[সংখ্যা ।।০, বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ৬।।০, ষাণ্মাসিক ৩।০]

[কার্য্যালয়— ... লেন, কলিকাতা।]

সচিত্র মাসিক পত্র

চতুর্থ বর্ষ

প্রথম খণ্ড

বৈশাখ—আশ্বিন (১৩৩৮)

সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

—পঞ্চপুষ্প কার্য্যালয়—

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী

বৈশাখ—আশ্বিন

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বর্ণানুক্রমিক চিত্র সূচী

ত্রিবর্ণ চিত্র

হৃদয়-যমুনা

শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

৪র্থ বর্ষ প্রথমার্দ্ধ | বৈশাখ, ১৩৩৮ | প্রথম সংখ্যা

সঙ্কীর্ত্তন

রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, এম-এ

সঙ্কীর্ত্তন গান অতি দুরূহ ব্যাপার, কীর্ত্তন-প্রচলিত তাল ও সুর সকল সচরাচর প্রচলিত তাল ও সুর হইতে অনেক বিভিন্ন; বহুদিন ধরিয়া সুদক্ষ গায়কের নিকট শিক্ষা না করিলে উহাতে দক্ষতালাভ করা যায় না। কীর্ত্তনের গান আবার পর্য্যায় (পালা) অনুসারে করিতে হয়; উহার পর্য্যায়ও অসংখ্য, সুতরাং বহুসংখ্যক পদ (গান) অর্থবোধ-সহকারে আয়ত্ত করিতে না পারিলে সঙ্কীর্ত্তন-গানে কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায় না। অধিকাংশ পদগুলি শাস্ত্রদর্শী সুপণ্ডিতগণের দ্বারা রচিত, ও বহুপদ সংস্কৃত-ভাষায় ও প্রাচীনভাষায় লিখিত; একারণ পদগুলি অর্থবোধ সমেত আয়ত্ত করিতে হইলে সবিশেষ ভাষাজ্ঞানের ও অনেকটা সংস্কৃত জ্ঞানের প্রয়োজন। বৈষ্ণবপদগুলির প্রতি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে সেগুলি বটতলার তুলট কাগজের পুস্তকে ও তদানীন্তন অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকদের হস্তলিখিত পুথিতে নিবদ্ধ ছিল; সুতরাং অনেক পদের পাঠ বিকৃত হইয়া বহুস্থানে "ধট, কচু অথনি"র অভাব হয় নাই। অনেক অল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর লোকের মুখে মুখে গীত হইয়া ঐ সকল বিকৃত পাঠ আরও বিকৃত হইয়া গিয়াছিল ও অনেক নূতন বিকৃতির সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং অনেক পদের অর্থবোধও সুকঠিন হইয়া উঠে। সুখের বিষয় শ্রদ্ধাস্পদ সঙ্কীর্ত্তনানুরাগী সাহিত্যিক স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয়দ্বয় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানকালের ভক্তি-শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য লোকগুরু পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রভৃতি সুপণ্ডিতগণের উদ্যমে বৈষ্ণবপদাবলীর পাঠ-বিশুদ্ধি-বিষয়ে অনেক উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে। এখন অনেক অল্পশিক্ষিত গায়কও পূর্ব্ব গায়কদের ন্যায় পদগুলির অশুদ্ধ আবৃত্তি করে না। সঙ্কীর্ত্তনের গানের তাল, সুর, ভাষা, উহার বহিরঙ্গ মাত্র; উহার ভাব ও রস উহার অন্তরঙ্গ, উহার মজ্জা ও নির্য্যাস। ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বুঝাইবার বস্তু [illegible] উহা

অনুভবের বিষয়; গায়কের অনুভূতি হইতে উহা শ্রোতৃ-মণ্ডলীর উপর আপন প্রভাব বিস্তার করে। গায়কের সরল অনুভূতিজনিত আবেগপূর্ণ একবিন্দু অশ্রু, মুহূর্ত্তকালীন কম্প, পুলক বা স্বরবিকৃতি সঙ্কীর্ত্তনকে অতি উচ্চে উন্নীত করে। সঙ্কীর্ত্তন-গানে গায়ক অকপটভাবে আপনি মজিতে পারিলে অপরেও মজিয়া যায়; গায়ক ব্রজ-জনৈকাশ্রয় নিকাম ভগবৎ-প্রেমের বর্ণনা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া অশ্রুপাত করিলে তাহা দেখিয়া কোন্ পাষাণ-হৃদয় অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারে?—ভাবসঙ্কীর্ত্তনগানের প্রাণ। ভাবের অভাবে অনেক সুকণ্ঠ তালসিদ্ধ গায়কের গান শ্রুতিমধুর হইয়াও মর্ম্মস্পর্শী হয় না। আবার অনেক গায়ক মধুরকণ্ঠ না হইয়াও ভাব-গদ্‌গদকণ্ঠে গান করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করেন। সঙ্কীর্ত্তন আবার দুই প্রকারের আছে—(১) নাম-সঙ্কীর্ত্তন; (২) লীলা-সঙ্কীর্ত্তন। প্রথমোক্ত কীর্ত্তন ভক্তিমূলক, কিয়ৎপরিমাণে স্বার্থমূলকও বটে, দ্বিতীয়োক্ত কীর্ত্তন প্রেমমূলক—রসাত্মক। মনুষ্যভাবে নিজ দুষ্কৃত্যাদি স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে ভগবন্নাম-গ্রহণ,ভগবৎ-কৃপা-প্রার্থনা ও দীনভাবে ভগবানের চরণে শরণাগতি নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য; ইহাতে সকলের সমান অধিকার। কিয়ৎকালের জন্য সংসার ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া, ভগবানের যে লীলায় কৃষ্ণগত-প্রাণ ব্রজবাসিগণ কিরূপে কৈতব-রহিত হইয়া, স্বসুখ-বাঞ্ছারহিত হইয়া একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দনের সুখের জন্য সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন,—ব্রজজনার্ত্তিহারীও তাঁহাদিগকে অনন্তলোকদুর্লভ কি প্রেমানন্দ-সুখ প্রদান করিয়াছিলেন, ব্রজগোপ-গোপীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ক্ষণেকের জন্য আপনাকে ব্রজবাসীর কোন ভাবে বিভাবিত করিয়া বৈষ্ণব-মহাজনগণের পদের সাহায্যে সেই লীলা আস্বাদন করার নাম লীলাকীর্ত্তন। "যৎ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।" এই কীর্ত্তনকে রসকীর্ত্তনও বলে। ইহাতে সকলের অধিকার সমান নয়, এই লীলারসাস্বাদনের পাত্রও অতি অল্প; এই জন্যই সঙ্কীর্ত্তনজনক শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

"বহিরঙ্গ সনে কর নামসঙ্কীর্ত্তন,
অন্তরঙ্গ সনে কর রসাস্বাদন।"

এ লীলায় পাপপুণ্যের গণনা নাই; আছে কেবল কৃষ্ণসুখে-ব্রজবাসীর সুখ; ব্রজবাসীর প্রেমাধীন হইয়া কৃষ্ণের সুখ। এ লীলায় ভগবান্ কৃষ্ণের ভগবত্তা নাই, থাকিলেও তাহা অতি প্রচ্ছন্ন। রাখালবালকগণ কতবার দেখিতেছে, কৃষ্ণ অসুরবধ ও অগ্নিপানাদি কত অমানুষিক কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু তাহারা পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাইতেছে, কৃষ্ণের যোগমায়া সব ভুলাইয়া দিতেছে। তাহাদের কানাই কানাই-ই আছে। ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিলে তাহারা কাঁধে চাপিতে পারিবে কেন? উচ্ছিষ্ট মিষ্টফল দিতে পারিবে কেন? তাহা হইলে যে ব্রজলীলা হইতে সখ্যরস অন্তর্হিত হইয়া যাইবে! জননী বাৎসল্যময়ী যশোদা কৃষ্ণসম্বন্ধে কত কথাই শুনেন, তাঁহার অপোগণ্ড শিশু কৃষ্ণের কত অলৌকিক কার্য্য দেখেন, তাঁহার মুখে ব্রহ্মাণ্ড দেখেন, তথাপি তাঁহার কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান হয় না। যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহার সব ভ্রম বলিয়া বোধ হয় ও তিনি শিশুর অমঙ্গল আশঙ্কায় কাতর হইয়া দেবতার নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করেন ও দেবোদ্দেশে পূজা অর্পণ করেন। পুত্রে দেবতা জ্ঞান হইলে বৃন্দাবনের বিশুদ্ধ বাৎসল্যরস তিরোহিত হইত। এই জন্যই দেবকীর বাৎসল্যে ও যশোদার বাৎসল্যে এত প্রভেদ। আর কৃষ্ণপ্রিয়াগণের তো কথাই নাই; কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রাণ, তাঁহারা কৃষ্ণকে দেবতা জানেন না, প্রাণবল্লভ জানেন, প্রাণের দেবতা জানেন। কৃষ্ণ একবার তাঁহাদের সম্মুখে চতুর্ভুজ হইয়া দাঁড়াইলে তাঁহারা সে রূপে দৃক্‌পাতও না করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক বলিয়াছেন, "তুমি কে গো দেবতা, আমাদের কৃষ্ণ কোথায় বলিতে পার?" ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কৃষ্ণ স্তুত হইয়া আপনিই বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্মা, তুমি 'নারায়ণ' আদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া কাহার স্তব করিতেছ? আমি নারায়ণ নহি, নারায়ণ তোমার পিতা—যাহার নাভি-নালে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তিনিই নারায়ণ। আমি সামান্য গোপবালক মাত্র, নন্দগোপ আমার পিতা।"—ব্রজলীলায় কৃষ্ণ কেবল স্নেহময় প্রেমময়, রসময়; সুতরাং এ লীলায় বিশুদ্ধ শান্তরসের ও বিশুদ্ধ দাস্যরসের বড় একটা স্থান নাই এখানে কেবল শুদ্ধ সখ্য ও বাৎসল্য ও শুদ্ধ মাধুর্য্যরস। পদকর্ত্তা

বৈষ্ণবমহাজনগণ স্বরচিত পদসমূহে অতি যত্নপূর্ব্বক এই সব রসের বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়াছেন। পদগুলি বিশদরূপে শ্রোতাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া রসপুষ্টির জন্ত ও অনেক ক্ষেত্রে তালপূরণের জন্ত গায়ককে পদের ভাব অনুসরণ করিয়া স্বরচিত ভাষায় অনেক কথা বলিতে হয়; উহাকে "আঁখর দেওয়া" বলে। আঁখর দিবার সময় যদি গায়কের অজ্ঞতা বা অসাবধানতাবশতঃ ঐ সব রসের ব্যত্যয় হয় বা একরসের সহিত অন্তরসের মিশ্রণ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা লবণাক্ত সন্দেশের ন্তায় ক্ষোভজনক হইয়া উঠে। উহাকে 'রসাভাস' দোষ বলে। গায়কের পক্ষে এই দোষ বড় গুরুতর। কৃষ্ণসখাদের বিশুদ্ধ সখ্যভাব; তাহাদের কৃষ্ণ সম্বন্ধে বাৎসল্য নাই ও তাহারা মাধুর্য্যের সংবাদ রাখে না, কেন না তাহা হইলে রসাভাস হয়। গোপী সঙ্গে সঙ্গত হইবার সময় কৃষ্ণ তাহাদিগকে সঙ্গে লন না। কৃষ্ণের প্রিয় নর্ম্মসখা সুবল, ও কৃষ্ণের বিদূষক ব্রাহ্মণ-কুমার মধুমঙ্গল ব্যতীত অন্ত কোন সখা গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের প্রণয়ের বিষয় অবগত নহে। কিন্তু 'সুবল-সংবাদ'ও প্রকৃত রস নয়, উহা 'উপরস' বলিয়া কথিত হয় এবং সুবল-সংবাদে কোনও প্রাচীন মহাজনের পদ নাই। বলরাম বলিষ্ঠ ও কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার সখ্যে কিঞ্চিৎ বাৎসল্য মিশ্রিত থাকা স্বাভাবিক হইলেও, কৃষ্ণের গোপী-প্রেমের সংবাদ তাঁহার রাখিবার উপায় নাই। রাখালবালক সকল মণ্ডলী রচনা করিয়া যখন গোষ্ঠে গমন করে বা গোষ্ঠ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করে, তখন পথিমধ্যে কৃষ্ণের রাধিকা-দর্শনের সুযোগ থাকিলে একটা ব্যপদেশ করিয়া বলরামকে অন্যান্ত বালক সঙ্গে লইয়া অগ্রে যাইতে বা আসিতে হয়। গোপী-সঙ্গে রজনী যাপন করিয়া আসিয়া কৃষ্ণ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছেন। তিনি আসিবার সময় ব্যস্ততাবশতঃ ভ্রমক্রমে গোপীর নীল-বসন পরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার জননী যশোদা তাহা বুঝিলেন না। তিনি বলিলেন, "রামক নীল বসন কাহে পিথ, বাবা, তুমি বলরামের নীলবস্ত্র পরিধান করিয়াছ কেন?" যে কোন ভাবে তাহার নিম্নতর ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু তাহার সহিত অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের সংমিশ্রণ হইতে পারে না। সখ্যে দাস্ত প্রচ্ছন্ন আছে, কিন্তু বাৎসল্যাদি নাই। বাৎসল্যে সখ্য দাস্ত প্রচ্ছন্ন আছে। মাতা দাসীর ন্তায় সেবা করেন; মাতার ন্তায় সুহৃদ্ কে আছে? কিন্তু বাৎসল্যের সহিত মাধুর্য্যের দেখা-শুনা হইবার উপায় নাই। মাধুর্য্যে অন্যান্ত রস প্রচ্ছন্ন আছে; গোপী কৃষ্ণের কি নহেন? দাসী, সখী, স্নেহকারিণী কান্তা। এইজন্ত মধুররস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ও লীলা-সঙ্কীর্ত্তনে মধুররসেরই প্রাধান্ত। কৃষ্ণ সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের, সর্ব্ব মাধুর্য্যের আধার; সুতরাং তিনি সুন্দরতম, মধুরতম। তাঁহার শক্তি অর্থাৎ তিনি ভিন্ন পূর্ণমাত্রায় তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে কে পারে? কিন্তু তিনি আপনি ব্যতীত যদি অন্তে কেহ ঐ অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য উপভোগ করিতে না পাইল, তবে তাঁহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের প্রয়োজন কি; সার্থকতা কি? আবার যদি কাহারও কর্তৃক পূর্ণমাত্রায় ঐ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আস্বাদিত না হইল, তবে তাঁহার এত সুন্দর, এত মধুর হইবার প্রয়োজন কি ছিল, সার্থকতা কি ছিল? সেইজন্তই তাঁহার নিজ অসংখ্য শক্তির মধ্যে সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য-গ্রাহিণী শক্তি,—তিনিই উহা আস্বাদন করিয়া আপনিই বিভোর হইয়া যান। এই কৃষ্ণসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যআস্বাদন-কারিণী কৃষ্ণশক্তিই বৈষ্ণবদিগের হ্লাদিনী শক্তি রাধা; কৃষ্ণের সহিত অভেদাত্মিকা। আর কৃষ্ণের অসংখ্য শক্তির মধ্যে যেগুলি ঐ হ্লাদিনী শক্তির পরিপুষ্টিকারিণী তাহারা, সুতরাং রাধিকা-সহচরী সখী। কৃষ্ণ সুন্দরতম, মধুরতম, সেইজন্ত তিনি রসরাজ, সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ, অপ্রাকৃত নবীনমদন, পরমপুরুষরূপে পরিকল্পিত; রাধা কৃষ্ণসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যমুগ্ধা, কৃষ্ণপ্রেমময়ী, কৃষ্ণভাবনাময়ী, পরদেবতা পরা প্রকৃতি। কৃষ্ণ নিজশক্তি দ্বারা নিজ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, ইহাই রসরাজ কৃষ্ণ ও মহাভাবিনী রাধার পরস্পর প্রেমসম্পদ; এই প্রেম মানুষিক নহে; এই প্রেম নৃলোকে হয় না। এই প্রেমের বর্ণনা মনুষ্যের ভাষায় হয় না। কিন্তু মনুষ্যকে মানুষের ভাষায় বর্ণনা করিতে হইবে। সেইজন্ত রাধাকৃষ্ণ একাত্মক হইলেও ইহাদিগকে পৃথক্ করিতে হইয়াছে। পুরুষের সৌন্দর্য্য রমণীই অনুভব করিতে পারে। কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য পূর্ণভাবে 'একমাত্র' রাধিকার আস্বাদ্য, এই জন্য কৃষ্ণ

সাধারণতঃ বহুবল্লভ হইয়াও প্রধানতঃ রাধিকাবল্লভ। আস্বাদনকারিণী প্রকৃতি (শক্তি) রাধা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি। যে সব অন্য শক্তিও কিয়ৎপরিমাণে আস্বাদন করিতে পারে, তাহারাও এই হ্লাদিনী শক্তির অংশ মাত্র, ঐ শক্তির পরিপুষ্টিকারিণী, ইঁহারাও কৃষ্ণকান্তা; কিন্তু ইঁহারা রাধকৃষ্ণের সুখেই সুখী। ইঁহারা রাধার পার্শ্বচরী সখী ইঁহারা আত্মসুখের গণনা করেন না, রাধার সহিত কৃষ্ণের মিলন সংঘটন করাইতে পারিলেই পরম সুখী হন। ভগবান্ কৃষ্ণ শুদ্ধ চিন্ময়, শুদ্ধ আনন্দময়, শুদ্ধ প্রেমময়, শুদ্ধ রসময়; কৃষ্ণকান্তাগণ শুদ্ধ চিন্ময়ী, শুদ্ধ আনন্দময়, শুদ্ধ প্রেমময়ী, শুদ্ধ ভাবময়ী। বৈষ্ণব কবি ও মহাজনকে মনুষ্যের ভাষায় এই তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া দায়ে পড়িয়া ইহাদিগকে মানবোচিত দৈহিক চেষ্টাদি দিতে হইয়াছে, ইঁহাদের রূপলাবণ্যাদি অঙ্কিত করিতে হইয়াছে, ইঁহাদিগকে অলঙ্কারাদি দিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সকলকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়াছেন যে, এই সব দেহাদি আমাদের ন্যায় রক্তমাংসময় নয়, প্রাপঞ্চিক বা কল্পিত নয়, নিত্য। উহা প্রপঞ্চজগতে প্রকাশিত হইলেও মর্ত্ত্যধামে আবির্ভূত হইলেও মরণ-ধর্ম্মের অতীত। ঐ মূর্ত্তি "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি"-নয়নে দর্শন করিতে হয়। এদিকে আবার সকল মনুষ্যের মধ্যেই আনন্দগ্রাহিণী শক্তি আছে। কোন না কোন বস্তুতে আনন্দবোধ করে না এমন মনুষ্য কেহ নাই। ঐ শক্তিও হ্লাদিনীর অংশীভূত। এই হ্লাদিনী শক্তি জীবের অন্তর্নিহিত থাকে বলিয়াই বৈষ্ণবকবি বলেন, 'জীব কৃষ্ণ নিত্যদাস; নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম' ইত্যাদি। কিন্তু যদি ঐ শক্তিকে অনিত্য বিষয় ভোগানন্দ-সুখ হইতে অপসৃত করিয়া ভগবৎ-সৌন্দর্য্যভাব-মাধুর্য্যের অনুভূতির দিকে উন্মুখী করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অনিত্য আনন্দের পরিবর্ত্তে শাশ্বত ভূমানন্দ, প্রেমানন্দ লাভ করা যায়। মনুষ্যের এই আনন্দগ্রাহিণী শক্তি এইরূপে উন্নত ও উজ্জ্বল হইলে কৈতবশূন্য, কামগন্ধশূন্য হইয়া কেবল কৃষ্ণসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে আকৃষ্ট হইলে হ্লাদিনী শক্তির পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন, হ্লাদিনী কেবল কৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন এমন নহে, কৃষ্ণ-অনুগত-জন মাত্রকেই কৃষ্ণানন্দরস পান করাইয়া থাকেন। কিন্তু যে সকল শক্তি বা বৃত্তির বিকাশ না হইলে ঐ আনন্দ-গ্রাহিণী শক্তির উন্নতি, উজ্জ্বলতা ও কামগন্ধশূন্যতা সাধিত হয় না, সেগুলির বিকাশ করিতে হইলে জড়দেহ লইয়া সংসারের বিষয়ভোগে ডুবিয়া থাকিলে চলিবে না।

"ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি"—

(মনু, ২।৯৪)

সর্ব্বদা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন, অনুধ্যান করিতে করিতে নিজ জড়দেহ ভুলিয়া ভাবনাময় দেহে আপনাকেও ঐ লীলায় উপস্থিত দেখিতে হইবে। কল্পনানেত্রে কোনও সহচরীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ঐ অপ্রপঞ্চ লীলা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। এইরূপে সহচরীগণ সমন্বিতা রাধার কৃষ্ণসেবার পরিপাটি দেখিতে দেখিতে, সহচরীগণের রাধানুগতি দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের সকলেরই আত্মসুখগণনাপরিশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে একান্ত আত্ম-বিসর্জ্জন দেখিতে দেখিতে, রাধাকৃষ্ণসেবায় কোন অংশের ভাগ লইবার জন্য লোভ স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইবে। রাধাকৃষ্ণলীলা আস্বাদন ও অনুশীলনের স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই। উহার এমনই উন্মাদিনী শক্তি যে, নিষ্কামভাবে জড়দেহ লইয়াও সংসারের নানা চিত্তবিক্ষোভের মধ্যে কিয়ৎক্ষণের জন্যও উহার আস্বাদন ও অনুশীলন করিতে করিতে মনে হয় যেন বৃন্দাবনেই আছি। উল্লিখিত লোভযুক্ত হইয়া একান্ত মনে সর্ব্বদা রাধাকৃষ্ণলীলা স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন করিতে পারিলে ভাবদেহে বৃন্দাবনে বাস অসম্ভব বা অত্যুক্তি নয়। ইহাই বৈষ্ণবদিগের সখী-অনুগতি, গোপীভাবে ইহাই নরোত্তম দাস ঠাকুরের 'কবে বৃষভানুপুরে আহীর গোপের ঘরে তনয়া হইয়া জনমিব।'

গোপীভাবে পুরুষকে শাড়ী পরিতে হয় না, ইহার সহিত বাহ্যবেশের সংস্রব নাই; এ ভাব ভাবনাসিদ্ধ; বেশসিদ্ধ নয়। এভাবে রমণীকেও কোন পার্থিব পুরুষকে "আমি রাধা তুমি শ্যাম" এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয় না। এভাব-ভাবিত জনগণের সকলেই ভাবদেহে প্রকৃতি; আর ইঁহাদের সকলেরই একমাত্র পতি পরমপতি পুরুষপ্রধান অপ্রাকৃত নবীনমদন ব্রজেন্দ্রনন্দন। নন্দনন্দন ব্যতীত তাঁহারা অন্য পুরুষের মুখদর্শন করেন না ও কাহারও

উপায় নাই; কেন না সেখানে, সেই ভাবরাজ্যে, সেই প্রেমের রাজ্যে সেই কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য পুরুষের এবং কৃষ্ণপ্রেমরসভাবিতমতি রমণী ভিন্ন অন্য নারীর প্রবেশ করিবার শক্তি বা অধিকার নাই। রাধারাণীর প্রতিষ্ঠিত এই ভাবের হাটে কোনও নরনারীর প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ। এখানে প্রবেশ করিতে হইলে দ্বারদেশে একখানি প্রবেশ-পত্রী দেখাইতে হয়। ঐ প্রবেশপত্রীর মূল্যও সামান্য নয়। উহা সংগ্রহ করিতে হইলে আপনার পার্থিব সর্ব্বস্ব দান করিয়া প্রথমতঃ কামনাশূন্য লালসার মূল্যে কৃষ্ণ ভক্তিরসভাবিতমতিরূপ প্রবেশপত্রী সংগ্রহ করিতে হয়।

এই সকল কারণে রসসঙ্কীর্ত্তনের গায়ককে বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে হয়; তাঁহাকে দেখিতে হয় যেন এক ভাবের বা রসের গানের সহিত ভাবান্তর বা রসান্তরের অযথা সংমিশ্রণ না হয়। তাঁহাকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয় যে, যদিও তিনি কান্ত-কান্তা ভাবের গান, প্রেমের গান গায়িতেছেন,—সে প্রেম পার্থিব নয়, সে গান সামান্য নরনারীর প্রেমে প্রযোজ্য নয়। সে প্রেম উন্নত উজ্জল "নির্ম্মল ভাস্কর," "অন্যতম কাম" নয়। সে প্রেম পরম সুন্দর, পর মধুর, ভগবানের প্রতি নিষ্কিঞ্চনা ভক্তির চরম বিকাশ; সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব যা অধিরূঢ় মহাভাব। কৃষ্ণ সামান্য নায়ক নহেন, রাধিকা সামান্য নায়িকা নহেন। রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন; কৃষ্ণই রাধা হইয়া আপন সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আস্বাদন করেন এবং রসিকশেখর করুণাময় কৃষ্ণ, জীবের প্রতি করুণা-বশে রাধার আদর্শ জীবের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া জীবকে সেই আদর্শ ধরিয়া তাঁহার প্রতি নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি ও অকৈতব প্রেমসাধন করিতে প্ররোচিত করেন এবং জীবের পক্ষে রাধা-প্রেমের আদর্শ ধরিয়া প্রেমভক্তি সাধন করা সহজ নয় জানিয়া পরমকরুণ কৃষ্ণ স্বয়ং রাধার ভাবকান্তি লইয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ উন্নতোজ্জল রস, স্বভক্তিশ্রী নিজ আবরণে কলির জীবকে সম্যক্‌প্রকারে দেখাইয়া দিয়াছেন।

রসকীর্ত্তন গানের কোন কোন স্থানে অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত হাস্য অদ্ভুত ইত্যাদি রসের অবস্থিতি থাকিলেও উহাতে বীর, রৌদ্র, ভয়ানকাদি

রসের তাদৃশ স্থান নাই। উহা প্রধানতঃ করুণরসাত্মক। উহাতে গোপবালকগণ কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইলে ম্রিয়মাণ থাকে। তাহারা প্রভাতেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই মাঠে যাইবার জন্য কৃষ্ণকে আহ্বান করিতে যায়; যশোমতী কৃষ্ণকে পাঠাইতে না চাহিলে তাহারা দুঃখে কাঁদিয়া ফেলে, তাঁহাকে কত বুঝায়। কৃষ্ণকে গোষ্ঠে লইয়া তাহারা তাহাকে কষ্ট পাইতে দেয় না, রাজা সাজাইয় কদম্ববৃক্ষের ছায়ায় বসাইয়া রাখে, বনে মিষ্ট ফল পাইলে তাহাকে খাওয়াইয়া, তাঁহার বৎস রক্ষণাবেক্ষণ করে। তিনি বাঁশী বাজাইলেই ও তাহাদের সহিত খেলা করিলেই তাহারা পরিতুষ্ট, তাহারা আর কিছু চায় না। তাহারা সকলেই ভাবে, কৃষ্ণ আমার ন্যায় আর কাহাকেও ভালবাসে না। সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণচন্দ্রকে গৃহে যশোদার নিকট দিয়া তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে আপন আপন ঘরে যায়। রাত্রিতে মায়ের কোলে ঘুমাইতে ঘুমাইতে তাহারা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়া উঠে; ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে তাহারা বনফুলের মালা গাঁথিয়া কৃষ্ণকে অর্পণ করে। বাৎসল্যময়ী যশোদা করুণার প্রস্রবণ, তিনি গোপালকে নয়নের অন্তরালে, তাহার অঞ্চলের বাহিরে যাইতে দিতে চান না। দধিমন্থনকালে তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার নবনীত-কোমল মুখে নয়ন স্থাপন করিয়া নবনীত প্রস্তুত করেন, চঞ্চল বালক প্রাঙ্গণের বাহিরে গেলে তিনি মৃতপ্রায় হন। "আঙ্গিনার বাহির হইয়া, যদি গোপাল খেলে গিয়া, তবে প্রাণ ধরিতে না পারি।" গোপ-বালকেরা তাঁহার কৃষ্ণকে গোষ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য আসিলে তিনি কাঁদিয়া অস্থির হন; কিছুতেই গোপালকে ছাড়িতে চান না। তাহাদের বহু বিনয়ে এবং জাতিবৃত্তির অনুরোধ ও কৃষ্ণের বিবিধ সান্ত্বনায় সম্মত হইয়াও তিনি কৃষ্ণের বেশ-বিন্যাস ব্যপদেশে বহু বিলম্ব করেন। বেশ-বিন্যাস করিবার সময়ে কৃষ্ণের কোমল মুখ ঘর্ম্মাক্ত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে পরিশ্রান্ত মনে করিয়া কাঁদিয়া আকুল হন; তাঁহার স্তনদ্বয় হইতে ক্ষীরধারা প্রবাহিত হইতে থাকে।" "স্তনক্ষীরে আঁখিনীরে বসন ভিজিয়া পড়ে।" তিনি পুনরায় গোপাল বালকগণের নিকট কৃষ্ণকে অন্ততঃ সেদিনের মত গৃহে

রাখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। কৃষ্ণ ও বালকগণ পুনরায় তাঁহাকে বুঝাইলে, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে রক্ষামন্ত্র পড়িয়া কৃষ্ণের সর্ব্বঅঙ্গে করস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বলরামের হস্তে সমর্পণ করেন ও তাঁহাদিগকে দূরস্থিত বনে যাইতে নিষেধ করিয়া দেন, বলিয়া দেন "এত নিকটে থাকিবি যেন সেখান হইতে তোর বাঁশী শুনা যায়।" কৃষ্ণের ধড়ার অঞ্চলে বনে গিয়া খাইবার জন্য প্রচুর নবনীতাদি বাঁধিয়া দেন, কিন্তু সে সময় তাঁহার সংজ্ঞা থাকে না, তিনি কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। "... ... ... কৃষ্ণপাণিং নিধায়, নয়নগলিতধারা নন্দজায়া পপাত।" রোহিণীর সান্ত্বনায় সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি কৃষ্ণগুণ গান করিয়া কৃষ্ণ-চিন্তায় কোনরূপে দিনটা অতিবাহিত করেন। সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণ গৃহে প্রতিগত হইলে, তিনি তাঁহার পরিশ্রান্ত ধূলিঘর্ম্মাক্ত শুষ্ক বদন দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন; বলেন, "হাঁরে নন্দদুলাল, হাঁরে আমার বাপের ঠাকুর, এতক্ষণ কি বনে থাকিতে হয়? ঘরে মা মরিয়া যায়, তুই সে ভাবনা ভাবিস না। তোর মুখ কেন শুকাইয়া গিয়াছে; তুমি বনে কিছু নাই, কেবল চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া খেলিয়া বেড়াইয়াছ; আমি যে নবনীত দিয়াছিলাম তাহা বুঝি ফেলিয়া দিয়াছিলে?" বাৎসল্যের এ স্নেহের করুণার এ প্রস্রবণের ক্লান্তি নাই, বিরতি নাই। আর রাধিকার ত কথাই নাই; তিনি এক বিশ্রামরহিত অশ্রুধারা, শ্যাম-সাগরোন্মুখী এক অশ্রুপ্রবাহিনী এক কারুণ্যতরঙ্গিণী। তিনি কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইলেও কাঁদিয়া আকুল, দেখিলেও কাঁদিয়া আকুল, কৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে রাখিয়াও কাঁদিয়া আকুল, কৃষ্ণ কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াও কাঁদিয়া আকুল; "দুহুকোরে দুহু কাঁদে।" "তাহার ভাগ্যে হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া কাঁদিতে জনম গেল।" এই সকল রসের বিশুদ্ধি রক্ষা ও পুষ্টিসাধন অর্থাৎ প্রগাঢ়তাবৃদ্ধির জন্য গায়ককে বিশেষ যত্নশীল হইতে হয়। গভীরতা না থাকিলে আপনিও ডুবিতে পারা যায় না, অপরকেও ডুবাইতে পারা যায় না, এই ডুবা ও ডুবানই কীর্ত্তগানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সঙ্কীর্ত্তন গানে আবার দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধীয়, বিশেষতঃ কালসাম্য সম্বন্ধীয়, অনেক বিধিনিষেধ আছে। অনেক গান ঋতুবিশেষে গেয়, অন্য ঋতুতে সেগুলি গান করা চলে না, কতকগুলি পর্য্যায় দিবসের বা রাত্রির সময়বিশেষে গেয়, অন্য সময়ে তাহা গান করা চলে না; কতকগুলি আবার জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে, কতকগুলি অন্ধকারময়ী রজনীতে, গেয়; তাহার ব্যত্যয় করিলে চলে না। জয়দেব গাইবার অনুরোধে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে, "চল সখি কুঞ্জং, সতিমিরপুঞ্জং" গাইলে দোষ হয়। কৃষ্ণসঙ্গপ্রাপ্তি জন্য ব্যাকুলা কলহান্তরিতা রাধাকে "কৃষ্ণ আনিয়া দিতেছি" বলিয়া আশ্বাস দিয়া গিয়া একজন বিদেশিনীকে সঙ্গে আনিলে ও তাহার সহিত রাধাকে আমোদ-কৌতুকে প্রবৃত্ত করাইলে রাধার কৃষ্ণার্থ-ব্যাকুলতা সব মিথ্যা হইয়া যায় ও রাধার রাধাত্ব লোপ পায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কীর্ত্তন গানের অসংখ্য পর্য্যায়। পূর্ব্বোক্ত রসাদি এবং এই সকল পর্য্যায়ের বিষয় অবগত হইলে, গায়কের পক্ষে বৈষ্ণবদিগের ভক্তি-শাস্ত্রের ও রস-শাস্ত্রের আলোচনা আবশ্যক। প্রত্যেক পর্য্যায়ের উপযোগী দুই চারিটী শ্রীগৌরাঙ্গসম্বন্ধীয় গান আছে। সে গানগুলিও গায়কের আয়ত্ত থাকা চাই। কোন পর্য্যায়ের গান করিতে হইলে অগ্রে তদুচিত গৌরাঙ্গ-বিষয়ক গান একটী করিতে হয়; উহাই গানের "গৌরচন্দ্র"—প্রস্তাবনা। গৌরচন্দ্র শুনিলেই কি পর্য্যায়ের গান হইবে বুঝা যায়। একারণ এক পর্য্যায়ের "গৌরচন্দ্র" অন্য পর্য্যায়ের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া চলে না। কীর্ত্তনের গানের প্রারম্ভে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক গান করার প্রথার উৎপত্তির কারণ এই,—লীলা-কীর্ত্তনের গান অধিকাংশই আদিরসাত্মক, উহা যেখানে সেখানে যাহার তাহার দ্বারা যে সে লোকের সম্মুখে গেয় নয়। সকলে কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমমাহাত্ম্য বুঝিতে পারে না,—সেই জন্যই মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ-সঙ্গে রসিক ভক্ত-সঙ্গে উহার আস্বাদন গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিতে হইলে সঙ্কীর্ত্তনের গান শুনাই প্রায়শঃ মনুষ্যের ভাগ্যে ঘটে না; কেননা গায়ক ও শ্রোতৃবর্গের সকলেই বা অধিকাংশই রসিক ভক্ত হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না। মহাপ্রভু পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গম্ভীরা

মধ্যে নির্জ্জনে শ্রীরাধার কোন ভাবে আবিষ্ট হইয়া আত্মহারা হইলে তদীয় প্রিয় সহচর স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায় তাঁহাকে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব প্রভৃতি বৈষ্ণবকবিগণের তদ্ভাবোচিত সঙ্গীত শুনাইয়া তাঁহার সুস্থতা বিধান করিতেন। কিন্তু স্বরূপ-দামোদর আজন্ম বিরক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, রায় রামানন্দ নামে মাত্র বিষয়ী; স্বভাবে জিতেন্দ্রিয় নির্ব্বিকার রসিক ভক্ত। মহাপ্রভুর কথাই নাই। ইহারা যে রসাস্বাদন করিবার অধিকারী, অন্যের ভাগ্যে সে রস আস্বাদনের আশা করাই ধৃষ্টতা মাত্র! তাই বৈষ্ণব ভক্তগণ এই অসুবিধা পরিহারের জন্য এক অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। যে পর্য্যায়ের গান সঙ্কলিত হয়,—গায়ক প্রারম্ভেই সেই পর্য্যায়ের উপযোগী ভাবব্যঞ্জক মহাপ্রভুর এক অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন-স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। তাহার পর সেই প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর সম্মুখেই যেন তাঁহার সেই বর্ণিত ভাবের উপযোগী গীত-সমূহ (রাধাকৃষ্ণের মিলন পর্য্যন্ত) গীত হয়। এই কারণেই 'গৌরচন্দ্র গান' গাইবার সময় সঙ্গীতস্থলে মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠার সময় শ্রোতা গায়ক সকলেই ভক্তিভরে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। 'গৌরচন্দ্র' গান শেষ হইলে অর্থাৎ গৌরচন্দ্র আসন পরিগ্রহ করিলে, তবে সকলে বসিতে পান। মহাপ্রভুর উপস্থিতির উপলব্ধি বশতঃই সঙ্কীর্ত্তন-স্থলে পাদুকাদি লইয়া গমনাগমন ও ধূমপানাদি অতীব নিষিদ্ধ। সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে 'গৌরচন্দ্র' গানের প্রথা কি সুন্দর, কি ভক্তিব্যঞ্জক, কি কৌশলময়! উহা ত একদিকে যেমন লীলাকীর্ত্তনগানের সুযোগ হয়, অপরদিকে তেমনই সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতা মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও সঙ্কীর্ত্তনস্থলের গৌরব বিধান ও পবিত্রতা-রক্ষা সংসাধিত হয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় অনেক শ্রোতা গৌরচন্দ্র গানই যে গানের শ্রেষ্ঠাংশ, গানের কীলক তাহা না বুঝিয়া বলিয়া থাকেন,—"অগ্রে গৌরচন্দ্রের খচবচিটা চুকিয়া যাক্, তাহার পর গান শুনিতে যাইব।" আজকাল আবার অনেক গায়কও গৌরচন্দ্র গানের সময় দণ্ডায়মান হন না, শ্রোতাদের তো কথাই নাই।" তাঁহাদের বৈষ্ণবতা, তাঁহাদের গৌরাঙ্গভক্তির বলিহারি যাই। কলিকাতায় পাদুকা ব্যবহার করিয়া কীর্ত্তনস্থলে যাওয়ার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। পল্লীগ্রামে এ সকল অনুচিত ব্যবহার অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। একবার এক পল্লীগ্রামে কীর্ত্তনের গান হইতেছিল—একজন শ্রোতা গান শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া উল্লাসভরে কয়েকটী ইংরাজী বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, সংকীর্ত্তনস্থলে ইংরেজী ভাষা ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহারের জন্য সে বেচারাকে শত দিক্ হইতে তিরস্কার ও ভ্রূকুটিবিক্ষেপ সহ্য করিতে হইয়াছিল সে সেই গ্রামের জামাতা না হইলে তাহাকে সঙ্কীর্ত্তনস্থল হইতে বিতাড়িত হইতে হইত। কিন্তু কলিকাতার ন্যায় স্থান বোধ হয় এরূপ শাসন অসম্ভব।

রায় রসময় মিত্র বাহাদুরের জীবনের শেষ অধ্যায়

শ্রীললিতমোহন সিংহ, এম-এ, বি-এল, বি-টি

মাননীয় রসময়বাবুর জীবন-কাহিনী তাঁহার স্বহস্তলিখিত পুস্তকে বিশেষভাবে বিবৃত আছে এবং তাঁহার কার্য্যাবলিও সমবেত সুধীবৃন্দের অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহার এই শোক-সভায় তৎসম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলিবার নাই, তবে যে ভাবে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে তাহার সঠিক বিবরণ অনেকেই সম্ভবতঃ অবগত নহেন; আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই বিবরণ যথাযথভাবে প্রকাশিত হইল। এক্ষণে আপনারা বিবেচনা করিবেন তাঁহার এই দেহত্যাগ সাধারণ মনুষ্যের দেহত্যাগের ন্যায় অথবা ইহাতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

দেহত্যাগের আনুপূর্ব্বিক বিবৃতি

৪ঠা বৈশাখ শুক্রবার—রসময়বাবু দেহত্যাগের পূর্ব্বে ৩।৪ মাস কাল রাত্রেও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন এবং ঐদিন পাঠে বিশেষ রাত্রি হওয়ায় তাঁহার এক পৌত্রী জিজ্ঞাসা করেন, দাদামহাশয়, আপনি আবার এত রাত জাগিয়া পড়িতেছেন কেন? তাহাতে তিনি বলেন, তোমরা যেমন পরীক্ষার জন্য পড় আমিও সেইরূপ পড়িতেছি। তাহাতে পৌত্রীটী হাসিয়া বলিল, দাদা মহাশয়ের আবার পরীক্ষা কিসের? তাহাতে তিনি বলেন, আমাকে এক বড় মাষ্টারের নিকট পরীক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে উপস্থিত সকলে রহস্য মনে করিয়া হাসিয়াছিলেন।

৫ই বৈশাখ শনিবার—ঐদিন তাঁহাকে University Instituteএ রাণী ভবানী হাইস্কুলের পারিতোষিক-

বিতরণ-সভায় যোগ দিতে হয়। রাত্রি ৭॥০ টার সময় সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিছুকালের জন্য পৌত্রী-দিগকে পড়ান, পরে ভাগবতপাঠ অন্তে আহারাদির পর সেদিন তাঁহার বেশ সুনিদ্রা হইয়াছিল। রাত্রি ৪টার সময় সামান্য অম্বল হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভাস্কর-লবণ চা'ন কিন্তু তাহা বাটীতে না থাকায় তিনি সে সময় "সোডি বাইকার্ব" সেবন করেন। তিনি রাত্রিতে নিদ্রান্তে জাগ্রত অবস্থায় প্রায়ই কীর্ত্তন করিতেন এবং ঐদিনও ঐ সময় মৃদুস্বরে নিম্নলিখিত কীর্ত্তনটী গাহিতে থাকেন :—

"ব্রজের সখা দাও হে দেখা,
হেরে তোমায় প্রাণ জুড়াই ;
নেচে নেচে মধুর হেসে,
দাঁড়াও এসে ভাই কানাই।

কীর্ত্তন-শেষে তিনি প্রণব মধ্যস্থিত যুগলমূর্ত্তির চিত্র-পটের দিকে মুখ ফিরাইয়া সতৃষ্ণনয়নে চাহিতে থাকেন। ঐ চিত্রপটটী তাঁহার শয্যাপার্শ্বে মস্তকের উপরেই ঝোলান থাকিত। এক্ষণে যে ভাবে শয়ন করিলেন তাহাতে তাহা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছিল। ঐ সময় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রও তাঁহার নিকটে ছিলেন। ঘড়িতে ৫টা বাজার শব্দ শুনিয়া তিনি তাঁহাকে "সকাল হইতে বেশী দেরী নাই তুমি শোওগে" বলেন। তাঁহার পত্নীও নিকটে ছিলেন। তিনি তাঁহাকে গাঢ়ভাবে নিদ্রা যাইতেছেন দেখিয়া প্রায় ৬টার সময় পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় তিনি যে গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন তাহার দ্বার আস্তে আস্তে বন্ধ করিয়া নীচে যান।

৭ই বৈশাখ রবিবার—প্রায় ৭টার সময় চাকরকে [illegible] (রসময়বাবুকে) তামাক সাজিয়া দিয়া যাইবে বলায় গিন্নি (রসময় বাবুর পত্নী) চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং বলেন কর্ত্তা কি এখনও উঠেন নাই? তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখেন তিনি যেন গাঢ়ভাবে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহাকে জাগাইবার চেষ্টা করা হয় কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারায় সকলে আসিয়া পড়েন এবং ডাক্তার দেখানও হয় কিন্তু
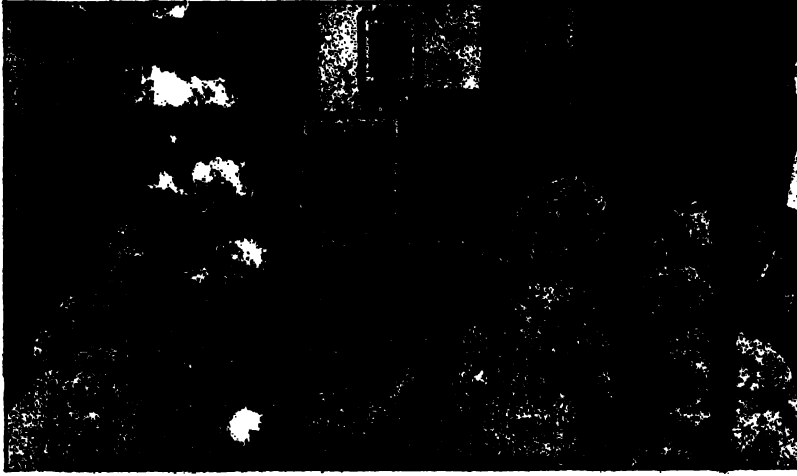
পরীক্ষাতে তাঁহার প্রাণবায়ু আর সেই দেহে নাই সিদ্ধান্ত হয়। আপনারা অনেকেই রসময়বাবুর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত এব পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চভাবে শিক্ষিত হইয়াও তিনি যে প্রাচ্য ধর্ম্ম-সেবী একজন উচ্চধরণের ভক্ত ও সাধক ছিলেন তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহার দেহ ত্যাগের বৃত্তান্তে

"অন্তকালে চ মামেব স্মরণ্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।"

এই ভগবৎবাক্যের এ ক্ষেত্রে সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাঁহার দেহত্যাগের সময় তাঁহার আজীবন আরাধ্য-দেবতা ব্রজের সখা নিশ্চয়ই মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন এবং তিনি হয় সাযুজ্য না হয় সামীপ্য লাভ করিয়া সাধকোচিত ধামে গমন করিয়াছেন বলিতে হইবে। অতএব আমরাও যেন তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া শেষের দিন এইরূপভাবে দেহত্যাগ করিতে পাই। তাহার সঙ্গলাভ আমাদের এই জীবনে আর ঘটিবে না সেই জন্য শোকপ্রকাশ স্বাভাবিক কিন্তু শেষ সময়ে আনন্দময়ের আনন্দের উপলব্ধির সহিত তাঁহার এই মর্ত্তধাম ত্যাগে আমাদের প্রাণেও আনন্দের আশা সঞ্চারিত হইতেছে এবং গোলকধাম-গত রসময় বাবু যেন আশীর্ব্বাদ করেন তাঁহার জীবনের শেষ যবনিকা আমাদের অনুকরণীয় হয় এবং আমরাও ব্রজের সখাকে দেখিতে দেখিতে যেন ইহধাম ত্যাগ করিতে পারি। *

---

* (১৩ই বৈশাখ, রবিবার ১৩৩৮ সাল (ইং ২৬শে এপ্রেল, ১৯৩১ সন) অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ১।১ চাল্তা বাগান লেনের স্নেহে শ্রীগৌরাঙ্গ মিলন মন্দিরে গোলোকধাম গত রায় বাহাদুর রসময় মিত্র মহাশয়ের স্মৃতি সম্মানার্থ শ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণব সম্মিলনী এক বিশেষ অধি- [illegible])

বৌদ্ধ কলা-শিল্পের অনুপ্রেরণা ও বাঘগুহার পরিচয়

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, এম-এ

দ্বিতীয় গুহা

বৌদ্ধরা আমরা দেখি মৃত্যু-সাধনাকে তাহাদের পরম ও চরম করিয়াছে। সংসারটাকে নিছক দুঃখ জ্ঞান করিয়া তাহারা শূন্য-বাদ দ্বারা সংসারকে অস্বীকার করিয়াছে সাধারণতঃ এইরূপই আমাদের ধারণা। কথাটা ঠিক এভাবে সত্য নয়। তাহাদের সাধনা মাত্র নাশের তপস্যা ধরিলেও চলিবে না।

বুদ্ধদেবের যখন মাত্র ষাটটী শিষ্য হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহাদের বলিতেছেন,—"যে ধর্ম্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ—তাহারই দূত হইয়া তোমরা দেশে দেশে সে ধর্ম্মকে প্রচার কর, দুই জনে এক পথে যাইও না।" যখন বিহার হইতে আরম্ভ হইল, তখন তিনি ব্যবস্থা দিলেন, বিহার নগরের মধ্যেও হইবে না, অতি নিকটেও হইবে না, অতি দূরেও না। নগরের ধারে প্রকৃতির রম্য স্থানেই বিহারের স্থান। প্রথম সঙ্ঘের আবাস হইল রাজা বিম্বিসারের উপবন বেড়ুবনে। মগধরাজের সাধের উপবনের অপেক্ষা সুন্দরতর স্থান বোধ হয় মধ্যদেশে আর ছিল না। সঙ্ঘ-গুলি প্রকৃতির অতি রম্যস্থানেই অবস্থিত। ইহা বৌদ্ধদের রুচিজ্ঞানের অকাট্য সাক্ষ্য দেয়। যে কোন বৌদ্ধ-স্থাপত্যের অবস্থানের প্রতি ভাল করিয়া একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃতির লীলা-ভূমির মধ্যে উহার স্থান। এমন কি এই সংসার বিদ্বেষী বা উদাসীন সাধুদের পরিচ্ছদের প্রতি লক্ষ্য করিলেও কথাটা বেশ বুঝা যায়। অন্যান্য সকল শ্রেণীর সন্ন্যাসী হইতে ইহাদের বেশভূষার পার্থক্য আছে। পোষাকের শোভনতার দিক দিয়া দেখিলেও ইহাদের সহিত কাহারও বেশভূষার তুলনা হয় না। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও ইহাদের শরীরের মধ্যে মাত্র মস্তক, মুখ, কর ও পদ অনাবৃত এবং সমস্ত শরীর বিশেষ যত্নের সহিত ত্রি-চীবর দ্বারা আবৃত। এই বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল যখন শহরের পথে চলা-ফেরা করে, লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের চলা-ফেরার ভিতর বেশ একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষিত সৈনিকের ন্যায় ইহারা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে এবং নিয়মিতরূপে পাদক্ষেপ করে। ইহারা একটা ছত্রভঙ্গ দলের মত পথ অতিক্রম করিয়া চলে না। আমি মাত্র বলিতে চাই বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের খুটি নাটি বিষয়েও একটা সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহাদের দর্শন সম্বন্ধে দু একটা কথা বলাও আবশ্যক। শূন্যবাদী মাধ্যমিক বা বিজ্ঞানবাদী যোগাচারী। সাংসারিক প্রয়োজনে একটা সাংসারিক সত্যকে মানে। সে সত্য আপেক্ষিক। তাহার প্রয়োজন সাংসারিক জীবনে অর্থাৎ সাধারণের সহিত সম্পর্কিত জীবনে। সে সত্যের নাম দেওয়া হইয়াছে সংবৃত বা পরতন্ত্র সত্য (Relative truth)। মহাযানীরা বলে, বুদ্ধদেব বিশেষ স্থান-কাল-পাত্র ভেদেই সূক্ষ্ম বা গুহ্য উপদেশ দিয়াছেন, মহাযানের মূল সূত্র সেই গুলি। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সূক্ষ্ম বা সহজ উপদেশ দেবার রীতির নাম—উপায় কৌশল্য।

কালে এমনই হইল যে বৌদ্ধশিল্পের বিশিষ্ট অংশ মহাযানীদেরই সৃষ্টি দাঁড়াইল। ইহা সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে মহাযানের প্রারম্ভেই ভক্তিবাদ। ত্রি-কায়া বাদই ভক্তিবাদের ভিত্তিভূমি। হীনযানীরা মোটামুটি মাত্র 'রূপকায়া' বুদ্ধকে জানিত। সে বুদ্ধ একজন রোগ-জরা মরণশীল দেহী ব্যক্তি। তাই বারহুতে-সাঁচীতে বুদ্ধ-

দ্বিতীয় গুহার অঙ্গনে বুদ্ধ ও পার্শ্বচর বোধিসত্ত্ব

মূর্ত্তির দেখা পাই না। মহাযানীদের সম্ভোগ কায়া বুদ্ধে ও হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দেবতার পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর। মহাযানীদের বিশিষ্ট বোধিসত্ত্ববাদ আসিয়া যখন দেখা দিল তখন বোধিসত্ত্বেরা দাঁড়াইল জ্যোতির্ম্ময় দেবতার রূপে। সকল দেশের কলা-শিল্পের প্রথম অনু-প্রেরণা এমনই অবতার ও দেবতার। অবতার ও দেবতার মন্দিরে মন্দিরে দেশ ছাইয়া গেল। মন্দিরের প্রাচীরে চিত্রিত হইল, তাহাদের গৌরব অবদান-কাহিনী। ভক্তি

এমন করিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সেবা পাইয়াছে। আবার বোধিসত্ত্বেরা তো নির্ব্বাণ প্রার্থী নয়—তাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সংসারের মঙ্গলসাধন। দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে

চতুর্থ গুহায় স্তম্ভের ব্রাকেট—
চতুর্থ গুহায় একটি প্রবেশ-দ্বার

নিকট সম্বন্ধ মহাযানীর নিকট 'সংসার' ও নির্ব্বাণ আলাদা নয়। মহাযানী সংসার ও নির্ব্বাণের পার্থক্য করে না, তাই সংসার তাহার নিকট মিথ্যা হয় নাই।

ভারতবর্ষের শিক্ষার উৎস বনে। সে শিক্ষা কোনদিন নাগরিক হয় নাই। এ শিক্ষার একটা বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির সহিত মানুষের সহজ যোগে। জন্মান্তর-বাদ এবং দৈনিক জীবন-যাত্রা প্রণালী প্রতি জীবের সহিত মানুষের একটি পাতাইয়াছে। বহু প্রাচীন বৃক্ষ, সূর্য্য, চন্দ্র, নদী-পূজা ইত্যাদিও প্রকৃতির সহিত এক বন্ধনে তাহাকে বাঁধিয়াছে। মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জীবের যে আত্মা আছে, এক ভারতবর্ষের ধর্ম্মই একথা বলে। পশুও পুষ্পের স্থান

তাই এই ধর্ম্ম-শিল্পে এত প্রচুর। প্রকৃতির সহিত মানুষের অন্তরের যে এই মিলন, এই হইল কলা-শিল্পের উৎস। বৌদ্ধকে সর্ব্বত্যাগী হইয়া মৈত্রীর সাধনা করিতে হইত। বিশ্বের প্রাণের স্পর্শ পাওয়াই তাহার সাধনা ছিল। শিল্পীরও

চতুর্থ গুহার দালান-মুখ

ঐ সাধনা। বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবনে শিল্পীর ভাবপ্রবণতা ও আধ্যাত্মবাদ idealism আসিবেই। এই idealismএর অসাধারণত্বের দরুণই সমগ্র ভারতীয় শিল্পের রূপ এত বস্তুনিরপেক্ষভাবাত্মক abstract। এখানে শিল্পের সাধনা হইয়াছে ভাবের। সমগ্র ভারতীয় শিল্পের প্রথম সূত্র হইতেছে রূপের মধ্যে অরূপের সাধনা।

ধাতুপূজার ব্যবস্থা তো বুদ্ধদেব নিজেই দিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ শিল্পের আরম্ভ তো ধাতুগর্ভেই। প্রাচীনতম বৌদ্ধ চৈত্যগুলির আশ্চর্য্য ভাস্কর্য্য ধাতুপূজারই অবদান। পিপ্‌পারওয়া ও সাঁচীর পেটিকাগুলিতে ঐ ধাতুপূজার পরিচয় পাই।

খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক হইতে দেড় হাজার বছরের উপর

ধরিয়া ভারতবর্ষে পাহাড় কুঁদিয়া বৌদ্ধদের চৈত্য বা বিহার গড়া হইয়াছে। শিল্প-রসিকের নিকট ভারতবর্ষের স্থাপত্য-শিল্পের এমন নিদর্শন আর নাই। ভারতের গৌরব-যুগের চিত্র-শিল্পেরও ঐ পীঠস্থান। প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকটও ইহারা অমূল্য। ভারতীয় শিল্পের ঐ যুগের নিদর্শন আর কোথাও বড় পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মমণ্ডল-(tropic) বর্ত্তী দেশে প্রকৃতি নিজহাতে তূলি ধরিয়াই আছেন এগুলি লোপ করিবার জন্য। পরবর্ত্তীযুগে শিল্প-রসিকের অমনোযোগিতায় এবং অভাবে অন্য সব কীর্ত্তি সহজেই লোপ পাইয়াছে। পাহাড়ও ধ্বংস হয় নাই, পাহাড়ের বুকের কীর্ত্তিও ধ্বংস হয় নাই। ঐ গুলি প্রায়ই পাহাড়ের বুকে কোঁদা বড় বা ছোট গুহা; তাহাদের ভাস্কর্য্য অন্দর-মহলেই, বাহির হইতে নির্ম্মাণ মাত্র করা হয় নাই, সারা পাহাড় কাটিয়া-কুঁদিয়া বিরাট্ হর্ম্ম্য বা মন্দিরের রূপ দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল স্থাপত্য যে কাষ্ঠনির্ম্মিত স্থাপত্যের অনুকরণে গঠিত ইহা সহজেই চোখে পড়ে। অন্ধ অনুকরণ চোখে বাজিতে থাকে, যখন পাথরের উপর পেরেকের অনুকরণ-চিহ্ন দেখি, খিলানের ছাদ বাঁশের কুটীরের ছাঁদে তৈয়ারী দেখি, দরজার তোরণ কুটীরের দরজার তোরণের মত দেখিতে পাই। কখনও নিতান্ত অনাবশ্যক কড়ি-বর্গার মত ঐ পাথরের কাজে কাষ্ঠই দেখিতে পাই।

ঐ সকল স্থাপত্যের মধ্যেই ভারতের প্রাচীন চিত্র-শিল্পের একমাত্র নিদর্শন মেলে। ভারতীয় ঐ প্রাচীর-চিত্র-শিল্পের দুইটী প্রধান তীর্থ—অজন্তা ও বাঘ*। উভয়

চতুর্থ গুহার প্রাচীর অলঙ্কার চিত্র

তাহাদের সম্পদের বড় পরিচয় পাওয়া যায় না। ইলোরার কৈলাসমন্দির, মহাবল্লীপুরের সাত প্যাগোডা এবং এই ধরণের অন্য দু' একটী ছাড়া পাহাড় কাটিয়া সৌধনির্ম্মাণের দৃষ্টান্ত বড় একটা চোখে পড়ে না; এই সকল জায়গায় পাহাড়ের বুকের ভিতর গুহা স্থানেই প্রাকৃতিক কারণে চিত্রগুলির উপর অত্যাচারের সীমা নাই। অনেক কিছুই সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়াছে; যাহা আছে তাহাই ভারতীয় চিত্র-শিল্পের সুবর্ণ-যুগের একমাত্র নিদর্শন। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও

* রামগড়ের যোগীমারা গুহা ইত্যাদি এখানে বলিতেছি না।

ঐ একটা ছিল বিশেষ গৌরবময় যুগ। সে দিনই বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিতেছিল। এসিয়ার প্রায় সকল স্থানেই ভারতীয় সংস্কৃতি ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সে সংস্কৃতির একটা বিশেষ অঙ্গ ভারতীয় শিল্প-কলা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া গিয়াছিল।

ইতালীয় প্রাচীর-চিত্র-শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবিত বিশেষজ্ঞ Cecconi বলিয়াছেন, মাইকেল এঞ্জেলোর যুগ পর্য্যন্ত ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম চিত্র-শিল্পের সহিত ইহাদের এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া তুলনা করা চলে। ইহাদের সম্বন্ধে বহু বিশেষজ্ঞের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে।

অজন্তা সম্বন্ধে বহু কথা বাহির হইয়াছে, বাঘের পরিচয়-কথা বড় একটা দেখা যায় না। এ প্রবন্ধে এখন বাঘের কিছু পরিচয় দিব।

বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণ শাখায়, গোয়ালিয়র রাজ্যের আজমের জেলায় বাঘ নামে (এখানে প্রায় ২০০০ লোকের বাস) একটা ছোট শহরের সন্নিকটে বাঘগুহা অবস্থিত। বাঘের নিকটতম রেলওয়ে ষ্টেশন মৌ; বি, বি, এণ্ড সি, আই রেলওয়ের একটি ছোট ষ্টেশন। ঐ স্থান হইতে বাঘ ৮৭ মাইল। রাস্তা বাঁধান ও বেশ ভাল। ট্যাক্সি পাওয়া যায়; ছোট-খাট শহর পথে পড়ে এবং আহারাদির কোন অসুবিধা নাই; পথে আবশ্যকমত ডাকবাংলো আছে। বড় শহরের মধ্যে ধর, একটা ছোট মারাঠা-রাজ্যের রাজধানী। বাঘ শহরেও বাংলো আছে। শহর হইতে গুহা প্রায় আড়াই মাইল। রাস্তা তত ভাল নয়। বর্ষাকালে মটর চলা শক্ত।

অন্ততঃ খৃঃ ষষ্ঠ শতকে ঐ গুহাগুলিতে উদয়াস্ত বুদ্ধদেবের জয়ধ্বনি উঠিত। কত বৌদ্ধভিক্ষুর জীবন-নাট্যের নীরব সাক্ষ্য আজও উহারা বহন করে, কে জানে? সুন্দরের ধ্যানে মগ্ন ঐ ভিক্ষুরা আপন মনে রঙের তুলিতে প্রাণের স্বপ্নকে ওখানে বসিয়া রূপ দিতেছিলেন। নিকটেই নর্ম্মদার একটা শাখা বাঘ নদী বহিয়া চলিতেছিল, উহার তীরের সূর্য্যাস্তের রঙই কি ভিক্ষুদের তুলিতে ফুটিয়া উঠিল!

পাহাড়টা মাত্র তিনশত হাত উঁচু এবং ওই দেশের মধ্যে মাত্র এইটাই বেলে পাথরের। পাহাড়টার সানু-দেশ এঁটেল মাটীর। বোধ হয় উহারই চাপে এবং চোয়ান জলেই নীচের গুহাগুলির এত দুর্দ্দশা। সব শুদ্ধ নয়টী গুহা এবং তাহাদের সম্মুখভাগের পরিমাণ প্রায় সাড়ে সাতশত গজ। গুহাগুলি অবশ্য পাশাপাশি নয়। এক-একটী গুহা বড় বাড়ীর মত; শত শত লোক উহাতে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিত।

গুহাগুলির মধ্যে একটীও লিপি মিলে না* এবং তাহাদের বয়স স্থির করার একমাত্র উপায় সমসাময়িক অন্য কোন ভাস্কর্য্যের সহিত বিশেষ মিল লক্ষ্য করা। অজন্তার কতকগুলি গুহার সহিত ইহাদের একটা সহজ মিল লক্ষ্য না করিয়া থাকিতে পারা যায় না এবং অজন্তার বিভিন্ন গুহার নির্দ্ধারিত বয়স হইতেই ইহাদের বয়স জানা যায়।

প্রথম গুহার নাম—'গৃহ'। এই গৃহের বিশেষ কোন কিছুই রক্ষা পায় নাই, মাত্র চারিটী স্তম্ভের একটা প্রায় ১৬ হাত × প্রায় ৯ হাত একটী ভগ্নপ্রায় ঘর আছে। স্তম্ভগুলি ধ্বংসপ্রায়। একটী বারান্দার চিহ্নমাত্র পাই, তাহা একেবারেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় গুহা পণ্ডোবঙ্কি বা পাণ্ডব গুহা। এইটী সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ইহারও চিত্রাবলী প্রায় মুছিয়া গিয়াছে, ধূমে ও আর্দ্রতায়। একটী সুবৃহৎ চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট কক্ষ বা সভাগৃহ, তিনপাশে ভিক্ষুদের কুঠরি চলিয়া গিয়াছে, সম্মুখে স্তম্ভময় বারান্দা, পশ্চাতে একটা স্তূপ, সর্ব্বশুদ্ধ ১০০ হাতের কিছু বেশী। বারান্দার সামনের দিক্‌টা ধ্বসিয়া গিয়াছে, ছয়টী অষ্টকোণ স্তম্ভের মাত্র গোড়ার দিক্‌টা পাওয়া যায়। বারান্দার মধ্য দিয়া তিনটী দরজা। বোঝা যায় একটা চত্বরকে ঘিরিয়া বারান্দাটা ছিল। সাধারণ বিহারের নক্সাতেই এই গুহার বিহার তৈয়ারী হইয়াছিল। চত্বরের চতুষ্পার্শে গুহার মধ্যে বারান্দার কোনই প্রয়োজন ছিল না, রৌদ্রবৃষ্টি তো সেখানে প্রবেশ করিতে পারিত না। বরং আলো ও বাতাসের পথরোধের হেতুই হইত। লোকজন সর্ব্বসময়ে চত্বরটী ব্যবহার করিতে পারিত। সাধারণ বিহারে ইহা

* একটী 'ক' শব্দ পাওয়া গিয়াছে, মনে হয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর 'ক'।

সম্ভব হইতনা, বলিয়াই বারান্দার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এবং ছাদের দৃঢ় অবলম্বনস্বরূপ স্তম্ভের সার্থকতা অবশ্য ছিল, কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, গুহার মধ্যের বিহার, বাহিরের বিহার কোনটী বা প্রথমে অষ্টকোণ হইয়া পরে বারকোণ, ষোলকোণ হইয়া চব্বিশকোণ হইয়াছে। তাহাদের উপরে সূক্ষ্মকার্য্য motif বিচিত্রধরণের। স্তম্ভের শীর্ষভাগ বা বোধিকা (রামরাজ pilaster) বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবার

অর্হৎদের আকাশ ভ্রমণ

হইতে পৃথক্ নকসায় তৈয়ারী হইত না। মঠকক্ষগুলির সম্মুখের কুড়িটা স্তম্ভ ও তাহাদের সহিত চারি কোণের প্রাচীর-গাত্র হইতে উদ্গত স্তম্ভগুলি বিচিত্র রকমের। সবগুলির নীচেই একটা সমচতুষ্কোণ ভিত্তি এবং তারপর উপযুক্ত। এগুলি ব্রাকেট ধরণের। মধ্যের সুবৃহৎ কক্ষে চারিটী গোল স্তম্ভ আছে। পাথর নরম বলিয়া এ গুলির আবশ্যক হইয়াছে। অজন্তা, ইলোরায় ইহাদের আবশ্যক হয় নাই।

ভিক্ষুদের কুঠি সংখ্যায় কুড়িটী। এগুলিতে কারুকার্য্যের কোন চিহ্ন নাই। প্রায় ছয় হাত লম্বা, ঐরকমই চওড়া এবং উচ্চতাও ঐরূপ।

শিল্পকার্য্যে বিভূষিত। তিনটী করিয়া মূর্ত্তি একত্র আছে, মধ্যে বুদ্ধদেব, উভয়পার্শ্বে দুইজন বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধের মূর্ত্তি অপর মূর্ত্তিদ্বয় হইতে বড়। ঢুকিতেই দক্ষিণ দিকের

সিদ্ধার্থ, ছন্দক ও কণ্টক

হলের পশ্চাতে যে স্তূপটী আছে একটা নাতিপ্রশস্ত আবৃত প্রবেশপথে সেখানে পৌছিতে হয়। প্রবেশদ্বারে দুইটী স্তম্ভ আছে। প্রবেশপথের উভয়প্রাচীর সুন্দর

তিনটী মূর্ত্তি বেশ স্পষ্ট, বুদ্ধমূর্ত্তি ১০৪ পদ্মের উপর দণ্ডায়মান, দক্ষিণহস্তে বরদামুদ্রা। দেহের রেখাপাত পরিষ্কার গুপ্ত-যুগের; মস্তকের কেশ ও উষ্ণীষ প্রচলিত নিয়মেই সজ্জিত।

অজন্তার মূর্ত্তির শরীরে আস্তর ও রঙের চিহ্ন পরিস্ফুট, বাঘের ও তাহার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। বুদ্ধদেবের সঙ্গে প্রায়ই যে দুইজন বোধিসত্ত্বকে দেখি তাঁহারা হইতেছেন অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়; প্রথমের হাতে থাকে পদ্ম, তাই তাঁহার নাম হইয়াছে পদ্মপাণি এবং অন্যের হাতে থাকে নাগপুষ্প। ফুঁসে চাঁপাকে নাগপুষ্প বলেন। এই বোধিসত্ত্বদের অন্য বিশিষ্ট চিহ্নও আছে। এখানকার বোধিসত্ত্বদের কিন্তু নাম নির্দ্দেশ করা যায় না; এখানে বামদিকের বোধিসত্ত্বের ডান হাতে পদ্মের কুঁড়ি আছে সত্য, কিন্তু অবলোকিতেশ্বরের আমরা সর্ব্বদাই বাঁ হাতে পদ্ম দেখি। তথাকথিত গান্ধার-শিল্পেও এমনই ত্রিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে মূর্ত্তি শিল্পের সহিত উহাদের সম্বন্ধ নাই বলিলেও চলে।

স্তূপের প্রবেশের দরজার মুখে দুইটা মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ভাব যেন বড় কঠোর। তাহারা স্থান পাইয়াছে তোরণযুক্ত বড় বড় কুলঙ্গীতে। মূর্ত্তি দুইটী প্রায় পাঁচ হাত, সাড়ে পাঁচ হাত উঁচু। বাঁ দিকের মূর্ত্তিটার মাথায় 'জটামুকুট'। তাহার মধ্যে অভয়-মুদ্রার ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি। মাথার উভয়পার্শ্বে জ্যোতি দেখাইবার জন্যই যেন কোন বিভূষণ রহিয়াছে। ইহা সত্যই জ্যোতির চিহ্ন বলিয়া মনে হয় না। ঐ মুকুটেরই অংশবিশেষ বলিয়াই বোধ হয়। সাঁচীর মিউজিয়মে অমনি দুইটী মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটীর গলায় একটী তিন-নলী হার আছে। হারটী বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, দুইটী তার মুক্তার এবং মধ্যে কোন অলঙ্কার, বাহুতে ও মণিবন্ধেও অলঙ্কার আছে। একটা কিছু ত্রিদণ্ডী উপবীতের ন্যায় বাম বক্ষ হইতে প্রায় জানুপর্য্যন্ত ঝুলিয়া ঘেরিয়া আছে। পরিধানে ধুতি। পরিধানের রকমে কুশান যুগের সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে। পরে এই দুইটী মূর্ত্তি হিন্দুরা যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবেশপথের দক্ষিণদিকের প্রাচীরের ত্রিমূর্ত্তি কুন্তী, ভীম ও অর্জ্জুন হইয়াছেন। বামদিকের ত্রিমূর্ত্তি দ্রৌপদী, নকুল, সহদেব হইয়াছেন। এই সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধমূর্ত্তি রমণীমূর্ত্তি বলিয়া গণিত হইয়াছে। দিল্লীর সেণ্ট্রাল এসিয়াটিক মিউজিয়মে রক্ষিত দিক্‌পাল বা বজ্রপাণিদের মূর্ত্তির সহিত ইহাদের সাদৃশ্য দেখি।

দ্বিতীয় গুহার বারান্দার উত্তরপ্রান্তে কতক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিগুলি নিতান্ত অস্পষ্ট। তবুও অজন্তার ঐরূপ মূর্ত্তির সহিত তুলনা করিলে মনে হয় মধ্যমূর্ত্তিটী কোন যক্ষের বা নাগের। সূক্ষ্ম-কটি সাধারণতঃ নাগেদেরই থাকে এবং তাহাতে মনে হয় ঐ মূর্ত্তিটী কোন নাগের। সর্প ফণাও দেখা যায়। মূর্ত্তিটী পুরুষ এবং ললিতাসনে উপবিষ্ট। উভয়পার্শ্বে উহা হইতে ক্ষুদ্রাকৃতি নারী-মূর্ত্তি আছে। সকল বৌদ্ধস্থানের মত এখানেও নাগ-পূজার চিহ্ন পাওয়া যায়। চতুর্থ গুহায়ও নাগেদের পরিষ্কার চিহ্ন আছে। ঐ গুহাতে দুইটী মকরবাহিনী দেবীকেও দেখি। বৌদ্ধদের মধ্যে এমন প্রচুর দেব-দেবীর পূজা হইত।

তৃতীয় গুহার নাম 'হথিখন' বা হস্তিশালা। এখানে কয়েকটী চিত্র পাওয়া গিয়াছে, নহিলে কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্তু নাই। ইহা বর্ত্তমানে শোচনীয়-রূপে ভগ্ন।

চতুর্থ গুহার নাম রঙ্‌মহাল। ইহার প্রাচীরেই বাঘের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রাবলীর পরিচয় পাই। তৃতীয় গুহা হইতে চতুর্থ গুহা প্রায় ১৭০ হাত দূরে এবং ইহা পঞ্চম গুহার অতি নিকটে। উভয় গুহার সামনে একটী প্রায় ১৫০ হাত লম্বা মণ্ডপ চলিয়া গিয়াছে, উহাতে বাইশটা স্তম্ভ। স্তম্ভগুলি গতপ্রায়, ছাদও অধিকাংশ পড়িয়াছে, পলস্তারা কিন্তু প্রায় অবিকৃত অবস্থায় আছে। ছাদে এবং পিছনের দেওয়ালে বহু চিত্রের ভগ্নাবশেষ-চিহ্ন দেখা যায়। চতুর্থ গুহার 'নক্সা' দ্বিতীয়ের নক্সার মতই। চতুর্থ গুহা আরও একটু বড়। তাহার নির্ম্মাণে যেন আরও মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল। হল্রের মধ্য-দরজাটী এবং তাহার স্তম্ভের সুন্দর কারুকার্য্য দেখা যায়। দরজার মাথায় সব সারি সারি বুদ্ধমূর্ত্তি এবং কারুকার্য্যবিশিষ্ট দেওয়ালগিরি (console)-তে দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহার হাত কোন বামনের উপর রহিয়াছে; ঐ বামন মকরের মুখের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। অতি অদ্ভুত কিন্তু খুব চলিত নক্সা।

গৌতমা ও যশোধরার বিলাপ

পঞ্চম গুহায় কয়েকটী সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম গুহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য নয়। শেষ তিনটী গুহা ভগ্নপ্রায়। ষষ্ঠে বিশেষ নূতনত্ব নাই। বাঘ এবং অজন্তার ছবি tempera পঙ্কের কাজ, উহা ফ্রেস্কো কাজ নয়, এ বিষয়ে কেহ কেহ ভুল করিয়াছেন। অজন্তা গড়িয়া উঠিয়াছে দীর্ঘকাল ধরিয়া—বাঘ একটা বিশেষ সময়ের, তাই তাহার শিল্প একই সূত্রে বাঁধা। অজন্তার শেষযুগের চিত্রাবলীর

সহিত ইহাদের পরিষ্কার মিল আছে। বাঘের চতুর্থ গুহাতে প্রাচীরের উপরিভাগে frieze) যে সূক্ষ্ম কাজের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার তুলনা নাই। চিত্রগুলি প্রাণ-

শিকারী, উজ্জালী, অমাত্য, পুরোহিত
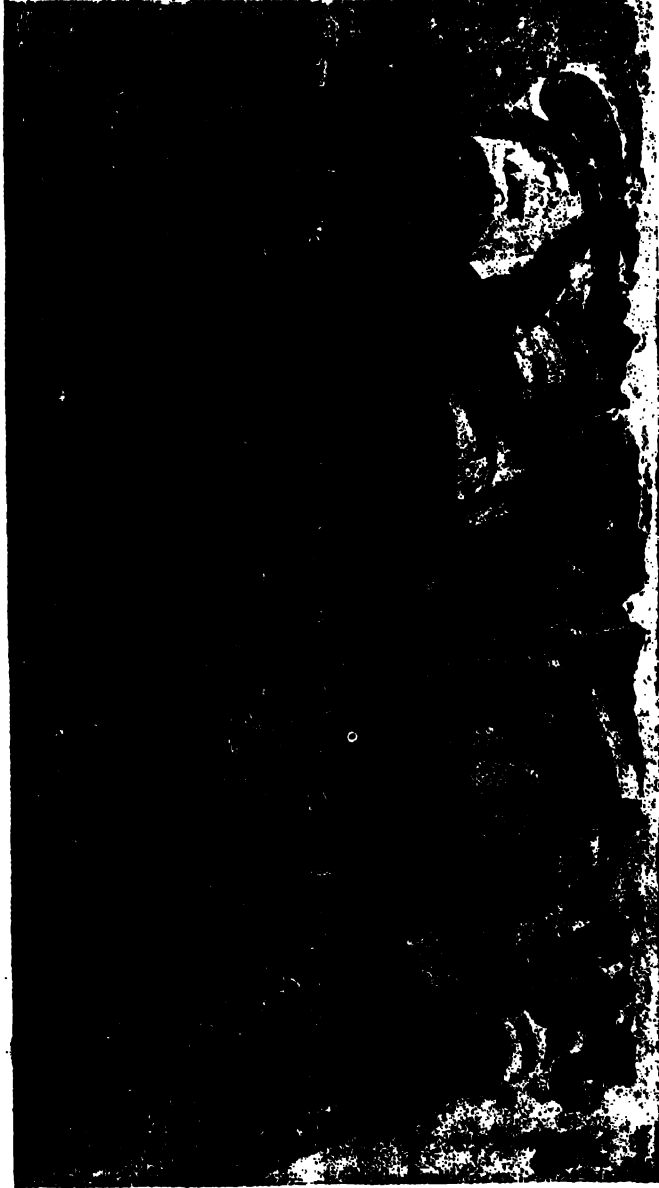
বন্ত জীবনের ছবি। জাতক বা অবদানের ছবি নয়। বৌদ্ধগুহায় ইহা দেখিয়া কেহ কেহ অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। সাঁচীতেই ইহার সূচনা হইয়াছে। মানবজীবনের আনন্দময় ছবি এই চিত্রশিল্পীদের রচনায় পাইবে,

ইহার সহজ হেতু প্রথমেই বলিয়াছি। পথে দুইটী 'হল্লিশক' বা গীতবাদ্যযুক্ত নাটিকার কোন নৃত্যাদি-দৃশ্য দেখা যায়। এমন কিছু মথুরা-ভাস্কর্য্যে ও আওরঙ্গাবাদের গুহাতেও দেখা যায়। মণ্ডন-শিল্পেরও (decorative work) এখানে বৈশিষ্ট্য আছে। সূক্ষ্মরেখার টানে শিল্পীর ক্ষমতা ও স্বাধীনতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল চিত্র প্রথমেই তোরণ পথক

তুলি বা রেখার টানের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। সেই টানের গুণেই চিত্র সজীব হইয়াছে। সেই রেখার টানে দেশকে (space) তফাৎ করিয়া দেখান একটুও শক্ত হয় নাই। রেখার টানে গতি যে একটুও বাধা পায় নাই, এইখানেই চিত্রকরের আরও বাহাদুরী। প্রতি চিত্রে চিত্রকরের প্রাণের যেন স্পর্শ লাগিয়াছে। রেখা শিল্পীর হাতে বিচিত্র ছন্দের মত খেলিয়া চলিয়াছে। শিল্পী এই প্রাণের উপাসক ; তাহার শিল্প সার্থক হয় যখন শিল্পে সে প্রাণ-সঞ্চার করিতে পারে। অজন্তায়, বাঘে ফুলে প্রাণ আছে, জন্তুগুলি যেন জীবিত বোধ হয়। শিল্পী কোন সৃষ্টির আনন্দেই আঁকিয়া চলিয়াছে।

শোভা-যাত্রা চলিয়াছে, এই বিরাট্ জীবসঙ্ঘের প্রতি জীবটী জীবন্ত। রোরুদ্যমানা নারীর বুকফাটা দুঃখ যেন মূর্ত্তি পাইয়াছে। গুরুর বাণী শিষ্যেরা শুনিতেছেন, উদগ্রতরুণ মুখে জ্ঞানের কি আকুল পিপাসা, গুরুর মুখ জ্ঞানের শান্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত! তুলির টানে জীবনের এমন 'ছোপ' বড় আর দেখা যায় নাই।

নূতন ধরণের বিষ্ণুমূর্ত্তি (বিশ্বরূপ)

শ্রীরমেশ বসু, এম-এ

বাঙ্গলা দেশের বহুস্থানে নানারকমের বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া যায়। যে কোন প্রাচীন পল্লীতে খোঁজ করিলেই মাটীর নীচে বা উপরে বিষ্ণুমূর্ত্তির অভাব হয় না। এক সময়ে যে এদেশে প্রাচীন ধরণের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম খুব চলিত ছিল তাহা ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। যত বিষ্ণুমূর্ত্তি এদেশে পাওয়া গিয়াছে আর কোন দেব-দেবীর মূর্ত্তি তত পাওয়া যায় নাই। এই সব বিষ্ণুমূর্ত্তির মধ্যে প্রায় অধিকাংশই অনেকটা মামুলী ধরণের, কেবল মাঝে মাঝে দুই-একটা নূতন ধরণের মূর্ত্তি পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত মূর্ত্তিগুলি বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি হইতে প্রাপ্ত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত এমন একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে যাহা দেখিতে ঠিক বৌদ্ধ পদ্মপাণি বা অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তির মত। এইরূপ আসীন অবস্থার বিষ্ণুমূর্ত্তি খুবই বিরল।

সম্প্রতি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার আরিয়ল গ্রামে একটী নূতন ধরণের বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উহা ঐ গ্রামস্থিত "আরিয়ল ইউনিয়ন ক্লাব" নামক পল্লীসমিতির চিত্রশালায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমিতি গ্রামহিতকর অন্যান্য প্রচেষ্টার মধ্যে মূর্ত্তি ও পুঁথিসংগ্রহের কাজেও লাগিয়াছেন। ইঁহারা ইতিমধ্যে কয়েকখানা পুথি এবং একটী হরগৌরীমূর্ত্তি ও একটী গণেশমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। পল্লীসমিতির পক্ষে এরূপ কার্য্যে হাত দেওয়া খুবই প্রশংসাজনক।

আরিয়ল গ্রামটী মুসলমান যুগের পূর্ব্বে যে প্রাচীন বিক্রমপুর-চক্রের অন্তর্গত ছিল তাহা এখানে প্রাপ্ত নানা নিদর্শন হইতে বুঝিতে পারা যায়। গ্রামের বর্ত্তমান হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে কাহারও কাহারও পূর্ব্বপুরুষেরা প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা সেই সময়ে গ্রামটীকে জলাভূমির ন্যায় দেখেন। কিন্তু একটী পাড়ার নাম ছিল সানবাড়ী পাড়া, উহা গ্রামের অন্যান্য অংশ হইতে উন্নত ছিল ও ঐস্থানে তখন মুসলমানদের বাস ছিল এবং এখনও আছে। ঐ

অংশে বহু পুরাতন ও ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপ দেখা যায়। উহার দুই দিকে দুইটী বড় দীঘি আছে। এই স্থান হইতেই অনেকগুলি মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়া নানা স্থানে চলিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যেগুলির খোঁজ পাওয়া গিয়াছে

বিশ্বরূপ

তাহাদের উল্লেখ করা গেল :—১। প্রকাণ্ড সূর্য্যমূর্ত্তি (ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ), ২। গৌরীমূর্ত্তি (ঢাকা মিউজিয়ম), ৩-৮। এই ছয়খানা বিষ্ণুমূর্ত্তি গ্রামের নানা বাড়ীতে পূজিত হইতেছে, ৯। একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি গ্রামের কোন কুটুম্ব কর্ত্তৃক বরিশালে স্থানান্তরিত হইয়াছে, ১০। একটী বড় প্রস্তরের আসন, ১১। হরগৌরীমূর্ত্তি (আরিয়ল ক্লাব), ১২। ভগ্ন গণেশমূর্ত্তি (ঐ)। ইহা ছাড়া কতকগুলি মূর্ত্তি বহু পূর্ব্বে গ্রাম হইতে ঢাকা কালেক্টরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এই সমস্ত মূর্ত্তি পাওয়াতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে পূর্ব্বে এখানে হিন্দুপ্রাধান্য ও সমৃদ্ধি ছিল, এবং উহার নাশ হওয়ার পর মুসলমান বসতি হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের ফলে মন্দিরগুলি বিনষ্ট হইয়াছিল এবং মূর্ত্তিগুলি ভগ্ন বা অভগ্ন অবস্থায় মাটীর নীচে বা দীঘির তলে আশ্রয় লইয়াছিল। এখন আবার উহারা লোকচক্ষুর গোচর হইয়া গ্রামটীর প্রাচীনতা এবং হিন্দুসভ্যতার শিল্পকৌশল প্রকাশ করিতেছে।

বর্ত্তমানে যে মূর্ত্তির কথা লিখিত হইতেছে উহাও গ্রামের ঐ প্রাচীনপাড়া হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই মূর্ত্তিখানা ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, ডান দিকের হাতগুলি একেবারেই নাই; হাঁটুর উপর হইতে নীচের দিকের অংশটাও মোটেই নাই এবং এ শ্রেণীর মূর্ত্তির বাহন গরুড়টীও নাই। কিন্তু যাহা আছে তাহা হইতেই যতদূর সম্ভব মূর্ত্তিটীর বিবরণ দিবার ও শ্রেণী নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা গেল।

এই মূর্ত্তিটির যে অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ইহা যখন অভগ্ন অবস্থায় ছিল তখন ইহার উচ্চতা প্রমাণ ছিল। এই বৃহৎ মূর্ত্তি যে মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও আকারে বৃহৎ হইবার কথা।

এই মূর্ত্তির চারিটি মুখ, উহা প্রায় অবিকৃত অবস্থায় আছে। ইহাদের তিনটীকে চিত্রে দেখা যাইতেছে, কিন্তু পশ্চাতেও আর একটী মুখ আছে। এই মুখগুলি পুরুষ (সম্মুখ ও পূর্ব্ব) নরসিংহ (দক্ষিণ) স্ত্রীলোক (পশ্চাৎ—পশ্চিম) এবং বরাহের (উত্তর। মূর্ত্তিটীর কুড়িটী হাত ছিল, তাহার মধ্যে বর্ত্তমানে শুধু বাম-দিকের দশটী হাত আছে। মূর্ত্তিতত্ত্ব অনুসারে এই দশটী হাতের মধ্যে একটী পতাক-হস্ত হইবার এবং একটীর যোগ-মুদ্রা থাকিবার কথা; বাকী আটটী হাতে দণ্ড, পাশ, গদা, খড়গ, পদ্ম, শৃঙ্গ, মুষল এবং অক্ষমালা থাকা আবশ্যক। এই বিধান দক্ষিণভারতীয় মূর্ত্তির,

কিন্তু বঙ্গদেশে হয় তো ইহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইত, যেমন বর্ত্তমান মূর্ত্তিটির বামদিকের একটী হাতে চক্র দেখা যাইতেছে, কিন্তু মূর্ত্তিতত্ত্ব অনুসারে উহা ডানদিকের একটী হাতে হইবার কথা। সুতরাং ডানদিকের দশটী হাতের পতাকহস্ত, যোগমুদ্রা, হল, শঙ্খ, বজ্র, অঙ্কুশ, বাণ, চক্র, বীজপূর এবং বরদমুদ্রার কোন কোনটীর স্থানান্তর হওয়া অসম্ভব নয়। এই শ্রেণীর মূর্ত্তি বিশ্বরূপ মূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত, ইহার চারিটী মুখ, কুড়িটী হস্ত, ইহাকে অন্য শ্রেণী হইতে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। *

এই মূর্ত্তিটী সম্বন্ধে সংস্কৃত শিল্পশাস্ত্রে বেশ পরিষ্কার বর্ণনা পাওয়া যায়। 'রূপমণ্ডন' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই শ্রেণীর প্রতিমার লক্ষণগুলি এইরূপ :—†

"বিংশত্যা হস্তকৈর্যুক্তো বিশ্বরূপশ্চতুর্মুখঃ।
পতাকা হলশঙ্খৌ চ বজ্রাঙ্কুশশরাস্তথা॥
চক্রং চ বীজপূরং চ বরো দক্ষিণবাহুষু।
পতাকাদণ্ডপাশৌ চ গদাখড়্গোৎপলানি চ॥
শৃঙ্গী মুসলমক্ষং চ ক্রমাৎস্যাৎ বামবাহুষু।
হস্তদ্বয়ে যোগমুদ্রা চৈন (?) গরুড়োপরিস্থিতঃ॥
ক্রমান্নরনৃসিংহস্ত্রীবরাহমুখবন্মুখৈঃ॥

বৈকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠ নামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে, উহাও অনেকটা এই ধরণের, কিন্তু উহার চারিটী মুখ ও মাত্র আটটী হাত। ত্রৈলোক্যমোহন নামে আর এক বিষ্ণু-মূর্ত্তি আছে, উহার চারিটী মুখ ও ষোলটী হাত। বিষ্ণু-মূর্ত্তির আর কোন শ্রেণীতে চারিটী মুখ ও কুড়িটী হাত দেখা যায় না, সুতরাং এই মূর্ত্তিটীকে বিশ্বরূপ মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। সাধারণতঃ হিন্দু মূর্ত্তিতে মুখের সংখ্যার সঙ্গে হাতের সংখ্যার একটা অনুপাত স্থির থাকে, যথা—১।২,৪,৮ ; ৩।৬,১২, ; ৪।৮,১৬ সুতরাং আমাদের এই মূর্ত্তির ৪।২০ অনুপাত খুব সাধারণ নয়।

বঙ্গদেশের নানা চিত্রশালায় যে সব বিষ্ণুমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কোথাও এই বিশ্বরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখা যায় না। সুতরাং আশা করা যায় এই মূর্ত্তিটী মূর্ত্তিতত্ত্ব-আলোচনাকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

* Elements of Hindu Iconography by T. A. Gopinath Rao, M. A. Vol. I. part I. (Madras, 1914), p.p. 258, 256. এই গ্রন্থে বিশ্বরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তির কোন চিত্র দেওয়া হয় নাই। সুতরাং তুলনা করিবার সুবিধা নাই।

† Elements of Hindu Iconography by T. A. Gopinath Rao, Vol. I. pt. II. (Madras, 1914) Appendix C. প্রতিমালক্ষণানি—p. 60.

প্রহেলিকা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ

থম্‌থমে' ঘন নিশীথে নামিল
ঝম্‌ঝমে' বারিধারা,
চেয়ে-থাকা এই চক্ষে লুকা'ল
শয়ন-সঙ্গী তারা ;
আশ্রয়-দ্বীপ দীপ্তি নিবিল
যেন-বা সাগর-রাতে ;
জাগে জাগরণ একক শূন্য
স্পন্দিত বেদনাতে !

এ তারা আমার সুদূরবর্ত্তী
জ্যোতিষ্ক শুধু নয় ;
অনাদি রাতের বুকের মাণিক—
ব্যথাভরা বিস্ময় ;
চোখের আলোর প্রথম প্রশ্ন,
আত্মার সহচরী—
এ তারা যে মোর জীবনবেণুর
সুরখানি অশরীরী !

নির্জ্জন গৃহে দুর্য্যোগ-রাতে
কেহ নাহি চাহিবার,—
সময়ের দেনা চুকতে চাহেনা
দুঃসহ দুর্ব্বার ;
ঘুরিয়া ফিরিয়া দেহে আর মনে
চোখোচোখি ফিরে' ফিরে',
তবু যে প্রণয় ঘনায়ে উঠেনা
বাধাহীন মন্দিরে !

ঝম্‌ঝম করে' যত ঝরে ধারা,
থম্‌থমে' তত রাতি,
মনে হয় যেন একসাথে শেষ
জীবনের যত বাতি !
সূর্য্যের সাথে সুর মিলাবার
জোনাকিও জেগে' নাই,
আঁধার জীবন, আঁধার মরণ—
জোড়াবাঁধা দুটী ভাই।

হু হু করে' আসে হিম নিঃশ্বাস,
হি হি করে' কাঁপে দেহ,
দুর্ব্বলে হানে প্রবল সত্য,
নাহি যার সন্দেহ !
কোথা সম্বল কাঁথা কম্বল,
জগতের হিম পথে,
নক্ষত্রের আলোকসূত্র
টানেনা তো দেহ-রথে !

দেহের ক্ষুধার কঠিন সত্য
কেঁদে করে রসাতল,
মাটীর ধরণী তাই তারে টানে
নিয়ে তার দলবল ;
তবু যে এ মন নোয়াতে চায় না—
চাহে সে ঊর্দ্ধপানে,
আলোর প্রাচীর এড়ায়ে তাকায়
আঁধারের সন্ধানে।

চক্ষু তাহার যত পা· বাধ,
ত· ্রন্ত মন,
।ওভি মেরে দেখে অন্ধ গুহায় —
কি আছে গুপ্তধন ;
মাটীতে পা ত। যেমন সত্য
তেমনি আকাশে হাত,
মোহানার মুখে প্রভাত-রাত্রি
মিলে বুঝি একসাথ !

শয্যা আমার গুটাইতে হ'ল,
লাগিছে জলের ছিটে,
তার। ধরা চো· ।শ্রু আসে যে—
অদ্ভুদ্ পৃথিবীটে !

জানিনা কি সুখে মুখর দাদুরী,
ঝিঁঝিরা তুলিছে তান,
আকাশ যখন ভাঙিয়া পড়িছে,
ধরণী কম্পমান !

তবু এ আঁধার রবে না' তা জানি,
আবার উঠিবে তারা,
বেঁচে থাকি যদি, আবার নয়নে
পড়িবে জ্যোতির ধারা ;
চোখে-চোখে দেখা হ'লে এইবার
বলিব তাহারে ডাকি' —
দোহাই তোমার, জানো যদি, বলো
ওপারের কথাটা কি !

শকুন্তলা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল, বেদান্তরত্ন

সম্প্রতি এই কলিকাতা নগরীতে ষ্টার থিয়েটারের পরিচালকবর্গের উদ্যোগে 'কালিদাস-উৎসব' সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের পঞ্চাশৎ অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের আয়ুষ্কাল কদাচিৎ ২০।২৫ রজনী অতিক্রম করে। এ অবস্থায় যে নাটকের "রজত-জুবিলি" এইভাবে সম্পন্ন হইল, তাহার প্রয়োগ-কৌশলে এবং বিশেষতঃ রচনা-নৈপুণ্যে নিশ্চয়ই কিছু পারিপাট্য আছে। কারণ,

আ-পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ-বিজ্ঞানম্ —

'সে কলা কৌশল যথেষ্ট নহে যদ্দ্বারা সহৃদয় দর্শকের পরিতৃপ্তি না হয়'।

শকুন্তলার প্রস্তাবনা হইতে দেখা যায় যে, উহার প্রথম অভিনয় বসন্তের পর অচিরপ্রবৃত্ত উপভোগযোগ্য গ্রীষ্মসময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—

ইদমেব তাবৎ অচিরপ্রবৃত্তমুপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়-মধিকৃত্য।

আমাদের উল্লিখিত জুবিলি অভিনয়-রাত্রি ছিল চৈত্র মাসের মহাবিষুব সংক্রান্তি—অচিরপ্রবৃত্ত উপভোগযোগ্য গ্রীষ্মসময়। এ যোগাযোগ আকস্মিক হইলেও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কালিদাস-উৎসব উপলক্ষে একটী সভাপর্ব্বের অনুষ্ঠান হয়। ঐ সভায় মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়-কর্ত্তৃক কালিদাস-প্রসঙ্গে লিখিত একটী নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, কালিদাসকে মহাকবি বলিলে পর্য্যাপ্ত বলা হয় না। তিনি মহা-মহা-মহা-কবি এবং তাঁহার শকুন্তলা নাটক সমস্ত কাব্যের শীর্ষস্থানীয়। এ নাটক কখনও পুরাতন হয় না, পুরাতন হইতে জানে না; অর্থাৎ মহাকবি সেক্সপীয়রের ভাষায়—

Age does not wither
Nor custom stale her infinite variety.

সুতরাং কালিদাসের এই অসামান্যা মানস-কন্যা শকুন্তলা বৈদিক ঋষির বর্ণিত [illegible]র ন্যায় একাধারে ভব্যসী ও নব্যসী—পুরাতন অথচ চিরনূতন। বিগত ১৫০০ বৎসরে এই শকুন্তলা নাটক কত ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, কত দেশে কত রঙ্গমঞ্চে বহুবিধ দর্শকের সমক্ষে অভিনীত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এখনও ইহার নবীনত্ব অক্ষুণ্ণ আছে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে [illegible] সেক্সপীয়র" নাম দিয়া আমি তদানীং প্রখ্যাত 'সাহিত্য' পত্রে কয়েকটী ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি। ঐ [illegible] আমি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, সেক্সপীয়র যেমন মানবিকতার কবি, কা[illegible] সুন্দরতার কবি। প্রত্যেক মহাকবিরই এক একটা বৈশিষ্ট্য থাকে—কেহ মানবিকতার, কেহ দার্শনিকতার, কেহ সামাজিকতার, কেহ [illegible]জিকতার, কেহ [illegible]তিকতার কবি। কিন্তু যিনি যাহা হউন না কেন, কালিদাস সুন্দরতার কবি। তাঁহার ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গীতে, ছন্দে, গন্ধে, প্রাকৃতিক-বর্ণনায়, চরিত্র-রচনায়—সর্ব্বত্র [illegible] সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সৌকুমার্য্য। তাঁহার মহা[illegible]ংশ ও কুমারসম্ভবে, তাঁহার খণ্ডকাব্য ঋতু[illegible] ও মেঘদূতে, তাঁহার নাটকত্রয় মালবিকাগ্নি[illegible] বিক্রমোর্ব্বশী এবং শকুন্তলায় —সর্ব্বত্রই সুষমা, সৌ[illegible] মাধুর্য্য ও সৌকুমার্য্যের ধারা পাঠক ও দর্শককে শ[illegible] অভিষিক্ত করে; তথাপি এই শকুন্তলা নাটকই [illegible]রাষ্টৈব ধাতুঃ"—তাঁহার মুখ্যতম, পূর্ণতম সৃষ্টি—সমস্ত কাব্য-নাটকের ললামভূত।

মহাকবি গেটেকে অভিজ্ঞ লেখকেরা উনবিংশ শতাব্দীর most potent literary force—সর্ব্বোত্তম প্রভাপী গ্রন্থকার বলিয়াছেন। শকুন্তলা সম্বন্ধে সেই গেটের প্রশংসাবাদ উল্লেখযোগ্য। মনে রাখিতে হইবে যে, মূল নাটকের রসাস্বাদনের সৌভাগ্য গেটের ঘটে নাই। তিনি সার উইলিয়াম জোন্‌স-কৃত বিকৃত ও বহু দোষদুষ্ট অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়াছিলেন। গেটের ঐ অভিমত ও মৎকৃত তাহার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

Wouldst thou the new year's blossoms
and the fruits of its decline
And all whereby the soul is nourished,
feasted, fed
Wouldst thou the heaven and earth in
one sole word combine
I name thee Sakuntala ; and all at once
is said.

বসন্তের ফুল্লফুল, শরতের ফলের মিশ্রণ
পুষ্ট তিরপিত আত্মা, মোহে যাহে মানবের মন,
স্বরগের মরতের একঠাঁই অপূর্ব্ব মিলন
'শকুন্তলা' 'শকুন্তলা' কিবা আর আছে অকথন।

এরূপ কাব্যের অনুবাদ করা কঠিন ব্যাপার নহে কি ? একেই তো কোন অনুবাদেই মূলের সম্পূর্ণ রূপ রক্ষা করা যায় না, বিশেষতঃ শকুন্তলার মত সুকুমার নাটকের অনুবাদে। এরূপ নাটকের অনুবাদ করিতে হইলে দীর্ঘকাল কবির ভাবে ভাবিত হইতে হইবে। তাঁহার তাললয়, তাঁহার ভাবভঙ্গী, তাঁহার প্রাণ দ্বারা পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদকেরও বিশিষ্ট রচনা-নৈপুণ্য থাকা চাই। এরূপ সংযোগ সু-দুর্লভ। শকুন্তলা নাটকের নানাভাষায় অনুবাদ আছে। আমাদের এই বাংলা দেশেই পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অবধি অনেকেই শকুন্তলার অনুবাদ করিয়াছেন। প্রত্যেকের অনুবাদেই কল্পনা ও রচনাশক্তির প্রকাশ আছে ; কিন্তু কেহই কি বসন্তের ফুল্লফুল ও শরতের মিলন ঘটাইতে পারিয়াছেন ? কেহ কি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে একঠাঁই বাঁধিতে পারিয়াছেন ? কিন্তু কালিদাসের মূলনাটকে ঐরূপ অঘটন ঘটন সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়।

মহাকবির কাব্যের অনুবাদ-বৈফল্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হোমরের 'ইলিয়াড্' কাব্যের ইংরাজী অনুবাদ। এলিজাবেথ-যুগে চ্যাপমান প্রথম এই কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া স্বল্পমাত্রই সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। পোপের "Homer's Illiad" সর্ব্বজন-বিদিত। এই অনুবাদ-গ্রন্থ পাঠ করিয়া একজন অভিজ্ঞ সমালোচক পোপকে বলিয়াছিলেন "Mr Pope, it is a good book but it is not Homer ?" পোপের তুলনায় লর্ড ডারবির অনুবাদ প্রশংসার যোগ্য। ইহাতে মূলের অনেকটা প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়, কিন্তু তথাপি সে কতটুকু ? রাজকবি টেনিসন একসময় আদর্শ দেখাইবার জন্য ইলিয়াডের কিয়দংশমাত্র অনুবাদ করিয়াছিলেন। ঐ অনুবাদকে উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুধের স্বাদ কোন দিন তক্রে মিটে কি ? ম্যাথু আর্নল্ড হোমরের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। নিজেও সুকবি—গ্রীক ভাবে ভাবিত (সম্ভবতঃ জন্মান্তরলব্ধ কোন গ্রীক কবির re-incarnation) ; ম্যাথু আরনল্ড কোনদিন ইলিয়াডের অনুবাদ করেন নাই। যদি করিতেন, তবে বোধ হয় সে অনুবাদ অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হইত। ইহার প্রমাণ তাঁহার 'সোরাব ও রস্তম' কাব্য। এ কাব্যের যাঁহারা রসাস্বাদ করিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না যে, হোমর যদি এ যুগে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া ইংরাজীতে কাব্য রচনা করিতেন, তবে তাঁহার রচিত কাব্য ঐ সোরাব-রস্তম কাব্যের অনেকটা অনুরূপ হইত।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন "কালিদাস ও সেক্সপীয়র" প্রবন্ধ লিখি, তখন এই দুই কবিই আমার প্রিয়তম কবি ছিলেন—এখনও আছেন। কৈশোর হইতে জীবনের এই ঘনায়িত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনেক কাব্য-নাটকই পাঠ করিয়াছি ; কিন্তু চাতকের যেমন মেঘমুক্ত সলিল ভিন্ন অন্য জলে পিপাসা মিটে না, আমারও

সেইরূপ এই দুই কবির—বিশেষতঃ কালিদাসের রচনা ব্যতীত কাব্যতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয় না।

সম্প্রতি কালিদাসের শকুন্তলা নাটক আর একবার পাঠ করিলাম। প্রবাদ আছে "অতিপরিচয়ে অবজ্ঞা আইসে" (familiarity breeds contempt); কিন্তু অবজ্ঞা তো দূরের কথা, এবারেও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম যে, শকুন্তলার দ্বারা গেটের যাহা ঘটিয়াছিল নিম্নস্তরে আমারও তাহাই হইল—

পুষ্ট তিরপিত আত্মা, মোহে যাহে মানবের মন।

গেটের মত মহাকবির হৃদয়তন্ত্রীতে শকুন্তলা পাঠে যে উদাত্ত সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, আমার মত নীরস ব্যক্তির সেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু তথাপি শকুন্তলার রসাস্বাদে মন যে নবীকৃত বোধ হইতেছে, আত্মা যে তুষ্ট ও তিরপিত হইয়াছে—এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ করিবার একটা প্রবল বাসনা চিত্তে জাগরূক হইয়াছে। কিছু কিছু অনুবাদও করিয়াছি; কিন্তু কখনও সম্পূর্ণ করিতে পারিব আশা হয় না। এরূপ অনেক শুভবাসনা অতীত জীবনে আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া বিলীন হইয়াছে। কারণ,—

উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে উকীলানাং মনোরথাঃ।

তবে ভরসা এই মাত্র যে, দীর্ঘকাল দার্শনিকতার কর্কশতার মধ্যে এবং উকিলতার গোলকধাঁধার মধ্যে বাস করিয়াও কাব্যরসের উৎস আমার হৃদয়-কন্দরে একেবারে বিশুষ্ক হয় নাই। এ বয়সেও কাব্যবিনোদ অনুভব করিতে পারি।

শকুন্তলার নান্দী অতিশয় উদাত্ত-গম্ভীর :—

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

অনুবাদে ইহার আরাব ও ঝঙ্কারের প্রতিধ্বনি উঠান সুকঠিন। তবে ইহার ভাবের কতকটা অনুবর্ত্তন করা যাইতে পারে মাত্র। আমার অনুবাদ এইরূপ—

আদ্যসৃষ্টি জল-মূর্ত্তি, অগ্নিমূর্ত্তি আর,
বিধিহুত হুত-ভুক্‌, হোতৃমূর্ত্তি যাঁর;
চন্দ্রসূর্য্য মূর্ত্তি—দুহু কালের কারক,
শব্দগুণ ব্যোম মূর্ত্তি, বিশ্বের ধারক,
ক্ষিতি মূর্ত্তি—যিনি সর্ব্ববীজের প্রকৃতি
বায়ুমূর্ত্তি যাঁতে সব প্রাণী করে স্থিতি—
অষ্ট-মূর্ত্তিরূপী সেই দেব মহেশ্বর
করুন এ নিখিলের রক্ষা নিরন্তর!

ইহার পর প্রস্তাবনা—সূত্রধার বা রঙ্গনায়ক (ম্যানেজার) ও নটীর প্রবেশ। স্বামী-স্ত্রী যুক্তি করিয়া স্থির হইল—

অদ্য খলু কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নামধেয়েন নবেন নাটকেন উপস্থাতব্যম্ অস্মাভিঃ—'কালিদাস-গ্রথিত অভিনব নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলের অভিনয় করিয়া দর্শকমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিতে হইবে।' রঙ্গমঞ্চে নটী একটি মনোহর গীত করিলেন :—

ইসীসিচুম্বিআইং ভমরেহিং সুউমারকেসরসিহাইং।
ওদংসয়ন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীসকুসুমাইং॥

অলিকুলগুঞ্জিত, মৃদু আধ-চুম্বিত
শিরীষ কুসুমকী হার,
(তার) পেলব কেশর-ভার।
কুণ্ডল শ্রুতি পরে, প্রমদা যতনে পরে
মৃদুতর করে সুকুমার॥

নটীর গীত শ্রবণে ক্ষণকালের জন্য সকলেই আত্ম-বিস্মৃত—

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ—

ইহার পর নাটকের আরম্ভ।

প্রথম অঙ্কে ভারতবর্ষের চক্রবর্ত্তী নৃপতি দুষ্যন্ত মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া শকুন্তলার পালক-পিতা কণ্ব মুনির আশ্রমের সন্নিকটে কৃষ্ণসার মৃগের অনুসরণ করিতেছেন। তিনি রথারূঢ়—তাঁহার হস্তে ধনুঃশর। সারথি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—

কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্য-কার্ম্মুকে।
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্॥

কৃষ্ণসার পাছু-সজ্য-শরাসনধারী,

সাক্ষাৎ পিনাকী দেখি মৃগ-অনুসারী।

দুষ্যন্তের মুখে কবি পলায়মান ঐ মৃগের অতি সুন্দর বর্ণনা শুনাইয়াছেন :—

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃকীর্ণবর্ত্মা,
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি॥

গ্রীবাভঙ্গে অভিরাম, রথপ্রতি স্যন্দমান
দৃষ্টি মুহুঃ করি নিপাতিত,
শরপাত ভয়বশে পুচ্ছদেশ সরভসে
পূর্ব্বদেশে ভূয়ঃপ্রবেশিত
অর্দ্ধভুক্ত তৃণরাশি বিবৃত বদনে খসি
শ্রমশ্বাসে পথি বিগলিত,
উচ্চলম্ফে মৃগবর, আকাশেতে বহুতর
ধারাপর স্বল্পমাত্র স্থিত।

দুষ্যন্ত মৃগকে লক্ষ্য করিয়া বাণমোচন করেন আর কি—এমন সময় আশ্রমবাসী তাপসদ্বয় তাঁহাকে নিবারণ করিলেন :—

আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।

কেন?

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ॥
ক বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে॥
তৎ আশুকৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্
আর্ত্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্ত্তুমনাগসি॥

মৃদু এই মৃগদেহে পুষ্পরাশি সম
উচিত কি শরাঘাত অনল-উপম?
কোথা সুকুমার এই মৃগশিশুপ্রাণ
তীক্ষ্ণধার কোথা তব বজ্রসার বাণ!
ধনুকে যোজিত শর, ত্বরায় প্রতিসংহর
আর্ত্তত্রাণ হেতু তব শস্ত্রের ধারণ
প্রহারিতে নির্দোষীরে নহে কদাচন॥

দুষ্যন্ত বাণ প্রতিসংহার করিলেন। তাপসেরা তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কুলপতি কণ্ব আশ্রমে নাই বটে, কিন্তু তাঁহার দুহিতা শকুন্তলা মুনির অনুপস্থিতিতে যথোচিত অতিথি-সৎকারে ত্রুটি করিবেন না। রাজা আশ্রমে প্রবেশ করিতে যাইবেন—হঠাৎ তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইল। রাজা ভাবিলেন :—

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র॥

শান্ত এ আশ্রমপদ, তথাপি স্পন্দিল
বাহু মম, কোথা ফল সম্ভব হেথায়?
কিন্তু অসম্ভব কেন? সর্ব্বত্র নিশ্চয়
ভবিতব্যতার দ্বার উন্মুক্ত সর্ব্বদা।

আশ্রমে প্রবেশ করিতেই দুষ্যন্ত দেখিলেন তিনটী তাপসকুমারী নিজ নিজ শক্তির অনুরূপ কলসী কক্ষে আলবালে জলসেচন করিতেছেন। তিনটীই অনিন্দ্য-সুন্দরী। রাজা ভাবিলেন :—

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥

আশ্রমবাসিনী বালা—
কিন্তু বপুঃ শুদ্ধান্ত-দুর্লভ
বনলতা করে যেন
আশ্রমলতারে পরাভব।

শকুন্তলা বিশেষভাবে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি ভাবিলেন কণ্বের কি বিবেচনা নাই? তিনি এই সুকুমারীকে কঠোর আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন?

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং
য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং
ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি।

বিভ্রমবিহীন এই বপুঃ মনোহর
তপঃ-ক্লেশ সাধিবারে নিয়োজিয়া ঋষি,
মনে হয় নীলোৎপলপত্রধার দিয়া
শমীলতা ছেদিবারে করিলা বিধান।

দুষ্যন্ত বৃক্ষের অন্তরালে সংবৃত থাকিয়া শকুন্তলার রূপ দেখিতে লাগিলেন। কুসুমের মত লোভনীয় ঐ রূপে

এবং সমস্ত অঙ্গে বিচ্ছুরিত যৌবনের লাবণ্যে তিনি প্রলুব্ধ হইলেন—

কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।

অথচ শকুন্তলা মুনিকন্যা, তাঁহার বিবাহযোগ্যা নহে। তাই তিনি মনকে বলিলেন, বোধ হয় শকুন্তলা কণ্বের অসবর্ণা-স্ত্রীর গর্ভজাতা। বোধ হয় কেন? নিশ্চয়।

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাংহি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥

ক্ষত্রিয়ের পরিণয়যোগ্যা এ কুমারী
নিসংশয়ঃ; নতুবা কি সাধুবৃত্ত চিত্ত
মোর প্রসক্ত হইত এ বালার প্রতি?
যে বিষয় সংশয়-আস্পদ, সজ্জনের
মনোবৃত্তি প্রমাণ তথায় সুনিশ্চিত।

সুযোগ বুঝিয়া রাজা বৃক্ষান্তরাল হইতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাপসকুমারীদের সহিত তাঁহার অনেকটা পরিচয় হইল। তিনি জানিতে পারিলেন যে, শকুন্তলা কণ্ব-দুহিতা নহে, অপ্সরা মেনকা তাঁহার জননী। কণ্ব তাঁহার পালক-পিতা মাত্র। আরও নিঃসংশয় হইবার জন্য তিনি সখীদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানাদ্
ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্।
অত্যন্তমেব সদৃশেক্ষণ-বল্লভাভির্
অহো নিবৎস্যতি সমং হরিণাঙ্গনাভিঃ॥

তাপসীর ব্রত এই, কামগন্ধহীন,
পালিবে এ বালা কিগো বিবাহ-অবধি?
অথবা জীবন-ভোর রবে উদাসিনী
সখী তব, বন মাঝে হরিণ-নয়না
প্রিয় হরিণীর সহ করিবে বসতি?

ক্রমে আলাপ বেশ জমিয়া উঠিতে লাগিল। 'কোর্টশিপ' যখন বেশ ঘনাইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় এক বন্যহস্তী দুষ্যন্তের অনুযাত্রীদিগের রথকোলাহলে ভীত হইয়া আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিল—

মূর্ত্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো
ধর্ম্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ॥

কিশোরীরা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কুটীরে ফিরিয়া গেলেন। শকুন্তলা যাইবার সময় কুশাগ্রে তাঁহার পদতল বিদ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহার বাকল কুরুবক বৃক্ষের ডালে আটকাইয়া গিয়াছে-এই ছল করিয়া দুষ্যন্তকে আর একবার দেখিয়া লইলেন। দুষ্যন্তও বাধ্য হইয়া শিবিরের অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যাইবার সময় খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন:—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদ্ অসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥

দেহ চলে পুরোদেশে
পরবশ মন পিছে ধায়
কেতু-শিরে চিনাংশুক
প্রতিকূল পবন উড়ায়।

এখানেই প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত। আজিকার মত আমরাও প্রবন্ধ সমাপ্ত করি। 'পঞ্চপুষ্পে'র আগামী সংখ্যায় শকুন্তলা নাটকের অবশিষ্ট ছয় অঙ্কের আলোচনা করিবার এবং স্থানে স্থানে সংস্কৃত অনুবাদ দিবার ইচ্ছা রহিল।

পল্লীকবি

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার, বি-এল

১

ওগো ও শহুরে কবি,—
দেখনিক তুমি দেখনিক কভু পল্লীমায়ের ছবি!
'ক্ষুদ্র গ্রামের অন্ধ আঁধারে'
কল্পনা কভু থাকে কি বাঁধারে?
চক্ষুজুড়ান সুনীল আকাশে শ্যাম প্রান্তর মেশে,
কল্পনা সেথা স্বপন-বিভোর ছোটে যে নিরুদ্দেশে!

২

তুমি তো দেখনি কবি,—
পল্লীমায়ের অঞ্চলে দোলে বিশ্ব-লোকের ছবি!
তুমি তো দেখনি 'নান্নু'র মাঠ,
'কাঁদরা', 'বিরূপী, 'কেন্দুলি'-ঘাট,
জ্ঞানদাস আর বিদ্যাপতি যে জয়দেব সাথে গাহে,
সে যে গো বিশ্বলোকের তীর্থ—শুধু কি তোমারি নহে?

৩

তুমি তো দেখনি কবি,—
পল্লীকবির মুকুরে পড়েছে নিখিল বিশ্বছবি!
'ফুলিয়া' গ্রামের সে কৃত্তিবাস,
'শ্রীখণ্ড'বাসী বলরাম দাস,
'জোফলাই' গ্রামে জগদানন্দ—আনন্দ দিল বাঁটি,
কি করিয়া তাহা ধুয়ে মুছে তুমি করিয়াছ পরিপাটী

৪

তুমি তো দেখনি কবি,—
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের 'কুমারহট্ট'-ছবি!
যেথা আসি' শ্যামা ধরিয়াছে কায়া,
পারেনি কাটাতে পল্লীর মায়া;
পড়িয়াছে বাঁধা হর-মনোরমা পল্লীকবির গানে,
শুধু সে কাহিনী কাটেনি আঁচড় শহুরে কবির প্রাণে

৫

ওগো ও শহুরে কবি,
'তোমরা গড়েছ হেম ও নবীন মধু বঙ্কিম রবি' ?
ভুলিয়া গিয়াছ ছিল কোথা বাড়ী,
'গুলিটা' এবং সে 'সাগরদাঁড়ী',
'নয়াপাড়া' আর 'কাঁটালপাড়া' যে—প্রথম আলোকদাত্রী,
'শিলাইদহের' প্রান্তর নদী—কবিসম্রাট্-ধাত্রী ।

৬

ওগো ও শহুরে কবি,
হয়তো এখন বরফের জলে আসিতেছে ভুলে 'ভবি',
কোথা 'ভাঙ্গাবাড়ী', 'ভাওয়াল' প্রান্ত
গোবিন্দ দাস, রজনীকান্ত ;—
ইন্দু, মাধুরী, গোপী, রামমণি আর রসময়ী দাসী,
আকবর সাহা, সালেবেগ সাথে বাজাল ব্রজের বাঁশি ।

৭

ওগো ও শহুরে কবি,
আঁখি মেলে হায় একবার দেখ বিশ্বকবির ছবি ।
ব্যাস, বাল্মীকি, আর সে হোমার,
ভার্জ্জিল আর শেক্সপীয়ার,
সাদী, ফর্দ্দূসী, হাফেজ, জালালুদ্দীন রুমী,
সার্থক করে গেছে সবে যে গো পল্লীর বনভূমি ।

৮

ওগো ও শহুরে কবি !
পল্লীর ধূলি মাঝে মোরা দেখি স্বর্গের পূত ছবি !
শ্যামা পল্লীর শ্যাম অঞ্চলে
বিশ্বমায়ের স্নেহটুকু দোলে,
তাই হাসি কাঁদি ভালবাসি আর নমি এই পথ-ঘাট,
চিরজীবী হও তোমরা বহিয়া শহুরে কবির ঠাট্ ! *

* গত পৌষ সংখ্যার পঞ্চপুষ্পে প্রকাশিত 'পল্লিকবি' পাঠান্তে ।

পরকীয়া*

পণ্ডিত শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভাগবতভূষণ

"পরকীয়া" বলিলে বৈষ্ণবদিগের পরকীয়ার কথাই মনে হয়। পরকীয়া ব্যাপার লইয়া অনেকে বৈষ্ণবদের প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আমরা দেখিব যে, পরকীয়ার ব্যাপার—ভালই হউক, আর মন্দই হউক—উহা তন্ত্রশাস্ত্রের, এমন কি ধর্ম্মশাস্ত্রেরও (যাহাকে আমরা "স্মৃতি" বলি) অনন্থমোদিত নহে। আমরা আরও দেখিব যে, সকল দিক্ হইতে, বিশেষতঃ অনুরাগের দিক্ হইতে দেখিলে তন্ত্রোক্ত 'পরকীয়া' বৈষ্ণব কথিতা পরকীয়াপেক্ষা উৎকর্ষ বা গুণ-সম্বন্ধে অতীব হীনা, তবে স্মৃত্যুক্ত পরকীয়ার কথা অন্যরূপ বটে। তন্ত্রে বা স্মৃতিতে পরকীয়া-শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। আমরাই, সে সকল শাস্ত্র-বিষয়ে ঐ কথার প্রয়োগ করিতেছি। কারণ এখন বলিবার আবশ্যক নাই—পরে বুঝা যাইবে।

প্রথমে বৈষ্ণবেরা পরকীয়া কাহাকে বলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব। রূপগোস্বামিপাদকৃত "উজ্জ্বল-নীলমণি"তে পরকীয়া এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা।

ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥

অর্থাৎ লোকযুগ্ম, কি না ইহলোক ও পরলোকের মুখ না চাহিয়া যে সকল নারী অনুরাগবশতঃ কোন পুরুষে আত্মসমর্পণ করে, যাহারা ধর্ম্মবন্ধনের দিক্ হইতে অস্বীকৃতা অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে সে পুরুষের বিবাহিতা নহে, তাহারাই পরকীয়া।

মনীষী জীবগোস্বামিপাদ এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার "লোচন রোচনী" নাম্নী টীকায় বলিয়াছেন :—

অন্তরঙ্গেণ রাগেণৈবার্পিতাত্মানো, ন তু বহিরঙ্গেণ বিবাহ-প্রক্রিয়াত্মকধর্ম্মেণ। + + ধর্ম্মেণ বিবাহাত্মকেনৈব স্বীকৃতা অস্বীকৃতা রাগেণ তাস্তু স্বীকৃতা, ইত্যর্থঃ।

এইখানে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই দুইটী কথা ব্যবহৃত হইয়াছে পাঠক ইহা লক্ষ্য করিবেন। এমন যে শাস্ত্রীয় বিবাহ তাহাকে বহিরঙ্গ বলা হইয়াছে কেন? ভরত মুনি বলেন :—

বহুবার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ।

যা চ মিথো দুর্লভতা সা মন্মথস্য পরমারতিঃ॥

অর্থাৎ যে অনুরাগে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ বহুবাধা-বিঘ্ন, যাহাতে প্রেমিক-যুগলের প্রচ্ছন্ন কামুকতা, যে রতি পরস্পরের দুর্লভা, তাহাকেই পরমা কি না শ্রেষ্ঠা রতি বলা যায়। ভরত মুনির এই শ্লোক রূপগোস্বামী ধরিয়াছেন।

দম্পতীর মধ্যে এমনটা ঘটে না; কারণ, সে ক্ষেত্রে কোন বাধা-বিঘ্ন নাই; সেই জন্য প্রচ্ছন্ন কামুকতাও নাই; রতিও সেখানে তুলনায় সুলভ।

পরকীয়া-ঘটিত এই সকল কথাই হইতেছে বৈষ্ণবদের অনুরাগ সম্বন্ধীয় মনস্তত্ত্বের (psychology of love) চূড়ান্ত বক্তব্য। ইহাকে Platonic love বলিতে হয়, বলুন। এই অতুলনীয় অনুরাগের করুণ কাতর ঝঙ্কার বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদের বীণা হইতে উত্থিত হইয়া এখনও মধুর মনোহর নিক্বণে বাঙ্গালীর কাণে বাজিতেছে এবং অনন্তকাল ঐরূপ বাজিবে। আমরা ইহাদের পরকীয়া শ্রীরাধার কথা এখানে কিছু বলিব; শ্রীরাধার অনুরাগের কেবলমাত্র একদিকের কথা। এখানে আগে মনে করিতে হইবে, শ্রীরাধার কৃষ্ণানুরাগ সম্বন্ধে—সেই পূর্ব্বকথিত বহু ভাবের বাধা-বিঘ্ন। এক কথায় তাহা বুঝাইতে গেলে বলিতে হয় শ্রীরাধা কুলবতী—তাঁহার "দুস্ত্যজ আর্য্যকুল," সে কূল হইতে অকূলের দিকে একপদ অগ্রসর হইলেই লৌকিক বিচারে তাঁহার ইহকাল ও পরকাল এককালে অতলে ডুবে—পরিণামে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর দুরপনেয় কলঙ্ক থাকে। কুলবতীর সে কলঙ্ক হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শতবার বাঞ্ছনীয়। তাহাতে আবার

* বৈষ্ণবশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের দিক্ হইতে লিখিত।

শ্রীরাধার জাজ্বল্যমান সংসার—সে সংসারে গুরুজন তো আছেনই, তদ্ব্যতীত তাহার বাহিরে—সমাজের চারিদিকের সকলেই ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মের অবমাননা তাহাদের একেবারে অসহনীয়। সেও একটা বিষম ভয়ের কথা। শ্রীরাধাকে এ সকলেরই ভয় রাখিতে হয়। কিন্তু এসকলেও তাঁহার কিছু হইল না—কৃষ্ণানুরাগের প্রবল বন্যায় শ্রীরাধার কুল শীল, 'ধরম-করম' সব ভাসিয়া গেল। তাহা হইলেও ঐ সকল বাধাবশতঃই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহজ-লভ্য নহেন, সে যে অনেক দূরের—অনেক কষ্টের কথা। এই যেমন শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা দেখিতে শ্রীরাধার ইচ্ছা, কিন্তু দেখিবেন কি করিয়া? সে সুযোগ কোথায়? লোক-লজ্জা যে তাহার প্রবল অন্তরায়, আরও কত প্রকার বাধা-বিঘ্ন যে তাহার বিষম অন্তরায়। কোনদিন শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে যাইবার পথে হয় তো দুয়ারের একটু ফাঁক দিয়া শ্রীরাধা ক্ষণমাত্রের জন্য দেখিতেছেন, কখনও বা অন্যের অদৃশ্য-ভাবে অট্টালিকার ছাদে উঠিয়া নিমেষের জন্য তাঁহাকে দেখিয়া লইতেছেন—এইরূপ ভাব। কিন্তু তাহাতে কি আশা মিটে—প্রাণ যে কেবল ডুকরিয়া কাঁদিয়া বলে—"নয়ন না তিরপিত ভেল।" শ্রীরাধার সেই সময়ের বিহ্বলতাময়ী উক্তি বা স্বগত চিন্তার কথা বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস এইরূপ লিখিয়াছেন:—

তার রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
তার প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
তার হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥
দেখিলে যে সুখ হয় কি বলিব তা।
(আমার) দরশ-পরশ লাগি আলাইছে গা॥

ইত্যাদি।

আবার সেই শ্রীরাধার আর্ত্তিমাখা কাকুতিময় "নিবেদন" পদের একাংশ এই। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন:—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
(তোমায়) না দেখিলে প্রাণ, হয় উচাটন,
কে জানে কেমন তুমি।

ইত্যাদি।

পাঠক, এ সকলের ব্যাখ্যা করার "বুলি" আমাদের ভাষায় নাই—কোন ভাষাতেও থাকিতে পারে না। ঐ "কে জানে কেমন তুমি"র—কেমন তুমি—কেমন তুমি—ও গো কেমন তুমি—এই চিন্তার পৌনঃপুন্যে শ্রীরাধার অনুরাগের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডপ্লাবী উৎস একেবারে যেন ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, যে প্রেমিকার প্রেমিকের সঙ্গ সতত অনায়াসলভ্য, সে প্রেমিকার তৎপ্রতি এমন ভাবের অনুরাগ হইতে পারে কি? বিবাহিতা স্ত্রীর তাই এতটা অনুরাগ পতির প্রতি সম্ভবে না—তাই সকল প্রকারে বার্য্যমাণা পরকীয়া শ্রীরাধার অনুরাগ অত মধুর। প্রবল জলস্রোত প্রস্তরখণ্ডাদির দ্বারা ব্যাহত হইলে যেমন সে স্রোত তখনই শতমুখ হইয়া ধাবিত হইতে থাকে, বার্য্যমাণা পরকীয়ার অনুরাগের তরঙ্গ-স্রোতের গতিও সেইরূপ।

জীবগোস্বামী এ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—স হি বার্য্যমাণ-ত্বাদিসম্ভাবেন রসোৎকর্ষং স্থাপয়তি। অর্থাৎ জীবগোস্বামীর মতে এই ভালবাসাই সকল প্রকার অনুরাগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পণ্ডিতবর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীরও ঠিক ঐ কথা। তিনি তাঁহার "আনন্দচন্দ্রিকা" টীকায় বলিয়াছেন:—বহু বার্য্যতে যতো রতের্হেতোঃ বহুবারণং লোকতো ধর্ম্মত-শ্চেত্যর্থঃ। যত্র রতৌ সত্যাং প্রচ্ছন্নকামুকত্বং যা চ রতির্মিথো দুর্লভতাময়ী সৈব মন্মথসম্বন্ধিনী রতিঃ পরমা উৎকৃষ্টা অন্যাপকৃষ্টেত্যর্থঃ।

অর্থাৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মোট কথা এই যে, এই পরকীয়া রতির তুলনায় অন্য সকল প্রকার অনুরাগই অপকৃষ্ট।

শাস্ত্রীয় বিবাহ সাধারণতঃ মনের টানে হয় না, তজ্জন্যই উহা বৈষ্ণবদিগের প্রেমের অভিধানে বহিরঙ্গ-ব্যাপার বলিয়া কথিত।

পরকীয়ার আবার দুই প্রকার ভেদ আছে—

কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধা মতাঃ। অর্থাৎ কুমারী ও বিবাহিতা ভেদে পরকীয়া দুই প্রকার। ইহাদের মধ্যে—

অনূঢ়া কন্যকাঃ প্রোক্তা সলজ্জাঃ পিতৃপালিতাঃ।
সখীকেলিষু বিস্রব্ধাঃ প্রায়ো মুগ্ধা গুণান্বিতাঃ॥

অর্থাৎ অবিবাহিতা মেয়েরা যাহারা সলজ্জভাবে

বাপের বাড়ীতে সঙ্গিনীদের সঙ্গে খেলাধূলা লইয়া থাকে, তাহারাই "কন্যা"—প্রায়ই মুগ্ধা গুণাপন্না।

"মুগ্ধা" কি তাহার আলোচনা এখানে অপ্রয়োজন।

ব্রজগোপিকাদের মধ্যে কৃষ্ণানুরাগিণী ছিলেন ঐ দুই প্রকার পরকীয়াই অর্থাৎ কুমারী এবং উঢ়া। এইসকল হইতেছে বৈষ্ণবদের পরকীয়াতত্ত্বের মূল কথা। এখানে আর একটী কথা না বলিলে এই পরকীয়ার কথা অসম্পূর্ণ থাকে। জানা প্রয়োজন যে,পরকীয়াতত্ত্ব কেবল কৃষ্ণলীলারই নিজস্ব, সাধারণের জন্য ইহা নহে। অন্ততঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ইহাই বলেন। সহজিয়া বৈষ্ণবদিগের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন :—

বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবন্নতু কৃষ্ণবৎ।

ইত্যেব ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ঃ॥

অর্থাৎ বড়লোক যাহা করেন ইতর লোকেরা তদনুগামী হন। এই জন্য গোস্বামিপাদ সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন, যাঁহারা মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভক্তের মতই থাকিবেন, কদাচ কৃষ্ণ হইতে যাইবেন না, অর্থাৎ কৃষ্ণের ন্যায় পরকীয়া ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবেন না। ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের (বৈষ্ণবশাস্ত্রের) সিদ্ধান্ত। ভাগবতেরও এই কথা। আমরা রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষে শুকদেবের কথা শুনিতে পাঠককে মনোযোগী হইতে বলি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আছে—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।

ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

ইহাও ঐরূপ নিষেধের কথা। গ্রন্থকর্ত্তা কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টই বলিতেছেন, পরকীয়ারসের সম্ভব কেবল ব্রজেই হইয়াছিল, অন্যত্র ইহার স্থান নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের "যোষিৎসঙ্গ" পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। অন্য বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে অন্য কথা হইতে পারে। যাহা হউক, এই পরকীয়া ভাবের অনুকারী বৈষ্ণব যে এখন বিরল, এমন নাও হইতে পারে। একথা ঠিক হইলে বলিতে হইবে যে, বৈষ্ণবশাস্ত্র-বিরুদ্ধ এই লৌকিক পরকীয়া ব্যাপার এখন আমাদের সমাজেই একভাবে পুষ্ট হইতেছে।

বৈষ্ণবশাস্ত্রের কথা বলিলাম, এখন তন্ত্রের কথা বলি। তাহাতেও দেখা যায়, ঐ পরকীয়াভাব তন্ত্রের দোহাই দিয়া প্রকারান্তরে সমাজের আর এক দিকে ঢুকিয়াছে। আমরা দিব্য অর্থাৎ তত্ত্বচক্রে তথা ভৈরবীচক্রে শৈব-বিবাহের কথা বলিতেছি। তন্ত্রোক্ত গুরুতত্ত্বের সহিতও এই পরকীয়া ব্যাপারের বিশেষ সংস্রব আছে। স্ত্রীলোক লইয়া তন্ত্রোক্ত সাধনাদি—যথা লতাসাধন—ঐ পরকীয়ারই ভাবান্তর। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শিব দেবীকে বলিতেছেন :—

কলিকালে প্রবৃদ্ধে তু জ্ঞাত্বা মচ্ছাস্ত্রমম্বিকে।

যোঽন্যমার্গৈঃ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ॥

* * *

উদ্বাহিতাপি যা নারী জানীয়াৎ সা তু গর্হিতা।

উদ্বোঢ়াপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ কুলনায়িকে॥

বেশ্যাগমনজং পাপং তস্য পুংসো দিনে দিনে।

তদ্দত্তাদন্নতোয়াদি নৈব গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ॥

অর্থাৎ কলির প্রাবল্যকালে আমার কথিত তন্ত্রমত জ্ঞাত হইয়াও যে ব্যক্তি অন্য শাস্ত্রমতে ক্রিয়াদি করিবে, সে মহাপাতকী হইবে। তৎকর্ত্তৃক অন্য-শাস্ত্রানুসারে বিবাহিতা স্ত্রী নিন্দনীয়া এবং তদ্রূপ বিবাহিতা হইলেও তাহার সংসর্গে সে পুরুষকে পাপী হইতে হইবে। দিনে দিনে তাহাকে বেশ্যাগমনের পাপ স্পর্শ করিবে। তাহার হস্ত-প্রদত্ত অন্নজল দেবতার অগ্রাহ্য।

শিবোক্ত বিবাহবিধি ব্যতীত অন্য বিধি অনুসারে বিবাহিতাকে শিব বেশ্যাতুল্যা বলিলেন. পরন্তু তৎকথিত ভৈরবীচক্রে বা তত্ত্বচক্রে বিবাহিতা প্রশস্তা এ কথা তিনি বলিয়াছেন :—

উভয়ত্র মহেশানি শৈবোদ্বাহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

তথা দানে চ পানে চ বর্ণভেদো ন বিদ্যতে॥

অর্থাৎ তত্ত্বচক্রে ও ভৈরবীচক্রে উভয়ত্র শৈবমতে বিবাহ হইতে পারে। সেখানে পানভোজনাদিতে বর্ণভেদ বিচার্য্য নহে।

সে বিবাহ কি প্রকার তাহা শিব বলিতেছেন :—

শৈববিবাহো দ্বিবিধঃ কুলচক্রে বিধীয়তে।

চক্রস্য নিয়মেনৈকো দ্বিতীয়ে জীবনাবধি॥

অর্থাৎ কুলচক্রে অনুষ্ঠেয় শৈববিবাহ দুই প্রকার। এক প্রকার বিবাহের সম্বন্ধ বা স্থায়িত্ব চক্রস্থিতিকাল

পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ২।৫ ঘণ্টা। এই প্রকারে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের জীবনে তাঁহার শতসহস্র বার নূতন নূতন বিবাহ হইতে পারে; নিত্যই চক্রে যাইলে নিত্যই বিবাহ,আর সে বিবাহ-বন্ধনও পূর্ব্বোক্তরূপে স্বল্পকালস্থায়ী। অন্ত প্রকার অনুষ্ঠেয় বিবাহের কিন্তু আজীবন সম্বন্ধ। তাহার পর শিব বলিতেছেন :—

বয়োবর্ণবিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে।
অসপিণ্ডাং ভর্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ॥

অর্থাৎ শৈব-বিবাহে বয়সের বা বর্ণের বিচার নাই; বিধবা অসপিণ্ডার বিবাহ হইতে পারে, ইহা শিবের শাসন।*

পাইলাম এখন ইহাতে বৈষ্ণবদের সেই উভয়বিধা পরকীয়া—উঢ়া ও অনূঢ়া। অনূঢ়ার চক্রে যাইতে বাধা নাই।

অবশেষে শিব বলিতেছেন :—

নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজনমৈথুনম্।
সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্ম্মে নিরূপিতম্॥

অর্থাৎ দেবি, মানুষেরা স্বভাবতঃই ভোজন ও মৈথুন-প্রিয়। সেই জন্য সংক্ষেপার্থে ও হিতার্থে তাহা শৈবধর্ম্মে নিরূপিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবদের পরকীয়াতত্ত্বে বিবাহ, অর্থাৎ ধর্ম্মের অনুমোদন, নাই। শিব কিন্তু তৎকথিত শাস্ত্রে পরকীয়ার বিবাহ ধর্ম্মতঃ অনুমোদন করিয়াছেন। অবশ্য তাহাতে তিনি বিধবা, অসবর্ণা, বয়োধিকা প্রভৃতির কোন বিচার রাখেন নাই। কিন্তু বৈষ্ণবদের সেই "রাগেণৈবার্পিতাত্মানঃ" ইত্যাদি কথার সহিত এ পরকীয়া ভাবের কতটা সম্বন্ধ তাহা বুঝা প্রয়োজন।+

এখন তন্ত্রোক্ত গুরু-সম্বন্ধে পরকীয়ার কথা বলিব। কুলার্ণব তন্ত্র বলেন, গুরুপত্নী পাঁচ প্রকার। যথা—

উঢ়া ধৃতা তথা ক্রীতা মূল্যেন চ সমাহিতা।
সকৃৎকামগতা চাপি পঞ্চধা গুরুযোষিতঃ॥

অর্থাৎ শিষ্য পাঁচ প্রকার নারীকে গুরুপত্নী জ্ঞান করিবেন। যিনি গুরুর বিবাহিতা তিনি তো গুরুপত্নী বটেনই, তদ্ভিন্ন শিষ্যের আর চারিপ্রকার নারীকে গুরুপত্নী জ্ঞান করা উচিত। ইহারা হইতেছেন, (১) ধৃতা (২) ক্রীতা (৩) অর্থদ্বারা অঙ্গীকৃতা এবং (৪) অন্ততঃ একবারও কামভাবে গতা। এই কয়প্রকার গুরুপত্নীই

---

*হিন্দুর বিধবা-বিবাহের অনুমোদন তন্ত্রে দেখা যায়। ইহা কত কাল পূর্ব্বের কথা বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ ইহা বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থাপক পরাশরের স্মৃতির অনেক পরের।

+ ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য বিবাহেরও স্বতন্ত্র পদ্ধতি শিব করিয়াছেন এবং সে বিবাহ তন্ত্রে ঐ নামেই উক্ত হইয়াছে। আমাদের সমাজে প্রচলিত ঐ বিবাহ-পদ্ধতির সহিত সে শৈবপদ্ধতি মূলতঃ এক হইলেও তাহার বিলক্ষণ একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। তৎকথিত ব্রাহ্ম ও শৈব বিবাহে গৃহীতা স্ত্রী সম্বন্ধে শিব বলেন ;—

পরিণীতাস্তু যা ভার্য্যা ব্রাহ্মৈর্ব্বাপিশিবস্থিতিঃ।
তা এব দারা বিজ্ঞেয়া অন্যাঃ সর্ব্বাঃ পরস্ত্রিয়ঃ।

অর্থাৎ ব্রাহ্ম বিবাহে গৃহীতা এবং শৈবপদ্ধতি অনুসারে চক্রে সম্পাদিত আজীবন বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধা স্ত্রী, এই দুই প্রকারের স্ত্রীই হইতেছেন যথার্থ দারা; অন্যাসকল পরস্ত্রীবৎ। তবে শিব ইহাও বলেন যে, শৈব-ভার্য্যার পুত্র পিতৃপিণ্ডাধিকারী নহে—"শৈব-ভার্য্যাসুতং বিনা"—এবং এরূপ পুত্রের বা তাহার জননীর কোন উত্তরাধিকারিত্বও নাই, তবে তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার সর্ব্বথা অধিকার আছে :—

ব্রহ্মান্বয়ে বিদ্যমানে পিত্রোঃ সপিণ্ডনে স্থিতে।
মৃতস্য শৈবীতনয়ো ন পিতুর্দায়ভাগো ভবেৎ।
শৈবপত্নী চ তৎপুত্রা লভেরন্ ধনভাগিনঃ।
গ্রাসমাচ্ছাদনং ভদ্রে স্ব প্রয়োজনথাধনম্।

এক সময়ে এদেশে এই প্রকার শৈব-বিবাহের নিতান্ত অসদ্ভাব ছিল না। এখনও ঐরূপ বিবাহের কথা কখন কখন শুনি। উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বকালে হিমালয় দিয়া তিব্বতে ও চীনে যাতায়াত করিতেন,বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরাও সেইরূপ করিতেন। সেই সময় তাঁহাদের সহিত পার্ব্বত প্রদেশের অনেক নারীর শৈব বিবাহ ঘটিয়াছিল, এরূপ বিবেচনার কারণ আছে। অদ্যাপি তাঁহাদের সেখানকার বংশধরেরা উপবীত ধারণ করেন। ঐ ব্রাহ্মণদিগের তিব্বতে গন্তব্য পথ দিয়া তথাকার লোকেরাও ভারতবর্ষে যাতায়াত করিতেন। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক Hiouen Thsang এবং Fa-hien সম্ভবতঃ সেই পথ দিয়াই ভারতে আসিয়াছিলেন। এখন বহুদিন হইতে সে পথের সত্তা লোপ পাইয়াছে। অন্য পথও তখন ছিল বোধ হয়। Elphinstoneএর "History of India"তে Hiouen Thsangএর ভারতে আগমনের পথের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। তাহার উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক।

পূজ্যা। এসকল স্ত্রীতে কিন্তু সেই অনুরাগেরই অসম্ভাব থাকা অনেকটা সম্ভব। আবার নিরুত্তরতন্ত্র আরও অনেক দূরের কথা গুরু-সম্বন্ধে বলেন :—

আগমোক্তপতিঃ শম্ভুরাগমোক্তপতির্গুরুঃ।
স্বপতিঃ কুলজায়াশ্চ ন পতিশ্চ বিবাহিতঃ।
বিবাহিতপতিত্যাগে দূষণং ন কুলার্চ্চনে।
কুলজাগুরবে দেবি পতিত্বে বরণঞ্চরেৎ।

অর্থাৎ আগমের মতে শিবই কুলজায়ার পতি; অথবা শিবের সহিত অভিন্ন দীক্ষাগুরুই সে নারীর যথার্থ পতি। অতএব কুলার্চ্চনকার্য্যে বিবাহিত পতি ত্যাগ করা দূষণীয় নহে; হে দেবি, কুলস্ত্রী গুরুকে পতিত্বে বরণ করিবেন।

পরকীয়া ব্যাপারে ইহার অধিক আর কি চাই? ইহাতে বিবাহিত পতি ত্যাগ করিয়া গুরুর প্রতি পতি-বুদ্ধি করা পর্য্যন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। অনুরাগের কথার কিন্তু কোনও উল্লেখ এখানেও দেখি না। পাঠক দেখিবেন, পূর্ব্বের লিখিত কয়প্রকারের গুরুপত্নী আর শিষ্যা নারীর কথা যাহা এখন বলিলাম এবং অতঃপর যে সকল স্ত্রীর কথা বলিব, ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব-শাস্ত্রকথিত ঊঢ়া ও অনূঢ়া দুই প্রকারেরই কামিনী থাকা সম্ভব। অনুরাগিণীর কথা কিন্তু ঠিক বলিতে পারি না।

কুমারীতন্ত্রের মতে সাধন সম্বন্ধে ৯ প্রকার কুলনায়িকা প্রশস্তা। যথা, নটী, কাপালিকা, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপালকন্যা এবং মালাকারকন্যা। স্বনামখ্যাত বৈষ্ণবপদ-কর্ত্তা শক্তিসাধক সহজিয়া চণ্ডীদাস রজকী লইয়া সাধনা করিয়াছিলেন, ইহা অনেকেরই জানা আছে। তবে ইহাদের অনুরাগ অদ্ভুত ছিল বটে। উক্তা ব্রাহ্মণী-সম্বন্ধে আবার বৃহত্তন্ত্রসার বলেন, "ব্রাহ্মণী তু ব্রাহ্মণবিষয়ে।" বেশ—ভাল কথা বটে। নিরুত্তর তন্ত্রে আছে :—

শ্যামাবিদ্যা ন সিধ্যন্তি নাপিতাঙ্গনয়া বিনা।
তারাবিদ্যা ন সিধ্যন্তি চাণ্ডালীগমনং বিনা।
শ্রীবিদ্যা চ ন সিধ্যন্তি ব্রাহ্মণীগমনং বিনা
ছিন্নমস্তা ন সিধ্যন্তি কাপালীগমনং বিনা।

ইত্যাদি

অর্থাৎ শ্যামা, তারা, কমলা ও ছিন্নমস্তার সাধনায় সিদ্ধি-লাভ ঐ সকল বিদ্যার ক্রমানুসারে নাপিতানী, চাণ্ডালী, ব্রাহ্মণী ও কাপালী গমন ব্যতীত হইতেই পারে না।

আর কত তুলিব? গান্ধর্ব্বতন্ত্রে আছে :—

মদিরায়াং ন বা শক্তৌ জাতিবৃত্তিং বিচারয়েৎ।
নানাজাতিষু সম্ভূতাং ব্রজেৎ সংপ্রাপ্য ন ত্যজেৎ॥

ইহার অর্থ হইতেছে, মদিরা সম্বন্ধে বা শক্তি (সাধন-সহায়া নারী) সম্বন্ধে জাতিবুদ্ধ্যাদি করিবে না। নানা-জাতি-সম্ভূতা পাইলেই গমন করিবে—ছাড়িবে না।' পাঠক দেখিবেন, উদ্ধৃত শ্লোকে বিধিলিঙের প্রয়োগ আছে। এ সকল পরকীয়ার কথা বটে। কিন্তু বৈষ্ণবের 'পরকীয়া' কখনই নহে। উপরে ঐ যে "নানাজাতিষু সম্ভূতাং ব্রজেৎ সংপ্রাপ্য ন ত্যজেৎ" উদ্ধৃত করা হইয়াছে, ঐ মতের পক্ষে রুদ্রযামল তন্ত্র হইতে নীচের কয় পংক্তি উঠাইলাম।

রজস্বা পুষ্করং তীর্থং কাশী চাণ্ডালী তু স্বয়ং
চর্ম্মকারী প্রয়াগঃ স্যাদ্রজকী মথুরামতা
অযোধ্যা পুসমী প্রোক্তা—

ইত্যাদি।

অর্থাৎ কি কি প্রকার স্ত্রীসংসর্গে কি কি তীর্থগমনের ফল-লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে রজস্বলা নারী পুষ্করতীর্থের সমা, চাণ্ডালী কাশীর তুল্যা, চর্ম্মকারী প্রয়াগের সমানা, রজকী মথুরার ফলদায়িনী, পুসমী অর্থাৎ নিষাদী (ব্যাধের স্ত্রী) অযোধ্যাক্ষেত্রের ফলদাত্রী, ইত্যাদি। দেখা গেল এইরূপ তথা-কথিতা পরকীয়ার চূড়ান্ত ব্যাপারই তন্ত্রে আছে।*

---

* তন্ত্র যে শ্রেষ্ঠ সাধনশাস্ত্রসকলের অন্যতম, তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝি। তবে যেমন ঘরের সকল জিনিসেই বাহিরের জঞ্জাল আসিয়া পড়ে তন্ত্রেও সেইরূপ অনেক আবর্জ্জনা স্থান পাইয়াছে। এ সকল লেখা কামান্ধদের কার্য্য—প্রক্ষিপ্ত। নচেৎ ঔরসকন্যাবৎ যে শিষ্যা, তাঁহাকে হিন্দুরমণী হইয়া পতিত্যাগরূপ চরম অপরাধের কার্য্য করিয়া পিতৃবৎ আধ্যাত্মিক দীক্ষাদাতা গুরুদেবকে পতিজ্ঞান করিতে হইবে, এ কথা দেবাদিদেবের উক্তি বলিয়া কোন হিন্দু বিশ্বাস করিবেন? ঐ

এখন স্মৃতিশাস্ত্রের কথা বলি। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত ব্যবস্থা-সমেত ১৩৩৭ সালের বঙ্গবাসী পঞ্জিকায় মৃত পুরুষদিগের প্রেতকার্য্যের অধিকার-নির্ণয়স্থলে ক্রমান্বয়ে "৬জনকে শাস্ত্রানুসারে অধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া তৎপরে ৩৭ দফায় "অসবর্ণা ভার্য্যা"কে ও তাহার পর ৩৮ দফায় অপরিণীতা স্ত্রীকে অধিকারিণী বলা হইয়াছে। অপরিণীতা স্ত্রীসম্বন্ধে উহাতে লিখিত আছে, "যথাবিধি বিবাহসংস্কার হয় নাই, কিন্তু তদ্বদ্‌ব্যবহৃতা স্ত্রী"। এই স্ত্রীকে বৈষ্ণবশাস্ত্র-কথিতা পরকীয়ার অন্ততঃ কতকটা লক্ষণা-বিশিষ্টা মানিতে হয়। কারণ তিনি কোন প্রকারে "বার্য্য-মাণা" না হইলেও অনুরাগিণী বটে; নতুবা তাঁহার পক্ষে চিরদিন ঐ ভাবে ব্যবহৃতা হওয়া অসম্ভব। অপরিণীতা স্ত্রীর পরে পারম্পর্য্যক্রমে শ্বশুর, জামাতা প্রভৃতি আরও কয়েকজনের প্রেতকার্য্যে অধিকারের উল্লেখ দেখা যায়। অপরিণীতার অধিকার কিন্তু ইঁহাদেরও পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। এ কথা বিবেচ্য। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের শুদ্ধি-তত্ত্বে "মাতামহঃ মাতুলঃ ভাগিনেয়ঃ মাতৃপক্ষসপিণ্ডঃ তৎসমানোদকাঃ অসবর্ণা ভার্য্যা অপরিণীতা স্ত্রী শ্বশুরঃ" প্রভৃতির উল্লেখ তদীয় বিচারসিদ্ধ ক্রমনির্ণয়ের একাংশে দেখা যায়। রঘুনন্দনের পূর্ব্বগামী স্মার্ত্ত শূলপাণি-প্রণীত শ্রাদ্ধবিবেক গ্রন্থে প্রেতক্রিয়াধিকারী নির্ণয়াংশে লিখিত আছে, "স্ত্রিয়োঽত্র অসবর্ণোঢ়া অপরিণীতা বা"। অর্থাৎ এখানে স্ত্রী বলিতে বুঝিতে হইবে, মৃতব্যক্তির অসবর্ণা ভার্য্যা (এই যেমন শৈববিবাহের স্ত্রী বা অপর পদ্ধতি অনুসারে বিবাহিতা স্ত্রী) অথবা তৎকর্ত্তৃক অবিবাহিতা* এতদূরে বোধ হয় বুঝা যাইবে যে, বৈষ্ণব-কথিতা পরকীয়াই শ্রেষ্ঠ।

রকমটা হইলে তো দেশশুদ্ধ পতিত্যাগ করা হয়, পত্নী লইয়া পতি বেচাবাদের আর ঘর করা চলে না।

তন্ত্রে গুরুদেব নানাস্থানে পিতৃভাবেই উল্লিখিত হইয়াছেন। আমরা বিশ্বসার তন্ত্রের গুরুগীতা, গুরুতন্ত্র প্রভৃতি হইতে কয়েকটী শ্লোক বা তদংশ পাঠককে দেখাইতেছি যথা :—

উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুম্।

অর্থাৎ জনক এবং ব্রহ্মদাতা (মন্ত্রদাতা) এই উভয়বিধ পিতার মধ্যে ব্রহ্মদাতা পিতা গুরুই প্রধান। অতএব জন্মদাতা অপেক্ষা মন্ত্রদাতা শ্রেষ্ঠ, ইহা সতত মনে করিবে।

অপর শ্লোকাংশ—

গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গতিঃ।

অর্থাৎ—গুরুই পিতা, গুরুই মাতা, গুরুই দেবতা (ঈশ্বর), গুরুই গতি।

অন্য শ্লোকার্দ্ধ—

গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।

অর্থাৎ—গুরুই পিতা, গুরুই মাতা, গুরুদেবই মহেশ্বর।

শ্লোকান্তর—

জন্মহেতু হি পিতরৌ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ।
গুরুর্বিশেষতঃ পূজ্যো ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শকঃ।

অর্থাৎ জন্মদাতা ও জন্মদায়িনী বলিয়া পিতামাতা যত্নের সহিত পূজ্য। কিন্তু ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ভেদ শিক্ষাদাতা (জ্ঞানদাতা) গুরু তাঁহাদের অপেক্ষাও বিশেষভাবে পূজনীয়। কারণ, পিতামাতা হইতে আমরা যে দেহ পাই, তাহা নর-পশুর দেহ হইতে পারে, কিন্তু সে দেহে বিবেকবুদ্ধি অর্পণ করিয়া যিনি যথার্থ মনুষ্যত্ব দিয়াছেন, তিনি পিতামাতা অপেক্ষাও গরীয়ান্। এইরূপ অনেক দেখান যাইতে পারে।

---

* আত্মার সদ্গতি লাভের জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা আছে। সেই জন্য ঐ কার্য্যকে মৃতব্যক্তির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াও বলা হইয়া থাকে। গতপ্রাণ ব্যক্তির অবিবাহিতা নারীর যখন এ হেন গুরুতর পারলৌকিক কার্য্যে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অধিকার দেখা যায়, তখন গৃহ্যব্যাপারে সে নারীকে বিশেষ সম্মানের চক্ষেই দেখিতে হয়। অনুরাগিণী স্ত্রীর যথার্থ যে অনুরাগ তাহা সমাজের উপেক্ষণীয় নহে; তাই বোধ হয় স্মৃতিশাস্ত্রে অন্ত্যেষ্টি বিচারে তাহাকে কথিতরূপ উচ্চাধিকার দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ অবিবাহিতার সহিত 'রক্ষিতার' তুলনা, স্বর্গের সহিত নরকের তুলনা। সকল দেশে সকল সময়েই এ প্রকার অপরিণীতা স্ত্রীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। এরূপ স্ত্রীর রকমটা বুঝাইবার জন্য আমরা সমাজ হইতে কোন বাস্তব দৃষ্টান্ত না খুঁজিয়া "দুর্গেশ-নন্দিনীতে" লিখিত বীরেন্দ্রসিংহের অবিবাহিতা অথচ অপরিণীতা স্ত্রীবৎ ব্যবহৃতা 'বিমলাকে' দেখাইতে চাই। বিমলার পূর্ব্ববৃত্তান্ত যাহাই হউক তাহার ন্যায় সাধ্বী স্ত্রী দুর্লভা। জাতীয় সাহিত্য জাতীয় হৃদয়ের মুকুরস্বরূপ, তাহা কাল্পনিক বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সুতরাং হৃদয়বান্ দুর্গেশনন্দিনী-প্রণেতা তাঁহার মানসী কন্যা বিমলার চরিত্র চিত্রণে ধর্ম্মশাস্ত্রের পোষকতা প্রাপ্ত অনুরাগেরই সম্মান করিয়াছেন। গ্রন্থকার সে চিত্র আঁকিতে যে আমাদের অনুমিত পূর্ব্বকথিত প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় ধারণা লইয়া তাঁহার তুলিকা ধরিয়াছিলেন, একথা আমরা বলিতেছি না; কারণ প্রেমের পথ কবির নিকট একরূপ নিষ্কণ্টক। আমাদের মনীষী পূর্ব্বপুরুষগণ অনেকটা কবির চক্ষুতেই অনুরাগের ব্যাপারকে দেখিতেন বোধ হয়; কারণ কবির চক্ষু না হইলে অনুরাগের মাহাত্ম্য ঠিক বুঝা যায় না। কেবল কঠোর সামাজিকশাসন যে ক্ষেত্রবিশেষে একেবারে চলিতে পারে না, ইহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বুঝিতেন বলিয়া অনুমান হয়। এখনকার হিন্দুসমাজেও সামাজিক প্রাজাপত্য বা ব্রাহ্ম বিবাহ-পদ্ধতি উপেক্ষা করিয়া গান্ধর্ব্ববিবাহ হওয়ার কথা আমরা শুনি। ১৩২৭ সালের ১২ই চৈত্র তারিখের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'হিতবাদী'তে লিখিত একটী গান্ধর্ব্ব বিবাহের খবর আমরা জানি। উহা ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, বেতিয়াস্তে ঘটিয়াছিল

পায়ের ধূলা

(গল্প)

শ্রীঅমরেশ ভট্টাচার্য্য

(ক)

বায়স্কোপ দেখিতে গিয়া রাণুর হঠাৎ ব্রাহ্মণের উপর অসীম ভক্তির উদয় যে কেন হইল মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে পারেন। ঘটনাটী এইরূপ;—আমার অতি শৈশবে আমার বাবা ও রাণুর বাবা একই অফিসে কাজ করিতেন। আমাদের বাসাও একই জায়গায় ছিল। আমার বাবা ছিলেন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ—আর রাণুর বাবা ছিলেন বৈদ্যকুলোদ্ভব নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। রাণুর বাবা আমাদের সাক্ষাৎ দেবতার স্থায় দেখিতেন। সেই সময় তাহাদের সহিত আমাদের একান্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তারপর প্রায় দশ বার বৎসর অতীত হইয়াছে, মধ্যে দুই একবার মাত্র তাহাদের সহিত আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইলেও আমাদের পূর্ব্ব সৌজন্য ঠিক একইরূপ আছে।

শিয়ালদহ ষ্টেশন—রাণু আর মাসীমারা নামিলেন। রাণু আমায় দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"আমায় হঠাৎ দেখে যে অবাক্ হয়ে গেলেন পরেশ দা!" আমি বলিলাম, "এটা হঠাৎ নয়, আমি জানতাম যে তুমি আজ আসবে!"

বায়স্কোপে জয়দেব হইতেছে। ফিলমের অনেকগুলিই নবদ্বীপ হইতে তোলা। আমারও নিবাস নবদ্বীপ। যেখানে যেখানে নবদ্বীপের দৃশ্য দেখান হইতেছে আমি সেগুলি রাণুকে বুঝাইয়া বলিতেছিলাম।

মুষলধারে বৃষ্টি—প্রেমবিহ্বল জয়দেব লক্ষ্যহারা হইয়া ছুটিয়াছেন, এমন সময় রাণুর পা আমার পায়ের সহিত ঠেকিয়া গেল।

বিনাকারণে কাহারও শ্রীচরণের ধূলা মাথায় দিবার প্রবৃত্তি আমার কোনদিনই ছিল না—সুতরাং নির্দ্দোষ রাণু যখন আমার শ্রীপাদুকার ধূলি লইবার জন্ম ব্যগ্র হইল তখন তাহাকে বাধা না দিয়া পারিলাম না। রাণু যে কাজ ইচ্ছা করিয়া করে নাই এবং যে স্পর্শটুকুর জন্ম আমারও অন্তর্যামির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না তাহার জন্ম তার অতটা ব্যস্ত হওয়া বাস্তবিক আমার পক্ষে উপেক্ষণীয় হয় নাই।

তখন কিন্তু কিছু বলার স্থান বা অবস্থা নয়; কাজেই মনের ক্ষোভ মনে রাখিয়াই আমি আমার পা দুখানি তুলিয়া গুরুদেবের মত পদ্মাসন হইয়া বসিয়া রহিলাম। বেচারী রাণু! চাহিয়া দেখি তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। এদিকে স্বয়ং ভগবান্ আসিয়া জয়দেবের খাতায় "দেহি পদপল্লবমুদারম্" লিখিয়া গেলেন—

আমার পদপল্লব তখনও আমি আলোয়ান দিয়া জড়াইয়া বসিয়া আছি। রাণুর বুঝি কিছুই দেখা হইল না। চুপি চুপি বলিলাম, "মোজা পরা পা থেকে ধূলো পাওয়া এখন শক্ত হবে, ভবিষ্যতে তোমাকে একসের আন্দাজ পায়ের ধূলা দেব।"

ইহার কয়েক মাস পরেই রাণুদের দেশে রাণুদের সহিত আমার দেখা। সেই সময়ে বৈদ্যসমাজের মধ্যে "শর্ম্মা" হইবার একটা উৎসাহ পড়িয়া গিয়াছে। রাণু হাসিতে হাসিতে বলিল, "পরেশদা, আমরা আর গুপ্ত নেই কিন্তু একেবারে "শর্ম্মা" হয়ে গেলাম।"

আমি বলিলাম,—"তথাস্তু"

"কোন জিনিসই গুপ্ত থাকা ভাল নয়। মানুষ তো নয়ই!"

"কিন্তু মানুষের মনটা?"

আমি বলিলাম, "সেটাও না—প্রকাশের পথ নিয়েই তো জগৎটা চলে আসছে।"

রাণুর ছোট্ট বোনটী তাহার কাপড়টা টানিয়া ধরিয়া বলিল—"এ কে?"

রাণু তাহাকে—"জানিনা যা" বলিয়া ধমক দিয়া আমাকে বলিল,—

"কিন্তু যেটা প্রকাশ করা যায় না?"

"ঐ না করিতে পারার মধ্যেই তো তার প্রকাশ।"

"ব্যথার কি আবার প্রকাশ হয়?"

আমি বলিলাম "ঐ গুমরিয়া গুমরিয়া মরা—নিজের মধ্যে নিজের পুঞ্জীভূত বেদনা বহন করাই ব্যথার প্রকাশ।"

বিষাদক্লিষ্ট মুখে রাণু বলিয়া ফেলিল—"এমনই নিষ্ঠুর তোমরা। তারপর রাণু তাহার কণ্ঠে লালপেড়ে সাড়ীর আঁচলটা জড়াইয়া লইয়া সাষ্টাঙ্গে আমায় প্রণাম করিতে যাইবে এমন সময় তাহার মাসীমা চিৎকার করিয়া বলিলেন, "রাণু শীগগির আয়, পরেশের চা টা নিয়ে যা, ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল যে।" "যাই" বলিয়া রাণু ব্যথাতুর চোখে আমার দিকে তাকাইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। পায়ের ধুলা আর লওয়া হইল না।

* * *

(খ)

সেই অতি শৈশবে কোন্ দূর বিদেশে পূজা পূজা খেলিতে গিয়া পাঁঠা বলি দিবার সময় রাণুর একটা আঙুল বলি দিয়াছিলাম, সে কথা কাহারও মনে নাই। রাণুর মা, মাসীমা প্রভৃতি সকলেই সে কথা ভুলিয়াছেন—রাণু ভুলিয়াছে, আমিও ভুলিয়াছিলাম কিন্তু একদল লোক তাহা ভুলিতে পারিল না। রাণুর বিবাহ-সম্বন্ধ লইয়া যাহারাই আসে তাহারাই এই বালিকাটীর একটী আঙুল না থাকা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া চলিয়া যায়। আমি জানিতাম এই অঙ্গহীনতার জন্য প্রকৃতপক্ষে যে অপরাধী সে দিব্যি দশজনের মধ্যে একজন হইয়া ছেলের বাজারে খুব বেশীদামে বিক্রী হইতে চলিয়াছে; আর যে নিরপরাধ সে অরক্ষণীয়া হইয়া আজ জনে জনের নিকট উপেক্ষিতা হইতেছে। তার নিরপরাধ বাপ-মা এ ভিক্ষার ঝুলি লইয়া প্রার্থীর নিকট দাঁড়ান। আমি জানিতাম এ ভিক্ষার ঝুলি আমারই মাথায় তুলিয়া লওয়া উচিত ছিল কিন্তু সমাজের সে বিধান নাই। তাই আমি স্থির করিয়াছিলাম রাণুকে কেহ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত আমিও কাহাকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। রাণু যখনই আমার পায়ের ধুলা লইতে আসিয়াছে তাই আমি তখনই প্রকৃত অপরাধীর মত সরিয়া পড়িয়াছি।

আমার বাবা হঠাৎ রাণুদের দেশ হইতে বদলী হইয়া গেলেন। "পরেশদা" বলিয়া যখন রাণু ছুটিয়া আসিল তখনও আমার পায়ের ধুলা মিলিল না—মোটর-চক্রের ধুলায় তাহার সমস্ত মুখ-চোখ ঢাকিয়া ফেলিল—আমাদের গাড়ী তখন ষ্টার্ট দিয়াছে।

* * * *

(গ)

দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আমি তমলুকের সত্যাগ্রহীর দলে মিশিয়াছি। আমার বিবেক বলিতে, আমি যাহা গ্রহণ করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য। রাণু বলিয়াছিল যে, মনের আগুন কি প্রকাশ হয়? প্রকাশ যদি না হয় তবে আজ আমার চারিদিকে দাউ দাউ করিয়া এমন আগুন কেমন করিয়া জ্বলিল? চারিদিকে পুলিসের হাঙ্গামা। লাঠির আঘাতে হরি সিংহের মাথা গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকদের খাদ্যাদি পুলিশ যথেচ্ছভাবে নষ্ট করিয়াছে। কলিকাতা হইতে ট্যাক্সি বোঝাই দিয়া দলে দলে তরুণ-তরুণীরা আসিয়া যোগ দিতেছে। বুড়ী মাইয়ের হুকুম—গোলাভরা ধান যাহারা পোড়াইয়া দিয়াছে,—সম্মুখের বাড়াভাতে ক্ষুধাতুরদের অন্নে যারা নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়াছে, তাদের পিঠ দেখান চলিবে না। দলে দলে সত্যাগ্রহী পুলিশ-কর্ত্তৃক ধৃত হইতেছে, আবার নূতনদল আসিয়া সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করিতেছে। ভোর না হইতেই মেয়েরা স্নানান্তে রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া স্বেচ্ছাসেবীর জন্য ছুটিয়াছে। তাহাদের হাতে পুষ্পচন্দন, আহার ও পানীয়। যাহারা সত্যাগ্রহী, তাহাদের তাহারা চন্দনতিলকে বিভূষিত করিয়া জলযোগ করাইতেছে।

রাত্রি ৪টার সময় পুলিশের হাতে যথেষ্ট প্রহার খাইয়া মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন জ্ঞান হইল দেখিলাম, কপাল দিয়া রক্ত পড়িতেছে। সঙ্গে একখানা রুমাল ছিল। খদ্দরের রুমাল। এখানি রাণুই আমায় দিয়াছিল। যত্ন করিয়া রুমালখানি সর্ব্বদা নিজের কাছেই রাখিতাম। তাহার এক কোণে লেখা আছে "পরেশ-দা"। রুমালখানি মাথায় বাঁধিয়া কোনক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি—এমনসময়

পুলিসের বড়বাবু আসিয়া বলিলেন—go on or you will die (চলে যাও না হয় মরবে) আমি বলিলাম I won't go (যাব না) পুলিশ আবার মারিল। তারপর কি হইল জানি না—সেই অপরিস্ফুট আলোকে আমি তাহ'কে চিনিতে পারি নাই। যখন পুনরায় জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম—পৃথিবীর উপর দিয়া ঊষার আলো আসিয়া পড়িয়াছে—সমস্ত রাত্রির সে বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি আর নাই। প্রকৃতি স্থির-সুন্দর! কোন পুলিশই আর সেখানে ছিল না—তাহারা আমাকে একা ফেলিয়া গিয়াছে। সেই নির্জ্জন সুন্দর প্রভাতে নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হইল—আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলাম।

সুন্দর প্রভাত-বায়ু-হিল্লোলে মেয়েদের প্রভাত ফেরীর গান ভাসিয়া আসিতেছে। ঐ কে একজন বুঝি আমার দিকে আসিতেছে। বাঙ্গলার তরুণি! তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়াছি। অত্যাচার করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কোন প্রতিবিধান করিতে পারিলাম না। আজ যদি রাণুকে পাইতাম তাহা হইলে বলিয়া যাইতাম—তাহার কাছে আমি কত অপরাধী—আর বলিতাম তাহাকে আমি কত ভালবাসি।

একটী কিশোরী গান গায়িতে গায়িতে আমার দিকে আসিতেছে—

"জাগৃহি ভগবন্ হে—"

চক্ষু বুজিয়া আসিল। তরুণী তাহার অঞ্চল দিয়া আমার পায়ের ধূলা মুছাইয়া আমার গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিল। আমার কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা—কিন্তু এ কে? কপালের রুমালখানি তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিয়া বলিলাম "রাণু!"

তখন প্রভাতের আলো সমস্ত জগতের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া রাণু বিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে বলিল—"পরেশদা!"

ছড়া

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সঙ্কলয়িতা শ্রীইন্দুবিকাশ বসু এম্-এ বি-এল

(১০১)

ঘুম নেইক রোগীর,
ঘুম নেইক যোগীর,
আর ঘুম নেইক শোগীর।
(শোগীর—শোক প্রাপ্ত ব্যক্তির।)

(১০২)

এক খিকরে মাছ বেঁধে না
সেই বা কেমন বড়শী,
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না
সেই বা কেমন পড়শী।

(১০৩)

খাটে খাটায় সোণায় গাঁতি,
তার অর্দ্ধেক মাথায় ছাতি,
ঘরে বসে পুছে বাত,
তার ভাগ্যে হা-ভাত।

(১০৪)

কপালে ছিটে ফোঁটা,
তুষ ঝুলি হাতে,
মাইরি দিদি, তোমার মাথা খাই—
কিছু নেইকো এতে।

(১০৫)

একে রপু বুদ্ধ, দু'য়ে পাট,
তিনে গোলমাল' চারে হাট।

(১০৬)

কালি, কলম, মন
লেখে তিন জন।

(১০৭)

কালি, কলম, পাত্ত
যেমন তেমন হাত্ত।

(১০৮)

অধীনের এই নিবেদন,
মন্দ বটি, চিড়ে কুটি—যখন যেমন তখন তেমন।

(এক রাজার কোন মন্ত্রী, অবস্থার ফেরে পড়িয়া চিঁড়ে কুটিতেছিল, সেই সময়ে রাজাকে দেখিয়া বলিতেছেন—অবস্থা বৈগুণ্যের কথা।)

(১০৯)

বৌ নয়ত হীরে!
কাল দিয়েছি পাটের শাড়ী,
আজ দিয়েছে ছিঁড়ে।

(১১০)

পুরুষের দশ দশা,
নারীর দশা তিন,
অভাগা পুরুষের
যদি ফেরে এক দিন।

(১১১)

দু নৌকায় পা দিলে,
পড়ে যাবে অগাধ জলে।

(১১২)

পুতুল মেয়ে উজল ছাই,
তবে যে তার গুণ গাই।

(১১৩)

বিহানে বাদল বাদল নয়,
মায়ে ঝিয়ে কোঁদল কোঁদল নয়।
(বিহান—প্রাতঃকাল।)

(১১৪)

কাজের বেলা গলার মালা,
কাজ ফুরালে চ্যাঙ্গা মালা।

(১১৫)

অভাগীর ছটা পুত,
একটা কানা, একটা ভূত।

(১১৬)

দন্ত কারো ভৃত্য নহে,
শুন মহীপাল,
একত্রে বসতি মোরা
করি চিরকাল।

(১১৭)

যাহা নাহি ভারতে,
তাহা নাহি ভারতে।

(১১৮)

চাইলে কি পাবে?
খাস বাগানের আম নয়,
যে চোক্‌লা কেটে খাবে।
(চোক্‌লা—অংশ।)

(১১৯)

বউটী ভাল বটে,
ঠোক্‌না খেয়ে বাটনা বাটে।
কপালে দীর্ঘ ফোঁটা,
মুখদর্শনি চৌদ্দ টাকা।

(১২০)

কপট প্রেমে লুকোচুরি,
মুখে মধু হৃদে ছুরি।

(১২১)

বেড়াও যদি ভোরের বেলা,
থাকবে না আর রোগের জ্বালা।

(১২২)

সকাল শুয়ে, সকাল উঠে,
তার কড়ি না বৈদ্যে লুটে।

(১২৩)

চালুনীর⋯ঝরঝর করে,
চালুনী ছুঁচের বিচার করে।

(১২৪)

বলতে পারি, কইতে পারি,
সইতে পারি না,
খেতে পারি, নিতে পারি,
দিতে পারি না।

(১২৫)

গুণ থাকে তো কাঁদি.
হুন থাকে তো রাঁধি।

(১২৬

ভগবানের মার,
দুনিয়ার বা'র।

(১২৭)

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়,
উলু খাগড়ার প্রাণ যায়।

(১২৮)

কাক মরল ঝড়ে,
পেঁচা বলে, আমার শাপ
লাগল হাড়ে হাড়ে।

(১২৯)

কিনতে ছাগল.
বেচতে পাগল।

(১৩০)

ঘোড়া চিনি কাণে,
দাতা চিনি দানে,
মানুষ চিনি হাসে,
আর মাণিক চিনি জলে!

(১৩১)

এক পায়ে না আরকে চায়,
হেলে ধরতে পারে না,
কেউটে ধরতে যায়।

(১৩২)

কর যদি তাড়াতাড়ি,
ভুলের হবে বাড়াবাড়ি।

(১৩৩)

বিস্তর আশা করলুম তোমায়,
প্রতিপালন করবে আমায়,
এমনি করলে শেষে,
থাকতে দিলে না দেশে।

(১৩৪)

অবুদ্ধির বল,—
কে খণ্ডাবে বল?

(১৩৫)

এক পয়সা নাই থলিতে,
লাফিয়ে বেড়ায় অলিগলিতে।

(১৩৬)

চোখে দেখলে শুনতে চায়,
এমন বোকা পাবে কোথায়?

১৩৭)

অন্ধকার ঘুরঘুটি,
চোরের মায়ের ভিরকুটি।

(১৩৮)

মেজে ঘসে কর ক্ষয়,
কাল অঙ্গ কি গোরো হয়?
(গোরো—গোরা।)

(১৩৯)

কালা বলে গায় ভাল,
অন্ধ বলে নাচে ভাল।

(১৪০)

পরের সোণা দিও না কাণে,
কেড়ে নেবে হেঁচকা টানে।

(১৪১)

সম্পদেতে কর্ত্তা আমি,
প্রভু, বিপদেতে তুমি।

(১৪২)

বিপদে শিবের গোঁড়া
সম্পদে শিব ত নোড়া।

(১৪৩)

গায়ের বলে হার যথা,
বুদ্ধি বলে জয় তথা।

(১৪৪)

পরের হাতে ধন,
পেতে অনেকক্ষণ।

(১৪৫)

নেংড়া, খোঁড়া, কাঠের ভিম,
চল নেংড়া সারাদিন।

(১৪৬)

আমে ধান,
তেঁতুলে বাণ।

(১৪৭)

বার রাজপুত তের হাঁড়ি
কেউ খায় না কারও বাড়ী।

(১৪৮)

কড়ি দিয়ে খাব দই,
কি করবে মোর গয়লা সই ?

(১৪৯)

বুঝতে নারি সেকরার ঠার,
বলে এক করে আর ?

(১৫০)

কি কথা বললে হায়, হায় !
সে কথা শুনলে হাসি পায়।
লেজ কাটা কুকুর হ'য়ে
সিংহী হ'তে চায়।

(১৫১)

বড় বউ বড়ালের ঝি,
কোণে ব'সে কর কি ?
মেজ বউ মেঘের ঝাটী,
সকল কথায় বেঁকে উঠি।
সেজ বউ সেজুনি,
সব কাজেতে এগুনি।
ন বউ নত্তা,
সকল ঘরের কত্তা।
নতুন বউ নথ্‌নি,
শেওড়া গাছের পেত্নী।
ছোট বউ আতরের শিশি,
ছোট ঠাকুরপোর গোঁফে ঘসি।

(১৫২)

স্বভাব যায় না ম'লে,
ইজ্জত যায় না ধুলে।

(১৫৩)

চোরের মায়ের বড় গলা,
খেতে চায় সে দুধ-কলা।

(১৫৪)

যেখানে বাঘের ভয়,
সেখানে সন্ধ্যা হয়।

(১৫৫)

পুতের...কড়ি
মেয়ের গলায় দড়ি।

(১৫৬)

বুঝলাম তোমার গিন্নিপনা,
তেল থাকে ত নুন থাকে না।

(১৫৭)

গড় করি মেয়েদের পায়,
ধানভানা চাল ঠাকুর খায়।

(মেয়েদের পায়ে ধান-ভানা চাল ঠাকুরকে এখনও অনেকস্থলে দেওয়া হয়—পূর্ব্বে সকল স্থানেই দেওয়া হইত। এখন শহর মাত্রেই ক[illegible]র চাল পাওয়া যায়।)

(১৫৮

ঝি জব্দ কিলে,
বউ জব্দ শিলে,
পাড়া-পড়শী জব্দ হয়
চোখে আঙ্গুল দিলে।

(১৫৯)

পরের কথায় লাথি চড়,
নিজের কথায় ভাতকাপড়।

(১৬০)

ছিড়ে, কুটে, কাটুনী—
পুড়ে ঝুড়ে—রাঁধুনী।

(১৬১)

জীব দিয়েছেন যিনি
আহার দিবেন তিনি।

(১৬২)

ন'মণ তেলও পুড়বে না,
রাধাও নাচবে না।

(১৬৩)
নিজেকে আগে সামাল কর,
শেষে গিয়ে পরকে ধর।

(১৬৪)
শাকের মধ্যে পুঁই,
মাছের মধ্যে রুই ;
ধানের মধ্যে কটকী
বোয়ের মধ্যে ছোটকী।

(১৬৫)
ভাবের ঘটাঘটি,
না দেখলে প্রাণে মরি—
আর দেখলে চটাচটি।

(১৬৬)
কাজের মধ্যে দুই
খাই আর শুই।

(১৬৭)
যদি হয় সুজন,
তেঁতুলপাতায় ন'জন ;
যদি হয় কুজন,
দশ ঘরে দশজন।

(১৬৮)
যদি হয় সুজন,
এক বিছানায় ন'জন,
যদি হয় দুর্জন,
এক বিছানায় একজন।

(১৬৯)
পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট,
বাপের বাড়ী ঝি নষ্ট।

(১৭০)
নীচ যদি উচ্চ ভাষে,
সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।

(১৭১)
পথ চলবে জেনে,
কড়ি নেবে গুণে।

(১৭২)
হাওয়া, আলো বেঁধ না,
রোগে ভুগে মোরো না।

(১৭৩)
এত সুখ যদি মোর কপালে,
তবে কেন আজ ক্যাঁথা বগলে ?

(১৭৪)
নাতির নাতি—
স্বর্গে বাতি।
(নাতির নাতি কয়জনে দেখে ?)

(১৭৫)
কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান,
বাপের বাড়ী থাকলে মেয়ে নিত্য অপমান।

(১৭৬)
লাল চোখে স্নেহ জয়,
হাসি মুখে মন জয়।

(১৭৭)
অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর,
অতি বড় রূপসী না পায় বর ?

(১৭৮)
অদন্তের হাসি
দেখতে ভালবাসি।

(১৭৯)
চিনি মিষ্টি, মিছরী মিষ্টি, আর মিষ্টি পিসী,
তার চেয়ে অধিক মিষ্টি বালকের হাসি।

(১৮০)
কাল কাপড়, রুক্ষ মাথা,
লক্ষ্মী বলেন থাকব কোথা ?

(১৮১)
ঠাকুরে করিলে হেলা
রাখালে মারে ঢেলা।

(১৮২)
ফোকলা মুখের চুম,
বড়ই খাজনার ধুম।

(১৮৩)

পেট হ'য়েছে ভরা

সবাই নয়ন তারা।

(১৮৪)

পেট হ'য়েছে খালি,

সবাই চোখের বালি।

(১৮৫)

খাঁচার ইচ্ছা খাঁচা আছে,

বাছা আমার উড়ে গেছে।

(১৮৬)

বিষহারা ঢোড়া

গর্জ্জন মুলুক জোড়া।

(১৮৭)

টাটের নৈবিত্তি, কাঠের চিঁড়ে

পেট ভোরে খা, আমার কিরে।

(কিরে—দিব্য। এমন আদর যে কাঠের চিঁড়ে খেতে বলছে।)

(১৮৮)

দেখছি কত দেখব আর,

ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

(১৮৯)

এই ক'রে পাকালুম কেশ,

জলে ভাসে জোড়া সন্দেশ।

(১৯০)

তাস, তামাক, পাশা—

এ তিন কর্ম্ম নাশা।

(১৯১)

সকাল, বিকাল নিকাল যেয়,

তার কড়ি কি বৈন্তে খায়?

(১৯২)

যে যত পায়,

সে তত চায়।

(১৯৩)

দরবারে না মুখ পায়,

ঘরে এসে মাগ ঠেঙায়।

(১৯৪)

অনেক কালের ছিল পাপ,

ছেলে হ'ল সতীনের বাপ।

(১৯৫)

খায় না খায় সকালে নায়,

হয় না হয় তিনবার যায়,

তার কড়ি কি বৈন্তে পায়?

(১৯৬)

ওল, কচু, মান—

এ তিন সমান।

(১৯৭)

হায় রে আমড়া,

কেবল আঁটি আর চামড়া।

(১৯৮)

শাক, অম্বল, পান্তা,

তিন ওষুধের হন্তা।

(১৯৯)

লিখতে লিখতে সরে,

হাগতে হাগতে মরে।

(২০০)

নিম নিসিন্দা যেথা,

মানুষ কি মরে সেথা?

পিপাসা
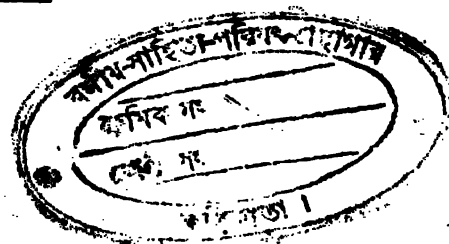
(উপন্যাস)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন বিকালবেলা জানালা দিয়া গিরি স্বেচ্ছাসেবক-দলের একটা মিছিল দেখিতেছিল। সেবকগণের রৌদ্রদীপ্ত ঘর্ম্মাক্ত মুখগুলি যানারোহী লক্ষীর বরপুত্রগণকে লজ্জিত করিয়া যেন হাস্য করিতে করিতে চলিয়াছে। হিমুদা কি এই সেবকদলে মিশিয়া দেশের কাজে লাগিয়া গিয়াছে? প্রত্যেক মুখখানি সে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে চাহিল। কিন্তু তত জনতার মধ্যে তাহার দৃষ্টি অধিকাংশেরই মাথার চুলগুলির উপর ব্যাকুলভাবে ফিরিতে লাগিল।

বনমালী ও গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর তাহার মাতাও যখন পাগল হইয়া গেলেন, তখন হইতে তাহার মনে উঠিয়াছিল যে হিমাংশুর এতদিনকার দুর্জ্জয় বাসনার সম্বন্ধে এইবার তাহার বিচার করিয়া দেখা উচিত। বিধাতা ভাঙ্গিবেন কি গড়িবেন সে লিপি উদ্ধার করিবার সূক্ষ্মদৃষ্টি কাহারও নাই। পিতার ঘর যদি এমন করিয়া অন্ধকার হইয়া না যাইত, সে তো অপত্যস্নেহের নীচে চিরদিনই তাহার কণ্ঠ ক্ষীণ করিয়া রাখিত। কণ্ঠের এ উচ্চতম ঝঙ্কার তাঁহারা কি এমনি করিয়াই দিয়া গেলেন? প্রখর বৈরাগ্যে তাহার সংসার-বুদ্ধি জ্বলিয়া উঠিতেছে না কেন? দেহের কোথায় এত কি অমৃত সঞ্চিত আছে, যাহার বেগ সময় সময় শিরার মধ্যে উল্লাসে চঞ্চল হইয়া উঠে? মাতাকে উন্মাদিনী করিয়া পিতা ও ভ্রাতার মহাপ্রস্থানের পর আজ বৎসরাধিককাল সে এইরূপই ভাবিতেছিল। আরও সে ভাবিতেছিল,—যে গরীব ছেলেটী শৈশব হইতে তাহার নিকট প্রাণের একান্ত অনুরাগ জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছে—জাতি, কুল, চরিত্র এবং সামাজিক মর্য্যাদায় সে তো কোন অংশে হীন নহে। তাহার অপরাধ যে সে দরিদ্র; কিন্তু এই অপরাধ সে কি মার্জ্জনা করিয়া লইতে পারিবে না?

গিরির প্রাণে এ ভাব যে কতদিন জাগিয়াছে তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না, তবে তাহার পিতার মৃত্যুর পর হইতে তাহার স্থির চিত্তে মাঝে মাঝে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। মাঝে মাঝে হিমাংশুর কথা মনে পড়িয়া তাহাকে উন্মনা হইতে দেখা যায়।

মায়ের পরিচর্য্যা লইয়া অনেকটা সময় সে কাটাইয়া দিত। মাতা কখন তাহাকে চড়-চাপড় মারিতেন, কখন হাসিতেন—কাঁদিতেন, কখন বা গালমন্দ করিতেন। সেদিন চিরুণী লইয়া তাঁহার মাথার জট ছাড়াইয়া দেওয়ার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, ওষুধটা এখন একবার খাও, তৈরী করে' দি।"

মায়ের কাছে সরল এবং বোধগম্য উত্তর কোন সময় সে পাইত না। পরিচর্য্যারও তাহার অন্ত ছিল না। যেখানে ভাল ঔষধের নাম শুনিত তাঁহাকে আনিয়া খাওয়াইত। ভাল সামগ্রীটী মা না খাইলে সে নিজেও মুখে দিত না। তাহার প্রশ্নে কাদম্বিনী 'হি' 'হি' করিয়া খানিকটা হাসিলেন। বলিলেন, "জামাই দেখালি নে? বাক্সে তোলা করে' রাখ্‌বি হতচ্ছাড়ি! আখাটা ধূ-ধূ করে' জ্বলে গেল, খানকতক লুচি ভেজে দে! আমি খাবো না—দে-দে, ভেজে দে, না দিলে নিন্দে হবে।"

এ তাহার নিগূঢ় ভাগ্যের পুরস্কার অথবা নিগ্রহ ভাবিয়া না পাইয়া সে হাঁটুর উপর মাথা নীচু করিয়া বসিল। একবার মুখ উঁচু করিয়া দেখিল, জননী তাহার দিকে দৃষ্টি

উগ্র করিয়া মুখ সিটকাইয়া রহিয়াছেন। সে চাহিয়া দেখিতেই কাদম্বিনী বলিলেন, "আমি তোকে পেটে ধরি নি? জামাই দেখাবি নে?"

গিরি এবার মৃদুস্বরে বলিল, "জামাই তো তুমি কর নি মা?"

মাতা বিকৃতমস্তিষ্ক না হইলে লজ্জায় মুখ ফুটিয়া এ রকমের কথা সে বলিতে পারিত না। মায়ের দুঃখে বেদনায় তাহার অন্ত ছিল না। নির্ব্বাক্‌ভাবে প্রশ্নগুলি শুনিয়া গেলে মাতার মস্তিষ্ক আরও গরম হইয়া উঠিত। তাই সে একান্ত সঙ্কোচভরে এই উত্তর করিল।

কাদম্বিনী বলিলেন, "হিমু কি আমার তেমনি ছেলে! বারণ করে' দিয়েছিস্ তুই। বনা একবার ডাকে না—কাছে আসে না—হিমুকেও ভেড়া বানালি?" কিছুকাল কন্যার উপর প্রখর দৃষ্টিতে চাহিয়া পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন, "চিতেটাও সাজালে না—মেয়েটা ভারিক্কি হয়ে বসে' রইল। হিমু তুই দেত বাবা চিতেটায় আগুন ধরিয়ে? মুখ রাখ্— কাল মুখ নিয়ে আর কতকাল এখানে পড়ে' থাক্‌ব?"

জ্ঞানের এই বিকারের দিনে মাতা যে হিমাংশুর দৈন্তের কথা ভুলিতে পারিয়াছেন এই আনন্দ সে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দিয়া উপভোগ করিতেছিল, আর চোখের জলে মাটি ভিজাইতেছিল। কাদম্বিনী পুনর্ব্বার 'হি' 'হি' শব্দে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গিরির অবশ দেহ তাঁহার কোলে ঢলিয়া পড়িল। সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিকাল বেলা তাহার গা ধুইবার কথাও মনে ছিল না। হিমাংশুর কথা মনে পড়িয়া আজ সে অত্যন্ত পীড়িত হইল—তাঁর কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া সে বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। কত দিনের কত শত তুচ্ছ ঘটনা তাহার মনের মধ্যে জাগরিত হইয়া তাহার মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল।

তারপর সে ভাবিতে লাগিল,—এই শ্মশান-গৃহে উন্মাদ মাতাকে লইয়া পরিচর্য্যায় জীবন শেষ করিতে তাহার দুঃখ নাই। কিন্তু যাহার জন্য মনের শান্তি হারাইয়া যে সাধু যুবকটী পথের ভিক্ষুক সাজিয়াছে সে দুঃখের স্মৃতি সে ভুলিতে পারিতেছে কই? কি ব্যথায় তাহার চিত্ত যে ভরিয়া আছে সে তো তাহার জানাই ছিল, কিন্তু যে সমস্ত কারণে সে নিজের চিত্তকে বাঁধিয়া ধরিয়া নির্লিপ্ত রাখিতে পারিয়াছিল, গুরুজনের যে অনুশাসন—সমাজ-নীতির যে বিড়ম্বনা—বুঝিয়া না দেখিয়া, যে তখন কেবল তাহার শ্লেষ, বিদ্বেষ এবং ঘৃণাই বুঝিয়াছিল, আজিও সেই বিচারের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে আপনার বুকের ব্যথা ভারি করিতেছে কি না? কিন্তু তাহাকে পাইবার উপায় কি? ভবশঙ্কর তো খোঁজাখুঁজি কম করেন নাই। তিনি নিরাশ হইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। প্রাণের মর্ম্মান্তিক পীড়ায় আপনার বহুধা শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া সে কি বেদনায় জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিতে বসিয়া গিয়াছে? এ ছাড়া আরও একটা চিন্তা—সে ভাবিতে না চাহিলেও সময় সময় তাহার প্রভাবে সে আতঙ্কিত হইয়া উঠিত। যে খবর কাকমুখে অতি ত্বরায় প্রকাশ পায়, সে খবর দিতে কলিকাতার উপরে একমাত্র ক্ষিতীশই ছিল। কিন্তু সেও শেষটা তাহার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইয়া বাস করিতেছিল।

সে এইরূপ ভাবিতেছে এমন সময় হরেনের পায়ের শব্দ তাহার শ্রুতিগোচর হইল। চাহিয়া দেখিল, সত্য সত্যই হরেন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া বসিল। হরেন বলিল,—

"এই যে, আপনি এখানে রয়েছেন। সেই বাবুটী আমার অফিসে গিয়ে ধন্না দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে বাসা পর্য্যন্ত এসেছেন। ঘরদুটো কি তাঁকে ছেড়ে দেব?"

গিরি নিজের স্বাভাবিক সংযত স্বরে বলিল, "দিতে পারেন।"

কিন্তু তাহার একলা-ঘরে এটা-সেটা কাজের অছিলায় একটা নির্দ্দিষ্ট মতলব প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে এই হরেন ছেলেটী যখনই আনাগোনা করিত, তখনি সে ভদ্রতার মর্য্যাদা পদদলিত করিয়া ছুটিয়া পলাইত অথবা সেই মুহূর্ত্তেই—সৌদামিনীকে সে কাছে পাইতে চাহিত। সে দেখিল, হরেন্দ্র আফিসের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া

হাসিয়াছে এবং সোফার উপর বেশ চাপিয়া বসিতেছে। সে তখন ভব্যতার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—

"আপনি একটু বসুন।"

সংক্ষেপে কথাটুকু বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

হরেন ভাবিল, যখন অপেক্ষা করিতে বলিল, তখন এখনি আবার ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু পরক্ষণেই সে দেখিতে পাইল, সৌদামিনীকে অগ্রে লইয়া গিরি ঘরে ঢুকিতেছে।

হরেনের চক্ষু দুটী ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া যেন প্রশ্ন করিতে লাগিল,—কোন্‌দিন তাহার কি ইতরামী সে দেখিতে পাইয়াছে যে, দেওয়ালের পিপীলিকা যেমন গর্ত্তের মধ্যে সহসা অদৃশ্য হইয়া যায়, সেই রকমে সে ছুটিয়া পলাইল এবং পিছনে একটা উপসর্গ লইয়া ফিরিয়া আসিল। সৌদামিনী কাছে থাকিলে মেয়েটীর হয় তো কথা বলিবার সুবিধা হয়, কিন্তু এ তো তাহা নয়—এ যেন নির্জ্জন কক্ষে ভরসা পাইবার জন্য এই দুষ্ট মেয়েটা সঙ্গী জুটাইয়া ঔদাস্য-ভরে চলিয়া আসিল।

এ রকম ঘটনা আজ নূতন নয়, প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। আর হরেনের অন্তরে ঝড় উঠিয়া গিরির অসামান্য রূপের দুর্ব্বোধ্য আকর্ষণে আবার শান্ত হইয়াও যাইতেছে।

সৌদামিনী খাটের উপর আসিয়া উঠিয়া বসিল। গিরি তাহার পিছনে একটু আড়ালে গিয়া বসিল।

সৌদামিনী চক্ষুদুটী কিছু উজ্জ্বল করিয়া বলিল, "হরেন-দার আরজী মঞ্জুর হয়েছে। আপনার যখন অভিপ্রায় তখন ঘরদুটো তাঁকে ভাড়া দিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে দিদি অনুযোগ করেছেন যে, ঠাকুরদার অভাবে আপনি যখন অভিভাবকের মত হয়ে রয়েছেন, তখন যে সকল কাজে আপনাদেরই দায়িত্ব বেশী, সে সকল কাজে দিদির মাথা নাড়া করে' নেবার কি খুবই প্রয়োজন? ভালমন্দ স্বাধীন মত খাটিয়ে একবার পরীক্ষা করে' দেখলেও তো পারেন।"

উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে গোধূলির শান্ত সমীরণ সান্ত্বনার সামগ্রীর মত ঘরে ঢুকিয়া হরেনের কাছে গিরির হৃদয়ের অস্পষ্টতা যেন দূর করিয়া দিতে লাগিল। একটু আগে যে মনে মনে সঙ্কল্প আঁটিতেছিল যে,—সৌদামিনীর এই ঘটকালীর পাগলামী রাত্রি প্রভাতেই তাহাকে ব্যস্ত ব্যস্ত করিয়া গৃহত্যাগের দ্বারাই সে পরিশোধ করিয়া লইবে, সে এখন সতর্কতার সহিত প্রশ্ন করিল,—

"এতটা অধিকার একজনের উপর ছেড়ে দেবার বেলায় যখন দ্বিতীয় একটা লোকের সামনে থাকার প্রয়োজন হয়, তখন সে প্রয়োজন, লজ্জায়, ভয়ে অথবা আনন্দে সেইটুকু শুধু আমি বুঝতে পারছি নে।"

গিরি অল্প অবগুণ্ঠনের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া তাহার সম্প্রদানের এই পরিণতি বুঝিয়া দেখিতে লাগিল। সৌদামিনী পিছনে চাহিয়া দেখিল গিরির মুখখানি কাল হইয়া গিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল,—

"এতটা অধিকার হরেনদা,—সে কতটা? মেয়েলোকের পুরীতে যেমন-তেমন একটা বেটাছেলে থাকলে এ অধিকারটুকু তার বুদ্ধি-বিবেচনার উপরে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। এতে লজ্জা, ভয় বা আনন্দের কথা কিছু নেই!"

হরেন্দ্র ভাতের হাঁড়ির মত মুখ ভারি করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর বুকের গর্জ্জন চাপিয়া সামলাইয়া সে বলিল,—

"আগেই তো বলেছ, যে সকল কাজে আমাদের দায়িত্ব খুব বেশী সে সকল কাজে তোমার দিদির মাথা নাড়া করে' নেবার খুব প্রয়োজন নেই। এ বুঝি খুব ছোট অধিকার? তোমার কোন্ কথাটা সত্য?"

সৌদামিনী বলিল, "সেও কিছু মিথ্যে বলি নি। অধিকার ছোট হোক বা বড় হোক বাহিরের এ সকল দায়িত্ব বাড়ীর পুরুষলোকের হাতে ছেড়ে দেওয়াই তো বেশী সুবিধের। কিন্তু কেন এ অধিকার দিলেন—কেন পেলাম?—এ সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব তোমরা খুঁজে বেড়াও কি না? তোমার স্মরণ থাকা উচিত, অনেক কাজ আমরা মোটা বুদ্ধিতেই করে' যাই।"

গিরি উঠিয়া দাঁড়াইল। টেবিলের উপরকার বইগুলি গোছাইবার ছলে নাড়াচাড়া করিয়া সেই দিকেই মুখ রাখিয়া সে বলিল,—

"অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই তো বৌঠাকরুণ! উনি ভেবেছেন, আমি তোমাকে ডেকে এনেছি—আর

অপমান বোধ করেছেন। সত্যই যাঁর সামনে বের হই—কথা বলি—এক বাড়ীতে বাস করি—আর সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাসও করি, এ কা'র প্রাণে ভাল লাগে?"

তাহারা উভয়েই চাহিয়া দেখিল, কথা কয়টী বলিয়া গিরি ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছে।

যাহাই হউক এই আচরণের পর সৌদামিনীর মুখের দিকে চোখ চাহিতে হরেনের লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার উপর মনে মনে রাগই হইল। সেই তো ঘটকালী করিয়া তাহাকে এতটা কাছে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে!

সৌদামিনীর মনের এ পরিবর্ত্তন কিছুদিন হইতে ঘটিয়াছিল। সে যেদিন ভবশঙ্করের মুখে হিমাংশু-সম্বন্ধে একটা আভাস শুনিয়াছিল, সেই দিন হইতে সে কিছু হটিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সম্বন্ধ সে তুলিয়াছিল সত্য, কিন্তু গিরির কাছে হরেন্দ্র তাহার কে? নারী সে, নারীর অন্তরের গভীর স্তরে সঞ্চিত বস্তুর আভাস পাইয়া সে তো অন্তরালের বস্তুটী দেখিবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিবে। অকারণ অনিশ্চিত পথে উত্যক্ত করিয়া সে তাহাকে অপমান করিতে পারে না। সে চাহিয়া দেখিল, লজ্জা ও অপমানের উষ্ণ তাপে হরেন্দ্র যেন এক মুহূর্ত্তেই ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে এবং হেঁট মাথায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে ধীরে ধীরে বলিল—

"হরেনদা রাগ করেছ? আমি তোমাকে ডেকে এনে বুকের উপর গুরুভার চাপিয়ে দিয়েছি। তুমি আমার ভাই। তোমাকে আঘাত করি এমন কি মনান্তর তোমার সঙ্গে আমার আছে? এ সম্বন্ধ যখন করি তখন আমার শ্বশুর ছিলেন। এখন দিদির মতে স্বাধীনতা এসে গেছে। ধৈর্য্য আর গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সেটা আমাদের পরীক্ষা করে' দেখা উচিত।"

হরেন্দ্র তখন সোফার উপর গা ঢালিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। মুখ দেখিয়া সৌদামিনী বুঝিল, তাহার বুকের তাপ জল হইয়া যাইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সৌদামিনীর সেদিনকার শেষের কথাগুলি বুঝিয়া দেখিয়া হরেন্দ্র শান্ত হইয়াছিল এবং পূর্ব্বের মত সহজভাবে মিলিয়া মিশিয়া সকলের সঙ্গে চলিতেছিল।

নীচের ঘর দুটায় সেই নূতন ভাড়াটিয়া সুকুমারবাবু আসিয়া বাস করিতেছেন। তিনমাস নিয়মিত ভাড়া দেওয়ার পর দু'মাসের ভাড়া তিনি বাকী ফেলিয়াছেন।

কিছুদিন হইতে লোকটীর চালচলনে হরেনের মনে কিছু সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সে সন্দেহ সত্য হইল, যেদিন সে ভাড়ার টাকা আদায় করিতে তাহার ঘরে ঢুকিল।

সে দেখিল, টেবিলের উপর মদের বোতল ও একটী কাচের গ্লাস পড়িয়া আছে। সুকুমার অর্দ্ধনেত্রে শয্যার উপর লুটাইতেছে। হরেনের আপাদমস্তক জ্বালা করিয়া উঠিল। কিন্তু সে নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া প্রথমতঃ ভাড়ার টাকারই তাগিদ করিল।

সুকুমার বলিল, "এত ঘন ঘন তাগিদ কচ্ছেন, আপনাদের ঘরের তলে মাথা গুঁজে ঋণ সঞ্চয় করে' অকস্মাৎ পালাব না আমি। আপনি কিছু ভাববেন না।"

হরেন্দ্র বলিল, "শুধু সে ভাবনা নয়, আরও অনেক রকম ভাবছি। এ সকল ভাববার সুযোগ আগে পেলে আপনাকে কি ডেকে ঘরে জায়গা দি? টেবিলের উপরকার বোতলটী আপনার সচ্চরিত্রের একটা জলন্ত পরিচয়। ভিতরে আর কতগুলি গুণ জমা হয়ে আছে—কি জানি? বোধ করি সীমা সংখ্যা নেই। সে যাক, আপনার সম্বল তো পঞ্চাশ টাকা বেতনের একটা কেরাণীগিরি। সে তুলনায় সাহস দেখি অত্যন্ত বেশী।"

সুকুমার চটিয়া গিয়া বলিল, "সম্বলের খবরটা তো সে দিন বন্ধুত্বের ভাণ করে' পেয়েছেন। সাহসের পরিচয় কি পেলেন?"

হরেন্দ্র বলিল, "শুধু সাহস নয়, বলতে গেলে দুঃসাহস। অনাত্মীয় লোকের ঘরে মাথা গুঁজে বাস করা—আর পঞ্চাশ টাকা সম্বলে স্ফূর্ত্তি করে' অজ্ঞান হওয়া দুঃসাহস নয় তো আর কি?"

সুকুমার অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত বিরক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া খাটের উপর উঠিয়া বসিল এবং জলন্ত চক্ষু দুটী হইতে কিছুক্ষণ অগ্নিবর্ষণ করিয়া সে বলিল,—

"ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকে উপদ্রব করার মত আস্পর্দ্ধা

আমি হই নি। টাকার গাছ নেই যে পেড়ে দেব। হাতে এলে ঘরে বসেই পাবেন। এরকম অপমান করতে আর কোনদিন চৌকাঠের মধ্যে পা বাড়াবেন না আপনি।"

হরেন্দ্র একটু হাসিল। ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "মদের বোতলটার সঙ্গে বিছানাটা যদি বাহিরে ছুঁড়ে ফেলে দি, এ মালিকানা এখনই বুঝা যায়! সে যা'ক, স্পষ্ট কথা বলাই ভাল, আপনার আর এ বাড়ীতে থাকা পোষাবে না। সন্ধ্যার মধ্যে টাকাকড়ি চুকিয়ে দিয়ে ঘর খালি করে' দেবেন।" এই বলিয়া দুপ্‌দাপ শব্দে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া সে উপরে উঠিয়া গেল। পরপর দুইটী ঘরে খোঁজ করিয়া কাহাকেও না পাইয়া রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া সে দেখিল, গিরি ও সৌদামিনী দুই ননদ-ভাজে বসিয়া তরকারী কুটিতেছে। শ্যামের মা বাসন মাজিয়া এক একখানি বাসন উপুড় করিয়া রাখিতেছে। বামুনঠাকুর রান্নাঘরটী কয়লার ধূমে কালবৈশাখীর আকাশের মত করিয়া তুলিয়াছে। সে রেলিং ধরিয়া ডাকিল,—"আপনারা একবার আসবেন এ ঘরে?"

উভয়ে ফিরিয়া দেখিল। সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে ডাকছ হরেনদা! আমাকে, না দিদিকে?"

"দু'জনকে।"

তাহারা উভয়ে তরকারীর বঁটী ছাড়িয়া চলিয়া আসিল।

তিনজনে তিনখানা সোফার উপর উপবেশন করিবার পর হরেন বলিল,—

"সদু আমার ছোটবোন, তা হ'লেও তিরস্কার করবার অধিকার তার আছে। কিন্তু আপনার কাছে আমি মাপ চাইতে এসেছি।"

গিরি সংশয়াকুলচিত্তে একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র। সৌদামিনী হাসিয়া বলিল, "মাপ্ করবেন কি না কথাটা শুনতে পেলে ঠাকুরঝি একবার ভেবে দেখতে পারেন। আর আমার তো ভাববার কিছু নেই। ভালমন্দ তিরস্কার করবার অধিকার আমি পেয়েছি।"

হরেন বলিল, "আপনাদের অসাবধানতার মাঝখানে বাড়ীতে একটা মাতাল এসে বাস করছে। কিন্তু সতর্ক করবার মত পরিচয় আমি এইমাত্র পেলাম। আমার প্রধান অপরাধ এই যে, আমিই তাকে ঘরে এনে ঢুকিয়েছি।"

শ্রোতা দু'জনের অনেকগুলি উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন মুখের মাঝে থামিয়া গিয়া যেন চক্ষু দুটীতে ফুটিয়া উঠিল। হরেন বলিল,—

"আগে তো জানি নে যে একখানা মিছরির ছুরি। সস্ত্রীক ভিন্ন যারা কল্‌কাতা শহরে ঠাঁই পেলে না, আমাদের পরিবারে আশ্রয় পেতে বা তার কি দাবী ছিল? শুধু সরল কথাগুলির দ্বারা মমতায় তো সে দাবী গড়ে উঠেছিল?"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "হরেনদা কি নীচের ঘরের ভাড়াটিয়ার কথা বলছ?"

হরেন বলিল, "হাঁ—হাঁ, ঐ সুকুমারবাবুর কথাই বলছি। বর্ষার সংস্রবে এ বাড়ীতে তো ঐ একটীমাত্র লোক বাস করে। ভাড়ার টাকা চাইতে গিয়ে দেখি, হতভাগাটা মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। বোতলটাও না হয় লোকে খেয়ে সাম্‌লে রাখে? পরাশ্রয় বলেও একটু হায়া নেই। সেটা টেবিলের ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। আর নিজে মুখ সিট্‌কে পড়ে রয়েছে। এমন দুশ্চরিত্র লোককে আর এক মুহূর্ত্তও গৃহে স্থান দেওয়া যায় না।"

মহিলা দুটীর মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু হরেন স্পষ্টতঃ দেখিয়া শুনিয়া যে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, তাহার উপর মতামত না দিলে কোন ক্ষতি হয় না। গৃহের পুরুষ লোকটী যাহাকে গৃহে স্থান দিয়াছে, সেইই আবার ভালমন্দ বিচার করিয়া স্থানটুকু নিজেদের অধিকারে কাড়িয়া লইতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া গিরি ও সৌদামিনী চুপ্ করিয়া রহিল।

গিরির দিকে চাহিয়া হরেন প্রশ্ন করিল, "এমন লোককে ঘরে স্থান দিতে পারা যায়? আপনি কি বলেন?"

গিরি আনতমুখে উত্তর করিল, "না।"

সৌদামিনী বলিল, "মাতাল বলে' দূর ছাই কচ্ছ, হয় তো তিনি বিলেতী সাহেবের আদব-কায়দা পেয়ে থাকবেন।"

হরেন্দ্র এতক্ষণ গিরির মুখের গভীর সৌন্দর্য্যটুকু

নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল। সৌদামিনী কেবলমাত্র বুঝিতেছিল, কাহার অভিপ্রায় জানিবার জন্ত আর্ত্ত তৃষ্ণায় তাহার চক্ষুদুটী উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। হরেন বলিল,—

"আমরা তো বিলেতী মানুষ নই, যে সেই সমাজের সমস্ত ধরণ-ধারণই মমতার চোখে দেখব? এতবড় একটা ব্যাপার তুচ্ছ করে' উড়িয়ে দিয়ে তাকে ঘরের মধ্যে পুষে রাখা যায় না। আপনার মত কি?"

গিরি তেমনি মৃদুস্বরে বলিল, "ঠিকই বলেছেন আপনি।"

তাহার নিজের অভিপ্রায় হইতে গিরির মতলবের যেন স্বতন্ত্র কিছু অস্তিত্ব নাই এইরূপ মনে করিয়া এই অনুকূল মতের বিনিময়ে তাহার অন্তরের সমস্ত কৃতজ্ঞতা সে যেন চক্ষুদুটী নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া দিতে লাগিল। গিরি একবার ঈষৎ চাহিয়া দেখিল, সৌদামিনীর এই আশ্রিত ভ্রাতাটী তাহার উপর দৃষ্টি গভীর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। সৌদামিনীর দিকে চাহিয়া সে মুখ নত করিল এবং তাহার সমস্ত দেহখানি লজ্জারক্ত হইয়া ঘামিয়া উঠিতে লাগিল। হরেন বলিল,—

"দু'মাসের ভাড়া বাকী, এমাসও প্রায় শেষ হ'য়ে এল। একসঙ্গে এতটা টাকা সে দিতে পারবে বোধ হয় না। এ টাকাটার আশা ছেড়ে দিয়ে আজ সন্ধ্যার মধ্যে পুনর্ব্বার মাতাল হ'বার পূর্ব্বেই ওকে তাড়াতে হ'বে।" এই বলিয়া সে গাত্রোত্থান করিল।

হরেন অসঙ্গত কিছু বলে নাই। তাই ইহার প্রতি কথায় গিরি সায় দিয়া চলিতেছিল। কিন্তু তাহার স্বভাবগত উদারতার ভিতরেও যেন একটু সম্মতি ছিল। ইহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল তখন, যখন হরেন সিঁড়ি ভাঙিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"উনি কি চলে' গেলেন?"

সৌদামিনী হাসিয়া বলিল, "ঘরের মধ্যে একটী লোক তো কমে গেছে দেখতে পাচ্ছি। তুমি সন্দেহ করছ কেন? এই বয়সে দৃষ্টি খাট হ'ল?"

সে-কথায় কাণ না দিয়া হরেনকে একবার ডাকিবার জন্য সে অনুরোধ করিল। হরেন আসিলে সে বলিল,—

"ওঁকে যেন সন্ধ্যার মধ্যে তাড়াবেন না। শহর জায়গা—বাসা খুঁজে নিতে সময় চাই। কিছু সময় দেবেন।"

তাহার দিকে রোষে একবার কটাক্ষ করিয়া হরেন মাটীর দিকে চাহিল এবং গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বলিল, "টাকা চাইতে গেলে আমাকে শুধু ধরে' মারে নি। এমন বেই-মানকে দয়া করতে বলেন আপনি?"

এইখানেই সমস্ত থামিয়া গেল। গিরি আর উত্তর করিল না। সৌদামিনীও কথা বলিল না। কিছুক্ষণ গুম্ মারিয়া বসিয়া থাকিয়া এই নিস্তব্ধতা ভাঙিবার সম্ভাবনা যখন সে দেখিল না তখন আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হরেন তখন আফিসে গিয়াছিল। গিরি নিজের ঘরে বসিয়া মহাভারত পড়িতেছিল; সৌদামিনী শুনিতেছিল। বাড়ীর ঝি শ্যামের মা আসিয়া ডাকিয়া বলিল,—

"পেরোত্তর ঘরে নাড়ী সিদ্ধ ক'রে পড়ে থাকা—কি অলুক্ষণ গো?"

গিরির পাঠ বন্ধ হইল। সৌদামিনীও ফিরিয়া চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছ শ্যামের মা?"

শ্যামের মা মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। বলিল, "বেড়াল না—কুকুর না—একটা মনিষ্যি—উপুসী পড়ে থাকলে ঘরের কল্যেণ হয়? এত সাধছি যে, আমাদের লক্ষ্মী-সরস্বতীর ঘর, এমন দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে' থেকে তাদের অকল্যেণ ক'র না। ওঠ, একটা অপবিত্তির জিনিস খেয়েছ বলেই না দু'কথা বলেছে! তা কি শুনলে, দেখ গিয়ে দাঁত সিটকে পড়ে রয়েছে।"

ইহারা বুঝিল, সে কাহার কথা বলিতেছে।

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুই গুছিয়ে-গাছিয়ে দিস্ নি?"

শ্যামের মা বলিল, "ওমা! দশটায় তার আফিস, সে কি আমি জানি নে? জল এনে, বাসন মেজে, তবে না এই সাধ্যসাধনা?"

সুকুমার হোটেলে রাঁধিয়া খাইত। শ্যামের মা তাহার কাজকর্ম্ম করিয়া দিত ও মাসে দুইটী করিয়া টাকা পারি-শ্রমিক পাইত।

সৌদামিনী বলিল, "আজ আফিসে যান্ নি বুঝি ?"

সে মুখ ভেঙচাইয়া বলিল, "আফিস তার মগজের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু তা'ও বলি মা ? খেয়েছে খেয়েছে না হয় একটু মদই খেয়েছে, বেবুশ্যে নিয়ে তো কেলেঙ্কারী কাণ্ড কিছু করে নি ! মদ তো বড় লোকের ছেলেরাই খায়। যে যত খায়, সে তত মান পায়। হরেনবাবু কি বলাটাই না বল্লে ! এতে কি ভাত তলায় যে মুখে দেবে ?"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "হরেনবাবু খুব বকেছেন না কি ?"

"কেন, সে তর্জ্জন-গর্জ্জন শোন নি ? বাপরে বাপ ! চোখ্ দুটোয় কি আগুনটাই জ্বালালে ! বুঝি পিরথিমী ভস্যিয়াৎ হয়ে যায় ! ঘর খালি করে' দিতে বল্লে—বিছানা-পত্তর ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইলে—বল্তে আর বাকী রেখেছে কি ?"

গিরি বলিল, 'কিছু খান্ নি আমাদের এতক্ষণ বল নি কেন ?"

"মেয়েলোক তোমরা, পুরুষকে ডিঙিয়ে আর কি কর্‌তে পার্‌তে বাছা ?"

গিরি কিছু না বলিয়া চুপ্ করিয়া রহিল। একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কি বামুন ?"

"কি জানি মা ! গলায় পৈতেটৈতে তো কিছু দেখি নে।"

গিরি বলিল, "তোমার বলা ভাল ছিল। এতক্ষণ ঠাকুর ছিল, ঘরে খেতেন ভাল, না হয় একটা উপায় হ'ত।"

শ্যামের মা বলিল, "ছুটীতে যে কুরুক্ষেত্তর লেগে গেল, তা'তে কি আর অত বেদ-বিচার মনে ওঠে মা ?"

সৌদামিনী বলিল, "সত্যি সত্যি একটা মানুষ না খেয়ে পড়ে রইল—হরেন-দাও যদি বাড়ী থাক্‌তেন ?"

গিরি বলিল, "তিনি থাক্‌লে খাওয়াটা আরও পেছিয়ে যেত বোধ করি। তুমি একবার যাবে তাঁর কাছে শ্যামের মা ?"

"কেন ?"

"একটু জলটল খেতে দিয়ে আস্‌তে। আর নিজে রাঁধেন তো ভাল, বাধা না থাকে আমরা রেঁধে বেড়ে দি।"

শ্যামের মা পুলকিত হইয়া বলিল, "তাই দাও মা ! পিত্তি জলে গেল, একটু কিছু খেয়ে জল তো খাক্—তারপর ভাতের কপালে যা থাকে।"

খাবার সাজাইয়া শ্যামের মার হাত দিয়া গিরি নীচে পাঠাইয়া দিল। ফিরিয়া আসিলে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "খেলেন কিছু ?"

শ্যামের মা বলিল, "ভাত আর রাঁধবে না, রাঁধতেও নিষেধ করে' দিলে। বল্লে,—হাতে করে' এনেছ, খাবারটা রেখে যাও।"

সৌদামিনী হাসিয়া বলিল, "তাই বুঝি রেখে চলে এলে ? ওই খাবাই পড়ে থাক্‌বে'খন। খাওয়াটারও সবুর সইল না তোমার ? অথচ দরদ তো খুবই দেখাচ্ছ।"

শ্যামের মা বলিল, "না গো ? চান্ করে' খাবে'খন। তাই তো তেল নিতে এলাম। বাজার-হাটও করে নি আজ। গন্ধতেল দেবে একটু—না নারকেলের তেল নিয়ে যাব ?"

সৌদামিনী বলিল, "গন্ধতেলই নিয়ে যাও।"

শিশি হইতে কিছু তেল কাচের বাটিতে ঢালিয়া লইয়া যেমন সে বাহির হইতে যাইবে অমনি সৌদামিনী তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—

"মাতাল কখনও দেখি নি আমরা। বাবুটী চান্ করতে কলতলায় নাম্‌লে আমাদের একবার খবর দিও, বুঝলে ?"

শ্যামের মা চটিয়া গেল। বলিল, "আহা ! কি রঙ্গই যে করো ! কোন্ রেতে একটু মদ খেয়েছে, তাই সে যাত্রার দলের সং হয়েছে—না সার্কাসের বাঘ হয়েছে ?"

সে রাগে গর গর করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বাবুটী তেল মাখিয়া কলতলায় নামিলে সে আবার উপরে উঠিয়া আসিল। বলিল, "কি দেখ্‌বে দেখে এস, কলতলায় নেমেছে গো ?"

গিরি বলিল, "কি আর দেখ্‌ব আমরা ? তুমি যাও, কিছু খেলেন কি না, দেখে তবে উপরে এস।"

সে চলিয়া গেলে সৌদামিনী আসিয়া গিরির হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

গিরি কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "লোকের ভাল দেখে আনন্দ কর্তে জানি নে আমরা—মন্দ দেখেই আমোদ পাই। এ সকল ভারি অন্যায়। আর এ সকল কি আমাদের দেখা উচিত ?"

সৌদামিনী বলিল, "তা' নয়। হরেন-দা বাড়ী এসে আবার না জানি কি অত্যাচার করে' বসে। তুমি সময় দিতে চেয়েছ, তা' তার মনে ধরে নি। লোকের চেহারা দেখেও অনেকটা পরিচয় তার পাওয়া যায়—চল না এবার দেখে রাখি ?"

এই বলিয়া সে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বারান্দায় লইয়া আসিল।

এই বারান্দার কোন বিশিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিলে তবে কলতলাটা দেখা যায়। সৌদামিনী উঁকি-ঝুঁকি দিয়া সে স্থানটা আবিষ্কার করিয়া লইল। সে দেখিল, কলের জলধারার নীচে মাথা পাতিয়া একটী গৌরকান্তি নধর যুবক যেন যোগাসনে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছে। গলদেশ পর্য্যন্ত কুঞ্চিত কেশরাশি জলের প্রকৃতি লইয়া যেন ঢেউ খেলিতেছে। পরিধানের শুভ্র বস্ত্র জলে ভিজিয়া অঙ্গের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ক্রোড়দেশে নানারঙের একখানি গামছা রক্তজবার মত ফুটিয়া রহিয়াছে। মুখমণ্ডলে একটা শান্ত গম্ভীর সৌন্দর্য্য অন্তরতম গূঢ় প্রকৃতির লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতেছে। সৌদামিনীর চক্ষু দুটী আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে গিরিকে তথায় টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল,—

"এমন মানুষে মদ খায় আর মাতাল হয়, দেখ্‌লেও তো বিশ্বাস হয় না!"

গিরি চাহিয়া দেখিল। বোধ করি প্রথম মুহূর্ত্তে তাহার মন-প্রাণ ও চক্ষুর মিলিত চেষ্টা ছিল না। কিন্তু সম্মানের চোখেই সে দেখিতেছিল। কলতলা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে তাহার দৃষ্টি যখন বাবুটীর উপর ছড়াইয়া পড়িল, তখন তাহার প্রত্যেক স্নায়ুগুলির রক্তের ধারায় খোঁচা দিয়া কে যেন ত্বরিতে তাহাকে জাগাইয়া তুলিয়া বলিল যে, ঐ বাবুটীর সঙ্গে তাহার হৃদয়ের কতখানি সম্পর্ক অবিচ্ছেদে যুক্ত হইয়া আছে। আতঙ্কে, বিস্ময়ে ও ব্যথায় সে কাঠ হইয়া গেল। শৈশব ও যৌবনের কতকদিন তাহার হিমুদার নির্লজ্জের মত ব্যস্ত ব্যবহারে তাহাদের উভয়ের প্রতিদিনকার যে ভাগ্য নিরূপণ করিত, সে লজ্জা তত বেশী ছিল না, যত লজ্জা আজ ঐ মদের বোতলটায় আর হরেনের কটু ও ব্যঙ্গোক্তিতে দিতেছে? আর যাহাকে কাছে পাইবার জন্য ভবশঙ্করের চেষ্টা ও তাহার উদ্বেগ পরাজয়ে মাথা নীচু করিয়াছে, সেই দুঃখী লোকটী এক বাড়ীতে বাস করিয়া অপরের ঝাঁটা-লাথি নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেছে! প্রবল এই রহস্যময় ব্যাপারে অবসন্ন দেহে সে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন শ্যামের মাকে দিয়া গিরি হরেনকে একবার ডাকিয়া পাঠাইল। হরেন আসিলে সে জিজ্ঞাসা করিল,—

"আপনি বাবুটীকে কিছু বলেছেন না কি ?"

"না। কাল তার সময় হয় নি। আজ যাব বলে' নীচে নামছিলুম, এমন সময় শ্যামের মা গিয়ে ডাক্‌লে।"

গিরি বলিল, "আমার কাল্‌কের কথাই ঠিক। তাঁকে কিছু সময় দেবেন।"

হরেন শুধু মুখ বিষণ্ণ করিল না, তাহার চক্ষুদুটী হইতেও ক্রূরতায় সমস্ত গৃহখানিতে কালি ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গিরি ইহা লক্ষ্য করিল এবং সে যখন দেখিল, হরেন যেন কথাটা গ্রাহ্যই করিতেছে না, তখন সে পুনর্ব্বার বলিল,—

"একটু সাবকাশ দেওয়ার বিশেষ কিছু ক্ষতি আছে বলে আমি মনে করি নে।"

এতটা কর্ত্তৃত্বের স্বরে হরেনের গাত্র জ্বালা করিয়া উঠিল। উগ্রস্বরে সে বলিল,—"আমি ক্ষতি মনে করি। মেয়েদের এ সকল অনধিকারচর্চ্চা। পুরুষের রীতি নয় যে, একটা মাতালকে সে অতটা সম্ভ্রম দান করে।"

গিরির চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। এই হীন উক্তি শুনিবার জন্য তথায় আর না দাঁড়াইয়া শ্যামের মার সন্ধানে সে দরদালানে চলিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া বলিল,—

"আজ আর তোমাকে নীচেকার রান্নাবান্নার জোগাড় করতে হবে না। বাবুটী এখানে খাবেন। ঠাকুরকে বলে দিও, আফিসের ভাত, সকাল সকাল বেড়ে যেন নীচের ঘরে দিয়ে আসে।"

মহা আনন্দিত হইয়া সে বলিল,"এই রকম পেত্যাশাই আমি কচ্ছিলুম মা! দু'দিন আজ খায় নি, হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে দেবে না। সে কি আমি জানি নে? ভয় কিছু জিগ্যেস করতে পারি নি। যাই, বাবুকে বলে আসি, ঠাকুরকেও বলে যাচ্ছি।"

গিন্নি বলিল, "ঠাকুরকে সকল দিনের জন্যেই বলে দিও। আফিস রয়েছে, কি রাঁধেন—কি খান্—শরীর থাকবে কেন?"

শ্যামের মার চক্ষুদুটী ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল। বলিল, "তোমার মায়ার শরীর, সে তো আমি জানি মা! আমারও কি কম মায়াটা পড়ে গেছে! একটু জল খাবে তো হা করে' তাকিয়ে থাকবে। হাতে তুলে দেব, তবে তেষ্টা দূর হ'বে। ঘর-গেরস্তালীর যদি কিছুমাত্র জানে মা! দুটো রাঁধা ভাত পায়, ভালই তো? কিন্তু একদিন না—দু'দিন না, এত বড় ঝক্কি ঘাড়ের উপর নেবে? বাবুকে একবার জানালে না, এ সব নেটা-পেটা বুঝতে তাদেরই যে মাথা ভাল?"

গিরি হাসিয়া বলিল, "এক মুঠো ভাত দেব, তা'তে আর বেশী ভাল মাথার কি দরকার হ'বে? তুমি যাও, ঠাকুরকে বলে এস গে?"

সে দেখিল, শ্যামের মার মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিতেছে। সে বলিল, "রান্না বন্ধ হ'ল বলে' যেন কাজ বন্ধ ক'র না শ্যামের মা? জল তোলা—ঘরদোর ঝাট্-পাট্ দিয়ে পরিষ্কার রাখা—চিঠিখানা পত্রখানা বাক্সে ফেলে আসা—কত কি রয়েছে। মাইনের টাকা দু'টো বরঞ্চ মাসে মাসে আমার কাছ থেকে নিও।"

সে দন্তবিকাশ করিয়া বলিল, "কেন, যাঁর কাজ করি তিনি দেবেন না?"

গিরি বলিল, "আমাদের টাকা ভাঙালেও চৌষট্টটা পয়সা পাবে। ভয় কি? যত কাজ বৃদ্ধি তো রান্না নিয়ে, তাই যখন উঠে গেল, তখন আর তাঁর দণ্ড করা কেন? তাঁকে ঘরের লোক ভেব, আর ভেব, তোমার দু'টাকা মাইনে বৃদ্ধি হ'ল।"

শ্যামের মার উদ্বেগ-ব্যাকুল হৃদয় বেশ শান্ত হইয়া মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল এবং বামুনঠাকুরকে খবর দিতে ত্বরিতপদে সে চলিয়া গেল।

আফিস হইতে ফিরিলে সে হরেনবাবুর কাছে মা ঠাকুরাণীর এই সনাতন দরিদ্র-সৎকার-বৃত্তির খুব প্রশংসা করিল।

হরেন মৌন থাকিয়াই সকল কথা শুনিয়া গেল। মেয়েদের প্রাণ—হাতে দড়ি দিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া একটা বেলার জন্য না হয় দয়া দেখাইতে পারেন। কিন্তু একটা অজ্ঞাতচরিত্র মদোমাতালকে ঘরের একজন করিয়া লইবার হেতুটা কি? ক্রোধে ও হিংসায় তাহার পা দু'খানা গিরির ঘরের দিকে ঠেলিতে লাগিল, কিন্তু একটা ক্রোধ লইয়া গম্ভীর মেয়েটীর কাছে ঝড়-জলের মত গিয়া উপস্থিত হওয়া বড় বেশী সুবিধার নয় মনে করিয়া সে পেচকের মত নীরবে চক্ষুদুটীতে শুধু অগ্নি জ্বালাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে গিরির ঘরে আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "সুকুমারবাবুর খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের হাঁড়িতে করে' দিয়েছেন না কি আপনি?"

গিরি বলিল, "হাঁ।"

হরেন কিছু সময় চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু দু'জনায় মুখোমুখী হইয়া এরূপ চুপচাপ্ বসিয়া থাকায় গিরি কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। সে বলিল,—

"আপনি আর কিছু বলবেন আমাকে?"

হরেন বলিল, "এরূপ ব্যবস্থা করার কারণ কি?"

গিরি বলিল, "তাঁর আফিস আছে। রেঁধে-বেড়ে আফিস করায় কষ্ট হয়। আর হাঁড়ির মুড়োয় একমুঠো ভাত দিতে কিছু আটকায় না।"

হরেন মুখখানা কালি করিয়া বলিল, "আপনার টাকা আছে, অন্নছত্র খুলুন না? কিছু কথা নেই। কিন্তু আমি যাকে তাড়াবার জন্ত প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছি, সেই মাতালটার উপরে আপনাদের এমন অহেতুক কৃপাদৃষ্টি কেন, সেইটুকু শুধু আমি বুঝে উঠতে পারছি নে।"

গ্লানিতে গিরির সমস্ত দেহ একবার কাঁপিয়া উঠিল। মাটীর দিকে মুখ নীচু করিয়া সে জবাব দিল, "সংসারের সকল কথা সকল লোকে একরকমে বোঝে না হরেন-বাবু।"

হরেন বলিল, "ঠাকুরদাদা আমাকে ভালমন্দ সকল কাজের ভার দিয়ে গেছেন, একথাও বোধ হয় আপনাদের অজানা নেই।"

গিরি বলিল "জানি।"

এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য সে আরও বলিল, "আপনার কর্ত্তব্য সতর্ক করা, তার ত্রুটি কিছুই নেই। দরকার হ'লে একথা ঠাকুরদাদাকে আমরা বলে দেব।"

গিরি খোলা জানালা দিয়া রাজপথের দিকে তাকাইয়াছিল। হরেনকে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ করিতে না দেখিয়া সে একবার চাহিয়া দেখিল। দেখিল এ লোকটা চটিয়া লাল হইয়া গিয়াছে, অথচ ইহার দৃষ্টির ভিতর কেমন যেন একটা কাঙাল আর উন্মাদনার ভাব। বচসার সময়েও ইহার চক্ষু দুইটী হইতে যেন ঐরূপ ভাব প্রকাশ হইতেছিল।

সে খাট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আপনি কিছু ভাববেন না হরেনবাবু। আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে খুঁৎ নেই, সে কথা বউ ঠাকুরাণী আর আমি ঠাকুরদাদাকে বেশ করে' বুঝিয়ে দেব। আর যদি দেখি শুধু মদের খবর পেয়ে, অনুমানের উপর যাঁর চরিত্রে আরও কিছু ছিদ্র আপনি বার কর্‌তে চলেছেন, তাঁর সেই আচরণ আমাদেরও মনে শঙ্কার সৃষ্টি করছে, তখন তাঁর সুখ-সুবিধা দেখার প্রয়োজন আমাদেরও আর থাকবে না। কি ছাই-ভস্ম রেঁধে বেড়ে খেয়ে চলে যান্ - মনে ভাল লাগে না।"

হরেন একটু ঠেস দিয়া বলিল, "ছাই রাঁধেন কি ভস্ম গেলেন, আপনার মত অতটা দূরদর্শী আমরা হ'তে পারিনি, সোজা চোখে দেখে যা বুঝি, কোন ভদ্র পরিবারের আদর-সোহাগ পাবার মত যোগ্যতা তাঁতে দেখা যায় না।"

সে চাহিয়া দেখিল, গিরি সেইরূপই মাথা নীচু করিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া আছে এবং তাহার মুখের সমস্ত স্বচ্ছতা মুছিয়া গিয়া অন্ধকারে গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিল —

"মুস্কিল এই যে আশ্রিত-পালনই আপনার স্বভাব, সে কিছু একদিনে বদলান যায় না।"

সে দেখিল এইরূপ স্তুতি-নিবেদনেও মেয়েটীর যেন কিছু মাত্র আবশ্যক বোধ নাই। তাহার মুখখানা সেইরূপই অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বরঞ্চ বোধ হইল, একটা কাজের ছুতা ধরিয়া গৃহত্যাগ করিতে তাহার পা দু'খানা নড়িয়া চড়িয়া উঠিতেছে। তখন তাহার শিরার রক্ত কিছু নাচাইয়া দিবার লালসায় সে পুনর্ব্বার ব্যগ্র হইয়া বলিল,—

"কিন্তু আমার সঙ্গত আপত্তি ও উপদেশ পাওয়া সত্ত্বেও ওঁকে বাড়ী ঠাঁই দিতে কেন আপনার এত আগ্রহ সেইটুকু শুধু আমাকে বুঝিয়ে বলুন।"

গিরি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিল, "ঠিক এই ধরণের কথা একটু আগেই আপনার মুখে একবার শোনা গেছে। কতবার শোনাবেন? আর তার উত্তরও পেয়েছেন; কতবার শুন্‌বেন?"

"বেশ তার আর দরকার করে না। সদুরও এই মত কি না একবার জানার দরকার ছিল।"

গিরি বলিল, "সে ভাল কথা, আপনি সুন, আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া সে কোনদিকে না তাকাইয়া হেঁটমুণ্ডে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গিরি গিয়া সৌদামিনীকে পাঠাইয়া দিল। কাহারও স্বাধীন মতে বাধা দেওয়া আর নিজের মতে প্রলুব্ধ করা তাহার স্বভাব নয়।

সৌদামিনীর সঙ্গে সে রকমের কোন আলোচনা সে করিল না।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দিনের শেষ আলো মুক্ত জানালার পথে ঘোলাটে হইয়া নিবিতেছে।

সৌদামিনী ঘরে ঢুকিয়াই আলোর সুইচটা টিপিয়া দিল এবং সর্ব্বপ্রথমে হরেনের দিকে তাহার নজর পড়িল।

প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া গম্ভীরভাবে সে বসিয়া আছে। শঙ্কায় সে জিজ্ঞাসা করিল,—

"কি হয়েছে হরেনদা? বাড়ীর খবর সব ভাল তো?"

ক্রোধে ও ক্ষোভে হরেনের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। সে শুধু একটা ঢোক গিলিল।

সৌদামিনী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর পত্র পেয়েছ? ভাল তো সব?"

হরেন এবার কথা বলিল। বলিল, "ভাল। কিন্তু আমাকে যতটা অপমান করলে তোমাদের প্রাণের শান্তি হয়, একদিনেই সেটা শেষ কর না?—প্রতিনিয়ত খোঁচা দেওয়ার কি প্রয়োজন আছে?"

কয়েক দিন হইতে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সৌদামিনী এবার কথাটা বুঝিল। বলিল, "তুমি বড় ব্যস্ত মানুষ হরেনদা! একটু থেমে থেমে চল।"

হরেন বলিল, "সে কারণে ব্যতিব্যস্ত করতে তোমাকে ডাকি নি। তোমাকে শুধু এই বল্‌তে ডেকেছি,—শ্যামের মার মুখে শুনলুম, নীচের ঘরের বাবুটীর মাছের মুড়ো এখন থেকে তোমাদের কড়াতেই চাপবে। একটা মদো মাতালের উপর অনুগ্রহদৃষ্টি পড়বার কোন হেতু তো দেখতে পাই না তোমার ননদের। কোঁকড়া চুল আর কটা চামড়া এদুটো তার আছে সত্য, কিন্তু নীচের সঙ্গে তো তোমাদের কোন সম্পর্কই নেই। এত সূক্ষ্মছিদ্র দিয়েও নজর চলে?"

সৌদামিনী নড়িল না। কোনরূপ অধীরতাও দেখাইল না কিন্তু গৃহে ঢুকিয়া সহসা কেহ তাহাকে দেখিলে অনুমান করিত যে, বজ্রের বিদ্যুৎ তাহার দেহের তাড়িতের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া দেহখানি ফাঁকা করিয়া লইয়া উভয়ে [illegible] হইয়াছে।

হরেন বলিল, "উত্তর নেই যে মুখে! না—এসকল কথা শুনতে মিষ্টি লাগে?"

সৌদামিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল "মেয়েলোকের পুরীতে ভাল গার্জ্জেন রেখে গেছেন ঠাকুরদাদা। আমি তোমাকে ডেকে এনেছিলুম। আবার আজ আমিই তোমাকে বলি,—যে বাসায় তুমি ছিলে, ঠিকানাটা জানিয়ে দাও, খালি আছে কি না শ্যামের মা গিয়ে দেখে আসুক। ছিঃ! ছিঃ! কথা বল্‌তেও শেখ নি?"

সৌদামিনী আর সে ঘরে দাঁড়াইল না। সেই পায়ে গিরির ঘরে গিয়া তাহাকে বলিল, "হরেনদার আর এ বাড়ীতে থাকা পোষাবে না। তুমি তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে এস! যাও—এখুনি যাও।"

তাহার এরূপ হঠাৎ রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া গিরি হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "তিনি বুঝি কিছু বলেছেন, তাই ঝগড়া করে' এলে? তাঁর কোন দোষই নাই। ঠাকুরদাদার অমতে আর তাঁরও অমতে একজনের ভাতের ব্যবস্থা করেছি, এ সম্বন্ধে তাঁর বল্‌বার অধিকার দু'রকমে আছে। বাড়ীর পুরুষ মানুষ হিসাবে, আর ঠাকুরদাদার প্রদত্ত গার্জ্জেন পদবী হিসাবে। তুমি মিছে কেন রাগ কর?"

সৌদামিনী বিরক্তির সহিত মুখ কালো করিয়া বলিল, "না—না, যে ভদ্রতা জানে না, তার আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকা উচিত নয়। মেয়েদের সম্ভ্রম রেখে কথা বল্‌তেও শেখে নি যে সে?"

গিরি বলিল, "তাই বলে' ক্রোধে এতটা আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে ওঠা ঠিক নয়! তিনি সেধে তোমার ঘরে এসে ওঠেন নি। তুমি ডেকে কাছে এনেছ। ডেকে এনে তাড়িয়ে দেওয়া সে যত দোষ পেয়ে হোক্—শেষের দোষকে কিন্তু অতিক্রম করতে পারে না। তুমি আমি যা' ভাল না বাসি, সে রকমের আচরণ তিনি কতক্ষণ করতে পারেন?" একটু পরে হাসিয়া সে বলিল, "তুমি ঘটক হ'তে পারবে না কোনকালে। ও ব্যবসা সাজবে না তোমার; ছেড়ে দাও।"

সৌদামিনী অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "তুমি একবার যাবে তাঁর কাছে?"

'কেন? গলা ধাক্কা দিতে? সে সম্পর্ক মেয়েদের নয়। ভুল তাঁর—তোমার—কি আমার সে মীমাংসাও তো হয় নি এখনও। ঠাকুরদাদা আসুন, সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। নিজেদের বিচারে নিজেদের দোষ আর কবে চোখে পড়ে?"

সৌদামিনী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেক পরে

পাহাড়ের ধারে

শিল্পী—শ্রীদেবী রায়চৌধুরী

বলিল, "বাবা কথা ভুলে গিয়েছিলেন বলেই আপনার কর্বার জন্ত ওকে ঘরে ডেকে এনেছিলুম। একটু তর সয় না—কি ব্যস্ত মানুষ!"

গিরি ত্রস্ত দৃষ্টিতে সৌদামিনীর উপর একবার চক্ষু ঘুরাইয়া লইল। বলিল, "ওঃ!" কিছু সময় মৌনী থাকিয়া বলিল, "তা' ব্যস্ততা দোষের নয়। তাঁর সংসারে হয় তো ঐরূপ ব্যস্ততার প্রয়োজন আছে। তোমারও দোষ নয়, তুমি তাঁকে সুপাত্র ভেবেই কাছে এনে রেখেছ। যত দোষ তো আমারই।"

বিবাহের প্রসঙ্গ লইয়া হরনের সম্বন্ধে দু'কথা বলিবার সুযোগ সৌদামিনীর বেশ উপস্থিত হইল কিন্তু হিমাংশুর কথা তুলিয়া ভবশঙ্কর তাহার মনে যে ধন্দ তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আগেকার সে চাঞ্চল্য তাহার অনেকাংশে ঘুচিয়া গিয়াছে। সে শুধু বলিল,—

"নীচের বাবুটীকে আশ্রয় করে' যখন এই ঝগড়া আর তাঁর চরিত্রে যখন পানদোষ রয়েছে, তখন এতটা অনুগ্রহ তাঁকে আমরা না দেখালেও তো পারি। তখন হরেনদা সময় অসময় কি ধরে' তেড়ে আসে দেখা যায়।"

গিরি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "পান-দোষ আছে বলেই একটু বেশী দরদ তাঁকে আমাদের করা উচিত। কোন দোষের উৎপত্তি এক কারণে হয় না। আমি ঠিক জানি না, কিন্তু অন্তরের অসহ্য বেদনার ঝোঁকে যার উৎপত্তি, বেদনা দিয়ে তা ঢাকা পড়ে না।" একটু পরে সে বলিল, "হয় তো তাঁর চরিত্রে অন্ত কোন দোষ নাই।"

সৌদামিনী আর কিছু বলিল না। দু'জনাই চুপ করিয়া রহিল।

সৌদামিনী যে চরম অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া আসিল তাহার পর হরেনের আর ভাবিবার না কি ছিল, কিন্তু এইরূপ উপকৃত ও অবমানিত হৃদয় লইয়াও সে আবার উদারভাবে ভাবিতে বসিল। সে ভাবিল,—নীচের তলায় নষ্টচরিত্র যেড়ে ছেলেটী ঘরের এক কোণে পড়িয়া থাকে, তাহাকে এক মুঠা ভাত দেওয়া সে তো বামুনঠাকুরের দিবার কথা। গত বেলায় সেই দিয়া আসিয়াছে। তবে তাহার বা এত গাত্র-দাহ হইতেছে কেন? তারপর মনে মনে সে শেষ কামনা করিল,—মেয়েরা যখন তাহাকে আশ্রয় দিয়াই কাছে রাখিলেন, তখন তাহার এই মত্ততা দিন দিন বাড়ুক—সে উচ্ছন্ন যাক্।

শ্যামের মাকে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া সে বলিল, "সদুকে একবার ডেকে দিবি তো!"

সৌদামিনী তখনও গিরির নিকটে বসিয়াছিল। শ্যামের মা আসিয়া বলিল, "ছোট মাকে একবার হরেনবাবু ডাক্‌ছেন।"

সৌদামিনী 'কেন' 'কি কারণ' কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। বিরক্তির সহিত বলিল, "আমার এখন সময় হ'বে না, বলে' আয় গে যা।"

গিরি হাসিয়া বলিল, "কাজের মধ্যে মুখখানা কেবল হাঁড়ি করে' তুলছ। এ বিষয়ে একটু ফুরসৎ করে' নিলে তোমার হাসি মুখ দেখে আমরা যে [illegible] ভদ্দর লোক ডাক্‌ছেন, শুনে এস, যাও।"

সৌদামিনী ব্যস্তভাবে বলিল, "গেলে তো সেই একই প্যান্‌প্যানানি! না হয় পেয়েছে একটা বোতলের ছুতো—তাই ধরে' মেয়েমানুষের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ? আমার ভাল লাগে না।"

গিরি বলিল, "ভাল কি সংসারের সকল জিনিস-টাই লাগে? না ভালর সঙ্গে সংসারে সর্ব্বত্রই জড়িয়ে থাকার সুবিধে পাওয়া যায়? তুমি তাঁর বোন্—তাচ্ছল্য কর কি করে? বিশেষ বাড়ীর উপরে! যাও—শুনে এস।"

সৌদামিনী চলিয়া গেল।

তাহাকে দেখিয়া হরেন বলিল, "বস।"

সে মুখ অন্ধকার করিয়া বলিল, "বস্‌বার এখন সময় হবে না। যা' বল্‌বে সংক্ষেপ করেই বল।"

হরেন বলিল, "এতটা ব্যস্ত যখন—থাক্। যদি সময় তোমার এর পরে হয়, আর সে পর্য্যন্ত আমার বলার ইচ্ছা থাকে, তখন শুন।"

সৌদামিনী বিরক্ত হইয়া বলিল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

কি শোনা যায় না ? কি বল্‌বে' বল না ? যতক্ষণ বল্‌বে, আমি নড়ছি নে।"

হরেন বলিল, "তোমার বসা নিয়ে আমি জিদ্‌ করি নে। যেভাবে হ'ক শুনলে হ'ল। বলছিলে কি না,—বস্‌বার এখন সময় হ'বে না। বস্‌বার সময় না হ'লে শুন্‌বারও সময় হয় না, এই তো আমি জানতুম।"

সৌদামিনী সোফার উপর বসিয়া পড়িল। বলিল,—"কি বল্‌বে—বল।"

হরেন বলিল, "কি বল্‌বে ভেবে ডেকেছিলুম, এখন মনে নেই। তবে দেখ, হাঁ—সময় সময় ঝগড়ার রূপ ধরে' এক একটা কথা ওঠে; আবার শান্তির সঙ্গে তার মীমাংসাও হ'য়ে যায়। কিন্তু সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে' থাকা তোমাদের ধৈর্য্যেতে কুলোয় না। তখন যদি তোমার পিঠে ছড়ি না পড়্‌ত, তামের মাকে দিয়ে তখনি-তখনি ডেকে পাঠিয়ে এ কষ্ট তোমাকে দিতে হ'ত না।"

সৌদামিনী কথা বলিল না।

হরেন বলিল, "যাক্‌, সুকুমারবাবুর সম্বন্ধে আমার আর কোন বক্তব্য নেই। আর আমিও সেই একটা দিনের অপেক্ষায়—মুখ বুজলুম, যেদিন তোমাকে পুরস্কৃত অথবা তিরস্কৃত করার কোন বাধাই আর তুমি মাঝখানে খাড়া করতে পারবে না।"

সৌদামিনী বলিল, "ভাল কথা।" বলিয়াই ধীরে ধীরে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

শ্রীকালিদাস রায়

শিল্পীর বেদনা—

কবি বলিয়াছেন—"কাব্য দেখে যেমন ভাবো কবি তেমন নয়গো।" ভাগ্যে তাহা নয়—তাই তো কবির দ্বারা রসময় আনন্দময় সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। ভাগ্যে তাহা নয়—তাই কবির রচনা আমাদের চির-দিনের—শাশ্বত-কালের সম্পত্তি হইতে পারিয়াছে। কবি যদি নিজে দুঃখে অভিভূত হইতেন, তাহা হইলে তিনি কি দুঃখের কথা সরসমধুর করিয়া লিখিতে পারিতেন—সবই যে তাঁহার অশ্রুজলে লোণা হইয়া যাইত। কবি যদি নিজে আনন্দে মাতিয়া মসগুল হইতেন—তবে কি তাঁহার আনন্দের কথায় শৃঙ্খলা থাকিত—সৌষ্ঠব থাকিত—সামঞ্জস্য থাকিত ? তাহা কি শিল্পের মর্য্যাদা লাভ করিত ? স্বয়ং ভগবান হইতে আরম্ভ করিয়া পটুয়াপাড়ার একটী মৃৎশিল্পী পর্য্যন্ত সকল স্রষ্টাই—শিল্পের উপকরণ বিষয়ে উদাসীন,—নির্লিপ্ত।

শিল্পী না হাসিয়া হাসান,—না কাঁদিয়া কাঁদান—বিশ্বজনের পংক্তিতে পরিবেষণের ক্লেশ তাঁহাকে সইতে হয়—পংক্তিতে বসিয়া খাইবার উপায় তাঁহার নাই। শিল্পী উদাসীন বলিয়াই দুই হাতে রস-সম্ভার বিলাইয়া দিতে পারেন। নির্লিপ্ত না হইলে তিনি নিজেই মধুপানে মত্ত হইতেন—গুঞ্জনের অবসর আর রহিত না। মোদকেরই মত শিল্পীরও সৃষ্টির উপকরণ দেখিয়া জিভে লালা ঝরে না। শিল্পী ও রসিকের মধ্যে রসিকই বেশী ভাগ্যবান। রসিক ভোগ করে—রসিকের যাহা ভোগ্য শিল্পীকে তাহাই উপকরণস্বরূপ লইয়া পরের জন্য পসরা সাজাইতে হয়। শিল্পীর সৃষ্টির মূলে কতবড় ত্যাগের বেদনা—কতবড় সংযমের আত্মনিগ্রহ যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে, আমরা কি তাহা শুনিতে পাই ? সবচেয়ে বড় বেদনাময়ী সাধনা, তাঁহার পক্ষে ব্যথানুভূতিরও সংযম। সেই সংযম অভ্যাস না করিলে,—'দুঃখময়বেদনায়' উদাসীন

না রহিতে পারিলে শিল্পী ব্যথিতের দলে ঝাঁপ দিয়া Florence Nightingale বা Howard the Philanthropistই হইতেন—Shakespeare কিংবা কালিদাস হইতে পারিতেন না।

শিল্পীর পক্ষে হৃদয়বত্তাটাই সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম নহে—বরং তাহার হৃদয়বেত্তা হওয়া চাই। হৃদয়ে হৃদয় ঢালিয়া দিলে হৃদয় জানা যায় না—হৃদয়কে নিখিলের হৃদয় হইতে একটু দূরে সরাইয়া অন্তরের চক্ষু দিয়া দেখিবার সুযোগ ও অবকাশ করিয়া লইতে হইবে। দ্রষ্টা হইবার সুযোগ না পাইলে স্রষ্টা হওয়া যায় না। পথের ধারে বা বাতায়নে বসিয়া যে দেখে সেই শোভাযাত্রার পরিপূর্ণ চিত্রটী আঁকিয়া দিতে পারে—শোভাযাত্রীর দলের কেহ তেমনটী পারে না। শিল্পের বিষয়বস্তু শিল্পীকে অভিভূত করে না,চঞ্চল করে না,ব্যাকুল করে না। তাই শিল্পের মধ্যে এত শৃঙ্খলা, সংযম, ধীরতা, অধ্যবসায়,একনিষ্ঠতা ও শোভন সামঞ্জস্য। আনন্দের প্রলাপও সাহিত্য নয়—বেদনার বিলাপও সাহিত্য নয়—সুখদুঃখে ঔদাসীন্যসঞ্জাত আলাপই প্রকৃত সাহিত্য। ইহাতে স্রষ্টাকে হৃদয়হীন বলিবে বল—শিল্পীর আন্তরিকতার অভাব আছে বলিবে বল—কাব্যের উপেক্ষিতাদের দেখাইয়া কবিকে বে-দরদী বলিবে বল—উপায় কি? শিল্পী আপন কথা বলিয়াছেন—

> কেমন করে' যোগ দেব আনন্দে?
> বসে' বসে' আমায় যে সব গাঁথতে হবে ছন্দে।
> মহোৎসবের উল্লাসেতে
> কেমন করে রইব মেতে?
> অসীমকে যে আনতে হবে আমার সীমার বন্ধে।
> ভোগের আমার নেই অবসর বিরামবিলাস অধিকার,
> আনন্দের এ যজ্ঞভূমে আমার শিরে গুরুভার।
> নির্নিমেষে আছি জাগি
> বিশ্বনরের ভোগের লাগি
> আলো ছায়ায় আঁকতে হবে আমার তালমন্দে।
> রুদ্র তুমি কর জীবন গড়ছ এবং ভাঙছ,
> করতে হ'বে অমর আমার ওর প্রতি মোহাক।
> তোমার যা ভোগ উপহরণ
> মোর তা সৃজন উপকরণ
> বিলাতে হয় প্রসাদ আমার বর্ণে রসে গন্ধে।

বাংলা ভাষার শব্দ-সঙ্কর

বাংলা ভাষাটা লইয়া মহামুস্কিল ঘটিয়াছে। সংস্কৃত শব্দবহুল নবজলধরী ঢং আর চলে না। কেহ ও ঢঙে লিখিলে আমরা ব্যঙ্গ করি। পার্শী শব্দে ঠাসবুনানী ভাষা কেহ কেহ লিখিয়াছেন—তাহাও আমরা পছন্দ করি নাই, বহু মুসলমান লেখকও পার্শীর খেজুর-কাঁটায় ভরা ভাষার নিন্দাই করিয়াছিল। হিন্দীশব্দবহুল বিনয়-সরকারী ভাষা আরও অসহ্য। একেবারে গ্রাম্য ভাষায় রচনা সুধীগণ সহ্য করেন না। বখাটের আড্ডার গাড়োয়ানি ভাষা বাংলা গল্প-উপন্যাসে চালাইবার চেষ্টাও কেহ কেহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা তো একরকম সর্ব্ববাদিসম্মতরূপেই অচল। মাতৃভাষা বলিয়াই দুধে দাঁত ভাঙবার পর ভেতো দাঁতের মত সাহিত্যের ভাষা আপনা হইতেই গজায় না। সাহিত্য রচনার জন্ত ভাষাশিক্ষারও প্রয়োজন আছে—আমি ব্যাকরণের কথা বলিতেছি না। শব্দসম্পদবৃদ্ধি ও ভাবানুযায়ী ভাষা নির্ব্বাচনের জন্ত সাধনা করিতে হয়। মনে ভাব জাগিতেছে, তীব্র অনুভূতি আছে,অতএব যেমন তেমন করিয়া তাহাকে প্রকাশ করিলেই সাহিত্য হইবে—এ ধারণা ভ্রান্ত। বুঝিবার ক্ষমতা থাকিলেই বোঝাইবার ক্ষমতা জন্মে না,—বোঝাইবার ক্ষমতা বহুদিনকার বহু সাধনায় অর্জ্জন করিতে হয়। এই সত্যটী না স্বীকার করার জন্য ভাষার জাত মারা যায়। এখন আবার ভাষার নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। আজকাল মুখের কথা যেমন চলিতেছে ইঙ্গবঙ্গে—অর্দ্ধেক বাংলা অর্দ্ধেক ইংরাজী;—লেখার ভাষাও হইতেছে তেমনি। যাঁহারা বলিয়াছিলেন, মুখের ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত, তাঁহারা এখন তাল সামলান। এখন তাঁহাদের বলিতে হইবে—ইংরাজী বুকুনীছুট ভদ্রলোকের মুখে মুখে চলতি বাংলা ভাষাই হইবে সাহিত্যের ভাষা, তাহা না হইলে নানা অনাচার ঘটিবে। অত্যাধুনিক ভাষার কিছু নমুনা দিইঃ—

"অবিশ্যি রবীন্দ্রনাথকে যদি Master Romanticist বলা হয়, তাহলে মোহিতলালকে Confident Classicist বলা যেতে পারে।"

"তাদের ছিল যাকে বলে Court life. Brilliant

Dialogueএর witএ তাদের রচনা সত্যই সরল ও সজীব হইয়া উঠিত।"

"অনেক সাহিত্যজ্ঞ কাব্যকেও Subjective এর চেয়ে Objectiveই বলিতে চান। Swinburne, Laus Veneris, Doleres, Les Noyades ইত্যাদি লিখিতে এ সব কবিতার Intense emotion sincerely feel করিয়াই লেখেন তাহা নাও হইতে পারে।"

"সাদা কথায়ও intensity থাকে ও Dramatic tone বা nervous force ই যে intensity of emotion নয়, তাহা যিনি বোঝেন না ইত্যাদি—

"তাহাও আমার খুড়ার চরিত্রের মধ্যে predominant trait নয়। * * * জগদ্ধাত্রীকে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের একটি অমোঘ Product করিয়া শরৎ-বাবু সৃষ্টি করিয়াছেন—যুগযুগাগত আচারসমষ্টির slave. না হইলে এসব Coincidence আসে কোথা হইতে?"

"Justice এর দিক থেকে দেখতে গেলে নারীর self assertive হবার rightকে অস্বীকার যায় না—Self assertive force মানুষের continuityর জন্ম জীবনযুদ্ধের সৈনিক।"

"Abstract ইসলাম Applied ইসলামের এই পার্থক্য...আপনার লেখক সাহেব পাঠক সাধারণের সময় ও মনের উপর জুলুম ভিন্ন আর কিছুই করেন নাই।"

"কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাঁরা Mindকে Matterএ এবং Lifeকে motionএ মিলিয়ে দিতে পারেন নি। Mind matterকে বাবা বলতে কিছুতেই রাজী হ'ন না। মানুষের মাথার brain যে matter এ বিষয়ে সন্দেহ নাই...ফলে mindকে এখন আর কেউ in terms of matter বর্ণনা করেন না।"

বঙ্গসাহিত্যের প্লাবন—

বর্তমান মাসিক সাহিত্যের জন্ম একজন 'কাইলেরিয়া চিকিৎসকের' প্রয়োজন। ইহার একটা পদের নিরাংশের অতিরিক্ত গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বাংলাদেশে প্রকৃত উপন্যাস লেখার প্রবর্তন করেন বঙ্কিমচন্দ্র—আর ছোটগল্প লেখার প্রবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্পের বয়ঃক্রম এদেশে ৩০ বৎসর মাত্র। আনারসের মতন ছোটগল্প বিদেশ হইতে আনা রসবস্তু। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আনারসের মতনই অম্লমধুর। কিন্তু বাংলার মাটীতে ক্রমে ঐ আনারসের মাধুর্য্য কমিয়া অম্লতারই পরিমাণ বাড়িতেছে। অম্লমধুর রসের আনারস যে একেবারে জন্মে না তাহা বলিতেছি না। এ কথা বলিলে অনেকগুলি শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের অমর্য্যাদা করা হইবে। কিন্তু আমি অম্লরসের জন্যও আনারসের চাষকে দোষ দিতেছি না। আনারসের বনে যে বঙ্গসরস্বতীর আঙিনা ভরিয়া গেল—পা বাড়াইবার যো নাই—নড়িতে চড়িতে গেলেই কাঁটায় বস্ত্র ও গাত্র দু-ই ছিঁড়িয়া যায়! সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ সরস্বতীর অঙ্গনটী 'কালসাপের ডেরায়' পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য উপাদেয় ফলের বৃক্ষগুলি আনারসের কণ্টকিত আক্রমণে মৃতপ্রায়।

প্রতিমাসের মাসিকপত্রগুলি—বিশেষতঃ পূজার সংখ্যা—সাময়িক পত্রগুলি খুলিলেই এ বিষয়ের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

ছোট গল্প যে সাহিত্যের একটী অঙ্গ তাহা কে অস্বীকার করিতেছে? কিন্তু ইহা উপন্যাস, কাব্য, নাট্য, রাজনীতি ইতিহাস ইত্যাদি অন্যান্য সাহিত্যাঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠতর নয়। কিন্তু এ যুগে সকল আঙুলই যখন ফুলিয়া কলাগাছ হইতেছে, সকল কঞ্চিই যখন বাঁশ হইতে দৃঢ় হইতেছে—সকল আমই হাত হইতে ডাগর হইয়া উঠিয়াছে, তখন ছোটগল্পও যুগধর্ম্ম পালন করিবে না কেন? বাঙলা দেশের লেখক ও পাঠক ছোট গল্পকে এত অধিক ও অযথা মর্য্যাদা দান করিতেছেন যে, ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিকসামর্থ্য অলস ও তরল কল্পনায় পর্য্যবসিত হইতেছে, অধিকাংশ সৃজনক্ষম শোণিতই অসার শোথরসে পরিণত হইতেছে। দেশের সাহিত্যসাধনার পক্ষে ইহা অল্প দুর্ভাগ্যের কথা নহে।

মাসিকপত্রের 'তিনের চার' অংশ কেবল ছোট গল্প ও ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস অধিকার করিয়া থাকে—পূজার সংখ্যাগুলির নয়ের দশ অংশ কেবল মাত্র ছোট গল্প—প্রায় প্রত্যেকখানিই গল্পের ছোটখাট লহরী। সাহিত্য-ব্যবসায়ীরা বলিবেন—যেমন পাঠকসম্প্রদায়ের রুচি ও

প্রবৃত্তি তেমনই ব্যবস্থা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—মাসিক পত্রাদি কি কেবল লোকরুচির আজ্ঞাবহ হইয়া দৌত্য করিতে থাকিবে? তাহাদের কি কোন উচ্চতর কর্ত্তব্য-বোধ ও দায়িত্ববোধ থাকিবে না? লোকরুচির ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিবর্ত্তন সাধনের ভারগ্রহণ কি মাসিক সাহিত্যের কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত নয়? একটী দেশের পাঠকসম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই যদি কেবল গল্প শুনিতে ভালবাসে—উচ্চতর সাহিত্যের রসবোধ বা ভাব গ্রহণ করিতে না পারে বা না চায়, তাহা হইলে লজ্জার কথা। এ লজ্জা-নিবারণের কাজ কিন্তু দেশের সাময়িক পত্রগুলিরই হওয়া উচিত। ছোট গল্প মাত্রই কিছু উপকথা কাহিনীর শ্রেণী-ভুক্ত লঘুতরল সাহিত্য নহে। আশা করি বিচক্ষণ পাঠক এ বিষয়ে আমাকে ভুল বুঝিবেন না। কিন্তু যে সকল ছোট-গল্পে সাধারণতঃ মাসিকপত্রগুলি সমাকীর্ণ সে গুলিকে রীতিমত সাহিত্যের আবর্জ্জনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পড়িলেই মনে হয়, লেখক অনুরোধে পড়িয়া যা-খুসী তাই লিখিয়া দিয়াছেন, আর্টের দিকে দৃষ্টি করিবার আদৌ তাঁহার অবসর নাই—অথবা সামান্য কিছু অর্থলোভে কয়েক পৃষ্ঠা পুরাইয়াছেন—অথবা সাহিত্যের অন্য কোন বিদ্যাবুদ্ধিসাপেক্ষ শাখা স্পর্শ করিতে না পারিয়া গল্পের শাখায় আরোহণ করিয়াছেন। কোনটী বা লেখিকা বিশেষের খাতিরে—কোনটি আত্মীয় প্রতিবেশী বা বন্ধু-পুত্রের আবদারে—আবার কোনটী বা ধনী যুবকের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য গৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সম্পাদক দেখেন গল্প হইলেই হইল—তাহাতে আর্ট থাক বা না থাক—পাঠকসাধারণও যে কোন প্রকারের গল্প পাইলেই খুশী। তাই সম্পাদকগণ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলিকে যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়া—দুইএকটীকে মাত্র বর্জ্জাইসে ছাপাইয়া, গল্পগুলিকে সুচিত্র সংযোগে আরো চিত্তাকর্ষক করিয়া বৃহত্তর অক্ষরে সযত্নে প্রকাশ করেন।

গল্প ও ছবি ছাড়া মাসিকপত্র অচল—গল্প একটী চরণ—ছবি অন্যটী। গল্পের চরণে রীতিমত শ্লীপদ সঞ্চার হইয়াছে

সৎসাহিত্যের রসাস্বাদন—

সাহিত্য সক্রিয় থাকিবে, আর পাঠকচিত্ত নিষ্ক্রিয় হইয়া তাহা উপভোগ করিবে, ইহা কখনও হইতে পারে না। সাহিত্যের মধ্যে সংক্রামিত কবির সৃজনীশক্তি পাঠকের চিত্তেও সৃজনীশক্তির উদ্বোধন করে। পাঠকচিত্ত সদ্যঃপ্রবুদ্ধ সৃজনী শক্তির সাহায্যে সৎসাহিত্যকে আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া পুনর্গঠন করিয়া লইবে, তবে তো রসোদ্বোধন। যে সাহিত্য পাঠকচিত্তকে এইভাবে সক্রিয় করে না তাহা সৎসাহিত্য নয়। আর যে চিত্ত সৎসাহিত্য পাঠকালে সক্রিয় হইয়া উঠে না তাহা সাহিত্য রসবোধের অধিকারী নহে। এই সৃজনী-শক্তির প্রয়োগে কিছু ক্লেশ আছে সত্য—কিন্তু তাহার তুলনায় আনন্দ অপরিমেয়। সৎকাব্যপাঠকালে এই সৃজনী-শক্তি প্রয়োগের আনুষঙ্গিকে ব্যাপারও কিছু আছে—তাহাতে রীতিমত বোধশক্তি ও মনোযোগ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাতেও চিত্তকে সক্রিয় ও সচেতন রাখিতে হয়—এই ক্রিয়াশীলতা চেতনার লীলাতেও যথেষ্ট আছে। নিষ্ক্রিয়তা আনন্দ নহে—জীবনী-শক্তির প্রয়োগের নামই আনন্দ। জড়প্রকৃতির লোকই জীবনী-শক্তির প্রয়োগকে ক্লেশ বলিয়া মনে করে।

ঐ আনুষঙ্গিক ব্যাপারের মধ্যে পড়িতেছে—রচনাটীর কুহরে কুহরে যে রস সঞ্চিত ও ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে তাহার আবিষ্কার। কলা-সৌষ্ঠবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাতুর্য্যে, আলঙ্কারিক বৈচিত্র্যে, শব্দের লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থে, অনুপ্রাস-শ্লেষযমক, মিল ও ছন্দোঝঙ্কারে নানা প্রকারের ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার মধ্যে যে বিন্দুবিন্দু রস ওতপ্রোত হইয়া আছে—সে সমস্তের সক্রিয়উপভোগ করিতে করিতেঅগ্রসর হইতে হইবে। কাব্যের সমস্ত পথটাই যে পুষ্পাস্তৃত, তাহা অনুভব করিতে করিতে চলিতে হইবে—বলিতে পারা চাই—

"আমার পথ চলাতেই আনন্দ।"

এই ভাবে অগ্রসর হওয়াকে ক্লেশ বলা চলে না—ইন্দ্রিয় যখন উপভোগ করে—তখন সে আপনার শক্তিকে একত্র সংহরণ করে এবং তাহাকে সক্রিয় করে—ইহাকে ক্লেশ বলিলে উপভোগ মাত্রই ক্লেশ। রসনায় সুখাদ্যের স্পর্শে লালা নিঃসৃত হয়—এই লালা সুখাদ্যকে সুস্বাদু করে। এই লালা নিঃসরণ রসনার ক্লেশজনক ব্যাপার নয়—ইহা তাহার Reflexive action। সকল Reflexive action

এর ন্যায় ইহা ক্লেশজনক নয়। কাব্যপাঠকালে সৎপাঠকের চিত্তের সক্রিয়তাও এইরূপ।

চর্ব্বণের জন্য দন্তকে একটু শ্রম করিতে হয়,—সুখাদ্য চর্ব্বণকালে দন্ত কি তাহাকে শ্রম বলিয়া মনে করে? শ্রমের ভয়ে সে কি কখনো সুখাদ্যকে বর্জ্জন করে? দন্তশূল রোগ থাকিলে বা দন্তের সামর্থ্য না থাকিলেই দন্ত কেবল তরল পদার্থকে প্রশ্রয় দেয়।

আলঙ্কারিকগণ সৎকাব্যের উপভোগকে আপনার আনন্দময় সম্বিতের চর্ব্বণ-ব্যাপার বলিয়াছেন।

সৎকাব্যের মুখে ভাষা বসাইলে সে বলিবে—

বোশেখ মাসের শীতল প্রসাদ নেইক বেলের
ঘোলের পানা
চক্ করে যে চুমুকে দেবে মেরে,
বোতলভরা নেইক সুরা এ নয় শুঁড়ির সরাইখানা
পান ক'রে যে বলবে "বাঃ বাঃ বেড়ে।"
মিল্‌বে নাক চা গরম কি ঠাণ্ডা মিঠে রঙিন জল
'আঃ কি আরাম' বলবে যে পান করি—
ডাব কেটে কেউ দেবে নাক নিভাবে না তৃষ্ণানল
বরোফ দিয়ে পেয়ালা গেলাস ভরি।
চাকের মধু নিঙড়ে কেহ মিশিয়ে আঙুর দাড়িম রসে
রাখেনিক হেথায় বাটী বাটী
ভাঁড় ভরে যে আখ-খেজুরের রস খাবে যে শুয়ে বসে
নেইক উপায় এ নয় গুড়ের ভাটী।
অক্লেশে বা অনায়াসে এক্‌টুও না নড়ে খেটে
গলার তলে যা চলে যায় সোজা,
ছটাকখানেক জিভকে দিয়ে সের আড়াই-এক ঢাল্‌বে পেটে
এমন কিছুই হেথায় বৃথাই খোঁজা।
পথের কাঙাল নয় রসনা. কণ্ঠনালীর ভিক্ষা যেচে
রসের সাথে হয় মিতালী তার,
দন্তগুলি অলস হ'য়ে রয়না হেথা বৃথাই বেঁচে
নয়ক তালু ঢালু নালীর ধার
এ যে আমার ফলের বাগান গুল্ম লতা কাঁটায় ঘেরা,
শাখায় শাখায় পাখীর বাসা দোলে,
চারদিকে এর মনসা সিজু মুগরো আনারসের বেড়া,
শীতল ছায়া ইহার আঁধার কোলে।
রসের তৃষা শাঁসের ক্ষুধা থাকে যদি তোমার, তবে
করতে হ'বে বৃক্ষে আরোহণ,
হাতের জোরে উচ্চ শাখা নোওয়ায়ে ফল পাড়তে হ'বে,
সইতে হবে মৌমাছি দংশন।
ঠোটেও আঠা লাগতে পারে ভাঙতে হবে ফলের খুলি,
ছিড়তে হ'বে চিরতে হ'বে চোকা,
চিবিয়ে চুষে খেতে হবে খাটতে রবে দন্তগুলি
সফল তবে এ ফলবাগে ঢোকা।
পেটভরানো বুক জুড়ানো না মুখকে করে প্রবঞ্চনা,
চলবে না এ ফলের অপযোগে।
দন্তগণের সেবার গুণে হেথায় রসের প্রতিকণা
ঐ রসনার লাগবে উপভোগে।
শ্রমের গুণে রসের সনে সপরিবার বদনখানি
হর্ষভরা মর্য্যাদা তার পাবে,
তপ্ত ইক্ষুচর্ব্বণসুখ রসিক জানে—বাড়ায় পাণি
গৌড়ী ফেলি গুড়শলাকা-লাভে।

মরুযাত্রী

(বড় গল্প)

শ্রীসুটবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি-এল

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

পাঁচ

বনপুর ষ্টেশনটী খুব ছোট। যখন গাড়ী থামল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সমস্ত আকাশটাই প্রায় কালো হয়ে এসেছে, কেবল পশ্চিম দিকের খানিকটা জায়গা লাল ডগ্‌ডগে, মনে হয় কে যেন খোঁচা মেরে রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছে। ষ্টেশন থেকে ডুলুদের বাড়ী প্রায় দেড়-ক্রোশ। ষ্টেশন থেকে নেমেই রেলওয়ে কোয়ার্টার। কোয়ার্টারের সামনে সবুজ খোলা জায়গাটা বেড়া দিয়ে ঘেরা; বেড়ার গায়ে বাহারি পাতার গাছ। বেড়া-ঘেরা জায়গায় তখনও দু'একটা ছেলে মালকোচা মেরে ছোটাছুটি করছে। খানিকটা ছাড়িয়ে গেলেই গাঁয়ের পথ। গাঁয়ে ঢুকতেই একদিকে বাঁশঝাড় আর এক দিকে রেলের খাল। এই খালে মাঝে মাঝে কুমীর আসে। ডুলুর মনে পড়ল তখন সে খুব ছোট। কোথা-কার এক সাহেব একবার একটা পাখী মারে। পাখীটা এই খালে পড়ে। তারপর তার চাকরকে আনতে বলে। সে বেচারীকে আর ফিরতে হয় নি। কুমীরে ডুবিয়ে নিয়ে যায়। খাল আর বাঁশঝাড়ের মাঝখান দিয়ে পথটা গাঁয়ের বুক চিরে এঁকেবেঁকে বারোয়ারি-তলা পর্য্যন্ত চলে গেছে। পথের দু'ধারে মাটীর ঘর। এখানে না কি কোঠাঘর তোলার হুকুম নেই। এ গাঁয়ের ঠাকুর লক্ষ্মীজনার্দ্দন; তাঁরই আদেশ—পাকা ঘর তুললে বংশ থাকবে না। আশে পাশে ছোট ছোট ডোবা। সারা পথটাই অন্ধকার, কোথাও কোথাও গাছের ফাঁক দিয়ে একটু আলো এসে পড়েছে। ছিটে বেড়া দেওয়া গাঁয়ের পাঠশালা। পাঠশালাটা ছাড়িয়েই জনার্দ্দনের ছোট ঘরখানি। এ দিকটায় শুধু জনার্দ্দন আর গোকলো মুদির ঘর, তারপরই একটা প্রকাণ্ড মাঠ। সেইখানেই গাঁয়ের শেষ।

পথ অন্ধকার। ডুলুর মনটার ভেতরও অন্ধকার ক্রমশঃ জমাট বেঁধে উঠেছে। একদিকে আজ যেমন তার মুক্তির আনন্দ, অন্যদিকে তেমনি তার ভয়। কেবলই মনের মধ্যে হ'চ্ছে—কি হ'বে? গাঁয়ের লোকে কি বলবে? তাড়িয়ে দেবে? অপমান করবে? মারবে? আরও তার ভয় হ'ল জোয়ানকে নিয়ে। গাঁয়ের লোক এই অপরিচিত লোকটীকে কিছুতেই সহ্য করবে না, একে তো তার বদনাম হয়েছেই, তার ওপর এই একজন অচেনা লোক সঙ্গে। ডুলুর একবার ইচ্ছে হ'ল বলে,—"জোয়ানদা, তোমায় আর আসতে হ'বে না, ফিরে যাও।" কিন্তু তার বলতে সাহস হ'ল না, যা গোঁয়ার লোক; তা'ছাড়া বেচারী তার জন্যে এত কষ্টস্বীকার করলে। গাঁয়ে পা দিতে না দিতে তাকে বিদায় দিতে মন তার কিছুতেই সায় দিলে না। তারপর তার হঠাৎ মনে হ'ল বছর দু'এক আগেকার এক ঘটনা। ভৈরবী ক্ষীর' জেলের মেয়ে তারই মত কি এক অপরাধ করেছিল। উঃ সে কি অত্যাচার, সিধু ভটচার্য্যি শেষ খড়ম পেটা পর্য্যন্ত বাকি রাখে নি। মনে হ'তেই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, হঠাৎ বলে' উঠল,—"জোয়ানদা! তুমি কিছুতেই যেতে পাবে না, তুমি গেলে এরা আমায় মেরে ফেলবে।" তার গলার স্বর কাঁপছে। কথায় যেন কান্না মেশান। জোয়ান নিজের খেয়ালে কত কি ভাবছিল। নতুন জায়গা, বেশ তো কোনও গোলমাল নেই। তার মনে হ'ল—সে অনেক দিন আগে এই

রকম এক কোন পাড়াগাঁয়ে পালিয়েছিল—পুলিশের ভয়ে গা ঢাকা দেবার জন্যে। মাত্র দু'রাত্তির ছিল। তখন কিন্তু মোটেই ভাল লাগে নি। এখন তো আর সে ভয় নেই। একটু ভেবে নিয়ে দেখলে—এবার জেল থেকে বেরুবার পর আর কিছু বদমায়েসী, মার-ধোর খুন-খারাপি করেছে কি না। মনের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে খুজে দেখলে—নাঃ নেই তো। বাঃ কি মজা, তা' হ'লে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এখানে দু'চার দিন থেকে এখানকার হালচাল দেখা যেতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল —এখানে নেশার কি উপায়? তা'ছাড়া পয়সা কোথায়? গাড়ীভাড়া বাদ মাত্র পাঁচটী টাকা বাকী আছে। মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল। ঠিক সেই সময় দুলু ঐ কথা জিজ্ঞাসা করতেই জোয়ান খিঁচিয়ে উঠল—"আচ্ছা আপদারে মেয়ে তো। যাব না কেন? নন্তু সেখানে মস্তানি করে' বেড়াবে আর আমি এই জঙ্গলে পড়ে থাকি, এখানে না আছে নেশা না আছে কিছু।" দুলু অতি কষ্টে কান্না চেপে চলতে-চলতেই চাপা গলায় বললে—"জোয়ানদা, তোমার দুটী পায়ে পড়ি, এখন তুমি ছাড়া আর আমার—" গলার আওয়াজ কান্নায় বুজে গেল, কথা আর বেরুল না। জোয়ান্ আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। কই কাঁদবার মত কিছুই তো ঘটে নি। তা'ছাড়া গাঁয়ের লোকে ওকে মেরেই বা ফেলবে কেন? ও করেছে কি? কিন্তু দুলুর শেষের কথাটা জোয়ানকে বেশ আশ্চর্য্য করে দিলে—কই তার জীবনে এমন কথা তো কেউ বলে নি। সে আবার কার কবে আপনার লোক? নাঃ বড় গোলমাল। ব্যাপরটা পরিষ্কার ক'রে নেবার জন্যে ব'ললে—"হাঁরে দুলু, এরা তোকে মেরে ফেলবে কেন? তোর কি অনেক গয়না-গাঁটী আছে? তোর গাঁয়ের লোকের কাছে কি তুই টাকা ধারিস? তাই যদি হয় আমি থেকে কি করব?" এতক্ষণে পাঠশালার কাছে এসে পড়েছে। দুলুর চমক ভাঙ্গল। তাড়াতাড়ি বললে, "টাকা ধার করি নি, সে সব অনেক কথা, ঘরে চল বলব। আচ্ছা জোয়ানদা, তুমি ততক্ষণ এক কাজ কর। আমি এই অন্ধকারটায় দাঁড়াচ্ছি তুমি গোকুলের দোকান থেকে একটা চিমনি, একটা হ্যারিকেন আর খানিকটা তেল কিনে আন।" জোয়ান চলে গেল। শীতকালের সন্ধ্যে। গাঁয়ের লোক যে যার ঘরে ঢুকেছে। পথে লোক-চলাচল একদম নেই, তবুও পাছে কারুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় সেই ভয়ে দুলু বটগাছের কোলে যেখানটা বেশী অন্ধকার সেইখানটায় দাঁড়িয়ে রইল। জোয়ান্ ফিরল, দুলুর কথামত হাতে হ্যারিকেন, একটা চিমনি, একটা ভাঁড়ে তেল। দুলুকে বললে—"এখানেও দোকানদার বেটারা চোর। চিমনি বলে' সাড়ে চার আনা, দু'পয়সা বেশী, আমি চার আনা দিয়ে চলে এসেছি, টুঁ শব্দটী করলে না।" ও সব কথা দুলুর কাণে গেল না। দুলু বললে—"তুমি এইখানটায় একটু দাঁড়াও, জোয়ানদা, আমি চট করে' আসছি" বলে চলে গেল।

ছয়

বারোয়ারি তলায় গান-বাজনা, যাত্রা, থিয়েটার হ'বার জন্যে খানিকটা জায়গা পড়ে আছে, মাথায় খড়ের ছাউনি, বাঁশের খুঁটির ওপর ছাউনি বাঁধা। এই জায়গাটার তিন দিকে বেড়া দেওয়া ছোট ছোট ঘর। এই সব ঘরে নানারকমের বড় বড় মাটীর পুতুল থাকে। পুতুলের গায়ে কাগজ লটকান থাকে, কোনটায় পুতনাবধ, কোনটায় কলির ছেলে, কোনটায় পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গা, কোনটায় পঞ্চ অবতার লেখা। একটা সাবিত্রী-সত্যবানও থাকে, একদিকে যম গদা কাঁধে দাঁড়িয়ে তার সামনে সাবিত্রী মরা সত্যবানকে কোলে নিয়ে ব'সে। ফি বছর একটী ক'রে ব্রাহ্মণ থাকে। সাবিত্রীর মাথায় সিঁদুর বিলিয়ে এই গাঁয়ের ও অন্যান্য গাঁয়ের মেয়েদের কাছ থেকে অনেক পয়সা রোজগার করে। এইখানটাই সেই সময় মেয়েদের ভিড় হয় সব চেয়ে বেশী। বারোয়ারীর আসল ঠাকুর থাকেন পূব দিকের বড় ঘরখানায়। তিনি হ'লেন লক্ষ্মীজনার্দ্দন। শীতকালে এই সব ঘরের অবস্থা যেমন খারাপ, পুতুলগুলোর অবস্থা তেমনই খারাপ। ঘরের চাল প্রায় নেড়া, খড়গুলো গাঁয়ের মাতব্বরদের গরুর পেটে আশ্রয় পেয়েছে, পুতুলের হাতের তীরধনুক বা ঐ জাতীয় জিনিস ছেলেরা খুলে নিয়ে গেছে। পাঠশালার ছুটীর পর ছেলেদের লুকোচুরির খেলার আড্ডা এই ঘরগুলো, কেউ কেউ পথ করে' বাঁশ মেরে অসহায় ভীম বা [illegible]

মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। কেবল সাবিত্রী-সত্যবানের ঘরটা তালা বন্ধ থাকে, বহু পুণ্যজোরে তাঁরা বেঁচে থাকেন, ছেলেদের হাতের স্নেহের পরশ তাঁহাদের দেহে পৌঁছুতে পায় না। তুলু এদিক্-ওদিক চেয়ে পা টিপে-টিপে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের সামনে এসে গড় হ'য়ে প্রণাম করলে, তারপর কি একটু ভেবে সাবিত্রী-সত্যবানের ঘরের সামনে হাজির হ'ল; বাইরে থেকেই গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম ক'রে অস্ফুটস্বরে বল্লে—"মনে বল দাও মা, বড়ই পাপী আমি।" একটু দাঁড়িয়ে থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরটা একবার দেখবার চেষ্টা করলে, কিছুই দেখা গেল না। বক্তার কথাগুলো যাঁর উদ্দেশ্যে বলা হ'ল তাঁর কাণে পৌঁছিল কি না কে বলিবে?

তুলুর আসার দেরী দেখে জোয়ান, একটা বিড়ি বা'র ক'রে ধরালে। 'তুলুর তুমি ছাড়া আর কেউ নেই' এই কথাটা বার বার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করতে লাগল। এতকাল পরে তা'হলে একটা কাজের মত কাজে নিজেকে লাগাতে পারবে ভেবে জোয়ান গর্ব্বে ফেঁপে উঠল। তুলু আসতেই জোয়ান বললে—"কোন্ শালা তোকে কি বলে তাই দেখি।" তুলু ব'ললে—"ছিঃ গালমন্দ ক'র না জোয়ানদা।" তুলু আজ এই প্রথম ধমকে কথা কইলে। জোয়ানও ধমকানি খেয়ে চুপ ক'রে গেল। আশ্চর্য্য! জোয়ান জীবনে যা' করে নি, তুলু ব'লে তাই কিছু বল্লে না, অন্য কেউ হ'লে—রেগে গুম হ'য়ে রইল। মনে মনে ব'ললে—আচ্ছা, দেখাই যা'ক না তুলুর আস্পর্দ্ধা কতদূর।

সাত

গাঁ ছেড়ে যাবার সময় তুলুর একথা একবারও মনে হয় নি যে ভাগ্যচক্র আবার তাকে এইখানেই এনে ফেলবে। তাই যাবার সময় মায়ের দু'চার খানা গয়না, বাপের একটা সোনার ঘড়ি, কাপড়-চোপড় যা-কিছু নেবার মত ছিল সবই সঙ্গে নিয়ে ঘরে নামমাত্র একটা তালা লাগিয়ে গেছল। ঘরের সামনে এসে দেখলে তালা ঠিকই লাগান আছে, তবে দরজার একদিক্কার কড়ায় ঝুলছে। দরজাটা খোলাই ছিল, অল্প একটু ধাক্কা দিতেই অন্ধকারে ঘরের চেহারাটুকু মূর্ত্তি চোখে পড়ল তা'তে সে শিউরে উঠল। ঘরের মেঝেটা ইঁদুরে খুঁড়ে মাটী জমা করেছে। তক্তাপোষটা এখনও পাতাই আছে, বালিশগুলোর সব তুলো ঘরময় ছড়ান। কাচের ছোট আলমারিটা মাটীর খেলনা বুকে নিয়ে উপুড় হ'য়ে পড়েছে। আরশুলা চতুর্দ্দিকে ছেয়ে ফেলেছে। তুলুর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। এক মিনিট চুপ করে' থেকে জোয়ানকে ব'ললে—"জোয়ানদা, তুমি ঝাঁ করে আলোটা জ্বেলে ফেল।" জোয়ান আলোটা জ্বেলে দিয়ে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। তুলু কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে নিয়ে ঘরের এক কোন থেকে একটা ঝাঁটা জোগাড় করে' ঘরের পঙ্কোদ্ধারে লেগে গেল। জোয়ান বাইরের দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে আপন মনে বিড়ি টানতে লাগল। ঘর পরিষ্কার করতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। তুলু বাইরে এসে ডাকলে—"জোয়ানদা!" জোয়ানের তন্দ্রা এসেছিল, চমকে উঠে বললে—"কি,"

তুলু—তুমি কোথায় শোবে?

জোয়ান—"এইখানে।"

তুলু—"এই হিমে বাইরে না জোয়ানদা, তুমি ঘরে শোও নইলে অসুখ কর্ব্বে, আমি ঐ দালানটায় শোব 'খন।

জোয়ান চোখদুটো রগড়ে একবার বেশ করে' চেয়ে দেখলে—হাঁ, তুলুই তো বটে। কথাগুলা একদম নতুন ধরণের, এত নরম এত মিষ্টি কথা তার জীবনে সে এই প্রথম শুনলে, কথার ভেতর এত আরাম লুকোন থাকতে পারে ব'লে তার ধারণাই ছিল না। জোয়ানের মনে হ'ল, মাসিও যেন এই ধরণের কথা একদিন ব'লে ছিল, পুলিশ ঠাণ্ডাবার দরকারে, নয় তো ভাড়াটের কাছে ভাড়া আদায়ের জন্যে, পাচি, হরিমতিও—কিন্তু এতে আর তা'তে যেন আকাশ-পাতাল তফাৎ। তার মনে হ'ল তুলু বাইরে শুলে তুলুরও ঠাণ্ডা লাগতে পারে, ব'ললে—"তুই বকিস্ নি, থাম ভারি মুরোদ বাইরে শোবেন, যা ঘরে যা আমায় ঘুমোতে দে" বলে' বসে' বসে'ই পাশ ফিরলে। তুলু আর তর্ক করলে না, ঘরে গেল। মেঝের ওপর অনেকক্ষণ চুপ করে' ব'সে রইল। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা—আজ তাদের খাওয়া হ'ল না, উপায়ই বা কি? এই রাত্রে কোন ব্যবস্থাই তো হ'তে পারে না। নিজের না হ'লেও চলবে, কিন্তু জোয়ানের? জোয়ানের কথা ভাবতে তারস্ত্রে

আর একজনের কথা মনে পড়ল। উঃ দুটো লোকে কত তফাৎ। বন্ধু কি সর্ব্বনেশে লোক, কি সর্ব্বনাশটাই না করে' দিলে। এই ঘরে বসে'ই কতদিন কত আদরের কথা, কত সোহাগের কথা, কত রঙ্গীন ছবি,কত সুখের স্বপ্ন তার মনের ওপর একটু-একটু করে' এঁকে দিয়েছে কিন্তু এমন কাপুরুষ যে আজ—জোয়ানের সঙ্গে তার ঢের তফাৎ, ঢের তফাৎ। জোয়ানের নয় সঙ্গ খারাপ, জোয়ান নয় মুখ্যু, জোয়ান নয় কথাবার্ত্তায় অশ্লীল, জোয়ান নয় নেশা করে, কিন্তু সে তো ভীরু নয়, তার মনটা বন্ধুর চেয়ে ঢের বেশী সভ্য, ঢের বেশী সাহসী। তাকে চিনতে তো একটু দেরী হ'ল না। সে যে বদমায়েস, সে যে ছোট-লোক সে যে গুণ্ডা, তা বুঝতে তো দুলুর একবিন্দু কষ্ট হ'ল না। সে জলের মত পরিষ্কার ছোট ছেলেতেও তার ঐ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি একদিনেই চিনে নিতে পারে। আর এই কপট ভীরু বন্ধু আজ পাঁচটা বচ্ছর ক্রমান্বয়ে অন্তরঙ্গভাবে মিশেও সে তাঁর আসল মূর্ত্তি ধরতে পারলে না। দুলু মনে মনে বললে—"জোয়ান্‌দা! তুমি যাই হও তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার সত্যি দাদা, তোমার দুটী পায়ে আমার পেন্নাম নাও। আর যদি দরকার হয় তুমি শুধু গাঁয়ের লোক নয় ঐ বিশ্বাসঘাতকের হাত থেকেও আমায় বাঁচিও।" শেষ দিক্‌টা ভাবতে গিয়েই হঠাৎ দুলুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভাবলে—ভগবানের কাছে সত্যই আমার আবেদন পৌঁছে থাকে, জোয়ানকে বিশ্বাস নেই, ওটা একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন গুণ্ডা, ও হয় তো—আর ভাবতে পারলে না, ঘরের মধ্যে আড়ষ্ট হ'য়ে বসে' রইল। বন্ধু হয় তো এই গাঁয়েই আছে, কালই হয় তো খবর পেয়ে আসবে, বেচারী মোটেই জানবে না যে তার যম এই বাড়ীর দরজা আগলে ব'সে আছে। বন্ধুর কথা ভেবে দু'ফোঁটা চোখের জল দুলুর গাল বেয়ে হাতের উপর পড়ল।

আট

তারপর দিন ভোর হ'তে না হ'তেই সারা গাঁময় একটা ঢি ঢি পড়ে গেল। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সকলেরই মুখে এক কথা—জনার্দ্দনের সেই কুলে-কালি-দেওয়া মেয়েটা আবার এসেছে রে! যাত্রা বা থিয়েটার বা ম্যাজিক দেখতে যেমন ভিড় হয় জনার্দ্দনের ঘরের সামনে সেই রকম ভিড় জমল। যেন একবারে মজার ব্যাপার। মাতব্বরদের সঙ্গে কতকগুলো বকা ছোড়াও জুটল। সিধু ভটচায্‌ দলের অগ্রণী। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে যখন হাঁক দিলে—"কই, সতী সাবিত্রী কই, সকালবেলা একটা পুণ্যি কর্ত্তে এলুম" তখন বেশ একটা হাসির রোল উঠল। ভিড়ের মধ্যে কে এক জন বলে' উঠল—দ্রৌপদীটা বাদ দেবেন না।" বাইরের গোলমালে দুলুর ঘুম ভেঙ্গে যেতেই ধড়মড় করে' উঠে-পড়ে কাপড় সংযত করে' নিয়ে দরজার দিকে একটা পা বাড়িয়েই থেমে গেল। পা দুটো যেন মাটীর সঙ্গে গেঁথে গেল। মাথাটা সেই যে নুয়ে গেল আর সিধে হ'ল না।

ওদিকে রকে জোয়ানও উঠে বসেছে। গোলমাল শুনে এক লাফে দরজার কাছে এসে হাজির। ব্যাপার কি? এত ভিড় কিসের? এরা কারা? দুলুই বা ঘাড় হেঁট করে' দাঁড়িয়ে কেন? কিছুই বুঝলে না। সিধু ভটচায্‌ আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দুলুর মুখের কাছে হাত নেড়ে মুখে এক অদ্ভুত আওয়াজ করে' অকথ্য ভাষায় দুলুকে বিঁধছে আর বাকি সকলের মুখের ভাবে বোঝা যায় তারা বেশ তারিফ করছে। তাদের মধ্যে একটা রোগা লম্বা বখা ছেলে অনেকটা এগিয়ে এসেছিল, দুলুর স্বাস্থ্যই বোধ হয় টেনে এনেছিল, কি বলতে যাচ্ছিল, ঠিক এমনি সময় কে একজন ভিড় সরিয়ে এগিয়ে এল—কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা, সটান দুলুর হাত ধরে—"চল, তুই ঘরে চল, তোরও কি ভীমরতি ধরেছে, ঐ সব দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছিস" বলে' এক রকম জোর করে' ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। দুলুর পায়ে যেন আর জোর ছিল না, হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শরীরটার ভার আগন্তুকটীর গায়ে পড়ল। দুলুকে কোন রকমে ভেতরে বসিয়ে রেখে বাইরে এসে ঘোমটা আর একটু সরিয়ে দিয়ে দৃঢ়স্বরে বললে, "আচ্ছা সিধু-কা, তোমরা কি? এই একটা নাভনীর বয়সী মেয়ের পেছনে লাগতে লজ্জা হ'ল না। ভারি সব সচ্চরিত্রের দল, তাই এসেছেন শাসাতে। ঐ যে বাঁড়ুয্যে ম'শায়ও এসেছেন দেখছি। বেশ বাছাই করা চরিত্রবান্ লোক এসেছেন

শাসাতে। যান, সব যেযার ঘরে চলে যান, আমাকে আর ঘাঁটাবেন না।"

তুলসীমঞ্জরীর এই হুকার দিয়ে কথা বলবার যথেষ্ট কারণ আছে। সে যখন সতের বছর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরল, তখন তার কোন কুলে কেউ নেই। কিন্তু তার নিজস্ব একটা জিনিস ছিল, সেটা হচ্ছে তার টলটলে যৌবন আর মুখরতা। সেই অভিভাবক না থাকার স্বর্ণ-সুযোগ বুঝে প্রথমে সিধু ভটচায তারপর তারাপদ বাঁড়ুয্যে ইত্যাদি ক্রমে একে একে গাঁয়ের সব মাতব্বরকটাই তার সুশ্রী চেহারার লোভে তার নিঃসহায় অবস্থা-সম্বন্ধে সহানুভূতি দেখাবার জন্যে ঘন ঘন তার ঘরে আসতে লাগল। তুলসীমঞ্জরী এই সব মাতব্বরদের ছেলেবেলা থেকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করলেও তাদের আসল মূর্ত্তি যেদিন তার চোখে ধরা পড়ল সেদিন তাদের চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দিয়ে গালমন্দ করে' বাড়ী থেকে তাড়াতে একটুও ইতস্ততঃ করলে না। তারপর থেকে তুলসী বুক ফুলিয়ে গাঁয়ের মধ্যে জোরের সহিতই বাস করতে থাকল, কেন না গাঁয়ের যারা মাথা তাঁদের নিজেদের গলদ থাকার দরুণ তাকে ঘাঁটাতে বা বিরুদ্ধে যেতে সাহস করত না।

তাই তুলসী যখন হঠাৎ এই ভিড়ের মধ্যে এই কাণ্ডটা করে' বসলে সিধু ভটচায প্রথমটা একটু দমে গেলেও পরে ঠিকই করা হচ্ছে ভেবে মনে সাহস সঞ্চয় করে' বললে—"দেখ তুলসী তুই আমাদের ওপর সর্দ্দারগিরি করতে আসিস নি। তোর বাবা পর্য্যন্ত কখনও আমাদের মুখের উপর কথা কইতে সাহস করত না তা জানিস্? যত সব নচ্ছার মেয়েকে গাঁয়ে রাখলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। ও সব প্রশ্রয় সিধু ভটচায বেঁচে থাকতে চলবে না। আমি ও বেটীকে আজই বিদায় করে' জলস্পর্শ করব" বলে' একবার ফুলু আর একবার তুলসীর দিকে তাকাতে লাগল। তুলসী অল্প একটু হেসে বললে, "সিধুকা!" একটু থেমে আবার বল্লে—কাকা বলতেও লজ্জা লাগে, যাই হোক, অকল্যাণ গাঁয়ের যদি একান্তই হয় তা আপনাদের মত লোক গাঁয়ে থাকার জন্ত এবং আপনাদের মত লোকের ছেলে থাকার জন্তই। অমঙ্গল থেকে বাঁচতে হ'লে আপনাদেরই তো আগে তাড়াতে হয়। সিধু আগুন হয়ে উঠল—"কি আস্পর্দ্ধা দেখেছ তুলসীর গাঁ থেকে তাড়াবে সিধু ভটচাযকে। দাঁড়াও তো দেখি কে ও বেশ্যাকে এখানে আটকাতে পারে? বাঁড়ুয্যে চলে এস তো। বলে এগিয়ে যেতেই তুলসী চেঁচিয়ে উঠল—"সিধুকা?"

জোয়ান ব্যাপার দেখে অনেক্ষণ থেকেই রেগে ফুলছিল। দালানের কোণ থেকে একটা ভাঙা দুর্ম্মুজের বাঁট তুলে নিয়ে ভিড়ের দিকে এগিয়ে যেতেই সকলেরই নজর পড়ল সেই দিকে। সিধু ভটচাযের নজরে পড়তেই তড়াক করে' তিন হাত পিছিয়ে গেল। এ রকম মূর্ত্তি এ গাঁয়ের লোক জীবনে কখনও দেখে নি। সকলেই এক পা এক পা করে' পিছুতে লাগল। অথচ লোকটা কে, কোথা থেকে এল, না জানলেও নয়, এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। একেবারে কেউ চলে গেল না, এদিক্-ওদিকে আশে-পাশে সরে রইল। তুলসী অনেকক্ষণ থেকেই এই লোকটার দিকে লক্ষ্য করছিল। যখন দেখলে সিধু ভটচায মশাই তার লক্ষ্য তখনই চেঁচিয়ে উঠল—"থাম মের না।" তুলসীর ধমকে ওঁচান হাত নামিয়ে নিতেই সিধু ভটচায একটা ঢোক গিলে বললে—"ইস মারে সব—শা।" তারপর যখন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে অসময়ে সাহায্য করতে পেছনে একটাও লোক নেই; প্রকাণ্ড ভিড়টা মাত্র নিজের একটা বিন্দুতে ঠেকেচে তখন সেও ব্যাপার বিশেষ সুবিধে নয় দেখে ফুলু,তুলসী এবং ঐ অপরিচিত লোকটাকে নিজের ব্রাহ্মণত্বের জোর এবং তাদের ভবিষ্যতের ভয় দেখিয়ে গজ গজ করতে করতে চলে গেল।

ফুলুর ওপর তুলসীমঞ্জরীর টান থাকবার বিশেষ একটা কারণও আছে, তুলসীর বয়স এখন একত্রিশ বছর হ'লেও চিরকাল আর তা ছিল না। বিয়ের আগে পর্য্যন্ত সে ছিল গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে ডানপিটে মেয়ে। তার খেলা ছিল হাডুডুডু, চুকোপাটি, জলে সাঁতরান, গাছে উঠে পেয়ারা খাওয়া, কুল খাওয়া। আর বন্ধু ছিল গাঁয়ের পাঠশালা-পালান যত ছেলে। এই সব অবাধে মিশতে পেত, তার কারণ সে ছিল বাপমরা মায়ের একমাত্র আদুরে মেয়ে। তার মা তাকে কোনও দিন বাধা দেয় নি পাছে সে মনে দুঃখ পায়। এর ফলে যা

হ'বার তাই হ'ল, সে একগুঁয়ে হ'ল, অবাধ্য হ'ল, সাহসী হ'ল, একটু লেখাপড়াও শিখলে, কিন্তু গেরস্থালীর কাজকর্ম্ম মোটেই শিখলে না। শুধু তাই নয়; নিজে ডানপিটে হ'লেও হঠাৎ বিয়ের আগে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল যে সে অজান্তে ছেলে সঙ্গীদের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ মুখচোরা গোবেচারী জনার্দ্দনকেই ভালবাসে, শুধু ভালবাসে নয় ভয়ানকভাবেই ভালবাসে। তাই যখন দেবল গ্রামে তার মা তার বিয়ের সব ঠিকঠাক করলে তখন তার প্রাণটা জনার্দ্দনের জন্য ডুকরে কেঁদে উঠলেও নিজের একগুঁয়েমির জোরে মুখে টু শব্দটী পর্য্যন্ত করলে না। মার কথায় সায় দিয়ে বিয়ে করে' শ্বশুর-ঘর করতে চলে গেল। কিন্তু যাবার আগে হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড করলে—নিজের দুটী গণ্ডে একরকম জোর করেই নিরীহ জনার্দ্দনের ওষ্ঠের দুটী ছাপ এঁকে নিয়ে চলে গেল। চলে গেল বটে, কিন্তু বেশীদিন আর শ্বশুর-ঘর করতে হ'ল না। যে দু' বচ্ছর রইল সে দু' বছরেই সংসারের রান্নাবান্না ঘর ঝাঁট দেওয়া শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা-যত্ন করা ইত্যাদি না করে' বাড়ীশুদ্ধলোককে জ্বালাতন করে' শেষ বিধবা হয়ে বাড়ী এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বাড়ীতে এসে সে হ'য়ে গেল কি এক রকমের। গাঁয়ের কারুর সঙ্গেই মেলা-মেশা করে না, এমন কি যে জনার্দ্দনের জন্য তার শ্বশুর-ঘরটাই ব্যর্থ হ'ল নিজের জীবনটা অশান্তিময় হ'ল তার সঙ্গেও না। নিরীহ জনার্দ্দন সেই যে তুলসীর জিদে একটা অপকর্ম্ম করে' বসল, সেই থেকে সেই আপনা হ'তেই সঙ্কুচিত হয়ে থাকত। তারপর সে বিয়ে করলে, ঘর-সংসার পাতল, দুলু হ'ল, বউ মরল, নিজের বয়স কত বেড়ে গেল, তবুও তুলসীর ভয় তার গেল না। তুলসী-মঞ্জরীর অবস্থা মন্দ নয়। জমি, জায়গা, পুকুর, বাগান, লক্ষ্মীজনার্দ্দন ঠাকুরের পালা ইত্যাদি নিয়ে একটা লোকের পক্ষে যথেষ্ট। তাই তুলসী তার বাপের আর মায়ের শ্রাদ্ধ ঘটা করেই করত আর ঐ দুটো দিনই সে নিজে গিয়ে জনার্দ্দনকে নিমন্ত্রণ করে' আসত। জনার্দ্দন এসে ঘাড় হেঁট করে' মুখটী বুজে খেয়ে চলে যেত। তারপর জনার্দ্দন দুলুকে রেখে মারা গেল। জনার্দ্দন মারা যাবার পর তুলসীই তার তত্ত্বাবধান করত। কারণ জনার্দ্দনের আত্মীয় বলতে আর কেউ কোথাও ছিল না। যখন নিরঞ্জন চাটুয্যের ছেলে বঙ্কু দুলুর সঙ্গে মেলামেশা করত তখন তুলসী কিছুই বলত না, কেন না তুলসীর ধারণা ছিল বঙ্কু ছেলেটা সত্যই ভাল। এণ্ট্রান্স পাশ করে' জলপানি পেলে, কলেজে পড়তে কলকাতায় গেল, লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু হঠাৎ যেদিন দেখলে দুলুর ঘরে তালা দেওয়া, দুলু বঙ্কুর সঙ্গে কোথায় চলে গেছে সেদিন তার মনটায় ঘেন্নায় একদিকে ভরে উঠলেও ভেতরে ভেতরে সে যে একটুও খুসী হয় নি তা শপথ করে' বলা যায় না। নিজের ব্যর্থ জীবনটা দিয়ে তুলনা করে' তুলসী ভাবলে—দুলু যদি সত্যই বঙ্কুকে ভালবেসে থাকে তা হ'লে বোধ হয় খুব অন্যায় হয় নি। তবে সমাজ? ওটা একটা ভাববার কথা। তার পরেই তার মনে পড়ল তার নিজের ওপর সমাজের মাতব্বর সিধু ভটচাযের কথা, তার পরে বাড়ুয্যের কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনটা সমাজের ওপর বিষিয়ে উঠল, ভাবলে—এই তো সমাজ, যেখানে একজন অল্পবয়সী বিধবাও সর্ব্বদা সশঙ্ক না থেকে দিন কাটাতে পারে না, সে যদি আজ নিজে না হয়ে অন্য একটা গোবেচারী মেয়ে হ'ত। ভাবতে ভাবতে তার মন রুখে দাঁড়াল সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে। তাই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে যেমন করে'ই হ'ক দুলুকে এদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতেই হ'বে, তাছাড়া দুলু যে জনার্দ্দনের মেয়ে। তাই তার কানে যখনই পৌঁছিল যে দুলু ফিরেছে আর গাঁয়ের লোক গেছে তাকে শাসাতে তখনই সে তার স্নানাহ্নিক ফেলে রেখে দুলুর ঘরের দিকে ছুটল।

নয়

ভিড় যখন সরে গেল, কোনও কারণ না থাকলেও তুলসীর হঠাৎ রাগ হ'ল এই জোয়ানের ওপর। জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কে?" গলার স্বরে বিরক্তি উপ্‌ছে পড়ছে।

জোয়ান থতমত খেয়ে গেল, বল্লে,—"আমি জোয়ান?"

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "জোয়ান, কে?" একটু থেমে আবার ব'ল্লে, "যেই হও বাপু, তুমি যেন ঘরে ঢুকো না, বাইরে দাঁড়াও" বলে' নিজে ঘরে ঢুকল। দুলু তক্তাপোষের এক কোণে ব'সে যেন পাথরে-কোঁদা একখানা বিষাদের

ছবি। দুলুর গা নাড়া দিয়ে তুলসী ব'ললে,—"হাঁরে দুলু, ঐ লোকটা কে? তুলসীর নাড়া খেয়ে দুলুর চমক ভাঙ্গল, ব'ললে—"এঁ?"

তুলসী আবার ব'ললে,—"ঐ যে চোয়াড়ে-চোয়াড়ে বিশ্রী লোকটা ও কে? চিনিস?"

"দুলু এতক্ষণে বুঝতে পেরে ব'ল্লে—"ওঃ, ও জোয়ানদা!"

"—হুঁ, কি জাত? কোথায় থাকে? কি করে?" দুলু অবাক্। এসব কথা তো সে আগে ভাবে নি, বল্লে—"তা তো' জানি না মাসিমা, কিন্তু বড় ভাল।"

তুলসী রেগে বললে,—"ভাল-মন্দ শুনতে চাই না। কে ও? কি জাত? হিন্দু, না মোছলমান, না ক্রীশ্চান, না কি? কতদিনের আলাপ?"

দুলু—"তা ঠিক জানি না মাসিমা, কিন্তু বড় ভাল লোক।"

তুলসী পুনরায় বললে, "ফের। আ মর। ভাল ভাল করে' যে অস্থির হচ্ছিস? দাঁড়া, ভাল দেখাচ্ছি, কেউ না পারে, আমিই তোকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় কচ্ছি বলে' রেগে গুম হ'য়ে চলে গেল। সারা পথটা মনে মনে কেবলই নিজেকে এই ব'লে ধিক্কার দিলে, কেন সে মরতে ঐ দ্বিচারিণী মেয়ের জন্যে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রলে, কেন সে ঐ একগাঁ লোকের সামনে সিধুকা'কে ঐ রকমভাবে যা নয় তাই বলে অপমান ক'রলে? কি না একটা কুলটার জন্যে। আরও, বেশী করে' তার কষ্ট হ'তে লাগল এই কথা ভেবে যে এই খানিক আগে সেই কি না ঐ রকম স্বেচ্ছাচারী মেয়ের জন্যে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তাকে বাঁচাতেই হ'বে। হ'ক না সে জনার্দ্দনের মেয়ে, হ'ক না সে নিজের মেয়ে, তবুও কোন দয়া, কোন সহানুভূতি পাবারই সে যোগ্য নয়। তাকে তাড়াবার প্রতিজ্ঞাই তার করা উচিত ছিল, তা না হ'য়ে—ছিঃ ছিঃ! বাড়ীতে পৌছে হাত পা ধুয়ে স্নানাহ্নিক সেরে তুলসী রামায়ণটা খুলে বসল। সে রোজই একবার করে' রামায়ণ পড়ে, তবে খাওয়া-দাওয়ার পরে। কিন্তু আজ তার মনটা এত অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে যে তার রাঁধবার ইচ্ছেও হ'ল না। রামায়ণেও তার মনের অস্বস্তি ঘুচল না, একই কথা দু'বার করে' পড়লেও অর্থবোধ মোটেই হচ্ছে না। আস্তে আস্তে পাশের ভাঙ্গা প্যাঁটরার ওপর তুলে রেখে চুপ করে' বসে' রইল। তারপর কি একটু ভেবে রান্নাঘরের দিকে গেল। রান্নার যোগাড় আগের রাত্রে সবই করা থাকে। বিধবার আহার। যোগাড়ের মধ্যে দুটা কাঁচ-কলা ভাতে, দুটা আলু ভাতে, একটু ডাল। ভাতটা চড়িয়ে দিয়ে, আলু আর কাঁচকলা ছেড়ে দিলে, ভাত ফোটবার আর অপেক্ষা রাখলে না, উঠে গিয়ে একটু ছেঁড়া ন্যাকড়ায় ডাল বাটা বেঁধে ভাতের মধ্যে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে চৌ-কাঠ চেপে বসল। উঠানে একটা আম গাছ, শীতে সব পাতা ঝরে গিয়ে ন্যাড়া হ'য়ে গেছে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে তুলসীর মনে হ'ল—কি বিশ্রী গাছটা, কোথাও জীবনের চিহ্ন নেই, বিশ্রী একদম বিশ্রী। তারপর একে একে মনে হ'ল—জগতের সবই খারাপ, সবই বিশ্রী, সেই লোকটা বিশ্রী, সিধুকা বিশ্রী, জনার্দ্দন বিশ্রী, খাওয়া বিশ্রী, বেঁচে থাকাটা বিশ্রী।

ঠিক এমনি সময় উঠানে যেন কা'র পায়ের আওয়াজ হ'ল, মুখটা বাড়াতেই দেখলে দুলুর ঘরের সেই লোকটা। তাড়াতাড়ি হাতের কাছে একটা খুন্তি তুলে নিয়ে, ঠিকরে উঠানে নেমেই চেঁচিয়ে উঠল—"খবরদার, এখনই বেরিয়ে যাও।" জোয়ান চিরকাল বাঘের বাচ্ছা কিন্তু কেন কে জানে, কিছুই বললে না, একটু অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে থেকে বললে—"দুলু যা বলতে বলেছে বলি, তারপর যাব।" রাগে দুঃখে ঘেন্নায় তুলসীর মুখ দিয়ে একটা কথা বেরুল না।

জোয়ান বল্লে—"দুলু আজই রাত্রের গাড়ীতে চলে যাবে, সন্ধ্যের সময় তোমায় একবার দেখা করতে বলেছে, কি একটা কথা আছে বলবে।" বলে' একবার বাড়ীর চতুর্দ্দিক দেখে নিয়ে ন্যাড়া আমগাছটার একটা শুক্‌নো ডাল ভেঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

কাল রাত থেকেই দুলুর একরকম উপোষ চলছে। তার ধারণা ছিল গাঁয়ের কোনও লোকই হয় তো তাকে সহ্য কর'বে না, কিন্তু মনে মনে এ কথাটাও তার বেশ জানা ছিল যে এই 'কোন লোকের' মধ্যে তুলসীমাসিমা নেই, মাসিমা তার দুঃখ নিশ্চয়ই বুঝবে, তাকে তাড়াতে পা'রবে না, তার পক্ষে তাই যথেষ্ট। ঐ একদিকে স্নেহের আশ্রয়

আর অন্যদিকে গাঁয়ের লোকের হাত হ'তে বাঁচাতে তার জোয়ানদা আছে। এই সব ভেবেই সে গাঁয়ে ফিরতে সাহস করে। গাঁয়ের লোকে তাকে অপমান ক'রলে, তার সহ্য হ'ত, কিন্তু মাসিমা, যাকে সে মা বলেই জানে, সেই যখন তার দুঃখ বুঝলে না, তার সব কথা শুনলে না, তাকে ত্যাগ করে' চলে গেল তখন এখানে আর কিসের জন্যেই বা থাকা, রাগে, অভিমানে, দুঃখে সে ঠিক করলে—জোয়ানের সঙ্গে সে চলে যাবে, যেদিকে জোয়ান নিয়ে যায় সেই দিকে, জোয়ানের ইচ্ছায় সে মোটেই বাধা দেবে না, একদম স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে, আর তার জীবনের ওপর মোটেই দরদ নেই। স্রোতে ভাসতে গিয়ে যদি তাকে অতলে তলিয়েও যেতে হয় তা'তেও তার আপত্তি নেই। তবে তার বড় ইচ্ছে হ'ল যাবার আগে একবার মাসিমার সঙ্গে দেখা ক'রে দুটা কথা বলে যাবে। আর একটা ইচ্ছে—সে যে কোথায় আছে, কে জানে, সে গাঁয়ে আছে কি নেই কে বলে দেবে, কা'কেই বা সে জিজ্ঞাসা ক'রবে? কেই বা তার কথার জবাব দেবে? সবাই হয় তো নাক সিঁটকে চলে যাবে। মনে মনে বললে, হে ভগবান্ শুধু একবার দেখা করিয়ে দাও, সেই পাপী, বিশ্বাসঘাতক দেখুক, বুঝুক, কি দুরবস্থাই আমার করেছে। একবার বেশ করে' জানিয়ে দেব স্ত্রীলোকের প্রাণটা ছিনিমিনি খেলবার জিনিস নয়, এমন বুঝিয়ে দেব যে জীবনে সে কখনও ভুলবে না। রাগে তার মাথার মধ্যে আগুন ছুটতে লাগল। রেগে অনেকক্ষণ গুম হ'য়ে বসে' রইল, তারপর একটা কথা মনে পড়তেই ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে গেল, বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পড়তে লাগল—বদ্যু বেঁচে আছে তো, সকালে কত লোক তার দরজায় ভিড় করে' ছিল, ভিড়ের দিকে মাত্র একবার সে তাকিয়ে ছিল, তার যতদূর মনে পড়ে, কই তার ভেতর তো সে ছিল না, থাকলে নিশ্চয়ই তার নজর এড়াত না, সে মুখ যে ভোলবার নয়। তবে? তবে কি সে নেই? মনে হ'তেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অনেকক্ষণ কাঁদবার পর কান্না তার মনটা অনেকটা হাল্কা হ'ল সে রাস্তার দিকে চৌকাঠের কাছ ঘেঁসিয়ে বসল যদি পুরান বন্ধুদের মধ্যে কেউ একবার এপথ দিয়ে যায় তা হ'লে শুধু বদ্যু বেঁচে আছে কি না এই খবরটা সে জেনে নেবে। একে শরীর ক্লান্ত তার ওপর কাল থেকে পেটে একটা দানা পর্য্যন্ত পড়ে নি, কখন যে দরজা ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, টেরই পেল না।

দশ

বত্রিশ নাড়ী-ছেঁড়া টান না হ'লেও দুলুর ওপর তুলসীর স্নেহের টানে একটুও মিথ্যে নেই। দুপুরে ভাতের সামনে একবার নামমাত্র বসলে, একটী গ্রাসও মুখে তুলতে পারলে না। ভাতশুদ্ধ থালাটা একদিকে ঠেলে দিয়ে হাত ধুয়ে উঠে পড়ল। দালানের একধারে আঁচলটা বিছিয়ে দিয়ে শু'য়ে পড়ল। দুলুর বোধ হয় খাওয়া হয় নি, কুকুর বেড়ালের মত সকলেই তাকে তাড়া দিচ্ছে—ভাবতে ভাবতে এক সময় তার দুটী চোখ জলে ভরে উঠল। হাত দিয়ে চোখ দুটা রগড়ে নিয়ে পাশ ফিরলে। তাকে সে নিজেও অপর সকলেরই মত অপমান করেছে এই কথাটা মনের ভেতর কেবলই কাঁটার মত খচ্ খচ্ করছে। অনেকক্ষণ ছটফট করার পর ঘুমের আশা নেই বুঝে যখন উঠে বসল তখন বিকেল হ'য়ে এসেছে। গাছের মাথার সোনালি ঝিকমিকে রোদটুকু এখন খিড়কির বাঁশ-গাছের মাথায় চলে গেছে। তার মনে হ'ল সন্ধ্যের সময় দুলু একবার যেতে বলেছে। তখনই সে উঠে রান্নাঘরের শিকলি তুলে দিয়ে মাথায় অল্প একটু ঘোমটা টেনে দুলুর ঘরের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

দুলুর ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত দুলুর শীর্ণ, ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে তুলসী চমকে উঠল—"আহা, বাছা রে! কত কষ্টই না পেয়েছিস্?" অনুতাপে তার সমস্ত মন ভ'রে উঠল, নিজের ওপর রাগ হ'ল। সে না কি আবার দুলুর মাসি? তাকে শুধু তিরস্কারই সে করলে। কোথায় তার ব্যথা কোথায় তার যাতনা সে দিকে সে মোটেই লক্ষ্য করলে না, একবার সে খোঁজ করলে না, দুলু তোর কি কষ্ট মা? তুলসীর চোখ দিয়ে হুহু করে' জল পড়তে লাগল। দুলুর মুখের দিকে আর তাকাতে পারলে না, হেঁট হয়ে দুলুর মাথায় গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে কেবলই বলতে লাগল—আহা বাছারে। একসময় অল্প একটু গা নাড়া দিয়ে ভাঙা গলায় ডাকলে—"দুলু, ও দুলু, দুলুমা!"

তুলসীর স্বরে মায়ের দরদ উপচে পড়ছে। নাড়া পেয়েই ছুলু জেগে উঠল। চোখ চেয়েই বল্লে—"কে, মাসিমা?" ধড়মড় করে' উঠতে যাচ্ছিল। তুলসী তাড়াতাড়ি গলাটা ধরে' একেবারে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বললে,—"ভয় কি মা, উঠছিস কেন? ছোট্ট, আট বছরের মেয়েটার মত ছুলু কোলের মধ্যে মুখটা গুজে রইল। তুলসী মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ব'ললে;—"হাঁ ছুলু, তুই না কি আজ চলে যাবি বলেছিস? কেন বলদিকিন, আমি বুঝি তোর কেউ নই?" কোল থেকে আস্তে আস্তে মাথাটা তুলে ছুলু বললে—"হাঁ মাসিমা, আমি আজই চলে যাব। কোথায় তা জানি না আমি পাপী, আমি ভ্র—তোমরা সকলে মিলে আমায় ঘেন্না কর, অপমান কর, যা খুসী তাই কর।" একটু থেমে আবার ব'ললে—"মাসিমা, একটা কথা যদি বল, সে কি বেঁচে আছে?" তুলসী চমকে উঠল—"আঃ কি ভুলটাই সে করেছে, মিছে সন্দেহ করে' তাকে আজ সকলে যা' না' তাই বলে' গাল-মন্দ করেছে। বললে—"হাঁ মা বস্তুতো' বেঁচে আছে, তাকে তুই তা হ'লে এখনও ভুলিস নি।"

ছুলু:—"তাকে ভোলা যে বড় শক্ত মাসিমা।" তুলসী—অবাক্। যে দৃঢ়তার সঙ্গে ছুলুর মুখ দিয়ে কথাটা বেরুল, সে তো ছেলেমানুষের মত নয়, সে তো উড়িয়ে দেবার মত নয়। লোকে যখন তাদের স্বামীর সম্বন্ধে কথা বলে, তারাও ঠিক ঐ রকম জোরেই বলে, তুলসী অনেকবার অনেকের মুখে তা শুনেছে। তার মনে হ'ল—ঠিকই তো, বিয়েই তো সব নয়। স্বামী স্ত্রীলোকের ভাগ্যে একবারই হয়, তা সে বিয়ের মন্তরের ভেতর দিয়েই হ'ক কি এমনিই হ'ক। আসল প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ কোনও বাহিরের অনুষ্ঠানের তো অপেক্ষা রাখে না। তারও তো বিয়ে হ'য়েছিল, শ্বশুর-ঘরও ছিল, স্বামীও ছিল, কিন্তু একদিনের তরে তো সে বিয়ে করা স্বামীকে ভালবাসা তো দূরের কথা, বাহিরের দেহটার একপাশের একটুখানি অধিকার তাও দিতে পারলে না, গোড়ার ভালবাসাই তার জীবনে জয়ী হ'ল, জনার্দনই হ'ল তার মনে প্রাণে স্বামী। বললে, "ছুলু সকালের কথা কিছু মনে রাখিস্ নি মা, কখন রাগের মাথায় কি বলে ফেলেছি সে কথা মনে করে' কি মাসির ওপর অভিমান করতে আছে? ছিঃ ওঠ, ক'দিন ধরে বোধ হয় খাওয়া হয় নি, মুখ শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেছে। চল্ দেখি রান্নার কি যোগাড় আছে, ওঠ" বলে' রান্না-ঘরে উঁকি মেরে দেখলে—কোথাও কিছু নেই। ঘরে ঢুকে বললে—"তোর সে গুণধর লোকটা কোথা? উঃ কি চেহারা! বাবা—দেখলে যেন ভয় লাগে। তাকে দেখতে পেলে তো তাকে হাঁড়ি-কুঁড়ি রান্না-বান্নার যোগাড় করতে পাঠাই।"

ইতিমধ্যে জোয়ান যখন দেখলে এখানকার ব্যাপার বড় অদ্ভুত, না হ'ল একটা মারামারি না হ'ল কিছু, সকাল থেকে কেবল একটা গোলমাল আর হট্টগোল, তখন তার মন গেল বিগড়ে। তার ওপর কাল থেকে সে একটা ফোঁটা মদ পর্য্যন্ত ছুঁতে পায় নি। সে বিরক্ত হ'য়ে আড্ডার সন্ধানে বেরুল। নিজের আড্ডা চিনে নিতে বড় দেরী হয় না। খুঁজে পেতে ঠিক চাষাপাড়ায় গিয়ে উঠল। সেখানে পৌঁছেই কলকাতা সম্বন্ধে বেশ একটা সরস বক্তৃতা দিতেই ভুতো হাতের ভাঁড়টা এগিয়ে দিয়ে বললে—"নে খা।" জোয়ান একপাশটায় উবু হয়ে বসে' এক চুমুকে ভাঁড়টা খালি করে' ভুতোর হাতে ফিরিয়ে দিলে। তারপর অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প-গুজবের পর জোয়ান বললে,—"বেটাকে এক ঘাতেই কাবু করে' দিতুম, শুধু ঐ মাগিটার জন্যে—"

কালু নেশায় ভরপুর—সব কথা স্পষ্ট করে' বেরুচ্ছে না; বললে,—"আলবৎ, ঐ টিকিওলা বামুনটাই বজ্জাতের ধাড়ী। এবার আসুক না লাউ চাইতে, দেখব'খন বেশ করে'।"

তুলসীর আদর আর সহানুভূতি ছুলুকে অনেকটা চাঙ্গা করে' তুললে। তুলসী নিজেই সব যোগাড় করে' রাঁধতে বসল, অনেক নিষেধ সত্ত্বেও ছুলু এটা-ওটা এগিয়ে দিয়ে রান্নার কাজে সাহায্য করতে লাগল। জোয়ান যখন ফিরল তখন রান্না প্রায় শেষ হ'য়ে

এসেছে, ডাল ফুটছে। বাইরে থেকেই ডালের গন্ধ পেয়ে জোয়ানের ক্ষিধে দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

একেবারে সটান রান্নাঘরের কাছে গিয়ে বললে,—"দে ঢুলু খেতে দে, ফিরে যেতে হয় পরে যাওয়া যাবে আগে খেতে দে, ক'দিন না খাইয়ে তুই আমায় আধমরা করে' রেখেছিস্।" রান্নাঘরের ভেতর মুখ বাড়িয়ে দিতেই দেখলে, ঢুলুর সেই মাসি। গোলমাল না করে' আস্তে আস্তে দালানের একধারে বসে' পড়ল। ঢুলু বেরিয়ে এসে জোয়ানকে চুপিচুপি ব'ললে—"জোয়ানদা, এখন আর যাওয়া হ'বে না, মাসি বলেছে এইখানেই এখন থাকতে হ'বে." তারপর চেঁচিয়ে ডাকলে—"মাসিমা, একবার এদিকে এস, একটু দরকার আছে।" তুলসী বাইরে এল, কোমরে কাপড় জড়ান, হাতে ডালের হাতা। বাইরে আসতেই ঢুলু বললে—"জোয়ানদা, তোমায় পেন্নাম কর্ব্বে। জোয়ানদা, তোমারও মাসিমা হ'ন. প্রণাম কর।" জোয়ান থতমত খেয়ে গেল। এই স্ত্রীলোকটীকে সে এখনও বুঝে উঠতে পারে নি ঢুলুর স্বপক্ষে কি বিপক্ষে। অদ্ভুত মেজাজ। ঢুলুর জন্যে এক গাঁ লোককে ধমকে তাড়ালে, আবার তারপরই ঢুলুকে গালমন্দ করে' চলে গেল। প্রণাম করতে তার মন কিছুতেই সায় দিলে না, হাজারই হ'ক, ঢুলুকে সে তো তিরস্কার করেছে। দেরী দেখে ঢুলু তাড়াতাড়ি বললে—"জোয়ানদা, মাসিমা হ'ন যে।" জোয়ানের মনের ভেতর যাই হ'ক, ঢুলুর কথা অগ্রাহ্য করা তার পক্ষে বড় শক্ত। ঢুলুর প্রত্যেক কথাই যেন তার কাছে হুকুম। কথার মধ্যে যেন মন্তর দেওয়া, তা না হ'লে তার মত লোককে এতদূর অনায়াসে টেনে আনতে পেরেছে? টুক করে' মাথাটা ছুঁয়ে ঠেকাতেই তুলসী বলে উঠল—"থাক, থাক, ছুঁসনি যেন, কি জাত কে জানে" বলে আবার রান্নাঘরে চলে গেল। ঢুলুও ভেতরে গেল। জোয়ান শুধু একলা অবাক্ হ'য়ে বসে রইল, তার মনের মধ্যে কি এক রকম নতুন ভাব. নতুন অনুভূতি। প্রণাম করা, শ্রদ্ধা করা, ভদ্র গেরস্থে বাস করা, ভদ্রলোকের মেয়েকে মাসিমা বলা, তার সঙ্গে কথা কওয়া তার পক্ষে সবই নতুন। বিস্ময়ের সঙ্গে একটা আনন্দও পেলে যার স্বাদ তার বত্রিশ বছরের জীবনের মধ্যেও একদিনও পায় নি। এই সব নতুন নতুন কথা আর ঘটনাগুলা সে দালানের অন্ধকারটায় নিরিবিলিতে বসে ভাবতে লাগল। কলকাতার কথা, পার্কের কথা, অনেক কথা মনে হ'ল। এখানকার মাসিমার কথা, তাড়ির আড্ডার ভূতোর কথা, কালুর কথা সব কথাই মনে হ'ল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সব কথার সঙ্গে ঢুলুর কথা জড়ান। আরও তার বিশেষ করে মনে পড়ল, কলকাতা থেকে আসবার দিনের কথা। আসবার আগে ঢুলুর জ্বর আছে কি না দেখবার জন্যে ঢুলুর কপালে হাত দিতে তার সমস্ত শরীরে কি রকম একটা অনুভূতি হয়েছিল। অথচ আশ্চর্য্য তারই আগের দিন তাকে যখন রক থেকে টেনে নামিয়েছিল তখন তার কোন অনুভূতিই হয় নি। তার মনে হ'ল, কারণে-অ-কারণে, সময়ে-অসময়ে পারুল, পাচি, অনি এরা তাকে কত দিন কতবার স্পর্শ করেছে, কই তার মনের মধ্যে কিংবা শরীরে কোন পরিবর্ত্তনই তো সে বোধ করে নি। ঢুলুর সঙ্গে কথা কইতেও তার যেন কত আরাম হয়। সেটা বোধ হয় তার মিষ্টি স্বভাবের জন্যে। "জোয়ানদা, ঘুমুচ্ছ না কি, ভাত দিয়েছি, খেতে বস।" ঢুলু বাঁ হাতের কেরোসিনের ডিবেটা চৌকাঠের ওপর রেখে ডান হাতের ভাতের থালাটা নামিয়ে দিলে। ক্ষিদেয় জোয়ানের নাড়ী চন্‌চন্ কচ্ছিল, তাড়াতাড়ি থালার সামনে উপু হয়ে বসে খেতে আরম্ভ করলে। পাঁচ-ছ গ্রাস খাবার পরেই জোয়ান মুখ বাড়িয়ে এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে নিয়ে বললে—"হাঁরে, ঢুলু তোর সেই মাসি চলে গেছে।" ঢুলু পেছন ফিরে ভাত বাড়ছিল, মুখটা ফিরিয়ে বললে—"ছিঃ জোয়ানদা, গুরুজনের সম্বন্ধে কি ঐ রকমভাবে কথা বলে? আর বলো না। ওতে মাসিমাকে অপমান করা হয়। তা'ছাড়া তোমারও আজ থেকে মাসিমা, শুধু আমার একলার নয়।" জোয়ান বেশ একটা স্ফূর্ত্তির সঙ্গেই কথাটা বলেছিল, ঢুলুর কথায় থতমত খেয়ে গেল। তারপরে বাঃ, অপমান, অভক্তি আবার ক্যা'রে

করলুম, কই, গালমন্দ তো কিছু করি নি? কিছু বুঝতে না পেরে মুখ গোঁজ করে' খেতে লাগল। ঢুলু তার এই জোয়ানদাদাটীকে এই ক'দিনেই বেশ চিনে নিয়েছে। পুলিশের সম্বন্ধে, মারপিট সম্বন্ধে, নেশা করা সম্বন্ধে অশ্লীলতা-সম্বন্ধে এই লোকটীর যতই কেননা অভিজ্ঞতা, থাকুক, সাংসারিক অভিজ্ঞতা যে তার এই দাদাটীর কত কম ঢুলু তা জানত। তাই তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে বাইরে এসে বললে—"ওকি জোয়ানদা! অত তাড়াতাড়ি খাচ্ছ কেন? আজ আর তো ট্রেণ ধর্ত্তে হবে না, একটু আস্তে আস্তে খাও।" জোয়ান মাথাও তুললে না জবাবও করলে না, যেমন খাচ্ছিল তেমনি খেতে লাগল। ঢুলু উঠে এসে জোয়ানের বাঁহাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললে—"জোয়ানদা ভাই, আমার ওপর রাগ ক'র না, লক্ষীটী, বুঝেছ? উনি মাসীমা হ'ন কি না ভাই।" জোয়ান আর চুপ করে' থাকতে পারলে না, ঢুলুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। ঢুলুর কথার ধরণই আলাদা, রাগকে যেন কর্পূরের মত উপিয়ে দেয়, তার ওপর আবার সেই স্পর্শ। জোয়ানের সমস্ত শরীর-মন চঞ্চল হ'য়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বললে,—"না রে না, ঢুলু, মাইরি আমি রাগ করি নি। আমিও মাসীমা বলব, কাল থেকেই বলব, তোরও মাসীমা, আমারও মাসীমা, কেমন?" একটু চুপ ক'রে থেকে বললে,—"আচ্ছা ঢুলু, কলকাতার সেই মাসী আর এ মাসী আলাদা নয়? অনেক তফাৎ নাঃ? এ মাসি মদ—"

ঢুলু চাপা অথচ ধমকের সুরে বললে—"চুপ। খবরদার ও সব কথা আর কখনও মুখে উচ্চারণ করো না। কলকাতার তারা ভয়ানক খারাপ, তাদের সম্বন্ধে কোনও দিন কোনও কথা মুখে এন না। ঢুলু রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। কথার মধ্যে কোথায় দোষ হচ্ছে, কি বলা উচিত ছিল, কোন্‌টা বলা উচিত ছিল না জোয়ান কিছুতেই ঠাহর করে' উঠতে পারলে না। তাড়াতাড়ি ভাত ক'টা মুখে পুরে উঠে পড়ল। ঢুলু ভেতর থেকেই জিজ্ঞাসা করলে,—"আর চারটী ভাত নেবে?" জোয়ান এক মুখ ভাতশুদ্ধ জবাব দিলে—"না।"

এগার

আরও দিন পাঁচেক কেটে গেছে। একদিন দুপুর-বেলা মাসীর কোল ঘেসে বসে ঢুলু যখন তার কলকাতার ইতিহাস একটু একটু করে' শেষ করলে, তখন তুলসী আঁচল দিয়ে নিজের চোখ আর নাক বেশ করে' মুছে নিয়ে ঢুলুর চোখ মুছতে যেতেই ঢুলু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, "না মাসীমা, থাক মুছ না ওতে তবু অনেকটা হাল্কা বোধ হয়, অনেকটা যেন আরাম পাই।" মাসী মাথাটা নিজের বুকের উপর টেনে নিয়ে জোর করে' সযত্নে চোখ দুটো মুছে দিতে দিতে বললে—"যাক্, যা হ'বার হয়ে গেছে সেখানকার কথা ভেবে আর মিছে কষ্ট পাস নি।" একটু চুপ করে' থেকে বললে, "হা রে ঐ যে পাচি, মতি, পারুল ওদের কথা বললি ওরা দেখতে কেমন? বেশ ভদ্দর গেরস্তের ঘরের মত মনে হয়?" ঢুলু মাসীর বুকে মুখ রেখেই বললে,—"কি জানি মাসি, ভাল ক'রে কোনও দিন লক্ষ্য করি নি। দেখতে হয় তো কেউ কেউ ভালও হ'তে পারে, কিন্তু তাদের দিকে চাইলেই কি রকম যেন মনে হয়। তাদের সর্ব্বাঙ্গে কি যেন মাখান। ঠিক সাধারণ মানুষের মত নয়। মুখটুক যেন রাতদিনই ঘষা, চুলটুল যেন কি রকমভাবে বাঁধা, চোখ দুটো যেন ঘোলাটে ঘোলাটে। সব চেয়ে বিশ্রী তাদের চাহনি। বড্ড খারাপ। কথাবার্ত্তাও তেমনি, তাদের কথা, তাদের ভাষা সব আলাদা, সব কথা বুঝতে পারতুম না, সেটা আবার কাণে শোনা যায় না এত্ত খারাপ। তবে একজন আছে মাসী, তার কথাগুলো বেশ আমার ভাল লাগত। তার নাম পারুল। দুপুর বেলা প্রায়ই আমার ঘরে আসত। কত কথা বলত! আমার বাড়ীর কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করত, আমার কে কে আছে, তারা দেখতে কেমন, আমার গাঁয়ের লোকের কা'র ক'টী ছেলেপিলে। কে কি করে। এই সব। আর আশ্চর্য্য রোজই ঐ এক কথা। আমারও বেশ বলতে ভাল লাগত, সেও বেশ বসে' বসে' শুনত। যেদিন না আসত তার পরদিন বলত,—'কাল আসতে পারি নি সংসার কচ্ছিলুম।' নিজেই বলত—'লোকে যেমন চাকরি করে না দশটা পাঁচটা আমিও সন্ধ্যে থেকে ভোর পর্য্যন্ত চাকরি

করি। আর দুপুরে যেদিন জোয়ানদা আমার ঘরে আসে সেদিন সংসার করি' ব'লে নিজেই খুব হাসত। দুলু আপনার মনে যখন এই সব বকে যাচ্ছে দুলুর মাসীর মন তখন অন্য চিন্তায় ডুবে আছে। হঠাৎ এক সময় একটা নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললে—"দেখ, দুলু, তারা সকলেই বোধ হয় খারাপ নয়? তারা বোধ হয় তোর আমার মতনই এককালে ছিল। এই ধর, তুই যদি আর দিনকতক ঐ খানে থাকতিস। জোয়ান যদি সত্যিই হঠাৎ সুবোধ ছেলে না হ'ত তা হ'লে কি হ'ত, বল দিকি নি? তুইও একদিন হয় তো বিমলি, পাঁচির মত হয়ে যেতিস। পেটের সঙ্গে যোঝা বড় শক্ত রে। ঐ যে পারুলের কথা বললি, সে হয় তো তোরই মত একদিন কত কেঁদেছিল, কত লোকের হাতে পায়ে ধরেছিল, কত দিন হয় তো না খেয়ে খিল দিয়ে পড়েছিল, হয় তো কত রকম ভাবে চেষ্টা করেছিল, শুধু যে আত্মহত্যা করে নি, মানুষ কি তা চট্‌ ক'রে পারে, আত্মহত্যা করা বড্ড শক্ত যে। কিছুতেই কিছু হয় নি, শেষ নিরুপায় হ'য়ে পেটের জ্বালায় একটু একটু ক'রে ঐ বিমলি, পাঁচি, পারুল হয়ে গেছে। এই ধর না আমাকেই যদি সে নিয়ে চলে যেত, আর ঐরকমভাবে একদিন ফেলে—" তুলসীর হঠাৎ খেয়াল হ'ল—কি সর্ব্বনাশ, সে করছে কি, তার কি সব বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। চট্‌ করে' কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে—"থাক্ গে, যে যা হ'য়েছে হ'য়েছে, কে কি হ'ত না হ'ত না অত কথায় দরকার আমাদের? ওসব বাজে কথা চুলোয় যা'ক্, এখন ওঠ। বেলা প্রায় গড়িয়ে এল। এই বেলা ফাঁকায় ফাঁকায় কাপড়চোপড় কেচে আসগে যা, আবার বেলায় ঘাটে লোক আসবে, কে কি বলবে দরকার কি? ওঠ্! আমিও উঠি, আমার আবার অনেক কাজ বাকি আছে।" হঠাৎ বাইরে উঁকি মেরে ব'ললে,—"তোমার সে দাদাটী কোথায়? তিনি বোধ হয় তাড়ির সন্ধানে বেরিয়েছেন, তা' তুই যাই বলিস্ বাপু, আমার যেন কেমন কেমন মনে হয়। তবে নামটা সার্থক বটে, জোয়ান তো জোয়ান বাবা; ও কি? ও কি চেহারা! তা' তোর কাছে যা শুনেছি, ছেলেটাকে একরকম ভালই বলতে হ'বে বই কি? তুই ঠিকই বলেছিস্। কথাবার্ত্তা একটু ছেলেমানুষের মতই বটে। ও আছে তাই আমারও ভরসা হ'চ্ছে যে সিধুকা টুঁ শব্দ করবে না। যাই হ'ক এখন তুই ওঠ, গা ধোয়া সেরে আয়, আমিও চল্লুম আবার কাল আসব।" তুলসীমঞ্জরী খিড়কীর দরজাটা খুলে চলে গেল।

সিধু ভটচায্ অপমান সহ্য করে' চুপ করে' গেছে এমন অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারবে না। তাই সেদিনের ঘটনার পরদিন থেকেই সিধু ভটচায্ উঠে পড়ে লেগে গেল কি করে' গাঁয়ের আপদ্ ঐ অসতী মেয়েটাকে জব্দ করা যায়। সেদিন রবিবার। আগে হ'তেই সব ঠিকঠাক করা ছিল, আজকে বারোয়ারীর তলায় দুলুর বিচার। সিধু ভটচায্ ভোর ভোর স্নানাহ্নিক সেরে খড়মজোড়া পায়ে দিয়ে তুলসীমঞ্জরীর দাওয়ায় এসে ডাক দিলে—"কই তুলসী, কই গো?" তুলসী গলায় আঁচল দিয়ে দালানের কালীমূর্ত্তির তলায় মাথা রেখে প্রণাম কচ্ছিল। প্রণাম সেরে বললে—"এই যে কাকা, আসুন। হাঁ, সে কথা আমার খুব মনে আছে, আপনি এগিয়ে যান, আমি দুলুকে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার কথাও নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। বিচার মানা না মানা সম্বন্ধে আমি আগে থাকতে কিছুই বলতে পাচ্ছি না। শুধু আপনি অনেক করে বলছেন তাই—" সিধু ভটচায্ অল্প একটু হেসে বললে,—"হাঁ,হাঁ,খুব মনে আছে, তোর একগুঁয়েমী এখনও গেল না; আচ্ছা, আমি চল্লুম" বলে' এক পা বাড়িয়েই আবার বললে,—"দেখ্, সেই বেটাকে যেন নিয়ে যাস নি। এটা আমাদের গাঁয়ের ব্যাপার, বাইরের কোনও লোককেই আমরা থাকতে দেব না। সে কথা আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি, সে যদি তোদের সঙ্গে আসে, একটা ভীষণ কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে।" কুরুক্ষেত্রটা যে কি হ'বে তুলসীর বুঝতে একটুও বাকী রইল না। কুরুক্ষেত্র বাঁধলে শুধু যে গাঁয়ের লোকই মরবে তা তুলসীর ভাল রকমই জানা আছে। হেসে বললে—"কাকা, তা আমি বলতে পারি না, দুলুর সে লোকটা যাবে কি যাবে না সে আপনারা বুঝুন, আর তার উপস্থিত থাকাটা যদি আপনারা অপছন্দ করেন, সে তো আপনাদেরই হাতে, আপনারা তাকে বাধা দেবেন, তা আমি মেয়ে মানুষ আমি কি জানি।"

বলে মুখ টিপে হাসতে লাগল। সিধু ভটচায্ একবার চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে নিয়ে ব'ললে—"আচ্ছা সে দেখাই যাবে, আমি তা হ'লে চল্লুম।" ব'লে চলে গেল।

খড়মের খট্‌খট্ আওয়াজ যখন অস্পষ্ট হ'য়ে গেল, তুলসী একটা নিঃশ্বাস ফেলে আপন মনেই ব'ললে—"কি মেয়ে হ'য়েই জন্মেছিল দুলু! তাঁর মেয়ে হয়ে তোর আজ এই শাস্তি। ভাগ্যিস্ সে আজ বেঁচে নেই।" তারপর তাড়াতাড়ি ঘরের সব শেকল তুলে দিয়ে আর একবার কালীর ছবিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে' দুলুর ঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

তুলসীর অনেক সাধাসাধি জেদাজেদিতে দুলু কাঁদতে কাঁদতে কেবল একই কথা বলতে লাগল—"এর আর বিচার কি মাসিমা, আমি যাব না কিছুতেই যাব না। যদি বিচার কিছু থাকে, তো ভগবান দেবেন। না মাসীমা, তোমার দুটা পায়ে পড়ি মাসীমা, আমায় যেতে ব'ল না, আমি কারুর ঘরে যাব না, আমি কেবল আমার নিজের ঘরে থাকব। আমার শুধু যা বিয়ে হয় নি, অনেক মেয়েই তো স্বামীর ঘর কচ্ছে তাদের কই বিচার হচ্ছে মাসিমা? আমায় যেতে বল না—" বলে তুলসীর পায়ের ওপর মুখ রেখে পা দুটাকে চোখের জলে ভিজিয়ে দিতে লাগল। তুলসীমঞ্জরী মনে মনে ঠিক করেছিল—বিচার যা হয় হ'কগে তেমন না মানলেই চলবে, কিন্তু একবারও ভাবে নি যে দুলু ঠিক এরকমটা করবে, একদম যেতেই চাইবে না। তুলসী যখন হতভম্ব হ'য়ে ভাবছে উপস্থিত কি করা উচিত, সেই সময় সিধু ভটচায এদের বিলম্ব দেখে একে একে লোক পাঠাতে লাগল। কিন্তু কারুর সাহস হ'ল না ঘরে মুখ বাড়ায়। হয় তো সেদিনের সেই দানবটা আছে। বেলা বয়ে যায় দেখে সিধু ভটচায্ উপস্থিত সকলের সামনে তুলসী আর দুলুর নামে অজস্র গালি দিয়ে শেষে একতরফা রায় দিলে—"দুলুর এ গাঁয়ে থাকা চলবে না আর নক্ত জরিমানাস্বরূপ বারোয়ারীর খাতায় পঞ্চাশ টাকা দেবে। না দিলে সেও একঘরে হ'য়ে যাবে।"

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

বঙ্গভাষায় আদি উপন্যাস
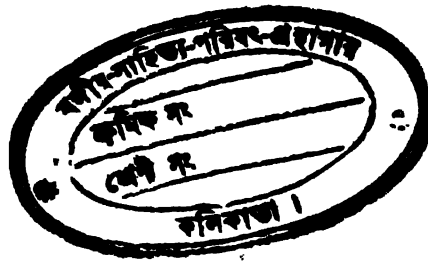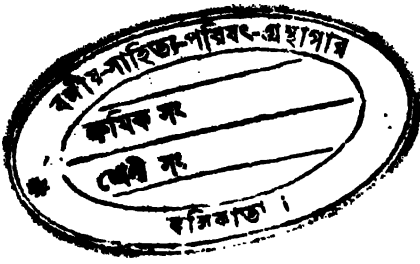
—শ্রীসুখেন্দ্রলাল মিত্র—

কল্পনাপ্রসূত সাহিত্য প্রধানতঃ তিন স্তরে অভিব্যক্ত; প্রথম-ক্রম রূপকথা, দ্বিতীয় অদ্ভুত আখ্যায়িকা (ইংরাজিতে যাহাকে romance কহে) এবং তৃতীয় উপন্যাস। রূপকথার যুগ এখন অতীত; বিশ্বের তাবৎ শিক্ষিত ব্যক্তি "সিংহ ও মূষিক; "বাঘ ও বক" কিংবা 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা" গল্পে পরিতৃপ্ত হন না। এই সমস্ত কথা আদিমযুগের মানব জাতিকে প্রহৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এজন্য কথা সরিৎ-সাগর, বৌদ্ধ-ধর্মের জাতক-কথা, বিষ্ণু শর্ম্মার পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি এবং ইউরোপীয় সাহিত্যে পি ঈসপ (Æsop), লাফনটেন (La Fontaine) প্রভৃতির চিত্তরঞ্জক গল্পগুলি একেবারে আর পুনরুদ্ধারের আশা নাই।

অদ্ভুত আখ্যায়িকার আয়ুও নিঃশেষিত। বৈতালপঞ্চবিংশতি কিংবা দশকুমার চরিত অথবা পাশ্চাত্য আরব্যোপন্যাস বা Don Quixote-বর্ণিত বিচিত্র আখ্যান পাঠে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে আনন্দ উপভোগ করিতেন, এক্ষণে আমরা সেরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, কেবল গল্প পাঠ করিবার খাতিরে এইগুলি পাঠ করি এবং পাঠকালীন অট্টহাস্য করি এই সমস্ত অপ্রথামূলক ও অসাধারণ—'আজগুবি' ও 'আষাঢ়ে' গল্পমাত্র কেবল চিত্তানন্দদায়ক, ইহাতে কোনও ন্যায্যকারিতা ও হিতজনকতা প্রদর্শন করে না। এই উভয় স্তরের সাহিত্য এক্ষণে বালকদের মনোরঞ্জক।

আধুনিক যুগ—বাস্তব ঘটনার যুগ। আধুনিক যুগে কৃত্রিম অপেক্ষা অকৃত্রিম, অসম্ভব অপেক্ষা সম্ভাবনাই বরণীয়। এই জন্য উপন্যাসের উৎপত্তি। উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রের কল্পনা উজ্জ্বল, অনুভূতি তীক্ষ্ণ, রসজ্ঞতা ভরপুর, এবং জীবন্ত-মানবের—আমাদের নিজেদের ন্যায় রক্তমাংস ও কাম-ক্রোধাদিযুক্ত মনুষ্যের চিত্র অঙ্কিত হয়। উপন্যাসের কলা-কৌশল চমৎকারিত্ব এবং বর্ণনাভঙ্গী হইতে চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি এবং উহার কল্পনার নানামুখী গতি প্রায় সমস্তই পাশ্চাত্য-শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য-আদর্শের মধ্য দিয়া পরিক্রান্ত হইয়া আসিতেছে, ইহা লক্ষ্যের বিষয়।

আমাদের বঙ্গভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম উপন্যাস। কোন কোন অনুসন্ধিৎসু সাহিত্যিক প্রমাণ-সহ দেখাইয়া দিলেও দিতে পারেন যে এই পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বে উপন্যাস লিখন-রীতি বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলন ছিল; কিন্তু উপন্যাসের তাবৎ কলাকৌশল এই পুস্তকেই বর্ত্তমান এবং এই পুস্তকই পাশ্চাত্য ঢং-এ প্রথম লিখিত। রসরাজ-অমৃতলাল বসু মহাশয় তাঁহার কোনও প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' আর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' এই দু' খানি সরস গদ্য-গ্রন্থ সেই সময় অনেক বাঙ্গালী অ-পাঠককে-ও পাঠক ক'রে ছেড়েছিল। টেকচাঁদ ঠাকুর হচ্ছেন প্যারীচাঁদ মিত্র আর হুতোম প্যাঁচা কালীপ্রসন্ন সিংহ। অধুনা বিস্তৃত বাঙ্গালার সহজ-সাহিত্য-রাজ্যের রোমুলাস্-রিমাস ছিলেন ঐ দুই মহাপুরুষ। আজ বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক হিউগো, টলষ্টয়, আনাতোল ফ্রান্স, ভল্টেয়র, অস্কার ওয়াইল্ড, মারি কারালি আর-ও কত কি হচ্ছেন, তা ছাড়া মোপাসাঁ ত ঘরে ঘরে। কিন্তু প্যারীচাঁদ মিত্র কি কালী-সিংহের নাম কোরে একবার মাথা নুইয়ে শ্রীদুর্গা ফাঁদতে তো কাকেও বড় দেখি না। কিন্তু এই দেশেই আজও পিতৃ-শ্রাদ্ধে বসতে হ'লে ব্যাসদেব ও অষ্টাদশ পুরাণকে আগে প্রণাম ক'রে, তবে ক্রিয়া আরম্ভ করতে হয়। যখন বাঙ্গালীর সংসারে ও সমাজে দেবতার প্রতি ভক্তির আধিপত্য ছিল, তখন গ্রন্থারম্ভে গণেশ-বন্দনা, সরস্বতী-বন্দনা, গুরুবন্দনাদি লিখিত হোত; আর এখন সেই বাঙ্গালীর সংসারে অর্থশক্তিরই একাধিপত্য, তাই ইন্‌স্‌পেক্টর-স্তোত্র লিখে স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের মঙ্গলাচারণ করিতে হয়। টেকচাঁদ ঠাকুর ও সিংহ মহাশয় সম্বন্ধে অন্যত্র একটা বিস্তৃত আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে, ফল কতদূর হয় বলতে পারি না।" বসুমতী বৈশাখ (১৩৩১)।

লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজি অনুকরণ-প্রিয় বাঙ্গালীর মতি-গতি পরিবর্ত্তন করাইতে হইলে এবং এই

হতভাগ্য জাতি—যাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই অশিক্ষিত—তাহাদিগকে শিক্ষানুরাগী করাইতে হইলে কেবলমাত্র উপদেশমূলক বক্তৃতা করিলে কিংবা প্রবন্ধ লিখিলে শুভ ফলিবে না; এই রুচির পরিবর্ত্তনের জন্য ইংরাজ-সমাজে প্রচলিত নভেলকে আদর্শ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় নভেল লিখিয়া স্বদেশীয় সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকের ক্ষুদ্র ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"যে স্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক কোন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে রত নহে সে স্থলে উক্ত প্রকার গ্রন্থের অধিক আবশ্যক, এতদ্বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তক-রচিত হইল।"

সেই যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে কোন আদর্শ ছিল না এবং নাটক ও বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশা করিতেন না। ইংরাজীনবিশ ইয়ংবেঙ্গল বাঙ্গালা ভাষাকে 'বর্ব্বরের ভাষা,' 'রাবিস' ইত্যাদি আখ্যায় ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে বাঙ্গালা ভাষা সুশিক্ষিতের চিন্তা প্রকাশের উপযোগী নহে। লেখকেরা সংস্কৃতানুসারিণী ভাষায় অলসভাবে লিখিলেই বাহবা পাইতেন এবং মন্দ লিখিলেও কোন নাটক বা সমালোচক নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করিতেন। কিন্তু সেই এক দিন আর আজ একদিন। ইদানীন্তন যুগে সুশিক্ষিতদের মধ্যে সকলেই বুঝিয়াছেন, জাতীয় ভাষার সম্যক অনুশীলন ও উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে না, কোনও জাতি একটী গণনীয় জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এক্ষণে অধিকাংশ কৃতবিদ্য ব্যক্তির বাঙ্গালা ভাষার প্রতি কেবলমাত্র আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে এমন নহে, বাঙ্গালা ভাষার সুলেখক হওয়াও তাঁহারা গৌরবের বিষয় মনে করেন।

'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথমে 'মাসিক পত্রিকা' নামক সাময়িক পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল; তৎপরে ১২৬৪ সালে পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'মাসিক পত্রিকা' মিত্র মহাশয়ের বঙ্গভাষা সেবার প্রথম উদ্যম নহে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েক বৎসর যাবৎ খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামক পুস্তক খণ্ডশঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে পুস্তকের পঞ্চম ভাগ 'জীবনবৃত্তান্ত' আখ্যায় প্রকাশিত হয়। উহাতে যুধিষ্ঠির, প্লেতো, বিক্রমাদিত্য ককেচে, আলফ্রেড এবং সুলতান মহামুদের চরিত্র বর্ণনা ছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক যে, লঙ্ সাহেবের মতে প্রথম তিনটী প্যারীচাঁদের লেখনী-প্রসূত। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে একেশ্বরবাদীতা অনুশীলন করিবার জন্য প্যারীচাঁদ ও তদনুজ কিশোরীচাঁদ নিজ বসত বাটীতে Hindu Theophilanthropic Society নামে একটী সভা ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে স্থাপনা করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ২১এ জানুয়ারি তারিখের বেঙ্গল হরকরা সংবাদপত্র পাঠে আমরা অবগত হই যে, সভার অধিবেশনে মিত্র মহাশয়দের বাটীতে অপরাপর শ্রোতাদের মধ্যে লঙ্ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং লঙ্ সাহেবের সহিত ইঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তিনি যে যুধিষ্ঠির, প্লেটো ও বিক্রমাদিত্য প্রবন্ধত্রয়-রচয়িতা প্যারীচাঁদের নাম নির্ণয় করিয়া ছিলেন তাহা অমূলক নহে।

এতৎব্যতীত ভারতবর্ষীয় কৃষি-সভা হইতে 'ভারতবর্ষীয় কৃষি-বিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ পুস্তিকা ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দুই খণ্ড,১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে দুই খণ্ড, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এক খণ্ড এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে একখণ্ড সর্ব্বসমেত ছয় খণ্ড প্রকাশ হইয়াছিল। সভার ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী পাঠে আমরা অবগত হই যে পুস্তিকাগুলি তাবৎ প্যারীচাঁদের লেখনীপ্রসূত।

১২৯৯ সালে প্যারীচাঁদ মিত্রের বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থাবলীতে বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা ভাষার এই প্রথম নভেল ও তাহার রচনা-প্রণালী ও ভাষা সমালোচনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি 'কলিকাতা রিভিউ'র ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যায় ইংরাজিতে এবং বঙ্গদর্শনের ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু ব্যতীত আরও অপরাপর বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবী এই পুস্তকের সমালোচনা করিয়া প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান বঙ্গসাহিত্যে কিরূপ উচ্চে অবস্থিত তাহা নির্ণয় করিয়াছেন।

যখন "মাসিক পত্রিকা" এবং "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হইয়াছিল তখন সমাজে কিরূপ আদৃত হইয়াছিল তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা "বিবিধার্থ সংগ্রহের" ১৭৭৬ শকাব্দার কার্ত্তিক সংখ্যা (তৃতীয় বর্ষ—৩২ খণ্ড) হইতে "মাসিক পত্রিকার" এবং ১৭৮০ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা (পঞ্চম ভাগ—৫ খণ্ড) হইতে "আলালের ঘরের দুলালের" সমালোচনা উদ্ধৃত করিলাম।

মাসিক পত্রিকা

এতদ্দেশীয় শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিদ্বয় হিন্দু বণিতাদিগের উপদেশার্থে উক্তাখ্যায় একখানি ক্ষুদ্র পত্র প্রকাশে বৃত হইয়াছেন। সঙ্কল্প উত্তম এবং ভরসা করি সফল হইবেক। পত্রের লিপি-প্রণালীর আদর্শ স্বরূপ নিম্নে কতিপয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল।

কলিকাতার যেখানে যাওয়া যায়, সেইখানেই মদ খাবার ঘটা। কি নারী কি বড়মানুষ, কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে। কথিত আছে, কোন ভদ্রলোক এক গ্রামে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তথায় দেখিলেন, লোকে ক্রমাগত গাঁজা সাজচে ও খাইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গ্রামে কত লোক গাঁজা খায়?" গাঁজাখোরের মধ্যে একজন উত্তর করিল, "আমরা সকলেই গাঁজা খাইয়া থাকি, গ্রামে শালগ্রাম ঠাকুর ও আমাদিগের টেঁপী পিসী—যাহার বয়স ১৫ বৎসর, কেবল তাঁহারাই থাকিত আছেন।" কলিকাতা এক্ষণে তদ্রূপ ;

মদ্যপানে কি শরীর ভাল থাকে? কোন কোন মদ্য পরিমিতরূপে পান করিলে উপকার হয় বটে, ডাক্তারেও এইরূপ বিধান দেন ; কিন্তু নিরন্তর পেয়ালাবাজিতে শরীর নষ্ট হয়। কত কত লোক মদ্য পান করিয়া অধঃপাতে গিয়াছেন। তাঁহারা বিয়ার কি সেরি কি পোর্ট কি ক্লারেট অথবা অন্য কোন নরম গোছের মদ্য স্পর্শ করেন না, কেবল ব্রাণ্ডী জল না মিশাইয়া বোতল বোতল পান করেন—তাহাতে প্লীহা, পক্ষাঘাত ও অন্যান্য রোগে যে শীঘ্র আক্রান্ত হবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য নহে। মদ্যপানে যে কেবল শরীর নষ্ট হয়, এমত নহে, শরীরের সঙ্গে বুদ্ধি ও ধনও যায়। জ্ঞান শূন্য হইয়া ভো অথবা টুপভুজঙ্গ হইয়া বসিলে কি ফল? জ্ঞানকে একেবারে ডুবাইয়া আমোদ করিলে সে আমোদে আমোদ হইতে পারে না, মনকে নির্ম্মল রাখিলে ও সৎকর্ম্ম করিলেই প্রকৃত আমোদ হয়। মদের জোরে লম্ফ-ঝম্প হইতে পারে বটে কিন্তু সে কতক্ষণ থাকে? অনেক ব্যক্তি মদে আসক্ত হইয়া বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়াছে—তাহাদিগের মান সম্ভ্রমও অন্তর্ধান হইয়াছে।

মদের অদ্ভুত শক্তি। যে ব্যক্তি পান করে, সে দুধকে জল বলে, ও জলকে দুধ বলে। কলিকাতার কোন বুনিয়াদি মাতালের বাটীতে তাঁহার চাকর প্রস্রাব করিতেছিল, মাতাল বাবুর মস্তকে পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার মাথায় কি পড়িল?" পরে [illegible]লেন প্রস্রাব। তখন উত্তর করিলেন—"তবে ভাল, আমি বোধ করিয়াছিলাম জল।"

কথিত আছে, অন্য এক বুনিয়াদি মাতালবাবু মদে মত্ত হইয়া দশমীর দিবস প্রতিমা বিসর্জ্জনকালীন নৌকা হইতে রোদন করিয়া বলিলেন,—'অরে! মা চলিলেন যে মার সঙ্গে কেহ কি যাবে না? আমরা সকলে ব্যস্ত, অরে বেটা চৌকী, তুই যা', এই বলিয়া চৌকীকে ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন।

অপর শুনা আছে, কোন মাতাল ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে জলের ঘটী ছিল না, একটা বিড়াল বসিয়াছিল। মাতাল জলের ঘটা মনে করিয়া বিড়ালকে ধরিলেন। বিড়াল মেও মেও করিতে আরম্ভ করিল। মাতাল বলিলেন—শ্যালা জলের ঘটী! তুই মেও মেও করিয়া কি বাঁচ্‌বি? তোকে অগ্রে খাবই। পরে বিড়ালকে মুখের কাছে তুলিলে বিড়াল আঁচড় কামড় করিয়া পলায়ন করিল।

আর এক ভক্ত মাতালের কথা শুনা আছে, তাহাও বলা যাইতেছে। সেই মাতালের নাম—সিংহ। আপন বাটীতে পূজা হইবে, ষষ্ঠীর রাত্রে উঠিয়া প্রতিমার নিকট যাইয়া কোপেতে পরিপূর্ণ হইলেন ; সিংহকে বলিলেন, 'আরে বেটার সিংহ, তুই নকল সিংহ, আমি আসল সিংহ, তুই বেটা মার পদতলে কেন? এই বলিয়া সিংহকে ভাঙ্গিয়া আপনি চাদর মুড়ি দিয়া সিংহ হইলেন। প্রাতঃকালে পুরোহিত আসিয়া দেখিলেন বাটীর কর্ত্তা সিংহ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আস্তে-ব্যস্তে বলিলেন "মহাশয় ওখানে কেন—মহাশয় ওখানে কেন?" কর্ত্তার নেশা ছুটিয়াছিল, সে স্থান হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া অধোমুখে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। গুরু পুরোহিত সকলে বলিতে লাগিলেন, "কর্ত্তা বড় ভক্ত, না হবে কেন, সিদ্ধ বংশ।" অন্বেষণ করিলে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়।

যদ্যপি মদ্য পানে এতাদৃশ দোষ তবে কি সুশিক্ষিত বাবুদিগের ইহাতে আসক্ত হওয়া উচিত? *

১৭৭৬ শকাব্দা। কার্ত্তিক সংখ্যা।

"আলালের ঘরের দুলাল"

(ক) একমাস অবধি শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর মহাশয়ের অপূর্ব্ব উপন্যাসের আলোচনা করিতে আমাদিগের বিশেষ মানস ছিল, কিন্তু নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত সে অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে

* ১২৬১ সালের কার্ত্তিক মাসের মদ্যপানে কত দুখ "প্রবন্ধ"

পারি নাই। এত খণ্ডে উপযুক্ত সমালোচনের স্থানাভাব, পরন্তু ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থ আর পাঠকদিগের অগোচর রাখা কর্ত্তব্য নহে; অধিকন্তু তাঁহার আখ্যায়িকাও এতাদৃশ রহস্য যে তাহার নামোল্লেখেই পাঠকদিগের প্রীতি জন্মিবে অতএব এস্থলে তাহার বিজ্ঞাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। উক্ত ঠাকুর মতিলাল নাম্না এক দুশ্চরিত্র বালকের উপলক্ষে কলিকাতার অনেক প্রকার লোকের চরিত্র সুচারুরূপে বর্ণিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ অল্পকালে বালকদিগের শাসন ও শিক্ষা কর্ম্মে মনোযোগ না করিলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে তাহা অতি পরিপাটীরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। বর্ণনা-শক্তির এক প্রধান প্রশংসা এই যে তাহার বর্ণিত বস্তুর প্রতিমা চিত্রপাটের ন্যায় মনোমধ্যে বিকসিত হয়। টেকচাঁদ ঠাকুরের ঐ শক্তির অভাব নাই; প্রত্যুত তাহাতে তিনি বিশেষ সম্পন্ন; তাঁহা কৃত বেচারামবাবু, বক্রেশ্বরবাবু, বরদাবাবু, মতিলাল, বটলর সাহেব, ঠকচাচা প্রভৃতি ব্যক্তির প্রতিমা অবিকল চিত্রিত হইয়াছে—কুত্রাপি ত্রুটির লেশ ও মনে হয় না। বক্রেশ্বরবাবুর 'ছেলে নয়ত পরেশ পাতর' এবং বেচারাম বাবুর 'একি ছেলের হাতের পিটে' এতাদৃশ অবিকল হইয়াছে যে আমাদিগের পরিচিত অনেক শিক্ষক ও উকিলের মুচ্ছুদির অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে এই প্রকার মনে ভ্রম হইতেছে। কলিকাতায় মতিলালের অভাব নাই। বোধ হয় পাঠকবৃন্দের যে কেহ ইচ্ছা করিবেন তিনিই আপন পল্লীর মধ্যেই দুই একটি মতিলাল পাইবেন। আমাদিগের পরিচিত দুই তিনটি যুবাকে মতি-লাল বলিয়া ভ্রম হইতেছে। গ্রন্থকারের লিপি-প্রণালী বিষয়ে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন, এবং বোধ হয় গ্রন্থকার নিজোক্তিরূপে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কিঞ্চিৎ পরিমার্জ্জিত করিলে প্রশংসনীয় হইত; পরন্তু তাঁহার কল্পিত নায়কেরা যে যাহা কহিয়াছে তাহা অবিকল ও সর্ব্বতোভাবে সুন্দর হইয়াছে। কি ইতর লোকের অশ্লীল শ্লেষোক্তি কি পণ্ডিতের অসাবধান সময়ের সামান্য কথা কিছুরই কোন অংশে অন্যথা হয় নাই। কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ক্রিয়া ও ইংরাজী পারসী মিশ্রিত প্রচলিত কথা পল্লীগ্রামে অনায়াসে বোধগম্য হইবে না; পরন্তু ঐ গ্রন্থ কলিকাতার ভাষায় কলিকাতাবাসিদিগের রোধে লেখা হইয়াছে; সুতরাং পল্লীগ্রামে ইহা বোধগম্য না হইলে ক্ষতি নাই।

১৭৮০ শকাব্দা। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

১২৬৫ সালের ১০ই বৈশাখ তারিখের "সংবাদ প্রভাকরে" নিম্নলিখিত প্যারা প্রকাশিত হইয়াছিল ;—

"আলালের ঘরের দুলাল নামক একখানি চিত্তসন্তোষকর নূতন পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার সমুদয়াংশ এ পর্য্যন্ত পাঠ করা হয় নাই এ জন্য অদ্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করণে অক্ষম হইলাম।"

দুঃখের বিষয় আমরা প্রভাকরের পরবর্ত্তী সংখ্যার সন্ধান পাই নাই। প্রভাকর ব্যতীত এই সময়ে নিম্নলিখিত সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হইত :—

(১) অদ্বৈতচরণ আঢ্য-সম্পাদিত 'সংবাদ'
(২) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সুধীরঞ্জন'
(৩) গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত 'সংবাদভাস্কর'
(৪) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা।'
(৫) স্মিথ সাহেব-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট।'
(৬) দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ" (অগ্রহায়ণ হইতে প্রকাশিত)

দুঃখের বিষয় আমরা ইহার কোনখানি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে প্রথমোক্ত সংবাদ-পূর্ণ-চন্দ্রোদয় পত্রিকায় যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মর্ম্মানুবাদ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠক এই ইংরাজি লেখার অনুবাদ পাঠে মৌলিক রচনার রসাস্বাদন করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা অনুবাদ করিতে বিরত হইলাম।

চা

গত মাঘ মাসের 'পঞ্চপুষ্পে' (১৩৩৭) শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় চা সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত অথচ উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা আর-একটুকু বিশদভাবে আলোচনা করিলে প্রবন্ধটী আরও কিছু গৌরবান্বিত হইত বলিয়াই বোধ হয়। চা'এর আবাদপ্রণালী তথা উৎপত্তিকথা ভিন্ন মোটামুটিভাবে তিনি সবদিক্ দিয়াই চা'এর বিচার করিয়াছেন। অবশ্য আমার এ আলোচনা প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তাহা নহে, তবে চা সম্বন্ধে আমি যতদূর অবগত আছি তাহা নিঃশেষে বলিবার পরও বিশ্বেশ্বর বাবুর নিকট হইতে এতৎপ্রসঙ্গে আরও নূতন কথা শুনিবার প্রত্যাশায় রহিলাম।

ইতিহাস

চা'এর ইতিহাস ও আবিষ্কার বিষয়ক ব্যাপারটী একটা দুরূহ রহস্যে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তথাপি ইতস্তত: স্পষ্ট-অস্পষ্ট একটু-আধটু অসংলগ্ন উল্লেখ যাহা চোখে পড়ে তাহা হইতে অন্তত: এটুকু অনুমান করা মোটেই কষ্টকর নহে যে চা'এর জন্মভূমি প্রধানত: চীন এবং সেখানে তাহার প্রচলনও অতি প্রাচীন কাল হইতে।

অনুমান ৩৫০ খৃ: অব্দে চীনদেশে চা ভেষজরূপে ব্যবহৃত হইত। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে Kieulung চা-গাছের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার প্রস্তুতপ্রণালীও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাই চা'এর প্রাচীনতম উল্লেখ নহে। চীনের বিশ্ব-বিশ্রুত ঋষি Confucius (৫৫০—৪৭৮ খৃ: পূ:) তাঁহার শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছেন,—"Be good and courteous to all, even to the stranger from other lands. If he say unto thee that he thirsteth give unto him a cup of warm tea without money or without price." Confucius-এর বহুপূর্ব্বে চীনসম্রাট্ Chin-Nung নাকি বলিয়াছেন,—"Tea is better than wine, for it leadeth not to intoxication, neither does it cause a man to say foolish things and repent thereof in his sober moments. It is better than water, for it doth not carry disease, neither doth it act as a poison, as doth water when the wells contain foul and rotten matter."

কিন্তু ইতিহাসের প্রধান সূত্র হইতেছে কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি। চীনদেশে চা আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রথম প্রবাদ এই যে, একদা কতিপয় বৌদ্ধভিক্ষু তাঁহাদের বিহারসমীপবর্ত্তী পানীয় জল লবণাক্ত বলিয়া ঐস্থানে জাত একটী গুল্মের কতকগুলি পাতা জলে ফুটাইয়া রাখেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য ইহাতে যদি জলের অরুচিকর গুণাবলীর কিছু সংশোধন সাধিত হয়। যথাকালে পরীক্ষার সাফল্য লোকমুখে প্রচারিত হইল; ফলে চা'এর চাষ ও প্রচলন বাড়িয়া চলিল। খৃ: পূ: ২৭৩৭ অব্দে প্রাগুক্ত Chin-Nung (চীনের ভেষজ ও কৃষি বিজ্ঞানে ইনি নাকি সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন !) একদিন তাঁহার সান্ধ্যভোজন রন্ধনের উদ্দেশ্যে বড় লতাগুল্ম জ্বালাইয়া জল ফুটাইতেছিলেন, এমন সময় অগ্নি ক্রমশ: নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি কতকগুলি লতাপাতা কুড়াইয়া আনিয়া অগ্নির তেজোবর্দ্ধন করেন। দৈবাৎ ঐসঙ্গে কতকগুলি পাতা পাত্রের মধ্যে পড়িয়া জলের সহিত সিদ্ধ হইয়া যায়। পরে উহা আস্বাদন করিয়া তিনি বেশ উত্তেজিত ও প্রফুল্লচিত্ত হ'ন। তদবধি তিনি নিজে তো ইহা ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইলেনই, তাহা ছাড়া দেশব্যাপী ইহার আদর-আপ্যায়ন বড় কম হইল না।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ধর্ম্মগুরু বোধিধর্ম্মের আবিষ্কার বিষয়ক কাহিনীটাও অপূর্ব্ব। চীনে ও জাপানে এই মহাপুরুষটীর সুখ্যাতি অনেক। চীনা ও জাপানীদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ের ইহা একটী ধ্রুব লক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সাধু মহাত্মাটী কে? তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিবার প্রবৃত্তি হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। জার্ম্মাণ ভিষক্ Kaempfer (১৬৫১—১৭১৬) তাঁহার Amœnitates Exoticæ গ্রন্থে এই ধর্ম্মগুরুর একটী সচিত্র জীবনবৃত্ত দিয়াছেন। চিত্রটিতে দেখা যায় ধর্ম্মের পদতলে একটী reed রহিয়াছে; তিনি যে নদসিন্ধু অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন ইহা তাহারই নিদর্শন। বোধিধর্ম্ম কোশযুখ নামধেয় জনৈক ভারতবর্ষীয় নৃপতির তৃতীয় পুত্র। আনুমানিক ৫১০—৫৩ খৃ: অব্দে তিনি চীনদেশে পদার্পণ করেন।

খৃষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগে চীনদেশে যে চা'এর প্রচলন ছিল তাহার উল্লেখ ক'একখানি আরবীয় গ্রন্থে পাওয়া যায় (Reinaud, Relation des Voyages, 1845, p. 40)। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বেই যে চা'এর প্রতি চীনাদের আসক্তি অতি প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ কিয়াং-যু নামক একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থে নিহিত আছে। এই গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে সম্রাট্ Te-Tsing ইহার উপর একটা শুল্ক বসাইয়া দেন (৭৮২ খৃ:)। এ শুল্কের কবল হইতে চীনবাসীরা অদ্যাবধি অব্যাহতি পায় নাই।

চা'এর সহিত আরববাসীদের পরিচয় হয় অনুমান ৮৫০ খৃ: অব্দে; ভেনীসিয়ানদের ১৫৫৯ খৃ: অব্দে; পর্ত্তুগীজদের ১৬০০ খৃ: অব্দে। ইংরেজেরা ইহার পরিচয় পায় অনুমান ১৬১৫ খৃ: অব্দে, যদিও ১৬৫০ খৃ: অব্দের পূর্ব্বে বিলাতে ইহার সাধারণভাবে প্রচলন হইতে দেখা যায় নাই। রাশিয়া ইহার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিল ১৬১৮ খৃ: অব্দে, প্যারী ১৬৭৮ খৃ: অব্দে ও আমেরিকা প্রায় ১৭৫০ খৃ: অব্দে।

চীন হইতে চা'এর প্রচলন হয় জাপানে। তাহা বিশ্বেশ্বর বাবুর প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা কখন—কোন্ সময়ে হয় বিশ্বেশ্বর বাবু তাহার কোনও ইঙ্গিতও দেন নাই। তিনি শুধু এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন যে, "মধ্যে একটী সমুদ্র মাত্র, পার হইতে বিশেষ আয়াস পাইতে হয় নাই।" যাহাহউক, জাপানে যে চা'এর আবাদ

হয় নবম শতকে তাহা ঐতিহাসিক পুথিপত্র হইতে জানিতে পারা যায়।

ইংলণ্ডে চা

ইংরেজ পুরুষের লেখনীমুখে চা'এর সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর জনৈক এজেন্ট মিঃ Wickham সাহেবের পত্রে। এই পত্র তিনি জাপানের ফিরাণ্ডো নামক স্থান হইতে চীনের মাকাও-প্রবাসী কোম্পানীর আর-একজন কর্ম্মচারী মিঃ Eatonকে ২৭এ জুন (১৬১৫) তারিখে লেখেন। ইহাতে উৎকৃষ্ট একটিন চা'এর ফরমাস ছিল। ইউরোপে চা প্রচলনকল্পে প্রথম উদ্যোগী হইয়াছিলেন লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক, নাম Cornelius Bottrekoe। ইনি ১৬৪৯ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত তাঁহার রচিত Tea, Coffee and Chocolate প্রবন্ধপুস্তকে ওজস্বী ভাষায় চা'এর নির্দ্দোষ গুণকীর্ত্তন করেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও হলাণ্ড হইতে কিছু কিছু চা বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল (১৬৪০)। ১৬৫৭ সালে লণ্ডনের এক্সচেঞ্জ এলীতে রীতিমত একটা চা'এর দোকান খোলা হয় এবং এই সময় হইতেই চা-পান একটা প্রথা হইয়া উঠে। বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত Mercurius Politicus নামে একখানি পুথি আছে। ইহার জন্মকাল—সেপ্টেম্বর ১৬৫৮। ইহাতে চা'এর উল্লেখ পাওয়া যায়। * Pepys ২৮এ সেপ্টেম্বর (১৬৬০) তারিখে তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন:—"I did send for a cup of tea (a China drink) of which I had never drunk before" ইত্যাদি। ১৬৬০ খৃ অব্দের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কোনও বিধি-বিধানে চা'এর উল্লেখ নাই। ঐ বৎসরই পার্ল্যামেন্ট-এর একটী বিধিতে গ্যালন-প্রতি আট পেনী করিয়া কর নির্দ্ধারিত হইতে দেখা যায় (Acts 12 Charles II, c. 23 & 24)। পরে পাতা চা'এর উপর পাউণ্ড-প্রতি পাঁচ শিলিং হারে কর আদায় করা হয় (১৬৮৮)। তদবধি চা'এর উপর শুল্ক স্থাপন রাজকীয় অধিকারে পরিণত হইয়াছে। তবে সময়ে সময়ে ইহার শুল্কহারের যে তারতম্য সাধিত হইয়াছে তজ্জন্য অবশ্য পার্ল্যামেন্টই দায়ী। প্রথমাবস্থায় বিলাতে এক পাউণ্ড চা'এর দর ছিল ছয় পাউণ্ড হইতে দশ পাউণ্ডের মধ্যে, ইহা বিশ্বেশ্বর বাবু উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ১৬৬১ বা ১৬৬২ খৃঃ অব্দে গুণানুসারে ইহার ১৬ শিলিং হইতে ৬০ শিলিং মূল্য নির্দ্ধারিত হয়।

১৬৬৮ খৃঃ অব্দ হইতেই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী সোজাসুজিভাবে ইংলণ্ডে চা আমদানী করেন। এই আমদানী সম্পর্কে বিশ্বেশ্বর বাবু এইমাত্র বলিয়াছেন যে—"১৬৭৮ খৃঃ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিলাতে ৪,৭১৩ পাউণ্ড চা আমদানী করেন।" কিন্তু সবচেয়ে বেশী আমদানী হয় ১৬৯৫ খৃঃ অব্দে এবং ঐ বৎসর হইতেই চা'এর আমদানী উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সপ্তদশ শতকের শেষে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে বার্ষিক আমদানী গড়ে ২০,০০০ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। ১৭০৩ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড ৮৫,০০০ পাউণ্ড সবুজ ও ২৫,০০০ পাউণ্ড কাল চা পাউণ্ড-প্রতি ১৬ হইতে ২০ শিলিং দরে পাঠাইবার জন্য চীনে হুকুমজারি করে। Milburn-এর Oriental Commerce গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে ১৭১১ খৃঃ অব্দে চা'এর ব্যবহার হয় ১৪ কোটী ২০ লক্ষেরও উপর। কিন্তু ১৮৮৬ সালের দিকে ইহা চরমে উঠে, তখন চীন হইতে ইহার আমদানীর হার প্রায় ৩০ কোটী পাউণ্ডে দাঁড়ায়। বিদেশী পণ্যের এতটা ব্যয় বাণিজ্যের ইতিহাসে অদ্যবধি একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার।

১৮৩৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, প্রায় দেড় শতাব্দীর উপর, বিলাতে চা সরবরাহ করা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল। এই সময় কোম্পানীর তত্ত্বাবধানের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে দর চড়িয়া যাওয়ায় চা আমদানীর এই পদ্ধতিটীর উচ্ছেদ হয়, কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয় এবং চা'এর ব্যবসায় করিতে সকলকেই অধিকার দেওয়া হয়। ফলে সেন্ট-হেলেনা, ব্রেজিল, করোলিনা, রাও জেনিরো, এমন-কি প্যারী ও কর্সিকাতেও চা'এর চাষ হইতে থাকে।

আমেরিকায় চা

খুব সম্ভব বিলাত হইতেই আমেরিকায় চা'এর প্রচলন হয়। ১৭১১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় চা'এর রপ্তানী আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই নাকি ক'একজন ওলন্দাজ smugglers তথায় ইহার পরিচয়সাধন করে। আমেরিকার প্রথম জাহাজ চীন যাত্রা করে ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে। আরও দুইখানি জাহাজ পরবর্ত্তী বর্ষে যাত্রা করিয়া ৮৮০,০০০ পাউণ্ড চা লইয়া ফিরিয়া আসে। ১৭৮৬-৭ খৃঃ অব্দে আরও পাঁচখানি জাহাজ যুক্তরাষ্ট্রে দশ লক্ষ পাউণ্ডের উপর পরিমাণ চা বহন করিয়া আনে। ১৮৪২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ক্যাণ্টন বন্দরেই চা'এর বাণিজ্য চলিত, কিন্তু ঐ সময়ে নানকিনের সন্ধির সর্ত্তানুসারে শাংহাই, আময়, ও ফু-চু বন্দরগুলি খোলা হয়। এই শেষোক্ত বন্দরগুলি হইতেই প্রধানতঃ চীনের চা'এর বাণিজ্যকার্য্য চলিত। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে চীনদেশীয় সমুদ্রগুলিতে জলদস্যুর অত্যধিক প্রাদুর্ভাব হওয়ায় চা'এর বাণিজ্যপোতগুলি সশস্ত্র সৈন্য না লইয়া বহির্গত হইত না।

আমেরিকাকে যে চিরকালই চা'এর জন্য পরের উপর সম্পূর্ণ ভারগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। যাটী

* Giovanni Batista Ramusio (১৫৫৯), L. Abneida (১৫৭৬), Maffeno (১৫৮৮) ও Tareina (১৬১০) প্রমুখ পর্য্যটকগণ চা'এর উল্লেখ করিয়াছেন (Paul Kransel, Dissertations, Berlin, 1902)।

জল ও আবহাওয়ার দিক্ দিয়া দেখিলেও চা-আবাদের উপযুক্ত ভূমি আমেরিকায় অপ্রচুর হইলেও একান্ত দুর্লভ নহে। সামারভিলির সমীপস্থ প্রদেশে চা-চাষের সূত্রপাতকল্পে দক্ষিণ করোলিনার ডাঃ শেপার্ড বহুকাল যাবৎ সচেষ্ট ছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগ সময়ে সময়ে ইহাতে যোগদানও করিয়াছিলেন। ইহা অনেক দিনের কথা। সামারভিলিতে এক্ষণে অনেকগুলি চা-বাগান অবস্থিত আছে এবং তত্রত্য উৎপন্ন চা'এর সুখ্যাতিও অনেক।

অনেকে হয়তো জানেন না, দারুণ গ্রীষ্মে আমেরিকার লোকেরা চা'এর সহিত বরফ মিশাইয়া সরবতের মত পান করিয়া থাকে।

ভারতে চা

চা'এর জন্মভূমি চীনদেশ হইলেও, ভারতের কোন কোন স্থানে ইহার আদৌ অসদ্ভাব ছিল না। কুচবিহার ও রংপুরে ইহা যে বন্যভাবে জন্মাইত তাহা আসামের প্রথম কমিশনার ডেভিড স্কট্ ১৮২০ খৃঃ অব্দে আবিষ্কার করিয়াছেন এবং বিশ্বেশ্বর বাবুও সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন। আসল চা-গাছের উৎপত্তিস্থল যে আসামের উচ্চপ্রদেশ তাহা মিঃ রবার্ট ব্রুস ১৮২৩ খৃঃ অব্দে ও ক্যাপ্টেন ফ্রাঁসিস জেন্কিন্স্ ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বেশ্বর বাবুর প্রবন্ধে এ কথার একটা ক্ষীণ ইঙ্গিত আছে মাত্র।

এখন ভারতের আফগানসীমা হইতে ব্রহ্মসীমান্ত পর্য্যন্ত চা জন্মিয়া থাকে। হিমালয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪,৬৬৭ হাত উপরে কোন কোন স্থানে, হিমালয়ের পাদদেশে ১,৩৩৭ হাত উপরে, ব্রহ্মপুত্রের তীরে, আসাম, ঢাকা, কুচবিহার, চট্টগ্রাম, ছোটনাগপুর, দার্জ্জিলিঙ্, তরাই, কাঙ্গড়া, গড়বাল, কুমায়ুন, কাছাড়, শ্রীহট্ট, দেরাদুন, হাজারিবাগ ও নীলগিরিতে যথেষ্ট চা জন্মে।

ভারতবর্ষের চা-প্রদেশগুলির আয়তন অনুসারে ইহাদের ক্রমপর্য্যায় এইরূপ :—আসাম, দেরাদুন, কুমায়ুন, দার্জ্জিলিঙ্, কাছাড়, কাঙ্গড়া, হাজারিবাগ, চট্টগ্রাম, বর্ম্মা, নীলগিরি ও ত্রিবাঙ্কুর।

ভারতে ১৯২৭ খৃঃ অব্দে কতগুলি চা'এর বাগান ছিল এবং তাহাদের পরিমাণই বা কত, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে জানা যাইবে :—

প্রদেশ	চা-বাগানের সংখ্যা	চা-উৎপাদক জমির পরিমাণ (একর)	গড়ে কত একরে চা'এর চাষ হইয়াছে
আসাম...	৯৫৬	৪২৩, ৭৭১	৪৪৩
বাঙ্গলা...	৩৭৫	১৯৬, ৭০৫	৫২৪
বিহার ও উড়িষ্যা	১৮	২,১৪৩	১১৯
যুক্তপ্রদেশ...	৩৭	৯,৭১৫	১৬১
পঞ্জাব...	২,৫০০	৫ ,৯৭১	৪
মান্দ্রাজ...	২৯০	৫৬, ৮৭১	১৯৬
কুর্গ...	১	৪১৬	৪১৫
ত্রিবাঙ্কুর...	১১২	৫৭, ৩৩৮	৫১২
সারা ভারত	৪,২৮৯	৭৫২, ৯৬০	২,৩৭৫

১৯২৮ সালে মোট ৭৭৩,০০০ একরে চা উৎপাদন করা হইয়াছে—পূর্ব্ববৎসর হইতে প্রায় দুই পার্সেন্ট বেশী। চা-উৎপাদক জমির শতকরা ৫৯ভাগ আছে আসামে (ব্রহ্মপুত্র ও সুর্ম্মা উপত্যকা) এবং উত্তরবঙ্গের ঘনসন্নদ্ধ দুই প্রদেশে (দার্জ্জিলিঙ্ ও জলপাইগুড়ি)। শতকরা যোলভাগ আছে দক্ষিণভারতে মালাবার-উপকূলস্থ উন্নতপ্রদেশে (ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য এবং বৃটিশাধিকৃত মালাবার, নীলগিরি ও কৈম্বাটোর সমেত)। বর্ত্তমান শতাব্দীতে দক্ষিণভারত চা'এর একটী প্রধান উৎপত্তিস্থল; কালে হয়তো ইহাই অন্যতম হইয়া দাঁড়াইবে। সম্প্রতি বর্ম্মার কারীন পর্ব্বতে চা'এর আবাদ হইতেছে, ইতিমধ্যেই লণ্ডনের বাজারে ইহার সুখ্যাতি ঘোষিত হইয়াছে, গুণের দিক্ দিয়া ইহা নাকি দার্জ্জিলিঙ চা'এর সমকক্ষ। ১৯২৮ সালে মোট ৪,৬২৩ বাগানে চা'এর আবাদ হইয়াছে, ১৯২৭ সালে ৪,২৮৯ এবং ১৯২৬ সালে ৪,০৪৮। ১৯২৮ সালে উৎপন্ন কাল ও সবুজ চা'এর মোট পরিমাণ ৪০৩,৭৫৫,০০০ পাউণ্ড (ইহার মধ্যে কাল চা'এর পরিমাণ ৩৯৯,৮৫৯,০০০ পাউণ্ড)। প্রদেশ অনুযায়ী ১,০০ পাউণ্ডে ইহার একটা তালিকা দেওয়া হইল :—

	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
আসাম	২৪১,৯৮২	২৩৫,৮৮৮	২৪৬,১৮
দক্ষিণভারত	৫১,১৪৮	৫৩,১০৯	৫৭,২৭২
বঙ্গদেশ	৯৫,৮৩০	৯৭,৯৪২	৯৬,১০৬
উত্তরভারত	৩,৬৯৫	৩,৩৭৪	৪,০৩৮
বিহার ও উড়িষ্যা	২৭৮	৬০	৩৩১
মোট	৩৯২,৯৩৩	৩৯০ ,৯২০	৪০৩,৭৫৫

১৯২৩—১৯২৯ পর্য্যন্ত কত হাজার পাউণ্ড চা স্থলপথে ও জলপথে রপ্তানী হইয়াছে তাহার নির্দ্দেশ এইরূপ :—

	স্থলপথে	জলপথে
১৯২৩—২৪	৩৩৯,২৯৮	৫,৪৭৬
১৯২৪—২৫	৩৪০,৯০৪	৭,৫৭২
১৯২৫—২৬	৩২৬, ৫৫৫	১০,৭৭০
১৯২৬—২৭	৩৫০, ৫০২	১১,৯৭৫
১৯২৭—২৮	৩৬২, ০১২	৮,৮৯২
১৯২৮—২৯	৩৫৯, ৭৮৪	৮,৪২৪

১৯২৮—২৯ সালে ২০ লক্ষ পাউণ্ড চা সমুদ্রপথে রপ্তানী হ্রাস হইয়াছে অর্থাৎ ১৯২৭—২৮এর তুলনায় এক পার্সেণ্ট কমিয়াছে। যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, মিশর, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও পারস্যেই এই রপ্তানীর হ্রাস ঘটিয়াছে।

গত পাঁচ বৎসরে চা'এর যৌথ ব্যবসায়ে কি পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বৎসর	সংখ্যা	সংগৃহীত মূলধন
১৯২৫—২৬	৫৭২	৪০ কোটি ৯ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা
১৯২৬—২৭	৬১৮	৪৫ „ ৫৫ " ২৩ „ „
১৯২৭—২৮	৬৩৮	৪৬ „ ৭ " ৫৬ " "
১৯২৮—২৯	৬৬৩	৪৭ „ ৩০ „ ৩ " „
১৯২৯—৩০	৬৭৪	৫২ „ ৪০ " ৭৪ " „

ইহা ছাড়া ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা পরিচালিত চা'এর ব্যবসায়েও প্রভূত মূলধন খাটিতেছে। উপরিউক্ত কোম্পানীসমূহের মধ্যে ১৯২৯—৩০ সালে ভারতে রেজেষ্টারিকৃত কোম্পানীর সংখ্যা ৪৯৫ এবং ইহাদের মূলধন ১২ কোটি ৪৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ছিল। ১৯২৮ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত ১৩৮টী কোম্পানী এবং ১৯২৯ সালে ৭৪টী কোম্পানী যথাক্রমে শতকরা ২৩৲ ও ২০৲ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যৌথ প্রথায় পরিচালিত ১৩৪টী কোম্পানীর ১০০৲ টাকার অংশের মূল্য ১৯২৮ সালে গড়ে ৩৩২৲ টাকা, ১৯২৯ সালে ১৩৫টী কোম্পানীর ১০০৲ টাকার অংশের মূল্য গড়ে ৩০৩৲ টাকা এবং ১৯৩০ সালে ১৩৯টী কোম্পানীর ১০০৲ টাকার অংশের মূল্য গড়ে ২৭৮৲ টাকা হইয়াছিল।

১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে বর্ত্তমান বৎসরের ৩১এ জানুয়ারী পর্য্যন্ত ২৫ কোটি ১০ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮ শত ৩৯ পাউণ্ড চা ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে ২৩ কোটি ৮১ লক্ষ ১৫ হাজার ৫ শত ৩৩ পাউণ্ড চা বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ডুয়ার্স চা-সমিতির যে বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহার সভাপতি মিঃ গ্রেহাম্ বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে চা-ব্যবসায়ের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নহে, বরং ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। ভারতীয় টি সেস্ কমিটী আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের অধিবাসিগণের চা-পানের নেশা বাড়াইবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিতেছেন। যদিও আমেরিকায় ইহাদের চেষ্টা তাদৃশ ফলবতী হয় নাই, তথাপি ক্রমেই ঐ দেশে চা'এর আদর বৃদ্ধি হইতেছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষেও চা'এর কাটতি বাড়াইবার জন্য এই কমিটী বিশেষ-ভাবে মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। এদেশে চা-খোরের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য ভাল চা ছোট ছোট পুরিয়ায় করিয়া বাজারে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে চা-পাতা নীলামে সাত আনা এক পাই দরে ও গুঁড়া চা পাঁচ আনা দশ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে চা-পাতার দর প্রতি পাউণ্ড আট আনা আট পাই এবং গুঁড়া চা'এর দর সাত আনা আট পাই ছিল। চা'এর বাজার যে এরূপ পড়িয়া যাইবে, ক'এক মাস পূর্ব্বেও কেহ ইহা অনুমান করিতে পারে নাই। লণ্ডন ও কলম্বোর বাজারের অবস্থাও এইরূপ। লণ্ডনে ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে যে চা মজুত ছিল গত জানুয়ারীর শেষভাগে তদপেক্ষা ৭০ লক্ষ পাউণ্ড অধিক চা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ইহার ফলেই বাজারের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।

চীনে চা

অধুনা চা'এর রেওয়াজ চীনদেশে যত পৃথিবীর কুত্রাপি আর তত নহে। চীনদেশে চা আর পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয় না—উহা সেখানে খাদ্যরূপে চলিয়া গিয়াছে। ক্ষুধার সময়েও চা—তৃষ্ণার সময়েও চা—চীনারা দিবারাত্রই চা-পান করিতেছে। রপ্তানীর চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় তথায় আবাদও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন সেখানে এমন অনেক স্থলে চা জন্মান হইতেছে যেখানে পূর্ব্বে মোটেই চা উৎপন্ন হইতে দেখা যায় নাই। চীনের ফোকীং, কিয়াংনাং, চেকিং, কিয়াংসি এবং কাণ্টু প্রদেশেই বেশীর ভাগ চা জন্মে। পিকিং-এর চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশ-গুলিতে যে চা জন্মে তাহা বিলাসপ্রিয় নাগরিকদিগের খুবই পছন্দসই। তাতারীর সীমায় সন্নিহিত প্রদেশসমূহে যে চা হয় তাহা রাশিয়া ও মস্কোতে প্রধানতঃ রপ্তানী হইয়া থাকে; এই চা নাকি অপূর্ব্ব সুস্বাদু। চীন যে পৃথিবীর চা-উৎপাদক

দেশসমূহের শীর্ষস্থানীয় তাহা বিশ্বেশ্বর বাবু স্বীকার করিয়াছেন এবং এখানকার উৎপন্ন চা'এর পরিমাণ করা যে সুকঠিন তাহাও তিনি বলিয়াছেন। তবে অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানে চা-এ ভেজালও বড় কম নহে।

বিশ্বেশ্বর বাবু আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"পূর্ব্বে চীনদেশই প্রধানতঃ পৃথিবীর নানাস্থানে চা যোগাইত। ক্রমশঃ ভারতবর্ষ ও সিংহল চীনের এই ব্যবসায়টী কাড়িয়া লইয়াছে।" কিন্তু তাই বলিয়া জাপান, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও ফরমোসা দ্বীপকে আমরা কোনক্রমেই অপাংক্তেয় করিতে পারি না, কারণ পৃথিবীর মধ্যে ইহারাও চা'এর অন্যতম উৎপত্তিস্থল। ফর্মোসা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবৎসর যে চা রপ্তানী করে তাহার পরিমাণ অনূন ২ কোটী পাউণ্ড। যবদ্বীপ ও সুমাত্রায় যে চা উৎপন্ন হয় তাহার পরিমাণ ১৪ কোটী পাউণ্ডের উপর। "কিন্তু বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ও সিংহলের সহিত প্রতিযোগিতায় অন্যান্য দেশের সাফল্যলাভ করিতে এখনও অনেক বিলম্ব"—বিশ্বেশ্বর বাবুর এ কথা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা চলে না।

তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীগুলির হস্তে চীনদেশ যে গত ৫৫ বৎসর যাবৎ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চীনের চা-ই যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং চীনাদের স্বহস্ত-উৎপন্ন চা'এর যে বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য আছে তাহা কোন চীনবাসীই অবিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। যাহাতে বৈদেশিক বাজারে চীনের চা'এর পূর্ব্বগৌরব পুনরধিষ্ঠিত হইতে পারে তজ্জন্য ২৫ বৎসর পূর্ব্বে চীন গভর্ণমেণ্ট যথাযথ ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করেন। লিয়াং কিয়াং প্রদেশস্থ লাট চু ফু ১৯০৫ সালে সিংহল ও ভারতবর্ষে একটী Tea Investigation Commission প্রেরণ করেন। ইহার ফলে নাংকিনে একটী Tea Industrial Training School স্থাপিত হয় এবং আরও পরবর্ত্তীকালে নানাস্থলে অসংখ্য চা-পরীক্ষক-সমিতি গড়িয়া উঠে, [illegible] করিয়াও চীনের চা'এর আবাদে কোনও নূতন প্রণালী [illegible] অবলম্বিত হয় নাই। তবে চীনের নিকট সকল চা-[illegible] দেশেই চিরকৃতজ্ঞ, কেননা কোন না কোন সময়ে তথায় চীনেরই আবাদ-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে।

চা'এর নামতত্ত্ব

চীনদেশে Thea sinensis নামক বৃক্ষের চা মিং, কুতু, কু-চা, কিয়া, তু ইত্যাদি নামে প্রচলিত। এইসকল নাম হইতে প্রতীতি হয় যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন কালে ঐ দেশে কোন কোন শাক-সব্জী হইতে চা উৎপন্ন হইত। মিং কথাটা তাং বংশের রাজত্বকালে প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান চীন-সাহিত্যেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায় এবং চা-বাক্সের উপর প্রায়ই মিং লেখা থাকে।

ইউরোপের বণিক্‌মহলে নানাজাতীয় চা'এর নাম শুনা যায়। যথা,—Black tea, Green tea, Brick tea, Bohea, Congoe, Gunpowder tea, Imperial gunpowder, Hyson, Pukli Hyson, Hyson skin, Pekoe, Pekoe Souchong, Flowery Pekoe, Scented Pekoe, Pouchong, Souchong।

চা'এর ভিন্ন ভিন্ন নাম চীনাদের দেওয়া। রঙ্ ও উৎপত্তি-স্থানের নামানুসারে এইসকল নাম রাখা হইয়াছে। ভারতবর্ষেও দেশভেদে চা'এর নাম ভিন্ন ভিন্ন। কাছাড় জেলায় চা'এর নাম—'ফুলিচাম্'। গাছের বাকলের রঙ্ হইতে ফুলিচাম্ বা শ্বেতকণ্ঠ নাম হইয়াছে। আসামবাসীরা ইহাকে ফ্লেপ বা ফ্লেপ বলে। কটকে মিসাফ্লেপ ও আসামের অন্যান্য প্রদেশে চা ফিলকাট নামে প্রসিদ্ধ।

চা'এর গুণাগুণ

ডাঃ নিকোলাস টুলপিয়াস-ই বোধহয় প্রথম ভেষজবিজ্ঞানের দিক্ দিয়া চা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থখানির নাম—Cornelio Bontekoe, Tractaat van het excellenste Kruyd Thee (1678)। গ্রন্থখানিতে তাঁহার নিজস্ব বক্তব্যের খুবই অভাব। উহা সমালোচকদিগের কবলে পড়িয়া উৎপীড়িত হইলেও অনেকগুলি ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে এবং উচ্চ 'অথরিটি' বলিয়াও উদ্ধৃত হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার বক্তব্যের মূলকথা এই যে, চা-পানে স্বাস্থ্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী—ইহা অনেক রোগসম্ভাবনার প্রতিষেধকও বটে। তাঁহার মতে প্রত্যহ ২০০ পেয়ালা চা-পান কিছু বেশী নহে। তাঁহার এই অভিমতের দরুণ ওলন্দাজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী নাকি তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। Bontekoeর জীবনা-লেখ্যলেখক Heydentrik Overcamp চা'এর খুব সুখ্যাতি করিয়াছেন এবং তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহার অনুসরণ করেন নাই বলিয়া দুঃখও করিয়াছেন। Etmuller চা'এর মানপত্র দিয়াছেন—"a fine stomachic cephalic and antinephritic"। Herbert Compton সাহেব তাঁহার Come to Tea with Us (1905) নামক গ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন—

"If you follow the trail of tea, as a beverage, you will find it doing good everywhere; easing pain, stimulating endeavour, quickening intelligence, loosening tongue and promoting cheerfulness." কাহারও কাহারও মতে চা হৃদয় ও রক্তাধারকে খুব স্নিগ্ধ রাখে।

চা ধারক ও উত্তেজক। ইহার মূল উপাদান হইতেছে thein বা caffein—ইহাতে উত্তেজনা গুণ আছে; tannin—ইহা শক্তিবর্দ্ধক; এবং একপ্রকার তৈল—ইহাতে চা সুস্বাদু ও সুগন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। চা'এর গুণাগুণ নির্ভর করে প্রধানতঃ blendingএর উপর। এই blending কথাটার তাৎপর্য্য এই যে একপ্রকার চা অন্তপ্রকার চা'এর সহিত এরূপ সন্তর্পণে সংযোগ করিতে হইবে যে, এরূপ করিবার কালে চা'এর গুণাবলী যেন হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়। চা'এর ইহা একটী নিগূঢ় রহস্য এবং এই বাণিজ্য-রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে কোন বণিক্ স্বপ্নাবস্থায়ও প্রস্তুত নহে।

চা'এর একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহা পান করিলে অধিকরাত্রি জাগরণ করা যায়। De Quincey লিখিয়াছেন, তিনি যখন সাহিত্যিক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন তখন রাত্রি আটটা হইতে ভোর চারটা পর্য্যন্ত অনবরত চা-পান করিতেন। এইসূত্রে চা'কে তিনি "the beverage of the intellectual" বলিয়া প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। পার্ল্যামেণ্ট-এর নিশীথ অধিবেশনের সময়ে Palmerston বলিয়াছেন, চা-ই তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। Cobden ও Clemenceauপ্রমুখও ঐ এককথা। দীর্ঘকালস্থায়ী পার্ল্যামেণ্ট-এর অধিবেশনে Gladstone মধ্যরাত্রি হইতে প্রত্যূষ অবধি অবিরত চা-পান করিতেন।

অধিক পরিচালনা দ্বারা মস্তিষ্কের কোনরূপ বিকৃতি ঘটিলে চা-পানে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়। তবে খালিপেটে চা জিনিসটা না খাওয়াই ভাল, কারণ ইহাতে অম্ল ও অজীর্ণরোগ সৃষ্টি করে। বিশেশ্বর বাবুর উপদেশ,—"চা'এর একটু উত্তেজিত শক্তি আছে, কিন্তু দোষও বেশ আছে, বিশেষতঃ এই গরম দেশে। বিশেষ হিসাব করিয়া এবং পরিমাণ ঠিক রাখিয়া পান করা আবশ্যক।"

চা'এর যদি বাস্তবিকই কোন গুণ না থাকিত তাহাহইলে পৃথিবীতে বাৎসরিক ২,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড চা'এর উৎপাদন হইত না। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চা-পান করে গ্রেটব্রিটেন—জন প্রতি ৯। পাউণ্ড; অষ্ট্রেলিয়া ৮। পাউণ্ড; নীউ জিলণ্ড ৮·২ পাউণ্ড; অষ্ট্রেলেসিয়া ৭। পাউণ্ড; যুক্তরাজ্য ৬। পাউণ্ড; কানাডা ৪। পাউণ্ড; নেদারলণ্ড ২$\frac{৭}{৮}$ পাউণ্ড; ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা ১। পাউণ্ড; রাশিয়া ১। পাউণ্ড; যুক্তরাষ্ট্র ১.৩০ পাউণ্ড এবং ফ্রান্স ০·০৭ পাউণ্ড।

কিন্তু তাই বলিয়া চা'এর নিন্দাবাদও কোনক্রমে বিরল নহে। Henry Saville (১৬৭৮) এর মতে চা-পান একটা কদভ্যাস। Jonas Hanwayর মতে—চা-পানের ফলে পুরুষের ধৈর্য্যচ্যুতি ও সৌন্দর্য্যহানি এবং স্ত্রীলোকের রূপবিপর্য্যয় অনিবার্য্য (Essay on Tea, 1756)। Hermann Boerhaave (১৬৬৮-১৭৩৮), Gerard van Swieien (১৭০০-১৭৭২) প্রমুখ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ চা'এর ঘোর বিরুদ্ধবাদী। এমন-কি Balzac চা'কে "insipid and depressing beverage" বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

সাহিত্যে চা

চা'এর প্রচলন যখন বিশ্বব্যাপী তখন সাহিত্যে যে ইহা স্থান সংগ্রহ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইংরাজ রাজকবি Nahum Tate (১৬৫২-১৭১৫) চা সম্বন্ধে যে হৃদ্য ও মৌলিক কবিতা লিখিয়াছেন তাহার নাম—Panacea, a poem on Tea (1700)। Johnson তাঁহার প্রসিদ্ধ অভিধান সঙ্কলনকালে যে খুব চা-আসক্ত ছিলেন তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। তিনি নিজের চিত্র এইরূপ আঁকিয়াছেন, "a hardened and shameless tea-drinker, who for twenty years diluted his meals with only the infusion of the fascinating plant; who with tea amused the evening, with tea solaced the midnight, and with tea welcomed the morning." Addison যে তাঁহার বন্ধু Steeleএর সহিত লণ্ডনের coffee-houseএ বসিয়া চা-পান করিতে করিতে বাক্যালাপ করিতেন তাহা না বলিলেও চলে। Boswellএর চা-পানের আর বিরাম ছিল না—চা তাঁহার নিকট "Heliconian Spring" ছিল। Hazlittও Johnson অপেক্ষা চা-পানে কিছু কম যাইতেন না। Shelleyর প্রিয়পানীয় জল হইলেও চা তাঁহার নিকট সর্ব্বদা আদরণীয় ছিল। Bulwerএর প্রাতরাশ ছিল dry toast ও cold tea। এক পেয়ালা চা ও এক ছিলিম তামাক গ্রহণ করিয়া Kent একাদিক্রমে আটঘণ্টাকাল কাজ করিতে পারিতেন। ঐতিহাসিক Motley বলেন—"I usually rose at seven, and with the aid of a cup of tea only, wrote until eleven." Victor Hugo মুক্তভাবেই চা-পান করিতেন, তবে তিনি সামান্য ব্র্যাণ্ডি মিশাইয়া পান করিতে ভালবাসিতেন।

জনৈক চীনদেশীয় চারণ চা'এর একটু অত্যুক্তি করিয়া গাহিয়াছেন,—

"One ounce does all disorders cure,
With two your troubles will be fewer,
Three to the bones more vigour give,
With four forever you will live
As young as on your day of birth,
A true immortal on the earth."

ইউরোপে চা'এর প্রথম সাহিত্যিক-প্রশংসা করিয়াছেন ইংরাজ-কবি Edmund Waller (১৬০৬-১৬৮৭):—

The muses friend doth our fancy aid,
Repress these vapours which the head invade,
Keeping that palace of the soul serene."

Queen Anne যে চা'এর একজন উপাসিকা ছিলেন তাহা Popeএর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে সুপ্রকট—

"Here thou great Anna! whom three realms obey,
Dost sometimes counsel take—and sometimes tea.

Nicholas Brady (১৬৫৯-১৭২৬) চা'এর স্তুতি করিয়াছেন—"The sovereign drink of pleasure and of health" এবং Cowper—"The cup that cheers, but not inebriates"।

Coleridge যে যৌবনে চা-পায়ী ছিলেন সে অনুমান কিছু অযৌক্তিক নহে —

"Though all unknown to Greek and Roman song
The paler Hyson and the dark Souchong,
Which Kieu lung, imperial poet praised
So high that cent per cent its price was raised."

Grayর কাব্যেও ইহার স্তুতি আছে,—

"Through all the room
From flowing tea exhales a fragrant fume."

Byronএরও চা-ভক্তি অগাধ—"I must have recourse to black Bohea"; অন্যত্র সবুজ চা'কে "Chinese nymph of tears" বলিয়া গুণগান করিয়াছেন।

ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যেই চা'এর সমস্ত ভক্তিটুকু সীমাবদ্ধ নহে। গ্রীক ভাষায় Herricken এবং Francius, লাটিন ভাষায় Pecklin (Theophilus Bibaculus), ফরাসী ভাষায় Pierre Pettit (পাঁচশত ছত্রের কবিতা) এবং জার্ম্মাণকবি Heinrich চা'এর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় সাহিত্যিকগণের রচনায়ও চা-রসের মাহাত্ম্য উহ্য নাই। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও 'নৌকাডুবি' এবং প্রভাত-কুমারের 'নবীন সন্ন্যাসী' হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কথাসাহিত্যে চা'এর প্রভাব বড় অল্প নহে।

ভ্রম-সংশোধন

পৃঃ ৮০, ২য় স্তম্ভ, ৩৩ লাইনে—'১৬৭৮ খৃঃ' স্থলে '১৬৪৮ খৃঃ' এবং '১৭৫০ খৃঃ' স্থলে '১৩৫০ খৃঃ' হইবে।

শ্রীকমলাকান্ত বসু

সমালোচনা

মেঘদূত *—আজকাল প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধে আমরা যে কল্পনোজ্জ্বল ধারণা পোষণ করি, প্রাচীন ভারতকে যে আমরা চিরন্তন সৌন্দর্য্যের আধারভূমি ও কাব্যের উৎসরূপে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, তাহা অনেকটা আমাদের মনে কালিদাসের কাব্য ও নাটক এবং অজন্তার চিত্রাবলী এই দুই বস্তুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের ফল। কালিদাসের কাব্যের মধ্যে মেঘদূত খণ্ডকাব্যটী যে ভারতের সুকুমার সাহিত্যোদ্যানের একটী অনিন্দ্যসুন্দর সৌরভময় পুষ্প একথা মেঘদূত রচনার সময় হইতেই গত সার্দ্ধ-সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের সাহিত্যরসিকগণ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। মেঘদূত যে একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্তরঞ্জন কাব্যগ্রন্থ ইহা যিনি এই বই একবার পড়িয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন। একবারও যাঁহার এই কাব্যের সঙ্গে পরিচয়লাভ ঘটিয়াছে তিনি আর ইহাকে ছাড়িয়া থাকিতে সমর্থ হইবেন না। কলেজে থার্ড-ইয়ার ক্লাসে পড়ি—এখন হইতে বাইশ বছর পূর্ব্বেকার কথা; আমাদের ইংরাজীতে অনার্স ছিল, সংস্কৃতও ছিল; ক্লাসে সতীর্থদের সঙ্গে একদিন তর্ক উঠিল—জগতে প্রধান প্রধান ভাষার সাহিত্যগুলির সঙ্গে তুলনায় সংস্কৃত সাহিত্যের স্থান কোথায়? তখন আমি সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মাক্সমূলারের মত গ্রহণ করিয়াছি—বেদ, রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণ বাদ দিলে অর্ব্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যটা পুরাপুরি একটা কৃত্রিম ব্যাপার. সংস্কৃত ভাষায় যাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহারা ঐ ভাষাকে ঘরে ব্যবহার করিতেন না, ঘরে হয় প্রাকৃত না হয় দ্রাবিড় ভাষা বলিতেন, সুতরাং এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে এই ভাষায় কোনও বড় সাহিত্য সম্ভব নহে, এই রকম একটা ধারণা তখন দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। তারপর, যেকলেও যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে সভ্যতা যতই বাড়িতে থাকে ততই কবিতার অধোগতি ঘটিতে থাকে, এমতও সমীচীন বোধ হইত। কলেজের পাঠ্য শকুন্তলা ছিল বটে, এবং মুদ্রারাক্ষস ও কিরাতার্জ্জুনীয়ের সঙ্গে তুলনা করিয়া শকুন্তলাকে অপার্থিব জগতের বস্তু বলিয়া মনে হইত বটে, কিন্তু টোলের উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এমন অনেক বন্ধুর নিকটে নৈষধের কতকগুলি শ্লোকের অর্থ শুনিয়া ঐ গ্রন্থকে প্রকৃত কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, এবং এই ধরণের পণ্ডিতী মহাকাব্যগুলি সম্বন্ধে একটা বিতৃষ্ণা আমার মনে আসিয়া গিয়াছিল। ওদিকে প্রাচীন ইংরেজী কাব্য Beowulf পড়িতেছি, প্রাচীন জারমান কাব্য Nibelungen Lied, গ্রীক নাট্যকারদের ট্রাজেডী অনুবাদের সাহায্যে পড়িতেছি, ইহাদের সরল পুরুষোচিত সৌন্দর্য্য আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করিয়াছে; সুতরাং প্রাচীন গ্রীক্ ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ বাদে অর্ব্বাচীন

+ মেঘদূত—মূল ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্তকৃত বঙ্গানুবাদ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কৃত "মেঘদূত পরিচয়" ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এম্-এ প্রণীত "কালিদাস ও মেঘদূত" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় সহিত, ও শ্রীযুক্ত রমেশনাথ চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত তিনখানি রঙীন চিত্রমণ্ডিত, এবং একখানি মানচিত্রযুক্ত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর মিত্র, ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফাল্গুন ১৩৩৭। পত্রসংখ্যা ।০+৩৪+১২১+৮৵০, পুস্তকের আকার ৭॥"×৫" ; কাপড়ে বাঁধা, কার্ডবোর্ডের বাক্সে, মূল্য দুই টাকা।

সংস্কৃত সাহিত্যকে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার মত মনোভাব তখন হইয়াছিল। আমার সহপাঠী শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য (এখন যিনি বিপণ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক) এক অভিজ্ঞান শকুন্তল ছাড়া অর্ব্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এমন কোন বই নাই—যাহা উপর্য্যুপরি পাঠ করিয়াও আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না, এই রকম একটা মন্তব্য শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি মেঘদূত পড়েছেন? মেঘদূত আমি তখনও পড়ি নাই, একথা স্বীকার করিতে হইল; তাহাতে তিনি বলিলেন—আগে আপনি মেঘদূত পড়ুন, তার-পরে আপনার সঙ্গে তর্ক ক'রবো। সেইদিনই বিধুভূষণ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত কলেজের পাঠ্য একখানি মেঘদূত পুরাতন বইয়ের দোকান হইতে কিনিয়া পাঠ আরম্ভ করিলাম, এবং বাঙ্গলা অনুবাদ ও সংস্কৃত অন্বয়ের সঙ্গে মিলাইয়া মূল কাব্যের রস প্রথম একটুমাত্র আস্বাদ করিতে সমর্থ হইলাম। ক্লাসে এই যে তর্ক উঠিয়াছিল, ইহার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ বোধ করিতে লাগিলাম, কারণ আমার পক্ষে এই তর্ক সার্থক হইল, মেঘদূতের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটিল।

সেই অবধি মেঘদূত কাব্যখানিকে কাছ ছাড়া করিতে পারি নাই। যখনই ভ্রমণে বা প্রবাসে বাহির হই, অন্ত তিন চারি-খানি বইএর সঙ্গে মেঘদূতখানিকে সঙ্গে না লইয়া পারি না। মেঘদূতের অনুরাগী বহু শিক্ষিত ভারতীয়ই নিশ্চয়ই এইভাবে এই বইকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখেন। কি জারমানীতে, কি গ্রীসে, কি যবদ্বীপে, কি ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে, যখনই দেশের প্রাচীন জীবনের একটু স্পন্দন পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিত, যখনই কাব্য ও রোমান্সের নির্ম্মল ধারায় অবগাহন করিবার ইচ্ছা হইত, তখনই সৌন্দর্য্যের এই উৎসে গিয়া আশ্রয় লইতাম—মেঘদূতের "উদার শ্লোকরাশি" তাহাদের মেঘমন্দ্র-ধ্বনি সমেত চিত্তের পক্ষে রসায়নের কার্য্য করিত। অবসর পাইলে মেঘদূত পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করা—শিক্ষিত লোকের পক্ষে ইহা তো সাধারণ ব্যাপার। মেঘদূতের মোহ কখনও কাটাইয়া উঠিতে পারিব কি না জানি না।

মূল সংস্কৃতের আস্বাদ পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে বলিয়া ইহার অনুবাদের প্রতি কখনও আমার আস্থা বা আকর্ষণ হয় নাই। তথাপি মেঘদূতের ইংরেজী, হিন্দী, বাঙ্গলা অনেকগুলি অনুবাদ দেখিয়াছি। বাঙ্গলা, হিন্দী, গুজরাটী, মারহাট্টি প্রভৃতি ভারতীয় আর্য্যভাষা যাঁহারা ব্যবহার করেন, আমাদের দেশের এইরূপ শিক্ষিতজনের পক্ষে, মেঘদূত, গীতা, উপনিষৎ প্রভৃতি সংস্কৃত বই মূল সংস্কৃতেই পড়া উচিত বলিয়া মনে করি; এবং এইজন্য, যে অনুবাদ পাঠে মূলের দিকে পাঠক আকৃষ্ট হয়, সেই অনুবাদই সার্থক অনুবাদ বলিয়া মনে করি। মূলের ভাবের সঙ্গে তাহার ছন্দোগতি ও শব্দঝঙ্কার অন্ততঃ কতকটাও অনুবাদে পাওয়া চাই; তবেই না মূলের সৌন্দর্য্যের কিয়ৎ পরিমাণ উপলব্ধি হইতে পারে। মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দই তাহার প্রাণ, এবং এই ছন্দের অনুরূপ কিছু না আনিতে পারিলে, যে ভাষারই হউক না কেন সে অনুবাদ ব্যর্থ হইয়া যাইবে, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। এই বিষয়ে, ইংরেজীতে হোরেস্ হেমান্ উইল্সনের পুরাতন অনুবাদ, কুন্দন আর্থার রাইডারের অনুবাদ যে মূল সংস্কৃতের গাম্ভীর্য কতখানি রক্ষা করিয়াছে তাহা ধরিতে দেরী লাগে না। বাঙ্গলা মেঘদূতের যতগুলি পদ্য অনুবাদ আছে, বোধ হয় সবগুলিই দেখিয়াছি। কিন্তু এতাবৎ কোনটীতেও চিত্তপ্রসাদ জন্মে নাই—সর্ব্বত্রই মনে হইয়াছে, এ তো কালিদাসের কবিতার মতন লাগে না। বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতির অনুযায়ী উপযোগী ছন্দ নির্ব্বাচন করিতে না পারাই ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ। মেঘদূতের সুখপাঠ্য বাঙ্গালা অনুবাদ হওয়া অসম্ভব, আমার মনে এইরূপ একটা ধারণা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এইজন্য পদ্যানুবাদের দিকে না গিয়া, মূল সংস্কৃত, সামান্য ব্যাখ্যা সহ অন্বয়, ও একটী গদ্যানুবাদ—মেঘদূতের মূল হইতে রসগ্রহণের জন্য বাঙ্গালী পাঠককে এইটুকু সাহায্য করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস; এবং ইহার ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালী যদি মূল মেঘদূতের সৌন্দর্য্যের একটুখানিও আভাস পাইতে পারেন তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হইত;—বাঙ্গালা পদ্যানুবাদের অভাব মোটেই লাগিত না, এবং এইজন্যই মেঘদূতের বাঙ্গালা সংস্করণে মূল সংস্কৃতটীও যাহাতে দেওয়া হয় এই ব্যবস্থা বরাবরই আমার ঈপ্সিত ছিল।

প্রচলিত পদ্যানুবাদের অনেকগুলি সম্বন্ধে এই কথা বলা যায়, যে কোথাও বা মূলের অনুযায়ী বা অনুকারী চার লাইনের শ্লোকের মত গ্রথিত বাঙ্গালা ছন্দে মূলের সমস্ত ভাব রক্ষা করিতে পারা যায় নাই—অনুবাদ দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে! আর কোথাও বা অনুবাদ না হইয়া মূলে নাই এমন নানা অবান্তর শব্দ বা ভাবে পূর্ণব্যাখ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পয়ারের বা মামুলী বাঙলা ছন্দের একটানা স্রোতে, বা নাচুনী ছন্দের হালকা গতিতে, কালিদাসের কবিত্বের সে মহিমা আর থাকে না—বস্তুটী অত্যন্ত খেলো হইয়া পড়ে। প্যারীবাবুর অনুবাদে তিনি যে বাঙ্গালা ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেটী মেঘদূতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। তাঁহার ছন্দো-নির্ব্বাচন প্রশংসনীয়, এবং এই বিষয়ে তিনি যে নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ছন্দের সূক্ষ্ম শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার কবিচিত্তের স্পর্শকাতরতারই পরিচায়ক। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ছন্দ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। প্যারীবাবুর মেঘদূতের ভূমিকাস্বরূপ তাঁহার প্রবন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন, প্যারীবাবুর ব্যবহৃত ২৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে (প্রতি ছত্রে বা পংক্তিতে ৩+৪=৭ তিন আর চারে সাত মাত্রা করিয়া তিনটী পর্ব্ব, এবং শেষে একটী পাঁচ মাত্রার পর্ব্ব) অক্ষর-বৃত্ত কিন্তু ২৭ মাত্রার মন্দাক্রান্তার ধীর-গম্ভীর গতিটী ক্ষুণ্ণ হয় নাই; যদিও একথা স্বীকার্য্য যে, প্যারীবাবুর ব্যবহৃত ছন্দ মন্দাক্রান্তার স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যটুকু অনেকটা বজায় রাখিলেও, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্যকে অতিক্রম করিয়া, তাহার বিশেষ ভঙ্গীটুকু—স্থানে স্থানে তাহার সংযুক্ত বর্ণবাহুল্যজনিত

একটা দুর্দমনীয় পরিবেশ—একটা পকাতোদাবং ধ্বনিনির্ঘোষ—সর্বত্র আনিতে সমর্থ হয় নাই। যেমন ১১ শ্লোকে সংযুক্তবর্ণের সমাবেশে যে বৃংহণঘোষ ধ্বনিত হইতেছে—

কর্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং।

তাহাকে প্যারীবাবুর অনুবাদে আনা সম্ভব হয় নাই, "যে গুরু গরজনে জাগিলে ভুইচাঁপা ধরণী ফুলে ফলে শোভিত হয়" কিন্তু তাহাতে অনুবাদকের অপরাধ বা শক্তিহীনতার পরিচয় পাই না, পাই বাঙ্গালা মাত্রাবৃত্ত ও সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে অন্তর্নিহিত বৈষম্য। বাঙ্গালা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করিলেও এ প্রশ্নের সমাধান হইত না, কারণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সংযুক্তবর্ণের গৌরব বজায় থাকে না। একমাত্র স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের এই বিশেষ শক্তির আভাস আনা যাইত। কিন্তু স্বরাঘাত-প্রধান বাঙ্গালা ছন্দ কতকটা চটুল ও লঘুগতি—ইহার সাহায্যে মন্দাক্রান্তার গাম্ভীর্য্য বজায় রাখা অসম্ভব। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে অনন্যোপায় হইয়া কিছু বর্জ্জন করিতেই হয়; এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রবোধবাবুর সঙ্গে আমিও একমত। এই ছন্দে যতটুকু পাওয়া গিয়াছে ততটুকুতেই মন্দাক্রান্তার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য—ইহার ধীর-রুচির গতি—তাহা বাঙ্গালায় চমৎকারভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

ছন্দোবিষয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় ভিন্ন প্যারীবাবুর অনুবাদের আর একটা প্রধান গুণ—ইহার প্রসাদ গুণ। পড়িতে কোথাও অন্তরায় হয় নাই। অনেক সময়ে মূল জানা না থাকিলে মেঘদূতের (বা অন্য পুস্তকের) অনুবাদ বোঝা সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুষ্কর হইয়া থাকে; পড়িতে পড়িতে সবটুকু বুঝিবার জন্য ভাবিতে হয়। অনুবাদ বুঝিতে গেলে যদি মূলের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সে অনুবাদের সার্থকতা কতদূর? প্যারীবাবুর অনুবাদের সম্বন্ধে বলা যায় যে, সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক একটানা পড়িয়া গেলে, তাঁহার বক্তব্য বুঝিতে কোনও কষ্ট অনুভব করিবেন না; অনুবাদ এমনই প্রাঞ্জল হইয়াছে। মোটের উপর মেঘদূতের যতগুলি বঙ্গানুবাদ আমি দেখিয়াছি, সবগুলির মধ্যে প্যারীবাবুর এই অনুবাদ আমার নিকটে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইয়াছে।

প্যারীবাবু বইয়ের একদিকে মূল সংস্কৃত ও অন্যদিকে বাঙ্গালা দিয়াছেন। মেঘদূতের মতন বইএর পক্ষে মূল দেওয়া অপরিহার্য্য। মূলের পাঠটা একটু বিচার করিয়া শ্রীযুক্ত প্রবোধবাবু বল্লভদেব ও জিনসেনের ধৃত পাঠের উপর নির্ভর করিয়া একটা প্রাচীন পাঠ দিবার প্রয়াস করিয়াছেন। ইহার উপর মল্লিনাথ-ধৃত শ্লোকগুলিও রাখা হইয়াছে। কিন্তু মল্লিনাথ-কর্তৃক যেগুলি বর্জ্জিত হইয়াছে সেই শ্লোকগুলি গৃহীত হয় নাই। মোটের উপর, এই পাঠকে প্রাচীন টীকাকারদের অবলম্বন করিয়া একটা vulgate বা লোক-প্রচলিত পাঠ বলা চলিতে পারে। তবে অনেকগুলি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক অতি সুন্দর—পুস্তকের পূর্ণতার খাতিরে সেগুলিকে শেষে দিতে পারিলে মন্দ হইত না।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের ও প্রবোধবাবুর প্রবন্ধদ্বয় এই সংস্করণের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় সংক্ষেপে মেঘদূতের কাব্যপ্রকৃতির ও ইহার মর্ম্মকথার একটু পরিচয় দিয়াছেন। প্রবোধবাবু কালিদাসের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক আলোচনা করিয়াছেন, এবং মেঘদূতের ছন্দ ও বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি উপযোগী কথার অবতারণা করিয়াছেন। প্রবোধবাবু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনা অতি কৃতিত্বের সঙ্গে করিতেছেন, ওদিকে ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার লেখাগুলি, এতাবৎ এবিষয়ে যত আলোচনা হইয়াছে, তাহাদের শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছে, সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধ যে অতি উপাদেয় ও তথ্যপূর্ণ হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

একথা সত্য যে, মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রসাদেই কালিদাসের প্রতিভা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা জনপ্রিয় সাধারণ সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্যারীবাবু সুন্দর ছোট একটী কবিতায় কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথকে প্রণতি জানাইয়া তাঁহার অনুবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন।

এইবার বইএর বাহ্যসৌষ্ঠবের কথা। ছাপা অতি পরিপাটী হইয়াছে এবং পুথির ধরণে লম্বা আকারে প্রতি পৃষ্ঠায় দুইটী করিয়া শ্লোক ছাপা হওয়ায় ও ধারে পাশে প্রচুর স্থান থাকায় বেশ নয়নতৃপ্তিকর হইয়াছে। বইখানির বাঁধাই ও চিত্রসমাবেশ বেশ সুরুচির পরিচায়ক। একগাদা বাজে ছবি দিয়া, তিন চার রঙের কালিতে ছাপিয়া জবড়জঙ্গ করিয়া ফেলা হয় নাই। ইহাতে তিনখানি মাত্র রঙ্গীন ছবি আছে, তিনখানিই বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর আঁকা। দুইখানি নৈসর্গিক দৃশ্যের—সমতলভূমি আর পর্ব্বতের মধ্যে দেবাকার আর ধূম্রাকার মেঘের গতি দুইখানিতে—এবং তৃতীয়খানি হইতেছে যক্ষপত্নীর—এই ছোট ছবিটী শিল্পীর একটী শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ছবি তিনখানি দেখিয়া মনে হয়, এইরূপ আরও খানকতক ছবি হইলে ভালো হইত,—আমাদের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয়। মেঘদূতের ছাপা এই রকমই হওয়া উচিত।

এই সুন্দর অনুবাদের এইরূপ সুরুচির পরিচায়ক সুন্দর সংস্করণের বাঙ্গালী পাঠকসমাজে বহুল প্রচার হওয়া উচিত। বন্ধু বা প্রিয়জনকে উপহার দিবার পক্ষে ইহা অতি চমৎকার পুস্তক হইয়াছে এবং বইখানি সমস্ত লাইব্রেরীতেও রাখিবার উপযুক্ত।

এই বইএর দ্বিতীয় সংস্করণে আর একটী জিনিস করিতে পারিলে বেশ ভালো হয়—তদ্দারা কালিদাসকে আরও প্রচার করা হইবে:—প্রত্যেক শ্লোকের নীচে ছোট অক্ষরে তাহার দুই একটী শব্দের ব্যাখ্যা সমেত অন্বয় দিলে বেশ হয়; এবং ভৌগোলিক ও অন্য টিপ্পনীগুলি অনুবাদের নীচেই সঙ্গে সঙ্গে থাকিলে ভালো হয়।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
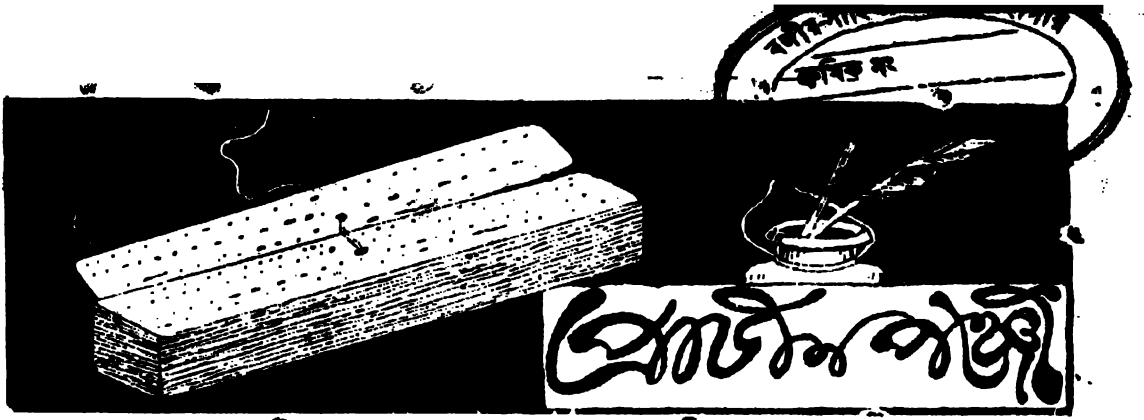
সেকালের কথা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

সেকালের কথা শুনিতে অনেকেরই ভাল লাগে। কিন্তু তাহা জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সেকালের সংবাদপত্র সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই সকল সংবাদপত্র ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। তবে সযত্নে অনুসন্ধান করিলে এখনও এখানে-সেখানে কিছু কিছু পাওয়া যায়। সম্প্রতি আমার সন্ধানে বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'-এর তিন বৎসরের (এপ্রিল ১৮৩০—এপ্রিল ১৮৩৩) ফাইল রহিয়াছে। এবার তাহা হইতে যে-সকল সংবাদপত্রের বিবরণ পাওয়া যায় উদ্ধৃত করিতেছি।—

নূতন সাময়িক পত্র

(৫ জুন ১৮৩০। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

সম্বাদ রত্নাকর ঃ—

"ষষ্ঠ সম্বাদপত্র।—এক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় পাঁচ সম্বাদপত্র প্রকাশ পাইতেছে অপর এই সপ্তাহের চন্দ্রিকার দ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে কলিকাতা শহরে অন্য এক বাঙ্গলা সম্বাদপত্র প্রকাশ হইবেক তাহার সংজ্ঞা সম্বাদরত্নাকর।"

(২৮ আগষ্ট ১৮৩০। ১৩ ভাদ্র ১২৩৭)

"সম্বাদ সম্পাদকের উক্তি।...গত জ্যৈষ্ঠের দর্পণে সম্বাদ রত্নাকরনামক সম্বাদপত্র প্রকাশবিষয়ক পত্র প্রচার হইয়াছিল তদনুষ্ঠানপত্রিকা প্রস্তুতা হইতেছে উক্ত সম্বাদপত্র নির্ব্বাহক যন্ত্রের উপেন্দ্রলাল অভিধেয় হইল।"

(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২। ১৬ মাঘ ১২৩৮)

"সম্বাদ রত্নাকরের গো লোকপ্রাপ্তি।—...সম্বাদ রত্নাকর-নামক যে এক কটুকাটব্য রচিত পত্র এই মহানগরে প্রকাশ হইতেছিল সংপ্রতি গত সোমবাসরাবধি তৎ পত্র প্রকাশ রহিত অর্থাৎ কোন অধর্ম্ম রোগে প্রলাপ দেখিয়া তাহার গো লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে...।" ("বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম্ম")

(২৬ জুন ১৮৩০। ১৩ আষাঢ় ১২৩৭)

শাস্ত্রপ্রকাশ ঃ—

"নূতন সম্বাদপত্র।—কলিকাতা নগরস্থ শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের আফিসে শাস্ত্রপ্রকাশনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সম্বাদপত্রের অনুষ্ঠান দেখিয়া আমারদের বোধ হয় যে তাহা লোকেরদের পরমোপকারক হইবে কেননা সামান্যতঃ সম্বাদপত্রে নানাদিগদেশীয় বহুবিধ সম্বাদ প্রচার হইয়া থাকে ইহাতে সেরূপ সমাচার প্রচার না হইয়া বেদবেদাঙ্গ পুরাণোপপুরাণাদি শ্লোকের প্রকৃতার্থ ও ফল এবং ব্রতাদির ইতিকর্ত্তব্যতা নানাশাস্ত্র হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়া সকল লোকের সহজে বোধার্থে চলিত ভাষায় প্রকাশ হইবে ক্রমশঃ বাঙ্গলা সম্বাদপত্রের বাহুল্যহওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিশিষ্টোপকার বিশেষতঃ নানা সম্বাদ-পত্রে নানাদেশীয় অনেক বিষয়ঘটিত সম্বাদ অনায়াসে জানিতে পারিবেন এবং এই শাস্ত্রপ্রকাশে প্রকাশিত শাস্ত্র-ঘটিত বিষয় বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা গেলে সাধারণ

লোকেরদের বুদ্ধিগোচর হইবেক এবং তাহা সপ্তাহে২ প্রকাশ হইবে ও তাহার মূল্য মাসে এক টাকা করিয়া দিতে হইবেক ইতি।"

(২৬ মার্চ ১৮৩১ । ১৪ চৈত্র ১২৩৭)

"শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক শাস্ত্রপ্রকাশনামক এক পত্র প্রকাশ হইতেছে তাহার তৃতীয় দর্শন অস্মদাদির দর্শনগোচর হইয়াছে ইহাতে বোধ হইল যে এই পত্র জনপদের উপকারক বটে যেহেতুক বিষয়িলোক প্রায় অনেকেই বেদ পুরাণ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের তাবৎ অর্থ জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক সকল নামও জ্ঞাত নহেন শাস্ত্রপ্রকাশপত্রে তাবৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রকাশ পাইবেক সুতরাং অবশ্যই লোকসকল তদবলোকনে উপকার স্বীকার করিবেন।—সং চং।"

(১৩ নভেম্বর ১৮৩০ । ২৯ কার্ত্তিক ১২৩৭)

ইণ্ডিয়া গেজেট ঃ—

"ইশতেহার।—ইণ্ডিয়াগেজেট। আগামি ১ দিসেম্বর তারিখঅবধি ঐ সম্বাদ পত্র প্রতি দিন প্রকাশিত হইবে।"

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

সংবাদ প্রভাকর ঃ—

"পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকরনামক সমাচারপত্র এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল সংপ্রতি গত ১৬ মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে তদবলোকনে বোধ হইতেছে যে তৎপ্রকাশক হিন্দুর ধর্ম্ম নাশেচ্ছুকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন [illegible] যেহেতুক [illegible] যুক্তি উক্তিদ্বারা শক্তি ভক্তি ব্যক্ত [illegible] এ সম্বাদপত্রের সম্বাদ শুনিলে ওঁরা [illegible] সন্তুষ্ট হইবেন।"

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । [illegible] ১২৩৭)

"বিজ্ঞাপন। যত্তপি মানাদেশীয় বিবিধ বৃত্তান্ত বোধক বহুবিধ সংবাদপত্রিকা প্রকাশদ্বারা নানা দিগন্তবাসি বিশিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামিক নাগরিকপ্রভৃতি বিদগ্ধব্যক্তিদের মানসাবাসে বিবিধবিষয়বিষয়ক প্রবোধ প্রকাশ প্রযুক্ত সংশয়াবস্থানের সংশয় হইতেছে তথাপি অস্মৎ প্রয়াসের বিফলতাবোধে অনুগ্রাহক মহাশয়েরদের অবশ্যই অনুগ্রহ হইতে পারে এবং বর্ণার্থগত দোষে দুষ্ট হইলেও সজ্জনসন্নিধানে গুণবৎ হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে অতএব এতাদৃশালোচনাদ্বারা নিশ্চিতান্তঃকরণ হইয়া সংবাদ প্রভাকরনামক সংবাদপত্র প্রকাশে সাহসী হইলাম। এই সংবাদ প্রভাকর পত্রে কলিকাতা রাজধানীস্থ গবর্নর কৌন্সেল ও সুপ্রিম কোর্ট ও পোলীস ও সদর দেওয়ানি ও নিজামৎ আদালতের ও বোর্ডের সমাচার ও ইঙ্গলণ্ড ফ্রান্সপ্রভৃতি দেশের ও ভারতবর্ষস্থ মান্দ্রাজ বোম্বে চীনাদি অন্যান্য দেশের এবং সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস্যাদি কোম্পানির স্বাধীন রাজ্যের ও অন্যাধিকারের নানাপ্রকার সংবাদ অর্থাৎ রাজকর্ম্মে নিয়োগাদি রাজনীতি বিষয় ও যুদ্ধবিষয় ও বিদ্যাবিষয় ও সওদাগরী বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিষয় ও দৈব ঘটনা বিষয় ও রহস্য বিষয়ইত্যাদি যখন যেরূপ আশ্চর্য্য বিষয় উপস্থিত হইবে তাহা প্রতি শুক্রবারে ছাপা হইয়া সপ্তাহানন্তর পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করা যাইবেক পাঠকবর্গেরা অবকাশে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও যত্তপি এই পত্র অবলোকন করেন তবে অনায়াসে এক স্থানে অবস্থান করিয়াও নানাদেশীয় বৃত্তান্তাবগত ও বহুদর্শী হইতে পারেন জ্ঞানপ্রার্থর্য্য সুতরাং সিদ্ধ ইতি।—সং প্রং।"

(২ জুন ১৮৩২ । ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

"প্রভাকরের অস্তাচল চূড়াবলম্বন।—আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরে সম্বাদ প্রভাকরনামক এক সমাচার পত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সর্জন হইয়া প্রখরতর কর প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুর তাহার বিধাতা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রকাশক ছিলেন প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাসপর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম্ম পক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্ম্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ

করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাঁহার দর্শন হওয়া ভার।...সং চং।"

(৫ মার্চ ১৮৩১। ২৩ ফাল্গুন ১২৩৭)

সম্বাদ সুধাকর :—

"সম্বাদ সুধাকর।—আমরা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক সকলকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতায় গৌড়ীয় ভাষায় সম্বাদ সুধাকরনামক এক সম্বাদপত্র গত সপ্তাহে প্রকাশ হইয়াছে।... এইক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় ৬ সম্বাদপত্র ও ইঙ্গরেজী বাঙ্গলায় ১ এবং ফারসী ভাষায় ১ ও এতদ্দেশীয় কোন বিজ্ঞ লোককর্ত্তৃক রচিত ইঙ্গরেজী ভাষায় ১ সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোরঞ্জন ও বহুদর্শনার্থ সর্ব্বসুদ্ধ এইক্ষণে ৯ সম্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে।"

(১২ মার্চ ১৮৩১। ৩০ ফাল্গুন ১২৩৭)

"বিজ্ঞাপন।...এই সম্বাদ সুধাকর পত্রে স্বদেশীয় ও ভিন্নদেশীয় বৃত্তান্ত রাজকর্ম্মের নিয়োগ ও রাজনীতি ও বিদ্যা ও রহস্য ও আশ্চর্য্য ও দৈবঘটনা ও ক্রয় বিক্রয় ও বাণিজ্যাদিবিষয়ক সমাচার এবং গবর্নর্ কৌন্সল ও বোর্ড ও সুপ্রিম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী ও পোলীস ও নিজামৎপ্রভৃতি আদালতের সমাচার যখন যাহা উপস্থিত হইবেক তাহা সপ্তাহানন্তরে প্রতি বুধবারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া পাঠকবর্গ সন্নিধানে প্রেরণ করা যাইবেক পাঠকবর্গ মহাশয়েরা স্বাবাসে স্থিতি করিয়া সাবকাসে এতৎ পত্রাবলোকন করিলে অনায়াসে অল্প প্রয়াশে নানা সম্বাদাভিজ্ঞ হইতে পারিবেন ইত্যলমতি বাহুল্যেন।—সং সুং।"

(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮)

"সম্বাদ সুধাকরপত্র পূর্ব্বাদি দিবসভিন্ন প্রতিদিন প্রকাশিত হইবেক এইরূপ প্রসঙ্গ হইয়াছে ইহাতে আমরা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছি যেহেতু পক্ষপাতবিহীন যে পত্র তদ্দ্বারা তাবতেরই বিশেষ শ্রেয়োংশ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে সুতরাং এরূপ পত্রের উন্নতি এবং শুভসম্বাদ শুনিলে কোন্ জনের চিত্ত সন্তুষ্ট না হয়...। —সং কৌং।"

(১৯ মার্চ ১৮৩১। ৭ চৈত্র ১২৩৭)

সমাচার সভা রাজেন্দ্র :—

"সমাচার সভা রাজেন্দ্রনামক বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় এক সমাচারপত্র সৃজন হইবার কল্প ছিল তাহা গত ২৫ ফাল্গুণ সোমবার প্রকাশ হইয়াছে প্রথম সংখ্যা দৃষ্টি করিয়াছি তাহাতে তৎপ্রকাশকের প্রতিজ্ঞা বা অভিপ্রায় কিছুই ব্যক্ত হয় নাই কেবল কএকটি সম্বাদ এবং তাহারি অবিকল অনুবাদ পারস্য ভাষায় হইয়া চারিতা কাগজ মুদ্রিত হইয়াছে বোধ হয় আগামিতে তৎপ্রকাশক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন যাহা হউক সকলপ্রকার কাগজ প্রকাশ হইল পূর্ব্বে কেবল ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র ছিল ইহাতে লোকেরদিগের বাঞ্ছা হইত বাঙ্গালা হইলে ভাল হয় তাহা হইলে পারস্য ভাষায় কাগজ প্রকাশ হইল সে অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে ইঙ্গরেজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় একত্রে দেখিবার সাধ ছিল তাহাও হইয়াছে পারস্য বাঙ্গালা উভয় ভাষায় কোন গ্রন্থাদি দেখা যায় নাই ৮ ঈশ্বরেচ্ছায় সে খেদও রহিল না এক্ষণে শুনিতেছি পারস্য ও বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা ভাষায় কটক অঞ্চলে হইবেক ইহা হইলে অধিকতর মঙ্গল জ্ঞান করিব।—সং চং।"

(১৯ মার্চ ১৮৩১। ৭ চৈত্র ১২৩৭)

"এতদ্দেশীয় দশম সম্বাদপত্র।—শ্রুত হওয়া গেল যে গৌড়ীয় ভাষায় লিখিত ও পারস্য ভাষায় অনুবাদকৃত অপর এক সম্বাদপত্র সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় লোকেরদের পাঠের নিমিত্ত এতদ্রূপ সম্বাদ পত্রের বৃদ্ধি হওয়াতে অনুমান হয় যে বিদ্যারো তদ্রূপ বৃদ্ধি হইতেছে। এবং যে সকল সম্বাদপত্র সংপ্রতি প্রকাশ হইয়াছে তাহা যদি গ্রাহকেরদের দ্বারা এমত পুষ্ট হয় যে এক বৎসরপর্য্যন্ত টেঁকে তবে আ[illegible] হয় ভারতবর্ষের উপরি উদিত প্রভাকর[illegible]নের সম্ভাবনা থাকিবে না।"

(১৬ এপ্রিল [illegible]৩১। ৪ বৈশাখ ১২৩৮)

দেশীয় সংবাদপত্র :—

"শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

৬৭১ সংখ্যক দর্পণে প্রাচীন বিপ্রস্য ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র

প্রকাশ হইয়াছে………তৎপত্রের আভাস এই যে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষায় কলিকাতা নগরে যে রীত্যনুসারে সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রপ্রকাশকেরদের দ্বারা তাদৃক শৃংখলাতে রচনা হইতেছে না বরং ইঁহারা বর্ণের শুদ্ধাশুদ্ধি বিবেচনা করিতেও অক্ষম……আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে কএক বৎসরহইতে যে কএক বঙ্গ ভাষায় সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে এবং ইদানীং নবীন পত্রসম্পাদকেরা যে ২ পত্র স্বজন করিতেছেন তাহার সমুদয় পত্রেরেই প্রতি কি তিনি তুল্যরূপে বিরাগ করেন কি তন্মধ্যে কাহাকেও গুরুত্ব পদ প্রদান করেন ও কাহাকেও বা লঘুরূপে মান্য করিতে অনুমতি দেন অপর ইহাও জানিতে ইচ্ছা যে বঙ্গভাষায় রচিত পত্রাদি কিরূপে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষার পত্রাদির তুল্য নহে এই বুঝি তাঁহার অভিপ্রায় হইবেক যে ইঙ্গলণ্ডীয় পত্রে যেমত বিজ্ঞাপন পত্রাদি এক পৃষ্ঠা বেষ্টিত হইয়া থাকে তদনুরূপ বাঙ্গলা সমাচারপত্র হয় নাই কি যেমত জেনরল আর্ডার-প্রভৃতি বাহুল্যরূপে ও শেষ পৃষ্ঠাতে বা পত্রের মধ্যে যেমত জাহাজ গমনাগমন ও বাজারের দ্রব্যাদির মূল্য এবং জন্ম বিবাহ মৃত্যুর সম্বাদ লিখিত হয় তদনুরূপে বঙ্গভাষার পত্র-সম্পাদকেরা লিখেন নাই যাহা হউক উভয় ভাষার পত্রের বিভিন্নতা দর্শাইয়া সংপ্রতি বঙ্গভাষার পত্রসম্পাদকদিগকে কি উচিত এবং কিরূপ পত্র স্বজন হইলে তাঁহার মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবেক ইহা জানান ন্যায্য ছিল ফলত অনুমান করি যে প্রাচীন বিপ্র মহাশয় ১৮৩০ সালের ৫ আপ্রিলের প্রকাশিত ইণ্ডিয়া গেজেটনামে কলিকাতা নগরের মধ্যে যে সম্বাদপত্র হয় তাহা অবলোকন না করিয়া থাকিবেন ঐ পত্রে কলিকাতার কোন বিজ্ঞ হিন্দুকর্তৃক এ দেশের সম্বাদ-পত্রসকলের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা অনায়াসে বোধ হইতে পারে যে কোন পত্রের কিরূপ স্বজন হইতেছে সুতরাং তাহা দৃষ্টি করিলে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রসম্পাদকেরদের প্রতি একেবারে এতাবৎ অশ্রদ্ধা করিতেন না।……প্রাচীন পত্রপাঠকস্য।—সং কৌং।"

(২১ মে ১৮৩১ । ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

এন্‌কোয়েরার :—

"নূতন সম্বাদপত্র।—আড়পুলিনিবাসি শ্রীযুত রামজয় বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি হিন্দুকালেজে শিক্ষিত হইয়া এক্ষণে ডেবিড হার সাহেবের স্কুলের গুরু মহাশয় হইয়াছেন তাঁহার পত্রদ্বারা আমরা জ্ঞাত হইলাম তিনি (ইনকোয়েরর) নামক এক সমাচারপত্র প্রকাশ করিবেন ঐ পত্র প্রতি সোমবারে প্রকাশ হইবেক এমত জ্ঞাত হইয়াছি…।"

(২৮ মে ১৮৩১ । ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

"গত ১৭ মে অবধি ইনকোয়েরের নামে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় সম্বাদ পত্র এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত অল্প বয়স্কেরদের দ্বারা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীযুত কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান সম্পাদক হন তৎপত্রের ভূমিকার শেষ ভাগ অবলোকনে আমরা বোধ করিলাম যে পত্রের প্রথম ভাগের লিখিত সম্পাদকের স্বীয় উক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয় তৎপত্রস্থিত বক্তৃতা এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকেরদের দ্বারা রচিত হইয়াছে এবং রচকেরদের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বৎসরের উর্দ্ধ নহে ইহাতে আমরা অবশ্যই আহ্লাদিত হইলাম এবং তাঁহারদের এতাবৎ অল্প বয়সে যে এরূপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ করিলাম।—সং কৌং।"

(২৫ জুন ১৮৩১ । ১২ আষাঢ় ১২৩৮)

ভাগবত সমাচার :—

"অথানুষ্ঠানপত্র।……শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভগদ্গীতা সর্ব্ব শাস্ত্রের সারাৎসার হইয়াছেন এই দুই শাস্ত্রের সর্ব্ব সাধারণে সমগ্ররূপে অনুশীলনাভাবে পরম ধর্ম্মের চর্চার প্রায় লোপ হইতেছে এবং শ্রীগোস্বামিপাদের অসংখ্য গ্রন্থ আছে তাহারো আলোচনার অপ্রাচুর্য্যহেতুক শ্রীশ্রী৺ মহাপ্রভুর সংপ্রদায়-সিদ্ধ অনেক বৈষ্ণবের মনঃপীড়া জন্মাইতেছে……ভক্তি শাস্ত্রের আলোচনা সমাচার পত্রে অত্যল্পই হয় আর বৈষ্ণবাচার এবং ব্রতাদি শ্রী একাদশী অষ্ট মহাদ্বাদশী শ্রীজন্মাষ্টম্যাদি শ্রীশ্রী মহা-প্রভুর সংপ্রদায় সিদ্ধগণের শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের মতেই নির্ব্বাহ হয় সংপ্রতি ঐ গ্রন্থের ব্যাখ্যার প্রচুর্য্যাভাবে শাস্ত্রা-নভিজ্ঞ বৈষ্ণব সকল স্বীয় সিদ্ধান্তানুসারে কেহ কোন দিবস করিতেছেন ইহা অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে অতএব এই বর্ত্তমান নগর মধ্যে এক ভাগবত সমাচার পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত

হয় তবে এ সকল বিষয় নিঃসন্দেহে সুন্দররূপে বোধ হইতে পারে…।

এই ভাগবত সমাচার অষ্টপৃষ্ঠা পরিমাণে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রতি সোমবারে প্রকাশ হইবেক ইহার মূল্য মাসে ১ এক তঙ্কা মাত্র।—সং প্রং।"

(৯ জুলাই ১৮৩১। ২৬ আষাঢ় ১২৩৮)

"……এক্ষণে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী ভাগবতীয় সমাচারপ্রকাশক মহাশয়ের এরূপ সৎপ্রবৃত্তিতে ও সদিচ্ছায় আমরা তাঁহার প্রশংসাবাদপূর্ব্বক এতদ্ব্যাপারে তন্মানস সাফল্য ত্বরায় হইয়া অস্মদাদির চক্ষুর্গোচর শীঘ্র হয় এই প্রতীক্ষায় রহিলাম।—সং কৌং।"

(২ জুলাই ১৮৩১ । ১৯ আষাঢ় ১২৩৮)

জ্ঞানান্বেষণ ঃ—

"জ্ঞানান্বেষণনামে এক সমাচারপত্র যাহার সূচনা পূর্ব্বে নিশ্চিতরূপে কর্ণগোচর হয় নাই গত শনিবার ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্দৃষ্টিতে প্রকাশক মহাশয়ের এ পত্র প্রকাশের প্রয়োজন যাহা লিখিয়াছেন তাহা উত্তম ও প্রশংসনীয় বোধ হইল……। —সং কৌং।"

(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯)

"আমরা জ্ঞানান্বেষণ গ্রাহক মহাশয়বর্গের সমীপে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি আপনকারদিগের আনুকূল্যে জ্ঞানান্বেষণপত্র আরম্ভাবধি এপর্য্যন্ত যে কেবল গৌড়ীয় ভাষায় চলিতেছিল এইক্ষণে আমারদের বোধ হয় যে তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া আগামি সপ্তাহাবধি গৌড়ীয় এবং ইংলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশ করিব কেননা যদিও বঙ্গভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের কেবল গৌড়ীয় ভাষাপাঠে তৃপ্তি হইতে পারে তথাপি জ্ঞানান্বেষণ-গ্রাহক ইউরোপীয় মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকের গৌড়ীয় ভাষাভ্যাসে তাদৃক মনোযোগ না থাকাতে তাঁহারদের উত্তমানুরক্তিহওয়ার ব্যাঘাত হয় অতএব বিবেচনা করিলাম জ্ঞানান্বেষণে যে২ বিষয় প্রকাশ হইবে তাহা ঐ উভয় ভাষার লিপিবদ্ধ হইলে জ্ঞানান্বেষণপাঠে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়দিগের বিশেষ মনোযোগ হইতে পারে এই বিবেচনাতে আগামি সপ্তাহাবধি পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষায় জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম……।"

(১৬ জুলাই ১৮৩১ । ১ শ্রাবণ ১২৩৮)

রিফর্ম্মার ঃ—

"রিফার্ম্মরনামক সম্বাদপত্র একালপর্য্যন্ত ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে উত্তরকালে তাহা বাঙ্গলা ভাষারূপ পরিহিতপরিচ্ছদ হইয়া প্রকাশ পাইবে……।"

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

শারদীয় পূজা। ……আমারদের অতি বিজ্ঞ বৃহস্পতি [সমাচার চন্দ্রিকা] লেখেন যে সংপ্রতি কএক সপ্তাহাবধি ইষ্টিণ্ডিয়ান জানবুল ইণ্ডি[য়া] গেজেটনামক সমাচার পত্র ও সমাচার দর্পণ প্রভৃতি পত্রসম্পাদক সাহেবেরা এক প্রবল কথা এই পাইয়াছেন যে প্রসন্নকুমার বাবু রিফার্ম্মর কাগজের এডিটর ঐ কাগজে বারম্বার দেবদেবী পূজাবিষয়ে অনেক নিন্দা প্রকাশ হইয়াছে এতএব বুঝা যায় উক্ত কর্ম্ম তাঁহার মতে যত্তপি নিন্দিত তবে তিনি কিপ্রকারে ঐ কর্ম্ম স্বয়ং করেন সুতরাং আমরা তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারি। উত্তর আদৌ রিফার্ম্মর কাগজের এডিটর তিনি নহেন তাহার প্রকাশক শ্রীযুত ভোলানাথ সেন। ইহা সত্য নহে রিফার্ম্মর কাগজের এডিটর বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরবিনা আর কেহ নাই যেহেতুক জানবুল এডিটর তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি রিফার্ম্মর কাগজের এডিটর কি না তখন ঐ রিফার্ম্মর কাগজে তিনি স্বীকার করিলেন। ভোলানাথ সেনের যন্ত্রালয়ে ঐ কাগজ মুদ্রাঙ্কিত হয় এতাবন্মাত্র ঐ কাগজের সহিত ঐ ভোলানাথ সেনের সম্পর্ক। তিনি ঐ কাগজের কর্ত্তা নহেন ঐ রিফার্ম্মর কাগজের কর্ত্তা বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুর ও শ্যামলাল ঠাকুর। ……কস্যচিৎ সত্যবাদিনঃ।"

(২৭ আগষ্ট ১৮৩১ । ১২ ভাদ্র ১২৩৮)

অনুবাদিকা ঃ—

"শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশকেষু।

এ সপ্তাহে আমরা দুই সম্বাদ পত্র অবলোকন করিলাম প্রথমতঃ অনুবাদিকা এই পত্র বঙ্গ ভাষায় শব্দবিন্যাসপূর্ব্বক

প্রস্তুত হইয়াছে অনুবাদিকা স্বতন্ত্র পত্র নহে রিফার্ম্মরহইতেই অনুবাদ হইবেক এবং প্রয়োজনমতে অন্য২ সম্বাদ পত্রহইতেও কোন উপকারি বিষয় অনুবাদিকাতে স্থান পাইবেক রিফার্ম্মর পত্র প্রকাশে লোকের যেরূপ মঙ্গলের আকার হইতেছে অনুবাদিকাদ্বারাও তাদৃক উপকারের সম্ভাবনা বটে কিন্তু অস্মদ দেশের মধ্যে অনেকে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা অবগত নহেন সুতরাং রিফার্ম্মরে কি প্রকাশ হয় অনেক লোকে তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না তজ্জন্য তৎসম্পাদকের ইচ্ছা যে তাহা সচরাচরে অবগত হইতে পারেন এই মানসে তাঁহারা রিফার্ম্মরের অনুবাদ করিতেছেন অনুবাদিকার পাঠকগণের নিকট সম্পাদকেরা কোন বেতন গ্রহণ করিবেন না বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন সুতরাং অত্রবিষয়ে তাঁহারদের সর্ব্বাংশেই অনুরাগ করা উচিত হয়। দ্বিতীয় অদ্য বুধবার কোন ২ হিন্দু বালকেরদের দ্বারা কলিকাতা ইনফার্ম্মরনামে এক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে ইহার অনুষ্ঠান পত্র পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছিলাম যদিও আমরা প্রথ[illegible] বটে বোধ করিতেছি যে এই পত্র প্রকাশে কোন জনের আহ্লাদের বিরতি হইবেক না যেহেতু ইনফার্ম্মরের অধ্যক্ষেরদের সংকল্প এই যে কোন বিষয় বিবরণে কাহারো মনে পীড়া দিবেন না বিশেষতঃ যিনি সম্পাদকতা করিতেছেন তিনি অত্র বিষয়ে বিচক্ষণ ও পারগ তথাচ আমরা কিছু দিন পত্র দৃষ্টি না করিলে কোন পক্ষে আশ্রয় করিব না নিবেদনমিতি। কস্যচিৎ নিয়ত পাঠকস্য।—সং কৌং।"

(৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৯ ভাদ্র ১২৩৮)

সম্বাদ সারসংগ্রহ ঃ—

"নূতন সম্বাদপত্র।—দর্পণের অপর এক পার্শ্বে এক নূতন সম্বাদ পত্র [সারসংগ্রহ] সংস্থাপনের উপক্রামক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপত্রকারকের অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় তাবৎ সম্বাদপত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া স্বীয় পত্রের মূল্য ২ টাকা করেন। তাঁহার এই প্রস্তাব শ্রবণে আমরা আহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের কিপর্য্যন্ত বাহুল্য হইয়াছে তাহা ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু আমারদের ভয় হয় যে তাঁহার তাদৃশ গ্রাহক প্রাপ্তি হইবে না। ইহার পূর্ব্বে যে সকল সম্বাদপত্র মাসিক দুই টাকা মূল্যে প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাহা সকলই বিফল হইয়াছে। ইহার দশ বৎসর পরে পাঠকের সংখ্যা যখন দশ গুণ বৃদ্ধি হইবে তখন ঈদৃশ প্রস্তাব সম্ভবিতে পারে।"

(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কার্ত্তিক ১২৩৮)

"সম্বাদ সারসংগ্রহ।—গত ১৪ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সম্বাদ সারসংগ্রহনামক এক নূতন সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছে ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা দৃষ্টি করিয়াছি এইক্ষণে তাহার দোষ গুণ বর্ণনে ক্ষান্ত রহিলাম। যেহেতু উভয় ভাষায় ভাষিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল না এইক্ষণে সারসংগ্রহপ্রকাশক সাহস করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতেই আমরা তুষ্ট হইয়াছি……।—সং চং।"

(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮)

নিত্যপ্রকাশ ঃ—

"অপর লোকপরম্পরা জ্ঞাত হইয়া গত চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি যে নিত্যপ্রকাশনামক এক সমাচারপত্র প্রত্যহ প্রচার হইবেক তৎপ্রকাশকের অভিপ্রায় আমারা পত্রদ্বারা অবগত হইয়াছি তিনি ঐ পত্র ১ টাকা মূল্যে প্রকাশ করিতে বাঞ্ছিত হইয়াছেন। তাহার কারণ কেবল নাস্তিককুল সমূল নির্ম্মূল করিবেন…নিত্যপ্রকাশের আবশ্যক আছে এক্ষণে ঐ পত্র যাহাতে শীঘ্র প্রকাশ পায় তাহা সাধু সদাশয় মহাশয়দিগের সর্ব্বদা যত্ন করা উচিত।

(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮)

"নূতন সম্বাদপত্র।— প্রায় প্রতিসপ্তাহেই একটা২ নূতন সম্বাদপত্র প্রকাশ পাইতেছে শুনা যাইতেছে যে এইক্ষণে চারিটার ন্যূন নয় প্রস্তুত হইতেছে তন্মধ্যে একটা প্রতিদিবস দেদীপ্যমান হইবে কিন্তু এই ব্যবহার দেশের বর্ত্তমানাবস্থায় অপরামৃশ্য বোধ হয়। সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র পূর্ণ করিতে যে পরিশ্রম সে অল্প নয় তবে যে সম্বাদপত্র প্রতিদিন প্রকাশিত হইবে তৎপ্রস্তুতকরণে সম্পাদকের কিপর্য্যন্ত পরিশ্রম হইবে তাহা কহা যায় না। এবং ব্যয়ও যে ন্যূন হইবে এমত নয় সে যাহা হউক সম্বাদপত্রের বৃদ্ধিতে জ্ঞানের বৃদ্ধি বোধ হইতেছে ইহাতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছি এবং তাবৎ সম্বাদপত্রের হিন্দুরদের মধ্যে যে পৌষ্টিকতা

হয় এমত আমারদের ইচ্ছা। এই রাজধানীর ব্যাপ্য ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় কেবল সাত সম্বাদপত্র আছে কিন্তু এইক্ষণে এতদ্দেশীয় লোক সম্বন্ধীয় চতুর্দ্দশ সংখ্যক সম্বাদ-পত্র চলিতেছে এবং অনুমান হয় যে বৎসর অবসান না হইতে২ তাহা বিংশতিসংখ্যক পর্য্যন্ত হইবে।"

—

(১২ নভেম্বর ১৮৩১। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩৮)

সম্বাদ সৌদামিনী :—

"সম্বাদ সৌদামিনী।—অবিরত নিয়ত ধর্ম্মনিরত বিধর্ম্ম-বিরত পরোপকারব্রত দীক্ষিত সুশিক্ষিত মহাশয় মহোদয়েরদের প্রতি সংপ্রতি কিঞ্চিদাত্ম নিবেদন করিতে সাহসী হইলাম ইহা শ্রবণে মহাশয়েরা শ্রবণপরিশ্রম স্বীকার করিলে আমার পরিশ্রম সফল হয়।

এই মহারাজধানী কলিকাতানগরে অনেক২ বিজ্ঞ মহাশয়েরা বহুবিধ সম্বাদ পত্র প্রকাশকরণক বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ লোকের বিজ্ঞান প্রদানদ্বারা নানাবিধোপকার করিতেছেন এবং গ্রাহক মহাশয়েরদিগের আনুকূল্য তন্নির্ব্বাহোপযুক্ত ব্যয়ে ক্লেশপ্রাপ্ত না হইয়াও তত্তবিষয় সম্পাদনদ্বারা অনায়াসে পুণ্য যশোভাগী হইতেছেন আমিও তদ্দৃষ্টে লোভাবিষ্ট হইয়া অভিষ্ট করিয়াছি যে সম্বাদ সৌদামিনীনামিকা সাপ্তাহিকী পত্রিকা সাধারণ ধারানুসারে প্রকাশ করিয়া তত্তন্মহামহিম মহাশয়েরদিগের মধ্যে গণ্য হই তাহা মহাশয়েরদিগের কৃপা কটাক্ষপাতব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না।

আমরা এমত মহতী প্রত্যাশা করি যে যদ্যপি মহাশয়েরা স্বীয়২ সহজ নানাগুণে ও বিবিধ সম্বাদপত্রাবলোকনে ও নানা কাব্যরসাস্বাদনে সতত তৃপ্তান্তঃকরণ থাকেন তথাপি আমার এই সম্বাদ সৌদামিনীতে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে বিরক্ত হইবেন না।

অতএব ভাবি ভব্য ভাবনাতৎপর মহানুভব ব্যক্তি কৃত সাহায্যাবলম্বনে উক্ত সম্বাদ সৌদামিনীসংজ্ঞক অভিনবপত্র প্রকাশকরণে উদ্যোগানন্তর সম্পন্ন করিয়া প্রতি গুরুবাসরে স্বনাম ধামাঙ্ককারিরদিগের সন্নিধানে সমর্পণ করা যাইবেক এতন্নির্ব্বাহকরণানুকূল্যার্থ মূল্য প্রতিমাসে ১ এক তঙ্কা নিরূপিতা হইল ইতি।

সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দত্ত।—সং রং।"

—

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮)

দলবৃত্তান্ত :—

"শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়। আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃত্তান্তনামক এক সমাচারপত্র প্রচার হইবেক যাবৎ প্রকাশ না হয় তাবৎকাল ঐ বৃত্তান্ত চন্দ্রিকাপত্রে প্রকাশ পাইবেক…।" ("বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম")

—

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৭ পৌষ ১২৩৮)

জ্ঞানোদয় :—

"নূতন গ্রন্থোদয়। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন মিত্র মহাশয় জ্ঞানোদয়সংজ্ঞক এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম এবং কএক পত্রসম্পাদক মহাশয়েরা উক্ত গ্রন্থের যে সাধুবাদ করিয়াছেন তাহাতে সম্যকপ্রকারে বোধ হইতেছে যে ঐ জ্ঞানোদয় জ্ঞানোদয় করিবার যোগ্য হইতে পারিবে সে যাহা হউক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া তাহা দৃষ্টি না করিলে আমরা তাহার বিশেষ গুণাগুণ কহিতে অপারক…।"

(১০ মার্চ ১৮৩২। ২৮ ফাল্গুন ১২৩৮)

"শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুত কৃষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদয়-নামক বাঙ্গালি মাগজিনের প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওয়া গেল। তাহাতে বোধ হয় যে এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং ঐ মহাশয়েরদের এ অতিপ্রশংসনীয় কর্ম্ম অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমারদের অত্যন্তাহ্লাদ।"

—

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৭ পৌষ ১২৩৮)

সমাচার দর্পণের দ্বিসাপ্তাহিক সংস্করণ :—

"দর্পণগ্রাহক মহাশয়েরদের প্রতি নিবেদন।…গ্রাহক মহাশয়েরদের মধ্যে অনেকেই সপ্তাহে বারদ্বয় দর্পণ প্রকাশ করিতে আমারদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন অতএব

প্রস্তুত হইয়াছে অনুবাদিকা স্বতন্ত্র পত্র নহে রিফার্ম্মরহইতেই অনুবাদ হইবেক এবং প্রয়োজনমতে অন্য২ সম্বাদ পত্র-হইতেও কোন উপকারি বিষয় অনুবাদিকাতে স্থান পাইবেক রিফার্ম্মর পত্র প্রকাশে লোকের যেরূপ মঙ্গলের আকার হইতেছে অনুবাদিকাদ্বারাও তাদৃক উপকারের সম্ভাবনা বটে কিন্তু অস্মদ দেশের মধ্যে অনেকে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা অবগত নহেন সুতরাং রিফার্ম্মরে কি প্রকাশ হয় অনেক লোকে তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না তজ্জন্য তৎসম্পাদকের ইচ্ছা যে তাহা সচরাচরে অবগত হইতে পারেন এই মানসে তাঁহারা রিফার্ম্মরের অনুবাদ করিতেছেন অনুবাদিকার পাঠকগণের নিকট সম্পাদকেরা কোন বেতন গ্রহণ করিবেন না বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন সুতরাং অত্রবিষয়ে তাঁহারদের সর্ব্বাংশেই অনুরাগ করা উচিত হয়। দ্বিতীয় অন্য বুধবার কোন ২ হিন্দু বালকেরদের দ্বারা কলিকাতা ইনকার্ম্মরনামে এক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে ইহার অনুষ্ঠান পত্র পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছিলাম যদিও আমরা [illegible] বোধ করিতেছি যে এই পত্র প্রকাশে কোন জনের আহ্লাদের বিরতি হইবেক না যেহেতু ইনকার্ম্মরের অধ্যক্ষেরদের সঙ্কল্প এই যে কোন বিষয় বিবরণে কাহারো মনে পীড়া দিবেন না বিশেষতঃ যিনি সম্পাদকতা করিতেছেন তিনি অত্র বিষয়ে বিচক্ষণ ও পারগ তথাচ আমরা কিছু দিন পত্র দৃষ্টি না করিলে কোন পক্ষে আশ্রয় করিব না। নিবেদনমিতি। কস্যচিৎ নিয়ত পাঠকস্য।—সং কৌং।"

(৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ১৯ ভাদ্র ১২৩৮)

সম্বাদ সারসংগ্রহ ঃ—

"নূতন সম্বাদপত্র।—দর্পণের অপর এক পার্শ্বে এক নূতন সম্বাদ পত্র [সারসংগ্রহ] সংস্থাপনের উপক্রামক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপত্রকারকের অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় তাবৎ সম্বাদপত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া স্বীয় পত্রের মূল্য ২ টাকা করেন। তাঁহার এই প্রস্তাব শ্রবণে আমরা আহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের কিপর্য্যন্ত বাহুল্য হইয়াছে তাহা ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু আমারদের [illegible] যে তাঁহার তাদৃশ গ্রাহক প্রাপ্তি হইবে না। ইহার পূর্ব্বে যে [illegible] সম্বাদপত্র মাসিক দুই টাকা মূল্যে প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাহা সকলই বিফল হইয়াছে। ইহার দশ বৎসর পরে পাঠকের সংখ্যা যখন দশ গুণ বৃদ্ধি হইবে তখন ঈদৃশ প্রস্তাব সম্ভবিতে পারে।"

(২২ অক্টোবর ১৮৩১ । ৭ কার্ত্তিক ১২৩৮)

"সম্বাদ সারসংগ্রহ।—গত ১৪ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সম্বাদ সারসংগ্রহনামক এক নূতন সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছে ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা দৃষ্টি করিয়াছি এইক্ষণে তাহার দোষ গুণ বর্ণনে ক্ষান্ত রহিলাম। যেহেতু উভয় ভাষায় ভাষিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল না এইক্ষণে সার-সংগ্রহপ্রকাশক সাহস করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতেই আমরা তুষ্ট হইয়াছি……।—সং চং।"

(১ অক্টোবর ১৮৩১ । ১৬ আশ্বিন ১২৩৮)

নিত্যপ্রকাশ ঃ—

"অপর লোকপরম্পরা জ্ঞাত হইয়া গত চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি যে নিত্যপ্রকাশনামক এক সমাচারপত্র প্রত্যহ প্রচার হইবেক তৎপ্রকাশকের অভিপ্রায় আমারা পত্রদ্বারা অবগত হইয়াছি তিনি ঐ পত্র ১ টাকা মূল্যে প্রকাশ করিতে বাঞ্ছিত হইয়াছেন। তাহার কারণ কেবল নাস্তিক-কুল সমূল নির্ম্মূল করিবেন…নিত্যপ্রকাশের আবশ্যক আছে এক্ষণে ঐ পত্র যাহাতে শীঘ্র প্রকাশ পায় তাহা সাধু সদাশয় মহাশয়দিগের সর্ব্বদা যত্ন করা উচিত।

(১ অক্টোবর ১৮৩১ । ১৬ আশ্বিন ১২৩৮)

"নূতন সম্বাদপত্র।— প্রায় প্রতিসপ্তাহেই একটা২ নূতন সম্বাদপত্র প্রকাশ পাইতেছে শুনা যাইতেছে যে এইক্ষণে চারিটার ন্যূন নয় প্রস্তুত হইতেছে তন্মধ্যে একটা প্রতিদিবস দেদীপ্যমান হইবে কিন্তু এই ব্যবহার দেশের বর্ত্তমানাবস্থায় অপরামৃশ্য বোধ হয়। সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র পূর্ণ করিতে যে পরিশ্রম সে অল্প নয় তবে যে সম্বাদ-পত্র প্রতিদিন প্রকাশিত হইবে তৎপ্রস্তুতকরণে সম্পাদকের কিপর্য্যন্ত পরিশ্রম হইবে তাহা কহা যায় না। এবং ব্যয়ও যে ন্যূন হইবে এমত নয় সে যাহা হউক সম্বাদপত্রের বৃদ্ধিতে জ্ঞানের বৃদ্ধি বোধ হইতেছে ইহাতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছি এবং তাবৎ সম্বাদপত্রের হিন্দুরদের মধ্যে যে পৌত্তিকতা

হয় এমত আমারদের ইচ্ছা। এই রাজধানীর ব্যাপ্য ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় কেবল সাত সম্বাদপত্র আছে কিন্তু এইক্ষণে এতদ্দেশীয় লোক সম্বন্ধীয় চতুর্দ্দশ সংখ্যক সম্বাদ-পত্র চলিতেছে এবং অনুমান হয় যে বৎসর অবসান না হইতে২ তাহা বিংশতিসংখ্যক পর্য্যন্ত হইবে।"

(১২ নভেম্বর ১৮৩১। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩৮)

সম্বাদ সৌদামিনী :—

"সম্বাদ সৌদামিনী।—অবিরত নিয়ত ধর্ম্মনিরত বিধর্ম্ম-বিরত পরোপকারব্রত দীক্ষিত সুশিক্ষিত মহাশয় মহোদয়েরদের প্রতি সংপ্রতি কিঞ্চিন্মাত্র নিবেদন করিতে সাহসী হইলাম ইহা শ্রবণে মহাশয়েরা শ্রবণপরিশ্রম স্বীকার করিলে আমার পরিশ্রম সফল হয়।

এই মহারাজধানী কলিকাতানগরে অনেক২ বিজ্ঞ মহাশয়েরা বহুবিধ সম্বাদ পত্র প্রকাশকরণক বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ লোকের বিজ্ঞান প্রদানদ্বারা নানাবিধোপকার করিতেছেন এবং গ্রাহক মহাশয়েরদিগের আনুকূল্য তন্নির্ব্বাহোপযুক্ত ব্যয়ে ক্লেশপ্রাপ্ত না হইয়াও তত্তদ্বিষয় সম্পাদনদ্বারা অনায়াসে পুণ্য যশোভাগী হইতেছেন আমিও তদ্দৃষ্টে লোভাবিষ্ট হইয়া অভিষ্ট করিয়াছি যে সম্বাদ সৌদামিনীনামিকা সাপ্তাহিকী পত্রিকা সাধারণ ধারানুসারে প্রকাশ করিয়া তত্তন্মহামহিম মহাশয়েরদিগের মধ্যে গণ্য হই তাহা মহাশয়েরদিগের কৃপা কটাক্ষপাতব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না।

আমরা এমত মহতী প্রত্যাশা করি যে যদ্যপি মহাশয়েরা স্বীয়২ সহজ নানাগুণে ও বিবিধ সম্বাদপত্রাবলোকনে ও নানা কাব্যরসাস্বাদনে সতত তৃপ্তান্তঃকরণ থাকেন তথাপি আমার এই সম্বাদ সৌদামিনীতে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে বিরক্ত হইবেন না।

অতএব ভাবি ভব্য ভাবনাতৎপর মহানুভব ব্যক্তি কৃত সাহায্যাবলম্বনে উক্ত সম্বাদ সৌদামিনীসংজ্ঞক অভিনবপত্র প্রকাশকরণে উদ্যোগানন্তর সম্পন্ন করিয়া প্রতি শুক্রবাসরে স্বনাম ধারাঙ্ককারিরদিগের সন্নিধানে সমর্পণ করা যাইবেক এতন্নির্ব্বাহকরণানুকূল্যার্থ মূল্য প্রতিমাসে ১ এক তঙ্কা নিরূপিতা হইল ইতি।

সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দত্ত।—সং রং।"

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮)

দলবৃত্তান্ত :—

"শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়। আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃত্তান্তনামক এক সমাচারপত্র প্রচার হইবেক যাবৎ প্রকাশ না হয় তাবৎকাল ঐ বৃত্তান্ত চন্দ্রিকাপত্রে প্রকাশ পাইবেক···।" ("বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম")

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৭ পৌষ ১২৩৮)

জ্ঞানোদয় :—

"নূতন গ্রন্থোদয়। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন মিত্র মহাশয় জ্ঞানোদয়সংজ্ঞক এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম এবং কএক পত্রসম্পাদক মহাশয়েরা উক্ত গ্রন্থের যে সাধুবাদ করিয়াছেন তাহাতে সম্যকপ্রকারে বোধ হইতেছে যে ঐ জ্ঞানোদয় জ্ঞানোদয় করিবার যোগ্য হইতে পারিবে সে যাহা হউক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া তাহা দৃষ্টি না করিলে আমরা তাহার বিশেষ গুণাগুণ কহিতে অপারক···।"

(১০ মার্চ ১৮৩২। ২৮ ফাল্গুন ১২৩৮)

"শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুত কৃষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদয়-নামক বাঙ্গালি মাগজিনের প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওয়া গেল। তাহাতে বোধ হয় যে এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং ঐ মহাশয়েরদের এ অতিপ্রশংসনীয় কর্ম্ম অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমারদের অত্যন্তাহ্লাদ।"

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৭ পৌষ ১২৩৮)

সমাচার দর্পণের দ্বিসাপ্তাহিক সংস্করণ :—

"দর্পণগ্রাহক মহাশয়েরদের প্রতি নিবেদন।···গ্রাহক মহাশয়েরদের মধ্যে অনেকেই সপ্তাহে বারদ্বয় দর্পণ প্রকাশ করিতে আমারদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন অতএব

এইক্ষণে তাঁহারদের ইচ্ছাবিষয়সম্পন্নের সময় উপস্থিত জ্ঞান করিলাম।...

এইক্ষণে আমারদিগের মানস হইয়াছে যে ১৮৩২ সালের প্রথমঅবধি করিয়া প্রতি বুধবারে অপর এক দর্পণপত্র প্রকাশ করি ঐ দ্বিতীয় পত্রে অত্যাবশ্যক না হইলে আমরা কোন ইশ্‌তেহার বা এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রহইতে গৃহীত বা প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি সে সকল পূর্ব্ববৎ শনিবারের পত্রেই প্রকাশিত হইবে। বুধবারের দর্পণে আমারদিগের স্বকপোলরচিত বিষয়মাত্র থাকিবে তন্মধ্যে দুই পৃষ্ঠায় প্রাচীন সর্ব্বসাধারণ সম্বাদ অপর পৃষ্ঠদ্বয়ে টাট্‌কা২ সম্বাদ প্রকাশ পাইবে।...

অতএব প্রতিসপ্তাহে দর্পণ দুইবার প্রকাশকরণের আবশ্যক হওয়াতে দেড় টাকা করিয়া মূল্য স্থির করা গেল...।

অতিরিক্ত দর্পণের প্রথম সংখ্যা আগামি ১১ জানুয়ারি বুধবার প্রকাশ পাইবে।"

(১১ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮)

"এইক্ষণে আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক দর্পণের অতিরিক্ত প্রথম কর্দ্দ পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করিতেছি উত্তরকালে তাহা প্রতি বুধবার পূর্ব্বাহ্নে প্রকাশ হইবে।"

(২১ জানুয়ারি ১৮৩২। ৯ মাঘ ১২৩৮)

এদেশীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস :—

"কলিকাতা রাজধানীতে এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রের উৎপত্তি।—কলিকাতা রাজধানীতে এইক্ষণে যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহার এক প্রস্তাব তিমিরনাশক পত্র হইতে আমরা গ্রহণ করিয়া ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তর করিলাম।...ঐ সমানুষ্ঠায়ির কিয়ৎ ২ কথাতে আমারদিগের সম্মতি নাই...।"

"পাঠকবর্গনিকটে সমাচারপত্র বিষয়ের আপীল।

এপ্রদেশে ইঙ্গলণ্ডাধিপতির আগমনে সমাচারপত্র পদার্থনামক উপাদেয় দ্রব্য দর্শন হইল কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ মহাশয়েরাও তাহার মর্ম্মাবগত ছিলেন না পরে অনেককালাবসানে কোন ২ রাজকর্ম্মকারি মুৎসুদ্দি মহাশয়েরা সমাচারপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাহাতে রাজকর্ম্মের নিয়োগ এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও দ্রব্যাদির বিক্রয়ের সম্বাদ ইত্যাদি বিষয় অনেকের প্রয়োজন ছিল এইমতে বহুকাল গতে কলিকাতা জরনেলনামক কাগজের সৃষ্টি হইলে তাহাতে বকিংহেম সাহেব আপন মুন্সীগিরী অনেক প্রচার করিতে লাগিলেন অর্থাৎ কৌন্সেলের গবর্ণমেণ্টের কৃত কর্ম্মের প্রতি অনেক কটাক্ষকরাতে তদ্বিপক্ষ জান বুল কাগজ সৃষ্টি হয় তাহা প্রথমে এতন্নগরে বর্ষাকালের বৃষ্টির ন্যায় বরিষণ হইল এইপ্রকার কাগজের আন্দোলনে এপ্রদেশীয় অনেক বিদ্বানলোক সমাচারকাগজ পড়িতে বড় রত হইলেন যাঁহারা ইঙ্গরেজী না জানেন তাঁহারাও সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিলেন অদ্যকার জরনেল কি লিখিয়াছে জানবুলে বা তাহার কি উত্তর হইয়াছে ইহাতে অনেকে ব্যগ্র হইলেন।

সমাচার দর্পণ মিসেনরি সাহেবদিগের বাঙ্গলা কাগজ অনেক লোক গ্রহণ করেন নাই অর্থাৎ ধর্ম্মদ্বেষিরা কাগজ করিয়াছেন অবশ্যই ইহাতে আমারদিগের ধর্ম্মের দ্বেষ আছে বহুদিবসের পরে জানা গেল তাহাতে কেবল নানা দিগ্‌দেশীয় সমাচার প্রচার হয় পরে ক্রমে অনেকে তাহার আদর করিলেন সমাচার দর্পণে কতকগুলিন প্রেরিতপত্র প্রথম প্রকাশ হয় তাহাতে এপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য কুলীন ঠাকুরদিগের নিন্দা ও বৈষ্ণবদিগের প্রতি শ্লেষ প্রকাশ হইল ইত্যাদি দেখিয়া অনেক বিশিষ্টলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন আমারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি একটা সমাচারের কাগজ যদ্যপি সৃষ্টি করেন তবে উত্তম হয় কিছুদিন পরে শুনিলাম শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত তারাচাঁদ দত্তজ ঐক্য হইয়া সম্বাদ কৌমুদী নাম দিয়া এক কাগজ ১২২৮ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রকাশ করেন তাহার মূল্য দুই টাকা স্থির করিলেন এতন্নগরমধ্যে ঐ কাগজ মহাসমাদৃত হইল যেহেতুক হিন্দুর নিউস পেপর হইয়াছে ইহাতে অজ্ঞ বিজ্ঞ সাধারণের আনন্দ জন্মিল ঐ কাগজ সৃজনসময়ে জেম্‌স কাল্‌ডর সাহেব অনেক সাহায্য করেন এবং তিনি এমত সাহস দিয়াছিলেন যে যত দিন ঐ কাগজের গ্রাহকদ্বারা ব্যয়ের আনুকূল্য না হয় তবে আমি সাহায্য করিব দুই তিন মাস গতে দত্তজের এক অনুষ্ঠান

শ্রীযুত হরিহর দত্ত ঐ কাগজের এক সহকারী হইলেন ইহাতে তাঁহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্ছা করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহার কটাক্ষ করা মত এজন্য তাঁহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর সহিত অনৈক্য হইল তিনি ঐ কাগজ-প্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে ধর্ম্মহানি এবং হিন্দুসমাজে মানহানি জানিয়া কৌমুদী ত্যাগ করিয়া ঐ সালের ফাল্গুনে সমাচার চন্দ্রিকানামক কাগজের সৃষ্টি করেন ইহাতে কৌমুদী ও চন্দ্রিকায় ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল শেষ দত্তজ কৌমুদী কাগজ ত্যাগ করেন পরে কৌমুদীর অনেক দুর্দ্দশা হইয়াছিল সে অনেক কথা অর্থাৎ কৌমুদী হিন্দুমত হইতে একেবারে বহিষ্কৃত হইল মধ্যে ২ এক বৎসর পড়িয়া যায় শেষ এক জন ঐ নাম ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার কাগজ করে এইমত কতককাল গেল এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় কৌমুদী-নামে কাগজ করিতেছেন ঐ কাগজের গ্রাহক কেবল সতীদ্বেষী কএক মহাশয়েরা আছেন শুনিয়াছি তাহার ব্যয়নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী ১৬ টাকা আর শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এত দিনে কোন স্থানে মিলাইয়া যাইতেন যাহা হউক বাঙ্গালিরদিগের মধ্যে চন্দ্রিকা ও কৌমুদী এই দুই কাগজ ছিলমাত্র চন্দ্রিকার ক্রমে ২ উন্নতি হইতে লাগিল কারণ যত ধর্ম্ম স্ততোজন্য অর্থাৎ সপ্তাহে দুইবার হইয়া পাঁচ শতাধিক গ্রাহক হইল।

অপর সন ১২৩০ সালের কার্ত্তিক মাসে তিমিরনাশক-নামক এ অকিঞ্চনদ্বারা সৃষ্টি হয় ৭ বৎসর প্রচলিত হইলে পরে ১২৩৭ সালাবধি সপ্তাহেতে দুইবার প্রকাশ করিতেছি এইক্ষণে পাঠকবর্গের কৃপায় তিমিরনাশকের বিনাশের আশা দূরে গিয়া অনেক প্রত্যাশা হইতেছে এই সকল দেখিয়া অনেকে সমাচার কাগজ করিতে মানস করিলেন।

প্রথমতঃ সন ১২৩৬ সালে বঙ্গদূত শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় তাহার প্রকাশক হইয়াছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না কেননা সুপ্রিম কোর্টে কাগজের দায়ে দোষী হইয়াও তথাচ কাগজ করিতেছিলেন শেষে সতীদ্বেষী হইতে আদেশ হয় তাহাতেই ত্যক্ত হইয়া ত্যাগ করিলেন শ্রীযুত ভোলানাথ সেন সতী বিপক্ষ হইতে মহানন্দে মগ্ন হইয়া বঙ্গদূতের এডিটর নাম প্রকাশ করিলেন শেষে বঙ্গ ভূতরূপে কাগজ হিন্দুসমাজে খ্যাত হইল তাহার কাহিনি কত লিখিব।

সন ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে প্রভাকর পত্র উদয় হয় তাহার কিরণে বুঝি জগৎ আলোক হইবেক এমনি প্রখর কিরণ প্রকাশ হইল তাহার কারণ কেবল ধর্ম্মপক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল নচেৎ তাহাতে মুন্সীআনা বা বিদ্যা বুদ্ধি কোন কথাই প্রকাশ পায় নাই কেবল নাস্তিকদিগকে অনেক কটু কহিয়াছিল তাহাতে হিন্দুসমাজে মান্য হইল কেননা ভদ্রলোক নাস্তিকের সঙ্গে বিবাদ করিতে কেহ বাসনা করেন না সুতরাং প্রভাকর অকুতোভয়ে অনেক পটাল পাড়িয়াছিল এইক্ষণে তিনি ধর্ম্মদ্বেষী হইয়াছেন যদি তাহার এতাদৃশ প্রবলতা এখন থাকে তবে জানি বৈদ্যপোর ক্ষমতা অথবা তাহার মুনসিফির যোগ্যতা।

ঐ সনের ৫ ফাল্গুনে সুধাকর সৃজন হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত প্রেমচাঁদ রায় তিনিও ঐ ঈশ্বর বদ্দির বড় ভাই তিনি কাগজ করিয়া ধর্ম্মদ্বেষারম্ভ করিলেন তাহাতেই তাঁহার দফা রফা হয় এক্ষণে দিবার প্রদীপের ন্যায় টিম২ করিতেছেন কিন্তু আস্ফালন বড় কথন কহেন প্রত্যহ কাগজ প্রকাশ করিব কিন্তু কাগজ কে লয় আর কে লইবেক তাহা জানি না তাঁহারাও জানেন না শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর মহাশয় দয়া করিয়া একটা প্রেস ও কতকগুলিন অক্ষর কিনিয়া দিয়াছেন তাহাতেই কর্ম্ম চলিতেছে আর কিছুদিন এই প্রকারে চলিবেক।

ঐ ফাল্গুন মাসে সভারাজেন্দ্রের জন্ম হয় তাহাতে পারসী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় চারি তক্তা কাগজ প্রতি সোমবার প্রচার হয় তাহাতে অনেক মুসলমান ও হিন্দু গ্রাহক হইলেন এক্ষণে নূতন কাগজের মধ্যে সভারাজেন্দ্র অগ্রগণ্য বলা যায় তাহার প্রতিকারণ ধর্ম্মপক্ষে আছেন।

সন ১২৩৮ সালের ৫ আষাঢ়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গলা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা

তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্ত কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট মন্তপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্ত ভদ্রলোকমাত্র ঐ কাগজ কেহ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেন।

বর্ত্তমান সনের ৭ ভাদ্রে রত্নাকর পত্র প্রকাশ হয় ইহার প্রকাশকের মত যাহাতে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হয় তাহার উপায় অবশ্যকর্ত্তব্য তিনি ইহার লাভাকাঙ্ক্ষি নহেন যাহা হউক তাঁহার গুণ পশ্চাৎ লিখিব।

এইক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট আমারদিগের আপীল এই সম্বাদপত্র সৃজন হওয়াতে মনে করিয়াছিলাম দেশের উপকার হইবেক ও প্রকাশকেরাও প্রতিপালন হইবেন তাহা না হইয়া কেবল অমঙ্গলের কারণ দর্শন হইতেছে যেহেতুক আদৌ ভদ্র লোকের অপমানসূচক কথা লেখা আর যে বিষয়ে প্রজার ক্লেশ আছে তাহার প্রার্থনা করিলে অবোধ প্রকাশকেরা মনে করে কথার উত্তর দিতে হইবেক এ জন্ত তাহার বিপরীত লেখে ইহাতে রাজাও সন্দিগ্ধ হইতে পারেন অপর যাহাতে হিন্দুর ধর্ম্মহানি হইবেক তজ্জন্তই অনেকের যত্ন অতএব মহাশয়েরা ইহার উচিত বিবেচনা করুন যদি বল আমারদিগের হইতে কি হইতে পারে কাগজের বিষয়ের কর্ত্তা তদ্‌গ্রাহক যে কাগজ যাহারদিগের অপাঠ্য বোধ হয় তৎক্ষণাৎ তাহাসকল ত্যাগ করুন তাহা হইলেই সে কাগজ রহিত হইতে পারে যদি বল অনুবাদিকার স্তায় বিনামূল্যে লোকের দ্বারে ফেলিয়া দিবেক তাহা হইবে না কেননা শ্রীযুত বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর অজ্ঞান নহেন রিফারমর কাগজ দুই টাকা করিয়া বিক্রয় করেন তাহাতে অনেক মুনফা আছে অনুবাদিকা অমনি দিতে পারেন অজ্ঞ লোক কয়দিন দিবেক আর যাহার কোন মূল্য নাই তাহা কে পাঠ করেন অতএব যদি দেশের ভদ্র মহাশয়েরা দেশের ভদ্র আকাঙ্ক্ষি হন তবে ছাপার কাগজের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করুন ইতি। তিং নাং।"

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ২৩ মাঘ ১২৩৮)

সংবাদপত্রের সংখ্যা-হ্রাস :—

"সমাচারপত্র রহিত।—কলিকাতা নগরে সংপ্রতি যেরূপ সমাচারপত্রের বৃদ্ধি হইয়াছিল তেমনি হ্রাসতা হইতেছে প্রথমতঃ শাস্ত্র প্রকাশকনামক এক পত্র বন্ধ হইল দ্বিতীয় সারসংগ্রহ কিছু দিন প্রকাশ হইয়া স্থগিত হয় তৃতীয় রত্নাকর পত্র বর্ত্তমান মাসঅবধি রহিত হইয়াছে সম্বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিন কাগজ বন্ধ হইল ইহাতে মনে করি যে ক্রমে২ নূতন কাগজ সকলেরই ঐ দশা প্রাপ্তি হইবেক ইতি।" ("বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম্ম")

(২১ এপ্রিল ১৮৩২। ৩১ চৈত্র ১২৩৮)

কলিকাতা গেজেট :—

"কলিকাতা গেজেটের ১ সংখ্যা গত শনিবারে [৭ই এপ্রিল] কলিকাতায় প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে কেবল গবর্ণমেণ্ট এবং নানা আদালতের আজ্ঞা ও ইশ্‌তেহার প্রকাশিত আছে এবং লণ্ডননগরে যে গেজেট মুদ্রাঙ্কিত হয় প্রায় তদনুরূপই হইয়াছে।"

(১৪ এপ্রিল ১৮৩২। ২৪ চৈত্র ১২৩৮)

গবর্ন্মেণ্ট গেজেট :—

"সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে যে এই মাসের আরম্ভাবধি কলিকাতা গেজেটনামে গবর্ণমেণ্টসম্পর্কীয় এক সম্বাদপত্র অর্ফান সোসৈটির যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইবে। ঐ গেজেটে গবর্ণমেণ্টের তাবৎ বিজ্ঞাপন ও ইশ্‌তেহার প্রকাশ পাইবে।

এইক্ষণকার গবর্ণমেণ্ট গেজেটের পরিবর্ত্তে উপরি উক্ত যন্ত্রালয়ে প্রতি বুধবার ও শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতা কুরিয়রনামক অপর এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ হইবে।"

(৩ এপ্রিল ১৮৩৩। ২২ চৈত্র ১২৩৯)

কলিকাতা কুরিয়র :—

গত ১ আপ্রিলঅবধি কলিকাতা কুরিয়র সম্বাদপত্র প্রত্যহ প্রকাশ হইতে লাগিল অন্তান্ত কলিকাতার প্রাত্যহিক প্রকাশিত সম্বাদপত্রের যে মূল্য ঐ পত্রেরও তন্মূল্য।"

(৫ মে ১৮৩২। ২৪ বৈশাখ ১২৩৯)

বিজ্ঞান শেবধি :—

"ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রন্থের অনুবাদকারি সোসৈটি ইতিসংজ্ঞক এক সমাজের দ্বারা বঙ্গভাষায় অতিপরোপকারক বিজ্ঞান শেবধিনামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবং ঐ গ্রন্থের ১ সংখ্যা সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীযুত লার্ড ব্রুম সাহেবের বিদ্যার অভিপ্রায় ও উপকার ও আহ্লাদজ্ঞাপক গ্রন্থের একাংশ শ্রীযুত অমরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুত কাশীপ্রসাদ ঘোষজকর্তৃক ভাষান্তরিত হইয়া ঐ সমাজের দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে এই ১ সংখ্যায় প্রকাশিত এক ইশ্‌তেহারদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ সমাজের অভিপ্রায় এই যে পরোপকারক গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলেখ্যক্রমে স্বদেশস্থ লোকেরদের উপকারার্থ ইউরোপীয় বিদ্যার গ্রন্থমালা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবেন। ঐ সকল গ্রন্থের এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থসকলের প্রত্যেক সংখ্যায় পঞ্চাশ ২ পৃষ্ঠা ভাষান্তরিতকরণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবেন। এই ব্যাপার শ্রীযুক্ত ডাক্তর উইলসন সাহেবের আনুকূল্যে হইতেছে তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তারদের যথোচিত যশস্বিতা প্রকাশ হইতেছে···।"

(৪ আগষ্ট ১৮৩২। ২১ শ্রাবণ ১২৩৯)

রত্নাবলি :—

"রত্নাবলিনামক নূতন সম্বাদ পত্রের যে ১ সংখ্যা সম্পাদককর্তৃক আমারদিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল তাহা আমারদের কর্তৃক প্রকাশ হওনের কিঞ্চিদ্বিলম্ব হওয়াতে যে ত্রুটি হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় তাহা মার্জ্জন করিয়া আমারদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। ঐ রত্নাবলি পত্র অতিপারিপাট্যরূপে প্রস্তুত হইয়াছে কথিত আছে যে শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে ঐ রত্নাবলির কিরণাবলিতে দিগ্‌ দেদীপ্যমানা হইতেছে।"

(৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

মফঃসল আকবার :—

"আগরা হইতে মফঃসল আকবারনামে ইঙ্গরেজী ভাষায় ১ সংখ্যক এক সম্বাদ পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।"

(৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

সম্বাদ কৌমুদী :—

"সর্ব্বজনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্বে কৌমুদীর লেখক ও সাহায্যকারী যিনি ছিলেন তেঁহ কোন আবশ্যকতাতে বাধিত হইয়া ঐ কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন এক্ষণে তাঁহার পরিবর্ত্তে নবীন লেখক ও সাহায্যকারী এই দিসেম্বর মাসের প্রথমহইতে হইলেন···।—কৌমুদী।";

(২ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২০ পৌষ ১২৩৯)

দিল্লী আকবর :—

"দিল্লীতে নূতন এক সম্বাদপত্র সংপ্রতি আরম্ভ হইয়া তাহা ইঙ্গরেজী ও পারস্য ভাষায় ভাসমান হইতেছে তাহার নাম দিল্লী আকবর অর্থাৎ উত্তর হিন্দুস্থানীর সম্বাদ পত্র। শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর শ্রীযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য অনেক সেনাপতি ও অতিমান্য সাহেবেরা সমাদরে ঐ সম্বাদপত্রের পৌষ্টিকতা করিতেছেন। তাহার দেড় শত কাপি সহী হইলে অনুমান তৎসম্পাদনের ব্যয় পোষাইবে তদুপরি যত লাভ হইবে তাহা দিল্লী মহানগরস্থ ইঙ্গরেজী কালেজে প্রদত্ত হইবে।"

(২০ মার্চ্চ ১৮৩৩। ৮ চৈত্র ১২৩৯)।

দিল্লী গেজেট :—

"সংপ্রতি দিল্লীতে দিল্লী গেজেটনামক এক নূতন সম্বাদ পত্র প্রকাশারম্ভ হইয়াছে। বোধ হয় যে তাহার ১ সংখ্যা পরশ্বঃ কলিকাতায় হরকরা সম্পাদকের নিকটে পঁহুছে।"

(১৮ জানুয়ারি ১৮৩২। ৬ মাঘ ১২৩৮)

বোম্বে দর্পণ :—

"ইণ্ডিয়া গেজেট পত্র পাঠকরাতে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে বোম্বে রাজধানীতে বোম্বে দর্পণনামক এক সম্বাদ পত্র স্থাপন হইয়াছে তাহা ইংরেজী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রকাশিত হইবে এবং প্রকাশকের অভিপ্রায় এই যে তদ্দেশস্থ লোকেরদের মধ্যে ইঙ্গরেজী ভাষার গ্রন্থের অনুশীলন হয় এবং ইউরোপীয় বিদ্যা সেই স্থানে ব্যাপ্ত হয়।

প্রথমতঃ ঐ পত্র মাসে কেবল দুইবার প্রকাশ পাইবে কিন্তু সাহায্য প্রাপ্ত হইলে তদধিকবার প্রকাশিত হইবেক।"

(২ মে ১৮৩২। ২১ বৈশাখ ১২৩৯)

জাম-ই-জামশেদ :—

"বোম্বে নূতন সম্বাদপত্র।—বোম্বের পত্রহইতে আমরা অবগত হইলাম যে সংপ্রতি গুজরাটি ভাষায় ঐ রাজধানীতে নূতন এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং কথিত আছে যে এতদ্দেশীয় অন্যান্য সম্বাদপত্রাপেক্ষা তাহার সৌন্দর্য্য আছে। তৎপত্র প্রস্তরে মুদ্রিত এবং কি ইউরোপে কি ভারতবর্ষের মধ্যে প্রস্তরেতে প্রথম সম্বাদ পত্র মুদ্রাঙ্কিতকরণ এই হয়।"

(৪ আগষ্ট ১৮৩২। ২১ শ্রাবণ ১২৩৯)

নেটিভ অব্‌জারভার :

"তদ্দেশীয় ভাষায় বোম্বের সম্বাদপত্র।—নেটিব অবজরবর নামক এক সম্বাদপত্র সংপ্রতি বোম্বে সৃজন হইয়া ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রকাশমান হইতেছে এবং বোম্বে ইড্যুকেসন সোসৈটি-কর্তৃক স্থাপিত পাঠশালায় শিক্ষিত এক ব্যক্তি যুবার দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতেছে।...

এতদ্রূপ বোম্বেতে চারি পাঁচ মাসের মধ্যে তদ্দেশীয় ভাষায় চারি সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দর্পণ প্রকাশমান তাহা বোধ করি যে মহারাষ্ট্রীয় ও ইংরেজী ভাষায় হয় দ্বিতীয় জামিজন সদনামক পত্র তাহা কেবল গুজরাটী ভাষাতে হয়। তৃতীয় আইন সেকন্দরনামক এক পত্র পারস্য ভাষায় হয়। চতুর্থ এই নেটিব অবজরবরনামক পত্রের উদয় হয়।

এই মহাদ্বীপের মধ্যে নানা সম্বাদপত্রের দেদীপ্যমানতা দেখিয়া ভারতবর্ষস্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি সুজনগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইবেন কিন্তু তাঁহারা ইহা বিস্মৃত না হন যে এই কলিকাতা রাজধানীর অন্তঃপাতিপ্রদেশেই এতদ্বিষয়ক প্রথম উত্তেজনারম্ভ হয়। এবং ভারতবর্ষে যে সম্বাদপত্র প্রথম মুদ্রাঙ্কিতকরণ সে বঙ্গ-প্রদেশেই হয়।"

(৬ এপ্রিল ১৭৩৩। ২৫ চৈত্র ১২৩৯)

বোম্বায়ে প্রকাশিত সংবাদপত্র :—

"বোম্বাইতে এইক্ষণে এতদ্দেশীয় ভাষায় ষট্‌সংখ্যক সম্বাদপত্র প্রকাশ পাইতেছে।

প্রথমতঃ বোম্বাই সমাচারনামক পত্র দশবৎসরাবধি প্রকাশ হইতেছে।* এই সম্বাদপত্র পূর্ব্বে সপ্তাহে একবার প্রকাশ হইত কিন্তু অনুমান বৎসরাবধি তাহা প্রত্যহ প্রকাশ হইতে লাগিল পরে গ্রাহকের অল্পতাপ্রযুক্ত এইক্ষণে সপ্তাহে দুইবার তাহা পারস্য ও বণিকেরদের স্বাভাবিক গুজরাটী ভাষায় মুদ্রিত হইতেছে তাহার অধিকাংশ গ্রাহক পারসীয়েরা। গ্রাহকেরদের সংখ্যা ১৬০। তাহাতে প্রায় ইঙ্গরেজী সম্বাদ পত্রহইতে সম্বাদ গৃহীত হইয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। সামান্যতঃ সম্পাদকের স্বকপোলরচিত উক্তি অতি সংক্ষেপে কিন্তু তাহা সদ্বিবেচনাপূর্ব্বকই লেখা যায় এবং তাহাতে অহিতজনকাভিপ্রায়ক প্রস্তাব প্রায় অর্পণ করা যায় না।

২। হরকরা ও বর্ত্তমান ইতিসংজ্ঞক পত্র সম্পাদক এমত এক ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন যে তাহাতে ব্যগ্রতা একেবারে দেশময় হইয়াছে এবং ঐ সকল আন্দোলনের দ্বারা অন্য ২ সম্বাদপত্র উত্থাপিত হয়। তিনি ধর্ম্মবিষয়ের বিবেচনা স্বীয় সম্বাদ পত্রে অবাধে অর্পণ করিতেছেন এবং অপরাধিও অন্যায় কার্য্যের নিত্য ভর্ৎসনা করিয়া থাকেন ইহাতে তিনিও অনেক তিরস্কার সহিষ্ণুতা করিয়া ক্রমে লোকেরদের প্রিয় পাত্র হইতেছেন এবং তাঁহার সংবাদ পত্রের দ্বারা এইক্ষণে দিন ২ উপকারেরও বৃদ্ধি হইতেছে। ঐ সম্বাদপত্র এইক্ষণে ইঙ্গরেজী ও গুজরাটি ভাষায় প্রকাশ হইতেছে তাহার গ্রাহক অনুমান এক শত নব্বই জন আছেন তাহার তৃতীয়াংশ ইউরোপীয়। ঐ হরকরা ও বর্ত্তমান সম্বাদ পত্র দেশীয় লোকেরা প্রায়ই পাঠ করিয়া থাকেন এবং যদ্যপি পত্রের মূল্য দানপূর্ব্বক গ্রাহকতারূপে তাহার পৌষ্টিকতা করিতে তাঁহারা বিমুখ থাকুন তথাপি তাহা পাঠ করিতে তাঁহারদের ব্যগ্রতার ন্যূনতা নাই।

৩। বোম্বাই দর্পণ মহারাষ্ট্র ও ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রকাশ হইতেছে ঐ পত্র অত্যন্ত মান্য ও উপকারক। তৎপত্র-সম্পাদক নিজে যাহা লিখিয়া থাকেন এবং অন্য সম্বাদ পত্র হইতে যাহা গ্রহণ করেন ঐ উভয়ই এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের জ্ঞান দান ও ভ্রান্তি দূরকরণের অত্যুপযুক্ত। গ্রাহক অনুমান দুই শত আশী জন তন্মধ্যে অনেকেই হিন্দু। ঐ সম্বাদ পত্রের বিষয়ে এতৎসম্বাদদায়ক মহাশয় লেখেন যে

* ইহা ১৮২২ সালের জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।

সংপ্রতি রাজধানীহইতে অতিদূর এক স্থানে ঐ বোম্বাই দর্পণ এক ব্যক্তির হস্তে দেখিলাম তিনি আমাকে কহিলেন যে এই যে দর্পণ আমি প্রাপ্ত হইয়া থাকি ইহা পঞ্চাশ জন পাঠ করিয়া থাকেন।

৪। জামি জামসদ্।—আমরা শুনিয়াছি যে এই পত্র হরকরা ও বর্ত্তমান পত্রের বিরুদ্ধাচরণার্থ স্থাপিত হয় তাহা গুজরাটী ভাষায় অতিসুন্দররূপে পাথরে মুদ্রাঙ্কিত হয়। ঐ পত্রে কখন ২ অত্যুপকারক প্রস্তাব দর্পণহইতে গৃহীত হইয়া অর্পিত হয় কিন্তু সম্পাদক নিজে কদাচিৎ কিঞ্চিৎ লিখিয়া থাকেন। অতিশিষ্ট বিশিষ্ট মান্য পারসীয়েরদের অনেকের সহিত তাঁহার আলাপ আছে। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান সেই বুদ্ধি যদি সদভিপ্রায়ে যোজন করেন তবে তাঁহার পত্রের দ্বারা অনেক উপকার হইতে পারিবে।

৫। নেটিব অবজরবর্‌নামক পত্র কেবল নামমাত্র নেটিব অর্থাৎ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র যেহেতুক তাহা এক্ষণে ইউরোপীয় সম্বাদপত্রের মধ্যে গণিত হইতে পারে।

৬। আইনা সিকন্দরপত্র এই পর্য্যন্ত কেবল পারস্য ভাষায় প্রকাশ হইত কিন্তু পত্র সম্পাদক স্বীয় এই মানস জ্ঞাপন করিয়াছেন যে ব্যয়োপযুক্ত গ্রাহক প্রাপ্ত হইলে তাহা পারস্য ও হিন্দুস্থানি ভাষায় প্রকাশ করিবেন। ভরসা হয় যে উক্ত দুই ভাষা ইউরোপীয় যে সাহেবেরা শিক্ষা করিতেছেন তাঁহারা এই কার্য্যে বিলক্ষণ পৌষ্টিকতা করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত সম্বাদসকল আমরা খ্রীষ্টীয়ান স্পেক্‌টেটর গ্রন্থহইতে গ্রহণ করিয়াছি।"

(১ জানুয়ারি ১৮৩১। ১৮ পৌষ ১২৩৭)

"১৮৩০ সালের বর্ষফল।—

মার্চ, ৪। কএক জন হিন্দু যুবব্যক্তির দ্বারা ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রকাশিত পার্থিনন নামক এক সম্বাদপত্র ধর্ম্মসভার উদ্যোগেতে নিবৃত্ত হয়।

(৭, ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২)

"১৮৩১ সালের বর্ষফল।—

ফেব্রুআরি, ৫। রিফার্ম্মরনামক এক লিবরাল সম্বাদ পত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় কলিকাতায় প্রকাশ হয়।

জুন, ১। দেরাজু সাহেব ইষ্টিণ্ডিয়াননামক এক সম্বাদপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন।

নবেম্বর, ৭। মিরটের গ্রীনবাই কোম্পানি নূতন এক সম্বাদপত্র সংস্থাপন করেন তাহার সংজ্ঞা মিরট ও কর্ণাল ও দিল্লীর উইক্লি আবজরবর।

(৯, ১২, ১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩)

"১৮৩২ সালের বর্ষফল।—

জানুআরি, ৬। বোম্বাই দর্পণনামক এক নূতন সম্বাদপত্রের ১ সংখ্যা প্রকাশ পায় তাহা মহারাষ্ট্রীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষায় মুদ্রাঙ্কিত হয় এবং বোম্বাই রাজধানীতে এতদ্দেশীয় যে প্রথম সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় সে এই।

ফেব্রআরি, ৯। কলিকাতা নগরে ইষ্টইণ্ডিয়ান লোক কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টার নামক সম্বাদ পত্র প্রকাশারম্ভ হয়।

ফেব্রআরি, ২৬। প্রভাকর অস্তয়ান।

আগস্ত, ২। অস্ত প্রভাকরের সহোদর রত্নাবলী নামক এতদ্দেশীয় এক বাঙ্গালা পত্র উদিত হয় তাহার অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক। চন্দ্রিকাতে লেখেন যে ঐ পত্র অতিশুশ্রূষণীয়।

নবেম্বর, ১৮। মফঃসল আকবরনামক এক ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদপত্রের ১ সংখ্যা আগরাতে প্রকাশিত হয়।
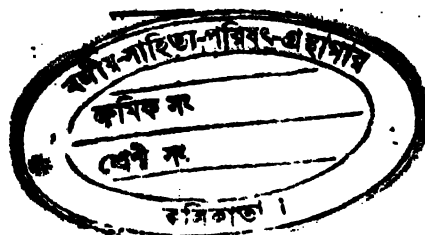
ব্রাহ্মণেতর বর্ণের গোত্র ও প্রবর

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

বৌধায়ন বলিয়াছেন যে বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ এই সপ্তর্ষি ও অগস্ত্য এই আট-জনের অপত্যগণ গোত্র নামে অভিহিত। গোত্র-সংখ্যা অসংখ্য, কিন্তু প্রবর-সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ :—

"গোত্রাণাং তু সহস্রানি অযুতান্যর্বুদানি চ।
ঊনপঞ্চাশদেবৈষাং প্রবরা ঋষিদর্শনাৎ ॥
বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ।
অত্রির্বশিষ্ঠঃ কশ্যপ ইত্যেতে সপ্তঋষয়ঃ ॥
তেষাং সপ্তর্ষীণামগস্ত্যাষ্টমানাং যদপত্যং তদ্গোত্রমিত্যুচ্যতে।"

বৌধায়ন-শ্রৌতসূত্র, প্রবরপ্রশ্ন, ৫৪

ব্রাহ্মণগণ উপরোক্ত ঋষিদিগের বংশধর। এই সকল গোত্র ও প্রবর তাঁহাদের জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে। এখন দেখা যাউক শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণেতর বর্ণের গোত্র ও প্রবর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৌধায়ন লিখিয়াছেন, ক্ষত্রিয়াণাং আর্ষেয়ঃ প্রবরো ভবতি মানবেড় পৌরুরবসেতি হোতা * * * * * বৈশ্যানাং আর্ষেয়ঃ প্রবরো ভবতি ভালন্দনবাৎসপ্রমাণ্ডকিলেতি হোতা" (ঐ, ৫২-৫৩) অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগের (স্বকীয়) তিনটী ঋষিনাম-যুক্ত প্রবর মানব, ঐড় (ঐল) ও পৌরুরবস্ এবং বৈশ্যদিগের (স্বকীয়) তিনটী ঋষিনামযুক্ত প্রবর ভালন্দন, বৎসপ্র ও মাণ্ডকিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের মধ্যে সকলেই ঐ সকল ঋষির বংশধর নহে। তাহাদের কি ব্যবস্থা হইবে? বৌধায়ন বলেন —"ক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং পুরোহিতপ্রবরো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে।" অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের পুরোহিতপ্রবর হইবে জানিবে। কেহ কেহ বলেন সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরই পুরোহিতপ্রবর হইবে, এমন কি ব্রাহ্মণ রাজা হইলে তাঁহাদেরও পুরোহিতপ্রবর হইবে (গোত্রপ্রবরনিবন্ধ-কদম্ব, ১২৮ পৃষ্ঠা)।

উপরে দেখা গেল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পুরোহিতপ্রবর হইবে। গোত্রের কোন কথা নাই। গোত্রের ব্যবস্থা কি হইবে? বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরায় যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকের প্রথমচরণের টীকায় লিখিয়াছেন—"এবঞ্চ যদ্যপি রাজন্যবিশাং প্রাতিস্বিকগোত্রাভাবাৎ প্রবরাভাবস্তথাপি পুরোহিতগোত্রপ্রবরৌ বেদিতব্যৌ। তথাচ। যজমানস্যার্ষেয়ান্ প্রবৃণীতে-ত্যুক্তা পৌরোহিত্যান্ রাজন্যবিশাং প্রবৃণীতেত্যাশ্বলায়ন।" অর্থাৎ এই প্রকারে যদিও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রাতিস্বিক অর্থাৎ স্বকীয় গোত্রের অভাব হেতু প্রবরাভাব তথাপি (তাহাদের) পুরোহিতগোত্রপ্রবর জানিবে। যথা অশ্বলায়নসূত্রে যজমানের (যজ্ঞাদিকার্য্যে) আর্ষেয় (হোতা) বরণ করিবে, ইহা বলিয়া পরে লিখিত হইয়াছে যে পুরোহিতদিগের আর্ষেয়গণকে বরণ করিবে। আমরা বিজ্ঞানেশ্বরের এই ব্যাখ্যায় সন্দিহান হইতেছি। প্রথমতঃ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মাত্রেরই যে স্বকীয় গোত্রের অভাব তাহা বলা চলে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বৌধায়ন-সূত্র হইতে দেখাইয়াছি। দ্বিতীয়তঃ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যে পুরোহিতের গোত্র ও প্রবর উভয়ই হইবে, ইহা তাহার উদ্ধৃত আশ্বলায়নসূত্রের দ্বারা সমর্থিত হয় না। প্রবৃণীতে শব্দ দ্বারা প্রবরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা গোত্রও বুঝায় কি? বৌধায়ন স্পষ্ট প্রবরের কথাই বলিয়াছেন, সুতরাং আমরা প্রকৃষ্ট প্রমাণাভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যে পুরোহিতের গোত্রও প্রাপ্ত হইবে, বিজ্ঞানেশ্বরের এই কথা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

এখন দেখা যাউক প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় কি না? মহাভারতের বিরাট-পর্ব্বের ৭ম অধ্যায়ের ১১-১২ শ্লোকে দেখা যায় বিরাট রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাহার গোত্র, নাম এবং কোন বিদ্যার পারদর্শী তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যুধিষ্ঠির তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

"যুধিষ্ঠিরস্য সমহং পুরা সখা বৈয়াঘ্রপদ্যঃ পুনরস্মি বিপ্রঃ

অস্মান্ প্রবোক্ষ্যং কুশলোঽস্মি দেবিত কঙ্কেতিনাম্নাস্মি বিরাট বিশ্রুতঃ॥ * এস্থলে যুধিষ্ঠির যে বৈয়াঘ্রপদ্যঃ গোত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছেন তাহা ঠিক কি? তিনি নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপনই করিতেছেন। নিজে ক্ষত্রিয় হইয়াও বিপ্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে গোত্রের পরিচয়ও দিতে হইয়াছে, তাই তিনি একটী কল্পিত গোত্রের নাম করিয়াছেন। যদি ক্ষত্রিয়গণ পুরোহিত গোত্র প্রাপ্ত হয় ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে তাঁহার ধৌম্যগোত্র হওয়া উচিত ছিল। বৌধায়নের মতে ব্যাঘ্রপাদ বশিষ্ঠ-বংশীয় এবং ধৌম্য কাশ্যপবংশীয়, সুতরাং একবংশীয় নহে। আবার নীলকণ্ঠের টীকায় বৈয়াঘ্রপদ্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া যুধিষ্ঠিরের বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্র স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে কি?

পি, এম, বাক্‌চির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকায় সামবেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় তর্পণ-বিধিতে ভীষ্মতর্পণের ব্যবস্থা দেখা যায়। ইহাতে লিখিত আছে—

"ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥

উক্ত মন্ত্রে ভীষ্মের উদ্দেশ্যে পিতৃতর্পণের রীত্যনুসারে একবার জলাঞ্জলি দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। যথা—

ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতং ক্রিয়াম্॥

ভীষ্মাষ্টমী অর্থাৎ মাঘী শুক্লাষ্টমীতে ভীষ্মতর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিদিন না করিলেও দোষ নাই।"

মহাভারতে ভীষ্ম পর্ব্বের ১২৩ অধ্যায়ে ভীষ্মকে জলদানের কথা আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শায়িত তখন তিনি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়েন। নিকট-বর্ত্তী ভূপালদিগের নিকট জল প্রার্থনা করিলে তাঁহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী ও শীতল জলপূর্ণ কুম্ভসকল আহরণ করিলেন। ভীষ্ম সেই উপনীত পানীয় নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "হে ভূপালগণ! আমি শরশয্যায় শয়ান হইয়া মনুষ্যলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, কেবল চন্দ্রসূর্য্যের পরিবর্ত্তনকাল প্রতীক্ষায় জীবিত আছি; আজি মনুষ্যোচিত ভোগসকল গ্রহণ করিতে পারি না।" ভীষ্ম এই বলিয়া ভূপালগণকে নিন্দা করিলেন, "ভূপালগণ! আমি অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি।" তৎপরে অর্জ্জুন আসিয়া পৃথিবীকে শরদ্বারা বিদ্ধ করিয়া অমৃততুল্য, দিব্যগন্ধ, অতি শীতল বিমল বারিধারা সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা ভীষ্মের তৃষ্ণা শান্তি করাইলেন। যে ভীষ্ম জীবিত থাকিতেই মনুষ্যোচিত ভোগ ত্যাগ করিয়া-ছিলেন, তাঁহাকে পৃথিবী-পৃষ্ঠের নদী-তড়াগাদির জলদ্বারা তর্পণের ব্যবস্থা কত দিনের? পিতৃতর্পণ বৈদিক প্রথা বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে ভীষ্মতর্পণ যে আধুনিক কালের যোজনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ আছে কি? এই ভীষ্মতর্পণপ্রথা বাঙ্গলার বাহিরে কোথায়ও অনুষ্ঠিত হয় কি না জানি না। যদি তাহা না হয়, তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, বাঙ্গালীর ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত বীরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ নিতান্তই প্রশংসার্হ। ভীষ্মতর্পণের মন্ত্র বাঙ্গলায় রচিত বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণও পাওয়া যায়। এই মন্ত্রে ভীষ্মের গোত্র বৈয়াঘ্রপদ্য এবং প্রবর-সাঙ্কৃতি বলা হইয়াছে, কিন্তু বৌধায়নের মতে ঐ গোত্রের প্রবর 'বাসিষ্ঠ'! আঙ্গিরাগণে সংকৃতি নামে গোত্র এবং সংকৃত্য নামে প্রবরের উল্লেখ আছে। কিন্তু বাঙ্গলায় প্রচলিত ধনঞ্জয়কৃত ধর্ম্মপ্রদীপের গোত্র প্রবরবিবেকে বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রের সাঙ্কৃতিপ্রবর এবং সাঙ্কৃতিগোত্রের প্রবর 'অব্যাহারাত্রিসাঙ্কৃতয়ঃ' লিখিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই ধনঞ্জয়ের সহিত বৌধায়নাদির অনেক গোত্রেরই প্রবরসাম্য নাই। যাহা হউক, আমাদের মনে হয় যিনি এই মন্ত্রের রচয়িতা তিনি বিরাট-পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রীয় বলিয়া উল্লেখ করিতে দেখিয়া ভীষ্মকেও ঐ গোত্রীয় ধরিয়া লইয়াছেন। তৎপরে ধর্ম্ম-প্রদীপানুসারে তাঁহার সাঙ্কৃতিপ্রবর স্থির করিয়াছেন এবং ভীষ্ম যখন ক্ষত্রিয় তখন তাঁহার বর্ম্মান্ত নাম হইতে হইবে। সুতরাং ভীষ্ম হইলেন বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রীয় ভীষ্মবর্ম্মা। জানি না মহাভারতে কোথায়ও ভীষ্ম, ভীষ্মবর্ম্মা বলিয়া

* 'কায়স্থ-সমাজ'-পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট এই শ্লোকটীর সন্ধান পাইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

উল্লিখিত হইয়াছেন কি না? আর পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যদি পুরোহিতগোত্র হয় তবে ভীষ্মের ধৌম্যগোত্র হওয়াই উচিত ছিল, কারণ ঐ বংশের পুরোহিত ছিলেন ধৌম্য।

উপরে দেখা গেল শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পুরোহিতপ্রবরের অতিদেশের বিধান থাকিলেও গোত্রের বিধান নাই। ব্যবহারতঃও গোত্রের কোন প্রাচীন প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল না। এখন দেখা যাউক কোন আধুনিক প্রমাণ পাওয়া যায় কি না। রাজপুতগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের যাহাই অভিমত হউক না, তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত। ইহাদের কাহারও কাহারও গোত্রপ্রবর আছে বলিয়া শুনিয়াছি। ইহা খুবই সম্ভব, কারণ ইহাদের কোন কোন রাজবংশ আপনাদিগের তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যথা, প্রতিহারবংশ হরিচন্দ্র নামক এক ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন। (Ep. Ind. Vol. ix. pp. 277-81, Vol, xviii. p. 88); চৌহান-বংশ বৎস-ঋষি হইতে উৎপন্ন (I. A. S. B., LV. Pt.I., p. 41, V. 12)। গোহিলটবংশ বৈজবাপী গোত্রীয় গুহদত্ত নামা নাগরব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন। (I. A. S. B., 1909, p. 183)। চৌলুক্য বা সোলাঙ্কীগণ, কদম্বদিগের ন্যায় 'হারিতীপুত্র' এবং মানব্যগোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কদম্বগণ ময়ূরশর্ম্মণ নামক এক ব্রাহ্মণের বংশধর। (E. I. Vol. viii, p. 31 ff) ইহা ভিন্ন পল্লবগণ দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামার বংশ ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (Ep. Ind. Vol. xix, p. 113)। যখন দেখা যাইতেছে ইঁহারা ব্রাহ্মণবংশীয় বলিয়া দাবী করিতেছেন তখন ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের ন্যায় গোত্র ও প্রবর থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। যখন রাজপুতগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করা হইল, তখন ইহাদিগকে ক্ষত্রিয়বংশীয় না বলিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়া থাকিবে; কারণ শাস্ত্র-অনুসারে পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তাহা হইলে আবার ক্ষত্রিয় আসিল কোথা হইতে? এই শাস্ত্রবিরুদ্ধতা সমন্বয় করিবার জন্যই বোধ হয় ইহাদিগকে ব্রাহ্মণবংশীয় বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হইলেও ক্ষত্রিয়োচিত উপজীবিকা দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া প্রচার করা হইয়া থাকিবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের সহিত আমাদের রাজপুত্রদিগের গোত্র সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। তিনি বলেন, রাজপুতদিগের নামমাত্র গোত্র থাকিলেও তাহারা বিবাহে গোত্রের বাছ-বিচার করে না। তাহারা তাহাদের নিজ নিজ খাম্প (tribe) বিচার করিয়া চলে। যেমন গোহিলট্ গোহিলটের, চৌহান চৌহানের কিংবা পরমার পরমারের কন্যা বিবাহ করিবে না। তিনি আরও বলেন, বাঙ্গলার বাহিরে তিনি আর কোথায়ও ব্রাহ্মণেতর জাতির গোত্রের বাছ-বিচার দেখেন নাই! আমরা আভাস পাইলাম কি প্রকারে আধুনিক কালের ক্ষত্রিয় রাজপুতগণের মধ্যে গোত্র ও প্রবরের প্রবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহারা ইহার কতটা সদ্ব্যবহার করে। তাহাদের প্রকৃত গোত্র, কুল বা বংশ, পাণিনি যাহাকে 'গোত্রাবয়ব' বলিয়াছেন (৪।১।৭৯)। বাস্তবিক তাহাদের আর্ষ-গোত্র নাম মাত্র। বঙ্গদেশে যাহারা রাজপুত বা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন তাহাদের মধ্যে সগোত্রা বিবাহ দেখা যায়। প্রবর্ত্তক-সংঘের শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় সগোত্রা বিবাহ করিয়াছিলেন।

এতক্ষণ আমরা দ্বিজাতির গোত্রপ্রবরের আলোচনা করিলাম। ইহা দ্বারা দেখা গেল ক্ষত্রিয়বৈশ্যের আর্ষ-গোত্র নাই। এক্ষণে আমরা শূদ্রের আর্ষ-গোত্রপ্রবরের আলোচনা করিব। ব্রাহ্মণেরা যাহাদিগকে শূদ্র বলেন বঙ্গদেশে তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের ন্যায় আর্ষ-গোত্রপ্রবরের প্রচলন দেখা যায়। ইহাদের উপরের শ্রেণীতে ইহার নিষেধ-বিধি অর্থাৎ সগোত্রে বিবাহাদি নিষিদ্ধ। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলিয়াছেন কলিকালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইতিহাসের দোহাই দিয়া তাহাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাঙ্গলা দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সকলেই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৬ সন, ১ম সংখ্যা, ৩ পৃষ্ঠা)। আমরা উপরে দেখিয়াছি, শাস্ত্রে কোথায়ও শূদ্রের গোত্রপ্রবরের ব্যবস্থা

নাই। রঘুনন্দন এই শূদ্রদিগের মধ্যেও গোত্রপ্রবরের প্রচলন দেখিয়াছিলেন, তাই তিনি তাহা শাস্ত্রদ্বারা সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"অতএবাসমানার্ষগোত্রজামিতি ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়বিষয়মিতি সম্বন্ধবিবেকঃ। তর্হি শূদ্রস্য শ্রাদ্ধাদাবধিকার শ্রুতেঃ-কথং গোত্রোচ্চারণামিতি চেৎ। গোত্রং স্বরান্তং সর্ব্বত্র গোত্রস্যাক্ষয্যকর্ম্মণি। ইতি গোভিলীয়দর্শনাদাকাঙ্খিতেন। শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাং। বৈশ্যবচ্ছৌচ-কল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টন্ত ভোজনং। ইতি মনুবচনে চকারসমুচ্চিত গোত্রেঽপি বৈশ্যধর্ম্মাতিদেশাৎ পূর্ব্বপুরুষ-পুরোহিত গোত্রভাগিত্বং প্রতীয়তে। তর্হি ন সমান-গোত্রাং ন সমানপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেতেত্যনেন শূদ্রস্যাপি সগোত্রা কথং ন নিষিধ্যতে ইতি চেদত্রোপদিষ্টাতিদিষ্টগোত্রস্যৈব নিষেধো নত্বতিদিষ্টাতিদিষ্ট শূদ্রগোত্রাদেঃ। অন্যথাতিদেশে ক্ষত্রিয়বৈশ্যমাত্রোপাদানং ব্যর্থং স্যাৎ ॥ ১২ ॥ (উদ্বাহ-তত্ত্বম্, ১২)।

অর্থাৎ এই জন্যই শূলপাণি সম্বন্ধবিবেকে বলিয়াছেন যে 'সমান আর্ষগোত্রজাকে বিবাহ করিবে না' ইহা কেবল ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পক্ষে জানিবে। শূদ্রদিগের কোন প্রকারই গোত্র ও প্রবর নাই। শাস্ত্রে তাহাদের শ্রাদ্ধাদি-কার্য্যে অধিকার দেখিতেছি। এই সকল কার্য্যে গোত্রাদির উল্লেখ অবশ্য কর্ত্তব্য, সে স্থলে তাহারা কি করিবে? শ্রাদ্ধাদি-কার্য্যে যে গোত্রাদির উল্লেখ হয় তাহার সম্বন্ধে গোভিলের এই প্রমাণ ৺শ্রাদ্ধে অক্ষয্যোদকদানাতিরিক্ত অর্ঘ্যদানাদিকার্য্যে গোত্র শব্দ সম্বোধনান্ত অক্ষয্যোদকদানে ষষ্ঠ্যন্ত, তর্পণে প্রথমান্ত, এইরূপ ভাবে গোত্র শব্দের উল্লেখ করিলে কর্ত্তার দোষ হয় না। এই গোভিলসূত্র ব্রাহ্মণ বিষয়ক হইলেও শূদ্রের ও শ্রাদ্ধাদি-কার্য্যে অধিকার নিবন্ধন গোত্র উল্লেখের আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় 'স্বধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রগণের মাসান্তে ক্ষৌরকার্য্য ও বৈশ্যদিগের ন্যায় শৌচ-ব্যবহার এবং ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্ট ভোজন কর্ত্তব্য' এই মনুবচনে শৌচকল্পপদের পরবর্ত্তী 'চ' কার দ্বারা শূদ্রদিগের প্রতি গোত্র উল্লেখযোগ্য কার্য্যে বৈশ্যধর্ম্মের অতিদেশ হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ 'চ' কার দ্বারা শূদ্রগণ যে কেবল বৈশ্যদিগের মত শৌচ করিবে তাহা নহে, গোত্রোল্লেখযোগ্য কার্য্যেও বৈশ্যদিগের মত পুরুষক্রমাগত পুরোহিতগণের গোত্র উল্লেখ করিবে ইহাও বুঝাইতেছে। তাহা হইলে 'সমানগোত্র সমানপ্রবরা ভার্য্যা লাভ করিবেন' এই বচন দ্বারা শূদ্রদিগেরও সমান গোত্র সমানপ্রবরা কন্যার সহিত বিবাহ নিষেধ হইবে না কেন? বিবাহ-বিষয়ে যাহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গোত্র উপদিষ্ট হইয়াছে বা যাহাদের গোত্র অতিদিষ্ট হইয়াছে তাহাদের পক্ষেই সগোত্রাদি কন্যা বিবাহ নিষেধ হইয়াছে, কিন্তু অতিদিষ্টা-তিদিষ্ট গোত্রভাগীর সগোত্রাদি কন্যা বিবাহ নিষেধ হইবে না।* রঘুনন্দনের এই যুক্তিতে কতকগুলি অসঙ্গতি আছে। যদি বঙ্গদেশের তথাকথিত শূদ্রের অতিদিষ্টাতি-দিষ্ট গোত্রপ্রবর জন্য গোত্রপ্রবরের বিধিনিষেধ অর্থাৎ সগোত্রে বিবাহ প্রযুক্ত না হইয়া থাকে তবে শ্রাদ্ধ-বিবাহাদিতে গোত্রপ্রবর উচ্চারণের অধিকারও জন্মিতে পারে না। বস্তুতঃ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন অতি-দেশের অতিদেশ হিন্দু-শাস্ত্রবিরুদ্ধ (20 C. W. N. p. 501)। আবার এই তথাকথিত শূদ্রদিগের উচ্চ শ্রেণীতে সগোত্রো বিবাহ প্রচলিত নাই কেন? রঘুনন্দন মনুর যে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন তাহা ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের জন্য, সাধারণ শূদ্রের প্রতি প্রযুক্ত নহে। এই ন্যায়বর্ত্তী শূদ্র-দিগের পনরদিন অশৌচ পালন করিবার কথা, কিন্তু বঙ্গদেশে কোন শূদ্র পনর দিন অশৌচগ্রহণ করিয়া থাকে কি? তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে বঙ্গদেশে ন্যায়বর্ত্তী অথবা শূদ্র নাই অথবা তাহাদের অধিকার লোপ করা হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের গোত্রপ্রবর থাকিতে পারে না। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে বঙ্গদেশের তথাকথিত শূদ্রদিগের গোত্র প্রবর ও তাহার বিধি-নিষেধ মনুর ঐ শ্লোকের উপর নির্ভর করিতেছে না। অতএব ইহার প্রকৃত কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। শূদ্রদিগের গোত্রপ্রবর নাই এই মাত্র দেখান হইল। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের আর্ষ-গোত্র নাই তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। তাহাদিগের প্রবর আছে। এই প্রবর দুইপ্রকার, স্বকীয় এবং পুরোহিতপ্রবর। স্বকীয় সমানপ্রবরে বিবাহ নিষিদ্ধ কিন্তু যাহাদের পুরোহিত-

* এই ব্যাখ্যানুবাদ শ্রীকৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার-প্রণীত উদ্বাহতত্ত্বের তত্ত্ববোধিনী টীকা হইতে গৃহীত হইল।

প্রবর তাহাদের সমানপ্রবরে বিবাহ নিষেধ এইরূপ কোন উপদেশ নাই। (গোত্রপ্রবরনিবন্ধকদম্ব, ৪, ১২৭-২৮ ও ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এক একটী মাত্র স্বকীয় প্রবর তাহা এই শূদ্রদিগের মধ্যে দেখা যায় না। তাহাদের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় গোত্রপ্রবর। ইহাদের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সগোত্রা বিবাহের প্রচলন নাই। এরূপ স্থলে তাহারা ব্রাহ্মণমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় না কি? অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকরও ঠিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি কায়স্থদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"The question arises who were the Kayasthas of Bengal originally. They think they are Kshatriyas, whereas the Brahmans regard them as Sudras. But the above considerations enable us to settle this point with some certainty. As they have such surnames as Datta, Ghosha, Varman and so on, which are still associated with the Nagar Brahman families of Gujrat and Kathiwar and as there is evidence to believe that Nagar Brahmans had settled in ancient Bengal, it appears that Kayasthas were originally Nagar Brahmans. This is supported by the fact that they have Brahmanical gotras. It is possible to argue that the Kayastha surnames are found also among the Navasakha and Sadgopas and that the latter also bear Brahmanical gotras. Nothing, however, can be more fallacious; because in regard to these castes two persons of the same padavi can marry if their gotras are different, as is exactly the case with the Brahmans in any part of India. It thus seems that the Brahmanical gotras of he Kayasthas is an indications of their Brahmanical origin. And when we find that their surnames such as Datta, Ghosha and Varman are not unknown among the present Nagar Brahmans of Gujrat and further that the Nagar Brahmans were living in old Bengal, it is difficult to avoid the conclusion that these Nagar Brahmans crystallized into the modern Kayastha caste of Bengal."

(Statesman. 20. I. 31.)

পরিশেষে সগোত্র-বিবাহ সম্বন্ধে বঙ্গদেশের একটী বিশেষ ব্যতিক্রম সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। ব্যতিক্রম দেখা যায় কশ্যপবংশে, যথা কাশ্যপ ও শাণ্ডিল্য-গোত্রে বিবাহ। কেহ কেহ হয় তো বলিবেন কাশ্যপ ও শাণ্ডিল্যে বিবাহ সগোত্র-বিবাহ হইল কি প্রকারে? আপাততঃ তাহাই মনে হইতে পারে। কাশ্যপ ও শাণ্ডিল্য বিভিন্ন নাম, কাশ্যপের প্রবর কাশ্যপ, আবৎসার, নিধ্রুব এবং শাণ্ডিল্যের প্রবর শাণ্ডিল্য, আসিত, দেবল। সুতরাং সমান গোত্রও নহে ও সমান প্রবরও নহে। কিন্তু সগোত্র কাহাকে বলে তাহা জানিলে আর এ আপত্তি হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৌধায়ন বলিয়াছেন—বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ এই সপ্তর্ষি এবং অগস্ত্য এই আট জনের অপত্য 'গোত্র' নামে অভিহিত। এই আট জনের অপত্য ভিন্ন অন্য কাহারও অপত্য 'গোত্র' পদবাচ্য নহে, কেবল (ভৃগু, যাস্ক, মিত্রয়ু, বেন ও শুনক) এবং কেবল আঙ্গিরস রথীতর, মুদ্গল, বিষ্ণুবৃদ্ধ, হরিত, কণ্ব, সংকৃতি, কপি ইহাদের গোত্র নাই অর্থাৎ ইহারা গোত্র নামে পরিচিত হইলেও ইহাদের গোত্র পরিলক্ষিত হয় নাই। সুতরাং সগোত্রে বিবাহ করিবে না এই নিষেধ ইহাদের প্রতি প্রযুজ্য নহে। ইহাদের বিবাহে সমান প্রবর না হয় তাহাই দেখিতে হইবে। উপরোক্ত আটজনের প্রত্যেকের বংশে বিভিন্ন শাখায় বিবাহ নিষেধ, কেন না তাহারা সগোত্র অর্থাৎ অষ্টগোত্রকর্ত্তা ঋষির বংশধর। ইহা ভিন্ন একটী মাত্র প্রবর সাম্যেও সগোত্র হয়। এখন কশ্যপের বংশে নিধ্রুব, রেভ, শণ্ডিল ও লোগাক্ষি এই চারিটী শাখা। সকলেই বলিয়াছেন ইহাদের পরস্পরের বিবাহ নিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে গোত্রপ্রবর-নির্ণয়ে অভিনব মাধবাচার্য্য যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধার করা গেল :—

"কশ্যপা অথ তত্র স্যুর্নিধ্রুবরেভশণ্ডিলাঃ;
এষাং সমানগোত্রত্বান্ন বিবাহঃ পরস্পরম্ ॥ ৬৪ ॥

* * * *

শণ্ডিলানাং কাশ্যাপাবৎসারশাণ্ডিল্যেতি বা কাশ্যপাবৎসারদৈবলেতি বা কাশ্যপাবৎসারামিতেতি বা শাণ্ডিল্যাসিতদৈবলেতি বা ত্র্যার্ষেয় প্রবরঃ। দৈবলাসিতেতি বা দ্ব্যার্ষেয়প্রবরঃ। এষাং ত্রয়াণাং গোত্রকর্ত্তুঃ কশ্যপানুবৃত্তে 'এক এব ঋষিযাবৎ' ইতি পারিভাষয়া চ নাম্নোক্তমম্বরঃ সমানগোত্রত্বাৎ। শণ্ডিলগোত্রস্ত চতুর্থে প্রবরে কশ্যপানুবৃত্ত্যভাবেঽপি শণ্ডিলগোত্রস্ত প্রাক্তনপ্রবরত্রয়েঽপি কাশ্যপস্যানুবৃত্তোর্বিদ্যমানতয়া তদনুবৃত্তিরস্তি।"

(গোত্রপ্রবরনিবন্ধকদম্ব, ৩৪৪ পৃঃ)

অর্থাৎ কশ্যপবংশে নিধ্রুব, রেভ ও শণ্ডিল (এই তিন গণ বা শাখা)। ইহাদের সমান গোত্রজন্য পরস্পর বিবাহ নিষেধ। * * শাণ্ডিল্যগোত্রে কাশ্যপ, আবৎসার, শাণ্ডিল্য ইতি বা কাশ্যপ, আবৎসার, দৈবল ইতি বা কাশ্যপ, আবৎসার, আসিত ইতি বা শাণ্ডিল্য, আসিত, দৈবল ইতি এই তিন ঋষিনামযুক্ত প্রবর। অথবা দৈবল, আসিত এই দুই ঋষিনামযুক্তপ্রবর। ইহাদের (প্রথম) তিনটিতে গোত্রকর্ত্তা কশ্যপের নাম থাকা প্রযুক্ত এবং 'যদি (উভয় বংশের) প্রবরে একটীমাত্র ঋষিনামও সমান থাকে তবে (তাহারা) সগোত্র। এই পরিভাষা দ্বারা ইহাদের সমান গোত্র জন্য পরস্পরের বিবাহ নিষেধ। শাণ্ডিল্যগোত্রের চতুর্থ প্রবরে যদিও কশ্যপের নাম নাই তথাপি পূর্ব্বপ্রবরত্রয়ে কশ্যপের নাম থাকায় (এই চতুর্থ প্রবরেও) উক্ত নামের অনুবৃত্তি আছে (বুঝিতে হইবে) কাশ্যপগোত্র নিধ্রুবগণের অন্তর্গত। শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্যগণের অন্তর্গত। ইহাদের নাম সাম্য কিংবা প্রবরসাম্য না থাকিলেও কেন যে ইহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা বোধ হয় এখন পরিষ্কাররূপে বোঝা গেল।

এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব কেন এইরূপ ব্যতিক্রম হইল, তাহার কোন কারণ পাওয়া যায় কি না। ইহার কারণ বোধ হয় কশ্যপবংশে বহুপরিবার প্রবেশ লাভ করিয়াছে যাহারা প্রকৃত কাশ্যপবংশীয় নহে। যেমন বীতহব্য, মিত্রয়ু, শুনক, বেন পরিবার ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়া ভৃগুর পরিবারভুক্ত এবং রথীতর, মুদ্গল, বিষ্ণুবৃদ্ধ, হরিত, কণ্ব ও সংকৃতি পরিবার তদ্রূপ অঙ্গিরার পরিবার-ভুক্ত হইলেও ভৃগুর এবং অঙ্গিরার প্রকৃত বংশধরদিগের সহিত বিবাহ হইতে বাধা নাই, এক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ সেইরূপই ঘটিয়াছে। অন্য গোত্রীয় অনেক যে কাশ্যপগোত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহারও প্রমাণও পাওয়া যায়। আমাদের দেশে একটা কথা আছে— 'হারাইয়া তাতাইয়া কাশ্যপ' অর্থাৎ গোত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং যে নিজগোত্র হইতে তাড়িত হইয়াছে তাহারা কাশ্যপগোত্র হইবে। ইহার শাস্ত্রপ্রমাণও পাওয়া যায়। বৌধায়ন বলিয়াছেন যে সগোত্রা বিবাহ করিলে, অবশ্য না জানিয়া যে সন্তান জন্মিবে তাহার কাশ্যপগোত্র হইবে, যথা 'সগোত্রাংগত্বা চান্দ্রায়ণং চরেদ্‌ব্রতে পরিনিষ্ঠিতে ব্রাহ্মণীঃ * ন ত্যজেন্মাতৃবদ্ভগিনীবদ্গর্ভো ন দুষ্যতি কশ্যপ ইতি বিজ্ঞায়তে।' আবার আর একজন বলিয়াছেন 'গোত্রস্যত্ব-পরিজ্ঞানে কাশ্যপং গোত্রমিষ্যতে।' (গোত্রপ্রবরনিবন্ধকদম্ব, ১৮৭ পৃষ্ঠা) † ইহা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বহু অন্যগোত্রীয় কাশ্যপ গোত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কেবল ভৃগু ও কেবল অঙ্গিরাগণের ন্যায় কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই কেন বোঝা গেল না। আমাদের দেশে চট্টোপাধ্যায়গণ কাশ্যপগোত্রীয় এবং বন্দ্যোপাধ্যায়গণ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় অথচ ইহাদের মধ্যে বহুকাল হইতে বিবাহাদি চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ এত বড় একটা ভুল করিবেন ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।

* এই 'ব্রাহ্মণীঃ ন ত্যজেৎ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণীকে ত্যাগ করিবে না, ইহা দ্বারাও দেখা যাইতেছে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গোত্র নাই, সুতরাং তাহাদের সগোত্রা বিবাহের প্রসঙ্গাভাব ; কাজেই ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা ত্যাগের বিধান নাই।

† অন্যমতে কাশ্যপ অথবা ভারদ্বাজ গোত্র হইবে, যথা—
"মোহাদ্‌গত্বা প্রতিগম্য চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্।
গর্ভস্থেৎ কাশ্যপোঽয়ং স্যাৎ ভরদ্বাজোঽথবা ভবেৎ॥"
অন্যমতঃ সগোত্রাবিবাহোৎপন্ন সন্তান চণ্ডাল হইবে।

(গোত্রপ্রবরনিবন্ধকদম্ব, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

জেনেভা-ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্-এ, ডি-লিট্

ন্যাশন্যাল লিবারেল ক্লাব

লণ্ডন, রবিবার ৩১শে আগষ্ট, ১৯৩০

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎ কৃপা তমোহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং॥

বারংবার ভক্তিভরে অবনতমস্তকে এই কথা স্মরণ করিতে করিতে পুরাতন পরিচিত এই আশ্রয়স্থানে আসিয়া কাল বেলা সাড়ে ছয়টার সময় পরিশ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। পোর্ট সৈয়াদ হইতে তার দিয়াছিলাম, তথাপি কি কারণে জানি না প্রভাত-চন্দ্র ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হয় নাই। যৎসামান্ত নিজের ব্যবস্থা নিজে করিয়া লইবার শক্তি ভগবান হঠাৎ কোথা হইতে দিলেন তিনিই জানেন। সমভিব্যাহারী ও পরিচিত লোক সঙ্গে অভাব ছিল না; ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন রে (Rae) প্রভৃতি অন্যান্য পরিচিত কলিকাতার বন্ধু, কিন্তু সকলেই যে যাহার কাজ লইয়া ব্যস্ত। সঙ্গের মাল আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল; যদিও বিলম্বে আসিয়া পৌছিল, রসিদের গোলমালে আরও গোলমাল হইল। মাল না পাইতে, গুছাইতে, খুঁজিতেও বিস্তর বিলম্ব হইল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ষ্টেশন-প্লাটফর্ম্মের ভিতর আসিয়া ঢুকিয়াছে। ফ্রান্সে মাল পাইতে এত গোলমাল হয় নাই। ইংলণ্ডের ব্যবস্থা কেন এত গোলমাল ইংরাজেরা নিজেরাই তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

যাহাহউক দেহে ও মনে হঠাৎ অসীমশক্তি ও ক্ষমতা কোথা হইতে আসিয়া পড়িল জানি না। কোনগতিকে কাজ সমাধা করিয়া আসিয়া ন্যাসান্তাল লিবারেল ক্লাবে (Nation Liberal Club) পৌছিলাম। ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব ভালই ছিল। লর্ড লিটন (Lord Lytton), লর্ড রেডিং (Lord Reading), রেভারেণ্ড মিষ্টার এণ্ডারসন, (Rev. Mr. Anderson) প্রভৃতির আপ্যায়িত পত্র আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ঘর গুছাইতে ব্যবস্থা করিতেও কিছু বিলম্ব হইল।

২৮ এ আগষ্ট রাত্রে মার্সেলস-এ পত্র ডাকে দিবার পর হইতে ক্রমাগত ভ্রমণ হইয়াছে। কুলী ও কুলী-সর্দ্দার-দিগের প্রতারণায়, পথের গরমে উত্যক্ত হইতে হইয়াছিল, কাগজে দেখিলাম নব্বই বৎসর এরূপ গরম হয় নাই। টেম্পারেচার প্রায় বিরানব্বই-এর কাছাকাছি হইয়াছে আবার মাঝে মাঝে হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়াও খুব বয়; কাজেই গরম কাপড় না পরিয়া উপায় নাই। P. & O. Express গাড়ীর খাওয়া ও বিছানার বাবুগিরি প্রসিদ্ধ। অতএব সে পথে কোন কষ্ট নাই, বরং জাহাজের বিলাতি ধরণের খাওয়ার পর P. & O. Express Train-এ ফরাসী প্রণালী-মত রান্না মুখরোচক হইল, আহার-সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সাবধান হইয়া বরাবর চলিতেছি; কাজেই শরীর খারাপ হইতে পায় নাই।

জাহাজ বেলা আটটার সময়ই মার্সেল বন্দরে পৌছিয়া-ছিল। গাড়ী ছাড়িল বেলা চারিটার সময়। এই দীর্ঘকাল অকারণ জাহাজে বসিয়া থাকিতে কষ্টবোধ হইতেছিল। সহযাত্রীদের মধ্যে যাহাদের ইচ্ছা ও শক্তি হইল তাহারা গাড়ী লইয়া শহর ঘুরিয়া আসিল। সকলে অধিক পয়সা খরচ করিয়া De Lawn অর্থাৎ নবাবী ধরণের P. & O. Express গাড়ীতে না গিয়া পরে সস্তা সচরাচর চলতীগাড়ীতে যাইবার ব্যবস্থা করিতে গেল। বক্সিস, মাস্থল ট্যাক্স, কাষ্টম তদারক ইত্যাদির জালায় রীতিমত ব্যতিব্যস্ত হইবার পর গাড়ী বেলা ৪ টার সময় বন্দর ছাড়িল। পথে নূতন দেখিবার কিছু নাই। সে সকল বিস্তারিত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। রোন (Rhone) নদী যেখানে সমুদ্রে

পড়িয়াছে, সে জায়গাটা ও তাহার উপর পোল দেখিবার ও মনে করিয়া রাখিবার জিনিস। নদী-মাতৃক ভারত-বর্ষের লোক ইউরোপের নদী দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে পারেনা। রাইন, রোন, টেম্‌স্‌, টাইবার, ফেন নদী প্রভৃতি সকল নদীই "জাহ্নবী-যমুনা" সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, নর্ম্মদা, কাবেরীর নিকট তুচ্ছ ও নগণ্য। কোনটা বা বেলেঘাটার খাল বলিলেই হয়। কিন্তু সমুদ্র-সঙ্গমে ফ্রান্সের রোন নদী মনে করিয়া রাখিবার বস্তু। বড় বড় পোল আমাদের দেশে অনেক আছে। কিন্তু সমুদ্র-সঙ্গমের কাছাকাছি কোথাও এমন পোল বোধ হয় নাই। নদীর দুই পারে পাহাড় পাওয়াতেই এ কীর্ত্তি সম্ভব হইয়াছে। সমুদ্রের ধারে ধারে, কোথাওবা হ্রদের ধারে ধারে বনজঙ্গল, ক্ষেত, বাগান, শহরের ভিতর দিয়া রেলওয়ে যাওয়াতে দৃশ্য বড় সুন্দর। ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বৈশিষ্ট্যই এই যে, এক ছটাক জমিও অনাবাদে পড়িয়া নাই—সর্ব্বত্রই লক্ষ্মীর আবির্ভাব।

ক্যালে না গিয়া গাড়ী বোলোন (Boulogn) পথে আসিল। বোলোন হইতে ফোকষ্টোন (Folkstone) ও বিয়াট্রিজ (Biatrizz) নামক দ্রুতগামী পারাপারের জাহাজে পুনরায় সমুদ্র পার হইতে হইল। বেলা ২॥৹ টার সময় সমুদ্র পার হইয়া নয় বৎসর পরে নিয়তির ফেরে পুনরায় শ্বেতদ্বীপ ইংলণ্ডে দেশহিতকর কার্য্যে আগমন ঘটিল। মন নানা চিন্তায় পরিপূর্ণ। বিষম গরমে সকলেরই কষ্ট। কিন্তু হাওয়া থাকাতে সুবিধা এই হইল নিত্যচঞ্চল English Channel (স্থির অচঞ্চল কায়ার মত পড়িয়া রহিল। যাহারা মহাসমুদ্র পার হইবার সময়ও সমুদ্র-পীড়ায় কাতর না হয় তাহারাও প্রায়শঃ ১৷৹ঘণ্টা বিলাতী খাড়ি English Channel পার হইবার সময় কষ্ট পান। গ্রীষ্ম ও বাতাসের অভাবে লাভের মধ্যে এইটুকু হইল।

ফ্রান্সে সমস্ত দিন-রাত বড় বড় নগর-গ্রাম দ্রুতগামী রেল গাড়ীর জানালা হইতে দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। Avignor, Lyons, Paris, Amiens প্রভৃতি শহরগুলি পূর্ব্বে যা দেখিয়াছি এবারও তাই। শহরের বাহির দিয়াই P. & O. Express যাতায়াত করে, অতএব দেখিবার বেশী কিছু নাই। যদিও গ্রীষ্মে অনাবৃষ্টিতে লোকের কষ্ট ও চাষবাসের ক্ষতি যথেষ্ট হইতেছে, তথাপি পথে প্রাকৃতিক শোভা কিছুমাত্র কম নাই। ছোট ছোট ছবির মত বাটীগুলি ছোট ছোট বাগানে ঘেরা; দেখিতে বড় চমৎকার।

কয়দিন ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। শুনা যায় নব্বই বৎসর বিলাতে এমন গরম হয় নাই; ক্রমশঃ ঋতু-পরিবর্ত্তন যথেষ্ট হইতেছে; গরমে মানুষ, ঘোড়া অনেক মরিয়াছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাদ্র মাসেই কালবৈশাখীর মত ঝড়-জল-বিদ্যুৎ সব আরম্ভ হইয়াছে। বর্ষা-বন্যার অভাব নাই। এসব উৎপাত এতদিন কেবল আমরাই ভোগ করিতাম; বিলাতে এসব হাঙ্গামা ছিল না; এখন প্রচুর পরিমাণে তাহা আরম্ভ হইয়াছে। আমি ১৯২১ সালে যখন আসি তখনও গরম খুব পড়িয়াছিল, অপেক্ষাকৃত হালকা কাপড় না আনাতে সে-বার এবং এবারও কষ্ট পাইয়াছি। এত গরমেও কিন্তু ফ্রান্সের ও ইংলণ্ডের সাজান বাগানের শোভার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। সকল বাড়ীতেই ছোট বা মাঝারী ফুলের ও শাক-সবজীর বাগান আছে। গৃহস্থ, মালির সাহায্যের জন্য বসিয়া থাকে না। নিজ হাতে বাগানের কাজ করে। তাহাতে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে, আরামও পায়।

লণ্ডনের পরিবর্ত্তন নিত্য হইতেছে, ১৯১২ সালে যাহা দেখিয়াছি ১৯২১ সালে তার চেয়ে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি, ১৯৩০ সালে তার চেয়েও বেশী। ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া রাস্তা ও ঘর বাটীর দৃশ্য কতকটা বপ্নের মত। তারপর দৃশ্য ইন্দ্রপুরীর মত। ভারতবর্ষের কোন নগরের সহিত এদৃশ্যের তুলনা হয় না। মোটর এবং বাসের ভিড় এত বেশী যে তাহা মনে করিতেও মাথা ধরিয়া যায়। আমার অপেক্ষা চক্ষুষ্মান ও শক্তিমান লোকেরও স্থানে স্থানে সাদা আস্তীন-ওয়ালা ট্রাফিক পুলিসের (Traffic Police) সাহায্য ব্যতীত রাস্তা পার হওয়া দুঃসাধ্য। অতি সাবধানে পথ চলিতে হয়। যখন-যেথা-সেথা যাইবার আর উপায় নাই। যখন সাউথ আফ্রিকায় (South Africa) সরকারী কাজে ১৯২৫-২৬ সালে গিয়াছিলাম, তখন যাতায়াতের সুবিধার জন্য সরকারী মোটর বরাবর দরজায় হাজির থাকিত, কিন্তু ব্যবস্থা কার্পণ্য-

ছুষ্ট। বাস্, ট্রাম, রেলপথে যাতায়াতের পয়সাও কুলাইয়া উঠা কঠিন।

আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ছুটীর সময় ... বড়লোক সবাই দেশ-বিদেশে বেড়াইতে যায় ও গিয়াছে। সকলেই বলে লণ্ডনে এখন কেহ নাই ও যায় না। কিন্তু কাজে তো তাহা নয়। রাস্তা-ঘাট বিষম জনতাপূর্ণ। একবার Punch-এ বোধহয় পড়িয়াছিলাম, "London is empty but fer the few negligible millions that one sees in the streets"। আসল কথাই তাই, রাস্তায় যে লক্ষ লক্ষ লোকে লোকারণ্য করে "হাওয়া-খেকো" বাবুরা তাহাদিগকে মানুষ বলিয়াই মনে করে না; তাহাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

লর্ড রেডিং (Lord Reading), লর্ড লিটন (Lord Lytton) প্রভৃতির পত্র পাইলাম যে, তাঁহাদের এখন লণ্ডন আসিবার সময় নয়; দেখা হইবার সম্ভব অল্প। পার্লামেন্ট, কলেজ, ইউনিভারসিটি, ব্রিটিশ মিউজিয়ম প্রভৃতি সব বন্ধ।

ন্যাসন্যাল লিবারেল ক্লাবে (National Liberal Club) আসিয়া আশ্রয় পাইলাম। আরাম, সুবিধা, ব্যবস্থা বন্দোবস্তের কোন ত্রুটী নাই। কিন্তু লোকের জীবনীশক্তির যেন বিশেষ অভাব দেখিলাম। পুরাতন লোক কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অথচ প্রাচীন লোকে ঘর পরিপূর্ণ। সবাই বৃদ্ধ, সবাই স্থবির, কারণ বিচার করিয়া বুঝিলাম যে নূতন যুগে লিবারেল (Liberal)-দের স্থান নাই বরং কনজারভেটিভ (Conservative)-দের স্থান আছে, শ্রমজীবী (Labour) দলের স্থান আছে-কিন্তু লিবারেলদের স্থান নাই, আদর নাই। ভারতবর্ষে এব্যাপার ঘটিতেছে, সর্ব্বত্র এই ব্যাপার ঘটিতেছে। মধ্যপন্থীদলের সম্মান ও আদর এখন তিরোহিত। উদার-নীতির ঔদার্য্য ও মনুষ্যত্ব রক্ষণশীলদিগের জবরদস্তের অবস্থা অপেক্ষাও হেয় হইয়া পড়িয়াছে।

লণ্ডন, রবিবার, সেপ্টেম্বর ৯

আজ নয়দিন লণ্ডনে পৌঁছিয়াছি। অনেকস্থান পরিদর্শন করা হইয়াছে। নূতন-পুরাতন অনেক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। নূতন করিয়া কোন কিছুই চোখে পড়িতেছে না। শনিবার (৩০ এ আগষ্ট) হইতে বুধবার পর্য্যন্ত ন্যাসনাল লিবারেল ক্লাবেই অবস্থান হইয়াছিল। তারপর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভাতচন্দ্রের রেড্ ব্রিক্ রোড্‌স্থ বাসায় আসিয়া কয়দিন বড় আনন্দেই কাটাইলাম। প্রভাতচন্দ্র বধূমাতাকে চিকিৎসার জন্য আনিয়াছে। আইল অফ্ ওয়াইট প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে-ইহারা বেশ সুন্দর বাসা পাইয়াছে। কোন গোলমাল এখানে নাই। একটা ঠিকা ঝি লইয়া বাঙ্গালীর মেয়ে, বাঙ্গালীর বধূ গৃহস্থালী ঘরকন্না করিতেছে। রন্ধন, হাট-বাজার ইত্যাদি সমস্তই ঝি-এর সাহায্যে করেন। বিলাতি ক্ষিপ্রকারিতা ও কর্ম্মপটুতা জন্মিয়াছে কিন্তু বিলাতি বিলাসিতা ও অনাবশ্যকীয় আদব-কায়দা ইত্যাদি স্বভাবগত হয় নাই, ইহা বিশেষ আনন্দের কথা। বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালীর মেয়েকে এখন দেশ-বিদেশে যাইতে হয়, হইতেছে এবং হইবে। পশ্চাদ্‌পদ হইলে স্বামী-পুত্রের কর্ম্মে ক্ষতি ও গ্লানির কারণ হয়। স্বধর্ম্ম ও স্বীয় আচার-ব্যবহার যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলেই দেশ-বিদেশ যাইতে পারেন। স্ব স্ব জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিবার কোনই হেতু নাই। ইহাদের সেবা ও যত্নে সকল কষ্টই দূর হইল। বহুকাল পরে পারিবারিক প্রথামত লুচি, রুটি, ব্যঞ্জন, ক্ষীর ইত্যাদি খাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। বৌমার "মেজমা" অর্থাৎ লেডী সর্ব্বাধিকারী প্রভাতের বিবাহ-কালে বৌমাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন বৌমা অক্ষরে অক্ষরে তাহা পালন করিতেছেন। ইঁহাদের সেবায় ক্লেশ ভুলিয়া গেলাম, মনে হইতে লাগিল যতদিন ইহারা এখানে থাকিবে ততদিন আমিও ইহাদের সহিত থাকি, কিন্তু কর্ম্মসূত্র অন্যস্থানে আকর্ষণ করিতেছে।

এ কয়দিন ক্রমাগত ইণ্ডিয়া আফিসে ও ইণ্ডিয়া হাউসে গিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আদেশ, উপদেশ করিতে হইল। যদিও লিগ্ অফ্ নেসনসের কর্ম্মক্ষেত্র বহু বিস্তৃত—সাম্রাজ্য "সভ্য"-জগৎব্যাপী। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের পক্ষে ভারতীয় প্রতিনিধির পক্ষে তাহা অতীব সঙ্কীর্ণ। যাহাদের হাতে, কর্ত্তৃত্বের ভার তাহারা সঙ্কীর্ণচেতা, ফলতঃ ভারতীয় কর্ম্মক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণতর হইয়াছে! সরকারী লোক, সরকারী পেনসনার ও সরকারের মুখাপেক্ষী জীবের দ্বারায় ভারতবর্ষের এ কার্য্য এতদিন চলিতেছিল। সাধারণের প্রতিবাদের সময় সময়

দু' একজন মধ্যবিত্ত স্বাধীনচেতা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। সহায়তার অভাবে তাঁহারাও নিজমতানুযায়ী কর্ত্তব্য-সাধনে অক্ষম হন। এই সকল কটু সত্য সেক্রেটারী-অব-ষ্টেট মিঃ ওয়েজউড বেনকে সবিশেষে বলিলাম। নির্ভীক অকৃত্রিম বন্ধুভাবেই বুঝাইতে চেষ্টা পাইলাম। তিনিও যে না বুঝিলেন তাহা মনে হইল না, কিন্তু প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তন না হইলে ফলের আশা করা বিড়ম্বনা। ভারতবর্ষ স্বাধীন রাজ্য নহে; ঘরে-বাহিরে, সময়ে-অসময়ে একথা প্রতিপলেই বিশদভাবেই বুঝাইয়া দেয়। যেখানে নিজ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেখানে স্বাধীন জাতিরা তাহাদিগের প্রতিনিধিকে কেনই বা আমল দিবে?

ভারতবর্ষের পক্ষে হাই-কমিশনার স্যর অতুল চট্টোপাধ্যায়কেও এ সম্বন্ধে বিস্তর কথা বলিলাম। ট্রেড-কমিশানার লিণ্ডসে, শিক্ষা বিভাগের পরামর্শদাতা পবিত্র দত্ত প্রভৃতি পদস্থ কর্মচারীদিগের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম কিন্তু ফল অকিঞ্চিৎকর হইল!

অল্ডউইচ্এ কিংসওয়েতে যে নূতন অতিরম্য অট্টালিকায় "ইণ্ডিয়া হাউসে" হাই কমিশানারের আফিস এখন উঠিয়াগিয়াছে তাহা ভারতবর্ষ হইতে আনীত, মার্ব্বল, কাঠ, ইত্যাদির সাহায্যে ভারতীয় কারিকর দ্বারায় গঠিত হইয়াছে। এই ইমারত প্রস্তুতের জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উপনিবেশ গুলির এক একটী নিজস্ব আফিসের জন্য বৃহৎ বৃহৎ সুরম্য অট্টালিকা এইস্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। "ইণ্ডিয়া হাউস" ইহারই অনুকরণ! ইম্পিরিয়াল কনফারেন্‌স ও জেনিভায় লিগ্-অফ্-নেসন্‌সে এই সকল স্বত্ব ও স্বামিত্ব রক্ষার মীমাংসার জন্য আলোচনা হয়। স্বাধীন, নিজরাজতন্ত্র-বর্জ্জিত ভারতের পক্ষে ঐ রম্য সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণে এ সকল সত্ব ও স্বামিত্ব-অর্জ্জনের বা রক্ষার আড়ম্বর বিসদৃশ মনে হয় এবং পদে পদে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে! বহু বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তি ও অসুবিধার মধ্য দিয়াও দেশের কার্য্য যথাসম্ভব উদ্ধার করিতে হইবে এই উদ্দেশ্য করিয়া এ গুরুভার এত আপত্তি ও অসুবিধা সত্বেও নিজ স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়াছি। ভগবান এ উদ্যোগের সহায় হউন।

গতবৎসর ও তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের আফিসের এক জন নিম্নতর কর্ম্মচারী ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ বৎসর দেখিলাম সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট ক্যাপ্টেন ওয়েজ উড বেন ও শ্রমজীবিদলের সেক্রেটারী স্বয়ং অভ্যর্থনা করিলেন ও নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। ইহাদের কথার মধ্যে কিন্তু সুর ঐ এক! ভারতবর্ষের রাষ্ট্রগত নিজস্ব কোনই অধিকার নাই এবং সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের উপদেশ মত চলিতে হইবে এ কথার ইঙ্গিত বার বার করিলেন। গতযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। ইহারই ফলে ভার্সেলস্ সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরের সময় লর্ড সিংহ ও মহারাজা বিকানীর ঐ সর্ত্তে ভারতের দিক্ হইতে স্বাক্ষর করেন এবং ভারতকে স্বাধীন রাজ্যরূপে গণ্য করার পরোক্ষে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। প্রত্যক্ষে ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছে। বাস্তবপক্ষে কেবল বৃটিশ দলের ছয়টা ভোট লিগ্ অফ্ নেশনসে পাইবার জন্যই ভারতবর্ষকে স্বাধীনরূপে খাড়া করান হইয়াছিল! যে আমন্ত্রণে যে বিষয়ের জন্য আসিয়াছি তাহার অন্ততঃ আংশিক কৃতকার্য্য হইলে ধন্য জ্ঞান করিব।

সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট যখন আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন সে সময় আণ্ডার সেক্রেটারী সার ফিন্‌ল্যাণ্ড ষ্টুয়ার্ট (যিনি সাইমন্ কমিশনের সেক্রেটারী ছিলেন) ও সার ম্যালকম্ সিটন্ সঙ্গে ছিলেন। ইঁহাদের সহিত পূর্ব্বপরিচয় ছিল, আদর-আপ্যায়ন যথেষ্ট করিলেন। বেহারের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর ও বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সার হেনরী হুইলার ও সার ওমার হয়াৎ খাঁ, সার বসন্ত মল্লিক মহোদয়-গণ আসিয়া সম্মান করিলেন এবং যাঁহার যেমন মতি সেই মত উপদেশ দিলেন। সার ক্যাম্বেল রোডস্ এক জন পুরাতন সওদাগর ছিলেন। তিনি বিশেষ যত্ন দেখাইয়া তাঁর হেনলী অফ্ টেমস্-এর বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকারের নিমন্ত্রণ করিলেন। সময়াভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লিটন, প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রফেসার ষ্টারলিং ও টেম্পারেন্সের ক্যাপ্টেন এণ্ডারসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল না। ভূতপূর্ব্ব

ভাইসরয় লর্ড হার্ডিং তাঁহার দেশের বাড়ীতে আছেন তাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে না জানিয়া দুঃখ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। সময়ের অল্পতার জন্য বহু বন্ধুর সহিত দেখা ঘটিতেছে না, ইহাতে মনে হয় কাজের সুবিধাও কমিয়া যাইবে।

সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের কর্ম্মচারী মিঃ ক্রফট্ আমাদের সেক্রেটারী হইয়া জেনিভা যাইতেছেন। তাঁর নিকট এসেম্ব্লির কাগজ পত্র বুঝিয়া লইয়া আমার মালপত্র তাঁহারই জিম্মায় দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম। দু একদিন পূর্ব্বে যাইয়া প্যারিস ইণ্টেলেকচুয়াল কো অপারেসন্ ইন্‌ষ্টিটিউট দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এখন তাহা বন্ধ কাজেই তাহা স্থগিত রহিল।

আপাততঃ যেরূপ গতিক দেখিতেছি জেনিভার কার্য্যান্তে লণ্ডনে প্রত্যাগমন না করিলেও বোধ হয় চলিবে। জেনিভা হইতে সোজা দেশে ফিরিবার চেষ্টাই করিতেছি। অক্টোবর মাসের শেষে সকলেই রাউণ্ড টেবল্ কনফারেন্সে ব্যস্ত থাকিবে। অকারণে শীত ও নানা অসুবিধা ভোগ করার আবশ্যকতা মনে হয় না। যদি প্রয়োজনবশতঃ দুই তিন সপ্তাহের জন্য পুনরায় লণ্ডনে ফেরা দরকার হয় তবে অবশ্য আপত্তি করিলে চলিবে না যা' হোক ভবিষ্যতে বুঝিয়া ঠিক করিব।

কলিকাতা পুলিশকমিশনার টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা. ঢাকার লোমানকে হত্যা ও হড্‌সনকে হত্যার চেষ্টা, ময়মনসিংহে বোমা ফেলা, গন্ধী-নেহেরু ও সপ্রু-জয়াকার শান্তি স্থাপনের চেষ্টার অকৃতকার্য্যতা, ইত্যাদি ব্যাপারে এ দেশের লোকের মন ভারতবর্ষের প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন ও বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। উপস্থিতক্ষেত্রে সকলের সহিত ঘনিষ্টভাবে মেশার সুবিধা নাই। এরূপ ব্যাপার স্বাধীনতা-প্রয়াসী সকল জীবের মধ্যেই আছে, সকল যুগে হইয়াছে ও হইবে। এ কথা বুঝাইবার চেষ্টা ভারতহিতৈষী মাত্রেরই করা উচিত। যথাসাধ্য এ বিষয় চেষ্টা করিতেছি, ফল কি হইবে তা ভগবানই জানেন। মনে হয় এত কষ্ট করিয়া বিদেশে আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য এই সকল অবস্থা যথাযথ ভাবে বুঝানর চেষ্টা। যাঁহারা শাসনকার্য্যে লিপ্ত তাঁহা-দিগকে বুঝি... [illegible] তালি বাজে. না। চিরদিন তাঁহাদের এই কর্ত্তব্য অক্ষুণ্ণভাবে বজায় থাকিতে পারে না সময় থাকিতে হিসাবমত প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করিলে সকল দিক রক্ষা পায়। সাম্যবাদী স্বাধীনতাপ্রয়াসী লিবারলদলের এই কথা এবং আমাদিগকে এই মতের অনুযায়ী কথা কহিতে হইবে এবং কার্য্য করিতে হইবে।

রাউণ্ডটেবল কনফারেন্স যা পারে তা' করুক। জেনিভার কাজের যে ভার আমি পাইয়াছি তা' পালন করিবার অবসরে আমি মূলমন্ত্র লইয়াই কাজ করিয়া কথা কহিব।

মরাল এডুকেশন কংগ্রেশ-এর সেক্রেটারী মিঃ গুল্ডের সহিত দেখা হইল। প্যারিসে ২৩এ হইতে ২৮এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সভা হইবে। তাহাতে আমার উপস্থিত থাকা অসম্ভব। বিশেষতঃ এ সভার মধ্যেও পরস্পর যেরূপ বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে না থাকাই উচিত। ১৮ বৎসর পূর্ব্বে হেগে এই কনফারেন্সে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল, ঘনিষ্টতাও বাড়িয়াছিল; সেই জন্যই আমার মায়া, কিন্তু অকারণ বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে যাইতে আমার আর প্রবৃত্তি হয় না। ট্রাভলার্স ক্লাবে ভর্জ্জ ফক্স পিটএর সঙ্গে দেখা করাতে এ সকল বিবাদের বিবরণ বিশেষ করিয়া পাইলাম। দেখিতেছি সকলের সঙ্গেই সকলেরই মতান্তর, বিবাদ ও বিদ্বেষ—কোথাকার ব্যাপার কতদূর গড়াইবে কে জানে? টেম্পারেন্স প্রেসিডেণ্ট লর্ড ক্লাইভএর সহিত রিফরম্ ক্লাবে ও তাহার সেক্রেটারী ফ্রেডারিক গ্রাবের সঙ্গে আরকব্রুক ও হ্যামপিক রোডে ওয়েমবেলডন পার্কে দেখা করিলাম। সুরা ও মাদক দ্রব্য বিরোধে আমরা এক্ষণে যে সংগ্রাম দেশে করিতেছি ইহারা তাহার বিশেষ সহায়ক। এসময় দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে এ সাধুকার্য্যে ব্যাঘাত পড়িতেছে এসব কথা তাহাদিগকে বুঝাইলাম। আফিং-প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের অবাধ বিক্রয় সম্বন্ধে জেনিভাতে আলোচনা হইবে। এ বিষয়ে আমার মত সরকার পক্ষের মতের নিতান্ত বিরোধী।

যে কারণেই হউক, জেনিভা রাজসূয় যজ্ঞে আমার প্রতি মাদক নিবারণ-সম্বন্ধে বাদানুবাদের ভার পড়ে নাই। সরকার পক্ষের সহিত বিবাদ করিয়া যে ব্যক্তি লাট সাহেবের অনুরোধ সত্ত্বেও Licensing Boardএর সভা-

নবাবিষ্কৃত চারিটী যোগিনী মূর্তি

(ঘোষ-- সংগ্রহ)

কাঙড়া-পদ্ধতির চিত্র—নিদর্শন

(ঘোষ—সংগ্রহ)

পতিত্ব ত্যাগ করিয়া ছিল—সকল সভ্যজাতির প্রতিনিধি বর্গের সম্মুখে যে বিষয়ের আলোচনার ভার এহেন ব্যক্তির উপর দেওয়া নিতান্ত নিরাপদ নহে, কর্তৃপক্ষ তাহা বুঝিয়াছেন। আমার এবার ভার না পড়াতে আমিও নিশ্চিন্ত।

Holloway বলিয়া একজন নূতন অভিনেতা New Theatreএ Richardএর অভিনয় করিতেছে। নাম রক্ষা ... সে অভিনয় দেখিতে গিয়া ১৮ (আঠার) শিলিং জরিমানা দিলাম ও নিতান্ত হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। সেকালের রামযাত্রার মত চীৎকার ও তরবারির ঠোকাঠুকী। তবে সাজসরঞ্জাম দৃশ্যপটের যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখলাম এবং অভিনয়ের সুবন্দোবস্ত ও বাড়িয়াছে। Stratford on Avonএ এবং Old Victoria তে ১৯২৬ সালে যে অভিনয় দেখিয়াছি তাহার মত সুন্দর নিখুঁৎ অভিনয় আর দেখিব না।

Picadilly Circusএর মাঝখানে Erosএর যে মূর্ত্তি ছিল তাহা উঠাইয়া দিয়া রাস্তা চওড়া করা হইয়াছে। লোকে তাহাতে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে বলিয়া সে মূর্ত্তি আবার পূর্ব্বস্থানে তুলিয়া আনিবার কথা হইতেছে লোক-মত অগ্রাহ্য করা এখানে অসম্ভব। কিন্তু একটা বিষয় লোকমতের দ্বৈধবশতঃ প্রাচীনপন্থীরা হটিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের দেশের ন্যায় এখানেও সেণ্টপলের বড় গিরজার সামনে ও ট্রাফালগার স্কোয়ারের সামনে খোলা জায়গায় বিস্তর পায়রাকে লোকে নিত্য খাওয়াইয়া আনন্দ লাভ করে। লণ্ডন কাউন্টি কাউনসেল ঠিকাদার দিয়া সেই সব পায়রা ধরিয়া নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। বৃন্দাবনধামে বানর ধরা ব্যাপারে যেমন দুই দল হইয়া আমার পরিশ্রম ও চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল এখানেও সেইরূপ দুইদল হইয়াছে।

সোমবার হইতে পায়রাধরা ও মারার সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। পায়রা ধরিলে ও মারিলে লক্ষ্মী ছাড়েন, আমাদের দেশের প্রবাদ ও বিশ্বাস, একথা এখানে বলিবার ও বুঝাইবার লোক নাই বোধ হয়।

পিকাডেলী সার্কাসে খুব নীচে দিয়া মাটীর তলদেশে 'টিউব রেলওয়ে' বহুদিন চলিতেছে। এখানে রাস্তা পারাপার হওয়া বড় কঠিন বলিয়া মাটীর তলা দিয়া পারাপারের রাস্তা (Causeway)ও ছিল। এবার দেখিলাম সেই রাস্তার চারিদিক জুড়িয়া বিস্তৃত একটা বাজার বসিয়াছে। বাজার যেন একটা ছোট নগর বলিলেও হয়। কত দোকান-পাট ও নগর সেই মাটীর-নিচে খোলা হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। গাড়ী চাপা পড়িার ভয় নাই; কাজেই লোকে ধীরে সুস্থে সেখানে বাজার-হাট করিতে পারে—বেড়াইতে পারে! লণ্ডনে যাহা সম্ভব কলিকাতায় কাদামাটীর বনিয়াদের শহরে তাহা সম্ভব নয়—গঙ্গার তলা দিয়া টনেল হইল না; কলিকাতার রাস্তার তলায় টিউব রেলওয়ে হইল না।

Sir Edwger Lulyum এর নকসায় Samnup-দের যে বাড়ী হইয়াছে তাহা দেখিবার বিষয় Selfudge Garmage, Whetly, Harood, প্রভৃতির ন্যায় আরও অনেক store লণ্ডনে বাড়িয়াছে, দশ-বিশটা হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল (Whiteaway Laidlaw) কোম্পানী এইসকল কোম্পানীর পকেটে থাকিতে পারে। ইহাদের প্রকোপে ছোট ছোট দোকান সব মারা যাইতেছে। অথচ ভাল জিনিস ইহারা সস্তায় দেয়। এখন বিদেশীবর্জ্জন যুগে ভারতবর্ষে এ সকল কোম্পানীর নামের কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু ইহারা যে প্রণালীতে গরীব লোককে সস্তায় ভাল জিনিস দিবার চেষ্টা করিতেছে, সে চেষ্টা বর্ত্তমান স্বদেশী-যুগে ভারতবর্ষে অভাব; ইহা দুঃখের বিষয়।

সকল দেশে যে দৈন্য ও হাহাকার উঠিয়াছে বিলাতও তাহার হাত এড়াইতে পারে নাই। পৃথিবী ব্যাপিয়া এই হাহাকার। শ্রমজীবী ও ধনীর নিত্যসংগ্রামে ধনী ক্রমশঃ হটিতেছে। তাহাদের প্রবর্ত্তিত বিলাসিতা শ্রমজীবীদের আক্রমণ করিয়াছে। শ্রমজীবীরা চায় অল্প পরিশ্রম, অধিক রোজগার ও প্রভূত বিলাসিতা; কাজেই মজুরী বাড়িয়া যাইতেছে—রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশঃ শ্রম-জীবীদের হাতে আসিতেছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেও তাহাদের সহিত যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইতেছে। কাজেই তাহাদের হাতে গভর্ণমেণ্ট (Government) আসিয়াছে।

কতদিন সে ক্ষমতা থাকিবে তাহা বলা যায় না। কিন্তু এই বিলাসিতা-স্রোত আনিতেছে দারিদ্র্য; সকলে রোজগার করিবার সুবিধা পায় না। সরকার হইতে তাহাদিগকে ভাতা (dole) দিতে হয়, বসিয়া বসিয়া খাইতে পাইলে কে আর পরিশ্রম করিবে, জিনিসের দামও এই ভাতা দিবার ভার তো চক্ররীতি-অনুসারে পড়িতেছে সেই শ্রমজীবীরই উপর। ধনীর দলও উৎসন্ন যাইতেছে। ট্যাক্স দিতে না পারার জন্য অনেক বড়মানুষ বসত বাড়ী ভাড়া দিয়া ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেছে। চৌরঙ্গীর অপেক্ষা ফ্যাসানের জায়গা Park Lane. Duke of Devonshireএর মত বড়মানুষ ও পৈত্রিক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাড়ী ভাঙ্গিয়া দিয়া ছোট ছোট ফ্লাট তৈয়ার করিয়া ভাড়া দিতেছেন। ফ্লাটের ভাড়া বৎসরে দুই হাজার গিনি অর্থাৎ প্রায় ত্রিশহাজার টাকা। বিলাসিতা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে কে জানে?

Free Masons Hall (Great Queen Street Aldwyeh) এবারেও দেখিতে গিয়াছিলাম। Polytechnic Institute, Regent Streetএ Sir Kenyston Studd এর সঙ্গেও দেখা করিলাম। তিনি Lord Cornwallisএর সঙ্গে ভারতবর্ষে Grand Lodge Deputationএ দুই বৎসর পূর্ব্বে গিয়াছিলেন। তার পর লণ্ডনের লর্ড মেয়র হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে সময় ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন তখন আমি Lodge Anchore Hope (234 E. C.) এর Master. আমাদের অভ্যর্থনায় তাঁহারা বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন, সে কথা তাঁহাদের মনে আছে

ক্রমশঃ

জগতের পতিতজাতির মুক্তি আন্দোলনের চেষ্টা

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, পিএইচ-ডি

গ্রীস

অন্যত্র আমরা প্রাচ্যখণ্ডের এক পতিত জাতির মুক্তি আন্দোলনের চেষ্টার ইতিহাস যথাসম্ভব বর্ণনা করিয়াছি একণে আমরা গ্রীসের সামাজিক অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব, কারণ মিশর, হেত্তিতরাজ্য, ব্যাবিলন ও আসিরিয়ার পর ইতিহাসে গ্রীসের উদয় হয়। সেইজন্তই গ্রীসের সমাজকে বর্ত্তমানের আলোচ্য বিষয় বলিয়া গ্রহণ করা হইল।

গ্রীসের বিষয় একটা কি দুইটা প্রবন্ধে বলা যায় না। গ্রীসের স্বাধীন ঐতিহাসিক জীবন ছয় বা সাতশত বৎসরের বেশী নয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে গ্রীক জাতি ঐতিহাসিক-জগতে যে লীলা খেলা করিয়া গিয়াছে তাহার প্রতিধ্বনি আজও চলিতেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্যে, কলাবিদ্যায়, যুদ্ধবিদ্যায়, রাজনীতিতত্ত্বে, দর্শনশাস্ত্রে এবং সামাজিক প্রশ্ন সমাধানের উপায় প্রদর্শনে যে উৎকৃষ্টতা এবং অনেকস্থলে চূড়ান্ততত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান জগৎ এখনও সেই স্থলে উপনীত হইতে পারে নাই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরও প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গ্রীস স্থাপিত করে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রীসের চর্চ্চা হইতে বিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং প্রাচ্যেও তাহার ধাক্কা অতীতে কয়েকবার বিশেষভাবে লাগিয়াছে। ভারতও তাহা হইতে বাদ যায় নাই।

এই সব কারণে গ্রীসের ইতিহাস যতই পাঠ করা যায় মন ততই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়ে। আর পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে যে গ্রীক বা হেলেনিক জাতিই প্রাচীনকালে সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে যেসব জাতি নিজেদের মধ্যে একজাতীয়তা সংস্থাপন করিতে ব্রতী আছেন তাঁহারা এহেন গ্রীসের জাতীয়-জীবনের ভুল অবগত হইয়া সাবধান হইতে পারেন। *

এই প্রবন্ধে আমরা কেবল গ্রীসের পতিতশ্রেণীর মুক্তি-আন্দোলনের প্রচেষ্টার ইতিহাস অবগত হইতে ইচ্ছুক, তাহা ব্যতীত অন্য বিষয়ের অনুসন্ধান এই স্থলে করা হইবে না।

গ্রীসের সামাজিক অবস্থার বিষয় জানিতে হইলে গ্রীক-জাতির উৎপত্তি বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে। গ্রীসের গোড়ার সংবাদ আমরা হোমারের জগৎ-বিখ্যাত "ইলিয়াডে" প্রাপ্ত হই। তথায় গ্রীকজাতি বা গ্রীসদেশের নাম উল্লেখ নাই। কিন্তু পরে যাহারা "গ্রীক"-জাতি নামে পরিচিত হইয়াছিল তাহাদের, হেলেনেস্, (Hellenes), ড্যানাইয়ান (Danaians) এ্যাকেয়ান (Achaeans) প্রভৃতি নামে তিনি অভিহিত করেন। "গ্রীক" নামটী পরে ঐতিহাসিক যুগে ব্যবহৃত হয়। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে গ্রীকজাতি তিনটী কুল বা শাখায় (Tribe) বিভক্ত ছিল যথা:—আইওনিয়ান (Ionians) ইহারা গ্রীসের এটিকায় এবং এসিয়া মাইনরে উপনিবেশ

---

* ভারতীয় ইতিহাসকার এলফিনষ্টোন পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কল বর্ণনাকালে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "হিন্দুরা সাতশত বৎসরে কিছুই ভুলে নাই এবং কিছুই শিখে নাই। They have forgotten nothing, they have learnt nothing)!" আমার বিশ্বাস আজও আমাদের মনের সেই অবস্থা আছে। ইহা আমাদের মনের গোড়ামী ও স্থাণুবৎ অবস্থার পরিচায়ক। আমেরিকার সমাজতাত্ত্বিক লেখক Brook Adams তাঁহার "Law of Civiligation and Decay" নামক পুস্তকে তাঁহার স্বদেশবাসীদের প্রাচীনসাম্রাজ্য সমূহের ভুল হইতে সাবধান হইবার জন্য সতর্ক করিয়াছেন।

স্থাপিত করিয়াছিল। এসিয়ার আইওনিয়ানেরা † আদিম কারীয় (Carians) জাতির সহিত রক্তসম্পর্ক স্থাপিত করিয়াছিল। ইহারা তাহাদের ইউরোপীয় জাতিদের ন্যায় নির্ভীক যোদ্ধা ছিল না, কিন্তু প্রথমে সভ্যতা ও চর্চ্চাতে তাহাদের অপেক্ষা উচ্চস্তর গ্রহণ করিয়াছিল। এই হেলেনিক-শাখায় ইউরোপীয় অংশ আটিকায় থাকিয়া এথেন্সে রাজধানী স্থাপিত করে। পরে বুদ্ধিবৃত্তি ও চর্চ্চার দ্বারা এই অংশ প্রাচীন জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। তৎপরে আসে ডোরিয়া (Doriens) জাতি। ইহারা আবার দুইটী রাষ্ট্র স্থাপন করে :—একটি দক্ষিণে স্পার্টা, এবং তাহার উত্তরে করিন্থে। ইহার পর আসে এওলিয়ান (Eaolian) জাতি, ইহারা থিবেশে রাজধানী স্থাপিত করে।

এই হেলেনিক জাতিসমূহ এক পূর্ব্বপুরুষেরই সন্তান বলিয়া নিজেদের এক গোষ্ঠীর লোক মনে করিত, এবং নিজেদের গণ্ডীর বাহিরের জাতির লোকের সহিত বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করিত না। বাহিরের লোকদের তাহারা "বর্ব্বর" (Barbarians) § বলিত, তাহাদের ঘৃণা করিত এবং নিজেদের দেশে তাহাদের কেহ বাস করিলে তাহাদের "মেটিক" (Metics) বলিয়া নাগরিক অধিকার প্রদান করিত না।

এই ত্রিভাষা বিভক্ত হেলেনিক জাতির মধ্যে ভাষারও কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা ছিল। তৎপর আচার-ব্যবহার, কিংবদন্তী এবং রাষ্ট্রগত বিভেদ ছিল। হেলেনিকেরা নগর রাষ্ট্র (City-state) গঠন করিয়াছিল। কখনও সমগ্র দেশটাকে এক রাষ্ট্রের অধীনে আনিতে পারে নাই। হেলেনিকের দেশভক্তি তাহার স্বীয় নগরের রাষ্ট্র-ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল কিন্তু বিজাতি হস্ত হইতে বিমুক্ত থাকিয়া হেলেনেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য "হেলেনত্ব" (Hellenedem) ভাব সৃষ্ট করা হয়। এইজন্য অলিম্পিক ক্রীড়াসমূহ Olympic games এবং আরও তিনটী মেলা স্থাপিত করা হয়। এই সব মেলাতে হেলেন-বংশীয় লোক ভিন্ন অন্য কোনও লোক যোগদান করিতে পারিত না। এইরূপ একটা জাতীয় রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তে চর্চ্চার বন্ধন দ্বারা তাহারা বাহিরের জাতিসমূহ হইতে নিজেদের পার্থক্য রক্ষা করিত।

এক্ষণে কথা উঠে, এই হেলেনিক জাতি কি গ্রীসের আদিম অধিবাসী? ভাষার দিক দিয়া দৃষ্ট হয় যে, তাহারা কেন্টুম * বিভাগীয় আর্য্য বা ইণ্ডো জার্ম্মাণভাষাভাষী। কিন্তু তাহাদের জনশ্রুতি বলে যে পূর্ব্বে এই দেশে "পেলাসগীয়" (Pelesgian) নামে একটি সভ্যজাতি বাস করিত। তাহাদের বিজিত ও ধ্বংস করিয়া আর্য্যভাষী হেলেনেরা সেই দেশে বাস করে। এই জনশ্রুতির মূলে কতটা সত্য আছে তাহা প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকদের তথ্যের বস্তু হইয়াছে। বর্ত্তমানে স্থির হইয়াছে যে পেলাসগীয়জাতি ভূমধ্যসাগরীয় জাতির (Mediterranean Sea-race) একটী অংশ। ইহারা বোধ হয় আর্য্যভাষী ছিল না। ফ্রান্সের বাস্কেরা (Basques) এই ভূমধ্যসাগরীয় জাতির একটি শাখা এবং তাহাদের ভাষা অনার্য্য। ইহারা কিন্তু বিশেষ সভ্যতা সম্পন্ন ছিল। পরে, উত্তর হইতে আর্য্যভাষাভাষী অসভ্যেরা আসিয়া তাহাদের ধ্বংস করে এবং ক্রমে বাকী সকলের সঙ্গে মিলিয়া যায় বা তাহাদের দাসশ্রেণীতে পর্য্যবসিত করে। এই সংমিশ্রণ ও সংগঠনেরফলে

† "আইওনিয়ান" শব্দ এসিয়াদেশের "যবন" নামে রূপান্তরিত হইয়া হিন্দুদের ভিতর আসিয়াছে। আইওনিয়নদের আদি পুরুষ Ion হইতে এই নাম আসিয়াছে। প্রাচীন বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, নোয়ার এক পুত্রের নাম "যবন"। প্রাচীন ভারতীয়েরা "যোন" "যবন" নামে গ্রীক সভ্যতাক্রান্ত ব্যক্তিদের অভিহিত করিতেন। এসিয়াবাসী আইওনিয়ানদের সংস্পর্শে সর্ব্বপ্রথমে প্রাচ্যদেশীয়েরা আসিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই সময় হইতে "যবন" শব্দের উৎপত্তি হয়।

§ "বর্ব্বর" কথাটী সংস্কৃতমূলক নহে। হেলেনিক জাতীয় লোকেরা পারসীক ও বিদেশীদের ভাষা বুঝিত না বলিয়া তাহাদের Barbaroi বলিত। বিদেশীয় ভাষা গ্রীকদের কাণে "বারবার" বলিয়া শুনাত, অতএব বিদেশীরা বর্ব্বর।

* আর্য্য বা ইণ্ডো জর্ম্মাণ ভাষাকে ভাষাতত্ত্ববিদেরা দুইভাগে বিভক্ত করেন :—কেন্টুম (Centum) এবং শাতেম (Satem) পশ্চিম ইউরোপীয় ভাষাসমূহ প্রথম শ্রেণীর এবং পূর্ব্ব ইউরোপীয় ও এসিয়ার আর্য্যভাষাসমূহ শেষোক্ত দলের। ইতিমধ্যে, অধুনা আবিষ্কৃত পূর্ব্ব তুর্কিস্থানের ইউ চি (Yue-Chi) জাতির ভাষাকে কেন্টুমশাখার অন্তর্গত বলিয়া ভাষাতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন। বৌদ্ধরাজা কনিষ্ক যে ভাষায় কথা কহিতেন তাহা কেন্টুম শাখার একটী অংশ।

ঐতিহাসিক "হেলেনিকজাতি" উদ্ভূত হয়। গ্রীসের ঐতিহাসিক যুগেও অনেকস্থলে পেলাসগীয়েরা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখিয়াছিল; পরে গ্রীসদের দ্বারা বিজিত হইয়া "হেলেনত্ব" প্রাপ্ত হয়। অবশ্য পরে কথা উঠে, কে হেলেনে বংশোদ্ভব এবং কে পেলাসগীজাতীয় লোক। কিন্তু কোন গ্রীক পেলাসগীয় বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিল না, কারণ তাহাতে হেলেনিকজাতির মর্য্যাদা গৌরব হইত। গ্রীকঐতিহাসিক হেরোতোটাস বলেন যে, আটিকার লোকেরা পেলাসগীয়, কিন্তু হেলেণেদের দ্বারা বিজিত হইয়া তাহারা হেলেনত্ব প্রাপ্ত হয়। আটিকার-রাজধানী আথেন্স চর্চ্চাতে গ্রীক ইতিহাসে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। তাহাদের প্রতি এই অপবাদ প্রয়োগ হইলে, আসল ব্যাপারটা কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা আজ নরতত্ত্ববিদেরা অনুমান করিতে পারেন না; আবার দক্ষিণের আরকেডিয়ানেরা (Arcadians) হেলেনত্বপ্রাপ্ত হইয়াও পেলাসগাস (Pelasgus) নামে একজন আদিপুরুষের সন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত। হেসিয়ড ওএসিউস তাঁহাকে একজন আদিমজাতীয় (Aborigine) লোক বলিয়া মনে করেন। এই ব্যক্তিকে পেলাসগীয় জাতীয় একজন পুরুষ বলিয়াই অনুমান হয়।

প্রাচীনকালের পতিত শ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের চেষ্টার অনুসন্ধানে আমাদের একটু অবান্তর কথা কহিতে হইতেছে কারণ, আমাদের একটা সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে, পতিত শ্রেণী-সমূহের নিম্নাবস্থা তাহাদের বিজিতজাতির বংশধর বলিয়া ঘটিয়াছে বা অর্থনীতিক দুরবস্থা হইতে সংঘটিত হইয়াছে? এইজন্য গ্রীকজাতির উদ্ভবের নরতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

প্রাচীন গ্রীকজাতির যে কয়টা সুনির্দ্ধারিত নর-করোটি (Skull) আজকাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা বার্লিনের বিখ্যাত করোটি-তত্ত্ববিদ্ ৺রুডলফ্ ভিরসো (Rudolf Virchow) পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই কয়েকটার মধ্যে লম্বামাথা-লম্বানাকবিশিষ্ট (Dolichocephalic-leptorrhine); এবং লম্বামাথা-মধ্যমাকৃতি নাকের লক্ষণবিশিষ্ট (Dolichocephic-mesorrhine) এবং চওড়া মাথা (Brachy-cephalic)বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ঐ স্থানের আর একজন নরতত্ত্ববিদ ৺ ফনলুসান বলেন যে এথেনীয়ের লম্বামাথা লক্ষণাক্রান্ত এবং স্পার্টানেরা চওড়া বা গোলমাথা লক্ষণাক্রান্ত এবং শেষোক্তেরা এসিয়া-মাইনর হইতে আগত! ইহাতে বেশ বোধগম্য হয় যে প্রাচীন গ্রীকদের হেলেনেত্বের স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও তাহারা একটা মিশ্রিত জাতি ছিল। অবশ্য লুসান এই লম্বামাথা-লম্বা বা সরু নাক-বিশিষ্ট লোকদের উত্তর-ইউরোপীয় বা টিউটন জাতি যাহাদের প্যানজার্ম্মানেক একমাত্র খাঁটি আর্য্য বলেন; তাহাদেরই বংশধর বলেন। কিন্তু এই লক্ষণাক্রান্ত লোক (Bistype) উত্তর ইউরোপ হইতে ভারত পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইহাদেরই প্যানজার্ম্মানেরা প্রাচীন (Nordic race) ইহারাই নাকি খাঁটী আর্য্য বলেন! অবশ্য ভারতে তাহারা মিশ্রিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা তর্কের বিষয়; এই বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বলিবার মত এখনও কিছু নির্দ্ধারিত হয় নাই। তৎপরে আসে. লম্বামাথা-মধ্যমাকৃতির লক্ষণের করোটি; ইহারা নিঃসন্দেহ ভূমধ্যসাগরীয় জাতির বংশধর; কারণ এই লক্ষণ (Cromagnon) মূলজাতির চিহ্ন এবং দক্ষিণ ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়াতে ইহারা এখনও বিরাজ করে। শেষে আসে গোলমাথার করোটি। লুসানের মতে এসিয়া মাইনরের বেশীর ভাগ লোকেরা এই লক্ষণাক্রান্ত। এই লক্ষণাক্রান্ত লোকদের তিনি Armenoid (আরমাণির ন্যায়) এই আখ্যা দিয়াছেন। মধ্য ইউরোপ হইতে মধ্য এসিয়ার পামীর উপত্যকা পর্য্যন্ত এই লক্ষণের জাতি বাস করে। ইউরোপে ইহাদের Alphine জাতি বলে। ভারতে এই লক্ষণের লোকও পাওয়া যায়।

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, গ্রীসের সভ্যাবস্থায় যে সামাজিক স্তরবিভাগের উদয় হয় তাহা একমাত্র বিজেতা ও বিজিত সম্পর্ক হইতে উদ্ভূত নহে। অনেকস্থলে বিজিতজাতি দাসত্বে পরিণত হইলেও বিজেতার ধমনীতেও আদিমজাতির রক্ত প্রবাহিত হইত। এক্ষণে বিচার্য্য, গ্রীসের সামাজিক নীতি কি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্র বিদ্যমান। প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমাজনীতি এক প্রকারের ছিল না তবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, গ্রীক রাষ্ট্রসমূহের অধিবাসীরা তিন স্তরে বিভক্ত ছিল নাগরিক (Civic), স্বাধীন বিদেশী

(Free alien) এবং দাসশ্রেণী (Servile class)। এই সঙ্গে কোন কোন রাষ্ট্র যথা স্পার্টা, আরগস (Argos) এবং এলিস (Elis), পেরিয়কি Periocci বলিয়া এক শ্রেণীর প্রজা বাস করিত যাহারা ব্যক্তিগতভাবে কতকটা স্বাধীনতা ও সুবিধা ভোগ করিত কিন্তু নাগরিকের অধিকার লাভে বঞ্চিত থাকিত।

গ্রীক নাগরিকেরা রাজনীতিক অধিকার সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া আর্থনীতিক সুখ ও সুবিধা স্বীয় শ্রেণীর ভোগে নিযুক্ত করিত। এক কথায় নাগরিক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণভাবে পার্থক্য বজায় রাখিয়া চলিত। ইহা তাহাদের কতকটা অহংকার এবং কতকটা স্বার্থপরতার পরিচায়ক ছিল। স্পার্টায় এই পার্থক্য আরও ভীষণভাবে বর্ত্তমান ছিল। তথায় পেরিয়কিদের সহিত বিবাহ পর্য্যন্ত চলিত না। একবার স্পার্টা বিদেশীদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় দেশে যুবকের অভাব হওয়ায় কুমারীরা বাধ্য হইয়া পেরিয়কি যুবকদের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করে। পরে স্পার্টান যুবকেরা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখে তাহাদের ভগিনীরা বাধ্য হইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদের সহিত বিবাহসম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে এবং অর্দ্ধ-স্পার্টান ভাগিনেয়দলও উদ্ভূত হইয়াছে! ইহা তাহাদের নিকট লোমহর্ষণ ব্যাপার*। অবশ্য ভগিনী ও ভাগিনেয়দের হত্যা না করিয়া তাহাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করে এবং ইহারা এড্রিয়াটিক সমুদ্রের একটী দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই পেরিয়েকেরা স্পার্টার বাহিরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কৃষিকার্য্য করিত এবং স্পার্টানরা বাণিজ্যাদি কর্ম্মকে ঘৃণা করিত বলিয়া ইহারা এই সব জীবিকার রাস্তা একচেটিয়া করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের রাজকর দিতে হইত এবং যুদ্ধ কালে পল্টনে ভর্ত্তি হইতে হইত। এই শ্রেণী ব্যতীত হেলট (Helot) বলিয়া দাসশ্রেণী স্পার্টায় ছিল। কিন্তু মেটিকেরা (বিজাতীয় বা বিদেশীয় লোক) তথায় বসবাস করিতে পারিত না। স্পার্টানরা নিজেদের ও প্রজাদের মধ্যে (তাহারা সকলেই নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত) বিশেষ ব্যবধান রাখিয়াছিল বলিয়া দিনরাত্রি তাহাদের সশঙ্কিতভাবে জীবনযাপন করিতে হইত। আইনানুযায়ী স্পার্টার নাগরিকের সুখসচ্ছন্দতা বজায় ছিল, কারণ হেলট গোলামেরা তাহার জমি চাষ করিত এবং সে সমস্ত নাগরিকের জীবনযাপন করিত। কিন্তু ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে এই কমঠপ্রবৃত্তির জন্য নাগরিকদের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে আর্থনীতিক তারতম্যেরও উদয় হইয়াছিল।

তৎপর আসে দাসশ্রেণীর কথা। এই শ্রেণী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরণে বর্ত্তমান ছিল। কোনস্থানে ইহারা আদিম অধিবাসী বা অন্য কোন প্রকারের প্রাচীন অধিবাসীদের বংশধর, যাহারা বিজেতাদের দ্বারা পরাজিত হইয়া তাহাদের জমির গোলাম কৃষকরূপে বাস করিত (Serf system; পূর্ব্ব বঙ্গের পুরাতন গোলাম বা নফর শ্রেণীর ন্যায় বোধ হয়?) * স্পার্টার হেলটেরা এই শ্রেণীর জলন্ত উদাহরণ ছিল, কিন্তু থেসালির পেনেসটারা (Penestae), সিসিলির কিলিরিরা (Cyllyrii) ক্রীটের ক্লারোটেরা (Clarotae) এবং হেরাক্লিয়া পন্টিকার মারিয়ান ডিনির (Mariandyni) প্রভৃতি দাসশ্রেণীও প্রায়ই হেলটদের পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা ক্রয় দ্বারা

---

* ইহা আমাদের দেশের প্রতিলোম বিবাহের ন্যায়। মধ্যযুগের জার্ম্মাণিতে ও প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। পৃথিবী উচ্চশ্রেণীর প্রতিলোম বিবাহের সন্তানকে সমাজে গ্রহণ করে না এবং তাহাদের উচ্চশ্রেণীর অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। বর্ত্তমান ভারতে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মিশ্রিত বিবাহের সন্তানেরাও এই বিধির অন্তর্গত হইয়াছে। ইউরোপীয় পিতা ও ভারতীয় মাতার সন্তান "Anglo-Idian" হয়, ইউরোপীয়দের পরেই রাজনীতিক অধিকার পায়; কিন্তু ভারতীয় পিতা ও ইউরোপীয় মাতার সন্তান "Indian" রূপে গণ্য হয়।

* ইহারা ক্রীত গোলামের ন্যায় ব্যবহৃত হইত না। ক্রীত গোলাম মনিবের নিকট তৈজসপত্র বা (পশুর) ন্যায় ব্যবহৃত হইত। একজন গোলামকে মনিব ইচ্ছা করিলে মারিয়া ফেলিতে পারিত এবং তাহার পুত্রাদি পাঁটাপাঁটীর বাচ্ছার ন্যায় বিক্রীত হইতে পারিত। কিন্তু Serfরা একটী নির্দ্দিষ্ট জমিতে থাকিতে পারিত, যাহা তাহার মনিবের জন্য কর্ষণ করিতে হইত এবং তাহাদের পুত্রাদি পাঁটার বাচ্ছার ন্যায় বিক্রীত হইত না। মানবের কিছু অধিকার তাহারা পাইত। মধ্যযুগে জার্ম্মাণিতে এই প্রথা ছিল এবং ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই প্রথা বন্ধ করা হয়। কিন্তু এই দুই দেশে Serf মনিবের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে গণ্য হইত।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত না, বংশবৃদ্ধি দ্বারা সেই কর্ম্ম সম্পাদিত হইত। ইহাদের সাধারণতঃ কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত রাখা হইত এবং ইহারা কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হইয়া সমাজের যৌথ সম্পত্তি (Communal property) বলিয়া গণ্য হইত এবং কিছু সুবিধাও প্রাপ্ত হইত। ইহাদের কর্ম্ম করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে বণ্টন করা হইত। কিন্তু যাহাদের পরিচর্য্যা করিবার জন্য হেলটেরা নিযুক্ত হইত তাহারা ইহাদের খুন করিতে বা খালাস দিতে পারিত না। কেবল যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলে হেলটেরা দাসত্ব হইতে মুক্তি হইতে পারিত। কিন্তু সময়ে হেলটেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলে গুপ্তপুলিশ তাহাদের উপর বিশেষ নজর রাখে এবং তাহাদের দিনরাত্রি সামরিক আইনের অধীনে থাকিতে হইত, এবং একবার ২০০০ হেলট যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলে রাষ্ট্র যখন তাহাদের মুক্তির দাবি স্বীকার করে, তখন এফরেরা (Ephro—রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্ম্মকর্ত্তা) তাহাদের গুপ্তভাবে হত্যা করে। এই নরহত্যা কিপ্রকারে সম্পাদিত হয় তাহা ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে!

সমাজের অবস্থাভেদে কিন্তু দাসদের ব্যবস্থা এবং দশাও বিভিন্ন হইত। আর্থনীতিক সাম্যতন্ত্রিক (Communistic) স্পার্টা প্রভৃতি রাষ্ট্রে যে ব্যবস্থা ছিল, ব্যক্তিত্ববাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবসায়জীবী রাষ্ট্রসমূহে (Industrial states) অন্য বন্দোবস্ত ছিল। আথেন্স ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সব স্থানে দাসেরা গোলামে পরিণত হইয়াছিল। কতকগুলি গোলামকে সমাজের যৌথ সম্পত্তিরূপে ব্যবহৃত করা হইত, তাহাদের পুলিশে বা টাকশালে কেরাণী বা কর্ম্মচারীদের খানসামারূপে নিযুক্ত করা হইত। কেহ কেহ আবার দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে, যথা রাষ্ট্রীয় দলিলাদি পুস্তকাগার (State archive) রক্ষা করিবার ভারপ্রাপ্ত হইত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাষ্ট্র হইতে তাহাদের বসন এবং দৈনিক খাদ্যের মূল্য (অর্দ্ধ-ড্রাকমা)* প্রাপ্ত হইত এবং যথাইচ্ছা থাকিতে পাইত। ইহারা নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে বস্তুতঃ "মেটিকদের" হইতে বেশী পৃথক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিত না।

বেশীর ভাগ গোলামেরা কিন্তু নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে গণ্য হইত। ইহাদের বাজারে ক্রয় করা হইত। যুদ্ধের কয়েদীদের, লুণ্ঠনদ্বারা ধৃত লোকেদের, বিশিষ্টপ্রকারের দোষাভিযুক্ত (Criminal) এবং যে সব অনাথ বালককে রাস্তায় মরিবার জন্য ফেলিয়া দেওয়া হইত তাহাদের গোলামবাজারে বিক্রয় করা হইত! এইসব গোলামেরা বেশীর ভাগ "বর্ব্বর"জাতীয় ছিল, কারণ অন্ততঃ কতকগুলি সুসভ্য রাষ্ট্র গ্রীকদের গোলামরূপে ক্রয় করিবার বিপক্ষে ছিল। হেলেনেরা বা গ্রীকেরা যদি যুদ্ধের কয়েদী হইত তাহা হইলে ২০০ ড্রাকমা দামে* তাহাদের খালাস করিবার নিয়ম ছিল (Herodotus, V, 77, VI, 79)। তত্রাচ পেলোপনিসিয়ান যুদ্ধে (স্পার্টা ও আথেন্সের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ) উভয়পক্ষ ক্ষিপ্ত হইয়া এই নিয়ম একবার অবজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু বর্ব্বরদের জন্য কোন দয়াই ছিল না; পারস্য সাম্রাজ্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হেলেনেরা ধরিয়া লইয়াছিল যে বর্ব্বরেরা নিকৃষ্ট জীব, এবং ভগবান জগতে মানবজাতিকে স্বভাবতঃই মনিব ও গোলাম এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে!

গোলামদের সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির গৃহস্থলীর কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইত। একটা মাঝারি রকমের গৃহস্থের বাড়ীতে ৩ হইতে ১২ জন পর্য্যন্ত গোলাম থাকিত এবং ধনীদের বাড়ীতে ৫০ বা ততোর্দ্ধ সংখ্যক গোলাম রাখা হইত। আবার ব্যবসা (Industry) বৃদ্ধি করিবার জন্য গোলামের সংখ্যা বাড়াইতে হইত। কারিকর ১ জন ২ জন গোলামকে শিক্ষানবীশরূপে তাহার অধীনে রাখিত এবং কর্ম্মে স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করিবারও সুযোগ প্রদান করিত। তবে খনিসমূহে গোলামদের দলবদ্ধ (Gang) করিয়া নিযুক্ত করা হইত। এই কর্ম্ম অতি শক্ত ও বেশী সময় লাগিত, সেইজন্য সেই সব গোলামদের জীবনও অল্প হইত। কিন্তু সস্তায় প্রচুর গোলাম প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া এ ঘটনায় কেহ দৃক্‌পাত করিত না।

আবার গোলামেরা যদিচ আইনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত, তত্রাচ এথেনীয়েরা তাহাদের

* ড্রাকমার বাজারদর বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন ছিল, আজকাল ইংরেজী হুরায় ৯ শিং ৩ পেঃ হইতে ৬ শিং ৩ পেঃ পর্য্যন্ত দর হইত।

প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিত। ইহাতে তাহাদের স্বভাবতঃ দয়ালুতার সহিত স্বার্থ বিজড়িত ছিল। এই জন্য গোলামদের পরিচ্ছদ নাগরিকদের হইতে পৃথক ছিল না, তাহারা মনিবের ঘরে বা মন্দিরে উপাসনার কোন কোন ব্যাপারে যোগদান করিতে পারিত এবং প্রায়ই তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হইত। পরে সাধারণ মত দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া, রাষ্ট্র মনিবকে তাহার গোলাম হত্যা করিবার বা তাহার উপর বেশী নিষ্ঠুরতা করিবার ক্ষমতা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছিল এবং মন্দিরে কোন গোলাম আশ্রয় লইলে আশ্রয়স্থানের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া তাহাকে মারা বা ধৃত করা হইত না। আবার কোন মনিব তাহার দাসের প্রতি ক্রমাগত নিষ্ঠুর আচরণ করিলে, সেই দাস অপরের নিকট বিক্রীত হইবার জন্য দাবী করিতে পারিত। অন্যপক্ষে, তাহার মুক্তির পথও বন্ধ করা হইত না, কখন তাহার প্রভুভক্তিপরায়ণতা এবং সেবায় তুষ্ট হইয়া মনিব তাহাকে খালাস দিত, সে নিজে অর্থ দিয়া (কতক পরিমাণে অর্থ গোলামেরা জমাইতে পারিত) দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হইবার সুবিধাও কখন কখন পাইত।

ইহাই হইল ঐতিহাসিক যুগের গ্রীসের সামাজিক অবস্থা। কিন্তু পতিত শ্রেণীসমূহের অবস্থা সম্যকরূপে অবগত হইতে হইলে প্রাচীনকালের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

ক্রমশঃ

প্রিয়া

(তামিল কবিতা হইতে)

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

ও দোলন চাঁপা, জানি আমি জানি
পেলব তোমার হিয়া,
তোমার চেয়েও পেলব যেজন
সেজন আমার প্রিয়া।
ফুল দেখে মিছে হওনা বিকল
অশান্ত রে হৃদয়,
সকলের পানে চেয়ে থাকে ওযে—
প্রিয়ার আঁখি ও নয়!

লতার মতন বাহুটি প্রিয়ার
কচি পল্লব কায়,
নিঃশ্বাসে তার মদির গন্ধ
হাসি ভরা মুক্তায়!
নয়নের তার নীরব চাহনি
যেন গো তীক্ষ্ণ বাণ,
নয়নের মাঝে নিমিষে বিঁধিয়া
মন করে আন চান।

আকাশের নীল তারো চেয়ে গাঢ়
আমার প্রিয়ার চোখ,
তার পানে চেয়ে শির না নোয়ায়
কে আছে এমন লোক!

প্রিয়ার ভূষণ ফুলে ভরিয়াছে—
খোঁপাও রয়েছে ফুলে,
ক্ষীণ কটি বুঝি ভারে ভেঙে পড়ে,
ঘন ঘন উঠে দুলে'।

গগনের চাঁদ নীচে কি নেমেছে
ভেবে দিশা নাহি পায়,—
পথে যেতে যেতে আকাশের তারা
তাই বুঝি ঝরে' যায়!
দিশাহারা তারা এবে তোমাদের
মিছে ভুল করা ভাই,
দিনে দিনে বাড়ে তোমাদের চাঁদ
বাড়া কমা এর নাই।

চাঁদের আননে এত রূপ নাই
প্রিয়ার মুখে যা আছে,
তাই তো বিকায় চিত্ত আমার
জ্যোৎস্না কে আর যাচে।
ফুলের মতন ও আঁখির আলো
চাঁদ যদি পেতে চায়—
আমারি দুয়ারে নিতি যেন এসে
ভিখারী হইয়া যায়।

মোহ

(উপন্যাস)

শ্রীমতী নীলিমা দেবী

এক

কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের একটা নির্জ্জন রাস্তার উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত সুন্দর বাগানের মাঝখানে একখানি চমৎকার সুসজ্জিত দ্বিতল বাটী। বাটীখানি, যে খুব বড় তাহা নহে, কিন্তু তাহার যে দিকেই দেখা যায় সকলই মনোরম বলিয়া মনে হয়, যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের ভিতর স্থাপিত। কিন্তু এমন যে সুন্দর গৃহখানি তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া মনটা বড় ভারী হইয়া যায়, মনে হয় যেন কোন ঘুমন্ত স্বপ্নপুরীতে আসিয়াপড়িয়াছি। মধ্যে মধ্যে দুই-চারি জন চাকরকে এদিকে-ওদিকে চলিতে ফিরিতে দেখা যায়, তদ্ভিন্ন কোন সাড়া-শব্দ নাই, সবই যেন সুপ্ত।

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা; বাটীর পিছনের টেনিস্ খেলিবার মাঠে একটা ১২।১৩ বৎসরের বালিকা তার বিলাতী শিক্ষয়িত্রীর সহিত টেনিস্ খেলিতেছে। বালিকাটীকে দেখিলে হঠাৎ বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়া মনে হয় না। তাহার মুখের ভাব ও গঠন অনেকটা পশ্চিমাঞ্চলের বা কাশ্মীরের কোন উচ্চবংশজাত কন্যার ন্যায়। মেয়েটীর এখনও রূপের পূর্ণবিকাশ হয় নাই, তবু তাহার দিকে একবার চাহিলে আর চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না; সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর তাহার কোমল স্নিগ্ধ চাহনি। আর খেলিতে খেলিতে সে যখন হাসিয়া উঠিতেছে তখন তাহার কাল কুচ্‌কুচে চোখ-দু'টী জলিয়া উঠিয়া তাহার সমস্ত মুখখানি দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে।

দোতলার বারান্দা হইতে এক বৃদ্ধা ও এক অল্পবয়স্কা-রমণী মেয়েটীর দিকে অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। দুইজনেরই মুখ বিষাদমাখা বৃদ্ধার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। বৃদ্ধা ইজিচেয়ারে শুইয়া আছেন ও অল্প রমণীটি তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে অশ্রুপাত করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "বৌমা, আমি বেশ বুঝতে পারছি যে আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু মা, আমার যে তোমাদের ফেলে যাবার এতটুকুও ইচ্ছা নাই, আমার এখনও যে অনেক কাজ বাকী আছে। পাঁচ-বৎসর পূর্ব্বে যেমন আমি দিবারাত্র ভগবানের নিকট প্রার্থনা করতাম, ঠাকুর, আমাকে নাও, তেমনই আজ তাঁর নিকট আর কিছু দিন বাঁচবার কামনা করছি। মাগো, তোমাদের এই অবস্থায় ছেড়ে গিয়ে যে আমি বৈকুণ্ঠধামেও শান্তি পাব না। আমার বাছা যে, আমার কাছে তোমাদের দিয়ে চলে গেছে, আমার নয়নের মণিকে হারিয়েও আমার তোমার জন্য বাঁচবার এত ইচ্ছা। তুমি ছেলেমানুষ, এই জীবন সংসারে ঐ বালিকাকে নিয়ে কি করবে, মা? তোমার এমনই দুর্ভাগ্য যে তুমি নির্ভর করতে পার এমন কেউই তোমার নাই। আমার ইচ্ছায় তো ঈশ্বরের নিয়মের ব্যতিক্রম হ'বে না, যতই বাঁচতে চাই না কেন, আমার মন বলছে যে, আমার সময় হয়ে এসেছে। তাই মনে করছি যে, শীঘ্র একটা সৎপাত্র দেখে প্রীতির বিয়ে দেব—তা'হলে তোমার মস্ত একটা দায়িত্ব কমে যাবে এবং জামাই তোমার ছেলের মত হয়ে তোমাদের দেখবে-শুনবে।"

বধূ চমকাইয়া উঠিলেন এবং আস্তে আস্তে বলিলেন, "মা, আপনি অমন কথা কেন বলছেন? ভগবান্ কখনও আমাদের ওপর এমন নির্দ্দয় হ'বেন না, আপনি নিশ্চয় ভাল হ'বেন। আর মা, যাঁর মেয়ে প্রীতি তিনি যে বলেছিলেন যে, বেশ বড় ও সুশিক্ষিতা না করে' মেয়ের বিয়ে কখনও দেবেন না। ও যে মা এই সবে ১৩ বছরের, ও বিয়ে কি জানে? ওর শিক্ষার এখনও অনেক বাকী। আর ওকে ছেড়ে আমি কেমন করে' থাকব? এ সব কথা কি আপনি ভেবে দেখেছেন?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "একমাস ধরে' দিবারাত্রি আমি এই

সব বিষয় বেশ ভাল করে' ভেবে দেখে এইরূপ স্থির করেছি। আমার ইচ্ছা নাতজামাই দেখে মরি। আমি শীঘ্রই পাত্র সন্ধান করবার জন্য লোক নিযুক্ত কর্‌ব। তোমার ভাবনা নাই মা, মেয়ে যাতে তোমার কাছে বেশী থাকতে পার তার ব্যবস্থা আমি কর্‌ব। হয় মেয়ে তোমার কাছে থাক্‌বে, না হয় যাতে তুমি ইচ্ছা করলেই মেয়ের কাছে থাক্‌তে পার সে ব্যবস্থা তো অবশ্যই কর্‌তে হ'বে। এই বাটীতে একা থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব হ'বে। প্রীতির বিয়ে দিয়ে জামাইকে বিলাত পাঠিয়ে দেব, যখন সে ফির্‌বে ততদিনে প্রীতি বড় হয়ে যাবে। আমার বাছার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কখনও কিছু কর্‌ব না, কেবল বাধ্য হ'য়ে বিয়েটা এখন দিতে চাইছি।"

বধূ বলিলেন, "মা, তা'হলে তো বিবাহ হওয়া না হওয়া একই হ'ল। তখন কেন এত ছোট মেয়ের বিয়ে দিই? প্রীতি ১৬ বছরের হ'লে বিবাহ দিলে ভাল হয়, এত শীঘ্র দিতে আমার মন সর্‌ছে না। তবে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছুই কর্‌তে চাই না, আপনি ভিন্ন আমার যে এ জগতে কেউ নাই। আমার ইচ্ছা যে ছেলে শিক্ষা শেষ করে' বিলাত থেকে ফিরে এসেছে এমন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব, বিয়ের পর জামাইকে বিলাতে পাঠাতে আমি রাজী নই। বিলেত গিয়ে অনেক ছেলে মানুষ না হয়ে অসৎ পথে যায়, তাই আমার বড় ভয় করে।"

বৃদ্ধা উত্তর দিলেন, "যে বিলাত থেকে ফিরে এসেছে তার বয়স ২৫।২৬ বৎসরের কম হ'বে না, তা'হলে প্রীতির চেয়ে অনেক বড় হ'বে। প্রীতি ১৩ বছরের হ'লেও বড় ছেলেমানুষ। সংসারে থেকেও কা'রও সঙ্গে একেবারে না মিশে প্রীতি যে ঋষিকন্যার ন্যায় সরলপ্রাণ, সংসার-বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ। এখন ও বিয়ে নামে মাত্র হ'বে। জামাই যতদিনে ফির্‌বে ততদিনে ও সব বুঝ্‌তে শিখ্‌বে। একটা ২০।২১ বছরের ছেলে পাই তো বড় ভাল হয়।"

বধূ সুরবালা আর একবার বলিলেন, "মা, তবে বিয়ে দেবার কি দরকার? আপনি সব পাকা করে রাখুন, দুই পক্ষে সব কথা ঠিক হ'য়ে থাক, তার পর ছেলে ফির্‌লে বিয়ে হ'বে।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তাও কি কখনও হয়। বিবাহ করে' বন্ধন হ'বে, দুই পক্ষে স্নেহ পড়্‌বে, তা'হলে ছেলেটাও চট্‌ করে' কিছু মন্দ কাজ কর্‌বে না।"

"আর বিয়ে হ'লে তোমার কুটুম্বেরা তোমাদের দেখ্‌বে, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মর্‌তে পার্‌ব।"

সুরবালা বলিলেন, "কাকাবাবু তো আছেন, মা, তাঁর মত স্নেহ আমাদের কে কর্‌বে? তিনি থাক্‌তে আমাদের কি ভাবনা?"

বৃদ্ধা সকল কথা ঠেলিয়া ফেলিলেন, তাঁর নাতজামাই দেখিবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল হইয়াছে, সুতরাং কোন কথাই তিনি শুনিলেন না। তিনি তাঁহার দেবর সুরেন্দ্রবাবুকে ডাকাইয়া তখনই নিজের মনের কথা বলিলেন। সুরেন্দ্রবাবু অনেক করিয়া নিষেধ করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা কিছুতেই কাহারও যুক্তি শুনিলেন না। সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে তিনি আর বেশী দিন বাঁচিতে পারেন না, কাজেই একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃদ্ধার মতে রাজী হইলেন।

দুই

প্রীতিলতার পিতা নরেন্দ্রনাথ মিত্র খুব বড় জমিদারের পুত্র। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নরেন্দ্রনাথ মুৎসদ্দীর কর্ম্ম করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পত্নী যখন মারা যান তখন তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর। তখন পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তান-সন্ততি কিছুই ছিল না। নিঃসন্তান বলিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য জেদ্ করাতে তিনি এক দরিদ্রের পরমসুন্দরী কন্যা সুরবালাকে বিবাহ করেন। সুরবালার পিতা ছিলেন না, তাহার মাতাও তাহার বিবাহের অল্পদিনপরেই মারা যান, কাজেই সুরবালার আপনার বলিবার বা স্নেহ করিবার কেহ বড় ছিলেন না। মামা, কাকা প্রভৃতি ছিলেন বটে, কিন্তু বিবাহের পর আর বড় কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সুরবালার শাশুড়ী তাহাকে কন্যার অধিক স্নেহ করিতেন। বধূর সুন্দর স্বভাব ও রূপে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রবাবুও স্ত্রীকে ঘরে আনিয়া ভালরূপ শিক্ষা দিয়া নিজের উপযুক্ত সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছিলেন। বধূর গুণে সকলেই বড় সন্তুষ্ট ছিলেন। বিবাহের তিন বৎসর পর প্রীতিলতার জন্ম হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার আর কোনও সন্তান-সন্ততি হয় নাই।

প্রীতিকে তাহার পিতা যে অতিশয় ভাল বাসিতেন তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি প্রীতিকে সর্ব্বদা নিজের কাছে রাখিতেন। প্রীতি যখন ৩৪ বছরের হইল অনেকদিন এমন হইয়াছে যে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার আফিসে মেয়েকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। একেবারে ইংরাজ মেয়েদের মত তাহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রীতির যখন চারি বৎসর বয়স তখন বিলাত থেকে তাহার শিক্ষয়িত্রী আনাইলেন। কিন্তু শুধু ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই নরেন্দ্রবাবু ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি মনে করিতেন যে মাতৃভাষা ভালরূপ না জানিলে মনের পূর্ণবিকাশ হয় না, তাই বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ভাল পণ্ডিত রাখিলেন। এদিকে প্রীতির মা ও ঠাকুর-মা তাহাকে হিন্দুকন্যার উপযুক্ত নীতিশিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রীতির শিক্ষার সর্ব্বতোভাবে সুন্দর ব্যবস্থা হইল।

প্রীতি যখন নয়বৎসরের তখন চারিদিনের জ্বরে নরেন্দ্রনাথের হঠাৎ মৃত্যু হয়। কিন্তু জ্বর হইতেই তিনি কেমন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি আর বাঁচিবেন না, তাই প্রীতির শিক্ষার বিষয় ও নিজ সম্পত্তির সকল ব্যবস্থা করেন। উইলে ব্যবস্থা করিলেন যে সুরবালার অবর্ত্তমানে প্রীতিলতা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে এবং ইচ্ছামত দান-বিক্রয় করিতে পারিবে। আর প্রীতির বিবাহের সময় তাহার স্বামীকে ৫০০০৲ টাকা যৌতুক দেওয়া হইবে। এইসকল ভার রহিল তাঁহার মাতা ও তাঁহার খুল্লতাত সুরেন্দ্রবাবুর উপর।

সুরেনবাবু নরেনবাবু অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় ছিলেন। খুঁড়ো-ভাইপোতে বেশ বন্ধুত্ব ছিল। সুরেনবাবুর এক পা খোঁড়া ও তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। কাজেই তাঁহাকে ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইয়াছিল। তিনি বিবাহ করেন নাই। বাড়ী বসিয়া তিনি জমিদারী ও ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান করিতেন।

তিন

খেলা শেষ হইয়া গেলে প্রীতি ও তাহার শিক্ষয়িত্রী মিসেস্ হুড্ বাগানে বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময় মিসেস্ হুড্ প্রীতিকে গল্পচ্ছলে নানাবিষয়ে সুশিক্ষা দিতেন।

সন্ধ্যার দীপ জ্বালিবার সময় হইতেই প্রীতি ছুটিয়া উপরে উঠিয়া আসিল এবং "নিনি, নিনি"—ঠাকুরমাকে প্রীতি নিনি বলিয়া ডাকিত—বলিতে বলিতে দৌড়িয়া বারান্দায় আসিয়া নিনির গলা জড়াইয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ নিনি"। বালিকার কণ্ঠের সেই মিষ্টভাষণে বৃদ্ধার সকল যন্ত্রনার হ্রাস হইল, তিনি বার বার তাহার মুখচুম্বন করিলেন। প্রীতি বলিল, "যদি তোমার কষ্ট না হয়, আমাকে আর্য্যনারীদের বিষয় ভাল ভাল গল্প বল্‌তে হ'বে। আজ আমার ছুটি, আজ আর তোমাকে ছাড়্‌ব না। কিন্তু আগে বল, তোমার কষ্ট হ'বে না তো।"

বৃদ্ধার শরীর যদিও খুবই খারাপ ছিল তিনি সেকথা প্রীতিকে জানিতে দিলেন না। শীঘ্রই তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিকের আসনে বসিলেন। আহ্নিক সমাপন করিয়াই তিনি প্রীতিকে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া আসিতে বলিলেন। প্রীতি আসিলে উভয়ে একত্রে হরিনাম জপ করিলেন। প্রতিদিনই এই নিয়মানুসারে দুইবেলা প্রীতিকে তাহার পিতামহী ভগবানের অর্চ্চনা করিতে শিখাইতেন ও তৎপরে তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। উপদেশ সমাপ্ত করিয়া গল্প করিতেন। গল্পের ছলে তিনি হিন্দুনারীর যাহা যাহা কর্ত্তব্য প্রায় সবই এই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকাকে শিখাইয়া ছিলেন। ধরিত্রীর ন্যায় সহিষ্ণুতা, স্বামীকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা, অতিথিসৎকার এবং দরিদ্রের প্রতি দয়া, এই বিষয়গুলিই তিনি বিশেষ করিয়া বুঝাইতেন ও শিক্ষা দিতেন। সেদিন পিতামহী সীতার বনবাসের গল্প বলিলেন। সব শুনিয়া প্রীতি জিজ্ঞাসা করিল, "রামচন্দ্র সীতাকে শেষপর্য্যন্ত এত কষ্ট দিলেন, তবু কেন সীতা মরিবার সময় বলিলেন যে, জন্মে জন্মে যেন রামচন্দ্র তাঁহার স্বামী হন?" এই প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধা প্রীতিকে স্বামীর প্রতি হিন্দুনারীর কর্ত্তব্য-বিষয়ে অনেক সদুপদেশ দিলেন।

চার

অনেক অনুসন্ধানের পর প্রীতির জন্য একটী মনো-

মত পাত্র পাওয়া গেল। ছেলেটী সদ্বংশজাত, সুশ্রী, বলিষ্ঠ ও বিদ্বান্। সে বরাবর সকল পরীক্ষায় সর্ব্ব-প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। তখন বি-এ পাস করিয়া সরকারী-বৃত্তি লইয়া বিলাত যাইবে এই স্থির হইয়াছিল। পাত্রদের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল, তবে প্রীতিদের মত বড়লোক নহে। প্রীতির মাতার ও পিতামহীর সব রকমে এই সুম্বন্ধ পছন্দ হইয়াছিল, কেবল পাত্র পিতৃহীন বলিয়া একটু তাঁহারা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু দেবব্রতের মাতা খুব বুদ্ধিমতী ও সুগৃহিণী ছিলেন। দেবব্রতের বয়স তখন ২০ বৎসর।

ছেলের প্রবাস-গমনের তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে বিবাহ হইবে স্থির হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রীতির ঠাকুর-মাতার অসুখ হঠাৎ বাড়িয়া গেল। সুরবালা বলিলেন, "বিবাহ এখন বন্ধ থাক, সবই তো পাকা হইয়া গিয়াছে, দেবব্রত চারিবৎসর পরে যখন বিলাত হইতে ফিরিবে তখন বিবাহ হইবে।" বৃদ্ধা কিন্তু সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি প্রীতিকে বিবাহিত দেখিতে ও নব দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতে উৎসুক হইলেন। কাজেই বিনা আড়ম্বরে নিতান্ত আপনা-আপনি দুই-চারিজনকে আনাইয়া নির্ব্বিঘ্নে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইল।

নরেনবাবুর মৃত্যু অবধি বাহিরের কাহারও সঙ্গে যাতায়াত এই পরিবারে একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর এই বিবাহও চুপি চুপি হইল, কাজেই ইহাদের আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব, কেহই প্রায় জানিলেন না যে প্রীতির বিবাহ হইল। এই সব কারণে সুরবালার মন একান্তই খারাপ হইয়া গিয়াছিল, কেবল শাশুড়ীর তৃপ্তির জন্য তিনি নীরবে রহিলেন।

বিবাহের অর্থ প্রীতি বড় কিছু জানিত না। সে যে দুই-তিনটী বিবাহ দেখিয়াছিল, তাহাতে দেখিয়াছিল আমোদ-আহ্লাদ, গান-বাজনা, বেশ-ভূষা, জনাগম ও বর। সে জানিত যে বিবাহের পর বরের সহিত কনেকে থাকিতে হয়, আর ঠাকুরমার কাছে শিখিয়াছিল যে সতী পতিব্রতা হয়। শ্বশুরবাড়ী যাইতে সে খুবই কাঁদিয়াছিল কিন্তু শাশুড়ীর আদর ও দেবরদের পাইয়া সে আনন্দিত হইল। দেবরদের বয়স তখন ষোল ও চৌদ্দ বৎসর। তাহারা প্রীতির খেলার সাথী হইল। বাল্যাবধি সঙ্গী কখনও সে পায় নাই, কাজেই ইহাদের পাইয়া একদিনেই খুব ভাব করিয়া ফেলিল। সন্ধ্যার পর কিন্তু আবার গোলমাল বাধিল, ঠাকুরমার কাছ-ছাড়া সে কখনও রাত্রে কাহারও কাছে শুইত না। শাশুড়ী তাহাকে বুকে করিয়া শুইলেন, প্রীতি তাঁহার স্নেহের পরশে আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িল।

ফুলশয্যার রাত্রে প্রীতি মহাগোল বাধাইল। সে কিছুতেই তাহার নূতন মাকে ছাড়িয়া শুইবে না। কিন্তু সে স্বভাবতঃ বড় নম্র ও বাধ্য ছিল, তাই অনেক করিয়া বুঝাইতে সে চুপ করিল।

শয়নকালে কক্ষের চারিদিক্ সুন্দর ফুলে সজ্জিত, চারিদিক্ গন্ধে আমোদিত। সেই সুধাগন্ধে যুবক দেবব্রতের প্রাণ প্রণয়োল্লাসে উচ্ছ্বসিত। কিন্তু তাহার নববধূ নিতান্ত বালিকা, সে চারিদিকের সৌন্দর্য্যে বিহ্বল, কিন্তু একেলা এই নূতন লোকটার সঙ্গে শুইয়া সঙ্কুচিত হইতেছিল। কিন্তু সে শিক্ষা পাইয়াছে যে স্বামী নিতান্ত আপন-জন তাই সে নির্ভয়। তবে তাহার ঘুম আসিতেছিল না। দেবব্রতের প্রেমের আবেগ প্রাণেই রহিল। তাহার পূর্ণ যৌবন, কবিত্বে ভরা হৃদয়, কিন্তু এই সরল বালিকাকে সে কি বলিবে। সে প্রীতিকে তাহাদের বাড়ীর কথা, মা'র ও ঠাকুরমা'র কথা জিজ্ঞাসা করিল, পড়াও খেলার কথা কহিল, কিন্তু আর কিছুই বলিতে পারিল না। এই বালিকার নির্ম্মল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া যেমন তাহার আনন্দ হইল, তাহার সৌন্দর্য্যে যেমন সে মুগ্ধ হইল, তেমনই তাহার সরলতা দেখিয়া দেবব্রত একটু নিরাশ হইল। তাহার প্রণয় অব্যক্ত রহিল।

প্রীতি যে পাঁচ-ছয়দিন শ্বশুরবাড়ীতে রহিল তাহার মধ্যে সকলের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হইল। দেবব্রতকেও সে অল্প অল্প করিয়া চিনিল ও তাহাকে প্রীতি গুরুজন বলিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে শিখিল। দেবব্রতও বালিকাজ্ঞানে তাহাকে স্নেহ করিত। প্রীতি পিত্রালয়ে ফিরিবার পূর্ব্বরাত্রে দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ, প্রীতি, কাল বাড়ী যাবে, তোমার খুব আহ্লাদ হচ্ছে তো?" প্রীতি চুপ করিয়া রহিল। দেবব্রত আরও জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের কথা কি তোমার মনে পড়বে? না, আমাদের একেবারে ভুলে

যাবে ?” প্রীতি কম্পিতস্বরে উত্তর দিল, “না, ভুলব কেন ?” দেবব্রত আবার বলিল, “আমাদের জন্ত তোমার মন কেমন করবে কি ?” এই প্রশ্নে প্রীতির চোখ দুইটী জলে ভরিয়া উঠিল ও সে বলিল, “আমার সকলের জন্ত মন কেমন করবে ও প্রত্যহ সকলকে দেখতে ইচ্ছা করবে।”

দেবব্রতের ও তাহাদের বাটীর সকলের সঙ্গে সে পাঁচ-ছয়দিন বাস করিয়াছে, তাহাদের আপন বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে, তাহাদের উপর ভালবাসা হইয়াছে, কাজেই বিদায়ের নামে তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। প্রীতির চোখে জল দেখিয়া দেবব্রত তাহার চোখ মুছাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহভরে চুম্বন করিল। সেই চুম্বনে বালিকার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, তাহাতেই স্বামী-স্ত্রীতে বন্ধন পূর্ণ হইল। এই আলিঙ্গনে, এই চুম্বনে সে কি হইল তাহা প্রীতির হৃদয়ঙ্গম হইল না, কিন্তু সে আস্তে আস্তে দেবব্রতের বুকে মুখটী লুকাইল। দেবব্রত উৎফুল্ল হইয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বহুচুম্বনে ভরিয়া দিল। লজ্জায় প্রীতির সুন্দর মুখখানি গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিল। দেবব্রতের তৃষ্ণা আরও বাড়িয়া গেল, সে অনেক সাধাসাধি করিয়া প্রীতির নিকট হইতে প্রতিদান আদায় করিল। কিন্তু তবু তাহার তৃপ্তি হইল না—সে চাহিয়াছিল যুবতীর প্রেমালিঙ্গন, কিন্তু পাইল শুধু বালিকার সলজ্জ চুম্বন।

রাত্রি প্রভাত হইল, প্রীতি পিত্রালয়ে গেল। কিছুদিন পরেই বৃদ্ধা ঠাকুরমাতার মৃত্যু হইল। তিনি যেন এই বিবাহ সুসম্পন্ন দেখিবার জন্তই প্রাণধারণ করিয়াছিলেন। প্রীতি ঠাকুরমাতার শোকে বড়ই অধীর হইয়াছিল। কেহ তাহাকে তুলিতে বা খাওয়াইতে পারে নাই। এদিকে প্রবাস-যাত্রার পূর্ব্বে দেবব্রত বিদায়গ্রহণ করিতে আসিল। ভগবানের এমনই লীলা যে স্বামীর আদরে ও মিষ্ট কথায় প্রীতি উঠিল ও সামান্ত কিছু খাইল।

শেষদিন বিদায়ের সময় দেবব্রত যে ভালবাসা, আদর ও চুম্বন প্রীতিকে দিল, তাহাই বালিকার প্রাণে চিরদিনের মত গাঁথিয়া গেল। দেবব্রত বিলাত-যাত্রা করিল—সেইদিন হইতে প্রীতির বালিকা-জীবনের শেষ হইল।

পাঁচ

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই তিন বৎসরে দেবব্রত বিলাতে সকল পরীক্ষায় খুব সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। পরীক্ষার পর তাহার আর কোনই কাজ ছিল না, প্রাণে আনন্দও ছিল না। এতদিন সে পড়া লইয়া ব্যস্ত ছিল, কাজেই তাহার বন্ধু বলিতে বড় কেহ ছিল না। এখন কাজ নাই, বন্ধু নাই, তাহার জীবন যেন লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মন বড়ই চঞ্চল, সে কি যেন চায়, কি যেন খুঁজিতেছে কিন্তু পাইতেছে না। তাহার কিছুতেই আনন্দ নাই।

কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া সে একখানি ছোট মোটর কিনিয়া ভ্রমণে বাহির হইল। ক্রমে সে স্কটল্যাণ্ডের নয়নাভিরাম সুন্দর পল্লীর পথে উপনীত হইল। সে ক্যালেণ্ডর নগর পার হইলে তাহার গাড়ী বিকল হইয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে গাড়ী চালাইতে পারিল না। সেখানে নগর নাই, গ্রাম নাই, জনমানবের বাসাও বেশী নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে এক পথিকের সাহায্যে সে তাহার গাড়ী ঠেলিয়া নিকটস্থ এক কুটীরে গাড়ী রাখিয়া পদব্রজে চলিল। এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া সে ট্রসাকস হোটেলে আসিয়া হাজির হইল। আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর সে দেখিল যে নির্জ্জন বনপথের উপর এই হোটেলটী বড়ই মনোরম স্থানে স্থাপিত। সামনে পিছনে পাহাড়, পাহাড়ে বনরাজি ফলফুলে ভরা, চারিদিকে প্রকৃতির সুন্দর ও স্নিগ্ধ ভাব। এই স্থানের শান্তি ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া দেবব্রত নিজের বিপদ ভুলিয়া গেল; সে বরং খুসীই হইল যে তাহার গাড়ী এমন শান্তিময় স্থানে বিকল হইয়াছে।

দেবব্রত হোটেলের লোক দিয়া গাড়ী ক্যালেণ্ডার শহরে পাঠাইয়া দিল ও যতদিন গাড়ী ঠিক না হয় ততদিন এই হোটেলেই বাস করিবে মনস্থ করিল। তাহার চঞ্চল হৃদয় যেন এই নির্জ্জন দেশে আসিয়া কতক শান্ত হইল। কিন্তু তবু তাহার প্রাণ যেন কি খুঁজিতেছিল, কাহাকে চাহিতেছিল!

কথা এখন বড় আর তাহার মনে হইত না। তিন বৎসর পূর্ব্বে যে সুন্দর খেলার জিনিসটীর মত ছোট্ট-মেয়েটীকে পাইয়া তাহার মন আনন্দিত হইয়াছিল, তাহা

এখন সুখ-স্মৃতিবৎ সুদূর হইয়াছে। সে প্রীতির সৌন্দর্য্যদেখিয়া ভুলিয়াছিল, তাহাকে সঙ্গিনীরূপে বরণ করে নাই। প্রীতি যখন তাহাকে চিঠি লেখে তখন সে ছোট ভগিনীর মতই লেখে, সেও কখনও কখনও সেইভাবেই পত্রের উত্তর দেয়। প্রীতিও দেবব্রতের ভিতর প্রণয়ের বন্ধন তখনও জন্মে নাই। বিবাহের বন্ধন যে চিরকালের সে বন্ধন যে অচ্ছেদ্য দেবব্রত ভুলিয়া গিয়াছে, তাই আজ তাহার মন ব্যাকুল ও চঞ্চল।

সন্ধ্যাগমে দেবব্রত স্নান করিয়া সান্ধ্যপরিচ্ছদ পরিয়া হোটেলের ড্রয়িংরুমে আসিল। আসিয়া সে একলা একটা জানালার পাশে চুপ করিয়া বসিয়া একমনে দূরের পাহাড়ের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু আকাশে রবি-কিরণের আভা রহিয়াছে। দেবব্রতের মনে হইল যে সূর্য্যের অপেক্ষা বুঝিবা তাহার সুবর্ণ-আভাই বেশী জ্যোতির্ম্ময়, বেশী হৃদয়গ্রাহী।

হঠাৎ এক সুন্দর নারীকণ্ঠের সুললিত স্বরে দেবব্রতের চমক ভাঙ্গিল। সে চাহিয়া দেখিল গান গাহিতে গাহিতে এক অনিন্দ্য সুন্দরী ইংরাজদুহিতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, সে গান বন্ধ করিয়াছে।

সে কি দেবী না মানবী! দেবব্রতের মনে সংশয় উপস্থিত হইল। মানবীর কি এত রূপ হয়? মনুষ্যলোকে কি কণ্ঠস্বর এত সুললিত হইতে পারে? দেবব্রত যে কখনও এত রূপ দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছিল না, সে রূপের দিকে চাহিলে মনে হইতেছিল যে চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে, অথচ সেদিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইতে সে পারিতেছিল না।

রমণী সংযত হইয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি জানিতাম না যে আপনি এখানে আছেন, নচেৎ গান গাহিয়া আপনাকে বিরক্ত করিতাম না।"

দেবব্রত ভদ্রতার সহিত বলিল, "সে কিছুমাত্র বিরক্ত হয় নাই বা তাহার বিরক্তির কোনই কারণ নাই।"

অতঃপর দুইজনেই সেই ঘরে বসিল কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কোন কথাবার্ত্তা হইল না।

এই ইংরাজযুবতীর নাম এমিলি উড্। ডাক্তারের মতানুসারে তাহার পীড়িত পিতাকে লইয়া তাহার মাতা ও সে এইস্থানে আসিয়াছে। এখানে বড় কেহ দুই-এক দিনের বেশী বাস করে না, বিশেষতঃ তখনও যাত্রীদের এই দেশ ভ্রমণের সময় আসে নাই। এমিলির মাতা তাহার পিতার সেবায় সদাই ব্যস্ত থাকেন। এমিলি সঙ্গীহীন, কোনরকমে গান গাহিয়া সময় কাটাইত। এমিলির বয়স তখন প্রায় কুড়ি বৎসর, তাহার বর্ণ প্রস্ফুটিত চম্পকের মত, মুখশ্রী সুন্দর কিন্তু ঈষৎ কঠোরভাবাপন্নপূর্ণ যৌবনে তাহার রূপ যেন উচ্ছ্বসিত, তবে তাহার মধ্যে যেন কমনীয়তার বড়ই অভাব।

অল্পক্ষণ পরে এমিলি দেবব্রতকে বলিল, "এখানে আমরা দু'জনই সঙ্গীহীন, তখন আর সাধারণ নিয়মে কি প্রয়োজন? আমরা তো নিজেরাই পরস্পরের পরিচয় দিতে পারি—আর কে তাহা করিবে।"

এতক্ষণ পরে দেবব্রতের অন্তরের গোপন ইচ্ছা পূর্ণ হইল। সে গোপনে এমিলিকে আড়্‌চোখে দেখিতেছিল ও কিরূপে তাহার সহিত আলাপ করিবে তাহাই ভাবিতে-ছিল। তাহার মনে হইতেছিল যেন সে এতদিন ইহারই অন্বেষণে ঘুরিতেছিল, দৈববলে তাই সেদিন এই স্থানেই তাহার মোটর বিকল হইয়াছিল।

ছয়

দুই-তিন দিনের ভিতর দেবব্রত ও এমিলির আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হইল। দুইজনেরই সেখানে বিশেষ কোন কাজকর্ম্ম ছিল না ও তাহাদের সমবয়সীও আর কেহই ছিল না। দেবব্রত তো এমিলির রূপে এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে, সে তাহার সবই সুন্দর দেখিত, তাহার চোখের তীব্র চাহনিও দেবব্রতের কাছে কোমল মনে হইত, তাহার ব্যবহারে যে চাঞ্চল্য অধিকাংশ হিন্দুর চোখে বিসদৃশ বলিয়া মনে হইত তাহা দেবব্রতের নজরে পড়িল না, তাহার কণ্ঠস্বরের যে সামান্য উদ্ধতভাব তাহাও দেবব্রত বুঝিতে পারিল না। দেবব্রত তখন বন্ধুহীন, নিরানন্দ, সুরূপা সঙ্গিনী পাইয়া তাহার হাস্যময় ব্যবহারে ভুলিয়া গেল। তাহার হৃদয়পটে এমিলির প্রফুল্লাননা, চঞ্চলা, হাস্যরতা মূর্ত্তি চিরতরে অঙ্কিত হইল। সে প্রীতিকে ভুলিল। কেবল মাঝে মাঝে সুখস্মৃতিরূপে প্রীতির কথা মনে উদয় হইত,

সে কত বড় হইয়াছে, কেমন হইয়াছে ভাবিত, কিন্তু আবার এমিলির সঙ্গলাভে সবই বিস্মৃত হইত।

দেবব্রত ও এমিলি প্রায়ই একসঙ্গে পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়াইত। দেশটী পর্ব্বতবেষ্টিত,—প্রকৃতিদেবীর প্রমোদ-উদ্যান। মধ্যে মধ্যে এক-একটী কুঞ্জে গিয়া মানুষ সহজেই মন হারাইয়া ফেলে। একদিন দুইজনে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়া গল্প করিতে করিতে বহুদূর গিয়া পড়িল, তাহাদের ধারণাই ছিল না যে কতদূর বা কোথায় আসিয়াছে। দুইজনেই বড় শ্রান্ত, একটু বিশ্রাম করিবার ও তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সেখান হইতে কোনদিকেই মানুষের বাসস্থান দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। জলের অন্বেষণে দুইজনেই অগ্রসর হইতে লাগিল। এমিলি আর চলিতে পারিতেছিল না, দেবব্রত একপ্রকার তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া জলের কলধ্বনি তাহাদের কর্ণগোচর হইলে তাহারা সেই শব্দ অনুসরণ করিল। বনমধ্যে ক্ষরস্রোতা পর্ব্বতনির্ঝরিণী চটুলনৃত্যে বিভিন্ন প্রস্তরাদির বক্ষে আঘাত করিয়া বহিতেছে। তীরে বড় বড় গাছের ছায়ায় মখমলের মত সবুজ ঘাস কে যেন শয্যা বিছাইয়া দিয়াছে—যেন কোন মুনিঋষির তপোবন। চারিদিক্ নিভৃত, নির্জ্জন, মধ্যে মধ্যে পল্লবপুঞ্জের মর্ম্মরধ্বনি ও জলের অবিশ্রান্ত কলধ্বনি যেন সুললিত সঙ্গীতে ভরিয়া দিতেছে। আবার মধ্যে মধ্যে পাখীদের মধুর গানে বনানী মুখরিত হইতেছে।

দেবব্রত এমিলিকে ঘাসের উপর বসাইয়া নিজের হাতের অঁাজলা করিয়া নদী হইতে জল আনিয়া তাহাকে পান করাইল। এমিলির এমন অবস্থা হইয়াছিল যে শুষ্ককণ্ঠ দিয়া তাহার কথা বাহির হইতেছিল না, সে প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। দেবব্রত তাহাকে জলপান করাইয়া তাহাকে ঘাসের উপর শুইতে বলিল। পরে নিজে মুখে-হাতে জল দিয়া ও আকণ্ঠ জল পান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে এমিলি ঘাসের উপর শুইয়া পড়িয়াছে। দেবব্রত তাড়াতাড়ি নিজের কোট বিছাইয়া এমিলিকে তাহার উপর শুইতে বলিল, তারপর বসিয়া এমিলির মাথা নিজের কোলের উপর লইল। দেবব্রত তাহাকে বলিল, "সব দোষ আমার, আমি আত্মহারা হইয়া গল্প করিতে করিতে এতদূর আসিয়া তোমাকে কত কষ্ট দিলাম। তুমি কি আমাকে কখনও ক্ষমা করিতে পারিবে? তোমাকে কাছে পাইলে আমি একেবারে বিহ্বল হইয়া যাই, পৃথিবীর সব কথা ভুলিয়া যাই। এখন কি করিলাম, তোমাকে কত কষ্ট দিলাম।" এই কথার উত্তরে এমিলি শুধু দেবব্রতের মুখের দিকে চাহিল ও তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া আস্তে আস্তে টিপিল। সেই চাহনিতে দেবব্রত কি যে দেখিল, সে জ্ঞানহারা হইয়া আস্তে আস্তে এমিলির ললাটে চুম্বন করিল। সেই চুম্বনে সকল বাঁধ ভাঙিয়া গেল, দুইজনার নীরবে প্রেমবিনিময় হইল। কিয়ৎক্ষণপরে দেবব্রত বলিল, "এমি, এতদিনে আমি মনের মানুষ পাইলাম। আমি এ পর্য্যন্ত কাহাকেও ভালবাসি নাই। আমি সঙ্গিনী খুঁজিতেছিলাম, আজ তোমাকে পাইলাম। আজ আমার সাধ মিটিল, জীবন সার্থক হইল।" এইরূপ নানাবিধ প্রেমালাপে দুইজনে পরস্পরের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। দুইজনেই আত্মসমর্পণ করিল, কিন্তু দেবব্রত বিবাহের প্রস্তাব করিল না দেখিয়া এমি কিছু আশ্চর্য্য হইল। মনে ভাবিল যে সে বিদেশী বলিয়া হয় তো এদেশের সব নিয়ম ভাল জানে না।

অনেকক্ষণ পরে দুইজনে হোটেলে ফিরিল। এত দেরী দেখিয়া এমিলির মাতা অস্থির হইয়া বেড়াইতে-ছিলেন। তাহাদের দেখিবামাত্র তিনি ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এমি বাধা দিয়া বলিল, "মা রাগ করিও না, আজ আমার বড় শুভদিন, আমাদের আশীর্ব্বাদ কর। দেবব্রতের সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়েছে। মা, আজ আমার মত সুখী কে?" মাতা তখন সকল দোষ ভুলিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে এমি তাঁহাকে বিলম্বের সকল কারণ বলিল।

বিবাহের কথায় দেবব্রত কেমন স্তম্ভিত হইয়া গেল। এতক্ষণ সে যেন স্বপ্নরাজ্যে ছিল, এই কথায় তাহার স্বপ্ন ভাঙিল। সে প্রাণ-মন দিয়া এমিকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে ব্যস্ত, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই যে সে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। সে সুদৃঢ় বন্ধন সহজে ছিন্ন হয় না। তাহার সকলই মনে হইল, সে সকলই বুঝিল, কিন্তু সে প্রকাশ করিল না।

যে সে বিবাহিত, বন্দী। সে ভাবিল, "এখন তো এই সুখস্রোতে গা ভাসিয়ে দিই পরে দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় মরে।" আনন্দে ও সুখে সে ও এমিলি দিন কাটাইতে লাগিল।

এমির বাবা-মা, দুজনেই এই মিলনে অতিশয় সুখী হইলেন। তাঁহারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও মনে করিতেন যে ভারতবর্ষ হইতে যাহারা শিক্ষার্থে এতদূর আসে তাহারা নিশ্চয়ই খুব ধনী—সুতরাং তাঁহারা খুবই আনন্দিত হইলেন, মেয়েটার ভাবনা হইতে উদ্ধার হইলেন। এই সময় সংবাদ আসিল যে দেবব্রত খুব ভাল করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বড় চাকুরী পাইয়াছে। বিবাহ যাহাতে শীঘ্র হয় সেজন্য এমিলির বাবা বড় ব্যস্ত হইলেন। তিনি কেবলই বলিতেন, "আমি তো বেশী দিন বাঁচিব না, এমিকে বিবাহিতা দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই।"

দেবব্রত কিন্তু একবৎসর সময় চাহিল। সে বলিল, "আমাকে তো এখনও একবৎসর থাকিতে হইবে। আমি দেশে ফিরিবার পূর্ব্বেই বিবাহ করিব।" সে যে কি করিবে কিছু স্থির করিতে পারিতেছিল না। এইরূপ অবস্থায় সে নিজ কলেজে ফিরিয়া গেল। তাহার মন তৃপ্ত কিন্তু শান্তিহীন। সে যতই তাহার বিবাহের কথা স্মরণ করে ততই সে যে বিবাহিত তাহাতে বিরক্তি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কি করিয়া সে এত বড় বন্ধন ছিন্ন করিবে ও তাহার ফলে প্রীতির উপর কত বড় অন্যায় হইবে সেই চিন্তা তাহাকে অস্থির করিল। তাহার দেহ, প্রাণ, মন এমির জন্য পাগল; কিন্তু সে যে প্রীতির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। ক্রমে দেবব্রত পাঠে রত হইল, কিন্তু অবসরকালে এইসকল চিন্তাই তাহাকে আকুল করিত।

ক্রমশঃ
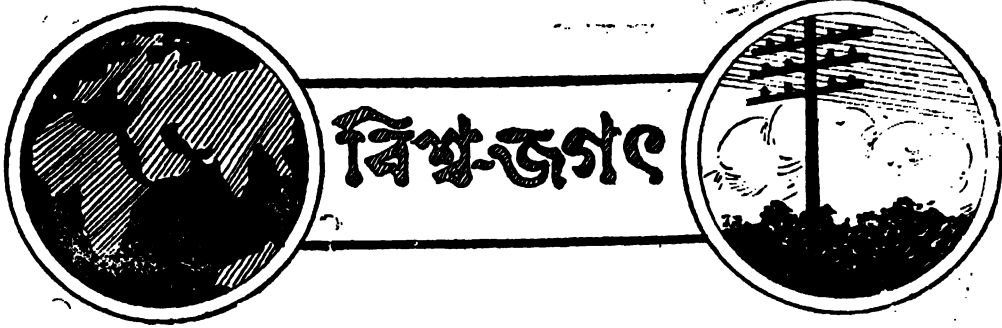
বিজ্ঞান

হাস্যোদ্দীপক আইন

সম্প্রতি কোন বৈদেশিক পত্রের পৃষ্ঠায় এক হাস্যোদ্দীপক আইনের সংবাদ পড়া গেল। এই আইনের নাম হইতেছে Bachelor Tax Act ; যে সমস্ত ব্যক্তি পঁচিশ বৎসরের পরও অবিবাহিত থাকিবে তাহাদের বাৎসরিক কিছু কিছু আক্কেল সেলামী স্বরূপ কর দিতে হইবে এবং দিতে অপারগ হইলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে। আগামী শীত-ঋতুর পর হইতেই এই আইন ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ইতালী ও যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে চলিতে থাকিবে।

ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায় ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বের সময়ে ইংলণ্ডে এইরূপ অবিবাহিত পুরুষদের উপর কর ছিল ; কিন্তু ১৭০৬ খৃঃ-অব্দে এই অন্যায় কর উঠিয়া যায়।

ইউরোপ, আমেরিকা নিত্য নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা আমাদের চমক লাগাইয়া দিতেছিল, আজ এই নূতন আইন উদ্ভাবনে ততোধিক বিস্ময়োৎপাদন করিল। শুনা যায় ইউরোপের নৈতিক অবনতিই এই আইনের মূল কারণ।

বিজ্ঞাপনের চটক

আমেরিকার বিক্রেতারা কিরূপ নূতন নূতন উপায়ে বিজ্ঞাপন দিয়া আপনাদের পণ্যদ্রব্যের প্রচার করেন তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। [illegible]াহাদের ব্যবসার পশ্চাতে যেমন আছে অসীম [illegible]া, তেমনি আছে উর্ব্বর মস্তিষ্কের চালনা। বিজ্ঞাপন [illegible] সকলেই দিয়া থাকে কিন্তু তাহারই মধ্যে যে দ[illegible]র পরিচয় [illegible]ওয়া যায় এ কথা কয়জন বুঝিতে পারে।

মুদ্রের [illegible] চক-মুদ্রাগুলি নাই। তবে

বিজ্ঞাপনের চটক

আমরা একখানি ছবি দিতেছি। এই ছবির মধ্যে

পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, নিউইয়র্কের এক ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দিবার জন্য এক ব্যক্তিকে 'রন্-পা' চড়াইয়া কেমন অদ্ভুত করিয়া সাজাইয়াছে। দূর হইতে এই চিত্তা-কর্ষক লোকটীকে দেখিলে প্রথমে দৈত্য বলিয়া ভ্রম হয়। লোকটীর পশ্চাতে বিজ্ঞাপন টাঙান আছে! এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন-প্রচেষ্টাটী না কি ঐ দেশের একজন জুতা-ব্যবসায়ীর মস্তিষ্ক-প্রসূত।...

কথক ফিল্মের এক টুকরা

কলিকাতায় আজকাল 'সবাক্ চলচ্চিত্রের' (Talkie Film) ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে। চারিদিকে সবাক্ চিত্রালয়ে ছবি দেখিয়া সবাই পরিতুষ্ট হইয়া আসিতেছেন কিন্তু সবাক্ চিত্রের মূল ফিল্মগুলি যে সাধারণ ফিল্মগুলি হইতে একটু বিভিন্ন প্রকারের তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না।

পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার জন্য আমরা একখানা সবাক্ চিত্রের শব্দসঞ্চারী (Sound-on) ফিল্মের ছবি দিতেছি। ...াই লক্ষ্য করিবেন ফিল্মের এক পার্শে গ্রামোফোন রেকর্ডের ন্যায় অসংখ্য রেখা টানা আছে। নীচের ছবিখানা শ্রীমতী আনিতা পেজের (Anita Page) একখানা গানের তরঙ্গের মূর্চ্ছনার চিত্র (vibration study)।

সবাক্ ছবি দুইপ্রকারের। একপ্রকার হইতেছে—sound-on film systemএ তৈয়ারী, অন্য প্রকারের হইতেছে disc systemএ তৈয়ারী; বারান্তরে এই disc system সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিষাক্ত গ্যাস হইতে পরিত্রাণ

খনিতে সময় সময় বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হইয়া অসংখ্য লোকের জীবন বিপন্ন করিয়া তোলে। এই কারণে পৃথিবীর সমস্ত দেশের খনিতেই 'ডেভিড্ সেফ্টী ল্যাম্প' নামক একপ্রকার আলোক ব্যবহৃত হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন।

সম্প্রতি একপ্রকার বৈদ্যুতিক বিষাক্ত-গ্যাস-সন্ধায়ী আলোক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আলোকগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে যদি কোনস্থানে বিষাক্ত গ্যাস থা...
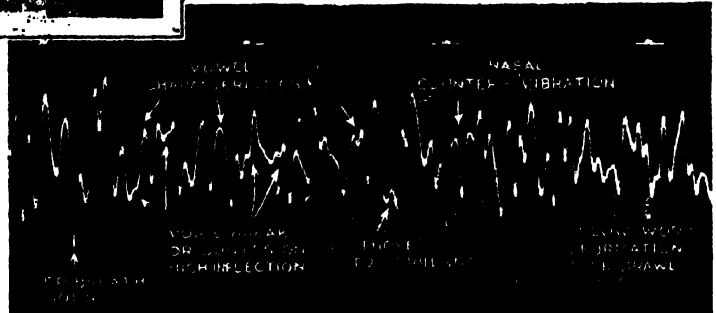
কথক ফিল্মের একটুক্‌রা

তাহা হইলে ইহার সহিত সংযুক্ত মজুরের বক্ষস্থিত একটী যন্ত্রে অত্যধিক উষ্ণতার সঞ্চার করে। এই উষ্ণতা দেখিয়া মজুর বুঝিতে পারে নিকটে বিষাক্ত গ্যাস আছে।

বিষাক্ত গ্যাস হইতে আত্মরক্ষা

ক্ষুদ্রতম বানর

কিছুদিন হইল লণ্ডনের পশু-প্রদর্শনীতে একটী বানর প্রদর্শিত হইয়াছে, শুনা যায় না কি এইটীই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম বানর। এই বানরটী

ক্ষুদ্রতম বানর

দক্ষিণ আমেরিকায় জঙ্গলে পাওয়া গিয়াছে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন ছবিতে বানরটী কেমন একটী ক্ষুদ্র চা-চামচে (tea-spoon) বসিয়া আছে।

বামনের দেশ

আমরা গালিভারের ভ্রমণ-কাহিনীতে বামনের দেশ সম্বন্ধে পড়িয়াছি। সম্প্রতি বিলাতে এক পাহাড়ের নীচে এইরূপ একটী বামনের শহর তৈয়ারী হইয়াছে। ইহাতে ঘর-বাড়ী, গির্জ্জা, পুকুর, পুল প্রভৃতি সমস্তই আছে।

যে সমস্ত লোক এইস্থানে বেড়াইতে আসেন তাঁহাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য এই বামনের শহর নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই সমস্ত জিনিস ছোট ছেলেদের পক্ষে যেমন আনন্দদায়ক তেমনি শিক্ষণীয়। আমাদের দেওয়া ছবিতে ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।—

বামনের দেশ

আশ্চর্য্য মুদ্রা

কিছুদিন হইল ক্যাটালিনা নামক স্থানে সমুদ্রের ধারে খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক স্থানে মাটির নীচে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রাগুলি কোন্ সময়ের তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন যে, হয় তো এগুলি বহুকাল পূর্ব্বে চৈনিক অথবা স্পেনীয় জল-দস্যুরা ফেলিয়া গিয়াছিল।

আমরা ইহার একখানি ছবি দিলাম। এই মুদ্রা-গুলি পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হয় তো নূতন আলোকপাত করিতে পারে।
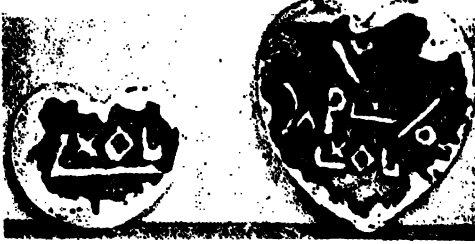
প্রাচীন মুদ্রা

মোটর-চালকের কারসাজি

পোর্টল্যাণ্ড শহরের এক মোটর-চালক তাহার নূতন খরিদা ফোর্ডগাড়ীখানির অতিরিক্ত ছিদ্রের (পাঙ্কারের) জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে কিছু দিন হইল সে এক নূতন কারসাজি খাটাইয়াছে।

মোটর-চালকের কারসাজি

সে তাহার গাড়ীর সম্মুখের দুইটী চাকার দিকে দুইটী বৈদ্যুতিক চুম্বক (electro magnet) ঝুলাইয়া দিয়াছে। ইহা রাস্তার ধারে চাকার সম্মুখে যে সমস্ত পেরেক ইত্যাদি পড়িয়া থাকে তাহা টানিয়া লয়। কাজেই আর ছিদ্র (পাঙ্কার) হইতে পারে না। আমরা ইহার একখানি ছবি দিলাম।

হাওয়ার কলের রূপান্তর

জার্ম্মাণীতে এক পাদ্রী কিছুদিন বেকার বসিয়াছিল। কাজের বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া সে এক উপায় করিয়াছে।

আলোকস্তম্ভের রূপান্তর

তাহার বাড়ীর পাশে এক পুরান ভাঙ্গা হাওয়ার কলের (wind-mill) স্তম্ভ পড়িয়াছিল; সে সেইটাকে সংস্কার করিয়া এক গির্জ্জায় রূপান্তরিত করিয়াছে। এই বিচিত্র গির্জ্জাটী দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছে। আমরা ইহার একখানি ছবি দিলাম।

বালকের কেরামতি

'লস্ এঞ্জেলে'র একটী বালকের পিতার নারিকেলের দোকান আছে। সে তাহাদের দোকানের পরিত্যক্ত

নারিকেলের শাঁসগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা যুক্তআমেরিকায় একটী সুদৃশ্য পতাকা তৈয়ারী করিয়াছে।

আমরা ইহার একখানি ছবি দিলাম। ইহাতে পাঠক-পাঠিকারা বালকটীর শিল্প-কুশলতার পরিচয় পাইবেন।
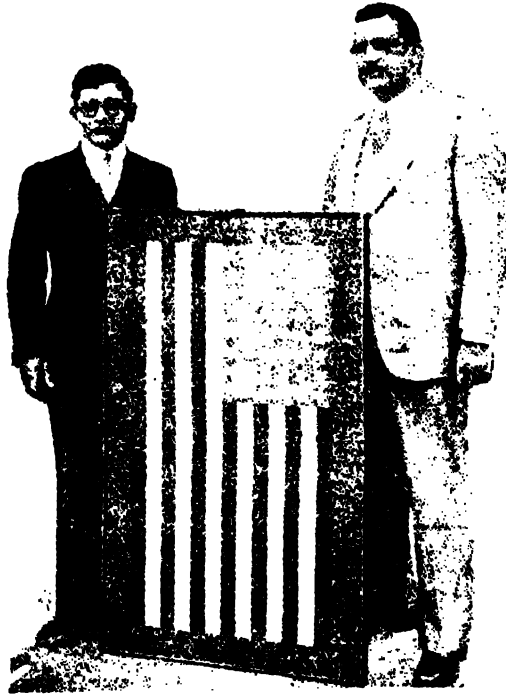
নারিকেলের তৈয়ারী পতাকা

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

সাহিত্য

গত মহাযুদ্ধের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে মধ্য-ইউরোপে একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল—Die Waffen Nieder ("Lay down your arms")। এই পুস্তকখানির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহার লেখিকা সর্ব্বসাধারণের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করেন এবং তাহারই ফলস্বরূপ তিনি পরবর্ত্তী জীবনে পৃথিবীর বুধ-মণ্ডলীর চির-ঈপ্সিত নোবেল পুরস্কার পান। বইখানির সাফল্য যে অলৌকিক হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ, ইহার প্রচারের পরেই পর পর ত্রিশটী সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং পৃথিবীর ষোলটী বিভিন্নভাষায় ইহা অনূদিত হয়।

এই বইখানি লিখিবার পূর্ব্বে লেখিকা আরও দুই-একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন, কিন্তু সেগুলিতে তাঁহার ততটা নাম হয় নাই, কারণ নাম হইবার মত বৈশিষ্ট্য তখন কিছু ছিল না। কিন্তু এই বইখানিতে তিনি সাধারণ ঔপন্যাসিকের পথ গ্রহণ করেন নাই—তিনি চাহিয়াছিলেন

শান্তির বাণী প্রচার করিতে, জগতের সমক্ষে একটা নূতন আদর্শ ধরিতে। তাই তাঁহার এই বইখানি পশ্চিম মহাদেশের সাহিত্যে বিপ্লব আনিয়া দিতে পারিয়াছিল।... অনেক সমালোচকের মতে এই বইখানির পূর্ব্বে Uncle Tom's Cabin ছাড়া আর কোন বই জগতের শান্তি-প্রিয়দের নিকট ততটা হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।

১৮৪৩ খৃঃ Prague শহরে Baroness Bertha Von Suttner জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা Francis Count Kinsky অষ্ট্রিয়ান-সৈনিক-বিভাগের একজন বড় কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ছেলেবেলায় অধিকাংশ সময় তাঁর মাতার নিকটেই থাকিতেন। প্রায়ই তিনি ফ্রান্স, ইংলণ্ড ইতালী প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাই কোন একটা শহর বিশেষে থাকিয়া তাঁর বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হইতে পারে নাই। তাঁর মা ছিলেন সুন্দরী, সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু—মানবতার প্রতি একটা প্রাণবন্ত দরদ চিরকালই তাঁর চরিত্রের মধ্যে লক্ষিত হইত। বার্থার যখন বয়স ত্রিশ বৎসর তখন কোন ঘটনা-বৈচিত্র্যে ভিয়েনায় তাঁর ভবিষ্যৎ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রথম আলাপের পরই উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সূত্রপাত হয়, ফলে শীঘ্রই তাঁরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহেন, কিন্তু ব্যারনের পিতা তাহাতে ঘোর আপত্তি তোলেন। শেষে ব্যাপার এমন দাঁড়ায় যে, উভয়েই রাশিয়ার ককেশাস্ পর্ব্বতে পলাইয়া গিয়া প্রণয়-অঙ্গুরী বিনিময় করিবার সুযোগ পান। এইস্থানে তাঁহাদের বিবাহের পর নানা দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া সুদীর্ঘ নয়টী বৎসর কাটাইতে হয়। সে সময় কখন কখন সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া বা কখন কখন উপন্যাস লিখিয়া তাহাদের সংসার চলিত। ঠিক এমনই সময় রুশ-তুর্ক যুদ্ধ (Russo-Turkish War) আরম্ভ হয়। তাঁর স্বামী তখন একজন সাংবাদিক হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন।

১৮৮০ খৃঃ যখন তিনি পুনরায় ভিয়েনায় ফিরিয়া আসেন তখন সমস্ত ইউরোপের চিন্তারাজ্য যুদ্ধের ধোঁয়ায় ঝাপ্সা হইয়া যায়। কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন বিষয় ভাবিবার অবসর পান নাই। কি করিয়া যুদ্ধ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাহারই চিন্তায় তখন সকলের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছিল। তাই এই সময়ের ঘটনা তাঁহার মনের মধ্যে যে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা তাঁহার পুস্তকখানির মধ্যে পাই। তিনি যুদ্ধ-বিষয়ক নানা পুস্তক এই সময় পড়িয়া ফেলেন এবং তাহারই উপর চিন্তা করিয়া তাঁর পুস্তকের সুরটী বাঁধিয়া লন।

বার্থা তাঁর অন্তরের পরিপূর্ণ দরদ দিয়া লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই—কেবল সমস্ত দিন-রাত ধরিয়া তাঁহার লেখনী অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে, শেষে সত্য-সত্যই তাঁহার পুস্তকখানি সমাপ্ত হইল। তিনি ইহার নাম দিলেন "Die Waffen Nieder" ('অস্ত্র পরিত্যাগ কর')।

তাঁর গল্পটী ছোট্ট, সুন্দর, আড়ম্বরশূন্য অথচ ইহার ভাবটী গভীর ও জীবন্ত। ছোট্ট দুটী তরুণ প্রাণ সবে বিবাহ করিয়া ধরণীর ধূলায় নামিয়াছে! তারপর আসিল যুদ্ধ। অমনি তাহাদের মধ্যে একজনকে গৃহ ছাড়িয়া সীমান্তের দিকে ছুটিতে হইল।...ইহার পর লেখিকা যুদ্ধের বিষময় ফল যে কিরূপ হয় তাহারই কাহিনী জলন্ত ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। গাড়ীর পর গাড়ী ভর্ত্তি মৃতদেহ, সৈনিকগণের জ্বর ও শীতের কবলে প্রাণত্যাগ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পশুর মত চারিদিকে ছুটাছুটী, হাজার হাজার সৈন্যের ভগ্ন সেতু হইতে পড়িয়া সলিল-সমাধি প্রভৃতি যুদ্ধের কত বীভৎসতার ছবি লেখিকা তাঁহার বইখানির মধ্যে দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। লেখিকার বইখানি লিখিবার যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ সমাজ ও গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রের (state) অগ্রে স্থান দেওয়া, তাহা যে কতদূর সফল হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। বোধ হয় সেই কারণেই সামরিক পত্রগুলি একবাক্যে বলিয়াছিল—"This is not a book, this is an historic event।" লেখিকার বক্তব্য মহাত্মা গন্ধীর অহিংস-অসহযোগ-নীতির রকম-ফের নয় কি?

এইরূপে উৎসাহ পাইয়া লেখিকা সেই বৎসরই Die Waffen Nieder নাম দিয়া একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করিলেন। পত্রিকাখানিকে তিনি দশ বৎসর

ধরিয়া যোগ্যতার সহিত পরিচালিত করেন এবং ইহার পর উহা "Friebens Warte" (chronicle of peace) নাম-ধারণ করিয়া আজ পর্য্যন্ত জার্ম্মণীতে বাঁচিয়া রহিয়াছে।

১৮৯১ খৃঃ অব্দে বার্থা রোমে নিখিল-বিশ্ব-শান্তি-বৈঠকে (World Peace Congress) সহকারী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন রমণী এইরূপ সম্মানিত পদ অলঙ্কৃত করেন নাই। ইহার পর তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া Austrian Peace Society নামে একটী সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সভাপতিরূপে যোগ্যতার সহিত উহা বহু বৎসর পরিচালিত করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার অশ্রান্ত চেষ্টাসত্ত্বেও যুদ্ধ তুলিয়া দিবার জন্য তাঁহার আবেদন তখনও দেশের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে নাই। সেই কারণেই বোধ হয় তিনি লিখিয়াছিলেন "Every reformist movement has to pass through three phases, first it is laughed at, then opposed, and finally it is accused of advocating the obvious."

অর্থাৎ—প্রত্যেক সংস্কারমূলক আন্দোলনের তিনটী স্তর আছে; প্রথমে লোকে ইহাকে বিদ্রূপ করে, পরে ইহা যাহাতে প্রচার না হইতে পারে সেদিকে বাধা দেয় এবং শেষে এ বিষয়টীর নূতনত্ব কিছুই নাই—সাধারণ বিষয় এই অজুহাতে অভিযুক্ত করে।

১৪ই জুন ১৯২৪ সালে বার্থা ইহ জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর দিনের ঠিক এক সপ্তাহ পরে সারা ইউরোপে মহাযুদ্ধের দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। তাহার পর আবার সারা দেশ ব্যাপিয়া কুশ্রী কুটিলতার সমারোহ, হীন স্বার্থ-সাধনের জন্য অজস্র জীবন-নাশ—সবই চলিতে লাগিল। যুদ্ধ তুলিয়া দিবার জন্য বার্থা যে অসহায়, আকুলকণ্ঠে মিনতি জানাইয়াছিলেন তাহার শেষ রেশটী তখনও শূন্য নীরবতায় কাঁদিয়া ফিরিতেছিল।

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

বৈশাখ

৬ই ... [illegible] রসময় মিত্র বাহাদুরের মৃত্যু (১৩৩৮) জন্মস্থান—চানক গ্রাম, ... [illegible] বর্দ্ধমান। পিতা—নবদ্বীপচন্দ্র মিত্র। বর্দ্ধমান জিলা স্কুল

রায় রসময় মিত্র বাহাদুর

হইতে ১৫৲ বৃত্তি লই... [illegible] এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হন। শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হন। এফ-এ পরীক্ষায় ২০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পড়েন ও কলেজের সর্ব্বোচ্চ-স্থান অধিকার করিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন—বি-এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার জন্য মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটী বৃত্তিও লাভ করেন। পরে ইনি সসম্মানে এম-এ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। বিদ্যাশিক্ষা ইহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমে ইনি মেদিনীপুর টাউন স্কুলে ১০০৲ বেতনে প্রথম শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। পরে হুগলী কলেজে অধ্যাপনা করেন। অতঃপর হেয়ার স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং হিন্দুস্কুলেরও কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে ইনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সঙ্কীর্ত্তন গানে ইহার স্বভাবসুলভ পারদর্শিতা ছিল। কাশী ধর্ম্মমণ্ডল ইহাকে 'ভক্তিবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। এরূপ ছাত্রবৎসল, উদারপ্রকৃতি, সহৃদয় বিচক্ষণ পুরুষ কচিৎ দেখা যায়। ইনি একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার ছিলেন। ইহার রচিতগ্রন্থ,—কৃপাবৃষ্টি।
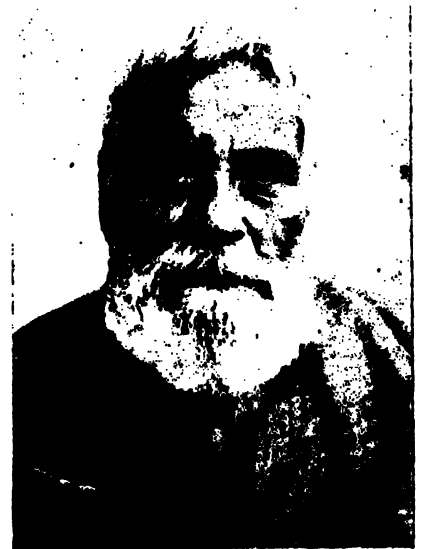
দেবেন্দ্রনাথ বসু

৮ই।...লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের জন্ম (১২৬৭)। পিতা—বাগবাজার বসুপাড়ার প্রসিদ্ধ বসুবংশীয় সবজজ ৺গোপীনাথ বসু। প্রথমে হিন্দুস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি ক্রমান্বয়ে নিউম্যান এণ্ড কোং, একাউন্টেণ্ট জেনারেল অফিস, মিনার্ভা থিয়েটার এবং কাশীমবাজার রাজবাটীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত-গ্রন্থ—বিদ্যাসাগর ১৮৯২), বেজায় আওয়াজ (১৮৯৩), বাসিফুল (১৩২২), সীমন্তিনী (১৩২৫), ওথেলো (১৯১৯), কুহকী (১৯২০), পরমহংসদেব (১৩২৯, শকুন্তলার নাট্যকলা (১৩৩৩), বরমাল্য (১৯২১), চক্ররিকা ১৩৩৭), গোপালের মা (সম্পাদিত)। ইনি নানা সাময়িকপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় 'নীহার' নামক সাপ্তাহিক পত্রে, দ্বিতীয় লেখা তাঁহার মধ্যম সহোদর সম্পাদিত 'নলিনী' মাসিক-পত্রিকায়, তৃতীয় লেখা 'বিভা' নামক মাসিক পত্রিকায়, (১২৯৪) এবং চতুর্থ লেখা 'উপাসনা' পত্রিকায়। তা ছাড়া সুমতি (ভারতবর্ষ, ১৩২৪), পুষ্পাঞ্জলি (ঐ, ১৩২৫), মুহূর্ত্তের ভুল (ঐ, ১৩২৮), পথের সন্ধান (ঐ, ১৩২৮), বিরজা (ঐ ১৩২৯) মায়ের পূজা (ঐ, [illegible], বি[illegible]দ-মিলন (ঐ, ১৩৩০), আত্মারাম (বসুমতী, ([illegible] [illegible]লবুল (ঐ, ১৩৩৪), বুদ্ধবাস্তুর প্রলাপ (পঞ্চপুষ্প, ১৩[illegible] বিসর্জ্জন (পুষ্পপাত্র, ১৩৩৫), দেশপ্রাণ গিরিশ[illegible] বসুমতী, ১৩৩৬), মহাকবি গিরিশচন্দ্র (নব-যুগ), সোনার বাঁধন, (১৩৩৭), হিতে বিপরীত (শিক্ষক, ১৩৩৭), শয়তান (খোকাখুকু, ৫ম বর্ষ), জরদগব (বসুমতী ১৩[illegible]), তেভিল ম্যারেজ (বসুমতী, ১৩৩৬), কলকে[illegible] সুর্মিমাসার দেশ (খোকাখুকু), চাঁদ মামার দেশ[illegible] পৃথিবীর কথা (ঐ)। জন্মভূমি, যমুনা, উদ্বোধন প্রভৃতি পত্রিকায়ও ইঁহার অনেক রসগর্ভ রচনা বাহির [illegible]। ইঁহার বিবাহ,—কেদারনাথ চৌধুরীর কন্যা চন্দ্রকার-মোহিনীর সহিত (খাটেশ্বর গ্রাম, ২৮[illegible] ১৮০৪ শক)।

মনস্তত্ত্বের একাংশ

ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্‌, এম্‌, এস্‌

(ক) দেখিবার রকম ফের (different angles of vision)

আমরা যদি দেখি, একটা লোক রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে, পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল এবং তাহার কপাল কাটিয়া রক্তধারা ছুটিল, অমনি তখনি সহানুভূতি-সূচক "আহা-আহা" "মরি-মরি" প্রভৃতি শব্দ করিয়া তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য, ব্যস্ত হই। কিন্তু কাছে গিয়া যদি তাহার রক্তজবা চক্ষু দেখিয়া ও তাহার মুখে মদের দুর্গন্ধ পাই তখনি সহানুভূতি উবিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রাগ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইটাই হইল পহেলা নম্বর নক্সা।

দ্বিতীয় নম্বর নক্সাটী দেখিয়া লউন। যদি কোনও লোক ম্যালেরিয়া কিংবা কালাজ্বরে ভোগে, তবে তাহাকে দেখিয়া, আমাদের মনে খুবই করুণার উদ্রেক হয়। কিন্তু যদি কেহ মদ্যপান করার ফলে যকৃতের দোষে ভোগে অথবা ক্ষণিক নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে মেহ রোগাক্রান্ত হয় তো তখনই সে আমাদের ঘৃণার পাত্র হয়।

তৃতীয় নম্বর নক্সা দেখুন। কেহ চুরি করিলে আমরা তাহাকে ঘৃণা করি; কিন্তু নিজের স্ত্রীর চরিত্রের উপরে সন্দিহান হইয়া কেহ স্ত্রীকে খুন করিলে আমরা মুখে বাহাই বলি, মনের কোণে তাহার জন্য এতটুকুও সহানুভূতির স্থান রাখি। দেশ উদ্ধার করিবার জন্য ডাকাতি করিলে আমরা ততটা অ-খুসী হই না।

চতুর্থ ও শেষ নক্সা লউন। একটী বোকা ছেলে [illegible]

চালাক ছেলে; কাহাকে আমরা পছন্দ করি? ইহার উত্তর খুব সহজ—চালাক ছেলেটীকেই সকলে ভালবাসিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

এক্ষণে উপরোক্ত চারিটী দৃষ্টান্তকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে—আমাদিগের পক্ষে সহজেই

সহানুভূতির পাত্র	বিরক্তি-উৎপাদক পাত্র
১। আকস্মিক বিপদগ্রস্ত লোক	...যদি সে মদ্যপান করিয়া থাকার জন্য বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে।
২। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যারামগ্রস্ত লোক	... ব্যভিচার জন্য পিড়ীত
৩। চোর ইত্যাদি	......ব্যভিচারিণী সন্দেহে যে স্ত্রী হত্যা করে বা দেশোদ্ধারের দোহাই দিয়া ডাকাতি করে
৪। চালাক চতুর ছেলে	......বোকা ছেলে

কেনই বামদিগের শ্রেণীভুক্ত লোকগুলি আমাদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করে, আর কি দোষেই বা ডানদিগের লোকগুলি বিরক্তিভাজন হয়?—এই প্রশ্নের উত্তরে সাধারণে বলিবেন—"বামদিকের লোকগুলির দুঃখভোগ কোনও দোষযুক্ত কারণের ফলে নহে, এইজন্য তাহাদের কথা ভাবিলে, অথবা তাহাদিগের দশা দেখিলে আমাদের প্রাণে করুণার সঞ্চার হয়; আর ডানদিকের লোকগুলি স্বেচ্ছাকৃত দোষের ফলে ভোগে বলিয়া তাহাদের অবস্থা দেখিলে আমাদের মনে দুঃখের উদ্রেক হওয়া দূরের কথা, ঘৃণা বা রাগের উদ্রেক হয়।" কিন্তু জনসাধারণে এই কথা বলিলেও, যিনি ষোল-আনা ন্যায়-বিচার করিবেন তিনি বলিবেন "উভয়শ্রেণীর লোকেই নিজ নিজ দোষে ভোগে; কাজেই উভয়েই তুল্য ব্যবহার পাইবার উপযুক্ত।" ফলতঃ আসল কথাও তাই। যে লোকটী পিচ্ছিল রাস্তায় কলার খোসার উপরে পা দেওয়ার জন্য পড়িয়া গেল সে কেন ভাল করিয়া পথ না দেখিয়া হাটে? যে লোকটী চুরি করে, সমাজ তাহার ভরণপোষণের ভার লয় না কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি নানাপ্রকারেরই যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আসল কথা এই—ভিন্ন ভিন্ন লোকে, ভিন্ন ভিন্ন কালে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে—একই জিনিসকে ভিন্নভাবে দেখে। মদ্যপানের কথাই ধরুন; এদেশে পুত্রকে ও [illegible] সমানে করিয়া—অর্থাৎ উহাদিগকে লুকাইয়া মদ্য পান করিতে হয়; কিন্তু বিলাতে পিতাপুত্রে একত্রে পান করেন। এই দেশেই এককালে প্রকাশ্যভাবে মদ্য ও গোমাংস ভক্ষণ করা একশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম এবং আবার বলি—আমরা দেশ, কাল ও পাত্র হিসাবে লোকের সম্বন্ধে ধারণা করিয়া থাকি। একজনকে হত্যা করিলে আমরা তাহাকে "খুনে" বলি; কিন্তু নেপোলিয়ান, হিণ্ডেনবার্গ প্রভৃতিকে "বীর" বলি। এত কথা বলিবার আমার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের বিচার-বুদ্ধি অত্যন্ত হাল্‌কা। এইজন্য, আমরা চোরকে, খুনেকে, মাতালকে পাইলে শাস্তি দিতে উদ্যত হই, কিন্তু যে সরিক পুকুরে ম্যালেরিয়া জীবাণুর চাষ করার প্রশ্রয় দেয় ও তৎফলে সবংশে ম্যালেরিয়ায় নিধন প্রাপ্ত হয়, তাহাকে দেখিয়া দুঃখ করি। কিন্তু মূলে, খুনে ও বিবদমান সরিক বড় বেশী তফাৎ নয়। এই কথাটা আমার দেশবাসীকে প্রণিধান করিতে বলি।* আমি বলি যে, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে যেমন চিকিৎসা করিবার আয়াস স্বীকার করা হয়, চোর, খুনে, মাতাল প্রভৃতিকেও তেমনি রোগী-জ্ঞানে চিকিৎসা করাই উচিত। জেলে পুরিয়া কঠোর বিধানে তাহাদিগের উপরে দণ্ড বিধান, দুইশত শতাব্দী পূর্ব্বে করা গেলেও, আজ যে তাহা করে, সে মানুষ আফ্রিকাতে গিয়া হোটেনটট্ বা জুলুদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করুক,—বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মাঝে তাহার স্থান বা জাতি নাই।

(খ) পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব

কিন্তু চোর বা খুনে দেখিলেই সরাসরি তাহাকে রোগী ধরিয়া লইলে চলিবে না; যেহেতু, যে কোনও মানুষকে শুধু ব্যক্তি হিসাবে দেখা ভুল। একটা বিংশ শতাব্দীর মানুষ অন্ততঃ বিংশশতাব্দী ধরিয়া তাহার, পিতৃপুরুষ, তাহার সমাজ, তাহার দেশের আবহাওয়া, প্রভৃতির সমষ্টির ফল। আবার শুধু তাহাই নয়— তাহার জন্মকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, তাহাকে

---

* যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানিতে চাহেন তাঁহারা লম্ব্রোসো, হ্যাভলক এলিস প্রভৃতির গ্রন্থ ও মৎপ্রণীত Outlines of Medical Jurisprudence (5th edition), Hare Pharmacy, 37, Amherst St, Calcutta অধ্যয়ন করিতে পারেন।

মানুষ করা সম্বন্ধে তাহার পিতামাতা, তাহার প্রতিবেশী, সমাজ ও কালের ঘাত-প্রতিঘাতেরও কম হাত নাই। এইজন্য, চোর বা খুনে পাইলে তাহার খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা আবশ্যক। সে সমস্ত দেখিয়া, তাহাতে দোষ না পাইলে,তবে তাহাকে ঘৃণা বা অবহেলা না করিয়া, তাহাকে রোগী বিবেচনা করিয়া, তাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহাতে সে ব্যক্তিরও লাভ এবং সমাজেরও লাভ; কারণ, পুলিশ, জেল, আদালত প্রভৃতি রক্ষাকল্পে জনসাধারণের পকেটে হাত বড় কম পড়ে না; অথচ, খুনে, চোর প্রভৃতিকে সংশোধন করিলে যে কত কায পাওয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি যে অবান্তর বা বাজে কথা বলিতেছি না, তাহার সপক্ষে বহুপ্রমাণ দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহা করিবার সময় নাই। তবে মদ্যপান নিবারণ করিয়া আমেরিকায় কি পরিমাণে জেলগুলি খালি হইয়া গিয়াছে এবং স্বর্গীয় জেনারেল বুথের মুক্তিফৌজের দুর্বৃত্তদলকে শাসন ও শিক্ষাদান করিয়া কি মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন তাহা সকলেরই জানা আছে। তাহা ছাড়া বোর্ষ্টাল জেলে কি সৎ কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহাও শিক্ষিত সমাজের অবিদিত নাই। যাহাই হউক, আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে "মানব জমী" অনেকসময়ে বুঝিয়াসুঝিয়া "আবাদ করিলে, ফলে সোণা।" এদেশে এখনো এসকল কথা বলিবার সময় হয় নাই—যে দেশে পূর্ব্বে মনেরই চর্চ্চা প্রধানতঃ হইত, আর আজ যে দেশের লোকেরা দুইপাতা ইংরাজী পড়িয়া, ততোধিক ইংরাজী হালচালের মর্কটামি করিয়া, ধন্য হইতেছে!

(গ) রোগ কোথায়?

লোকে যদি বোকা হয়, বা চোর হয়, তো দোষ কাহার? দোষ প্রত্যক্ষে সেই ব্যক্তিরই, পরোক্ষে তাহার সমাজের সমাজের উপরে, বিশেষ করিয়া ছিন্নভিন্ন হিন্দুসমাজের উপরে, আমাদের হাত খুব অল্পই; কাযেই সমাজের কথা আর বলিব না। এক্ষণে দোষী ব্যক্তিটিকে লইয়াই আলোচনা করা যাউক।

ছেলেটী বোকা কেন? কেহ বলিবেন, উহার বাপ-দাদা বোকা ছিল, ও কি সেয়ানা হইতে পারে? আবার আর একজন বলিবেন—উহার ধাতে যে সব লেখাপড়া সয় না উহাকে সেই সব বিদ্যা শিখাইতে যাওয়ায় উহার বুদ্ধির স্ফুরণ হইল না। পুনশ্চ, অপরে বলিবেন—উহার বাপ-মা তেমন চেষ্টা-যত্ন করিল না, কাযেই আসমান থেকে কি বুদ্ধি নামবে? ইত্যাদি নানারূপ কারণ দর্শিত হইবে। কিন্তু এগুলি গৌণকারণ হইলেও, মুখ্যকারণ হইতেছে, ছেলেটার শরীরের দোষ!

একথা শুনিয়া হয় তো কেহ কেহ হাসিবেন—"বোকা হওয়াটা না কি শরীরের গঠনের ত্রুটির ফল! আর যদিও বোকা হওয়ার ঐ কারণটা সম্ভবপর হয়, তবু চোর, খুনে, বদমেজাজী হওয়াটার কারণ উহা কিছুতেই হইতে পারে না!"

কিন্তু আমরা বলিতেছি—প্রকৃতই ব্যারাম রোগীর দেহেতেই! এ কথাটা বুঝাইবার পূর্ব্বে অনেক কথা বলিবার আছে,—সেগুলিকে গোড়ার কথা হিসাবে না বলিয়া লইলে, বুঝান শক্ত হইবে। কাযেই, বুঝাইবার খেই বা সূত্র পরে ধরিয়া লইব—এখন গোড়ার কথা দু'-চারটা বলিয়া লইব।

আমাদের দেহের সকল গঠন যদি নির্দ্দোষ হয় এবং দেহের সকল অংশ যদি বেশ সুশৃঙ্খলায় কায করে, তাহা হইলে মানুষ দেবতা হয় (super-man)। মনে করুন নির্জ্জন পথে একলা চলিতেছি, এমন সময়ে রাস্তায় একটী মোহর পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলাম। চক্ষু যে মোহর দেখিল, তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কে সংবাদ গেল; মস্তিষ্কে পূর্ব্বলব্ধ সমস্ত জ্ঞান সঞ্চিত থাকে বলিয়া, মস্তিষ্ক তখনি বলিল, এটা দামী জিনিস, এটা পাইলে আমার বর্ত্তমান কষ্ট ঘোচে। মস্তিষ্কের একাংশ যখন দ্রষ্টবস্তুটীর গুণাত্মক বিবেচনায় রত, সেই মুহূর্ত্তে, মস্তিষ্কের যে অংশে কৃত-কার্য্যের দোষ-গুণ-বিচারের ভার আছে, সে অংশ বলিল, না, ছিঃ এটী কি লইতে আছে? অমনি এই বিচারের সঙ্গে সঙ্গে হস্তকে গুটাইয়া রাখা হইল। এতগুলি কথা লিখিতে ও পড়িতে যতটা সময় গেল তাহার সহস্রাংশের একাংশ সময়ে এত কাণ্ড হইয়া গেল। কিন্তু যদি চর্চ্চার অভাবে, কুলগতপীড়ার দোষে অথবা দেহগত আকৃতি-প্রকৃতির দোষে তোমার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ হয় না, তবে

তোমার মস্তিষ্কে ঐ মোহর দৃষ্টি প্রবল ঝটিকা উৎপাদন করিয়া, বিচারবুদ্ধিকে ডিঙাইয়া খপ্ করিয়া হাতকে হুকুম দিবে—উহাকে ট্যাকস্থ কর এবং চোখকে হুকুম দিবে—"ঘাড় ফিরাইয়া দেখ, কেহ দেখিল না তো ?"

এখন বুঝিলেন, তফাৎ কোথায় ? তফাৎ মস্তিষ্কের কার্য্যে। সুস্থলোকেরা ধীরভাবে পলকের মধ্যে সব বিচার করিয়া সংযত থাকে ; ব্যারামীরা মাথার ভিতরে প্রবল ঝড় অনুভব করে এবং সেই ঝড়ের মুখে উড়িয়া যায়—যা'-তা' করিয়া বসে !

কাযেই, সমাজের তথাকথিত দুষ্ট বা দুর্ব্বৃত্তলোকেরা কৃপার পাত্র—তাহাদিগকে লইয়া মনপ্রাণে ভালবাসিয়া, তাহাদিগকে যত্ন করিয়া খাইতে ও বিদ্যা বা কায শিক্ষা করিতে দিলে, এব আবশ্যকমত ঔষধ দিলে, তাহারাই সুপথে চলিতে শিখে। দেহের ব্যারাম ধরা সুখসাধ্য—মনের ব্যাধি ধরাও যেমন শক্ত, সারানও ততোধিক ধৈর্য্য ও কষ্টসাধ্য। কিন্তু কাযকে ঘৃণা করিলে বা ভয় পাইলে তো চলিবে না ! মনে রাখিতে হইবে যে ইহারা—

সেই ননীচোরের, বস্ত্রহারীর উল্টামুখী সংস্করণ !

মাসপঞ্জী

চৈত্র-বৈশাখ

রাজনৈতিক ও সামাজিক—

২১ এ চৈত্র—লাহোরে লাজপত রায় হলে শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্তের ছাত্রসভায় বক্তৃতা। আগ্রায় সান্ধ্য আইন জারি—আগামী এক পক্ষকালের জন্ম জনসাধারণকে রাত্রি দশটার পর গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষেধ।

২২এ—দিল্লী সঙ্গম থিয়েটারের সুপ্রশস্ত হলে মুস্‌লিম কন্‌ফারেন্সে মৌলানা সৌকৎ আলীর বক্তৃতা। মহাত্মাজীর শরীর অসুস্থ—ডাঃ আন্সারির পূর্ণবিশ্রামের প্রস্তাব। ছাত্র-সম্মেলনের নির্ব্বাচিতা সভানেত্রী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দাশগুপ্তা এম-এ, পি, এচ- ডি-কে বরিশাল ষ্টিমার ঘাটে বিপুলভাবে সংবর্দ্ধনা। সুরাটে জনসাধারণের লবণ তৈয়ারী।

২৩এ—সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানকল্পে নয়াদিল্লীর লাট-প্রাসাদে মহাত্মা গন্ধী ও লর্ড আরুইনের পুনরালোচনা-বৈঠক। কুমারী মীরা বেন বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া করাচীর মিউনিসিপাল হাসপাতালে শয্যাশায়ী। লাহোরে জন সি, ডি রায়ের অভ্যর্থনা।

২৪এ—মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেমস পেডি সি-আই-ই-র উপর মেদিনীপুর স্কুলভবনে ৫ বার গুলী নিক্ষেপ। দিল্লীর কনভোকেশন হলে যাবতীয় বণিক-সভার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে স্বরাজ শাসন-তন্ত্র সম্বন্ধে মহাত্মাজীর বক্তৃতা। রেঙ্গুনে বিদ্রোহী ও পুলিশে সজ্ঘর্ষ রেঙ্গুনে ব্রহ্ম-বিদ্রোহ মামলার স্পেশাল ট্রাইবিউন্যাল বিচার আরম্ভ। ভগৎসিংএর শ্রাদ্ধদিবস—শহরব্যাপী হরতাল।

২৫এ—অমৃতসরে মহাত্মা গন্ধী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, যমুনালাল বাজাজ, মহাদেব দেশাই,পণ্ডিত গোবিন্দকান্ত মালব্যের উপস্থিতি—মহাত্মা-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিপুল জনতা। আফগানীস্থানের ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লার মক্কাতীর্থ দর্শনে যাত্রা (রোমের সংবাদ। মহাত্মা গন্ধী শয্যাশায়ী—১০১ ডিগ্রি জ্বর।

২৭এ—শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের দার্জ্জিলিংএ অভ্যর্থনা।

২৯এ—জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস উদযাপন উপলক্ষে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসভার অধিবেশন। ওয়াই-এম-সি-এর ভূতপূর্ব্ব জেনারেল সেক্রেটারী ও গোল টেবিল বৈঠকের ডেলিগেট মিঃ কে, টী, পলের মৃত্যু। মহাত্মা গন্ধীর স্বাস্থ্যোন্নতি।

৩০এ—শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারির সভাপতিত্বে গুজরাট বিদ্যাপীঠের পঞ্চম বার্ষিক স্নাতক

সম্মেলনে মহাত্মা গন্ধীর বাণীপাঠ। সুর্ম্মা উপত্যকায় ছাত্রসভা।

১লা বৈশাখ—মহাত্মা গন্ধীর সবরমতী আশ্রমে আগমন। ময়মনসিংহে ভীষণ ঘুর্ণীবাত্যা—বহু ঘরবাড়ীর পতন। বড়লাট ও লেডী আরুইনের বিলাত-যাত্রা উদ্দেশে বোম্বে রওনা।

২রা—রাজা আলফোনসোর ডিউক অব সিরাস্তার সহিত ভোর রাত্রে 'প্রিন্স অব্ আলফোন্সো' যুদ্ধজাহাজযোগে স্পেন পরিত্যাগ। নয়াদিল্লীতে স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালে দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলা আরম্ভ। শ্রীহট্টের জননায়ক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে আলবার্ট হলে কলিকাতাস্থ শ্রীহট্টবাসীদের অভিনন্দন-পত্র প্রদান। কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত। বঙ্গবাসী কলেজের ক্যানিং হোষ্টেলে অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আত্মদাতা যতীন্দ্রনাথ দাসের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন ও পরলোকগত আত্মার গুণকীর্ত্তন।

৪ঠা—ভারতের নূতন বড়লাট লর্ড উইলিংডনের কাউণ্টেস অব উইলিংডন-সহ বোম্বাইতে পদার্পণ। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সস্ত্রীক সিংহল যাত্রা। চট্টগ্রামে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বিপুল অভ্যর্থনা। বোম্বাইতে মহাত্মা ও বোম্বে গবর্ণরের দুই ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা।

৯ই—কলিকাতা চৌরঙ্গী রোডস্থ সেণ্টপল ক্যাথিড্রেলে পরলোকগত কে, টি, পলের স্মৃতিসভা। আফগানিস্থানে অশান্তির গুজব। নাগপুরে গোল টেবিল-বৈঠক-প্রত্যাগত ডাঃ মুঞ্জে শয্যাগত। পাঞ্জাবে থার্ণল সংবাদপত্র-আফিসে খানাতল্লাস—সম্পাদক ও মালিক গ্রেপ্তার। বোম্বাই মাড়োয়ারী যুবসমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গন্ধীর সভাপতিত্বে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে অভিনন্দন প্রদান। চুঁচুড়ায় ভীষণ ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড।

১০ই—'রঙ-বেরঙ' সম্পাদক অশ্লীল কবিতা প্রকাশ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার। পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত অর্ডিনান্স ও ফৌজদারী সংশোধন বিধি অনুসারে "ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লার চিঠি" শীর্ষক ফরাসী ভাষায় লাহোরে মুদ্রিত এবং জমিদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ভারত সরকারে বাজেয়াপ্ত (পেশোয়ারের সংবাদ)।

১২ই—বোম্বাইয়ের লাট স্যর ফ্রেডারিক সাইকেসর বিলাত যাত্রা। ব্রহ্মবিদ্রোহীদের সঙ্গে পুলিশ ও সেনাদলের ঘোর সঙ্ঘর্ষ—৪০ জন বিদ্রোহীর শব প্রাপ্তি। 'শুকদেব ভগৎ সিং, রাজগুরু কি ফাঁসী' ও 'সহীদ ভগৎ সিং' শীর্ষক হিন্দী পুস্তিকাদ্বয় বাজেয়াপ্ত। দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসভা। চট্টগ্রামে সামরিক প্রহরী—শহরে সাঁজোয়া গাড়ীর টহল। রাজা আমানুল্লার মক্কাতীর্থ পরিদর্শন। বারদৌলীতে মহাত্মাজী ও স্থানীয় কৃষকদের আলোচনা। ময়মনসিংহে ছাত্র-সম্মিলনে গুণ্ডামী—শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে আক্রমণ।

১৩ই—মহাত্মাজী ও সর্দ্দার বল্লভ ভাইয়ে আলোচনা—যুদ্ধ বিরতির সর্ত্ত ভঙ্গের কথা। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতায় আগমন।

১৫ই—ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রসমিতির নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাসকে নেত্রকোণা ষ্টেশনে বিদায়-সংবর্দ্ধনা। বোম্বাইয়ে পতাকা সপ্তাহ সহস্র সহস্র কংগ্রেস সভ্য সংগ্রহ।

১৬ই—মহাত্মা গন্ধীর সদলবলে বোরসাদ ভ্রমণ। মৌলবী আবুল কাসেম দেনার দায়ে গ্রেপ্তার। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী ৮ই জুন পর্য্যন্ত স্থগিত।

১৮ই—স্পেনের ভূতপূর্ব্ব রাজা আলফান্সো ও ডিউক অব মিরাণ্ডার ছদ্মবেশে লণ্ডন হইতে প্যারী যাত্রা।

১৯এ—লর্ড ও লেডি আরুইনের লণ্ডনে উপস্থিতি। ষ্টেশনে বিপুল অভ্যর্থনা।

২০এ—কালিকটের খিলাপেট উপকূলে বিশাল জনসভায় নরীম্যানের বক্তৃতা। বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে মিঃ ব্রেলভি কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান-সেবাদল-কর্ম্মীদের-শিক্ষা-শিবিরের উদ্বোধন।

সভা-সমিতি—

২৯এ চৈত্র—বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন। বঙ্গীয় গ্রন্থালয়-পরিষদের জনসভায় আচার্য্য রমণের "আলোক বিকীরণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৬ই বৈশাখ—নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসুর ৭১তম জন্মতিথি উপলক্ষে শ্যামবাজার এ, ভি স্কুল হলে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অমৃতচক্রের অধিবেশন।

৭ই…অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের ডাক্তার উপাধি-লাভে সিটি কলেজে ডাঃ আকুহার্টের সভাপতিত্বে ও বহু গুণিজনের সমক্ষে সংবর্দ্ধনা।

১০ই—জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে বিদ্যাসাগর কলেজ হোষ্টেলে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয়ের সভাপতিত্বে মহোৎসব ও শাস্ত্রব্যাখ্যা।

১১ই…শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের জন্মতিথি উপলক্ষে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ-প্রতিষ্ঠিত শঙ্করমঠে যথারীতি উৎসব—জনসভায় শঙ্করাচার্য্যের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা।

১২ই…কলেজ ষ্ট্রীটস্থ জ্যোতিষ-পরিষদ্ ভবনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে পরিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন।

১৩ই—ডাঃ সাতকড়ী গাঙ্গুলির সভাপতিত্বে অখিল বঙ্গ লাইসেন্সিয়েট মেডিক্যাল ছাত্র-সম্মিলনীর অধিবেশন।

১৬ই…শ্যামবাজারস্থ বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে বিবেকানন্দ মিশনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন—সভাপতি কবিরাজশিরোমণি শ্রীযুত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়।

১৬ই…পুণ্যস্মৃতি নৈয়ায়িকপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ৺বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে শোক-প্রকাশার্থ সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশন—সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়।

১৮ই…বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীটস্থ ধর্ম্মাঙ্কুর-বিহারে বৌদ্ধদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্ব্ব বৈশাখী পূর্ণিমোৎসব অনুষ্ঠান।

২০এ…অখিল-বঙ্গ-নারী- মহাসম্মেলনের অধিবেশন—সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী।

সাহিত্যিক—

২০এ চৈত্র…বাঙ্গলার বিখ্যাত স্মৃতি-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, বিবিধ-গ্রন্থপ্রণেতা মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন।

২৯এ…মান্দ্রাজের 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ বৈদ্ভরমণের পরলোকপ্রাপ্তি।

১লা বৈশাখ…টাউনহলে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে কলিকাতা কর্পোরেশনের অভিনন্দন-পত্র প্রদান।

২রা…অখিল-ভারত-হিন্দু-মহাসভার সম্পাদক পণ্ডিত দেবরতন শর্ম্মার মৃত্যু।

৬ই…রায় রসময় মিত্র বাহাদুরের মৃত্যু।

২০এ…মজঃফরপুর সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্ব্বেদের প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত শিবচন্দ্র মিশ্র কাব্যসাংখ্য-ব্যাকরণতীর্থের মৃত্যু।

অখিল বঙ্গ-নারী মহাসভা

কলিকাতায় সম্প্রতি যে অখিল বঙ্গনারী মহাসভার অধিবেশন শ্রীযুক্তা সরলাদেবী চৌধুরাণীর সভানেত্রীত্বে হইয়া গেল তাহা দেশব্যাপী নারী-জাগরণের প্রকৃষ্ট পরিচয়। নারীরা আজ আর আপনাদের অভাব-অভিযোগের বিষয়ে উদাসী নন, আজ তাঁহারা যুক্তির ও শক্তির সহিত আপনাদের দাবী প্রচার করিতে শিখিয়াছেন। নারীদের দাবী গ্রাহ্য হইবার পক্ষে সভানেত্রীর অভিভাষণে যেভাবে পুরুষদের ভৎর্সনা করা হইয়াছে ও নারীর সকল দুর্গতির কারণ যে তাহারাই বলা হইয়াছে, এমতের আমরা সমর্থন করি না। পরস্পরের সাহায্যে নারী ও পুরুষকে পাশাপাশি চলিতে হইবে; ইহার মধ্যে কেহ অপর পক্ষকেই কেবল কটু তিরস্কার ও দোষারোপ করিলে কোন সুফলই ফলিবে না।

* *

নারী মহাসভার হাওড়ার প্রতিনিধি শ্রীযুক্তা বাসন্তী মজুমদার-কর্তৃক উপস্থাপিত সপ্তম প্রস্তাবটি লইয়া খুব তর্ক চলে। ঐ প্রস্তাবের একটী ধারায় ছিল যে ভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহে যেন বাধা না থাকে। শ্রীযুক্তা অনুরূপাদেবী বলেন ঐরূপ বিবাহ কেহ করিলে, আপত্তি কেহই করে না; সুতরাং ঐ অংশটী বাতিল করা হউক। উক্ত মূল প্রস্তাব ও শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সংশোধনী প্রস্তাব উভয়েরই সমর্থনকারিণী বহু মহিলাই ছিলেন। শ্রীযুক্তা শান্তি দাস মূল প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতাকালে একস্থলে বলেন যে, ভিন্ন সম্প্রদায় বা ভিন্ন জাতির নরনারীর রক্তের সংমিশ্রণ-ফলে শক্তি ও সাহসসম্পন্ন বংশধরের সৃষ্টি হইতে পারিবে এবং ঐ সমস্ত ভবিষ্যত নরনারী সারা দেশে প্রবল সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদকে অতিক্রম করিতে পারিবেন। বর্দ্ধমান-কাটোয়ার প্রতিনিধি শ্রীমতী নির্মলাবালা সান্যাল এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, নিরক্ষরতায় দেশ এখনও মগ্ন—এইরূপ অসঙ্গত অন্যায় প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া সামাজিক ভিত্তিকে শিথিল করিলে ফল কদাচ ভাল হইবে না, পল্লীরমণীরা এইরূপ প্রস্তাবের অনুকূল হইবেন না। বহু তর্ক-বিতর্কের পর শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সংশোধনী, সভায় গৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতে কি ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না যে পুরুষেরা সমাজ-সংস্কারে যতই কেন অগ্রসর হউন না, বাঙ্গালার রমণী অনেক বিষয়ে দেশের প্রচলিত কোন কোন প্রথার বিরুদ্ধে যাইতে চাহেন না।

* *

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলেন যে, এরূপ মিলনের প্রবর্ত্তন হইলে হয় সমুদয় হিন্দুকে মুসলমান, নয় সমস্ত মুসলমানকে হিন্দু হইতে হইবে; কিন্তু তাহা ঘটা সম্ভবপর নয়। বাঙ্গালার মেয়েরা তাঁহাকে সমর্থন করিয়া দেখাইয়াছেন যে রক্ত-সংমিশ্রণজনিত বলিষ্ঠ ও সাহসী বংশ-ধর লাভ করিবার কথাটা তাঁহাদের সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই—সুপ্রজনন বিদ্যাও এমতের সমর্থন করে না। পিতা-মাতার শারীরিক ও মানসিক দোষ-গুণ কতকটা সন্তানে

বর্ত্তিয়া থাকে সত্য ; কিন্তু তাই বলিয়া ভিন্নজাতির বা ভিন্নসম্প্রদায়ের নর-নারীর রক্তের সংমিশ্রণ ফলেই যে শক্তি ও সাহসসম্পন্ন বংশধরের সৃষ্টি হইতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায় ? এই ভিন্নজাতি বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারীর দৈহিক কিংবা মানসিক উৎকর্ষ না থাকিলে দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ জাতকে বর্ত্তিতে পারে না। দৈহিক বা মানসিক শক্তিতে নিকৃষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়ের ভিতর রক্তের সংমিশ্রণ হইলে কি বলিষ্ঠ ও সাহসী বংশধর জন্মিবে ? মালীরা যেমন ভাল গাছ হইতেই কলমের চারা করিয়া থাকে, সেইরূপ করিতে না পারিলে চলিবে না। আবার এসম্বন্ধে আর একটা কথাও ভাবিবার আছে, শিক্ষা, দীক্ষা ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ভিতর দিয়া জাতকের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়। সেদিকের উৎকর্ষের কথাও ভাবা উচিত। যাহা হউক এ বিষয়েও মূল প্রস্তাবটী যে সভায় অগ্রাহ্য হইয়াছে তাহাতে আমরা সুখী হইয়াছি, কারণ এই প্রস্তাবের মূলে বৈজ্ঞানিক কোন সত্য নাই।

* *

সভায় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তেজনার লক্ষণ দেখা যায় শ্রীমতী প্রতিভা রায়ের উপস্থাপিত প্রস্তাবটীতে। প্রস্তাবটী ছিল বিবাহ-বন্ধন-ছেদ, বহু-বিবাহরোধ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, পর্দ্দা ও পণপ্রথা তুলিয়া দেওয়ার সম্বন্ধে। এবারও শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর নেতৃত্বে প্রতিবাদকারিণী এই রকম প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইতে দেন নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গালার মেয়েদের অধিকাংশই স্বামীকে ত্যাগ করিবার পক্ষপাতিনী নন। অবশ্য সত্যকথা বলিতে কি আমরাও এইরূপ চাই। বাঙ্গালার রমণীরা তাহাদের বৈশিষ্ট্যের ধারা বজায় রাখিয়া সামাজিক সংস্কারকামী হইয়া যতদূর সম্ভব পরিবর্ত্তন করুন, কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তন যেন করিয়া না বসেন যাহাতে বাঙ্গালার রমণীকে কিছুতেই চিনিতে পারা যাইবে না—বাঙ্গালার আর পাশ্চাত্যের রমণীর ভিতর এমন একটা বৈশিষ্ট্য যেন থাকে, যাহাতে অনায়াসে পার্থক্যটা বুঝা যায়। বাঙ্গালার মেয়েরা স্বামীকে দেবতা জ্ঞান না করুন, অন্ততঃ মানুষ জ্ঞান করিয়াও তাহাদের মধ্যে যদি দোষ কিছু দেখিতে পান, সভ্যতা-ভব্যতার অভাব দেখেন, তবে আপনাদের চরিত্রের মাধুর্য্যে ও জ্ঞান গরিমায় তাহাকে সংশোধন করিয়া লউন না কেন—এ ক্ষেত্রেও শুদ্ধির আবশ্যকতা খুবই আছে বলিয়া মনে হয়। আবার অপরদিক হইতে দেখিলে একথাটা মনে ওঠে বাঙ্গালার মেয়েদের উপর তাহাদের স্বামীরা যে অযথা অত্যাচার করেন, সামান্য দোষ-ত্রুটির অজুহাতে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, তাহারও শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সামান্য কারণে পত্নীকে নির্য্যাতন করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। অবশ্য পত্নী ত্যাগ করিয়া পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিতে আজকাল আর কাহাকেও বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ আমাদের মনে হয় সাংসারিক অসচ্ছলতা।

* * * *

এই মহাসভার অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী মোহিনী দেবীর অভিভাষণ হইতে নিম্নলিখিত অংশটী উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"যে সনাতন সভ্যতার মধ্যে আমার জন্ম তাহারই প্রাক্কালে যুধ্যমান স্বামীর রথাশ্ব চালনা করিয়াছিলাম, আমি তাহারই মধ্যভাগে কেশ কাটিয়া ধনুকের ছিলা করিতে দিয়াছিলাম, আমি 'মেরা ঝান্সী নাহি দেংগা' বলিয়া অগণিত শত্রুর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই আমাকে তোমরা কি নিষেধ বাক্যে, কি অনুশাসনের জোরে গৃহকোণে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে ? পিতা, পতিপুত্রের মঙ্গলকামনায় আমি উপবাস করিয়াছি, তাঁহাদের শুভকামনা করিয়া বুক চিরিয়া রক্ত দিয়াছি। ইষ্টকামনায় দেবদ্বারে মানস করিয়াছি, আজ সেই পিতা-পুত্র-স্বামীর সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দিনে কিছুতেই ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিব না।" বাঙ্গালার নারীরা তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত সকল অধিকার বিধাতার আশীর্ব্বাদে লাভ করুন, আমরা সুখী হইব। অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রীর যে উক্তি আমরা উদ্ধৃত করিলাম তাহার উপযুক্ত তেজস্বিতা বাঙ্গালার নারীরা অর্জ্জন করুন।

* * * *

গান্ধীজীর বিলাতের সাজ-সজ্জা

আমেরিকার 'ককস্ মুভিটোনে'র একজন প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকালে তাঁহার একটী প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী

বলিয়াছেন যে, তিনি এখানে যেমন সজ্জায় থাকেন, বিলাতেও যদি তেমনই ভাবে না যান তো রাজার প্রতি অসম্মান দেখান হইবে। তিনি আরও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সেখানকার জল-হাওয়ায় যদি কোনরূপ শারীরিক ক্ষতি না হয় তো তিনি এখানে যেমন আবরণ ব্যবহার করেন, সেখানেও ঠিক সেই রকম আবরণ ব্যবহার করিবেন।

* * * *

এ কথা একমাত্র তাঁরই যোগ্য কথা। আমাদের দেশে যাঁরা বড় চাকুরী করেন বা যাঁদের সাহেবদের কাছে যাইতে হয়, তাঁরা হ্যাট-কোট ধারণ করেন। উহাতে তাঁহাদের মর্য্যাদা কত কমে এটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধিও কি তাঁহাদের নাই? শুনি যে সাহেব মনিব না কি তাহা না হইলে রাগিয়া যান। এমন অন্যায় রাগ যদি সাহেবের হয় তো হোক, বাঙ্গালী তাহার জাতীয় পোষাক পরিতে থাকিবে। সমস্ত বাঙ্গালী প্রতিজ্ঞা করুন যে অফিস-কাছারীতে যাইতে হইলে, যে কয়জনের না পরিলেই নয়, তাঁহারা ব্যতীত আর কেউ হ্যাটকোট পরিবেন না। সকলেই যদি বলেন যে, আমাদের প্রচলিত রকমের সাজ করিব এবং তেমন করিয়াই অফিসে যাইব, মনিব কি করিবেন? যদি কোন সাহেব বাঙ্গালীর অধীনে কাজ করে, সে কি চাকুরীর মোহে জাতীয় পোষাক ছাড়িয়া ধুতি চাদর পরিয়া আসে? বাঙ্গালী সাহেবের কাছে কাজ করিলে ঠিক ঐ রকম প্রথাই অবলম্বন করিবে না কেন? রেলে, ষ্টিমারে সাহেবী পোষাক পরিলে খাতির পাওয়া যায় এই অজুহাতে যাঁরা ধুতি পরিত্যাগ করেন তাঁদেরই বলিব যথার্থ দাস-মনোবৃত্তি। আর কিছু দিন পূর্ব্বে হয় তো এইভাবেই পোষাক-পরিচ্ছদ পরা হইত, কিন্তু সে কাল আর নাই, এখন আমাদের মত গ্রামপ্রধান দেশে, ধুতিধারীর দেশে, ধুতিরই মান বেশী। এখন এমন দিন আসিয়াছে যখন সম্রাট্‌কেও হয় তো কৌপীনের মান বজায় রাখিতে হইবে। যেখানে সেখানে যখন তখন অকারণে যদি কোন লোককে সাহেবী পোষাক পরিতে দেখি তো মনে হয় সে ব্যক্তি জীব-বিশেষের ন্যায় অনুকরণপ্রিয়।

* * * *

পোষাক-পরিচ্ছদের যখন কথাটা উঠিল তখন মেয়েদের পোষাক সম্বন্ধেও আমাদের একটু দাসমনোভাবের পরিচয় দিব। ইংরাজের মেয়েরা যেমন হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত, কদাচ একটু নীচু পর্য্যন্ত সার্ট পরিয়া থাকেন ও চুলগুলি ছোট করিয়া কাটিয়া bobbed hair হন; ঠিক সেইভাবে আমরা আমাদের ছোট মেয়েদের ছোট সার্ট পরাইয়া ও চুল ছাটাইয়া আনন্দ উপভোগ করি। ছোট মেয়েদের এরূপ পোষাক পরিধান সৌন্দর্য্যের দিক্ হইতেও মন্দ দেখায় না; কিন্তু স্কুল কলেজের ছাত্রীদের ভিতর বয়স্থা মেয়েদের ইংরেজ মেয়েদের অনুকরণে যখন চলিতে দেখি তখন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে হয়। জানি না আমাদের জীবদ্দশাতেই ইংরাজ মেয়েদের মত গৃহস্থ ঘরের ঝি-বউদিগকে এরূপ প্রায় অর্দ্ধ নগ্ন অবস্থায় পথে ঘাটে চলিতে দেখিব কি না। আহারের ন্যায় পোষাক-পরিচ্ছদের উপর যে আত্মার উন্নতি কতটা নির্ভর করে তাহা যাঁরা জানিতে চান তাঁহারা মহাত্মাজীর আত্মকথা পড়িয়া দেখিতে পারেন।

* * *

মৈমনসিংহে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মত শ্রদ্ধেয় নেতাকে যখন নির্য্যাতিত হইতে দেখিলাম, নারী মহাসভায় তার প্রতিবাদ-কল্পে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে যখন সভানেত্রী সে প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন দেখিলাম, দুষ্কৃতকারীরা যখন এখনও ভদ্রসমাজ হইতে বিতাড়িত হয় নাই জানিলাম, তখন কি করিয়া বলিব দেশের অধিকাংশ লোকেই অহিংস নীতির দিকে—গুণ্ডামী বা বলপ্রয়োগ যে হীন মনুষ্যত্বের পরিচায়ক তা তাদের অবিদিত নাই। বাঙ্গালী বরাবর বাঙ্গালীর দ্বারা লাঞ্ছিত, অপমানিত হইতেছে, দেশকে উন্নত করিতে গিয়া, সমস্ত জগতের কাছে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি কি এর জন্য ধিকৃত, নিন্দিত হইবে না। বাঙ্গালী যদি তার জন্মভূমিকে নিরবচ্ছিন্ন লজ্জার বিষয়ই করিতে চায় তো করুক—কিন্তু তার সঙ্গে 'দেশাত্ম-বোধ,' 'মুক্তিকামনা', 'আত্মোৎসর্গ' প্রভৃতি মামুলী বাক্যালাপ

চলিবে না, মানাইবে না, খাপ খাইবে না। কপটতারও একটা সীমা আছে।

* * *

আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত চিত্তে রসময় মিত্রের মহাপ্রয়াণে জানাইতেছি যে, গত ৬ই বৈশাখ আদর্শ শিক্ষক রায়বাহাদুর রসময় মিত্র মহাশয় হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন। পূর্ব্বদিন তাঁহাকে আমরা রাণী ভবানী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভা হইতে সন্ধ্যা ৭ টার সময় ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছি—তখনও তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ। কে জানিত ভগবানের আহ্বান এত শীঘ্র আসিবে? যাঁহারা তাঁহার পদতলে বসিবার সুবিধা পাইয়াছেন, তাঁহারাই আমার মত একবাক্যে বলিবেন তাঁহার মত আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ চরিত্রবান্ পুরুষ বড় কম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি কোমলতার অবতার, আবার আবশ্যক হইলে রুদ্রমূর্ত্তিও ধরিতে পারিতেন, অবশ্য শেষোক্ত অবস্থাটা তাঁহার অভিনয়ের মূর্ত্তি। সে চিত্তে চাঞ্চল্য বড় একটা দেখা যাইত না। এক দিকে তিনি ছিলেন যেমন ধীর, স্থির, গভীর-প্রকৃতি, আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ শিক্ষক। ছাত্রদিগের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বুঝিয়া লইয়া তিনি প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব ফুটাইবার চেষ্টা করিতেন—শিক্ষা দিতেন আদর্শ মানব হইতে। তিনি ছিলেন মানবতার পূজারী। লক্ষ লক্ষ ছাত্র তাঁহারই আদর্শে চালিত হইয়া তাঁহারাই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া প্রকৃত মানবপদবাচ্য হইতে পারিয়াছেন ও সমাজের কল্যাণে মন-প্রাণ নিয়োজিত করিতে পারিয়াছেন। চরিত্রগঠনের এমন সহায়ক শিক্ষক বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

* * *

এত বড় উদার-প্রকৃতি রসময়বাবুর চরিত্র আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন—আজীবন ধর্ম্মের পথে চলিয়া, অন্যকে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেন। বাস্তবিকই ধর্ম্মই তাঁহাকে তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল—তিনি ছিলেন ভক্তিমার্গের একজন বড় সাধক। জীবনে যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতেন, তাহা প্রচার করিতে কখনই তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সত্যাসক্ত, সত্যনিষ্ঠ, স্থিতধী পুরুষ আজকাল বাঙ্গলায় বড় বিরল হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার কীর্ত্তন একটা উপভোগের সামগ্রী ছিল। গলা তাঁহার ভাল ছিল না, সুকণ্ঠ বলিয়া তাঁহার গর্ব্ব-করিবার কারণ কখনও ছিল কি না বলিতে পারি না। আমি ৩৬ বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে জানি, কারণ ১৮৯৫ সালে যখন তিনি হেয়ার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসেন তখন অল্প কয়েকদিনের জন্য আমরা তাঁহার পদতলে বসিবার সুবিধা পাইয়াছিলাম। তদবধি আমরা তাঁহার নিকট পুত্রাধিক স্নেহ-মমতা পাইয়া আসিয়াছি। তাঁহার প্রাণটা যে রসে কতদূর ভরপুর ছিল—তাঁহার নাম যে অন্বর্থ-নামা ছিল তাহা তখনই বুঝিতে পারিতাম, যখন তাহার কীর্ত্তন শুনিতাম। বহুবারের পঠিত ও বহুধার শ্রুত পদ যখন তিনি ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া কীর্ত্তন করিতেন তখন সেখানে একটা নূতন জগতের সৃষ্টি হইত। প্রত্যেক পদের 'আখর' এমন ভাবে তিনি যোজনা করিতেন যে তাহার অর্থ শ্রোতার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যাইত। পদটীর ভাবার্থ যেন মুর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইত তাঁহার 'আখরে'র সাহায্যে অনেক পদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। কীর্ত্তনের সময়ে ভাব-বিহ্বল রসময়বাবুর মুখে যে শান্ত মধুর চিত্র প্রতিভাত হইত তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন যে ভাবরাশি যেন তাঁহার হৃদয় উৎস হইতে অনর্গল বাহির হইয়া আসিতেছে।

* * *

বাঙ্গালা দেশে কীর্ত্তনীয়াদিগের যত দোষই থাকুক, তাঁহারা যে পদাবলীকে বাঙ্গালায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাদের নিকট বঙ্গবাসী চির-কৃতজ্ঞ। ভদ্র শিক্ষিত সমাজের এই শ্রীকীর্ত্তনের মহিমা প্রচার করিবার জন্য যাঁহারা এখন চেষ্টা করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন রসময়বাবু ছিলেন তাঁহাদের অগ্রণী। সে আজ বহুবৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যরথী দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ীতে একদিন তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত ফিরিতে ফিরিতে তাঁহাকে

অনুনয় করিয়া বলি, এই কীর্ত্তনের ধারাটা মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন কলিকাতা হইতে উঠিয়া না যায়। এই ধারাটা বজায় রাখা চাই। ইতিপূর্ব্বে সুকণ্ঠ খগেনবাবুর পদগান আমরা প্রায় শুনিতাম—কিন্তু মাত্র দুই চারি চরণ। গুণ গুণ করিয়া দুই চারিজন বন্ধু-বান্ধবের নিকট তিনি গাহিতেন। তার পরেও তাঁহাকে বহুবার অনুরোধ করায় তিনিও সাধনা করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রস-গানের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার মত কুশলী রসকীর্ত্তনীয়ার কর্ত্তব্য এই যে রসময়বাবু-প্রবর্ত্তিত ধারাটা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে। অবশ্য তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী—সময় তাঁহার বড় কম, তবুও আমরা তাঁহার নিকট বলিতেছি তিনিও যেন এবিষয়ে যোগ্য দু'একজন ছাত্রকে তৈয়ারী করেন।

* * *

এই কীর্ত্তন-সম্বন্ধে রসময়বাবুর চরিত্রের একটা কথা বলিব। যখন তিনি হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষকপদে উন্নীত হইতে যাইতেছেন তখন কোন অসূয়াপরবশ উচ্চপদপ্রার্থী শিক্ষক শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মহোদয়ের নিকট অভিযোগ করিয়া বলেন 'রসময় বাবু একজন কীর্ত্তনীয়া—কীর্ত্তন গান করিয়া থাকেন। ভাবে বিভোর হইয়া থাকিলে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া চলে না।" সাহেব যখন কীর্ত্তন গানের অর্থ তাঁহার নিকট হইতে বুঝিলেন ভক্তি-মূলক গান, তখন তিনি সোৎসাহে বলিলেন, আপনি যাহাকে দোষ বলিতেছেন, আমি তাহাতে উঁহার অতিরিক্ত গুণেরই পরিচয়ই পাইতেছি. "He is a headmaster and a kirtania." তৎপরে সাহেব রসময়বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি কীর্ত্তন গান করেন, তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন 'হাঁ'—গাহিয়া থাকি। বাস্তবিকই তিনি বহুবার আমাকে বলিয়াছেন, "বাবা এখন ভক্তির পথে চল।" ভক্তির পথে সকলকে চালিত করিতে তাঁহার অন্তর সর্ব্বদাই ব্যগ্র থাকিত।

* * *

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের বিশুদ্ধিতা রক্ষার জন্য তিনি আত্মপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কোথাও শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা হইতে দেখিলে তিনি শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ প্রকাশ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই।

আমরা তাঁহার জীবনের শেষ তিনদিন কি ভাবে কাটিয়াছিল তাহা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব। উহা পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায় ভগবদ্‌ভক্ত রসময় তাঁহার আরাধ্য দেবতা রসময়েরই পদতলে বসিয়া সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল ছিলেন।

* * *

ভারতবন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেবের বাণী

ফ্রি প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার মারফতে ভারতের অকৃত্রিম-বন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেব যে বাণী প্রচার করিয়াছেন তাঁহা এই:—যত দিন না ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে দক্ষিণ আফ্রিকা ততদিন ভারতের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দান করিতে পারিবে না। এখনকার জাতীয় দলের প্রায় প্রত্যেকের মনোভাবই আমি জানি। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতার সময়ে জয়যুক্ত হউক ইহাও তাহাদের প্রাণের কামনা।

জাপানের সহিত তাহাদের সেদিনকার যে সন্ধি হইয়া-গিয়াছে তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় জাপানের প্রতি তাহাদের সম্মান কতদূর গভীর। এই সন্ধির সর্ত্তের মত উদারতার পরিচায়ক ভারতের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার কোন সন্ধিই হয় নাই। জাপান যেমন স্বাধীনতা লাভ করিয়া সম্মানার্হ হইয়াছে, ভারতও ঠিক তদ্রূপ সম্মানার্হ হইবে সেই দিন যে দিন স্বরাজ লাভ করিবে—সেদিন তাহার জাতীয় দাবী গ্রাহ্য হইবে।

যতদিন না সেই শুভদিনের উদয় হয়, ততদিন ভারতীয় জাতীয় দলের কর্ত্তব্য দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাড়া ও অন্যান্য দেশে যেভাবে ভারতের ন্যায্য দাবী অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে সে চেষ্টাকে জাগ্রত রাখিতে। ভারতবাসীর উচিত নয় যে সামান্য যে সকল অধিকার তাহারা পাইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করা। জাপানের মত ভারতবর্ষকে সহ্য করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন এখনও দক্ষিণ আফ্রিকার লোকের হৃদয়ে

হইতেছে। এই আন্দোলন বন্ধ হইয়া গেলে সকলই বন্ধ হইয়া যাইত।"

* * *

ম্যানচেষ্টার গার্জেন প্রভৃতি কয়েক খানা কাগজ বিলাতে মহাত্মা গন্ধীজীর সম্বন্ধে অযথা আলোচনা হইতেছে দেখিয়া লণ্ডনে ভারতবন্ধু এণ্ড্রুযে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন আমরা যীশু খ্রীষ্টের মত-গুলি আপন আপন জীবনে ব্যবহৃত সত্যরূপে কখনও প্রয়োগ করি না। মহাত্মা গন্ধীজী যীশুখৃষ্টের উপদেশ-গুলি (বিশেষতঃ তাঁহার Sermon on the Mount) অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছেন। তাঁহার মত যীশুখৃষ্টের বাণী প্রাচ্যজগতে আর কেহ প্রচার করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এ হেন চরিত্রকে মসীলিপ্ত করিবার জন্য যাঁহারা ব্যগ্র তাঁহাদের সে চেষ্টা কখনই ফলবতী হইবে না। তিনি যাহা বলিতেছেন সম্পূর্ণভাবে তাহা না জানিয়া স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা না করিয়া যাহারা কোন কথা বলেন তাঁহারা মাত্র হঠকারিতারই পরিচয় দেন। মহাত্মার কোন কার্য্যে অহিংসার পরিচয়ের লেশ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, একথা জোর গলায় বলা যায়।

* * *

বিলাতের এলবার্টহলে Society for the Propagation of the Gospel সভায় মিঃ এমেরি যে বক্তৃতা দিয়াছেন ও যাহার সারমর্ম্ম ২রা মে টেলিগ্রামে বাহির হইয়াছে তাহা এই : "সভার কার্য্য বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে ভারতীয় দলের, আমাদের সহিত বন্ধুতা ও সহযোগিতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে, যদিও রাজনৈতিক ও জাতীয়তার দিক হইতে তাহাদের ও আমাদের ভিতর নানা বিষয়ে পার্থক্য আছে। ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই আমাদের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক-দিগের আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারা যে জন-সেবা করিয়া থাকেন তাহাতে ভারতবাসীকে ঘুষ দিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার চেষ্টা নাই। আর্ত্তের সেবা, দরিদ্রের অন্নবস্ত্র মোচন, শিক্ষা দান ও যীশু খৃষ্টের মত প্রচারই তাঁহাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু মিঃ গন্ধী একা স্বীকার করেন না।"

মহাত্মা গন্ধীজী যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভুল বুঝিয়াই এমেরি সাহেব এই কথা বলিয়াছেন। মহাত্মাজীর মত যীশুখৃষ্টের ভক্ত তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ভিতর কয়জন আছেন বলিতে পারি না—জীবনে তাঁহার সার সত্যগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ কয়জন করিয়া থাকেন? খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারকেরা বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে যীশুখৃষ্টের উদারমত গুলি, অন্ততঃ অহিংস নীতির পরিচায়ক কয়টা মত তাঁহারা প্রতিপালন করিয়া থাকেন? মানুষের কি সহজজ্ঞান নাই যে তাহারা বুঝিতে পারে সত্যই কাহারা দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য মনঃ-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

মরু-উৎস

(গল্প)

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

এক

শ্যামল যে কেন এখনও আত্মহত্যা করে নাই, তাহার বন্ধু বান্ধবেরা কেবল এই কথা আলোচনা করিত। সংসারে বিবাহ শতকরা নিরানব্বই জন করিয়া থাকে; স্ত্রীও অধিকাংশ লোকের আছে, কিন্তু উক্ত বস্তুটি শ্যামলের অদৃষ্টে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। বেচারাকে কাজে-অকাজে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। পত্নী যে কাহারও এমন বিভীষণ হইতে পারে ইহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। সত্যকথা বলিতে কি কারাগারের বন্দী বোধ হয় তাহার অপেক্ষা সুখে থাকিতে পায়।

পত্নী সুশীলার মধ্যে কি কোন গুণ ছিল না?

ছিল—তাহার অন্তর ছিল কুটিলতায় ভরা, সে ছিল কলহে সুনিপুণা, দুঃখমার্গের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিতা। তাহার ছিল আচারনিষ্ঠায় বাটীর লোককে গৃহছাড়া করিবার অদম্য শক্তি, মিথ্যা ভাষণে পটুতা, অহেতুক অপবাদ সৃষ্টি করিবার অসাধারণ নৈপুণ্য, স্বল্প বিদ্যার গর্ব্বে লোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; সর্ব্বোপরি তাহার স্বামীকে সর্ব্বদা সন্দেহের চোখে দেখাই ছিল তাহার প্রধান লক্ষ্য। উঠা-বসা, আহার-নিদ্রা হইতে আপিস যাওয়া পর্য্যন্ত স্বামীর প্রতিকার্য্যের উপর অমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে কোন বড়দরের ডিটেকটিভও যে পারিত না তাহা খাঁটি কথা।

এ হেন রমণীরত্নের নাম কিন্তু সুশীলা তাহার পিতামাতা বা যে কোন আত্মীয়-স্বজন এই নাম করিয়াছিলেন তাহার দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। প্রথম প্রথম নির্ব্বোরোধ শ্যামল আপনার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে গিয়া যেরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইত ও সে যেরূপ অভিনয়ের সৃষ্টি করিত তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সে অদৃষ্টের নিকট আত্মসমর্পণ পরোয়া করিয়া একরকম বেভাবে দিন কাটাইতে লাগিল।

দুই

সেদিন ঘড়ির কাঁটা ছয়টা বাজিয়া মিনিট কয়েক অগ্রসর হইয়াছে। আপিস হইতে ফিরিয়া শ্যামল ক্লান্ত দেহে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গেই সুশীলা গৃহের মধ্যস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখের ভাব অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। শ্যামল অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। শিকারী বিড়ালগুলা শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে নিঃশব্দে যেমন কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে সুশীলাও তেমনই ভাবে কয়েক মিনিট শ্যামলকে লক্ষ্য করিল। কিছুক্ষণ এ ভাবে থাকিয়া ধীর কণ্ঠে সুশীলা প্রশ্ন করিল,

—"আজ এত দেরী হ'ল কেন? ছটা তো বেজে গেছে কখন?"

নম্র শান্তকণ্ঠে শ্যামল উত্তর দিল—"আপিসেই একটু দেরী হ'ল, কাজ বেশী ছিল।"

"অন্যদিন তো আপিসে দেরী হয় না?" বলিয়াই সুশীলা এমন মুখভঙ্গী করিল যে সে নিরুত্তরে থাকিতে না পারিয়া বলিল,—"আপিস তো আমার নিজের নয় যে রোজ এক সময় বাড়ী আসব; ছুটী না হলে তো আসা চলে না, আর কতই বা দেরী হয়েছে এই তো ছটা কুড়ি; গুরু গর্জ্জনে ছাদ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল—কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া বলিল—"ওগো আর বোকা বুঝিও না, আমিও মানুষ, দুদশ পাতা লেখাপড়া আমিও করেছি। সামান্য কথা যে না বুঝব তত মুখখুই নেই; ও সব বাজে কথায় ভোলাতে এস তুমি কাকে? পাঁচটার সময় কোন আপিস খোলা থাকে?"

শ্যামল যেমন সচরাচর চুপ করিয়া থাকে যদি তেমনই থাকিত তাহা হইলে এইখানেই অভিনয়ের যবনিকা পড়িত, কিন্তু অবসাদক্লিষ্ট শ্যামলের স্কন্ধে আজ শয়তান ভর করিয়াছিল, ঝাঁঝের সহিত সে বলিল,—ভাল জ্বালা, আপিসে কাজ ছিল দেরী হয়েছে, একশবার বলছি তা বিশ্বাস হচ্ছে না আপিসে ছিলুম না তো এই ক মিনিটের জন্য গেছিলুম কোন চুলোয়?

সুশীলা শ্যামলের সম্মুখে দুই পা সরিয়া আসিল, তারপর হাত দুইটা বিচিত্র ভঙ্গীতে নাড়িয়া বলিল,—"কেন আমি কি তোমার হাতে পায়ে বেড়ী দিয়ে রেখেছি, যাও না—যাও না কোন যমের বাড়ী যাবে যাও না। এখনি এই তো কোথা হতে স্ফূর্ত্তি করে এলে আবার কোথা যাবে যাও না আমি তো বারণ করি নি।"

দুঃখ কষ্টে শ্যামলের মুখ দিয়া আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িল।—ভগবান্ "কবে যে আমায় নেবে?"

জলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন প্রজ্জলিত হইয়া উঠে, একথাতেও সুশীলা তেমনি জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, ওগো শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়? তা যায় না। তোমায় কেন ভগবান্ নিতে যাবেন? আমিই না তোমার আপদ বালাই হয়েছি আমি মলেই তুমি বাঁচ?"

শ্যামল মনে মনে বলিল—'সে কথা একবার একশ-বার।"

প্রকাশ্যে কিন্তু সে নীরব রহিল।

সুশীলা তবু তাহাকে ছাড়িল না। দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—কথার উত্তর দাও।"

কি বলব বলে দাও"

"বলি এতক্ষণ ছিলে কোথা, তার একটা জবাব দেবে তো—না চুপ করে থাক্‌লেই হ'বে

"কি বলব বল? আমার কথা তো তুমি বিশ্বাস কর না।"

"ঃইতেই বোঝ তুমি কেমন গুণের নিধি? কোন মেয়ে ইচ্ছে করে সোয়ামীকে অবিশ্বাস করে?"

"শরীরটা বড় খারাপ লাগছে সুশীলা, আজকার দিনটা আমায় একটু রেহাই দাও।"

"ও তো আমি জানি আমার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তোমার দেহে আগুন লাগে, অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে তো কিছু হয় না।"

নিরুপায় দেখিয়া শ্যামল বলিল,—"আজ আমায় চা দেবে না সুশী?

"এতক্ষণ যেখানে যাদের কাছে বসে আড্ডা দিচ্ছিলে সেখানে শরীর খারাপ লাগে নি? যত শরীর খারাপ হ'ল আমার কাছে এসে? আমায় দেখলেই তোমার শরীর জলে উঠে। আমি কি কুৎসিত? না নিগুণ না মুখ্‌খু? তোমার হাতে পড়েছিলুম তাই আমার 'মর্য্যাদা' বুঝলে না।"

"খাবার কিছু আছে সুশী?"

"ঘরের বৌকে তোমাদের ভাল লাগে না, তাই আমার এত 'অবজ্ঞা' তুমি কত্তে পার; তা বেশ কোন সুন্দরীর কাছে ছিলে এতক্ষণ শুনি?"

এই কুৎসিত ইঙ্গিতে শ্যামলের শরীরের ভিতর রি রি করিয়া উঠিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্যামলের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "না আমায় দেখছি পাগল কর্ব্বে।"

"বলি আমি তোমায় পাগল কর্ব্ব? এত বড় মিথ্যে কথাটা বল্‌তে পারলে? মুখ আড়ষ্ট হ'য়ে বেঁকে গেল না? জিভ খসে পড়ল না? মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল না? ওরে অধমে 'পাপিষ্ঠ' সকালেশে এত বড় মিথ্যে কথা আমার মুখের উপর বলতে সাহস হ'ল? আমি পাগল করলুম, হে ভগবান আমি যদি যথার্থ সতী হই তবে ঐ যে মুখ দিয়ে আমায় এত বড় মিথ্যে অপবাদ দিলে সে মুখের শাস্তি তুমি দিও।"

পত্নীর এমন শুভকামনা সত্ত্বেও শ্যামল নীরব হইয়া রহিল। অন্তরের মধ্যে যাহা হইতেছিল তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। সুশীলা একবার তাহার মুখের ভাবটা দেখিয়া লইয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—"সোয়ামী হয়ে যে এমন দুর্নাম দেয় তেমন সোয়ামী থাকার চেয়ে না থাকা যে ভাল।"

ক্লিষ্টস্বরে শ্যামল বলিল, "ভগবানের অবিচার। তা হ'লে তো তুমি বাঁচতে আর বিশেষ করে আমিও বাঁচতুম।"

"তা তো বলবেই আমি তোমায় বড় জ্বালা দিচ্ছি কি না তাই মলে তুমি বাঁচ। ওরে বাবারে একি ভয়ানক লোক রে, এরা সব কর্ত্তে পারে রে, কোন দিন আমায় গলায়ও ছুরী দিয়ে রাখবে। ওগো বাবাগো কোথায় আছ তুমি দেখ একবার মেয়ের তোমার কি দুর্গতি আজ হচ্ছে। এমন হতভাগা লক্ষ্মী ছাড়ার হাতে দিয়েছিলে যে জ্বলে পুড়ে মলুম, এর চেয়ে আমার জলে ফেলে দাওনি কেন?" শ্যামল মনে মনে বলিল, "আমার দুর্ভাগ্য তাই

তারপর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেলেও ভিতর হইতে আহারের জন্য আহ্বান আসিল না দেখিয়া শ্যামল অগত্যা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই কোন সকালে দুইটা ভাত মুখে দিয়া বাহির হইয়াছে তাহার পর এতক্ষণ পর্য্যন্ত না চা, না একটু জলখাবার, কিছু জুটে নাই। 'বাস' ভাড়া ছাড়া এমন একটী পয়সা সুশীলা তাহাকে দিত না যাহাতে প্রয়োজন হইলে দুই খিলি পান কিনিয়া খাওয়া চলে। মাহিনার পাই পয়সাটী পর্য্যন্ত সে হিসাব করিয়া লয়। পুরুষ মানুষের হাতে কখনও যে অর্থ রাখিতে নাই এ অভিজ্ঞতা তাহার বিলক্ষণ আছে, কাজেই ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তি করিতে সুশীলার শরণাগত হওয়া ভিন্ন শ্যামলের উপায় ছিল না। ধীরে সে রন্ধনগৃহের সম্মুখে আসিল। দেখিল ঘরটা অন্ধকার। আলো জ্বালিয়া শ্যামল লক্ষ্য করিল আহার্য্যের [illegible]।

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সে শয়ন-কক্ষে আসিল। খাটের উপর সুশীলা গভীর নিদ্রামগ্না। অনুসন্ধিৎসু নেত্রে চাহিয়া শ্যামল দেখিল আহার্য্যের সন্ধান সেখানেও মিলিল না সুশীলার নিদ্রা-সুখে ব্যাঘাত ঘটাইতে তাহার সাহসে কুলাইল না। একবার ভাবিল দরকার নাই আহারে, শুইয়া পড়া যাক; কিন্তু অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় শরীর যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে ভাবিয়া শ্যামল ঝিকে ডাকিল। সদ্য নিদ্রা-ভঙ্গে চোখ মুছিতে মুছিতে সে উঠিয়া আসিলে শ্যামল প্রশ্ন করিল—"আমার খাবার কোথায় ঝি?"

"খাবার তো আজ হয় নি বাবু, মা রাঁধেন নি।" তোমরা কিছু খাও নি?"

"হাঁ আমি মুড়ি কিনে খেয়েছি; মা দোকান থেকে লুচি-তরকারী এনে খেয়ে ছিলেন।"

"আর আমার? আমার কি ব্যবস্থা হয়েছে?

অপ্রতিভভাবে ঝি বলিল,—"আপনার জন্যে তো মা কিছু রাখলেন না, বল্লেন যে চুলোয় সারা বিকেল কাটিয়ে এসেছে সেইখানে গিয়ে যেন খায়।"

শ্যামল স্তব্ধ হইয়া রহিল। এবার সত্যই তাহার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। জগতে এমন দুরবস্থা কি কাহারও হয়। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাসীটার মনে বোধ হয় দয়া হইতেছিল, সুস্পষ্টভাবে সে বলিল, "ঘরে তো কিছু নেই, দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে; কি জানি বাবু মার কেমন আক্কেল নিজে খেয়ে দেয়ে শুয়ে রইলেন সোয়ামী কি খেলে না গেলে সে খোঁজও একবার নিলে না এমন ধারা মানুষ কখনও দেখি নি। তা 'এঠোজাঁটা' কি জেলে দেব কিছু করে নেবেন?"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া শ্যামল বলিল,—"না দরকার নেই একটা রাত না খেয়েও কেটে যাবে এখন, তুমি শোও গিয়ে।"

এমন সময় সুশীলা সেখানে আসিয়া বজ্র নির্ঘোষে বলিল,—"আচ্ছা তোমার জ্বালায় কি আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। রাত্তিরে শুয়েও একটু নিস্তার নেই? আমার চোখের উপর এই সব কাণ্ড? এমন করে মানুষ বাঁচে কি করে?"

সুশীলার আকস্মিক আবির্ভাবে দাসী ও শ্যামল উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্যামল কি বলিতে যাইতেছিল তাহাকে সে অবকাশ না দিয়াই 'মেল ট্রেণের' মত অবিরামগতিতে সুশীলা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল,—"একি সর্ব্বনেশে লোক রে। বাটীতে ঝি রেখেও শান্তি নেই, রাত দুপুরে তার সঙ্গে হাসি, ঠাট্টা, ইয়ারকি। বাইরে যা কর কর সে তো আমি দেখতে যাই না, ঘরের মধ্যে আমার চোখের উপর এই ব্যাপার ঝি চাকরাণীর সঙ্গে! তোমার গলায় দেবার দড়ি জোটে না?"

শ্যামলের ধৈর্য্যের সীমা অনেকক্ষণই অতিক্রম করিয়াছিল, সে চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া ভবিষ্যতের কথা ভুলিয়া গিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"ও রকম অভদ্রের মত কথা বল না তুমি? জ্বলন্ত অনলে ঘৃত ঢালিয়া দিলেও বুঝি এমন জ্বলিয়া উঠে না। সুশীলা লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, কি কি বল্লে আমি অভদ্র, আমি ছোটলোক, আমি ছোট লোকের মেয়ে। বটে বড্ড গায়ে লেগেছে না? হাতে হাতে ধরে ফেলেছি কি না তাই আমায় এত অপমান? ঝি নিয়ে উনি বাড়ী বসে রঙ্গ করবেন, আর আমি কিছু বলব না, আচ্ছা থাক তুমি দেখি কত বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে তোমার, আমার মুখের উপর কথা বল এত সাহস? আর হাঁরে হতভাগী তুই এখনও আমার বাড়ী দাঁড়িয়ে আছিস কোন ভরসায়? ভেবেছিস বাবু তোকে বাঁচাবে? দেখবি মুড়ো ঝাঁটা বার করব? খাবি দু ঘা। বেরো বেরো এখনি বেরো বলছি?" বলিতে বলিতে অদূরে রক্ষিত একগাছা সম্মার্জনী তুলিয়া লইয়া সুশীলা রণরঙ্গিণীমূর্ত্তিতে দাঁড়াইল।

দাসীটা এতক্ষণ হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, এবার সেও অগ্রসর হইয়া মুখের উপর জবাব করিল "কি ঝাঁটা মারবে? দেখি না কে কাকে ঝাঁটা মারে, আমরা ঝাঁটা ধরতে জানি না? একি তোমার সোয়ামী পেয়েছ যে মুখ বুজে লাথি ঝাঁটা খেয়ে যাবে? মার না এক বার ঝাঁটা তার পর দেখছি তোমায়। বাড়ী থেকে তাড়াবে। এখুনি যাচ্ছি তোমার বাড়ী থেকে, তোমার মত ছোট লোকের বাড়ী মানুষ থাকে? আচ্ছা

লোকের ছেলের কি দুর্দ্দশা তুমি করছ, গালাগালি, বকুনি না খেতে দেওয়া, আমার সঙ্গে মানুষ এমন ব্যাভার করে ?

"তবে রে হতচ্ছাড়ি তোর এত দরদ কেন ?"

"তোমার মত চামার তো নই, মানুষ বলে তাই।"

"কি কি আমি মানুষ নই চামার ? ঐ হতভাগার কাছে আস্কারা পেয়ে তোর এত সাহস বেড়েছে!"

উন্মত্তার মত সুশীলা দাসীর দিকে ছুটিয়া আসিল, সেও কম পাত্রী নহে, ইতস্ততঃ চাহিয়া একটা কাঠের পিঁড়ি তুলিয়া রণোন্মুখ বীরের মত দাঁড়াইল। সংগ্রাম ভীষণ হইয়া উঠিল।"

নিকটস্থ ঘুমন্ত বাড়ীগুলা সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতি গৃহের ছাদ ও বাতায়নে জনতামুহমান শ্যামল কোন দিকে না চাহিয়া টলিতে টলিতে আপন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া গৃহতলেই লুটাইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত অন্তর ব্যাপিয়া একটা কামনা কেবল জাগিতেছিল—'ভগবান্ এই শয়নই যেন আমার শেষশয়নে পরিণত হয়।'

বাহিরের রণক্ষেত্র তখন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। কথা কাটাকাটি খুবই চলিতেছে।

বাহিরে প্রতিবেশীরা যাহার যা খুসী বলিতেছিল। চীৎকার কোলাহলে পল্লী যেন আরও মুখর হইয়া উঠিল। রজনীর শান্ত মাধুর্য্য যে কখন সেখানে অবস্থান করিতেছিল তাহা অনুমান করাই কঠিন।

শ্যামল কান দুইটা হাত দিয়া চাপিয়া রহিল। নিষ্কৃতি নাই। সহসা সুশীলা রণভঙ্গ দিয়া সেই ঘরেই ছুটিয়া আসিল। শ্যামল ভাবিল শতমুখী বুঝি এবার তাহারই পৃষ্ঠদেশে পড়িবে। সভয়ে সে উঠিয়া বসিল।"

তাহার ভাবনা কিন্তু অমূলক হইল; সম্মার্জ্জনী হাতে লইয়াই সুশীলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি চল্লুম যে দিকে দু চোখ চায়, এখানে থাক তুমি তোমার সোহাগী ঝি নিয়ে; তোমার ইঙ্গিত না থাকলে ও আমায় এত অপমান কর্ত্তে পারে; বেশ ঝি নিয়েই থাক তুমি আমি চল্লুম।" পরক্ষণেই যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল তেমনভাবেই সে বাহির হইয়া গেল। শ্যামল খানিকক্ষণ নীরবে একভাবেই পড়িয়া রহিল। ভাবিল, যাক যেখানে খুসী, পরক্ষণে মনে পড়িল সুশীলার অসাধ্য কাজ কিছুই নাই, কোথায় গিয়া কি করিয়া বসিবে যাহার জের মিটাইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহারই প্রাণান্তের উপক্রম ঘটিবে। অনাহার ক্লিষ্ট অবসন্নদেহ উঠিতে চাহিতেছিল না, তথাপি একান্ত চেষ্টায় সে ঘরের বাহির হইয়া আসিল। শ্যামল নিকটস্থ ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর মা কোথায় রে ?"

তিনি তো রাস্তা দিয়ে চলে গেলেন।'

শ্যামল ঝড়ের মত ছুটিয়া পথে বাহির হইল।

সুশীলা খুব বেশী দূর যায় নাই, একটা গ্যাসপোষ্টের নীচে দাঁড়াইয়াছিল। শ্যামল তাহার হাত খানা ধরিতেই এক ঝটকায় সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আবার কি কর্ত্তে মর্ত্তে এসেছ, যাও দূর হও সোহাগী ঝিকে নিয়ে থাকগে, আমি গঙ্গায় ডুবে মরব, যাও তুমি যাও।"

কাঁদ কাঁদ স্বরে শ্যামল বলিল,—"তোমার হাতে ধরি সুশীলা আর পথে দাঁড়িয়ে লোক হাসিও না, ঘরে চল লক্ষ্মীটী!"

লক্ষ্মী কিন্তু কণ্ঠস্বর আর এক পর্দ্দা উচ্চে তুলিয়া বলিল, "আমি লোক হাসাচ্ছি, এখনও এত বড় অপবাদ, এ প্রাণ আমি কিছুতেই রাখব না, আফিন্ খাব আমি"।

"কৌন আফিন্ খায়া রে ?"

দীর্ঘ যষ্টি হস্তে এক পাহারাওয়ালা সম্মুখে আসিয়া পুনরায় গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করিল—

"ক্যা হুয়া, কৌন বিষ খায়া ?"

শ্যামলের মুখে তখন যে ভাব ফুটিয়া উঠিল তাহা দেখিলে দর্শকেরও হয়তো চোখে জল আসিবে। সে অশ্রুজড়িতকণ্ঠেই উত্তর দিল—"কুছ নেহি হুয়া।"

"আলবৎ হুয়া এ আওরৎ ক্যা বোলতী!"

বিপন্নভাবে শ্যামল বলিল,—"কুছ নেহিজী, হাম ঘর যাতা।"

"নেহি বাবু, হাম শুনা এ আওরাৎ আফিন খাতী, চাব থানা মে লে যাগা এ জরুরী কেন হুয়া।" বিশ্বের আলো শ্যামলের চোখে নিষ্প্রভ হইয়া আসিল, সঙ্গে অর্থাদিও নাই যাহাতে পরিত্রাণের উপায় করা যাইতে পারে। পাহারা-ওয়ালা তখন আরও রুক্ষভাবে তাহাদের [illegible]

আদেশ দিতেছিল, সুশীলা সত্যই একটু ভয় পাইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্যামল বহু অনুনয়-বিনয়ে তাহাকে শান্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া গৃহের অভিমুখে চলিল। সুশীলাও ধীরে ধীরে তাহার অনুগমন করিতে লাগিল। পাঁচটি টাকা দণ্ড দিয়া এ-বিভ্রাট মিটাইয়া শ্যামল বাহিরের ঘরেই শুইয়া পড়িল। রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

তিন

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দিন দুই পরে অফিস যাইবার জন্য কাপড়-চোপড় পড়িয়া শ্যামল যখন মুকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুলগুলা সুবিন্যস্ত করিতেছিল, তখন ধীরপদে সুশীলা সে ঘরে প্রবেশ করিল। অফিসের অনাচার-দুষ্ট জামা-কাপড়-স্পর্শের ভয়ে সুশীলা এসময় কোন দিন ঘরে আসিত না; তাহাকে দেখিয়াই শ্যামল প্রমাদ গণিল। সুশীলা একবার স্বামীর আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া সহজকণ্ঠে বলিল,—"ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পায় না, নয় ?"

তাহার এই সহজভাবে কথা বলাটাকেই শ্যামল অত্যন্ত ভয় করিত। বিরাট্ ঝঞ্ঝার পূর্ব্বে প্রকৃতির নীরব নিথর ভাবটা যেমন আসন্ন দুর্য্যোগের আভাস দেয়; সুশীলার শান্ত কণ্ঠস্বরও তেমনই প্রবল ঝটিকার সূচনা করিয়া দেয়। সশঙ্কিতভাবে শ্যামল বলিল,—"হয়েছে কি সেইটে শুনি।"

কণ্ঠধ্বনি ঠিক এক পর্দ্দা উচ্চে উঠাইয়া সুশীলা বলিল, "কি হয়েছে ? কিচ্ছু জান না তুমি ? রোজ জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ও বাড়ীর ঐ ছুড়ী বৌটার সঙ্গে কি হয়!"

শ্যামল প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তাহারপর অতি কষ্টে অসহ্য ক্রোধ দমন করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"তুমি দিন দিন কি হচ্ছ সুশীলা আমায় যা বল তা বল, কিন্তু একজন ভদ্রলোকের মেয়ের নামে কুৎসিত অপবাদ দিতে তোমার বাধলো না।"

উত্তর শুনিয়া সুশীলা গর্জ্জিয়া বলিল,—"ও বড্ড যে গায়ে লাগল ? ঐতেই দেখ আমি সত্যি কি মিথ্যে বলছি ? ভারী আমার ভদর রে। তুমি কি ভাব আমি কিছু খোঁজ রাখি না ? কি জন্যে তুমি সব সময় জানলা দিয়ে ওদিকে চেয়ে থাক ? ঐ বা কেন এসে জানালার সামনে দাঁড়ায় ? কিছু নেই তোমাদের মধ্যে ? আচ্ছা থাক। আজ আমি বলে আসছি ওকে, দেখি ও কেমন মেয়ে। ওর স্বামীকে বলব 'ইস্ত্রীর' গুণের কথা,—সেই বা কেমন লোক, বৌকে শাসনে রাখতে পারে না ?"

শ্যামলের সর্ব্বদেহে বিন্দু বিন্দু স্বেদ ফুটিয়া উঠিল। ভাবিল পল্লীর লোকেরা একেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, ইহার উপর পত্নী যদি তাহাদের বাড়ী বহিয়া অকারণে বিবাদ করিয়া আসে, তাহা হইলে পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করা ভিন্ন উপায় নাই।

স্বামীকে নীরব দেখিয়া সুশীলা বলিল,—"কি, অমন ভিজা বেড়ালের মত হয়ে বসলে যে ?"

"কি, কর্ব্ব বল, তুমি কি সত্যিই পাগল হয়েছ ?"

"তাই তো ? আমি পাগল ? আমি কিছু বুঝি না, নয় ? আমায় পাগল কর্ত্তে পাল্লেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়, যা খুসী কর্ত্তে পার। ওগো সেটা অত সহজ নয় গো, অত সহজ নয়। আমি পাগল হ'বার মেয়ে নই।"

বাস্তবিক কথাটা সত্য হইলে বেচারা একরকম স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িতে পাইত।

সুশীলা বলিতে লাগিল,—"এ স্বভাব তোমার গেল না, ঘরে তো ঝি রাখবার জো নাই, বাইরে কি কর না কর ভগবান্ জানেন, আমায় পেয়েছ নিতান্ত নিরীহ ভাল মানুষ, করে নিচ্ছ যা-খুসী; অন্য কেউ হ'লে অমন সোয়ামীকে সায়েস্তা করত। কর, যা প্রাণ চায় কর।"

ইদানীং শ্যামল এসব অভিযোগের বড় উত্তর দিত না; এই সব কথা লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করিতে তাহার নিজেরই ঘৃণা বোধ হইত। এতক্ষণে সে নীরবই ছিল, এবার শুধু বলিল,—"আমায় তুমি দেখেছ কখনও ওদিকে চাইতে ?"

"বলি হাঁ গো চোখে দেখাটাই কি সব, অনুমানটা কিছু নয় ?"

"ও' অনুমানে নির্ভর করে' তুমি এই কাণ্ড করছ ?"

"বেশ অনুমান কি আমার মিথ্যে ? অত রোজা

আমি নই, বিদ্যে একটু পেটে আছে, শহরে থাকি, ইস্‌কুলে'ও পড়েছি, হতুম পাড়াগাঁর মুখ্‌খু মেয়ে চোখে ধূলা দিয়ে যা খুসী কর্ত্তে পারতে। আমি ছায়া দেখলে কায়া ধরতে পারি। যাক ভাল চাও তো যা বলি শোন, এসব 'প্রিবিত্তি' তুমি ছাড়। নয় তো খুনো-খুনি, রক্ত-গঙ্গা করব আমি বলে দিচ্ছি। মুখ বুজে সব সয়ে যাচ্ছি বলে যে এসব কাণ্ডও সইব তা ভেব না। ঐ মেয়েটাকেও আজ দেখে নেব কেন ও জানালার সাম্‌নে আসে, এই তো আমি আছি, আমি কতবার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকি?"

"এযে অন্যায় তোমার, ওর জানালায় ও যদি দাঁড়ায়—"

"ঐ তো ঐ খানেই তো গণ্ডগোল, অমনি তোমার গায়ে লাগল তো। ভেতরে কিছু না থাক্‌লে কি আর এমন হয়?"

হতাশভাবে শ্যামল বলিল,—"বেশ আমি আর কিছু বলব না।"

"বলবে আর কি? ধরা পড়লে সবাই চুপ করে' থাকে, সাধু হয়, বলবার কি মুখ আছে যে বলবে?"

সুশীলা আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল। বাধা পড়িল, ভৃত্যটা দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে। তাহার দিকে চাহিয়া শ্যামল বলিল,—"কি রে?"

"বাইরে তড়িৎ বাবু এসেছেন।"

"বসতে বল, যাচ্ছি।"

শ্যামল উঠিল। সুশীলা মুখ বাঁকাইয়া আপনমনে বলিতে লাগিল,—"মরণ আর কি, আসবার সময়-অসময় নেই মুখ-পোড়াদের? আপিস যাচ্ছে মানুষ এখন ঘাটের মড়ারা মরতে এল কি কাজে? আর তেমনই হতচ্ছাড়া মনিষ্যি!"

সুশীলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর বাহিরের আগন্তুকের শ্রবণে প্রবেশের যোগ্য উচ্চতা লইয়াই ধ্বনিত হইল। প্রতিবাদে কোন ফল নাই জানিয়াই শুধু করুণনেত্রে একবার চাহিয়া শ্যামল নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

একটু পরে শ্যামল ফিরিয়া আসিয়া পত্নীর কাছে কিছু বলিতে চায়, এমন ভাব দেখাইল; কিন্তু সুশীলা সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

শ্যামল উৎকণ্ঠিতভাবে একবার হস্তস্থিত ঘড়িটার দিকে চাহিল, তাহার পর একরূপ মরিয়া হইয়াই বলিল—"তড়িতের বে আজ, তাই যাবার কথা বলতে এসেছে।" সুশীলা তীব্রদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল, কথাটা সত্য কি মিথ্যা তাহা বুঝিয়া লইবার জন্য, তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিল,—"আচ্ছা তাকে ডেকে আনছি।"

"বেশ আমার সামনে এসে বলে যাক সে।"

"উহু, তুমি গেলে হ'বে না। তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরি করে' আনবে? তারপর বের নাম করে দুই বন্ধু কোথায় যাবে মজা কর্ত্তে, তেমনি বোকা আমায় পেয়েছ কি না? নিধেকে ডাকতে বল।"

"বেশ তাকেই বল। কিন্তু সুশী লক্ষ্মীটী তড়িতের সামনে একটু ভাল ভাবে কথা বল।"

"কেন আমি কি লোকের সঙ্গে মন্দ ভাবে কথা বলি?"

"আমি মন্দ ঐ দুঃখেই তো আমি মরি—আমার সবই তুমি মন্দ দেখ, বল কি আমি কথা বলতে জানি না?"

আর একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখিয়া শ্যামল ত্রস্তে বলিল,—"না না, তা আমি কেন বলব? কৈ ডাকতে পাঠাও তাকে, আমার আপিসের বেলা হচ্ছে।"

শ্যামল মনে মনে ইষ্টনাম জপিতে লাগিল। রণচণ্ডী পত্নীকে ইতিপূর্ব্বে কোন বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে সে বাহির করে নাই। আজ নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই বাল্যসুহৃদকে ইহার সম্মুখে আনিতে হইল। মানে মানে তাহাকে বাড়ীর বাহির করিতে পারিলে সে রক্ষা পায়। বিশ্বাস নাই তো সুশীলাকে। কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে কে জানে? গৃহে প্রবেশ করিয়া তড়িৎ সুশীলাকে নমস্কার করিয়া বলিল,—"ডেকেছেন বৌদি?"

"হাঁ, কি বলতে এসেছেন শুনলুম।"

স্মিতমুখে তড়িৎ বলিল:—"আজ আমার বিয়ে তাই শ্যামলদাকে বলতে এসেছিলুম সন্ধ্যের আগেই যেন আমাদের ওখানে যায়।"

"তারপর।"

বিস্মিতভাবে তড়িৎ প্রশ্ন করিল, "তারপর কি হ'বে?"

"তারপর বাড়ী ফিরবেন কখন ?"

"এখান থেকে বারাকপুর যাব, রাত্রে ফেরা হয় তো সম্ভব হবে না ? শেষ রাত্রে লগ্ন। সকলে সকালে এক সঙ্গে ফিরব।"

"হাঁ, তা বুঝেছি ? তা বারাকপুরে কা'র বাগান-আছে তাই শুনি ? আপনার ?"

তড়িৎ অবাক্ হইয়া খানিকক্ষণ বান্ধবীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাগান-বাড়ী ?"

শ্যামল মনে মনে আপন মরণ-কামনা করিতেছিল, কি বলিবে, কি বলা সঙ্গত এখানে সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। সুশীলা ব্যঙ্গহাস্যে গৃহখানি মুখর করিয়া বলিল,—"হাঁ বাগানবাড়ী ? সেইখানেই তো যাচ্ছেন বিয়ে তো একটা বাজে কথা, নয় তো বরযাত্রী গিয়ে কেউ রাত্তির কাটিয়ে আসে ? এ তো শুনি নি।" মতলব করে' কোথায় গিয়ে সব আড্ডা দেওয়া হবে ?"

তড়িৎ নির্ব্বাক্। সুশীলা হাত-মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল,—"যান যান আর বোকা বুঝতে হ'বে না, যেমন হতভাগা নিজে, তেমনই তার সব বন্ধুরা হয়েছেন ? আপনি আর কি কাজে দাঁড়িয়ে আছেন, যান ওসব চালাকী চলবে না আমার কাছে।" কথাটা বলিয়াই ক্ষিপ্রপদে সুশীলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাহারও মুখে কথা নাই—বিবাহের পূর্ব্বে বন্ধুপত্নীর এরূপ সন্দিগ্ধ ব্যবহার দেখিয়া বিবাহে তাহার বিতৃষ্ণা ধরিয়া গেল। স্বকর্ণে সকল কথা শুনিয়া এতদিন বন্ধু যাহা বলিত তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিল; বন্ধু কি ভাবে যে দিন কাটাইতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল।

একটু পরেই তাহার ভৃত্য দ্বারসম্মুখে আসিয়া বলিল,—"বাবু আপিস যেতে হবে না ? মা বলছেন।"

উভয়ে সচেতন হইয়া উঠিল, সকরুণকণ্ঠে শ্যামল ডাকিল,—"তড়িৎ !"

তড়িৎ কষ্টে ওষ্ঠে হাসি আনিয়া বলিল,—"না শ্যামলদা, আমি কিছু মনে করি নি; তোমার অবস্থা যে কত শোচনীয় তা এক মুহূর্ত্তেই বুঝেছি; চল যাওয়া যাক।"

ক্লান্তদেহে অপরাহ্নে শ্যামল গৃহে ফিরিতেছিল। বাড়ীর কথা মনে হইতেই তাহার সর্ব্বদেহ শিথিল হইয়া আসিতেছিল, কেবলই মনে হইতেছিল এইখানেই যদি এ যাত্রার অবসান হইত। একটা মাল-বোঝাই লরি কিংবা বাস ঘাড়ে আসিয়া এমন দুর্ব্বহ জীবনের শেষ করিয়া দেয় না ? এমন হৃদয়হীনা জায়া কার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, এমন সন্দিগ্ধমনা নীচপ্রকৃতির রমণী তাহার নির্ম্মল চরিত্রে কি দেখিল যাহাতে সে এমন হইল ? বিবাহের পর হইতে সে অকারণে এরূপ ব্যবহার করিতেছে কেন ? প্রাণভরা ভালবাসার বিনিময়ে খাইতে-শুইতে, উঠিতে-বসিতে, পদে পদে সে পাইতেছে কঠিন শাসন। বিবাহিত-জীবনের প্রত্যেক দিনের ঘটনার ভিতর কোন দিনও তো সে অসঙ্গত ব্যবহার করে নাই—চুপ করিয়া থাকিয়া তাহারই কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে—সামনে তো যা ইচ্ছা তাহাই বলে, অন্য লোকের সামনেও নিষ্কৃতি নাই। সকালের ঘটনা মনে পড়িয়া অসহ্য যাতনায় তাহার দেহ-মন যেন অধীর হইয়া উঠিল। ভাবিল কি মনে করিয়া গেল আজ তড়িৎ, বিবাহের পর হইতে বন্ধু-বান্ধবের সংশ্রব ত্যাগ করায় তাহারাও ক্রমে দূরে সরিয়া গিয়াছিল; এক তড়িৎই শুধু পূর্ব্বের মত আসিত ও যাইত। আজ হইতে তাহার সহিত সম্বন্ধও শেষ হইয়া গেল। এখন শুধু সুশীলার শাসনের কঠিন বন্ধনে থাকিতে হইবে। রাগ করিয়া কথা না কহিয়া—অসহযোগ করিয়া আবার অনুনয়-বিনয় করিয়া অনেক রকমেই সে সুশীলার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু সফল হয় নাই।

চার

শ্যামল বাড়ীর নিকটে আসিলে একজন ভদ্রলোক তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"আপনার জন্যই আমি অপেক্ষা কচ্ছি মশায় ?"

লোকটী শ্যামলের সম্মুখের বাটীতেই থাকেন। একটু শঙ্কিতভাবে সে বলিল,—"কেন বলুন তো ?"

শ্যামলের মুখের দিকে চাহিয়া লোকটী বলিল,—

"আপনার স্ত্রী আজ আমার বাড়ী গিয়ে আমার স্ত্রীকে গালিগালাজ দিয়ে এসেছেন, তিনি বলেন আমার স্ত্রী না-কি আপনাকে—কি আর বলব মশায়।"

শ্যামল বজ্রাহতের মত নিস্পন্দদেহে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল সুশীলার অসাধ্য কি কিছু নাই [illegible] বাড়ী বহিয়া ইহাদের সহিত কোন্দল করিয়া [illegible] তাহা শ্যামল বুঝিতে পারে নাই।

লোকসমাজে বাস করাও যে তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। শ্যামলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—

"কি আর বলব মশায়, স্ত্রীলোক কিছু তো বলা যায় না, যে সব কথা বলতে লাগলেন? আবার বল্লেন আমার স্ত্রী যদি আর জানালার সামনে আসেন তা হ'লে না কি কাটারি দিয়ে তার নাক-কাণ কেটে নেবেন? একি মুস্কিল দেখুন দেখি। বাড়ীর জানালায় সে দাঁড়াতে পারবে না?"

শ্যামল একথারও উত্তর দিতে পারিল না—আর বলিবার আছেই বা কি? আকুল অন্তরে সে শুধু প্রার্থনা করিতেছিল, ধরণী তুমি দ্বিধা হও, এ লাঞ্ছিত মুখ তোমার অঙ্কে লুকাইয়া সর্ব্বযাতনা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করি।

শ্যামলের মনোভাব উপলব্ধি করিয়া ভদ্রলোকটী কোমলভাবে বলিলেন, "আপনাকে অবশ্য আমি এজন্য অনুযোগ কচ্ছি না, আপনার কোন দোষ নেই, তাও জানি সামনে থেকে আপনার দুর্দ্দশা সব সময়ে দেখছি, আপনাকে শুধু কথাটা জানিয়ে রাখলুম। আচ্ছা আসুন তবে, বাড়ী ফিরতে দেরী হ'লে আবার—এই সহানুভূতিসূচক কথা শুনিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে শ্যামল বলিল, "আমার অপরাধ নেবেন না দয়া করে'। বড় হতভাগা।"

"না না, আপনার কি দোষ যান বাড়ী যান।" লোকটী প্রস্থান করিলে শ্যামল ঘরে ঢুকিল।

পাঁচ

ইহার কয়েকদিন পরে সকাল-বেলা একখানি পোষ্টকার্ড হাতে লইয়া রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা পত্নীর সম্মুখে আসিয়া শ্যামল বলিল,—"তোমার মার বড় অসুখে, বিজন চিঠি দিয়েছে।" সুশীলা উঠিয়া চিঠিখানা হাতে লইয়া একবার সেটার উপর চোখ বুলাইয়া রাখিয়া দিয়া আবার খুন্তি-কড়ায় মনোনিবেশ করিল। মুখ দেখিয়া মনোভাব কিছু অনুমান করা গেল না।

শ্যামল প্রশ্ন করিল,—"তা হ'লে তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা এখুনিই তো কর্ত্তে হ'বে?"

কয়দিনের জন্য পত্নীর বন্ধনপাশ হইতে মুক্তি পাইবার সম্ভাবনায় তাহার সমস্ত চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সুশীলা তাহার আশা দীপ মুহূর্ত্তেই নিবাইয়া দিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল,—"না, আমি যাব না।"

"মার এত অসুখ, তুমি যাবে না। মা হয় তো মনে করবেন আমিই যেতে দিই নেই—আমার স্বার্থের জন্যে ধরে রেখেছি।"

"কি করে' যাব? তুমি তো আমার সঙ্গে গিয়ে যতদিন থাকব, ততদিন থাকতে পার্ব্বে না?" শ্যামলের গাত্রে কে যেন জলবিছুটী ঘষিয়া দিল, কষ্টে কণ্ঠস্বর সহজ রাখিয়া বলিল,—"চাকরীটা ছাড়তে পারলে গিয়ে থাকা যায়।"

"তবে আর আমি যাই কি করে'?"

"কেন, তোমার যেতে বাধা কি?"

"আমি যাব, তোমায় এখানে দেখবে কে?"

এবার বিরক্তভাবেই শ্যামল বলিল,"আমায় দেখবে কে? তার মানে আমি কি কচি খোকা?"

"খোকা নয় বলেই তো ভাবনা। আমায় সরিয়ে দিয়ে তুমি যা খুসী করে' বেড়াও আর কি? সে হচ্ছে না। যদি আমার সঙ্গে গিয়ে থাক—"

বাধা দিয়া শ্যামল বলিল,—"আমার তো জমিদারী নেই যে চাকরী ছেড়ে গিয়ে তোমার আঁচল ধরে' বসে থাকব।"

"ওগো তা তো জানিই, আমার আঁচল ধরে থাকতে কি আর ভাল লাগে, তা লাগে না; তবু কাল-কুৎসিৎ, কি বোকা মুখখু নই।"

আশাভঙ্গে শ্যামল সেদিন অত্যন্ত রাগিয়াছিল আপনাকে সংবরণ করিতে না পারিয়াই বলিয়া উঠিল,—"তুমি যে, কত ভাল মানুষ সে আমিই জানি।"

"আজিকার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়াছি বলিয়া—"

এইটুকুমাত্র তাহার ওষ্ঠের অগ্রে বাহিরে আসিয়াছিল। পরক্ষণেই সুশীলার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টির দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল। কড়াখানা এক পদাঘাতে উনানের উপর উলটাইয়া দিয়া দৃপ্তা সিংহিনীর মত দাঁড়াইয়া উঠিল, তাহার পর একখানা বড় গোছের হাতা বেশ বাগাইয়া ধরিয়া রোষদৃষ্টিতে চাহিয়া গর্জ্জিয়া বলিল,—"কি কি বল্লে আমি ভাল মানুষ নই। এতদিন এক সঙ্গে থেকে এই তোমার আমার উপর ধারণা—ওরে মিথ্যেবাদী, ওরে অধম্মে, ওরে শয়তান—"

রাগে তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। সহসা আর একটা সুবুদ্ধি তাহার মাথায় আসিতেই সে লাফাইয়া উঠিয়া তারস্বরে বলিল,—"আমি মরব—মরব; এ প্রাণ আর রাখব না, ছাদ থেকে পড়ে মর্ব্ব আর লোককে বলে যাব ঐ স্বামীর জন্য জীবন দিলুম।" পরে এক ধাক্কায় শ্যামলকে সরাইয়া দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। শ্যামলও সঙ্গে সঙ্গে চলিল সুশীলাকে বাহিরে দেখা গেল না। ছাদের কথাটা মনে করিয়া শ্যামল রুদ্ধশ্বাসে ছাদেই আসিল। সেখানে জন-প্রাণী নাই। ভাবিল—গেল কোথায়? লাফাইয়া পড়ে নাই তো? কিন্তু তা হ'লে তো একটা প্রচণ্ড শব্দ হ'ত। প্রাচীরের উপরটা শ্যামল চাহিয়া দেখিল। কোথাও তো নাই। ত্রস্তপদে আবার সে নীচে আসিল। পত্নীর নাম ধরিয়া কয়বার ডাকিল; সাড়া মিলিল না। ভাবিল, বাড়ীর বাহির হইয়া গেল না তো? অফিসের বেলা হইয়া যাইতেছে এখনও স্নান হয় নাই, আহার ভাগ্যে আজ তো জুটিবেই না, অথচ সুশীলাকে শান্ত না করিয়াও তো কোন কাজ করা চলে না? শ্যামল কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল বাহিরের দিকে। সম্মুখ ও পার্শ্বের বাড়ীগুলার বারান্দা ও বাতায়নে অসম্ভব জনতা। পার্শ্বের বাড়ীর লোকেরা সকলেই সেখানে সমবেত হইয়াছে। সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি শ্যামলেরই বারান্দার উপর, সুশীলা যে ঐখানেই অবস্থিত তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব ঘটিল না। শ্যামল ক্রতগতি বারান্দায় আসিল। মুক্তকেশী শ্লথিত-বসনা সুশীলা বারান্দার কার্ণিশের উপর দাঁড়াইয়া বোধ হয় তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। শ্যামলকে দেখিয়াই চেঁচাইয়া বলিল,—"পড়লুম—পড়লুম।"

স্তম্ভিত শ্যামলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সুশীলা পুনরায় [illegible] করিয়া বলিতে লাগিল:—"এখনি পড়্‌লুম [illegible]ত্যাচার আমার অসহ্য হয়েছে; এমনি করে [illegible] তোমার হাত এড়াব, আমায় যেমন জ্বালালে ভগবান এর বিচার কর্ব্বেন।"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় শ্যামল চোখ-কাণ বুজিয়া কোনমতে রেলিংএর সম্মুখে আসিয়া দুইহাতে জোর করিয়া ধরিয়া তাহাকে নামাইল। ছাড়িবামাত্রই সুশীলা স্বামীকে ধাক্কা দিয়া নীচে নামিয়া একখানা বঁটি লইয়া আপনার শয়নকক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। শ্যামল কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সজোরে দ্বারে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করিল। ভৃত্যটাও চীৎকার করিতেছিল, দ্বারে আঘাতের শব্দ, তাহার উপর সুশীলা ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "এখনি মর্ব্ব এই বঁটী গলায় দিয়ে দেখি আমায় কে বাঁচায়।"

অনেক সাধ্য-সাধনায় সেদিনের দাম্পত্যকলহ মিটিয়া গেল, কিন্তু বেচারা শ্যামলের ভাগ্যে সে-বেলা আর আহার জুটিল না।

ছয়

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়দিন পরে সুশীলার ভ্রাতা বিজন আসিল মাতার মৃত্যু সংবাদ বহন করিয়া এবং শ্রাদ্ধ-উপলক্ষ্যে ভগিনীকে লইয়া যাইবার জন্য। পল্লী মুখর করিয়া সুশীলা মার জন্য কাঁদিল—হতভাগা স্বামীর জন্য মাকে শেষ সময় একবার দেখিতে পাইল না, বলিয়া অনুযোগ করিল! মাতার শ্রাদ্ধ—সমারোহ-ব্যাপার, না যাইলে নয়। কাজেই সুশীলাকে যাত্রার আয়োজন করিতে হইল। অন্ততঃ কয়দিনের জন্য সে একটু স্বাধীনতা পাইবে ভাবিয়া শ্যামল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। আয়োজন শেষ হইলে স্বামীর সম্মুখে আসিয়া সুশীলা বলিল, "দেখ আমি যে ক'দিন না ফিরি সে ক'দিন বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না, সকালে আফিসে যাবে. এসে বাড়িতে থাকবে।"

কষ্টে হাসিয়া শ্যামল বলিল,—"ভয় নেই সুশী তুমি

সামনে থাক আর না থাক তোমার আদেশ লঙ্ঘন কর্ব্ব এত বড় সাহস কি আমার হ'বে ?" সুশীলা ভ্রাতার সহিত পিত্রালয় চলিয়া গেল। দিন তিনেক পর বিকাল-বেলা শ্যামল বাহিরের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথের দিকে চাহিয়া ছিল, পথচারী লোকগুলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার পথে বাহির হইয়া পড়িবার একটা অদম্য আগ্রহ আসিতে-ছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এমন সময় রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কে ডাকিল, "বাবু।" বিস্মিতভাবে দ্বার খুলিয়া শ্যামল দেখিল অল্প বয়সী একটী মেয়ে ছোট একটী ছেলেকে কোলে করিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাহাকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া বলিল,—"আমি এই সামনের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করি; আমার ছেলের বসন্ত হয়েছে বলে তাঁরা বাড়ী থেকে বার করে' দিয়েছেন; আমি সবে দেশ থেকে এসেছি এখানে কা'কেও চিনি না, রোগা ছেলে নিয়ে এখন কোথায় যাই বাবু, আপনি যদি একটু আশ্রয় দেন ?"

শ্যামল কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। রুগ্ন শিশুটীকে লইয়া রমণী দ্বার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। একজন দুই জন করিয়া পল্লীস্থ কয়েকজন লোক সেখানে দেখা দিলেন। তাঁহাদের দিকে চাহিয়া সে বলিল,—"আমার অবস্থা তো আপনারা সবাই জানেন বাড়িতে ওকে রাখবার সাহস আমার নেই ? আপনারা যদি কেউ একটু স্থান দেন আমি তা' হ'লে সব খরচ দিতে রাজি আছি।"

উপস্থিত লোকেরা কেহই কথাটা কাণে তুলিলেন না দেখিয়া শ্যামল তাঁহাদের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথাই আবার বলিল, এবার তিনি স্পষ্টই উত্তর দিলেন,—"না শ্যামলবাবু, বসন্তরোগী ওর সংস্পর্শে যেতে নেই, ওকে সখ করে কে ঘরে নিয়ে যাবে ? তার চেয়ে হাঁসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।"

হাঁসপাতালের নাম শুনিয়াই মেয়েটা আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমাদের পায় পড়ি বাবুরা আমার ছেলেকে হাঁসপাতালে দিও না, সেখানে গেলে মানুষ আর বাঁচে না। তোমাদের ঘরের এক পাশে আমার একটু ঠাঁই দাও। ভগবান্ ভাল কর্ব্বেন।"

উত্তরে সেই ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"ঘরের পাশে ঠাঁই দাও, আবদার! হাঁসপাতালে না যাস্ পথে গিয়ে মরগে যা ? ঘরে তোকে কে জায়গা দিয়ে মরতে যাবে ? দাও হে শ্যামলবাবু ওটাকে তাড়িয়ে দাও, সাংঘাতিক রোগ, ওর কাছে থাকাও ঠিক নয় যা যা এখানে থেকে যা।"

সকলেই নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলে শ্যামল একাকীই এই মুহ্যমান নারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটী আকুল হইয়া কাঁদিতে ছিল। ছেলেটীর অবস্থাও শোচনীয়। ক্ষণেকের জন্য শ্যামল সুশীলার ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ও ভবিষ্যতের লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গেল। এই ব্যথাতুর মাতৃহৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ যাতনা তাহার চিত্তে একটা বিপুল করুণা ও প্রাণগলা সহানুভূতির উদ্রেক করিয়া দিল। মেয়েটীর দিকে চাহিয়া সে বলিল,—"ছেলেকে নিয়ে তুমি ভিতরে এস। যতদিন না তোমার ছেলে ভাল হয় তুমি এখানেই থাক।"

সজলনয়নে কৃতজ্ঞদৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া মেয়েটী বলিল,—"ভগবান আপনার ভাল কর্ব্বেন।" বাহিরের ঘরে শয্যা আনিয়া শ্যামল ছেলেটাকে শোয়াইয়া দিল; ব্রণ-কণ্টকিত দেহে তাহার তিল রাখিবার স্থান নাই। জীবনের অস্তিত্ব প্রায় অনুভবই করা যায় না। মেয়েটী সাগ্রহে প্রশ্ন করিল,—"ছেলে আমার বাঁচবে তো বাবু ?"

"ভগবানকে ডাক, তিনিই ভাল করে' দেবেন।" শ্যামল শীতলা মাতার পূজারী ও ডাক্তার আনিতে গেল। দুইদিন পরে ছেলেটীর অবস্থা আরও শোচনীয় হইল। তাহার মাতাও বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছে। শ্যামল প্রাণপণে দুইজনের পরিচর্য্যা করিতেছিল। বাঁচিবার আশা কাহারই ছিল না—শ্যামল ভাবিতে ছিল মৃত্যুটা ইহাদের যখন অনিবার্য্য তখন একটু শীঘ্র ঘটিলেই ভাল হয় তাহা হইলে তাহার অদৃষ্টে আর লাঞ্ছনা ভোগ ঘটিবে না। আর যদি এই ত্রীরোগ(?) ব্যাধিতে সে আক্রান্ত হইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করে তাহা হইলে পত্নীর শাসনের হাত হইতে একেবারে রক্ষা পায়। গতরাত্রে বিজয় আসিয়া ইহাদের দেখিয়া

গিয়াছে। সে ভগিনীরই উপযুক্ত ভ্রাতা। প্রকৃত ঘটনা সে বিশ্বাস করে নাই, অজানা অপরিচিত একটা লোককে এত বড় রোগ সত্ত্বেও কেহ যে নিছক করুণাবশে ঘরে স্থান দিতে পারে ইহা সে অসম্ভব বলিয়া দুই-চারিটী কড়া কথাও শ্যামলকে শুনাইয়া দিতে ত্রুটী করে নাই। শ্যামল ভাবিল, বিজন বেশ রং চড়াইয়াই সুশীলাকে সকল কথা বলিবে, ফলে আত্মীয়বান্ধবপূর্ণ কাজের বাড়ীতে তাহার চরিত্রের যেরূপ সমালোচনা চলিবে তাহাও সে অনুমান করিয়া লইল। তাহাই নয়, সে ভাবিল, সুশীলা তো সেখানে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া গৃহাগত আপদদ্বয়কে সম্মার্জ্জনীআঘাতে বিদায় করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। চন্দননগর হইতে কলিকাতা কয়টা ষ্টেশন মাত্র। তারপর? শ্যামলের বুকের রক্ত জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল। ঐ মুমূর্ষু রোগীরা কিন্তু কিছুই বুঝিল না। পথে গাড়ির শব্দ শুনিলেই তাহার সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিতেছিল; ভাবিতেছিল ঐ বুঝি সুশীলা আসিল। সন্দেহ সত্যে পরিণত করিয়া দ্বারে একটা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল, শ্যামলের দেহের শোণিত-চলাচল যেন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। মৃত্যু নিশ্চিত জানিলে মানুষের মনে যেরূপ একটা বিরাট, উদাসীন-ভাব জাগিয়া উঠে, তেমনিই নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকারভাবে শ্যামল আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া একটা প্রবলতর কিছুর জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। একান্তভাবেই সে অদৃষ্টের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিল। রোগী দুইটার জন্যও তাহার মনে চিন্তা রহিল না। দ্বার খুলিয়া গম্ভীরমূর্ত্তি বিচারকের মত সুশীলা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার অনলকণাবর্ষী নেত্রের দিকে চাহিয়া শ্যামল দৃষ্টি নামাইল। মৃত্যুপথযাত্রী রোগী দুইজনার দিকে চাহিয়া সুশীলা সহসা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল—মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইল না। পরের সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করা বা কথা বলা তাহার ধাতে সহিত না।

উদ্যত অশনি নিক্ষিপ্ত হইতে না দেখিয়া বিস্মিত-ভাবে শ্যামল চাহিল। দৃষ্টি সেও নামাইতে পারিল না। সুশীলার মুখে আজ যে ভাব সে লক্ষ্য করিল, তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব। বিজন সুশীলার নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, ভগিনীকে নীরব শান্ত দেখিয়া সে বলিল,—"দাঁড়িয়ে দেখছ কি দিদি ঘাড় ধরে বার করে' দাও।"

এই প্রশ্নে সুশীলা যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল; তারপর আর একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিল,—"বলিস কিরে ওরা যে মরতে বসেছে?"

"কিন্তু—"

"না, না আহা এসময় কি ওদের কিছু বলা চলে?"

শ্যামল আপন শ্রবণকেই বিশ্বাস করিতে পারিতে-ছিল না। তাহার দিকে চাহিয়া সুশীলা বলিল,—"ওদের ভাল করে' চিকিৎসা করিয়েছিলে তো? আচ্ছা চেষ্টা কল্লে এখনও কি বাঁচান যায় না?" তারপর ভাইএর দিকে চাহিয়া বলিল,—"বিজন তুই একজন ভাল ডাক্তার ডেকে আন? যা ভাই আর দেরী করিস নে?"

বিজন কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া সুশীলা বলিল;—"কথা পরে হ'বে তুই যা আগে।"

বিজন চলিয়া গেলে ছেলেটীকে শয্যা হইতে সুশীলা আপন কোলের উপর তুলিয়া লইল। তাহার পর নিকটস্থ পাত্রস্থিত বেদানার রস লইয়া ধীরে ধীরে মতা ও পুত্রের শুষ্ককণ্ঠে ঢালিয়া দিতে লাগিল।

শ্যামল অবাক্ হইয়া তাহার মাতৃমূর্ত্তি ও তাহার কার্য্য-কলাপ দেখিতেছিল; সে দেখিতেছিল তাহার বুভুক্ষিত হৃদয়ের উৎস যেন আজ পরের ছেলেকে কোলে পাইয়া অভিমুখে ছুটিয়াছে। কিছু বলিবার শক্তিও তাহার ছিল না। স্বামীর দিকে চাহিয়া কোমলকণ্ঠে সুশীলা বলিল,—তোমার চেহারা বড় খারাপ দেখাচ্ছে। সকাল হ'তে কিছু খাও নি বুঝি? যাও উঠে মুখ-হাত ধোওগে, এদের কাছে আমি আছি, কোন ভয় নেই।" একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া সে আবার বলিল,—"ঘরে তো বেশী টাকা রেখে যাই নি, এদের চিকিৎসা বোধ হয় ভাল হয় নি? আমার মনে হচ্ছে ভাল করে' চিকিৎসা ও পরিচর্য্যা হ'লে এরা বাঁচতে পারে দেখি ভগবান্ কি করেন।"

শ্যামল তেমনই নির্ব্বাক রহিল। যে যাদুকরী অঘটন ঘটন-পটীয়সী মায়াস্পর্শে শাহারায় ফুল ফুটিয়া উঠে তাহারই উদ্দেশে তার সমস্ত অন্তর গভীর ভক্তিভরে বার বার প্রণত হইতেছিল।
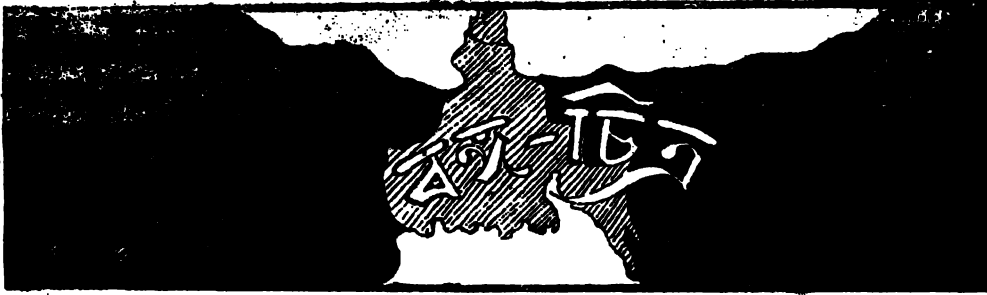
কলিকাতার খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহ

কলিকাতার অধিবাসীরা দৈনিক প্রায় ৩০০০ মণ দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। প্রতিদিন শিয়ালদহ ষ্টেশন দিয়া ৮০০ মণ দুগ্ধ কলিকাতায় আসে। সহরে যে সমস্ত গরু আছে, তাহাদের নিকট হইতে দৈনিক ১০০০ মণ দুধ পাওয়া যায়। সহরতলী হইতে দৈনিক ১০০০ মণ দুধ সরবরাহ হয়। ২০০ মণ দুধ হাওড়া ষ্টেশন দিয়া আসে। গবর্ণমেন্টের সমবায় বিভাগ, বিগত ১২ বৎসর ধরিয়া সহরে খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহের বিষয় বিবেচনা করিতেছিলেন। ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারেল এসোসিয়েসনের সভায়ও এই বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে, হুগলী জেলার খামারগাছি গ্রামে একটি গোশালা নির্ম্মাণ করা হইবে এবং তথায় বর্ত্তমান যুগের উপযোগী যন্ত্রপাতি বসান হইবে। ইহার ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারেল এসোসিয়েসন দিবেন এবং বাকী অর্দ্ধেক মিল্ক ইউনিয়ন বহন করিবেন। এই গোশালা ও কলকারখানা চালাইতে যে সাময়িক ব্যয় লাগিবে, তাহা ভারত গবর্ণমেন্ট দিবেন।

কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। ১২ লক্ষ লোক যে সহরে বাস করে, সেই সহরে প্রতিদিন ৩০০০ মণ দুধ বিক্রয় হয়। ইহাতে জন প্রতি দেড় ছটাক দুধ পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ লোকই দুধ খায় না। অধিকাংশ শিশুই যে দুধ খায় না, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার। এইরূপ অবস্থায় শিশুমৃত্যু যে বেশী হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। যে শিশুরা বাঁচে তাহারাও দুর্ব্বল হয়। কলিকাতায় প্রচুর দুধ সরবরাহের বিরাট আয়োজন করা কর্ত্তব্য।

—সঞ্জীবনী

পাটের বিভ্রাট

বাঙ্গালায় পাটের চাষ বৃদ্ধির ফলে পাটচাষীদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইহার ফলে যে কেবল কৃষকরাই বিপন্ন হইয়াছে, তাহা নহে; বাঙ্গালার প্রজা, জমিদার ও সাধারণ গৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলেই আঘাত পাইয়াছে। পাটের কলের মালিকেরা এবং মজুরেরাও যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি! পাটকলের কর্ত্তৃপক্ষ কলের কাজ অনেক কমাইয়া দিয়াছেন; ফলে বাঙ্গালার বহু পাটকলের মজুর এখন বে-কার। তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, সপ্তাহে মাত্র ৪০ ঘণ্টা কাজ হইবে। ফলে, গত মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি প্রায় ৩০ হাজার লোকের কাজ গিয়াছে। আমাদের মনে হয়, পাটকলের মালিকেরা আর কিছুদিন এই নিয়ম বাহাল রাখিলে শীঘ্রই আরও কয়েক হাজার শ্রমিকের কাজ যাইবে। পাটকলে অনুমান তিন লক্ষেরও অধিক শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে; কলের মালিকদের এই নিয়ম চলিতে থাকিলে তাহার মধ্যে বোধ হয় এক লক্ষ শ্রমিকের কাজ থাকিবে না। এই দুর্দ্দিনে আরও এক লক্ষ লোক উপার্জ্জনহীন হইলে, দেশের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। এত লোক বেকার হইলে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গের আশঙ্কা আছে। শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গবরমেণ্টের তূণে অস্ত্রের অভাব নাই। অশান্তি দমনের জন্য গবরমেণ্ট অস্ত্র প্রয়োগে যে পশ্চাৎপদ হইবেন না, তাহাও বলা বাহুল্য। প্রকাশ, এখন হইতেই তাঁহারা এ বিষয়ে উদ্যম দেখাইয়াছেন। শ্রমিক নেতাদের উপর ইতিমধ্যেই ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৪৪ ধারা জারি হইয়া গিয়াছে। গবরমেণ্টের এই নীতির আমরা প্রতিবাদ করিতেছি। কারণ, ইহাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না, বরং আরও অশান্তির সৃষ্টি হইবে। এদেশের দুর্ভাগ্য, জনসাধারণ কি কখনও শান্তির মুখ দেখিতে পাইবে?

—বঙ্গবাসী

Printed by Saurindra Kumar Ghosh at the Biswabhandar Press, 216, Cornwallis Street, Calcutta and Published by the same from the Panchapushpa Office, 31 Telipara Lane, Calcutta.

৪র্থ বর্ষ প্রথমার্দ্ধ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ { দ্বিতীয় সংখ্যা

পল্লীগীতি, বৈষ্ণবগাথা ও চৈতন্যদেব

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

(১) পল্লীগীতির নায়িকাগণ

এই বাঙ্গলাদেশে যে গীতি-কথা ও পালা-গান পাওয়া যাইতেছে,—তাহা অজস্র,—হেমন্তে শিউলী ফুলের ন্যায় অজস্র। বোধ হয় এত রূপ-কথা, গীতি-কথা ও পালা-গান জগতের কোথাও নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক—এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর রচিত। নবম-দশম শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বনফুলের ন্যায় যেখানে-সেখানে সেগুলি পাওয়া যায়। যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহাদের মধ্যেও প্রাচীন ধারাটী আছে। দশম শতাব্দীর একটী গীতি-কথায় যে কবিত্বের মাল-মসলা আছে, ষোড়শ শতাব্দীর পালা-গানে তাহার জের চলিতেছে। "সুন্দরী জলে স্নান করিতেছেন,—হাঁটু পর্য্যন্ত নামিয়া তিনি অঙ্গ-মার্জ্জনা করিলেন, তারপর কোমরজলে নামিয়া তিনি অঙ্গমার্জ্জনা করিলেন, তারপর বক পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত হইয়াছে, তিনি বাহুমূল ও কণ্ঠদেশ মার্জ্জনা করিতেছেন, সর্ব্বশেষে ভ্রমরকৃষ্ণ বক্রান্ত কেশজালে বেষ্টিত কেবল পদ্ম-মুখখানি জাগিয়া রহিল এবং কোমল হস্তে সেই পদ্ম-মুখখানি মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন"—এই ভাবের চিত্র দশম শতাব্দীর মহীপালের গানে পাই, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মহীষাল বন্ধুর গানে পাই এবং ষোড়শ শতাব্দীর জেলুয়া-সুন্দরীর পালায়ও পাইতেছি। বাঁশীর সুরে মন কাড়িয়া লওয়ার কথা,—নদীর জল উজান বহা, গৃহবাসিনী বিরহিণীর প্রাণ-যমুনার উজান গতি—এই কথা পালা-গানের আদিযুগ হইতে কতবার কতভাবে শুনিয়া আসিতেছি; সুতরাং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পালা-গানের ছাঁচটাও সেই এক। ঐ ছাঁচ খৃষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীর সেই ছাঁচটাতেও অষ্টাদশ শতাব্দীর পালা-গানগুলি ঢালা হইয়াছে।

এই পালা-গান রূপ-কথা ও গীতি-কথায় আমরা সাধারণতঃ বঙ্গের মহীয়সী মহিলাদের প্রেমের জন্য অপরূপ আত্মত্যাগের কথা পাইয়াছি। সামাজিক শাসন-সম[illegible]

ঊর্দ্ধে এই মহিলারা ইঁহাদের প্রেমের বেদীতে যাবতীয় সংস্কার বলি দিয়াছেন। ইঁহারা এত বড় যে ব্রাহ্মণের শাস্ত্র—মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতির ধার ধারিতেন না। মাতা-পিতার আশ্রয় হইতে রাজকন্যা তাঁহার প্রেমাস্পদের কাছে ছুটিয়া যাইতেছেন। হরিদ্বার হইতে গঙ্গা শুনিলেন সাগরের আহ্বান, আর কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন—শত শত শৈলসম বাধা অতিক্রম করিয়া ছুটিলেন, তাঁহাকে রুধিবে কে? ভেলুয়া এক বিপদ হইতে অন্য বিপদে পড়িতেছেন—মাথার উপরে পিতৃকুল ও তাঁহার স্বীয় মনোনয়নের স্বামিকুলের বজ্র—কিন্তু স্ত্রীলোক মূর্ত্ত শক্তি; সেই শক্তি কত বড় এবং প্রেমের ক্ষেত্রে কতটা দুর্জ্জয় সাহস ও তেজ দেখাইতে পারে—বারংবার তাহার উদাহরণ আমরা এই পল্লীগাথায় পাইতেছি। 'আঁধাবঁধু' পালার নায়িকা তাঁহার স্বামীর আদেশ গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রেমিকের সঙ্গে চলিয়া গেলেন—কি দুর্নিবার তাঁহার প্রেম! সামাজিকগণ এতটা সাহস কল্পনাও করিতে পারিবেন না। সমস্ত সামাজিক আদর্শ এখানে পালা-গায়ক ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। পালা-রচক দেখাইলেন স্বামীর হৃদয় কত বড়,—স্বামি-ত্যাগিনীর মতন কত কলুষহীন, নিষ্পাপ ও তাঁহার আঁধাবঁধু কিরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণপ্রতিম একটা খাঁটি চরিত্র! মহুয়া বাপের মনোনয়ন অগ্রাহ্য করিয়া হৃদয়ের যে বল দেখাইয়াছে তাহাতে সতীকুলশিরোমণিদের শীর্ষস্থানে কবি তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কাঞ্চনমালাকে তাঁহার গুরু বলিলেন, "তোমার স্বামীর নষ্টচক্ষু উদ্ধার হইতে পারে, যদি তুমি কোন মহান্ আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পার।" কাঞ্চনমালা নিজের চক্ষুতে হাত দিয়া বলিলেন, "এই দুইটী চক্ষুর দৃষ্টি গ্রহণ করুন, আমার স্বামীর চক্ষু ভাল করিয়া দিন" সাধু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "এ ত্যাগ বড় ত্যাগ নহে।" "তবে আমার এই রাজধানী—এই কুবেরের ঐশ্বর্য্য—এ সমস্ত গ্রহণ করিয়া আমাকে নিঃস্ব ভিখারী করিয়া রাস্তায় দাঁড় করাইয়া, আমার স্বামীর চক্ষু দান করুন।" সাধু এবারও ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "এ ত্যাগ খুব বড় ত্যাগ নহে।" "তবে বড় ত্যাগ কি? আপনি যে ত্যাগ বলিবেন সেই ত্যাগ আমি করিব, আমার স্বামীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসুক।"

স্ত্রীলোকের হৃদয় কি উপাদানে গড়া সাধু তাহা ভালই জানিতেন। এই মূর্ত্তিমতী শক্তিদের দুর্ব্বলতা কোথায়—সাধু তাহার পরিচয় বিলক্ষণ জানিতেন। কাঞ্চনমালার সপত্নী মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কাঞ্চনমালার জীবনটী এই সপত্নীর বড়যন্ত্রে অভিশাপের মত হইয়া গিয়াছিল, তিনি সেই পত্নীর নাম কাণে শুনিতে পারিতেন না।

সাধু একটী ফল কাঞ্চনমালার হাতে দিয়া বলিলেন, "চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সাক্ষী হও, কাঞ্চনমালা সর্ব্বত্যাগের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে।" কাঞ্চন, এই ফলটী তুমি আমার হাতে দাও এবং প্রতিজ্ঞা কর এই ফলের সঙ্গে তোমার স্বামীর উপর তোমার সমস্ত অধিকার চলিয়া যাইবে, আজ হইতে তোমার স্বামী তোমার সপত্নীর হইবেন, তুমি আর তাঁহার মুখদর্শন করিতে পারিবে না। এই দানের সময় তোমার চক্ষুর কোণায় একবিন্দু অশ্রু পড়িতে পারিবে না, একটী মাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িলে—এই ত্যাগ তোমার বৃথা হইবে, তোমার স্বামী তাঁহার চক্ষু ফিরিয়া পাইবেন না।"

রাম বনগমনের সময় যে সমস্যায় পড়িয়াছিলেন,—এ সমস্যা অবলা নারীর পক্ষে তদপেক্ষা বড় সমস্যা, এ পরীক্ষা সীতার অগ্নি-পরীক্ষা হইতে বড় পরীক্ষা। আশ্চর্য্য কথা এই যে বাঙ্গলার নিরক্ষর পল্লীর কৃষক এতবড় মনস্তত্ত্বের বিষয় অবগত ছিলেন; তিনি কোন আড়ম্বর না করিয়া দৃশ্যের পর দৃশ্যের অবতারণা করিয়া কবিত্বের শিখরদেশ হইতে এই বিয়োগান্ত চিত্র দেখাইলেন। ঐ দেখুন কাঞ্চনমালা স্বামীর দিক্ হইতে মুখ ফিরিয়া ধীরপদে চলিয়া যাইতেছেন,—পাছে হৃৎপিণ্ডের কোন গুরু ধ্বনি শোনা যায়, চোখের জল পড়িতে পড়িতে পাছে পড়িয়া যায় এ আশঙ্কায় সতর্কভাবে তাহার চিরশত্রুর হস্তে প্রাণাধিক স্বামীকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিতেছেন।

তিনি কেবল বলিতেছেন,—"আমার স্বামী দৃষ্টি ফিরিয়া পাউন।" এইখানে কবি যবনিকাপাত করিলেন। শেষে মাত্র এই দুইটা ছত্র লিখিলেন—"কাঞ্চনমালা স্ত্রীলোক বলিয়াই বোধ হয় এত বড় শক্তি দেখাইতে পারিয়াছিল। পুরুষ হইলে পারিত না।"

গীতি-কথায় এক বণিক্‌-সীমন্তিনী স্বামীর গৃহে বসিয়া তাঁহার প্রণয়ীর সঙ্গে পত্রব্যবহার চালাইতেছে; রাজপুত্র লিখিতেছেন, "তোমার স্বামী তাঁহার বাণিজ্যের জাহাজ লইয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া কি লাভ?" উত্তরে রমণী লিখিতেছেন, "আমার স্বামীর মৃত্যুতে আমি একটুও দুঃখিত নহি, তোমার মত এমন রাজ-স্বামী পাইব, ইহা হইতে আমার আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে?" তাঁহাদের পত্রবাহিকার প্রতি শাশুড়ী-ননদী সন্দিগ্ধা হইলেন, সংবাদবাহিকার আসা-যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। তখন কপোতের মুখে চিঠিপত্র প্রেরিত হইতে লাগিল এবং উত্তর আসিতে লাগিল।

এই সমস্ত বিষয় হিন্দুর ঘরে অতীব নিন্দার বিষয়, কিন্তু এই রমণী একবারে তুষারধবল নিষ্কলঙ্কচরিত্র ছিলেন, পালাগায়কেরা ঠিক অন্তর্য্যামীর মত হৃদয়ের বিশুদ্ধতার উপর দৃষ্টি রাখিতেন। সাধ্বী স্ত্রী এইসকল কৌশল অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিপদ্‌গ্রস্ত স্বামীর জীবনরক্ষার উপায় করিয়াছিলেন। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল, মহিষাল বন্ধুর অটুট ধৈর্য্য ও প্রেমসঙ্কল্প, কাজলরেখা ধোপার পাঠ প্রভৃতি গীতি-কথায় নায়িকার বিচিত্র প্রেমলীলার মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য সংযম ও মৌনভাব,—এসমস্ত প্রাচীন কাহিনী যে বঙ্গদেশে মহিলাদের মহিমান্বিত অতুলছবি ঘরে ঘরে অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ষোড়শ শতাব্দীর বহু পালা-গান, যথা মলুয়া, চন্দ্রাবতী, রাণী কমলা ও বণিক্‌কুমারী কমলা প্রভৃতি আমরা পাইয়াছি, তাহাদের ছাঁচ একই। সেই প্রাচীন রীতির ইঁহারা নূতন দৃষ্টান্ত। ইঁহাদের প্রত্যেক চিত্রটী এরূপ মনোজ্ঞ ও অধ্যাত্মনীতির এরূপ উচ্চ আদর্শ যে বঙ্গীয় মহিলাদের মধ্যে ইঁহারা এক-একটী দেবীস্থানীয়। যদিও এই সমস্ত পল্লী-সাহিত্যে ধর্ম্মের প্রসঙ্গ একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—ইঁহারা যে স্বর্গের সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বৈষ্ণবদিগের স্বর্গদ্বার দূরবর্ত্তী ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর ও চিত্র-সমালোচক রদনষ্টাইন বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা পল্লীর এই মহিলাচিত্রগুলি লক্ষ্য করিয়া আমার মনে হইল, অজন্তা ও হস্তীগুম্ফার নারীমূর্ত্তিগুলি আমি জীবন্তভাবে ফিরিয়া পাইলাম।" সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ সিল্‌ভেঁ লেভি লিখিয়াছেন, "আমাদের হিমশীতল বরফাচ্ছন্ন প্রদেশে বসিয়া এই সকল নর-নারীর চিত্র আমাকে যেন ভারতবর্ষের চিরবসন্তময় রমণীয় উদ্যানে লইয়া গিয়া প্রণয়ী ও প্রণয়িণীর স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাইয়া আনিল।" সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখিকা ও চিত্রকর এ্যাণ্ড্রু হগমান বঙ্গপল্লীর এই নায়িকাগুলিকে সেক্সপীয়র ও রেসীনের নায়িকাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য মনে করিয়াছেন। লর্ড রোনাল্ডসে (মারকুইস অব জেটল্যাণ্ড) হইতে আরম্ভ করিয়া—স্যর জর্জ্জ গ্রীয়ারসন পর্য্যন্ত য়ুরোপের বিখ্যাত লেখক ও সমালোচকবর্গ এই পল্লী-গীতিকাগুলির প্রশংসা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গের পল্লী-গীতিকাগুলির শীঘ্রই ফরাসী ভাষায় অনুবাদ হইবে। রোমেঁ রোলাঁর ভগিনী শ্রীমতী ম্যাডিলাইন রোলাঁর সহযোগে মিসেস্ হগমান এই অনুবাদ সঙ্কলন করিবেন। কিন্তু আজ বৈষ্ণব-প্রসঙ্গের মধ্যে ইহাদের কথা তুলিলাম কেন?

(২) সহজিয়াদের প্রেমের আদর্শ

বাঙ্গালী মহাপ্রভুকে ভগবানের অবতার বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। মহাপ্রভু আমাদেরই মত বাঙ্গালী ছিলেন; এই দেশের জল-মৃত্তিকায় যেমন তাঁহার দেহ গড়া, এই দেশের আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়া তেমনই তাঁহার মন গড়া ছিল। এদেশের লোক যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে তপস্যা করিতেছিল—তাঁহারই সিদ্ধিস্বরূপ তিনি আসিয়াছিলেন। এই রূপকথা ও গীতিকথাগুলিতে আমরা যে সকল স্ত্রীলোকের কথা পাইয়াছি—তাঁহারা প্রেমের আদর্শ, তাঁহাদের মত রমণীরত্ন জগতের অন্যত্র বিরল—তাঁহারা যে ত্যাগ ও প্রেমের উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা অন্য দেশ দূরে থাকুক—ভারতের অন্যত্রও বিরল। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের বড় বড় কাব্যে আমরা কয়টী স্মরণীয় নায়িকা পাইয়াছি? বেশী নয়, তাহাদের সংখ্যা নখাগ্রে গণনা করা যায়; কিন্তু সামান্য এক-একটী পালাগানে সেই সকল সংস্কৃত কাব্যের আদর্শ নারীচরিত্রের সমকক্ষ কিংবা

তাঁহাদের অপেক্ষাও উজ্জ্বল নারীচরিত্র আমরা পাইতেছি। ভারত-বরেণ্যা সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, গৌরী, কাদম্বরী প্রভৃতি অতি অল্প কয়েকটী নারীর চিত্র সংস্কৃত সাহিত্যে লাভ করিয়া আমরা যুগযুগান্তর যাবৎ তাঁহাদের পায়ে পূজার অর্ঘ্য ঢালিয়া দিতেছি। কিন্তু মহুয়া, মলুয়া, বণিক্‌কুমারী কমলা, চন্দ্রাবতী, কমলারাণী, মদিনা, ভেলুয়া, সুরম্নেছা, কাজলরেখা, কাঞ্চনমালা, [illegible] মালা প্রভৃতি যে সকল নায়িকার চরিত্র আমরা [illegible] পাইতেছি,তাঁহারা ভারতের কাব্যে ও পুরাণোক্ত নায়িকা-দের সঙ্গে তো এক পংক্তিতে বসিতে পারেনই, কেহ কেহ তাঁহাদিগকেও ছাপাইয়া গিয়াছেন।

এই সকল নারী-চরিত্র—কবিকল্পনার মিথ্যা মায়াজাল নহে। ইহারা প্রেমের যে অমিত সাহস—সমাজের অনু-শাসনের প্রতি যেরূপ তাচ্ছিল্য, উদ্ভাবনী শক্তির যে অপূর্ব্ব আদর্শ ও আত্মমহিমারক্ষায় যে অকুতোভয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর কবি-কল্পনা নহে। অনেক-পালাগান ও গীতিকথার ভিত্তি ঐতিহাসিক। কঙ্ক ও লীলা-চরিত্র চন্দ্রাবতী, মদিনা—সখিনা,—ইহাদের উপর কবিগণ একটু কল্পনার রং ফলাইয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু কবিগণ মূলতঃ ঐতিহাসিক উপকরণের কাঠ-খড় দিয়া এইসকল দেববিগ্রহ গঠন করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বলিয়াছিলেন, "আজকাল যুবক ও যুবতীগণ ঘরে ঘরে সহজধর্ম্মানুযায়ী পথে প্রেমের চর্চ্চা করিতে চেষ্টিত।" ইহারা এই উক্তির প্রমাণস্বরূপ। কিন্তু "সহজ সহজ সবাই কহয় সহজ জানিবে কে?" যিনি কামের তিমির অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই শুধু এই পথে যাইবার যোগ্য। কবি বলিতেছেন, এরূপ যোগ্য লোকের সংখ্যা বেশী নহে। যাঁহারা এই সহজ প্রেমের পন্থী, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বাস্তবিক যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন? কবির উত্তর "কোটিকে গোটিকে হয়"—এই যে কোটীর মধ্যে একজন তাহার গুণপণা কি! চণ্ডীদাস উত্তরে বলিতেছেন,"যে ব্যক্তি মাকড়সার জালের দড়ি দিয়া সুমেরু পর্ব্বতকে ঊর্দ্ধে ঝুলাইয়া রাখিতে পারে, যে ব্যক্তি গোখরা সাপের বদনবিবরে ভেকের নৃত্য দেখাইয়া তাহাকে অক্ষত দেহে ফিরাইয়া আনিবার শক্তি রা[illegible] এক কথায় যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে, সেই এই পথে আসুক—এ পথ বড় বিপৎসঙ্কুল। এই পথ যে কি—তাহার আভাস তরণীরমণ নামক এককবি তৎকৃত "চণ্ডীদাস-চরিত" নামক পুস্তকে দিয়াছেন। প্রেমিক প্রেমিকাকে কত বড় সংযম ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হয়, চণ্ডী-দাসের রামী তাহাই কবি-বন্ধু কোন রাজার কাছে বলিতেছেন। প্রথম প্রেমের অঙ্কুর উদ্গমের পর পুরুষ ও রমণীর কিছু কালের জন্য ছাড়াছাড়ি হওয়া প্রয়োজনীয়, পুরুষ যাইয়া বাস করিবেন গুণবতী ও রূপবতী যুবতীদের সান্নিধ্যে, এবং রমণী বাস করিবেন সুপুরুষদের সাহচর্য্যে। ছয় মাস এইরূপ থাকিয়া যদি দেখেন তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষায় তাঁহাদের একগৃহে রাত্রি বাসের ব্যবস্থা; কিন্তু তাঁহাদের গাত্রস্পর্শ নিষিদ্ধ। তারপর রমণী কি পুরুষ প্রণয়ের পাত্রের পদমাত্র স্পর্শ করিয়া আর কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট মাস কাটাইয়া দিবেন। ইহার মধ্যে যদি তাঁহারা কামনার লেশ হৃদয়ঙ্গম করেন, তবে সংযম-পথের যাত্রা ব্যর্থ হইয়ে। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন "দেহকে শুষ্ক কাষ্ঠের মত করিতে হইবে।" তাঁহার রাধা বলিতেছেন, "আমি নিজ-সুখ-দুঃখ কিছু না জানি, তোমার কুশলে কুশল মানি।" প্রণয়ী নিজের সুখের আশা একেবারে ছাড়িয়া দিবেন—প্রণয়-পাত্রের সুখই তাঁহার একমাত্র উদ্দিষ্ট লক্ষ্য হইবে—তাহার মধ্যে কামগন্ধ থাকিতে পারিবে না। এই প্রেমসাধনার রাজ্যে ভালবাসা একটী অখণ্ড সামগ্রী—ইহাকে দাম্পত্য, সখ্য, ভ্রাতৃভাব, বাৎসল্য এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ নাম দেওয়ার প্রয়োজন নাই, যে পর্য্যন্ত লক্ষ্যে না পৌছিয়াছে সে পর্য্যন্ত প্রবাহিনীদের নাম গঙ্গা, যমুনা, তাপ্তী, কাবেরী বা গোদাবরী। মহাসমুদ্রে পৌছানমাত্র তাহারা বিরাটের অঙ্গীয় হইয়া পড়িল, তখন তাহারা সেই বিরাটের মধ্যে নাম-গোত্র হারাইয়া ফেলিল। এই জন্য চণ্ডীদাস রামীর উদ্দেশে বলিয়াছেন, "তুমি [illegible] পিতৃমাতৃ—তুমি বেদমাতা গায়ত্রী।" সামাজিকগণ [illegible] কথা শুনিয়া জিভ কাটিবেন; কিন্তু চণ্ডীদাসের [illegible] সামাজিকগণের বাস্তভূমির বহু ঊর্দ্ধে।

এই অখণ্ড প্রেম কিরূপ বস্তু তাহা বৃদ্ধ বাল্মীকি কিছু কিছু বুঝিয়া দশরথের মুখে বলিয়াছিলেন, "কৌশল্যা আমার মাতা, সখী ও দাসীর মত।" গীতি-কথার মধ্যমণি মালঞ্চমালার উপাখ্যানটী আপনারা পড়িয়া দেখুন —মালঞ্চের চরিত্রে এই অখণ্ড ভালবাসা কিরূপ অপূর্ব্বভাবে দেখান হইয়াছে। এই চরিত্র বাঙ্গলা-পল্লীর এক মহাদান—ইহা প্রেমকে যে লোকাতীত রাজ্য হইতে দেখাইয়াছে, সেই কল্পলোক বাঙ্গালী ভিন্ন অপরের অনধিগম্য। যতই কেন দুশ্চরিত্র, ব্যভিচারী ও দুষ্ট হউক না কেন যাহাকে প্রাণদান করিয়াছ, তাহার নিকট হইতে সে প্রাণ আর ফিরিয়া আনিতে পারিবে না। ইহাদের আইনে তালাকনামা ত্যাগ বা ডাইভোর্স নাই; অবশ্য সামাজিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য divorce প্রয়োজনীয় —কুলকলঙ্কিনীকে লইয়া ঘর করিবার বিধি কোনস্থানে নাই। কিন্তু সহজিয়াদের মতে প্রেমের রাজ্য—ধর্ম্মরাজ্য —সাধনার রাজ্য। এখানে দান করিয়া প্রত্যাগ্রহ করা চলে না—দানের নিয়মই তাহা নহে, যাহা দিয়াছ—তাহা ফেরৎ আনিবে কিরূপে? চণ্ডীদাস তাই বলিয়াছেন—"প্রেম করিয়া যে ভাঙ্গে—সে প্রেমের সাধনার ফল পায় না।" যিশু মনুষ্যজাতির সঙ্গে অপূর্ব্ব প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি কণ্টকের মুকুট মাথায় পরিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা তাঁহাকে বর্ব্বরোচিতভাবে হত্যা করিল, মরিতে মরিতে ভগবানের নিকট তাহাদেরই জন্য প্রার্থনা করিয়া গেলেন। সন্তান সহস্র পাপের পাপী হইলেও কি তাহাকে মাতা ছাড়িতে পারেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রেমের উত্তুঙ্গ শিখরে ক্ষমা ও সাম্যের উদার হাওয়া বহে। সেখানে দাম্পত্য, সখ্য, বাৎসল্যে প্রভেদ নাই, —সেখানে দানের প্রত্যাহার নাই, পাপিষ্ঠ কি পাপিষ্ঠাকে ত্যাগ করিয়া লোক সুখ-সুবিধা খুঁজিতে পারে কিন্তু সহজিয়া প্রেমকে অবলম্বন করিয়া সুখ খোঁজে না, সে প্রেম অবলম্বন করিয়া সাধনা করিতে চাহে। "প্রণয় করিয়া ভাঙ্গয়ে যে। সাধন-অঙ্গ পায় না সে।" চণ্ডীদাসের এই কথার মত বড় কথা কোন কবি বা ধর্ম্মগুরু বলেন নাই।

কবি এই কথার ইঙ্গিত পুনরায় রাধার মুখে করিয়াছেন —"আমি শ্যাম অনুরাগে এ দেহ সঁপেছি তিল তুলসী দিয়া।" তিল-তুলসী দিয়া দান করা—সর্ব্বত্যাগের দান, তাহার প্রত্যাহার চলে না। আমার দেহ প্রণয়ীকে এইভাবে দান করার অর্থ—"আমার চক্ষু আমার নিজের সুখের পথে চাহিবে না, তোমার ইচ্ছায় তাহার লক্ষ্য স্থির হইবে, আমার হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি তোমার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হইবে,—আমার বলিয়া আমি কিছু রাখিলাম না—আমি [illegible] হইয়া গেছি।" হিন্দুরা দুষ্ট গুরুকে ছাড়িতে উপদেশ দেন নাই, দুষ্ট স্বামীও ত্যাজ্য নহে, দুষ্ট সন্তানকে মাতা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। দুষ্ট প্রণয়িণীও সহজিয়া-মতে অত্যাজ্য; সমস্ত কষ্টের জন্য বুক পাতিয়া লইয়া সহজিয়ারা প্রেমের সাধনা করেন।

(৩) শৈবধর্ম্মের অভ্যুদয় ও যৌনসম্বন্ধের নব-বিকাশ

নবম শতাব্দীতে শৈবধর্ম্ম বঙ্গদেশে মস্তকোত্তোলন করে। এই শিব বেদের রুদ্রদেব অথবা তাণ্ডবনৃত্যশীল সংহারক নহেন, ইনি বুদ্ধের সকল গুণ হরণ করিয়া বঙ্গের পূজাপীঠে আসনগ্রহণ করিলেন। ইনি বুদ্ধের ন্যায় মহাভিক্ষু, ইনি বুদ্ধের ন্যায় কন্দর্পজয়ী, ধ্যানপরায়ণ, সমাধিমগ্ন, ইনি জগতের দুঃখে বিগলিতপ্রাণ; বিষপান করিয়া জগৎকে রক্ষা করিয়াছেন; যেরূপভাবে জাগতিক কষ্টদর্শনে বিগলিতচিত্তে বুদ্ধ ভিক্ষুকের দুঃখ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। বুদ্ধ রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করিয়া বনে-জঙ্গলে—ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। শিবের ভাণ্ডারী কুবের। কিন্তু তিনি কুবেরকে কোন দিনই শরণ করেন নাই, তিনি শ্মশানে-মশানে ছাই-ভস্ম অঙ্গে মাখিয়া বেড়াইতেন। কোথায় রাজপুত্রগণের সঙ্গে বুদ্ধ সখ্যস্থাপন করিয়া দিব্যবেশী সৈন্যগণ সমাবৃত হইয়া থাকিবেন, তাহা না করিয়া নিম্নশ্রেণীর দল ও ভিক্ষুগণের সঙ্গে তিনি বিহার করিতেন। ভারতবর্ষের বিশাল পটে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি মুছিয়া গেল, তৎস্থলে শিব মহাভিক্ষু ও মহাকারুণিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া—কপিলবস্তুর রাজকুমারের অঙ্গরাগে বিভূষিত হইয়া উদিত হইলেন। [illegible] শুধু বুদ্ধ যাহা দিয়াছিলেন, শিব কি তাহাই দিয়া

ক্ষান্ত হইলেন? তাহাহইলে বুদ্ধের সমকক্ষ বা প্রতিরূপ এক দেবতাকে পাইয়া লোকেরা বুদ্ধকে ছাড়িবে কেন? শিব ত্যাগী, শিব ভিক্ষু, শিব কামজয়ী, শিব মহা-কারুণিক, শিব ধ্যানীদের গুরুস্থানীয় কিন্তু শিব আদর্শ গৃহী। বুদ্ধদেব গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চিরজীবন সন্ন্যাসধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 'সমঞ্ঞফলসুত্ত' নামক পালি পুস্তকে বুদ্ধ অজাতশত্রু মহারাজের নিকট গার্হস্থ্য হইতে সন্ন্যাস যে কত শ্রেষ্ঠ, তাহা উদ্দীপ্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে শত শত গৃহস্থ শত শত ধনীর সন্তান গার্হস্থ্যধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাসের দিকে তিনি জাতীয় জীবনে এমন একটা ঝোঁকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহাতে গৃহস্থগণ পাছে তাঁহাদের পুত্র-কন্যারা ভিক্ষুর ব্রতগ্রহণ করে, এই জন্ম আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বুদ্ধের যাহা কিছু অধ্যাত্মসম্পদ তাহা শৈবধর্ম্ম উত্তরকালে গ্রাস করিয়া লইয়াছিল—কিন্তু শৈবধর্ম্মের প্রধান দান—গার্হস্থ্যধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া। শৈবধর্ম্ম গার্হস্থ্যের সঙ্গে সংযমের সূত্রে দাম্পত্যের এক অচ্ছেদ্য বন্ধন সৃষ্টি করিয়া আদর্শ দাম্পত্য-শিক্ষা দিয়াছিল। হরপার্ব্বতী আদর্শদম্পতী। কৈলাসের উদার সাম্যপূর্ণ শিখরদেশে শিবপার্ব্বতীকে—সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গ শিক্ষা দিতেছেন, সমস্ত শাস্ত্র শিবের শ্রীমুখো-চ্চারিত হইয়া পার্ব্বতীকে উন্নত চিন্তায় দীক্ষিত করিতেছে। কৈলাসশেখরে হরগৌরীর এইরূপ যুগল-মূর্ত্তি আমাদের পরিচিত। তারপর নন্দী-ভৃঙ্গী, কার্ত্তিক, গণেশ ইহারা এক পরিবারভুক্ত। মূষিক, পেচক, ময়ূর ও বৃদ্ধ ষাঁড় ও পার্ব্বত্য পোষা সিংহটাও তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠুরতা ভুলিয়া এই পরিবারে নাম লিখাইয়াছে। পার্ব্বতী রাজকন্যা হইয়াও কত সুখে ভিক্ষুকের গৃহিণীর সংসারের দুঃখের ভার কাঁধে লইয়াছেন। সিদ্ধি ও ভাঙ বাটিতে বাটিতে তাঁহার হাতে দাগ পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি ভগবতী প্রসন্নাননা, স্বামীর সহিত নিত্যকলহ, কিন্তু ভোলানাথ স্বামীর মুখ একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেন না। শিব কত আদরে শাঁখারী সাজিয়া তাঁহাকে শাঁখা পরাইতেছেন, যখন দক্ষালয়ে সতী প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন একযুগ তিনি তাঁহার জ্যোবলম্বী সতীর শববহন করিয়া পর্ব্বতে, অরণ্যে নদীতীরে শোকার্ত্ত হইয়া বেড়াইয়াছিলেন, সেই মহা-শোকের পর মহাযোগী যে মহাধ্যানে নিবিষ্ট হইলেন তাহা ভাঙ্গিতে দেবতাদের কত ফন্দী কত ষড়যন্ত্র করিতে হইয়াছিল!

বৌদ্ধধর্ম্মের শুষ্ক ঊষর রাজ্য যেন শৈবধর্ম্মের মৃত-সঞ্জীবনীতে ফুলপল্লবে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল! যৌনপ্রেম বুদ্ধদেব তাঁহার আশ্রমের বাহিরে রাখিয়াছিলেন; এবার শৈব ধর্ম্মের আশ্রয়ে তাহার শাখা-পল্লব ও বিচিত্র কাণ্ডে কত পুষ্প কত ফুল শোভা পাইতে লাগিল। পালরাজগণের সময়ে ধীরে ধীরে এই যৌনপ্রেম আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা পাইতে লাগিল। 'দারা পুত্র কিছু নহে' এই নীতি মুছিয়া ফেলিয়া শৈবেরা হরপার্ব্বতীর গার্হস্থ্য-চিত্র আঁকিয়া ফেলিলেন। তখন হইতে শতশত রূপ ও গীতি-কথায় রাজকুমার ও রাজকন্যাগণের প্রেমের লীলার বিচিত্র চিত্রে বঙ্গের চিত্রশালা ভরিয়া উঠিল। হরপার্ব্বতীর প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি ভাল করিয়া লক্ষ্য করুন। হরপার্ব্বতী পরস্পরের বাহুপাশবদ্ধ, যে তৃষিত চক্ষুতে শিব গৌরীর মুখসুধা পান করিতেছেন, সে চক্ষুদুটীর তুলনা নাই—তাহা যেন প্রেমে ভরপুর—"নয়ন জনু থির ভৃঙ্গ আকার, মধুমাতল কিএ উড়ই না পারে," দক্ষিণ করাঙ্গুলিতে শিব গৌরীর চিবুক স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি অঙ্গুলি হইতে যেন স্নেহ-সুধা ঝরিয়া পড়িতেছে, কি প্রগাঢ় আলিঙ্গন, কি অনিন্দিত পদ্মপলাশতুল্য প্রেমে ঢল ঢল যুগ্মনেত্র! যদি গৌরীর মুখ আপনারা নাও দেখিতেন তবুও ভোলানাথের দুইটী আপনহারা চক্ষু দেখিলেই বুঝিবেন যেন তপঃক্লান্ত পান্থ তপঃসিদ্ধি পাইয়াছেন, তীর্থযাত্রী যেন তীর্থের মোহানায় আসিয়াছেন—শিবের সেই লুব্ধদৃষ্টির প্রমত্ততা লালসার মদিরাপানজাত নহে, তাহা প্রেমের অমৃতনিষিক্ত—শিবের সমস্ত দেহ যেন গৌরীর স্পর্শে এলাইয়া পড়িয়াছে। প্রস্তরনির্ম্মিত বহু শিব-দুর্গার মধ্যে এমন দুই-একটী পাওয়া যায়, যাহা অমর প্রেমকে পাষাণের রেখায় রূপ দিয়াছে। সেই সময়ের শিলালিপি ও তাম্রফলকে শিবের স্তোত্র পাঠ করুন, দেখিতে পাইবেন হরগৌরীর প্রেমলীলা কবিরা কত ছন্দোবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন।

কোনটীতে শিবের ললাটের অর্দ্ধেন্দুর জ্যোতিতে ব্রীড়ানতা গৌরী-ললাটের সিন্দুররাগ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, কোনটীতে তাঁহার অসম্বৃত অঙ্গবাস-মুক্ত দেহের ললাম সৌন্দর্য্য দেখিয়া দেবাদিদেব মৃদুমধুর হাসিতেছেন—এই ভাবে হরগৌরীর লীলাছবি রাজকবিগণ বন্দনার স্তোত্রে বর্ণনা করিয়াছেন; শিল্পীরা সেই চিত্র প্রস্তরবিগ্রহে কুঁদিয়া রাখিয়াছে। দশম শতাব্দীর পর হইতে প্রেমের লীলারস অবাধভাবে সাহিত্য ও শিল্পে ছুটিয়াছে। শুধু শৈব সাহিত্যে নহে—সেনরাজগণের প্রদত্ত দান-পত্রে বিষ্ণুবন্দনায়ও যুগল প্রেমের ধারা বহিয়া গিয়াছে, একটীতে "লক্ষ্মীবক্ষের কস্তুরী পত্রে অঙ্কুরাঙ্কিত বিষ্ণুর দেহস্পর্শে সরস্বতী অভিমান ভরে বলিতেছেন 'তুমি সরিয়া যাও, আমার নবমল্লিকার মালাটি বিবর্ণ করিয়া নষ্ট করিও না।"

বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংযম ও ইন্দ্রিয়নিরোধের এই প্রতিক্রিয়া—শিবের মহিমান্বিত দাম্পত্য প্রেম তৎপার্শ্বে দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবী প্রেমলীলা নানাভাবে শিল্প ও সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বুদ্ধদেব স্ত্রীজাতিকে তাঁহার ধর্ম্মাশ্রমে প্রবেশ করিতে দেন নাই। এমন-কি তাঁহার অশীতিপরা বৃদ্ধা মাসীমাতা মহাপ্রজাবতী, যিনি আদর্শ নারী ছিলেন, বহু অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁহাকে প্রথমতঃ ভিক্ষুসংঘের বিহারে প্রবেশের অনুমতি দেন নাই। শেষে তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দের পুনঃপুনঃ অনুরোধে ও স্নেহশীলা মাসী ও ধাতৃমাতা মহাপ্রজাবতীর প্রভাব এড়াইতে না পারিয়া তিনি সঙ্ঘের লৌহতোরণ মহিলাদের জন্য উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন—কিন্তু সেই সময়ে বলিয়াছিলেন, "আনন্দ তোমরা আজ যাহা করিলে তাহার ফলে আমার সঙ্ঘ অচিরাৎ ধ্বংস পাইবে। শ্বেতাষ্টিকা (একরূপ কীট) লাগিলে যেরূপ শস্যক্ষেত্র নষ্ট হয়, সংঘে নারীদের প্রবেশ এ ধর্ম্মকে তেমনই নষ্ট করিবে।" কিন্তু তিনি স্ত্রীলোকদিগের প্রবেশাধিকার দিলেন সত্য—বিনয় সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে দেখা যায়, যেরূপ কঠোর নীতিতে তিনি যৌনসম্বন্ধ শাসনাধীন করিয়াছিলেন, তাহা কঠিনতম সতর্কতামূলক।

কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব তিন শতাব্দীতে সঙ্ঘের মধ্যে একদল দেখা দিলেন, যাঁহারা ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর মধ্যে এই মিলনের অন্তরায় স্বীকার করিলেন না—ইহাদের নাম হইল "সমভিপ্পায়ী" (সমভিপ্রায়ী)। রাত্রিকালে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী একত্র হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন—স্ত্রীলোক ও পুরুষের ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে এক অভিপ্রায়ে—মিলন অনুচিত নহে, ইহাই প্রচার তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। লোকে বিদ্রূপ না করিতে পারে, এজন্য সমভিপ্পায়ীরা রাত্রিকালে অতি সংগোপনে তাঁহাদের সভাসমিতি আহ্বান করিতেন। আধুনিক সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি শ্রেণীর নৈশ-সম্মিলন, সমভিপ্পায়ীদের সেই প্রাচীন ধারা বজায় রাখিয়াছে।

আমার Folk Literature of Bengal নামক পুস্তকে আমি লিখিয়াছিলাম—মালঞ্চমালার গল্পটা বাজারের সস্তাদরের মাদুর নহে। ইহা একখানি পারস্যের শিল্পীর হাতের সাচ্চা কার্পেট; গঙ্গা যেমন ধূর্জ্জটীর জটার জটিল ব্যূহ ভেদ করিয়া ভগীরথের চেষ্টায় বঙ্গপল্লীতে লোকের গৃহের আঙ্গিনা দিয়া বহিয়া গিয়াছেন, কোন অজ্ঞাতনামা পল্লীকবি সেইরূপ এই চরিত্র কল্পনা করিয়া উর্দ্ধতম প্রেমের আদর্শ কি তাহা বাংলার গৃহস্থকে শিখাইয়াছেন। অপর কোন জাতি এই গল্পের অনাস্বাদিত মহত্ত্ব বুঝিবেন না, ইহা অপূর্ব্ব ও অননুকরণীয়। আমার এই কথায় তদানীন্তন ছোটলাটের সেক্রেটারী মিঃ গোরলে—বলিয়াছিলেন, "দেশপ্রীতির স্রোতে হাবুডুবু খাইয়া দীনেশবাবু এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন" কিন্তু তৎপরেই তিনি ভূমিকায় লিখিলেন, "গল্পটী দীনেশ বাবুর তর্জ্জমায় পড়িয়া আমার মনে হইল তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, সুতরাং আমার প্রথমকার ধারণা ভুল।"

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "প্রণয় করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন অঙ্গ পায় না সে।" এই কথা সহজিয়ারা ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারেন না। তুমি যাহাকে ভালবাসিয়াছ তাহাকে আর তুমি ছাড়িতে পারিবে না—সহজিয়া প্রেমের এই ধারা। সহজিয়াদের প্রেমে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই।

পালাগান ও গীতিকথাগুলিতে প্রেমের যে দুর্জ্জয় ও একনিষ্ঠ ব্রতের চিত্র দেওয়া হইয়াছে—তাহা এক যুগ ভরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিক্রিয়ার ফলে জাতীয় তপস্যার সিদ্ধিস্বরূপ। রুদ্ধ জলস্রোত ছাড়িয়া দিলে তাহা যেরূপ বেগে

পাথর ভাসাইয়া লইয়া যায়, বহু যুগের আচরিত যৌন-সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যৌনসম্বন্ধ এরূপ অবাধ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ভালবাসার জন্য মানুষ কি না করিতে পারে? এইসকল [illegible]নীতে রমণী-হৃদয়ের যে অদম্য আবেগ ও তেজের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—[illegible] প্রেমের তপস্যা, তাহাতে অসম্ভব সম্ভব হইয়া গিয়াছে। পালাগুলি সামাজিক আইন-কানুন সদর্পে অগ্রাহ্য করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা নিষ্ঠার সীমালঙ্ঘন করে নাই। সর্ব্বত্র রমণীর প্রেম অনাবিল, একনিষ্ঠ, রমণী সর্ব্বত্র মহিমময়ী। সেই সকল প্রেমতপস্বিনীদের কথা মনে হইলে, স্বতই ধারণা হয়, সংগীতপরায়ণা বিদুষী বঙ্গসরস্বতীর শুভ্র মূর্ত্তি, হৈমন্তিক ধান্যশ্রীর পবিত্র প্রতীক লক্ষ্মীদেবী, নানাপ্রহরণময়ী বিপত্তারিণী দুর্গাদেবীর শ্রীরূপ—মহামেঘসদৃশা, ভয়ঙ্করী বিনাশ-বিলাসময়ী কালিকা মূর্ত্তি, এই যে বার মাসে আমরা যাঁহাদের পূজা-পার্ব্বণে ঢাক-ঢোল-বাদ্যে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকি—ইঁহারা আমাদের বঙ্গনারীরই রূপ। পূজকেরা জীবনে রমণীগণের শক্তি দেখিয়া শক্তির রূপ গড়িয়াছেন এবং শক্তির পূজা করিয়াছেন। হালিডে সাহেব যিনি পরে বাঙ্গলার ছোট লাট হইয়াছিলেন তিনি লিখিয়াছেন:—"একদা তিনি একটা সতীদাহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনও সতীদাহের আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। সতীটী তরুণ যৌবনে স্বামী হারাইয়াছিলেন তিনি। অপূর্ব্ব সুন্দরী। হালিডের সঙ্গে একটী পাদ্রী ছিলেন, তিনি সতীকে নিবৃত্ত করিবার জন্য নানারূপ বক্তৃতা করিলেন। তাঁহারা প্রথমে ভাবিয়াছিলেন ব্রাহ্মণেরা ইহাকে ভাঙ খাওয়াইয়া বেহুঁস করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিচারে টেকসই হইল না—তখন বাগ্মিপ্রবর সেই রমণীকে বলিলেন, "একটু সামান্য অগ্নির স্ফুলিঙ্গ গায়ে পড়িলে কেমন লাগে, ক্ষুদ্র একটা আঙুলে ফোস্কা পড়িলে কিরূপ জ্বালা হয়, তাহা কি তুমি জান না? তোমার সমস্ত দেহটা বাঁশের সঙ্গে বাঁধিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে,—চারিদিকে সংকীর্ত্তনের হৈ হৈ শব্দে ও ঢক্কারবে তোমার আর্ত্তনাদ চাপা পড়িবে, কাহারও সাড়া থাকিবে না, সেই বিপদে তোমাকে রক্ষা করে? একটী আঙুলের অগ্রভাগে ফোস্কা পড়িলে সমস্ত রাত্রি তোমার ঘুম হয় না; তুমি একেবারে বুদ্ধিশূন্যা, তোমার আসন্ন ঘোর বিপদ টের পাইতেছ না?"

সতীর মন তখন তাঁহার পতির ভাবনায় তন্ময়, পাদ্রীর বক্তৃতা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি জনৈক সহচরীকে একটী মোমবাতী জ্বালাইতে বলিলেন। তখন একবার মাত্র পাদ্রীর দিকে নির্ব্বিকারভাবে তাকাইয়া স্বীয় অনামিকাটী সেই অগ্নির উপর ধরিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত অঙ্গুলিটী পুড়িয়া ছাই হইল, তখনও তাঁহার মুখ অবিচলিত, একটীবারও তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হয় নাই। হালিডে সাহেব চিৎকার করিয়া বলিলেন, "আমরা আপনার দৃঢ় চরিত্র বিশেষভাবে বুঝিয়াছি ক্ষান্ত হউন, আর আপনাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবে না।"

পালা-গানগুলিতে কোন অগ্নিপরীক্ষার কথা নাই, কিন্তু যে সকল পরীক্ষার কথা আছে, তাহা অগ্নি পরীক্ষা হইতে কঠোরতর। সমাজের সর্ব্বত্র প্রেমের জন্য এই ত্যাগ ও কঠোর সাধনা চলিতেছিল—সেগুলি নিছক কল্পনা নহে। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সতীর শ্মশানের ধূলি এখনও উড়িতেছে, পাদ্রীর সঙ্গে গলা মিশাইয়া আমরা সেগুলিকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিলে আমাদের স্বর্গীয়া জননীরা আমাদের অভিশাপ করিবেন। এখন সতীদাহের যুগ আমরা ফিরিয়া আনিতে চাহি না, সে আদর্শ ও তপস্যার যুগ শেষ হইয়াছে। কিন্তু যে যাহাকে জানিল না চিনিল না, যে যাহার কোন অপকার করে নাই, রণক্ষেত্রে যাইয়া তাহার গলায় ছোরা বসাইল, কিংবা মারিতে গিয়া নিজে মরিল ইহাই হইল জাতীয় গৌরবের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধ্বজা। আর প্রেমের জন্য আত্মত্যাগটা কুসংস্কার। আমরা সোণা ফেলিয়া কাঁচকে আদর করিয়াছি, যে শিক্ষায় আমাদিগকে এতদিন অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে সে শিক্ষা আমরা আর চাই না।

(৪) বৈষ্ণব ধর্ম্মে যৌনসম্বন্ধের পরিণতি

এই যে প্রেমের তপস্যা বাঙ্গলার নর-নারীরা এতাদৃশ আগ্রহে করিতেছিলেন, প্রেমযজ্ঞশালায় তাহার শেষ আহুতি

পড়িল যে দিন চণ্ডীদাস প্রেমের সংগীত গাহিলেন! তখন অনাহত স্বর্গের নহবৎ বাজিয়া উঠিল। প্রায় সহস্র বৎসর বহু নরনারী এই তপস্যা করিতেছিলেন, মালঞ্চ-মালা, কাজলরেখা, কাঞ্চনমালার মত নারীচরিত্র জগতের কোন্ সাহিত্যে আছে? কাঞ্চনমালা আত্মহত্যা করিয়া মরিল, মরিবার সময় চন্দ্রসূর্য্য এবং নক্ষত্রদিগকে ডাকিয়া বলিল—"তোমরা আমার মৃত্যুর সাক্ষী. তোমরা নীরব থাকিও। হে বায়ু, তুমি সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, তোমার মৃদু নিঃস্বনেও যেন একথা ব্যক্ত না হয়, হে নদীর উপরে উড়ন্ত ক্ষুদ্র টুনটুনি পক্ষীটী! আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি আমার মৃত্যুর কথা যেন তিনি না জানেন,—তিনি আমার প্রতি বিমুখ, অপরের প্রতি অনুরক্ত, এই নবদম্পতি সুখে থাকুন। আমার মৃত্যুর কথা শুনিলে তিনি দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইবেন—আমার মৃত্যুকালে তাঁহার প্রাণে এটুকু দাগাও দিয়া যাইতে চাহি না।" মালঞ্চমালা তাঁহার স্বামী রাজকুমারকে মৃত্যুশয্যা হইতে তিল তিল করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া তিনি জীবনলাভ করিতেন, সেই রাজকুমার অপর এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া তিনি নবদম্পতির বাসরগৃহে উঁকি মারিয়া দেখিলেন। তখন মনে মনে বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "রাজদম্পতি তোমরা ঘুমাও, তোমাদের গৃহের বাতি চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকুক! তোমাদের বংশধরদের মাথার হেমচ্ছত্র চিরবিরাজিত থাকুক! রাজকুমারী, তুমি কি সুন্দর,—তোমার মাথার সিন্দুর ও হাতের শাঁখা তোমার চিরসৌষ্ঠব সাধন করুক! আমি কি তোমার পায়ের কাছে দাঁড়াইতে পারি? আমি কি এমন রাজকুমারের যোগ্য? তুমিই তাঁহার যোগ্যা, আমি এই যুগলরূপ দেখিয়া গেলাম, এই আনন্দের পুঁজিটুকু লইয়া বাকী জীবন কাটাইয়া দিব।"

শেষে অনুতপ্ত রাজকুমার মালঞ্চমালাকে স্বগৃহে আনিলেন, বিপুল জয়ধ্বনির সহিত বিরাট্ পুষ্পতোরণ উঠিল। মহাসমারোহে কাঞ্চনমালা স্বগৃহে আসিলেন, কিন্তু তিনি নিজহস্তে সপত্নীকে পাটরাণীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। প্রজারা সপত্নীর নাম দিল রাণী এবং মালঞ্চমালাকে নাম দিল 'ঠাকুরাণী'—একটা উপাধি পৃথিবীর কিন্তু অপরটা দেবমন্দিরের। তিনি আর ইন্দ্রিয়তাড়িত সুখান্বেষী সংসারের লোক নহেন—কল্পলোকের দেবী, এই জন্য 'ঠা[illegible]'। এইসকল কাহিনী বহুপ্রাচী[illegible] দশম-একাদশ শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু [illegible] এই প্রেমের তপস্যার ফল ভাল হইল না। যুবকযুবতীরা লালসার কূপে পড়িতে লাগিলেন। এজন্য চণ্ডীদাস নরনারীকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে সে যেন এই পথে না আসে। কিন্তু নরনারীর প্রেম উচ্চগ্রামে যে ভগবানের সিংহাসনের নিকট পৌছায়, তাহা তিনি স্বীকার সর্ব্বদাই করিয়া গিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া আছয়ে যেজন কেহ না চিনিতে পারে,
প্রেমের আরতি যে জনা জানয়ে
সেই সে চিনয়ে তারে।"

অর্থাৎ সেই মহাপ্রেমিক বিশ্বদেবতা সর্ব্বত্র আছেন, কিন্তু তাঁহাকে জানা সম্ভব নহে, কেবল যে ব্যক্তি জীবনে প্রেমের তপস্যা করিয়াছে, একমাত্র সেই ব্যক্তি, তাঁহাকে পাইতে পারে।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে জীবন দিয়া শত শত লোক প্রেমের তপস্যা করিতেছিল। যে সাগর বঙ্গদেশকে ভাসাইয়া লইয়া চলিতেছিল—সেই সাগরের অগ্রগামী ঢেউ চণ্ডীদাস, এই হিসাবে তিনি জাতীয় মহাকবি। পল্লীগাথার ভাষা ও ভাবের সঙ্গে চণ্ডীদাসের যত ঐক্য—অন্য কোন কবির সঙ্গে এদেশের প্রাচীনতম সাহিত্যের তেমন ঐক্য পরিদৃষ্ট হয় না; "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল," এই কবিতার ভাব পল্লীগাথার বহু স্থানে দৃষ্ট হয়,—"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইলা বাটে" এ কবিতার ভাবও প্রাচীনতম পালাগায়কদের রচনায় অনেকস্থলে পাওয়া যায়। "চলে নীল শাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি, পরাণ সহিত মোর" ইহারও জোড়া পালা-গানে পাওয়া গিয়াছে, বস্তুতঃ বৈষ্ণবদের কবিদের ভাবসমৃদ্ধির উপকরণ পালা-গানে যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। "ঢল ঢল ঢল অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়" এইরূপ কাব্যকথাও পালা-গানের অনেকগুলিতে আছে।

মোটকথা, বাঙ্গালী যৌনপ্রেমের তপস্যায় যেসকল

সুকোমল ভাব ও ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছিল, সিদ্ধ কবিরা মাজিয়া-ঘষিয়া তাহাদিগকে স্বীয় কবিতায় গ্রহণ করিয়াছেন, তবে পালা-গান ও বৈষ্ণব কবিতা উভয়ই ভগবানলব্ধ হইলেও পালা-গানের সীমা সাংসারিক জীবনের গণ্ডীতে আবদ্ধ। তাহা অধ্যাত্ম-জীবনের প্রান্ত-সীমায় আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক হয় নাই। বৈষ্ণব কবির গানে আধ্যাত্মিকত্বচিন্তা সুস্পষ্ট, এই প্রভেদ তীক্ষ্ণধী পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। চণ্ডীদাস হইতে এই অধ্যাত্মরসের ধারা ছুটিয়াছে। জয়দেব তাহার আভাস দিয়াছিলেন। পালা-গান ও গীতিকথায় প্রণয়ীযুগল সংসারের ভাবে উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন, সেখান হইতে স্বর্গের দ্বারদেশ দেখা যায়; কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা অধ্যাত্ম-রাজ্যেরই অধিবাসী! তাঁহাদের রচনা অনেকস্থলে রুচি-সঙ্গত নহে, কোথাও বা অশ্লীল, বরং এ বিষয়ে পালা-গান-গুলি বেশী সতর্ক। কৃষকের রচনা হইলেও উহাতে দূষণীয় কিছু নাই, কিন্তু বৈষ্ণব কবির লেখায় আবর্জ্জনা ও পঙ্ক আছে, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। কিন্তু তাম্রকুণ্ড ও কোষাকুষি যদিও নর্দ্দমায় পড়ে—তথাপি তাহা পূজারই উপকরণ, তাহাদের স্বরূপ বুঝিতে ভুল হয় না।

পালা-গানে ও গীতিকথার নায়ক-নায়িকারা যেভাবে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ দেখাইয়াছেন—পার্থিব অনুরাগের সীমানা তাহা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। এই প্রেমের আবেগে তাহারা কুলশীলমান সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, অত্যাচারের চূড়ান্ত সহ্য করিয়াছেন এবং প্রেমাস্পদের তুলনায় জীবনকে তৃণের মত অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়াছেন। এদিকে রাধাকৃষ্ণের বর্ণিত প্রেম সময়ে সময়ে কুরুচিদুষ্ট,—সময়ে সময়ে স্থূলশরীরের বর্ণনাবহুল—সময়ে সময়ে আবার উচ্ছ্বসিত ছন্দে ইন্দ্রিয় ও ভোগের বর্ণনায় কলঙ্কিত। শ্রেষ্ঠ পালা-গানে পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদিকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিরাও একেবারে উহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই।

তথাপি পালা-গান ও গীতিকথার রাজ্য পদাবলীর রাজ্যের নিম্নস্তরে। কবিত্ব হিসাবে পল্লীগীতিকা বৈষ্ণব পদের নিম্নে দাঁড়াইবে না; তথাপি গুণের বিচারে উচ্চ পদের ব্যবস্থা করিতে হইলে বৈষ্ণব পদকেই উচ্চাসন দিতে হইবে।

অনেকে বলিবেন—পদাবলীর মধ্যে ধর্ম্মের ছাপ আছে—এজন্য তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে, কিন্তু আমরা তাহা মানি না,—কবিতা আর ধর্ম্ম এক জিনিস্ নহে।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম পরমাত্মা ও জীবাত্মার গূঢ় সম্বন্ধের প্রতীক—ইহা বৈষ্ণব কবিরা নিজেই বলিয়াছেন, দাশরথীর পদে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে—"হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি, ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা সতী। মুক্তি কামনা আমারি হবে বৃন্দা গোপনারী, আমার দেহ হবে নন্দের পুরী—স্নেহ হবে মা বসুমতী। ধর ধর জনার্দ্দন পাপভার গোবর্দ্ধন কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি।" কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন:—"গোস্বামী সিদ্ধান্ত মতে স্বয়ং ভগবান। বৃন্দাবন ছাড়ি এক পদ নাহি যান। তবে যে গোপিকার হয় এতই বিষাদ। ইহা হেতু প্রোষিতভর্তৃকা রসাস্বাদ, স্ফূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে, তখন ভাবেন বুঝি এলেন বৃন্দাবনে। অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেছেন মধুপুরী।"

সুতরাং গোস্বামীরা এই রূপকের কথা স্বীকার করিয়াছেন। স্বয়ং চৈতন্যদেব বলিয়াছেন—"যুবকের আর্ত্তি যথা যুবতী দেখিয়া। সেইরূপ অন্য কিছু না পাই ভাবিয়া এ কারণে ভক্তগণে ভজে যদুপতি। পত্নীভাবে তার প্রতি স্থির করি মতি।" এই রূপক—বড়ই ব্যাপক। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে যত নায়ক-নায়িকার মনোভাব স্থান পাইয়াছে। রোমিও-জুলিয়েট অথবা শকুন্তলা-দুষ্মন্তের পূর্ব্ব-রাগ,—কুমারে বর্ণিত গৌরীর শিবপূজা, ইনিস ক্লিওপেট্রা কিংবা কালিদাসের যক্ষ-যক্ষীর বিরহ, সেক্সপীয়রের মিরেণ্ডা, মিল্টনের এডাম ইভের স্ফটিকশুভ্র প্রেম-নির্ভর—মেটারলিঙ্কের মিসলেণ্ডার অভিসার, বেহুলা ও সাবিত্রীর নিষ্ঠা—এক কথায় যে কোন দেশের যে কোন নায়ক-নায়িকা প্রেম-লীলার নানা রূপ দেখাইয়াছেন, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে সেই রূপটী লুক্কায়িত আছে। বৈষ্ণবদের রূপকের সার্থকতা এই যে রূপকটী সুকুমার মনোবৃত্তির সার্ব্বজনীন প্রতীক। এদেশের যে কোন কবির মনে প্রেমের

যে কথা উদয় হইয়াছে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, মাথুর, ভাব-সম্মেলন, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রভৃতি শত শত লীলার মধ্যে সেই কবির হৃদয়োচ্ছাস একটু স্থান করিয়া লইয়াছে। এজন্য মনোহর-সাহী রাগিণীতে যখন পদাবলী গীত হয়,তখন মহাজনগণের উক্তি সকলের হৃদয়ে সাড়া পায়। ভালবাসার রাজ্যে এই সার্ব্বজনীনত্ব অন্য কোন রূপকের নাই। এ যেন একটা গড়া রাজ্য, কোন অনুষ্ঠানের এখানে ত্রুটি নাই; কবিগণ সহজেই এই তৈরী রাজ্যে ঢুকিয়া নিজের সুরটী শত শত সুরের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোহরণ করিবার সংজে একটা সুবিধা করিয়া লইতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ এই পদগুলি ভক্তি-মূলক ও আধ্যাত্মিক। অন্য দেশের লোকেরা তাহা স্বীকার করুন বা না করুন—ইহার শত অশ্লীলতা সত্ত্বেও ইহা যে ভক্তিরাজ্যের জিনিস, প্রেমের অনাবিল সুধা তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। গঙ্গাজলে কত জিনিস ভাসিয়া যায়, গঙ্গাকে তাহারা অপবিত্র করিতে পারে না। নিধুবাবুর টপ্পাগুলিতে কত উচ্চ ভাব আছে। "প্রেমে কি সুখ হ'ত," "ভালবাসবে বলে ভালবাসি নে", "তাঁরে ভুলি কেমনে" প্রভৃতি শত শত গানে তাঁহার প্রেমের উন্নত আত্মত্যাগের কথা আছে। কিন্তু তাহা যখন কোন বাইজী গান করে, তখন তাহার গান পবিত্র বলিয়া কেহ মনে করেন না। কিন্তু কোন কীর্ত্তনওয়ালী যখন রাধাকৃষ্ণের একটা পালাগান করে, তখন মন স্বতঃই আর একটা রাজ্যে যায়—সে রাজ্যের মালিক স্বয়ং বৃন্দাবনেশ্বর। তাহাতে কত রঙ্গ-তামাসা এমন-কি শারীরিক ভোগের কথা আছে এবং গায়িকাটীও গণিকা—তথাপি কোন্ শ্রোতা এমন আছে যে পালাটী শুনিয়া বলিবে—ইহা অপবিত্র? সেই গণিকাটীকে আসরে যে গান গায়িতে বলিবে, তাহাই গায়িবে, কিন্তু যদি বলা যায় 'কীর্ত্তন গাও,' তখনই সে বলিয়া বসিবে,'মহাশয় বাসি কাপড় ছাড়ি নাই, কীর্ত্তন গায়িব কিরূপে?' ইহা তাহার কুসংস্কার-জাত ভাব নহে। বস্তুতঃ যখন ভাস্কর দেব-বিগ্রহ নির্ম্মাণ করে, তখন সে মনে করে সে যাহা নির্ম্মাণ করিতেছে, তাহা অতি বড়—তাঁহার বাক্য মনের অগোচর, এ জন্য কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে সে সেই পাথরের উপর পা দিয়াছে, অমনি আবার সেই কাঠ বা পাথরের উপর গড় করিয়াছে। গায়িকাও সেইরূপ কীর্ত্তনকে সাধারণ গান বলিয়া মনে করে না। যদি কেহ ভাল গায়ক বা গায়িকার মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া থাকেন—তবে বুঝিবেন, সহস্র দোষ সত্ত্বেও কেন কীর্ত্তনের এতাদৃশ আদর! কীর্ত্তন দেবপূজার ফুল—বৃন্দাবনের ধূলি পর্য্যন্ত যে প্রেম-পরশে তীর্থের দাবী করে, সেই প্রেমের একটী অধ্যায় যদি কেহ ভাল কীর্ত্তনীয়ার মুখে শোনেন, তবে অন্যান্য গানের সঙ্গে ইহার কি পার্থক্য—স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে—পার্থিব ও অপার্থিবে কি প্রভেদ, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব পদগুলির সর্ব্বত্রই একটা ইঙ্গিত আছে—সেই ইঙ্গিতে অধ্যাত্মরাজ্যের কথা স্পষ্ট হইয়া উঠে। ধরুন চণ্ডীদাসের "সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম"—নাম শুনিয়া প্রেম সংসারে কোথাও হইয়াছে—তাহা তো জানি না—"নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো"—নামের এই অলৌকিক ক্ষমতার কথায় কিসের ইঙ্গিত করিতেছে—অধ্যাত্মরাজ্যের নয় কি? পরবর্ত্তী ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট "জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো—"কোন সংসারের নায়িকা কি নায়কের নাম এমন করিয়া জপ করিয়াছে? "যেখানে বসতি তার সেখানে থাকিয়া গো—যুবতী ধরম কৈছে রয়।" আমরা সকলেই বলি ভগবান সর্ব্বত্র আছেন, কিন্তু সে কথা মুখের কথা মাত্র, যদি সত্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম যে তিনি এইখানে এখনও আছেন, তবে কি আর আমি সংসারে থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আর কুলধর্ম্ম রক্ষা হইত? ভগবানকে যে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করে, তাহার আবার কুলধর্ম্ম কি, সে যে অকূলে পড়িয়াছে।

চণ্ডীদাসের কবিতায় বহুস্থানে এই অপরূপ ইঙ্গিত? রাধার অন্তরে প্রেমের আবেগ আসিয়াছে—তখন তিনি আর নীলাম্বরী পরেন না, আহার-বিহার ভোগ-বিলাস ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনি গৈরিক বস্ত্র পরেন ও উপবাস করেন—"বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে"—ইহার অর্থ সন্ন্যাসীর মত তিনি অল্পাহারী হইয়াছেন ও রাঙ্গাবাস

অর্থাৎ গেরুয়া পরিতেছেন। পরের ছত্রে এই ইঙ্গিত আরও সুস্পষ্ট—"যেমন যোগিনী-পারা"। তিনি চাঁপা ফুলের মালা দিয়া বেণী সাজাইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দেখুন চাঁপার মালা খুলিয়া স্বীয় ভ্রমরকৃষ্ণ কেশপাশের মধ্যে কৃষ্ণের রূপটী খুঁজিতেছেন, 'এলাইয়ে বেণী, ফুলের গাঁথুনী, দেখয়ে খসায়ে চুলি।"

তারপরে "আকুল নয়নে চাহে মেঘপানে না চলে নয়ন-তারা"—মেঘ দেখিয়া চৈতন্যচন্দ্র কৃষ্ণভ্রমে এইভাবে কতবার সংজ্ঞাহারা হইয়াছেন। চৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে ঘর ছাড়িয়া কতবার বাহিরে আসিয়া "কে এল কে এল বলে" উন্মত্তভাবে প্রতীক্ষা করিয়াছেন—"ক্ষণে ক্ষণে ফুল-বনে চলয় একান্ত"—রাধারমণ ঠাকুর তাঁহার কথা বলিতে গিয়া এই কবিতাটী লিখিয়াছেন। রাধিকার পূর্ব্বরাগের কবিতায় চণ্ডীদাস বলিতেছেন—"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার তিল তিল আসে যায়, মন উচাটন, নিঃশ্বাস সঘন কদম্ব কাননে চায়, রাই এমন কেনবা হৈল।" চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এগুলি কি তাহার আগমনী, না প্রেমের সিংহাসন যে মর্ত্ত্য হইতে তুলিয়া লইয়া বৈষ্ণবেরা উর্দ্ধরাজ্যে স্থাপন করিতেছিলেন তাহারই কবিত্বপূর্ণ প্রয়াস?

গোবিন্দদাস ব্রজবুলিতে যে কবিতাটী লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ এই,—"গৃহের আঙ্গিনায় কণ্টক পুঁতিয়া ফুলসম কোমল পদতল রাই তাঁহার উপর দিয়া চলা-ফেরা করিতেছেন। দুই হাতে চক্ষু দুটী চাপিয়া অন্ধকারে গতিবিধি করিতেছেন; কারণ অভিসারে যাইতে হইলে তাঁহাকে কতবার কণ্টকের পথ ভাঙ্গিতে হইবে, সূচীভেদ্য অন্ধকারের পথে যাইতে হইবে।"

এইসকল কি অভিসারের সাধনা, না সন্ন্যাসের সাধনা? আঙ্গিনায় জল ঢালিয়া, রাই পিছল পথে যাইবার অভ্যাস করিতেছেন; পার্থিব প্রেম কি এরূপ কঠোর সাধনালব্ধ। ইহা ব্রহ্মপ্রেম-পথের যাত্রীর তপস্যা।

বিদ্যাপতি একটী পদে রাধিকার মুখে বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি আমার হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, ডাঙ্গায় উঠাইলে মাছ যেরূপ ছটফট করিয়া মরিয়া যায়, তোমার বিরহে আমার সেইরূপ অবস্থা হয়।" আরও কত কি উপমা দিয়া বুঝাইতেছেন যে কৃষ্ণ বিহনে তিনি মুহূর্ত্তকাল বাঁচিতে পারেন না, সর্ব্বস্ব দিয়া তিনি রিক্তহস্ত হইয়াছেন—কিন্তু শেষছত্রে তিনি বলিতেছেন—"আমি সর্ব্বস্ব যাহাকে দিলাম সে কে এবং কিরূপ?"

সাধকের মনে কোন কোন মুহূর্ত্তে এইরূপ সন্দেহ আসে। বহু তপস্যা, বহু কঠোর সাধনা করিয়া তাঁহার সময়ে সময়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক, কাহার জন্য এসকল করিতেছি। সে যে অতি বিরাট্, অবাঙ্মনসগোচর—আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র—আমার অর্ঘ্য গিয়া তাঁহার পায় পৌঁছিবে কি? হিমালয়ের পাথরে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে প্রাণ দিলেও তো গিরিরাজ একটুও নড়েন না। আমি যাঁহার জন্য প্রাণ দিতে বসিয়াছি, তিনিও কি সেইরূপ নির্ম্মম, সেইরূপ অনায়ত্ত? তবে কি সমস্ত পূজোপচার ব্যর্থ হইল? রাধা গভীর আশঙ্কায় বলিতেছেন, "মাধব তুহুঁ কৈছে কহবি মোয়।"

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
সোহি মধুর বোল শ্রবণে হি পশল
শ্রুতিপথে পরশ না গেল,
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু,
না বুঝিনু কৈছন কেল
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখিনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

এই চির অতৃপ্ত, শতবার আস্বাদনের পরেও যাহা অনাস্বাদিত থাকিয়া যায়—ইহাই প্রেমের স্বরূপ; ইহার ক্ষুধা এক জীবনে, বহু জীবনে, অনন্ত জীবনেও মিটে না;—সাধকের সঙ্গে ভগবানের নিত্যলীলায় এই অতি পুরাতন অথচ নিত্য নূতন প্রেমের অভিব্যক্তি।

৫। বঙ্গদেশের প্রেমসাধনার শেষ ফল—চৈতন্যদেব ও পার্থিব প্রেমের শেষ পরিণতি

বৈষ্ণব কবিদের এই ভাবের শত শত যে ইঙ্গিত আছে, তাহাই পদাবলীর বৈশিষ্ট্য। যেরূপ হিমাদ্রির গাত্রে কাঁকর ও অন্ধকার গর্ত্ত থাকা সত্ত্বেও তাহারা গিরিরাজের অভ্রভেদী মহিমা ম্লান করিতে পারে না, সেইরূপ অশ্লীলতার পঙ্ক ও বিগর্হিত রুচির প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পদাবলী

চিরপবিত্র। পদাবলীর শত গ্লানি সত্ত্বেও এই পবিত্রতা এত স্পষ্ট যে কীর্ত্তনের শ্রোতা এই পবিত্রতার ভাবে প্রথম হইতেই অভিভূত হইয়া যান। গঙ্গা নদীর যাত্রী যেরূপ গঙ্গায় কি ভাসিয়া যায় তাহার প্রতি লক্ষ্য করেন না, গঙ্গার পবিত্রতায় তিনি পবিত্র হইয়া যান,—পদাবলীর পাঠক এবং কীর্ত্তনের শ্রোতাও সেইভাবে মুগ্ধ হন,—এজন্য কীর্ত্তন-ওয়ালীরা বাসিকাপড় ছাড়িয়া কীর্ত্তন গায়িতে বসে এবং ভণিতায় কবির নাম উল্লেখের সময় যুক্তকরে তাহাকে প্রণাম করে।

বাঙ্গলাদেশে যে প্রেমোৎসব চলিয়াছিল- যে সাধনায় কোন লোকই দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করেন নাই, অতি কঠোর পন্থা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন—মহান্ আত্মোৎসর্গ ও জীবনদানের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, সেই সাধনা চণ্ডীদাস শত শত পদে ব্যক্ত করিয়া তন্মধ্যে অধ্যাত্মপ্রেমের বীজের অঙ্কুরাবস্থা দেখাইয়াছেন। চৈতন্যদেবে সেই উদ্যমের সম্পূর্ণ বিকাশের অবস্থা। চণ্ডীদাস কুঁড়ি, চৈতন্যদেব প্রফুল্ল পদ্ম; চণ্ডীদাস বর্ষণোন্মত ধারা, চৈতন্যদেব উন্মত্ত বন্যা। জাতীয় জীবনে চণ্ডীদাস যে ভাবের অগ্রদূত, চৈতন্যদেব সেই ভাবের দেবদূত।

চৈতন্যদেব ঠিক জাতীয় হৃদসরোবরের মাঝখান হইতে পদ্মটীর ন্যায় উদ্ভূত হইয়াছিলেন,—তিনি যে সংবাদ প্রচার করিয়াছিলেন,তাহার জন্য তৎপূর্ব্বেই জাতীয় চিত্তে উৎকণ্ঠা জাগিয়াছিল, এজন্য তিনি তৃষিতের নিকট শীতল বারির ন্যায় আমাদের এত প্রিয় হইয়াছিলেন; বাঙ্গালী তাঁহাকে যে আদর করিয়াছে, তাহার তুলনা জগতে বিরল, তাহারা আজ সাড়ে চারিশত বৎসরের পরেও "সদ্যজাত শিশু", "গৌরাঙ্গ", "নবদ্বীপচন্দ্র", "নদের চাঁদ", "গোরা" "নিমাই" প্রভৃতি নাম দিয়া সেই নবদ্বীপের শিশুটীর প্রতি আদর দেখাইয়া থাকে। তাঁহারা গৌরাঙ্গের বাল্য-লীলা, বিবাহ, দিগ্বিজয়ী জয়, সন্ন্যাস, জাতিভেদ অস্বীকার ও অপূর্ব্ব ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে শত শত গীতি রচনা করিয়াছে। এখনও প্রতিদিন প্রত্যুষে, প্রতি প্রদোষে খঞ্জনী, করতাল ও খোলের সঙ্গে তাঁহারই ন্যায় ও লীলা লইয়া বঙ্গের পল্লীতে শত শত গীতি সুকণ্ঠে গীত হয়, কৃষক হলকর্ষণের সময় "এমন প্রেমের দেবতা আর হবে না," চণ্ডালাদি অন্ত্যজজাতি "গোরা জাতের বিচার মানে নারে, দেখবি যদি আয় সকলে",— কত চোর দস্যু —পতিতের এই মহা-বন্ধুর সম্বন্ধে গান গাইয়া থাকে। বঙ্গবাসীর হৃদপদ্মের কত মধু যে তাহার নামে নিঃসৃত হইয়া থাকে তাহার অন্ত নাই। আর কোন্ সাধক, ভক্ত, ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীর সম্বন্ধে একটা সমগ্র দেশ এত ভালবাসার পরিচয় দিয়াছে? বাঙ্গালী গৌরের জীবনের প্রত্যেকটী ঘটনা গানে গানে গাঁথিয়া রাখিয়াছে—জগতের আর কোন্ মহাপুরুষ এত গানের অভিনন্দন পাইয়াছেন —তিনি বঙ্গের হৃদয়ের অন্তঃপুরে যেরূপ প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেরূপভাবে এ দেশে আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না, তিনি এই জাতির যুগ-যুগান্তরের তপস্যার ফল, সাধনার সিদ্ধি, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন ও তৃষিতের বারি। নিত্যানন্দ তাঁহার সম্বন্ধে যে গানটী রচনা করিয়াছিলেন, প্রত্যেক বাঙ্গালীর প্রাণ তাহাতে সাড়া দিয়া উঠে, "ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে জন আমার প্রাণ"

সাধনাক্ষেত্রেও চৈতন্যদেব সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও অগ্রগামী। খৃষ্ট জগতে ভ্রাতৃভাব শিখাইতে আসিয়াছিলেন, মানুষের প্রতি মানুষের অবাধ প্রীতির তিনি মুক্ত পরিবেষণ করিয়াছিলেন—"তোমার প্রতিবেশীকে তোমার নিজের মত ভালবাস"—"দেবমন্দিরে পূজা লইয়া গিয়া স্মরণ কর তোমার কাহারও সঙ্গে ঝগড়া আছে কি না, সে ঝগড়া যে পর্য্যন্ত মিটাইয়া না আসিবে সে পর্য্যন্ত আমার পিতা তোমার পূজা লইবেন না," "তোমার এক গালে কেহ চড় মারিলে তাহার নিকট আর-একটা গাল ফিরাইয়া দিও—আর একটী চড় খাইবার জন্য," "কেহ পেণ্টালুন চুরি করিলে, তাহাকে কোটটা পর্য্যন্ত দিয়া আসিও"—"কেহ তোমাকে মোট মাথায় দিয়া এক মাইল বেগার খাটাইলে তাহার জন্য দুই মাইল ঘুরিয়া বেগার খাটিও।"

মানুষ-প্রীতির কথা ইহা হইতে ঊর্দ্ধে কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু মানুষের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত

হইলেই ভগবানের প্রেমের অধিকারী হওয়া যায় না। মহাবীর ও বুদ্ধদেব জগতের কীট-পতঙ্গকেও তাঁহাদের অসীম দয়ার গণ্ডী হইতে বাদ দেন নাই! খৃষ্টের উপাসকগণ মনুষ্যের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপদেশ পালন করিল। ফাদার ডোমেয়ণ কুষ্ঠীর সেবা করিয়া স্বয়ং কুষ্ঠগ্রস্ত হইলেন। বুদ্ধদেবের ভক্ত রাজা অশোক নিজে দেশ-দেশান্তরে এমন-কি ইউরোপে পর্য্যন্ত শত শত পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন। জৈন সন্ন্যাসী এখনও মাথায় ময়ূরপুচ্ছ বাঁধিয়া কীট-পতঙ্গগুলি সেই পুচ্ছ দ্বারা ঝাড়িতে ঝাড়িতে চলেন, পাছে জীবহত্যা হয়, শত শত জৈনপন্থী পিপীলিকাকে শর্করা-কণা খাওয়াইয়া থাকে, জীবে দয়া-নীতির এত বাড়াবাড়ি হইয়াছিল যে এখনও কোন কোন জৈন স্বীয় অনাবৃত দেহের রক্তমোক্ষণ করিবার সুবিধা মশক প্রভৃতি কীটদিগকে দিয়া থাকেন।

এই জগতে মানুষের প্রেম ও সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেম এইভাবে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল। মনুষ্যজাতির সঙ্গে প্রীতির ভাব সংস্থাপিত হইল—এই প্রীতির গুরু যিশু। সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া ও প্রীতির সম্বন্ধ সুদৃঢ় হইল, এই প্রীতি ও দয়ার গুরু—মহাবীর ও বুদ্ধদেব। ভারতবর্ষে বহুযুগ যাবৎ এই প্রীতির তপস্যা চলিতেছিল। ভগবানের প্রেমস্বর্গলাভের জন্য সোপানাবলী সৃষ্টি হইল। মানুষের সঙ্গে কলহ মিটাইয়া না আসিলে দেবতার দর্শন মিলিবে না, সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া না থাকিলে পশুরক্ত-রঞ্জিত পথে তাঁহার রাতুল চরণ চলিবে না। এগুলি প্রাথমিক সূত্র—ইহার অভ্যাস ও সাধনা না হইলে প্রেমের দেবতাকে কে পাইবে? য়ুরোপে মানুষের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছে—কিন্তু জীবজগৎকে তাঁহারা আত্মাহীন জড়-পিণ্ডবৎ মনে করিয়া মানুষের প্রেমের এলাকা হইতে তাহাদিগকে বাদ দিয়া গিয়াছেন।

এই দুই তপস্যা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই দুই অপরিহার্য্য প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া যখন বাঙ্গালী তাঁহাকে ডাকিল—তখন প্রেমের দেবতার আসন টলিল। ঐরাবতের শুণ্ডদণ্ডে পর্ব্বতসমান বাধা বিদূরিত হইল, তখন ধূর্জ্জটির জটা আবেগে দুলিয়া উঠিল, ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে চাঞ্চল্য দৃষ্ট হইল, বিষ্ণুর পাদপদ্মসিক্ত করিয়া গঙ্গাদেবী তাঁহার কচিৎ আবর্ত্তশোভী, কচিৎ বেণীকৃত, জলধারা লইয়া নবদ্বীপের দিকে ছুটিলেন, সেই ধারাতে শান্তিপুর ডুবু ডুবু হইয়া নদীয়া ভাসিয়া গেল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সমস্ত বঙ্গদেশ এই বন্যায় পরিপ্লাবিত হইল। আমরা দেখিতে পাই চণ্ডীদাসের পদাবলী মহাপ্রভু দিন-রাত স্বয়ং গান করিতেন এবং স্বরূপ দামোদরের মুখে সেই গান শুনিয়া সারারাত্রি একটা উদ্দাম আনন্দে কাটাইয়া দিতেন। চণ্ডীদাস সহজপ্রেম অবলম্বন করিয়া ভগবৎপ্রেমলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু নরনারীদিগকে পুনঃপুনঃ সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, এ বড় দুর্গম রাস্তা—এ পথে কেহ যেন না আসে। নর-নারীর প্রেম ভগবৎ-প্রেমের সোপান কিন্তু এই সোপান বাহিয়া উঠা একরূপ অসম্ভব, এককোটী লোকের চেষ্টা বিফল হয়—একজন সেই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। চণ্ডীদাস আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময় শত শত নর-নারী এই সহজপথের পন্থী হইয়াছেন, কিন্তু সেই তিমিরাবৃত পথ বড় বিপজ্জনক।

পালা-গানগুলিতে দেখা যায় - এই নর-নারীর প্রেম ক্রমে বাঙ্গালীর আদর্শ হইয়া এই প্রদেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। এই আদর্শ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দম্পতীকে আশ্রয়হীন ও নিম্নগামী করিয়াছে, কচিৎ আশ্রয় দিয়াছে।

চণ্ডীদাস এই নরনারীর প্রেমের জন্য যে কণাপ্রমাণ রন্ধ্র রাখিয়াছিলেন—লোকহিতৈষী পতিতপাবন প্রেমগুরু সেই রন্ধ্রটীও রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তিনি অতি পরিষ্কার স্বরে বলিলেন—

> "প্রেম প্রেম করে লোক প্রেম জানে কেবা
> প্রেম করা কি হয় রমণীর সেবা।
> অভেদ পুরুষনারী যখন জানিবে,
> তখন প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিবে।
> বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব শুন মন দিয়া,
> যার অল্প হিল্লোলে জুড়ায় দগ্ধ হিয়া।"

সামান্য দীপশিখা দ্বারা কীটপতঙ্গের পথ দেখান চলিতে পারে, কিন্তু ভগবান ক্ষুদ্রতম কীটের জন্যও

চন্দ্রসূর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ক্ষুদ্রের জন্য অল্প ব্যবস্থা করেন নাই। মহাপ্রভুও সেইরূপ মানুষকে একেবারে ঊর্দ্ধতম স্বর্গের সন্ধান দিয়াছেন, তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসাদ-কণা বিতরণ করেন নাই—একবারে জাতিবর্ণ নির্ব্বিচারে সকলকে সুধাভাণ্ড লইয়া আহ্বান করিয়াছেন। বলার মত বলিতে পারিলে কোন বড় কথাই মাথা ডিঙ্গাইয়া যায় না, জনসাধারণকে আমরা যত মূর্খ মনে করি—তাহারা তত মূর্খ নহে। পরমহংসদেব যখন উপনিষদের কথা যাকে-তাকে বলিতেন, তখন ষড়দর্শনের সারকথা তারা অনায়াসে বুঝিয়া যাইত।

এ জাতি প্রেমের তপস্যায় ততটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল যাহাতে প্রেমের সর্ব্বোচ্চতত্ত্বে তাহারা সায় দিতে পারিত, এজন্য যে কথা 'বলি বলি ক'রে বলা হ'ল না,' যে কথা ফুলের কুঁড়ির মত ফুটিতে যাইয়া মুদিত ছিল—সেই কথা যখন অপূর্ব্ব ছন্দে তিনি বলিলেন, তখন শত শত লোক তাঁহার পিছন পিছন পাগল হইয়া ছুটিল। কুলিয়া গ্রামে শতসহস্র লোকের ভিড়ে পাকাবাড়ীর ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল, গঙ্গা পাড়ি দিতে যাইয়া সেই উন্মত্ত জন-সঙ্ঘ, নৌকা ডুবাইয়া দিল। যে রাত্রে কাজির নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনের দল নদীয়া-পরিক্রম করিয়াছিল—সেই রাত্রে লক্ষ লোক তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিল,—কুলবধূরা পাগলের ন্যায় মশাল হাতে করিয়া তাঁহার মুখারবিন্দ দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছিল। হরিনাম করিতে করিতে অশ্রুপ্লাবিতমুখে মাথা ঢুলাইয়া তিনি যে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, শত শত মশাল হস্তে নরনারী তাঁহার সে দেবোপম মূর্ত্তি দেখিবার জন্য ভিড় করিতেছিল। যে রাত্রে বাসুদেব দত্তের গৃহে তিনি রুক্মিণীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন, কৃষ্ণবিরহের জীবন্ত-মূর্ত্তি কৃষ্ণ-প্রিয়ার ভাবে অনুভাবিত হইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রেম-লিপি লিখিতেছিলেন, সে লিপি চক্ষুজলে মুছিয়া যাইতেছিল—সেই রাত্রে সেই উদ্দাম অপূর্ব্ব অভিনয় দর্শন করিতে করিতে যখন প্রভাত হইয়া গেল—তখন দর্শকবৃন্দ "এত শীঘ্র রাত্রি কেন শেষ হইল" বলিয়া পূর্ব্বাকাশে অরুণদেবকে বন্দনা না করিয়া গঞ্জনা করিয়াছিল। যে দিন শান্তিপুর হইতে সন্ন্যাসীবেশে তিনি কুলিয়াগ্রামে আসিতেছিলেন, সে দিন শত সহস্র লোকে তাঁহার পদধূলি কুড়াইয়া বহুক্রোশ ভূমিতে অনতিগভীর একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল।

ভালবাসার উৎস স্থানের তিনি সন্ধান দিয়াছিলেন, এই উৎসের সন্ধানে কত মুনি-ঋষি কত যুগ যাবৎ সন্ধান দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন—কিন্তু কেহ তাহা দিতে পারেন নাই, তিনি সেই উৎসের মূলে আপামর সাধারণকে লইয়া গিয়াছিলেন, এজন্য তাহারা তাঁহাকে এত ভালবাসিয়াছিল। "মানুষ দারাপুত্রকন্যাকে ভালবাসে," স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখিয়াছিলেন,—"কিন্তু ভগবানকে তৎপূর্ব্বে বা পরে কে এমন করিয়া ভালবাসিয়াছে?" এত কান্না এত বিরহ-ব্যথা, এত শোক—দারাপুত্রকন্যা অপেক্ষা শতগুণ বেশী ভালবাসা,—কি কখন কেহ ভগবানকে দেখাইতে পারিয়াছে? নবমেঘোদয়ে ময়ূরী উতলা হয়, নবমেঘোদয়ে চৈতন্যের মত চেতনা হারাইয়া নবমেঘকে তাহার প্রেমাস্পদ ভাবিয়া কে এমন করিয়া দু'বাহু বাড়াইয়া ধরিতে গিয়াছে? কে কবে সত্য সত্য তমালকে আলিঙ্গন দিয়া প্রেমাস্পদকে পাইয়াছি বলিয়া তিনদিন তিনরাত অজ্ঞান হইয়া এমনভাবে প্রিয়ার সঙ্গে মিলনসুখে আত্মহারা হইয়াছে? কবির স্বপ্ন-লব্ধ আদর্শ তপস্বীর যুগব্যাপী চেষ্টার সিদ্ধি—তিনি জীবনে দেখাইয়াছেন। প্রফুল্ল পুষ্প ভ্রমরকে আহ্বান করে, চন্দ্র বারিধিকে বিপুল উচ্ছ্বাসের সহিত আহ্বান করে, মহাপ্রভুর প্রেমময় মূর্ত্তি সেইরূপ ভগবানের দিকে আপামর সাধারণকে আহ্বান করিয়াছে। তিনি বিশেষভাবে কোনস্থানে বক্তৃতা করেন নাই—তিনি অঙ্গুলিসঙ্কেতে যাহা দেখাইয়াছেন, সকলে তাহা দেখিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কৃষ্ণকমল ইঁহারই শ্রীমূর্ত্তির একখানি নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছিলেন; সেই মূর্ত্তির নাম দিয়াছিলেন 'রাই-উন্মাদিনী'। এখানে রাধা চৈতন্যের মহাভাবকে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন, কবিরা যে লিখিয়াছিলেন "জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর", কিংবা "বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল",—এগুলি শুধু কাব্যকথা নহে, এই রস অনাস্বাদিত নহে। কৃষ্ণকমলের রাধা মেঘ দেখিয়া যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহা গম্ভীরায়

স্বরূপ দামোদর ও রামরায়ের কাছে চৈতন্য যে বিলাপ-কাকলী করিয়াছেন সেই সত্যকার কারুণ্যে ভরপূর; সেই অপূর্ব্ব বিলাপের লহরে লহরে যে কারুণ্য, তাহার মত মর্ম্মস্পর্শী কবিতা জগতে দুর্লভ। কিন্তু কৃষ্ণকমল-বর্ণিত [illegible] বুঝিতে হইলে চৈতন্য-চরিতামৃত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়া দরকার, নতুবা কবির সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিতে হইবে "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরের ধার।"

বিশ্ববিদ্যালয়পঞ্জীর একপৃষ্ঠা

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে, যাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অনেকেরই নাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, লালবিহারী দে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভোলানাথ চন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি অসংখ্য প্রতিভাশালী মহাপুরুষ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তাঁহাদের প্রতিভার ও মনীষার অনপনেয় প্রভাবরেখা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনগণের মুখে শুনা যায় যে সেকালে যেরূপ ও যত প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পরবর্ত্তী যুগে সেরূপ ও তত প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহারা বলেন বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পুঁথিগত বিদ্যার শিক্ষা দেন, মনুষ্য গঠন করেন না। আবার নবীনগণ বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই, যখন বিদ্যালয়ের আয়তন [illegible] এবং আসবাব যৎসামান্য ছিল তখন পুঁথিগত বিদ্যাই শিখান হইত কিন্তু এখন বড় বড় বিদ্যালয়গৃহে, বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত গবেষণাগারে, উচ্চ বেতনের অধ্যাপকদিগের নিকট হইতে ছাত্রগণ যে শিক্ষা লাভ করিতেছেন তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। এই উভয়দলের কথা শুনিয়া হঠাৎ এই ধারণা হয় যেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের পূর্ব্বে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইত তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-পঞ্জীর একটী পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখা যাউক এ ধারণা কতদূর ভিত্তিমূলক।

বোম্বাই এর বণিক্ সম্রাট প্রাতঃস্মরণীয় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে দুই লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া উহার উপস্বত্ব উচ্চশিক্ষায় উৎসাহদানের জন্য ব্যয় করিতে অনুরোধ করেন। ফলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হয়। এই প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার বলিয়া বিবেচিত হন। আমরা প্রথম ত্রিশ বৎসরের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারীদের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিব তাঁহারা যথার্থই উচ্চশিক্ষার গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কি না। এই সঙ্গে ইহাও পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য যে যাঁহারা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন বা উক্ত পরীক্ষা দেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে [illegible] জীবনের পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

"এম্-এ" উপাধিধারীদের মধ্যে কাশ্মীরের রাজমন্ত্রী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত ব্যবহারাজীব ও দানবীর স্যর রাসবিহারী ঘোষ, সমালোচকশ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসু, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ

সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, বিখ্যাত দেশনায়ক ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অক্লান্তকর্ম্মী স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, দার্শনিকশ্রেষ্ঠ স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, কুশাগ্রবুদ্ধি স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি মনীষিগণ এবং বি-এ উপাধিধারীদের মধ্যে প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবিসম্রাট্ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির কথা স্মরণ করিলে ইহা সহজেই প্রতীত হইবে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী নহেন এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা পাণ্ডিত্যে, প্রতিভায় ও মনীষায় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারীদিগের সহিত তুলনায় তাঁহাদের অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহেন, হয় তো শ্রেষ্ঠ। আমরা কেবল আলোচনায় সুবিধার জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারীদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়া লইলাম, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাদিগকেই শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব-চিহ্নে ভূষিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রথম প্রদত্ত হয়—৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে। ইনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে প্রথমশ্রেণীর প্রথম হইয়া এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি হাইকোর্টের বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী সর্ব্বাধ্যক্ষ প্রসিদ্ধতর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নহেন। ইনিও হাইকোর্টের উকীল ছিলেন এবং ইংরাজী দর্শনাদিতে এবং আইনে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত না হইলে যে এককালে স্যর রাসবিহারী ঘোষের ন্যায় অদ্বিতীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রবিশারদ হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহার পাণ্ডিত্যের সামান্য নিদর্শন "On the Position of Women in Bengali Society" নামক প্রস্তাবে এবং মুখার্জ্জীর ম্যাগেজিনে দুই-একটী প্রবন্ধে মাত্র রক্ষিত আছে। ইনি কিছুকাল বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পুণ্যস্মৃতি ৺আনন্দমোহন বসু এই বৃত্তি লাভ করেন। পিতৃবিয়োগের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করিতে না পারিলেও ইনি পরবর্ত্তী সকল পরীক্ষায়—এফ-এ, বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষায়—প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা দেখিয়া শিক্ষকগণ চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি বিতরণকালে ভাইস চান্সেলর মহোদয় উচ্চকণ্ঠে ইঁহার প্রশংসা করেন। তৎপরে তিনি কেম্ব্রিজে উচ্চগণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম র‍্যাংলার হন। ইনি অসুস্থতানিবন্ধন পরীক্ষায় নবমস্থান অধিকার করেন বটে, কিন্তু শিক্ষকগণ ও সতীর্থরা মনে করিয়াছিলেন তিনিই প্রথম স্থান অধিকার করিবেন। অতঃপর ব্যারিষ্টার হইয়া তিনি এদেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি মনে করিলে ব্যবহারাজীবরূপে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাঁহার অধিকাংশ সময় দেশবাসীর শিক্ষার উন্নতি ও রাজনীতিক অধিকার বিস্তারের চেষ্টায় ব্যয়িত

করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তিনি প্রথম সভাপতি ছিলেন ও উহার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট যত্ন লইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সাধু নীরবকর্ম্মী প্রায় দেখা যায় না। আমরা যখনই মনে করি বিশ্ববিদ্যালয় আনন্দমোহনের ন্যায় একজন ব্যক্তিকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, তখনই মনে হয় এই বিশ্ববিদ্যালয় তাহার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৺গৌরীশঙ্কর দে এই বৃত্তি লাভ করেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী উজ্জ্বল রত্ন। বি-এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ইনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এম্-এ পরীক্ষায় গণিতশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইনি আনন্দমোহনের এক বৎসর পূর্ব্বে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও তাঁহার এক বৎসর পরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ইঁহার গণিতশাস্ত্রের অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা বাঙ্গালী শীঘ্র ভুলিবে না। গণিতের অধ্যাপক রূপে ইনি সহস্র সহস্র শিষ্যের শ্রদ্ধা ও ভক্তি
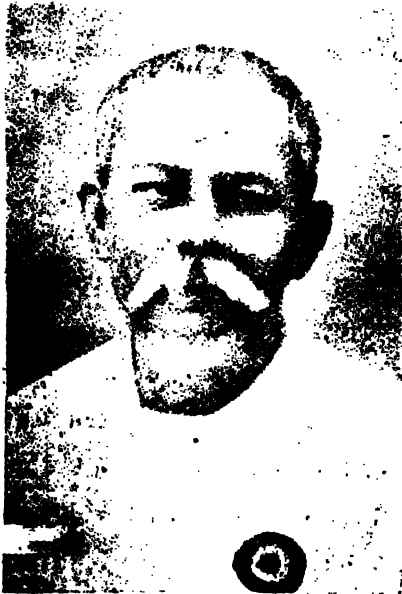
অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে

করিয়াছেন। ইনি অর্থের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া সামান্য বেতনে জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কিরূপে গণিতের অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার শিষ্যগণের অবিদিত নাই। আমরা কিঞ্চিদধিক পঞ্চবর্ষকাল ইঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া গণিতশাস্ত্রে উপদেশলাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। গাধা পিটিয়া কিরূপে ঘোড়া করিতে হয় তাহা তিনি যে বিলক্ষণ জানিতেন সে সম্বন্ধে আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। এম্-এ পড়িবার সময় আমরা প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় শিক্ষকের নিকটও গণিতশাস্ত্রে উপদেশ লইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। গণিতের কোনও কোনও দুরূহ প্রশ্নের সমাধান উভয়েই করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু গৌরীশঙ্কর যেরূপ সরল ও সহজ প্রথায় প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিতেন তাহাতে বিস্মিত হইতাম। তিনি তাঁহার বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালটুকু এম-এ পরীক্ষার্থীদের জন্য ব্যয় করিতেন। গ্রীষ্মের বা পূজার অবকাশেই এম্-এ পরীক্ষার্থীদের জন্য তিনি দৈনিক তিন ঘণ্টা সময় ব্যয় করিতে পারিতেন। তাঁহার গণিতবিষয়ক গ্রন্থগুলি তাঁহার অসামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়। মানুষ হিসাবে এরূপ সরল, নিরহঙ্কার ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। 'Plain living and high thinking' এর এমন জীবন্ত আদর্শ সর্ব্বদা দৃষ্টির সম্মুখে থাকায় আমাদের জীবনের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অনেক সময় আমরা বলসঞ্চয় করিতে পারিয়াছি। যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ ব্যক্তির সৃষ্টি করিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ৺সারদাচরণ মিত্র প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ইনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইঁহার এক বৎসর পূর্ব্বে কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম এবং বি-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় ইংরাজিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইঁহার হস্ত হইতে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ছিনাইয়া লইবার জন্য সারদাচরণ বি-এ পরীক্ষায় কয়েক মাস পরেই ইংরাজীতে এম্-এ পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করেন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিকচন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি হস্তগত করেন। ইনি পরে হাইকোর্টের উকীল ও কিছুকাল বিচারপতি ছিলেন। কিন্তু দেশের মঙ্গলকর নানাবিধ প্রতিষ্ঠানে

নেতৃত্ব করিয়া তিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে তাঁহার পূর্ব্বগামী প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারীরা কেহ তাঁহার ন্যায় চেষ্টা করেন নাই। ইঁহার চেষ্টায় প্রাচীন কবিগণের পদাবলী সংগৃহীত ও সুসম্পাদিত হইয়াছিল এবং ইঁহার নেতৃত্বে বহু বৎসর থাকিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ উপকৃত হইয়াছিল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৺কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। ইঁহার ছাত্রজীবনের কৃতিত্বের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি মেদিনীপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৺গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় এই বৃত্তি লাভ করেন। ইনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এফ-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয়, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সারদাচরণ মিত্রের সহিত একত্রে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি পরে হাইকোর্টের উকীল হইয়া আলীপুরে প্র্যাকৃটিস করেন। ইনি কিছুকাল 'সাধারণী'-সম্পাদনে সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়-চন্দ্র সরকারের সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৃত্তি লাভ করেন। ইনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এফ-এ পরীক্ষায়

বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৩য় স্থান, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় ৩য় স্থান এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এম্-এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভের পর কিছুকাল প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপনা করিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন এবং পরে বিচার-বিভাগে চাকুরী করেন। ইনি সবজজ হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কেহই এই বৃত্তিলাভের উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল এই উপাধি লাভ করেন। ইনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ হইতে এম্-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম বিভাগে প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে আর কোনও ছাত্র ইতঃপূর্ব্বে এই বৃত্তি লাভ করেন নাই। উমেশচন্দ্র পরে ষ্ট্যাচুটারী সিভিলিয়ান হইয়া তৎকালে দুর্লভ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণার ফল বাঙ্গালায় প্রকাশিত করিয়া তিনি মাতৃভাষাকে যে সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য তিনি বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দুইজন এই বৃত্তি পান,—(১) মুলরাজ। ইনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লাহোর কলেজ হইতে ইংরাজীতে দ্বিতীয় বিভাগে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং গবর্ণ-মেণ্টের শাসন-বিভাগে কার্য্য লন।

নন্দকৃষ্ণ বসু

(২) ৺নন্দকৃষ্ণ বসু। ইনি মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত ব্যবহারাজীব ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের সহোদর। ইনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এফ-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয়,১৮ ৫ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে গণিতশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি কিছুদিন পাটনা কলেজে অধ্যাপনা করিয়া ষ্ট্যাচুটারী সিভিলিয়ান হন এবং যথাসময়ে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অল্প বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার Incarnation নামক ইংরাজী প্রস্তাবটী তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ৺প্রসন্নকুমার লাহিড়ী প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। ইনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি বহু বৎসর মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে (এক্ষণে বিদ্যাসাগর কলেজ) ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। কলেজ-পাঠ্য ইংরাজী বহু পুস্তকের সুন্দর টীকা ও ব্যাখ্যাপুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী ছাত্রদিগের এইসকল পুস্তকপাঠে বিশেষ উপকার হইত। আমাদের মনে পড়ে জেনারেল এসেম্ব্রিজ ইনষ্টিটিউসনে আমাদের পঠদ্দশায় উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত (ব্রুস অব গ্রেঞ্জহিল স্কলার) ডাক্তার জন মরিসন ইংরাজী পড়াইবার সময় ইউরোপীয় টীকাকারদিগের গ্রন্থ না দেখিয়া অনেক সময়ে লাহিড়ীমহাশয়ের পুস্তকের সাহায্য লইতেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রিঙ্গল্ কেনেডি নামক একজন য়ুরোপীয় এই বৃত্তি লাভ করেন। ইনি এলাহাবাদে অধ্যাপনা করিতেন। ইনি বোধ হয় পরে বিচার-বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৺নীলকণ্ঠ মজুমদার এই বৃত্তি লাভ করেন। ইনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পি-আর-এস বৃত্তি লাভের পর ইনি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করেন এবং নানা স্থানে অধ্যাপনা করিয়া কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। গীতা সম্বন্ধে ইঁহার একটী মূল্যবান গ্রন্থ আছে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৺সূর্য্যকুমার অগস্তি এই বৃত্তি লাভ করেন। ইনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় ২য় স্থান এবং পরবৎসর এম-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনিও ষ্ট্যাচুটারী

সূর্য্যকুমার অগস্তি

সিভিলিয়ান হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত, পারসী, ফরাসী, লাটীন প্রভৃতি বহুভাষায় পণ্ডিত ছিলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৺আশুতোষ গুপ্ত এই বৃত্তি লাভ করেন। ইনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এফ-এ পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে গণিতশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করিলেও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনিও ষ্ট্যাচুটারী সিভিলিয়ান হইয়াছিলেন। অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কেহ বৃত্তি পান নাই।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৺রামচন্দ্র মজুমদার এই বৃত্তি লাভ করেন। ইনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় গণিতশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন এবং কিছুদিন

এই কোর্টে বিচারপতির আসনও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে শাস্ত্রী) প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ইনিও ৺উমেশচন্দ্র বটব্যালের ন্যায় সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইনি পরে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইনি সাহিত্য-সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং ইঁহার রচিত প্রবন্ধাদি ইঁহার পাণ্ডিত্য,

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

সূক্ষ্মসমালোচনশক্তি ও চিন্তাশীলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৺ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বৃত্তি পান। ইঁহার সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী নাই যাঁহার নিকট ইঁহার কীর্ত্তিকাহিনী অপরিচিত, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইনি বি এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় গণিতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবৎসর তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে এম-এ উপাধি লাভ করিয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। পরে বি-এল ও ডি-এল পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের উকীল হন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, হাইকোর্টের বিচারপতি ও পরে প্রধান বিচারপতির কার্য্য করিয়াও তিনি দেশের বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিয়াছিলেন। বহু বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিত্তালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ও উহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

তাঁহারই চেষ্টায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি-পরীক্ষাতেও স্থান পাইয়াছে। যে বিশ্ববিদ্যালয় অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেও এরূপ একজন মহাপুরুষের সৃষ্টি করিতে পারে, সে বিশ্ববিদ্যালয় অবজ্ঞার বস্তু নহে।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ৺রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বসু উক্ত বৃত্তি লাভ করেন। ইনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম বিভাগে প্রথমস্থান এবং পরবৎসর এম-এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া

রায় অবিনাশচন্দ্র বসু বাহাদুর

ছিলেন। ইনি কিছুকাল অধ্যাপনা এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী করিবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের কণ্ট্রোলার নিযুক্ত হন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও প্রেমচাদ রায়চাদ বৃত্তি পান। ইনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এফ-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয়, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নে প্রথম বিভাগের প্রথম ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় পদার্থ-বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি পরে রিপণ কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ হন। জটিল বিষয় সরল ও সহজ ভাষায় বুঝাইবার ইঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। ইনি আজীবন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—কখনও পত্রিকাধ্যক্ষ, কখনও সম্পাদক এবং কখনও সভাপতিরূপে। ইনি বাঙ্গালা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সাহিত্যে বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয়ে যেসকল মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ইঁহার অকাল মৃত্যু বঙ্গবাসীর দুর্ভাগ্যের বিষয়।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কেহ বৃত্তি পান নাই।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল মজুমদার সি-আই-ই মহোদয় এই বৃত্তি পান। ইনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এফ্-এ পরীক্ষায় প্রথম হন এবং সাহিত্যে ও গণিতে ডফ্ স্কলার্শিপ এবং সংস্কৃতে প্যাচেট প্রাইজ পান। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইনি বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী, গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করেন এবং সকল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঈশান স্কলারশিপ পান। ১৮৮৯ ষ্টাব্দে ইনি গণিতশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পরবৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর ইনি ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-বিভাগে প্রবেশ করিয়া বহুপ্রদেশের একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের দায়িত্বপূর্ণ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল মজুমদার

কার্য্য প্রশংসার সহিত সম্পাদন করেন। আমরা বহু বৎসর ইঁহার অধীনে কার্য্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং পরিণত বয়সেও ইঁহার অভুত পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। তিনি হিসাব-বিভাগে অনেক সংস্কার সাধিত করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ৩০০০৲ টাকা মাসিক বেতনে প্রথম শ্রেণীর একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল পদে উন্নীত হন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহার গুণের ও সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ইঁহাকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি অবসরগ্রহণ করিয়া এখন প্রধানতঃ হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থাদির আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেছেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনজন এই বৃত্তি পান, যথা,—ই-এম্ হুইলার, জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ই-এম হুইলার—সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত ও দেশনায়ক রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিদ্যালয়-পরিদর্শিকা মনোমোহিনী হুইলারের পুত্র। ইনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী ও ল্যাটিনে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পান এবং শেষোক্ত বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইনি ল্যাটিনে এম-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভের পর ইনি ইংরাজীর অধ্যাপক হন এবং পরে বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইনি আত্মহত্যা করেন।

৺জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য—ইনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বি-এ

জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য

পরীক্ষায় ইংরাজী, সংস্কৃত ও দর্শনে অনার্স পান এবং প্রথম দুই বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইনি পরে রিপণ কলেজে আইন ও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যুর পর ইনি রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ হন। ইঁহার

অধ্যাপনা-প্রণালী অতি সুন্দর ছিল। ইনিও অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—ইঁহার পরিচয়-প্রদান নিষ্প্রয়োজন। এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী নাই যিনি বঙ্গমাতার এই সুসন্তানের নাম শ্রবণ করেন নাই। ইনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী, সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্র এই তিন বিষয়ে অনার্স লন এবং সকল বিষয়েই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ইনি সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রে প্রথম স্থান এবং ইংরাজীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর তিনি ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভের পর ইনি বি-এল পরীক্ষা দেন, উহাতেও প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী হন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ন্যায় ইনিও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইঁহার দার্শনিক ও অন্যান্য প্রবন্ধাবলী ইঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্মসমালোচনাশক্তির পরিচয় দেয়। সুবক্তারূপেও ইনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত মোহিনীকান্ত ঘটক এই বৃত্তি পান। ইনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে প্রথম শ্রেণীর সম্মান পান এবং গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সকল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি এম-এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পর বৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ইনিও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল মজুমদারের ন্যায় ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-বিভাগে প্রবেশ করিয়া অবশেষে প্রথম শ্রেণীর একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের পদে উন্নীত হন। ইঁহারও অধীনে আমরা বহুবৎসর কার্য্য করিবার অবসর পাইয়াছি এবং ইঁহার বিবিধ গুণাবলী প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসরগ্রহণ করিবার পর বড়োদার গুইকোয়ার ইঁহাকে কিছুদিনের জন্য রাজস্ব-সচিব করিয়া লইয়া যান। ইনি এক্ষণে অবসরকাল নানা গ্রন্থপাঠে অতিবাহিত করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মোহিনীকান্ত ঘটক

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্স মেরী হল্যাণ্ড এই বৃত্তি পান। ইঁহার পূর্ব্বে বা পরে আর কোনও মহিলা এই বৃত্তি পান নাই। ইনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী ও ল্যাটিনে প্রথম শ্রেণীর সম্মান পান এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় ল্যাটিনে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইনি শিক্ষা-বিভাগে বিদ্যালয়-পরিদর্শিকার পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

আচার্য্য অশ্বঘোষ

শ্রীনীহাররঞ্জন মিত্র

আনুমানিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সমস্ত বৌদ্ধভিক্ষু ও দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কবিবর অশ্বঘোষের স্থান ছিল অতি উচ্চে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে চারিজন ব্যক্তি "সূর্য্যতুল্য" বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। সর্ব্বপ্রথম তিনিই মহাযান-সম্প্রদায়ের উদারনৈতিক মতবাদ প্রচার করেন। যে পর্য্যন্ত না জগতের সমস্ত প্রাণী নির্ব্বাণলাভ করিতে পারে সে পর্য্যন্ত নির্ব্বাণলাভের উপযুক্ত হইলেও কেহ নির্ব্বাণগ্রহণ করিবেন না, অশ্বঘোষ তাঁহার 'সৌন্দরনন্দ কাব্যে' এই কথা প্রথম প্রচার করিলেন; এই মতবাদের উপরই মহাযান-সম্প্রদায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

অশ্বঘোষ ভারতীয় পণ্ডিত হইলেও ভারত অপেক্ষা চীনে এবং তিব্বতেই তাঁহার খ্যাতি অধিক বিস্তৃত। ইহার কারণ, তাঁহার রচিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে দুই-একখানি ব্যতীত প্রায় সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে এবং চৈনিক ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া নানারূপ পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধনের দ্বারা অদ্ভুত আকারপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি যে বৌদ্ধস্থবিরগণের মধ্যে একজন বিশিষ্ট দার্শনিক ছিলেন, তাঁহার যে অসাধারণ কবিপ্রতিভা ছিল এবং মহারাজ কণিষ্কের পরিচালনায় ও ভিক্ষু-পার্শ্বের সভাপতিত্বে সমগ্র বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কাশ্মীরে যে শেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি উপস্থিত ছিলেন, এতদিন ইহাই জনসাধারণের ধারণা ছিল। ইহার অধিক কেহ বড় একটা জানিতেন না। এই সকল অস্পষ্ট ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া Prof. Kern এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে অশ্বঘোষ নামে কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন না, শিবের রূপান্তর "কাল"কে ঐ নামে অভিহিত করা হইত (১)। তাঁহার এই উক্তি যে আস্থাস্থাপনের সম্পূর্ণ অযোগ্য সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে অশ্বঘোষের বাল্যনাম যে "কাল" ছিল এ কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন (২)।

অশ্বঘোষ কিন্তু পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট আজ আর অপরিচিত নহেন। বিস্মৃতির কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে যিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী আত্মগোপন করিয়াছিলেন, জগতের অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের একাগ্রসাধনার ফলে আজ তিনি লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়াছেন।

অশ্বঘোষ যে ঠিক কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সে কথা নিশ্চিতভাবে আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। ভারতীয় পণ্ডিতগণ দার্শনিক বিষয়ে এতই মত্ত থাকিতেন যে, তাঁহারা নিজেদের কথা পর্য্যন্ত লিখিতে ভুলিয়া যাইতেন। বৌদ্ধযুগ ভারতের ইতিহাসে অতি গৌরবময় যুগ। কিন্তু এমনই অন্ধকারে ইহার ইতিবৃত্ত সমাচ্ছন্ন যে তন্মধ্য হইতে অশ্বঘোষের ন্যায় মনীষী ব্যক্তিরও অবস্থিতি-কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ই-ৎসিং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে (৩) ভারতে আগমন করেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ-

অবস্থিতিকাল

কাহিনীতে প্রাচীন আচার্য্যগণের নামের সহিত অশ্বঘোষের নামের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব প্রভৃতি অন্যান্য বৌদ্ধাচার্য্যগণের পূর্ব্বে 'অশ্বঘোষ' বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি তাঁহাকে কবি বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে তাঁহার রচিত স্তোত্রসমূহ এবং "বুদ্ধচরিত" কাব্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ে অতি শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইত (৪)। "বসুবন্ধুর জীবনচরিত" গ্রন্থে (৫) লিখিত

(১) Der Buddhismus und siene Geschichte in Indien—Vol. II, pp. 464.

(২) Indian Antiquary, 1903. (৩) Keith বলেন ৬৭১-৯৫ খৃষ্টাব্দে। (৪) M. Fujishama—Journ. Asiat. 1888. pp. 425. (৫) এই পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় কে প্রণয়ন করেন তাহা জানা যায় না। পরমার্থ ৫৪৬ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমভারত হইতে চীনদেশে পর্য্যটন করিতে গমন করেন। সেই সময় তিনি চৈনিক ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।

আছে যে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পাঁচশত বৎসর পরে কাপিন দেশে (কাশ্মীরে) বৌদ্ধগণের এক সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় ৫০০ জন অর্হৎ এবং ৫০০ জন বোধিসত্ত্ব উপস্থিত ছিলেন। উহার সভাপতি ছিলেন কাত্যায়নী-পুত্র এবং সহ-সভাপতি ছিলেন অশ্বঘোষ। ঐ সভায় পণ্ডিতগণ "সর্ব্বত অহিধর্ম্ম" সঙ্কলন করেন এবং "বিভাষা" নামে ইহার একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। সমাপ্ত হইলে অশ্বঘোষ উহা প্রস্তরফলকে লিখিয়া রাখেন (১)। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৪৮৭ অব্দে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন; সুতরাং ঐ গণনানুসারে অশ্বঘোষ খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

E. B. Cowel তৎসম্পাদিত "বুদ্ধচরিত" কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে ঐ কাব্যখানি খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিকভাষায় অনূদিত হয়। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে উহা ভারতীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে বিশেষ সমাদরলাভ করিয়াছিল; সুতরাং উহার গ্রন্থকার (অশ্বঘোষ) অন্ততঃ-পক্ষে আরও দুই-এক শতাব্দী পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

Prof. Levi অশ্বঘোষকে কণিষ্কের সমসাময়িক বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতে কণিষ্ক খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে বর্ত্তমান ছিলেন (২)। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, অশ্বঘোষের আশ্রয়দাতা কণিষ্ক খৃঃ ৩২০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

এইরূপ বিভিন্ন সূত্র হইতে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যে, অশ্বঘোষ কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার "সূত্রালঙ্কার" গ্রন্থে এমন দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে মনে হয় কণিষ্ক তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। তবে Keith এই সমস্যার এইভাবে সমাধান করিয়াছেন যে, কণিষ্ক অশ্বঘোষের সমকালীন হইলেও তিনি তাঁহার পূর্ব্বেই পরলোকগমন করেন অথবা তাঁহাদের পূর্ব্বেও কণিষ্ক নামধারী অপর এক ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন (৩)। কণিষ্কের সময়ে লিখিত একখানি শিলালিপিতে "অশ্বঘোষরাজ" নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। অশ্বঘোষ এবং অশ্বঘোষরাজ একই ব্যক্তি কি না সে বিষয়ে Keith সন্দেহপ্রকাশ করিলেও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত "সৌন্দরনন্দ" কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "সারনাথের অশোকস্তম্ভে ক্ষোদিত শিলা-লিপিতে 'রাজা অশ্বঘোষ' নামে এক ব্যক্তি (কণিষ্কের রাজত্বের ?) চত্বারিংশৎ বৎসরে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। ঐ ব্যক্তিকে আমাদের গ্রন্থকার (অশ্বঘোষ) বলা যাইতে পারে, কারণ সিদ্ধপুরুষগণ বর্ত্তমান যুগেও রাজা বা মহারাজ উপাধি পাইয়া থাকেন। সুতরাং অশ্বঘোষের ন্যায় মহাপুরুষ যে রাজা- উপাধি পাইবেন তাহা আর বিচিত্র কি ?"

অশ্বঘোষ প্রণীত "মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র" নামক গ্রন্থখানি লুপ্ত হইয়াছে। জাপানী পণ্ডিত সুজুকি উহার A Discourse on the Awakening of Faith in the Mahayana (সংক্ষেপে Awakening of Faith) নামে ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। ঐ অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বহু চৈনিক গ্রন্থ ও প্রবাদাবলী হইতে অশ্বঘোষ-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিয়াছেন।

(ক) লি-তাই-সান-পাপ-চি (১) (Record of the Triratna under Successive Dynasties) নামক গ্রন্থে "সর্ব্বাস্তিবাদিন্" সম্প্রদায়ের বিবরণ হইতে

চৈনিক গ্রন্থাবলী হইতে তাঁহার অবস্থিতিকাল নির্ণয়

উল্লিখিত হইয়াছে যে, নির্ব্বাণের ৩০০ বৎসর পরে পূর্ব্বভারতে অশ্বঘোষ বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সংসারত্যাগ করিবার পর তিনি সমস্ত তৈর্থিক মত (২) খণ্ডন করেন এবং "মহা-অলঙ্কারশাস্ত্র" নামক গ্রন্থ (৩) প্রণয়ন করিয়া বুদ্ধের মত

(১) Watters on Yuan Chwang—Vol. I. pp. 278. (২) Keith's History of Sanskrit Drama. pp. 58. (৩) History of Sanskrit Literature, pp. 55.

(১) এই গ্রন্থ ফি-চাং-ফাং কর্ত্তৃক ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে সংকলিত। (২) তির্থক শব্দের অর্থ সন্ন্যাসী। প্রথমেই এই শব্দে দিগম্বর জৈনসম্প্রদায়কে বুঝাইত। পরে সমস্ত বিরুদ্ধমতবাদীদিগকে বুঝাইত। চৈনিক ভাষায় উহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে বুঝায়। (৩) এই গ্রন্থ কুমারজীব কর্ত্তৃক ৪০৫ খৃষ্টাব্দে চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয় কুমারজীব খৃঃ ৩৩১ হইতে ৪১৩ খৃঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

বহুলভাবে প্রচার করেন। ঐ গ্রন্থে কয়েকশত "গাথা" আছে।

(খ) হুই-ইয়েন (১) কুমারজীবের উক্তি প্রামাণ্য স্বরূপ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, নির্ব্বাণের ৩৭০ বৎসর পরে অশ্বঘোষ আবির্ভূত হন।

(গ) "মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র" গ্রন্থের দ্বিতীয় চৈনিক অনুবাদের ভূমিকালেখক (২) বলিয়াছেন যে, নির্ব্বাণের ৫০০ বৎসর পরে অশ্বঘোষ জন্মগ্রহণ করেন।

(ঘ) মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রের চৈনিক অনুবাদক সাঙ্ য়িঙ (৩) লিখিয়াছেন যে ধর্ম্মান্ধতার যুগ শেষ হইলে অর্থাৎ নির্ব্বাণের ৫০০ বৎসর পরে অশ্বঘোষ আবির্ভূত হন।

(ঙ) ফু-ৎসাউ-ৎউঙ্-চি (৪) (History of Buddhism, Vol. V) নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "নির্ব্বাণের ৬০০ বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিচালনার ভার অশ্বঘোষের উপর পতিত হইবে" ভগবান্ তথাগতের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছিল।

(চ) অবতংসক-সম্প্রদায়ের বিখ্যাত পরিচালক এবং শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রের ভাষ্যকার সুপণ্ডিত ফা-ৎসাঙ্ উপরি-উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়াছেন।

(ছ) পরমার্থের অনুকারী চিহ্-ক'আই শ্রদ্ধোৎপাদ-শাস্ত্রের অনুবাদকালে লিখিয়াছেন যে, তথাগতের নির্ব্বাণের প্রায় ৬০০ বৎসর পরে কয়েকজন তির্থক বুদ্ধের ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। সেই সময় অশ্বঘোষ নামে একজন ধার্ম্মিক শ্রমণ......এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

(জ) এই "৬০০ বৎসরের" প্রবাদটী চীনদেশীয় এবং জাপানী বৌদ্ধদের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত। ফা-ৎস্থ-লি-তাই-তুঙ্-ৎসাই নামক গ্রন্থেও (৫) এই প্রবাদ-কেই সমর্থন করা হইয়াছে।

(১) শ্বেতপদ্মসম্প্রদায়ের নেতা। ৩৩৩ হইতে ৪১৬ খৃঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। (২) লেখকের নামের উল্লেখ নাই। (৩) ইনি কুমারজীবের একজন প্রধান শিষ্য। ৩৮২ হইতে ৪৩৯ খৃঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। (৪) চীনদেশীয় পুরোহিত চিহ্-প'আন কর্ত্তৃক লিখিত বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস। (৫) ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে নিয়েন-চাঙ্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বুদ্ধ এবং পুরুষানুক্রমিক স্থবিরগণের ইতিহাস।

"মহাযান সূত্রে" (১) উক্ত প্রবাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে:—

"বুদ্ধের মৃত্যুর পর মহামায়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন জীবিতাবস্থায় বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন কি না? আনন্দ বলিলেন, তাঁহার ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে নির্ব্বাণের পর মহাকাশ্যপ আনন্দের সহিত ধর্ম্মপিটক সঙ্কলন করিবেন এবং ইহা সমাপ্ত হইলে মহাকাশ্যপ কুক্কুটপাদগিরিতে নিরোধসমাপ্তিলাভ করিবেন। ইহার পর আনন্দও দিব্য-জ্ঞানলাভের ফলস্বরূপ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন। এই সময় সদ্ধর্ম্ম উপগুপ্তের হস্তে আসিবে। তিনি এই ধর্ম্মের মুখ্যাংশ অতি সুন্দরভাবে প্রচার করিবেন। ... ... ৬০০ বৎসর অতীত হইলে তির্থকগণের ৯০টী বিভিন্ন সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়া বুদ্ধের ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিবার জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে। এই সময় অশ্বঘোষ নামে জনৈক ভিক্ষু সুন্দরভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবেন। ৭০০ বৎসর অতীত হইলে ভিক্ষু নাগার্জ্জুন অধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া এবং জ্ঞানের বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিয়া সুন্দরভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিবেন।"

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধদার্শনিক নাগার্জ্জুন অশ্বঘোষপ্রণীত শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রের একখানি ব্যাখ্যাপুস্তক (২) প্রণয়ন করেন। তিনি বলিয়াছেন যে বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন সময়ে অশ্বঘোষ নামে ছয়জন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রের প্রণেতা-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি অর্থাৎ অশ্বঘোষ মহা-মায়াসূত্রে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে (অর্থাৎ নির্ব্বাণের ৬০০ বৎসর পরে) জগতে আসিয়াছিলেন।

চৈনিক গ্রন্থাবলীতে অশ্বঘোষ সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। ঐসকল প্রবাদে তাঁহার নাম চন্দনকনিষ্ট নামক নৃপতির সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত রহিয়াছে।

(১) এই সূত্রের অপর নাম "মাতাকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধের ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গারোহণ সূত্র"। (২) ইহার সংস্কৃত নাম "মহা-যানশাস্ত্রব্যাখ্যা" আনুমানিক ৪০১—২ খৃষ্টাব্দে চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয়।

(ক) সংযুক্তরত্নপিটক সূত্রে (১) লিখিত আছে যে তুখার প্রদেশের অধিপতি মহারাজ চন্দনকনিষ্টের (২) সহিত তিনজন বিজ্ঞব্যক্তি ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের নাম—অশ্বঘোষ, মথর (বা মদর) নামক জনৈক অমাত্য এবং বৈদ্যশ্রেষ্ঠ চরক।

প্রবাদাবলী হইতে তাঁহার অবস্থিতিকাল নির্ণয়

(খ) রাজা চন্দনকনিষ্টের সহিত অশ্বঘোষের পরিচয়ের কথা অপর একখানি চৈনিক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে:—"(সেই সময়) তুখার প্রদেশের রাজা অতিশয় শক্তিশালী হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল চন্দনকনিষ্ট। তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বলিয়া যে রাজ্য তিনি আক্রমণ করিতেন তাহাই তাঁহার পদানত হইত; সুতরাং তিনি যখন তাঁহার চতুরঙ্গ সেনা লইয়া পাটলীপুত্র অভিমুখে অভিযান করিলেন তখন ঐ রাজ্য তাঁহার পদানত হইল। তখন তিনি পরাজিত নৃপতির নিকট ৯০ কোটী স্বর্ণমুদ্রা অথবা তত্তুল্য মূল্যবান দ্রব্য দাবী করিলেন। শেষোক্ত নৃপতি অর্থপ্রদানে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষ, বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র এবং অনেকগুণশালী একটী কুক্কুট পক্ষী দান করিলেন। ঐ পক্ষীটা সম্পূর্ণ হিংসাবিরত ছিল এবং নিতান্ত ক্ষুধাপীড়িত হইলেও কোনও কীট ভক্ষণ করিত না। প্রত্যেকের মূল্য ৩০ কোটী স্বর্ণমুদ্রা নির্দ্ধারিত হইল। তুখারপতি সন্তুষ্টচিত্তে উপহারত্রয় লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(গ) অশ্বঘোষের জীবনচরিত নামক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থেও (৩) ঐ গল্পটী লিখিত আছে।

এইসকল প্রবাদাবলী হইতে সুজুকী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতের ধার্ম্মিক-সম্প্রদায়ে অশ্বঘোষের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। যে রাজা অগণিত ধনরত্নের পরিবর্ত্তে একজন ভিক্ষুকে লইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তিনি নিশ্চয়ই অতি নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ছিলেন। সিন্ধুতীর হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং নিশ্চয়ই তিনি পরিনির্ব্বাণের পর ৩০০ হইতে ৬০০ বৎসরের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। এখন বিচার্য্য এই চন্দনকনিষ্ট এবং কণিষ্ক একই ব্যক্তি ছিলেন কি না? ইহার সমর্থনকল্পে তিব্বতীয় মতের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত একটী প্রবন্ধের (১) সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পূর্ব্বোক্ত প্রবাদগুলি অপেক্ষা ইহাতে অনেকটা ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয়।

"পল্লব ও দিল্লীর অধিপতি কণিষ্ক নির্ব্বাণের ৪০০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, সংসারত্যাগী কাশ্মীরপতি সিংহ সুদর্শন নাম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধভিক্ষু হইয়াছেন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন তখন তিনি কাশ্মীরে গমন করিয়া সুদর্শনের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলেন। সেই সময় অশ্বঘোষ নামে একজন মহাযানীয় পুরোহিত বর্ত্তমান ছিলেন। সমগ্র উত্তরভারতে তাঁহার অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল। কাশ্মীর ও জলন্ধর-বিজেতা কণিষ্কের যেমন ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে অত্যন্ত প্রতাপ ছিল তেমনই অশ্বঘোষও ধার্ম্মিকমণ্ডলে মহাপ্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে আসিবার জন্য রাজা (কণিষ্ক) অশ্বঘোষকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক দূত প্রেরণ করিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ অশ্বঘোষ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না বটে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশাবলীপূর্ণ এক পত্র লিখিয়া জ্ঞানায়স্ নামক তাঁহার প্রধান শিষ্যকে দিয়া রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।"

যদিও তিব্বতীয় প্রবাদাবলীর সহিত চীনদেশীয় বিবরণ সমূহের অনেকস্থলে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তবে এক বিষয়ে উভয়েরই মিল আছে যে, অশ্বঘোষ কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে বিশেষ পরিচয় ছিল (২)।

(১) ইহার সংস্কৃত প্রণেতার নাম অজ্ঞাত। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ৭৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যেও বর্ত্তমান ছিল। ৪৭২ খৃষ্টাব্দে ইহা চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয়। (২) ভারতের তুখার প্রদেশে পর পর তিন ভ্রাতা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন কণিষ্ক। "কনিষ্ঠ" শব্দটী যদি ম্লেচ্ছকনিষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে কণিষ্ক এবং চন্দনকনিষ্ঠ একই ব্যক্তি। (৩) ইহার মূল সংস্কৃত প্রণেতার নাম অজ্ঞাত। কুমারজীব কর্ত্তৃক চৈনিক [illegible] অনূদিত হয়।

(১) Joournal of the Bnddhistc Society. vol. 1 Part III

(২) Maxmuler এর মতে কণিষ্ক ৮৫—১০৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে Lassen এর মতে খৃঃ পূঃ Princep এর মতে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে

যাহাই হউক, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, অশ্বঘোষ খৃষ্টের পূর্ব্বে ৫০ বৎসর হইতে খৃষ্টের পরে ৮০ বৎসরের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

তারানাথ (১) বলেন যে, অশ্বঘোষ সঙ্ঘগুহ নামক অর্থশালী ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা খোত্র-নিবাসী জনৈক বণিকের দশম অর্থাৎ সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। যৌবনে সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী হইলে তিনি বিদিশ গৌড়, তীরহুতি, কামরূপ ও অন্যান্য কয়েকটী দেশে ভ্রমণ করিয়া ঐসকল দেশীয় বৌদ্ধপণ্ডিতগণকে নিজের অসামান্য মনীষাদ্বারা তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতে লাগিলেন। উপরি উক্ত সমস্ত প্রদেশই পূর্ব্বভারতে অবস্থিত।

তাঁহার বাসস্থান ও ভ্রমণ

কিন্তু "বসুবন্ধুর জীবন-চরিত" গ্রন্থে অশ্বঘোষকে শ্রাবস্তীর অন্তর্গত তাবিত নামক স্থানের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। নাগার্জ্জুনপ্রণীত মহাযানশাস্ত্রব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, অশ্বঘোষ পশ্চিমভারতের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম "লোক" ও মাতার নাম "ঘোনা" ছিল। "লি-তাই-সান্-পাও-চি" গ্রন্থে লিখিত আছে, "দ্বাদশতম স্থবির অশ্বঘোষ মহাসত্ত্ব বারাণসীর অধিবাসী ছিলেন।" Prof. Murakami বলেন যে, অশ্বঘোষ দক্ষিণভারতের অধিবাসী ছিলেন (২)। এইসকল বিবরণ পাঠ করিয়া সুজুকী বলিয়াছেন যে, অশ্বঘোষ যে উত্তরভারতের অধিবাসী ছিলেন না, এ কথা নিশ্চয়।

অশ্বঘোষের গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত গ্রন্থ-পরিচয় পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার মাতার নাম ছিল সুবর্ণাক্ষী এবং তিনি বর্ত্তমান অযোধ্যার অন্তর্গত "সাকেত" নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন।

যেখানেই তাঁহার জন্মস্থান হউক একথা সত্য যে তিনি পশ্চিমভারতে গমন করিয়াছিলেন। সাধারণ বৌদ্ধ পণ্ডিত দিগকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তখন তিনি পাটলি-পুত্রে (১) গমন করিলেন। তাঁহার জীবনচরিতে আছে যে, একাদশ স্থবির পার্শ্ব মধ্যভারতে এই ব্রাহ্মণ তীর্থিকের অসামান্য প্রতিপত্তির কথা এবং তাঁহার দিগ্বিজয়ের ফলে অনেক বৌদ্ধ-বিহারে ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ হইয়াছে শুনিয়া এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য উত্তরভারতে হইতে যাত্রা করিলেন। অশ্বঘোষ ইহার পর হইতে নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া মধ্য ভারতে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু অপর একখানি গ্রন্থে (২) দেখিতে পাওয়া যায় যে এই ঘটনার পরও অশ্বঘোষ পাটলিপুত্রেই অবস্থান করিতেছিলেন এবং তথা হইতে তাঁহাকে কণিষ্ক স্বীয় রাজধানী গান্ধারে লইয়া যান; সুতরাং তাঁহার বাসস্থান এবং ভ্রমণ-সম্বন্ধে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে (ক) ভারতের উত্তরাঞ্চল ভিন্ন অপর তিন দিকের কোন এক প্রদেশে এবং খুব সম্ভব পূর্ব্ব-ভারতের সাকেত নগরীতে তাঁহার জন্ম হয়, (খ) মধ্য-ভারতে তিনি প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে এবং তদানীন্তন বৌদ্ধগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষু বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং (গ) তাঁহার জীবনের শেষভাগ উত্তরভারতে অতিবাহিত হয়। খুব সম্ভব সেই সময়ই তিনি মহালঙ্কারসূত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

অশ্বঘোষের বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধেও বিভিন্ন মত বর্ত্তমান। তারানাথ বলেন যে, নাগার্জ্জুনের অন্যতম প্রধান শিষ্য আর্য্যদেব অশ্বঘোষের দীক্ষাগুরু। তিনি তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া যাদুবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দীক্ষা

তাঁহার যাদুবিদ্যার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য অশ্বঘোষ বিবিধ তান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহার অবরোধগৃহে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূলসূত্রটী লিপিত ছিল। অশ্বঘোষ যাদুবিহ্বল

Cunningham এর মতে ৫৮ খৃষ্টপূর্ব্বে Fengussan এর মতে ৭৯ খৃষ্টাব্দে, Rhys Darrids এর মতে ১০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। (১) Geschichte des Buddhismus I. pp. 90 (২) The Bukkyo Shirim—Vd. I, no 6.

(১) কেহ কেহ বলেন, নালান্দায়। (২) Transmission of Dharmapitaka ইহার সংস্কৃত অথবা চৈনিক নাম আমার জানা নাই।

অবস্থায় উহা পাঠ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যে অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহার জন্ম তাঁহার মনে অত্যন্ত অনুশোচনা হইল এবং প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শাক্য-মুনির ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

হীনযানী বৌদ্ধগণ তারানাথের উক্তিকেই সমর্থন করেন। য়ুয়ান্ চুয়াং বলিয়াছেন যে, তিনি পার্শ্ব কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন (১)। অশ্বঘোষের জীবনচরিতেও লিখিত আছে যে পার্শ্বই তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। তর্কসভায় অশ্বঘোষ প্রস্তাব করিলেন যে, পরাজিত ব্যক্তি স্বীয় জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া ফেলিবেন কিন্তু পার্শ্ব তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, পরাজিত ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম্মমত ত্যাগ করিয়া বিজেতার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। অবশেষে ইহাই স্থির হইল। পার্শ্ব প্রশ্ন করিলেন, "কি উপায় অবলম্বন করিলে দেশে শান্তি বিরাজমান থাকে, রাজা দীর্ঘজীবী হইতে পারেন এবং জনসাধারণ সুখে ও শান্তিতে কাল কাটাইতে পারে?" তির্থক অশ্বঘোষ এই প্রশ্নের উত্তর করিতে না পারিয়া অধোমুখ হইলেন এবং পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে মস্তকমুণ্ডন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

Transmission of Dharmapitaka গ্রন্থে লিখিত আছে যে, অশ্বঘোষ পার্শ্বের শিষ্য পুণ্যযশস্ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পুণ্যযশস্ তাঁহাকে তর্ক এবং যাদুবিদ্যায় পরাস্ত করিয়াছিলেন। অশ্বঘোষ তর্কে পরাস্ত হইলে পুণ্যযশস্ তাঁহাকে বিহারমধ্যস্থ পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া একখানি পুস্তক আনিতে আদেশ করিলেন। পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া অশ্বঘোষ ঘোরতর অন্ধকার দেখিতে পাইলেন। এরূপ অন্ধকার যে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি পুণ্যযশস্‌কে বলিলেন যে, অন্ধকারে তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। পুণ্যযশস্ তখন স্বীয় দক্ষিণ হস্ত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন এবং তখন তাঁহার অঙ্গুলি হইতে দিব্য আলোক বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার-দর্শনে অশ্বঘোষ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং পুণ্যযশসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

সে যাহা হউক এইরূপ দীক্ষাগ্রহণের পর অশ্বঘোষ ত্রিপিটকের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং পরিশেষে স্থবিরপদে উন্নীত হইলেন। এই সময় একদিন রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, ভগবতী তারাদেবী তাঁহাকে পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বুদ্ধের গুণকীর্ত্তন করিতে আদেশ করিতেছেন। অতঃপর তিনি "বুদ্ধচরিত" কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন (১)।

তাঁহার নাম অশ্বঘোষ কেন হইল, এ সম্বন্ধে অনেক মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় অশ্বগণ

নামকরণের কারণ

আনন্দে হ্রেষাধ্বনি করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম অশ্বঘোষ। আবার ইহাও কথিত আছে যে, এক সময় তিনি যখন ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেছিলেন সেই সময় ক্ষুধার্ত্ত অশ্বগণ আহারে বিরত হইয়া তাঁহার বাণী শুনিতে লাগিল। সেইজন্ম তাঁহার নাম হইল অশ্বঘোষ। আরও একটী প্রবাদ আছে যে, তাঁহার বীণাধ্বনি শ্রবণে অশ্বগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তব্ধ হইয়া থাকিত বলিয়া তাঁহার নাম অশ্বঘোষ (২)। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে তাঁহার "পুণ্যাদিত্য" নামের উল্লেখ আছে। "বুদ্ধ ও স্থবিরগণের ইতিহাস" গ্রন্থে তাঁহাকে 'পুণ্যশ্রিক' বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তারানাথ তাঁহার আরও আটটী নামের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা:—কাল, দুর্দ্দশ, দুর্দ্দশকাল, মাতৃচেত, পিতৃচেত, সুর, ধার্ম্মিক সুভূতি, মতিচিত্র এবং আর্য্য। তাঁহার উপাধি ছিল, "আচার্য্য" এবং "ভদন্ত।"

দীক্ষাগ্রহণের পর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত অশ্বঘোষ পাটলিপুত্রে গমন করিলেন। তথায় তিনি নগরবাসীদিগকে মুগ্ধ করিবার জন্ম "রাষ্টবর" নামে একটী

সঙ্গীত

সুমিষ্ট সুর সৃষ্টি করিলেন। এই অতি সুমিষ্ট সুরসমন্বিত গান শ্রবণ করিলে শ্রোতার মন করুণরসে আর্দ্র হইত এবং দুঃখ-

(১) Watters on Yuan Chwang Vol I. pp. 239

(১) Geschichte des Buddhismus, pp. 91

(২) Watters on Yuan Chwang, Vol. II, pp. 102.

দৈন্যনিপীড়িত মানবজীবনের অসারতা তাহার মনে জাগরিত হইত। তাঁহার এই চিত্তোন্মাদকারী গান শ্রবণ করিয়া সেই নগরের পাঁচশত কুমার সংসারত্যাগ করিলেন। সমস্ত রাজকার্য্য বিশৃঙ্খল এবং দেশ জনশূন্য হইবে আশঙ্কায় পাটলিপুত্ররাজ ঘোষণাদ্বারা নগরমধ্যে ঐ গীত বন্ধ করিয়া দিলেন। যে সমস্ত গানের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন তন্মধ্যে "গণ্ডিস্তোত্রগাথা" তাঁহার অসামান্য সুরজ্ঞানের পরিচায়ক।

অশ্বঘোষ হিন্দুধর্ম্মত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াই দেখিলেন, হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ প্রভূতপরিমাণে গ্রন্থ রহিয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্মে সেরূপ নাই। তখন তিনি লেখনী ধারণ করিলেন। দর্শন, কাব্য, সঙ্গীত, নাট্যবিষয়ক বহু গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, দুই একখানি ব্যতীত তাঁহার প্রণীত মূল সংস্কৃত গ্রন্থাবলী এখন আর পাওয়া যায় না।

গ্রন্থাবলী

তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই চৈনিক অথবা তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সেই অনুবাদগুলিই আমাদের সম্বল। তাঁহার কোন কোন গ্রন্থের অসম্পূর্ণ অংশাবলী কীটদষ্ট অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে বা হইতেছে। Prof-Luder তুরফান্ প্রদেশ হইতে তাঁহার তিনখানি নাটক আবিষ্কার করিয়াছেন। একখানির নাম "শারিপুত্র প্রকরণ" অপর দুইখানির নাম অজ্ঞাত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে তাঁহার "সৌন্দরনন্দ" কাব্যের তালপত্র পুঁথি আবিষ্কার করেন। "বজ্রসূচি" নামে তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ আছে। এতদ্ব্যতীত সুজুকীও তাঁহার চৈনিক ভাষায় অনূদিত অনেক গ্রন্থের নাম করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার গ্রন্থাবলীর তালিকা দেওয়া হইল।

(১) বুদ্ধচরিত কাব্য—বুদ্ধদেবের জীবনচরিত লইয়া লিখিত।

(২) সৌন্দরনন্দ কাব্য—ইহাতে বুদ্ধদেব তাঁহার ভ্রাতা নন্দকে কি করিয়া যে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) শারিপুত্রপ্রকরণ—নাটক। ইহাতে বুদ্ধদেব কিরূপে মৌদ্গল্যায়ন (বা সারস্বতী পুত্রপ্রকরণ) ও শারিপুত্রকে দীক্ষিত করেন তাহারই বিবরণ আছে।

(৪) ও (৫)—এই দুইখানিও নাটক। ইহাদের নাম ও বর্ণিত বিষয় অজ্ঞাত।

(৬) মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র—দর্শনপুস্তক। মহাযান-সম্প্রদায়ের মূলতত্ত্ব ইহাতে লিখিত আছে।

(৭) মহালঙ্কার সূত্রশাস্ত্র (বা মহাযানসূত্রালঙ্কার)—দর্শনপুস্তক।

(৮) নির্ব্বাণলাভের নৈতিকসোপানাবলী সম্বন্ধে লিখিত শাস্ত্র।

(৯) শূন্যবাদ সম্বন্ধে জনৈক নির্গ্রন্থের জিজ্ঞাসাবাদ।

(১০) দশটী অনুপকারী কর্ম্ম-সম্বন্ধে লিখিত সূত্র।

(১১) প্রভুসেবার নিয়মাবলী সম্বন্ধে লিখিত পঞ্চাশটী শ্লোক।

(১২) ছয়টী জন্মের দ্বারা দেহান্তরপ্রাপ্তির বিবরণ।*

(১৩) বজ্রসূচি—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর আক্রমণ করিয়া লিখিত।

(১৪) গণ্ডিস্তোত্রগাথা—সঙ্গীত বিষয়ক পুস্তক।

অশ্বঘোষের তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। কথিত আছে যে, কণিষ্কের রাজধানীতে এক পিশাচ-সিদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিত। সাধারণতঃ সে কাহারও সহিত মিশিত না এবং প্রয়োজন হইলে কথাবার্ত্তা অতি সংক্ষেপে শেষ করিত। প্রাচীন পণ্ডিতগণ অপেক্ষাও সে অধিক খ্যাতিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং সাধারণ লোকে তাঁহাকে অর্হৎ মনে করিত; † কিন্তু অশ্বঘোষের চক্ষুতে ধূলিনিক্ষেপ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। তিনি তাহাকে প্রেতসিদ্ধ বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে, ভৌতিক সাধনার দ্বারা বাক্‌পটুতা লাভ করিলেও কোন প্রশ্নের যথাযথ উত্তরপ্রদান তদ্দ্বারা সম্ভব হয় না এবং প্রেতসিদ্ধ ব্যক্তি একবার উচ্চারিত কথা পুনর্ব্বার উচ্চারণ করিতে পারে না। একদিন তিনি

---

* (৮) হইতে (১২) সংখ্যক পুস্তকগুলির সংস্কৃত নাম অজ্ঞাত।

† Watters on Yuan Chwang. Vol II pp. 102.

ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করিবার মানসে তাহার নিকট গমন করিলেন এবং তাহার সহিত আলোচনার ফলে তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়বিশ্বাসে পরিণত হইল। তখন তাঁহার অনুরোধে রাজা ব্রাহ্মণগণকে অশ্বঘোষের সহিত প্রকাশ্যসভায় বিচারে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। বিচার আরম্ভ হইলে অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণকে পঞ্চবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল বটে, কিন্তু তাহার উত্তর ঠিক হইল না। অশ্বঘোষ তাহাকে তাহার উক্তি পুনরাবৃত্তি করিতে বলিলেন। এবার ব্রাহ্মণ নীরব রহিল। অশ্বঘোষ তখন তাহার মুখাবরণ জোরপূর্ব্বক দূরে ফেলিয়া দিয়া ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির মুখের বিচিত্রভাব সকলকে দেখাইলেন। ব্যাকুল হইয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিবারণ করিল। অশ্বঘোষ তখন দর্শকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভিত্তিহীন খ্যাতি বহুদিন স্থায়ী হয় না।"

গল্প

এইবার আমরা অশ্বঘোষের খ্যাতি ও চরিত্র-সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ করিব। অশ্বঘোষ এরূপ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন যে তাঁহার সমসাময়িক অনেক ক্ষুদ্র কবি তাঁহার নামের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীও অশ্বঘোষের নামে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার রচিত সমস্ত গ্রন্থ চৈনিক ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। গ্রন্থসমূহে বিষয়-নির্ব্বাচন ও ঘটনা-সংস্থাপনে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার ভাষায় কিয়ৎ-পরিমাণে মিষ্টতার অভাব থাকিলেও তাহাতে সৌন্দর্য্য বা শক্তির অভাব নাই। স্বতঃস্ফূর্ত্ত কবিত্বের দ্বারা তাঁহার আখ্যানসমূহ সমুজ্জ্বল। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু সৌভাগ্য যে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কারণ দীক্ষাগ্রহণের পর হইতেই তিনি লেখনীধারণ করেন এবং তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা কাব্য, দর্শন, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতির বহুলসৃষ্টির দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করিতে লাগিল। অতি নিপুণতার সহিত তিনি তাঁহার দার্শনিক মতবাদসমূহ এই সকলের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনানৈপুণ্যে অতি নীরস জিনিসও সরস হইয়াছে। শুষ্ক উপদেশের আকারে যে সকল সত্য সাধারণের মনে কোন স্থান পাইত না, গল্প এবং কবিতার মধ্য দিয়া তাহাই তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তাহাদের বোধগম্য করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের নিয়মাবলী অতি সুষ্ঠুভাবে পালন করিলেও তিনি ধর্ম্মান্ধ ছিলেন না। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার রচনার মধ্যে ভারত কাব্য, রামায়ণ, সাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শন এবং জৈনমতের উল্লেখ দেখিয়া তাঁহার জ্ঞানানুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃতিত্ব

সৌন্দর্য্যের পুরস্কার

(গল্প)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারি
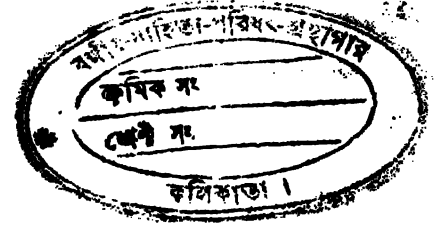
স্ত্রী ভাগ্যে নরেশচন্দ্র একজন ভাগ্যবান্ পুরুষ, কারণ তাহার মত কুশ্রী পুরুষ সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। অমন কদাকার পুরুষেরও যে আবার বিবাহ হইতে পারে তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন; তাহার উপর নরেশ যাহাকে বিবাহ করিল সেই স্ত্রী সরযূর সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে হাজারের মধ্যে অমন একজন শ্রীসম্পন্না রমণী দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। রাজা-মহারাজার প্রাসাদেও সচরাচর অমন সুন্দরী মেলে না। নরেশচন্দ্রের এই রূপবতী নারীকে জীবন সঙ্গিনী রূপে পাইবার একটু ইতিহাস আছে, তবে তাহা নিতান্তই সাধারণ ও উত্তেজনাশূন্য। সরযূর পিতা স্ত্রী-কন্যাকে নিতান্ত নিঃসম্বল ও নিঃসহায় রাখিয়া মারা যান। কলিকাতা শহর, কে কার খোঁজ রাখে। এক নম্বর বাড়ীর সঙ্গে দুই নম্বরের বাড়ীর কোন পরিচয় নাই। একই বাড়ীর নীচের তলায় যখন মৃতদেহের পার্শ্বে ক্রন্দন-ধ্বনি উঠে, তেতলায় হয় তো তখন হারমণিয়ম সহযোগে সঙ্গীত চলিতে থাকে—

'মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখি জাগো, জাগো'

কলিকাতা প্রাসাদনগরী—পাষাণপুরী, পাষাণপুরীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে অধিবাসীদের হৃদয়ও কতকটা পাষাণের ধর্ম্ম পাইয়াছে; কিন্তু পাষাণেও ঝর্ণার ধারা বহে। সব-মানুষ সমান হয় না। জগবন্ধুবাবু স্ত্রীপুত্রসহ সরযূদের সঙ্গে একই বাড়ীতে বাস করিতেন। বিধবার এই আকস্মিক বিপৎপাতে তিনি আন্তরিক দুঃখিত হইলেন, তাঁহার স্ত্রী যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন। সরযূর বয়স তখন দ্বাদশ বৎসর, জগবন্ধুবাবুর একমাত্র পুত্র নরেশ-চন্দ্র তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়া গেলে সরযূর মা জগবন্ধুবাবুর স্ত্রীকে ধরিয়া বলিলেন,—"নরেশের সঙ্গে সরযূর বিবাহ দিতে হইবে। মেয়েটার একটা গতি হইলে আমি নিশ্চিন্তে মরিতে পারি।"

জগবন্ধুবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "সে কি হয় দিদি, সরযূ যে তোমার রাজরাণী হ'বার যোগ্য, আর আমার ছেলেও তো দেখ্‌তে তেমন সুন্দর নয়।"

সরযূর মা জগবন্ধুবাবুর স্ত্রীর হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"সে আমি জানি দিদি, মেয়ের কপালে যদি সুখ থাকে তবে সে এতেই সুখী হ'বে। তুমি অমত করো না, বেটা ছেলের আবার রূপ কি?" জগবন্ধুবাবুর স্ত্রী মনে মনে জানিতেন—অমন পুত্রবধূ পাওয়া ভাগ্যের কথা। সরযূর দেহের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তরের সৌন্দর্য্য কম ছিল না। তিনি কর্ত্তার কাছে কথাটা পাড়িলেন। তাঁহার অমত হইল না। হরিতকী দান করিয়া সরযূর মা সরযূকে নরেশের হাতে তুলিয়া দিলেন। তারপর একে একে নরেশের মাতা পিতার মৃত্যু হইল; বিবাহের পর সরযূর মা মাত্র একবৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। নরেশচন্দ্র বি-এ পাশ করিয়া সরকারী আফিশে একটা চাকুরী যোগাড় করিয়া লইল; সংসার চলিতে লাগিল। নরেশ বুঝিত সে এ রত্ন লাভের যোগ্য নহে; ফলে সরযূর কাছে সে একটু কুণ্ঠিত হইয়াই চলিত। এ যেন ক্লাশের 'লাষ্ট বয়' কোন গোপন কারণে হঠাৎ "ফাষ্ট" হইয়া গিয়াছে, অথচ সে মনে মনে বেশ বুঝিতে পারে এ গৌরবলাভের যোগ্যতা তাহার নাই। সরযূ স্বামীর এই কুণ্ঠার ভাব বুঝিত; কিন্তু কারণ বুঝিত না। হয় তো অতখানি বুঝিবার বয়স তখন তাহার ছিল না।

বছর পাঁচেক পরের কথা। সপ্তদশী সরযূর যৌবন-লাবণ্য তাহার দেহশ্রীকে একটা নূতন দীপ্তি দান করিয়াছে। তিলোত্তমার কথা কাব্যে পড়িয়াছি কিন্তু দেখি নাই, তবে সরযূর দেহ তাণ্ডারে ভগবান্ বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য তিলতিল করিয়া আহরণ করিয়া পরিপূর্ণ করিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। যৌবনের

পেলবস্পর্শে মনে হইত সরযূর দেহ হইতে একটা স্নিগ্ধ কিরণচ্ছটা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। দেবীর মত সুন্দরী রাণীর মত মহিমময়ী সরযূর দিকে চাহিলে নরেশ যেন শিহরিয়া উঠিত। সরযূকে স্পর্শ করিতেও যেন তাহার সঙ্কোচবোধ হইত।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। নরেশ খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। শিয়রের আলোটা কমান, স্তিমিতালোকে ঘরখানিতে একটা স্নিগ্ধতার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দেয়ালের ঘড়িটা কেবল অনবরত টিক্ টিক্ করিতেছে। ইতিমধ্যে সরযূ যে কখন ঘরে ঢুকিয়াছে নরেশ তাহা জানিতেও পারে নাই। হঠাৎ কপালে শীতল কোমলকরস্পর্শে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল —সরযূ। নরেশ উঠিয়া হাসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—"খাওয়া শেষ হ'ল।"

"কেন বল তো? আজ বুঝি আমার জন্য ভুরিভোজনের আয়োজন করেছিলে?" নরেশ বলিল, "না, না আমি সে ভেবে বলি নি। এমনিই জিজ্ঞেস কল্লুম?"

"তবু ভাল। কিন্তু স্ত্রীর জন্য এত যার দরদ সে জানতেও পারে না তার স্ত্রী কখন ঘরে এল!"

নরেশ বুঝিল তাহার প্রশ্নটা বেখাপ্পা হইয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বলিল,—"তা ঠিক নয়, তবে কি জান একটা কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।"

সরযূ স্বামীর একখানি হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"দেখ, একটা কথা বলব। ঠিক উত্তর দেবে?"

"কি, বল?"

"আচ্ছা, রাত-দিন তুমি এত কি ভাব?" নরেশ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। এই চকিত ভাব কিন্তু সরযূর দৃষ্টি এড়াইল না। নরেশ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল,—"না, কই ও তোমার ভুল।"

"না, গো না, এত ভুল মেয়েদের হয় না। আমি বুঝি কিছু বুঝতে পারি না। তুমি আমায় বিয়ে করে' সুখী হও নি, এই না?"

"যদি বলি তাই।"

"সে তো আমি আগেই বুঝতে পেরেছি। তুমি আর বেশী কি বললে?" বলিতে বলিতে সরযূর গভীর কৃষ্ণায়ত চক্ষু দুইটী ছল ছল করিয়া উঠিল। মেঘের ভরা আকাশ বর্ষণোন্মুখ হইল। নরেশ সরযূর চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিল, "দূর পাগলি, অমনিই কান্না সুরু হ'ল? আমি ঠাট্টা করেছি বৈ তো নয়।" সরযূ জবাব দিল না, নয়ন আনত করিয়া বসিয়া রহিল। স্বামী স্ত্রীকে ঠাট্টা করিয়াও যে অমন রূঢ় কথা বলিতে পারে তাহা সরযূর বিশ্বাস হয় না। বাঙ্গালী মেয়ের এ আজন্ম সংস্কার বিশ্বাসের পরিপন্থী।

নরেশ বুঝিল এ কথায় সরযূকে অতিমাত্রায় আঘাত দেওয়া হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বাহুবেষ্টনে সরযূর মাথাটী নিজের বুকের উপর টানিয়া আনিয়া বলিল,—সরযূ, এ ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু নয়, তুমি অতি সরল তাই বোঝ না। যদি জানতে তুমি কত সুন্দর শুধু দেহেই নয় মনেও, যদি বুঝতে যার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হ'ত সেই তোমাকে পেয়ে ধন্য হ'ত, তা হ'লে এ কথা তুমি হেসেই উড়িয়ে দিতে। আমার এমন কোন গুণ নাই যাতে আমি তোমাকে স্ত্রীরূপে পেতে পারি সরযূ! এতদিন নিজ হ'তে তোমাকে কিছু বলি নি, যখন কথা তুলেছ তখন বলাই ভাল। এ বিয়েতে আমি সুখী হ'য়েছি বটে কিন্তু তুমি খুসী হও নি। রাজার ঘরে পড়লে তোমাকে মানাত ভাল। আমার এ কুৎসিত চেহারা তুমি কি সহ্য কর্ত্তে পার সরযূ!"

সরযূ স্বামীর বুক হইতে মাথা তুলিয়া লইয়া দুইহাতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"ছিঃ এ কথা বলতে আছে, বিয়েটা কি মানুষের হাত ধরা? কথায় আছে, শোন নি—'জন্ম মৃত্যু বিয়ে এ তিন বিধাতা নিয়ে'; যা বলতেন যার সঙ্গে যার বিয়ে হ'বে ভগবান আগেই ঠিক করে' রাখেন। আর তুমি যে দেখতে খারাপ এ কথা তো আমার মনে একদিনও হয় নি, বরং তোমার ও আমার পূজনীয় শ্বশুর-শাশুড়ীর দয়ায় আমি তোমার পায়ে স্থান পেয়েছি।"

নরেশ স্ত্রীর আন্তরিকতায় [illegible]

বলিল—"তুমি তার নি সরযূ, সে তোমারই গুণ; কিন্তু আমি ভাবি, তোমার মত সুন্দরী—"

সরযূ কথাটা শেষ করিতে না দিয়া বলিল—"সুন্দরী, সুন্দরী করেই তো তুমি পাগল হ'বে দেখ্‌ছি, আমার চাইতে ঢের সুন্দরী আছে!"

"আমি তো দেখি নি, আর দেখ্‌ব কি না সন্দেহ আছে?"

"তুমি কটাই বা সুন্দরী দেখেছ? বাঁশবনে শেয়াল রাজা—এ হ'য়েছে তাই," সরযূর মন হইতে একটা ভারী বোঝা নামিয়া গেল।

নরেশ বলিল,—"আচ্ছা এই কথা তো! পরীক্ষা করা যাক,—তুমি রাজী?"

সরযূ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"বা রে জানা নেই, শোনা নেই, অমনি রাজী হ'লেই হ'ল? আচ্ছা লোক তুমি তো, বল আগে, কি কর্ত্তে চাও?"

"এই দেখ" বলিয়া নরেশ পকেট হইতে একখানা বাঙ্গলা দৈনিক কাগজ বাহির করিয়া স্ত্রীর কাছে ধরিল।

"এ কি?"

"পড়েই দেখ।"

সরযূ বলিল—"না, তুমিই পড়, আমি শুনি।"

নরেশ আলোটা বাড়াইয়া দিয়া পড়িতে লাগিল—

সৌন্দর্য্যের পুরস্কার

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় সৌন্দর্য্যউদ্বোধিনী সমিতি-কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে এই সমিতির বিচারে যে রমণী শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাহাকে পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। শুধু বাঙ্গলা দেশের মহিলাগণই এই পুরস্কার প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। যিনি এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন প্রথমতঃ তাঁহাকে নিজের একখানা ফটো পাঠাইতে হইবে, অতঃপর সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে যাহার ফটো গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে তাঁহাকে শেষপরীক্ষার জন্ত সমিতির বিচারক-[illegible] উপস্থিত হইতে হইবে। মহিলাদিগের সম্ভ্রমরক্ষার জন্ত যথোচিত ব্যবস্থা থাকিবে। ফটো ফাল্গুন মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। উক্ত তারিখের পর ফটো প্রেরিত হইলে তাহা গৃহীত হইবে না। বাঙ্গলার পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ বিচারকের কার্য্য করিবেন।

সরযূ শুনিয়া গেল। স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া নরেশ হাসিয়া বলিল,—"এখন বুঝতে পেরেছ কি কর্ব?"

সরযূ বলিল,—"আমার ফটো পাঠাবে এই তো? আমি তা'তে রাজী নই।"

"কেন?"

"কেন কি এমন কথা সাতজন্মেও শুনি নি। ভদ্র-ঘরের বউ তার ফটো বাইরে পাঠাবে কি?"

"কেন, তা'তে কি দোষ?"

সরযূ উত্তর দিল,—"ছিঃ সে বড় লজ্জার কথা আর পাঁচ জনে সে ফটো দেখবে—তা হয় না।"

"লজ্জার কথা কোনখানটায় দেখলে? স্ত্রী যেমন স্বামীর গুণের কথা পাঁচ জনের মুখে শুনলে খুশী হয়, স্বামীও তেমনি খুসী হয় স্ত্রীর গুণের কথা শুনলে। তোমার ফটো দেখে তারা সবাই বল্‌বে,—হাঁ সুন্দরী বটে, এত যার রূপ মনটাও নিশ্চয় তার দেহের চাইতে ঢের সুন্দর। এ সুখ্যাতি শুনলে কি লজ্জা হয়, না গর্ব্ব হয়!"

"তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বল? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এ ফটো পাঠাবার কি এমন দরকার?"

"তুমি যে বলেছ বাঙ্গলা দেশে তোমার চাইতে ঢের সুন্দরী আছে, তা আমি দেখব?"

"তা'তে তোমার লাভ?"

"লাভ আর কি তবে তোমার ধারণা যে সত্যি নয় এ আমি দেখিয়ে দেব।"

নারীহৃদয়ের বড় কোমল জায়গায় আঘাত দেওয়া হইল। সরযূ চুপ করিয়া রহিল।

নরেশ মিনতিভরা স্বরে বলিল, "অমত ক'রো না, লক্ষীটী, শুধু একখানা ফটো পাঠাব বই তো নয়। কে [illegible] বল? তা'তে আর দোষ কি? কত

মেয়ে ফটো পাঠাবে, তারাও তো ভদ্রঘরের মেয়ে ও বউ।"

সরযূ বলিল,—"কেউ পাঠাবে না, আমি জানি।"

নরেশ স্ত্রীর গালে একটা টোকা মারিয়া বলিল, "গোণবার বিদ্যা কবে থেকে শিখেছ আবার? সে যাক আমার এই একটা অনুরোধ রাখ, নইলে বড় দুঃখিত হ'ব? বল রাজী।"

"নাও বাপু শুয়ে পড়, রাত অনেক হ'ল। আজ এই রাত্রেই তো আর ফটো তোলা হ'বে না। কাল যা হয় ক'রো।"

নরেশ আনন্দে সরযূর পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, এই তো চাই।"

"যাও আর রঙ্গ কর্ত্তে হ'বে না। দেখছ, ঘড়ীতে ক'টা বাজে!"

দেওয়ালের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল। আলো নিবাইয়া দিয়া স্বামী-স্ত্রীতে শুইয়া পড়িল।

সরযূই বিচারে শ্রেষ্ঠসুন্দরী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। যে দিন নরেশের কাছে খবর আসিল মাত্র তিনখানি ফটো শেষপরীক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে—তাহার মধ্যে সরযূ একজন সেদিন নরেশের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বিচারকদের সম্মুখে সরযূকে উপস্থিত করাইবার তারিখও সে পত্রে লিখিত ছিল। নরেশ সরযূকে পত্র পাঠ করিয়া শুনাইল। সে ব্যাপার শুনিয়া মহা অনর্থ বাধাইয়া তুলিল; রূপ দেখাইবার জন্য সমিতিতে যাইতে সে কোনমতেই রাজী হইল না। নরেশ তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিল,—"বেশীক্ষণ তোমাকে সেখানে থাকতে হ'বে না। আর আমি তো সঙ্গে যাচ্ছিই। তোমার ভয় কি? আমি জেনে এসেছি যারা বিচার কর্ব্বেন তাঁরা ছাড়া বাইরের লোক সেখানে আর কেউ থাকবে না।" অনেক অনুরোধ ও উপরোধে সরযূ যাইতে রাজী হইল এই সর্ত্তে—যে নিতান্ত সাধারণ কাপড়-চোপড় পরিয়া সেখানে যাইবে। নরেশ তাহাতেই রাজী [illegible] সরযূ গেলও সেই ভাবে দুই হাতে চারগাছা [illegible] আটগাছা সোণার চুড়ী সঙ্গে একগাছা করিয়া শঙ্খবলয়, গলায় সরু সোনার হার। সীঁথিতে সিন্দুররেখা, কপালে সিন্দুরটীপ, পরণে সবুজ রঙের একখানা সাড়ী, গায়ে ঐ রঙের একটী জামা ও পায়ে আলতা—এই সজ্জায় মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবীর মত সরযূ সমিতিতে উপস্থিত হইল। তাহার আর দুইজন প্রতিযোগিনী যে অলঙ্কার ও পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া গিয়াছিল তাহার বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পায়ে স্লিপার হইতে আরম্ভ করিয়া মাথার চুল পর্য্যন্ত সজ্জার বাকী ছিল না। অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে ও পরিচ্ছদের ঔজ্জ্বল্যে তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অনেকটা ঢাকা পড়িয়া গিয়া একটা কৃত্রিমতার আভাস সারাদেহ ভরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিন জনকেই একে একে বিচারকদিগের সম্মুখে আসিতে বলা হইল, আর দুই জন একটা দৃপ্ত ভঙ্গিমা লইয়া অসঙ্কোচগতিতে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল কিন্তু মুস্কিল হইল সরযূর। গভীর লজ্জায় সে না পারিতেছিল মুখ তুলিতে না পারিতেছিল সহজভাবে হাটিতে। প্রতি মুহূর্ত্তে সঙ্কোচে যেন তাহার পা দুইটী জড়াইয়া যাইতেছিল। মুখমণ্ডল তাহার লাল হইয়া উঠিল, আনত চক্ষু দুইটীতে ভীতির ভাব জাগিয়া উঠিল। মুক্তার মত স্বেদবিন্দু তাহার কপালে চক্ চক্ করিতে লাগিল। এই স্বাভবিকতায় তাহার সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিচারকগণ রায় দিলেন সরযূই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতে পাঁচহাজার টাকার একখানি চেক্ দিলেন। চেকখানি সরযূর কম্পিতহস্ত হইতে পড়িয়া গেল। সে কোন মতে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া স্বামীর সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

পরদিন দৈনিক ইংরাজী ও বাঙ্গলা কাগজে সরযূর ফটোসহ সংক্ষিপ্তপরিচয় বাহির হইল এবং একটী বাঙ্গলা কাগজে একজন নূতন কবি সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীর বন্দনা করিয়া সরযূর উদ্দেশ্যে কবিতাও লিখিয়া ফেলিলে কলিকাতা শহরে সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতা [illegible] প্রথম সুতরাং সারা শহরময় [illegible]

গেল। কোন কোন কাগজ বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে প্রকাশ্যে অভিনন্দন দিবারও প্রস্তাব তুলিল।

নরেশ হাসিয়া বলিল,—"দেখলে, আমি যা বলেছিলুম তাই হ'ল।" সরযূ তাহার সম্বন্ধে এই প্রকাশ্য আলোচনায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল এবং স্বামীর কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না।

তাহার গাল দুটী রক্তিমাভ হইয়া উঠিল মাত্র। বরং সে প্রশ্নটা এড়াইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ যে কাগজে লিখ্‌ছে, আমাকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দন দেবে, সত্যি না কি?"

নরেশ হাসিমুখেই জবাব দিল, যদিই বা দেয়, তা হ'লে তুমি কি কর্ব্বে সরযূ? যাবে তো?"

সরযূ কোন জবাব দিল না। অন্য সময় হইলে সে এ প্রস্তাব শুনিলেই রাগিয়া উঠিত। কিন্তু গতকল্যকার ব্যাপারে সরযূর জীবনের উপর দিয়া যেন একটা প্রবল ঝড় বহিয়া তাহার দৃঢ়মূল আজন্মের সংস্কারকে কতকটা শিথিল করিয়া দিয়াছে। এবারেও সে প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া প্রতিপ্রশ্ন করিল, "তুমি কি বল?"

নরেশ উত্তর দিল,—"মন্দ কি? একটা নূতন জিনিস হ'বে।"

সরযূ হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে কিন্তু কাল্‌কের মত পোষাকে যাওয়া চল্‌বে না।"

"তার আর ভাবনা কি। পাঁচ হাজার টাকা তো তোমারই রয়েছে। বল্‌তো পাঁচ হাজার টাকারই গয়না ও কাপড় কিনে ফেলি।"

সরযূ একটু লজ্জিত হইল, উত্তেজনার মুখে সে আপনাকে সামলাইতে পারে নাই সে অভিমানের সহিত বলিল,—"আমি কি তাই বল্লুম।"

"না, না তুমি তা বল নি। আমিই বলছি।" নরেশ হাসিয়া স্ত্রীর হাত ধরিল। সরযূ হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "যাও, আজ তোমার আফিস নেই? কত বেলা হ'ল খেয়াল আছে? নাও চানটান্ ক'রে খাবে এস।" নরেশ খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া আফিসে চলিয়া গেল।

সেদিন দুপুর বেলা যে সরযূর কি ভাবে কাটিয়া গেল তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। আগে আগে মাত্র চুল বাঁধিবার সময় ও সিন্দুর পরিবার জন্য সরযূর আয়নার দরকার হইত কিন্তু সেদিন দুপুরবেলায় সে বহুবার আয়নায় মুখ দেখিল এবং বহুবার তাহা রাখিয়া দিল। এই ভাবে দুপুর শেষ হইয়া কখন যে বৈকাল হইয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারে নাই। পাঁচটার সময় যখন নরেশ গৃহে ফিরিল তখন তাঁহার হুঁস হইল। স্বামীর দৈনন্দিন জলখাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিতেও সে ভুল করিয়াছে, সরযূ লজ্জিত হইয়া বলিল,—"তোমার খাবার তৈরি কর্ত্তেই ভুলে গেছি। তুমি কাপড়-চোপড় ছাড়, আমি চট করে তৈরি করে আন্‌ছি।" নরেশ তীক্ষ দৃষ্টিতে সরযূর আপাদমস্তক একবার চাহিয়া দেখিল, পরে বলিল "না থাক্ গে, খাবার আনিয়ে নিলেই হ'বে এখন।"

কাগজে প্রস্তাবিত অভিনন্দন-দান কার্য্যে পরিণত হইয়াছে কিন্তু প্রকাশ্য সভায় শত সহস্র প্রশংসমান চক্ষুর অভিনন্দন গ্রহণ করার পর হইতেই সরযূর গতানুগতিক জীবন-পদ্ধতিতে একটা পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। আগেকার ধরাবাধা নিয়মের মধ্যে যেন সে আপনাকে কোনমতেই খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না। যে পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না, যাহার জন্য স্বামীর নিকট হইতে তাহাকে বহু অনুযোগ শুনিতে হইয়াছে এখন তাহাই তাহার প্রধান লক্ষ্যস্থল হইয়াছে; অঙ্গসজ্জার সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিও এখন তাহার সতর্ক চক্ষু হইতে এড়াইতে পারে না। তাহার কারণও ছিল। এখন কলিকাতার মহিলা মজলিসে বা মহিলা সমিতিতে প্রায়ই তার নিমন্ত্রণ আসিত। ইহাতে স্বামীর উৎসাহও ছিল। প্রথম প্রথম নরেশ স্ত্রীর অনুগামী হইত কিন্তু কেরাণী সখ চিরকাল বজায় রাখিতে পারে না. বিশেষতঃ সারা দিনও হাড়-ভাঙ্গা খাটুনীর পর এবং তাহার সব সময় ভালও লাগিত না; সুতরাং সরযূকে সময় সময় একাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইত। একাকিনী বাহিরে যাইতে একটু বাধ বাধ ঠেকিত বটে কিন্তু ক্রমশঃ তাহা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গেল। ইদানীং সন্ধ্যার পর প্রত্যহই সরযূকে বাহিরে যাইতে হইত। একদিন নরেশ প্রশ্ন করিয়া জানিল "মিঃ রায়ের বাড়ীর মহিলাদের গানের আড্ডায় তাহাকে থাকিতে হইবে। সরযূর এই ব্যবহারে [illegible]

ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিল ; কারণ এই অনুপস্থিতির দরুণ দৈনন্দিন সাংসারিক কার্য্যেও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল।

একদিন নরেশ আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সরযূ সাজসজ্জা শেষ করিয়া আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া কাণে দুল পরিতেছে, স্ত্রীকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল "আজও আবার পার্টি না কি ?" সরযূ পূর্ব্ব রাত্রে একটু দেরী করিয়াই বাড়ী আসিয়াছিল।

সরযূ হাসিয়া বলিল "দেখ আজও রাত্রে ফিরতে একটু দেরী হ'বে। তুমি কিছু মনে করো না।"

নরেশ বিরক্তি আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না ; তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল,—"কেন ? কিন্তু এটা কি ভাল হচ্ছে সরযূ !"

সরযূ একটু লজ্জিত হইল। কাল যে সে অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছে নরেশ তাহার কোন কৈফিয়ৎ লয় নাই, এমন কি এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যও করে নাই। সরযূ তো নিজে কিছু বলিবার চেষ্টা করে নাই। তবে সে ইহা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল—স্বামী তাহার ব্যবহারে ক্রমশঃ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, সরযূ অনেক দিন ভাবিয়াছে স্বামীর অসন্তুষ্টির কারণ কি ? যারা সেখানে যায় তারা সবাই তো ভদ্রমহিলা। তবে তাহার যাইতে দোষ কি ? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খোলাখুলি ভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গেলে সরযূ কতকটা স্বস্তি অনুভব করিত ; কিন্তু বাহিরের প্রবল আকর্ষণে তাহার সমস্ত দ্বিধা ভাসিয়া যাইত। স্বামীর প্রশ্নে সরযূর মনের মধ্যে সেই দ্বিধার ভাবটা আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। প্রশ্নের কোন উত্তর সে দিতে পারিল না।

স্ত্রীকে নিরুত্তর দেখিয়া নরেশ পুনরায় বলিল, "দেখ সরযূ, তুমি অন্য কিছু মনে করো না। হয় তো তুমি ভাবছ আমার কি ছোট মন। কিন্তু তুমি তো জান তোমার কোন কার্য্যে আমি কোনদিন বাধা দিই নি। এখন আমার মনে হচ্ছে তুমি ভুল পথে চলছ।"

সরযূ এবার বলিল, "তুমি যদি এ সব ভাল মনে না করছ তবে আমাকে বাধা দাও নি কেন ?"

নরেশ উত্তর দিল, "এ প্রশ্ন উঠে না, সরযূ। তোমার যে বয়েস তাতে ভাল-মন্দ বোঝবার শক্তি তোমার আছে, এক্ষেত্রে উপদেশ দেওয়া আমি সঙ্গত মনে করি নি। আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা কচ্ছি, এর উত্তর তুমিই দাও।"

"কিন্তু আজ যে আমার না গেলেই নয়।"

"কেন ?"

"আজ বালীগঞ্জে মেয়েদের একটা থিয়েটার হ'বে। তাতে একবার মাত্র আমাকে ষ্টেজে 'এপিয়ার' হ'তে হবে। আমি প্রথমে কোন মতেই রাজী হই নি কিন্তু শেষে ছাড়াতেও পারি নি। আমার চেহারা সুন্দর বলেই না কি সে পার্টে আমাকে মানাবে ভাল! তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?"

নরেশ সরযূর কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল, পরে বলিল, "না—"

সরযূ বলিতে লাগিল "দেখ, তুমি কিছু ভেবনা যারা আজ সেখানে প্লে করবে তারা সবাই ভদ্রলোকের স্ত্রী-কন্যা, তা না হ'লে কি আমি সেখানে যাই ?"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নরেশ বলিল,—"যা ভাল বোঝ কর। আমার বলবার কিছুই নাই। তবে একটু শীগ্‌গির ফেরবার চেষ্টা করো। আমার শরীরটা আজ ভাল নেই। আর আমার কথাগুলিও ভেবে দেখ। এমন সময় বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। প্রবল উত্তেজনায় সরযূর শরীরে বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলিয়া গেল। বাহিরের উত্তেজনায় নিজের শরীরের রক্তও উষ্ণ হইয়া উঠে। সরযূ তাড়াতাড়ি স্বামীর গায়ে মাথায় হাত দিতে দিতে বলিল,—"না তেমন কিছুই নয়। তুমি চুপ করে শুয়ে থাক। আমি যত শীগ্‌গির পারি ফিরে আসব।" সে ত্বরিতপদে নীচে নামিয়া গেল। নরেশের গায়ে তখন বেশ জ্বর। সে অবসন্নের মত বিছানায় শুইয়া পড়িল।

অভিনয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রেক্ষা-গৃহে লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণের জায়গা নাই। বড়বাজারের স্থূলোদর ভাটিয়া, মাড়োয়ারি হইতে আরম্ভ করিয়া কলুটোলার রঞ্জিত দাড়ীওয়ালা মুসলমান ব্যাপারীরা পর্য্যন্ত সেদিন ভদ্রনারীর নৃত্য দেখিবার জন্য উপস্থিত ছিলে। সাধারণ দর্শকের তো কথাই নাই। অনবরত করতালি-ধ্বনিতে সমস্ত বাড়ীটা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

সরযূ সজ্জাগৃহের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তার পার্টের এখনও অনেক দেরী; কিন্তু যে উৎসাহ লইয়া সে বাড়ীর বাহির হইয়াছিল তাহার সমস্তটাই যেন এখন কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকের আনন্দোৎসবের মধ্যে সে যেন কোনমতে যোগ দিতে পারিতেছিল না। তাহার থাকিয়া থাকিয়া কেবলই স্বামীর কথা মনে হইতেছিল। সে গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল—হয় তো আমি ভুল দেখিয়া আসিয়াছি। তার নিশ্চয়ই খুব জ্বর হইয়াছে। কেন আসিলাম? আচ্ছা চলিয়া গেলে হয় না?

"একি, আপনি এখানে চুপ চাপ বসে কেন?" সরযূ চাহিয়া দেখিল—মিঃ রায়। ইনিই অদ্যকার অভিনয়ের উদ্যোক্তা ও প্রযোজক। খুব সুন্দর চেহারা, মিষ্টভাষী ও সদালাপী। সরযূ কোন উত্তর দিল না। মিঃ রায় পুনরায় বলিল,—"এখানে বসে কি হ'বে, আপনার তো ঢের দেরী চলুন বক্সে গিয়া বসি। অভিনয় কেমন হচ্ছে দেখুন।"

সরযূ বলিল—"না, থাক। এই বেশ আছি।"

"তা কি হয়? চলুন—" বলিয়া মিঃ রায় সরযূর হাত ধরিতে উদ্যত হইল।

সরযূ হাত দুইটী পিছনে সরাইয়া লইয়া বলিল—"সেখানে আর কে আছে?"

"লীলারা বোধ হয় আছে"; লীলা বলিতে মিঃ রায়ের ভগিনী বা তাহার বান্ধবীগণ।

সরযূ আপত্তি করিল না। মিঃ রায় তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সরযূ বক্সে গিয়া দেখিল—সেখানে কেহ নাই। মিঃ রায়ের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লীলারা কোথায়?"

মিঃ রায় অপ্রতিভভাবেই উত্তর দিল "এই তো ছিল, তবে গেল কোথায়?"

"আপনি তাদের ডেকে নিয়ে আসুন, না?"

"কেন, আমাকে কি আপনার বিশ্বাস হয় না?" বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া সরযূ চমকিয়া উঠিল। মিঃ রায়ের চক্ষু দুটী যেন অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল।

'এ কথা আপনি বলছেন কেন, মিঃ রায়?"

মিঃ রায় একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,"না, না, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি কিছু ভেবে বলি নি।"

সরযূ বলিল, "আপনার ব্যবহারে আমি বড় দুঃখিত। আমি ভেবেই পাই না আপনি ভদ্রলোক হ'য়ে একজন মহিলার হাত ধরতে যান কি করে। আজ যখন আপনি আমার বাড়ীতে মোটর নিয়ে যাবেন, কথা ছিল, লীলা তখন আপনার সঙ্গে যাবে। কিন্তু সে যায় নি। এখনও সে এখানে নেই। এর অর্থ কি মিঃ রায়?" উত্তরে মিঃ রায় কি বলিল বুঝিতে পারা গেল না, হঠাৎ নীচে ডাক পড়াতে সে তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। সরযূর সমস্ত দেহ-মন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল। সে বক্স হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিল। এ কি! এ লীলা না! সে জানিত লীলা বিবাহিতা, লীলার স্বামীকে লীলার সঙ্গে বহুবার দেখিয়াছে, তবে লীলার সঙ্গে বসিয়া ঐ ভদ্রলোকটী কে? তাহার চোখের ভুল নয় তো? না—না, তাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে। কিন্তু একজন পরপুরুষের সঙ্গে লীলা এমন অন্তরঙ্গভাবে কেমন করিয়া বসিয়া আছে! সরযূ মদ কখনও দেখে নাই, কিন্তু ভদ্রলোকটীর সামনের গ্লাসে যে পানীয় রহিয়াছে গন্ধে ও বর্ণে তাহা নিতান্ত সাধারণ পানীয় বলিয়া তাহার মনে হইল না। তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ লীলার চোখ সরযূর দিকে পড়িতেই সে নিতান্ত অপ্রতিভের মত বলিয়া উঠিল, "এই যে সরযূ, এস তোমাকে মিঃ চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিই। মিঃ চ্যাটার্জ্জি ইনি—"

সরযূ আর দাঁড়াইল না, দ্রুত পাদবিক্ষেপে নীচে নামিয়া গেল।

সে এইটুকু আসিতেই হাঁফাইয়া পড়িল, বুকটা টিপ্‌টিপ্‌ করিতে লাগিল। সিঁড়ির রেলিংটা ধরিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

"এ কি, সরযূ! তোমার মুখ এমন ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে কেন? অসুখ করেছে?"

সরযূ চাহিয়া দেখিল, সুশীলা। সে আজ প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে, নাচে-গানে তাহার সমকক্ষ অভিনেত্রী আজ পার্টিতে একটিও নাই। সাজ-সজ্জায় আজ তাহাকে

বাস্তবিকই পরীর মত দেখাইতেছিল। প্রথম অঙ্কের অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার কিছুক্ষণ অবসর।

সরযূ শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিল—"হাঁ, আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই। মাথাটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ কর্চ্ছে।"

"এস না আমার সঙ্গে, একটু ওডিকলোন দিয়ে দিই। আর একা একা থাকলে কখনও ভাল লাগে?" বলিয়া সুশীলা হাসিয়া ফেলিল।

সরযূ হতাশভাবে বলিল, "কোথায় যাব?"

"কেন গ্রীনরুমে চল না। সেখানে, মিঃ রায় আছেন, মিঃ ঘোষ আছেন, আরও বাহিরের কয়েকজন ভদ্রলোক আছেন। আলাপ করবে এস না। সেখানে তোমার কথাই হচ্ছে দেখে এলুম।"

আশ্চর্য্য হইয়া সরযূ বলিল—"আমার কথা কেন?"

সুশীলা তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যাও না, জিগ্যেস ক'রগে কেন? আমি তার কি বলব।"

সুশীলার কথা-বার্ত্তায় ধরণ-ধারণে সরযূর চমক্ লাগিয়া গেল। "এই যে সুশীলা বিবি, হামি তুমাকে কেত ঢুঁড়ছি, লেকিন, দেখা পেলুম নাই—"সরযূ চাহিয়া দেখিল সুশীলার চোখের ইঙ্গিতে একজন সুদর্শনকায় সভ্য-ভব্য মাড়োয়ারী যুবকের এই অপূর্ব্ব বাঙ্গলা জবান ও মৃদু-মন্দ গতি মধ্যপথেই থামিয়া গেল। সরযূ একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া সামনের দরজার পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। সুশীলা তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটী একটা আচম্‌কা বাধা পাইয়া বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

সরযূর পা দুটী কে যেন সেখানে ক্রূর সহিত আটকাইয়া রাখিয়াছে। কণ্ঠ ও জিহ্বা তাহার ক্রমাগত শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল। সরযূ তো জানে সুশীলা কোন এক বিশিষ্ট পরিবারের কন্যা, তবে এ কেমন করিয়া সম্ভব হয়! সে আর ভাবিতে পারিল না, তাহার মনে হইতে লাগিল বিদ্যুতালোকিত গীতি-গন্ধময় এই সুন্দরী পুরী যেন বিষাক্ত নিঃশ্বাস উদ্গীরণ করিতেছে। কোথায় সে আসিয়াছে? কাহাদিগকে সে ভদ্রমহিলা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে? এখন উপায়! থর থর করিয়া তাহার আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল তাহার সারা দে স্বেদ-সিক্ত হইয়া উঠিল। এই কারাগার হইতে তাহার মুক্তির পথ কোথায়? এত রাত্রে একাকিনী সে বাড়ীই বা যাইবে কি করিয়া! অথচ এক মুহূর্ত্তও তার আর এখানে থাকা চলে না। যে ভাবেই হউক তাহাকে এখনিই পলায়ন করিতে হইবে।

* * * * *

একখানি ট্যাক্সি করিয়া সরযূ যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সরযূ কম্পিতপদে উপরে উঠিল, তার বুকের নিঃশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল। যেন কত অপরাধ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে, শয়নকক্ষের দ্বার ভেজান ছিল, কিন্তু ভিতরে সব চুপ্‌চাপ্, কেবল দেওয়ালের ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিতেছে। ঘরে ঢুকিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে সরযূ বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামী জাগিয়া আছে বলিয়া বোধ হইল না। বুকে বলসঞ্চয় করিয়া দ্বার ঠেলিয়া সরযূ ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল স্বামী ঘুমাতেছে। নিদ্রিত স্বামীর কপালে হাত দিয়া সরযূ বুঝিল জ্বরে তাহার গা পুড়িয়া যাইতেছে হঠাৎ শীতল করস্পর্শে নরেশ জাগিয়া উঠিয়া দেখিল—সরযূ!

"একি, তুমি কখন এলে!" সরযূ কোন কথা না বলিয়া স্বামীর পায়ের উপর পড়িয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, নরেশ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্ত্রীকে টানিয়া তুলিয়া বলিল,—"একি ব্যাপার? তুমি কাঁদছ কেন? কি হ'ল।" সরযূ অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে সে রাত্রির ব্যাপার অকপটে খুলিয়া বলিল।

নরেশ সস্নেহে স্ত্রীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"দুঃখ করো না সরযূ! তোমার শিক্ষারও একটা মূল্য আছে। আজ যারা আপনার ঘর ছেড়ে বাইরের আকর্ষণটাকে বড় করে' দেখছে—তারা ভাবছে সমাজের একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করছি, হয় তো এ বিদ্রোহ হ'তে পারে কিন্তু তার মূলে কেবল মোহই আছে, সত্য নেই। তোমার মত মেয়েদের তাদের সঙ্গে খাপ খায় না।"

সরযূ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল —"এ তারা বোঝে না কেন ?"

নরেশ হাসিয়া বলিল—"রামায়ণ তো পড়েছ, সরযূ! রামের দেওয়া গণ্ডীত্যাগ করে' সীতা যখন রাবণকে ভিক্ষা দিতে গিয়েছিলেন তখন কি তিনি ভাবতেও পেরেছিলেন যে তাঁর জীবনব্যাপী শোকাশ্রুতে একটা মহাকাব্য অভিষিক্ত হ'বে ?"

সরযূ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিল,—"তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি—"

নরেশ বাধা দিয়া বলিল—"তোমার কোন কৈফিয়ৎ আমি শুনতে চাই না সরযূ। আমি এই ভেবেই আনন্দ পাচ্ছি বাঙলার মেয়েরা এখনও তাদের নারীত্বের গৌরব-বোধ হারিয়ে ফেলে নি এবং দরকার হ'লে এখনও তা ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির মত দপ করে' জ্বলে উঠতে পারে—তা সে সংস্কার যতই যুক্তিহীন, অন্ধ, পুরান বলে মনে হ'ক না কেন ? আর এও বল্‌ছি, সরযূ, তোমার মত নারীরাই যুগে যুগে জাতিকে গরীয়সী, মহীয়সী করে' এসেছে।"

চির-লবণ

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরানো ঘট ভাসিয়ে জলে, বছর হ'লে শেষ,
　　　　বসিয়া থাকি তটে,
ঊষার লাগি', রজনী জাগি' চাহিয়া অনিমেষ
　　　　ধূসর প্রাচী-পটে।
এবার ভাবি নবীন রবি উদিবে হাসি-মুখে,
　　　　ছড়াবে হেম-ভাতি,
যাবে কুয়াসা, নূতন আশা জাগিবে প্রাচী-বুকে
　　　　পোহাবে দুখ-রাতি।
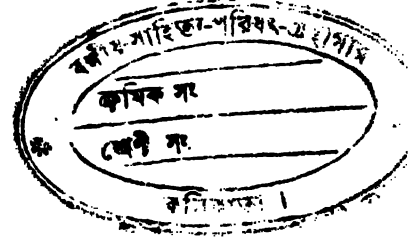
মাটীর ঘট চূর্ণ করি' সোণার ঘট ভরি'
　　　　সোণার বারি আনি,
হ'বই হ'ব পূর্ণ আজি বিন্দু পান করি'
　　　　ঘুচিবে তৃষা-গ্লানি ;
মাটীর ঘট পরশ করি' সলিল গতবার
　　　　হয়েছিল যে লোণা,
এবার জলে পাবই পাব স্বর্গ-সুধা-তার
　　　　—পাত্রটী যে সোণা !

বাড়িল বেলা, অগ্নি-খেলা, দীপ্ত ভানু দহে
আকাশ, ধরাতল,
বক্ষ মোর সাহারা হেন তৃষার কথা কহে
যাচি' শীতল জল ;
দারুণ তৃষা কণ্ঠ শোষে, কলস পানে চাই,
—সে যে পরম নিধি,
সোণায় ঢাকা তরল বিষ সেথায় শুধু পাই,
—হায় নিঠুর বিধি !

বুঝিনু তবে আধার নিয়ে গর্ব্ব এত করা
মিছা যে ভাই তবে,
কাল-জলধি সৃজনাবধিই আছে লবণ-ভরা,
—চিরদিনই তা রবে ;
লবণ বারি হয় না মিঠা যে আধারেই রাখ,
সোণা অথবা মাটী,
সব স্বাদের অতীত হ'য়ে সিন্ধু-বারি চাখ।
এই কথাটী খাঁটি !

কত বছর এমনি করে' আশায় বসে থাকা
মোটেই নয়ক' ভালো,
দেখ্‌বে, যত এগিয়ে যাবে খুলে কালের ঢাকা,
কালোর পরে কালো।
তাহার চেয়ে ঝাঁপিয়ে পড় অতল নীল নীরে
—হয় ত ডুবে যাবে,
নয় ত ফিরে উঠবে ধীরে ও-পারের ও তীরে
—অকূলে কূল পাবে।

'কর্ম্মদেবী'-চরিত্রাঙ্কনে রঙ্গলাল

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'কর্ম্মদেবী' নামক সৎকাব্য রচনা করিয়া "আমাদিগের দেশীয় ভাষায় ভাষিতা বিমলানন্দ-দায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগবৃদ্ধি"র প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বলিখিত 'ভূমিকা'য় আশা করিয়াছিলেন যে, "সৎকাব্যের যে দিন দিন সমাদরবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই, অতএব এই 'কর্ম্মদেবী' স্বীয় অগ্রজা 'পদ্মিনী'র ন্যায় সাধারণের কিয়ৎ অনুগ্রহের পাত্রী হইবেন এমত বিশ্বাস হইতেছে"। কবি যে তাঁহার এ প্রচেষ্টায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তাহারই সমসাময়িক রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রমুখ "প্রচুর মানসিক শক্তিশালী সাহিত্যিকগণের ন্যায় তিনিও "মাতৃভাষার উত্তমোত্তম কাব্য প্রণয়ন করিয়া" বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন।

সূচনা

রাজপুত জাতির শৌর্য্যবীর্য্যের আধারভূমি রাজপুতানার অন্তঃপাতী মারবর দেশে আদর্শসতীকুলরাণী রাজনন্দিনী কর্ম্মদেবীর একটী মর্ম্মরমূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। কবি রঙ্গলাল সাধারণের নিকট এই মূর্ত্তির পরিচয়-প্রকাশেই 'কর্ম্মদেবী' কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

"মরুদেশে আছে এক রম্য সরোবর
কর্ম্ম-সরোবর নাম পুণ্য তীর্থস্থল,
অদূরে মণ্ডপ এক ধবল উজ্জ্বল,—
অপূর্ব্ব উপলময়ী প্রমদা প্রতিমা
মণ্ডপ-মাঝারে শোভে,রূপে নাহি সীমা;
শুনিলাম কর্ম্মদেবী নৃপনন্দিনীর
পাষাণপ্রতিমা সেই, শোভিত রুচির।
কেবা সেই কর্ম্মদেবী কিবা কথা তাঁর?
কেন সে স্থাপিতা মূর্ত্তি অপ্সরা-আকার?
কেন কর্ম্ম-সরোবর সরসীর নাম?
বিশেষিয়া পূর্ব্বকথা, কহ গুণধাম।"

'কর্ম্মদেবী' কাব্যের বিষয়-বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ওরিণ্ট ঈশ্বর, নৃপতি শ্রীমাণিক্য দেব রায়ের একমাত্র "ষোড়শী রূপসী, কুমারী কন্যা, শ্রীকর্ম্মদেবী, যশল্মীর অন্তঃপাতী পুগলদেশস্থ ভট্টিজাতির অধিপতি, অনঙ্গদেবের পুত্র, মহাপরাক্রান্ত ও রূপে গুণে অদ্বিতীয়, বীরাগ্রগণ্য 'সাধু'র শৌর্য্য বীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন ও তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন এবং তদবধি প্রতিজ্ঞা করেন যে,—

"সাধু ভিন্ন অন্য জনে, পতি শব্দে সম্বোধনে
না করিব আপনা অসতী;
যদি অন্য হয় স্বামী, জীবন ত্যজিব আমি
অথবা ত্যজিব নিকেতন।"

ইত্যাদি

কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কর্ম্মদেবীর পিতা রাঠোররাজকুমার অরণ্যকমলের সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া বাগ্‌দান করিয়াছিলেন।

একদিন মাণিক্য রায়ের নগরে অত্যন্ত ধুমধামের সহিত রঙ্গভূমি সুসজ্জিত হইল। নানাদেশ হইতে চৌহান, রাঠোর প্রভৃতি রাজপুত বীরগণ যোদ্ধৃবেশে দলে দলে রঙ্গভূমির বলী-চক্রে প্রবেশপূর্ব্বক নানাপ্রকার যুদ্ধক্রিয়ার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিল। সমরশিক্ষার প্রতিযোগিতায় সেদিন তাবৎ বীরমণ্ডলীর মধ্যে পুগল-রাজকুমার "সাধু"ই জয়লাভ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিল এবং "লোকারণ্য অগণ্য সুধন্য ধ্বনি" করিতে লাগিল। তখন—

"মাণিক্য আসন থেকে করি গাত্রোত্থান,
ইঙ্গিতে আপন স্থানে করেন আহ্বান।
মঞ্চোপরি বসি যথা সীমন্তিনীগণ।
সেই দিগ হয়ে 'সাধু' করিছে গমন।"

এমন সময় এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। রাজকুমারী "কর্ম্মদেবী মনে মনে সাধু পরিণীতা বণিতা আমি" স্থির করিয়া অশ্বারোহী 'সাধু'র গলদেশে কুসুম-মাল্য অর্পণ করিয়া সর্ব্বজন-সমক্ষে বলিলেন—

"ধর, ধর রাজপুত্র এ কুসুম-হার
কুমারী শ্রীকর্ম্মদেবী কৃত পুরস্কার
দেখাইলে রঙ্গভূমে শিক্ষা চমৎকার
তব যোগ্য পুরস্কার আছে কিবা আর !
করিলেন সমর্পণ পাণিসহ প্রাণ
এই কুসুমের হার তার অভিজ্ঞান।"

অতঃপর শ্রীমাণিক্যভূপ, বিশেষ চিন্তান্বিতা হইয়া কন্তাকে বলিলেন—

"কহ বাগ্‌দত্তা যেই, কহ বাগ্‌দত্তা যেই
কেমনে আর বরিবেক সেই !"

এতদ্ভিন্ন অরণ্যকমল অতি প্রচণ্ড ও দুর্দ্দান্ত, সে শীঘ্রই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া তিনি এ বিবাহে আপত্তি করিলেন। কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডায় ?

উপযুক্তা, জ্ঞানবতী, তেজস্বিনী কন্তা নানাবিধ যুক্তি-তর্ক দ্বারা পিতাকে অবশেষে এই স্বয়ংবর বিবাহে প্রবৃত্ত করাইলেন। বলিলেন—

"এই শাস্ত্র সুশোভন এই শাস্ত্র সুশোভন
যার প্রতি রতি, মতি; পতি সেইজন।
হ'লে অন্তথাচরণ হ'লে অন্তথাচরণ
নিশ্চয় তোমার পদে ত্যজিব জীবন॥"

সুতরাং 'শুভলগ্ন শুভক্ষণে মাণিক্যদেব রায়' 'সাধু'র হস্তে কন্তা সমর্পণ করিলেন, পিত্রালয় নিরানন্দে পরিণত হইল।

"চলিল রঙ্গিণী রঙ্গে প্রিয় প্রাণপতি সঙ্গে
রতি যথা স্বীয় পতি সনে—"

পথিমধ্যে দৈবপ্রতিকূলভাবশতঃ অরণ্যকমলের সহিত 'সাধু'র ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। যেন—

"এক সিংহী তরে, দুই সিংহে রণ করে
গরজিত ঘোর স্বরে, কম্পিত দুই শরীর।"

অমিতবিক্রমে সাধু অরণ্যকমলের সহিত অসি-যুদ্ধ করিতে করিতে, অবশেষে—

"হয় 'সাধু'বীর ধরায় পতিত হয়
পুনঃ না উঠিতে বসি অরণ্য কমল পশি,
হৃদয় উপরে কষি, মারিল অসি দুর্জ্জয়
যেন যজ্ঞোপবীতের প্রায়।
মুহূর্ত্তকে কাটিলেক সাধুর কাঞ্চন কায়।"

সাধুর এই শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে সাধ্বী কর্ম্মদেবী, অশ্রুবিগলিতনয়নে, শোকাকুলহৃদয়ে স্বীয় সহোদরকে বলিলেন,—

"পতি-রতা পত্নী যেই,
পতিব্রতে রতি তার, জীবনে মরণে
হারাইয়া পতি ধনে,
যতি ব্রতে ব্রতী সেই, হইবে কেমনে ?"

তখন—

"পতির খর কৃপাণ লইয়ে করে
স্বীয় বাম বাহুতে প্রহারে।
ছিন্নকর ভূষণ সহিত
সহোদর হস্তে করি সমর্পণ—"

অনুরোধ করিলেন,—

"আমাদের কুলকবিবরে
দিও এই হস্ত রতনমণ্ডিত
সতীত্বের সঙ্গীত আখ্যানে ভাই
গান যেন দাসীর চরিত।"

তারপর ভ্রাতাকে অপর বাহু ছেদন করিয়া পিতৃ-সন্নিধানে প্রেরণ করিতে উপদেশ করিলেন এবং জানাইলেন,—

"পিতার স্থানে দাসীর এ শেষ ভিক্ষা
সাধু সহ দহি কলেবর
এই স্থানে সরসী খনন করি'
নাম দেন কর্ম্ম-সরোবর।"

অনন্তর—

"বাণী শেষে ধরাসনে বরাননা
পতি পাশে পতিতা হইলা।"

তারপর সব ফুরাইল। 'চন্দনা'র তীরে" চিতা সাজাইল— মহা আড়ম্বরে" তখন—

"জ্বলিল বিষম হুতাশন,
কালানল সম সেই বৈশ্বানর ॥
দহিল কাঞ্চন তনুদ্বয় চারু।"

গ্রন্থশেষে কবি পূর্ব্বোল্লিখিত পাষাণমূর্ত্তির পরিচয় এইরূপে সমাপ্ত করিয়াছেন,—

"সেই কর্ম্ম-সরোবর পুণ্যতীর্থস্থান,
রত্নশিলা বিরচিত সতীর আকৃতি
ধরাধামে অবতীর্ণা যেন দেবী ধৃতি
সতীত্ব, সাধ্বীত্ব গুণে বরণীয়া অতি
অধুনা তাহার তুল্য আছে কেবা সতি ?"

কাব্য প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মদেবী কাব্যের বৈশিষ্ট্য

কি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া কবি রঙ্গলাল তাঁহার "পদ্মিনী-উপাখ্যান", "কর্ম্মদেবী" প্রভৃতি কাব্যগুলি রচনা করেন তাহা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"স্বাধীনতা-সুখ-বিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিরহ হয়, সুতরাং পরপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যে যথার্থ কবি কোনরূপেই কেহ হইতে পারে না"—এই 'অযুক্তি নিরসন' নিমিত্ত উক্ত কাব্যসমূহের সৃষ্টি। অলৌকিক বর্ণন-দোষে দূষিত বোধ হওয়ায় রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণেতিহাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি আধুনিক রাজপুতইতিহাস হইতেই আপনার উপাখ্যান সংগ্রহ করিলেন। ভারতের বীরত্ব, শৌর্য্য, বীর্য্য, তেজস্বিতা, সতীত্ব প্রভৃতি গুণাবলীর আদর্শরক্ষাই তাঁহার কাব্যের মূল বা ভিত্তি।

কবি রঙ্গলালের "কর্ম্মদেবী" এক বিষয়ে বঙ্গ সাহিত্যে 'অভিনব' কাব্য তাহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রথম কাব্যে 'উদ্দীপনা' শক্তির অভাব কথঞ্চিৎ মোচন হইয়াছে।

"আমাদের এই একটী ভাল বস্তু ছিল না; উদ্দীপনা-শক্তি ছিল না। যে বাক্‌শক্তি ইউরোপে এলোকোয়েন্স বলিয়া প্রতিষ্ঠিত তাহা আমাদের ছিল না।" (যোগসাধন —২য় ভাগ)

অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, উপমা, রূপক, দৃষ্টান্ত, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনাদীপক, অপহ্নুতি প্রভৃতি কাব্যের অলঙ্কার। অলঙ্কারকারেরা উদ্দীপনা-বিভাবের বর্ণন ও তাহার লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উদ্দীপনা বিভাবকে তাঁহারা রসের একটী অঙ্গ বলেন। রসকে কাব্যের সারভূত পদার্থ বলেন। "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্।"

কর্ম্মদেবীতে স্বদেশ-হিতৈষণায় প্রবৃত্ত হইয়া উদ্দীপনা বলিতেছেন,—

"সোমনাথ, মধুপুরী, আর কলিঞ্জরে
নিধিপূর্ণ মন্দিরের পঞ্জরে পঞ্জরে।
কে হরিল সেই সব অমূল্য রতন ?
কে হরিল সে সকল কুবেরের ধন ?
কে করিল পুণ্যভূমি দুঃখেতে নিক্ষেপ ?
কে দিল তাহার দেহে যাতনা প্রলেপ ?
অনুপমা ভারতের পতিব্রতাগণ
কে করিল তাহাদের মর্য্যাদা হরণ ?
* * * *
কি বাণিজ্য দ্রব্য এদেশে এনেছ ?
তোমাদের দেশ বড় উর্ব্বর জেনেছ ?
জাননা ভারতভূমি লক্ষ্মীর আবাস
কত শস্য জন্মে ইথে বিরহে প্রয়াস ॥
* * * *
এই দেশে কুঙ্কুম কস্তুরী মৃগমদ
এই দেশে কালাগুরু চন্দন বিশদ ;
এই দেশে মল্লিকা, যূথিকা আর যাঁতি
এই দেশে মালতী সেবতী নানাভাতি।
* * * *
এ চেয়ে অনেক ধন অমূল্য রতন।
তোমরা এদেশ থেকে করেছ হরণ ॥
লহ এক এক অশ্ব এক এক জন
দ্রুতবেগে সিন্ধুপারে কর পলায়ন।
ধন আশে পুন আর এসনা এদেশে,
যদি এস প্রতিফল পাবে তার শেষে।

কবি ও কাব্য আমাদের দেশে অনেক। "কিন্তু একজনও উদ্দীপক ছিলেন না। যে নিভৃত-চিন্তা কবিতা থাকার কারণ, সেই নির্জ্জনস্পৃহা উদ্দীপনা না থাকার কারণ। এই যে সমস্ত বঙ্গজাতি টপ্পাগান-প্রিয় তাহাতে কি বুঝায়?

এ দেশে কখনও উদ্দীপনার বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই।" (যোগসাধন)

অন্যান্য কাব্যাপেক্ষা রঙ্গলালের কবিতার বৈশিষ্ট্য এই "উদ্দীপনা" যথা—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।"
ইত্যাদি (পদ্মিনী)

'কর্ম্মদেবী' কাব্যের আদর্শ ভাব ও ভাষা

'কর্ম্মদেবী' বীরত্বগাথার চূড়ান্ত কবিতা। তেজস্বিতা, বীরচর্য্যা, বীরবার্ত্তা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার নিরুৎসাহ ভাব এ কাব্যে পরিলক্ষিত হয় না। কবির কথায় বলিতে হয়, যে এই গ্রন্থ,—

"বীররসে বিচক্ষণ, তাই মাত্র আলাপন।"

বঙ্গদেশের, তথা সিন্ধু-কাবেরী-নর্ম্মদাদি পরিশোভিত সমগ্র ভারতবর্ষের নারীধর্ম্মের একমাত্র আদর্শ অমূল্য সতীত্ব রত্ন। রঙ্গলালের 'কর্ম্মদেবী' সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর অনুরূপ আদর্শে অঙ্কিতচিত্র ; সতীত্বের গৌরবময় আলেখ্য।

যে বীরত্ব ও সতীত্বের মহৎ আদর্শ উপলক্ষ্য করিয়া কবি তাঁহার এই কাব্য রচনা করিয়াছেন—তাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে সফল মনোরথ হইয়াছেন। উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া—উচ্চ চিন্তা করাইয়া মানুষকে মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন করিব—এই তাঁহার সংকল্প ছিল। এই দৃঢ় সংকল্পে তিনি লেখনী ধারণ করিয়া বীণাপাণির পরিচর্য্যায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে সাধুসংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে। বীরাগ্রগণ্য পুগলরাজকুমার "সাধু" ও বীরমহিষী, রাজনন্দিনী, সতী কর্ম্মদেবী তাহার মহান্ আদর্শে নির্ম্মিত সুন্দর প্রতিকৃতি।

'কর্ম্মদেবী' রচনায় "ভাষা সালঙ্কৃতা এবং বহুলীকৃতা" করিবার অভিলাষও তাহার পূর্ণ হইয়াছে। নানাবিধ ছন্দ, রস ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া তাহার কাব্য বঙ্গভাষার অশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছে। কতিপয় কবিতায় সংস্কৃত ছন্দেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য কবি সংস্কৃত ভাষায় রচিত "কুমারসম্ভব কাব্য" বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন।

'কর্ম্মদেবী' রাজস্থানের শৌর্য্য-দীপ্তি-ছটায় উদ্ভাসিত। উক্ত কাব্যের ভাষা ও শব্দসম্পদ ও রচনামাধুর্য্যে বরেণ্য। যথা—

"মার্ত্তণ্ড-ময়ূখমালা মৃত্যুর কিঙ্করী
মায়াবিনী মরীচিকা যার সহচরী॥
* * *
প্রমথেশ প্রমদা পূজিত প্রহরণ
দিনকরদ্যুতিপ্রায় অতি সুশোভন।

উপসংহার

ভাব ও ভাষার পরিমার্জ্জিত রুচি সংরক্ষা করিতে রঙ্গলাল বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি 'পদ্মিনীর' ভূমিকায় বলিয়াছেন—"হে স্বদেশীয় মহাশয়-বর্গ! আপনারা ঘৃণিত উলঙ্গ আদিরসের কবিতার প্রেম পরিহার পূর্ব্বক বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রীতি রসে প্রবৃত্ত হউন।"

ভারতচন্দ্রের আদিরসাত্মক কবিতার প্রতি বীতস্পৃহ হইয়াই তিনি এই রৌদ্ররসের বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যরচনা করেন। আদিরসলালায়িত বাঙ্গালীর রুচির সহিত বীরভাবাপন্ন রাজপুতদিগের রুচির তুলনা করিয়া বাঙ্গালীকে তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। যথা—

"মাটিতে রচিত মল্ল, মল্লসহ খেলে
সমাদরে ক্রয় করে রাজপুতের ছেলে।
যে দেশে যেরূপ বৃত্তি, সেইরূপ মতি
সেইরূপ ক্রীড়ারস, সেইরূপ রতি।
শৈশব হইতে সেই দিগে চিত ধায়।
অন্যরস অন্যরূপ ক্রীড়া নাহি চায়।
যথা বাঙ্গালার লোক নহেক সাহসী
নারীপ্রিয় কেলি-কলা কৌতুকবিলাসী
শিশুর পুতুলে দেখ, আভাস তাহার
কামকলা-ছলা তাহে প্রত্যক্ষ প্রচার।
পুতুলে পুতুলে বিয়া, বহু বহু কেলি
নিতান্ত কিশোরে যত বাল-বালা মেলি।
কিরূপে পৌরুষপথে যাইবে বালক
তামাকু-খাকুয়া বুড়া, প্রিয় খেলনক।
পশ্চিমের প্রজাপুঞ্জ পুরুষার্থ চায়,
সেইমত দেখহ শিশুর খেলনায়।"
(কর্ম্মদেবী)

ইহার সহিত রাজপুতবালা কর্ম্মদেবীর সেই তেজঃপূর্ণ পুরুষার্থব্যঞ্জক উক্তিটার তুলনা করিলেই আমাদের জাতীয়-দৌর্ব্বল্য বেশ বুঝা যায়।

"বীরের নন্দিনী আমি, বীরবর মম স্বামী,
বীরপ্রসবিনী হ'ব শেষ ;
বাহুবলে পুত্রগণ করিবেক সুশাসন
বাড়িবেক পুগলের দেশ।"

(কর্ম্মদেবী)

তাই বলি আজ দিন আসিয়াছে,—হে বাঙ্গালার নরনারী! যে দিন কবি রঙ্গলালের "কর্ম্মদেবীর" উদ্দীপনা ও বীর প্রতাপের উচ্চ আদর্শ তোমাদের জাতীয়-জীবনের উন্নতিকল্পে পথপ্রদর্শক-বর্ত্তিকাস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। কবিবরের এই উক্তি স্মরণপথে জাগরূক রাখিতে হইবে,—

"বীরভোগ্যা এ মেদিনী, বীরভোগ্যা এ মেদিনী,
সেইরূপ বীরভোগ্যা বীরের নন্দিনী।"

আশা করি ভগবদ্কৃপায় বঙ্গের প্রতি গৃহে কবি রঙ্গলাল-অঙ্কিত ভারতরমণীর সতীধর্ম্মের আলেখ্য "কর্ম্মদেবী" আদর্শরূপে নরনারীর মানসপটে চিরাঙ্কিত থাকিবে। *

* খিদিরপুর মধুমিলন উৎসবের যোড়শ বার্ষিক অধিবেশনে রচনা-প্রতিযোগিতায় পদকপ্রাপ্ত।

পিপাসা

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত
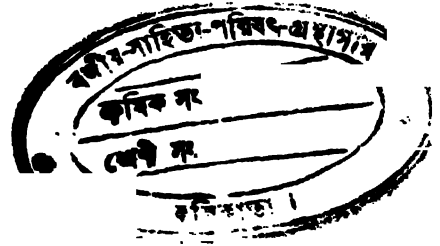
সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইহার দিন দুই পরে সেদিন দুপুর-বেলায় উপস্থিত বাড়ীর পুরুষমানুষ দুইটী যে যাহার কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। শ্যামের মা বাসন-কোসন মাজিয়া ঘর পরিষ্কার করিয়া দীর্ঘ পরিশ্রমের পর একবার পাড়ায় বাহির হইয়াছিল। সৌদামিনী নিদ্রিত। এই অবকাশে গিরি একবার নীচে নামিল। হিমাংশুর ঘরটী শ্যামের মার তত্ত্বাবধানে খোলাই থাকিত। ঘরের কাজ সারিয়া শিকলটা আঁটিয়া রাখিলেই তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইত।

গিরি শিকল খুলিয়া চোরের মত ঘরে প্রবেশ করিল। চারিদিকে চক্ষু বুলাইয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে সে কাঁদিবে কি হাসিবে স্থির করিতে না পারিয়া খাটের এক কোণে বসিয়া পড়িল।

তারপর একখানা শতছিন্ন তোষকে মোড়া যে শয্যাটী ছিল, সে তাহা মেলিয়া ফেলিল। দেখিল, তাহার স্থানে স্থানে চাওড়া চাওড়া তুলা সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। মাথার বালিসটী শুধু তৈলাক্ত নয়—ময়লার চাপে আর কাল রঙএর মাঝখানটায় জমাট বাঁধা। মেঝের উপর এক জোড়া ছেঁড়া চটি, একটা ষ্টোভ, স্পিরিটের বোতল একটা, আলুমিনিয়মের ডেকচী একটা, থালা একখানা, বাটী দুটী; পিতলের ঘটী একটী এবং কতকগুলি শিশি-বোতল জঞ্জালের মত চারিদিকে ছড়ান। তারপর নজর পড়িল একটা জলের কুঁজোর উপরে। কুঁজোর গলাটী নাই। একটা কাচের গ্লাস পড়ি-পড়ি করিয়া রহিয়া গিয়া জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতেছে। দেওয়ালে পেরেকের গায় দুইটী জামা ও একখানা কাপড় বেশ পরিষ্কার। কোণের দিকে একপার্শ্বে একটী টিনের বাক্স, তালা দেওয়া। তাহার উপরে কয়েকখানি মলিন বস্ত্র জড় করিয়া রাখা হইয়াছে এবং ঐ বস্ত্রের ভিতর দিয়া একটা কাঠের বাক্সের কতকাংশ দেখা যাইতেছে।

সে উঠিয়া গিয়া কাপড়গুলি সরাইয়া ফেলিল। কাঠের বাক্সটার তালা ছিল না। সিল্কের কাপড়ে জড়ান একটা বাণ্ডিল উপরে চিক্ চিক্ করিতেছিল। সে বাণ্ডিলটা তুলিয়া দেখিল, মহেশ ভট্টাচার্য্য-কৃত একখানা গৃহ-চিকিৎসার পুস্তক। তাহার নীচে হোমিওপ্যাথি ঔষধ-পূর্ণ কতকগুলা শিশি। সে সেগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া খাটের উপর আসিয়া চুপ্ করিয়া বসিল; কিন্তু তাহার যেন মনে হইতে লাগিল, গৃহস্বামীর সুকৃতি বা দুষ্কৃতির সমস্ত রহস্যই ঐ বাণ্ডিলটার ভিতরে যেন গা ঢাকা দিয়া লুকাইয়া আছে।

সে ধীরে ধীরে বাক্সটার নিকটে গিয়া আবার দাঁড়াইল। বাণ্ডিলটা খুলিয়া দেখিল,—একখানা খাতা। উপরে এক টুক্‌রা কাগজ আঠা দিয়া লাগান, বড় বড় অক্ষরে লেখা —'শেষের সম্বল'।

খাতাখানার পৃষ্ঠা উল্টাইতেই পুলক ও বিস্ময়ের বিপুলতর উচ্ছ্বাসে তাহার বুকখানা ফুলিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি জানালার নিকটে গেল এবং শিক ধরিয়া দেখিতে লাগিল, তাহার এ চুরি কেহ লুকাইয়া দেখিতেছে কি না!

তাহারা উভয়ে যখন এক সঙ্গে পড়াশুনা করিত, তখন হিমাংশু যেখানে যে ভাল শ্লোকটা পাইত এই খাতায় লিখিয়া রাখিত; স্বাক্ষর করিত,—'হিমাংশু'। গিরিও নিম্নভাগে অনুরূপ লিখিয়া হাত দুরস্ত করিত। স্বাক্ষর করিত,—'গিরি'। খাতাখানা দুইজনারই পাশাপাশি হস্তাক্ষরে পূর্ণ। গিরি কত খুঁজিয়াছে—পায় নাই। এই দুষ্ট চোর ঔষধের মধ্যে ডুবাইয়া যে তাহাকে তাজা করিয়া রাখিয়াছে এ ধারণা সে কোথায় পাইবে? খাতা-খানাকে নমস্কার করিয়া সে তাহা সেইভাবে বাঁধিয়া আবার তুলিয়া রাখিল এবং তথায় আর অধিকক্ষণ না দাঁড়াইয়া দরজায় শিকল টানিয়া দিয়া টলিতে টলিতে সে উপরে উঠিয়া গেল।

নিজের ঘরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিছানার উপর পড়িয়া থাকিয়া অনেক কথাই সে ভাবিয়া লইল। খাতাখানাকে যে 'শেষের সম্বল' করিয়াছে তুলিবার সম্ভাবনা তাহার কোথায়ও আর বেদনাকে যে বুকজোড়া করিয়া রাখিয়াছে, কবরের মুখ মিলিতে স্থান বা তাহার কোথায়?

তারপর কাব্যের স্বপ্নময় সুখস্মৃতির মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবিয়া থাকিবার পর একটা বিষয়ে সে যাহা সিদ্ধান্ত করিল, তাহার মধ্যে সৌদামিনীকে টানিয়া লইবে কি না সে ভাবিতে লাগিল। না লইলেও বা উপায় কি? তাহার অগোচরে কতটা কি করা যাইতে পারিবে? আর করাও কতদূর সঙ্গত হইবে? সে তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিল। এত ব্যস্ত যে, একটা দিনও যেন আর এভাবে অতীত হইতে দেওয়া যায় না।

সৌদামিনীর ঘরে গিয়া দেখিল, সে তখন মনোযোগের সহিত আসন বুনিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

গিরি বলিল,—"বেড়াতে যাবি?"

সৌদামিনী আসনের উপর নজর রাখিয়া বলিল, "কোথায়?—বাগানে?"

"বাগানে পুরুষমানুষ না হ'লে আর একলাটী যাই কি করে'? আর এই দুপুর রোদ্দুরে! যাব এক গেরস্থ-বাড়ীতে।"

আসনখানা গুটাইয়া রাখিয়া সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কাপড় পালটাবে না?"

"কাপড়ের আর কি পালটাব? এই তো নিকটেই এক পড়শীর ঘরে যাব" বলিয়া সৌদামিনীর হাত ধরিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল। এবং শিকল খুলিয়া হিমাংশুর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ঘরের মধ্যে পা দিতেই তাহার সকল উৎসাহ থামিয়া গিয়া মুখখানা বিমর্ষ হইয়া পড়িল। বলিল,—"বাবুটীর এই গেরস্থালী দেখতে এলুম।"

সৌদামিনী গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা! এরই জন্যে এত ভণিতা!" তারপর চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া সে বলিল, "বিছানাটা বুঝি শ্মশান থেকে কুড়িয়ে এনেছেন? বোতলটা কিছু বাড়তি রকমের দেখছি।"

গিরির চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিতেছিল। অতিকষ্টে সে সংবরণ করিল।

সৌদামিনী বলিল, "সমানে সমান মেলে কি না! শ্যামের মাও হয়েছে তেমনি। না হয় জিনিস-পত্তরগুলো একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখ—যেন কাকে ছড়িয়ে রেখে গেছে। এমন অপটু লোকটীর দুটো ভাতের ব্যবস্থা করে' দিয়ে ভালই করছ।"

গিরির বুকের মধ্যে যে আলোড়ন চলিতেছিল, সেটা যেন আরও বেশী করিয়া দুলিয়া উঠিল। তাহারা উভয়েই এখন খাটের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়াছে। কিছু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া গিরি বলিল,—"ভাবছি কি—এত কষ্ট পেয়ে মানুষ কাটায় কি করে'? জিনিস-পত্তরের তো আমাদের অভাব নেই। উপর থেকে কিছু কিছু এলে ঘরটা সাজিয়ে দিলে কেমন হয়?"

সৌদামিনী এ প্রস্তাব বেশ আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিল। উৎসাহের সহিত সে বলিল, "মদের বোতলগুলায় যদি তুমি হাত দিতে সাহস কর, ঘরটা এমন করে' সাজিয়ে দিতে পারি যে, বাবুটী চমৎকৃত হয়ে যান্।"

গিরিও তাহাই চায়। তখন দুইজনে কোমরে কাপড় জড়াইয়া হিমাংশুর টীনের এবং ঔষধের বাক্সটী ব্যতীত অন্য সকল দ্রব্যই পরিত্যাজ্য জিনিসের মত তাহারা আর একটী ঘরে জড় করিয়া রাখিয়া আসিল। তারপর ঘরটী ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া উপর হইতে সতরঞ্চ, তোষক, সুদৃশ্য চাদর, ঝালর-দেওয়া বালিস, পাশের বালিস, নেটের মশারি প্রভৃতি আনিয়া খাটখানি সুদৃশ্য করিল। ছোট টেবিল ও একখানা চেয়ারও দুইজনে হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে টানিয়া লইয়া আসিল। তাহার উপর লেখাপড়ার সজ্জা, রূপার ডিবা, রূপার গেলাস, আয়না-চিরুনী, টেবেল-ল্যাম্প, এমন কি ছুরি-কাঁচি পর্য্যন্ত রাখিতেও বাদ রাখিল না। আলনাও একখানা আনিল। তাহার উপর কাপড়-চোপড়গুলি গুছাইয়া রাখিল। মোট কথা সর্ব্বরকমে দৃশ্যসম্পদে কক্ষটী তাহারা এমন সুন্দর করিয়া তুলিল যে, এই ক্ষুদ্র গৃহের কর্ত্তাটীর শনির দশা এই দুই নারীর ব্যস্ত হস্তের কোমল স্পর্শে যেন কাটিয়া গেল।

গিরি যখন দুইখানি রুমাল আনিতে উপরে চলিয়া গেল, তখন সৌদামিনীর অন্তরে একবার খোঁচা দিয়া উঠিল যে,যাহার সুখ-সুবিধার জন্য তিলটুকু বাদ রাখিতেছে না, সেই যুবকটী তাহার ননদিনীর পরিচিত কি না? অথবা তাহার ননদিনী শুধু সভাবধর্ম্মের বশেই এইরূপ করিয়া যাইতেছে।

কাঠের বাক্সের ভিতরকার রেশমী রুমালের বাণ্ডিলটার উপর তাহার নজরও একবার পড়িয়াছিল। গিরি চলিয়া গেলেই সে তাহা খুলিয়া দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল কিন্তু যদি তখনই তাহার ননদিনী আসিয়া পড়ে তাহা হইলে একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে ভাবিয়া নিরস্ত হইল। গিরি ফিরিয়া আসিলে সে বলিল,—"এত খাটুনি—এখন পুরস্কার পেলে হয়। বোতল তো কম সরাইনি; পুরস্কার দেবার মত মেজাজ আর সম্বল তাঁর থাকলে হয়।"

গিরি ছোট একটী বেদনাভরা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"মেজাজ যে নেই, সে বোতলেই প্রমাণ। আর সম্বল থাকলে তিন মাসের ভাড়া বাকী পড়ে? আমরা দুঃখী-দুঃখই আমাদের পুরস্কার। তাই তো দুঃখী লোক কে অত ভালবাসি। হরেনবাবুকে বরং বলে দিও, ভাড়ার টাকার জন্যে যেন এঁকে ব্যতিব্যস্ত না করেন।"

সৌদামিনী হাসিয়া বলিল, "পুরস্কার তো গেল! এখন আসলেও ফক্কিকার! যাক্, হরেনদার কাছে কিছু উত্তম-মধ্যম পাওয়া যাবে। একদিক্ থেকে পেলেই হ'ল

বেলা বড় বেশী ছিল না। আফিসের বাবুদের ফিবিবার সময় হইয়াছে। তাহারা আর নীচের ঘরে অপেক্ষা করিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হিমাংশু আফিস হইতে ফিরিয়া শিকল টানিয়া ঘরে ঢুকিতেই নেটের পরিচ্ছন্ন মশারিখানা, শয্যার সুদৃশ্য চাদর এবং তদুপরি দুগ্ধফেননিভ উপাধান কয়টী নির্য্যাতনের চিহ্নের মত সর্ব্বপ্রথমে তাহার চক্ষুদুইটা বিদ্ধ করিয়া ধরিল। ইহারা যেন গৃহখানায় অন্যের স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া দিবার জন্য কঠোর দৃষ্টিতে অবজ্ঞা করিতেছে! ঘরের মধ্যে পা বাড়াইতে সে সাহস করিল না। শ্যামের মার অপেক্ষায় চৌকাঠ ধরিয়া ব্যাকুলচিত্তে বারেক পথের দিকে, বারেক সিঁড়ির পথে চাহিতে লাগিল।

শ্যামের মা সেদিন তাহার এক বোনঝির সঙ্গে দেখা করিতে একটু দূরে গিয়াছিল। অন্যদিন এ সময় গৃহের কাজকর্ম্মে সে ব্যাপৃত থাকিত। এই বৃদ্ধা দাসী একমাত্র তাহার অবলম্বন হইলেও সে কোনদিন তাহাকে

ডাকাডাকি করিত না। প্রয়োজনের বেলা উৎকণ্ঠিতভাবে তাহার মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিত। আজও তাহার পরিশ্রান্ত দেহ লইয়া সে শুধু আকুল প্রতীক্ষায় দ্বারের পথে চাহিয়া রহিল।

শ্যামের মা যখন ফটক দিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিল, তখন সে তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "শ্যামের মা আমাকে আজই উঠে যেতে হবে, সে কথা আফিসে যাবার বেলাও তো বল নি?"

সে উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তোমাকে উঠে যেতে হ'বে কে বল্‌লে?"

হিমাংশু বলিল, "এই দেখ না, এ ঘরে আর একটী বাবু এসেছেন। আমি এখন কি করি বল তো?"

শ্যামের মা ত্বরিতপদে হিমাংশুর গা ঘেঁসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ—কে বাবু?"

হিমাংশু ব্যাকুলভাবে বিষণ্নমুখে বলিল, "কা'কেও তো দেখছি নে! কিন্তু দেখতে পাচ্ছ তো সকলি?"

শ্যামের মা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছু বিষণ্ন হইল। বলিল, "তাই তো! কোন বড়লোকের বেটা হ'বে। নিশ্চয়ই এ হরেনবাবুর কাজ। আচ্ছা! তুমি দাঁড়াও বাছা! আমি শুধিয়ে আসি। বুড়ো মানুষ আমি! আমার সৎপরামশটাও একবার নিতে হয়? তুমি ভেবো না বাছা! আমি যাচ্ছি ওপরে—ন্যাটের মশারি ঐ কলকাতায় ছুঁড়ে ফেলে দেব'খন্" বলিয়া সে দুপ-দাপ পদশব্দে উপরে উঠিয়া গেল।

আজ দু'দিন হিমাংশু ইহাদের অন্ন গ্রহণ করিতেছে। প্রথমদিন সে ভাবিয়াছিল, মেয়েদের হয় তো কোন ব্রত আছে। তাই ঘর-দ্বারের নিকট সংশ্লিষ্ট এই হতভাগাকে বাদ দিয়ে তাঁরা পারেন নাই। পরের দিনও যখন ঐরূপ ব্যবস্থা হইল, তখন সে কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘৃত হইতে দুগ্ধ মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত ষোড়শোপচারে খাদ্য যখন আপনা-আপনি আসিয়া জুটিতেছে তখন যে ক'দিন হেন গালার অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় মন্দ কি? সেদিনের সেই দুর্ব্যবহারের পর হরেনের অন্নগ্রহণ করায় তাহার মনে একটু খুঁতখুঁতি উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু শ্যামের মার আদর-আপ্যায়নে তাহা আর বাড়িতে পারে নাই। এখন সে মনে করিল, তাহাকে বিদায় করিবার অছিলায় দুঃখের স্মৃতিটা বোধ করি এইরূপ ভালমন্দে বিজড়িত করিয়া দেওয়া হইল।

দুই-তিনটা ঘর অতিক্রম করিয়া শ্যামের মা দেখিল, গিরিরা দুই ননদ-ভাজে একস্থানে বসিয়া গল্প করিতেছে। রণচণ্ডী-মূর্ত্তিতে অগ্রসর হইয়া সুর সপ্তমে চড়াইয়া সে বলিতে লাগিল,—"অনেক বাড়ীরই ভাত গিলেছি মা। কিন্তু তোমরা যে কুকীর্ত্তি করলে বাছা! চর্ম্মচোখে দেখি নি। এ আমি একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বলতে পারি।"

তাহারা উভয়েই সন্ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন, কি করেছি আমরা?"

শ্যামের মা সেইরকম সুরে বলিল, "আর বাকীই বা কি রেখেছ? ধম্মপুণ্যি ভুলে কেবল পয়সাটাই চিনেছ বাছা! শ্যামের মাকে আজ যেন ঝি কেড়েছ, পয়সা রাখলে মাটিতে ছ্যাদলা পড়ে যেত! অমন ছোটলোকের পিরবিত্তি নয়। পিণ্ডি তো দেবে একমুঠো চেলের—তার জন্যে মুনিঋষিজন্ম বৃথা করব? তেমনি ছোটলোক পেয়েছ আমাকে?"

গিরি বলিল, "ছোটলোক কেন হ'বে তুমি? কি হয়েছে খুলেই বল, না? যদি কোন দোষ ক'রে থাকি আমরা—তুমি তো মায়ের মত, ভুলতে বেশী সময় লাগবে না।"

শ্যামের মা বলিল, "মায়ের মত,—সে কথা কি মিথ্যে! আধখানা জিনিস শ্যামের মাকে না দিয়ে আধখানা মুখে দাও না।"

গিরি বলিল, "কিন্তু আমাদের কুকীর্ত্তির কথাটা তো এখনও শুনতে পাই নি"

শ্যামের মা বলিল, "এ সব অনাছিষ্টি কাণ্ড তোমাদের নয় মা! এ সব হরেন-বাবুর, সে আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমরা তো ঘর ছেড়ে চলে যাও নি?"

গিরি বলিল, "সে গেলে এ ঝগড়া কা'র সঙ্গে হ'তো? এখন যার কাজ হয় কথাটা খুলে বল না শুনি?"

শ্যামের মা বলিল, "হ'লই না হয় একটু মদ খায়—তাই

বলে তো আর মাতাল নয়? আফিস থেকে এসে ধুঁকে পড়ছে একটু বসবার জায়গা পায় না। কোন্ বড়লোকের বেটা ঘরে এসে ঢুকল, একবার দেখতে পেলে হয়। আমি বাড়ী ছিলুম না, তাই চারহাতে ন্যাটের মশারি খাটিয়াছে।"

তাহারা এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিল।

সৌদামিনী বলিল, "চারহাত, সে কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তিনি ভাড়া বেশী দেবেন যে।"

শ্যামের মা রাগিয়া গিয়া বলিল, "কত টাকা ভাড়া বেশী পাবে শুনি? যা' বেশী পাও আমার মাইনে থেকে কেটে নিও। খাওয়াপরা দিচ্ছ, মাইনেতে দরকার কি আমার; ভেবে দেখলে না যে ভদ্দরলোকের ছেলে যায় কোথায়? যাও বললেই গেল আর কি। নুটিশ দিয়েছ তাকে?"

সৌদামিনী হাসিয়া বলিল, "অত আইন-কানুন আমরা জানিনে তো; বাবুটী দাঁড়িয়ে রইলেন আর তুমি ঝগড়া করতে রইলে! তার চেয়ে তাঁকে বরং ন্যাটের বিছানার ওপর গিয়ে বিশ্রাম করতে বল না? যিনি এসেছেন তিনিও ভদ্রলোক গলা ধাক্কা দেবেন না।"

শ্যামের মা মুখঝাপটা মারিয়া বলিল, "থাক্ আর দরদ দেখাতে হবে না। নিজেরা কাজ-কর্ম্ম সব সেরে নিও, তা' কিন্তু বলে দিয়ে যাচ্ছি। আমার দ্বারা আজ আর ও সব কিছু হ'বে না।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তোমার আবার কি হলো?"

সে বলিল, "এই আজগুবি শহরে বাসা খুঁজে-পেতে নেবে সেইরকম মনিষ্যি আর কি? সন্ধ্যের মধ্যে একটা হিল্লে করে নেবেন তার দাঁড়ান চাই তো! আর নকড়িবাবু উকীলের বাসায় একবার যাব; ওঠ বললেই উঠান যায় কি না সেটাও দেখতে হ'বে আমাকে।"

সে গমনোদ্যত হইল।

সৌদামিনী মুখ অন্ধকার করিয়া বলিল, "আমাদের সঙ্গে আদালত করবে না কি তুমি? মেয়েলোক যে আমরা? আমাদের ওপর মোটেই তোমার দয়া-মায়া নেই। যত মায়া পড়েছে ঐ বাবুটীর ওপর। ঘর-সংসারের এতগুলি কাজ আমরা কি করে কি করি বল দিকি নি?"

"কেন, গতর খাটিয়ে কর। গো-বেচারা মানুষ, তাকেও তো দেখতে হয়! তোমরা গলাধাক্কা দিয়েছ বলে আমি তো দিতে পারি নে।"

গিরি এবার কথা বলিল। বলিল, "গলাধাক্কা কেন দেবে! তুমি স্বচ্ছন্দে তাঁকে সেখানে বসাও। বিছানা-পত্তর আমাদেরই সব। স্নেহ না থাক্, তোমার খাঁচার পাখী আমরা উড়িয়ে দি কি করে?"

শ্যামের মার অধোরোষ্ঠে এক ঝলক হাসি খেলিয়া গেল। বলিল, "যদি বাবুটী এসে হল্লা করেন?"

সৌদামিনী বলিল, "তুমিই লড়বে তাঁর সঙ্গে। আমরা তো আর যেতে পারব না সেখানে?"

কথা শুনিয়া শ্যামের মা গলিয়া গেল, বলিল,"যার কাছে যখন ভার পেয়েছি, তখন দেখব কোন রাজপুত্তুর এসে বাড়ীর মধ্যে ঢোকেন।"

এই বলিতে বলিতে উল্লাসভরে সে নীচে নামিয়া গেল। আসিয়া দেখিল, হিমাংশু সেই রকমই বিষণ্ণমুখে চৌকাঠ ধরিয়া আছে। সে বলিল "বেশ মানুষটা কিন্তু বাছা হা করে' দাঁড়িয়ে রয়েছ। অমন মাটীর মানুষ হ'লে শহরে বাস করা যায় না বাপু। যাও, ঘরে গিয়ে বস। বিছানাপত্তর সব আমাদের, তার জন্যে ভাবনা নেই কিছু।"

হিমাংশু বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিল না। ইদানীং বেচারা বেশী কথা বলায় একরকম অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একটা কিছু শেষ মীমাংসা হইল না, সে মনে মনে বুঝিল; কিন্তু শ্যামের মা তো বাড়ীর কর্ত্তা নয়, তাহার কাছে শুনিতে হইলে অনেকগুলি কথা খরচ করিতে হইবে। উপরে মেয়েরা আছেন। পুরুষেরা কেহ বাড়ীতে নাই, যদি কিছু অসম্ভ্রমসূচক বাক্য তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, সে বড় অন্যায় হইবে। সে তখন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া জামাকাপড় ছাড়িতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া রহিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রাত্রি গভীর। গিরির ঘুম হয় নাই। অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের নানারূপ চিন্তায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। একটী তরলবুদ্ধি বালিকাকে অগ্নিলীলার মাঝখানে ছাড়িয়া দিয়া পিতা কেন অসময়ে চক্ষু মুদিত করিলেন? এরূপ অসহ্য নীরব ক্রন্দন বুকে গাঁথিয়া শূন্যমনে শূন্যঘরে সে আর কতদিন টিকিতে পারিবে?

তারপর সে ভাবিতে লাগিল, জীবনের মধ্যাহ্ন গরিমায় জগতকে পুলকিত করিবার শ্রেষ্ঠ দিনে এত-গুলি নেশার বোতলে গৃহটী যে অলঙ্কৃত করিতে পারিয়াছে, তাহার দিন কখনও ফাঁক যায় না। চায়ের পেয়ালার মত সে ইহাকে জীবনের নিত্যসঙ্গী করিয়া তুলিয়াছে! তাহার চক্ষুদুটী দিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপ দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া সকাল-সকাল সে ঘুমাইয়া পড়িল

পরদিন সৌদামিনীর হাত দিয়া হরেনের দ্বারা কতকগুলি তৈলচিত্র সে খরিদ করাইয়া আনিল এবং সকলে আফিসে চলিয়া গেলে তাহারা দুইজনে নীচের ঘরে সেগুলি টাঙাইয়া রাখিয়া আসিল।

সৌদামিনীর কৌতূহল ক্রমেই বাড়িতেছিল; কিন্তু কি সূত্রে, কোথায়, কি ভাবে ঝঙ্কার উঠে দেখিবার জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া সে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সেদিন জলখাবারের থালা লইয়া হিমাংশুর নিকটে রাখিয়া দিয়া শ্যামের মা তথায় বসিয়া পড়িল। জলযোগ শেষ হইলে সে বলিল,—"বাছা! একটা কথা তোমাকে বলি। তুমি এ নেশাটা ছাড়। লোকে কত কি বলাবলি করে, আমারই প্রাণে আঘাত লাগে। ভদ্দরলোকের ছেলে তুমি, কাজ কি ছাই-ভস্ম খেয়ে?"

হিমাংশু করুণ নেত্রে শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কথা বলিল না।

শ্যামের মা বলিল, "কাণে ঢুকল না বুঝি? বুড়ো মানুষের সঙ্গে সত্যি-সত্যিই ঝগড়া করবে মনে ভেবেছ? আচ্ছা! দেখি, কি করে' তুমি আর গ্লাস গালে তোল?" একটু পরে সে আবার বলিল, "তুমি তো গাছতলায় বাস কর না? গেরোস্তের ঝি-বৌ ঘরে—এ সকল কি ভাল দেখায়? না, নিজে ভাল দেখ!"

হিমাংশু একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া এবার কথা বলিল, "নেশা আমি করি সত্য, কিন্তু তোমাদের কার কোন অসম্মান কোনদিন আমি করি নি।"

শ্যামের মা বলিল, "পরের বাড়ীতে কি তা' করা যায়? না, করে' তিষ্ঠে থাকা যায়? তুমি তো আর অজ্ঞানী নও, যাদের খাবে, তাদের মর্জ্জিমত তো চলাফেরা উচিত?"

কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া হিমাংশু বলিল, "খাবার ব্যবস্থা তোমরাই গায়ে পড়ে' করে' দিয়েছ। এ ঋণ হতচ্ছাড়া বোম্বেটে লোকে পরিশোধ করতে পারে না। তাই সময়-সময় ভাবি যে, তোমাদের এ অযাচিত অনুগ্রহ আমি আর নেব না। আর এত ভাল খাবার খাওয়ার আমার তো কোন প্রয়োজন নেই।"

শ্যামের মা বলিল, "তবু বুঝি নেশাটা ছাড়তে পারবে না? নিতান্তই ব্রহ্মদৈত্যে তোমাকে ভর করেছে! ওঝার হাতেও পড়েছ, তা' কিন্তু আমি তোমাকে বলে দিয়ে যাচ্ছি। নিজে যা রাঁধতে সে তো আমার দেখা আছে। ওই ছাই-ভস্ম সমানে তোমাকে গিলতে দেব ভেবেছ? তাও দেব না—আর মদও তোমাকে ছাড়াব

হিমাংশু বলিল, "সে চেষ্টা আমি অনেক করেছি শ্যামের মা! তোমাদের অনুরোধ রাখতে পারলে আমি খুব আনন্দিতই হ'তুম; কিন্তু উপায় নেই, তবে হাঁ, একটা কথা, যদি কোনদিন কোন অভদ্র আচরণ আমার দেখ গলা ধরে' ঘরের বের করে' দিও।"

"সে তো তোমাকে আমি চিনি। একটুখানি দোষ কুসঙ্গে পড়ে করে' ফেলেছ, আর তো কোন দোষ তোমার চরিত্রে দেখা যায় না।" কিছুক্ষণপরে সে আবার বলিল, "মা বলছিলেন এই যে সকল ছবি দেওয়ালে টাঙান রয়েছে, এরা সব মানুষদেবতা। এই ঘরে বসে তুমি যা' কিছু করবে বাছা, এঁরা সবই দেখতে পাবেন। এঁদের কি তুমি শ্রদ্ধা কর না?"

দেওয়ালের চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সে দেখিল, এগুলি,—পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গন্ধীজী, এঁদেরি ছবি। সে চুপ করিয়া অসাড়ের মত চাহিয়া রহিল। শ্যামের মা উচ্ছিষ্ট থালাটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

হিমাংশুর মনে কত কি উঠিতে লাগিল। শ্যামের মা দাসী যে শিক্ষা তাহাকে দিয়া গেল, বালককালে গঙ্গাধরের নিকটে গিরি এবং সে এই রকমের কত শিক্ষাই না তাহারা পাইয়াছে। তারপর সে ভাবিতে লাগিল, শ্যামের মা যে বলিয়া গেল,—মা বল্‌ছিলেন—এই মাটী-কে? এই ইতরকে কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিতে এ সকল উদ্যোগ-আয়োজন কি তাঁরই? পরমহংসদেব আর স্বামীজী—এইসকল দেবতাকে যিনি এ হতভাগার শাসনের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলেন তাঁহার নিজের চরিত্র না জানি কতটা উন্নত। হরেনবাবু যে গৃহের পুরুষ সে গৃহে দেবীর স্থান হইল কি করিয়া? দুর্নীতির সঙ্গে নীতি কি করিয়া একত্রে বাস করিতেছে?

তারপর সে ভাবিতে লাগিল,—মরুর মত নির্জ্জীবকে সস্নেহে চেতনা দিবার শিক্ষা যিনি অবগত আছেন, তাঁহার ছায়াচিত্রটা কি একবার দেখিতে পাওয়া যায় না? দেখিতে পাইলে তাঁহার কাছে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতাম,—আমার সকল অধিকার তুমি কাড়িয়া লও কল্যাণি! শুধু ঐটুকু—শ্যামের মা বিকৃতমুখে যাহার জন্য তিরস্কার করিয়া গেল—সেই জীবনীশক্তিটুকু আমাকে ভিক্ষা দাও। হিমাংশুর মনঃপ্রাণ সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

হিমাংশুর সহিত হরেনের ভাড়ার টাকা লইয়া বচসা হইয়া যাইবার পর সৌদামিনীও গিরিকে জানান সত্ত্বেও তাহারা যখন তাহার মর্য্যাদা রাখিল না; বরং সে যখন দেখিল, এই অবান্তর ঘটনা লইয়া মেয়েদের সঙ্গে একটা মন-কষাকষির সূত্রপাত হইয়া উঠিতেছে, তখন হইতে হিমাংশুর সহিত সে আর আলাপ করিত না, দেখা হইলে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইত।

হিমাংশুর তো বিড়ম্বনার জীবনই ছিল। কিন্তু একটা দিকে সে বেশ স্বস্তির সহিত কাটাইতেছিল। খাওয়া-পরার চেষ্টা নাই—বিছানা-পত্র ময়লা হইতে পায় না—ভাড়ার তাগিদ নাই—মন্দ কি? কিন্তু হরেনবাবু সহসা এমন শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন কেন? সে ভাবিত, হরেনকে ডাকিয়া ভাড়ার টাকা কিছু দিয়া দেয়। কিন্তু পাছে সকল পরিশোধ হইল না বলিয়া সে আবার ঝগড়া বাঁধায়, এই আশঙ্কায় সে আর তাহাকে কাছে ডাকিতে সাহস পায় নাই। যাহা হউক হরেনবাবু নিজেই একদিন আসিয়া রাত্রিকালে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিল।

প্রণয়ের সংশয় এবং আক্রোশ অতি বিচিত্র। ইহার প্রচণ্ড লীলা বিশ্বপ্রকৃতির বুকে কখনও আলোকে কখনও বা অন্ধকারে খেলিয়া যাইতেছে!

গিরির নির্দ্দেশমত তৈলচিত্রগুলি খরিদ করিয়া তাহার রুচি সম্বন্ধে হরেনবাবু বেশ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল এবং এগুলি কি ভাবে কোন্ গৃহে অলঙ্কৃত করে দেখিবার জন্য উৎসুকও সে কিছু কম ছিল না। গিরিকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "ছবিগুলি টাঙান হয় নি বুঝি?" সৌদামিনীকে সে প্রথমে কাছে পাইয়াছিল। কিন্তু গিরির কাছে গিয়া বসিবার এ সুযোগ সে পরিত্যাগ করিল না। হরেনের প্রশ্নে গিরি উত্তর করিল, "টাঙিয়েছি—নীচের ঘরে।"

নীচে একটা বৈঠকখানা ঘর ছিল। সেখানে চিত্রের অভাব ছিল না। আর সে ঘরও তো হরেন দেখিয়া আসিয়াছে। সে বলিল, "নীচের ঘরে কেন? এমন সব সাধু পুরুষদের ছবি নিজের কাছেই রাখ্‌বেন ভেবেছিলুম। আমারও ইচ্ছা তাই। নীচের ঘর তো আমি দেখে এসেছি।"

"নেই সেখানে? কোন্ ঘরে দেখেছেন?"

"ঘর আর দু'খানা কোথায়? বৈঠকখানাই তো?"

"কেন, যে ঘরটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে?"

হরেন অত্যধিক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে ঘরে কেন?"

গিরি বলিল, "সে ঘরে ছিল না—তাই।"

বাবুটীর উপর ইহাদের ভাব-ভক্তি দেখিয়া হরেনের চক্ষুদুটী জ্বলিয়া উঠিল। তথাপি সে কতকটা সংযতস্বরে বলিল,—"এ বড় অদ্ভুত কথা! তাঁর সখ থাকে নিজের পয়সায় মেটা'তে পারেন। আর এতটা অনুগ্রহ ঘরের দর বাড়ানর জন্যে যদি হয়, আগে করে' রাখলে শোভা পেত। এখন কেন?"

গিরি বলিল, "বেশী টাকার আমাদের দরকারই বা কি? দিন তো চলে' যাচ্ছে একরকমে। বেশী টাকা-পয়সার প্রত্যাশা করি নে হরেনবাবু।"

হরেন রাগতস্বরে বলিল, "কিসের প্রত্যাশা করেন তবে? নিছুটুষু ভাড়াটিয়াবেশী সুপুরুষ বাবুটীর উপর আর কিসের প্রত্যাশা করা যায়?"

হায়! হায়! ইহারা আবার নারীজাতিকে নীতির শাসনে রাখিতে চায়?

ক্রোধে এবং অপমানে গিরির দেহের সমস্ত শিরা ছিঁড়িয়া যাইয়া যেন রক্তের ফিন্‌কি বাহির হইতে চাহিতেছিল। মাথা নীচু করিয়া সে একটা অস্ফুটধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া হরেন হয় তো মনে মনে হাসিল। কিন্তু গিরির তখনই চেতনা হইল যে, নারীর শ্লীলতায় কথায় কথায় যে আঘাত করিতে পারে, সেই অর্ব্বাচীন লোককে কিছু স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন। তখনও পর্য্যন্ত দাঁত দিয়া নীচের ওষ্ঠ সে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। ক্রোধদীপ্ত চক্ষুদুটী কিছু শান্ত করিয়া মুখখানা সে উঁচু করিল। বলিল,—"মনের দোষে তাঁর সমস্ত চরিত্রটা কলুষিত মনে করা যায় না হরেনবাবু! আমাদের সংস্রবে এসেছেন তিনি—এক-বাড়ীতে ঘরের লোকের মতই বাস করেন। আরও অনেক রকমের প্রত্যাশা তাঁর কাছে করা যায়। কিন্তু সম্মুখে তেমন শ্রোতাও নেই—আর আমার বলার তত অবসরও নেই।" কথাটা বলিয়া কোনদিকে না তাকাইয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

একটা কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হরেনও উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিজের ঘরে গিয়া কিছুক্ষণ হতভম্বের মত বসিয়া রহিল। তাহার চোখে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল যে, সৌদামিনী যে আশ্বাস দিয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া আনিয়াছিল, এই দুর্জ্ঞেয় চরিত্রের মেয়েটী সে রকমের সান্নিধ্য পরিহার করিয়া ক্রমাগতই পিছু হটিয়া চলিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচের তলায় হিমাংশুর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়াই সে দেখিল, যাহা সে মনে করিয়াছিল তাহা মিথ্যা হয় নাই। শুধু তৈলচিত্র নয়—আরও অনেককিছু গৃহসজ্জা উপঢৌকন দিয়া বাবুটীকে সম্পন্ন গৃহস্থ করিয়া তোলা হইয়াছে। সন্দেহভঞ্জনের জন্য কিছু মোলায়েম স্বরে সে বলিল,—"আপনি শুয়েছেন! ঘরের চেহারা দেখি বদ্‌লে ফেলেছেন?"

হিমাংশু ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "বসুন। ঘরের চেহারা বদ্‌লালে কি হয়, আমি তো বদ্‌লাই নি। কাদার কৈমাছকে স্বচ্ছজলে রেখে স্বস্তি দিতে গেলে শুধু ভুল হয় না—সময়ে ক্ষোভও জন্মে। জেনে-শুনে নিজে কি আর অতটা অর্থব্যয় করি?"

হরেন বলিল, "অপরে করেছেন তবে? কে তিনি? মায়ার বশে করেছেন বুঝি? আপনার সেই বন্ধুটীর পরিচয় পেলে মনের কৌতূহল মেটাতে পারতুম।"

হিমাংশু বলিল, "আমি কিছুই জানি না। জান্‌তে পেলে আমি নিজে কিছু সুখ-সুবিধা বোধ করি না করি, অন্ততঃ অপরকে জানিয়ে দিতে পারতুম যে, আমার সেই গোপন বন্ধুটীর এ অযাচিত করুণা শুধু দুর্লভ নয়—তুলনাশূন্যও বটে!"

হরেন অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিল। বলিল, "আমরা হ'লে এ হেন বন্ধুটীর খোঁজ নিতে সর্ব্বপ্রথমে চেষ্টা করি। আর সে চেষ্টা অন্যান্য প্রধান কাজের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানই হয়।"

হিমাংশু বলিল, "চেষ্টা আমিও করেছি। সেদিন আফিস থেকে এসে ঘরটা প্রথমে চোখে পড়তে ভাবলুম,—বেশ একটা সত্যকার আষাঢ়ে গল্পের সৃষ্টি হয়েছে! কিন্তু তখনও মনে ওঠে নি যে, আলাউদ্দীনের প্রদীপটা দীর্ঘকাল পরে আবার আমারই পিছনে লেগে এ সকল ভৌতিক ক্রীড়া দেখাবে। শ্যামের মাকে ডেকে বিদায় নেব ভাবছি,

কিন্তু সে এসে আশ্চর্য্যরূপে এই খাটের ওপরে আমাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিল।"

হরেনের আর সহ্য হইতেছিল না। সে উঠিয়া গিয়া দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল, "হাঁ। যোগ্যপাত্রই তো আপনি। ভৌতিক কাণ্ডের বিস্ময়টা কেটে গেলে প্রদীপের খোঁজ নেবেন বোধ করি?" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

হিমাংশু নিয়মিত মদ না খাইলেও অধিকাংশ দিনই তাহার কামাই যাইত না। কিন্তু শ্যামের মা যেদিন হইতে তাহাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছে, সেই দিন হইতে কি গৃহে, কি বাহিরে গ্রাস হাতে তুলিতেই সে দেখিতে পায়,—পরমহংসদেব, স্বামীজী—ইঁহারা তাহার পানে তাকাইয়া আছেন। তাহার হাত কাঁপিয়া যায়, গ্রাস মাটিতে রাখিয়া দিয়া আপন মনে কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষ ভাসাইয়া বিছানার উপর আসিয়া সে শুইয়া পড়ে।

শ্যামের মার কথা রাখিতে বিশেষতঃ অজ্ঞাতে থাকিয়া যাঁহারা আদর-যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদের সন্তুষ্ট রাখিতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিত। সে যে কোন ভদ্র পরিবারে মিশিবার উপযুক্ত নয়, সে কথাও সে বুঝিতে পারিত। কিন্তু যে আকুল তৃষ্ণায় অনুক্ষণ তাহার অন্তর দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল, যদি ইহা সে নিবৃত্ত করিতে পারিত, তাহা হইলে এ হেয় তৃষ্ণাকে সে প্রশ্রয় দিত না, জয় করিতে পারিত, এ অতি সত্য কথা।

একদিন সন্ধ্যার পর শ্যামের মা কাছে আসিলে সে তাহাকে বলিল, "একটু বসবে? গুটিকতক কথা আছে।"

সে মেঝের উপর বসিল।

হিমাংশু গালে মুখে হাত দিয়া টেবিলের উপর দৃষ্টিনত করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্যামের মা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলবে বলছিলে—বল না?"

হিমাংশু বলিল, "হাঁ।" বলিয়া একটু নড়াচড়া করিয়া সে আবার তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

শ্যামের মা বলিল, "আশ্চর্য্য মানুষ তুমি বাছা? আকাশমুখী হ'য়ে দিবারাত্তির কি এত ভাব' বল তো শুনি? ক্ষিধে নেই—তেষ্টা নেই—মনিষ্যির সঙ্গে কথাটী পর্য্যন্ত নেই। যদি কিছু বলতে গেলে—গলায় আট্‌কা পড়ে গেল! তোমার বাড়ীর ঠিকানাটা দিতে পার আমাকে? মাকে আসতে লিখে দি! 'এমন 'হা পিত্যেশি' করে' আফিসের কাজ কর কি করে?"

খাটের নীচে হইতে একটী বোতল বাহির করিয়া হিমাংশু বলিল, "এটা তো ছাড়তে পারছি নে শ্যামের মা! তুমি ঐ ছবিগুলো খুলে নিয়ে যাও। শান্তি পা'বার মত একটু সময় না পেলে কি করে' বাঁচি বল?"

হঠাৎ গিরি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "শান্তির ওষুধ ঐ কুখাদ্য নয় হিমু-দা! চেতনা হারানর নাম শান্তি নয়, সংযম শেখ।" বলিয়া ধূলা পায় আবার সে বাহির হইয়া গেল।

গিরি অধুনা সুযোগ পাইলে শ্যামের মার সঙ্গে ইহার যে সকল কথাবার্ত্তা হইত ওৎ পাতিয়া শুনিত।

হিমাংশুর হাত হইতে বোতলটা সশব্দে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া মেঝের উপর তরঙ্গ খেলিতে লাগিল।

শ্যামের মা বোতলের টুক্‌রাগুলি সাবধানে কুড়াইয়া লইতে লাগিল। বলিল, "আর খেয়ো না। আমার কথা না শোন, ভদ্দরলোকের মেয়ের কথা রাখ। অমন মা ত্রিসংসারে মেলে না।"

সে চলিয়া গেলে হিমাংশু মুড়িসুড়ি দিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। বিস্ময়ে ও লজ্জায় তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে হতচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল।

এইরূপ পড়িয়া থাকিবার পর পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক-ত্যাগী এই দুঃখী লোকটার অন্তরের এক কোণে আনন্দের এক ঝলক তাণ্ডব-উল্লাস জাগিয়া উঠিতেই হরেনের কথা ভাবিয়া আবার দুইটী চক্ষু তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। এই রাক্ষসের হস্তে না পড়িয়া যদি কোন সাধু যুবকের পদসেবা করিবার অধিকার গিরি

পাইত! তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে চক্ষুর দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া পড়িল।

যা'ক—গিরি এখন সংসারী হইয়াছে। এ ক্ষুদ্র মরু-বক্ষঃ কাঁপিয়া উঠিবার মত আর কোন সম্পর্কই তাহার সঙ্গে নাই। কিন্তু শুধু সংযম-শিক্ষার একটুখানি উপদেশ দিয়া তড়িতের মত অতি সংক্ষেপে চোখের সম্মুখে খেলিয়া গেল, ইহা কি তাহার পরগৃহিণীর গাম্ভীর্য্য? না হরেনবাবুর অনুশাসন? এই কষ্টের লীলাটুকু দেখা বুঝি তাহার অদৃষ্টে বাকী ছিল? তাই কি না ওই নিষ্ঠুর হরেনকে আশ্রয় করিয়াই সে দৃশ্য দেখিবার সুযোগ ধরিতে হইল।

পিতামাতার জন্য সর্ব্বদাই তাহার অন্তর কাঁদিত। দয়াময়ীর কথা স্মরণ করিয়া কত রাত্রি চোখের জলে বালিস ভিজিয়া গিয়াছে! কিন্তু আজ সে দেখিতে পাইল, তাঁহাদের শেষ-জীবনে বেদনা দিয়া আর নিজেও ব্যথা পাইয়া গিরির অন্তর লেশমাত্র ক্ষুন্ন সে করিতে পারে নাই। হায়! হায়! এখন সে কোথায় গিয়া দাঁড়ায়? চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে—একান্ত শূন্য!

পরদিন যখন সে উঠিল তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। শ্যামের মার উপর গিরির সেদিন বেশ তাড়না ছিল। হিমাংশুর দ্বারের খিল কোন্ সময় খট্ করিয়া উঠিবে এই প্রত্যাশায় সংসারের কাজ-কর্ম্মের মধ্য দিয়া তাহার কাণদু'টী অনুক্ষণ নীচের ঘরের দিকে ফিরিতেছিল। হিমাংশু দ্বার খুলিলে সে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বলিল, "এত বেলায় উঠলে, খাবারগুলো জুড়িয়ে গেছে। একটু পরেই আফিসের তাড়া লেগে যাবে—ক'ন কি করবে?"

হিমাংশু চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, "বেলা অনেকখানি হয়ে গেছে। আচ্ছা আর আফিসে যাব না। একটা বাসা খুঁজে-পেতে নিতে হ'বে, তা'তেও সময়ের দরকার।"

শ্যামের মা একটু হাসিল। বলিল, "তোমার গায়ে আমরা তো জলবিছুটি দেই নি! থাক না মাতাল হয়ে পড়ে'! নেশার উপর রাগ নয়—মানুষের উপর রাগ!"

হিমাংশু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল। বলিল, "মদ আমি আর ছোঁব না, তুমি তাঁকে বলে দিও। যদিও ঐ জিনিসটা আমার এখন খুবই প্রয়োজন; কিন্তু ঐ নেশার মত আর একটা জিনিস পেয়েছি,—তোমাদের অনুরোধ রাখা। এ সুখটুকু আর ছাড়ি কেন? জীবনের অবশিষ্ট কালটায় একমাত্র সম্বল ক'রে রাখব।"

শ্যামের মা ইহার অর্থ কতক বুঝিল, কতক বুঝিল না। সে বলিল, "নাও—এখন হাতে মুখে জল দাও। সময় তো আর তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে না?"

হিমাংশু বলিল, "আফিসে তো যাচ্ছি নে, তার এত তাড়াতাড়ি কিসের?"

"আফিসে তোমাকে যেতে হ'বে। বাসা করে' এস না। ঠাকুর-দেবতার মত কে এমন যত্ন করে রাখে দেখা যা'ক। অদিষ্টে সুখ থাকলে মতি-গতি তার কখনো এমন হয় না। বাসা যেন করলে—চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে কে? আমার শ্যামকে হারিয়েছি, তোমাকেও হারা'ব? এক পা নড়াও দেখি—কেমন পার?"

শ্যামের মার চক্ষু দুইটী আর্দ্র হইয়া উঠিল। একমাত্র পুত্র শ্যামের শোক তাহার বক্ষটাকে ঘিরিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিয়াছিল। হিমাংশুর চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানিতে সে পুত্রের ছায়া দেখিতে পাইত। সে বলিল,—"মদ খেতে মাই তোমাকে বারণ করেছেন। তা'তে রাগ কর কেন? আহা! মায়ার শরীর তাঁর—তিনি কি তোমাকে দুঃখ দিতে পারেন?"

হিমাংশুর চক্ষুদুইটী দিয়া বিন্দু বিন্দু জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে বলিল, "আমি তো বলি নি, যে তিনি মন্দের জন্য বলেছেন! তেমন কথা ভাবিও নি। একটু থামিয়া সে বলিল, "তুমি যদি কাছে পিঠে একটা বাসা খোঁজ করে দাও, আর কাজ কর্ম্ম গুলো—"

শ্যামের মা বাধা দিয়া বলিল, "এই রকম একটা অনাছিষ্টি কাণ্ড আজ সকালে তুমি বাধাবে মা তা জানেন। তাই তো তোমার ঘরে তাড়াতাড়ি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।"

হিমাংশু মনে মনে একটু হাসিল। সকল সম্পর্কই

মা ও ছেলে

জন্মের মত যে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে তাহার আবার এ দরদ কেন? একশ্রেণীর বীর আছে যারা বুকে তীর ছুঁড়িয়া মারে, আবার সঙ্গে সঙ্গে শুশ্রূষাও করে, আর ধার্ম্মিকতা দেখায়। নারীর কি সেই কাজ? তাহার মনে হইল, জিজ্ঞাসা করে যে, সমস্ত ক্ষোভ এবং দুঃখ এই ছোট ঘরটীর অধিবাসী হইয়া আজীবন সে নীরবে সহ্য করিতে থাকে, ইহাই কি তোমার ঠাকুরাণীর ইচ্ছা? কিন্তু তাহার মুখে কিছুই ফুটিল না। আকস্মিক এই অভাবনীয় সাক্ষাতের একটুখানি আনন্দগুঞ্জন বুকের মধ্যে আলোড়ন তুলিয়া তাহাকে কতকটা নির্ব্বাক্ করিয়া রাখিল। কিছুক্ষণ পরে সে শুধু বলিল, "আমার সংবাদটা আমার বাপ-মাকে পাঠিয়ে একটু যশ কিনবেন তোমার ঠাকুরাণী বোধ হয় এরূপ একটা দুশ্চেষ্টার কৌতূহল মনে মনে পোষণ করেছেন। তুমি তাঁকে বলে দিও, তা'তে কোন ফল হ'বে না। আর আমি বেঁচে আছি কি মরেছি এরূপ একটা সন্দেহ তাঁদের মনে আছে। কিন্তু আমি মদ ধরেছি—আর উচ্ছন্ন গেছি এ সংবাদ দিয়ে তাঁদের তিনি বেশি তৃপ্তি দিতে পারবেন না।"

শ্যামের মা মোটামুটি যাহা বুঝিল, গিরিকে গিয়া সমস্ত বলিল। গিরি এসকল কথা কি সৌদামিনী কি হরেনবাবু কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়া দিল। সাক্ষাৎ দর্শনের ফলে উভয়ের অন্তর এইরকম নূতন এক পথে বেদনায় জমাট হইয়া উঠিতে লাগিল।　　　　ক্রমশঃ

পূজা

শ্রীসুকুমার সরকার

আমার প্রাণের পরম পূজারে বারে বারে অবহেলি'
হে দেবি, কোথায় চ'লে যাবে আজি ছলনার খেলা খেলি!
নিবেদিত ছিল যাহা কিছু মোর তব মনোমন্দিরে,
নিজেরে নিজেরি প্রেম-শৃঙ্খলে রাখিয়াছি বন্দীরে!
জানিনা কি দেখে ভুলেছিল মন কি দিয়ে ভুলায়েছিলে!
ভুলের কাঠীর মায়া-পরশনে দুয়ার খুলায়েছিলে!
এমনি করেই ভেঙে দিবি যদি তবে গড়েছিলি কেন;
চ'লে যাবি যদি তবে এসে মোর প্রাণ হরেছিলি কেন!
পাষাণী-ই যদি তবে কেন তোর করুণা-নির্ঝরিণী,
আমার আঁখির অরুণ-আলোকে বাজাইল কিঙ্কিণী!
মেঘের মতই কালি যদি বুকে কেন তড়িতের আলো;
স্বপনের মত এসে বলেছিলি তোমারেই বাসি ভালো!

সারা জীবনের সাথী সেইদিন ক্রন্দন-ই ছিল মম ;
না-পাওয়াই ছিল আশা-উচ্ছ্বাসে সান্ত্বনা অনুপম !
কল্পনা দিয়ে কত সুমোহন ছবি কল্পনা করি ;
মনের মধুর দেবীরে রচিয়া রাখিয়াছি মনে ভরি !
তার সনে আমি কহিয়াছি কথা গোপন গানের সুরে ;
অনুভবিয়াছি আমার আমিরে তাহারি প্রাণের পুরে !
তারপরে যবে দেখেছি তোমারে উদিতা উষার মত ;
সহসা একদা এই দুনিয়ার আনন্দে আধনত !
পেয়েছি বলিয়া পাগল পুলকে উঠেছিনু গান গেয়ে !
চোখের অশ্রু সার্থক হ'ল মুকুতার হাসি বেয়ে !
ভেবেছি আমার সুচিরদিনের শত কল্পনারাশি
মোরি সাধনায় মূর্ত্তি নিয়েছে প্রাণের বাহিরে আসি' !
আজি বুঝিয়াছি ভুল মহাভুল ক্ষণিকের মোহ-মায়া
এসেছিল মোর সর্ব্বনাশিতে ধ'রে তোরি ছল কায়া !
তুই কি বুঝিবি হৃদয়ে আমার কি পরশ-মণি আছে,
সোনা হ'য়ে যেত সবটুকু তোর রহিলে তাহারি কাছে !
মোর আদর্শ প্রেমের পুণ্য ক্ষণিকে যায় কি বোঝা ;
আমিও যেমনি তোমারে খুঁজেছি আমারেও চাই খোঁজা !
তনুর অতীতে লুকায়ে রয়েছে যেই মহীয়সী বাণী ;
যেথা সাম-গীত পূর্ণের প্রেমে করে নিতি কাণাকাণি !
তথায় মিলন সুগভীরতম—সে কিরে কথার কথা ;
চাই পবিত্র মাধুর্য্যে ভরা অন্তর-মধুরতা !
তবু তুমি দেবী ক্ষণিকা হ'লেও ক্ষণ-মহিমার লাগি'
হৃদয় হইতে বিদায়ের দিনে নমে প্রেম-বৈরাগী !

কবিচিত্তে দুঃখবাদের স্থান

শ্রীকনকলতা ঘোষ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে" —কথাটী সকলের পক্ষে প্রীতিপ্রদ না হইলেও কবিদের জীবনে খুবই সত্য। আমার মনে হয় যে, যাঁহারা কবি, অর্থাৎ সত্যকার কবিপ্রতিভা যাঁহাদের আছে তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনেই একটা-না-একটা এমন গভীর দুঃখ এক এক সময়ে আসে, যাহার তীব্র অনুভূতিতে তাঁহাদের সমস্ত মন-প্রাণ নিতান্ত উদাস হইয়া যায়; পরে দুঃখের তীব্রতা সহনীয় হইয়া আসিলে সেই উদাসীন ভাবই ভাষার সাহায্যে তাঁহাদের লেখনীর মুখে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা-বেদনা, দুঃখ ও ব্যর্থতার অনুভূতি একটা অপূর্ব্ব রূপ লইয়া নিঃশেষ হইয়া ঝরিয়া ঝরিয়া কাব্য-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং সেই প্রাণময় বেদনা যখন ভাষায় মূর্ত্ত হইয়া উঠে তখন তাহা সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী হইয়া পাঠকচিত্তকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয়। যে কবিতা এইরূপ প্রাণস্পর্শ করিতে পারে তাহাই সত্য ও সার্থক হইয়া স্থায়ী কাব্য-সাহিত্যের সম্পদরূপে পরিগণিত হয়।

মানুষের জীবনে দুঃখ আছেই—পৃথিবীতে আসিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখে কেহ কোনদিন থাকিতে পায় নাই, সেজন্য অন্তরের দুঃখানুভূতিকে ভাষায় রূপ দিবার শক্তি সকলের না থাকিলেও দুঃখের রূপ সকলেরই পরিচিত, তাই যাঁহাদের ক্ষমতা আছে তাঁহারা যখন যেরূপ দুঃখ-ব্যথা পাইয়া থাকেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া রাখেন বলিয়া অন্যের নিকটে তাহা বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হয়। সময়বিশেষে বিশেষ বিশেষ কবিতার ভাব বিভিন্ন পাঠকচিত্তকে এক অবর্ণনীয় দুঃখময় আনন্দ ও সহানুভূতিতে ভরাইয়া তুলিতে সমর্থ হয়।

যখন কোন কবিতার ভাবের সহিত পাঠকের অন্তরের ভাব এক হইয়া যায়, তখন তাহার মনে হয় যে তাহার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা যে প্রকার ঠিক সেইপ্রকার মনের অবস্থা ইতিপূর্ব্বে অনেকের হইয়াছিল, অন্ততঃ একজনের যে হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যিনি এইপ্রকার ভাবসম্বলিত কবিতার রচয়িতা তিনিই এইপ্রকার বিশ্বাসের উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া মনে করা যায়। এইরূপ ধারণার মধ্যে কিছু সান্ত্বনা নিশ্চয় আছে, নতুবা কবিতার প্রতি মানুষের এতটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকিত না, যাহার জন্য দুঃখের মধ্যেও মানুষ তাহার সাহচর্য্য প্রার্থনা করিত বা কবিতার মধ্য হইতে উৎসাহ ও সান্ত্বনা-লাভের জন্য বিশেষ বিশেষ সময়োপযোগী কবিতার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত।

অর্থনীতির দিক্ হইতে দেখিলে দেখা যায় প্রায়শঃ কবিতাপুস্তকের চাহিদা বড় নাই, কাব্যের সংস্করণ খুব কমই হয়, কিন্তু অন্তরের দিক্ দিয়া দেখিলে কাব্যসাহিত্যের মত কোন সাহিত্যই উচ্চাসনলাভ করিতে পারে না। অবশ্য যথার্থ কবিপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের রচিত যে সকল কবিতা সেইসকল কবিতার কথাই আমি বলিতেছি, নতুবা সত্যকার কাব্যরচনার শক্তি নাই, অথচ জোর করিয়া সাময়িক খেয়ালের বশে যা হ'ক কিছু মিলাইয়া দিয়া কবি হইতে যাঁহারা চাহেন তাঁহাদের রচিত কবিতার কথা বলিতেছি না. সে রকম কবিতার স্থান স্থায়ী সাহিত্যে হয় না বলিয়া মনে হয়।

এ কথা অবশ্য সত্য যে, যাঁহারা শক্তিমান কবি তাঁহারা মাত্র দুঃখের গাথাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন না। অনেক সুখানুভূতিপূর্ণ কবিতা, হাস্যরসাত্মক কবিতা, প্রেম-কাব্য,

ভক্তিমূলক কবিতা প্রভৃতিও তাঁহারা রচনা করিয়া থাকেন। তবে সাধারণতঃ কোনও গভীর বেদনারস্পর্শে কবি-চিত্ত প্রথম উদ্বেলিত হইয়া উঠে বা প্রথম রচনারম্ভের পরেই হয় তো কোনও গভীর দুঃখ কবির জীবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অন্তরকে দুঃখময় করিয়া তোলে। অধিকাংশ স্থলে দুঃখবাদই কাব্যপ্রেরণার মূল উৎস হইয়া দাঁড়ায়।

কবির জীবনে যখন যেমন দুঃখই আসুক না কেন, তাঁহারা আপনাদের অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যে তাহা উপেক্ষা করিতে, অগ্রাহ্য করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং সেই সময়ের হৃদয়ের ভাবরাশিকে লেখনীর মুখে প্রকাশ করিবার জন্য ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাই কবিতা কবির "হৃদয়ের ভাষা" বলিয়া পরিচিত।

আজ পর্য্যন্ত কোনও কবিই দুঃখের স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়া দুর্ব্বলতার পরিচয় দেন নাই—আপনার শক্তিকে ব্যর্থ হইতে দেন নাই। জীবনে যত দুঃখই তাঁহারা পান না কেন, সমস্ত দুঃখকে দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়া, অশ্রু-প্রবাহের ভিতর দিয়া প্রশান্তচিত্তে বরণ করিয়া লইয়াছেন।

আপনার জীবনে দুঃখবাদকে এমন ভাবে গ্রহণ করিয়া সার্থক করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ তাঁহারা অমর, পাঠকসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। যদি তাঁহারা এইরূপ না করিয়া দুঃখ পাওয়া মাত্র অভিভূত হইয়া পড়িয়া লেখনীধারণে অক্ষম হইতেন এবং শক্তি থাকিলেও দুঃখকে নিজের জীবনে ভগবানের দেওয়া আশীর্ব্বাদের মতই গ্রহণ করিয়া হৃদয়ের ভাষাকে প্রকাশ না করিয়া দুঃখের নিকট পরাজয় মানিয়া মস্তক অবনত করিতেন, তাহা হইলে আজ যেমন তাঁহাদের কেহ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিত না, তেমনই তাঁহাদের "ব্যথার দান" অবিনশ্বর হইয়া পাঠকসাধারণের চিত্তকে সহানুভূতির পবিত্র ধারায় স্নিগ্ধ শীতল করিয়া দিতে পারিত না এবং তাঁহাদের রচিত কবিতা হইতে সাধারণ লোকেরা উৎসাহ ও শক্তির সন্ধান প্রাপ্ত করিতে পারিত না। পূর্ব্বাপরের এমন একটা অপূর্ব্ব বন্ধন, কাব্যসাহিত্য ব্যতীত পৃথিবীর আর কিছুতে থাকিত কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কালিদাস, চণ্ডীদাস, তুলসীদাস, রামপ্রসাদ, মীরাবাঈ হইতে ঈশ্বরগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র-লাল, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কাব্যসাহিত্যকে বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছেন।

অনেকে হয় তো বলিতে পারেন, কবি হইলেই দুঃখ পাইতে হইবে এমন কি কথা আছে আর এ কথা যে সত্য তাহার প্রমাণ কি?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতে পারি এই যে,দুঃখ পাইলেই সকলে যেমন কবি হইতে পারে না, তেমনি কবি হইলেই দুঃখ পাইতে হইবে এমন কথাও ঠিক বলা যায় না।

একথা অবশ্য বলা যায় যে, পৃথিবীতে অতি সাধারণ মানুষ হইতে যাঁহারা অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহৎলোক হইয়াছেন বা বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক উন্নতি-লাভ করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকে সাধারণ লোকের মত থাকিবার সময় এক এক সময়ে এমন একটা ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছেন যাহা ঘটিয়াছিল বলিয়াই তাঁহাদের স্বভাবের বা অন্তরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল এবং সেরূপ পরিবর্ত্তন প্রায় প্রত্যেক স্থলেই তাঁহাদের জীবনকে মহনীয় ও বরণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। বড় তাঁহারা হইতেনই, কারণ আদর্শ মানব হইবার মত শক্তি লইয়া তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন নিশ্চয়, তথাপি ঘটনাগুলিকে উপলক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

এ কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে বেশীদূর যাইতে হয় না, প্রত্যেক শ্রদ্ধেয় মনীষী ব্যক্তির জীবনচরিত আলোচনা করিলে এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণ লোকে হয় তো যে সব ঘটনাকে ও আত্মীয়-বন্ধুর কথা বা ব্যবহারকে নিতান্ত সাধারণভাবে দেখিয়া ও গ্রাহ্য করিয়া থাকেন, ঠিক সেই সব কথায় ও ব্যবহারে কবিচিত্ত অনেক সময় উদ্বেল হইয়া উঠে; তাহার কারণ কবিহৃদয় স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ এবং কোমল; সেজন্য প্রিয়জনের ব্যবহারের মধ্যে এবং ঘটনাচক্রে এমন অনেক দুঃখ তাঁহারা পান যাহা হয় তো অন্য সাধারণ লোকে তাঁহাদের মত একভাবে উপলব্ধি করিতেও পারে না। জীবনে শোক প্রত্যেক লোকই পাইয়া

থাকেন কিন্তু কয়জন তাহা সকরুণভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন ?

সামাজিক বা রাজনৈতিক যে কোনও ব্যবস্থা যাহা জনসাধারণ নিয়মের মত মানিয়া লয়, কবিরা সেইসকল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনেকসময় লেখনীচালনা করিয়া আপনাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও সহানুভূতিপূর্ণ অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিরা যেসকল কবিতা রচনা করেন, তাহার মধ্যে যেগুলিতে তাঁহাদের নিজজীবনের অভিজ্ঞতার ফল পরিস্ফুট হয় ও যেগুলি তাঁহাদের আপনার অন্তরের ভাবার পূর্ণ অভিব্যক্তি সেই সব কবিতা যেরূপ প্রাণস্পর্শী ও ভাবসম্পদে অতুলনীয় হইয়া থাকে, মাত্র ভাষা ছন্দজ্ঞানের সাহায্যে লিখিত কবিতা সেরূপ হয় না। এইসকল কারণে কবিচিত্তে দুঃখবাদের স্থান অনেক উচ্চে, তাঁহারা যখন অন্তরে কোনপ্রকার ব্যথা পান তখন উত্তেজিত হইয়া বা অধীর হইয়া বাহিরে তাহা প্রকাশ করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া না তুলিয়া নির্জ্জনে নীরবে আত্ম-সমাহিতভাবে বসিয়া সেই সময়ের হৃদয়ের ভাষাকে লেখনীর মধ্য দিয়া কাব্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে প্রাণপণ যত্ন করেন, তখন সেই একাগ্র সাধনার মধ্যে সান্ত্বনা ও সিদ্ধি একই সময় তাঁহাদের করতলগত হয়।

একদিন একটা দুঃখ পাইয়া একজন যাহা বলিয়া যান, চিরদিন (অন্ততঃ কাব্য-সাহিত্য যতদিন সঞ্জীবিত থাকিবে ততদিন) বহুলোক সেই একই প্রকার দুঃখের সম্মুখীন হইয়া আকুলভাবে সেই বহুপূর্ব্বের বলা কথাটাকে সমব্যথীর মত আঁকড়িয়া ধরিতে চাহে, কাব্য-সাহিত্যের এবং কবির দুঃখময় আনন্দের পরিপূর্ণ সার্থকতা ইহা হইতেই সপ্রমাণ হয়। ভারতীয় ও য়ুরোপীয় অনেক বড় কবি যে জীবনে নানাপ্রকার দুঃখ-কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন, একথা প্রায় সকলেই জানেন !

আবার অনেক কবির জীবনের কাহিনী হয় তো অনেকেই জানেন না, তবে মনস্তত্ত্ব বিষয়ে যাঁহাদের সামান্য অভিজ্ঞতা আছে : তাঁহারা সেইসকল কবির রচনাবলীর মধ্য দিয়া তাঁহাদের দুঃখ-বেদনার কিছু কিছু আভাস পাইয়া থাকেন। যেসকল কবির জীবনের বাহিরের দিক্‌টা দেখিয়া মনে হয় তাঁহাদের জীবনে কোনও দুঃখই নাই বা ছিল না, কে বলিতে পারে কবে কোন্ ঘটনার ভিতর দিয়া তাঁহাদের প্রশান্ত চিত্ত সহসা উদ্বেলিত হইয়া কাব্যলক্ষ্মীর চরণতলে আশ্রয় লয় নাই ? পরে সাধনাবলে তাঁহার কৃপালাভ করিয়া অন্তর্নিহিত বেদনাকে লেখনীর উৎসমুখ দিয়া বাহির করিয়া ধন্য হন নাই !

আমার বিশ্বাস প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন কবির জীবনে এমন দুই একটী দুঃখময় ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার ফলে তাঁহাদের কাব্যপ্রতিভার প্রথম বা যথার্থ উন্মেষ হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত কয়েকজন বিদেশীয় ও এদেশের কবিদের জীবন হইতে উদ্ধারণ করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না ; কিন্তু তাহা হইলেও আমি বলিব যে সেইরূপ ঘটনায় যে বেদনা তাঁহারা পাইয়াছেন তাহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই, বিধাতার আশীর্ব্বাদের মতই সে বেদনা তাঁহাদের জীবনকে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাই আজ তাহা সাহিত্যের সম্পদ। কল্যাণ দুঃখের বেশে কবিদের নিকটে আসে বলিয়াই তাঁহাদের জীবনকে এমন সত্য, সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারিয়াছে এবং পারিবে। দুঃখকে ব্যর্থতাকে প্রশান্তচিত্তে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইতে পারেন বলিয়াই কবিরা চিরস্মরণীয়, "মরিয়া অমর" হইতে পারেন।

———

স্মৃতিপূজা

শ্রীঅমরেশচন্দ্র সিংহ

মনীষী, মনস্বী, যশস্বী ও পরমভাগবত রসময় মিত্র মহোদয় আর এই ধরাধামে নাই। জীবনব্যাপী যাঁহার কৃপাকণা পাইয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন সেই ব্রজ-বিপিন-বিহারী বংশীধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত-জীবন সেই রসময় আজ চিরনিদ্রায় সমাহিত হইলেন। তাঁহার জীবনও রসময়--মরণও রসময়। নীরোগ রসময় শনিবার রাত্রিতে (১৮ই এপ্রিল, ১৯৩১) গাঢ়নিদ্রায় নিমগ্ন, রবিবার অতিপ্রত্যূষে তাঁহার পৌত্রীর শিশুপুত্রটীর ক্রন্দনে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, শিশুটী মাতৃক্রোড়ে পুনরায় নিদ্রিত হইয়াছে এই সংবাদে নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার স্বভাব-সুলভ নিত্যানন্দচিত্তে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণসখার উদ্দেশে একটী কীর্ত্তনগানের দুই কলি গায়িতে গায়িতে ভক্তিবিহ্বল হইয়া ভক্তবৎসলের চরণে ঢলিয়া পড়িলেন। গৃহের কেহ জানিতেই পারিলেন না যে তিনি চিরদিনের মত আজ শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। কর্ম্ম যাঁহার নীরব—মরণও তাঁহার নীরব; জীবন যাঁহার সুন্দর—মরণও তাঁহার সুন্দর।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া সাবডিভিসনের অন্তর্গত মঙ্গলকোট থানার অধীন চানক গ্রামে রসময় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহীর মৃত্যুর ছয়মাসকাল পরে তাঁহার জন্ম হয়। রসময়ের পিতা নবদ্বীপচন্দ্র মিত্র মহাশয় একপুত্র ও এককন্যা রাখিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১২৭০ সালে পৌষ মাসে রসময় যখন পাঁচ বৎসরের বালকমাত্র তখন তিনি মারা যান। তিনি নিজের শক্তিতে সদুপায়ে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু দীনদুঃখীর অভাব-মোচনে তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যয় করিয়া নিঃস্ব অবস্থায় বালককে পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া যান।

রসময়ের দীনা বিধবা জননী পতিহারা হইয়াও অধীর হইলেন না। পতিপ্রাণা স্বর্গীয় পতির অনন্ত আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করিয়া দুঃস্থ পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব নিজস্কন্ধে গ্রহণ করেন।

রসময়ের নিকট জননী মূর্ত্তিমতী ভগবতী ছিলেন। জননীর দেয় শিক্ষা, দীক্ষা ও ভগবৎনির্ভরতা তাঁহার জীবনের অমূল্য পাথেয় ছিল। মরণাবধি সংসারের প্রবল ঝঞ্ঝায় তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, তাঁহার অটুট বিশ্বাস ছিল জননী তাঁহাকে বুকে করিয়া রক্ষা করিতেছেন। যে শিক্ষার প্রেরণা পাইয়া তিনি শিক্ষক সম্প্রদায়ের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছিলেন, যে দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া তিনি শিশুসমাজের ধ্রুবতারা হইয়াছিলেন, যে ভগবৎনির্ভরতার পরমভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ভক্তগণের মুকুটমণি হইয়াছিলেন, সে শিক্ষা প্রধানতঃ তিনি তাঁহার জননীর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। নিঃস্ব রসময় উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক অমূল্য সম্পদ জননীর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চিত্তের কোমলতা, চিন্তার প্রসারতা, হৃদয়ের উদারতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, পরহিতব্রত এবং দীনদুঃখীর সেবা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

বাল্যে রসময় সুশীল ও সুবোধ বালক ছিলেন না। তাঁহার বালসুলভ চপলতা ও চঞ্চলতা তাঁহার জননী অম্লান-বদনে সহ্য করিয়াছেন। কখনও ক্রোধপ্রকাশ বা কটুকাটব্য বাক্যপ্রয়োগ করেন নাই।

বাল্য পাঠে উদাসীন থাকিয়া তিনি ক্রীড়াকন্দুক লইয়াই দিনপাত করিতে ভালবাসিতেন। সাতবৎসর বয়সে গুরুমহাশয়ের গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া প্রাইমারি বিদ্যালয়ে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে গ্রামের নিকটে বৈরাগীতলা মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকলেই তাঁহাকে বীরভূম জিলাস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য তাঁহার

পিতৃব্যের নিকট অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মাইনর স্কুলের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত অতিকষ্টে পড়িবার খরচ চালাইয়া তাঁহার দেবোপম পিতৃব্য বিনোদচন্দ্র মিত্র মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রের ভবিষ্যৎমঙ্গলের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অতি কষ্টে তাঁহার দরিদ্র পিতৃব্য মাসিক তিনটাকা স্কুলের বেতন দিবেন প্রতিশ্রুতি দিলে বালক রসময় বীরভূম জিলাস্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য শিউড়ী গেলেন। ভর্ত্তি হইবার সময় বার আনা প্রবেশ-ফির অভাবে এবং বার আনা সংগ্রহের জন্য এক সপ্তাহকাল তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তিনি চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই বিদ্যালয় হইতে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় চার বৎসরের জন্য বৃত্তি পান। বৃত্তি পাওয়ায় তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার পথ উন্মুক্ত হইল; এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পর্য্যন্ত কাহারও গলগ্রহ হইতে হইবে না বুঝিতে পারিয়া তাঁহার জননী ও পিতৃব্য নিশ্চিন্ত হইলেন। বীরভূম জেলাস্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের (উত্তরকালের লর্ড সিংহের) সহিত সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে তিনি আবদ্ধ হন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের মরণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট ছিল। বিদ্যালয়ে পঠদ্দশায় সমস্ত শ্রেণীতে সমস্ত বিষয়ে রসময় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিতেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় নির্ব্বাচিত হইয়া অতিকষ্টে ফি দাখিল করিয়া রসময় গৃহে ফিরিয়া যাইবার পর কঠিন রোগাক্রান্ত হইলেন; তাঁহার জীবনের আশা সবাই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সেবা-শুশ্রূষায় এবং মাতৃদেবীর আন্তরিকতা ও প্রার্থনায় তিনি সে যাত্রায় রক্ষা পাইলেন। তিনি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সকলে তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আর এক বৎসরের অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ভাবিয়াও তিনি পরীক্ষা দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পরীক্ষার শেষে গৃহে ফিরিয়া শুনিলেন তাঁহার আরাধ্যদেবী জননী আর ধরাধামে নাই। তাঁহার মৃত্যুতে তিনি যেন জীবনের ধ্রুবতারা হারাইয়া উন্মত্তবৎ হইয়া পড়িলেন। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল, তিনি ১৫৲ টাকার এবং সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ১০৲ টাকার বৃত্তি পাইয়াছেন। যিনি এই সুসংবাদে আনন্দে অধীর হইতেন সেই দুঃখিনী জননীর অবর্ত্তমানে এই শুভ সংবাদ তাঁহাকে বিন্দুমাত্র আনন্দ দিতে পারে নাই।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণপ্রিয়তম মধুময় সখা রসময়কে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলে কলিকাতার খরচ ১৫৲ টাকার ভিতরই হইবে এইপ্রকার আশ্বাস দিয়া পত্র লিখিলেন। বন্ধুর দান, বন্ধুর প্রাণ অসীম ও অপরিসীম ছিল। এইপ্রকার বন্ধুর চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া রসময়ের পক্ষে জীবন-ধারণ করা কষ্টদায়ক ছিল, কিন্তু স্বাবলম্বনশীল রসময় বন্ধুর গলগ্রহ হইতে ইচ্ছুক না হইয়া হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। অধ্যাপক গ্রিফিথ্‌স্ সাহেবের চরণ-প্রান্তে বসিয়া অধ্যাপনা-বিষয়ে যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভবিষ্যৎজীবনে অনেক সহায়তা করিয়াছে। গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব বিদেশী হইয়াও বাঙ্গালী বালকের প্রতি যেরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন তাহার তুলনা বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। রসময় গ্রিফিথ্‌স্ সাহেবের নিকট পুত্রের অধিক স্নেহ ও কৃপা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তা ও সহৃদয়তায় তিনি ভবিষ্যজীবনে উন্নতিলাভ করিয়াছেন। তিনি ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বি-এ পড়িবার সময় অর্থের অস্বচ্ছলতার জন্য তিনি কমিশনার-অফিসে ৩০৲ টাকা বেতনের একটী চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কমিশনারের Personal Assistant ছিলেন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। বঙ্কিমবাবুর জামাতা শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রসময়ের সহাধ্যায়ী ও হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। রসময় একখানা দরখাস্ত লিখিয়া রাখালবাবুর সহিত বঙ্কিমবাবুর নিকট গেলেন। বঙ্কিমবাবু সেই দরখাস্ত পড়িয়া বলিলেন, "২০৲ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাওয়া ছেলে ৩০৲ টাকার কেরাণীগিরির চেষ্টায় আছ,...তুমি পুনরায় যদি আমার আফিসের ত্রিসীমানায় আস, তবে তোমায় চাবুক লাগাইব।" তাহারা অতিশয় লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। যথাসময়ে বি-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী কলেজে সর্ব্বোচ্চস্থান

অধিকার করায় ২৫৲ পঁচিশ টাকা লাহাবৃত্তি ও গণিত শাস্ত্রে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হওয়ায় "Thwaytes Gold Medal" পাইলেন। গ্রিফিথ্‌স সাহেবের ইচ্ছা রসময় গণিতে এম-এ পরীক্ষা দেন কিন্তু গণিতে এম-এ পরীক্ষা দিতে হইলে প্রত্যহ নিয়মমত অঙ্ক কষিতে হইবে। তাঁহার সাংসারিক অপ্রতুলতা বৃদ্ধি পাইতেছিল, সেইজন্য কতকগুলি ছেলে পড়াইয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সংসারে পাঠাইতে হইবে এই আশায় অল্পপরিশ্রমে ইংরাজীতে এম-এ পাশ করিতে পারিবেন ভাবিয়া ইংরাজিতে এম-এ পড়িতে লাগিলেন। যথাসময়ে এম-এ পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সে বৎসর ইংরাজিতে কোন পরীক্ষার্থীই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

গঙ্গার ত্রিধারার ন্যায় রসময়ের জীবন কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পথে চালিত হইয়াছিল। একনিষ্ঠ কর্মযোগী রসময় তাঁহার কর্মজীবন সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি ছিলেন যেন পরশপাথর, যাহা স্পর্শ করিতেন তাহাই যেন সোণা হইয়া যাইত। এম-এ পাশ করিয়া তিনি চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে এইসময় তিনি কোনরূপ ভাল চাকুরী যোগাড় করিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া মেদিনীপুরে"কার্ত্তিকবাবুর সখের স্কুলে"র প্রধান শিক্ষক হইয়া যান। তখন তাঁহার বয়স তেইশ বৎসর মাত্র। নবীন রসময় প্রবীণের দায়িত্ব ও অধিকার পাইয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহার শিক্ষা ও শাসন-প্রণালী অপূর্ব্ব ছিল। স্থানীয় লোকেরা যে স্কুলকে ঘৃণা ও রহস্য করিয়া "সখের স্কুল" বলিত সেই বিদ্যালয়ে মাত্র একমাস অনন্যসাধারণ পরিশ্রম করিয়া রসময় তাহার সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করেন; এবং উহাকে আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। সেখান হইতে তিনি হুগলীর নরম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া আসেন, তথা হইতে তিনি বেহার প্রদেশে আরার জিলাস্কুলে যান।

রসময়ের কথা ভাবিতে গেলে পুরাকালে ঋষিদের কথা মনে পড়িয়া যায়। তাঁহারা যেমন স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া নবীন শিষ্যদিগকে মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথে প্রবর্ত্তিত করাইবার চেষ্টা পাইতেন, রসময়ও ঠিক সেইরূপ আদর্শে কার্য্য করিতেন। তাঁহার স্কুলের কথা ভাবিলে নিমাই পণ্ডিতের টোল কিংবা বুনো রামনাথের টোলের কথা মনে পড়ে। পৃথিবীর কোনও ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই, সামান্য শাকান্নের উপর নির্ভর করিয়া বহু ছাত্রের অধ্যাপনায় তিনি নিজজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

আরা হইতে তিনি হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে আসেন এবং হুগলী কলেজে কয়েকমাস অধ্যাপনা করেন। তারপর ১৮৯৫ সালে তিনি হেয়ার স্কুলে আসেন। হেয়ার স্কুলে পাঁচবৎসর মাত্র ছিলেন, তাঁহার যত্ন ও অধ্যবসায়ে স্কুলের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ে ব্যয়সঙ্কোচের অজুহাতে হিন্দুস্কুলকে উঠাইয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতার হিন্দুঅধিবাসিগণ ইহাতে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারা 'ট্রষ্ট ডিডে'র বলে এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে দিবেন না বলায় গবর্ণমেণ্ট হিন্দুস্কুলকে রাখিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় রসময়কে ইহার প্রধান শিক্ষক করিয়া আনিতে হয়। তিনি হিন্দু স্কুলের সহিত এমনভাবে জড়িত হইয়া পড়েন যে হিন্দুস্কুলকে ভাবিতে গেলে তাঁহার কথা মনে পড়িয়া যায় এবং রসময়কে ভাবিতে গেলে হিন্দুস্কুলের কথা মনে পড়ে। এইসময় তাঁহার কর্ম ও সাধনা, তাঁহার প্রাণ ও প্রেম যেন হিন্দুস্কুলের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল।

বুনো রামনাথ যেমন নিজ ছাত্রদিগকে মহামূল্য অলঙ্কার মনে করিয়া অহঙ্কার করিতেন রসময়ও সেইরূপ ভাল ছেলেদের গর্ব্বে গর্ব্ব অনুভব করিতেন। তাঁহার অসংখ্য ছাত্র উন্নতি লাভ করিয়া দেশ-বিদেশে পূজিত হইতেছেন; কত উচ্চ পদাভিষিক্ত হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। তাঁহাদের গৌরব রসময়ের গৌরব, তাঁহাদের সুখ্যাতি রসময়ের সুখ্যাতি, তাঁহাদের আদর্শ রসময়ের আদর্শ। কর্মযোগী রসময় যে কেবল অসংখ্য ছাত্রের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিতে চরণপূর্ণ করিয়াছেন তাহা নহে, সরকার তাঁহার কার্য্যের সুখ্যাতি করিয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছেন।

রসময়ের জন্মভূমি কাটোয়া সাবডিভিসনের মধ্যে, যে কাটোয়ায় ভক্তির অবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমে পাগল হইয়া, ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে ধূলিতে কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত গোরা-চাঁদ লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন, যে ধূলি এখনও নিমাইয়ের কত আনন্দাশ্রু সযত্নে বুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, যাহার আকাশে-বাতাসে ভক্তের হরিগুণ-কীর্ত্তন ভাসিয়া বেড়াই-তেছে সেই স্থানই ভবভারাক্রান্ত পথিকের পক্ষে ভক্তির শীতল ছায়াপথ ও পরম শুভকর। ভক্তিই বিষ্ণুপাদোদক গঙ্গা, ভক্তিই ত্রিতাপানল-বিদগ্ধ ভস্মাবশেষ জীবাত্মার একমাত্র কল্যাণকারিণী। সমগ্র সাধনতত্ত্বের চরম পরিপক্ক-ফলনিঃসৃত অমৃতময় রসের নামই 'পরাভক্তি' সেই রসে রসাল রসময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাবলে 'পরাভক্তি'র অধিকারী হইয়াছিলেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য কীর্ত্তনগায়ক রসময়ের অপূর্ব্ব উন্মাদনাময় সংকীর্ত্তন যে শুনিয়াছে, তাঁহার ভাবাবেশ দেখিবার সৌভাগ্য যাহার ঘটিয়াছে, প্রবল বন্যার ন্যায় দরবিগলিত অশ্রুধারা গণ্ড বহিয়া বক্ষদেশ ভাসাইতে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে রসময় কি অমৃতের আস্বাদ পাইতেন। গৃহী হইয়াও রসময় ছিলেন সন্ন্যাসী, সংসারের কোনও বস্তুই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিত না; সংসারের কোনও মায়াই তাঁহাকে ভুলাইতে পারে নাই। এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নয়নমণি আদরিণী জ্যেষ্ঠাকন্যা মুমূর্ষু শয্যায় শায়িতা, রসময় সংবাদ পাইলেন কাশীপুরে নড়াইলের জমিদারের বাড়ী কীর্ত্তন হইবে। প্রভুর নাম সংকীর্ত্তন হইবে, রসময় কি স্থির থাকিতে পারেন! তিনি, জয় শ্রীরাধারাণী,জয় শ্রীরাধাগোবিন্দ বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গৃহের বাহির হইয়া গেলেন, প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যা অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। এই রকম কত ঘটনাই যে তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না।

রসময়ের সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীস্বরূপিণী। দ্বিতীয় শ্রেণী:ত পড়িবার সময় তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি অধ্যাপনা, সংকীর্ত্তন ও সভাসমিতির কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন, গৃহের সমস্ত কাজের ভার লইয়াছিলেন তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিণী। এই বৃদ্ধা বয়সেও সংসারের একটু কাজেও কখনও ত্রুটি করেন না, দীনদরিদ্রের সেবা, নিরন্নকে অন্নদান, অতিথি-সৎকার, ব্রাহ্মণ ও স্বজনের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকিয়া তাঁহার পতির চরণে নিবেদিত জীবন সার্থক হইয়াছে। পতি-হারা হইয়াও হিমগিরির ন্যায় তিনি অচল, অটল এবং পুণ্যতোয়া সুরধুনীর ন্যায় সংসারের মধ্যে নিত্য প্রবাহিত হইয়া শোকসন্তপ্ত চারিকন্যা ও দুই পুত্রকে সান্ত্বনা দিতেছেন, "আমি তো আছি, তোমরা শোকে মুহ্যমান হইলে তিনি যে স্বর্গে গিয়াও চঞ্চল হইবেন এবং আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি দেখিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন।"

দরিদ্রের সন্তান রসময় ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ও প্রশস্তির বিজয়মাল্যে ভূষিত হইয়াও দেবতার আশীর্ব্বাদ চন্দন-তিলক প্রশস্ত ললাটে ধারণ করিয়া কখনই অহঙ্কারী হন নাই। ভক্তের দাস্যভাব তাঁহার জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি যে আকাশে বিচরণ করিতেন তাহা জ্ঞান ও গরিমায় উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ম্ময় ছিল এবং তিনি যে ভূমিতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা মানব-প্রেমের রসে ও ভগবদ্‌ভক্তিতে সজীব ও সতেজ ছিল। সেই মহাপুরুষের স্মৃতিপূজাই এই দীনদুঃখী ও ভক্তিহীনের চরম তৃপ্তি ও শীতল সান্ত্বনা।

অপবাদ

(গল্প)

শ্রীহরিপদ গুহ

—এক—

অসম্ভবও সম্ভব হইল।

অবশেষে দেব-চরিত্র পরেশের নামেও অপবাদ রটিল।

প্রথম প্রথম পরেশ সমস্ত ঘটনাটা রহস্যচ্ছলেই লইয়াছিল এবং স্ত্রী সুষমার অভিমান দূর করিতে চেষ্টারও ত্রুটি করে নাই।

কয়েকদিন ধরিয়া সাধাসাধির পরও যখন সুষমার রাগ একটুও পড়িল না, বরং দিন দিন বাড়িতেই লাগিল, তখন পরেশও একদিন জেদ ধরিয়া বাঁকিয়া বসিল।

একটা সামান্য ব্যাপার দেখিতে দেখিতে তালগোল পাকাইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল।

পরেশ ধনীর সন্তান; বর্ত্তমানে সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। অন্যান্য বড়লোকের ছেলের মত পরেশের কোনপ্রকার বদ্ খেয়ালই ছিল না।

সুষমা দরিদ্রের কন্যা; পরমসুন্দরী বলিয়াই পরেশের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। পিতার একমাত্র সন্তান, তাই সে বড় আদরের এবং সে একটু অভিমানীও ছিল।

বিবাহের পর বছর তিনেক বেশ সুখেই কাটিয়াছিল।

তারপরই কেমন সব ওলটপালট হইয়া গেল।

ঘটনাটা এই :—

কে আসিয়া সুষমাকে লাগাইয়াছিল যে, পরেশ বাগানবাড়ীতে বাইজী নাচাইয়া কেলেঙ্কারীর একশেষ করিতেছে।

কয়েকদিন হইতেই সুষমা পরেশকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। তাহার অন্যমনস্কভাব পরিবর্ত্তনটা অতি সহজেই সুষমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কয়দিন ধরিয়াই পরেশের বাড়ী আসিতে রাত্রি অধিক হইতেছিল এবং বাড়ীর ভোজনেও বিশেষ তৃপ্তি ছিল না।

কাজেই চট্ করিয়া কথাটা মনে লাগিল। অবিশ্বাস করিতে পারিল না।

বড়লোকের ছেলেদের পরিণাম যে কি তাহা সুষমা ভাল করিয়াই জানিত এবং জানিত বলিয়াই সে ভয়ে ভয়ে চলিত; স্বামীর মনোরঞ্জন করিতেও যত্নের ত্রুটি করিত না। সে মনে মনে যে ভয় করিতেছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিয়া সে একেবারে শিহরিয়া উঠিল।

ইহার পরই অভিমানের পালা সুরু হইল।

সুষমা মুখ ফুটিয়া পরেশকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে নাই! তাহার সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া গোপনে কাঁদিয়াই আকুল হইতেছিল।

নারীর সব চেয়ে বড় আঘাত লাগে কিসে তাহা পরেশ জানে এবং সেটাকে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সুষমাকে একটু রহস্য করিয়াই একদিন বলিয়াছিল যে, একজন বাইজীকে সে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে।

সুষমা একেই সন্দেহের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়া মরিতেছিল, তাহাতে স্বামীর মুখের এই স্বীকারোক্তিতে সে একেবারেই নিঃসন্দেহ হইয়া গেল।

তারপর ব্যাপারটা যখন খুব জটিল হইয়া দাঁড়াইল, তখন পরেশ বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সুষমার রাগ তাড়াইবার জন্য স্বপক্ষে-বিপক্ষে সত্য-মিথ্যার অনেক যুক্তির অবতারণা করিল।

কিন্তু কিছুই আর হইল না।

সুষমা স্বামীর সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিল। এক বাড়ীতে থাকিয়াও সে স্বামীর কাছে নিজেকে ধরা দিত না।

পরেশও রাগে-দুঃখে হতাশভাবে রাত্রে বাড়ী আসা একেবারে বন্ধ করিয়া দিল।

ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ঘটনাটা ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর হইয়া চলিল।

ইহারই কয়েকদিন পরে সুষমা একদিন পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

তাহাদের কোন মীমাংসাই আর হইল না।

—দুই—
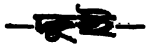
পরেশ তাহার কাছারি-ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিল। হঠাৎ একদিন এক সুকুমার-দর্শন বালক আসিয়া তাহাকে নমস্কার জানাইয়া বলিল যে কোন একটা কাজ দিয়া তাহাকে আশ্রয় দিতে হইবে।

পরেশ একটু বিব্রত হইয়া পড়িল।

অজ্ঞাত-কুলশীল কে এই বালক? আর কখনও তো ইহাকে সে দেখে নাই।

জিজ্ঞাসা করিল—

তোমার নাম কি?

সে জবাব দিল—প্রণবকুমার।

পরেশ একবার আড়চোখে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—কতদূর পর্য্যন্ত পড়েছ?

প্রণব বলিল—বিদ্যে ঐ ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত। বেশী আর কোত্থেকে হ'বে? অল্প বয়সে মা-বাপ মারা গেল; এক খুড়ো ছিল, নামে-বেনামে সে সব দখল করে' নিলে আর আমাকেও এমন যন্ত্রণা দিতে লাগ্‌ল যে একদিন বেরিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়লুম নকুড়..সার যাত্রা পার্টিতে। গলাটা ভাল ছিল, চুকিয়েল বেশ মানায়—পড়ে গেলুম অধিকারীর নজরে; তারা আমায় লুপে নিলে।

মাথাটা ভাল, দুদিনেই তৈরী হ'য়ে গেলুম। নাচতে গাইতে বেশ ভালই পারি, তবে কি জানেন মশাই, ওই চৌ-চৌ কোম্পানী আমার ভাল লাগে না; আর অধিকারীর যে খিট্‌খিটে মেজাজ, ও একেবারেই অসহ্য। রাতদিন ট্যাঁক্ ট্যাঁক্ ওটা খেও না, সেটা খেও না, গলা ধরে যাবে। অত কেন রে বাপু, দিবি তো পাচ টাকা মাইনে, তা আবার খ্যাঁচ খ্যাঁচ! কাজে জবাব দিয়ে চলে এলুম।

আমাকে কিন্তু আপনার রাখতেই হ'বে বাবু! মাইনে-টাইনে চাইনে। খেতে পরতে দিলেই চল্‌বে। নেচে গেয়ে আমি আপনাকে খুব ফূর্ত্তিতেই রাখব।

প্রণবকে দেখিয়াই পরেশের ভাল লাগিয়াছিল।

চট্ করিয়া রাজী হইয়া গেল।

প্রণবের মুখে হাসি আর ধরে না।

তাহার থাকিবার স্থান ও আহারের সংস্থান হইয়া গেল। পরেশ একটা চাকরকে ডাকিয়া প্রণবকে বাগান-বাড়ীতে লইয়া যাইতে বলিল।

পরেশদের একটা থিয়েটার-পার্টি ছিল; সেখান হইতে প্রণবকে একটা ভাল দেখিয়া বাইজীর পোষাক, চুল, ঘুঙুর ইত্যাদি বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

বন্ধুদের চমকিত করিবার জন্য পরেশ পূর্ব্বেই তাহাদের খবর দিয়াছিল যে, কলিকাতা হইতে একজন বিখ্যাত বাইজীকে আনান হইয়াছে, বিকালে যেন তাহারা বাগান-বাড়ীতে পদধূলি দেয়। এতবড় অঘটন কেমন করিয়া যে সম্ভব হইল বন্ধুর দল তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। যাহা হউক তাহারা পরেশের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিল না, এক বুক আশা লইয়া কম্প্রবক্ষে পরেশের বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রণবকে মানাইয়াছিল অতি চমৎকার। বন্ধুদের কথা দূরে থাকুক, পরেশ নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে, বাইজী পুরুষ।

বন্ধুর দল পরেশের রুচির প্রশংসা করিয়া তাহাকে তারিফ দিতে লাগিল।

প্রণবকুমার নাচিয়া-গাহিয়া, নয়ন-বাণ হানিয়া সকলকে একেবারে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

এই বাইজীকে লইয়াই বিভ্রাটের সূচনা।

এই ঘটনাটাই কি প্রকারে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সুষমার কাণে গিয়া মিথ্যা সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

—তিন—

সুষমা লজ্জা ও ঘৃণায় একেবারে মরমে মরিয়া গিয়াছিল। তাহার বুকের মধ্যে যে দাবদাহ হইতেছিল, সেই আগুনে সে নিজেই পুড়িয়া মরিতেছিল; কাহাকেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছিল না।

কিছুদিন পরেই কিন্তু তাহার মনের কথা বলিবার একটা সুযোগ মিলিয়া গেল। তাহার শৈশব-সহচরী অপর্ণা স্বামীর সঙ্গে পিত্রালয়ে বেড়াইতে আসিল। একদিন দ্বিপ্রহরে সুষমা অপর্ণাকে একা পাইয়া নির্জ্জনে লইয়া সমস্ত ঘটনা অকপটে প্রকাশ করিয়া দিল।

সমস্ত শুনিয়া অপর্ণা কহিল—পোড়ার মুখী, করেছিস্ কি? সব জেনে-শুনে ওই অবস্থায় তুই তাকে ছেড়ে এলি? ধন্যি সাহস তোর! আমি হ'লে কিন্তু কিছুতেই তাকে ওই অবস্থাতে রেখে আস্‌তে পারতুম না ভাই! যদি তোর এই সন্দেহ সত্যিই হয়, তবে তো তুই তাকে রসাতলের পথে ঠেলিয়ে যেতেই ছেড়ে দিলি, তাকে রক্ষে করবার কোন উপায়ই তো তুই করলি না! আমার কথা শোন্, তুই ফিরে গিয়ে সব অভিমান ভুলে তার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখের ভাগী হয়ে তাকে বুকে টেনে নিয়ে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখ।

কথাটা সুষমার মনে খুবই লাগিয়াছিল। কয়েকদিন সে মনে মনে ইহা লইয়া আলোচনাও করিল খুব। তারপর একদিন যেমন সহসা চলিয়া আসিয়াছিল তেমনই সহসা একদিন আবার স্বামীর ভিটায় ফিরিয়া গেল।

পরেশ এত শীঘ্র সুষমাকে আশা করে নাই, কাজেই একটু অবাক্ হইল। তাহার রাগ তখনও কমে নাই; তবুও সুষমার মানসিক অবস্থাটা কল্পনা করিয়া মনে মনে সে খুব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সুষমা ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল; পরেশ তাহাকে বাধা দিয়া মুখে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য আনিয়া বলিল—ছিঃ ছিঃ কর কি? ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না! আমি মহা-পাপিষ্ঠ। এই অবেলায় হয় তো আবার তোমায় নাইতে হ'বে। বলিয়াই সে একবার সুষমার আপাদমস্তক দেখিয়া লইল।

সুষমার বুক ছাপিয়া কান্না আসিল। সে ঢিপ করিয়া পরেশের পায়ের উপর একটা প্রণাম করিয়াই তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

—চার—

গোপন থাকে না, কথাটা ক্রমে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই পরেশের এই অধঃপতনে দুঃখ-প্রকাশ করিল এবং সর্ব্বত্রই সুন্দরী ওই বাইজীকে লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। বৃদ্ধের দল ছিঃ ছিঃ করিয়া বলিতে লাগিল—ভায়া হে, সাবধান। ছোঁড়ার দিন দিন যে রকম মতিগতি হচ্ছে তাতে ঝি-বউ নিয়ে বাস করা দায় হয়ে উঠ্‌ল দেখছি।

চরিত্রবান্ বলিয়া যে অতবড় সুনাম, তাহা যে কেমন করিয়া নষ্ট হইয়া গেল পরেশ ভাবিয়া পায় না; রক্ষা করিবার জন্যও সে কোনপ্রকার চেষ্টা করে না। চারিদিকে তাহার যতই দুর্নাম রটে, সে যেন নিজেকে ততই উচ্ছৃঙ্খল দেখাইতে চেষ্টা করিতে থাকে এবং প্রণবকে যাহাতে কিছুতেই চিনিতে পারা না যায় সেজন্য নিত্য-নূতন আয়োজন চলিতে থাকে।

পরেশ আপন মনেই হাসিয়া লুটোপুটি খায়।

* * *

কয়দিন হইতেই বন্ধুদের মনে একটা খটকা লাগিয়াছে। তাই তাহারা বাইজীকে একটু বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিল।

সেদিন নাচিতে নাচিতে হঠাৎ বাইজীর বুকের তুলা ভরা স্তন দুইটা একটু সরিয়া যায় এবং একটু পরেই মাথার চুলটা খুলিয়া পড়িয়া গেল।

বন্ধুর দল হো-হো শব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল; পরক্ষণেই কিন্তু তাহাদের মুখ একেবারে কালিমাখা হইয়া গেল। এত বড় ঠকা তাহারা আর কখনও ঠকে নাই।

সেদিন আর মজলিশ জমিল না। ব্যাটা-ছেলের বাঁদর-

নাচ দেখিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। বিষণ্ণ বদনে যে যার ঘরে চলিয়া গেল।

এতদিনে সত্য কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সব শুনিয়া সকলে উচ্চ হাস্য করিতে লাগিল। যাহারা তাহার অপবাদ দিয়াছিল, অধঃপাতে যাইবার জন্য দুঃখ করিয়াছিল, তাহারাই আজ মুক্তকণ্ঠে পরেশের গুণগান করিয়া বলিল—এ তো জানা কথাই। অতবড় চরিত্রবান্ ছেলে কি কখনও পা পিছলে পড়ে! বাহাদুর বটে। গ্রাম শুদ্ধ লোককে কি ঠকানটা না ঠকালে।

সুষমা চুল বাঁধিতেছিল। পরেশ বাইজীকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সুষমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—বাইজী তোমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তোমরা কথা কও, আমি এখনই আস্‌ছি—বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যে বাইজী তাহার স্বামীকে এমন করিয়া বশ করিয়াছে, তাহাকে একবার দেখিবার জন্য অনেকদিন হইতেই সুষমার মনে মনে ইচ্ছা ছিল। আজ তাহাকে দেখিয়া সে একেবারে অবাক্ হইল। এত রূপও মানুষের থাকে! সে তন্ময় হইয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া বারিবিন্দু ফেলিতে লাগিল।

প্রণবকুমার একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা হইয়া গেল। এই-রূপ যে একটা কিছু হইবে তাহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই।

সুষমা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বাইজীর হাত ধরিয়া বলিল—আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও ভাই!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পরেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—তোমার স্বামী তোমারি আছে সুষমা তাকে কেউ নিতে পারবে না! সঙ্গে সঙ্গে সে প্রণবকুমারের ছদ্মবেশ সব খুলিয়া ফেলিল।

লজ্জায় সুষমা একেবারে মরমে মরিয়া গেল।

প্রণব বলিল—আমায় তাড়িয়ো না দিদি, আমার কোন দোষ নেই।

পরেশের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সুষমা বলিল—না ভাই, তোমাকে তাড়াব না। তবে এখন হ'তে তোমার স্থান হ'ল উপরের বৈঠকখানায়। বাগানবাড়ীতে আর নয়।

পরেশ বক্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—দেখ, আমাকে যেন একেবারে ভুলে যেও না সুষু! কি জানি স্ত্রীষু বিশ্বাসঃ নৈব কর্ত্তব্য।

সুষমা বলিল—যাও তুমি ভারি ইয়ে—কি যে বল!

"শাতকুম্ভ" ও "জাম্বুনদ"

শ্রীবিমলাচরণ দেব

অমরকোষ, বৈশ্যবর্গ, ৯৪—৯৫ শ্লোকে স্বর্ণের ঊনিশটী পর্য্যায় দেওয়া আছে। তন্মধ্যে "শাতকুম্ভ" ও জাম্বুনদ আছে।

মার্কেণ্ডেয় পুরাণ, ৫৪ অধ্যায়ে জম্বুদ্বীপের বর্ণনা আছে। উক্ত অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে আছে যে, গন্ধমাদন পর্ব্বতে (উক্ত পর্ব্বতস্থিত জম্বুবৃক্ষ হইতে) গজদেহপ্রমাণ জম্বুফল পড়ে। ২৯ শ্লোকে আছে :—

"তেষাং স্রাবাৎ প্রভবতি খ্যাতা জম্বুনদীতি বৈ।
যত্র জাম্বুনদং নাম কনকং সম্প্রজায়তে॥"

এইসকল জম্বুফলের রস গড়াইয়া জম্বুনদীর সৃষ্টি হইয়াছে এবং নদীতে জাম্বুনদ নামক স্বর্ণ উৎপন্ন হয়।

শাতকুম্ভ শতকুম্ভ নামক পর্ব্বতবিশেষে জাত স্বর্ণ। এই পর্ব্বত সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাই নাই।

এই পর্য্যন্ত যদি ধরা যায় তাহা হইতে "জাম্বুনদ" ও "শাতকুম্ভ" ঠিক এক জিনিস নয়। দুইই স্বর্ণ বটে, কিন্তু বিভিন্ন আকারের স্বর্ণ।

হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে ৬৪ অধ্যায়ে, ৪ শ্লোকে আছে :—

"জাম্বুনদময়াস্তত্র শাতকুম্ভ ময়ানি চ।
প্রদীপ্তজ্বলনাভানি শীতরশ্মিনিভানি চ।
শয়নানি মহার্হাণি তথা সিংহাসনানি চ।"

ইহাতে বোধ হয় যে "জাম্বুনদ" ও "শাতকুম্ভ" এক জিনিস নহে। শুধু "চ" আছে বলিয়া নহে। একটীর বর্ণ প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায়, অপরটীর বর্ণ চন্দ্রের ন্যায়।

ইহাতে অমরকোষের সহিত বিরোধ বোধ হইতেছে। "শাতকুম্ভ" ও "জাম্বুনদ" কি দুইই স্বর্ণ, কিন্তু বিভিন্ন আকরে জাত বা বিভিন্ন জাতীয়? কিংবা একটী স্বর্ণ, অপরটী অন্য কিছু?

এই অবস্থায় বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, ১২ অধ্যায়, ১০ শ্লোকে "শাতকুম্ভ" শব্দের প্রয়োগ পাই। ভট্ট উৎপল (খৃঃ ১০ম শতাব্দীর লোক) এই গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। তাঁহার টীকায় একস্থলে আছে :—"শাতকুম্ভ শব্দ সুবর্ণরজতয়োর্দ্বয়োরপি বাচকঃ।"

রজত অর্থে "শাতকুম্ভ" কোথাও পাইয়াছি মনে হয় না। হরিবংশ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকে শাতকুম্ভের বর্ণ সাদা পাই। তাহা হইলে রজত হইতেও পারে বা কোন বিশেষ প্রকারের স্বর্ণ, যে সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ এখন লুপ্ত তাহাও হইতে পারে। বলিতে পারি না প্ল্যাটিনাম বা তজ্জাতীয় খুব দুষ্প্রাপ্য কোন ধাতু, যাহা দুষ্প্রাপ্যতার (কাজেই মহার্ঘতার) জন্য ধাতুরাজ স্বর্ণের সহিত এক শ্রেণীতে পরিগণিত হইত।

মোট কথা, বোধহয় ইহা অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে প্রণিধান ও কৌতূহলের বিষয় বটে।

সেকালের কথা (২)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গতবারে সংবাদপত্রের বিবরণ দিয়াছি, এবার এপ্রিল ১৮৩০ হইতে এপ্রিল ১৮৩৩ সালের মধ্যে সমাচার দর্পণে যে-সব নূতন গ্রন্থ এবং স্কুল-কলেজের কথা বাহির হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।—

স্কুল-কলেজ

রামমোহন রায়ের স্কুল ঃ—

(৮ অক্টোবর ১৮৩১। ২৩ আশ্বিন ১২৩৮)

"....আমরা শুনিয়াছি যে বাবু রামমোহন রায় যখন হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষেরদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না তখন তিনি এতদ্রূপ প্রশংসনীয় কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে তদ্বিষয়ে ভগ্নাশতাপ্রযুক্ত তাঁহার মন কিছু দুঃখী না হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় শতং বালক বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে লোকের এতদ্রূপ বিরোধে সর্ব্বসাধারণের উপকার।"

(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯)

"...শিমুলা সংলগ্ন শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলনামক বিদ্যালয়... ।"

পাদরী ডফের স্কুল ঃ—

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭)

"কলিকাতায় চিতপুর রোড অর্থাৎ বড় রাস্তার ধারে যে বাটিতে এক স্কুল অর্থাৎ বিদ্যালয় ... পাদরি সাহেব লোকেরা ঐ বিদ্যালয় করিয়াছেন এবং তাহারদিগের বয়ান অর্থাৎ স্কটলণ্ড যে গির্জাসংক্রান্ত ধন আছে সেই ধন হইতে বিদ্যালয়ের ব্যয় হইবেক এবং বিদ্যালয়ের সাহায্যকারি শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় হইয়াছেন ও তিনি ঐ বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থি বালকদিগকে রীতি নীতি শিক্ষা করাইবেন।"

হিন্দু ফ্রি স্কুল ঃ—

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৬ ভাদ্র ১২৩৮)

"গত ৩১ আগস্ত বুধবারে বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক এবং অপর দুই জন হিন্দু মহাশয়েরদের অধন হিন্দু ফ্রি স্কুলের প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হয়। ছাত্রেরা বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে একত্র হইল এবং শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত ড্রাজু [ডিরোজিও] সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লীক এবং অপর কএক জন এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের সম্মুখে ঐ ছাত্রেরদের পরীক্ষা হয়। ঐ পরীক্ষাতে শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক ও তাঁহার সহকারিরদের উদ্যোগ অতিপ্রশংসনীয় দৃষ্ট হইল।

হিন্দু কালেজের পূর্ব্বছাত্র শ্রীযুত বাবু রাধানাথ পালনামক এতদ্দেশীয় এক যুব মহাশয়কর্ত্তৃক [যোড়াশাঁকো নিবাসী বৃন্দাবন পালের মধ্যম পুত্র] এতদ্দেশীয় শিশুগণকে বিনামূল্যে বিদ্যাদানাভিপ্রায়ে ঐ হিন্দু ফ্রি স্কুলনামক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উক্ত বাবু ও তাঁহার মিত্রেরা ঐ স্কুলের পোষকতানিমিত্ত এক চান্দা করিয়াছেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদিগকে বিদ্যাসাধন নিতরণার্থ উক্ত বাবুর উদ্যোগের কিছু ত্রুটি নাই। পূর্ব্বাহ্নে ছয় ঘণ্টাঅবধি নয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে।

এতদ্দেশীয় মহাশয়কর্ত্তৃক এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাদানবিষয়ে ইনকোয়াররে অত্যুত্তম লিখিয়াছেন। তৎপত্রসম্পাদক লেখেন যে ইহার পূর্ব্বে কেবল ইউরোপীয় লোকেরদের বদান্যতাতেই এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাভ্যাস হইত। হিতৈষি বিদেশীয়েরদের কর্ত্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়ব্যতিরেকে অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্তু কালক্রমে মহারূপান্তর হইয়াছে। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা স্বদেশীয়েরদিগকে ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং স্বদেশীয়েরদের উপকারার্থ যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা সুজ্ঞাত হইয়াছেন। আন্দুলে স্থাপিত বিদ্যালয়ের বিষয়ে যাহা লেখা গিয়াছে তৎপরে শ্রুত হওয়া গেল যে কেবল হিন্দুরদিগকে বিদ্যাবিতরণার্থ কলিকাতার নানা পল্লীতে হিন্দুরদের কর্ত্তৃক নানা পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে এবং প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে অবগত হওয়া গেল যে এইক্ষণে এতন্মহানগরে ভিন্ন২ ছয় স্থানে ছয়টা পৌর্ব্বাহ্নিক পাঠশালা নিযুক্তা হইয়াছে তাহাতে তিন শত সত্তর জন বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। এই সকল বিদ্যালয় হিন্দুকালেজে সুশিক্ষিত হিন্দু যুব মহাশয়েরদের দ্বারা স্থাপিত হইয়া সম্পন্ন হইতেছে।"

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১১ ফাল্গুন ১২৩৮)

"প্রভাকর পত্রদ্বারা আমরা জ্ঞাত হইলাম যে বাবু ভুবনমোহন মিত্র ও বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও বাবু রাধানাথ পাল এবং অন্যান্য সকলে হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপন করিয়া তাহার ব্যয় নিজহইতে বহুকালাবধি করিতেছেন কিন্তু সংপ্রতি ঐ স্কুলের ব্যয়ের বাহুল্যহওয়াতে স্বদেশীয় লোকেরদের নিকটে তাঁহারদের উপকার যাচ্ঞা করিতে হইয়াছে। ধনদাতৃগণের মধ্যে প্রভাকর মহাশয় এই২ নাম বিশেষ লেখেন।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। ... ১০০
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ... ৫০
শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর। ... ৫০
শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল। ... ৪০
শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি। ... ৪০
শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়। ... ১৬
শ্রীযুত আগার সাহেব। ... ১০

(১৮ জুন ১৮৩১। ৫ আষাঢ় ১২৩৮)

"সংপ্রতি পরম্পরায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত রসিককৃষ্ণ মল্লিক সিমুলিয়াতে হিন্দু ফ্রি স্কুলনামে বিনাবেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন প্রায় ৮০ জন বালক ঐ স্থানে শিক্ষাকরণার্থে গমন করিয়া থাকেন তথায় কেবল পুস্তকের অর্দ্ধ মূল্য দেন আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে ইহারা বিদ্যা উপার্জন করিয়া আপনার দেশের উপকারজন্য কি শ্রম করিতেছেন...।—সং কৌঃ

(৮ অক্টোবর ১৮৩১। ২৩ আশ্বিন ১২৩৮)

"উক্ত স্কুলের কোন মান্য প্রধান মেম্বর দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ বিদ্যালয়ের গত এক কমিটিতে তদধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন তথা শ্রীযুত বাবু রাধানাথ পাল তথা শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীকপ্রভৃতি কএক জন প্রধান২ কর্ম্মকারকেরা সভা শোভা করিয়া বহুবিধ বিচার করণান্তর এই প্রস্তাব করিলেন যে যে কএক জন মেম্বর হিন্দু ধর্ম্মের দ্বেষী ও দুঃসাহসি কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করে তাহারদিগের সহিত আমরা কোন বিষয়ের অংশ রাখিব না...।

উপরি লিখিত কএক পংক্তি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠকরণেতে পাঠকগণের এই বোধ হইবে যে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষেরদের অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম্ম পুনর্ব্বার অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক আছেন এবং তদ্ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বচন যে প্রকাশ না পায় এতদর্থ তাঁহারা যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতেছেন ইহা প্রভাকরসম্পাদক বাক্কৌশলদ্বারা লোকদিগকে জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। এই উক্তি পাঠ করিয়া আমি আশ্চর্য্য রসে মগ্ন হইলাম এবং ঐ পশ্বাচারিসম্পাদক মহাশয় এমত অসত্য ও অমূলক কথা কি অভিপ্রায়ে প্রকাশ করিতেছেন তাহা জানিতে পারিলাম না। তিনি যে বৈঠকের বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা গত ৯ সেপ্তেম্বরে হিন্দু ফ্রি স্কুল বিদ্যালয়ে হয় তৎসময়ে আমি তথায় সভাপতি ছিলাম অতএব সেই স্থানে যে সকল ব্যাপার হইয়াছিল তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণে আছে অতএব হিন্দু ধর্ম্মবিনাশাকাঙ্ক্ষি কতক২ মেম্বরেরদের সঙ্গে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষের আর কোন সম্পর্ক রাখিবেন না এমত প্রস্তাব কদাচ হয় নাই ইহা আমি তদ্রূপ জানি অতএব হিন্দু ফ্রি স্কুলের শিষ্টবিশিষ্ট সহকারিরদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি প্রভাকরসম্পাদককে এই গল্প প্রকাশ করিতে সুপরামর্শ দেন তাহা জ্ঞাত নহি যেহেতুক এই কথা বাস্তবিক অসত্য কেবল ইহা বলিয়া নহে কিন্তু তাহাতে অনেক মহাশয় ব্যক্তির এবং আমারদের সম্ভ্রমের কলঙ্ক জন্মে। যে অযুক্ত ধর্ম্মের শৃংখলে বহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ আছে তাহা দূরকরণে যদপি আমারদিগের অভিপ্রায় থাকিত তবে আমরা কখন হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করিতাম না

ঐ স্কুলের সংস্থাপনকালাবধি তাহাতে আমার সম্পর্ক আছে এবং অদ্যাপিও তথায় আমি অধ্যাপনাবস্থায় আছি। অপর আমি এই বিষয় সুজ্ঞাত আছি যে ফলোপধায়ক বিদ্যা বর্দ্ধনার্থ এবং ঐ বিদ্যার দ্বারা ধর্ম্ম বিষয়ক মোহদূরীকরণাভিপ্রায়ে ঐ হিন্দু কি স্কুল সংস্থাপিত হইয়া যে তাহার পৌষ্টিকতা হইয়াছে ইহা আমি সুন্দর অবগত আছি। হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধাচারকরণদ্বারা যাঁহারা ধর্ম্মলোপচিকীর্ষু হইয়াছেন এমত সকল ব্যক্তিদের সহকারিতায় ঐ স্কুলের অধ্যক্ষেরা নিতান্তেচ্ছুক ছিলেন এবং যাঁহারা আপনারদের পৈতৃকধর্ম্ম আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন এমত ব্যক্তিরা তাহার পৌষ্টিকতাকরণে যে অনুপযুক্ত তাঁহারদের এমত কখন বোধ ছিল না অতএব প্রভাকরপ্রকাশক স্বীয় অদ্ভুত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিদ্বারা এমত অনুমান করুন যে ঐ স্কুলের অংশী ও অধ্যক্ষেরা ছাত্রেরদের ধর্ম্মজ্ঞানবিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা যেকোন মতঃপ্রবিষ্টেরদের সামঞ্জস্যের সপক্ষ অতএব তাবদ্ব্যক্তিরদের বিবেচনাকরণের যে অধ্যক্ষ্যতা আছে তদধ্যক্ষতানুসারে কার্য্যকরণে কাহারু বাধা জন্মান তাঁহারা অপরাধ জ্ঞান করেন। তাঁহারদের এমত স্পষ্ট বোধ আছে যে জ্ঞানের উদ্দীপন হইলে অবোধতা দূর হইবে অতএব তদ্রূপ জ্ঞান যে সর্ব্বসাধারণের হয় ইহা তাঁহারদের বিশেষাভিপ্রায়। অতএব হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার্থ উপায় যে করিতেছেন ইহা পশ্চাচারি মতের মুরব্বি প্রভাকরসম্পাদক কি নিমিত্ত কহিতেছেন আমরা যে তাঁহার মত অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের সপক্ষ ইহা তাঁহার সম্বাদ পত্রে তূরীবাদ্যের ন্যায় প্রকাশকরাতে কি তিনি আমারদিগকে মিত্রতা দর্শাইতেছেন যদি এমত তাঁহার ভরসা থাকে তবে তাহা নিতান্ত বিফল যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রেরা যদ্রূপ হিন্দুধর্ম্ম ঘৃণা করি তদ্রূপ আমারদের অপর কোন ঘৃণ্য বস্তু নাই। হিন্দুধর্ম্ম কুকর্ম্মের যদ্রূপ কারণ তদ্রূপ অপর কুকর্ম্মের কারণ জ্ঞান করি না হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা যদ্রূপ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি না এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের শান্তি ও কুশল ও সুখের হিন্দুধর্ম্মে যদ্রূপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রূপ অপর কোন বিষয়ে আমরা বুঝি না। এবং অযুক্তধর্ম্ম বিনাশার্থ আমাদের যে অভিপ্রায় তাহা কি ব্যঙ্গোক্তি কি তোষামদ কি ভয় কি তাড়না কোন প্রকারেই আমরা ত্যাগ করিব না। তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা করা যে আমারদের অভিপ্রায় ইহা কহিয়া আমারদের সন্তোষ জন্মাইতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার কথাতে আমারদের মন কোনপ্রকারে যে লইবে না ইহা তিনি ভালরূপে জ্ঞাত থাকুন। যে হিন্দুরদের চক্ষু ফুটিয়াছে তাহারদের প্রতিকূলে নানা সময়ে তিনি যে গ্লানি উক্তি কহিয়াছেন তাহাতে কি আমরা মনোযোগ করিয়াছি কদাচ নহে।

... মাধবচন্দ্র মল্লীকস্য।

৩০ সেপ্তেম্বর ১৮৩১।"...

কলিকাতা হাই স্কুল ঃ—

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০। ১৫ কার্ত্তিক ১২৩৭)

"কিয়ন্মাস গত হইল কলিকাতা মহানগরে এক হাই স্কুল-নামক এক ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় উইলিন্টন ইষ্ট্রিটে স্থাপিত হইবার বৃত্তান্ত অনেক ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে উদিত হইয়াছিল...।" ("প্রেরিত পত্র")

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯)

"গত বৃহস্পতিবার দশ ঘণ্টাসময়ে উক্ত স্কুলের চারি ঘরে বালকদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষাহওয়াতে প্রথম ক্লাশের পাঠার্থিগণের পরীক্ষা শ্রীলশ্রীযুক্ত লর্ড বিসোপ সাহেবকর্তৃক নীত হয় এবং অন্য এক ঘরে শ্রীযুত আর্চডিকান্‌দ্বারা সম্পন্ন হয়।"

বর্দ্ধমানে নুতন বিদ্যালয় ঃ—

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮)

"আমরা উক্তস্থানের এক আত্মীয়ের পত্রে অবগত হইলাম যে বর্দ্ধমানে শ্রীযুত মিসিনরি সাহেবেরদের উদ্যোগে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এক্ষণে বর্দ্ধমানের শ্রীযুত জজসাহেবের যেস্থানে বিচার গৃহ নির্ম্মাণ হইয়াছে তাহার পশ্চিম প্রায় আট শত হস্ত অন্তরে অথচ নগরের মধ্যে খোশবাগনামে এক উদ্যান আছে সেই উদ্যানে বিদ্যালয় নির্ম্মাণ হইতেছে এই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী পারস্য আরবী এবং সংস্কৃত এই কএক বিদ্যার শিক্ষা ও আলোচনা হইবেক। শ্রীযুত হেচকিন্সন সাহেব ইঙ্গরেজী ভাষার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন অন্য২ বিদ্যা শিক্ষাদেওন-হেতুও মৌলবী এবং পণ্ডিত স্থির হইয়াছেন প্রত্যেক ছাত্রজন্য দুই মুদ্রা মাসিক বেতন গ্রহণের নিয়ম হইয়াছে এই বিষয়ের সম্মতিপত্রে তন্নগরের প্রায় ৬০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন বর্দ্ধমান নগরে যে ২ সাহেবলোক বাস করেন তাঁহারদের তাব-ত্তেরই উক্তবিষয়ে অভিমতি আছে এবং সকলেই আনুকূল্য করিবেন এমত গতিক বটে বর্দ্ধমানদেশে পারস্য ভাষারই অত্যন্ত চর্চা ইঙ্গরেজী ভাষা অত্যল্প লোকে জানেন। যদিও আমরা জানি যে তথায় অন্য দুই এক বিদ্যালয় আছে তাহাতে বিনা-বেতনে ইঙ্গরেজী পাঠ হইবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তন্মধ্যে কোন

বিদ্যালয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক এবং তাদৃক অনুরাগ নাই অন্য স্কুলে যদিও উপযুক্ত অধ্যাপক এবং নিয়মও বিলক্ষণ থাকিতে পারে তাহা নগরহইতে দূর এবং কোন ২ কারণে তথাকার হিন্দুরা যাইতে সঙ্কোচ করেন এই বিদ্যালয় নগরমধ্যেও বটে এবং সকলেরই অনুরাগ আছে সুতরাং ইহার উন্নতি হইবার সন্দেহ করি না।—সং কৌং।"

হিন্দু বেনিভোলেণ্ট ইনষ্টিটিউশন :—

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

"হিন্দু বিনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন।—শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বসুজ মহাশয় যে এক চেরিটী অর্থাৎ দাতব্য স্কুল স্বীয় ভবনে সংস্থাপিত করিয়াছেন ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের এক মণ্ডলী একজামিন অর্থাৎ মাসিক পরীক্ষা গত রবিবার দিবসে হয় তাহাতে হিন্দু কালেজের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক শ্রীযুত পাব্বেল সাহেব ঐ বালকদিগের পরীক্ষা লওনপূর্ব্বক পরিতুষ্ট হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের বালকেরা সৎপথাবলম্বী এবং শারদা বাবুর স্কুলেতে বিশেষ মনোযোগ আছে সুতরাং ভালই হইবে এবং ক্রমে ২ বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবেক এ কোন বিচিত্র কথা ইতি।—সং প্রং।"

(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩১। ৩ পৌষ ১২৩৮)

"নূতন বালিকা বিদ্যালয়।—আমরা শুনিতেছি যে বহুবাজারের গিরি বাবুর পথের এক বিংশতি সংখ্যক ভবনে বালিকারদের পাঠের জন্যে শ্রীযুক্ত রিবেরণ্ড মেকফরসন সাহেব এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বালিকারদের পাঠ জন্য বেতন অত্যল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে।—সং কৌং।"

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি :—

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

"অরিয়েণ্টেল সিমিনরিনামক পাঠশালার পরীক্ষা।—গত ১৪ফেব্রুয়ারি ৩ফাল্গুন মঙ্গলবার উক্ত পাঠশালার বালকদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছে পাঠশালাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আঢ্যের বিশেষ যত্নে পরীক্ষাসময়ে এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয় বহুবিধ লোকের সমাগমন হইয়াছিল শ্রীযুত ডেবিড হ্যার সাহেব-প্রভৃতি কএক জন বিজ্ঞ সাহেব পরীক্ষক ছিলেন তাঁহারদিগের [illegible] প্রায় তাবৎ বালকেরা করিয়াছিল তাহাকে কি পরীক্ষক কি দর্শক সভায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকেরাও পুস্তকাদি পারিতোষিক দ্রব্য প্রাপ্তিতে তুষ্ট হইয়াছে আমরা অনুমান করি এই স্কুলের ক্রমে উন্নতি হইতে পারিবেক যেহেতুক প্রায় তিন বৎসর হইল স্থাপন হইয়াছে এপর্য্যন্ত কোন বালকের নাস্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই এজন্য ভদ্র লোক ঐস্থানে বালক পাঠাইতে সন্দিগ্ধ হইবেন না এবং যে সকল পুস্তকাদি পাঠে নাস্তিক হয় তথায় পাঠ হয় না। আমরা ইহাও শুনিয়াছি আঢ্য বাবু বালকদিগকে সর্ব্বদা সাবধান করিয়া থাকেন।—সং চং।"

টাকির বিদ্যালয় :—

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ২৩ মাঘ ১২৩৮)

"আমরা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত রেবেরেণ্ড আলেকজণ্ডর ডফ সাহেব শ্রীযুত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরী এবং শ্রীযুত বাবু রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরির অধিকার অথচ বাসগ্রাম টাকিতে এক পাঠশালা স্থাপিত করিবেন টাকির সমীপস্থ যমুনার পশ্চিম পার্শ্বে এই বিদ্যা ভবন নির্ম্মাণ হইবেক তাহার টাকি একেডিমি নাম দিবেন মনস্থ করিয়াছেন তথায় ইঙ্গরেজী পারস্য এবং আরবি এই তিন ভাষাই শিক্ষা দেওয়া যাইবেক অথচ বালকেরদের নিকট যথার্থ বেতনমাত্র গৃহীত হইবেক না অত্রবিষয়ে শ্রীযুত রায় চৌধুরী বাবুরা যথেষ্ট আনুকূল্য করিবেন।"

(৩০ জুন ১৮৩২। ১৮ আষাঢ় ১২৩৯)

"আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতা নগরহইতে প্রায় বিংশতি ক্রোশ অন্তর অতিসমৃদ্ধ টাকি স্থানে এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থ এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ স্থান শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠ রায় চৌধুরী এবং তাঁহারদের পরিজনগণের আবাস তাঁহারা ঐ স্থানে বৃহৎ২ তিনটা অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া ইঙ্গরেজী ও আরবী পারসী ও বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষকসকল নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এক জন উপযুক্ত সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক তথায় আছেন অল্পকালের মধ্যে তিনিও ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনারম্ভ করিবেন।

উক্ত বিদ্যালয়ের তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার শ্রীযুত পাদরি ডফ সাহেবের প্রতি সমর্পিত হইয়াছে গত ১৪ [জুন] বৃহস্পতিবার উক্ত সাহেবের দ্বারা ইঙ্গরেজী পারসী বাঙ্গালা ভাষাভ্যাসক কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে চিৎপুরে ঐ সাহেবের পাঠশালায় যদ্রূপ নিয়ম আছে তদ্রূপ নিয়মই এই পাঠশালায় চলিবে। এই স্থানের ছাত্রেরা বিদ্যা-

শিক্ষার্থ এমত ব্যগ্র যে তিন দিবসের মধ্যেই ৩৪০ জন ছাত্র নিযুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুত বারলো সাহেব ও বাগুশির শ্রীযুত টেম্বল সাহেব তৎসময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন এই নূতন বিদ্যালয়ের বিষয়ে তাঁহারা যথেষ্ট সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন।

এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা এই পাঠশালার ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারদের উপযুক্তরূপ প্রশংসা করা দুঃসাধ্য যেহেতুক স্বচ্ছ দেশোপকারার্থ তাঁহারা স্বীয় ধন ব্যয় ও পরিশ্রমের কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না। এবং তাঁহারা নিজের লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ঐ জিলার মধ্যবর্ত্তি স্থানপর্য্যন্ত সংপ্রতি এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন।"

(১৪ জুলাই ১৮৩২। ৩২ আষাঢ় ১২৩৯)

"কৌমুদী পত্রহইতে অবগত হওয়া গেল যে ৩০ জুন শনিবারে টাকিহইতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। সংপ্রতি টাকিতে যে বিদ্যালয় ঐ বাবুকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে ঐ বিদ্যালয়ে অন্যূন পাঁচ শত করিয়া বালক বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রতিদিন আসিতেছে এবং আরো অনেক বালক তাহাতে বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক আছে কিন্তু ঐ বিদ্যালয়ে স্থান সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত এইক্ষণে তাহারদের ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারে না। কথিত আছে যে দুর্গোৎসবের পর ঐ পাঠশালা বাটী আরো বাড়ান যাইবে

শান্তিপুর একাডেমি :—

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ২৩ মাঘ ১২৩৮)

"শান্তিপুরের আকাদিমি।—...বিজ্ঞ অথচ লোকহিতৈষী শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়কর্তৃক গত দিসেম্বর মাসের দ্বাদশ দিবসে তাহা স্থাপিত হইয়াছে এবং ঐ বাবু তাহার অধ্যক্ষও হইয়াছেন। ঐ পাঠশালা স্থাপনাবধি অদ্যপর্য্যন্ত ৫৮ জন বালক পূর্ব্বাহ্নে দশঘণ্টাবধি অপরাহ্নের পাঁচ ঘণ্টাপর্য্যন্ত প্রতিদিন হাজির হইয়া শিক্ষার পৌর্ব্বাপর্য্য এবং উত্তম ধারানুসারে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে।...ঐ বিদ্যালয় উক্ত বাবুর খরচেতে কোম্পানির রাস্তার পূর্ব্ব দিগে স্থাপিত হইয়াছে। অপর শ্রীযুত জজ এডুার্ড মলিক সাহেব ঐ পাঠশালার বালকেরদের শিক্ষক হইয়া বৎসরে দুইবার বালকেরদের পরীক্ষার্থ স্থির করিয়াছেন...।

কেষাঞ্চিদ্দর্পণগ্রাহিণাং বিদ্যালয়সহকারিণাঞ্চ।
শান্তিপুর ১৮৩২ সাল, ২৯ জানুয়ারি।"

চুঁচুড়ার পাঠশালা :—

(৩ মার্চ্চ ১৮৩২। ২১ ফাল্গুন ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়।

কএক সপ্তাহহইতে জনরব হইয়াছে যে চুঁচুড়া শহরের এবং তদধীন স্থানসকলের বাঙ্গালা লেখা পড়ার যে কএকটা সরকারি পাঠশালা আছে তাহা উঠিয়া যাইবেক ইহাতে দেশের বড় ক্ষতি হইবার সম্ভাবনাজন্য বিদ্যাবিষয়ক কমিটির সম্বন্ধে কোন২ সমাচারপ্রকাশকেরা তাহার যথার্থকারণ না জানিয়া অবিবেচনাসূচক কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

আমি উক্তস্থানে বাস করি ঐ সকল পাঠশালার বিষয় যথার্থ যাহা জ্ঞাত আছি তাহা লিখিয়া পাঠাই আপনকার মত হয় প্রকাশ করিবেন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালে অথবা কহ ১৮ বৎসর হইল চুঁচুড়ার হাকিম ফারবেস সাহেব একটা পাঠশালা উপস্থিত করেন। তাহার অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক পাদরি মে নামক এক জন মিসিনরি সাহেব ছিলেন তাহাতে অধিক সংখ্যক বালক ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গালা পড়িত কিন্তু কোন কারণবশতঃ সে পাঠশালা উচ্ছিন্ন হইয়া গেলে পরে মহামহিম শ্রীযুত বেলি সাহেবের আনুকুল্যে বাঙ্গালা পাঠশালার নিমিত্ত সরকারহইতে মাসিক ৬০০ শত টাকা দিতে হুকুম হয় তদ্দারা যে সাহেব গরিহাটীঅবধি কৃষ্ণনগরপর্য্যন্ত গঙ্গার ও খালের ধারে হাটে বাজারে ও রাজপথে পাঠশালা স্থাপন করেন কিন্তু ইহার কর্ত্তা বা সংস্থাপক কে তাহার যথার্থ স্পষ্টরূপে বহুকাল ব্যক্ত হইল না সুতরাং মিসিনরি সাহেব অধ্যক্ষ ইহাই লোকেরদিগের বোধ হইল এজন্য বিশিষ্টলোকের বালকেরা তাহাতে পাঠ স্বীকার করিল না পরে পাদরি সাহেব আপন পরিশ্রম ও আয়াস ন্যূন করিবাতে পাঠশালার সংখ্যা অল্প করিলেন অর্থাৎ যেখানে২ হাট বাজার ছিল সেই২ স্থানে পাঠশালা থাকিল পাদরি সাহেব বালকদিগকে পারিতোষিক পয়সা দিতেন ইহাতেই মুসলমান ও হিন্দু চাষাভুষা লোকের ছেল্যেরা যাবৎ পয়সা পাইত তাবৎকাল পাঠশালায় যাইত বিশিষ্টলোকের সন্তান যে কেহ গিয়াছে এমত শুনা যায় নাই এবং বোধগম্যও হয় না।

সরকারহইতে যে ছয় শত টাকা প্রতি মাসে বাহির হয় তাহার প্রায় অর্দ্ধেক পাদরি সাহেবের নিজের বেতন এবং তাঁহার গাড়ি ও বজরাভাড়াতেই যাইত অবশিষ্ট অর্দ্ধেক বিশেষ্যাধিক পাঠশালার ব্যয় হয়।

পাদরি মে সাহেবের পরে পাং পীয়র্সন সাহেব ঐ কর্ম্মে ছিলেন এক্ষণে পাং হিগ [Higgs] সাহেব তাহাতে আছেন এইপ্রকারে আঠার বৎসর গত হইল ইহাতে ঐ পাঠশালায় প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা সরকারের ব্যয় হইয়াছে। অপর পাদরি সাহেবদিগের মঙ্গল সমাচার প্রচার করা এবং কেতাব করা কর্ম্মসম্বন্ধে মধ্যে২ পাঠশালা দেখিতে যাইতেন পরন্তু গুরুমহাশয় যাহারা ছিল তাহার এ পাদরি সাহেবের নিজের লোকের আত্মীয় এজন্য তাহারা পাদরি সাহেবের দওরা করিতে যাইবার পূর্ব্বেই সমাচার পাইত তৎকালে কতকগুলিন বালক জড় করিয়া রাখিত মাত্র। ইহাতেই তাবতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন ঐ পাঠশালাবিষয়ে নিযুক্ত ব্যক্তি-ব্যতীত আর কাহার কি উপকার হইয়াছে বা হইতে পারে।

পরন্তু তালপাত কলাপাত ইত্যাদি লেখা পড়া পূর্ব্বে যে-প্রকার হইত ঐ পাঠশালায়ও সেইপ্রকার হইয়াছে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যা কাহার দেখা যায় নাই অধিকন্তু এই কেবল কতকগুলিন মুটে মজুর পোদ বাগদীর ছেল্যেরা পাদরি সাহেবের প্রসাদাৎ দোয়াইৎ কলম স্পর্শ করিয়াছে মাত্র বিষয়কর্ম্মকরণো-পযুক্ত লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই এবং লেখাপড়া করিয়াছিল এই অভিমানে ও অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না এইপ্রকার অনেকের দুইকুল গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিশিষ্ট সন্তানমধ্যে যাহারা অর্থ ব্যয় করিয়া পড়িতে পারে না এমত লোকের নিমিত্ত খয়রাতি পাঠশালা করিয়াছেন ও করিতেছেন ইহারদিগের বিদ্যা মনুষ্যত্ব না হইলে সাধারণ বা ক্ষুদ্র লোকের বিদ্যাপ্রদানে অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম জলে নিক্ষেপ করা হয় মাত্র।

এতদ্দেশে বিদ্যাভ্যাসাদি মঙ্গলজনক বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোক বিশেষ মনোযোগ না করিলে রাজদ্বারা কিপ্রকারে তাবৎ নির্ব্বাহ হইবেক। এক্ষণে শুনিতেছি হুগলিতে একটা বড় পাঠশালা হইতেছে বোধ হয় ইহাতেই পাদরি সাহেবের পাঠশালার কিচির মিচির রহিত হইবেক কারণ তাহাতে বিশেষ উপকার নাই কেননা তাদৃশ লেখা পড়া পূর্ব্বে হইত এক্ষণেও বিনা রাজার সহকারে হইতে পারে যদি স্কুলবুক সোসাইটী পাঠশালার পাঠ্য গ্রন্থ দেন তবে মফঃসলের তালপাত ও কলাপাত লেখা পড়া চলিবেক এক্ষণে যেপ্রকার লেখা পড়া হইতেছে জ্ঞান হয় এমত বিদ্যাদান অনাবশ্যক এই বিবেচনাবিধায় ঐ পাঠশালা কোন মিসিনরি সাহেবকে দিবেন। ইহাতে টাকা বাঁচান কিম্বা লোকের ক্লেশ হয় এমত অভিপ্রায় রাজার হইতে পারে না।

কস্যচিৎ চুঁচুড়ানিবাসিনঃ।—সং চং।"

হিন্দু লিবারেল একাডেমি :—

(১৪ এপ্রিল ১৮৩২। ৩ বৈশাখ ১২৩৯)

"পরমপূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদং আমরা অবগত হইলাম যে ১ মার্চ তারিখে শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র ও বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু বেহারিলাল সেট এই কএক জনে হিন্দু লিবরল একেডিমি নামক এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেক দীনদুঃখিদিগকে বিদ্যা দান করিতেছেন এবং ইহার দ্বারা অনেক দুঃখি লোকের ইংরেজী পড়ার বড়ই সুগম হইয়াছে যেহেতু অন্য২ পাঠশালায় পড়িবার অনেক বাধা আছে কারণ কোন স্থানে হিন্দু ধর্ম্ম লোপ হয় ও কোন স্থানে বা অর্থ ব্যয় হয় কিন্তু এই পাঠশালায় কোন শঙ্কা নাই ধর্ম্মলোপ হয় না ও ব্যয়ো হয় না আর পূর্ব্বোক্ত বাবুরা কাগজ কলম ও বিবিধপ্রকার পুস্তক নিয়মমতে অবাধে বিতরণ করিতেছেন এবং ছাত্রগণের নিকটহইতে ঐ সকল সামগ্রীর কিছুমাত্র মূল্য লন না।...

কস্যচিৎ বড়বাজারস্থস্য।"—সং চং।

মলঙ্গার চতুষ্পাঠী :—

(২৫ আগষ্ট ১৮৩২। ১১ ভাদ্র ১২৩৯)

"নূতন চতুষ্পাঠী।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত শ্রীধর শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুপণ্ডিত নানা শাস্ত্রে বিদ্যাবান্ বিশেষতঃ পুরাণ শাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ আছে তিনি সংপ্রতি বহুবাজারের মলঙ্গাধামে এক চতুষ্পাঠী করিয়াছেন গত ৩১ শ্রাবণ মঙ্গলবার অধ্যাপনারম্ভ হইয়াছে তদুপলক্ষে এতন্নগরস্থ অনেক অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং ঐ নিমন্ত্রিত পণ্ডিতদিগকে মুদ্রাদি দানে সম্মানান্বিত করিয়াছেন ইহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল ঐ ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণাদির তাবৎ ব্যয়ের আনুকূল্য করিয়াছেন এবং পরেও আবশ্যকমতে করিবেন কেননা কথিত আছে। বিনাশ্রয়ং ন জীবন্তি পণ্ডিতাবনিতালতাঃ।—সং চং।"

নূতন পুস্তক

(১৭ জুলাই ১৮৩০। ৩ শ্রাবণ ১২৩৭)

"শ্রীযুত মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর যে পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থ

ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন তাহা সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।"

(২৪ জুলাই ১৮৩০। ১০ শ্রাবণ ১২৩৭)

"নীতিকথা [মর্‌যাল ম্যাকসিম্] ।—শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নীতিকথা সংগ্রহ করিয়া সংপ্রতি যথাক্রমে বর্ণশ্রেণী-পূর্ব্বক ইঙ্গরেজী ভাষায় মুদ্রিতকরণপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন…।"

(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ২০ ভাদ্র ১২৩৭)

"অবোধ বৈদ্যবোধোদয় ।—কাঁচনাপাড়ানিবাসি বৈদ্য শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ রায়ের আদেশে শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্নবিরচিত যে বৈদ্যোৎপত্তি গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তাহা অনেকেই অবগত হইয়াছেন সংপ্রতি কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ মুন্সী ঐ প্রকাশিত গ্রন্থের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক অবোধ বৈদ্যবোধোদয় নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এই যে রায় কৃত গ্রন্থের অপ্রামাণ্যহেতুক দোষকথন এবং মহারাজ রাজবল্লভ সংগৃহীত ব্যবস্থাসম্মত ও মনু যাজ্ঞবল্ক্য-প্রভৃতি প্রমাণান্বিত পণ্ডিতগণস্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্রানুসারে যথার্থ অম্বষ্ঠোৎপত্তিকথন এবং ব্রাহ্মণগণের যথার্থ স্তুতি কীর্ত্তনাদি প্রকাশ করিয়াছেন অপর এতদ্গ্রন্থে বহুতর বৈদ্যকর্তৃক স্বাক্ষর হইয়াছে এক্ষণে ঐ পুস্তক চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইলে শীঘ্র প্রকাশ পাইবেক। সং চং।"

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০। ১৫ কার্ত্তিক ১২৩৭)

"আমরা মোদমানে সর্ব্বজন সন্নিধানে প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতায় শ্রীল শ্রীযুত রাইট্ রেবেরেণ্ড লার্ডবিসোপসাহেবের মানসে আমোদদ রসনস্ নামকৈক ইঙ্গরাজী গ্রন্থ [Johnson's Rasselas] গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদ করণে শোভাবাজারস্থ শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সম্প্রতি সংপ্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অপর চাণক্য মুনিকৃত প্রচলিত অষ্টোত্তর শত শ্লোক এবঞ্চ পঞ্চ ও নবরত্ন কবিতাদি তাহাও উক্ত মহারাজ স্বকীয় ইচ্ছায় ইংগ্লণ্ডীয় ভাষায় রূপান্তর করিয়াছেন এবং ত্বরায় সমূল প্রকাশক হইবেন। উক্ত রূপান্তর প্রকাশানন্তর পাঠকবর্গের নিশ্চয় সন্তোষকর হইবেক যেহেতুক অব্যবহিত পূর্ব্বে মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থদ্বয়ে সর্ব্বসাধারণ প্রমাণ কারণ হইয়াছে অতএব অস্মদাদির অনুমেয় যে বর্ত্তমান গ্রন্থদ্বয় উত্তমাতিশয়রূপে বিখ্যাত হইবেক।"

(৮ জানুয়ারি ১৮৩১। ২৫ পৌষ ১২৩৭)

"১৮৩০ সাল, ২০ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইঙ্গরেজী ভাষায় রচিত এক কাব্য গ্রন্থ মুদ্রিত করেন হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথম ইংগ্লণ্ডীয় ভাষায় রচিত কাব্য।"

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

"এতদ্দেশীয় ভাষায় নূতন গ্রন্থ। শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি হিন্দুবদিগের দর্শনশাস্ত্রের মতঘটিত বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণীনামক এক পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে ইঙ্গরেজী অনুবাদের সঙ্গে২ আসল সংস্কৃত শ্লোক অর্পিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ অনুমান বৎসর বাইট সত্তর হইল গুপ্তিপল্লিনিবাসি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যকর্তৃক রচিত হয় এবং তাহা পণ্ডিতেরদের কর্তৃক অতিমান্য তাহার [কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের] ঐ অনুবাদ অতিউত্তম নৈপুণ্যরূপে প্রস্তুত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব ২ অনুবাদাপেক্ষা তাহা অত্যুৎকৃষ্ট।"

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮)

"শ্রীযুত মহারাজ কালিকৃষ্ণ বাহাদুর…সংপ্রতি নীতিসংকলন-নামক এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ চাণক্য পণ্ডিতের সংগ্রহ ১০৮ শ্লোক পঞ্চরত্নের ৫ শ্লোক নবরত্নের ৯ শ্লোক বানর্যাষ্টক বানরাষ্টক মোহমুদ্গরের ১৩ শ্লোক শান্তিশতকের ১০১ শ্লোক সর্ব্বসুদ্ধা ২৫৮ শ্লোক সংগ্রহ-পূর্ব্বক তন্নিম্নে ঐ সকল শ্লোকের মর্ম্মার্থ ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন ইহাতে যদ্যপিও কোন ২ ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয় এবং তাঁহার পিতৃস্বস্পুত্র শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ অনুবাদ বিষয়ে যে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন তাহা উক্ত গ্রন্থে ব্যক্ত আছে তথাপি তাঁহার বিদ্যা ভদ্রসমাজে অবশ্যই গৌরবীয়া বটে।"

(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮)

"নূতন গ্রন্থ। পাকরাজেশ্বর।…এই দেহধারণের মূলাধার আহার অতএব সর্ব্বোপভোগযোগ্য মানবের নিমিত্ত অন্নপূর্ণা রূপ ধারণ-পূর্ব্বক অম্ল তিক্ত মধুর লবণ কটু কষায় ষড়যুক্ত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্যভোজ্য দ্রব্যসকল সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ত্রিবিধ প্রকার বিভাগ করিয়া অন্নদাসূপ নামক শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। ঐ শাস্ত্র সর্ব্বসাধারণ বোধের কঠিনতাপ্রযুক্ত তৎকর্ম্ম সুনিষ্পন্নাভাবে প্রচণ্ড প্রতাপবান সকল গুণ নিধান শ্রীমান্ মহারাজ নল মহাশয় এবং পাণ্ডবীয় ভীমসেন ও দ্রৌপদীপ্রভৃতি স্বস্বনামে সূপশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং উত্তরোত্তর সুগমোপায় নিমিত্ত অনে-কানেক মহামহোপাধ্যায় মহাশয়েরা নানাবিধ কুতূহলনামে সূপশাস্ত্র প্রকাশে স্থূলতাধিক্য করিয়াছেন। তৎপরে যবনাধিকারে ঐ সকল সূপশাস্ত্র হইতে প্রয়োজনমতে কিঞ্চিৎ২ সংগৃহীত হইয়া পারসীয় ভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। এইরূপে হিন্দুরাজ্য বহুকালাবধি ভ্রষ্ট হওয়াতে ঐ সকল সংস্কৃত সূপশাস্ত্র এতদ্দেশে প্রায় লোপ পাইয়াছে। অতএব মহানুভব শ্রীযুত বিক্রমাদিত্য মহারাজাধিকারে সংস্কৃত সূপশাস্ত্র সংক্ষেপ সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীযুত

ক্ষেম শর্ম্মকৃত ক্ষেমকুতুহলনামক গ্রন্থ হইতে ও শ্রীযুত শাহজহান বাদশাহের নিত্য ভোজনের নেয়ামৎখাননামক পারসীয় পাকবিধি ও নওয়াব মহাবত্তজঙ্গের নিত্য ভোজনের পাক বিধি-হইতে সাধারণের দুষ্কর পাক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুলভ পাক যাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয় তাহা গ্রহণ করিয়া এবং বর্ত্তমান অনেকানেক সুপকুশল ব্যক্তিদিগের নিকট জ্ঞাত হইয়া বিষয়ি ব্যক্তি সকলের সুগমবোধার্থ পরিমাণ সহ পাক বিধি এবং ভক্ষণজন্য অজীর্ণ হইলে দ্রব্যান্তর ভক্ষণে আশুপ্রতিকারক জীর্ণ মঞ্জরী গ্রন্থ এবং তদর্থ সংস্কৃত মূল সহ গদ্য পদ্য রচনাতে পাক রাজেশ্বর নাম প্রদানপূর্ব্বক গৌড়ীয় সাধুভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত করিলাম ইতি।—সং চং।"

[এই পুস্তকের একখণ্ড আমি রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি। তাহার আখ্যাপত্রের উপর লেখা আছে,—

পাক রাজেশ্বরঃ

শ্রীবিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কারভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত

হইয়া কলিকাতার যোড়াবাগানের সুধাসিন্ধু যন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৫৩। বাং ১২৩৮।]

(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

"তাড়িত [The Persecuted] নামক এক নাটক।—ঐ গ্রন্থকর্ত্তা বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর স্থানে আমরা তাড়িতনামক এক নাটক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম ঐ গ্রন্থ তিনি অতিনৈপুণ্যরূপে রচনা করিয়াছেন। ইঙ্গরেজী ভাষা ঐ বাবুর দেশীয় ভাষা নহে অতএব ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহার ঐ ভাষাতে লিখন অত্যুত্তম জ্ঞান হয় কিন্তু কলিকাতাস্থ লোকেরা এইক্ষণে যেপ্রকার দলাদলে বিভক্ত আছেন তদৃষ্টে ঐ পুস্তকের মর্ম্ম প্রকাশ করা আমারদের সুকঠিন। তাহাতে লেখেন যে ব্রাহ্মণেরা আপন শিষ্যেরদিগকে ফাঁকি দিয়াও ঐ শিষ্যেরদের ভ্রান্ততাপ্রযুক্ত ধনোপার্জনে প্রাধান্য করেন। অপর লেখেন যে হিন্দুরদের ভাগ্যবান্ লোকেরা ধর্ম্মবিষয়ক বিধি পরিত্যাগ করিয়া লাম্পট্যাদিতে আসক্ত আছেন যদ্যপি তাঁহার এতদ্রূপ দোষ অর্পণকরা কঠিন বোধ হয় তথাপি তাহা যে অযথার্থ নহে ইহা কহিতে আমারদের সঙ্কোচ নাই। রাজধানী নিবাসি লোকেরদের আচার ব্যবহারসকল শিথিল হইয়া গিয়াছে। এবং যাঁহারা নাস্তিক বলিয়া সংপ্রতি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ ব্যক্তিরদিগকে তিরস্কার করেন তাঁহারা যদি আপনারদের পরমমান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা বিচারিত হন তবে তাঁহারাই পরমদোষী হইতে পারেন।"

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

"শোভাবাজারের শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ... এইক্ষণে লোকেরদের অতি শুশ্রবণীয় যে বেতাল পঁচিশে ও মহানাটকের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অপর নায়ক নায়িকার রস বিস্তারঘটিত যে অতিপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর পুস্তক শোভাবাজারের শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় বিজ্ঞব্যক্তিরদের মধ্যে এই গ্রন্থ অতিশুশ্রবণীয়। এবং যাঁহারা ঐ নায়ক নায়িকাবিষয়ক রসানভিজ্ঞ তাঁহারদের অতিসুশ্রাব্য।"

(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

"নূতন হিন্দুস্থানী গ্রামার অর্থাৎ ব্যাকরণ।—শ্রীযুত যকিংহেম সাহেবের পরে শ্রীযুত আর্টনামক যে সাহেব কলিকাতার জর্নল সম্বাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন তাঁহাকর্ত্তৃক ইঙ্গলণ্ড দেশে এক নূতন হিন্দুস্থানী গ্রামার প্রকাশ হইয়াছে। ইহার কতকগুলিন পুস্তক শ্রীযুত থাকর কোম্পানির ঘরে বিক্রয় হইতেছে।"

(১৪ জুলাই ১৮৩২। ৩২ আষাঢ় ১২৩৯)

"সম্বাদ তিমিরনাশকহইতে নীত। নূতন পুস্তক।

অস্মদাদির গোচর হইল যে শোভাবাজারস্থ শ্রীশ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর কৃত প্রশ্নোত্তর সংগৃহীত ইঙ্গরেজী গ্রেইট লিটেরিটিউর (অর্থাৎ উত্তমা বিদ্যাচয়) নামক পুস্তক বঙ্গভাষায় যাহা সংপ্রতি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা রাজার দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত মেষ্টর হেনরী মেনসেল সাহেবের প্রার্থনাকরণ তৎপাণ্ডুলেখ্য প্রদান করিয়াছেন। ইহা ঐ সাহেব অবিলম্বে কোন ইঙ্গরেজী মুদ্রাযন্ত্রালয়ে উভয়বাণীসম্পৃক্ত-সহিত যন্ত্রিতপূর্ব্বক প্রত্যেক গ্রন্থ ২ তঙ্কামূল্যে বিক্রয়জন্য স্থির করিয়াছেন অতএব উক্ত গ্রন্থ পাঠশালার ছাত্রদিগের অধ্যয়নকারণ পরমযোগ্য এবং তল্লাভগ্রাহক অনেক সম্ভাবনা।

অপরজ্ঞাবগত হইলাম যে পূর্ব্বোক্ত সাহেবদ্বারা শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরানুবাদিত রাসেলাস্নামা কাব্যগ্রন্থ শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইয়া ৪ তঙ্কায় প্রাপ্তব্য হইবে এমত নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন।"

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ২৫ ভাদ্র ১২৩৯)

"বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা।—বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকানামক এক নূতন গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তদ্বিশেষ শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ধর্ম্মসভায় যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তদুত্তর যে ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হন তাহা ভাবার্থসহিত মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া স্বজন সজ্জনগণকে প্রদান করিতেছেন। ঐ গ্রন্থের তাৎপর্য্য শূদ্র বৈষ্ণবসকল বিপ্র ভক্তি বিপ্র সেবাই করিবেন নচেৎ ব্রাহ্মণ যে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন অথবা তাঁহার প্রসাদ ভোজন করিবেন এমত শাস্ত্র নাই এবং যুক্তিসিদ্ধও নহে এই বিষয়ে নানা শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে।"
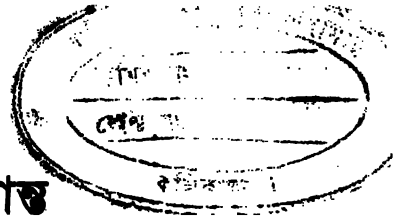
আরব সুলেমানের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীগুরুদাস সরকার

আদম পাহাড় (Adam's Peak) সিংহল

শুন্‌তে পাই এই পাহাড়ের চূড়ার উপর বাবা আদমের যে পায়ের ছাপটী আছে তা কম করে' প্রায় ৭০ হাত লম্বা। এই পাহাড়ের চারিদিকে একটা জায়গা আছে সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে মণিরত্ন পাওয়া যায়। নীলমণি (নীলা), ইন্দ্রনীল (sapphire), পদ্মরাগ—যাকে আমরা সাধারণ কথায় চুণি বলি—আর পোখরাজ (Topaz) এ সবই সেখানে মিলে।

সিংহল দ্বীপে দুইজন রাজা আছেন—একজন বড় আর একজন ছোট। এখানে মুথব্বর সোণা মণিমাণিক্য সবই পাওয়া যায় আর এর চারিদিক্ যে সমুদ্র এই দ্বীপটাকে ঘিরে যেন স্নান করিয়ে দিচ্ছে সেই সমুদ্রে পাওয়া যায় শাঁখ আর মুক্তা। এই শাঁখের খোলায় ফুঁ দিয়ে বাজান হয়—তুরী-ভেরীর মতন করে'—লোকে এ দ্রব্য মূল্যবান সামগ্রীর মত যত্নে রেখে দেয়। তারপর হারকন্দ সমুদ্র বয়ে জাহাজীরা যখন সিরণ দ্বীপ অর্থাৎ সিংহল ছাড়িয়ে চলে আসে তখন পথে কতকগুলা দ্বীপ যে চোখে না পড়ে তা নয়। গুণ্‌তিতে ক'টা তা ঠিক করে' জানা না গেলেও এই দ্বীপগুলার আয়তন কোনটারই বড় কম নয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে রাম্নী দ্বীপ বর্ত্তমান নাম সুমাত্রা (Sumatra)। কয়েকজন রাজার রাজত্ব এই একই দ্বীপের মধ্যে। এই দ্বীপের পরিমাণ ৮০০ হইতে ৯০০ পারা-সাং পরিমাণ। এখানে সোণার খনি আছে। আর ফাঁ-চুড়ের কর্পূর বলে' যে খুব ভাল দরের কর্পূর তা এইখানেই পাওয়া যায়।

এখান থেকে যেতে পর পর আরও কতকগুলি দ্বীপ পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটির নাম নিয়াস দ্বীপ ও দ্বীপ-পুঞ্জ। এইসব দ্বীপে যথেষ্ট সোণা পাওয়া যায়। এখানকার লোকেরা নারিকেল খেয়েই বাঁচে। এদের যা-কিছু খাবার তৈয়ারী হয় সব তা'তেই নারিকেল, আর গায়ে এরা নারিকেল তেলই মাখে। এই দ্বীপবাসীদের মধ্যে যদি কেউ বিবাহ করতে যায় তা'হলে তা'কে শত্রুপক্ষ লোকের একটা লোককে মেরে তার মাথাটা আনতে হয়, যদি কেউ দুইজন শত্রু মারে সে দুইটী বিয়ে করতে পারে। যদি কেউ ৫০ জন শত্রু নিধন করে' ৫০টী মাথা আনতে পারে সে ৫০টী স্ত্রী লাভ করে। এদের এই প্রথার কারণ হচ্ছে যে এদের শত্রুর সংখ্যা খুব বেশী। তাই যারা খুব মর্দ্দলোক আর দুঃসাহসী, জাতভাই-এর কাছে তাদেরই সম্মান খুব বেশী। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে বাঁশ আর বকস কাঠ (ব্রেজিল কাঠ) পাওয়া যায়। এখানে হাতী অনেক আছে—আর আছে অনেক নর-খাদক রাক্ষসজাতি। এই দ্বীপের দুইধারে দুই সমুদ্র। হারকান্দ আর সলাহিত (মলক্কা প্রণালী) এর পারেই যে দ্বীপগুলি কাছাকাছি রয়েছে তার নাম লক্ষবালূ (নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ) এ দেশের মেয়ে-পুরুষ সকলেই উলঙ্গ থাকে—কেবল নাভী থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে রাখে। এই দ্বীপগুলির উপকূল দিয়ে কোন জাহাজ যেতে দেখলে এরা সব ছোট-বড় সাল্‌তীতে করে' এসে উপস্থিত হয় আর বিদেশী মাল্লাদের কাছ থেকে নারিকেল বদল দিয়ে লোহা সংগ্রহ করে' নেয়। এ দেশে গ্রীষ্মও নাই শীতও নাই এদের জামাকাপড়েরও কোন দরকার নাই। লক্ষবালুর ও-পিঠে আন্দামান সমুদ্র, যেখানে দুটী দ্বীপ ছাড়াছাড়ি হ'য়ে রয়েছে। এখানকার সারা বাসিন্দারা জ্যান্ত মানুষ ধরে' খায়। এদের রং কালো, চুল কোঁকড়া কোঁকড়া, পায়ের পাতা লম্বা লম্বা আর তাদের মুখ চোখের চেহারা দেখলে ভয় হয়। এদের মধ্যে কারুর কারুর পায়ের পাতা প্রায় এক হাত করে লম্বা। এরা

একেবারেই লম্বা। যদি এদের ভোজা থাকত তা'হলে এদের কাছ দিয়ে যারা যেত তাদের সকলকেই ধরে খেত। কখন কখন যেতে যেতে পালে বাতাস না পেয়ে কোন কোন জাহাজ আটকে পড়ে যায়। যখন খাবার জল ফুরিয়ে যায় তখন মাল্লাদের এই দ্বীপবাসীদের কাছে জলের জোগাড়ে যেতে হয়। কখন কখন তারা এই সুযোগে দু'চারজন মাল্লাকে ধরে' ফেলে, কিন্তু অনেকেই তাদের হাত এড়িয়ে পালিয়ে আসতে পারে। এই দ্বীপগুলার ওধারে আর কিছু দূর অগ্রসর হ'লে পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু যে সব জাহাজ চীন মুলুকে যাবে বলে রওনা হয় তাদের পথে সে পাহাড় পড়ে না। শুনতে পাওয়া যায় যে, এ পাহাড়ে রূপার খনি আছে আর এখানে লোকজনের বাসও আছে, কিন্তু যে সব জাহাজ সেখানে যাবে বলে যে দিকে অগ্রসর হয় তারা আর সেখানে গিয়ে পৌঁছিতে পারে না। এই রূপাওয়ালা পাহাড়ে যেতে হ'লে অনলুসনামী বলে একটা পর্ব্বত লক্ষ্য করে' চল্‌তে হয়। একবার একখানা জাহাজ এই অঞ্চল দিয়ে যাবার কালে মাল্লাদের নজরে এই পর্ব্বতটা পড়ে যায় আর তারা সেই দিকে এগিয়ে চলে। পাহাড়ের কাছে পৌঁছে তারা নঙ্গর করলে আর পরের দিন সকালে নৌকায় করে গিয়ে ডাঙ্গায় উঠল, তারপর কাঠখড়ি যোগাড় করে' সেখানে আগুন জ্বালাল। সেই রূপামিশান ধাতুতে আগুনের তাপ লেগে রূপা গলে গিয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল! তখন তারা বুঝতে পারলে যে এখানে যথেষ্ট রূপা পাওয়া যায়। তারা যত ইচ্ছা রূপা নিয়ে এসে জাহাজ বোঝাই করল। কিন্তু জাহাজ ফিরে আসার পর এমন ঝড় উঠল যে তারা যত রূপা বয়ে এনেছিল সবই সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে হ'ল। এই রকমে রূপার পাহাড়ের সন্ধান পেয়ে তারা খুব জোগাড়-যন্ত্র করে' আর একবার সেই দিকে রওনা দিলে, কিন্তু সেবার খুঁজে আর সে পাহাড়ই পাওয়া গেল না। সমুদ্রের পথে এমন ঘটনা অনেক ঘটে। এমন অনেক দ্বীপ আছে যেখানে যাওয়ার হুকুম নাই। সেই সব জায়গা চেষ্টা করে' খুঁজতে গেলে আর পাওয়া যায় না। এই সব দ্বীপের মধ্যে এমন অনেকগুলা স্থান আছে যেখানে মোটেই গিয়ে পৌঁছবার যো নাই। এ সব হচ্ছে যাদুর ব্যাপার। এই যাদুর জন্যেই বাইরের লোকেরা কেউ (হঠাৎ) গিয়ে সেখানে চড়াও হ'বেন তার যোটী নাই।

কখনও কখনও হারকান্দ সমুদ্রে একরকম জলস্তম্ভ, সাদাপারা মেঘ, উঠে তার ছায়ার অন্ধকারে জাহাজ ঢেকে ফেলে। এই মেঘ থেকে একটা জিহ্বা বার হয়ে আসে সেটা সরু আর লম্বা। ক্রমে সেটা সমুদ্রের জল পর্য্যন্ত এসে পৌঁছায়। জলে ছোঁয়া পড়লেই সমুদ্রটা যেন ফুটতে থাকে। ক্রমে সেটা ঘূর্ণী বাতাসে ধূলা-বালি উড়ে যেমন স্তম্ভের মত হ'য়ে মাটীর উপর দিয়ে চলতে থাকে তেমনি একটা স্তম্ভের আকার ধরে। যদি কখনও সেই জলস্তম্ভ কোন জাহাজের উপর গিয়ে পড়ে অমনই সে জাহাজসুদ্ধ গ্রাস করে' ফেলে। ক্রমে মেঘ আরও উঁচুতে উঠতে থাকে আর বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়; সেই বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র উথলে উঠে; সাগরের গর্ভে যে সব জিনিস থাকে তার টুকরা টুকরা উপরে উঠে পড়ে। আমি বলতে পারি না সেই মেঘই সমুদ্র থেকে জল টেনে নেয় কি আর কোন উপায়ে এই ব্যাপার ঘটে। পূব দেশের সব সমুদ্রেই এমন এক জোর হাওয়া ওঠে যে তাতে করে ঢেউ উঠে উঠে ক্রমে সমুদ্রটা ফেঁপে উঠ্‌তে থাকে, যেমন আগুনের উপর জলের হাঁড়ি বসান থাকলে জল উৎলায় তেমনি করে সমুদ্রের জল উৎলে উঠ্‌তে থাকে সমুদ্রের পেটে যা কিছু থাকে তখন সবই উৎলে উঠে আর সেগুলা গিয়ে লাগে যে সব দ্বীপ আছে সমুদ্রের মাঝখানে তারই কিনারায়-কিনারায়। জাহাজগুলা সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অতিকায় মাছগুলা মরে ভেসে ওঠে। যেমন ধনুক থেকে তীর ছোড়ে সমুদ্র কখনও কখনও তেমনই জোরে জলের ভিতরকার পাহাড়গুলাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

আর হারকান্দ সমুদ্রে যে বাতাসের রাজত্ব—যে বাতাস বয় পশ্চিম থেকে—ঠিক খাড়া পশ্চিম না হ'ক কতক কোণাকুণি হ'য়ে আসে উত্তর—উত্তর-পশ্চিম পর্য্যন্ত। এই হাওয়া বইতে থাকলে সমুদ্রের জল হাঁড়ির জলের মত ফুটে ওঠে আর অম্বর প্রভৃতি সব উগ্‌রে ফেলে। সমুদ্রে যত

গভীর আর বিশাল হ'বে তার ভিতর থেকে অম্বরও তত উচুদরের পাওয়া যাবে

যখন এই হারকান্দ সমুদ্র এমনই করে' ফেঁপে ওঠে তখন তার জলের উপরে জলন্ত আগুনের মত কি যেন দেখা যায়। এই সমুদ্রে লুহাম বলে' একরকম মাছ আছে। সে বড় হিংস্র জানোয়ার; মানুষ পেলে গিলে খেয়ে ফেলে।

(এর পর পুঁথির কয়েকটা পাতা পাওয়া যায় না)

চীনদেশ থেকে মাল রপ্তানী হয়ে খুব অল্প পরিমাণেই বোগদাদ কি বসরায় যায়। এই মাল-রপ্তানী-কারবার যে ভাল করে' জেঁকে উঠ্‌তে পারে নি তার প্রধান কারণ হচ্ছে হানফু (Hanfu) বন্দরে মালগুদামে প্রায়ই আগুন লাগে—আর সেই আগুনে ব্যবসায়ীরা রপ্তানীর জন্য যে মাল গুদামজাত করে' রাখে তা সবই নষ্ট হয়ে যায়। হানফু হচ্ছে চীনা আর বিদেশী জাহাজের আড্ডা। এই বন্দরে চীন আর আরব এই দুই দেশের মালই এসে জমা হয়। আগুন লেগে মাল-লোকসানের কারণ হচ্ছে এই যে, এখানকার গুদামগুলা কাঠ আর নলখাগড়া দিয়ে তৈরী; কাজেই আগুন খুব সহজেই লাগে। আর আর দেশে চীনা মাল খুব আমদানী হওয়ার আর যে-সব কারণ আছে তার মধ্যে জাহাজডুবির কথা বাদ দিলেও চলবে না। যেতে আস্‌তে অনেক জাহাজ মারা পড়ে। এর উপর আছে পথে বোম্বেটেদের উৎপাত; তারা সাম্‌নে পেলে সব লুটে-পুটে নেয়। আর এক কারণ হচ্ছে দায়ে পড়ে মাঝের পথের বন্দরগুলায় কোথাও আটকে পড়া। একেই তো লম্বা পাড়ি তারপর মাঝের পথে জাহাজ কোথাও আটকে গেলে ব্যবসায়ীদের আর উপায় থাকে না ঠিকানায় পৌঁছাবার—আগেই তাদের বাধ্য হয়ে মাল বিক্রি করে' ফেলতে হয়।*

* ফরাসী অনুবাদ হইতে।

লীলা

(গল্প)

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

এক

গভীর রাত্রে একটা চাপা কান্নার অস্ফুট শব্দে ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। উৎকর্ণ হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। শব্দটা কোথা হইতে আসিতেছে অনুমান করা কঠিন হইল না। নীচেকার কয়খানা ঘর অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া থাকিত বলিয়া সম্প্রতি একজনকে ভাড়া দিয়া ছিলাম। স্বামী-স্ত্রী ও কয়টী শিশু-সন্তান লইয়া ইহাদের সংসার। প্রথম কয়টা দিন ভালই কাটিয়াছিল, তাহার পর হইতে এই উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি রাত্রেই প্রহারের শব্দ, পুরুষের গর্জ্জন ও বধূর অর্দ্ধস্ফুট রোদনধ্বনি শুনিতে পাই। এমন একটা দিনও যায় না পাষণ্ডটা স্ত্রীর উপর উৎপীড়ন না করে। অথচ লোকটা নিতান্ত মূর্খ বা মাতাল নয়। দেখিলে ভদ্রলোক বলিয়াই বোধ হয়, অথচ ব্যবহার কি হীন! বৌটী যেন সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি। এত যে অত্যাচার লাঞ্ছনা কিন্তু একটী দিনের জন্য তাহাকে স্বামীর একটা কথার উত্তর দিতে দেখিলাম না; কি তাহার বিরুদ্ধে একটা অনুযোগ কাহারও নিকট করিতে শুনিলাম না; সকল উৎপীড়ন নীরবে সহনশীলা ধরিত্রীর মত সহিয়া যাইত। সে নহিলেও আমাদের প্রায় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ করাই বা যায় কি? প্রতিদিন একটা লোকের উপর অকারণে এই নৃশংসপীড়ন চোখেও দেখা যায় না—তথাপি

করিবার মতও কিছু ছিল না। তাহার স্ত্রীকে সে মারুক-ধরুক, কাটুক অন্যের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার বা একটা কথা পর্য্যন্ত বলিবার অধিকার নাই।

হতভাগাটা সেদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে কি জন্য রুদ্রমূর্ত্তি ধরিল, জানিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। গভীর রাত্রি, চারিদিক্ শান্ত নীরব,কথাগুলা স্পষ্টই কাণে আসিতে লাগিল। উপর্য্যুপরি কয়টা আঘাতের শব্দ হইল। অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি নিরুদ্ধ করিবার জন্য একটা প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা বাহির হইয়া আসিতেছিল। নীরব নিশীথিনীর বক্ষে যে অস্ফুটধ্বনি ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা ব্যথায় অত্যন্ত আর্দ্র বলিয়াই মনে হইল। কঠোর কর্কশ পরুষকণ্ঠে ধ্বনিত হইল :—

"নে ওঠ আর ঢং ক'রে পড়ে থাকতে হ'বে না। শীগ্‌গীর চুপ্ কর, ওপরে ওরা শুনতে পাবে।" দারুণ বিরক্তির মধ্যেও হাসি আসিল; তোমার ঐ ভৈরব আরাব যদি উপরের লোক শুনিতে না পায়, তবে ও ক্ষীণকণ্ঠের রোদনধ্বনিতে তাহারা বধির থাকিবে সন্দেহ নাই। ক্ষীণকণ্ঠে বধূটী কি বলিল শুনিতে পাইলাম না। তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্বামীপ্রভু সদর্পে বলিয়া উঠিল —"আমায় আবার কে কি বলবে? কার এত সাধ্য? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা? আমি পুরুষ, যা খুসী করব, বলতে আসবে কে? আমার স্ত্রীকে আমি মারব। কোন শা—তা'তে কথা কইতে আসবে? আসুক দেখি? তোকে চুপ করতে বলছি চুপ কর কেঁদে আর লোক জানাতে হ'বে না। ফুলরাণী ইন্দুমতী আমার রে—ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান। গায়ে হাত পড়েছে কি না পড়েছে অম্নি করে' উঠল দেখ না যেন কে কত মেরেছে। ছোটলোকের বেটী ওঠ বলছি।"

এবার বধূটীর কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম; সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দেখ আমায় যা বল বল,আমার বাবা-মা স্বর্গে গেছেন, সেখান থেকে টেনে এনে তাঁদের লাঞ্ছনা ক'র না। এটা তোমার ভারী অন্যায়।"

"অন্যায় করব। নিশ্চয় বলব। তুই একা ছোট-লোক—তোর চৌদ্দপুরুষ ছোট লোক। বড্ড গায়ে লেগেছে; ছোট লোককে ছোট লোক বলেছি, তা'তে আমার অন্যায়টা কি হয়েছে রে হতভাগী?"

এই সব অভদ্রজনোচিত কথাবার্ত্তা শুনিয়া রাগে সর্ব্ব দেহ জ্বলিতে লাগিল, অথচ উপায়ও তো নাই। কি পাষণ্ড লোকটা। সমস্ত দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম ও সন্তান পালন করিয়া রাত্রেও কি বৌটার একটু নিষ্কৃতি নাই? লোকটার মনে একটু দয়াও হয় না? পত্নী সন্তানের জননী বলিয়া স্নেহ-সম্মান দেওয়া দূরে থাক, শুধু একসঙ্গে বাস করিতেছে, একটা মানুষ বলিয়াও কি এই অমানুষিক নির্য্যাতন করিতে একটু দ্বিধাবোধ হয় না? একটা পশু কি পাখী পুষিলেও তো তাহার উপর মমতা হয়। সেটুকু মায়াও কি ওর স্ত্রীর উপর নাই? কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর লোকটা আবার বলিল,—"তবুও যে বসে রইলি? ওঠ, উঠে মশারীটা দে সেলাই করে' কাল বলেছি না মশারীটা সেলাই করে' রাখতে, হয় নি কিসের জন্যে? এখনই সেলাই কর বলছি?" "কি? সুতো নেই? কেন আনাতে পারিস নি কাউকে দিয়ে? ক'াকে দিয়ে আনাবি? তার আমি কি জানব? যাকে দিয়ে হ'ক তোকে আনিয়ে করে' রাখতে হ'বে আমার হুকুম। জানি না আমি, দে এক্ষনি মশারী সেলাই করে'। যেখান থেকে পাস আন সুতো, চালাকী পেয়েছিস আমার সঙ্গে?"

বধূটী নীরব রহিল। স্বামী গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল,—"তবু শোনে না কথা। শীগ্‌গীর মশারী সেলাই কর। ছেঁড়া দিয়ে সারা রাত্তির মশা কামড়াবে আমি ঘুমোব কি করে' রে' পোড়ার মুখী" সত্য কথাই তো একে পুরুষ, তা'তে একজনের স্বামী, এটুকু অসুবিধা তিনি সহিবেন কিরূপে? একটা রাত্রির কতকটা যদিও কাটিয়া গিয়াছে বাকিটুকুর জন্য ঘুমের ব্যাঘাত সহ্য করা যায় কি? স্ত্রী যেখান হইতে পারুক চুরি, ডাকাতি ভিক্ষা করিয়া সূতা আনিয়া মশারী সেলাই করিয়া দিক্। তিনি এতটুকু কষ্ট সহিবেন না। কত জন্মের পুণ্যফলে বাঙ্গালা দেশে এমন স্বামী হওয়া ঘটে! আর প্রতি মুহূর্ত্তে উঠিতে বসিতে এইভাবে স্বর্গস্থ জনক-জননী ও পূর্ব্ব-পুরুষগণের লাঞ্ছনার কারণ হইয়া রমণীর জীবনধারণ

কন্না বিড়ম্বনাময়? পত্নী সর্ব্ব বিষয়েই স্বামীর অধীন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার পিতা-মাতা ও পিতৃকুলকে লাঞ্ছিত করিবার তিনি কে? অকারণে বধূটীর লাঞ্ছনার বেদনা সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিতেছিলাম। এরূপ হৃদয়হীন পাষণ্ড স্বামীর পত্নী হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরণ তাহার পক্ষে অনেক সুখের। আপনার অপমান-লাঞ্ছনা, সেও না হয় সহ্য যায়, কিন্তু পিতামাতার বিশেষ করিয়া তাঁহারা যদি স্বর্গত হন তাঁহাদের এই নিষ্ঠুর অপমান যে কত মর্ম্মন্তুদ তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ তাহার প্রতিবাদ করিবার উপায় পর্য্যন্ত নাই।

মিনতিপূর্ণ করুণকণ্ঠে বৌটী বলিল,—"আজকার রাত্তিরটুকু একটু কষ্ট সহ্য কর, কাল আমি নিশ্চয় মশারীর ছেঁড়া সেলাই করে' রাখব, এখন আমি কোথায় সুতো পাব?"

"কোথায় পাবি তা আমি কি জানি? যেখান থেকে, তোর যে বাবার বাড়ী থেকে পারিস নিয়ে আয়, মশারী সেলাই কর্ব্বি তবে আমি শোব। নয় তো আজ তোর হাড় একদিকে আর মাস একদিকে করব, আন সুতো শীগ্‌গীর আন।"

হুঙ্কারে বাড়ীখানা যেন কাঁপিয়া উঠিল। এ কি সাংঘাতিক লোক? একবার ভাবিলাম খানিকটা সুতা না হয় দিয়া আসি, কিন্তু বৌটীর এই নির্লজ্জ লাঞ্ছনার সামনা-সামনি দাঁড়াইতে যেন কুণ্ঠাবোধ হইতে লাগিল। অত্যাচার-উৎপীড়ন যত কঠিন হোক না কেন তাহার কেহ সাক্ষ্য থাকিলে বেদনার গুরুত্ব যেন আরও বাড়িয়া যায়। বৌটীর সংকোচ ভাবিয়াই উঠিলাম না। কিন্তু সুতা না পাইলে তাহার অদৃষ্টে কি যে ঘটিবে তাহা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। নীচে আবার প্রহারের শব্দ আরম্ভ হইল; সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চেঁচাইতে লাগিল,—"দূর হ'—দূর হ'—তুই এখনি দূর হয়ে যা। আমার ঘরে আর তোর জায়গা নেই। একটা কাজ পারে না কেবল তিন মণ চালের ভাত গিলবে। দূর হ' লক্ষীছাড়ি—নইলে তোকে আজ খুন করে' ফেলব।

দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিলাম। সত্যই কি বৌটাকে পথে বাহির করিয়া দিবে না কি? এ তো ভাল বিপদ হ'ল। বৌটী করুণকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল,—"তোমার পায়ে পড়ি আমায় বার করে' দিও না। এত রাত্রে কোথায় যাব আমি? আমায় যত খুসী মার—তাড়িয়ে দিও না।"

"মারব তো। খুন করে' ফেলব। নিশ্চয় তাড়াব তোকে—যেখানে খুসী চলে যা। যা না সেই শালা-ছোটলোক শূয়ারদের বাড়ী যা। আমি তোকে ঘরে রাখব না। এক কথা বলে দিলুম। যা যা এখুনি দূর হ'।"

ছেলেগুলা বোধ হয় জাগিয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠটার কণ্ঠ শুনিলাম—

"ও বাবা মাকে আর মের না বাবা—মা মরে যাবে—ও বাবা—"

পিতৃদেব তাহাকেও বোধ হয় দু'-এক ঘা প্রহার করিলেন। বালক আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। বিবিধ কণ্ঠস্বরের সংমিশ্রণে নিম্নতলে যেন তাণ্ডবলীলা চলিতে লাগিল, বোধ হইল। বধূটীর চাপা কান্না শিশুদের উচ্চ-চীৎকার আর তাহাদের পিতার সিংহগর্জ্জনে রজনীর শান্ত নীরবতা সে অঞ্চল ছাড়িয়া কোথায় যে পলায়ন করিল তাহা নির্ণয় করাই দুরূহ। স্বামী জাগিয়া উঠিলেন, ব্যাপার কি বলিয়া আমি প্রায় কাঁদিয়া অনুরোধ করিলাম—"বৌটাকে মেরে ফেললে তুমি একবার যাও।" স্বামী নীচে আসিলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে আসিলাম। বৌটাকে তখন লোকটা টানিয়া পথের ধারে আনিয়াছিল, আমাদের দেখিয়াই সে সহসা ভাল মানুষের মত সরিয়া দাঁড়াইল। বৌটী দ্রুতভাবে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। লোকটাকে স্বামী কিছু আর বলিলেন না। আমরা উপরে আসিলাম।

দুই

পরদিন প্রভাতে কি একটা কাজের জন্য সম্মুখের বারান্দায় আসিয়াছিলাম। নীচেকার কলতলায় বসিয়া বৌটী বাসন মাজিতেছিল। তাহার দিকে একবার চাহিয়াই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। কি ভয়ানক! অর্দ্ধাবৃত পৃষ্ঠ ও বাহুদুটার উপর যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু লাল কালশিরার দাগ; এমন করিয়া লোককে যে চোরকেও [illegible]

না। এর কি কোন প্রতীকার নাই? কি কার্য্যে আসিয়াছি ভুলিয়া গিয়া অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। বাসনগুলা ধুইয়া লইয়া বৌটী উঠিয়া দাঁড়াইল, উপরের দিকে চাহিতেই আমার সহিত দৃষ্টিবিনিময় হইল। আমার চোখে সে কি দেখিল কে জানে? একবার চাহিয়াই অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বাসনের গোছা লইয়া সে ঘরে চলিয়া গেল। আমিও গৃহে আসিলাম। খোকা নীচে গিয়াছিল, ছুটিয়া আসিয়া আমায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"মা নীচের মাসীমার গায়ে অমন দাগ হ'ল কি করে'? মাসীমা বললে পড়ে গেছি। কোথায় পড়ে গেছল মা? তুমি দেখেছ মাসীমার খুব লেগেছে না?"

স্বামী অদূরে বসিয়া চা খাইতেছিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "তোর মাসীমা রোজই অম্নি পড়ে যায় আর গায়ে দাগ হয়!"

বিরক্তভাবে বলিলাম,—"তুমি হাসছ কি বলে'? সত্যি দেখ দেখি কি ভাবে মেরেছে। এর প্রতীকার একটা করতে পার না?"

হাসি বন্ধ করিয়া ক্ষুব্ধ গম্ভীরকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"কি কর্ব্ব বল? তার স্ত্রীকে সে মারে, আমি কি করতে পারি?"

"বাঃ স্ত্রী বলে' ওকে খুন করে' ফেলবে না কি? বৌটার যা শরীর, তা'তে আর যদি দু'এক দিন অমনি করে' মারে তা' হ'লে ওর ভবলীলা সাঙ্গ হ'বে। লোকটাকে একবার ভাল করে' বলেই দেখ না যদি একটু ভদ্রভাবে চলে।"

"হাঁ, আমার কথা শুনবার জন্য ওর তো ঘুম হ'চ্ছে না। বেশ, বলে দেখব আজ।"

"তাই বল—না হয় কিছু ভয় দেখিও। জন্তুর উপর অত্যাচার কর্লেও আইনে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অবলা রমণীদের উপর এই যে ভীষণ অত্যাচার যারা করে তাদের জন্য কি কোন শাস্তির ব্যবস্থা কোথাও নেই; বাঙলার মেয়েরা কি পশুরও অধম?"

স্বামী হাসিয়া বলিলেন—"বল বল। চোখের উপর দেখছ যখন তখন তো আর আমি প্রতিবাদ কর্লেও শুনবে না। কিন্তু আমিও এমন অনেক স্ত্রীর কথা জানি যাদের অত্যাচারে স্বামীর জীবনও দুর্ব্বহ হ'য়ে ওঠে।"

"হ'তে পারে। কিন্তু স্ত্রী তো স্বামীকে ধরে' মারতে পারে না, অত্যাচার কতই কর্ব্বে?"

"ধরে' না মেরেও তার চেয়ে বেশী কষ্ট দেওয়া যায়। যা'ক, বেশী বললে তুমি রাগ করবে, আর ও রাস্কেলটার ব্যবহার দেখে বেশীকিছু বলতেও পার্চ্ছি না। তবে মনে কর না আমাদের দেশের রমণীমাত্রেই এমনি লাঞ্ছনা সহ্য করে। আজকাল এরকম অত্যাচার সহ্য করতে বড় বেশী দেখা যায় না"—বলিয়াই স্বামী গৃহের বাহির হইয়া গেলেন।

মধ্যাহ্নে আহারশেষে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইয়া নীচে আসিলাম। বধূটী একমনে একরাশ সাবানে-কাচা কাপড়-জামা লইয়া 'ইস্ত্রী' করিতেছিল। এক পার্শ্বে একটা পিতলের বাটিতে কতকগুলা ভাত রহিয়াছে, কোন্ সকালের রান্না, শুকাইয়া প্রায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিকটে দুইটা সিদ্ধ পটল। আহারের উপকরণ এই পর্য্যন্ত। এ আহার্য্য যে এই বৌটীরই তাহা বুঝিতে বিলম্ব ঘটিল না। অদূরের উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলা দেখিয়া ব্যঞ্জনাদিও যে রান্না হইয়াছিল বুঝা গেল। স্বামী ও সন্তানদিগের আহার-শেষে তাহার অদৃষ্টে ইহার বেশী জুটে নাই। বধূটী কার্য্য করিতেছিল আর কি যেন ভাবিতেছিল। আমার আগমন লক্ষ্য করে নাই। নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিলাম। বিকালের জলখাবার তৈয়ারীই ছিল সেইগুলা হাতে করিয়া আবার তাহার ঘরে ফিরিলাম। জিনিসগুলা নামাইয়া রাখিবার শব্দে সে ফিরিয়া চাহিল। কাজ রাখিয়া ব্যস্তভাবে আমার কাছে আসিয়া বলিল,—"আসুন দিদি, আজ আবার এত জিনিস এনেছেন কেন?"

সে-কথার উত্তর না দিয়া বলিলাম, "তুমি এখনও খাও নি কেন ভাই? বেলা তো কম হয় নি।"

"এই যে এবার খেতে বসব; এই কাজটা সেরে রাখি।"

মাটীতে বসিয়া পড়িয়া বলিলাম,—"এসব তুমি কেন করছ, ধোপা আসে নি?"

"ধোপা তো আমাদের নেই।"

"তবে? এইসব তুমি কাচ—কাপড়-জামা, বিছানা-পত্তর, সব?"

সে-কথার জবাব না দিয়া সে কাজই করিতেছিল। কিছুক্ষণ তাহার নিপুণ হাতের কাজ দেখিয়া পুনরায় বলিলাম—"এইবার খেতে বস না লীলা।"

"এই বসছি দিদি, আজ শনিবার উনি এক্ষুনি বাড়ী আসবেন কি না কাপড়গুলো তৈরী না থাকলে—

সে স্তব্ধ হইল। কাপড়গুলা প্রস্তুত না থাকিলে কি ঘটিবে তাহা সে উহ্য রাখিলেও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—"একটা কথা বলব লীলা?"

লীলা আমার দিকে চাহিল। কি বলিব তাহা বোধ হয় অনুমান করিয়া লইয়াই কুণ্ঠিত ক্ষীণস্বরে সে বলিল,—"বলুন।"

"কিছু মনে করবে না তো?"

ব্যস্তভাবে সে বলিল,—"আপনাকে সত্যিই বড় বোন বলে মনে করি দিদি, আপনার কথায় আমি কিছুই মনে কর্ব্ব না।"

একটু থামিয়া বলিলাম,—"তোমার কি কেউ আপনার লোক নেই লীলা যাদের কাছে গিয়ে দিন কত তুমি থাকতে পার?"

বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল,—"একথা কেন বলছেন দিদি?"

"এখানে থাকলে এই অত্যাচার সয়ে তুমি ক'দিন বাঁচবে?"

'অত্যাচার?"

লীলার শ্যামল মুখশ্রী ক্ষণেকের জন্য আরক্ত হইয়া অস্ত রবির বিদায়কিরণ-প্রতিফলিত তরুণ কিশলয়ের মত ঝলমল করিয়া উঠিল। মাথা নত করিয়া সে বলিল,—"অত্যাচার? সে আর এমন বেশী কি দিদি। ওতে আমার কিছু কষ্ট হয় না।"

"বল কি! এই মার গালাগালি—"

উদ্গত দীর্ঘশ্বাস বক্ষে চাপিয়া সহজভাবেই সে বলিল,—"তা আর কি হ'বে, আমি স্ত্রী, তিনি স্বামী, তিনি যদি আমার সঙ্গে সৎ ব্যবহার না-ই করেন তা'তে বলবার কিছু তো নেই। আমি সব রকমে তাঁর অধীনা বৈ তো নয়। আমার উপর যা খুসী তিনি নিশ্চয়ই করতে পারেন?"

"না লীলা, তা বোধ হয় পারেন না। স্ত্রী তো মানুষের বাইরে নয়, একটা লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচারের অধিকার কারোর নেই। এই যে তোমার গায়ের দাগগুলি, এর আসল খবর যদি কেউ পুলিশে দিয়ে আসে, তা' হ'লে কি তোমার স্বামী,—স্বামী বলে' রেহাই পাবেন?"

লীলা শিহরিয়া উঠিল। ব্যগ্রকাতরদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"না না এসব খবর তারা পাবে কি করে'? আর আমিই যখন চুপ করে' সয়ে যাচ্ছি তখন অন্য কারো এতে কিছু বলবার তো নেই; তিনি স্বামী। আমার অদৃষ্ট মন্দ তাই আমাকে দুচোখে দেখেন না। কিন্তু তাই বলে তাঁর ব্যবহারের কথা আমি অন্য কা'কেও জানাতে যাব কেন? অন্য কারোও তো তা'তে বলবার কিছু নেই।"

অবাক্ হইয়া, আমার অপেক্ষা বয়সে ছোট এই মেয়েটীর দিকে গভীর শ্রদ্ধাভরে চাহিয়া রহিলাম। এ ধৈর্য্য, এ সহিষ্ণুতা, এই অসামান্য পতি-ভক্তি শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব। শত অত্যাচারেও নীরব লাঞ্ছনায় ধৈর্য্যশীলা এমন নারী বুঝি জগতে আর কোথাও নাই।—এ শুধু ভারতের নিজস্ব।

লীলা আবার বলিল,—"ওঁর রাগটা একটু বেশী, তাই অমন করেন। সেটা আমার ভাগ্য—ওঁর দোষ কি?"

"বেশ তাঁর না হয় দোষ কিছু নেই, কিন্তু রোজ এভাবে মার খেলে তুমিই বা বাঁচবে কি করে'?"

"কি করব, উপায় কি আছে?"

"মাঝে মাঝে কি কোথাও গিয়ে থাকতে পার না?"

"থাকবার স্থান আমার আছে দিদি। বাবা-মা নেই যদিও, তবু দুটী ভাই, তিনটী বড় বোন আছেন। তাঁরা সকলেই সম্ভ্রান্ত, অবস্থাপন্ন। আমি গেলে খুবই যত্ন করে' রাখেন। নিয়ে যাবার চেষ্টাও তাঁরা বহুবার করেছেন। আমি যেতে চাই না।"

বিস্মিত হইলাম। আমার ধারণা ছিল তাহার কেহ কোথাও নাই বলিয়াই বুঝি এমনই ভাবে পড়িয়া থাকিয়া উৎপীড়ন সহ্য করে। তাহার যে অবস্থাপন্ন আত্মীয়স্বজন থাকিতে পারে তাহা কোনদিন লীলাদের দেখিয়া ভাবিতে

পারি নাই। লীলার স্বামীর বেশ-ভূষার অবশ্য ত্রুটী ছিল না, কিন্তু যে দুরবস্থার মধ্যে তাহারা থাকে আর যে বেশে লীলা ও তাহার সন্তানদের থাকিতে দেখি তাহাতে তারা যে সম্রান্ত ঘরের তাহা ভাবিতেই পারি না। এক-একখানা ছিন্নবস্ত্র ভিন্ন মা ও সন্তানদের দেহে অন্য কিছু কোনদিন দেখি নাই; গৃহের আসবাব-পত্রের মধ্যে দুইটা রং-ওঠা টিনের ট্রাঙ্ক, তৈজসের মধ্যে কয়টা ভাঙ্গা ঘটী, বাটি। তবে লীলার নম্র ভদ্র ব্যবহার, দারিদ্র্যের মধ্যে ও সর্ব্ববিষয়ে পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলতা দেখিয়া সন্দেহের কারণ থাকিলেও তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া ও কথা-বার্ত্তা শুনিয়া উহাদিগকে অতি নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়াই ধারণা হইত।

লীলার কথার উত্তরে বলিলাম,—"তুমি যেতে চাও না কেন ভাই?"

ধীরকণ্ঠে সে বলিল,—"নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যটাই তো সব নয় দিদি, আমার সঙ্গে উনি যেরূপ ব্যভারই করুন, তবুও আমি না থাকলে ওঁর খাওয়া-পরা সব বিষয়ে খুব কষ্ট হয়। রেঁধেও খেতে পারেন না। কোন কাজও করতে পারেন না। সেই জন্যও যাই না; তা ছাড়া তাঁরা সবাই বড় মানুষ, আমি গরীব, আমায় যতই যত্ন করুন না কেন একটু কৃপার ভাব তার মধ্যে থাকবেই। এ স্বাভাবিক, এজন্য অবশ্য আমি কা'কেও দোষ দিই না। ধনী কখনও দরিদ্রকে এক সমান ভাবতে পারে না। তাই আমি যাই না। অদৃষ্ট-দোষে আমার অবস্থা খারাপ, তা' বলে অন্যের কৃপাকটাক্ষ কেন সইতে যাব? তা' ছাড়া ওঁর ওপরও কেউ সন্তুষ্ট নয়—ওঁর সম্বন্ধে দু-দশ কথা বলবেই তারা। দরকার কি কা'কেও কোন কথা বলবার সুযোগ দিয়ে? ওঁর ব্যবহারে আমার কোন কষ্ট হয় না দিদি। ও সয়ে হ'য়ে গেছে।"

প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঐ অত্যাচারী উৎপীড়ক স্বামীর উপরও এত মমতা? কেহ তাহাকে কিছু বলিতে পারিবে না বলিয়া নিজে এই লাঞ্ছনা অকাতরে সহ্য করিয়া যাইতেছে, তবু দুইদিন কোথাও গিয়া একটু শান্তি লাভ করিতে চায় না। এ ত্যাগের মর্য্যাদা স্বামী কি তাহা জানে না বা বুঝে না?

প্রশ্ন করিলাম,—"তোমার বাপের বাড়ী কোথায় ভাই?"

"এই কলকাতাতেই দিদি। দেশে জমিদারী আছে, তাঁরা বাস করেন এখানেই। দাদারা এখন বালীগঞ্জেই রয়েছেন। কটক-অঞ্চলে তাঁদের খুব বড় জমীদারী আছে, অন্যান্য জায়গায়ও আছে। আমার এই দুর্দ্দশার মধ্যে তাঁরা এসে উপস্থিত হ'বেন বলে ঠিকানা কা'কেও জানাই নি। সেইজন্য তারা আসেন না। কেন তাদের কাছে নিজেকে ছোট করি—সেইজন্য ঠিকানা বলি নি।"

"হয় তো ভালই করেছ, তবে উভয় পক্ষে যাওয়া-আসা থাকলে তোমার একটু ভাল হ'ত।"

"তা হ'ত, কিন্তু ওঁকে সকলে বড় অবজ্ঞার চোখে দেখত, এ তারা জানে আমি ভাল আছি, সুখে আছি, সেই ধারণাই থাক তাদের। আমি একটু কষ্ট পেলুমই বা?"

"আচ্ছা লীলা, তোমার বাপের বাড়ীর অবস্থা তো দেখছি বেশ ভালই। তবে তাঁরা তোমার এমন ঘরে বে দিয়েছেন কেন? আমার কথায় তুমি কিছু মনে কর না ভাই!"

শির-সঞ্চালন করিয়া সে বলিল,—"না। তাহার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—"এ কথা আপনার মনে হওয়া স্বাভাবিক, তবে এর উত্তর দিতে হ'লে আমার পক্ষে অনেক অপ্রিয় কথা তুলতে হ'বে। আপনি যখন সবই দেখছেন তখন গোপন আর কি করব? বলছি আপনাকে আমার বাবা-মা আমায় কিছু খারাপ দেখে বে দেন নি। এ সমস্ত দুরবস্থার কারণ আমার স্বামী; আমার শ্বশুরের টাকার অভাব ছিল না। শ্বশুর-বাড়ীর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন সকলেই সম্রান্ত ধনবান্। অদৃষ্টগুণে আমারই এই দুরবস্থা। যখন আমায় বিয়ে হয় স্বামী আই-এ পাশ করেছেন। বিয়ের পর কি খেয়াল হ'ল আর পড়লেন না। তারপর ক'বছরের মধ্যে শ্বশুরের সমস্ত টাকা কি করে' উনি শেষ করে' আনলেন সে উনিই জানেন? আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতেও নানা বাদ-বিসংবাদ হ'তে শুরু হ'ল। শেষে বাড়ীর অংশ কাকার কাছে বেচে দিয়ে উনি বাড়ী ছেড়ে এলেন। সে

টাকাও ক'দিনে শেষ হ'য়ে গেল। আমার বাবার দেওয়া কয়েক হাজার টাকার গহনা ছিল, সেও গেল, তারপর বাধ্য হ'য়ে এই চাকরী নিলেন। কাজ করতে খুবই কষ্ট হয়। পরিশ্রম করা তো অভ্যাস নেই। সহ্য করতে পারেন না। কি করবেন উপায় নেই, তাই যতদিন আমার বাপ-মা বেঁচে ছিলেন, তাঁরাও অনেকবার টাকা দিয়ে ওঁকে সাহায্য করেছেন। তারপর দাদারাও কিছু কিছু দিয়েছেন। কিন্তু পরের সাহায্য কতদিন নেওয়া যায়। পরের সাহায্যে কখন কা'রও দুঃখ ঘোচে না, অনর্থক কেন অপরের কৃপার পাত্রী হই? তাদের স্নেহের উপর অত্যাচার করি? তাই তাদের কাছ থেকে আমি সরে থাকি। দুঃখ-কষ্ট যতই হ'ক তাদের জানাই না। উনি তা'তেই আরও রাগ করেন। উনি চান এখনও আমি তাদের কাছ থেকে সাহায্য চাই, বোঝেন না ওঁরই সম্মান বজায় রাখ্‌তে আমি তাঁদের কাছে অনুগ্রহভিক্ষা করি না। তাদের অনেক আছে, সাহায্য তাঁরা অনায়াসে করতে পারেন—কর্‌বার ইচ্ছাও আছে। কিন্তু সে সাহায্যের ভিতর কতটা ঘৃণা ও অবজ্ঞা মিশান থাক্‌বে তা' উনি বোঝেন না, উনি কেবল টাকাই চান।"

আমি কোন কথা বলিলাম না। গভীর সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে শুধু তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। এই স্বল্পভাষী মেয়েটীর ভিতর এত সূক্ষ্ম বোধশক্তি, এত সহনশীলতা, এত আত্মসম্মান-জ্ঞান যে নিহিত আছে তাহা আমার ধারণার অতীত ছিল। স্বামীর উৎপীড়ন, আপনার দুঃখ-যন্ত্রণা সমস্ত নীরবে সহিয়া স্বামীর আদেশ সত্ত্বেও তাহারই সম্ভ্রমহানির আশঙ্কায় সে আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যগ্রহণ করে না। দুর্ভাগ্য তাহার স্বামী যে এমন রত্ন পাইয়াও তাহার মর্য্যাদা বুঝিল না। আর এ বিষয়ে কিছু না বলিয়া তাহার হাত হইতে জামাটা টানিয়া লইয়া বলিলাম,—"আমি তোমার জামা ইস্ত্রী করে' দিচ্ছি তুমি খেতে বস।" বার কত আপত্তি করিয়া সে আহার্য্যের সম্মুখে আসিয়া বসিল।

আমার আনীত দ্রব্যগুলা লইয়া তাহার নিকটে আসিতেই ব্যস্তভাবে সে বলিল,—"ও থাক্‌ দিদি, বিকালে ছেলেরা খাবে।"

আমিও সন্তানের মা। পুত্র-কন্যাকে না দিয়া এ সমস্ত তাহার গলা দিয়া নামিবে না বুঝিয়াই অর্দ্ধাংশ তাহার পাতে দিয়া বাকিটা রাখিয়া জামায় ইস্ত্রী ঘষিতে বসিলাম। লীলা খাইতেছিল। জামাটা রাখিয়া আমি বলিলাম,—"তোমার স্বামী কত মাইনে পান ভাই?"

প্রশ্নটা সভ্যতা-বিরুদ্ধ হইলেও জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইতেছিল। মুখ তুলিয়া লীলা বলিল,—"আগে একশ'দশ পেতেন, বছরখানেক হ'তে আর দশ টাকা বেশী পাচ্ছেন।"

"একশ'কুড়ি সে তো বিশেষ কম নয়, তবে তোমরা এমন—" এটুকু বলিয়াই লীলা কি মনে করিবে ভাবিয়া চুপ করিলাম।

ম্লান হাসিয়া লীলা বলিল,—"আমরা এত কষ্টে থাকি কেন জিজ্ঞাসা করচেন? কি করব দিদি ওঁর খরচটা একটু বেশী পড়ে। সংসারে বেশী কিছু দিতে পারেন না তাই। চিরদিন সুখে কাটিয়ে এসেছেন কষ্ট করতে পারেন না তো; আমরা মেয়েমানুষ—"

বাধা দিয়া বিরক্তভাবে বলিলাম,—"মেয়েমানুষও মানুষ ভাই। তারাও ভগবানেরই সৃষ্ট জীব, পুরুষের চেয়ে দুঃখ-কষ্ট অনুভবের শক্তি তাদেরও কম নেই। তাদের সুখ-সুবিধার দিকে একটু লক্ষ্য রাখাও তো চাই। এই তো তোমার শরীর—দু'খানা হাড়। এর ওপর অত পরিশ্রম করা ঠিক সহ্য হয় কি? একটা ঝি তো তোমার স্বামী রাখ্‌তে পারেন; তারপর খাওয়ার ব্যবস্থা তো প্রত্যহ এই রকমই হয়?"

অপ্রতিভভাবে সে বলিল,—"না না এই আজকে—"

উত্তরে বলিলাম,—"থাক, আর ঢাকতে হ'বে না। কি খাও না খাও সেটা দেখাও তোমার স্বামীর উচিত, তবে আমি জানি অনেক পুরুষই মেয়েদের সুখ-সুবিধা, খাওয়া-দাওয়ার ওপর লক্ষ্য রাখেন না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী তাঁদেরই যেন একচেটিয়া। সত্যি ভাই তোমার যে অবস্থা তা'তে এভাবে বেশী দিন চললে শেষের দিন যে তোমার খুব নিকট হ'য়ে আসবে তা'তে সন্দেহ নাই।"

গাঢ়স্বরে সে বলিল,—"মেয়েমানুষের জীবন, ওঁদের রেখে যদি যেতে পারি সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।"

"তা ভাই তিলে তিলে মরার চেয়ে একেবারে মরাই ভাল। আশীর্ব্বাদ করি সেই ভাগ্যই তোমার হ'ক।"

লীলার আহার শেষ হইলে আমি উপরে আসিলাম, আমি তখনও ঘরে ঢুকি নাই, সিঁড়ির উপর হইতেই গোটাকত প্রচণ্ড চড়-চাপড়ের শব্দের সহিত লীলার স্বামীর চীৎকার শুনিলাম। হতভাগাটা কি বাড়ী আসিতে না আসিতেই স্ত্রীকে মারিতে আরম্ভ করিল? কারণ জানিবার জন্য আবার নীচে আসিয়া সে কি বলিতেছে শুনিবার চেষ্টা করিলাম। লোকটা বাড়ী মুখরিত করিয়া চেঁচাইতেছিল,—"আমি শুনেছি তুই কার সঙ্গে কথা বল্‌ছিলি, বল্ এ ঘরে কে ছিল?"

লীলা প্রায় কাঁদিয়াই বলিল,—"সত্যি বলছি, ওপরের দিদি শুধু ছিলেন।"

"হতচ্ছাড়ি আমি কাণা? না কালা? দেখলুম পুরুষমানুষের মত কে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কথার শব্দও পুরুষের মত আর তুই বললি ওপরের দিদি।"

হাসিব না কাঁদিব? অবাক্ হইয়া রহিলাম। কণ্ঠস্বরে লালিত্য না থাকিলেও উহা এমন কর্কশ নয় যে শুনিয়া কেহ আমাকে পুরুষ বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে? আকারে না হয় একটু দীর্ঘাঙ্গী কিন্তু তা বলিয়াই এমন কিছু বিপর্য্যয় রকমের আমার লম্বা-চওড়া চেহারা নয় যে দেখিয়া কেহ আমাকে পুরুষ বলিয়া ভাবিবে। লীলাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া এক পদাঘাতে তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়া পতিদেবতা হুঙ্কার দিয়া বলিল,—"চালাকী রাখ্? বল্ কার সঙ্গে এতক্ষণ ইয়ারকি দিচ্ছিলি!"

"ওগো তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—"

"থাম থাম না শা—ভারী আমার সতী সাধ্বী কি না। আমার পা ছুঁয়ে তাই সত্যি কথা বলছেন। ভাল কথায় বলছি বল কে ছিল এখানে। নয় তো দেখ্ তোকে কি করে খুন করি। শয়তানী—"বলিয়া আরও কয়টা পদাঘাত করিল। লীলা নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। রাগে সর্ব্বদেহ জ্বলিতেছিল। বল হীনা রমণী বলিয়া কি তাহার কোন উপায় নাই। লীলার চুলের গোছা ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া সে বলিল,—"এখনও বল্‌লি না নিতান্তই মরবি আজ আমার হাতে? দেখি তোর কোন্ বাবা এসে বাঁচায়—মর তবে?" একগাছা সরু বেত সে তুলিয়া লইল। আর সহ্য হইল না, দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া লীলার বড় ছেলেটাকে ডাকিয়া বলিলাম,—"রমু তোর বাবাকে বল এঘরে এতক্ষণ আমিই ছিলুম, তোর মাকে যেন উনি মারধোর না করেন।" কথাগুলা জোরেই বলিয়াছিলাম। লোকটা শুনিতে পাইল। দেখিলাম মুখটা অন্ধকার করিয়া লীলার নিকট হইতে সে সরিয়া দাঁড়াইল। এখনকার মত লীলা নিষ্কৃতি পাইল ভাবিয়া আমি কতকটা লঘুচিত্তে উপরে আসিলাম।

বেশীক্ষণ নয়। একঘণ্টাও বুঝি অতীত হয় নাই! আবার নীচে হইতে সেই প্রবল গর্জ্জন। কি ব্যাপার! কথাগুলা স্পষ্টই কাণে আসিতে লাগিল—কণ্ঠস্বর তো আদৌ মৃদু নয়।

"তোকে চাইতেই হ'বে। আমার দরকার দুশ'টাকা যেমন করে' হ'ক আন্ তোর ভাইদের কাছ থেকে?"

লীলা কি উত্তর দিতেছে শুনিতে পাইলাম না।

লোকটা বলিতে লাগিল,—"ও সব আমি জানি না, বন্ধুদের আমি কথা দিয়েছি, তাদের সঙ্গে যাব পশ্চিমে বেড়াতে। যেখান থেকে পারিস আমায় টাকা এনে দে। তোদের জন্তেই আমার যত খরচ, তুই আর ঐ আপদ্ ছেলেগুলা না থাকলে আমার খরচটা কি? যা উপার্জ্জন করি তা'তে সচ্ছন্দে আমার দিন কেটে যায়। যা না তোরা দূর হ'য়ে—দেখ কি সুখে থাকি, আমি—"

খানিকক্ষণ নীরবে কাটিল। আবার গর্জ্জন হইল—"দেখ্ আমায় রাগাস্ নি। এই একবার মেরেছি এখনও আমার সেজন্তে হাত জ্বালা করছে, আবার যদি উঠি তা'হ'লে কিন্তু তোকে আস্ত রাখব না, যা বলি কর 'পোষ্ট-কার্ড' এনেছি, তোর ভাই বোন যাকে হ'ক লেখ্ যে আমার বিশেষ দরকার দুশ' টাকা যেন পত্রপাঠ পাঠায়। কেন এত বড়মানুষ তারা এ কটা টাকা দিতে পারে না?"

এবার লীলার কথা শুনিলাম—"তারা হয় তো দিতে পারে, কিন্তু তোমার কি নেওয়া উচিত; এভাবে ভিক্ষে চাওয়া কত অপমান তা কি বোঝ না?"

"কি ভিক্ষে, আমি ভিক্ষে চাইছি, এতবড় কথা? এ

আমার স্থায্য প্রাপ্য—সে শালারা দিতে বাধ্য। তাদের বাড়ী আমি বিয়ে করে' তাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করেছি, জানে না আমার যখন যা দরকার তখনই তা' তারা দিতে বাধ্য—ভিক্ষে চাইছি, অপমান হ'বে? বড় লম্বা লম্বা কথা হয়েছে? লেখ্ এখনি।"

দৃঢ়কণ্ঠে লীলা বলিল,—"তুমি যাই বল, টাকা আমি চাইতে পারব না তারা তো দিতে ত্রুটী করে নি। আর কি বলে চাইব?"

"আলবৎ দেবে, তাদের বাপ দেবে। কেন দেবে না, মেয়ে যখন দিয়েছে তখন সে ছোটলোক শালারা আমার সমস্ত খরচ দিতে বাধ্য। কেন দেবে না! লেখ্ বলছি নচ্ছারণী—বসে বসে খাবেন, দরকার মত বাপের বাড়ী থেকে আমায় টাকা আনিয়ে দিতে পারেন না, কেন তোর, তোর ছেলেদের খরচ তোর ভাইরা দিতে পারে না? বড় মানুষী দেখাতে আসে। দিক্ না বোন-ভাগ্নেদের খরচ।"

"তারা হয় তো দিতে পারে, কিন্তু নেওয়া যে তোমার অপমান?"

"কিসের অপমান রে? যত বড় মুখ তত বড় কথা? আমার অপমান কিসে? তাদের বোন ভাগ্নের খরচ দিতে তারা বাধ্য, আমি যদি আজ তোকে খেতে না দিই তারা কিছু করতে পারে? তোদের খেতে দিই সে তো দয়া করে'। লেখ চিঠি।"

অবিচলিতকণ্ঠে লীলা বলিল,—"তুমি আমায় মার, কাট, যাই কর, চিঠি আমি কিছুতে লিখব না, অন্য লোকের কাছে তোমাকে ছোট হ'তে আমি দেব না।"

"বটে, বড্ড দরদ দেখান হচ্ছে, আমার অপমান হ'বে বলে উনি চিঠি দেবেন না। ভারী টান আমার উপর। বুঝি না কিছু আমি? ভাইয়ের টাকা আমি খরচ করব সে প্রাণে সহ্য হ'বে না। এত যদি ভাইয়ের উপর মায়া তো গিয়ে থাক্ না সেই শালাদের কাছে। দূর হ' দূর হ'—" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম প্রহার করিতে লাগিল।

তাহার কথা শুনিয়া আমি আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না, স্বামী তখনও বাড়ী আসেন নাই যে তাঁহাকে দিয়া কিছু বলাইব। মারের শব্দ ও লীলার অস্ফুটরোদনধ্বনিতে চারিদিক্ যেন মুখর হইয়া উঠিল। অস্থিরপদে উপর-নীচে করিতে লাগিলাম। ভৃত্যটা বাহিরে ছিল, ভিতরে আসিতেই ডাকিয়া বলিলাম,—"বিষ্ণু, নীচের বাবুকে আমার নাম করে' বল্‌গে যা, যদি উনি মার-ধোর বন্ধ না করেন, তাহ'লে আমি এখনই পুলিশে খবর পাঠাব। এসব কাণ্ড এখানে চলবে না।" বিষ্ণু নীচে গিয়া কি বলিল জানি না; প্রহারের শব্দটা বন্ধ হইল। ক্ষুব্ধচিত্তে আমি গৃহে আসিয়া বসিলাম।

তিন

কিছুদিন পরে রবিবার সকালবেলা আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল স্বামীর এক বন্ধুর বাড়ী। বেলা এগারটার সময় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আমি কাপড় পরিতে-ছিলাম, দাসী লক্ষ্মী ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"বৌদি, একবার চলুন, বৌটাকে মেরে ফেললে।" যে ঘরে আমি ছিলাম সেটা বাড়ীর একপার্শ্বে। প্রহারের শব্দ তাই কাণে আসে নাই। বিস্মিতভাবে বলিলাম,—"আজ আবার মারছে, সেদিন এত করে' বলে দিলাম। এত ভাল জ্বালা হ'ল। কাপড়খানা পরিধান করিয়া ত্রস্তপদে নামিয়া আসিলাম। স্বামী বাহিরে গিয়াছিলেন। ভৃত্যকে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার আদেশ দিয়া লীলার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। দ্বার খোলাই ছিল; ভিতরের দৃশ্য স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। লীলা ভূমিতলে পড়িয়া আছে। পতি-দেবতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনবরত লাথি-কিল-চড় বর্ষণ করিতেছেন। ছেলেমেয়েগুলা পিতার ভয়ে বোধ হয় আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লোকটা আজ নির্ব্বাক্। প্রহারের শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ আজ ছিল না। আমাকে দেখিয়া রমু ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,— "মাসীমা, মা মরে গেল, বাবাকে বারণ কর তুমি, ক'দিন মার জ্বর হয়েছে খায় নি, আর মারলে মরে যাবে

আমি কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম। রমুর কথায় সচেতন হইয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া বলিলাম, —"ভয় নেই বাবা তোমার মাকে আর মারতে দেব

না।" লীলার স্বামী বোধ হয় আমাকে দেখিতে পায় নাই, প্রহার সমানভাবেই চলিতেছিল। স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। দাসীকে বলিলাম,—"উনি কি করচেন বাইরে? যে ক'রে হ'ক ডেকে আন, আর মারলে বৌটা মরে যাবে যে।"

"তাই তো দেখছি, ওমা এ কি সর্ব্বনেশে লোক।" তাহার কণ্ঠস্বরে লোকটা সচকিতে চাহিল, আমার স্বামীও তখন আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়াই লোকটা অতি ভাল মানুষের মত একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। লীলা কষ্টে উঠিয়া বসিল। উনি তীব্রস্বরে ডাকিলেন,—"শৈলবাবু।"

নিরীহভাবে ভদ্রলোক নিকটে আসিলে রুক্ষকণ্ঠে উনি বলিলেন,—"ক'দিন আগে আমার স্ত্রী আপনাকে বলে দিয়েছিলেন, এসব কাণ্ড এখানে চলবে না, তবুও কেন আপনি আজ আবার এই ভদ্রপল্লীতে ছোট-লোকের কাণ্ড আরম্ভ করেছেন?"

খুব নম্রভাবে শৈলবাবু বলিলেন,—"কি বলব আপনাকে, জানেন না আপনারা আমার এই বৌটা অতি বজ্জাত ওকে মাঝে মাঝে—"

বাধা দিয়া তীব্রকণ্ঠে উনি বলিলেন,—"থামুন আপনি, আপনার ব্যবহার আমার সব জানা আছে। মিথ্যে ওঁর দোষ দেবেন না, আপনাকে এই শেষ বলে দিলুম, আর যদি ফের স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে দেখি,আপনাকে তা হ'লে পুলিশে দিয়ে আমি ছাড়ব। ছিঃ ছিঃ, আপনি না ভদ্র-সন্তান! এই ব্যবহার আপনার? যাদের আপনারা নীচ ছোটলোক বলেন তারাও যে এমন করতে পারে না।

শৈলেনবাবু নিরুত্তরে সমস্ত কথা শুনিয়া গেলে স্বামী আরও দুই-চারিটা কড়া কথা বলিয়া সেস্থান ত্যাগ করিলেন। ট্যাক্সি আসিয়াছিল, আমরা বাহিরে আসিলাম।

দ্বার-সম্মুখে আসিয়াই স্বামী বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দেখ মণি এসেছে, তবে আর যাওয়া হ'ল না।

মণিবাবু নিকটে আসিলেন, স্বামী সানন্দে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"চল ভিতরে চল। ওঃ কত কাল পরে দেখা।" মণিবাবু ওঁর বাল্যবন্ধু। কার্য্যোপলক্ষে অধিকাংশ সময়ই বাহিরে বাস করিতেন। কার্য্যের অবসরে কলিকাতার বাড়ীতে আসিলেই আমাদের বাড়ী আসিয়া থাকেন। আমাকে নমস্কার করিয়া স্বামীর সহিত তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্যকে ট্যাক্সি ফিরাইয়া দিতে বলিয়া আমিও অনুগমন। করিলাম অন্তঃপুর-সীমায় পা দিয়াই বিকট কলরোলে চমকিয়া উঠিলাম। লোকটা কি এখনও লীলাকে ছাড়ে নাই? মণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হচ্ছে বৌদি' আপনার বাড়ির মধ্যে? এ যেন কুরুক্ষেত্রের পুনরভিনয় চলছে। ব্যাপার কি? বাড়ীতে আর কে আছে?"

"আর বলেন কেন? সখ করে' খানকয়েক ঘর ভাড়া দিয়ে এই উপদ্রব জোটান হয়েছে।"

স্বামী বিস্মিতভাবে বলিলেন,—"কি ভয়ানক লোক। এই বারণ করে' এলুম তবু—"

"আহা তোমার বাক্য শোন্‌বার জন্যে তার আর তো ঘুম হচ্ছে না।"

ত্রস্তপদে তিন জনে আসিয়া গৃহসম্মুখে দাঁড়াইলাম। আমরা বাড়ী নাই জানিয়া লোকটা প্রবলবিক্রমে উচ্চ-রবে নির্ভয়ে চেঁচাইয়া বলিতেছিল,—"খুন করব তোকে। তোর জন্যে অন্য লোক এসে আমায় দশ কথা শুনিয়ে যায়। আমার কি মান-অপমান নেই? স্ত্রীর জন্যে আমার মর্য্যাদা নষ্ট হ'ল, অমন স্ত্রীকে খুন করে' ফাঁসী যাব। ও কেন তোর হ'য়ে বল্‌তে আসে? নিশ্চয় ওর সঙ্গে তোর কিছু আছে? নয় তো তোকে মারলে ওর গায়ে বাজবে কেন? আমার স্ত্রীকে আমি মারব, ওর কি? বল ওর সঙ্গে তোর কি কথা হয়েছে, ও কেন তোর জন্যে আমায় কথা শুনিয়ে গেল? আগে বল্ তার পর তোকে খুন করি।"

উত্তেজনায় উনি রক্তমুখী হইয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া যাইতেছিলেন, আমি হাতটা চাপিয়া ধরিলাম। ক্রোধে আমারও সর্ব্বদেহ কাঁপিতেছিল। মণিবাবু আশ্চর্য্যের সহিত শুধু ঘরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। লোকটা এক পার্শ্বে ছিল, আমাদের দেখে নাই। লীলা মাটীতে পড়িয়া। তাহার দিকে চাহিয়াই আমি আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তাহার দেহ সংজ্ঞাহীন অসাড়। ওষ্ঠের কোণ বহিয়া শোণিতের স্রোত বহিতেছে। নিকটে দাঁড়াইয়া ছেলে-

মেয়েগুলা আকুল হইয়া কাঁদিতেছিল। লীলার জীবনের অস্তিত্বও কিছু অনুভব করিতে পারিলাম না। লোকটা ফিরিয়া চাহিল। ভূত দেখিয়াও বুঝি কেহ এমন চমকিয়া উঠে না। মুহূর্ত্তমাত্র সেখানে থাকিয়া মুক্তদ্বার দিয়া সে যে কোথায় চলিয়া গেল তাহার কোন সন্ধানই মিলিল না। সেদিকে লক্ষ্য করিবার মত অবস্থা তখন আমাদের কাহারই ছিল না। তিন জনে ছুটিয়া ঘরে আসিলাম। লীলার লুণ্ঠিত মস্তকটা কোলে তুলিয়া লইয়া স্বামীকে বলিলাম,—"শীগ্‌গীর একজন ডাক্তার নিয়ে এস, লীলাকে বোধ হয় সত্যিই মেরে ফেলেছে।" তাহার নাড়ীর গতিপরীক্ষা করিয়া উনি বলিলেন, "এখন ও বেঁচে আছে, তবে থাকবে কি না বলা যায় না, মণি তুই ভাই একটু দেখ, আমি ডাক্তার ডেকে আনি। ওকে না হয় ওপরে নিয়ে যাও। আচ্ছা লোক বাড়ীতে রেখেছিলুম।" স্বামী বাহির হইয়া গেলেন।

মণিবাবু বলিলেন, "একে ওপরে নিয়ে গিয়ে ভাল ক'রে শুইয়ে দিন বৌদি।"

দাসী ও চাকরের সাহায্যে লীলার অচেতন দেহ উপরে আনিয়া শয্যার উপর রাখিলাম। শিশু কয়টাকে লক্ষ্মীর হাতে দিয়া লীলার পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। বহুক্ষণ ধরিয়া চোখে মুখে জলসেচন করার পর সে চোখ চাহিল। মণিবাবু গরম দুধে খানিকটা ব্রাণ্ডী মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন। ডাক্তারের প্রেস্কিপসন ব্যতীত ব্রাণ্ডী কিনিতে পারা যাইবে না বলিয়া শুধু দুধই কয় চামচ তাহার মুখে দিলাম। বহুক্ষণ লীলা কথা বলিতে পারিল না। তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিল,—"আমায় এখানে কে আনলে?"

তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলাম,—"আমিই এনেছি লীলা, তুমি কেমন আছ?"

ক্ষীণকণ্ঠে সে উত্তর দিল,—"বড় কষ্ট—"

আমার চোখে জল আসিল। ধীরে ধীরে তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। মণিবাবুর চোখ দিয়া বন্যার প্রবল বেগের মত অশ্রু পড়িতেছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া তিনি মুখ-হাত ধুইতে গেলেন। লীলা খানিকটা নীরব থাকিয়া বলিল,—"আমায় এখানে কেন আন্‌লেন? ছেলেরা কৈ? উনি?"

"ছেলেরা আমার কাছেই আছে লীলা। তাঁর ভাবনাটা উপস্থিত স্থগিত রাখ, তাঁর দয়ায় যদি এ যাত্রা তোমার জীবন থাকে তখন সে চিন্তা ক'র।"

লীলা আর কথা বলিল না। স্বামী চিকিৎসক লইয়া আসিলেন। আমি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ডাক্তার রোগী দেখিতে লাগিলেন, দেহে প্রহারের চিহ্নগুলা সুস্পষ্ট ছিল। চিকিৎসক প্রশ্ন করিলেন,—"এগুলা কিসের দাগ?" কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বে ক্ষীণস্বরে লীলা বলিল,—"আমি পড়ে গেছলুম।"

প্রবীণ চিকিৎসক হাসিলেন। বলিলেন,—"পড়ে গেলে কি গায়ে এমনি দাগ হয় মা।" আমরা স্তব্ধ হইয়াই রহিলাম। বহুক্ষণ দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর স্বামীর দিকে চাহিয়া ইংরাজিতে বলিলেন,—"অবস্থা খুব খারাপ। অত্যন্ত দুর্ব্বল। যে কোন সময় 'হার্টফেল' করতে (হৃদ্‌-যন্ত্রের কাজ বন্ধ হ'তে) পারে। তারপর গায়ের ক্ষতস্থানগুলার 'সেপ্‌টিক' হ'বার সম্ভাবনা খুব আছে।" ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

দাসীকে ডাকিয়া সকলের আহারাদির ব্যবস্থা করিতে বলিয়া আমি লীলার পার্শ্বেই বসিয়া রহিলাম। সে তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার রক্তহীন শুষ্ক পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া গভীর বন্যায় সমস্ত চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। এই যে নির্ম্মল ফুলটী অকালে শুকাইয়া যাইতে বসিয়াছে এজন্য দায়ী কে? অভাগিনী সমস্ত অন্তর দিয়া স্বামীকে ভালবাসিয়া কি নির্ম্মম প্রতিদানই না পাইয়াছে! স্বামীর কষ্ট ও সম্ভ্রমহানির ভয়ে দুইদিন পিত্রালয়ে পর্য্যন্ত সে গিয়া থাকে নাই। তাহার সর্ব্বস্ব হাসিমুখে স্বামীর সেবায় দিয়া বুকভরা ভালবাসার বিনিময়ে লাভ করিয়াছে কি? উৎপীড়ন, অত্যাচার, প্রহার—অমানুষিক লাঞ্ছনা।

কিছুক্ষণ পরে স্বামী দ্বারসন্নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"আমি যাচ্ছি পুলিশে খবর দিতে,, যেমন করে' পারি ও বদমায়েস্‌কে আমি পুলিশে দেব, বাড়ী আসে নি তো

আর? আচ্ছা পালাবে কোথায়? আফিসের ঠিকানা আমি জানি। উনি কেমন আছেন?"

"সেই রকমই ঘুমোচ্ছে। তুমি সত্যি পুলিশে যাবে?"

"না গিয়ে কি করব? ওঁর যা অবস্থা, বাঁচবার আশা নেই, গায়ে ঐ দাগ, স্বাভাবিক মৃত্যু কেউ তো বিশ্বাস করবে না। তখন আমি কি করব। আর ওর মত পশুপ্রকৃতির লোকের শাস্তি হওয়া খুব দরকার। যদিই এ যাত্রা উনি ভাল হ'ন তা হ'লে ও আর কখন অত্যাচার করতে সাহস পাবে না; আমি যাচ্ছি তবে। রমুর মা জাগলে ওঁর দাদাদের বা অন্য আত্মীয়দের ঠিকানা জেনে নিও, তাঁদের খবর দেওয়া দরকার।"

স্বামী বলিয়া যাইতেছিলেন. মৃদুকণ্ঠে লীলা ডাকিল,—"দিদি!"

"কি ভাই লীলা? তুমি জেগে আছ?"

"হাঁ দিদি; জামাইবাবুকে তুমি পুলিশে যেতে বারণ কর।"

স্বামী দাঁড়াইলেন। আমি বলিলাম,—"কেন লীলা? ওরকম লোকের শাস্তি হওয়া তো দরকার।"

কাতরতা পূর্ণকণ্ঠে সে বলিল,—"না দিদি না, তিনি যাই করুন তবু তিনি আমার স্বামী। তাঁর বিরুদ্ধে তোমরা আমায় যেতে বল না।"

"কিন্তু যে উৎপীড়ন হয়েছে তোমার উপর—"

"কিছু না, কিছু না। আমার অদৃষ্ট, তাঁর কি দোষ; ওঁকে যেন এজন্য কোন কষ্ট পেতে না হয়। দিদি তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। তবু বল্‌ছি, যদি তোমরা পুলিশ আন তা হ'লে আমি তাদের কাছে কোন কথাই স্বীকার করব না। আমায় অকৃতজ্ঞ মনে কর' না, ভেবে দেখ তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী। যত উৎপীড়ন যত লাঞ্ছনাই তিনি আমার উপর করুন, আমার তিনি দেবতা। তাঁর দোষ-গুণ বিচারের অধিকার আমার নেই; তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা আমি কাউকে বলতে পারব না।"

সুগভীর শ্রদ্ধাভরে আমরা তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম,—"তোমার যা অবস্থা তা'তে জীবনের আশা কমই। এ-যাত্রা যদি ভাল হ'য়ে ওঠ, তা'হ'লে আর যা'তে তোমার ওপর নির্য্যাতন না হয় তার ব্যবস্থা তো হওয়া উচিত।"

মেঘ-মেদুর আকাশে ক্ষণিক বিদ্যুৎ-বিকাশের মত মৃদুহাসির রেখা তাহার প্রভাহীন মুখে ফুটিয়া উঠিল। আস্তে আস্তে বলিল,—"বলেন কি দিদি স্বামীর ব্যবহারের প্রতীকারের জন্যে অন্যের সাহায্য নিতে হ'বে? ছি! আমার অদৃষ্ট মন্দ—তিনি আমার উপর বিরূপ। অন্যের কাছে অভিযোগ করে' ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে ভাল ব্যবহার আদায় করে' নিতে হ'বে আমায়! না দিদি মিনতি করি আপনাকে, আমি বাঁচি আর মরি তাঁকে আপনারা শাস্তি দেবেন না। তিনি যত দুর্ব্ব্যবহারই করুন আমার সঙ্গে, আমার সমস্ত অন্তর তাঁর শুভ ভিন্ন মুহূর্ত্তের জন্যও অশুভ কামনা করতে পারে না। আমি যে তাঁর স্ত্রী।"

সে চুপ করিল। বিহ্বল দৃষ্টিতে আমি তাহার শান্ত নির্ব্বিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

এবার মণিবাবুর সংযমের বাঁধ টুটিয়া গেল। বালকের ন্যায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লীলার মুখের কাছে মুখ রাখিয়া বলিলেন,—"লিলি, তুই আমাদের বড় আদরের ছোট বোন—আজ কি শুনলাম-চোখে কি দেখলাম! সতী সাধ্বী মার আমার তুই উপযুক্ত মেয়ে। একবার চেয়ে দেখ, তোর ছোটদার দিকে—আমি কত তোর খোঁজ করেছি—কোথাও খোঁজ পাই নি—রাজার হালে আমরা থাকি, আর আমাদের ছোট বোন অন্নবস্ত্রের ভিখারী—পাষণ্ডের হাতে প্রতিদিন নির্য্যাতিত হচ্ছে! হায় ভগবান্ মূর্খ স্বামীটা যদি এখানে থাকৃত তো তার চৈতন্য হ'ত।"

লীলা ছোটদার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল,—"আশীর্ব্বাদ কর ছোটদা ওঁর যেন মতি-গতি ভাল হয়।"

জেনেভা-ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

সোমবার ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

এবার দশদিন মাত্র লণ্ডনে বাস হইল। আজ ১১-১৫ মিনিটের গাড়ীতে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইতে প্যারিস হইয়া জেনেভা যাত্রা করা হইল, স্যর ইওয়াট গ্রীভস (হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ), স্যর ডেনিস ব্রে (ভূতপূর্ব্ব ভারতসরকারের বৈদেশিক সেক্রেটারী Late foreign Secretary to the Government of India), স্যর জাহাঙ্গীর কয়াজী (প্রেসিডেন্সী কলেজের বার্ত্তাশাস্ত্রের (Economics এর) অধ্যাপক এবং আমি জেনেভা সভায় সহযোগী এবং অন্ত সহযাত্রী। মালপত্র পূর্ব্বে গিয়াছে, মহারাজা বীকানীরেরও সেক্রেটারী বাজপাই সাহেব প্যারিসে অপেক্ষা করিতেছেন, প্যারিসে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইয়া একত্র যাওয়া হইবে।

লণ্ডনে ছিল কেবল বোঝাপড়ার কাজ, তাহা শেষ হইয়াছে, অনেকের সঙ্গে দেখা করা হইল না। অনেক জায়গায় যাওয়া হইল না, অনেক জিনিস দেখা হইল না। এই অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা শেষ করিতে হয়। ১৯২১ সালে যখন লিটন কমিটির কাজ শেষ করিয়া লণ্ডন ত্যাগ করি তখন মনে তো ছিল না যে তৃতীয়-বার ইংরাজ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে আবার আসিব। বিধিলিপি বলিয়া বাধা-বিঘ্ন-আপত্তি সত্ত্বেও আসিয়া না হয় কিছু দেখা হইল, প্রারব্ধবলে আবার যদি আসা হয় ভাল করিয়া দেখা যাইবে।

ভগ্নস্বাস্থ্যের আপাততঃ উন্নতি হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট; রেল, বাস, মোটর প্রভৃতি রাস্তা-ঘাট বিপদসঙ্কুল, ইহার মধ্যে ভগবৎকৃপায় যে দৌড়ধাপ করিয়া ধরিয়া চলিতেছে তাহাতে পূর্ব্বপরিচিত সকলেই আশ্চর্য্য হন, আমিই আশ্চর্য্য হই, প্রভাতচন্দ্র ও বধূমাতার সেবা-যত্নে সকল ক্লেশ ভুলিয়াছি, বাড়ী হইতে বাড়ীতেই আসা হইয়াছে, ইংরাজীতে যাহাকে বলে Home to Home, এ ঠিক তাই; তাহাদের ছাড়িয়া যাইতে পুনরায় বাড়ী ছাড়িবার সময়ের ক্লেশ হইতেছে।

প্রভাতচন্দ্রের সনির্ব্বন্ধ ইচ্ছায় Oxford Circusএ গিয়া ছবি তোলান হইয়াছে, ছবি দেখিয়া ভগ্নদেহ এ অধমকে চেনা দায় হইবে। চক্ষুর সহায় অন্য প্রকরণও সংগ্রহ হইয়াছে, যদিও কর্ম্মক্ষেত্রে বিপত্তি-বাধা-বিঘ্ন অনেক, যথাশক্তি কর্ম্ম সমাধা করিবার চেষ্টা করিতেই হইবে, তাহার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত হইলাম।

যে গরমে সমস্ত দেশ কষ্ট পাইতেছিল তাহা কমিয়াছে, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়া বেশ ঠাণ্ডা পড়িতেছে; আসিবার সময় ইংলিস চ্যানেল পার হইতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই, আজ ডোভার (Dover) ক্যালের পথে কিরূপ হইবে তাহা তিনিই জানেন যিনি সকল পথের নিয়ন্তা।

বুধবার ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

আজ লীগ অব নেসন্‌স্ এসেম্বলী মহাসভার প্রথম অধিবেশন হইল। বহুদিন হইতে এ সভার কথা শুনিয়া আসিতেছি। মহাযুদ্ধের পর সকল জাতিরই মনে হইল যে অকারণ দ্বন্দ্ববিবাদ রক্তপাতে কোন ফল নাই, যুদ্ধবিগ্রহে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়। বিজয়ী জাতিও এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে তাহার পক্ষে পরাজয় অপেক্ষা জয় হানিকর, সন্ধিস্থাপনের পর সকলেরই চেষ্টা যে বিবাদবিসংবাদ আপোষে শালিসী দ্বারা মিটাইয়া লওয়া উচিত, •সৈন্যবল রণতরীবল, আজকাল একজাতির অপেক্ষা আর একজাতি বাড়াইয়া চলিতেছে—দেশের ধনহানি তাহাতে হইতেছে। অতএব যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করিয়া যথার্থ শান্তিস্থাপন করিতে পরস্পরের বোঝাপড়া ভাল করিয়া করিতে হইবে, সকল বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে চুয়ান্নটা সভ্য জাতির

প্রতিনিধি প্রতিবৎসর জেনেভাতে একত্র হয় ও সংবৎসর ধরিয়া যে সকল কথা উঠিয়াছে তাহার মীমাংসা করে।

ভারতবর্ষ কোন বিষয়ে বাস্তবিক স্বাধীন না হইলেও জেনেভা রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং ভারতবর্ষের প্রতিনিধির অন্ততঃ এখানে সম্মান আছে।

কাল সকালে লণ্ডন হইতে প্যারিস পথে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, জেনিভা হ্রদের উপর প্রাসাদতুল্য হোটেলে বিষম খরচা দিয়া বিষম বাবুগিরির মধ্যে পড়িয়াছি। হোটেলের ঘর-বিছানা আসবাব-আয়োজন দেখিয়া তাক লাগিয়া যায়। নানালোকের সঙ্গে দেখাশুনা আলাপ-পরিচয় হইতেছে। ভারতবর্ষের কাপড়ের আদর এখানেও যথেষ্ট হইতেছে। আমি ছাড়া অবিলাতী কাপড় আর কাহারও অঙ্গে নাই। কাজেই খাতির-যত্ন যথেষ্ট হইতেছে, পরস্পরের খানা দেওয়া, আদর ও আপ্যায়ন যথেষ্ট হইতেছে। তাহাতে খরচা বেশী হয়, ভারতবর্ষের লোকও এখানে কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা যথেষ্টই অনুগ্রহ করিতেছেন। স্যর অতুল চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমূল্য চট্টোপাধ্যায় ও ডাক্তার রজনীকান্ত দাশ এখানে কর্ম্ম করেন, তাঁহারা যে কি যত্ন করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ছাত্র ও অধ্যাপক যথেষ্ট আছেন। তাঁহারাও আসিয়া দেখাশুনা করিতেছেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ফরেন সেক্রেটারী (Foreign Secretary) আর্থার হেণ্ডারসন, দক্ষিণআফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হার্টজহগ (General Hertzhog) লীগ অব নেসনস্‌এর প্রাণস্বরূপ, লর্ড রবার্ট সেসিল (Lord Robert Cecil) পার্লামেণ্টের মেম্বর মিস লরেন্স, মিস উইলকিনসন, মিষ্টার বক্সটন, অষ্ট্রিয়ান পণ্ডিত ঋষিতুল্য মসিয় গোটয়েটি (Mr. Goitic) প্রভৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথা নিত্য চলিতেছে, প্রথম হইতে আমার নানা কাজের ভার অযাচিতভাবে আসিয়া পড়িয়াছে।

কাজ ও খানা প্রভৃতির মধ্যে হাঁটিয়া ও মোটরে করিয়া শহরে হ্রদের ধারে বেড়ানও যথেষ্ট হইতেছে। জেনিভা অতি প্রাচীন শহর। চতুর্দ্দিকে উচ্চ আলপস পর্ব্বতরাজি, মধ্যে হ্রদ, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সহিত অনেকে ইহার তুলনা করেন, স্থানে স্থানে আমার দক্ষিণ আফ্রিকা মনে পড়ে। ইউরোপের অন্যান্য শহরেরই মত বাড়ী ঘর-দ্বার, নূতন পুরাতন শহরে অনেক পার্থক্য আছে, নূতনের কাছে পুরাতনকে সতত হটিতে হইতেছে। ইউরোপের রাজনৈতিক হাঙ্গামা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনেকে এই স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্যের আশ্রয় বহুবার লইয়াছে। ফ্রান্সের ভল্টেয়ার ও রুসো, ইটালীর মুসোলিনী, ভারতবর্ষের শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্ম ও মহেন্দ্র প্রতাপসিংহ এখানে আশ্রয় পাইয়াছে. খৃষ্টিয়ান যাজক ক্যালভিন ও নক্স এইখানে তাঁহাদের কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। গিবন এইখানে বসিয়াই তাঁহার অপূর্ব্ব রোমের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেন ও পুস্তক রচনা করেন, এদিকে Zenith ওমেগা প্রভৃতি ঘড়িওয়ালার বিজ্ঞাপনে ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক সর্ব্বদা মনে করিয়া দিতেছে, জেনেভার হ্রদ হইতে বেগবতী রোন নদী (Rhone) উৎপন্ন হইয়া ফ্রান্সের ভিতর দিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িতেছে, শিল্প ও বাণিজ্যের বহু বিস্তার না থাকিলেও কৃষিসাহায্যে লোকের বেশ চলিয়া যাইতেছে।

বহুকাল ধরিয়া ভূগোল ও ম্যাপ মাত্রে যে সব দেশের পরিচয় ছিল এখন চুয়ান্নটা জাতির প্রতিনিধি প্রধান পুরুষদের সহিত চাক্ষুষ আলাপ হইল, পুনরায় ভূগোল পড়িবার প্রয়োজন হইল।

যে স্থানে মহাসভার অধিবেশন সেখানে ধূমধাম ঐশ্বর্য্যের কোন চিহ্ন নাই, বন্দোবস্ত ভাল; কিন্তু অতি সাধারণ ধরণেরও কোন জাঁক-জমক-আড়ম্বর নাই। নিশান-পতাকা নাই, বাজনা-বাদ্য নাই, Democratic ধরণের সব কাজ। মধ্যে সভাপতির আসন ও অভ্যর্থনা সম্বন্ধে ধূমধামের কথা হইয়াছিল, তাহাতেও কাহারও মত হয় নাই। ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা হয়। যাহার যে ভাষায় ইচ্ছা ও সুবিধা সে সেই ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত একজন বক্তৃতার অনুবাদ করিয়া শুনায়। Loud speaker এর ব্যবস্থা অতি সুন্দর, ভারতবর্ষে এ চেষ্টা বিশেষ কৃতকার্য্য হয় নাই। এখানে Loud speaker এর সুব্যবস্থার জন্য এই বিস্তীর্ণ সভার সকল স্থানেই সকলের কথা শোনা যায়।

আমাদের দলপতি মহারাজা বিকানীরকে একটা

আংশিক সভা বা কমিটির সভাপতি করিবার চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বৈজ্ঞানিক স্যর জগদীশচন্দ্র বসু সম্প্রতি জেনেভাতে আসিয়াছিলেন, স্যর জগদীশ বিলাতেও গিয়াছিলেন।

সোমবার ৮ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন হইতে আসিয়াছি, আর সেখানে ফেরা হইবে কি না সন্দেহ। শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুগ প্রদেশের নিকট বিদায় লইবার সময় অনেক কথাই মনে হইল। চ্যানেল পার হইতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই, দীর্ঘ রেলপথের যাত্রাতেও অসুবিধা হয় নাই, Pullman কার ও Sleeping কারের বিলাসিতাতে ভ্রমণের সুখ খুব বাড়িয়া গিয়াছে। সোমবার বৈকালে প্যারিস পৌঁছিয়া যতদূর সম্ভব প্যারিসের রাস্তা-ঘাটগুলি আর একবার দেখিয়া লইলাম, নতর দাম (Notre Dame) লুভ্‌র্ (Louvre) টুলিয়ার গার্ডেন (Tullier Garden) Bastille Memorial (যেখানে ব্যাষ্টিল কারাগার ছিল তাহার চিহ্নস্থান) ইত্যাদি পূর্ব্বপরিচিত স্থান দেখিয়া সীন নদীর (Seine) ধার দিয়া (Chams Ecysu) স্যাঁজ ইসিসের বাগানের ভিতর এক হোটেলে প্যারিসীয় ধরণের খানা খাইয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইল। ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ স্যর ইওয়ার্ট গ্রীভস্ ও ভূতপূর্ব্ব ফরেন সেক্রেটারী স্যর ডেনিস ব্রে সঙ্গে থাকাতে ফরাসী ভাষায় অজ্ঞতা জন্য বিশেষ কষ্ট হইল না।

Intellectual Co-operation সংক্রান্ত Paris Institute দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহার বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয় বলিয়া তাহা দেখিতে যাওয়া হইল না। এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য লীগ অব নেসনসে এবার চেষ্টা হইবে। অধ্যাপক কালিদাস নাগ এখন এখানে আছেন। তিনি এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন।

বৃহস্পতিবার ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

আজ মহাসভার যথেষ্ট কাজের প্রথম দিন। পৃথিবী হইতে যুদ্ধ উঠিয়া যায় ও আপোষে শালিসীতে সকল বিষয়ের মীমাংসা হয়, সকল বক্তারই এই কথা। মনের কথা কাহার কতদূর তাহা ভগবান জানেন। ভারতবর্ষের এ বিষয়ে বক্তব্য ও কর্ত্তব্য কিছু নাই,—কেবল শুনিয়া যাওয়া।

ক্যানাডার স্যর রবার্ট বরডেন, ফ্রান্সের মোসিঁয়ে ব্রিয়ান্দ এবং ইংলণ্ডের মিষ্টার হেণ্ডারসন আজ প্রধান বক্তা। বরডেন ও হেণ্ডারসন ইংরাজীতে আধুনিক ধরণের সুন্দর বক্তৃতা করিলেন, কিন্তু মোসিঁয়ে ব্রিয়ান্দ-এর ফরাসী বক্তৃতা সকলের উপরে গেল। পুরাতন প্রথামত হাত-পা নাড়া, অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য ও ভাষার গাম্ভীর্য্য যথেষ্ট ছিল। সভাশুদ্ধ লোক ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ইংরাজীতে এ শ্রেণীর বক্তৃতা-প্রথা লোপ পাইয়াছে।

জাতীয় নূতন প্রাসাদ

Loud Speaker সাহায্যে সকলের শুনিবার ব্যবস্থার সঙ্গে আর-এক নূতন ব্যাপার আজ দেখিলাম, ইংরাজীতে বক্তৃতা হইয়া যাইতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোতে তাহার ফরাসী তর্জ্জমা একজন শুনাইতেছে। সেইরূপ যখন ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা হইতেছে, ইংরেজী তর্জ্জমা একজন টেলিফোঁতে শুনাইতেছে। এই অদ্ভুত ব্যবস্থার কথা পূর্ব্বে কাণে শুনিয়াছিলাম। আজ স্বচক্ষে দেখিলাম। ইউরোপে ও আমেরিকায় জ্ঞান-বুদ্ধি-বিস্তারের চেষ্টা যাহা হইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

মহাসভার কাজের মাঝে মাঝে সরকার-নিযুক্ত মোটর লইয়া শহর-ভ্রমণ, হ্রদের ধারে বেড়ান ও দর্শনীয় জায়গা সব দেখিয়া বেড়ানও হইতেছে। অমূল্য চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীর সহিত পরিচয় হইল। কালিদাস নাগকে

লইয়া পুরাতন তথ্যের আলোচনা অনেক হইল। ফরাসী লেখক রুসো যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যেখানে বাস করিতেন, ভল্টেয়ার, Calvin, Knox প্রমুখ ধর্ম্মজাযকদিগের যেখানে যেখানে কীর্ত্তিস্তম্ভ রহিয়াছে, সেসকল স্মৃতি তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল।

Indian Legislative Assemblyর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি Sir Frederic Whyleএর মা গতবার হ্যাম্পষ্টেডের বাটীতে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি পাশের হোটেলে আছেন। তিনি বিশেষ যত্ন ও আপ্যায়ন করিতেন—বিলাতে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার বাটীতে থাকিবার জন্য বিশেষ জেদ করিলেন। বিলাতে ভারতহিতৈষী যেসকল রমণী আছেন তিনি তাঁহাদের একজন। তাঁহার পুত্র এখন চীনদেশে সরকারী adviser-পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ভারতের প্রতি তাঁহার টান এখনও আছে

জাতীয় প্রাসাদ

সোমবার ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

প্রত্যহ খানা ও পার্টির অত্যাচারে শরীররক্ষা দুষ্কর হইতেছে, অথচ এসকল ব্যাপার ছাড়িবার নয়, সভায় ও কমিটিতে বসিয়া যে কাজ এই সকল ব্যাপারে ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা অপেক্ষা শতগুণ কাজ হয়। পৃথিবীর সকল জাতির প্রতিনিধির নিকট ভারতবর্ষের কথা খোলাখুলি রকমে এইসকল মিলনস্থানেই সম্ভব। যথাসম্ভব তাহা করিতেছি।

ক্যানাডার প্রতিনিধিগণ নিকটস্থ Hotel Burgesisএ প্রকাণ্ড ভোজ দিয়াছিল। বৃটিশ প্রতিনিধিগণ এবং অন্যান্য ৫৩ জাতির দলপতি ও তাঁহাদের পত্নীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ইংরেজ রমণীরা সকলে সমান সুন্দরী হয় না—বিশেষতঃ আজকাল ছোট ঘাঘরার উৎপাতে তাঁহাদের স্বাভাবিক রূপেরও লাঘব হইতেছে। ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের মেয়েরা পূর্ব্বের মত দীর্ঘ সুশ্রী ঘাঘরা পরিয়া আসিয়াছিলেন, দেখিতে বড় সুন্দর। আজ সবাই যে যার উপাধির পরিচয় মেডেল পরিয়া আসিয়া সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। বাড়ীতে এ বিষয়ে মনে করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও আমার মেডেল আনা হয় নাই। নূতন বহুতর লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিস্তর কথা হইল, গোলটেবিল বৈঠকে (Round Table Conferenceএ) যে সকল প্রতিনিধি আসিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের দ্বারা কোন কাজ হইবে না ইহা অনেকেরই ধারণা। ভগবান জানেন কি হইবে। নানা কারণে আমার এ সকল কথাবার্ত্তা বলা অসঙ্গত।

বাঙ্গালী মুসলমান, হিন্দুস্থানী অনেক স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হইতেছে। তাঁহারা সকলে দিগ্‌গজ পণ্ডিত কিংবা বক্তা কিংবা স্বধর্ম্মচ্যুত তাহা নহেন। নিজ নিজ স্বামীর সাহচর্য্যের জন্য আসিয়াছেন ও কাজ চালাইয়া লইতেছেন।

Fermey of Vallaine নামক অদূরবর্ত্তী গ্রামে আজ বেড়াইতে গিয়াছিলাম। প্রসিদ্ধ লেখক Vallaine ফ্রান্সের উৎপাতে মাঝে মাঝে পলাইয়া এখানে প্রাণরক্ষা করিতেন এবং এইখান হইতে তাঁহার অনলবর্ষী রচনাবলী ফ্রান্সের বিপ্লববাদে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। রুসো এবং ভল্টেয়ার উভয়েই এই সুইজারল্যাণ্ডে বসিয়া ফ্রান্সের বিপ্লবকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি বায়রন কিছুকাল জেনিভায় বাস করিয়াছিলেন। ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে হেয়ার স্কুলের শিক্ষকশ্রেষ্ঠ নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট বায়রনের Prisoner of Chillon পড়িয়াছিলাম। 'My hairs are grey but not with years' এখনও কাণে বাজিতেছে। সেই Chillon দুর্গে Savoy রাজবংশীয় অত্যাচারী নরপতির হস্তে বন্দী Bonnivard যে নির্য্যাতন সহিয়াছিল; বায়রন অমর ভাষায় তাহা চির-স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। Lake

of Genevaর উপর বহুতর সুন্দর শহর ও গ্রাম আছে। ষ্টীমারে চাপিয়া সেইসকল সুন্দর শহর, গ্রাম ও মনোরম শৈলমালা দেখিতে দেখিতে চিলন দুর্গে পৌছিলাম। তন্ন তন্ন করিয়া দুর্গের সকলভাগ দেখিলাম। বন্দী বনিভার্ড ছয় বৎসর যে অন্ধকারে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন; সেই প্রস্তরস্তম্ভে বায়রন নিজের নাম ক্ষোদিত করিয়া দুর্গকে অমর করিয়া গিয়াছেন। হ্রদের উপর Fevityz, Montnin, Beri, Eviant, Lusanne প্রভৃতি শহর। স্যার জগদীশ বসু, রবিবাবু প্রভৃতি এখানে আসিয়া সর্ব্বদা বাস করেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও চিত্তবৃত্তি তাহাতেই এখনও এত ভাল আছে। যাঁহারা কাশ্মীর দেখিয়াছেন তাঁহারা এই স্থানের সহিত তাহার তুলনা করেন।

বায়রনের কবিতা Prisoner of Chillon পুনরায় পাঠ করিয়া তবে বিশ্রামলাভ করিলাম।

শনিবার British and Dominions Universities Students Conference এ আহার ও বক্তৃতা করিবার নিমন্ত্রণ ছিল। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরিয়া বক্তৃতা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষবিধান করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হইল।

যত জায়গায় যাইতেছি, যত লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় হইতেছে সে সকল বিষয়ের বিস্তীর্ণ বিবরণ লেখা অসম্ভব, মিটিংএ ৫৪ জাতির দলপতিদেরই বক্তৃতা হইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী প্রভৃতির বক্তৃতাই ভাল হইল। সকলেরই এক কথা পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করুক, যুদ্ধ-বিগ্রহ উঠিয়া যাউক। ফাঁকা কথায় এ কথার মীমাংসা হইতে পারে না, কাজে কতদূর কি হয় দেখা যাউক।

শীত ক্রমশঃ বেশ পড়িতেছে। সকল বিষয়েই বিশেষ সাবধান হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইতেছে।

মঙ্গলবার ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

ক্রমশঃ শীত পড়িয়া আসিতেছে। যেদিন বৃষ্টি হয় শীত আরও বেশী হয়। বৃষ্টি না হইলে পরিষ্কার থাকিলে হ্রদের উপরের বাড়ীগুলি বড় সুন্দর দেখায়, তাহার পশ্চাতে দূরে আলপ্সের পশ্চাতে আল্‌স্‌ (Alps on Alps arise)। বহুদূরে Mount Blaner (শ্বেত পর্ব্বত) দেখা যায়। শরতের নির্ম্মল আকাশে এ পর্ব্বত-শ্রেণীর শোভা অতি রমণীয়।

দেশী-বিদেশী বহুলোকের সেবা-যত্ন-আপ্যায়নে কোন ক্লেশ অনুভব করিবার অবকাশ পাইতেছি না। 'লাঞ্চ' 'ডিনার-পার্টি'র অত্যাচার হইতে বহুকষ্টে করযোড়ে সকলের নিকট বিদায় চাহিয়া লইতেছি, যদিও ভারতবর্ষের পথ হইতে করিবার কিছুই নাই। তথাপি যেটুকু কাজ হইবে তাহার ত্রুটি না হয় তাহার জন্য সর্ব্বদা বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়, Assemblyএর মিটিংএ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকা, কমিটী কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া ও কাগজ-পত্র পড়া ও দোর রাখাতে অনেক সময় যায় ও পরিশ্রম হয়, সবদিক্ বাঁচাইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটী হইতেছে না, তাহার ফলে ভাল আছি। বাড়ীছাড়া হইয়া ঔষধ স্পর্শও করি নাই, খাওয়া, ঘুম, হজম খুব হইতেছে। হোটেলের রাজভোগের খাওয়া অনেক বাদসাদ দিয়া যাইতে হয়, পরিশ্রমের চোটে এক-একদিন ১২ ঘণ্টাও ঘুম হয়। কোন কোন দিন বিশেষ রাত্রের খানা কিংবা পার্টির পর ঘুম হয় না। বিছানায় বসিয়া কাজ করি কিংবা পড়ি। কথাবার্ত্তায়, কাজে-কর্ম্মে পড়া-শুনায় ও ভ্রমণে সময় শীঘ্র কাটিয়া যাইতেছে।

সভার নিয়ম হইতেছে প্রত্যেক জাতির পক্ষ হইতে এক-একজন দলপতি স্বরূপে সাধারণভাবে Assemblyর প্রকাশ্য মিটিংএ বক্তৃতা করিবে। আমাদের দলপতি স্বরূপই আজ মহারাজা বিকানীর বক্তৃতা করিলেন, তাঁহার লম্বা-চৌড়া চেহারা, সৈনিকোচিত ভঙ্গী, গলার গম্ভীর আওয়াজ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিল। দলস্থ সকলে মিলিয়া বক্তৃতা তৈয়ারী জাহাজ হইতেই হইতেছিল। লণ্ডনে ও এখানে সরকার-পক্ষ হইতে তাহার তদারক হয়। মহারাজা বক্তৃতা বেশ আরম্ভ করিয়া লইয়াছিলেন। কাগজ না দেখিয়া বেশ সুন্দরভাবে বক্তৃতা করিলেন। সকলেই অজস্র প্রশংসা করিল, আমরা আপ্যায়িত হইলাম।

চীন, জাপান ও শ্যামদেশের প্রতিনিধির বক্তৃতা সুন্দর হইয়াছিল। ইউরোপের শ্বেতজাতিদল যাহাতে এসিয়ার জাতির উপর অত্যাচার-অনাচার না করিতে

পারে এই মর্ম্মে সকলেই বক্তৃতা করিলেন, ভারতের পক্ষে বক্তৃতার অর্থও তাই, পরস্পরের বোঝা-পাড়া ক্রমশঃ বাড়িয়াছে, ভাল ফল হওয়া সম্ভব।

বুধবার ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

আজ এসেম্বলীর Primary Meetingএর শেষ দিন। এইবার কমিটীর কাজ আরম্ভ হইবে। তিন সপ্তাহ এই কাজ চলিবে। League of Nationsএর সাধারণ প্রকাশ্য বক্তৃতা অপেক্ষা কমিটির কাজ অধিক প্রয়োজনীয়।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুনীতি, শিশুমঙ্গল প্রভৃতি বিষয়ে কমিটিতে আমার কাজ পড়িয়াছে—ভারতবর্ষের ছয়জন মেম্বরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য জায়গার মত এখানেও 'কাউনসেল' আছে এবং কাউনসেল ও অন্যান্য 'ইলেকসান' লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ হয়। যেখানে খানা, পার্টি প্রভৃতি চলিয়াছে সেখানে এই ইলেকসনের সঙ্গে তাহাদের বিশেষ সম্পর্ক আছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মন্ত্রী এবার আয়ারল্যাণ্ডের কাউনসেলে প্রবেশের প্রার্থী। ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র-শাসন-প্রণালী পায় নাই বলিয়া আমাদের কাউনসেল-প্রবেশের যো নাই।

চীন এতদিন কাউনসেলে ছিল। তাহার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চীনদেশ পুনরায় এ অধিকার পাইবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইল না—ইহাতে চীন ক্ষুণ্ণ। ইউরোপের বাহিরে সব জাতিই তাহাতে ক্ষুণ্ণ। ইউরোপের জাতিদিগকে কোন বিষয়ে আঁটিয়া উঠা দুঃসাধ্য, যাহাহউক, ক্রমশঃ উন্নতির আশায় সকলকে ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে হইবে।

কাল রাত্রে বিষম ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। ঠাণ্ডা যদি ক্রমশঃ এইরূপ বাড়ে, বিলাত ফিরিয়া যাইবার কল্পনা ত্যাগ করিতে হইবে।

দুইদিন পূর্ব্বে রাত্রে হোটেলে একজন মেম্বরের ঘরে পিস্তল লইয়া চোর ঢুকিয়াছিল। ভাল-মন্দ সকল লোক এখন জেনিভায় আসিয়া ইহা কাশীর তুল্য করিয়া তুলিয়াছে। দরজা বন্ধ করিয়া শুইবার প্রথা এখানে নাই

ঘুরিয়া-ঘুরিয়া শ্রাবণ মাসের পঞ্চপুষ্প "স্মৃতিরেখা" লইয়া আসিয়া পৌছিয়াছে। রাধানগরের বামুনপাড়ার বাল্য-স্মৃতিকথার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সাংসারিক চেষ্টায় সামাজিক ও রাজনৈতিক স্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিল। Legislative Assemblyর মেম্বর বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বিলাত যাইবার পথে আজ এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহারও নিকট কোন কোন কথা শুনিলাম। ভারতবর্ষের নিয়তি কোন্ পথে যাইতেছে, কোথায় যাইবে, আমাদের ইহাতে কর্ত্তব্য কি, আমার নিজের কর্ত্তব্য কি, নিশিদিন ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিতেছি না। এই মহাসভায় কত লোকের সঙ্গে কত কথা হইতেছে। তাহাতে ধাঁধাঁ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। ভগবান বল দিন, পথ দেখাইয়া শান্তি দিন।

ক্রমশঃ

মরু-যাত্রী

(বড় গল্প)

শ্রীনুটবিহারী মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কাম

বঙ্কু ছেলেটা এককালে সত্যিই ভাল ছিল। গাঁয়ের হাই স্কুল থেকে জলপানি পেয়ে কলকাতায় পড়তে গেল কিন্তু সেখানকার সঙ্গ আর লেখাপড়া তাকে শিক্ষার চেয়ে কুশিক্ষাই বেশী দিলে। তাই যখনই ছুটীতে বাড়ী আসত তখনই দুলুর ঘরের দিকে ছুটত। প্রথম প্রথম কত মজার গল্প, হাসি, কলকাতার জু, বোটানিক্যাল গার্ডেন, স্কুল, ট্রাম, বাস, মোটর, ফুটবল—সব শোনাত। তারপর পাঁচটা বচ্ছর এইরকম ভাবে মিশে, ভালবাসার কথা বিয়ের কথা, কত সুখের স্বপ্নে দুলুর কচি মনটায় রাঙিয়ে দিয়ে হঠাৎ একদিন দুলুকে নিয়ে কলকাতায় চম্পট দিলে। শুধু দুলুকেই নিয়ে গেল না, দুলুর সঙ্গে দুলুর মায়ের দু'চারখানা গয়না, দুলুর বাপের একটা সোণার ঘড়ি নিয়ে চলে গেল। যতদিন গয়না বেচার টাকা ছিল ততদিন একটা বাসা নিয়েছিল। একটা পাচকও ছিল, একটা ঝিও রেখেছিল। সে আর কতদিন? মাস তিনেক। এই মাস তিনেকের মধ্যে বঙ্কু আরও পেকে উঠল। লেখাপড়া আগেই ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু সেই সময়ের দুটী বদমায়েস বন্ধু তাকে ছাড়লে না; সুতরাং টাকাগুলি বদ খেয়ালিতে ফুঁকে দিতে বেশী দেরী হ'ল না। টাকা শেষ হ'তেই বঙ্কু চোখে অন্ধকার দেখলে। তারপর দু'চারদিন চাকরীর সন্ধানে ঘুরে যখন দেখলে চাকরী পাওয়াটা ঠিক নিরীহ মেয়েকে গাঁ থেকে বার করে' আনার মত সহজ নয় তখন হঠাৎ তার এক আত্মীয়ার সন্ধান পেয়েছে বলে' দুলুকে খবর দিলে। দুলু তখন একটুও সন্দেহ করে নি। তাই একদিন দুপুরবেলা বঙ্কু দুলুকে একখানা থার্ডক্লাশ গাড়ীর খড়খড়ি তুলে দিয়ে কাঞ্চমণির কাছে রেখে গা ঢাকা দিলে। তারপর অনেক অনুসন্ধানের পর যখন এক ষাট টাকা মাইনের চাকরী জোটালে তখন দুলুকে একদম ভুলে গেছে। তাই হঠাৎ যখন গাঁয়ের জরিমানায় চিঠি পেলে তখনই জানতে পারলে—দুলু বনপুরে। চিঠিটা পেয়ে সুবোধ ছেলেটীর মত পঞ্চাশটী টাকা পাঠিয়ে দিয়ে ভাবতে বসল—আশ্চর্য্য? দুলু বনপুর গেল কি করে' কার সঙ্গেই বা গেল? বাঘের মুখ থেকে গরু সরিয়ে নেওয়া বরং সহজ কিন্তু ক্ষ্যান্তর কবল থেকে দুলুকে উদ্ধার করা—পুলিশের হাত নেই তো? একবার আসল ব্যাপারটা জানা দরকার হয়েছে।

তারপর আরও দিন চারেক কেটে গেছে। ইতিমধ্যে পারুলের একখানা চিঠি এসেছে। পারুল লিখেছে—"জোয়ান-দা! বড় মজা হয়েছে, তোমার মাসী মরেছে। কি কতকগুলা কাগজ-পত্তর বাণ্ডিল ক'রে তার উকীলের কাছে দিয়ে গেছে। অনেকেই বলছে—তার বাড়ী-ঘর-দোর না কি তোমার নামে লিখে দিয়েছে, আবার কেউ কেউ বলছে, নন্তুর নামে। নন্তু খুব উকিলবাড়ী যাতায়াত কচ্ছে। তুমি চটপট চলে এস। না আস তো আমার টাকা ক'টা পাঠিয়ে দিও। বড্ড দরকার। আজ চারদিন জরে উঠতে পাচ্ছি না, গায়ে ফোড়ার মত কি হয়েছে বড্ড যন্ত্রণা হয়।

ইতি
পারুল"

জোয়ানের মন যেন এ ক'দিন ঘুমে অচেতন হয়েছিল। চিঠির ঐ ক লাইনে কি ছিল কে জানে। জোয়ানের ঘুমন্ত মনটাকে ভয়ানকভাবে ঝাঁকানি দিলে। জোয়ান ছটফট

করতে লাগল। তার ভেতরে আজ 'কলকাতার জোয়ান' শয়তানের মত মাথা তুলে দাঁড়াল। হঠাৎ তুলুকে সামনে পেয়ে বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল—"তুই ছুঁড়িই যত নষ্টের মূল, তোর জন্যে আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল আমি এখানে চলে এসেছি অমনি নস্তুশালা কি রকম বেড়ে উঠেছে দেখছিস? যাই, গিয়ে সব সায়েস্তা করছি। তুই এখানে মর! আমি চললুম" বলে বারান্দার এককোণে চুপ করে ব'সে রইল। তারপর অন্ধকার যখন তার কালো ডানা মেলে সমস্ত গাঁ খানাকে একটু ক'রে ঢেকে দিলে জোয়ান্ তক্তার তলা থেকে বেগুনে কোটটা টেনে নিয়ে ষ্টেশনের দিকে চলল।

নস্তুর উদ্দেশ্যে জোয়ানের এই ধরণের কথা তুলুর কাণে আজ যেন আগুনের ছ্যাকা দিয়ে দিলে। তুলুর মুখ দিয়ে একটা কথা বেরুল না। জোয়ান চলে যাবার পর তুলু নিজেই আশ্চর্য্য হ'ল, সে কি ক'রে এই রকম এবং এর চেয়েও বেশী অসঙ্গত, অশ্লীলভাষী লোকালয়ে নির্ব্বিবাদে দেড়টা মাস কাটিয়ে আসতে পেরেছে। জোয়ান-সম্বন্ধে তুলুর মনের এক কোণে একটু একটু করে আশার ছবি তৈরী হচ্ছিল যে, বোধ হয় জোয়ানদা একদিন তার ভাষা আর আচার-ব্যবহারে একেবারে বদলে যাবে কিন্তু আজ হঠাৎ আবার জোয়ানের মুখে যখন অব্যবহার্য্য ভাষার অগ্ন্যুৎপাত হ'ল তুলুর মনের কোণের ছবির রেখাগুলা কে যেন নির্ম্মম ভাবে মুছে দিয়ে গেল। তুলু জোয়ানদা-সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলে—"যাকগে—গেল, ভালই হ'ল আর যেন না ফেরে। আমার যত উপকারই সে করে থাকুক, ওদের সংসর্গে না থাকাই ভাল। তখন প্রাণ বাঁচাতে স্রোতের মুখে খড়ের মত জোয়ানদাকে আশ্রয় করেছিলুম, কিন্তু তার প্রয়োজনই বা কি?" এইসব যুক্তি দিয়ে মনের মাথায় থাবড়া মেরে নিজেকে বোঝাবার হাজার চেষ্টা কর্লেও মন কেবলই মাথা তুলে বলতে লাগল—উহু, তা নয়, তা নয়। অবশেষে মনের দ্বন্দ্ব 'বেশ হয়েছে' বলে থামিয়ে দিয়ে তুলু রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। বারোয়ারির বিচারের পর তুলসীমঞ্জরী তুলুর সঙ্গে অনেক গবেষণার পর ঠিক করেছে—জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। উপস্থিত প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে বন্ধুকে একটা চিঠি লিখিয়ে আনা, আজকাল অনেক রকমের বিবাহ হয়, সে তুলুকে বিবাহ কর্ত্তে রাজি আছে কি না, যদি রাজি হয় তবে সব দিকেই ভাল, যদি না হয়, তবে পরের কথা পরে বিবেচনা করা যাবে। মোট কথা এখানে থাকা একেবারে অসম্ভব। সিধু ভটচায মাত্র পনের দিনের সময় দিয়েছে, এরই মধ্যে যা হয় একটা ব্যবস্থা কর্ত্তেই হ'বে। কথা আছে তুলু কালই দুপুরে তুলসীমঞ্জরীর কাছে যাবে। দুজনে পরামর্শ করে চিঠি লিখবে।

তারপর দিন কোনও রকমে চারটী ভাত ফুটিয়ে নিয়ে তুলু যখন খাওয়া-দাওয়া শেষ করলে তখন দুপুর। বাইরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ কচ্ছে। কোথাও ছায়ার নাম মাত্র নাই। গোকলো মুদির ঘরের পরেই মাঠ। মাঠটা ধূ ধূ কচ্ছে, ঐ দূরে দু'টা গরু আপনার মনে চরে বেড়াচ্ছে। গাছের পাতাগুলা শুকিয়ে হলদে হয়ে গেছে।

গোকুলের খোড়ো ঘরের ছাউনির তলায় একটা কুকুর শুয়ে শুয়ে ন্যাজ নাড়ছে, আর জিভ্ বার করে' হাঁপাচ্ছে তুলু সেইদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবলে—মানুষ কি কুকুরের চেয়েও অধম, অস্পৃশ্য। ঐ তো কুকুরটা এই দারুণ রোদ্দুরে আশ্রয় পেয়ে শুয়ে শুয়ে আরামে ন্যাজ নাড়ছে, কই কেউ তো তাকে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসছে না। যত অত্যাচার মানুষ কি শুধু মানুষের ওপরেই করে? সে তো বেশী কিছু চায় না। সে তার নিজেরই গাঁয়ে বাপের ভিটেয়, মাথাটী গুঁজে পড়ে থাকবে, কারুর গলগ্রহ হ'বে না, কারুর অনুগ্রহপ্রার্থী হ'বে না, কারুর কাছে কোনও কিছুই সে আশা করবে না, শুধু নিজের ঘরে মাথা গুঁজে থাকবে। তাও কি এই নিষ্ঠুর সমাজ দেবে না? ততটুকু পাবার আশা সে কি করতে পারে না? যে সমাজ শুধু তাড়িয়েই দিতে পারে, বুকে তুলে নিতে পারে না, তুলুর মনে হ'ল, সে সমাজ কিছুতেই ভাল নয়, ভাল হ'তে পারে না। স্বার্থপর, একচোখো। একই অপরাধে একজনের শাস্তি হ'ল মাত্র পঞ্চাশটা টাকা আর একজনের গ্রাম থেকে চিরদিনের নির্ব্বাসন। তুলুর মন তেতে উঠল, সমাজের ওপর, বন্ধুর ওপর।

ঘরে চাবি দিয়ে ফুলু মাসীর ঘরের উদ্দেশ্যে পা চালিয়ে হনহন ক'রে চলল।

মাসী বল্লে—"আমি যেমন যেমন বলি তুই লিখে যা।"

ফুলু বল্লে—"মাসী দরকার নেই তাকে চিঠি লিখে, আমি থাকতেও চাই না এখানে। অন্য কোথাও চলে গিয়ে ভিক্ষে করে' খাব সেও ভাল।"

মাসী ফুলুর অভিমান বুঝতে পেরে ব'ল্লে,—"রাগ করে কি লাভ বল্। বস্তু ছেলে ভাল, হয় তো বোঝালে বুঝতে পারে। মিছে রাগ করলে সারা জীবনটা কোথায় কষ্ট পাবি, কি যে হ'বে তা তো বলা যায় না, মেয়েছেলে কত কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হয়, এসময় রাগ-অভিমান ছেড়ে দে। এখন হয় তো ভিক্ষে-টিক্ষে ক'রে দু'চার বছর চলবে, লোকে অল্প বয়েস দেখে হয় তো দয়াও কর্ত্তে পারে, কিন্তু শেষ বয়সে কি হ'বে বল দেখি, হয় তো রাস্তায় মরে পড়ে থাকবি,—মুখে এক গণ্ডুষ জল দিতে কেউ থাকবে না।"

তুলসীমঞ্জরীর বলার সঙ্গে সঙ্গে ফুলুর চোখের উপর কলকাতার এক দৃশ্য স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল। তাদেরই বাড়ীর সামনে একদিন এক আধবুড়ী স্ত্রীলোক কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না, মরে পড়েছিল। পাশে তার ভিক্ষার ঝুলি, কোমরে শতছিন্ন ময়লা কাপড় তাও সম্পূর্ণভাবে লজ্জা-নিবারণ কর্ত্তে পারে নি, জঞ্জালের কাছ ঘেঁষে পড়ে আছে মুখের ওপর মাছি ভন্‌ভন কচ্ছে, একটা কুকুর মুখ শুঁকে গেল পাশের বাড়ী থেকে তারই উপর চারটা, চিংড়িমাছের খোলা ছুঁড়ে দিয়ে গেল। ফুলু ভয়ে একরকম অদ্ভুত চীৎকার করে তাড়াতাড়ি মাসীর পায়ে হাত দিয়ে বল্লে,—"না মাসী বল, বল তুমি যা বলবে আমি তাই কর্ব্ব।" মাসী বেশ গুছিয়ে বল্লে, ফুলু বাঁহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে চিঠিখানা শেষ কল্লে। তুলসীমঞ্জরী উঠে গেল। সেদিন বস্তু বারোয়ারির জন্যে পঞ্চাশটা টাকা পাঠিয়াছিল। তুলসী তাই থেকে ঠিকনাটা জেনে একটা কাগজে টুকে রেখেছিল। সেই কাগজ দেখে ফুলু ঠিকানা লিখে দিতে তুলসী বল্লে, "তুই ঘরে যা, আর দেরী করিস্ নি। কাল এম্নি সময় আবার আসিস।" ফুলু কেঁদে ফেলে বল্লে, "মাসীমা! ঘরে একলাটী কি করে থাকব, জোয়ানদা আজ চলে গেছে।"

জোয়ান চলে গেছে শুনে কে জানে কেন আজ তুলসীর কেমন একটু ভয় হ'ল। তুলসীমঞ্জরী মুখে সিধু ভটচাযের ওপর যাই করুক আর যাই বলুক না কেন, আসল ভরসা ছিল ঐ জোয়ান। ঐ একটামাত্র লোক, তার বিপুল ক্ষমতা আর অসীম সাহস নিয়ে এই গাঁয়ের সমস্ত লোককেই ঠেকিয়ে রাখতে পারত। সে আজ চলে গেছে শুনে তুলসীমঞ্জরীর বুক কেঁপে উঠল। ফুলুর সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকেও নিঃসহায় নিরবলম্ব বোধ কর্ল্লে। তুলসী-মঞ্জরী একথাও বেশ জানত সিধু ভটচায একদিকে যেমন ভীরু অপরদিকে তেমনি অসচ্চরিত্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। তার কোপ থেকে নিজেও পরিত্রাণ পাবে বলে তার ভরসা হ'ল না। ফুলুকে বল্লে—"সে কি রে? কোথা গেল?" ফুলু একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে ব'ল্লে—রাগে সঙ্গের সময়। যা'ক গে মাসীমা, ওরা ইতর—কখনও ভদ্দর হয় না।"

মাসীমা বেশ বুঝলে ফুলুর সঙ্গে তার একটা কিছু ঘটেছে তা না হ'লে এই সে দিন সে নিজে যখন জোয়ানের ওপর রেগে উঠেছিল সেদিন ফুলু কেবলই বলেছে—"জোয়ানদা খুব ভাল লোক, আর আজ তার হঠাৎ মতের একেবারে পরিবর্ত্তন। ব'ল্লে—দেখ ফুলু, তুই বড় নেমকহারাম, সে লোকটা নিজের কাজকর্ম্ম ফেলে রেখে, কত ক্ষতিস্বীকার করে' তোকে গাড়ী ভাড়া দিয়ে নিয়ে এল, আর আজ সে হ'ল ইতর।"

ফুলু ঝাঁঝের সুরে বল্লে,—"আহা, কাজকর্ম্ম তো ভারি, কেবল নেশা ভাঙ আর খুনখারাপি—এই তো কাজ আর সে কাজ ভারি ভদ্দরলোকের কাজ।"

মাসী অবাক্। বাস্তবিকই সে খুনী না কি? খুনীর মতই চেহারা বটে। কিন্তু এদিকে চলন-ধরণ, কথা-বার্ত্তায় যেন ছেলে-মানুষি মেশান। ব'ল্লে "বলিস কি? খুনী?"

ফুলু বল্লে—"তা ছাড়া কি? জোয়ানদা তো নিজের মুখেই স্বীকার করেছে;" তুলসীমঞ্জরীর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না, ভয়ে আর বিস্ময়ে তার সারা মনটা ছেয়ে গেল।

রাত তখন অনেক হয়েছে। কোথাও জীবনের সাড়া নেই। গাছের পাতাগুলা পর্য্যন্ত নড়ছে না, যেন ভয়ে। নড়লেই হয় তো ঘুমন্ত পৃথিবীর আরামের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটবে। আকাশের চেহারা অদ্ভুত, কে যেন হাজার জায়গা ফুটোকরা একখানা মিস্‌মিসে কাল চাদর দু'দিক থেকে টান ক'রে ধরে আছে।

ডুলু মামীমার কাছেই যা হয় চারটী খেয়ে নিয়ে ভেতরের দালানের একদিকে ঘুমিয়ে পড়েছে। তুলসী-মঞ্জরী রান্নাঘরের শেকল তুলে দিয়ে নিজের ঘরে এসে রামায়ণখানা হাতে নিয়ে প্রদীপের সামনে বসল। উত্তরকাণ্ডের একটা জায়গা পড়লে—

> যমের দক্ষিণ দোর ঘোর অন্ধকার।
> রাত্রিদিন নাহি তথা সব একাকার॥
> যত যত পাপী লোক সেই দ্বারে থাকে।
> একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে॥

নরকের বর্ণনা পড়ে তুলসীমঞ্জরীর গায়ে কাঁটা দিল। বইটা মুড়ে ভাবতে বসল—এই যে চুরাশী সহস্র কুণ্ড পাপীদের জন্যে খোলা রয়েছে তার মধ্যে ডুলুর স্থান কোথায়? ডুলুর জায়গা যেখানেই হ'ক, তার নিজের জায়গা নিশ্চয়ই ওখানে নয়। কেন না সে পাপী নয়। সে কখনও প্রবঞ্চনা, মিথ্যে কথা, নাস্তিকতা প্রভৃতি পাপ করে নি। বরং সে আজীবন ভাল কাজই কর্ব্বার চেষ্টা করেছে, এই তো সে একজন অসহায় আশ্রিতাকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা কচ্ছে। হ'তে পারে সে একজন ভ্রষ্টা মেয়েকে আশ্রয় দিচ্ছে, কিন্তু আশ্রয় তো সকলকেই দেওয়া উচিত; কিন্তু মনের কোণ থেকে আর একজন উঁকি মেরে বলতে লাগল,—"নিঃস্বার্থ নয়, স্বার্থ আছে,ও যে জনার্দ্দনের মেয়ে।" তারপর সে ভাবতে বসল সে ঠিক ঐ রকম ভাবেই অন্য একজন মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারত, কি না। মনে মনে খুব পারতুম বল্লেও বলার মধ্যে সে জোর নেই। অতর্কিতে জানলা দিয়ে বাইরের গাঢ় কাল আকাশের দিকে তাকাতেই তুলসী-মঞ্জরীর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ কর্ত্তে লাগল। মনে হ'ল আকাশ দানবের মত তার লক্ষ লক্ষ চোখ মেলে তার অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখবার চেষ্টা কচ্ছে। ধড়াস্ করে' জানালাটা কোনও রকমে বন্ধ করে' দিয়ে মেঝের বিছানায় আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে তার মনে হ'তে লাগল—সে বৃথাই এতকাল রামায়ণ পড়ে এসেছে। এতকাল সে তার নিজের মনের মত ব্যাখ্যাই করে'এসেছে, আর সেই মত তৃপ্তি পেয়েছে। কতদিন সে নিজের পরোলোক-সম্বন্ধে মিথ্যে গর্ব্ব মনে মনে পুষে এসেছে। এমন-কি অনেক সময় সে নিজেকে মনে মনে সীতার পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে আনন্দে ফুলে উঠেছে। সবই আজ তাসের ঘরের মত চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়ল! সে তৃপ্তি, সে আনন্দ, সে শান্তি সবই ভুয়ো ভুয়ো—একেবারে ভুয়ো।"

তারপর আরও দিন পাঁচ-সাত কেটে গেছে। এই কদিনে তুলসীমঞ্জরী যেন অনেক বদলে গেছে—শরীরেও মনেও। চোখের কোলে কে যেন খানিকটা কালি ঢেলে দিয়েছে। মুখের সে সহজ হাসি নেই। ডুলুকে আশ্রয় দেওয়া একটা সাধু কাজ বলে ধারণা ছিল বলেই তার বুকে যথেষ্ট বল ছিল, কিন্তু সেদিন রাত্রের পর থেকেই তার সমস্ত সাহসই মন থেকে উবে গেছে। নিজের পরলোক-সম্বন্ধেও তার যথেষ্ট দ্বিধা জন্মেছে, তাই সে ঠিক করেছে—ডুলু পাপীই হ'ক আর ভালই হ'ক ডুলুকে বাঁচানয় তার স্বার্থ আছে এবং সেই স্বার্থের মূলে তার নিজের পাপের ছোট্ট ইতিহাস লুকান আছে; সুতরাং ডুলুর সম্বন্ধে সে আর কোন কিছুই কর্ব্বে না; নিজের জন্যে পরলোকের সম্বল হিসাবে যদি কিছু করবার থাকে তাই প্রাণপণ যত্নে কর্ব্বে। তাই সে উঠে-পড়ে লেগে গেল ধর্ম্মানুষ্ঠানে। বারোয়ারি তলায় লক্ষ্মীজনার্দ্দনের ভোগ রাঁধে এক পূজারী ব্রাহ্মণ। তুলসীমঞ্জরীর হঠাৎ মনে হ'ল কৃচ্ছ্রসাধনের প্রথম সোপান হিসাবে ঐটাকে আগে অবলম্বন করা দরকার। তাই হঠাৎ সেদিন সিধু ভটচাযের পায়ের ধূলা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—"আচ্ছা কাকা, ঠাকুরের ভোগ পূজারী ব্রাহ্মণকে দিয়ে রাঁধিয়ে লাভ কি? ও কি পুরুষমানুষের কাজ? চিরকাল তো মেয়েরাই করে' এসেছে। আমায় বলেন তো আজ থেকে আমিই রাঁধার ভারটা নিই।" সিধু ভটচায তুলসীমঞ্জরীর এ রকম হঠাৎ পরিবর্ত্তনের কারণ কিছু বুঝতে না পেরে প্রথমটা

অবাক্ হ'ল। তারপর বললে—"সে কি? তুই রাঁধবি? তা হ'লে তো ভালই হয়। মিছিমিছি ভোগরান্নার মাসে দু'টাকা ক'রে বেশী যায় কেন? বেশ তাই হোক, কিন্তু একটা কথা—"

দুলু সম্বন্ধে তুলসী তাড়াতাড়ি বল্লে—"সে সম্বন্ধে আমায় কিছু জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন না। আপনারা যা ইচ্ছে করুন।"

তুলসী যখন বাড়ী ফিরল তখন তার মনের মধ্যে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ হ'ল—যা'ক্, অনেকটা কাজ এগিয়ে যাওয়া গেল। তার পরদিন থেকেই রাত থাকতে উঠে দেড়ক্রোশ পথ হেঁটে গাঁয়ের নদীতে স্নান ক'রে আসে। অতি শুদ্ধভাবে জপ-আহ্নিক সেরে পট্ট-বস্ত্র পরে ভোগরান্নায় লেগে যায়। তার নিজের রান্না উঠিয়ে দিয়েছে, সে একবেলা ঐ ভোগের অল্পমাত্র খেয়ে আসে এবং রাত্রে ঠাকুরের প্রসাদ ফলমূল খেয়ে থাকে। তুলসীমঞ্জরী ঠিক কল্লে—কোনও কিছু উপলক্ষ পেলেই সে উপবাস কর্ব্বে এবং বাকি ক'দিন এইরকমভাবে অল্প আহার ক'রে কাটাবে।

এদিকে দুলু মাসীর এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনে শুধু আশ্চর্য্য নয়, ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। মাসী তার দিকে ফিরে তাকায়ও না, জবাবও দেয় না, অথচ পনের দিনের মাত্র দিন তিনেক বাকি। দুলুর মাত্র ভরসা বন্ধুর চিঠি। তাও তো কই চিঠি এল না। দুলু সন্ধ্যের সময় ঘরের আলোটা জ্বেলে দরজা ঠেস দিয়ে ব'সে ব'সে নিজের অদৃষ্টের কথা, মাসীর উপেক্ষার কথা, জোয়ানদার হঠাৎ চলে যাওয়ার কথা, চিঠির কোনও জবাব না আসার কথা হতাশভাবে যখন ভাবছে তখন হঠাৎ দরজার বাইরে কার পায়ের আওয়াজ হ'তেই দুলুর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর গলার আওয়াজ হ'ল—"এই যে দুলু। তুলসীমাসীর ওখানে গেছলুম, দেখলুম না, তুমি তা'হলে ঘরেই আছ দেখছি।" দুলু অন্ধকারেই বন্ধুর অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখেই একবার চমকে উঠেই কি রকম বিমূঢ় হ'য়ে ব'সে রইল, গলা দিয়ে একটু শব্দ পর্য্যন্ত বেরুল না।

তের

কলকাতার গ্যাসের আলো, রাস্তার কোলাহল, গাড়ীঘোড়ার দৌড়-ঝাঁপ, গমগমে আওয়াজ জোয়ানের রক্ত নাচিয়ে দিলে। জোয়ানের মনে হ'ল—সামনের চওড়া চওড়া রাস্তা, ধারের সরু সরু গলি যেন শহরটার শিরা-উপশিরা; ট্রাম বাস, ফিটন, মুটে, বাবু, সাহেব, এরা যেন রক্ত, জোরে জোরে চলাচল করছে। জোয়ান শিয়ালদার গির্জ্জেটার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফ ছাড়লে—"আঃ বাঁচা গেল। টেঁকে হাত দিয়ে দেখলে বাকী ক'গণ্ডা পয়সায় উপস্থিত বিনোদ সার দোকানের খরচটা চলতে পারে! দোকান থেকে যখন বেরুল জোয়ানের মাথার মধ্যে রক্ত ঝিম ঝিম কচ্ছে। কানাইবাবুর গলির মোড়ে পৌছুতেই দেখলে দূরে ভিড় জমেছে। একটু এগিয়ে গিয়ে নজরে পড়ল—লাল পাগড়ী। ভিড়ের পেছন থেকে উকি মেরে দেখলে, পটলীর ঘরে খনাতল্লাসী চলছে। আর একখানা বাড়ী ছাড়িয়ে গেলেই পারুলের ঘর। রাস্তা থেকেই দেখলে, পারুলের ঘরে দিব্যি গান-বাজনার মজলিস্ চলেছে। বুঝলে,—পারুলের অসুখের কথা সব মিথ্যে। কিন্তু আজ জোয়ানের শরীর বড় ক্লান্ত, কোথাও একটু শুয়ে পড়তে পারলেই ভাল হয়। জোয়ান আর দাঁড়াল না, নিজের ঘরে এসে ঢুকল দেশলাই জ্বেলে দেখলে তক্তা-পোষটা ঠিকই পাতা আছে। হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে সটান শু'য়ে পড়ল। মাঝরাতে জোয়ানের ঘুম ভাঙল পাশের ঘরের চাপা গলার ফিস ফিসে আওয়াজে। জোয়ানের মনে হ'ল কার উদ্দেশ্যে কে যেন অজস্র আদরের বাণী ঢেলে দিচ্ছে। জোয়ান একবার ভাবলে হঠাৎ রামখেলানের হ'ল কি? একটা হাই তুলে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালের মিঠে রোদটুকু আশপাশের সকল বাড়ীর দেওয়ালে, বারান্দার ছাদে তা'র হাতের স্নেহের পরশ লাগিয়ে দিয়ে রংচটা বালীখসা বাড়ীগুলাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। শুধু যা জোয়ানের ঘরেই ঢুকতে পাচ্ছে না। সকালে এই সময়টা রামখেলান আর লছমিয়া কাপড়ের দু'দিক ধরে এক রকম আওয়াজ করে ভাজ করে। কাপড় ভাঁজ করার ফট ফট আওয়াজ এ ঘরে আসছে। জোয়ান উঠে বসল। হাত দুটাকে বার কতক সজোরে শূন্যে ছুঁড়ে আবার চুপ করে বসে রইল। কি ভেবে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে একবার

চতুর্দ্দিক চেয়ে নিলে—পার্কের ঐ কোণে তখনও গোটাকতক ছেলে একটা কুকুর নিয়ে ছুটাছুটি কচ্ছে। কতকলোক বাজার করে পার্কের মাঝখানকার সরু পিচ দেওয়া পথ দিয়ে ফিরছে। জোয়ানের বড় ভাল লাগল। যেন কতকাল এদের দেখে নি। হঠাৎ কাল রাতের রামখেলানের কথা মনে পড়তেই, রামখেলানের বুদ হয়ে না থেকে হঠাৎ এই ভীমরতি বা সুমতি হওয়ার ওপর দুটো রসিকতা করবার লোভে রামখেলানের ঘরের দিকে গেল। ঘরের সামনে গাধাটা বাঁধা। পিঠে সজোরে একটা চাপড় মেরে সরিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকতেই লছমিয়া ইস্তিরি কর্ত্তে কর্ত্তেই একবার চোখ তুলে দেখে নিয়ে ব'ললে; "কবে ঘুম্‌লি ?" লছমিয়ার ঠোঁটে চাপা হাসি। জোয়ান একবার লছমিয়ার দিকে তাকিয়ে নিয়ে ব'ললে—"তোকে বড় মিঠা লাগছে লছমিয়া। ব্যাপার কি ?" অপর দিকে যে লোকটা এইমাত্র ভাঁজ করা কাপড়খানা সযত্নে রাখছিল তার নাম ছট্টু।

আজ প্রায় মাসখানেক রামখেলান ভববীলা শেষ ক'রেছে। একদিন দারুণ নেশার ঘোরে কাপড়ের মোট নিয়ে সার্কুলার রোড ধরে আসছিল, হঠাৎ গর্দ্দভপুঙ্গব কি কারণে ভয় পেয়ে এলোমেলোভাবে রাস্তা দিয়ে ছুটতে থাকে। রামখেলানও কাপড়ের জন্যে নাই হ'ক, নেশার ঘোরেই বাহনটার পাছু নেয়। তারপর হঠাৎ একটা মোটার তার সমস্ত শক্তি নিয়ে তার ঘাড়ে পড়ে। তারপর হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। লছমিয়া দুদিন খুব কাঁদলে। রুগ্ন মেয়েটার জন্যে দু'চার ঘর মনিবদের কাছ থেকে কিছু চাঁদা তুললে। কিন্তু এমন বরাত। সেও টিঁকল না। ছেলেদের লিভারের দোষ না কি সাংঘাতিক, তাইতেই ম'ল। লছমিয়া এবার আর কাঁদল না। নিজের ঘরেই মুখ গুঁজে পড়ে রইল। রামখেলানের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হ'লেও ছট্টু ছিল রামখেলানের বন্ধু। ছট্টুর অনেককালের সাধ লছমিয়াকে বিয়ে করে। সে-ই এসে লছমিয়াকে দরদ জানিয়ে আবার চান করায়—খাওয়ায়। এমন-কি তারই যত্নে লছমিয়া বুক বেঁধে আবার কাজ করতে লাগল। আজ দিন আষ্টেক হ'ল ছট্টু লছমিয়াকে বিয়ে করেছে। ছট্টু ইটলীর বাসা উঠিয়ে এনে লছমিয়ার সঙ্গে এক করে' ফেলেছে।

জোয়ানের গলার আওয়াজ পেয়ে একবার তাকিয়ে নিয়ে ছট্টু ভাবলে বোধ হয় গাঁহাক। কিন্তু জোয়ানের মুখে নিজের সদ্যবিবাহিত স্ত্রীর লছমিয়ার রূপের প্রশংসা শুনে শুধু অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রইল। ছট্টুর ওপর হঠাৎ নজর পড়তেই জোয়ানের মুখের ভাব হ'ল—তুই আবার কে রে ?

লছমিয়া বুঝতে পেরে, পাছে জোয়ান ঐ সদ্যবিবাহিত দ্বিতীয় বারের স্বামীটাকে হঠাৎ কটু কথা কিছু বলে' ফেলে, তাড়াতাড়ি বললে,—"মেরে আদমি।" জোয়ান লছমিয়ার কথা শুনে কিছু বুঝতে না পেরে বললে,— "রামখেলান ?" লছমিয়ার হাত থেকে ইস্তিরি পড়ে গেল, চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল, হঠাৎ চীৎকার করে কেঁদে উঠলো—"রামখেলান হো"—কাঁদতে কাঁদতে ধপ্ ক'রে ভুঁয়ে বসে পড়ল। ছট্টু এই আগন্তুকটার ওপর সুরু থেকেই বিরক্ত হয়েছিল, তারপর রামখেলানের কথা তুলে লছমিয়াকে যখন বসিয়ে দিলে তখন খাপ্পা হয়ে এগিয়ে এসে আগে নতুন ইস্তিরিটা তুললে, পরে জোয়ানকে ব'ললে—"তুম কোন্ রে ফজিলমে ঝামেলি—" লছমিয়ার কান্না আর থামে না। ছট্টু যত বোঝায় তত ডুকরে কেঁদে ওঠে। জোয়ানের কাছে ব্যাপারটা অনেকখানি পরিষ্কার হ'ল—রামখেলান মরেছে, এবেটা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। জোয়ান মনে মনে কত কি তোলাপাড়া করতে লাগল। লছমিয়ার কান্না আচ্ছা অদ্ভুত তো! জোয়ানের মনের মধ্যে কি যেন একটা কথা, কিসের যেন সুর বাজছে—তার সঙ্গে যেন লছমিয়ার কান্নার অনেকটা মিল আছে, তাই লছমিয়ার কান্না হঠাৎ জোয়ানকে ভয়ানক বিব্রত করে' তুললে। আস্তে আস্তে বাইরে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে জিজ্ঞাসা করেলে—"তোর লেড়কী ?"

লছমিয়া দু'হাতে ধপাধপ করে' বুক চাপড়ে চেঁচিয়ে উঠল—"সো ভি ভাগ গিয়া রে, মেরে কলিজা—

জোয়ান এক লাফে দরজা, আর এক লাফে রাস্তার পড়েই একটু ছুটলে। তারপর আস্তে আস্তে চলতে লাগল। এসব ব্যাপার আগে অনেক হয়েছে, একদিনের

তরেও জোয়ানের মনকে নাড়া দেওয়া তো দূরের কথা, মনের কাছে ঘেঁষতেই পারে নি। আজ কিন্তু তার ঠিক সে অবস্থা নয়। সেই যে একদিন দুলুর কান্না মনকে অকারণেই নাড়া দিয়েছিল,সেই থেকেই মনের ভিত আলগা হয়েছে, অপরের দুঃখের ঝোড়ো হাওয়া মনের পাশ দিয়ে গেলেই অতর্কিতে মনটা নড়ে ওঠে। তাই লছমিয়ার কান্না জোয়ানের মনের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতা কেড়ে নিলে। তাই এক পা এক পা করে' এগিয়ে যখন পারুলের ঘরে পা দিলে তখন পারুলের মিথ্যা চিঠির কথা স্মরণ করে' কিছুতেই পারুলের ওপর চটল না, বরং ভেতরে ভেতরে একটা সহানুভূতির সুর বেজে উঠছিল। তাই জোয়ান মনে মনে ঠিক করলে—যাক্, এবারের মত পারুলকে শুধু একটু ধমক দিয়ে ছেড়ে দেবে, কিছু বলবে না। ঘরে পা দিয়েই ধমকের সুরে ডাকলে "—পারুল।" ঘরের কোণ থেকে অস্ফুটস্বরে আওয়াজ হ'ল—"কে? জোয়ানদা!" জোয়ান পারুলের ক্ষীণস্বরে যত না চমকে উঠল, তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হ'ল তার চেহারা দেখে। বেঁচে থেকে যে মানুষের চেহারা ঐরকম হ'তে পারে জোয়ান তা শুধু আজকেই জানলে। জোয়ানের মুখ দিয়ে একটা কথা বেরুল না, চুপটী করে' দাঁড়িয়ে রইল। পারুল একবার কাৎরে উঠে আস্তে আস্তে পাশ ফিরে বললে,—"তোমার কথাই ভাবছিলুম জোয়ানদা! তুমি তো চলে গেলে আমার টাকা ক'টা নিয়ে, তারপর আমি মরি আর কি? উঃ ক'দিন যে কি কষ্ট গেছে। বাপ রে! কাল রাত্তিরেও জ্বর গায়ে চেঁচিয়েছি। নগদ তিরিশটা টাকা কাল পেয়ে গেছি।" হঠাৎ বুক থেকে চাদরটা সরিয়ে দিয়ে ব'ললে—"এগুলো পেকে উঠেছে কোথাও বাকি নেই, সর্ব্বাঙ্গে বেরিয়েছে।" পারুল হাঁপিয়ে পড়ল, আর বলতে পারলে না। জোয়ান দেখলে পারুলের একটী কথা মিথ্যে নয়। গুটীতে সমস্ত শরীর ছেয়ে ফেলেছে। জোয়ান আর দাঁড়াল না, রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, খানিকদূর এসেই আবার পারুলের ঘরের দিকে ফিরল। এবার আর ঘরে ঢুকল না। রকের ওপর উঠে বাইরের জানলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"হাঁ রে মাসীর সেই কাগজ-পত্তর কোন্ উকিলের কাছে আছে?" অস্ফুটস্বরে আওয়াজ হ'ল—"ননী উকিলের কাছে।" জোয়ানের মনটা সকাল থেকে বিগড়ে গেল। আজ কেবল একই সুর, চারিদিকে যেন কান্না আর কান্না। আজ আর জোয়ান আগেকার মত মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলে না। তবুও কতকটা হাল্কা হ'বার চেষ্টায় একটা বিড়ি ধরিয়ে বাড়ি, ঘর, টাকা, দলিল, এইসব ভাবতে ভাবতে ননী উকীলের বাড়ীর দিকে চলল।

অনেক হাঁকডাকের পর কে ভেতর থেকে জবাব দিলে "—বাড়ী নেই।" জোয়ান উঠল না, উকীল বাড়ীর বাহিরের রকে বসে-বসেই বিড়িটা শেষ করলে। বেলা তখন সাড়ে এগারটা। রাস্তায় রোদ চন্ চন্ করছে। সামনে দিয়ে কত লোক যাতায়াত করছে। পিয়ন বাড়ী বাড়ী চিঠি বিলি ক'রে গেল। একটা রিক্সওয়ালা সামনের বাড়ীর দুটো লোককে নামিয়ে দিয়ে ভাড়ার জন্তে হাঁকাহাঁকি করছে। একটা ফিরিঙ্গির ছেলে গুলটিপ নিয়ে জঞ্জালের মধ্যে বেড়ালকে তাগ কচ্ছে। জোয়ান্ কি ভেবে উঠে পড়ল। লছমিয়ার কান্নাভেজা মুখ, পারুলের রুগ্ন চেহারা, এসবের তলায় আর একজনের করুণ কচি মুখ কেবলই উঁকি মারছে। সকল কিছুর মধ্যেই যেন দুলু। আশ্চর্য্য! যত কিছু দুঃখু, যত কিছু কান্না সবের মধ্যে দিয়ে যেন দুলুর কান্নাই জোয়ানের কাণে আসছে। জোয়ান কি ভেবে আবার বড় রাস্তায় নেমে পড়ল—বোধ হয় এক ছোকরা ডাক্তারকে দেখে। তার ভেতরের পকেট থেকে রুগী-দেখা নলটা উঁকি মারছে। জোয়ান হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বল্লে,—"দেখ,একটী রুগী আছে, তাকে কি করা যায় বল দেখি। খুব জ্বর, খুব কষ্ট। গায়ে সব ফোড়া।" ছেলেটী প্রথমে ভাবলে—পাগল। তারপর বল্লে,—"রুগী কোথায়? তার কে আছে?" জোয়ান হঠাৎ চটে উঠে বল্লে—"দেখবার কোন বেটী নেই, তা হ'লে আর জিজ্ঞাসা করছি।" ডাক্তার বল্লে,—"আম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে দাও।" জোয়ান বল্লে—"দাও বল্লে তো হ'বে না, তুমিই ডেকে দাও।" ডাক্তার প্রথমটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কচ্ছিল। পরে কি ভেবে বললে,—"আচ্ছা, চল দেখি।" কাছেই এক মেড়োর কাপড়ের দোকান। জোয়ান একরকম হাত ধরে' তাকে টেনে নিয়ে গেল।

ফোন করা হ'তেই জোয়ান পারুলের ঘরের দিকে চলল। জোয়ান যখন পারুলের বাড়ীর সামনে এল, তখন মুক্ত বাজার করে' ফিরছে। সে পারুলদের বাড়ীরই ওপরের ঘরে থাকে। তার বাঁ হাতে দুটা লম্বা চিচিঙ্গে তার কচি সবুজ ডোরাকাটা ডগা দুটো মাটীতে ঠেকছে। বাঁ হাতে একটা চুবড়ী। চুবড়ীতে দুটা বড় বড় কুমড়ার ফালি কতকগুলা পেঁয়াজ, তার নীচে কুচো চিংড়ি। জোয়ানকে দেখেই মুক্ত অল্প একটু হেসে বললে,—"একটু ধর, না ভাই, কাপড়ের কসিটা এঁটে নিই।" জোয়ান ধরলেও না, জবাবও দিলে না। সটান্ পারুলের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। মুক্ত এদিক-ওদিক চেয়ে, দেখলে,—ওবাড়ীর রকে সুরো উবু হ'য়ে ব'সে সোডাওয়ালার সঙ্গে গল্প করছে। মুখ টিপে ডাকলে—"ও সুরো, বলি এ ছোঁড়ার হ'ল কি? একদম ভেল্ বদলে ফেলে যে, কত ঢংই দেখলুম" বলে হাসতে হাসতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল। জোয়ান পারুলের ঘরে গিয়ে দেখলে, পারুল ঠিক সেইভাবেই শুয়ে আছে, ডাকলে—"পারুল।" পারুলের সাড়া নেই। বাইরে হর্ণের আওয়াজ হ'ল। জোয়ান বেরিয়ে এল। আম্বুলেন্সের দুটা লোক জোয়ানের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে ধরাধরি করে' পারুলকে গাড়ীতে তুলে দিতেই পারুলের চমক ভাঙ্গল। ডাকলে—"জোয়ানদা!" জোয়ান গাড়ীর পাশেই দাঁড়িয়েছিল' বললে,—"যা, না, সেরে যাবি।" পারুল ব'ল্লে,—"ভাই, আমার তিরিশটা টাকা বিছানায় আছে, এনে দাও জোয়ানদা। তুমি ভাই আমার সঙ্গে আসবে?" জোয়ান বালিশের তলা থেকে নোট ক'খানা এনে পারুলের আঁচলে বেঁধে দিয়ে ব'ল্লে,—"টাকা বেঁধে দিয়েছি, যা।"

পারুল, "জোয়ানদা, ভাই—" বলে' কি একটা ব'ললে বোঝা গেল না, গাড়ীর হর্ণের আওয়াজে চাপা পড়ে গেল।

তারপর আরও ক'দিন কেটে গেছে কলকাতার সে মোহ আর নেই। সেই যে সেদিনের লছমিয়ার কান্না, পারুলের অসুখ আর দুলুর করুণ মুখ জোয়ানের মনের মধ্যে একটা বেখাপ্পা, বেসুরো, করুণ সুর বাজিয়ে দিলে, সে সুর যেন কিছুতেই যায় না। সারা দিন-রাত সে যেন একঘেয়েভাবে মনের মধ্যে একই সুরে বেজে চলেছে। কোনও কাজেই উৎসাহ আনতে দেয় না। এই পাঁচদিন ধরে ক্রমাগত ননী উকিলের বাড়ী যাতায়াত ক'রে, জোয়ান যখন বুঝলে মাসীর বাড়ী কিংবা টাকা পেতে হ'লে আগে আইনের অনেক দুর্ব্বোধ্য জিনিস বুঝতে হ'বে, পরে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হ'বে এবং উপস্থিত কিছু গাঁটের কড়িও খরচ করতে হ'বে, তখন সে একরকম নিরুৎসাহ হ'য়েই ব'সে রইল।

চৌদ্দ

পাঁচির ওখানে ভাত খেয়ে, তারই ভাঙ্গা তক্তপোষটার ওপর শু'য়ে জোয়ান দিবানিদ্রায় সমস্ত দুপুরটা কাটিয়ে দিলে। তার দেহ এবং মন দুই-ই আজ অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে; কোন কাজেই যেন উৎসাহ নেই—কোন কিছুতেই যেন মন বসতে চায় না। একটা বিরাট্ শূন্যতা, একটা অলস নিশ্চেষ্টতা আজ তার মনটাকে নেশার মত আচ্ছন্ন করে' ফেলেছে। দীর্ঘ চার ঘণ্টাকাল দিবানিদ্রার পর সে যখন চোখ কচ্‌লে বিছানার ওপর উঠে ব'সল—তখন বেলা শেষ হ'য়ে এসেছে,—অপরাহ্নের পড়ন্ত ম্লান রৌদ্রটুকু জানালার ফাঁক দিয়ে কোণাচেভাবে তক্তপোষের একটা ধারে এসে পড়েছে। সামনের খোলা জানালাটার কোলেই সরু গলি। গলির ওপারের হলদে রংএর দোতলা বাড়ীটার ছাদে আলসের ধারে দাঁড়িয়ে একটী বধূ দীর্ঘ-ঘোমটাটাকে কপালের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে পাশের বাড়ীর আর-একটা মেয়ের সঙ্গে কথা কইছে। সুমুখের গলি দিয়ে ফিরিওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে; একটা রিক্সগাড়ী ঠিং-ঠিং-ঠিং-ঠিং করে' সুমুখ দিয়ে চলে গেল—তার ঘণ্টাধ্বনি অস্পষ্ট, অস্পষ্ট হ'তে হ'তে কখন এক সময় বাতাসে মিলিয়ে গেল।

জোয়ান চুপ ক'রে' বসেছিল। কেন কে জানে; আজ তার দেহ এবং মন কোনটাই কাজ করতে চাইছে না। তারা যেন ক্লান্তির শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছে। পাঁচি ভাত খেয়ে পান বিক্রি করতে বেরিয়েছে,—ফিরতে রাত হ'বে। একলা ঘরে চুপ করে' বসে' থাকা জোয়ানের পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠল,—তার প্রকাণ্ড বুকখানায় ভেতর কেন

খাঁ খাঁ করছে,—সে যেন একটা প্রকাণ্ড ভাঙ্গাবাড়ী, যার মধ্যে ধ্বনি নেই—আছে কেবল প্রতিধ্বনি। হঠাৎ লম্বা দুটো হাত উঁচুতে তুলে গামোছা দিয়ে, হাই তুলে সে শয্যাত্যাগ ক'রে উঠে পড়ল এবং লক্ষ্যহীনভাবে পথে বেরিয়ে প'ড়ে যেদিকে দু'চক্ষু যায় চলতে সুরু করে' দিলে।

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। বড় রাস্তার দু'ধারের আলোগুলা মিটমিট ক'রে জ্বলে উঠেছে। অদূরের একটা তেতালা বাড়ীর ছাদের পাশেই একফালি চাঁদ ছোট একটুকরা ছিন্ন মেঘের টুকরার মত আকাশের গায়ে প্রায় মিশিয়ে রয়েছে।—এমনি আবছা এবং ম্রিয়মাণ। জোয়ান গলির মোড়ের কাছ বরাবর এসে একবার থমকে দাঁড়াল, —কোন্‌দিকে যাবে সে! দুনিয়ার সকল দিক্‌ই তার পক্ষে সমান,—কোন দিক্ থেকেই কোন তাগিদ নেই,—কোন আকর্ষণ নেই; শুধুই চলা আর চলা—লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরের মত

হঠাৎ তার নজরে প'ড়ে গেল—অদূরে যে নূতন বাড়ীটা তৈরী হ'চ্ছে তারি তলায় অনেকগুলা লোক ভিড় করে' দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্যদিন হ'লে জোয়ান ছুটে যেত, আর কিছুর জন্যে না হ'লেও, অন্ততঃ কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্যে। তার মধ্যে রসজ্ঞান কোনদিনই ছিল না, —কিন্তু কৌতূহল ছিল অফুরন্ত। সে যেন একটা বিরাট্ উদ্দাম শিশু। আজ কে তাকে তার সেই শৈশবের রাজ্য থেকে এমন নির্ম্মমভাবে নির্ব্বাসিত করে' দিলে? এই কি তার জীবনের প্রথম যৌবনারম্ভ? এই কি সেই সন্ধিক্ষণ, যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ, পৃথিবীকে দেখে না —স্বপ্ন দেখে?

অভ্যাসবশতঃ সেই ভিড়টার দিকে সে তার অলসমন্থর পাদু'টাকে চালিয়ে নিয়ে গেল বটে কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু ব্যস্ততা, এতটুকু আগ্রহ, এতটুকু কৌতূহল নেই। কাছে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে সে দেখে, একজন কুলিশ্রেণীর লোক একজন কুলিরমণীর কোলে মাথা রেখে চুপ ক'রে রাস্তার ওপর পড়ে রয়েছে, আর সামনের মেস-বাড়ীর দুটী ছোকরা তার পায়ের যে জায়গাটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে সেইখানটায় বরফ ঘ'ষে রক্ত বন্ধ করবার চেষ্টা করছে। ক্ষত যে খুব সাংঘাতিক তা' নয়—তবে অনেকখানি কেটে গেছে এই যা।

জোয়ান চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। কি অপূর্ব্ব মমতা ঐ কুলিরমণীর মুখে-চোখে! সে যেন তার সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত স্নেহ, সমস্ত মাধুর্য্য, সমস্ত দরদ, সমস্ত সহানুভূতি তার ছোট ছোট সজল চোখ দুটীর ভেতর দিয়ে ঐ আহত লোকটার অবসন্ন ক্লান্ত দেহখানির ওপর নিঃশেষে ঢেলে দিতে চায়। আর কি গভীর শান্তি, কি নিবিড় সন্তোষ, কি অখণ্ড আত্ম-বিস্মৃতি ঐ আহত লোকটার অবসন্ন মুখখানির উপর ভেসে উঠেছে! অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব! জোয়ান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে,—তারপর আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে হেদোর মোড়ের কাছে এসে কি মনে ক'রে সে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। রাত হ'য়ে এসেছে। লোকের তেমন ভিড় নেই। দীঘির চারিদিকে একটা পাক দিয়ে সে ক্লান্তভাবে একটা গাছের তলায় ঘাসের ওপর গিয়ে বসল। তার দেহ আর মনের ক্লান্তির শেষ নেই। তার মনে হচ্ছিল—আজ তার জন্যে একটী স্নেহময় কোল চাই যেখানে মাথা রেখে ঐ আহত কুলিটার মত সে চুপ করে' খানিক পড়ে থাকতে পারে।

* * * *

তার পরদিন থার্ড ক্লাশের একটা টিকিট কেটে জোয়ান ট্রেণে গিয়ে উঠল। বনপুর ষ্টেশনে সে যখন গিয়ে নামল তখন বেলা বারটা বেজে গেছে। চারিদিকে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। ষ্টেশন থেকে দুলুদের বাড়ী প্রায় দেড় ক্রোশের পথ। নাওয়া নেই,—খাওয়া নেই, তার ওপর কাল সারারাত সে ঘুমায়নিও নি; কিন্তু কেন কে জানে, তার মনটা ভেতরে ভেতরে একটা স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে। আজ যেন দুনিয়ার সব কিছুই তার ভাল লাগছে। পথের ধারের একটা ডোবা থেকে একজন গ্রামের বউ কলসী কাঁখে পথের ওপর কালো একটা ছায়া ফেলে চলে গেল। অদূরে এক পাঠশালায় ছেলেরা এক ঘেয়ে সুরে নামতা মুখস্থ করছে। একটা পাতায়

ঘরের সামনে দাওয়ায় ব'সে দুটী বৃদ্ধ দাবা খেলছে। এই সামান্য, অতিসাধারণ দৃশ্যও আজ জোয়ানের কাছে অপূর্ব্ব ব'লে মনে হচ্ছে। চলতে চলতে তার বার বার মনে হচ্ছিল—দুনিয়াটা কি চমৎকার! এর মধ্যে মনে হচ্ছিল কোথাও যেন কোন নিষ্ঠুরতা, কোন উগ্রতা, কোন বিশৃঙ্খলা নেই। এতদিন ধ'রে সে যে জগৎটাকে দেখে এসেছে সে সত্যকারের জগৎ নয়—সে একটা দুঃস্বপ্নের জগৎ। আজ যেন সে হঠাৎ জেগে উঠেছে—তার দুঃস্বপ্নে-দেখা কুৎসিত জগৎটা জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। আজ দুনিয়ার মধ্যে কোথাও যেন কোন জটিলতা নেই—সবই যেন সহজ, সরল, নিরুদ্বেগ। সঙ্গে সঙ্গে একটী তরুণীর সহজ সরল করুণ মুখখানি তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল। আজ দুলুর কাছে গিয়ে কত কথাই সে বলবে, ভদ্রলোক যেমন ক'রে কথা বলে ঠিক তেমনি ক'রে;—তার মধ্যে এতটুকু উগ্রতা, এতটুকু অসংযম থাকবে না; সে দুলুর গা ছুঁয়ে শপথ করবে—সে জীবনে আর কোনদিন মদ ছোঁবে না,—কিন্তু এ শপথ সে কি রাখতে পারবে? নিশ্চয়ই পারবে,—তার আজ মনে হচ্ছে দুলুর জন্যে সে সব করতে পারে—সব—সব! এমনি আরও কত শপথ সে করবে! কেন কে জানে, তার চোখ দুটা সহসা জলে ভ'রে উঠল। তার ইচ্ছা যেতে লাগল—ছোট ছেলের মত করে' দুলুর কোলখানির মধ্যে মুখ লুকিয়ে সে আজ খুব খানিকটা কাঁদে। পরক্ষণেই এক জোড়া অশ্রুসজল করুণ চোখ তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল—কি অপূর্ব্ব মমতা সেই চোখ দুটীতে! কি গভীর সহানুভূতি, কি আন্তরিক দরদ! একটা গভীর তৃপ্তির আবেশে পথের মধ্যেই তার চোখ দুটী বুজে আসতে লাগল।

দুলুদের বাড়ীর দরজার কাছে এসে সে যখন দাঁড়াল, তখন বেলা একটা বেজে গেছে। ভেতরে ঢুকে উঠান থেকেই শুষ্ককণ্ঠে সে ডাকলে—'দুলু'। সে স্বর ক্ষীণ এবং কম্পিত। পরক্ষণেই দুলু এসে তার সুমুখে দাঁড়াল। কিন্তু তার মুখে-চোখে তো এতটুকু আগ্রহ, এতটুকু আনন্দ নেই;—তার পরিবর্ত্তে সেখানে ফুটে উঠল বিরক্তি এবং আতঙ্ক। জোর করে' টেনে হাসবার চেষ্টা করে' দুলু ব'লে—"কি মনে করে' জোয়ানদা!" জোয়ান কিছুক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল, তারপর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কম্পিতকণ্ঠে বললে—"আমি জানতে এসেছি, আমাকে কি তোমার কোন দরকার আছে?"

অত্যন্ত বিচলিতকণ্ঠে দুলু ব'ললে,—"না, তোমাকে বোধ হয় আর কোন দরকার হ'বে না জোয়ানদা। মাসী তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন—তিনি এসেছেন। কাল আমরা কাশী যাচ্ছি—সেইখানেই সারাজীবন থাকতে হ'বে বোধ হয়। উনি খেয়ে-দেয়ে একটু বেরিয়েছেন—এখুনি হয় তো ফিরে আসবেন।"

জোয়ান কাঠের মত চুপ করে' কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর অত্যন্ত করুণকণ্ঠে ব'ললে—"তা হ'লে আমাকে আর কোন দিনই তোমার দরকার হ'বে না দুলু?"

দুলু বললে,—"না, বোধ হয় আর দরকার হ'বে না জোয়ানদা! যদিই কখন হয় তোমাকে জানাব। আর কিছু কি তোমার বলবার আছে? তিনি বোধ হয় এখুনি ফিরবেন।" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখে-মুখে একটা আতঙ্কের ভাব স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। সেই দিক্ পানে একবার চেয়েই জোয়ান ধীরে ধীরে দুলুদের দরজা পার হ'য়ে পথে এসে পড়ল। চারিদিকে রোদ টাঁটা করছে। সারা গাঁখানা নীরব, নিস্তব্ধ! কেবল পথের ধারে একটা পুরাতন অশ্বত্থগাছের শুষ্ক পত্রহীন উচ্চ শাখায় বসে একটা তৃষ্ণার্ত্ত দাঁড়কাক ভাঙ্গাগলায় কাতর-কণ্ঠে অবিশ্রাম ডেকে যাচ্ছিল।

পথের ওপর দীর্ঘছায়া ফেলে জোয়ান চলেছে—কোথায় চলেছে জানে না—জানে কেবল, চলতে হ'বে—জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত চলতে হ'বে লক্ষ্যহীনভাবে, উদ্দেশ্যহীনভাবে।

দুলু যেমন দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তেমনই রইল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জোয়ানকে দেখা গেল—সে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে যখন দৃষ্টির অন্তরালে মিশিয়ে গেল তখন ধীরে ধীরে শয্যায় এসে শুয়ে পড়ে বালিশের মধ্যে মুখখানাকে লুকিয়ে ফেললে।

আলোচনা

দনুজমর্দ্দন ও রাজা গণেশ

ফাল্গুনের 'পঞ্চপুষ্পে' প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের "দনুজরাজা" নামক প্রবন্ধ পড়িয়া নিতান্ত দুঃখের সহিত এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। নিখিলবাবুর মত ঐতিহাসিকও যদি আলোচ্য বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত লেখা না পড়িয়াই আলোচনায় যোগ দেন, তবে দেশে ঐতিহাসিক আলোচনার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বড়ই নিরাশ হইতে হয়।

দনুজমর্দ্দন ও গণেশের অভিন্নত্ব ১৯২২ সনে প্রকাশিত আমার "Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal" নামক গ্রন্থে প্রতিপাদিত হয়। রায় মহাশয়ের লেখার ভাবে বুঝিতেছি, তিনি এই গ্রন্থখানি পড়েন নাই। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রবাসী" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে এই অভিন্নত্বে গালাগালি সহকারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। উত্তরে প্রবাসীর ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩০ সংখ্যায় আমার 'দনুজমর্দ্দন ও রাজা গণেশ' নামক প্রবন্ধে ফিরিয়া এই অভিন্নত্ব সম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রমাণ প্রদত্ত হয়। পরে "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় বাল্যলীলাসূত্রের দোহাই দিয়া শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অভিন্নত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। আমি ১৩৩১ সনের বঙ্গবাণীতে 'বাল্যলীলা সূত্র ও রাজা গণেশ' নামক প্রবন্ধে বাল্যলীলাসূত্র, মুদ্রিত হইবার ইতিহাস প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া দেই যে উহা সাত নকলে এবং সংশোধনে আসল খাস্তা হইয়াছে—উহার কোন শ্লোকই ঐতিহাসিক বিচারে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন।

নিখিলবাবুর মত প্রাচীন ঐতিহাসিককে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লজ্জাবোধ হয় যে, "রিয়াজ এই কথা বলেন" বা "ষ্টুয়ার্ট এই কথা বলেন" অথবা" রাখালবাবুর এই মত," "নগেনবাবুর ঐ মত", "দীনেশবাবুর ওই মত"—ইত্যাদি দোহাই একেবারে মূল্যহীন। যাত্তসহ প্রমাণবলে যাহা স্থিরীকৃত হয়, রিয়াজ বা ব্লখ্‌ম্যান্ বা ষ্টুয়ার্ট, কাহারও দোহাই-ই তাহার নিকট খাটে না। এই প্রমাণগুলি এতই পরিষ্কার যে ঐতিহাসিক প্রমাণ-বিচারে সুদক্ষ নিখিলবাবু শুধু এইগুলির আলোচনা করেন নাই বলিয়াই পঞ্চপুষ্পের অতখানি জায়গা অনর্থক নষ্ট করিয়াছেন।

এই অভিন্নত্বপ্রমাণ যিনিই অনুধাবন করিয়াছেন তিনিই এই অভিন্নত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মুদ্রাতত্ত্বের আলোচনায় পরলোকগত সুহৃদ্বর রাখালবাবু অগ্রণী ছিলেন। তিনি বারেকমাত্র প্রবাসীতে সন্দেহপ্রকাশ করিয়া উত্তর পাইয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে রাখালবাবুর সহিত অনেকবার দেখা হইয়াছে। তাঁহার মনে পরে আর এই অভিন্নত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। "বাঙ্গালার ইতিহাসে"র দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে নিশ্চয়ই তিনি এই অভিন্নত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া লইতেন। বঙ্গীয় মুদ্রাতত্ত্বের অন্যতম আলোচক শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন্ সাহেব তাঁহার কিছুদিন পূর্ব্বের পাটনা অভিভাষণে সাগ্রহে এই অভিন্নত্ব অনুমোদন করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই পঞ্চপুষ্প পত্রিকার গত বৎসরেরই গোড়ার দিকেই বোধ হয় এক প্রবন্ধে এই অভিন্নত্ব স্বীকার করিয়াছেন। নিম্নে অভিন্নত্বের প্রমাণ অতি সংক্ষেপে দিলাম। আশা করি পাঠান্তে নিখিল বাবুর মনেও এই অভিন্নত্ব সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিবে না। ইহার পরে যদি রায় মহাশয় আমার ইংরেজী বইখানা অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করেন তবে তো কথাই নাই।

বাঙ্গালার সুলতানী আমলের সমসাময়িক ইতিহাস নাই—এইজন্যই ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রচিত রিয়াজ-উস্ সালাতিন ইতিহাসের মর্য্যাদালাভ করিয়াছে। মোটকথা, রিয়াজের ঘটনাবলীর বর্ণনা মোটামুটি সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, কিন্তু মুদ্রার সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে উহার সন-তারিখে গুরুতর ভুল আছে। এই ভুল ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মুদ্রাপেটিকার তালিকায় বঙ্গীয় সুলতানগণের মুদ্রার তারিখ পড়িয়া সংশোধন করা যাইত। ব্লখ্‌ম্যান্ ইত্যাদি মহা মহা পণ্ডিতগণও এই চেষ্টাই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকবশতঃ প্রথম গ্রন্থখানিতে পাঠোদ্ধারকারী সাহেব মুদ্রার তারিখগুলি ঠিকমত পড়িতে না পারিয়া গতানুগতিকতায় ভুল পাঠ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্লখ্‌ম্যানের হাতে ভুল সংশোধনের উপযোগী উপাদান বড় পড়েই নাই। ১৯১৮ সনে এই যুগের ৩৪৩টী মুদ্রা ঢাকা জেলার কেতুন নামক স্থান হইতে পাওয়া যায়। উহাদেরই পাঠোদ্ধারের ফল আমার "Coins and Chronology." এই মুদ্রাগুলির সাহায্যে এই যুগের ঘটনা-পারম্পর্য্য নিম্নরূপে

জানিবার সুযোগ হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রাপ্ত উপাদানের পাঠোদ্ধারে ভুল সংশোধনেরও উপায় হইয়াছে।

এই যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে রিয়াজের বিবরণ এইরূপ:—ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহ। সিকন্দরের পুত্র গিয়াসুদ্দিন আজাম শাহ। আজাম শাহ ভাতুরিয়ার জমীদার গণেশ কর্ত্তৃক নিহত হ'ন। গণেশ রাজ্যে প্রবল হইয়া উঠেন। আজাম শাহের পুত্র হামজা শাহ। হামজা শাহের পরবর্ত্তী সুলতান শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ। বায়াজিদ শাহকে হত্যা করিয়া গণেশ বাঙ্গালা দেশের রাজা হইয়া বসিলেন এবং মুসলমানদের উপরে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। সেই আমলে পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত পীর ছিলেন নূর কুতব আলম। নূর কুতব আলম্ জৌনপুরের বিখ্যাত সুলতান ইব্রাহিম শাহকে বঙ্গ আক্রমণ করিতে আহ্বান করিলেন। ইব্রাহিম শাহ সসৈন্যে বঙ্গআক্রমণে অগ্রসর হইলেন। রাজা গণেশ ইহাতে ভয় পাইয়া নূর কুতব আলমের শরণাপন্ন হইলেন। পীর বলিলেন, তিনি ইব্রাহিম শাহকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিতে পারেন—শুধু যদি গণেশ মুসলমান হ'ন। গণেশ বলিলেন, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার পুত্র যদুকে মুসলমান করা হউক। পীর তখন নিজের মুখের পানের চাবা খাওয়াইয়া যদুকে মুসলমান করিলেন। যদু জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ নামধারণ করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এই সময় ইব্রাহিম শাহ মারা গেলেন। গণেশ যদুকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া হিন্দু করিলেন এবং নিজে আবার রাজা হইয়া বসিলেন এবং নূর কুতব আলমের পুত্র ও পৌত্রকে সোণার গাঁতে নির্ব্বাসিত করিলেন। গণেশ মারা গেলে যদু সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (হিন্দু থাকিয়াই) এবং পরে আবার মুসলমান হইয়া জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ নামধারণ করিয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিলেন।

এই বিবরণের সহিত মুদ্রা ও শিলালিপির প্রমাণ মিলাইবার পূর্ব্বে শুধু একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, বঙ্গআক্রমণ করিতে আসিয়া ইব্রাহিম শাহের মৃত্যুর কথাটা ভুল—মুদ্রার প্রমাণে জানা যায়, ইব্রাহিম শাহ ইহার অনেকবছর পরেও জীবিত ছিলেন।

এখন রিয়াজের বিবরণ ও মুদ্রার প্রমাণ পাশাপাশি সাজাইয়া দেখা যাউক। যাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন যে মুদ্রার প্রমাণ যে সত্য তাহার বিশ্বাস কি? ব্লখ্ম্যান্ ভুল করিলেন, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের পেটিকা-বর্ণনায় উহার সম্পাদক ভুল করিলেন, রিয়াজ ভুল তারিখে ভরা,—আর তুমিই এমন কোন্ পণ্ডিত আসিলে যে ভুল করিতে পার না? ইহাদিগকে সামান্য পারস্য ও আরব্য ভাষায় জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া আমার ইংরেজী পুথিখানা পড়িতে বলা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমি এইখানে শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে যাঁহারা মুদ্রাতত্ত্ব বোঝেন এবং মুদ্রার পাঠোদ্ধার ঠিক হইল কি না পরখ করিতে পারেন তাঁহারা সকলেই আমার পাঠ প্রামাণ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

রিয়াজের তথ্য	মুদ্রার প্রমাণ
ইলিয়াস শাহের মৃত্যু ও সিকন্দর শাহের রাজ্যপ্রাপ্তি	ইলিয়াসের মুদ্রায় প্রাপ্ত শেষ বৎসর ৭৫৮ হিজরি। সিকন্দরের মুদ্রার প্রথম প্রাপ্ত তারিখ ৭৫৮ হিজরি। (৭৫৮ হিঃ—আরম্ভ ২৫এ ডিসেম্বর ১৩৫৬)।
সিকন্দরের মৃত্যু। আজাম শাহের রাজ্য প্রাপ্তি।	সিকন্দরের মুদ্রায় আজ পর্য্যন্ত শেষ প্রাপ্ত বৎসর ৭৯২ হিঃ। আজামের মুদ্রায় প্রথম প্রাপ্ত বৎসর ৭৯৫ হিঃ।
আজাম শাহের মৃত্যু। সৈফুদ্দিন হামজা শাহের রাজ্য লাভ।	আজামের মুদ্রায় প্রাপ্ত শেষ বৎসর এবং হামজার মুদ্রায় প্রাপ্ত প্রথম বৎসর ৮১৩ হিঃ (আরম্ভ ৬ই মে—১৪১০ খৃঃ)
হামজা শাহের মৃত্যু। বায়াজিদ শাহের রাজ্য-লাভ।	হামজার মুদ্রায় শেষ প্রাপ্ত বৎসর এবং বায়াজিদের মুদ্রায় প্রথম প্রাপ্ত বৎসর ৮১৫ হিঃ (আরম্ভ ১৩ই এপ্রিল,—১৪১২)।
বায়াজিদের মৃত্যু। গণেশের রাজ্যলাভ। ইব্রাহিম শাহের বঙ্গআক্রমণ; যদুর মুসলমানত্ব গ্রহণ এবং জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ নামে সিংহাসনারোহণ।	বায়াজিদের মুদ্রায় শেষ প্রাপ্ত বৎসর ৮১৭ হিঃ বায়াজিদপুত্র ফিরোজ শাহের মুদ্রায় তারিখ ৮১৭ হিঃ। এই রাজার অস্তিত্ব কেতুনে প্রাপ্ত মুদ্রায়ই প্রথম জানা গিয়াছে। (৮১৭ হিঃ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দের ২৩এ মার্চ্চ আরম্ভ হইয়াছিল।) ৮১৮ হিঃ। জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের মুদ্রার আবির্ভাব। বহুতর মুদ্রা।
ইব্রাহিম শাহের মৃত্যু।	নূর কুতব আলমের সমাধির শিলালিপি সাহায্যে জানা যায় ৮১৮ হিজরির ৭ই জুলকাদা নূর কুতব আলমের (ইব্রাহিম শাহের নহে) মৃত্যু হইয়াছিল। ইহাতেই গণেশ সুযোগ পাইয়াছিলেন।

	৮১৮ হিজরির ৭ই জুলকাদা—মোটামুটি ৬ই জানুয়ারী ১৪১৬খৃঃ। ৮১৯ হিঃ তারিখযুক্তজালালুদ্দিনের দুই-তিনটী মাত্র মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ১৪১৬ খৃঃ এর ১লা মার্চ্চ তারিখে ৮১৯ হিজরির আরম্ভ
যদুর প্রায়শ্চিত্তান্তে হিন্দু হওয়া এবং গণেশের জাঁকিয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে উপবেশন।	১৩৩৯ শকাব্দাযুক্ত দনুজমর্দ্দনের বহুতর মুদ্রা; টাকশাল চাটিগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম এবং পাণ্ডুনগর। (শকাব্দ সাধারণতঃ অতীতাব্দরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহার সহিত ৭৮ যোগে খৃষ্টাব্দে পরিণত করা হয়। মুদ্রার অব্দ অতীতাব্দ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণই নাই—তাই ৭৭ যোগে খৃষ্টাব্দ করিতে হইবে। ১৩৩৯ শকাব্দ ১৪১৬ খৃষ্টাব্দের ২৯এ ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হইয়াছিল। ১৩৪০ শকাব্দের দনুজমর্দ্দনের কয়েকটী মুদ্রা।
গণেশের মৃত্যু। যদুর হিন্দুরূপেই সিংহাসনারোহণ। পরে আবার মুসলমান হইয়া জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ নামধারণ।	১৩৪০ শকাব্দের মহেন্দ্রদেবের নামীয় যাবতীয় মুদ্রা। (১৩৪০ শকাব্দ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের ২৯এ মার্চ্চ আরব্ধ)। ৮২১ হিজরিতে জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের বহু মুদ্রার পুনরাবির্ভাব এবং অখণ্ড ধারায় ৮৩৫ হিজরি পর্য্যন্ত চলিয়া যাওয়া। (৮২১ হিঃ ১৪১৮ খৃঃ এর ৮ই ফেব্রুয়ারী আরব্ধ—তখনও ১৩৪০ শক চলিতেছে)।

এইস্থলে এইটুকু শুধু বিচার্য্য যে গণেশ রাজা হইলেন অথচ মুদ্রাপ্রচার করিলেন না ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা; অথচ দেখা যাইতেছে, ইতিহাসের অজ্ঞাত কোথাকার এক দনুজমর্দ্দন মাটি ফুঁড়িয়া উঠিয়া ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ শকে চাটগাঁ, সোণার গাঁ এবং পাণ্ডুয়া হইতে মুদ্রার প্রচার করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববঙ্গাধীশ্বরত্বের পরিচয় দিতেছেন! আবার মজা এই যে, ইতিহাসের ঠিক যেই খোপটীতে গণেশকে পাই, মুদ্রাধারায় ঠিক অনুরূপ স্থানে দনুজমর্দ্দনকে পাই। ইতিহাস-প্রমাণ-বিচারজ্ঞের অতঃপর সন্দেহমাত্র থাকা উচিত নহে যে, রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দন অভিন্ন এবং মহেন্দ্র যদুর হিন্দু নাম।

মহেন্দ্রের আজপর্য্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত মুদ্রাই ১৩৪০ শকাব্দের, একটীও ১৩৩৯ শকের নহে। দনুজমর্দ্দনের ১৩৩৯ শকের মুদ্রাই বেশী, ১৩৪০ এরও দুই-তিনটী পাওয়া গিয়াছে।

দনুজমর্দ্দনের কোন মুদ্রায়ই টাকশালের নাম চন্দ্রদ্বীপ পাওয়া যায় নাই। চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া যাহা পড়া হইয়াছিল তাহা ভুল—উহা স্পষ্টই 'চাটিগ্রাম' হইবে। সর্ব্ববঙ্গাধীশ দনুজমর্দ্দনের সহিত চন্দ্রদ্বীপের প্রবাদের দনুজমর্দ্দনের কোন সম্বন্ধ নাই।

বটু ভট্টের দেববংশের কথা যত কম আলোচিত হয়—ততই ভাল। উহা বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের কলঙ্কের কথা, পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্নেহদৌর্ব্বল্যের কথা, Macaulayর বাঙ্গালী বর্ণনার সপক্ষের কথা। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া এই পুথি পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়া তো চক্ষু স্থির! শাস্ত্রী মহাশয় আজীবন পুথি ঘাঁটিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুথিসংগ্রহব্যাপারে হাজার বার-শের পুথি আমারও হাত দিয়া সংগ্রহ হইয়াছে। দেববংশের বর্ত্তমান পুথি যে জাল গ্রন্থ এবং made to order, এই বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণ যদি ইতিহাসের মূল উপাদান লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে বা মতামত প্রকাশ করিতে অগ্রসর হ'ন, তবে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় অনর্থক কথার কাটাকাটি থামিয়া যায়।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

'চা'

গত মাঘ মাসের 'পঞ্চপুষ্পে' শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত 'চা' সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'চা' সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে প্রবন্ধটী পূর্ণ। লেখক মহাশয় এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, "প্রত্নতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মনে হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কালে চা পান প্রচলিত ছিল চীনাদের মধ্যে। চীনাদের দেশের একটা কিংবদন্তী অনুসারে কিন্তু চীনারাও ইহার মাহাত্ম্য পাইয়াছিল ভারতবাসীর নিকট। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে না কি বোধিধর্ম্ম নামে এক ধর্ম্মগুরু ভারতবর্ষ হইতে গিয়া, কেবল পারমার্থিক তত্ত্ব নয়, চা-তত্ত্বও চীন দেশে প্রচার করিয়াছিলেন।" ঋষিযুগে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে চা বৃক্ষ ছিল এবং তাহার গুণাগুণ যে ঋষিদের জানা ছিল তাহার উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। 'চা'র সংস্কৃত নাম হইতেছে—শ্লেষ্মারি, গিরিভিৎ, শ্যামপর্ণী ও অতন্দ্রী। আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণ পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহার গুণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

শ্লেষ্মারি গিরিভিচ্ছ্যামপর্ণী তন্দ্রী স্ত্রিয়ামুভে।
শ্লেষ্মারি পত্রং কফঘ্নং স্বেদং বলবর্দ্ধনম।
প্রতিশ্যায় হরং প্রোক্তং জ্বরঘ্নং কামদীপনম্।
কাম সংহরণং বহ্নিদীপনং জাড্যনাশনম্।
ক্বাথোঽস্য সিতয়াযুক্তঃ সেব্যো নৈরুজ্যমিচ্ছতা।

সুতরাং ইহার পত্র যে কফঘ্ন, স্বেদজনক, বলবর্দ্ধক, প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) নিবারক, জ্বরঘ্ন, কামোদ্দীপক ও শরীরের জড়তানাশক তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রয়োগ-বিধি

তাঁহারা অবগত ছিলেন। ইহার কাথ (সম্যক্ চূর্ণকৃত এক [illegible]ল দ্রব্য অর্ধসের গরম জলে ফেলিয়া দিয়া কিছুক্ষণ পরে ছাঁকিয়া লইয়া) চিনির সহিত সেবনীয় বলা হইয়াছে।

[illegible]চলন—

চা'র প্রচলন সম্বন্ধে লেখক মহাশয় বেশ একটা অদ্ভুত রকমের গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভারতবর্ষে অধুনা যে এত চা-পায়ী দেখা যাইতেছে ইহার প্রচলন এত অধিক কিরূপভাবে হইল সে সম্বন্ধে শুনিতে পাই এদেশে 'চা'এর প্রচলন বেশী করিবার জন্য চা-কর সাহেবরা প্রথমে চা, চিনি ও দুগ্ধ প্রভৃতি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন এবং চায়ের প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশে দেশে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন যে, চা পান করিলে পরিশ্রমের লাঘব হইয়া থাকে—জ্বর-জ্বালা নিবারিত হইয়া থাকে, লোকের মনে স্ফূর্ত্তির উদয় হইয়া থাকে ইত্যাদি। তাঁহাদিগের পরিশ্রমে অল্প দিনের মধ্যেই অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালী শীঘ্রই চা পান করিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে চা আমাদের নিত্য পানীয়ের মধ্যে গণ্য হইল।

[illegible] উপাদান—

এক্ষেত্রে চা'র কি কি উপাদান আছে তাহা লেখক মহাশয় উল্লেখ করেন নাই। সে-কারণ চায়ের উপাদান আমি প্রদান করিলাম।

রাসায়নিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা চা'এর উপাদানের মধ্যে আলবুমেন, টেনিন, ধাতবলবণ ও তৈলাক্ত পদার্থ প্রভৃতির [illegible] পাইয়াছেন।

[illegible]রাসায়নিক কোয়েনিজ (Coenig) বলিয়াছেন যে, পরীক্ষাদ্বারা চা-এর মধ্যে নিম্ন-লিখিত উপাদানগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

[illegible]		শতকরা
[illegible]	...	১১·০৯
থিন	...	১·৩৫
এসেনসিয়াল অয়েল	...	·৬০
ট্যানিন	...	১২·৩৬
নাইট্রোজেনাস পদার্থ		২১·২২
চর্ব্বিময় পদার্থের বর্ণের উৎপাদন ডেক্সটিন ইত্যাদি		১০·৭৫
অন্যান্য নাইট্রোজেনাস		১৬·৭৫
সূক্ষ্মকাষ্ঠ তন্তু	...	২০·৩০
[illegible] পদার্থাংশ	...	৫·১০

চা-এর উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে লেখক মহাশয় কিছু বলেন নাই। কিন্তু প্রত্যেক চা পায়ীর ইহার উপকারিতা ও অপকারিতার বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক।

পাশ্চাত্য [illegible]দেশীয়দিগের মতে "স্নায়বিক রোগে চা পান করিলে অল্পকাল স্থায়ী উত্তেজনা আনিয়া মনকে প্রফুল্লিত করে। [illegible] পার্কস (Parkes) বলেন—চা পান করিলে স্নায়ুমণ্ডলী [illegible] চা'র উষ্ণতাও এই উত্তেজনার অন্য কারণ। [illegible] একটু [illegible] স্বাদ আসে না। চা পান করিলে রক্তসঞ্চালন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, ঘর্ম্ম ও মূত্র বর্দ্ধিত হয় ও আলস্য দূর হয়। পরিশ্রমে ইচ্ছা বর্দ্ধিত ও ট্যানিনের ভাগ বেশী থাকে বলিয়া কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। স্যর উইলিয়ম রবার্টস বলেন—চা'র ট্যানিন পাকক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়। অতএব তাঁহাদের উপদেশ, আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে চা পান করা উচিত নহে। অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে চা খাওয়া উচিত। *

অল্পবয়স্ক, পীড়িত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে চা পান করিতে স্যর উইলিয়ম রবার্টস নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার একথা বাঙ্গালী শুনিবে? বাঙ্গালী নিজে খাইবে ও তাহার শিশু পুত্রদিগকে পর্য্যন্ত খাওয়াইয়া তাহার মরণের পথ পরিষ্কার করিবে। অতিরিক্ত মাত্রায় চা পান স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি দূষণীয় ও অনিষ্টকর। আজকাল চাকে অনেকে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ইহা খাদ্যদ্রব্য মোটেই নহে। সে-সম্বন্ধে ইংরাজ ডাক্তারের অভিমত—

The excessive drinking of tea is bad, especially when fasting. Tea is not a food, and should not be taken as such. If used with moderation, it undoubtedly serves a useful purpose among our daily wants. It is essentially a stimulant of the brain and nervous system, producing no subsequent depression; but if taken in excess induces indigestion, loss of appetite, and constipation in some persons. These bad effects are produced even when small quantities are cousumed.

—Notter and Firth.

কেবলমাত্র পরিমিতভাবে ঋতুবিশেষে ইহা পান করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। অপরিমিত চা পানে অজীর্ণ ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা হইয়া থাকে। অতিরিক্ত পরিমাণে চা পানে অক্ষুধা, অনিদ্রা, উদরাধ্মান, হৃৎকম্প ও দৃষ্টিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। চা'এর মধ্যে নার্কটিক নামক একপ্রকার মাদক বিষ আছে। নার্কটিক কয়েক গ্রেণ সেবনে কুকুর প্রভৃতি জন্তুসকল পঞ্চত্ব পাইয়া থাকে এমন কথা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ১২।১৪ গ্রেণ নার্কটিক একজন সবল লোকের উপর ভয়ানক বিষক্রিয়া প্রকাশ করিতেও সমর্থ হয়। এজন্য বালকদিগকে মোটেই চা পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ নার্কটিক বিষের দ্বারা বালকগণ শীঘ্রই অচৈতন্য হইতে পারে।

কবিরাজ—শ্রীইন্দুভূষণ সেন

---

* Tea should not be taken with or shortly after meals as the tannin tends to coagulate the albumens of the food undergoing the process of digestion.—

Parkes.

অতীতের প্রহরী

[শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী]

মোহ

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী নীলিমা দেবী

সাত

এদিকে প্রীতির জীবনস্রোত প্রায় একভাবেই বহিয়া চলিতেছে। সে আপনার শিক্ষা লইয়া সর্ব্বদাই ব্যস্ত—পড়া, শেলাই, গান-বাজনা, খেলা ও মোটার চড়িয়া তাহার দিনগুলি কাটিতেছিল। বাহিরে কিছুরই পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু প্রীতির দেহ ও মনে অজানা কিসের সাড়া সে পাইল। সে আজকাল প্রায়ই তাহার স্বামীর কথা ভাবে, এখন যেন তাহার সকল কাজেরই নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে—তাহার মনে হয় সবই স্বামীর চরণে উৎসর্গ করিবার জন্য। যতই সে দেবব্রতের উন্নতির কথা শুনিত তার ততই বাসনা হইত যেন সে দেবব্রতের উপযুক্ত পত্নী হইতে পারে। এদিকে দেবব্রত তাহাকে যে চিঠি লিখিত সেগুলি এত প্রাণহীন যে, তাহাতে প্রীতি ব্যথিত হইত, লজ্জায় সেও কিছু লিখিতে পারিত না। তাহার মনের অতৃপ্ত বাসনা মনেই থাকিয়া যাইত। সে তাহার মা'র কাছেও মনের কথা বলিতে পারিত না।

আজকাল সময় পাইলেই প্রীতি শ্বশ্রূগৃহে যায়, মাঝে মাঝে স্বেচ্ছায় গিয়া শাশুড়ীর কাছে দুই তিন দিন কাটাইয়া আসে। দেবব্রতের মাতা কমলা প্রীতির ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ, তিনি প্রীতিকে মেয়ের মত দেখেন। প্রীতিকে ও বাড়ীর সকলেই ভালবাসে, দেবব্রতের ভাই দুইটী তাহাকে ছাড়িতে চাহে না।

প্রীতির বয়স এখন ষোল বৎসর। তিন বৎসর পূর্ব্বে যে প্রীতি এই ঘরে নববধূ-বেশে আসিয়াছিল, তাহাতে ও আজিকার প্রীতিতে অনেক প্রভেদ। যারা তখন দেখিয়াছিল তারা হঠাৎ দেখিলে হয় তো চিনিতে পারিবে না। আজ যৌবনের স্পর্শে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন কে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। বসন্তের আগমনে ফুল্ল কুসুমের মত যৌবনাগমে তাহার রূপ আজ পূর্ণ বিকসিত; তাহার সকল অঙ্গের গঠন আজ সৌন্দর্য্যে ভরা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কি সুন্দর সৌষ্ঠব, অঙ্গ-চালনায় কি মনোরম লালিত্য। সে যখন হাঁটিয়া আসে তখন মনে হয় যেন মরালী ভাসিয়া আসিতেছে। প্রীতিকে যে দেখে সেই তন্ময় হইয়া যায়, আর যে তার সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করে সেই মুগ্ধ হয়। কিন্তু প্রীতির হাসিভরা মুখ আজকাল কেমন যেন বিষাদভরা হইয়া গিয়াছে, তাহার চোখের চাহনিতে যেন কাতরতা মাখা; তাহার কারণ, আজ প্রায় আট মাস হইল দেবব্রত তাহাকে বা তাহাদের বাড়ীর কাহাকেও পত্র লিখে নাই। দেবব্রত পরীক্ষার ফল বা চাকুরী পাওয়ার কথা পর্য্যন্ত তাহাদের জানায় নাই। প্রীতি ও তাহার মাতার দুই-তিনখানি পত্রের উত্তর দেয় নাই। দুই-তিন মাস অন্তর দেবব্রত নিজের মা বা ভাইকে একখানা করিয়া ছোট চিঠি লেখে। সকলেই বিশেষ চিন্তিত। কমলা তো পুত্রকে কখনও বা ভর্ৎসনা করিয়া কখনও বা বুঝাইয়া পত্র লিখিতেন, কিন্তু দেবব্রতের চরিত্রের পরিবর্ত্তন কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। সে মাকে শুধু সংক্ষেপে লিখিত যে সে ভাল আছে ও শীঘ্রই দেশে ফিরিবে।

সুরবালা পাগলের মত হইলেন, কি যে করিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। বিধবার পরামর্শদাতা বলিতে একমাত্র খুড়শ্বশুর সুরেনবাবু। তিনি দেবব্রতের অধ্যাপকদের পত্র দিলেন ও উত্তরে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র পাইলেন। অধ্যাপকদের প্রশংসার পাত্র দেবব্রত কেন যে

এইরূপ ব্যবহার করিতেছে তাহা সুরবালা বুঝিতে পারিলেন না—তাঁহার মনে সন্দেহ একটু একটু জাগিতেছিল। প্রীতির মনে কিন্তু স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে দেবব্রত নিশ্চয় কাহারও প্রণয়ে পড়িয়াছে ও তাহাকে আর চাহে না।

একদিন প্রীতি শুনিতে পাইল সুরবালা মিসেস্ হুড্‌কে বলিতেছেন, "আপনি আগামী মেলে বা যত শীঘ্র পারেন বিলাত যান, আপনি ভিন্ন আমার আর কে আছে? আপনি সেখানে গিয়ে দেবব্রতের সকল খোঁজ নিয়ে আমাদের জানাবেন।"

মিসেস্ হুড বলিলেন, "প্রীতিকে আমি নিজের সন্তানের মত ভালবাসি, তা'র সুখের জন্য আমি সব করতে পারি। আমি নিশ্চয় যাব।"

কথাগুলা শুনিয়া প্রীতি তাঁহাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। যে কখন মাতার কোন কথার উপর কিছু বলিত না সে একেবারে দৃঢ়স্বরে বলিল, "মা মিসেস্ হুড্‌কে বিলাতে পাঠাতে পারবে না। কেন মা পাঠাবে? বেশ বুঝা যাচ্ছে তিনি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান না, তিনি নিশ্চয় সেখানে কা'কেও ভাল বেসেছেন তখন জোর করে' তাঁকে ধরে আনায় কি লাভ বা সুখ হ'বে? মা যিনি আমাকে চান না, তাঁর ঘাড়ে কি জোর করে' আমাকে ফেলে দেবে? আমি সে রকম সম্পর্ক চাই না। তোমার কি, মা, একটুও মান-সম্ভ্রমজ্ঞান নাই? আমার জীবন অবশ্যই কোনরকমে কাটাতে পারব। পৃথিবীতে তো [illegible] রকম কাজ করা যায়। কত মেয়ের যে বিবাহ হয় না, কত মেয়ে যে অল্প বয়সে স্বামী হারায় তাদের কি দিন কাটে না?" সুরবালা তো প্রীতির কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "প্রীতি, হিন্দুর মেয়ের স্বামী বিনা যে গতি নাই, ধর্ম্ম নাই, স্বামী বিনা তার জীবনই বৃথা। আর সে যদি মা একটা ভুল করে, সেও তো ছেলেমানুষ, তাকে তো শিক্ষা দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। একটা অন্যায় থেকে তো তাকে বাঁচাতে হ'বে।"

উত্তরে প্রীতি বলিল,—"না, মা, তিনি এত ছেলে-মানুষ নন যে এটুকু বুঝবার ক্ষমতা তাঁর নাই। দেখই না কি হয়, তাঁর মত উচ্চশিক্ষিত লোক হয় তো নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার নিজেই ফিরে আসবেন।" এই বলিয়া সে মিসেস্ হুড্‌কে বলিল, "আপনি নিশ্চয় আমার মনের ভাব ঠিক বুঝতে পারছেন। আমার এই অনুরোধ আপনাদের শুনতেই হ'বে।"

তাহার পর প্রীতি তাহার ছোটঠাকুরদা সুরেনবাবুর কাছে গেল। সে তার 'দাদু'কে বন্ধুর মত সকল কথা বলে ও তাঁহার পরামর্শ মত চলে। তাঁহাকে সে সকল কথা খুলিয়া বলিল। তিনি তাঁহার জননীর সঙ্গে একমত হইলেন, কিন্তু প্রীতি অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়াও যখন তাঁহাকে স্বমতে আনিতে পারিল না, তখন কাঁদিয়া-কাটিয়া ভাসাইয়া দিল। শেষে স্নেহের জয় হইল—তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দিদিমণি আমি 'আইবুড় কার্ত্তিক'—আমি তো ভাই তোদের মান-অভিমানের পালার ধার ধারি না, তাই অমন উল্টো রায় দিয়েছিলাম।"

সেদিনটা প্রীতি বড়ই অশান্তিতে কাটাইল। সারাদিন ছট্‌ফট্ করিয়া বৈকালে তাহার মাকে বলিল, "আমি একবার শ্বশুরবাড়ী যেতে চাই, আজ আর আস্‌ব না। হয় তো তিন-চার দিন সেখানে থাকতেও পারি। দেখি যদি সেখানে গিয়ে আমার মনের পরিবর্ত্তন হয়।" সুরবালা রাজী হইলেন।

প্রীতি যখন তাহার শ্বশুরবাটী পৌঁছিল তখন তাহার শাশুড়ী একলা ছাদের উপর বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। প্রীতি নিঃশব্দে গিয়াছিল, তিনি বুঝিতেও পারেন নাই। হঠাৎ "মা" বলিয়া ডাকিতে তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। তিনি প্রীতির কথাই ভাবিতেছিলেন। সেই দিনের বিলাতী ডাকে তিনি দেবব্রতের চিঠি পাইয়াছিলেন। সেই চিঠিতে দেবব্রত যেসকল কথা লিখিয়াছিল তাহাতে তাঁহার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল। 'কেন তাহার বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল', 'বিবাহ দিয়া তাহার জীবনের সুখ নষ্ট করিয়া দিয়াছেন' প্রভৃতি নানান্ কথা সে লিখিয়াছিল। প্রীতিকে দেখিয়া শ্বশ্রূমাতা তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রীতিও তাঁর সঙ্গে নীরবে অশ্রু-পাত করিতে লাগিল। সে শাশুড়ীর কান্না দেখিয়া বড় ভীত হইয়াছিল, কিন্তু যখন সে আসে তখন সে দেখিয়াছিল তাহার দেবরেরা বন্ধুদের সঙ্গে হাসিতেছে, কাজেই কান্নার কারণ কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিল না। শাশুড়ী একটু

স্থির হইলে প্রীতি তাঁহাকে জানাইল যে, সে তাঁহার কাছে থাকিতে আসিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তিনি আবার কাঁদিতে লাগিলেন। প্রীতি তখন বলিল, "মা, আপনি কেন এত কাঁদ্‌ছেন? আমাকে সব কথা খুলে বলুন।" বিলাতী ডাকের চিঠিখানা পাশেই পড়িয়াছিল, প্রীতি লেখা দেখিয়াই বুঝিয়াছিল যে কাহার চিঠি, সে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কি চিঠি এসেছে?" কমলা প্রথমে কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, তিনি মনের কথা মনে চাপিয়া প্রীতিকে বলিলেন, "খবর ভালই, দেবু ২।৩ মাসের মধ্যে দেশে ফিরবে।"

প্রীতি জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কেন এত কাঁদছেন, কি হ'য়েছে বলুন। আমার কাছে কিছু লুকাবেন না।"

কমলা কিন্তু কিছুতেই প্রীতিকে আসল কথা বলিলেন না, কেবলমাত্র বলিলেন,—"তুমি ভেব' না বাছা, সে আস্‌লে সব ঠিক হয়ে যাবে, এখন কি একটা খেয়াল চেপেছে, কে জানে।"

প্রীতি তৃপ্ত হইল না, উপায়বিহীন হইয়া চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে সে বুঝিল যে দেবব্রত তাহাকে চাহে না। শাশুড়ীর কাছে দুইদিন থাকিয়া তাঁহার খুব সেবা-যত্ন করিল, মেয়ের মত সদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিল। যাইবার দিন কেবল তাঁহাকে বলিয়া গেল, "মা, যদি তিনি আমার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্নই করেন; তা' হ'লে কি আপনার স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হ'ব আমাকে আপনার কন্যা ভাবতে পারবেন না মা?"

কমলা তাঁহার চিবুক ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যাই হ'ক না কেন, তুমি আমার মেয়েরও অধিক, আমি তোমাকে কখনও ছাড়ব না।"

আট

এইসময় দেবব্রতের জীবনও যে শুধু আনন্দময় ছিল তাহা নহে। এমিলির রূপে সে মুগ্ধ, তাহার অকৃত্রিম প্রণয়ে সে পূর্ণ। তাহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাইলে বিবাহিত জীবনের সুখস্বপ্ন তাহাকে আমোদিত করিতে পারে, কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় মাঝে মাঝে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিত। সে যে হিন্দুর ছেলে, জন্মাবধি হিন্দুনীতি শিক্ষা করিতেছে, তাহার মন যে হিন্দুসংস্কারে পূর্ণ; কাজেই তাহার চিত্তচাঞ্চল্যের আর সীমা ছিল না। সে ভাবিত কোন্ অধিকারে সে একজন অসহায়া বালিকার জীবন মরুভূমির মত ধূ ধূ করিয়া দিবে।

দেবব্রত কিন্তু যতক্ষণ এমির কাছে থাকে ততক্ষণ মোহান্ধ হইয়া শুধু সুখের স্রোতে তার প্রাণ-মন নিমজ্জিত থাকে, কিন্তু নিভৃতে থাকিলেই যে অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে তাহার সরল মুখখানি মনে পড়িয়া তাহার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হয়। উদ্বাহের সেই প্রতিজ্ঞা, ধর্ম্মের সেই বন্ধন, সেই বালিকা বধূর কথা স্মরণ করিয়া সে কখন কখন মনে করিত যে এমিকে ত্যাগ করিয়া দেশে যাইবে, সেখানে এমিকে ভুলিবার চেষ্টা পাইবে। কিন্তু মোহের জালও শীঘ্র ছিন্ন হয় না। এমির মূর্ত্তি মনে পড়িলেই আবার সব ভুলিয়া তাহারই দিকে মন ধাবিত হয়।

দেবব্রত এক বিনিদ্ররাত্রি অতিকষ্টে অতিবাহিত করিল —আজ যেন সে বিবাহের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিল— দেবতার সম্মুখে সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহা কতদূর রক্ষা করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে এক বালিকাকে সে কি দুঃসহ যাতনাই না দিয়াছে। সে দৃঢ়সংকল্প করিল, প্রকৃত অবস্থা এমিলীর কাছে বর্ণনা করিবে, তার অদৃষ্টে যা আছে তাহাই হাসিমুখে গ্রহণ করিবে। সকালে উঠিয়াই সে এমিদের বাড়ী গেল, কিন্তু তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। এমিলীর কি যে মোহিনী শক্তি ছিল, সে যাহা মনে করিত দেবব্রতকে দিয়া তাহাই করাইতে পারিত। [illegible] যে প্রতারণা করিয়াছে সে কথা দেবব্রত বলিতে [illegible] না। তাহার উপর এমির যে অগাধ বিশ্বাস তাহা কেমন করিয়া ভাঙ্গিবে? তবু যদি এমি আপনা হইতে বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেয় এই আশায় বলিল, "দেখ প্রিয়ে, আমার একটী কথা বলিবার আছে আমি আমার ধর্ম্ম কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না, আমার ইচ্ছা যে তুমি আমার ধর্ম্ম অবলম্বন কর।" দেবব্রতের আশা ছিল যে ইহাতে নিশ্চয় এমি অসম্মত হইবে ও বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবে। এমির কিন্তু কোন ধর্ম্মেই সেরূপ দৃঢ় আস্থা ছিল না, আর তাহার তখন দেবব্রতকে বিবাহ করিবার একান্ত ইচ্ছা। এমি প্রথমে ঈষৎ আপত্তি করিয়া ধর্ম্মপরিবর্ত্তনে সম্মত

হইল। দেবব্রতের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল, তাহার উপর সে বড় চাকরী পাইয়াছে বলিয়া এমিরা এই বিবাহে বিশেষ প্রলুব্ধ ছিল।

দিন পনের পরে দেবব্রত ও এমিলীর আর্য্য-সমাজ মতে বিবাহ হইয়া গেল, এমিলী শুদ্ধিপ্রথানুযায়ী হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিল। বিবাহের পরে নবদম্পতী পাশ্চাত্য প্রথামতে দেশভ্রমণে গেল। ফ্রান্সের দক্ষিণে আনেসি হ্রদের ধারে ছোটগ্রাম ভুর্ষাতে তাহারা পনের দিন যাপন করিল। সেখানে নির্জ্জনে শ্যামল তৃণে ঢাকা পাহাড়ের গায়ে সুনীল আকাশের তলায় দুইজনে সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া সমস্ত দিন প্রণয়-আবেশে কাটাইতে লাগিল।

ক্রমে দেবব্রতের যাইবার দিন আসিল। বন্দোবস্ত হইল যে এমি একবৎসর পরে যাইবে। এখন দেবব্রত গিয়া সব ঠিক করিয়া তবে তাহাকে দেশে লইয়া যাইবে।

নয়

বাড়ী ফিরিয়া প্রীতিলতা সুরবালাকে বলিল,—"মা আমার সঙ্কল্প অটুট রইল। আমার শাশুড়ী কি চিঠি পেয়েছেন জানি না, তিনি কেবল কাঁদছেন। আমার মনে হয় যে সেখানে তিনি কিছু করেছেন। রাত্রে যখন আমার শাশুড়ী মনে কর্‌তেন যে আমি ঘুমিয়েছি তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদ্‌তেন ও আস্তে আস্তে কি বল্‌তেন। মা! আমার ইচ্ছা যে, আজ হ'তে তুমি আর কা'কেও বল না যে, আমার তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে। তাঁর যে আর একটা নাম আছে সেই নামে আমার পরিচয় দিও। আর আমার ইচ্ছা যে আমি একটু একটু ক'রে সমাজে মিশতে আরম্ভ করি। আমি তো সমাজে বেশী মিশি নি, যদি এমন ভাগ্য হয় যে দু-তিন মাস পরে ফিরিয়া এসে আমাকে নিয়ে যান, তখন আমাকে অশিক্ষিত মনে না করেন বা আমার জন্য তাঁকে সমাজের কাছে লজ্জিত না হ'তে হয়।"

সুরবালা বলিলেন, "সে সব তো বুঝ্‌লাম কিন্তু নাম লুকবার কারণ কি? তার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে জানাতে আপত্তির মানে তো বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। আচ্ছা পাগল তো তুই।"

প্রীতিলতা বলিল, "যদি তিনি বিবাহ ক'রে থাকেন তা হ'লে বৃথা অনেক গোল হ'বে। কা'রও সুখে আমি ব্যাঘাত দিতে চাই না। আমার সুখ তো নষ্ট হ'বেই তখন অন্যকে অসুখী করে' কি ফল হ'বে?"

সুরবালা মেয়ের কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্। তাঁহার মনে হইল যে প্রীতির মাথা খারাপ হইয়াছে। সে কি সব বলিতেছে, এরূপ কথা তো কখনও তাহার মুখে শুনেন নাই। প্রীতি যে মনে মনে দেবব্রতকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল তাহা তাঁহার ধারণাতেই আসিল না। বিরাট্ স্বার্থত্যাগ ও অপরিসীম ভালবাসা না থাকিলে কখনও কেহ এমন করিতে পারে না। সেরূপ ভালবাসা কবে, কিরূপে জন্মিল তাহা তিনি বুঝিতেই পারিলেন না।

প্রীতির ইচ্ছা হইল যে, সে উচ্চপরিবারের সহিত পরিচিত হয়, তাঁহাদের সঙ্গে মেশে। ইংরাজ ও বাঙ্গালী উচ্চসমাজে সে মিশামিশি করিতে চাহে। সুরেনবাবু ও মিসেস্ উড্ প্রীতির ইচ্ছা পূরণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। সুরেনবাবু এতদিন পরে আবার সমাজে মিশিতে আরম্ভ করিলেন ও সর্ব্বদা প্রীতিকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। প্রীতিও যে একবৎসর কলেজে পড়িয়াও তাহার বন্ধুদের কখনও আসিতে বলে নাই বা তাহাদের বাড়ী কখনও যায় নাই সে রীতি ছাড়িল। সেই অবধি সে মধ্যে মধ্যে বন্ধুদের আসিতে বলিত ও তাহাদের বাড়ীতে যাইতে লাগিল। আজকাল আর সুরেনবাবুর বাড়ী ঘুমন্ত পুরী নাই, এখন তাহা যুবতীদের প্রমোদ-উদ্যান। বৈকালে প্রায়ই হাস্যকোলাহলে, ক্রীড়া-কৌতুকে উহা ঝঙ্কৃত ও মুখরিত হয়।

দিনের বেলায় প্রীতির বেশ আনন্দে কাটিয়া যাইত, কিন্তু রাত্রে শয়নকালে তাহার প্রতিফলে উদ্বেগ আসিত, মনোদুঃখে প্রীতির বুক যেন ফাটিয়া যাইত। তাহার স্বামী তাহাকে কেন এত উপেক্ষা করিতেছেন, সে কি দোষ করিয়াছে এইরূপ নানা চিন্তায় বিনিদ্র থাকিত। ক্রমে তাহার স্বাস্থ্যও নষ্ট হইতে লাগিল।

দেবব্রতের মানস-প্রতিমাকে প্রীতি প্রত্যহই পূজা করিত। সেই প্রথমচুম্বনে বালিকার মনে যে প্রণয়ের, যে ভক্তির বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহা এই কয়বৎসরে পুষ্পরূপে

প্রস্ফুটিত হইয়াছে। প্রীতি মনে মনে তাহার সমস্ত হৃদয়খানি দেবব্রতের চরণে ডালি দিয়াছে। সে কত আশা করিয়াছিল যে স্বামীকে প্রেম, ভালবাসা দিয়া ভরিয়া দিবে ও প্রণয়ের প্রতিদান পাইবে। কত সুখস্বপ্নে সে সুদীর্ঘ তিন বৎসর যাপন করিয়াছে, আর এখন এই শেষের কয়েক মাসের এত অবহেলা যেন তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। পাছে তাহার মা ব্যথা পান বা তাহার মনের ব্যথা বুঝিতে পারেন তাই সে আমোদে দিন কাটাইবার ব্যবস্থা করিত।

একদিন প্রাতে প্রীতি ও মিসেস্ উড্ বসিয়া গল্প করিতেছেন, কথায় কথায় দেবব্রতের ফিরিয়া আসিবার কথা উঠিল। মিসেস্ উড্ বলিলেন, "তোমার মা প্রতিদিন টেলিগ্রামের আশা করিতেছেন, তোমার স্বামী নিশ্চয় এইবার রওনা হইবে।" এই কথায় প্রীতি বিবর্ণ হইয়া পড়িল। এতদিন মনের ব্যথা চাপিয়া রাখিয়া ও রাত্রে ভাল না ঘুমাইয়া তাহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল। আবার ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে সে সংবাদপত্রে ইংলণ্ডের জাহাজের যাত্রীদের নামের তালিকায় দেবব্রতের নাম দেখিয়াছে। সেই অবধি তাহার বুকের ভিতর কি রকম করিতেছিল। সে এতক্ষণ গল্পালাপে সে-যন্ত্রণা চাপিতে চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ এই কথা শুনিয়া আর তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ অটুট রহিল না। তাহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মিসেস্ উড্ তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, তোমার কি অসুখ করেছে?" প্রীতি তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া খুব কাঁদিল ও পরে সংবাদপত্রে নামটা তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। মিসেস্ উড্ তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "বোধহয় তোমাকে তাক্ লাগিয়ে (surprise করে') দেবে বলে কোন খবর দেয় নাই।" প্রীতি বলিল, "না, না আমার মন বলছে যে তিনি চান না যে আমরা জানি।" এই বলিয়া সে মিসেস্ উড্‌কে অকপটে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন আপনি আমাকে বলুন আমার কি করা উচিত ও কি করলে দুঃখকে জয় করতে পারব।" প্রীতিকে মিসেস্ উড্ কন্যার মত ভালবাসিতেন। তাহার কষ্ট দেখিয়া তিনি দেবব্রতের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "দেবব্রত যদি তোমায় ব্যথা দেয় তো আমি তার প্রতিশোধ ল'ব। আমি কখনই চুপ করে' থাকব না। আবশ্যক হ'লে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত গিয়ে তার এইরূপ ব্যবহারের কারণ সন্ধান ক'রে তা সমূলে বিনষ্ট করব। আমার বাছাকে কষ্ট দিয়ে সে সুখভোগ করবে তা' কখনই হ'তে দেব না।"

প্রীতি স্থিরকণ্ঠে বলিল, "সে করে' কি আমার সুখ হ'বে? তবে কেন অন্যের সুখ নষ্ট করবেন? ব্যথার যে কি যন্ত্রণা যে ভুগেছে সেই জানে, সে আর অন্যকে ব্যথা দিতে চাহে না।" মিসেস উড্ বলিলেন, "যদি সে ভালবেসে বা বিবাহ করে' থাকে তা' হলে তোমার মায়ের উচিত তোমার আবার বিয়ে দেওয়া। তোমার তো নামে মাত্র বিবাহ হয়েছে।" মিসেস্ উড্ যদিও এতদিন হিন্দু পরিবারে ছিলেন তবুও তিনি হিন্দু রীতিনীতি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতেন না। কাজেই প্রীতির উত্তরে তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। প্রীতি বলিল, "বিবাহ একবার ছাড়া দু'বার কখনও হয় না। হিন্দুর কাছে বিবাহের বন্ধন চিরজন্মের মত ও হিন্দু রমণীর পক্ষে দু'বার বিবাহ অসম্ভব। তাহ'লে হিন্দু মেয়ের সতীত্ব থাকে না। আমি হিন্দু, আবার বিয়ে তো কখনই করব না। জীবনটা পৃথিবীর কাজে উৎসর্গ করতে চেষ্টা করব ও তাতে সিদ্ধিলাভ করবার জন্য সচেষ্ট হ'ব।" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ প্রীতি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "মাকে এখন কিছু বলবেন না, তাঁকে যতটুকু ব্যথা হ'তে রক্ষা করতে পারি তার চেষ্টা করতে হ'বে। আমি যথাসম্ভব হাসিমুখে দিন কাটাব।"

প্রীতি সেদিন আবার শ্বশুরবাড়ী বেড়াইতে গেল, যদি সেখানে কোন খবর আসিয়া থাকে সেই আশায়; কিন্তু সেখানে এ প্রসঙ্গ কেহই উত্থাপন করিল না। তখন সে তাহার মধ্যম দেবরকে আড়ালে লইয়া বলিল, "আজ কাগজ দেখেছেন?"

সে উত্তরে বলিল, "হাঁ, কেন জিজ্ঞাসা করছ বৌদি।" আপনারা তাহ'লে খবর পেয়েছেন কি? তবে আমাদের জানান নি কেন?"

সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কিসের খবর?"

প্রীতি কাগজখানা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, দেবরকে যাত্রী-তালিকায় তার স্বামীর নামটা দেখাইল। সে দেখিয়া

বলিল, "আমি তো লক্ষ্য করি নি। দাদা এমন করছেন ? খবর তো কিছুই দেন নাই। বম্বে থেকে নিশ্চয় খবর দেবেন। আমরা খবর পেলেই তোমাকে আগে খবর দেব, সে আর বলতে হবে না।" প্রীতির কিন্তু বড়ই মন খারাপ হইয়া গেল। দেবব্রত নিজের মাকে পর্য্যন্ত খবর দিল না, ইহার কারণ কি ? মায়ের স্নেহ, ভাইদের ভালবাসা এত শীঘ্র কি ভুলা যায় ? প্রীতির একবার মনে হইল হয় তো মিসেস্ হুডের কথাই ঠিক, সকলকে আশ্চর্য্য করিবার উদ্দেশ্যেই খবর দেন নাই।

দেখিতে দেখিতে সময় কাটিয়া গেল, কোন খবর দুই বাড়ীর লোকে পাইল না। দেবব্রত গৃহে ফিরিল না। পরে জানিতে পারা গেল যে, সুদূর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে সে সোজা নিজ কর্ম্মস্থানে গিয়াছে। তাহার মাতা হতাশ ও বিশেষ কাতর হইয়া অনতিবিলম্বে পুত্রের কর্ম্মস্থানে যাত্রা করিলেন।

কিছুদিন পরেই দেবব্রতের মাতা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কোন কিছু গোপন না করিয়া সকল কথাই প্রকাশ করিলেন। এই ঘটনায় প্রীতির উপর তাঁহার স্নেহ-ভালবাসা আরও বাড়িয়া গেল। প্রীতিকে বলিলেন, "মা, আজ থেকে তুমি আমার মেয়ে।" দেবব্রতের মাতা ক্রোধে ছেলের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। সুরবালাকে বলিলেন, "প্রীতি আমার মেয়ে, তুমি যদি ওর বিবাহ না দাও, আমি সৎপাত্র দেখে ওর বিবাহ দেব। ওর জীবন নষ্ট হবে তা আমি প্রাণ থাকতে সহ্য করতে পারব না।"

সুরবালা এই সংবাদে শোকাতুরা হইলেন ও ফলে সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। প্রীতির অবিশ্রান্ত শুশ্রূষায় তিনমাস রোগভোগের পর সুস্থ হইলেন। প্রীতির শাশুড়ী ও দুই দেবরও খুব সেবা-যত্ন করিয়াছিলেন। প্রীতির গুণে দুই পরিবারে যথেষ্ট প্রীতি জন্মিয়াছিল ও এই নূতন শোকে যেন তাঁহাদের মধ্যে সে প্রীতির বন্ধন আরও বর্দ্ধিত হইল।

দশ

সুরবালা সুস্থ হইলে তাঁহাকে লইয়া সুরেনবাবু ও প্রীতি পুরীতে হাওয়া-পরিবর্ত্তনের জন্য গেলেন। মিসেস্ হুড্ স্বদেশে বেড়াইতে গেলেন, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে বিলাত গিয়া এমিলীকে খুঁজিয়া সকল কথা জানান; কিন্তু প্রীতি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিল যাহাতে তিনি একাজ না করেন। শুধু বলিয়াই প্রীতি ক্ষান্ত হইল না, সে প্রত্যেক চিঠিতে মিসেস্ হুডকে লিখিত যে তিনি যেন কিছু না বলেন। তবে প্রীতির বড় ইচ্ছা হইয়াছিল যে যাহাকে দেবব্রত বিবাহ করিয়াছে, যাহার জন্য তিনি এত বড় অন্যায় করিতে পারিয়াছেন সে দেখিতে কেমন, তাহার গুণই বা কিরূপ ? যে দেবব্রত অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিল, মায়ের কথা ভিন্ন যে কখনও কোন কাজ করিত না, যে ভাইদের প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসিত, তাহার এত পরিবর্ত্তন হইল কি করিয়া; দেশে ফিরিয়া একবার তাহাদের দেখিতেও আসিলেন না। তবে কি তিনি নিজভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়াছেন না তাঁহার নব-প্রণয়িনীর আকর্ষণে সকলকেই ভুলিয়া গিয়াছেন।

সুরবালা পুরীতে আসিয়া বেশ সুস্থ হইলেন কিন্তু জীবনে তাঁহার আর যেন উৎসাহ নাই, সদাই উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। প্রীতি জোর করিয়া রোজ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যায়, কত হাসি কত গল্প করে। সমুদ্রের ধারে অনেকের সঙ্গে প্রীতি বেশ বন্ধুত্ব জমাইয়াছে, প্রীতিদের বাড়ীতে কত লোক বেড়াইতে আসেন, সকলে মিলিয়া দল বাঁধিয়া এখানে-ওখানে বেড়াইতে যান। প্রীতি নিজের ব্যথা গোপন করিয়া মাকে সজীব রাখিবার জন্য এইসকল অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া থাকে।

* * *

একদিন বৈশাখ মাসের অপরাহ্নে সুরবালা কিছুতেই বেড়াইতে যাইতে চাহিতেছেন না দেখিয়া প্রীতি অনেক সাধাসাধি করিয়া যখন তাঁহাকে রাজী করিতে পারিল না, তখন বলিল, "মা, আমি তবে মাসীকে (তাহার মানুষ-করা ঝিকে সে মাসী বলিত) নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসব কি ?" সুরবালা খুব উৎসাহের সহিত অনুমতি দিলেন। সুরবালার আজ একা থাকিবার একান্ত ইচ্ছা, আজ তাঁহার মন বড়ই খারাপ। তিনি আজ মেয়ের কাছে নিজের মনের ভাব গোপন করিবার জন্য ব্যস্ত, তাই প্রীতির সামনে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল ভাব দেখাইলেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে তিনি

কত আশায় পূর্ণ হইয়া প্রীতির বিবাহ দিয়াছিলেন, কত সুখের আশা করিয়াছিলেন। আজ সবই চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসর এই তারিখে ওঁদের বাড়ীতে কত উৎসব হইত। মাতা ও কন্যা দুইজনেই ভাবিতেছেন যে আজ কি দিন অন্যের বুঝি মনে নাই, তাই পরস্পর পরস্পরকে নিজ মনোভাব সম্বন্ধে অন্ধকারে রাখিতে ব্যস্ত। দুইজনেই নির্জ্জনে একটু চিন্তা করিবার অবসর খুঁজিতেছিলেন, তাই বেড়াইতে যাইবার আদৌ ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও প্রীতি ঝি ও দ্বারবানকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রের ধারে গেল। সমুদ্রের ধারে বসিয়া যেন তাহার মনোবেদনা ভগবানের নিকট জানাইবারই বাসনা। সে বাড়ী হইতে কিছুদূর গিয়া বালুকার উপর বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল, বাহ্যজগৎ সে একেবারে ভুলিয়া গেল। নিজ জীবনের ছবিগুলি আদ্যোপান্ত যতদূর মনে পড়ে প্রীতি তাহাই ভাবিতেছিল। এদিকে চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া ঘন কাল মেঘে যে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে সে হুঁস তাহার নাই। সে অপলকনয়নে দূরপথে দেখিতেছে, সম্মুখের লহরীলীলা তার দৃষ্টিপথে পড়িতেছে না। মাঝে মাঝে শুধু চোখদুটী জলে ভরিয়া উঠিতেছে ও দুই-এক ফোঁটা গাল বাহিয়া পড়িতেছে।

মাসী তা'র ব্যথার ব্যথী, সে জানিত যে প্রীতি মাকে ভুলাইবার জন্য তাঁহার সামনে প্রফুল্লভাব দেখাইত। প্রীতি মধ্যে মধ্যে কেন একেলা থাকিতে চায় তাহা মাসী বুঝিতে পারিত। এই সন্তানহীনা নারী প্রীতিকে বড়ই ভালবাসিত। তাহারও মনে আজিকার দিনের কথা জাগিয়াছিল, তাই সেও নীরবে একটু দূরে বসিয়াছিল। হঠাৎ তার হুঁস হইল যে ঝড় আসিতেছে, সে প্রীতিকে বলিল "চল মা বড় ঝড় আসছে।" প্রীতি উত্তর করিল, "ঝড়েতে একটু সমুদ্রের খেলা দেখে যাই।" তার মনে হইতেছিল যে তাহার মনে যেরূপ ঝড়টা বহিয়া বুকটা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতেছে, ঝড়ের প্রকোপে কি তেমনই সমুদ্রবক্ষেরও করিতেছে? এই ভাবিতে ভাবিতে সে আবার নিমীলিত নয়নে মেঘের ও জলের দিকে দেখিতে লাগিল। মাসীর বারংবার ডাক যেন আর তার কাণে যাইতেছিল না।

অল্পক্ষণ মধ্যে চারিদিক্ আরও অন্ধকার করিয়া ঝড় উঠিল। সমুদ্রবক্ষঃ যেন ক্ষোভে ক্রোধে দুলিয়া উঠিল, জলের কি প্রকোপ—কি চাঞ্চল্য! একদিকে মেঘের প্রলয়গর্জ্জনের সহিত সমুদ্রের ধ্বনি মিশিয়া মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছিল, অন্যদিকে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা যেন পর্ব্বতরাজির মত বিস্তৃত হইয়া সৈকতভূমিকে গ্রাস করিতে উদ্যত। এই সকল কারণেও প্রীতির মনে ভয় নাই, সে সেই ঝঞ্ঝার মধ্যে যেন নিজমনের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়া চিন্তান্বিত। সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া শুধু ঝড়ের খেলা দেখিতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছাদিত, আকাশে ঘন কাল মেঘ, সমুদ্রের কাল জল, সবারই কাল রূপ। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎলীলায় তরঙ্গশীর্ষে শ্বেত-ফেনাভূষণ অপরূপ চিত্র তাহাদের দৃষ্টিপথে মুহূর্ত্তের মধ্যে উপস্থিত হইয়া আবার অন্ধকারে মিলিয়া যাইতেছিল। প্রীতির হৃদয়াকাশেও আজ সেইরূপ সকলই অন্ধকার, আশার রেখামাত্র তার নাই, তবুও যেন মধ্যে মধ্যে আশার ক্ষীণ আলোক জাগিয়া আবার নিমেষে মিলাইয়া যাইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। তাহাতে প্রীতির চমক ভাঙ্গিল, সে আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইল যে তিনজন লোক তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাদের দেখিয়া প্রীতি দাঁড়াইয়া রহিল। তখন আর তার ঝড়ের ভয় নাই, বৃষ্টিতে ভিজিতে আপত্তি নাই। দেখিতে দেখিতে একটী বছর দশেকের বালিকা প্রীতির কাছে আসিয়া পড়িল। সে প্রীতিকে দেখিয়া বলিল, "আপনিও আমাদের মত ঝড়-বৃষ্টিতে পড়েছেন? আপনারও কি বাড়ী অনেক দূর? বাপ্‌রে কেমন করে' বাড়ী পৌঁছাব জানি না, বাড়ী যে দূরে আর ঝড়েতে এগুতেই দিচ্ছে না—ফেলে দিচ্ছে যে।" প্রীতি বলিল, "আমার সঙ্গে এস, আমার বাড়ী খুব কাছে, ঝড় থামলে বাড়ী যেও।" প্রীতির কথা শেষ হইতে না হইতেই বালিকার সঙ্গীরা আসিয়া পড়িল, প্রীতির সম্মুখে এক তন্বী ও এক তরুণ যুবক বালিকার পাশে দাঁড়াইল। বালিকা বলিল, "দাদা, দিদি, এঁর বাড়ী খুব কাছে, ইনি আমাদের ওঁর বাড়ী যেতে বলছেন, চল না। বাপ্‌রে যে ঝড়, আর বৃষ্টির চোট, আমি চোখে দেখ্‌তে পারছি না।"

প্রীতি বলিল, "আপনারা আমার সঙ্গে চলুন। মা বড় খুসী হবেন"—বলিয়া প্রীতি বালিকার হস্ত ধরিয়া চলিতে লাগিল। কাহারও আর কথা কহিবার শক্তি নাই। তাহারা নীরবে চলিল। এদিকে সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জনের সহিত বজ্রের নিনাদের যেন স্বরসাধন হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আলোক তাহাদের নয়ন ধাঁধিয়া দিতেছিল।

একটু যাইতেই প্রীতি দেখিল যে তাহার দাদু চাকর সঙ্গে লইয়া তাহারই খোঁজে আসিতেছেন। বেচারা সুরেনবাবু খোঁড়া পায়ে ঝড়ের আঘাতে ভাল হাঁটিতে পারিতেছেন না। প্রীতি দেখিতে পাইয়া একটু ক্ষিপ্রপদে তাঁহার কাছে গিয়া বলিল, "দাদু, আমার জন্য এত কষ্ট করে' কি আস্‌তে হয়? আমার সঙ্গে তো লোক রয়েছে, তখন এত ভয় কেন? আমার জন্য আপনি কত কষ্টই পেলেন?"

"তুমি যে আমাদের নয়নের মণি ভাই, তুমি একটু চোখের আড়াল হ'লে যে অন্ধকার দেখি।"

"সে কথা এখন থাক্ দাদু, এঁদের বাড়ী নিয়ে যাই চলুন, সকলে বড় ভিজে গেছেন।"

সকলে যথাসম্ভব শীঘ্র চলিয়া প্রীতিদের বাড়ী পৌছিল। সুরবালা বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি কোন কথা বলিবার আগেই প্রীতি বলিল, "মা, দেখ, কাদের আমি সঙ্গে করে' এনেছি, ভাগ্যে মা আমি একটু ঝড়ের ও ঢেউয়ের খেলা দেখ্‌বার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলাম, তাই তো এঁদের পেলাম, আমাকে বক্‌তে পাবে না মা।" সুরবালা একটু হাসিয়া বলিলেন, "এত ভিজে গেছ, যদি অসুখ করে?"

উত্তরে সে বলিল, "এঁদের বুঝি অসুখ করতে জানে না, আগে এঁদের ছাড়্‌বার কাপড় দেবে চল মা। দেখ তো, কত ছোট মেয়েটী, ও যে কাঁপ্‌ছে।" তারপর প্রীতি সুরেনবাবুকে বলিল, "দাদু আপনি বাবুটীর ভার নিন, আমরা ওপরে যাচ্ছি।"

তখনও সন্ধ্যার আলো সর্ব্বত্র জ্বালা হয় নাই, অন্ধকারে ভাল দেখা যাইতেছিল না, প্রীতি সেজন্য চাকরদের তাড়া দিয়া উপরে গেল। সুরবালা ইতঃপূর্ব্বেই মেয়ে দুইটীকে লইয়া উপরে গিয়াছিলেন। প্রীতি তাড়াতাড়ি নিজের ভাল কাপড় বাহির করিয়া মেয়ে দুইটীকে দিল। সুরবালা নিজহস্তে ছোট মেয়েটীর মাথা মুছাইয়া কাপড় ছাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। প্রীতির বড় জামা-কাপড় কোনপ্রকারে তাহাকে পরাইয়া দিলেন। এদিকে প্রীতি নিজের কথা ভুলিয়া বড় মেয়েটীর জন্য ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছিল। দাসী আসিয়া প্রীতির চুল খুলিয়া দিবার জন্য টানাটানি আর ভিজা কাপড় বদ্‌লাইতেছে না বলিয়া বকুনি আরম্ভ করিয়া দিল।

সকলের কাপড় ছাড়া হইলে প্রীতি কাপড় ছাড়িল। সে যখন হাল্‌কা বাসন্তী রংয়ের পাত্‌লা সাটী জ্যাকেট পরিয়া একরাশ কাল চুল পিঠে ছড়াইয়া, কপালে একটী সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া আস্তে আস্তে নীচের বসিবার ঘরে ঢুকিল, তখন দীপালোকে মনে হইল যেন কোন ঋষিকন্যা আসিয়া উপস্থিত। যুবক নির্ম্মলকুমার তো একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে সভ্যতা ভুলিয়া অপলক দৃষ্টিতে প্রীতির দিকে চাহিয়া রহিল। সেই দৃষ্টিতে প্রীতি লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল।

ইহার পূর্ব্বে অন্ধকারে, ঝড়ে বৃষ্টিতে কেহই কাহাকেও ভাল করিয়া দেখে নাই। এখন প্রীতির রূপ দেখিয়া ছোট মেয়েটী রমা, ছুটিয়া প্রীতির নিকট গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "আপনি কি সুন্দর, আপনাকে দেখে গল্পের দেবকন্যার মত মনে হচ্ছে।" প্রীতি ঈষৎ হাসিয়া, বালিকার মুখটী তুলিয়া একটী চুম্বন দিয়া বলিল, "দেখ্‌লে তো আমি মানুষ ছাড়া আর কিছু নই।"

কিছু পরেই সুরবালা গরম চা ও জলখাবার আনিয়া সকলকে সযত্নে খাওয়াইলেন। তারপর সকলে বসিয়া গল্পালাপ করিতে লাগিলেন, যতক্ষণ বৃষ্টি না থামে অভ্যাগতদের বাড়ী যাওয়া তো অসম্ভব। কথাপ্রসঙ্গে সুরবালা জানিলেন যে তাঁহারা দুই ভাই ও দুই ভগিনী। নির্ম্মলকুমার বড়, তাহার বয়স ২৩, সম্প্রতি উকিল হইয়াছে। বড় মেয়েটী নীলিমা বয়স সবে ষোল বৎসর। মেয়েটী খুব সুন্দরী না হইলেও রং ফর্সা বলা যায় ও খুব সুশ্রী, তাহার মুখখানি যেন কোন অসামান্য শিল্পী নিখুঁৎ করিয়া গড়িয়াছেন। সে এক বৎসর বাগ্‌দত্তা। বিবাহের সব পাকা

হইবার পর তাহার ভাবী স্বামী বিলাতে পড়িতে গিয়াছে, আর দুই বৎসর পর ফিরিবে। নীলিমা এখন স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গিনী হইবার জন্য নানা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। রমার বয়স বার বৎসর, সে স্কুলে পড়ে, দেখিতে সে অনেকটা তাহার দিদির মত। নির্ম্মলরা কায়স্থ, তাঁহাদের পিতা নৃপেন্দ্রনাথ বসু, সরকারী বড় চাকরী করেন, উপস্থিত লক্ষ্ণৌ শহরে বাস করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিতে হয় বলিয়া নির্ম্মল ও নীলিমা ভবানীপুরে মামার কাছে থাকিয়া পড়িত। রমা ও তাহার ভাই বিমল পিতামাতার কাছেই থাকিত। তাহারা সকলে দুই-তিনমাস হইল পুরীতে রমার জন্য বায়ুপরিবর্ত্তনে আসিয়াছে। স্বর্গদ্বারের কাছে তাহারা বাড়ী লইয়াছিল, সে বাড়ী প্রীতিদের বাড়ী হইতে অনেক দূর। যত দেরী হইতে লাগিল ততই নির্ম্মলের চিন্তা বাড়িতে লাগিল। তাহাদের পিতামাতা কতই না ভাবিতেছেন। সুরবালা তাহাদের আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি। একটু বৃষ্টি থাম্‌লেই গাড়ী ডাকিয়ে আমি নিজে সঙ্গে করে' তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসব।"

ক্রমশঃ

শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য

শ্রীহরিহর শেঠ

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ ও স্নেহাস্পদ বালকবৃন্দ! আজ এই সভায় আমাকে সভাপতির আসন দিয়া আপনারা যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন, সেজন্য আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

আমি প্রথমেই কৃতী ছাত্রবৃন্দকে অভিনন্দিত করিতেছি। যাহারা এবার বিফলমনোরথ হইয়াছে, আশা করি তাহারা নিজ নিজ চেষ্টার দ্বারা পরবৎসর সফলতালাভ করিবে। প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে দুই-একপদ পশ্চাতে পড়িয়া থাকার অর্থই যে নিষ্ফলতা তাহা আমি মনে করি না, অথবা বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়সকলের পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়াই যে ছাত্রজীবনের চরম লক্ষ্য তাহাও নহে। পরীক্ষা পাঠ্য-বিষয়-শিক্ষার মাপকাটি হইতে পারে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাড়পত্র লইয়া জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পাইলেই যে সর্ব্ববিষয়ে তথাকার উপযোগী হইবে এরূপ বলা যাইতে পারে না। পূর্ণাঙ্গ মানবত্বেরই প্রয়োজন। মানবজীবনকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্যই শিক্ষার দরকার। বিদ্যালয়গুলিই সকল বিষয়ে শিক্ষার পবিত্র সাধনক্ষেত্র হওয়া উচিত। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় হইলেও নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়, একণে অধিকাংশ বিদ্যালয়ই ঠিক তাহা নহে। বহুক্ষেত্রেই মনে হয় এখনকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা এমন কোন কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই হয় না। ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইতে হইবে, সুতরাং বিদ্যালয় চাই। এই বিদ্যালয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন ভালই, নচেৎ স্থানীয় এক বা কতিপয় লোকের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লীগ্রাম বা এখানকার মত স্থানে উচ্চ প্রাইমারি অথবা মধ্য-ইংরেজি বা মাইনর, এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ই সাধারণতঃ দেখা যায়; আর তাহার উন্নতি অর্থে প্রথম বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণের চেষ্টা, তৎপরে উহাকে উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত করা। সাধারণতঃ দেখা যায় ইহাই চরম লক্ষ্য, তারপর সেই বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বা পরীক্ষার ফল যদি পর পর ভাল হয়, তাহাহইলে তথা হইতে অধিক কামনার আর বড় কিছু থাকে না। যুবকগণ শিক্ষামন্দির হইতে বাহির হইয়া মনুষ্যত্বলাভে কতটা সফল হইল—সমাজ ও সংসারের পক্ষে কতটা উপযোগী হইল—একল বিষয় চিন্তা করা বিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যের মধ্যে থাকে না।

ভাষাজ্ঞান বা আক্ষরিক বিদ্যালাভ মানবত্বের একটা প্রাথমিক বা প্রধান অবলম্বন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই পথে অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গেই পুস্তকগত বিদ্যা ছাড়া অনেককিছু শিক্ষা আবশ্যক। জীবন-সংগ্রামে বাঁচিবার জন্য বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা-লাভের দরকার। সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, যাহা কিছু শিক্ষা করা যাক্ তাহাতে লাভ আছে। কিন্তু তাহাই মানুষের জীবনের শিক্ষার সবটুকু নয়। আদর্শ জীবনলাভের জন্য আমরণ জীবনের সঙ্গে যাহা অঙ্গীভূত করিয়া রাখিতে হইবে তাহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যদ্দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি, স্বভাবজ উন্নতির সহায়তা না হয়, ধর্ম্মে আস্থা, নিজের প্রতি বিশ্বাস না আসে, গৃহস্থের কর্ত্তব্য, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য, নাগরিকের কর্ত্তব্য শিক্ষা না দেয় সে শিক্ষা অপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহাতে এসব বিষয় খুবই অসম্পূর্ণ; অথচ এসব শিক্ষা পাইবার জন্য বিদ্যালয় ছাড়িবার পর আর সময়-সুযোগ বড় থাকে না; সুতরাং বিদ্যাভ্যাসের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যেই আবশ্যকীয় সকল শিক্ষার স্থান থাকা প্রয়োজন।

ধর্ম্মহীন শিক্ষাও আমাদের দেশের ধাতুগত নহে। ধর্ম্মালোচনা দ্বারা আভ্যন্তরীণ উন্নতিলাভ করা এদেশের বিদ্যাশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। জ্ঞানবান হইলেই ধার্ম্মিক হইবে এমন কোন কথা নাই। ধর্ম্মহীন পাণ্ডিত্য অপেক্ষা জ্ঞানহীন ধার্ম্মিক শ্রেয়ঃ। মহত্ত্বই মানুষের সার সম্পদ, সুতরাং ধর্ম্মাশ্রিত শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। যে সব প্রতিষ্ঠানে এই মহৎ আদর্শ লইয়া শিক্ষাদান করা হয় তাহাকেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষালয় বলি। শিক্ষার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানে শুধু উৎকৃষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইবার নয়।

আমরা ইংরাজি শিক্ষা করি, উচ্চশিক্ষালাভের জন্য, যে সব ইংরাজি গ্রন্থ অধ্যয়ন করি, ইংলণ্ডের যুবকগণও সেই সব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষালাভ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের স্বদেশপ্রীতি, দেশাত্মবোধ, স্বাধীন মনোবৃত্তি প্রভৃতি গুণে যে উচ্চাদর্শে হৃদয় গড়িয়া উঠে আমাদের তাহা হয় না কেন? লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া সে দেশের লোকও কেরাণীগিরি বা অন্য চাকুরী করে, কিন্তু তাহারা তো আমাদের মত প্রভুর দাস বনিয়া যায় না বা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আমাদের মত তথাকার লোক জাতীয়তা বিসর্জ্জন দেয় না। যে জাতির যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহাকে বলি দিয়া জাতি কখনও উঠিতে পারে না। জাতীয় ভাবধারা অনুসরণ না করিয়া যে শিক্ষারই ব্যবস্থা করা হউক, তাহাতে ইষ্ট সাধিত হয় না, বরং উহাতে অনিষ্টোৎপত্তিরই সম্ভাবনা থাকে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানসিক পরিপুষ্টি। এই পরিপুষ্ট মনঃসম্পন্ন মনুষ্য-সমষ্টির দ্বারা যে শক্তি গঠিত সে জাতি উন্নত। শিক্ষার মূলসূত্র সকল জাতির এক নহে। অধুনা জগতের মধ্যে বিশিষ্ট সভ্যজাতি বলিয়া যাঁহারা খ্যাত তাঁহাদের সকলেরই শিক্ষার আদর্শ স্বতন্ত্র। ফরাসীর সহিত জর্ম্মাণীর, জর্ম্মাণীর সহিত ইংরাজ, এমন-কি ইংরাজের সহিত আয়র্লণ্ডের শিক্ষা অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে culture বলে তাহার ঠিক মিল নাই। জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষবিধান জন্য শিক্ষা জাতীয় ভাবের হওয়া আবশ্যক; সুতরাং দেখা যাইতেছে শিক্ষার আদর্শই জাতীয় উন্নতি-অবনতির জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। এই আদর্শ উচ্চ হওয়া আবশ্যক; এজন্য প্রথম দরকার চরিত্রবান্ জ্ঞান ও শ্রদ্ধার বিগ্রহ-মূর্ত্তি সু-শিক্ষক ও শিক্ষাদানের সুন্দর পদ্ধতি। শিক্ষকের মন হইতে একথা একবারও অন্তর্হিত না হয় যে শিক্ষা পাওয়া মনুষ্য-জীবনের একটা কাজ সারা মাত্র নহে, উহা শিক্ষার্থীর জীবনের বস্তু। উহা দেহের রক্ত-মাংসের মত জড়িত। উহার সম্পর্ক জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত। শিক্ষকের পবিত্র কর্ত্তব্য ছাত্রের অধীত পুস্তকে একটা অধিকার বা চিন্তার মৌলিকতা জন্মাইয়া দেওয়া বা জ্ঞানার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়াতেই শেষ হয় না। প্রকৃত শিক্ষকই বিদ্যার্থীর সম্মুখে মূর্ত্তিবন্ত শিক্ষা, জ্ঞানের জীবন্ত প্রস্রবণ।

প্রতিষ্ঠান যেরূপই হোক, উহা পরিচালনার উদ্দেশ্যই প্রথম কথা। সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ও তাহা পালনের চেষ্টা ভিন্ন কোন প্রতিষ্ঠানই সাফল্যলাভ করিতে পারে না। সেকালের গুরুগৃহে অধ্যয়নের কথা ছাড়িয়া দিলে, বর্ত্তমানে এ দেশের শিক্ষা ও শিক্ষালয়সকলের ধারা ও

আদর্শ বৈদেশিক শাসনের সহিতই আসিয়াছে। ইংরাজেরা তাঁহাদের আগমনের প্রথম যুগে চাহিয়াছিলেন, আমাদিগের মধ্যে এমন একটা জাতি গঠন করিতে যাঁহারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় থাকিলেও, প্রবৃত্তি, প্রজ্ঞা এবং মতে ইংরাজ হইবে। এক কথায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল তাহারা "more English than Hindu" হইয়া উঠিবে। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন আমাদিগকে তাঁহাদের সর্ব্বাংশে অনুরাগী করিয়া তোলা। তাঁহাদের শাসন ও ব্যবসায় কার্য্য চালাইবার সুবিধার জন্য তাঁহারা চাহিয়াছিলেন একদল কাজ চালাইবার মত ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ লোক। জ্ঞানে ও ধর্ম্মে গরীয়ান করিয়া তোলা সে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল না। স্বাবলম্বনের পথ দেখাইয়া দেওয়াও তার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং কার্য্য ও ব্যবস্থায়, আইন ও শাসনে সে পথ যথাসম্ভব অর্গলরুদ্ধই করা হইয়াছিল; সুতরাং আমাদের পঙ্গুত্ব অনিবার্য্য ছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালী বলিতে একটা ধর্ম্মজ্ঞান ও শৃঙ্খলাহীন কেরাণীজাতি বুঝানর বিচিত্রতা কি? বৈদেশিক শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়াই বাঙ্গালী শিক্ষার সহিত অর্থের সম্পর্ক প্রথম বুঝিতে শিখে, তাই তাহারা অপর সমস্ত দিক্ ভুলিয়া অবাধে সেই শিক্ষায় গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। ভগবানের আশীর্ব্বাদ কি অভিসম্পাত জানি না আজ অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইতেছে। আজ আর গতানুগতিক শিক্ষায় অন্ন-বস্ত্র-সংস্থানের সমস্যা পূরণ হইতেছে না; সুতরাং আমাদের শিক্ষার আদর্শ-বিষয় নূতন করিয়া চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে।

পরাধীনতা অশেষ অকল্যাণের আধার ইহা সত্য, কিন্তু রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই যে একপ্রকার জাতীয় অবনতি ঘটিবে এমন কথা নাই। দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে থাকিয়া আমাদের সামাজিক জীবনে, আহারে, ব্যবহারে, ভাষায়, পরিচ্ছদে যে কিছু বিপার্য্যয় ঘটে নাই তাহা নহে। তৎপরে পৌনে দুইশত বৎসরের রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনেও সে বিপর্য্যয়ের ছাপ এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয় নাই। তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে মিশিয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাতেও আমাদের ভাবরাজ্যে এমন অধঃপতন আনিতে পারে নাই। পারে নাই তার অর্থ,—রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আমাদের জাতিধর্ম্ম চাহিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু আমাদের ভাবনীতিতে এরূপ বিজয়বাসনা, তাহার উপর আধিপত্যপ্রচেষ্টা ছিল না।

আমি এখানে মুসলমান ও ইংরাজ শাসনের তুলনায় প্রবৃত্ত হই নাই বা ইংরাজ শাসনের অথবা ইংরাজী শিক্ষার দোষ দেখাইবার জন্যও এসব কথার অবতারণা করি নাই। ইংরাজি শিক্ষায় কোন লাভ নাই বা ইংরাজ জাতির নিকট হইতে গ্রহণের কিছু নাই, একথা কেহই বলিতে পারেন না। আমার বলিবার কথা শুধু, ঠিক উদ্দেশ্য লইয়া না চলিলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

আপনাদের এই বিদ্যালয়ের ত্রয়োবিংশতি বৎসরের অতি সংক্ষিপ্ত কথা শুনিলাম, তাহা হইতে স্বল্পসামর্থ্য লইয়া আপনাদের চেষ্টায় কিরূপে ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা অবগত হইলাম। একশতটী ছাত্র পাইলেই আপনাদের সরকারী সাহায্যের পরিমাণ দ্বিগুণ হইতে পারে সেজন্য ছাত্রের তালিকায় এই সংখ্যা, পূরণের জন্য স্থানীয় অভিভাবকদিগের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন। জীবনযাপনের সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রায় অর্থের বিনিময় ভিন্ন কোন কিছু আদান-প্রদান সম্ভবপর নহে। শিক্ষাক্ষেত্রেও পূর্ব্বেকার উদারতা নাই, সুতরাং ইহাতেও ব্যয়বাহুল্য অনিবার্য্য। এই ব্যয়ের জন্য বে-সরকারি ছোট ছোট পল্লীবিদ্যালয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্রদের মুখা-পেক্ষী হইতেই হয়। পূর্ব্বে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের মধ্যে অর্থের কথা ছিল না। এই বাঁশবেড়িয়ায় গঙ্গাতীরে একসময় বহুসংখ্যক টোল ছিল। তখন এইস্থানেই গুরুদেব ছাত্রদের গৃহে রাখিয়া শুধু মনের খোরাক শিক্ষা নয়—তাহার সঙ্গে দেহের খোরাকও দিতেন। দেশের রাজা, জমিদার প্রভৃতি তখনকার এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অন্যদিকে অর্থোপার্জ্জনই শুধু তখন ছাত্রের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল না। দৈহিক উন্নতির সহিত মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিসকলের পূর্ণ পরিণতি দ্বারা জ্ঞানধর্ম্মে গরীয়ান হইয়া মানবতার চরম উৎকর্ষলাভ করাই তখন প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সে শিক্ষায় জ্ঞানান্বেষণের সহিত বুদ্ধি বিকশিত, রুচি মার্জ্জিত, কর্ম্মে আসক্তি আনিত।

সেই উচ্চ আদর্শের শিক্ষার দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে, আর সেই সঙ্গে বাঁচিবার জন্য মানুষের মতন করিয়া বাঁচিবার জন্য যেমন শিক্ষা প্রয়োজন, সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শুধু রাষ্ট্রে নয়, সকল দিকেই আজ মরণ-বাঁচনের একটা সন্ধিক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন চাই সৃষ্টি-সামর্থ্য। বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে, জীবন-সংগ্রামে বিপর্য্যস্ত বাঙ্গালী যুবককে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। নিজের চেষ্টায় আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন চাই গঠন-যজ্ঞের পূর্ণানুষ্ঠান, বাঙ্গালার শ্মশান-পল্লীগুলির সংস্কার। উহাই সংগঠন-যজ্ঞের পীঠস্থান।—এই সংস্কারের জন্য দেশের বল যুবকদের আত্ম-নির্ভরশীল কুসংস্কারমুক্ত সুনাগরিক করিয়া তুলিতে হইবে।

আজ দেশমধ্যে যে নবযুগের মহা অভ্যুদয়ে নবজাগরণের মহাসূচনায় নব অরুণোদয়ের ন্যায় পূর্ব্বগগন আলোকিত, যে শিক্ষায় এই নূতন যুগ ও জাগরণকে বরণ করিয়া লইবার শক্তিবৃদ্ধি না হয়, তেমন শিক্ষার স্থান থাকিতে পারে না। স্বদেশপ্রীতি ও দেশাত্মবোধ এখন শিক্ষার প্রথম কথা। জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ, তার প্রথম কর্ত্তব্য। যে শিক্ষায় সে পথের বাধা আনিতে পারে তাহাও পরিত্যাজ্য। শুধু শিক্ষা কেন এখন এমন বেশ, এমন আহার, এমন খেলা, এমন উৎসব, এমন চিন্তার স্থান থাকিতে পারে না যাহা দেশাত্মবোধ, স্বদেশ-প্রীতির পরিপোষক নহে।*

জগতে পতিত জাতির মুক্তি-আন্দোলনের চেষ্টা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রাচীনকালে হেলেনদের প্রত্যেক কৌমের (tribe) একজন করিয়া রাজা থাকিত, তিনি ভগবান জিউস (Zeus) হইতে রাজদণ্ড ও মানবকে শাসন করিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেন। ইহার নিম্নে সর্দ্দারেরা (chiefs), তৎপর স্বাধীন জনসংঘ বাস করিত, তাহারা রাজমিস্ত্রী, সূত্রধর, চর্ম্মকার, বৈদ্য, পুরোহিত, চারণ, মৎসজীবী প্রভৃতি পেশা অবলম্বন করিত। ইহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কি প্রকারের ছিল তাহা আজ নিরূপণ করা যায় না। সর্দ্দারদের কিন্তু জমিদারী ছিল, ক্রীতদাস দ্বারা তাহারা জমী চাষ করাইত এবং কিয়দংশ মাহিনা-করা গরীব স্বাধীন লোকদের দ্বারা চাষ করাইত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে Thetes বলিয়া অভিহিত করা হইত। এই সময়ে গোলামদের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ছিল না, কারণ সেই যুগে সর্ব্বশ্রেণীর লোকদের ভাব ও শিক্ষা প্রায় এক প্রকারেরই ছিল। তখন স্ত্রীলোকদের বিশেষ কষ্ট ছিল (কার্য্যতঃ তাহারাও গোলাম-শ্রেণীভুক্ত ছিল) কিন্তু থেটিস্ বা গরীব স্বাধীন লোকদের নিজের জমি না থাকায় এবং ঠিকা কার্য্যের উপর জীবিকানির্ব্বাহে বাধ্য হওয়ায় ও সমাজে পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ায়, তাহাদের অবস্থা তখন ভাল ছিল না।

গ্রীসের সামাজিক অবস্থা মোটের উপর এইরূপ ছিল। ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে অনেকস্থলে বিজেতা ও বিজীত দ্বারা সমাজে শ্রেণীসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে, আবার অনেকস্থলে অর্থনৈতিক তারতম্যবশতঃ শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে, এই শ্রেণীস্তর মধ্যে কোন শ্রেণী-সংঘর্ষ উপস্থিত হইত কি না এবং যদি তাহা হইত তাহা হইলে সাহিত্যে ও ইতিহাসে তাহার কি নজীর আমরা পাই? এই বিষয়ে অনিসন্ধিৎসু হইয়া আমরা সর্ব্বপ্রথমে সাহিত্যের মধ্যে তাহার প্রমাণ পাইতে চেষ্টা করিব।

* বাঁশবেড়িয়া এম, ই, স্কুলে পারিতোষিক বিতরণ-উৎসব উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ। ২৬এ বৈশাখ ১৩৩৮।

অমর কবি হোমার হইতে আমরা সর্ব্বপ্রথমে গ্রীসের সংবাদ পাই। তিনি তাঁহার 'ইলিয়াডে' যে সমাজের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে গ্রীস ইতিহাসের মধ্যযুগের (Middle Age) সামন্ততন্ত্র (feudalism) যে তৎকালে প্রচলিত ছিল তাহা জানা যায়। কাহারও মতে খৃঃ পূঃ দশম শতকে, কাহারও মতে অষ্টম শতকে হোমার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গ্রীসের প্রাচীন যুগ (Heroic Age বা Classical Age) তাহার অগ্রেই শেষ হইয়াছিল। হোমার-বর্ণিত সমাজে আমরা শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাই পূর্ব্বেই ইহা উক্ত হইয়াছে। এই সময়ের সমাজে সকলে একসঙ্গে কায়-কর্ম্ম করিলেও একটা আভিজাত্যের অহংকার (aristocratic tone) বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার খাতির বেশী হইত এবং গণসংঘ (masses) রাজনীতির চর্চ্চা করিলে তাহাতে অসন্তোষ উৎপন্ন হইত। এই সময়ে সমাজে "জোর যার মুল্লুক তার" এই ছিল মূলমন্ত্র! এই যুগে মন্দিরে নরবলিও হইত।

হোমার যেমন যোদ্ধাদের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করিয়াছেন, পরবর্ত্তী যুগের বড় কবি হেসিয়ড (Hesiod) তেমনই গরীবের দুঃখবর্ণনা করিয়াছেন। ইনি গ্রাম্য বা কৃষক কবি নামে খ্যাত ছিলেন। হেসিয়ড পরিশ্রমকে প্রশংসা করিয়াছেন, ক্ষমতাপন্ন লোকদের বিশেষতঃ জজদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া অভিশাপ করিয়াছেন। হেসিয়ডের যে তিন খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে "এরগা"র (Erga) কৃষিকর্ম্মের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে একজন পরিশ্রান্ত ভগ্নদেহবিশিষ্ট কৃষকের অবস্থার এইরূপ বর্ণনা আছে। এই কৃষক গ্রাম্যজীবন ভালবাসিত এবং অধিকতর ভালবাসিত যদি অধিকমাত্রায় খাইতে পাইত এবং কম খাটিতে হইত! এই পরিশ্রান্ত ও বুভুক্ষু কৃষকের মনে ভাবের উচ্ছ্বাস নাই। এই কবিতার প্রথম অধ্যায়ে সামাজিক ব্যাপার অতি তীব্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে:—'কুমার কুমারের উপর রুষ্ট, সূত্রধর সূত্রধরের উপর; এবং-কি ভিক্ষুক অন্য ভিক্ষুকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং চারণ চারণের প্রতি।" তৎপর তিনি জজদের প্রতি রাগান্বিত হইয়াছেন, কারণ তাহারা গরীবকে লুণ্ঠন করে,— "আহাম্মকেরা জানে না যে পূরা হইতে অর্দ্ধেক ভাল এবং ম্যালো (Mallow) ও আসফোডেলে (Asphodel) কিছু আনন্দ নাই।" ম্যালো (Mallow) নামক একপ্রকারের চারাগাছ যাহা গরীবদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত এবং গ্রীক পুরাণোক্ত মৃতব্যক্তিদের ফুল আসফোডেল, পরকালের নন্দনকাননের মধ্যে ও গ্রীসের পাহাড়ে জন্মাইত। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে এই সামান্য জিনিস হইতেও গরীবেরা বঞ্চিত হইত।

তৎপর আবার কবি বলিতেছেন—"কঠোর পরিশ্রমে কোন লজ্জা নাই, আলস্যেই লজ্জা" এবং "তোমার প্রতিবেশীকে সাহায্য কর, সে তোমাকে প্রতিদান করিবে। একজন প্রতিবেশী একজন জ্ঞাতি অপেক্ষা ভাল।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "ভাল মাপ দাও এবং যদি পার তবে ঠিক মাপের উপর কিছু দিও।"

হেসিয়ডে এই বর্ণনাতে আমরা "জোর যার মুল্লুক তার" নীতির প্রমাণ পাই। তিনি গরীবের কবি, গরীবের দুঃখ বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রাচীন যুগে স্বর্গরাজ্যের বা সুবর্ণযুগের কোন আভাস নাই!

হেসিয়ডের নৈতিক কবিতাতে ক্ষমতাবান্ ও সম্পত্তিশালী শ্রেণীদের প্রতি যে ভর্ৎসনা আছে তাহা পড়িয়া আমরা হিব্রু পয়গম্বরদের ঐ প্রকারের উক্তিগুলির সহিত সাদৃশ্য দেখিতে পাই! ইহার পর, নৈতিক কবিতা হইতে যে ধারা নিঃসৃত হইয়াছিল তাহা "অরফিউসের" (Orpheus) নেতৃত্বে ধর্ম্মের খাতে প্রবাহিত হয়। অরফিউসের ধর্ম্ম-আন্দোলন সাধারণ লোকমধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল; সাহিত্যে তাহার কোন চিহ্ন আর পাওয়া যায় না; কিন্তু যে স্থলে এই আন্দোলন দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তথায় ইহাকে আবার দেখিতে পাওয়া যায়। পিথাগোরাসের দর্শনে ইহার চিহ্ন পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। পিথাগোরাস এক সন্ন্যাসীভ্রাতৃ-সম্প্রদায় স্থাপিত করেন। অতীন্দ্রিয়বাদ (Mysticism) এবং পবিত্রতা তাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল।

এই সঙ্গে এশিয়া মাইনরে ডিয়নিসাস্ (Dionysus) নামে একজন ব্যক্তি উত্থিত হইয়া এক ধর্ম্মান্দোলনের সৃষ্টি করেন। ইহার মধ্যেও mysticism বিশেষভাবে বর্ত্তমান ছিল। এই ধর্ম্মান্দোলনকে Dionysian cult এবং

Eleusynian mysteries নামে আখ্যাত করা হয়। এথেন্সের কাছে Eleusis নামক স্থানে এই ধর্মের প্রধান মন্দির ছিল। সমগ্র গ্রীসে এই ধর্মান্দোলন বিস্তারিত লাভ করে। স্ত্রীলোকেরা বেশীর ভাগ এই ধর্মের উপাসক ছিল। উপাসকবর্গ ধর্মান্ধ হইয়া গীত ও বাদ্যাদিসহকারে শোভাযাত্রা করিয়া মন্দিরে গিয়া তাণ্ডবনৃত্য করিত। এই নৃত্যকে Bacchalian dance বলা হইত। ধর্মান্ধতার সহিত অদ্ভুতভাবে স্ত্রীলোকেরা নৃত্য করিত বলিয়াই পূর্বোক্ত নৃত্যপদ্ধতির এত বদনাম হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা গুপ্তভাবে দলবদ্ধ হইত। সাহিত্য এবং ইতিহাস স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারে না এই ধর্মান্দোলনের পশ্চাতে কি ছিল। কিন্তু ইহা গরীব সাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাবস্থাপন করিয়াছিল। আমেরিকান লেখক C. O. Ward ১ বলিয়াছেন যে এই ধর্মসম্প্রদায়ের প্রভাব পশ্চিম এসিয়াতে বিস্তার করিয়াছিল। ইহারা সর্বত্র গরীবদের আর্থনীতিক ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ (Trade-guilds) করিয়া তাহাদের স্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিত। তিনি বলেন ভারতের বর্ণবিভাগ (Caste-system) এই Trade-guild আন্দোলনের ধাক্কায় সৃষ্ট হয় আর আলেকজাণ্ডারের সঙ্গী গ্রীক পণ্ডিতগণ যে ভারতে "Dionysus"কে পূজা করিতে দেখিয়াছিলেন তাহাও এই ধাক্কার ফলস্বরূপ! এই মতটী সত্য কি না তাহা ঐতিহাসিকেরা বিচার করিবেন; তবে ইহা সত্য যে, প্রাচীন গ্রীকেরা যে সব Trade-guilds করিয়াছিল তাহা ধর্মের আবরণে সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যেক guild-এর একজন অধিষ্ঠাতৃদেবতা ছিল ২ এবং রাষ্ট্র বিশেষতঃ পরে রোমান শাসকবর্গ এই আন্দোলনকে পছন্দ করিতেন না বলিয়া ইহা অনেকটা গুপ্তভাবে অন্তঃসলিলা চলিয়াছিল। সার উইলিয়াম রামসে বলেন, ৩ প্রাচীনকালে এসিয়া মাইনরের গ্রীকেরা ধর্মের নামে নিজেদের মধ্যে বিভাগ স্থাপন করিয়াছিল এবং আর্থনীতিক সংঘসমূহ ৪ উদ্ভব করিয়াছিল। তিনি বলেন ইহার জের এখনও মুসলমান তুর্কীদের মধ্যে অন্তঃসলিলারূপে চলিতেছে বা ৫০ বৎসর আগে পর্যন্ত চলিয়াছিল! তিনি আরও বলেন, তুর্কীদের দরবেশের ৫ দল এবং কায়িক পরিশ্রমকারীদের ৬ মধ্যে এখনও যে সংঘবদ্ধতা রহিয়াছে তাহা এই প্রাচীন প্রথারই জের বলিতে হইবে।

গ্রীস ইতিহাসের এ গুপ্ত অধ্যায়ের যেটুকু আমরা জানিতে পারি তাহা দ্বারা এইমাত্র বুঝিতে পারি যে, গরীবেরা ধনীর শোষণনীতি ও অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ধর্মের নাম দিয়া সংঘবদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহজগতের দুঃখ-কষ্টভোগের জ্বালায় তাহারা হাহুতাশ করিয়া, তাহা

১—C. O. Ward—"Ancient Lowly"

২ সমাজ-তত্ত্ববিদেরা বলেন, প্রাচীন গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ এবং মধ্যযুগের ইউরোপের Trade-guildপ্রথা এক (principle) আদর্শ-অনুযায়ী সৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রেণীবদ্ধ classই পরে ভারতে casteএ পরিণত হয় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। Nesfield বলেন, ভারতে Trade-guildপ্রথা আর্থনীতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল, পরে ইহা বর্তমানের জাতিতে পরিণত হয়। কিন্তু প্যারিসের স্বর্গগত অধ্যাপক Durkheimএর মতে ভারতের জাতিভেদপ্রথা ধর্মের ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল; আবার জার্মাণ সমাজ-তত্ত্ববিদ স্বর্গগত Maxweber বলেন, ভারতে লোকে প্রথমে নিজেদের আর্থনীতিক সুখসুবিধা-সংরক্ষণের জন্য সংঘবদ্ধ হয় এবং সেই বন্ধন ধর্মের নাম দিয়া দৃঢ় করে। মধ্যযুগে গ্রীসে, ও রোমে এইপ্রকারে শ্রমজীবী ও ব্যবসা-জীবীদের Corporate life সংঘবদ্ধ-জীবন সংগঠিত হইয়াছিল।

৩ "In Ionia, in European Greece, on the Anatolian plateau, and in India we must suppose that there did exist such a social state which was adapted to the fourfold way of life, and that....All tended to fall ultimately under that primeval system....In Asia the religious influence is always stronger, in Europe the political struggle of party with party...is the supreme fact." Sir William M. Ramsay—Asiatic Elements in Greek Civilization, p. 245.

৪ "They were a guild or brotherhood united in the worship of a god or a goddess, as all unions and festivals were." Ibid—p. 193.

৫ "The dervishes are not an integral part of Mohammedanism. They are a survival of an ancient custom grafted on to Islam." Ibid—

৬ "However the original Anatolian system prevailed, the Phratry flourished and they have been transmitted through the Seljuk Turks to the Ottoman Turks in form described." p. 193. See also- Buckler—Ibid—Anatolian Studies.

হইতে মুক্তি পাইবার কোন উপায় না দেখিয়া ধর্ম্মান্ধতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল! যখন আমরা শ্রবণ করি যে গ্রীসের গরীবসাধারণ এই ধর্ম্মপূজায় মত্ত হইত তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাহা ঘটিয়াছে বা এখন ঘটিতেছে সেই অনুষ্ঠান গ্রীসের পতিত-শ্রেণীসমূহে সংঘটিত হইয়াছিল অর্থাৎ ইহজগতের দুঃখ ধর্ম্মজগতে মিটাইবার আশায় বসিয়া থাকিত এবং নিজের দারিদ্র্য ধর্ম্মান্ধতার নেশায় কাটাইত এবং স্বপ্ন দেখিত কবে পরলোকের সেই সুখময় স্থানে (Elysian Field এ) আরামে বিচরণ করিবে! এইজন্যই নানাপ্রকার ধর্ম্মের mysticism এবং mysteries প্রচলিত হইয়াছিল।

হেসিয়ড ও অরফিউসের যুগের পর পিণ্ডার (Pindar) উদয় হন, কিন্তু তিনি তাঁহার আদর্শে ডোরিক আভিজাত্য শ্রেণীর মেজাজ প্রদর্শন করেন। এইজন্য তিনি হেসিয়ড হইতে অধিকদূর যাইতে পারেন নাই। তিনি ধনীদের উদার হইতে বলিয়াছেন এবং ধনী হইবার নিতান্ত প্রয়োজনও নাই বলিয়াছেন।

ইহার পর ইউরিপিডেস (Euripides) তাঁহার নাটকে দুইটী অত্যাচারিত নীরব সহনশীল শ্রেণীর অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি স্ত্রীলোক ও গোলামদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি জারজদের তাঁহার নাটকের নায়ক সাজাইতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং তাঁহার চিন্তায় এইভাবই ক্রমাগত জাগিতেছিল যে, এই জগতের কতকগুলি লোকে পরের সেবা করে ও তাহাদের সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়, কিন্তু সর্ব্বসময়ে এইসব সেবকেরা মনিবদের অপেক্ষা ন্যূন নহে!

ইহার অনেকদিন পরে আরিষ্টফেনেস্ (Aristophanes) তাঁহার Edesia Usae নামক নাটকে একটা নূতন ভাব দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই নাটকের বিষয় হইতেছে "জাতীয় পার্লামেণ্ট-এ স্ত্রীলোক"। ১ এই পুস্তক এক বিপ্লবাত্মক পুস্তক, কারণ, ইহা প্রথমে পাঠ করিলে বোধ হইবে যে, প্লেটোর "রিপাবলিকে"র ৫ম অধ্যায়ে কম্যুনিসম ও পারিবারিক জীবন উঠিয়া যাইবার যে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে ইহাতেও তাহাই অনুসৃত হইয়াছে।

এই সঙ্গে প্লেটোর উদয় হয়। তিনিও পূর্ব্বোক্ত লেখক পেরিক্লিসের সংস্কারের সময় জীবিত ছিলেন এবং উভয়েই উক্ত সংস্কারকের কোন কোন সংস্কার ও কার্য্য তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছিলেন। পেরিক্লিসের এই যুগ আথেন্সের সর্ব্ব দিক্ দিয়া শ্রেষ্ঠ যুগ। তখন আথেন্স একটা সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী এবং ধনীতন্ত্র পরিচালিত Bourgeois-democracy স্থাপন করিয়াছে। এই যুগেই প্লেটো তাঁহার অমর দার্শনিক আদর্শ জগতে প্রদান করেন। তিনি বলিয়াছেন এই সুসভ্য সময়ে গ্রীসের প্রত্যেক নগরে ধনী ও গরীব শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীবিরোধ বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। এই যুগে কেবল লেখনীর সাহায্যে ধনী ও আভিজাত্যের অভিমান ও দাবীর সমালোচনা করা হয় নাই, অনেকস্থলে এই বিরোধ তরবারীর সাহায্যেও হইয়াছিল। এই সমৃদ্ধির যুগেই প্লেটো (oligarchy) যথেচ্ছাচার-তন্ত্রের এবং পেরিক্লিস স্থাপিত গণতন্ত্রের (democracyর) বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিতে চাহিলেন এবং আর্থনীতিক সাম্যবাদের উপর সেই সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা দেন। তাঁহার মত "Republic"২

১ ঐতিহাসিক যুগে গ্রীক রমণীরা অবরোধমধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন। হোমারের সময় তাঁহাদের স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে তাঁহাদের পরাধীনতা আসে। গ্রীসের সুসভ্য সময়ে স্ত্রীলোক তৈজসপত্রাদির ন্যায় ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে গণ্য হইত। এই জন্য ইউরিপিডেসের নাটক বিপ্লবাত্মক বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি স্বাধীন গ্রীক নাগরিক স্ত্রীদের পতিত বলিয়া জানিয়া তাহাদের জন্য লেখনী ধরিয়াছিলেন।

২ প্লেটোর "Republic" প্রাচীনকালের পণ্ডিতদের নিকট অবজ্ঞাত হইলেও এবং বর্ত্তমানের পণ্ডিতদের নিকট "utopia" বলিয়া অগ্রাহ্য হইলেও, তাঁহার পুস্তক প্রাচীনকালের চর্চ্চার স্রোতের দিক্ প্রদর্শন করে। একদিকে প্রাচীন ইউরোপের ধনতন্ত্রীয় সাম্রাজ্যভোগের উন্মাদনার মধ্যে ইহা বোমা ফেলিয়াছিল, অন্যদিকে ইহাতে প্রাচ্যমতের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানের ইংরেজ অধ্যাপক Willoughby ও আমেরিকান অধ্যাপক Burgess স্বীকার করিয়াছেন যে, প্লেটো এই পুস্তকে প্রাচ্যমত দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। Burgess সেই প্রাচ্যমতকে ভারতীয় বৌদ্ধমত বলেন। বস্তুতঃ প্লেটো কপিলের সাংখ্যদর্শন হইতে নিজের Beliefin metempsychosis (পূর্ব্বজন্মবাদ) ও Three Social Classes (ত্রিগুণাঃ) গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাজের সর্ব্বপ্রকারের প্রচলিত বিশ্বাস ও ক্ষমতা উড়াইয়া তিনপ্রকারের মানবচরিত্রদ্বারা সমাজকে ভাগ করা কপিলের দ্বারাই প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল।

নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানের পণ্ডিতেরা এই পুস্তকে আধুনিক anarchism, socialism ও communismএর বীজ বপন হইতে দেখেন। অবশ্য প্লেটো কেবল লিখিয়া গিয়াছিলেন, সেই সময়ে খুব কম লোকে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং তাঁহার মতবাদগুলি প্রাচীন জগতে অগ্রাহ্য হইয়া অবজ্ঞাত হইয়াছিল। প্লেটোর রচনায় প্রাচ্য ও প্রাতীচ্যের ভাবের সমাবেশ দেখা যায় এবং সেই সমাবেশের ফলে জগতে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির উপায়ের একটা আদর্শ ব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা লোকে অবজ্ঞা করিলেও, তাহার মধ্যে মানবজাতির উন্নতিকল্পে যেসব ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে।

যাহা হইবার তাহা কিন্তু হইয়াছিল। কবি ও সংস্কারকদের কথা শাসক ও ধনীশ্রেণী শ্রবণ করে নাই। গ্রীস গৃহবিবাদের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল। শহর-রাষ্ট্রে ও শ্রেণী-বিবাদে গ্রীস জর্জ্জরিত হইয়াছিল। শেষে ইসক্রেটেস্ নামে একজন পণ্ডিত বলিলেন, হেলেনে জাতি যখন আপোষে একজাতীয়তা লাভ করিতে অসমর্থ তখন বাহির হইতে কেহ আসিয়া সকলকে বিজীত করিয়া এক করিয়া দিক্ এবং সেই বাহির হইতেছে উত্তরের উদীয়মান রাজ্য ম্যাসিডন! কিন্তু বিপরীত দলের নেতা ডেমস্থেনেস্ বলিলেন, সেই দেশের রাজাটা? সে তো বর্ব্বর! কিন্তু দেশের সেই বর্ব্বর রাজা ফিলিপ করনিয়ার যুদ্ধে গ্রীসের জাতীয়-জীবনের স্বাধীনতা চিরকালের জন্য লুপ্ত করিয়া দেয়। তাহার মৃত্যুর পর, গ্রীস আর-একবার স্বাধীনতা-সমর করে, কিন্তু ফিলিপের ভবিষ্যৎ জগৎজয়ী সন্তান আলেকজাণ্ডার আবার গ্রীসকে পরাধীন করে। পণ্ডিতদের মুক্তির ঐতিহাসিক চেষ্টার বিষয়ে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

গেল পঁচিশে বৈশাখ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব হ'য়ে গেছে। উৎসবে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলুম, কবির দর্শন ও আশীর্ব্বাদলাভ ভাগ্যে ঘটেছিল এজন্য নিজেকে ধন্য মনে ক'রছি। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত,

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী লীলা রায়, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত অমল হোম প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট লোক উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের মেয়েরা সমাদরে ও সযত্নে অতিথিদের নিজেরা পরিবেষণ ক'রে খাইয়েছেন। লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার দেশের মেয়েরা এতে অতিথিদের গৌরবান্বিত ক'রেছেন।

মনোজ্ঞ পরিবেশের মধ্যে, রজনী-প্রভাতের হিরণ-কিরণের সঞ্জীবনস্পর্শ আমাদের ছুঁয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই উৎসব আরম্ভ। কুঙ্কুম-চন্দন-চর্চ্চিত বিকচ কুসুম-মাল্য-বিভূষিত কবিকে আশ্রমের বালিকা-বালকরা গানের ভিতর দিয়ে, আচার্য্য বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন পুণ্য মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা ও বক্তৃতার দ্বারা, বন্ধুরা ও ভক্তরা উপহারের দ্বারা অভিনন্দিত ও সম্বর্দ্ধিত করেন। একজন চীন শিল্পী কবিকে একখানি ছবি উপহার দেন—একজন চীন কবি তাঁর নিজের লেখা চীন ভাষায় একটী কবিতা
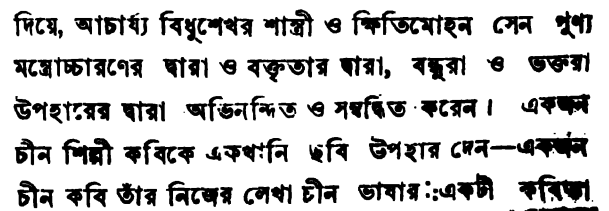
পড়ে কবিকে তা উপহার দেন। আরও একজন চীন ভদ্রলোক ও চীন ভদ্রমহিলা কবির জন্যে উপহার এনেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যা ব'লেছিলেন তার সারমর্ম্ম হ'চ্ছে এই যে তিনি শুধু কবি, আর কিছু নন।—

"শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই
আমি কবি সদা আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি"
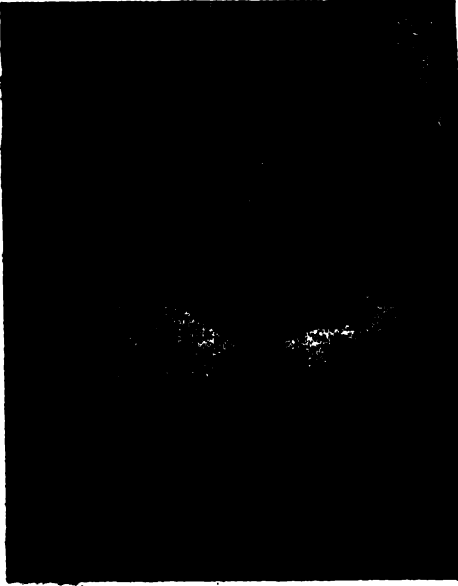
সাংবাদিকেরা বাণীপ্রার্থনা ক'র্‌লে তিনি ব'লেছেন তাঁর বাণীতে বিশ্বাস নেই, বাণী দেবার যোগ্যতাও তাঁর নেই। সাংবাদিকদের কবি আরও ব'লেছেন যে ভারতবাসী যেন ভাবোচ্ছ্বাসে তাদের সব শক্তি নষ্ট হ'তে না দেয়, তাকে যেন কাজে পরিণত করে। তিনি ব'লেছেন 'বন্দে মাতরম্' যথেষ্ট হ'য়েছে—এখন 'বন্দে ভ্রাতরম্' বলা চলুক।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন অথর্ব্ববেদ থেকে যেসব মন্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি ভারি চমৎকার। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োগ কর্‌বার মত। আমি ক্ষিতিবাবুকে যখন ব'ল্‌লুম 'মন্ত্রগুলি যেন কবিগুরুর জন্যেই লেখা হ'য়েছিল—ওঁর প্রতি সেসব কী সুপ্রযুক্তই হয়েছে! অথর্ব্ববেদের এক জায়গায়, কবির সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে খাপ-খাওয়া এতগুলি মন্ত্র ছিল, এ অতি বিস্ময়কর ব্যাপার, তখন ক্ষিতিবাবু ব'ললেন 'এক জায়গায় কি আর ছিল, নানাস্থানে ওগুলি বিক্ষিপ্ত ছিল, অনেক যত্নে সংগ্রহ ক'রে এক সূত্রে গাঁথা হ'য়েছে।' আচার্য্য ক্ষিতিমোহনের মত বিবুধের পক্ষেই এ কাজ সম্ভব। আমরা কয়েকটী মন্ত্র ও তার বাঙ্গলা অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত ক'র্‌ছি :—

"ত্বং তা বিশ্বা ভুবনানি বেথ
সখা নো অসি পরমং চ বন্ধু।

ধ্যানবলে তোমা অপেক্ষা অধিক কবি কেহ নাই, হে আত্ম-লীলাময়, জ্ঞানেও তোমা অপেক্ষা জ্ঞানী কেহ নাই। বিশ্বভুবন সবই তুমি জান। তুমি আমাদের সখা, তুমিই আমাদের পরম বন্ধু।

পশ্চাৎ পুরস্তাদধরাদ্‌ উতোত্তরাং
কবিঃ কাব্যেন পরিপাহি
সখা সখায়ম্ অজরো জরিমণে
মর্ত্তাঁ অমর্ত্ত্যস্ত্বং নঃ

উত্তরায়ণের তোরণদ্বারে রবীন্দ্র ভক্তগণ
শ্রীকালীপদ বিশ্বাস গৃহীত ২৫শে বৈশাখের ফটো হইতে

পশ্চাতে-সম্মুখে নীচে-উপরে, হে কবি তোমার কাব্যের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। বন্ধু যেমন বন্ধুকে রক্ষা করে তেমনই হে জরা-রহিত, জরাজীর্ণ আমাদিগকে—হে অমৃত, ম্রিয়মাণ আমাদিগকে রক্ষা কর।"

রাতে আকাশের ঘনঘটা, অবিরাম প্রবল বর্ষণ ও দামিনী-চমকের মধ্যে আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের নৃত্য-গীত। মনোহর তাদের বেশ, মধুময় তাদের কণ্ঠ, ললিত তাদের অঙ্গহার, ছন্দোময় তাদের পদক্ষেপ, হৃদয়হরণ তাদের ভঙ্গী।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ—অতীতে বা বর্ত্তমানে এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা নিয়ে আর কেউ জন্মগ্রহণ

করেন নি! রূপে, রসে, আনন্দে তিনি বাঙলার প্রকৃতিতে সুধা-সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব ও অভিনব চেতনা দিয়েছেন। বঙ্গলক্ষ্মী যথার্থ ই বলেছেন তিনি 'সমগ্র মানব-মনো-জগতকে রঞ্জিত ও সঞ্জীবিত ক'রেছেন।' তাঁকে সহস্রবার প্রণাম—ভগবান তাঁকে দেহেও অমর করুন। কবি সেদিন আমাদের শুনিয়ে ব'লেছিলেন :—

বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হোক্ মোর
ছিন্ন ক'রে দাও কর্ম্মডোর।

আম্‌রা দোব না তাঁকে ছুটি, আমরা তাঁর ভক্ত, আমরা তাঁর অনুরাগী, আম্‌রা বল্‌ছি 'আরো অনেকদিন ধ'রে আমরা আপনার চারিদিকে বসে' আপনার গান শুন্‌তে চাই—শুন্‌ব। ভক্তের বাসনা তিনি অপূর্ণ রাখতে পারেন না—বিধাতা তাঁকে তা অপূর্ণ রাখতে দিতে পারেন না।'

বাঙলার চারিদিকে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর বহু উৎসব হয়ে গেছে—বহু অভিনন্দন তাঁর উদ্দেশে রচিত হয়েছে। বক্সা দুর্গে রাজবন্দীরা তাঁকে লক্ষ্য করে' যে প্রশস্তি রচনা করেছিলেন, সেটী পড়ে' আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করেছি। তার সমগ্র অংশ এখানে উদ্ধৃত কর্‌বার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লুম না :—

অভিনন্দন-পত্র

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শ্রীচরণকমলে,—

ওগো কবি, তোমায় আমরা করিগো নমস্কার। সুদূর অতীতের যে পুণ্য প্রভাতক্ষণে তোমার আবির্ভাব, আজ
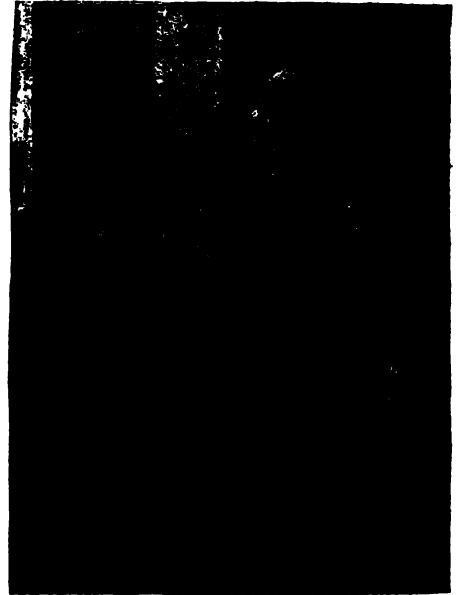
রবীন্দ্রনাথের শয়নগৃহে 'উত্তরায়ণে' শ্রীকালীপদ বিশ্বাস গৃহীত ২৫শে বৈশাখের ফটো হইতে

বাংলার সীমান্তে নির্ব্বাসনে বসিয়া আমরা বন্দীদল তোমার সেই জন্মক্ষণটীকে বন্দনা করি। আর স্মরণ করি বিরাট্ মহাকালকে, যিনি সেই ক্ষণটীর দ্বার-পথ উন্মুক্ত করিয়া এই দেশের মাটির পানে তোমাকে অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে পথ দেখাইয়াছেন।

যেদিন জ্যোতির্ম্ময় আলোক-দেবতা তমসাতীরে প্রথম চোখ মেলিয়া চাহিলেন—আলোক-বহ্নির আত্ম-প্রকাশই তো সেদিনকার একমাত্র সত্য নয়। সেই একের প্রকাশে সুপ্তির অন্ধকার তটে তটে বিচিত্র বহুত্তমে আপনাকে জানিয়া জানাইয়া উঠিয়াছে। হে মর্ত্ত্যের

হে ধ্যানী, তোমার চোখে জাতি মহান্ বিশ্বমানবের স্বপ্ন দেখিয়াছে।

হে সাধক, তোমার হাতে জাতি আপনার সাধনার ধন গ্রহণ করিয়াছে।

তাই কি তুমি প্রত্যেকের পরমাত্মীয় ?

রবি, তোমার আকাশবিহারী বন্ধুর সঙ্গে তোমার যে পরম সাদৃশ্য আমরা দেখিতে পাইয়াছি। তুমি নিজকে প্রকাশ করিয়াছ—তাই তো বিস্মৃতির অখ্যাত প্রদেশে আমাদের মাঝে আলো জলিয়া উঠিয়াছে। হে ঐশ্বর্য্যবান্ তোমার মাঝে জাতি আপন ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইয়াছে।

হে ঋষি, তোমার জনমক্ষণে এই বাঙ্গলার জনমগেহে সমগ্র জাতির জন্মজয়ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল! অজাত আমরা সেদিন অজানা নীহারিকাপুঞ্জের মাঝে না জানিয়াও শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। আজ জাগ্রত জীবনের যাত্রা-পথে দাঁড়াইয়া হে অগ্রজ, তার ঋণশোধ করি।

আমরা না আসিতে তুমি আমাদের জীবনের জয়গান গাঁথিয়াছ। আমরা সে-দান প্রণামের বিনিময়ে আজ অঞ্জলি পাতিয়া লইতেছি।

তোমার জন্মক্ষণটী পিছনের অতীতে হয় তো হারাইয়া গিয়াছে—কিন্তু আজিকার এই স্মরণদিনে, আমাদের কণ্ঠের জয়ধ্বনি, সম্মুখের অগণিত মুহূর্ত্ত-শ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া অনন্তের শেষ-সীমান্তপারে গিয়া পৌছুক।

হে কবি-গুরু! 'তোমায় আমরা করি গো নমস্কার।' অবরুদ্ধের অভিনন্দন গ্রহণ কর। ইতি

গুণমুগ্ধ

সমবেত রাজবন্দী

এই অভিনন্দনের উত্তরে কবিগুরু দার্জ্জিলিং হইতে ১৯এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে যে প্রত্যভিনন্দন জানাইয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

প্রত্যভিনন্দন

বক্সা দুর্গস্থিত রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হোতে
উন্মুখর ঊর্দ্ধ স্রোতে
বন্দী বারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন॥

মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি' অঙ্কুর আকাশে দিল আনি'
স-সমুখ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্ত্য নরের রাজধানী॥

"অমৃতের পুত্র মোরা"—কাহারা শুনালো বিশ্বময়!
আত্ম-বিসর্জ্জন করি' আত্মারে কে জানিল অক্ষয়!
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জানিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥

মাসপঞ্জী

রাজনৈতিক--

২২এ বৈশাখ—গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা তুর্কি প্রজাতন্ত্ররাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টপদে চতুর্থবারের জন্য নির্ব্বাচিত।

২৫এ—শ্রীযুক্ত মনচোড়সা আভারী রাজদ্রোহের অপরাধে অস্ত্র-আইনের ৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার—নাগপুরে এই উপলক্ষে শহরব্যাপী হরতাল-পালন।

২৬এ—স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে বর্ম্মী বিদ্রোহের যবনিকাপাত—১৫ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ৫৬ জনের দ্বীপান্তর।

৩রা জ্যৈষ্ঠ—চট্টগ্রামে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সান্ধ্য আইন প্রত্যাহৃত।

১২ই—শেঠ যমুনালাল বাজাজের নিকট মহাত্মাজীর পত্র—করাচী কংগ্রেসে গৃহীত স্বরাজ-প্রস্তাবের ব্যাখ্যা। সেকেন্দ্রাবাদ হইতে ব্রহ্মদেশে দুইদল সৈন্যের যাত্রা—আরও দুইদল প্রস্তুত—বিদ্রোহদমন-সম্পর্কে সরকারী ইস্তাহার—বিদ্রোহীদল কর্ত্তৃক পুলিশ-ফাঁড়ি আক্রমণ।

১৮ই—শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্তের নিকট মহাত্মাজীর তার। প্রিভিকাউন্সিলে রামকৃষ্ণের আপীল—ফাঁসী ১১ই জুলাই পর্য্যন্ত স্থগিত।

২০এ—হাওড়া টাউন হলে শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্তের বক্তৃতা—সভায় মারামারি—চারিদিক্ হইতে বিক্ষোভব্যঞ্জক ধ্বনি। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বর্ম্মণ (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কংগ্রেস-কমিটীর সম্পাদক) বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার।

২১এ বৈশাখ—ব্রহ্মে সাম্প্রদায়িক অশান্তি—৩ জন ভারতবাসী নিহত এবং ৭ জন গুরুতরভাবে আহত।

২২এ—বিলাতে কমন-সভায় বয়কট-সম্পর্কে আরউইন-গন্ধী চুক্তির ফলাফল বিষয়ে আলোচনা—ভারতসচিবের পুনঃপুনঃ কৈফিয়ৎ।

২৪এ—কুমিল্লা ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সংবর্দ্ধনা। গাড়োয়ান-ধর্ম্মঘট-সম্পর্কে কারাদণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণের মুক্তিলাভে জমাদার-সমিতির পক্ষ হইতে অভিনন্দন প্রদান।

২৬এ—শ্রীহট্ট সমাজতন্ত্রবাদ-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সহস্রাধিক কৃষক ও শ্রমিকের যোগদান এবং অসংখ্য মহিলা ও পুরুষ দর্শকের সমাবেশ—শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বিপুল সংবর্দ্ধনালাভ।

২৭এ—মালয়ে কলকারখানা বন্ধ—ত্রিশ হাজার শ্রমিক বেকার (নাগাপট্টমের সংবাদ)।

২৯এ—ত্রিচুরে মিঃ কে, এফ, নারিম্যানকে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে মানপত্রপ্রদান ও বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন। ই-আই-রেলে দানাপুর 'ক্রু'-বিভাগের ২৭ জন কর্ম্মচারী ২৪ ঘণ্টার নোটিশে বরখাস্ত—দানাপুরে চাঞ্চল্য।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ—ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দার্জ্জিলিং-এ আগমন ও আশানটুলিতে অবস্থান।

১৬ই—কাণপুরে আবার দাঙ্গা—২ জন নিহত ও ২৪ জন আহত—শহরে সান্ধ্য আইন ও ১৪৪ ধারা জারী।

বৈদেশিক—

২২এ বৈশাখ—পর্ত্তুগীজ যুদ্ধজাহাজ জলমগ্ন—মাদিরা দ্বীপের বিদ্রোহ প্রশমিত (লিসবনের সংবাদ)।

২৫এ—জাতীয় দলের আন্দোলনে মিশর গবর্ণমেণ্ট শঙ্কিত—কাইরো নগরীর পথে পথে বর্ষাধারী সৈনিকদিগের টহল—আবদিন রাজপ্রসাদের চারিদিকে সতর্কতা অবলম্বন—নিকটবর্ত্তী পথে লোকজন ও যানবাহন-চলাচল নিষিদ্ধ (কায়রোর সংবাদ)।

২৭এ—স্পেনে অশান্তির অনল—উত্তেজিত জনতা ও সৈন্যদলের সঙ্ঘর্ষ—দুইজন সাধারণতন্ত্রী ও একজন সিভিল গার্ড গুরুতররূপে আহত (মাদ্রিদের সংবাদ)।

১০ই জ্যৈষ্ঠ—হাইনন দ্বীপে ঘরোয়া বিবাদ—বৃটিশ রণতরীর সতর্কতা-অবলম্বন (হংকং-এর সংবাদ)।

১২ই—লাইবিয়ান মরুতে দুর্ঘটনা—শকুনের মুখে নারী ও শিশু (কায়রোর সাবাদ)।

১৬ই—ক্যাথলিক কর্ম্মিসঙ্ঘের সহিত ফ্যাসিষ্ট গবর্ণমেণ্টের বিরোধের ফলে, ইটালী গবর্ণমেণ্টের হুকুমে রোমের ক্যাথলিক সঙ্ঘ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্ত অফিস বন্ধ (রোমের সংবাদ)।

১৮ই—সিনোর মুসোলিনীর গীর্জ্জা-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য অবিলম্বে বন্ধ করিবার জন্য সংবাদপত্রগুলিকে হুকুমদান (ঐ)।

২০এ—মিশরে সিনেটের নির্ব্বাচন উপলক্ষে সমগ্র দেশময় সৈন্য ও পুলিশ মোতায়েন—প্রধানমন্ত্রী সিদ্কী-পাশার ঘোষণা (কায়রোর সংবাদ)।

সাহিত্যিক—

২৫এ বৈশাখ—শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিপুল সমারোহ—কবির বহু বন্ধু-বান্ধব ও অনুরক্ত ব্যক্তির সমাগম—চীনাকবি ডাঃ শিও এবং চীনাশিল্পী মিঃ কউ-এর উপস্থিতি—কবির বক্তৃতা ও সদ্যরচিত কবিতা আবৃত্তি।

৩০এ—ময়মনসিংহ কালীপুরের খ্যাতনামা সাহিত্যিক জমীদার নরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের ৫৩ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ।

সভা-সমিতি—

২১এ বৈশাখ—হুগলী জিলা-রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর পঞ্চম অধিবেশন…সামড় গ্রামে বিরাট্ জনসমাগম।

২২এ—ম্যাঞ্চেষ্টারের রয়াল এক্সচেঞ্জে বৃটিশ ব্যবসায়িগণের ভারতের বিদেশী পণ্যবর্জ্জনের প্রতিবাদ-সভা।

২৩এ—আজামপুরে ছাত্রসভায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তৃতা।

২৪এ—মাঙ্গালোরে দক্ষিণ কানাড়া রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বক্তৃতা।

২৫এ—ত্রিপুরা জেলা-ছাত্রসম্মেলনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

২৬এ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সভায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে অভিনন্দন প্রদান—ভাইস-চান্সেলার লেঃ-কর্ণেল হাসান সুরাবর্দ্দীর বক্তৃতা।

১৮এ—লাহোর ডাঃ বি, এল মুঞ্জের সভাপতিত্বে যুবসম্মেলন—ভারতের বীরেন্দ্রবর্গের পদাঙ্ক-অনুসরণ ও সামরিক বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব।

২৭এ—বোম্বাই-এ সার্ভেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটী গৃহে শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেটার সভাপতিত্বে "অখিল-ভারত রেলশ্রমিক-সঙ্ঘের" অধিবেশন—রেলবিভাগে ব্যায়সঙ্কোচ-সম্পর্কে আলোচনা—জি-আই-পি রেলের কর্ম্মচ্যুত রেলকর্ম্মচারিগণের পুনর্নিয়োগ-বিষয়ে বক্তৃতা···।

৫ই জ্যৈষ্ঠ · মোহাম্মদী অফিসে "ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবী সঙ্ঘের" সাম্প্রাদায়িক ঐক্য-সমিতির অধিবেশন।

১১ই—দ্বারভাঙা বিল্‌ডিং-এ পরলোকগত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সপ্তম মৃত্যু-স্মৃতি-বার্ষিকী উৎসব।

১২ই—সেনেট-হলে "অখিল হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনে"র বিংশ অধিবেশন—সভাপতি সুবিখ্যাত কবি জগন্নাথ দাস রত্নাকরের অভিভাষণ।

১৭ই—পাবনা জেলা ছাত্র-সম্মেলনে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অভিভাষণ।

১৯এ—এলবার্ট হলে কলিকাতার শেরিফ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত স্বেচ্ছাপাঠ্য করিবার ব্যবস্থার প্রতিবাদকল্পে বিরাট্ সভা—বহু শিক্ষক, পণ্ডিত, অধ্যাপক, অধ্যক্ষদের উপস্থিতি।

২০এ—ডাঃ ডি, এন, মৈত্রের বাগবাজার ব্যায়াম-সমিতিতে "মহাসমরের পর ইউরোপের জাতীয় শক্তি-সাধনা" সম্বন্ধে আলোকচিত্র সাহায্যে বক্তৃতা।

সমালোচনা

লীলাকমল—শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত। গুরুদাস এণ্ড সন্স-প্রকাশিত।

"উতল ঘন মধুরসে" কমলের বুক যখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, পাপ্‌ড়ির বন্ধন তখনই তার খুলিয়া যায়, গন্ধ এবং সৌন্দর্য্য তখনই তার নিখিল চিত্তকে সচকিত করিয়া তোলে। কবি-চিত্তের ভিতর যে নিবিড় রসানুভূতি আছে তাহাতেই দোলা লাগিয়া কাব্যের এই লীলাকমলটিকেও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইহার পাপ্‌ড়িগুলি—অর্থাৎ ছন্দ, অলঙ্কার, শব্দচয়ন প্রভৃতি যেমন চমৎকার, গন্ধ অর্থাৎ ভাব ও রসের পরিবেষণও তেমনি চমৎকার। কিন্তু রূপক থাক্। এইবার সাদা কথায় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

কাব্যের সৌন্দর্য্য, আমার মতে সকলের আগে নির্ভর করে তাহার বাহিরের কাঠামর উপরেই। এইজন্য কাব্যের রূপ ভাবেরও আগে আবশ্যক হয়। সাবলীল প্রকাশ-ভঙ্গী না থাকিলে, ছন্দ এবং শব্দের উপর অধিকার না থাকিলে, ভাষার সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতি না থাকিলে কবিতা লোক-চিত্তকে সাধারণতঃ জয় করিতে পারে না। 'লীলাকমলে'র কবিতাগুলির ভিতরে ছন্দ ও শব্দ অবাধ গতিলাভ করিয়াছে। সেই জন্য অর্থপরিগ্রহের পূর্ব্বেই তাহার ঝঙ্কার কাণে বাজে এবং কাণের ভিতর দিয়া তাহা মর্ম্মেও প্রবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যেমন :—

মেলিয়াছি আঁখি, আমি জলবালা, সূর্য্য-স্বয়ম্বরা

অথবা

উদাসী বিধুর চৈতালী হাওয়া আজি বৈকাল শেষে

অথবা

সুরভি সুধার পেয়ালা ধরি'
জাগিল যত পুষ্পপরী

অথবা

গগনে গগনে মেঘ-মল্লার গাহিছে মেঘ,
বিদ্যুৎ-নটী নাচে

'লীলাকমলে'র কবি অজস্র ছন্দের বেসাতি লইয়া কারবার করেন নাই, সুরের কসরৎ তাঁর অল্প কয়েকটী ছন্দের ভিতরেই নিবদ্ধ। ভাণ্ডারে হয় তো তাঁর সুরের সম্পদ আরও বহু রকমের আছে। কিন্তু তাহা না থাকিলেও ক্ষুব্ধ হইবার হেতু ছিল না; কারণ যে কয়টী সুরের আলাপ তিনি করিয়াছেন তাহাতে তিনি যে একেবারে ওস্তাদ তাহারও পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাহাদের ভিতর কোথাও কোন দৈন্য নাই। আর সেই জন্যই সেগুলি তাঁহার নিজের চিত্তে যেমন দোলা জাগাইয়াছে রস-পিপাসু পাঠকদের চিত্তকেও তেমনি করিয়া দোলা দিয়া গিয়াছে।

এইবার ভাবের কথা—যে রস কাব্যের প্রাণ সেই রসের কথা। সৌন্দর্য্যের দেবতা মানব-মনের নিভৃতে বসিয়া চিরদিন খেয়ালের পর খেয়াল রচনা করেন। সাধারণের চোখে এ খেয়ালের রূপ ধরা পড়ে না, তাহাদের কাছে তাহার কোনও অর্থও নাই। তাঁহার এই খেয়ালকে বুঝিতে হইলে তপস্যার আবশ্যক হয়। বস্তুতঃ সেজন্য কবি চিত্তকে কঠোর তপস্যাই করিতে হয়। 'লীলাকমলে'র অনেক স্থানেও এই দুশ্চর তপস্যার রূপ ধরা পড়িয়াছে :—

একান্ত বাঞ্ছিত ওগো সেই হ'তে বাতায়ন খুলি'
যাপিয়াছি শ্রেষ্ঠ দিনগুলি !
তোমার আসার আশে, নিদ্রাহীনা নিশীথিনী শত
কত বার ষড় ঋতু, গেছে ফিরে ব্যর্থ আশাহত।
আশ্বিনের আলো-বীণা, ফাল্গুনের অভিসার-দিন
হইয়াছে বেদনা-বিলীন।

জীবনের শ্রেষ্ঠবস্তু তিনি ইহার জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। তাই তাঁর

সোনার জীবন নীল হ'য়ে গেছে,
বেদনার বিষে সর্ব্বনাশা !

কিন্তু তাহা হোক্। তবু এ তপস্যা তাঁর ব্যর্থ হয় নাই। তাই তাঁর আজ

সুদৃঢ় পাষাণে গড়া লৌহদ্বার মর্ম্মপুরে
নিঃশব্দে অর্গল যায় ছুটি',—
কঠিন প্রাচীর শ্রেণী মৃদুল-মোহিনী সুরে
পুষ্প সম পড়ে টুটি' টুটি'।

সুন্দরের সঙ্গে মিলনের যে আকাঙ্ক্ষা, আপনাকে রিক্ত করিয়া দিয়াই বন্ধুকে জয় করিবার যে সাধনা তাহাই কবিদের শাশ্বত সাধনা। বন্ধুকে পাওয়া নহে, তাহার সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিয়া দেওয়াই সেখানে আনন্দ হইয়া উঠিয়াছে। আপনাকে বিকাইয়া দেওয়ার ভিতর যে সুখ আছে, ধরা নহে ধরিবার চেষ্টার ভিতর যে আনন্দ আছে, প্রকৃত পাওয়ার ভিতর তাহা হয় তো নাই। তাই নিখিল কবিহৃদয় চিরদিন দীর্ঘনিঃশ্বাসের সেতুই গড়িয়া চলিয়াছে। দুঃখের তিলকই তাহাদের ভালে সার্থকতার জয়টিকা পরাইয়া দেয়। 'লীলাকমলে'র কবিও তাই অন্বেষণের মশাল জ্বালাইয়া গহন তিমির রাত্রির ভিতর দিয়া চলিয়াছেন সেই সুন্দরেরই অভিসারে। এজন্য যদি জন্ম-জন্ম, যুগ-যুগান্তরও যদি কাটিয়া যায়, তবু তাঁর তাহাতে ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই।

আজো যার পাইনি উদ্দেশ,
তারে খোঁজা নাহি হোক্ শেষ !

আলোকে আঁধারে দূরে—
মানব-জীবন পুরে'
খুঁজি তার পদচিহ্ন লেশ

যুগে-যুগে কালে-কালে দিকে-দিকে জন্ম-জন্ম মোর,
সেই দেবতার খোঁজে হ'য়ে যাক্ একান্ত বিভোর !

তাঁহার প্রশ্ন চলিয়াছে—

যৌবন জাগিল যদি অন্ধ অন্তরের গন্ধ গানে
উন্মীলিয়া আঁখি-পুষ্প, বিস্ময়ে তাকালো বিশ্বপানে
—কোথা সেই প্রেমসূর্য্য ?

অনুরাগের শিহরণে বুকে মধু জমিয়া উঠিয়াছে কিন্তু বঁধুকে তো এখনও জানা হয় নাই !

প্রভাতের আলো ?…শুনিয়াছি নাম
রূপ নাকি তা'র নয়নাভিরাম
স্ফুটন-মন্ত্র কানে অবিরাম
ঢালে বলো কোন্ বঁধু ?

কখন আশায় কখন হতাশায় মন তাঁর চঞ্চল বিহ্বল। তাই কখনও তিনি বলিতেছেন—

নিঃস্ব বাতাস বহে' যায় শুধু রিক্ত বুকের মাঝে,—
কিছুই ভরিল না যে !—

কখনও বা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

* * * অসমাপ্ত পূরবীর সুর
অশ্রু সকরুণ তানে করেনি কি কখনো বিধুর
আনন্দ গোধূলি তব। শোননি কি কভু কোনো দিন
একটি ক্রন্দন শব্দহীন !

কখনও বা অপূর্ব্ব
পুলক রসে তাঁর উদ্বেলিল তনু;
রোমাঞ্চ জাগিল অঙ্গে দিঠিতলে সঙ্গে সঙ্গে
ফুটিলো স্বপ্নের ইন্দ্রধনু।

পাওয়া ও না-পাওয়ার এই দ্বন্দ্ব, আশা-নিরাশার এই সংঘাত বইখানির ভিতর চমৎকার ফুটিয়াছে। বস্তুতঃ রচয়িত্রীর মর্ম্মকথাও এই ভাবের বৃন্তটী ঘিরিয়াই ছন্দিত হইয়া উঠিয়াছে।

সৌন্দর্য্যের দেবতার এই সন্ধানের ভিতর দিয়াই প্রকৃতির সঙ্গেও কবির নিগূঢ় পরিচয় ঘটিয়াছে। এ পরিচয়ও বাহিরের নহে, একান্তভাবেই অন্তরের; সুতরাং তাহার ভিতর শব্দের ফেনপুঞ্জ নাই, আছে ছোট ছোট দুই-চারিটী পংক্তির ভিতর দিয়া অন্তর্দৃষ্টির সুনিপুণ অভিব্যক্তি। যেমন—

দিনের বিদায়-চুম্বন লেগে মেঘে-মেঘে ফোটে ফাগ!

অথবা

গোধূলির গায় দেছ'কি পাঠায়ে সিঁথার সিঁদুর মম!

কিংবা

মধ্যাহ্নে বেণুর কুঞ্জে অব্যক্ত-মর্ম্মর-ম্লান-ভাষা
আমারে জানালো কার সুগভীর মৌন-ভালবাসা!

'লীলাকমলে'র কবি আনকোরা নূতন ভাবের পসরা লইয়া রসপিপাসুদের দুয়ারে হাজির হন নাই। মানুষের সহজ সরল চিরন্তন বেদনাই তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু। কিন্তু রচনার ভঙ্গীতে, আন্তরিকতার মাদকতায় এবং ব্যঞ্জনার সরসতায় তাহা একেবারে নূতন জিনিসের মতই হইয়া গিয়াছে। প্রকাশভঙ্গী সবল, কিন্তু শক্তি বা দম্ভের উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার ভিতর কোথাও নাই। তাহা সর্ব্বত্র সংহত সংযত মার্জ্জিত। শক্তি যেখানে সত্যকার শক্তি, সংযম যে সেখানে স্বাভাবিক এই গ্রন্থখানির ভিতর তাহারও অজস্র প্রমাণ আছে। কেবল একটীমাত্র বিষয়ে সামান্য একটু অসংযমের চিহ্ন আমাদের চোখে পড়িয়াছে—তাহা গ্রন্থের বহিরাবরণে। গ্রন্থের অধরবে ভূষণ-বাহুল্যে ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু লোকের রুচি ভিন্ন; সুতরাং সম্ভবতঃ এ বিষয়ে তাঁহার কৈফিয়ৎও আছে।

'লীলাকমল' গ্রন্থকর্ত্রীর প্রথম গ্রন্থ হইলেও, এই প্রথম বইখানিতেই তিনি যে রসানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন তাহা দুর্লভ। ইহা বাঙ্গলার কবি-সমাজের ভিতর তাঁহার প্রতিষ্ঠাকে যে দৃঢ় করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

নিরুপমা বর্ষস্মৃতি—১৩৩৭

ত্রয়োদশ বর্ষ ধরিয়া বর্ষস্মৃতি বাহির হইতেছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশ হইতে আরও কয়েকখানা বার্ষিকী বাহির হইত, এখন সেগুলি আর বাহির হয় না, অবশ্য ছেলেদের জন্য লিখিত সুন্দর কয়েকখানি বার্ষিকী এখনও রীতিমত বাহির হয়, সেগুলির কথা বাদ দিয়াই বলিলাম। এখন শিবরাত্রির সলিতার মত একমাত্র নিরুপমা বর্ষস্মৃতিই বাহির হইয়া চিত্রে ও রসরচনায় শারদীয়া পূজার সময় বাঙ্গালীর মনকে আনন্দ দান করিয়া থাকে। এবার পূজার পরও এখানিকে বাহির হইতে না দেখিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম; সম্পাদক শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট জানিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলাম যে, নানা কারণে এবার প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইবে। এবার আমাদের দেশের অবস্থা যে শোচনীয় তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে মাত্র একখানি বর্ষস্মৃতি বাঙ্গলাদেশ হইতে যাহা বাহির হয়, তাহা অল্পদিন হইল বাহির হইয়াছে; অথচ ইংলণ্ড বা আমেরিকারও কথা ভাবুন প্রত্যেক বড় বড় কাগজের একটা করিয়া কি শোভনসুন্দর বার্ষিক সংস্করণই না বাহির হইয়া চিত্রে, রসরচনায়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, হাস্য-কৌতুকে দেশবাসীকে আনন্দদান করিয়া থাকে। আর এত বড় একটা দেশে একখানা এধরণের কাগজ যদি না চলে তবে বড়ই দুঃখের কথা।

আলোচ্য গ্রন্থে নয়টী গল্প ও একটী কবিতা ও চিত্রকর বিজয়কৃষ্ণ বসুর 'ভারী' নামক ব্যঙ্গচিত্র আছে। গল্পগুলির মধ্যে পাঁচটী প্রথিতযশঃ লেখকদের লেখনী-প্রসূত যাঁহাদের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। ইহা ছাড়া নবীন লেখক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের করুণরসাত্মক 'কঙ্কাল', শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষালের চলনসই গল্প 'পরিত্রাণ' আছে। শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবীর 'নিরুদ্দেশের যাত্রী' গল্পে আখ্যানবস্তুর বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও রচনার মাধুর্য্যে ছোট একখানি গীতিকবিতার মত হৃদয়ে একটা করুণ উদাস সুরের ঝঙ্কার তোলে। হাস্যরসে সুদক্ষ প্রভাতকুমারের তুলিকায় এবার হাস্যরসের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। বাস্তব চিত্র হিসাবে গল্পটী মন্দ হয় নাই। এবার হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'খামখেয়ালী' গল্পে। মাঝে মাঝে বিদ্রূপের [illegible]

একটু বেশী অনুভূত হইয়াছে ও যেসকল ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্যে উহা আরোপিত হইয়াছে তাহাও ধরা পড়িয়া যায়। তাঁহার মত কৃতী লেখকের পক্ষে এ রচনা একটু বেশী রকমের তরল হইয়া পড়িয়াছে। অচিন্ত্যকুমারের 'ক্ষণিকা' গল্প আমাদের ভাল লাগে নাই। ঊষার দেশের জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ হইতেছে। ছোট বাড়ীতে একটুকুও স্থান নাই, সেখানে প্রৌঢ়া ঊষার স্বামীকে একান্তে টানিয়া আনিয়া যেরকম ব্যবহার করিয়াছে তাহা বাস্তব চিত্র হো নয়ই—দরিদ্রঘরের ঘরণী যে 'দারিদ্র্য, চিত্তদীনতা ও অবসাদ' লইয়া সংসার-যাত্রা কায়ক্লেশে নির্ব্বাহ করে তাহার পক্ষে ভাল কাপড় ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া স্বামীর মনোহরণের চেষ্টা এ সময় কি সময়োচিত? মনে রাখিতে হইবে বাড়ীর তিনি কর্ত্রী, সকলকে দেখাশুনা সামাজিকতা-রক্ষাও তাঁহাকেই করিতে হইতেছে, ভাণ্ডারের ভার তাঁহারই উপরে। লেখকের কয়েক ছত্র উদ্ধার করিয়া দিলে ঊষার চিত্রটা বেশ পরিস্ফুট হইবে—'এই পনেরো বছর সে কোনদিন এমন কলহাস্য করেনি—নিজের মাটীর দেহকে গগনের বিদ্যুল্লতার সঙ্গে উপমেয় করে তুলবার জন্যে তার না ছিল ভঙ্গী না বা লীলাচাপল্য। অন্তরে যে পবিত্রতা না থাকিলে নারীর শরীর সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী হ'তে পারে না, সে পবিত্রতাটুকু আজ অর্জ্জন করে' ঊষা নিমেষে তার এই ক্লিষ্ট জীর্ণ দেহটাকে স্বর্গচারিণী অপ্সরীর হাতের বীণা করে তুলেছে!' এখন জিজ্ঞাস্য এই 'পবিত্রতাটুকু' কি তাহা লেখক কোথাও ইঙ্গিতেও বলেন নাই, আর কি করিয়াই বা অর্জ্জন করিলেন তাহাও জানেন নাই—জানাইয়াছেন মাত্র এই কয় ছত্রে—'ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ঊষা অঙ্গসজ্জা করছে। ঊষা এবাড়ির বড় বৌ—যে মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে তার জ্যেঠাইমা বয়সে ত্রিশ ঘেঁসেছে। ঊষা এ-যুগে গান্ধারীর প্রতিনিধি। বিয়ে হয়েছে বছর পনেরো হ'ল। ভাগ্য ভাল বলে দশটি সন্তানের একটিও অকচ্যুত হয়নি। দেহ ত নয় দড়ি। দুই চোখে অগাধ ক্লান্তি, নিস্তেজ ললাটে করুণ বিষণ্ণতা। সেও আজ মেতে উঠেছে।" এই মেতে উঠার ভিতর পবিত্রতার ভাব কোথায়? তার পর এই ছোট বাড়ীতে ঊষার মেয়ে যারা যেখানে গোপনে বসিয়া বরকে দেখিতেছিল সেখানে আসিয়া পাড়ার একটী ছেলে সুব্রতের যে প্রেমনিবেদন সেটাও শোভন হয় নাই। মায়া প্রশ্ন করিল—'মিছি হয়ত আসছে মাসে আমার বিয়ে হবে। তারপর তোমার দেখা পাব?' উত্তরে সুব্রত যাহা বলিল তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না:—'দেখা আর পাবে না, মায়া! কি হ'বে দেখা দিয়ে? প্রেম মরে, তা মরে বলেই এত সুন্দর। ভালোবাসাকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে কেন মানুষের এত মাথাব্যথা? তোমার শারীরিক মৃত্যুটা কুৎসিত, কিন্তু আমার জীবনে তোমার পরম মৃত্যু ঘটবে এ দুঃখের মত পবিত্র ও সুন্দর দুঃখ আমি কল্পনা করতে পারি না। তার জন্যে আমার দুঃখ নেই।' এ সব হেঁয়ালীর অর্থ পাঠকেরা আপন-আপন অনুভূতির সাহায্যে করুন।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত চারু সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যশস্বী শিল্পীর তুলিকার ত্রিবর্ণ চিত্রের পনেরখানি ও দ্বিবর্ণ চিত্রের তিনখানি ও যশস্বী যতীন্দ্র-কুমারের একবর্ণের চিত্র একখানি সুন্দর চিত্র আছে। এতদ্ভিন্ন একবর্ণের বহু চিত্র আছে। চিত্রসম্ভারে এ বৎসরের বর্ষস্মৃতি কোন বৎসর অপেক্ষা শ্রীহীন হয় নাই—আমাদের মনে হয় এদিকে তাহার শ্রী বর্দ্ধিতই হইয়াছে।

দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে—বাঙ্গালী ও বোম্বাই-রমণীরা যাহা করিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত। সম্পাদক ভায়া ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বলকারিণী কয়েকজন মহিয়সী মহিলার প্রতিকৃতি দিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন।

পুস্তকের পত্রসংখ্যা ১২০। মূল্য ১৷০ মাত্র।

চক্করীকা—'চক্করীকা' গ্রন্থের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একখানি রস-রচনা। দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। তিনি বহুদিন ধরিয়া হাস্য, কৌতুক ও রস-রচনায় বাঙ্গালীর প্রাণে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। নির্জ্জীব জাতিকে সজাগ করিয়া তুলিতে, তাহাদের প্রাণে সজীবতা আনিতে ও আনন্দদান করিতে যে পথ তিনি ধরিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা সে পথের পথপ্রদর্শক ছিলেন একে একে তাঁহারা স্বর্গত হইয়াছেন, এখন আছেন মাত্র পরশুরাম ও কেদার বাবু। আমরা তাঁহার চিরদিনই ভক্ত, কারণ তাঁহার রচনায় যে রস-ঘন উক্তি পাই, তাহা আমাদের অবসাদ-ক্লিষ্ট প্রাণে প্রচুর আনন্দ দান করে। রস-সৃষ্টির অপূর্ব্ব উন্মাদনার সাক্ষাৎ পাইব আশা করিয়া তাঁহার প্রত্যেক রচনাই আমরা পাঠ করিয়া থাকি।

আমরা পুস্তকখানির সমালোচনা করিব না, রসানুভূতি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব, কারণ আমাদের ধারনা রস-রচনা বিশ্লেষণ

করিয়া সৌন্দর্য্য দেখান যায় না; সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে প্রত্যেক গল্পটী মনোযোগের সহিত পড়িতে হইবে। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি সকল পাঠকই এ পুস্তক পাঠ করিয়া রসবস্তুর সন্ধান পাইবেন, চিত্রিত নরনারীর সুন্দর আলেখ্য দেখিতে পাইবেন আর পাইবেন প্রচুর আনন্দ। যত বড় গম্ভীরপ্রকৃতির লোকই হউন না কেন পাঠ করিয়া হাসিবেনই হাসিবেন। এই রচনাগুলিতে শ্লীলতা বা ভব্যতার অভাব নাই; একঘেয়ে, তরল বা পানসে নয়, অযথা অতিরিক্ত বিদ্রূপে ভারাক্রান্ত নয়, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি যে কোথাও বিদ্রূপ বর্ষিত হয় নাই তাহা বলি না, তাহাদিগকে সহজে ধরিতেও যে পারা যায় না, তাহা নয়, তবে সর্ব্বত্রই তাহা বাঙ্গালীর একশ্রেণীর লোকের আদর্শ (type) মাত্র। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এরণ্ডাচার্য্য জ্যোতিষ্ক্রমের চিত্রটী দেখুন। 'রক্ত-চন্দনলিপ্ত সটাক ললাট যেন গড়ের মাঠ, স্বয়ং শনৈশ্চরের অধিষ্ঠানক্ষেত্র। উজ্জল প্রখর চক্ষুর্দ্বয়ে রবিচন্দ্র বিরাজমান। চোর এবং ডাকাইতগণের সর্দ্দার মঙ্গল গ্রহ রক্তচন্দনচর্চ্চিত ইঁহার লোমশ বক্ষঃস্থল আলো করিয়া বসিয়াছেন আর লোমশ বলে লোমশ! যেমন কটা, তেমনি মোটা, তেমনি দীর্ঘ, দেখিলেই ভ্রম হয় যে বুকে বুঝি দাড়ি গজাইয়াছে।' এ চিত্র ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাহারা গিয়া থাকেন তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়াছেন। ইঁহার মুখের রসের কথাগুলি যেমন বাস্তব তেমনই মধুর। 'আমি আচমন করব না, নিবেদন করব না! কেবল শাস্ত্রবাক্য সফল করব প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যম্।' তাঁহাকে রিসার্চ্চ স্কলার গবেষক ছাত্র বলিতে শুনিয়া তিনি উত্তরে বলেন—'আমি ও গরু নই যে গবেষণা করব? সকল রকম 'ষণা'ই আমার হস্তা-মলক, কেবল 'ষণা' কি? ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আমার চোখের উপর। দেবেন্দ্রনাথের রচনায় কোথাও মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গ নাই, আছে সরস হাসি ও কৌতুক। অনেকসময় সে হাসির ভিতর দিয়া তাঁহার প্রাণের আলা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। তিনি সমাজের দুষ্টক্ষতগুলির সংশোধনের জন্য যে মৃদু ভৎসনা প্রাণস্পর্শী রসের ভিতর দিয়া করিয়াছেন তাহাতে আনন্দ ও শিক্ষার যুগপৎ সমাবেশ আছে।

তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে কয়েকটী সুন্দর নক্সা। নক্সা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত পাঠকেরা ইতিপূর্ব্বে আমাদের পত্রিকায় পাইয়াছেন। সত্যই তিনি বলিয়াছেন 'অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য সাহিত্যিক নক্সার প্রাণ। পাঠকের মনে sense of the ludicrousএর উদ্দীপনা করাই সাহিত্যিক নক্সার উদ্দেশ্য। * * * নক্সা লেখককে অনেক স্থলে বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করিতে হয়। কিন্তু অভিপ্রায় মূলে উপায়ের দোষ-গুণবিচার। অতিরঞ্জন বর্জ্জনীয় হইলেও এ স্থলে মার্জ্জনীয়। শুধু অতিরঞ্জন কেন, হাস্যরসের যে কিছু বিশদ উপকরণ আছে, সে সমস্তই নক্সারচয়িতার অস্ত্রাগারের অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক ব্যাপারে, লোকাচারে বা ব্যক্তিগত ব্যবহারে যাহা কিছু বিসদৃশ নক্সাকার তাহার উপর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শ্লেষের প্রখর শর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু নিপুণ যোদ্ধার তূণ কেবল অগ্নিবাণ প্রসব করে না। তাহা বরুণ প্রভৃতি অস্ত্রের আধার। তন্মধ্যে নক্সা-রচয়িতার উদার সমবেদনা ও কারুণ্যই সর্ব্বপ্রধান। এই সমবেদনার হেতু আহত ব্যক্তিও নক্সার আনন্দ উপভোগ করেন। নহিলে বুঝিতে হইবে, নক্সায় মধুসঞ্চয় বা রস-সৃষ্টি হয় নাই, হুল ফুটান হইয়াছে মাত্র। রস-রচনার এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে সত্যই বলিতে পারা যায় এ ধরণের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে যেকয়খানি বাহির হইয়াছে, ইহা তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

গল্পগুলি ইতিপূর্ব্বেই মাসিকপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তবে লেখক ইহার পুনর্মুদ্রণ করিলেন কেন? কৈফিয়তে প্রবীণ সাহিত্যসেবী যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। 'হাসি কখনও বাসি হয় না, এই বিশ্বাসে এই গল্পগুলি পুনর্মুদ্রিত হইল।' কথাটা খুবই খাঁটি। হাস্যরসাত্মক কথার প্রচার যত অধিক হইবে চিত্তে ততই আনন্দের ছায়াপাত হইবে * * * 'কাহারও কাহারও মতে গল্পগুলি অতিরঞ্জিত। অতিরঞ্জন মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি ও প্রবৃত্তি। কুলাচার্য্য হইতে ক্যানভাসার, ঔষধ ও পুস্তকের বিজ্ঞাপন হইতে প্রত্নতত্ত্বের প্রমাণ বা ঐতিহাসিক গবেষণা অনেক স্থলেই অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট।' (পাঠকগণ 'বলিবিদ্রো ভবিষ্যতি' গল্পে প্রজাপতি গোঁফ Butterfly প্যাটার্ণের—গোঁফের—প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা দেখুন।) "এই অতিরঞ্জন প্রভাবেই বর্ণনায় বরযাত্রীর সংখ্যা পঞ্চাশ হইতে পঞ্চশতে পরিণত হয়। বক্তৃতার শ্রোতা, সংবাদপত্রের গ্রাহক, রঙ্গালয়ের দর্শক এবং ব্যবহারাজীবীর মক্কেল আবশ্যকমত অসম্ভবরূপে বৃদ্ধিলাভ করে। সম্পাদকের কলমের কল্যাণে সমালোচনা আজগুবি গল্পের আকৃতি ধরে। * * * মজলিসে, আসরে, বাসরে আমরা রসনার রশ্মি ছাড়িয়া দি—রচনায় লেখনী উদ্দাম হইয়া উঠে। অতিরঞ্জন মানবের মজ্জাগত। কেবল একস্থানে আমরা এই প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিতে

সঙ্কোচবোধ করি, সংযত ও সতর্ক হই—সে ইনকম্‌ট্যাক্স অফিসে।'

বাস্তবিকই রচনায় সর্ব্বত্রই রসের ভিতর দিয়া সহজ-সরল সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রচনা কোনখানেই আড়ষ্ট নয়, রসের প্রস্রবণ হইতে অনবরত রস বহির্গত হইতেছে। কোন রচনাই পড়িতে অবসাদ আসে না। মনে ক্লান্তিবোধ হয় না।

পুস্তকখানির নামকরণে একটু বৈশিষ্ট্য আছে—'চঞ্চরীক' শব্দের অর্থ ভ্রমর। 'চঞ্চরীকা' শব্দের প্রচলন বাংলা সাহিত্যে বড় একটা দেখিতে পাওয়া না গেলেও শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় ইহার 'ভ্রমরী' অর্থে প্রচলন করিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনিও ভ্রমরের মত যে ফুলে যে মধু পাইয়াছেন তাহা সঞ্চয় করিয়া মুক্তহস্তে বিলাইয়াছেন। ভ্রমরের অব্যক্ত-মধুর গুঞ্জন পুস্তকের সর্ব্বত্রই ধ্বনিত হইতেছে।

আলোচ্য পুস্তকে আটটী রসের গল্প আছে। প্রত্যেক গল্পই রসে ভরপুর, তথাপি বলিব 'কাঠে কাঠে'র মত এমন রস-ঘন গল্প কথা-সাহিত্যে অল্পই বাহির হইয়াছে। 'চক্র-ভঙ্গ' গল্প রসরাজ অমৃতলালের 'দ্বন্দ্বে-মাতমমে'র পর প্রকাশিত হয় বলিয়া সমধিক আদর পায় নাই কিন্তু ইহাতে নূতনত্বের দাবী কম নাই। কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া যে, রসের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে তাহা আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে:—'ঠোঁট দু'খানি যেন কৃপণের দরজার মত বন্ধ হইয়া গেল,' 'আমার মাথাটা যেন আময়দা মাঠ, বেটা স্ফূর্ত্তির হাওয়া পেয়ে নাচ্‌তে সুরু ক'রে দিল', 'কটা পাস' প্রশ্নের উত্তর 'সার সেনেটহলে ঢুকে সেই যে চিৎপাত হ'য়ে পড়্‌ল, আর পাস্ ফিরতে পার্‌ল না', 'তোমার ত চক্ষুলজ্জা নেই'র উত্তর, 'সে কি সার! বিলাতি বেগুনের মত চক্ষু আমার চব্বিশ ঘণ্টা লজ্জায় লাল হয়ে রয়েছে!' মাতালের মুখে স্বরাজের ব্যাখ্যা—'তোমার স্বরাজ যদি দরাজখানা হয় ত হ'লে রাজি আছি, খুব চাই।' 'ওহে সেদিন আর নাই' এর উত্তর 'সার, এত বয়স হ'ল, দিনকে ত থাকৃতে কখন দেখলুম না। ওটার স্বভাব ঐ, আসে আর চলে যায়।' তৎপরে প্রত্যেক রচনায় রসের ফুলঝুরির আলোকে চরিত্রগুলি বেশ উজ্জ্বলভাবেই চিত্রিত হইয়াছে।

রচনাগুলির আর একটা বৈশিষ্ট্য হইতেছে কথোপকথনে কবিতার মিল, ইংরাজীতে যাহাকে বলে jingling verse। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম রচনা হইতেই ধরুন:—'বাপ মরে জোয়ানগিরি ক'রে ব্যাটার বাকিয় স্যাকিয় যেন ফুলঝুরি ঝরে' 'ফুস্-ফুস্ কানাকানি, ঠ্যাং ধরে টানাটানি। হাত ধরে খিঁচ, কাছা টেনে প্যাঁচ! হাত-পা-মাথা-চালা, কান-দুটো ঝালাপালা—'

'মাণিকজোড়ে' যোগ্যের সহিত যোগ্যের রসের ভিতর দিয়াই যোজনা হইয়াছে। 'বেণো জলে' সুদক্ষ শিল্পী কয়েকটী রেখার সম্পাতে অমূল্যর ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের চিত্রকে সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। 'হাস্য নস্য এবং নাসিকা, এই তিনটী অমূল্যের ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের বিশেষত্ব।' 'হাস্যে, নস্যে তা'র মুখখানি সর্ব্বদা ভরপুর। কিন্তু নাকটী সে মুখের সঙ্গে এমন বে-প্যাটেণ্ট বে-মানান বে-খাপ যে, দেখিলে মনে হয় সেটা যেন কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। যিনি জামালপুরের পাহাড়ের টানেল দেখিয়াছেন, তিনিই সে সছিদ্র নাসিকা কতক অনুমান করিতে পারিবেন। নাকটির জন্য শ্বশুর মহাশয়ের মুখটিকে মুখোস বলিয়া মনে হয়।' আবার অমূল্যর ভাবী পত্নীর নাক নাই। কিন্তু সে না থাকাটা কি রকম লেখকের কথায় বলি:—'কিন্তু সে নাই যে কি রকম না থাকা, তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ব্যতীত উপলব্ধি হইবার নহে। আকাশকুসুম নাই, শশশৃঙ্গ নাই, অশ্বডিম্ব নাই, তথাপি এসকল না থাকিয়াও আছে। ***পরহস্তগত ধনের ন্যায়, রিফর্ম স্কিমের মত এ নাসিকা যে থাকিয়াও নাই। বাবা ও মেয়েকে এক সঙ্গে দেখিলে মনে হয় যেন বাপের নাসিকা গঠন করিয়া বিধাতাপুরুষ একেবারে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিলেন। এক দিকে যেমন বাড় অন্য দিকে তেমনি বাড়ন্ত। নথ নাড়িবার ত কথাই নাই, অমূল্যর ভাবী পত্নী যে কখনও নাক নাড়া দিবে সে সম্ভাবনাও অসম্ভব।' ইহার উপর আখ্যানবস্তুতে নায়ক অমূল্যের শরীরে পাশ্চাত্য জগতের monkey gland ব্যবহারের পরিবর্ত্তে ষাঁড়ের রক্ত সঞ্চারিত করার ফলে যে হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন তাহা অতিরঞ্জিত হইলেও মুখ-রোচক; অবশ্য শেষের চিত্রটা না থাকিলেই ভাল হইত। লেখকের রচনায় করুণ-রস ফুটিয়া উঠিয়াছে 'আরোগ্যলাভে'। উপেক্ষিত কবিদের জন্য কবিতার মাসিকপত্র 'কবিতা কল্পলতিকা' বাহির করিয়া নায়ক যেরূপ দায়গ্রস্ত হইয়া পড়েন তাহা যেরূপ বাস্তব সেরূপ শিক্ষাপ্রদ।

রসের দিক্ দিয়া আলোচ্য পুস্তকের পরিচয় কতকটা দিলাম। চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণভাবে এই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে প্রত্যেক চিত্র বাঙ্গালীর ঘরের সজীব চিত্র। বাঙ্গালীর সমাজের দুষ্ট প্রথাগুলির উচ্ছেদের জন্য যেরূপ চিত্রের অঙ্কন সময়োপযোগী লেখক সেইরূপ চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। অথচ কোন দুষ্ট

চরিত্রের ভিতর সমতা নাই—সকল চরিত্রে একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে—তাহাদের ব্যক্তিত্ব আছে, বিষয়বস্তুর ভিতর রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্য সবই আছে—প্রেমের চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু সে প্রেমের ভিতর পাশ্চাত্য প্রেমের উৎকট গন্ধ আদৌ নাই।

গল্পগুলিকে যে শিল্পী চিত্রের সাহায্যে 'উজ্জ্বলে মধুরে' করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন তাহার কৃতিত্বের পরিচয় না দিলে প্রত্যবায় আছে। আলোচ্য পুস্তকের শিল্পী চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক ও স্বাভাবিক হইয়াছে। শিল্পী যে লেখকের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। চিত্রগুলি দেখিলেই বর্ণিতব্য বিষয়গুলি মনের ভিতর যেন একটা স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়।

ছবি, ছাপা, কাগজ, বাঁধা সবই সুন্দর। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত, মূল্য দুই টাকা।

আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ—দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গন্ধী। অনুবাদক শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত। এই খণ্ডে সত্যাগ্রহের উৎপত্তি হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত এই আন্দোলনের ক্রমবিকাশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ১ম খণ্ডের সমালোচনার সময় যাহা যাহা বলিয়াছি এ খণ্ডের সমালোচনা সম্বন্ধেও আমাদের তাহাই বক্তব্য, সুতরাং পুনরুক্তি করিতে চাহি না। 'সাবধানতা' অধ্যায়ে "আরোগ্য সাধন" guide to health বিষয়ে আহার ও তৎসম্বন্ধে যেরূপ বিচার করিয়াছিলেন, কালে ব্যবহার-সম্বন্ধে একটু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'দুধ ত্যাগ করা যদি সর্ব্বাংশে লাভজনক বলিয়া মনে হয় অথবা অভিজ্ঞ বৈদ্য বা ডাক্তার যদি পরামর্শ দেন তবেই দুধ ত্যাজ্য, নচেৎ কেবল আমার পুস্তকের কথার উপর নির্ভর করিয়া কেহ যেন দুধ ত্যাগ না করেন। এখনও পর্য্যন্ত আমার অভিজ্ঞতা এই যে যাহার হজমশক্তি মন্দ হইয়াছে অথবা যে শয্যাগত হইয়াছে তাহার পক্ষে দুধ ব্যতীত হাল্‌কা অথচ পুষ্টিকর খাদ্য আর কিছু নাই।' এ খণ্ডে অহিংসা-ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ ইত্যাদি গুণ বিকসিত করিবার জন্য যাহা করা কর্ত্তব্য তাহাই তিনি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। নির্ঘণ্ট সমেত পুস্তকের পৃষ্ঠা ৪১৪; মূল্য ছয় আনা।

সত্যব্রত

বীণা—কবিতার বই। শ্রীসন্তোষকুমার পাল প্রণীত। পৃষ্ঠা ৫৮। মূল্য দশ আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে মোট ১৪টী কবিতা আছে, তন্মধ্যে দুই-একটী ব্যতীত প্রায় সবগুলিই ভাবসম্পদে উজ্জ্বল এবং আনন্দদায়িনী শক্তিতে পূর্ণ। "বিকাশ", "কপালকুণ্ডলা", "পল্লীমাধুরী" প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা বিশিষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। অপরগুলিও বিশেষ চিত্তাকর্ষক। কবির "বীণা"র প্রতি ঝঙ্কারে নূতন নূতন প্রীতিপ্রদ সুর বাজিয়াছে।

বইখানির বাহ্যসৌন্দর্য্যও মন্দ নয়। বাঁধাই ও ছাপা ভাল।

শ্রীনীহাররঞ্জন মিত্র

দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গলাদেশের চরম দুর্দ্দিন উপস্থিত। বাঙ্গলার মফঃস্বলে ঘরে ঘরে হাহাকার। প্রতিনিয়ত সংবাদপত্র সাহায্যে নানাস্থান হইতে এই শোচনীয় দুর্দ্দশার ঘটনা যাহা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। পতি স্ত্রীপুত্রকে অনাহারে মুমূর্ষু দেখিয়া আত্মহত্যারূপ মহাপাপ অনুষ্ঠিত করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছে না; পত্নী স্বামীপুত্রকে অনশনক্লিষ্ট ও দারুণ অভাবগ্রস্ত দেখিয়া নিজেও মরিতেছে, তাহাদিগকেও মারিতেছে। ইহা ছাড়াও কত কি বীভৎস ব্যাপার প্রত্যহ ঘটিতেছে। এ সম্বন্ধে "হিতবাদী" যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

আমরা প্রত্যহ মফঃস্বলের নানাস্থান হইতে অন্নকষ্ট ও দুর্দ্দশার সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি। কেহ একবেলা খাইতেছে, কেহ একদিন অন্তর একবেলা খাইতেছে, আবার কেহ বা দুইদিন অন্তর একবেলা খাইতেছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থা খুব শোচনীয়। উত্তর বঙ্গে এবার দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অধিক; পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর ও ত্রিপুরা জেলা হইতেই অধিক দুর্দ্দশার খবর পাওয়া যায়। ইহার কারণ একটী নহে, বহু। তাহার নিবারণেরও উপায় দেখা যায় না। তথাপি দেশবাসী সকলকে এখন এ বিষয়ে অবহিত হইয়া কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। সরকার-পক্ষ হইতে সাহায্যের আশা কম; জমীদারগণ নিজেদের লাটের খাজনা দিতে অসমর্থ হইয়াছেন—তাঁহারা অপরকে সাহায্য করিবেন কিরূপ? একমাত্র আশাভরসা বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের উপর। যাঁহারা কৃষকের উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিয়া গত [illegible] বৎসরে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা কি আজ কৃষকদের দুর্দ্দশায় সাহায্যদানে বিমুখ থাকিবেন? দরিদ্র কৃষককুল আজ তাঁহাদের মুখ চাহিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। সাগুনা ইউনিয়ন হইতে খবর আসিয়াছে, তথায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ২।১ করিয়া খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে; নেত্রকোণার দুর্গাপুর থানার ৪।৫ খানি গ্রামের সকল লোক আশ্রয়হীন, গাইবান্ধায় একদিকে জমিদার পক্ষ সার্টিফিকেট দ্বারা খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অপর দিকে ই, বি, রেল কর্ত্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ না দিয়া কৃষকের জমি দখল করিতেছে। "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?" দেশের লোকের এই অবস্থা। সরকার দুর্ভিক্ষ ঘোষণা না করিলে সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইবে না। কাজেই লোক না খাইয়া, দুর্দ্দশায় পড়িয়া মরুক, তাহাতে কি আসে যায়? দেশবাসী কি সমবেত শক্তি লইয়া ইহার প্রতিকারে অগ্রসর হইতে পারেন না?

চরকা ও তকলি

মহাত্মা গন্ধী আইন-অমান্য-আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিলে সহসা এ দেশে চরকা ও তকলির যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহা ইতিপূর্ব্বে কখনও কেহ দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। চরকা তখন নিত্যব্যবহার্য্য গৃহপঞ্জিকার মত বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছিল, এমন কি আফিসের বাবুরাও বাসে, ট্রামে, ও ট্রেণে বসিয়া তকলিতে সূতা কাটিতে মত্ত হইয়াছিলেন, মুটে-মজুর-পরিচারকদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু এখন আর সে দৃশ্য বড় চোখে পড়ে না। তাই "হিতবাদী" বলিতেছেন :—

চরকা ও তকলির আবির্ভাবও যেরূপ সহসা হইয়াছিল, তিরোভাবও সেইরূপ সহসা হইল। এখন অতি অল্প গৃহস্থের বাটীতেই প্রত্যহ

নিয়মিতরূপে চরকা বা তকলিতে সূতা কাটা হয়। অধিকাংশ বাটীতেই চরকা এখন মাচায় উঠিয়াছে, তকলি কোথায় পড়িয়া আছে, কেহ তাহার কোন সন্ধানই রাখেন না। চরকা তকলির এই অনাদর ও তিরোভাবের প্রধান কারণ, বস্ত্র বুনাইবার অসুবিধা। একজোড়া খদ্দরের ধুতি বুনাইতে হইলে তাঁতীকে তিন পোয়া বা সাড়ে তিন পোয়া সূতা ও দুই টাকা পারিশ্রমিক দিতে হয়। তাঁতী কাপড়ের টানা মিলের সূতা দিয়া চরকার সূতায় পোড়েন করে। টানা ও পোড়েনের উভয়ই চরকার সূতায় অতি অল্প তাঁতীরা বুনিয়া থাকে। কলের সূতায় টানা বা দৈর্ঘ্য এবং চরকার সূতায় পোড়েন বা প্রস্থ দিয়া যে খদ্দর হয়, তাহা "হাফ খদ্দর" হয়। টানা ও পোড়েন উভয়ই চরকার সূতা হইলে খাঁটি খদ্দর বা "ফুল খদ্দর" হয়। খাদি-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি আজকাল আড়াই টাকা মূল্যে একজোড়া খাঁটি খদ্দর বিক্রয় করিতেছেন, এ অবস্থায় দুই টাকা মজুরি ও তিন পোয়া সূতা দিয়া কে "হাফ খদ্দর" ক্রয় করিবে? এই কারণেই লোকে চরকা বা তকলিতে সূতা কাটায় ক্ষান্ত হইয়াছে। অনেক গৃহস্থের বাটীতে ৫।৭ সের সূতা জমিয়া আছে, বস্ত্র বুনাইবার সুবিধা হইতেছে না। এই সূতার গতি না করিতে পারিলে চরকা বা তকলির পুনঃ প্রচলন হইবার আশা নাই।

বঙ্গে লবণের কারখানা

ভারত গভর্ণমেণ্ট গত ২২এ মে তারিখে লবণ-প্রস্তুত সম্পর্কে যে ইস্তাহার জারি করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—

(১) যেসকল স্থানে লবণ প্রস্তুত বা সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার সন্নিহিত গ্রামসমূহের অধিবাসীরা নিজের ব্যবহারের জন্য নিজ নিজ গ্রামে লবণ প্রস্তুত বা সংগ্রহ করিতে পারিবে। (নিজের ব্যবহার বলিতে কৃষি, গবাদি পশুর জন্য বা মাছের পচন নিবারণের জন্য লবণ ব্যবহার বুঝিতে হইবে)।

(২) এই উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীরা লবণ-প্রস্তুতের জন্য পাত্র বা নোণা জল শুকাইবার অগভীর খড়ি নির্ম্মাণ করিতে পারিবে।

(৩) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে গ্রামের বাহিরে লবণ বিক্রীত হইতে পারিবে না। সুতরাং পায়ে হাঁটিয়া যে পরিমাণ লবণ বহন করা যাইতে পারা যায় সেই পরিমাণ লবণই লইয়া যাইতে পারা যাইবে,—কেহ যান-বাহনের সাহায্যে লবণ লইয়া যাইতে পারিবে না।

(৪) উপরি উক্তসর্ত্তে যেখানে লবণ প্রস্তুত হইবেসেখানে লবণপ্রস্তুতের পাত্র ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে না বা সরকারী কর্ম্মচারিগণ তাহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং প্রহরী সরাইয়া লওয়া হইবে।

(৫) যেখানে দেখা যাইবে যে গ্রামবাসীরা এইসকল সুবিধার অপব্যবহার করিতেছে, তথা হইতে অনুমতি প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইবে। কোন গ্রামে যদি সেই গ্রামের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ প্রস্তুত বা সংগৃহীত হয়, তাহাহইলে তাহা অনুমতির অপব্যবহার বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এ বিষয়ে "সম্মিলনীর" অভিমত :—

—বঙ্গদেশে সমুদ্র উপকূলের জলে লবণের ভাগ কম। কারণ সমগ্র বঙ্গ উপকূলে বহু নদী আসিয়া সমুদ্রে পড়াতে সাগরজলে লবণের ভাগ কম হইয়াছে।—ইহা ব্যতীত লবণ তৈয়ারীর সুবিধামত স্থানের ও প্রস্তুত লবণ দেশের অভ্যন্তরে চালান করিবার অসুবিধা রহিয়াছে। ইহা দূর করিতে হইবে। সমুদ্রজলে লবণের ভাগ কম হইলেও ২০ ফিট জলের নীচে লবণের ভাগ অধিক। কাঁথিতে যেমন লবণের কারখানা হইতে পারে, তেমনি ২৪ পরগণার রেজারগঞ্জ, খুলনার উপকূলে ও বাখরগঞ্জের উপকূলে লবণ তৈয়ারী হইতে পারে। শেষোক্ত দুইস্থান সুন্দরবনের মধ্যে পড়ায় সমুদ্রজল ফুটাইয়া লবণ তৈয়ারী করিবার সুলভ কাঠের অভাব হইবে না।

লবণের কারখানা করিতে গবর্ণমেণ্ট যে শুল্কের সাতের৮ ভাগ প্রদান করিতে চাহিয়াছেন এবং যাহা দ্বারা লবণের কারখানা প্রস্তুত হইবার কথা আছে তাহা দিয়া লবণের কারখানা প্রস্তুত হইলে যেন তাহা অবাঙ্গালীর হস্তে গিয়া না পড়ে তজ্জন্য বাঙ্গালীকে সজাগ থাকিতে হইবে। বর্ত্তমান লবণের ব্যবসায় অবাঙ্গালীর হাতে, অবাঙ্গালীর সুবিধার জন্য বাঙ্গালীকে অধিকতর শুল্ক দিতে হইতেছে। আবার এই নূতন ব্যবসায়টিও অবাঙ্গালীর হস্তে যাহাতে না পড়ে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিলের মামলা

পরলোকগত বি, কে চক্রবর্ত্তীর পুত্রদ্বয় সমরেশ ও শেখরেশ চক্রবর্ত্তী বি, কে, লাহিড়ী এবং বি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ২৮, ৩৫, ৩৩৯৲ টাকা আদায় করার জন্য বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড হাইকোর্টে যে মামলা দায়ের করিয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ সর্ত্তে আপোষে বিচারপতি আমিরালী কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইয়াছে। বাদী কোম্পানী আরজীতে বলিয়াছেন যে বিবাদীদের অসাবধানতাবশতঃ কোম্পানীর এই পরিমাণ টাকা লোকসান হইয়াছে এবং বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে যাওয়ার সময় কোম্পানীর নিকট ব্যাঙ্কের দেনা ছিল। অপরপক্ষে, বি, কে, লাহিড়ী ও বঙ্গলক্ষ্মী মিলের নামে তুলা খরিদের বাবদ ১,৩৩,৯০১ টাকা পাওনা দাবী করিয়া এবং মহারাজ এস, কে, আচার্য্য চৌধুরী নামে তিনি কোম্পানীকে কর্জ্জ বাবদ ১০,০০০৲ টাকা আগাম দিয়াছিলেন

বলিয়া একুনে ২,০৩,৯০১৲ টাকা দাবী করিয়া আর একখানা মামলা দায়ের করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত মামলার দাবী কোম্পানী পরলোকগত চক্রবর্ত্তীর পুত্রদ্বয়ের নামে এই সর্ত্তে মামলা প্রত্যাহার করিলেন যে, ১৯২৭ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর বাদী কোম্পানী পরলোকগত চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে ২,৪,২১২১৲ টাকা বন্ধকপত্র দ্বারা কর্জ্জগ্রহণ করিয়াছিল—সুদ সমেত ঐ টাকার দাবী, পরলোকগত চক্রবর্ত্তীর পুত্রদ্বয় সমরেশ ও শেখরেশ পরিত্যাগ করিলেন। এজন্য তাঁহারা কোম্পানীকে ইস্তফা-পত্র লিখিয়া দিবেন। কোম্পানী বা বিবাদীদের মধ্যে আর কোন দাবী দাওয়া রহিল না। বি, কে, লাহিড়ীর বিরুদ্ধে মামলাও কোম্পানী এই সর্ত্তে প্রত্যাহার করিলেন যে-বি, কে, লাহিড়ীও কোম্পানীর বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার করিবেন। কোম্পানী বা লাহিড়ী কাহারও কোন দেনা-পাওনা দাবী রহিল না। বি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আনীত মামলাও কোম্পানী প্রত্যাহার করিয়াছেন।

—বঙ্গবাসী

কুলী মহিলার মহত্ত্বদৃষ্টান্ত

শ্রীহট্টজেলার অন্তর্গত কুলাউরা নামক স্থান হইতে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে কাইরাদারা গ্রামের একটী কুলী রমণী সেণ্ট জ্যাণ্টনী স্কুলের পক্ষ হইতে ১,২৫০০৲ টাকা মূল্যের একটা লটারী প্রাইজ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত দরিদ্রা কুলীরমণী এই অযাচিত লাভের অর্থ নিজ ব্যবহারের জন্ম আত্মসাৎ না করিয়া ইহা সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্ত একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং অন্যান্য জনহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত দুঃস্থ কুলীরমণী তাঁহার এই অসামান্য ত্যাগ দ্বারা যে মহাপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রচুর বিত্ত-বিভবশালী অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে একান্ত বিরল।

—চারুমিহির

শিক্ষাবিভাগের সার্কুলার

আইন-অমান্ত-আন্দোলনের সময় বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগ হইতে এই মর্ম্মে এক সার্কুলার জারী হইয়াছিল যে, কোনও প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিবে না, এই প্রতিশ্রুতি লিখিয়া না দিলে কোন ছাত্রকেই স্কুল-কলেজে ভর্ত্তি করা হইবে না। কয়েক মাস হইল ঐ সার্কুলার প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এখন এই নিয়ম আছে যে, ছাত্রগণ যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, সেই বিদ্যালয়ে নিয়ম প্রতিপালন করিবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে হয়।

—বঙ্গরত্ন
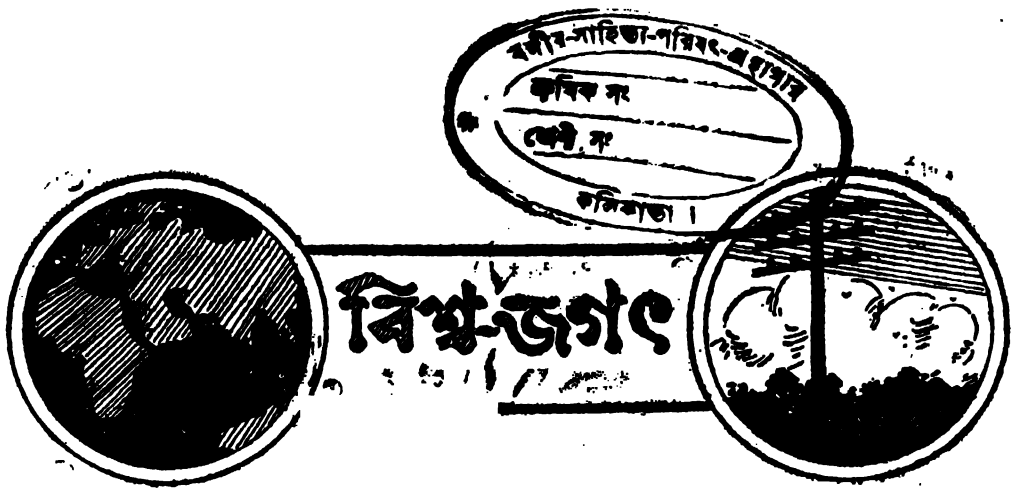
শিল্প-কলা

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

ইতালী

সৌন্দর্য্যের রাণী ইতালীর পদতলে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ভূমধ্যসাগর যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অজস্র চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করিয়া দিতেছে! মাথার উপর মরুপ্রদেশের বিবর্ণ আকাশ, বুকভরা তৃষ্ণা লইয়া সাগরের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিয়াছে; বাতাসের ভিতর দিয়া যে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের মাদকতা, স্বপ্নের অলস আমেজ, একদিন তাঁর ভাবুক সন্তানগণের মনে যে অপরূপ ছন্দের হিল্লোল তুলিয়াছিল তার শ্রান্ত রেশটুকু বুঝি আজও নির্ব্বাপিত হয় নাই। তাই পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বেও এই ইতালীরই মাটিতে যে তিনটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের এই আকাশের অনন্ত তৃষা বাতাসের উদাস নিঃশ্বাস চঞ্চল করিতে পারিয়াছিল। তাঁহারা প্রত্যেকে আপনাপন মনে এই অপূর্ব্ব ভাবের প্রকাশ-বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা ইহাকে উদ্‌ঘাটিত করেন স্ব স্ব অভিরুচি-অনুযায়ী পথে, কেউ বা ছন্দে, কেউ বা পটের উপর রঙ্ আর রেখায় অথবা পাষাণগাত্রে রূপের লীলাছন্দে। ইতালীর এই তিনটী কলাবিদের নাম—লিয়োনারদো দ্য' ভিঞ্চি (Leonardo Da Vinci) মাইকেল এঞ্জেলো ও রাফেল।

১৪৫২ খৃঃ লিয়োনারদো দ'. ভিঞ্চি ইতালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে কেবলমাত্র একজন শিল্পী ও কলাবিদ ছিলেন তাহা নয়, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য তখনকার ইতালীর শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের নিকট মোটেই অকিঞ্চিৎকর ছিল না! তিনি একধারে যেমন চিত্রশিল্পী ও রূপদক্ষ ছিলেন, অপরধারে তেমনি গণিতশাস্ত্রবিদ ও
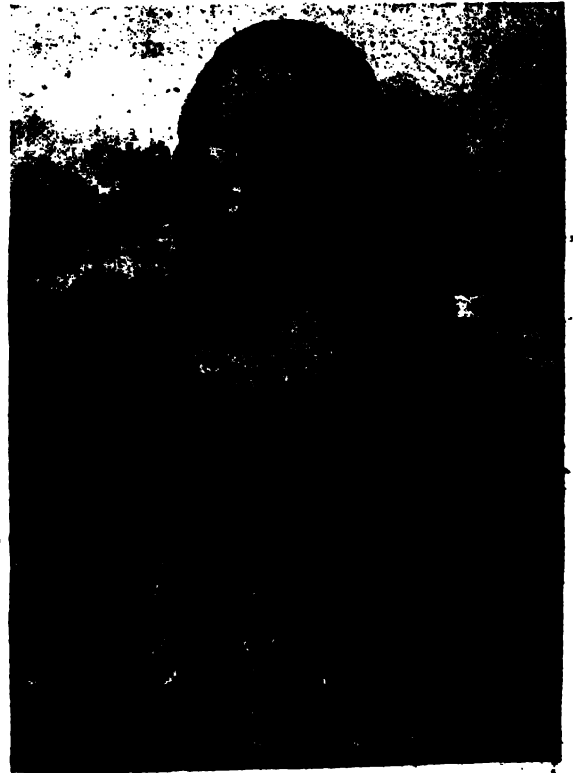
মোনালিসা—লিয়োনার্দো-দ-ভিঞ্চি

বৈজ্ঞানিক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। শিল্পী হিসাবে তাঁহার স্থায় অমন সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ তখনকার ইতালীর রূপ্রকার-গণের মধ্যে বড় একটা দৃষ্ট হইত না! তিনি পথে চলিতে চলিতে যাহা দেখিতেন তাহা তাঁহার অন্তরমধ্যে মুদ্রিত করিয়া রাখিতেন; শেষে যখন গৃহে ফিরিয়া রঙ ও তুলি লইয়া চিত্রাঙ্কন করিতে বসিতেন তখন প্রতিটী রেখার বিচিত্র বর্ণসমাবেশের মধ্য দিয়া তাঁর মনের ভাবটীকে যথাযথভাবে রূপ দিতেন এবং অনেকসময় সেগুলি এতই সুন্দর এবং ভাবব্যঞ্জক (suggestive) হইত যে মোটেই বিশ্বাস করা যাইত না যে তাহা বাস্তব নহে! লিওনারদো তাঁর মধ্যবয়সের অঙ্কিত চিত্রগুলির ভিতর দিয়া ইতালীর চিত্রশিল্পে এক বিশিষ্ট ধারা আনিয়া দেন। এই চিত্রগুলির মধ্যে তিনি বর্ণসমাবেশ (Colour-Combination) অঙ্কন-বৈশিষ্ট্য (Technique) প্রভৃতির দিকে যতটা না দৃষ্টি দিয়াছেন ততটা দিয়াছেন ইহার অতীন্দ্রিয়তার (Mysticism) দিকে। তিনি চাহিয়াছিলেন যে দর্শক তাঁহার ছবিখানিতে চক্ষুর সম্মুখে যাহা না দেখে যেন মনের মধ্যে তাহার চেয়ে গূঢ়তর এবং গভীরতর কোন বিষয়ের ইঙ্গিত সে পাইতে থাকে।

এইসময়কার ছবিগুলির মধ্যে তাঁর "Monalisa" ও "Last Supper" এর নাম করা যাইতে পারে। এই ছবিখানি, ছবিই বর্ত্তমানে প্যারীর লুভার মিউজিয়াম আছে। "Last Supper" ছবিখানিতে শিল্পী যেরূপ বিষাদভাব ব্যঞ্জনা করিয়াছেন তাহা সত্যই অনবদ্য সুন্দর। 'মোনালিসা' ইতালীর ফ্লোরেন্স শহরের Francisco নামক জনৈক উচ্চ রাজকর্মচারীর স্ত্রী। তাঁহার স্বামী তাঁহার একখানি ছবির জন্য লিওনারদোকে অনুরোধ করেন। লিওনারদো প্রত্যহ মোনালিসাকে তাঁহার সম্মুখে বসাইয়া এই চিত্রখানি অঙ্কিত করেন। ছবিখানি এমনই সুন্দর হইয়াছিল যে আজও উহা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্রসম্পদ বলিয়া পরি-গণিত হইয়া আসিতেছে।...একটী বিশিষ্ট বয়সের সুন্দরী তরুণী স্বপ্নমাখা জ্যোতির্ম্ময় চোখদু'টীর দৃষ্টিতে যেন কোন সীমাহীন প্রদেশের দিকে আকুল তৃষ্ণায় চাহিয়া আছে। সরল সুগৌর মুখখানির মধ্যে কেমন একটা অন্তর-সঞ্চিত বেদনার ম্লানছায়া, কম্প্র ঠোঁটদুটীর মধ্যে এক অস্পষ্ট ব্যাকুলতা! দূরনিবদ্ধ দৃষ্টি যাঁহার সন্ধানে ফিরিতেছিল মাঝে মাঝে তাঁহার দর্শন পাইয়া চিরদিন পিপাসী প্রাণ তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। তাই চোখের কোণে একটু রহস্যপূর্ণ হাসির রেখাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অপূর্ব্ব ভাবসম্মিলন শিল্পীকে চিরস্মরণীয় ও বরেণ্য করিয়া রাখিয়াছে। শুনা যায় এই ছবিখানি শেষ হইবার কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন মোনালিসা মারা যান। মনোযোগী পাঠক অভিনিবেশসহকারে দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে ছবিখানির মধ্যে মৃত্যুর আসন্নছায়া শিল্পীর অলক্ষ্যে কিরূপ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

লিওনারদো ফ্লোরেন্স হইতে ইজিপ্ট পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসেন। এই সময় তিনি ইজিপ্টে Carrara নামক বিখ্যাত মূর্ত্তি তৈয়ারী করিবার প্রস্তর আবিষ্কার করেন। এই প্রস্তরের আবিষ্কারে পাষাণ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। তিনি পাষাণমূর্ত্তি গঠন করিবার একটী যন্ত্রও তৈয়ারী করেন।

তাঁহার মস্তিষ্ক যথেষ্ট উর্ব্বর ছিল। তিনি কোন কাজ করিতে বসিলে এক সঙ্গে তাঁহার মনের মধ্যে দশ জন ব্যক্তির কাজ করিবার মত ভাব (Ideas) আসিত। কিন্তু তিনি কি করিবেন। তিনি সবার ন্যায়ই দোষগুণ-সম্পন্ন ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব। কাজেই তাঁহাকে বহু কার্য্য অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর বহু ইতালীয় শিল্পী তাঁহার অসমাপ্ত চিত্রাদি হইতে ভাবসংগ্রহ করিয়া ছবি আঁকিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৫১৯ খৃঃ লিওনারদো পরলোকগমন করেন।

লিয়োনারদোর অপরাপর চিত্রের ন্যায় তাঁহার "Madonna and Child" নামক চিত্রখানি প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। ইহা রোমের Convent of S. Onofrio নামক স্থানে রক্ষিত আছে। ইহার মধ্যে শিশুটীর গঠনসৌষ্ঠবই না কি ছবিখানির বৈশিষ্ট্য। এগুলি ছাড়া তাঁহার 'যিশুর মুখমণ্ডল' 'ব্যাকস্', 'লুক্রেসিয়া ক্রিভেলি' প্রভৃতি চিত্র উল্লেখযোগ্য।

লিওনারদোর পরে যিনি ইতালীর কলালক্ষ্মীর অন-

সৌষ্টববর্দ্ধনের জন্য কিছু দান করিয়াছিলেন তিনি হইতেছেন মাইকেল এঞ্জেলো। এঞ্জোলা লিওনার্দো হইতে তেইশ বৎসরের ছোট ও র‍্যাফেল হইতে আট বৎসরের বড়।

মাইকেল এঞ্জেলো শিল্পী ছিলেন না; তিনি ছিলেন ভাস্কর এবং কবি। তাঁহার গঠিত প্রতিমূর্ত্তিগুলি আজও ইতালীয় ভাস্কর্য্যের সীমানির্দ্দেশ করিয়া দেয়।…ইতালীর ফ্লোরেন্স শহরের নিকটবর্ত্তী ক্যাপরিস নামক ক্ষুদ্র গ্রামে ৬ই মার্চ্চ ১৪৭৫ খৃঃ অব্দে মাইকেল এঞ্জেলো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। শৈশব হইতেই এঞ্জেলোর মধ্যে কলাবিদ্যার প্রতি কেমন একটা দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা চাহিয়াছিলেন এঞ্জেলো লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহারই ন্যায় একজন বিশিষ্ট নাগরিক হউক কিন্তু তিনি তাহার বিপরীতপথে অগ্রসর হন। তিনি বিদ্যালয় হইতে পলাইয়া গিয়া এক চিত্রকরের দোকানে শিক্ষানবীশ হন। শুনা যায় তিনি এই সময়ে এরূপ শিল্পকুশলতা লাভ করিয়াছিলেন যে বহু চিত্রকরের প্রতিকৃতি-অঙ্কনের বিচ্যুতি অনায়াসে দেখাইয়া দিতে সমর্থ হন। এই কারণেই বোধ হয় তিনি পরবর্ত্তী জীবনে সর্ব্বদাই বলিতেন "আমি এখন যেরূপ ছবি আঁকি তাহা অপেক্ষা বাল্যে ঢের ভাল আঁকিতাম।"

এইসময় তাঁহার এক সহকর্ম্মীর সহিত একদিন কলহ হয়। শেষে উহা এতদূর গড়াইয়াছিল যে সেই ব্যক্তি রাগ সামলাইতে না পারিয়া একটা পাথর কাটিবার বাটালি লইয়া তাঁহার নাকের উপর বসাইয়া দেয়। ইহাতে তাঁহার নাকটী চিরজীবনের জন্য বিকৃত হইয়া যায়। তাঁহার বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বৎসর সেই সময় সমস্ত ইতালীতে তাঁহার প্রশংসা ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ে তিনি রোমের পোপ দ্বিতীয় জুলিয়সের সমাধিমন্দির তৈয়ারী করিবার জন্য নিযুক্ত হন। ইহা তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যেই সমাপ্ত করেন। ইহার পর তিনি Sistine Chapel নামক ধর্ম্মমন্দিরের ছাদের নিম্নে নক্সা করিবার জন্য মনোনীত হন। এঞ্জেলোর ইহাই বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি। এই বিরাট ধর্ম্মমন্দিরের ছাদ দৈর্ঘ্যে ১৫০ ফুট এবং প্রস্থে ৬০ ফুট। ইহার উপর পাষাণগাত্রে তিনি যে অপরূপ নক্সা করেন তাহা আজও ভাস্করকুলের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া থাকে; বাস্তবিকই এমন মনোরম, বিস্ময়কর, পরিকল্পনাবিশিষ্ট ও অভিনব মূর্ত্তিসমাবেশ প্রায়ই দেখা যায় না। প্রত্যেকটী মূর্ত্তি যেন এক-একটী লীলা ও লাস্যভরা কবিতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

তিনি যখন এই ধর্ম্মমন্দিরের মূর্ত্তি গঠনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন ইহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহার

সিষ্টাইন চ্যাপেলের খিলানের কারুকার্য্য
—মাইকেল এঞ্জেলো

সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্মশক্তির প্রয়োগ করেন। তিনি যখন কাজ করিতেন তখন তাঁহার নিকট সাহায্য করিবার জন্য অথবা দর্শক হিসাবে কাহাকেও থাকিতে দিতেন না। পাগল এঞ্জেলো সমস্ত দিনরাত অভিভূতের ন্যায় কাজ করিয়া যাইতেন! একবার 'পোপ' এঞ্জেলোর নিকট কতদূর কাজ অগ্রসর হইয়াছে দেখিবার জন্য অনুমতি চান। কিন্তু এঞ্জেলো বলেন যে তিনি তাঁহার কার্য্য শেষ না হইবার পূর্ব্বে কাহাকেও দেখিতে দিবেন না। শেষে একদিন 'পোপ' আর লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া

লুকাইয়া আস্তে আস্তে ধর্মমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেন। এঞ্জেলো যখন দেখিলেন যে পোপ তাঁহার নিষেধ না শুনিয়াও আসিয়াছেন তখন আর ক্রোধদমন করিতে পারিলেন না; হস্তস্থিত একটা যন্ত্র লইয়াই তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন। তিনি কোনরকমে পলাইয়া সেযাত্রা রক্ষা পান। পোপ শীঘ্র কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না বলিয়া আরও দু'একজন ভাস্করকে তাঁর নিকট পাঠান। কিন্তু তিনি তাহাদের কাহাকেও ভিতরে আসিতে দেন নাই। শেষে যখন ১৫১১ খৃঃ ইহা সমাপ্ত হইল তখন সমস্ত বিশ্ব ইহার দিকে নির্ব্বাক্‌-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। মানুষের কর্ম্মশক্তি ও প্রতিভা যে এরূপ অভ্রভেদী হয় তাহা কেহ কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই!

কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! তখন তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজন শিল্পী তাঁহার উপর হিংসাপরবশ হইয়া তাঁহার নামে কুৎসা রটাইতে আরম্ভ করে। এই সময় র‍্যাফেল-ই একমাত্র তাঁহার প্রতিভা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। শেষে হঠাৎ একদিন 'পোপ' মারা যান এবং তাঁহার পরে পোপ দশম লুই ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি এঞ্জেলোকে তাঁহার এই বিরাট্‌ কার্য্য সম্পাদনের জন্য কিছুই পারিশ্রমিকস্বরূপ দেন নাই। দরিদ্র এঞ্জেলো ইহাতে বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। ইহার পর হইতে তাঁহার আর কাজের উপর বিশেষ ঝোঁক দেখা যাইত না।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং রাত্রিজাগরণে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গিয়াছিল। দিবারাত্র ঘাড় বাঁকাইয়া কাজ করাতে তাঁহার মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, সর্ব্বক্ষণ নিবদ্ধদৃষ্টিতে থাকিবার জন্য চক্ষু জ্যোতিহীন হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার কণ্ঠনালীতে এরূপ ভীষণ ঘা' হইয়াছিল যে তাহার অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ফিরিতেন! এক-একদিন যন্ত্রণার তাড়নায় পশুর ন্যায় গোঁ গোঁ করিতে করিতে মাটিতে মুখ ঘষিতেন! কিন্তু এইসময় সান্ত্বনা দিবার মত তাঁহার কেহ ছিল না। তাঁহার সংসারে একটী প্রভুভক্ত ভৃত্য ছাড়া তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার আর কোন লোক ছিল না।

যৌবনে তিনি তাঁহার প্রতিবেশিনী এক উদ্ভিন্ন-যৌবনা সরলা নারীকে ভালবাসিয়াছিলেন। এই নারীই সাধারণের অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁর জীবনে বহুবিধ রস-প্রেরণা আনিয়া দেন। যদিও তাঁহাদের বিবাহ হয় নাই তাহাহইলেও এঞ্জেলোর শেষদিন পর্য্যন্ত অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের একটী বিশিষ্ট স্থান সর্ব্বদা তাঁহারই জন্য উন্মুক্ত ছিল। শেষে তাঁহার জীবনের এই সঙ্কট অবস্থায় হঠাৎ একদিন তাঁহায় মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন। সেদিন আর এঞ্জেলো কিছু মুখে দিলেন না। সমস্ত দিন তিনি মুক্ত বাতায়ান-পথে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁর চোখের পাতায় অন্তরের সঞ্চিত সমস্ত অশ্রুর ভিড় করিয়া আসিল, কিন্তু তাহার এক বিন্দুও ঝরিয়া বস্ত্র সিক্ত করিয়া দিল না,—তিনি নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে ক্রমশঃ বেলা পড়িয়া আসিল, আকাশে অগণিত তারকা ফুটিয়া উঠিল, তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। হঠাৎ কর্কশস্বরে একটা নিশাচর পাখী ডাকিয়া উঠিল, তিনি আনন্দে দিশাহারা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আমি পেয়েছি! আমি

মদন-দেবতা—মাইকেল এঞ্জেলো

পেয়েছি!"—আর কিছু বলিলেন না, তিনি আস্তে আস্তে তাঁর আরাম-কেদারায় হেলিয়া পড়িলেন। তাঁহার ভৃত্য

প্রভুর চীৎকার শুনিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখে তিনি আর নাই! কিন্তু তখনও তাঁহার চোখদুটী আকাশের কোন এক স্বপ্নলোকের দিকে নিবদ্ধ, একটা অন্তর-বিদীর্ণ হাসির শেষরেখাটী তখনও বিদ্যমান!

এঞ্জেলোর অন্যান্য মূর্ত্তিগুলির মধ্যে তাঁহার যৌবনে গঠিত "Cupid"এর মূর্ত্তিটী সূক্ষ্ম ও সুকুমার ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। উহা এখন South Kensingtonএর Albert Museumএ রক্ষিত আছে। তাঁহার "Holy Family" চিত্রখানিও উল্লেখযোগ্য। ইহার মূলচিত্রটী এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তবে ইহার একখানি নকল এখনও ফ্লোরেন্সের Uffisi চিত্রশালায় রক্ষিত আছে—তাহা হইতে ইহার পরিচয় পাইতে পারি। ইহার মধ্যে তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা (back-ground) বা মানবদেহের গঠনভঙ্গিমা যেরূপ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব্ব।

(পরবর্ত্তী বারে র‍্যাফেল সম্বন্ধে আলোচনা হইবে)।

বিজ্ঞান

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

দ্রুতগামী মোটর

সম্প্রতি ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মোটার দৌড়ের খুব প্রচলন হইয়াছে। সেই কারণে মোটার দৌড়-কারিগণের সখ মিটাইবার জন্যপ্রায়ই নানারূপ দ্রুতগামী মোটার তৈয়ারী হইতেছে। এবার আমরা এইরূপ একখানি মোটারের পরিচয় দিব।

আলোচ্য গাড়ীখানি কোন আমেরিকান মিস্ত্রী কর্ত্তৃক-তৈয়ারী হইয়াছে। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার চারিখানি চাকাতেই চারিটী বিভিন্ন মোটার সংযুক্ত আছে এবং

নবাবিষ্কৃত মোটার

বোধ হয় সেই কারণে ইহার গতিও সাধারণ গাড়ী হইতে বহু অধিক হইয়াছে। গাড়ীখানি কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার একটী মোটার দৌড় প্রতিযোগিতায় ঘণ্টায় ২৪৫ মাইল করিয়া দৌড়ায়। ক্যালিফোরণিয়া শহরের হলিউড নামক স্থানের E. G. Pennypacker নামক একব্যক্তি এই গাড়ীখানির পরিকল্পনা করেন।

আমরা ইহার একখানি ছবি দিলাম।

ছারপোকার চাষ

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের কোনস্থানে একশ্রেণী ছারপোকার চাষ হইতেছে। একটী বড় বাড়ীর মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় বহু ছারপোকা বহুবিধ কাঠের কুঠরীর মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের প্রত্যহ দু'বেলা খাইতে দেওয়া হয় এবং তাহাদের যাহাতে যথাযথরূপে সেবা হয় সেইজন্য বহুলোক নিযুক্ত হইয়াছে

ছারপোকা রাখিবার খোপ

এই ছারপোকাগুলি পুষিবার উদ্দেশ্য আমেরিকার শস্যক্ষেত্রে একপ্রকার ভীষণ ক্ষতিকর পোকা জন্মায়;

একমুঠা ছারপোকা

তাহারা সর্ব্বপ্রকারে শস্য-উৎপাদনের পক্ষে বিঘ্ন-উৎপাদন করে। এই ছারপোকাগুলিকে যদি শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহাহইলে তাহারা ঐ ক্ষতিকর কীটগুলিকে খাইয়া ফেলে; অথচ শস্য-উৎপাদনের কোনরূপ প্রতিবন্ধক হয় না।

শুনা যায় না কি এই ছারপোকাগুলির আহারের জন্য বৎসরে পাঁচ হাজার বস্তা আলু নিঃশেষিত হইয়া যায়। আমরা এই বিষয়ে দু'খানি ছবি দিলাম।—

মজার বাড়ী

আমেরিকার এক বাড়ীর কনট্রাক্টার তাহার ব্যবসার বিজ্ঞাপন দিবার জন্য একটু কা-সাজি খাটাইয়াছে। সে বড়রাস্তার ধারে যেখানে লোকের চলাচল বেশী সেখানে একটী মজার বাড়ী তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে।

সম্মুখ হইতে এই বাড়ীখানিকে দেখিলে প্রথমে সাধারণ বাড়ী বলিয়া ভ্রম হয়। ফটক, কাঁকর-বিছান রাস্তা, ফুলগাছ, জানালা, দরজা প্রভৃতি সমস্তই আছে। কিন্তু যদি কেহ একবার ইহার পশ্চাৎদিক্ হইতে দেখে তাহা হইলে দেখিবে যে কেবল সামনের প্রাচীরই আছে তাহা ছাড়া আর-কিছুই নাই।

এইরূপ বাড়ীর দ্বারা সেই ব্যক্তি সাধারণকে বুঝাইতে চায় যে অপর কনট্রাক্টারকে দিয়া বাড়ী তৈয়ারী করিলে তাহারও ইহার মত বাহিরের সমস্ত উপকরণ থাকিবে বটে, কিন্তু ভিতর দিক্‌টা একদম ফাঁকা!

আমরা এই বিচিত্র বাড়ীখানার একখানা ছবি দিলাম। ছবিটীর একপার্শ্বে, সামনে হইতে বাড়ীটী কেমন দেখায় এবং অপর পার্শ্বে তাহা বস্তুতঃ কি তাহার চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মজার বাড়ী

শব্দহীন কাগজ

কাগজ ভাঁজ করিতে গেলেই কেমন একটা খস্ খস্ শব্দ হইয়া থাকে। ইহার উপর যদি কাগজ অত্যাধিক মোটা হয় তো তাহা হইতে ঐরূপ শব্দ খুব জোরেই বাহির হইয়া থাকে। ইহাতে সাধারণের বিশেষ কিছু অসুবিধা না হইলেও বেতারে মাইক্রোফোনের সম্মুখে যাঁহারা কাজ করেন তাঁহাদের যথেষ্ট অসুবিধা হইত।

শব্দহীন কাগজ

কিছুদিন হইল এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য এক শ্রেণীর শব্দহীন কাগজের আবিষ্কার হইয়াছে। এই কাগজগুলি যাঁহারা রেডিওতে বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন তাঁহারা ব্যবহার করেন।

আমরা ইহার একখানি ছবি দিলাম।

বিচিত্র বিশ্রামাগার

আমেরিকার মোটরে চলা রাস্তার ধারে ধারে বহুবিধ বিশ্রামাগার আছে। তাহাতে আরোহীরা পান, ভোজন ইত্যাদি সারিয়া পুনরায় গন্তব্যপথে যাত্রা করে। কিছুদিন হইল এরূপ শ্রেণীর বিশ্রামাগারের মালিকেরা স্ব স্ব দোকানখানির বাহিরের বৈচিত্র্য সম্পাদনে দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে নূতনত্ব-বিষয়ে বেশ একটা প্রতিযোগিতা চলিতেছে। আমরা একখানা ছবি দিলাম। এই ছবির মধ্যে পাঠক দেখিতে পাইবেন এক ব্যক্তি তাহার দোকানের বাহিরের দিক্‌টা কেমন একটী পেচকের আকৃতিতে তৈয়ারী করিয়াছে। এই দোকানটার মনোজ্ঞ বহিরাবরণের জন্য না কি ইহার অল্পবয়স্ক খরিদদারের সংখ্যা বেশী।

বিচিত্র বিশ্রামাগার

কথকচিত্রে জন্তু

কথকচিত্রে জীবজন্তুর ছবি তুলিবার জন্য যে কত পরিশ্রম করিতে হয় তাহা বোধ হয় সকলে অবগত নন। সম্প্রতি হলিউড হইতে Dr. Ditmars নামক এক বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠে আমরা এ বিষয়ে বহু তথ্য জানিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন যে কথকচিত্রে সাধারণতঃ যেসমস্ত জীবজন্তুর ডাক শুনিতে পাই তাহা সমস্তই যে নকল তাহা নহে। তাঁহাদের এইসমস্ত ছবি তুলিবার জন্য অনেকসময় দুর্ভেদ্য জঙ্গলে যাইতে হয় এবং ভয়াবহ জীবজন্তুদের সম্মুখে থাকিয়া ছবি তুলিতে হয়। একসময়ে তাঁহাদের এক জঙ্গলে গিয়া ভীষণ Fer-de lance নামক সর্পের কথক ছবি তুলিতে হয়। তাঁহারা ইহার দুই ফুট দূরে ক্যামেরা রাখিয়া ছবি তোলেন। ইহা যে কতদূর বিপজ্জনক তাহা সহজেই অনুমেয়।

কুকুরের চিত্রাভিনয়

আমরা এই বিষয়ে দুইখানি ছবি দিলাম। একটীতে জঙ্গলে কিরূপে সবাকচিত্র তোলা হয়, অপরটীয় ষ্টুডিওতে বসিয়া কিরূপে নকল শব্দাদি করিয়া তাহা সম্পন্ন হয় তাহা কুকুরের চিত্রাভিনয় দৃষ্টে দেখা যাইবে।

বন্যজন্তুর সবাকচিত্র গ্রহণ
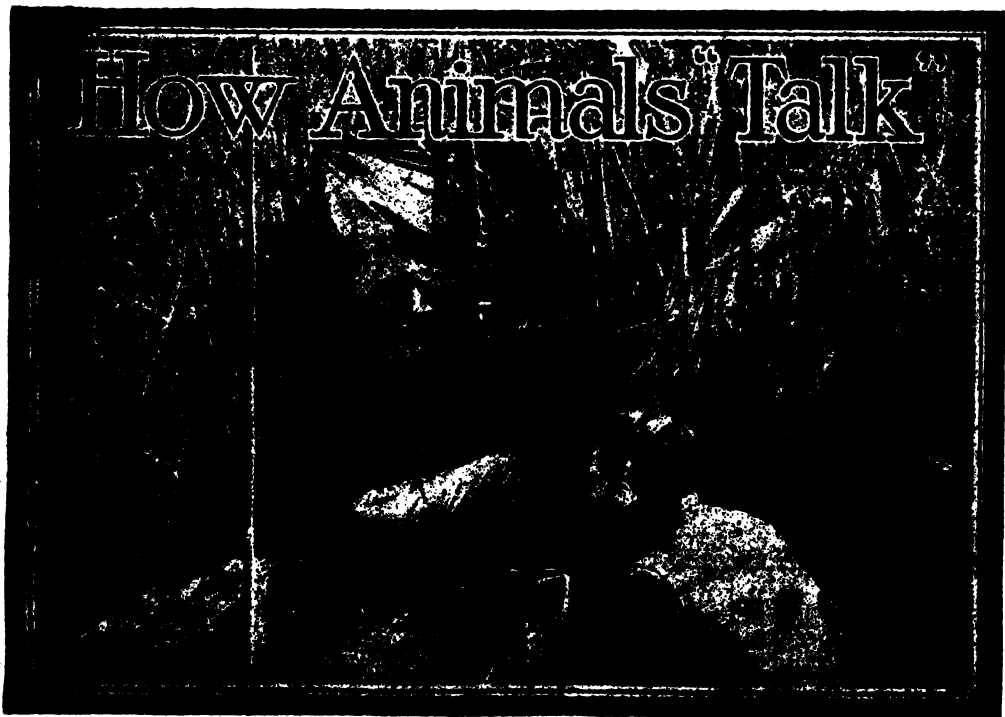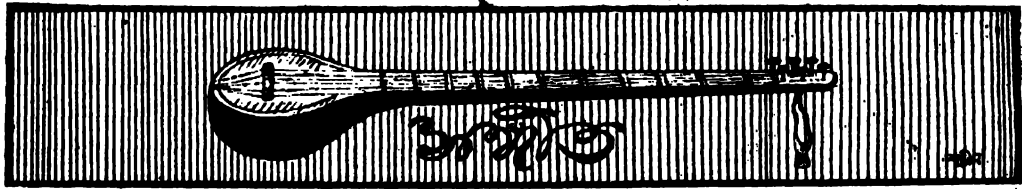
কথা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
(অন্ধগায়ক)

বারোয়া-মিশ্র--দাদ্‌রা

আমার ঘুমের নীরব কূলে!
কতই রূপের নিত্য নবীন,
স্বপন-ছায়া দোলে

বাদল-নটীর নূপুর বাজে,
আমার আঁখির পলক মাঝে.
মেঘের কাজল পরার চোখে,
রূপের ভুবন খোলে।

তোমার বাঁশীর মোহন সুরে
উজান তোলে হৃদয়পুরে,
তারি তালে ঢালে তোমার,
মধুর মিঠা বোলে ॥

  +   o   +   o   +   o

II প প প | দ প প | র জ্ঞ জ্ঞ | র স স I প প প | গ ম ম |

আ মা আর্ ঘু মে এর্ নী র অব কু লে এ ক ত অই রূ পে এর্

  +   o   +   o   +   o

প প ণ | ধ ণ ণ | ধ র্স র্স | ণ ধ ণ | ধ প প | প প প II

নি ই ত্য ন বী ঈন স্ব প অন ছা য়া আ দো লে এ এ এ এ

+ o + o + o
প র্´ র্´ | র্´ র্´ র্´ | র্´ র্´ র্´ | র্´ জ্ঞ´ জ্ঞ´ | র্´ জ্ঞ´ জ্ঞ´ | র্´ র্স´ র্স´
বা দ অল্ ন টী ঈর্ নু পূ উর্ বা জে এ আ মা আর্ আঁ খি ইর্

+ o + o + o
ন ন ন | র্স´ র্স´ র্স´ | স র র | ম ম ম | প ধ র্স´ | র্স´ র্স´ র্স´
প ল অক্ মা ঝে এ মে ঘে এর্ কা জ অল্ প রা আর্ চো খে এ

+ o + o
জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ | ম প প | স প প | প প প ||
রূ পে এর্ ভু ব অন্ খো লে এ এ এ এ

+ o + o + o
স ম ম | ম ম ম | ম প প | ম গ ম | প ধ ধ | ধ ধ ন
তো মা আর্ বাঁ শী ঈর্ মো হ অন্ সু রে এ উ জা আন্ তো লে এ

+ o + o + o
ধ র্´ র্স´ | ন ধ প | র্স´ র্স´ র্´ | র্´ র্´ র্´ | র্´ জ্ঞ´ জ্ঞ´ | র্´ র্স´ র্স´
হৃ দ অয় পু রে এ তা আ রি তা লে এ ঢা লে এ তো মা আর

+ o + o
গ ম ম | প ন ন | ন র্স´ র্স´ | র্স´ র্স´ র্স´ ||
ম ধু উর্ মি ঠা আ বো লে এ এ এ এ

কবির পরিণয়—

বঙ্গ সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি শ্রীমতী রাধারাণী দত্তের সহিত সুকবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের শুভ-পরিণয় হইয়া গিয়াছে। উভয়েই বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে খ্যাত এবং উভয়েরই সৎসাহস প্রশংসার যোগ্য। শ্রীমতী রাধারাণী বাল-বিধবা, এতদিনে পত্যন্তর গ্রহণ করিলেন, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব এতদিন অবিবাহিতই ছিলেন। দম্পতীর যাহা কিছু কাম্য, তাহা লাভ করিয়া তাহাদের গৃহ শান্তি, আনন্দ ও মাধুর্য্যের আগার হউক ভগবানের কাছে ইহাই প্রার্থনা করি।

* * *

অফিসের কর্ত্তাদের অবিচার—

সরকারী এবং সওদাগরী সকল অফিসেরই নানাদিক্ হইতে আয় কমিয়াছে বলিয়া অফিসের কর্ত্তারা লোক ছাড়াইয়া বা কর্ম্মচারীদের বেতন কমাইয়া দিতেছেন। অথচ যাঁহারা মোটা বেতন পাইতেছেন,সঞ্চিত অর্থ যাহাদের আছে, গ্রাসাচ্ছাদনের প্রাচুর্য্য যাদের তাঁদের বেতন, মোটরকার এলাওয়্যান্স, হিল এলাওয়্যান্স, হাউস এলাওয়্যান্স প্রভৃতি কোনটারই বাতিল হইতেছে না—তেমন কমিতেছে না। অল্প বেতনের কর্ম্মচারী যাহাদের জন্য অফিস বজায় আছে, যাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চিত নাই, যাহারা নিতান্তই অসহায় তাহাদেরই মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া অফিসকে টিকাইয়া রাখিবার চেষ্টা চারিদিকে। সমস্ত দেশের প্রতিবাদ এই অসঙ্গত ব্যাপারের বিরুদ্ধে জাগ্রত হউক।

* * *

নারীমুক্তি-সম্পর্কে—

বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠের 'নবশক্তি'তে জামসেদপুর হইতে এ, কে, চক্রবর্ত্তীর নারীমুক্তি-সম্পর্কিত যে লেখাটী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে অনুধাবনযোগ্য বলিয়া নিম্নলিখিত অংশটী উদ্ধৃত করিলাম :—

জন্মগত পার্থক্যকে অগ্রাহ্য করে' এবং সৃষ্টির গূঢ়তম রহস্যকে অবজ্ঞা করে সমাজকে বিকলাঙ্গ করবার অধিকার নারী বা পুরুষ কাহারও নাই কিন্তু তাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করবার অধিকার বা ন্যায়গত দাবী স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে করতে পারে।

* * *

অভিজ্ঞতা চ'ক্ষে অঙ্গুলি দিয়া প্রতিদিন এই দিক্‌টায়ই আকর্ষণ করতে চায় যে আধুনিক অবাধ স্বাধীনতা স্বাধীনতার নামান্তর মাত্র, যথেচ্ছচারই ইহার লক্ষ্য বস্তু এবং পরিণাম অত্যন্ত অশুভ। নারী নিজকে গড়ুন—নিজকে গঠিত করতে হ'লে মাতৃত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কচি কচি প্রাণগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য শক্ত করে, তুলতে হ'বে এবং প্রয়োজনানুসারে শিক্ষাপ্রণালীর আংশিক পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হ'বে—শিক্ষার মধ্যে একটি লক্ষ্যকে স্থির রাখতে হ'বে যে পুত্রকন্যা যেন ধর্ম্মকে ভিত্তি করে' সংযমের সঙ্গে বয়োবৃদ্ধির ধাপগুলা পার হ'তে পারে—বয়োবৃদ্ধ

চাই যেন প্রত্যেক মেয়েই ঘরোয়া কাজকর্ম্ম সমুদয় সুচারুরূপে শিক্ষা করে—যাকে আধুনিক শিক্ষায় শিথিল করে' তুলেছে। প্রয়োজন হইলে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করতে পারে।

* * *

উপাধি প্রাপ্তিতে—

শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ, শ্রীযুক্ত আবদুল্লা সুরাবর্দ্দি ও বাঙ্গলার এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়েরা এবার ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'স্যর' উপাধি লাভ করিয়াছেন। যোগ্যলোকদিগকে সম্মানিত হইতে দেখিলে আমরা আনন্দিত হই। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ সম্বন্ধে বহুবার আমরা আমাদের পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি, ডাঃ আবদুল্লা সুরাবর্দ্দি একজন মনীষাসম্পন্ন বরেণ্য পণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক। নৃপেন্দ্রনাথের প্রতিভা আইনজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। ইঁহাদের প্রত্যেককেই আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ইঁহারা দীর্ঘায়ু হইয়া দেশের ও দশের কল্যাণকর বহু কার্য্য করুন—প্রথম দুইজন যেমন গবেষণা করিয়া আপনাদের যশ অর্জ্জন করিয়াছেন ও ভারতবর্ষের মধ্যেই তাঁহাদের মনীষা আবদ্ধ নয়, সেইরূপ সরকার মহাশয়ও সমাজের কল্যাণকল্পে অগ্রণী হইয়া সৎসাহসের পরিচয় দিতে থাকুন ইহাই আমরা অন্তরের সহিত কামনা করিতেছি।

* * *

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতের স্থান—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রদের ইচ্ছাধীন করিবেন বলিয়া শুনা গিয়াছিল—কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনেই হয় নাই। হিন্দু 'কালচারে'র যাহারা স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ প্রস্তাব কিরূপে গ্রহণ করিবেন তাহা ভাবিয়াই উঠিতে পারা যায় না। হিন্দুর হিন্দুত্ব বুঝিতে হইলে—হিন্দুর 'কালচারে'র ধারা বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বিদেশীয় মনীষীরা যার যা ইচ্ছা বলিয়া যাইতেছেন, তাহাদের ভুল-ভ্রান্তি ধরিতে হইলে সংস্কৃত ভাষা ও প্রাদেশিক ভাষাগুলির সাহায্যে ধরিয়া দিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পথ যদি কোনরূপে রুদ্ধ হয় তাহাহইলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সংস্কৃত ভাষাকে 'ইচ্ছাধীন' করিলে কোন ছাত্রই ইহা গ্রহণ করিবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য কোন কোন সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ মনীষীরা বলিতেছেন, প্রবেশিকা পরীক্ষার পরও এ ভাষা অনায়াসে অল্পদিনের ভিতর শিক্ষালাভ করিতে পারা যায়; কিন্তু একেই এ ভাষা অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা আয়ত্ত করা কঠিন এবং শিক্ষা করিতে বহু সময়সাপেক্ষ, এ ক্ষেত্রে প্রথম হইতেই যদি ছাত্রদের মনে এভাষা-প্রীতি না জাগাইয়া দিতে পারা যায় তাহাহইলে এ ভাষার ভবিষ্যৎ যে কি হইবে তাহা আর কাহাকেও কি বলিয়া দিতে হইবে? বাঙ্গালা ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা। বাঙ্গালার সম্পদ বৰ্দ্ধিত করিতে হইলে, ভাষাকে শ্রী ও লাবণ্যময়ী করিতে হইলে, সংস্কৃতের দ্বারস্থ হইতেই হইবে। সে দিক্ হইতেও এ ভাষার শিক্ষার প্রয়োজন আছে। যাহা হউক বাঙ্গালা দেশের রাজধানীতে যে বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত, যাহার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতাদের অধিকাংশ বাঙ্গালার লোক, তাঁহারা এরূপ প্রস্তাব আগেই তুলিতে পারেন একথা সজ্ঞানে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম এইরূপ একটা প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘ্রই উঠিবে। যাহাতে এমন অসম্ভব প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে না পারে তাহার জন্য বাঙ্গালার সমস্ত শিক্ষিতলোক বদ্ধপরিকর হউন।

* * *

ভীষণ দুর্ভিক্ষ—

দেশের চারিদিক্ হইতে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। বাঙ্গালার অতি দুঃসময়। আর্থিক সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক সকল রকম দুর্দ্দশাই বাঙ্গালাকে গ্রাস করিয়াছে, তাহার উপর করাল দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া যদি লক্ষ লক্ষ নর-নারীর প্রাণ যায় তো দাঁড়াই কোথায়; ইহার উপায়ই বা কি?"

লোকান্তরে—

বিগত ২০এ জ্যৈষ্ঠ পণ্ডিতবর লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহাশয় পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কুশাগ্রবুদ্ধি পণ্ডিত বড় কমই দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে যেমন তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, প্রাণটা ছিলও তাঁহার তেমনিই উদার; তাঁহার মত ত্যাগী পুরুষ আজ কাল বড় বিরল। অসহযোগ-আন্দোলনের সময় তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন, তৎপরে সর্দ্দা-আইন পাশ হইবার পর তিনি 'মহা-মহোপাধ্যায়' উপাধি পরিত্যাগ করেন। গত বৎসর জালগাঁওয়ে যে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন হয় তাহার প্রচার-কার্য্যে তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া উহাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এই পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যায়। কোনরূপ চিকিৎসায় সুফল না পাইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বদিনই তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কাশীধামে যাত্রা করেন এবং সেখানে পৌঁছিয়াই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভক্তিশাস্ত্রে পণ্ডিতজী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিবার সুযোগ ও সুবিধা যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, তাঁহার বক্তৃতা অভক্তের মনেও ভক্তির বীজ উপ্ত করিয়া দিত—নয়নে প্রেমাশ্রু বিগলিত করাইয়া দিত। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এরূপ তেজস্বী, নির্ভীক, কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রকৃত ব্রাহ্মণকে হারাইয়া ভারতবর্ষ আজ শোকে মুহ্যমান।

* * *

সুপ্রসিদ্ধ যশোহর-খুলনার ইতিহাস প্রণেতা মনস্বী ঐতিহাসিক অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ দৌলতপুরে উদরী রোগে মারা গিয়াছেন। তিনি ছিলেন বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম সেবক। দেশের প্রকৃত ইতিহাস সংকলনের জন্য যাঁহারা ব্রতী ছিলেন তাঁহাদেরও মধ্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও দেশপ্রীতি তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা প্রবল ছিল। ষড়গোস্বামীর জীবনচরিত সাধারণে প্রকাশ করিয়া তিনি বাঙ্গালীর নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

* * *

২৭এ জ্যৈষ্ঠ এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফতে জানা গেল যে প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের ধুরন্ধর পণ্ডিত, বৈষ্ণব শাস্ত্রের মহারথী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয় তাঁহার স্বদেশ ধামগড়—নারায়ণগঞ্জে মারা গিয়াছেন। তাঁহার বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রীতির ফলে বাঙ্গালা সাহিত্য অমূল্য শ্রীশ্রী পদকল্পতরু পাইয়া ধন্য হইয়াছে। প্রাচীন পদকর্ত্তাদের পদসংগ্রহ ও তাঁহাদের বিশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি আজীবন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। আমরা যখন "পঞ্চপুষ্পের" সম্পাদন ভার গ্রহণ করি তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি যেসকল মূল্যবান্ প্রবন্ধ দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এই প্রাচীন সাহিত্যিকের মৃত্যুতে বাঙ্গালা ভাষা যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা অবর্ণনীয়।

* * *

সেদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম আমাদের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্বয় সুবেদার মেজর শৈলেন্দ্রনাথ বসু হঠাৎ হৃদ্‌রোগে মারা গিয়াছেন। যখন ১৮৯৫ সালে শৈলেন্দ্রনাথ হেয়ার স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হন তখন হইতে তিনি আমাদের সতীর্থ হন। তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মাতুলালয় সাঁতরাগাছি গ্রামে তাঁহার সহিত আমরা প্রথম পরিচিত হই। স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য বরাবরই ছিল—খেলাধূলা প্রীতি তাঁহার অত্যন্ত বেশী ছিল। বাঙ্গলাদেশের খেলা-ধূলায় ইতিহাস যদি কোনদিন লিখিত হয় তবে তাহার ভিতর শৈলেন্দ্রনাথের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা কতদূর ছিল তাহা বাঙ্গালী জানিতে পারিবে। তাঁহার ন্যায় সজ্জন, হৃদয়বান পুরুষ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী পল্টনের নেতা স্বরূপে যেরূপ কঠোরভাবে বাঙ্গালী যুবকদিগকে শিক্ষা দিতে ও বাঙ্গালার মুখ যাহাতে উজ্জ্বল করিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে নিয়মানুবর্ত্তী করিবার সদুদ্দেশ্যে শৈলেন্দ্রনাথ সৈনিকদের এমন কঠিন পরিশ্রমের কার্য্য দিতেন

যাহাতে তাহাদের নিকট তিনি অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন ; ফলে সাংঘাতিক ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হন। ফুটবল, হকি, টেনিস, সন্তরণ, ক্রিকেট সকল রকম খেলাতেই তিনি সিদ্ধ ছিলেন। বাঙ্গালার ছেলেরা খেলার মাঠে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিলে কখন ইংরাজীদিগের নিকট যথাযোগ্য সম্মান পাইবে না একথা তাঁহার মুখে লাগিয়াছিল, মানুষ হইতে হইলে দেহকে সবল রাখিতে হইবে একথা বুঝিতেন বলিয়া তিনি চিরদিনই তাঁহার দেহকে সবল রাখিয়াছিলেন। পরিশ্রম করিতে কোনদিন কেহ তাঁহাকে কুণ্ঠিত হইতে দেখে নাই। যৌবন হইতেই তাহার মাংসপেশী সকল যেমন দৃঢ় ছিল, আবার শ্লথ করিলে তাহারা তেমন কমনীয় হইয়া পড়িত। এখানে তাঁহার সাহসের একটু পরিচয় দিব। বহুকাল পূর্ব্বে সেণ্ট জোসেফ ও মোহনবাগানের মধ্যে ট্রেডস্ কাপের ফুটবল খেলা হইতেছিল। খেলার শেষে উভয় দলের মধ্যে বচসা হইয়া ঝগড়া হয়, পরে মারামারি চলিতে থাকে। বাঙ্গালীর মধ্যে যখন প্রায় সকলেই পলাইয়াছে তখনও মোহনবাগানের সেকালের ব্যাক শচীনবাবু (এক্ষণে ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ও শৈলেন্দ্রনাথ নির্ভীকতার সহিত বিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের সহিত ঘুষাঘুষি চালাইয়া রক্তাক্ত দেহে বিজয়ী বীরের মত দাঁড়াইয়া ছিলেন।

আমি আজ তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কথা, যে কথা তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিন্ন বড় একটা কেহ জানেন না, তাহারই একটু পরিচয় দিব। আশৈশব শৈলেন্দ্রনাথ কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু সে সকল কবিতা আজ পর্য্যন্ত সাধারণ-লোক-লোচনের গোচরীভূত হয় নাই। ভাবের স্বচ্ছতা সরলতার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে গম্ভীরবেদী শৈলেন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া রসের কল্প কি সুন্দরভাবেই প্রবাহিত হইত। রস-রচনায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে শৈলেন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

পদব্রজে ভ্রমণ করিতে শৈলেন্দ্রনাথের উৎসাহের সীমা ছিল না। পদব্রজে যেমন ভ্রমণ করিতে তিনি পারিতেন, ততোধিক পারিতেন দ্রষ্টব্যস্থানের বর্ণনা করিতে। জীবনে জগতের দ্রষ্টব্য যা কিছু দেখিতেন তাহাই লিখিয়া রাখিতেন। মুদ্রিত করিবার জন্য কতবার অনুরোধ করিয়াছি,—কিন্তু কিছুতেই রাজী করিতে পারি নাই, প্রতিবারেই বিনয়ের সহিত বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা দেখি, ভাল করে' নকল করে দেব—বন্ধুপ্রীতির জন্য ওটা ভাল লাগ্ছে, আসলে আমি বুঝতে পার্ছি কিছুই হয় নি ইত্যাদি ইত্যাদি।" এই ভ্রমণকাহিনী গুলিতে স্বাভাবিক দৃশ্যের যেমন সহজ সরল ভাষায় বিবৃতি ছিল, তেমনই দৃষ্টচরিত্রের সুন্দর বিশ্লেষণ ছিল। ভ্রমণ-কাহিনী পড়িতে পড়িতে মনে হইত বায়স্কোপের একটা সুন্দর দৃশ্যের পর অপর একটা চিত্তবিনোদন দৃশ্য দেখিতেছি। এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫২ বৎসর মাত্র।

এই দুঃসহ বেদনায় শৈলেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ অশোককে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব তাহা ভাষায় খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাঁহার পিতার স্মৃতি বাঙ্গলাদেশের খেলোয়াড়রা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিবেন জানি, কিন্তু আমার বিবেচনায় যদি তাঁহার হস্তলিখিত কবিতা ও প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত করিয়া সাধারণে প্রকাশ করা হয়, তাহাহইলে তাঁহার স্মৃতি স্থায়িভাবে রক্ষিত হইবে।

* * *

ভ্রম-সংশোধন—

গত বৈশাখের পত্রে ১৪৮ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভের ১৮ ছত্রে ছাপাখানার ভুলে লিখিত হইয়াছে—"মহাত্মার কোন কার্য্যে অহিংসার পরিচয়ের লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।" এরূপ অশ্রদ্ধেয় কথা বাহির হইবার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ; অবশ্য 'অহিংসার' স্থলে যে 'হিংসার' হইবে তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সমগ্র স্থানের ভাব উহাই বুঝাইয়া দেয়।

প্রতিভার খেয়াল

প্রতিভাবান ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেরই এমন সব উৎকট খেয়াল থাকে যে, সে সব কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। গীতিনাট্য-লেখক ক্রেগ বলেন, "আগে আমি দিনকতক ধরে আমার মাথাটিকে তাতিয়ে নি। তারপর আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা চলে যায়, চোখ জ্বলতে থাকে এবং কল্পনা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তারপর আমি সপ্তাহ-তিনেকের মধ্যেই একখানা গীতি-নাট্য লিখে ফেলি!" বিখ্যাত লেখক এডগার অ্যালেন পো ব্রাণ্ডি না খাইলে লিখিতে পারিতেন না।

লিখিবার সময় ভলটেয়ারের দরকার হইত কাফি। ঔপন্যাসিক ডি কুইন্স আফিম খাইয়া তবে লিখিতে বসিতেন। নাট্যকার শিলার বরফের ভিতর পা রাখিয়া, পচা আপেলের দুর্গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ করিয়া, তবে রচনা-কার্য্যে মনোযোগ দিতে পারিতেন! মিলটন রচনা-কালে বালিস ও লেপের ভিতরে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতেন। রুসো মাথার উপরে রোদের তাপ লইয়া এবং কবি শেলি আগুনের খুব কাছে মাথা রাখিয়া লিখিতে বসিতেন। কবি সুইনবার্ণ গৃহতলে শুইয়া কবিতা লিখিতেন। ভিক্টর হুগো উঁচু টেবিলের সামনে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রচনা করিতেন। হার্ব্বাট স্পেন্সার রচনা কার্য্যের মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া একটা না একটা ব্যায়াম করিয়া আসিতেন।

সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্স ঘরের মেঝেতে এক টুকরা কাগজ পড়িয়া থাকিলে বা যে স্থানে যে বই থাকে সে স্থানে সে বই না থাকিলে লিখিতে পারিতেন না। সাদের লিখিবার সময় তাঁর চার পাশে বইগুলি ছড়ানো না থাকিলে তিনি মোটেই লিখিতে পারিতেন না। কবিবর ষ্টারন্ সুন্দর পোষাকের উপর একটী সুন্দর সলোম পশুচর্ম্মের টুপী না পরিয়া, আরাম কেদারায় না বসিয়া লিখিতে পারিতেন না। শেরিডান ও সিলার মদের বোতল সুমুখে না পাইলে লিখিতে পারিতেন না। লর্ড লিটনএর তলোয়ারশুদ্ধ দরবারী পোষাক না পরিলে লেখা আসিত না।

—সময় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮)

কৃষি-সংবাদ

সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষের চাষী-জমির শতকরা ১০ ভাগে গমের এবং ৩৫ ভাগে ধানের চাষ হয়।

*   *   *

বঙ্গদেশের সমুদায় চাষী-জমির শতকরা ৭০ ভাগে, আসামের ৮০ ভাগে এবং ব্রহ্মদেশের ৭৪ ভাগে ধানের চাষ হয়।

*   *   *

বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত সমিতির প্রকাশিত হিসাব অনুসারে, বাঙ্গালার সমগ্র কৃষককুলের নগদ দেনার পরিমাণ ৯৩ কোটি টাকা। ইহার সহিত ধান্যাদি বস্তু-বিনিময়ের ঋণ যোগ করিলে বাঙ্গালার কৃষকদের মোট ঋণ ১০০ কোটি টাকার কম হইবে না।

সমগ্র ভারতবর্ষে, ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে, আনুমানিক ৭২,৪০,০০০ একর (এক একর কিঞ্চিদধিক তিন বিঘার) জমিতে চীনাবাদামের চাষ করা হইয়াছে। ১৯২৯-৩০ খৃঃ অব্দে চীনাবাদাম-চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৫৭,৪৮,০০০ একর। সুতরাং গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর শতকরা নয়ভাগ অধিক জমিতে চীনাবাদামের চাষ করা হইয়াছে। সমগ্র ভারতের চীনাবাদাম-চাষের জমির শতকরা ৫৭,৭ ভাগ মান্দ্রাজে, ১৭,৭ ভাগ বোম্বাই-প্রদেশে, ১০,৭ ভাগ ব্রহ্মদেশে, ৬,২ ভাগ হায়দ্রবাদে এবং অবশিষ্ট ৭,৭ ভাগ অন্যান্য প্রদেশে রহিয়াছে। বাঙ্গলাদেশে চীনাবাদামের চাষ খুব কমই হয়। কিন্তু বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানের মৃত্তিকাই চীনাবাদাম-চাষের পক্ষে অনুপযোগী নহে।

* * *

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে যত জমিতে কার্পাসের চাষ করা হয়, তাহার শতকরা প্রায় ২৯ ভাগ বোম্বাই-প্রদেশে, ...গ মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে, ১৩ ভাগ হায়দ্রাবাদে, ..০ ভাগ পাঞ্জাব প্রদেশে এবং প্রায় ৩০ ভাগ অন্যান্য প্রদেশে অবস্থিত।

* * *

সমগ্র পৃথিবীতে ৩০—৩২ কোটি একর জমিতে গমের চাষ করা হয়। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনুমানিক ৪৫০ কোটি 'বুশেল' (এক বুশেল প্রায় ৭।০ সের) অর্থাৎ প্রায় ... কোটি মণ। সমগ্র ইউরোপে পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক ... কিন্তু একক দেশ হিসাবে, গমের চাষী-...র পরিমাণ রুশিয়ায়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৎপর ...যুক্তরাষ্ট্রের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার ...ব্রিটিশ ভারতবর্ষ এবং ক্যানাডার স্থান। গমের ...র পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রেই ...পেক্ষা অধিক অর্থাৎ হেক্টার (২,৪৭১১ একর) প্রতি ...তে ১০ কুইণ্টাল (এক কুইণ্টালে ৩,৬৭৪৩ বুশেল); রুশিয়ার ৭।৮ কুইণ্টাল। ক্যানাডায় গমের ফলন ...স্থায় গমের ফলন অপেক্ষা কিছু কম হইলেও, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ক্যানাডায়-ই গমের ফলন অধিকহয়। গমউৎপাদনে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থানাধিকার করিয়াছে।

...মগ্র পৃথিবীতে যে পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ করা হয়, তাহার শতকরা কিঞ্চিদধিক ৮০ ভাগ জমি একমাত্র এসিয়া-মহাদেশেই অবস্থিত। এসিয়ার মোট উৎপন্ন ধান্যের শতকরা ৬০ ভাগ একমাত্র ভারতবর্ষেই জন্মে। ...র্ষের উৎপন্ন-ধান্যের শতকরা ২০ ভাগ পরিমিত জাপানে উৎপন্ন হয়। সমগ্র পৃথিবীর ধান্য-চাষের ...মির অর্দ্ধাংশেরও অধিক ভারতবর্ষে অবস্থিত; এবং পৃথিবী... উৎপন্ন ধান্যের অর্দ্ধাংশ অপেক্ষাও অনেক ...ক ধা... ...বর্ষে জন্মে।

* * * * *

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, লর্ড রিপণ যখন ভারতের বড়লাট ছিলেন, তৎকালে তাঁহার চেষ্টায় 'লোকাল সেলফ্ গভর্ণমেণ্ট' (Local Self Government) বা স্থানীয় আত্মশাসন অর্থাৎ জেলায় জেলায় মিউনিসিপ্যালিটী, লোকাল বোর্ড এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ১৮৮৩-৮৫ সালের মধ্যে এগুলি যে ভাবে গঠিত হইয়াছিল, এখনও অনেকটা সেই নীতিতেই এগুলি চলিতেছে।

সরকারী বিবরণ মতে, ১৯২৮-২৯ সনে, বাঙ্গালার ২৬টি জেলা-বোর্ডের মোট ১৫৬০০০০০৲ অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক দেড় কোটি টাকা আয় হইয়াছিল। এই মোট আয় এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত-সাহায্য কিঞ্চিদধিক ৩ লক্ষ টাকা হইতে জেলা বোর্ডগুলি শিক্ষার জন্য ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ডাক্তারখানা ইত্যাদির জন্য প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা এবং রাস্তাঘাট, জলসরবরাহ প্রভৃতির জন্য প্রায় ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বাঙ্গালার জেলা-বোর্ড সকলের অন্তর্গত অধিবাসীর সংখ্যা ৪ কোটীর অধিক। জেলা-বোর্ডের ব্যয়-সঙ্কলনের জন্য ৪৩ লক্ষাধিক লোক হইতে চাঁদা আদায় করা হয়। ইহার শতকরা ৮০ জনের অধিক কৃষক। এ কারণে জেলা-বোর্ডের অর্থ বলিতে, প্রধানতঃ কৃষকদেরই অর্থ বুঝায়। বাঙ্গালার কৃষকদের অর্থেই বাঙ্গালার ২৬টি জেলা বোর্ডের ব্যয়-নির্ব্বাহ হইতেছে বলিলেও, বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, গভর্ণমেণ্ট জেলা-বোর্ড সকলকে যে সাহায্য প্রদান করেন, তাহারও অধিকাংশই বাঙ্গালার কৃষকদের অর্থ। কৃষকেরা অর্থ দেয়, আর সেই অর্থ ব্যয় করেন বাঙ্গালার উকিল, মোক্তার, জমিদার প্রভৃতি (ইঁহারাই প্রধানতঃ ডিঃ বোর্ডের সভ্য)—যাঁহারা সহরে বাস করেন এবং কৃষকদের সহিত কোনরূপেই সংশ্লিষ্ট নহেন। ফলে, জেলা-বোর্ড সকল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে, বিগত প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেও, বাঙ্গালার কোনও জেলা-বোর্ড-ই স্থানীয় কৃষকদের কৃষির উন্নতিসাধনোদ্দেশ্যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিয়াছেন বলিয়াও শুনা যায় না! ইহা আমাদের দেশের শিক্ষিত-(?)সম্প্রদায়ের কৃষি-অপ্রীতির এবং চাষ-বাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতারই সম্যক্ পরিচায়ক। কৃষির উন্নতির উপরেই যে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং দেশবাসীর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে, ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলে, জেলা-বোর্ডের সভ্যেরা স্বাস্থ্য-পরিদর্শক নিযুক্ত না করিয়া, সর্ব্বাগ্রে কৃষি-পরিদর্শক-ই নিযুক্ত করিতেন। আমাদের বাঁচিবার উপায় পথে নয়, পথে যে মানুষ চলিবে, তাহাদের নিজেদের মধ্যে। সুতরাং পথের জন্য বহু অর্থব্যয় না করিয়া, পথে যে মানুষ চলিবে, তাহাদের অর্থাৎ কৃষকদের উন্নতি সাধনের জন্যই সর্ব্বাগ্রে জেলা-বোর্ডের অর্থব্যয় করা কর্ত্তব্য।

—কৃষি-সম্পদ (বৈশাখ, ১৩৩৮)

...by Saurindra Kumar Ghosh at the Bishwbhandar Press, 216, Cornwallis Street, Calcutta and Published ...the same from the Panchapu... Office, 21 Telipara Lane, Calcutta.
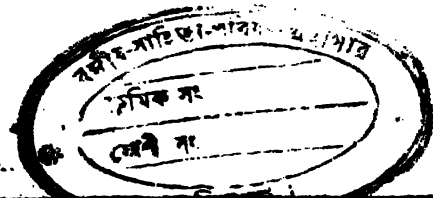
৪র্থ বর্ষ প্রথমার্দ্ধ | আষাঢ়, ১৩৩৮ | তৃতীয় সংখ্যা

শকুন্তলা

২

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বৈশাখের 'পঞ্চপুষ্পে' মৃগয়াবিহারী দুষ্যন্তের অনুসরণ করিয়া আমরা হিমালয়ের পাদমূলে মালিনীতীরস্থ, শকুন্তলার পালকপিতা কুলপতি কণ্বের শান্ত আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলাম এবং দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পরস্পর প্রথম সন্দর্শনে উভয়েরই চিত্তে কিরূপ ভাববিকার উপস্থিত হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। শকুন্তলা (আত্মগতম্)—কিং ণু ক্খু ইমং পেক্খিয় তবোবণ বিরোহি ণো বিআরস্স গমনীঅম্‌হি সংবুত্তা? (কেন ইহাকে দেখিয়া তপোবন-বিরোধী বিকারের পাত্রী হইলাম?) রাজা তৎপূর্ব্বেই শকুন্তলার অলোকসামান্য রূপ দেখিয়া, তাহার—

অধরঃ কিশলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।—

কিশলয়-শোণিমা অধরে
বাহু বিটপের অনুকারী।
কুসুমের মত লোভনীয়
সর্ব্ব-অঙ্গে যৌবন বিথারী।

—দৃষ্টি করিয়া প্রলুব্ধ হইয়াছেন (যদ্ আর্য্যম্ অস্যাম্ অভিলাষি মে মনঃ)।

উভয়ের এই ভাব দর্শন করিয়া শকুন্তলার সখীদ্বয় চুপি চুপি বলিলেন—ওলো! আজ যদি তাত কণ্ব এখানে থাকিতেন, তবে এই বিশিষ্ট অতিথিটাকে নিজের জীবনসর্ব্বস্ব উপহার দিয়া কৃতার্থ করিতেন!

কথায় কথায় রাজা শকুন্তলার পরিচয় জানিয়া লইলেন এবং তিনি যে ঋষিকন্যা নহেন, অপ্সরা-সম্ভবা, আর চিরকুমারী থাকিবেন না, অনুরূপ বরে প্রদত্তা হইবেন—ইহা শুনিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন (ন খলু দুরাপেয়ং প্রার্থনা)। আমরা দেখিয়াছিলাম আলাপ বেশ ঘনাইয়া আসিতেছিল এবং রাজার 'কোর্টশিপ' ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল, এমন সময়—

মূর্ত্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথঃ
ধর্ম্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ।
স্যন্দনের শব্দে ভীত, তপস্যার মূর্ত্ত বিঘ্নসম,
আলোড়িয়া মৃগযূথ, বন্যহস্তী প্রবে... ...ম।

চকিত হইয়া শকুন্তলা সখীদিগের সহিত কুটীরে ফিরিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু যাইবার কালে কুশাঙ্কুরে যেন তাঁহার চরণ বিদ্ধ হইল এবং কুরুবকশাখায় তাঁহার বল্কল বিলগ্ন হইল—এই ছলে রাজার দিকে ফিরিয়া একটু বিলম্ব করিলেন। আর রাজা? তিনিও শিবিরে ফিরিতে বাধ্য হইলেন বটে—কিন্তু তাঁহার—

দেহ চলে পুরোভাগে
পরবশ মন পাছু ধায়
চিনাংশুক কেতু-শিরে
প্রতিকূল পবন উড়ায়।

রাজা শিবিরে ফিরিলেন বটে—কিন্তু তাঁহার মন বন্দী রহিল শকুন্তলার নিকট। শকুন্তলাই তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান হইল। বিদায়ের শেষ দৃশ্য তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে ভাসিতে লাগিল—

দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে
তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী
শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্॥

'কুশাঙ্কুর বিঁধিল চরণে'
কতিপয় পদ গিয়া—করি এই ছল,
ফিরি বালা চাহে মোর পানে
ছাড়াইতে বৃক্ষশাখে অ-লগ্ন বল্কল।

আবার ভাবিতে লাগিলেন—'না, এ আমার ভ্রম! আমি বাসনার দ্বারা বিড়ম্বিত হইতেছি।

স্নিগ্ধং বীক্ষিতম্ অন্যতোঽপি নয়নে
যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি সা সাসূয়মুক্তা সখী
সর্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো
কামো স্বতাং পশ্যতি

নয়ন অন্যত্র ক্ষেপি
মুগ্ধ তার দৃষ্টিপাত হায়!
গুরু নিতম্বের ভরে
মন্দগতি বিভ্রমের প্রায়,
'যেও না' কহিলে সখী,
যেন কোপে উত্তর প্রদান—
'সকলেরি আমি লক্ষ্য'
এই মত বিড়ম্বিছে কাম।

মৃগয়ায় এত উৎসাহ ছিল কিন্তু রাজা আজ তাহাতে মন্দোৎসাহ হইলেন। সেনাপতি আসিয়া মৃগয়ার কত গুণকীর্তন করিলেন, কত উৎসাহ দিলেন—

মেদচ্ছেদকৃশোদরং লঘুভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ
সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।

মেদক্ষয়ে কৃশোদর
হয় বপুঃ দৃঢ়তর
লঘু আর উদ্যোগ-তৎপর
ভয় কিংবা ক্রোধবশে
বিকারিত অনায়াসে
প্রাণিচিত্ত (মৃগয়ায়) হয় সে গোচর—

কিন্তু কিছুতেই রাজার নির্ব্বাপিত উৎসাহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইল না। তিনি আদেশ করিলেন—মৃগয়া স্থগিত থাকুক।

গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং
শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতং
ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্যতু।
বিশ্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ
পল্বলে
বিশ্রামং লভতামিদঞ্চ শিথিল-
জ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ॥

গাহন করুক আজি মহিষের দল
জলাশয়ে মুহু মুহু শৃঙ্গ আস্ফালিয়া,
বৃক্ষচ্ছায়ে মৃগকুল শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে
রোমন্থন করুক অভ্যাস, তৃণমূল
পল্বল হইতে নির্ভয়ে বরাহ-যূথ
করুক খনন, আর মোর শিথিলিত
ধনুঃ, জ্যাবন্ধ খসায়ে লভুক বিশ্রাম।

শিবিরে রাজার প্রিয় বয়স্য বিদূষক উপস্থিত ছিলেন। মৃগয়ার প্রতি তাঁহার বিষম বিদ্বেষ। পেটুক ব্রাহ্মণ—ক্ষুধার সময় পর্য্যাপ্ত আহার মিলে না—তৃষ্ণার সময় পার্ব্বত্য নদীর কটুজল পান করিতে হয়। তার উপর বরাহ, বৃক প্রভৃতি বন্য জন্তুর পিছু পিছু দৌড়ান। মাধব্যের কোমল

খাতে এত সহিবে কেন ? রাজা মৃগয়া বারণ করাতে মাধব্য মহা খুশী। তিনি ভাবিলেন তাঁহার অনুরোধেই এই অঘটন ঘটিল। প্রকৃত কারণ কিন্তু রাজার মুখে আমরা শুনিতে পাই :—

ন নময়িতুম্ অধিজ্যমস্মি শক্তো ধনুরিদমাহিতসায়কং মৃগেষু।
সহবসতিমুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ কৃত ইব মুগ্ধ-বিলোকনোপদেশঃ ॥

গুণযুক্ত সংযোজিত শর, ধনু আর আকর্ষিতে নারি মৃগগণে
সঙ্গবাস বিনিময়ে যারা, শিখায়েছে প্রেয়সীরে মুগ্ধ বিলোকনে।

মাধব্যকে নির্জ্জনে পাইয়া রাজা শকুন্তলার কথা জুড়িয়া দিলেন। বলিলেন 'সখে! তোমার চক্ষু নিষ্ফল—যাহা দেখিবার তাহা তো দেখিলে না! আশ্রম-ললাম-ভূতা শকুন্তলাই দেখিবার সামগ্রী।' বিদূষক বলিলেন, 'পিণ্ড খর্জ্জুরে অরুচি হইলে তেঁতুল খাইবার ইচ্ছার মত বনবালা শকুন্তলার প্রতি আপনার অভিলাষ।' রাজা বলিলেন, 'সখে ! দেখ নাই তাই এরূপ বলিতেছ—

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ ॥

চিত্রপটে লিখি কৈলা প্রাণের সঞ্চার।
রূপোচ্চয়ে মনঃসৃষ্টি বুঝি বিধাতার ॥
বিধাতা বিচিত্র-কর্ম্মা তিলোত্তমা সম।
সৃজিলা এ নারী-রত্ন রূপে অনুপম ॥'

রাজা বলিলেন, শুধু তাই নয়; আমার মনে হয়, শকুন্তলা—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈঃ
অনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥

অনাঘ্রাত পুষ্প হেন, কিশলয় নখ-স্পর্শহীন,
অনাবিদ্ধ রত্ন, মধু অনুচ্ছিষ্ট নব রস-লীন,
অখণ্ড পুণ্যের ফল, অকলঙ্ক সে রূপপ্রতিমা
কারে ভোক্তা নিরমিল বিধি—কার হেন ভাগ্যসীমা।

তখন দুই বন্ধুতে যুক্তি চলিতে লাগিল—কি অছিলায় দুষ্যন্ত আশ্রমে পুনঃপ্রবেশ করিবেন। মাধব্য বলিলেন, 'কেন ? আপনি তো রাজা—প্রজার উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশে আপনার অধিকার। নীবারের ষড়্‌ভাগ তাপস-দিগের নিকট দাবি করিতে যান।' রাজা বলিলেন—'মূর্খ ! বল কি ?

যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ ধনম্।
তপঃ ষড়্‌ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা হি নঃ ॥
চাতুর্ব্বর্ণালব্ধ ধন নৃপতির, ক্ষয়ী সে নিশ্চয়।
আরণ্যকদত্ত কর, তপস্যার ষষ্ঠাংশ অব্যয় ॥'

কিন্তু ভাগ্যবানের ভার ভগবান্ বহন করেন। বলিতে বলিতে, দুইটী ঋষিকুমার রাজার দর্শনার্থী হইয়া শিবিরে উপস্থিত। দুষ্যন্তের ক্ষাত্রতেজঃ লক্ষ্য করিয়া তাপসেরা বলাবলি করিতে লাগিলেন—

নৈতচ্চিত্রং যদয়মুদধিশ্যামসীমাং ধরিত্রীম্
একঃ কৃৎস্নাং নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুর্ভুনক্তি।
আশংসন্তে সমিতিষু সুরা বদ্ধবৈরাহি দৈত্যৈর্
অস্যাধিজ্যে ধনুষি বিজয়ং পৌরুহূতে চ বজ্রে ॥

নীল-সিন্ধু-সীমা এই বিপুলা ধরণী
একাকী শাসেন রাজা—নগর-অর্গল-
সম দৃঢ়—দীর্ঘবাহু, চিত্র নহে ইহা।
দৈত্যরণে বদ্ধবৈর অমরারিগণ
বিজয় ভরসা রাখে বজ্রে বাসবের,
ততোধিক দুষ্যন্তের অধিজ্য ধনুকে।

রাজা প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি আজ্ঞা ?'

তাপসদ্বয় বলিলেন—'মহারাজ! মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত নাই—এই সুযোগে

রক্ষাংসি নঃ ইষ্টিবিঘ্নমুৎপাদয়ন্তি

—রাক্ষসেরা আমাদের যজ্ঞবিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। অতএব আপনি কয়েক রাত্রি আশ্রমে যাপন করিয়া আমা-দের পরিত্রাণ করুন।'

রাজা বলিলেন 'তথাস্তু'। সারথির উপর হুকুম হইল, 'সসজ্জ রথ উপস্থিত কর'। বলিতে বলিতেই রথ হাজির। ইতিমধ্যে কিন্তু রাজমাতার আজ্ঞা বহন করিয়া রাজধানী

হইতে অনুচর উপস্থিত। 'চতুর্থ দিবসে, পুত্রের কল্যাণে ব্রত অনুষ্ঠিত হইবে—রাজা যেন নিশ্চয় প্রতিগমন করেন'। দুষ্মন্তের উভয়সঙ্কট—একদিকে জননীর আজ্ঞা, অন্যদিকে তপস্বি-কার্য্য। যে পক্ষে 'more attractive metal', সেই পক্ষেরই জয় হইল। রাজা আশ্রমের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন—আর রাজধানীতে রাজমাতার পুত্রপ্রতিম সখা মাধব্যকে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। রাজা ভাবিলেন—'এ চপল ব্রাহ্মণবটু অন্তঃপুরে গিয়া কত কি না জানি রটনা করিবে। সতর্ক হওয়া ভাল'। প্রকাশ্যে বলিলেন, 'সখা! শকুন্তলার বৃত্তান্তটা পরিহাস মাত্র—সত্য ঘটনা নহে'।

ক বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সমমেধিতো জনঃ।
পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ॥

মৃগশাবকের সাথে আজন্মলালিত,
অনভিজ্ঞ-মন্মথব্যাপার
সেই শকুন্তলা কোথা, আমি কোথা আর—
(যা শুনেছ) সত্য নহে পরিহাস সার।

মাধব্যও সেইরূপই বুঝিয়া গেলেন।

দুষ্মন্ত রাক্ষস-বাধা বারণের জন্য ধনুর্ব্বাণহস্তে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশমাত্রে সমস্ত বিঘ্ন দূরে পলায়ন করিল।

কা কথা বাণসন্ধানে জ্যাশব্দেনৈব দূরতঃ।
হুঙ্কারেণেব ধনুষঃ স হি বিঘ্নান্ অপোহতি॥

দূর হ'তে জ্যাঘোষ শুনিয়া পলাইল
সব বিঘ্ন—ধনু তাঁর হুঙ্কারিল যেন—
বাণসন্ধানের বল কোথা অবসর?

রাক্ষসের উৎপাত চলিলে, তবু রাজা অন্যমনস্ক থাকিতে পারিতেন। এখন অনন্তকর্ম্মা হইয়া শকুন্তলার চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। প্রবল আসঙ্গলিপ্সা—কিন্তু মিলনের আশা কোথায়? কখন ভাবিলেন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তো রাক্ষস-বিবাহ নিষিদ্ধ নহে—শকুন্তলাকে বলপূর্ব্বক হরণ করি। তখনই মনে হইল—শকুন্তলা ঋষিকন্যা, তপোবলরক্ষিতা।

জানে তপসো বীর্য্যং সা বালা পরবতীতি মে বিদিতম্।
অলমস্মি ততো হৃদয়ং তথাপি নেদং নিবর্ত্তয়িতুম্॥

তপস্যার বীর্য্যবল বিদিত আমার,
সেই বালা পরাধীনা, নহে অবিদিত,
তথাপি অশান্ত মন নারি ফিরাইতে।

তিনি দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। কি দিবা কি রাত্রি তাঁহার উদ্বেগ ও অস্বস্তির সীমা রহিল না। মেঘদূতের 'কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ' বিরহী যক্ষের ন্যায় তিনিও

প্রতি নিশি ভুজন্যস্ত-অপাঙ্গগলিত
তপ্ত অশ্রুধারা ঝরি করিল বিবর্ণ
উগ্র তাপে যার রত্নরাজি, সেই মোর
কনকবলয়, কিনাঙ্কিত মণিবন্ধ হ'তে
বার বার সন্তর্পণে করি প্রতিসার।

ইদম্ অশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্ বিবর্ণ মণীকৃতং
নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রবর্ত্তিভিরশ্রুভিঃ।
অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহুর্ম্মণিবন্ধনাৎ
কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্য্যতে॥

ফলতঃ দুষ্মন্তের বড়ই সংকট দশা ঘটিল। তাঁহার ক্ষুধিত চক্ষুঃ আশ্রমের চতুঃপার্শ্বে শকুন্তলার অন্বেষণ করিতে লাগিল—কারণ, 'ন প্রিয়াদর্শনাদ্ ঋতে শরণম্ অন্যৎ।'

এ দিকে শকুন্তলার অবস্থাও কম শোচনীয় নহে। তিনি প্রবল অনঙ্গতাপে দগ্ধ হইয়া অত্যন্ত অসুস্থা হইয়া পড়িলেন।

সখীরা ভাবিলেন—আতপলঙ্ঘন (sunstroke)। সন্তর্পণে তাঁহাকে মালিনী-তীরস্থ বেতসকুঞ্জে আনিয়া শিলাপট্টের উপর কিশলয়-শয্যায় শয়ন করান হইল এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে উশীর লেপন করিয়া প্রকোষ্ঠে মৃণালবলয় ও স্তনযুগে পদ্মপত্র সন্নিবেশিত হইল।* সখীদ্বয় নলিনী-পত্র দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কিছুমাত্র স্বস্তি হইল না। সখ্যৌ (উপবীজ্য সস্নেহং) হলা সউন্তলে অবি সুহাঅদি দে নলিনীপত্ত-বাদো?

---

* প্রিয়ংবদে কস্যেদং উশীরানুলেপনং মৃণালবন্তি চ নলিনীপত্রাণি নীয়ন্তে। কিং ব্রবীষি? আতপলঙ্ঘনাদ্ বলবদ্ অস্বস্থা শকুন্তলা তস্যাঃ শরীরনির্বাপনায় ইতি।

শকুন্তলা। কিং বীজঅস্তি মং সহীও?

'যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে'—এই সনাতন নিয়ম। শকুন্তলার বিশ্রামগৃহ বাহির করিতে দুষ্যন্তের অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই বেতস-বেষ্টিত লতাকুঞ্জের দ্বারে উপনীত হইলেন এবং পাদপান্তরিত থাকিয়া কুঞ্জের অভ্যন্তরে দেখিলেন শকুন্তলা কাতর দশায় কুসুমশয্যায় শায়িত আছেন আর সখীদ্বয় তাঁহার সেবা করিতেছেন। রাজা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন—অয়ে লব্ধং নেত্রনির্ব্বাণম্—হায়! চক্ষু সার্থক হইল! এই যে আমার চিত্তরমা শিলাপট্টে শয়ান রহিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার এ কি অবস্থা! এ কি আতপবাধা কিংবা আমারই মতন দশা? কিময়ং আতপ-দোষঃ উত যথা মে মনসি বর্ত্ততে? অথবা কৃতং সন্দেহেন? বৃথায় সন্দেহ।

স্তনন্যস্তোশীরং প্রশিথিল মৃণালৈকবলয়ং
প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজ নিদাঘ প্রসরয়োর্
ন তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগম্ অপরাদ্ধং যুবতিষু॥

স্তনোপরি উশীর লেপিত
শিথিলিত মৃণাল বলয়।
পীড়াতুর প্রেয়সীর যেন
কমনীয় বপুঃ মনে হয়
গ্রীষ্ম ও কামের তাপ
যদ্যপিও উভয় সমান
কিন্তু আতপের কোথা
যুবতিতে হেন শোভা দান।

সখীরা যখন দেখিলেন কিছুতেই শকুন্তলার স্বস্তি হইতেছে না, তখন বলাবলি করিতে লাগিলেন—'সেই রাজর্ষির প্রথম দর্শনাবধি শকুন্তলার এই পর্য্যাকুল অবস্থা—, এ আতপতাপ নহে, বোধ হয় মদনপীড়া'। প্রিয়ংবদা প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসিলেন—'সখী! সত্য বলো কেন তোমার এমন হ'ল। দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হইতেছ—কেবল লাবণ্যময়ী ছায়া তোমাকে এখনও ত্যাগ করে নাই'। আড়াল হইতে দুষ্যন্ত শুনিয়া মনে মনে বলিলেন—প্রিয়ংবদা ঠিকই বলিয়াছে—

ক্ষামক্ষামকপোলমাননম্ উরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং
মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ পাণ্ডুরা।
শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়মালক্ষ্যতে
পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী॥

অতি-ক্ষাম কপোল বালার
দেখি কান্তি মলিন ধূসর
ক্লান্ত কটিদেশ, অংস
বিনমিত, পীন স্তন শ্লথতর।
শোচ্যা কিন্তু রম্যতরা,
যেন তন্বী মদনপীড়িতা,
মাধবীর লতা যেন
উষ্ণ বায়ু শোষণে শোষিতা।

শকুন্তলা লজ্জাবিজড়িত স্বরে সখীদের বলিলেন—যেদিন হইতে সেই রাজর্ষি আমার দৃষ্টিপথগামী হইয়াছেন, সেইদিন হইতে তাঁহার লালসা আমাকে এইরূপ করিয়াছে। দুষ্যন্ত আড়াল হইতে শুনিয়া মহাখুসি। মনে মনে বলিলেন—

স্মরএব তাপহেতুর্নির্ব্বাপয়িতা স এব মে জাতঃ।
দিবস ইবাভ্রশ্যামস্তপাত্যয়ে জীবলোকস্য॥

যে অনঙ্গ তাপ-হেতু,
সেই পুনঃ করে প্রশমন।
তপচ্ছেদে জীবলোক প্রতি
অভ্রশ্যাম দিবস যেমন॥

শকুন্তলা আরও বলিলেন, 'যদি তোমাদের অনুমত হয়, তবে যাহাতে আমি সেই রাজর্ষির অনুকম্পা পাই তাহার উপায় কর—নহিলে আমার জন্য তিলাঞ্জলির ব্যবস্থা কর'। প্রিয়ম্বদা বলিলেন,—'সখি! অনুরূপ বরেই চিত্তার্পণ করিয়াছ। নদী সাগরেই প্রবেশ করে; মাধবীলতা সহকারতরুকেই আশ্রয় করে।' অনসূয়া বলিলেন, 'কি উপায়ে শীঘ্র উভয়ের নির্জ্জনে মিলন ঘটিতে পারে?' প্রিয়ম্বদা বলিলেন, 'শীঘ্র মিলন দুষ্কর নহে, কারণ, রাজর্ষিরও শকুন্তলার প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত লক্ষ্য করিয়াছি। তিনিও দিন দিন ক্ষীণ হইতেছেন'। একটু ভাবিয়া প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে বলিলেন, 'সখি! রাজার উদ্দেশে একখানি প্রণয়-পত্র রচনা কর। আমি নির্ম্মাল্যের মধ্যে গোপন

করিয়া রাজার হাতে পাঠাইয়া দিব'। অনুসূয়া এ যুক্তির অনুমোদন করিলেন। শকুন্তলা বলিলেন, 'তা যেন করিলাম—কিন্তু রাজা যদি আমায় প্রত্যাখ্যান করেন ?' দুষ্যন্ত আড়ালে থাকিয়া মনে মনে হাসিলেন—

অয়ং স তে তিষ্ঠতি সঙ্গমোৎসুকো
বিশঙ্কসে ভীরু যতোবধীরণাম্।
লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ং
শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ ॥
যার প্রত্যাখ্যান-ভয়ে ভীত তুমি ভীরু !
সেজন সম্মুখে তব সঙ্গম-উৎসুক ;
যাচকের কাছে লক্ষ্মী নহেন সুলভ,
লক্ষ্মীর দুর্লভ কবে ঈপ্সিত যে ধন।

সখীরা বলিলেন, 'শকুন্তলা ! এ কি তোমার অমূলক আশঙ্কা ? কে এমন মূঢ় যে, শরীরের আপ্যায়ন-কারী জ্যোৎস্নাকে বস্ত্রান্তর দ্বারা বারণ করিবে ?' তখন শকুন্তলা ভাবিয়া-চিন্তিয়া একটী ললিত-পদ-বন্ধন গীতি রচনা করিলেন। লিখিবার সামগ্রীর অভাবে শুকোদরের ন্যায় সুকুমার এক পদ্মপত্রে ঐ পত্র নখের দ্বারা লিখিত হইল। অন্তরাল হইতে রাজার চক্ষু শকুন্তলার মুখের উপর নিসক্ত রহিল। রাজা মুগ্ধ নেত্রে দেখিতে লাগিলেন

উন্নমিতৈক ভ্রূলতম্ আননমস্যাঃ পদানি রচয়ন্ত্যাঃ।
কণ্টকিতেন প্রথয়তি ময্যনুরাগং কপোলেন ॥
গীতিরচনায় মগ্না, কি মধুর আনন বালার,
ভ্রূলতাটি উন্নমিত, গণ্ডে দেখি পুলকের ভার —
প্রকটিছে এইরূপে অনুরাগ উপরে আমার।

এইবার শকুন্তলা স্বলিখিত প্রণয়পত্র সখীদের পড়াইয়া শুনাইলেন।

তুজ্ঝ ণ আনে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা বি রত্তিম্পি।
ণিগ্ঘিণ তবই বলীঅং তুই বুত্তমনো রহাইং অঙ্গাইং ॥
সখা ! নাহি জানি হৃদয় তোমার !
মম মনে মনসিজ, পাতিয়া আসন নিজ
দিবানিশি অভাগীরে দহে অনিবার,
তব তরে অকরুণ ! (তুমি মম) মনোরথসার !

রাজা দেখিলেন, আত্মপ্রকাশের এই উপযুক্ত অবসর। তিনি হঠাৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন ঃ—

তপতি তনুগাত্রি মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব।
গ্লপয়তি যথা শশাঙ্কং ন তথা কুমুদ্বতীং দিবসঃ ॥
লো সুন্দরী ! মদন তাপিত করে তোমা,
মোরে কিন্তু দহে নিরন্তর
কুমুদীরে নাহি দেয় গ্লানি,
শশাঙ্কেরে যেমন্ত বাসর

সখীরা আদর করিয়া রাজাকে সেই শিলাতলের এক-দেশে বসাইলেন এবং 'বয়স্য' বলিয়া সম্বোধন করিয়া দুই-একটা কাজের কথা পাড়িলেন। প্রিয়ংবদা সখীটী কিছু মুখরা—তিনি বলিলেন, 'আপনাদের অন্যোন্যানুরাগ বিস্পষ্ট বটে, তথাপি সখীস্নেহ আমাকে মুখর করিতেছে। আপনি রাজা—বিপন্নের আর্ত্তিহর। আপনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই মদনরাজা আমাদের সখীটির উপর অত্যাচার করিতেছেন—আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার প্রতিবিধান করুন, রাজা বলিলেন, 'এ অনুরোধ আমার প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশ'। অনুসূয়া বলিলেন—'আমারও একটা কথা। শুনিয়াছি রাজারা বহুবল্লভ—আমাদের প্রিয় সখীটী যাহাতে বন্ধুজনের শোকের কারণ না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবেন।' রাজা বলিলেন 'সে কি ?

পরিগ্রহবহুত্বেপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্ররসনা চোর্ব্বী সখী চ যুবযোরিয়ম্ ॥
পরিগ্রহ বহু মোর
কুলের প্রতিষ্ঠা কিন্তু মাত্র দুই জন
সমুদ্রমেখলা পৃথ্বী—
(আর) তোমাদের এই সখী প্রিয়তম।'

সখীদের করণীয় শেষ হইল। এইবার তাঁহারা একটা অছিলা করিয়া লতামণ্ডপের বাহিরে গেলেন। প্রিয়ংবদা বলিলেন—ঐ যে একটী উৎসুক মৃগশিশু জননীর অন্বেষণ করিতেছে। আয় ভাই অনুসূয়া ! তার মাকে খুঁজিয়া দিই।' অনুসূয়াও তাহাতে যোগ দিলেন। শকুন্তলা বলিলেন, 'কর কি ? আমাকে কার কাছে একলা ফেলিয়া যাও ;' সখীরা বলিলেন, 'যিনি পৃথিবীর রক্ষক, তাঁর কাছে রাখিয়া গেলাম'। শকুন্তলা উঠিয়া সখীদের অনুসরণ করেন আর কি ? রাজা ধরিয়া বসাইলেন (বলাদ্ এনাং নিবর্ত্তয়তি)। বলিলেন—

উৎসৃজ্য কুসুমশয়নং নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণং।
কথমাতপে গমিষ্যসি, পরিবাধাপেলবৈরঙ্গৈঃ॥

ছাড়িয়া কুসুমশয্যা এই
স্তনোপরি নলিনীর দলে
অঙ্গ তব সন্তাপ-পেলব,
বাহিরিবে কোথা রবিকরে ?

শকুন্তলা বলিলেন—'পৌরব! অবিনয় করিও না। আমি তোমার অনুরাগিণী বটি কিন্তু পরবশ।'

রাজা।—সে জন্য ভয় করিও না। দেখ,

গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বহ্বো রাজর্ষিকন্যকাঃ।
শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ॥

শুনি পুরাকালে বহু রাজর্ষিতনয়া
পরিণীতা হ'লে গান্ধর্ব্ববিধানে, অনু-
মোদন তাহার করেছিলা গুরুজন।

শকুন্তলা বলিলেন,—'তা' হক্। তবু সখীদের অনুমতি নিতে হ'বে। হাত ছাড়—'

রাজা—বেশ, ছেড়ে দিতেছি।

শকুন্তলা—কখন ?

রাজা—একটীবার চুম্বনের পর।

অপরিক্ষত কোমলস্য তাবৎ কুসুমস্য নবস্য ষট্পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য॥

অক্ষত কোমল তব সরস অধর
নবপুষ্পরস যথা তৃষিত ভ্রমর
মধুর উহার রস মৃদু করি পান
যাবৎ জুড়াই সখি! পিপাসিত প্রাণ।

এই বলিয়া দুষ্যন্ত শকুন্তলার চিবুক ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন—লজ্জাশীলা শকুন্তলা তাহার পরিহার করিলেন (মুখমস্যাঃ সমুন্নমিতুম্ ইচ্ছতি—শকুন্তলা পরিহরতি নাট্যেন)। ঠিক এই ক্ষণে কুঞ্জদ্বার হইতে সখীদের কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'চক্রবাকবধূ! সহচরকে বিদায় দাও—রজনী উপস্থিত' এবং শান্তিজল হস্তে বৃদ্ধা তাপসী গৌতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।

সখীদের স্বর শুনিবামাত্র সংকেতের অর্থ বুঝিয়া বৃক্ষান্তরালে দুষ্যন্ত নিজেকে সংবৃত করিয়াছিলেন। গৌতমী আসিয়া স্নেহভরে শকুন্তলার দেহে শান্তিজল সেচন করিলেন এবং তাহাকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। গোতমী বলিলেন, 'বৎসে! দিবা অবসানপ্রায়, চল কুটীরে ফিরিয়া যাই।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও শকুন্তলাকে পিসিমার সঙ্গে ফিরিতে হইল। বিদায়ের সময় শকুন্তলা লতাবলয় তথা দুষ্যন্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—লতাবলয়! সন্তাপহারক! আমন্ত্রণ করি তোমাকে ভূয়োপি পরিভোগায়!

এ দৃশ্য বেশ স্বচ্ছ, স্বাভাবিক এবং সংযত। মহাকবি কালিদাস নিশ্চিতই এইভাবে এ চিত্র আঁকিয়াছিলেন। কিন্তু প্রক্ষিপ্তকারের হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। বঙ্গদেশে প্রচলিত পুঁথিতে (যাহাকে Bengal recension বলে) এ দৃশ্য এমন সংযতভাবে শেষ হইতে দেওয়া হয় নাই। তাহাতে বেশ বাড়াবাড়ি, চুম্বন আলিঙ্গনের খুব ছড়াছড়ি। সে দৃশ্যের শকুন্তলা শুদ্ধশীলা আশ্রমপালিতা বনবালা নহেন—প্যারিস সালোনের (saloon) চটুলা নাগরী! পাঠক! একটু নমুনা দেখুন!

আমরা দেখিয়াছি, দুষ্যন্ত শকুন্তলার চিবুক ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে, কালিদাসের শকুন্তলা লজ্জাভরে তাহার পরিহার করিলেন। প্রক্ষিপ্তকারের শকুন্তলা ইহার স্থলে যেন ছল করিয়া লতামণ্ডপ ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কয়েক পদ গিয়া ফিরিয়া ভঙ্গীসহকারে বলিলেন, (পদান্তরে প্রতিনিবৃত্ত্য সাঙ্গভঙ্গম্) 'পৌরব! অনিচ্ছাপূরকোপি সম্ভাষণমাত্রপরিচিতোঽয়ং জনো ন বিস্মর্ত্তব্যঃ—তোমার ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিলাম না—তা' বলিয়া আমাকে যেন ভুলিয়া যাইও না।' রাজা বলিলেন, 'সুন্দরি! যতই তুমি দূরে যাও আমার হৃদয়ের নিকটেই থাকিবে।

শকুন্তলা। হা ধিক্! হা ধিক্! এ কথা শুনে আমার চরণ যে চলিতেছে না। যা হ'ক্ এই কুরুবকে সংবৃত হ'য়ে ইহার ভাবানুবন্ধ লক্ষ্য করি। (তথা কৃত্বা স্থিতা)।

রাজা একেবারে দিশাহারা। বলিতে লাগিলেন,—'যার এমন সুকুমার রূপ—তার এমন কঠোর ব্যবহার! এখন এ লতামণ্ডপে থাকিয়া লাভ কি?' কিন্তু রাজার যাওয়া হইল না। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন শকুন্তলার প্রকোষ্ঠচ্যুত মৃণালবলয় ভূপতিত রহিয়াছে। বহুমান সহকারে

উঠাইয়া তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন—বলিলেন 'হৃদয়স্য নিগড়মিব মে'—কিন্তু প্রিয়ার লীলা-ভরণ দ্বারা আশ্বসিত হইলাম। শকুন্তলা আড়াল হইতে এই অভিনয় দেখিতেছিলেন—তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, লতাবলয়কে উপলক্ষ্য করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। দুষ্মন্ত সহর্ষে বলিলেন 'এ কি? এ যে মেঘ না চাহিতেই শুষ্ককণ্ঠ চাতকের মুখে প্রভূত বারিধারা!'

শকুন্তলা বলিলেন—অর্দ্ধ পথে মনে পড়ে গেল আমার মৃণালবলয় ফেলে গেছি। আমার হৃদয় বদলে তুমিই নিয়েছ। দাও। দাও। বলয়রিক্ত হাত মুনিদিগকে কেমন করে দেখাব।

রাজা বলিলেন—দিতে পারি, যদি আমাকে পরাইয়া দিতে দাও।

শকুন্তলা—উপায় কি? আচ্ছা তাই দাও।

রাজা শকুন্তলার হস্তগ্রহণ করিলেন এবং স্পর্শের অভিনয় করিয়া বলিলেন—'কামতরুর ইহা প্ররোহ—মদন হরকোপে ভস্ম হইবার পর অমৃতবর্ষী দৈবকর্ত্তৃক সঞ্জীবিত।

মৃণালবলয় পরাইতে স্বভাবতঃই রাজার বিলম্ব হইতেছিল। শকুন্তলা (যদিও এখন গান্ধর্ব্ববিবাহ হয় নাই) বলিলেন, 'ত্বরতাং ত্বরতাম্ আর্য্যপুত্র!' দুষ্মন্ত বোধ হয় একটু বিস্মিত হইলেন—ভাবিলেন 'আর্য্যপুত্র শব্দ ত' ভর্ত্তা সম্বন্ধে প্রযোজ্য (ভর্ত্তৃরাভাষণ পদমেতৎ)। প্রকাশ্যে বলিলেন দেখ! দেখ! মৃণালবলয়টী তোমার মণিবন্ধে যেন নব শশিকলার ন্যায় শোভা পাচ্চে।

শকুন্তলা বলিলেন, 'পবনচালিত কর্ণোৎপলরেণুতে (যদিও আধিশয্যায় কর্ণোৎপল ধারণের কোনই উপযোগিতা ছিল না) আমার চক্ষু কলুষিত—কিছু দেখিতে পাচ্ছি না।'

রাজা—বটে! যদি অনুমতি হয়, মুখমারুতে চক্ষুটী বিশদ করে দিই।

শকুন্তলা—এটা অনুগ্রহ বটে কিন্তু তোমাকে যে বিশ্বাস হয় না।

রাজা। ভয় নাই। অভিনব সেবক আদেশ লঙ্ঘন করে না।

শকুন্তলা। অতিভক্তি কিন্তু অবিশ্বাসের কারণ।

এইবার রাজা শকুন্তলার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া মুখমারুত দ্বারা চক্ষু বিশদ করিয়া দিলেন (মুখমারুতেন চক্ষুঃ সেব্যতে)। ভাবাবেশে শকুন্তলার অধর স্ফুরিত হইতে লাগিল। দুষ্মন্ত স্বগত বলিলেন

চারুণা স্ফুরিতেনায়ম্ অপরিক্ষতকোমলঃ।
পিপাসতো মমানুজ্ঞাং দদাতীব প্রিয়াধরঃ॥

অক্ষত কোমল এই অধর প্রিয়ার
দিতেছে অনুজ্ঞা মোরে স্ফুরি চারুতর
—আমি পিপাসা-আকুল।

কিন্তু দুষ্মন্তকে এই মৌন আজ্ঞার উপর নির্ভর করিতে হইল না। শকুন্তলা বলিলেন—'চক্ষুর রেণু উদ্ধার করিয়া আপনি আমার মহৎ উপকার করিলেন—আমি আর্য্যপুত্রের (আবার আর্য্যপুত্র!) কিছুই প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না!' দুষ্মন্ত বলিলেন, 'মধুকর কমলের গন্ধমাত্রে সন্তুষ্ট। তোমার সুরভি মুখের পরিমল তো আঘ্রাণ করিয়াছি!' নির্লজ্জ শকুন্তলা বলিলেন—'ভ্রমর গন্ধমাত্রে যদি তুষ্ট না হয় তবে?' দুষ্মন্ত—তবে? ইদম্ (ইতি ব্যবসিতঃ)। এ শকুন্তলা কখনই কালিদাসের শকুন্তলা নহে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ই বলিয়াছেন, —শকুন্তলা নাটকে অতিমাত্রা ও অত্যুক্তির যথেষ্ট অবসর ছিল কিন্তু কালিদাস কখনও তাঁহার সংযত লেখনীকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেন নাই।

শুধু তাই নয়। মূল নাটকের প্রতি একটু নিপুণ দৃষ্টিপাত করিলেই প্রক্ষিপ্তকারের হস্ত ধরা পড়ে। শকুন্তলাকে লইয়া গৌতমী লতাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর আমরা দুষ্মন্তের মুখে শুনিতে পাই:—

তস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীর লুলিতা শয্যা শিলায়ামিয়ং
ক্লান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈরর্পিতঃ।
হস্তাদ্ ভ্রষ্টমিদং বিসাভরণমিত্যাসজ্যমানেক্ষণো
নির্গন্তুং সহসা ন বেতসগৃহাদীশোঽস্মি শূন্যাদপি।

শিলাতলে শয্যা পুষ্পময়ী
প্রেয়সীর শরীরলুলিত
পদ্মপত্রে নখরে লিখিত
প্রেমপত্র তাপবিগলিত

হস্তভ্রষ্ট মৃণালবলয়—

একদৃষ্টে করি নিরীক্ষণ

প্রিয়ারিক্ত লতাগৃহ হ'তে

সহসা নির্গত হ'তে নাহি উঠে মন।

দুষ্যন্ত যদি (প্রক্ষিপ্তানুযায়ী) শকুন্তলার কক্ষে মৃণাল-বলয় পরাইয়া দিয়া থাকিতেন, তবে আবার শিলাতলে হস্তভ্রষ্ট মৃণালবলয়ের সাক্ষাৎ পাইলেন কিরূপে? আরও দেখুন। শকুন্তলা বেতসকুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে দুষ্যন্ত চুম্বনের স্বকৃত ব্যর্থপ্রয়াস স্মরণ করিয়া খেদ করিয়া বলিতেছেন :—

মুহুরঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিরামম্

মুখমংসাবিবর্ত্তি পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কথমপ্যুন্নমিতং ন চুম্বিতং তু॥

মুহুর্মুহুঃ পদ্মকর আবরিত বিম্বাধর

'না না' বলি ক'রে মানা বিক্লব রমণ

বিমুখ আনন মরি তুলিনু চিবুক ধরি

সুমুখীর—কিন্তু হায়! হ'ল না চুম্বন!

যদি পিপাসিত দুষ্যন্ত (প্রক্ষিপ্তকারীর মতে) সে অধরসুধা পানই করিয়া থাকিতেন, তবে 'হল না চুম্বন' এ কথার সার্থকতা কি? অতএব বঙ্গে প্রচলিত পুথির ঐ অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, ইহা নিঃসংকোচে বলা যায়। সে যাহা হ'ক, দুষ্যন্ত যখন শূন্য লতাগৃহে ঐ ভাবে পরিক্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় নেপথ্যে ধ্বনি হইল :—

সায়ন্তনে সবনকর্ম্মণি সংপ্রবৃত্তে

বেদিং হুতাশনবতীং পরিতঃ প্রকীর্ণাঃ।

ছায়াশ্চরন্তি বহুধা ভয়মাদধানাঃ

সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ পিশিতাশনানাম্॥

সায়ন্তন হোমকর্ম্ম প্রবৃত্ত হইতে,

হে রাজন্ দীপ্ত-অগ্নি বেদির চৌদিকে

ভ্রমিতেছে ছায়া বহু, সন্ধ্যা মেঘমত

তাম্রবর্ণ, নরমাংস ভোজী রাক্ষসের,

নানামতে তপস্বীরে ভয় প্রদর্শিয়া।

রাজা তৎক্ষণাৎ বেদির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ইহার পর ত্বরায় দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ সম্পন্ন হইল। গোপনে বিবাহ—সখীদ্বয় ভিন্ন কেহই এ বৃত্তান্ত জানিলেন না। অনসূয়ার মুখে আমরা এ বিবাহের কথা শুনি। জইবি গান্ধর্ব্বেণ বিহিনা নিবুত্ত কল্যাণাং শকুন্তলা অনুরূপভত্তৃগামিনী সংবুত্তেতি নিব্বুদং মে হিঅঅং।

কয়েকদিন খুব সুখে কাটিয়া গেল—

অগণিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ।

এই অল্পস্থায়ী দাম্পত্য-জীবনের মধুর ইতিহাস কবি শকুন্তলার মুখে একদিনের একটী ক্ষুদ্র ঘটনায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এক দিন আশ্রমের একদেশে বেতসলতামণ্ডপে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা উপবিষ্ট আছেন—রাজার হস্তে পদ্মপত্রের ঠোঙ্গায় কতকটা জল রহিয়াছে। এমন সময় শকুন্তলার কৃতক-পুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ নামক (নামটী কেমন মধুর!) মৃগশিশু সেখানে আসিয়া উপস্থিত। রাজা আদর করিয়া হরিণটীকে জলপান করাইতে গেলেন কিন্তু অপরিচিত বলিয়া সে নিকটে ঘেঁসিল না। তখন শকুন্তলা ঐ জল হাতে করিলে সে পান করিল। তাহাতে দুষ্যন্ত পরিহাস করিয়া বলিলেন—'স্বজনে সকলেরই প্রত্যয়—তোমরা উভয়ই বুনো কি না! (দুবে বি তুম্হে আরণ্ণআ ত্তি)।'

দুষ্যন্তের মুখে আমরা এ দাম্পত্য জীবনের অন্য দিকের পরিচয় পাই।

অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং

পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু

প্রেয়সীর সেই বিম্বাধর

অম্লান তরুণতরুপল্লব সমান-

লোভনীয়—অহো! বারবার

রতোৎসবে করিলাম সন্তর্পণে পান।

দুষ্যন্ত সুরসিক পুরুষ—অধরের প্রতি তাঁহার প্রথম হইতেই লোভ। কিশলয়-শোণিমা অধরে।

অধিক কি তিনি পূর্ব্বেই ঐ অধরকে 'রতি-সর্ব্বস্ব' এই সার্থক বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন (রতিসর্ব্বস্বম্ অধরম্)। অতএব দুষ্যন্তের মনের ভাব বিদ্যাপতির ভাষায় প্রকাশ করিলে বলিতে হয় :—

কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়নু

না বুঝনু কৈছন কেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু

তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

দুষ্যন্তের পক্ষে কিন্তু 'লাগ লাগ যুগ' নহে—স্বল্প কটি ত্রিযামা রাত্রি। আশা কিছুমাত্র না মিটিতেই তাঁহাকে আশ্রমত্যাগ করিতে হইল। অথ স রাজর্ষি ইষ্টিং পরিসমাপ্য ঋষিভি র্বিসৃষ্টঃ আত্মনো নগরং প্রবেশ্য। কারণ, তাপসদিগের প্রবর্ত্তিত যজ্ঞ যেদিন পরিসমাপ্ত হইল, তাহার পর আর তিনি কি অছিলায় থাকিতে পারেন ?

বিদায়ের কালে শকুন্তলা অনেক কাঁদিলেন—বলিলেন, 'আর্য্যপুত্র ! কতদিনে এ অভাগীর সংবাদ লইবে ?' দুষ্যন্ত নিজের নাম-মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী শকুন্তলার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়া বলিলেন :—

একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং
নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্।
তাবৎ প্রিয়ে মদবরোধগৃহপ্রবেশং
নেতা জনস্তব সমীপ মুপৈষ্যতীতি॥

প্রতিদিন অঙ্গুরীখোদিত নামাক্ষর
মম, গণিবে প্রেয়সি ! একটি একটি ;
গণনায় শেষ যবে, আসি অনুচর
লয়ে যাবে তোমা, মোর অন্তপুর মাঝে।

দুষ্যন্ত আজ রাজধানী ফিরিয়া গেছেন। শকুন্তলা আসন্নবিরহে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া পতিচিন্তায় মগ্ন আছেন—যেন চিত্রাপিতা প্রতিমূর্ত্তি !

পেক্খ দাব বামহত্থাবহিদবঅণা আলিহিদা বিঅ পিঅসখী ভত্তুগদাএ চিন্তাএ। অত্তাণংবি ন এসা বিভাবেদি।

এমন সময় দৈবক্রমে মহাক্রোধী দুর্ব্বাসা অতিথিরূপে সেই কুটীরদ্বারে উপনীত হইয়া হুঙ্কার করিলেন—অয়মহং ভোঃ! শকুন্তলা দুষ্যন্তের চিন্তায় বিভোর—ঐ হুঙ্কার তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। আর যায় কোথায় ? দুর্ব্বাসা অমনি অভিশাপ দিলেন ! 'আমি অতিথি—আমার অপমান ! শোন মূঢ়ে !

বিচিন্তয়ন্তী যম্‌ অনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মাম্ উপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমম্ কৃতামিব॥

যাহার চিন্তায় তুমি তন্ময়মানস
তপস্বী অতিথি মোরে কৈলে অপমান
স্মরিলেও সে তোমারে হ'বে বিস্মরণ,
উন্মত্ত পূর্ব্বের কথা বিস্মৃত যেমন।

—এই বলিয়া দুর্ব্বাসা ত্বরিতপাদক্ষেপে আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। ভাগ্যে সেই সময় অনুসূয়া-প্রিয়ংবদা অনতিদূরে পুষ্পচয়নে প্রবৃত্তা ছিলেন। তাঁহারা শুনিতে পাইয়া প্রমাদ গণিলেন—হদ্ধী হদ্ধী অপ্পিঅং এব্ব সংবুত্তং—'হায় হায় কি সর্ব্বনাশ ঘটিল!' অনুসূয়া বলিলেন, 'প্রিয়ংবদা ! যা যা ঋষির পায়ে প'ড়ে ফিরিয়ে আন। আমি অর্ঘোদক সাজাই।' প্রিয়ংবদা অনেক কাকুতি-মিনতি করিলেন—অনেক পায়ে ধরিলেন। কোপন ঋষির কোপ কি যাইবার ? অনেক অনুনয়ে একটু নরম হইয়া বলিলেন—'আমি যাহা বলেছি তাহা অন্যথা হইবার নয়—তবে শকুন্তলা যদি অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে, তবে শাপের বিমোচন হইবে'। অনুসূয়া শুনিয়া বলিলেন—'সখি ! তবে আর ভাবনা কি ? রাজা ত' যাইবার সময় স্ব নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দিয়া গিয়াছেন। ঐ অভিজ্ঞান শকুন্তলার হাতেই আছে।' উভয় সখীতে যুক্তি করিয়া স্থির হইল—শাপবৃত্তান্ত গোপন রাখিতে হইবে—শকুন্তলাকেও বলা হইবে না। সুকুমার নবমালিকাকে বল উষ্ণোদক সেচন করিবে ?"

পতিবিরহিণী তন্ময়চিত্তা শূন্যহৃদয়া অজ্ঞাতশাপবৃত্তান্তা। শকুন্তলাকে উটজদ্বারে উপবিষ্ট রাখিয়া আমরা অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিলাম। বারান্তরে পরবর্ত্তী ঘটনার বর্ণন করিব।

স্বাধীনতা

বন্দে আলী মিঞা

১

রাত নাই আর—ভোরের আকাশে
শুকতারা দেখা যায়
পাতায় ঝরিছে মেঘের কাঁদন
উতলা পূবের বায়।
চখা ডেকে ডেকে কাটায়েছে নিশা
মনে জাগে তার আলোকের তৃষা
গাঙচিলগুলা পদ্মার বুকে
উড়ে উড়ে গান গায়!

কেতকী কাঁটায় পথ হারাইয়া
কাঁদিছে বিহগ একা
ওর চোখে জাগে সুদূর লোকের
যাত্রার লিপিলেখা ;—
বন্দী করেছে ক্ষণিকের ভুল
তার লাগি হিয়া ব্যথায় আকুল
ডানা ঝটপটি আপনারে আরো
বিঁধিয়া মারিতে চায়।

দিনের দুয়ারে পূবের পথিক
ছড়াইছে রাঙা আলো
ওর জয়গান কানে এসে বাজে
—মনে তার লাগে ভালো ;
নীল আকাশের আলোকের ধারা
বুকে তার আনে চেতনার সাড়া
কেয়াকাঁটা-ঘেরা নীড় ছেড়ে আজ
অসীমেতে মন ধায়!

২

ডানা ছড়ে গেছে—খসেচে পালক
কেতকীর কাঁটা লেগে—
সহিয়াছে দেহে বিষের যাতনা
মনের মুক্তি মেগে,
স্বাধীন জীবন কামনার পথে
বাধার প্রাচীর আসি কোন মতে
রুধিতে পারেনি তায়।

মেঘের সাথে সে উড়ে উড়ে চলে
গীত গায় প্রাণ ভরি'
কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে অতীত দিনের
বন্দী জীবন স্মরি'
এই ধরণীর ঋতুর পশরা
এত যে অজানা—এত মধুভরা
এর স্বাদ লভি' ছোটো সে পরাণ
পুলকেতে শিহরায়।

———

পিপাসা

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্যামের মার তাড়নায় যাহাহউক দু'টী দাঁতে কাটিয়া হিমাংশু অফিসেও গেল, আবার ফিরিয়াও আসিল। কিন্তু আজিকার এ সুধাধবলিত শয্যায় সুধা ছিল না—কণ্টকই ছিল। শ্যামের মা প্রতিদিনের মত খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। গিরিও পিছু পিছু আসিয়া অন্য ঘরে গা ঢাকা দিয়া রহিল।

হিমাংশু ভাবিতে লাগিল,—এগুলি তৈরী করে কে? একটা টিকিওয়ালা বামুন তো ভাতের থালাটা রাখিয়া যায় কিন্তু এ সকলের বিধি-ব্যবস্থা যাহার হাতে সে কি গব্যঘৃত আর ঘন আটা দুধের শ্রাদ্ধ করিয়া দূরের এ তৃষিত আত্মাটাকে তৃপ্তিসাধনের ছলে খোঁচা মারে?

শ্যামের মা বলিল, "তুমি আর মদ ছোঁবে না শুনে মা খুব খুসী হয়েছেন।"

হিমাংশু মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "খুসীর প্রাণ তাঁর— খুসী হবেনই তো! বাবুটী কলতলায় বিছানাপত্তর ছুঁড়ে ফেলে দিতে খুসী—আর মা-টী বুঝি যত্নের মধ্যে খুঁচিয়ে মারতে খুসী?"

গিরি পশ্চাতের ঘরে শিহরিয়া উঠিল। সে তাহাকে কত ভুলই বুঝিতেছে!

খাবার থালাটার উপর দৃষ্টিপাত করিয়া হিমাংশু বলিল, "এগুলো না দিলে কি পার না? একটু পরেই তো ভাত খাবো?"

শ্যামের মা বলিল, "ওমা! আফিসে এই খাটুনি খেটে এসে মুখে একটু জল না দিলে কি দেহ থাকে?"

হিমাংশুর আর কথা কাটাকাটি করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। বুড়ীটা সকাল সকাল উঠিয়া গেলে বিছানার উপর গড়াইয়া পড়িতে পারা যায়। কিন্তু বিছানাটার উপরেও তো সজারুর গা খাড়া করিয়া হিলিবিলি করিতেছে! সে শুষ্কমুখে বলিল, "আচ্ছা! তুমি যাও, আমি খাব' খন।"

"সে আমি যাচ্ছি নে থালাবাটী রেখে গেলে মা আবার বকাবকি করবে।"

হিমাংশু বলিল, "এতবড় সম্পন্ন গৃহস্থের একখানা থালাবাটীতে এখনি আট্‌কে যাবে না। তুমি যাও।"

শ্যামের মা বলিল, "তোমারও বা এত তক্‌রার করার কি দরকার? ভাত তো খেয়েছ কোন্ সকালে। খেয়ে নাও। আমার শ্যামের কোন গুণটাই আর এড়িয়ে যায় নি! সে শত্রুটা এক এক সময় কি কম গোঁ ধরেছে আর আমাকে কম নাকাল করেছে?"

খাবার খাইয়া থালাটা সে খালাস করিয়া দিল। বলিল, "তোমাদের বামুনঠাকুরকে ভাত কিছু কমিয়ে দিতে ব'লো। ভাত না লক্ষ্মী—এত করে' কি ফেলা যায়, ভাল দেখায় না।"

শ্যামের মা বলিল, "লক্ষ্মী যা'তে না ছাড়ে তেমনটী থাকলে তো হয়! তোমাদের এ বয়েসে লোহার কড়াই মুখে দেবে—পেটের আগুনে গলে যাবে। অমন করো না বাপু! পাঁচজনে সুখ্যেত করলে আমাদেরও প্রাণ দশ হাত হ'য়ে ওঠে, তা বোঝ?"

শ্যামের মা দু'বেলা বকিয়া যায়—হিমাংশু শুনিতে পায় কি পায় না। কিন্তু এইরকমে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। প্রথম আঘাতের দিনে সে যদি এই গৃহ হইতে পা তুলিয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে হিমালয়ের পাদদেশে গিয়া চুল-দাড়ী বৃদ্ধির সহিত পরিবর্ত্তিত মনে বসবাস করিবার একটা আকস্মিক ক্ষুদ্র সাহস সে পাইত

কি না বলা যায় না, কিন্তু গিরির স্বহস্তরচিত এই সুকোমল শয্যার সঙ্গে পৃথক্ সে হইতে পারিত। এখন শ্যামের মার অনুযোগ এবং আদর আপ্যায়নকে উপলক্ষ্য করিয়া সে যখন দাঁড়াইয়া গেল এবং দিনের পর দিন চলিয়া রুদ্ধ অপমানের দগ্ধতা কিছু মৃদু হইয়া আসিল তখন সে আবার অনুভব করিতে লাগিল যে, গৃহখানির প্রতি অণুপরমাণুর মাদকতায় তাহার পা দু'খানা টানিয়া টানিয়া কর্দ্দমের মত নীচের দিকে টানিয়া লইতেছে।

এইরূপে তাহার চিন্তার স্রোত আবার পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইল। এখন শ্যামের মা ডাকিলে সে কাণ পাতিয়া শোনে, যথাযথ উত্তর দেয়। আর গিরির কণ্ঠে একটুখানি আওয়াজ শুনিবার—অঞ্চলাগ্রভাগের একটুখানিও দেখিবার প্রত্যাশায় দুর্ব্বলতার আবেষ্টনে তাহার মন-প্রাণ ঝুঁকিয়া উঠে। সেদিনকার সেই তেমনি একটুখানি উপদেশ না হউক—জিহ্বায় সুতীক্ষ্ণ বিষ সঞ্চারিত করিয়া লইয়াও সে যদি পলকের জন্য এক-আধবার কাছে আসিয়া ছেলেবেলাকার বন্ধন গরিমাটুকু ফুটাইয়া তুলিত! সেদিন পলকে আসিল, পলকে চলিয়া গেল, সে অনুপম মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে চক্ষু দু'টী যে লজ্জায় জড়াইয়া পড়িল!

গিরি ঐ একটা দিন ভিন্ন তাহার সম্মুখে আর কোন দিন দেখা দেয় নাই। কিন্তু শ্যামের মার নিকট সে সর্ব্বদা খোঁজ লইত। আর সেদিনকার কথাবার্ত্তায় সে জানিতে পারিয়াছিল যে, হিমাংশু তাহাকে পরস্ত্রী বলিয়াই জানিয়াছে। পাছে বেদনার ঝোঁকে একটা গুরুতর কিছু ক্ষতি করিয়া বসে এই আশঙ্কায় সে তাহার গতিবিধি এবং আদর-যত্নের দিকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক মনোযোগী হইয়াছিল। সৌদামিনীকে সে বলিয়াছিল, বামুন-ঠাকুরের আর প্রয়োজন নাই। মুখ ফুটে কেহ কিছু বলেন না, হয় তো অনেকের মুখে এসকল রান্নাবান্না ভাল লাগে না দু'জনা অসুখে পড়লে ঠাকুরদাদাই রেখেছিলেন; এখন তো ভাল হয়েছি, এখন আর দরকার কি?" সৌদামিনী ভবশঙ্করের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিল। সে বুঝিতে পারে নাই কাহার খাওয়ার কষ্ট লক্ষ্য করিয়া ননদিনী এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে ইহাও বুঝে যে, উপর আর নিচু দিয়া একটা মান-অভিমানের দ্বন্দ্ব নীরবে চলিতেছে!

শ্যামের মাকে ছুটির অজুহাত দেখাইয়া হিমাংশু একদিন আফিসে গেল না। গিরি একটী দিন মাত্র দেখা দিয়া যখন দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে তখন আর সাক্ষাৎ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই এইরূপ ধারণায় সে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিল।

সেদিন দুপুরবেলা হরেন আফিসে গিয়াছে। শ্যামের মাও কাজ-কর্ম্ম সারিয়া গিয়াছে তাহার সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, সে দেখিতে পাইল। আরও কিছুক্ষণ বাদে শয্যাত্যাগ করিয়া সে উঠিয়া বসিল এবং অঙ্গনে পা দিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল। তারপর সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া সে উপরে উঠিতে লাগিল। গিরির সঙ্গে তাঁহার গ্রাম্য এবং পড়শীর যে সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আটকায় না। কিন্তু গিরিকে সে পরস্ত্রী বলিয়াই জানিতেছে; এতদিন একবাড়ীতে বাস করিয়াও ছেলেবেলাকার সে-সম্বন্ধ সে-গৃহের পরিজনগণের মুকাবেলায় কোনদিন স্পষ্ট হয় নাই। এক্ষেত্রে নির্জ্জনে উপযাচক হইয়া অন্দরের পুরীতে খবর না দিয়া হঠাৎ সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া অপরের চোখে শুধু দোষের নহে—চরিত্র-বিকারেরও বটে।

সে মনে করিয়াছিল, হরেন যেরূপ রুক্ষপ্রকৃতির লোক তাহাতে ঐরূপ নির্জ্জন অবসর ভিন্ন গিরির সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভব হইবে না কিন্তু সাক্ষাতের সময়ে সে অভিযোগ করিবে কি অভিমান করিবে—অথবা তাহার দোষ-অপরাধ হাসিমুখে সে ক্ষমা করিয়া বিদায় লইবে—ইহার কোন্‌টা সে করিবে, তাহাও কিন্তু তাহার অন্তরে তখন পর্য্যন্ত ভালমত স্থির হয় নাই।

উপরের ঘরগুলিতে কতগুলি নারীর শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে জানা না থাকিলেও পুরুষের মধ্যে হরেনকে ভিন্ন এ বাড়ীতে সে আর কাহাকেও দেখে নাই। সেই ভরসাই তাহার ছিল।

কম্পিত বক্ষে উপরে উঠিয়া প্রথম যে ঘরটীতে সে ঢুকিল, সেই ঘরেই দেখিতে পাইল, পালঙ্কের উপরে

এলায়িত শতদলের মত গিরি অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে! কিছুমাত্র কঠোরতা নাই, বাল্যকালের মতই মুখখানি সুশান্ত।

গিরির হাতের পোঁছাটায় তাহার নজর পড়িল। তাহারই নিষ্ঠুর ধাক্কায় ছুরি বিদ্ধ হইয়া যে স্থানটা কাটিয়া গিয়াছিল, সে ক্ষত-চিহ্নটার দাগ এখনও মিলাইয়া যায় নাই কিন্তু যেদিকে নজর পড়িলে তাহার মনে নূতন রকমের আর একটা সন্দেহের উদ্রেক করিত, গিরির সেই সিঁথিটার উপর তাহার লক্ষ্য হইল না।

যাহাহউক বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া এই হতচেতনা নারীর সৌন্দর্য্যসুখ উপভোগ করিয়া তৃষ্ণা মিটাইতে সাহস হইল না। মৃদুস্বরে সে ডাকিল,—"গিরি?"

গিরি ঘুমঘোরে চাহিয়া দেখিয়া চমকিত হইল। দেখিল, সৌদামিনী কাছে নাই, বুঝি পাশের ঘরে ঘুমাইতেছে। শ্যামের মা বুঝি বাহিরে গিয়াছে! আর দেখিল—তাহার ঘরে অশিষ্ট বাল্য সঙ্গীটী। আর ভাবিল চোরের মত সে গৃহে প্রবেশ করিয়া নিদ্রার অবসরে তৃষ্ণা মিটাইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

বিস্রস্ত বসন সামলাইয়া লইয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। রোষে এবং ঘৃণায় তাহার মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

তীব্র কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল,—"তোমাকে এখানে এ সময়ে কে আস্‌তে বলেছে হিমুদা?"

হিমাংশু যদি কিছু একটা সঙ্গত উত্তর চট্‌পট্ করিয়া দিতে পারিত, তাহাহইলে গিরির মনে যে গ্লানি উঠিয়া ছিল তাহা হয় তো থামিয়া যাইত এবং লজ্জায় সে মুখ নীচু করিয়া ফেলিত! হিমাংশুর মুখে কথা জোগাইল না। চক্ষু দু'টী তাহার করুণ হইয়া উঠিল।

গিরি সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিল, "সেদিন শ্যামের মা'র মুখ দিয়ে যে কথা তোমার বাপ-মাকে জানাতে নিষেধ করে' পাঠিয়েছিলে, আমি জানতুম তার একটা সত্য। কিন্তু শুধু মদ ধর নি—উচ্ছন্নও গেছ?"

হিমাংশু স্তম্ভিত হইয়া গেল। গিরি খাটের উপর জুড়িয়া বসিয়া যে অভিনব অভ্যর্থনা আজ তাহাকে করিল, তাহা প্রলয়ের ঝঞ্ঝার মত ভীষণ! সে বেগ সহ্য করিবার শক্তি তার নাই!!

সে মুখ তুলিয়া দেখিল, গিরির চক্ষু'দুটী কপটতাহীন। কিন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জিতেছে;

কতক্ষণ এইরূপ নীরবে কাটিল কাহারও জ্ঞান ছিল না। হিমাংশুর যখন চমক কিছু ভাঙ্গিল, তখন সে ভাবিল,—সত্যই গিরি এখন পরস্ত্রী। নির্জ্জন কক্ষে তাহার সঙ্গে বলিবার মত অসঙ্গত অসাময়িক মান-অভিমান ভিন্ন আর কি বা ছিল? কিন্তু সে যে তাহাকে কলঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে নিদ্রার সুযোগ ধরিয়া ঘরে ঢুকে নাই, এইটুকু শুনাইয়া দিবার জন্য তাহার ওষ্ঠ দু'খানা একবার নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। গিরি বলিল,—"চোরের মত ঘরে ঢুকেছ, কোন কথাই আমি শুন্‌তে চাই না। যদি আর এক মুহূর্ত্ত এখানে দাঁড়িয়ে কাটাও আমাকেই ঘর ছেড়ে চলে' যেতে হ'বে।"

হিমাংশুর দেহ তখন কাঁপিতেছিল। এই সঙ্গে ভূমিকম্প হইয়া মাটির ভিতর তাহাকে লুকাইয়া ফেলিলে, পিছু হটিয়া যাইবার লজ্জা এবং আরও অনেক রকমের লজ্জা হইতে সে বাঁচিয়া যাইতে পারিত। গিরি রোষ-দীপ্ত কণ্ঠে বলিল,—"যাবে তুমি? না লোক ডেকে জড় করব?"

হিমাংশু চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইলে সে কিছু শান্ত এবং সংযতস্বরে বলিল, "যদি তোমার মুখোমুখি কিছু বলবার থাকে, খবর পাঠিয়ে, শুন্‌বার সময় আমি ক'রে নেব।"

নিঃসহায়ের মত হেঁটমুণ্ডে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

সে কোন বাদ-প্রতিবাদ করিল না দেখিয়া গিরির প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। আশা-ভরসার ভস্মস্তূপের মধ্যে যোগিনীর বেশে সে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

হিমাংশুর ঘরে শ্যামের মা গৃহে ফিরিয়া সর্ব্বপ্রথমে একবার উঁকি মারিয়া দেখিল। এটা তাহার স্বভাব ছিল। ঘরটী শূন্য দেখিয়া ভাবিল, কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গিরিকে জিজ্ঞাসা

করিল,—"আমার ছেলেকে তো দেখ্‌ছি নে মা! কোথায় গেল?"

গিরি শুষ্কমুখে বলিল, "আমি তার কি জানি?"

কিন্তু তড়িৎপৃষ্টের মত তাহার অন্তর একবার কাঁপিয়া উঠিল। অল্প পরে সে বলিল, "রাগ করেছেন বোধ হয় একবার খোঁজ কর না?"

শ্যামের মা ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বকেছ না কি? কি মানুষ গা? সাতেও নেই, পাঁচেও নাই, বাড়ীর এককোণে পড়ে' রয়েছে! তোমাদের রীত-চরিত্তির একটুও ভাল নয় মা!"

গিরি বলিল, "সাতে নয়, পাঁচে নয়, পঁয়ত্রিশে আছেন। সে যাক্—তবু ছেলে তো? শুধু শুধু আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে লাভ নেই, তা'তে আর কতটা টান্ দেখাতে পারবে?"

সে মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "আমার বয়ে গেছে খোঁজ করতে। ভরা সোমত্ত মেয়েমানুষ! তোমাদের কেন অত গা? যা' বল্‌বার আমিই তো বল্‌ব। পুরুষ মানুষের সঙ্গে লড়াই কর, ছিঃ! ছিঃ! ঘেন্নার কাণ্ড এ সব!"

গিরির হাসি পাইল। অন্তরের বেদনায় তাহা ফুটিতে পারিল না। সে বলিল, "আমাদের শাসন এর পরে করলেও তো চল্‌তে পারে শ্যামের মা; দেরি হয়ে গেলে যে খোঁজ পাবে না।"

"খোঁজ আর পেয়েছি বাছা! শহর জায়গা—একটা মোড় ঘুরলেই তলিয়ে যায়! ঘরে বসে বসে ঘোড়সোয়ারী করবে বইতো নয়!"

সে গস্ গস্ করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল। বাড়ীর সম্মুখের রাস্তাটা এবং গলির মুখগুলি দেখিয়া-শুনিয়া সে ফিরিয়া আসিল। বাস্তবিকই তো এতবড় প্রকাণ্ড শহরে এত রাস্তা-ঘাটের মধ্যে কোথাও সে সন্ধান করিবে? ঘরে ফিরিয়া আসিয়া হিমাংশুরগৃহের দরজাটা খুলিয়া সেইখানে চৌকাঠের কাছে সে বসিয়া রহিল এবং গালে মুখে হাত দিয়া উদাসভাবে পুনঃ পুনঃ শূন্য শয্যাটার দিকে তাকাইতে লাগিল। গিরিও উপরকার গবাক্ষ দিয়া রাজপথের দিকে তাহার উচ্ছৃঙ্খল চক্ষু দু'টী নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দু'দিন গেল, হিমাংশুর খোঁজ হইল না। বাড়ীর মধ্যে একটা স্তব্ধভাব দেখিয়া হরেন এক এক সময় সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল যে, ইহাতে দুঃখিত হইলে চলিবে কেন? ভদ্র আচরণ সে জানিবে কোথায়?—যে বলিয়া কহিয়া বিদায় লইবে! আর জানিলেও নেশার ঝোঁকে জ্ঞান হারান কিছু বিচিত্র নয়।

সৌদামিনী ব্যাপারটা ভালমত বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তার হরেনদার উপর সন্দেহ করিয়া সে মৌনী হইয়া রহিল। গিরি ভাবিল,—হিমুদার এ আত্মবিস্মৃতি কেন? এই মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়াই তো! হয় তো সেদিন তাহার মনে কোন কু-অভিপ্রায় ছিল না। শুধু ভব্যতারই অভাব ছিল। কিন্তু তার যথেষ্ট প্রমাণ কি? সে যেখানেই যাক্ না কেন, নারায়ণ! তুমি আমাকে ভাবিতে যথেষ্ট বল দাও যে তাহার মনে কোন পাপ ছিল না। এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেও সময় সময় আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিল। আর শ্যামের মার দেহ হইতে রক্তের স্রোত খালি হইয়া তাহার হাত-পায়ের কর্ম্মের জোর যেন কমিয়া গেল!

সেদিন আফিসের ছুটির পর ফিরিবার পথে হরেন কোন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল এবং কথায় কথায় তথায় বেশ রাত্রিও হইয়া গেল। সে যখন একটা গলি পার হইয়া কলেজ-স্কোয়ারের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে এমন সময় গুণ্ডা-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। হিমাংশু বাগানের ভিতর একখানা বেঞ্চির উপর শুইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, গুণ্ডাটা একখানা ছোরা তুলিয়া হরেনের নিকটে টাকা-পয়সা চাহিতেছে। হিমাংশু পশ্চাৎ দিক্ হইতে সহসা ছুরিসমেত তাহার হাতের পোঁছা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"ওঁর কাছে বোধ করি কিছু নেই। থাক্‌লে দিয়ে দিতেন। এই টাকা ক'টা নিয়ে তুমি ওঁকে অব্যাহতি দাও।" বলিয়াই পকেট লইতে দশ টাকার দু'খানা নোট টানিয়া বাহির করিয়া গুণ্ডাটার বামহস্তে সে গুঁজিয়া

দিল। সে তাহা লইয়া একটা গলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরেন প্রথমটা কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে হিমাংশুর দিকে চাহিল। কিন্তু বাড়ীর মেয়েদের একটা অকারণ এবং বিধির অতিরিক্ত ঝোঁক এবং করুণা এই তরুণ যুবার উপর কাজে-অকাজে বর্ষিত হইতে দেখিয়া তাহার ঈর্ষা হইত। এমন লোককে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তাহার জেদ ছিল না। শুধু ভদ্রতার খাতিরে সে বলিল,—"চলুন বাড়ীতে যাই। একটা খবর পর্য্যন্ত দিয়ে আসেন নি। আজ দু'দিন খোঁজ খবর নেই, বাড়ীর সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

হিমাংশু বলিল, "আমি তো এখন যেতে পাচ্ছি না। আপনি একলাটী যাবেন না বরং একখানা ট্যাক্সি আমি ডেকে দি।"

এই বলিয়া হরেনকে কথা বলিবার অবসর না দিয়া হ্যারিসন রোডের মোড়ে সে চলিয়া গেল এবং একখানা ট্যাক্সি সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে ফিরিয়া আসিল।

হরেন গাড়ীতে চড়িবার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কবে যাচ্ছেন তা' হলে? কাল?"

হিমাংশু বলিল, "দেখি।"

ট্যাক্সিখানা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সে আবার বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল।

হিমাংশুর প্রতি শ্রদ্ধায় হরেনের অন্তঃকরণ ভরিয়া না উঠিলেও, সে কিন্তু কিছুই গোপন না করিয়া এই দুর্ঘটনার ব্যাপারটা বাড়ীতে আসিয়া যথাযথভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিল। শ্যামের মা, সৌদামিনী ও গিরি সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহারা হিমাংশুর সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিল।

গিরি সমস্ত শুনিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। সেই সৎসাহস—সেই সাধুতা—বিপদে শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ বিচার না করা—বালককালের সকল গুণগুলিতেই দেখি হিমুদার অন্তরটী এখনও অলঙ্কৃত হইয়া আছে। শুধু—সে আর ভাবিতে পারিল না। শ্যামের মাকে তখনি-তখনি কলেজস্কোয়ারে পাঠাইবার জন্য তাহার ব্যগ্রতা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু নিজের জীবন যাহার হাতে রক্ষা পাইল, হরেনবাবু যখন সহজে তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিতে পারিলেন, তখন সেইই বা এখন তাহাকে কি সূত্রে আনিতে পাঠায়। তাহার অন্তরের মধ্যে খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রসঙ্গটা থামিয়া যায় দেখিয়া সে শুধু তাহার সকরুণ নেত্র দু'টী শ্যামের মার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া ধরিল। সৌদামিনী ইহা লক্ষ্য করিল। সে বলিল,—"যিনি তোমার জীবনরক্ষা করলেন, তাঁকে শুধু মুখের কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে অন্ততঃ আজকের রাতটার মত ঘরে অভ্যর্থনা করে' আনলে সঙ্গত হ'ত হরেন-দা!"

হরেন বলিল, "কি করে' আনব বল? ও সব লোকে গোঁ ধরলে কি আর ফেরান যায়?"

শ্যামের মা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "একবার নীচে যা'বে মা? সদরদরজাটা বন্ধ করে' দিতে?"

হরেন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তুমি আবার এত রেতে কোথায় যাবে?"

"যেথায় খুসী। কাজকর্ম্ম মিটে গেলেও তোমাদের তাঁবেদারীতে থাকতে হ'বে না কি? অমন কাজের মুখে ঝাড়ু মারি। তুমি এস মা! দরজাটা বন্ধ করে' দাও।"

গিরি ও সৌদামিনী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নীচে নামিয়া গেল। ফটকের ধারে আসিলে সৌদামিনী বলিল, "শ্যামের মার কাজ নয় তাঁকে ফিরিয়ে আনা। চল না আমরা সবাই যাই?"

গিরি বলিল, "সবাই কে কে?"

"হরেনদাকে আর নেব না। নিলেও বেশী কিছু সুবিধে হ'বে না। নিজেদের গাড়ী রয়েছে—ভয় কি? তুই যা তো শ্যামের মা। সহিসকে গাড়ী যুড়তে বলে দে।"

সহিস আস্তাবলের নিকটে একটা ঘরে থাকিত। শ্যামের মা তাহাকে ডাকিয়া তুলিল এবং গাড়ী লইয়া চলিয়া আসিল। হিমাংশু যে কলেজস্কোয়ারের বাগানের মধ্যে পুনর্ব্বার ঢুকিয়াছে, হরেনের মুখে তাহারা তাহা শুনিয়াছিল।

গাড়ীর শব্দ পাইয়া হরেন নীচে নামিয়া আসিল। বলিল, "তোমরাও চলেছ না কি সদু?"

"হাঁ, তুমি দরজাটা বন্ধ করে উপরে যাও, আমরা এখনি ফিরে আসছি।"

শ্যামের মা বলিল, "হাঁকিয়ে দে রে—আর দেরী করিস্ নে।"

গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

রাত্রি তখন গভীর। শহরটা মৌন হইয়া শুধু পুলিস-প্রহরী দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তখনও পথে দু'এক জন লোক চলাচল করিতেছিল। কোনরূপ গোলমাল ছিল না।

হিমাংশু পথে পথেই ঘুরিতেছে আর আফিস করিতেছে। দোকানের অতি সামান্ত খাদ্যে আজ দু'দিন সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে। মাথা গুঁজিতে একটু আশ্রয় চাই, তখনও সে-কথা তাহার মনে উঠে নাই। এমনই উদ্ভ্রান্ত—এমনই উদাস সে।

ভাল বা মন্দ যে অভিপ্রায়েই হউক নিদ্রাচ্ছন্ন পর-নারীর উপর নির্জ্জনে দেখা করা চরিত্রের দুর্ব্বলতা এ কথা সে স্বীকার করে। কিন্তু আজিও ছেলেবেলাকার মুখের যে সম্বন্ধ লইয়া ঐ নারী তাহাকে আহ্বান করিতেছে, সেই সম্বন্ধ ধরিয়া, অথবা বালককালে বয়সের হিসাবে যেটুকু শিক্ষা সে তাহার নিকটে পাইয়াছে সেই সম্ভ্রম ধরিয়া ধারণা কিছু উচ্চ করিবার কিংবা ক্ষমা করিবার সৎসাহসও তাহার ছিল। রক্তচোখে লোক জড় করিবার ভয় না দেখাইয়া মিষ্ট মুখে দেহে বিষ সঞ্চারিত করিয়া দিলেও সে যেরূপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গিয়াছিল, সেইরকম নামিয়া যাওয়া ভিন্ন অন্ত কোন দুঃসাহসের আশঙ্কা তাহাকে জাগরিত করিয়াই তো সে মিটাইয়া দিয়াছিল। খাওয়া ও থাকার অপর্য্যাপ্ত দয়া দেখাইয়া অবশেষে পায়ে থেঁতলাইয়া অদ্ভুত রকমে সকল সম্পর্ক সে শেষ করিয়া দিল? সম্পর্ক যদি রাখিবে না,সেদিন উপদেশ দিবার ছলে পরপুরুষের কক্ষে রূপের পসরা লইয়া প্রবেশ করিয়া স্মৃতির সঙ্গে তৃষ্ণা জড়াইয়া দিবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল? আর শেষের দিনে দুর্ব্বৃত্তের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার ভরসায় মাতাল ও কুচরিত্র বোধে উচ্ছন্ন গিয়াছে বলিয়া যে গর্ব্বিত অস্ত্র সে ব্যবহার করিল, সঙ্গে সঙ্গে যদি পিতা-মাতার কষ্টের কথা তুলিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার কিছু নীতিজ্ঞান ও মমত্ব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত।

দুঃখ ও দুর্দ্দশার মধ্যে দিন কাটাইয়া অকলঙ্ক চরিত্রের পুরস্কার যখন তাহার এই রকমের হইল, তখন ক্রন্দনের রুদ্ধ চাপে তাহার বক্ষ এই দুঃখে ফাটিয়া যাইতেছিল যে, তাহার নির্দ্দোষ পিতামাতাকে অকারণ কষ্ট দিয়া যে পাপ সে কিনিল, তাহার শাস্তি এই অর্ব্বাচীন বালিকার দেওয়া শাস্তি অতিক্রম করিয়া কেন উপরে উঠিতেছে না, এইরূপ বিক্ষিপ্ত মনে লজ্জা, দুঃখ ও ঘৃণায় তাহার মাথায় কখন বা আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছিল, কখন বা আত্মঘাতী হইবার ইচ্ছাও সে করিতেছিল। এমন সময় শ্যামের মা আসিয়া ব্যস্তভাবে ডাকিল, "কি গো বাছা, একজনকে তো গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচালে, আমার একটু উপকার কর না, আমি যে মহা বিভ্রাটে পড়েছি।"

শ্যামের মা তাহার দুই হস্ত জড়াইয়া ধরিল।

হিমাংশু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। বলিল, "কি বিপদ শ্যামের মা?"

"এখানে দাঁড়িয়ে বলার সময় নেই বাছা! ফটকের কাছে এস তুমি—আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না।"

এই বলিয়া তাহার হাতে সজোরে টান দিয়া ফটকের দিকে ছুটিতে লাগিল।

হিমাংশু কাপড় চোপড় সামলাইতে সামলাইতে পিছু পিছু চলিল। শ্যামের মা তাহাকে ঘোড়ার গাড়ীর নিকটে আনিয়া হাজির করিল।

গাড়ীর দরজা খোলাই ছিল। গিরিকে দেখিবামাত্র হিমাংশুর মুখ বিবর্ণ হইয়া নীচু হইয়া পড়িল। গিরি কাতরকণ্ঠে বলিল,—"গাড়ীতে এস হিমুদা! রাগ কর কেন? দয়া-মায়া কিছু নেই তোমার?"

হিমাংশু মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু গিরির মুখের প্রতি শব্দটা বুকের রক্তে জীবন্ত হইয়া তাহার কাণের কাছে বাজিয়া উঠিতে লাগিল।

গিরি বলিল, "দোষ তো একজনা করি নি? শোধ-বোধ

দাও না সেটা? আমাকেও কাঁদাবে—তুমিও কাঁদবে?"

শ্যামের মা বলিল, "কি বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড তোমার বাছা! তিন পিরথিম ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হ'য়ে গেছি। তুমি তো খাণ্ডিব দাহন করে' বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বসেছ! আমরা যে জ্বলে পুড়ে মরি! এস, পুলিসের লোক আসছে, পথের মাঝে হল্লা করে' লোক হাসিও না। উঠে এস?"

হিমাংশু মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার যে কি বিপদের কথা বল্‌ছিলে?"

"বিপদ নয়? দু'দিন না খেয়ে না দেয়ে পড়ে রয়েছ! কি করে' ভাত মুখে দেই বল তো বুড়ো মানুষ বলে' আমাকে অগ্রাহ্যি কর, তাই তোমার কাছে ধরে এনেছি এ বড় শক্ত বাঁধন বাছা! আমরাই কাটাতে পারলুম না!"

গিরি বলিল, "সত্যি হিমুদা! ঝগড়া করে যদি জিততে চাও—বাড়ীতে চল অনেক সময় পাবে। আমার কথা যদি নাও রাখ, এই শ্যামের মা আর আমাদের বৌ-ঠাকরুণ তোমাকে অনুরোধ কচ্ছেন এঁদের মর্য্যাদা রাখা তোমার উচিত। তারপর না পোষায় তুমি আবার চলে এস? বৌঠাকরুণ মুখ ফুটে তোমায় কিছু বলতে পারছেন না, কিন্তু চোখ দুটো শঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে যে, তাঁর এই সামান্য উপরোধ অমান্য করে' পাছে তুমি তাঁকে আঘাত কর।"

ইহার উপর আর কথা বলা চলে না—দাঁড়াইয়া থাকাও চলে না। শ্যামের মা পুনর্ব্বার হাত ধরিয়া টানিতে সে মুখ নীচু করিয়া উপরে সহিসের পার্শ্বে গিয়া বসিল।

সহিস গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

হঠাৎ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া হিমাংশু চলিয়া আসিল বটে, কিন্তু গিরির শ্বাস-প্রশ্বাসের অধিকারের মধ্যে বাস করিতে থাকিয়া তাহার জীবন-প্রবাহ যেন দিন দিন বালুকার মধ্যে আটকাইয়া শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। গিরি অন্তরালে থাকিয়া দেখিতেছে, আর নিজের শাসনপদ্ধতির কঠোরতার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে! ইনি নারীর মর্য্যাদা রাখিলেন সত্য, কিন্তু অনেকের চোখে অত্যন্ত খাট হইয়া পড়িলেন যে! এ ভাবে মাথা নীচু করিয়া কাছাকাছি আসিয়া না দাঁড়াইলে যেন ভাল ছিল। গিরির মনে তখন এই দ্বন্দ্বই উঠিতেছিল।

সে ভাবিতেছিল,—হিমুদা বোধ করি ভাবিয়া আসিতেছেন তাঁহাকে অযোগ্য বিবেচনা করিয়া চিরদিন আমি উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন এবং মাতার মস্তিষ্ক সুস্থ ছিল, ততদিন আমার কাছে প্রেম-নিবেদন-করা তাহার উচিত হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহার পর এ বুকের ভিতর সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে দাবানল জ্বলিতেছে, তিনি বোধ করি তাহার কিছুই খবর পান নাই কিন্তু—

কিন্তু সে যখন কতকটা স্বাধীন মতের অধিকারিণী হইল এবং হিমাংশুকে অপ্রত্যাশিতভাবে কাছে পাইয়া পরীক্ষার দ্বারা বুঝিল যে, যশ, খ্যাতি ও সম্পদের সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করিয়া সংসারের এই উদ্ভ্রান্ত পথিকটী নিজের জীবন এবং চরিত্র নষ্ট করিতে বসিয়াছে, তখন এক লহমার জন্য বিদ্যুৎ-চমকের মত যদি সে তাহাকে দেখা দিতেই গেল, নিশ্চিত একটা আশ্বাসের দ্বারা প্রাণের বেদনা কেন সে জুড়াইয়া তুলিল না? যদি এ ভুল তাহার না হইত, সেদিন সেই নির্জ্জন দুপুর বেলা শিহরণের ভিতর দিয়া সে তাহাকে সম্ভাষণ করিতে যাইবে কেন?

গিরি ভাবিয়া দেখিল, দোষের সমস্ত অংশটা সে নিজে গ্রহণ করিতে পারে কি না? সামাজিক সুবিধি অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত গলা চাপিয়া না ধরিলে সম্ভব হইত বটে। নারী যে সে! নিজের ইষ্টকথা বুকের বাহির করিবে, বেহায়াপনা আর কাহাকে বলে? পুরুষে দয়া করিয়া যে বিচার করিবে, তাহারা মুখ বুজিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া নিজেকে নির্ব্বিঘ্ন মনে করিবে, শৈশব হইতে এমন সংস্কারের মধ্যে জড়িত থাকিয়া সৌদামিনীর কাছেও সকল কথা খুলিয়া বলিতে তাহার বাধা ঠেকিয়াছে। সে বাধাটুকু হয় তো কাটিয়া

যাইতে পারিত, যদি না সে হরেনকে লইয়া একটী গোলক-ধাঁধাঁর সৃষ্টি করিয়া বসিত। আর ভবশঙ্কর যদি দেশে গিয়া কাজের মধ্যে আটক না পড়িতেন তাহা হইলেও তাঁহাকে আকারে ইঙ্গিতে অনেক কথাই বুঝাইয়া দিতে পারা যাইত। ইহার কোনটাই হইল না—ভাগ্যদেবতা অলক্ষ্যে থাকিয়াই কটাক্ষ করিলেন। এ তীব্রতা মুছিয়া যাইবে কবে? কতদিনে?

তারপর সে যাহা ভাবিতে বসিল, তাহা ভাবিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কিন্তু উপায় কি? এ পর্য্যন্ত দোষগুণ কম-বেশী যাহার যতটা থাকুক না কেন পরস্ত্রী-বোধে নিদ্রিতা নারীর শয্যাপার্শ্বে নির্জ্জনে লালসাতুর চোখে অবস্থিতি করা—চরিত্রের এ সর্ব্বপ্রধান অপরাধ মোহবশে ভুলিতে পারিলেও ইষ্টদেবতার স্থানে বসাইবার কোন গুণই তো সেখানে অবশিষ্ট রহিল না! সে বসিয়া বসিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। এক একবার যখন হুঁস হইতেছিল, কখন ভাবিতেছিল যে, না—না, এ দোষের সংশোধন না হইলে কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। গ্রহণ করিলে হৃদয়ে সত্যবস্তু বলিয়া কিছুই থাকিল না। আর। এই অপরাধে নারীকে পরাধীনা রাখিবার বিধির উপর পুরুষে একটা বাঁধন আঁটিবে।

সেদিনকার সে কুক্রিকায় গিরি যতটা আহত হইয়াছিল, হিমাংশুর অনুতাপে তত বেশী হয় নাই—যত হইয়াছিল গিরির ব্যবহারে; কারণ গিরিকে জাগ্রত পাইবে ভরসা করিয়াই সে উপরে উঠিয়াছিল। যখন তাহাকে নিদ্রিত দেখিল, তখন নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টাও সে করিয়াছিল। সে তাহাকে পরস্ত্রী বলিয়া জানিত সত্য, কিন্তু কতটা ভদ্রতা রক্ষা করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়ান যায়, বুঝিবার—বিচার করিবার মনের স্থিরতা অবস্থার গতিকে তাহার ছিল না। সে তাই নিজের দোষের অপেক্ষা গিরির অপরাধই অধিক মনে করিতে পারিয়াছিল।

অকস্মাৎ গিরিকে অত্যন্ত নীচু করিবে অভিপ্রায় থাকিলে এবং গিরি মুখে যাহাই বলুক না কেন, অন্তরে অন্তরে তাহাকে এতটা হীন ভাবিয়াছে বিশ্বাস করিতে পারিলে, পুনর্ব্বার স্নেহের এ দাবী সে অগ্রাহ্যই করিত। কালো মুখ লইয়া কখনই সে ফিরিয়া আসিত না।

সে মনে করিয়াছিল, গিরি বোধ করি অনুতপ্ত হইয়াছে। ফাঁক বুঝিয়া নিজেই এক সময় উপস্থিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া যাইবে। সে সকল কিছুই হইল না। অধিকন্তু শ্যামের মার হাত দিয়া গিরির আদর-আপ্যায়ন ভ্রুকুটি করিয়া যেন নির্দ্দেশ করিয়া দিতে লাগিল যে, মেয়েটী যেন শত্রুকে বড় পিঁড়িখানাই আগাইয়া দিতেছে। এইরূপে উভয়ের এক একটা দিন যেন এক একটা যুগের মতই চলিতেছিল। ইতিমধ্যে ভবশঙ্কর একদিন আসিয়া অঙ্গনে দাঁড়াইয়া গিরিকে ডাক দিলেন।

পরিচিত গলার আওয়াজ পাইয়া হিমাংশু ত্রস্তে জানালার পথে উঁচু হইয়া দেখিল,—অঙ্গনে ভবশঙ্কর। সে মাথা নীচু করিয়া ডুব মারিল। বুকের মধ্যে তাহার ধড়ফড় করিতে লাগিল।

ভবশঙ্কর উপরে উঠিয়া গেলেন। গিরি ও সৌদামিনী ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভবশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল তো সব? এমন তাড়াহুড়ো করে' চিঠি লিখেছ—পড়ি কি মরি! বুড়ো মানুষ সে জ্ঞানটা তো থাকবার কথা!"

সৌদামিনী বলিল, "চোখের আড়াল হ'লে আপনার তো আর মনে থাকে না। ঠাকুরমার বাঁধন নেই, তা'তেই এই!"

ভবশঙ্কর বলিলেন, "ওটা আমার দোষ নয় সদু! মায়াটা ঠিক যেন দুধের প্রকৃতি। আগুনের সংস্রব পেলেই উথলে উঠে—নয় তো স্থির। তারপর খবর ভাল তো?—তোমার স্কুলের ভিত কাটা হ'য়ে গেছে। বারটা কুঠরীর পত্তন করে' দিয়ে এসেছি। লাইব্রেরী-ঘরটা বড় করতে বলেছিলে না? দোতলার দুটো ঘর জুড়ে একটা হ'বে, ব্যবস্থা করে' দিয়ে এসেছি। গ্রামে রৈ রৈ পড়ে গেছে,—তাকে দেশে-ঘরে আন।—তাকে দেশে-ঘরে আন। গিরীশ তো লতাটার মত নেতিয়ে পড়েছে। তার বাড়ী-ঘর ক্রোক্ করতে এসেছিল। গ্রামের লোকের সঙ্গে যে এত ভাব-ভক্তি, একটা কাণা কড়ি দিয়েও কেউ সাহায্য করলে না। তোমার টাকাটা দিয়ে যখন তাকে ঋণমুক্ত করলুম, তখন সে আমার পা দু'খানা ধরে' কাঁদতে লাগল যে,—আমাদের অত্যাচারে চলে গেছে

সে, তাকে এনে দেন আপনি। গঙ্গাধর সমাজের কি কি ছিলেন আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি! তাঁর রীত-প্রকৃতি নয়েই মেয়েটী জন্মেছে, সে দেশে-ঘরে এলে দেশের অনেক মঙ্গলই হ'বে। আপনি তাকে এনে দিন্, আমরা ও-ইট, কাঠ, চুণ, বালি চাই না।"

গিরি মুখ নীচু করিয়া বলিল, "তাঁদের কৃপাদৃষ্টি আমাদের উপর প'ড়েছে শুনে সুখী হ'লুম। কিন্তু তাঁদের রুচিমত না চল্‌লে এ সুদৃষ্টি বেশীদিন থাক্‌বে না। দেশের কাজ করতে বাবাই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, যেখানেই থাকি—সে কি আমি ভুল্‌তে পার্‌ব? বাবার উপর তাঁরা বৃথা একটা আক্রোশ পুষে না রাখেন; যদি কিছু দয়া আমাকে তাঁদের করার থাকে, এইটুকু যেন করেন।"

অনেক্ষণ সকলে নীরবে থাকিবার পর গিরি বলিল, "মা'র শরীর খুব খারাপ হ'য়ে পড়েছে। আগে এক-আধটু বারান্দায় এসে বস্‌তেন—এখন আর তাও বসেন না। নিজের ঘরের কোনটীতে বসে কেবলই বকাবকি করেন। আমারও মন-প্রাণের অবস্থা এমন হয়েছে যে আর মুহূর্ত্তকাল এখানে থাক্‌লে বোধ করি আমিও পাগল হ'য়ে যাব। মাসীমা'রা গিরিডি আছেন, তাঁকে চিঠি লিখে আমি বন্দোবস্ত করে' ফেলেছি। চলুন দিন কতক সেখানে গিয়ে বাস করে' আসি। আসুন তবে এসে বসুন।"

ভবশঙ্কর ঘরে ঢুকিয়া খাটের উপর বসিয়া বলিলেন, "গিরিডি বেশ জায়গা শুনেছি, কিন্তু এ সকল কার ঘাড়ের উপর ফেলে রেখে যাবে? হরেনও কি যাবে?"

"তাঁর তো ছুটী নেই। এখানকার জন্য আপনার ভাবনা নেই। সে আমি ঠিক করে দেব'খন্। হরেনবাবুও রইলেন।"

ভবশঙ্কর বলিলেন, "ভাল। সে ছোঁড়াটার কোন খোঁজ পেলে? তার বাপ-মার যা' অবস্থা হয়েছে! আহা! ঐ একটী মাত্র ছেলে তো! দুটীতে সর্ব্বক্ষণ আমার কাছে এসে কেঁদে-কেটে লুটোপুটি! তাদের ধারণা, আমি মনোযোগী হ'লে তাদের হারানিধিকে খুঁজে বের করে' দিতে পারি।"

কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা বলিল-না। ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর সৌদামিনী বলিল, "ঠাকুরদাদা! আপনি জামা-কাপড় ছেড়ে চান্‌টা করে ফেলুন। গাড়ীতে ঘুম হয় নি। একটু জলটল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। ভাত না হয় একটু দেরী করেই খাবেন।"

ভবশঙ্কর বলিলেন, "এ খুব ভাল ব্যবস্থা দিদি! কে বলেছে তোরা বিধি-ব্যবস্থা কিছু জানিস্ নে! কিন্তু নেশাটা তো দেরী করলে চল্‌বে না! শ্যামের মা কোথায়? একছিলিম তামাক সেজে দিত!"

গিরি বলিল, "সে বাজারে গেছে, দেখি আমি সেজে দিচ্ছি।"

সৌদামিনীর ব্যবস্থামত কার্য্যগুলি শেষ করিয়া ভবশঙ্কর শয্যায় আশ্রয় লইলেন।

হিমাংশু ঘরের বাহির হয় নাই। ভবশঙ্করকে দেখা অবধি সে আপনাকে আড়াল করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। নাকে মুখে দুটী গুঁজিয়া সে আফিসে গেল এবং রাত করিয়া ফিরিয়া আসিল।

সকালবেলাটায় ভবশঙ্করের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে—হরেনের তেমন অবকাশ হয় নাই। সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, ইহারই প্রশ্রয়ে স্বেচ্ছাচারিতার পথে মেয়ে দুইটার যে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, সাম্‌নাসাম্‌নি না হউক ভবশঙ্করকে নির্জ্জনে ডাকিয়া সে সতর্ক করিয়া দিবে।

আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, বিছানা-পত্র সব বাঁধা-ছাঁদা হইতেছে। ভাবিল,—ঠাকুরদাদা বোধ করি ইহাদের দেশের বাড়ীতে লইয়া যাইবেন। সে কিছু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুরদাদা বুঝি আমাদের স্নেহের নীড় ভেঙ্গে দিতে এসেছেন?"

ভবশঙ্কর হাসিয়া বলিলেন, "ইচ্ছে তো হয় যে, হাত-পাগুলা ছুঁড়াছুড়ি করি। ওতে না কি রক্তসঞ্চালনের ক্রিয়া হয়। এ জীর্ণ দেহে পেরে উঠি কই? ভাঙ্গচুর করার এখন তোমাদেরই বয়েস।"

হরেন বলিল, "কিন্তু এতটা ভাঙ্গচুর করতে সহসা আমরা সাহস করি নে।"

ভবশঙ্কর বলিলেন, "সাহস তোমাদের নেই সে আমি জানি। কিন্তু দুঃসাহসের বেলায় আটকায় না।"

হরেনের মুখে আসিতেছিল বলে যে,—মেয়েরা এ বিষয়ে তাহাদেরও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কিন্তু সম্মুখের চারিটা চক্ষুর উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে থামিয়া গেল।

ভবশঙ্কর বলিলেন, "হরেনকে কিছু বল নি বুঝি? ঘর-সংসারের ভার নিয়ে ওকেই তো থাক্‌তে হ'বে। সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিতে হ'বে তো!"

গিরি বলিল, "কল্‌কাতায় কিছু জমীদারী নেই যে তাই বুঝিয়ে দিতে সময় লাগ্‌বে। আপনি পায়-পায় গিয়ে জিনিস ক'টা কিনে আনুন। সকালে তো সময় হ'বে না। আমি বরং বৌঠাকরুণকে নিয়ে সকালের খাবারটা তৈরী করে রাখি। ট্রেণ তো ভোরেই।"

গিরির মাসীমা এবং তাঁহার ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনিতে ভবশঙ্কর বাজারে চলিয়া গেলেন; সৌদামিনীকে লইয়া গিরি রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

এই অচিন্ত্যনীয় ব্যাপারে হরেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে আবিষ্টের মত কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা দু'খানা ঘোড়গাড়ীতে জিনিস-পত্র উঠিতে লাগিল। শ্যামের মাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গিরি মিষ্ট খাইতে তাহার হাতে দশটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে শান্ত করিল এবং নানারূপ উপদেশ দিল। সকলে ঘোড়গাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে সৌদামিনীকে সে বলিল, "মাকে নিয়ে তুমি গাড়ীতে গিয়ে ওঠ।"

সে শ্বশ্রূকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলে ভবশঙ্কর ও শ্যামের মাকে সঙ্গে লইয়া—গিরি একটু দূরে সরিয়া গেল। হরেনও নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। গিরি ভবশঙ্করকে বলিল, হিমুদার সঙ্গে একবার দেখা করে' যাবেন না? তিনি আমাদের বাড়ীতেই আছেন যে!"

ভবশঙ্কর অত্যধিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "হিমাংশু?"

গিরি বলিল, "হাঁ।"

শ্যামের মাকে দিয়া হিমাংশুকে সে ডাকিতে পাঠাইল। হিমাংশু আসিয়া ভবশঙ্করের পদধূলি লইল এবং নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

গিরি বলিল, "এঁকে অনেক কথাই বলার আছে আপনার ঠাকুরদাদা! কিন্তু সে সময় তো হ'বে না। বরং আমি সংক্ষেপে কিছু বলে' কাজ সেরে নি।" এই বলিয়া হিমাংশুর দিকে মুখখানা সে ফিরাইল এক তাড়া চাবি তাহার হস্তে ধরিয়া দিয়া বলিল, "বাড়ী-ঘরের সমস্ত ভার তোমার উপর রইল হিমুদা! নীচের ঘরে আর থেক না। শ্যামের মাকে সে সব বলে দিয়েছি। হাত-বাক্সটা খুলে দেখলে দেশের স্কুল এবং এখানকার অনাথ-আশ্রমের কাজের তালিকা একটা তুমি পাবে। বাবার অনেকগুলি সৎসঙ্কল্পের কথা আমি জানি। বাবার কাছে শিক্ষা আমি শুধু পাই নি—তুমিও পেয়েছ। তাঁর সঙ্কল্পগুলি সফল করে' তুল্‌তে আমি যেমন ঋণী,—সেইরূপ তোমাকেও আংশিক দায়ী করা যায়। ব্যাঙ্কে টাকার সুদ খুব কম। কোন ব্যবসায়ে ঐ টাকাটা সুবুদ্ধির সঙ্গে খাটালে অনেক আয় হয়। ঐ রকম কোন ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা-লাভের চেষ্টা হাতে-কলমে তুমি কর— যদি আমার কথা শোন—আর তাই তুমি কর—আমরা উভয়ে তাঁর কাছে ঋণমুক্ত হ'তে পারব। তাঁর মুক্ত আত্মা শুধু আগ্রহে আমার দিকে ব্যগ্র হ'য়ে নেই—তোমার দিকেও রয়েছে। তোমার কাছে ভবিষ্যতের অনেক প্রত্যাশাই তাঁর ছিল। তুমি যতটা না জান—আমি জানি।"

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "এর বেশী কিছু জানার দরকার হ'লে চিঠি লিখ—ঠিকানা দেওয়া আছে। ঠাকুর রৈল, শ্যামের মাকেও রেখে গেলাম, তোমাদের কষ্ট হ'বে না। হরেনবাবুর সঙ্গে তোমার অ-বনিবনারও কোন কারণ নেই।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে একটুখানি থামিল। তারপর ঢোক গিলিয়া সে বলিল, "আর একটা কথা। এতদিন তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। চেয়ে দেখ, আমার সিঁথি এখনও সাদা আছে। সেদিনকার দুপুর-বেলার ঘটনাটা তোমার চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলঙ্ক। এই কলঙ্ক মুছে ফেলে নিজেকে সংস্কৃত কর্‌বার জন্য ঠাকুরদাদার পা ছুঁয়ে যদি মনে মনে প্রতিজ্ঞা—আর সে দৃশ্যটা দেখে যাবার সুযোগ

আমাকে দাও—আমি তৃপ্তির সঙ্গে গাড়ীতে উঠতে পারি।"

হিমাংশু নতমস্তকে ভবশঙ্করের পদধূলি লইল।

গিরি বলিল, "দিন লাগুক—বর্ষ লাগুক—ক্ষতি নেই। কিন্তু নিষ্কলঙ্ক হওয়া চাই। এ শাস্তি একা তোমার নয়—আমারও।" তারপর সে বলিল, "আমি আর কিরূপে পরীক্ষা করব? যেদিন নিজের বিবেকের কাছে শুদ্ধ হ'তে পারবে, সেই দিন স্মরণ ক'র।"

এই বলিয়া ভবশঙ্করকে লইয়া সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। হরেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিয়া যেন মাটির নীচে মিশিয়া যাইতে লাগিল। নিরানন্দের মধ্যেও হিমাংশু একটুখানি আনন্দ পাইল।

সমাপ্ত

আলোচনা

কথা

আমাদের দেশে, "কথা" কথাটীর একটা নিজস্ব রূপ এবং ভাব আছে—যাহা অন্যত্র অ-পরিজ্ঞাত। "কথা" বলিতে বুঝায় ভাগবত-কথা—হরি-কথা—কৃষ্ণ-কথা—রামায়ণী কথা—মহাভারতীয় কথা—পারমার্থিক ব্যাখ্যা-বিবৃতি—'ইষ্ট-গোষ্ঠী'।

আদিম 'আচার্য্য' বা প্রবক্তা হইতেছেন 'স্বয়ং ভগবান'—যথা নিজউক্তি, "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াং"। আদি শিক্ষা-গুরুও হইতেছেন স্বয়ং তিনি—যথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে, "শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখি-পিঞ্ছমৌলিঃ"।

'আচার্য্য' বলিতে লৌকিক বিষয়-বিশেষে প্রাজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ বুঝাইলে, আমাদের দেশে, তিনিও সর্ব্বজন-পূজার্হ বলিয়া গণ্য—যথা গীতায়, "দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনং শারীরং তপঃ"।

জগতের লৌকিক আচার্য্যগণ হইতেছেন—ভগবানের শক্ত্যা-বেশস্ফুলিঙ্গতুল্য।

নামের মাহাত্ম্য-গুণেই নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মর্য্যাদা,—নিজের ব্যক্তিগত কোনও গুণে নহে। তদ্রূপ, 'কথা'র মাহাত্ম্য-গুণেই কথাচার্য্যের মর্য্যাদা। উহা কথকের কাব্য-জ্ঞান, বক্তৃতা-শক্তি বা শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য-নিরপেক্ষ বস্তু।

সৎসঙ্গে ভগবৎ-'কথা'এক অপূর্ব্ব "অনর্পিতচরী" সাধনা।

'কথা'তে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের সমস্ত শক্তির সমাবেশ—'কথা' সেবন (শ্রবণ) করিতে করিতেই জীবের সমস্ত 'অনর্থ-নিবৃত্তি' সাধিত হয় এবং ক্রমশঃ—শ্রদ্ধা, রতি, প্রেম-ভক্তি উদিত হয়—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদুক্তি :—
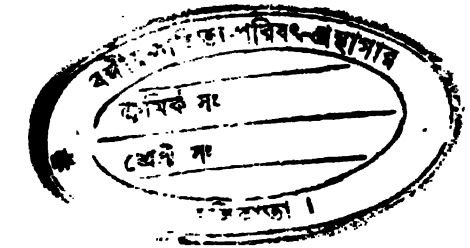
> সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো
> ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
> তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
> শ্রদ্ধা-রতি-র্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।

দুর্লভ মানব-জীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য, গতি, কাম্য এবং 'প্রয়োজন' হইতেছে কৃষ্ণ-প্রেম।

কত কত তরল চটুল খেয়াল—কত তরঙ্গ কত হিল্লোল—কত সঞ্চারী, ব্যভিচারী ভাবলহরী আসে যায়—মানবকে আন্দোলিত করিয়া—হাবু-ডুবু খাওয়াইয়া, নিমেষে কোথায় চলিয়া যায়। কিন্তু, স্থায়ী-ভাব—'ধর্ম্ম' ["ধৃ" ধাতু-মূলক—যাহা ধরিয়া, অবলম্বন করিয়া, আশ্রয় করিয়া, মানুষ স্থির থাকে—অচল-প্রতিষ্ঠ থাকে যথা খৃষ্ট-বাদীর anchor] হইতেছে কৃষ্ণ-রতি। কৃষ্ণ-প্রেমই মানুষকে স্থির সুখে প্রতিষ্ঠিত রাখে—ইহা এমনই লোভনীয় অনুভব যে, ইহার সহিত অন্য কোনও সম্পদেরই তুলনা হয় না, যথা গীতা—"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—ইহার অগ্রে, লৌকিক দুঃখ তাহার দুঃখ-'বোধ' হারাইয়া ফেলে—যথা গীতায়, "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—যথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, "প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার। নিজ দুঃখবিঘ্নাদির না করে বিচার" (মধ্য। ৪)

'রতি'র উদয়ে, কৃষ্ণতোষণই একমাত্র সুখ বলিয়া গণ্য হয়—নিজ সুখ-দুঃখ-ঘটিত স্বতন্ত্র বোধ থাকে না—যথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশিক্ষাষ্টকীয় আস্বাদন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য। ২০):—

"না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ তাঁর হৈল মহা সুখ
সেই দুঃখ মোর সুখ-বর্য্য।"

কিন্তু, লৌকিক ভাবে 'সুখ' খুঁজিতে গেলে, 'দুঃখ'ই সার হয়। চণ্ডীদাস বলেন—"সুখ দুঃখ, দুটী ভাই, সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুঃখ যায় তার ঠাঞি"।

কৃষ্ণ-রতির পথে, মিলনেও সুখ, অ-মিলনেও সুখ—'কভু মিলে, কভু না মিলে দৈবের ঘটন'—মিলা অ-মিলা দুইই রস—বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ দুইই সুখ—দুইই পরম অস্বাদ্য—সুধু আস্বাদনের রকম-ফের মাত্র—বিষামৃতে একত্র মিলন—তপ্তইক্ষু চর্ব্বণ—বক্রমধুরা—বাহিরে বিষজ্বালা অন্তর আনন্দবিভোর—কেবলই সুখ—কেবলই মধু—মধুরং মধুরং মধুরং।

এই 'রতি'ই একমাত্র "বেদ্যং বাস্তবং বস্তু"—তাপ ত্রয়োন্মূলনং শিবদং—ইহারই লোভে, 'স্বয়ং ভগবান্'—ভক্ত-হৃদি-কারাগারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অবরুদ্ধ হয়েন—'সদ্যহৃদ্যবরুধ্যতে'।

ভক্তও তেমনি 'সমর্থ' বটে—"এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ সেখানে রাখিয়া থোব"—প্রাণধনকে কয়েদ করিবার কৌশল উত্তম জানেন।

এই 'রতি'র জন্যই ঋষি পাগল—গৃহী পাগল—পণ্ডিত-সন্ন্যাসী পাগল—রাজার কুমার সর্ব্বত্যাগী ফকির!

এই "রতি"র মূল হইল "কথা"—"শ্রীকৃষ্ণ-কথা"।

ভক্তি-মন্ত্রের আদি আচার্য্য এবং প্রচারক—এমন-কি স্বয়ং ব্যাসদেবেরও শ্রীকৃষ্ণ-রতিতে দীক্ষাগুরু হইলেন যে দেবর্ষি শ্রীনারদ—তিনিও এই 'রতি'মন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিলেন 'কথা'তে!

ঋষি-মুখে "মনোহরাঃ কৃষ্ণ-কথাঃ" গীত শ্রবণের ফলে তাঁহার 'রতি' হইল, যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে :—

তত্রান্বহং কৃষ্ণ-কথাঃ প্রগায়তা
মনুগ্রহেনাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ।

তদবধি, ব্রহ্মর্ষি নারদ—তাঁহার "স্বর-ব্রহ্ম-বিভূষিতা দেব-দত্তা" বীণাযোগে শ্রীহরির অমল যশোগুণালঙ্কৃত ভুবনমঙ্গল 'কথা' [নাম, রূপ, গুণ, লীলা] অহরহঃ গান করিয়া বিশ্বজগৎ বিচরণ করিতেছেন। ["চরাম্যহং"]—এখনও করিতেছেন—কারণ, ভগবান্ নিত্য—তাঁহার লীলা নিত্য—তাঁহার ধাম নিত্য—তাঁহার পরিকর নিত্য।

আদি কথাচার্য্য—'কথা'র আদি প্রবর্ত্তক, কথক, প্রচারক—'কৃষ্ণ-রতি'র আদি দীক্ষাগুরু হইতেছেন শ্রীনারদ।

'কথা'র নামান্তর 'নাম'। 'কথা' হইতে হয় 'রতি'—আর 'নাম' হইতে হয় 'রুচি'—'নাম' হইতে 'কৃষ্ণ-প্রেম—একই তত্ত্বের এ পিঠ আর ও পিঠ।

কলিতে নামই নামী—নামেতেই ভগবানের সমস্ত শক্তি নিহিত—যথাহি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-শিক্ষাষ্টকে—'তত্রার্পিতা নিজ-সর্ব্বশক্তিঃ'। ইহা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের 'মম বীর্য্য-সংবিদঃ কথাঃ' একই তত্ত্ব।

'কথা'—বাগ্দেবী সরস্বতী—মহাশক্তি।

'কথা'—লোককে হাসায় কাঁদায়—সকল শুভ কার্য্যের দ্যোতনা, প্রেরণা—প্রাদাম্ভ করে—সুপ্ত প্রাণকে জাগায়, অজ্ঞান-তম বিনাশ করে—মায়া-মোহের ঘোর দূর করে—সংবুদ্ধি জাগাইয়া প্রকৃত শিক্ষা-দাতা গুরুর কাজ করে।

'কথা'—ব্রহ্ম-বাদীর 'প্রথম নাম ওঙ্কার'—খৃষ্ট-বাদীর First Word God—ঋষির 'প্রণব—নাদ অনাহত—'শব্দ-ব্রহ্ম'—'স্বর-ব্রহ্ম'।

'কথা' এবং 'নাম' হইতেই "উন্নতোজ্জ্বল-রসশ্রী" কৃষ্ণ-রতির উদয় হয়। এই 'কথা' এবং 'নাম' আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের যে অ-পূর্ব্ব 'অনর্পিত-চরী' সাধনা—তাহার প্রবর্ত্তক হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য—যিনি 'কৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব কৈলেন ধন্য'—যিনি 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখান'—যিনি'নাম প্রেম জানাইয়া বিশ্ব কৈলেন ধন্য'—যিনি'আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম সঙ্কীর্ত্তন'—'নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে'।

'কথা'র আসরে (১) 'স্বয়ং ভগবান্' শ্রীহরি (২) আদি কথাচার্য্য শ্রীনারদ এবং (৩) কলিতে নাম-প্রেম-মূলক-সঙ্কীর্ত্তনের আদি প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য—উপস্থিত হয়েন।

'কথা'—কৃষ্ণ-বংশীরই নামান্তর। ইহা মানুষ কেন—বনের পশু-পক্ষীকে পর্য্যন্ত আকুল করে—কৃষ্ণ-মুখী করে—যমুনা উজান বহায়—মরা গাঙে, মরা প্রাণে—আনন্দের বান ডাকায়।

'কথা'র দিব্য শক্তি, অলৌকিক মাহাত্ম্য, প্রকৃত তত্ত্ব এবং গুরুত্ব মনে জাগরূক রাখিলে, 'কথা' কখনও ব্যর্থ হয় না—হইতে পারে না। সে আসরের আকাশ-বাতাস ধন্য—প্রতি

ধূলি-কণা পবিত্র। অন্যথায়, ইহা বারওয়ারী মজলিস অপ-কথা বা গ্রাম্য-কথার বৈঠক—অতএব, সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্তের শিক্ষাও তাহাই—তিনি তারস্বরে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন "গ্রাম্য কথা না শুনিবে—গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।" 'কথা'-মাহাত্ম্য—নাম-চিন্তামণির মূল্য—ইষ্ট-গোষ্ঠির মর্য্যাদা—তিনি স্বয়ং "আচরি জীবেরে শিখাইয়াছেন।"

সৎসঙ্গে 'কথা' এক ত্রিলোকপাবনী শক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

'বাসুদেব-কথা-প্রশ্নঃ পুরুষাং স্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং পৃচ্ছকং শ্রোতৃংস্তদ্পাদসলিলং যথা।"

'কথা'—কথককে, প্রশ্ন-কর্ত্তা গৃহস্বামীকে এবং শ্রোতৃবর্গকে যুগপৎ পূত-পবিত্র ধন্যাতিধন্য করে—একাধারে ত্রি-ধারা-বাহিনী শক্তি। হরি-কথার মহিমা এমনই বটে।

'কথা—কাব্যের উল্লাস, পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর বা ভাষার ঝঙ্কার মাত্র নহে—ইহা "শ্রুৎকর্ণরসায়নাঃ"—কথা 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে—প্রাণ আকুল করে'।

'কথা'—'ইতর-রাগবিস্মারণং নৃণাং' কৃষ্ণের যে 'সুষ্ঠু অধরচুম্বিতং বেণু-গীতং' তাহারই রূপান্তর—যাহা কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিলে, একমাত্র কৃষ্ণ-কথাই ভাল লাগে—অন্য কথা অ-ধন্য বোধ হয়—কৃষ্ণ-সম্বন্ধী যাহা একমাত্র তাহাই ভাল লাগে—'ইতর বা অন্য বিষয়ে 'রাগ' বা আসক্তি থাকে না।

'কথা'—ভক্ত-গানেরই নামান্তর—যাহার লোভে 'স্বয়ং ভগবান্' বৈকুণ্ঠ এবং যোগী-হৃদয় পরিহার পূর্ব্বক সেই আসরে আসিয়া উপবিষ্ট হয়েন—যথা, নিজোক্তি "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

যোগমার্গের একাগ্র কঠোর সাধনা দ্বারা যোগী যাঁহাকে বান্ধিতে পারিল না—তিনি, ভক্তের শুদ্ধ অনুরাগের সহজ 'কথা'র লোভে ছুটিয়া আসেন। কলিতে 'কথা'র মাহাত্ম্য এমনি যে, যোগেশ্বরেশ্বর যিনি, তিনি অন্য কিছুতে এমন নহে, যেমন কথা দ্বারা তুষ্ট হয়েন—'রমিত' [আনন্দিত] হয়েন—যথা নিজোক্তি, 'কথয়ন্তঃ পরস্পরং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ'—লোক 'কথা' দ্বারা পরস্পর প্রবোধিত হইলে ["বোধয়ন্তঃ পরস্পরং"] পরস্পর হরি-কথার সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিলে, তিনি যেমন প্রীত হয়েন এমন আর কিছুতেই নহে।

'কথা'—অজ্ঞানতমের নাশক 'সম্বন্ধ'-তত্ত্বের উদ্বোধক—ইহার কীর্ত্তন এবং শ্রবণ 'অভিধেয়' সাধন-সোপান—উহার পবিত্র আস্বাদন অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বল-রস-শ্রী 'রতি' রূপ 'প্রয়োজন'-সিদ্ধির সাধন-সঙ্কেত।

'কথা'—ভগবদ্ভক্তিরই নামান্তর—ইহা সর্ব্বোপনিষদের সার। "গীতামৃতং মহৎ"। ইহার কথন এবং শ্রবণ সংসারমলনাশনং' —এই 'গীতা' 'সুগীতা কর্ত্তব্যা"—ইহা 'সু' অর্থাৎ সুষ্ঠুরূপে সদাচারপূত এবং আদর্শ-নিষ্ঠভাবে গীত হওয়া কর্ত্তব্য। অন্যথায়, ইহা কুঞ্জরস্নানবৎ পণ্ডশ্রম।

'কথা'—'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং'—পরম পবিত্র রসাল অমৃত বস্তু—চিন্ময় রস-প্রতিভাবিত প্রকৃত 'রসিক'—ভাবুক'-গণেরই আস্বাদ্য।

'কথা'—শাস্ত্রী পণ্ডিত এবং একমাত্র সুধীগণেরই 'গীতা' নহে ইহা গোপী-গীতাও বটে। যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতেঃ—

তব কথামৃতং তপ্ত-জীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।

'কথা'—তাপিত তৃষিত জনের 'অমৃতং'—ইহাই "জীবরক্ষ-মহৌষধি"—ইহা 'শ্রবণ-মঙ্গলং' এবং সর্ব্বকলুষনাশনং।

'কথা'র আচার্য্য, পরিবেষক, প্রচারক এবং 'কথা' দেন যাঁহারা—তাঁহারা 'ভূরিদা' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ভাবাবেশে 'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলিতে বলিতে আত্মহারা হইতেন। 'কথা'-দাতা এবং কথাচার্য্য ধন্যাতিধন্য।

'কথা'—গীত এবং 'পদে'রই নামান্তর—যাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য স্বরূপ-রামানন্দের 'কণ্ঠেতে ধরিয়া' আকুল হইতেন—'কর্ণতৃষ্ণায় মরি, পড় 'রসামৃত' শুনি'—'গাও এক গীত যাতে আমার হৃদয়ের হয়ে ত সম্বিৎ'। "স্বরূপ-গোসাঞি তবে মধুর করিয়া" কখনও গীতগোবিন্দের, কখনও বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের "পদ গায় প্রভুরে শুনাইঞা"—কখনও বা ভাগবতীয় 'কথা' বা শ্লোক—আর অমনি "অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব অঙ্গে প্রকট হইল"—

ভাবোদয় ভাব-সন্ধি, ভাব-শাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য।
এই মতে মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে।

কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধ-বাহ্য স্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্য স্ফূর্ত্তি তিন রীতে প্রভু স্থিতি॥

ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্তের গম্ভীরা-লীলার দিব্য চিত্র—ইহাই 'রতি'র—'অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বলরস-শ্রী' দিব্য মূর্ত্তি।

সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা—লীলা-রস-সম্ভোগে নিমগ্ন—দৈহিক কার্য্য এবং লৌকিক আচারাদি শুধু যন্ত্র-বৎ সংঘটিত—'শরীর' এথায় 'মন' বৃন্দাবন। যথাহি শ্রীচরিতামৃতে :—

স্নান, দর্শন ভোজন দেহ-স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়॥
এই ত কহিলুঁ প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥
'শরীর' এথায় প্রভুর 'মন' বৃন্দাবন।

সাধন-রাজ্যের এই দুর্ল্লভ জীবন্ত মূর্ত্তিখানি আমাদের মানস-পটে চির-জাগরুক থাকুন।

'কথা'—হরি-নামেরই নামান্তর। নাম এবং নামীই অভিন্ন—'নাম-নামিনোরভেদঃ'। শুদ্ধ ভাবে 'কথা' কহিলে—সহজ অনুরাগে, নিষ্ঠার সহিত 'নাম' করিলে—চিন্তামণি বান্ধা আছেন ভক্তের দুয়ারে—"নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি"।

'কথা'—কীর্ত্তনেরই নামান্তর। ইহা সর্ব্বানর্থ-বিনাশ করিয়া চরম এবং পরম শ্রেয়ঃ যাহা, তাহা প্রদান করে—ইহা "ভবমহা-দাবাগ্নিনির্ব্বাপনং"—"সর্ব্বাত্ম-স্নপনং"—অতএব, সর্ব্বাপেক্ষা জয়যুক্ত ["পরং বিজয়তে"]।

'কথা'—মুমূর্ষু, তথা মুমুক্ষু, রাজা পরীক্ষিতের ভব-পারের তরণী। 'কথা'—কত কত তাপিত তৃষিত জনের প্রাণারাম—কত কত লোক সারা জীবনের সমস্ত সম্বল পণ করিয়া—এখনও পল্লীতে পল্লীতে, মাস ভরিয়া—সম্বৎসর ধরিয়া, 'কথা' দিতেছেন—শুনিতেছেন—শুনাইতেছেন।

আমাদের দেশের নিজস্ব সামগ্রী এবং অমূল্য সম্পদ এই 'কথা' জয়যুক্ত হউন—অক্ষুণ্ণ বিজয়-শ্রীতে চির-প্রতিষ্ঠিত থাকুন—ইহাই সুধীভক্তমাত্রেরই প্রাণের কামনা।

কিন্তু, কাল-দোষে, নানা গ্লানি এবং ব্যভিচারী ভাব এই 'কথা'কে আক্রান্ত করিয়াছে। সুধীগণ স্ব স্ব চিত্তের সত্য স্ফুরণ অনুসারে সৎসাহসে কার্য্য-তৎপর না হইলে, এই অমূল্য বস্তু—একেবারে বিলুপ্ত না হইলেও—অচিরে যে দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 'কথা'র শুভ্র, শুদ্ধ সত্য আদর্শ বজায় রাখিতে, কথক, শ্রোতা এবং জনসমাজের দায়িত্ব যথেষ্ট।

একমাত্র প্রণিধান যোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে, 'কথা' একটা লেন্-দেন্ কেনা-বেচা-ঘটিত পেশাদারী ব্যাপার বা ব্যবসায় মাত্র নহে। অর্থাগম ইহার আনুষঙ্গিক ফল। শ্রোতৃবর্গ উপকৃত হইলে, অর্থ জল-প্রবাহের ন্যায় অজস্রধারে আসে—ইহাই আমাদের দেশের সনাতনী ধারা। অন্য কোনও দেশে কোনও সাধনা-কৌশলে যাহা না ঘটে, তাহা পাওয়া যায় আমাদের দেশের 'কথায়'। ইহাতে একাধারে চিত্ত-শোধনী পাবনী ত্রি-ধারা প্রবাহিত—যাহা দ্বারা (১) পৃচ্ছক (প্রশ্নকর্ত্তা) (২) বক্তা বা কথক (৩) শ্রোতৃগণ—যুগপৎ পবিত্র এবং ধন্যাতিধন্য হইয়া থাকেন।

এই ত্রি-বর্গ ফল পূর্ণ মাত্রায় আদায় করিতে হইলে কর্ত্তব্য এই যে, (১) কথা-দাতা গৃহস্থ—শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠাযুক্ত জিজ্ঞাসু-ভাবে সজাগ থাকিবেন—(২) শ্রোতৃবর্গ—শ্রদ্ধা, সংযম এবং একাগ্রতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, (৩) আচার্য্য—কেবল শুদ্ধ রস, নির্ম্মল ভাব উদ্দীপন করিবেন—পবিত্র আদর্শ জাগাইবেন। ইহা হইলে, আমাদের এই অমূল্য সম্পদ 'কথা'র লুপ্তমর্য্যাদা ফিরিয়া আসিবে—ম্লানগৌরব অচিরে পুনরায় স্বকীয় উজ্জ্বল-শ্রীতে বিরাজ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্তের অবদান—'নাম' এবং 'প্রেম' প্রচার—নিজ আচরণ দ্বারা জগতের জীবকে শিক্ষাদান এবং পথ-প্রদর্শন। কৃষ্ণ-প্রেমই জীবের একমাত্র 'প্রয়োজন'। ইহা লাভের উপায়—সাধু-সঙ্গ, শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার সহিত 'নাম'—'কথা'—'গীত' শ্রবণ-কীর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য স্বকীয় শক্তি-সঞ্চার পূর্ব্বক আদর্শস্থানীয় 'আচার্য্য' প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন—যথা, শ্রীরায়-রামানন্দ 'রস-তত্ত্বের' আচার্য্য—শ্রীহরিদাস ঠাকুর 'নাম-তত্ত্বের' আচার্য্য—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নাম-প্রেমের আচার্য্য—শ্রীস্বরূপ দামোদর 'গীত' এবং 'পদে'র আচার্য্য—শ্রীরূপ সনাতন 'শাস্ত্রের' আচার্য্য—দাস রঘুনাথ ঠাকুর 'শুদ্ধ বৈরাগ্যে'র আচার্য্য—শ্রীভট্ট রঘুনাথ 'কথা'র আচার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য লীলা ধরিতে হইলে—তাঁহার পার্ষদ-পরিকরবর্গের আশ্রয়-অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই আচার্য্যগণের প্রদর্শিত আদর্শের অতিক্রম বা বিরুদ্ধাচার করিলে শুদ্ধ বৈষ্ণবের অপরাধ ঘটে।

'কথা' এবং কথাচার্য্যের আদর্শ শ্রীভট্ট রঘুনাথে দেদীপ্যমান।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ইঁহাকে শক্তিসঞ্চার করিয়া "কথা"তে ব্রতী করিলেন—তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করাই কথাচার্য্য বা কথক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

'কথা' কহিবার আসর এবং ভাব-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীভট্ট রঘুনাথকে উপদেশচ্ছলে যে জীবন্ত নির্দ্দেশ প্রকটিত আছে (চরিতামৃত, অন্ত্য। ১৪ দ্রষ্টব্য) তাহাই চির-স্মরণীয় হওয়া কর্ত্তব্য :—

"বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন"
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ সনাতন স্থানে।
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণ নাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান।

[তদনুসারে]

রূপ গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তার মন।
অশ্রু-কম্প গদ গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র রোধ করে বাষ্প না পারেন পড়িতে।
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমেতে বিহ্বল তবে, কিছুই না জানে।
গ্রাম্য-বার্ত্তা না শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণ-কথা-পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায়।
বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে এই মাত্র জানে।
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেম অনর্গল।
এই ত কহিলুঁ তাতে চৈতন্য-কৃপা ফল।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অ-হৈতুকী কৃপার ফল এমনই বটে :—

"এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভু-কৃপাতে কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত হৈলা"।

আমরা সকলে সম-স্বরে বলি :—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেম-দীক্ষামশিক্ষয়ৎ।

যিনি কৃষ্ণভাবামৃত [উন্নতোজ্জ্বল-রস] আস্বাদন করিয়া এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া, প্রেম-দীক্ষা [শুদ্ধ-প্রীতি-মূল ভজন-প্রণালী] বিষয়ক দিব্য জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ

জগতে গ্রন্থাগার-আন্দোলন*

(ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর)

কুমার শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

নিরক্ষরতা এবং অজ্ঞতার সম্পর্ক এদেশে এখন যতটা ঘনিষ্ঠ হইয়াছে পূর্ব্বে ততটা ছিল না। লোকে নিরক্ষর থাকিয়াও জ্ঞানার্জ্জনের সুযোগ পাইত। তখন মুখে মুখে অমূল্য তত্ত্বকথা প্রচারিত হইত। কথকঠাকুর, পুরাণ ও ভাগবত-পাঠক সহজবোধ্য ভাষায় মানব-জীবনের অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য আখ্যায়িকার ভিতর দিয়া সুর-তান-লয় যোগে সাধারণ লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেন—রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যায়িকা যাত্রা প্রভৃতি লোকরঞ্জক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া সাধারণের মানসপটে চিত্রের ন্যায় অঙ্কিত হইয়া যাইত। তা ছাড়া রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ তো দোকানী পশারী হইতে আরম্ভ করিয়া ঘরে ঘরে চলিত। এই সব কারণে নিরক্ষর লোকও জ্ঞানবান ও চরিত্রবান হইতে পারিত। এইরূপ জ্ঞান চর্চ্চার প্রভাবে বাঙ্গালা দেশে এমন কতকগুলি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর ছিল—নিরক্ষরতা সেই সব ধর্ম্মমত-প্রচারে বাধা উৎপাদন করে নাই। প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে যতটা সাহস ও মানসিক বলের আবশ্যক তাহারও অভাব ঘটে নাই। জনসাধারণের উপর বৌদ্ধ,

* চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে অক্ষয় তৃতীয়া-মেলায় বক্তৃতা পঠিত।

জৈন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহাদের মধ্য হইতে যে সব ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বাঁধা-ধরা গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করিয়া উদারতার চরম পথে প্রধাবিত হইয়াছিল। এই ধরুন আমার বাসগ্রাম বাঁশবেড়িয়ায় রামবল্লভী সম্প্রদায়ের কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ইঁহাদের বেদীর নাম "পরম সত্য" এবং সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় ইঁহাদের মূলধর্ম্ম—ইঁহাদের মত-প্রতিপাদক একটী গীতে তাহা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

কালী কৃষ্ণ গাড খোদা।
কোন নামে নাহি বাধা—
বাদীর বিবাদ দ্বিধা—
তাতে নাহি টলো রে।
মন কালী কৃষ্ণ গাড খোদা বলো রে॥

এই মতবাদীদের অধিকাংশই নিরক্ষর ছিল। তাহাদের সমাধিক্ষেত্রের সংলগ্ন ভূমিতে আমাদের গ্রামের সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। গ্রন্থাগার সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের উপযুক্ত স্থান—বাণী-মন্দির সকল ধর্ম্মমতের মিলনক্ষেত্র—সেখানে ভেদাভেদের স্থান নাই। রামবল্লভী সম্প্রদায়ের ন্যায় আউল-বাউল প্রভৃতি নানা উদারনৈতিক ধর্ম্মমত বাঙ্গলার সাধারণ নিরক্ষর লোক সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। নিরক্ষরতা এই সব মত প্রচারের গতিরোধ করিয়া দাঁড়ায় নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জন-শিক্ষার সকল পথ একে একে রুদ্ধ হইয়াছে—মুখে মুখে শিক্ষার সহজ উপায়গুলি বিলুপ্ত হইয়াছে—কাজেই অজ্ঞানতায় দেশ সমাচ্ছন্ন হইতেছে; সে অজ্ঞানতা দূর করিতে হইলে এখন অক্ষর পরিচয়ের আবশ্যক হইয়াছে; অক্ষর পরিচয়ই এখন জ্ঞানলাভের প্রথম সোপান। দ্বিতীয় সোপান হইতেছে—বিদ্যালয়ে শিক্ষা। সেই শিক্ষার চরম গতি হইতেছে গ্রন্থাগার। বিদ্যালয়ের শিক্ষা নির্দ্দিষ্টকালের জন্য কিন্তু গ্রন্থাগারের শিক্ষা আজীবন—মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জ্ঞানস্পৃহা বর্দ্ধনই গ্রন্থাগারের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—তাহার মনোবৃত্তি স্ফুরণের সুযোগ হয় না। সে নিজেকে চিনিতে পারে না—ব্যর্থ-জীবন যাপন করে। মানুষ যে শ্রেষ্ঠ জীব—শ্রীভগবানের লীলা-খেলা তাহার মধ্যেই যে প্রকটিত হইতেছে, সে তাহা বুঝে না; সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। মৃগনাভির সৌরভে চঞ্চলচিত্ত হইয়া মৃগ যেমন ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া গন্ধের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে মানুষও মৃগের ন্যায় নিজেকে চিনিতে পারে না—আত্মজ্ঞান উপলব্ধির অভাবে বিক্ষিপ্তচিত্তে উদ্‌ভ্রান্তজীবন যাপন করে। সে বুঝে না—

"শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

এখন আমার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

স্মরণাতীত কাল হইতে জগতে গ্রন্থসঞ্চয়-কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু গ্রন্থাগার-আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছে নিতান্ত আধুনিক যুগে। প্রাচীনকালের গ্রন্থাগার কিরূপ ছিল বা তাহার ইতিহাস-সঙ্কলন আমার অদ্যকার আলোচ্যের বিষয় নহে। বিগত মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী সময় মধ্যে অতি সংক্ষেপে জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গ্রন্থাগার-আন্দোলনের বিস্তৃতি ও পরিপুষ্টির কথা আমি আজ আলোচনা করিব। আমি কোনও বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের উল্লেখ করিব না। গ্রন্থাগারসমষ্টি লইয়াই আন্দোলনের উৎপত্তি; তাহার ফলে জগতে অসংখ্য গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে হয় তো কতকগুলি প্রতিষ্ঠান অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও কিছু আসিয়া যায় না যদি তাহা প্রাণবন্ত হয়—যদি তাহার সৌরভে দিক্ আমোদিত হওয়া সম্ভব হয়। গণতন্ত্রের বাণী বর্ত্তমান গ্রন্থাগার-আন্দোলন দ্বারা উদ্দাম গতিতে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

আমি এক ঘণ্টার মধ্যে বর্ত্তমান গ্রন্থাগার-জগতে আপনাদের ঘুরাইয়া আনিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য

চলুন প্রথম মার্কিন মুলুকে ঘুরিয়া আসি। আমেরিকার যুক্তরাজ্যেই গ্রন্থাগার-আন্দোলনের বিস্তৃতি সকল দেশ

অপেক্ষা বেশী। যুক্তরাজ্য গ্রন্থাগারের দেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই দেশ হইতে গ্রন্থাগারের বাণী

সেণ্টলুই শহরে সাধারণ গ্রন্থাগার—সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী বিল্ডিং

প্রথম উদ্গত হইয়া জগতের দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যুক্তরাজ্যে গ্রন্থাগারের চূড়ান্ত ব্যবস্থাই আছে। ঐ দেশের লোকেরা কিন্তু তাহাতেও তুষ্ট নহে। এত বেশী লাইব্রেরী থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহা অপর্য্যাপ্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েসন্ সেই দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে লাইব্রেরীর সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া দেখেন যে ৫৩৪টী শহরের মধ্যে ৪৭৫টীতে লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা আছে। ৩০৬৫টী কাউণ্টির মধ্যে ২৫৩টীতে লাইব্রেরী-আন্দোলনের কার্য্য সুচারুভাবে চলিতেছে। যুক্তরাজ্যের ছয় সহস্র লাইব্রেরী লোক অনুপাতে শতকরা ৫৬ জন লোকের পাঠের সুবিধা করিয়া দিয়াছে বাকী শতকরা ৪৪ জন অর্থাৎ ৫ কোটী লোকের জন্য আরও ভালরকম ব্যবস্থার আবশ্যক। সে ব্যবস্থা কিরূপে সম্ভব হইবে তাহার জন্য এইরূপ উপায় তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—
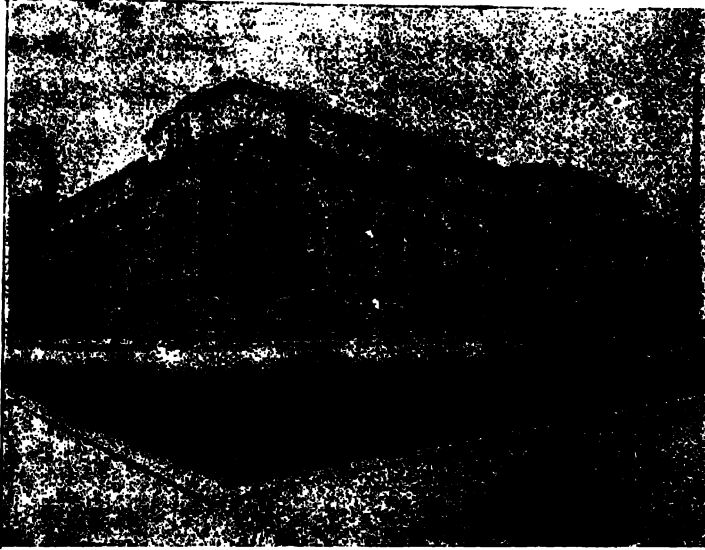
(১) প্রচার (publicity)—গ্রাম্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষায়তনের ভিতর দিয়া প্রচারের চেষ্টা।

(২) বিনামূল্যে লাইব্রেরী-আন্দোলন-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রিকাদি যথেচ্ছভাবে বিতরণ।

(৩) সাধারণ পাঠাগারের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম ও লাইব্রেরীর উচ্চ আদর্শের অনুকূলে জনমত গঠন।

(৪) লাইব্রেরীর সাহায্যার্থে দানশীল জনগণের অনুরাগবর্দ্ধন।

(৫) প্রত্যেক ষ্টেটে লাইব্রেরী-কমিশন গঠন।

নানা অসুবিধা ও স্থলবিশেষে প্রতিকূলতাচরণ সত্ত্বেও আমেরিকা লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের স্থায়ী কমিটী উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্যে সাফল্য-সাধনে সদা তৎপর আছেন। লাইব্রেরীর কার্য্য সম্পর্কে কানাডা যুক্ত রাজ্যের সহিত
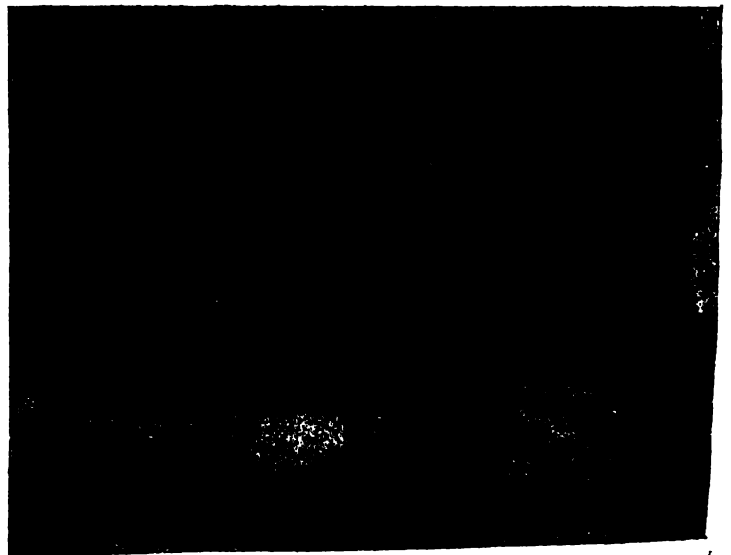
ঐ গ্রন্থাগারের বালকবালিকাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহ

একসূত্রে গ্রথিত থাকায় তাহার পৃথক্ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যুক্তরাজ্যের তুলনায় আমরা কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে কুল-কিনারা পাওয়া যায় না।
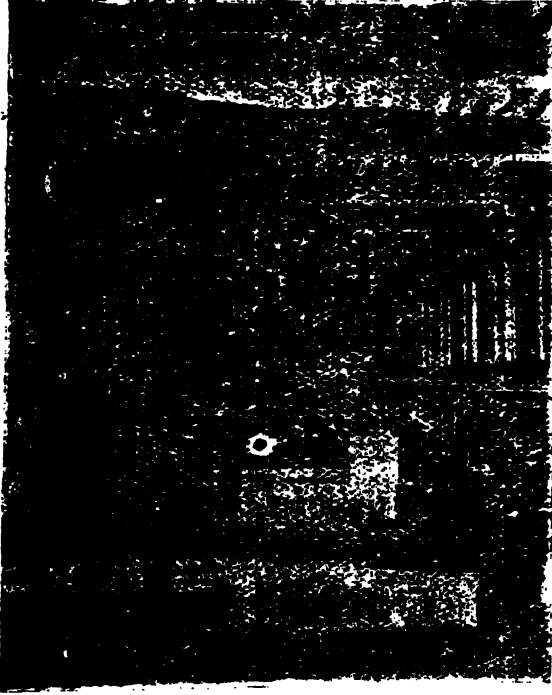
সেণ্টলুই গ্রন্থাগারের বই পড়িবার খোলা তাক—
(Open-shelf-room)

মেক্সিকো

চলুন মার্কিন যুক্তরাজ্যের দক্ষিণে মেক্সিকোতে লাইব্রেরী-আন্দোলনের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে কি না দেখিয়া আসি। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের রাজবিপ্লবের পূর্ব্বে মেক্সিকোতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষোন্নতির আকাঙ্ক্ষা সজাগ হয় নাই কাজেই তখনও লাইব্রেরী-আন্দোলনের সাড়া পাওয়া সম্ভব হয় নাই। মেকসিকো দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানালোক নিবদ্ধ ছিল—জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে আরদ্ধ হয়—আরও দশ বৎসর পরে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মেক্সিকোতে এক আইন পাশ করিয়া সাধারণ শিক্ষা-বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। সেই বিভাগের কর্ত্তৃত্ব একজন মন্ত্রীর হস্তে অর্পিত হয়। তখন হইতে শিক্ষাসচিব নিরক্ষরতা বিদূরণ-কল্পে গ্রামে গ্রামে কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন; ক্রমে শিক্ষিত ও জনসাধারণের মধ্যে সখ্যতা স্থাপনের সেতুস্বরূপ শিক্ষাসচিব লাইব্রেরী-স্থাপনে অবহিত হন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে লাইব্রেরীর জন্য একটী পৃথক্ বিভাগ গঠিত হয়। বিগত ৮।৯ বৎসরের চেষ্টায় মেক্সিকোতে ১৫০০ (দেড় হাজার) সাধারণ লাইব্রেরী, ১০০০ (এক হাজার) স্কুল-লাইব্রেরী, পাঁচ শত শিল্প-সংক্রান্ত লাইব্রেরী, এবং ৫০০ (পাঁচ শত) গ্রাম্য লাইব্রেরী সংস্থাপিত হইয়াছে।

জনপ্রিয় শিক্ষাসচিব বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও অনকয়েক কর্ম্মচারী লইয়া এতগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। এ কার্য্যে তিনি সাধারণের সাহায্য কিছুই পান নাই। জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতে যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। দক্ষিণ আমেরিকাতেও লাইব্রেরী-আন্দোলন ক্রমশঃ বিস্তৃতি-লাভ করিতেছে। সেখানেও শত শত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা

চলুন আটলানটিক মহাসাগর পার হইয়া দক্ষিণ আমেরিকা হইতে একবার দক্ষিণ আফ্রিকায় লাইব্রেরীর অবস্থা দেখিয়া আসি। সরকারের সাহায্যে মেক্সিকোতে যাহা সম্ভব হইয়াছে জনৈক দানবীরের অর্থানুকুল্যে দক্ষিণ আফ্রিকার লাইব্রেরীর আন্দোলন তদনুরূপ সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে। দানবীর আণ্ড্রু কার্ণেগী (Andrew Cornegie) নিউইয়র্কের কার্ণেগী করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। কানেডা ও ব্রিটিশাধিকৃত সাম্রাজ্যের জন্য চারি কোটী টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। কানাডার লাইব্রেরীর অভাব প্রায় বিদূরিত হইয়া আসিলে কার্ণেগী করপোরেশন দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। সেই অজ্ঞানান্ধকার দেশে লাইব্রেরী সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন জন্য ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে তাঁহারা তিন জন গ্রন্থরক্ষককে (লাইব্রেরীয়ান) লইয়া একটী কমিটি গঠন করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরণ করেন।

তিন মাস নানাস্থানে পরিভ্রমণের পর কমিশনারগণ জ্ঞাপন করেন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় আধুনিক লাইব্রেরী-আন্দোলনের স্পন্দন আদৌ অনুভূত হয় নাই। সাধারণের জন্য মিউনিসিপ্যাল ও কার্ণেগী-লাইব্রেরীর সংখ্যা মোট ছিল ছয়টী আর চাঁদার দ্বারা স্থাপিত সাধারণ লাইব্রেরীর সংখ্যা ছিল কিঞ্চিদধিক দুই শত; কিন্তু সেগুলি নামে মাত্র লাইব্রেরী, পুস্তকসংখ্যা অকিঞ্চিৎকর; এমন-কি পাঠকদের বসিয়া পড়িবার জন্য স্থান পর্য্যন্ত ছিল না। পরিভ্রমণ শেষে তাঁহারা ব্লুম ফৌনটেন শহরে ১৯২৮ সালের নবেম্বর

হাওয়াই গ্রন্থাগার

মাসে একটী সম্মেলন আহ্বান করেন। তাহাতে লাইব্রেরী-আন্দোলনের বিস্তৃতিকল্পে অনেক জল্পনা-কল্পনার পর এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়—

(১) যে সাধারণ লাইব্রেরীর কর্ম্মপদ্ধতি প্রচারোদ্দেশে একটী প্রধান কেন্দ্র, ছয়টী উপকেন্দ্র এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র কেন্দ্র দ্বারা সমগ্র দেশটীকে জালের মত লাইব্রেরী দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিতে হইবে। কার্য্যক্ষেত্র প্রথমতঃ যাবতীয় স্থানীয় বিদ্যালয়, থানা ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরম্ভ করা হইবে।

(২) পল্লীপাঠাগারগুলির পরিপুষ্টির জন্য দেশের ডাকঘরগুলি সর্ব্বদা লাইব্রেরীর পুস্তক বিনা মাশুলে বহন করিবে। রেলওয়ে ট্রেণ নামমাত্র মাশুল লইয়া লাইব্রেরীর পুস্তক লইয়া যাইবে।

(৩) দক্ষিণ আফ্রিকার লাইব্রেরী এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা সেই সময় করা হয়।

(৪) নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে লাইব্রেরীগুলিতে কেবল-মাত্র লাইব্রেরিয়ানের কার্য্যে বিশেষজ্ঞগণ লাইব্রেরীর কর্ম্মচারীরূপে নিয়োজিত হইবেন।

(৫) লাইব্রেরী-আইন-প্রণয়ন জন্য একটী কমিটি গঠিত হইবে।

(৬) এইসকল কার্য্যে বার্ষিক ২৬০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইবে, তাহার অর্দ্ধেক গভর্ণমেণ্ট ও অর্দ্ধেক কার্ণেগী করপোরেশনের নির্দ্দিষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত দিবেন। তাহার পর করপোরেশনের দান হ্রাস ও গভর্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বৎসরাধিক পূর্ব্বে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং এত অল্প দিনের কার্য্যের উপর মন্তব্য প্রকাশ চলে না।

রোডেশিয়া ও কেনিয়া প্রদেশে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃতির জন্য কার্ণেগী কমিশন ইতিমধ্যে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। কমিশন সেখানে লাইব্রেরী-আন্দোলনের বীজ বপন করিয়াছে এখনও অঙ্কুর উদ্গত হয় নাই। আফ্রিকা মহাদেশের অন্যান্য অংশ এখনও অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, সেখানে আধুনিক লাইব্রেরী-আন্দোলনের স্পন্দন অনুভূত হয় নাই। কাজেই আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া এখন আমাদিগকে য়ুরোপে যাইতে হইবে।

বুলগেরিয়া ও রুমানিয়া

চলুন প্রথমে বুলগেরিয়া ও রুমানিয়া ঘুরিয়া আসি! বুলগেরিয়া আমাদের দেশের মত কতকটা প্রাচীনপন্থী। সে দেশের পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া আধুনিক যুগ উপযোগী করা হইয়াছে। লাইব্রেরী-আন্দোলন প্রতিষ্ঠানগুলিকে নবভাবে গঠনের সহায়তা করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির নাম চিতালিষ্টা (chitalishta)—একাধারে থিয়েটার, সিনেমা, ক্লাব ও

লাইব্রেরী। বুলগেরিয়ার বর্ত্তমান শিক্ষাসচিব লাইব্রেরী-আন্দোলনের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি লাইব্রেরী-আইন পাশ করাইয়া লাইব্রেরী-আন্দোলন রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তিনি দুই হাজার চিতালিষ্টা স্থাপন করিয়াছেন। এইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া লাইব্রেরী-আন্দোলন পরিপুষ্ট হইতেছে। লাইব্রেরী-আইন-সংক্রান্ত কার্য্যভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী হইতেছেন একজন বিদুষী মহিলা। সেফিয়া শহর তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরিয়ানের কার্য্যে শিক্ষালাভ করিয়া লাইব্রেরী-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন।

রুমানিয়া প্রতিবাসী বুলগেরিয়ার পথানুসরণ করিয়া চলিয়াছে। প্রাচীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আস্ত্রা (Astra) এবং এথিনেসিয়াম (Atheneseum)এর ভিতর দিয়া আধুনিক লাইব্রেরী-আন্দোলন বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। রুমানিয়ার সাহিত্য ও জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে আস্ত্রাগুলি স্থাপিত। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর এই কয় বৎসর মধ্যে আস্ত্রার প্রচেষ্টায় রুমানিয়ায় দুই হাজার লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইসব লাইব্রেরীতে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের ব্যবস্থা আছে। সামাজিক সম্মেলনেরও এগুলি প্রধান কেন্দ্র—ধনিক, শ্রমিক, ও কৃষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের এই লাইব্রেরীগুলি অপূর্ব্ব মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটী ও স্থানীয় বোর্ডগুলি এইসব লাইব্রেরীতে মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়া থাকেন। রুমানিয়ার গভর্ণমেণ্ট এইসব প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে বুলগেরিয়ার মত মুক্তহস্ত নহে।

মধ্য-য়ুরোপের নব্য-সাধারণ-তন্ত্র

রুমানিয়ার পশ্চিমদিকের প্রতিবেশী মধ্য-য়ুরোপের তিনটী নব্যজাতি আধুনিক লাইব্রেরী-আন্দোলন পরম উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিয়াছে। এই তিনটী দেশের শিক্ষাসচিব সাধারণতন্ত্র-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষরতা দূর ও জ্ঞানবিস্তারকল্পে লাইব্রেরী-স্থাপন প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। যুগোশ্লেভিয়াতে শিক্ষাসচিবের অধীনে লাইব্রেরীর সংপ্রসারণমানসে একটী পৃথক্ বিভাগ গঠিত হইয়াছে। এই বিভাগ একসহস্র পল্লী-লাইব্রেরী স্থাপন এবং তৎসহযোগে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য সাতশত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেখানে শত শত নরনারী লিখিতে ও পড়িতে শিখিতেছেন। পল্লী-লাইব্রেরীগুলিতে চিত্তবিনোদনের পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে গৃহের কাজকর্ম্ম সংক্রান্ত চিত্তাকর্ষক পুস্তক আছে—সেগুলি পাঠ করিয়া পল্লীবাসী নরনারীগণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সহিত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপনের উদ্দীপনা পাইয়া থাকেন।

হাঙ্গারী

হাঙ্গারী রাজ্যবিপ্লব ও রাজ্যস্খলনের ধাক্কা এখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। যুদ্ধের পরিণাম দারিদ্র্যবৃদ্ধি ও নিরক্ষরতার প্রসার—এই দুইটাই হাঙ্গারী প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতেছে। এত প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াছে বলিয়া হাঙ্গারীকে নিশ্চেষ্ট মনে করিবেন না। শিক্ষাসচিব ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণমানসে একটী অনুসন্ধান-সমিতি গঠন করেন। অনুসন্ধান ফলে Adult Educatlon Bill এর খসড়া প্রস্তত হইয়াছে। এই বিলের তৃতীয় পরিচ্ছেদে সর্ব্বত্র লাইব্রেরী-স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। তবে যেসব নগণ্য স্থানে লাইব্রেরী-স্থাপন সম্ভবপর নহে সেখানে গভর্ণমেণ্ট সাহায্যে কাউণ্টি-কাউন্সিল-কর্তৃক চলন্ত লাইব্রেরী (travelling library) প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জেচোশ্লোভেকিয়া

হাঙ্গারীর উত্তর প্রতিবেশী জেচোশ্লোভেকিয়াকে কিন্তু লাইব্রেরী-আন্দোলন বিশেষভাবে স্পন্দিত করিয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে সেখানে সাধারণ পাঠাগার-আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। তদনুযায়ী ব্যবস্থা হয় যে প্রত্যেক জনপদ (commune) যেখানকার অধিবাসী-সংখ্যা অন্যূন তিনশত সেখানে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একটী করিয়া সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিতে হইবে। প্রথম শ্রেণীর সাধারণ পাঠাগারে চারিটী বিভাগ থাকা

অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করা হয়; সেগুলি হইতেছে lending বা পুস্তক-দাদন-বিভাগ, reference বা সংশয়-মীমাংসক বিভাগ, news room বা সংবাদগৃহ এবং বালকবালিকা-বিভাগ। যেখানে অন্যূন দুই সহস্র অধিবাসী সেখানে এইরূপ প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরী স্থাপন করিতেই হইবে—এইরূপ বাধ্যকর নিয়ম। এতদপেক্ষা বৃহৎ জনপদের লাইব্রেরীর সহিত আবশ্যকানুযায়ী শাখালাইব্রেরী স্থাপন বাধ্যকর। যদি কোনও জনপদে অন্যূন চারিশত সংখ্যক minority থাকে সেখানে তাহাদের জন্য বিশেষ (special) লাইব্রেরী-স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। এই-সব লাইব্রেরী স্থাপন ও পরিপোষণের জন্য মাথা প্রতি এক আনা হিসাবে 'লাইব্রেরী রেট্' আদায় করা হয়। নির্ব্বাচিত লাইব্রেরী কমিটির নির্দ্দেশমত লাইব্রেরীয়ান লাইব্রেরীর পরিচালন করেন। যে জনপদে অন্যূন দশ সহস্র অধিবাসী সেখানকার লাইব্রেরীতে সর্ব্বসময়ের জন্য লাইব্রেরীয়ান্ নিযুক্ত থাকেন। শিক্ষা-সচিবের অধীনে বিশেষজ্ঞ লাইব্রেরীয়ানগণ লাইব্রেরী-কার্য্য পরিদর্শন ও পরিচালনের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির সহায়তা করেন। লাইব্রেরীয়ানের কার্য্যশিক্ষার জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা আছে। গভর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীগুলিতে নগদ অর্থ-সাহায্য করেন না বটে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে পুস্তক সাহায্য করেন।

এখানে ১৯১৯ সালের আইনানুযায়ী ১৯২০ সালে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩,৪০০ লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। লাইব্রেরী-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমান কালে লাইব্রেরী-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৬,০০০—ইহাদের জন্য বার্ষিক ব্যয় হয় ১৫ লক্ষ টাকা। জেচোস্লোভাকিয়া আইন-নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে লাইব্রেরী-স্থাপন বিষয়ে দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়া লাইব্রেরী-জগৎকে এতদূর আকৃষ্ট করে যে, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রেগ শহরে জগতের লাইব্রেরীয়ানগণের আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পোল্যাণ্ড

আর কিছু উত্তরাভিমুখে চলিলে আমরা পোল্যাণ্ডে গিয়া পৌছিব। পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক নির্য্যাতনের কথা এখনও লোকে বিস্মৃত হয় নাই। এ তো সেদিনকার কথা। বিগত মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড পূর্ণস্বাধীনতা লাভ করে। স্বীয় ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের শক্তি পুনর্লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নবজাগ্রত পোলিশ জাতি সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানবিস্তারের জন্য সচেষ্ট হইল। ফলে প্রথমেই স্থাপিত হয় দুইটী স্বেচ্ছাকৃত প্রতিষ্ঠান —Society of Peoples' Libraries এবং Peoples' School Association। পরমোৎসাহের সহিত উভয় সভাই লাইব্রেরী-আন্দোলনের কার্য্যপরিচালনা করিতে থাকেন। প্রথমোক্ত সভা ১,৩০০টী লাইব্রেরী ও শেষোক্ত সভা ৫০০ স্থায়ী ও ৮০০ চলন্ত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। নাগরিক ও গ্রাম্য সভা এই-সব লাইব্রেরীকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ লড্জ শহরের কথা বলি। সেখানকার নাগরিক সভা একটী সাধারণ পাঠাগার এবং পাঁচটী শিশু-পাঠাগার স্থাপন করিয়াছে। দেশের ভবিষ্যৎ যে শিশুদের হাতে, তাই তাহাদের প্রতিভা স্ফুরণের জন্য এই বিপুল প্রচেষ্টা। পোল্যাণ্ডের লাইব্রেরীগুলি সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার কেন্দ্র-স্বরূপ ব্যবহার হয়। এমন লাইব্রেরী নাই যেখানে নিয়মিত-ভাবে শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা, চিত্র-প্রদর্শন সহ সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও তৎসহ গীতবাদ্যের ব্যবস্থা নাই। শিশুদের লাইব্রেরীর কর্ত্তৃত্বের ভার শিশুদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়—স্বায়ত্তশাসনের প্রথম শিক্ষা তাহারা হাতে-কলমে সেইখানেই পায়। শিশুপ্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ এইখানেই আরম্ভ হয়। আমাদের দেশে অযথা শাসনে শিশুর মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায় না, ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসে। পরাধীনতার প্রভাব শিশুহৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে থাকে। ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের জন্য শিশুদের শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা নেতাগণের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।

পোল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্ট এখন দেখিতেছেন যে, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের জ্ঞানবিস্তারের সম্যক্ ব্যবস্থার উপযোগী নহে—কার্য্যের প্রসার আরও বিস্তারিত হওয়া আবশ্যক। আইনের শক্তি ভিন্ন "সকলের জন্য পুস্তক" এই বাণী সার্থক হইতে পারে না। লাইব্রেরী-

আইনের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে—তাহাতে প্রত্যেক জনপদে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষুদ্র জনপদে লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করা জেলাস্থ সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী পক্ষে বাধ্যকর হইবে। লাইব্রেরী রেট্ স্থাপন দ্বারা ব্যয়সঙ্কুলান করা হইবে। এই আইন বিধিবদ্ধ করাইবার জন্য ওয়ারস শহরের Union of Polish Library বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছে। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে পোল্যাণ্ডে অচিরে ১৫,০০০ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ফিনল্যাণ্ড

চলুন আরও উত্তরে গিয়া ফিনল্যাণ্ডের লাইব্রেরীর অবস্থা দেখিয়া আসি। আপনারা হয় তো মনে করিবেন
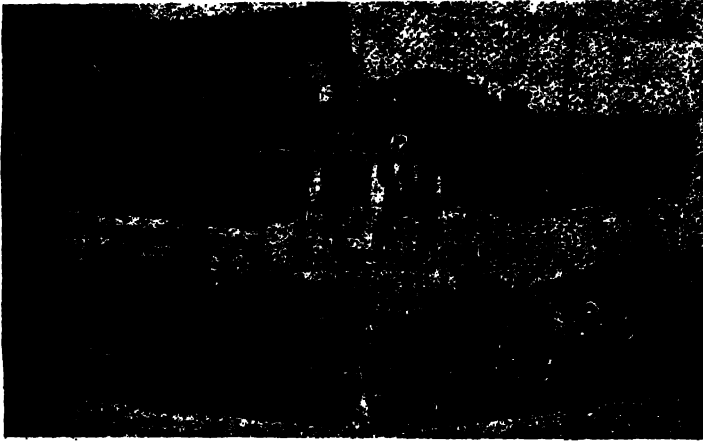
বিভিন্ন গ্রন্থাগার-কেন্দ্র—হাওয়াই

সেই অতিদূর তুহিনাবৃত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জনবিরল অজ্ঞাত জনপদে লাইব্রেরী-আন্দোলনের সাড়া পাওয়া কি সম্ভব? বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালে ফিনল্যাণ্ড স্বাধীনতালাভ করে। এতকাল পরপদানত থাকিয়া ফিনিশ ভাষা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল—বিদেশী ভাষার প্রভাবে অজ্ঞতায় দেশ ভরিয়া গিয়াছিল। যেখানে নিরক্ষরতা সেইখানে লাইব্রেরীর স্থান কোথায়? তবে ফিনল্যাণ্ডে লাইব্রেরী একেবারে ছিল না তাহা নয় স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থে ছোট-খাট লাইব্রেরী বহু দূরে দূরে স্থানে স্থানে ছিল; Library Society of finland সেগুলিকে একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল বটে তবে তাহাদের কার্য্যকারিতা নির্দ্দিষ্টস্থানে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে ফিনল্যাণ্ডে লাইব্রেরী-আইন পাশ হয়। এই সময় হইতে গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং লাইব্রেরী-আন্দোলনের প্রসারবৃদ্ধির ভার গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ফিনল্যাণ্ডে ৫৪টী নগরের মধ্যে ৩৮টীতে সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে; এক সহস্র পল্লী-পাঠাগার স্থাপন দ্বারা গ্রাম্যলোকের পাঠের অভাব বিদূরিত হইয়াছে। ফিনল্যাণ্ডের বার আনা লোক পল্লীবাসী। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট পুস্তক-ক্রয়, লাইব্রেরীয়ান ও কর্ম্মচারীদের বেতন, ঘরভাড়া বা খাজনা ইত্যাদি যাবতীয় খরচের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া থাকেন, বাকী অর্দ্ধাংশ লাইব্রেরী রেট্ দ্বারা সংগ্রহ করিতে হয়। লাইব্রেরীর গৃহনির্ম্মাণ জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সাহায্য করেন। Central County Library গুলি গভর্ণমেণ্টের নিকট অতিরিক্ত সাহায্য পাইয়া থাকে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ডে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লাইব্রেরী-বোর্ড গঠিত হয়, শিক্ষাবিভাগের সহযোগে লাইব্রেরী-আন্দোলনের পরিচালনায় এই বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত আছে। শিক্ষামন্ত্রীমণ্ডলীর একজন সভ্য এই বোর্ডের সভাপতির কার্য্য করেন। বোর্ডের অধীনে Government Library Burean আছে। তাহাতে একজন Director, সাতজন lecturer ও একজন সম্পাদক আছেন। এই Bureau ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কি কার্য্য করিয়াছিল শুনুন। ৭৩৪টী লাইব্রেরীকে সাহায্য প্রদান করে, প্রচারকার্য্যের জন্য ৬০টী লেকচারের ব্যবস্থা করে। দুইটী লাইব্রেরী স্কুল পরিচালনা করে তাহাতে ৫৮ জন লাইব্রেরীয়ানের কার্য্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন; ১০২ পৃষ্ঠায় ফিনিশ ভাষায় পুস্তক-তালিকা (Critical Catalogue of Books in the Finish Langnage), ১০৭ পৃষ্ঠায় সুইডিস্ ভাষার পুস্তক-তালিকা (Critical Catalogue of Books in the Sweedish languages) এবং ৮৩ পৃষ্ঠায় সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ

নির্দ্দেশক পুস্তক (Guide Book for the Classification of Literature) প্রকাশ করেন।

হায়! আমাদের দেশে কবে গভর্ণমেণ্টের এমন সুমতি হইবে—কবে লাইব্রেরী-আন্দোলন গবর্ণমেণ্ট স্বীয় কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে? বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ আশা দুরাশা বলিয়াই মনে হয়।
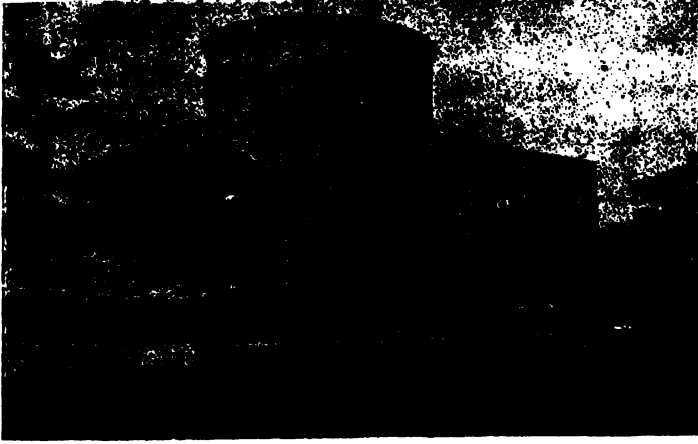
ষ্টকহল্‌ম গ্রন্থাগারের বাহিরের দিক্

সুইডেন

আর কিছু পশ্চিমে অগ্রসর হউন। প্রাচীন সুইডেন দেশের লাইব্রেরী-আন্দোলনের সাফল্য দেখিয়া লউন। একশত বৎসর পূর্ব্বে লাইব্রেরী-আন্দোলন উদ্ভূত হইয়াছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সুইডেনে প্রথম লাইব্রেরী-আইন বিধিবদ্ধ হয়। শতায়ুঃ হইলেও নানা বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া সুইডেনে লাইব্রেরী-আন্দোলন য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর জীবন-লাভ করিয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে দুইজন লাইব্রেরী-সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত শিক্ষাসচিব লাইব্রেরীর আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করিতেছেন—এই দুইজন বিশেষজ্ঞের মধ্যে একজন সাধারণ পাঠাগার অপরজন বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট পাঠাগার সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

সেই সময় হইতে সাধারণ পাঠাগারে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে—কার্য্যপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া লাইব্রেরীগুলি নবভাবে গড়িয়া তোলা হইতেছে—পুস্তকের নিকট সাধারণের অবাধগতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে—আধুনিক প্রণালীতে লাইব্রেরী-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে—প্রাচীন পন্থার গ্রন্থ পঠন ও অনুশীলন-সমিতি-যুক্ত লাইব্রেরীগুলির শ্রীবৃদ্ধির জন্য অকাতরে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে—সুইডেনে এইশ্রেণীর লাইব্রেরীর একটু বৈশিষ্ট্য আছে, অন্যত্র তাহা বিরল। লাইব্রেরী-পরিচালনে অমিতব্যয়িতা প্রতি-রোধকল্পে সুইডেন দেশের ২৪টী নাগরিক লাইব্রেরীর প্রসার বৃদ্ধি করিয়া Central Library সৃষ্টির প্রস্তাব চলিতেছে।

একবৎসর পূর্ব্বে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সুইডেনে লাইব্রেরী সংক্রান্ত একটী নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আমেরিকার County Library Serviceএর কর্ম্মপ্রণালীর আদর্শে জেলা লাইব্রেরীগুলির কার্য্যকারিতাবৃদ্ধি ও সংপ্রসারণের বিপুল চেষ্টা চলিতেছে। সুইডেনের শিক্ষা-বিভাগের লাইব্রেরী-সংক্রান্ত পরামর্শদাতা জানাইতেছেন যে, তাঁহারা প্রত্যেক জেলা লাইব্রেরীকে দশসহস্র মুদ্রা বার্ষিক সাহায্য করিবেন (লাইব্রেরীর জন্য৫,০০০,লাইব্রেরী-কার্য্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ানের জন্য ২,৫০০৲,reference
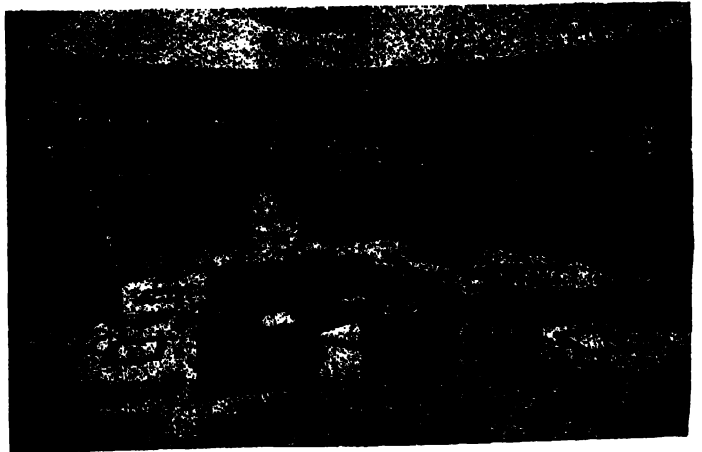
ষ্টকহল্‌ম গ্রন্থাগারের ভিতরের দৃশ্য—ফটোগ্রাফ লইবার দিনে

পুস্তক-সংগ্রহের জন্য ২,৫০০ মুদ্রা)। তিনি আশা করেন দুইটী করিয়া লাইব্রেরী নবভাবে গড়িয়া তুলিবেন এবং দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে ২৪টী নাগরিক লাইব্রেরী নূতন প্রণালীতে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে।

স্কুল-লাইব্রেরীগুলির উন্নতিবিধানের প্রচেষ্টাও যথেষ্ট চলিতেছে। স্কুলের সহিত স্কুললাইব্রেরীর ঘনিষ্ঠভাব ক্রমেই দৃঢ় হইতেছে। লাইব্রেরীর উপকারিতা এবং পুস্তকপ্রণালী সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে ছাত্রদের পাঠস্পৃহা আশাতীত-রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক লইয়া এখন আর ছাত্রগণ তুষ্ট নহে, অধিক বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভের জন্য লাইব্রেরীতে তাহারা চুম্বকের মত আকৃষ্ট হইতেছে। তাহাদের আগ্রাহাতিশয্য-পূরণের জন্য গভর্ণমেণ্ট স্কুল-লাইব্রেরী সংক্রান্ত সাহায্য বৃদ্ধির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ১৯২৮ সালের স্কুল-সংস্কার আইনের ফলে স্কুল-লাইব্রেরীগুলির দ্রুত উন্নতি হইতেছে

১৯১৩ সালে সুইডেনে ২৭৭টী স্কুল-লাইব্রেরী ছিল, ১৯২৭ সালে ১২৭৭টীতে দাঁড়াইয়াছে, এই তিন বৎসরে সম্ভবতঃ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্কুল-লাইব্রেরীগুলির পুস্তক-সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তাহা দুই ক্রোরে পৌছিয়াছে।

গত বিংশবর্ষের মধ্যে সুইডেন দেশে লাইব্রেরী-আন্দোলনের সাফল্য শিক্ষামন্ত্রীমণ্ডলীর বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেছে। তাঁহারা কেবল বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়া তুষ্ট হন নাই—তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের উপদেশমত সকল রকম সুযোগ ও সুবিধা এবং অর্থানুকূল্যপ্রদানে কুণ্ঠিত হন নাই—তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাঁহাদের অদম্য চেষ্টা ও অধ্যবসায় সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। ক্রমশঃ
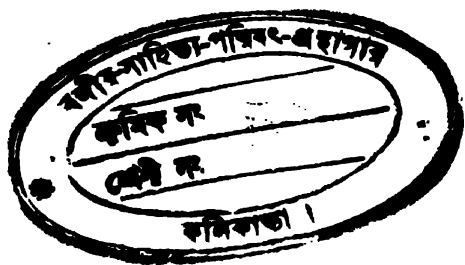
ভাবের অভিব্যক্তি

অভিব্যক্ত শ্রীমহিতোষ বিশ্বাস

শিল্পী

চিন্তা

ভয়

যন্ত্রণা

অবজ্ঞা

পাগলের খেয়াল

যাচ্ঞা

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি

শ্রীনিখিলনাথ রায়

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মেরই আদর ছিল, কিন্তু সে-আদর ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল। সাধারণের অবশ্য তাহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল না, শিক্ষিত সম্প্রদায়ই তাহার আদর করিতেন। এককালে যে শিক্ষিত সম্প্রদায় ফিরিঙ্গী-পুঙ্গব শ্রীমদ্ ডিরোজিওকশেশয়ে মধুপানরত হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানবর্জ্জিত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া তাহারা অনেকটা সংযত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের একদল নাস্তিক্যবাদের অনুকরণ করিতেন ও কোমত-তন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। অনুশীলনকেই তাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া মানিতেন। তদ্ভিন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কতক কতক উচ্ছৃঙ্খলও ছিলেন। সেইসময়ে এক মহাপুরুষের প্রভাব দেশমধ্যে সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হয়। আমরা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথাই বলিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের উপরও তাঁহার প্রভাব গিয়া পড়ে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত হইয়া উঠেন। ইহাতে তাঁহার ধর্ম্মমতের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেশবচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল, সেই শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমে পরমহংসদেবের প্রতি অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। ইহারই কিছু পরে ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি ও অল্‌কট থিওজফির বার্ত্তা লইয়া এ দেশে আসিলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম,বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতিকে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের কথাও মানিয়া লইলেন। এই সন্ধিক্ষণে দেখা দিলেন শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, আর তাঁহার সঙ্গে আসিলেন পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি। আমরা এক্ষণে তাঁহারই কথা বলিব।

চূড়ামণি মহাশয়ের কথা এবং তিনি এদেশে কি কাজ করিয়াছিলেন তাহা এখনকার অনেকেই অবগত নহেন। তিনি যে,একজন যুগপ্রবর্ত্তক সে কথা এক্ষণে কেহ স্মরণ করেন কি না সন্দেহ, কারণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য -অদ্যাবধি কোনই চেষ্টা হয় নাই, এমন কি তাঁহার দেহ রক্ষার পর শোকপ্রকাশের জন্য সাধারণের পক্ষ হইতে একটী সামান্যমাত্র সভারও অনুষ্ঠানের কথা আমরা শুনি নাই। তাঁহার কথা বিস্মৃতি-সাগরেই নিমগ্ন হইয়াছে। আজ সাহিত্য-পরিষদের সৌজন্যে তাঁহার কয়েকজন ভক্তশিষ্য চূড়ামণি মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাই আমরা সংক্ষেপে তাহার কার্য্যের আনুপূর্ব্বিক একটা বিবরণ দিবার চেষ্টা করিতেছি। ইহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, তিনি দেশের জন্য কি কাজ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি কাব্য-অলঙ্কারাদি পাঠের পর ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার তীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচয় সকলে প্রাপ্ত হন। কাশীমবাজারের গুণগ্রাহী জমিদার রায় অন্নদাপ্রসাদ

রায় বাহাদুর তাঁহার ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে তাহার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন এইখানে তিনি দর্শন-উপনিষদাদি আলোচনার সুযোগলাভ করেন। রায়বাহাদুর তাঁহার জন্য অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দেন। সেইসমস্ত গ্রন্থ আলোচনা করিয়া তাঁহার চিন্তাশক্তি দিন দিন প্রসারলাভ করিতে থাকে। সেইসময়ে বহরমপুরে ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ কবিরাজ গঙ্গাধর রায়। কেবল চিকিৎসাশাস্ত্র বলিয়া নহে, বহুশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা ছিল! সেই মহা-পণ্ডিতের সহিত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কোন কোন বিষয়ের বিচার হয়। তাহাতে সকলে চূড়ামণি মহাশয়ের বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হন। সেই বিচারের ফলে তাঁহার প্রথম পুস্তক শ্রাদ্ধাম্নবিবেক প্রকাশিত হয়, তাহাতে শ্রাদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছিল। শ্রাদ্ধাম্নবিবেক যেরূপভাবে লিখিত হয়, তাহাতে সকলে তাঁহার দার্শনিকতার বিশেষরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হন। ক্রমে তিনি একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

রায়বাহাদুর অন্নদাপ্রসাদ অনেকসময়ে মুঙ্গেরে থাকিতেন। চূড়ামণি মহাশয়ও তাঁহার সঙ্গে যাইতেন। সেইখানে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন জামালপুরের রেলওয়ে অফিসে কেরাণীর কার্য্য করিতেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহার সে-অনুরাগ দিন দিন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন মুঙ্গেরে আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী নামে এক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার মুখপত্রস্বরূপ ধর্ম্মপ্রচারক নামে বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে লিখিত এক মাসিকপত্রও লিখিত হয়। তর্কচূড়ামণি মহাশয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভায় শাস্ত্রব্যাখ্যা ও 'ধর্ম্মপ্রচারকে' প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ব্যাকরণের বর্ণোৎপত্তি, সন্ধি, সমাসাদি যে কাল্পনিক নহে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনি 'ধর্ম্মপ্রচারককে' তাহা দেখাইতে চেষ্টা করেন। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় সকলেই তাঁহাকে প্রগাঢ় চিন্তাশীল বলিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে দেশমধ্যে চূড়ামণি মহাশয়ের নাম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়।

বালকদিগের মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন স্থানে স্থানে স্থানে সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। মুঙ্গের, বাঁকীপুর, ভাগলপুর, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ও চূড়ামণি মহাশয় সমাগত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ব্যাখ্যা করিতেন। কেবল বালক বলিয়া নহে, বয়স্থদিগকেও উদ্দেশ করিয়া সে সকল বক্তৃতা ও ব্যাখ্যা করা হইত। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার ভাষা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের ভাষা ওজস্বিনী বলিয়া অনেকে মতপ্রকাশ করিতেন আর চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা ছিল যুক্তিপূর্ণ। এই দুই ভাবের বক্তৃতায় তখন দেশমধ্যে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। অনেকে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যে একটু অনুরাগ হইতেছিল, এক্ষণে দিন দিন তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মানুরাগ সুদৃঢ় হইতে থাকে! ইহাদের সঙ্গে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি যোগ দিয়া আন্দোলনের মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলেন। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামধারণ ও কাশীধামে গমন করেন। সেখানে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। চূড়ামণি মহাশয় কাশীতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশ হইতে যখন তাঁহার ডাক পড়িল, তখন তিনি বাঙ্গালা অভিমুখেই অগ্রসর হইলেন।

বাঙ্গালায় আসিতে আসিতে তিনি প্রথমে বীরভূমে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। তাহার পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন। এইখানে খ্যাতনামা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। আমরা বলিয়াছি এই সময় হইতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইতেছিল, ধর্ম্মপরায়ণতার জন্যই যে তাহা হইয়াছিল, সে কথা অবশ্য বলা যায় না। কিন্তু তাঁহারা অনুশীলনকে ধর্ম্ম বলিয়াই বুঝিতেন। হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্র যে সেই অনু-শীলনকে পরিচালিত করিতে পারে না এ বিশ্বাস ক্রমে

তাঁহাদের মনের মধ্যে আসিতেছিল। তদ্ভিন্ন স্বদেশপ্রীতিও তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত করে। তাই তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রণী বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র, শিশিরকুমার প্রভৃতির মনে সেইভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। ইন্দ্রনাথও তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। আর সেই মনীষী ভূদেব যে সকলেরই অগ্রগণ্য ছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। ইন্দ্রনাথ বর্দ্ধমানে চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রের প্রধান কয়েকটী বিষয় লইয়া ন্যায়মতে বাদ-বিচার আরম্ভ করেন। ধর্ম্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব জাতিভেদ, আচারতত্ত্ব পুনর্জ্জন্ম, খাদ্যাখাদ্যের ব্যবস্থা, বিধবার যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যাদির কর্ত্তব্যতা প্রভৃতি জটিল বিষয়ের কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনা ও বিচার হয়। চূড়ামণি মহাশয়ের ঐসকল বিষয়ে দার্শনিক যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিয়া ইন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। তখন বর্দ্ধমানে তাঁহার উদ্যোগে চূড়ামণি মহাশয় কয়েকদিন বক্তৃতা প্রদান করেন। ইন্দ্রনাথ বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রভৃতি কয়েকজনকে বর্দ্ধমানে আনাইয়া চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তাঁহাদের সহিতও চূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রসম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহার পর ইন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি চূড়ামণি মহাশয়কে কলিকাতায় যাইতে পরামর্শ দেন। তখন তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হন। ইন্দ্রনাথও তাঁহার সহিত আসেন।

কলিকাতায় আসিয়া ইন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত চূড়ামণি মহাশয়ের পরিচয় করাইয়া দেন। চূড়ামণি মহাশয় তাঁহাদের নিকটও ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। বর্দ্ধমানে ইন্দ্রনাথের সহিত যেরূপ বাদবিচার হইয়াছিল এখানেও সেইরূপ হইতে থাকে। ক্রমে সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন, তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই প্রীতিলাভ করেন। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া সকলকে শুনাইতেছি। চন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—"যখন কলেজে পড়ি তখন আমার দেব-দেবীতে বিশ্বাস ছিল না, আমি সত্য-ধর্ম্ম খুঁজিতাম। তখন কেশববাবুর ধর্ম্মান্দোলনের ধুম পড়িয়াছিল। অনেক যুবক তাঁহার চেলা হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কালেজে আমার সঙ্গে তাঁহার কয়েকজন উদ্যমশীল চেলা পড়িতেন। আমি মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে যাইতাম—কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিতাম। কিন্তু তাহাতে Reid, Hamilton, Kant, Victor Cousin প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের কথাই অধিক থাকিত। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। তাহার পর অগস্ত কোম্‌তের দুই একখানা গ্রন্থ পড়ি এবং স্বর্গীয় মহাপুরুষ দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত বন্ধুত্ব হয়। দেখিলাম কোমতের প্রণালীতে আমাদের সমাজ প্রণালীর অনেক সমর্থন আছে। বড় আহ্লাদ হইল কিন্তু কোম্‌তের ঈশ্বর নাই দেখিয়া তাহাতে আমার তৃপ্তি হইল না। দ্বারকানাথকে বলিলাম। মহামনা মহাপুরুষ বলিলেন,—তবে জোরে ঈশ্বরকে ধরিয়া থাক। আবার সত্যধর্ম্ম খুঁজিতে লাগিলাম। ইংরাজীতে দেখিতাম, ইংরাজের মুখে শুনিতাম, Religion কেবল ঈশ্বর লইয়া, আর কিছু লইয়া নয়। ভাবিতাম—তবে ঈশ্বর ছাড়া এই যে এত বস্তু ব্যাপার রহিয়াছে ইহাদের সহিত তবে কি মানুষের কোন ধর্ম্মমূলক সম্বন্ধ নাই? বঙ্কিমবাবুর বাসায় প্রতি রবিবার আমরা এইসকল আলোচনা করিতাম। সেই সময় পূজনীয় শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণির নাম শুনা গেল। ইন্দ্রনাথকে বলিয়া বঙ্কিমবাবু চূড়ামণি মহাশয়কে একদিন আপন বাসায় আনাইলেন। চূড়ামণি মহাশয় ধর্ম্মকথা কহিলেন, তিনি যেমন বলিলেন—ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম্ম, অর্থাৎ যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম, অমনি আমার সকল সংশয় দূর হইল। বিশ্বে যাহা কিছু আছে সকলই ধর্ম্মের অন্তর্গত দেখিলাম। বিশ্বে যাহা কিছু আছে বিশ্বনাথ হইতে তাহা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে বিশ্বনাথকে পাওয়া যায় না বুঝিলাম, কারণ বিশ্ব তাহা হইলে আমাদিগকে রক্ষা না করিয়া বিনাশই করে। যাহা এত অন্বেষণে পাই নাই তাহা পাইলাম। আমার আনন্দের সীমা রহিল না।" (বঙ্গভাষার লেখক)।

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির উদ্যোগে চূড়ামণি মহাশয় প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। নানা সভায় তাঁহার বক্তৃতা হইতে লাগিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যে

তাঁহার নাম চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল! তখন মফঃস্বল হইতে লোকপ্রবাহ কলিকাতার দিকে ধাবিত হইল। যাহারা আসিতে পারিল না তাহারা সংবাদপত্র পাঠ করিয়া তাঁহার ধর্ম-ব্যাখ্যার পরিচয় পাইতে লাগিল। একজন গ্রন্থকার তাঁহার সে সময়ের কথা যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"এ সময় সহরেতে হন উপনীত।
নানা শাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা পরমপণ্ডিত॥
তর্কচূড়ামণি আখ্যা নাম শশধর।
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম বঙ্গদেশে ঘর॥
শাস্ত্রব্যবসায়ী নন প্রবৃত্ত সাধনে।
হীরকের খণ্ড যেন মণ্ডিত কাঞ্চনে॥
মাঝারি বয়স সুশ্রী সুন্দর গড়ন।
গলায় রুদ্রাক্ষ দুলে শাক্তের লক্ষণ॥
অঙ্গে বাহে সমধারা মাখা সরলতা।
মানুষের মধ্যে যেন মানুষ-দেবতা॥
তেজ ভারি নিষ্ঠাচারী আপন ধরমে।
গা ফুটে লাবণ্য উঠে সৎগুণগুণে॥
বাক্য সুকৌশল অতি বল রসনায়।
শাস্ত্রের করেন ব্যাখ্যা বিবিধ সভায়॥
শ্রুতিরুচিকর কথা মিষ্টভাষ গুণে।
দেশেতে প্রচার নাম হয় অল্পদিনে॥
সমাচার পত্র এবে দেশের চলন।
সুযশ গৌরব বুকে করিয়া ধারণ॥
বহিয়া লইয়া যায় দূর দূর দেশে।
পাইয়া বারতা লোক অগণন আসে॥
আসিতে না পারে যারা অবস্থার আড়ে।
বক্তৃতা বিক্রয় হয়, কিনে ঘরে পড়ে॥"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি)

কলিকাতার আলবার্ট হলে প্রথমে তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ হয়। সেখানে স্থানাভাব হওয়ায় বেঙ্গল থিয়েটার, ষ্টার থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যালয়ে এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে, অবশেষে বিডন গার্ডেনের খোলা মাঠে তাঁহার বক্তৃতা হইতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্যোগে শেষের দিকে হাবড়া টাউন হলেও তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছিল। এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শেষ পর্য্যন্ত চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু সে কথা যে সত্য নহে হাবড়া টাউনহলে তাঁহারই চেষ্টায় চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা প্রদান তাহারই প্রমাণ। ইহার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার নিজমত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। খাদ্যাখাদ্য-বিচার প্রভৃতি দুই-একটী বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত চূড়ামণি মহাশয়ের মতভেদ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাই 'প্রচারে' লিখিয়াছিলেন,—"পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না এবং তাঁহার যতন সফল হইবে না। এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া আমরা তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিলাম না।" হিন্দুশাস্ত্রে ও সমাজে যাহা অখাদ্য বলিয়া কথিত, চূড়ামণি মহাশয় তাহা পরিত্যাগ করা লোকের সাধ্যাতীত বলিয়া স্বীকার করেন নাই; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের তাহাতে অন্য মত ছিল। এইরূপ দুই-একটী বিষয়ে তাঁহাদের মতভেদ হয়। তাই বলিয়া তিনি কখনও চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হন নাই! যে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিতে যাইবেন, তাহাতে জিনিস আছে, তিনি যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইবেন এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। তবে কোন কোন বিষয়ে অবশ্য তাঁহাদের মতভেদ হইয়াছিল।

চূড়ামণি মহাশয় যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিতেছিলেন 'বঙ্গবাসী'তে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন দেশ মধ্যে বঙ্গবাসীর অপরিসীম প্রভাব, শহর হইতে পল্লীর নিভৃত স্থানে পর্য্যন্ত 'বঙ্গবাসী' পঁহছিতেছিল। তাই তাঁহার বক্তৃতা দেশ মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা যাহাতে স্থায়িভাবে থাকে, সেইজন্য পুস্তক লেখারও ব্যবস্থা হইল। 'ধর্ম্মব্যাখ্যা' নামে তাঁহার পুস্তক প্রকাশিত হয়। 'ধর্ম্মব্যাখ্যার' ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—"ভারতীয় ধর্ম্ম এইরূপ প্রাকৃতিক পদার্থ বলিয়াই খৃষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম বা অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইহার কোন বিশেষ সংজ্ঞা নাই। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র

কেবল ধর্ম নামেই অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম শব্দের সাধারণতঃ যে বৈয়াকরণ অর্থ বুঝি আর্য্যধর্ম স্থলে তাহাই বুঝিতে হইবে। 'ধৃঙ' অবস্থানে এই ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয়ের দ্বারা 'ধর্ম' পদ সাধিত। যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না, যাহা বস্তুর প্রকৃতির স্বরূপ তাহাই তাহার ধর্ম। আমাদের ধর্মও সেইরূপ। যে গুণবিশেষ সূক্ষ্ম বীজভাবে থাকাতে আমরা মনুষ্য, যে সূক্ষ্ম গুণবিশেষের বিনাশে মনুষ্যত্বের হানি, যে সূক্ষ্ম গুণবিশিষ্ট না থাকিলে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না সেই সূক্ষ্ম গুণবিশেষ আমাদের ধর্ম। সেই সূক্ষ্ম গুণসম্ভূত গুণবিশেষ একই পদার্থ কার্য্য কারণ ভেদে নানা প্রকারে পরিণত হয়।" ধর্মব্যাখ্যা দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি একথা আরও বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। বঙ্কিমবাবুও 'নবজীবন' পত্রে "ধর্মজিজ্ঞাসা" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"ধর্মশব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা Religio শব্দের অনুরূপ। ধর্ম—ধৃ+মন্ (ধ্রিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোকং বা) এইজন্য আমি ধর্মকে Religio শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।" তাহার পর তাঁহার 'ধর্মতত্ত্বে' লিখিতেছেন,—"যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ, না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম। তাহার নাম মনুষ্যত্ব।" এই ধর্মজিজ্ঞাসা ও ধর্মতত্ত্ব অবশ্য চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্মব্যাখ্যার পর লিখিত হয়।

চূড়ামণি মহাশয়ের এই ধর্ম-প্রচারের সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাহা ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। এই পরিচয় সম্বন্ধেও কোন কোন কথা উঠিয়াছে। কিন্তু আমরা বিশেষরূপে জানি তাহার কোনই মূল নাই। এই সময়ে বালকদিগের জন্যও তিনি 'বাল্যাশ্রম' নামে সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বয়ঃস্থদিগের ন্যায় বালক-যুবকদিগের মধ্যেও ধর্মালোচনা হইতে লাগিল। সকলের মধ্যে প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাহ্নিকের ধুম পড়িয়া গেল। দেবমন্দিরে সকলের মস্তক অবনত হইতে লাগিল। অনেকের মস্তক শিখামণ্ডিতও হইয়া উঠিল। ফলতঃ সে দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য মনে করিবেন, সে সময়ে হিন্দুসমাজ মধ্যে চূড়ামণি মহাশয়ের প্রভাব কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল। কি শহর, কি পল্লী সর্ব্বত্রই তখন তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে যে তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, সে কথাও আমরা জানি।

চূড়ামণি মহাশয়ের কলিকাতায় ধর্মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলেও তাহা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এইরূপে শহরে ও মফঃস্বলে ধর্মান্দোলন দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিল। এই ধর্মান্দোলনের সময় দেশ মধ্যে এক বিরাট্ আন্দোলন উপস্থিত হয়। আমরা সহবাস-সম্মতি আইনের প্রতিবাদের কথাই উল্লেখ করিতেছি। একটী নিম্নশ্রেণীর লোক তাহার বালিকা স্ত্রীর উপর অত্যাচার করায় তাহাতে তাহার মৃত্যু ঘটে। ইহা লইয়া সংবাদপত্রমহলে খুব লেখালেখি চলিতে থাকে। চূড়ামণি মহাশয়ও 'বঙ্গবাসী'তে এইরূপ বীভৎসকাণ্ডের যারপরনাই প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ইহাকে ধর্ম ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করেন। ক্রমে এই আন্দোলন সরকারের কর্ণগোচর হইলে সরকার-পক্ষ হইতে সহবাস-সম্মতি-আইন প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হয়। কিন্তু তাহাতে ১২ বৎসর হইতে সহবাস-সম্মতির বয়স নির্দ্ধারণ করায় তাহার প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। চূড়ামণি মহাশয় 'বঙ্গবাসী'তে তাহার প্রতিবাদ করেন। ঋতুমতী হইলেই শাস্ত্রমতে গর্ভাধানের ব্যবস্থা, ঋতুমতী হওয়া অবশ্য একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স অপেক্ষা করে না। সেই জন্য বয়স নির্দ্ধারণ না করিয়া উপযুক্ত সময়ে সহবাসের ব্যবস্থা কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন এবং শাস্ত্র হইতে তাহা দেখাইয়া দেন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকও এই মত ব্যক্ত করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আইন-সভায়—স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রও প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সরকারপক্ষ এসকল প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া ১২ বৎসর বয়স নির্দ্ধারণ করিয়াই সহবাস-সম্মতি-আইন পাশ করেন। দেশের সর্ব্বত্রই ইহার প্রতিবাদ হয়। কলিকাতার স্থানে স্থানে অবশেষে গড়ের মাঠে লোকারণ্যের মধ্যে ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ হয়। চূড়ামণি মহাশয়—জ্বালাময়ী ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করেন। সভাভঙ্গের পর যখন সেই লোকপ্রবাহ বড়লাটের বাটীর সম্মুখ দিয়া "আইন চাই না, আইন

চাই না", বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতেছিল, সে দৃশ্য এখনও পর্য্যন্ত চক্ষুর সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে দেখা দিতেছে। চূড়ামণি মহাশয়ের ন্যায় বঙ্গের অনেক প্রসিদ্ধ লেখক 'বঙ্গবাসী'তে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেন। কয়েকটী প্রবন্ধের জন্য 'বঙ্গবাসী'কে রাজদ্রোহের অভিযোগে আদালতে হাজির হইতে হইয়াছিল ; পরে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তখনকার রাজদ্রোহ আইন সুস্পষ্ট ছিল না। 'বঙ্গবাসী'র এই মোকর্দ্দমা হইতে তাহাকে সুস্পষ্ট করা হয়। এখন অনেকে যে তাহার কবলে পড়িতেছেন, তাহা অবশ্য সকলে লক্ষ্য করিতেছেন।

এই সময়ে রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্‌বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি বেদ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্যভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলে, চূড়ামণি মহাশয় 'বঙ্গবাসী'তে তাহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বেদের মন্ত্রের আধিদৈবিক, অধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন প্রকার অর্থ হইতে পারে, ইহাই বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রবন্ধে উহা সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেন। ইহা লইয়া কেহ কেহ রমেশচন্দ্রের ও কেহ কেহ চূড়ামণি মহাশয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সংবাদপত্রে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেন। চূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। গীতার শঙ্কর-ভাষ্যের ব্যাখ্যা-মূলক অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। "ভবৌষধ" নামে একখানি পুস্তকও তিনি প্রণয়ন করেন। 'বঙ্গবাসী'তে দুর্গোৎসবের সময় বৎসর বৎসর যে প্রবন্ধ লিখিত হইত, তাহা লইয়া "দুর্গোৎসব পঞ্চক" নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। পরে তাহার "ভক্তিসুধা লহরী" নামকরণ করা হয়। "ভক্তি-সুধা লহরী"তে তিনি ভক্তির পবিত্র ধারা ফুটাইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বেদব্যাস' নামে মাসিক-পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, চূড়ামণি মহাশয় তাহাতে অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি লইয়া "সাধন প্রদীপ" নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। আরও কোন কোন মাসিকপত্রে ও 'বঙ্গবাসী'তে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক ও প্রবন্ধ যে বঙ্গসাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এই হিন্দু-ধর্ম্মান্দোলন হইতে যে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও বলা যাইতে পারে। ইহার ফলে সামাজিক প্রবন্ধ, আচার-প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যে দেখা দিয়াছিল। সুতরাং সে আন্দোলন সকল দিকেই যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা অবশ্য সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। আর এই আন্দোলনের মূলে যে চূড়ামণি মহাশয় ছিলেন, তাহাও বোধ হয় নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না।

কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া চূড়ামণি মহাশয় কিছুদিন স্বগ্রামে বাস করেন, ফরিদপুর জেলায় প্রাণপুর তাঁহার স্বগ্রাম। তাহার পর বহরমপুরে আসিয়া শেষজীবন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বহরমপুরে তিনি শাস্ত্রচর্চ্চা, অধ্যাপনা ও গ্রন্থপ্রণয়নে নিবিষ্ট থাকিতেন। সাধনপ্রদীপ ও ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ বহরমপুর হইতেই প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ইহার জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। চণ্ডীর একখানি ভাষ্য লিখিতেও তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি "চূড়ামণি দর্শন" নামে সংস্কৃত ভাষায় একখানি দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র গ্রন্থাদি সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। 'চূড়ামণি দর্শন' কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই— সহস্রাধিক পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত উহা লিখিত হইয়াছিল। দার্শনিকতায় তাঁহার নিজের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রাচীন দার্শনিকদিগের মত অনুসরণ এবং ষড়্‌দর্শনের সমন্বয় স্বীকার করিলেও তাঁহার একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবের মত ছিল। চূড়ামণি দর্শনে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা হইতেছিল। আধ্যাত্মিক দর্শনের আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে শারীর-বিজ্ঞানের আলোচনার প্রয়োজন হয়! এইজন্য তিনি বিশেষভাবে শারীরবিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ করেন। গ্রন্থ হইতে সকল কথা বুঝিয়া লওয়ার সুবিধা না হওয়ায় তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াও কারমাইকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদাগারে গিয়া শবব্যবচ্ছেদ দেখিয়া শরীর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা ছিল। তিনি বলিতেন, জ্ঞানের রাজ্যে জাতিভেদ নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদির আলোচনা তিনি ভালবাসিতেন। অধ্যাত্মজ্ঞানে তিনি অনেকদূর অগ্রসর

হইয়াছিলেন। কেবল পাণ্ডিত্য বলিয়া নহে,তাঁহার সাধনাও ছিল। মনঃসংযোগে ব্যাধি দূর করার একপ্রকার চিকিৎসার আবিষ্কার তিনি করিয়াছিলেন। তাহাতে অনেকের দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার কথা আমরা অবগত আছি। চূড়ামণি মহাশয় আর একবার প্রচারের জন্ত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায়, সকল লোকই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শেষজীবনে বহরমপুরে থাকিয়া সেইখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে যথাসম্ভব বিবরণ প্রদান করিলাম। এইবার তাঁহার ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। চূড়ামণি মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদন সরস্বতীর ভ্রাতা যাদবানন্দের বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা হলধর বিদ্যামণি মহাশয়ও একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। চূড়ামণি মহাশয় নিজে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। আর শাস্ত্রে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং সকলকে তাহা বিশ্বাস করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন। তাই বলিয়া তিনি অন্ধবিশ্বাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। যুক্তিবলে তিনি শাস্ত্রে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিতেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার মত অনুসরণ করিতেন। তিনি নিজে যাহা বিশ্বাস করিতেন, তাহা নির্ভয়ে প্রকাশ করিতেন। তাঁহার মত নির্ভীক ও তেজস্বী ব্রাহ্মণপণ্ডিত অল্পই দেখা যায়। তাঁহার সংযম অতুলনীয় ছিল। অর্থলালসা তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে পারিত না। সামান্য গৃহস্থের ন্যায়ই তিনি জীবনযাপন করিতেন। তিনি আপনাকে গৃহীই মনে করিতেন সেজন্য গৃহকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকিতেন। গোসেবা তাঁহার নিত্য ব্রত ছিল, পরিবার প্রতিপালনে তিনি উপেক্ষা করিতেন না। অথচ ইহার মধ্যে তাঁহার জ্ঞানালোচনা ও সাধনারও ব্যবস্থা ছিল। তাঁহার একদিকে গোসেবা ও আর একদিকে বেদান্ত-আলোচনা মহর্ষি বশিষ্ঠের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যখন তিনি শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন, তখন ব্যাসের কথা আমাদের স্মরণ পথে উদিত হইত। আর যখন প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন, তখন শঙ্করের কথা আমাদের মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিত। ফলতঃ তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী, শাস্ত্রবিশ্বাসী, নির্ভীক, তেজস্বী, সংযমী, সাধনশীল, ত্যাগীপুরুষ বর্ত্তমান যুগে বিরল বলিয়াই মনে হয়। *

---

* পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৩৩৭। ১৪ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে লেখক-কর্ত্তৃক পঠিত।

রুধির

(গল্প)

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

১

প্রবাসের পথে তিনটী বৎসর ঘোরাফেরা করিয়া নিখিল যেদিন ঘরে ফিরিল—সেদিন সংখ্যায় শুধু একা নয়,—আর একটী প্রাণীও ওর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া নিভৃত অন্তঃপুরটীকে সহসা মুখর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে বাল্যবন্ধু সুহাস আসিয়া বলিল,—"বল্গি চিনতে পারিস নিখিল ?"

নিখিল ছুটিয়া আসিয়া আলিঙ্গনের পর্ব্বটা শেষ করিয়া লইয়া বলিল, "না তা পারব কেন ? চিঠি লিখেও তো বাবুর আর সাড়া পাবার উপায় নেই, কি কাব্যরোগেই ধরেছে বাবা।"

চেয়ারে বেশ আরাম করিয়া বসিয়া সুহাস কি একটা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু দ্বারান্তরালে স্বল্পাবগুণ্ঠিতা একটী সুন্দরীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

পরক্ষণে নিখিলের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "না, বান্ধবীটী তো বেশ হয়েছে দেখছি, বলি, নির্ব্বন্ধের পালাটা কবে চুকল...হাঁ হে ?"

নিখিল হাসিতে হাসিতে বলিল,—"ঠিক একটী বছর ভাই, ইচ্ছে ছিল তোর মত চিরকুমার থেকে সাহিত্যচর্চ্চা করব···কিন্তু পেরে উঠলাম না সুহাস, বেনারসে এক বন্ধুসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়েই ওকে দেখি—তারপর—কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া সুহাসের মুখের দিকে চাহিয়া নিখিল মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

সুহাস কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়, চক্ষু দুইটা মুদিত করিয়া জলস্রোতের মত বলিয়া চলিল—"হুঁ বান্ধবীর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময়ের পর হইল আলাপ, তারপর 'লাভ'···তারপর অর্দ্ধাঙ্গিনী তারপর এই অন্তঃপুর কেমন তাই না হে ?"

নিখিল একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, পরে বলিল, "এখনও ঠিক তেমনিটাই আছিস সুহাস,...যা হ'ক···তোর সাধনা চল্‌ছে কেমন ?

দেশালাই-এর কাটিতে একটা 'সিগার' ধরাইয়া বারকয়েক ধোঁয়া ছাড়িয়া সুহাস বলিল,—"মন্দ নয়. তোমার তো এখন কিশোরী-সাধনা চল্‌ছে...সাহিত্যের উৎস বোধ করি অনেকদিন আগেই শুখিয়ে গেছে।"

নিখিল দরজার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে ওষ্ঠপুট রঞ্জিত করিয়া বলিল,—"তা অনেকটা তাই,তবে একেবারে শুখায় নি ভাই, যে ধারাটুকু বইছে সেটুকু শুধু নলিনীর জন্যেই বেঁচে আছে, ওর এদিকে বেশ একটু নিষ্ঠা আছে কি না ?" বলিয়াই নিখিল ডাকিল. "নলিনী ও নলিনী ?"

দ্বারান্তরাল হইতে নলিনী বাহির হইয়া আসিল, ঠিক একটা স্বপ্নময় পুষ্পস্তবকের মত। আসিয়াই দু' হাত তুলিয়া সুহাসকে নমস্কার করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল—সুহাসও প্রতি নমস্কার করিয়া একদৃষ্টে নলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! সুহাস দেখিল নলিনী একটা জলন্ত রূপশিখা, দীপ্তি তার এত প্রখর যেন চক্ষু দুইটা ধাঁধিয়া যায়. মুখের প্রতিটী কুঞ্চন রেখায় পুষ্পিত যৌবনের মঞ্জুশ্রী চক্ষু দুইটার ভিতর হইতে প্রতি নিমেষে একটা স্বচ্ছ মদিরতা যেন ঝরিয়া পড়িতেছে, সে দৃষ্টির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সুহাসের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

নিখিল হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি রে, এখুনই কি কবিত্ব জমে উঠল না কি ? নে নলিনীর সঙ্গে আলাপ কর।" কি গো তুমি অমন করে' দাঁড়িয়ে রইলে যে, বস না এই চেয়ারটায়, হাঁ এ:ই কথা তোমায় বলছিলাম আধুনিক তরুণ সাহিত্যের অদ্বিতীয় রথী ইনি, নাম শুনেছ নিশ্চয়—সুহাস রায়।"

"সুহাস রায়···ইনিই ওঃ, ওঁর লেখা তো আমি ঢের পড়েছি, লেখায় কি চমৎকার হাতই না বানিয়াছেন।" কথা কয়টী নলিনীর বিযুক্ত ওষ্ঠপুট দিয়া ঠিক পিয়ানোর সুরে বাজিয়া উঠিল—আরক্ত দুটী কপোলতলে চমৎকার একটু টোল খাইয়া উঠিল। সুহাস পুনরায় স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল!

পাতলা নীলকাপড়ের শিথিল প্রান্তরেখাটী নলিনীর পাদুটীকে যেখানে স্পর্শ করিতেছিল, সুহাস সেইদিকে চাহিয়া সহসা আবেশময় কণ্ঠে বলিল, "চমৎকার, কিন্তু নলিনী নামটা তো আমার পছন্দ হ'ল না নিখিল।"

"পছন্দ হ'ল না?" নিখিল নলিনীর রক্তাক্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

সুহাস মৃদু হাসিয়া বলিল—"না, আমি কিন্তু এখন থেকে ওঁকে ষোড়শী বলেই ডাকব নিখিল।"

"ষোড়শী বাঃ শরৎবাবুর 'ষোড়শী', মন্দ নয়, নলিনী এতে রাজী আছ তো?"

নলিনী কথা কহিল না—প্রত্যুত্তরে একটু হাসিল মাত্র!

প্রথম আলাপের সঙ্কোচটুকু কাটিয়া গেলে নলিনী স্বহস্তে চা করিয়া আনিল! পীতাভ চায়ের মিষ্ট সৌরভের সহিত আসর বেশ জমিয়া উঠিল— প্রসঙ্গ চলিল সাহিত্য লইয়া।

নিখিল বলিল, "সাহিত্যের চরমপন্থীর দলকে আমি তেমন আমল দিতে পারি নে সুহাস, লেখা তোমাদের প্রশংসা করি কিন্তু সমাজের দিকে যখনই চোখ ফিরাই..."

কথায় বাধা দিয়া সুহাস একেবার তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আমাদের সমাজ! মানে বলতে চাও এই যে আমরা যা লিখি আমাদের সমাজে তা ঘটে না, এটা হচ্ছে তোমাদের দৃষ্টির ভুল, নীতির দিকে চাইতে চাইতে তোমাদের চোখ গেছে ঝলসে, সৃষ্টির পথ তোমরা কোন-দিনই প্রশস্ত করতে পারবে না নিখিল।"

নিখিল একটু গাঢ়স্বরে বলিল, "কিন্তু—"

"আবার 'কিন্তু', 'কিন্তুর' ফাঁস গলায় পরেই তো আমরা মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করে তুলছি, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্য প্রায়ে উঠছে পাহু। আধুনিক সাহিত্য এই 'কিন্তু'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে বলেই নীতিবাগীশরা আজ তাদের লেখনীকে অসির কাজে লাগিয়াছে—ফলে দাঁড়িয়েছে এই, নিজেও ওরা সৃষ্টি করতে পারছে না পরকেও সৃষ্টি করতে দিচ্ছে না, কেমন তাই না নিখিল?"

নিখিল এ কথার কোন উত্তর দিল না,—বাহিরের অস্পষ্ট গোধূলি-আলোর দিকে চাহিয়া আপন মনে কি ভাবিতে লাগিল!

পাশের চেয়ারেই চিত্রার্পিতের মত নলিনী বসিয়া আছে,—তরুণ সাহিত্যিকের এই মতবাদ শুনিতে শুনিতে সে আত্ম-সমাহিত হইয়া পড়িয়াছে। নীলাম্বরী সাড়ীর প্রান্তটী সুবিন্যস্ত কেশপাশের উপর হইতে অলক্ষিতে কখন সরিয়া গেছে—ঘরের স্বচ্ছ আলোকচ্ছটা সমগ্র আধারটাকে চমৎকার একটী কবিতা রচনা করিতেছে!

সুহাস নলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আমার মতটা আপনার বোধ হয় ভাল লেগেছে, নিখিলের মতের সঙ্গে আপনার মতের যে মিল থাকবে একথা আমি ভাবতে পারি নি। আমি চাই সৃষ্টির ভেতর যৌবন, যে সৃষ্টি বার্দ্ধক্যের চাপ নিয়ে বিশ্বমানবের দ্বারে এসে ঘাড় কুঁচকে দাঁড়ায়, বিশ্বমানব সে সৃষ্টির দিকে চোখ ফিরিয়ে সহানুভূতির অশ্রু ফেলতে পারে, আনন্দ পেতে পারে না;—আমরা সৃষ্টির ভেতর আনন্দ রস যোগাতে চাই, আপনার এতে মত কি বলুন?"

নলিনী আনত চক্ষুদুইটা একটুখানি তুলিল—সাহিত্য প্রসঙ্গ লইয়া ইতিপূর্ব্বে বান্ধবীদের সহিতও আলোচনা করিয়াছে কিন্তু আজ এই বিদ্রোহী তরুণটীর সহিত স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতেই তার কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতেছে;—নলিনী ভাবিল দু' চারখানি বই পড়িয়া কতটুকু জ্ঞানই বা সে সঞ্চয় করিয়াছে—বিশেষ বৈদেশিক সাহিত্যের সহিত পরিচয়ও তেমন ঘনিষ্ঠ নয়?

নলিনী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমাকে আপনি আপনি করে' লজ্জা দেবেন না, আর আমার মতের কি মূল্য আছে বলুন? আমি কিই বা পড়েছি!"

সুহাস হাসিল—নলিনী যে এমনিভাবে ধরা দিবে

তাহা সে জানে, কারণ সাহিত্যিক মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনের মুখে ঠিক অমনই উত্তরই সে শুনিয়াছে !

সুহাস উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল,—"তোমার মতের মূল্য নেই সে কি ষোড়শী,- আমি তো জানি—মানুষের মত মাত্রেই মানুষের যৌবনের মত, জরার মত থাকতে পারে কিন্তু সে মত মত নয়···তোমার জাগ্রত যৌবন নিখিলের মতে মত দেবে না—কারণ ওর ভেতর এসেছে জরা,... কিন্তু তোমার ভেতর এখনও জরার লক্ষণ প্রকাশ পায় নি ষোড়শী, তোমার জাগ্রত যৌবন বিশ্বমানবের কাণে কাণে সৃষ্টির নূতন সুর শোনাতে চায়, পুরান সুরে তোমার মন ভরবে কেন ষোড়শী···"

সুহাস থামিল ;—একটা দৃপ্ত তেজ তার আয়ত দুটী চক্ষু হইতে বাহির হইয়া আসিল—সে তেজ নলিনীর অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করিল কি না জানি না !

নালিনী একবার নিখিলের দিকে আর একবার সুহাসের দিকে চাহিয়া কেমন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল—কণ্ঠের কথাকটী ওষ্ঠে আসিয়া বার কয়েক কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল !

সুহাস নলিনীর মৌন ভাষা পড়িয়া লইয়া,— নিখিলের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"তাহলে তোমারই হ'ল পরাজয় নিখিল,...ষোড়শী আমার মতেই মত দিয়েছে, .. কেমন আধুনিক সাহিত্যের ওপর তোমার আস্থা আছে তো ?"

নিখিল হাসিতে হাসিতে বলিল, "না না আদৌ নয়, কোন জিনিস জোর করে' স্বীকার করা যায় না সুহাস।"

"বেশ, কিন্তু একদিন তোমাকে স্বীকার করতেই হ'বে নিখিল, তখন দেখবে, ষোড়শী 'রাইট' আর তুমি 'রং'।"

রাত্রি হইয়া আসিয়াছিল—সুহাস চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল,—বাহিরে পুঞ্জীভূত অন্ধকার—নলিনীর দীপ্ত উজ্জ্বল মুখখানির উপর মমতাময়ী দৃষ্টি রাখিয়া সুহাস ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল !

২

পরদিন হইতে সাহিত্যের আসর সন্ধ্যার নিখিলের গৃহে বেশ জমিয়া উঠে। সুহাসই এ আসরের মূর্ত্তিমান্ জ্যোতিষ্ক,—নলিনী তার ভক্ত ! আধুনিক সাহিত্যের ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে নলিনী তাহার উপর অতিমাত্রায় দরদী হইয়া উঠিয়াছে,—নুট হ্যামসন, ইবসেন, বনার্ডশতে সে এখন রীতিমত মসগুল ! নিখিল কিন্তু সুহাসের মতের সহিত নিজের মতের এখনও খাপ খাওয়াইতে পারে নাই— তাই সুহাস আসিলেই ধীরে ধীরে সে নিজের সজ্জিত কৌচটীতে আসিয়া আশ্রয় লয়,—পাছে ওদের দুঃসহ আলোচনা ওর কর্ণদুইটীকে মুহুর্মুহু উচ্চকিত করিয়া তোলে,—এই আশঙ্কায় আলমারী হইতে বিদ্যাপতি পাড়িয়া আনিয়া মনঃসংযোগ করে !

···সুপরিচ্ছন্ন দুইখানি বেতের চেয়ারে পাশা-পাশি বসিয়া কাব্যের রাজ্যে অভিযান সূচনা করে—সুহাস ও নলিনী ! দক্ষিণের মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া রাত্রির শিথিল হাওয়াটা কেমন একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া যায়—নলিনীর স্বল্পকুঞ্চিত চক্ষুদুইটী মাঝে মাঝে কেমন ত্রস্ত হইয়া ওঠে,—চাহিয়া দেখে—পাশের চেয়ারে সুহাসবাবু... বিস্ময়ময় দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে !

সেদিন সুহাস বলিল,—"বন্ধনটা তো এখনও খুলতে পারলেন না ষোড়শী...আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,— আধুনিকতার মুক্তিসংগ্রামে শিরার রক্ত এখনও তোমার পাগল-ছন্দে নেচে উঠল না।"

নলিনী একবার সচকিত দৃষ্টিতে সুহাসের মুখের দিকে চাহিল।

"বুঝলে না ? নিখিলের ভেতরে যে জরা রয়েছে, তা' তোমাকে পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করে' তুলেছে ষোড়শী। আগাছায় পড়ে তুমি বাড়তে পারছ না। ...আচ্ছা বাইরে আজ আমার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে' বেশ নিঃসঙ্কোচে বেড়াতে পার ষোড়শী ?"

কিছুদিন আগে হইলে সুহাসের এই কথাটী শুনিয়া নলিনী হয়তো জিভ্ কাটিত,—কিন্তু আধুনিকতার খর-উত্তাপে সে ভাবটুকু তার উবিয়া গিয়াছিল, তাই একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া উত্তর দিল—"না...তা,...তবে... তবু... ।"

নলিনীর কথা আর শেষ হইল না, সুহাসের হাসির মাত্রা সহসা এমনি প্রবল হইয়া দাঁড়াইল যে সমস্ত কক্ষ

কাঁপিয়া উঠিল...বলিল, হ্যাঁ ওঁর মত না হ'লে পারবে না ষোড়শী এই তো তুমি বলতে চাও ..তা বুঝেছি,...কিন্তু এইটেই হচ্ছে জরা···বা মানুষের ভয়াবহ মৃত্যু...” বলিয়াই মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলি পিছনের দিকে সরাইতে সরাইতে সুহাস ওপাশের নিখিলের দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলিল,...“ষোড়শীকে বিয়ে করা তোমার পাপ হ'য়েছে নিখিল...শুন্‌বে কেন? ওর অবাধ মুক্ত যৌবনকে কেড়ে নিয়ে বিনিময়ে ওকে দিয়েছ তোমার জরা, তোমার দুর্ব্বলতা আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এর জন্যে ষোড়শীকে দুষ্‌তে যাবে না নিখিল, দুষ্‌বে তোমাকে, তোমার জরাকে, সঙ্কীর্ণতাকে।”

নিখিল হাসিয়া উঠিল, “বেশ দুষুক না, কিন্তু এর জন্যে দায়ী শুধু তো আমি একা নই সুহাস, দায়ী যদি কেউ হয় তো সে আমাদের এই সমাজ।”

“হাঁ সমাজ, তুমি নও, কারণ তোমাকে নিয়ে সমাজ নয়···না?” হো হো করিয়া সুহাস হাসিয়া উঠিল। নিখিল আর কোন উত্তর দিল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবেই কাটিল,—সহসা সুহাস দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, নলিনী নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে 'হ্যামসুনে'র “হাঙ্গার” খুলিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছে, মুক্ত বাতায়নের ভিতর দিয়া জ্যোৎস্না তার লুণ্ঠিত শাড়ীর উপর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতেছে···ঝাড়ের পরিচ্ছন্ন আলোয় নলিনীর মুখখানি উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে।

সুহাস ডাকিল, “ষোড়শী”...'

নলিনী 'হাঙ্গার' হইতে মুখ তুলিল,...স্বেদসিক্ত সুন্দর একখানি মুখ,···চ'খের প্রান্তে শুধু একটু কুণ্ঠা···তা' ছাড়া আর অন্য কিছু নয়!

“...আজ শ্রাবণ রাত্রির সমস্ত মধুকে নিঙড়ে নিয়ে আমার একটা গল্প লিখতে ইচ্ছে করছে ষোড়শী, সত্যি সে লেখার কাছে আজকের এই'হ্যাম্‌সুন'ও হ'য়ে উঠবে ম্লান!”

নলিনী হাসিয়া প্রশ্ন করিল,...“পারবেন লিখ্‌তে?”

“খুব পারব ষোড়শী...”

“পারবেন,···তাহ'লে লিখতে আরম্ভ করুন,...আর একটা নোবেল পুরস্কার আপনারই ভাগ্যে জুটে যাক্‌... মন্দ কি···এতে...'

সুহাস বলিল...“তুমি আমায় সাহায্য করবে ষোড়শী?

“আমি...আমি···আপনাকে কি দিয়ে সাহায্য করব বলুন···আপনি লিখবেন নিজে—”

সুহাস নিরুত্তর। সুতীক্ষ্ণ সুগভীর দৃষ্টি নলিনীর মুখখানির উপর সে মেলিয়া ধরিল!...নলিনী যেন আজ মূর্ত্তিমতী একটা কবিতা, সংযত ছন্দের হিল্লোলে মধুময়ী···যৌবনের পূর্ণ পরিণতি।

সুহাস আর বসিয়া থাকিতে পারিল না—উঠিয়া দাঁড়াইল—পৃথিবীর রূপ অকস্মাৎ আজ বাদলাইয়া গেছে যেন!

“উঠলেন...”

“হাঁ...ষোড়শী···উঠতে হ'ল আজ,...সমস্ত ঘরটীতে একটা দুঃসহ জরা কেমন ভেসে উঠেছে...উঃ, বাইরে বড় অন্ধকার ষোড়শী···মেঘ ক'রে এসেছে...না?...আলোটা বাইরে একটুখানি দেখাও তো...'

নলিনী আশ্চর্য্য হইল—সুহাসের মস্তিষ্কের কি গোল হইয়াছে? পরক্ষণেই তার মনে হইল—শ্রাবণ রাত্রির এই স্নিগ্ধ শীতল জ্যোৎস্না সহসা আজ ওকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে···বাড়ী ফিরিয়া ওর হয় তো আজ একটা গল্প না লিখিলেই নয়?

নলিনী স্পষ্ট দেখিল—বাতায়ন-পথ দিয়া জ্যোৎস্না এখনও তেমনি ঝরিয়া করিয়া পড়িতেছে—বাহিরের আকাশ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল—মেঘের এতটুকু লেশ নাই!

“চলুন...আলো না নিয়েই আপনাকে সিঁড়ি পার করে' দিয়ে আসি...”

নলিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া আগে আগে চলিতে লাগিল, সুহাস চলিল পিছনে পিছনে...নলিনীর গায়ের আঁচলটা দুই-একবার সুহাসের গায়ে আসিয়া স্পর্শ করিল,—তাড়াতাড়ি পা ফেলিতে গিয়া নলিনীর পায়েও তার পা ঠেকিয়া গেল।

সিঁড়ির শেষ ধাপটীতে আসিয়া নলিনী থম্‌কিয়া দাঁড়াইল,—বাহিরের সুপ্রচুর জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, “খুব অন্ধকার না, সুহাসবাবু?...মাথায় আপনার ভূত চেপেছে বুঝতে পারছি,...যান্‌ আজ

রাত্রিরেই গল্পটা আরম্ভ ক'রে দিন,—কাল শেষ করে' আনা চাই...ওঃ কি অমন করে' চাচ্ছেন কেন ?"

"হাঁ, আনব" বলিয়া হঠাৎ সুহাস তার শিথিল দু'টী বাহু দিয়া মুহূর্ত্তে নলিনীকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল, তার প্রত্যেক নিঃশ্বাসটী দীর্ঘতর হইয়া আসিল,—ওষ্ঠপুটে আসিয়া কথাগুলি বারকয়েক কাঁপিয়া উঠিল! নলিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না, নিজের দেহটাকে চকিতে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, "ছিঃ...এতবড় নির্লজ্জ আপনি ...মেয়েদের আপনি এম্‌নি করে' অপমান কর্‌তে চান ?"

সুহাস এর কোন উত্তর করিল না টলিতে টলিতে বাহির হইয়া পড়িল। আচ্ছন্ন দৃষ্টিটা বাহিরের পথের দিকে স্থির রাখিয়া নলিনী খানিকক্ষণ বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

৩

কয়দিন হইতে সুহাস আর নিখিলের গৃহে পদার্পণ করিল না,—সন্ধ্যার সাহিত্যের আসর সুনিবিড় ব্যর্থতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

সুহাসের সে রাত্রির অদ্ভুত অভিনয় স্মরণকরিয়া মনে মনে নলিনী কণ্টকিত হইয়া উঠিল,...সুহাসের দেহের উত্তাপ এখনও যেন সে অনুভব করিতেছে,...কি দুঃসহ সে উত্তাপ ...নলিনীর মনে হইল সুহাসের রক্তচঞ্চল শিরাগুলি আজও যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে খেলিয়া বেড়াইতেছে,... আর যে কথা সে বলি-বলি করিয়া বলিতে পারিল না, সে আত্ম-নিবেদন যেন স্পষ্ট কণ্ঠে শুনিতে পাইল, নলিনীর সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া আসিল!

সুহাসের আশায় নলিনী সন্ধ্যার মুহূর্ত্তগুলি একে একে গণিয়া চলিল,...বেশের পরিপাট্য অন্য দিনের চেয়ে আজ কিছু বেশী,...মুখখানি ঠিক একটী সদ্যফোটা গোলাপ..., আরসীতে নিজের রূপটা দেখিয়া নলিনীর অন্তঃস্থল সহসা দুলিয়া উঠিল...এত রূপ ? সুহাস আকৃষ্ট হইবে না কেন ?

ধপ্‌ধপে সাদা টেবিলক্লথের উপর একগুচ্ছ যুঁই ফুল ছড়াইয়া রাখিয়া নলিনী প্রস্থানের উপক্রম করিতেছে, এমন সময় নিখিল ডাকিল,—'নলিনী!'

"কি বলছ"—নলিনী উৎকণ্ঠার সহিত নিখিলের কৌচের দিকে অগ্রসর হইল।

নলিনী আসিয়া কৌচে বসিলে নিখিল নিজের ডান হাতখানি নলিনীর বাঁ হাতের উপর রাখিয়া খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—তারপর সহজ গাম্ভীর্য্যে বলিল, "সত্যি আধুনিক বাস্তববাদকে আমরা কি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছি নলিনী, মানুষ যখন বাস্তবতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠে,— তখন সত্যিই কি এর কাছ থেকে সে মুক্তি পেতে চায় না ?"

নলিনী কি বুঝিল জানি না—তবে স্বামীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া মুহূর্ত্তে কেমন চিন্তাশীল হইয়া উঠিল।

নিখিল বলিতে লাগিল,—"বাইরের স্বচ্ছ জ্যোৎস্না তোমার চ'খে এসে পড়ছে না নলিনী ?...ওর অতল গভীর তলে যে রূপটী ফুটে উঠছে,সেটা বাস্তবের না আদর্শের রূপ; বাস্তবের ছায়া দিয়ে ওকে ধরতে যাও...ও তোমায় ধরা দেবে,...কিন্তু সহজ সুন্দর মূর্ত্তিতে পরমুহূর্ত্তে ও যে রূপ নিয়ে ফুটে উঠবে,...সেটা তোমাদের আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেই উজাড় হ'য়ে যাবে না নলিনী...মানুষের অতৃপ্ত আঁখি-তারকার কাছে চিরদিন ও ঘুম-পাড়ানিয়া গানের মতই জেগে থাকবে...এটা বিশ্বাস কর তো নলিনী ?"

নলিনী বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল,—আকাশ ভরিয়া আলোর জোয়ার নামিয়াছে,—সেই জোয়ারের তোড়ে সমস্ত পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে, নলিনী বাহিরের এই দৃশ্য দেখিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

নিখিল ফের বলিল, "প্রকৃতির এই স্বচ্ছ জ্যোৎস্নাকে বিদায় দিয়ে আধুনিক সাহিত্য কেবল নগ্ন বাস্তবের পূজা ক'রে দিগ্বিজয়ী হ'তে চায় নলিনী ? কিন্তু পারবে না..."

নলিনী এবার মুখ খুলিয়া বলিল, "পারছেও...তো ?"

"হাঁ...পারছে,...পারছে তবে ঠিক আমাদের দেশে পারছে না, নলিনী,...যাদের দেশে পারছে...সে দেশে বোধ হয় আকাশ ভ'রে এম্‌নি ক'রে জ্যোৎস্না হাসে না,...বনের ফুল এম্‌নি করে' গন্ধ ছড়ায় না, নলিনী,— প্রকৃতি সেখানে জড়পিণ্ডের মত প'ড়ে রয়েছে...তা'তে প্রাণ ব'লে কিছু নেই,...তাই বাধ্য হয়েই সেখানকার

লোকেরা বাস্তবের সঙ্গে সখ্যতা ক'রেছে… কিন্তু…"

নিখিলের কথাটা আর শেষ হইল না—সিঁড়ি বহিয়া একটা দমকা হাওয়ার মত যে ঘরে আসিয়া ঢুকিল সে সুহাস! মুহূর্ত্তকাল ধরিয়া শয্যারত দুটী প্রাণীর দিকে চাহিয়া সুহাস গম্ভীরভাবে চেয়ারে আসিয়া বসিল, তারপর আপনা হইতেই বলিল,—"আসবার তেমন ইচ্ছে ছিল না নিখিল, কিন্তু আসতে হ'ল, হয় তো যোড়শীর এতে বিরক্তি হ'তে পারে…" বলিয়াই সুহাস অভিমান-উদ্দীপ্ত চক্ষু দুইটা নলিনীর মুখের উপর একবার স্থির রাখিল! নলিনী সে দৃষ্টির দাহ সহ্য করিতে পারিল না,—নীরবে চক্ষু নত করিল।

নিখিল হাসিতে হাসিতে বলিল,…"তোমার যোড়শীর খবর তো আমি বল্‌তে পারি নি সুহাস, কিন্তু বিরক্তি সে তরফ থেকে হয় নি…এটুকু বেশ জোর করেই বল্‌তে পারি…তারপর নলিনীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "যাও উঠে বন্ধুটীকে একবার অভিনন্দন জানিয়ে এস নলিনী…!"

নলিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল বটে কিন্তু সারা অন্তর ব্যাপিয়া যে একটা সুনিবিড় অবসাদ তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছিল,—সেটাকে ও সহজভাবে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিল না।

সুহাস চোখে-মুখে একটা স্বাভাবিক দীপ্তি ফুটাইয়া বলিল, "আমার…আসাটাই…তা হ'লে আজ অন্যায় হয়েছে …না…যোড়শী ?…"

নলিনী কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ও-পাশ হইতে নিখিলের কণ্ঠস্বরটা প্রবল হইয়া উঠিল, "অন্যায়…একশোবার অন্যায় সুহাস,…বেচারা বড় আশা করে' একটু আলাপ জমাতে এসেছিল,…আর তুমি এসে কি না বাধা দিলে।"

কথাটায় নলিনীর মুখখানি সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল।

সুহাস এ ভাবটুকু স্পষ্ট করিয়াই লক্ষ্য করিল,—বলিল, "তা' হ'লে আমি তোমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই নে নিখিল,…আমি উঠলাম আজ…"

সুহাস সত্য-সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইল—চকিত গতি-বেগের সঙ্গে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে তার মাথার কেশগুলি নাচিয়া উঠিল।

নিখিল বলিয়া উঠিল,—"পাগল হ'লে সুহাস,…লক্ষ্মী ছেলেটীর মত ব'সে আসর জমাও তো দেখি,…আজ আমিও না হয় এতে যোগ দিচ্ছি…"

সুহাস একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল,…"লক্ষ্মী ছেলেটীর মত? সে তোমরা পার নিখিল…আমাদের ধাতে ওটা বরদাস্ত হয় না,…ভাবপ্রবণ পঙ্গু মন নিয়ে কোনদিনই আমার কারবার নয় নিখিল,…কেন অনেক দিনই তো এ কথা তোমায় ব'লে এসেছি।"

"আচ্ছা…তা' হ'লে না হয় দুষ্টু ছেলের মতই লেগে পড়…আমি না হয় কাণে আঙ্গুল দিচ্ছি।" নিখিল হাসিতে লাগিল।

সুহাস আবার চেয়ারে আসিয়া বসিল। নলিনী মুখোমুখী হইয়া বসিয়া আছে, ঠিক একটী নিষ্প্রাণ মর্ম্মর-মূর্ত্তি,…ভাষাহীন অবলুপ্ত চেতনায় আত্মসমাহিত।

সুহাস নলিনীর মুখের দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বলিল,—"আজ তোমাকে ঠিক গম্ভীর টুর্গেনিভের মত মনে হচ্ছে যোড়শী,…আশ্চর্য্য হ'চ্ছে এই যে তিনটে রাতের মধ্যেই তুমি এতখানি বদ্‌লে গেছ,…যাক্‌,… আজকের আলোচনায় তোমার প্রবৃত্তি আছে তো যোড়শী ?"

নলিনী চক্ষু দুইটা একবার উন্নত করিল,—তারপর অস্ফুটস্বরে বলিল,—"আছে, তবে আধুনিক সাহিত্যকে নিয়ে নয়…"

সুহাস অমনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিখিল ওপাশ হইতে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল,—"হাস্‌লে যে সুহাস ?"

"সেই তো কথা নিখিল, যা হ'ক…you have defeated me. (আজ আমি হেরে গেচি)—আমি সত্যিই আর থাকতে চাইনে নিখিল…"

নিখিল বলিয়া উঠিল, "আর্‌…রে…"

"না…না…জরাকে নিয়ে আমি আলোচনা কর্‌তে চাই নে নিখিল…তা'র চেয়ে বরং মৃত্যু ভাল…যোড়শীকে

তিন রাত্রি মন্ত্র দিয়েই তুমি বিগড়ে ফেলেছ নিখিল… strange…very strange…আশ্চর্য্য, অত্যাশ্চর্য্য !"

নিখিল হাসিতে হাসিতে বলিল—তিন রাত্রি নয় সুহাস…মাত্র একটা ঘণ্টা আজ আমার কাছে এসে ও ব'সেছিল,…যেটুকু আলোচনা হ'ল…তা'তে স্পষ্ট ক'রেই বুঝলুম…সাহিত্যের idealism এর (আদর্শবাদের) দিক্‌টায় ও অনেকখানি পক্ষপাতী…যদিও মুখে এটা অস্বীকার করতে কুণ্ঠিত !…অবিশ্যি তোমাদের realism এর (বাস্তবাদের) ওপর ও যে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠুক…এ কথাও আমি বলতে চাই নে সুহাস—"

সুহাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,…"সে না চাইতে পার নিখিল,…কিন্তু এটা তো মান'…যে যেখানে জরা এসে শিকড় গেড়েছে…সেখানে যৌবন আসতে ভয় পায়,… জেন' নিখিল…যৌবন হ'চ্ছে জীবনের অগ্রদূত,…জরার পাশে তা'র স্থান নয়,…পুঞ্জিত গতানুগতিকতাকে পিষ্ট করে' নূপুর-নিক্কণে সে অনাগতের গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলে,…পিছনে তা'র লক্ষ্য নয় নিখিল,…আচ্ছা আজ আমি আসি ষোড়শী…কিছু মনে ক'র না,…' নলিনীর স্তব্ধ মুখখানার উপর একটা ব্যথাতুর দৃষ্টি হানিয়া সুহাস অজ্ঞাতসারে নিজের পা-দুইখানি বাড়াইয়া দিল। চেয়ারে উপবিষ্টা নলিনী একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না, যেমনভাবে বসিয়াছিল—ঠিক তেমন ভাবেই বসিয়া রহিল।

৪

অর্দ্ধঘণ্টাকাল নিঃসাড়ে বসিয়া থাকিয়া নলিনী ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।…উন্মাদের মত টলিতে টলিতে একেবারে সিঁড়ির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল !… সেখানে আসিয়া দেখিল,—আকাশ ভরিয়া আজও জ্যোৎস্নার বান ডাকিয়াছে,—বাগানের ভিতর হইতে রজনী-গন্ধার চমৎকার একটা সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে—দূরে জ্যোৎস্নাসিক্ত কি একটা গাছের ডালের আড়ালে একটা অনামা পাখী গাহিয়া গাহিয়া থামিয়া গেল। নলিনী একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিল,…এম্‌নি একটা জ্যোৎস্নামধুর রাত্রে সুহাসের বিদায়-বেলায় সে তা'র দেহের স্পর্শলাভ করিয়াছিল—শিরার তপ্ত রক্তকণিকাগুলি তা'র শিরার ভিতর তার সুপ্ত রক্তকণাগুলিকে টগবগ করিয়া ফুটিয়ে তুলেছিল,…নলিনীর স্পষ্ট অনুভূত হইল— আজও তারা তেমনি করিয়াই যেন ফুটিয়া উঠিতেছে… আর তার মনে হইল লক্ষ যুগের সুনিবিড় তৃষ্ণা লইয়া সুহাস তার যৌবন পাত্রের দিকে একাগ্র অধীরতায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে,… নলিনী কেমন পাগল হইয়া উঠিল।

সহসা কাহার পদশব্দে নলিনীর চমক ভাঙিয়া গেল— নলিনী বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া রহিল !

"রাগ করে' যাবার উপায় নেই ষোড়শী,…তাই আবার ফিরতে হ'ল,…সেদিন যে গল্পটা লিখব ব'লেছিলাম…আজ তা' শেষ করে' এনেছি…, চল এখুনই তোমাকে শুনিয়ে যাব ষোড়শী…আমার ওপর রাগ করেছ …না ?…"

"না…না…রাগ আমি করি নে সুহাসবাবু…আপনি আসুন…আপনার গল্প আমি শুনতে চাই…, আসুন… দাঁড়িয়ে রইলেন যে… ?—নলিনীর ডান হাতখানি সুহাসের দিকে একটুখানি ঝুঁকিয়া গিয়া আবার অবশ হইয়া নুইয়া পড়িল !

সুহাস নলিনীর মুখখানির দিকে একবার স্থির দৃষ্টিতে চাহিল, চ'খের দুটী তারার যে বেদনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল একবার বুঝি সেটুকু সে পড়িয়া লইল,—তারপর স্মিত হাসিয়া বলিল, "আজ থাক্ ষোড়শী…ও জরার ভেতর গল্প জুড়ে আমি আনন্দ পাব না…তা'র চেয়ে আর এক দিন না হয়…"

"না…না…তা' হ'বে না সুহাসবাবু, আপনার আমি পায়ে পড়ি…আপনি আমার ঘরে ব'সে পড়বেন… এর পরে তো আর আপত্তি নেই ?"

সত্যই সুহাস আর আপত্তি করিতে পারিল না—যন্ত্র-চালিতের মত নলিনীর পিছনে পিছনে চলিল

নলিনীর যুঁই ফুলের মত শুভ্র বিছানার একপাশে একটা আলো জ্বলিতেছে…অপর পাশে ইতস্ততঃ ছড়ান বাঙ্গালা ইংরাজী আধুনিক সাহিত্যের কয়েকখানি কেতাব …আর এক পাশে একখানি মোটা এক্সারসাইজ বুক… দোয়াতদানি…নলিনীর লিখিবার সরঞ্জাম !

সুহাস বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া হাসিয়া বলিল,— "আজ দু'জনে আমরা এই নিভৃত কক্ষে, নিখিল কি মনে

করবে ষোড়শী…"বলিতে বলিতেই নলিনীর খাতাখানি নিজের দিকে টানিয়া লইল। নলিনী সেটা ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া বলিল, "কি মনে করবে…, তা' ভেবে আপনার দরকার নেই সুহাসবাবু, আপনার গল্প আপনি পড়তে আরম্ভ করুন…"

নলিনী বিছানার একপাশে আসিয়া বসিল। নিস্তব্ধ —নিভৃত কক্ষ…বাতির আলোয় আলোকিত। বাতির স্থির আলোকশিখাটীর মত নলিনীর দৃষ্টি স্থির—তার সুবিন্যস্ত কেশপাশের ভিতর হইতে একটা মৃদু সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে।

সুহাস আর দেরী করিল না,—পকেটের ভিতর হইতে হাতে লেখা সভাঁজ কয়েকখানি কাগজ বাহির করিতে করিতে বলিল,— "আজ আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি ষোড়শী যে তোমার নারীত্বের যথার্থ জাগরণ আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি,…সমস্ত কুণ্ঠাকে দূরে ঠেলে রেখে যেদিন তোমার যৌবনরথ সৃষ্টির বন্ধুর পথে বিপুল বেগে এগিয়ে চল্‌বে, সেদিন আমি এর চেয়েও ধন্য হ'ব ষোড়শী…, আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি সে শুভ সন্ধিক্ষণের আর দেরী নেই…আচ্ছা তা' হ'লে এটা পড়তে আরম্ভ করি।"

"হাঁ…করুন,…আর দেরী করবেন না সুহাসবাবু…" নলিনী একবার বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

সুহাস পড়িতে সুরু করিল :—

…চিরযৌবন…চিরতারুণ্যের পূজারী সে অখিল নারীর দ্বারে দ্বারে প্রেমের বাতি জ্বালিয়া মোসাফিরের মত ঘুরিয়া মরে…, কত দিন—কত মাস—কত বর্ষ —তার জীবনের আঙিনা দিয়া চলিয়া যায়, কত শ্রাবণ রাত্রি তার জীবনের তীরে বসিয়া অশ্রুনীরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথা কোটে—কত মধু রাত্রি ঝরাফুলের মত তা'র দেহ-দেউলের সোপানতলে আসিয়া লুটিয়া পড়ে…তবু সেই ধ্যানের নারীর সন্ধান মেলে কই?…প্রেমের পরশ দিয়া তার তৃষিত অন্তর ভরিয়া তোলে কই?…তার যৌবন ঠিক বন্দীর মতই ব্যাকুল হইয়া ওঠে,— উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়া অখিল বাঙলার বুকে দাবানল সৃষ্টি করিতে চায়,…সহসা মুক্তির দিন তার ঘনাইয়া আসে,—উদয়-তারার সলাজ চাহনির মত সে আসিয়া একদিন তা'কে ধরা দেয়,…তা'র প্রেমের বাতি হুরীর রূপে রাঙিয়া ওঠে,—তখন সে বলে –'আমি পেয়েছি…আমি পেয়েছি নারী,…আমার জীবন আজ তোমায় পেয়ে ধন্য হ'য়ে উঠল নারী…, তুমি আমায় প্রেম দাও ওগো…"

সুহাসের কণ্ঠস্বর সহসা গাঢ় হইয়া আসিল, চক্ষু তুলিয়া দেখিল,—নলিনীর ব্যগ্র আঁখি দু'টী অলক্ষিতে তা' অতি নিকটেই সরিয়া আসিয়াছে…দু'চোখে তার স্বপ্নে আবেশ…

সুহাস এ দৃশ্য দেখিয়া নলিনীর বিছানার এক পা অচেতনের মত পড়িয়া গেল। তার চক্ষুঃ দুইটী নিবি অবসাদে পূর্ণ, নলিনী সহসা চক্ষুঃ মেলিয়া তাহার দি চাহিল, সে মূর্ত্তি দেখিয়া নলিনীর আপাদমস্তক শিহরি উঠিল!…নলিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না বিছানার উপর হইতে বিদ্যুৎ-গতিতে উঠিয়া দাঁড়াই বলিল, "সুহাসবাবু, যান এখনি বেরিয়ে যা'ন—এ বাড়ী আর কখনও যদি পদার্পণ করেন তা হ'লে আপনার ম লোকের যা যোগ্য পুরস্কার তা আজ দিলাম না—সেদি দেব। আর সেদিন আপনার বন্ধুর কাছে আপন স্বরূপ জানিয়ে দেব।"

নলিনীর কণ্ঠস্বর বিশ্রী কটু হইয়া মুহূর্ত্তে তাহাকে চবি করিয়া তুলিল! সুহাস ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্র হইল, যাইবার পূর্ব্বে নলিনীর দিকে না পা চাহিতে,—না পারিল একটা কথা বলিতে!

…স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় নলিনী কক্ষের দ্বারে আ স্থির হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল,—তার মনে হ বাহিরে ধরিত্রীর অঙ্গের শত শত ক্ষত মুখ দিয়া অ ধারায় আজ রুধিরস্রাব হইতেছে,—আর তার দে সমস্ত রুধিরকণা টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে! নলিনী ত স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না, -টলিতে টলি নিখিলের ঘরে আসিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল,—নিমে মধ্যে জ্বলন্ত বাতিটী নিবাইয়া দিয়া সে স্বামীর শয উপর ঢলিয়া পড়িল,…কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও নিখি দেহটাকে আজ নিজের বক্ষতলে টানিয়া লই পারিল না।

জেনেভা-ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

শুক্রবার ১৯এ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

পূর্ব্ববৃত্তান্তে লিখিয়াছি যে আপাততঃ লীগ এ্যাসেম্ব্লির সাধারণ প্রকাশ্য মিটিং স্থগিত আছে, উপস্থিত চুয়ান্ন জাতির প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে প্রতি জাতি হইতে এক একজন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিবার পর সভা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বিচার-জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমিটির উপর ভার দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের পক্ষে আমাদের দলপতি মহারাজা বিকানীর বক্তৃতা করেন, তাঁহার ভাষা, উচ্চারণ ও বক্তৃতা-ভঙ্গী সকলের সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। শ্যাম, চীন ও জাপান-পক্ষের বক্তৃতাও সকলের সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইংরাজী কিংবা ফ্রান্সের ভাষায় ভারতবর্ষ, শ্যাম, চীন ও জাপানের প্রতিনিধিগণের বক্তৃতা সকলের চেয়ে ভাল হইয়াছে। Mr, Brand, Fonger, Minister of France বিশ্ববিখ্যাত বক্তা, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে এসিয়ার ৪ জন প্রতিনিধির বক্তৃতা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে; সকলেই মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিলেন।

এ্যাসেম্ব্লীর প্রধান কাজ ছয়টা কমিটির সাহায্যে হয়। এইসকল কমিটিতে সকল বিষয় বিশেষভাবে বিচার হইয়া রিপোর্ট হইলে সেইসকল রিপোর্ট পরে পুনরায় এ্যাসেম্ব্লীর প্রকাশ্য সভায় দাখিল হইয়া চূড়ান্ত বিচার হইবে।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ছয়জন ভিন্ন ভিন্ন ছয়টা কমিটির মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছে, আমি দ্বিতীয় ও পঞ্চম কমিটীতে আছি।

দ্বিতীয় কমিটির আমার জিম্মার কাজ স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে ভাবের, সাহিত্যের, শিল্পের ও শিক্ষার আদান-প্রদান হইয়া লীগের উদ্দেশ্য কিসে সাধিত হয়, সকল জাতির মধ্যে কিসে সদ্ভাব স্থাপিত হইয়া জগতের মঙ্গল হয় ইহা অন্যতর আলোচ্য বিষয়। ইহার নাম Intellectual Co-operation— এ দুইটী অতি গুরুতর বিষয়!

স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সময় অল্প বলিয়া ভারতের পক্ষে প্রধান বিষয়গুলির উল্লেখমাত্র সম্ভব হইয়াছিল। বক্তৃতার সুখ্যাতি হইয়াছে; আমি লিখিয়া সভাস্থলে বক্তৃতা পাঠ করি না; ইহাতে অনেকে আশ্চর্য্যও হইয়াছেন

পঞ্চম কমিটির কাজ কারাগারের কঠোর নিয়ম-সংশোধন এবং শিশু-মঙ্গল, সে দুইটী কাজও শেষ হইয়া গিয়াছে; যাহা সাধ্য বলিয়াছি ও করিয়াছি।

আসিয়া অবধি অনেকগুলি বক্তৃতা হইয়া গেল। কাজেই আরও বক্তৃতার জন্য তলব আসিতেছে, ক্রমে ক্রমে যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালনে চেষ্টা করিতেছি।

দ্বিতীয় ও পঞ্চম কমিটির বড় বড় কাজ এখনও অনেক বাকী আছে। প্রস্তুত হইতে পরিশ্রমও খুব হইতেছে।

প্রস্তুত হইবার জন্য বহু লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় ও আলোচনা প্রয়োজন। তাহার জন্য অন্য লোকেও যেমন প্রায় প্রতিদিন খানা ও পার্টি দিতেছে, আমরাও সেইরূপ তাহাদিগকে ফেরৎখানা দিতেছি। তবে স্বাস্থ্যের অনুরোধে বহুরাত্রের পার্টিগুলা ক্রমশঃ বাদ দিতে হইতেছে।

যাঁহাদের সঙ্গে এইরূপ দেখা-শুনা হইতেছে তাঁহাদের ভিতর ভারতবাসিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন— শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার স্ত্রী, ডাক্তার রজনীকান্ত দাস ও তাঁহার স্ত্রী (ইনি Russian Jew) পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষের পুত্র ডাক্তার সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ গুহ, বেহারের তারিণী সিংহ,

ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মান্দ্রাজের মিষ্টার রাও, ভারতবর্ষ হইতে সদ্য সমাগত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, এম-এল-এ। ইউরোপীয় ও আমেরিকার ভদ্রলোক ও মহিলাও বিস্তর সাহায্য করিতেছেন। British and Dominion University Students Conferenceএর মিষ্টার জড়, মিষ্টার পুল, Moral Education Congressএর মিষ্টার স্পিলার, International Education Bureauর সেক্রেটারী, লর্ড রবার্ট সিসিল, মিষ্টার হেণ্ডারসন, মিষ্টার বক্সটন, ফরেন অফিসের অণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ ডাল্টন, মিঃ নোয়েল চেকার, ডবলিন ইউনিভারসিটির মিঃ বিঙ্কি, লাইডেন ইউনিভারসিটির আইন-অধ্যাপক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সকলের নাম ও উপাধি মনে করিয়া রাখা অসম্ভব, জিজ্ঞাসা করাও অভদ্রতা।

বিশ্ববিশ্রুত বহু মহাজনের সমাগমে নূতন মানসিক শক্তি, আনন্দ-কুতূহল ও অভিজ্ঞতা সঞ্চার হইতেছে। স্বাস্থ্য ভগবৎ কৃপায় এখনও ভাল আছে। প্রিয়জনের অপ্রীতির কারণ জন্মে নাই।

এ সকল গুরুতর পরিশ্রমের মধ্যে বেড়ান, স্বভাবের শোভাদর্শন প্রভৃতিও বন্ধ থাকিতেছে না। আহার-ঔষধ দুই এইরূপভাবে চলিয়াছে। আমাদের সহযোগী হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ স্যর ইউয়ার্ট গ্রীভস্ তাঁহার ভগিনীর বিষম পীড়ার জন্য গত শুক্রবার লণ্ডনে গিয়া মঙ্গলবার আসিয়াছিলেন। ভগিনীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইতেছে বলিয়া তিনি কাল একেবারে চলিয়া যাইবেন। তাঁহার জায়গায় ভূতপূর্ব্ব জজ ও সেক্রেটারী অব ষ্টেটের কাউনসেলের মেম্বর স্যার বসন্ত মল্লিক প্রতিনিধি হইয়া আসিতেছেন। স্যার ইউয়ার্ট গ্রীভস্ বিশেষ যত্ন ও আত্মীয়তা করিতেছিলেন। তাঁহার যত্নে কোন কষ্ট বা অসুবিধাই জানিতে পারিতেছি না। আমাদের ফেরৎ যাইবার জাহাজের সংবাদ কিছু পাইতেছি না। এখানকার কাজ শেষ হইলে সাধারণতঃ আমাদের বিলাত ফিরিয়া গিয়া রিপোর্ট লেখার সাহায্য করিবার কথা; কিন্তু শীত ক্রমশঃ অধিক পড়িবে। রিপোর্ট লেখা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন কাজ নাই। Imperial Conference ও Round Table Conferenceএর হাঙ্গামার জন্য এখন বিলাতে কাহারও সঙ্গে দেখাশুনা কিংবা কথাবার্ত্তার বিশেষ সম্ভাবনাও কিছু নাই। এইসকল কারণবশতঃ ১০ই কিংবা ১৭ই অক্টোবর মার্সেলস হইতে জাহাজের জন্য চেষ্টা করিতেছি। এখনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। জাহাজ না পাওয়া গেলে কাজেই বিলাতে অল্পদিনের জন্য ফিরিয়া যাইতে হইবে।

২২শে সেপ্টেম্বর, সোমবার।

গতকল্য (রবিবার) জেনিভা হইতে ৭০।৮০ মাইল দূরে সামোনে ডি মণ্ট ব্লাঙ্ক (Chamoni D' Mont Blanc) নামক অপূর্ব্ব পার্ব্বত্যপ্রদেশে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পূর্ব্বাহ্নে ঝড়-জল বজ্রাঘাত যথেষ্ট হইয়াছিল! পূর্ব্ব-ব্যবস্থামত রবিবার যে সামোনিতে যাইতে পারা যাইবে তাহা কোনমতেই মনে করিতে ভরসা হয় নাই; কিন্তু সকালে দুর্য্যোগ কাটিয়া খুব রোদ দেখা দিল; অতএব যাইবার কোন অসুবিধা হইল না।

শ্রীযুক্ত অমূল্য চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার স্ত্রী লুচি, আলুর দম, বেগুন ভাজা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। বহুকাল পরে দেশী খাওয়ায় আপ্যায়িত হইলাম। পথে চা, কফি প্রভৃতির আয়োজনও হোটেলে ছিল। যাহা দেখিলাম তাহাতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব দূর হইয়া গেল! অনন্যোপায় হইয়া স্বভাবের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ, চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইলাম। পার্ব্বত্য উপত্যকা অনেক দেখিয়াছি, এমনটী দেখি নাই। উপত্যকার উভয়পার্শ্বের আকাশস্পর্শী পাহাড় উপত্যকার মাঝখানে আভার (Aver) নদী খরবেগে বহিয়াছে। পাইন (Pine), ওক (Oak) প্রভৃতি গাছে পাহাড়ের গা ঢাকা। পাহাড়ে ছোট বাড়ী ও হোটেল আছে। গ্রীষ্মকালে ইউরোপের সকল জায়গা হইতে লোক আসিয়া এইসকল বাড়ী ও হোটেলে বাস করে। উপত্যকা হইতে ফুনিকুলার রেলওয়ে (Funicular Railway) অর্থাৎ তারে ঝোলা রেলওয়েতে এই সকল পাহাড়ে উঠিতে হয়। সিমলার মালগুদামের কাছে ও দার্জ্জিলিংএ Sanitarium এর নীচে ময়লা ফেলিবার জন্য এইরূপ তারের ঝোলান রেলের ব্যবস্থা আছে; উহা অতি মোটামুটি রকমের; এখানে এরূপ রেলপ্রণালীর চরম উৎকর্ষ দেখা যায় এবং ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ রেলওয়ে। গ্রীষ্মকালের

অপেক্ষা দারুণ শীতের সময় এইসব জায়গা শীতের খেলা (winter sports) এর জন্য বহুলোকের সমাগম হয়। সকল পাহাড় বরফে আবৃত—উপত্যকা-আধিকতা সব বরফে আবৃত—সেই বরফের উপর স্কেট, স্কী (Ski), Tabbagger Sledge প্রভৃতি খেলার জন্য বিস্তর লোক আসে। গাইড বা পথপ্রদর্শকের সাহায্যেও পাহাড়ে উঠিতে গিয়া সময়ে সময়ে কেহ কেহ প্রাণ হারায়, এইরূপে অনেকবার বিশেষ ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

Funicular Railway তে উঠিতে বিশেষ কোন বিপদ নাই। সময় অভাবে তাহা হইল না। কিন্তু যাহা হইল তাহা Funicular Railway অপেক্ষা চমৎকার।

পূর্ব্বে খরস্রোত আভার নদীর কথা বলিয়াছি। জেনিভা হ্রদ হইতে রোন নদী ফ্রান্সের ভিতর দিয়া বহিতেছে। হ্রদের বিপরীত পাড়ের উচ্চ পর্ব্বতরাজির গ্লেসিয়ার (Glacier) অর্থাৎ বরফের সমতল পাহাড় গলিয়া রোন নদীর উৎপত্তি। সেই নদী হইতে জেনিভার লাকমান হ্রদের উৎপত্তি এবং সেই হ্রদ হইতে বাহির হইয়া রোন নদীর গতি ফ্রান্সের ভিতর দিয়া বহিতেছে। প্যারিস হইতে আসিবার সময় রেলের ধারে এই নদীর গতি প্রাতঃ সূর্য্য-কিরণে প্রতিফলিত দেখিয়া আনন্দ উথলিয়া উঠিয়াছিল।

জেনিভার অদূরেই রোন নদীর নীল জল ও আভার নদীর সাদা জল মিলিয়া ত্রিবেণী-সঙ্গম সৃষ্টি করিয়াছে।

সিমোনা পর্ব্বতের গ্লেসিয়ার গলিয়া আভার নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা সিমোনার উপত্যকার ভিতর দিয়া কতবার আভার নদীর পারাপার হইলাম বলিতে পারি না, কখন এ পারে, কখন ও পারে, কখন পোলের উপর দিয়া নদী পার হইতে হইতে সমস্ত দিন উপত্যকা দিয়া আভার নদীর শোভা দেখিতে দেখিতে গমন করিলাম—গাছে ঘাসে, ফুলে ফলে, লতায় পাতায় লতাকুঞ্জে উপত্যকা স্বর্গশোভা ধরিয়াছে। ছোট বড় নগর, গ্রাম, শহর তাহার উপর রহিয়াছে, রেলওয়ের বড় কারখানা এখানে আছে। পশু পক্ষীর খেলা শহরের যেসব জিনিস তাহাতে অজস্র রহিয়াছে—বর্ণনার প্রয়োজন নাই কিন্তু এক-একটা নগর, শহর, গ্রাম, গণ্ডগ্রাম ছাড়িয়া শহরের ক্ষেতের, মাঠের, বাগানের যে শোভা তাহা কখনও দেখি নাই—দেখিবও না।

পাহাড়ের মাথার উপর তুষার পড়িয়া জমিয়াছে দেখা যাইতেছে। তাহার উপরের পাহাড়েও সেই তুষার জমিয়া বরফ পড়িয়া আছে। যেন বহতা নদী হঠাৎ জমিয়া গিয়া জলের নদীর পরিবর্ত্তে বরফের নদী হইয়া অনন্তকাল জমিয়া পড়িয়া আছে—আমাদের যেমন মাটী-পাথর, গাছ-পালার পৃথিবী—এই গ্লেসিয়ার যেন জমা জলের নিরেট বরফের পৃথিবী। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে উপরে অংশটা অল্প অল্প করিয়া গলিয়া জল হইতেছে, সেই জল গড়াইয়া ক্রমশঃ ধীরে ধীরে পরে। বেগে—বহু বেগে নদীর আকার ধারণ করিয়া দেশ ভাসাইয়া চলিয়াছে। এই বরফের নদী কতদূর ব্যাপী তাহার ইয়ত্তা করা সহজ নয়। কোন কোন নদীর উৎপত্তি-স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া আবিষ্কারকেরা এই বরফ-নদী ধরিয়া উঠিতে উঠিতে প্রাণ দিয়াছে এবং প্রতিবৎসর দিতেছে। কখনও গঙ্গোত্রীর পথে যাওয়া হয় নাই—হইবার সম্ভাবনাও নাই। চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চ অমরনাথ উঠিয়া দেখার সম্ভাবনাও নাই। মোটর ও রেল সাহায্যে ৭,০০০ সাত হাজার ফুট উচ্চ আল্‌পস পর্ব্বতের সিমোনিয়া গ্লেসিয়ার দেখিয়া সে সকল জেদ মিটাইতে হইল।

পথে বস্‌নিয়া (Bosnia) গ্লেসিয়ার ও আর একটী গ্লেসিয়ার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার শোভা, মহিমা ও সৌন্দর্য্য-বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত। মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশ সূর্য্যালোকে প্রতিভাত এবং সূর্য্যালোক-বিচ্ছুরিত জমাট হিমানী-সমুদ্র উচ্চ দুই পর্ব্বত চূড়ার মধ্যে যেন হীরক সমুদ্রের মধ্যে দেখাইতেছিল। সে জমাট বরফের সাগর উপত্যকার সমতল পর্য্যন্ত পৌঁছে না। যে পর্য্যন্ত যথেষ্ট শীতল সেইখানে তাহার জমাট আকার, যেখানে শৈত্যের অভাব সেইখানে পৌঁছিয়াই গলিতে আরম্ভ করে এবং গলিয়া হয় প্রস্রবণ—প্রস্রবণ হইতেই নদী।

উপত্যকার সমতলপ্রদেশ হইতে এই দুই গ্লেসিয়ার বহু উর্দ্ধে, সে পর্য্যন্ত ফুনিকুলার রেলওয়ে যায় না; অতএব

সে বিরাট্ জমাট সমুদ্রের উপর চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লজ্জিত।

যখন এই সমুদ্র হঠাৎ জমিয়া গিয়াছিল, তখন হইতেই জমা অবস্থাতেই উহা চিরন্তনকাল রহিয়া গিয়াছে। সমতল ক্ষেত্র হইতে জমাট বরফসাগর তিনতলা চারতলা বাড়ীর মত উচ্চ, কোথায়ও বা ছোট পর্ব্বতের মত উচ্চ। স্থির-নেত্রে দেখিলে মনে হয় যেন বিশাল চিত্রপটে কোন নিপুণ শিল্পী বিশাল তুলিকা সাহায্যে বিশাল সমুদ্র আঁকিয়া বিছাইয়া রাখিয়াছে। এই বিশাল চিত্র যুগ-যুগান্ত হইতে ভূলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যদেশ সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে; প্রলয়বিষাণ বাজিলেই প্রলয়বেগে এই পুঞ্জীভূত তুষার দ্রব হইয়া বিশ্বগ্রাস করিবে।

"দেশ ভেদে কাল ভেদে" বিশ্বনাথের এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া আকুলহৃদয়ে তাঁহার রাতুল চরণতলে লুটাইয়া পড়িলাম—লোকসঙ্গ তখন ভাল লাগিল না, সঙ্গীরা অনেকে দূরে পড়িয়াছেন—যিনি শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গে ছিলেন তাহা হইতে দূরে গিয়া ধীরে ধীরে একটা পাথরের উপর বসিয়া পড়িলাম। প্রাণ-মন-হৃদয় বিশ্বদেবের চরণ-তলে লুণ্ঠিত করিয়া বহুকাল পরে তাপক্লিষ্ট মন অপূর্ব্ব অনুভূতিতে ভরিয়া গেল।

যে মহাসমুদ্র তটে পর্ব্বতশিখরে পার্থিব আয়োজন সাহায্যে পিতৃমাতৃ-গুরুজন-প্রিয়জনের তর্পণ করিয়াছি—করিয়া তৃপ্তি পাইয়াছি—যে সব অমরাত্মার সান্নিধ্য-অনুভূতি পুরীতে, হরিদ্বারে পাইয়াছি, আর পাইলাম আজ এই বিশাল তুষার-সমুদ্রের কূলে।

তর্পণের অধিকারী আজ আর একজন বাড়িয়াছেন—বংশের, পরিবারের ও আমার চিরহিতৈষী আত্মীয়প্রবর শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়—আমাদের চিরদিনের সাধের চাটুয্যে মহাশয়" পূর্ব্বভ্রমণ-কাহিনীতে উল্লিখিত "কাশীর দাড়ীবাবা" ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এবার যাত্রার সময় রুগ্নদেহ লইয়া সুরি লেনের বাড়ীতে আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—দুর্ব্বলদেহ লইয়াও হাওড়ার ষ্টেশনে আসিয়া বিদায় দিয়া গিয়াছিলেন। তাহাই চির-বিদায় হইয়াছে। এ কথা কাল রাত্রে বাড়ীর পত্রে সংবাদ পাইয়াছিলাম।

নিভৃতে আন্তরিক ভক্তিভরে তর্পণের সময় তাঁহার উপস্থিতি কে রোধ করিতে পারে? অন্যান্য অতীত বান্ধবগণের সঙ্গে চাটুয্যে মহাশয়ের আত্মার অক্ষয় মঙ্গল-কামনা করিলাম।

মধ্যাহ্ন সূর্য্য গগন উদ্ভাসিত করিয়া সেই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধির শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন অথচ ধীরে ধীরে তুষার-পাত হইতেছে; এ তুষার পাতে অসুখ হয় না, বরং স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি হইয়া থাকে ইহাই প্রসিদ্ধি। তুষারপাত কিছুক্ষণ উপভোগ করিবার পর আর ভরসা হইল না—ছাতা খুলিলাম, অধিক্ষণ ছাতা রাখিতে পারিলাম না, তুষারে ছাতার চাল ভরিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। যে দেশে সর্ব্বদা তুষারপাত হয়, সেখানকার বাড়ী-ঘরের ছাত এইজন্য ঢালু হয়, যাহাতে তুষার জমিতে না পারে।

বরফ-সমুদ্রের মাঝে যেমন বড় বড় ঢেউ উঁচু হইয়া জমিয়া আছে, তেমনি অনেক ঢেউ নীচু হইয়া গিয়া সেইভাবেই আছে। কোথাও বা উঁচু ও নীচু জমাট ঢেউ-এর মাঝে ঢেউ-এর জায়গাটা ফাটিয়া গিয়া বড় বড় ফাটাল হইয়াছে, তাহাতে সময়ে সময়ে বিপদও যথেষ্ট হয়—অনেক বিপদের গল্প শোনা গেল, পাহাড়ে চড়া যাহাদের সখ ও বাতিক তাহারা সময়ে সময়ে এই সকল স্থানে বিপন্ন হয়। আমাদেরও এই সখ উপভোগ করিবার জন্য নিমন্ত্রণের অভাব হইল না। তীর্থের পাণ্ডা অথবা সমুদ্রতীরে নুলিয়ার যেমন অভাব নাই তেমনই এই জমাট বরফ-সমুদ্রের ধারেও গাইড (Guide) বা পথপ্রদর্শকের অভাব নাই; তাহারা পর্ব্বতের ও জমাট সমুদ্রের সকল সন্ধান রাখে। পর্ব্বত-আরোহণ-উপযোগী পোষাক পরিয়া কোমরে মোটা কাছি জড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে, হাতে পাহাড়ে চড়িবার যন্ত্র একদিকে, ছুঁচাল ধারাল ডগা, উহা বরফে বা পাহাড়ের উপর গুঁজিয়া দিলে ভর দিয়া উঠা যায়, যন্ত্রের আর একদিকে ছোট কুড়ালী বা বাঁশের মত ব্যবস্থা, তাহার সাহায্যে বরফে বা পাহাড়ে ধাপ কাটিয়া লইয়া উঠা যায়। যাত্রীর কোমরে কাছি বাঁধিয়া উপরে টানিয়া তোলা হয়। প্রলোভন ও নিমন্ত্রণসত্ত্বেও এ অসমসাহসিক কার্য্যে ভরসা হইল না। দূর হইতেই বিশাল বিরাট্ অক্ষয়

তুষার-ক্ষেত্রের শোভা উপভোগ করিয়া যথাসময়ে নীচে নামিলাম। তখন আর কিছু ভাল লাগিতেছিল না।

পুনরায় বন, পর্ব্বত, উপত্যকা, অধিত্যকার শোভা উপভোগ করিতে করিতে এবং পূর্ব্বদৃষ্ট ক্ষুদ্র গ্লেসিয়ারদ্বয়ের শোভার সহিত সামোনি Mere de glace Mont Blancএর মানসিক তুলনা করিতে করিতে জেনিভা ফিরিলাম। দূরে Mont Blancএর উচ্চশির সদাই জাগিয়া রহিয়াছে। হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় আলপস্ (Alps) প্রদেশের সকলস্থান হইতেই ইহা দেখা যায়।

যাইবার সময় ও ফিরিবার সময় বার বার মনে পড়িতেছিল বহুদিন পূর্ব্বে ঝাঁঝা সিমূলতলায় পার্ব্বত্য পথে রচিত গাথা—

"অয়ি জীবন-সঙ্গিনী
......বড় সাধ হয় মনে
"করি তোমা ভ্রমণ-সঙ্গিনী।" তাহা হইল না।

বুধবার ২৪এ সেপ্টেম্বর,

প্রত্যহ খানা ও বক্তৃতা প্রবলবেগে চলিয়াছে, কোনদিন দু'টা কোনদিন তিনটা বক্তৃতাও হইতেছে, যত হইতেছে তত বক্তৃতার আদরও বাড়িতেছে, না বলিয়া পরিত্রাণ নাই। আমাদের কমিটির কাজ যাহা আছে তাহা ছাড়া International Club, Society for Protection of Animals, Humanistic Society প্রভৃতির বাহিরের প্রতিষ্ঠান ও বক্তৃতা চলিয়াছে।

তার উপর চোখের ডাক্তার, চশমার দোকান, ঘড়ির দোকান দেখিতে ও অন্যান্য লোকের সঙ্গে দেখা-শোনাতেও সময় যাইতেছে। মাঝে মাঝে বাজার-হাটও দেখিতে যাই। কিন্তু সব জিনিস দুর্ম্মূল্য বলিয়া ছুঁইবার উপায় নাই। জেনিভাতে ঘড়ি ছাড়া আর কিছু জন্মায় না। বাহির হইতে সব জিনিস আসিবার দরুণ এবং জগতের নানাদেশের লোক এই সময় আসিয়া জোটে বলিয়া দাম অত্যন্ত অধিক। আমাদের দেশের মত রাস্তার ফুটপাতে হাট বসে, তফাতের মধ্যে যে পুলিস ও তোলা তোলার জুলুম নাই।

এইসকল কাজ ও অকাজের অবসরে Geneva Cathedral City Hallও মিউজিয়ম দেখিয়া আসিয়াছি। ক্যাথিড্রেল রোমানক্যাথালিক (Roman Catholic) দলের ছিল। Calom, Knox প্রভৃতি মূর্ত্তিবিদ্বেষী ধর্ম্মযাজকদিগের আমলে সমস্ত প্রস্তরমূর্ত্তি ও ছবি দূরীভূত হয়। পরবর্ত্তী যুগে এক ধনকুবের Rhone মূর্ত্তি সেখানে বসাইয়াছে; দর্শকদিগের নিকট দর্শনী আদায় হয়।

সিটি হল বা টাউন হল পুরাতন বাড়ী, পুরাতন সব ঠাট বজায় আছে, পাঁচতলা পর্য্যন্ত উঠিবার সরাসরি গড়ান রাস্তা। বড়লোকেরা গাড়ী-ঘোড়া পাল্কী (Litter) চড়িয়া একতলা হইতে পাঁচতলা পর্য্যন্ত চড়িতেন। তাহাদেরই সুবিধার জন্য এত বড় বাড়ীতে এখনও সিঁড়ি নাই!

Salle Nationale জাতীয় দালান নামে একটী বড় সাজান ঘর আছে। এই ঘরে Alabama জাহাজ-সম্বন্ধে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ঝগড়া শালিসীতে মীমাংসা হয়, সেই অবধি জেনিভাতেই শালিসী মধ্যস্থের সকল ব্যাপার মীমাংসা হয়। Red Cross Societyও এই ঘরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্য এই ঘরটী বর্ত্তমানে জগতের লোকহিতকর কাজের স্মৃতি-উপলক্ষে এত মূল্যবান্। 'তরবারি ভাঙ্গিয়া লাঙ্গল প্রস্তুত কর' এই শিক্ষার জলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ, যথার্থ তরবারী ভাঙ্গিয়া আমেরিকায় যে লাঙ্গল তৈয়ারী হইয়াছিল, তাহা এইখানে রক্ষিত আছে।

হৈমন্তী

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

তারকিত নীল-নভ-কুন্তলে বেণী যবে বিনাইলে,
মৃগশিরা তারা ছায়া মেলি' দিল সাগর-মুকুর-নীলে।
আমন ধানের মঞ্জরী-তরী দোলে তৃণ-পারাবারে,
হিম-শিশিরের পরশে অধীরা হেমন্তী এল পারে।
কোজাগরী চন্দ্রিকা,
ঝাউয়ের শাখায় পরাল মধুর স্নেহ-অনুরঞ্জিকা!
ঝিকিমিকি ঘাসে জ্যোৎস্না-জরীর কম্পিত ছায়াখানি—
তা'রি তলে হায় প্রজাপতি সাথে ঘুমাইছে অঘ্রাণী।
শাঙন-ধনুতে তীর কে পরাল কোন সে মরুর পরী
—ধরণীর বন-কবরীতে দোলে নীবারের মঞ্জরী।
নীর-নির্ঝর রহি' রহি' বাজে, মেঘ-মৃদঙ্গ-রোলে,
কৃত্তিকা তারা শিহরি' উঠিছে চাঁদেরি জোয়ার-দোলে!

কাজল-কুহেলি-গুণ্ঠনতলে তরুণ গৌরতনু,—
কল্যাণী হৈমন্তী-চরণে নমিছে কুসুমধনু!
দেহ-দীপ ঘেরি' ধূপ-ধূম-শিখা-সৌরভ-সমারোহ,
আশাবরীসুর রাগিণীতে জাগে সাহানারি সন্দোহ!
শ্যাম গোধূলিতে দীঘি-পথে বাজে কা'র ভীরু পদধ্বনি,
ভাবের বেণুকা মূরতি ধরেছে—তিমির-রাতের মণি!
হিম-সাগরের পরী,
উতলা হাওয়ায় ভাসায়ে এনেছে মুকুতার ছায়াতরী!
অধর পাথরে শিহরি উঠিছে আভীরা মেয়ের হাসি,—
আকাশের নীলে হেমন্তী-বধূ উঠিলে কি পরকাশি'?

খ্যাতির বিড়ম্বনা

(গল্প)

শ্রীআশু চট্টোপাধ্যায়

পরস্পরকে ভাল না বেসে তারা থাকে কি করে'? উভয়েই সুশ্রী, একই রঙ্গালয়ের গায়ক ও গায়িকা,—প্রতি রাত্রে পূর্ণ পাঁচটী অঙ্ক ধরে প্রেমের অভিনয়। আগুনের সঙ্গে খেলা করলে হাত পুড়বেই। মাসে কুড়িবার বেহালা ও বাঁশীর সুর লহরীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে যদি এক-জনকে বলতে হয়—"তোমায় ভালবাসি", তবে একদিন নিজের কথার জালেই তাকে বন্দী হ'তে হ'বে। ক্রমে দৃশ্যপটের রঙের লীলায়, অঙ্গরাগের সুরভিতে, ঐক্যতানের ছন্দের দোলায় মোহের জন্ম হ'ল। কোন বইয়ের অভিনয় কালে যখন এল্‌সা ও লহেন গ্রঁ আলোকোজ্জ্বল মধুর রাত্রিতে ঘরের জানালা খুলে গাইত, "ভুঞ্জিব দোঁহে আজি রজনীর মদির সুবাসখানি", তখন এই মোহ তাদের দিকে ভেসে আসত। আবার এই মোহ তাদের বুকে ঘনিয়ে আসত, যখন উষার তরুণ আলোয় রোমিও ও জুলিয়েট সাদা থামঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে গাইত—

"চাতক নহে, ও বুল্‌বুল্‌ গাহে গান।

এই কামনার মোহ-ই তাদের জড়িয়ে ধরত, যখন তারা ফষ্ট ও মার্গারেট সাজত আর চন্দ্রালোকিত আইভিলতা ও ফুটন্ত গোলাপের কুঞ্জে একজন আর একজনকে বলত, "আননে তোমার আর একবার চাহিতে দাওগো মোরে।"

শীঘ্রই সমস্ত প্যারী নগরী তাদের প্রেমের কাহিনী শুনে উৎসুক হয়ে উঠল। সে বৎসরের এইটাই ছিল সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা। নাট্যালয়ের সঙ্গীতের আবহাওয়ার মধ্যে এই দু'জন প্রসিদ্ধ নট-নটীর পরস্পরের দিকে আকর্ষণ সকলকেই আনন্দ দিলে। অবশেষে একদিন সন্ধ্যায় সুন্দর অভিনয়ের পর যখন করতালি-উচ্ছ্বসিত দর্শকবৃন্দের সামনে যবনিকা নেমে এল আর পুষ্প-সমাকীর্ণ রঙ্গমঞ্চে জুলিয়েট দাঁড়িয়েছিল, তখন দু'জন গায়ক-গায়িকার মনে এক অদম্য ভাবোচ্ছ্বাস ঘনিয়ে এল—যেন তাদের প্রেম এইরূপ সফলতার মধ্য দিয়েই নিজেকে ব্যক্ত করবার সুযোগ খুঁজছিল। হাতেতে হাত জড়ান হ'ল, অনন্ত প্রণয়ের শপথ করা হ'ল—দূরাগত জয়ধ্বনি এ শপথকে যেন পবিত্র করে' দিলে। নট ও নটীর মিলন হ'ল।

বিবাহের পর কিছুদিন রঙ্গমঞ্চে তাদের দেখা গেল না। ছুটী ফুরালে একই বইয়ে তারা নামল। তাদের এই পুনরাগমনে সকলে চমৎকৃত হ'ল। এর আগে গায়কেরই ছিল বেশী আদর। বেশী বয়স হওয়াতে আর জন-সাধারণের বেশী সম্পর্কে আসাতে সে তাদের পছন্দ-অপছন্দের কথা জানত, আর সেইজন্যই সবাইকে মোহিত করে' রাখতে পেরেছিল। তার পাশে গায়িকাকে উজ্জ্বল-ভবিষ্যৎ, তীক্ষ্ণধী ছাত্রীর মত মনে হ'ত গায়িকার কাঁধ দু'টী যেমন রুগ্ন ও ছোট ছিল তেমনি তার গলার স্বর ছিল কচি ও অমসৃণ। কিন্তু বিয়ের পর ফিরে এসে যখন সে তার আগেরই এক ভূমিকায় নামল তখন তার স্পষ্ট, মধুর সুর-লহরী গানের প্রথম কলিতেই প্রস্রবণের জলের মত এমনই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে একটা বিস্ময় ও আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল, আর সে রাত্রের জন্য তাদের সমস্ত মনোযোগ গায়িকার দিকেই আকৃষ্ট হয়ে রইল। আর গায়িকা?—সেই সুখের রাত্রির হাওয়া যেন সহসা হাল্কা, নির্ম্মল ও স্পন্দনশীল হ'য়ে সাফল্যের সমস্ত গৌরব ও ঔজ্জ্বল্য তার দিকে ভাসিয়ে নিয়ে আসছিল। তার স্বামীর গানের শেষে জয়ধ্বনি করতেও যেন সবাই ভুলে গেল। উজ্জ্বল আলোর পাশে অন্ধকারকে যেমন গাঢ়তর দেখায়, তেমনি তার স্বামীকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন রঙ্গমঞ্চের অতি

অকিঞ্চিৎকর স্থানে তার পতন হয়েছে—যেন অভিনয়ে সে একজন অতিসাধারণ মূক অভিনেতা ছাড়া আর কিছুই নয়

আসলে, গায়িকার সুরোচ্ছ্বাসে যে আবেগ ফুটেছিল তা তার কাছ থেকেই পাওয়া; গায়িকার গভীর নয়নের কটাক্ষে আগুন জ্বালিয়েছিল সে একা। এ ধারণায় অবশ্য তার গর্ব্ব হ'বারই কথা, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার অভিনেতা হিসাবে অহঙ্কারই বড় হ'ল। অভিনয়ের পর সে দর্শকদের মধ্যে বেতনভোগী প্রশংসকদের দলপতিকে ডেকে এনে জানাল যে, তারা সেদিন তার প্রবেশ ও প্রস্থান করবার সময় করধ্বনি করতে ভুলে গেছল, তৃতীয় অঙ্কের শেষে প্রত্যাহ্বান করতেও ভুলেছিল; আরও বললে যে সে একথা রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষকে জানাবে, ইত্যাদি।

হায়রে! বৃথাই সে চেষ্টা করতে লাগল, বৃথাই বেতনভোগী প্রশংসকেরা তাকে অভিনন্দন দিতে লাগল; সাধারণের অনুগ্রহ তার স্ত্রীর উপর বর্ষিত হ'য়ে সম্পূর্ণভাবে তারই করায়ত্ত হ'য়ে রইল। অভিনয়ে তার স্ত্রীর অংশ এমনভাবে বাছাই হ'ত যে, তা তার প্রতিভা ও রূপের সঙ্গে চমৎকারভাবে খাপ খেত। একজন প্রতিষ্ঠাশালিনী মহিলা যেমন নৃত্যগৃহে প্রবেশ করেন তেমনি করে' সে প্রশংসালাভ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হ'য়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করত। তার প্রত্যেক বারের সাফল্যে তার স্বামী কেমন স্ফূর্ত্তিহীন, কোপনস্বভাব ও উত্তেজিত হ'য়ে উঠত এই যে সাধারণের কাছে পাওয়া পূজা তার হাত থেকে তার স্ত্রীর হাতে চলে গেল, এটাকে বেচারা ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না; সে মনে করতে লাগল তার স্ত্রী ডাকাতি করে' তার প্রাপ্য সম্মানটা কেড়ে নিচ্ছে। বহুদিন ধরে' সে সকলের নিকট, বিশেষ করে' তার স্ত্রীর কাছে এই অকথনীয় মনোক্লেশ লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় একরাশ উপহৃত ফুলের তোড়া নিয়ে সিঁড়িবেয়ে উপরে প্রসাধন-কক্ষে যেতে যেতে তার সাফল্যোৎফুল্ল স্ত্রী প্রশংসোত্তেজিত কণ্ঠে যখন বললে, "আজকের দর্শকমণ্ডলী ছিল চমৎকার!" তখন সে শ্লেষের সঙ্গে তিক্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "তাই না কি!" কথাটা বলার ভঙ্গীতে সহসা তার তরুণী স্ত্রী তার মনের ভাব স্পষ্ট বুঝে নিয়েছিল।

তার স্বামী তাকে হিংসা করে! যে স্বামী নিজের সৌন্দর্য্য কেবল একা ভোগ করতে চায় এ সেই প্রণয়ীর হিংসা নয়,—এ কলাবিদের কঠিন, নির্ম্মম, হিংস্র ঈর্ষ্যা। সময় সময় যখন সে একটা গানের শেষে থামত, আর সংখ্যাতীত হাত থেকে জয়ধ্বনি তার দিকে বর্ষিত হ'ত, তখন তার স্বামী কেমন অন্যমনস্ক ও উদাসীন হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকত, আর তার চঞ্চল দৃষ্টি যেন দর্শকদের ডেকে ডেকে বলত—"তোমাদের জয়ধ্বনি আগে থামুক, তখন আমি গান গাইব।"

হায় রে! সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ আনন্দোচ্ছ্বাসে প্রতিধ্বনিত করে' একদিন যে মধুর জয়ধ্বনি তার জন্যে উঠত, আর তা না ওঠায় সে মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়ে। সত্যই একবার যে এই জয়ধ্বনির স্বাদ পেয়েছে সে কি আর তা ছেড়ে থাকতে পারে! প্রসিদ্ধ নটেরা বৃদ্ধত্বের জন্য বা পীড়ার জন্য মরে না—তারা তখনি মরে যখন লোকের জয়ধ্বনি আর তাদের অভ্যর্থনা করে না। দর্শকদের অবহেলায় আমাদের এই নটও হতাশ হ'য়ে পড়ল। সে রোগা হ'য়ে গেল; স্বভাব হল খিটখিটে। বৃথাই সে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলে, নিজের এই বোকামীটাকে লজ্জা দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে। রঙ্গমঞ্চে আসবার আগে বারবার সে মনকে বোঝাত—

"ও তো আমারি স্ত্রী; আমি তো ওকে ভালবাসি।"

কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অস্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে জীবনের এই স্বাভাবিক দার্শনিকতা—কোথায় চকিতে মিলিয়ে যেত। স্ত্রীকে সে তখনও সম্পূর্ণভাবে ভাল-বাসিত কিন্তু তার মধ্যের গায়িকাকে ঘৃণা করত। তার স্ত্রীও তা বুঝতে পারত আর শুশ্রূষাকারিণীর মত তার এই করুণ পাগলামীর দিকে নজর রাখত প্রথমে সে নিজের সফলতার অসম্পূর্ণতা আনবার চেষ্টা করলে, নিজের কণ্ঠস্বর ও প্রতিভাকে পূর্ণভাবে ব্যবহার না করবার চেষ্টা করলে—কিন্তু স্বামীর মতই আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে দাঁড়ালে তারও সমস্ত সিদ্ধান্ত ভেসে যেত। তার অজ্ঞাতে তার প্রতিভা মনের উপর আধিপত্য করত। তারপর সে স্বামীর কাছে নিজেকে স্বেচ্ছায় ছোট করত; —তার উপদেশ চাইত, স্বামীর মতে তার অভিনয় ঠিক হচ্ছে কি না জিজ্ঞাসা করত

অঙ্গ তার স্বামীর মনস্তুষ্টি হ'ত না। অভিনেতারা যেমন পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করে তেমনি ভালমানুষের ভাণ করে। মিথ্যা বন্ধুত্বের স্বরে সে স্ত্রীর সবচেয়ে সাফল্য-মণ্ডিত রাত্রিতে তাকে বলত, "তোমার নিজের দিকে একটু দৃষ্টি রাখা উচিত, প্রিয়ে! অভিনয় এখন তেমন ভাল হচ্ছে না; উন্নতি কিছুই হচ্ছে না।"

অন্য সময় সে স্ত্রীকে গান গাওয়া থেকে বিরত করতে চেষ্টা করত। বলত, "সাবধান হও; নিজেকে সম্পূর্ণ-ভাবে দান করে' ফেলছ যে। বড় বেশী গাইছ, এত তাড়াতাড়ি নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করে' ফেল না। আমার মনে হয় তোমার এখন কিছুদিন ছুটী নেওয়া দরকার।"

এ বিষয়ে তুচ্ছ কারণ দেখাতেও সে পশ্চাৎপদ হ'ত না। বলত, "তোমার সর্দ্দি হ'য়েছে, তাই গলাটা আজ ভার ভার" কিংবা হয় তো রাগের ভরে বলত, "দ্বৈতগানের শেষটা তুমি বড় তাড়াতাড়ি আরম্ভ ক'রে আমার গানটাও নষ্ট করে' দিয়েছিলে। ইচ্ছে করেই করেছিলে।" হায় রে, হতভাগ্য! সে বুঝতে পারত না যে রঙ্গমঞ্চের সামনে এসে স্ত্রীকে আড়াল করে' দাঁড়িয়ে, জয়ধ্বনিকে থামিয়ে রাখতে বা পুনরায় দর্শকদের পূজা পাবার আশায় সে নিজে যখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি গাইত, তখন সেই তার স্ত্রীর অভিনয় নষ্ট করে' দিত। স্ত্রী কখনও এ বিষয়ে অভিযোগ করত না, কারণ সে তার স্বামীকে খুবই ভালবাসত। তা' ছাড়া সাফল্য মনকে উদার করে' দেয়। প্রতি সন্ধ্যায় সে যখন স্বেচ্ছায় নিজেকে লুপ্ত করবার জন্যে মঞ্চের পিছনদিকে অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়াত তখন দর্শকদের আগ্রহাতিশয্যে তাকে সামনে আসতেই হ'ত

এই অদ্ভুত ঈর্ষ্যার কথা রঙ্গালয়ের সবাই শীঘ্র জানতে পারলে, আর অন্যান্য অভিনেতারা এ নিয়ে বেশ ঠাট্টা-তামাসা আরম্ভ করে' দিলে। স্ত্রীর গানের প্রশংসা করে' স্বামীকে তারা ব্যতিব্যস্ত করে' তুললে। যে কাগজখানা স্ত্রীর অভিনয় সম্বন্ধে চারস্তম্ভ অজস্র প্রশংসা লিখে স্বামীর অন্তর্হিতপ্রায় খ্যাতির বিষয় দু'চার কথা লিখত সেখানা তারা স্বামীর চোখের সামনে মেলে ধরত। এক দিন এই রকম একটা প্রবন্ধ পড়ে' সে খোলা কাগজখানা হাতে করে' স্ত্রীর প্রসাধান-কক্ষে ছুটে গিয়ে ক্রোধে বিবর্ণ হ'য়ে বললে, "এ লোকটা নিশ্চয়ই তোমার প্রণয়ী ছিল।"

এ রকম অবিচার করবার মত মনোবৃত্তি তখন তার হ'য়েছিল। দর্শকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও স্বামীর ঈর্ষ্যার পাত্রী হ'য়ে এই হতভাগ্য রমণী অতিদুঃখের হীনজীবন যাপন করছিল, যদিও প্যারী নগরীর সকল দেওয়ালের গাত্রলগ্ন রঙ্গালয়ের বিজ্ঞাপনে তার নাম বড় বড় অক্ষরে ছাপান থাকত; আর মিষ্টান্ন ও গন্ধদ্রব্য-বিক্রেতার সকল দ্রব্যের গায়ে তার নাম না থাকলে তাদের মাল কাটতি হ'ত না। পাছে নিজের প্রশংসা চোখে পড়ে এই ভয়ে সে কোন পত্রিকা খুলত না। যেসব ফুলের তোড়া লোকে তার দিকে ছুঁড়ে দিতে পাছে সেগুলা তার সাফল্য-মণ্ডিত রাত্রিগুলির স্মৃতি জাগিয়ে রাখে, সে ভয়ে সেগুলি প্রসাধন-কক্ষের এক কোণে এমনভাবে জড়ো ক'রে রেখে দিত যে শীঘ্রই সেগুলা শুকিয়ে যেত। এমন কি সে রঙ্গালয় ত্যাগ করবার ইচ্ছাও স্বামীর কাছে প্রকাশ করেছিল কিন্তু তার স্বামী তা'তে অমত ক'রে বলেছিল, "তা হ'লে লোকে বলবে আমিই তোমাকে রঙ্গালয় ছাড়িয়েছি।"

কাজে দু'ইজনে এই ভীষণ যন্ত্রণাভোগ করতে লাগল।

একদিন রাত্রির অভিনয়ে একটা ভূমিকায় প্রথম অবতরণ করে' গায়িকা যখন মঞ্চের উপর যাচ্ছিল তখন একজন তাকে বললে, "সাবধান; রঙ্গালয়ে আজ তোমার বিরুদ্ধে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র হয়েছে।" কথা শুনে সে হেসেই অস্থির, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র? কি কারণেই বা হ'বে! সকলের কাছ থেকে সে সহানুভূতিই পেয়ে এসেছে, কোন দলাদলির মধ্যে তো সে ছিল না। কিন্তু কথাটা সত্য। স্বামীর সঙ্গে দ্বৈতসঙ্গীতের মধ্যস্থলে যখন তার কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত স্বরমূর্চ্ছনা সাফল্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠে মুক্তাহারের মত দুলছিল, তখন চারদিক্ থেকে একটা হিস্‌হিস্ শব্দ উঠে তাকে থামিয়ে দিলে। তার মতই সমস্ত দর্শকমণ্ডলী আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সবাই রুদ্ধনিঃশ্বাসে বসে রইল—সকলেরই মনে হচ্ছিল যেন

গায়িকার অগীত সঙ্গীতাংশটুকু তাদের বুকে বন্দী হয়ে গুমরে মরছে। সহসা একটা ভয়ঙ্কর ধারণা বিদ্যুৎগতিতে গায়িকার মনে জেগে উঠল—সে বুঝতে পারলে কাহার চক্রান্তে তার গানের মাঝখানে হিস্‌হিস্‌ শব্দ হয়েছিল। তার সামনে রঙ্গমঞ্চে একা তার স্বামী দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাইতেই সে দেখতে পেলে তার চোখে একটা ক্রুর হাসির রেখা; একটু পরেই তা মিলিয়ে গেল। হতভাগ্য রমণী সবই বুঝতে পারলে। ক্রন্দনাবেগে তার দমবন্ধ হয়ে এল উচ্ছ্বসিত অশ্রুজলে অন্ধের মত টলতে টলতে সে রঙ্গমঞ্চের বাইরে চলে গেল।*

* আলফঁস্‌ দোদের গল্পের অনুবাদ।

জৈন শলাকা-পুরুষ

অধ্যাপক হরিহর শাস্ত্রী

জৈন শাস্ত্রমতে 'উৎসর্পিণী' ও 'অবসর্পিণী' এই দুইটী সংজ্ঞায় কাল বিভক্ত। 'উৎসর্পিণী' কালে প্রাণীদিগের আয়ুঃ এবং শরীরাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, আর 'অবসর্পিণী' কালে তাহার ক্রমশঃ হ্রাস হয়। এই দুইটী কালের প্রত্যেকটীই আবার ছয়ভাগে বিভক্ত। অবনতি-রূপ 'অবসর্পিণী' কালের ১ম বিভাগ—সুষমা-সুষমা। এই সময়ে মনুষ্যের শরীরের উচ্চতা তিন ক্রোশ পরিমাণ (১২,০০০ গজ)। এই কালের মনুষ্যের মধ্যে সকলেই সুন্দর ও সরলচিত্ত। তিনদিন অন্তর লোকের ভোজনেচ্ছা হয়, আর ইচ্ছামাত্রেই কল্পবৃক্ষ হইতে বিবিধ খাদ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়—তাহার জন্য কোনও আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। এই সময়ের মনুষ্যদিগের মলমূত্রত্যাগের প্রয়োজন হয় না এবং কোনও রূপ ব্যাধিও তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। এই যুগে স্ত্রী ও পুরুষ যুগপৎ এক গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয় এবং যৌবনপ্রাপ্ত হইলে উভয়ে পতি-পত্নীর ন্যায় ব্যবহার করে। পুত্রকন্যা ভূমিষ্ঠ হইলেই মাতাপিতা তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করেন, শিশু নিজের অঙ্গুষ্ঠ লেহন করিয়া ৪৯ দিনেই পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হয়। মৃত্যু—স্ত্রী-পুরুষের একসময়েই হইয়া থাকে।

২য় বিভাগ—সুষমা। এই কালে মনুষ্যের উচ্চতা দুই ক্রোশ (৮,০০০গজ), দুইদিন অন্তর ভোজনের ইচ্ছা হয় এবং পূর্ব্ববৎ কল্পবৃক্ষ হইতেই ভোজ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। কালের এই দুইবিভাগেই (সুষমা-সুষমা ও সুষমা) কোনও রাজামহারাজের অস্তিত্ব থাকে না। সিংহাদি হিংস্রজন্তুও শান্তস্বভাবে বিরাজ করে।

ইহার পর অবসর্পিণী কালের ৩য় বিভাগ—সুষমা-দুঃসমা। কালের এই বিভাগে মনুষ্যের শরীরের উচ্চতা এক ক্রোশ (৪,০০০ গজ)। এই সময়ে মানুষ একদিন অন্তর আহার করে। এই কালেও লোকে বিনা পরিশ্রমে কল্পবৃক্ষ হইতে উপভোগের সকল সামগ্রী প্রাপ্ত হয়। এই 'সুষমা-দুঃসমা' কালের শেষ অংশে প্রতিশ্রুত, সম্মতি, ক্ষেমঙ্কর, ক্ষেমন্ধর, সীমঙ্কর, বিমলবাহন, চক্ষুমান্‌, যশস্বান, অভিচন্দ্র, চন্দ্রাভ, মরুদেব, প্রসেনজিত, নাভিরায় - এই চতুর্দ্দশ কুলকর (মনু) ক্রমশঃ জন্মলাভ করেন। ইহারা কুলপ্রবাহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এইজন্য ইহাদিগকে 'কুলকর' বলা হয়। এই কুলকরেরা অপরাধী মনুষ্যের দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া 'মনু' নামেও অভিহিত। কুলকরগণের উৎপত্তির পূর্ব্বে মনুষ্যদিগের কোনও নাম ছিল না—স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগকে 'আর্য্য' আর পুরুষেরা স্ত্রীলোককে 'আর্য্যে' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। চতুর্দ্দশ-তম কুলকর মহারাজ নাভিরায়ের সময়ে কল্পবৃক্ষ সমূহ প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নাভিরায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগভূমি ছিল। এইবার কর্ম্মভূমির প্রারম্ভ হইল। এখন হইতেই লোক জীবিকার জন্য কৃষি-

বাণিজ্যাদি কর্ম্মের আবশ্যকতা অনুভব করিল। কিন্তু মানুষ তখন কি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহার উপায়-সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। যদিও এই সময়ে স্বয়ং ধান্যাদি বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল, কিন্তু তাহার উপযোগিতা-সম্বন্ধে মানুষের কোনও জ্ঞান ছিল না। এইজন্য তাৎকালিক মনুষ্যেরা মহারাজ নাভিরায়ের নিকটে নিজেদের ক্ষুধাদি কষ্টের কথা নিবেদন করিল এবং স্বয়ং উৎপন্ন বৃক্ষসমূহের প্রয়োজন জানিতে চাহিল। মহারাজ নাভিরায় তাহাদিগকে ধান্যবৃক্ষ হইতে কিভাবে তণ্ডুল নিষ্পত্তি হয়, সে বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এই কর্ম্মভূমির প্রারম্ভ-সময়ে মানুষের নিকটে রন্ধন-ভোজনাদির কোনও পাত্র ছিল না—নাভিরায়ই তাহাদিগকে স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখাইলেন।

মহারাজ নাভিরায়ের মহিষীর নাম মরুদেবী। ইঁহার গর্ভে কর্ম্মভূমির প্রবর্ত্তক, জৈন আদি তীর্থঙ্কর, ভগবান্ ঋষভদেব জন্মলাভ করেন।

৪র্থ বিভাগ—দুঃসমা-সুষমা। এই কালের আদি অবস্থায় মানুষের আয়ুঃ ৮৪ লক্ষ আর শরীরের উচ্চতা ১,১০০ গজ। এই সময় হইতেই রাজত্ব, বাণিজ্য, বিবাহ, বিদ্যাধ্যয়নাদি কার্য্যের সূচনা হইল। এই কালের নাম 'সৎযুগ'। এই যুগেই চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর, দ্বাদশ চক্রবর্ত্তী, নব নারায়ণ, নব প্রতিনারায়ণ, নব বলভদ্র এই ৬৩ শলাকাপুরুষ আবির্ভূত হন। ইহা ছাড়া ৯ নারদ, ১১ রুদ্র ও ২৪ কামদেবও এই সময়ে উৎপত্তিলাভ করেন।

তীর্থঙ্কর

তীর্থঙ্করগণ, স্বর্গ হইতে কোনও রাজার ঔরসে ও পট্টমহিষীর গর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা 'কেবল জ্ঞান' লাভ করিয়া সমগ্র দেশে ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা জীবগণকে মোক্ষমার্গের অধিকারী করেন এবং শেষে নিজেও মুক্ত হন।

চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করের মধ্যে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পিতামাতার নাম পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ইঁহার চরণে বৃষের চিহ্ন ছিল। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা নবমীতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে অযোধ্যা নগরীতে ঋষভদেবের জন্ম হয়। ইঁহার শরীর কাঞ্চন বর্ণ এবং উচ্চতায় দুই হাজার হস্ত পরিমাণ (৫০০ ধনুঃ)।

ঋষভদেব যৌবনপ্রাপ্ত হইলে পিতা নাভিরায়, কচ্ছ ও মহাকচ্ছ নামক দুই রাজার যশস্বতী ও সুনন্দা নাম্নী দুই কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

মহারাণী যশস্বতীর গর্ভে ঋষভদেবের প্রথম পুত্র ভরত জন্মলাভ করেন। ভরতের পর বৃষভসেন, অনন্তবিজয়, মহাসেন, অনন্তবীর্য্য, অচ্যুত, বীর, বীরবর, শ্রীসেন,গুণসেন, জয়সেন, প্রভৃতি ৯৯ পুত্র ও ব্রাহ্মী নামে এক কন্যারও ইঁহারই গর্ভে জন্ম হয়।

মহারাণী সুনন্দার গর্ভে ঋষভদেবের বাহুবলী নামক এক পুত্র ও সুন্দরী নামে এক কন্যা মাত্র উৎপন্ন হয়।

ভগবান্ ঋষভদেবই প্রজাগণকে কৃষি, বাণিজ্য, যুদ্ধ-বিদ্যা, শিল্পকলা প্রভৃতি শিক্ষা দেন। এই সময় হইতেই কর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণব্যবস্থার আরম্ভ হয়, ইহার পূর্ব্বে জাতিবর্ণের কোনও নিয়ম ছিল না।

ভগবান্ ঋষভদেব, এক এক সহস্র রাজার উপরে এক এক মহামণ্ডলেশ্বরের ব্যবস্থা করেন। এইরূপ চারিজন মহামণ্ডলেশ্বর ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথম মহামণ্ডলেশ্বর হরি হইতে হরিবংশ, অকম্পন হইতে নাথ-বংশ,কাশ্যপ হইতে উগ্রবংশ ও সোমপ্রভ হইতে কুরুবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

কিছুকাল পরে ঋষভদেব, ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজে 'সিদ্ধার্থ' নামক বনে তপস্যা করিতে গেলেন। এক লক্ষ এক হাজার বর্ষ বয়সে ঋষভদেব, কৈলাসপর্ব্বতে মাঘমাসে পদ্মাসনে মোক্ষলাভ করেন।

জৈনশাস্ত্র মতে ঋষভদেবের প্রথম পুত্র ভরতের নামানুসারেই এই দেশের নাম ভারতবর্ষ।

দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর—অজিতনাথ। ইঁহার পিতার নাম জিতশত্রু, মাতার নাম বিজিতসেনা। অজিতনাথের শরীরের উচ্চতা ৪৫০ ধনুঃ (১)। জন্মস্থান—অযোধ্যা। ইনি খড়্গাসনে মুক্তিলাভ করেন।

(১) এক ধনুর পরিমাণ ৪ হস্ত।

তৃতীয় তীর্থঙ্কর—সম্ভবনাথ। পিতার নাম দৃঢ়রথ, মাতার নাম সুসেনা দেবী। জন্মস্থান—শ্রাবস্তী নগরী। শরীরের উচ্চতা ৪০০ ধনুঃ।

চতুর্থ তীর্থঙ্কর—অভিনন্দন। পিতা—স্বয়ম্বর, মাতা—সিদ্ধার্থা। জন্মস্থান—বিনীতা নগরী। শরীরের উচ্চতা ৩৫০ ধনুঃ।

পঞ্চম তীর্থঙ্কর—সুমতিনাথ। পিতা—মেঘরথ, মাতা মঙ্গলাদেবী। জন্মনগরী—বিনীতা। শরীরের উচ্চতা ৩০০ ধনুঃ।

ষষ্ঠ তীর্থঙ্কর—পদ্মপ্রভ। পিতা—ধরণি, মাতা সুসীমা দেবী। জন্মস্থান—কৌশাম্বী নগরী। দেহের দীর্ঘতা ২৫০ ধনুঃ।

সপ্তম তীর্থঙ্কর—সুপার্শ্বনাথ। পিতা—সুপ্রতিষ্ঠিত, মাতা পৃথ্বীসেনা। জন্মস্থান—অসিঘাট (ভদৈনী) কাশী। শারীরিক উচ্চতা ২০০ ধনুঃ।

অষ্টম তীর্থঙ্কর—চন্দ্রপ্রভ। পিতা—মহাসেন, মাতা লক্ষ্মণা। জন্মভূমি—চন্দ্রপুরী। শরীরের উচ্চতা ১৫০ ধনুঃ।

নবম তীর্থঙ্কর—পুষ্পদন্ত। পিতা—সুগ্রীব, মাতা জয়রামা। জন্মস্থান—কাকন্দীপুর। শরীরের উচ্চতা ১০০ ধনুঃ।

দশম তীর্থঙ্কর—শীতলনাথ। পিতা—দৃঢ়রথ, মাতা সুনন্দা। জন্মস্থান—ভদ্দলপুরী (গোয়ালিয়র জেলার অন্তর্গত ভেলসা নগরী)। দৈহিক দীর্ঘতা ৯০ ধনুঃ।

একাদশ তীর্থঙ্কর—শ্রেয়াংসনাথ। পিতা—বিষ্ণুরাজ, মাতা নন্দা দেবী। জন্মস্থান—সিংহপুরী (সারনাথ)। শরীরের উচ্চতা ৮০ ধনুঃ।

দ্বাদশ তীর্থঙ্কর—বাসুপূজ্য। পিতা—বসুরাজ, মাতা জয়াদেবী। জন্মস্থান—চম্পাপুর। দৈহিক দীর্ঘতা ৭০ ধনুঃ।

ত্রয়োদশ তীর্থঙ্কর—বিমলনাথ। পিতা—কৃতবর্ম্মা, মাতা—জয়শ্যামা। জন্মস্থান—কম্পিলীপুর। শরীরের উচ্চতা ৬০ ধনুঃ।

চতুর্দ্দশ তীর্থঙ্কর—অনন্তনাথ। পিতা—সিংহসেন, মাতা জয়শ্যামা। জন্মস্থান—কোশলপুর। শরীরের উচ্চতা ৫০ ধনুঃ।

পঞ্চদশ তীর্থঙ্কর—ধর্ম্মনাথ। পিতা—ভানুরাজ, মাতা সুপ্রভা দেবী। জন্মস্থান—রত্নপুর। শারীরিক উচ্চতা ৪৫ ধনুঃ।

ষোড়শ তীর্থঙ্কর-শান্তিনাথ। পিতা—বিশ্বসেন, মাতা ঐরা দেবী। জন্মস্থান—হস্তিনাপুর। দেহের উচ্চতা ৪০ ধনুঃ।

সপ্তদশ তীর্থঙ্কর—কুন্থনাথ। পিতা—শূরসেন রাজা। মাতা শ্রীকান্তা। জন্মস্থান—হস্তিনাপুর। শরীরের উচ্চতা ৩৫ ধনুঃ।

অষ্টাদশ তীর্থঙ্কর—অরনাথ। পিতা—সুদর্শন রায়, মাতা মিত্রসেনা। জন্মস্থান—হস্তিনাপুর। শরীরের উচ্চতা ৩০ ধনুঃ।

ঊনবিংশ তীর্থঙ্কর—মল্লিনাথ। পিতা কুম্ভরাজ, মাতা প্রভাবতী। জন্মস্থান—মিথিলা। শরীরের উচ্চতা ২৫ ধনুঃ।

বিংশ তীর্থঙ্কর—মুনি সুব্রত। পিতা—সুমিত্র, মাতা সোমাদেবী। জন্মস্থান—রাজগৃহ। শরীরের উচ্চতা ২০ ধনুঃ।

একবিংশ তীর্থঙ্কর—নমিনাথ। পিতা—বিজয় রাজ, মাতা—বিপুলারাণী। জন্মস্থান—মিথিলা। শরীরের উচ্চতা ১৫ ধনুঃ।

দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর—নেমিনাথ। পিতা—সমুদ্রবিজয়, মাতা—শিবা দেবী। জন্মস্থান—দ্বারকানগরী। আয়ুঃ এক হাজার বৎসর। শরীরের উচ্চতা ১০ ধনুঃ (৪০ হাত)।

ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর—পার্শ্বনাথ। পিতা—অশ্বসেন, মাতা বামা দেবী। জন্মস্থান—ভেলুপুরা, কাশী। আয়ুঃ ১০০ বৎসর। শরীরের উচ্চতা ৯ হাত।

চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর—বর্দ্ধমান। ইঁহার নামান্তর মহাবীর স্বামী। পার্শ্বনাথের নির্ব্বাণলাভের ২৫০ শত বৎসর পরে বিদেহদেশের অন্তর্গত কুণ্ডপুরে রাজা সিদ্ধার্থের ঔরসে ত্রিশলা দেবীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার 'মহাবীর' ও 'বর্দ্ধমান' নামকরণ-সম্বন্ধে আচার্য্য সকল-কীর্ত্তি "মহাবীর পুরাণে" বলিয়াছেন,—

"অয়ং স্যাম্নংতাং বীরঃ কর্ম্মারাতিনিকন্দনাৎ।
শ্রীবর্দ্ধমান নামাসৌ বর্দ্ধমান গুণাশ্রয়াৎ ॥"
(৮৯ শ্লোক)

মহাবীর ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সংসারাশ্রমে ছিলেন, তাহার পরই তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি তখন রাজভবনকে কারাগারের ন্যায় দুঃখপ্রদ মনে করিলেন, তাই রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন।—

"কারাগারসমং গেহং জ্ঞাত্বা রাজ্যশ্রিয়া সমম্।
ত্যক্তুং তপোবনং গন্তুং প্রোদ্যমং পরমং ব্যধাৎ ॥"
(মহাবীর পুরাণ, ১০৫ শ্লোক)

পিতা সিদ্ধার্থ জ্ঞানী ছিলেন। তিনি পুত্রের সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণে তত বিচলিত হইলেন না। কিন্তু মাতা ত্রিশলা শোকার্ত্তচিত্তে আত্মীয়-বন্ধুগণের সহিত বিলাপ করিতে করিতে পুত্রের সহিত অনুগমন করিলেন।

"রোদনঞ্চেতি কুর্ব্বাণা বন্ধুভিঃ সমমার্ত্তধীঃ।
বিলাপৈর্বহুভির্দুঃখাৎ সা পুত্রমনুনির্যযৌ ॥"

দেবী ত্রিশলা নগরের বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত আসিলে বিদ্বদ্ বৃদ্ধেতা এই বলিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন যে,

"দেবি কিং বেৎসি নাস্যেদং চরিত্রং ত্বং জগদ্‌গুরোঃ।
অয়ং ত্রিজগতীভর্ত্তা সুতস্তেঽদ্ভুতবিক্রমঃ ॥
ভবাব্ধৌ ন্যপতৎ পূর্ব্বমুদ্ধৃত্যাত্মনমাত্মবিৎ।
পশ্চাদ্ ভব্যান্ বহূন্ জন্তূনুদ্ধারিষ্যতি তীর্থরাট্ ॥
অত্যাসন্নভবং প্রাপ্তো জগদুদ্ধরণক্ষমঃ।
ঘৎসুতো দীনবদ্ গেহে শুভে কুর্য্যাৎ কথং রতিম্ ॥"

দেবি, তুমি কি এই জগদ্‌গুরুর চরিত্র জান না? অদ্ভুতবিক্রম তোমার এই পুত্র, ত্রিজগতের রক্ষক হইবেন। ইনি নিজেকে সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া বহু ভব্য প্রাণীকে নিস্তারের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। হে শুভে, জগদুদ্ধারে সমর্থ তোমার এই পুত্র, কেন দীনের ন্যায় গৃহাশ্রমের প্রতি অনুরাগী হইয়া থাকিবেন?

এই মহাপুরুষের বাক্যে ত্রিশলা দেবী গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

মহাবীর তখন দিগম্বরবেশ ধারণ করিয়া নানাদেশ পর্য্যটন করিলেন, শেষে জৃম্ভিকা গ্রামের প্রান্তভাগে 'ঋজুকূলা' নদীতটে এক শালবৃক্ষের তলে ধ্যানস্থ হইলেন। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মহাবীর ৩০ বৎসর কাল দেশ-দেশান্তরে অহিংসা-ধর্ম্মের প্রচার করেন। এই সময়ে মহাবীরের কণ্ঠ হইতে যেসকল উপদেশবাণী ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাই আচারাঙ্গ প্রভৃতি দ্বাদশভাগে তাঁহার প্রধান শিষ্য গৌতম স্বামী (অন্য নাম ইন্দ্রভূতি) কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন। এইসকল সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া কুন্দকুন্দ, সমন্তভদ্র স্বামী, বিদ্যানন্দী, প্রভাচন্দ্র-প্রমুখ আচার্য্যগণ, পঞ্চাস্তিকায়, আপ্তমীমাংসা, অষ্টসহস্রী, প্রমেয়-কমল-মার্ত্তণ্ড প্রভৃতি বিচারবহুল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মহাবীর স্বামী কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যার প্রাতঃকালে বিহার প্রদেশের পাবাপুরীতে মোক্ষলাভ করেন। বর্ত্তমান সময়ে পাবাপুরের (পোখরপুর) জৈনমন্দিরে মহাবীরের চরণপাদুকা রক্ষিত আছে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী অমাবস্যায় এখানে বিরাট্ উৎসব হইয়া থাকে। আজ ২,৪৫৭ বৎসর হইল মহাবীরের নির্ব্বাণলাভ হইয়াছে।

মহাবীরের নির্ব্বাণ তিথি এই কার্ত্তিকী অমাবস্যায় জৈনসম্প্রদায় দীপাবলীর উৎসব ও লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করেন।

চক্রবর্ত্তী

১ম চক্রবর্ত্তী—আদিতীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পুত্র।

২য় সগর। জৈনপুরাণের মতে সগরের পিতার নাম—সমুদ্রবিজয়, মাতার নাম সুবালা। সগরের ৬০ হাজার পুত্র। তাহার মধ্যে ভগীরথ নামক পুত্রকে রাজ্যসমর্পণ করিয়া তিনি তপোব্রত ধারণ করেন। পিতার মোক্ষলাভের পর ভগীরথ কৈলাস পর্ব্বতে গঙ্গাতীরে শিবগুপ্ত মুনির নিকটে দীক্ষিত হন। ভগীরথের চরণের সহিত গঙ্গার সংযোগ হওয়ায় গঙ্গার ভাগীরথী নাম হয়। সেইদিন হইতে জৈনসম্প্রদায়ের কাছে গঙ্গা পবিত্রতীর্থ।

৩য় চক্রবর্ত্তী—মঘবা। ৪র্থ সনৎকুমার। ৫ম শান্তিনাথ। ৬ষ্ঠ কুন্থুনাথ। ৭ম অরনাথ। ৮ম সুভৌম। ৯ম পদ্মনাথ। ১০ম হরিসেন। ১১শ জয়সেন। ১২শ ব্রহ্মদত্ত।

নারায়ণ

নারায়ণেরা সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন না। রাজ্যাবস্থাতেই তাঁহাদের মৃত্যু হয়, এজন্য তাঁহারা নরকগামী হন। নরকভোগ পূর্ণ হইলে নারায়ণেরা তীর্থঙ্করাদিরূপে জন্মলাভ করিয়া মুক্ত হন। নারায়ণগণের নাম :—

১। ত্রিপিষ্ট, ২। দ্বিপিষ্ট, ৩। স্বয়ম্ভূ, ৪। পুরুষোত্তম, ৫। নরসিংহ, ৬। পুণ্ডরীক, ৭। দত্তদেব, ৮। লক্ষ্মণ, ৯। কৃষ্ণ।

প্রতিনারায়ণ

প্রতিনারায়ণেরাও সেই জন্মে মোক্ষলাভ করিতে পারেন না—জন্ম-পরম্পরায় মুক্তির অধিকারী হন। নারায়ণের হস্তে সুদর্শন-চক্রদ্বারা প্রতিনারায়ণগণের মৃত্যু হয়। এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ৯ জন প্রতিনারায়ণ উৎপন্ন হইয়াছেন :—

১। অশ্বগ্রীব, ২। তারক, ৩। মেরুক, ৪। নিশুম্ভ, ৫। মধুকৈটভ, ৬। প্রহ্লাদ, ৭। বলি, ৮। রাবণ, ৯। জরাসিন্ধু।

বলভদ্র

নারায়ণের বিমাতার গর্ভে বলভদ্রগণ জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। বলভদ্রগণের নাম :—

১। বিজয়, ২। অচল। ৩। ধর্ম্মপ্রভ, ৪। সুপ্রভ, ৫। সুদর্শন, ৬। নন্দী, ৭। নন্দিমিত্র, ৮। পদ্ম (রামচন্দ্র), ৯। বলদেব। ইনি নবম নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের পিতৃব্য বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ ও রোহিণীর গর্ভে বলদেব উৎপন্ন হন। বলদেব, নেমিনাথেরও জ্যেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ জরাসিন্ধুকে বধ করিয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের সহিত তাঁহার পরমমিত্রতা ছিল।

বেদমূলক পুরাণাদি শাস্ত্রের সহিত জৈনশাস্ত্রের এইরূপ কৌতূহলজনক ঐক্য ও অনৈক্য, প্রণিধানযোগ্য। পাঠক-পাঠিকাগণ অনুমোদন করিলে ভবিষ্যতে জৈনশাস্ত্র-সম্মত রামচরিত্র, কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিব।

বর্ত্তমান সময়ে 'অবসর্পিণী' কালের ৫ম বিভাগের প্রারম্ভ হইয়াছে। এই বিভাগের নাম—'দুঃসমা', ইহার স্থায়িত্ব ২১ হাজার বৎসর। এই কালে মানুষের আয়ুঃ, বল, দৈহিক দীর্ঘতা প্রভৃতি সকলই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। এইযুগের প্রারম্ভে মানুষের আয়ুঃ ১২০ বৎসর ও দৈহিক উচ্চতা ৭ হাত পরিমাণ ছিল। প্রতি হাজার বৎসরে ৫ম বর্ষ হিসাবে আয়ুর হ্রাস হইতেছে এবং সর্ব্বশেষে দুই হাত পরিমাণ শরীর ও ২০ বৎসর আয়ুঃ হইবে। এই সময়ে ধর্ম্মের একেবারে অভাব হইয়া পড়িবে।

'অবসর্পিণী' কালের ৬ষ্ঠ বিভাগ—দুঃসমা-দুঃসমা। ইহা আরও অবনতির সময়। এই কালের ৩৯ দিন অবশিষ্ট থাকিতে পৃথিবীতে মহান্ উপপ্লবের সৃষ্টি হইবে। পশু, পক্ষী, মনুষ্য, গৃহ, গ্রাম, নগর—সমস্তই এই সময়ে ধ্বংসমুখে পতিত হইতে থাকে। জৈনমতে ইহাই প্রলয়কাল। এই সময়েই অবনতিরূপ 'অবসর্পিণী' কালের সমাপ্তি।

'অবসর্পিণী' কাল পূর্ণ হইলে উন্নতিরূপ 'উৎসর্পিণী' কালের আরম্ভ। ইহারও ছয়টী বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগই ২১ হাজার বৎসর স্থায়ী। এই কালের ১ম বিভাগ—দুঃসমা-দুঃসমা। পূর্ব্বকালের যাহা-কিছু পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা এই কালে উন্নতিলাভ করিতে থাকে। ২য় বিভাগ—দুঃসমা। এই কালে মনুষ্যের আয়ুঃ ও শরীর-পরিমাণাদির ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তৃতীয় বিভাগ—সুষমা-দুঃসমা। এই কালে 'অবসর্পিণী' কালের চতুর্থ বিভাগের ন্যায় পুনর্ব্বার চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর ও চক্রবর্ত্তী, নারায়ণ, প্রতিনারায়ণাদি ৬৩ শলাকাপুরুষ আবির্ভূত হন (২) এবং মানুষের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি

(২) এই যুগে শলাকা পুরুষগণের নামের পরিবর্ত্তন হয়। নিম্নে ভবিষ্যৎ তীর্থঙ্কর প্রভৃতির নাম প্রদত্ত হইল :—

তীর্থঙ্কর—মহাপদ্ম, সুরদেব, সুপার্শ্ব, স্বয়ম্প্রভ, সর্ব্বাত্মভূত, দেবপুত্র, কুলপুত্র, উদঙ্ক, প্রোষ্ঠিল, জয়কীর্ত্তি, মুনিসুব্রত, অর, উপায়, নিষ্কষায়, বিপুল, নির্ম্মল, চিত্রগুপ্ত, সমাধিগুপ্ত, স্বয়ংবর, অনিবর্ত্তী, বিজয়, বিমল, দেবপাল, অনন্তবীর্য্য।

বাড়িতে থাকে। ইহার পর ৪র্থ দুঃসমা-সুষমা। ৫ম সুষমা ও ৬ষ্ঠ—সুষমা-সুষমা বিভাগ পরিপূর্ণ হইলে 'উৎসর্পিণী' কালের সমাপ্তি হয় এবং আবার পূর্ব্ববৎ 'অবসর্পিণী' কালের আরম্ভ। এইভাবে প্রতিনিয়ত কাল-চক্রের গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

বৈদিক শাস্ত্রমতেও সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারিযুগ ক্রমশঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। কলির পর আবার সত্যাদি যুগের প্রারম্ভ হইবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় যথাযথ অবতারাদি আবির্ভূত হইবেন। আবার রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ প্রভৃতি সংঘটিত হইবে—ভবিষ্যৎ আবার অতীতের গর্ভে প্রবেশ করিবে।

চক্রবর্ত্তী—ভরত, দীর্ঘদন্ত, মুক্তদন্ত, গূঢ়দন্ত, শ্রীসেন, শ্রীভূত, শ্রীকান্ত, পদ্ম, মহাপদ্ম, বিচিত্রবাহন, বিমলবাহন, অরিষ্টসেন।

বলভদ্র—চন্দ্র, মহাচন্দ্র, চক্রধর, হরিচন্দ্র, সিংহচন্দ্র, বরচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, সুচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র।

নারায়ণ—নন্দি, নন্দিমিত্র, নন্দিসেন, নন্দিভূতি, সুপ্রসিদ্ধ-বল, মহাবল, অতিবল, ত্রিপৃষ্ঠ, বিভু।

গুণভদ্রাচার্য্যের "উত্তরপুরাণে" এইসকল নাম আছে। কিন্তু অনেক অন্বেষণ করিয়াও 'প্রতিনারায়ণে'র নাম পাই নাই।

ছড়া

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সঙ্কলয়িতা—শ্রীইন্দুবিকাশ বসু

(২০১)
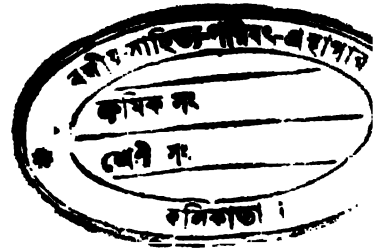
স্বর্গে ছিল খ্যাঁসারির ডাল,
মর্ত্তে আন্‌ল কে?
গড় করি রে খ্যাঁসারির ডাল,
কাছা খুলতে দে।

(২০২)

ভাসুর মেগেছেন ভাত,
সে ভয়ে আছি;
সকাল বেলায় তুলি শাক,
সন্ধ্যে বেলা বাছি।

(২০৩)

কুঁড়েরে বলে কুঁড়ে—
আমি ঘুমুই, তুই দোর-তাড়া দে;
কুঁড়েরে কুঁড়ে বায় বয়,
দোর না দিলে ভাল হয়।

(২০৪)

কাজে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে,
খচনে মারেন পুঁড়িয়ে পুঁড়িয়ে।

(২০৫)

শরীরের নাম মহাশয়,
যা সওয়াবে তাই সয়।

(২০৬)

সাত গিন্নি হিচ্ পিচ্,
বেরালকে বলে আদা ছিঁচ।

(২০৭)

বাড়ীর শত্রু কাণা,
পুকুরের শত্রু পানা।

(২০৮)

মনে বড় সাধ,
চড়ব বাঘের কাঁধ।

(২০৯)

যার ধন তার ধন নয়,
নেপোয় মারে দই।

(২১০)

খাওয়াব হাতীর ভোগে,
দেখব বাঘের চোখে।
(অর্থাৎ যত্নও করব, শাসনেও রাখব)

(২১১)

অরুচির অম্বল,
শীতের কম্বল,
বর্ষার ছাতি,
ভট্টচাযের পুঁথি।
(অবস্থাবিশেষে প্রয়োজন)

(২১২)

শাকে ভাতে ছিলাম ভালো,
মাছ কিনে জ্বালা হ'লো।

(২১৩)

বামুন, বাদল, বান—
দক্ষিণা পেলেই যান।

(২১৪)

আমি কি নাচতে জানিনে,
মাজায় ব্যথা তাই পারিনে।

(২১৫)

যা ছিল আমানি পান্তা,
মায়ে ঝিয়ে খেনু ;
ঘরজামাই রামের তরে
ধান শুকাতে দিনু।

(২১৬)

হাজারও যদি হয় সোনার ভাগারী,
তবু ধরবে লোহার কাটারী।
(ভাগারী = অংশীদার)

(২১৭)

আমার বুদ্ধি শোন,
ঘর-দোর ভেঙ্গে ফেলে নটেশাক বোন।

(২১৮)

মহন্তে মহন্তে দ্বন্দ্ব করে,
গরীব বেচারা পুড়ে মরে।

(২১৯)

এনে দাও কাছে মারি,
বাপের পুণ্যে নড়তে নারি।

(২২০)

ননদিনী রায়বাঘিনী
পাড়ায় পাড়ায় কুচ্ছ গায়।
যদি ননদ মরে যায়
সুখের বাতাস বইবে গায়।

(২২১)

অঘটির ঘটি হ'ল,
জল খেতে খেতে প্রাণটা গেল।

(২২২)

ভায়ের ভাত,
ভাজের হাত।

(২২৩)

এক ছেলে তার ফুলের সজ্জে,
পাঁচ ছেলে তার কাঁটার সজ্জে।

(২২৪)

ভাজো কট কট কাবলী মটর।
চিবিয়ে খাও কটর মটর।

(২২৫)

উই, ইঁদুর, কুজন—ভাল ভাঙে তিনজন,
ছুঁচ, সুতো, সুজন—ভাল করেন তিনজন।

(২২৬)

চেয়েছেন জীরে,
পেয়েছেন হীরে।

(২২৭)

কিসে আর কিসে
তামায় আর সীসে।

(২২৮)

এমন স্থানে বসবে,
কেউ না বলে উঠ ;
এমন কথা বলবে,
কেউ না বলে ঝুট।

(২২৯)

ঘরে নাই ভাত,
কোঁচা তিনহাত।

(২৩০)

বাপের জন্মে চড়িনি ডুলি,
ভেঙে গেছে মোর পাছার খুলি ;
নামা ডুলি, নামা ডুলি।

(২৩১)

মন্দ বড় বাছের বাছ,
ঠেস দিয়েছে আমরুল গাছ।

(২৩২)

যারে কর মর মর,
সে পায় দেবীর বর।

(২৩৩)

এক ভস্ম আর ছার,
দোষগুণ কব কার।

(২৩৪)

সাধ গেছে বোষ্টম হ'তে,
—ফাটে মোচ্ছব দিতে।

(২৩৫)

বাস করবো নগরে, মরব গিয়ে সাগরে।

(২৩৬)

পাগল কি গাছে ফলে ?
আক্কেলেতে পাগল বলে।

(২৩৭)

দশের মুখে জয়,
দশের মুখে ক্ষয়।

(২৩৮)

মামার শালা, পিসের ভাই—
তার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই।

(২৩৯)

দেখতে না হয় সাপের ছানা,
দংশালে যে প্রাণ বাঁচে না।

(২৪০)

যার নাম ভাজা চাল,
তার নাম মুড়ি ;
যার মাথায় পাকা চুল,
তার নাম বুড়ী।

(২৪১)

দৈবকী আর বসুদেবে—
কবে কৃষ্ণ উদ্ধারিবে,
কারাবদ্ধ পিতামাতা
শুন কৃষ্ণ আমার কথা।

(২৪২)

নোলা করে সগবগ,
ও নোলা তুই সামাল কর ;
আগে যাবি নোলা বাপের ঘর,
তবে খাবি নোলা দুধের সর।

(২৪৩)

তুফানেতে হাল ধরে না,
সেই বা কেমন নেয়ে ?
কথা পড়লে বুঝে না,
সেই বা কেমন মেয়ে ?

(২৪৪)

এক হাতে কখনও কি
বেজে থাকে তালি ?
ভাজা ভাজা করিতেছ—
হাড় হ'ল কালী।

(২৪৫)

আমার দই-এর এমনই গুণ
একসের দইয়ে তিনসের নুন।

(২৪৬)

নিয়ে আয়ত বৌ নোড়া,
যাই কুঁদুলের পাড়া ;
আর চাই না বৌ নোড়া,
পেয়েছি কুঁদুলের গোড়া।

(২৪৭)

যে যাতে রত,
বলবে তারি মত।

(২৪৮)

শশা খেয়ে যেমন জলকে টান,
তেমনি ভায়ের বোনকে টান,

গুড় খেয়ে যেমন জলকে টান,
তেমনি বোনের ভাইকে টান।
(শশা খাইলে জল খাইতে ইচ্ছা করে না, গুড় খাইলে জল খাইতে ইচ্ছা করে)

(২৪৯)

কানা পুত পোষে,
রাজা-বউ শোষে।

(২৫০)

গোদাবাড়ি ছাঁদনদড়ি
এখন তুমি কার ?
—যখন যার কাছে থাকি
তখন আমি তার।

(২৫১)

যত বল তত নয়—
তার অর্দ্ধেক কিছু হয়।

(২৫২)

পেয়েছি কোঁদলের গোড়া,
আর যাব না উত্তরপাড়া।

(২৫৩)

অভাগার ঘোড়া মরে,
ভাগ্যবানের মাগ মরে।

(২৫৪)

কুটুমের মধ্যে শালা,
গয়নার মধ্যে বালা।

(২৫৫)

আপনার ঢাকা থাক,
পরের বিকিয়ে যাক্।

(২৫৬)

পড়েছি যবনের হাতে,
খানা খেতে হ'বে সাথে।

(২৫৭)

কোন্ কালে হবে পো,
নেকড়া-কানি তুলে থো।

(২৫৮)

চিত্তির চোটে গেছে ফেটে
কাঠামো হ'য়েছে সার,
ভজবো কি ভোলানাথ তোমায়
ভক্তি নেইক আর।

(২৫৯)

এক চীর পাণ দুই চীর হ'ল,
সোণার সিংহাসনে ভাগ বসিল।

(২৬০)

কাপড় হ'লে পচা,
আঙুল হয় খোঁচা।

(২৬১)

দশে মিলে কর কাজ,
হার-জিত নাহি লাজ।

(২৬২)

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট,
গিন্নীর পাপে গৃহ নষ্ট।

(২৬৩)

কড়ি নেবে গুণে,
পথ চলবে জেনে।

(২৬৪)

গাধা সকল বইতে পারে,
ভাতের কাঠি বইতে নারে।

(২৬৫)

খুঁজি খুঁজি নারি,
যে পায় তারই।

(২৬৬)

বেহায়ার নাহি লাজ, নাহি অপমান,
সুজনকে এক কথা মরণ সমান।

(২৬৭)

বেহায়ার নাহি লাজ, নাহি অপমান,
শত লাথি খাইলেও নাহি দেয় কান।

(২৬৮)

আমি বেহায়া পেতেছি পাত,
কোন্ বেহায়া না দেয় ভাত ?

(২৬৯)

গাজনের নেই ঠিকানা,
শুধুই বলে ঢাক বাজানা।

(২৭০)

ঘর-জামাইয়ের পোড়ার মুখ,
মরা-বাঁচা সমান সুখ।

২৭১)

আমি যার করি আশ,
সে করে মোর সর্ব্বনাশ।

(২৭২)

তোমায় দেখিয়া দুঃখে মোর বুক ফাটে,
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।

(২৭৩)

মন মানে না তীর্থ কর,
মিছে কাজে মন ঘুরে মর।

(২৭৪)

যার সঙ্গে মজে মন—
কিবা হাড়ি, কিবা ডোম।

(২৭৫)

জ্বালা দিতে নাহি ঠাঁই,
জ্বালা দেয় সতীনের ভাই।

(২৭৬)

থাকে যদি চুড়ো বাঁশী,
মিলবে রাধা হেন কত দাসী।

(২৭৭)

দাওয়া মাড়া যতদিন,
বাপ-খুড়া ততদিন।

(২৭৮)

পুরুষের দশ দশা,
কখনো হাতী, কখনো মশা।

(২৭৯)

কপালে যার মৃত্যুলেখা,
ঘরে বাঘ দেয় দেখা।

(২৮০)

ঘোল, কুল, কলা—
তিনে নাশে গলা।

(২৮১)

কাল হাঁড়ি কিয়া পাত,
তবে দেখবি জগন্নাথ।

(২৮২)

গিন্নীর হাতে রাঙ্গা পলা,
বৌয়ের হাতে সোণার বালা।

(২৮৩)

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,
সবার একদিন আছে শেষে।

(২৮৪)

চক্ষে চক্ষে যতক্ষণ,
প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ।

(২৮৫)

আমার আমার যত কর
চিনির বলদ ব'য়ে মর।

(২৮৬)

একলা ঘরে একলা,
থাকতে বড় সুখ;
মারতে গেলে ধরতে নাই,
ঐত বড় দুখ।

(২৮৭)

একলার ঘরে মেকলা,
খেতে বড় সুখ—
মারতে গেলে ধরতে নাই—
অইত বড় দুখ।

(২৮৮)

আন মাগীর আন চিন্তে,
দুয়ো মাগীর পতি চিন্তে।

(২৮৯)

গায়ে উড়ে খড়ি,
কলপ-দেওয়া দাড়ি।

(২৯০)

দিন থাকতে বাঁধে আল,
তবে খায় নানা শাল।

(২৯১)

ছিল না কথা হ'ল গাল,
আজ না হয় তো হ'বে কাল।

(২৯২)

ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ,
তুমি কুট চাল্‌তা,
আমি কুটি নাউ—
আর গতর কুড়ি বউকে বল,
ধান কুটতে যাউ।

(২৯৩)

গেছলাম তোর বাপের দেশ,
দেখে এলাম তোর মায়ের বেশ

(২৯৪)

কড়ি ফটকা চিঁড়ে দই,
কড়ি বিনে বন্ধু কই ?

(২৯৫)

রোগে রূপ নষ্ট,
কোঁদলে জাত নষ্ট।

(২৯৬)

ঘর নেই, দুয়ার বাঁধে
বৌ নেই, ছেলের জন্য কাঁদে

(২৯৭)

কার শ্রাদ্ধ কেবা করে,
খোলা কেটে বামুন মরে।

(২৯৮)

জায়গা জেনে বসি,
জমি জেনে চষি।

(২৯৯)

ছুঁচোয় যদি আতর মাখে,
তবু কি তার গন্ধ ঢাকে ?

(৩০০)

ঘরের কাঠ উইয়ে খায়,
কাঠ কুড়াতে বলে যায়।

মোহ

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী নীলিমা দেবী

এগার

প্রীতি ও নীলিমার আলাপের সূত্রপাত হইতে ক্রমে দুই পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্বের সৃষ্টি হইল। কিছুদিনের মধ্যেই প্রত্যহ যাতায়াত নিয়মিত হইল ও প্রীতি মধ্যে মধ্যে নীলিমার পিতা-মাতার অনুমতি লইয়া নীলিমাকে তাহাদের বাড়ীতে রাখিত। রাত্রে দুইজনে এক সঙ্গে শুইত ও সমস্ত দিন পড়ায়, গানে, খেলায়, বেড়ানতে সকল সময় একত্রে কাটাইত। রমাও সুরবালার বড় ভক্ত হইয়া পড়িল। আর সুরবালাও যেন ইহাদের পাইয়া নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব ক্রমে কাটিয়া গেল। ক্রমে প্রীতিও নীলিমাদের বাড়ী মাঝে মাঝে সমস্ত দিন কাটাইয়া আসিত। সে নৃপেনবাবুকে মেশোমহাশয় ও তাঁহার স্ত্রীকে মাসীমা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, কাজেই নির্ম্মলকেও দাদা বলিত।

প্রথম প্রথম নির্ম্মলের কাছে প্রীতির সঙ্কোচবোধ হইত, কারণ সে পূর্ব্বে কখনও কোন যুবকের সঙ্গে মেশে নাই। নির্ম্মলও তাহার কাছে লজ্জাবোধ করিত কিন্তু প্রীতির সরল-কোমল স্বভাবের গুণে সে বাধ বাধ ভাব শীঘ্র কাটিয়া গেল। প্রীতি নির্ম্মলকে বড়ভাইয়ের মত দেখিতে লাগিল। দাদা তাহার ছিল না বলিয়া যেন এই নূতন সম্পর্কটা তাহার বড় বেশী মিষ্টি লাগিত।

কলিকাতায় ফিরিয়াও এই বন্ধুত্ব অটুট রহিল, ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। এখন বন্ধন এমনই গাঢ় হইয়াছে যে, প্রীতির মনে হয় সত্যই বুঝি এই নূতন বন্ধুরা তাহার আপনার ভাই-বোন। তাঁহাদের মধ্যে এখন আর কোনরূপ বাধা নাই, পরস্পরকে তাঁহারা এখন সকল কথাই বলে। প্রীতিরা কেবল দেবব্রতের নাম গোপন রাখিলেন, তাহার রাশিনাম শান্তিকুমার ইঁহাদের কাছে প্রকাশ করিলেন। সে কোথায় থাকে না থাকে তাহা তাঁহাদের জানা নাই, জানাইলেন।

এদিকে নির্ম্মল ও প্রীতির মধ্যে সম্প্রীতি বাড়িল। নির্ম্মল শীঘ্র প্রবাসযাত্রা করিবে বলিয়া তাহার বিশেষ কোন কাজ নাই। সে প্রতিদিনই প্রীতিদের বাড়ী যাইত, প্রীতিকে পড়ায় সাহায্য করিত, তাহারা দুইজনে একসঙ্গে খেলিত, গান করিত। সুরবালা বা সুরেনবাবু সর্ব্বদা তাহাদের নিকটে থাকিতেন। সকলের বেশ আনন্দে দিন কাটিত।

নির্ম্মলের যাইবার দিন আরও নিকট হইলে নৃপেনবাবু বলিলেন, "প্রীতির স্বামীর সন্ধান না করে' এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকা বড় অন্যায়, মেয়েটার জীবন এমন করে' নষ্ট করা কিছুতেই উচিত নয়। নির্ম্মল তো বিলাত যাচ্ছে, আমার ভাবী জামাতা অমিয়ও সেখানেই আছে। উহারা দুইজনে সন্ধান করে' তাহাকে ধরে দেশে আনতে পারে। মেমটাকে হয় তো যথেষ্ট টাকা দিলেই সে তা'কে ছাড়িয়া দিবে। এরূপ ছেলেদের জব্দ করা একান্ত দরকার। বিবাহ তো ছেলেখেলা নয় যে এমন করে' ছেঁটে ফেল্‌বে। সুরবালা ও সুরেনবাবুর এই কথাগুলি বড় মনোমত হইয়াছিল। নৃপেনবাবুর মত ক্ষমতাশালী লোক যদি তাঁহাদের সহায় হন তো তাঁহারা দেবব্রতকে ফিরিয়া পাইবেন, সেই আশা তাঁহাদের মনে জাগিল। কিন্তু প্রীতি কিছুতেই সম্মত হইল না, সে বুঝাইয়া অবশেষে নৃপেনবাবুকে তাহার পক্ষে টানিয়া লইল। অন্য সব যুক্তি বিফল হইলে প্রীতি বলিল, "মেশোমহাশয়, ওতে কি আমার সুখ হ'বে মনে করেন? আমারও সুখ হ'বে না, কেবল আরও দু'টী জীবন নষ্ট হ'বে, ভগবান যা' কর্‌বেন, তাই হ'বে।" এ কথার উত্তর নাই, নৃপেনবাবু নিবৃত্ত হইলেন।

বার

কয়দিন হইল প্রীতি শাশুড়ীকে সেবা করিবার জন্য শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। তাঁহাদের সর্ব্বকার্য্যে প্রীতিকে দরকার, সে বাড়ীর মেয়ের মত ও তাহাকে না হইলে চলে না।

এদিকে নির্ম্মলের যাইবার দিন আসিয়া পড়িয়াছে। সকলকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া নির্ম্মলের বড়ই মন খারাপ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতির অভাবটাই সে যেন বেশী অনুভব করিতেছিল। প্রীতিকে কয়দিন না দেখিয়াই যদি কষ্ট হয়, প্রবাসে এতদিন তাহাকে না দেখিয়া কেমন করিয়া থাকিবে সেই চিন্তা যেন নির্ম্মলকে আরও কাতর করিল। কিন্তু প্রীতির সঙ্গে তাহার কিসের বন্ধন? মাত্র তো কয় মাস তাহাদের পরিচয়, তবে কিসের এই বেদনা। কেন সর্ব্বদা প্রীতিকে দেখিতে এত ইচ্ছা, কেন তাহার সঙ্গ এত ভাল লাগে, এই সকল চিন্তায় নির্ম্মলের হৃদয় পূর্ণ হইল। সে মনকে বুঝাইল, "বোধ হয় এই অল্প বয়সে প্রীতির জীবন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া সহবেদনায় নীলিমা অপেক্ষা তাহাকেই অধিক স্নেহ করি।"

নির্ম্মলের যাইবার দিন আসিল, সকলেই অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিবার কথা বলিলেন। সুরবালা বলিলেন, "ছেলে তো আমার হয় নাই, তুমি আমাকে পুত্রের ভালবাসার আস্বাদ দিয়েছ, এই দুঃখিনী মাকে প্রতি ডাকে চিঠি দিতে ভুলো না। তুমি যতদিন না আসবে ততদিন শান্তি পাব না।" নির্ম্মল বলিল, "মা, আমি আপনারই ছেলে, আপনার কথা কখনও ভুল্‌ব না।" প্রীতির কাছে যখন বিদায়ের পালা আসিল তখন

দুইজনেই নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। প্রীতির মুখ বিবর্ণ, গলার স্বর যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, কথা কহিবার ক্ষমতা যেন তার কে হরণ করিয়াছিল। খানিক পরে নির্ম্মল প্রীতির হাত দুটী ধরিয়া বলিল, "প্রীতি, আজ আসি। আবার যেদিন ফিরব সেদিন নিশ্চয় দেখা হ'বে। চিঠি লিখবে তো বোন্?" প্রীতি কোন কথার উত্তর দিতে পারিল না দেখিয়া সুরবালা বলিলেন, "প্রীতি, চুপ করে' রয়েছ কেন?" প্রীতি একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া কম্পিতস্বরে বলিল, "বিলাতের নামে আমার ভয় হয়।" এই বলিয়া সে ছুটিয়া সেখান হইতে পলাইল। নির্ম্মল ও সুরবালা তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। একটু পরেই কিন্তু প্রীতি ফিরিয়া আসিল ও বলিল, "দাদা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, আমি প্রতিদিনই সেই প্রার্থনা করব এক-দিনও যেন সেখানে অনাবশ্যক দেরী ক'র না।" এই বলিয়া প্রীতি পায়ে হাত দিয়া নির্ম্মলকে প্রণাম করিল। নির্ম্মল তাড়াতাড়ি তাহাকে উঠাইয়া, সকলকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

ট্রেণ যখন ষ্টেশন হইতে ছাড়িল তখন নির্ম্মল বড়ই কাতর হইয়া পড়িল। কোন্ অচেনা-অজানা দেশে যাইবে, সেখানে আত্মীয়-স্বজন হইতে এত দূরে জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা প্রিয় কি অপ্রিয় হইবে তাহা জানা নাই, কতদিন সকল প্রিয়জনকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে, এই সকল চিন্তায় সে বড়ই ব্যাকুল হইল। মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হইতেছিল যে প্রবাস-যাত্রা অনাবশ্যক, সে যাইবে না কিন্তু আবার ক্রমে সে শান্ত হইল। সকলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি যেন তাহার সহিল কিন্তু প্রীতিকে ছাড়িয়া যাইবার বেদনা দুর্ব্বহ হইল।

জাহাজে নির্ম্মলের, নানারকম লোকের সঙ্গে আলাপ হইল। নানা ক্রীড়া-কৌতুকে দিন কাটিয়া যাইত। কিন্তু সকল আমোদ-প্রমোদের মধ্যে প্রীতির মূর্ত্তিটী মধ্যে মধ্যে তাহার মনে জাগিয়া উঠিত। সে শতচেষ্টা করিয়াও তাহার বিচ্ছেদ-যাতনা ভুলিতে পারিল না।

বিলাত হইতে প্রত্যেক সপ্তাহে নির্ম্মল সুরবালা ও প্রীতিকে পত্র লিখিত। প্রীতির চিঠিগুলি ছোটবোন যেরূপ বড়ভাইকে লেখে ঠিক সেইরূপ, তাহাতে স্নেহ-ভালবাসা ও মঙ্গল-কামনায় পূর্ণ। নির্ম্মলও তদুত্তরে তাহাকে যথাযথভাবে আশীর্ব্বাদী পত্র দিত।

তের

প্রায় দুই বৎসর পরে ফাল্গুন মাসের এক সন্ধ্যায় সুরবালা একাকী বারান্দায় বসিয়া আছেন। নানাপ্রকার চিন্তায় তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল। বাহিরে পাগল-করা বাতাস বহিতেছে আর তাঁহার প্রাণের ভিতরে যেন সেইরূপই তোলপাড় হইতেছে। নীলিমাদের কলিকাতার বাড়ীতে তখন প্রীতি গিয়াছে। শীঘ্রই নীলিমার বিবাহ হইবে, সেইজন্য সব গোছ-গাছ করিতে ও আনুষঙ্গিক নানা কাজে প্রীতি মহা ব্যস্ত ও খুব স্ফূর্ত্তিতে আছে। বিবাহ লক্ষ্ণৌ শহরে হইবে, প্রীতি নীলিমাদের সঙ্গে পরদিন লক্ষ্ণৌ যাইবে। প্রীতিকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে—এই চিন্তাই সুরবালাকে বেশী কাতর করিয়াছে। প্রীতিকে কাহারও সঙ্গে যাইতে দিতে তাঁহার মন মোটেই সরিতেছে না,- অথচ বারণ করিবারও উপায় নাই। কিন্তু প্রীতি শাশুড়ীর কাছে দুই-চারি দিন মাঝে মাঝে থাকা ছাড়া তাঁহার কাছছাড়া হয় নাই। দূরদেশে মেয়েকে একা ছাড়িয়া দিতে হইবে, আবার প্রীতি সেখানে বেশীদিন থাকিতে চাহিতেছে, এইজন্য তাঁহার মন আরও অস্থির। নীলিমা ও রমা তাঁহার কাছে প্রায়ই থাকে, তাহারা তাঁহার কন্যা-প্রতিম, কাজেই সুরবালা প্রীতিকে তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজেই সঙ্গে যাইতেন কিন্তু সে উপায় নাই। সুরেনবাবু সম্প্রতি ভারি অসুখ হইতে সবে সারিয়া উঠিতেছেন, এখনও শয্যাশায়ী, কাজেই তাঁকে লইয়াও যাওয়া চলে না আর ফেলিয়া যাইতেও পারেন না। আর এক কারণে প্রীতিকে যাইতে নিষেধ করিতে পারেন না, বেচারী জীবনে যতটুকু আনন্দ পায় ততটুকুই ভাল।

সুরবালা ও প্রীতি প্রীতির শাশুড়ীর কাছে লক্ষ্ণৌ যাইবার কথা বলিতে যাওয়াতে তিনি সোৎসাহে সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ওকে পাঠাও ভাই, বাছা একটু স্ফূর্ত্তি করিয়া আসুক।" তারপর কি যেন বলিতে

গিয়া থামিয়া গেলেন, মনের কথা মনেই রহিয়া গেল।

নীলিমার ভাবী-স্বামী অধ্যাপক হইয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। নির্ম্মলও ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছে। নীলিমার শ্বশুরবাড়ী লক্ষ্ণৌ শহরেই, সুতরাং বিবাহ সেইখানেই হইবে। বিবাহ ফাল্গুন মাসের শেষেই হইবে, কিন্তু নৃপেনবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর অনুরোধে স্থির হইয়াছে যে প্রীতি বৈশাখমাস পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবে।

তখন বিবাহের আর মাত্র পনের দিন বাকী আছে। নীলিমা পূর্ব্বেই লক্ষ্ণৌ গিয়াছে। নীলিমার মামা, মামী, নির্ম্মলের সঙ্গে প্রীতি ও নীলিমার দুই-একজন বন্ধু কাল যাইবে। প্রীতির সঙ্গে যাইবে তাহার ঝি-মাসী। কাল যাইবে অথচ প্রীতি আসিতে এত দেরী করিতেছে কেন? সে যে বলিয়া গিয়াছিল যে আজ একটু সকাল সকাল ফিরিয়া আসিবে, রাত্রি আটটা বাজিল তবু সে ফিরিল না দেখিয়া সুরবালা চিন্তিত হইয়াছেন। এমন সময় মোটরের হর্ণ শুনিতে পাইলেন।

প্রীতি হাসিতে হাসিতে আসিয়া আগে তাহার দাদুর ঘরে গেল। তারপর মায়ের কাছে আসিয়া বলিল, "মা, আমার জন্য নিশ্চয় কত ভাবছ কিন্তু কি করব বল তোমার এই ছেলেটীর জন্য এত দেরী হ'ল।" নির্ম্মল প্রীতির সঙ্গে আসিয়াছিল, সে বলিল, "বা, রে! এখন দোষ হ'ল আমার বুঝি? মাসীমা জানেন, প্রীতি নিজে দর্জিদের সঙ্গে বকাবকি করতে ও বাজারে গিয়ে দেরী করে ফেল্‌লে—ওর কিছুই পছন্দ হয় না। আর এখন হ'ল আমার দোষ।

প্রীতি বলিল,- "মা, তোমার ছেলে কোর্ট থেকে আসতে দেরী করেছে।"

এই রকম দুই জনের ঝগড়া হইতে লাগিল। সেই ঝগড়ার ভিতর কত বন্ধুত্বের আভাস পাওয়া গেল।

নির্ম্মল বিলাত হইতে ফিরিয়া পর্য্যন্ত আদালত হইতে প্রত্যহ প্রীতিদের বাড়ীতে আসে। সেই খানেই চা খেয়ে প্রীতির সঙ্গে টেনিস খেলে, তার পর সুরবালা ও প্রীতি নির্ম্মলকে লইয়া মোটারে বেড়াইতে যাইতেন, ফিরিবার পথে তাহাকে বাড়ীতে দিয়া আসিতেন। নীলিমা যতদিন কলিকাতায় ছিল সেও প্রতিদিন সেইখানে যাইত ও মধ্যে মধ্যে থাকিত। সুরেনবাবুর অসুখের সময় নির্ম্মল ও নীলিমা এই খানেই থাকিত ও সেবা করিত। দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এই ঘনিষ্ঠতা নির্ম্মলের পক্ষে যেমন মধুর তেমনই কষ্টদায়ক হইয়াছিল। নির্ম্মলের সমস্ত জীবন প্রীতিময় হইয়াছে, সে বহু চেষ্টা করিয়াও প্রীতিকে ভগিনীরূপে দেখিতে পারে নাই। প্রণয় যে মানুষের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। প্রীতি যে পরস্ত্রী সে কথা নির্ম্মল আপনাকে দিনের মধ্যে শতবার মনে করাইয়া দিত, তবু তাহার মন বুঝিত না। অনেক সময় নির্ম্মল প্রেমে আত্মহারা হইত এবং অতি কষ্টে নিজেকে পুনঃ সংযত করিত। পাছে আত্মবিস্মৃত হইয়া মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলে এইজন্য সদাই সতর্ক থাকিত।

চৌদ্দ

নৃপেনবাবু লক্ষ্ণৌ-এ একজন খুব জনপ্রিয় লোক। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে ও তাঁহার স্ত্রী মিষ্ট ব্যবহারে জাতিনির্ব্বিশেষে দেশের সকলকেই বশ করিয়াছেন। উভয়ের পরকে আপন করিবার ক্ষমতা অসাধারণ, ধনীদরিদ্র কেহই তাঁহাদের স্নেহ-সৌজন্য হইতে বঞ্চিত নহে।

নৃপেনবাবু যদিও হিন্দু, কিন্তু আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত আধুনিক, একটু পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন বলিলেও চলে। তিনি মেয়ে-পুরুষে মেশা-মিশিতে দোষ দেখিতেন না ও পরিচিতের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষে আলাপ সমর্থন করিতেন। প্রায় রোজই বৈকালে তাঁহার বাটীতে একটী ছোটখাট মজলিস্ বসিত, টেনিস প্রভৃতি নানাপ্রকার আমোদ-আহ্লাদ চলিত।

রমা এখন প্রায় চৌদ্দ বৎসরের হইয়াছে কিন্তু দেখিতে এত বড় হইয়াছে যে মনে হয় ষোল বৎসর বয়স। সে খুব হাস্যকৌতুকপ্রিয়, তাহার হাসিতে নৃপেনবাবুর বাড়ী সর্ব্বদাই মুখরিত থাকিত। তাহার উৎসাহের অন্ত

নাই, তাহার উদ্যোগে প্রত্যহই একটা হুজুগ আছেই, টেনিস, নাট্যাভিনয়, বনভোজন এই সব ব্যবস্থা তাহার চাই।

নির্ম্মল থাকিলে রমার আরও সুবিধা হয়, কারণ নির্ম্মলের প্রকৃতিও তাহার প্রকৃতির অনুরূপ, সেও খুব আনন্দময়। আজ কাল কিন্তু নির্ম্মলের সে উৎসাহ নাই দেখিয়া রমা বড় চিন্তিত। বিলাত হইতে ফিরিবার পর তাহার দাদাটী হঠাৎ বড় গম্ভীর হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বদাই যেন সে কি ভাবে। রমা কিছুতেই ইহার কারণ খুঁজিয়া পায় না, তাই মাঝে মাঝে রাগ করিয়া বাবা-মাকে বলে যে বিলাত গেলে মানুষ যদি এত বদ্‌লাইয়া যায় তো আর কেহ যেন বিলাত না যায়। রমা নির্ম্মলকে ঠাট্টা করিয়া বলিত, "দাদা, তুমি কি বিলাতে বউ রাখিয়া আসিয়াছ, সর্ব্বদাই তুমি যেন তাহার কথা ভাব্‌ছ মনে হয়।" নৃপেন-বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মনেও একথা মধ্যে মধ্যে জাগিত কিন্তু নির্ম্মল একদিন স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিল যে সে এত বড় গাধা নহে যে মেম বিবাহ করিবে।

ইহার পর কিন্তু নৃপেনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী ছেলের বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ও নির্ম্মলের অজ্ঞাতসারে অনেক মেয়েও দেখিলেন। নীলিমার ইচ্ছা তাহার একটী সহাধ্যায়ী বন্ধু রেণুকা মিত্রের সহিত নির্ম্মলের বিবাহ হয়। নীলিমা ও রেণুকা এক সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া একই সঙ্গে কলেজে পড়িত, দুইজনে খুব ভাব। রেণুকা মেয়েটী বেশ সুন্দরী এবং বড় শান্ত প্রকৃতির। নৃপেনবাবুরাও রেণুকাকে খুব ভালবাসেন ও তাঁহাদের এই বিবাহে খুব ইচ্ছা ছিল। নির্ম্মল রেণুকা ও নীলিমাকে পড়াইত এবং তাহাতে ও রেণুকাতে বেশ সরল সদ্ভাব ছিল। কাজেই সকলেরই ধারণা ছিল যে এই বিবাহে নির্ম্মলের কোন অমত হইবে না। এখন পর্য্যন্ত বিবাহের কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই কিন্তু নৃপেন বাবুর নিমন্ত্রণে রেণুকা ও তাহার মা বিবাহোপলক্ষে প্রীতির সঙ্গে লক্ষ্ণৌ আসিয়াছেন।

এই সময় একদিন বৈকাল বেলা নৃপেনবাবুর বাড়ীতে অনেক তরুণ-তরুণী জমা হইয়াছে। নৃপেনবাবুর বাটীর জমি অনেক, তাহাতে সুন্দর বাগান ও টেনিস কোর্ট। সেদিন টেনিসে একদিকে প্রীতি ও নির্ম্মল, অন্যদিকে নীলিমা ও অমিয় দুইটী দলকেই সুন্দর মানাইয়াছে ও উভয় পক্ষই খুব ভাল খেলিতেছে, কাহার জিৎ হয় তাহা শেষ পর্য্যন্ত অনিশ্চিত রহিল, সকলেই সোৎসাহে খেলা দেখিতে লাগিল। অবশেষে প্রীতি এমন সুন্দর খেলিল যে তাহারাই জয়ী হইল, প্রীতির শেষ মারই তাহাদের জিতাইল। নির্ম্মল আনন্দে "well done! partner বহুৎ আচ্ছা খেলোয়াড়" বলিয়া প্রীতির হাত দুইটী ধরিয়া ফেলিল। উভয়েই খেলার জন্য আরক্তিম বদন ও জয়োৎসাহে উচ্ছ্বসিত। প্রীতির হাত ধরিতেই সে হাসিয়া নির্ম্মলের মুখের দিকে চাহিল। এইরূপ সম্বোধন পূর্ব্বে নির্ম্মল কখনও করে নাই, যদিও উহারা প্রায়ই এক দিকে খেলে। প্রীতির হাত ধরিয়া নির্ম্মল আত্মহারা হইয়া ভাবিতেছিল, 'ইহাকে যদি আমার জীবন-সঙ্গিনী করিতে পারি তবেই আমার জীবন সার্থক হয়'। নির্ম্মলের চোখের দিকে চাহিয়া প্রীতি অবাক হইল, এমন ভাবে তো নির্ম্মলকে কখনও চাহিতে দেখে নাই। সে চাহনিতে কত স্নেহ, কত ভালবাসা, অথচ তাহা কত বেদনাভরা। প্রীতি সে চাহনি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল, এমন সময় নীলিমা আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল—প্রীতির চমক ভাঙ্গিল

অমিয় বলিল, "এত করে' হারিয়ে দেওয়া কি ভাল হ'ল?"

প্রীতি উত্তরে হাসিয়া বলিল,—"জিততে পারলেন না আর এখন দোষ হ'ল আমার, বেশ লোক তো।"

আবার খেলা আরম্ভ হইল। খেলা শেষ হয় হয় এমন সময় একজন বলিষ্ঠকায়, সুপুরুষ যুবা আসিয়া উপস্থিত। তাহার বেশভূষা পরিপাটী, গোঁপ-দাড়ি পরিষ্কার কামান। তাহাকে দেখিয়া নৃপেনবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "এস বাবা, আমি ভাবছিলুম কেন এত দেরী হচ্ছে? কালই বা কেন আস নি? ভাল আছ তো?"

সে যুবকটীর কিন্তু এই কথাগুলি কাণে পৌঁছিল না, সে পলকহীন দৃষ্টিতে নির্ম্মল ও প্রীতিকে দেখিতেছিল। নৃপেনবাবুর স্ত্রী তাহার দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ও মেয়েটী চমৎকার সুন্দরী! না? এত রূপ বড় দেখা

যায় না।" যুবকটী একটু লজ্জিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওটী কি নির্ম্মলের ভাবী বধূ?" নৃপেনবাবুর স্ত্রী উত্তর দিলেন, "সে যে হ'বার নয় বাবা, এই বড় দুঃখ, ওকে বউ করতে পারলে আমরা সকলে বড়ই সুখী হইতাম। মেয়েটীকে ভগবান একাধারে সবগুণ দিয়েছেন, কেবল ভাগ্য বড়ই মন্দ। এত রূপ, এত গুণ সবই বৃথায় যায়।"

এমন সময় যাহারা খেলিতেছিল তাহারা চারিজনই সেখানে আসিল। নীলিমা ও অমিয় আগাইয়া আসিয়া দুজনে সমস্বরে বলিল, "বেশ লোক তো আপনি, দুই দিন আসা হয় নাই কেন?" নীলিমা আরও বলিল, "ভাবছিলাম, যে গিয়ে ধরে নিয়ে আসব।" প্রীতি ততক্ষণ নির্ম্মলের সঙ্গে কি কথায় মত্ত ছিল, নীলিমার শেষ কথাগুলি শুনিয়া সে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু নবাগতের দিকে চাহিয়াই প্রীতি চমকিয়া উঠিল ও তাহার রাঙ্গামুখ একেবারে রক্তবিহীন হইয়া গেল, তাহার সর্ব্বশরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। নির্ম্মলও যুবকটীকে দেখিবামাত্র আগাইয়া গিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিল। সকলেই কথায় ব্যস্ত ছিল, সুতরাং প্রীতির এ ভাব কেহই দেখিতে পায় নাই, কেবল সে ভাব দেখিয়াছিল সেই যুবকটী। যুবকও কি রকম হইয়া গিয়াছিল, সেও নিস্তব্ধ, আনমনা, কাহারও কথার উত্তর দিতেছিল না। অমিয় তাহার এই ভাব দেখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "কি মশাই, আপনাকে কি রোগে ধরল না কি? ওঁকে যে দেখে সেই জ্ঞানহারা হয় কিন্তু আপনার তো এমন হ'বার অধিকার নাই। মেম-সাহেব এখানে নেই, তা না হ'লে দেখতে পেলে অনেক ভুগতে হ'ত।" যুবক কোনই উত্তর করিল না, সেইরূপ নির্ব্বাক রহিল। এমন সময় নৃপেনবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "এস প্রীতি তোমার সঙ্গে আমার এই ছেলেটীর পরিচয় করে দিই।" এই বলিয়া তিনি প্রীতিকে হাত ধরিয়া সামনে আনিলেন। প্রীতি ততক্ষণে মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়াছিল, তাহাকে লজ্জাবনতা নববধূর মত বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। তিনি বলিলেন, "এইটী মিষ্টার দেবব্রত ঘোষ, আর এ হচ্ছে মিসেস্ এস্ ঘোষ, না ও নাম বলিতে ইচ্ছা যায় না, প্রীতিলতা ঘোষই ভাল। মুহূর্ত্তের তরে উভয়েই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, হঠাৎ দেবব্রত বলিল, "একি! প্রীতি, তুমি!" প্রীতি কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে নমস্কার করিল। দেবব্রত কেমন যেন হইয়া গেল। নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি একে চেনেন না কি? এদিকে নির্ম্মল প্রীতির ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, তাহার মনে কেমন যেন সন্দেহ হইতে-ছিল কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই প্রীতির শান্ত সরল উত্তরে সে সন্দেহ দূর হইল। বেশ সহজভাবে প্রীতি নির্ম্মলকে বলিল, "আমাদের বহুদিনের পরিচয়।" দেবব্রত তখন তাড়াতাড়ি নিজের অপ্রতিভ অবস্থার লজ্জা ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল, "প্রীতিকে অনেক দিন দেখি নি, তাই প্রথমটা ঠিক চিনতে পারি নি। দূর থেকে মনে হচ্ছিল যে চিনি।" তার পর নৃপেনবাবুর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তাই অমন অবাক হ'য়ে দেখছিলাম। প্রীতি যখন খুব ছোট ছিল তখন চিনতাম, এখন কত বড় হয়েছে।" অমিয় ঠাট্টা করিয়া বলিল, "যে প্রীতিকে দেখেছে বা জেনেছে সে কখনও ভুলতে পারে না, আপনার মেমসাহেবটীর খুব মোহিনী শক্তি আছে, বোধ হয় তাই সকলকে ভুলিয়ে দিয়েছে।"

প্রীতি এই কথাটা ঘুরাইয়া দিবার জন্য নির্ম্মলকে বলিল, "দাদা, রেণুকা যে খেলবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছে তোমরা আর এক দান খেলবে না?" নৃপেনবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "দেবব্রত একটু খেলবে না?" নির্ম্মল প্রীতিকে বলিল, "তুমি খেলবে না?"

প্রীতি। "না।"

নির্ম্মল। "সে হ'বে না, চল।"

প্রীতি। "রমার বন্ধু অলকাকে নিয়ে খেল না, রমা বলে সে খুব ভাল খেলতে পারে।"

নির্ম্মল। "তোমাকে তো কখনও এত শীঘ্র শ্রান্ত হ'তে দেখি নি, আজ কি হ'ল? আমি শুনব না, চল মিষ্টার ঘোষ ও রেণুকাকে হারিয়ে দিই গিয়ে।"

প্রীতি অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত নির্ম্মলের সঙ্গে গেল। তাহার কেবল মনে হইতেছিল কোথাও পলাইয়া যায়। পরমুহূর্ত্তে আবার মনে হইতেছিল সে যেন ধরা না পড়ে। আরে মনে মনে এই ইচ্ছা প্রবল হইতেছিল যে দেবব্রতের সামনে সে সকপ্রকারে যেন শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণ করিতে

পারে। কিন্তু প্রীতি এইরূপ সাক্ষাতের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তখন তাহার বিগত ছয় বৎসরের সমস্ত ব্যথা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিশেষ কাতর করিয়াছিল। সে তখন নির্জ্জনে থাকিতে চাহিতেছিল। এমন সময় রমা আসিয়া প্রীতিকে বাঁচাইল, সে বলিল, "আমি খেলব, তোমরা আমাকে খেল্‌তে দেবে না ভেবেছ, আমার ব্যায়াম না হ'লে বাবা বক্‌বেন, আমি যে মোটা হয়ে যাচ্ছি।" নির্ম্মল বলিল, "এত করে খেলে কে না মোটা হয়? আজ রাত্রে খেও না, তা' হলেই হ'বে। এখন আমাদের খেলতে দাও।" সে রেগেই অস্থির। প্রীতি তাহাকে বলিল, "তুমি খেল আমি বসি গিয়ে।" প্রীতি খেলিবে না, কাজেই নির্ম্মলের আর খেলিবার ইচ্ছা নাই, সেও পাকে-প্রকারে না খেলিবার মতলব করিল কিন্তু মতলব খাটিল না। নির্ম্মল ও রেণুকা এক দিকে এবং দেবব্রত ও রমা অন্য দিকে খেলিল। নির্ম্মলের খেলায় মন নাই, কাজেই তাহারা হারিল, রমার আনন্দ ধরে না। দেবব্রত বলিল, "মনের মত সঙ্গিনী হয় নি তাই।" এই কথাগুলিতে কিন্তু দেবব্রতের কেমন একটা ব্যথা লাগিল। প্রীতিকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তার মনের মধ্যে মস্ত ঝড় উঠিয়াছিল। অপ্রাপ্তবয়স্কা একটী সুন্দর-বালিকার ছবিই তাহার মনে ছিল, এখন পূর্ণযৌবনা প্রীতির এ কি মনোমোহিনী মূর্ত্তি! কি স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য! কি সুন্দর ধীর-মন্থর গতি। চোখের চাহনিতে কি নম্র মিষ্টভাব। দেবব্রত অনেক দেশ ঘুরিয়াছে, অনেক সুন্দরী দেখিয়াছে, এমিলীও খুব সুন্দরী কিন্তু এ যে অতুলনীয়া। দেবব্রতের মনে হইতে লাগিল, "এ তো আমারই অথচ একে আমি স্বেচ্ছায় ঠেলিয়া ফেলিয়াছি। এই ভাবিতে ভাবিতে তার মনে হিংসার উদয় হইল। প্রীতিকে সে তো ভালবাসে না, কখনই বাসে নাই, তবু কেন তার এমন হইতেছে। যতবার নির্ম্মল প্রীতির সঙ্গে কথা কহিতেছে দেবব্রতের ঈর্ষা জাগিয়া উঠিতেছে। তাহার নিজের প্রীতির সঙ্গে কথা কহিবার খুবই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছে। আর সব চেয়ে বেশী তাহার জানিতে ইচ্ছা যে প্রীতি নির্ম্মলকে কি ভাবে দেখে। নির্ম্মল যে প্রীতির অনুরক্ত তাহা দেবব্রত জানিয়াছে।

নির্ম্মল খেলা ছাড়িয়াই প্রীতির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে প্রীতি, কেন চুপ করে' আছ?"

প্রীতি বলিল, "কিছু তো হয় নি।"

দেবব্রত আসিয়া প্রীতির পাশের চেয়ারে বসিল এবং প্রীতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়? কেমন আছেন? দাদু কেমন আছেন? এতক্ষণ প্রীতি দেবব্রতের দিকে চায় নাই, কিন্তু হঠাৎ আসিয়া এ প্রশ্নগুলিতে সে অবাক হইয়া গেল। প্রীতি দেবব্রতের মুখের দিকে চাহিল কিন্তু চোখে চোখে মিলন হইতেই প্রীতি আরক্তিম মুখে চোখ নামাইয়া লইল। দেবব্রত যে শুধু, "মা কোথায়" জিজ্ঞাসা করিবে প্রীতি তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। অন্ততঃ "তোমার মা" বলিল না কেন? সে কি সব ভুলিয়া গিয়াছে? প্রীতি ধীরে ধীরে প্রশ্নের উত্তর দিল। তখন দেবব্রত জানিয়া লইল যে প্রীতির সঙ্গে কে আসিয়াছে ও সে কতদিন ও কোথায় থাকিবে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া ঘরে যাওয়ার প্রস্তাব হইল। কে বলিল, "একটু তাস খেলা, গান বাজনা করা যা'ক চল।" তাহাতে সকলেই উঠিল, কেবল প্রীতি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নীলিমা বলিল, "তুমি বসে রইলে যে, ঘরে যাবে না?"

প্রীতি বলিল, "কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, চারিদিক ফুলের গন্ধে মেতে উঠেছে, এমন সময় বাগান ছেড়ে আমি ঘরে যেতে চাই না।"

নীলিমা বলিল "আজ এত ভাবের উদয় কেন?"

এ কথায় প্রীতি কোন উত্তর দিল না। নির্ম্মলকে ইহার পূর্ব্বেই তাহার মা ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রীতি নীলিমাকে বলিল, "চল না একটু বাগানে বেড়িয়ে আসি। দূর থেকে গান আরও মিষ্ট শুনাবে।" নীলিমাকে তাহার মা ডাকিলেন, সে চলিয়া গেল। দেবব্রত প্রীতিকে একা পাইল, এই অবসর সে খুঁজিতেছিল। সে বলিল, "তুমি মিসেস এস্‌ ঘোষ কবে থেকে হ'লে। প্রীতি ম্লানহাসি হাসিয়া উত্তর দিল, "ছয় বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখ মাসের এমনি এক শুক্লা রজনীতে—নিজের নাম যে লোক ভুলে যায় তা তো

জানতুম না।" দেবব্রতের তখন মনে পড়িয়া গেল যে তার রাশিনাম শান্তিকুমার ছিল।

"ও নামে কেন নিজের পরিচয় দাও? এঁরা কি সব জানেন? যতদূর বুঝিতেছি এখনও এঁরা জানেন না যে আমি তোমার কে?"

প্রীতি একবার দেবব্রতের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—সকলে জানেন আমার স্বামী ইউরোপের কোন অজানা দেশে আছেন,হয় তো সেইখানে বিবাহ করেছেন। আপনার কোনও ভয় নাই, সুখে নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনাতে আমাতে শুধু ছেলেবেলার পরিচয়, দুই পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। আপনাকে বিপদে ফেল্‌ব না।" এই বলিয়া প্রীতি চলিয়া যাইতেছিল।

দেবব্রত প্রীতিকে বলিল, "একটু দাঁড়াও। কেন তুমি নিজের পরিচয় আজ দিলে না?"

"যে সম্বন্ধে ছিন্ন হয়ে গেছে, সে পরিচয়ে লাভ কি? [illegible]কে ক্ষতি হ'ত।"

"আমি তোমার কাছে যেরকম [illegible] তুমি আমার ক্ষতির কথা ভাবলে কেন?"

"আমার কাহারও অনিষ্ট করবার ইচ্ছা গেল না। এ সব কথা ক'য়ে কোনই লাভ নাই, আপনি ঘরে যান।"

"শুধু বল, যতদিন তুমি এখানে থাক্‌বে, ততদিন তোমাতে আমাতে কি রকম ব্যবহার চলবে?"

"হঠাৎ এমন করে' দেখা হ'বে ভাবি নি। আপনি যখন চিনে ফেলে নাম করে' কথা বল্লেন, কাজেই আমরা যে বেশ পরিচিত সেটা বল্‌তে হ'ল, এখন সেই মতেই চল্‌তে হ'বে।"

দেবব্রত আ। কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। নির্ম্মল ঘরের ভিতর প্রীতিকে দেখিতে না পাইয়া এতক্ষণে তাহার সন্ধানে আসিতেছিল। প্রীতি তাহাকে দেখিয়া বলিল, "দাদা এতক্ষণে বুঝি আসতে পারলে? বাহিরের এত সৌন্দর্য্য ছেড়ে ঘরের ভিতর ভাল লাগে কি? রেণুকে কেন সঙ্গে আনলে না? সে কি করছে?' নির্ম্মল কোন কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "তা' তুমি তো একজন ভাল সঙ্গী পেয়েছ,আর আমি কি না তোমাকে চারিদিকে কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।"

প্রীতি হাসিল, সে হাসি কল্লোলিনীর মৃদু মধুর সঙ্গীত-ধ্বনির মত। সে হাসিয়া বলিল, "হাঁ, ভাগ্যে এঁকে পেয়েছিলাম নইলে তো একাই থাক্‌তে হ'ত।"

নির্ম্মল বলিল, "পুরাতন বন্ধু পেয়ে আমাদের ছাড়লে চলবে কেন?"

"কে গান গাইছেন বল তো দাদা; বড় মিষ্টি লাগছে" এই বলিয়া প্রীতি কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিল।

নির্ম্মল বলিল, "তোমার গান শুন্‌বার জন্য সকলে ব্যস্ত হয়েছেন. তুমি গাইবে চল; ও রেণুকা গাইছে।"

ঘরে যাইতে সকলে প্রীতিকে গান করিতে বিশেষ অনুরোধ করিল। প্রীতি বলিল, "আমাকে আজ ক্ষমা করুন, আজ আমার গান গাইতে ইচ্ছা কর্‌ছে না।" নৃপেনবাবু বলিলেন, "সে কি হয়, মা! তোমাকে গাইতেই হ'বে, তোমার গান শুনবার জন্য আমি কতদিন আশা করে' আছি।"

"আপনি যখন গাইতে বল্‌ছেন তখন গাইব, কিন্তু আপনারা কখনও মিষ্টার ঘোষের গান শুনেছেন? আমি ছেলেবেলায় দু'চার বার ওঁর গান শুনেছিলাম. চমৎকার গাইতে পারেন. ওঁকে গাইতে বলুন না।"

দেবব্রত যে গায়িতে পারে সে কথা কেহই জানিত না। প্রীতির কথা শুনিয়া সকলে তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল।

দেবব্রত বলিল, "আমি অনেকদিন গান করি নি, ভুলে গেছি।"

এ কথার উত্তরে রমা বলিল, "হাঁ! ভুলে গেছেন! এতদিন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, আর ছাড়ছি না। দিদি! তুমি তো শুনেছ মাঝে মাঝে ওঁর বাড়ীর দিক্ থেকে গানের আওয়াজ আসে, আমরা ভাব্‌তাম কে গাইছে। তা' সাহেব মানুষ যে বসে বসে বাংলা গান গাইতে ভালবাসেন তা তো জান্‌তাম না। আজ কাল একা আছেন বলে প্রায়ই বসে গান হয়। আজ ধরা পড়ে গেছেন। কোন আপত্তি শুনছি না—গাইতেই হ'বে।"

দেবব্রত প্রীতির দিকে চাহিয়া বলিল, "ছোটবেলায় লোক যা শুনে তাই ভাল লাগে, আমি ভাল গাই কি না বুঝবার বয়স তোমার তখনও হয় নি।"

প্রীতি বলিল, "একটু একটু বুঝতে শিখেছিলাম হয় তো কতকটা রঙ্গিন করে' দেখেছিলাম কিন্তু যতদূর মনে পড়ে আপনি খুবই ভাল গাইতেন।"

দেবব্রতকে গায়িতে হইল। সে সত্যই খুব ভাল গায়িল। সকলে গানের খুব প্রশংসা করিল। রমা তার কাছে গিয়া বলিল, "খুব সাধাতে যানেন যা' হোক আবার প্রীতিদির কাছে প্রশংসাবাদের জন্য কতই না ফিকির করলেন।"

দেবব্রত এইবার বলিল, "প্রীতি! তুমি এইবার গাও, আমাকে জব্দ করে' নিজে ফাঁকি দিলে চল্‌বে না।"

উত্তরে প্রীতি বলিল, "আমার গান সকলে শুনে শুনে পুরান হ'য়ে গেছে, আর দাদা তো ঝালাপালা হয়েছে, আজ থাক্।"

অমিয় আর লক্ষ্ণৌবাসী আর দুই একজন বলিল, "আমরা তো শুনি নি আমাদের শুনাতে হ'বে।"

দেবব্রত বলিল, "ছাড়া কিছুতেই হ'বে না।"

প্রীতি বলিল, "আপনারা কিছু বুঝেন না, একদিনে সব হয়ে গেলে পরে আর ভাল লাগবে না, আজ এমন ভাল গান শুনলেন, আজ আর থাক। রোজ নূতন নূতন হ'লে আরও ভাল লাগবে।"

নির্ম্মল এবার উৎসাহভরে বলিল,—"তুমি যে নূতনের প্রিয় তা আমি জানতাম না। আমি যে রোজ তোমাদের বাড়ী গিয়া গান গাইতাম, তখন বুঝি তোমার খারাপ লাগত?"

প্রীতি নির্ম্মলের কাছে গিয়া বলিল, "হাঁ, খুব খারাপ লাগত তাই আজ এখনই ইচ্ছা যাচ্ছে। 'আজি মর্ম্মর ধ্বনি' গাও তো শুনি।"

রাগিয়া নির্ম্মল বলিল, না। তুমি যদি এক সঙ্গে গাও তো গাইতে পারি। আজ কি যে তোমার হয়েছে বুঝতে পারছি না, তোমার তো এ মূর্ত্তি কখনও দেখি নি। এত করে' সবাই সাধছে তা, ভাল গাও বলে বুঝি দেমাক হচ্ছে।" প্রীতির চোখ দুইটী ব্যথায় ভরিয়া গেল, সে একবার নির্ম্মলের মুখের দিকে চাহিল, "আচ্ছা, গাইছি চল।"

দেবব্রত সেই সময় বলিল, "না, না, আজ থাক না কাল হ'বে, আজ হ'লে আমি শুনতে পাব না আমাকে এখুনি যেতে হ'বে।" দেবব্রতের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই যাইবার জন্য উঠিল। সকলে চলিয়া যাইবার জন্য নির্ম্মল বলিল, "প্রীতি, তোমার কি হয়েছে, আমাকে বল!"

প্রীতি। কিছু নয় দাদা। প্রাণটা কেমন উদাস মনে হচ্ছে, বোধ হয় মাকে ফেলে এসেছি তাই। কখনও তো তাঁকে ছেড়ে থাকি নি।"

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা কচিখুকী তো। নির্ম্মল বুঝিল প্রীতি আসল কারণ গোপন করিল। প্রীতিও বুঝিল সে বিশ্বাস করিল না, তবু দুইজনেই হাসিল।

তখন প্রীতি নিজের ঘরে গেল। সেখানে যাইতেই মাসী আসিয়া বলিল, "প্রীতি বাগানে কার সঙ্গে কথা বল্‌ছিলে মা?" প্রীতি চুপ করিয়া রহিল, মাসী বলিল, "আমাদের জামাইবাবু না? আমি দেখেই চিন্‌তে পেরেছি। তোকে কি বল্লে?"

প্রীতি বলিল, "মাসী! কাউকে বলো না উনি কে। আমার এই কথা রাখ্‌তেই হ'বে। বলে তো কোন লাভ হ'বে না, তখন মিছে গোল ক'র না।"

মাসী রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে বলিল,—"এবার হাতের কাছে পেয়েছি, ওঁকে একবার জব্দ কর্‌তেই হ'বে। উনি সুখে থাক্‌বেন আর আমার বাছা শুকিয়ে যাবে, তা কখনই সহ্য কর্‌বে না, একবার বোঝা-পড়া করে' নেব ওঁর মেমটাকে একবার বলে দেব যে ওঁর আসল স্ত্রী কে, তাকে বুঝিয়ে দেব যে সে ওঁর কেউ নয়।"

মাসী রাগে কাঁপিতেছিল। প্রীতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "তুমি কি সত্যই আমাকে ভালবাস? যদি একথা তুমি কাহাকেও বল, আমি আর এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইব না, তোমাকে আর কাছে আস্‌তে দেব না, আমাকে ছুঁতে দেব না।"

মাসী তো হতভম্ব, সে বলিল, "তার চেয়ে আমাকে মেরে ফেল না, তোমাকে ছেড়ে যে আমি একটুও থাকতে পারি না।"

তখন প্রীতি মাসীকে আরও বলিল, "দেখ মাসী একথা মাকে জানাবার কোন দরকার নাই। তিনি জান্‌লে তাঁর মনের ব্যথা বাড়বে বই তো নয়, উপায় তো কিছুই নেই। মাকে তো একবার হারাতে বসেছিলুম, আর কেন? মার পক্ষে একথা ভুলে যাওয়াই ভাল। তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে কাউকে বলবে না।" এই বলিয়া প্রীতি মাসীকে জড়াইয়া ধরিল। প্রীতি যাহা চাহিত, বুড়ি তাহাই করিত।

সকলের কাছে মনের ভাব গোপন করিবার জন্য প্রীতি একটু পরে যখন আবার সকলের কাছে গেল, তখন সে খুব ফুর্ত্তিতে হাসি-গল্প করিতে লাগিল। নির্ম্মলকে ভুলাইবার জন্য সে বলিল, "এস দাদা একটু কবিতা পড়া যাক।" রাত্রে প্রীতি, নীলিমা ও রেণুকা একঘরে শুইত, নীলিমা অনেকদিন পরে বন্ধুদের পাইয়া অমিয়'র গল্প করিতে লাগিল। তার পর ক্রমে কথায় কথায় প্রীতি দেবব্রতের কথা তুলিল। সে জানিতে পারিল যে দেবব্রত ঠিক পাশের বাড়ীতে ... পেনবাবুর বাড়ীর মধ্যে শুধু একটা প্রাচীরের ব্যবধান। নীলিমা বলিল, "মেম-সাহেব গরম পড়িলেই পাহাড়ে পালিয়ে যান। মাস ছয়েক হ'ল সিমলা পাহাড়ে তাঁর একটী ছেলে হয়েছে। পাছে ছেলের একটুও তাত লাগে সেই ভয়ে আজ দিন সাতেক হ'ল আবার মুশুরী পাহাড়ে চলে গেছেন। সেই অক্টোবরের শেষে ফিরবেন। দেবব্রতদা একাই থাকুক, বাঁচুক বা মরুক, তা'তে মেমসাহেবের কি? মিষ্ট কথা ভরা চিঠি প্রত্যহ লিখলেই তাঁদের কর্ত্তব্য করা হয়। আমাদের দেশের ছেলেদের মত এমন বোকা আর বোধহয় কেহই নাই, তাই তারা মেম ঘাড়ে করে আনে। কি প্রলোভনে যে সব ভুলে যায় কে জানে? শুধু শাদা চামড়া না অন্য কিছু মোহিনী শক্তি আছে? দেবব্রতদা'র দশা দেখে একটু দয়া হয় কিন্তু আবার মনে হয় বেশ হয়েছে, বোকামীর ফলভোগ হওয়া দরকার। এমন ভাল লোক কেন যে এমন ভুল করলেন? আজ প্রায় দুই বৎসর আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, মা'কে 'কাকীমা' বলেন। মা ওঁকে বড় স্নেহ করেন, উনিও রোজই আমাদের এখানে আসেন। মেমসাহেবও আমাদের বাড়ীতে এসেছেন কিন্তু বোধহয় এতটা ঘনিষ্ঠতা ঠিক পছন্দ করেন না। দেখতে খুব সুন্দরী, বয়স বোধ হয় দুজনের একই হ'বে বা কাছাকাছি। তিনি খুব নাচ ভালবাসেন, এমন কি ছোট ছেলেকে ফেলেও প্রায়ই নাচে যেতেন। লোক বোধহয় মন্দ নহে, তবে ওদের প্রকৃতি ঐ রকম, কি করবে। দেবদা স্ত্রীকে খুব ভাল বাসেন কিন্তু আমার কেমন মনে হয় তাঁহার মনে যেন কিসের অভাব আছে, তিনি পুরা সুখী নন। আমাদের দেশের লোক একটু সেবাযত্ন-আদর চায়, হয় তো তাহারই অভাব দেবদা'র হয়। মেম বিবাহ করেছেন। মা, ভাইরা, আত্মীয় স্বজন কেহই ও সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না। কিন্তু কর্ম্মফল তো ভোগ করতে হ'বে। দেবদা আমাদের সকলকে কিন্তু খুব স্নেহ করেন, নিতান্ত আপনার জন ভাবেন। মেমসাহেব বোধহয় এতটা ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করেন না। ভাই এঁদের দেখলে তোর স্বামীর কথা আমার কেবল মনে পড়ে আর রাগে গা জ্বালা করে। দাদা কত খোঁজ করছিল কোন সন্ধান পায় নি। সে বেঁচে আছে কি না জানিস্ কি?"

প্রীতি আস্তে আস্তে বলিল, "বেঁচে আছেন সেটা ঠিক।"

"কোথায় আছে তা জানিস্?"

"না।"

"তবে কেমন করে' জান্‌লি যে বেঁচে আছে?"

"জমিদারী থেকে নিয়মিত টাকা যায়, ব্যাঙ্ক খবর রাখে; ঠিকানা জানে। সে কথা থাক ভাই।"

"খোঁজ তো তা' হ'লে চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়, তবে কর না কেন?"

"কি লাভ? অনেকবার তো বলেছি, অমন জোর করে বেঁধে এনে কি সুখ হ'বে? এইবার শুতে চল, অনেক রাত হয়েছে।"

এই বলিয়া প্রীতি উঠিয়া একবার জানালার ধারে গেল, নীলিমা ও রেণুও উঠিয়া তাহারই কাছে গিয়া দাঁড়াইল। প্রীতি বলিল, "কি সুন্দর রাত, এমন পরিষ্কার জ্যোৎস্না কলকাতায় দেখা যায় না।"

নীলিমা উত্তরে বলিল, "দেবদার ঘরে এখনও আলো জ্বলছে, এত রাত্রে একা জেগে জেগে কি করছেন।"

রেণুকা বলিল, "বোধহয় মেমসাহেবকে চিঠি লেখা হচ্ছে।"

নীলিমা বলিল, "না, বেচারা বোধ হয় চেয়ারে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন, ঠিক মনে হচ্ছে যেন ডেস্কয় মাথা দিয়ে বসে আছেন। মেম স্ত্রীরা তো স্বামীদের কষ্ট বোঝে না, বাঙ্গালীর মেয়ে হ'লে কখনও এমন করে' একা রেখে যেত না।"

প্রীতি বলিল, "তোমরা খুব যা হোক সব কল্পনা করতে পার, এখন রাত প্রায় দুপুর হ'ল, ঘুমোবে চল। কাল অমিয়বাবু এসে চোখের শ্রান্ত ভাব দেখলে কি বলবেন।"

সে রাত্রি প্রীতি বিনিদ্র রহিল। দেবব্রতের ওদিকে পুরাতন স্মৃতি ও প্রীতির মুখখানি ঘুম হরণ করিল।

ক্রমশঃ

মণি-কণা

(কবীর হইতে)

শ্রী[illegible] রায়

হৃদয় আমার অতি অবোধ বেজায় বোক। হায়;
বুঝাই তারে কেমন ক'রে—হায়রে একি দায়!
বাব্‌লা কাঁটা সে করেছে বপন আনন্দে—
সেই গাছেতে আজ সে কি না দ্রাক্ষা পেতে চায়!

যে দশা ঐ তলা-ফুটো জলের কলসের,
যে দশা ঐ শাখা হ'তে বিচ্ছিন্ন পত্রের,
সেই দশা হায় প্রেমবিহীন অভিমানীর গো,
খাঁটি কথা—এর মাঝেতে নেই ভেজালের ফের।

এমন পাগল কোথায় আছে—দেখ্‌ছে জ্বলে ঘর,
ঘরের পরে জল ঢালে না—ঢাল্‌ছে ধূলার পর।
কবীর কহে—পরশ পাথর কি হয় ছোঁয়ালে?
শিলার ভিতর লোহার মতোই রইল যে অন্তর।

চৌচিরিয়া পাষাণ হিয়া গাঙ্‌ সে হ'লো বা'র,
চৌদিকেতে ঝর্ঝ'রিয়া ঝর্‌ছে জলের ধার।
পাহাড় যে সেও ডুবে' গেল জলের পাথারে,
নদী হ'লো সমাহিত তরঙ্গেতেই তার।

সুধা-সিন্ধুর জলে তোমার আজ করেছি স্নান,
চাওয়ার বালাই এক নিমিষে তাইতো অবসান।
বীজের মাঝেই গাছের গোড়া গোপন রহে গো,
চাওয়ার মাঝেই লুকিয়ে আছে সব রোগেরই প্রাণ!

ফুল-বাগানে যাস্‌নে ওরে—যাস্‌নে বাগানে,
অন্তরে তোর ফুল ফুটেছে মনের বিতানে।
হাজার দলে কমল ফুটে' আসন গড়েছে,
ডোব্‌রে ব'সে সেই আসনে রূপের ধেয়ানে।

কাদার মাঝে লুকিয়েছিল রত্ন সমুজ্জ্বল,
কেউ খুঁজেছে পূব পছিমে কেউ খুঁজেছে জল
কবীর তারে যেই পেয়েছে বাঁধ্‌ল আঁচলে—
জেল্লাতে তার সারাজীবন উচ্ছল চঞ্চল!

রাত মিলানো —আলো ঝ'রে আন্‌লো ডেকে ভোর,
মন খুলে' আজ আনন্দেরি গান গা সখি, তোর।
আকাশ ভ'রে ফুল ফুটেছে—হাজার তরো ফুল,
অমৃতেরি ফল ফলেছে—সুধার নাহি ওর!

বন্ধু, তোমার সৌধ-চূড়া আকাশ ছুঁয়েছে,
তারই পানে চেয়ে আমার নয়ন ঝুরে যে।
কোটি দীপের আলো জ্বলে সূর্য্য-শশী গো,
তারও মাঝে চিত্ত আমার পথ্‌রে ভুলেছে!

কাহার কাছে পা'ব আমি বঁধুর সন্ধান ?
কবীর কহে—দেখ্‌রে খুঁজে তোর নিজেরি প্রাণ
তরু ছাড়া যায় না যেমন বনরে খুঁজে পাওয়া,
হৃদয় হ'তে পৃথক ক'রে নেই তাহারো স্থান !

আজ মিলেছি বঁধুর সাথে নদীর কিনারায়,
জন্ম ছেপে সুধার ধারা উছ্‌লে ঝ'রে যায়।
কবীর কহে—হৃদয় আমার দুকূল ছেপেছে,
চল্‌ছি ছুটে' নাহি জানি কোন্ সে দরিয়ায় !

পেয়ালা ভ'রে নাওগো তোমার—ঝর্‌ছে সুধার ধার,
নাম-পেয়ালায় ভরিয়া লহ পাত্রটি তোমার।
কবীর কহে—আর [illegible] গো—
গরলভরা বন্ধু ওরে, আর যা সবি তার !
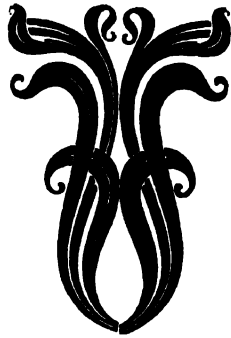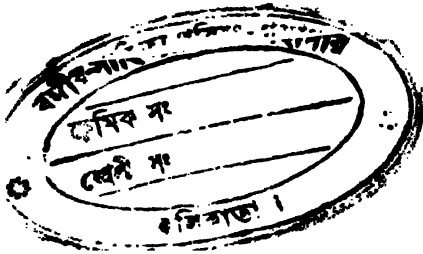
সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব

সৌন্দর্য্য মানবজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতা জীবনের প্রধান সম্পত্তি। কেবল [illegible] বিশেষই সৌন্দর্য্য-মধুর অন্বেষণে ভ্রমর-বৃত্তি হইয়া জীবনপাত করিতেছে, তাহা নিরপেক্ষভাবে বলা যায় না। কেন না, জগৎ হইতে তাহার সৌন্দর্য্যটুকু কোন প্রক্রিয়াবিশেষে অকস্মাৎ বাদ দিলে সম্পূর্ণ কাব্যরসবর্জ্জিত বিষয়ী লোকদিগের জন্যও দড়ি কলসী সংগ্রহ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। সাংসারিক নিত্য সুখদুঃখের সহিত সৌন্দর্য্যতৃষ্ণার এমন প্রগাঢ় সম্পর্ক যে, বোধ করি, মনুষ্যমাত্রেরই জীবনকাহিনী বিশ্লেষণ করিলে সেই পিপাসার সফলতা বা নিষ্ফলতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। সকলেরই জীবনকালে এমন একটি মুহূর্ত্ত দেখা যায়, যখন সে সুদূর বনপ্রদেশ হইতে সায়ংকালীন বংশীধ্বনি কর্ণাগত করিয়া চন্দ্রাপীড়ের ঘোড়ার মত সেই অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দিগ্বিদিক্ পথে ছুটিয়াছে, এবং হয় ত শেষ পর্য্যন্ত তাহার উদ্‌ভ্রান্ত জীবন চরম লক্ষ্যের ঠাহর না পাইয়া নিয়তিবশে কোন-রূপ অচ্ছোদ সরোবরের সলিলতলে সমাধি লাভ করিয়াছে।

সৌন্দর্য্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। এবং যাহার সৌন্দর্য্যপিপাসা জন্মে নাই, তাহার মনুষ্যত্বের প্রকোষ্ঠে পৌঁছিতে এখনও বিলম্ব আছে, অক্লেশে এরূপও নির্দ্দেশ করা যায়। নীরব বনস্থলীতে, চন্দ্রিকা-স্নাত শিলাতলে মহাশ্বেতার সহিত উপবিষ্ট হইয়া অতীতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে পুণ্ডরীকের মত চন্দ্রকরাহত হইয়া মরিতে যাহার অভিলাষ না জন্মে, আমার মতে সে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য। জীবনের মত বস্তুটাকে কাব্যরসের জন্য এরূপ অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিতে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু মধুকরোদ্বেজিতা শকুন্তলার লীলাকমলের আঘাত পাইবার জন্য স্বয়ং মধুকরস্থলীয় [illegible] কেহ যে বাসনা করেন না, ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। বারুণীতীরে তরুশাখায় অন্তরালে কোকিল ডাকিয়া ক্ষুদ্র একটি গৃহস্থ পরিবারে ভয়ানক নৈতিক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। এইরূপ নৈতিক বিপ্লবও যে, মনুষ্য-সংসারে অসাধারণ ঘটনা তাহাও সহজে বিশ্বাস করিব না। সুতরাং সৌন্দর্য্যের সহিত মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ; সুতরাং সৌন্দর্য্য-পিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ।

মানুষ সৌন্দর্য্য চায় ও সৌন্দর্য্য পায়; অর্থাৎ প্রকৃতির খানিকটা অংশ মানুষের চোখে সুন্দর বলিয়া ঠেকে; অর্থাৎ প্রকৃতির বাকী অংশ অসুন্দর অথবা কুৎসিত বলিয়া বোধ হয়। খানিকটা সুন্দর, কেন না বাকীটা কুৎসিত। খানিকটা কুৎসিত, কেন না বাকীটা সুন্দর। অর্থাৎ কুৎসিতের সহিত সমবায়ে, তাহার সহিত তুলনায় বাকীটা সুন্দর। কতকটা কুৎসিত না হইলে বাকীটা সুন্দর হইত না, অথবা সবটা সুন্দর হইলে সৌন্দর্য্য শব্দ নিরর্থক হইত। সুতরাং সুন্দরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে কুৎসিতের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে। একরে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই। কোন্‌টা সুন্দর, আর কোন্‌টাই বা কুৎসিত; এটাই বা সুন্দর কেন আর ওটাই বা কুৎসিত কেন, এই প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে। মানুষের মনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির এমন সম্বন্ধ কেন, যে, মন খানিকটাকে সুন্দর

বলিয়া বাছিয়া লয়, সেইটাকে আপনার করিতে চায়, সেইটার দিকে ধাবিত ও আকৃষ্ট হয় ও অবশিষ্টটাকে কুৎসিত বলিয়া পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে দূরে রহে, তাহার সংসর্গ ছাড়িতে চায়; এই গভীরতর প্রশ্নও ইহার সঙ্গে উপস্থিত হয়। ইহাতে মানুষের লাভ কি? মানুষ এমন করে কেন? মানুষের এ প্রবৃত্তি কোথা হইতে ও কি উদ্দেশ্যে? কিসেই বা ইহার পরিণতি? বস্তুতঃই কি প্রকৃতির দুইটা ভাগ; একটা ভাগ সুন্দর, আর একটা ভাগ কুৎসিত; শুধু মানুষের পক্ষে নহে, মানুষ ভিন্ন অপর জীবেরও পক্ষে; শুধু মানুষ আর অপর জীব কেন, মানুষ ও ইতরজীব ছাড়িয়া যদি প্রকৃতির কোনরূপ নিরপেক্ষ সত্তা থাকে, তবে সেই নিরপেক্ষ অস্তিত্বের পক্ষে? উপস্থিত প্রবন্ধে এই প্রশ্ন কয়টির যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

স্থূল সূক্ষ্ম হিসাবে সমুদয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে দুইটা ভাগ করিতে পারা যা। এইরূপ শ্রেণীবিভাগের পূর্ব্বে সৌন্দর্য্য কথাটার অর্থ একটু বুঝা উচিত। উপরে যে সংজ্ঞা দিয়াছি, মোটের উপর তাহাতেই কাজ চলিতে পারে। মানুষের মন যেটাকে টানিয়া রাখিতে চায়, যাহাতে সুখানুভব করে —, বল, তৃপ্তি বল, আরাম বল, আনন্দ বল, এইরকম একটা অনুভূতি যাহার সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়, তাহাই সুন্দর। আর মন যাগ হইতে দূরে থাকিতে চায়, দুঃখ বা তজ্জাতীয় কোনরূপ অনুভূতি যাহার পরিণাম, তাহাই কুৎসিত। সুতরাং সৌন্দর্য্যের সহিত সুখের ও কুৎসিতের সহিত দুঃখের সম্বন্ধ। আবার সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহারের অধ্যবসায় ও ধারাবাহিক চেষ্টাকেই যদি জীবন বল, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যপিপাসা জীবনের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।

এই সৌন্দর্য্যের খানিকটা স্থূল, খানিকটা সূক্ষ্ম। মধুর রস, মধুর গন্ধ, মধুর শব্দ, স্পর্শ ও দর্শনে যে সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তি জন্মে, মনুষ্যমাত্রই অথবা সুস্থস্বভাব মনুষ্যমাত্রই যাহা প্রায় সমভাবে সমপরিমাণে উপভোগ করিতে সমর্থ, তাহাকে স্থূলের মধ্যে ফেলা যায়। মিষ্টান্নভোজনে প্রায় সকলেরই সমান তৃপ্তি জন্মে; ইহাতে বড় মতভেদ দেখা যায় না। মানুষেতর জীবও ন্যূনাধিক পরিমাণে এই তৃপ্তির ভাগী, এই স্থূল সৌন্দর্য্য উপভোগে সমর্থ। ইহা জীবনমাত্রেরই, অন্ততঃ অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনমাত্রেরই নিত্যভোগ্য। ইহা না হইলে জীবনযাত্রা চলে না। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ইহার উদ্ভব বেশ বুঝা যায়। দেহরক্ষার জন্য জড়জগৎ হইতে কতকগুলা মালমসলা বাছিয়া লইতে হয়, কতকগুলাকে বাছিয়া ত্যাগ করিতে হয়; কতকগুলা প্রাকৃত শক্তি দেহের ও জীবনের স্থিতি, পুষ্টি ও অভিব্যক্তির অনুকূল, কতকগুলা প্রতিকূল। সুতরাং কতকগুলা স্পৃহার সহিত গ্রহণ করি, কতকগুলা দূরে রাখি, নতুবা জীবন চলিত না।

সুতরাং মিষ্টরস, কোমল শয্যা, স্নিগ্ধ সমীরণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, ইন্দ্রিয়-গ্রহণ সময়েই যাহাদের দ্বারা তৃপ্তি বা আরাম উৎপন্ন হয়, নিত্য জীবনযাত্রার নিমিত্ত যাহারা উপযোগী, তাহাদিগকে এই স্থূল শ্রেণীতে ফেলা চলে। জীবনের জন্য ইহাদের দরকার, কাজেই ইহাদের ভাল লাগে; সুতরাং মানুষের প্রবৃত্তির সহিত উহাদের সম্বন্ধ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ক্রিয়াজনিত তাহাও বুঝা যায়। লঙ্কা অথবা কুইনাইন্ যদি রসনাপ্রিয় হইত, তাহা হইলে জীবনরক্ষা একটা বিকট ব্যাপার ঘটিয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্য্য আছে তাহাকে সূক্ষ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে। মানুষ ভিন্ন ইতরজীবের এই সৌন্দর্য্যভোগের শক্তি আছে কি না সন্দেহস্থল। এই সৌন্দর্য্য — [illegible] প্রাভিলেজ। মানুষের মধ্যেও সকলে সমানভাবে ও সমানমাত্রায় ইহার উপভোগে অধিকারী নহে। দৈনন্দিন জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ইহার অধিক উপযোগিতা আছে সাহস করিয়া বলা চলে না। এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রবৃত্তি বা শক্তি কবিশ্রেণীস্থ মনুষ্যের বিশেষরূপে পরিস্ফুট। সাংসারিক বা বৈষয়িক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবিশ্রেণীস্থ মনুষ্যের যেরূপ অপবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে ইহাকে জীবিকার্জ্জনের প্রতিকূল বলিয়াই বরং বোধ হয়। ইংরাজীতে যাহাকে আর্ট বলে, এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ও প্রকাশই তাহার অবলম্বন ও বিষয়। এবং মানবমনের যে অংশটা ইহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার ইংরাজী নাম ঈস্থেটিক বৃত্তি। জীবিকার সহিত সম্বন্ধের এইরূপ অভাব বলিয়াই এই বৃত্তিটার তাৎপর্য্য ও অভিব্যক্তি ভাল বুঝা যায় না। এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত।

প্রথমে এই প্রশ্ন আইসে, এই সৌন্দর্য্য কিসের ধর্ম্ম? ইহা কি পদার্থবিশেষেরই প্রকৃতিনিহিত ধর্ম্ম, অথবা মনুষ্যের মনেরই একটা সৃষ্টি, কল্পনা বা কারিগরি? বস্তুতঃ এমন দেখা যায় শ্যাম যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, রাম তাহাতে সৌন্দর্য্যের কণিকামাত্র দেখেন না। আমার নিকট যাহা সুন্দর, তোমার কাছে হয়তো তাহা কুৎসিৎ। মদস্রাবী হস্তীর শুণ্ডাস্ফালন দর্শনে অথবা

গিরিগুহার অভ্যন্তরে কীচকধ্বনি শ্রবণে কালিদাস যে আনন্দ অনুভব করিতেন, তাহাতে যে সকলেই সহানুভূতি দেখাইবেন এইরূপ প্রত্যাশা করা যায় না; সৌন্দর্য্য বিষয়ে মনুষ্যের রুচিগত তারতম্য ফেলিবার নহে। উজ্জয়িনীর রাজপথে তামাসা উপস্থিত হইলে কালিদাসের নয়ন তামাসা ফেলিয়া পার্শ্বস্থ সৌধবাতায়নের প্রতি ঊর্দ্ধমুখে ধাবিত হইত; স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্র-পরিহিতা যুবতীর সন্দষ্টবস্ত্র অবয়বের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল; এবং তাঁহার মানসচক্ষু জলদময়ী তিরস্করিণীর আবরণ ভিন্ন করিয়া গুহাস্থিতা কিন্নরীর নগ্নদেহের দিকে বিবর্তিত হইত। কিন্তু কালিদাস একালে আমাদের সংস্কৃত কালেজের ছাত্র হইলে পাশের ঘরে পূরিয়া যথাবিধানে তাঁহার হায়ার ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করা যাইত সন্দেহ নাই। আবার বিশ্বাসঘাতী নিষ্ঠুর সংসার কর্তৃক পরিত্যক্ত মানসিক উপপ্লবে উদ্‌ভ্রান্ত জরাক্রান্ত রাজা লীয়রকে আঁধারে অসহায়ে প্রান্তরমধ্যে ততোধিক বিশ্বাসঘাতী ও নিষ্ঠুর জড়প্রকৃতির উপপ্লবে উৎপীড়িত দেখিয়া জগৎরূপী পেষণযন্ত্রের অনির্দেশ্য আবর্ত্তন-প্রণালীর ঠাহর না পাইয়া স্তম্ভিত হইবার ক্ষমতা যে সকলের জন্মিয়াছে তাহা বলা যায় না।

সুতরাং সুন্দরের সৌন্দর্য্য যে, তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, তাহা সকল সময়ে বলা চলে না। যিনি সৌন্দর্য্য ভোগ করিবেন, তাঁহার অনুভূতির তীক্ষ্ণতার উপরে সৌন্দর্য্যের মাত্রা নির্ভর করে। অমুক পদার্থটাকে সুন্দর বলিবার আমারও যে পরিমাণ দাওয়া আছে, তোমারও কুৎসিত বলিবার সেই পরিমাণ দাওয়া আছে। এ বিষয়ে যে তোমাকে আইনানুসারে বাধ্য করিতে পারি, তাহা বোধ হয় না। তথাপি দেখা যায়, কতকগুলি পদার্থ এমন আছে, যাহারা সুস্থপ্রকৃতি মানুষের মধ্যে অধিকাংশের কাছেই সুন্দর বলিয়া ঠেকে। যেমন পাখী, প্রজাপতি, ফুল। প্রশ্ন এখন এই—কি গুণে ইহারা সুন্দর; ইহাদের সৌন্দর্য্যে আমাদের লাভ কি?

প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া বড় সহজ নহে। বেইন্ সাহেবের বই খুলিলেই পঞ্চাশ রকম সৌন্দর্য্যতত্ত্বের বিশপাতা বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু তার মধ্যে একটাও তৃপ্তিকর নহে। আজকাল আমাদের একটা রোগ জন্মিয়াছে, কোন একটা কিছুর উৎপত্তি ও অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা দরকার হইলে তৎক্ষণাৎ ডারুইনের কাছে ছুটিয়া যাই। কিন্তু ডারুইন্‌ও এখানে বড় ভরসা আপাততঃ দেন না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মূলমন্ত্র একটা মাত্র কথা। যাহা জীবিকার উপযোগী, যাহাতে কোন-না-কোন রূপে জীবনের সাহায্য করে, তাহাই প্রকৃতি কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া অভিব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু উপরে দেখিয়াছি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের সহিত জীবনযাত্রার সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ দেখায় না। কেন না, সাংসারিক বিষয়ে কাব্যরসপিপাসু বড় দুর্ভাগ্য জীব। শীতল সরবতের প্রতি অনুরাগ জীবনরক্ষার উপযোগী বুঝা যায়, কিন্তু ধবলগিরিতে মাহাত্ম্য না দেখায় বিশেষ কিছু আসে যায় না।

ডারুইন বলেন ফুলের রূপ ও প্রজাপতির রূপ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন। প্রজাপতি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরাগরেণু বহন করিয়া পুষ্পিত বৃক্ষের বংশরক্ষা ও জাতরক্ষা করিয়া থাকে। ফুলের রঙে ও রূপে প্রজাপতি আকৃষ্ট হয়, তাই যে ফুলের যত রূপ, তাহার বংশরক্ষা পক্ষে জীবনসংগ্রামে ততই সুবিধা। কাজেই সুন্দর ফুলের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি। আবার নিরীহ প্রজাপতির শত্রুসংখ্যা অনেক; ইহাদের সৌন্দর্য্যবৃত্তি এমনই অপরিস্ফুট যে, এতটা সৌন্দর্য্যকে একবারে উদরসাৎ করিবার জন্য ইহারা বিশেষ লালায়িত। এবং এই সকল শত্রুদের সহিত সম্মুখসমরে দাঁড়ানও নিরীহ প্রজাপতি-জীবনের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নহে। তাই প্রজাপতি ফুলের গায়ে গা দিয়া ফুলের সঙ্গে মিশিয়া ফুলের রূপের ভিতর নিজের রূপ লুকাইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করে। কাজেই ফুল এদিকে যেমন সুন্দর, প্রজাপতির কোমল দেহও তেমনি সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই হিসাবে ফুলের রূপের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি, প্রজাপতির সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ফুল। উভয়ে উভয়ের রূপরাশি ক্রমেই ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

উভয় উভয়ের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছে স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু আমরা যেমন ফুলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই, প্রজাপতিও যে তেমনি রূপমুগ্ধ হইয়া আকৃষ্ট হয়, এতটা স্বীকার করিতে পারিনা। ফড়িং জাতির সৌন্দর্য্যবৃত্তির এতটা তীক্ষ্ণতা স্বীকার করিতে বড়ই নারাজ হইতে হয়। ফড়িং জাতি একঘেয়ে শাদা কালোর চেয়ে রঙের বৈচিত্র্য দেখে, তা' সে রঙ লবক্ সাহেবের কাঁচেই থাক্, আর কেরোসীন্-দীপের শিখাতেই থাক্; এই পর্য্যন্ত বুঝা যায়। এবং রঙ্‌দার পুষ্পবিশেষের নিকট গেলে মধু সঞ্চয়টাও ঘটিয়া থাকে, এই পর্য্যন্ত জ্ঞানের জন্য প্রজাপতিকে বাহাদুরী দিতে পারি। পুষ্পদেহে আর মক্ষিদেহে বর্ণবৈচিত্র্য বিকাশের ব্যাখ্যার জন্য ইহার বেশীও আবশ্যক নহে। কিন্তু এইরূপ বর্ণবৈচিত্র্যের সমাবেশ মানুষের চোখে কুৎসিত না লাগিয়া সুন্দর লাগে কেন, এ কথার উত্তর পাওয়া গেল না।

আর একটা কথা আছে—যৌননির্ব্বাচন। ডারুইন সাহেবই ইহারও প্রবর্ত্তক। সিংহের কেশর, পাখীর কাকলি, ময়ূরের

পুচ্ছ, এ সমস্তই সুন্দর; এবং এ সমস্তই যৌননির্ব্বাচনে অভিব্যক্ত। স্ত্রীজাতি সুন্দর পুরুষ বাছিয়া লয়; ফলে বংশপরম্পরায় সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়। পারাবত যখন তাহার বিস্ফারিত নীলকণ্ঠ আনম্র উন্নম্র করিয়া, চারুপুচ্ছ নর্ত্তিত করিয়া, কান্তাধ্বনিতের অনুকরণ করিয়া পারাবতীর নিকট নাচিতে থাকে, তখন সে জানে না যে, সে প্রকৃতির নিয়োগে মানুষের জন্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে নিযুক্ত হইয়াছে। যৌননির্ব্বাচন মানিয়া লইলে জীবজগতে সৌন্দর্য্যের উদ্ভব অনেকটা বুঝা যায়; কিন্তু কপোত ও কুক্কুট জাতির পক্ষে এত সূক্ষ্ম রূপানুভূতি মানিয়া লওয়া একটু গায়ের জোর বলিতে হইবে। সম্প্রতি ওয়াল্‌স্‌ সাহেব যৌননির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। তিনি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বলেই এ সমুদয়ের উদ্ভব বুঝাইতে চাহেন। সুতরাং ডারুইনের মত এখনও অসংশয়িত চিত্তে গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। গ্রহণ করিলেও মূলকথার ব্যাখ্যা হইল না। ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ময়ূরীর নিকট বাহবা লইতে পারে; কিন্তু মানুষের তাহাতে কি আসিয়া যায়? মানুষের চোখে ময়ূরপুচ্ছ সুন্দর লাগে কেন? ময়ূরপুচ্ছের উজ্জ্বল বর্ণসমবায়ে কি মাহাত্ম্য আছে যে, এত তৃপ্তি জন্মে?

আধুনিক মনোবিজ্ঞান সৌন্দর্য্যতত্ত্ব যেরূপে বুঝায়, তাহা এইরূপে সংক্ষেপে বিরচিত করা যাইতে পারে। অনুভূতির বৈচিত্র্য-পরম্পরা লইয়া চৈতন্য বা চিৎ—প্রবাহ। সমস্ত অনুভূতিগুলি একরকমের হইলে তাহাদের পরম্পরাকে চৈতন্য বলা যাইত কি না সন্দেহ। অনুভূতির মধ্যে পরস্পর যত পার্থক্য, বৈচিত্র্য বা বিশিষ্টতা, চৈতন্যও তত বিকসিত ও পরিস্ফুট। সুতরাং মানুষের অস্তিত্বের, অর্থাৎ মানুষের চৈতন্যের অস্তিত্বের অর্থই এই যে, অনুভূতিগুলা এক নহে। পঞ্চাশ রকম বিভিন্ন শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের সমবায়ে জগতের যে দৃশ্যপট, তাহা ক্ষণে ক্ষণে বদলাইয়া নূতন শব্দ, নূতন স্পর্শ, নূতন গন্ধ সম্মুখে আনিতেছে, তাহাতেই চৈতন্যের ধারাবাহিক স্রোত একটানে চলিয়াছে। চৈতন্যের অস্তিত্বের সঙ্গে বৈচিত্র্যের এমন সম্বন্ধ; সুতরাং যেখানে চৈতন্য আছে, সেখানে বৈচিত্র্যও আছে। যেখানে বৈচিত্র্য পরিস্ফুট, চৈতন্যও সেখানে সম্যক্ বিকসিত। সেইখানেই রূপ ও সেইখানেই সৌন্দর্য্য। আবার অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্ত্তন জীবনের পক্ষে শুভ নহে; ধীরে ধীরে ক্রমে পরিবর্ত্তন ঘটিলেই কল্যাণ, নতুবা জীবনের শৃঙ্খল অনেক সময়ে ছিঁড়িয়া যায়। পরিবর্ত্তনের ঘাতপ্রতিঘাতে জীবনের গ্রন্থি আল্‌গা হইয়া পড়ে। কাজেই আকস্মিক বা অতিমাত্র কিছুই ভাল লাগে না।

সুতরাং সৌন্দর্য্যের এক অঙ্গ অনুভাবের চৈতন্য আর পরিবর্ত্তনের আকস্মিকতার অভাব আবার যাহার সহিত জীবনের স্থিতি ও পুষ্টির কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, যাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল, যাহাতে জীবনসংগ্রামে আমাদের ভীতির ভাব কোনরূপে কমাইয়া দেয়, তাহারই প্রতি মন স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়; তাহাই দেখিতে ভাল লাগে। যেমন সুগঠিত বলিষ্ঠ নরদেহ; যেমন স্বাস্থ্যশোভাসম্পন্ন আরক্তিম যুবতীর গণ্ডদেশ; যেমন দৃঢ়মূল ছায়াবিস্তারী মহীরুহ; যেমন দৃঢ়ভিত্তি সৌষ্ঠবসম্পন্ন অট্টালিকা।

সৌন্দর্য্যের আর একটা অঙ্গ সহানুভূতি। শুধু আমার চোখে যাহা ভাল লাগে তাহা সুন্দর; আবার যাহা আমার চোখে, তোমার চোখে, অপরের চোখেও ভাল লাগে, তাহা আরও সুন্দর। মানুষের কতকগুলা বৃত্তি আত্মপুষ্টির অভিমুখী, আত্মপুষ্টির উদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত। কতকগুলা সমাজপুষ্টির অভিমুখী, তদুদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত। এই সামাজিক পরার্থবৃত্তিগুলি উন্নত মনুষ্য-প্রকৃতির প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাতে এই বৃত্তিগুলিকে জাগাইয়া দেয়, উত্তেজিত করে, ইহাদের প্রবলতা ও তীক্ষ্ণতা সাধন করে সেগুলি আরও সুন্দর। দয়া মায়া স্নেহ প্রণয় প্রভৃতি সামাজিক বৃত্তিগুলি যতই ফুটিয়া উঠে, ততই সমাজের কল্যাণ। সেইজন্য যে সকল পদার্থ দয়া মায়া প্রণয়াদি বৃত্তির উত্তেজক ও পরিপোষক তাহারা অতি সুন্দর।

আর অধিক বলার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। যাহাতে চৈতন্যের প্রবাহ স্থিরবেগে মন্দগতিতে চালিত রাখে তাহা সুন্দর; যাহাতে জীবনে ভরসা দেয়, প্রাকৃতিক প্রতিকূল শক্তির সম্মুখে আত্মাকে ম্রিয়মাণ হইতে নিষেধ করে তাহা সুন্দর; আর যাহাতে পাঁচের মনে সমান প্রীতি জন্মাইয়া মনে মনে জড়াইয়া দেয়, পরার্থবৃত্তিগুলিকে জাগ্রত ও উত্তেজিত রাখিয়া সমাজজীবনকে অগ্রসর করে তাহা আরও সুন্দর। এই হিসাবে জীবনরক্ষার সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ; শুধু আমার জীবনের রক্ষা নহে, তোমার জীবনের এবং সমগ্র সমাজজীবনের রক্ষার সহিত ইহার সম্বন্ধ। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই সৌন্দর্য্য অনুভূতির জনক ও বিকাশক।

এইরূপে ব্যাখ্যার পথে কয়েক পা অগ্রসর হওয়া যায় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ ঘটে না। যখনই মনে করা যায় সৌন্দর্য্য জীবনরক্ষক, তখনি নিতান্ত ইউটিলিটির ভাব আসিয়া পড়ে, সৌন্দর্য্যের সুন্দরতা দূর হয়। সৌন্দর্য্যে এমন একটা জিনিষ

আছে, যাহার উপভোগে কেবল তৃপ্তিমাত্র, সুখমাত্র; ফলাফল চিন্তা, ইউটিলিটি চিন্তা, ভবিষ্যৎ চিন্তা, জীবনমরণ চিন্তা যাহাকে কলুষিত করে না; যাহা বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ নির্ম্মল সুখ বই আর কিছুই নহে। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কিরূপে ইহার উৎপত্তি তাহা সমস্যাই থাকিয়া যায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের কাছে সদুত্তর মিলে না।

আমার বিবেচনায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে আর একটু চাপিয়া ধরিলে কতকটা পরিষ্কার হইতে পারে। প্রকৃতি একভাবে আমার বিরুদ্ধে ও সমাজের বিরুদ্ধে খড়্গহস্তে দণ্ডায়মানা,—নির্ম্মমা, নিষ্ঠুরা, দয়ালেশবিবর্জ্জিতা। আবার প্রকৃতি অন্যভাবে আমাকে ও সমাজকে সেই খড়্গাঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুলা ও ব্যতিব্যস্তা। কেন এমন তাহা বলা যায় না, কিন্তু ইহা একটি সত্য, ইহা মানিতে হয়, না মানিলে চলে না। ইহাতেই আমার নিজত্বের আর ইহাতেই সমাজের অভিব্যক্তি। ইহার ফলেই আমি সেই খড়্গাঘাত হইতে দূরে থাকিতে ক্রমশঃ শিখিতেছি; ক্রমেই আমার জ্ঞানবিকাশ, বুদ্ধিবিকাশ, ধর্ম্মবিকাশ ঘটিতেছে। আমার অনুভূতি ক্রমেই তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইতেছে। অনুভূতি, অর্থাৎ দুঃখের অনুভূতি। দুঃখের অনুভূতি, অর্থাৎ প্রকৃতিহস্তের খড়্গাপাতের আশঙ্কা। এই অনুভূতি যাহার তীক্ষ্ণ নহে, খড়্গাপাতের আশঙ্কা যাহার নাই সে জীবনসমরে আত্মরক্ষায় সমর্থ নহে, তাহার জীবনের ভরসা নাই*। যাহার এই আশঙ্কা প্রবল, এই অনুভূতি প্রবল তাহারই মোটের উপর জীবনের ভরসা অধিক। সেই ব্যক্তি সংগ্রামে কিছুদিন বাঁচিতে পারিবে। সম্মুখযুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে বলা যায় না; ভয়াকুল মৃগের ন্যায়, শঙ্কামাত্রসম্বল শশকের ন্যায় শত্রু হইতে পলাইয়া লুকাইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে মাত্র। সুতরাং জীবনে দুঃখানুভূতির বিকাশ; সুতরাং জীবন দুঃখময়। জীবপর্য্যায়ে যে যত উন্নত, সে তত দুঃখী, সে তত দুঃখ আহরণে, দুঃখ অন্বেষণে, দুঃখ উপভোগে নিযুক্ত। সমাজের ইতিহাস, সভ্যতার কাহিনী ইহার সাক্ষী।

জীবন দুঃখময়; কেন না, দুঃখময়তাতেই জীবনের উন্নতি ও ভরসা। আবার জীবন দুঃখময় সেইজন্যে জীবনে সুখের আবশ্যকতা। নহিলে দুঃখের ভারে জীবন টিকিত না; নহিলে প্রকৃতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত প্রকৃতির এ কি রকম খেয়াল বুঝা যায় না; কিন্তু প্রকৃতির খেয়াল এইরূপ। মন্দ করিয়া ভাল করে, ভাল করিবার জন্য প্রকৃতির মন্দ ব্যবহার; মানুষের প্রতি দয়াবশতঃ প্রকৃতি এত নিষ্ঠুর। প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য কি বলা যায় না। কবিশ্রেষ্ঠ টেনিসন্ দেখিতে পান নাই, আমরাও পাই না; কেন না, যখনই দেখি ভাল, তখনই পরক্ষণে দেখি মন্দ। সুতরাং খেয়াল বা লীলা বলিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইবে।

জীবন দুঃখময়, তাই মানুষে সুখ খুঁজিয়া বেড়ায় ও সুখ পায়। সুখ না পাইলে ধরাধামে মানুষ টিকিত না। সুখের মাত্রা অধিক কি দুঃখের মাত্রা অধিক, সে কথা আর তুলিব না। তাহার উত্তর ঠিক নাই। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, খুঁজিলে সুখ মিলে, অন্ততঃ মানুষ সুখের অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এইটা তাহার জীবনের একটা কাজ এবং অগত্যা সুখের সে সৃষ্টি করে। যে যত উন্নত তাহার তত দুঃখ; তাহার তত সুখের দরকার, নহিলে তাহার জীবন চলে না; মোটের উপর সে তত সুখ খুঁজিয়া পায়। দুঃখের অনুভূতি যাহার তীক্ষ্ণ তাহার নাম কবি; কাজেই মোটের উপর কবির সুখের অনুভূতিও প্রবল। সুখের জন্য যে কতকগুলি সামগ্রী নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা নহে। অমুক পদার্থগুলাই সুখ দিবে, সুন্দর দেখাইবে, এমন নয়। মানুষ সম্মুখে যাহা পায় তাহা হইতে সুখ টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে। দ্রব্যাদ্রব্য বড় বিচার করে না; যেখানে সেখানে যখন তখন সুখের আবিষ্কার করে, সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করে। কতকগুলা পদার্থ আছে বটে যাহাতে সাধারণ মানুষে কিছু-না-কিছু সুখ পায়, কিছু-না-কিছু সৌন্দর্য্য দেখে; উপরে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছি। এই পদার্থগুলা কোন-না-কোন রূপে জীবন রক্ষার পক্ষে অনুকূল, আশাপ্রদ। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এ সাধারণ নিয়ম খাটে না। তাহাদের সুখের বড়ই দরকার; তাই যাহা তাহা হইতে সুখ আকর্ষণ করে। তাহা জীবনের উপযোগী কি জীবনের অন্তরায়, তাহা বিচার করিবার অবকাশ থাকে না। বিনা বিচারে তাহাকে মনের মত গড়িয়া লয়, তাহাতে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। জীবনের পথে চলিতে চলিতে দু'চোখে যাহা দেখে তাহাই প্রীতির চশমা পরিয়া সুন্দর করিয়া লয়; কেন না সৌন্দর্য্যই তাহার পক্ষে আবশ্যক; বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যই তাহার অবলম্বন, বিশুদ্ধ সুখই তাহার উদ্দেশ্য। যাহা বুঝিতে পারে তাহাতে আনন্দ পায়; যাহা বুঝে না তাহাতেও আনন্দ পায়। অনেক সময় যাহা বুঝা যায় তার চেয়ে যাহা বুঝা যায় না

---

* প্রাকৃত শক্তির অত্যাচার কেবল ব্যক্তিজীবনের উপর নহে, সমাজজীবনের উপরেও সমভাবে বিদ্যমান। আবার সমাজরক্ষা না হইলে ব্যক্তিজীবন রক্ষা হয় না, সুতরাং পরের দুঃখেও সহানুভূতি প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

তাহাতে বেশী আনন্দ হয়। স্থূলহিসাবে এটা একটা সমস্তা। বিজ্ঞানবিৎ জগৎযন্ত্রের জটিলতা উদ্‌ঘাটন করিয়া যতই কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার আবিষ্কার করেন, আবিষ্কৃত নিয়ম-প্রণালীকে যতই মনুষ্যজীবনের সহায় করিয়া তুলেন, এক কথায় জগতের রহস্তকে যতই বুঝিতে চেষ্টা করেন ও বুঝেন, ততই তিনি আনন্দ পান, সৌন্দর্য্য অনুভব করেন। আবার সেই দুর্ভেদ্য-রহস্যের যে ভাগটা কোন মতে আয়ত্ত হয় না, কোন মতে নিয়মের বশে আসে না, সে ভাগটা আরও সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা সাধারণ মানুষে যেটা বুঝি তাহাতে বিশেষ আরাম পাই, আর যেটা বুঝি না, তাহাতে সময়ক্রমে আরও আরাম পাই। * অনেকের মতে বৈজ্ঞানিক জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া সৌন্দর্য্যের বিনাশে নিযুক্ত। যাহা হউক মানুষের সৌর্য্যন্দ ও তদনুভবজাত সুখ নইলে মানুষের জীবনযাত্রা দুঃসাধ্য হয়; তাহাতেই মানুষের এই সৌন্দর্য্য-সৃজনে ক্ষমতা।

সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনায় এই কয়টি কথা পাওয়া গেল।

(১) জীবের মধ্যে মনুষ্য সূক্ষ্মসৌন্দর্য্যভোগে অধিকারী।

(২) সকলের আবার সৌন্দর্য্যপিপাসা ও সৌন্দর্য্যভোগ শক্তি সমান নহে। ইহা অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রকৃতির লক্ষণ।

(৩) বৈচিত্র্যের সমাবেশে ও পরম্পরায় চৈতন্যের অস্তিত্ব। সুতরাং এরূপ বৈচিত্র্যের আদর।

(৪) কতকগুলি পদার্থ কোন-না-কোন রূপে জীবনের ও স্বাস্থ্যের অনুকূল। কতিপয় পদার্থ জীবনসমরে ভীতি ও নৈরাশ্য দূর করিয়া আশা ও প্রফুল্লতা আনে। কতকগুলি মুখ্য বা গৌণভাবে জাতীয় জীবন বা সমাজ-জীবনের অনুকূল, সহানুভূতি ও পরার্থবৃত্তির উদ্দীপক। ইহারা সুন্দর।

(৫) কিন্তু অনেকস্থলে ব্যক্তিজীবন বা জাতীয় জীবনের স্থিতি বা পুষ্টি বিষয়ে কোনরূপ আনুকূল্য করে না, অথচ অনেকের নিকট সুন্দর, এমন পদার্থ দেখা যায়। ইহারা সুন্দর কেন, স্থির করা দুষ্কর।

(৬) মনুষ্যের অভিব্যক্তির সহিত দুঃখবৃত্তি ফুটিয়া আসিতেছে। নিজের জন্য শঙ্কা ও পরের জন্য শঙ্কা ইহার মূল। এই দুঃখ-বৃত্তি ব্যক্তিজীবন ও জাতীয় জীবনরক্ষার অনুকূল।

(৭) দুঃখের উৎপত্তির সহিত সুখের উৎপত্তি না ঘটিলে মনুষ্য-জীবন বা উন্নত মনুষ্যজীবন টিকিত না। তাই যেখানে সেখানে সুখ কুড়াইয়া পাইবার ক্ষমতা মানুষের জন্মিয়াছে। কোথা সুখ পাইবে কোথা পাইবে না, তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা সর্ব্বত্র চলে না। যেখানে সুখ বা আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই সুন্দর। সাধা-রণতঃ যাহাদের দুঃখ-বৃত্তি প্রবল, তাহারাই অধিক সুন্দর জিনিস দেখিতে পায়। দুঃখের ন্যায় সুন্দর সামগ্রী বোধ করি দ্বিতীয় নাই।

(৮) এই হিসাবে সৌন্দর্য্য মানুষের মনে, বস্তুবিশেষে নহে। এবং এই হিসাবে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই জগৎকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

(সাধনা ২য় বর্ষ—২য় ভাগ ১৩০০ ভাদ্র)

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

---

* রামচরিত্রে সীতানির্ব্বাসন অনেকের চোখে ভাল লাগে না। বিশেষতঃ আমাদের মত ইংরাজীওয়ালাদের কাছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত রামচরিত্রের প্রতি এ কারণে কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। রামচরিত্রের এইটুকু ভাল বুঝা যায় না এবং আমার বিবেচনায় এই জন্যই ইহা সুন্দর। সমাজশক্তির প্রতিঘাতে মহৎ ব্যক্তির জীবনে সময়ে সময়ে এমন একটা বিপ্লব উপস্থিত করে তাহাতে তাঁহার জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। সামাজিক জীবনের এই একটা দুর্ভেদ্য সুতরাং সুন্দর রহস্য। বাসন্তী দেবী রামকে সম্মুখে পাইয়া যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছেন; কিন্তু তিনিই আবার রামচরিত্রের এইটুকু বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছেন—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো ন জানতুমর্হতি।

মুক্তির পথে

(চিত্র
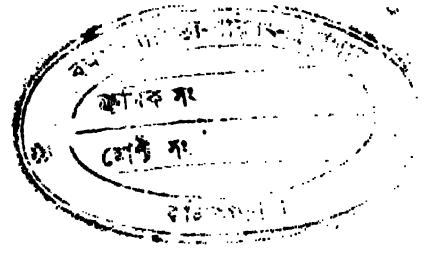
শ্রীহৃদয়রঞ্জন ঘোষাল

(১)

যে সময়ে বাঙলা দেশের আকাশে বকের পালকের মত শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল পেঁজা তুলার ন্যায় দেখায়, বাতাসে ভাসিয়া আসা-ধূপের গন্ধ তরুণ কবির মন-প্রাণ অকস্মাৎ আমোদিত করিয়া তোলে, শুভ্র শরতের এমনই একদিনে চাঁপাপুকুর "বঙ্গবাণী নিম্ন-প্রাথমিক" বিদ্যালয়ের গুরু-মহাশয় শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর হঠাৎ ওপারের ডাক আসিয়া পড়িল। মাত্র তিন দিনের জ্বর, মৃত্যুর পূর্ব্ব-রাত্রে শঙ্কর রীতিমত প্রলাপ বকিতে লাগিল। —কে? মোল্লার পো? ত্রৈমাসিকটা লিখেই রেখেছি। আজই ফেলে দিস দাদা,—হাজরে খাতা কৈ?—হাজরে—

সেবারে "বাবু" আসিয়া মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন, ত্রৈমাসিক বিবরণপত্র নিয়মমত পাঠান হয় না, ভবিষ্যতে ঐরূপ করিলে তিন মাস অন্তর যে সাড়ে চারি টাকা সাহায্য দেওয়া হয় তাহা বন্ধ করা হইবে। ইহলোকে সে তাহার অন্নবস্ত্রের মালিক, চাকরী-জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবতা ইনসপেক্‌টার বাবুর নিকট তিন মাসের হিসাব-নিকাশ সময়মত দাখিল করিতে পারে নাই। মৃত্যুপথের পথিক হতভাগ্য শঙ্করের অন্তিম নিঃশ্বাস বোধ করি, সাহায্য বন্ধ হইবার ভবিষ্যৎ বিভীষিকায় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। আজ যাহার কাছে সে সারা জীবনের হিসাব-নিকাশ দিতে চলিয়াছে, জানি না, অনেক ত্রুটি-ভরা তাহার এই "বিবরণপত্র" পড়িয়া ওপারের অচেনা নূতন মনিব তাহাকে ক্ষমা করিবেন কি না!

তথাপি মৃত পণ্ডিতের স্বর্গবাস যাহাতে নিরুপদ্রব হয়, সেপক্ষে সাধ্যমত তদ্বিরের কোন চেষ্টাই বাকি রহিল না। তারিণী চক্রবর্ত্তী গ্রামের সকলের খুড়া হইলেও শঙ্করের সহিত সম্পর্কটা অনেক নিকট ছিল। এ গ্রামের দায়-অদায়ে এ পর্য্যন্ত পুরুষানুক্রমে তাঁহারাই মাথা দিয়া আসিতেছেন। শঙ্করের মৃত্যুর চার-পাঁচদিন পরে একদিন সকালে তারিণী আসিয়া বলিল, "অনেক বলা-কহায় মাইতির পো রাজী হয়েছে, এখন বউমাকে নিয়ে আজই "ট্যাংরার" আফিসে যেত হয়। 'শুদ্ধু' কোনও রকমে হ'তেই হ'বে।"

হালদারগিন্নী সদ্যবিধবা মোক্ষদার পাশে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া দুঃখপ্রকাশের অবসরে, অনাগত দিবসের অন্ধকারময় ভয়াবহ চিত্র বায়োস্কোপের ছবির মত চোখের সামনে সুস্পষ্ট ধরিয়া দিয়া 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দিতেছিলেন। তারিণীর কথা শুনিয়া হালদার গিন্নির সুর বদলাইয়া গেল। তিনি সরিয়া আসিয়া মোক্ষদার কাণের কাছে ফিস ফিস করিয়া বলিলেন,— "ও মিন্‌সের ওই রকম। এই জমীর জন্যেই না ওর সঙ্গে মামলা হয়েছিল? মুখপোড়া! আমি বলে পাঠাই গে জমি বেচায় তোমার মত নেই।" মোক্ষদা মুখ নীচু করিয়া বসিয়াছিল। হালদার-গিন্নীর কথা শুনিয়া প্রবল-বেগে মাথা নাড়িয়া অস্ফুট ক্রন্দনস্বরে বলিল;—"না! না!—" হালদার-গিন্নী ততক্ষণে উঠানের এক কোণে দাঁড়াইয়া পাড়ার একটী ছেলেকে হাতমুখ ঘুরাইয়া কি বুঝাইতে ব্যস্ত ছিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই তারিণী একবার চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া লাঠি ঠুকিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল,— "আমি জানি, ও জাতের স্বধর্ম্ম, নেহাৎ দুটা রাঁধা ভাতের জন্যে কার দোরে যাব তাই, না হ'লে ভর সন্ধ্যেবেলায় ও আঁস্তাকুড় কোন "শা—" মাড়ায়, খালি দেহি দেহি পুনঃ

পুনঃ”—বলা বাহুল্য, তারিণীর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী রাসমণি তখন সেখানে ছিল না।

ভবসুন্দরীর কাণে কথাটা যাইতেই মৃত বোন্‌পোর উদ্দেশে আর একপালা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—

“বলে, সোয়ামি যার বাড়া আর কেউ নেই, তাকে দিলি যমের হাতে তুলে, তার চেয়ে তোর জায়গা-জমি হোল বেশী আপন! ও বাবা! কি বিছুটির চারা আমার জন্যে রেখে গেলি রে!—”

তারিণীর পিসী নিকটেই ছিলেন,—“আর মা! বেন্তর বাঁচার বেন্তর দুখ্‌খু। কপালে না জানি আরও কি আছে”—বলিয়া অদূরে উপবিষ্ট মোক্ষদার প্রতি কি একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করিলেন।

কিন্তু কপালে আর যাহাই থাকুক না কেন, উপস্থিত শকরের যে সামান্য একটু ব্রহ্মোত্তর ছিল তাহা সাফ বিক্রয় কোবালায় আপাততঃ ভাবাগাছির সিবু মাইতির ঘরে গিয়া উঠিল। সংসারে থাকিবার মধ্যে রহিয়া গেল, “বালবিধবা” ভবসুন্দরী, মোক্ষদা, আর, হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরে গোময়ের অভাবটা যাহাতে একেবারে না হয়—সম্ভবতঃ তাহারই জন্য জীর্ণ কঙ্কালসার একটা গাভী।

(২)

শ্রাদ্ধশান্তি অনেকদিন চুকিয়া গিয়াছে। সেদিন তারিণীর পিসী আসিয়াছিলেন। ভবসুন্দরী তাহার সহিত রায়েদের বাড়ি কথকতা শুনিতে গিয়াছেন। গরীবের শোক করা বিড়ম্বনা মাত্র। পোড়া পেট এমনি বালাই। রান্না ঘরের কায-কর্ম্ম মিটিয়া গিয়াছে। মাজা বাসন কয়েকটা রাখিয়া মোক্ষদা দাওয়ার এক প্রান্তে আঁচল বিছাইয়া অলসভাবে শুইয়া পড়িল। রৌদ্রতপ্ত অলস মধ্যাহ্নের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া অনেক কথাই এলোমেলো ভাবে তাহার মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিল। আজ ১০ বৎসরের কথা সংসারে আসিয়াছে। শৈশবে পিতার স্নেহ সে পায় নাই। শুনিয়াছে তাহার জন্মের পূর্ব্বেই তিনি মারা গিয়াছেন। মায়ের কথা কিছু কিছু মনে করিতে পারে। একদিন আহ্লাদ দাসের দোকান হইতে মা তাহাকে মুড়কি, বাতাসা কিনিয়া দিয়াছিলেন। খাওয়া শেষ হইলে বৃদ্ধ আহ্লাদ দাস ঘটীতে করিয়া তাহাকে জল দিয়াছিল, আর একদিন ছোট মামীর ছেলে ষষ্ঠীর হাতে বিস্কুট দেখিয়া কাঁদিয়াছিল বলিয়া মা তাহার পিঠে একটা কিল বসাইয়া দেয়। তখন সে দাদামহাশয়ের কোলে চড়িয়া কোন একটা দোকানে বিস্কুট কিনিতে গিয়াছিল। এইরূপ দু’একটা ঘটনা। বিবাহের পরের বৎসরেই দাদামহাশয় তাহাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন। মামারা খোঁজ-খবর নেন না। ওঁদের মুখে শুনিয়াছিল অনেক দূরে পশ্চিমে নাকি তাঁরা সব চাকরি করেন।

দরিদ্র স্বামীর সংসারে শত অভাব-অনটনের গ্লানি, মাস্‌শাশুড়ীর অকারণ গঞ্জনা,—সবই সে এ পর্য্যন্ত মুখ বুজিয়া সহিয়া গিয়াছে—ঐ একটী মানুষের মুখের দিকে চাহিয়া স্ত্রীলোকের একান্ত গর্ব্বের বস্তু, স্বামীর যত্ন ও ভালবাসা হইতে সে তো বঞ্চিতা ছিল না! মনে পড়ে, ছেলেবেলায় সে ব্রত করিয়াছিল, “আরশী, আরশী, আরশী আমার স্বামী যেন ফার্সী।” ফার্সী পড়া কি তাহা সে তখন যেমন জানিত না, এখনও জানে না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাহার স্বামী তো ফার্সীর চাইতেও ঢের বেশী পড়িয়াছিলেন। রাজার নিকট হইতে পোষ্ট আফিসে ওনাদের কাছে টাকা আসিত তাহা সে জানে। কতদিন তুলসী-তলায় প্রদীপ দিবার সময় সে বার বার প্রণাম করিয়া বলিয়াছে,—“হে ঠাকুর! এঁকে ভাল রাখ, রাজাকে ভাল রাখ। এবার যেন রাজা বাবু এঁর নামে বেশী করে’ টাকা পাঠিয়ে দেন।”

সে বছর ও বাড়ীর শৈল ঠাকুরঝী প্রথম শ্বশুরঘর করিয়া আসিয়া গল্প করিয়াছিল যে তার বড় লাটসাহেবের বাড়ী কাজ করে। সে খুব বড় আপিস, স্বামী মরিয়া গেলে তার বিধবা বৌকে তারা অনেক টাকা দেয়। তা লাটসাহেব তো এঁদেরও স্কুল দেখিতে “বাবু”কে পাঠান। সে তখনি ছুটিয়া গিয়া উৎসুকনয়নে স্বামীকে বলিয়াছিল যে শৈল ঠাকুরঝীর বর যে আপিসে কাজ করে সেখানকার সাহেব বিধবা বউকেও টাকা দেয়। তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—“হঠাৎ তোমার বিধবা হ’তে সাধ গেল কেন?”

অমন অলক্ষণে কথার ‘ছিরি’ দেখিয়া সে বিস্তর কান্না-

কাটি করিয়াছিল। তিন দিন স্বামীর সহিত কথা কহে নাই। তাহার পর কথা কহাইবার কি সাধ্যসাধনা! সে তো মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, আর কথা কহিবে না। কিন্তু তিনি বুকের কাছে মাথাটা টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া বলিয়াছিলেন,—পাগল আর কি! সত্যিই তো আর আমি কিছু এখনই মরে যাচ্ছি না। একটা ঠাট্টা করেছিলাম, বোঝ না। অবশেষে দোলার ভিতর ঘুমন্ত শিশুপুত্র দেড় বছরের বিশুকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,—"মোক্ষদা, ওই তোমার টাকা বল, মোহর বল, সব। অভাগিনী তাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। বিশু থাকিলে না জানি আজ কত বড়টী হইত!

বহুদিনের নিরুদ্ধ অশ্রুবেগ আর বাধা মানিল না। দুই গণ্ড বহিয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া অঞ্চল ভিজাইয়া তুলিল।

(৩)

এক বৎসর পরের কথা। তারিণীর স্ত্রী রাসমণি একটী মৃতসন্তান প্রসব করিয়া কয়েকমাস ধরিয়া নানান রোগে ভুগিতেছে। সংসার অচল; সাম্‌নের মাসে আবার ঠাকুরপালা আছে। সাত পাঁচ ভাবিয়া একদিন দুপুরে বেড়াইতে আসিয়া তারিণীর পিসী কথাটা পাড়িল,—"সেই তো পাঁচ দোর ঘুরতেই হয়। তা বাপু পর তো আর নয়! তারিণী বল্লে পিসী তুমি গিয়ে একবার বল গে—ও বাড়ীর বউ মা যদি কটা মাসও অন্ততঃ রান্নার কাজটা দেখা শোনা করেন।"

"এ আর বেশী কথা কি মা! তা বেশ! বউ যাবে বৈ কি? আর মা! আমারও যেমন পোড়ার দশা!" —হাতের পাজটী চুপড়ির মধ্যে রাখিয়া ভবসুন্দরী আঁচলে চক্ষু মুছিলেন।

তারিণীর পিসীও সেদিন বেশীক্ষণ আর বসিলেন না। সংসারের নানান ঝক্কি তাঁহাকেই পোহাইতে হয়!

(৪)

শীতের সন্ধ্যা। সারাদিন টিপ টিপ করিয়া অবিশ্রান্ত জল হওয়ায় বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। কয়দিন হইতে মোক্ষদার একটু একটু জ্বর হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বুকের ব্যথাও আছে। এই কয়মাসের অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তারিণীর বাটীর ঝি "পেলাদীর মা" অনেক দিন হইতে তাহার মেয়ের বাটী যাইবে বলিতেছিল। মোক্ষদা আসিতেই রাসমণি তাহাকে ছুটী দিয়াছেন, মুখে প্রকাশ করিলেন, ঠাকুর, দেবতার কাজে, "সুদ্‌রের" ছোঁয়া জল—বাটনার অনাচারটা যাহাতে না ঘটে সেদিকে তাঁহার বরাবরই নজর আছে কিন্তু লোকাভাবে কিছু করিতে পারেন না।

রান্নার কাজ সকাল সকাল শেষ করিয়া নিত্যকারের মত রুগ্ন গৃহকর্ত্রী রাসমণির জন্য মোক্ষদা লুচি বেলিতেছিল। রাসমণির ছোট মেয়ে রাণু অদূরে বসিয়া খানিকটা ময়দার তাল লইয়া পুতুল গড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। অন্যদিন এই সময় ভবসুন্দরী মোক্ষদাকে লইতে আসেন। ময়দা বেলা শেষ করিয়া, কড়াটা উনানে চাপাইয়া দিয়া মোক্ষদা যেমনি পেছন ফিরিয়া বসিতে যাইবে, অমনি কি একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া চমকাইয়া উঠিতেই রাণু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল,—"বলাই মামা!" রাণুকে দেখিয়া বলাই চোরের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। একটা তীব্র সুমিষ্ট গন্ধে ঘরটী ভরিয়া উঠিয়াছে। মোক্ষদার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল! চেষ্টা করিয়াও সে উঠিতে পারিল না। শরীরে কে যেন পাথর চাপাইয়া দিয়াছে; ভয়ে জড়সড় হইয়া বসিয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে সে ঘামিতে লাগিল।

এ দিকে রাণু তাহার বলাই মামার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে চেঁচাইতে লাগিল,—"মামা! আমার মাথায় একটু এসেন্!" রাসমণি গোলমাল শুনিয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি রে রাণী? হয়েছে কি? মরণ! চেঁচাচ্ছে দেখ না?"

হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া নির্লজ্জ বলাই তাহার দিদির কাছে যে মিথ্যার অভিনয় করিল তাহার সারমর্ম্ম এই:—কয়দিন ধরিয়া মাথার যন্ত্রণা হওয়ায় মোক্ষদা তাহাকে একটু অডিকোলন আনিয়া দিতে ধরিয়াছিল। সেই শিশি দেখিয়া রাণুও বায়না ধরিয়াছে তাহাকেও একটা দিতে হইবে। এই বলিয়া বলাই ঘাড় নাড়িয়া শিষ দিতে দিতে দ্রুত পদবিক্ষেপে বাড়ীর বাহির হইয়া

গেল। ভ্রাতার গুণের কথা রাসমণির অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করা চলে না। যথাসম্ভব মুখ বুজিয়া রান্নাঘরে আসিতেই রাসমণি সত্তনিক্ষিপ্ত এসেন্সের গন্ধ পাইলেন। অপরাধ সাব্যস্ত করিতে এর চেয়ে বড় প্রমাণের আবশ্যক করে না। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া রাসমণি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "দেখ বাছা! আমি ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি। ওসব নাটুকেপণা আমার এখানে চল্‌বে না। তুমি ভাল চাও তো এক্ষণি মানে মানে বিদেয় হও! গেরস্তঘরের বউ ঝি—ছিঃ ছিঃ।" তারিণীর পিসী জপে বসিয়াছিলেন রাসমণির গলার আওয়াজে ছুটিয়া আসিয়া সামান্য যাহা কিছু বুঝিতে পারিলেন তাহাতেই একবারে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওরে আমার ধর্ম্মের সংসার ছারে খারে গেল।"

ইতিমধ্যে ভবসুন্দরীও মোক্ষদাকে লইতে আসিয়া, দজ্জাল বউয়ের কীর্ত্তির কথা সমস্তই শুনিলেন।

তারপর চলিল, সে এক বীভৎস ব্যাপার! কিল, চড়, লাথি কিছুই আর বাকি রহিল না। বহু যুগ ধরিয়া একান্ত অসহায় পঙ্গু নারীজাতির প্রতি এই যে বিরাট্ অত্যাচার চলিতেছে তাহারই এক মর্ম্মন্তুদ, সকরুণ পুনরভিনয়!

* * *

গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ, সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বারোয়ারী তলায় আখড়া হইতে বলাই এর কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। সে গাহিতেছে, মনের মতন রতন পাইলে, যত্ন করিতে তাহার কোন আপত্তি নাই। হঠাৎ উঠানে বাঁধা গাভীর অস্বাভাবিক ডাকে ও ছুটছুটিতে জাগিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিতেই ভবসুন্দরীর নজরে পড়িল, রান্নাঘরের কোণে লিচু গাছের তলায় কি একটা কালো জিনিস ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া পুড়িতেছে, তাহার চেঁচামেচিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই পাড়ার অনেক লোক উঠানের মাঝে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বেই মোক্ষদা এই নির্ম্মম কুৎসিত সংসারের সমস্ত লজ্জা, সব কিছু কলঙ্ক ও অপমানের বোঝা পিছনে ফেলিয়া চিরসুন্দরের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে।
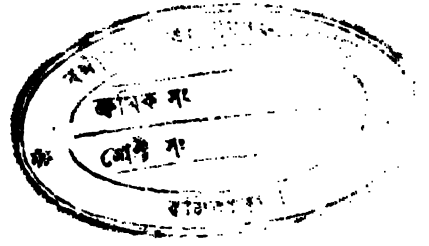
সাহিত্য-প্রসঙ্গ

শ্রীকালিদাস রায়

(১)

সৃষ্টি ও সান্ত্বনা

আমরা ভুলিয়া যাই, শিল্পানুশীলন মাত্রই সতর্ক সমালোচনা বা রস-বিচারের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না—একটা পরিপূর্ণ সৃষ্টিই বিচারের সামগ্রী। সর্ব্বশ্রেণীর রচনা সম্বন্ধে উৎকর্ষের এমন একটা সীমা থাকা উচিত, সেই সীমা পর্য্যন্ত না পৌছিতে পারিলে কোন রচনাকেই বিচারের বিষয়ীভূত করা উচিত নয়। তাহা করিলে রস-বিচারের আদর্শের অমর্য্যাদা হয়। বিচারক যদি অক্ষমের রচনাকে বা অক্ষম রচনাকে উপেক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে রসবোধের আভিজাত্য নষ্ট হইয়া যায়। ঘৃণা করিতে বলি না—উপেক্ষা করিতে বলি না—আমি ঔদাসীন্যের কথা বলিতেছি।

রচনা যখন উৎকর্ষসীমা লাভ করে নাই—কিন্তু উৎকর্ষের অভিমুখী—যখন তাহা আত্মপ্রকাশের প্রয়াস মাত্র—অভিব্যক্তির জন্য একটা সংগ্রাম মাত্র—অনেক সময় শিল্পশালার experiment মাত্র, তখনও তাহা বিচার-গণ্ডীর বহির্ভূত। এক্ষেত্রে উপেক্ষা চলিতে পারে না—এক্ষেত্রে অপেক্ষার কথা আছে। বিচারক এক্ষেত্রে ধৈর্য্য ও সহানুভূতির সহিত প্রতীক্ষা করিবেন—ইহাই প্রত্যাশা করা যায়।

রচনা যখন যশোলোলুপ ব্যক্তির সুখ-স্বপ্ন মাত্র—অক্ষম ব্যক্তির নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক—অথবা ব্যক্তি বিশেষের অবসর-বিনোদনের প্রয়াস মাত্র—তখন উপেক্ষাই বাঞ্ছনীয়। তাহাকে বিচারের অধীন করিয়া তুলিলে একদিকে বিচারের আদর্শ ক্ষুন্ন হয়—অন্য দিকে অযোগ্যকে অযথা মর্য্যাদা দেওয়া হয়।

সকলেই কিছু শিল্প-জগতের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য শিল্পানুশীলন করে না। অনেকে নিজের কর্ম্মপিষ্ট তাপক্লিষ্ট শুষ্ক নীরস জীবনকে সরস ও সহনীয় করিয়া তুলিবার জন্য, নিজের বেদনাতপ্ত হৃদয়কে সান্ত্বনাপ্রদানের জন্য, দারিদ্র্য-কুণ্ঠিত জীবনকে মূর্চ্ছনাময় বর্ণরেখাময় ব্যঞ্জনাময় সম্পদের অনুকল্প দানে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য শিল্পানুশীলন করে—এই বেদনারক্ত সত্যটীকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না। এইসকল রচনা যদি উৎকর্ষের সীমা লাভ না করে—তবে তাহাদিগকে কিছুতেই হৃদয়হীন বিচারের অধীন করিয়া তোলা উচিত নয়। সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলে ভাল হয়—তাহা যদি সম্ভব না হয়, অন্ততঃ ঔদাসীন্য শোভনতর।

এখানে কথা হইতে পারে বিচার-ক্ষেত্রে যাহা আসা-যাওয়া করিতেছে, তাহা অব্যাহতি পাইবে কিরূপে? যাহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, বিচারক তাহারও সন্ধান রাখিবেন—এ প্রত্যাশা কি করিয়া করা যায়? ইহার উত্তরে আমি বলি—রচনার মধ্যেই এমন সব ইঙ্গিত থাকে, যাহারা ব্যক্তিগত জীবনকে চিনাইয়া দেয় এবং রচনার মূল প্রেরণা যে কি তাহাও জানা কঠিন হয় না। ইহা ছাড়া, বিচারক কেবল রসজ্ঞ নহেন—তিনি তত্ত্বজ্ঞও হইবেন, ইহা প্রত্যাশা করা যায়—তিনি শুধু বিচারে অপক্ষপাতী হইবেন কিন্তু হৃদয়বান্ হইবেন না ইহাও তো অস্বাভাবিক। রসজ্ঞ ও বিচারক বলিয়া তিনি জীবনের অন্যান্য অঙ্গ হইতে বিচ্যুত—এমনটা তো হইতে পারেন। তাই বলি, যদি সহানুভূতির দৃষ্টিতে না দেখিতে পারেন—উৎকর্ষের সাধারণ সীমা পর্য্যন্ত পৌছায় নাই বলিয়া অন্ততঃ ঔদাসীন্য দেখাইতে পারেন।

ইহার উত্তরে আর একটা কথা হইতে পারে। যে রচনা উৎকর্ষের সীমা পর্য্যন্ত পৌছায় নাই বা যাহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিবিশেষের আত্মতৃপ্তির জন্য রচিত—তাহাকে প্রকাশ করা কেন? যদি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিতই হয় তবে তাহাকে উপেক্ষা কেন করা হইবে?

ছাপার অক্ষরে প্রকাশরোধ করার অধিকার কাহারও নাই ; কিন্তু ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত রচনাকে হাতের লেখা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে—চমৎকারিতার সম্ভাবনা না থাকিলে বেশীদূর অগ্রসর না হইলেই চলে ; কেহ যদি লেখা পড়িয়া শোনায় তবে ভদ্রতার খাতিরে আদ্যোপান্ত শুনিতে হয়। ছাপা লেখা না পড়িলেও চলে—শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া বিচারের বিষয়ীভূত মনে না করিলেও চলে।

যে আত্মতৃপ্তির জন্য অক্ষম লেখক কিছু রচনা করে, ছাপার অক্ষরে প্রকাশও সেই আত্মতৃপ্তিরই অঙ্গীভূত। একই দুর্ব্বলতা রচনা ও রচনা-প্রকাশ উভয়েরই প্রেরণা, ইহা মনে করিয়া লওয়া কঠিন নয়।

মাসিকপত্রে প্রকাশরোধ করা চলে। সম্পাদক নিজে রসজ্ঞ, সুপণ্ডিত ও সুবিচারক হইলেই ইহা সম্ভব হয়। সম্পাদক আপন পত্রিকার সাহিত্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইলেই ইহাতে বাধা হয় না। লেখক যখন আপন রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ মাত্র করেন---তখন তিনি বিচারাধীন হ'ন না বটে—কিন্তু সেই গ্রন্থ যদি সমালোচনার জন্য পেশ করেন, তখন তিনি নিজেই বিচার চাহেন। এক্ষেত্রে বিচারক কি করিবেন? বিচারের উপযুক্ত যদি না হয়—তবে স্পষ্টতঃ বা ইঙ্গিতে সে কথা লেখককে জানানই ভাল—বিচারের বিষয়ীভূত করিয়া রসবিচারের আদর্শের অবমাননা করা উচিত নয়।

(২)

আধুনিক সাহিত্যের কয়েকটী বিশিষ্ট লক্ষণ

কিছুদিন হইতে আধুনিক সাহিত্য পাঠ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে,—আধুনিক সাহিত্যিকদের সহিত প্রবীণ সাহিত্যিকদের দ্বন্দ্ব মূলতঃ সাহিত্যের নৈতিক আদর্শ লইয়া এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকে সাহিত্যে প্রাধান্য দেওয়া উচিত কি না এই সমস্যা লইয়া। কেবল এই দেশে নয়—সকল দেশের প্রবীণ ও নবীনের মধ্যেই এই দ্বন্দ্ব চলিতেছে।

আধুনিক সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক সত্য নৈতিক আদর্শকে কতটা রূপান্তরিত করিয়াছে, তাহা বিস্তারিতভাবে বলা কঠিন। আমি কোনপ্রকার অভিমত প্রকাশ না করিয়া কয়েকটী দৃষ্টান্তের দ্বারা কেবল তাহার আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

অতিবড় পাষণ্ড ঘৃণিতের চরিত্রেও যে মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে,—ঘৃণিতা সুরামত্তা বেশ্যার অন্তরেও যে মাতৃত্বের ছায়া থাকিতে পারে—হীন কামাতুরা চরিত্রহীনার জীবনেও যে প্রকৃত প্রেমের জন্য আকুলতা, পাষাণতলের ধবল অঙ্কুরটীর মতই প্রতীক্ষা করিতে পারে ইহা সসাহসে স্বীকার করা আধুনিক সাহিত্যের অঙ্গীভূত। এই সাহিত্য মনে করে রচনার বিষয়বস্তু যত জঘন্যই হউক—বর্ণনা যত লালসাপঙ্কিল হউক—আবহাওয়া যতদূর নারকীয় হউক তাহাতে আসে যায় না—অত্যন্ত নীচ হীন পতিত যাহারা, তাহাদের জীবনের সহস্র কুশ্রীতা অতিক্রম করিয়াও যদি মাঝে মাঝে শিবসুন্দরের পানে তাহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে—তাহা হইলে সমস্ত কদর্য্যতা সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত হইয়া গেল।

সমস্ত কামপ্রবৃত্তির অন্তরালে নারীর পক্ষ হইতে একটা mother instinct এবং—পুরুষের পক্ষ হইতেও একটা সৃজনবাসনা প্রচ্ছন্ন আছে—জীববিজ্ঞানগত এই সত্য আধুনিক সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছে। Natural selection ও Perpetuation of species-এর বৈজ্ঞানিক নিয়মটীকে আধুনিক সাহিত্য সুসভ্য নর-নারীর যৌনবোধের সহস্র জটিলতার মধ্যেও আদিমতম স্বরূপে মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করে না।

আধুনিক সাহিত্যের বিশ্বাস,—নরনারীর একনিষ্ঠতা একটা convention, একটা কৃত্রিম সামাজিক শাসনে ও কবিদের জয়কীর্ত্তনে এই সংস্কারটা একটা সত্য সম্বন্ধের রূপ ধরিয়াছে মাত্র। মানুষের মনোজগৎ এত বিরাট্ ও জটিল যে একটীমাত্র মানুষের সাহচর্য্যে তাহার সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি অসম্ভব। তৃষ্ণা বহুমুখী—সেইজন্য বহুর সংস্পর্শে আসিলে তবে জীবনের পরিপূর্ণতা ঘটে। বহুর মধ্য দিয়া মানুষ এককেই চায়—বহুর মধ্য দিয়া পুরুষ তাহার আদর্শনারীকেই সম্ভোগ করে ইত্যাদি কথা লইয়া আধুনিক সাহিত্য একটা অর্দ্ধবৈজ্ঞানিক অর্দ্ধদার্শনিক সত্যকে খাড়া করিয়াছে।

পুরুষ তাহার আদর্শনারীকে পায় না—তাহাকে সারাজীবন ধরিয়া অন্বেষণ করিয়া ফেরে। সেজন্য সে নানা নারীর রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া ঘুরে—এইরূপে সে নানা নারীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে চায়—তাহার আদর্শ-নারীটার অন্বেষণে। আধুনিক সাহিত্য এই তত্ত্বকে সত্য মনে করে এবং তাহাকে সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিয়া তুলিতে সঙ্কোচবোধ করে না। তাহার বিশ্বাস যাহা সত্য তাহাই তো সাহিত্যের মূল উপাদান।

আধুনিক সাহিত্য মনে করে, বিবাহের বন্ধন একটা অন্ধসংস্কার মাত্র,—বৈচিত্র্যহীন বিবাহিত জীবনযাত্রায় প্রেম ধ্বংস পায়। বিবাহিত দম্পতির পক্ষে ভালবাসাটা একটা সাংসারিক ও সামাজিক প্রয়োজন-সাধনের সংস্কার মাত্র। আধুনিক সাহিত্য মনে করে—এই সত্যটাকে সে আবিষ্কার করিয়াছে। ইহা আবিষ্কার নহে—এই দেশেরই প্রাচীন সাহিত্যে আধুনিক সাহিত্যের এই ধারণাটী রসসৃষ্টির উপাদানস্বরূপ গৃহীত হইত। আমি বৈষ্ণব সাহিত্য ও প্রাচীন সাহিত্যের পরকীয়াবাদের কথার ইঙ্গিত করিতেছি। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই ইহাকে একটা সামাজিক সংস্কার বলিয়াই জানেন। কিন্তু সেটা কেবল বৈজ্ঞানিক বোধের কথা। সংস্কারমাত্র বলিয়া মানিয়া লইলেও সকলে যে ইহাকে আবহমান কাল হইতে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার ও বরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহার কারণ তাহারা বৃহত্তর প্রবলতর বিশ্বজনীন সত্যেরই শাসন মানিয়াছে।

আধুনিক সাহিত্য যে সকল সত্যকে আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া মনে করে—আনুষঙ্গিক সত্যের সাহায্যে সেগুলিকে যতক্ষণ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে—ততক্ষণ তত দূষণীয় হয় না। কিন্তু উৎসাহ ও উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া যখন কতকগুলি অসত্যের সাহায্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করে তখনই চিন্তাশীল নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণও ক্ষুব্ধ হ'ন। কোন একটী সত্যকে সমর্থন করিতেছে বলিয়া অসত্যও সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইতে পারে না। ন্যায় পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ন্যায়ও অন্যায়ে পরিণত হয়। সত্য যদি অসত্যের সাহায্যে আত্মরক্ষা করে, তবে সত্যও অসত্য হইয়া যায়—তাহা সৎসাহিত্যের রূপ ধরিতে পারে না। যাহাই হউক—সে কথা আমার মুখ্য আলোচ্য নয়।

আধুনিক সাহিত্য বলে, আন্তরিকতা (sincerity) বা সত্যানুভূতি না থাকিলে সাহিত্য হয় না। একথা যে যথার্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সত্যকে আধুনিক সাহিত্য দেহাত্মবাদের সহিত অভিন্ন করিয়া তুলিয়াছে এবং মানবহৃদয়ের পবিত্র ও মহৎ আদর্শগুলিকে কতকটা conventional ও insincere বলিয়া মনে করিতেছে। আধুনিক সাহিত্যের বাণী—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" কিন্তু মানুষকে কল্পলোক হইতে একেবারে বিচ্যুত করিয়া তাহার সত্যস্বরূপে দেখিতে গিয়া আধুনিক সাহিত্য মানুষের আদর্শকে ছোট করিয়া ফেলিয়াছে—তাই অনেক সময় সে পবিত্র ও মহৎ বৃত্তির অভিব্যক্তিকে মিথ্যা, ভণ্ডামি ও কৃত্রিমতার অভিনয় মাত্র মনে করে। তাই অনেক সময় দৈহিক কামনা ও ভোগলালসার অভিব্যক্তি ও দৈহিক প্রয়োজন-নিবৃত্তির বাসনার বিকাশকেই মানুষের পক্ষে পরম সত্য ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিয়াছে—সেইখানেই সে দেখিয়াছে সবচেয়ে বেশী sincerity। আধুনিক সাহিত্যে কাব্যের প্রধান উপজীব্য হইয়াছে 'দেহাত্মবাদ'। এই দেহাত্মবাদকে রমণীর 'স্তনাগ্রচূড়ায়' প্রতিষ্ঠিত করিতে আধুনিক সাহিত্যের অনেক শক্তিসামর্থ্য ব্যয়িত হইতেছে। এই দেহাত্মবাদ brutalityর স্তরে নামিয়া গেলেও আধুনিক সাহিত্যের আপত্তি নাই।

যৌনসম্পর্ককে অবলম্বন করিয়াই প্রবীণ সাহিত্যের সহিত নবীন সাহিত্যের নৈতিক আদর্শের মূলতঃ পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাই আধুনিক সাহিত্যে যৌনসম্পর্কীয় নৈতিক আদর্শের কি রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহারই আভাস দিলাম।

(৩)

সুখের কবি ও দুঃখের কবি

সুখের কবি বলেন—

> অথই দুঃখ-পাথারে ফুটেছে আনন্দ-শতদল
> অমানিশীথে ও পূর্ণিমা-সুখে উথলে সিন্ধুজল।

দুঃখের কবি বলেন—

অতল দুঃখ-সিন্ধু
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙ্গিছে ইন্দু।
দিগন্তপারে তরঙ্গ আড়ে যারা হাবুডুবু খায়
তাদের বেদনা, ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ-সুষমায় ?

কাব্যের লক্ষ্য দুঃখ কখনই নয়—আনন্দ যে লক্ষ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রস যদি ব্রহ্মস্বাদসহোদর হয়, তবে তাহাতে দুঃখের লেশ নাই, আবার যদি তাহা বিলাসকলাসু কুতূহল চরিতার্থ করে, তাহাতেও দুঃখ থাকিলে চলিবে না—'কাব্যং শিবেতর-ক্ষতয়ে' যদি হয়, তবে শিবেতর অর্থাৎ অকল্যাণ বা দুঃখ নাশ করিবার জন্যই তো কাব্য। যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক না কেন, কাব্যের উদ্দিষ্ট আনন্দ। সেজন্য সকল কবিকেই আনন্দের কবি বলা যাইতে পারে। তবে 'সুখের কবি' 'দুখের কবি' কথা দু'টার কোন সার্থকতা নাই কি ? আছে বৈ কি ?

মানুষের সম্ভোগ, সুখ, স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, স্ফূর্ত্তি ইত্যাদিকে উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যে কবি রসানন্দ সৃষ্টি করেন তিনি সুখের কবি। আর মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা, নিয়তির পীড়ন, ঐহিক, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য, মূঢ়তা, জরা, পীড়া ইত্যাদিকে উপকরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যে কবি রসানন্দ সৃষ্টি করেন, তিনিই দুঃখের কবি। অ-কবির পক্ষে আনন্দসৃষ্টি শক্ত—সৃষ্টির উপাদান সুখই হোক আর দুঃখই হোক। কবির পক্ষে উভয় উপাদানেই তাহা সহজ। সুখের সঙ্গে আনন্দের আত্মীয়তা আছে—তাই সুখের উপাদানে আনন্দসৃষ্টি সোজা। দুঃখ সহজে চিত্তকে আলোড়িত করে; তাই আনন্দ তাহাতে নবনীর মত ভাসিয়া উঠে,—দুঃখ সহানুভূতি, করুণা, প্রীতি, কল্যাণ, মাধুর্য্য, সহৃদয়তা ইত্যাদিকে উদ্বোধন করে—এ সমস্তই আনন্দেরই অভিব্যক্তি। যাহা সহজে চিত্ত বিগলিত করে, তাহাই সহজে প্রীতিরিও সঞ্চার করে।

দুঃখের কবি যদি সত্যই দুঃখে মুহ্যমান হইতেন, তবে কোন রচনাই করিতে পারিতেন না, ছন্দও আনন্দে ঝঙ্কৃত হইত না,—ভাষা নাচিয়া নাচিয়া চলিতে পারিত না। দুঃখের কবি আনন্দের সন্ধান না পাইলে দুঃখের কাহিনীও বর্ণনা করিতে পারিতেন না। আর দুঃখের কাহিনী যাঁহারা পড়েন, তাঁহারা আনন্দই পান। আনন্দ যদি না পাইতেন তবে দুঃখের কাব্যকে এত ভালবাসিতে পারিতেন না—দুঃখের কবিকে এত বাহবা দিতেন না—ট্রাজেডির অভিনয় দেখিবার জন্য পয়সা খরচ করিয়া রঙ্গ-মঞ্চে ভিড় করিতেন না। যে রচনায় saddest thoughts আছে তাহা sweetest হইতেও পারিত না।

দুঃখকে সবাই এড়াইয়া চলে। দুঃখের কাব্য যে এত আদর পায়, তাহা দুঃখ দেয় বলিয়া নয়, আনন্দ দেয় বলিয়া, সুখে চোখের জল পড়ে না ঠিক কিন্তু চোখের জল আনন্দের একটা অঙ্গবিশেষ। সুখ ও আনন্দের তফাৎটা বুঝিতে পারিলে দুঃখের কাব্য, সুখ না দিক, আনন্দ যে দেয়, সে বিষয়ে কেহ আপত্তি করিবে না।

দুঃখের তরঙ্গে যাহারা হাবুডুবু খায় তাহাদের দৃশ্য বড়ই শোচনীয় সন্দেহ নাই,—তাহাদের কথা খবরের কাগজে পড়িলেই কষ্ট হয়—তাহাদের দুঃস্থ পরিবারের জন্য চাঁদা দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাহাদের লইয়া কাব্য লিখিলে তাহা পড়িয়া আনন্দই জন্মাইবে, চিত্তকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে না। একা কবিই দুঃখ-পাথারে আনন্দের শতদল ফোটাইতে পারেন।

দুঃখের কাহিনী লইয়া কাব্য হয় না, যিনি বলেন তিনি যেমন অকবি, সুখের বিলাস লইয়া খাঁটি কাব্য হইবে না যিনি বলেন, তিনিও তেমনি অ-কবি।
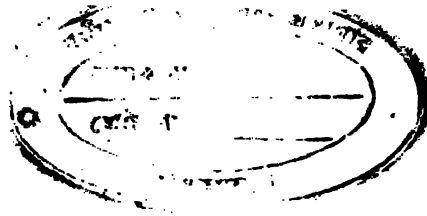
বিশ্ববিদ্যালয়পঞ্জীর এক পৃষ্ঠা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রায় শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী বাহাদুর এই বৃত্তি পান। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নে প্রথম শ্রেণীর সম্মান এবং পর বৎসর এম-এ পরীক্ষায় উক্ত বিষয়ে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত হন। ইনি প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইনি কিছুকাল কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ইনি এক্ষণে কৃষ্ণনগরে অবসরকাল যাপন করিতেছেন।

রায় জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী বাহাদুর
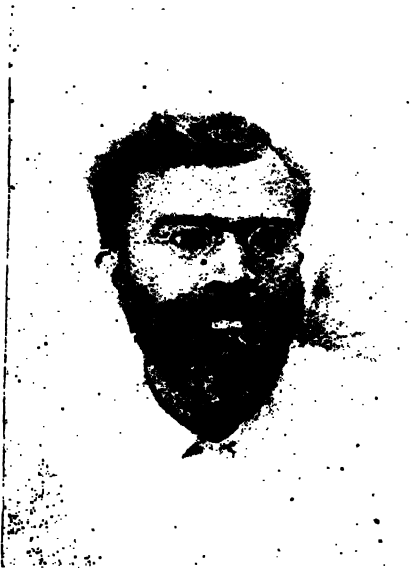
১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ৺সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৃত্তি পান। ইনি আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ ও কলিকাতা উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েরই বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম এবং পর বৎসর উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েরই এম-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন। অতঃপর এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা এল্‌এল্‌-ডি এবং কলিকাতা

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের এডভোকেট এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের অন্যতম রাজনীতিক নেতারূপে ইনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ৪৪ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে অপসৃত হন। ইঁহার সাংখ্যদর্শন বিষয়ক সুদীর্ঘ প্রস্তাব, ঠাকুর আইন অধ্যাপকের বক্তৃতা এবং নানা ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি ইঁহার গভীর চিন্তাশীলতা ও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ৺জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী এই বৃত্তি পান।

ইনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এফ-এ পরীক্ষায় ৩য় স্থান অধিকার করিয়া গণিতে ডফ্ স্কলারশিপ পান, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে প্রথম শ্রেণীর সম্মান প্রাপ্ত হন, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায়

দেওয়ান বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী

গণিতে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইনি মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে এলিয়ট মেডেল পাইয়াছিলেন এবং পরিণত বয়সেও কৃষি ও বীমা বিষয়ে প্রস্তাব লিখিয়া পিএইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। ইনিও ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে প্রবেশ করিয়া একাউণ্টেণ্ট জেনারেল পদে উন্নীত হন কিন্তু অল্পবয়সেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। সংস্কৃত কবিতা রচনায়, বাঙ্গালা কবিতা ও নাটক রচনায়, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রস্তাব রচনায় সর্ব্ববিষয়েই তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইনি কিছুকাল মহীশূরে রাজস্বসচিব ছিলেন এবং মহীশূরাধিপতি ইঁহাকে 'রাজমন্ত্র প্রবীণ' নামক উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। এ সম্মান তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালী পান নাই। গবর্ণমেণ্টও ইঁহাকে 'দেওয়ান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। আমরা ইঁহারও অধীনে কিছুকাল কার্য্য করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ইঁহার রমণীয় গুণগ্রাম প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের প্রতি বন্ধুভাবে সহৃদয়তার সহিত আলাপ করিতে এরূপ অল্প লোককে দেখিয়াছি। ইঁহার অমায়িকতা ও শিষ্টাচারের কথা ভুলিবার নহে।

গতবারে রামচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিয়া ছিলাম তখন তাঁহার ছবি পাওয়া যায় নাই—এই মাসে তাঁহার একখানি ছবি দিলাম।

রামচন্দ্র মজুমদার
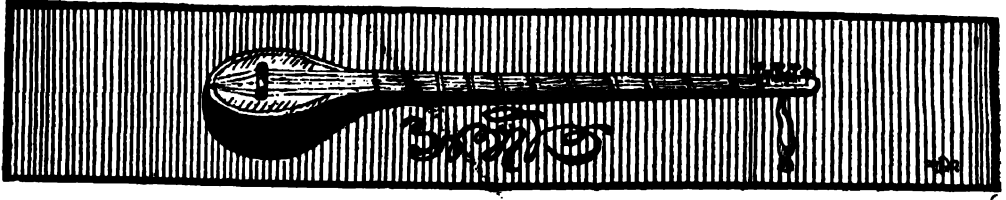
কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা

মিশ্র-ইমন--দাদ্‌রা

আষাঢ়ে আজ নাম্‌ল বাদল
ফুট্‌ল কেয়ার মঞ্জরী
টুপুর টুপুর বাজিয়ে নূপুর
নাচ্‌ল বাদল সুন্দরী।
ইঙ্গিতে চায় চপলা যে
না জানি কোন্ হর্ষে লাজে
বাদ্‌লা ঝরার গানে গানে
কি সুর বেড়ায় সঞ্চরি'!
মেঘ বালাদের উৎসবে আজ
কুন্দ কদম ফুট্‌ল যে,
ঘরছাড়া আজ পূবের হাওয়ায়
মনের আগল টুট্‌ল যে;
মেঘ-নটিনীর নাচন্ তালে
নাচ্‌ল শিখী আপন তালে,
তপ্ত মরুর সিক্ত সুখে
গাইল চাতক গুঞ্জরি'!

স্থায়ী :—

+ o + o + o
[I গনা ধা -পা | পা -া পা I পা -হ্মা পা | গা গা -া I রা -গা রা | গা মা -মা I
আ॰ ষা ঢ়ে আ জ না ল বা দ ল ফু ট্ ল কে য়া র

+ o + o + o
গা -া গা | রা -া -সা I সা সা -া | রা রা -রা I গা হ্মা পা | পা পা -া I
ম ঞ্ জ রি ॰ ॰ টু পু র টু পু র বা জি য়ে নূ পু র

+ o + o
হ্মা পা ধা | না না না I ধা না র্রা | র্সা -া -া II
না চ ল বা দ ল সু ॰ ন্দ রি ॰ ॰

অন্তরা ও আভোগ :—

\+ o + o + o
II গা -া গা | পা -া -ধা I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I না না -া | ধা ধা -া I
ই ং গি তে চা য় চ প ০ লা যে ০ না জা ০ নি কো ন্
মে ঘ ন টি নী ঃ না চ ন তা লে ০ না চ ল শি খী ০

\+ o + o + o
না -া ধা | পা জ্ঞা -া I র্সা -র্গা র্গা | র্মা র্মা -া I র্গা -া র্রা | না র্সা -া I
হ ০ র্ষে লা জে ০ বা দ্ লা ঝ রা র্ গা ০ নে গা নে ০
আ প ন তা লে ০ ত প ত ম রু র্ সি ০ ক্ত সু খে ০

\+ o + o
পধা না -র্সা | না ধা -পা I পা -জ্ঞা জ্ঞা | গা -া -া II
কি০ সু র বে ড়া য় স ০ ঞ্চ রি ০ ০
গা ই ল চা ত ক গু ০ ঞ্জ রি ০ ০

সঞ্চারী :—

\+ o + o + o
II সা -া পা | সা সা -রা I গা -া গা | গা গা -া I রা গা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -া I
মে ঘ বা লা দে র উ ৎ স বে আ জ কু ০ ন্দ ক দ ম

\+ o + o + o
জ্ঞা -পা ধা | পা -া -া I না -া ধা | পা পা -া I পা জ্ঞা -পা | গা গা গা I
ফু টু ল যে ০ ০ ঘ র্ ছা ড়া আ জ পূ বে র হা ও য়া

\+ o + o
রা গা -মা | মা মা -া I গা -া রা | সা -া -া II
ম নে র আ গ ল্ টু টু ল যে ০ ০

প্রাচীন-পুঁথির পাটা

প্রাচীন-পুঁথির পাটা

রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন

১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দের বিশ্বভারতী কোয়াটার্লির তৃতীয়খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর আমেরিকার 'ডিস্‌কাশন গিল্‌ড্‌ ও ভারতীয় সমিতি' হইতে রবীন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমরা তাহার কিয়দংশ ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম।

*　　*　　*

গিল্‌ড্‌ আর সমিতির পক্ষ হইতে কবিকে শ্রীযুক্ত এম এস্‌ নোডিক স্বাগতোক্তি জানান। অভিনন্দন-সভার সভানেত্রী হইয়াছিলেন শ্রীমতী মেরি উলি। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নোডিক বলেন, 'আমেরিকার একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলাকে আমরা আমন্ত্রণ করিয়াছি এবং আমাদের ভাগ্য যে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের 'ডিন্' যাঁহাকে বলা যাইতে পারে তিনি আজ নেতৃত্ব করিতে আসিয়াছেন—তিনি হইলেন মাউণ্ট হলিওক কলেজের কর্ত্রী।' শ্রীমতী উলি তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—'আমি জানি আজ যিনি আমাদের অতিথি, তাঁহাকে পরিচিত করাইবার প্রয়োজন নাই। আমার মনে হয় কোন স্বাগত বাণীও তাঁহাকে বলিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁহাকে ভক্তি নিবেদন করিবার জন্য শত শত লোক যে সমাগত হইয়াছেন, তাহার অপেক্ষা স্বাগত আর কি হইতে পারে?

*　　*　　*

আমাদের অতিথির এমন কোন্ বিশেষ একটী কার্য্য নির্দ্দেশ করা যায় না, যাহা স্বতন্ত্রভাবে প্রশংসিত বা প্রচারিত হইবে। তাঁহার কার্য্য বহুমুখী ও বিস্তৃত। ভারতের সমস্যাসমাধান করিবার পক্ষে তাঁহার অপেক্ষা অধিক আর কেহ কিছু করেন নাই, করিতেছেন না।' তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধীয় কার্য্যে ব্যক্তিত্বের গৌরবের উপর তিনি জোর দিয়াছেন—শান্তির আদর্শের উপর জোর দিয়াছেন।

*　　*　　*

'পঁচিশ বছরের অধিক কাল পূর্ব্বে তিনি সুদূর ভারতবর্ষে ছেলেমেয়েদের জন্য একটী বিদ্যাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। আমরা, যারা বড় বড় ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কিছু নই, তার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিলে আনন্দিত হইতে পারিতাম; কারণ সেখানে শিক্ষাদানের অন্তর্নিহিত ব্যাপারটা হইতেছে বড় হইবার স্বাধীনতা দিয়া প্রত্যেক শিশুকে বিকাশোন্মুখ করা। ধরাবাঁধা পাঠ্যবিধির উপর তাঁহার আস্থা ছিল না, সুতরাং কবির প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাগারে তরুছায়ার তলে শিক্ষা দেওয়া হয়—জীবন্ত প্রকৃতির মাঝখানে, সেখানে নাটক-নাটিকা অভিনীত হয়, নৃত্য হয়, বসন্তের গান হয়, বর্ষার গান হয়। সেইসকল গান কবির দ্বারা রচিত ও সুর-সংযোজিত হইয়া উৎসবের আনন্দ বর্দ্ধন করে।

*　　*　　*

মুক্তি ও প্রগতি—এই দুইটী হইল তাঁহার বিদ্যাগারের মূল কথা। তার চারিদিকে কৃষ্টির আব-হাওয়া। অনেক কিছু জ্ঞান যাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে এমন সব পণ্ডিত সেখানকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে আসেন। জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও সেখানে মুক্তি আছে, স্বাধীনতার মন্ত্রে ছেলেমেয়েদের হৃদয় সেখানে সঞ্জীবিত।'

*　　*　　*

পরিশেষে শ্রীমতী উলি বলেন, 'আজ আমি আপনাদের কাছে তাঁর কথা বলিতেছি যে মানুষ কবি ও দার্শনিক, জ্ঞানদাতা এবং সমগ্র মানুষের সমাজের মিত্র।' শ্রীযুক্ত নোডিকও শেষে বলেন যে, কবি যখন প্রাচ্যে ফিরে যাবেন, তিনি যেন সমাজের এই বাণী লইয়া যান যে আমরা আশা করি প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের যথার্থ মিলন ঘট্‌বে—মানবের হিতার্থে উভয়েই কাজ ক'র্‌বে।'

* * *

কবীন্দ্রের প্রত্যুত্তর হইতে কয়েকটী কথা অনুবাদ করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।' তোমাদের সভ্যতার ফল কি? তোমরা বাহির হইতে দেখিতে পার না। মানবের নিকট তোমরা কিরূপ ভীতির নিদান হইয়াছে, তাহা তোমরা উপলব্ধি কর না। আমরা তোমাদিগকে ভয়ের চক্ষুতে দেখি। প্রত্যেক স্থানে লোক পরস্পরের প্রতি সন্দেহ-যুক্ত। প্রতীচ্যের সমস্ত বড় দেশই প্রস্তুত হইতেছে যুদ্ধের জন্য—এমন কোন ধ্বংসের বৃহৎ কার্য্যের জন্য যাহার বিষ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইবে।

* * *

এই বিষ তাহাদের নিজেদের মধ্যেই আছে। তাহারা ইহার সমাধান করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় না, কারণ মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি তাহারা বিশ্বাস হারাইয়াছে—আত্মার বুদ্ধিতে তাহারা বিশ্বাস হারাইয়াছে। তাহাদের মন পূর্ণ হইয়াছে পারস্পরিক সন্দেহ, ঘৃণা ও ক্রোধের দ্বারা। তবুও তাহারা এমন কোন যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে চায় যাহার সাহায্যে সমস্ত বিপদ ঘুচিয়া যাইবে।

* * *

তাহারা নিরস্ত্রীকরণের (disarmamentএর) দাবী করে, কিন্তু তাহা বাহির হইতে আসিতে পারে না—কাজের কর্ম্মপটুতা আছে, কিন্তু শুধু তাহাতেই কোন কাজ হয় না। কেন? কারণ ব্যক্তি হইল মানব আর যন্ত্র হইল মানবতা-হীন। শক্তিতান্ত্রিক লোকদের বাহিরের জিনিস-সম্বন্ধে নৈপুণ্য আছে, কিন্তু মানবের ব্যক্তিত্ব তাহারা হারায়। ব্যক্তির মধ্যে অলৌকিক যাহা আছে, মনুষ্যত্বের মধ্যে ঐশী যাহা আছে, তাহার বোধ তোমাদের নাই।

* * *

আমি ইহা উপলব্ধি করিয়াছি, আমি আপনাকে প্রশ্ন করিয়াছি, কোথায় তাহার সন্ধান পাইব—মহৎ মানব? চরম মানব? শক্তির এবং ঐশ্বর্য্যের যন্ত্রের মধ্যে জগতের মনুষ্যত্বকে পাইব না। যদি তিনি সভ্যতার হৃদয়ের মধ্যে নাই, তবে কোথায় তিনি? মহামানব, ফসল-সংগ্রাহক মানব, গীতকার মানব, স্বপ্নদ্রষ্টা—কোথায়?

* * *

প্রতিদিন আমি বোধ করি আমার হৃদয় আমার দেশে ফিরিয়া গিয়াছে—যে স্বপ্ন দেখে, যে ভগবানকে বিশ্বাস করে তাহার কাছে ফিরিয়া গিয়াছে। আমি সেই ভগবানকে অনুসন্ধান করি এবং আমি আমার নিজের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাই। সেখানে আমার বিদ্যালয় আছে। সে বিদ্যালয়কে সাধারণ বিদ্যালয় ভাবিলে ভুল হইবে। মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্করূপ ঐশ্বর্য্য সেখানে আমাকে সুখী করে। সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা সব আমার পুত্রকন্যা। সেই বিদ্যালয়ের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা অনির্ব্বচনীয়। আমাদের সম্বন্ধ—আত্মার সম্বন্ধ। হয় তো আমি তার যোগ্য নই, কিন্তু তাহারা আমার মধ্য দিয়া 'মানব'কেই ভক্তি করে—স্কুলমাষ্টারকে নয়, তাহার অতীত আর কিছুকে। ইহা কুসংস্কার নহে। প্রাচ্যে আমরা মনুষ্যত্বকে সকলের অপেক্ষা বড় করিয়া দেখি।'

* * *

ম্যাট্রিকুলেশনে বিজ্ঞান শিক্ষা

গত মাসে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য কি না সে সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি; এবারে ম্যাট্রিকুলেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থার যে পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব সেনেট-সভায় উপস্থাপিত হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাই। আমাদের ছাত্রাবস্থায় এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় Geikie's Physical Geography ও Huxley's Science Primer নামক বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় দুইখানি পুস্তিকা অবশ্যপাঠ্যরূপে

নির্দ্ধারিত ছিল। এই দুইখানি পুস্তক হইতে ভূগোল ও বিজ্ঞানের মূল সত্যের সহিত প্রত্যেক ছাত্রেরই কিছু না কিছু পরিচয় হইত। তারপর আশুবাবুর নব-বিধানে বৈশিষ্ট্যের যুগে ম্যাট্রিকুলেশন হইতে সাধারণ ছাত্রের পক্ষে বিজ্ঞান একবারে বাদ পড়িয়া যায়, কিন্তু এখন আবার অনেকেই বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষা সকলেরই পাওয়া উচিত মনে করিয়া পূর্ব্বের মত বিজ্ঞান-শিক্ষা যাহাতে ম্যাট্রিকুলেশনে চলিতে থাকে তাহার জন্ত উদ্যোগী হইয়াছেন। বাস্তবিকই বিজ্ঞান-শিক্ষার বহুল প্রচার না হইলে—বিজ্ঞানের নানাবিষয়ের সারসত্যের সহিত পরিচয় না থাকিলে ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক জ্ঞান না জন্মিলে শিক্ষার প্রসার লাভ হয় না। বিজ্ঞান-সম্বন্ধে কৌতূহল উদ্রেক করিতে হইলে ম্যাট্রিকুলেশন হইতে চেষ্টা না করিলে চলিবে না। পূর্ব্বে যখন পূর্ব্বোক্ত দুইখানি বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক অবশ্যপাঠ্য ছিল তখন তাহারা পাঠের চাপে কষ্ট পায় নাই, আর এখন ঐরূপ বিজ্ঞান-বিষয়ক তথ্যপূর্ণ অবশ্যজ্ঞাতব্য পুস্তক বা পুস্তিকা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইলে ছাত্রদের প্রতি কিছুমাত্র অবিচার করা হইবে না। অধিকন্তু বিজ্ঞানচর্চ্চা দেশে বিস্তৃতভাবে চলিলে অন্নবস্ত্রের সমস্যার পথ অনেকটা সুগম হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সেদিন স্যর বেঙ্কটরমণ বেকার-সমস্যা দূর করিবার জন্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটার প্রতি নজর না রাখিলে দেশের উন্নতি হইবে না—হইতে পারে না। তাই আমরা এই বিধান সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।

*　　*　　*

লোকান্তরে

আজ যাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া আমরা শোকসন্তপ্ত তিনি ছিলেন আমাদের অকৃত্রিম স্নেহাস্পদ বন্ধু—কাশী-ধামের হরিহর শাস্ত্রী মহাশয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি আমাদের কার্য্যালয়ে আসিয়া তাঁহার প্রেরিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন—সে প্রবন্ধ এই মাসেই প্রকাশিত হইয়াছে। ভবিষ্যতের জন্ত তিনি যেভাবে [illegible]'র সেবা করিবেন তাহাও জানাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় কুশাগ্রবুদ্ধি সংস্কৃতজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত খুব বিরল। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তিনি প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন। তাঁহার রচনার আমরা বড়ই পক্ষপাতী ছিলাম—তাহা যেমন সরল, তেমনই ভাব-গভীর। তাঁহার সমালোচনাশক্তির প্রাখর্য্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম। নৈয়ায়িকের ন্যায় সূক্ষ্মবিচার যেমন তিনি করিতে জানিতেন, ভাবের দিক্ দিয়া তেমনই দুর্ব্বোধ্য বিষয়বস্তুকে মনোরম ও সাধারণগ্রাহ্য করিয়া উপস্থাপিত করিতে পারিতেন। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির পাঠোদ্ধার তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন সরল, অমায়িক প্রকৃত বিদ্বান্‌কে হারাইয়া বাঙ্গালাদেশ আজ মুহ্যমান। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল মাত্র ৪২ বৎসর, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার গুণগ্রাম ভারতবর্ষবিস্তৃত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

*　　*　　*

আমরা আজ আর একজন প্রতিভাসম্পন্ন উদীয়মানা লেখিকার অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত। কুমারী পুষ্পরাণী ষোল বৎসর বয়সেই ২১এ জ্যৈষ্ঠ ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মাতামহ শ্রদ্ধেয় মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। রেডিয়োর শ্রোতারা তাঁহার গান ও গল্প প্রায়ই শুনিতে পাইতেন। প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ হইবার পূর্ব্বেই আমরা পুষ্পরাণীকে হারাইয়াছি।

*　　*　　*

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ৮৮তম জন্মোৎসব

'গিরিশসঙ্ঘে'র উদ্যোগে কলিকাতার নাট্যপীঠে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ৮৮তম জন্ম-বার্ষিক-উৎসব গত ১১ই আষাঢ় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধেয় মাননীয় বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। নাট্যপীঠে প্রবেশ করিয়া বহুল ছাত্র-সমাগম দেখিয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহার পর তাহাদের কার্য্যকলাপে তেমন প্রীতিলাভ করিতে

পারি নাই। আনন্দের কারণ বুঝিয়াছিলাম ছাত্রেরা প্রকৃতই গুণীর আদর করিতে শিখিয়াছে বলিয়া—গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধার স্রক্‌চন্দন দান করিতে তাহারা আসিয়াছে বলিয়া; কিন্তু বক্তাদের বক্তৃতা যখনই অযথা দীর্ঘ হইতেছিল বা যখন তাহাদের ভাল লাগিতেছিল না, তখনই তাহারা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছিল। ইহাতে অবশ্য দোষের কারণ নাই—ইহা জীবনের লক্ষণ—প্রাণের স্পন্দনের অনুভূতির পরিচায়ক; কিন্তু তাহার পর যখন মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের ইঙ্গিত ও বাক্য অবহেলা করিতে দেখিলাম, তখন স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মানীর মানরক্ষা করিতে যাহারা জানে না তাহারা ভারতের প্রাচীন ধারার প্রতি—প্রকৃত শিক্ষার প্রতি—কৃষ্টির প্রতি কোনদিন অবহিত হইয়া চিন্তা করে নাই ভারতের বৈশিষ্ট্য কোথায়? তারপর যখন জনতা যাহা চায় তাহাই করিতে লাগিল তখন অগত্যা সভাস্থল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। কোন বিশিষ্ট বন্ধু ছাত্রদিগের এই দুর্বিনীত ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষোভপ্রকাশ করিলে উত্তরে আমি বলিতে বাধ্য হই—'বন্ধু ইহার জন্য দায়ী কে বা কাহারা? আমাদের আধুনিক শিক্ষার উপর অযথা দোষ দিলে তো চলিবে না। দায়ী আমরা! আমরা আমাদিগের পুত্রকন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াই আমাদের সর্ব্ব কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করি, কিন্তু আমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছি শিক্ষার পূর্ব্বে, আচার ও বিনয় সম্বন্ধে শিক্ষা দান করা উচিত। আমরা তাহাদের 'সহবৎ' শিক্ষার জন্য কি করিয়া থাকি? আমাদের দেশের প্রবাদবাক্য 'হ'বে পো তো সহবতে থো' কথাটা কখন কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি—আচার ও বিনয় সম্বন্ধে প্রকৃত শিক্ষা না পাইয়া যদি আমাদেরই পুত্রেরা এইরূপ দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করিয়া থাকে তাহার জন্য আমরাই দায়ী! এজন্য যদি প্রকৃতই লজ্জিত হইবার কারণ কাহারও থাকে সে আমাদেরই হওয়া উচিত।' অপর পক্ষে শিক্ষিত যুবকদিগকে জিজ্ঞাসা করি—বিনয়হীন বিদ্যার মূল্য কি?

* * *

তবে এ সম্বন্ধে বয়স্থ ছাত্রদিগকেও বলি, ভাল না লাগিলে সে স্থলে গোলমাল না করিয়া চলিয়া গেলে তাহাদের পক্ষে অধিকতর শোভন হইত না কি? যাহারা শুনিতে চায়, তাহাদের প্রতি তাহাদের কি কোন কর্ত্তব্যই নাই। ভবিষ্যতের আশা-ভরসার স্থল যুবকদিগকে আর কিছু বলিতে চাই না। আর একটা কথা বক্তাদিগকেও বলি, শ্রোতাদিগের ভিতর চাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে দেখিলে তাহারা কেন সংযত হন না। প্রকৃতই যদি শিক্ষা দিবার—নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইবার কিছু থাকে তাহা হইলে অন্য উপায়েও তো সে কার্য্য সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। সংবাদ-পত্রের সাহায্যে তাহা অক্লেশেই হইতে পারে না কি?

* * *

মধুসূদনের শ্রাদ্ধ-বাসরে

গত ১৪ই আষাঢ় খিদিরপুরের মধুসূদন লাইব্রেরীর কর্ম্মকর্ত্তারা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল দাস বি-এল-কে পুরোভাগে রাখিয়া লোয়ার সার্কিউলার রোডস্থ কবরস্থানে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি দান করিয়াছিলেন। তৎপরে সন্ধ্যার সময় ৭টা ২০ মিনিট হইতে ৮টা ৫০ মিনিট পর্য্যন্ত ও তাহার পরে ৯টা ৩০ মিনিট হইতে ১০টা ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত 'রেডিও' আর্টিষ্টদের সহযোগিতায় আবৃত্তি, গান, মাইকেল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন ও শ্রদ্ধেয় কবিবরের শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিয়াছিলেন।

বৈকালিক এই অনুষ্ঠান আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে, কলিকাতাবাসী যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। বাস্তবিক মধুসূদনের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবার নূতন কোন পন্থা উদ্ভাবন করিতে না পারিলে চলিবে না। অবশ্য শুধু তাঁহার রচনাই তাঁহাকে চিরঅমর করিয়া রাখিবে সত্য—'গৌড়জন যাহে করিবে আনন্দে পান সুধা নিরবধি'—কিন্তু সে পাঠ-স্পৃহা জাগাইবার নূতন উপায় বাহির করিতে হইবে। সে রসের সন্ধান বলিয়া দিলেই হইবে না—কাণের ভিতর দিয়া যাহাতে মরমে প্রবেশ করিয়া শ্রোতার প্রাণকে আকুল করিয়া তুলে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ভুলিলে চলিবে না মানুষের স্মৃতি অল্পকালস্থায়ী—নূতনের মাদকতায় আমরা পুরাতনকে ভুলিতে বসি। পুরাতনকে সজীব করিয়া রাখিতে না পারিলে—পুরাতনের উপর নূতনের ভিত্তি গঠিত না করিতে

পারিলে সমাজ-জীবনের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। সে দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা চাই।

* * *

যোধপুরাধিপতির দান

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোধপুরের বদান্যবর মহারাজ বাহাদুর একটী কৃষি-কলেজ স্থাপিত করিবার জন্য দুইলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে হইলে শিক্ষা ও আর্টের সর্ব্ববিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদিন কৃষি-কলেজের অভাব বড়ই অনুভূত হইত। কৃষিপ্রধান ভারত-বর্ষের জন্য যে আধুনিক যুগের উপযোগী কৃষি-কলেজের আবশ্যকতা আছে তাহা আর কাহাকেও কি অধিক করিয়া বলিতে হইবে! কৃষিপ্রধান দেশের লোকেরা সনাতন উপায়ে চাষবাস করিয়া আসিতেছে ও দেশ-প্রচলিত জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যেসকল উপায় চলিয়া আসিতেছে তাহাই ব্যবহার করিয়া সফলকাম হইতে পারিতেছে না। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে অল্প-পরিশ্রমে জমীর উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে দেশের মঙ্গল সুদূরপরাহত। এই সদুদ্দেশ্যে মহারাজের দান যেমন উপযোগী ও সাময়িক হইয়াছে, তেমনই ইহার প্রসারও বহুবিস্তৃত হইলে ভারতের সুফল অবশ্যম্ভাবী।

এই সম্পর্কে বাঙ্গালা দেশের জন্য একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কৃষি-কলেজ এখনও স্থাপিত হইতেছে না দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। নদীমাতৃক বাঙ্গালাদেশে এরূপ কলেজের আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী; কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে যে একটী সামান্য সরকারী বিদ্যালয় চুঁচুড়ায় চলিতেছিল, তাহারও নামগন্ধ আর শুনা যায় না। শিক্ষিত বাঙ্গালীর ছেলেদের এদিকে যেমন অবহিত হওয়া উচিত, তেমনই উদার-হৃদয় কোন দানবীরের এবিষয়ের উন্নতির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করা উচিত।

* * *

হাই-কমিশনার

গত ১৩ই আষাঢ় স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে হাই-কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তির স্থলে যোগ্য ব্যক্তিই মনোনীত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী। স্যর অতুলচন্দ্র এই ভার সমর্পণ করিয়া এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এল-এল-ডি উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য স্কটলণ্ডে গমন করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও উপাধি দান যোগ্য ব্যক্তির উপরই যে অর্পিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

কামেত-অভিযান

গত বৎসর ব্রিটিশ কাঞ্চনজঙ্ঘা-অভিযান-সম্প্রদায় হিমালয়ের জংসং শিখর পর্য্যন্ত অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। উহার উচ্চতা ছিল ২৪৩৪০ ফুট। এ বৎসর এফ, এস, স্মাইথ সাহেব পাঁচজন সঙ্গীসহ যুক্তপ্রদেশের কামেত শিখরের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিবার চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। এই শিখরটীর উচ্চতা কাঞ্চনজঙ্ঘার নিম্নেই—২৫৪৪৭ ফুট। গত ১৩ই আষাঢ়ের টেলিগ্রাফ হইতে জানিতে পারা যায় স্মাইথ সাহেব এই অসমসাহসিক কার্য্যে সকলকাম হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে এই পর্ব্বতের উপর উঠিবার জন্য নয়বার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কেহই কোনবার কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইংরাজ জাতির অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে পর্ব্বতারোহণদক্ষ যুবক স্মাইথ সাহেব এই অসাধ্যসাধন করিয়াছেন। বিলাতের 'টাইম্‌স্' পত্রের নিজস্ব সংবাদদাতার সংবাদ হইতে এই সংবাদ জানা গিয়াছে। শীঘ্রই কামেত শিখরের বিষয় সম্পূর্ণভাবে জানা যাইবে আশা করা যায়।

* * *

মনীষার কার্য্যকলাপ

আজ আমরা পাঠকদিগের নিকট পাঁচজন গণিতজ্ঞের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী প্রদান করিব। দেখাইতে চেষ্টা করিব প্রতিভা সহজজ্ঞানের উপর যতটা নির্ভর করে, ততটা আর কিছুরও উপর করে না। মনীষার অলৌকিক শক্তির উৎস কোথায় বিলাতের 'টিটস্-বিট' পত্রিকা চারিজন গণিতজ্ঞের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছে। আমরা ঐ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার উদ্ধার করিয়া অপর একজন বাঙ্গালী গণিতজ্ঞ শ্রীযুক্ত সোমেশ বসুর জীবন-কাহিনীও এই প্রসঙ্গে

বিবৃত করিব,—ইঁহারা হইতেছেন মৃত রামানুজম্, বার্ন্নটন্, উইলিয়ম্ গিবসন্, নিকোলাস সণ্ডারসন ও সোমেশ বসু।

মান্দ্রাজ প্রদেশের রামানুজমের জীবন-কাহিনী ইতিপূর্ব্বে নানাপত্রিকায় কতক প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবাসী গণিতবিষয়ে চর্চ্চা বহুদিন হইতে করিয়া আসিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা জগতকে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন, ঐসকল তথ্য আরবদিগের মারফত পাশ্চাত্য-জগতে জানিয়া ধন্য হইয়াছে। সেদিনও বিলাতে ও আমেরিকায় শ্রীযুক্ত সোমেশ বসু মুখে মুখে বড় বড় গুণভাগ, বর্গফল, ঘনফল প্রভৃতি কঠিন কঠিন মানসাঙ্ক অল্প-সময়ের মধ্যে উত্তর দিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি বিলাতে একশত সংখ্যাকে একশত সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া গুণফল নির্ভুল করিয়া ৫২½ মিনিটের মধ্যে উত্তর দিয়াছেন।

এই সকল গণিতজ্ঞদিগের ভিতর সর্ব্বপ্রথমেই যাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি হইতেছেন শ্রীনিবাস রামানুজ আয়ঙ্গার। ১৮৮৭ সালে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে জন্মগ্রহণ করেন ও ৩২ বৎসর বয়সে ১৯২০ সালে অকালে পরলোক গমন করেন। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যাবস্থায় পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। সে সময়ে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র দেখাইতে পারেন নাই। এমন-কি দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাকে সাধারণ ছাত্রের মতই দেখা যাইত। স্কুলে ভর্ত্তি হইবার পর তাঁহার প্রতিভা-স্ফুরণের সুবিধা ঘটে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে যখন বালক রামানুজ পড়িতেছিল, তখন ১ম শ্রেণীর জনৈক ছাত্রের নিকট হইতে ত্রিকোণমিতি লইয়া পাঠ করেন। ইহার পূর্ব্বে এ বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ অভিজ্ঞতাই ছিল না, এমন-কি এ বিষয়ের কোন পুস্তকই তিনি দেখেন নাই, অথচ উপন্যাসের মত সহজভাবেই তিনি পুস্তকখানি পড়িয়া আরম্ভ করেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় কঠিন কঠিন উপপাদ্যগুলি সহজেই প্রমাণ করিতে পারিয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর হইতে গণিতশাস্ত্রের দিকে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ বাড়িয়া যায় এবং এ বিষয়ের গভীর তথ্য-সকল সমাধান করিতেই ব্যগ্র হইয়া পড়েন, ফলে পাঠ্য-পুস্তকের প্রতি তাঁহার আদৌ আগ্রহ দেখা যায় নাই এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন। কিন্তু আমরা জানি তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯০৯ সালে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই সময় বিধবা জননী, পত্নী ও ছোট ছোট ভাই-ভগিনীদিগের প্রতিপালন করিবার জন্য ২০৲ টাকা বেতনে তাঁহাকে সামান্য একটী চাকুরী গ্রহণ করিতে হয় এবং অবসর সময়ে ছাত্রদিগকে পড়াইয়া কিঞ্চিৎ আয় বৃদ্ধিও করিতে হয়। ইহা ছাড়া অবসর সময়ে উচ্চগণিতের আলোচনাও করিতে থাকেন। এই সময়ে কোন সদাগরের উচ্চ কর্ম্মচারীর অনুগ্রহে রামানুজম্ মান্দ্রাজের পোর্টট্রাষ্ট অফিসে একটী কিছু বেশী বেতনের চাকুরী পান। এখন অবসর সময় তাঁহার একটু অধিক হইল। এই সময়ে একাগ্রচিত্তে তিনি গণিত-বিষয়ক সমস্যার সমাধান করিতে লগিলেন। তাঁহার গণিত-বিষয়ক প্রশ্নসকল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন গণিতজ্ঞদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তাঁহারা যুবক রামানুজের ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে কেম্ব্রিজে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। কিন্তু বিলাত যাইবার পক্ষে তাঁহার প্রথম অন্তরায় হয় সমুদ্র-যাত্রা। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাদের বংশে কেহ কখনও সমুদ্র-যাত্রা করেন নাই। যুবকের আশাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু সাধনায় বিরতি দেখা গেল না। অতঃপর তাঁহার জননী ভগবতী নানীগিরির প্রত্যাদেশ পাইয়া রামানুজকে বিলাত যাইবার অনুমতি দেন। মান্দ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয় ১৯১৪ সালে তাঁহাকে একটী বৃত্তি প্রদান করিয়া তাঁহার সাধনার পথ আরও সুগম করিয়া দেয়।

কেম্ব্রিজে আসিয়া দিন-রাত ধরিয়াই তিনি গণিত-সাধনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রায়ই নিদ্রাভঙ্গে শয্যাত্যাগ করিয়া নূতন নূতন তথ্যের উদ্ভাবনা তিনি করিতেন—যেন তিনি এইসকল সত্য স্বপ্নে লাভ করিয়াছেন। ১৯১৮ সালে ভারতবাসীর ভিতর তিনিই সর্ব্বপ্রথমে রয়েল সোসাইটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই সদস্যপদ লাভের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ব্রিটিশ শাসিত সমগ্র দেশের ভিতর মাত্র ২৮ জন বৈজ্ঞানিক, যাঁহারা নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিবেন, তাঁহারাই এই পদলাভ করিতে পারিবেন। একজন বর্ত্তমান থাকিতে

অপর একজন তাঁহার স্থানে মনোনীত হইতে পারিবেন না। তাঁহার অপূর্ব্ব উদ্ভাবনীশক্তির দরুণ তিনি এই পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পরে ভারতবাসীর ভিতর স্তর জগদীশ, ডাঃ মেঘনাথ সাহা ও স্তর রমণ এই সোসাইটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে, নিরামিষাশী রামানুজ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। পত্নী তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। বিলাতের বুধমণ্ডলীর চেষ্টায় কোনরূপে আরোগ্য-লাভ করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিয়া রামানুজ আবার গণিতসাধনায় ব্যাপৃত হন। ১৯২৪ সালে পুনরায় যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মারা যান। বিলাতে থাকিবার সময়ও তিনি নগ্নপদে ভ্রমণ করিতেন অত্যন্ত সাধারণভাবে তিনি জীবনযাত্রা করিতেন। ১৯১৮ সালে ট্রিনিটিকলেজ, কেম্ব্রিজের তিনি 'ফেলো' নির্ব্বাচিত হন।

সত্য কথা বলিতে কি, নিউটনের পর এত বড় মনীষা আর কাহারও বড় একটা দেখা যায় না। জ্ঞানরাজ্যের প্রবেশের কুঞ্চিকা যে গণিতশাস্ত্র তাহা খুলিবার পথ রামানুজ সত্যই সুগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কালে তাঁহার গুণ-গ্রাম যতই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে ততই জগতের দৃষ্টি তাঁহার দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইবে।

এইবার যে মনীষীর রেখা-চিত্র অঙ্কিত করিব তাঁহার যথাযোগ্য সমাদর ইংলণ্ড করিতে পারে নাই। ইঁহার নাম Jedediah Buxton। ইনি ডার্বি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সহজজ্ঞানে ইনি বড় বড় অঙ্ক মুখে মুখে কষিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেন। কোনদিনও তিনি লিখিতে বা পড়িতে শিখেন নাই। নিজের জীবিকার জন্ম তিনি কৃষিকার্য্য করিতেন।

একদিন হঠাৎ যখন তিনি মাঠের মাঝে চাষের কাজে ব্যাপৃত, তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয় ১ইঞ্চি ঘন আট ভাগের একভাগে কতভাগ আছে যাহার তিনটী দিক্ যথাক্রমে ২৩,১৪৫,৭৮৯ গজ, ৫,৬৪২,৭৩২ গজ ও ৫৪, ৯৬৫ গজ? (How many cubical eighths of an inch are there in a body whose three sides are 23, 145, 789 yards, 5,642, 732 yards & 54, 965 yards?)

কাজ করিতে করিতেই বাক্সটন ৫ ঘণ্টার মধ্যে ঠিক উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা বড় বড় গণিতের সংখ্যাসম্বন্ধীয় জটিল প্রশ্ন তিনি মানসাঙ্কের সাহায্যে আশ্চর্য্যরূপে কষিয়া দিতে পারিতেন। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক তাঁহার আর একটী শক্তি ছিল, তিনি বড় বড় হিসাব মনের ভিতর বহুদিন ধারণ করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন; এ বিষয়ে জগতে তিনি অদ্বিতীয় লোক ছিলেন।

১৭৫৪ সালে বাক্সটন ইংলণ্ডে রাজা ও রাজপরিবার-বর্গকে দেখা করিতে আসিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। ড্রুরি লেনে থিয়েটারে গিয়া প্রসিদ্ধ অভিনেতা গ্যারিক যতগুলি কথা বলিয়াছিলেন তাহা ও প্রত্যেক নৃত্যপরায়ণ নট-নটীর পদশব্দ গণনা করিয়া বলিয়া দিয়ছিলেন কিন্তু অরচেষ্ট্রা হইতে নানাবিধ শব্দ-তরঙ্গ উত্থিত হওয়ায় তাহাদের প্রত্যেক কম্পনটী গণনা করিয়া ধরিতে পারেন নাই।

আর একজন এ বিষয়ে দক্ষ ছিলেন উইলিয়ম গিবসন। ইনি ছিলেন ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ডের কৃষক। আপনার যত্ন ও চেষ্টায় ইনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে নয় সংখ্যার সহিত নয় সংখ্যার গুণন তিনি মুখে মুখে বলিয়া দিতেন। যৌবনে প্রকৃতিদত্ত শিক্ষার উপর নিজের চেষ্টায় গৃহে বসিয়া কাহারও সাহায্য না লইয়া শিক্ষা করিয়া সদ্যপ্রকাশিত নিউটনের উদ্ভাবিত সত্যগুলির যাথার্থ্য নির্ণয় করেন। জার্ম্মেণী হইতে উচ্চগণিতের ছাত্রেরা তাঁহার সংবাদ পাইয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া উচ্চগণিতের জটিল সমস্যাসকল সমাধান করিয়া লইয়া যাইত। তাঁহার গোলাবাড়ীতে ১০।১২ জন ছাত্র প্রায়ই তাঁহার নিকট শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে আসিত।

প্রায় জন্মান্ধ নিকোলাস স্যাণ্ডারসন স্মৃতিশক্তির প্রাখর্য্যবশতঃ গুণ, ভাগ কষিয়া দিতেন, বর্গফল, ঘনফল অনায়াসে অনেক দশমিক পর্য্যন্ত বাহির করিয়া দিতে পারিতেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ ডক্টর-অব-ল উপাধিতে তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানার্হ গণিতের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

এবার যাঁহার কথা বলিব তিনি আমাদের বাঙ্গালা দেশের একজন সুসন্তান। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্র-

যোগিনী গ্রামে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৮৮৮ইং) জন্মগ্রহণ করেন। ৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়ার দিকে তাঁহার মনোযোগ আদৌ ছিল না। ৬ বৎসর বয়সেও বর্ণমালা শিখিতে না পারার দরুণ তাঁহাকে এক নিমন্ত্রণ বাড়ীতে তাঁহার পিতা যাইতে নিষেধ করিয়া দেন। মনের কষ্টে বালক এক ঘণ্টার মধ্যে বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া পিতার নিকট পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইলে পিতা তো অবাক্ হইয়া গেলেন। নিম্ন প্রাইমারী স্কুলে পড়িবার সময় যখন ইনস্‌পেক্টার-অব-স্কুল বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়া বালক সোমেশকে চারিটী সংখ্যাকে চারিটী সংখ্যা দিয়া গুণ করিতে বলেন, বালক শ্লেট-পেনসিলের সাহায্য না লইয়াই মানসাঙ্কের সাহায্যে দুই মিনিটের ভিতর নির্ভুল উত্তর দিয়া তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়া দেন। এই ইনস্‌পেক্টর মহাশয়ই বালকের প্রতিভার বিষয় প্রথম অবগত হইয়া ছেলেটীর দিকে শিক্ষক মহাশয়কে মনোযোগ দিতে উপদেশ দিয়া যান। ক্রমে দেশের বালক, যুবক ও বৃদ্ধেরা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সুস্বাদু আহার্য্যাদি দিয়া এইরূপ মানসাঙ্ক কষাইয়া উত্তর মিলাইয়া দেখিতেন। এইরূপে ৮ বৎসর বয়সে সোমেশচন্দ্র ১৪ সংখ্যাকে ১৪ সংখ্যা দিয়া মুখে মুখে গুণ করিয়া নির্ভুল উত্তর দিতে পারিতেন।

সোমেশচন্দ্রের অতি অল্পবয়সে বিবাহ হয়। এই সময়ে অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, যে শক্তির বিকাশ তাঁহার ভিতর দেখা যাইতেছে এইবার তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে। সোমেশচন্দ্র সেইসকল ভবিষ্যদ্‌বেত্তাদের বাণী মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন—বিবাহের বন্ধন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিবাহের দ্বারা শক্তির অপচয় হইতে পারে না। এই সময় হইতে ছয় বৎসর ধরিয়া এই সাধনায় একাগ্রচিত্তে তিনি নিযুক্ত থাকেন। বিবাহের পরে তিনি ১০০ সংখ্যাকে ১০০ সংখ্যা দিয়া গুণ ও যে কোন সংখ্যার ১০৯ বর্গ অনায়াসে বাহির করিয়া দিতেন। একবার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডাঃ হ্যারিসনের নিকট সোমেশ ৩০ সংখ্যাকে ৩০ সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া তিন মিনিটের মধ্যে উত্তর দিতে সমর্থ হন। ডাঃ হ্যারিসন বালকের মানসিক শক্তির অপূর্ব্ব পরিচয় পাইয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, আজ পর্য্যন্ত জগতে মানসিক অঙ্ক কষিয়া যাঁহারা সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের ভিতর অন্যতম হইতেছেন জার্ম্মাণীর মিষ্টার গস্, কিন্তু তিনি এইরূপ গুণের কাজ তিন ঘণ্টার ভিতর করিতে পারিতেন।

ইহার পর তাঁহার পত্নী-বিয়োগ ঘটে। প্রেমময়ী পত্নীর বিয়োগ-ব্যথা দূর করিবার জন্য তিনি গুরুর সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং ভাগ্যক্রমে স্বামী শ্রীমৎ ভোলানন্দগিরি মহারাজের পদাশ্রয় পান।

এই সময়ে তিনি ইংলণ্ডে গিয়া বড় বড় অঙ্ক মনে মনে কষিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দেন। ইংলণ্ডে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়, ১৮৭৩ সালের ২৪এ ডিসেম্বর হইতে ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কত সেকেণ্ড? যথার্থ উত্তর অল্প-সময়ের মধ্যে দিয়া, জগতের মধ্যে তিনিই যে এ বিষয়ে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সোমেশচন্দ্র পত্নী-বিয়োগের পর হইতে হিন্দু-বিধবার মত নৈষ্ঠিক জীবনযাপন করিয়া আসিতেছেন। অনেকসময় তিনি অল্প দুগ্ধ ও কয়েকটা বাদাম খাইয়া থাকেন।

এই শক্তির মূলউৎস কোথায় জানিতে হইলে, তাঁহার নিজের কথায় বলিতে পারা যায়, অধিকাংশস্থলেই তিনি সহজজ্ঞানে উত্তর দিয়া থাকেন। বড় বড় অঙ্কের সময় তিনি মনে মনে কষিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সাধনাবলে তিনি সেগুলি চকিতের মধ্যে ঠিক করিয়া লইতে পারেন, এ শক্তি তিনি ধ্যানের সাহায্যে পাইয়াছেন। ৮ বৎসর বয়স হইতেই তিনি যোগসাধনা করিয়া আসিতেছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেদিন চট্টগ্রামে তিনি এই কথাই বলিয়াছেন। বাস্তবিক এ শক্তি যোগের সাহায্যে চিত্তের একাগ্রতায় যে পাওয়া যায়, তাহা খুবই খাঁটী কথা।

আমাদের যৌবনাবস্থায় কলিকাতায় একজন শ্রুতিধর আসিয়াছিলেন, তিনি শত প্রশ্ন শত ব্যক্তির মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া ঠিক পরে পরে বলিয়া যাইতে পারিতেন। বিভিন্ন ভাষা যাহা তিনি কখনও শ্রবণ করেন নাই, সে ভাষায় বক্তার মতই বলিয়া যাইতে পারিতেন। আমরা শুনিয়া তো অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। এ শক্তিও যোগের বলে—চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া তন্ময়তার সাহায্যে লাভ করা যায়।

গণশক্তির জাগরণ—

প্রাচীনকালে যে সকল মনীষী গণতন্ত্রের পরিকল্পনা করিয়া জগতের ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছেন, হজরত মোহাম্মদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহার সময়ে যে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ ইতিহাস আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারে না। আমরা বলিতে চাই, প্রকৃত গণতন্ত্র অতীতেও ছিল না, আর আজও নাই। উহা কবি এবং ভাবুকের স্বপ্ন রাজ্যেই বিচরণ করিতেছে।

বর্ত্তমান রাজনীতিকেরা জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, রুশিয়া, আমেরিকা, চীন প্রভৃতি দেশের নজির টানিয়া বিংশ শতাব্দী যে গণতন্ত্রের যুগ—ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু ইহার কোথাও আজ পর্য্যন্ত সত্যকার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই; কারণ সাধারণ লোকের শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। সিংহাসনচ্যুত জার্ম্মাণ-সম্রাট্ বলেন,—"জার্ম্মাণীতে গণতন্ত্রমূলক শাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।' ফ্রান্সে অর্থনৈতিক কারণে প্রেসিডেণ্টকে ডিক্টেটারের সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। রুশিয়ার বলশেভিকবাদ গণতন্ত্রবাদের অনেকটা কাছাকাছি হইলেও সেখানে শ্রমিকের অসংযত স্বৈরশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলির উপর আমেরিকা যে নীতি চালাইতেছেন, তাহা আদতেই গণতন্ত্রমূলক নীতি নয়। সাম্য-প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রও সত্যিকার গণতন্ত্রের ছায়ামাত্র, কায়া নহে। এইরূপে একটু একটু করিয়া বর্ত্তমান জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা কোথাও প্রকৃত গণতন্ত্রের উপাদান খুঁজিয়া পাই না। সুতরাং বিংশ শতাব্দীকে যাহারা গণতন্ত্রের যুগ বলেন—আমাদের মতে তাঁহারা কতকটা ভ্রান্ত।

যে গণতন্ত্র অপরের স্বাধীনতাকে সম্মান করে, জাতিতে জাতিতে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হয়, তাহাই প্রকৃত গণতন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্রে কোন দিনই সামঞ্জস্য হইতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদের অর্থ গণতন্ত্রকে অধিকার করা। যে গণতন্ত্র প্রতিবেশী জাতির স্বাধীনতা সহ্য করিতে পারে না, তাহা গণতন্ত্র নামের কলঙ্ক। স্বৈরশাসন একজনেই করুক, তাহা সব সময়ে স্বৈরশাসন নামেই অভিহিত হইবে। আজকালকার তথাকথিত গণতন্ত্র গণশক্তির হাতের স্বৈরশাসন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সত্যকার গণতন্ত্র আজ পর্য্যন্ত কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রই যে গণশক্তির উদ্বোধন আরম্ভ হইয়াছে—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চিরলাঞ্ছিতের জাগ্রত অভিমান স্বেচ্ছাচারিতার দুঃসহ আচরণ কখনই সহ্য করিতে পারে না; তাই দেশের সুপ্ত গণশক্তির জাগরণের ফলে বলদৃপ্ত স্বেচ্ছাচারিতার অবসান যে একদিন

হইবেই তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। ইউরোপীয় মহাসমরের অব্যবহিত পরেই জার্ম্মাণী, রুশিয়া প্রভৃতি পর পর ১৮টী দেশ হইতে (সত্যকার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হইলেও) রাজতন্ত্রশাসন বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে সাম্যের আবহাওয়ায় মানুষের চিন্তাশক্তি একটু একটু পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। সুতরাং আশা করা যায়, মদগর্ব্বিতের অমানুষিক অত্যাচার ও রক্তচক্ষুকে গণশক্তি আর দীর্ঘকাল ভয় করিয়া চলিবে না।

বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে গণশক্তির উদ্বোধনের ফলে ১৮ জন রাজা তাঁহাদের সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা এখানে এই সিংহাসনচ্যুত রাজগণের একটা তালিকা দিতেছি—

১। স্পেনরাজ আলফোন্‌সো, ২। পর্ত্তুগালরাজ ম্যানোয়েল, ৩। জার্ম্মাণসম্রাট্ উইলিয়াম, ৪। গ্রীসের রাজা জর্জ্জ, ৫। বুলগেরিয়ার রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড, ৬। রুমানিয়ার রাজা ক্যারোল, ৭। রুশসম্রাট্ সাইরল, ৮। মক্কার রাজা হুসেন, ৯। মিশরের রাজা আব্বাস হিল্‌মী, ১০। আফগানিস্থানের রাজা আমানুল্লাহ, ১১। পারস্যের রাজা আহমদ্ শাহ, ১২। মন্টিনেগ্রোর রাজা নিকোলাস, ১৩। গ্রীসের রাজা কনস্টেন্‌টিন, ১৪। অষ্ট্রীয়ার রাজা কার্ল, ১৫, ১৬। তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ ও আবদুল মজিদ এবং জার্ম্মাণীর আরও দুইজন অখ্যাত রাজা।

এই যে এতগুলি রাজার ভাগ্যবিপর্য্যয় হইয়া গেল, তবু সাম্রাজ্যবাদীদের চক্ষু খুলিল কি? ইউরোপের বুকের উপর এখনও সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণ-প্রভাব বিদ্যমান। এই প্রভাবের কবে অবসান হইবে তাহা কে বলিতে পারে? সমগ্র পৃথিবী ব্যথাদীর্ণ চিত্তে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের ত্রিবেণী-সঙ্গমে অবগাহন করিয়া তাহার জন্ম-জন্মার্জ্জিত ক্লেদরাশি হইতে বিমুক্ত হইতে ব্যগ্র—উৎফুল্ল। কে বলিয়া দিবে কতদূরে সে সুখের দিন তার!

—শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী

(মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ়)

ফেলপড়া বীমা কোম্পানীর কথা—

বিলাত (United Kingdom) বনাম ভারত

ভারতবর্ষে বীমা-ব্যবসার ইতিহাস বড় বেশী দিনের নয়। অল্প কয়েকটি কোম্পানী ছাড়া আর বাকী সবগুলিই স্বদেশী যুগের সময় হইতে সুরু হইয়াছে। স্বদেশী যুগের পূর্ব্বে যে সকল কোম্পানী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে সকল গুলিরই সমুদয় মূলধন ভারতবাসীর নহে।

প্রথম প্রথম ভারতীয় বীমা-কোম্পানীর সহিত বিদেশী-বীমা-কোম্পানীগুলি তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন না। কিন্তু ভারতীয় বীমা-কোম্পানীর পসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখন তাঁহারা হয় ত বুঝিতে পারিয়াছেন যে ভারতবাসীর বিদেশী বীমার কুহক ক্রমেই অতীতের গর্ভে বিলীন হইতেছে এবং তাঁহাদের স্বদেশ-প্রিয়তার ফলে ভারতীয় বীমা-কোম্পানীগুলির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ভারতবাসীর দেশ-প্রাণতার স্রোত এখন আর অনায়াসে অবরোধ করা সম্ভব নয় বলিয়াই বোধ হয় বর্ত্তমানে বিদেশী কোম্পানীর পরিচালকগণ কোমর বাঁধিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়াছেন, আর এই প্রতিযোগিতার জন্যই আজ ভারতীয় বীমা-কোম্পানীর অনেকগুলিকেই Anglo-Indian সংবাদ-পত্রাদিতে "Mushroom" আখ্যা দেওয়া হইতেছে।

Blue Book অনুযায়ী দেখা যায় যে ইংরাজী ১৮৪৯ সন হইতে ১৮৯৯ সন পর্য্যন্ত ভারতে কুড়িটী বীমা-কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ভারতে বীমা ব্যবসায়ের পরিচালনার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ পৃথক কোনও আইন পাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। কিন্তু ইংরাজী ১৯০০ সন হইতে ১৯১২ সন পর্য্যন্ত নূতন নূতন বীমা-কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল দেখিয়া, ইং ১৯১২ সনে ভারতীয় বীমা বিষয়ক আইন পাশ করা হয়; সে আইনও বিলাতী ১৯০৯ সনের বীমা আইনের অনুকরণ বলিলে অন্যায় হইবে না। ইংরাজী ১৯১২ সনের আইন পাশের পর হইতে দেশী বীমা-কোম্পানীর (যেসকল কোম্পানী বাস্তবিক জীবন-বীমা-কোম্পানী নহে) ফেল পড়ার বিবরণ বৎসরের পর বৎসর সরকারী Blue Bookএ এমনভাবে

প্রকাশিত হইতেছে যে, তাহার ফলে ভারতবাসীর ভারতীয় কোম্পানীর প্রতি আস্থা ক্ষুণ্ণ না হইয়া পারে না। কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা ভারতীয় বীমা আইনের বিরোধী অথবা ভারতীয় বীমা-কোম্পানীগুলি আইনের অধীনে থাকিয়া সুসংযতভাবে কাজ করে তাহা ইচ্ছা করি না। অন্যায়ভাবে কার্য্য-কলাপাদির পরিচালনহেতু বীমাকারীদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আমরা কঠোর আইন প্রণয়নের পক্ষপাতী, কিন্তু তাই বলিয়া ফেল-পড়া প্রকৃত জীবন-বীমা কোম্পানী নহে; এইরূপ মুষ্টিমেয় কয়েকটী দেশী কোম্পানীর কথা বার বার Blue Bookএ উল্লেখ করিয়া সমগ্র দেশী বীমা-কোম্পানীর বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে যে প্রচারকার্য্য চালানো হইতেছে আমরা তাহারই তীব্র প্রতিবাদ করি।

যে সকল ভারতীয় বীমা-কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে বলিয়া ভারত সরকার বছর বছর তাঁহাদের প্রচারিত Blue Bookএ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই সাধারণ জীবন-বীমা কার্য্য (Ordinary Life Insurance Business) চালাইতেন না। Blue Bookএর বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ভারতীয় ঐ ফেলপড়া কোম্পানীগুলির কার্য্য ছিল Dividing Societyর অনুকরণে। কিন্তু ক্রমশঃ ঐ বিবরণ লোপ পাইল এবং তাহার স্থলে তাহাদিগের আখ্যা দেওয়া হইল "Life Insurance Company" এবং তাহাদিগের বিনষ্ট হইবার হেতুর মধ্যে প্রধান বলিয়া প্রকাশ করা হইল—নিজ নিজ কোম্পানীর ডিরেক্টর এবং কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের ভিতর অবিচারে টাকা ধার দেওয়া। বাস্তবিকই যদি ঐ কারণেই ঐসকল কোম্পানী ফেল পড়িয়াছিল, তবে ঐসকল ব্যাপারের সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয় ছিল। এইভাবে দেশের বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলির যেমন পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারী সহানুভূতি প্রকাশ হইতেছিল, তেমনই আবার বে-সরকারী সংবাদ-পত্রাদিতে বলা হইয়া আসিতেছে ভারতবর্ষের Mushroom কোম্পানী-সমূহের কথা।

Mushroom কোম্পানী যে ভারতবর্ষেরই একচেটিয়া সম্পত্তি এরূপ ধারণা যাঁহারা পোষণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগকে বিলাতের (United Kingdom) বীমা কোম্পানী-সমূহের কার্য্য-কলাপের বিবরণ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ইং ১৯২৫ সনের Blue Book হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভারত সরকার তৎপূর্ব্বে কিছুকাল ধরিয়া ইং ১৯১২ সনের ভারতীয় জীবনবীমা আইন সংশোধনের বিষয় ভাবিতে থাকেন। কিন্তু যে যে ঘটনাবলির জন্য বিলাতী ১৯০৯ সনের বীমা আইনে সংশোধনের প্রয়োজন ঘটে ভারতে এখনও তদ্রূপ এমন কোনও ঘটনা ঘটে নাই। বলা বাহুল্য যে, ব্যবসা জগতে বিশেষতঃ বীমা ব্যবসায়ে বিলাতের মূলমন্ত্র হইতে "Freedom and Publicity" অথচ সর্ব্বসাধারণের স্বার্থজড়িত এই বীমা ব্যাপারে, বিলাতী ঐ ১৯০৯ সনের বীমা আইন সংশোধন সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই যে প্রথমে 'Departmental Committee'র আলোচনা ব্যাপারাদি গুপ্তভাবে চালাইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু সে দেশে Public opinion বা জনমত অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ। পচা আবর্জ্জনা দেশে সহজে কেহ ধামাচাপা দিয়া রাখিতে সাহসও করে না এবং পারেও না। সেইজন্য Departmental Enquiryর ব্যাপার পরদার আড়ালে পরিচালিত করিবার প্রস্তাবসত্ত্বেও ইহার আমূল বিবরণ অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। বিলাতে বীমা-কোম্পানীসমূহের যাবতীয় কার্য্যকলাপাদির বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব। এই অভিযোগ যে আজ নূতন তাহা নহে। এই অভিযোগ পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও প্রায় তদ্রূপই আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; অতএব ঐ দেশের "Publicity" কথা বুঝিতে হইলে Departmental Committeeর সমস্ত আলোচনা বিশেষভাবে পাঠ করা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে না হউক অন্ততঃ বীমা ব্যবসায়ে যেসকল ভারতবাসী নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমানে ভারতীয় বীমা-কোম্পানী-সমূহের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে যে প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে এবং তাহার ফলে অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের মনে দেশী কোম্পানীসমূহের প্রতি যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চলিতেছে তাহা দূর

করা বিশেষ আবশুক। মাত্র ২৫।৩০ বৎসরই যে দেশের জীবন-বীমার ইতিহাস সে দেশের সহিত বহু পুরাতন অন্যান্য দেশের ইতিহাসের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে ভারতে এমন কিছু ঘটে নাই যে কারণে লোকের মনে আতঙ্কের উদয় হইয়া ভারতীয় বীমা-কোম্পানীগুলির প্রতি ভারতবাসীর আস্থা হারাইতে পারে।

"Mushroom Companies" ভারতে যত না প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকুক, বিলাতে অর্থাৎ United Kingdomএ তাহাদের রকম ও সংখ্যা এত অধিক যে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সে বিষয়ে তদ্দেশীয় কর্তৃপক্ষগণের পক্ষে কোনরূপ প্রতীকার করা এখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

বর্ত্তমান যুগে United Kingdomএর কি অবস্থা? ইহার উত্তরে আর কিছু এখন না বলিয়া আনুষঙ্গিক ১৯০০ সন হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত বিলাতের ফেলপড়া কোম্পানী সমূহের যে তালিকা পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে লোকের চোখ খুলিয়া যাইবে এবং বিলাতেও যে বীমা-কোম্পানী এখনও গণ্ডায় গণ্ডায় ফেল পড়িতেছে তাহা এ দেশের কর্ত্তাভজার দল বুঝিতে পারিবেন। এই বিদেশী মোহের কুহকজাল দূর করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এই তালিকাস্থিত কোম্পানীগুলির প্রারম্ভাবস্থা হইতে ধ্বংসাবস্থা পর্য্যন্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন কোম্পানী অর্দ্ধমৃত হইয়া রহিল, কেহ বা শৈশবাবস্থাতেই লয়প্রাপ্ত হইল, কেহবা যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থায় হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করিল আর বৃদ্ধত্বে পঞ্চত্বপ্রাপ্তির আশ্চর্য্য কি?

—শ্রীচুণীলাল লাহিড়ী

(ব্যবসা ও বাণিজ্য, জ্যৈষ্ঠ)

নানারূপ আঠা প্রস্তুত প্রণালী—

কাগজের প্যাড প্রস্তুত করিবার জন্য যে আঠা ব্যবহৃত হয় তাহার প্রস্তুত প্রণালী :—

১। প্রথমে ৩½ আউন্স শিরিষ; ৮ আউন্স গ্লিসিরিণ (Glycerine) এবং পরিমাণ মত জল পৃথক্ পৃথক পাত্রে রাখিতে হইবে।

তাহার পর এই ৩½ আউন্স শিরিষে খানিকটা জল দিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিতে হইবে।

তারপর উহার তলানি ফেলিয়া দিয়া অন্য পাত্রে করিয়া জাল দিয়া শিরিষ গালাইয়া লইতে হয়; তারপর উহার সহিত "গ্লিসিরিণ" মিশ্রিত করিতে হয়। এইরূপ করিলে যদি "মিক্‌শ্চার"টা খুব ঘন হয়, তবে উহাতে আরও জল মিশ্রিত করা যাইতে পারে।

২। প্রথমে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ওজন করিয়া পৃথক্ পৃথক পাত্রে রাখিতে হয়।

গ্লু ৬ আউন্স, ফটকিরি ৩০ গ্রেণ, এসেটিক এসিড ½ আউন্স, এলকোহল ১½ আউন্স, জল ৬½ আউন্স; তারপর 'এলকোহল' ব্যতীত অন্যান্যগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া water bathএর উপর রাখিয়া গরম করিলে শিরিষ গুলিয়া যাইবে। তারপর ঠাণ্ডা হইলে উহার সহিত 'এলকোহল' (alcohol) মিশ্রিত করিতে হয়।

৩। এক আউন্স জলে এক আউন্স ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (calcium chloride) মিশ্রিত করিয়া উহার সহিত ৫ আউন্স শিরিষ মিশ্রিত করিতে হয়। তারপর উহা আঠা আঠা হইয়া আসিলে জাল দিয়া সম্পূর্ণভাবে গুলিতে হয়।

৪। ২০ আউন্স শিরিষে খানিকটা জল দিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিতে হয়, পরদিন প্রাতঃকালে বেশী জলটুকু ফেলিয়া দিয়া, আঠাটা 'মসলিন' (muslin) কাপড়ের উপর করিয়া ছাঁকিয়া উহার অপরিস্কৃত অংশ ফেলিয়া দিতে হয়।

তারপর water bathএ করিয়া জাল দিয়া ভাল করিয়া শিরিষটাকে জলের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। তারপর উহার সহিত ৫ আউন্স গ্লিসিরিণ (Glycerine), এক আউন্স সিরাপ (syrup) মিশাইয়া ভাল করিয়া নাড়িতে হয়। শেষে ৫০ গ্রেণ ট্যানিন (Tannin) অপর একটী পাত্রে অল্প-পরিমাণে জল দিয়া গুলিয়া, উহাতে মিশ্রিত করিতে হয়।

এই প্রকার মিক্‌শ্চার গরম করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

৫। ১৫ আউন্স শিরিষ খানিকটা জলে ভিজাইয়া গুলিতে হয়। তারপর উহার সহিত ৫ আউন্স গ্লিসিরিণ আর এক আউন্স চিনি মিশ্রিত করিয়া জাল দিতে হয়। শেষে উহার সহিত দুই আউন্স মসিনার তৈল বা Linseed

oil মিশ্রিত করিয়া নাড়িতে হয়। ইহাও গরম করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

টেবলেট গ্লু প্রস্তুত প্রণালী—

১। ৩½ আউন্স শিরিষে যথেষ্ট পরিমাণে জল দিয়া কয়েক ঘণ্টা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। তারপর উহার তলানি ফেলিয়া দিয়া অন্য পাত্রে করিয়া গরম করিয়া শিরিষটাকে গলাইয়া ফেলিতে হয়। তারপর উহার সহিত ৮ আউন্স গ্লিসিরিণ মিশ্রিত করিতে হয়। এইরূপ করিলে যদি "মিক্শ্চার"টা খুব ঘন থাকে, তবে উহাতে আরও জল দিতে হয়।

২। ৬ আউন্স শিরিষ, ৩০ গ্রেণ ফটকিরি (alum), ½ আউন্স এসেটিক এসিড, আর ৬½ আউন্স জল একত্রে মিশ্রিত করিয়া water bathএর উপর রাখিয়া যতক্ষণ শিরিষটা ভাল করিয়া মিশ্রিত না হয়, ততক্ষণ জ্বাল দিতে হয়; তারপর ঠাণ্ডা হইলে উহার সহিত "এলকোহল" মিশ্রিত করিতে হয়।

৩। এক আউন্স "ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড" ১ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া উহার সহিত ৫ আউন্স শিরিষ মিশাইয়া আঠা আঠা করিয়া আগুনের উপর রাখিয়া যতক্ষণ না সমস্ত জিনিসটা সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত হয়, ততক্ষণ জ্বাল দিতে হয়।

৪। এক পাউণ্ড শিরিষ, ৪ আউন্স গ্লিসিরিণ, বড় দু' চামচ "ফলের সিরাপ" (Glucose syrup), আর ⅟₁₆ আউন্স "ট্যানিন" একত্রে গরম করিয়া এক ঘণ্টা রাখিয়া, তারপর উহা কোন পাত্রে পাতাইয়া দিতে হয়। এই আঠার যে কোন প্রকার রং করা যাইতে পারে।

(ব্যবসা ও বাণিজ্য—জ্যৈষ্ঠ)

মোটর শিল্প—

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে নিকোলাস্ কাগ্নট্ নামক জনৈক ফরাসী রাস্তায় মাল-বহনোপযোগী একটী মোটর গাড়ী তৈয়ার করিয়াছিলেন। এই গাড়ী ঘণ্টায় আড়াই মাইল হিসাবে চলিত। উনবিংশ শতাব্দীতে কতকগুলি মোটর গাড়ী যাত্রী লইয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ১৮৩১ খৃঃ অব্দে ইংলিশ পার্লিয়ামেণ্ট আইন করিয়া এইসকল গাড়ীর রাস্তায় চলাচল বন্ধ করিয়া দিলেন। এই আইন ১৮৯৬ সাল পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল; সুতরাং ১৮৩১ হইতে ১৮৯৬ সাল পর্য্যন্ত মোটর গাড়ীর অতি সামান্যই প্রচলন হইয়াছিল। ১৮৯৬ সালের পর হইতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র মোটর গাড়ীর উন্নতি-সাধনে বিশেষ মনোনিবেশ করিল। তখনকার মোটরগাড়ীগুলির মধ্যে আকার-প্রকারে যথেষ্ট বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইত। ঐ সময় হইতে মোটর গাড়ীর নির্ম্মাণ-প্রণালীর ক্রমোৎকর্ষ সাধিত হইতে হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। মাত্র একজন আবিষ্কর্ত্তার প্রচেষ্টায় কিংবা এক শতাব্দীর মধ্যে এইসকল উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ডাইমলার (Daimler), ক্রেব্‌স (Krebs), পানহার্ড (Panhard), রভস্ (Rovce), গিবন্ (Gibbon) এবং রোট্‌স্ (Roots), ইঁহারাই প্রথম যুগে মোটর নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করেন। আমেরিকার ডিউরিয়া (Duryea), হাইনস্ (Haynes), উইনটন্ (Winton), ফোর্ড (Ford), কিঙ্গ (King), মাক্সওয়েল (Maxwell), ষ্টেন্‌লি (Stanley), হোয়াইট (White) এবং ফ্রেঙ্কলিন্ (Franklin), ইঁহারাই মোটর নির্ম্মাতাদিগের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী।

১৯০৩ সালে আমেরিকায় মোটরগাড়ী-নির্ম্মাতাদের একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সমিতি সেলডেন পেটেণ্ট অনুসারে মোটরগাড়ী নির্ম্মাণের জন্য লাইসেন্স প্রদান করিত। ৮ বৎসর কাল যাবৎ এই সমিতির প্রচেষ্টায় মোটর-নির্ম্মাণ কার্য্য বিশেষভাবে অগ্রসর হইয়াছিল। ১৯০৯ হইতে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত কতকগুলি কারণে মোটর-নির্ম্মাণ-কার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহাদিগের মধ্যে নূতন আবিষ্কারের বিরুদ্ধে জন-সাধারণের কুসংস্কার, রাস্তার দুরবস্থা, তৈয়ার করিবার খরচের আতিশয্য, চালাইবার খরচের আধিক্য ইত্যাদিই প্রধান। এই সময়ের পর হইতে মোটরগাড়ীর চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে মোটরগাড়ী অধিক পরিমাণে বিক্রয় ও প্রেরণের সুবিধার জন্য অধিক সংখ্যক গাড়ী নির্ম্মাণ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল।

কিস্তিবন্দীক্রমে আদায়ের সর্ত্তে মোটর ক্রয়ের প্রথা, ব্যবহৃত মোটরগাড়ীর ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন, ব্যবসায়ীদিগের সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং বিজ্ঞাপনের বহুল প্রচারের ফলে মোটর-নির্ম্মাতাগণও ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক মোটর-গাড়ী প্রস্তুত করিতে লাগিল। এই সময়ের মধ্যে মোটর-চালনে বাষ্পীয় কিংবা তড়িৎশক্তির পরিবর্ত্তে অন্তর্দাহ (Internalcombustion) ইঞ্জিনের প্রবর্ত্তন হইল। ব্যক্তিগত কিংবা বে-সরকারী লোকের প্রচেষ্টায় প্রবর্ত্তিত দ্রুতগামী এবং নির্ভরযোগ্য যানের প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন যাবৎই অনুভূত হইতেছিল। যখন লোকে বুঝিল যে, মোটর গাড়ীর দ্বারাই এই প্রয়োজন সাধিত হইতেছে তখন শুধু ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় নহে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আশ্চর্য্যরূপ দ্রুতগতিতে মোটর গাড়ীর প্রচলন হইতে লাগিল।

ভারতবর্ষেও গত পনর বৎসরের মধ্যে মোটর ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯১৩-১৪ সালে চারি হাজারের কিছু অধিক মোটর এদেশে আমদানি হইয়াছিল। ১৯২৭-২৮ সালে ৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৯ হাজার ৫ শত ৬৭টী মোটর গাড়ী এবং ১৯২৯-৩০ সালে ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৭ হাজার ৩ শত ৯৯ খানা মোটর গাড়ী ভারতবর্ষে আমদানি হয়। ইহার মধ্যে ১৯২৯-৩০ সালে শতকরা ৬৮ ভাগেরও বেশী গাড়ী আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র ও কানাডা হইতে এবং শতকরা ২১ ভাগ গাড়ী যুক্ত-রাজ্য হইতে আসিয়াছিল। ১৯২৮-২৯ সালে আমেরিকা ও কানাডা হইতে শতকরা ৭৪ ভাগ ও যুক্তরাজ্য হইতে শতকরা ১৯ ভাগ গাড়ী আসিয়াছিল। যুক্তরাজ্য হইতে ১৯২৮-২৯ সালে আমদানি গাড়ীর প্রত্যেকটীর মূল্য গড়ে ২ হাজার ৬ শত ৭৬ টাকা এবং ১৯২৯-৩০ সালে আমদানি গাড়ীর প্রত্যেকটীর মূল্য গড়ে ২ হাজার ৫ শত ৬৯ টাকা পড়িয়াছিল। ১৯২৮-২৯ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে আনীত প্রত্যেকটী গাড়ীর মূল্য গড়ে ২ হাজার ১ শত ৫০ টাকা এবং পরবর্ত্তী বৎসরে আনীত প্রত্যেকটী গাড়ীর মূল্য গড়ে ২ হাজার ৩০ টাকা হইয়াছিল। কিন্তু কানাডা হইতে আনীত প্রত্যেকটী গাড়ীর মূল্য ১৯২৯-৩০ সালে পড়িয়াছিল ১ হাজার ৮ শত টাকা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে পড়িয়াছিল ১ হাজার ৬ শত ২৪ টাকা। উক্ত বিবরণ হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বর্ত্তমান আমেরিকায় প্রস্তুত মাঝামাঝি শক্তিসম্পন্ন গাড়ীর পরিবর্ত্তে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন গাড়ীই এদেশে আমদানি হইতেছে এবং বিলাত হইতেও নানা প্রকার হাল্‌কা গাড়ী এদেশে আসিতেছে।

বোম্বাই নগরে Assembly Plant প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তথায় আমদানি গাড়ীর সংখ্যা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। বোম্বাই হইতে নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে রেলপথে এবং দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে উপকূলপথে মোটর গাড়ী প্রেরিত হইয়া থাকে। ১৯২৯-৩০ সালে ভারতবর্ষে যত মোটর গাড়ী আসিয়াছিল তন্মধ্যে বোম্বাইয়ে ৮ হাজার ৭ শত ২৮ টী, বঙ্গদেশে ৩ হাজার ২ শত ৪৭ টী, সিন্ধুপ্রদেশে ১ হাজার ৬ শত ৩৩টী, মান্দ্রাজে ২ হাজার ৬ শত ৫৫টী এবং ব্রহ্মদেশে ১ হাজার ১ শত ৩৬টী মোটর গাড়ীর আমদানি হইয়াছিল। ১৯২৯-৩০ সালে ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের ১ হাজার ৯ শত ৫৩টী মোটর-সাইকেল আমদানি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১ হাজার ৮ শত ৪২টী অর্থাৎ শতকরা ৯০ ভাগই যুক্ত-প্রদেশে গিয়াছিল।

যাত্রীদিগের যাতায়াতের জন্য মোটর, অম্‌নিবাস্, ভ্যান (Van) ও লরী ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে এদেশে আমদানি হইতেছে। ১৯২৯-৩০ সালে ২ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৫ হাজার ৩ শত ৬টী যান এদেশে আসিয়াছিল। এই বৎসরে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ৪ হাজার ৯ শত ৬৫টী মোটর গাড়ীর আমদানি হয়; তন্মধ্যে আমেরিকা হইতেই আসিয়া-ছিল ৪ হাজার ৮ শত ৯৮টী। দুই বৎসর পূর্ব্বে মোটর-যানের ব্যবসায়ের অবস্থা যেরূপ আশাপ্রদ ছিল, এখন আর তাহা নাই। ভারতবর্ষে কতকগুলি নূতন নূতন রাস্তা নির্ম্মাণের যে কল্পনা চলিতেছে তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে এই ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতি সাধিত হইতে পারে।

(বণিক—জ্যৈষ্ঠ)

বাঙ্গালায় ফলের চাষ—

বাঙ্গালায় সরকারি কৃষি-বিভাগের এডিশনাল ডিরেক্টর মিঃ কে ম্যাক্লিন কৃষিগবেষণার ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দিবার জন্য সিমলায় গিয়াছেন। প্রকাশ, সেখানে তিনি বাঙ্গালায় ফলের চাষের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। সরকারী 'উন্নতি' বিধানের ধারা যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, উন্নতি কিরূপ হইবে। ইতিমধ্যেই শুনা যাইতেছে—সর্ব্বাগ্রে ফলের চাষের জন্য একজন মোটা মাহিনার কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে। তাঁহার প্রধান কর্ম্মস্থান হইবে কালিম্পঙে, সুতরাং মোটা রকমের একটা ভাতাও চাই। এই কর্ম্মচারী এদেশী হইবেন কি বিদেশী হইবেন তাহা বলা যায় না। বাঙ্গালার জল-মাটিতে ফলের আবাদ সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য হয় ত অষ্ট্রেলিয়া হইতেও কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেও আমদানি করা হইতে পারে। বাঙ্গালায় আম, কাঁঠাল, বেল, কলা, পেঁপে, পেয়ারা, আনারস প্রভৃতি ফলের তুলনা মেলে না। অনেক ফল স্বচ্ছন্দ বনজাত। ভাল করিয়া চাষ আবাদ করিলে যে, প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যেও পাওয়া যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার জন্য অষ্ট্রেলিয়া হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইবারও প্রয়োজন দেখা যায় না, কালিম্পং পাহাড়ে হেড কোয়াটার্স বসাইবার বা কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিং বাড়ীতে আপিস খুলিবারও প্রয়োজন দেখা যায় না। অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত পল্লীবাসী কৃষকেরা অল্প আয়াসে যাহা সম্পন্ন করিতে পারে, মোটা মাহিনার সরকারী বিশেষজ্ঞের হাতে পড়িয়া হয়ত তাহার অস্তিত্বই লোপ পাইবে। গবরমেণ্ট যদি সত্যই কিছু করিতে চাহেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারা বাঙ্গালার ধ্বংসোন্মুখ কৃষকদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করুন। সামান্য অন্নজলের ব্যবস্থা হইলেই কৃষককুল বাঁচিয়া যাইবে। বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কৃষকেরা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না; রোগে ঔষধ পায় না; প্রচুর পানীয় জল পর্য্যন্ত পায় না। বাঙ্গালার কৃষক তাই মরিতে বসিয়াছে; তাহাদের স্থানে বিদেশী চাষী আসিয়া বাগানের কাজ করিতেছে। কিন্তু বিদেশী চাষী দ্বারা কি দেশের অভাব পূরণ সম্ভব হইতে পারে? চাষী যেমন কমিয়া যাইতেছে, চাষের প্রধান সহায় গবাদি পশুও তেমনি হ্রাস পাইতেছে। তাহার উপর জলকষ্ট ক্রমেই তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। এরূপ অবস্থায় কেবল আপিস বসাইলে বা মোটা মাহিনার অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলে কি হইবে? চাষের উন্নতি করিতে হইলে, চাষী চাই, গরু চাই, জল চাই। বাঙ্গালায় এক সময়ে এ সবই ছিল। তখন বাঙ্গালার কৃষি-সম্পদ্ ছিল পৃথিবীর সকল জাতির লোভের সামগ্রী, বাঙ্গালীর আশা-ভরসার ও আনন্দের উৎস। গবর্ণমেণ্ট যদি বাঙ্গালার কৃষকদিগকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারেন, গবাদি পশু রক্ষা করিতে পারেন, জলের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আবার বাঙ্গালার সেই দিন ফিরিয়া আসিবে।

—বঙ্গবাসী

কলিকাতায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ—

১লা জুন হইতে কলিকাতায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যয় প্রতি 'ইউনিটে' তিন আনার স্থলে এগার পয়সা হইয়াছে—বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কর্ত্তৃপক্ষ এই ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে সহরবাসীর যে অনেক সুবিধা হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রতি 'ইউনিটে' এক পয়সা দর কমিলে সহরবাসিগণ এগার মাস পূর্ব্বের অর্থব্যয় করিলেই বারোমাস উহার ফল ভোগ করিতে পারিবেন—এবং ইলেক্ট্রিক কোম্পানীর বার্ষিক সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা আয় কমিবে।

এই ব্যয়-সঙ্কোচের সকল কৃতিত্ব কলিকাতা কর্পোরেশনের সুযোগ্য কাউন্সিলর শ্রীযুক্ত মনোমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্য। কলিকাতা কর্পোরেশনের নিজস্ব

বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য ইনি যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রায় ফলপ্রসূ হইয়া আসিল—আপাততঃ ইউনিটের দর কমাইবার জন্য তিনিই ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানীর পরামর্শ-সভায় সর্ব্বপ্রথম প্রস্তাব করেন। বলা বাহুল্য ইহাতে উক্ত কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ যথারীতি বিরোধিতা করেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

—ঢাকাপ্রকাশ

সনাতন সঙ্ঘ—

ময়মনসিংহের অন্তর্গত 'বাণীগ্রামে' সম্প্রতি 'সনাতন সঙ্ঘ' নামে একটী জনহিতকর আশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছে। কুমিল্লার সুপ্রসিদ্ধ 'অভয়াশ্রম' এবং শ্রীহট্টের বিদ্যাশ্রমই এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ। কংগ্রেসের অন্যতম কর্ম্মী শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন গোস্বামী অপর কতিপয় স্বদেশপ্রেমিক কর্ম্মীর সহযোগে এই প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। আগামী ৯ই জুন তারিখে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী এই আশ্রমের উদ্বোধন-ক্রিয়া সমাপন করিবেন।

খাদি প্রচার, পল্লী সংগঠন, গ্রাম্য বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপন এবং সঙ্ঘবন্ধনই এই আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই আশ্রমের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সাধু প্রচেষ্টার সার্থকতা কামনা করি।

—চারুমিহির

সর্দ্দা আইনের মামলা—

নোয়াখালি জিলার রামগঞ্জ থানার মাণিকপুর গ্রামের আবদুল আজিজ (বয়স ৫০ বৎসর) ও আবদুল কাদের (বয়স ৪৫ বৎসর) তাহাদের খুল্লতাত কন্যাদ্বয়কে (একটির বয়স ৪ বৎসর ও অপরটির বয়স ৩ বৎসর) বিবাহ করায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সর্দ্দা আইন অনুসারে মামলা দায়ের হইয়াছে। নোয়াখালি জিলায় সর্দ্দা আইনের মামলা এই প্রথম। আমরা প্রথম হইতেই বলিয়াছি—সর্দ্দা আইন বিধিবদ্ধ হইলে সরকারকে আমাদের সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে ও তাহার ফল কখনই ভাল হইবে না। এখন সত্য সত্যই তাহা হইতে আরম্ভ হইল। বিবাহ-ব্যাপারেও লোকের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে। তবে এই মামলাটির সম্বন্ধে আমরা একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। মেয়ে দুইটি পিতৃহীন। সম্পত্তির লোভেই তাহাদের বিবাহ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাহার উপর ৫০ বৎসরের পুরুষের সহিত ৩ বৎসরের মেয়ের বিবাহও সমর্থন করা যায় না। সর্দ্দা আইন অপ্রয়োজনীয় হইলেও এইরূপ শিশু-বিবাহ সমাজে বন্ধ হওয়া উচিত।

—হিতবাদী

১৩৩১ সালের বাঙ্গালার লোকসংখ্যা—

বর্ত্তমান বর্ষে বাঙ্গালার মোট লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটী ৯ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬ শত ৬৭ জন। নিম্নে লোকসংখ্যার তালিকা দেওয়া গেল।

বর্দ্ধমান—	১৫.	লক্ষ	৭০	হাজার	৬	শত	৫৬	জন
বীরভূম—	৯	”	৪৭	”	৪	”	২৫.	”
বাঁকুড়া—	১১	”	১২	”	৩	”	৩৭	”
মেদিনীপুর—	২৭	”	৯১	”	৩	”	১৯	”
হুগলী—	১১	”	৬	”	৮	”	২	”
হাবড়া—	১০	”	৯৯	”	৩	”	৭৯	”
২৪ পরগণা—	২৭	”	৮	”	৫	”	৯	”
কলিকাতা—	১১	”	৬১	”	৪	”	১০	”
নদীয়া—	১৫	”	২৯	”	৭	”	৭৬	”
মুর্শিদাবাদ—	১৩	”	৭০	”	৮	”	৮৫	”
যশোহর—	১৬	”	৭০	”	৫	”	৭৭	”
খুলনা—	১৬	”	২১	”	৯	”	৭৯	”
রাজসাহী—	১৪	”	২৯	”	১	”	৮	”
দিনাজপুর—	১৭	”	৫৪	”	১	”	৫২	”
জলপাইগুড়ি—	৯	”	৮৩	”	৫	”	৯৪	”
রংপুর—	২৫	”	৮৯	”	৪	”	১৭	”
বগুড়া—	১০	”	৮৬	”	৪	”	৯৩	”
পাবনা—	১৪	”	৪৯	”	৮	”	৩৫	”
মালদহ—	১০	”	৬৩	”	৩	”	১০	”
ঢাকা—	৩৪	”	৩৩	”	১	”	৩	”
ময়মনসিংহ—	৫১	”	১৫	”	০	”	৮	”
ফরিদপুর—	২৩	”	৩৫	”	৯	”	৪৩	”
বাখরগঞ্জ—	২৯	”	২০	”	৯	”	৫৯	”
ত্রিপুরা—	৩১	”	৯	”	১	”	৬৮	”
চট্টগ্রাম—	১৭	”	৯৩	”	০	”	৯২	”
নোয়াখালী—	১৭	”	৩	”	৬	”	৮২	”
পাঃ চট্টগ্রাম—	৩	”	১৬	”	৩	”	৩৯	”
কুচবিহার—	৫	”	৯০	”	০	”	৭২	”
ত্রিপুরারাজ্য—	৩	”	৮২	”	২	”	৯	”

—সময়

কৃষি, ব্যবসা ও বাণিজ্য

(ব্যবসা-বাণিজ্য)

১৯৩০ সালের ব্যবসা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা—

গতবর্ষের (১৯৩০ সালে) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সমুদয় বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, অখিল-জগত-ব্যবসা-বাণিজ্যে ভীষণ মন্দা পড়িয়াছে। বর্ত্তমানযুগে এরূপ বৎসর কখনও আসিয়াছে কি না সন্দেহ। এই বৎসর স্মরণীয় এবং ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান-যুগে ব্যবসা-জগতে যতপ্রকার হতভাগ্য বৎসর আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে এইটীই সর্ব্বপ্রধান। আমরা ইহাকে তমসাচ্ছন্ন বৎসর অর্থাৎ Black Yearও বলিতে পারি। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বহু অর্থনীতিক ও ব্যবসায়ী তাঁহাদের সমস্ত চিন্তা এবং অধিকাংশ সময় দিয়া জগতব্যাপী এই ঐতিহাসিক স্মরণযোগ্য প্রতিকূল বর্ষের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন—দু'তিনটী কারণও তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ উহাই সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রথমতঃ তাঁহাদের মতে গম, তুলা, পশম, তৈল, রবার প্রভৃতির অতিরিক্ত আমদানীতে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, কারণ এই সমস্ত জিনিসের অতিরিক্ত চালান বাজারের দর কমাইয়া দিয়াছে এবং যদিও ক্রেতার পক্ষে উহা সুবিধা-জনক কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে উহা ভীষণ ক্ষতিকর। ইহাতে চাহিদাও কমিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বেকারের পরিমাণ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। আর একটী বিশেষ কারণ এই যে, জাতীয় কলকব্জার ব্যবসায়ে এবং সোণাচালানে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। ইহার উপর ভারতে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন, চীনে প্রজাবিদ্রোহ, রুশ হইতে জাতীয় প্রচারকার্য্য, বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক ও কর্ম্মসমস্যা এবং সমস্ত দেশসমূহের পরস্পর বিদ্বেষই ইহার মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই তো গেল ব্যবসার গূঢ় কথা, কিন্তু ইহার প্রতি-কারের উপায় কি? ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু আমরা এমন কতকগুলি উদাহরণ দেখিতেছি যাহার দ্বারা আবার শীঘ্রই শান্তির প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। যদিও এই উদাহরণগুলি অত্যন্ত ক্ষীণ, তবুও ইহার পশ্চাতে আলোক অপেক্ষা করিতেছে। চৈনিক আগন্তুকের নিকট শুনা যায় যে, তাঁহাদের দেশে না কি শান্তভাব ফিরিয়া আসিতেছে এবং ভারতবর্ষেও শান্তি আশাপ্রদ। আমাদেরও আশা ইহার অনুকূল। মনঃশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী—ইহার দ্বারাই জগতে শান্তি এবং সুখের প্রতিষ্ঠা হইবে।

১৯৩০ সালে ভারতে বিদেশী-বাণিজ্য—

বর্ত্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যে যে অবনতি হইয়াছে তাহার মূলে কার্পাসজাত দ্রব্যাদির অত্যন্ত কম পরিমাণে আমদানী এবং প্রায় সকল প্রকার পণ্যদ্রব্যেরই মূল্য হ্রাস। ১৯৩০ সালে আমদানী-বাণিজ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। বাঙ্গালা ও বোম্বাই প্রদেশে গম, চিনি ও ইস্পাত পূর্ব্বাপেক্ষা কম আমদানী হইয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্যেরও এরূপ শোচনীয় অবস্থা পূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। গালা, চা এবং পাটের (প্রধানতঃ পাটনির্ম্মিত দ্রব্যাদির) যথারীতি চাহিদার অভাবে মূল্য হ্রাস হওয়ায় বঙ্গদেশ হইতে ৪ হাজার ২ শত ৮৭ লক্ষ টাকার দ্রব্য কম রপ্তানী হইয়াছে। বীজ ও খাদ্যদ্রব্য কম পরিমাণে রপ্তানী হওয়ায় এবং কার্পাসের দর কমিয়া যাওয়ায় বোম্বাই প্রদেশ হইতে ১৬ শত ৫০ লক্ষ টাকা, সিন্ধুদেশ হইতে ৬ কোটী টাকা এবং মাদ্রাজ হইতে ৯ কোটী ৪১ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য কম রপ্তানী হইয়াছে।

গতবর্ষের ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবরণ-পাঠে

দেখা যায় যে, এই বৎসর ৪ শত ৪২ কোটী টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছিল। ১ শত ৮৫ কোটী টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানী এবং ২ শত ৫২ কোটী টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী ও ৫ কোটী টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য পুনরায় রপ্তানী হইয়াছিল।

আলোচ্যবর্ষের সভারেইন ও অন্যান্য স্বর্ণমুদ্রার আমদানী প্রায় ৯ কোটী টাকার হইয়াছিল—কারেন্সী নোটের আমদানী হইয়াছে ১৩ কোটী টাকার। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, ১৯২৯ সালে ১২ কোটী টাকার রৌপ্য এবং ৮ লক্ষ টাকার কারেন্সী নোট আমদানী হইয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯১৩ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত কি পরিমাণ পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল ;—

পণ্যদ্রব্য		ধন		মোট		
১৯১৩—৪২৪	কোটী	৪৮	কোটী	৪৭২	কোটী	টাকা
১৯১৪—৩৬৯	"	৩১	"	৪০০	"	"
১৯১৫—৩০৭	"	২৩	"	৩৩০	"	"
১৯১৬—৩৭৮	"	১৭	"	৩৯৫	"	"
১৯১৭—৩৮৮	"	৩৫	"	৪২৩	"	"
১৯১৮—৪১৮	কোটী	৪	কোটী	৪২২	কোটী	টাকা
১৯১৯—৪৯২	"	১২	"	৫০৪	"	"
১৯২০—৬১৫	"	৩৪	"	৬৪৯	"	"
১৯২১—৫০৫	"	৬১	"	৫৬৬	"	"
১৯২২—৫৩৬	"	৫২	"	৫৮৮	"	"
১৯২৩—৫৬৮	"	৬৮	"	৬৩৬	"	"
১৯২৪—৬২৬	"	৭৪	"	৭০০	"	"
১৯২৫—৬৩৩	"	৮৬	"	৭১৯	"	"
১৯২৬—৫৬৩	"	৪৮	"	৬১১	"	"
১৯২৭—৫৭৩	"	৩৮	"	৬১১	"	"
১৯২৮—৫৮৬	"	৪২	"	৬২৮	"	"
১৯২৯—৫৭৮	"	৩১	"	৬০৯	"	"
১৯৩০—৪৪২	"	৩০	"	৪৭২	"	"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১৯৩০ সালে ১৯২৯ সাল অপেক্ষা ১ শত ৩৭ কোটী টাকা কম মূল্যের পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য হইয়াছে। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে ১৯২৯ সাল ও ১৯৩০ সালের ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আমদানী ও রপ্তানীর পার্থক্য বেশ বুঝা যাইবে :—

	১৯২৯ সাল	১৯৩০ সাল	শতকরা কতকম
বঙ্গদেশ	৮৭৩০০০০০০৲ (আমদানী)	৬১৫৩০০০০০৲ (আমদানী)	২৯.৫
	১৪০১৮০০০০০৲ (রপ্তানী)	৯৭৩১০০০০০৲ (রপ্তানী)	৩০.৬
বোম্বাই	৮৪৩৩০০০০০৲ (আমদানী)	৬১৪৩০০০০০৲ (আমদানী)	২৭.২
	৭৯২৭০০০০০৲ (রপ্তানী)	৬২৭৭০০০০০৲ (রপ্তানী)	২০.৮
সিন্ধু	২৮৪৮০০০০০৲ (আমদানী)	২১০৬০০০০০৲ (আমদানী)	২৬.১
	২৭০৪০০০০০৲ (রপ্তানী)	২১০৪০০০০০৲ (রপ্তানী)	২২.২
মাদ্রাজ	২৬৯৬০০০০০৲ (আমদানী)	২২৪৬০০০০০৲ (আমদানী)	১৬.৭
	৪৫৮২০০০০০৲ (রপ্তানী)	৩৬৩৪০০০০০৲ (রপ্তানী)	২০.৭
ব্রহ্মদেশ	২১৫৪০০০০০৲ (আমদানী)	১৮৩০০০০০০৲ (আমদানী)	১৫.০
	[illegible]৫৯০০০০০০৲ (রপ্তানী)	৩৯৬২০০০০০৲ (রপ্তানী)	৮.৩*
মোট	২[illegible]৮৬১০০০০০০৲ (আমদানী)	১৮৪৭৮০০০০০৲ (আমদানী)	২৫.৭
	৩২৮৯০০০০০০৲ (রপ্তানী)	২৫৭০৮০০০০০৲ (রপ্তানী)	২১.৮

* এখানে ৮.৩ শতকরা কম নহে, শতকরা বেশী।

ভারতে চাউল-সমস্যা—

দেখা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা, আসাম, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ ও মহারাষ্ট্র দেশের প্রায় ১৭॥০ কোটী লোক সাধারণতঃ চাউলের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। প্রতিবৎসর এই সকল লোকের জন্য ৯০ কোটী, ৪৭ লক্ষ, ৭০ হাজার মণ চাউলের প্রয়োজন, কিন্তু এই পরিমাণ চাউল ভারতে উৎপন্ন হয় না; সেইজন্য প্রতিবৎসর রেঙ্গুন হইতে ২ কোটী ৭০ লক্ষ মণ চাউল আমদানী করা হয়।

ভারতে ভারতবাসীর চাউলের অভাব হইতে পারে না; প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিলে এ সমস্যার নিশ্চয়ই সমাধান হইতে পারে। কৃষির উপর ভারতে ব্যয় হয় খুব অল্পই। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ ভারত অপেক্ষা অনেক সমৃদ্ধিশালী, সুতরাং তাহাদের কৃষির উপর ব্যয়াধিক্য কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু ইটালী তেমন ধনী দেশ নহে। ইংরাজ অর্থনীতিক ভারতবর্ষকে ইটালীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। এস্থলে উভয়ের কৃষির উপর ব্যয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করিবার জিনিস। ভারতবর্ষের (১৯২৪-২৫) প্রতি হাজার একর কর্ষিত ভূমিতে বৎসরে খরচ দেখা যায় মাত্র ৩০৲ টাকা। কিন্তু ইটালীর (১৯২৫-২৬) প্রতি হাজার একর কর্ষিত ভূমিতে বৎসরে খরচ দেখা যায় ১৮৪৲ টাকা। উপরন্তু ভারতে পতিত জমির ভাগ অনেক বেশী। এস্থলে কৃষির উপর ভারতের যে খুব বড় একটা দাবী থাকিতে পারে তাহা বলাই বাহুল্য।

(কৃষি)

কৃত্রিম সার প্রস্তুত—

ঢাকা কৃষিক্ষেত্রের কৃষিবিভাগের পরীক্ষা-মন্দিরে বহুদিন হইতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের পচনক্রিয়ার প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে। পাটের পচন, গাঁটবাঁধা পাটের ভিতরে গরম হওয়া, সবুজ সার এবং অন্যান্য অনেক উদ্ভিজ্জ পদার্থের পচন-প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়াছে। তন্মধ্যে খড়ের পচন-প্রণালী বিশেষভাবে দেখা হইয়াছে। ফলে দেখা গিয়াছে যে, পাটের আঁশ যে প্রণালীতে পচিয়া থাকে খড়ের পচন-প্রণালীও প্রায় তদ্রূপ।

বিলাতে রথামষ্টেড্ নামক পরীক্ষাক্ষেত্রে রিচার্ডস সাহেবও ঠিক এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং তিনিও আমাদের মত ফল পাইয়াছেন। সেই ফলটা এই :— সুযোগ বুঝিয়া নাইট্রোজেন এবং ফস্ফেট যোগ করিলে খড় শীঘ্র পচিয়া থাকে এবং তাহাতে যে সার প্রস্তুত হয় তাহা অনেকটা গোয়ালঘরের সারের সমতুল্য।

খড়ের সহিত নাইট্রোজেন যোগ করিবার উদ্দেশ্যে রথামষ্টেডে এমোনিয়া সংযুক্ত লবণ ব্যবহার করা হইয়াছিল। আজকালকার "এড্কো" সংযোগ করিলে খড় পচাইবার জন্য এমোনিয়ালবণের আর আবশ্যক করে না।

ঢাকার পরীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে যে, ইউরিয়া নামক পদার্থ সংযোগে খড়ের পচনক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র এবং উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্যয়াধিক্যবশতঃ ইউরিয়ার পরিবর্ত্তে গোমূত্র অতি সুন্দর কাজ করে বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং নাইট্রোজেনের জন্য গোমূত্র এবং ফস্ফটের জন্য হাড়ের গুঁড়া এই দুই পদার্থের সংযোগে কৃত্রিম উপায়ে খড় হইতে সার প্রস্তুত করিবার একটী ধারা শীঘ্রই বাহির করা হয়।

কার্য্যপ্রণালী নিম্নলিখিতরূপ :—

অব্যবহার্য্য খড়, আকের শুক্না পাতা, আকের ছিব্ড়া, ক্ষেতের আগাছা, কচুরীপানা প্রভৃতি যে কোন নরম উদ্ভিজ্জ পদার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই পচাইবার পদার্থ জমির উপর একফুট উঁচু করিয়া স্থাপন কর। এই গাদা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কত বড় হইবে তাহা পচাইবার পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। প্রথম ফুট বিছান হইলে তাহার উপর হাড়ের গুঁড়া কয়েক মুঠা ছড়াইয়া দেও এবং পরে একভাগ গোমূত্রে পাঁচভাগ জল মিশ্রিত করিয়া সেই জলদ্বারা গাদাটী বেশ করিয়া ভিজাইয়া দেও। তারপর আর এক স্তর খড় বা অন্যান্য পদার্থ স্থাপন কর এবং পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তাহাতে হাড়ের গুঁড়া ছিটাও এবং গোমূত্র দ্বারা ভিজাইয়া দেও। এইরূপে গাদা প্রস্তুত করিয়া যাও। গাদাটীর তলার বেড় খুব বড় করা উচিত নহে। গাদার ভিতর জলের ভাগ যত অধিক হইবে পচনক্রিয়াও তত দ্রুত হইবে। সুতরাং পচনের ফলে যখন গাদাটী গরম হয় তখন যদি গাদার তলার বেড় বড় হওয়ার

দরুণ প্রত্যেক স্তর খুব পাতলা হয় তবে সমস্ত তাপ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই পচনক্রিয়া সম্পন্ন হইতে দেরী হইয়া পড়ে। তলা বড় করার আর একটা দোষ এই যে, জলীয় ভাগ বহু পরিমাণে উড়িয়া যায়। সেইজন্য ছোট গাদা লইয়া কাজ আরম্ভ করা সর্ব্বরকমে ভাল, কারণ একটী গাদা শেষ হইলে তাহার গায়ে আর একটী গাদা করা কিছুই কষ্টকর নহে। বর্ষাকালে গাদার মাথা সমান না রাখিয়া কোণ করিয়া দেওয়া ভাল। টিনের ঘরের চাল যেমন ঢালু হয় সেই রকম করাই ভাল; সমতল হইলে গাদার ভিতরে জল ঢুকিয়া সারটা নষ্ট করিয়া ফেলে, কিন্তু ঢালু ছাদ থাকিলে জল গাদার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া গড়াইয়া পড়িয়া যায়।

গাদা ঠিকমত প্রস্তুত হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে ভিতরের উত্তাপ খুব বেশী হইবে। খুব বেশী গরম হইলে গাদা ভাজিয়া পুনরায় গড়িয়া দেওয়া উচিত। তাহাতে নাইট্রোজেন নষ্ট হইবে না। ঠিক কত ডিগ্রী তাপে সবচেয়ে ভাল কাজ হইবে তাহা এখনও সঠিক বলা যায় না। তবে মোটামুটি এই ধরা যায় যে শরীরের উত্তাপের কাছাকাছি অর্থাৎ কাঃ তাপে নাইট্রোজেন প্রভৃতি কিছুই লোকসানের ভয় থাকে না। পচনক্রিয়া সম্পন্ন হইতে প্রায় ৪ মাস সময় লাগে। তখন গাদাটী সুন্দর সারে পরিণত হইয়া থাকে।

এই নিয়মে কাজ করা এখন আর পরীক্ষার বিষয় নহে। আগে যে সমস্ত আগাছা বা ঘাস বা খড়কুটা নষ্ট হইত এবং যে গোমূত্র কোন কাজে লাগিত না এখন তাহা হইতে ঢাকা ফার্ম্মে প্রায় ১৫০০ মণ উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইতেছে। পূর্ব্বে যে পরিমাণ সার প্রস্তুত হইত এখন তাহার ⅙ অংশ বেশী সার পাওয়া যাইতেছে।

সরকারী সকল কৃষিক্ষেত্রেই এখন এই কৃত্রিম সার প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং সাধারণ যে কেহ এই বিষয়ে উৎসাহী হইলে জেলায় কৃষি-কর্ম্মচারীর নিকট এ বিষয়ে সাদরে উপদেশ এবং সাহায্য পাওয়া যায়।

কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর মহাশয় এই দেশের অনেক গণ্য ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন যে কিরূপে কৃষিবিভাগ হইতে তাঁহাদের প্রত্যেকের জেলার স্থানীয় চাষীদিগের উন্নতি ও সাহায্য করা যাইতে পারে। উত্তরে অধিকাংশ ব্যক্তিই জানাইয়াছিলেন যে সারের অভাব পূরণ করা কৃষিবিভাগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য।

মূত্রের পরিবর্ত্তে এমোনিয়াম্ সালফেটের জল (একশত ভাগ জলে দুইভাগ এমোনিয়াম্ সাল্‌ফেট্ গুলিয়া লইলে চলে) ব্যবহার করা চলে, কিন্তু বিনা খরচায় সহজে যে মূত্র পাওয়া যায় তাহা ত্যাগ করিয়া খরচের দিকে যাইবার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। সুতরাং গোমূত্র যাহাতে নষ্ট না হয় তাহা দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য।—সম্মিলনী

শ্রাবণ মাসের কৃষি—

সব্জীবাগান

এই সময় শাকাদি, সীম, ঝিঙে, লঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুঁই, বেগুন, বরবটি, সাঁকালু, টেঁপারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি ও দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে।

বিলাতী সব্জীর বীজ, বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই।

ফুলের বাগান

দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা), এমারান্থাস, কক্সকোম্ব, লাইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, মার্টিনিয়া, ক্যানা প্রভৃতি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই।

ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া তাহা হইতে দুই-একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপণ করিয়া নূতন ঝাড় তৈয়ারী করা যায়।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল কাটিং করিয়া পুঁতিয়া চারা তৈরি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ক্যানা, লিলি প্রভৃতির পট্ বা গামলা বদলাইবার সময়

বর্ষারম্ভ, কেহ কেহ সময় না পাইলে আষাঢ়-শ্রাবণ পর্য্যন্ত এই কার্য্য শেষ করেন।

মূলজ ফুলগাছের মূল বর্ষায় বসাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। কতকগুলির মূল বর্ষাকালে গামলায় তুলিয়া না রাখিলে জল বসিয়া পচিয়া যায়। ডালিয়া এই শ্রেণীভুক্ত।

কলিয়স, ক্রোটন, আমারান্থাস, একালিফা প্রভৃতির ডাল কাটিয়া পুঁতিয়া এই সময় বাড়াইতে পারা যায়।

ফলের বাগান

আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তেও বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত যেন গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মারা না যায়।

আম, লিচু, কুল ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল-কলম করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি-চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং করা বলে।

আনারসের গাছের ফেঁকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীজ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল-গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈরি করিতে হয়।

পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। বর্ষাতেই পেঁপে-বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায় কিন্তু চারা তৈরি করিয়া ভাদ্রমাসের আগেই চারা নাড়িয়া না পুঁতিলে ভাদ্রের রৌদ্রে চারা বাঁচান দায় এবং জমিতে ঘাস-পাতা-পচানি হেতু জমি অম্লাক্ত হওয়ায় তখন চারার অনিষ্ট হয় চারা-গুলি তিন-চারি পাতা হইলে, যখন বৃষ্টি হইতে থাকে তখন নাড়িয়া বসান উচিত।

যাহারা বেড়ার বীজের দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হইবেন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুরমত গজাইতে পারে।

শস্যক্ষেত্র

কৃষকের এখন বড় মরসুম। বিশেষতঃ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যাইবে। আষাঢ় মাসে বীজ-ধান্য বপনের উপযুক্ত সময়। এই মাসের শেষ কিংবা ভাদ্রের প্রথমে আউশ ধান কাটে।

পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। বাংলার দক্ষিণাংশে পাট নাবিতে হয়।

অন্যান্য

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁটালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখনও একটু সময় আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের মাটি বিচলিত করা কর্ত্তব্য।

সুপারিগাছের গোড়ায় এই সময় গোবরমাটি দিতে হয়। এই সময়ে ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোবর দিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। ফলের গাছে হাড়ের গুঁড়া এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা—শিশু, সেগুন, মেহাগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

ক্ষেতে জল না জমে সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেত্রের পয়নালা ঠিক করিয়া দেওয়া এই সময় বিশেষ আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাওয়া যায়, কোন লতা-গুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া এইরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়।

কলার তেউড় এ মাসে পুঁতিলেও হইতে পারে। বেগুন, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া এই সময় গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে।

আকের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতক-গুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন নিকটস্থ চারি গাছা আক একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নইলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিংবা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুঁতিবে। এই মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে লঙ্কা পুঁতিলেই হইবে, নচেৎ গাছগুলি ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল ভাল হয় না।—সম্মিলনী

মাসপঞ্জী

রাজনৈতিক—

২৩এ জ্যৈষ্ঠ···বেসিন জিলায় (রেঙ্গুণ) নূতন পুলিশ নিয়োগ—২২টী গ্রাম উপক্রুত। চট্টগ্রামে পুনরায় সান্ধ্য-আইন জারি—বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার।

২৪এ···জার্ম্মাণীর আর্থিক দুরবস্থা—লণ্ডনে রাজস্বদপ্তরে রুদ্ধগৃহে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সহিত জার্ম্মাণ মন্ত্রীদ্বয় ডাঃ ব্রিউনিং ও ডাঃ কার্টিয়াসের আলোচনা—জাতির প্রতি হিণ্ডেনবার্গের আবেদন।

২৫এ···ব্রহ্মে বিদ্রোহীদের সাড়া—পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ—বহু হতাহত—সম্পত্তি লুণ্ঠিত—গৃহ ভস্মীভূত। নওজোয়ান ভারতসভার সভাপতি মিঃ আমেদিন গ্রেপ্তার। 'ময়ূখ'-সম্পাদক গ্রেপ্তার (বরিশাল)। মক্কায় অহিংস আন্দোলন—জনাকীর্ণ সভায় (বারদৌলি) 'সীমান্ত গন্ধী' মিঃ আব্দুল গফর খাঁর বক্তৃতা—সভানেত্রী শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গন্ধী।

২৮এ···বোম্বাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির শেষ অধিবেশনে জাতীয় পতাকা ও সরকারী ঋণ সম্বন্ধে আলোচনা।

৩১এ···ফ্রান্সের নবনির্ব্বাচিত সভাপতি মঁসিয়ো ডুমের এলাইসি রাজপ্রাসাদে ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডুমার্গের নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ। ব্রহ্মে পূর্ব্ববৎ লুঠতরাজ ও ভারতীয়ের প্রতি অত্যাচার।

২রা আষাঢ়···চট্টগ্রামে আবার কার্ত্তুজ ও বিস্ফোরক দ্রব্য—স্থানে স্থানে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার—আরও দুই মাস ১৪৪ ধারার কার্য্যকাল বৃদ্ধি। বিদ্রোহীদের ক্ষমাপ্রদর্শন-কল্পে ব্রহ্ম গভর্ণরের কয়েকটী সর্ত্তের ঘোষণা।

৩রা···ব্রহ্ম-বিদ্রোহের জের—বৌদ্ধ-মন্দির চড়াও—বহু বিদ্রোহী ধৃত। "আনন্দবাজার পত্রিকার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত 'স্বাধীনতার দাবী' নামক বাজেয়াপ্ত পুস্তকের খোঁজে আনন্দবাজার অফিসে খানাতল্লাস—পুনশ্চ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে পুলিশের হানা।

৪ঠা···চট্টগ্রামে গ্রামে গ্রামে খানাতল্লাস—সেনাদল-কর্ত্তৃক পাহাড়তলী ঘেরাও—গ্রেপ্তারের হিড়িক। চাঁদপুরে ধরপাকড়—বহু কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার। বারাণসীর 'আজ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাও বিষ্ণু পারদকার গ্রেপ্তার। হাজিপুর রেল-ষ্টেশনে ডাকলুটের জের—৩ জন কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার।

৫ই···বাঙ্গালা-কংগ্রেস-দ্বন্দ্বের তদন্ত-সম্পর্কে প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতির আবেদন। মৈমনসিংহে মদের দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং-এ বাধা—স্বেচ্ছাসেবককে চপেটাঘাত—পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ। লক্ষ্ণৌ বড়বাঁকির কৃষকদের দুর্দ্দশার কাহিনী—জমিদারের রাজস্ব আদায়ে কঠোর-নীতি অবলম্বন—গ্রামে গ্রামে ১৪৪ ধারা জারি।

৮ই···বড়বাঁকিতে খাজনা-সমস্যা গুরুতর—কংগ্রেস-সেক্রেটরী গ্রেপ্তার—১৫০ জন কৃষক পুলিশ-হেফাজতে। ব্রহ্ম-বিদ্রোহ—সর্ব্বত্র অবাধ লুঠতরাজ। কলিকাতার নানা-স্থানে খানাতল্লাস—ভগৎসিং-এর চিত্র হস্তগত।

৯ই···বোম্বাই সরকারের অর্থসঙ্কট—সেণ্টজ হাঁসপাতালে রোগীর স্থান হ্রাস। মজঃফরপুর জেলার বেণীপুর নামক স্থানে 'যুবক'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামবিকাশ শর্ম্মার গৃহে খানাতল্লাস—সম্পাদকের নামে ১২৪ (ক) ধারার পরোয়ানা। ব্রহ্মে ভারত-বিদ্বেষ-আন্দোলনের মূলউৎস-সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর অভিমত।

১০ই···'যুবক'-সম্পাদকের জামিনে মুক্তি। বহুবাজারে পিকেটিং।

১২ই···লাহোরে 'ট্রিবিউন'-অফিসে খানাতল্লাসী—পুলিশকবলে বহুসংখ্যক 'ট্রিবিউন' পত্র।

১৪ই···বোম্বাই-এ শান্তিপূর্ণ পিকেটিং-সম্পর্কে শ্রীযুক্ত গণপতি শঙ্কর দেশাই গ্রেপ্তার।

১৫ই···নাগপুর কংগ্রেস-সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস, টি, ধর্ম্মাধিকারী বেতুলের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে গ্রেপ্তার। স্বর্গীয় লালা লাজপৎ রায়ের প্রতিষ্ঠিত লাহোরের 'পিপল' পত্রিকা অফিসে খানাতল্লাস ও পররাষ্ট্র অর্ডিন্যান্স ভঙ্গজনিত অপরাধে পুলিশ-কর্ত্তৃক সম্পাদক গ্রেপ্তার। আনন্দতালুকে

(বোরসাদ) সম্পত্তি ক্রোক—মহাত্মা গন্ধীর তীব্র প্রতিবাদ ও রাজস্ব রেহাই করার উদ্দেশ্যে তালিকা প্রস্তুত।

১৬ই···বোম্বাই-এ দেশীয় নৃপতিগণের বৈঠক—গোল-টেবিল-বৈঠকে যোগদান-প্রসঙ্গ। লক্ষ্ণৌ-এ বহু কৃষক গ্রেপ্তার—খাজনা-প্রদান সমস্যা প্রবল। শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত কাব্যগ্রন্থ 'শতাব্দীর সঙ্গীত' বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত।

১৭ই···সম্রাট্ কর্ত্তৃক দীনেশ গুপ্তের প্রাণদণ্ড মকুবের প্রার্থনা না-মঞ্জুর—ফাঁসীর দিন অনির্দ্দিষ্ট।

১৮ই···ব্রহ্মে টাঙ্গুজেলায় কতিপয় ভারতীয়ের গৃহে হানা—কয়েকটী গ্রামে অত্যাচার—৬৯ জন বিদ্রোহীর আত্ম-সমর্পণ। লক্ষ্ণৌ-এ খাজনা-আদায়ের ব্যাপারে ৭০০ শত লোকের বিরুদ্ধে মামলা—লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস-কমিটীর সদস্য স্বামী গৌতম, কংগ্রেসকর্ম্মী পণ্ডিত লক্ষ্মীচাঁদ ও জমিদার ঠাকুর নাম্নার সিং গ্রেপ্তার।

১৯এ···প্রোমে (রেঙ্গুণ) ৬০০ শত বিদ্রোহীর আত্ম-সমর্পণ—হেনজাদা জেলায় অতিরিক্ত পুলিশ-বাহিনী মঞ্জুর। বোম্বাই-এ সরকারী সংবাদপত্র 'গুজরাট পত্রিকা'র প্রথম প্রকাশ।

২০এ···"ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই"—পাঞ্জাব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-সম্মেলনের প্রস্তাব।

বৈদেশিক—

৩০এ জ্যৈষ্ঠ···ফ্রান্সের উপকূলে সেণ্ট নেজারের নিকট ষ্টীমার ডুবির ফলে ৪০০ শত লোকের প্রাণহানি (প্যারিসের সংবাদ)।

১লা আষাঢ়···কাবুলে বিষম ভূমিকম্প—১৫ জন নিহত—৫০টী বাড়ী ধ্বংস (পেশোয়ারের সংবাদ)।

৬ই···বিভিন্ন রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থার প্রতিকার-কল্পে আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট-এর এক বৎসরের জন্য সমস্ত রাষ্ট্রের নিকট হইতে ঋণের অর্থ আদায় স্থগিত রাখার প্রস্তাব—প্রেসিডেণ্ট হুভারের ঘোষণা (ওয়াশিংটনের সংবাদ)।

৮ই···ঋণ আদায় স্থগিতের জন্য ত্যাগস্বীকারের সমস্যা—শেষ সিদ্ধান্তের ভার ফরাসীর হাতে—ফ্রান্সের উপর সমগ্র জগতের দৃষ্টি—সর্ব্বত্র রাজনৈতিক মহলে গবেষণা। কাবুলে রাজকর্ম্মচারিগণ দণ্ডিত—অবৈধ কার্য্য ও ঘুষ গ্রহণ।

৯ই···লণ্ডনের ডরসেটের নিকট এক কারখানায় ভীষণ বিস্ফোরণ—৯ জন নিরুদ্দেশ, ১৯ জন কর্ম্মচারী আহত। প্রেসিডেণ্ট হুভারের প্রস্তাবে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের উত্তর।

১১ই···ফ্রান্সে প্রেসিডেণ্ট হুভারের প্রস্তাব-সম্পর্কে আলোচনা।

১৪ই···স্পেনের সাধারণ নির্ব্বাচন—গণতান্ত্রিক দলের জয়—নির্ব্বাচনের হাঙ্গামায় ছয় জন নিহত (মাদ্রিদের সংবাদ)।

১৫ই···গ্রীষ্মাধিক্যে নিউইয়র্কে একদিনে ২৩০ জনের প্রাণনাশ। ভারতে বিমানপোত-চালনার প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত রাখার সম্বন্ধে লণ্ডন পার্ল্যামেণ্টে কমন্স-সভায় সদস্য-দিগের খেদ।

সামাজিক—

২৫এ জ্যৈষ্ঠ···কাণপুরে আবার অগ্নিকাণ্ড—অগ্নি-নির্ব্বাণে কিরণ সেবাসমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণের সহায়তা—গত দাঙ্গার বিষময় ফল।

৩১এ···শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ মহকুমার সমস্ত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ। মহাত্মাজীর "যুদ্ধ মেডেল" প্রাপ্তি-বিষয়ে মতদ্বৈধ—প্রেস-প্রতিনিধির নিকট মহাত্মাজীর বর্ণনা।

২রা আষাঢ়...এলাহাবাদ জংসনে পণ্ডিত জওহরলালের উপস্থিতি ও ভীষণ চাঞ্চল্য—ক্ষ্যাপা মুসলমানের অদ্ভুত আচরণ—শ্রীযুক্তা কমলা নেহরুকে আক্রমণের অভিপ্রায়? বরোদায় নূতন আয়-কর—জনমতের তীব্র বিরুদ্ধতা—নির্ব্বাচিত সদস্যগণের একযোগে পদত্যাগ। স্যালেমে ১৫ জন পিকেটার কারাদণ্ডিত—তাড়ির দোকানে নীলাম-সম্পর্কে পিকেটিং ও জনসাধারণকে নীলাম-আহ্বানে যোগদানে বাধাপ্রদান।

৫ই···কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ত্রিবাঙ্কুর সরকারের লক্ষাধিক মুদ্রা দান।

৬ই···মাদ্রাজে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড—পাঁচশত ঘরবাড়ী ভস্মসাৎ—হাজার লোক গৃহহীন। ত্রিচীনপল্লীতে বিষম দাঙ্গা—১২ জন আহত—তথাকথিত অস্পৃশ্যদের উপর সামাজিক বাধা-নিষেধের ফল।

১১ই···তাজমহল হোটেলে ইউরোপীয়ানগণ কর্ত্তৃক

মহাত্মাজীর সংবর্দ্ধনা—'স্বরাজ গভর্ণমেণ্টে ইংরাজদের স্থান' সম্পর্কে মহাত্মাজীর বক্তৃতা। টাউনহলে স্তর সি, ভি, রমণকে কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে অভিনন্দনপত্র প্রদান। হাওড়া ষ্টেশনে ডাক্তার আন্সারীকে কলিকাতাবাসীর বিপুল সংবর্দ্ধনা। কলিকাতা হ্যালিডে পার্কে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা কর্ত্তৃক মহাসমারোহে জাতীয়পতাকা উত্তোলন।

১২ই…লক্ষ্ণৌ-এ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিপুল সংবর্দ্ধনা—আমিনুদ্দৌলা পার্কে কৃষাণদিগের বিরাট্ জনসভা—বর্ত্তমানে কৃষাণদিগের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর বক্তৃতা।

১৫ই…ডাঃ আন্সারী কর্ত্তৃক 'লিবার্টি হাউস'এর দ্বারোদ্ঘাটন—নবগৃহ-প্রবেশে দেশনায়কগণের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। বোম্বাই-এ পিকেটিং—তিন শত পুরুষ ও মহিলার যোগদান—তাড়ির দোকানের লাইসেন্স বন্ধ করিবার অভিযান। এলাহাবাদে পিকেটিং আরম্ভ—মুসলমান বস্ত্রব্যবসায়ীদের হুম্‌কী।

১৭ই…ঢাকা কামারুন্নেশা বালিকা-বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটীর সভায় ভীষণ চাঞ্চল্য—সম্পাদক বিভু গুহঠাকুরতার পদত্যাগ—শ্রীমতী সুজাতা রায়কে পুনর্নিয়োগের আলোচনা।

১৮ই…রেঙ্গুণের পাইনমিনা বাজারে ভারতীয় দোকানে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি—একটী বৃহৎ সৌধের দুইটী মহাল ভস্মীভূত। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ সন্তরণবীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের একাদিক্রমে ৭৫ ঘণ্টা সন্তরণের সঙ্কল্প—হেদুয়ায় অসংখ্য নরনারীর সমাগম।

১৯এ…সেকেন্দ্রাবাদে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—প্রায় এক শত দোকানে অগ্নিসংযোগ—৩০ জন হিন্দু ও ৪ জন মুসলমান আহত, ৫ জন দাঙ্গাকারী ধৃত। মোর্ভিরাজ্য (বোম্বাই) সভাসমিতি ও মিছিলাদির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া পিকেটিং-এর ফলে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকগণ ধৃত—৩৬ জনকে বেসারার সীমান্তে মরুভূমিতে আটক।

২০এ…খাজনা সম্পর্কে নূতন সমস্যা—লক্ষ্ণৌ-এ জমিদারগণের রসিদ-প্রদানে অসম্মতি—১৮ জন কংগ্রেসকর্ম্মী ১০৭ ধারা-অনুযায়ী গ্রেপ্তার। কাণপুর দাঙ্গা সম্বন্ধে বিবৃতি প্রদান করায় অখিলভারত হিন্দুমহাসভার সম্পাদক পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল ১৫৩ (এ) ধারানুসারে পাটনা জেলা-মেজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত।

সভা-সমিতি—

১লা আষাঢ়…দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ষষ্ঠ বার্ষিক স্মৃতিতর্পণ—সমগ্র বঙ্গদেশে দেশবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

৮ই · বোরসাদে মহাত্মা গন্ধী—কৃষক-সভায় বক্তৃতা—বাকী রাজস্ব প্রদান সম্পর্কে উপদেশ।

১১ই…কলিকাতা 'নাট্যনিকেতনে' মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ৮৮ তম জন্মোৎসব।

১৩ই…বাগবাজারে শ্রীশ্রীহরনাথ পাঠশালা ভবনে ঠাকুর পাগল হরনাথের জন্মতিথি-উৎসব।

১৪ই·· মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু-বার্ষিকী উৎসব—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে স্তর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর সভাপতিত্বে বিরাট্ সভা। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিউটে স্তর সি, ভি, রমণের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব-অনুষ্ঠান।

১৫ই…সালিখা নাট্যপীঠে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর সভানেত্রীত্বে গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য-সমাজের চতুর্দ্দশ বার্ষিক উৎসব।

১৬ই·· হ্যালিডে পার্ক (স্বরাজ উদ্যান)এ শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে বিরাট্ জনসভা—"ব্রহ্মবিদ্রোহ" সম্পর্কে আলোচনা—গোলমালে সভাভঙ্গ।

১৯এ…কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্-হলে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে "অখিলভারত ট্রেড্ ইউনিয়ান কংগ্রেস"-এর একাদশ অধিবেশন আরম্ভ।

২০এ…ইটালী জীবশিব মিশন আলয়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃশাস্ত্রী মহাশয়ের "গীতা" সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা। শ্রীধর্ম্মরাজিক চৈত্যবিহার হলে "বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভের পন্থা" বিষয়ে বক্তৃতা। সুবার্ব্বাণ রিডিং ক্লাবে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠান।

সাহিত্যিক—

২১এ জ্যৈষ্ঠ…স্বনামধন্য বেদজ্ঞ পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (দ্রাবিড়) মহাশয়ের পরলোক গমন (বারাণসী)।

২৭এ . বঙ্গসাহিত্যে সুপণ্ডিত বৈষ্ণবশাস্ত্রাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মৃত্যু (নারায়ণগঞ্জ)

১৬ই আষাঢ় ..'চরকসংহিতা' প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রগ্রন্থের সম্পাদক সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্যরত্ন কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ সেন (এম-এ) মহাশয়ের মৃত্যু (কলিকাতা)।

শান্তিপুর-চিত্র

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নদীয়া জেলার শান্তিপুরধাম বঙ্গে চিরদিন একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আধ্যাত্মিক জগতে একদিকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু এবং অপরদিকে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষের লীলাস্থল বলিয়া শান্তিপুর সুবিখ্যাত। ইহার রাসমেলা ও সূক্ষ্মবস্ত্রের খ্যাতি সুদূরপ্রসারিত। স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিতপ্রবর ৺রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি, ঔপন্যাসিক ৺দামোদর মুখোপাধ্যায়, কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী, ব্যায়ামবীর শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী ও ৺আশানন্দ মুখোপাধ্যায়, ভাগবতোত্তম শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী ও ৺রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভৃতি মহোদয়গণ এই শান্তিপুরের অধিবাসী। শান্তিপুরের কীর্ত্তিমালা একত্র গ্রথিত হইলে এক সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে। ইহার আংশিক বিবরণ বহু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নে ইহার একটী চিত্র প্রদত্ত হইল। (১)

এক

প্রসিদ্ধ লং সাহেব ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুর সম্বন্ধে একটী বর্ণনা লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধের নাম 'The Banks of the Bhagirathi'। (২) নিম্নে উহার সারাংশ উদ্ধৃত হইল। তৎসঙ্গে প্রয়োজনগত প্রাসঙ্গিক অন্য বিষয়েরও উল্লেখ থাকিবে।

প্রথমেই শান্তিপুরের বৈশিষ্ট্য হিসাবে উক্ত হইয়াছে যে, ইহা "গোস্বামীদিগের দুর্গ"। হল্‌ওয়েল্ পূর্ব্বে ইঁহাদিগকে "Gentoo Bishops" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। "শান্তিপুর গোঁসাই, দর্জ্জি ও তন্তুবায়ের জন্য বিখ্যাত। বিদ্যার জন্য ইহার খ্যাতি বহুকাল হইতেই আছে। ইহা হিন্দু-সংস্কারক চৈতন্যের বন্ধু অদ্বৈতের জন্মস্থান ছিল। এখনও ৩০টীর অধিক চতুষ্পাঠী আছে, পূর্ব্বে অবশ্য আরও বেশী ছিল। এক-তৃতীয়াংশ লোক বৈষ্ণব। অদ্বৈতের বহু বংশধর এখানে বাস করেন। দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে চৌধুরীবাবু শ্যামচাঁদের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।"

শান্তিপুরের উক্ত খাঁ-চৌধুরী বাবুরা বিশিষ্ট ধনী ও কীর্ত্তিমান্ ছিলেন। তাঁহারা সমুদ্রপথে অর্ণবপোতে বাণিজ্য-কার্য্য করিতেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তাঁহারা ১০৮টী পুষ্করিণী ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। শান্তিপুরে এখনও 'খাঁদের পুকুর' বর্ত্তমান। স্বগ্রামে তাঁহাদের কীর্ত্তিমালার মধ্যে ৺কালাচাঁদ ও ৺শ্যামচাঁদ বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা অন্যতম। ৺শ্যামচাঁদবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাসময়ে দেশদেশান্তর হইতে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত আগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে গুপ্তিপাড়ার ৺বৃন্দাবনচন্দ্রদেবের মঠের শ্রীপাদ সোমকানন্দ পণ্ডিত-মণ্ডলীসহ উপস্থিত ছিলেন এবং ইঁহাদের সঙ্গে আগত ৺নীলমণি ভট্টাচার্য্য কৌশলে খাঁ-চৌধুরীদের ভ্রম বুঝাইয়া গুরুর নামে ৺শ্যামচাঁদবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। (১) ৺রামগোপাল খাঁ-চৌধুরী ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিগ্রহ এবং ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি "তদুপলক্ষে নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া, লক্ষ মুদ্রা যৌতুকদানে 'চৌধুরী' উপাধি গ্রহণ"(২) করিয়াছিলেন। কিন্তু দৃষ্ট হয় যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশবর্ষ বয়সে রাজগদী লাভ করেন। (৩) কিংবদন্তী এই যে, মহারাজ ক্রমশঃ

---

(১) ইতিপূর্ব্বে 'শান্তিপুর' ও 'যুবক' পত্রিকার অনুরূপ কতিপয় চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে—শান্তিপুরে চৈতন্যদেব, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের শান্তিপুর লীলা, শান্তিপুরের প্রাচীন গ্রন্থত্রয়; সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, শান্তিপুরের সাধু ও ভক্তমণ্ডলী, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ও শান্তিপুর এবং শান্তিপুরে রসসাগর।

(২) The Calcutta Review, Vol. 6

(১) যুবক, শ্রাবণ ১৩২৩

(২) শান্তিপুর বৃত্তি

(৩) নদীয়া-কাহিনী

বর্দ্ধমান ২৫,০০০৲, ৫০,০০০৲ ও ৭৫,০০০৲ টাকা দান-গ্রহণে শূদ্রবাটীতে আসিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু লক্ষ টাকার তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। মোট নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই মন্দির বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। মন্দির-লিপিতে লিখিত আছে—

তঃ শ্যামচন্দ্রস্য
মন্দিরং পূর্ণতোমিয়াৎ
বসুবেদর্ত্তু শুভ্রাংশু
সংখ্যয়া গণিতে শকে।

শান্তিপুরের বিদ্যার খ্যাতি সম্বন্ধে এখানে আর একটী উক্তি উদ্ধৃত হইল। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ত্রিবেণী, গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর, নবদ্বীপ এই চারিটী স্থান বঙ্গদেশে বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র। "Tribeni is one of the four *samajes* or places famous for Hindu learning, the other three being Guptipara, Santipoor, and Novodwip or Nadiya, all situated 20 to 30 miles north of Tribeni." (১)

আর এক কথা। চৈতন্যদেব ও অদ্বৈতাচার্য্য আমাদের চক্ষুতে যে কত মহৎ ছিলেন, সে ধারণা না থাকায় পাদরি লং সাহেব উঁহাদের সম্বন্ধে অতি সাধারণভাবে লিখিয়াছেন। অন্যত্র (২) ইনি চৈতন্যদেবকে 'বিপ্রবশ্রেষ্ঠ' ('Heresi-arch') বলিয়াছেন এবং তাঁহার জন্ম, মৃত্যু, সন্ন্যাসগ্রহণের তারিখ প্রভৃতি বিষয়ে তৎকালপ্রচলিত কতকগুলি মারাত্মক ভ্রমের মধ্যে পড়িয়াছেন।

দুই

তারপর লং সাহেব কতিপয় সামাজিক কলঙ্কের কথা লিখিয়াছেন। "প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে (সে সময় হইতে) চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন কুলীন ছিলেন। তাঁহার ১০০টী পত্নী ছিল। তিনি একটী পত্নীর উপর স্বেচ্ছাচার-যুক্ত ব্যবহার করায়, তাঁহার শ্যালক তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। তাঁহার ৮টী স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছিল। শান্তিপুরে পূর্ব্বে বহু সতীদাহ হইত। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার ৫৬টী সতীদাহের মধ্যে ২০টী শান্তিপুরে হইয়াছিল। নরবলিও বিতর হইত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুরের নিকট কালীঘাটে একটী মুসলমান ক্ষৌরকারকে কালীদেবীর সম্মুখে বলি দেওয়া হইয়াছিল; হত্যাকারীর ফাঁসী হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের) একদল ব্রাহ্মণ বারোয়ারী পূজোপলক্ষ্যে মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া আমোদ করিতেছিল। ছাগাভাবে একজন কালীদেবীর সম্মুখে নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গীকৃত করিল এবং অন্য একজন খড়্গ দিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিল। পরদিন প্রাতে জ্ঞানলাভ করিয়া, তাহারা শবকে ঘাটে লইয়া গিয়া দাহ করিল এবং ঐ ব্যক্তি ওলাউঠায় মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিল। (১) আত্ম-হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। স্ত্রীলোকেরা সামান্য গৃহকলহের জন্য উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে বলপূর্ব্বক হত্যা করা হয়; সম্প্রতি একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে ঘাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, তার মুখময় কাদামাখা ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে (ঐ সময়ের) ৪৫ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দগ্ধ হইবার অনুমতি চাহিয়াছিল; ম্যাজিষ্ট্রেট্ অর্থ দিতে চাহিলে সে প্রত্যাখ্যান করিল এবং সেই রাত্রেই তাহাকে দগ্ধ করা হইল। এখানে কখনও কখনও তান্ত্রিক ব্যভিচার-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তন্মধ্যে একটী হইতেছে নগ্নিকা স্ত্রী-লোকের পূজা। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে শান্তিপুরের এক ব্রাহ্মণ একটী চর্ম্মকারকন্যার সহিত অবৈধ সংসর্গ করিয়াছিল; মহারাজের আজ্ঞায় তাহার ধোপা-নাপিত বন্ধ হইল; সে বৃথা মহারাজ ও নবাবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল; পরে মহারাজের করুণা হইয়াছিল কিন্তু লোকের আপত্তিতে উহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়াই থাকিল। উৎকোচগ্রহণ অতি সাধারণ; প্রতিদিন দুই আনা পাইলে সাক্ষী যে-কোন কথা শপথ করিয়া বলিতে পারে।"

যখন লং সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন, তখন সাধারণ মিশনারী বা মিস্ মেয়ো প্রভৃতি প্রচারিত বার্ত্তার ন্যায় ইহা মিথ্যা কলঙ্কপ্রচার বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না।

(১) Bengal, Past and Present, 1909, Vol. III, p. 22

(২) The Calcutta Rev., 1846, Vol. 6, pp. 422-3

(১) মনস্বী ভোলানাথ চন্দ্রও 'Travels of a Hindoo' নামক পুস্তকে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইতিহাসের কুদিক দিয়াও আমরা অনেক শিক্ষা পাইতে পারি। এখানে অপর মিশনারীর একটী অনুরূপ উক্তি উদ্ধৃত করা গেল। ইহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইলে আনন্দের কারণ হইবে। বর্ত্তমান শান্তিপুরবাসীর পক্ষে ইহা কতকটা অভাবনীয়। লিখিত হইয়াছে যে, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শান্তিপুর পাশ্চাত্য-জগতের ব্যভিচারকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করিত। "A system of refined and abandoned licentiousness was discovered here two years ago exceeding in profligacy whatever has been practised at the Palais Royal in Paris or at Varsailles." (১)

অপ্রিয় সত্যশ্রবণে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। পূর্ব্বপুরুষদের যে সব কার্য্যে লজ্জাবোধ হয়, এখন যেন পরবর্ত্তীরা সে সব কাজ না করে। দুর্নীতির আর একটী উদাহরণ লিখিত হইল। "দুর্গোৎসবের নবমীর দিন শান্তিপুরে অশ্লীল ও নিতান্ত অশ্রাব্য ভাষায় গান হয়। (২) সাধারণের সমক্ষে বা প্রকাশ্যপথে এপ্রকার গান, এবং কুভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্যপ্রদর্শন ভাল নয়। ডাবরিয়া পল্লীর কতিপয় ব্যক্তি ঐরূপ গান বন্ধের জন্য মহকুমা হাকিমের নিকট আবেদন করায়, তিনি উহা বন্ধের জন্য পুলিশের উপর আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং এ বৎসর ঐরূপ গান হয় নাই। পূর্ব্বে আইন থাকিলেও উহা ভঙ্গ হইত।" (৩) তখনকার দিনে বঙ্গের বহু স্থানেই অনুরূপ অশ্লীলতার প্রশ্রয় দেওয়া হইত; এখনও ভিন্ন প্রকারের আপত্তিজনক আমোদের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

সতীদাহ সম্বন্ধে ওয়ার্ড্ লিখিয়াছেন, "১৮০৯ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুর নিবাসী রামচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে তাঁহার ৮৫ বৎসর বয়স্কা পত্নী সহমৃতা হন। তৎপূর্ব্বে ইঁহাকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল; কোন অঙ্গ দীপশিখায় দাহ করাইয়া বা হস্তে জলন্ত অঙ্গার রক্ষা করিয়া এই পরীক্ষা দিতে হইত।" ৪) সতীদাহের অন্যান্য বীভৎস প্রথাও শান্তিপুরে প্রচলিত ছিল। শান্তিপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতেও মৃত ব্যক্তিকে ও তার স্ত্রীকে আনাইয়া এখানে দাহ করা হইত। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও সতীদাহ প্রচলিত ছিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর দপ্তরে এই সতীদাহের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিত। (১) গঙ্গার ঘাটে শবের [illegible] সম্বন্ধে হোনিগ্‌বার্জার লিখিয়াছেন, "এত ক[illegible]য়াও যাহারা বাঁচিয়া যাইত, তাহারা আত্মীয়-প্রতিবেশীর নিকট নূতন মানব ও অপরিচিত বলিয়া গণ্য হইত। 'একঘরে' হইবার ভয়ে তাহারা আর স্বস্থানে ফিরিত না, ভাগীরথীতীরেই বাস করিত। শান্তিপুরের সমস্ত (?) লোকসংখ্যাই এইরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে।" (২) এই কারণে এবং শান্তির জন্য অর্থাৎ ভাগীরথীতীরে বাসার্থে লোক আসিত, ইহাও হয় তো 'শান্তিপুর' নামের অন্যতম কারণ। উপরোক্ত ব্রাহ্মণ চর্ম্মকারকন্যার সংস্রব বোধ হয় হীন তন্ত্রমতেই হইয়াছিল!— "চর্ম্মকারী প্রয়াগঃ স্যাদ্রজকী মথুরা মতা।" (৩)

তিন

পূতিগন্ধময় পয়ঃপ্রণালী ত্যাগ করিয়া এবার লং সাহেব লিখিতেছেন, "এখানে সুন্দর চিকণ 'উড়ানী' প্রস্তুত হয়। নগরের দুই মাইল দূরে (রায়গড়ে) একটী চিনির কারখানা আছে; ইহাতে ৭০০ শত লোক নিযুক্ত আছে এবং দৈনিক ৫০০ শত মণ চিনি উৎপন্ন হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কাপড়ের কারখানায় ৫,০০০ হাজার লোক নিযুক্ত ছিল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুরের কারখানা হইতে ১৪,০০০ হাজার মণ চিনি বিলাতে রপ্তানী হইয়াছিল। নদীর গতির বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এক শতাব্দী পূর্ব্বে নদী উক্ত চিনির কারখানার পশ্চাৎভাগ দিয়া প্রবাহিত হইত; রেণেলের মানচিত্রে (১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতে মুদ্রিত) 'শান্তিপুর' (বৃহৎ অক্ষরে প্রদর্শিত) নদী হইতে বহুদূরে অবস্থিত আছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সরকার শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর রাস্তার সংস্কারের জন্য ২০,০০০ হাজার টাকা দিয়াছিলেন।"

শান্তিপুরের পার্শ্বে ভাগীরথীর প্রবাহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ ছিল। অদ্বৈতাচার্য্যের সময় (১৪৩৪—১৫৫৮)

(১) The Friend of India, 24. 4. 1845 : শ্রদ্ধেয় শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

(২) নদে শান্তিপুর হ'তে 'খেঁড়ু' আনাব। - ভারতচন্দ্র

(৩) যুবক, আশ্বিন ১৩০১

(৪) Hindu Mythology

(১) শান্তিপুর, আশ্বিন ১৩৩৭

(২) নদীয়া-কাহিনী

(৩) রুদ্রযামল তন্ত্র

খৃষ্টাব্দে) ভাগীরথী শান্তিপুরের তিন দিকে (উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে) প্রবাহিত হইত।

> "বৈকুণ্ঠে বিরজা নদী বহে চতুর্দ্দিগে।
> শান্তিপুরে ত্রবময়ী বহে তিন ভাগে॥" (১)

এখনও উত্তর দিকে বাব্‌লার প্রান্তে ও পূর্ব্ব দিকে ঘোড়ালিয়া হইতে বাব্‌লা পর্য্যন্ত গঙ্গার খাত (এই নির্ঝর বা 'মেজোর' বর্ষাকালে জলপূর্ণ হয়) বিদ্যমান। শান্তিপুরের বর্ত্তমান সীমা—উত্তরে নির্ঝর ও বাব্‌লা গ্রাম, পূর্ব্বে সুরুগড় (সারাগড়), দক্ষিণে প্রান্তর ও গঙ্গা, পশ্চিমে গোফেয়া। শান্তিপুরের খুন্দকার-বাটীতে রক্ষিত তপঃপ্রভাবান্বিত দৈবশক্তিসম্পন্ন কাজেম আলির নামে আকবর বাদশাহের প্রদত্ত পাঞ্জায় লিখিত আছে, 'দক্ষিণে গঙ্গা, উত্তরে নির্ঝর ও বাব্‌লা, পূর্ব্বে সুরুগড় ও পশ্চিমে গোফেয়া এই চতুঃসীমান্তবর্ত্তী স্থান তোমাকে জায়গীরস্বরূপ দান করা হইল।' (২)

ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর (ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলে) শান্তিপুরের নিম্নস্থ ভাগীরথী দিয়া সিংহল-যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী। (৩) ধনপতিপুত্র শ্রীমন্ত না কি শান্তিপুরে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। (৪) কবিকঙ্কণ আনুমানিক ১৫৮৮।৮৯ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, ভাগীরথীর গতি শান্তিপুর হইতে বীরনগর (উলা) দিয়া প্রবহমানা ছিল এবং শান্তিপুর ধনপতি সদাগরের সিংহলযাত্রার পথে পড়িয়াছিল।

> "কোথায় রন্ধন কোথা চিড়া খণ্ড কলা।
> নবদ্বীপে উত্তরিল বেণিয়ার বালা॥
> চৈতন্য-চরণে সাধু করিল প্রণাম।
> সে ঘাটে রহিয়া করে রন্ধন ভোজন॥
> রজনী প্রভাতে সাধু মেলি সাত নায়।
> নবদ্বীপ পাড়পুর এড়াইয়া যায়॥
> স্বরার চালার তরি তীরের পয়াণ।
> মুজাপুরের ঘাটে ডিঙ্গা করিল চাপান॥
> নায়্যা পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক।
> ডাহিনে রহিল পুরী আম্বুয়া মুলুক॥
> বাহ বাহ বল্যা ঘন প'ড়ে গেল সাড়া।
> বাম ভাগে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া॥
> উলা বাহিয়া খিসমার আশে পাশে।
> মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে॥
> মহেশপুর সদাগর বাহিল তখন।
> ফুলিয়ার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন॥" (১)

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বীরনগরের ৺দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-লিখিত বিবরণে ভাগীরথীর উক্তরূপ গতিনির্দ্দেশ পাওয়া যায়।

> "পাটুলি দক্ষিণে করি, প্রেমানন্দে সুরেশ্বরী,
> নবদ্বীপ সমীপে আইলা।
> গঙ্গাকে সারদা ক'ন, মম ভক্ত বিবরণ,
> আছে হেথা বলিয়া চলিলা॥
> অম্বিকা পশ্চিম পারে, শান্তিপুর পূর্ব্বধারে,
> রাখিল দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।
> উল্লাসে উলায় গতি, বটমূলে ভগবতী,
> চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া॥" (২)

মনস্বী ৺ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারি শান্তিপুর-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। পরে তিনি তাঁহার দৈনন্দিন লিপি হইতে সংগৃহীত ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তকে (৩) লিখিতেছেন, "গত শতাব্দীতে শান্তিপুরের অব্যবহিত নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। এখন মধ্যে প্রায় এক বর্গমাইল চর পড়িয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে শান্তিপুরের ইতিহাসের ঠিক উপাদান পাওয়া যায় না। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র (খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী) বোধিদ্রুমের শাখা লইয়া এই ভাগীরথী দিয়াই হয় তো সিংহলে গিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ানও (৩৯৯-৪১৪ খৃষ্টাব্দ) হয় তো এই পথ দিয়াই সমুদ্রে গিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। চাঁদসদাগর ও শ্রীমন্তের যাত্রাও হয় তো এই পথে হইয়াছিল।" কিন্তু ফা হিয়ান্ সিংহল হইতে জলপথে চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং ঐ দুই সময়ে হয় তো শান্তিপুর ছিল না।

---

(১) হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল

(২) যুবক, বৈশাখ ১৩১৫

(৩) প্রেমধনের মর্ত্ত্যে আগমন (৪) কুশদ্বীপ-কাহিনী

(১) চণ্ডী (২) দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী

(৩) Travels of a Hindoo

চাঁদসদাগরের সপ্ত ডিঙ্গা বহু পণ্য ও ধনজনসহ পূর্ব্বোক্ত নির্ঝরে মগ্ন হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি। শান্তিপুরের কবি ৺হরিচরণ দে লিখিতেছেন,—

"খুঁড়িতে খুঁড়িতে কভু মিলে কত ধন,
বাদশাহী আমলের সুন্দর গঠন—
রজত-কাঞ্চন-মুদ্রা কিবা পরিপাটী,
বিশুদ্ধ ধাতুর ; শঙ্খকড়ি মাখা মাটী।
ভাগ্যগুণে কত জনে পেয়ে এই ধন,
'চাঁদসদাগরে' মনে করয়ে স্মরণ।" (১)

কিন্তু কাণা হরিদত্তের পরে ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত বিজয় গুপ্তের প্রামাণিক 'মনসামঙ্গলে' চাঁদসদাগর বা বেহুলার শান্তিপুরতল দিয়া গমনের কোন উল্লেখ নাই। চাঁদসদাগরের নিবাসভূমি চম্পকনগর বিভিন্নমতে ত্রিপুরা, বর্দ্ধমান বা মেদিনীপুর জেলায়, ভাগলপুরের সন্নিকটে, ধুবড়ীতে, বগুড়ার নিকটবর্ত্তী মহাস্থানে, দিনাজপুর জেলায় সনকাগ্রামে বা দার্জ্জিলিংএ রণিৎ নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। "কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্বাস যে চাঁদবেণের গল্পটী আগাগোড়া কল্পনামূলক।" (২)

ভোলানাথ বাবুর লেখায় শান্তিপুরের প্রাচীনত্বের কথা আসিয়া পড়িতেছে ; সুতরাং এখানে তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা কর্ত্তব্য। "৬৫৯ শকাব্দে অর্থাৎ ৭৩৭ খৃষ্টাব্দে (বা আদিশূরের সময়) শান্তিপণ বা শান্তমুনির শান্তিপুরে বর্ত্তমান থাকা প্রমাণিত হইতেছে। এতৎপ্রসঙ্গে ৭৩৭ খৃঃ অঃ বা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে শান্তিপুর বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তাহার কত দিন পূর্ব্বে বা কয় শত বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া 'শান্তিপুর' জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা অতীতের অন্ধকার গর্ভে সমাহিত।" (৩) এইবার সন্দেহের রাজ্যে অবতরণ করিতে হইবে। "ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের গণনায় পৃথিবীর ভূপঞ্জর সৃষ্ট হইবার যুগে (Eocsene Period) হিমালয়ের তটদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্রতরঙ্গ প্রবাহিত ছিল। শুদ্ধ তটভাগ কেন, বর্ত্তমান উচ্চতায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত জলমগ্ন ছিল। (১) কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য (৮ম শতাব্দী) যখন দিগ্বিজয়ার্থ গৌড়ে আসেন অর্থাৎ প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়নগর হইতে অনতিদূর পরেই সাগরতরঙ্গ প্রবাহিত হইত।" (২) তখন শান্তিপুরের অস্তিত্ব ছিল কি? মেগাস্থিনিসের সময় অবস্থা কিরূপ ছিল দেখা যাউক্। "নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, ২৪ পরগণা এবং মুর্শিদাবাদের কিয়দংশের তখন অস্তিত্ব ছিল না। ক্রমে ক্রমে দ্বীপ ও চরভূমিতে পরিণত হওয়ায় এ সকল স্থানের—অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ ; সাগরদীয়া, কালাদীয়া ; শিবচর, গোপালচর প্রভৃতি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সভায় (খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দী) মেগাস্থিনিস্ নামে যে গ্রীক্ রাজদূত ছিলেন, তিনি লিখিয়াগিয়াছেন যে, পাটলিপুত্র (পাটনা) হইতে গঙ্গাসাগরসঙ্গম ন্যূনাধিক ৩০০ মাইল। এক্ষণে রেলপথের মাপ ৪৫০ ও হাঁটা পথে ৫০০ মাইল হইবে।" (৩)

আদিশূরের সময়, অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ আছে। (৪) "কহ্লণ-প্রণীত 'রাজতরঙ্গিণী'র বর্ণনায় সমুদ্র যে প্রাচীন রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন (পৌণ্ড্রপট্টন বা পাণ্ডুয়া) হইতে অধিক দূরে ছিল না, তাহা প্রতিপন্ন হয়। শ্রীহর্ষ যখন আদিশূরের রাজধানীতে (৫) উপনীত হন, তখন তিনি উহার সন্নিকটেই সমুদ্র দর্শন করেন।......ঘটককারিকা এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীতে এই সকল দ্বীপের বিবরণ ও সীমা দেওয়া হইয়াছে। সেনরাজগণের সময়ে যখন নবদ্বীপে অন্যতম রাজধানী ছিল, তখন সেই নবদ্বীপ রাজ্য গঙ্গা-গর্ভোত্থিত বহুসংখ্যক দ্বীপমালায় বিভক্ত ছিল ; ইহার মধ্যে ১২টী দ্বীপ প্রধান। ঐ ১২টীর মধ্যে নবদ্বীপ একটী এবং সেই নবদ্বীপ পুনরায় নয়টী দ্বীপের সমষ্টি। উক্ত ১২টী দ্বীপের মধ্যে অন্যতম 'মধ্যদ্বীপের' অন্তর্গত উলা বা

---

(১) যুবক, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ (৩) শান্তিপুর-স্মৃতি

(১) হিমালয়ের গর্ভে সামুদ্রিক জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২) রাজতরঙ্গিণী, ৫ম তরঙ্গ

(৩) প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার প্রাচীন ভূতত্ত্ব

(৪) পঞ্চপুষ্প, আশ্বিন ১৩৩৭

(৫) গৌড় (রামপাল বা কর্ণসুবর্ণ বা সুবর্ণগ্রাম ?)

বীরনগর, শান্তিপুর প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান। প্রাচীন নবদ্বীপ রাজ্যের ৬টী দ্বীপ (অগ্র, নব, মধ্য, চক্র, এড়ু ও প্রবাল) গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ভাগীরথী দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। অপর ৬টী দ্বীপ ইহাদেরই পূর্ব্বভাগে অবস্থিত।" (১) এখন বল্লাল সেনের 'দানসাগর'গ্রন্থ প্রণয়নের সময় ১১৬৮-৯ খৃষ্টাব্দ। (২) তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ আদিশূরের রাজত্বের সময়—(ক) ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ৯৮৬-১০০৬ খৃষ্টাব্দ, (খ) প্রসন্নকুমার ঠাকুর-কর্ত্তৃক 'বেণীসংহারে' লিখিত ১০৬৩খৃঃ, (গ) বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহে' লিখিত ১০৭৭খৃঃ (কান্যকুব্জে দূতপ্রেরণ), (ঘ) জেনারেল কানিংহামের মতে ৭০০খৃঃ। (৩) সুতরাং 'শান্তিপুর-স্মৃতি'কার ইতিহাস মন্থন করিয়া শান্তিপুরের সময়-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা বক্ষ্যমাণ সন্দেহের নিরাকরণ পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। তিনি অবশ্য আদিশূরের সময়-সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন ; কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে শান্তিপুর ভাগীরথীগর্ভ হইতে উঠিয়াছিল কি না অথবা সমুদ্র কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ঠিক্ বুঝা যাইতেছে না।

নদীয়া ও বঙ্গের ভূতত্ত্বের মধ্যেই শান্তিপুরের ভূতত্ত্ব মিলিতে পারে বলিয়া নদীয়ার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। "পুরাকালীন বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণের লিখিত বিবরণে কুত্রাপি নদীয়ার নাম দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গ্রীক্ বা রোমীয়গণের বৃত্তান্তেও ইহার কোন উল্লেখ নাই কিংবা সুপ্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক ফা হিয়ানের বর্ণিত তৎকালীন বঙ্গের ইতিহাসে নবদ্বীপের উল্লেখ নাই। আবার যখন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অন্যতম চীন-পরিব্রাজক হুয়েন্ত সাং বঙ্গের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তখনও তিনি নবদ্বীপের নামোল্লেখ করেন নাই। অতএব এ সময়ে হয় নবদ্বীপের অস্তিত্ব ছিল না অথবা উহা সামান্য নগণ্য অবস্থায় থাকায় কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তবে বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের সংগৃহীত গ্রন্থসমুদায় অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে পৌরাণিক যুগেও নদীয়ার নাম পরিচিত ছিল।······ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহু গবেষণায় স্থির করিয়াছেন যে সমগ্র নদীয়া এবং বর্ত্তমান যশোহরের উত্তরাংশ পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর বহু পুরাতন সুবিস্তীর্ণ ও সমুন্নত চরভূমি এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে অধ্যুষিত।" (১) শান্তিপুরও হয় তো ৭ম শতাব্দীতে ছিল না বা নগণ্য ছিল, অথবা ইহাও হয় তো নবদ্বীপের মত বহু প্রাচীনকালে অধ্যুষিত ছিল।

গঙ্গার বদ্বীপ (বকদ্বীপ বা বগ্‌দী) বা বৌদ্ধযুগের সমতট বা উপবঙ্গের উৎপত্তি অতি প্রাচীন। কিন্তু তখন শান্তিপুর গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ···· কিন্তু মহাভারতে পাণ্ডবগণের গঙ্গাসাগরসঙ্গমে পঞ্চশত নদীতে অবগাহন করিয়া, সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গ-গমনের যে উল্লেখ আছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, তখন ২৪-পরগণার উদ্ভব হইয়াছে। ···· এই গঙ্গাসাগরসঙ্গম (২) হিন্দুর মহাতীর্থ, পুরাণ-তন্ত্রাদিতে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।······কালিদাসের রঘু বঙ্গীয়দিগকে উৎখাত করিয়া, গঙ্গাস্রোতের মধ্যে যে স্থানে জয়স্তম্ভ নিখাত করিয়াছিলেন, সেই বদ্বীপ ২৪-পরগণাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতায়' ও কবিরামের 'দিগ্বিজয়প্রকাশে' এই বদ্বীপকে 'উপবঙ্গ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।" (৩) সমতটের মধ্যে নবদ্বীপের স্থান সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, "সেন-রাজত্বের প্রাক্কালে গাঙ্গেয় রাজ্যে (সমতটে) অন্ততঃ দ্বাদশটী প্রধান দ্বীপ ছিল ; তন্মধ্যে নবদ্বীপ একটী এবং নবদ্বীপই পুনরায় নয়টী দ্বীপের সমষ্টি। এখনও নানাবিধ কারিকা ও বৈষ্ণবগ্রন্থের সাহায্যে ভাগীরথীপ্রবাহের প্রারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে এই সকল দ্বীপের অস্তিত্ব ও প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে।" (৪) এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

৺ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী লিখিতেছেন, "প্রথিত আছে, ভূমিকম্পদ্বারা বঙ্গদেশ উৎপন্ন হয়। কবিরামের 'দিগ্বিজয়-

---

(১) যশোহর-খুলনার ইতিহাস

(২) Ind. Hist. Qrly., Vol. V, 1929, p. 133

(৩) চরিতাভিধান

---

(১) নদীয়া-কাহিনী

(২) বর্ত্তমান সঙ্গম তদানীন্তন সঙ্গমের বহুদূর দক্ষিণে অবস্থিত।

(৩) মানসী ও মর্ম্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১০৩৫

(৪) ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩০০

প্রকাশে' (মোগল যুগের প্রাক্কালে রচিত) এই ভূমিকম্পের উল্লেখ আছে।...বরাহ-মিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'য় (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী) 'সমতত' উল্লিখিত আছে। সে সময়ে খুলনা, যশোহর ও সুন্দরবনে মনুষ্য-বসতি ছিল না, ৭ম শতাব্দীর পরে এ সকল স্থানে বসতির সূত্রপাত হয়।...উপর্য্যুক্ত প্রবল ভূমিকম্পের ফলে নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, সুকচর, চাকদহ, দামুরদহ, খড়দহ, এঁড়েদহ, হালিসহর, বরাহনগর, শিয়ালদহ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়।" (১) এই ভূমিকম্প কবে হইয়াছিল বুঝা যায় না। 'সমতট' শব্দ আরও অধিক ব্যাপক। শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় মেদিনীপুর-অভিভাষণে বলিয়াছেন, "সম্প্রতি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিল্‌কিনিয়া গ্রামে উৎকীর্ণ লিপিসমেত একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে বিল্বকিণকিয় গ্রাম যে সমতটের অন্তর্গত, তাহা ক্ষোদিত আছে। সুতরাং ত্রিপুরা জেলা যে সমতটের অন্তর্গত, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।"(২)

বঙ্গ ও সমতটের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় 'যশোহর-খুলনার ইতিহাসে' সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আরণ্যকে (৩) বঙ্গের উল্লেখ আছে। বঙ্গে আসিলে তখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, বঙ্গবাসীদের প্রতি 'পক্ষী' ইত্যাদি শ্লেষ প্রযুক্ত হইত। বেদোক্ত দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে জাত পঞ্চ পুত্রের নামানুসারে অঙ্গ (বেহার), বঙ্গ (ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী স্থান অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান এবং সম্ভবতঃ রাজসাহী, পাবনার কতকাংশ ও ঢাকা অঞ্চল), কলিঙ্গ (উড়িষ্যা অঞ্চল), পুণ্ড্র (মালদহ হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত প্রদেশ) ও সুহ্ম (দক্ষিণ-রাঢ় বা হুগলী অঞ্চল) এই পাঁচটী প্রদেশের নামকরণ হয়। (৪) তখন বঙ্গের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গম পুণ্ড্র দেশের সীমার নিকটবর্ত্তী ছিল। এই বর্ণনায় নদীয়া তথা শান্তিপুরের নামগন্ধ পাওয়া যায় না। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং ভারতভ্রমণে আসিয়া (৬৭১—৬৯৫ খৃষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন, "তাম্রলিপ্তিই (তমলুক) পূর্ব্ব-ভারতের দক্ষিণপ্রান্ত সীমা।...ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমা হইতে তাম্রলিপ্তি ৪০ যোজন দক্ষিণে অবস্থিত।...ইহা মহাবোধি (বুদ্ধগয়া) ও নালন্দা হইতে ৬০ যোজন দূরবর্ত্তী। চীন হইতে আসিতে হইলে এই স্থানেই জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে হয়। (১)

রামায়ণের সময় না কি পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ ভগীরথ (২) কর্ত্তৃক গঙ্গা হিমাচল হইতে আনীত হইয়া পর্ব্বতের পাদদেশের অনতিদূরে সমুদ্রে পতিত হয়। এ সমন্ধে ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তখন সমগ্র প্রবাহই 'ভাগীরথী' আখ্যাপ্রাপ্ত হইত। বহুকাল পরে যখন পদ্মা বা নলিনীর উৎপত্তি হয়, তখন তৎসঙ্গমস্থল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহেরই 'ভাগীরথী' নাম প্রচলিত হয়। মহাভারতের সময় যুধিষ্ঠিরাদি সাগরের অনতিদূরে মিথিলার গঙ্গাকৌশিকী (কুশী) সঙ্গমে স্নান করিয়াছিলেন। তখন ঐ স্থলের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে বিস্তৃত চরভূমির উৎপত্তি (ভূমিকম্পের জন্য ?) হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে বহু নদী প্রবাহিত হইতেছিল। (৩) সে সময় বঙ্গের বিভাগ ছিল—পূর্ব্ব, পশ্চিম বা দক্ষিণ (রাঢ়)। তাম্রলিপ্তকগণ ম্লেচ্ছ ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (৪)

মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীতে বা ঐরূপ কোন সময়ে বঙ্গে প্রকৃতভাবে আর্য্যজাতির অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। ৫) তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালায় পুণ্ড্র (পুঁড়া বা পোদ) জাতি সমুদ্রকূলে বাস করিত; নমঃশূদ্র, বাগ্‌দী প্রভৃতি জাতিও বঙ্গের অধিবাসী ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূটজাতি বঙ্গে আসিয়া 'রাঢ়' বা 'লাঢ়ে' বাস করিয়াছিল। শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দের মতে মেগাস্থিনিস্-বর্ণিত 'গঙ্গারিডি', 'গঙ্গারাষ্ট্র' বা 'গঙ্গারাঢ়ী'র মধ্যে বঙ্গদেশ অবস্থিত ছিল। প্লিনি গঙ্গাসঙ্গমের নিকটবর্ত্তী দ্বীপে লবণ-প্রস্তুতকারী 'মোদগালিঙ্গী' (মোলঙ্গী) জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ রাজ্যের প্রধান বন্দর গঙ্গে বা গঙ্গারেজিয়া হইতে প্রবাল, উৎকৃষ্ট মস্‌লিন ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি হইত বলিয়া প্রথম শতাব্দীর পেরিপ্লাসে লিখিত আছে। গঙ্গের

(১ নব্যভারত ১৩১১ ; সমাজ-ব্যাধির চিকিৎসা।
(২) নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯　(৩) ঐতরেয়, ২।১০১
(৪) মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০৪।৫০

(১) সমসাময়িক ভারত, ১১শ খণ্ড　(২) পথ, ফাল্গুন ১৩০৭
(৩) বনপর্ব্ব, ১১৩।১-৩　(৪) দ্রোণপর্ব্ব, ১১৯।১৫
(৫) বঙ্গদর্শন ১২৮০ ; বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার।

কলিকাতার দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূভাগ বা পূর্ব্বোক্ত প্রবাল দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। বদ্বীপের সমুদ্রতীরবর্ত্তী অংশ বহুকাল বনাবৃত ছিল, নদীর মোহানার সঙ্গে সঙ্গে বনও সরিয়া গিয়াছে।... কতবার ভূমির উত্থানপতন হইয়া গিয়াছে। পতঞ্জলি পাণিনির মহাভাষ্যে যে কালকবনের (সুন্দরবন) কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হয় তো রাজগৃহের নিকট অথবা আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন সীমানুযায়ী মগধের আরও বহু পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। প্রয়াগে সমুদ্রগুপ্তের (৩২৫ খৃঃ) প্রশস্তিতে যে সমতটাবিজয়ের উল্লেখ আছে, তাহা বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগ, ফরিদপুর ও বরিশাল লইয়া প্রধানতঃ গঠিত এবং তত্রোক্ত 'ডবাক' পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া অনুমিত হয়। তবকাত-ই-নাসিরি ও যশোধর্ম্মদেবের প্রশস্তিতে পূর্ব্ববঙ্গ ও সমতটের ঐরূপ উল্লেখ আছে। হুয়েন-স্যাং বা ইউয়ান্-চোয়াং (১) (৬২৯-৬৪৫ খৃঃ) কর্ণসুবর্ণ, সমতট প্রভৃতির যেভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বুদ্ধদেবের জীবদ্দশা হইতেই সমতটে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। (২) তবে কি সমুদ্রগুপ্তের সময় বা ৪র্থ শতাব্দীতে সমতটের মধ্যে নদীয়া তথা শান্তিপুর বিদ্যমান ছিল? অন্ততঃ এ সময়ের পূর্ব্বে ইহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।

ক্রমশঃ

(১) Rhys Davidএর উচ্চারণ।

(২) যশোহর-খুলনার ইতিহাস
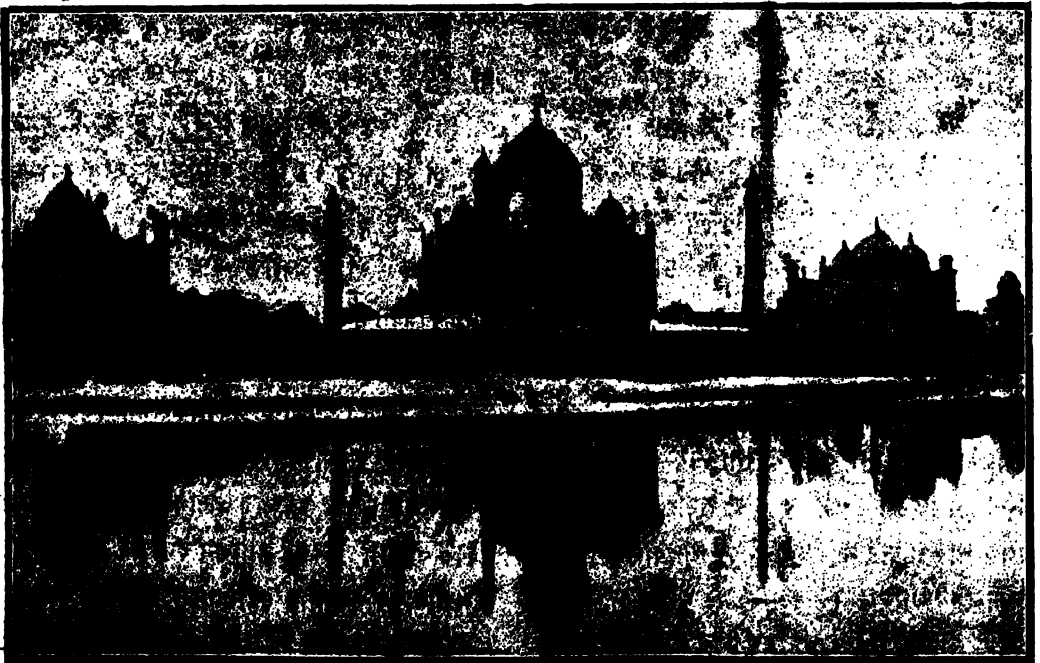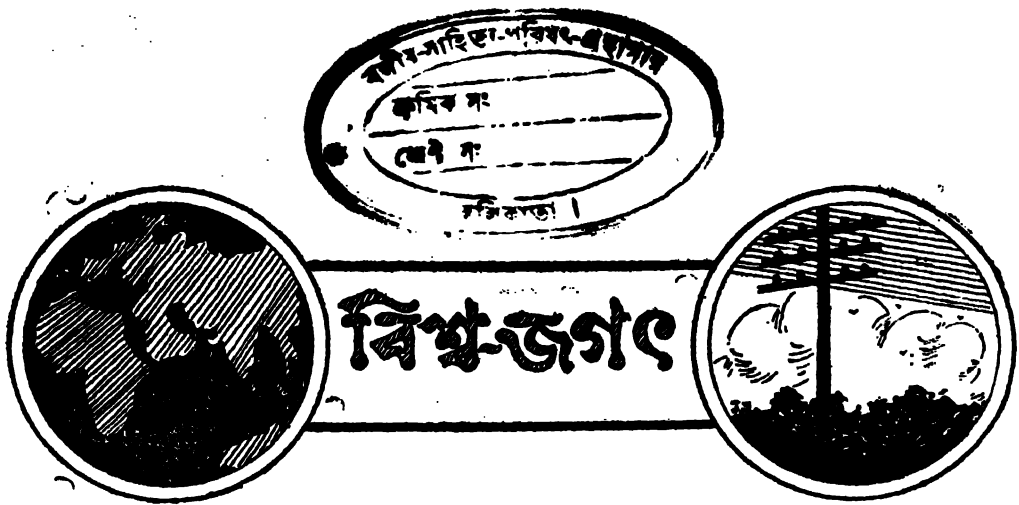
বিজ্ঞান

টেলিফোনে সুবিধা

যাঁহারা কারখানায়, জাহাজে বা চলন্ত বিমানপোতে বসিয়া টেলিফোন করিয়া থাকেন তাঁহারা সবাই জানেন যে ঐ সকল স্থানে টেলিফোন করা কিরূপ কষ্টকর। সর্ব্ব সময়েই বাহির হইতে নানা রকমের শব্দ আসিয়া কথোপ-কথনের ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকে। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার জন্য সম্প্রতি একপ্রকার বাহিরের শব্দ-নিবারক টেলিফোন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই শ্রেণীর টেলিফোনের সহিত সাধারণ-টেলিফোনের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। সাধারণ টেলিফোনে আমরা Mouth-pieceটী যেমন মুখের সামনে ধরিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকি ইহাতে কিন্তু সেরূপ হয় না। Mouth-piece টী বক্তার গলার উপর বগলস্ দিয়া আঁটা থাকে। কথা বলিবার সময় যখন গলার শিরায়-উপশিরায় শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তখন সে সমস্ত তরঙ্গগুলি শব্দে রূপান্তরিত হইয়া রন্ধ্রের মধ্যদিয়া চলিয়া যায়।

আমরা এ বিষয়ের একখানি ছবি দিলাম। এইরূপ টেলিফোনগুলির নাম 'Laryngaphone"।
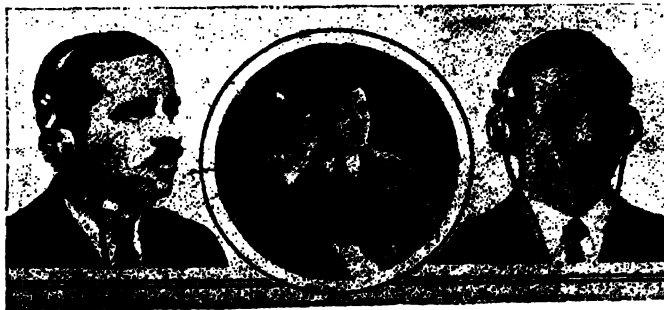
টেলিফোনের সুবিধা

সামুদ্রিক পিঁয়াজ

ইঁদুর মারিবার জন্য সমস্ত দেশেই নানারূপ বিষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত বিষ অনেক সময় কুকুর, বেড়াল এমন কি মানুষেরও জীবননাশ করিয়া থাকে। সম্প্রতি এক শ্রেণীর সামুদ্রিক পিঁয়াজের আবিষ্কার হইয়াছে। এই পিঁয়াজগুলি হইতে এক প্রকারের বিষ উৎপন্ন হয়, যাহার দ্বারা যত ইচ্ছা ইঁদুর সহজেই মারিতে পারা যায় কিন্তু কুকুর-বেড়াল প্রভৃতি অন্য জীবের বা মানুষের কোনরূপ ক্ষতি হয় না।

এই প্রকারের পিঁয়াজগুলি ভূমধ্যসাগরের উপকূলে যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমেরিকার "Biological Survey" এই প্রকারের পিঁয়াজের বহুল প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা এই বিষয়ের একখানি ছবি দিলাম

সামুদ্রিক পিঁয়াজ

আমরা ইহার একখানি ছবি দিলাম
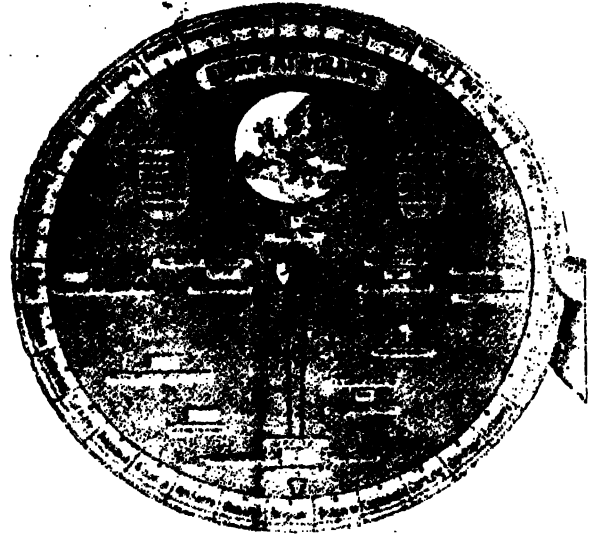
অভিনব মানচিত্র

বায়ুপূর্ণ নৌকা-তাঁবু

বায়ুপূর্ণ রবারের নৌকা আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে খুব প্রচলিত হইয়াছে। সম্প্রতি আর এক প্রকারের এই শ্রেণীর নৌকা তৈয়ারী হইয়াছে। এই নৌকাগুলি জল হইতে তুলিয়া আবার ডাঙার উপর তাঁবুর আকারে খাটান যাইতে পারে।

আমরা ইহার একখানি ছবি দিলাম।

মানচিত্রে কারসাজি

আমরা সকলে চক্রাকার শতাব্দী-পঞ্জিকা দেখিয়াছি। সম্প্রতি আমেরিকার এক ব্যক্তি ঐরূপ ধরণের এক প্রকার সমস্ত ইউরোপের প্রসারিত ভূখণ্ডের মানচিত্র তৈয়ারী করিয়াছেন। এই মানচিত্রখানি ঠিক শতাব্দী-পঞ্জিকার-ই মত করিয়া তৈয়ারী হইয়াছে। যে কোন দেশের নামের উপর চক্র ঘুরাইয়া দেখিলে উহার অপর ধারে সেই দেশের স্থান-নির্দেশ, প্রধান নদী ও পর্ব্বতগুলির নাম, প্রাকৃতিক অবস্থান প্রভৃতি নির্দেশিত হইবে।
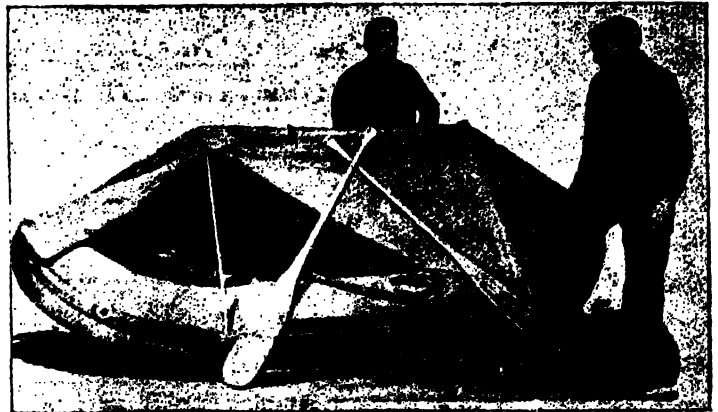
বায়ুপূর্ণ নৌকা-তাঁবু

ফোটোগ্রাফে চালাকি

আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে অনেকের হয় তো ফটোগ্রাফ-ক্যামেরা আছে। তাঁহারা চেষ্টা করিলে তাঁহাদের বন্ধুর এক মজার ছবি তুলিতে পারেন। আমাদের দেওয়া ১নং ছবিখানি দেখিলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে এক ব্যক্তি মইয়ে উঠিয়া দেয়ালে ছবি টাঙাইতে গিয়া কিরূপ ভাবে পড়িয়া যাইতেছে।...আমরা এই ছবিখানির মত একটী ছবি তুলিবার কথা বলিতেছি। অবশ্য ইহাতে তাঁহার বন্ধুকে সত্য সত্যই মই হইতে ফেলিয়া দিয়া মাথা ফাটাইতে হইবে না, সে বিষয়ে আশ্বস্ত থাকুন।

ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি।

এইবার পাঠক ২নং ছবিটীর দিকে নজর রাখুন। ঘরের মেজের উপর একখণ্ড Wall-paper বিছাইয়া আপনার বন্ধুকে শোয়াইয়া দিন। মেজের উপর একটী মই, একটী চেয়ার ও একখানি ছবি এমন করিয়া রাখুন যেন উপর হইতে দেখিলে তাহা দেওয়াল হইতে হেলিয়া পড়িতেছে বলিয়া মনে হয়। এইবার আপনার বন্ধুর উপরে আর একটী মই খাটাইয়া তাহার উপর হইতে তলার দিকে ক্যামেরার মুখ করিয়া এক্সপোজার দিন। ছবি এইবার তৈয়ারী করিয়া দেখুন কি হইয়াছে।

১নং ছবি ২নং ছবি

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

শিল্প-কলা

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

লিওনারদো ও মাইকেল এঞ্জেলো যখন ইতালীর শিল্প-জগতে এক নব-যুগ প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন লোক-লোচনের অলক্ষ্যে থাকিয়া একান্ত মনে যে এক কিশোর শিল্পী কলা-লক্ষ্মীর রূপ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন তিনি হইতেছেন র‍্যাফেল। অন্তরে এবং বাহিরে শিল্পীর গুণাবলির দ্বারা বিভূষিত হইয়া জগতে কয়জন কলাবিদ্ আজ পর্য্যন্ত জন্মাইয়াছেন জানি না, কিন্তু র‍্যাফেলের মধ্যে যে স্রষ্টা তাহার প্রত্যেক গুণটী দিতে কার্পণ্য করেন নাই, আমরা তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। তিনি ছিলেন সুন্দর, মনোরম ছিল তাঁর কণ্ঠ, তাঁর অঙ্গের সাবলীল প্রতিটী রেখা অপূর্ব্ব, তাঁহার প্রতিটী পেশীর গঠন-ভঙ্গিমায় এক নৃত্যদোতুলচ্ছন্দের দ্যোতনা! অপরধারে তিনি ছিলেন শিল্পী, তাঁহার প্রত্যেকটী চিত্র ছিল অনবদ্য সুন্দর, তাঁহার গঠিত প্রত্যেকটী মূর্ত্তি সুকুমার ভাস্কর্য্যের সীমা-নির্দ্দেশক, তাঁহার রচিত কাব্যসম্ভারে ছিল জীবনের সহজ স্পন্দন।

র‍্যাফেলের অন্য নাম Sauzio Raffaello ; ইতালীর আরবিনো (Urbino) নামক স্থানে ৬ই এপ্রিল ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা Giovanni Sauzio একজন শিল্পী ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ শিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার বয়স যখন এগার বৎসর তখন হঠাৎ একদিন তাঁহার পিতা মারা যান এবং তাঁহার পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার অধ্যয়ন বিষয়ে বিশেষ নজর রাখিতেন না বলিয়া র‍্যাফেল আপন ইচ্ছানুযায়ী পথে শিক্ষাগ্রহণ করিবার সুযোগ পান। তাঁহার বয়স যখন ষোল বৎসর তখন তিনি সাধারণ বালকের ন্যায় বিদ্যালয়ে না গিয়া তখনকার ইতালীর একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী Perugino-র চিত্রালয়ে গিয়া চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এইস্থানে উক্ত শিক্ষকের নিকট পাঁচ বৎসরকাল অবস্থান করিয়া শিক্ষাগ্রহণ করেন। এই সময় তিনি চিত্র-বিদ্যায় এরূপ পারদর্শী হইয়া উঠেন যে, তাঁহার কয়েকখানি চিত্র দেখিয়া তাঁহার শিক্ষকেরই অঙ্কিত বলিয়া ভ্রম হইত। তাঁহার এই সময়ের চিত্রগুলির মধ্যে এই কয়টী চিত্র উল্লেখযোগ্য—"The Saviour on the Cross" (লণ্ডনে রক্ষিত), "The Crowning of the Virgin" (ভেটিকানে রক্ষিত), "The Marriage of the Virgin" (এক্ষণে মিলানে রক্ষিত)।

মাতা ও পুত্র

১৫০৪ খৃঃ অব্দে তিনি সাইনা (Siena) ধর্ম্মমন্দিরের পাঠাগারের খিলানে নক্সা করিবার জন্য আহূত হন এবং বিশেষ দক্ষতার সহিত তাহা সুসম্পন্ন করেন। ইহার ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু এখনও বর্ত্তমান আছে। অনেকের ধারণা যে এই সময়ই তিনি Vision of a Knight, (লণ্ডনের National Galleryতে রক্ষিত) নামক ছবিটী অঙ্কিত করেন। এই সময় তিনি তাঁহার জন্মস্থান পরিভ্রমণে বাহির হন এবং ভ্রমণ করিবার সময়ে St. Michael ও St. Georgeএর দুইখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন। এই দুইখানি

ছবি এখন লুভার (Louvre) মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এই বৎসরেরই শেষে তিনি ফ্লোরেন্সে গমন করেন। ফ্লোরেন্সে তখন মাইকেল এঞ্জেলো ও লিওনারদো'র প্রতিপত্তি অসীম। একদিন পথে র‍্যাফেল তাঁর শিষ্যগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বাহির হইয়াছেন, এমন সময় মাইকেল এঞ্জেলোর সহিত সাক্ষাৎ হইল। এঞ্জেলো তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন,—"আপনাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কোন সেনাপতি তাঁহার সৈন্যসামন্ত লইয়া রণক্ষেত্রে চলিয়াছেন।" র‍্যাফেলও রসিকতা বজায় রাখিয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন,—"আর আপনাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কোন জল্লাদ অপরাপর শিল্পীর প্রতিভাকে বলি দিবার জন্য মসানে লইয়া যাইতেছে—বাস্তবিক আপনি থাকিতে আমাদের সুনাম আর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।"

ফ্লোরেন্সে থাকিয়া তিনি যে সময় অতিবাহিত করেন, তাহা তাঁহার জীবনের এক মূল্যবান্ অধ্যায়। এই সময় তিনি মাইকেল এঞ্জেলো ও লিওনারদো'র চিত্র ও মূর্ত্তিগুলি বিশেষভাবে দেখিবার সুবিধা পান। এই দুইজন অনন্য-সাধারণ প্রতিভাশালী ভাস্কর ও শিল্পীর কার্য্যাবলী তাঁহার মনে যে রেখাপাত করিয়াছিল, ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাই রসপুষ্ট হইয়া শিল্প-জগতে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। র‍্যাফেল নিজে বহুবার বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার চিত্রাঙ্কনের মূল অনুপ্রেরণা পান, মাইকেল এঞ্জেলোর গঠিত মূর্ত্তিগুলি হইতে। র‍্যাফেল কিন্তু এই দুইজন শিল্পীর অন্ধ-অনুকরণ করেন নাই। তাঁহাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া আপন তুলিকাপাতে এক সুন্দর ও রহস্যপূর্ণ রূপ-কথার মায়ালোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি Ansidei Madonna নামক চিত্রখানি অঙ্কিত করেন। এই চিত্র-খানি তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে National Gallery ৭০,০০০ হাজার পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করেন।.. প্রাচীন চিত্রকরগণের চিত্রপদ্ধতির উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং ঐ পদ্ধতির ভিত্তির উপর যে কয়খানি চিত্র অঙ্কন করিবার চেষ্টা করেন তাহাতে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই, কারণ তিনি এই পদ্ধতির অঙ্কন-বৈশিষ্ট্য (Technique) যথাযথভাবে আয়ত্ত করিতে তখনও পারেন নাই। এই কারণে তিনি দ্বিতীয়বার ফ্লোরেন্সে আগমন করেন। এইবার এইস্থানে Fra Bartolommeo নামক এক শিল্পীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, তিনি তাঁহাকে প্রাচীন পদ্ধতির (Earlier school) অঙ্কন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। এই সময় ফ্লোরেন্সে অবস্থানকালে তিনি "La Bella Giardiniera" (লুভারে রক্ষিত) একখানি চিত্র এবং একখানি ম্যাডোনা মাতৃমূর্ত্তি, যাহা এক্ষণে ব্রাশেল্‌সে রক্ষিত আছে, অঙ্কিত করেন।

সানসিস্তোর মাদোনা

১৫০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রোমে পোপ-কর্তৃক নিমন্ত্রিত হ'ন। এইস্থানে তাঁহাকে প্রধান ধর্ম্মমন্দিরের একটী কক্ষের (Stanza della Segnature) খিলানের উপর একটী চিত্র অঙ্কিত করিতে হয়। এই চিত্রখানির সহিত তাঁহার পূর্ব্ব-অঙ্কিত "Entombing of Christ" নামক চিত্রের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। শেষোক্ত চিত্রটী প্রাচীন চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির অনুসরণে অঙ্কিত হইলেও ভাবে ও রূপ-ব্যঞ্জনায় জীবন্ত, ইহার প্রতিটী তুলির টানে এক সুগভীর অর্থ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ১৫১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এই চিত্রটী সমাপ্ত হয়। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় এই "Stanza"-র (প্রশস্ত গৃহ) অপর একখানি চিত্র অঙ্কিত করেন।

র‍্যাফেল তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সময় অতিবাহিত করেন রোমে। এই সময় তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ চিত্রগুলির অধিকাংশই অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নয়ন-মন-মোহকর এই অপূর্ব্ব চিত্রগুলির আকর্ষণে এখানে অনেক বন্ধু জুটিয়াছিল। এমন কি তখনকার রোমের অভিজাত সম্প্রদায়ের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন। তিনিও কখন কাহারও

অযাচিত অভিনন্দনকে উপেক্ষা করিতেন না। তাহার উপর তাঁহার দেহের লালিত্য, মিষ্ট কণ্ঠস্বর, বলিবার বিশিষ্ট ভঙ্গী প্রভৃতি ব্যক্তিগত সদ্‌গুণের জন্য বহু লোক তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য লালায়িত হইত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি কোন না কোন ইতালীর সান্ধ্য-সমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া প্রাণ-মাতান উচ্চহাস্যে ও সুষ্ঠু রসিকতায় স্থানটীকে মুখরিত করিয়া তুলিতেন। ছবি আঁকিয়া তাঁহার বিপুল অর্থাগম হইত, নিরবচ্ছিন্ন স্বচ্ছন্দতায় তাঁহার জীবন বেশ কাটিয়া যাইতেছিল—তিনি ভাবিয়াছিলেন এইরূপেই বুঝি জীবন কাটিয়াও যাইবে।···কিন্তু অলক্ষ্যে থাকিয়া নিষ্ঠুর নিয়তি যে পরিহাস করিয়াছিল, তাহা তখন কে বুঝিতে পারিয়াছিল—কে ভাবিয়াছিল যে, তাঁহার জীবন-নাট্যে এখনই যবনিকাপাত হইবে!!

১৫২০ খৃষ্টাব্দে র‍্যাফেল তাঁহার "Transfiguration of Christ" নামক চিত্রখানি আঁকিতে আরম্ভ করেন। এই চিত্রখানি প্রায়-সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন তাঁহার ভীষণ জ্বর হয় এবং এই জ্বরেই ৬ই এপ্রিল সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকে গমন করেন। যেদিন তাঁহার মৃত্যুসংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, সেদিন সমস্ত রোমের মধ্যে ভীষণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। দলে দলে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া তাঁহার দ্বার-প্রান্তে সমবেত হইল। সকলে তাহাদের প্রিয় শিল্পীকে শেষবারের মত দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া রহিল। শেষে পোপ আদেশ দিলেন যে, তাঁহার মৃতদেহ তিন দিনের জন্য তাঁহার চিত্রশালায় (Study) "Transfiguration of Christ" নামক চিত্রটীর সম্মুখে শায়িত থাকিবে, যাঁহার ইচ্ছা আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন। তিন দিন পরে তাঁহার মৃতদেহ আনিয়া Sta-maria Rotonda নামক গির্জ্জায় কবরস্থ করা হয়।

র‍্যাফেল-সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক গ্রন্থকারগণ যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ছিলেন বিনয়ী, দয়ালু, পশুপক্ষীর প্রতি স্নেহপরবশ, সুন্দর ও কষ্টসহিষ্ণু, এতটুকু দাম্ভিকতা তাঁহার কার্য্যকলাপে পরিলক্ষিত হইত না। যেই তাঁহার নিকট আসিত তাহাকেই তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা তিনি জয় করিয়া লইতেন। র‍্যাফেল যদিও অবিবাহিত অবস্থাতে পরলোকে গমন করেন, তাহা হইলেও এ কথা বলিতে পারা যায় না যে, তাঁহার জীবনে নারীর প্রভাব কোন দিন ছিল না। যৌবনে La' Fornarina নাম্নী কোন একটী সমবয়সী মেয়ের সহিত তাঁহার প্রণয় হয়। এই মেয়েটীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি যে সমস্ত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহা হয় তো আজ ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও যাহার উদ্দেশে লিখিত হইয়াছিল, তাহার অনুমোদন পাইয়াছিল বলিয়া শিল্পী তাহাদের পূর্ণ সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু কেন যে তাহাদের ভিতর বিবাহ-বন্ধন হইয়া প্রেমের বন্ধনকে অটুট রাখে নাই, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভেই রহিয়া গিয়াছে! র‍্যাফেল তাঁহার মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার অঙ্কিত নক্সা, ছবি, ফ্রেস্কো (সিমেণ্টের উপর অঙ্কিত) প্রভৃতি তাঁহার প্রিয় শিষ্যদ্বয় Giulio Romano, ও Fattoreকে দান করিয়া যান।

এইবার আমরা র‍্যাফেলের কয়েকখানি বিখ্যাত ছবির পরিচয় দিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

১। "Balthasar Castiglione"—র‍্যাফেলের মনুষ্যাকৃতিগুলির (Portrait) মধ্যে এইটাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। Balthasar ছিলেন র‍্যাফেলের এক বাল্যবন্ধু। বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের সখ্যতা অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ও প্রতিভাশালী গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহার রচিত "The Courtier" নামক উপন্যাসখানি সেই সময় যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। এই পুস্তকখানির মধ্যে তখনকার Urbino-র রাজপরিবারের কার্য্যকলাপ বেশ দক্ষতার সহিত চিত্রিত হইয়াছিল। Balthasar-এর এই চিত্রখানি এখন লুভার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

২। "The Madonna of San Sisto"—এই চিত্রখানি বর্ত্তমানে ড্রেসডেনে রক্ষিত আছে। র‍্যাফেল-অঙ্কিত ম্যাডোনার চিত্রগুলির মধ্যে এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। যদিও এই চিত্রখানির একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী রহিয়াছে, তাহা হইলেও ইহা যে এইরূপ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে তাহার মূল কারণ অপরাপর চিত্রের তুলনায় আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিতে ইহা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই

চিত্রখানির মধ্যে শিশু খৃষ্ট কিরূপ সহজ অথচ গভীরভাবে অসীমের দিকে অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে! ক্ষীণাঙ্গী, শান্ত, সৌম্য যিশু-মাতাকে শিল্পী এইরূপ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে আমাদের মনেও এক শান্ত সমাহিত ভাবের উদ্রেক হয়;—চক্ষুর সম্মুখে এই চিত্রখানির ভাবমাধুর্য্য এরূপ গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া যায় যে, আমরা কোনমতে তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারি না।

৩। "The Transfiguration of Christ"—এই চিত্রখানি র‍্যাফেলের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত চিত্র। চিত্রখানির মধ্যে শূন্যে যিশুখৃষ্ট ভাসিতেছেন এবং তাঁহার প্রিয় শিষ্যদ্বয় Moses ও Elijah পদতলে লুণ্ঠিত রহিয়াছেন। নিম্নে বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে পিটার, জেম্‌স্‌, জন্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের মুখে বিভিন্ন ভাব-ব্যঞ্জনা (expression) ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই চিত্রখানির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিত্র-সমালোচকগণের মধ্যে মতান্তর আছে। তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে শিল্পী যে দুইটী বিষয়-বস্তু লইয়া এই চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার দুইটী বিভিন্ন চিত্রে অঙ্কিত করা উচিত ছিল; কিন্তু সাধারণ-ভাবে দেখিতে গেলে, শিল্পীর এই চিত্রখানি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এ চিত্রখানি তাঁহার চিত্রগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়ও ছিল। চিত্রখানি তিনি Cardinal Giulio de' Midici-র জন্য অঙ্কিত করেন।

খৃষ্টের রূপান্তর

৪। "The Ansidei Madonna" (লণ্ডনের National Galleryতে রক্ষিত) এই চিত্রখানি শিল্পী Perugia-র Ansidei পরিবারের জন্য অঙ্কিত করেন। চিত্রটীর মধ্যস্থলে যিশুমাতা শিশু-যিশুকে লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এক পার্শ্বে John the Baptist এবং অপর পার্শ্বে St. Nicholas দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ১৫০৬ খৃঃ অব্দে চিত্রখানি অঙ্কিত হইবার পর হইতেই উহা S. Fiorenzo-র ধর্ম্মমন্দিরে টাঙান ছিল। ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে Lord Robert Spencer উহা ক্রয় করিয়া Duke of Marlboroughকে উপহার দেন। ইহার পর গত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে National Gallery উহা সত্তর হাজার পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করিয়া লন। এই চিত্রখানি শিল্পীর প্রথম জীবনের অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম।—

আনসিদেই মাদোনা

র‍্যাফেলের পর আরও যে একজন ইতালীয় শিল্পী ও রূপকারের নাম উল্লেখ করিতে পারি, তাঁহার নাম সালভেতর রোজা (Salvator Rosa); তিনি ছিলেন স্ফূর্ত্তিবাজ, আমোদপ্রিয় লোক, গান গাহিয়া, শিস্‌ দিয়া, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু তিনি যখন রঙ্‌ ও তুলি লইয়া চিত্রাঙ্কন করিতে বসিতেন তখন তাহার মধ্যে এমন বিষাদ ও বীভৎসভাবের সৃষ্টি করিতেন যে, তাহা দেখিয়া মনে হইত না যে তাঁহার মত একজন আমোদপ্রিয় লোক এমন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

নেপ্‌লসের নিকট Renella নামক গ্রামে ২০এ জুন ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে রোজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শিল্পী হইলেও তিনি তাঁহার পুত্রকে গির্জ্জার ধর্ম্ম-যাজক

করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করিতেন। কিন্তু রোজার যখন বয়স ষোল বৎসর, তখন তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া এক সঙ্গীতজ্ঞের নিকট গিয়া সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করেন। এই ব্যক্তির নিকট মাত্র কিছুদিন শিক্ষা করিয়া তিনি সঙ্গীত-বিদ্যায় বেশ পারদর্শিতা লাভ করেন। তখনই তাঁহার রচিত দুই-একটী সঙ্গীত সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। রোজার ভগিনীর Francerco Francanzano নামক এক ব্যক্তির সহিত পরিণয় হয়। এই ব্যক্তি শিল্পী ছিলেন। রোজা প্রায়ই তাঁহার চিত্রশালায় গমন করিতেন। এইরূপে প্রত্যহ যাতায়াতের ফলে তাঁহারও চিত্র-বিদ্যার উপর প্রবল আকর্ষণ জন্মে। তিনিও চিত্র-অঙ্কন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিন্তু অন্যান্য চিত্রশিল্পিগণের ন্যায় চিত্রশালায় বসিয়া চিত্রাঙ্কন করিতে আরম্ভ করিলেন না;—আল্পস্ পর্ব্বতের দুর্গম শৃঙ্গগুলিতে বিচরণ করিতে করিতে প্রকৃতির ভীম-ভয়াল দৃশ্যনিচয় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই পর্ব্বত অভিযানের সময় তিনি একবার এক ডাকাতদলের হাতে পড়েন। এই দলেরই মধ্যে একটী মেয়ে তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া তাহারই চেষ্টায় কোনরকমে সে-যাত্রায় প্রাণরক্ষা পান।

১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রোমে ফিরিয়া আসেন এবং স্বাধীনভাবে চিত্র-বিদ্যার উৎকর্ষের দ্বারা জীবিকা-অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় Grand Duke ও Midici পরিবার তাঁহার শিল্পালোচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। শেষ-বয়সে তিনি ফ্লোরেন্সে রাজন্যবর্গের কীর্ত্তি-কলাপকে শ্লেষ করিয়া কতকগুলি ছড়া রচনা করেন। ইহাতে ফ্লোরেন্সের অভিজাত সম্প্রদায় তাঁহার উপর বড় রুষ্ট হন। ফলে তিনি চিরজীবনের জন্য ফ্লোরেন্স হইতে বিতাড়িত হন। ইহার পর ১৫ই মার্চ্চ ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রোজার চিত্রগুলি মাইকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল প্রভৃতির চিত্রগুলির সমকক্ষ না হইলেও সেগুলি যে কোনমতে উচ্চ শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে হীন ছিল তাহা নহে। তাঁহার চিত্র-গুলির মধ্যে অধিকাংশই যুদ্ধবিষয়ক এবং দৃশ্যপটে (Landscape) ইহাদের মধ্যে এইগুলিই প্রসিদ্ধ—"The Philosopher," "Jesus disputing with the doctors," "St. Francis di Paola," "Soldiers of Gideon," "Bandits in Council," "Mercury and the Woodman," "Tobias and the Angel," "Some Landscapes of Munich," "Moses at rock," "Battle-scenes—Rome," "Halt of Soldiers," "A monk of meditation," "Soldiers playing at dice."

Printed by Saurindra Kumar Ghosh at the Biswabhandar Press, 216, Cornwallis Street, Calcutta and Published by the same from the Panchapushpa Office, 31, Telipara Lane, Calcutta.

৪র্থ বর্ষ
প্রথমার্দ্ধ

শ্রাবণ, ১৩৩৮

চতুর্থ সংখ্যা

পরকীয়া

দ্বিতীয় প্রস্তাব *

(শ্রীভগবানের আত্মারামত্ব)

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভাবে বুঝিতে হইলে ভগবানের আত্মারামত্বের মূলে হইতেছে অনুরাগ। তিনি অনুরাগের কাঙ্গাল—উহার নিত্যভিখারী, শাস্ত্রে ইহাই দেখি। তাঁহার এই ভিখারী ভাব যেন হিন্দুর অস্থিমজ্জাগত। পরকীয়ার অনুরাগের অপরিশোধনীয় ঋণে কাঙ্গাল হইয়া শ্রীচৈতন্য জগতে আসিয়াছিলেন; আবার বাৎসল্যের কাঙ্গাল গোপাল যেন সকলেরই কাছে হাত পাতিয়া ভিখারী; তুমি যতই দেও না কেন, হাতখানি বারংবার পাল্টে পাল্টে পাতা বুঝি ও শিশুর কোন কালেই ঘুচিবে না। ও ছেলে কি চাহে—কত না চাহে—কে জানে, কে বলিতে পারে? এমন দাতা কে আছে, ও শিশুর বুক-ভরা ভিক্ষার আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে? আর এক ভিখারী—সেই "প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা," যাঁহার পার্শ্বে নিয়ত মা অন্নপূর্ণা স্বয়ং, যিনি কোটী রাজ-রাজেশ্বর, যিনি স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্য্যময় মহেশ্বর, হরি! হরি! তাঁহারই কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি! অনুরাগ এমন জিনিস! তাই সাধারণতঃ অনুরাগ হইতেছে বৈষ্ণবের কাছে বড়ই মধুর, কিন্তু পরকীয়া ভাবের অনুরাগই তাঁহার নিকট সকল অনুরাগের শ্রেষ্ঠ। কারণ, ইহার তুল্য ত্যাগ (Sacrifice) আত্মদান বা আত্মনিবেদন (Self-resignation) আর কোনপ্রকার অনুরাগেই হয় না। ইহা পূর্ব্বের প্রস্তাবে বুঝাইয়াছি। তাই বৈষ্ণবের মতে ভগবানের আত্মারামত্বের মূলে সেই পরকীয়ার প্রবলতম আসক্তিই আছে। তাহা কিরূপে হয় বলিব।

দার্শনিক-প্রবর Spinozaও যেন কতকটা বৈষ্ণব-মতের পোষকে বলিয়াছেন স্বয়ং ঈশ্বর আত্মানুরাগী; সে অনুরাগ অসীম—অনন্ত; আর তাহা তাঁহার বুদ্ধি বা জ্ঞানগত। (God loves Himself with an infinite intellectual love.) বোধ হয়, সে-কালে সপ্তদশ শতাব্দী ইউরোপে, ইহা নূতন কথা। সে

* ১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসের "পঞ্চপুষ্পে" ইহার প্রথম প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পড়িবার আগে সে প্রস্তাবটী একবার পড়িয়া লওয়া ভাল।

যাহাই হউক, ইহা ভগবানের একরূপ আত্মারামত্বের কথা বটে। বৈষ্ণবেরা কিন্তু ঐ আত্মারামত্ব ঠিক Spinozaর কথার ভাবে বুঝেন না। ঐ Intellectual কথাটাই তাঁহাদের সেরূপে বুঝিবার পক্ষে বিষম অন্তরায়। কেন, তাহা বলিতেছি। আমাদের দর্শন-শাস্ত্রানুসারে "Intellect" কথা সমষ্টিভাবে মহত্তত্ত্বকে ও ব্যষ্টিভাবে বুদ্ধিতত্ত্বকে নির্দেশ করে—যাহা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বলিয়া কথিত এবং যাহার ফল হইতেছে, বিবেক। এই বিবেক দ্বারা সদসৎ বিচার করিয়া মানুষের যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ হয়। বৈষ্ণব কিন্তু রাসলীলায়, ভগবানের আত্মারামত্ব প্রকারান্তরে, অর্থাৎ ভাবরাজ্যের—Sentimentএর রাজ্যের অতুলনীয়া সেই পরকীয়ার সাহায্যে ভাবের দিক্ হইতেই—Emotionএর দিক্ হইতেই আস্বাদ করেন—Intellectএর দিক্ হইতে করেন না। Spinozaর সহিত তাঁহার মতের বা কার্য্যের এইখানেই সামঞ্জস্য নাই। কারণ, সাধক অহঙ্কারতত্ত্বে না থাকিলে—নিজের স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানে না থাকিলে—"তুমি আমি" এই দ্বৈতজ্ঞানে না থাকিলে তাঁহার ঐ বিষয়ের আস্বাদন বা ভোগ অসম্ভব। তিনি বুদ্ধি-তত্ত্বে পৌছিলে, বা তাহাতে তাঁহার অবস্থান-কালে অহঙ্কার তাঁহাকে একেবারে ছাড়িতে হয়, তখন তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ভাবের জ্ঞান আর থাকে না; তিনি তাঁহার পশ্চাতে তাহা ফেলিয়া সেখানে পৌছেন। * তাই, একদিকে বড় বিষম রকমের ভোগী অথচ বিরক্ত বৈষ্ণব, অহঙ্কার অর্থাৎ অহং-জ্ঞান বজায় রাখিয়া—"তুমি-আমি"র ভিতর দিয়া, দ্বৈতভাবের ভিতর দিয়া—রসতত্ত্ব রাধাকৃষ্ণের ভিতর দিয়া ভগবানের স্বানুরাগের বা আত্মারামত্বের আস্বাদন করেন। গোপী-কৃষ্ণ, অথবা রাধা-কৃষ্ণ একই বস্তু, কেবল এ কথাটী মনে রাখিয়া লীলা-চর্চ্চা করিলে ঐ আত্মারামত্ব অন্ততঃ কিছুও বুঝা যায়। তাই বৈষ্ণবের সাধনা হইতেছে দ্বৈতভাবের, আর যোগীর সাধনা অদ্বৈতভাবের।

বৈষ্ণবের পরকীয়ার ভালবাসা পার্থিব বিবেকজ্ঞান-বর্জ্জিত; তিনি ঐ বিবেকের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না; সে অপেক্ষা-বুদ্ধি তাঁহার অনুরাগের বানের ডাকে কোথায় ভাসিয়া যায়। কারণ, তাঁহার আসল যে প্রেরণা তাহা তাঁহার আদৌ বুদ্ধিগত নহে—কেবলই ভাবগত—(Emotional) কাজেই ইহকাল, পরকাল, ধর্ম্মাধর্ম্ম কুল-শীল প্রভৃতির দিকে চাহিবার তাঁহার অবকাশ বা ক্ষমতা কোথায়? আমাদের পূর্ব্ব প্রস্তাবে উদ্ধৃত পরকীয়া-সম্বন্ধীয় শ্লোকে রূপ-গোস্বামিপাদ এই প্রকারের কথাই বলিয়াছেন; তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। † মানুষের উপর ভাব বা অনুরাগের প্রভাব, বিবেক বা বুদ্ধির প্রভাব অপেক্ষা শতগুণে অধিক। সেই জন্য কবির স্থান অন্য সকল প্রকার প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের বহু উচ্চে; সেই জন্য তাঁহাকেই সচরাচর সরস্বতীর বরপুত্র বা Favoured of the Muses বলা হইয়া থাকে। আর সেই জন্যই তুলনায় Huxley বা Tyndall অপেক্ষা Victor Hugoর মানবকে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা বহুগুণে অধিক। Sentiment এবং Intellect এতদুভয়ের প্রভাব বিচার-কালে একজন মনীষী বলিয়াছেন, "Sentiment governs the world." আমাদের মনে হয়, একথা খুব ঠিক; কারণ, পৃথিবীতে যদি প্রীতি, দয়া, সমবেদনা ইত্যাদি কিছু না থাকে, যদি মাতৃস্নেহ, নারীর প্রেম, সন্তানের শ্রদ্ধা-পূর্ণ স্মৃতি ইত্যাদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, ভূবিদ্যা, খগোলবিদ্যা প্রভৃতি কতক্ষণ পৃথিবীকে বজায় রাখিতে পারে? তাই বৈষ্ণব স্বয়ং রসপ্রবণ চিত্ত বলিয়া, ভগবানের স্বানুরাগ বুঝিতে ভগবদ্মুখী চিদ্বৃত্তিশালিনী কেবল ভাবময়ী পরকীয়ার সাহায্য লন। তাহা ভিন্ন তাঁহার অন্য উপায় নাই।

---

* যোগমার্গের সাধনায় ঠিক ভগবানের আত্মারামত্ব উপলব্ধি হয় না। যোগী সেখানে তাঁহার চূড়ান্ত সাধনায় পৌছিলে, স্বয়ং আত্মারাম হইয়া যান। তখন তাঁহার জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই তিন ভাবেরই (ত্রিপুটির) লয় হইয়া যায়; সুতরাং সে অবস্থায় তাঁহার উপলব্ধি বা ভোগের কিছুই থাকে না। যোগী তখন অহঙ্কার বা অহংজ্ঞান বিচ্যুত হইয়া, সম্পূর্ণভাবে আত্মাবস্থিত হইয়া পরম শান্তির পদে—Eternal blissএ—অধিরূঢ় থাকেন। এই অবস্থাই হইতেছে তাঁহার চরম লক্ষ্য এবং ইহাই হইতেছে তাঁহার সাধনার শেষ অবস্থা, যাহা অনন্তকাল স্থায়ী—মৃত্যুঞ্জয়ত্ব।

† বিবেক-বর্জ্জিতা বলিয়া পরকীয়া কামুকা নহেন, এ কথা প্রথম প্রস্তাবে বুঝান হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া যে একনিষ্ঠ ভাব তাহাই হইতেছে পরকীয়ার বৈশিষ্ট্য। ইহার আংশিক ভাবও ভাল.

শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহে কিন্তু ভগবানের আত্মারামত্ব তাঁহার যুগলভাব অপেক্ষা আরও ভালরূপে পরিস্ফুট। তাহা বুঝাইতেছি। রাধা ও কৃষ্ণ দুইটী unit বটে—অভেদ হইয়াও গণনায় দুইটী। তাঁহাদের রাসলীলার পরিণামে (Sequel) আদর্শ-পরকীয়া শ্রীরাধার ভগবানে এককালে আত্মনিবেদনের ফলে, তাঁহারা পরস্পরে যেন আলিঙ্গনবদ্ধভাবে মিশিয়া এক হইয়া যান—তাঁহাদের দেহ দুই ঘুচিয়া এক হয়। কিন্তু শ্রীরাধার অনুরাগের এতই আতিশয্য যে, শ্যাম ও গৌরবর্ণের দুইটী শরীরের একীকরণ-ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের তেমন কালো রংও শ্রীরাধার সোণার রং এ ঢাকা পড়িয়া যায়, আর শ্রীরাধার নিজের চম্পক-দাম-গৌরবর্ণ—যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের আপনার দেহের বর্ণ—ঐ রাস-"রসায়নের" ক্রিয়ায়, যেন প্রেমের কোন অজ্ঞাত Chemical action এ একেবারে ফুটিয়া উঠিয়া সে মিলিত দেহে উচ্ছ্বসিতভাবে লহরী তুলিয়া খেলিতে থাকে; দৃশ্যতঃ সে একীভূত শরীরে শ্রীরাধাই যেন সমধিকভাবে প্রকাশমানা (Predominating) ইহাই বুঝা যায়। এটা হইতেছে রাধা-পরকীয়ার অতুলনীয় অনুরাগের ভগবদ্দত্ত সম্মান—ভগবান এখানে যেন ছোট হইয়া গিয়াছেন। ইহাই হইতেছে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ। যুগল রাধা-কৃষ্ণের সামবায়িক (Synthetical) ভাবের এই শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহে ভগবানের আত্মারামত্ব বড়ই উন্নতভাবে সূচিত; ইহা আমাদের বুঝিবার খুব একটা জিনিস। সাধকই না ভগবানের সারূপ্যলাভ করেন, শাস্ত্রে দেখি? এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহে—হরি বল ভাই—স্বয়ং ভগবান অনুরাগিণী পরকীয়া আত্মসমা "রাধা" রাণীর সারূপ্য পাইয়া যেন নিজেই ধন্য হইয়াছেন; শ্রীরাধার রাধাত্ব বা ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে যেন একেবারে ছাপাইয়া উঠিয়াছে; তাঁহার উপর দিয়া যেন রাধা-প্রেমের মহা-প্লাবনের বান চলিয়া গিয়াছে, দেখি। ইহাই হইতেছে বৈষ্ণবের ভগবানের যথার্থ আত্মারাম-অবস্থা—অবশ্য কেবল ভাবের দিক্ হইতেই ইহা বুঝিবার; তিনি এক দেহেই দ্বৈতভাবে রাধা ও কৃষ্ণ হইয়া রাধা-ভাবে আপনাকে (কৃষ্ণকে) আস্বাদন করিতেছেন। দেবী-ভাগবতে দক্ষিণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ এবং বামাঙ্গ শ্রীরাধা এই ভাবের এক মিলিত মূর্ত্তির উল্লেখ আছে—নাম "গোপাল-সুন্দরী"। হর-সম্বন্ধেও "অর্দ্ধনারীশ্বর" মূর্ত্তি ঐরূপ; দক্ষিণাঙ্গ হর, বামাঙ্গ গৌরী। কিন্তু এসকলে নারীভাবের প্রাধান্য নাই—দুই অংশই সমান, যেন উহাতে দর্শনের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝায়, অথবা কালিদাসের "বাগর্থাবিবসম্পৃক্তৌ" ইতি শ্লোকাংশ মনে করিয়া দেয়। গৌরাঙ্গ-বিগ্রহের সহিত তুলনায় ঐ সবের ভাবের খেলা কম। কিন্তু সে যাহা হউক, দেখা যায় গৌরাঙ্গ-বিষয়ে বৈষ্ণব শাক্ত অপেক্ষাও গোঁড়া শাক্ত। কারণ, তাঁহার প্রাণের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের এই উল্টা ভাবের—শক্তি-প্রধান ভাবের—সারূপ্য (আমরাই এখানে "সারূপ্য" শব্দ ব্যবহার করিতেছি) তিনি বড়ই আস্বাদন করেন। আবার একবার হরি বল ভাই—বৈষ্ণবের পরকীয়া কোন জগতের বস্তু বুঝ; তাঁহার ধ্যান কর; আর পার তো সে পরকীয়া-ভাবের ভাবুক হইয়া আজীবন "ঝুরিয়া" মর।

যাহা বলিলাম তাহাতে যেন বুঝায় যে, যুগল রাধা-কৃষ্ণ ভগবানের দ্বৈতভাব; আর শ্রীগৌরাঙ্গকে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুই দেহের সমবায়-হেতু সহসা যেন অদ্বৈতভাবেরই বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। তিনি দ্বৈতভাবেরই বটে এবং সেই জন্যই বৈষ্ণবের বিশেষভাবে আস্বাদ্য। অদ্বৈত হইতেছে ব্রহ্ম-তত্ত্ব; সে তত্ত্বে শক্তি সুপ্তা (Latent) শ্রীগৌরাঙ্গে কিন্তু শক্তি (হ্লাদিনী) সতত কোলাহলময়ী—বিশেষভাবেই জাগ্রতা (Patent)। সে কোলাহল হইতেছে প্রেমের অবিশ্রান্ত তরঙ্গ-নিনাদ; ঘুমের সময়েও সে কোলাহল থামে না। এটা ঐ পরকীয়া হ্লাদিনীরই বৈশিষ্ট্য। এ পরকীয়ার কৃপা পাইলে সুষুপ্তি তো দূরের কথা, স্বপ্নাবস্থাও আসে না। পাঠক, গম্ভীরায় মহাপ্রভুর দৈনন্দিন দারুণ বিরহদশা একবার স্মরণ করুন। তাঁহার কত না পূর্ণ অনিদ্র রজনী সেখানে কাটিয়াছে!

পরকীয়ার মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে (যে মাহাত্ম্যের প্রভাবে স্বয়ং ভগবান্‌কে গৌরাঙ্গ হইয়া আসিতে হইয়াছিল) আরও দুই-চারিটী কথা না বলিলে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিবে। পরকীয়া রাধা কেবল কৃষ্ণ-সুখেরই অভিলাষিণী, তাহাতে তাঁহার ইহকাল ও পরকাল থাক বা যাক্। কবিরাজ গোস্বামী পূর্ব্বপ্রস্তাবে উদ্ধৃত রূপ-গোস্বামিপাদের পরকীয়া-সম্বন্ধীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা-স্বরূপ যেন লিখিয়াছেন—

লোক ধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহ-ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্ম সুখমর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥

চৈতন্যচরিতামৃত—আদিলীলা

শ্রীরাধা ঐহিক ও পারলৌকিক সকল কর্ম্মই ত্যাগ করিয়া কেবল কৃষ্ণ-সেবারই ভিখারিণী; কারণ, ঐরূপ সব কর্ম্ম কৃষ্ণ-সেবার বিষম অন্তরায়। কবিরাজ গোস্বামী বলেন:—

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমঃ ধর্ম্ম॥

চৈতন্যচরিতামৃত—আদিলীলা

বড়ই আশ্চর্য্য কথা। আবার শ্রীরাধার সম্বন্ধে আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্য্য—একটা অনন্ত আশ্চর্য্য ভাবের ব্যাপার হইতেছে এই—

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্ম-কৃষ্ণ-সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥

চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা

এমন আর আছে কি? জগতে এমন ভাবের প্রণয়িণী কেহ আছে কি? বিবাহিতা স্ত্রীর কথা দূরে থাক, রক্ষিতা বা কোন বেশ্যাও তো এমন কাজে অগ্রসর হইতে পারে না। কেন না, তাহাদের নিজ নিজ নায়ক-সম্বন্ধে নিজেদের স্বার্থ বা কামনা আছে; সেই জন্য ঐরূপ কার্য্যে তাহাদের স্বতঃই ঈর্ষা আসে। আর, এ কি ঐ কামগন্ধহীনা নারী রাধা, যে নিরন্তর অপরা স্ত্রীর সহিত আপনার নায়কের মিলন করিয়া দিতে কুট্টনীবৎ ব্যগ্রা, আর তাহাতেই সে "আত্ম-কৃষ্ণ-সঙ্গ হইতে কোটি সুখ পায়!" মরি! মরি! এমনটি নিষ্কামভাব তোমরা দেখিয়াছ কি? জগতের কোন সাহিত্যে এমন নারী-চরিত্র আছে কি? এ পরকীয়ার কার্য্য কেন এমন অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ভাবের? উত্তর, গীতার সেই "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" মন্ত্রই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য; তাই তাঁহার নিজের সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান তথা শারীরিক ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কিছুই নাই, সে সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত; সুতরাং ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ কাম বা স্বার্থও তাঁহার নাই; আছে মাত্র তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম অনন্যপক্ষী ভাবে শ্রীভগবানের চরণে শরণ-গ্রহণ:—

শীতল জানিয়ে, শরণ লইনু,
ও দুটি কোমল পায়।

আর আছে কেবল ইহার সঙ্গে সঙ্গে সেই কাতর প্রার্থনা—

জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
প্রাণ-নাথ হোয়ো তুমি।

এই সকল কারণে কৃষ্ণ-সেবায় তিনি নিজে যে সুখ অনুভব করেন, সখীসকলকেও সেই সুখের ভাগী করিতে তিনি নিয়ত চেষ্টিতা। হ্লাদিনীর ইহাও একটী বৈশিষ্ট্য। শ্রীরাধার সখীদিগের নিকট উক্তি-সম্বন্ধীয় কৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তনময় পদগুলি (যাহা "রসোদ্গার" নামে খ্যাত) কেবলই তাঁহার সখীদের আকর্ষণ করার মন্ত্র মাত্র। তাই এমন নারীর এমন ভাব দেখিয়া ভগবানকেও বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। তাই তিনি নিজে রাধা হইতে চাহিয়াছিলেন—

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হতে তবে মন ধায়॥*

চৈতন্যচরিতামৃত—আদিলীলা

* ভগবানের মনে হইল যে, তাঁহার মাধুর্য্য তিনি নিজে বুঝিবেন কি করিয়া? অর্থাৎ সাধারণভাবে আমরা যেমন বুঝি যে, সন্দেশ কি জিনিস তাহা সন্দেশ বুঝে না—যে সন্দেশ খায় সেই তা' বুঝে। অতএব তাঁহার ইচ্ছা হইল, নিজে রাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া—অন্তর কৃষ্ণ ও বহিঃ রাধা হইয়া তাঁহাকে নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেই হইবে। কারণ, রাধাই তাঁহাকে আস্বাদন করেন। সেই জন্য রাধার স্বরূপের প্রয়োজন। তাই বৈষ্ণবপদকর্ত্তা গোবিন্দদাস গাইয়াছেন:—

জয় নিজ কান্তা, কান্তি কলেবর,
জয় নিজ প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।

ইংরেজী বিজ্ঞান ও দর্শনে শিক্ষিত আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয় তো বলিতে পারেন, "দূর কর ছাই ওসব! গৌরাঙ্গে ভগবানের আত্মারামত্ব একটা কল্পনা বা Theory মাত্র।" কথাটা না হয় মানিয়াই লইলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এমন মনোহারিণী কল্পনা জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের কয়জনের মাথায় আসিয়াছে আর এমন একটা Theoryই বা কয়জন দার্শনিক গড়িয়াছেন? যদি আমাদের এই প্রশ্ন অসঙ্গত না হয়, তবে আবার জিজ্ঞাসা করি, হে ইংরেজি শিক্ষাভিমানিন্, তুমি কেন স্বীকার করিবে না যে, যাঁহাদের মাথা হইতে এমন একটা কল্পনা বা তত্ত্ব বাহির হইয়াছে, তাঁহাদের স্থান জগতে বড়ই উচ্চে? *

জয় ব্রজ-সহচরী, লোচন-মঙ্গল,

জয় নদীয়া-বধূ নয়ন-আমোদ।

ঐরূপ কল্পনার পরেই যেন আমাদের পূর্ব্ব-কথিতরূপে রাধাকৃষ্ণ-দেহদ্বয়ের মিশ্রণ আরম্ভ ও শেষ হইল।

* বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের অতি-নতুন সম্বন্ধ। সম্প্রতি New Yorkএর ১৯৩১ সালের গত জানুয়ারি মাসের "Truth-Seeker" পত্রিকায় খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার আইনষ্টাইনের এ সম্বন্ধে ঐরূপ মতই উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার মত হইতেছে:—"One is inclined to regard Religion and Science as irreconcilable antagonists." অর্থাৎ লোকের মনের ঝোঁক হইতেছে এই ভাবের যে, ধর্ম্ম আর বিজ্ঞান দুইটা পরস্পর এমন শত্রু যে, তাহাদের ঐক্য বা মিলন হইতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যেও মতভেদ আছে। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক Sir James Jeanএর "The Mysterious Universe" নামক পুস্তকে Dr. Einsteinএর মতের বিপরীত ভাবের কথা আছে। ঐ পুস্তকের অনেক সমালোচক Roland Mc Corquodaleএর কয়েক ছত্র আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

° ° Science ° ° leads us to the reality of the unseen. God laid the foundations of the universe when he said, "Let there be light."

This brilliant book should cause the materialist who is firm in mechanistic philosphy to think. It is a veritable witness to the closer relationship of science and religion. The whole trend of this book emphasises the fact that science is not yet at grips with reality, although she is very near. The immediate task before science is to study the shadows of reality, and patiently await the results. Our whole conceptions of the universe are undergoing a change. No man can foretell the consequences.

The abiding impression that this book leaves with us, is that science is standing on the threshold of some profound revelation concerning the formation of the universe.

অর্থাৎ—অদৃষ্টপূর্ব্ব (অজ্ঞাত কোন) সত্তার সত্যতার দিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে লইয়া যায়। ঈশ্বর-কর্তৃক বিশ্ব-সৃষ্টির আরম্ভ হইল, যখন তিনি বলিলেন, "আলোক হউক।"

যে সকল জড়-বাদীদের (জড়জগতের) শক্তি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তত্ত্বের উপর দার্ঢ্য আছে, এই গৌরবের বইখানি পড়িলে তাঁহাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সম্বন্ধ যে নিকটতর তাহার প্রকৃষ্ট (প্রমাণের) সাক্ষ্য হইতেছে এই বই। ইহার সমগ্র ঝোঁক হইতেছে জোরের সহিত এই কথাই বুঝান যে, বিজ্ঞান এখনও সত্যকে ধরিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহার খুব কাছেই আসিয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানের সমক্ষে নির্দ্দিষ্ট আশু কর্ত্তব্য কার্য্য হইতেছে, (তদৃষ্ট) সত্যের ছায়াপাত-সমূহের অভিনিবেশপূর্ব্বক অনুধ্যান করা এবং ধৈর্য্যসহকারে পরিণামের জন্য অপেক্ষা করা। জগৎ-সম্বন্ধে আমাদের সমগ্র ধারণারই পরিবর্ত্তন হইতেছে। ইহার ফল যে কি হইবে, কে পূর্ব্বে তাহা বলিতে পারে।

জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে যেন কোন নিগূঢ় রহস্য-উদ্ঘাটন রূপ ব্যাপারের প্রবেশ-পথে বিজ্ঞান আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আমাদের মনে এমনি একটা স্থায়ীভাবের ধারণা এই পুস্তক করিয়া দেয়।

আমাদের বক্তব্য এই যে, ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা বলেন, জড়বিজ্ঞান তাহা ঠিক কি না বুঝিবে কি করিয়া? কারণ বিজ্ঞান বুঝায় স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে; ধর্ম্মের শিক্ষাদাতা মহাপুরুষেরা কিন্তু তত্ত্ব-কথা বুঝিয়াছেন অতীন্দ্রিয়তার দিক্ হইতে। এই যে অতীন্দ্রিয়তা-লব্ধ সত্যজ্ঞান, ইহাকে একরূপ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বা স্বানুভূত সত্য (Intuition) বলা যাইতে পারে, অথবা 'Revelation'ও বলা যায়। এই জ্ঞান বিশ্লেষণ (Analysis) বা বিচার-তর্কের (Reasoning) অপেক্ষা রাখে না, অথচ ইহা একবারে প্রমাদ-শূন্য বলিয়া শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, ঈশা, মুসা প্রভৃতি মানিয়া গিয়াছেন। ইহারা সকলে বড়, না জড়-বাদী নাস্তিক বৈজ্ঞানিকেরা বড়? মানুষের হৃদয় অধিকার কাহারা করিয়াছেন?

ভক্তের অতীন্দ্রিয়তা-সম্বন্ধে অনেক কথা অনাদিক সকল ধর্মশাস্ত্রেই আছে। অনেক ভক্ত ভগবানের পৃথিবীতে আগমনের সংবাদ তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। ভক্ত অতীন্দ্রিয় না হইলে এরূপ হয় না। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বহু বৎসর পূর্ব্বে সে কথা ভক্ত কবি চণ্ডীদাস গীতে উদ্ধৃত তাঁহার একপদে লিখিয়াছেন :—

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যামরায়।
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল।
* * * *
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে।

মহাপ্রভুর পূর্ব্বগামী বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে এই একটী মাত্র পদে তাঁহার অবতীর্ণ হইবার কথার উল্লেখ দেখি। Bibleএও ভবিষ্যদ্বক্তাদের (Prophets) বাক্যে যীশু খৃষ্টের আগমনের উল্লেখ দেখা যায়। এই যেমন প্রচারক John the Baptist ঘোষণা করিয়াছিলেন :—Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. * . * There comes one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.—St. Mark.—আবার সময়ান্তরে যখন তিনি তাঁহার সম্মুখে সমবেত জনতার মধ্যে যীশুকে দেখিয়াছিলেন, তখনই তিনি তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যকে তাঁহার সময়ের নবদ্বীপের জনসাধারণ চিনে নাই, কিন্তু গোদাবরীতীরে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত ভক্ত রায় রামানন্দের সহিত যখন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন রায় তাঁহাকে ভালরূপে চিনিয়াই বলিয়াছিলেন :—

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে।
পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ।
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা।
তাহাতে প্রকট দেখি বংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল দেখি কমলনয়ন। ইত্যাদি

চৈতন্য-চরিতামৃত—মধ্যলীলা—৮ম পরিচ্ছেদ

আবার শ্রীরামচন্দ্র যখন পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তখন মাত্র ১২জন ঋষি তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া চিনিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সময়েও তাঁহাকে অনেকে চিনেন নাই। ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। কারণ ভক্ত ভিন্ন ভগবান আর কাহাকেও ধরা দেন না। ভগবানকে চিনিবার কথা দূরে থাকুক, একালের দিনে আমাদের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভাবান্ ব্যক্তি কেহ আসিলে, তাঁহাকে কয়জন বুঝেন ? এই Shakespeare এতদিন কাহারা পড়িয়া বুঝেন ? বহু মনীষী সমালোচক তাঁহাকে অন্ধকার হইতে টানিয়া না বাহির করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অমন প্রতিভার সংবাদ জগৎ এখন জানিত কি ? আর এখনকার বৈজ্ঞানিক-পুঙ্গব পূর্ব্বকথিত Einsteinএর সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। যেদিন তিনি তাঁহার ১৪ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় বিজ্ঞানের তথ্যসকল প্রচার করিলেন—যখন Newtonএর আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ-Theory তিনি একরূপ ভ্রমাত্মক বলিলেন, তখন আমাদের পূর্ব্বকথিত রামচন্দ্রের সময়ের ঐ ঋষিদের মত জগতের মাত্র ১০জন পণ্ডিতই তাঁহার কথা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা চিনিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই এইরূপ।

কাব্যেরও (Poetry) সহিত বিজ্ঞানের বনে না, ইহাও জানা কথা বটে। যেজন্য তাহার ধর্ম্মের সহিত বনে না, অনেকটা সেই কারণেই তাহার কাব্যের সহিতও বনে না। কারণ, ধর্ম্মের কথা হইতেছে একরূপ জগতের সর্ব্বোচ্চ মনোহর কাব্য (Sublimest poetry)। কিন্তু ধর্ম্ম তো সাধারণ কাব্যের মত কোন কিছু নয় ? এ যে জগতের কাব্য, সে প্রান্তে বিজ্ঞান বিচরণ করা দূরের কথা, এপর্য্যন্ত তাহার খোঁজও পায় নাই।

কাব্যের অত্যুন্নত প্রগাঢ়তাই পরিণামে ধর্ম্মে পরিণত হয়।

ভাবের খেলা কোন প্রমাণেরই অপেক্ষা রাখে না, এমন-কি কোন কোন সময় শাস্ত্রও মানে না। কারণ, ভাব স্বতঃই প্রমাণকে ছাড়াইয়া উঠিতে চায়। ভগবানের আত্মারামত্ব শ্রীগৌরাঙ্গকে অবলম্বন করিয়া আমরা যাহা বুঝিলাম, উহা ভাবেরই কথা—ভক্ত মহাজনদের কথা। রসাপ্তবাক্য বা শাব্দিক প্রমাণের মত ঐ কথা মাত্র। এপর্য্যন্ত সহস্র সহস্র ভক্ত ঐ কথা মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বরেণ্য পণ্ডিতগণেরও অভাব নাই। ভক্তের কথার উপর যিনি কথা কহিতে চাহেন, তাঁহার সহিত আমাদের কোন তর্ক নাই। আমরা বুঝি, গীতা প্রভৃতি ভক্তেরই কথা। এই দেখুন, দক্ষিণাকালী-প্রতিমার দিকে—একেবারে উলঙ্গিনী! ভক্ত কিন্তু মাকে এমন নিরম্বরা দেখিয়া কাপড় পরাইতে চাহে। সে ভাবের কান্না কাঁদিয়া মার কাছে বলে :—

বসন পর মা বসন পর তুমি—
রাঙ্গা চন্দনে মেখে জবা পদে দিব আমি।

আর শাস্ত্রে মার বসন পরার কোন কথা না থাকিলেও—বরং শাস্ত্র তাহার বিষম বাধক হইলেও—সে, সে দিকে একেবারে না চাহিয়া, মাকে জবরদস্তি কাপড় পরাইয়া রাখে, দেখাদেখি অন্য মাতৃভক্তের মধ্যে কেহ কেহ ঐরূপ কাপড় পরায়। ভাবের কাছে শাস্ত্রাশাস্ত্র নাই। শাস্ত্রবিধি সাধারণতঃ বিধিমার্গীর জন্য। ভাবুকভক্তের জন্য বা রাগমার্গীর জন্য শাস্ত্রের কোন বিধি-নিষেধ নাই এবং তাহা থাকিতেও পারে না। তাই অমন ভক্ত ছেলের অমন আব্দার মার বাবাও শুনিতে বাধ্য। কাজেই ভক্তের হাতে পড়িয়া সে পাগলী উলঙ্গিনী জগদম্বার কাপড় পরা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাই একাধারে মহাভক্ত ও মহাপণ্ডিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার ভক্তের কথা আপ্তবাক্যের ন্যায়—পরম সত্যের ন্যায় মানিয়া লইয়া লিখিয়াছেন :—

এহ ত ভক্তের কথা নহে ব্যভিচারী।

বঙ্গভারতী

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বঙ্গভারতী, করিছে আরতি আজিকে তোমারে দীনের দল,
লহ গো প্রণতি, শ্রদ্ধা, ভকতি, লহ গো হর্ষ, অশ্রুজল।
তোমারি পুণ্য দেউল ধন্য, তারি বেদীতলে তুলিয়া তান
গাহিব—জয়তু ভারতী মহতী, তুমিই দেবতা, তুমিই প্রাণ।
আশা-উল্লাস, প্রীতি-উচ্ছ্বাস, বাসনা-বেদনা তোমাতে লীন;
তুমি গো ধন্য, জানি না অন্য দেবতা আমরা তোমা' বিহীন।
অম্লান তুমি, তব পীঠভূমি হোক অম্লান সর্ব্বকাল;
সেবক-চিত্তে ভকতি-বিত্তে করুক দেউলে আরো বিশাল।
বঙ্গভারতী, লহ গো আরতি, শ্রদ্ধা, হর্ষ, অশ্রুজল;
এসেছে বিনত শতেক ভক্ত চরণাসক্ত সেবক-দল।

শৈশব-কালে জননীর কোলে করেছি আমরা স্তন্য-পান;
জননীর স্নেহে পুরানু এ দেহে যবে অসহায় স্বল্প-প্রাণ।
এল যৌবন, সকল ভুবন বিভবে বিলাসে মোহন ভায়;
চিত্ত আকুল ছাপিয়া দু'কূল চলে বাধাহীন যে-দিকে চায়।
স্থৈর্য্য-বিহীন চিত্তে সেদিন তব পদতলে করিলে বশ;
হে বাণী অতুলা, কি জ্যোতি বিপুলা দেখালে, দানিলে
কি সুধারস!

যবে অসহায় ছিনু ক্ষীণকায় বাঁচাল জননী-স্তন্যধার;
যুবক-চিত্ত যখন মত্ত দেখালে তোমার স্বর্ণ-দ্বার।
আজিকে সভায় চরণ আগায়ে এসেছি তোমার বেদীর তল;
বঙ্গভারতী, লহ এ প্রণতি, করিছে আরতি সেবক-দল।

সেবক পূজিছে, সেবক গাহিছে—জয় শুধু তব, তোমারি জয়।
সকলি বিলোপ হউক, কি ক্ষোভ? তোমারি সেবায়
দেহেরি লয়।

হে দেবী তোমার গড়েছে আগার যারা তারা নহে অর্থবান;
বিভববিহীন দীনতম দীন গড়েছে দেউলে স'পি' পরাণ।
মানব-ইন্দ্র দীন রামেন্দ্র, দীন ব্যোমকেশ অস্থি দ্যায়;
তাঁদেরি শোণিতে রচি' চারিভিতে বাণীমন্দির আজি দাঁড়ায়।
জননী ভারতী, তব প্রেম-প্রীতি দীন সন্তানে নিয়ত দাও;
যাহারা রিক্ত তাদের চিত্ত সুষমা-সুবাসে তুমি পূরাও।
বঙ্গভারতী, তোমারি আরতি তাইত করিছে দীনের দল।
লহ গো প্রণতি, শ্রদ্ধা, ভকতি, লহ গো হর্ষ, অশ্রুজল।

হে বাণী-দেউল, পুণ্যে অতুল, ওহে পরিষৎ, নমস্কার!
তিমির-নাশন বিদ্যা-আসন, ভাবের জ্ঞানের শুদ্ধাগার!
বঙ্গ-হৃদয়-সরসে উদয় হয়েছ তুমি যে কমল প্রায়,
কমল-উপরে ভারতী আদরে চরণ রাখিয়া অতুল ভায়।
চরণ ঘেরিয়া ঘুরে যে হাসিয়া মধু, বঙ্কিম, চণ্ডীদাস,
ঘুরে কাশীরাম, মুকুন্দরাম, গুপ্ত, গিরিশ, কৃত্তিবাস।
তব বেদীতলে আসে দলে দলে বিগত-সেবক-আত্মা-চয়;
শুনি যেন সবে গাহিছে নীরবে—জয় পরিষৎ, বাণীর জয়!
নম পরিষৎ, উদার মহৎ, হে ভাষাসেবীর সেবার ঠাঁই!
নম পবিত্র মিলন-তীর্থ, তুমি অক্ষয়, বিনাশ নাই।
পূজিতে ভারতী তোমারে আরতি করি গো আজিকে,
হে বেদীতল!
লহগো প্রণতি, শ্রদ্ধা, ভকতি লহ গো হর্ষ, অশ্রুজল। *

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ঊনচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবসে

শকুন্তলা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

(৩)

গত মাসের 'শকুন্তলা'তে আমরা পতিবিরহিণী শূন্যমনাঃ শকুন্তলাকে উটজদ্বারে উপবিষ্ট থাকিয়া দুর্ব্বাসার দারুণ শাপগ্রস্তা হইতে দেখিয়াছিলাম। এ অভিশাপের বিন্দু-বিসর্গও শকুন্তলা জানিতে পারেন নাই। ইহার পর কয়েক মাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে শকুন্তলার শরীরে গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল।

সম্প্রতি তাত কণ্ব শকুন্তলার দুর্দ্দৈবের স্বস্ত্যয়ন করিয়া সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। সখীদের ভাবনার অন্ত নাই। 'দুষ্মন্তপরিণীতা গর্ভবতী শকুন্তলার বৃত্তান্ত প্রবাসপ্রত্যাগত তাত কণ্বকে কিরূপে জানান যায়? দুষ্মন্তেরই বা এ কিদৃশ আচরণ? এত কথা বলিয়া এতদিনে একখান লেখা পর্য্যন্ত দিল না! সরলহৃদয়া সখী কিরূপ কপট জনে আত্মসমর্পণ করিল! কামো দানিং সকামো হোহু—কাম! এইবার সকাম হও! অহবা দুব্বাসসো সাবো এসো বিআরেদি—অথবা এ সব দুর্ব্বাসার শাপেরই ফল। রাজার কাছে অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়টী পাঠাইয়া দিব না কি? কাহাকে দিয়াই বা পাঠান যায়?' এই সব ভাবিয়া সখীদ্বয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন— ইত্থংগদে অম্হেহি কিং করণিজ্জং।

একদিন অতি প্রত্যুষে কণ্ব-ঋষি শিষ্যকে অনুমতি করিলেন—প্রভাতের আর কত বিলম্ব দেখিয়া বল। শিষ্য কুটীর হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন—রজনী অবসানপ্রায়।

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং ॥
লোকো নিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু ॥

এক দিকে চলে শশী অস্তাচল শিরে
(অন্য দিকে)
অরুণেরে পুরঃসরি রবি ফুটে ধীরে।
[illegible] উদয়, অস্ত উপচয়—
[illegible] শিক্ষা।

ক্রমে উষার অরুণরাগ ফুটিয়া উঠিল—

কর্কন্ধূনাম্ উপরি তুহিনং রঞ্জয়ত্যগ্রসন্ধ্যা
দার্ভং মুক্তোটজপটলং বীতনিদ্রো ময়ূরঃ।
বেদিপ্রান্তাৎ খুরবিলিখিতাদ্ উত্থিতশ্চৈষ সদ্যঃ
পশ্চাদুচ্চৈর্ভবতি হরিণঃ স্বাঙ্গমায়চ্ছমানঃ ॥

বদরী উপরে পতিত তুষার, রঞ্জিত উষারাগে
বিমল প্রভাতে জাগিল ময়ূর, দার্ভ উটজ আগে।
খুর-আলিখিত বেদিপ্রান্ত হ'তে, প্রসারি দীঘল অঙ্গ
উঠিয়া হরিণ গুরু অবসান সদ্যঃ করিল ভঙ্গ।

হোমবেলা আসন্ন দেখিয়া শিষ্য গুরুকে নিবেদন করিলেন। বেদীর উপর বৈদিক বিধানে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। আহুতি দিবার সময় কণ্ব দৈববাণী শুনিলেন—

দুষ্মন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্ অগ্নিগর্ভাং শমীমিব ॥

দুষ্মন্ত-আহিত তেজঃ
সুমঙ্গল করিয়া ধারণ।
নন্দিনী তোমার ঋষি!
অগ্নি-গর্ভা শমীর মতন।

হোমান্তে কণ্ব-ঋষি শকুন্তলার কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং লজ্জানম্রমুখী দুহিতাকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন—'বৎসে!

সংকল্পিতং প্রথমমেব তবার্থে
ভর্ত্তারম্ আত্মসদৃশং সুকৃতৈর্গতা ত্বম্।

অনুরূপ ভর্ত্তা পূর্ব্বে সংকল্পিনু যাঁরে।
সুকৃতির ফলে বৎসে! লভিয়াছ তাঁরে ॥

কি সৌভাগ্য! যজমানের দৃষ্টি ধূমাকুলিত থাকিলেও আহুতি ঠিক হোমাগ্নিতে পতিত হইয়াছে। বৎসে! সুশিষ্যে প্রদত্ত বিদ্যার ন্যায় তুমি আজ অশোচনীয়া হইলে। অদ্যৈব ঋষিপরিরক্ষিতাং ত্বাং ভর্ত্তুঃ সকাশং বিসর্জয়ামি—অদ্যই তাপসগণের সমভিব্যাহারে তোমাকে স্বামিসকাশে প্রেরণ করিব।'

তখন গমনের সজ্জার তাড়া পড়িয়া গেল।—সহি তুবর তুবর সউন্তলাএ পত্থাণকোহ্ণং নিব্বত্তিদুং। সখীরা যুগপৎ হর্ষবিষাদে নিমগ্ন হইয়া কেশরমালা, মৃগরোচনা, তীর্থমৃত্তিকা, দূর্ব্বাকিশলয় প্রভৃতি মাঙ্গলিক-দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তখনকার শোকে এই এক সান্ত্বনা যে, শকুন্তলা বেচারী সুখী হইবে—সা তবস্বিণী নিব্বুদা হোদু।

শকুন্তলা আজ সূর্য্যোদয়েই অবগাহন-স্নান সমাপন করিয়াছেন। তাপসীরা নীবার-হস্তে স্বস্তিবাচন করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন বীরপ্রসবিনী হও—কেহ বলিলেন ভর্ত্তার বহুমতা হও। সখীদ্বয় তাঁহাকে পত্রপুষ্পের অলঙ্কার পরাইতে গেলেন—সে আভরণ শকুন্তলার অশ্রুজলে সিক্ত হইল। শকুন্তলা বলিলেন—'হায়! আজ হ'তে সখীকৃত মণ্ডন আমার পক্ষে দুর্লভ হইল'। সখীরা সান্ত্বনা দিলেন—'সখি! মঙ্গল বেলায় কাঁদিও না'। প্রিয়ংবদা আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'এ রূপের অতি অযোগ্য এই বন্য আভরণ! কিন্তু উপায় কি?' ঠিক সেই সময় দুইটী ঋষিকুমার দিব্য অলঙ্কার লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সকলে বিস্মিত হইলেন। ঋষিকুমারেরা বলিল—'ইহা তাত কণ্বের তপঃপ্রভাব। তাঁহার আদেশে আমরা বনস্পতি হইতে কুসুমচয়ন করিতে গেলাম—অমনি

ইন্দুধবল ক্ষৌমবসন, প্রদানিল তরু নব,
চারুচরণ-রাগসুভগ, অলক্তক তরু-ভব।
নবকিশলয়-পেলব-আঙুলি, বনদেবতার করে,
দিল অন্যতরু নানা আভরণ, শকুন্তলার তরে।

ক্ষৌমং কেনচিদ্ ইন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যম্ আবিষ্কৃতং
নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগসুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্ব্বভাগোত্থিতৈঃ
দত্তান্যাভরণানি নঃ কিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ॥

তখন সেই সকল আভরণে সখীরা শকুন্তলাকে সাজাইলেন। তাত কণ্ব ইতিপূর্ব্বেই সকলকে ত্বরান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার দুই শিষ্য শার্ঙ্গরব ও সারদ্বত শকুন্তলার সঙ্গে রাজধানী হস্তিনা যাইবেন—আর সঙ্গে যাইবেন আর্য্যা গৌতমী।

গৌতমি আদিশ্যতাং শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ শকুন্তলানয়নায়। বলিতে বলিতে কণ্ব স্বয়ং প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া শকুন্তলাকে বিদায় করিতে আসিলেন। তাঁহার আজ চক্ষু সজল, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ।

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টম্ উৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥

শকুন্তলা পতিগৃহে যাবে আজি
　　জড়িমা-জড়িত মোর মন
কণ্ঠ মোর বিক্লব-গদ্‌গদ
　　বাষ্পভারে কলুষ নয়ন।
বনবাসী আমি, মোর চিত্ত যদি
　　কাতর এমত স্নেহভরে,
গৃহী যারা, তনয়ার নব বিরহের,
　　শোক তারা সহিবে কি ক'রে।

শুধু পালকপিতা কণ্বের কেন, আশ্রমবাসী নরনারীর কেন—বনবালা শকুন্তলার বনের পশুপক্ষী তরুলতার সহিত এমনই হৃদয়ের যোগ যে, আজ শকুন্তলার বিয়োগ-সম্ভাবনায়—

উগ্গলিঅ-দব্ভকবলা মিঈ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরী।
ওসরিঅপাণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্সূ বিঅ লদাও॥

মৃগী ছাড়িয়াছে দর্ভের কবল
　　ময়ূরী নর্ত্তন তার,
পরিচ্যুত পাণ্ডুপত্র ছলে, দেখ
　　মুঞ্চে লতা অশ্রুভার।

শকুন্তলা উঠিয়া পিতার চরণবন্দনা করিলেন। পিতা আশীর্ব্বাদ করিলেন—বৎসে!

যযাতেরিব শর্ম্মিষ্ঠা ভর্ত্তুর্বহুমতা ভব।
সুতং ত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি॥
ভর্ত্তৃবহুমতা হও, যযাতির শর্ম্মিষ্ঠা যেমন।
অচিরায় লভ বৎসে! পুরু-সম পুত্র অনুপম॥

কণ্ব বলিলেন 'মা! বেদিস্থিত যজ্ঞীয় অগ্নিকে প্রদক্ষিণ কর—আজ্যগন্ধে তোমার সমস্ত অমঙ্গল দূরিত হইবে।' শকুন্তলা বেদিপ্রদক্ষিণ করিলেন।

এইবার যাত্রার সময়। নবমালিকা যে শকুন্তলার 'বনজ্যোৎস্না' ভগিনী, সহকার বাহিনীপতি, ময়ূরী যার সহচরী, মৃগবধূ খেলার সঙ্গিনী, হরিণপোত যাহার কৃতক-পুত্র, সেই শকুন্তলা চিরদিনের জন্য আশ্রমত্যাগ করিয়া যাইবে! কণ্বমুনি আশ্রমতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ভোঃ ভোঃ তপোবন-তরুগণ!

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনা হপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

জলস্পর্শ করে না যে
তোমাদের যাবৎ না হয় জলপান,
মণ্ডনে আগ্রহ তবু
স্নেহ হেতু করেনা যে পল্লব-আদান,
যাহার উৎসব হয়
তোমাদের হ'লে নব প্রসূন-প্রসূতি
সেই শকুন্তলা আজি
পতিগৃহে যাবে, সবে দেহ অনুমতি।

এমনি কোকিলের কলরব শুনা গেল। কণ্ব বলিলেন:—

অনুমতি দিলেক গমনে
বনবাস-বন্ধু তরুগণ
কোকিলের কুহরবে ওই
শুন সাদর প্রতিবচন।

অনুমতগমনা শকুন্তলা তরুভিরিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ।
পরভৃতবিরুতং কলং যতঃ প্রতিবচনীকৃতমেভিরাত্মনঃ॥

শুধু তাই নহে—বনদেবতারা অশরীরী বাণীর দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিঃ
ছায়াদ্রুমৈ র্নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ॥

নলিনীশ্যামল সরোবর শত
রচিত করুক যাত্রা
ছায়াময় তরু [illegible]
সৌরকিরণ মাত্রা!
পদ্মপরাগ মিশি রেণু সনে
সুভগ করুক পন্থ
মৃদুল মধুর বহুক পবন
শুভ নিরাময় শান্ত!

শকুন্তলা বনদেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। প্রিয়ংবদাকে বলিলেন—'সখি! যদিও আর্য্যপুত্রকে দেখিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু এ আশ্রম ছাড়িতে পা উঠিছে না'। এইবার শকুন্তলা লতাবহিনী বনজ্যোৎস্নার কাছে গেলেন এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন 'বনজোসিনি! শাখা-বাহু দিয়া আমায় প্রত্যালিঙ্গন কর—আজ তোমায় ছাড়িয়া চলিলাম।' সখীদের বলিলেন—একে তোমাদের দুই জনের হাতে সঁপিয়া গেলাম। সখীরা কাঁদিয়া বলিলেন—'আমাদের কার হাতে দিয়া গেলে?' কণ্ব বলিলেন—'কেঁদ না—তোমাদেরই শকুন্তলাকে শান্ত করিতে হ'বে'। শকুন্তলা পিতাকে বলিলেন—বাবা! 'আমার আসন্নপ্রসবা মৃগবধূটী রহিল—এ নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হ'লে আমাকে সংবাদ দিতে ভুল না'। এমন সময় কে পশ্চাৎ হইতে শকুন্তলার বসন ধরিয়া টানিল। তিনি ফিরিয়া বলিলেন 'কে'? কণ্ব বলিলেন 'আর কে'?

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণম্ ইঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে॥

যার মুখে কুশাঙ্কুর বিঁধিলে, যতনে
সেঁচেছিলে ব্রণহারী তৈল ইঙ্গুদীর,
বর্দ্ধিলে যাহারে তুমি শ্যামা-মুষ্টি দিয়া
কৃত-পুত্র সেই মৃগ টানিছে তোমারে।

শকুন্তলা কাঁদিয়া বলিলেন—'বাছা কেন মিছে আমার অনুসরণ কর। আমি তোমায় ছাড়িয়া চলিলাম। তোর মার বিহনে আমি তোকে লালন করেছিলাম—এবার বাবা তোকে দেখ্‌বেন। দে, বিদায় দে।'

এই করুণ দৃশ্য লক্ষ্য করিয়া সহৃদয় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ কত সকরুণ,

কত মর্ম্মান্তিক হইতে পারে এই চতুর্থ অঙ্কে তাহা দেখা যায়।......চেতন অচেতন সকলের সঙ্গে, (শকুন্তলার) এমনি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা, এমনি প্রীতি ও কল্যাণের বন্ধন।... তাহার মধুর চরিত্রখানি অরণ্যের ছায়া ও পুষ্পমঞ্জরীর সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত, পশু-পক্ষীদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যের সহিত নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট।'

শার্ঙ্গরব দেখিলেন—বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে। গুরুকে বলিলেন—'দেব। শুনিয়াছি, স্নিগ্ধজনকে জলের ধার অবধি অনুগমন করিতে হয়। এই সরোবরতীর—এখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন।' কণ্ব, দুষ্মন্তকে যে সন্দেশ দিবার তাহা শার্ঙ্গরবকে বলিয়া দিয়া, শকুন্তলাকে উপদেশ দিলেন :—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥

শুশ্রূষিবে গুরুজনে, করিবে সপত্নীজনে
প্রিয়সখী মত ব্যবহার।
ভর্ত্তৃকৃত অবমানে, রহিবে অক্ষুব্ধ প্রাণে
(রোষবশে) না করিবে প্রতীপ আচার।
পরিজনে সুদক্ষিণা, সৌভাগ্যে গরব-হীনা—
এমতে গৃহিণী-পদ পায় নারীগণ
অন্যথায়, হয় মাত্র কুলের নাশন॥

গৌতমী বলিলেন 'বধূর সম্পর্কে ইহাই সার উপদেশ। শকুন্তলা! বাছা! এ উপদেশ মনে গেঁথে রাখ।'

কণ্ব। বৎসে! এইবার আমায় ও সখীদের আলিঙ্গন কর।

শকুন্তলা। বাবা! তোমার অঙ্কচ্যুত হইয়া কেমন করিয়া জীবনধারণ করিব? মলয়তট হ'তে পরিভ্রষ্ট চন্দনলতা কি বাঁচিতে পারে?

কণ্ব বলিলেন—বৎসে! কিমেবং কাতরাসি?

অভিজনবতো ভর্ত্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে
বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈস্তস্য প্রতিক্ষণমাকুলা।
তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং
মম বিরহজাং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি॥

হওনা কাতর। অভিজাত ভর্ত্তা তব
শ্লাঘ্য গৃহিণীর পদে স্থাপিলে তোমায়,
প্রতিক্ষণ র'বে সমাকুল, কার্য্যভারে
তাঁর সমৃদ্ধি-বহুল। অচিরে তনয়
লভি, বৎসে! প্রাচী যথা পাবন তপন
মোর বিরহজ শোক হবে না গণন।

শকুন্তলা পিতার পদতলে পতিত হইলেন। কণ্ব আশীর্ব্বাদ করিলেন—আমার যা' মনোগত, তাই তোমার হ'ক।

শকুন্তলা সখীদের বলিলেন—'ভাই তোরা দুজনে একসাথে আমায় আলিঙ্গন কর।' সখীরা তাহাই করিলেন এবং শাপ-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া শকুন্তলাকে বলিয়া দিলেন—'যদি রাজা হঠাৎ তোমাকে চিনিতে না পারেন, তবে তাঁর নামাঙ্কিত আংটিটী তাঁহাকে দেখাইও।' শকুন্তলা চমকিয়া বলিলেন 'কি অলক্ষণে কথা!' সখীরা বলিলেন 'ভয় পাও কেন? জান তো স্নেহের স্বভাব—অমঙ্গল আশঙ্কা করা'। একপ্রহর বেলা অতীত হইল। শার্ঙ্গরব তাড়া করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা আশ্রমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'বাবা! আবার কবে তপোবনে ফিরিব?' কণ্ব বলিলেন—

ভূত্বা চিরায় চতুরন্ত-মহীসপত্নী
দৌষ্মন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য।
ভর্ত্রা তদর্পিতকুটুম্বভরেণ সার্দ্ধং
শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্॥

চতুরন্তা পৃথিবীর সপত্নী হইয়া
বহুদিন ভুঞ্জি রাজভোগ, অনন্তর
প্রতিদ্বন্দ্বিহীন পুত্রে স্থাপি সিংহাসনে
তাহারে কুটুম্ব ভার করিয়া অর্পণ,
(ভর্ত্তাসহ) শান্ত এ আশ্রমে পুনঃ করিবে প্রবেশ।

তবুও গমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। গৌতমী দেখিলেন বিদায় আর শেষ হয় না। বলিলেন 'শকুন্তলার কথার শেষ হ'বে না। আর্য্য! আপনি ফিরুন'। কণ্ব বলিলেন 'বৎসে! তপস্যার ব্যাঘাত হইতেছে। আর না।' শকুন্তলা পিতাকে আবার আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন 'বাবা! তপঃক্লেশে আপনার কৃশ শরীর—আমার জন্য বেশি

ভাবিবেন না। এইবার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল—তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

শমমেষ্যতি মম শোকঃ কথং নু বৎসে ত্বয়া রচিতপূর্ব্বং।
উটজদ্বারি বিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ ॥

নীবার, উটজদ্বারে, যারে রোপিয়াছ তুমি
যতন করিয়া
অঙ্কুরিত হেরি তারে, ধরিবে ধৈরজ বৎসে!
কিসে মোর হিয়া?

যাও বৎসে! শিবাঃ তে পন্থানঃ সন্তু।'

শকুন্তলা সহযাত্রীদিগের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যতক্ষণ দেখা গেল সখীরা তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন 'হায়! হায়! শকুন্তলা বনের আড়ালে পড়িল—আর কই দেখা যায় না'। কণ্ব বলিলেন—'তোমাদের সঙ্গিনী চলিয়া গেছে—শোক করো না, আমার সঙ্গে এস।' সখীরা বলিলেন—'তাত! শকুন্তলা বিহনে আজ আশ্রম শূন্য বোধ হইতেছে।' কণ্ব বলিলেন—'তা' বটে। স্নেহের ধর্ম্মই এই। কিন্তু,

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব তামদ্য সম্প্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা ॥

কন্যা পরকীয় ধন,
পাঠাইয়া তারে আজি স্বামীর সকাশে
নিরুদ্বেগ চিত্ত মম,
প্রত্যর্পণ করি ন্যাস ন্যাসকারী-পাশে।

কণ্বাশ্রম হইতে হস্তিনাপুর পহুঁছিতে এক দিনের বেশি লাগিল। পরদিন প্রত্যুষে শকুন্তলা গৌতমীর সহিত শচীতীর্থে স্নানার্থ গঙ্গাজলে অবতরণ করিলেন। দৈবক্রমে তীর্থবন্দনার সময় রাজদত্ত অঙ্গুরীয় তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া সলিলে পড়িয়া গেল এবং একটা রোহিত মৎস্য তাহা গ্রাস করিল। শকুন্তলা পতিচিন্তায় নিমগ্ন—কিছুই লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু এইরূপে তাঁহার অভিজ্ঞানটী হারাইয়া গেল। (শচীতীর্থং বন্দমানায়াঃ সখ্যাস্তে হস্তাৎ গঙ্গাস্রোতসি পরিভ্রষ্টম্ * * রোহিত মৎস্যস্য উদরাভ্যন্তরে আসীৎ)।

এদিকে দুষ্যন্ত দুর্ব্বাসার শাপ প্রভাবে শকুন্তলার বৃত্তান্ত একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন। একদিন 'আম'-দরবারের পর রাজা অন্তঃপুরে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় নেপথ্য হইতে সঙ্গীত হইল—

হে ভ্রমর! ভুলিলে কেমন?
চুম্বিত চূতমঞ্জরী ভুলিলে কেমন!
অভিনব মধুলোভী—
কমল কুসুম শোভী—
—বসতি হৃদয়ে তার হরিল তোমার মন!

রাজা গীত শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। চিত্তের অতল হইতে কি যেন অজ্ঞাত স্মৃতি মথিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥

রমণীয় হেরি বস্তু, করিয়া শ্রবণ
শব্দ সুমধুর, সমুৎসুক হয় যদি
সুখিত যে জন—নিশ্চয় অজ্ঞাত-পূর্ব্ব
জন্মান্তরগত কোন সৌহার্দ্দ্য প্রাচীন,
চিত্তের অতল মথি, উঠে তবে জাগি!

ঠিক সেই সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া সংবাদ দিল—হিমগিরির উপত্যকানিবাসী তপস্বীরা মহর্ষি কণ্বের আদেশ বহন করিয়া সস্ত্রীক উপস্থিত। রাজা কিছু বিস্মিত হইলেন—'তপস্বীরা সস্ত্রীক সমাগত! কেন?' কঞ্চুকীকে আদেশ দিলেন—তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিয়া অগ্নিগৃহে প্রবেশ করাও। আমি সেখানে অপেক্ষা করিতেছি।

অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলেন, 'ভগবান্ কণ্ব কি উদ্দেশ্যে তাপসদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন? তাঁহাদের তপস্যায় কি বিঘ্ন ঘটিয়াছে? অথবা আমার অ-পুণ্যে তরুলতার ফলফুল শুষ্কিত হইয়াছে?' প্রতিহারী বলিলেন—'না মহারাজ! ঋষিরা আপনার সুশাসনের সুখ্যাতি করিতে আসিয়াছেন।' এমন সময় রাজপুরোহিত সস্ত্রীক তাপসদিগকে লইয়া অগ্রসর হইলেন। রাজা সসম্ভ্রমে আসনত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলে শার্ঙ্গরব বলিলেন—এ বিনয় রাজার উপযুক্ত বটে।

ভবন্তি নম্রাঃ তরবঃ ফলাগমৈঃ
নবাম্বুভির্ভূরিবিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ
স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্ ॥
ফলাগমে নত হয় তরু,
নবোদকে বিনম্র সে ঘন।
পরার্থীর ইহাই প্রকৃতি,
অনুদ্ধত ঐশ্বর্য্যে সুজন ॥

তথাপি রাজপুরে প্রবেশ করিতে বনবাসী তাপসদিগের অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন—

অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখসঙ্গিনম্ অবৈমি ॥
শুচি অশুচিরে যথা,
জাগরিত যথা সুপ্তগণে,
স্নাত যথা তৈলাক্তেরে
কামচারী যথা বদ্ধজনে।
বিলাস-লোলুপ হেরি নাগরিকে হেন হয় মনে ॥

পতিগৃহে প্রবেশ করিতেই শকুন্তলার বামেতর চক্ষুঃ স্পন্দিত হইল। তিনি গৌতমীকে বলিলেন 'একি! আমার দক্ষিণ নয়ন কাঁপিল কেন?'

গৌতমী বলিলেন—'মা! ও কিছু নয়। পতিকুল-দেবতা তোমার মঙ্গল করুন।'

দুষ্মন্ত অবগুণ্ঠনবতী শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া প্রতিহারীকে বলিলেন—

কেয়ম্ অবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিশলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্ ॥
কে অবগুণ্ঠনবতী, হেরি ও রমণী
ঋষি মধ্যে, নাতিস্ফুট লাবণ্য তনুর,
শুষ্কপত্র মাঝে যেন নব কিশলয়?

প্রতিহারী বলিল—আমারও কৌতূহল হইতেছে। কি অপূর্ব্ব দেহ-লাবণ্য!

রাজা। যাই হ'ক—পরস্ত্রী দর্শনীয় নয়।

এদিকে কিন্তু শকুন্তলার বুক কাঁপিতে লাগিল—তিনি বলিলেন—'হৃদয়! আর্য্যপুত্রের অনুরাগ স্মরণ করিয়া স্থির হও।'

তাপসেরা অগ্রসর হইয়া হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন—কেমন আপনাদের তপোনুষ্ঠান, নির্ব্বিঘ্ন বটে তো?

তাপসেরা বলিলেন—

কুতো ধর্ম্মক্রিয়াবিঘ্নঃ সতাং রক্ষিতরি ত্বয়ি।
তমস্তপতি ঘর্ম্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্যতি ॥
কোথা ধর্ম্মক্রিয়াবিঘ্ন
তুমি যথা রক্ষক সতের?
প্রভাকর উদিলে আকাশে
থাকে না ত' প্রকাশ তমের ॥

রাজা বলিলেন, ভগবান্ কথের আদেশ কি?

শার্ঙ্গরব বলিলেন—'গুরুদেব বলিয়াছেন—পরস্পর শপথপূর্ব্বক আপনি ও আমার কন্যা যে পরিণীত হইয়াছেন, প্রীতি-সহকারে আমি তাহার অনুমোদন করিয়াছি। কারণ,

ত্বম্ অর্হতাং প্রাগ্রসরঃ স্মৃতোঽসি নঃ
শকুন্তলা মূর্ত্তিমতীব সৎক্রিয়া।
সমানয়ন্ তুল্যগুণং বধূবরং
চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ ॥
সৎপুরুষের রাজা! অগ্রগণ্য তুমি,
শকুন্তলা সুকৃতি মূর্ত্তিমতী।
তুল্যগুণ বধূবরে করিলা যোজন
চির নিন্দামুক্ত প্রজাপতি ॥'

গৌতমী বলিলেন—'আর্য্য! আমারও কিছু বক্তব্য আছে।

(শকুন্তলা) করে নাই অপেক্ষা গুরুর,
তুমি পুছ নাই বন্ধুগণে
দোঁহাকার এ হেন চরিত্তে
কি আর বলিবে অন্য জনে?'

ণাবেকৃখিদো গুরুঅণো ইমাএ, ণ তুএ বি পুচ্ছিদো বন্ধু।
একককস্সিঁ চরিএ ভণাদু কিং এক্ক এক্কস্সিঁ ॥'

রাজা বলিলেন—'এ আবার কি উপস্থিত!'

কথাগুলি শকুন্তলাকে যেন দগ্ধ করিল। শার্ঙ্গরব বলিলেন—সে কি? লোকাচারে তো আপনি অনভিজ্ঞ

নহেন। স্ত্রী পতির প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, তাহার বন্ধুরা তাহাকে স্বামী-সকাশেই রাখিতে চায়।

রাজা বলিলেন—'এ মহিলাকে আমি কি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছি?' শুনিয়া শকুন্তলার চক্ষুঃ স্থির—বলিলেন 'হৃদয়! তোমার আশঙ্কাই ঠিক।'

গৌতমী বলিলেন—'বৎসে! একটুক্ষণ লজ্জা সংবরণ কর। তোমার ঘোমটা খুলিয়া দিই—তাহা হ'লেই স্বামী চিনিতে পারিবেন।' গৌতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিলেন। রাজা দেখিলেন—অপূর্ব্ব সুন্দরী! মনে মনে বলিলেন—

> ইদমুপনতমেবং রূপম্ অক্লিষ্টকান্তি
> প্রথম পরিগৃহীতং স্যান্ন বেত্যব্যবস্যন্।
> ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
> ন খলু সপদি হাতুং নাপি শক্নোমি ভোক্তুম্॥

> অম্লান রূপসী এই
> উপনীত বিনা আমন্ত্রণে
> পরিণীতা? কিম্বা নহে
> ভাবি তাই অনিশ্চিত মনে।
> প্রভাতে ভ্রমর যথা
> হিমকণা-সিক্ত কুন্দফুল
> উপভোগে, পরিত্যাগে—
> চিত্ত মোর তুল্য দ্বিধাকুল।

রাজা আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—হে তাপসগণ! অনেক ভাবিয়া দেখিলাম—ইঁহার যে পাণিগ্রহণ করিয়াছি, কিছুতেই তো মনে হইতেছে না।

প্রতিহারী শুনিয়া বিস্মিত—মনে মনে ভাবিলেন—'প্রভুর কি ধর্ম্মভয়! এই অযাচিত-উপস্থিত বরস্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করিলেন!'

শকুন্তলা স্বগত বলিলেন—আর্য্যের দেখি বিবাহেই সন্দেহ। আমার উচ্চ আশার এই পরিণাম!

শার্ঙ্গরব বলিলেন—মা তাবৎ! মহারাজ! গ্রহণ না করাই তো উচিত! দেখুন—

> কৃতাভিমর্শাম্ অনুমন্যমানঃ
> সুতাং ত্বয়া নাম মুনির্ব্বিমান্যঃ।
> মুষ্টং প্রতিগ্রাহয়তা স্বম্ অর্থং
> পাত্রীকৃতো দস্যুরিবাসি যেন॥

> ধর্ষিলে তনয়া তাঁর
> মুনি তোমা করিলা সম্মান।
> পাঠাইয়া কন্যা নিজ,
> চৌর্য্য যেন চোরে করি দান॥

সারদ্বত বলিলেন—শার্ঙ্গরব! চুপ কর। শকুন্তলে! আমাদের যা বক্তব্য আমরা বলিয়াছি। রাজা যা বলিলেন শুনিলে, তো! এক্ষণে যাহাতে ইঁহার প্রত্যয় হয় এরূপ উত্তর দাও।

শকুন্তলা (জনান্তিকে)। সেই অনুরাগের যখন এমন ভাবান্তর, তখন স্মরণ করাইয়া লাভ কি? তথাপি লোকের কাছে আমার আত্মক্ষালন দরকার—চেষ্টা করি! (প্রকাশ্যে) আর্য্যপুত্র! (অর্দ্ধোক্তে) না না, বিবাহেই যখন সন্দেহ, তখন এ সম্বোধন সাজে না—পৌরব! তপোবনে এই মুগ্ধা বালিকাকে বঞ্চনা করিয়া এখন তাহাকে এইভাবে প্রত্যাখ্যান করা কি আপনার উচিত?

রাজা কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন—

> শান্তং পাপং। ব্যপদেশমাবিলয়িতুং কিমীহসে
> জনমিমঞ্চ পাতয়িতুম্।
> কুলঙ্কষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমম্ভস্তটতরুঞ্চ॥

> হায় নারী! নিজকুল করিতে আবিল
> একি চেষ্টা তব! করিতে পতিত মোরে
> পুনঃ? কুলঙ্কষা নদী যথা, কলুষিয়া
> প্রসন্ন সলিল নিজ, করে উন্মূলিত
> তটতরু আর! কিন্তু শান্ত হ'ক পাপ!

শকুন্তলা বলিলেন যদি সত্যই পর-স্ত্রী শঙ্কায় আমাকে ত্যাগ করিতে চান তবে অভিজ্ঞান দর্শাইয়া আপনার আশঙ্কা দূর করিতেছি। রাজা বলিলেন বেশ কথা—উদারঃ কল্পঃ। শকুন্তলা অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরী খুলিতে গিয়া দেখেন অঙ্গুলি শূন্য! গৌতমীর মুখের দিকে চাহিয়া সকাতরে বলিলেন একি? একি? আমার আংটী কোথা গেল? গৌতমী বলিলেন নিশ্চয় শচীতীর্থে স্নানের সময় পড়িয়া গিয়াছে। রাজা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন—একেই বলে স্ত্রীজাতির উপস্থিত বুদ্ধি। শকুন্তলা বলিলেন এ আমার দুরদৃষ্টের প্রভাব। আচ্ছা অন্য প্রমাণ দিতেছি। এই বলিয়া তপোবনে বাসিত দাম্পত্য-জীবনের দু' একটী

স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপে রাজার স্মৃতি একেবারে বিকল—তাঁহার কিছুই স্মরণ হইল না। ঘটনাক্রমে রাজার প্রিয় বয়স্য মাধব্যও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কিছু কিছু জানিতেন—যদিও রাজা রাজধানী ফিরিবার সময় তাঁকে বলিয়াছিলেন—'শকুন্তলা-ঘটিত সমস্ত কাহিনীটা পরিহাস-জল্পনা মাত্র'। তথাপি মাধব্য থাকিলে হয় তো শকুন্তলা-বাক্যের সমর্থন হইত।

রাজা বলিলেন—'স্বার্থান্বেষী রমণীরা এইরূপ মধুর মিথ্যা বাক্যেই বিষয়ীদিগের চিত্তাকর্ষণ করে।'

গৌতমী বলিলেন—'একি বলিলেন মহারাজ! তপোবন-লালিত শকুন্তলা কৈতবের নাম গন্ধ জানে না'।

রাজা বলিলেন—তাপসবৃদ্ধে!

স্ত্রীণাম্ অশিক্ষিতপটুত্বম্ অমানুষীষু
সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ।
প্রাগ্ অন্তরিক্ষগমনাৎ স্বম্ অপত্যজাতম্
অন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ কিল পোষয়ন্তি॥

দূরে থাক তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানবীর কথা—
ইতর প্রাণীতে দেখ সুব্যক্ত কেমন
স্ত্রীজাতির অশিক্ষিত বঞ্চনা-পাটব।
কোকিলা অপত্য নিজ, উড়িবার আগে,
অন্য পক্ষী দিয়া করে কৌশলে পালন!

এইবার শকুন্তলার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি সরোষে বলিলেন—'অনার্য্য! নিজের মন দিয়া অপরের মন দেখিও না। তোমার ধর্ম্মের কঞ্চুক—তুমি তৃণাচ্ছন্ন কূপ। কে তোমার অনুকরণ করিবে?' রাজা ঈষৎ বিচলিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন—

ন তির্য্যগ্ অবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং
বচোপি পরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংসজ্জতে।
হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
স্বভাববিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদংগতে॥

অকৈতব এই রোষ হয় অনুমান—
বক্র দৃষ্টি অকপট, অরুণ নয়ন,
পরুষ-অক্ষর বাণী, দৃঢ় অস্খলিত,—
বিম্বাধর কাঁপে যেন শীতাতুর যেন,
যুগ্মভুরু প্রকৃতি-বঙ্কিম, যুগপৎ
হয়েছে নমিত, বিভ্রমবিহীন কোপে।

প্রকাশ্যে বলিলেন—আর্য্যে! দুষ্যন্তের চরিত্র কাহারও অবিদিত নয়। শকুন্তলা অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন—'হায় হায়! মুখে মধু, হৃদে বিষ—এই কপটের কথায় প্রত্যয় করিয়া শেষে স্বৈরিণী প্রতিপন্ন হইলাম।'

শার্ঙ্গরব বলিলেন—'অসংযম ও চাপল্যের এইরূপই ফল'।

সারস্বত এতটা উগ্র নহেন—তিনি বলিলেন—বাদ-প্রতিবাদে ফল কি? আমরা গুরুর আদেশ পালন করিয়াছি।

তদেষা ভবতঃ পত্নী ত্যজ বৈনাং গৃহাণ বা।
উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী॥
ইনি ধর্ম্মপত্নী তব, প্রভু তুমি বর্জ্জনে গ্রহণে।
শুনি পূর্ণ অধিকার, স্বামীর যে জায়ার সদনে॥

গৌতমি! আসুন, আমরা যাই।' এই বলিয়া সকলে অগ্রসর হইলেন। শকুন্তলা করুণ স্বরে বিলাপ করিতে করিতে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—'এ বঞ্চক আমায় প্রতারণা করিল—তোমরাও আমাকে ছাড়িয়া চলিলে!' গৌতমী শার্ঙ্গরবকে বলিলেন—বৎস! নিষ্ঠুর স্বামী যাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল—ও এখন কি করিবে?

শার্ঙ্গরব সক্রোধে মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন—রে দুষ্টে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছ! শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার সে সময়কার অবস্থা কবি করুণ তুলিতে অঙ্কিত করিয়াছেন:—

ইতঃ প্রত্যাদেশাৎ স্বজনমনুগন্তুং ব্যবসিতা
স্থিতা তিষ্ঠেত্যুচ্চৈর্বদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।
পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রসরকলুষামর্পিতবতী
ময়ি ক্রূরে যত্তৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্॥

প্রত্যাখ্যান ব্যাকুলিতা
স্বজনের করে অনুসার
গুরুসম গুরু-শিষ্য
তিষ্ঠ বলি করিলে হুঙ্কার,

স্মৃতিচ্যুত বিস্মিত নৃপ
ফাপি বালা ক্ষুব্ধ পতি পানে
দাড়াইলা অবিচল—
বিষদিগ্ধ শল্য হানে প্রাণে !

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে হয়—'প্রত্যাখ্যান যখন অকস্মাৎ বজ্রের মতো শকুন্তলার মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িল, তখন তপোবনের দুহিতা বিধ্বস্ত-হস্ত হইতে বাণাহত মৃগীর মতো বিস্ময়ে ত্রাসে বেদনায় বিহ্বল হইয়া ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া রহিল।'

শার্ঙ্গরব বলিলেন—শকুন্তলে !

যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা
ত্বমসি কিং পিতুরুৎকুলয়া ত্বয়া।
অথ তু বেৎসি শুচি ব্রতমাত্মনঃ
পতিকুলে তব দাস্যমপি ক্ষমম্ ॥

রাজা বলিছেন যাহা সত্য যদি হয়,
পিতৃগৃহে কুলটার কোথা বল স্থান ?
সাধ্বী বলি আপনারে জানত নিশ্চয়
পতিগৃহে দাসীত্বও তোমার শ্রেয়ান্।

রাজা বলিলেন—হে তাপস ! ইঁহাকে ছলনা করিবেন না। দেখুন—

কুমুদান্যেব শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তি পঙ্কজান্যেব।
বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ ॥

শশী মাত্র কুমুদীরে তজে,
পদ্মিনীরে জাগায় ভাস্কর।
পরনারী-স্পর্শ-পরাঙ্মুখ
সদা যেন বশীর অন্তর ॥

শার্ঙ্গরব বলিলেন—'ইহাও তো হইতে পারে, চিত্ত-বিক্ষেপে আপনার স্মৃতি ভ্রংশ হইতেছে এবং আপনি দার-ত্যাগী হইতেছেন।'

রাজ-পুরোহিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন—গুরুদেব ! এ সম্পর্কে আপনাকেই গুরুলাঘব জিজ্ঞাসা করি।

মূঢ়ঃ স্যামহমেষা বা বদেন্মিথ্যেতি সংশয়ে।
দারত্যাগী ভবাম্যাহো পরস্ত্রীস্পর্শপাংশুলঃ ॥

মূঢ় হব আমি ? কিম্বা এ রমণী মিথ্যা-
বাদী ? কি করি সংশয়ে ? হ'ব দারত্যাগী ?
কিম্বা স্পর্শি পরনারী হইব পাংশুল ?

পুরোহিত বলিলেন—'মহারাজ ! প্রসব পর্যন্ত ইনি আমার গৃহে অবস্থান করুন। সাধুর মুখে শুনিয়াছি, আপনার প্রথম পুত্র চক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত হইবে। যদি দেখা যায় মুনির দৌহিত্র তাদৃশ জন্মিল, তখন ইঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন—অন্যথায় ইঁহাকে পিতৃসকাশে প্রেরণ করিবেন।'

রাজা বলিলেন—আপনার যেরূপ অভিরুচি।

পুরোহিত। বৎসে ! আমার সঙ্গে আইস।

শকুন্তলা 'মা বসুন্ধরে ! আমাকে স্থান দাও মা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার অনুগমন করিলেন। গৌতমী ও তাপসেরাও নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। কণ্বশিষ্যেরা প্রত্যাবৃত্ত হইলে—

সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা
বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুঞ্চ প্রবৃত্তা।
স্ত্রীসংস্থানং চাপ্সরস্তীর্থমারাদ্
উৎক্ষিপ্যৈনাং জ্যোতিরেকং জগাম ॥

নিন্দি যবে অদৃষ্ট আপন, সেই বালা
ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপিয়া বাহু কান্দিতে লাগিল,
জ্যোতিঃ এক নারীমূর্তিধারী, তুলি তারে
অপ্সর তীর্থের মুখে হৈল-অদর্শন !

এ ব্যাপারে সকলেই বিস্মিত হইলেন। হইবারই কথা। এ ঘটনার মূলে শকুন্তলার গর্ভধারিণী সুরদেহী অপ্সরা মেনকা। তিনিই অপ্সরাতীর্থে শকুন্তলার দুঃখ-দুর্দশা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে আকাশ-যানে উঠাইয়া আনিয়া মারীচ ঋষির হেমকূট-পর্বতস্থ পুণ্যাশ্রমে স্থাপন করিলেন—

অপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ প্রত্যক্ষবৈক্লব্যাং শকুন্তলাম্ আদায় মেনকা দাক্ষায়ণীম্ উপগতা।

সেই আশ্রমের 'বৃহৎ শূন্যতাকে শকুন্তলা আপনার বৃহৎ দুঃখের দ্বারা পূর্ণ করিয়া' বাস করিতে লাগিলেন। 'সেখানে সমস্তই আমাদের নিকট স্তব্ধ নীরব—কেবল বিশ্ব-বিরহিতা শকুন্তলার নিয়ম-সংযত, ধৈর্য-গম্ভীর, অপরিমেয় দুঃখ আমাদের মানস নেত্রের সম্মুখে ধ্যানাসনে বিরাজমান।'

অবশ্য, দুষ্মন্ত তখন ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিলেন না। তিনি ব্যামোহিত চিত্তে শকুন্তলার কথা ভাবিতে লাগিলেন—

কামং প্রত্যাদিষ্টাং স্মরামি ন পরিগ্রহং মুনেস্তনয়াম্।
বলবৎ তু দূয়মানং প্রত্যায়য়তীব মাং হৃদয়ম্॥

স্মৃতির মথনে, পড়ে না ত' মনে
(প্রত্যাখ্যাতা) মুনিদুহিতার পরিণয়।
কিন্তু গুরুতর হৃদয় পীড়ন
যেন মোরে দানিছে প্রত্যয়॥

দুষ্মন্তকে এই ব্যাকুলিত দশায় রাখিয়া অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিলাম। কিরূপে তাঁহার নষ্ট স্মৃতি ফিরিয়া আসিল এবং পরে কি কি ঘটনা ঘটিল, আমরা বারান্তরে তাহা বিবৃত করিব।

সম্মোহিতা

(উপন্যাস)

শ্রীমতী ঊষা মিত্র

এক

সে-দিবস যখন খেলার মাঠ হইতে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নরেন দাস ইজিচেয়ারের সুকোমল আস্তরণে শুইয়া স্বীয় জয়লব্ধ মেডেলখানা মুগ্ধনয়নে বারংবার দেখিতেছিল, তখন ড্রয়িংরুমের ভারী নীল পর্দ্দা সরাইয়া সুহৃদ্বর জিতেন্দ্র দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হে কোন্ দল জিত্‌ল আজ?" জয়ের নেশায় অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রদ্বয় খুলিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া সগর্ব্বে মস্তক কিঞ্চিৎ দুলাইয়া নরেন বলিল, "অনুমান কর।" হাসিয়া জিতেন বলিল,—"আমাদের নরেন দাস যে দিকে আছে সে দিকে জয়লক্ষ্মী যে বাঁধা এ কথা কি এত শীগ্‌গির ভুলতে পারি? কিন্তু শাস্ত্রে বলেছে—নিশ্চয়কে নিশ্চয়ও ভয় করবে—তাই এ প্রশ্ন। মেডেল পেয়েছিস বুঝি? এ নিয়ে সবশুদ্ধ কটা হ'ল?"

"চব্বিশ কি পঁচিশ হ'বে বোধ হয়"।

"এসব যত্ন করে' রেখে দিস্।"

"অর্থাৎ?"

"আরে বোকা বোঝ না? অর্থাৎ কি না বিয়ের সময় সব তোর বৌদি'কে উপহার দেওয়া যাবে।"

"বিয়ে যে আমি কর্ব্বই এরই বা ঠিক কি?"

"সংসারে সবাই যা' করবে, করেছে, তুমি সে কাজ করবে না কোন্ দুঃখে?"

"দুঃখে [illegible] নহে, তবে কি জান—বিয়ে [illegible] শুধু ওই মেডেলগুলো দেখে দেখে বৌর পেট ভরবে না নিশ্চয়। ওই মেডেল কি তার পক্ষে যথেষ্ট হ'বে?"

"কেন,—তার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম, স্নেহ, দয়া, মায়া, আদর, যত্ন, সোহাগ এই এত সব রয়েছে। এরাও কি তার খোরাক যোগাতে পারবে না?"

"শুধু এই সবে কি সে তৃপ্ত হ'তে পারবে? তার পেট ভরবার জন্যে আর কি কিছু চাই না?"

'অর্থাৎ? অর্থ? তা তুই ডাক্তারি পড়ছিস—বছর কয়েক পরে পাস দিয়ে বেরিয়ে আস্‌বি যখন, তখন তো কুবেরের ভাণ্ডার তোর হাতে হ'বে।"

"কিন্তু পাশ যে হ'ব তারই বা ঠিক কি?"

"তাও বটে, এই খেলার জন্যেই তোর সর্ব্বনাশ হ'বে—আচ্ছা ভাই, বন্ধুর খাতিরে কি ক'বছরের জন্যে সর্ব্বনেশে খেলাকে বাদ দিতে পারিস্ না?"

করুণকণ্ঠে নরেন উত্তর করিল,—"এ অনুরোধ ক'র না জিতেন, না ভাই খেলা ছাড়তে আমায় বলো না, আমার মনে হয়, যেদিন ওকে বন্ধ করব সেই সঙ্গে আমারও দম বন্ধ হ'য়ে যাবে। তুমি জান না—পৃথিবীতে আমি যাঁকে সব চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি,—আমার সেই বৌদি—"

"কোন্ বৌদি? সেই যিনি সিরাজ গাঁয়ে থাকেন, যাঁর কথা তুমি সব সময়ে বল সেই তিনিই কি?"

"হাঁ তিনিই, সেই আমার আরাধ্যা স্নেহময়ী বৌদিদি কত বলেছেন কত দিব্যি দিয়েছেন—চোখের জল ফেলেছেন, কিন্তু এমনই আমি যে তাঁর অবাধ্য হ'য়ে আজও তাঁর [illegible]

ব্যথা দিয়ে আসছি, অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি না ভাই, পারি না একে ছাড়তে।”

“কি এমন নেশা তার কিই বা এমন শক্তি যাতে তোমায় মাতাল, উন্মাদ, ভবিষ্যৎ-জ্ঞানশূন্য ক'রে তুলেছে— এতই কি শক্তি তার যার জন্য তুমি জীবনের উন্নতির এই অমূল্য অবসর সময় নষ্ট করছ। ছিঃ ছিঃ পুরুষ না তুমি? এতটুকু কি দৃঢ়তা নেই?”

মৃদু হাস্য করিয়া কুণ্ঠার সহিত নরেন উত্তর করিল— “বুঝবে না তুমি, বুঝবে না কত বড় শক্তি এর—কি ভীষণ উন্মাদনা এর।”

“যা—যা সত্যিই তুই একটা ই—য়ে।”

“বুঝেছ তো এখন? কি আমি? এই জন্যেই না বিয়ে করব না ঠিক করেছি।”

“কিন্তু এতেও আটকাবে না কিছু। বাবার তোমার অগাধ সম্পত্তি, মাত্র দুটী ভাই তোমরা—উইলও তিনি শুনছি করেছেন, নয়? কি রকম উইল করেছেন? দুই ভাইয়ের আধাআধি কি?”

“হাঁ অমনি বোধহয় হ'বে কিছু—ওসব আমি জানি না ভাই, দাদাই যখন রয়েছেন তখন ওসব দেখবার আমার দরকার কি?”

বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া জিতেন বলিলেন,—“বড় আহাম্মুক হে তুমি, স্বীকার করি দাদা তোমার ভাল—কিন্তু তার মন্ত্রী অর্থাৎ তোমার বৌদি, মাফ করো ভাই তার বিষয়ে যা শুনেছি—যাক সে কথা, তুমি ভাল কাজ করছ না। ঈশ্বর না করুন কিন্তু এর পর? বিশেষ আজকাল তোমার বাবার শরীর বড় ভাল নয়, সর্ব্বদা দেখতে পাই পুরীতেই থাকেন, তোমার বুদ্ধি একটুও নেই—কি করছ এ?”

“যাক গে ওসব কথা—সেদিন না তুই বলেছিলি আমার বৌদিকে দেখতে যাবি, চল না আজ যাই—এ ক'দিন ছুটী আছে।”

“বাপরে এমন দীর্ঘ ছুটীর ক'টা দিন, সেই পাড়াগাঁয়ে কাটাতে বলিস? গাঁয়ে খানা নোংরা, সব বিশ্রী চারিদিকে—বন-জঙ্গল, ম্যালেরিয়া, পোকা-মাকড়।”

পল্লীগ্রামের চিত্রখানি নেত্র-সমূখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে জিতেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। যদিও কোন গ্রাম দেখিবার সৌভাগ্য তাহার অদ্যাবধি ঘটিয়া উঠে নাই কিন্তু উহার চিত্তমধ্যে বাঙ্গালার গ্রামের কদর্য্য চিত্র বহুপূর্ব্বেই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। এই ছুটীতে কোথায় সে বায়স্কোপ-থিয়েটার দেখিয়া উহার মাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া লইবে, না সেই অজ পাড়াগাঁয়ে নোংরা-আবর্জ্জনার মধ্যে অবস্থিতা এক অশিক্ষিতা, সরমসঙ্কুচিতা নারীকে দেখিতে গিয়া এমন বাঞ্ছিত অবসরটুকু নষ্ট করিতে ছুটিবে? জিতেনের বর্ণনা করিবার ভঙ্গী শুনিয়া নরেন হাসিয়া উঠিয়া বলিল, “না হে—না, যা তুমি মনে করেছ সে রকম ভয়ের কিছু নেই সেখানে—বিশেষ বৌদিকে দেখলে—তার সঙ্গে কথা বললে কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হ'বে না; বরং পাথেয় স্বরূপ কিছু লাভ ক'রলাম বলে মনে হ'বে।”

অসহিষ্ণু জিতেন বলিয়া উঠিল,—“থাক ভাই, থাক, তাঁকে দেখবার জন্যে আমি ব্যস্ত হই নি; এত কষ্ট করে' তাঁকে দেখে বিশেষ লাভও যে কিছু হ'বে এও মনে হয় না, মাঝে থেকে এমন অবসর-সময়ের সদ্ব্যবহার করা হ'বে না, তা' ছাড়া এক পল্লী-বাসিনীকে না দেখলে যে জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে তাও মনে করি না।”

নরেন্দ্রের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল—ঐ বিলাসপ্রিয় স্বার্থপর পুরুষের সহিত উহার বৌদিদিকে লইয়া বাদানুবাদ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। নরেনের শুষ্ক বিরস মুখের দিকে চাহিয়া জিতেন অনুতপ্ত হইয়া ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলিল—“মাফ কর ভাই—তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি—কিছু মনে করো না, হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আচ্ছা আমি ঠিক যাব, আসছে শনিবারেই চল তবে।”

“না এর দরকার নেই কিছু, জোর করে যেতে আমি বলি নি তোকে, তুইই ক'বার বলেছিলি সেই জন্যে কথাটা তুলেছিলাম।”

“আচ্ছা, আচ্ছা, সে হ'বে—কিন্তু তোর সঙ্গে বকে' বকে' গলা শুকিয়ে গেছে; এক কাপ চা আনাতে পারিস?”

লজ্জিত হইয়া নরেন বলিল—“আমার ভুল হয়েছে তুই যা চায়ের ভক্ত এতক্ষণ দেওয়া উচিত ছিল—আচ্ছা পাঁচ মিনিট সবুর কর আনিয়ে দিচ্ছি।”

“কোথা থেকে আনাবে?

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া নরেন বলিল,—"সামনের দোকান থেকে।"

জিতেন ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"থাক, থাক, আমার হয়েছে, তোর বৌদির মেজাজ জেনেও অসময়ে চায়ের তলব ক'রে তোকে সত্যিই ব্যস্ত ক'রে তুলেছি।"

"না, না, ব্যস্ত কি সামনের ওই দোকান থেকে আনিয়ে দেব, তবে কি না দোকানের চা হয় তো—"

বাধা দিয়া জিতেন বলিল,—"হ'ক দোকানের চা, তা'তে কি, কিন্তু চা যে আমি এখন মোটেই খাব না।"

"এইমাত্র না চাইলি ?"

"ও শুধু তোকে ব্যস্ত করবার জন্যে।"

নরেন বুঝিল উহার লজ্জাস্খলনের জন্য বন্ধুর এ প্রতারণা, নচেৎ জিতেনের ন্যায় চা-খোরের চায়ের উপর সহসা এ বিতৃষ্ণার কোন হেতু নাই। দার্জ্জিলিংয়ের উৎকৃষ্ট চা খাওয়া যাহার অভ্যাস তাহাকে দোকানের নিকৃষ্ট চা দানের প্রস্তাব কিরূপে করিতে পারিয়াছিল ভাবিয়া নরেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

নরেনের লজ্জা-রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া স্নেহতরলকণ্ঠে জিতেন বলিল—"এঃ, তুই সত্যিই ভারি ছেলেমানুষ, এতে এত লজ্জা বা সঙ্কোচের কি আছে রে। মা ছাড়া সংসারে কি কেউ যত্ন করতে পারে ? তোর যে মা-ই নেই, সত্যি নরেন তোর জন্যে বড় কষ্ট হয়। যাবি আজ আমার মায়ের কাছে ? চল নরেন আজ আমরা দু'ভাইয়ে মাকে মা বলে ডাকব।"

কষ্টে অশ্রু দমন করিয়া নরেন বলিল,—"চল, কিন্তু তিনি যে আমায় চেনেন না।"

হাসিয়া জিতেন বলিল,—"সেই জন্যেই নিয়ে যাচ্ছি, আজ থেকেই না হয় পরিচয় সুরু হ'বে।"

"কিন্তু আজ আমি যেতে পারব না ভাই।"

"কেন ?"

"আজ বৌদির ওখানে যাবার কথা, না গেলে তিনি বড় ব্যথা পাবেন।"

"তুমি বুঝিয়ে বলো, আজ কিন্তু মায়ের কাছে নিয়ে যাবই। চল, একটু শীগ্‌গীর ক'রে নাও—কাল থেকে আমার সেণ্ট ফুরিয়েছে এক শিশি কিনে নিয়ে যেতে হ'বে।"

হাসিয়া নরেন বলিল,—"একদিন সেণ্ট না হ'লে চলে না ?"

"সত্যি তুই বিশ্বাস করবি নি কালরাত্রে ঘুমুতেই পারি নি—ওটা যে ফুরিয়ে গেছে মনে ছিল না, আবার কালই ধোপা কাপড় নিয়ে গেছল, গন্ধ একটু যে থাকবে তারও উপায় ছিল না।"

"আমি কি ভাবি জানিস ?"

"না—কি ?"

"তোর বাবার যদি অত পয়সা না থাকত, যদি খুব গরীবের ঘরে জন্মাতিস তখন কি হ'ত ?"

"হ'ত না কিছুই ; তখন ওই আবার অভ্যাস হ'য়ে যেত কিন্তু তুই ভুল বুঝছিস—অনেক বলতে—ঐ বাড়ীটুকু।"

"আর কিছু নেই ? তবে তুই এত বেশী বেশী খরচ করিস্ কোত্থেকে ? শান্তিপুরের ধুতী আর রাধানগরের ভাল আদ্দির পাঞ্জাবী ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করতে কোনদিন দেখিছি বলে মনে হয় না ; তারপর চারদিন সপ্তাহে সিনেমা-থিয়েটার আছে।"

"বাবা আমায় আর আমার বোনকে হাত-খরচের জন্যে প্রতি মাসে যথেষ্ট টাকা দেন ; তিনি নিজে কিছু জমিয়ে রাখতে পারেন না, বড় বেশী খরচ করেন—আমাদেরও সেই অভ্যেস হ'য়ে গেছে।"

"মা কিছু বলেন না ?"

"বলেন, কিন্তু বাবা খরচ কমাতে পারেন না যে, নে এখন ওঠ।"

দুই

কলিকাতার কোলাহল-মুখরিত পথে চলিতে চলিতে নরেন বলিল,—"আজ ফিরে যাই, ভারি লজ্জা করছে।"

সজোরে উহাকে টানিয়া জিতেন বলিল,—"কেন আজ হ'বে না। মার কাছে যাবে এতে লজ্জা কি ?"

"কিন্তু তিনি মনে কি ভাববেন।"

বিশেষ কিছু নয়, মাত্র—এ জেনে খুশী হ'বেন, একটী নয়—বরং আজ থেকে তিনি দু'ছেলের মা হ'লেন।"

নীরবে কতকপথ অতিবাহিত করিয়া জিতেন বলিল,—

"এসব খেয়াল ছাড়—তোর জন্যে ভাবনা-দুঃখ হয়, কেউ তোকে যত্ন করবার নেই, বিয়ে কর—যত্ন পাবি।"

"সে যে এখন হ'তে পারে না, সে তো আগেই বলেছি।"

"এ তোর ভুল বিশ্বাস, অভাব যখন কিছু নেই তখন—"

"না, আমার মতে নিজে যতদিন না উপার্জ্জন করি, স্ত্রীকে প্রতিপালন করার ক্ষমতা যতদিন না হয়, ততদিন বিয়ে করা ঠিক নয়। আচ্ছা, বিয়ের জন্যে—আমায় এত অনুরোধ করছিস—নিজে করছিস না কেন?"

"আমি?"

"তুমিই।"

"পাগল হয়েছ, এখন বিয়ে করব কি?"

"কেন?"

"এই কেমন জবাব দেওয়াই যে মুস্কিল। তবে তুই দেখিস, যেদিন মানসীকে খুঁজে পাব, সেইদিন ঠিক বিয়ে করে ফেলব।"

"তুই বা কি করে' জানলি যে আমার মানসী বরণডালা হাতে ধরে' দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল আর আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি?"

উচ্চহাস্যে পথের লোকদিগকে চকিত করিয়া, নরেনের কাঁধের উপর ঢলিয়া পড়িয়া জিতেন বলিল,—"ওরে বাপরে তোর মধ্যে যে এতখানি কবিত্ব গজিয়ে উঠেছে—এটা জানা ছিল না, তা-হ'লে বল্ তোর মাঝে 'ই-য়ে' একটু আছে?"

বন্ধুর কবল হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া নরেন বলিল,—"সত্যি তুই বড় নির্ল্লজ্জ। এতগুলো লোক যে হাঁ করে' আমাদের কথা শুনছে, কি এরা ভাবছে বল্ তো?"

"এমন আর কি ভাববে,—জোর মনে করবে, এটা একটা মাতাল—নয় পাগল,—ব্যস—এই তো?"

"না তোর সঙ্গে রাস্তা চলাও মুস্কিল।"

"কিন্তু—যতক্ষণ তোর সেই মানসীকে না খুঁজে পাস—অন্ততঃ সেইটুকু সময়ও এ দীনকে বাহাল রেখ বন্ধু—তবে দুঃখের বিষয় তোর কর্ণ্ণ:রাগ শেষ হ'য়ে গেছে—বাড়ীর দরজায় এসে পড়েছি বুঝতেই পারি নি।"

নরেন তাঁর বিক্ষিপ্ত অন্তর সংযত করিয়া লইয়া নূতন মায়ের চরণবন্দনার নিমিত্ত উৎফুল্লান্তঃকরণে অগ্রসর হইয়া চলিল।

স্তূপীকৃত পুস্তক-মধ্যে উপবিষ্ট ডাক্তার শরৎ বাবু চশমার ভিতর হইতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুক যুবার প্রতি চাহিলেন। জিতেন বলিলেন,—"বাবা নরেনকে আজ ধরে এনেছি।" বৃদ্ধ স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজীর পড়াশুনা কি হয়?"

"ও ডাক্তারি পড়ে ভুলে গেছ বাবা? কতবার ওর কথা বলেছি যে।"

মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে স্মরণশক্তির দ্বারে মৃদু একটু আঘাত করিয়া ডাক্তার বলিলেন,—"বুড়োও যে হ'য়েছি জিতেন, সব কথা কি মনে থাকে; বেশ ছেলে, বাড়ীতে কে কে আছেন? শুনেছিলুম যেন—সব কথা মনেও থাকে না। কে যেন বলেছিল—তোমার বাবা অনেক পয়সা রেখেছেন—বেশ ছেলে, বেশ—"

পিতার প্রশ্ন করিবার ধরণ দেখিয়া জিতেন শঙ্কিত হইয়া উঠিল—বাধা দিয়া বলিল,—"বাবা ওকে মার কাছে এনেছিলুম, মা কি বাড়ীতে নেই?"

ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া হাঁকিলেন,—"রামশরণ—কোথায়, কোথায় গেল আবার হতভাগা? সুলেখা এস তো মা এদিকে।"

"যাই বাবা।"

উত্তর দিবার অল্পক্ষণ পরেই লাবণ্য-ভরা দেহে শান্ত শ্রী ও চোখে-মুখে স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা লইয়া—এক শ্যামাঙ্গী তরুণী আসিয়া দাঁড়াইল—মুকুলিত যৌবনের বসন্তোৎসব উহ'র দেহে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। নরেনের দৃষ্টির সম্মুখে মেয়েটী কিঞ্চিৎ বিব্রতভাবে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা ডেকেছ?"

"হাঁ মা, ইনি তোমার দাদার বন্ধু—তোমার মায়ের কাছে এঁকে নিয়ে যাও।"

চকিতে একবার চোখ তুলিয়া সুলেখা পিতার চেয়ার ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। হাসিয়া জিতেন বলিল,—"ছি—রে—দাঁড়িয়ে রইলি যে—মা আছেন বাড়ীতে?"

[illegible] সম্মতি জানাইল। ভগিনী [illegible] নূতন যে [illegible] বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিল। কত লোক—উহার কত বন্ধু—আসিত—সকলের অভ্যর্থনার ভার ছিল লেখার উপর, কিন্তু উহাকে লজ্জিত হইতে কোনদিনই দেখা যায় নাই, বরং সপ্রতিভ-ভাবেই সে সকলকে সমানে অভ্যর্থনা করিত। ভগিনীকে একটু ঝাঁকানি দিয়া জিতেন বলিল,—"লেখা আজ তোর একি হ'ল রে? চল্ না মার কাছে।" স্বপ্নের দেশ হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগতার ন্যায় অভিভূত হইয়া সুলেখা বলিল,—"কোথায় যাব?" উহার অমনোযোগিতা দর্শনে ভ্রাতা আনন্দ অনুভব করিয়া বলিল,—"আজ কি তোর শরীর ভাল নেই?"

অপদস্থা সুলেখা মৃদুস্বরে বলিল,—"চল।"

দ্বিতলে উঠিতে উঠিতে জিতেন বলিল,—"এটী আমার বোন নরেন, এমন কর্ম্মিষ্ঠা লক্ষ্মী মেয়ে—সকল কাজে এমন—।"

পশ্চাৎ হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুলেখা গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"দাদা।"

বন্ধুদ্বয় হাসিয়া উঠিল। রাগিয়া লেখা বলিল,—"যাও, আমি তোমাদের কাউকে নিয়ে যাব না।" উহাকে ধরিয়া ফেলিয়া গভীর স্নেহে জিতেন বলিল,—"সত্যি কথায় রাগের কি আছে রাণী?"

"যাও—আমি জানি না, তুমি ভারি দুষ্টু।"

"জিতেনের জননী গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন,—"ওকে এত রাগিয়েছ কেন জিতেন?"

দুষ্টামির হাসি হাসিয়া জিতেন বলিল,—"আজ তোমার লেখা কি করেছে জিজ্ঞাসা কর না।"

অপরিচিত আগন্তুককে দেখিয়া জননী জিজ্ঞাসুনেত্রে পুত্রের দিকে চাহিয়া তাহাকে বলিলেন—"এস বাবা এস—কে এটী জিতু?"

"আমার ভাই—তোমার আর এক সন্তান—তুমি দুঃখ কর কি না একমাত্র না কি আমিই তোমার বংশধর যদিই না বাঁচি—তাই—"

পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় জননী শিহরিয়া উঠিলেন,—"বালাই, কি যে বলিস, ও কথা বলতে নেই। এস বাবা।"

প্রণত নরেন্দ্রকে সাগ্রহে তুলিয়ে বলিলেন,—"তোমার কথা অনেকবার জিতুর মুখে শুনেছি। কতবার ওকে বলেছি তোমায় আনতে।"

"পরিচয় পরে হ'বে,—বড় ক্ষিদে পেয়ে গেছে যে মা।"

হাসিয়া মা বলিলেন,—"বেশ তো খা না। লেখা, তোমার দুই দাদার জন্যে চা নিয়ে এস।"

অল্পক্ষণ-মধ্যেই দুইখানি মিষ্টান্ন-পূর্ণ রেকাব ও চা লেখা নরেন ও জিতেনের সম্মুখে রাখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল! গজা কয়খানি শেষ করিয়া নরেন বলিল,—"চমৎকার খাবার, বাজারের নয় বোধ হয়।"

"না হে না, তবে আর বলছি কি, লেখা বোনটী একাধারে অন্নপূর্ণা ও সরস্বতী।"

"আপনি করেছেন? সুন্দর হয়েছে।"

উচ্চশব্দে হাসিয়া জিতেন নরেনের উপর ঢলিয়া পড়িলে হস্তস্থিত চায়ের কাপ উল্টাইয়া খানিকটা গরম চা নরেনের হাতে পড়িয়া গেল। নরেনের মুখ হইতে একটা যন্ত্রণাসূচক শব্দ বাহির হইল।

জননী রাগতস্বরে বলিলেন,—"কি করলি, বল তো।"

ক্ষিপ্রগতিতে সুলেখা খানিক 'ভ্যাসলিন' আনিয়া নিপুণ হস্তে উহার দগ্ধ স্থানে দিয়া ছিন্নবস্ত্রে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল,—"ও-ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসুন, সব ভিজে গেছে।"

কোমল হস্তের সুখস্পর্শ। লোকসানের মধ্য দিয়া এই যে লাভটুকু অযাচিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল, উহা যেমনই মধুর ঠিক তেমনই বাঞ্ছনীয়। দাহ ভুলিয়া সেই মিঠা স্পর্শটুকু পরম আগ্রহে অন্তর ভরিয়া নরেন উপভোগ করিয়া লইল।

অপ্রস্তুত জিতেন ক্ষুব্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বেশী জ্বালা করছে?"

স্নিগ্ধহাস্যে বন্ধুর দিকে চাহিয়া সবেগে মাথা নাড়িয়া নরেন উত্তর দিল,—"না, না, কিছু নয়, এত লজ্জা পাচ্ছ কেন; ওটা অজ্ঞানকৃত—"

"কিন্তু ওবে আমার জ্ঞান কৃতই।"

তিক্তকণ্ঠে জননী শান্তিদেবী বলিলেন,—"এত বড় ছেলে হ'ল, তবু যদি জ্ঞান-বুদ্ধি একটু থাকে। হেসে অমন গড়িয়ে পড়বার দরকার কি ছিল? আহা বাছার

কত লাগল। জানবার কি কথা হয়েছিল। ওদের—ভাই-বোনের সবই বিপরীত।"

মস্তক নত করিয়া জিতেন বলিল,—"লেখাকে নরেন আপনি বললে কেন—তাই আমার হাসি এল।" অপ্রতিভ নরেন লেখার দিকে চাহিতে গিয়া মস্তক অবনত করিয়া লইল—সে দেখিল বুদ্ধিতে উজ্জ্বল সহানুভূতি-ভরা নেত্রদ্বয় উঁহারই মুখের উপর ন্যস্ত।

শান্তি বলিলেন,—"রাত হ'য়ে এল, আজ এখানেই চারটী খেয়ে যেও নরেন।"

উঁহার কথায় লুপ্তসংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল।

"অনেক রাত হয়ে গেছে কথায় কথায় বুঝতে পারি নি—আজ যাই মা—অন্য এক দিন এসে খেয়ে যা'ব।"

—"কেন আজ আপত্তি কিসের ?"

—"আপত্তি আর কি—কিন্তু বাড়ীতে বলে আসি নি।"

"কিন্তু বাড়ীতে তোমার খাবার আগলে বসে থেকে কারুর উদ্বেগেরও তো সম্ভাবনা নেই মোটেই।"

লজ্জিত নরেন মৃদু আপত্তি জানাইল,—"না নেই কিন্তু আজ থাক।"

"আচ্ছা আজ ছেড়ে দেব যদি তুমি কথা দাও' যে রোজ তোমার মাকে একবার ক'রে দেখা দেবে।" নরেন স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল।

তিন

"মা—ওমা—একটা যে বাজে—বাবা কি আজ ভেতরে আসবেন না ?"

"আমি কি করব মা, তুই তো কত ডেকে পাঠালি।"

সুলেখা ঝঙ্কার করিয়া উঠিল—"আমি ডেকেছি তুমি কোন্ একবার ডেকে পাঠালে—সকাল থেকে রাত্তির লোক এসে জড়ো হবে, নাইবার খাবার ফুরসত থাকবে না, আর আমি সেই সকাল থেকে রান্নাঘর আগলে বসে থাকি ?"

হাসিয়া মা বলিলেন,—"তুই বা রান্নাঘরে রয়েছিস কেন ? ঠাকুর গেল কোথায় ?"

বামনঠাকুর তাহার [illegible] দোক্তা-[illegible] রঞ্জিত দন্তবিকাশ করিয়া বলিল,—"[illegible] আমি [illegible] মা—দিদিমণি থাকতে দিলে না, বল্লেন—তুমি চুলতে [illegible] বেরালে সব এঁটো করে গেলে কত্তার আবার [illegible] হ'বে না।"

শ্যামা ঝি গৃহিণীর গাত্রে তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে বলিল—"বড় অন্যায় করেছে দিদি—তুমি দেবতা একটু ঢুলছিলে এও তাঁর সইল না।" হাসিয়া শ্যামা লুটাইয়া পড়িল।"

ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—"তাই বুঝি—তুই দেখেছিস কখন আমাকে ঢুলতে ?"

"রাম রাম, তা কেন, তবে কি না মাঝে মাঝে আফিং একটু বেশী হ'য়ে যায়, তাই না পাজি বেরালে সুবিধা পেয়ে মাছগুলো সব খেয়ে যায়।"

"তুমি দেখেছ আমায় আফিং খেতে ? দেখ ঝি, তোমার কথা সইব না—আর যখন-তখন যদি এমন—"

"এই ঠাকুর এদিকে এল—চুপ কর শ্যামা।"

নিমেষে কলহ বন্ধ হইল, শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া ঠাকুর একবার শ্যামার প্রতি তীব্র-দৃষ্টিপাত করিতে ভুলিল না। গৃহিণীর অত্যন্ত নরম মেজাজের জন্য কেহ তাঁহাকে মানিত না বরং সুলেখাকে ঝি, চাকর প্রভৃতি ভয় করিয়া চলিত। সুলেখা বলিল,—"যাও দেখে এস বাবার কত দেরী।"

ডাক্তার শরৎ রায় স্বীয় প্রকাণ্ড অট্টালিকার এক অংশে ডিসপেন্সারীতে কতকগুলি মনুষ্য-বেষ্টিত হইয়া বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে একজন রোগীর রোগের কাহিনী শুনিতেছিলেন। ঠাকুরের আহ্বানে ডাক্তার কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। এই লইয়া চতুর্থবার কন্যার আহ্বান আসিয়াছে।

ভৃত্যের আহ্বানে বৃদ্ধ মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়া বলিলেন, "লেখা মাকে বল আর আধঘণ্টার মধ্যে আসছি।"

ভৃত্যের বাক্যে লেখা আগুন হইয়া উঠিল,—"তুমি বলতে পারলে না একটা বেজে গেছে—লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিতে পারলে না ?"

"বলেছি দিদিমণি, না হয় জিজ্ঞেস কর ?"

মধ্যস্থ হইয়া শান্তি বলিলেন,—"ও আবার লোকদের

[illegible] লোকেরা নিজ থেকে না গেলে [illegible] মা কি করেন।"

"[illegible] পারেন না, দেখি কেমন না আসেন।" লেখা পিতা[illegible] উদ্দেশে চলিল।

"শোন লেখা, তুমি এখন বড় হ'য়েছ, সেই আগেকার মত ছোটটী নেই, যখন-তখন অমন হুট হুট করে' একঘর মানুষের সামনে যেও না, সেটা ভাল দেখায় না।"

খীর অঙ্কের প্রতি চাহিয়া ঠোঁট উলটাইয়া তাচ্ছিল্যভরে লেখা বলিল—"ই ভারি তো বড় হয়েছি যাব আমি।"

"না বাবা, এমন অবাধ্য মেয়ে দেখি নি, তখুনি বলেছি লেখাপড়া বেশী শিখিও না; আমার কথা কে শোনে, দাসী বাঁদী বই তো নই।"

মায়ের কথা শুনিয়া সুলেখা হাসিয়া ফেলিল—"কি যে তোমার ওই কথাগুলো, শুনলে হাসি পায়—যদি বাইরে যেতে দিতে না চাও তবে বাবাকে সকাল সকাল নাইতে খেতে বল।"

মাতাও হাসিয়া উঠিলেন,—"তোরচেয়েও উনি বুঝি আমার কথা বেশী শোনেন? বলতে পারিস না?"

বাদপ্রতিবাদ অনাবশ্যক বিবেচনায় লেখা চুপ করিল।

"কি রে এত রাগ করেছিস কার ওপর।" জিতেন আসিয়া জননীর নিকট বসিল। লেখা কথা কহিল না। শান্তি বলিলেন, "মেয়েকে বাইরে যেতে বারণ করেছি তাই রাগ হয়েছে।"

"কেন কোথায় যাচ্ছিল ও?"

"বাইরে কর্ত্তাকে ডাকতে।"

রীতিমত বিস্মিত হইয়া জিতেন বলিলেন—"এ তো নতুন কথা নয় মা—লেখা যে রোজই বাবাকে ডাকতে যায়। ও না গেলে বাবা হয়তো বারটার আগে ভেতরে আসতে পারেন না। আজ আবার কি হ'ল?"

বিরক্ত হইয়া জননী বলিলেন—"হ'বে আবার কি, দিন দিন বয়েস বাড়ছে বই কমছে না।"

"ও সেই কথা!" সশব্দে জিতেন হাসিয়া উঠিল—"তা হ'লে বল আজ থেকে লেখারাণী পর্দ্দানসীন, যা বা [illegible]ভী করে' থাকতে হ'বে না—বাবাকে ধরে' [illegible]।"

লেখা মায়ের দিকে চাহিল।

অনিচ্ছার সহিত শান্তি বলিলেন,—"যাও, আমার কথা যখন এ বাড়ীতে থাকবেই না তখন কথা না কওয়াই উচিৎ কিন্তু পারি না যে চুপ করে' থাকতে।"

"তবুও বসে রইলি যে, যা না রাণী।"

"আমি আর কখনও যাব না।"—কাঁদিয়া লেখা মুখ ঢাকিল।

স্নেহে কন্যাকে ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নেহান্ধ জননী ভাবিলেন—সত্যই তো এমনই কি বয়স হইয়াছে তাঁহার কন্যার এখনও যে তেমনি ছোটটীই আছে সে, তেমনই আবদার—শিশুর মত তেমনই চোখের জল। বিচারশক্তিকে পরাজিত করিতে, বাস্তব দৃষ্টির উপর মিথ্যার আবরণ টানিতে, স্নেহ-ভালবাসার ন্যায় এমন অদ্ভুত তৎপরতা বোধহয় সংসারে অপর কোন বস্তুরই নাই। তাই আজি শান্তির দৃষ্টি প্রতারিত ও পরাজিত হইয়া স্নেহেরই জয় ঘোষণা করিল। স্নেহাপ্লুতকণ্ঠে তিনি বলিলেন—"চুপ কর—কাঁদিস না পাগলি—যাও মা বেলা অনেক হয়েছে—কর্ত্তাকে ডেকে নিয়ে এস গিয়ে।"

লেখা চোখ মুছিয়া ছুটিয়া গিয়া পিতার পশ্চাতে দাঁড়াইল। স্নেহভরে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেলা কি অনেক হ'য়েছে মা?"

"হয় নি? একবার ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখ তো।"

বিস্মিত শরৎবাবু বলিলেন,—"তাই তো একটা হ'য়ে গেছে কেউ আমায় একথা বলে নি।"

"বলে নি আবার, দশবার রামশরণ আর লছমনঠাকুর পর্য্যন্ত এসে ফিরে গেছে, সত্যি বাবা যদি রোজ রোজ এমন—"

এর পরের কথাটা ডাক্তারের অজানিত ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"ওরে না না সে কি হয়, রোজই কি আর এমন দেরী করতে পারি? আজ তা থাক্ কেউ যদি ঘড়ীর কথা মনে করিয়ে দিত—আমার দোষ কি বল তো মা?"

"ঘড়ী যে সামনেই ছিল বাবা।" পিতা ও কন্যা উভয়ে হাসিয়া ফেলিলেন। কন্যার হাত ধরিয়া ডাক্তারকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া একখানা কাগজ হস্তে কম্পাউণ্ডার পথ

আগুলিয়া দাঁড়াইল। ক্রুদ্ধস্বরে লেখা বলিল—"ও কি ও?"

"আজ্ঞে দানীশবাবুর এই—"

সবটুকু শুনিবার মত ধৈর্য্য লেখার ছিল না; বাবা দিয়া ঘড়ীর দিকে অঙ্গুলী-সঙ্কেতে দেখাইয়া সে বলিল—"এতক্ষণ কি করছিলেন? বিকেলে বাবা যখন আবার আসবেন তখন ওসব হ'বে।" ডাক্তারের এই আদরিণী মেয়েটীর কথা পরিচিত সকলেই জানিত কিন্তু উপস্থিত নব আগন্তুকেরা অবাক্-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। সাম্রাজ্ঞীর ন্যায় পিতার হস্ত ধারণ করিয়া সুলেখা অন্দরে প্রবেশ করিল।

পিতা ও ভ্রাতাকে পরিবেষণ করিতে করিতে সে বলিল, —"বাবা তুমি কত বিশ্রী হ'য়ে যাচ্ছ দিন দিন"। ব্যজনী হস্তে লেখার জননী মাছি তাড়াইতেছিলেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন,—"মেয়ের কথার শ্রী দেখ, ও আবার কি কথা লেখা?" যথেষ্ট ঝি-চাকর সত্ত্বেও পিতাকে দুই-একটী ব্যঞ্জন বণ্টন করিয়া স্বহস্তে পরিবেষণ করিতে না পারিলে সুলেখা শান্তি পাইত না। মুড়ীঘণ্টটুকু সব পিতার পাতেই ঢালিয়া দিয়া বলিল,—"না মা, তুমি দেখতে পাও না বড় বিশ্রী হ'য়ে যাচ্ছেন বাবা।"

সকৌতুকে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি রকম বিশ্রী মা?"

মায়ের দিকে চাহিয়া লজ্জিতভাবে মস্তক নত করিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল,—"বিশ্রী—রোগা—কালো—কালা—কি জানি কেমন বাবা।"

গভীরস্নেহে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিলেন,—"তোমার ছেলে যে এখন বুড়ো হয়েছে সে কথা ভুলে যাস কেন মা।"

"কিন্তু তুমি বুড়ো হও নি বাবা, ও বাড়ীর জ্যেঠা-মশায় কত বুড়ো হ'য়েছেন—তিনি কই এমন হন নি তা? নয় তুমি বড্ড বেশী কাজ কর বাবা—সময়ে খাও না সময়ে নাও না তাই না এমন বিশ্রী হ'য়ে যাচ্ছ।"

"আচ্ছা কাল থেকে ঠিক বারটায় খাব; কেমন?"

"কিন্তু ও কথা তুমি অনেকবার বলেছ—কেমন নয় দাদা?"

"বাবা কথা রাখতে জানে না—না রে লেখা?"

"একটুও না, শোন বাবা—।"

বাধা দিয়া ডাক্তার বলিলেন,—"আচ্ছা আচ্ছা, এবার থেকে দেখে নিও মা—ঠিক কথা রাখি কি না—দুশ্রী একটু না হ'লে যে আমার লেখা মায়ের কাছে বড় বকুনী খেতে হ'বে।"

এতক্ষণ পরে গৃহিণী কথা বলিলেন,—"সত্যি তুমি বড় রোগা হয়ে গেছ।"

লেখা খুসী হইয়া বলিয়া উঠিল,—"দেখলে বাবা—মাও এ দেখেছেন—আমি মিথ্যে বলি নি—সত্যিই তুমি বুড়ো হও নি আর।"

সহসা লেখা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল উপস্থিত সকলেই তাঁহার দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিতেছে। কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া রাগে, দুঃখে, অভিমানে সে ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

চার

উঁচু-নীচু পাহাড়ে ঘেরা সিরাজপুর গ্রামটী চিত্রেরই ন্যায় মনোরম। এখানে ছোট-বড় পার্ব্বত্য ঝরণা ঝির ঝির করিয়া অব্যক্ত-মধুরস্বরে ও একটা বড় নদী প্রবলবেগে বহিয়া যায়। প্রকৃতির নিপুণ হস্তের স্পর্শে উহার চতুর্দ্দিক্ সৌন্দর্য্য-পূর্ণ। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন—গ্রামখানি নীরব নিস্তব্ধ, মাত্র কয়েকটা কাক পুকুরধারের বৃহৎ নারিকেল গাছগুলার উপর বসিয়া কর্কশকণ্ঠে এই নীরবতাকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল এবং পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী গ্রামের জমীদার রমেন চৌধুরীর প্রকাণ্ড শুভ্র অট্টালিকার দ্বারে লম্বিত খাঁচার মধ্যে উপবিষ্ট কাকাতুয়া উহাদিগের সহিত কণ্ঠের সামঞ্জস্য মিলাইতে ব্যস্ত ছিল। ছোট ছোট ঘর-গুলার পাশ দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া পরিচ্ছন্ন পথটুকু পুষ্করিণী পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। অতিরিক্ত গ্রীষ্ম হেতু পুষ্করিণীর জল অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর গ্রীষ্ম অনেক পরিমাণে বেশী। রৌদ্রের উত্তাপে গৃহের বাহির হওয়া কষ্টসাধ্য। কিন্তু চৌধুরী-দিগের নিরলস বড়বধূ কুন্তলা সূর্য্যের তীক্ষ্ণ দহনকারী রশ্মিকে উপেক্ষা করিয়া কতকগুলা বাসন লইয়া পুকুর-পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কেশ হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত

সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বিধাতার অদ্ভুত নির্ম্মাণ-কৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না—শিল্পীর শুধু যে গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে, পরিকল্পনার রূপ, রং ও লাবণ্যের অদ্ভুত সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়; অধিকন্তু কিছুদিন হইতে তাহার সারা দেহে বৈরাগ্যের ছায়া পড়িয়া আলোর উপর, আঁধারপাতে উজ্জ্বলে মধুরে মিশিয়াছে। বয়স আন্দাজ ত্রিশ হইলেও উঁহাকে আঠার উনিশের উর্দ্ধ মনে হয় না। কিন্তু সম্ভবতঃ অতর্কিতে বিধাতার মস্ত এক ভুল হইয়া গিয়াছিল। বিধবার দীর্ঘ আয়ত নেত্রদ্বয় আনন্দে উদ্ভাসিত ছিল না—সে নেত্রের দৃষ্টি বড় করুণ—বড় মর্ম্মস্পর্শী। কুন্তলা একবার নিকটস্থ অট্টালিকার দিকে চাহিয়া দেখিলেন—উঁহার অজ্ঞাতে বক্ষ-পঞ্জরের মধ্য দিয়া এক গভীর নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল—সে যে অধিক দিনের কথা নহে—যখন ঐ বৃহৎ অট্টালিকার গৃহিণী পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন—কি আনন্দে—কত সুখে—আদরে আহ্লাদে দিনগুলা যে তাঁহার কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত আজ সে কথা ভাবিয়া কুন্তলা বিস্মিত হইলেন কিন্তু উঁহার পরের ইতিহাসটুকু বড় করুণ। কি অনাবিল আনন্দই না ছিল সে দিনে। কে জানে কাহার অভিশাপে সকলই শূন্যে মিলাইয়া গেল, রাখিয়া গেল—ব্যর্থতার হাহাকার—ক্ষুধাতুর শূন্য হৃদয়ের তীব্র শুষ্ক আর্ত্তনাদ—আর রাখিয়া গেল উঁহার অমর স্মৃতিটুকু যাহাকে তিনি পরম আগ্রহে সাদরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আছেন। উঁহার চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। নিষ্ঠুর নিয়তির কি এ লাঞ্ছনা, স্বামী যেদিন ক্ষুদ্র কন্যাটিকে উঁহার বক্ষে তুলিয়া দিয়া খুড়তুতো ভ্রাতা রমেন চৌধুরীর হস্তে স্ত্রী-কন্যাকে সমর্পণ করিয়া চিরবিদায় লইয়াছিলেন—সেদিন তিনি এই সত্যকে কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না—যে স্বামী তাঁহাকে ছাড়িয়া সত্যই চিরদিনের জন্য চলিয়া গেলেন, কিন্তু ক্রমে যখন বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি এই সত্যকেই নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহার পর আবার এক নূতন আঘাত পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ জমিদার তারা চৌধুরী মৃত্যুর সময় স্বীয় পুত্র রমেনের সহিত ভ্রাতুষ্পুত্র অমলকেও সমভাবে বিষয় ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন এবং অমল চৌধুরীর মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী পরিবারের সবাই সেই কথাই জানিত কিন্তু উঁহার মৃত্যুর কতিপয় দিবস পরে—রমেন সগর্ব্বে সকলকে উচ্চকণ্ঠে জানাইয়া দিল ক্ষুদ্র এক বাগান এবং উহারই সংলগ্ন কিছু ধানের জমি ছাড়া কুন্তলার স্বামীর কিছুই নাই। তিন-চারি বৎসর রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকায় তাঁহার অংশের সমস্ত বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। সে দিন কর্ত্তার মুখের প্রতি চাহিয়া সহসা কুন্তলার নির্জ্জীব মনটা বিদ্রোহ হইয়া উঠিল—এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া নিজের দাবী জানাইবার সংকল্প করিলেন কিন্তু উহা মুহূর্ত্তেকের জন্য; কোথা দিয়া খানিকটা গ্লানি, লজ্জা, অভিমান আসিয়া উঁহার সারা চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল—অবসাদে মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে বলিল নালিস করিয়া নিজ ন্যায্যগণ্ডা বুঝিয়া লইতে, জমীদারের একমাত্র সন্তান গীতা—উঁহাকে যে পদমর্য্যাদাসুযায়ী গড়িয়া তুলিতে হইবে কিন্তু কুন্তলার চিত্ত ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া উঠিল—তিনি কাহার সহিত বিবাদ করিবেন? পরমারাধ্য স্বামীর ভ্রাতার সহিত? ইহাও কি সম্ভব? ছিঃ। কথাটা নানা রংয়ে রঞ্জিত হইয়া তরুণ জমীদারের কর্ণগোচর হইতেও বিলম্ব হইল না; বিশেষতঃ—সম্প্রতি-আগতা মাসীমাতা স্বরচিত শ্রুতিকটু বাক্যগুলার সংযোগে উঁহার মাধুর্য্য পুরা মাত্রায় ফুটাইতেও ভুল করিলেন না—উপরন্তু যখন তিনি বলিলেন, উঁহাকে গৃহে রাখিলে অনর্থ না ঘটাইয়া ছাড়িবে না, অতএব সুবিবেচকের ন্যায় আগে হইতে উঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য—স্বকর্ণে মাসীমা কুন্তলার মন্তব্যগুলা নাকি শুনিয়া ছিলেন—তখন ইহার উপর আর কথা চলে না। ক্রুদ্ধ রমেন অবিলম্বে অগ্রজপত্নীকে বহিষ্কৃত হইবার জন্য আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে কুন্তলা দেবর-নির্দ্দিষ্ট ছোট্ট ঘরখানিতে উঠিয়া যাইতেও বিলম্ব করিলেন না। ফলের বাগান এবং জমীটুকুতে সামান্য যাহা উৎপন্ন হইত তাহাতেই মাতা-কন্যার কোনপ্রকারে চলিয়া যাইত। জমীদার অদ্যাবধি অবিবাহিত। রমেনের একমাত্র অনূঢ়া ভগিনী ইলা কুন্তলার শত নিষেধ সত্ত্বেও লুকাইয়া গীতালিকে নানারূপ সুখাদ্য আনিয়া প্রত্যহ খাওয়াইয়া যাইত। এই সংযমী ধৈর্য্যশীলা বৌদিদিকে সে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। বাসনগুলা ধৌত করিয়া

উঠাইতে উঠাইতে পৃষ্ঠদেশে কাহার কোমল স্পর্শে কুন্তলা ফিরিয়া চাহিলেন।

"এই রোদে কেন এসেছ বৌদি—ক্ষান্তকে বলেছি সে রোজ এসে বাসন মেজে দেবে। মুখয়ে রাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে তোমার।"

একটু মলিন হাসিয়া কুন্তলা বলিল,—"না এ আর কষ্ট কি— তুই এই ভরা রোদে বেরিয়েছিস কেন ইলা?"

চুপি চুপি ইলা বলিল,—"বিশুদার সঙ্গে পাহাড়ে গেছলুম, কি সুন্দর পাহাড়, চারিদিকে কত পাখী গাছ-পালা, হরিণের ছোট একটা এমন সুন্দর ছানা, কত চেষ্টা করলুম গীতার জন্যে ধরতে কিন্তু পালিয়ে গেল। যাবে তুমি একদিন দেখতে? কখন যাও নি, না? বল না বৌদি।"

ইলা কুন্তলার হাত ধরিয়া টানিল। উহার ব্যস্ততা দেখিয়া কুন্তলা হাসিয়া ফেলিলেন—"এত বড় হ'লি এখনও কি বুদ্ধি হ'ল না রে? এখনও এ বনে সে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটে বেড়াবি? কবে আর একটু জ্ঞান-বুদ্ধি হ'বে ইলি?"

"তোমাদের মত রাতদিন ঘর-সংসার আগলে পড়ে থাকতে হ'বে না কি? মা গো মা সে কি বিশ্রী।" ইলা হাসিয়া উঠিল।

"হাসলি যে।"

"ধেৎ—সে কথা শোনে না ভারি খারাপ।"

"কি কথা ইলা?"

"শুনবে তুমি? বিনয়দা বলছিল, সে আমায় বিয়ে করবে—কি খারাপ মাগো—না না তা আমি কখন করব না, এ কিন্তু তোমায় বলে রাখছি বৌদি।"

বিস্মিত কুন্তলা অস্থির হইয়া বলিল, "কি বলছিল সে তোকে? সব বল লক্ষ্মীরাণী।"

"না না সে বিশ্রী কথা বৌদি ভারি খারাপ—বিয়ে করে না ছিঃ—বিয়ে করলে তোমার মত এই সব করতে হ'বে তো? না বৌদি এ সব আমি পারব না।" সবেগে ইলা কুন্তলার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল—বাসন কতক ছিট-কাইয়া পড়িল—বিব্রত কুন্তলা ইলাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া হস্তস্থিত বাসনগুলা নামাইয়া রাখিল।

"মেয়ে হ'য়ে জন্মালে যে বিয়ে করতে হ'বে ইলি, এ যে হিঁদুর ঘর।"

ইলা বলিল,—"কেন করতে হয় বৌদি? তোমার মত দাসীবৃত্তি করবার জন্যে কি?"

সে দিনের সেই ক্ষুদ্র ইলা এত কথা শিখিল কবে? বিস্ময়-ভাব দমন করিয়া কুন্তলা বলিল,—"দাসীবৃত্তি কি রে পাগল? এ যে আমার নিজের কাজ, কষ্ট হয় না তো কিছু, কিন্তু তাই বলে যে বিয়ে করবে না এমন কি আছে এতে?"

ইলা কি যেন ভাবিতেছিল কুন্তলার কথা শুনিতে পাইল না, আপনমনেই বলিল;—"আচ্ছা তুমি যা বললে সে কি সত্য?"

"কি?"

"এই যে বললে বিয়ে করতেই হ'বে।"

"সত্যি বই কি, বিয়ে ছাড়া যে আমাদের উপায় নেই পাগলী।"

দীপ্তকণ্ঠে ইলা বলিল,—"কেন নেই? পুরুষদের আছে আর মেয়েদের নেই?"

"সে অনেক কথা তুই বুঝবি না।"

"না— আমি বিয়ে করব না—কি করবে তোমরা?"

উহাকে কাছে টানিয়া কোমলকণ্ঠে কুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ তুই এত রেগেছিস কেন ঠিক ক'রে বলত।"

"কিন্তু বিনুদার সঙ্গে বিয়ে কিছুতে করব না এ তোমাকে বলে দিচ্ছি বৌদি।"

"কেন সে কি করেছে বল তো লক্ষ্মী।"

"জান বৌদি বিনয়দা কি বলছিল? বলছিল তোমার বৌদি ভারি সুন্দর—আর—আর—।"

আশ্চর্য্যভাবে কুন্তলা বলিল,—"আর কি বললে সে?"

কথাটা স্মরণে ইলা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"না সে কথা শোনে না—তুমি কিন্তু আজ থেকে বিনুদার সামনে

বেরিও না—ও ভাল নয়—আর—” ইলা মস্তক অবনত করিল।

নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে কুন্তলা শিহরিয়া উঠিলেন। ইলার বুঝিবার এতখানি ক্ষমতা কবে যে হইয়াছিল ইহা তাঁহার নিকট অজানিত থাকিলেও উহার বুঝিবার শক্তির পরিচয় পাইয়া মনে মনে খুসি হইলেন। বিনয়ের সহিত ইলার এত অধিক ঘনিষ্ঠতা তিনি পছন্দ করিতেন না। বলি বলি করিয়াও ঐ শিশু ভাবাপন্ন মেয়েটাকে এ বিষয় আজও কুন্তলা বলিয়া উঠিতে পারেন নাই কিন্তু সে যে নিজ হইতেই বুঝিয়াছে ইহাতে বড় যেন তৃপ্তি পাইলেন। বিনয় মিত্র উঁহাদিগেরই প্রতিবেশী, তরুণ জমীদারের বন্ধুদিগের মধ্যে প্রথম ও প্রধান উচ্ছৃঙ্খল নবীন যুবক। কতক্ষণ পরে জড়িত কণ্ঠে কুন্তলা বলিলেন,—“তুই আর আজ থেকে বিনয়ের সঙ্গে মিশিস না ইলা লক্ষ্মী বোন।”

আশ্চর্য্যভাবে ইলা উত্তর দিল, “আবার আমি তার সঙ্গে কথা কব? এ কথা তুমি বিশ্বাস কর বৌদি? যে তোমাকে অপমান করে, যে তোমাকে—”

“ইলা ঐ রোদে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে তোমার?”

কর্কশ কটু কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়ে চমকিত হইয়া উঠিল। রমেন চৌধুরীর সৎ পরামর্শদাত্রী মাসীমাতা যে কখন উহাদিগের সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—এ বিষয়ে কাহারও খেয়াল ছিল না। ইলা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল! এই হিংসুক কঠোরচিত্ত নারীকে মোটেই সে সহিতে পারিত না। ইনি আসিয়াই না উহার বড় আদরের গীতকে—স্নেহশীলা বৌদিকে—বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছেন। উঁহারই নিমিত্ত তাহার রাজরাজেশ্বরী বৌদির আজ এত কষ্ট। এই অভিভাবিকাকে সে আদৌ দেখিতে পারিত না। তিক্তকণ্ঠে ইলা বলিল,—“দেখতে পাচ্ছ না—বৌদির সঙ্গে—আমার নিজের দিদির সঙ্গে কথা বলছি—”

এই মুখরা স্পর্দ্ধিতা মেয়েটীকে মাসী কিঞ্চিৎ ভয় করিতেন কিন্তু মুখে সেভাব কোনদিন প্রকাশ হইতে দিতেন না। ভ্রূকুটী-কুটিল নেত্রে উভয়কে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া মাসী বলিলেন,—“অন্ধ নই বাছা তবে কি না রোদে দাঁড়িয়ে অসুখ-বিসুখ কিছু করে তার দায়ী আমি নই।”

“তোমার তার জন্যে ভাবতে হ’বে না—এতদিন যে করেছে সেই করবে—রোদে দাঁড়িয়ে যদি আমার বৌদির অসুখ না করে তবে আমারও করবে না।”

“বেশ বেশ তোমার ঐ বৌদিই যেন তখন এসে সেবা করেন—সেই যে বলে না, উড়ে এসে জুড়ে বসা—পরের ঘরের মেয়ে, তার দরদ হ’বে কেন—ঠায় রোদে মেয়েটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে—চোকথাকীরা দেখতে পায় না রোদের তাত। আর বাপু জমীদারের মেয়েতে আর তোতে কি সমান।”

রাগ করিতে গিয়া ইলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল,—“উড়ে এসে জুড়ে বসেছে কে— তুমি না আমার বৌদি?”

আরক্তনেত্রে মাসীমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—“কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—এই সব ওকে শেখান হয়, এই জন্যেই না রমেনকে বলি—আমায় বিদেয় করে’ দাও। বলে যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। আমি মরি ইলা ইলা করে’ আর ও-কি না কথায় কথায় সবারি সামনে আসে অপমান করতে?”

“দেখ মাসী—”

বাসনগুলা ক্ষিপ্রতার সহিত কুড়াইয়া লইয়া কুন্তলা ধমক দিয়া ইলাকে থামাইয়া ধীরপদে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়া মাসীও প্রস্থানের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন, একা একা যে কোন্দল হয় না। আক্রমণের জীবই যখন সরিয়া গেল তখন কাহাকে নিমিত্ত করিয়া এমন মধুর বাক্যবাণ বর্ষিত করা যাইতে পারে। অগত্যা ইলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“কেন তুমি এই রোদে ঐ মাগীর কাছে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাও? দেখলে কেমন চলে গেল—একবারটী ফিরেও চাইলে না। তাও বলি বাছা বিধবা মানুষের এত দেমাক কিছু না।”

রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে ইলা বলিল,—“ওঁ। নামে যা তা বল না, জান না তুমি ওকে—আমার বৌদিকে, যাও

আমি এখন যেতে পারব না—গীতাকে একবার কোলে না নিয়ে নড়ছি না।" কোনদিকে না চাহিয়া ইলা পুষ্করিণীর সোপানের উপর বসিয়া পড়িল। আরক্তনেত্রে উঁহার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কি বলিতে বলিতে স্বামী-মাত্তা গৃহাভিমুখে ফিরিলেন।

ক্রমশঃ

ক্ষণিকের মোহ

শ্রীকালিদাস রায়

বাঁচবে যাহা সগৌরবে শাশ্বতকাল ধরি
তারে আমি শ্রদ্ধাভরেই রাখি মাথার' পরি।
কিন্তু যারা পড়বে ঝরে, মরবে দু'দিন পরে,
হায় মমতায় বিগলিত হই তাদেরি তরে।
তাদের তরেই সজল আমার অবুঝ দুনয়ন,
সত্য কথা বলতে তারাই ভালবাসার ধন।

কেউবা পাণি লেহন করে, কেউবা চুমা চায়,
কেউবা তাদের নির্ব্বিবাদে অঙ্কেতে ঘুমায়,
কেউবা তাদের দাঁতে ক'রে আঁচল ধ'রে টানে,
কেউবা সরল হরিণ-চোখে চাহে আমার পানে।
কেউবা কেঁদে ধূলায় গড়ায় আদর পাবার আশে,
জানেনা দিন ফুরিয়ে এলো কেউবা নাচে হাসে।
অবাক্ হ'য়ে দেখি আমি এদের ওঠা বসা,
এদের নিয়ে হলো আমার জড়্ভরতের দশা।

এদের আমি ভালই বাসি—বুলাই গায়ে হাত,
এদের কথাই স্বপ্ন দেখি সারা বাদল রাত,
ক্ষণিক হলেও এদের বুকে নেই কি কোন আশা?
চলে যাবে না পেয়ে হায় একটু ভালবাসা?

সেদিন এলো দিন ফুরালো মরবে দু'দিন পরে
এই বেদনাই ফুঁপিয়ে কেঁদে পরাণ আকুল করে।
কোন রূপে দুদিন আয়ু তাদের বাড়ে যদি,
তাহার লাগি চল্‌ছে কতই যত্ন নিরবধি।

নিত্যধনের বণিক্ যত-আমায় ক্ষমা করো,
ক্ষণিক আমার মনভুলানো, অনিত্য মোর বড়।
রামধনুটির পানে আমি করুণ চোখে চাই,
ফুলের পানে চেয়ে ব্যথার সীমানা না পাই।
পরাণ ভুলায় খদ্যোতিকার একটুখানি হাসি,
রঙিন জলবুদ্বুদেরেও দেখতে ভালবাসি।
নিত্যকালের রবির দ্যুতি ভক্তি করি তাঁয়
চন্দ্রে আমি প্রণাম করি সকল পূর্ণিমায়।

সোনার প্রদীপ শ্রীমন্দিরে আলোক করে দান,
মাটির দীপের দীপান্বিতাই মাতায় আমার প্রাণ
জানি আমি রসিকসভায় নিশ্চয়ই একঘরে,'
সঙ্গ তাদের, চতুরানন, নেই বা দিলে মোরে।

জাগরণ

(গল্প)

শ্রীহরিপদ গুহ

এক

কালবৈশাখী। আমরা কয়টী বন্ধু সুদূরবর্ত্তী এক পল্লীতে যাত্রা শুনিতে চলিয়াছিলাম। তখন অপরাহ্ণ। নীলাম্বর মেঘমুক্ত;—দিনমণির উজ্জ্বল কিরণে চারিদিক্ উদ্ভাসিত। সহসা পশ্চিম দিক্‌টা ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন হইয়া হইয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে সারা আকাশটাই কাল মেঘে ছাইয়া ফেলিল।

যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু শস্যক্ষেত্র ধু ধু করিতেছে। আশে পাশে লোকালয়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। নিরুপায় দেখিয়া আমরা প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়াইতে লাগিলাম। ভীষণ বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। ধূলায় আমাদের চক্ষু অন্ধ হইবার উপক্রম করিল। অন্ধকারে পথ নির্ণয় করা যায় না। আমি হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া গিয়া বেশ একটু আঘাত পাইলাম; কাপড়খানাও ছিঁড়িয়া গেল। এমন সময় মুষল-ধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল।

ছুটিতে ছুটিতে আমরা একটা কুটীরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম; অগত্যা তারই দাওয়ায় উঠিয়া পড়িলাম। এক সঙ্গে আমাদের চার-পাঁচজন ভদ্রবেশীকে দেখিয়া গৃহস্বামী সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। কি করিয়া যে আমাদের অভ্যর্থনা করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

তাহাকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিয়া আমরা একখানা চাটায়ের উপর বসিয়া পড়িলাম।

বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃ বাড়িতেই চলিল। বৃদ্ধগৃহকর্ত্তা আমাদের সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে বলিল—"চাল-দাল দিচ্ছি, আপত্তি না থাক্‌লে দয়া করে' আপনারা হাঁড়িটা উনুনে বসিয়ে দিন!"

আমি বলিলাম—"না, অত আর হাঙ্গামা করে' কাজ নেই, বৃষ্টি থাম্‌লেই বাড়ী চলে যাব।"

সহসা রমেন বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিয়া বসিল—"মশায় আপনারা কি জাত?"

বৃদ্ধ অস্ফুটস্বরে কি বলিতে যাইতেছিল, কপাটের পাশ হইতে তাহার কন্যা তাহাকে ডাকিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল—"বাবা, ওনাদের শুক্‌নো মুড়ি-চিঁড়ে খেতে বলুন না? তাতে তো আর দোষ নেই।"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা, সেই বেশ, খাটুনীটাও কম যাবে' খন।"

রমেন গম্ভীরভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কই, বল্‌লেন না, আপনারা কি জাত?"

মাথা নীচু করিয়া নম্রস্বরে বৃদ্ধ বলিল—"আমরা নমঃ।'

অকস্মাৎ যেন বারুদ-স্তূপে অগ্নি-সংযোগ হইল। রমেন চীৎকার করিয়া উঠিল—"এ্যা, নমঃশূদ্দুর! এত সাহস তোমাদের কবে থেকে হলো হে? ব্রাহ্মণকে তোমাদের বাড়ীতে খেতে বল্‌তে বুক কাঁপ্‌ল না? ছি, ছি, শৈলেশ-দা, তুমি আবার মুড়ি-চিঁড়ে খাবার যোগাড় কর্‌ছ!"

দ্বারের পার্শ্ব হইতে মেয়েটী অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে ডাকিল—"বাবা! ..."

তাহার যেন আরও কত কি বলিবার ছিল, শেষ করিতে পারিল না। অকস্মাৎ তাহার বেদনাতুর চোখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। আমি রমেনকে বলিলাম—"কেন মিছে গোল করছিস্! তোর ইচ্ছে না হয়, নাই খেলি।"

রমেন ঝঙ্কার দিয়া কহিল—"তার মানে? আমি না হয় নাই খেলুম, আর তুমি জেনে-শুনে কোন্ আক্কেলে খাবার কথা বল্‌ছ? তোমরাই না বড় ঘর; তোমাকেই দেখে না দশজন শিখ্‌বে?" তারপর অন্যান্য সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিল—"চল হে, ওঠা যাক্। আর এখানে নয়; এর চেয়ে বৃষ্টিতে ভেজাও ভাল শরীরের কষ্ট হ'বে বলে তো আর জাত দিতে পারি না!'

তাহারা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রমেন বলিল—"কি শৈলেশদা, তোমার কি যাবার ইচ্ছে নেই না কি? এখনও বসে রইলে যে?"

আমি নম্রকণ্ঠে জবাব দিলাম—"না ভাই, শরীরটা ভাল নেই; এ জলের মধ্যে আমি কিছুতেই যেতে পারব না।"

রমেন সদর্পে বলিল—"বেশ, বাধ্য হয়েই কিন্তু আমাদের সমাজে জানিয়ে দিতে হ'বে যে, তুমি চাঁড়ালের বাড়ী খেয়েছ।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"বেশ, তাই বল গে যাও। দরকার হ'লে বাড়ীতে কেন, এদের হাতেও হয় তো খেতে হ'বে।"

ঘরের বাহিরে যাইতে যাইতে সুচারু রমেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"বুঝ্‌লে না রমেনদা, শৈলেশদা'র মন মজেছে ওই দ্বারের পাশে লালকমলে!"

রমেন "তাই বটে" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সকলকে লইয়া বেগে বাহির হইয়া গেল।

আমি সেই নির্লজ্জ ইঙ্গিতের আঘাতে নির্জীবের মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম।

দুই

বৃষ্টিতে ভেজার জন্য রাত্রে কম্প দিয়া আমার জ্বর আসিল, তাহার ফলে সকালে আর মাথা তুলিতে পারিলাম না। একটু সুস্থ বোধ করিলে অপরাহ্ণে যখন বাড়ী ফিরিলাম, মা তখন কান্না জুড়িয়া দিলেন; বলিলেন—"শৈল, তুই কোথায় কি ক'রে এলি? সমাজ যে আজ আমাদের 'একঘরে' করে' দিয়েছে। লক্ষ্মী বাবা আমার, যা,—ও বাড়ীর মুখুয্যে-মশায়ের হাতে-পায়ে ধরে' ক্ষমা চাই গে। এমনই করে' আমায় আর জ্বালাস নি।"

আমি তখন ব্যাপারটা সমস্তই বুঝিতে পারিলাম। তাহারা যে এতটা নীচতা করিতে পারে, তাহা আদৌ বিশ্বাস হয় নাই।

আমি 'ধপ্' করিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িলাম। তারপর ধীরে ধীরে মাকে বলিলাম—"সব মিছে কথা মা, সব মিছে; তুমি বিশ্বাস করো না।"

"বেশ তো তুই যা, তাঁদের তাই বলে আয়।" বলিয়া তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

সংসারে বিধবা মা ছাড়া আপনার বলিতে আর আমার কেহ ছিল না। তাঁহার সে আদেশ আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তখনই সমাজপতির বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন সেখানে বড় বড় মাথাগুলি বিরাজ করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই সকলে গম্ভীর হইয়া গেলেন।

আমি তাঁহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিলাম—"বাড়ী এসে শুন্‌লুম, আপনারা আমাদের একঘরে করেছেন; কি অপরাধ আমার?"

বটব্যাল-খুড়ো তাঁহার একটা চোখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সে সব খবর না নিয়ে কি আর কিছু করা হয়েছে? তোমরা দু'পাত ইংরিজি পড়তে শিখে সমাজটাকে একেবারেই 'ডোণ্ট কেয়ার' কর; নাও ঠেলা, বোঝ এখন।"

আমি বলিলাম—"তারা যা' বল্‌লে, তাই বিশ্বাস ক'রে আমায় একঘরে কর্‌লেন। আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করাও তো আপনাদের উচিত ছিল। সেদিন অসুখ করেছিল বলেই আমি আস্‌তে পারি নি।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় নস্য লইতে লইতে শিখা দোলাইয়া বলিলেন—"হাঁ হে, ওই রকম সুন্দরী তন্বীর মুখ দেখ্‌লে অনেকেরই অসুখ হয়!"

আমার মাথাটা সহসা গরম হইয়া উঠিল; 'ফস্' করিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"হাঁ আপনার মত লম্পট যারা তাদের হয় বটে।"

আর যায় কোথায়! অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। মুখুয্যেমশাই ক্রোধে মুক্তকচ্ছ হইয়া চোখ-মুখ অসম্ভবরূপ গরম করিয়া বলিলেন—"ওহে ছোক্‌রা তোমার বড় বাড় বেড়েছে দেখ্‌ছি! যাও, এখনই এখান থেকে! তোমাকে গাঁ ছাড়া না করি তো আমার নামই মিথ্যে!"

দলের মধ্যে কে একজন বলিয়া উঠিল—"সাধু! সাধু!"

আমি আর সেখানে না দাঁড়াইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

তিন

মা আমার মুখে সমস্ত শুনিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন —"বিনা দোষে যারা আমার ছেলেকে অপমান করে, তাদের সমাজের মধ্যে আমিও আর থাকতে চাই না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"এই তো আমার মায়ের উপযুক্ত কথা!"

"এখানকার বাড়ী-ঘর, জমি-জমা যা-কিছু আছে, সব বেচে দিয়ে চল আমরা কলকাতায় চলে যাই।"

"চোরের মত ভয়ে পালিয়ে যাব? তা হ'বে না! এখানে থেকেই অন্যায়ের প্রতীকার কর্‌ব। নমঃশূদ্র-মোড়ল ও তার মেয়ের প্রতি বন্ধুদের আচরণ দেখে আমার উঁচু জাতের ওপর ঘৃণা জন্মে গেছে! তারা কি রকম ব্যবহার কর্‌লে, তার পরিবর্ত্তে আমরা,—ছি, ছি!"

মাকে তখন ঘটনাটা আগাগোড়া ভাঙিয়া বলিলাম। শুনিয়া তিনিও 'ছি, ছি' করিতে লাগিলেন।

চার

পরদিন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই আমি নমঃদের কর্ত্তা সেই বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলাম—"তোমাদের সমস্ত জাত-ভাইদের বিশেষ করে' যুবকদের একবার সন্ধ্যার পর ডাকাতে হ'বে।"

সে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন বাবু?"

"দরকার আছে। সেই সময় সব শুনতে পাবে— এখন নয়।"

বৃদ্ধের সম্মতি লইয়া আমি বাটী ফিরিয়া আসিলাম।

* * *

নির্দ্দিষ্ট সময়ে গিয়া দেখিলাম,—বহু নমঃশূদ্র যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ আসিয়া মোড়লের গৃহ-সম্মুখস্থ জমিতে সমবেত হইয়াছে। আমি তাহাদের উদ্দেশ করিয়া বলিলাম— "কাল আমার বন্ধুদের দ্বারা মোড়লের অপমান দেখে আমি মনে বড় ব্যথা পেয়েছি। তোমাদের মধ্যে আত্ম-সম্মান জাগাতে চাই; বল, আমার এই ভিক্ষা দেবে?"

মণ্ডল কহিল—"তা'তে কি হয়েছে বাবু, আমরা যে ছোট!"

"নিজেকে ছোট ভাব্‌তে ভাব্‌তে মানুষ ছোটই হয়ে যায়। আত্মা সকলেরই সমান,—ব্রাহ্মণেরও চণ্ডালেরও। উচ্চ-নীচ কার্য্যেই বিচার হয়। ভগবান্ যখন তোমাদের অন্তরে জাগ্রত রয়েছেন তখন তোমরা কম কিসে? সমাজে তোমাদেরও স্থান আছে। বুক ফুলিয়ে চল দেখি, কার সাধ্য তোমাদের গতিরোধ করে?"

যুবকদল সমস্বরে বলিল,—"মনে মনে ইচ্ছা থাকলেও আমরা ভরসা পাই না। কে আমাদের চালাবে?"

"ভীরুতা, কাপুরুষতা ত্যাগ কর। ভয়ই মৃত্যু। আজ থেকে আমি তোমাদের মধ্যে রইলুম; রইলুম কেন, মিশে গেলুম!"

"আমাদের কি করতে হ'বে বলুন?"

"আমি তোমাদের জন্য একটা পাঠশালা খুলব। সেখানে সকালে ছেলেদের এবং সন্ধ্যায় বড়দের পড়্‌তে হ'বে। তোমাদের মধ্যে যারা কিছু লেখাপড়া জানে, তারা আমার সাহায্য করবে। আমার প্রায় একশ বিঘের ওপর জমি আছে; তার অর্দ্ধেক ধান ও অপর অর্দ্ধেক ডাল-কলাই, তরী-তরকারীর চাষ হ'বে। আমি যে রকম উপদেশ দেব, সেই রকম করে' চাষ করলে, ফসল যা হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী হ'বে। গোটা তিনেক দুধওয়ালা ভাল গাই আছে, তার ওপর আরও পাঁচটা কিনব। তোমরা শুধু ভাল করে' তাদের সেবা করবে! যা দুধ হ'বে সমস্তই প্রত্যহ নিকটস্থ মহকুমায় বিক্রী হ'বে। সেখানে আমি একটা ভাল দেখে বড় ঘর ভাড়া নেব। ক্রমে উৎপন্ন ফসলও সেখানে বিক্রী হ'তে থাকবে। যারা গরীব, যারা বেকার, তারাই এই সমস্ত কাজ করবে। তাদের ভরণ-পোষণ বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত থাক্‌বে সে সমস্তই ব্যাঙ্কে জমা রাখা হ'বে। পরে সেই টাকা থেকে আরও জমি-জমা ও গরু বাড়ান এবং আরও পাঁচটা কাজ করা যেতে পারবে। অবশ্য প্রথমেই যে সকলকে কাজ দিতে পারি, সে ক্ষমতা আমার নেই। আমার সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করলুম; আমি কিছু চাই না। তোমরা শুধু আমার বুড়ো মাকে ও আমাকে দু'মুঠো খেতে দিও। মেয়েদেরও বসে থাকলে চলবে না; অবসর মত তাদেরও লেখা-পড়া ও শিল্পকর্ম্ম শিখ্‌তে হ'বে। আমি তার বন্দোবস্ত ক'রে

দেব। ক্রমে ভাল শিল্পী হ'তে পার্‌লে, তাদের তৈরী জিনিসও আমি বিক্রী কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।"

সকলেই আমার প্রস্তাবে আন্তরিক সম্মতি-জ্ঞাপন করিল। তাহাদের মিলিতকণ্ঠ আমার প্রশংসায় মুখরিত হইতেছে দেখিয়া আমি বিনীতভাবে তাহাদিগকে নিষেধ করিলাম।

মাননীয় সমাজপতি মহাশয় এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ আমায় নানাপ্রকার জব্দ করিতে প্রাণপণে চেষ্টায় লাগিয়াছিলেন; শেষে কিন্তু নমঃদিগের মুখের জোর ও লাঠির বহর দেখিয়া মনের আক্রোশ তাহারা মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইলেন।

এক বৎসর চেষ্টার ফলে বৃদ্ধ মণ্ডলের বাল-বিধবা কন্যার বিবাহ তাদেরই স্বজাতি একটা সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত ছেলের সহিত হইয়া গেল। সেই বিবাহে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ-কায়স্থ যুবক যোগদান ও মিষ্টমুখ করিতে বিরত হয় নাই।

গ্রামবাসিগণ পুনরায় গোলযোগ বাধাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নমঃশূদ্রদিগের বিক্রম দেখিয়া পূর্ব্ববারের ন্যায় সেবারেও পশ্চাৎপদ হইতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করেন নাই।

পাঁচ

পাঁচ বৎসর পরে

নমঃদিগের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় তাহাদের লেখা-পড়া ও চাষ-বাসের বহু উন্নতি হইয়াছিল। জমি-জমা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। একটা ছোট-খাট গোশালাও নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সেখানে বিশুদ্ধ ঘৃতও প্রস্তুত হইয়াছিল। মৎস্য বিক্রয়ের জন্য কয়টা বড় দীঘিও জমা লওয়া হইয়াছিল।

সেবার আমরা একটা ছোট-খাট প্রদর্শনী বসাইয়াছিলাম। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে নিমন্ত্রণ করায় তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার উদ্বোধন কালতে আসিয়াছিলেন। কৃষি-জাত দ্রব্যাদির উন্নতিদর্শনে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং মুক্তকণ্ঠে মেয়েদের শিল্পকর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

[illegible] মণ্ডলের জামাতা আমারই উদ্যমে [illegible] তাহাদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহারই ফলে তাহারা যাহা কিছু উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, ইত্যাদি সুখ্যাতি সাহেবের নিকট করায় তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়া আমার করমর্দ্দন করিলেন। আমি লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিলাম।

তিনি বলিতে লাগিলেন—"বাবু, বাঙ্গালী যুবকেরা চাকুরীতে সময় ও স্বাস্থ্য নষ্ট না করে যদি আপনার ন্যায় এই রকম কাজে মন দেয় তা হ'লে তাদের দেশ অনেকটা অগ্রসর হ'তে পারে। আমি বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্টে আপনার প্রশংসা করে' রিপোর্ট পাঠাব এবং কাজের পুরস্কার স্বরূপ যাতে আপনাকে কোন উপাধি দেওয়া হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকৃব।"

আমি বিনীতকণ্ঠে বলিলাম—"সাহেব, ওই বিষয়ে আমায় ক্ষমা করবেন। খেতাব পেলে হয় তো মাথা ঠিক্ রাখ্‌তে পার্‌ব না। তার চেয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন—আমি যেন জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত নিঃস্বার্থ-ভাবে এই রকম করে' কাজ কর্‌তে পারি।"

সাহেব আমার মুখের দিকে চাহিলেন; কি দেখিলেন জানি না, হাসিয়া পিঠ্ চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন—"ভেরী নাইস বাবু, ভেরী নাইস! ভাল কথা বাবু বেশ ভাল কথা, আপনি একজন সত্যকার মানুষ।"

তারপর তিনি পুনরায় আমার করমর্দ্দন করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

সাহেব চলিয়া গেলে আমি মণ্ডলের জামাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম। সে কেবলই হাসিতে লাগিল।

আমি ঊর্দ্ধে চাহিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"হে ঠাকুর, নিন্দা-প্রশংসার অতীত করে' আমায় আরও কর্ম্ম কর্‌বার শক্তি দাও প্রভু!"

বিজুড়ের ভাঁড়ারপোতা

শ্রীহরিহর শেঠ
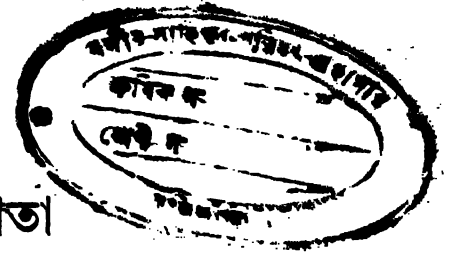
আজ যে বিষয়টী লইয়া লিখিতে বসিয়াছি ইহা সাহিত্যের কোন্ শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারে, এ কথার উত্তর দিতে হইলে একটু বিপদ আছে। বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত বিজুড় গ্রামের শ্রীযুক্ত ননীলাল গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন সামন্ত মহাশয়ের সাদর-নিমন্ত্রণে প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক কোন গবেষণার উদ্দেশে আমরা তথায় বেড়াইতে যাই। প্রত্নতত্ত্বের কোন আবিষ্কার তো দূরের কথা, এমন কোন নূতন তথ্যেরও সন্ধান পাই নাই যাহাতে ইহাকে প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে স্থান দিতে পারা যায় বা ইহাকে যদি ভ্রমণই বলা যায়, তাহা হইলে ইহার মধ্যে এমন কোন বিশেষ বৃত্তান্ত নাই, যাহা বিস্মৃত যুগের ইতিহাসে নূতন আলোকপাত করিবে।

ভাঁড়ারপোতার দৃশ্য

সাধারণতঃ বিজুড় বলিলেও গ্রামের নাম কৃষ্ণনগর-বিজুড়, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের মেমারি ষ্টেশন হইতে ইহা প্রায় ছয় মাইল হইলেও গাড়ির পথ দিয়া অর্থাৎ সাতগাছিয়া হইয়া যাইতে হইলে প্রায় দশ মাইল। পূর্ব্বের কথামত ষ্টেশনে একজন ভদ্রলোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত যশোদাবাবুর সহোদর। আমরা যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় বারটা, সুতরাং চৈত্র মাসের মধ্যাহ্ন, গরম বেশই পড়িয়াছে। সুবিধার মধ্যে আজকাল সুদূর পল্লীপ্রান্তেও বাস্ মোটরের অভাব নাই। একখানি ট্যাক্সি লইয়া প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বিজুড়-পল্লী মধ্যে আমাদের গন্তব্য স্থান সামন্ত মহাশয়দের বাটীতে পৌঁছিলাম।

ভাঁড়ারপোতার সমবেত গ্রামবাসী

সামন্তরা এক সময় খুবই খ্যাতিপন্ন ছিলেন, এখনও গ্রামে তাঁহাদিগকে সাধারণে অনেকটা সম্ভ্রমের চোখে দেখিয়া থাকেন। গ্রামের মধ্যে পাকা বাড়ী বলিতে তাঁহাদের বাড়ী এখনও উল্লেখযোগ্য। আমরা তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপে উপবেশন করিতেই পল্লীর কতিপয় ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়া গ্রামের অবস্থার কথা যাহা শুনিলাম, তাহাতে দুঃখ হইল। পূর্ব্বে যে সব বর্দ্ধিষ্ণু লোকদের এখানে বাস ছিল, তাঁহাদের সকলেরই প্রায় বিষয়-বৈভব সমস্তই গিয়াছে; কোন কোন

বংশ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কোন কোন বংশে শিবরাত্রির শলিতার ন্যায় দুই-একজন আছেন মাত্র। ম্যালেরিয়াই এই ধ্বংসের প্রধান কারণ। এখন গ্রামের লোকসংখ্যা এক হাজারও নয়, তার মধ্যে অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ সাঁওতাল। এই স্বল্প-সংখ্যক অধিবাসীদের শিক্ষার জন্য না আছে ভাল বিদ্যালয়, চিকিৎসার জন্য না আছে যোগ্য চিকিৎসক। এখনও দুই-চারিটী বড় বড় পুষ্করিণী যাহা আছে তাহার অবস্থা শোচনীয়, তবে চারি-পাঁচটী টিউব্‌ওয়েল্ হওয়ায় এখন পানীয়-জলের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। আসিবার কালে পথে, ঘাটে, চালা-ঘরের দাওয়ায় যে কতিপয় যুবক বালক বা প্রৌঢ়ের নয়নগোচর হইল, তাহাদের একজনকেও সবল ও সুস্থ দেখিলাম না। শুনিলাম্ ইউনিয়ন্-বোর্ডের সুযোগ্য উৎসাহী সভাপতি শ্রীযুক্ত গোপালদাস দত্তের চেষ্টায় পথ, ঘাটপ্রভৃতির উন্নতি হওয়া যাহা সম্ভব তাহা হইয়াছে। তাঁহারই উদ্যোগে গ্রামের নিকটেই সম্প্রতি এক মহীয়সী মহিলার বদান্যতায় একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। শীঘ্র উহার প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। প্রায় ঘণ্টাধিককাল ধরিয়া গ্রাম্য ভদ্রলোক-দিগের নিকট হইতে এখানকার পূর্ব্বগৌরব ও বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা শুনিলাম।

শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন সামন্তের বাটীতে রক্ষিত রামসীতাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা

প্রথমেই বলিয়াছি প্রত্নতত্ব-বিষয়ক গবেষণার জন্যই সেখানে গিয়াছিলাম। প্রায় ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সামন্ত-বংশের অধুনামৃত আমার এক আত্মীয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম এখানে ভূগর্ভে পুরাকালের এক সমৃদ্ধিশালী রাজার বাড়ী আছে এবং তন্মধ্যে বহু ধনরত্ন ও যক্ষের ধন লুক্কায়িত আছে। সেই স্থানে অতীত যুগের পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির কোন কোন নিদর্শন তখনও পরিলক্ষিত হইত। তখন আমার বয়স নিতান্ত কম না হইলেও, এখনকার মত পুরাতনের প্রতি মোহ তখন তত বেশী ছিল না, সুতরাং এ বিষয়ে তেমন করিয়া চিন্তা কোনদিন করি নাই। কখন কখন কথাটা মনে উঠিত কিন্তু আবার উহা বিস্মৃতির গর্ভেই বিলীন হইয়া যাইত। যশোদানন্দনবাবুর নিমন্ত্রণ-পত্রখানি পাইয়াই আমার সেই পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল। শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় এজন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন, আসিতে লিখিলাম। কয়েক দিন পরে তিনি সেখানে প্রাপ্ত একটী রৌপ্যমুদ্রার ছাপ-মারা একখণ্ড কাগজ লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়া, যাইবার ইচ্ছা আগ্রহে পরিণত হইল। তখন দেহের কথা ভুলিয়া গরমের কথা ভুলিয়া, তাঁহাদের সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দিলাম এবং নির্দ্ধারিত দিনে আমরা তথায় গেলাম। আমরা বলিতে, আমার ভ্রমণের বিশিষ্ট সহচর ক্যামেরা-সহ বন্ধুবর নারায়ণচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও আমি।
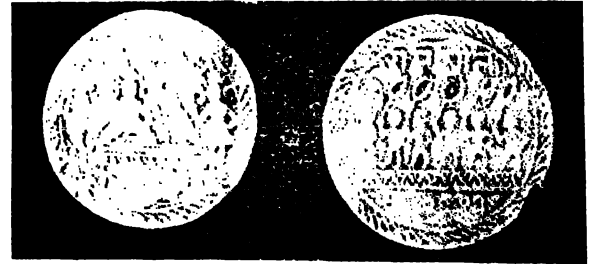
শ্রীযুক্ত নন্দলাল দত্তের প্রাপ্ত বৃহদাকার রৌপ্যমুদ্রা

সামন্তদের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া যতক্ষণ কথা হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রাচীন জনপদের যে একটা অস্পষ্ট কিংবদন্তী অনেকের মস্তিষ্ক মধ্যে আছে তাহার কথাই সমধিক। সে সকলের সারমর্ম্ম—কালুরাম রায়, কলিঙ্গ রায় বা কালুরায় নামে প্রাচীনকালে এখানে এক রাজা ছিলেন। মায়ানদী নামক নদীতীরে তাঁহার প্রাসাদ ছিল। সে স্থানে সময় সময় অনেকগুলি পুরাতন স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, এক সময় অতি মূল্যবান্ হীরকাদিও পাওয়া

গিয়াছিল। এখানে যে কল্যাণপুর, কোঁদা, করোরি, কালিটিকুরি, কৃষ্ণনগর-বিজুড় প্রভৃতি গ্রামগুলি আছে ইহা পূর্ব্বোক্ত রাজার নামের আদ্যক্ষর লইয়াই নামকরণ হইয়াছিল, এখানকার লোকের ইহাই বিশ্বাস। প্রাচীনতার নিদর্শন হিসাবে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট একখানি বর্দ্ধমান রাজ-সরকারে পেশ-করা দলিলের অনুলিপি দেখিয়া জানা যায় যে, বাঙ্গলায় বর্গীর হাঙ্গামার পূর্ব্বেও এই গ্রাম বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। তিনি বর্দ্ধমান-রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায়-প্রদত্ত ১১০৯ সালের একখানি সনন্দও দেখাইলেন। উহার মর্ম্ম এই যে, রাজাবাহাদুর গ্রামের গোস্বামী বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষকে কয়েকখণ্ড দেবোত্তর জমি দান করিয়াছিলেন
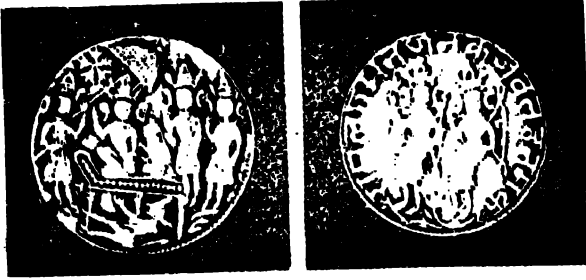
শ্রীযুক্ত নন্দলাল দত্তের প্রাপ্ত রামসীতাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা

সময়ের অল্পতা-হেতু আমরা আর বিলম্ব না করিয়া একটা ছাতা হস্তে বাহির হইলাম। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই আমাদের সহিত চলিলেন। গ্রামের ভিতর পল্লী-পথ ধরিয়া প্রায় দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মাঠে গিয়া পড়িলাম। কোথাও মাঠ, কোথাও আইল ধরিয়া সেই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে গ্রামের বিগত-বৈভবের লুপ্তকাহিনী শুনিতে শুনিতে এ্কটী স্থানে পেঁাছিলাম। শুনিলাম, পূর্ব্বে এই স্থানে একটী নদী ছিল; পূর্ব্বে যে মায়ানদীর কথা শুনিয়াছিলাম, ইহা পূর্ব্বে এইখানেই অবস্থিত ছিল। ঐ লুপ্ত নদীর আকার পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহা এখন ঠিক করিতে না পারিলেও বুঝা যায় সে স্থানটী এক সময় নদীগর্ভেই ছিল। নিকটে এমন-কি বহুদূর পর্য্যন্ত একখানিও ইটকালয় না থাকিলেও এখানে স্থানে স্থানে দুই-পাঁচখানি ইট দেখিতে পাইলাম। উপস্থিত জনগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, এসব ইষ্টক অতি পুরাতন; ইহা 'কেলে ধান' নামক একপ্রকার ধান্য-মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত হইত। তাঁহারা দুই-একখানি সেই ইট ভাঙ্গিয়া ভিতরে পোড়া ধান্যের চিহ্ন আমাদের দেখাইলেন। সেগুলি কত পুরাতন জানি না, কিন্তু এরূপ ইট পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই বা এরূপভাবে প্রস্তুত ইটের কথা পূর্ব্বে কখনও শুনিও নাই।

এই নদীর তীরেই কালুরাজার প্রাসাদ ছিল বলিয়া এখানকার লোকেদের বিশ্বাস। এস্থান হইতে অগ্রসর হইয়া ক্রমে একটু অসমতল উচ্চভূমিতে উঠিতে লাগিলাম। এখানকার মাটির সহিত ছোট ছোট ইষ্টক ও চূর্ণ-মৃৎপাত্র-সকল মিশ্রিত। তাহা দেখিয়া পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহের তুলনায় এখানকার স্বাতন্ত্র্য বেশ বুঝা যায়। এখানে পূর্ব্বোক্ত রাজার বাড়ী ছিল কি না ইতিহাস হইতে কিছুই জানিতে পারা না গেলেও এখানে যে একটা প্রাচীনরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার ভিতর এই স্থানটীকে লোকে 'ভাঁড়ারপোতা' বলে। মহানদ ও দ্বারবাসিনীতে 'ধনপোতা' নামক দুইটী স্থান আছে। বর্দ্ধমান জেলার পাণ্ডুক নামক গ্রামে 'রাজারপোতা' নামে আর-একটী স্থান আছে। জনপ্রবাদ, তথায় পুরাকালের হিন্দুরাজাদের সময়ের সঞ্চিত ধনরাশি এখনও

লক্ষ্মীকান্ত রায়ের সুবৃহৎ পুষ্করিণী
(তীরে হস্তী চরিতেছে)

মৃত্তিকাতলে নিহিত আছে। এই স্থান-সম্বন্ধেও কিংবদন্তী ঐরূপ। শুনিলাম এই নাম পূর্ব্বাপর সকলেই শুনিয়া আসিতেছেন।

মেনকাক্ষিদহের নিকট বুড়াশিবের মন্দির

আমরা সেই অল্পোচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর বৃক্ষলতা ভেদ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। একটী বৃহৎ বৃক্ষের তলে একটী স্থান দেখাইয়া অনেকেই বলিলেন সেখানে পূর্ব্বে তাঁহারা একটী ইঁদারা দেখিয়াছেন, এখন তাহা ক্রমে মাটি-চাপা পড়িয়াছে। এই বিশিষ্ট স্থানে বহুসংখ্যক পুরাতন মুদ্রাদি প্রাপ্তির কথা প্রথমাবধিই শুনিয়া আসিতেছি। সামন্তদের বাড়ীতে বসিয়া তাঁহাদের প্রাপ্ত একটীমাত্র মুদ্রা দেখিয়াছিলাম। সেটী দেখিয়া সাধারণতঃ বেদিয়াদের নিকট রামচন্দ্রী টাকা বলিয়া যে রৌপ্যমুদ্রাগুলি দেখিতে পাওয়া যায় উহা তাহারই একটী খুব পুরাতন বলিয়া মনে হইল। গোস্বামী মহাশয় যে মুদ্রার ছাপ লইয়া গিয়াছিলেন তাহাও এইরকমের কোন মুদ্রারই উপর কাগজ রাখিয়া দাগ করা। স্বর্ণ মুদ্রাগুলি যাঁহারা যাঁহারা পাইয়াছিলেন সকলেই প্রায় গালাইয়া বা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন, শুনিলাম। তাঁহাদের কথা হইতে দুই-তিন জনের নিকট কতিপয় রৌপ্যমুদ্রা আছে এবং হয় তো স্বর্ণমুদ্রাও থাকিতে পারে, এইরূপ আশা পাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কল্যাণপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামে গমন করিলাম।

সেই গ্রামে যাইতে যাইতে এবং তথায় গিয়াও জানিলাম, স্বর্ণমুদ্রা যে যে ব্যক্তি পাইয়াছিলেন তাহা আর তাঁহাদের নিকট নাই। হয় বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন, না হয় গলাইয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়াছেন। আমরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী গৃহস্থের চালার বাহিরে মাটির দাওয়ায় বসিলাম। আমরা একে সেখানকার নূতন লোক, তাহার উপর সঙ্গে বালকবৃন্দ এত লোক থাকায় বেশ বুঝিতে পারিলাম গ্রাম মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আর যাঁহাদের কাছে প্রাপ্তমুদ্রা আছে বলিয়া অনেকেই জানে, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া যে সব উত্তর পাওয়া যাইতে লাগিল তাহাতে বেশ মনে হইল তাঁহাদের কাছে থাক আর নাই থাক, তাঁহারা কখন যে পাইয়াছিলেন সে কথাও অনেকে গোপন করিতেছেন এবং যদি থাকে ভয়ে উহা আনিতেছেন না।

বুড়াশিব মন্দিরের সান্নিধ্যে ভগ্ন দেব-দেবী মূর্ত্তি

কতিপয় লোকের নিকট সন্ধান করার পর সেই গ্রামের নন্দলাল দত্ত নামক এক ব্যক্তি দুইটী রামসীতা অঙ্কিত মুদ্রা—একটী আমেরিকার ডলারের মত বড় ও মোটা অপরটী আকারে পয়সার মত কিছু মোটা—আনিয়া

উপস্থিত করিলেন। আরও জানিতে পারিলাম অনেকের নিকট এইরূপ মুদ্রা আছে, যাহা পূর্ব্বোক্ত ভাঁড়ারপোতা ও নিকটস্থ স্থানে পাওয়া গিয়াছে। যতক্ষণ মুদ্রাগুলি দেখি নাই ততক্ষণ উহা দেখিয়া না জানি কি তথ্যে উপস্থিত হইব এই মনে করিয়া কতই আশান্বিত হইয়াছিলাম; কিন্তু সত্য বলিতে কি, রৌপ্য মুদ্রাগুলি দেখার পর একেবারেই নিরাশ হইলাম; কারণ এ প্রকার মুদ্রা পূর্ব্বে অনেক দেখিয়াছি, আমার নিজের সংগ্রহের মধ্যেও আছে। ওগুলি সত্যকার কোন মুদ্রা নহে। পূর্ব্বে অনেকে বিনিময়ের জন্য এরূপ মুদ্রা প্রস্তুত করাইত।

রামসীতা ক্ষোদিত স্বর্ণমুদ্রা কখন দেখি নাই বা ওরূপ স্বর্ণমুদ্রার কথা কখন শুনি নাই, সুতরাং একটী এইরূপ মুদ্রা দেখিবার জন্য বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল। অনেককে বলিলাম, অনেকে সন্ধানও করিলেন, কেহ দেখাইতে পারিলেন না। শুনিলাম লক্ষ্মী দুলে নামক একব্যক্তি একটা ভাণ্ডে কয়েকটা মোহর এবং কাশীনাথ রায় নামক একব্যক্তি একটী মোহর পাইয়াছিলেন। কেবল ননীলাল স্বর্ণকার নামক এক ব্যক্তির কাছে একটী এরূপ মুদ্রা আছে, ইহা জানিতে পারিলাম। তাঁহার বাড়ী বিজুড়ে, পল্লীর ভিতরেই —গ্রামস্থ একজন ভদ্রলোক জামিন হইলে আমরা পূর্ব্বোক্ত রৌপ্যমুদ্রা দুইটী ফেরৎ দিবার কড়ারে লইয়া ফিরিলাম।
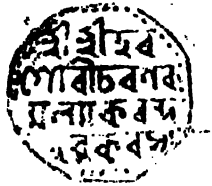
আসামের রাজা গৌরীনাথ-নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা

ফিরিবার পথে গ্রামের বিগত সম্পদের নিদর্শন জমিদার লক্ষ্মীকান্ত রায়ের কমলদলময় সংস্কারহীন সুবৃহৎ পুষ্করিণী, দুই-একখানি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, মেনকাক্ষি-দহের নিকট গ্রামের জাগ্রত দেবতা বুড়াশিবের মন্দির, প্রস্তর-নির্ম্মিত কতিপয় ভগ্ন-অভগ্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিয়া ফিরিলাম। বুড়াশিব অনাদিলিঙ্গ, ইঁহার সম্বন্ধে গ্রামবাসীর বিশ্বাস, বৃষ্টি না হইলে যে স্থানে শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন সেই চৌবাচ্চার মত স্থানে জলপূর্ণ করিয়া দিলেই বারিপাত হয়। এই মন্দির দেখিয়া ফিরিবার সময় পথে জনৈক পল্লীবাসী তাহার সংগৃহীত দেশী-বিদেশী মুদ্রাগুলি আনিয়া আমাদের দেখাইলেন। দেখিলাম, সেগুলি প্রায়ই ভিন্ন দেশীয়, তন্মধ্যে একটী বাঙ্গলা অপর দুইটী ফার্সী ভাষায় লিখিত। ফিরাইয়া দিবার চুক্তিতে এই তিনটী লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার বাটী হইয়া, তাঁহাদের কারুকার্য্যময় প্রাচীন দোলমঞ্চ দেখিয়া সামন্তদের বাটীতে ফিরিলাম। বলা বাহুল্য, তিনি মিষ্টমুখ না করাইয়া ছাড়িলেন না। কিন্তু এখানে আসিয়া কঠিনতর সমস্যায় পড়িলাম। তখন পিপাসায় কাতর হইলেও ভোজনের স্পৃহা আদৌ ছিল না, কিন্তু গৃহস্বামীর আগ্রহ ও সরল আতিথেয়তার অনুরোধ অমান্য করা অসাধ্য হইল। সুতরাং জলযোগ সারিয়া বাটী ফিরিবার জন্য তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম। আসিবার কালে গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণকারের নিকট হইতে সেই স্বর্ণমুদ্রাটী চাহিয়া দিলেন। উহার মালিক বলিলেন, তাঁহার পিতা ইহা এই গ্রামেই পাইয়াছিলেন। মুদ্রাটী হাতে পড়িবামাত্র বুঝিলাম ইহা কোন হিন্দু রাজাদের সময়ের একটী যথার্থ মুদ্রা, কিন্তু সত্য গোপন করিব না, স্বর্ণকারের কথা হইতে কেমন একটু খোঁকা হইল যে, ইহা তাঁহার পিতার সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু এখানে তিনি পাইয়াছিলেন কি অন্যত্র কাহারও নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন। যাহা হউক নূতন জিনিসটী পাইয়া মনে বেশ একটু আনন্দ হইল। চৈত্রমাসের মধ্যেই উহা ফেরৎ দিতে স্বীকৃত হইয়া মুদ্রাটী লইয়া আসিলাম। গোস্বামী মহাশয় ষ্টেশনে যাইবার জন্য আমাদের সহিতই মোটরে উঠিলেন। আসিতে আসিতে তাঁহার সহিত গ্রামের কথা আলোচনা করিতে করিতে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

এই ভ্রমণ বা অভিযানের মধ্যে অবশ্য বলিবার মত এমন কিছুই নাই; তাহা হইলেও যে অনুমানের বা কিংবদন্তীর কথা ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারি এমন ধারণা লইয়া ফিরিলাম না। যেসকল কথা শুনিলাম তাহার সত্য-মিথ্যা আমি নির্ণয় করিতে না পারিলেও, জঙ্গলময় উচ্চভূমির তলে কোন

লুকান ধনরত্ন বা রাজ-প্রাসাদের ভিত্তিমূল বা প্রোথিত প্রাসাদের অস্তিত্ব আছে দুই-চারি ঘণ্টার মধ্যে এ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারিলেও আগ্রহান্বিত গ্রামবাসীদের সামর্থ্যানুযায়ী খনন-কার্য্যের দ্বারা একটু অনুসন্ধান করিতে এবং প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগকে এ স্থানটী একবার দেখিতে বলিতে ইচ্ছা হয়।
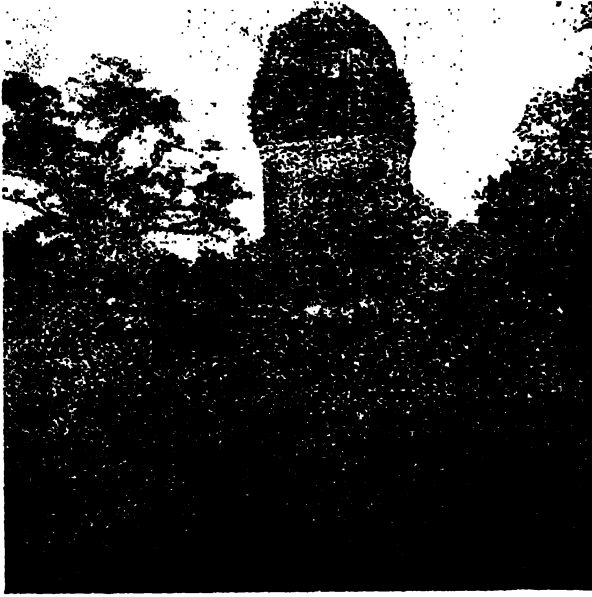
গোস্বামী মহাশয়দিগের প্রাচীন দোলমঞ্চ

যে মুদ্রাগুলি আনিয়াছিলাম তাহার মধ্যে রামসীতা দুইটী আমার নিজের গুলির সহিত মিলাইয়া দেখিলাম প্রায়ই এক। ফার্সী লেখা দুইটাও দেখিলাম আমার আছে; উহা মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের কোম্পানীর প্রস্তুত মুদ্রা। সমস্ত মুদ্রাগুলি-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য সেগুলি লইয়া একদিন যাদুঘরের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুরের নিকট গমন করি। তিনি নিজে দেখিয়া এবং প্রাচীন মুদ্রা বিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত কথা কহিয়া বলিলেন, বাঙ্গলা লেখা রৌপ্যমুদ্রাটী আসামের ১৭৮০-৯৫ খৃষ্টাব্দের দেশীয় নৃপতির নামাঙ্কিত মুদ্রা। উহার একদিকে লিখিত আছে;—"শ্রীশ্রীস্বর্গদেব গৌরীনাথ সিংহ নৃপস্য সক ১৭১" অপর দিকে,—

"শ্রীশ্রীহরগৌরী চরণকমলমকরন্দমধুকরস্য।" এ মুদ্রাটী সম্বন্ধে কোন কথাই নাই, কারণ উহা একজন মুদ্রা-সংগ্রাহকের সংগ্রহ মাত্র, কোথা হইতে পাইয়াছেন তাহার স্থিরতা নাই।

সমুদ্রগুপ্তের সময়ের বাঘাসনা
শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী-অঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রা

সুবর্ণমুদ্রাটী হাতে লইয়াই চন্দ মহাশয় বলিলেন ইহা গুপ্ত রাজাদের মুদ্রা, সমুদ্র গুপ্তের সময়ের। তিনি ভিনসেণ্ট স্মিথের প্রাচীন মুদ্রা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ খুলিয়া উহার অনুরূপ চিত্র দেখাইলেন; উহার একদিকে আছে;—

রাজা বামদিকে দণ্ডায়মান আছেন, বামহস্তে শূলধারণ করিয়া আছেন, দক্ষিণহস্তে বেদীর উপর ধূনা দিতেছেন। বামে গরুড়ধ্বজ। বামহস্তের ঠিক নিম্নে সমু (সমুদ্র) এবং অপর পার্শ্বে তত্ববিজয়জিতা লিখিত আছে।

মুদ্রার অপর দিকে;—পদদ্বয় পদ্মোপরি রাখিয়া দেবী সম্ভবতঃ লক্ষ্মী সিংহাসন-উপবিষ্টা। দক্ষিণদিকে লেখা আছে পরাক্রমা এবং একটী মনোগ্রাম আছে।

শুনিলাম হেষ্টিংসের সময় কালীঘাটে গুপ্ত রাজাদের সময়ের কতিপয় সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত মুদ্রার বিষয় অধিক কিছু বলিবার বা গবেষণার দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত সামর্থ্য ও সময় আমার নাই। ১৩২১ সালে বর্দ্ধমানে যে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল তাহার ইতিহাস-শাখায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় এম্‌.এ, বি-এল্ পঠিত "রাজার পোতা" ও "বারাসত" নামক একটী প্রবন্ধে, বর্দ্ধমান হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে পাণ্ডুক নামক একগ্রামে একদিকে লক্ষ্মীমূর্ত্তি অপর দিকে গুপ্তাক্ষরে "নরেন্দ্র গুপ্ত" লেখাঙ্কিত একটী সুবর্ণমুদ্রা প্রাপ্তির কথা জানা যায়।*

* শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

জগতে গ্রন্থাগার আন্দোলন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কুমার শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

নরওয়ে

[গত মাসে আমরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে উহার আরও কয়েকখানি চিত্র এইবারের প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইল।]

সুইডেনের সহিত নরওয়ে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। শতাব্দী পূর্ব্বে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে নরওয়ে-গভর্ণমেণ্ট রাজ্যস্থিত এক পুস্তকাগার হইতে এক পুস্তক লইয়া জনৈক মৎস্যজীবী বালক উত্তরকালে অধ্যাপকের পদলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বালকটী নরওয়ে দেশে জন্মগ্রহণ করে। ১৪ বৎসর বয়সে বালকের পিতা তাহাকে আর স্কুলে পড়ান বৃথা বলিয়া তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া নরওয়ের উত্তরাংশে নির্জ্জন সমুদ্রে তাহাকে মৎস্য
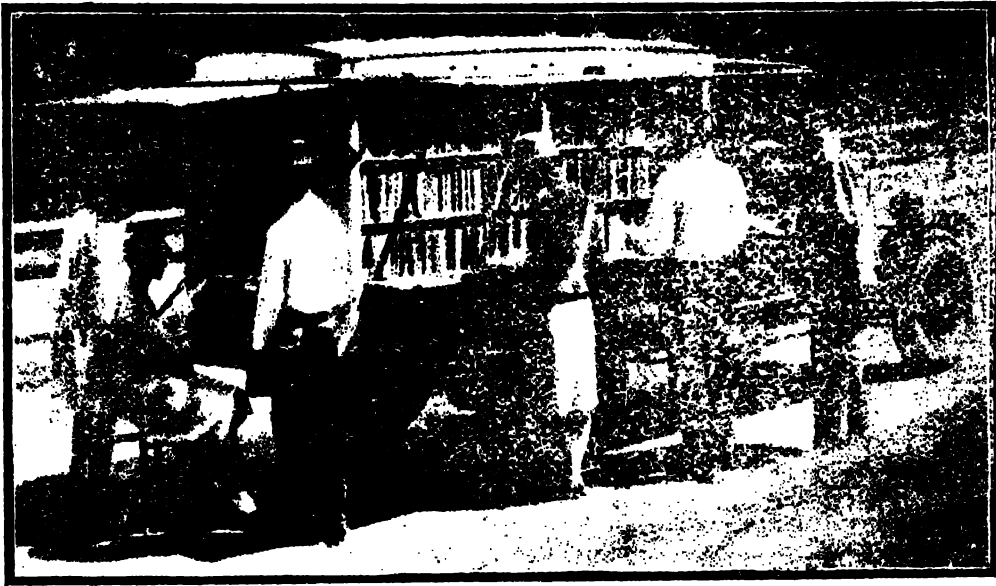
আমেরিকার একটী ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার

লাইব্রেরীগুলিকে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানসময়ে নরওয়ে রাজ্যে ৬০টী মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী এবং এক সহস্রাধিক পল্লী-লাইব্রেরী আছে। শিক্ষা-মন্ত্রীর অধীনে পৃথক্ লাইব্রেরী-অফিস আছে। এই বিভাগ হইতে লাইব্রেরীগুলিকে যথাযোগ্য অর্থ-সাহায্য এবং উন্নত প্রণালীতে লাইব্রেরী পরিচালিত হইতেছে কি না তাহা তদন্ত করা হইয়া থাকে। নরওয়ে গভর্ণমেণ্ট নানাস্থানে চলন্ত লাইব্রেরী প্রেরণের এবং নরওয়ের প্রত্যেক বন্দরে নাবিকগণের মধ্যে পুস্তক-বিতরণের জন্য পুস্তকাগারের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছে। নরওয়ের উত্তর সমুদ্রোপকূলের এইরূপ

আমেরিকার গ্রন্থাগার—১নং চিত্র

ধরিবার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। বালক মৎস্য ধরিয়া বেড়াইত বটে, কিন্তু সুযোগ পাইলে সমুদ্রতীরবর্ত্তী পুস্তকাগার হইতে পুস্তক লইয়া পড়িত। এই পুস্তকাগারে ভাল ভাল পুস্তক রাখা হইত। নূতন পুস্তক বাহির হইলেই সেখানে পাঠান হইত। বালক আগ্রহসহকারে সেই সব বই পড়িয়া ফেলিত। ২৩ বৎসর বয়সে বালক আমেরিকা গিয়া একটী স্কুলে ভর্ত্তি হয় এবং ২৮ বৎসর বয়সে ডিগ্রী লাভ করিয়া অধ্যাপকের কার্য্যলাভ করে। সেই বালক এখন St Olafs' Collegeএর বিখ্যাত অধ্যাপক Professor Rolvaag। এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। মান্দ্রাজে জনৈক প্রতিভাশালী বালক রাস্তার আলোক সাহায্যে পুস্তক পড়িয়া উত্তরকালে হাইকোর্টের জজের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।
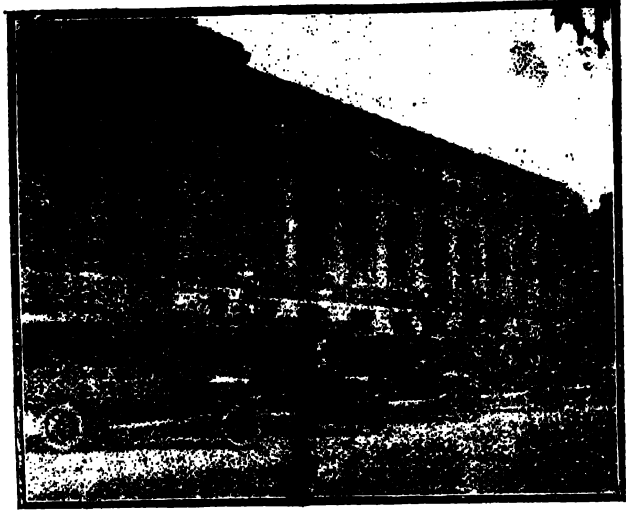
আমেরিকার গ্রন্থাগার—২নং চিত্র

আমেরিকার গ্রন্থাগার—৩নং চিত্র

হয়। নরওয়ের বর্ত্তমান ১২০০ সাধারণ পাঠাগারে চৌদ্দ লক্ষ পুস্তক আছে। নাগরিক লাইব্রেরীর সংখ্যা ৬৩, তাহাদের পুস্তক-সংখ্যা আট লক্ষ। নরওয়ে দেশটী পর্ব্বতবহুল, ছোট-বড় শৈলমালায় সমগ্র দেশটী আচ্ছন্ন, হ্রদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে—কাজেই এক জেলা হইতে অন্য জেলায় যাতায়াতের পথ অতিশয় দুর্গম। এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানহেতু জনবিরল স্থানের জন্যও লাইব্রেরীর বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এত প্রাকৃতিক অসুবিধা সত্ত্বেও সেখানে লাইব্রেরীর কার্য্যে কোনরূপ শৈথিল্য দেখা যায় না।
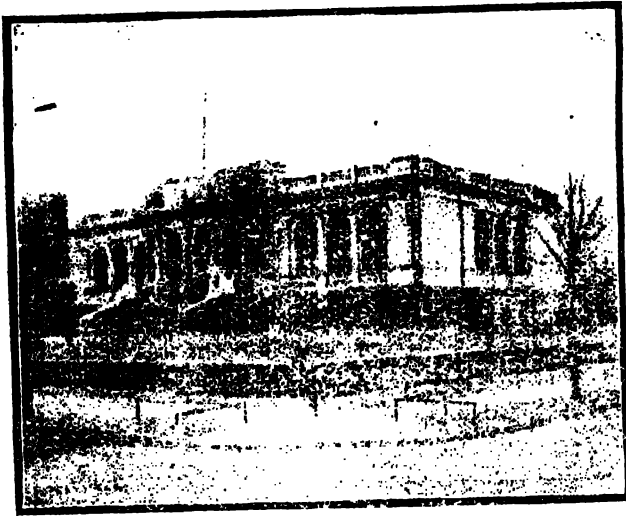
বর্ত্তমান সময়ে নরওয়ের লাইব্রেরীগুলিতে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ হইতেছে বার্ষিক দেড় লক্ষ ক্রোনার অর্থাৎ এক লক্ষ টাকা। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে নরওয়েতে Worship and Instruction মন্ত্রীর অধীনে প্রথম লাইব্রেরী-বিভাগ স্থাপিত হয়। এই বিভাগ হইতে লাইব্রেরীর সাহায্য-বিতরণ ও পরিদর্শন-কার্য্য হইয়া থাকে। ডিউই (Dewy) প্রণালী-অনুযায়ী পুস্তক তালিকা মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত

ছেলেদের পাঠ-স্পৃহা বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রত্যেক লাইব্রেরীতেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য গল্পের ক্লাস বসিয়া থাকে। স্কুলের লাইব্রেরীয়ান্‌গণই এই সব গল্পের ক্লাস পরিচালনা করেন। এই সব ক্লাসের চিত্তাকর্ষক গল্পের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে জ্ঞানলিপ্সা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়া থাকে। পাঠকেন্দ্র (study circle) বক্তৃতা ও নাটকাদির অভিনয়ের দ্বারাও জনশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

ভেরী-বাদক

(চিত্র)

অধ্যাপক শ্রীফণীভূষণ রায়

ভেরী-বাদক সেদিন বাগানে ইতস্ততঃ পায়চারি কচ্ছিল আর মাঝে মাঝে ঘাড় উঁচিয়ে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল।

সকলেই ঠাট্টা করে' ওকে 'ভেরী-বাদক' বলে ডাকত। গরম দিনের বিকাল-বেলায় পথে বেরিয়েছে নদীর ধারে বেড়াতে—তখন কি না সৈন্য-দল-হ'তে-আনা "তূরীটা" নিয়ে বাজাতে সুরু করে এবং তালে তালে পা ফেলে ফেলে চলে! খুব যে মনের সুখে বাজিয়ে যায় দেখলেই বোঝা যেত—আসন্ন সন্ধ্যায় তার সেই বেসুরো সঙ্গীতের রেশ সূর্য্যাস্তের আকাশকে ছেয়ে ফেলত এবং নদীর স্থির জলের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে দূর-দূরান্তরে গিয়ে পৌছাত।

শহরের বাইরে একটা কুঁড়ে-ঘরে থাকে—কুঁড়ে-ঘরটা তাসের প্রাসাদের মতই পতনশীল—একটা ভাঙ্গা নৌকার তক্তা দিয়ে কোনও রকমে জোড়া-তাড়া দিয়ে দাঁড় করান। একখানা মরচে-পড়া লোহার পাত "খট্টা"র কাজ চালায়—শীতের রাত্রিতে ঐ লৌহ-শয্যায় শুলে তুহিনস্পর্শে হাড় কাঁপিয়ে দেয়—আর গরম দিনে মনে হয় অগ্নিশয্যা—রৌদ্রে তাতা সেই লোহার খাটে শুলে আধ-সিদ্ধ হ'য়ে যাবার ভয় থাকে।

"আর্সেনাল" ঘিরে যে লম্বা শাদা দেওয়াল চলেছে তো চলেছেই সেটা হঠাৎ শেষ হ'য়ে যায় পাহাড়ের এই দিক্‌কার দ্রাক্ষাকুঞ্জে—সেই দেওয়ালে-ঠেস-দিয়ে-দাঁড়ান একখানা ঘর—ওখানকার সরাইখানা। হিংস্র জন্তুর মত লম্বা-গলা কামানগুলার নীচে ঘরখানা যেন ভয়ে জড়সড় হ'য়ে আছে। নীচু দরজার একগোছা শুকিয়ে-যাওয়া "জেনেট"-গাছের ডাল ইসারায় যেন পথিককে ডাকছে—কিন্তু সরাইখানার খাবার যা' মিলে তা' অখাদ্য।

ভেরী-বাদক তার স্ত্রীর সঙ্গে এসে "সরাই" খুলেছিল। সরাই খুলতে না খুলতেই খরিদ্দারও জুটেছিল মন্দ নয়—[illegible] আসে একদল মাঝিমাল্লা—গুণের দড়া তাদের কাঁধেই থাকে—বলে চট্‌পট্ এক এক গ্লাস দিয়ে দাও তো; ওদের দলের আর সব তখন ঠেলে ঠেলে নৌকো "লক্" পার করে। আর্সেনালের সৈন্যদের তো কথাই নাই। তারা ওখানে এসে "আড্ডা" জমায়। বারুদখানার সামনের ছোট্ট দরজা দিয়ে বেরিয়ে—দেওয়াল ঘেঁসে ঘেঁসে তারা আসে—ভয় যদি "আদজুতা (Adjutant) হঠাৎ দেখে ফেলেন। ওরা একবার এসে বসলে অনেকক্ষণ উঠতে চায় না—বাজী রেখে তাস খেলে—খেলার সঙ্গে চীৎকার হৈ রৈ—মনে হয় সরাইখানা উল্টিয়ে দিল আর কি! ওদের মাথায় কাপড়ের টুপী, ক্যানভাসের খাকী কোর্ত্তা—কোর্ত্তার পিছনে বড় বড় অক্ষরে লেখা "আর্ত্তিলারি" (Artillerie) দেখে হঠাৎ মনে হয়—ওরা জেল-পালান কয়েদী নয় তো!

ভেরী-বাদককে দেখলে মনে হয় না খুব অসুখী—একটা সন্তোষের হাসি তার শীর্ণ ঠোঁটে ভেসে ভেসে ওঠে—তার দারিদ্র্য-ক্ষীণ মুখখানিকে উজ্জ্বল করে—কিন্তু সে ছিল একেবারে নিঃস্ব, রিক্ত—জীবনের পথে অসহায় পশুর মত—বিরুদ্ধ ভাগ্যের মার তাকে অনেক খেতে হয়েছে...ঘোলাটে ঘোলাটে দু'টো চোখ—চোখের পাতা ফুলে রক্তবর্ণ—তার খাঁড়ার মত নাকের গা' বয়ে টপ্ টপ্ চোখের জল অনবরত গড়াচ্ছেই সে মাঝে মাঝে কোটের হাতা দিয়ে অন্যমনস্কভাবে মুছে ফেলে!

—"সুৎ"—ভেরী-বাদক চেঁচিয়ে উঠল—যাক এখন দু'একজন লোকের মুখ দেখা যাবে··

সকাল-বেলা থেকে যে ঝিমঝিমানি গা-কাঁপানি বৃষ্টি পড়ছিল—গাছপালা চতুর্দ্দিক্ অস্পষ্ট কুয়াসায় ঢেকে—এই থেমে আসে আর কি! পাহাড়ের চূড়ায় কুঁয়াসার শাদা আবরণ আস্তে আস্তে গড়িয়ে সরে যাচ্ছিল—পার্ব্বত্য দুর্গের আকাশ-উচ দেওয়াল পাহাড়ী দেবদারুর উন্নত শাখাগুলির

মাথা টপকিয়ে নজরে পড়ছিল—দেখাচ্ছিল যেন পাতা-ঢাকা শিকারী বাজের বাসা।

একপাল ছেলে-ছোক্‌রা—বুকে পিঠে এক-একখানা গরম কাপড় কোনমতে জড়ান—ভেরী-বাদকের কুঁড়ের আধেক-খোলা দরজার পথে "ক্রক" করে' বেরিয়ে এল—ও'রা হ'বে প্রায় ছ'-সাতজন—একই রকমের চেহারা—শণের মত কটা চুল—লম্বা লম্বা রোগাটে—পায়ের কাঠের জুতা কাঁকর-পথের উপর টেনে টেনে আস্‌ছিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে জায়গাটা ওদের কলরবে, কান্নায়, হাসিতে মুখর হ'য়ে উঠল···এমন সময় পায়ে পাথর ঠেকে ওদের মধ্যে একজন একেবারে উপুড় হ'য়ে পড়ে গেল—ওর হাত ধরাধরি করে' যারা ছিল—তারাও সঙ্গে সঙ্গে ভূমিসাৎ হ'ল...সঙ্গে সঙ্গে কি হো হো হাসি—হাসি আর থামে না। ওদের মধ্যে যা'রা একেবারে "বালখিল্য" তারা ভেরী-বাদকের কোর্ত্তা আঁকড়িয়ে ধরছিল ক্ষীণ মুষ্টির সবটুকু জোর দিয়ে—শীতের ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়ায় বেচারাদের কচি হাতগুলো বেজায় নীলাভ মেরে গেছল।

এক ঝলক রৌদ্র ফ্যাকাসে-রংয়ের মেঘ চিরে বেরিয়ে এল—"পপলার"এর উচ্চ শিরে পড়ে' জলজল্ করে উঠল—

"এবার আর কোন সন্দেহ নাই"—ভেরী-বাদক নিম্নস্বরে বল্‌ছিল—"ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গলদ্‌ঘর্ম্ম করে' দেবে সূর্য্যদেব।"

ছুটাছুটি কর্ত্তে কর্ত্তে—ওদের পোষাক এলোমেলো হ'য়ে গেল—পায়ের কাঠের জুতা কোথায় যে পড়ে রইল ঠিকানা নাই—গায়ের কাপড় এবং পরিধেয় বস্ত্রে এমন তাল পাকিয়ে গেল যে হাঁট্‌তে গেলেই পড়ে আর কি···তখন ভেরী-বাদক ভারী গলায় চেঁচিয়ে বল্ল—'যা, যা, ঘরের ভিতর যা—মায়ের কাছে নাক মুছে আয়···'

বালখিল্যদল ওর কথা মোটে আমলেই আনল না। ভেরী-বাদক যতই চীৎকার করে, ওদের কৌতুকের হাসি ততই প্রবল হ'য়ে ওঠে। ওদের মধ্যে যে'টী সব-চেয়ে ছোট—হাতখানি লম্বাও হ'বে না—সে ভেরী-বাদকের দিকে চেয়ে মুচ্‌কি হেসে এমন "হুৎ" করে' উঠ্‌ল যে আর সকলে হাস্‌তে হাস্‌তে গড়াতে লাগল

কপট ক্রোধের সহিত ভেরী-বাদক হাত উঁচিয়ে, চোখ পাকিয়ে চারদিক্ দেখতে লাগল—যেন আকাশ, পৃথিবী, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পদার্থনিচয়ের কাছে নালিশ জানাচ্ছে খুদে ছেলেটার দুঃসাহসের দরুণ—আকাশটাই কেন ভেঙ্গে পড়ে না!

আকাশের ভেঙ্গেপড়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না—একটা অজানা পাখী অপগতমেঘ, উজ্জ্বল-মধুর আকাশের বুকের ভিতর তীব্র চীৎকার করে' উড়ে গেল।

ভেরী-বাদক খুব গম্ভীর স্বরে—আঙ্গুল নেড়ে নেড়ে একটা অদম্য হাসি চেপে রাখবার জন্য ঠোঁট কাম্‌ড়িয়ে বল্‌তে লাগল—'বাপ্! ম'শায়দের চেহারা দেখেই যদি গায়ে জ্বর না আস্‌ত...কথার চোট তো খুব!'

সত্যকথা বল্‌তে কি—এই বালখিল্যদলকে ভেরী-বাদক খুব ভালবাসত—দেখলে কেউ মনে কর্ব্বে না যে ওর সন্তান নয়—মাদাম্-এর কাছে যখন সে বিয়ের প্রস্তাব করে—এদের দুঃখ—এতগুলো বুভুক্ষুর দুঃখ দেখেই করেছিল—আর মাদাম্—এই "পঙ্গপাল" ছাড়া আর কোন যৌতুক ভেরী-বাদকের ঘরে আন্‌তে পারেন নি! বিয়ের প্রস্তাব না করেই বা উপায় কি! ওদের বাপ যে এক দুর্য্যোগের দিনে নৌকাডুবি হ'য়ে মারা গেল—সেটা কিছু আর ওদের দোষ না! ভেরী-বাদক তখন "সরাইখানার" নিত্যযাত্রী—সন্ধ্যাবেলা হ'লে এসে গল্প-গুজব করে। এখন এলেই শুন্‌তে পায় বিধবার কাতরোক্তি আর খোলা বাক্সের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস আর হা-হুতাশ··· তারপর সরাইখানাতে এলেই ছোট ছোট ছেলেরা হুড়মুড় করে' এসে কোলে চড়ে—নাকে চোখে হাত চালিয়ে দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে' তোলে—তাই একদিন সে বলে ফেল্ল—'দেখুন মাদাম্—কোনপ্রকারে যদি সকলে মিলে একসঙ্গে থাকা যেত! আমি রোজগার বড় বেশী করি না—তবুও এদের মুখের গ্রাস জোটাবার কিছু সাহায্য কর্ত্তে পারি···'

মাদাম্ রাজী হয়েছিলেন কোনপ্রকার উৎফুল্লতা না দেখিয়ে—ছেলেদের কথা ভেবে।

ভেরী-বাদক এমনই তো আগে বেশী রোজগার-পত্র কর্ত্ত না, এখন হ'ল কি—সে তার নৌকাদুটো জল থেকে ডাঙ্গায় উঠিয়ে আন্‌ল—সেগুলো এখন ঘোলা-জল খালের ধারে চিৎ হয়ে পড়ে থাকে—যেন সেগুলো আর চালানই

যাবে না···থাক্ এখানে—যতক্ষণ না একেবারে পচে ধ্বসে যায়।

ইতিমধ্যে সংসার যা চল্‌তে লাগল—চমৎকার! কোনদিন জোটে তো কোনদিন জোটে না—এর কাছে হাত পাতা, ওর কাছে হাত পাতা—নানাপ্রকার অভাব, অসুবিধা ··

সরাইখানার ভিতর হ'তে তীব্র স্বরে—সে স্বরে অনুরাগ ও অনুযোগ দুই-ই ছিল—চীৎকার শোনা গেল—'ওখানে অকর্ম্মার ঢিপির মত দাঁড়িয়ে না থেকে একবার দেখলে হয় না - পেটে আজ পড়বে কি !'

ভেরী-বাদক বিজ্ঞের মত প্রশান্তভাবে বল্ল—"সেই কথাই ভাবছিলাম মাদাম্!" সরাইখানায় ঢুকে ভেরী-বাদক চট্‌পট্ একটা "জাল" তুলে নিল এবং বেল্টের মতন কোমরে জড়িয়ে ফেল্ল। তখন লম্বা-ঝুল পিরাণটা পরে' তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল—যা'তে করে' কেউ সন্দেহ না কর্ত্তে পারে—কি তা'র কোমরে জড়ান আছে !

এই রকম নদীর ধারে ধারে অবৈধ মৎস্য শিকার তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছল—নদীর স্রোত নয় তখন, নদী সাপের মত এঁকেবেঁকে গিয়ে দূরদিগন্তে মিশেছে। নেহাৎ দুরদৃষ্ট না হ'লে—খুব কম করে' হ'লেও গোটাচার "রোশ" মাছ না নিয়ে সে ফির্‌চে না। সেগুলো উনুনে চড়ালে ভাজা মাছের গন্ধে সরাইখানা আমোদিত হ'য়ে উঠত। অন্যদিন হয় তো নিয়ে আস্‌ত অব্যর্থ সন্ধানে কতকগুলো "ব্রোশে" ধরে—স্রোতের জলে সেগুলো যখন লাফালাফি কর্ত্ত আর ছোট মাছের পিছনে তাড়া কর্ত্ত। তবে বোঝাটা একটু ভারী হ'লে টাট্‌কা পাতায় ঢেকেঢুকে একদম সকলের অলক্ষ্যে চালান করে' দিত হোটেলে—সেখানে মাছের বদলে চক্‌চকে আর ঝন্‌ঝনে টাকা পাওয়া যেতই। সেখানে কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসাও কর্ত্ত না—এতগুলো কোথায় মারা পড়ল! আবার কোনদিন "শিক্" মাছ মাথায় নিয়ে ফেরী কর্ত্ত আশপাশের গাঁয়ে। গাঁয়ের আঙ্গুর-ক্ষেতওয়ালারা বোতলভরা মদের বিনিময়ে মাছ কিনে নিত আর ভেরী-বাদকও পিরাণের নীচেকার "বেল্টে" বোতল ঝুলিয়ে দিব্যি চলে আস্‌ত !

সেইদিন—জাল কোমরে জড়িয়ে তো বেরিয়ে এল; তারপর ছোট্ট বাগানটার দরজা বন্ধ করে' দাঁড়াল এসে বড়রাস্তার উপর। কন্‌কনে হাওয়া—যেন ছুরীর ধার—মাথায় টুপীটা টেনে টেনে কাণের উপর লাগিয়ে দিয়ে চট্‌পট্ চলতে লাগল। পথের দূরত্বটাকে কমাবার জন্য সে বেঁকে "আর্সেনালে"র দেওয়াল ঘেঁসে চল্‌তে লাগ্‌ল। একদল ছোট্ট মেয়ে গান গেয়ে গেয়ে সেখানে ঘুর্-পাক খাচ্ছিল। পিছনের ধোবার আঙ্গিনায় দড়িতে ঝুলান রাশি রাশি জামা ও পেণ্টলুন বাতাসে উড়ে উড়ে দড়ি-ঝুলান মানুষের মত দেখাচ্ছিল! "আর্সেনালে" ঢং ঢং ঢং ড্রিলের ঘণ্টা বেজে উঠল।

পথের মোড় ঘুর্‌লেই চোখে পড়ে একখানা কুঁড়ে—ভাঙ্গা-চোরা অপরিষ্কার—ভেরী-বাদকের কুঁড়েখানার মতনই প্রায়! কতকগুলো ছেঁড়া কাপড়-চোপড় বাগানের বেড়াতে শুকাচ্ছিল! বাঁধাকপির পাতা আর শুক্‌নো পেঁয়াজের ডাঁটা বাগানের কোণে জমে পড়্‌ছিল·· কুঁড়েখানার মালিক "মার্ক্‌মাল"—ভেরী-বাদকের বন্ধু।

কুঁড়ের ওপর কুণ্ডলী-পাকান ধোঁয়ার রেখা দেখা যাচ্ছিল···"ভেরী-বাদক" মুখে আঙ্গুল পূরে দিয়ে একটা তীব্র, বহুক্ষণস্থায়ী, উচ্চ শব্দ করে' উঠ্‌ল—তৎক্ষণাৎ কুঁড়ের দরজা খুলে একটা প্রকাণ্ড মাথা দেখা দিল...মুহূর্ত্ত-মধ্যে মার্ক্‌মাল এসে সশরীরে উপস্থিত।

দু'পা যেতে না যেতেই মার্ক্‌মাল "সোল্লাসে" ভেরী-বাদকের পিঠে এক জবর চড় বসিয়ে দিল—'কেমন ঠিক কি না—যাচ্ছ তো!'

-হাঁ, হাঁ—ঠিক, ঠিক্'—ভেরী-বাদক সহজ আনন্দের সুরে উত্তর দিল। মার্ক্‌মাল—দেখ্‌তে দৈত্য-বিশেষ, লম্বা পা, লম্বা হাত, কিন্তু দেহের অনুপাতে ভোজন জোটে কম—সুতরাং কেমন যেন ঢিলে ঢিলে চেহারা। রাস্তায় চলছিল বেশ একটু আড়ষ্টভাবে—তার অত বড় দেহটা নিয়ে সে যেন অপ্রস্তুত—কি কর্ব্বে যেন জানে না। মাথায় চামড়ার টুপী চক্ষু পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে—শীর্ণ মুখখানা দেখ্‌তে হয়েছে তাই জন্তুর মত—পরিধানে ডোরা-কাটা সুতি পেণ্টলুন—তা আবার হাঁটুর কাছে ছেঁড়া—পিট্‌পিটে দুটো চোখ—কেমন যেন হিংস্র অথচ নির্ব্বিকার ভাব।

কন্‌কনে হাওয়ায় পিঠ নুয়ে পড়্‌ছিল—পকেটে হাত গুঁজে দুই বন্ধু তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগল।

কেউ দেখবে বলে—অনেক ঘুরে-ফিরে—মাঠ, ঘাট পেরিয়ে—তারা উপস্থিত হ'ল অবশেষে নদীর ধারে…

আসন্ন সন্ধ্যায় নদীর কূল ছাপিয়ে তখন সবে অন্ধকার নেমেছে—দূরে একখানা নৌকা বালুচরে ঠেকে হাড়-গোড় ভাঙা অবস্থায় পড়েছিল—একখানা মাটি-কাটা জাহাজ নিঃশব্দে ভেসে যাচ্ছিল—সন্ধ্যায় অন্ধকারে ওরা কদাচিৎ দেখতে পাচ্ছিল।

চারদিকে সতর্ক, উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্ত্তে কর্ত্তে তারা আঁচ কচ্ছিল—অন্ধকারটা ঠিক গভীর হয়েছে কি না… দূরে "উইলো"-গাছের ঘন ঝোপ অন্ধকারে কিম্ভূত-কিমাকার দেখাচ্ছিল। কোন বিপদের সম্ভাবনা যদিও ছিল না তবুও বাতাসে কাণ পেতে শুনতে লাগল—কোথাও কোনও খুটখাট্ শব্দ শোনা যায় কি না…

অন্ধকারের গাঢ় যবনিকা ধীরে ধীরে নেবে এল—যেন ওদের নির্ব্বাক্ সঙ্গী!

নীচে—নদীর ধারে বেতের গাছগুলো লতিয়ে লতিয়ে বেশ একটা দুর্ভেদ্য ঝোপ সৃষ্টি করে' তুলেছিল—সেই ঝোপটার কথা ওদের বিশেষ করে' জানা ছিল। এখন হামাগুড়ি দিয়ে, বেতের ডগা হাত দিয়ে সরিয়ে, ওরা আস্তে আস্তে নেবে পড়্ল কোনও একটু শব্দ না করে'—কারণ মাছ যদি ভড়্কে পালায়!

নীচুতে নেবে—মাটিতে উবু হয়ে বসে ইতস্ততঃ দেখছিল—দিনশেষের ক্ষীণ আলোটুকু তখনও নদীর জলে চিক্‌মিক্ করছিল!

ভেরী-বাদক কিছু দেখতে না পেয়ে বিরক্তিভরে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ওপারের দিকে তাকিয়ে রইল যেন এসব ব্যাপারে তার আর কোন সংস্রব নাই

হঠাৎ মার্ক্‌মাল চেঁচিয়ে উঠ্ল—'আ রে বন্ধু বরাত জোর দেখ দেখ—"কার্প" মাছ না এক-একটা রামছাগল

ওর ছিল বিড়ালের চোখ—মার্ক্‌মালের শিকারী চোখ বহুদিন বনে-জঙ্গলে, মাঠে-ঘাটে, নদী-খাল-বিলের ধারে ধারে ঘুরে একেবারে "দিব্যদৃষ্টি" পেয়েছিল…কিন্তু মধ্যে মধ্যে সেও সাপ দেখ্তে ব্যাঙ্ দেখ্ত…

অন্ধকার একটু সরে যাবার দরুণ ভেরী-বাদক মাছ দেখতে পেল।

তাদের পায়ের কাছে—তলতরে জলের নীচে—যেখানে জল জমে জমে কূয়োর মতন হয়েছে—কার্পগুলো সেখানে আস্তে আস্তে নড়াচড়া কর্চ্ছিল। এই দুই আততায়ীর নাকের ডগার সামনে দিয়ে—মাছগুলো সুমন্থর গতিতে ভেসে ভেসে যাচ্ছিল ওদের যেন তাচ্ছিল্য করে'। ঝাঁক বেঁধে যাবার সময় সকলে একসঙ্গে এমন সাবলীল গতিতে যাচ্ছিল যে নদীতে তরঙ্গসঞ্চার হচ্ছিল। তা দেখ্তে খুব সুন্দর লাগছিল। নদীর মত বিলাসময়ী ছিল ওদের গতি। অন্ধকারে মাছগুলোর কালোপিঠ নজরে আস্‌ছিল না—কিন্তু মধ্যে মধ্যে ওরা 'চিতান' দিচ্ছিল—তখন রূপোর মত শাদা পেট আর রক্তের মত "কান্‌কো" অন্ধকারে জলের নীচেও দেখা যাচ্ছিল—সত্যিই বড়গুলা এক-একটা জন্তুর মত বড় হ'বে।

কিন্তু কি মুস্কিল জাল ফেল্‌বার উপায় নাই—বাঁধ বাঁধবার জন্য যত রাজ্যের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর এনে ফেলেছে—একবার যদি জালে জড়িয়ে যায়-ছিঁড়ে কুচিকুচি হ'বে। এই দুই "মৎস্য-চোর" দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ—কিন্তু কোন যুক্তি ঠাওরাতে পারে না…জলের ভিতর বড় বড় কার্পগুলো এমন স্বচ্ছন্দের সহিত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারপর তারা এগিয়ে গেল—দু'হাত জলের ওপর বাড়িয়ে দিয়ে—বিড়ালের থাবার মত—জলে আচ্ছা করে' পা ডুবিয়ে দিয়ে-পা দিয়ে জল নাড়্তে লাগ্‌ল। ঠিক সেই সময় প্রান্তর যেখানে গিয়ে আকাশ ছুঁয়েছে—সেইখান থেকে চতুর্দ্দশীর চন্দ্র উঠে এল—প্রকাণ্ড চন্দ্র…ধব্‌ধবে শাদা। চন্দ্রের আলোকে কেউ যদি দেখ্তে পায়—তারা আর তাদের নিরাপদ মনে কচ্ছিল না।

রাত্রি হয়েছিল এমন নীল—এমন উজ্জ্বল—এমন প্রসন্ন রাত্রি—বড় বড় নৌকা দিয়ে জলীয়বাষ্প কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল সেই ক্রমবিস্তৃত শুভ্র বাষ্প দেখতে হ'য়েছিল যেন আকাশগঙ্গার ঢেউ-দোলান স্রোত…

মার্ক্‌মাল বলে উঠ্ল—'না আজ আর কিছু হলো না।'

ভেরী-বাদক উত্তর দিল-'চল—মানে মানে ভেগে পড়ি…'

নদীর ধার দিয়ে তারা চল্ল—নদীর বুকে যেখানেই জল একটু তির্‌তিরিয়ে উঠ্‌ছিল জ্যোৎস্না-চুম্বনে বড়ই মনোরম দেখাচ্ছিল

মার্ক্‌মাল আপন মনে—কিন্তু স্পষ্টস্বরে বল্লে—'সরকারী বাঁধে গেলে—মাছ পাওয়া যাবেই…'

ভেরী-বাদকের সাহস কম—কিন্তু বন্ধুর কথা ঠেল্‌তে না পেরে বল্ল—'চল—কিন্তু মাছ জালে জড়াতে গিয়ে যেন নিজেরা ফাঁদে না পড়ি…'

পুরাণো "মিলের" কাছে নদীর একটা নালা লাফিয়ে পার হ'য়ে—তারা চল্‌তে লাগল পা টিপে টিপে…কারণ পাথরের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি গেলে পায়ের শব্দে নিশ্চয়ই "মিলার" সাহেবের কাণ-খাড়া হ'বে…নদীর চড়া পার হ'য়ে বাঁধান রাস্তায় পড়ল। তারপর ওপারে উঠে মেঠো রাস্তায় চল্‌তে লাগল—হাঁটু-সমান ঘাস—শিশিরে ভিজে জুতো জবজবে হ'য়ে গেল। চারদিকে "পপলার"গুলো যেন বিকট-মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। প্রান্তরে—অনেকগুলো গরু

শুয়ে শুয়ে নিশ্চিন্তমনে জাব কাটছিল—এখন ওদের পায়ের শব্দে চমকে—"হাম্বা হাম্বা" করতে লাগ্‌ল।

বাঁধ পৌঁছান গেল এতক্ষণে। নদীর ধার থেকে একটা নালা বের করে'—একটা মস্ত বড় চৌবাচ্চার মতন পাথর দিয়ে বাঁধান। বাঁধের খুঁটিতে জলের ঢেউ লেগে "ছপাৎ" করে' উঠছিল। বাঁধের ঠিক ওপরে মস্ত বড় একটা "উইলো"-গাছ—গাছের গুঁড়ির অর্দ্ধেকটা জলের নীচে—কাল ডালাপালা নিয়ে হুমড়ি খেয়ে এসে জলের ওপরে পড়েছে বেশ একটা অন্তরাল রচনা করে'। সবগুলা ডালপালা ফুলে ফুলে ছয়লাপ হ'য়ে গেছল—সেই সাদা, সাদা ফুলের অজস্র অঞ্জলি শুভ্র জ্যোৎস্নায় শুভ্রতর দেখাচ্ছিল।

ওখানে মাছ যা' মারা পড়ে—প্রচুর। নদী থেকে মাছ এসে নালা দিয়ে ঢুকে বেরুতে গিয়ে বাঁধ ঠেকে ঘুরে আসে—তারপর ওখানকার গভীর জলে থেকেই যায়—সময়ে সময়েই দেখা যায় মাছের ঝাঁক ভেসে ভেসে ঘুর-পাক খাচ্ছে।

মাছ তো মিলে প্রচুর—কিন্তু বাঁধের "পাহারাওয়ালা" ফাদার হান্‌জ বড় বেয়াড়া লোক—কোন খাতির রাখতে চায় না—তবে ঐ সময়ে তো তার "হোটেলে" মদের গ্লাস নিয়ে 'মদ' পরখ করা উচিত—কোথায় কে মাছ ধরছে—কি দরকার তার নজর রাখবার!

চট্ করে' ঢালু পথে গড়িয়ে বাঁধের নীচে তারা নেবে এল। জলের নীচে অনেকটা জায়গা পাথর দিয়ে বাঁধান—ওর ওপর দিয়ে রূপালি স্রোত ঝির্‌ঝির্ করে' বয়ে যাচ্ছিল—সেই স্রোতের মৃদু আঘাতে শ্যাওলাগুলো ফুর্‌ফুর্ করে' উঠছিল যেন খোঁপা খোলা চুলের গোছা···সেইখানটায় ওরা দেখল মস্ত বড় বিশাল এক ঝাঁক "পিক" মাছ ভেসে ভেসে চলেছে খুব ঘেঁসাঘেঁসি করে'—মাছগুলোর কাল পিঠ দেখলে মনে হয় ওখানে জলের গভীরত্ব মোটেই নাই। বাঃ একটু ঝুঁকে পড়ে—ঝাঁক-শুদ্ধ ধর্লেই হয়! ভেরী-বাদক চট্ করে' কোমর থেকে জাল খুলে ফেল্ল—তারপর হাত সাম্‌নের দিকে এগিয়ে 'জালখানা' মেলে এক নিমিষের জন্য আঁচ করে' নিল—তারপর জাল ফেল্‌ল··· মাকড়সার জালের মত হঠাৎ বিস্তৃত হ'য়ে "জালটা" সমস্ত ঝাঁকটাকে বেমালুম জড়িয়ে ফেল্ল।

দু'হাতে দড়ীটা ধরে' এখন টেনে টেনে তুল্‌তে হয়—বেজায় ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছে কি না!

ওরা মশগুল হ'য়ে টেনে টেনে তুলছে—এমন সময়—বাঁধের ওপর থেকে মোটা-গলার আওয়াজ এল—"দাঁড়া,—দাঁড়া—পালাবার চেষ্টা করিস্ না।"

লোকটার হাতের ওপর চন্দ্রালোক পড়ে' চক্‌চক্ কচ্ছিল···বাঁধের পাহারাওয়ালা "হান্‌জ" রিভলভার হাতে করে' এসে দাঁড়িয়েছে।

মার্ক্‌মাল দেখেই এক লাফে এসে ডাঙায় উঠ্‌ল—তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে বাঁধ ডিঙিয়ে ছুটে চল্‌ল—তার ছায়া "উইলো"-গাছের গুঁড়ির পিছনে ত্রস্তভাবে মিলিয়ে গেল—সাদা ও কুহেলী-আচ্ছন্ন প্রান্তরের মাঝে তার আর কোনও চিহ্ন রইল না।

ভেরী-বাদক হাতের জাল টপ্ করে' ফেলে দিয়ে—নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। একটুকুও শব্দ না করে' স্রোতের সঙ্গে ভেসে চল্‌ল। জল ভয়ানক ঠাণ্ডা—ওর দাঁতে দাঁত লেগে যায় আর কি! কিছুদূর ভেসে গিয়ে নদীর বাঁধে নলবনের ঝোপের আড়াল দিয়ে উঠতে যাবে—দেখে আর একজন পাহারাওয়ালা "ওৎ" পেতে বসে আছে। তখন আবার জলে নেবে—সাঁতরে সাঁতরে চল্‌ল—এমনি করে' একটা ঘণ্টা! কন্‌কনে, ঠাণ্ডা জলে—হাত-পা অবশ হ'য়ে আস্‌ছে, সুতরাং উঠ্‌তেও হ'ল এবং ধরাও দিতে হ'ল। পাহারাওয়ালারা ওর কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে যাবার সময় বেশ মিষ্টি মিষ্টি আলাপ করছিল। বুড়ো হান্‌জ ওর পিঠে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে বলে উঠল—'অনেক কষ্টের নিধি তুমি—যাক্—পাওয়া যে গেছে—ভাগ্যি···' একটা ছোট্ট কুঠরীতে ওকে রাত্রির মত বন্দী করে' রেখে দিল—সাধারণতঃ ওখানে ওরা দড়াদড়ী, বৈঠা, লগী রাখে। ভেরী-বাদকের ভিজা কাপড় হ'তে জল পড়ে স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। সেইখানে বসে বসে—কাঁপতে কাঁপতে ভেরী-বাদক ভাবতে লাগল—যত সব দুঃখের কথা—পুলিশের লোকগুলা কেমন নির্ম্মম—জরিমানা হ'লে তার টাকাই বা কোথায় পাবে—এমন সুন্দর জালখানা—এমন সূক্ষ্ম-বুনান আর কি ফিরিয়ে দিবে..সরাইখানাতে একপাল 'ছেলে'—ঘরে খাবার নাই এক মুঠা—ছোট্ট ছোট্ট পাখীগুলা যেমন ধাড়ী পাখীকে ঘিরে কিচির-মিচির করে—ওরাও তেমনি "খাই খাই" কর্‌ছে—কিন্তু অসহায় জননীর চঞ্চুপুটে মুখের গ্রাস কোথায়! *

---

* প্রসিদ্ধ ফরাসী কথা-সাহিত্যিক Monsieur Emile Mosellyর মূল 'Le Trompion' গল্পের অনুবাদ।

স্বাস্থ্যরক্ষার কয়েকটি সহজ উপায়

১। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণ মুক্তবায়ু সেবন কর্ত্তব্য। এরূপ বায়ুতে যে অক্সিজেন থাকে, তাহা লাভ করার ফলে স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে।

২। শয্যা হইতে উঠিয়াই চায়ের পেয়ালা লইয়া বসা উচিত নহে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের পক্ষে চা তো উপযোগীই নহে, নিতান্ত অভ্যাসের বশে ইহা ছাড়িতে না পারিলেও খালি পেটে ইহা পান করায় বিষবৎ কার্য্য করিয়া থাকে।

৩। দোকানের বা রেষ্টুরেণ্টের চা পান করা আর অঞ্জলি অঞ্জলি বিষ পান করা সমান কথা। দোকানদারেরা একই বালতির জলে পান করা সকল পাত্রই ডুবাইয়া লয়; ইহাতে একের সংক্রামক রোগ অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। চা পান করা যাঁহাদের অভ্যাস আছে, স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে তাঁহারা বাড়ীর প্রস্তুত ভিন্ন উহা যেন কদাচ পান না করেন।

৪। ছোলা ভিজা এবং আদার কুচি ও সৈন্ধবলবণ প্রাতঃকালে সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং তাহার ফলে কোনপ্রকার রোগ হইতে পারে না। সকালে এবং বিকালে অন্য খাবার না খাইয়া মুড়ি, নারিকেলের নাড়ু, নারিকেলের সন্দেশ প্রভৃতি খাইলে স্বাস্থ্যবান হওয়া যায়।

৫। স্নানাহারের সময় নির্দ্দিষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। কোনদিন আটটায়, কোনদিন নয়টায়, কোনদিন ১০টায় আহার করিলে পরিপাকের বিঘ্ন জন্মিয়া থাকে।

আহারের মত স্নানের সময়ও ঠিক রাখিতে হইবে, তাহা ছাড়া কোনদিন পুষ্করিণীতে, কোনদিন নদীতে, কোনদিন কলের জলে, কোনদিন কুয়ার জলে স্নান করিলে শরীরের পক্ষে উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে।

৬। অপরিষ্কৃত জলে বা যে জল দূষিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, সেরূপ জলে স্নান করিলে রোগভোগ অনিবার্য্য।

৭। আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য। আহারও অতি ধীরে ধীরে ভালরূপ চর্ব্বণ করিয়া করাও কর্ত্তব্য। অনেকে কার্য্যের খাতিরে যে নাকে মুখে গুজিয়া তাড়াতাড়ি আহার করিয়া থাকেন, তাহার ফলেই রোগ-ভোগ করিতে বাধ্য হন। ধীরে ধীরে আহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার পক্ষে কোনও ব্যাঘাত ঘটে না।

৮। স্নানের সময় ভাল করিয়া তৈলমর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। তৈলমর্দ্দনে আমাদের লোমকূপগুলি পরিষ্কার হয় এবং লোমকূপ দিয়া শরীরের মধ্যে উহা প্রবেশ করায় শারীরিক শক্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। গায়ে সরিষার তৈল মর্দ্দন করাই ভাল। সরিষার তৈল মর্দ্দনে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মতে নানারূপ রোগেরই যে মূলকারণ বীজাণু, সেই বীজাণু-গুলি নষ্ট হইয়া থাকে।

৯। অধিক পান চর্ব্বণ করা দাঁতের পক্ষে তো অনিষ্টকরই, তাহা ছাড়া অধিক পান চিবাইলে পরিপাকেরও বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

১০। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে সকল প্রকার মাদক দ্রব্যই বিষবৎ বর্জ্জন করিতে হইবে। একদিন মাদকদ্রব্য সেবনে যে বিষ উদরস্থ করা হয়, তাহার ফলে ভোগ এক দিনেই শেষ হয় না।

১১। নিমন্ত্রণ খাওয়া যত কম করা যায়, ততই ভাল। নিমন্ত্রণে যাইলেও পরিপাক করিবার শক্তিতে যতটা কুলায়, তাহার বেশী আহার করা কর্ত্তব্য নহে। কোনও সংক্রামক পীড়ার সময় নিমন্ত্রণ খাওয়া একেবারেই বর্জ্জন করা উচিত।

১২। দুই বেলা কিছু কিছু ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। মুগুর ভাঁজা, ডম্বল, ডনফেলা প্রভৃতি ব্যায়ামে শারীরিক পেশীগুলি অধিক পুষ্টিলাভ করে। অন্যান্য ব্যায়ামের সুবিধা না হইলে মুক্তবায়ুতেও ভ্রমণ করিলেও ব্যায়ামের কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

১৩। দিবা-নিদ্রা এবং রাত্রি-জাগরণ—দুইটিই স্বাস্থ্য ক্ষয়ের কারণ, কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে অল্পক্ষণ নিদ্রা যাওয়া চলিতে পারে।

১৪। মলমূত্রের বেগ-ধারণে নানারূপ পীড়া-উৎপত্তি নিশ্চিত। হাঁচি, কাসি প্রভৃতির বেগও ধারণ করিতে নাই। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সকল প্রকার বেগ-ধারণেরই নানারূপ কুফলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

১৫। মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। মানসিক প্রফুল্লতায় স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু কুসঙ্গ করিয়া বা কুকাজে রত হইয়া মনের প্রফুল্লতা আনয়ন কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে অনিষ্ট হইয়া থাকে।

১৬। কুচিন্তায় শরীর ক্ষয় হয়, অতএব স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

১৭। "লোভে পাপ এবং পাপে মৃত্যু"—এই যে কিম্বদন্তীটি চলিয়া আসিতেছে, ইহার মূল্য খুবই বেশী। অন্যায় কাজ করিলে তাহার ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে; স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিনিষেধগুলি এই জন্যই মানিয়া চলা আবশ্যক। যাঁহারা বাল্যে বা যৌবনে কামক্রোধাদি ষড়রিপুর একান্ত দাস হইয়া পড়েন, বার্দ্ধক্যে তাঁহাদের স্বাস্থ্যহানি নিশ্চিতই ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা বাল্যকাল হইতে করিতে হয়। যাঁহারা চিত্তসংযম করিতে পারেন, রোগের যন্ত্রণা তাঁহাদিগকে কদাচিৎ ভোগ করিতে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চিত্তসংযমের মত আর কিছুই নাই।

১৮। কুৎসিত নাটক-নভেল পাঠ করা অপেক্ষা ইতিহাস পুরাণাদি পাঠে অধিক সময় ব্যয় করা কর্ত্তব্য। নাটক-নভেল পাঠের ফলে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ইহা শরীরক্ষয়ের বিশেষ কারণ। থিয়েটার এবং বায়স্কোপ দেখা সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযুজ্য।

১৯। একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পক্ষে প্রত্যহ নিম্নলিখিতরূপ আহার্য্য গ্রহণ কর্ত্তব্য—

চাউল—দেড় পোয়া হইতে সাত ছটাক

দাউল—দেড় ছটাক হইতে দুই ছটাক

মৎস্য—অর্দ্ধ পোয়া হইতে আড়াই ছটাক

ঘৃত, তৈল—দেড় কাঁচ্চা হইতে তিন কাঁচ্চা

লবণ—এক কাঁচ্চা

তরকারী—দুই ছটাক

মসলা—অর্দ্ধ কাঁচ্চা

দুগ্ধ—অর্দ্ধ সের হইতে তিন পোয়া

কোন কোনদিন মৎস্য না খাইয়া মাংস খাওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহারা মৎস্য বা মাংসাশী নহেন, তাঁহাদের পক্ষে এবং যাঁহারা দাল কম খাইয়া থাকেন, তাঁহাদের দুগ্ধ আরও বেশী খাইতে হইবে।

২০। একই জিনিষ প্রত্যহ খাওয়া রুচিকর নহে, এজন্য আহার পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যক। প্রত্যহই ফল অধিক করিয়া খাওয়া উচিত। ফলের রসে শরীর যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্ট হইয়া থাকে।

—শ্রীইন্দুভূষণ সেন
(আয়ুর্বিজ্ঞান-সম্মিলনী)

বাঙ্গালার লবণ-শিল্প ও ব্যবসায়

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আমলের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে যে লবণ উৎপন্ন হইত তাহাতেই বাঙ্গালার অভাব মোচন হইত। বাঙ্গালার লবণ শিল্প তৎকালে যে বিশেষ উৎকর্ষ

লাভ করিয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। বাঙ্গালার লবণ তখন বাঙ্গালা দেশের প্রয়োজন মিটাইয়াও বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। বাঙ্গালার সকল কারখানায় সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে লবণ মজুত থাকিত। ভারতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আগমনের পর উহার একাধিপত্যের প্রারম্ভে সকল কারখানায় যে লবণ মজুত ছিল, কথিত আছে তাহা নিঃশেষ হইতে প্রায় দশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই সময়ে কলিকাতা সহরের বহু লবণ-ব্যবসায়ী প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে তখন বিদেশী লবণ অপেক্ষা দেশীয় লবণই বিশেষ পছন্দ করিত। স্বদেশীয় যুগে বাঙ্গালা দেশে বিদেশী লবণ বর্জ্জিত হইয়াছিল। তখন হইতে এদেশে "কর্কচ লবণ" ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু এই কর্কচ লবণ বোম্বাইয়ের অতি নিকৃষ্ট লবণ। ইহাই বাঙ্গালা দেশে অতি সমাদরে ও সকল ধর্ম্মব্যাপারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার জনমত উপেক্ষা করায় বিদেশী লবণ সহজে বাঙ্গালায় প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই।

বাঙ্গালার সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রধান প্রধান স্থানে এই লবণের ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তমলুক, হিজলি, কাঁথি, সুন্দরবন, ভোলা (বাখরগঞ্জ) ও চট্টগ্রাম লবণ তৈয়ারীর জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। সুন্দরবন ও ২৪ পরগণায় প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইয়া সন্নিকটবর্ত্তী কলিকাতা সহরে প্রেরিত হইত এবং এখান হইতে বাঙ্গালার চারিদিকে চালান হইত।

এই ব্যবসায়ে সুনিপুণ মালাঙ্গি শ্রেণীর বহুলোক নিয়োজিত ছিল। চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার বহু গৃহস্থ এই ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার এই শিল্পসম্পদ্ বিলুপ্ত হইলে এই সকল লোক বেকার হওয়ায় তাহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের আর কোন উপায় রহিল না। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে এই সকল জীর্ণ শীর্ণ, বুভুক্ষুদের অনেকেই এজগৎ হইতে চিরবিদায় লইল। বাঙ্গালার লবণ শিল্পের এই নিদারুণ স্মৃতি এখনও অনেকেরই স্মৃতিপটে মুদ্রিত রহিয়াছে।

আজকাল বাঙ্গালার জন্য প্রতি বৎসর ১৷৷০ কোটি মণ লবণ কলিকাতার বন্দরে আমদানি করা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ৫০ লক্ষ মণ লবণ এডেন হইতে ও বাকী ১ কোটি মণ বিদেশ হইতে আনীত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এডেন, লোহিত সাগরতীরবর্ত্তী বন্দর, ঈজিপ্ট, স্পেন, চেশায়ার (লিভারপুল), হামবুর্গ ও রুমানিয়া হইতে লবণ ভারতে আমদানি হইয়া থাকে। করাচী ও পশ্চিম উপকূলে যে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ অতিশয় অল্প।

যে বাঙ্গালা দেশ একদিন শিল্পবাণিজ্য ও ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নত ছিল, আজ তাহার অধিবাসীরা আধুনিক শিক্ষায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসী অপেক্ষা উন্নত হইয়াও গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে অক্ষম। স্বদেশীয় যুগে ভারতের নব জাগরণ হইয়াছিল। এই জাগরণের ফলে যাহারা বাস্তবিক কিছু কাজ করিয়াছে আজ তাহারাই সৌভাগ্যবান। আজ বাঙ্গালার সমগ্র ব্যবসায় ও বাণিজ্য অ-বাঙ্গালী ও ইংরাজ ব্যবসায়ীদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর অক্ষমতার পরিচায়ক। এক কথায় ভারতে ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের পরেই পশ্চিমা ও ভাটিয়াদিগের স্থান। কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর মধ্যে যে ভীষণ বেকার-সমস্যায় উদ্ভব হইয়াছে ইহার প্রতিকারের উপায় কি? বাঙ্গালার কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে ইহার সমাধানের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

আজ দশ বৎসর যাবৎ বাঙ্গালা দেশে কয়েকটি জয়েণ্ট-ষ্টক-কোম্পানী খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু দুই-একটা ভিন্ন অন্যগুলি তাহাদের প্রাথমিক কার্য্যাদি মাত্র করিতেছে। ইহার কারণ কি? কোন বাঙ্গালীর সম্মুখে কোন জয়েণ্ট-ষ্টক-কোম্পানীর কাগজপত্র স্থাপন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ অতীতের দুই-একটা কোম্পানীর সহিত তুলনা করিয়া বিশেষজ্ঞের মত বলেন,—"ওসব কিছু না, আজ আছে কাল নাই।" এই যে দেশের প্রতি ও দশের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব, দেশ হইতে ইহা নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা ও কলঙ্ক আর কিছু নাই।

লবণ-ব্যবসায়ে গভর্ণমেণ্টের যে সহানুভূতির কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরে যদি বাঙ্গালাদেশ এই কার্য্যে বিশেষ অগ্রণী না হয় তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশে অ-বাঙ্গালীরা আসিয়া যে সে ব্যবসায় হস্তগত করিবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই ব্যবসায়ে মূলধনও প্রচুর প্রয়োজন। কাজেই এই ব্যবসায় করিতে হইলে জয়েণ্ট-ষ্টক-কোম্পানীর নিয়ম অনুসারে কোম্পানী গঠিত করিয়া বিশেষ পারদর্শী লোকের দ্বারা উহা পরিচালনা করা উচিত, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে যে ইহা বিশেষ উন্নতিলাভ করিবে তাহা সুনিশ্চিত। বাঙ্গালা তাহার নিজের প্রয়োজনীয় লবণ প্রস্তুত করিবে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব ও রাজপুতানা যখন তাহাদের নিজের লবণ প্রস্তুত করিতেছে তখন বাঙ্গালার পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা শোভা পায় না।

—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়

(সঞ্জীবনী)
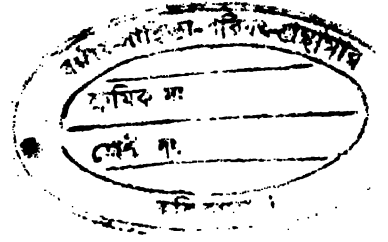
বিবিধ প্রসঙ্গ

দেশের কথা

ভারতের জাতীয় দুর্দ্দশা

বিগত ১৯৩০ সালের ২২এ আগষ্ট তারিখে স্যর জন সাইমন তাঁহার চিকাগো-বক্তৃতায় আমেরিকার নিকট ভারত-সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান ভারত-সমস্যার মত অন্য কোন সমস্যা এত জটিল নহে। তিনি বলেন যে, "ভারতে সাত কোটী মুসলমান ও চার-পাঁচ কোটী অস্পৃশ্য-জাতির বাস। তিনি ভারতে ৫৬০টী ভারতীয় রাজ্য পরিদর্শন করিবার সুবিধা পান। ভারতে সর্ব্বজন-বোধ্য নিজস্ব কোন ভাষা নাই। ভারত-গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ভারতে ক্রমশঃ গণতন্ত্র-প্রথা প্রচলিত করা, কিন্তু ইহা ভারতের প্রকৃতিগত নয়। ভারতবর্ষে ৬০,০০০ বৃটিশ-সৈন্য ও ১,৬০,০০০ দেশীয় সৈন্য আছে। ভারতের পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি আর নাই। উহাকে ফিরাইয়া আনিবার শক্তিও ভারতের নাই, এখন ভারত নিরুপায়। আমরা যদি প্রতি বৎসরের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্টি ও জ্ঞান-গরিমায় জগতের ভিতর নূতন দান করিয়া বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা গণনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, তদ্রূপ ১০০০ জন মনীষীর মধ্যে কেবল মাত্র ৩।৪ জন ভারতীয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

এতদ্ব্যতীত যদি আমরা অশিক্ষিত লোকের একটা শতকরা হিসাব লই, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ভারতীয়দিগের ভিতর অশিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৯৪ জন, মার্কিণের ভিতর শতকরা ৭·৭ জন, ইংরেজের ভিতর শতকরা ১·৬ জন। অধিকন্তু জগতের প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলির সহিত ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতে ১০০টী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থলে জাপানে ৯৩টী বিদ্যালয়, কানাডায় ৫৪৮টী, গ্রেট-বৃটেনে ৫৮৬টী এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৮৮৩টী ঐরূপ বিদ্যালয় আছে।

আর একটা দিক্ দিয়া যদি আমরা দেখি, তাহা হইলে ব্যাপারটা আরও সহজ হইয়া উঠিবে। ভারতবর্ষ একটী কৃষিপ্রধান দেশ; কিন্তু তাহার কর্ষণোপযোগী ভূমির পরিমাণ কত অল্প। আমরা দেখি, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫·৪ একর কর্ষিত ভূমির স্থানে অষ্ট্রেলিয়ার ২৫·৬ একর, গ্রেটবৃটেনে ২১·০ একর, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৬·১ একর এবং ভারতে মাত্র ২·৭ একর ভূমি কর্ষিত হয়।"

ভারতে কোটী কোটী লোক আছে, কিন্তু তাহারা শক্তিহীন, পরাধীন, দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ভারতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন লাগিয়াই আছে। ইহাতে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ভারতও পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে।

এই অবস্থার ভিতর ভারতবাসীকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে—মানুষের মত হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে—ভারতের উন্নতি করিতে হইবে। শুধু রাজশক্তির দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকিলে দেশের উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। যে ভারতের অতীত সমুজ্জ্বল ছিল—যে ভারত একদিন জগতে জ্ঞানের বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া অজ্ঞান-অন্ধকারকে দূর করিয়াছিল সেই ভারতবাসীর প্রাচীন ভাবধারার পরিচয় লইতে হইবে; সেই ক্ষীণ ভাবধারাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে—তাহাতে যে সব মলা-মাটী পড়িয়াছে তাহা ভারতবাসীকেই কতকটা পরিষ্কার করিয়া তুলিতে হইবে। এদিকে অবহিত না হইলে জাতীয় দুর্দ্দশার অপনোদন হওয়া সম্ভবপর নয়।

গো-সমস্যা

শোনা যায় কলিকাতার একমাত্র ট্যাংরা ও সোনাডাঙ্গা কসাইখানায় প্রতি বৎসর একলক্ষের উপর গো-হত্যা হয়। বিগত ১৯১৯ সালের কলিকাতার গো-হত্যার সংখ্যা ১,৬৪,৩৫২টী, ১৯২০ সালে ১,৪৩,২৩৮টী এবং ১৯২২ সালে ১,৪৭,৯৬৬টী। ভারতের ৬১,২৭৫ জন ইংরাজ সৈন্য ও ৬,৬৬৬ জন সৈনিক-কর্ম্মচারীর প্রতি সপ্তাহে গড়পড়তা ৩ সের গো-মাংস যোগাইতে গিয়া বৎসরে প্রায় ৮,৫৩৮ টনের উপযোগী প্রায় ৬৬,৭৫০টী গাভী এবং ২৫,০০০টী বলদ হত্যা করা হয়। সুতরাং ভারতের গো-সংখ্যা যে ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

গো-জাতিই যে ভারতের মহোপকারক এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবে না। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ অথচ সুস্থ সবল বলদের অভাবে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইতে পারে না। ভারতের প্রত্যেক বলদ গড়ে ৫৴ বিঘা জমি চাষ করে। এই সকল শীর্ণকায় বলদের শাবকোৎপাদন-শক্তিও ফলপ্রসূ নয়—কাজেই দুগ্ধবতী গাভী ও বলদ ভাল জন্মিতেছে না।

আমাদের দেশে সংখ্যার অনুপাতে লোক-প্রতি গড়ে দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ আধছটাক মাত্র পড়ে। ভারতের এই দুধের অভাবের জন্য প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ৫০ লক্ষ টাকার জমাট-দুধের আমদানী হয়। দুধ আমদানী হইল তো দেশের লোকের অভাব-মোচনের জন্য কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশ হইতে দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ঘৃত বৎসরে ৪,৭৩,৭৩২ মণ বিদেশে রপ্তানী হয়।

দেশের লোককে সুস্থ ও সবল করিতে হইলে ঘৃত ও দুগ্ধের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে, নচেৎ জাতি ধ্বংসের মুখে যেমন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তেমনই চলিবে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রথমেই চাই সবল সুস্থ জনন-ক্ষম বলদ। পূর্ব্বে দেশে 'ধর্ম্মের ষাঁড়' নামে যেসকল বলদ যথেচ্ছভাবে গোচারণের মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত, স্বচ্ছন্দবনজাত খড়-পাতা, শাক-শব্জী খাইয়া জীবনধারণ করিত, সেইরূপ করিবার জন্য গোচারণের মাঠ সংগ্রহ করিতে হইবে। তারপর দেশে ভালরূপ বলদ না পাওয়া গেলে বিদেশ হইতে বলদ আমদানী করিয়া গো-জাতির বংশ-বৃদ্ধি করিতে হইবে। গো-জাতির শ্রীবৃদ্ধি না হইলে দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, ছানা, মাখন প্রভৃতি দ্রব্য পাওয়া দুরূহ হইবে। জীবন-ধারণের উপযোগী এসকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে না পারিলে দেশবাসীকে বাঁচাইয়া রাখা কঠিন হইয়া পড়িবে। আর একটী কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, দেশের দিকে চাহিয়া এ দেশের লোক যেন দেশের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি অর্থের লোভে বিদেশে রপ্তানী না করেন

ভারতের কয়লা

পৃথিবীতে কয়লার খনির জন্য ভারতবর্ষ বিখ্যাত। নিম্নে ১৯২৯ সালে নবেম্বর মাসে ভারতের বিভিন্ন খনি হইতে কত কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে, ভারতের খনিসমূহের প্রধান ইন্‌স্পেক্টরের রিপোর্ট হইতে একটা তালিকা দেওয়া গেল—

প্রদেশ	খনি হইতে উত্তোলিত (টন)	অন্যত্র প্রেরিত (টন)
আসাম—	২৬,৫১৯	২৪,৭৬৬
বেলুচিস্থান—	৫৪২	৩৮২
বাংলা (রাণীগঞ্জ)—	৩,৯২,৯৪৯	৪,২৭,৪৬৪
বিহার ও উড়িষ্যা —		
বালিগঞ্জ—	৪৯,৮৮৬	৫৪,৯৪২
ঝরিয়া—	৭,৯৩, ২৪	৭,৫৪,৯৮৮
বকারো—	১,৮৫,৮৭২	১,৯১,৮৫২
গিরিডি—	৩৭,৬২৭	৩৭,৪৫২
জয়ন্তী—	৩,০৭৯	৩,০০৬
ডেল্টানগঞ্জ—	১২১	......
হিঙ্গির রামপুর—	২,৭২৭	১,৮৬৪
চরণপুরা—	৪৩,০৪২	৪২,০২০
মধ্যপ্রদেশ—		
পঞ্চভেলী—	৪৪,০৬৫	৪৪,০৫৯
চন্দা—	১৭,:২৩	১৫,৬৩৩
পাঞ্জাব—	৩,৬৯৪	২,৯৬২
মোট—	১৫,৪০,৭১৫ (টন)	১৫,৯১,৩৯০ (টন)

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, কয়লা যাহা উত্তোলিত হইয়াছে তাহার অপেক্ষা বেশী বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষ ও জার্ম্মাণী

আমেরিকার মত জার্ম্মাণীও ভারতবর্ষের সহিত সখ্যতা-স্থাপনের প্রয়াসী। ভারতের উপর জার্ম্মাণীর ভালবাসা যে কিরূপ তাহা আমরা ম্যুনিকের Die Deutsche Akademy হইতে পরিচয় পাই। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটীর উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ ও জার্ম্মাণীর মধ্যে বন্ধুত্ব-সূত্র দৃঢ় করা। এই উদ্দেশ্যে এবারে এই শিক্ষালয়ের ২০টী বৃত্তি ভারতীয় গ্রাজুয়েটদিগকে দেওয়া হইয়াছে। আনন্দের বিষয় এই যে, এই বিশজনের মধ্যে দশজন বাঙ্গালী, একজন বাঙ্গালী মহিলা। বাঙ্গালী মহিলার নাম—কুমারী মৈত্রেয়ী বসু। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌-বি পরীক্ষোত্তীর্ণা ডাক্তার। এখন ইনি চিত্তরঞ্জন-সেবাসদনে কার্য্য করিতেছেন এবং শীঘ্রই ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যার উচ্চতর শিক্ষা-লাভ এবং গবেষণা করিবার জন্য জার্ম্মাণী যাইবেন।

কুমারী মৈত্রেয়ী বসু

Die Deutsche Akademyর Secretary একস্থানে বলিয়াছেন যে, ১৯৩১-৩২ সালের জার্ম্মাণদেশীয় নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ২০টী ভারতীয় গ্রাজুয়েটকে বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার জন্য প্রতিযোগিতাও দাঁড়াইয়াছিল ভীষণ। ভারতীয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র হইতে ৩০০ শত আবেদনপত্র তিনি পাইয়াছিলেন।

বার্লিন ও ম্যুনিক শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত আছেন। যদি জার্ম্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিচক্ষণ ভারতীয় পণ্ডিতদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে ভারত ও জার্ম্মাণ দেশের মধ্যে শিক্ষার আদান-প্রদানে যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করা যাইতে পারে।

এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, যদি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপযুক্ত শিক্ষিত গ্রাজুয়েট জার্ম্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার জন্য যান এবং ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যদি তাঁহারা ভালরূপে জার্ম্মাণ-ভাষা শিক্ষা করেন তাহা হইলে তাঁহার সুবিধা আরও বাড়িবে এবং আর্থিক উন্নতির পথও সুগম হইবে।

সঙ্গীতে বালিকার কৃতিত্ব

মানুষের প্রতিভা কখন যে কি ভাবে প্রকাশ পায় তাহা বলা বড়ই শক্ত। উহা সর্ব্বত্র বয়সের অপেক্ষা করে না। এখানে আমরা অল্পবয়স্কা একটী বালিকার প্রতিভার কতকটা পরিচয় দিব।

যাঁহাদের বাড়ীতে বেতার আছে, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা সকলেই 'ল্যাবুনচুষ পুষ্প'কে চেনেন। ইহার প্রকৃত নাম—কুমারী পুষ্পরাণী ঘোষ। বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। পুষ্পরাণী সঙ্গীতে কিরূপ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা কোন বেতার-শ্রোতারই অজ্ঞাত নহে। অল্পবয়সে এরূপ দক্ষতা লাভ করিতে বড় একটা কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কুমারী পুষ্পরাণী ঘোষ

পুষ্পরাণী কাশীপুরে থাকে। আমরা শুনিলাম, পুষ্পরাণী তাহার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার ঘোষের নিকট সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। প্রভাতবাবুর অক্লান্ত চেষ্টায় পুষ্পের এই প্রতিভার বিকাশ।

পুষ্পরাণী যে শুধু সঙ্গীতেই কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে তাহা নহে, লেখাপড়া ও আবৃত্তিতেও তাহার বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক বহুস্থানে সঙ্গীত ও আবৃত্তির জন্য সে বহু পুরস্কার পাইয়াছে। ইহারই মধ্যে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায়ও পুষ্প আপনার স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারিয়াছে।

ল্যাবুনচুষ—কয়েকটী পারিতোষিকসহ

ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষি

কৃষিজগতে ভারতের স্থান

গতমাসে আমরা দেখাইয়াছি যে, ভারতবর্ষে কৃষির জন্য অন্যান্য দেশের তুলনায় কত কম টাকা ভারত-সরকার ব্যয় করেন। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় যে কত বেশী টাকা খাজনা আদায় করা হয়, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আমরা নিম্নে জগতের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্থানের উৎপন্ন ফসল ও খাজনা আদায়ের দুইটী তালিকা দিলাম।

১ম তালিকা

দেশ	দশ কাঠা জমিতে গড়ে প্রতিবৎসর শস্য উৎপন্ন
বেলজিয়াম	১১ মণ .... সের

দেশ	দশ কাঠা জমিতে গড়ে প্রতিবৎসর শস্য উৎপন্ন			
ডেনমার্ক	৮	মণ	৩২	সের
জার্ম্মাণী	৮	,,	১৬	,,
ইংলণ্ড	৮	,,	১২	,,
মিশর	৬	,,	৩২	,,
জাপান	৬	,,	২৮	,,
কানাডা	৬	,,	২৮	,,
আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র)	৬	,,	২০	,,
অষ্ট্রেলিয়া	৫	,,	৩২	,,
ভারতবর্ষ	৪	,,	...	,,

২য় তালিকা

দেশ	১০০৲ মূল্যের উৎপন্ন ফসলের দেয় রাজস্ব
ইংলণ্ড	৮।/০
ইতালী	৭৲
অষ্ট্রিয়া	৪৸/০
ফ্রান্স	৪৷/০
জার্ম্মাণী	৩৲
বেলজিয়াম	২৷/০
হলাণ্ড	২৷/০
ভারতবর্ষ	১৫৲ হইতে ২০৲

ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর রাজস্ব কত বেশী দিতে হয়।

শিল্প

বাংলায় তামা, পিতল ও কাঁসার শিল্প

বঙ্গদেশে মোট ১,৫০,০০০ জন লোক তামা, কাঁসা ও পিতলের কাজ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ এদেশের শিল্পীরা দুই প্রকারে তামা, কাঁসা ও পিতলের বাসন তৈয়ারী করে। (১) ঐ সমুদয় ধাতুকে আগুনের উত্তাপে নরম করিয়া হাতুড়ী দ্বারা পিটিয়া ও (২) ধাতু ঢালাই করিয়া ইচ্ছানুরূপ নানাপ্রকার আকার প্রদান করা হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমটীতে শ্রম ও অর্থ-ব্যয় বেশী পড়ে, কিন্তু দ্বিতীয়টীতে তত পড়ে না।

বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার দিনে ব্যয়-সঙ্কোচ করা খুবই প্রয়োজন। বাসনতৈরী করিবার অনেক উপায় প্রাচ্য-জগতে এখন প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গীয় সংরক্ষণশীল শিল্পীরা এখনও ঐসকল প্রথা অনুসরণ করে নাই। অনেক ক্ষেত্রে ঐগুলির অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়, কারণ উহাতে ধাতুর খরচা শতকরা ২০ ভাগ এবং মজুরীও শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়া যায়।

—অজিত ঘোষ

রাখালের কথা

জনৈক সহপাঠী

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এখন অমৃতলোকে স্তুতি নিন্দার বাহিরে। আজ যদি তাহার কোন অকৃতী সহ-পাঠী স্মৃতিপট উদ্ঘাটন করিয়া অতীতের দুই-একটী কথা আলোচনা করেন, ভরসা করি 'পঞ্চপুষ্পে'র পাঠকবর্গ তাহাতে অসহিষ্ণু হইবেন না।

রাখালদাস পিতামাতার আদরের সন্তান। বাল্যে ও তারুণ্যে স্নেহপ্রবণ পিতামাতা—সাধ্যমত তাহার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। সে মুখের কথা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা তাহার অভাব দূরীকরণে যত্নবান্ হইতেন। এরূপ স্থলে অনেককেই ক্ষুদ্রচেতা ও আত্মসুখে নিমগ্ন হইতে দেখা যায়, কিন্তু রাখালদাস ছিল অন্য প্রকৃতির লোক। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি এবং অকৃত্রিম বন্ধুবৎসলতা সর্ব্বদাই তাহার চিত্তকে সরস করিয়া রাখিয়াছিল। সহপাঠীদের মধ্যে, কে ধনী, কে দরিদ্র, কে

সমাজের উচ্চস্তর, কে নিম্নস্তর হইতে উদ্ভূত, এই সকল কথা মনে করিয়া সে তাহার আচার-ব্যবহার নিয়মিত করিত না।

যদি শুনিয়াছে তাহার পিতৃহীন কোনও সহপাঠী পরীক্ষায় ফিএর টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, সে নিজে অগ্রসর হইয়া তাহাকে সাহস দিয়াছে, বলিয়াছে—"টাকা না যোগাড় হয় আমি যে প্রকারে পারি অভাব পূরণ করিয়া দিব।" তখনকার দিনে বহরমপুরে স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও স্বর্গীয় রাজা আশুতোষনাথ রায় বাহাদুর দরিদ্র ছাত্রের পিতামাতার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সুতরাং এরূপ অভাব কদাচিৎ ঘটিত। আমরা যে ছাত্রটীর কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহারও অভাব পূর্ব্বোক্ত পুণ্যশ্লোক ভূস্বামীদ্বয় পূরণ করিয়াছিলেন তথাপি একজন অজাতশ্মশ্রু বালকের একজন পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র সহপাঠীর প্রতি এই অকৃত্রিম সহানুভূতি, তাহা কি সহজে ভুলিবার কথা।

দরিদ্র ছাত্র গৃহশিক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন প্রকারে ব্যয়নির্ব্বাহ করে। সদা পরিশ্রমনিরতা জননীর এরূপ সাধ্য নাই যে ছেলেকে একটী পড়িবার আলো কিনিয়া দেন। রাখালদাস বন্ধুর অভাব-অভিযোগ সুবিধা-অসুবিধার কথা অবগত হইয়া নীল চিম্‌নী ও সবুজ 'ডোম'বিশিষ্ট একটী পড়িবার আলো নিজের পকেট-খরচের টাকা হইতে কিনিয়া বন্ধুকে উপহার দিয়াছে। তাহার ব্যবহারে ঘৃণা বা দাম্ভিকতা থাকিলে তাহার বন্ধু হয় তো সে উপহার গ্রহণ করিত না, কারণ বাল্যের দারিদ্র্যদুঃখ তরুণ সংসার-প্রবেশার্থীকে স্থূলচর্ম্মী না করিয়া বরং অধিকতর ভাব-প্রবণ (Sensitive) করিয়া তোলে। ডোম্‌, চিম্‌নী, ল্যাম্প কোন দিন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের সহানুভূতি-সঞ্জাত সেই আলোকের স্মৃতি রাখালদাসের সেই ভাগ্যহীন বন্ধু এখনও বিস্মৃত হইতে সমর্থ হয় নাই।

একটী ছাত্রের ঘরে আগুন লাগিয়া সর্ব্বস্ব পুড়িয়া গিয়াছে। একখানি পড়িবার বইও সে বাঁচাইতে পারে নাই। রাখালদাস তাহার নিজের বই দিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়াছে। আসিবার সময় তাহার হাতে ঠিকানা-না-লেখা একখানি আঠা-দিয়া-আঁটা ডাকের খাম দিয়া দিব্য দিয়া বলিয়াছিল, বাড়ী না পঁহুছিয়া খামখানি খুলিবে না। রাখাল তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছে। তাহার বন্ধুটী বাড়ী আসিয়া খামখানি খুলিয়া দেখে, তাহার ভিতর দশ টাকার একখানি নোট রহিয়াছে। সে কোন অর্থসাহায্য প্রার্থনা করে নাই। রাখালদাস স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার সহপাঠীর এই দারুণ বিপৎকালে অসঙ্কোচে এই দশটী মুদ্রা দিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। তাহার চক্ষুতে এই দশটী টাকা সামান্যই বোধ হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার বন্ধুর এই অপ্রত্যাশিত দানে চোখে জল আসিয়াছিল। সে ভালরূপই বুঝিয়াছিল যে, এই দশটী টাকার মূল্য দশ মোহরের অপেক্ষাও অনেক বেশী।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাল্যকালে সে বোধ হয় তাহার পিতার সহিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিল। সে সময় মুঘল বাদসাহদিগের স্মৃতিচিহ্ন সে অনেক কিছুই দেখিয়া আসিয়া থাকিবে। যতদূর স্মরণ হয়, আমরা তখন বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলের

পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। রাখাল বলিত, বাদসাহ একজন তাঁহারই এক সুবিখ্যাত কীর্ত্তির দ্বারদেশে স্বয়ং লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন "যদি ভূতলে স্বর্গ থাকে তাহা হইলে তাহা এইখানে, তাহা এইখানে, তাহা এইখানে—হমিনস্ত হমিনস্ত হমিনস্ত।" আমরা তখন বড় কষ্ট করিয়া শিশুপাঠ্য ইংরাজী ইতিহাস মুখস্থ করিতাম। মাষ্টার মহাশয় সেই ইংরাজী ইতিহাসের বাঙ্গলা করিয়া কে কাহার পিছু পিছু ধাওয়া করিয়াছিল তাহা বুঝাইয়া দিতেন। সেই সময় রাখাল হঠাৎ রাজা বাদসাহদিগের কাহিনী লইয়া মস্‌গুল হইয়া উঠিল। তখন বাঙ্গালার ইতিহাস-বিষয়ক কোন ভাল গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। ইহার কয়েক বৎসর পরে যখন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনী' প্রকাশিত হয় তখন আমরা অনেকেই নাটক-নভেল ফেলিয়া সেই অপূর্ব্ব কাহিনীগুলি পাঠ করিয়াছিলাম! ইতিহাসের মূল্য আমরা তখন হইতে বুঝিতে পারি, কিন্তু রাখালদাস বুঝিয়াছিল ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই। তাহার হাতের লেখা কোনকালেই ভাল ছিল না এবং রেখা-চিত্রাঙ্কণেও সে কোনদিন পারদর্শী হয় নাই। পেন্সিলের মাথার দিক্‌টা চিবান তাহার এক রোগ ছিল। তাহার এক-একটী পেন্সিল ৪।৫ দিনের মধ্যেই পরিত্যক্ত হইত। সেই মাথা-চিবান পেন্সিল দিয়া নুরজাহান বেগম এবং সাহজাহান, জাহাঙ্গীর, আকবর প্রভৃতি বাদসাগণের অদ্ভুত রকমের চিত্র আঁকিয়া সে তাহার লাইন-টানা এক্সারসাইজ বুকের অনেক সাদা পাতাই পরিপূর্ণ করিত। যখন সে বি এ ক্লাসে পড়ে, সেই সময়েই গীবন-প্রণীত প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাসের একটী মূল্যবান্ সংস্করণ ক্রয় করিয়াছিল। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ পাঠে তাহার ক্লান্তি হইত না। রাখাল দাস বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহার পিতামাতা উভয়েই দেহরক্ষা করেন। পিতাকে সে বড়ই ভক্তি করিত। পিতার মৃত্যুর পর একবৎসর কাল সে কদলীপত্রে ভোজন ও মৃৎপাত্রে পানীয় গ্রহণ করিত। কালাশৌচ উত্তীর্ণ হইলে তবে এ অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়।

১৯০৪ সালে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হেতু, মফঃস্বলের বি-এ, পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা অনেকেই কলিকাতায় আসিয়া সশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। রাখালদাসের দুইজন দুঃস্থ সহপাঠী কোথায় থাকিয়া কিরূপে পরীক্ষা দিবে ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কোনরূপই কিনারা করিতে পারিতেছিল না। অবস্থাপন্ন ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই হিন্দু হোষ্টেলে থাকিয়া পরীক্ষা দিবে স্থির করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা সৌখীন তাহারা 'মহৎ আশ্রমে' থাইবে, থিয়েটার দেখিতে যাইবে এই প্রকার নানারূপ জল্পনা করিতেছিল। পূর্ব্বোক্ত দুঃস্থ ছাত্রদ্বয়ও তাহাদিগের নিকটে বসিয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল। উভয়েরই এই প্রথম কলিকাতায় আগমন। একজন অপরকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে যাইতেছিল "ভাই আমরাও মহৎ আশ্রমে যাইব" কিন্তু ভুলবশতঃ তাহার মুখ দিয়া যাহা বাহির হইল তাহা নিতান্ত সত্যকথা। সে বলিয়া ফেলিয়াছিল "ভাই আমরাও অনাথ আশ্রমে যাইব।" এই লইয়া বেশ একটা হাসির ধূম পড়িয়া গেল। ইহার কিছুক্ষণ পরে রাখালদাস সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সে তাহার সহপাঠীরা* কলিকাতায় পরীক্ষা দিতে যাইতেছে এবং কে কোথায় যাইবে তাহার স্থির হইতেছে না শুনিয়া উপস্থিত সব কয়জনকেই তাহার মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটস্থিত নিজবাটীতে আতিথ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। অপর কেহ সম্মত হইল না কিন্তু সেই দরিদ্র ছাত্র দুইটী ইহা যেন তাহাদের প্রতি ভগবানেরই বিশেষ অনুগ্রহ এইরূপ বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সানন্দে সম্মতিজ্ঞাপন করিল। কলিকাতায় আসিয়া এই উপলক্ষে যে দশাহ-কাল অতিবাহিত করিয়াছিল সেরূপ নির্ম্মল আনন্দ তাহারা আর জীবনে কোথাও ভোগ করে নাই—একথা তাহারা নিজমুখেই বলিয়াছিল। 'মহৎ আশ্রম' রাখাল দাসের বাটীর অতি সন্নিকটেই অবস্থিত। নবাগত অতিথিদ্বয়কে আর মহৎ আশ্রমে যাইতে হয় নাই। তাহারা বন্ধুগৃহে বসিয়াই মহৎ আশ্রমের নানারূপ স্বাদু আহার্য্যের আস্বাদ উপভোগ করিত। সেসকল আহার্য্যের নামের সহিতও তাহারা

*রাখালদাসের সহপাঠীর মধ্যে কটক রাভেন্‌শা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, এবং বহরমপুর কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র এম্-এ এই দুইজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা বিদ্যাবত্তায় ও চরিত্রমাধুর্য্যে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন।

পরিচিত ছিল না। গৃহস্বামী কিন্তু তাহার কিছুই স্পর্শ করিত না। সে দুইবেলা নিরামিষ আতপান্ন গ্রহণ করিত। বৎসরান্তে নিষ্ঠার সহিত পিতৃযাগ উদ্‌যাপন না করিয়া সে এ নিয়মের আর ব্যতিক্রম করে নাই। রাখালদাস এই সময় হইতেই প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিল। প্রতিদিন কলেজে পড়াশুনা করিয়া সে মিউজিয়মে যাইত এবং তথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তাহার প্রায়ই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। রাখালদাসের bluff heartiness তাহার আড়ম্বরহীন সরস সহৃদয়তা তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ কেহই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়াইয়া আদর-যত্ন করিয়া তাহার আর ক্লান্তি ছিল না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় খণ্ডের পণ্ডিত-সমাজে সুপরিচিত একজন শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপকের মুখে শুনিয়াছি যে, রাখালদাস পুনা নগরীতে অবস্থানকালে তিনি তথায় দুই-একদিনের জন্য তাহার অতিথি হইয়াছিলেন। গৃহস্বামী তাঁহাকে শুধু খাওয়াইয়া তৃপ্ত হন নাই, আসিবার সময় তাঁহার নানা আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে নববস্ত্র উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ডাঃ রামদাস সেন মহাশয়ের আত্মজ স্বর্গীয় বোধিসত্ত্ব সেন মহাশয় রাখালদাসের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। রাখালদাস প্রণীত "করুণা" নামক কথাগ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে যে "বোধিসত্ত্বায়" শব্দটী দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কোনও বৌদ্ধ দেবতাবাচক নহে বোধিসত্ত্ব সেন মহাশয়ের উদ্দেশ্যেই লিখিত। বন্ধুর ব্যয়-বাহুল্য উল্লেখ করিয়া বোধিসত্ত্ব কতবার অনুযোগ করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ [illegible] দর্শে নাই। রাখাল জীবনের আনন্দ উপভোগ করিতে [illegible] করে নাই। He warmed both his hands before the fire of life. কিন্তু তাহার উদার[illegible] [illegible] [illegible]নও কেবলমাত্র আত্মসুখলিপ্সু [illegible] হইতে দেয় নাই। নাট্যকলার প্রতি রাখালদাসের [illegible] অনুরাগ ছিল বিশেষ করিয়া ঐতিহাসিক নাটকাদির অভিনয়-সম্পর্কে তাহার সমধিক উৎসাহ দেখা যাইত। একবার Elphinstone Theatreএ এক বিলাতী থিয়েটার কোম্পানী আসিয়া For the King নামক একখানি ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় করিতেছিলেন। এই নাটকে Oliver Cromwellএর চরিত্র কোন নিপুণ অভিনেতা-কর্ত্তৃক অভিনীত হইতেছিল। রাখালদাস নিজের ও তাহার কয়েকটী বন্ধুর জন্য নিজ ব্যয়ে ৪৲ টাকা মূল্যের চারিখানি কি পাঁচখানি টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন। হঠাৎ কলিকাতাবাসী অপর একজন বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এই নাটকের কথা শুনিয়া ইংরাজ অভিনেতা-অভিনেত্রীদিগের অভিনয়-নৈপুণ্য দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করায় রাখালদাস নানা অনুরোধ সত্ত্বেও স্বয়ং না গিয়া কেবল তাঁহার বন্ধুকয়জনকেই থিয়েটার দেখিতে পাঠাইয়া দিলেন।

রাখালদাস যখন কর্ম্মস্রোতে নিমগ্ন হইতেন তখন তাঁহার যেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইত। তখন আর হাস্য-পরিহাস বা চপলতার চিহ্ন মাত্র পরিলক্ষিত হইত না। তাঁহাকে হাতী-গুম্ফায় মাচানের উপর বসিয়া খারবেলের লিপির ছাপ লইতে ও পাঠোদ্ধার করিতে দেখিয়াছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই কার্য্যে কাটিয়া গিয়াছে। গুহার ভিতরের ছাদে উৎকীর্ণ এই বিশাল লিপি মুখ তুলিয়া কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষা করিলেই ঘাড়ে ব্যথা জন্মে কিন্তু রাখালদাসের ক্লান্তি নাই। এই লিপি পরীক্ষাকালে তাহাকে স্বর্গীয় পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। তিনি একক কিরূপে এই দুঃসাধ্য কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়া রাখালদাস শ্রদ্ধাভরে তাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে।

রাখালদাসের হাতের লেখা ভাল ছিল না বলিয়া তাহাকে লিপিকার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত। বাঙ্গলার ইতিহাসের ন্যায় বহু প্রমাণ-পঞ্জী ও পাদটীকা-সংবলিত গ্রন্থ মুখে মুখে বলিয়া যাইতে হইলে কিরূপ মেধা ও ধীশক্তির আবশ্যক তাহা যিনি গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছেন তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম ইংরাজী প্রবন্ধ "কুক্কুট পাদগিরি" হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার অপ্রকাশিত গ্রন্থ "উড়িষ্যার ইতিহাস" পর্য্যন্ত অনেক সারবান ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক নিবন্ধ রাখালদাস রচনা করিয়াছেন। বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট সেগুলি সুপরিচিত হইলেও সাধারণ পাঠক তাহাকে "শশাঙ্ক," "ধর্ম্ম-পাল," "ময়ূখ," "করুণা" " অসীম" প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহের লেখক বলিয়াই জানে। রাখালের নিকটেই

শরতের উপহার

শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

শুনিয়াছিলাম যে কোনও সময়ে কলিকাতা মিউজিয়মে জনৈক খ্যাতনামা বৈদেশিক অধ্যাপকের সহিত ইতিহাস-চর্চ্চা লইয়া তাহার আলোচনা হয়। যতদূর স্মরণ আছে তাঁহার নাম Maspero, তবে ইনি Dawn of Civilization প্রণেতা Maspero কি না বলিতে পারি না। এই অধ্যাপক মহাশয় কথা-প্রসঙ্গে বলেন যে, ইতিহাস-সম্বন্ধে উৎসুক্য জন্মাইতে হইলে গল্পচ্ছলে, ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত সাধারণে গোচরীভূত করিতে হয়। এই আলোচনার ফলে 'পাষাণের কথা' হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপন্যাস গ্রন্থগুলি ক্রমশঃ রচিত হইতে থাকে। বাঙ্গালী পাঠকের মধ্যে কয়জন "ধর্ম্মপাল" পাঠ করার পর সমসাময়িক ইতিহাসে অনুসন্ধিৎসু হইয়া এসিয়াটিক সোসাইটির— Memoir, "Palas of Bengal" পড়িয়াছেন তাহা জানি না কিন্তু কথা-গ্রন্থ হইতে পাঠকেরা ক্রমশঃ নিছক ইতিহাস গ্রন্থে আকৃষ্ট হইবেন ইহাই গ্রন্থকারের যে আসল উদ্দেশ্য ছিল সে কথা তাহাকে নিজ মুখে ব্যক্ত করিতে শুনিয়াছি। মনে হয় কেবল "পাষাণের কথা"ই কতকাংশে এ উদ্দেশ্য সাধিত করিয়াছে। রাখালের বড় ইচ্ছা ছিল যে একবার Egyptology (মিশরতত্ব) সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চেষ্টা করে কিন্তু এ বিদ্যা এ দেশে থাকিয়া আয়ত্ত করার সুবিধা হয় নাই—তাই তাহার এ অভিপ্রায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রাতত্ব সম্বন্ধে রাখালদাসই সর্ব্বপ্রথমগ্রন্থরচনা করিয়াছেন। "প্রাচীন মুদ্রা" হিন্দীভাষায় অনুদিত হইয়াছে কিন্তু বাঙ্গলায় কয়খণ্ড বিক্রয় হইয়াছে তাহা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাল জানেন।

রাখালদাস-প্রণীত "বাঙ্গলার তক্ষণ-শিল্প' (Bengal Sculptures) নামক যে গ্রন্থখানি প্রত্নতত্ব-বিভাগীয় গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভারত-সরকারের ছাপাখানায় আংশিক মুদ্রিত হইয়াছে আজ গ্রন্থকারের অবর্ত্তমানে তাহা আর মুদ্রণ-সমাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে কি না বলিতে পারি না। যতদূর শুনিয়াছি এই গ্রন্থখানি প্রথমে Doctorateএর thesis রূপে (ডক্টর উপাধির জন্ত লিখিত গবেষণামূলক প্রবন্ধরূপে) আরব্ধ হয়। যে কারণেই হউক বিশ্ববিদ্যালয় উহা গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু বর্ণমালার উদ্ভব-বিষয়ক প্রবন্ধটী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। অদ্যাবধি উহা ইতিহাস-শাখায় এম-এ, পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। রাখালদাসের Swan Song তাহার ইংরাজী ভাষায় রচিত উড়িষ্যা-বিষয়ক ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এই ইতিহাসখানি ছাপা হইতেছে শুনিয়াছি ... মুদ্রণ-কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল অবগত নহি। রোগ-শয্যায় শয়ন করিয়াও এই পুস্তকের ছবিগুলির ব্লক যাহাতে সুচারুরূপে নির্ম্মিত হয় সে-সম্বন্ধে তাহাকে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। তাহার স্নেহাস্পদ অনুজতুল্য জনৈক শিল্পীকে এই কার্য্যের ভার দেওয়া তাহার ইচ্ছা ছিল—সে মনে করিয়াছিল যে তাহাতে অভাবগ্রস্ত শিল্পীর কিঞ্চিৎ আর্থিক সুবিধা হইতে পারে। ... হইতেছে এসম্বন্ধে খোঁজ লইতে শুনিয়াছি। নানা কারণে তাহা এ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত না হইলেও এই পরোপকার-চিকীর্ষা বিস্মৃত হইবার নহে। প্রত্নতত্বের বাদানুবাদ-প্রসঙ্গে কোনও কোনও স্থলে মতবৈষম্য যে কচিৎ ব্যক্তিগত বিদ্বেষেও পরিণত হইয়া থাকে তাহা আমরা শুনিয়াছি কিন্তু আজ রাখালদাসের মৃত্যুতে মতদ্বৈধের কথা বিস্মৃত হইয়া ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ মাত্রেই যে তাহার বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। আজ ভারতীয় পণ্ডিত-সমাজের বিশেষজ্ঞগণ মৃত সহকর্ম্মীর উদ্দেশে তাঁহাদের স্বরচিত বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ নানা রূপে নিবেদন করিয়া কি একখানি Memorial Volume প্রকাশিত করিতে পারেন না? প্রতীচ্য-খণ্ডে মৃত পণ্ডিতের প্রতি এরূপ সম্মান-প্রদর্শন প্রথা অপরিচিত নহে। স্মারক পুস্তক প্রকাশিত হউক বা না হউক "বাঙ্গলার ইতিহাস" প্রণেতাকে বাঙ্গালী পাঠক সহজে ভুলিতে পারিবে না।

জেনেভা-ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

২৫এ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

আজ ভারতবর্ষের ডাক গেল। ১০ই অক্টোবর শুক্রবার মার্সেলস্ হইতে বাক্মুক নামক P. & O. কোম্পানীর জাহাজে যাত্রা করি এ সংবাদ বাড়ীতে ও বঙ্গের বন্ধুগণকে দিলাম।

স্যর জগদীশ বসু Intellectual Co-operative Committeeর মেম্বররূপে বহুদিন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, বৎসর বৎসর এই উপলক্ষে আসিয়া দুই-একদিন জেনিভা নগরে থাকেন—বাকী সময় স্বাস্থ্যের জন্য কিংবা নিজের আবিষ্কারের বহুল প্রচার-জন্য ইউরোপের নানাস্থানে বেড়ান।

Intellectual Co-operative Committeeর জন্য বিশেষ কোন কাজ করিবার সময় ও সুবিধা হয় না। সকলের সঙ্গে তাঁহার মতের ও মনের ঐক্য হয় না বলিয়া তিনি অনেক সময় এখানে থাকেন না। যদিও সুইজার-ল্যাণ্ডে অনেকদিন আছেন, এখানে বড় আসেন না। গত পূর্ব্ব রবিবার জেনিভা-হ্রদের উপর টেরিটে শহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সেইখানে পাহাড়ের উপর বাড়ী লইয়া তিনি অনেকদিন ছিলেন। আজ জেনিভার ভিতর দিয়া মার্সেলস্ চলিলেন—এই মেলে বাড়ী যাইবেন। লেডি বসু আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

স্যর জগদীশের অসুস্থ শরীর বলিয়া তিনি কখন কাছ ছাড়া হন না। দেশে-বিদেশে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য সঙ্গে থাকেন। তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে সন্ধ্যার সময় গিয়াছিলাম। 'আমার ভাল দেখিয়া যাইতেছেন' এই কথা বাটীতে সংবাদ দিবার জন্য লেডি বসুকে বলিয়া দিলাম, বিদেশে আসিয়া ও থাকিয়া শরীরের অসুখ সারিয়াছে ও ভাল আছি এ সংবাদ স্বয়ং দেখিয়া গিয়া কেহ বলিলে বাড়ীর লোকের প্রত্যয় হইবে, ডাক্তারের সার্টিফিকেটও ডাকে পাঠাইলাম।

আমি লণ্ডনে না গিয়া বরাবর ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতেছি বলিয়া স্যর জগদীশ দুঃখপ্রকাশ করিলেন। লীগ অব নেসন্স-এর কার্য্য শেষ হইয়াছে; লণ্ডন যাইবার বাস্তবিক আর কোন প্রয়োজন নাই এবং রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স-এর যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে অসাফল্য অবশ্যম্ভাবী এবং গায়ে পড়িয়া কোন দলের কোন লোককে ধর-পাকড় করিয়া কোন ফল নাই; এ কথা তাঁহাকে বোঝান দুঃসাধ্য হইল।

দেশে পুলিশের ও সরকারের যেরূপ জুলুম ও অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং যাহারা সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদের হঠকারিতা যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে শীঘ্র কোন সামঞ্জস্য সম্ভাবনার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পুলিশ-অত্যাচারের অনেক কথা বিলাতী কাগজ-ওয়ালারা এখানে প্রকাশ করেন না; কিন্তু আমেরিকার সংবাদ-পত্রপরিচালকগণ সে সব কথা বিশেষ সংবাদদাতা দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। ভগবান্ উভয়পক্ষকে যতদিন সুমতি না দেন কোন পক্ষেরই মঙ্গল সম্ভব নয়।

লীগ্ অব নেসন্স-এর পক্ষ হইতে আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-সংরক্ষণের চেষ্টা হইতেছে—ভারতবর্ষ এদিকে জ্বলিয়া যাইতেছে অথচ সেসকল বিষয়ে এখানে উচ্চবাচ্য হইবার যো নাই। এ অবস্থায় দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া যাওয়ার কোন উপকারের আশা নাই।

পুনার নিকটস্থ সাঙ্গোলী রাজ্যের রাজা, বম্বে-প্রদেশের ভোর রাজ্যের রাজা প্রভৃতি এখানে আসিয়া জুটিয়াছেন। ভারতীয় ডেলিগেসনের পক্ষ হইতে আমরা খানা দিতেছি; তাহাতে এই সকল রাজা-রাজড়া বিলাতের রাজনীতিজ্ঞ-

পুরুষগণের ও ইউরোপ, আমেরিকার নানা রাজনীতিজ্ঞগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া এসকল বিষয়ে যতদূর সম্ভব আলোচনা করিতেছি। পার্লামেন্টের Boston Nail Baker, Dalton, Henderson, Miss Lawrence প্রভৃতি শ্রমজীবী মন্ত্রীদলের যেসকল সভ্য আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে ক্রমাগত বুঝাইতেছি যে ঔপনিবেশিক অধিকার (Dominion Status) ব্যতীত ভারতবর্ষের কোন সম্প্রদায়ই সন্তুষ্ট হইবে না। তাঁহারা মুখে সহানুভূতি দেখান কিন্তু কাজের বেলা কিছুই করেন না। কনসারভেটিভ ও লিবারেল সম্প্রদায় তাঁহাদের বিরোধী, এইজন্য তাঁহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের এই ওজর। তাঁহাদের মন্ত্রিত্বের মেয়াদ বোধ হয় শীঘ্র শেষ হইয়া আসিবে।

দলে দলে যেখানে যে সূত্রে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে এসকল কথা বলিবার সুবিধা ও অবকাশ পাইতেছি, তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র ঔদাস্য কিংবা কার্পণ্য করিতেছি না—নিজের স্বাস্থ্য ও সুবিধার পক্ষে লক্ষ্য রাখিতেছি না।

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী-প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রমজীবীদিগের প্রয়োজনীয় উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য যে কমিটী হইয়াছে তাঁহারা সাদরে বার বার আহ্বান করিয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেছেন। লীগ্ অব নেসন্‌সের যে কাজের জন্য আসিয়াছি, একাজ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তথাপি এই উপরি পরিশ্রম করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছি না; কারণ ইহার সাহায্যে ভারতবর্ষের যথেষ্ট উপকার সম্ভব। International Labour Officeএর ডাইরেক্টর Mr. Somna, ডেপুটী ডাইরেক্টর মিঃ বট্‌লর, সেক্রেটারী ডাঃ Eastmen প্রভৃতির সঙ্গে এই সকল আনুষঙ্গিক বিষয়ে ক্রমাগত আলোচনা হইতেছে—প্রয়োজনমত বক্তৃতা ও লেখালেখি চলিয়াছে।

স্যর ইউয়ার্ট গ্রীভস্-এর ভগ্নিনী মরণাপন্ন পীড়ার জন্য লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জায়গায় বিহার ও বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব জজ স্যর বসন্তকৃষ্ণ মল্লিক আসিয়াছেন, Imperial Conference উপলক্ষে এবং প্যারিসে চিকিৎসা ও বাজার-হাট করা উপলক্ষে মহারাজা বিকানীরও আজ প্যারিসে চলিলেন। ভারতীয় ডেলিগেসনের পক্ষ হইতে আজ শেষ মধ্যাহ্ন-ভোজ দেওয়া হইল, তারপর ছবি উঠাইবার পালা। আর-একটা এইরূপ মধ্যাহ্ন-ভোজ ও একটা রাত্র-ভোজ হইয়া গিয়াছে, অন্যান্য ডেলিগেটরা যেরূপ আমাদের ভোজ দিয়াছেন, ইহা তাহারই ফেরৎ ভোজ। ভারতবর্ষের খরচেই এসব ভোজ দেওয়া হয়, তবে অন্যান্য দেশের পক্ষ হইতে খানায় যেরূপ আড়ম্বর হয় দরিদ্র ভারতের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। সামান্য ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইতে হয়, মহারাজা বিকানীর নিজে দুইটা মধ্যাহ্ন-ভোজ ও একটা রাত্র-ভোজ দিয়াছেন, সকলের সঙ্গে বিশেষ সৌজন্য ও আত্মীয়তা করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

দেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার রাজ্যে যাইবার জন্য তিনি বারংবার সাদর আমন্ত্রণ করিলেন।

লীগের কমিটীর কাজই আসল কাজ, তাহা খুব জোর চলিয়াছে। ছয়টার মধ্যে দুইটা কমিটীর প্রধান কাজের ভার আমার উপর; সে কাজ ভালই হইয়াছে ও হইতেছে বলিয়া শুনিতে পাই।

কমিটীর কাজের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে লীগের সাধারণ অধিবেশনও চলিয়াছে। তাহাতে ভোট-মঙ্গলই অধিক। সালিসীর বিচারে বিবাদ মিটাইবার জন্য লীগের পক্ষ হইতে সকল জাতির মধ্য হইতে ১৫ জন জজ নিযুক্ত হন। সে ভোটমঙ্গল-ব্যাপারে হাঙ্গাম হয় অনেক, আজ সমস্ত দিন ধরিয়া সেই হাঙ্গামা চলিল। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে বোম্বের ব্যারিষ্টার স্যর চিমনলাল শিতলবাদের নাম প্রস্তাব হইয়াছিল, তিনি একটী মাত্র অর্থাৎ ভারতবর্ষেরই ভোট পাইলেন। পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজাতির আন্তর্জাতিক সভায় ভারতের প্রধান আসন পাইতে বিলম্ব অনেক, নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদ মিটাইতে হইবে—রাষ্ট্রীয় অধিকার পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইবে এবং প্রধান পুরুষেরা নিঃস্বার্থভাবে দেশ-সেবার জন্য এখানে যখন আসিবেন ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণের মত বারমাস থাকিয়া ভারতবর্ষের অভাব দূর করিবার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত হইবেন তখনই কিছু হইবে। আপনাদের ভিতর মারামারি, কাটাকাটি ও সরকারী অত্যাচার

নিবারণ না করিয়া ইহার সুফল আশা করা যায় না।

তিন তিন বার তো ইউরোপে আসিয়া দেশ-সেবার চেষ্টা কায়মনোবাক্যে করিলাম।

সকলেই আশ্চর্য্য হন এই বয়সে, এই শরীর লইয়া, কাহারও নিকট কখন কোনরূপ উৎসাহ বা সহায়তা না পাইয়া এত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই গুরুভার ক্ষীণ স্কন্ধে লইতে কিরূপ দুঃসাহসী হইয়াছি। এত কাজ-কর্ম্মের মধ্যেও যেখানে যাহা দেখিবার তাহাও যথাসাধ্য দেখিতে ভুলি নাই। যেমন সামোনি প্রদেশে পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ। জংফ্র ও সেন্ট বার্নার্ডস প্রদেশেও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক, কিন্তু তাহা দূরবর্ত্তী স্থান এবং যাইতেও কষ্ট ও শ্রম যথেষ্ট হয়। শীত ক্রমশঃ বাড়িতেছে, ও সকল প্রদেশে তুষারের ঝড় (Blizzard) আরম্ভ হইয়াছে। সে ঝড়ের সময় পূর্ব্বে সেন্ট বার্নার্ডস কুকুরেরা পথিককে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিত, এখন টনেল হইয়া পর্ব্বত পার হইবার সময় পথিকের সেই শ্রেণীর ঝড় হইতে বিপদ-সম্ভাবনা অনেক কম, কাজেই সেন্ট বার্নার্ডস মোন্‌সলে ও তাঁহার আশ্রিত কুকুরের কথা আর বড় শোনা যায় না। এই আল্‌প্‌স পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়াই নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন—Alps! There shall be no Alps. নিজ বীর্য্যে আল্‌প্‌স পর্ব্বতের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া বিশ্ববিজয়ী বীর এই দম্ভ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সব মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য যেরূপ দেখা চলিতেছে, ছোট ছোট গৃহস্থালীর খুঁটিনাটী ব্যাপারও তেমনই দেখিতে হইতেছে। হোটেলের খাবার তিনবার না খাইয়া মাঝে মাঝে খাবার বন্ধ করিয়া ফল খাইবার আয়োজন নিজে করিতে হয়। যথাসময়ে দোকানে যাতায়াত করিয়া চক্ষুর চিকিৎসার প্রধান ডাক্তার বোল-এর কাছে যাতায়াত করিয়াও সময় কাটাইতে হয়, জেনিভার ঘড়ির চেষ্টাও করিতে হয়, আবার চার পয়সার জায়গায় চার ফ্র্যাঙ্ক অর্থাৎ দুই টাকা খরচ করিয়া নাপিত নয় নাপতানীর বাড়ী গিয়া পায়ের আঙুলের বসা নখ কাটিয়া আসিতে হয়, বাঙ্গালী ছাত্রেরা আসিয়া আত্মীয়তা করিয়া গত বারের মত হাতের নখ কাটিয়া দেয়।

নাত-জামাই পার্ব্বতীপ্রসন্ন হাওয়ার জাহাজ ডাকে লিখিয়াছে—ইউরোপে তিন মাস ও প্রবাস-পত্র যত্ন করিয়া পড়িতেছে, এ পর্য্যায়ের পত্রও পড়িবে।

সোমবার ২৯এ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

লীগের কাছে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, মাঝে মাঝে লীগের অধিবেশন অল্প সময়ের জন্য হইতেছে, তাহাতে চল্‌তি কাজ মাত্র হয় বেশী বক্তৃতা হয় না। কাজ বেশী হইতেছে ছয়টা বড় বড় কমিটিতে ক্রমাগত সকাল-বিকাল কখন বা রাত্রে সে কাজ চলিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বাদানুবাদ হইয়া যেমন কোন বিষয়ে স্থির হইতেছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টার তাহার রিপোর্ট দাখিল করিতেছে। রিপোর্ট লইয়াও অনেক বাদানুবাদ হয়, তাহার পর প্রস্তাব হয়, সেই প্রস্তাব লীগের মিটিংএ দাখিল হইয়া পাশ হয়।

দু'নম্বর ও পাঁচ নম্বর কমিটিতে আমার খাস কাজ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, নীতি এই সকল বিষয়ে কাজের ভার পড়িয়াছে। যথাসাধ্য কাজ করিয়া যাইতেছি, ফল নিতান্ত মন্দ হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না, আমাদের যথার্থ রাজকীয় অধিকার কিছু নাই, কাজেই কাজ ও কথাগুলা অনেকটা খেলা-ঘরের কাজ ও কথার মত হইয়া চলিতেছে। তবে এই রকম হইতে হইতেই কাজে প্রাণ আসিবে, দশ বৎসরের মধ্যে যে সব ভারত-প্রতিনিধি আসিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের এই সকল কাজে অনুরোধ বা কৃতিত্বের অভাবে কাজ বড় জমাট বাঁধিবার অবকাশ পায় নাই, খোসামুদে খয়ের খাঁ ধামা-ধরার দল দিয়া বহুদিন প্রতিনিধির কাজ চলিয়াছে সেই জন্যও কাজের জমজমা হইতেছে না। এবার ভারত-প্রতিনিধিরা কাজের একটা জমজমা বাধাইয়াছেন—একথা সকলের মুখেই শোনা যাইতেছে।

এই কারণে লীগ-কমিটিতে যে কাজ অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা ছাড়া অন্য কাজ আরও আসিয়া পড়িতেছে, ভারতের মুখরক্ষার জন্য সেসকল আহ্বান অমান্য করা যায় না। যদিও International Labour Officeএর সঙ্গে আমাদের লীগের কাজের আপাততঃ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোনরূপ সম্পর্ক নাই তথাপি শ্রমজিবীদিগের শিক্ষা-

ব্যবস্থার জন্ত যে কন্ফারেন্স হইতেছে তাহার জন্ত উপর্য্যুপরি পরিশ্রম করিতে হইতেছে। Director M. Tornma, Deputy Director Mr. Buller, Secretary Dr. Eastman, Dr. Das, Mr. Rao প্রভৃতি কর্ম্মকুশল কর্ম্মিগণ যথেষ্ট খাটাইয়া লইতেছেন।

লীগের শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী Mr. Duper Firor, Mr. Opresan, Mr. Bunnet, Mr. Comne, Information-বিভাগের Mr. A C. Chatterjee প্রভৃতির সহিতও সর্ব্বদা জটিল বিষয়েরও আলোচনা হইতেছে, আমাদের ডেলিগেটগণের মেম্বারদিগের মধ্যে কর্ম্মচারী Craftgoodchild প্রভৃতির সঙ্গে সর্ব্বদা আলোচনা চলিতেছে। British Delegationএর Miss Hamllor, Miss Lawrence, Mr. Dalton, Mr. Buxton, Lord Robert Cecil, Foreign Secretary Mr. Henderson, Mr. Nail Baker, Australian Delegationএর Mr. Coleman প্রভৃতির সহিত দিবা-রাত্র আলোচনা চলিতেছে। এক হোটেলে থাকার দরুণ খাইবার সময়েও বিশ্রাম নাই।

মহারাজা বীকানীর চলিয়া যাওয়াতে কাজের ভার আরও বাড়িয়া চলিয়াছে।

South Africa ও Canada Delegationএর প্রতিনিধিরা International Conferenceএর জন্ত লণ্ডনে গিয়া খাতির জমাইয়া বসিতেছেন। সে কন্-ফারেন্স ও Round Table Conferenceএ ভারতবর্ষের পক্ষে কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। বোম্বাই, কলিকাতা, মেদিনীপুর, চন্দননগর, মৈমন-সিংহ, চট্টগ্রাম, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে যেরূপ দিন দিন হাঙ্গামা বাড়িতেছে তাহাতে দেশের অবস্থা ক্রমশঃ অতি শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। লণ্ডনে এ শোচনীয় অবস্থার উন্নতির কোন আশাই দৃষ্ট হইতেছে না। স্থিরভাবে সম্মান-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চুয়ান্ন জাতির প্রতিনিধিগণের সাক্ষাতে কাজ করা বড়ই সুকঠিন হইতেছে।

লেডি, ব্লুমফিল্ড "সুপ্রীম পীস মুভমেণ্ট" নামে শান্তি-স্থাপন-আনুকূল্যে যে সভা স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানে আজ ভারতের রীতিনীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার আহ্বান ছিল। বিস্তর লোক সমাগম হইয়াছিল—কথাগুলা সকলেরই ভাল লাগিল। আজ মহাসপ্তমী পূজা। সেই কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতার সার্থকতা সম্পাদনে সুবিধা হইল। বহু সহস্র ক্রোশ দূরে প্রিয়জন-বিরহে বিদেশে আজ মহামায়ার পূজার মহাশান্তি-স্থাপন-আনুকূল্যে দুইবার কথা বলিবার সুবিধা ও বিদেশীকে আমাদের প্রাণের কথা বুঝাইবার অবকাশ পাইয়া ধন্ত হইলাম। বক্তৃতা এক ঘণ্টার উপর হইয়াছিল।

আজ সমস্ত দিন বৃষ্টি হওয়ায় খুব ঠাণ্ডা অথচ সভায় লোক ধরে না।

জেনিভাতে যে বাঙ্গালী দল আছেন, তাঁহাদের পূজার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তাঁহারা বিজয়া-দশমীর সম্মিলন-ব্যবস্থার আয়োজনের চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

গতকল্য রবিবার ছিল। প্রায় ২৫ পঁচিশ ক্রোশ দূরে আরও উচ্চ পাহাড়ের কোলে এ্যানিসি হ্রদের উপর এ্যানিসি শহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এখানকার পর্ব্বতও হ্রদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার, দেখিয়া আশা মেটে না। পথে ছোট বড় অনেক শহর আছে, গ্রাম কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। রবিবার বলিয়া সব শহরের পথে ঘাটে মেলা বসিয়া গিয়াছে। নাগর-দোলা ও মেলার সরঞ্জামের ধুমধাম যথেষ্ট, জেনিভা শহরেও এইরূপ মেলা বসিয়াছে। মধ্যে একটা বড় সার্কাস আসিয়া-ছিল, নাচ, তামাসা, থিয়েটার প্রভৃতির অন্ত নাই, নানা জাতীয় লোকের আনন্দ-কোলাহলে রাত্রে বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছি, দিনের বেলা যে হাঙ্গামা তাহাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত।

আমাদের কাজ-কর্ম্মের সুবিধার জন্ত লণ্ডন হইতে ৩৪ জন কেরাণী ও ২ জন মহিলা-টাইপিষ্ট আসিয়াছে, তাহারা যথেষ্ট সেবা করিতেছে, তাহাদেরও রবিবারে আনন্দ করিবার জন্ত চাঁদা তুলিয়া খাওয়া-দাওয়া, মোটরে বেড়ান প্রভৃতির আয়োজন করা হইয়াছিল, তাহারা পূর্ণ আনন্দ-লাভ করিয়াছে অকুণ্ঠিত চিত্তেই ইহা জ্ঞাপন করিয়াছে।

রুসিয়া হইতে সমস্ত গীর্জ্জা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ভগবান্ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন, ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে। জেনিভাতে রুসিয়ানদের যে গীর্জ্জা আছে তাহা দেখিতে

গিয়া মুগ্ধ হইলাম। আলো-ধূপ, দীপ, অর্চনা আমাদেরই মত, অতি ভক্তিভরে ভগবৎপূজা চলিয়াছে, আর্তসেবার ব্যবস্থাও আছে।

মঙ্গলবার ৩০এ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

নানা দিগ্‌দেশের নানাজাতি জেনিভা নগরে চিরকাল আসিয়া জমে, সেইজন্য ইহা গরীবের জায়গা নয়। লণ্ডন-প্যারিসের পথে-ঘাটে নানা ছাঁদের ভিখারী দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও আইন-অনুসারে ভিক্ষা করা বন্ধ ও শাস্তিযোগ্য, তথাপি নানা ছাঁদের ভিখারীর অভাব সে সব বড় বড় নগরে নাই—কেহ জুতা, ফিতা ও দেশলাই বিক্রয়ের ভাণ করে, কেহ বাজনা বাজাইবার ভাণ করে, কেহ ফুটপাতের উপর রঙের গুঁড়া ছড়াইয়া ছবি আঁকার ভাণ করে (Pavement Artisrt) কিন্তু করে ভিক্ষা, দারিদ্র্য নিবারণ জন্য Unemployment Pension, Sickness Pension, Widows Pension প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া দেশের লোকের উপর ট্যাক্সের বোঝা বিষমরূপ চাপিয়াছে, Poor Law আছে, Alms House আছে, তবু ভিক্ষা বন্ধ হয়, কিন্তু জেনিভাতে ভিক্ষার ব্যাপার আদৌ নাই—মদের দোকান যথেষ্ট আছে কিন্তু প্রকাশ্য বেশ্যা নাই, স্কুল-কলেজ-ইউনিভারসিটি যথেষ্ট, জাতি যদিও বহুদিন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সাধারণ-তন্ত্র-পরিচালিত তথাপি উহাদের নিজস্ব ভাষা নাই। সুইজারল্যাণ্ডের চারিদিক্ ঘিরিয়া আছে পর্ব্বতরাজ আল্‌প্‌স (Alps) আর তাহার কোলে বিচিত্র হ্রদ ও নদী এবং হ্রদ ও নদীর কোলে শোভাময় অতুল স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যময়ী উপত্যকা, পর্ব্বতের অপর পারে ফ্রান্স, জার্ম্মণী, অষ্ট্রীয়া, ইটালী প্রভৃতি দেশ। তাহাদের ভাষাই সুইস জাতি ব্যবহার করে। সুইজারল্যাণ্ডের যে অংশ অন্য যে দেশের গায়ে ও পাশে পড়িয়াছে ইহারা তাহাদের ভাষাই ব্যবহার করে। অধিকাংশ লোক ফরাসী ভাষা ব্যবহার করে। এখানে ঘড়ি, এনামেলের কাজ ও লেসের কাজ ও ব্যবসাই অধিক। অন্যান্য শ্রমজীবী খুব কম, চাষবাস ও গোপালন পল্লীগ্রামের লোকেরাই করিয়া থাকে। পাহাড়ের গায়ে নধরদেহ সুন্দর গাভী দেখিয়া প্রাণ জুড়াইয়া যায়। এই গাভীর দুগ্ধেই বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ব-প্রচলিত জমাট দুধ তৈয়ার হয়, সব জিনিসই দুর্ম্মূল্য, কিন্তু দুধ, মাখন, পনীর মোটের উপর সস্তা ও উৎকৃষ্ট। ফলমূল, শাকসব্জীও দুর্ম্মূল্য। ভাল বড় পীচ এক ফ্র্যাঙ্ক অর্থাৎ অর্থাৎ আট আনার কম পাওয়া যায় না।

সামান্য একজন ট্রাম-কণ্ডাক্টারের নিত্য খরচ তিন ফ্র্যাঙ্ক বা দেড় টাকা। স্থানীয় কোন কলকারখানা নাই বলিয়া সকল জিনিস দুর্ম্মূল্য। কাপড়-চোপড়, বাক্স, পেড়া গৃহস্থালীর যে কোন জিনিস লণ্ডন, প্যারিসের অপেক্ষা দুর্ম্মূল্য। দেশ-প্রান্তে কড়া পাহারা, বিনা মাশুল দিয়া কোন জিনিস আনিবার যো নাই, রেলে, মোটরে, ষ্টীমারে বা পদব্রজে সুইজারল্যাণ্ড হইতে পার্শ্ববর্ত্তী দেশে কিংবা পার্শ্ববর্ত্তী দেশ হইতে সুইজারল্যাণ্ডে আসিতে হইলে ফ্রেঞ্চ ও সুইস ঘাঁটীর দারোগা উভয়ে খানা-তল্লাসী করিবে; কাপড় ঝাড়া দিয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের উপর যাতায়াতের সময় এসব অত্যাচার হয় নাই, কারণ আমরা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি এবং সম্রাজ্ঞী অতিথি, কিন্তু জেনিভার বাহিরে যে কয়দিন মোটরে করিয়া নিকটে কিংবা দূর গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছি সঙ্গে ছাড়পত্র রাখিতে হইয়াছে এবং আমাদের সুইস ড্রাইভারের নাম-ধাম-নম্বর সব প্রতিবার যাইতে-আসিতে লেখাইতে হইয়াছে। প্রতিনিধি-দিগের নিত্য ব্যবহারের জন্য তিনখানা বড় ভাড়া-মোটর সরকার হইতে হাজির থাকে, তাহাতে চড়িয়া বেড়াইতে যাওয়া হয়। শহরের বাহিরে গেলেই এই হাঙ্গামা। এইরূপে সুইজারল্যাণ্ড ক্ষুদ্র দেশ হইলেও আভা রাজবংশীয়-দিগকে (House of Savoy) তাড়াইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে ও প্রজাতন্ত্র-নিয়মে শাসন চালাইতেছে। বড় বড় বিষয় শুধু কাউন্সিলে স্থির হয় না, প্রত্যেকের ভোট লইয়া স্থির হয়।

রাস্তা-ঘাট অতি সুন্দর, অতি পরিষ্কার। কোথায়ও ময়লা-আবর্জ্জনা নাই, ৭০ মাইল লম্বা জেনিভা হ্রদের চারিধারে বাঁধান সুন্দর মোটর-রাস্তা আছে। যত ইচ্ছা বেড়াও। শীত যদিও পড়ে কিন্তু আকাশ পরিষ্কার। লণ্ডনের মত ধোঁয়া ও কুয়াসাতে কষ্ট হয় না। সেই জন্য এখানে শীত, গ্রীষ্ম সকল সময়েই বিদেশের বায়ুসেবনের

এক ভবঘুরের দল আসিয়া বাস করে, ছোট-বড় হোটেলে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। লোকে বলে সুইস হোটেলওয়ালা ও হোটেল-পরিচালক জগতে অতুলনীয়, ফরাসীরা রাঁধে ভাল কিন্তু এমন পরিচালক হয় না।

আমাদের হোটেলের নাম হোটেল বো রিভাজ (Hotel Beau Rivage), খুব বড় হোটেল। ব্রিটিশ ও ইণ্ডিয়ান ডেলিগেটগণ প্রতি বৎসর এইখানে আড্ডা পাতে—ইহা একরূপ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নিকটে এবং হ্রদের উপরেই অন্যান্য বড় বড় হোটেলে অন্যান্য দেশের ডেলিগেটরা আশ্রয় লয়। হোটেলের খরচ বড় চড়া। ঘরের ভাড়া এক পাউণ্ড; প্রত্যহ মধ্যাহ্ন ভোজ ৫৲, সান্ধ্য ভোজ ছয় টাকা, চা-কফি ইত্যাদি দুই টাকা—এই রকম সব দাম, রান্নার প্রসিদ্ধি থাকিলেও প্রতিদিন তিনবার মাছ, মাংস খাওয়া দুঃসাধ্য বলিয়া আমি অনেক খানা বাদ দিয়া ফলমূল খাই।

লীগের কর্ম্মচারী শ্রীমান্ অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (স্যর অতুল চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা) অনেক সময় নিমন্ত্রণ করিয়া ঝোল-ভাত খাওয়ান। International Labour Officeএর ডাক্তার রজনীকান্ত দাস এক রাসিয়ান ইহুদীকে বিবাহ করিয়া এখানে আছেন। তিনিও মাঝে মাঝে বাঙ্গলা খাওয়া খাওয়ান, ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুত বিপিনবিহারী ঘোষের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ ফরাসী কন্যা বিবাহ করিয়া এখানে আছেন। কিন্তু তার স্ত্রীর ব্যারাম। সত্যেন্দ্রনাথ গুহ (এম-এস-সি) এখানে বাসায় আছেন। আরও আছেন ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বেড়াইতে আসিয়াছিলেন কলিকাতা ইউনির্ভাসিটির অধ্যাপক কালীদাস নাগ ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অতএব বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা শুনা যথেষ্ট হয়।

বম্বে, মান্দ্রাজ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি জায়গার লোক ও দুই-চারিজন কর্ম্ম-উপলক্ষে কিংবা কর্ম্মের উমেদারী উপলক্ষে বাস করিতেন। কিন্তু দেশ-প্রচলিত নিয়ম-অনুসারে পরস্পরের মধ্যে মনের মিল বড় কম। এর নিন্দা ওর কাছে ওর নিন্দা এর কাছে সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়, কাজেই কাহারও শ্রীবৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি নাই।

শীত খুব পড়িয়াছে, এখন ঘরে আগুন করার প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে—Central Heating অর্থাৎ নলে করিয়া ঘরে ঘরে গরম আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহাতে বড় সুবিধা হয়। জাহাজে ও বিলাতেও ধুতি চালাইয়াছি। কিন্তু আলপস্-বক্ষে সুইস শীতে ধুতি ছাড়াইয়াছে। একবার বিনা পাগড়ীতে দশ পা বাহিরে গিয়া অসুখ হইবার জোগাড় হইয়াছিল। ক্রমশঃ

মরুবালা

(গল্প)

শ্রীগোপেন্দ্র বসু

নিশীথ রাত্রের জ্যোৎস্না-প্রোজ্জ্বল দিগন্তবিস্তৃত মরু-প্রান্তরের বিরাট্ নিস্তব্ধতা বিধ্বস্ত করিয়া একদল ক্লান্ত অশ্বারোহী যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে চলিতে চলিতে উত্তর আফ্রিকায় প্রসিদ্ধ মরু-উদ্যান—খর্জ্জুরকুঞ্জাবৃত সিউয়ার সীমান্তে—স্রোতস্বিনী লেথা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অশ্বারোহীরা মিশরদেশীয় দস্যু। কিব্বা-অধিপতি বেদুইন সর্দ্দারের রাজ্যে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করিয়া তাহার রাজ্যের প্রায় সমুদয় ধনরাশি লুণ্ঠনপূর্ব্বক মহাহর্ষে উপলখণ্ড-বহুল মালভূমি অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে মিশর-অভিমুখে যাত্রা করিতেছিল। তাহাদের সঙ্গে বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য ও একটীমাত্র সামান্যা সুন্দরী বেদুইন বালা। যুবতীর অনুপম-সুন্দর মুখখানি শিশিরস্নাত গুলেস্থানের গোলাপের ন্যায় পেলব ও সুন্দর; তাহার বিশাল ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নদুটীর

বিরাম চাহনি অন্তরের কর্মব্যথার পরিচায়ক। যুবতীর কোমলাঙ্গের প্রায় সর্বত্র দৃঢ় রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ। বন্দিনী—বেদুইন-সর্দার-কন্যা—সে পীড়িতা।

অদূরে অসীম বিস্তৃত ঊষর প্রান্তর, ঊর্দ্ধে চন্দ্রালোক-প্লাবিত সীমাহীন আকাশ, সম্মুখে স্রোতস্বিনী বহুদূর-বিস্তৃতা লোহা নদী—প্রকৃতির বৃহৎ ও প্রশান্ততম নগ্ন প্রকাশ। লোহার দিগন্তপ্রাবী বক্ষে পূর্ণিমার চন্দ্র বিরাজিত।

নদীতীরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর দস্যুসর্দার কায়ুদ প্রিয় অনুচর মীরণকে ডাকিল 'মীরণ'।

একটী অনিন্দ্য সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক বন্দিনীর তত্ত্বাবধান করিতেছিল; সে তথা হইতে উত্তর দিল—'জনাব্'। কায়ুদ ব্যস্ত বলিয়া উঠিল—'কিছু শুন্‌তে পাচ্ছ কি?' মীরণ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া বলিল—'হাঁ জনাব, অশ্বপদের শব্দ।'

চিৎকার করিয়া কায়ুদ অনুচরগণকে বলিল—'ভাইসব উঠিয়া পড়, শত্রু আমাদের পিছু লইয়াছে।' মুহূর্ত্ত-মধ্যে মীরণ ব্যতীত, সকলেই প্রস্তুত; সে কুর্ণিশ্ করিয়া সর্দারকে জানাইল—'জনাব বেদুইন-বালা হিন্দিয়া বিশেষ অসুস্থা' মীরণের বাক্যে সর্দার বিশেষ বিরক্ত হইয়া কঠোরভাবে বলিল—'উহাকে এইখানেই হত্যা করিয়া যাইতে হইবে, বেদুইন সর্দার আমাদের চিরকালের শত্রু ছাড়া ইহা এই অবাধ্য যুবতীকে সঙ্গে লইলে আমাদের দ্রুত পলায়নের বিশেষ ব্যাঘাত হইবে—আর কোন কথা নয় সবাই চল।'

* * *

বেদুইন-বালার বিদ্যুৎশিখার ন্যায় অপরূপ রূপলাবণ্য প্রথম দর্শনেই-যুবক মীরণের কুমার-চিত্তে এক স্নিগ্ধ স্বর্গীয় মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়া তাহার কঠোর নিরস দস্যুবক্ষে বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল।

সর্দার কঠোরস্বরে আদেশ করিল—'বেদুইন-বালা হিন্দিয়ার শির নাও' দৃঢ় রজ্জুবদ্ধা পীড়িতা যুবতী একবার কাঁপিয়া উঠিল। [illegible] সঙ্গে মীরণও কাঁপিয়া উঠিল—কে যেন [illegible] মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দিল। সর্দারের আদেশে [illegible] দুইজন দুইখানি তরবারি লইয়া অগ্রসর হইল, মীরণের চক্ষু হিংস্র পশুর ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে কোষ হইতে তীক্ষ্ণ তরবারি বাহির করিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল—'খবরদার জান কবুল আমি থাকতে কেউ বেদুইনারগাত্র স্পর্শ করিতে পারিবে না।'

* * * *

অমার্জ্জনীয় স্পর্দ্ধা! সর্দার বিশেষ কুপিত হইয়া বলিল—'বেয়াদপের শির নাও'। শির লইবার আদেশ হইল কিন্তু মীরণের অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা দলস্থ সকলেই জানিত; তাহার মত বীর যোদ্ধা দলের মধ্যে কেন সমগ্র মিশরে আছে কি না সন্দেহ, দস্যু-সর্দারের আদেশ হইলেও কেহ অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না, ইহাতে দস্যু-সর্দার ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া দুই-চারিজন অনুচর সহ মীরণকে আক্রমণ করিল, মীরণ বলিষ্ঠ হস্তে সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বেদুইনকে রক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে বিপক্ষদল নিকটতর হইতেছে দেখিয়া দস্যুগণ মীরণ ও হিন্দিয়াকে ত্যাগ করিয়া দ্রুতগতিতে পলাইতে বাধ্য হইল।

মীরণের উন্নত সুন্দর দেহ হইতে শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল, অসুস্থা হিন্দিয়া এই ভীষণ দৃশ্য দর্শনে মূর্চ্ছা গেল।

* * * *

দূরে অতিদূরে শত্রুপক্ষের অশ্বের পদধ্বনি অল্প অল্প শোনা যাইতেছে, মীরণ বলিল এখনও পলায়নের প্রচুর সময় আছে। সে চন্দ্রালোক-প্রোজ্জ্বল হিন্দিয়ার নিরুপম অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি তৃষিতনেত্রে দেখিতে লাগিল। মূর্চ্ছিত অবস্থায় হিন্দিয়ার সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মীরণের চক্ষু আর ফিরিতে চাহে না, সে স্থির করিল যে বেদুইন-বালাকে ফেলিয়া যাইবে না স্বীয় জীবন বিসর্জ্জনেও তাহাকে সে বাঁচাইবেই; বেদুইন-বালা একবার চক্ষু মেলিয়া পরক্ষণে আবার নিমীলিত করিল। অতি নিকট হইতেই উভয়ের দৃষ্টির বিনিময় হইল। মীরণ তাহার কুসুমকোমল দেহখানি সযত্নে ধরিয়া একটা নরম পশুচর্ম্মের শয্যার উপর স্থাপন করিয়া অপলক-নেত্রে তাহার স্বর্গীয় [illegible] আকণ্ঠ পান করিতে করিতে পুনরায় চিন্তা করিতে [illegible] হিন্দিয়াকে সুস্থ করা যায় কিরূপে? অধিক বিলম্ব [illegible]

বোধ হয় সে বাঁচিবে না, একটী অশ্ব পাইলে তাহাকে লইয়া লোকালয়ে গিয়া সুস্থ করা যাইতে পারে। অত্যধিক শোণিতপাতে আজ তাহার দেহ অবশ, নহিলে সে স্বয়ং হিন্দিয়াকে পৃষ্ঠে করিয়া বিস্তৃত মরুপ্রান্তর অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিত, কিন্তু তাহা অসম্ভব; তবে শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে হিন্দিয়াকে বাঁচাইতে পারা যায়।

* * * *

শত্রুপক্ষের আগমনের শব্দ কিছুদূর হইতে শোনা গেলে খর্জ্জুরকুঞ্জের ছায়া হইতে উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া সে উচ্চস্বরে তাহাদের ডাকিতে লাগিল; আজ তাহার প্রাণের প্রতি মমতা নাই, সে আজ মুক্তেতরবারিধৃত ক্রুদ্ধ অনুধাবনকারী শত্রুকে ভয় করে না; আজ তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য হইতেছে কি করিয়া হিন্দিয়ার প্রাণরক্ষা করা যায়।

* * * *

বেদুইন-সর্দ্দার-পুত্র ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অশ্ব হইতে নামিয়াই স্বীয় ভগিনীকে চিনিতে পারিয়া তাহাকে সস্নেহে দৃঢ়আলিঙ্গনবদ্ধ করিল এবং কিছুক্ষণ পরে মীরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে?' মীরণ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—'আমি কায়ুদের দলভুক্ত মিশরদেশীয়—আমার নাম মীরণ'। কিব্বা-সর্দ্দার-পুত্রের আদেশে কতিপয় সশস্ত্র সৈন্য অগ্রসর হইয়া অস্ত্রহীন মীরণকে বন্দী করিল। মীরণ আজ জীবনে এই প্রথম অবিচলিতচিত্তে শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিল।

* * * *

মীরণ মুক্ত।

বেদুইন-রাজনীতিতে আত্মসমর্পণকারী শত্রুর শাস্তি-প্রদান নিষিদ্ধ, সেই হেতু মীরণ কিব্বা-অধিপতির বিচারে অবিলম্বে কিব্বা-সীমানা পরিত্যাগ করিবার সর্ত্তে মুক্ত।

কিন্তু মুক্ত মীরণের প্রাণে শান্তি নাই। কালরাসোর প্রান্তরের ন্যায় তাহার হৃদয়মরু বিদীর্ণ করিয়া মর্ম্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইতেছিল। সূর্য্যাতপ্ত ঊষর কিব্বা-সীমান্ত অতিক্রম করিতে করিতে মীরণ অশ্রুপ্লুতনয়নে একবার চিরদিনের মত কিব্বা-সর্দ্দারের প্রাসাদের দিকে চাহিয়া দেখিল।

কিব্বা! যেখানে তাহার জান্, তাহার কলিজা, তাহার বেহেস্ত হিন্দিয়ার আবাস, সেই স্থান অবিলম্বে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে সে বাধ্য—সে প্রতিশ্রুত। সন্ধ্য-অস্তগত সূর্য্যের ক্ষীণ রক্ত রশ্মিতে কিব্বা-সর্দ্দারের প্রাসাদের যে মীনারটী দেখা যাইতেছিল মীরণ অপলক-নেত্রে সেই দিকেই চাহিয়াছিল, বাতায়নপথে একজোড়া কাজল-কালো আয়ত স্নিগ্ধ চক্ষুও তাহার প্রতি সমস্ত প্রাণমন নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া দেখিতেছিল; মীরণ স্থির বুঝিয়াছিল সেই সুর্ম্মা-আঁকা চোখদুটী হিন্দিয়ার। অন্ধকার অল্প অল্প করিয়া ঘনীভূত হইতে লাগিল—মীনারটী কৃষ্ণবর্ণ আকাশের গায় মিলাইয়া গেল। মীরণের বলিষ্ঠ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটী উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল; সে ধীরে অতি ধীরে মন্থর গতিতে ঊষর মরুপ্রান্তরের পথে চলিতে চলিতে বুঝিল একখানি পবিত্র স্নিগ্ধ বুকে তাহার একটু স্থান রাখিয়া সে চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত হইতেছে। তাহার কলিজা ভেদ করিয়া ধ্বনিত হইল "হিন্দিয়া—"

* * * *

মধ্যরাত্রে সীমাহীন শূন্য প্রকৃতির উপর দিয়া ধ্বংসলীলা চলিতেছিল—মরুপ্রান্তরে প্রবল বাত্যা, মুষলধারে বৃষ্টি ও অশনিপাতে সে তাণ্ডবলীলা ক্রমশঃই বাড়িতে চলিল। লেখা নদীর নির্জ্জনতীরে একটী শিলাখণ্ডের উপর অস্থির বিষাদময় চিত্তে উপবিষ্ট মীরণ ভাবিতেছিল সেই ক্ষণদৃষ্টা বেহেস্তের হূরী-সদৃশা বেদুইন-বালা হিন্দিয়ার কথা, যাহাকে সে আর জীবনে কখনও দেখিতে পাইবে না, শুধু চোখের দেখা তাও অসম্ভব—একেবারে অসম্ভব। কিব্বা-অধিপতির কন্যা হিন্দিয়া; আর সে একজন ঘৃণ্য দস্যু! তাহা হইলেও কে যেন তাহার তৃষিত জিহ্বার অতি নিকট হইতে সুধার পাত্রটী কিছুক্ষণের জন্য রাখিয়া চিরদিনের মত কাড়িয়া লইল।

প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা ভীষণ হইতে ভীষণতর ভাব ধারণ করিল—অদূরে খর্জ্জুরবৃক্ষশ্রেণী প্রবল বাত্যা-তাড়নে ভূমিশায়ী হইতে লাগিল। মীরণ নির্ব্বিকারচিত্তে দেখিতে লাগিল। বেদনার তীব্র আঘাতে তাহার অন্তর-আত্মা যেন অবশ হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল। হিন্দিয়া ব্যতীত তাহার জীবন মরুভূমির মত ঊষর, নিষ্প্রয়োজন, সে আজ সাগ্রহে মরণকে বরণ করিতে প্রস্তুত—মরণই আজ

তাহার একমাত্র প্রিয়-শান্তিদায়ক। এই দুর্জ্জয় বাসনার তীব্র দংশন হইতে মৃত্যুই কেবলমাত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে। বাত্যাবিতাড়িত একটা শিলাখণ্ড প্রবলবেগে তাহার মস্তকে আসিয়া লাগিল। মীরণ চীৎকার করিয়া উঠিল 'হিন্দিয়া—"

* * * *

মীরণ যে কতক্ষণ সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সে বলিতে পারে না—লুপ্তসংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলে সে দেখিতে পাইল কে যেন দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া তাহার দিকে আসিতেছে, মীরণের চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল। তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইল "হিন্দিয়া—"

অশ্বারোহী তাহার নিকটে নামিল। নিকটেই ভীষণরবে বজ্র পড়িল—প্রলয়ের অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ-শিখা অতি প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠিতেই মীরণ চীৎকার করিয়া উঠিল 'হিন্দিয়া—হিন্দিয়া—সত্যই তুমি'।

মীরণের বিশাল বলিষ্ঠ উষর বক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হিন্দিয়া আবেগের সহিত বলিল—"সত্যই আমি মীরণ।"

আলোচনা

গণেশ ও দনুজমর্দ্দনের অভিন্নতা

গত ১৩৩৭ সালের শ্রাবণ মাসে পঞ্চপুষ্পে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লিখিত 'দনুজ রাজা' প্রবন্ধের আমরা কার্ত্তিক, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে আলোচনা করিয়াছিলাম; তন্মধ্যে ফাল্গুন মাসে লিখিত গণেশ ও দনুজমর্দ্দনের অভিন্নতা সম্বন্ধে আমাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় আমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং আমাদিগকে কোন কোন বিষয়ে উপদেশও দিয়াছেন। তিনি পঞ্চপুষ্পের অনেক স্থান অনর্থক নষ্ট করার জন্ত ও অকারণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মত উদ্ধৃত করিবার জন্য অনুযোগও করিয়াছেন কিন্তু কোন একটা বিষয়ের বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইলে একটু অধিক স্থানের ও ভিন্ন ভিন্ন মতের আলোচনার কি প্রয়োজন হয় না? একেবারেই সিদ্ধান্তটী বলিয়া দেওয়াই কি সমীচীন? সে যাহা হউক, আমরা ভট্টশালী মহাশয়ের সিদ্ধান্তটী এখনও পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। কেন পারি নাই নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি। এবারও আমাদিগকে পঞ্চপুষ্পের কতকটা স্থান লইতে হইবে। আশা করি, ভট্টশালী মহাশয় তজ্জন্য বিরক্ত হইবেন না।

প্রথমে একটা কথা বলিয়া রাখি যে, আমাদের প্রবন্ধ লেখার পূর্ব্বে আমরা ভট্টশালী মহাশয়ের লিখিত Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal পুস্তকখানি পড়ি নাই, কিন্তু প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার পুস্তক ও রাখালবাবুর বাঙ্গলার ইতিহাস আলোচনা করিয়া ভট্টশালী মহাশয়ের গণেশ ও দনুজমর্দ্দনের অভিন্নতা প্রমাণ সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। প্রবন্ধ লেখার পূর্ব্বে ভট্টশালী মহাশয়ের পুস্তক না পড়িলেও গণেশ ও দনুজমর্দ্দনের অভিন্নতা সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ ও কতক কতক যুক্তির কথা পরাম্পরাসূত্রে অবগত ছিলাম। সে জন্য তাহা পাঠ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা মনে করি নাই। পুস্তকখানি পাঠ করার পর অবশ্য কোন কোন

বিষয়ে আমাদের মতের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে, কিন্তু গণেশ ও দনুজমর্দ্দনের অভিন্নতা মানিয়া লওয়ার কোনই কারণ ঘটে নাই।

আমাদের প্রথম কথা এই যে, ভট্টশালী মহাশয় বাঙ্গলার স্বাধীন সুল্‌তানগণের মুদ্রার যে পাঠ দিতেছেন, তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত হইতেছে কি না? তিনি পূর্ব্ব-পাঠকারীদের পাঠ ভ্রান্ত বলিয়া যাহা প্রকাশ করিতেছেন, তাহা কি সকলেই মানিয়া লইতেছেন? সকলে যে মানিয়া লন নাই, একথা আমরা শুনিয়াছি। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও তাঁহার প্রবন্ধে একথার উল্লেখ করিয়াছেন। নলিনীবাবুর নিজের কথা হইতেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া কি সকলেই মানিয়া লইবে? সে যাহা হউক, আমরা তাঁহার পাঠ ঠিক নয় বলিয়া ধরিয়া লইতেছি, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া যায় কি না তাহাও দেখাইতেছি।

ভট্টশালী মহাশয়ের গণেশ ও দনুজমর্দ্দনের অভিন্নতা-সম্বন্ধে প্রমাণ মুদ্রাতত্ত্বের সহিত রিয়াজুস সালাতীনের বর্ণনার ঐক্য। কিন্তু সালাতীনের সকল কথার সহিত কি তাঁহার কথিত মুদ্রাতত্ত্বের ঐক্য হয়? রিয়াজের কোন কোন বিষয় তাঁহাকেও ভ্রান্ত বলিতে হইয়াছে। যেমন ইব্রাহিম শাহের মৃত্যু, গণেশের সাত বৎসর রাজত্ব ইত্যাদি। অবশ্য রিয়াজের গণেশের রাজত্বকালের সময়ও মুদ্রাতত্ত্বের সহিত ঐক্য হয় না। এক্ষণে তাঁহার সিদ্ধান্ত খাড়া করিবার জন্য যতটুকু দরকার তিনি ততটুকু যদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রমাণ কি একদেশাবদ্ধ হয় না? তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহার সিদ্ধান্তের সহিত রিয়াজের কোন কোন বিষয়ের এমন অনৈক্য আছে যে, তাহার মীমাংসা হওয়া সুকঠিন। ভট্টশালী মহাশয় রিয়াজের কোন কোন কথা উল্লেখ করিলেও আমরা রিয়াজের সমস্ত কথাগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। তাহার কতটুকু ভট্টশালী মহাশয় লইয়াছেন ও কতটা বাদ দিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যাইবে।

১। ৭৭৫ সনে (হিজরী) রাজা কংসের চক্রান্তে সুল্‌তান গিয়াসউদ্দিন (আজমশাহ) নিহত হন।

২। ৭৮৮ সনে গিয়াসউদ্দীনের পৌত্র সামসউদ্দীনকে (সিহাবউদ্দীন বায়জিদশাহ) তাতুড়িয়ার জমীদার রাজা কংস হত্যা করিয়া বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করেন।

৩। রাজা কংস বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসল্‌মান প্রজাবর্গের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করেন; মুসল্‌মান রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত হইয়া উঠে। শেখ মইনুদ্দীন আব্বাসের পুত্র শেখ বাদরুল এস্‌লামের শিরশ্ছেদ, অন্যান্য মুসল্‌মান শাস্ত্রবেত্তাদিগকে নৌকারোহণে নদীগর্ভে নিমজ্জিত করা হয়।

৪। নুরকোতবাল আলম বিধর্ম্মী রাজার প্রাদুর্ভাব ও মুসলমানদের প্রাণবিনাশের জন্য এব্রাহিম শাহকে কংসের অত্যাচার হইতে মুসল্‌মানদিগকে রক্ষা করিতে পত্র লিখিয়া পাঠান।

৫। পত্র পাইয়া সুল্‌তান এব্রাহিম কাজী সাহাব-উদ্দীনের সহিত পরামর্শ করিয়া বঙ্গ আক্রমণে অগ্রসর হন এবং ফিরোজপুরে শিবির সন্নিবেশ করেন।

৬। এব্রাহিমের আগমনে কংস ভীত হইয়া কোতবালের নিকট ক্ষমা চাহিয়া বঙ্গদেশকে এব্রাহিমের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

৭। কোতবাল বিধর্ম্মী রাজাকে রক্ষা করিতে অসম্মত হন। কংস তাঁহার চরণতলে মস্তক লুটাইয়া তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই করিতে সম্মত হন।

৮। কোতবাল তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলেন। কংস তাহাতে সম্মত হন, কিন্তু কংসের রাণী তাঁহাকে নিষেধ করায় তিনি তাঁহার পুত্র যদুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়া তাহাকেই সিংহাসন প্রদান করিতে বলেন। তদনুসারে যদুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়া জালালউদ্দীন নাম দিয়া সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার নামে খোতবা প্রচারিত হয়।

৯। কোতবাল সুল্‌তান এব্রাহিমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে এক্ষণে বঙ্গদেশের রাজা মুসলমান, মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত নহে।

১০। ইহাতে কাজী সাহাবউদ্দীন যদিও নিরুত্তর হন, তাহা হইলেও সুলতানের সন্তুষ্টির জন্য কোতবালের পাণ্ডিত্য ও অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা আরম্ভ করেন এবং তাহাতে

তিনি অপ্রতিভ হন। কোতবাল তাঁহার পরীক্ষার অসন্তুষ্ট হইয়া সুলতান ও কাজীকে অভিশাপ প্রদান করেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহাদের উভয়েরই মৃত্যু ঘটে।

১১। এব্রাহিমের মৃত্যু-সংবাদে রাজা কংস স্বীয় পুত্র জালালউদ্দীনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পুনর্ব্বার রাজমুকুট নিজ মস্তকে ধারণ করেন।

১২। কংস হিন্দু শাস্ত্রের বিধানানুসারে জালালউদ্দীনকে স্বর্ণনির্ম্মিত কতিপয় গাভীর গর্ভে মুখদ্বারা প্রবেশ করাইয়া অধোদ্বার দিয়া নির্গত করান। অবশেষে গো-দেহের স্বর্ণরাশি ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করেন। তিনি রাজপুত্রকে এইরূপ যথাশাস্ত্র পরিশুদ্ধ করাইয়া হিন্দুশাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুত্র কোতবালের শিক্ষায় এসলাম ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইলেন না এবং পিতৃপ্রদত্ত হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না।

১৩। রাজা কংস আবার মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। কোতবালের পুত্র শেখ আনওয়ার পিতাকে ইহার প্রতিকার করিতে বলেন। সে সময়ে কোতবাল ঈশ্বরোপসনায় নিবিষ্ট থাকায় বিরক্তি-সহকারে পুত্রকে বলেন যে, তোমার রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত না হইলে এ অত্যাচারের অবসান হইবে না। কংস কোতবালের পুত্র আনওয়ার ও ভ্রাতুষ্পুত্র জাহাদকে বন্দী করিয়া অবশেষে আনওয়ারকে বধ করেন। যে মুহূর্ত্তে আনওয়ারের মৃত্যু হয়, সেই মুহূর্ত্তে কংসেরও প্রাণবায়ু নির্গত হয়। কোন ইতিহাসবেত্তার মতে জালালউদ্দীন (যিনি বন্দী ছিলেন) খেতমতকারগণের সাহায্যে পিতাকে বধ করিয়াছিলেন।

১৪। রাজা কংস বঙ্গদেশে সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১৫। জালালউদ্দীন নির্ব্বিবাদে পিতার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি পিতার মত উপেক্ষা করিয়া অনেক হিন্দুকে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ স্বর্ণনির্ম্মিত গাভীর স্বর্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, গোমাংস দ্বারা তাঁহাদের জাতিপাত করেন। সোণার গাঁ হইতে শেখ জাহাদকে আনয়ন করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন।

এই বিবরণের মধ্য হইতে ভট্টশালী মহাশয়ের মুদ্রাতত্ত্বের সহিত মিল করিবার জন্য হইতেছেন, বায়জিদশাহ ও তাঁহার পুত্র ফিরোজশাহের পর গণেশের সিংহাসনারোহণ, ইব্রাহিম শাহের আক্রমণের ভয়ে নুরকোতবাল আলমের শরণ-গ্রহণ, তাঁহার কথা-অনুসারে নিজে মুসলমান না হইয়া যদুকে মুসলমান হইতে দেওয়া, যদুর জালালউদ্দীন নামধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন ও সেই নামে মুদ্রা-প্রচার। তাহার পর গণেশের আবার সিংহাসনে আরোহণ, গণেশের পর যদু বা জালালউদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণ। ইহার মধ্যেও রিয়াজের সহিত তাঁহার কোন্ কোন্ কথায় অনৈক্য হইতেছে তাহা আমরা দেখাইতেছি।

ভট্টশালী মহাশয় মুদ্রাতত্ত্বানুসারে ফিরোজসাহের পরে গণেশের সিংহাসনারোহণের কথা বলিতেছেন। কিন্তু রিয়াজে ফিরোজ শাহের কোনও উল্লেখই নাই। অবশ্য মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণই মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু রিয়াজের সহিত ইহারও অনৈক্য। রিয়াজে শমসউদ্দীন বা সিহার-উদ্দীন বায়জীদশাহকে হত্যা করিয়া গণেশের রাজা হওয়ার কথা আছে। তাহার পর ভট্টশালী মহাশয় রিয়াজের ইব্রা-হিম শাহের আক্রমণের ভয়ে নুরকোতবল আলমের শরণ-গ্রহণ ও যদুকে মুসলমান করা এবং তাহাকে সিংহাসন প্রদানের কথা মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু গণেশের দ্বিতীয়বার সিংহাসন-আরোহণের কথা রিয়াজের সহিত তাহার ঐক্য হয় না। রিয়াজ ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর গণেশের সিংহাসনে আরোহণের কথা বলেন, কিন্তু ইব্রাহিম শাহ বহুদিন বাঁচিয়া ছিলেন বলিয়া ভট্টশালী মহাশয় তাহা স্বীকার না করিয়া কোতবাল আলমের মৃত্যুর পরই গণেশের দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণের কথা বলিতেছেন। রিয়াজের মতে কিন্তু কোতবাল আলম জীবিত থাকিতেই গণেশ দ্বিতীয়বার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। ইহাতেও অনৈক্য দেখা যাইতেছে। যদুর প্রায়শ্চিত্ত-সম্বন্ধে তিনি রিয়াজের কথাই মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু রিয়াজ বলিতেছেন, যদু ইসলামের বিশ্বাস হারান নাই, তিনি হিন্দু হইতে পারেন নাই। ভট্টশালী মহাশয় এ কথা মানিয়া লইতেছেন না, কারণ তিনি বলিতেছেন যে গণেশের পর যদু হিন্দু থাকিয়াই 'মহেন্দ্র দেব' নামে মুদ্রার প্রচার করিয়াছিলেন; সুতরাং এ বিষয়েও উভয়ের অনৈক্য। রিয়াজ বলিতেছেন, কোন ইতিহাসবেত্তার

মতে যদু যিনি বন্দী ছিলেন, শ্বেতমতকারগণের সাহায্যে পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। যদিও রিয়াজের মতে আনওয়োরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গণেশের মৃত্যু হয়। যদু যে হিন্দু হইতে পারেন নাই, তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখাতেই তাহা বোধ হয়। তাহার পর পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসিয়া যেরূপ হিন্দুদিগকে মুসলমান করাইতে লাগিলেন ও প্রায়শ্চিত্তের স্বর্ণনির্ম্মিত গাভীর স্বর্ণ যেসকল ব্রাহ্মণ লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে গোমাংস খাওয়াইয়া যেরূপ তাঁহাদের জাতিপাত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে এক ফাঁকে হিন্দু হইয়া 'মহেন্দ্র দেব' নামে মুদ্রা প্রচার করিলেন, রিয়াজের বর্ণনার সহিত ইহার সামঞ্জস্য করা যায় না। ফেরেস্তা বলেন যে, গণেশের মৃত্যুর পর যদু নিজে ইচ্ছা করিয়াই মুসলমান হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, মুসলমান হওয়ার পর যদুর যে আবার হিন্দুভাব আসিয়াছিল তাহা রিয়াজ হইতে বুঝা যায় না। 'মহেন্দ্র দেব' নামে যদুর মুদ্রা প্রচার খাড়া করিবার জন্য ইহা যে ভট্টশালী মহাশয়ের কল্পনা তাহা বলিতেই হইবে। ইহার সমর্থনের কোনই প্রমাণ নাই। বরং বিপরীত কথাই দেখা যাইতেছে। সেরূপ কল্পনাকে কিরূপে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়। আর রিয়াজের সকল কথাও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ইব্রাহিম শাহের বঙ্গ আক্রমণের কথা অন্য কোন ঐতিহাসিক বলেন নাই। যদুর আজগুবি প্রায়শ্চিত্ত হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায় না। আগামী বারে আমরা গণেশ ও যদুর দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেব নামে মুদ্রা প্রচার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীনিখিলনাথ রায়

আলাপ-আলোচনা

ছেলেদের মাসিকপত্রিকা

যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্ব বিভাগের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন অধুনা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এগুলির ভিতর শ্রেষ্ঠ কাগজগুলিতে বালকবালিকাদের রচনা যাঁহারা পড়েন তাঁহাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে অল্প-বয়স্ক লেখক-লেখিকাদের হাত পাকিয়াছে ও পাকিতেছে।

* * *

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট পত্র-পত্রিকার পরিচালকদিগের লেখা-সম্বন্ধে উচ্চ আদর্শ রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ যথাসময়ে কাগজ প্রকাশ করা চাই। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা কাগজ-খানি পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। সময়ে হস্তগত না হইলে তাহাদের মন ক্ষুণ্ণ হয়। কৌতূহলবৃত্তি অযথা রুদ্ধ হইয়া পড়ে। ফলে কাগজের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি হ্রাস হইতে থাকে। এ শ্রেণীর কাগজের ভিতর 'মৌচাক', 'সন্দেশ'(?), 'খোকাখুকু'কে'ই উচ্চ স্থান দেওয়া যায়, কারণ ইহারা নিয়মিত-ভাবে প্রকাশে ও উচ্চ আদর্শ-রক্ষাকল্পে বাস্তবিকই যত্নশীল।

* * *

এই সকল পত্র-পত্রিকার মধ্যে কয়খানি 'ছোটদের বৈঠক' বা এমনই কিছু একটার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা ইহার অনুমোদন করি না। পত্র-পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষেরা যেন এ বিষয়ে দৃঢ় থাকেন যে খারাপ লেখা তাঁহারা ছাপিবেন না। ছোটদের ভিতর যাহারা কাগজের মাপকাঠির যোগ্য রচনা করিতে পারে, তাহাদের লেখা কাগজের সাধারণ বিভাগেই ছাপা হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকা সংগ্রহ করিবার ব্যবসাদারী বুদ্ধি লইয়া 'ছোটদের বৈঠক' রূপ স্বতন্ত্র স্থানে একগাদা অপকৃষ্ট লেখা ছাপা উচিত নয়—উহাতে পত্র-পত্রিকার আদর্শ খাট হইয়া যায়।

* * *

অনেকগুলি পত্র-পত্রিকায় আবার দেখি যে একই সংখ্যায় একই লেখকের একাধিক রচনা মুদ্রিত হইয়াছে। এরূপ করা মোটেই ঠিক নয়, উহাতে পত্র-পত্রিকার বৈচিত্র্য নষ্ট হয়, পাঠক-পাঠিকারা বুঝিতে পারেন যে ঐ সব কাগজের লেখক ও রচনার দৈন্য আছে। কাগজের স্থায়িত্ব যাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে, কাগজ-সম্বন্ধে তাহাদের এইরূপ ধারণা হইলে, সে কাগজের আয়ুঃ ক'দিনই বা টিকিবে ?

* * *

সাহিত্যিকের ঋণ অস্বীকার

বাঙ্গলার একজন নামজাদা সাহিত্যিক বিদেশী গল্পের অনুবাদ করিয়া একখানি নাম-করা মাসিকপত্রে তাহা ছাপাইয়াছিলেন, কোন স্থানে মূল-বিদেশী গল্পের বা গল্প-লেখকের ঋণ তিনি স্বীকার করেন নাই, ইহা লইয়া সম্প্রতি সংবাদপত্রে বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যিকদের মধ্যে অসাধুতা থাকা গর্হিত, যথার্থ সুলেখক তাঁহার লিপি-নৈপুণ্যে অনুবাদকেও চমৎকার করিতে যখন পারেন, রসের সাহায্যে মূলের ভিতর নূতনভাবে প্রাণের স্পন্দন আনিতে পারেন, তখন মূলের উল্লেখ না করিবার কারণ কি ?

* * *

যদি এইরূপ বিনা স্বীকৃতিতে অন্যস্থান হইতে আখ্যান-বস্তু লওয়া হয়, তাহা হইলে মহাসাহিত্যিক হইলেও অপহারককে মার্জ্জনা করা চলিবে না। আর দশজনও ঐরূপ কুকার্য্য করে এই অজুহাতে তাঁহার কার্য্যকে কোন-রূপে সমর্থন করা যায় না। দশজন চোর ধরা পড়ে নাই ও শাস্তি পায় নাই বলিয়া, যে ধরা পড়িয়াছে সে অব্যাহতি লাভ করিবে ইহার কোন বিশিষ্ট কারণ নাই।

* * *

আবার অনেকস্থলে দেখা যায় লেখক ঋণস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ভুলক্রমে পত্রিকার সম্পাদক বা পুস্তকের প্রকাশক তাহা গ্রহণ করেন নাই বা পাদটীকায় লিখিয়া দেন নাই; আবার কোন কোন স্থলে যে ইহা তাঁহাদের ইচ্ছাকৃত কার্য্য নয়, তাহাও বলিতে পারি না, কারণ এরূপ করায় তাহাদের একটু স্বার্থ আছে—সম্পাদকের স্বার্থ নিজের দিক্ হইতে নয়, তাহার লেখককে সাধারণের নিকট প্রচার করিবার দিক্ হইতে, আর প্রকাশকের উদ্দেশ্য অনুবাদ-রচনা অপেক্ষা মৌলিক রচনার বিক্রয়াধিক্যের সম্ভাবনা বেশী বলিয়া। যাহা হউক এ বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে চাই না। আমরা চাই আমাদের সাহিত্যিকদের ভিতর সত্যের প্রতি অচলা নিষ্ঠা দেখিতে।

* * *

মহাত্মাজীর বিলাত-যাত্রা

মহাত্মা গন্ধীজীর বিলাত যাওয়া হইল না। বিলাত হইতে আমাদের দেশের সকল দুঃখের আশু অবসানের 'আশ্চর্য্য প্রদীপ' যে পাওয়া যাইত না তাহা কাহারও অবিদিত নাই—তবু মহাত্মাজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অনেক সুফল হইত এমন আশা অনেকেই করিয়াছিলেন, তাঁহার যে বিলাত যাওয়া হইল না, মহাত্মা ইহা বিধাতার বিধান ও মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা বলিয়াছেন। গুজরাট বিদ্যাপীঠের বক্তৃতায় তিনি জানাইয়াছেন যে যতক্ষণ তিনি জাহাজে না ওঠেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ যেন মনে না করেন যে তিনি বিলাত যাইবেন, এইরূপ কথা তিনি বরাবরই বলিয়া আসিয়াছেন, ফলে ঘটিলও তাই।

* * *

তিনি আরও বলিয়াছেন যে লণ্ডনের দিকে আশাভরা-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিবার দরকার নাই। আমাদের কাম্য বস্তু এই ভারতেই আছে—যথার্থ শক্তিমান ও সত্যনিষ্ঠ যদি আমরা হই তো আমাদের সাধনার সিদ্ধিলাভ হইবে—ভারতের ঘনঘটা-সঙ্কুল রাজনৈতিক আবহাওয়া আমাদের বিশ্বাসের বলেই প্রসন্ন ও মেঘমুক্ত হইবে। মহাত্মা সকলকে যুদ্ধবিরতি মানিতে অনুরোধ করিয়াছেন, বলিয়াছেন আমাদের দিল্লী-চুক্তি পালন করিতে হইবেই। ভবিষ্যৎ ইহার কি ব্যবস্থা করিবে তাহা অচিরেই জানা যাইবে।

* * *

উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ভীষণ জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষ

প্রতিদিন বাঙ্গালার চারিদিক হইতে বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ভীষণ বন্যা, অবর্ণনীয় অন্নকষ্ট, গৃহহীনদের

দুর্গতি, শিশুদের অসহ্য আর্ত্তনাদের হৃদয়ভেদী সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি বড় বড় নদী ও ছোট ছোট নদীর জল কূল ছাপাইয়া প্লাবন আনিয়াছে। এই দুর্বৎসরে যখন পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় ধান্য ও পাট সুন্দরভাবে জন্মিয়াছে শুনিয়াছিলাম, তখন কত আশাই না মনে জাগিয়াছিল যে, বাঙ্গলার এ দুর্দ্দিন শীঘ্রই কাটিয়া যাইবে; কিন্তু তারপর যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে ও যেসকল মর্ম্মন্তুদ করুণ-কাহিনীর চিত্র সংবাদপত্রে বাহির হইতেছে তাহা পড়িয়া ও দেখিয়া কোমলপ্রাণ বাঙ্গালীর কথা তো ছাড়িয়া দিন এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি না জানি না যাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহির্গত না হয়। বাঙ্গালী আর্ত্তকে রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য করিতে কখনও

হয় নাই, পূর্ব্বে এরূপস্থলে সাহায্যের অতিরিক্ত টাকাই উঠিত; কিন্তু এখন বাঙ্গালার শক্তি-সামর্থ্য কোথায়? অবশ্য নানাস্থানে সাহায্যের ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু ক্ষতির তুলনায় তাহার সংখ্যা ও সহায়তার পরিমাণ নিতান্তই অল্প। এরূপ অবস্থায় রাজভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত কিন্তু গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে বাঙ্গালার কাউন্সিলে মাত্র ত্রিশহাজার টাকা, আর 'শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার' জন্য পাঁচলক্ষেরও অধিক টাকা মঞ্জুর হইয়াছে! প্রজা না বাঁচিলে 'শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা' কাহার জন্য প্রয়োজন হইবে? অবশ্য মন্ত্রীবর আশা দিয়া বলিয়াছেন বন্যা ও দুর্ভিক্ষের জন্য আবশ্যক হইলে সাহায্য করা যাইবে। সরকারের সাহায্যের পরিমাণ যতই অল্প হউক—সরকার এ বিষয়ের গুরুত্ব যতই ছোট করিয়া দেখুন না—তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না—চাই দেশের লোকের সহানুভূতি। এই সহানুভূতি উদ্রেক করিবার জন্য যে উদারচেতা মহাপ্রাণ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র অগ্রণী হইয়া ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়াছেন সে ভিক্ষার ঝুলি বাঙ্গালী পূর্ণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। দেশের লোক এরূপস্থলে পূর্ব্বেও তাঁহার আহ্বানে যেরূপ সাড়া দিয়া আসিয়াছে, আজও তাহা দিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

* * *

পরলোকে

গত ২৩এ শ্রাবণ শনিবার রাত্রি সাড়ে-এগারটার সময় সুপ্রসিদ্ধ বেদবিৎ পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী মহাশয় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালার একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু কোনদিন সংস্কারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর তিনি আপনাকে আবদ্ধ রাখেন নাই। স্বদেশীযুগে যাঁহারা তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনিয়াছেন তাঁহারাই জানেন তাঁহার দেশ-ভক্তি কত অকৃত্রিম ছিল। প্রত্যেক শ্রোতাই তাঁহার যুক্তিপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হইত। বহুবার কারাবরণ ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও দেশ-সেবার কার্য্যে কখনও তিনি শিথিলপ্রযত্ন হন নাই। সংবাদ-পত্র পরিচালন দ্বারা দেশের কার্য্য ভালরূপে চলিতে পারে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রথমে তিনি স্বর্গগত মহাপ্রাণ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের দক্ষিণহস্ত স্বরূপে 'সন্ধ্যা' কাগজে যোগদান করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে সে সময় তিনি একজন বড় বক্তা ছিলেন। কথা ও কার্য্যে কখনও তাঁহার অমিল ছিল না। যখন তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল, কপর্দ্দকমাত্রও তাঁহার সম্বল রহিল না, তখন এই স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া—কংগ্রেসের কার্য্যে মনঃপ্রাণ নিয়োগ করেন, কিন্তু যখন দেখিলেন বাঙ্গালার কংগ্রেসদল বিলাত-ফেরৎ-দলের দাসভাব লইয়া কার্য্য করিতেই প্রস্তুত তখন তিনি কংগ্রেস-দল ছাড়িয়া রাজনীতির সহিত সকল সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিয়া বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য-সঙ্ঘে যোগদান করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সংস্কার দ্বারা দেশ-সেবা। এই সঙ্ঘের প্রকাশিত "ভাস্কর" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের তিনি ছিলেন সম্পাদক। সর্দা-আইনের বিরুদ্ধে তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধাবলী যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই একবাক্যে স্বীকার করিবেন তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান যেমন গভীর ছিল তেমনই তিনি নির্ভীকভাবে স্পষ্ট করিয়া তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিতেন, কাহারও মুখাপেক্ষী হইতেন না।

কবিবর গিরিশচন্দ্রের ৮৮তম জন্মদিনে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মনে হইতেছিল ইনি কি সেই মোক্ষদাচরণ স্বদেশীর প্রথম যুগে যাঁহার অগ্নিস্রাবী বক্তৃতা হৃদয়ের রক্তকে চঞ্চল করিয়া দিত—জ্ঞানের উৎস যাঁহার সর্ব্বদাই উৎসারিত হইত। তাঁহাকে যে আমরা এত শীঘ্র হারাইব তাহা স্বপ্নের

অগোচর ছিল, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৫৭ বৎসর হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুতে আমরা শোকসন্তপ্ত হইয়াছি।

* * *

গত ২৪এ শ্রাবণ বাঙ্গালাদেশ আরও দুইজন মনীষীকে হারাইয়াছেন। তাঁহাদের একজন ছিলেন অধ্যাপক খোদাবক্স ও অপরজন সিটি কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ।

অধ্যাপক খোদাবক্স পাটনার প্রসিদ্ধ খোদাবক্স লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ খোদাবক্সের পুত্র। বাল্যকালে তাঁহার অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে শৈশবেই অধ্যয়নের জন্য বিলাতে পাঠান। তথায় ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ উপাধি লাভ করেন ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল অনন্যসাধারণ। এই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকখানি সুযুক্তিপূর্ণ পুস্তক আছে—এগুলিতে সাম্প্রদায়িক ভাবের কথা বড় নাই, আছে ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহারই বিশ্লেষণ—আছে একেশ্বরবাদের ইতিহাস। তাঁহার 'ইস্‌লাম সভ্যতার ইতিহাস' তাঁহার কীর্ত্তিকে চিরদিন অম্লান রাখিবে, স্যর আশুতোষ এই পুস্তকপাঠে তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট-শ্রেণীর ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানের সর্ব্বদিকের পুস্তক-অধ্যয়নশীল ব্যক্তি বড় কমই দেখিতে পাওয়া যায়—অধীত বিদ্যা ছিল তাঁহার প্রচুর। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁহার ছিল না—রচয়িতাদের ভাবগুলি তিনি আত্মস্থ করিয়াছিলেন, তাহাদের সুন্দর সমালোচনা ও আলোচনা তিনি করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। সরল উদারহৃদয় অধ্যাপক খোদাবক্সের আর একটী বড়গুণ ছিল—সরসতা, হাস্য-প্রবণতা, এই গুণেও তিনি তাঁহার ল' কলেজের ছাত্রদের ভিতর খুব প্রিয়-অধ্যাপক হইতে পারিয়াছিলেন—সরল করিয়া বলিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার প্রচুর। সদালাপে তিনি বন্ধুদিগকে বহুক্ষণ মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। তাঁহার ভিতর সংকীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না। প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই উজ্জ্বল ছিল। মৃত্যুকালে অধ্যাপক খোদাবক্সের বয়স হইয়াছিল ৫৪ বৎসর মাত্র।

অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন চট্টরাজের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। গণিতে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। অনেকেই তাঁহার 'বীজগণিত' (Algebra) কষিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ৪০ বৎসর ধরিয়া একাদিক্রমে গণিতের অধ্যাপক থাকিয়া কত ছাত্রকে যে তিনি শিক্ষিত করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। এই বিদ্বজ্জন-সমাজে আদৃত চরিত্রবান্, শান্তধীর, গম্ভীরবেদী ব্যক্তির বিয়োগে সিটি কলেজের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে তাহা কত দিনে যে পূরণ হইবে তাহা বলিতে পারি না। মৃত্যুকালে চট্টরাজ মহাশয়ের ৬০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। আমরা এই দুইজন অধ্যাপকের বিয়োগে শোকসন্তপ্ত।

* *

ভারতীয় ছাত্রের কৃতিত্ব

কৃষি-বিদ্যায় ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রী কুমারী রাজুল সা ভারতীয় মহিলাদিগের ভিতর এ বিষয়ে প্রথম উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহার এই উপাধিলাভে আমরা বাস্তবিকই আহ্লাদিত হইয়াছি। আহ্লাদের কারণ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে যে এ বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করিবার জন্য তিনি আমেরিকা যাত্রা করিবেন। সম্প্রতি সংবাদপত্র হইতে জানিতে পারিলাম শীঘ্রই তিনি আমেরিকায় যুক্তরাজ্যে এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে যাইতেছেন। বৎসরে প্রায় ৮০০ ডলার (প্রায় ২৪০০৲ টাকা) মূল্যের 'লেডি বারবুর' বৃত্তি পাইয়া তিনি মিশিগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতে যাইতেছেন। আশা করি পাঠ সমাপন করিয়া তিনি উহার ব্যবহারিক জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিয়া সুজলা সুফলা ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্যের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিবেন।

* *

ডাক্তার এ, পি, মাথুর সম্মানের সহিত পদার্থ-বিদ্যায় প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ষ্টেট ডক্টরেট্' উপাধি-প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই উপাধিই হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি। কিছুকালের জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যর

গিলবার্ট ওয়াকারের নেতৃত্বে আব-হাওয়া বিষয়ে ইনি গবেষণার কার্য্য করিয়াছিলেন এবং আব-হাওয়া বিজ্ঞানে (Meteorology) Imperial College of Science, London হইতে প্রশংসার সহিত ডিপ্লোমা পান। প্যারিশের ভারতীয় ছাত্রদের এসোসিয়েশন যখন তাঁহার এই সম্মানপ্রাপ্তিতে তাঁহাকে অভ্যর্থিত করেন, তখন সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন প্যারিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যাবিদ্ বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক চার্লস কেব্রী। ডাক্তার মাথুরের আশ্চর্য্যজনক গবেষণার জন্য তাঁহাকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও তাঁহার ভবিষ্যৎ যে সমুজ্জ্বল তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। ভারতীয়দের ভিতর পার্শী-সমাজের ডাক্তার মাথুরই এই বিশেষ সম্মানার্হ উপাধি প্রথম পাইলেন। তাঁহার এই উপাধিপ্রাপ্তিতে আমরা গর্ব্ব অনুভব করিতেছি।

আমেরিকায় শিক্ষা ব্যপদেশে পার্শী ডাক্তার

ডাক্তার কে, এ, জে, লালকাকা, ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসের জনৈক কাপ্তেন। মানসিক চিকিৎসায় পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য তিনি আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। ম্যাসেচুসেটের বিকৃতমস্তিষ্কদিগের শিক্ষাগারের ভিতর 'উর-সেপ্টার ষ্টেট্ হাঁসপাতাল'ই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। এই স্থানকে কাপ্তেন লালকাকা কেন্দ্রস্বরূপ স্থির করিয়াছেন। জগতের ভিতর এই হাঁসপাতালই হইতেছে মানসিক চিকিৎসার প্রধান শিক্ষাস্থল। এইখানেই তিনি এক বৎসর থাকিয়া মানসিকরোগচিকিৎসা বিজ্ঞানে (Psychiatry) লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবেন স্থির করিয়াছেন। তাহার পর অন্যান্য-স্থানে আমেরিকায় মেডিকেল টেক্নিক্ ও হাঁসপাতাল চালাইবার ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে ফিরিবেন। ডাক্তার লালকাকা ভারতবর্ষে ১৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া আমেরিকায় যাত্রা করিয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি এ বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ করিয়া বিশেষজ্ঞ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিবেন। বাঙ্গালাদেশে ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু ছাড়া আমরা আর কাহাকেও এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বলিয়া জানি না। এ বিষয়ে ডাক্তার লালকাকার নিকট হইতে আমরা মৌলিক গবেষণা দেখিতে চাই।
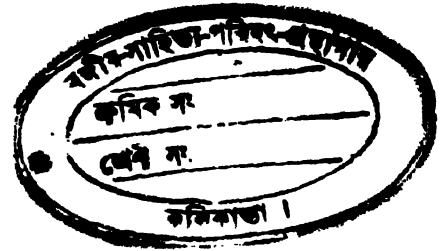
গান্ধার শিল্প-কলা অবতরণিকা

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

সুন্দর কথাটা শুনিলে, সুন্দর কোন শিল্প-রচনা দেখিলে, সজ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক ইয়ুরোপীয়ের মনে জাগিয়া উঠে গ্রীক্ সৌন্দর্য্য-ভাবনা, তাহার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় গ্রীক্ শিল্প-রচনা—গ্রীক্ শিল্প-কল্পনা, গ্রীক্ শিল্প-নীতি ; এমনই একটা ধারণা সারা ইয়ুরোপের সত্তাকে ছাইয়া আছে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পেতিহাসের 'যাদুঘরে' তাই গান্ধারশিল্প বা 'ইণ্ডো-হেলেনিক' শিল্পের চর্চ্চায় ইয়ুরোপের এত জীবন্ত উৎসাহ, তা ভারত-শিল্পেতিহাসের হিসাবে এই শিল্প-কলার স্থান যতই নীচে হউক না কেন। জাতীয় শিল্প-কলাসাধনার সহিত ইহার নাড়ীর যোগ ঘটে নাই ; দেশের শিল্প-কল্পনায় ইহার অনুপ্রেরণা উপেক্ষণীয়, ইহা কোন একটী স্বল্প-কালস্থায়ী, দেশীয় রীতিতে বিদেশীয় শিল্পের সাময়িক ফ্যাশান-রচনা। ভারতীয় মনকে ইহা স্পর্শ না করাতে ইহার স্থায়িত্ব সম্ভব হয় নাই এবং ইহার যাহা কিছু চিহ্ন পরে পাই, সে ইহা হইতে প্রাপ্ত কিছু 'টেক্‌নিকে' বা 'ডিটেলে', বাকী অন্য কিছু যদি গৃহীত হইয়া থাকে তাহা এমনই করিয়া মিশিয়া গিয়াছে যে তাহার স্বাধীন সত্তার সংবাদ পাওয়া দুরূহ। পূর্ব্বে যেমন ইউরোপের সুন্দর কল্পনায় 'কুসংস্কারের' কথা বলিলাম, তেমনই ইউরোপে প্রকৃতি বুঝিতে বুঝায় প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্য—তাহার অন্তরের রস নয়। এই দুইটী কথাই ভারতীয় শিল্প-কলার রসাস্বাদ গ্রহণ করিতে হইলে ভুলিতে হইবে।

পার্শ্বের মূর্ত্তিটী একান্তই গ্রীক্ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বড় বেশী তর্কও হয় নাই। নাম দেওয়া হইয়াছে woman and the tree motif. ভারতে এই মোটিফ (সুসজ্জীকরণ) সাধারণ। 'চুলকোক' দেবতা (স্পষ্ট নারী মূর্ত্তি) বলিয়া যাহা পরিচিত তাহার সুসজ্জীকরণ প্রথা ঠিক এই ধরণের। স্মিথ ইহাকে চন্দ্রা যক্ষী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে ভারুত হেলেনিজমের সন্ধান কোথায় ? সাঁচীরও ঐ সাধারণ motifএর কথাই কি একেবারে বাদ দেওয়া যায় ? মথুরাতে তো এই শ্রেণীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ম্লান অশোকতরু নারীর পাদ-স্পর্শে মুঞ্জরিত হইয়া উঠে—ঐ ভঙ্গী ভারতীয়-শিল্পকলায় একান্ত সুপরিচিত। এইখানেই প্রকৃত ভারতীয় ভাব পরিস্ফুট। প্রকৃতিতে আর মানুষে মিলিয়া এক অখণ্ড পূর্ণরূপ হইয়াছে। মানুষের প্রাণশক্তিতে আর প্রকৃতির উচ্ছ্বসিত জীবনধারায় একান্ত মিলিয়া গিয়াছে। রচনার বিষয়ে ইহারা দুইটী স্বাধীন বস্তু নয়, উভয়ে উভয়ের পরিপূরক এবং মাত্র উভয়ে মিলিয়াই এক পূর্ণরূপের ছবি সম্ভব হইয়াছে। ইহাই হইতেছে ভারতীয় Naturalism—এবং ইহারই ছবি, এইখানে দেখি, যদিও ইহা গান্ধারী শিল্পীরই রচনা।

Woman and the tree motif

গান্ধার বলিতে মোটামুটি উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ বোঝায়। যে-খান হইতে এই ভাস্কর্য্যের চিহ্ন-সমূহ উদ্ধার হইয়াছে বা হইতেছে তাহা বিশেষ করিয়া ইয়ুসুফজাই জেলার (জামাল্‌গরাই, সারি-বালোল ও তাখ্‌ত-ই-বাহাই) ও সোয়াট উপত্যকা এবং ভারতের দিকে তক্ষশীলা ও পেশোয়ার জেলা। গান্ধার-ভাস্কর্য্যের নিকটতম গ্রীক্ মডেলের আদিতে খোঁজ পাই ব্যালবেক ও পামিরা প্রদেশে। তিনটী গ্রীক-ধারা আইওনিয়ান্, করিন্থিয়ান ও ডোরিকের মধ্যে মধ্যমটীর সহিতই গান্ধার-ভাস্কর্য্যের বিশেষ সম্বন্ধ! গান্ধার-শিল্পের যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহা ভাস্করের সৃষ্টি, উহাতে স্থাপত্যের চিহ্ন নাই।

বুদ্ধ ও পার্শ্বচর দুই বোধিসত্ত্ব (শহর-ই-বালোল)

গান্ধার-শিল্পের সংগ্রহ অতি প্রচুর, বিশেষ করিয়া তাহা ব্যক্তিগত সখে সংগৃহীত হইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল পরে স্যর জন মার্শাল প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগের কার্য্য হিসাবে মন দিয়াছিলেন। ফলে সংগৃহীত বস্তু সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ইহাদের তারিখ সম্বন্ধে স্যর জন বলেন—সহস্র সহস্র মূর্ত্তির মধ্যে একটীতেও পরিচিত কোন অব্দের উল্লেখ পাই না, তাহাদের ভঙ্গীতেও কোন্‌টী অগ্রের কোন্‌টী পশ্চাতের তাহার সুনির্দ্দিষ্ট কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

হেলেনিক্ শিল্পের প্রাচীন পরিচয় পাই, সর্ব্বপ্রথমে ‘বিমারণ’ পেটিকাতে, তারিখ নিয়া সূক্ষ্ম বিচারের স্থান নাই, ধরিলাম খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতক, প্যালাস এ্যাথেনি মূর্ত্তিকে (লাহোর মিউজিয়াম) স্মিথ ঐ সময়েরই বিবেচনা করেন। তক্ষশীলার আয়োনীক মন্দিরও প্রাচীন যুগের; ধর্ম্মরাজিক
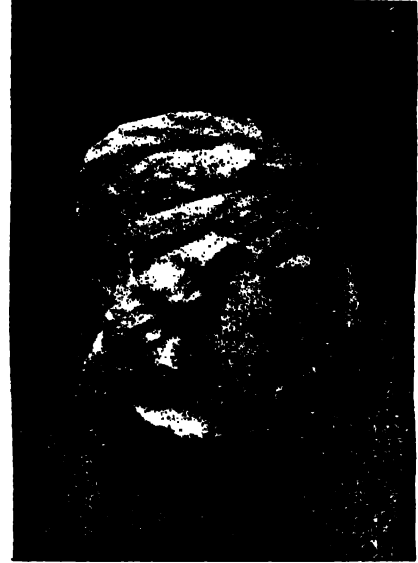
১নং চিত্র

স্তূপ ও শিরকাপের জৈনস্তূপের অংশবিশেষও ঐ যুগের। হেলিডোরাসের কথা তো অতি বিখ্যাত। খৃঃ পূঃ ২০০

২নং চিত্র

হইতে গ্রীক ও শক রাজাদের মুদ্রায় ভারতীয় ধর্ম্মসংক্রান্ত

নিদর্শন দেখি। ইহাই ভারতে গ্রীক্ শিল্পের প্রথম যুগ, ভারতীয়দিগের সহিত লেনদেনের আরম্ভ

৩নং চিত্র

কিন্তু ইহা গান্ধার—হেলেনীয়-শিল্প নয়। গান্ধার হেলেনীয় শিল্প ইহার সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারীও নয়—অর্থাৎ এই ধারা হইতে তাহার জন্ম নয়। ইহা বিশেষ করিয়া গ্রীক্ শিল্পের কম-বেশী হুবহু নকল, ভারতীয় রসের স্থান ইহাতে নাই বলিলেও চলে।

৪নং চিত্র

কনিষ্কের তারিখ এখনও স্থির হয় নাই র‍্যাপসনের ৭৮ খৃষ্টাব্দের আদর কমিতেছে। ১২০ খৃঃ অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কনিষ্কের যুগে, মহাযানের স্বাধীন সত্তার প্রকাশের যুগে যে এ গান্ধার-ভাস্কর্য্য রচিত হইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ। মহাযানেই বিশেষ করিয়া বুদ্ধপূজা ও বোধিসত্ত্ব পূজা প্রচারিত হয়। মহাযানই বৌদ্ধ ধর্ম্মকেসাধারণের ধর্ম্ম করিয়া তুলে এবং তাহা সম্ভব হয় বৌদ্ধধর্ম্মে বিশিষ্ট ভক্তিবাদ অবতারণায়। মহাসাঙ্ঘিকেরা ঐ কাজ আরম্ভ করে, কিন্তু মহাযানই উহাকে সর্ব্বব্যাপী করিয়া তুলে। নবধর্ম্মের একটা যেন দৈবী শক্তি আছে, খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে তাহা দেখি; মহম্মদের ধর্ম্মে দেখি তাঁহার মৃত্যুর আশী বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধজগৎ সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। মহাযানও সেই শক্তিতে আশ্চর্য্যরূপে সারা দেশ ছাইয়া ফেলিল। শ্রীযুক্ত

৫নং চিত্র

ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য অতি মূল্যবান পুস্তক 'বৌদ্ধ প্রতিমাতত্ত্বে' বলেন, মহাযানে বজ্রযান উৎপত্তির পূর্ব্বে বৌদ্ধ-প্রতিমার যুগ (বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বের বিশিষ্ট পূজাতন্ত্র) আসিতে পারে না। 'বৌদ্ধ-দেবতা-বাদ' বিশেষ করিয়া বজ্রযানের সৃষ্টি। শক্তি-বাদ-সম্পর্কে ইন্দ্রভূতি ও 'জ্ঞান-সিদ্ধির' কথায় প্রথম 'বজ্রযান' শুনা যায়। সে সময় হইতেছে খৃঃ অষ্টম শতাব্দী। অমিতায়ুস-সূত্রের তারিখের কথা তুলিব না, কিন্তু তাহার চীনা অনুবাদ হয় ১৪৮—১৭০ খৃঃ মধ্যে। ডাঃ ভট্টাচার্য্য 'মহাসুখবাদ' বজ্রযানেরই বিশেষ কল্পনা বিবেচনা করেন এবং 'মহাসুখবাদকেই 'বৌদ্ধ-

দেবতা-বাদের' বীজ-মন্ত্র বলেন। কিন্তু দেখি, অমিতায়ুসসূত্র বা সুখাবতীব্যূহ বহু প্রাচীন, সেই সুখাবতীব্যূহে 'বৌদ্ধ-দেববাদ' পরিস্ফুট হইতেও অতি পরিস্ফুট। সুতরাং বৌদ্ধ-দেববাদ মহাযানের প্রায় গোড়ার দিকেই যে গান্ধার-ভাস্কর্য্যের অনুপ্রেরণা আনিয়াছে, ইহা অস্বীকারের উপায় নাই। বিরাট্ ভাস্কর্য্য তাহারি ভাষ্য। সর্ব্বযুগের একান্ত মহাযানী

৬নং চিত্র

মার্কা ত্রিমূর্ত্তি—বুদ্ধ ও পার্শ্বচর দুই বোধিসত্ব (শহর-ই-বালোল) এমন করিয়া গান্ধার-শিল্প রচনায় জাঁকিয়া বসিল কেমন করিয়া? শক্তি-বাদ-সম্পর্কে ডাঃ ভট্টাচার্য্য তান্ত্রিকতাকে বৌদ্ধ-সৃষ্টি বলেন। অষ্টম শতাব্দীতে যে বজ্রযানের সৃষ্টি, তাঁহার কথামতই যদি তাহাই তান্ত্রিকতার সৃষ্টি করিয়া থাকে, অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে, তান্ত্রিকদের অস্তিত্ব তো সুপরিজ্ঞাত। এ-কথা আর বিচারসহ থাকে না।

ভারতীয় ধর্ম্মের এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা সকলে স্বীকার করিতেছেন—তাহা অতি অলক্ষ্যে পরদেশীকে স্বদেশী করিয়া লয়। ভারতীয় ধর্ম্মের এই বিশেষ গুণটী প্রথম লক্ষ্য হয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের কালে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাকে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে যে একটা বড় হেলেনীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠে তাহাকে ভারতীয় করিয়া তুলে বৌদ্ধেরা, তাই সারা গান্ধার শিল্প বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়-বস্তু লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন প্রাদেশিক বা সাময়িক শিল্প-সম্ভার-সম্বন্ধে এমন কথা আর কখনও বলা সম্ভব হয় নাই।

গান্ধার-ভাস্কর্য্য এই নব-দীক্ষিত বৌদ্ধ-গ্রীক্ রচনাই যদি হয়, তবে ইহার প্রকৃতি বুঝিতে আর বড় কষ্ট হইবে না। বারবেরিয়ানবাদী গ্রীক্‌রা বৌদ্ধ হইল, তাহা বলিয়া তো ভারতীয় হয় নাই। গান্ধার-ভাস্কর্য্যের তাই সাধারণ নিয়ম হইতেছে যে, যে মূর্ত্তি যত গ্রীক শিল্পনীতির পরিপন্থী তাহাই তত পুরাতন, যাহা যত ভারতীয়-পন্থী তাহা ততই নূতন। ১ হইতে ১০নং চিত্র—ঐ সূত্র অনুসারে প্রদত্ত হইল।

১, ২, ৩, ৪ নির্ব্বিবাদে একান্তই হেলেনীয়, লক্ষ্য করিলে অতি সূক্ষ্মভাবে ভারতীয় ভাবের ক্রম-বর্দ্ধমান অস্তিত্ব চোখে পড়ে, ৪নং মুখের একটু নূতন বিশিষ্ট মুখ-ভাব আছে, ১নং ও ২নংএর মুখভাব হইতে একটু স্বতন্ত্র, তবুও তাহারা ভারতীয় মাটিতে যে নিতান্তই বিদেশীয়, ইহাতে কোনই সন্দেহ থাকে না। ৫নং মূর্ত্তিতে

গুম্ফ-শোভিত মুখ-ভাবে এক অপূর্ব্ব পৌরুষের পরিচয় পাই, তাহা বিশিষ্ট ভারতীয় একথা বলিতেছি না, কিন্তু প্রচলিত গ্রীক-তন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র। ৬নং যে হেলেনীয় সৃষ্টি ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এইবার ইহাতে নূতন যুগের সন্ধান পাই, মূর্ত্তিতে ভাবের সমাবেশ পাই। গান্ধার-হেলেনীয় সৃষ্টি গ্রীক্-শিল্পের অনেকটা বিকৃতি, সে অনুপ্রেরণার, সে প্রতিভার দীপ্তির অভাব চক্ষুকে বড়ই বেদনা দেয়, ৬নং চিত্র যেন গান্ধার-শিল্পে নূতন আলোকপাত করে। এ মূর্ত্তিটী বিশিষ্ট সৃষ্টি নয়, অন্য সকলের মতনই একটি শ্রেণীর টাইপ্ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। জ্যোতির্ম্মণ্ডলকে গ্রীক্-উৎপত্তি মনে করিবার কোন কারণ নাই, ইহা সৌর-উপাসনা হইতে উদ্ভূত, প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে পারস্যের আর্য্যদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বেই ইহা প্রচলিত ছিল এবং ইহা পারস্য ও ভারতবর্ষের সাধারণ সম্পত্তি। মুখের সহিত পূর্ণচন্দ্রের তুলনা অতি প্রাচীন, চন্দ্রের স্নিগ্ধ দীপ্তি ও মুখের দীপ্তি এক বলিয়াও মানা হইয়াছে। চন্দ্রের উপাসনাও ইহার মূল হইতে পারে। এদেশের সকল রাজারাই হয় সূর্য্য নয় চন্দ্রবংশ-উদ্ভূত। ৭নং মূর্ত্তিতে আরও সুপরিস্ফুট শান্তির ছাপ লাগিয়াছে। ৮নং মূর্ত্তি গান্ধার ভাস্কর্য্যে অতি অপূর্ব্ব বলিয়া আমার মনে হয়। ৯নং মূর্ত্তিতে যোগীর সাক্ষাৎ পাই। এই যোগীর মত অপূর্ব্ব আশ্চর্য্যভঙ্গী শিল্প-কলায় আর কখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। সারা এসিয়া জুড়িয়া ইহারই ছন্দে দেশে দেশে বিরাট্ শিল্প-কলা রচিত হইয়াছে। এ যে গ্রীক্ হাতেগড়া 'মোটা' মাংসল মূর্ত্তি ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই যোগীর ভাব একান্ত ভারতীয়। গান্ধার-শিল্পে গ্রীক্ দেব-দেবী এদেশে আসে নাই। প্যালাস এথেনী বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্বে একবার 'সখের খেয়ালে' মাত্র গড়া হইয়াছিল—সে 'গান্ধার-শিল্পের' কোঠায় পড়ে না। সে দেব-দেবীরাও সব তখন বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে কায়া তো বদলায় নাই। এইটাই গান্ধার-শিল্পের গোড়ার কথা। ১০ নম্বরে একেবারে ভারতীয় যোগীর সাক্ষাৎ—অবশ্য ঐ হেলেনীয় হাতেই গড়া। যোগীর ধারণা শিল্পীর অন্তরে পৌঁছায় নাই, তাই অন্তরের রূপ দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই, কিন্তু বাহির হইতে যাহা কিছু সম্ভব সবই করা হইয়াছে।

সিদ্ধার্থ বোধিসত্ত্ব এখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্, ত্বগস্থি-মাংসং এলয়ঞ্চ যাতু……।

এখানে এইসকল মূর্ত্তির বিবৃতি-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া একটু আলোচনা করা যাউক। বুদ্ধের কেশকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা গ্রীক্-উদ্ভাবনা বলিয়াই বিবেচনা করেন। কুমারস্বামী জাতক-নিদান কথা হইতে দেখাইয়াছেন যে বুদ্ধ মুণ্ডিতশীর্ষ নহেন। বুদ্ধ যে মাত্র অস্ত্রসাহায্যে কেশকর্ত্তন

৭নং চিত্র

করেন, মুণ্ডন করেন নাই, ইহারা সকলে জানেন—ভারুতে, সেই কেশের স্বর্গলোক-যাত্রার দৃশ্য দেখি।

গান্ধার-ভাস্কর্য্য অনেক স্থানের বৌদ্ধ-শিল্পকলায় ন্যায় (ভারুতের পর হইতে প্রায় সর্ব্বত্রই) মানুষের জীবনের

প্রায় সকল ঘটনাই খোদিত করিয়াছে। সাঁচীতে, বাঘেতে 'ফূর্ত্তির' দৃশ্য দেখিতে পাই।

৮নং চিত্র

প্রথমেই বলিয়াছি যে এখানকার ভাস্কর্য্যের নূতন পুরাতন স্থির করিবার সাধারণ রীতি হইতেছে, হেলেনীয় প্রভাবের চিহ্নের কম বেশী লক্ষ্য করা। এখন সাধারণতঃ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, হেলেনীয় ভাব যত বেশী দেখি অর্থাৎ নমুনার বয়স যত বেশী হয়—আর্টের হিসাবে, তাহার স্থান ততই উচ্চতর। ভারতীয় পণ্ডিতদের কথা ঠিক ইহার উল্টা। এমন সম্ভব হইল এই জন্য যে, তাঁহারা বিবেচনা করেন আর্টের উচ্চতা নির্ভর করে, রচনা যত subjective (বস্তুভাবনিরপেক্ষ) হয়, রূপকর্ম্ম যত 'আধ্যাত্মিক' বা ভাবের অভিব্যক্তিতে কৃতকার্য্য হয়। এই হিসাবে প্রথমেই যে কথা বলিয়াছি গ্রীক-সংস্কারে মুগ্ধ ইয়ুরোপের প্রচলিত মতের সহিত ইহা মিলিতে পারে না।

৯নং চিত্র

আরও একটী গভীর প্রশ্ন গান্ধার-ভাস্কর্য্য-সম্পর্কে উঠে, বুদ্ধমূর্ত্তি, তথা দেব-মূর্ত্তিরচক কি ঐ শিল্পীরা? বুদ্ধমূর্ত্তির

১০নং চিত্র

গোড়ার কথা—যোগী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই যোগীর ভাব-কল্পনা একান্তই ভারতীয়। মথুরা-শিল্পকে কিছুপূর্ব্বে

গান্ধার-শিল্পেরই অনেকটা শাখা বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছিল। কথাটা এখন একেবারেই লোপ পাইতে বসিয়াছে। মথুরায়, ভারহুত-সাঁচীর ভারতীয় শিল্প-কলা-ধারা চলিয়া আসিয়াছে এবং সত্যকার মথুরা শিল্প একান্তই ভারতীয়। সেখানে যে বুদ্ধমূর্ত্তি রচিত হইয়াছে, তাহাতে গান্ধারের 'গন্ধ'ও পাই না। সুদূর দাক্ষিণাত্যেও গান্ধার-শিল্পের প্রভাবের পরিচয় পাইলেও একান্ত স্বাধীন বুদ্ধমূর্ত্তি রচিত হইয়াছে। *

গান্ধার-শিল্পকলার মূলে দেখিতে পাই শিল্পী কর্ম্মকার, রূপকার নয়। এইবার স্মরণ করিতেছি 'Art is long, time is short'—তবু আশা করি বারান্তরে ভারতীয়-শিল্পকলার কয়েকটী মূলসূত্রের কথা কিছু বলিব এবং ক্রমে ক্রমে সেই গৌরব-অবদান-কাহিনী কিছু কিছু বিবৃত করিব।

* এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে ; এখানে তাহার স্থান নাই। তবে কুমারস্বামীর একটী প্রবন্ধের কথা উল্লেখ না করিয়া পারি না, সেটী দীর্ঘও নয়, অত্যন্ত দুরূহও নয়—Indian Origin of Buddha Image J. A. O. S. Vol. 46.

সনেট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

সে দিন বসন্তে নাহি ছিনু তব পাশে,—
যে দিন সে মদোদ্ধত তরুণ ফাগুন,
ল'য়ে এল বরভূষা—কুসুমের রাশে ;—
জ্বেলে দিল বিশ্বমাঝে যৌবন-আগুন।
বিহগের কলতান—ফুলের সুঘ্রাণ,
বিচিত্র সে শোভা আর বিবিধ বরণ,
পারেনি পুলকস্রোতে ভ'রে দিতে প্রাণ,—
আঁখির নিমেষ মোর করেনি হরণ।
চম্পকের লীলাহাসে করিনি ভ্রূক্ষেপ,
গাঁথি নাই বসি' বসি' বকুলের মালা ;
বৃথা মরিয়াছে কেঁদে চপল দ্বিরেফ,
উদাসীন হ'য়ে তাহে ছিনু অয়ি বালা।
বৃদ্ধ শীত ঘিরে যেন ছিল মোর পাশে,
লতা-কিসলয়-ভরা পূর্ণ মধুমাসে।

বঙ্গের মহিলা কবি *

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

'বিক্রমপুরের ইতিহাস' এবং অন্যান্য সুখপাঠ্য গ্রন্থের রচয়িতা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সম্প্রতি 'বঙ্গের মহিলা কবি' নামক একখানি গ্রন্থ আমাদিগের নিকট সমালোচনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে মহিলারা অনেকেই নিজ নিজ প্রতিভাবলে অতি উচ্চস্থান অধিকৃত করিয়াছেন, এ কথা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। উপন্যাস, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, জীবনচরিত ও অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ-রচনায় তাঁহারা যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় গীতি-কবিতার ক্ষেত্রেই মহিলারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সরলতা ও আন্তরিকতা, ভাষার লালিত্য ও ভাবের মাধুর্য্য ইঁহাদের কবিতাগুলিকে একটী বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে রামী, চন্দ্রাবতী, আনন্দময়ী, গঙ্গাদেবী, দ্বিজতনয়া, শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী, ৺গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু, ৺বিরাজমোহিনী দাসী, শ্রীযুক্তা লজ্জাবতী বসু, ৺প্রমীলা নাগ, ৺বিনয়কুমারী বসু, ৺সরোজকুমারী দেবী, ৺হিরণ্ময়ী দেবী, ৺পঙ্কজিনী বসু, শ্রীযুক্তা সরলা বালা দাসী, শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীযুক্তা মৃণালিনী সেন, শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী, রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী, ৺নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, শ্রীযুক্তা সরমা-সুন্দরী ঘোষ, ৺সুশীলা সুন্দরী সেন, শ্রীযুক্তা সরলাবালা দাসী, শ্রীযুক্তা অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা, শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী, শ্রীযুক্তা রাধারাণী দত্ত (এখন দেব,) শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, শ্রীযুক্তা লীলা দেবী ও সম্প্রতি পরলোকগতা উমা দেবীর জীবনী ও কবিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিবরটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য গ্রন্থকার পরিশিষ্টে আরও কয়েকজন মহিলা কবির নাম ও গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থের কাগজ, ছাপা, ছবি এবং বাঁধাই অতি মনোরম হইয়াছে এবং তিন শতের অধিক পৃষ্ঠাব্যাপী ক্রাউন অক্টেভো আকারের এরূপ সচিত্র বাঁধান পুস্তকের মূল্য দুই টাকা মাত্র ধার্য্য হওয়ায়, আমরা আশা করি, গ্রন্থখানি অধিক দিন প্রকাশকের আলমারী-জাত হইয়া থাকিবে না, শীঘ্রই—উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের একটী অভাব ছিল এবং যোগেন্দ্রবাবু এই অভাব মোচন করিয়া বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গালার মহিলারা স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা এবং যদিও আজকাল সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, তাঁহাদের জীবনীর উপকরণ, এমন-কি তাঁহাদের একখানি চিত্র সংগ্রহ করাও যে কত কঠিন ব্যাপার তাহা আমরা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, ৺গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধা মহিলা কবিরাও তাঁহাদের প্রথম গ্রন্থগুলিতে তাঁহাদের নিজ নিজ নাম প্রকাশিত করিতে সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় যে এই মহিলা কবিদের অনেকেরই জীবনী ও চিত্র সংগ্রহ করিয়া পাঠক-সমাজে উপহার দিতে সমর্থ হইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারেন এবং তাহার নিকট সমালোচকের প্রশংসা কিছুই নহে। তবে সকল কবির সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় স্বয়ং লিখিয়াছেন :—"কোন গ্রন্থেরই প্রথম সংস্করণ আশানুরূপ করা সম্ভবপর হয় না, আমিও পারিয়াছি এমন

* 'বঙ্গের মহিলা কবি'—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত, ৩২ নং বাবীবাজার রোড, ঢাকা, ২৪ বি, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

কথা বলিতে পারি না। আমরা আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে যোগেন্দ্রবাবু গ্রন্থখানি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা পাইবেন। সেই সঙ্গে সমস্ত গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের তারিখ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা উচিত।

সমালোচনার জন্য এই গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইবার বহুপূর্ব্বে, বোধ হয় গ্রন্থখানির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবা মাত্র আমরা উহার একখণ্ড ক্রয় করিয়া আনি এবং যত্নপূর্ব্বক পড়িয়া আত্মীয়গণকে পড়িতে দিই। গ্রন্থখানি পাইয়া আমাদের এত আনন্দ হইয়াছিল যে, উহার ক্রটি-বিচ্যুতির কথা মনে উদিত হয় নাই এবং এখনও পুস্তকখানি সমালোচনা করিতে বসিয়া উহার ক্রটি-বিচ্যুতির কথা লিপিবদ্ধ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিবার জন্য লেখক মহাশয় সকলের নিকট সাহায্য চাহিয়াছেন, আমরা এই গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে কয়েকটা তথ্যের সন্ধান দিতে বাসনা করি।

(১) প্রাচীন যুগের মহিলা কবিগণের মধ্যে 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' উল্লিখিত মাধবী দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়—

"মাধবী দেবী শিখি মাহিতীর ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যার নাম গণি॥

পুনশ্চ,

শিখি মাহিতীর ভগ্নী শ্রীমাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী তোঁহে পরমা বৈষ্ণবী॥

ইঁহার রচিত কয়েকটী পদাবলী "বঙ্গভাষার লেখক" ও অন্যান্য গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে।

(২) যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী এক স্ত্রীকবি ভোলাময়রা ও নীলুঠাকুর প্রভৃতির সমসময়ে এক কবির দলের সৃষ্টি করিয়া স্ব-রচিত গান শুনাইতেন। 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত "বাঙ্গালীর গান"এর ১৮৬ পৃষ্ঠায় ইঁহার একটা গান উদ্ধৃত আছে। দীনেশবাবুর ইতিহাসেও ইঁহার উল্লেখ আছে।

(৩) ভবানী বা ভবরাণী নাম্নী এক স্বর্ণকার-জাতীয়া কবি তর্জ্জা ও ঝুমুরের গীত রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচনা অশ্লীলতাদোষ হইতে মুক্ত না হইলেও তৎকালীন সমাজে নিতান্ত অনাদৃত হয় নাই। "বাঙ্গালীর গান"এর ১০৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(৪) আলোচ্য গ্রন্থে যাঁহাদের নাম নাই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কাব্যগ্রন্থ-তালিকার এইরূপ নিম্নলিখিত কবি ও গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়—

জগদীশ্বরী দেবী—দ্রৌপদী ৩৬ পৃঃ (১৩১১),
নবীনকালী দেবী—মন্দোদরীর রণসজ্জা ৫৮ পৃঃ (১২৮৭),
সরমা-সমাধি বা ষটচক্রভেদ ৬০ পৃঃ (১২৯২),
ভুবনমোহিনী দেবী—স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান ৬৫পৃঃ (১২৮৪),
রমণী দেবী—শ্রীকৃষ্ণলীলা (১ম ও ২য় ভাগ) ২৩৩ পৃঃ (১৩১১),
নলিনীবালা দাসী—নলিনীগাথা ৩৬৩ পৃঃ (১৩০৫),
প্রভাবতী দেবী—অমলপ্রসূন বা প্রভাবতী কবিতাবলী (১৩০৭),
বসন্তকুমারী দাসী—রোগাতুরা বসন্তকুমারী (১২৭৮),
বিনোদিনী দাসী—কনক ও নলিনী (১৩১২),
সরলাবালা দেবী—প্রবাহ,
জনৈকা দুঃখিনী স্ত্রীলোক—অশোকবনে সীতা।

(৫) আধুনিক লেখিকাদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নহে, তবে তাঁহাদের মধ্যে সম্প্রতি-পরলোকগতা চারুলতা ঘোষ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী, রেখা-প্রণেত্রী শ্রীযুক্তা কনকলতা ঘোষ প্রভৃতির নাম দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী (সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর দুহিতা) রাণী জ্যোতির্ম্ময়ীও অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং সেগুলি মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের ন্যায় সুপণ্ডিতের সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া-ছিল। 'অকল্পিতা' গীতিকাব্য-প্রণেত্রী শ্রীমতী হেমলতা দেবীর নামও উল্লেখযোগ্য। আমরা জানি, অনেক বঙ্গমহিলা স্বামী বা আত্মীয়-পরিজনের চিত্তবিনোদনের জন্য বা পারিবারিক শোকের সান্ত্বনার জন্য কবিতা লিখিয়া থাকেন কিন্তু সেগুলি প্রকাশযোগ্য হইলেও সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হন। আমার মাতৃদেবীকে আমি আমার শৈশবকাল হইতে কবিতার অনুশীলন করিতে দেখিয়াছি এবং যদিও তাঁহার দুই-চারিটী কবিতা 'বামাবোধিনী পত্রিকা' ও 'আর্য্যাবর্ত্তে' প্রকাশিত

হইয়াছিল এবং কয়েকটী কবিতা ও গাথা আমার সোদরোপম বন্ধু শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় তৎ-সম্পাদিত 'যমুনা' মাসিকপত্রে ছাপাইয়াছিলেন, আমি এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার অনুমতি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অনেক গৃহেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম। অনেকস্থলে গ্রন্থ কেবল আত্মীয়-স্বজনগণের মধ্যে বিতরণের জন্যই মুদ্রিত হয়—বিক্রীত হয় না।

আমার গ্রন্থাগারে জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত-বিরচিত 'ধূলিরাশি' নামক এইরূপ একখানি সুন্দর কবিতাপুস্তক (১৮৯৪) আছে, তাহার প্রারম্ভে তাঁহার পিতা একটী ইংরাজী কবিতায় 'আশীর্ব্বচন' প্রকাশ করিয়াছেন। পাইকপাড়ার রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ, ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ ও শরচ্চন্দ্র সিংহের ভাগিনেয়ী কৃষ্ণকুমারী "দুহিতার বিলাপ" নামক কবিতায় স্বর্গগতা মাতৃদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়াছেন। আমার মাতৃষ্বসা (রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহারাজ-কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পত্নী) ৺ইন্দুবালার "স্মৃতি" শীর্ষক কাব্যগ্রন্থও এইরূপ শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ ও বিতরণার্থ মুদ্রিত হয়। আমার এক জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা ইন্দুবালা ঘোষের রচিত 'অশ্রুধারা' কাব্যগ্রন্থও এই পর্য্যায়ভুক্ত। এসকল গ্রন্থ ঠিক সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত না হইলেও এইরূপ কতকগুলি পুস্তকের নাম আলোচ্যগ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া উহার উল্লেখ করিলাম।

যোগেন্দ্রবাবু ঐতিহাসিক এবং তিনি যাহা দিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইলেও আমরা আশা করি তিনি আরও কিছু দিবেন। ভবিষ্যৎ সংস্করণে আধুনিক সাহিত্যে কিরূপে বাঙ্গালায় মহিলা কবির আবির্ভাব হইল তাহার একটু ঐতিহাসিক বিবরণ তাঁহার নিকট আমরা পাইবার আশা করি।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সুপণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৎসম্পাদিত 'মুখার্জীর ম্যাগেজিনে' 'Bengali Female Literature' নামক একটী প্রবন্ধে—নিম্নলিখিত মহিলা কবি-রচিত পুস্তকদ্বয়ের সমালোচনা করেন :—

(১) স্বীয় মনের প্রতি উপদেশ। কোন বঙ্গমহিলা প্রণীত।

(২) কবিতা হার। জনৈক হিন্দু মহিলা* প্রণীত।

এই প্রবন্ধের একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, "১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে 'প্রভাকর' মাসিকপত্রে ঠাকুরাণী দাসী নাম্নী এক মহিলা তাঁহার নিজনামে নানা গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতেন; বোধ হয় নিজনামে এই মহিলাই সর্ব্বপ্রথম স্বরচিত কবিতা প্রকাশ করেন।" এই ঠাকুরাণী দাসী কে তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। ঈশ্বর গুপ্তের যুগের মহিলা কবিদের রচনারও কিছু নিদর্শন সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়

'প্রভাকরে'র পর বোধ হয় 'বামাবোধিনী পত্রিকা'ই বঙ্গীয় মহিলাগণকে গদ্য-পদ্য রচনা প্রকাশে বিশেষভাবে উদ্বোধিত ও উৎসাহিত করে। সেকালে 'বামাবোধিনী'র অনেক লেখিকার নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত ছিল এবং যদিও তখন গ্রন্থের এত ছড়াছড়ি ছিল না, সাময়িক পত্রে কবিতা প্রকাশ করিয়াই অনেক লেখিকা কবি বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের ব্যয়ে বামাবোধিনী সভা সুবিখ্যাত প্যারীচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেবের সাহায্যে "বামা রচনাবলী" সঙ্কলিত করেন। উহাতে অবলাবান্ধব, বঙ্গবন্ধু, বামাবোধিনী পত্রিকা প্রভৃতির লেখিকাদের উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য রচনাসমূহ প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে নিম্নলিখিত মহিলা কবিদের নাম পাওয়া যায়।

যোগমায়া দেবী, রাধারাণী লাহিড়ী, ক্ষীরদা মিত্র, রমাসুন্দরী ঘোষ, লক্ষ্মীমণি দেবী, স্বর্ণপ্রভা বসু, মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রমোহিনী, বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, কামিনী দেবী, ভাবিনী দেবী, জয়কালী গুপ্ত, স্বর্ণলতা দেবী, আ-মো-বসু, রঘুমণি দেবী। এতদ্ব্যতীত 'বারাসতস্থ কোন ভদ্রকুলবালা', 'বর্দ্ধমানস্থ কোন ভদ্রকুলবালা', 'দত্তপুকুরস্থ কোন ভদ্রকুলবালা', 'জগদ্দলবাসিনী', '* * * চট্টোপাধ্যায়', 'দোয়ার উত্তরপল্লীনিবাসিনী কোন মহিলা', 'ঢাকাস্থ কোন রমণী' স্ব স্ব নাম গোপন রাখিয়া যে সকল রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও 'বামা রচনাবলী'তে স্থান পাইয়াছে।

যোগমায়া দেবী মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী। ইঁহার রচিত "দয়াময়ের চরণাশ্রয় প্রার্থনা"

* ৺গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী

শীর্ষক বিয়োগান্ত কবিতায় পাঠকগণ ইঁহার রচনা-পদ্ধতির পরিচয় পাইবেন :—

কোথা হে করুণাময় জগতের পতি,
কৃপা দৃষ্টিপাত কর অধীনীর প্রতি।
পাপেতে জড়িত আমি রহিতে না পারি,
কেমনে পাইব পিতা তব প্রেমবারি।
অনাথের নাথ তুমি নির্দ্ধনের ধন,
ভক্তি-পুষ্প দিয়া নাথ পূজিব চরণ।
সবিনয়ে করি পিতা এই নিবেদন,
তোমার চরণতলে যেন থাকে মন।
কেমনে পাইব প্রভু তব দরশন,
হৃদয়ে আইলে তুমি জুড়াব জীবন।
তোমার দয়ার আমি কত দিব সীমা,
যেদিকে ফিরাই আঁখি তোমারি মহিমা।
করুণা করিয়া পিতা এস হৃদাসনে,
বারেক হের হে নাথ এ অধীনী জনে।
সংসারের ভার আর সহেনা এ প্রাণে,
শীতল করহে নাথ প্রেমবারি দানে।
তোমার নিমেষ মাত্র ভুলে নাহি থাকি,
দয়াময় নাম যেন হৃদয়েতে রাখি।
পাপেতে জড়িত আমি কত র'ব আর,
থাকিবে জীবন পিতা চরণে তোমার।
করুণা করহে পিতা পাপী জীবগণে,
পুলকে প্রফুল্ল আমি থাকি দরশনে।
তোমার দয়াতে আমি হ'তেছি পালন,
তুমি পিতা দয়াময় জীবের জীবন।
তোমার দয়ার পিতা নাহি সমতুল,
পূজিব চরণ পিতা দিয়া প্রীতিফুল।
তোমার দয়ার পিতা কে করিবে শেষ,
দয়াময় জ্ঞানী মূর্খ না কর বিশেষ।
আমি পিতা জ্ঞানহীন এই ভিক্ষা চাই,
তোমার চরণে পিতা যেন ঠাঁই পাই।

চিরকুমারী রাধারাণী লাহিড়ী পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইনি সম্প্রতি পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইঁহার প্রবন্ধ ও কবিতা গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহার রচনার নমুনা—

ঈশ্বরের মহিমা

যে দিকেতে ফিরাই নয়ন সেই দিকে করি বিলোকন
অপার বিভু মহিমা, মিলে না যাহার সীমা,
সকলই কৌশলে রচন।

প্রভাতের তরুণ তপন মরি কিবা নয়নরঞ্জন!
পাখীর ললিত গীত, সকলেই প্রফুল্লিত,
মনুজের হরষিত মন।

নানাবিধ কুসুমনিচয় সারি সারি ফুটে সমুদায়!
সুমধুর মনোহর, শোভয়ে ধরণী'পর,
গন্ধবহ সুসৌরভ বয়।

শস্য-পূর্ণ হরিত প্রান্তর বীচি যেন ধরণী-উপর!
মনোহর সুরঞ্জিত থাকয়ে হ'য়ে শোভিত
দর্শকের নেত্র তৃপ্তিকর।

সুষমা পূরিত উপবন! তাহে করে বিহগ কূজন!
লতাপাতা বিমণ্ডিত, তরুরাজি সুশোভিত,
সকলেই হ'রে লয় মন।

নিরমল সুনীল আকাশে আহা! যবে চন্দ্রমা প্রকাশে।
দশ দিক আলোময়, নিশীথে দিবসোদয়,
হাসিমুখে কুমুদ বিকাশে।

নিবিড় নীরদদল মাঝে ক্ষণ-প্রভা কি সুন্দর সাজে,
চমকিয়া ত্রিভুবন, সচকিত করে মন,
ক্ষণে ক্ষণে অম্বরে বিরাজে!

কাদম্বিনী হেরিলে অম্বরে শিখীকুল পুলকের ভরে,
স্বীয় পুচ্ছ বিস্তারিয়ে, শিখিনীরে সঙ্গে নিয়ে,
কিবা নৃত্য আরম্ভন করে!

প্রকাণ্ড ভূধরশ্রেণীচয় যেন কারো নাহি করে ভয়!
উন্নত করিয়া শির, দৃঢ়কায় মহাবীর,
কিছুতেই কাঁপে না হৃদয়।

সেই সব ভূধরের গায় আহা কি সুন্দর শোভা পায়!
সুশোভিত মনোহর বিবিধ তরু-নিকর
হেরিলেই নয়ন জুড়ায়।

নির্ঝরের সুশীতল জল কিবা স্বচ্ছ কিবা নিরমল!
গিরিবর-শির হ'তে সুগম্ভীর নিনাদেতে
পড়ে আসি অচলের তল।

চারিদিকে সুবিশাল গিরি দাঁড়াইয়ে শোভে সারি সারি
তার মাঝে সুললিত উপত্যকা সুশোভিত
কি সুন্দর! আহা মরি মরি!

এই সব অপূর্ব্ব রচন দিবানিশি করিছে ঘোষণ
মহতী বিভু-মহিমা, অচিন্তন অনুপমা,
গাও সবে আনন্দিত মন।

পুণ্যস্মৃতি ক্ষীরদা মিত্র কোন্নগর-নিবাসী সাধু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের চতুর্থী কন্যা। অমর কবি দীনবন্ধু তদ্বিরচিত 'সুরধুনী কাব্যে' শিবচন্দ্র দেবের প্রসঙ্গে তাঁহার কন্যাগণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"সুশিক্ষিতা ছয় কন্যা ভারতীর ভাব।"

আমার পিতামহী কৈলাসকামিনী এই কন্যাগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ছিলেন। শিবচন্দ্রের চতুর্থী, পঞ্চমী ও কনিষ্ঠা কন্যারাই সেকালে উৎকৃষ্ট গদ্য-পদ্য রচনা লিখিয়া সুখ্যাতি ও পুরস্কারাদি লাভ করিয়াছিলেন। "আলালের ঘরের দুলালে"র বিখ্যাত গ্রন্থকার প্যারীচাঁদ মিত্রের পুত্র চুনীলাল মিত্রের সহিত ক্ষীরদার বিবাহ হয় এবং শ্বশুর-বাড়ীতেও তিনি সাহিত্যসাধনায় বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত হন। ইঁহার রচিত 'কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনা' নামক একটী সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ওহে বিশ্বনাথ, করি প্রণিপাত,
তোমার চরণে আমি।
তুমি বিনা আর, কে আছে আমার,
তুমি জগতের স্বামী॥
তোমার কৃপায়, জন্মেছি ধরায়,
তুমি সর্ব্ব সুখদাতা।
তোমারি সৃজিত, তোমারি পালিত,
তুমি মম পরিত্রাতা॥
কতই যতনে, রেখেছ এ জনে,
জন্মাবধি চিরকাল।
পড়িলে বিপদে, রাখি নিজপদে,
ঘুচায়েছ সে জঞ্জাল॥
রোগেতে যখন, হয়ে অচেতন,
তোমার শরণ লই।
তুমি বিনা আর, কে করে উদ্ধার,
গতি নাই তোমা বই॥
কতবার কত, বিঘ্ন শত শত,
হইতে করেছ পার।
করি সুরক্ষণ, রেখেছ জীবন,
নাহি কোন দুঃখভার॥
যেরূপ আমার, অজস্র কৃপায়,
রেখেছ হে কৃপাধার।
কর সেই মত, অধর্ম্মে বিরত,
হয় যেন সদাচার॥
সতত এখন, করিহে প্রার্থন,
কর মোর আত্মোন্নতি।
তোমারি চরণ, করিহে স্মরণ,
তোমাতেই থাকে মতি॥
তোমারি আদেশ, পালি সবিশেষ,
তোমাকেই করি ধ্যান।
তোমারি কৌশল, সকলি মঙ্গল,
ইহা যেন থাকে জ্ঞান॥
পড়িলে বিপদ, না ভুলি ও পদ,
বিরাজিত থাক মনে।
ওহে দয়াময়, দিও পদাশ্রয়,
অন্তে এই পাপীজনে॥

শিবচন্দ্রের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা রমাসুন্দরীর সহিত কলিকাতার শঙ্কর ঘোষের বংশসম্ভূত (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক) ডাক্তার দুকড়ি ঘোষ মহাশয়ের বিবাহ হয়। ইনি 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় অনেকগুলি সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 'পুষ্প' শীর্ষক

একটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠকগণকে ইঁহার রচনা-পদ্ধতির পরিচয় দিব :—

হায় কিবা ঈশ্বরের, রচনা অসীমা।
পুষ্পেতে তাঁহার কত রয়েছে মহিমা॥
বিবিধ বর্ণের ফুল হলে বিকশিত।
কিবা তাহে, বনস্থল হয় সুশোভিত॥
আহা! কি কৌশল আছে, পুষ্পের ভিতর।
পুষ্প কোষবৃন্ত আদি, পাপড়ী কেশর॥
গন্ধবহে গন্ধ তার, লয় দিগন্তর।
সকলেরি হয় তাহে, প্রফুল্ল অন্তর॥
কি বালক কিবা বৃদ্ধ কিবা প্রৌঢ়জন।
সকলেই হয় তাহে, প্রমোদিত মন॥
নাহিক এমন বুঝি, পাষাণ হৃদয়।
দেখিলে পুষ্পের শোভা, মোহিত না হয়॥
পুষ্পময় সুশোভিত, দেখিলে কানন।
ঈশ্বরের হস্ত কেবা না করে স্মরণ॥
আহা! যিনি করেছেন, পুষ্পের সৃজন।
ধন্যবাদ দাও তাঁরে ওহে নরগণ॥
কি কৌশলে পুষ্প সব, হয়েছে রচন।
কি কৌশলে দিন দিন হয় হে বর্দ্ধন॥
কি কৌশলে হয় তাহে ফল উৎপাদন।
কি কৌশলে হয় তাহে গন্ধের সৃজন॥
ভাবিলে আনন্দ হয়, মোহিত হৃদয়।
ঈশ্বরের প্রতি কত প্রেম উথলয়॥
এ শোভায় যে না স্মরে শোভার আকর।
বিফল নয়ন তার পাষাণ অন্তর॥

শিবচন্দ্র দেবের পুত্রবধূ পূজনীয়া শ্রীযুক্তা শরৎকুমারী দেবও কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্তা। 'পদ্মাবতী দেবী' ছদ্মনামে ইনি ১৩১০ সালে 'শান্তিকানন' নামক যে ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত করেন তাহাতে অনেকগুলি সঙ্গীত সন্নিবেশিত আছে।

স্বর্ণপ্রভা বসু জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী এবং সুপ্রসিদ্ধ আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী।

প্রবন্ধ [illegible] হইয়া যাইতেছে বলিয়া আমরা 'বামাবোধিনীর' যুগের লেখিকাগণের সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিব না। কিন্তু একথা আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখা উচিত যে, ইঁহারা অগ্রণীর কার্য্য না করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনিক মহিলা কবিগণের এরূপ আবির্ভাব ঘটিত কি না সন্দেহ। রবীন্দ্র-যুগের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে সকল লেখিকা বঙ্গবাণীর মন্দিরে অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁহাদের নাম, আশা করি, উপেক্ষিত হইবে না। 'বঙ্গদর্শনে'র যুগেও কোন কোন লেখিকা যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১২৭৯ সালে পৌষের 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র অন্নদাসুন্দরী দাসী-বিরচিত 'অবলাবিলাপ' নামক কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "যে স্ত্রীলোক অন্নদাসুন্দরীর ন্যায় কবিতা রচনা করিতে না পারেন তিনি যেন লেখেন না" এবং উহা বঙ্গকামিনী-বিরচিত পদ্যগ্রন্থগুলির "কোনখানির অপেক্ষা ন্যূন নহে" বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

১২৮১ সালে 'কোন হিন্দু মহিলা'-প্রণীত 'দুঃখমালা' নামক পদ্যগ্রন্থ পারিবারিক দুঃখের সান্ত্বনার্থ রচিত বলিয়া সমালোচনাযোগ্য না মনে করিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' লিখিয়াছিল, 'লেখাটী বেশ সরল, সরস এবং কষ্ট-কল্পনাসম্ভূত নহে।'

হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠগণের রচনা-সমলঙ্কৃত কার্ত্তিক মাসের 'বঙ্গদর্শনে' মহিলাকবি ভুবনমোহিনী দেবীর একটী কবিতাও প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৮২ সালের শ্রাবণ মাসে 'দরিদ্র যুবক' শীর্ষক কবিতাটী বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে পত্রস্থ করিয়াছিলেন।

'বনপ্রসূন'-রচয়িত্রী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর মেয়ে'র প্রত্যুত্তর দিতে কিরূপে অগ্রধারণ করিয়াছিলেন তাহা মদ্বিরচিত 'হেমচন্দ্র' নামক গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার মহিলা কবিগণের অনেক রচনা সাময়িক পত্রাদিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। গ্রন্থকার মহাশয় 'সাহিত্যে'র প্রিয়কবি অধুনা-বিস্মৃত প্রমীলা নাগ ও বিনয়কুমারী বসুর কোন কোন রচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। গ্রন্থকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ

জ্ঞাপন করিয়া আমরা তাঁহার ও তাঁহার গ্রন্থপ্রকাশকগণের নিকট আর একটা প্রার্থনা জানাইতেছি। আমাদের মনে হয় প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ মহিলা কবিগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে আমাদের একটী অভাব মোচন হয়। কবিতাগুলি প্যালগ্রেভের বিখ্যাত গীতি-কবিতাসংগ্রহের ন্যায় যুগ-হিসাবে তিন বা চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে। আশা করি আমাদের এ প্রার্থনা নিষ্ফল হইবে না।

মোহ

(উপন্যাস)

শ্রীমতী নীলিমা দেবী

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

পনের

পরদিন সকালে সকলেই চায়ের টেবিলে বসিয়া আছেন, প্রীতি কেবল তখনও আসে নাই। তাহার দেরী দেখিয়া নির্ম্মল ও নীলিমা চঞ্চল হইয়া পড়িতেছে। নির্ম্মল বলিল, "রমা দেখে আর তো প্রীতি কেন আস্‌ছে না, অসুখ করে নি তো ?" রেণুকা বলিল, "অসুখ কেন করবে, আমি যখন আসি তখন ও ঘুমচ্ছিল, আদুরে মেয়ে বেলায় ওঠা বোধ হয় অভ্যাস।" নির্ম্মল প্রীতিকে এত স্নেহ-যত্ন করে সেটা রেণুর মোটেই ভাল লাগে না। প্রীতি কাছে থাকিলে নির্ম্মল যেন অপর কাহারও সঙ্গে মিশিতে পর্য্যন্ত চায় না।

রেণুর কথা শুনিয়া নির্ম্মল একটু বিরক্তভাবে বলিল, "প্রীতির মত মেয়ে খুব কমই দেখা যায়, তার মত শিক্ষা কয়জন পেয়েছে। আদুরে বটে কিন্তু সে আদরে নষ্ট হয় নি। সে পাখীর ডাকের সঙ্গে ওঠে তা' জান কি ?"

নীলিমা বলিল, "কাল আমরা অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প করেছিলাম, ওর তো রাত জাগা অভ্যাস নেই, তাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই কথা হইতেছে এমন সময় প্রীতি ঘরে ঢুকিল। তাহার দিকে চাহিয়াই নির্ম্মল চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া প্রীতির কাছে গেল, সেই সঙ্গে নৃপেনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, "কি হ'য়েছে তোমার, প্রীতি ? মুখ সাদা, চোখের নীচে যেন কালি পড়েছে, অসুখ করেছে কি মা ?"

প্রীতি বলিল, "কিছুই হয় নি, আপনারা ব্যস্ত হ'বেন না, রাত্রে মোটেই ঘুমুতে পারি নি, তাই মাথাটা ধ'রেছে। আমার জন্য সকলে বসে আছেন কেন ? আমার বড় লজ্জা কর্‌ছে।"

এই বলিয়া সে নীলিমাকে বলিল, "তুই ভাই আমাকে কেন তুলে দিয়ে এলি না।" নীলিমা একদৃষ্টে প্রীতির মুখের দিকে চাহিয়াছিল, তা'র মনে হইল প্রীতি যেন কত কাঁদিয়াছে। সে বলিল, "প্রীতি, ভাই, আমার দোষেই কাল বোধ হয় তোমার ঘুম হয় নি।" তাহার পর সে মাকে বলিল, "জান মা, কাল আমি বড় বোকার মত কাজ করেছি। গল্প কর্‌তে কর্‌তে দেবদার কথা হচ্ছিল, সেই সঙ্গে প্রীতির স্বামীর ওপরও খুব রাগ কর্‌ছিলাম ও অনেক কথা বলেছিলাম। প্রীতির কাছেও কতকগুলা কথা জান্‌তে পেরেছি, ওর স্বামীকে চেষ্টা কর্‌লেই ধরে আনা যেতে পারে।"

নির্ম্মলের মা প্রীতিকে নিজের কাছে আনিয়া বসাইলেন। প্রীতি চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল, "কা'রও দোষ নেই, মাসী-মা, ও-সব কথা এতদিনে গা সওয়া হ'য়ে গেছে, চার বছরে অনেকটা অভ্যেস হ'য়ে গেছে। মাকে ছেড়ে কখনও থাকি নি, তাই বোধ হয় ঘুম হচ্ছে না। দাদা তো কাল বলেছে যে আমি কচি খুকী।" এই বলিয়া প্রীতি কথাটা ঘুরাইয়া দিল। সে সেই দিনের নানান্ কথা পাড়িল, কি হইবে, কে কি কাজ করিবে, কে কোথায়

[illegible] নীলিমার বিবাহের জন্য [illegible] প্রস্তুত হইলে, [illegible] প্রসঙ্গে সকলের মন ভুলাইয়া দিল। সকলেই ভুলিল, ভুলিল না কেবল নির্ম্মল, সে চিন্তিত হইয়া প্রীতির মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। চা-পান শেষ হইলে প্রীতি বলিল, "মেসো ম'শায়, আমি একটু হেঁটে বেড়াতে যেতে পারি কি? এ দেশের কি নিয়ম? আমার বেড়ান অভ্যেস, হয় তো বেড়ালে মাথাটা ছেড়ে যাবে।"

নৃপেনবাবু উত্তরে বলিলেন,—"মা, আজ তোমার পক্ষে হাঁটা উচিত হ'বে না বোধ হয়, তোমার চেহারা বড় খারাপ দেখাচ্ছে ও তোমাকে খুব শ্রান্ত মনে হচ্ছে। তুমি আমার মোটরে করে' একটু বেড়িয়ে এস। তুমি প্রস্তুত হও, আমি গাড়ী আন্‌তে বলি।"

প্রীতি প্রস্তুত ছিল, সে নীলিমা ও রেণুকে বলিল, "তোমরা যাবে না ভাই, তৈরী হ'য়ে এস না!"

নীলিমা বলিল,—"আমার সঙ্গে কয়েকজন দেখা কর্‌তে আসবে। আমি তো এখন যেতে পার্‌ব না ভাই।"

রেণুও এক ওজর বাহির করিল। চাপরাসী আসিয়া খবর দিল যে ড্রাইভার আসে নাই। তখন নির্ম্মল বলিল, "আমি ড্রাইভ ক'রে নিয়ে যাব, আমার একটু ছাপাখানায় কাজও আছে, সেরে আস্‌ব।" এই বলিয়া সে মোটর আনিতে গেল।

প্রীতির অনুরোধে নির্ম্মল তাহাকে লইয়া Wingfield Parkএর দিকে গেল। সেখানে গিয়া আবার প্রীতি একটু নামিয়া বেড়াইতে চাহিল। বেড়াইতে বেড়াইতে নির্ম্মল বলিল, "প্রীতি, আমার কাছেও কি তুমি মন খুলে কথা বল্‌বে না? তুমি সকলকে যা'তা বুঝিয়ে দিতে পার কিন্তু আমায় ঠকাতে পার্‌বে না। তোমাকে এ রকম বিচলিত হ'তে তো কখনও দেখি নি, কি হয়েছে আমাকে বল।" এই বলিয়া সে প্রীতির হাতখানি ধরিল।

প্রীতি বলিল, "আমার মনটা ভাল নেই। দাদা, নীলিমার বিয়ে হ'বে আনন্দ যত হচ্ছে, আমার দুঃখও ততই হচ্ছে। তোমাদের দু'জনকে পেয়ে আমার যে কত সুখ হয়েছে তা তোমরাও ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বে না। ব্যথা যারা পায় নি তারা ব্যথা বুঝে না। তোমাদের পেয়ে আমার মরু-জীবনে ভালবাসার আস্বাদ পেয়েছি। নীলিমার সঙ্গে আর তো বেশী দেখা [illegible] হ'বে না এই চিন্তা আমাকে পীড়িত করেছে। তবু তুমি কল্‌কাতায় বরাবর থাক্‌বে, তোমাকে সর্ব্বদা পাব, এইটাই আমাকে অনেকটা সান্ত্বনা দিচ্ছে। দাদা, তোমার স্নেহ-ভালবাসা যেন চিরদিন পাই। তোমাকে পেয়ে আমি বল-বুদ্ধি-ভরসা পেয়েছি। দাদু আর মা মারা গেলে আমার কি দশা হ'বে ভাব দেখি। যখন ভবিষ্যতের কথা ভাবি তখন বড় অস্থির হ'য়ে পড়ি। দিনগুলা এখন তো একরকম কেটে যাচ্ছে, পড়া ইত্যাদিতে বেশ মন ভরে থাকে কিন্তু পরে এই সঙ্গীহীন জীবন কেমন করে কাটাব বল তো। কাল রাত্রে এইসব ভাবনা আমায় পাগল করেছিল। আমার শুভানুধ্যায়ীরা সকলেই বলেন, তাঁ'কে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে আস্‌তে, হয় তো টাকা পেলে ও সব জানলে মেম তাঁ'কে ছেড়ে দিতেও পারে। তাঁর যা কিছু আছে সর্ব্বস্ব মেমকে দিন না, আমার তো অনেক আছে। কিন্তু অভিমানই বল, আত্মমর্য্যাদা বল, আমাকে বাধা দেয়। স্বেচ্ছায় যে আমাকে ভালবাস্‌লে না তা'কে পেয়ে কি সুখ পাব? আবার মনে হয় যে, প্রাণভরা ভালবাসা দিয়ে সেবা-যত্ন ক'রে তাঁর ভালবাসা কি আদায় কর্‌তে পার্‌ব না? কত কথা মনে হয় সব তো বলা যায় না। আমার তো জীবন মাটী হয়েছেই। আমার স্বামী যদি মেমকে যথার্থই ভালবেসে থাকেন আর মেমও যদি সে ভালবাসার প্রতিদান দিয়ে থাকে, তা'হলে আবার দু'টী জীবনের সুখ কেন নষ্ট করি, এই ভেবে কিছু কর্‌তে ইচ্ছা যায় না। যাক্‌, তোমাকে আমার জন্য বড় ব্যাকুল দেখে আজ মনের ব্যথা জানিয়ে ফেল্লুম। এখন তুমি আমাকে বল কি কর্‌লে মনের জোর পাব?"

নির্ম্মল এতক্ষণ মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়াছিল, যখন সে প্রীতির দিকে চাহিল, প্রীতি দেখিল যে নির্ম্মলের চোখ জলে ভরা। নির্ম্মল শুধু প্রীতিকে বলিল,—"প্রীতি, তুমি এত কথা আমাকে বল্লে, তবুও সব যে বল্লে না তা' বেশ বুঝতে পার্‌ছি। বেশ, যখন তোমার ইচ্ছা যাবে ব'ল, কিন্তু একটা কথা এখন বল্‌তে হ'বে। মাসীমার কাছে শুনেছি যে বিয়ের সময় তুমি একেবারে ছেলেমানুষ ছিলে ও তোমাদের মাত্র দুই-চারি দিনের পরিচয় হ'য়েছিল। তবে তুমি তোমার স্বামীকে কেমন ক'রে ভালবাস্‌তে শিখলে?

ভালবাসা তোমাকে কে শেখালে? তোমার কথায় তো মনে হয় যে তুমি তাকে খুবই ভালবাস, তোমার প্রতি কথায় নিঃস্বার্থ প্রেমের আভাস পাচ্ছি।"

প্রীতি বলিল, "ভালবাস্তে কেউ তো শেখায় নি, ভালবাসা কি, তা ঠিক বুঝি কি না তাও জানি না, তবে মনে মনে দেবতা গ'ড়ে পূজা কর্‌তে শিখেছি মাত্র। আশীর্ব্বাদ কর যেন তাই নিয়ে জীবন কাটাতে পারি।"

নির্ম্মলের মুখটা মেঘাবৃত আকাশের মত বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। প্রীতি নির্ম্মলের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিল না—তাহার চির-পোষিত আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল; প্রীতি ভাবিল, তাহার দাদা তাহার গভীর দুঃখে সহানুভূতি জানাইল।

সেদিন বৈকালে আবার নৃপেনবাবুর বাড়ীতে দেবব্রত আসিল। প্রীতি বেশ সহজভাবে তাহার সঙ্গে কথা কহিল, হাসিল, টেনিস্ খেলিল। পাছে, কাহারও মনে সন্দেহ হয়, প্রীতি বেশ সতর্কভাবে ব্যবহার করিল, যেমন অন্যান্য সকল পরিচিতের সহিত ব্যবহার করে সেইরূপ ভাবে দেবব্রতের সহিত করিল, বরং পুরাতন পরিচয়ের জন্য একটু বেশী ঘনিষ্ঠ ভাব দেখাইল। সেদিন প্রীতিকে যখন সকলে গান গায়িতে বলিল, সে এমন হৃদয়স্পর্শীভাবে "কিছুই তো হ'ল না" গানটী গায়িল যে সকলের চোখে জল আসিল। তাহার হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ব্যথা যেন সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিল। কিন্তু এই গান শেষ হইতেই প্রীতি আবার গান ধরিল। এবার সে বিবাহের উপযোগী পরিহাসপূর্ণ গান গায়িল। সবাই ভাবিল এ কি রকম মেয়ে, একবার কাঁদে আবার হাসে। কেবল নির্ম্মল বুঝিল যে, সে কি রকম অভিনয় করিল।

দেবব্রতের প্রাণের ভিতর প্রীতির গানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রসের স্রোত বহিল। এই সরল প্রাণ যে কত বেদনা পেয়েছে, তার জন্য যে সে নিজে দায়ী, এই চিন্তা দেবব্রতকে ব্যাকুল করিল। আবার তাহার সংযম ও দুঃখজয়ের প্রচেষ্টা দেখিয়া দেবব্রত স্তম্ভিত হইল; সেই নব যুবতীর মনের বল দেবব্রতের মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ এমন কি ভক্তিরও সঞ্চার করিল। এই দেবীসমা নারী তাহার স্ত্রী অথচ সে নিজের মোহের বশে ইহাকেই ত্যাগ করিল। রূপগুণের একত্র সমাবেশ বড়ই বিরল, সে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সব পাইয়াও সব হারাইল। কিন্তু এখন সে নিরুপায়।

মোহ

পরদিন হইতে নৃপেনবাবুর বাটীর সকলেই বিবাহের বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নির্ম্মল ও তাহার মা সকালে-বিকালে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে রমাও যাইত আর রেণুও কখন কখন যাইত। নৃপেনবাবুর স্ত্রীর ইচ্ছা তাঁহার বন্ধুদের রেণুকে দেখান। বাড়ীতে নীলিমা ও প্রীতি অন্যান্য গোছ করিত।

বিকালে প্রত্যহই দেবব্রত আসিত, সে না আসিয়া থাকিতে পারিত না। তখন নৃপেনবাবুর বাড়ীর দিকে কি এক অপূর্ব্ব আকর্ষণী-শক্তি তাহাকে টানিত যে, সে বাড়ীতে যতক্ষণ থাকিত ততক্ষণই ছট্‌ফট্ করিত। কোন কাজে তাহার আর মন নাই আর কোনও চিন্তা নাই, কতক্ষণে নৃপেনবাবুর বাড়ী যাইবে, কতক্ষণে প্রীতিকে দেখিবে সেই চিন্তাতেই ব্যাকুল। মধ্যে মধ্যে সে এমিলীর কথা ভাবিতে চেষ্টা করে কিন্তু তার মাঝে প্রীতির জ্যোতির্ম্ময়ী স্নিগ্ধমূর্ত্তি আসিয়া তাহার মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। কি জাগরণে কি স্বপ্নে সেই মূর্ত্তি কেবলই তাহাকে ঘিরিয়া থাকে। এই কয়দিন দেবব্রত প্রীতিকে প্রায়ই একলা পায়; কারণ অমিয় আসিলেই নীলিমা তাহার সহিত কথা কহিতে ও দুইজনে বেড়াইতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। প্রীতি নানাপ্রকারে দেবব্রতের মনোরঞ্জন করে, কখনও বা কোন পুস্তকের আলোচনা করে, কখনও একত্রে পদ্যপাঠ করে, কখনও দেশবিদেশের গল্প হয়, কখনও গান হয়। দুইজনেই সুগায়ক কাজেই বেশ মিল হয়। এই কয়দিনের পরিচয়ে উভয়ে উভয়ের অন্তরের কতকটা পরিচয় পাইয়াছে, কাজেই দুইজনে একত্রে বেশ দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু ভবিষ্যতে এই মিলনের পরিণাম যে কি হইবে তা' ভাবিবার অবকাশ তাহাদের ছিল না।

একদিন দেবব্রত, অমিয় ও নীলিমা বাগানে বসিয়াছিল, প্রীতি তখনও নীচে আসে নাই। নীলিমা বলিল, "দেবদা, রোজ রোজ বাড়ীতে থাক্‌তে ভাল লাগে না, একটু বেড়াতে

নিয়ে চলুন না। আমাদের মোটর তো পাবার যো নেই, প্রীতি বেচারি হাঁপিয়ে গেল। ওর রোজ খানিকক্ষণ মোটরে বেড়ান অভ্যাস; এখানে এসে একদিন বই বেড়াতে পায় নি। সেদিন সকালে দাদার সঙ্গে বেড়িয়ে আস্‌বার পর বেচারার মাথা ধরা ভাল হ'ল। মেয়েটার জন্য সকলেই এত দুঃখিত যে কি বল্‌ব। এমন মিষ্টস্বভাব, শান্ত ও গুণবতী, সকল কলায় নিপুণ, সর্ব্বপ্রকারে সুশিক্ষিতা মেয়ে আমি কখনও দেখি নি, আর রূপের তো কথাই নাই। কেমন করে যে ও সারাটা জীবন কাটাবে ভাবতে পারি না। ওকে যে বিয়ে করেছিল সে যে কি রকম লোক বুঝি না। আমাদের দেশের ছেলেদের কি যে স্বভাব মেম দেখলে ভুলে যায়। আপনিও একজন সেই দলের, আপনাকে আমাদের খুবই ভাল লাগে কিন্তু এ বিষয় আপনিও কম দোষী ন'ন।

আমাকে মাপ কর্‌বেন কিন্তু দু'একটা অপ্রিয় সত্য না বলে থাক্‌তে পার্‌ছি না। আপনারা যখন বিদেশিনীদের বিবাহ করেন তখন ভুলে যান যে পূর্ব্ব-পশ্চিম কখনও ভালরূপে মিশ্‌তে পারে না। ভালবেসে বিয়ে কর্‌লেও মনে মনে তারা ঘৃণা করে ও নিজেদের উচ্চতর প্রাণী মনে করে। কই তারা তো আমাদের কোন আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে না, আপনারাই নিজস্ব হারিয়ে পরের অনুকরণ করে চলেন তাই কোন প্রকারে সংসার চলে যায়।"

"আমাদের দেশের মেয়েদের আপনারা নিকৃষ্ট মনে করেন কিন্তু তাদের মত স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা কর্‌তে কে জানে; নিজের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়েও স্বামী-ভক্তি কি বিদেশিনীরা জানে? এই প্রীতির কথাই শুন্‌লে আশ্চর্য্য হ'বেন। ওর মা, ওদের সকল বন্ধুবান্ধব, মিসেস্ হুড, আমার বাবা, দাদা সকলেই ওর স্বামীর সন্ধান করে ফিরিয়ে আন্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছিলেন। বাবা নিজে বিলেত যেতে রাজি ছিলেন; আর দাদা, মিসেস্ হুড, সকলেই তো তা'র সন্ধান কর্‌তে পার্‌তেন কিন্তু একা প্রীতির অনুরোধে সকলে চুপ করে আছেন। প্রীতির মন যে কত উদার কি বল্‌ব, সে বলে তাঁরা দু'জনে যদি দু'জনকে ভালবেসে থাকেন তো দুইটী জীবনের সুখ নষ্ট করা কি আমার উচিত। আমার জীবন তো ব্যর্থ হ'য়েছেই তখন অনর্থক আর দুইটী জীবন নষ্ট করি কেন? তিনি আমাকে কখনও ভালবাসেন নি, এখন জোর করে ধরে এনে কি সুখ পাব? তখন মিছে কেন কষ্ট দিব? স্বেচ্ছায় যে আমাকে ভালবাসে না তার ভালবাসা কি জোর করে পাওয়া যায়? সবাই বলেন যে তুমি তোমার ভালবাসা দিয়ে কালে তাকে জয় করে নিতে পার্‌বে, কিন্তু ওর বিশ্বাস যে তা' সম্ভব নয়। সে বলে জোর করে ভালবাসা আদায় কর্‌তে গেলে উল্টা হয়। হয় তো বেচারার মনে মনে খুব অভিমান হয় তাই ও কথা বলে।"

সমস্ত শুনিয়া অমিয় বলিল, "আমার করে যে একবার যদি তার দেখা পাই তো বেশ ঘা কতক কষিয়ে দি। এমন করে অযথা একটী বালিকার জীবন মাটী করে দিলে! প্রীতি স্বামীর উপযুক্ত হ'বে বলে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, ওর মা ওকে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিবার জন্য অকাতরে টাকা খরচ করেছেন। পাছে স্বামী এলেও সে সমাজে ভালভাবে মিশ্‌তে না পারে তাই তিনি নির্জ্জন-জীবন ছেড়ে আবার জনসমাজে মিশ্‌তে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এই বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল। এদিকে সে পলাতক যে কোথায় আছে তা' ওঁরা কাউকে বলেন না।"

প্রীতি এই সময় আসিয়া পড়ায় এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। সকলে তাহার দিকে চাহিলে সে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা সব কুঁড়ে তো, এমন সময় বসে থাকা কি?"

নীলিমা বলিল, "তুই সাজ কর্‌তে এত দেরী কর্‌লি যে? কি চমৎকার সেজেছিস্ ভাই—কার জন্যে এত সাজ?"

প্রীতি হাসিয়া বলিল, "কেন আমাকে কি সাজতে নেই? আমার না হয় তোর মত কেউ দেখবার নেই, আমি নিজের তৃপ্তির জন্য কি একটু সাজতে পারি না?"

নীলিমা বলিল, "তোর জন্য আমরা কতক্ষণ অপেক্ষা কর্‌ছি, দেবদা আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাবেন।"

এইবার প্রীতি দেবব্রতের দিকে চাহিয়া বলিল,—

"মিষ্টার ঘোষের কি হয়েছে? নীলিমা, ওঁর চেহারা দেখ্ ভাই, ওঁকে দেখে মনে হয় উনি বোধ হয় একটা ভূত দেখেছেন। আপনার ছেলেটী ও মিসেস্ ঘোষ ভাল আছেন তো? আজ চিঠি পেয়েছেন তো?"

নীলিমা বলিল, "সত্যই তো, দেবদা' রাগ করেছেন কি? তাই কি মুখখানা অমন করেছেন।"

দেবব্রত লজ্জিত হইয়া বলিল, "না, না, রাগ করব কেন, দুঃখের কাহিনী শুন্‌লে কা'র না মন খারাপ হয়।" এই বলিয়া প্রীতির কথার উত্তরে সে বলিল, "সবাই ভাল ও স্ফূর্ত্তিতে আছে। আজ একটু শ্রান্ত মনে হচ্চে মাত্র। চল, সকলে বেড়িয়ে আসা যা'ক।"

প্রীতি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল, সে এই প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। দেবব্রতের সঙ্গে নৃপেনবাবুর বাড়ীতে মেশামিশি করিতে তাহার খুবই ভাল লাগিতেছিল কিন্তু বেশী ঘনিষ্ঠতা করিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না। দেবব্রতের গাড়ীতে চড়িতে বা তাহার বাড়ীতে যাইতে প্রীতির কেমন যেন অভিমান ও দ্বিধাবোধ হইত। তাহারই তো সব অথচ সেই কেহ নহে। সে ওরূপ ভাবে একেবারে যাইতে নহে, তাই সে দেবব্রতের গাড়ীতে বেড়াইতে যাইতে রাজী হইতেছিল না। অমিয় ও নীলিমা জেদ্ করিতে লাগিল। দেবব্রত অনেকক্ষণ চুপ করিয়াছিল, সে বোধ হয় কতকটা প্রীতির আপত্তির কারণ বুঝিতে পারিতেছিল কিন্তু কিছু না বলিলে ভাল দেখায় না বলিয়া সে বলিল, "আমি গরীব মানুষ, আমার Luxurious car (আরামদায়ক 'কার') নেই বলে কি এত আপত্তি? আমার যা' আছে তা'তেই বেড়িয়ে না হয় আমাকে একবার কৃতার্থ কর।"

উত্তরে প্রীতি রাগিয়া বলিল, "আপনার কথার প্রথম অংশটা ফিরিয়ে নিন তা' হলে যাব, নইলে কিছুতেই যাব না।"

দেবব্রত কথা ফিরাইয়া লইল, মোটর আনিল। সে নিজেই চালায়। গাড়ী আনিয়া সে বলিল, "প্রীতি! তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো আমার পাশে বস। নীলিমা ও অমিয় ভিতরে বসুক, ওদের তফাতে বসিয়ে সুখের ব্যাঘাত দেওয়া কি আমাদের উচিত হ'বে? আবার কাল থেকে চার-পাঁচদিন অমিয় এ বাড়ীতে আস্‌তে পাবে না, দেখাশুনা হ'বে না। সেই বিয়ের দিন দেখা হ'বে।"

প্রীতি বলিল, "অমিয়বাবু তো নীলিমাকে ৪।৫ দিন পরে একেবারে পাবেন, আমি যে আমার সখীকে এমন করে পাব না। আমার বড় হিংসা হচ্চে—অমিয় বাবুর ওপর।"

নীলিমা বলিল,—"প্রীতি ও আমি ভিতরেই বসি, সেই ঠিক হ'বে।"

দেবব্রত কিন্তু কিছুতেই ছাড়িল না, বলিল, "না, না, প্রীতি, আমার কথা রাখ, ওদের একসঙ্গে বসতে দাও।"

অমিয় ঠাট্টা করিয়া বলিল, "আমি দেখছি আমাদের চেয়ে আপনার প্রীতির কাছে বস্‌বার আগ্রহটাই বেশী। কিন্তু মশায় সাবধান, আপনার গতিক বড় ভাল নয়। একে আপনার স্ত্রী আপনাকে এক্‌লা ফেলে গেছেন তা'তে এমন মধুর সঙ্গ, নিজেকে যেন হারিয়ে বস্‌বেন না। মিসেস্ ঘোষকে সাবধান করে দেব না কি? তিনি নিশ্চিন্ত মনে শৈলবিহার কর্‌ছেন ও ভাবছেন তাঁ'র খাঁচার পাখী খাঁচায় আছে, এদিকে পাখী বুঝি বা শিকল কেটে পালায়।"

দেবব্রত শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল অমিয় যাহা বলিতেছে তাহা যদি সত্য হয় তা' হলে কি হ'বে? প্রীতিকে আবার পাইবার জন্যই কি সে অস্থির হইয়া পড়িতেছে না? যতক্ষণ দূরে থাকে ততক্ষণ কষ্ট হইবার কারণ কি? তবে কি সে প্রীতিকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে? না, প্রীতির রূপের মোহ তাহাকে টানিতেছে? এমিকে তো সে খুব ভালবাসে, তবে কেন তাহার প্রাণ প্রীতিকে চাহে?

অমিয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রীতি বলিল, "রাখুন আপনার ঠাট্টা। ঘোষসাহেব যা' বলেছেন খাঁটী কথা; ওর পাশেই আমার স্থান—কিন্তু এইটুকু বলে রাখছি যে আপনার যদি কোনরকম বেচাল দেখি তো দেখ্‌বেন তখন কি কঠোরভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করব। খুব সাবধানে থাক্‌বেন, আমার বোন্‌টীও সহজে ছেড়ে দেবে না। আর একটা চলিত কথা আছে—ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। ঘুঁটে

বলে তোমারও একদিন আছে'। কথাটা ভাল করে মনে রাখ্‌বেন।"

এই কথার পর সকলে মোটরে উঠিল। উঠিয়া প্রীতি বলিল, "যদি বেড়াতেই নিয়ে যাচ্ছেন, সহজে ছাড়ান পাবেন না। খুব খানিকটা বেড়িয়ে আনা চাই।"

গাড়ীতে প্রীতি ও দেবব্রতের মনে নানাপ্রকার চিন্তার স্রোত বহিতে লাগিল। গাড়ীর বেগে এক একবার যখন উভয়ের দৈহিক স্পর্শ ঘটিতেছিল তখন দুইজনেরই শরীর কাঁপিয়া উঠিতেছিল—উভয়ের মধ্যে পুলক-শিহরণ হইতেছিল। প্রীতি খুব সাবধানে ছিল যাহাতে কোন প্রকার কথা না উঠে—তাহাকে বা দেবব্রতকে বিপদে পড়িতে না হয়। একে তো অমিয় বাহির হইবার ঠিক পূর্ব্বেই বড় মুস্কিলের কথাই তুলিয়াছিল ও তাহাতে দেবব্রত যে অস্বস্তি বোধ করিতেছিল তাহাও প্রীতি তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বেশ বুঝিয়াছিল। কাজেই সে মোটরের কথা, লক্ষ্ণৌ শহরের কথা ও নানান্ ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে সময় কাটাইয়া দিল। বাড়ী ফিরিয়া নামিবার আগে কেবল দেবব্রত একবার মৃদুস্বরে বলিল, "প্রীতি, তোমার কাছে আমি যে রকম অপরাধী, তা'তে তুমি যে আজ আমার অনুরোধটা রেখেছ এর জন্য তোমাকে কি যে বল্‌ব ভেবে পাচ্ছি না, কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় এতই পূর্ণ যে আমার কথা জোগাচ্ছে না। আমি তোমার কাছে এতটুকুও আশা রাখবার অধিকারী নহি।"

নির্ম্মল দরজার নিকট দাঁড়াইয়াছিল, সে প্রীতিকে হাত ধরিয়া নামাইয়া লইল ও বলিল, "মনে করেছিলাম যে গোলমাল চুকে গেলে আমি তোমাকে সব দেখিয়ে আন্‌ব, তা' দেববাবু আমাকে সে সুখ থেকে বঞ্চিত কর্‌লেন।

প্রীতি হাসিতে হাসিতে বলিল, "আজ তো শুধু বেড়ান হ'য়েছে মাত্র, দেখ্‌বার তো অনেক জিনিস বাকী আছে, সে তুমিই দেখিও দাদা।"

দেবব্রত বলিল, "সে হ'বে না, তোমাদের সঙ্গ থেকে বুঝি আমি বাদ পড়ব?"

নির্ম্মলের প্রতি দেবব্রতের হিংসার উদ্রেক হইয়াছিল। নির্ম্মল ও প্রীতির মেলামেশার ভাবটা একটু যেন বাড়াবাড়ি রকমের বলিয়া তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল।

সতের

প্রীতি আবার একটা মহা মুস্কিলে পড়িল। নৃপেনবাবুর বাড়ীতে বেশী জায়গা নাই বলিয়া ব্যবস্থা হইল যে স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থান দেবব্রতের বাড়ীতে করা হইবে ও খাওয়ান নৃপেনবাবুর বাড়ীতেই হইবে। দুই বাড়ীর মাঝখানে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যাতায়াতের পথ করা হইল। প্রীতি, রেণু ও রমার উপর বাড়ী সাজাইবার ও অভ্যর্থনার ভার পড়িল। প্রীতি যাহাতে নৃপেনবাবুর বাড়ীতে কাজে থাকিতে পারে সেই চেষ্টা করিয়া কিন্তু বিফল হইল।

দেবব্রতের বাটীতে প্রবেশ করিতে যে প্রীতির আপত্তি কেন, তাহাতে যে কি ভয়ানক ব্যথা সে পাইবে তাহা তো কেহ বুঝিবে না! সে একবার ভাবিল অসুখের ভাণ করিয়া নিজের ঘরে থাকিবে, কিন্তু তাহা হইলে নৃপেনবাবু অস্থির হইয়া পড়িবেন বলিয়া ও নীলিমার সুখের দিনে দুঃখের কালিমা পড়িবে ভাবিয়া সে নিরস্ত হইল। সে মনের জোর করিয়া কাজে লাগিল, কিন্তু ব্যথায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। তাহার মনে ভয় হইল যে, এত কষ্ট তাহার সহ্য হইবে না ও সে মনের সংশয় বা ব্যথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না। এমন-কি, সে মাসীমাকেও কোন কথা বলিল না।

দেবব্রত নিজের কাজের ঘর ও শোবার ঘর ছাড়া সবই বিবাহের কার্য্যে খালি করিয়া দিল। প্রীতি ছোটবেলা হইতে ঘর সজ্জিত করিতে শিখিয়াছে বলিয়া সে ভার তাহারই উপর পড়িল, রেণু ও রমা তাহাকে সাহায্য করিবে স্থির হইল। গাত্র-হরিদ্রার পূর্ব্বদিন নৃপেনবাবুর স্ত্রী প্রীতি ও রেণুকে সঙ্গে করিয়া দেবব্রতের বাড়ী লইয়া গেলেন। প্রীতির পা যেন চলিতেছিল না, চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছিল। সে একবার বলিল, "মাসীমা! দাদা, রেণু ও রমার উপর এ কাজের ভার দিলে হ'ত না? আমি নীলিমার কাছ ছেড়ে থাক্‌তে চাই না। তিনি বলিলেন, "না মা, তোমাকেই এ কাজের ভার নিতে হ'বে, ওদের ওপর ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ব না। আর নির্ম্মল আজ এ সব কাজ কর্‌তেও পার্‌বে না, ওকে বাজারে ছুটোছুটি কর্‌তে হ'বে।"

যখন দেবব্রতের বাড়ী ঢুকিলেন তখন নির্ম্মলের মাতা

ও রেণু আগে আগে যাইতেছিলেন ও প্রীতি অনেকটা পিছনে ছিল। দেবব্রত সামনেই দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে নির্ম্মলের মা বলিলেন, "তোমার আজ অফিস্ নেই, তুমি তো বলেছ এদের সাহায্য করবে। তুমি তো বাবা ঘরের ছেলে, তোমার লোকজন দিয়ে দেখে শুনে সব করিয়ে নিও। আমার লোকজন সবাই ও বাড়ীতেই ব্যস্ত, কেবল প্রীতির মাসীকে আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, এ বাড়ী ও বাড়ী যদি আনাগোনা করতে হয় করবে। রমাটা কোথায় যে আছে জানি না।" তিনি এই কয়টী কথা বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

ততক্ষণ প্রীতি নতমুখে একটা ফুলগাছের কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া একটী ফুল লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। তাহার কেবল মনে হইতেছিল যে ছুটিয়া পালায়।

তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া দেবব্রত বলিল,—"প্রীতি! ফুল দেখিলেই তো কাজ এগোবে না। চল বাড়ীর ভেতর গিয়ে সব বন্দোবস্ত করবে চল।"

রেণু বলিল,—"কি ভাই, তোর ভাব লেগে গেল না কি, ফুল দেখা যে আর শেষ হয় না।"

প্রীতি নীরবে বাড়ীর ভিতর গেল। রেণু অন্য এক ঘরে কি দেখিতে যাওয়ায় দেবব্রত সেই অবসরে বলিল, "প্রীতি! আমি বড়ই দুঃখিত, কিন্তু কি করব বল। আমি বলেছিলাম 'কাকীমা, আমাকে আপনি শুধু বলে দিয়ে যাবেন, আমি সব করে রাখব।' তোমার যে এ বাড়ীতে আসতে ভাল লাগতে পারে না তা' আমি জানি।" প্রীতি সে কথায় কোনই উত্তর দিল না, সে আপন কাজে মনোনিবেশ করিল। তাহা ছাড়া মাসীমাও আসিয়া পড়িয়াছিলেন ও তাহার পরে রমাও আসিল। রমা আসিয়াই বলিল, "দেবদা! সব ছবিগুলি কোথায় সরিয়ে ফেলেছেন? আপনার বেবীর ছবিটা দিন না দিদিদের দেখাই। জান, প্রীতিদি, ওঁর খোকাটা এমন সুন্দর মোটাসোটা হয়েছে, আমার তাকে চট্‌কাতে খুব ভাল লাগে। যখন ছিল, আমি কেবল এ বাড়ীতে এসে তাকে নিয়ে থাকতুম। এমিলী বউ দি আমাকে বড় ভালবাসেন। দেবদা! এখন বলুন তো, সব ছবিগুলি কেন সরিয়ে দিয়েছেন?"

রেণুও বলিল, "হাঁ, দেখান না ছবি!"

প্রীতি রমাকে একটু বিরক্তির স্বরে বলিল, "কাজ করবার মন নেই, কেবল লোককে বিরক্ত করা। তুমি কি একটু চুপ করে থাকতে পার না? নে, এই ফুলগুলা সাজা কিংবা ওবাড়ী থেকে কিছু জিনিসপত্র আন।" রমা একটু স্তম্ভিত হইয়া গেল, এ পর্য্যন্ত কখনও সে প্রীতিকে এমন করিয়া কথা কহিতে শুনে নাই। সে দেবব্রতের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিল, "প্রীতিদির কি হয়েছে বলতে পারেন? যা'র সদা হাস্যমুখ্ ও যে কখনও মিষ্টি কথা ভিন্ন বলে না, সে আজকের মত আনন্দের দিনে এমন কেন হ'ল? ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখুন তো কি রকম বিমর্ষ। আমি যাই দাদাকে ডেকে আনি গে, দাদা এলে ঠিক প্রীতিদি'কে হাসাতে পারবে।" রমা চলিয়া গেলে দেবব্রত প্রীতির কাছে গিয়া বলিল, "প্রীতি, তোমার কষ্ট হচ্ছে, তুমি যাও, আমি লোক ডেকে এনে সব করে রাখ্‌ব।" প্রীতি নীরবে কাজ করিতে লাগিল।

দেবব্রত বলিল, "আমার সঙ্গে একটী কথাও কি বল্‌বে না? তোমার মুখ দেখে আমার বড়ই কষ্ট হ'চ্ছে।"

উত্তরে প্রীতি বলিল, "কাজ করতে এসেছি, কাজ করছি। আর কি কথাই বা বল্‌বার আছে? কষ্টের কোনই কারণ নাই, তবে প্রথমে আমার একটু ভ্রান্তি ও দৌর্ব্বল্য হ'য়েছিল সত্য; কিন্তু এ কয়দিনের মত এ বাড়ী তো মেশোমহাশয়েরই, তখন আপত্তি বা দুঃখের কি আছে? আপনার বাড়ীতে, তা' না হ'লে, আমি এমন ক'রে আস্‌বই বা কেন? চলুন, বারান্দায় কি রকম ব্যবস্থা করা যাবে দেখা যা'ক।"

দেবব্রত আর কিছু বলিতে পারিল না। প্রীতি ও রেণুকা সব কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেলে, ঝি-মাসী দেবব্রতকে একলা পাইয়া বেশ কড়া কড়া দু'চার কথা শুনাইয়া দিল। সে বলিল, "আমার বাছা যদি আমার মুখ বন্ধ ক'রে না রাখত তো তোমার ভালমানুষী ও সুখের ঘরকন্না সব ভেঙ্গে দিতুম। মেয়েটা মুখ বুজে সব সহ্য করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু এত কি ছেলেমানুষের সহ্য হ'বে? ও কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে, মুখে হাসি নেই, একটুতে চোখ ছল্‌ছল্ করে। আমার ভয় হয় যে চেপে চেপে থেকে অসুখে না পড়ে। তা' হ'লে ওর মাকে গিয়ে আমি কি

যে করে জানি না। তিনি যে আমার উপর মেয়ের ভার দিয়েছেন! ও তো ওর মাকে পর্য্যন্ত জানায় নি যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, পাছে মা ব্যাকুল হয়। ও নিজের কথা ভাবে না, কেবল সকলের সুখের জন্য ব্যস্ত। তুমি যে কি রত্ন পেয়ে হারিয়েছ তা তো জান না। তোমার মেম যতই ভাল হোক না কেন আমার মেয়ের মত কখনই হ'তে পারে না। একদিন তুমি জানতে পারবেই যে তুমি ভুল করেছ, নইলে বুড়ীর সব কথাই মিথ্যা হ'বে। তোমার মা তো প্রীতিকে মেয়ের মত ভালবাসেন, তাঁর একটু কিছু হ'লেই মাকে আমার চাই। তোমার ভাইরা তো রোজ না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারে না। ওর গুণে সবাই বশ, বুঝ্‌লে না কেবল তুমিই। তুমি নিষ্ঠুরের মত এমন কাজ কর্‌লে যে আমাদের সকলকে কষ্ট দিয়েছ। এই মেয়েকে কে দেখে বল ?" এই বলিয়া বুড়ী রাগে গর্‌গর করিতে করিতে চলিয়া গেল।

একেই দেবব্রতের মনে কয়দিন শান্তি নাই, নিজে যে কত বড় অপরাধ করিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ অনুভূতি তাহার হৃদয়কে ব্যাকুল করিতেছিল। তাহার উপর প্রীতি যে সর্ব্বসাধারণের কাছে তাহাকে বাঁচাইয়া চলে ও সে যে তাহার সুখের জন্য এত যত্নবতী, এই সব কথা দেবব্রত যতই শুনিত ততই সে নিজেকে অতি নীচ ও অতি পাষণ্ডজ্ঞানে ধিক্কার দিত। এদিকে কয়দিন প্রীতির মধুর ব্যবহারে সে বড়ই সুখ ও তৃপ্তি পাইতেছিল, আর প্রীতির সঙ্গসুখও যথেষ্ট লাভ করিতেছিল। সে প্রীতির সঙ্গলাভে বড়ই লালায়িত হইয়াছিল, এতদিন সে মনে করিয়াছিল যে প্রীতিও বুঝি প্রতিদান দিতে প্রস্তুত কিন্তু হঠাৎ আজিকার রুক্ষ ব্যবহারে তাহার বড়ই ব্যথা লাগিল। সে সহানুভূতি জানাইতে গেল আর প্রীতি যেন উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত কহিল না। দেবব্রত আশা করিয়াছিল যে, সেইদিন বহুক্ষণ নির্ব্বিরোধ সুখে সেই আনন্দময়ীর সঙ্গ পাইবে—তাহাকে দুই-চারিটী মনের কথা বলিবে কিন্তু কিছুই হইল না। তদুপরি ঝি-মাসীর ভর্ৎসনায় ফলে তাহার মনে নানারূপ চিন্তার উদ্রেক হইল। সে স্থির করিল যে প্রীতির সঙ্গে একবার সকল বিষয়ে খোলাভাবে কথা কহিবেই। আর সে জানিতে চেষ্টা করিবে যে তাহার প্রতি প্রীতির আন্তরিক ভাব কি। বিবাহের সময় তো ভালবাসা কি তাহা প্রীতি শিখে নাই, আর তাহার পরই তো ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। প্রীতির তো রাগ ও বিরক্তি হইবার কথা অথচ কেন সে তাহাকে জন-সমাজে প্রকাশ করে না! কেনই বা সে তাহার সঙ্গে মোটরে বেড়াইতে বাহির হইল দেবব্রত কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। আবার নির্ম্মলের সঙ্গেও বড়ই আপনার মত ব্যবহার করে, সে নির্ম্মলের সন্নিকটে বড় শান্তিতে থাকে। নির্ম্মলকে প্রীতি ভালবাসে কি না তাও বুঝিতে পারা যায় না। নির্ম্মল যে প্রীতিকে ভালবাসে তাহা তো বেশ বুঝা যায়। প্রীতি যদি নির্ম্মলকে ভালবাসিয়া থাকে তাহা হইলে কি হইবে, এই কথা মনে হইলে দেবব্রতের সর্ব্বশরীর ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠে। নির্ম্মলের প্রতি রাগে শরীর ফুলিতে থাকে। এখন দেবব্রত বুঝিল যে, সে প্রীতিকে নিজেই চায়, কাজেই প্রীতি অপরের হইতে পারে মনে হইলে তাহার রক্ত যেন গরম হইয়া উঠে।

আট

কয়দিন প্রীতির সঙ্গে দেবব্রতের কথা হয় নাই, প্রীতি সদাই যেন বড় ব্যস্ত। দেবব্রতের ধারণা যে প্রীতি দূরে দূরে থাকিতেছে। নির্ম্মলের সঙ্গে অনেকবার অনেক সময় প্রীতিকে দেবব্রত দেখিয়াছে। তাহারা দুইজনে দেবব্রতের বাটীতে আসিয়া কত কাজ কত গোছ করিতেছে, তাহাদের হাসির শব্দ, কণ্ঠস্বর দেবব্রতের কাণে পৌছাইতেছে, অথচ প্রীতি একবারও তাহার নিকট আসে না বা কথা কহে না। একদিন নির্ম্মল তাহার অফিসঘরে আসিয়াছিল কিন্তু প্রীতি সে ঘরে ঢুকিল না, দরজার বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নির্ম্মল দুইতিন বার ডাকিল তবু প্রীতি নিরুত্তরে বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল।

আজ নীলিমার বিবাহ, সকলের আনন্দ যেন ধরিতেছে না। বাড়ীটী দীপাবলীতে এমন সুসজ্জিত হইয়াছে যে ইন্দ্রপুরী বলিয়া ভ্রম হইতেছে। নৃপেন বাবুর বাটী হইতে দেবব্রতের বাড়ী পর্য্যন্ত আলোর মালা,

গাছের ডালে ডালে আলো, চারিদিক যেন হাসিতেছে। আজ দেবব্রতের বাড়ীতেই বরকে বসান হইয়াছে ও সেইখানেই পুরুষদের খাওয়ান হইতেছে। নৃপেনবাবুর বাড়ী, উঠান, বাগান সবই অন্দরমহলে পরিণত হইয়াছে।

প্রীতি কনেকে সাজাইয়া দিয়াছে কিন্তু সে অন্য কোন শুভানুষ্ঠানে যোগ দেয় নাই। নৃপেনবাবুর স্ত্রী অনেক করিয়া বলা সত্ত্বেও সে শুভকার্য্যের কোন দ্রব্যাদিতে হাত পর্য্যন্ত দেয় নাই। সে দূরে দূরে বেড়াইয়াছে ও কেহ কিছু করিতে বলিলে বলিয়াছে, "না, আমার মত ভাগ্য নিয়ে কেউ যেন জন্মায় না, আমি শুভসামগ্রীতে হাত দেব না।"

বসন-ভূষণে আজ প্রীতিও সাজিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া তাহার রূপের লাবণ্য অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

আজ তাহার প্রিয় সখীর বিবাহ, তাহার আনন্দ যেন উছলিয়া উঠিতেছে। সে জোর করিয়া নিজের সকল ব্যথা চাপা দিয়াছে। তদ্ভিন্ন তাহার আজ আর একটী মহা উদ্দেশ্য আছে। আজ একবার এই বেশে সে দেবব্রতকে দেখা দিতে চায়। ছয় বৎসর পূর্ব্বেও সে খুব সুন্দরী ছিল বটে কিন্তু এখন যে তাহাকে দেখে সেই তাহার জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ দেখিয়া একবার ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইয়া যায়। আজ প্রীতির মনে বিজয়াভিলাষ প্রবল, সে আজ দেবব্রতকে অভিভূত করিবেই। প্রীতিকে এই ভুবন-ভুলান অপরূপ রূপে সজ্জিত দেখিয়া নীলিমা কাণে কাণে বলিল, "দেখিস্ ভাই, সকলের মাথা ঘুরিয়ে দিস্ নি যেন, তা' হ'লে কি উপায় হ'বে? আমি যদি পুরুষ হ'তাম তো এখনি তোর পায়ে লুটিয়ে পড়্তুম। মেয়ে আমি, তবুও তোকে বুকে ধর্‌তে ও তোর অধরসুধা পান কর্‌তে ইচ্ছা যাচ্ছে।"

প্রীতি মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "এ পর্য্যন্ত তো কারও মাথা ঘোরে নি, তখন তোর এত ভয় কিসের? যা'র মাথা ঘোরা উচিত ছিল তাকেই ধরে রাখতে পারি নি জানিস্ তো, তখন এ রূপের কি বা দাম বল? আমার সঙ্গে অমন করে ঠাট্টা করা সাজে কি ভাই, আমি যে সকল সুখে বঞ্চিতা।"

বিবাহের সময় উপস্থিত। বরকে অন্দরে আনিবার জন্য লোক পাঠান হইয়াছে। বরাঙ্গনারা সকলে স্ত্রী-আচারের সব জোগাড় ঠিক করিয়া রাখিতেছেন। প্রীতি ও রমা বরকে দরজার নিকট হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার ইচ্ছায় সামনের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। রমা কি স্থির থাকিবার মেয়ে, অনতিবিলম্বেই সে বরের কেন অন্তঃপুরে আসিতে দেরী হইতেছে দেখিবার জন্য প্রীতিকে টানিয়া লইয়া বাগানের দিকে গেল। সেই সময় দেখিতে পাইল যে অমিয়কে লইয়া দেবব্রত ও নির্ম্মল হাসিতে হাসিতে আসিতেছে। প্রীতির অধর-প্রান্তে অল্প অল্প হাসির রেখা, চোখ দুইটী তারকার মত উজ্জ্বল। তাহার সেই মনোমোহিনী রূপে চারিদিক আলো করিয়া সে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এই যে বর মশায়! শুভাগমন করুন" বলিয়া অমিয়কে অভ্যর্থনা করিল। মুখে অভ্যর্থনা করিল অমিয়কে কিন্তু দেবব্রতের দিকে চাহিয়া হাসিল। দুইজনের চোখে চোখে মিলন হইল, সেই দৃষ্টিতে দেবব্রতের হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইল। অমিয় ঠাট্টা করিয়া বলিল, "আপনি আজ যে কনে সেজেছেন, যদি ভুল করে ফেলি দোষ দিতে পার্‌বেন না কিন্তু। দেখুন না, নির্ম্মলদার কি দশা হয়েছে, বেচারা চোখ তো আপনার দিক থেকে ফেরাতে পাচ্ছে না, এমন করা কি ভাল হচ্ছে আপনার?"

উত্তরে প্রীতি বলিল,—"আজ আপনার স্পর্দ্ধা বেজায় বেড়েছে দেখতে পার্‌ছি, যা' মুখে আস্‌ছে তাই বলে ফেলছেন, এর ফল ভোগ কর্‌তে হ'বে। রমা, তুই ভাই আগেই একটু সাজা দিয়ে দে তো।"

বরকে স্ত্রী আচারের স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রীতি ছুটিয়া নীলিমার কাছে গেল। তাহাকে গিয়া বলিল, "তোর বরকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই কিন্তু তাঁর আজ আহ্লাদের আধিক্যে মাথাটা ঠিক নাই, আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকম ঠাট্টা করছিলেন। এর শাস্তি ভাল করে দিস্ ভাই।"

নীলিমা প্রীতির গাল টিপিয়া বলিল, "এমন গোলাপটী পেতে ইচ্ছা সকলেরই হয়। যে পেয়েও হেলায় ছেড়ে গেছে তার মত হতভাগ্য আর নাই।"

"সে কথা কেন বল্‌ছিস্, ভাই, তিনি হয় তো খুবই সুখে আছেন। তাঁর অভাব কিছুরই হয় নি, বরং হয় তো আরও ভাল পেয়েছেন। আমি দুর্ভাগ্যবতী।"

দেবব্রত, নির্ম্মল, বিমল ও আর দুইজন কনেকে লইতে আসিয়াছিলেন। প্রীতির শেষের কথাগুলি দেবব্রতের কাণে বেশ স্পষ্ট করিয়া গেল। প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল প্রীতিকে বুকের মধ্যে ধরিয়া তাহার সকল ব্যথা দূর করিয়া দেয়, তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করে। কিন্তু হায়! সে যে হইবার নয়। কিন্তু তাহার সমস্ত মণ-প্রাণ প্রীতির জন্য কাঁদিতেছে, প্রীতির দিকে ছুটিতেছে। কোন উপায় নিরূপণ করিতে না পারিয়া দেবব্রত শুধু ব্যথিত অন্তরে প্রীতির দিকে চাহিল। আবার দুইজনের চোখাচোখি হইল। বুঝি বা সেই চাহনিতে দেবব্রত তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সব জানাইল। প্রীতির চোখ পুলকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহার কার্য্য-সিদ্ধি হইয়াছে। দেবব্রতের মনে হইল যে প্রীতির চাহনিতে সাদর আহ্বান রহিয়াছে, তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল।

প্রীতি শুভদৃষ্টির স্থানে গেল না, তাহার ভয় পাছে সে সেখানে গেলে অমঙ্গল হয়; সে একাকী গিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া নিজের বিবাহের দিনের কথা ভাবিতেছিল, তাহার চোখের কোলে জল ছল্ ছল্ করিতেছে। প্রীতি চিন্তায় বিভোর, তাহার পশ্চাতে যে একজন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সে জ্ঞান তাহার নাই। আস্তে আস্তে কাহার কর দুটী তাহাকে জড়াইয়া ধরিল সে চমকাইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল, দেবব্রত অতি দীন কাতরভাবে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

দেবব্রত বলিল, "প্রীতি, আজ আমাদের বিয়ের দিনের কথা আমার মনে জেগে উঠছে। সেইদিন এই বেশে তোমায় প্রথম দেখেছিলাম। সে কথা এখনও ভুলি নি, মাঝে মাঝে সে চেহারা আমার মনের মাঝে জেগে ওঠে। তখন কিন্তু বুঝি নি তুমি কত সুন্দর। প্রীতি, আমি যে ভুল, যে অপরাধ করেছি, তার ক্ষমা নেই আর নিজের কর্ম্মফলও আমাকে ভুগতে হ'বে। কিন্তু প্রীতি, এইটুকু জেনো যে তুমি একা কষ্ট পাচ্ছ না, এখন আমিও যথেষ্ট ভুগছি আর যতদিন বাঁচব ভুগব। এখানে যেদিন থেকে তোমাকে আমি চিনেছি, সেইদিন থেকেই তোমাকে ভালবাসতে শিখেছি। এখন আমি তোমাকে পাবার জন্যে পাগল, তোমাকে না পেলে আমি সুখী হ'তে পারব না। তুমি আমার অথচ তোমাকে পাচ্ছি না, কি যে করব. কি করলে ভাল হ'বে কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না। কি উপায় হ'বে? তুমি কি আমার হ'বে না?"

প্রীতি এতক্ষণ অবাক্ হইয়া চুপ করিয়াছিল, এমন কি, সে যে দেবব্রতের বাহুপাশেই বদ্ধ, তাহাও জ্ঞান ছিল না। কিন্তু এই কথাগুলির শেষে দেবব্রত যেই তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল, অমনই প্রীতির চমক ভাঙ্গিল। একবার তাহার ইচ্ছা হইল যে আত্ম-সমর্পণ করে, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই নিজেকে মুক্ত করিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল। প্রীতির চক্ষু দুটী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, সে বিরক্তি ও রাগের সহিত বলিল, "এখন আমাকে চাওয়ার তো কোনও অর্থ নাই। আপনি যে এখন অন্যের তা' কি ভুলে গেছেন? এখন আর এমনভাবে কাহারও সঙ্গে কথা বল্‌বার আপনার অধিকার নেই। আর আমাকে কষ্ট তো যথেষ্টই দিয়েছেন, তা'র উপর অপমানের বোঝাটা নাই চাপালেন? আমার সঙ্গে লুকিয়ে প্রণয় কর্‌বার কথা তো আপনার নয়। যদি ভালবেসেই থাকেন তো সে কথা কি আপনার সকলের সামনে বলা উচিত নয়? আমার সঙ্গে যে আপনার কি সম্পর্ক, যে দিন পৃথিবীর লোককে জানাতে পারবেন, সে দিন আমি আপনার এ সব কথা শুনব, আজ নয়। স্বামী হ'য়ে কি না আজ লুকিয়ে ভালবাসা জানাতে এসেছেন, ধিক্! আর একটা কথা বলি, অন্ততঃ একজনের প্রতিও সত্যব্যবহার করুন। আমার প্রতি যদিও আপনি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করেছেন, আপনার বল্‌বার এই ছিল যে আপনি তো আমাকে ভালবাসেন নি। তাই যদিও আপনি উদ্বাহপণ ভঙ্গ করেছিলেন, আপনি নিজের মনের প্রতি অসত্য বা অন্যায় করেন নি, কিন্তু এখন কি করছেন? একজনকে ভালবেসে সজ্ঞানে বিয়ে করে আবার বলছেন যে 'তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে চাই। এই কি আপনার ধর্ম্ম? আমাদের

প্রকৃত সম্বন্ধ কেহ জানে না। লোকের সামনে আমরা বন্ধু মাত্র, আর যথার্থই আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনার সুখ নষ্ট করিতে কিছুমাত্র ইচ্ছা করি না। আপনি যে এখানে আছেন জান্‌তাম না, জান্‌লে হয় তো আস্‌তুম না। প্রকৃতই যদি আপনার অশান্তির কারণ হই তো বড়ই দুঃখের কথা হ'বে। আপনি যেটা ভালবাসা মনে কর্‌ছেন সেটা মোহ মাত্র—সকলে আমার ব্যথায় ব্যথিত, তাই আপনারও করুণার উদ্রেক হয়েছে—এটা প্রণয় হ'তেই পারে না। আপনি আমাকে যদি যথার্থ ভালবেসে থাকেন চলুন আমার হাত ধরে নিয়ে সকলের সামনে বল্‌বেন আমি আপনার কে। তা' পার্‌বেন না আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কাজেই ওসব কথা আর আমার কাছে বল্‌বেন না।"

দেবব্রত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রীতি আরও বলিল, "এখানে যতদিন থাক্‌ব আমাদের বন্ধুভাবটা বজায় রাখা দরকার। তার পর আমি আবার আপনার জীবনপথ থেকে সরে যাব। হয় তো জীবনে আর দেখাও হ'বে না, তখন এবারের মিলনটা যা'তে সুখস্মৃতি হ'য়ে থাকে তাই করুন।" এই বলিয়া প্রীতি উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। তাহার চক্ষুর জল পাছে দেবব্রত দেখিতে পায়, সেই ভয়ে সে ফিরিয়াও চাহিল না।

বিবাহের পর বরকন্যা যখন বাসরে আসিল, তখন প্রীতি সংযত হইয়াছে। তখন সে হাসি, ঠাট্টা, স্ফূর্ত্তি ও গানেতে একাই একশত। দেবব্রত বুঝিল সে অভিনয় করিতেছে, নীলিমাও জানিল যে তাহার ব্যবহার কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক ও একবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোর আজ কি হয়েছে রে?" প্রীতি মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কেন আমার কি আমোদ করা সাজে না?"

সব গোলমাল যখন থামিয়া গেল তখন প্রীতি নিজের ঘরে গিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া খুব খানিকটা কাঁদিল। এ অবস্থাও তার ভাল লাগিল না, সে বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, আস্তে আস্তে গিয়া খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইল। তখন চাঁদের আলোতে চারিদিক্‌ হাসিতেছিল, প্রীতি উদাসমনে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল যে জানালার নীচে পদশব্দ। ক্রমে মানুষের ছায়া দেখিল ও অব্যবহিত পরেই দেবব্রতকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। দেবব্রতও প্রীতিকে দেখিতে পাইল। প্রীতি বুঝিল যে দেবব্রতও বড়ই অশান্তি ভোগ করিতেছে, তাহাতে তাহার মনে কষ্ট হইল। যেন তাহাকে কিছু বলিতে চায়, কিন্তু তাহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইতেছে না।

ক্রমশঃ

মহাযোগ

শ্রীঅনিলবরণ রায়
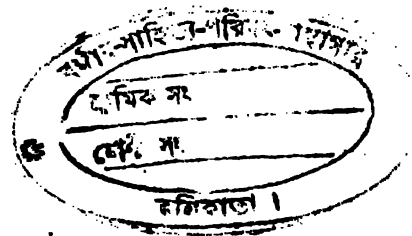
শ্রান্তিহীন নিরলস যুগ যুগ বাহি'
সাধিছ কি মহাযোগ, প্রকৃতিসুন্দরী?
প্রতি রন্ধ্র হ'তে তব উঠে কি আকুতি
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে অনন্তের পানে?
প্রেমের আবেশে দিব্য রস-লীলা মাঝে
পড়িলে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে কার বাহুপাশে,
নিঠুর সে প্রিয় তব গিয়াছে ছলিয়া
জ্ঞান-হারা পেয়ে তোমা; তারি লাগি কি গো
বিশ্ব জুড়ি' উঠে তব হৃদয়-কম্পন?
বসিয়াছ স্তব্ধ হ'য়ে তাহারি ধেয়ানে
হিমাদ্রি-শিখর' পরে? নদ নদী রূপে
ঊর্দ্ধশ্বাসে তার পানে চলেছ ছুটিয়া

কোনোদিকে নাহি আর কর দৃষ্টিপাত।
মেলিয়া সহস্র বাহু বিটপি-লতায়
ঊর্দ্ধমুখে মাগিতেছ তাহারি আলোক।
আবর্ত্তিয়া ষড়ঋতু নিত্য নব সাজে
সাজিছ কি তার তরে বিশ্ব-বিমোহিনী ?
শত শত সরসীর স্বচ্ছ দরপণে
হেরিছ আপন রূপ। নিস্তব্ধ নিশীথে
নিখিলের প্রাণ করি' ঘুমে অচেতন
তাহারি উদ্দেশে তব হয় অভিসার।
নক্ষত্র-খচিত নীল অম্বর-অঞ্চলে
নিশি নিশি তারি লাগি পাতিছ আসন।
প্রিয় তব এক পাদ(ও) যায় নাই সরি'
ত্যজিয়া তোমারে সতী। তোমারি মাঝারে
গূঢ়ভাবে আপনায় করেছে গোপন
খেলিতে তোমার মনে লুকোচুরি খেলা।
সদা তাঁর বংশীধ্বনি শুনিছ শ্রবণে,
মরম-মুকুরে তাঁর পড়িতেছে ছায়া,
অন্তরে বাহিরে তাঁরি লভিছ সঙ্কেত,
তাই তব হৃদে জাগে এত ব্যাকুলতা।
নাথের নিগূঢ় ইচ্ছা করিতে পালন
বিশ্ব-রূপে আপনারে করিছ বিকাশ
বিস্তারিয়া অনন্তের রহস্য অসীম।
বিচিত্র তোমার লীলা ওগো বিশ্বময়ী।
হইতেছ নিমগন শান্ত সমাধিতে,
প্রকাশি' জ্ঞানের জ্যোতি করিছ সন্ধান ;
পাতিছ রূপের ফাঁদ ভুবন ব্যাপিয়া
ধরিবারে প্রাণনাথে নিবিড় বন্ধনে ;
সৃজিয়া অসংখ্য জীব নিজ মর্ম্ম হ'তে
জ্বালিছ প্রেমের তৃষা হৃদয়ে হৃদয়ে,
তোমারি সে হোমানল দিব্য প্রেমাহুতি,
তোমারি বিরহ জাগে নিখিলের প্রাণে।
প্রিয়তম-পদে দিতে প্রেম-উপহার,
নিজেরে তুলিছ গড়ে তন্ন তন্ন করি',
বিন্দুমাত্র ত্রুটি কোথা চাহ না রাখিতে,
পূর্ণতম সিদ্ধি বিনা তৃপ্তি নাহি তব,
নাহি ক্লান্তি, নাহি তব ধৈর্য্য-পরিসীমা।
কখনো উঠিছ নাচি' প্রলয়ের রূপে,
বিচূর্ণিতে সব বাধা প্রিয়-সঙ্গমের
এতটুকু দেরী যেন নাহি সহে আর।
নিজেই করিছ পান নিজ রক্ত-ধারা
ছিন্নমস্তারূপে। কোটি কোটি কল্পব্যাপী
তিল তিল করি' যাহা করিছ নির্ম্মাণ
নিমেষে নির্ম্মম হ'য়ে ফেলিছ তা' ভাঙ্গি'
ধ্বংস হ'তে নব সৃষ্টি করিতে সূচনা।
যুগে যুগে ভাঙ্গাগড়া চলেছে তোমার,
নিজ হস্তে নিজ কীর্ত্তি করিতেছ লোপ,
লক্ষ্যের সাধনে শুধু অচল অটল—
রচিবে এমন সৃষ্টি অত্যাশ্চর্য্যময়।
এ-মর্ত্ত্য জগতে হ'বে নন্দন-কানন,
সৌন্দর্য্যে আনন্দে প্রেমে পরিপূর্ণ সবে,
সব দ্বন্দ্ব দুঃখ তাপ দূরে যাবে চলে ;
সুদীর্ঘ বিরহ তব হ'বে অবসান,
দিব্য জ্যোতির্ম্ময় নব মানব-সমাজে,
প্রিয়তম সনে হ'বে অপূর্ব্ব মিলন।

———

'গণিত ও গণতন্ত্রে' হিসাবে ভুল

হিন্দু ও মুসলমান কয়েদীর সংখ্যা ও অনুপাত

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

মাসিক "মোহাম্মদী"-সম্পাদক মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ তাঁহারই সম্পাদিত মাসিকপত্রিকায় গত ফাল্গুন মাসে "গণিত ও গণতন্ত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে হিন্দু ও 'মুছলমান'দিগের সংখ্যা-সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ উক্তিই অসত্য ও অর্দ্ধসত্যে মিশ্রিত এবং ঐগুলি সাধারণ পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দেয়, এ কারণে ঐসকল কথার আলোচনা আবশ্যক মনে করিয়া অদ্য কেবলমাত্র হিন্দু ও 'মুছলমান' কয়েদীর সংখ্যা ও অনুপাত-সম্বন্ধে কিছু বলিব।

'মুছলমান'দিগের মধ্যে কয়েদীর সংখ্যাধিক্য-সম্বন্ধে মৌলানা সাহেব লিখিয়াছেন যে, 'মুছলমানের' সংখ্যা অধিক, সে হিসাবে তাহাদের কয়েদীর সংখ্যা অন্য জাতির তুলনায় অধিক হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তাহার পর অপরাধে লিপ্ত হইয়া আইনের চোখে ধূলি দেওয়ার সুযোগ ও যোগ্যতাও তাহাদের কম। অনেক সময় গ্রামের দুর্দ্দান্ত জমিদার, মহাজন ও মণ্ডলদিগের ক্রোধভাজন হইয়া তাহাদিগকে বিনা কারণে কারাভোগ করিতে হয়। তদবির করার শক্তির অভাবেও বহু নিরাপরাধ মুছলমানকে কারাগারে পচিতে হয়। সকলের উপরে, মুছলমান ক্ষাত্রতেজসম্পন্ন জাতি। আত্মসম্মানে আঘাত লাগিলে অনেক সময় তাহারা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ে। এই সব কারণে মুছলমান কয়েদীর সংখ্যা তাহাদের আনুপাতিক ক্রম অপেক্ষা শতকরা ৩৪ জন হিসাবে বাড়িয়া যায়। কিন্তু নীতি ও চরিত্র-সংক্রান্ত অপরাধে দণ্ডিত মুছলমানের সংখ্যা যে অ-মুছলমান অপেক্ষা, বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু অপেক্ষা, অধিক একথা একেবারে অসত্য। একটা হিসাবে, এই ব্যাপারের কতকটা অনুমান করা যাইতে পারিবে।

স্ত্রীলোকেরা খুন, দাঙ্গা, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধে খুব কমই দণ্ডিত হয়। তাহাদের অধিকাংশই নৈতিক চরিত্র-সংক্রান্ত অপরাধে দণ্ডিত হইয়া থাকে। ১৯২৯ সালের জেল রিপোর্ট দেখিলে জানা যাইবে—মোট ৪০২ জন নারী কয়েদীর মধ্যে মুছলমান ১০৪ জন, খৃষ্টান ২১জন, অন্যান্য ১৭জন অর্থাৎ সর্ব্বসাকুল্যে মোট অহিন্দু নারী কয়েদীর সংখ্যা ১৪২ জন; আর একা হিন্দুনারী কয়েদীর সংখ্যা ২৬০ জন। প্রকৃত রহস্যের কতকটা আভাস এই সংখ্যা হইতে জানিতে পারা যাইতেছে।"

১৯২১ সালের আদমসুমারী ১৯২১ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে হয়। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে অসহযোগ-আন্দোলন ভীষণভাবে চলিতে থাকে, অনেকে স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে। অনেক মান্যগণ্য নেতাও ঐ সময়ে জেলে যান; সুতরাং তৎকালে কয়েদীদিগের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা হঠাৎ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বর্ত্তমান আদমসুমারীতেও কয়েদীদিগের মধ্যেও হিন্দুর সংখ্যা ঐরূপ কারণে অত্যধিকভাবে বৃদ্ধি পাইবে। সাধারণতঃ বাঙ্গালার জেলে ২০.২২ হাজার কয়েদী থাকে, কিন্তু বর্ত্তমানে মহাত্মা গন্ধী-প্রবর্ত্তিত আইন-অমান্য-আন্দোলনে যোগ দিয়া প্রায় ৬৭ হাজার হিন্দু সেন্সসের রাত্রিতে ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ তারিখে জেল খাটিতেছিলেন। সুতরাং ভবিষ্যতে ঐ গণনায় সংখ্যা হিসাবে ও অনুপাত হিসাবে হিন্দুরাই জেল খাটে এ কথা প্রমাণ করা বড়ই সহজ হইয়া উঠিবে!!

Annual Report on the Administration of Jails of the Bengal Presidency সরকার-কর্ত্তৃক প্রতি বৎসর প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসরের সরকারী রিপোর্ট একত্রে পাঠ করিয়া তাহা হইতে সংখ্যাদি লইলে কোন বিশিষ্ট বৎসরের abnormality বা বিশিষ্ট কারণে

সংখ্যার ন্যূনাধিক্য বাদ দেওয়া যাইতে পারে। নিম্নে বাঙ্গালার জেলসমূহে কয়েক বৎসরের কয়েদীদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগের অনুপাত দেওয়া হইল।

	হিন্দু শতকরা	মুসলমান শতকরা
১৯২৫	৩৯·৯১	৫৭·০৭
১৯২৬	৪০·৬৮	৫৬·০৬
১৯২৭	৪০·৪৫	৫৬·২৯
১৯২৮	৩৯·৯৫	৫৬·২০
৪ বৎসরের গড় আয়	৪০·২৫	৫৬·৪১

মুসলমান কয়েদীর সংখ্যাধিক্যের কারণ-সম্বন্ধে মৌলানা সাহেব লিখিয়াছেন,—"অপরাধে লিপ্ত হইয়া আইনের চোখে ধূলি দেওয়ার সুযোগ ও যোগ্যতাও তাহাদের কম। অনেক সময় গ্রামের দুর্দ্দান্ত জমিদার, মহাজন ও মণ্ডলদিগের ক্রোধভাজন হইয়া তাহাদিগকে বিনা কারণে কারাভোগ করিতে হয়। তদবির করার শক্তির অভাবেও বহু নিরপরাধ মুছলমানকে কারাগারে পচিতে হয়।" প্রথমতঃ উপরোক্ত হেতুসকল একেবারেই সত্য নহে। তর্কের খাতিরে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও ঐ সকল হেতু হিন্দুর সম্বন্ধেও খাটে। কলিকাতা-সম্বন্ধে ইহা আদৌ প্রযুজ্য নহে। কলিকাতায় 'মুছলমান'দিগের মধ্যে অনেক ধনী, সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা অপরাধী মুসলমানদিগকে আইনের হাত হইতে রক্ষা করা ধর্ম্ম ও পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করেন। জমিদার, মহাজনের অত্যাচার করা আদৌ সম্ভবপর নহে। 'মুছলমান' অপরাধীদিগকে রক্ষা করিতে ও আশ্রয় দিতে 'মুছলমান' ব্যারিষ্টার, নেতা বা সম্পাদক পশ্চাদপদ নহেন। মফঃস্বলেও মুসলমান অপরাধীদিগকে সাধারণতঃ মুসলমানেরা আইনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন, বিশেষ করিয়া প্রতিপক্ষ যদি হিন্দু হয় অথবা অপরাধ যদি নারী-হরণ-সম্পর্কিত হয়।

সুতরাং কলিকাতা শহরে হিন্দু ও মুসলমান অপরাধীদের সংখ্যা ও অনুপাত তুলনা করিলে কোন জাতির মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা বেশী তাহা বুঝা যাইবে। কলিকাতা শহরে মোটামুটি হিন্দু শতকরা ৭১ জন, মুসলমান শতকরা ২৩ জন। অপরাধীদের মধ্যে সামান্য সামান্য কারণে দণ্ডিত, যেমন রাস্তায় মাতলামী করা বা জোরে মোটর হাঁকান ইত্যাদি অপরাধ বাদ দিয়া, ভারতীয় দণ্ডবিধি-আইনের আমলে দণ্ডিত অপরাধীদের সংখ্যা লইয়া বিচার করা যাউক। যাহারা দণ্ডবিধি-আইনের আমলে দণ্ডিত তাহাদিগকে নৈতিক চরিত্রহীন ও প্রকৃত দুষ্কর্ম্মকারী (Morally depraved and real criminal) বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। দণ্ডবিধি আইনের অধিকাংশ অপরাধ নৈতিক, সামাজিক ও চরিত্র-ঘটিত অবনতির ফল-প্রসূত।

Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs সরকারী কাগজ। গত ১৯২৭ সালের রিপোর্ট-পাঠে জানা যায় যে, ১৯২৭ সালে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ১৩৮২ জন হিন্দু ও ১৪৮১ জন মুসলমান। অপর কয়েক বৎসরের রিপোর্ট হইতে অঙ্ক উদ্ধৃত করিতে পারিলে ভাল হইত কিন্তু অন্যান্য বৎসরের রিপোর্ট-লেখকের হাতের কাছে না থাকায় উহাদের সাহায্য লইতে পারা গেল না। মৌলানা আক্রাম খাঁ লিখিয়াছেন যে—"মুছলমান ক্ষাত্রতেজসম্পন্ন জাতি। আত্মসম্মানে আঘাত লাগিলে অনেক সময় তাহারা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ে। এই সব কারণে মুসলমান কয়েদীর সংখ্যা তাহাদের আনুপাতিক ক্রম অপেক্ষা শতকরা ৩।৪ জন হিসাবে বাড়িয়া যায়।" বাঙ্গালাদেশের জেলখানার বার্ষিক রিপোর্টপাঠে কোন অপরাধে কতজন জেল খাটিতেছে তাহা জানা যায়।

হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া লোকে, বিশেষ করিয়া ক্ষাত্রতেজ-সম্পন্ন জাতি চুরি-ডাকাতি করে না বা চোরাই মাল রাখে না বা নারীহরণ করে না বা খুন-জখম করে না বা আফিম, কোকেন প্রভৃতি গোপনে চালান দেয় না। হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুত হইলে লোকে মারামারি করে। ১৯২৮ সালের জেল-খানার রিপোর্টপাঠে জানা যায় যে, ২২,৩১৫ জন কয়েদীর মধ্যে মাত্র ৬৬৬ জন মারামারি বা আঘাত করার জন্য জেলে গিয়া, ১,০৭০ জন গুরুতর জখম ইত্যাদি করার জন্য জেল খাটিতেছে। পূর্ব্বোক্ত ৬৬৬ জনের মধ্যে ২১১ জন

একমাস বা একমাসের কম সাজা পাইয়াছে, ১০৭০ জনের মধ্যে ৭৬ জন একমাস বা একমাসের কম সাজা পাইয়াছে। ইহার অধিক যাহারা সাজা পাইয়াছে তাহারা ইচ্ছা করিয়াই, কেহ গুণ্ডামী করিয়া, কেহ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বা কেহ প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া অপরাধ করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া প্রায় সাড়ে বাইশ হাজার অপরাধীর মধ্যে মাত্র ২৮৭ জন সাজা পাইয়াছে। ইহার মধ্যে হিন্দু আছে, শিখ আছে, খৃষ্টান আছে, বৌদ্ধ আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে মুসলমানের জেলে যাওয়ার কারণ 'হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া অপরাধ করা' নয়। মুসলমানগণের অপরাধের অন্য কারণ নিশ্চয়ই আছে। ১৯২৬ সালের রিপোর্ট পাঠেও অনুরূপ অঙ্ক পাওয়া যায়। মোট ২১,৮৩৪ জন কয়েদীর মধ্যে মাত্র ৩৬০ জন ঐরূপ সাজা পাইয়াছে। অপর অপর বৎসরের অঙ্ক দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

তৎপরে লেখক মহাশয় হিন্দু স্ত্রীলোকের অপরাধ-প্রবণতা দেখাইবার জন্য ১৯২৯ সালের জেলরিপোর্ট হইতে কতকগুলি অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে তিনিও জেলরিপোর্ট পাঠ করেন বটে, তবে তাঁহার সমধর্ম্মীদের পক্ষে যেসকল কথা সুবিধাজনক নহে তাহা চাপিয়া যাওয়া ও হিন্দুর সম্বন্ধে গ্লানিকর কথা প্রকাশ করায় তাহার কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ হয় না। হিন্দুর যে দোষ নাই এ কথা কেহই বলে না। হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই, স্ত্রীলোকেরা পিতামাতার বা স্বামীর উত্তরাধিকারী নহেন, এ সমস্ত কারণে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। ইহা হিন্দু স্ত্রীলোকের অপরাধপ্রবণতার কারণ হইতে পারে, আর মুসলমানদের অমানুষিক পর্দ্দাপ্রথা মুসলমান স্ত্রীলোকদিগকে অনেক সময়েই আইনের কবল হইতে রক্ষা করে। কিন্তু তিনি যে লিখিয়াছেন স্ত্রীলোকদের "অধিকাংশই নৈতিক চরিত্র-সংক্রান্ত অপরাধে দণ্ডিত হইয়া থাকে। ইহা তিনি কোথায় পাইলেন? ১৯২৮ সালের জেলরিপোর্টপাঠে জানা যায় যে, মোট ৪২০ জন নারী-কয়েদীর মধ্যে ২২২ জন সামান্য অপরাধ যাহা দণ্ডবিধি-আইন ব্যতীত অপর আইনের ধারা-অনুযায়ী দণ্ডিত। ইহাদিগের মধ্যে আবার ১৪৯ জন একমাস বা একমাসের কম সাজা পাইয়াছে। চুরি-অপরাধে ৭৯ জন সাজা পাইয়াছে, চোরাই মাল রাখার জন্য ১৫ জন সাজা পাইয়াছে। স্ত্রীলোকের নৈতিক অপরাধ বলিতে সাধারণে যাহা বুঝে—যেমন গর্ভপাত, শিশুসন্তানকে ফেলিয়া দেওয়া, গৃহ হইতে বাহির করা, নাবালক-নাবালিকা বিক্রয় করা বা বিবাহ-ঘটিত অপরাধ প্রভৃতিতে—মাত্র ৪১ জন দণ্ডিত। ইহাদের সকলেই কিছু হিন্দু নহে। মোট সংখ্যার মধ্যে যদি শতকরা ১০ জনেরও কম নৈতিক অপরাধে অপরাধী হয়, তাহাতে এ কথা বলা চলে না যে, অধিকাংশই নৈতিক চরিত্র-সংক্রান্ত অপরাধে অপরাধী। ৫৪ প্রকারের অপরাধের মধ্যে ২৪ প্রকারের অপরাধে কোন স্ত্রীলোক দণ্ডিত হয় নাই; ১৩ প্রকারের অপরাধে ১৩ জন স্ত্রী দণ্ডিত হইয়াছে। ১৯২৬ সালের রিপোর্টপাঠে জানা যায় যে, ৪২০ জন স্ত্রী-কয়েদীর মধ্যে গর্ভপাত ইত্যাদি অপরাধে ২২ জন স্ত্রীলোক দণ্ডিত। সামান্য অপরাধে ২০৭ জন দণ্ডিত। অপরাধীদের মধ্যে ২০ জন বিবাহিতা, ৮ জন অবিবাহিতা, ১২৭ জন বিধবা ও ৮৩ জন বেশ্যা।

ধর্ম্মহিসাবে ১৯২৮ সালে ৯৩ জন মুসলমান, ২৬১ জন হিন্দু; ১৯২৬ সালে ১১৭ জন মুসলমান, ২৩৪ জন হিন্দু দণ্ডিত হয়। লেখক সম্পাদকও নহেন বা সংবাদপত্র-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও নহেন। তাঁহার পক্ষে পর পর বৎসরের জেলরিপোর্ট সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে যে রিপোর্ট তিনি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা হইতে তিনি অঙ্কসকল উদ্ধৃত করিলেন। উপর্য্যুপরি দশবৎসরের জেলরিপোর্ট হইতে অঙ্ক উদ্ধৃত করিতে পারিলে বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হইত; কিন্তু উপরে যাহা উদ্ধৃত করা গেল তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে মৌলানা আক্রাম খাঁর আক্রমণের মূলে কতটুকু সত্য আছে।

স্বামী

(গল্প)

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

এক

স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া বই কয়খানা একটা টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়া ত্রস্তপদে কোনমতে সোপান কয়টা বহিয়া শেফালী উপরে আসিয়া ডাকিল,—

'মা মা!'

সম্মুখের ঘর হইতে পীড়িতা জননী ক্ষীণ স্বরে সাড়া দিল, 'শেফা এসেছিস্?'

শেফালী তখন মাতার শিয়রে আসিয়া বসিয়াছিল, ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল;—'আজ কেমন আছ মা?'

ডান হাতখানা সে সন্তর্পণে জননীর ললাটে রাখিল। সস্নেহ নয়নের স্নিগ্ধ-দৃষ্টি তনয়ার সর্ব্বদেহে বুলাইয়া মা বলিল,—'এখানে আর বসিস না মা, যা আগে একটু কিছু খেয়ে আয়। সেই কখন দু'টা খেয়ে গেছিস্ যা।'

শেফালী না উঠিয়া মায়ের পার্শ্বে শুইয়া পড়িয়া ব্যগ্রভাবে পুনরায় বলিল,—'কেমন আছ বল্‌লে না মা?'

'আমি ভালই আছি শেফালী, তুই যা মা খেয়ে আয়।'

'যাব এখন মা, একটু শুই তোমার কাছে।'

অমলার শীর্ণ দেহের উপর একটা হাত রাখিয়া পলকহীন নেত্রে শেফালী চাহিয়া রহিল। তাহার পর গাঢ়-কণ্ঠে বলিল,—'তুমি দিন দিন বেশী রোগা হয়ে যাচ্ছ মা, অসুখ তোমার একটুও কমছে না। এরকম হ'লে ক'দিন তুমি বাঁচবে, ডাক্তার কি ছাই ওষুধ যে দিচ্ছে, কিছু ফল হচ্ছে না। কাল আমি অন্য একজন ডাক্তার আনাব, তুমি বারণ ক'র না।'

মৃদু হাসিয়া অমলা বলিল,—'পাগলী রোজ ডাক্তার বদল করেই কি মাকে তোর বাঁচাতে পার্‌বি; আমার দিন যে শেষ হ'য়ে এসেছে।'

শেফালী কথা কহিল না। মাতার শয্যার একাংশে মুখ লুকাইয়া অশ্রুধারা নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দুর্ব্বল হাতখানা কষ্টে উঠাইয়া অমলা তাহার পিঠের উপর রাখিয়া বলিল,—'কাঁদিস নি শেফালী, তুই জানিস না মরণের জন্যে আমি কত উন্মুখ হ'য়ে আছি। বাঁচবার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। এ জীবন যত শীগ্‌গীর শেষ হয় ততই ভাল। তুই বুঝবি না কি জ্বালা আমি সহ্য কর্‌ছি—এ দেহের প্রতি অণু-পরমাণুটা পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ নিজের বিনাশ কামনা কচ্ছে। মরতে আমি একটুও কাতর নই, আমার ভাবনা কেবল তোর জন্যে।'

অমলার নেত্রপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। শেফালী উঠিয়া বসিয়া মাতার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল,—'কেন মা সব সময় তুমি ঐ কথা বল। আমি বুঝতে পারি না কেন তুমি কেবল মরতে চাও।'

কৃষ্ণপক্ষ রজনীর অবসানে ক্ষীয়মাণ চন্দ্রমা যেমন পশ্চিম গগনপ্রান্তে ক্ষণতরে হাসি ছড়াইয়া ফুটিয়া উঠে তেমনই ম্লান হাসির রেখা অমলার পাণ্ডুর ওষ্ঠে দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। তাহার পর যেন কি একটা অজ্ঞাত-ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াই সে বলিল,—'সে কথা যেন তোকে কখন বুঝতে না হয়। ওঃ, না না যে যার নিজের কাজের ফল ভোগ করে, অন্য লোক কেন তার অংশীদার হ'বে, ভগবান তোকে যেন সমস্ত আঘাত থেকে চিরদিন রক্ষা করেন—কে জানে প্রায়শ্চিত্ত এখনও কি শেষ হয় নি। একজনের দোষে কি অন্যে শাস্তি পাবে।'

শেফালী অবাক্ হইয়া জননীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। প্রথমটা সে এ অসংলগ্ন কথাগুলার মর্ম্ম অনুভব

করিতে পারে নাই। তাহার পর এগুলাকে প্রলাপবাক্য ভাবিয়া সভয়ে জননীর গায়ে হাত দিয়া সে বলিল,—'মা, মা কি বলছ তুমি ?'

অমলাও চমকিয়া উঠিল, তাহার পর আপনাকে কতকটা সংযত করিয়া লইয়া সহজকণ্ঠে বলিল,—'না কিছু বলি নি, তুই যা খেয়ে আয়।'

'যাব একটু পরে, তোমার কাছে এখন খানিকটা থাকি।'

হাসিয়া অমলা বলিল,—'ভয় নেই রে, আমি ভাল আছি, তুই যা।' শেফালী উঠিল না। খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া অমলা বলিল,—'আচ্ছা শেফা এক মুহূর্ত্ত আমার কাছ ছাড়া হ'তে চাস না, বিয়ে হ'লে কি কর্ব্বি বল দেখি—কি করে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে থাক্‌বি ?'

জননীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে শেফালী বলিল,—'ঐ জন্তেই তো তোমায় কত দিন বলেছি মা বিয়ে আমার দিও না, তুমি তো সে কথা শুনবে না, এখনও তোমায় বারণ কর্চ্ছি—'

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অমলা ত্রস্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—'ও কথা বলিস না, বলিস না। তোর বিয়ে দিয়ে তোর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমি যেতে চাই।'

'বিয়ে না হ'লে তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্ব্বে না ?'

'কি করে হ'ব ? আমি গেলে কার কাছে তুই সংসারে থাকবি ? কে দেখবে তোকে ?'

'কা'কেও দেখতে হ'বে না মা—নিজেকে নিজেই দেখতে পারবার মত ক্ষমতা আমার যথেষ্ট আছে।'

ঝরে-পড়া ফুলের শেষ হাসির মত করুণ হাসির আভাসমাত্র জননীর শুষ্ক মুখখানা ঈষৎ বিভাসিত করিয়া তুলিল। তারপর বিষাদক্লিষ্ট মুখে বলিল,—'ওরে তুই ছেলেমানুষ সংসারটাকে চিনিস না, জানিস না এ পৃথিবী কত ভীষণ জায়গা। এখানে মানুষ পরিচয় দিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের বেশীর ভাগই শয়তান। বড় ভয়ানক স্থান—এখানে তোর মত অসহায়া নারীর রক্ষকশূন্য হয়ে থাকা সম্ভবপর নয়। তারপর তোর টাকা, সুন্দর চেহারা সবই তোর শত্রু হ'য়ে দাঁড়াবে। তাই তো কত বড় আশঙ্কার বোঝা বুকে নিয়েও তোর বিয়ের চেষ্টা কর্চ্ছি।'

কৌতূহলীভাবে শেফালী বলিল,—'আশঙ্কাটা আবার কি মা ?'

ব্যস্ত হইয়া অমলা উত্তর দিল,—'কিছু না, কিছু না, রোগের জালায় কি মাথার ঠিক আছে আমার, কি যে বলি তার মাথা-মুণ্ডু নেই।'

'প্রায়ই তো তুমি অমন কথা বল।'

'ঐ অসুখের জালায় মা, অসুখের জালায়। যা তোর বে'টা কোনমতে দিতে পারলে বাঁচতুম। একটা সম্বন্ধও ঠিক হচ্ছে না। আমি তো বাবু পয়সা খরচ কর্ত্তে অসম্মত নই, মেয়েও সুন্দর, তবু কেউ—'

'তবু কেউ তোমার মেয়েকে না নিতে চাইলেই আমি কিন্তু বাঁচি মা, বেশ আছি যত উৎপাত—'

'ওরে তুই বুঝবি না যদি ভগবান দিন দেন তা হ'লেই জানবি বিবাহিত জীবন মেয়েমানুষের কত সুখের। স্বামীর ঘরে যত দুঃখই থাক্ তবুও সে পরম শান্তি। সংসারধর্ম্ম কত সুখের তা যখন বুঝবি আমার এ-সব কথা তখন মনে করিস।'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস অমলা ত্যাগ করিল। এমন সময়ে দাসী আসিয়া বলিল,—'ও বাড়ীর মাসীমা এসেছেন মা।'

'কে, মাধবী-দিদি ? যা তো শেফালী, ডেকে নিয়ে আয় তাঁকে, কাল বলে গেছলেন তাঁর দাদার ছেলের সঙ্গে তোর বের জন্যে চেষ্টা কর্ব্বেন, কিছু হ'ল কি না শুনি।'

'কিন্তু ঐ কথা নিয়ে বেশীক্ষণ বকবক ক'র না যেন মা, শেষে যদি জ্বর বাড়ে।'

'ওরে না না, কিছু হ'বে না, তুই ডেকে আন তাঁকে। আর লক্ষ্মী তুই আমায় একটু ধর তো উঠে বসি।'

দাসীর সাহায্যে অমলা কষ্টে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। তাহারই আদেশমত ভূমিতলে একখানা মূল্যবান কার্পেট বিছাইয়া দিয়া দাসী নীচে নামিয়া গেল। প্রতি-বেশিনীর সহিত শেফালী ফিরিয়া আসিল। অমলা সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল,—'এস দিদি এস, অনেকক্ষণ থেকে তোমারই অপেক্ষা কর্চ্ছি, বস। শেফা তোর মাসীমার জন্য গোটাকতক পান পাঠিয়ে দিয়ে তুই খেতে যা। দিদি বস,—এস এখানেই বস আমার কাছে।'

অমলার গাত্রস্পর্শ করিয়া মাধবী বলিলেন,—'জ্বর তো বেশ আছে দেখছি। তা তুই যদি শুয়ে থাকবি তা হ'লে মেয়ের বে দেবে কে বল দেখি?'

আগ্রহভরে তাঁহার হাতখানা ধরিয়া অমলা বলিল,—'মেয়ের বিয়ে কি দিতে পারব দিদি?'

শয্যার একধারে তাঁহারই সন্নিকটে বসিয়া পড়িয়া স্মিতমুখে মাধবী বলিলেন,—'সু-খবর এনেছি ভাই, সন্দেশ খাওয়া কয়।'

'সত্যি—সত্যি বলছ দিদি?'

'সত্যিই বলছি, উনি গেছলেন সকালে দাদার ওখানে, নীহারের বের জন্যে দাদাও চেষ্টা কচ্ছেন, উনি শেফালীর কথা বলতে তিনি রাজি হ'য়েছেন। মেয়ে পছন্দ হ'লে কোন আর বাধা নেই। তা হ'লে ধর হ'য়ে গেছে; শেফা তো আমাদের অপছন্দের মেয়ে নয়। যেমন মেয়ের বের জন্যে ব্যস্ত হ'য়েছিলে তেমনই মনের মত জামাই হ'বে; নীহার আমাদের রূপে-গুণে সমান—এখনও যেন ছেলেমানুষ, দেখলে কে বলবে ছেলে এম-এ পাশ করেছে।'

অমলার শীর্ণমুখ প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা বহিতেছিল। গভীর কৃতজ্ঞতাভরে মাধবীর দুই হাত ধরিয়া সে বলিল,—'দিদি ভগবান তোমার ভাল কর্বেন।'

সস্নেহে তাহার পিঠে হাত রাখিয়া মাধবী বলিল,—'কেন যে তুই এত ব্যস্ত হ'য়েছিলি মেয়ের বের জন্যে আমি তাই ভাবি। অমন সুন্দর মেয়ে তোর, অত টাকা সবই ওর। ওর আবার বের ভাবনা। আমি তো বরাবর বলছি অত ব্যস্ত হ'য়ো না, ওর খুব ভাল পাত্রেই বিয়ে হ'বে।'

অমলা নীরব রহিল। তাহার অন্তরের ভাষা শুধু অন্তর্যামীই বুঝিলেন।

মাধবী আপন মনেই অনেক কথা বলিয়া যাইতেছিলেন অমলার চিত্ত সেদিকে ছিল না। ক্ষণপরে সচেতন হইয়া অমলা প্রশ্ন করিল, 'তাঁরা কবে মেয়ে দেখতে আসবেন দিদি।'

'কবে আর কৈ? দাদা কালই আসবেন।'

'ও, তা আমি তো পড়ে আছি মিথ্যে মানুষ, তুমি এস ভাই, যা করবার তুমিই ক'র আর শ্যামবাবুকে ব'ল তিনিও যেন একটু উপস্থিত থাকেন।'

'সে তো থাকবেই, তোমায় কিছু বলতে হ'বে না।'

'হ্যাঁ দিদি, তোমারাই আমার ভরসা।'

কথাটা সত্যই। প্রতিবেশীদের করুণাতেই সম্পূর্ণ অসহায় স্বজনহীন অবস্থায় সে এতদিন নিরাপদে এখানে কাটাইতে পারিয়াছে। বিধবা অমলা যখন এ পল্লীতে প্রথম আসে কন্যা শেফালী তখন কয়মাসের শিশু। দুইটী পুরাতন দাসদাসী ভিন্ন আর কেহ তাহার সঙ্গে আসে নাই, কেহ তাহার ছিলও না। স্বামীসহ সে বিদেশে থাকিত সহসা তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় অনন্যোপায় হইয়া কন্যাকে লইয়া সে এখানে আসিয়াছে। এই পরিচয়ই সে সকলকে দিয়াছিল।

এই সহায়হীনা নারীকে পল্লীর লোক সহানুভূতির চোখেই দেখিয়াছিল। সকল বাড়ীর রমণীরা তাহার গৃহে যাতায়াত করিতেন। অমলার অর্থের অভাব ছিল না। বাড়ীখানি সে কিনিয়াই লইয়াছিল। মেয়েটাকে লইয়া ইহাদের মধ্যে দিনগুলি তাহার ভালই কাটিতেছিল। মাধবীদের বাড়ী ছিল অমলার গৃহসংলগ্ন। মাধবী ইহাকে সত্যই ভগিনীর মত স্নেহ করিতেন। তাহার স্বামী শ্যামরতনবাবু ইহাদের অভিভাবকের মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মেয়েটী বড় হইতেই অমলা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার বিবাহের জন্য। কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধে অমলার মনে একটা ভাবী আশঙ্কার ভাব ছিল; তাহার অহেতুক শঙ্কায় মাধবী হাসিতেন, আশ্বাস দিতেন। তথাপি অমলা সুস্থির হইতে পারিত না। তাহার পর তিন মাস হইতে কঠিন ব্যাধি তাহার দেহ আক্রমণ করিয়া শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছিল। অসুখ যতই বাড়িতেছিল অমলা ততই কন্যার বিবাহের জন্য ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল। প্রতিবেশী সকলেই শেফালীর বিবাহের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতে লাগিল। অমলার অসুখ সারিবে না তাহা সেও বুঝিত আর সকলেও বুঝিত, তাই তাহারই জীবদ্দশায় মেয়েটীর বিবাহ দিয়া তাহার শেষ মুহূর্ত্তটী শান্তিময় করিয়া দিবার জন্য তাহারা ব্যস্ত হইয়াছিল। মাধবীর চেষ্টাই ছিল সব চেয়ে বেশী।

তারপর মাধবী তাহাকে বলিল,—'আচ্ছা ভাই তুমি এখন শোও তবে, আমি কাল আসব, কোন চিন্তা কর' না; এই মাসের মধ্যেই তোমার মেয়ের বে হ'য়ে যাবে। যাই তবে এখন।' বলিয়া অমলাকে শোয়াইয়া দিয়া মাধবী গৃহের বাহির হইয়া গেলেন।

দুই

বিকালবেলা কন্যাকে ডাকিয়া অমলা বলিল, 'আজ আর কোথাও বেড়াতে যাস্ নি শেফা, তাঁরা আজ এখনি তোকে দেখতে আসবেন।'

মাতার পদপ্রান্তে বসিয়া ক্ষুণ্নকণ্ঠে শেফালী বলিল,—'আমার বিদায় করবার আয়োজন এত শীগগীর শীগগীর না কর্‌লে কি মা একেবারেই চল্‌ত না?'

অমলা হাসিয়া বলিল,—'কি যে বলিস, বিদায় কর্ব্ব কি? যা চুলটা একটু পরিষ্কার করে আয় দেখি; অমন মুখ ভার কর্লি কেন?'

'কি জানি মা, বিয়ের কথায় আমার মনে কেমন যেন একটা ভয় হয়। আমার বিয়ে দিও না মা।'

অমলা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল,—'না, না ওকি কথা! ভগবান তোকে সুখী করুন। আমার জীবনের অভিশাপ—'

'কি মা, তোমার জীবনের কি?'

'কিছু নয়—কিছু নয়, তুই বড় বকাস শেফালী, যা উঠে, চুলটা ঠিক ক'রে আয়। তোর সব বিশ্রী—বিয়ের কথায় কেউ তো অমন মন ভার করে না। তোর বয়সী তোর বন্ধু যারা সবার তো বিয়ে হ'য়ে কেমন তারা শ্বশুরঘর কচ্ছে আর তোর যত অনাসৃষ্টির ভয়-ভাবনা। যা ওঠ—'

'তুমি যাই বল, সত্যি বলছি মা, আমার বিয়ের নামে এত ভয়—'

কথার মাঝখানে অমলা কাতরভাবে বলিল,—'শেফা, শেফা তোকে ব্যাগ্রতা করি, আমার অমন করে উতলা করিস না—ওরে তুই জানিস না, বুঝবি না কত বড় আশঙ্কা, কত বড় বিপ্লবের সম্ভাবনা মাথায় নিয়ে আমি, ওরে যা যা তুই এঘর থেকে। আমায় পাগল করিস নি—' ক্লান্তিভরে অমলা জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

শেফালী স্তব্ধভাবে শিয়রে বসিয়া অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, অকারণে বা অতি তুচ্ছ কারণেই জননী এমন ব্যাকুল ও উত্তেজিত হইয়া উঠেন কেন? সে বুঝিত মার অন্তরের কোনখানে এমন একটা গোপন বেদনার উৎস নিহিত আছে যেখানে সামান্য ঘা পড়িলেই উহা স্বতঃউৎসারিত হইয়া উঠে। ইহার মূল নির্ণয় শেফালী কোনদিন করিতে পারে নাই, আজও পারিল না। অমলা বহুকষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া লইল। তারপর কন্যার দিকে চাহিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল,—'সন্ধ্যে হ'য়ে এল, আর দেরী করিস না যা শেফালী।'

অনিচ্ছা-মন্থরপদে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। অমলা আপন মনে অস্ফুটকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—'ঠাকুর একের পাপে অন্যকে শাস্তি দিও না—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হ'ল না ঠাকুর—আমাকে যত দুঃখ-কষ্ট দাও আমি হাসিমুখে বুক পেতে নেব—কিন্তু ঐ অম্লান কুসুমের—'অমলা শিহরিয়া উঠিল।

একটু পরেই শেফালী ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষুণ্নকণ্ঠে অমলা বলিল,—'এই তো বেশ হয়েছে, এইবার কাপড়টা বদলে ফেল। ঐ আলমারীটা খোল দেখি, নে দেরী করিস না, ওরই মধ্যে দেখ একটা 'স্কারলেট' রংয়ের রেশমী শাড়ী আছে সেইটা আর তার সঙ্গে 'ম্যাচ' করে এম্নি একটা জ্যাকেট বার কর। একটা 'পেটি' কোটও অম্নি বার করে রাখ।'

কাপড়-জামা বাহির করিয়া শেফালী আলমারিটা বন্ধ করিতেছিল, অমলা ব্যস্তভাবে বলিল,—'ওরে রাখ রাখ—গয়না বার কর্ত্তে হ'বে না?'

'আঃ জ্বালাতন কর্‌লে—গয়না আবার কি হ'বে।'

'দরকার আছে, তুই বার কর্ ঐ ড্রয়ার খোল, হীরের ব্রেসলেট দুটো আর নেকলেসটা বাইরে এনে রাখ। দুল দুটো, গোটাকত ব্রেচেও বার করিস।'

শেফালী এবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বলিল,—'না মা ওসব আমি কখনও পরব না, এ তোমাদের ভারী অন্যায়; দেখতে আসবে দেখে যা'ক না। রাজ্যের জামা-কাপড় জড়িয়ে সং সাজিয়ে বার কর্‌তে হ'বে এমন কোন কথা আছে।'

'তা নইলে পছন্দ হ'বে না।'

'নাই বা হ'ল এমন পছন্দ। সহজভাবে দেখে যাক, ইচ্ছে হয় পছন্দ করুক, না-হয় না করুক। আমরা তো খেলনার পুতুল নই যে রং চং যত বেশী হ'বে কাটতিও তেমনই বেশী হ'বে।'

কন্যার মুখের উপর বিষণ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া গাঢ়স্বরে অমলা বলিল,—'মেয়েমানুষ খেলনার পুতুলেরই সমান শেফালী। খেলনার পুতুলের দামও কেউ আমাদের দিতে চায় না। খেলনার পুতুল যেটুকু আদর-যত্ন পায় তাও বোধ হয় মেয়েদের ভাগ্যে জোটে না। সংসারে মেয়েদের প্রয়োজন খুবই বেশী কিন্তু তার যোগ্য মর্য্যাদা তারা পায় না। পুতুলের মত দেখে-শুনে বাছাই করে মানুষ মেয়েদের নিয়ে যায়, মনোমত হ'তে পারে সংসারে স্থান পায়, না হ'লে পথের ধূলোয় বার করে দিতেও কেউ কুণ্ঠিত হয় না। তারপর যা থাক তাদের অদৃষ্টে।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ ও নতমুখে বসিয়া থাকিয়া শেফালী বলিল,—'সংসারে এই যদি আমাদের দাম হয়, তবে সেখানে গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষার দরকার কি মা? এই তো বেশ আছি।' একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস কন্যার অজ্ঞাতে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সমীরণে মিশাইয়া দিয়া অমলা উত্তর দিল,—'উপায় নেই মা, উপায় নেই, পুরুষরা আমাদের যে চোখেই দেখুক না কেন ওদের পদানত হ'য়ে ওদের আশ্রয় নিয়ে আমাদের থাকতেই হ'বে নইলে আরও বিপদ চারদিক হ'তে ঘিরে আসবে। উপায় নেই বলেই তো এই সংসারের মধ্যে তোকে—না শেফালী কাপড় পর আর ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করিস নে, আমায়ও আর ব্যস্ত করে তুলিস্ নে। ভগবান্ তোর ভালই কর্ব্বেন।' বাহিরে কয়েকজনের পদশব্দ শুনিয়া সাগ্রহে দ্বারের দিকে চাহিয়া অমলা বলিল,—'দিদি আসছেন বুঝি।'

কয়জন প্রতিবেশিনীর সহিত মাধবী ঘরে আসিলেন। উৎকণ্ঠার সহিত অমলা বলিল,—'বাঁচলুম দিদি এসেছ, দাও তো মেয়েটাকে সাজিয়ে ওঁরা এসেছেন তো।'

কাপড়-জামা ছুটী তুলিয়া লইতে লইতে মাধবী বলিলেন, 'দাদা নীচে বসে আছেন। আয় শেফা' বলিয়া তিনি স্বয়ং শেফালীর কাপড়-জামা পরিবর্ত্তন করাইয়া দিয়া হাত ধরিয়া নীচে লইয়া বসিলেন। অমলা ব্যগ্র উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল কি একটা অজানিত আশঙ্কার আভাস তাহার রক্তহীন মুখখানাকে আরও বিমর্ষ করিয়া তুলিয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া তাহার সর্ব্বদেহ স্পন্দিত হইতেছিল। কোনমতে তিনি যেন আপনাকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। মেয়ে দেখা হইয়া গেলে সুসজ্জিতা শেফালীর হাত ধরিয়া মাধবী হাসিমুখে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অমলা ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—'কি দিদি কি হ'ল?'

'ভয় নেই রে তোর, মেয়ের বের ফুল সত্যিই এবার ফুটেছে। শেফাকে দাদার খুব পছন্দ হয়েছে, তিনি এই মাসের মধ্যে বে দিতে চান।'

'সত্যি বলছ?'

'দেখ তো পাগল, সত্যি ছাড়া কি ঠাট্টা কচ্ছি আমি, তুই কি ভাবিস বল তো, তোর মেয়ের বে আর হ'বে না।'

'সত্যি দিদি, সত্যি আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না যে সত্যি শেফার এত সৌভাগ্য হ'বে যে, সে বৌ হয়ে ঘর করতে পার্ব্বে।'

মাধবী হাসিয়া বলিলেন, 'অসুখ ভোগ করে' করে' তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। অমলা গরীবের ঘরে কাল কুতসিৎ মেয়ে তাদের সব বে হচ্ছে আর তোমার অমন সুন্দর মেয়ে, অত টাকা খরচ কর্ব্বে, তার বে হ'বে না কেন?'

'কেন?'

অমলার শুষ্ক ওষ্ঠ বারেকমাত্র স্পন্দিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার দেহের নিঃশেষিতপ্রায় শোণিতটুকু সর্ব্বাঙ্গ ছাড়িয়া শুধু মুখখানাকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে অস্বাভাবিক আরক্ত করিয়া তুলিল। তাহার পর একটা মর্ম্মভেদ যাতনাকে সে যেন সবলে দমন করিয়া বহুকষ্টে বলিল,—'আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, তাই ভয় হয়।'

'আর ভয় নেই, ভাই মেয়ে পছন্দ হয়েছে, দেনা-পাওনা নিয়ে কোনও গোল হ'বে না। কথা শুধু, তুমি এখন ছেলে দেখার কি কর্ব্বে?'

'কি আর কর্ব্ব দিদি? জান তো আমার কেউ নেই,

তোমরা যা কর্ব্বে তাই হ'বে। আমার ছেলে দেখার কোন দরকার নেই।'

'তবে দাদাকে সেই কথা বলে' দিন ঠিক কর্ত্তে বলি; দিন ঠিক করে' কাল তোমার খবর দেব। আজ তবে আসি আমরা। তুমি এইবার একটু শুয়ে পড় আর যেন অসুখ বাড়িও না।'

কষ্টে হাসিয়া অমলা বলিল,—'না, শেফালীর বের আগে আমার কিছু হ'বে না ভাই, শেফালীর একটা উপায় না হ'লে আমি তো মরেও শান্তি পাব না। জোর করেও আমার সে জন্যে বেঁচে থাকতে হ'বে।'

'আহা ওকথা কেন বলছ? সেরে উঠে মেয়ে-জামাই নিয়ে সুখে ঘর কর; চিরজীবন তো দুঃখেই গেল। আসি তবে'—বলিয়া মাধবী চলিয়া গেলেন। অন্য সকলেও তাহার অনুগমন করিল।

অমলাকে শোয়াইয়া দিয়া নিশ্চলভাবে শেফালী তাহার শিয়রে বসিয়া রহিল। একটা অজানিত অননুভূতপূর্ব্ব ভীতি তাহার অন্তরে ছায়া বিস্তার করিয়া সমস্ত দেহ-মন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-শান্তির কল্পনা তাহার মনকে একেবারেই স্পর্শ করিতে পারিল না।

তিন

মাধবীর ভ্রাতুষ্পুত্র নীহারের সহিত শুভদিনে শেফালীর বিবাহ হইয়া গেল। নীহার সর্ব্বরূপেই আকাঙ্ক্ষিত সুপাত্র। তাহার বলিষ্ঠ দেহের রূপলাবণ্য, তাহার নম্র মধুর স্নিগ্ধ ব্যবহার, অমলার ব্যাধিক্লিষ্ট দেহ-মনকে বরষা-ধারা-পুষ্ট তটিনীর মত আনন্দের প্লাবনে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল। তথাপি সেই অজানিত আশঙ্কার ভাবটা সে মন হইতে কিছুতেই দূর করিতে পারিল না। রহিয়া রহিয়া সে কাঁপিয়া উঠিতেছিল—শেফালীকে নিকটে আনিয়া বার বার বক্ষে চাপিয়া ধরিতেছিল। জননীর সহিত বিচ্ছেদ-আশঙ্কা শেফালীকেও অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে মাতা ভিন্ন জগতে আর কাহাকেও সে দেখে নাই, পিতার কথা লেশ-মাত্র তাহার মনে পড়ে না। একান্ত নির্ভরের সহিত মাতাকে আশ্রয় করিয়া তাহারই শীতল স্নেহ-ছায়ায় সকল ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটাইয়া সে এত বড় হইয়াছে। মাকে ছাড়িয়া একদিনও তাহাকে অন্যত্র থাকিতে হয় নাই। মাতার বিচ্ছেদ-চিন্তা তাই তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। মনোমত স্বামী পাইয়াও সে সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে জননীর অন্তরস্থ অমঙ্গল-আশঙ্কা শেফালীর চিত্তেও ছায়া ফেলিয়া তাহাকে শঙ্কিত করিয়া তুলিতেছিল। মাতার বিষণ্ন মুখের দিকে চাহিয়া সে ক্রমশঃই ক্ষুব্ধ ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। সে যোগ্যপাত্রে অর্পিত হইয়াছে, তাহার জন্য চিন্তার আর কোন কারণ নাই, তথাপি জননীর উন্মনা ব্যাকুলভাব দেখিয়া সে মনে মনে বড়ই ব্যথা পাইতে লাগিল—সে ভাবিতে লাগিল মাতার দুঃখের অন্য কোন গোপন কারণ আছে। প্রতিবেশীদের যত্ন-চেষ্টা, মাধবী ও শ্যামরতনবাবুর কর্ত্তৃত্বে বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। আশার অতিরিক্ত যৌতুকাদি প্রাপ্তে পাত্রের পিতাও অত্যন্ত তুষ্ট। অস‍ন্তোষ-অভিযোগ কোন পক্ষেই কিছুই ছিল না।

পরদিন কন্যা-বিদায়ের অনতিপূর্ব্বে নীহারের পিতা দেবনাথবাবু শ্যামরতনবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন,—'ওহে আমার বেনঠাকরুণের সঙ্গে একবার দেখা করে যাব না? বিশেষ তিনি যখন অসুস্থ তখন দেখা করাটা উচিত নয় কি?' শ্যামরতনবাবুও ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—'ঠিক, ও কথাটা আমার মনেই হয় নি। তোমাদের মধ্যে যখন চিরদিনের জন্য একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল তখন উভয় পক্ষে দেখা করা ও কথাবার্ত্তা হওয়া উচিত। বেশ আমি খবর দিয়ে আসি।' কিছুক্ষণ পরে শ্যামরতনবাবু উপর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'যাও তুমি, সেখানে শুধু তোমারই ছেলে বৌ আছে।'

সোপানের সম্মুখে আসিয়া দেবনাথবাবু বলিলেন,—'একা একা যেতে কেমন বাধ বাধ ঠেকছে। তুমি এস না হে। তিনি আমাদের সামনে বার হন না তো, এত দিন এখানে আছেন কখন কেউ তাঁর পায়ের আঙুল পর্য্যন্ত দেখতে পায় নি। ভারী সংকোচ-কুণ্ঠা তাঁর, তুমি আপনার লোক হ'লে তাই তোমার সঙ্গে দেখা করছেন। যাও তুমি।'

'তবে একাই যাই, বড় বাধ বাধ ঠেকে' বলিতে বলিতে দেবনাথবাবু সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলেন। শ্যামরতনবাবু ব্যস্তভাবে কন্যাবিদায়ের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না দেখিতে গেলেন। কক্ষদ্বারের রক্তাভ রেশমী যবনিকা সরাইয়া দেবনাথবাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন। শেফালী ও নীহারকে নিকটে বসাইয়া অমলা কি বলিতেছিল। মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া বৈবাহিকের দিকে চাহিয়া সে যুক্তকরে ললাটস্পর্শ করিয়া বলিল,-"আসুন।"

দেবনাথবাবু কি বলিতে গিয়াই অকস্মাৎ অত্যন্ত চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অমলারও সমস্ত দেহ ঝঞ্ঝা-বিকম্পিত তরুশাখার মত সজোরে কাঁপিয়া উঠিল। একটা অস্ফুট কাতরধ্বনি তাহার ওষ্ঠভেদ করিয়া বাহিরে আসিল মাত্র। তাহার দুর্ব্বল কম্পমান দেহ ভূতলে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই নীহার দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। শেফালী ব্যাকুল বিহ্বলনেত্রে শুধু জননীর দিকে চাহিয়া রহিল। কি যে ঘটিল, কেন অমলা এমন হইয়া পড়িল সে একটুও অনুমান করিতে পারিল না। শেফালীর দিকে চাহিয়া নীহার ব্যগ্রভাবে বলিল,—'শীগ্‌গির একটু জল আন তো, তোমার মার মুখে চোখে দিতে হ'বে।'

দেবনাথবাবু এতক্ষণ নির্ব্বাক্‌ভাবে চাহিয়াছিলেন, পুত্রের কথায় সচকিতভাবে বলিয়া উঠিলেন,—'কি বল্লে নীহার ওই ওর মা।'

বিস্মিতভাবে পিতার দিকে চাহিয়া নীহার বলিল,—'হাঁ আমার শাশুড়ী।'

'তোমার শাশুড়ী? কি সর্ব্বনাশ!' অসহ্য ক্রোধে দেবনাথের সর্ব্বদেহ কাঁপিতেছিল। চোখদুটা হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলিয়া উঠিল। ইহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া নীহার অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেও বাহিরে সেভাব প্রকাশ না করিয়া সহজকণ্ঠে বলিল,—'সর্ব্বনাশের কি হ'ল বাবা, আমার শাশুড়ী ঠাকুরুণকে তুমি চেন না কি?'

'চিনি বৈ কি।' তারপর জলদগম্ভীরকণ্ঠে নীহারের শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'মৃন্ময়ী চিনতে পার আমাকে?'

অমলা বেতসপত্রের মত পুনরায় কাঁপিতে লাগিল।

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া অত্যন্ত কটু চাপাকণ্ঠে দেবনাথ বলিল,—'কথার উত্তর দাও?'

শেফালী স্তব্ধ বিহ্বলভাবে চাহিয়া ছিল; এসব কথার কোন মর্ম্মই সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, শুধু এইটুকু বুঝিতেছিল কি একটা দারুণ বিভ্রাট্, একটা ভীষণ বিপদ তাহাকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়াছে। আর নীহার নির্ব্বিকারভাবে পিতার দিকে চাহিয়াছিল।

দেবনাথ কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিল,—'আমায় তুমি নিশ্চয় চিনেছ? কেন তুমি আমার এ সর্ব্বনাশ করলে,—এর পর আমি লোক-সমাজে মুখ দেখাব কি ক'রে? কেন তুমি এ শত্রুতা কর্‌লে আমার সঙ্গে?'

কষ্টে মাথা তুলিয়া অমলা বলিল,—'আমি জানতুম না যে নীহার তোমার সন্তান।'

দারুণ রোষে বিকৃতকণ্ঠে দেবনাথ বলিল,—'আমার ছেলে বলে নাই বা জানলে, যে কোন ভদ্রসন্তান বলে জানতে তো? তবে কোন্ সাহসে তুমি ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বে দিলে, ধর্ম্মের ভয় তোমাদের নেই জানি কিন্তু আইনের ভয়ও কি রাখ না? কি মনে করেছ তুমি?'

নীহার স্থিরভাবে পিতার কথা শুনিয়া যাইতেছিল। শেফালীর মুখে একটা গভীর আতঙ্কের চিহ্ন ক্রমশঃই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, সে যে কি শুনিতেছে তাহাই কেবল বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কেন যে তাহার সহিত কোন ভদ্রসন্তানের বিবাহ হইতে পারে না তাহা সে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাহার বা তাহার মাতার অপরাধ কি? তাহার মাতাই বা কেন অমন মুহ্যমান হইয়া পড়িল। সবই যেন তাহার নিকট প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার আবাল্য অত্যন্ত সুনির্ম্মল জীবনও যেন গভীর কালিমা-সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। এ রহস্যের মূল কোথায়? কি ঘৃণ্য বার্ত্তা তাহার মধ্যে নিহিত আছে তাই বা কে জানে?

মাতা ও কন্যার বিবর্ণ মুখের দিকে ব্যথিতনেত্রে চাহিয়া নীহার বলিল,—'কথাটা কি বাবা আমার শান্ত হ'য়ে বল তো; ওঁর ওপর আর কেন কটুকাটব্য কচ্ছ, দেখছ না উনি কষ্ট পাচ্ছেন?'

পিতা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—'কাল যে হ'য়েছে, আজই ওদের উপর এত দয়া—কিন্তু ওরা তোর কি সর্ব্বনাশ করেছে জানিস?'

'যাই করুন তবু এ অবস্থায় ওঁদের ওপর পীড়ন করা উচিৎ নয়, কি করেছেন উনি তাই বল না।'

রোষকষায়িতনেত্রে একবার অমলার দিকে চাহিয়া দেবনাথ বলিলেন,—'ওকেই জিজ্ঞাসা কর না নিজমুখে পরিচয়টা দিক। শয়তানী এখানে সতী-সাবিত্রী সেজে বসে ভদ্র-ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলেই কি লোকে ওকে ভদ্রঘরের কুলবধূ বলবে না হিন্দুঘরের সীতা-সাবিত্রীর একজন বলে মনে ক'রবে?' ওকে আমি এখনি জেলে দিতে পারি।'

শেফালী সংজ্ঞাহীনার মত মাতার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। তখনও অমলার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইতেছে না দেখিয়া দেবনাথ গর্জ্জন করিয়া অমলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল,—'আচ্ছা থাক তুমি, দেখছি আমি তোমার দৌড় কতদূর? সতীলক্ষ্মী সাজা তোমার বার কচ্ছি আমি। আমার ছেলে না জেনে তোমার ঘরে বে করেছে তা'তে তার কিছু ক্ষতি হ'বে না। ওটাকে ত্যাগ করে এখনি দশটা বিয়ে সে কর্ত্তে পার্ব্বে। তুমি যাতে আর কারো মাথা এভাবে খেতে না পার তার ব্যবস্থা এখনি কচ্ছি। কি ভয়ানক প্রতারণা, আচ্ছা এখনি আমি পুলিশে যাচ্ছি, আগে তো এ পাড়ার সকলকে ডেকে তোমার সত্য পরিচয়টা জানিয়ে দিই দেখ মজাটা। আর নীহার দেখছি ওকে আমি?' বলিয়া সবলে দেবনাথ নীহারের হাত ধরিয়া টানিলেন। পিতার আকর্ষণে সে নড়িল না, ব্যথিত করুণ নেত্রে শেফালী ও অমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শেফালীর অর্দ্ধলুণ্ঠিত দেহ অরুন্তুদ মর্ম্মযাতনায় এক একবার স্পন্দিত হইতেছিল। দেবনাথের কথাগুলা বিষশল্যের মত অন্তরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বদেহ জ্বালাইয়া তুলিতেছিল; সে মাঝে মাঝে ভাবিতেছিল তার অভাগিনী জননী যদি পাপের পথ হইতে তাহাকে দূরে রাখিতেই চাহিয়াছিল তবে চিরকুমারী রাখিল না কেন? মিথ্যা আশার মোহে ক্ষণিক সুখের অঞ্জন চোখে লাগাইয়া কেন চিরদিনের মত তাহার সর্ব্বদেহ-মনে দহন জাগাইয়া তুলিল। আবাল্য সঙ্গিনীদের আদর্শে সেও ভবিষ্যৎ জীবনের কত সুখের চিত্র, ঘর-সংসারের মধুর কল্পনা অন্তরে আঁকিয়া রাখিয়াছে, যাহাতে তাহার কোন অধিকার নাই। যে সংসারে দাঁড়াইবারও অধিকারী সে নয় তাহারই সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গৃহলক্ষ্মীর আসনে সে বসিতে গিয়াছিল? পথের ধূলাই যে তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থান। ঐ স্বামী, শুভদৃষ্টির সময়ই হিন্দু বালিকার চিরন্তন সংস্কারবশে কুমারী জীবনের সযত্ন-রক্ষিত প্রেমের সম্পুটখানি যাঁহার পদে উজাড় করিয়া দিয়া সে রিক্ত হইয়াছে এখন তিনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন না ইহা নিশ্চিন্ত। এ সম্ভাবনা সত্বেও কেন জননী তাহার বিবাহ দিয়া জীবনটা আরও বিষময় করিয়া তুলিল। এই ক্ষণকালব্যাপী সুখ স্মৃতি আজীবন তাহাকে দগ্ধ করিবে! মরুপথে তৃষিত পথিককে মরীচিকা যেমন বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, গাঢ় তিমিররাশির মধ্যে চকিত বিজলী-বিকাশ পথহারা পান্থকে যেমন আরও পথ ভুলাইয়া দেয় তাহার অভিশপ্ত জীবনের মধ্যে এ স্বর্গের আলো তাহাকে তেমনই কোন্ পথে লইয়া চলিল? জন্মান্ধের দুঃখ তত বেশী হয় না, যত হয় দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হইয়াও যাহারা উহা হারাইয়া থাকে তাহাদের। পূর্ব্ব হইতে আপন সত্য পরিচয় জানিলে সে জীবনের গতি অন্যরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে পারিত।

পুত্রের দিকে চাহিয়া ভ্রুভঙ্গী করিয়া দেবনাথ বলিলেন,—'আবার দাঁড়িয়ে রইলি কেন বল?'

এবার পিতার দিকে চাহিয়া নীহার দৃঢ়স্বরে বলিল, 'ব্যস্ত হয়ো না বাবা আমায় ভাবতে দাও।'

'ভাববার কি আছে এতে শুনি, চল নীচের আগে ওর পরিচয় সকলকে দিই? সতী-লক্ষ্মী সাজার মজাটা বুঝিয়ে দিই?'

'থাম, থাম বাবা, দেখছ ওদের অবস্থা।'

'ও দয়া যে উথলে উঠল, চল হতভাগা' বলিয়া সজোরে দেবনাথ আবার তাহাকে টানিলেন। একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে নীহার বলিল, 'একটু অপেক্ষা কর বাবা ওঁর মুখ থেকে শুনতে দাও আমাকে।'

'হতভাগা উল্লুক আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? শুনবি আবার কি?'

অমলার শীর্ণ কপোল বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। সেই

দিকে চাহিয়া কোমলকণ্ঠে নীহার বলিল, 'মা আপনার কি বলবার আছে?'

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে অমলা বলিতে লাগিল,—'তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার কাছে বড় অপরাধী।'

'কিছু না কিছু না, আপনি তো কোন অন্যায় করেন নি। নিঃসন্তানকে পাপের পথ হ'তে রক্ষা করাই তো বাপ-মার কর্ত্তব্য।'

অমলা আরও আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—'আমায় ক্ষমা কর বাবা, শুধু মেয়ের স্বার্থের জন্যই এ কাজ আমি করে বসেছি।' বাবা আজ চোদ্দ বছর ধরে যে অনুতাপানলে জলে মর্‌ছি—সে জালা থেকে কথঞ্চিৎ শান্তি পাব মনে করে আমার অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী তোমাদের বলব। বাস্তবিকই এর পূর্ব্বে আমি সতীত্বে সীতা-সাবিত্রীর চেয়ে কোন অংশে হীন ছিলাম না। বড়লোকের মেয়ে—সতী-সাধ্বীর গর্ভে জন্মে সতীত্বের ধারণা খুবই উঁচু ছিল। মা-বাবাকে হারিয়ে যাঁর হাতে পড়েছিলাম—তিনি ছিলেন বড়লোকের ছেলে—সকল রকম দোষই তাঁতে ছিল। তবু তিনি ছিলেন আমার উপাস্য দেবতা। আমার চোখে কোনদিন তাঁর কোন দোষই পড়ে নাই! অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য যকৃতে ফোড়া হয়ে তিনি মারা যান—রেখে যান ঐ শেফালীর মত অম্লান কুসুমটাকে। তোমার বাবা ছিলেন আমার স্বামীর অকৃত্রিম বন্ধু। তার মৃত্যুর পর তিনি আমাকে কুপথে আন্‌বার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নাই। তারপর আমার সঙ্গীত-শিক্ষক তিনিও আমার স্বামীর জনৈক বন্ধু, স্বামীই তাঁকে আমাকে কীর্ত্তন গান শেখাবার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি আমার ধর্ম্মনষ্ট করেন। অল্পদিনের মধ্যেই আমার মোহ কেটে গেল—বৈষ্ণবপদ গাহিতে গাহিতে, প্রেমের ভজন করতে করতে, প্রেমের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে অনুতাপানলে পুড়তে লাগলুম—পুড়ে পুড়ে এখন আমার দেহ-মন ছাই হ'য়ে গেছে—চোদ্দ বছরের অভিশপ্ত-জীবনের এই আমার সত্য ইতিহাস। অনেকবার মনে হয়েছে শেফার [illegible] কথাটা খুলে বলি,—বলতে আরম্ভ করেও [illegible] বোধ [illegible] পারি নি—দুর্ব্বলতাও কতকটা ছিল। এখন 'লজ্জা ভয় মান' সব দূর করেছি—দুর্ব্বলতার হাত থেকেও রক্ষা পেয়েছি মনে হচ্ছে—জগতে কারোর কোন ক্ষতি করি নাই—তোমারও যে বিশেষ কিছু ক্ষতি করেছি তা মনে হচ্ছে না—তবে তোমার কাছে আনুপূর্ব্বিক সব কথা খুলে না বলেই বিয়ে দিয়েছি। বাবা এটার মূলেও স্বার্থ আছে। তবে তোমার বাবার কাছে কোন দিন কোন দোষ করি নি—আর এইটাও জান্‌তাম না যে, তুমি দেবনাথবাবুর সন্তান! দোষ যা করেছি তা তোমার কাছেই করেছি—'

ব্যঙ্গের সুরে দেবনাথ বলিলেন,—'কিছু না এতে আর দোষ কি? এখন মেয়েকে আমাদের ঘাড়ে চাপালে।'

উজ্জ্বল দৃষ্টিতে পিতার দিকে চাহিয়া নীহার বলিল,—'তুমি একটু চুপ কর বাবা।'

অমলা বলিতে লাগিল,—'আমি আমার মেয়েকে একটা আশ্রয়ে স্থাপন কর্ত্তে চেয়েছিলুম। আমার পাপে ওকে আপনারা শাস্তি দেবেন না, ও সম্পূর্ণ নিরপরাধ ওকে নিয়ে যান, আকুল মিনতিপূর্ণ নেত্রে সে দেবনাথের দিকে চাহিল।

বিকৃতকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—'আহা কি কথাই বল্লেন, ওকে নিয়ে যান শান্তিপুরের মা গোঁসাই কি না উনি তাই মাথায় করে বাড়ী নিয়ে যাব? বলতে লজ্জাও করে না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা তোমার'—তাহার পর পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'নীহার সব কাহিনী শোনা হ'ল তো এইবার বাড়ী চল—তারপর ওকে জব্দ কর্চ্ছি আমি—এস।'

নীহার শেফালীকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কাল রাত্রে দেবতা ও ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করে যার সকল ভার গ্রহণ করেছি তার কি হ'বে?'

'তার কি হ'বে আমি কি জানি?' ওদের ভাবনা তো তোকে ভাবতে হ'বে না, তুই বাড়ী চল, দেখ ওর কি করি?'

'এতে তোমার লাভ হ'বে কিছু?'

'লাভ না হ'ক—ক্ষতি যা হয়েছে—'

বাধা দিয়া নীহার বলিল,—'ক্ষতি কিছু হয় নি, যথেষ্ট টাকা যৌতুক পেয়েছ, বৌও সুন্দরী হ'য়েছে, তবে ক্ষতিটা কি?'

দেবনাথ রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন,—'উল্লুক, ওয়ার আমার সঙ্গে বাঁদরামি?'

ত্রস্তে পিতার পদস্পর্শ করিয়া ব্যথিতভাবে নীহার বলিল, 'আমাকে তুমি এমনই অপদার্থ মনে কর বাবা?'

দেবনাথ একটু শান্তভাব ধারণ করিয়া বলিলেন,—'তবে?'

'তবে আর কি?'

'হতচ্ছাড়া ছেলে তবু হেঁয়ালী ছাড়বি নি। কি যে বলিস কিছু বুঝি না ও আমার বৌ হ'ল কি করে?'

'বাঃ কাল ওর সঙ্গে আমার বে হয় নি?'

'তা হ'লেই বা, তাই বলে বেশ্যার মেয়ে আমার বৌ হ'বে?

'তা কি করা যাবে বাবা দেবদ্বিজ-অগ্নি সম্মুখে রেখে যাকে গ্রহণ করেছি সে যাই হ'ক স্ত্রী ভিন্ন অন্য কিছু তো আর তাকে বলা যাবে না—ওর জন্মের তো দোষ নেই—আর চরিত্রেরও দোষ নেই। কি বলে আমি ওকে ত্যাগ করি।'

দেবনাথ ধৈর্য্য হারাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—'ওরে বাঁদর এত টাকা খরচ করে তোকে লেখাপড়া শিখানই আমার বৃথা হ'ল, ওকে স্ত্রী বলছিস তুই?'

'বিয়ে যখন করেছি তখন ও ভিন্ন কি বলব?'

'বটে ওকে ঘরে নিয়ে যাবি না কি?'

'কোথায় রেখে যাব বল—ওর ভার সবই তো আমার আজীবন বহন কর্ত্তে হ'বে। কাল থেকে সে ব্যবস্থা তোমরাই তো করে দিয়েছ?'

'ওরে গরু, তখন কি জানতুম ওর মা—'

কথাটা সম্পূর্ণ হইতে না দিয়া নীহার বলিল,—'ও কথা থাক বাবা ওর মা যাই হ'ক—ওর দোষ কি?'

'ওর দোষ থাক আর না থাক ওকে ঘরে নেওয়া হ'বে না।'

'আমার স্ত্রী তা হ'লে থাকবে কোথায়?'

অসহ্য ক্রোধে আরক্তমুখে দেবনাথ করপদ অগ্রসর হইয়া আসিলেন। দুর্ব্বিনীত পুত্রের পৃষ্ঠদেশে গোটা কত চড় বসাইয়া দিবার অদম্য আগ্রহ স্থান-কাল ভাবিয়া বোধ হয় তাঁহাকে সংবরণ করিতে হইল। দাঁত মুখ খিঁচাইয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন,—'তুই একেবারে উচ্ছন্ন গেছিস, ওকে স্ত্রী বলতে সংকোচ হচ্ছে না।'

'না বাবা, স্ত্রীকে স্ত্রী বলতে কোন সংকোচই আমার হচ্ছে না, কিন্তু আর বাদ-প্রতিবাদে কাজ নেই—আমার যা বলবার আছে আগে শোন, শুনে তোমার যা হয় কর'? ওকে যখন আমি বিয়ে করেছি, তখন ওর সব ভার আজীবন বহন কর্ত্তে, স্ত্রীর যোগ্য মর্য্যাদা, স্নেহ ওকে দিতে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমি বাধ্য। সে যাই হ'ক ওর জননীর অতীত জীবন আমার দেখ্‌বার প্রয়োজন নাই—আমি দেখছি বর্ত্তমান—দেখছি ও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, নির্ম্মল—পূর্ব্বে ওর মার একদিন পদস্খলন হয়েছিল সত্য কিন্তু আজ তিনি অনুতাপানলে সম্পূর্ণ অপাপবিদ্ধ—শুদ্ধ। তিনি শুধু তোমার বৌয়ের মা নন—আমারও মা। সন্তানের শুভকামনায় সর্ব্বত্যাগী তাঁর মাতৃহৃদয়কে আমি শ্রদ্ধা না ক'রে থাকতে পারছি না। আমার কথা এই—আমার স্ত্রীকে আমি ত্যাগ কর্ত্তে পারব না, তাকে যদি ঘরে স্থান দাও তবেই আমি তোমার সঙ্গে যাব, নয় তো আমায় দূরেই থাকতে হ'বে। আমি তো অক্ষম নই, যে-ভাবেই হ'ক ধর্ম্মপত্নীকে আশ্রয় দিতে, তার সব ব্যয় নির্ব্বাহ কর্ত্তে পারব। তবে সন্তানের কর্ত্তব্য আমি ভুলব না? তুমি আমায় দূরে সরিয়ে দিলেও আমি চিরদিন তোমাদের পদানত হ'য়েই থাকব, তবে ওকে যখন গ্রহণ করেছি, তখন ত্যাগ আমি কর্ত্তে পারব না, আমার এ অবাধ্যতা তুমি ক্ষমা কর। বল এখন কি কর্ব্ব?'

দেবনাথ হতবুদ্ধি হইয়া পুত্রের শান্ত নির্ব্বিকার মুখের দিকে চাহিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শান্তিপুর-চিত্র

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

চার

এইবার শান্তিপুর ও ভাগীরথীর পারস্পরিক সংস্থিতি-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাউক। এককালে শান্তিপুরের মধ্যস্থ চৌগাছা পল্লীর ভিতর দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়; গঙ্গাতীরস্থ চারিটী প্রাচীন বৃক্ষের জন্য ঐ পল্লীর নাম না কি 'চৌগাছা' হয়, উহা[illegible] মধ্যে একটী বৃক্ষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। (১)

হেজ্ সাহেব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর তদানীন্তন কারখানা সমূহের এজেণ্ট বা গবর্ণর ছিলেন। তিনি ১৬৮২ খৃ[illegible] [illegible]ই অক্টোবরের রোজনামচায় লিখিতেছেন যে, ম:-বাবাকে [illegible] শান্তিপুরের [illegible] লিয়ায় রবিবারে এক বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় তাঁহারা মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়াছিলেন এবং ঐখানেই কোম্পানীর সোরার নৌকা আসিত। পুনরায় কাশিম-বাজার যাইবার সময় তিনি ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল রাত্রিতে শান্তিপুরের ('Santapore') নিকট বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং ১১ই এপ্রিল নদী বাহিয়া বাগাঁচড়ায় ('Bogatcher') গিয়াছিলেন। তিনি কোম্পানীর এক বজরায় ছিলেন, ডড্ ও হেরন্ সাহেব নিজের বজরায় ছিলেন এবং ১০ খানি নৌকায় ('Ulock, Ulak, Holak, Qolock') সৈন্য, বাবুর্চ্চি, খান্‌সামা, ভৃত্য, আর্দ্দালি প্রভৃতি ছিল। "বাগাঁচড়া সুন্দর স্থান; তথাকার ভূস্বামী তাঁহার সংরক্ষিত হরিণ, ময়ূর প্রভৃতি দেখাইলেন; কিন্তু আমরা একটীও পাইলাম না।" (২)

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৯এ-৩০এ জুন হল্‌ওয়েল সাহেবকে বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদ লইয়া যাইবার পথে শান্তিপুরের সম্মুখীন স্থানে ('Opposite to Santipore') একখানি নৌকায় ('Wollack') করিয়া আনা হইয়াছিল। হল্‌ওয়েল্ 'কলিকাতা অঞ্চলের দুর্দ্দান্ত (Black) জমিদার' ছিলেন এবং অন্ধকূপ-হত্যার বিবরণের প্রচারক বলিয়া খ্যাত; কিন্তু অন্ধকূপ-হত্যার বিবরণ যে অপ্রামাণিক এবং গ্রে (ছোট) সাহেবই যে ইহার প্রথম প্রচারক তাহা প্রমাণিত হইয়াছে; হল্‌ওয়েলের বর্ণনার তারিখেরও গোল-মাল আছে।(১) যাহা হউক, হল্‌ওয়েলের শান্তিপুর আগমনের কথা লং সাহেবও তাঁহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন। হল্‌ওয়েল্ শান্তিপুরের জমিদারগৃহ নদী হইতে ১॥০ মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত বলিয়াছেন। এবং ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত মানচিত্রে (২) শান্তিপুরের অবস্থান নদী হইতে দূরে প্রদর্শিত আছে। লিখিত আছে যে শান্তিপুরের নিকট নদীর জল হ্রাস হওয়ায় তরী আর অগ্রসর হইল না। তখন একজন প্রহরীকে 'সেই জেলার' জমিদারের নিকট পাঠান হইল। তাঁহার উপর রাজবন্দীকে মুর্শিদাবাদ লইয়া যাইবার জন্য ক্ষুদ্র তরী সরবরাহের আদেশ ছিল। জমিদার পাইক-সাহায্যে উক্ত প্রহরীকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ইহা শুনিয়া তরীর জমাদার তাহার অধীনস্থ লোকদিগকে বন্দুক, ঢাল ও তরবারি দ্বারা সজ্জিত করিয়া জমিদারকে বন্ধন করিয়া মুর্শিদাবাদ লইয়া যাইবার জন্য সাক্ষাৎ প্রমাণস্বরূপ হল্‌ওয়েল্ সাহেবকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। সাহেবের পায়ে তখন যন্ত্রণাদায়ক স্ফোটকা-বলী হইয়াছিল, শৃঙ্খলের জন্যও ব্যথা লাগিতেছিল এবং রক্ত পড়িতেছিল। সুতরাং সাহেব শৃঙ্খল খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু বাঘ বা বাতাসের নিকট আবেদনের ন্যায় উহা গ্রাহ্য হইল না। তাহারা বলিল,

---

(১) শা[illegible]

(২) Hedge's Diary

(১) Modern Review, March 1931—Further Light on the Black Hole

(২) Holwell—Interesting Historical Events

শক্তি

শিল্পী—শ্রীদেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী

ইহা আলিনগরের (কলিকাতার) কেল্লা নয়।' সাহেব কখনও কখনও হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিল। দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য্যতাপ, ১৯॥০ মাইলের উপর পথ; দুর্ব্বলতা ও অকথ্য যন্ত্রণায় প্রতি পদক্ষেপে সাহেবের পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিল। জমিদার বরকন্দাজ লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন। রক্ষীরা হল্‌ওয়েলকে দেখাইল এবং 'বন্দীর মূল্য ৪ লক্ষ টাকা' বলিল। তখন জমিদার ভ্রম স্বীকার করিলেন। কিন্তু জমাদার উঁহাকে বাঁধিবার আদেশ দিল। এইবার জমিদার ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন, ক্ষতিপূরণ করিতে সম্মত হইলেন এবং তরীসংগ্রহের ভার লইলেন। তখন 'নির্দ্দয় পামরেরা' সাহেবকে পথে কিছুদূর আনয়ন করিবার পর তাহাকে ধরিয়া এবং ঢাল দ্বারা আবরণ করিয়া (রৌদ্রের জন্য) লইয়া চলিল। একজন নিম্নপদস্থ গোমস্তা সাহেবকে চিনিত, তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল এবং সে সাহেবকে একছড়া কলা দিল; কিন্তু পথে প্রহরী তাহার অর্দ্ধেক কাড়িয়া লইল। প্রতিশ্রুত তরী আসিল না। পরদিন (৩০এ জুন) উহারা একখানি ছোট জেলে-ডিঙ্গী জোর করিয়া ধরিয়া আনিল; উহাতে মাত্র সাহেব ও দুইজন প্রহরীর স্থান হইল; বাঁশের শয্যা হইলেও পূর্ব্বের বৃহৎ তরণীর অপেক্ষা মসৃণ ও আরামদায়ক ছিল; স্থানের অভাবে ক্লেশ হইতে লাগিল এবং স্বল্প স্পন্দনেই সাহেবের স্ফোটকে বা ক্ষতে ব্যথা লাগিতে লাগিল। ৭ই জুলাই তরী মুর্শিদাবাদে পৌঁছিল। পথে সাহেবকে বরাবর পর্য্যায়ক্রমে মুষলধারে বৃষ্টি বা প্রখর রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। প্রহরী শেখ বহুল কৃপা করিয়া সাহেবকে কলা, পেঁয়াজ, মুড়িগুড়, করোলা প্রভৃতি দিয়াছিল। মুর্শিদাবাদে সাহেবকে মুক্ত অশ্বশালায় রাখা হইয়াছিল। সেখানে ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিক্ ল ও ভার্ণেট্ এবং ইহুদী বণিক্‌বর্গ হইতে সাহেব যথেষ্ট অনুগ্রহলাভ করিয়াছিল। ইংরেজের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য সাহেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় শহরের পথে পথে প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল। (১)

শান্তিপুরের ইতিহাসে ভাগীরথী অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। বখ্‌তিয়ার খিলিজি ১১৯৮ (মতান্তরে ১২০৩) খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ-গমনের পূর্ব্বে শান্তিপুর ও ঘররার মধ্যবর্ত্তী 'বক্তার' ঘাটে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুকবি শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক্ বলেন, "শান্তিপুরের 'বক্তারের ঘাট' শান্তিপুরের বক্তার নামক কোনও মুসলমান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইলেও উহা 'বখতিয়ার খিলিজির ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং শান্তিপুরের নিকটস্থ কদমপুরে বখ্‌তিয়ার প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম কদম (=পা) পুর হইয়াছে, ইহা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে।" (১) ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রতিপত্তিশালী দেওয়া[illegible] সিংহ একবার শান্তিপুরের ঘাটে বজরা[illegible] তিনি ভক্ত ও দাতা ছিলেন বলিয়া উলা[illegible] কিছু আদায় করার উদ্দেশ্যে সেই সম[illegible] হইলেন। প্রত্যেকেরই মল্লবেশ এবং হস্তে[illegible] আসিয়াই বলিলেন, "বেটা সিংহ কোথায়[illegible] বাহির হইলে, দলপতি বলিলেন, "মায়ের সিংহের পায়ে ব্যথা হইয়াছে। তিনি স্বপ্নে বলিয়াছেন [illegible] এবার তোমার স্কন্ধে চাপিয়া আসিবেন। তাই আমরা রজ্জু লইয়া আসিয়াছি তোমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইব।" উদ্দেশ্য সিদ্ধ[illegible]

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়, [illegible] চন্দ্র ও রসসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ [illegible] তাঁহাদের শান্তিপুর-তলস্থ ভাগীরথীতে [illegible] অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একক[illegible] রাজধানীর সন্নিকটস্থ সমৃদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল এবং উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরাও স্বাস্থ্যান্বেষণে [illegible] ভাগীরথীতে আসিয়া বাস করি[illegible] অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ প্রভু ব্রহ্ম[illegible] শাস্তমুনি, শাস্তাচার্য্য, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি বহু মহাপুরুষের লীলাপ্রকাশ শান্তিপুর-কুলিয়ার গঙ্গাতেই বা গঙ্গাতীরে হইয়াছিল। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন শান্তি[illegible] ভাগীরথীর বিস্তর সুখ্যাতি করিয়াছেন। [illegible] মিত্র শান্তিপুরের ভাগীরথীর এইরূপ অ[illegible]

"পরিহরি কালনার গৌরাঙ্গ
শান্তিপুরে সুরধুনী দিল দরশন"

(১) Holwell—Indian Tracts (1764)

(১) মহানাদ (২) নবী[illegible]

(৩) আমার জীবন। যুবক, আষাঢ় ১৩৩৭

যথায় ভবানীপতি 'ভক্ত অবতার',
হ'লেন 'অদ্বৈত' নামে, হরিতে ভূভার।
চৈতন্যের দীক্ষাগুরু অসীম-গৌরব,
খৃষ্ট-অবতারে যথা 'জনে'র সম্ভব।

*　　*　　*

সারি সারি কত নারী নবীনা সুন্দরী,
চলিতেছে হাস্য-মুখে পথ আলো করি।
বাজিছে মোহন মল চঞ্চল চরণে,
ডিছে অঞ্চল চারু চল সমীরণে।
ভব-মনোরমা-সমা রামাগণ,
সিল আনন্দে করি গঙ্গা দরশন।
ঞ্চল পেঁচিয়ে কান্ধে বান্ধিয়ে কোমর,
ভাসাইল নব অঙ্গ গঙ্গার উপর।
একেবারে কত রামা জীবনে ভাসিল,
কমলে কমলে যেন কমল ঢাকিল।" (১)

নবীনচন্দ্রও 'আমার জীবনে' শান্তিপুরের মেয়েদের ন্ধ ভাল ও মন্দ দুই বলিয়াছেন। দাশরথী রায় দ ও সোণামণির দ্বন্দ্বে' লিখিয়াছেন, "কান্তি পুরের মেয়ে।" মনস্বী ভোলানাথ চন্দ্র র মেয়েদের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য, বাক্‌পটুতা ও কেশ-বিপাট্যের কথা লিখিয়াছেন। (২)

n Santipur women are observed that light female form, that slender and delicate hat graceful shape and elegance of and that smooth, soft body, which e native beauty of Bengal. They have a great repute for their hair-braiding, to which the poet has done justice in the *va Sundar*. But Milton's 'amorous nets' Bharatchander 'snaky braids'. (৩) ation and sparkling wit, also distinguish the Santipur women". ভোলা ময়রা বলিতেন,

শান্তিপুরের শালী ভাল, ভাল তার খোঁপা।
গুপ্তিপাড়ার মেয়ে ভাল, ভাল তার চোপা॥

(মতান্তরে)

শান্তিপুরের শালী ভাল, গুপ্তিপাড়ার মেয়ে।
মাণিককুণ্ডের মূলো ভাল, চন্দ্রকোণা ঘিয়ে॥ (১)

আর একটী অনুরূপ বাক্য চলিত আছে—

উলার মেয়ে কুল কুলুটী, ন'দের মেয়ের খোপা।
শান্তিপুরে নথ নাড়া দেয়, গুপ্তিপাড়ার চোপা॥ (২)

শান্তিপুরের বিদ্যার খ্যাতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ৺দীনবন্ধু মিত্র শান্তিপুরের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সম্বন্ধে লিখিতেছেন,

পবিত্র অদ্বৈতবংশ-পঙ্কজ-তপন,
সাহসী 'গোঁসাই' ভট্টাচার্য্য মহাজন।
পণ্ডিত-পটল-পদ্ম প্রভাময়-মতি,
বিচারে বিরাজে মুখে আপনি ভারতী।
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-পতি আরাধ্য তাঁহার,
তিনি কি পূজেন কভু কোন অবতার?
দ্বিজদল গর্ব্ব করি বলিল সভায়,
"গৌরাঙ্গ পরম ব্রহ্ম সংশয় কি তায়?"
উত্তর 'গোঁসাই' দিল ব্রহ্মবাদী ন্যায়,
"সন্দ নন্দ-নন্দনেতে, গৌরাঙ্গ কোথায়!" (৩)

৺রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি নিজ বাটীতে বিগ্রহ 'বিশ্বমোহনের' প্রতিষ্ঠা করাইয়া ছিলেন। সুতরাং দীনবন্ধু বাবুর ঐরূপ ব্যাখ্যা বিকৃত মনে করিয়া শান্তিপুরস্থ বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা বলেন যে ঐ বাক্যের অর্থ এইরূপ—"যখন লোকে শ্রীকৃষ্ণকে বোঝে কি না সন্দেহ, তখন তাহারা 'রাধাভাবদ্যুতি-সমন্বিত' কৃষ্ণকে অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গকে কেমন করিয়া বুঝিবে?"

লং সাহেব-বর্ণিত উক্ত রাস্তাটী সপ্তদশ শতাব্দীর চতুর্থাংশে নদীয়ারাজ রুদ্র রায়ের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্য আনুমানিক ৯ মাইল। (২)

রধনী। (২) Travels of a Hindoo.
াইয়া বিমোহিনী বেণীর শোভায়।
পিনী—তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।

(১) শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর সংগৃহীত।
(২) নদীয়া-কাহিনী (৩) সুরধনী

পাঁচ

লং সাহেব লিখিতেছেন, "১৮২৮ খৃষ্টাব্দ (১) পর্য্যন্ত শান্তিপুরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর বাণিজ্যের কুঠী (Commercial Residency) বর্ত্তমান ছিল। তন্তুবায়দিগের নিকট হইতে কোম্পানী বৎসরে ১২ হইতে ১৫ লক্ষ টাকার বস্ত্র খরিদ করিতেন। রেসিডেণ্টের বেতন বাৎসরিক ৪২,৩৫১৲ টাকা ছিল এবং তিনি নিজের লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত মর্ম্মরমণ্ডিত তল-সমন্বিত প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করিতেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বড়লাট মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লী এই বাটীতে দুইদিন ছিলেন। ইহা পরে মাত্র ২,০০০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। (২) মার্জ্জরিব্যাঙ্কস্ শেষ কুঠীয়াল ছিলেন এবং তাঁর কার্য্যেই কোম্পানীর ব্যবসা নষ্ট হয়। (৩) ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুরের নিকটস্থ নীলের কুঠীর বিবরণ পাওয়া যায়—ইউরোপীয়ের অধীনে গঙ্গাধরপুরে, কালীঘাটে, নন্দঘাটে ও হুর্ণী (চুর্ণী) খালের ধারে ঐরূপ কুঠী ছিল। নদীয়ার নদীসমূহের তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক মে সাহেব ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুর হইতে নবগঙ্গা-তীরস্থ মজরা পর্য্যন্ত একটী প্রস্তাবিত খালের জন্য জরিপ করিয়াছিলেন; উহা কার্য্যে পরিণত হইলে সমগ্র বৎসরই বড় নদীর সহিত সংযোগ থাকিত। স্থায়ী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিয়োগ না হওয়া পর্য্যন্ত ভাগীরথী-তীরস্থ সকল স্থানের মধ্যে শান্তিপুরেই বেশী ডাকাতি হইত। এমন কি জমিদারেরা ও ভদ্র 'বাবু' লোকেরা পর্য্যন্ত ডাকাইতদের সহিত যোগ দিত। রাত্রিতে কেহ শান্তিপুরের ধার দিয়া যাইতে সাহস করিত না। এখন প্রহরী-নৌকা রাখা হইয়াছে, উহারা ক্ষিপ্রগতি এবং উহাদের জন্য নদীতে ডাকাতি বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।"

শান্তিপুরে 'কুঠীর পাড়া'য় 'মাজবিন্' সাহেবের ঐ কুঠী ছিল। কারখানার মধ্যে ছোটটীকে 'থাই' ও বড়টাকে 'বানক' বলিত। শান্তিপুর হইতে এককালে ২২॥০ লক্ষ টাকার মসলিন রপ্তানী হইত। "Santipur was once the centre of a flourishing weaving industry, and its muslins had a European reputation, the town being the site of a Commercial Residency and the centre of large factories under the E. I. Co. Owing to the Competition of machine-made goods, however, the weavers are no longer prosperous.... ..

Santipur was once famous for its weavers, and in the beginning of the 19th Centary the agent of the East India Company used to purchase muslins to the annual value of £15 ,000 (=Rs. 22,50,000). The industry, however, has almost died out." (১)

শান্তিপুরের কুঠীয়াল ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১৯এ আগষ্টে লিখিত সরকারী-পত্রের বলে শান্তিপুরে একটী প্রকাণ্ড মদের ভাঁটী প্রস্তুত করান। (২)

সহৃদয় স্যর হেন্‌রি কটন মাজবিন্ সাহেব-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "It was in the early twenties that J. Marjoribanks—*one of the last* of the Commercial Residents of the Company, who enjoyed a salary of £5,000 per annum and lived in a magnificent house which cost £ 10,000 and was sold on his retirement in 1828 for £ 2,00—was a partner in Mr. Hill's Indigo concern at Neechindipore in the Chooadanga subdivision. Then Shore was Magistrate and Ogilvie Collector of Naddia and the Hon. Mr. Ramsay, an uncle of Lord Dalhousie, was Resident of Maldah". (৩)

মাজবিন্ সাহেব যে শেষ কুঠীয়াল ছিলেন না তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সাময়িক কলিকাতা-

(১) ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্যবসায় ছিল অনুমান হয়।
(২) এখন ইহার কিছুই নাই।
(৩) তজ্জন্য তিনি না কি জহর চুষিয়া আত্মহত্যা করেন।

(১) Imperial Gazetteer, Vol. X
(২) No. 13414, Hunter's Bengal Mss. Records
(৩) Indian and Home Memories

গেজেটের ঘোষণায় দেখা যায় যে শান্তিপুরের বাণিজ্যিক কুঠীয়ালের সহকারী জে-জি-লায়ল্ ৩রা এপ্রিল হইতে এক সপ্তাহের জন্ত ছুটি পাইয়াছিলেন। (১)

শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায়বংশ ও প্রামাণিক-বংশ প্রভৃতি এই কুঠীর দেওয়ানী করিয়া বা ইহার সহিত ব্যবসায়াদি করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছিলেন। "অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হুগলী জেলার ইলছোবা মণ্ডলাই-নিবাসী ফুলিয়া মেলের ৺জানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বংশে ৺রাজবল্লভ চট্টোপাধ্যায় শান্তিপুর মদনগোপাল পাড়ার ভট্টাচার্য্য-বংশে বিবাহ করিয়া কুলভঙ্গ করেন এবং তদবধি শান্তিপুরে বাস করেন। সে সময় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী সূতা ও বস্ত্র ব্যবসায়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। তখন শান্তিপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে অনেক তন্তুবায়ের বসতি ছিল এবং শান্তিপুরের মসলিনের খ্যাতিও বিলক্ষণ ছিল। কোম্পানী এই সূত্রে শান্তিপুরে বড় কারখানা (factory) খোলেন। নৌকাযোগে শান্তিপুর হইতে কলিকাতায় বস্ত্র রপ্তানী হইত। ২০০ বৎসরে ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বের ভাগীরথীর অবশেষ এখনও 'নেজোর' নামে খ্যাত। এই নেজোরের নিকট উক্ত কারখানার ধ্বংসাবশেষ-চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। (২) ১৮১২ খৃষ্টাব্দে (৩) সনন্দ (Charter) দ্বারা ই-আই-কোম্পানীর ব্যবসা ভারতে রহিত করা হয়, সেই সময় শান্তিপুরের কুঠী বন্ধ হয়। এই সকল কুঠীতে সেই সময় একজন বা দুইজন ইংরেজ কর্ম্মচারী থাকিতেন। বেশীর ভাগ কাজ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর দ্বারাই সম্পন্ন হইত। রাজবল্লভ নবপ্রতিষ্ঠিত কুঠীতে কর্ম্ম পান। পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সততার জন্ত তিনি ক্রমে দেওয়ান বা প্রধান বাঙ্গালী কর্ম্মচারী হন। পুত্র রামপ্রসাদ ও পৌত্র রামসুন্দরও দেওয়ান ছিলেন। এই জন্ত ঐ গোষ্ঠীকে লোকে 'দেওয়ান চট্টজ' বলিত। শান্তিপুরের কুঠীর সাহেবরা অনেক সময় কলিকাতায় কোম্পানীর অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত হইতেন। চট্টোপাধ্যায়েরা বহু লোককে কলিকাতায় ও অন্ত মহকুমায় কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। রামসুন্দরের দ্বিতীয় পুত্র রামমোহন কলিকাতায় পুলিশ কমিশনার (?) ও ম্যাজিষ্ট্রেটের (Blacquiere) দেওয়ান ছিলেন। রামসুন্দরের চতুর্থ পুত্র কাশীনাথ পুলিশ ইন্স্পেক্টর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ গোলকনাথ ও অপর তিন পুত্র শান্তিপুরের কুঠীতে (১) কর্ম্ম করিতেন এবং নিজ জমিদারীর তত্ত্বাবধারণ করিতেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রকাশিত Twining's 'Travels in India' পুস্তকে এই চট্টোপাধ্যায়-বংশের উল্লেখ আছে।" (২)

কোম্পানীর ব্যবসা রহিত হইলেও, কুঠীর ভগ্নাবশেষ বহুদিন দণ্ডায়মান ছিল। "In the time of Rudra Rai Santipur was populous and had a celebrated cloth-mart. The Government purchases of Santipur muslin, which then had a European reputation, averaged over 12 lakhs (৩) during the first 28 years of the 19th Century. The last remains of these factories were pulled down and sold between 1870 & 1880. The name 'Kuthirpara' (rows of factories) still remains." (৪)

এখানে প্রসঙ্গতঃ Blacquiere সাহেবের কথা আসিয়া পড়িতেছে। "মোকাম শান্তিপুরের রামমোহন চট্টোপাধ্যায় অনেক কাল পর্য্যন্ত শ্রীযুত ব্ল্যাকির সাহেবের দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অনেক লোকের সাহায্য ও সৎকর্ম্ম করিয়া সৌজন্যরূপে এতাবৎ কালক্ষেপ করিয়াছেন সংপ্রতি তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে এবং সাহেব তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে (৫) সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তিনিও উপযুক্ত মত কর্ম্ম করিতেছেন।" (৬) "কলিকাতা হইতে Blacquiere সাহেবের অধীনে কতকগুলি বলিষ্ঠ ইউরোপীয় গোরা আনাইয়াও শান্তিপুর হইতে বহুসংখ্যক গোড়া উপর গোষ্ঠী (গোড়ো গোয়ালা ?) সংগ্রহ করিয়া বিখ্যাত দস্যু

(১) সমাচার-দর্পণ, ২১|০ ও ৩|৪|১৮৩০

(২) বোধ হয় কেবল 'কুঠীরপাড়া' এই নামে।

(৩) '১৮১২'র পরিবর্ত্তে '১৮৩৩' হইবে অনুমান হয়।

(১) এক পুত্র রাধানাথ দেওয়ান ছিলেন—শান্তিপুর-স্মৃতি

(২) শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—বংশ পরিচয়

(৩) পূর্ব্বে ২২|০ লক্ষ লিখিত হইয়াছে।

(৪) J. Garrett—Nadia District Gazetteer (1910)

(৫) রাধানাথ (?)

(৬) সমাচার-দর্পণ, ২৪|৬|১৮২০

বিশ্বনাথের পালিত-পুত্র বৈদ্যনাথের সাহায্যে সরকার শীঘ্রই বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হন।" (১) ইহা ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

লিখিত হইয়াছে যে মাজবিন্ সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার শিশুপুত্র ব্ল্যাকিয়ার শান্তিপুরের চট্টোপাধ্যায়-বাটীতে লেখাপড়া শেখেন ও ডাল-ভাত খাইয়া মানুষ হন, পরে বিলাত যান, পরে কলিকাতা হইতে শান্তিপুরে আসিয়া ডাকাত দমন করেন। (২) ইহা কিরূপে সম্ভব? কলিকাতার লোয়ার সাকুলার রোডের গোরস্থানের স্মৃতিফলকে লিখিত আছে—William Coates Blacquiere ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট মারা যান; তিনি ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন; তিনি হুগলী, নদীয়া, যশোহর এবং বাখরগঞ্জ জেলার দস্যুদমনে নিযুক্ত হইয়া যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখান; তিনি ৫৩ বৎসরেরও উপর কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও জষ্টিস্ অব্ দি পিস্ ছিলেন; ইত্যাদি। (৩) এই সূত্রে আর একটী অনুরূপ ঘটনার বিষয় লিখিত হইতেছে। শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব, পণ্ডিত ও কবি ৺হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয়ের পিতা ৺রাধামাধব প্রামাণিক মহাশয় একবার একটী অসহায় সাহেব বালককে বিপন্মুক্ত করিয়া তাহাকে আশ্রয়দানে প্রতিপালন ও তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৪)

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুর কুঠীর তত্ত্বাবধায়ক আড়ঙ্গের প্রধান কর্ম্মচারীকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় যে, ১৭৬৩ হইতে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শান্তিপুরের বাণিজ্যাধিকার ব্যাপারে ইংরেজের সহিত ফরাসী ও ওলন্দাজের কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। "In obedience to the Board's requisition, I have made the strictest enquiry throughout the Aurangs under my superintendence and cannot find that any foreign European Company hath either established factories or publicly deputed European or Native agents to trade at or purchase the manufactures of Santipore or its subordinates. The Dutch have constantly made *dadney* contracts deliverable at Chinsurah. During the years 177-5 6 and 1777 Mr. Bilow, a French gentleman, hired a small Bungalow in Santipore and, as I am informed, purchased a few cloths for his own account without interfering with the Company's weavers or exhibiting any public commission whatever.

This is the only European except the Company's Agents who has appeared in the Santipur districts for any purpose of trade since the year 1763 to the knowledge or remembrance of the inhabitants of this Factory.

True Copies & Extracts,
John Bebb,
Secretary." (১)

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত হলওয়েলের বর্ণনায় শান্তিপুরের মলমল ও বস্ত্রশিল্পের কথার উল্লেখ আছে। "N. E. of Calcutta, distant about 3 days' journey, lies Krishnager, the fort and capital of Rajah Kissen Chand. He possesses a tract of country of about twelve days' journey; and it is taxed at 9 lacs per annum; though his reveunues exceed 25 lacs. His principal towns are Santipur, Nuddeah, Bouren, &c, where mullmulls, 'coffaes' (কথার বস্ত্র?) and cotton

(১) নদীয়া-কাহিনী

(২) শান্তিপুর-স্মৃতি (৩) Bengal, Past & Present, 1910, Vol. V, p. 312. (৪) যুবক, চৈত্র ১৩১৫

(১) Bengal, Past & Present, 1909. Vol, III. p. 368: Extract of a letter from Mr. Prinsep, Superintendent of Santipore, to the Comptroller of Aurangs, dated the 10th April, 1784.

yarn are manufactured for the European markets; the country produces 'copofs' (কাপাস ?) and grain, but not sufficient for exportation." (১)

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের রোজনামচায় ৺ ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন যে শান্তিপুরে দশ সহস্রের অধিক তন্তুবায় ও দর্জ্জি ছিল। "The place, however, enjoys a great repute for the manufacture of fine cotton cloths—it being, in this respect, next to Dacca in Bengal. There are yet in Santipur upwards of ten thousand families of weavers and tailors." (২)

শান্তিপুরে যে ডাকাতির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করা গেল। "কোম্পানীর Export Warehouse-keeper শান্তিপুরের ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত কোম্পানীর গোমস্তাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত, নিম্নলিখিত অভিযোগটী বোর্ডের নিকট পেশ করিয়াছিলেন—

"রামচন্দ্র সেন, পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র সেন, সহসা দুই তিন শত অশ্বারোহী সিপাহী ও বরকন্দাজ লইয়া 'শান্তিপুরের আড়ঙ্গে' উপস্থিত হয়। পঞ্চাশ জন লোক আড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহারা আমাদিগকে বলে যে রামচন্দ্র সেনের নিকট আমাদের তথনই হাজির হইতে হইবে। আমরা ইহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তাহারা বলপূর্ব্বক আমাদের গোমস্তা মনোহর ভট্টাচার্য্যকে ধরিয়া লইয়া যায়। এই ভট্টাচার্য্য, কোম্পানীকে সূতার যোগান দিত। তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়ায় কোম্পানীর কাজ অচল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের এরূপ করিবার কারণ যে কি, তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। এজন্য আমরা নিধিরাম মুখোপাধ্যায় ও গোপাল ভট্টাচার্য্যকে আপনাদিগের নিকট কলিকাতায় পাঠাতেছি। ইহাদের নিকট সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া আপনারা এ বিষয়ে তদন্ত করিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।" (১)

এই সূত্রে শান্তিপুরের আশানন্দ-সম্বন্ধে ঢেঁকী বা বাবলা গাছ লইয়া ডাকাত তাড়ান, ডুমু-দহে ডাকাতের কুঠীর মধ্যে হইতে দুই জন ডাকাতকে দুই বগলে করিয়া গুপ্তিপাড়া পর্য্যন্ত আনা (২) প্রভৃতি অনেক গল্প প্রচলিত আছে। ডাকাতেরা অনেক সময় অগ্রে সংবাদ দিয়া ডাকাতি করিত। ইতিপূর্ব্বে দস্যুদমনে সরকার শান্তিপুরের গোড়ো গোয়ালার সাহায্য লইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় একসময়ে শান্তিপুরের ভাগ্যে মিথ্যা দুর্নাম রটিয়াছিল। প্রায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দের সমকালে উলাকে দস্যুদমনে সাহসের জন্য 'বীরনগর' আখ্যা প্রদানের পর "শান্তিপুরে দস্যুভীতি হওয়ায় তত্রস্থ অধিবাসিগণ নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করিলে, সাহেব তাহাদের ভয় দেখিয়া শান্তিপুরের 'গাধানগর' নাম প্রদান করিয়াছিলেন।" (৩) এই প্রসঙ্গে শান্তিপুরের আধুনিক যুগের শক্তিচর্চ্চা এবং ব্যায়ামবীর শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামীর 'গোস্বামী ইন্‌ষ্টিটিউট্' প্রভৃতির কথাও সগৌরবে উল্লেখযোগ্য।

স্কুল

লং সাহেব লিখিতেছেন, "শান্তিপুরে একটী ইংরেজী বিদ্যালয় (৪) আছে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির হিল্, ওয়ার্ডেন্ ও ট্রাউইল্ সাহেব শান্তিপুরে বক্তৃতা দিতেন। তাঁহারা বলেন যে, এখানকার লোকেরা খুব সরল এবং সাধারণ বাঙ্গালীর তুলনায় তাহারা অধিক আগ্রহপূর্ব্বক সত্যগ্রহণ করে। শান্তিপুর উপযুক্ত প্রচারক্ষেত্র হইতে পারে কি না এ সম্বন্ধে নিম্নরূপ বিবরণী লিখিয়া অনুকূল মত দিয়াছিলেন—শান্তিপুরে অন্ততঃ ৫০,০০০

(১) Holwell—Interesting Historical Events

(২) Travels of a Hindoo

(১) Long—Selections from Unpublished Records (1869); সেকালের ও একালের : Proceedings of the Secret Department, dated 12. 11. 1764

(২) দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন; ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩১

(৩) নদীয়া-কাহিনী

(৪) হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয় (?)

বাসিন্দা আছে ; ২০,০০০ বাটীর মধ্যে বহু পুরাতন অট্টালিকা আছে ; ইহার সন্নিকটে বৃহৎ জনপূর্ণ গ্রাম আছে : ১০,০০০ বাসিন্দা পূর্ণ 'গুপ্তপাড়া' ইহার ৬৷০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ৪৫,০০০ জনপূর্ণ অম্বিকা এবং কালনা নামক দুইটী পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ইহার প্রায় ৪ মাইল দূরে ; জনসমূহের নৈতিক অনুভূতি ও সদয় ব্যবহার বোধ হয় কোম্পানীর বিদ্যালয়গুলির (প্রাথমিক ?) সাধারণ শিক্ষা হইতেই প্রধানতঃ সম্প্রাপ্ত (১) ; ১২ মাইল দূরবর্ত্তী কৃষ্ণনগর হইতে চিকিৎসা-সাহায্য পাইবার সুযোগ আছে এবং ইহা নদীর নিকটবর্ত্তী হওয়ায় কলিকাতা যাতায়াতের সুবিধা আছে।"

লং সাহেব ও ভোলানাথবাবুর বর্ণনায় বহুস্থলে সাদৃশ্য বর্ত্তমান। ভোলানাথবাবু লিখিতেছেন, "Once Santipur was a large, populous, and manufacturing town. Now it has not half this number (20,000) of houses...The descendants of Nityananda are Gossains of Khurdah. The descendants of Adwaita are Gossains of Santipur. There, the principal idol is Shyamsoonder. Here, the principal idol is Shyamchand. One-third of the people are Vaishnavas. There are yet many *tols* or seminaries, in this town, but much fewer than in former times. No Brahmin, however, now marries 100 wives, nor does any widow think of sutteeism, but re-marriage. The Baroary Poojah, that used to be celebrated here with the greatest eclat, has gone out of vogue." (২)

দীনবন্ধু লিখিয়াছেন,

> সুরপুর-সমপুর শান্তিপুর ধাম,
> গায় গায় অট্টালিকা শোভা অভিরাম।
> কিবা ঘাট, কিবা বাট কিবা ফুলবন,
> যে দিকে চাহিয়া দেখি জুড়ায় নয়ন।
> নিবসতি করে লোক সংখ্যা নাহি তার,
> গোঁসাই দরজি তাঁতি হাজার হাজার।
> শান্তিপুরে ডুরে শাড়ী সরমের অরি,
> 'নীলাম্বরী', উলাঙ্গিনী', 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী'। (১)

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ও অন্য সময়ের ঝটিকা, বন্যা প্রভৃতি দুর্য্যোগে শান্তিপুরের বহু গৃহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আর্থিক অবস্থাও পূর্ব্বের ন্যায় নহে। তবে নূতন অট্টালিকাও অনেক উঠিয়াছে। "লোকসংখ্যা-হ্রাসের কারণ—১৮৮০-৫ খৃষ্টাব্দের ম্যালেরিয়া, ১৮৮৫ ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের বন্যা, কলিকাতা ও কলসমূহে লোকের প্রয়াণ।" (২) ইহা ছাড়াও অন্যান্য অনেক কারণ আছে—গঙ্গার অপসৃতি, বাণিজ্যের অবনতি, মহকুমা স্থানান্তরকরণ, কর্ম্ম উপলক্ষে বহির্গমন, মন্বন্তর, প্লেগ ও সংক্রামক রোগের বাহুল্য, বর্গীর হাঙ্গামা, দস্যুভয়, বিভিন্ন সময়ের প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যবিষয়ে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুসারে শান্তিপুরের লোকসংখ্যা ২৪,১৯২, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে উহা ২৬,১০৩, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২৬,৮৯৮, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৩০,৪৩৭, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ২৯,৬৮৭ এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ২৮,৬৩৫ ছিল।

শান্তিপুরে পূর্ব্বোক্ত বারোয়ারী পূজায় এখন আর সেরূপ ব্যয় হয় না বা ব্যয় করিবার ক্ষমতার অভাব। "১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বারোয়ারী দুর্গা পূজায় শান্তিপুরে ৭,০০০৲ টাকা (তখনকার দিনে) ব্যয় হইয়াছিল।...একটী ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, তাহাতে ২০টী ছাত্র আছে, প্রত্যেকের মাহিনা মাসিক ১৲ টাকা।" (৩) উহা অপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। "গুপ্তিপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি কল্‌কেতার নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামে ক'বার বড় ধুম ক'রে বারোয়ারী পূজো হ'য়েছিল। এতে টক্করাটক্করিও বিলক্ষণ চ'লেছিল। একবার শান্তিপুরওয়ালারা, ৫ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে এক বারোয়ারী পূজা করেন ; সাত বৎসর ধ'রে তার উজ্জুগ হয়, প্রতিমাখানি ৬০ হাত উঁচু হ'য়েছিল।-শেষে বিসর্জ্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জ্জন

(১) সত্য বা কি ? পূর্ব্বোক্ত দোষগুলিরও ঐ কারণ নয় তো ?

(২) Travels of a Hindoo

(১) সুরধুনী

(২) Nadia District Gazetteer (1910)

(৩) The Friend of India, 24. 4. 1845

ক'ত্তে হ'য়েছিল। তা'তেই গুপ্তিপাড়াওয়ালারা মা'র অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁধে এক বারোয়ারি পূজো করেন, তা'তেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।... পূর্ব্বে চুঁচড়োর মত বারোয়ারী পূজা আর কোথাও হ'তো না।" (১)

বর্ত্তমানকালে শান্তিপুরে গতায়াতের অনেক সুবিধা হইয়াছে এবং আধুনিক বিদ্যালয়ও অনেকগুলি হইয়াছে, কিন্তু চতুষ্পাঠী ১।২টী কোনও মতে বজায় আছে। সেকালের যে বিদ্যালয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা শান্তিপুরের উত্তরাংশে 'বানকে' (একরূপ শান্তিপুরের বাহিরে) অবস্থিত ছিল, কোম্পানীর কুঠীর সাহেবেরা উক্ত ট্রেণিং পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীমোজাম্মেল হক্ বলেন যে, সেখানকার অধ্যাপক ৺রামকমল বিদ্যালঙ্কার বিখ্যাত 'প্রকৃতিবাদ' অভিধান প্রণয়ন করেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পাদ্রী বোমওয়েচ্ সাহেবের আদেশে আনুমানিক ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় 'ধাতুবিবেক' গ্রন্থ লিখেন, ইহা পরে (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে) ব্যাপ্টিষ্ট্ মিশন মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। (২) সাধু হরিমোহন প্রামাণিকের জীবনীতে লিখিত আছে, "তাঁর প্রথম বয়সে (জন্ম ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ) শান্তিপুরের মধ্যে কোন বিদ্যালয় ছিল না। তাঁর পিতা ৺রাধামাধব প্রামাণিক তৎকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় সকলেরই শিক্ষক ছিলেন। পরে সরকারের যত্নে রামনগরে বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, উহা বেশী দিন ছিল না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মিশনারীদের দুইটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, একটী শান্তিপুরের উত্তরাংশে ও অপরটী রামনগর পল্লীতে। (৩) "৺দীনদয়াল প্রামাণিকের যত্নে শান্তিপুরের মিশনারী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।" (৪) শান্তিপুরে মিশনারীদের উদ্যম বড় বেশী সাফল্যলাভ করে নাই। প্রথমে ৺কৃষ্ণময় ও রামময় ভট্টাচার্য্য খৃষ্টান্ হওয়ায় কিঞ্চিৎ সামাজিক আন্দোলন হইয়াছিল। তারপর কেহ কেহ খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শান্তিপুরের বাহিরে চলিয়া যান। তন্মধ্যে একজনের বিষয়ে এ স্থলে কিছু লিখিত হইল। শান্তিপুরের বল্লভ বংশের জমিদার ৺নবকুমার মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রেভারেণ্ড ৺পিয়ারীমোহন মুখার্জ্জি বি-এ, বি-ডি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করায় পিতা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৬৮ বৎসর বয়সে মারা যান। লণ্ডন মিশনারী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ মুলেন কর্ত্তৃক তিনি পাঠদ্দশায় প্রায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুরে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি পরে ডফ্ কলেজে পড়িয়াছিলেন। ইনি ইংলণ্ডীয় গীর্জ্জার পাদরী ছিলেন এবং সুন্দরবন মিশনের তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছিলেন। ইনি বিশপ্ কলেজে অধ্যাপকতা করিতেন। তাঁর পুত্র মিঃ পি, সি, মুখার্জ্জি এল, এম, এস কলিকাতায় ইটালীতে বাস করেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন স্বাস্থ্য-বিভাগীয় কর্ম্মচারী। সংস্কৃত-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ৺নীলমণি মুখোপাধ্যায় পিয়ারীমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, তাঁহার এক পুত্র আলিপুরের উকীল, ইনি কলিকাতায় নীয়োগীপুকুর লেনে বাস করেন। (১)

১৯২১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনায় শান্তিপুর থানায় (১টী নগর ও ৬১ খানি গ্রাম) মাত্র একজন খৃষ্টান্ ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। সম্প্রতি একজন খৃষ্টান্ চিকিৎসক (ডাঃ এমবার্ট) আছেন এবং মেয়েদের জন্য মিশনারীদের একটী হাঁসপাতাল হইয়াছে।

ভোলানাথবাবু শান্তিপুরের গোস্বামীদিগের সম্বন্ধে এক ছত্র লিখিয়াছেন। এখানে সামান্যতঃ বলা যায়, "অদ্বৈতাচার্য্যের বংশধরেরা প্রধানতঃ শান্তিপুরে, শিবালয়ে ও উথলী গ্রামে বাস করেন। ইঁহাদের শাখাপ্রশাখা ঢাকা, ময়মনসিং, কোচবিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, বগুড়া, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর ইত্যাদি স্থলে বিস্তৃত হইয়াছে। দোলগোবিন্দকে (অদ্বৈতপুত্র কৃষ্ণ মিশ্রের পুত্র) ঈশান

(১) হুতোম পেঁচার নক্সা

(২) যুবক, চৈত্র, ১৩২৩

(৩) শান্তিপুর-রত্ন

(৪) যুবক, চৈত্র, ১৩১৫

(১) উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন পুত্র এখন আলিপুরের উকীল নাই। তাঁহার এক পুত্র শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় বহু বৎসর পূর্ব্বে আলিপুরের ওকালতি ছাড়িয়া Benares Anglo-Vernicular বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়া কাশীধামে যান এবং কয়েক বৎসর হইল মারা গিয়াছেন। —সম্পাদক

নাগরের বংশধর শান্তিপুর হইতে শিবালয় আনেন। তাঁর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রত্নেশ্বর নাটোরের ব্রহ্মত্ব পাইয়া ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার উথলীতে (১) বাস করেন। দোলগোবিন্দের এক শাখা শিবালয়ে ও দুই শাখা উথলীতে আছে। উথলীতেও উত্তর পাড়ায় ও দক্ষিণ পাড়ায় দুই (?) দল। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ পাড়ায় বিগ্রহ আছে। রত্নেশ্বর-পৌত্র রামচন্দ্র হইতে মধ্য পাড়ায় বড় আটানী ও লক্ষ্মীনারায়ণ হইতে মধ্য পাড়ায় ছোট আটানী ঘর। লক্ষ্মীনারায়ণের জ্যেষ্ঠ নবকিশোর হইতে কাটোয়ার বড়প্রভু ও ছোটপ্রভুর ঘর হইয়াছে। উথলীতে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের ধারার বর্ত্তমান ২৬ ঘর হইয়াছে। এই বংশে পঞ্চম দোল-পর্ব্ব (তিন দিন ধরিয়া হয়) পূর্ব্ববঙ্গে বিখ্যাত। দোলমঞ্চ তিনটী সুবৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ।" (২)

ক্রমশঃ

(১) নদীয়া জেলার উথলী নয়

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ড : ২য় অংশ

ছড়া

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

সঙ্কলয়িতা—শ্রীইন্দুবিকাশ বসু

(৩০১)

যার ছেলেকে কুমীরে খায়,
সে ঢেঁকী দেখলে ভয় পায়।

(৩০২)

পরের জন্য গর্ত্ত খোঁড়ে,
আপনি তা'তে প'ড়ে মরে।

(৩০৩)

মুড়ি আর ভুঁড়ি,
সব রোগের শুঁড়ি।

(৩০৪)

নেশাতে বুক ফাটে,
কুকুরে বুক চাটে। মুখ

(৩০৫)

বচনের বলিহারি হারি হইয়াছে,
সমুখে কি যেতে পারি ও মুখের কাছে।

(৩০৬)

রজকের লাভ কোথা উরজের কাছে,
কাটা গাছে জল দিয়ে ফল কিবা আছে ?

(৩০৭)

মনোহর, হিতকর—
খুঁজিলে না পাই বরাবর।

(৩০৮)

খুন করলে খুনে,
পরের কথা শুনে।

(৩০৯)

এক হেঁসেলে তিন রাঁধুনী—
পুড়ে ম'ল তার কেন গাদুনী।

(৩১০)

অন্তত্রা বরষা কাল,
হরিণী চাটে বাঘের গাল।
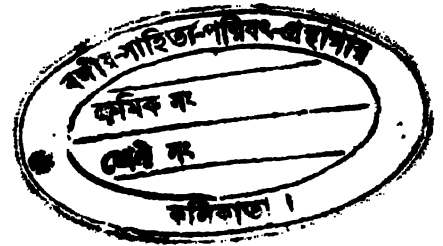
শোন রে হস্তিনী তোরে কই,
সময়গুণে সবই সই।

(প্রবল ব্যক্তি বিপদে পড়িলে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তাহার সম্মুখীন হইয়া অপমান করিতে সাহসী হয়।)

(৩১১)

বারটা ঝাড়লুম তেরটা মোলো,
তুই না ম'রে অপযশ হোলো।

(৩১২)

ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ী,
আমার যে আমি তারি।

(৩১৩)

নাই মাগ, নাই পুত,
বেড়ায় যেন যমদূত।

(৩১৪)

দিয়ে ধন বিড়েন মন,
কেড়ে নিতে তার কতক্ষণ?

(৩১৫)

ক'নের মা কাঁদে,
টাকার পুঁটলী বাঁধে।

(৩১৬)

বার বার মুরগী খেয়ে যাও ধান,
এইবার মুরগী বধিব পরাণ।

(৩১৭)

যদি হয় লুচী,
মুচীর বাড়ীই রুচি।

(৩১৮)

মুচীর এক কাম;
খায় আর শোয়, আর সেঁয়ে চাম।

(৩১৯)

ভাগের ভাগ পেলে,
না খেয়ে চিবিয়ে ফেলে।

(৩২০)

ঘরে থাকতে নানা নিধি,—
খেতে দেয় না দারুণ বিধি।

(৩২১)

খেয়ে দেয়ে যায় শুতে,
বিধাতা নে যায় মুলো চুরি করতে।

(৩২২)

নেশার রাজা মদ,
তা হ'তে কড়া তোষামদ।

(৩২৩)

মোরে বল কালো কালো,
যার কালো তার মায়ের ভালো।

(৩২৪)

কত সাধ যায় রে চিতে,
মলের আগে চুট্‌কী দিতে।

(৩২৫)

কত সাধ হয় রে চিতে,
ফোগলা গালে মিশি দিতে।

(৩২৬)

নিত্য চাষার ঝী,
বেগুন-ক্ষেত দেখে বলে—
এ আবার কি?

(৩২৭)

মাঘের শীত বাঘের গায়
ক্ষীণের শীত সর্ব্বদায়।

(৩২৮)

নিত্য রাজা কটক যায়,
পথের সম্বল ঘরে ব'সে খায়।

(৩২৯)

স্বামী নাই, পুত্র নাই,
কপাল ভরা সিঁদুর;
ধান নাই, চাল নাই,
গোলা ভরা ইঁদুর।

(৩৩০)

ছাঁচের জলে খাবি খায়,
সমুদ্দুর পার হ'তে যায়।

(৩৩১)

দিও কিঞ্চিৎ,
না কর বঞ্চিত।

(৩৩২)

কইতে জানলে ঠকি না,
বসতে জানলে উঠি না।

(৩৩৩)

আমার নাম নিতাই,
আমি এক খাই, এক খিতাই।

(৩৩৪)

মার আর ধর
পিঠে বেঁধেছি কুলো,
বক আর ঝক
কাণে দিয়েছি তুলো।

(৩৩৫)

দেখতে না হয় সাপের ছানা,
দংশালে যে প্রাণ বাঁচে না।

(৩৩৬)

খেতে পারি না, খেতে পারি না, অনিচ্ছে—
তিন তোলো ভাত, একটা উচ্ছে।
(তোলো = তোলো হাঁড়ি = বড় হাঁড়ি।)

(৩৩৭)

খেতে পারি না, সকে না,
মুখে দিলে থাকে না।
(সকে না = অরুচি।)

(৩৩৮)

দেখে ঘোর কলি,
হাড়ে মাসে জলি।

(৩৩৯)

এক কলসী জল তুলে
কাঁকালে দিলে হাত,
এই মুখে খাবে তুমি
বাগিনীর ভাত।

(৩৪০)

আবর তাঁতি গোবর খায়,
স্ত্রীর কথায় মরতে যায়।

(৩৪১)

সোণা নাকী ঝী আমার
শ্বশুর-বাড়ী যায়—
উনুন-মুখী বৌ আমার
বাটায় পান খায়।

(৩৪২)

আহাম্মক যে হয়,
পেছনে কথা কয়।

(৩৪৩)

অন্তর হয়েছ তুমি
অন্তরেতে থেকে,
সকলই বুঝিতে পারি
মুখখানি দেখে ;
হাসি হাসি মুখখানি
তাহে কত ঠাট,
হাসির ভিতর আছে
ফাঁকির কপাট।

(৩৪৪)

যে ঘাটেতে জল নাই
পাথর কেন ভাসে ?
যার সঙ্গে ভাব নাই,
সেই বা কেন হাসে ?

(৩৪৫)

দুগ্ধ, শ্রম, গঙ্গাবারি,
এ তিন বড় উপকারী।

(৩৪৬)

দুর্ব্বলতা যার যত,
অভিমান তার তত।

(৩৪৭)

আপনার ছেলেটী,
খায় এতটী,
বেড়ায় যেন লাটিমটী।
পরের ছেলেটা,
খায় এতটা,
বেড়ায় যেন বাঁদরটা।

(৩৪৮)

মনে করি হেন কর্ম্ম
করিব না আর,
স্বভাবে করায় কর্ম্ম
কি দোষ আমার?

(৩৪৯)

যারে বল্লে, ছিঃ,
তার রইল কি?

(৩৫০)

জামায়ের জন্ত মেরে হাঁস,
গুষ্টিশুদ্ধ খায় মাস।

(৩৫১)

মামার ক্ষেতে বিয়ল গাই,
সেই সম্পর্কে মামাত' ভাই।

(৩৫২)

শালটুন, শালটুন,
সকল কথা থাকে গুঁজে—
মাগের কথা শুন।

(৩৫৩)

তোমাকে জব্দ করবে যে,
নন্দালয়ে বাড়ছে সে।

(৩৫৪)

জ্যেষ্ঠ, তোমাকে পিণ্ড নাশ,
যদি হয় বারমাস,
যদি হয় আমার পত্নের ঘরে
সত্ত পিণ্ডে বিনাশ করে।

(৩৫৫)

সখা যার জনার্দ্দন,
তার সনে কি সাজে রণ?

(৩৫৬)

ভালবাসি যাকে,
রূপের দেখি তাকে।

(৩৫৭)

আমে দুধে এক হয়,
আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যায়।

(৩৫৮)

পথেও হা—বে,
চোখও রাঙাবে।

(৩৫৯)

বোঝেনি যে আছে ভাল,
আধ-বোঝেন্নির প্রাণটা গেল।

(৩৬০)

গণক যদি গণে ঠিক,
তবে কেন সে মাগে ভিখ্?

(৩৬১)

বলবার সে কথা নয়,
বলবই বা কি?
বললে যে ধরম যায়,
রইবেই বা কি?

(৩৬২)

নইক আমি আটাশে ছেলে,
ভয় পাব না চোখ রাঙালে।
(রামপ্রসাদী?)

(৩৬৩)

হায় তরমুজ করব কি?
ঘোটা দেইত ধরব কি?

(৩৬৪)

অবাক্ করলে বেগুনে,
ফুঁ দিতে মুখ পুড়ে গেল
তুষের আগুনে !
(তুষের আগুনের তাপে মুখ পুড়ে গেল তথাপি বেগুন পুড়ল না।)

(৩৬৫)

এক শ' কোড়া গুণে খান,
ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান।

(৩৬৬)

দেয়, থোয় রাখে মান,
তারে বলি যজমান।

(৩৬৭)

শালা তোর বোনের গলায় মালা,
তোর বোনকে বিয়ে করে আমার এত জ্বালা।

(৩৬৮)

ঝগড়াটে লোক যারা ঝগড়া নাহি পায়,
বেণাগাছে চুলকিয়ে গড়াগড়ি যায়।

(৩৬৯)

রাজার বাড়ী চেড়ী,
দিনে সাতখান ছাড়ি।
(সজ্জা-বিলাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।)

(৩৭০)

খায় না দেয় না পাপী সঞ্চয় করে,
তার ধন খায় চোরে আর পরে।

(৩৭১)

হে···থায় খেয়ে মু···
তারে না ছোঁয় যমদূতে।

(৩৭২)

ঘুরেনে পণের টাকা,
এমন বিয়েতে কাজ নেইকো বাপা।
('বাপা'র স্থলে 'কাকা'ও শুনিয়াছি)

(৩৭৩)

ছেলে নষ্ট হাটে,
বৌ নষ্ট ঘাটে।

(৩৭৪)

বুক ডাক ছ' মাস,
কপালে যা যার থাক।

(৩৭৫)

দারুণ থারী ঘরের রাজা,
পূর্ব্ব দুয়ারী তাহার প্রজা,
পশ্চিম দুয়ারীর মুখে ছাই,
উত্তর দুয়ারীর কাছে না যাই।

(৩৭৬)

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ,
দক্ষিণ ছেড়ে, উত্তর বেড়ে
বাড়ী কর গে থা পোতা যুড়ে।

(৩৭৭)

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ,
উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা।

(৩৭৮)

যার হাতে খাই নি, সে বড় রাঁধুনী,
যার সঙ্গে ঘর করি নি, সে বড় ঘরণী।

(৩৭৯)

ফুলের শোভা ভোমরা,
গাইয়ের শোভা চোমরা।

(৩৮০)

লেখা-পড়া করে যেই,
গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সেই।

(৩৮১)

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট,
লঙ্কা ডিঙ্গাতে মাথা করে হেঁট।

(৩৮২)

লিখিব পড়িব মরিব দুখে,
মচ্ছ ধরিব খাইব সুখে।

(৩৮৩)

যার যেমন কামনা,
তেমন ঢাকী বাজনা।

(৩৮৪)

কি খাওয়ালি মুড়কী-মুড়ি,
পাগল করালি ছুঁড়ি।

(৩৮৫)

টস্, টস্, টস্,
আমানি পাথর ছুই,
ভাত—গোটা দশ।

(৩৮৬)

ঘর জ্বালানি,
পর ভোলানি।

(৩৮৭)

মানুষ ঠাকুর দোষ না,
আমার পিত্যেশ ক'র না।
(পিত্যেশ=প্রত্যাশা।)

(৩৮৮)

ভেল্কীর খেলা, স্বপ্নের মিলন,
সত্য বটে যখন তখন।

(৩৮৯)

ঘরের মধ্যে তিনজন,
হে···গেল কোন্ জন।

(৩৯০)

ক্ষমার বড় গুণ নাই,
দানের বড় পুণ্য নাই।

(৩৯১)

কাঁতখান, কাঁতখান,
বটঠাকুর কি পাঁকাল মাছ খান?
(কাঁত=দেওয়াল, প্রাচীর। প্রাচীরকে মধ্যে রাখিয়া ভাদ্রবৌ ভাসুরের সহিত কথা কহিতেছেন।)
বটঠাকুর বলিতেছেন—
খান, খান, খান,
খান পাঁচ ছয় খান,
এখন তেলটুকু পেলে
নাইতে যান।

(৩৯২)

পাসুরে, পাসুরে মরি,
পরের হাঁড়ির ভাত নিয়ে
নিজের হাঁড়ি ভরি।
(পাসুরে=ভুলে। এমনই উদার যে পরের হাঁড়ির ভাত নিয়ে নিজের হাঁড়িতে রাখেন।)

(৩৯৩)

কালে কালে কি হ'ল,
পুলিপিঠের লেজ বেরুল।
(পুলিপিঠের লেজ থাকে না।)

(৩৯৪)

কত শত গেল রথী,
ভৈরবতলার চক্রবর্ত্তী।

(৩৯৫)

লোহা জব্দ কামারবাড়ী,
মেয়ে জব্দ শ্বশুরবাড়ী,

(৩৯৬)

ছাঁদা কথা, মাথায় জটা,
ছাড়াতে গেলে বিষম লেঠা।

(৩৯৭)

ঝড়ে ঘর পড়ে,
ফকিরের কেরামত বাড়ে।

(৩৯৮)

ঠাকুর ঘরে কে?
আমি তো কলা খাই নে।

(৩৯৯)

হাই-এর আছে ভাই,
হাঁচির কেউ নাই।

(৪০০)

কলকাতার ছিষ্টি,—
গুড়ে নাই মিষ্টি,
তেঁতুলে নাই টক্,
কলকাতা চপ্।

ব্যবধান

(গল্প)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারি
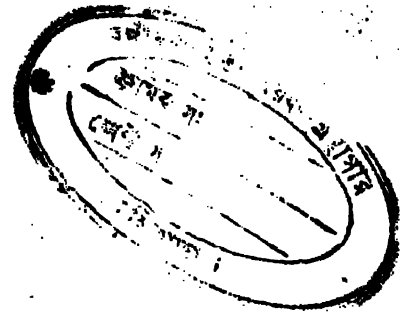
অনিল বেলা সাতটার সময় ঘুম হইতে উঠিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে পুকুর-ধারে আসিয়া দেখিল শোভা কোমরে কাপড় জড়াইয়া 'আঁক্‌সি' দিয়া বেলপাতা পাড়িতেছে। অনিলের বয়স চৌদ্দ, শোভার বয়স দশ। শোভা অনিলের স্ত্রী; চারিবৎসর পূর্ব্বে তাহাদের বিবাহ হইয়াছে।

শোভা অনিলকে দেখিতে পায় নাই। সে বেল-পাতা পাড়িতেই ব্যস্ত ছিল। অনিল পত্নীকে দেখিয়াই হাঁকিল,—"ও ঝি, বেলপাতা পাড়া হ'ল ?" শোভা স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়াই 'আঁক্‌সি' ফেলিয়া দিয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া হাসিতে লাগিল।

অনিল বলিল,—"রকম দেখ না! এটা এত হাসে কেন ?"

শোভার হাসির মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। সে হাসিতে হাসিতে পড়িয়া যায় আর কি! অনিল এবার রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"মার খাবে দেখ্‌ছি। দেখ ক্ষীর-দি, আজ কিন্তু ওকে আমি আর আস্ত রাখব না।"

বাড়ীর ঝি ক্ষীরি একমনে বাসন মাজিতেছিল। অনিলের ডাকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সেও ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং চাহিয়া দেখিল অদূরে বেলগাছের তলায় বৌ-দিদি হাসিতে হাসিতে একেবারে লুটোপুটী খাইতেছে।

হাসির কথাও বটে। শোভা যখন ভোর-বেলা মোটা কলমের ডগা দিয়া নিকষ-কালো কালিতে নিদ্রিত স্বামীর দুইগালে বেশ পরিষ্কার করিয়া গরু, গরু লিখিয়া রাখে এবং কপাল হইতে নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ত্রিশূলের মত একটা বিচিত্র ছবি অতি সন্তর্পণে আঁকিয়া দিয়া পলায়ন করে তখন সে মোটেই ভাবিতে পারে নাই যে ঘুম ভাঙিলে স্বামীর চেহারাটা এমন চমৎকার দেখাইবে।

ক্ষীরি অনিলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"দাদা-বাবু, এ কি করেচে ? তোমার মুখময় এসব কি ?"

অনিল তাড়াতাড়ি ডানহাতটা মুখের উপর বুলাইয়া লইয়া বলিল,—"কেন কি হয়েছে ?"

"দেখনা গে আয়না দিয়ে। কি চিত্তিরই করেচে।"

অনিল কোনমতে চোখে-মুখে জল দিয়া বাড়ীতে আসিয়া আয়নায় মুখ দেখিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল। সে ঠাকুরঘরের দুয়ারে ছুটিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—"মা, ওমা !"

মাতা তারাসুন্দরী তখন ঠাকুরঘরে আহ্নিকের আয়োজন করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি মুখ না তুলিয়াই জবাব দিলেন,—"কি সকাল-বেলাই আবার চেঁচামেচি কেন ?"

অনিল কাঁদিয়া বলিল,—"দেখ না, মা, কি করেচে ?"

"কি করেচে রে"—বলিয়া মাতা পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মা'র হাস্য দেখিয়া পুত্র আরও জলিয়া উঠিয়া বলিল,—"মা, আজ কিন্তু ওকে আমি মেরে ফেলব। বুড়-ধাড়ির কাণ্ডটা দেখ না।"

"এ বুঝি বৌমার কীর্ত্তি। না আর পারি নে, কোথা গেল বাঁদরী!"

বাঁদরী ওরফে শোভা তখন বেল-পাতার সাজী হাতে ঠাকুর-ঘরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বধূমাতার দিকে চাহিয়া শাশুড়ী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"সকাল হ'তে-

না হ'তেই ঝগড়া সুরু হ'ল? ওর গালে এ কে এঁকেচে?"

বধূমাতা উত্তর দিল,—"আমি।"

গৃহিণী ধমক দিয়া বলিলেন,—"কেন এসব আঁকলে? এ রকম কি করতে আছে মা!"

শোভা ধমক খাইয়া চক্ষু লাল করিয়া বলিল,—"ও কেন আমার বইয়ে গাধা লিখেচে?" তাহার পর কাঁদিয়া বলিল,—"উনি যা-তা লিখবেন, তা'তে দোষ নেই, আর আমি লিখলেই যত দোষ।"

তারাসুন্দরী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "ভাল জ্বালাতনে পড়েচি, দেখি নিয়ে এস তোমার বই?"

শোভা ছুটিয়া গিয়া 'কথামালাখানা' লইয়া আসিল এবং খুলিয়া শাশুড়ীকে দেখাইয়া দিল বইয়ের মাঝখানে বেশ বড় বড় করিয়া লেখা রহিয়াছে—শোভা-গাধা।

তিনি এবার পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হাঁ রে তুই ওর বইয়ে এসব লিখিচিস্ কেন?"

অনিল জোর গলায় নালিশ করিয়াই মোকদ্দমা জিতিয়া লইবে ভাবিয়াছিল কিন্তু এবার বুঝিল প্রাথমিক অপরাধটা তাহার স্কন্ধেই চাপিতেছে; সুতরাং নালিশের মূলসূত্র হারাইয়া সে পাল্টা জবাবে বলিল,—"ও আমাকে যা-তা বলবে কেন?"

মাতা তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি তোকে যা-তা বলে শুনি?"

"কাল রাত্তিরে আমি ওকে আমার প্রাইজের বইগুলি দেখাচ্ছি—ও বলে কি না ভারি তো প্রাইজ—থার্ড হয়ে প্রাইজ পেয়েচে, তা আবার দেখান হচ্চে। ও একথা বলবার কে? পারে ও ফার্ষ্ট হ'তে?"

অনিল এবার তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছে।

শোভা জবাব দিল,—"খুব পারি। দিক্ না আমাকে স্কুলে—আমি ফার্ষ্ট হ'য়ে প্রাইজ নিয়ে আসতে পারি কি না!"

অনিল চেঁচাইয়া বলিল,—"ওরে আমার কি বিদ্বান্ রে, তবুও যদি 'বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' শেষ হ'ত। বোকাচণ্ডীর গলায় ফুটেছে না, সাধ্য কি আর তা'তে মুখ দিয়েছে সারাদিনমান। পড়া ওর না, ওখানেই ইতি।"

পুত্রের কথায় তারাসুন্দরী হাসিয়া ফেলিলেন কিন্তু পরক্ষণেই গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিলেন,—"ওর পড়া হ'ক আর না হ'ক তা'তে তোর কি? তুই বার বার ফার্ষ্ট হ'স; এবার তুই থার্ড হ'লি কেন শুনি? পড়া নেই, শুনা নেই, কেবল ঝগড়া আর বাঁদরামি। যা পড়তে বস্ গে। ফের যদি গোলমাল করবি তো কর্ত্তাকে ডাকব।"

শোভা স্বামীর দুরবস্থাটা বেশ সানন্দচিত্তে উপভোগ করিতে লাগিল। সে একবার চকিতে শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া লইয়া স্বামীর দিকে চক্ষু নাচাইয়া একটু হাসিল। এই হাসি অনিলের 'কাটা ঘায়ে মুণের মত ছিটাইয়া' পড়িল। অপমানিত অনিল সবেগে ঠাকুরঘর হইতে বাহিরের বৈঠকখানায় গিয়া জ্যামিতিখানা বাহির করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—"ইফ্ টু এঙ্গলেস্—"

অনিলের পিতা মহেশ্বরবাবু তক্তপোষের উপর বসিয়া পাতঞ্জল-দর্শনের সাধন-পাদের ১৪ সংখ্যক সূত্রের বাংলা টীকা পড়িতেছিলেন—দুঃখের হেতু অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি। তিনি পুত্রের পাঠ্য-পুস্তকের প্রতি অকস্মাৎ এতাদৃশ অখণ্ড মনোযোগের কোন হেতু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন—"আস্তে।"

কয়েকদিন পরের কথা। পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া তারাসুন্দরী এক বিছানায় শয়ন করেন। পুত্র তাঁহার দক্ষিণদিকে, পুত্রবধূ বামদিকে শয়ন করে। এই রীতির চুলমাত্র এদিক্ ওদিক্ হইবার উপায় নাই, তাহা হইলে স্বামী-স্ত্রীতে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তারাসুন্দরীর বহুদিনের ইচ্ছা পুত্র ও পুত্রবধূকে একত্রে শোয়াইয়া দেখেন—দেখিতে কেমন হয়। এই বাসনা তাহার কিছুতেই পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। আজ সন্ধ্যাবেলা বিছানা পাতিবার সময় তিনি ইচ্ছা করিয়া বিছনার একপার্শ্বে নিজের বালিশটা সরাইয়া রাখিয়া পুত্র ও পুত্রবধূর মাথার বালিশ দুইটা পাশাপাশি করিয়া পাতিয়া রাখিলেন।

অনিল ও শোভাকে খাওয়াইয়া দিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "যাও আঁচিয়ে এবার শোও গে। শুয়ে শুয়ে গল্প কর। আমি এই যাচ্চি।"

ক্ষীরি অনিলের হাতে জল দিতেছিল, শোভা নিজেই আর একটা ঘটী হইতে জল লইয়া আঁচাইতেছিল। অনিলের দিকে চাহিয়া শোভা জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, তুমি যে বল পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে। কি করে' বুঝলে ?"

অনিলের তখন হাত-মুখ ধোয়া হইয়া গিয়াছে; সে কাপড় দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল,—"যা, যা, আর বুঝতে হ'বে না।"

শোভারও মুখ ধোয়া শেষ হইয়াছিল, সে স্বামীর হাত ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল,—"বল না শুনি।"

অনিল এবার রাশভারী চালে উত্তর দিল,—"শুনলেই হ'ল, বুঝবি কি তুই।"

"না, আমি বুঝব, তুমি বল।"

পরক্ষণেই শোভা অনিলের হাত ধরিয়া টানিয়া আবার বলিল,—"আচ্ছা এখন থাক। শোবার পরে ব'ল কেমন ?"

দুইজনেই নির্ব্বিবাদে গিয়া এক জায়গায় শুইয়া পড়িল এবং অনিল নানা-প্রমাণ-প্রয়োগ-সহকারে শোভাকে বুঝাইতে লাগিল কেমন করিয়া এত বড় একটা পৃথিবী রাত্রি-দিন বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। শোভা বেশী কিছু বুঝিল না, বলিল—"আচ্ছা, না হয় মানলুম পৃথিবীটা ঘুরচে। কিন্তু আমরা টের পাই না কেন ?" অনিল এ উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিল, বলিল—"একটা মস্ত বড় জালাতে যদি কতকগুলো পিঁপড়ে থাকে আর সে জালাটাকে যদি ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তা-হ'লে পিঁপড়েগুলো কি বুঝতে পারে যে জালাটা ঘুরচে ?"

শোভা উত্তর দিল—"বা রে, পিঁপড়ে তা বুঝতে পাচ্ছে কি না, আমরা তা জানব কেমন করে' ?"

অনিলের বিদ্যার শেষ হইয়াছে। সুতরাং সে এবার জোর গলায় বলিয়া উঠিল, "আলবৎ জানতে পারব।"

শোভা সমান জোরেই উত্তর দিল,—"ক'খনও নয়।"

"কখ্খনো নয় ? তবে কি মাষ্টার মশায় ভুল বলে' দেছেন ?"

শোভা ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "মাষ্টার মশাই ছাই বলেছেন।"

"কি, তবে তুইই সব জানিস্ আর মাষ্টার মশায় কিছু জানেন না—"বলিয়া উত্তেজিত অনিল শোভার চুলের মুঠি ধরিয়া তর্কযুদ্ধের শেষ মীমাংসা করিতে উদ্যত হইল।

শোভা চীৎকার করিয়া বলিল, "দেখ না মা, সুধু সুধু মারছে; লাগে না বুঝি, ছাড় বলচি ?"

কর্ত্তার আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তারাসুন্দরী চীৎকার শুনিয়া বলিলেন,—"ওই আবার বাধল বুঝি। ওগো একটু ধমকে দাও না। আর যে সহ্য হয় না। কর্ত্তা গম্ভীরকণ্ঠে হাঁকিলেন,—"র'স যাচ্ছি।"

অনিলের হাতের মুঠি তৎক্ষণাৎ শিথিল হইয়া গেল এবং উভয়েই পৃথিবীর কলহতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া মুখোমুখী হইয়া চুপচাপ পড়িয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে দুইজনেই ঘুমাইয়া পড়িল।

মহেন্দ্রবাবু নৈশ আহার সমাধা করিয়া শয়নঘরের অপর পার্শ্বের খাটের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন আর বোধ করি সংসারের একটা কূটতত্ত্ব তাঁহার মাথার মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় গৃহিণী ঘরে আসিয়া একত্রে নিদ্রিত পুত্র ও পুত্রবধূর দিকে স্নিগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিলেন। পরে স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"দেখ কেমন দুটাতে ঘুমুচ্ছে।"

মহেন্দ্রবাবুর এতক্ষণ এই ব্যাপারটা নজরে পড়ে নাই। তিনিও এবার তাহাদিগের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"দেখ, কতক্ষণ থাকে। এই যুদ্ধ সুরু হ'ল বলে।"

কিন্তু গোল বাধিল শেষ রাত্রে। অনিল হঠাৎ জাগিয়া বুঝিল—শোভা তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া একেবারে বুকের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। সজোরে শোভাকে ঠেলিয়া দিয়া সে নিদ্রালু কণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল"—আরাম দেখ না, আমাকে যেন কোল-বালিশ পেয়েচে।"

শোভা কাঁদিয়া উঠিল। গোলমালে তারাসুন্দরী জাগিয়া উঠিয়া বিরক্তকণ্ঠে বলিলেন—"কি জ্বালাতন, রাত্তিরে একটু ঘুমুব, তারও যো নেই। এই হতভাগা পাজী, আবার কি হ'ল।"

অনিল বলিল,—"দেখ না মা, ও আমার গলা জড়িয়ে শুয়ে আছে।"

"বেশ করেচে। তা'তে তোমার গলাটা ক্ষয়ে গেছে ?"

অনিল বলিল, "না, আমি ওর কাছে শোব না।"

"আয় এদিকে আয়। তোর ওখানে শুতে হ'বে না।"

অনিল বগল-দাবা করিয়া বালিশটা তুলিয়া লইয়া মাতার দক্ষিণপার্শ্বে গিয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িল।

শোভাও জাগিয়াছে, সে ধীরে ধীরে হাতড়াইয়া দেখিল—অনিল পূর্ব্ব জায়গায় নাই। শাশুড়ীর কোন্ দিকে সে শুইয়া আছে, অন্ধকারে সে ভাল করিয়া ঠাহর করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে যখন বুঝিল অনিল মাকে একলাই অধিকার করিয়া আছে তখন সে শাশুড়ীর দিকে ফিরিয়া বলিল—"মা, আমার দিকে তুমি ফিরে শোও।"

তারাসুন্দরী উত্তর দিলেন,—"এই তো শুয়েছি মা।

"না, আমার দিকে সরে এস।"

এবার অনিল গর্জ্জন করিয়া উঠিল;—হাঁ, সরে শোবে! আমার মা আমার কাছে শোবে।"

শোভা সমানে উত্তর দিল—"ওর যেন একলার মা?" পরে মাতৃসমা শাশুড়ীর গালের উপর গাল রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ, মা, তুমি আমাদের দুজনেরই মা, কেমন নয়?"

শাশুড়ী উত্তরে বলিলেন,—"হাঁ, গো, হাঁ, এবার ঘুমোও দিকি নি। রাত যে শেষ হ'য়ে এল।"

অনিল কিন্তু মাতার এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, সে বলিল,—"তা কি ক'রে হ'বে মা। ওর বাড়ী তো প্রসাদপুরে।"

প্রসাদপুরে অনিলের শ্বশুরালয়, বিবাহের পর দুই-একবার সে সেখানে গিয়াছে।

শোভা এবার গম্ভীরকণ্ঠে বলিল,—"বুদ্ধি যা হ'ক। মা-ই যদি না হ'বে তবে মা বলে ডাকি কেন?"

তারাসুন্দরী গভীর স্নেহে পুত্রবধূর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—"হাঁ মা, আমি তোমাদের দু'জনেরই মা।"

অনিল আরও অসন্তুষ্ট হইল; কিন্তু হঠাৎ উত্তর দিবার মত একটা কথাও তাহার মনে আসিল না। সে উত্তরে কি [illegible] ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে আর কাহারও সাড়া-শব্দ শোনা গেল না।

জ্যৈষ্ঠের দুপুর। খর রৌদ্র চারিদিকে খাঁ খাঁ করিতেছে। তারাসুন্দরী এক মনে কাঁথা সেলাই করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি পিছনে চাহিয়া দেখিলেন,—পুত্র ও পুত্রবধূ সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—"ক্ষীরি, ও ক্ষীরি।"

ক্ষীরোদার সবেমাত্র দিবানিদ্রার আবেগটা আসিয়াছিল, অসময়ে গৃহিণীর ডাক শুনিয়া সে বিরক্তচিত্তে উঠিয়া আসিল।

গৃহিণী বলিলেন, "দেখ তো মা, বাঁদর দুটো গেল কোথা?"

ক্ষীরি রাগিয়া জবাব দিল, "কি করে' জান্‌ব মা, কোথায় কোন্ বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সোয়ামী-স্ত্রীতে এমন করে' ধেই ধেই করে' নেচে বেড়ায়, তা যাই বল মা, এ কিন্তু সাত জন্মেও দেখি নি।"

তারাসুন্দরী কটুকণ্ঠে জবাব দিলেন—"তা না দেখেছিস্, না দেখেছিস্। ওরা কোথায় আছে দেখে আয়।" পরে তিনি একটু কোমলস্বরে বলিলেন—"ওদের তোরা মন্দটাই দেখিস, বয়সটা তো আর দেখিস্ নে। বড় হ'লে আপনিই সেরে যাবে।"

ক্ষীরি দুম্‌দাম্ শব্দে পা ফেলিয়া যাইতে যাইতে উত্তর দিল—"এ আর শোধরাবে মনে কচ্চ? তা হচ্ছে না। এ নিয়ে কত ভুগ্‌বে দেখ।"

গৃহিণী এবার ঝঙ্কার দিয়ে বলিলেন,—"তা'তে তোর কি? ভুগতে আমিই ভুগব। এতে তোরই বা এত মাথা ব্যথা কেন?"

ক্ষীরি গজ্ গজ্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। ইহাদিগকে এখন কোথায় পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা কি? সে নিতান্ত অপ্রসন্নচিত্তে কি করিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় পাশের ঘর হইতে মৃদু মৃদু কথার শব্দ শুনিতে পাইয়া জানালায় উঁকি দিয়া দেখিল—শোভা বঁটী দিয়া পাকা আম কাটিতেছে, আর অনিল সাম্‌নে হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। আরও দুই-চারিটা পাকা আম বঁটীর কাছে পড়িয়া আছে। ক্ষীরি বুঝিল সত্বই এই আমগুলি বাগান হইতে কুড়াইয়া আনা হইয়াছে। দৃশ্যটা মধুর সন্দেহ নাই, কিন্তু এই মাধুর্য্য ক্ষীরির একমাত্র ভোগ

করিতে ইচ্ছা হইল না। সে অতি সন্তর্পণে জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে বলিল,—"মা, দেখবে এস।"

গৃহিণী কিছু বুঝিতে না পারিয়া ক্ষীরির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার আর সবুর সহিতেছিল না। সে ফিস্ ফিস্ করিয়া পুনরায় বলিল, "সোয়ামী-স্ত্রীর কাণ্ডটা একবার দেখবে এস। কেমন দুটীতে বসে গুজ গুজ ফুস্ ফুস্ হচ্ছে।"

নবদম্পতির শয্যাগৃহে আড়ি পাতিবার প্রথা বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। তবে জননীর দিক্ দিয়া এই ব্যাপারটা সুসঙ্গত নহে। কিন্তু এক্ষেত্রে তারাসুন্দরীর মত প্রবীণা গৃহিণীরও কৌতূহল দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষীরির সঙ্গে গিয়া ধীরে ধীরে জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন।

কে আম আগে খাইবে তাহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে তর্ক চলিতেছিল। অনিল বলিতেছে—"তুই আগে খেয়ে দেখ, মিষ্টি না টক্।"

শোভা উত্তর দিল—"দূর তা কি হয়, আমার আগে খেতে নেই।"

অনিল জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

"মা বলেন—বর না খেলে কনের খেতে নেই।"

অনিল এবার অবাক্ হইয়া গেল। বাস্তবিক অনিল শোভার সহিত নিজের সম্বন্ধটা ভাল করিয়া ঠাহর করিতে পারিত না।

তারপর "আচ্ছা দে—" বলিয়া অনিল কর্ত্তিত আম্রখণ্ড শোভার হাত হইতে গ্রহণ করিয়া খাইতে খাইতে চিন্তিত-ভাবে প্রশ্ন করিল—"আমি তোর বর হলুম কেমন করে?"

শোভা গম্ভীরভাবে বলিল—"বিয়ে হ'লে বর হয় না? ও হরি—তাও জান না। আচ্ছা মাকে এবারে জিগ্‌গেস কর

নিজের অজ্ঞতাটা পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি নিতান্ত স-প্রতিভভাবে বলিয়া উঠিল, "আমটা কিন্তু বড্ড টক্?"

শোভা বলিল,—"টক! আচ্ছা ওটা রেখে দাও। আর একটা দিচ্ছি।" শোভা আর-একটা আম কাটিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে অনিল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"বিয়ে হয় কেন বলতে পারিস। সবারই হয়?"

শোভা বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল—"সবারই হয়।"

অনিলের একটা কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছে, সুতরাং সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, সবারই যেন হয়, কিন্তু কেন হয়?"

"এও বোঝ না পণ্ডিত! মা বলেন এ ভগবানের কাজ।"

অনিল এবার অবিশ্বাসের স্বরে জবাব দিল,—"যাঃ, মা কখন বলেন নি।"

"মা বলেন নি? আমি কি তবে মিছে কথা বল্‌চি? ডাকব মাকে?"

জানালার ধারে দাঁড়াইয়া ক্ষীরি এবার সশব্দে হাসিয়া ফেলিল। হাসির শব্দে দুইজনের চক্ষুই জানালার দিকে পড়িল এবং অনিল মাকে দেখিয়া একেবারে ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

বছর দুই পরে। অনিল প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিবার জন্য শীঘ্রই কলিকাতায় যাইবে। এই দুই বৎসরে শোভার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে এখন দ্বাদশবর্ষীয়া কিশোরী এবং ইতিমধ্যে বধূত্বের সম্বন্ধে অনেক কথাই শিখিয়া ফেলিয়াছে। এখন আর সে 'গাছ-কোমর' বাঁধিয়া আমতলায় ঘুরিয়া বেড়ায় না। পূর্ব্বে যে পরণের কাপড় হাঁটুর নীচে নামিত না তাহা এখন নিয়মিতভাবে অলক্তক-রঞ্জিত পদদ্বয়ের শেষপ্রান্ত চুম্বন করিয়া চলে। মাথার কাপড় যথাস্থানেই থাকে, তবে সময়মত ঘোম্‌টা টানা সম্বন্ধে শোভা এখনও ভাল করিয়া অভ্যস্ত হইতে পারে নাই। মাথার কাপড় কপালের নীচে কিছুতেই নামিতে চাহে না। ইহাতে কিন্তু শোভাকে বড় সুন্দর দেখায়, সুতরাং শাশুড়ীও এ সম্বন্ধে বিশেষ জিদ করেন না।

অনিলের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে অকারণ চাঞ্চল্য তাহার অনেকটা কমিয়াছে। সর্ব্বসময়ে সে এখন শোভার সঙ্গে অকারণে কলহ করে না বটে, কিন্তু রসনা সম্পূর্ণ স্ববশে আসে নাই। সময় এবং সুযোগ পাইলে

দুই-একটা কঠিন বাক্যবাণ ছাড়িতে সে কৃপণতা করে না। শোভাও তাহার সমান প্রত্যুত্তর দেয়, কিন্তু উচ্চকণ্ঠে নহে।

অনিলের এতাদৃশ সভ্য-ভব্য হইবার একটু কারণও ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার এবার প্রবেশিকা-পরীক্ষার বৎসর; সুতরাং অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কোন কাজে মন দিবার অখণ্ড-অবসর ছিল না। পরীক্ষার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল পাঠ্যপুস্তকের প্রতি মনোযোগের মাত্রা ততই গভীর হইতে চলিল। মাঝে মাঝে সে শেষরাত্রে উঠিয়াও অধ্যয়ন করে। অকস্মাৎ মাতা-পিতার প্রতি ভক্তিটা তার বাড়িয়া উঠিল এবং শোভাকে তো সে কোন দুর্ব্বাক্য বলেই না বরং তাহাকে নানাবিধ উপায়ে খুসী রাখিবার চেষ্টা করে।

অবশেষে পরীক্ষার দিন আসিয়া পড়িল। কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বরাত্রে রাত্রির সময় ঠিক করিতে না পারিয়া প্রায় তিনটার সময় অনিল জাগিয়া বসিল এবং আলো জ্বালিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। মাতা সুষুপ্তা, পার্শ্বের ঘরে পিতারও কোন সাড়া-শব্দ নাই, শোভাও অকাতরে ঘুমাইতেছে; রাত্রির গভীর নিস্তব্ধ প্রহরে অনিল আপন মনে পড়িয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ শোভা জাগিয়া উঠিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল,—"জ্বালাতন, পড়ার জ্বালায় রাত্তিরে ঘুমোবার যো নেই।"

অনিল কোন উত্তর দিল না। পরের দিন পরীক্ষা—এই আসন্ন সময়ে কাহারও চিত্তে আঘাত দেওয়া ঠিক নয়, হয় তো তাহার মৌন অভিশাপে পরীক্ষার কোন ব্যাঘাতও ঘটিয়া যাইতে পারে; সুতরাং সে ধীরে ধীরে আলোটা তুলিয়া লইয়া পার্শ্বের কক্ষে আসিয়া পুনরায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিল।

শোভা ভাবিয়াছিল ভালই হইল, এবার সে নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুমাইতে পারিবে কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না। ঘুম আর তাহার চোখে আসিল না। খানিকক্ষণ সে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া অনিলের পড়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া অতি সন্তর্পণে দরজাটী ভেজাইয়া দিল। অনিল একবার শোভার মুখের দিকে চাহিয়া আবার যেমন পড়িতেছিল তেমনিই পড়িয়া যাইতে লাগিল। শোভা কয়েকটা বই তুলিয়া অনিলের একেবারে গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"রাগ করেচ?"

"না—" আবার পড়া চলিতে লাগিল।

"হাঁ, তুমি রাগ করেচ, নইলে চলে এলে কেন?"

অনিল কথাটাকে নিতান্ত লঘু করিয়া বলিল—"দূর, কাল এগজামিন কি না তাই ভাল করে' পড়া তৈরি কর্ত্তে হ'বে।"

শোভা অনিলের ডান হাতটী টানিয়া বলিল—"না, তুমি ওখানে পড়বে চল।" এই বলিয়া অন্য হাতে আলোটা তুলিয়া লইল।

অনিল খপ্‌ করিয়া আলোটা ধরিয়া বলিল, "যা, তুই ঘুমোনা গে।"

শোভা মিনতি-স্বরে বলিল,—"না, তুমিও চল।"

অনিল এবার একটু বিরক্ত হইয়াই বলিল—"বেশী গোল করিস্ নে। পড়ার ক্ষতি হচ্ছে, মাকে কিন্তু ডাক্‌ব। মা—"

শোভা তাড়াতাড়ি দুই হাতে অনিলের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"যাচ্ছি, লক্ষীটী, মাকে ডেক' না।"

অনিল হাসিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। শোভার ভীতির ভাব দেখিয়া অনিল বলিল,—"আচ্ছা ডাক্‌ব না। এখন যা লক্ষীটী।"

শোভা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইবার কোন লক্ষণ তো প্রকাশ পাইল না, বরং অনিল যেখানে বসিয়া পড়িতেছিল সেইখানে তাহার খোলা পুস্তকের সামনে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল এবং অনিলের ডান হাতের আঙ্গুলগুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ শোভা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি তো কাল কলকাতা যাচ্ছ, কবে ফিরবে?"

বই হইতে মুখখানা তুলিয়াই অনিল উত্তর দিল—"চার দিন বাদে।" পরে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"না, এমনিই" বলিয়া শোভা চুপ করিল।

অনিল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি গেলে খুব কষ্ট হ'বে?"

শোভা কোন উত্তর দিল না। ঘন ঘন অনিলের আঙুলগুলি নাড়িতে লাগিল।

অনিল নিজেই বলিয়া চলিল—"আমার কিন্তু ভাল লাগ্‌চে না। তুইও যদি আমার সঙ্গে যেতিস তো বেশ ভাল হ'ত।"

"দুর, তা কি হয় ?"

"কেন হয় না ?" মাকে বল্লে—"

"বল্লেই হ'ল কি না ! যেতে দেবেন কেন ?"

অনিল শোভার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল,—"দিলে ভাল হয়, না ? বেশ দু'জনে যাওয়া যায়।"

শোভা ধীরে ধীরে নিজের মাথাটী অনিলের হাঁটুর উপর তুলিয়া দিল ; কোন উত্তর দিল না। অনিল শোভার কপালে গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"কষ্ট আর কি ? তিন-চার দিন তো মোটে। কি বলিস্ ?"

"তিন-চার দিন বুঝি কম, কষ্ট হয় না ?" বলিয়া শোভা অনিলের হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইল।

শোভার এই উত্তরে অনিলের কিশোর অন্তরখানি এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং সে হঠাৎ কিশোরী বধূর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহার কুসুম-পেলব গণ্ডে চকিতে একটা প্রগাঢ় চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল।

"যাও দুষ্টু"—বলিয়া শোভা তাড়াতাড়ি একেবারে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল আর অনিল কম্পিতবক্ষে সেই গভীর স্নিগ্ধ রাত্রিতে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পুলক শিহরণে শিহরিয়া উঠিল।

পরদিন অনিল সকালেই পিতামাতার চরণবন্দনা করিয়া কলিকাতা চলিয়া গেল। গত রাত্রির গভীর ঘটনা স্মরণ করিয়া লজ্জায় স্বামী-স্ত্রী কেহ কাহারও সহিত দেখা করিতে পারিল না।

পরীক্ষান্তে কলিকাতা হইতে ফিরিয়াই অনিল দেখিল শোভা প্রবল জ্বরে একেবারে শয্যাগত হইয়া আছে। অনিল যেদিন বাড়ী হইতে যায় সেই রাত্রেই শোভার যে জ্বর আসে সে জ্বর এখনও বিরামলাভ করে নাই, বরঞ্চ অন্যান্য উপসর্গ সহযোগে সাধারণ জ্বরটা সহজ পথ ছাড়িয়া কুটিল পথে চলিবার উপক্রম করিতেছে। সময়মতই ডাক্তার ডাকা হইয়াছে, ঔষধে কোন ফল হইতেছে না।

রোগীর ঘরে কেহ নাই দেখিয়া অনিল ধীরে ধীরে সেখানে প্রবেশ করিয়া রুগ্ন শোভার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল। শোভার স্বর্ণ দেহলতা যেন এ কয়দিনেই শয্যার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কেশদাম তৈলহীন রুক্ষ, সূর্য্যদগ্ধ ফুলের মত মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, চোখের কোণে কালির রেখা। শোভা চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিল।

অনিল ধীরে ধীরে ডাকিল,—"শোভা !"

শোভা চক্ষু মেলিয়া চাহিল, দৃষ্টি অলস ম্লান ; একটা নির্জ্জীবতার ভাব যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সে কোন উত্তর দিল না। অনিল শোভার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে পুনরায় ডাকিল,—"শোভা !"

শোভা নিজের ডান হাতখানি অনিলের কোলের উপর রাখিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল,—"কখন এলে ?"

"এইমাত্র এসেচি। এখন কেমন আছ শোভা ?"

"মাথাটা যেন খসে যাচ্ছে। একটু টিপে দাও না। মা কোথা—"

"বাইরে গেছেন,ডাক্‌ব—"

"না, থাক্। একটু জল।"

শোভার মুখে জল দিয়া অনিল শোভার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। দুইজনেই নির্ব্বাক্ ; সমস্ত ঘরটা একেবারে নিস্তব্ধ। অনিল অনিমেষ নয়নে শোভার প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি শুনিতে লাগিল।

শোভার অসুখ ভালর দিকে গেল না, ক্রমশঃ বাঁকিয়া দাঁড়াইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, অনিল যেভাবে রাত্রি দিন শোভার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল তাহা এই বয়সের ছেলের পক্ষে কদাপি দেখা যায়। আহার-নিদ্রা সে এক রকম ভুলিয়াই গেল। ঘুমাইবার জন্য মাতা জিদ করিলে সে রোগীর শয্যাপার্শ্বে শুইয়া পড়ে এবং খানিকক্ষণ বাদেই আবার জাগিয়া উঠিয়া রোগিণীর শিয়রে বসে। এইভাবে রাত্রিদিন কাটিতে লাগিল।

সে রাত্রিতে শোভার রোগের বড় বাড়াবাড়ি হইল। যমে-মানুষে টানাটানি হইতে লাগিল। ডাক্তারবাবু সে রাত্রি সেখানেই রহিয়া গেলেন। আজ জ্বরের বিরাম-সময়টাই আশঙ্কাজনক। সমস্ত বাড়ীটা যেন একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় ছম্‌ছম্ করিতেছে। অনিল শোভার পার্শ্বেই

জাগিয়া বসিয়াছিল। সে শোভার বগল হইতে থার্ম্মো-মিটারটী বাহির করিয়া পরীক্ষান্তে বলিল,—"মা, জর কমছে। এইবার ভাল হ'য়ে যাবে, না মা ?"

মৃত্যুপথযাত্রিণী বধূর দিকে চাহিয়া জননী উদগত অশ্রু গোপন করিয়া উত্তর দিলেন—"হাঁ, বাবা। যাও তুমি একটু ঘুমোও গে। আমরা সবাই রয়েছি। ভয় কি !"

অবিশ্রান্ত কয়রাত্রি জাগিয়া অনিলও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মিথ্যা আশ্বাসমুগ্ধ অবোধ কিশোর আর দ্বিরুক্তি করিল না, পার্শ্বের কক্ষে গিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িল।

সেই রাত্রেই শোভার মৃত্যু হইল। স্ফুটনোন্মুখ কুসুম-কলিকা প্রত্যাসন্ন বসন্তের অর্ঘ্য-অভিনন্দন গ্রহণ না করিয়াই ধরার ধূলিতে ঝরিয়া গেল।

রথ-যাত্রা

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ

চল্‌তি কথার ছড়ায় আছে 'আষাঢ় মাসে রথ-যাত্রা, যাত্রী হয় জড়।' 'যাত্রী জড় হয়' বলিলে যথেষ্ট হইল না—যাত্রীর বন্যা-প্রবাহ বয়—স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ-যুবা, অন্ধ-খঞ্জ কেহ বাদ যায় না—গ্রাম-নগর উজাড় করিয়া সব যেন কি এক উন্মাদনায় ঘরের বাহিরে ছুটিয়া আসে!

শ্রীরামপুর মাহেশের—ঢাকার ধামরাইলের—পুরীধামে শ্রীজগন্নাথের রথ-যাত্রার কথাই মনে আসিতেছে।

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর"—শ্রীচণ্ডীদাসের এই কথার সার্থকতা এই রথ-যাত্রা উপলক্ষ্যে যেমন প্রকটিত হয় এমন বোধ হয় আর কোনও গণ-উৎসবে নহে—দুর্গাপূজায়ও নহে। এ যেন—দেশ-গ্রাম-নগর শুদ্ধ সব লোকের একযোগে—একই আকর্ষণে—"ব্রজের পথে" ছুটিয়া আসার দৃশ্য—যোড়শ সহস্র ব্রজ-গোপীর বৃন্দাবনের মহারাস-অভিসারে ছুটিয়া আসার চিত্রাভাস—"অন্যোহন্যালক্ষিতোদ্যমা"—'ব্যত্যস্ত-বস্ত্রাভরণা'—কে কাহার খোঁজ লয়—যে যাহার আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। —কি এক আকর্ষণে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছুটিয়া আসা! রথ-যাত্রার রজ্জুর টান্—এমনিই আকর্ষণী শক্তি-সম্পন্ন বটে। বৃন্দাবনের কৃষ্ণবংশীর টানও বুঝি ইহার কাছে হার মানে।

রথ-যাত্রায় অচল ব্রহ্ম সচল হন, শ্রীক্ষেত্রের এই "জয় জগন্নাথ" হইতেই দেশময় রথ-যাত্রার এত প্রসার-প্রতিপত্তি—তাহার মূলে রহিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

'রথ'-যাত্রা উৎসব—অর্থাৎ নৃত্য-গীত বাদ্যভাণ্ড সহকারে দেবতা-স্থানে বিগ্রহের বিজয়-যাত্রা অর্থাৎ স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া অনুষ্ঠান—অতি প্রাচীনকাল হইতে নানাদেশে নানা আকারে প্রচলিত ছিল। ইহা বৌদ্ধদের মধ্যে ছিল—সিসিলি দ্বীপে ছিল—এমন-কি রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান-গণের মধ্যে আছে—খরসান্ পাহাড়ে একবার এই উৎসব দেখিয়াছিলাম আর আমাদের এই হিন্দুর দেশে তো কথাই নাই—গণেশের রথ-যাত্রা, কার্ত্তিকের রথ-যাত্রা, শিবের রথ-যাত্রা; সর্ব্বপ্রধান অবশ্য হইতেছে শ্রীজগন্নাথের রথ-যাত্রা আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে—পুষ্যা নক্ষত্রে।

'রথ'—অর্থ শরীর, চরণ—যথা,শ্রীচরিতামৃতে (মধ্য। ১১) "রায় কহে, চরণ—রথ, হৃদয়—সারথি। যাহাঁ লঞা যায়, তাহাঁ যায় জীব-রথী॥"

উপনিষদে আছে "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি।"

চলিবার সামর্থ্য বা যোগ্যতা দেয় যাহা তাহাই 'রথ'।

এখনও বঙ্গদেশে চলতি প্রয়োগ আছে 'রথে কুলায় না'—'রথ নাই'—অর্থাৎ চলিবার শক্তি-সামর্থ্য নাই।

অচলকে সচল—স্থিতিশীলকে গতিশীল করে 'রথ'।

রথ-যাত্রা হইতেই 'যাত্রা' কথাটার বহুল প্রচলন হইয়াছে—যথা, রাস-যাত্রা, দোল-যাত্রা, কৃষ্ণজন্ম-যাত্রা, স্নান-যাত্রা, হেরাপঞ্চমী-যাত্রা ইত্যাদি।

শুধু 'যাত্রা' প্রয়োগও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে, যথা—"এই মত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ। প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন॥"

'বন-যাত্রা' প্রয়োগও আছে (মধ্য। ৫ম)।

'যাত্রা' হইতেই 'যাত্রী', 'যাত্রিক' এই সুন্দর কথা দুইটার উদ্ভব এবং ভাষায় বহুল প্রচলনের ফলে ভাষা-সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

'যাত্রা' নামক নৃত্য-গীত-বাদ্য-সম্বলিত প্রচলিত আনন্দানুষ্ঠানের নামকরণও ইহা হইতে হইয়াছে। শুভক্ষণে স্থানান্তরে গমনের নাম 'যাত্রা করা'—'শুভযাত্রা' প্রভৃতি প্রয়োগের প্রচলনও ইহা হইতে হইয়াছে।

ঐ একই অর্থে 'বিজয়', 'বিজয়া' প্রয়োগও খুব প্রচলিত হইয়াছে।

মূল-অনুষ্ঠান জগন্নাথের রথ-যাত্রা সম্বন্ধে কথাটা যেরূপ প্রচলিত আছে তাহা এই :—

ঐশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মী দেবীর সহিত বিরাজমান শ্রীজগন্নাথের মনে বৃন্দাবনে গোপীগণ-সহ মাধুর্য্য-লীলারসাস্বাদের স্মৃতি জাগরূক হইল। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়া গেলেন—স্নান এবং অঙ্গ-রাগসাধন করিলেন—বৃন্দাবন-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইহার নাম জগন্নাথের স্নান-যাত্রা, অঙ্গ-রাগ, নব-যৌবন, নেত্রোৎসব। এই সময়কে বলে 'অনবসর'—এই সময়ে একপক্ষ-কাল শ্রীজগন্নাথ জনসাধারণকে দর্শন দেন না—শুধু দয়িতাগণের অধিকার। তারপর পাণ্ডু-বিজয় শ্রীজগন্নাথের সঙ্গে সুভদ্রা এবং বলরাম কেন থাকেন এই সমস্যার সুমীমাংসা এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া জ্ঞাত নহি।

পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে মস্তিষ্কের কসরৎ করিতে নিযুক্ত থাকুন। ইত্যবসরে সহজভাবে—সরল ভক্তির চোখে—রথযাত্রাচ্ছলে জগন্নাথের এই বৃন্দাবন-বিজয়ের অন্তর্নিহিত রসাস্বাদ কিরূপ হয় দেখা যাউক।

নিভৃতে লোক-লোচনের অন্তরালে বিশ্বপতি জগন্নাথ নিজরূপ ও ভাব পরিবর্ত্তিত করিতে ব্যাপৃত—"গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং" পুরাণ পুরুষ—মণি-কোঠায় আবদ্ধ দারু-ব্রহ্ম—"নব-যৌবন" অর্থাৎ নব-কিশোর শ্যাম-সুন্দর হইলেন—ধ্যানী-জ্ঞানী-যোগী তপস্বীর অচলায়তন ব্রহ্ম সচল সলীল হইলেন—নবকিশোর মদন-মোহনরূপে ভক্তসাধারণের মধ্যে অবতরণ করিলেন—লোক-সংঘট্টের আকুল-ব্যাকুল-ভাবের ঠেলা-ঠেলির মধ্যে নিজকে বিলাইয়া দিলেন। ইহাই জগন্নাথের রথ-যাত্রা—ইহাই "জয় জগন্নাথ"—ইহাই গোপীজন-বল্লভের বৃন্দাবনে পুনরাবির্ভাব—যাঁহার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং তৎসহ বিশ্বজগৎ আকুল আগ্রহে তৃষিত চাতকের ন্যায় কত সহস্র বৎসর প্রতীক্ষায় ছিলেন—যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

'কহ সখি, কি করি উপায়।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক মোর নেত্র-চাতক
না দেখি পিয়াসে মরি যায়।

'স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্র-স্পৃহাম্'—সেই মদনমোহন আমার নেত্র-স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

এই ব্রজের কৃষ্ণকে দেখাইবার জন্যই তিনি জগন্নাথ-মন্দিরের দ্বারপালকে কতই না অনুনয়-বিনয় করিতেন! কিন্তু মন্দিরে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে সঙ্কোচ বোধ করিতেন, তাই গরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত হইয়া দর্শন করিতেন—আপনভাবে বিভোর হইয়া চোখের জলে ভাসিতেন—খাল জুড়িয়া প্রেমাশ্রু বহিয়া যাইত। শ্রীরাধা-ভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীজগন্নাথকে আর্ত্তি নিবেদন করিতেন :—

বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ
ইহাঁ লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া রথ-ধ্বনি।
তাহাঁ পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি।
ইহঁ রাজ-বেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাহাঁ গোপ-বেশ, সঙ্গে মুরলী-বাদন।
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সেই সুখ-সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ।
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে।

কখনও বা আকুল হইতেন—"কাঁহা কৃষ্ণ কাঁহা যাও, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাও, কহ সখি, কহ ত উপায়।"

কখনও আকুল হইয়া নিবেদন জানাইতেন :—

সেই [ভাব] সেই [কৃষ্ণ] সেই [বৃন্দাবন]।
যদি পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

রথ-যাত্রায় হারাণ-ধন সবই পাইলেন। তাই তদানীন্তন কালের মুখ্যাতিমুখ্য ভক্তাগ্রগণ্যগণের নেতৃত্বে সাত-সম্প্রদায়ে চৌদ্দমাদল চুয়ান্ন করতাল যোগে এক অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তন-মহোৎসব বিধান করিলেন—রস-সায়র উথলিত করিলেন—"অনর্পিতচরী" অশ্রুতপূর্ব্ব প্রেম-সাধনা প্রদর্শন করিলেন—আকুল আর্ত্তিতে প্রমত্ত উৎসবে মাতিলেন—বিশ্বজগৎকে মাতাইলেন—

"এহিঁ ত পরাণ-নাথে পাইনু"।
যাহাঁ লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু"॥

ইহা হইতেই "জয় জগন্নাথ" বিঘোষিত হইলেন—রথ-যাত্রার মাহাত্ম্য ও কীর্ত্তি প্রকটিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল।

"কালেন লুপ্তেয়ং বৃন্দাবন-কেলিবার্ত্তা"—তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হইল। মথুরা-মণ্ডলের লুপ্তলীলা ও লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার সাধিত হইয়াছে তাঁহার স্বীয় পরিক্রমাগুণে এবং নিজ-শক্তিতে অনুপ্রাণিত গোস্বামীগণ দ্বারা।

বৈদান্তিক অ-দ্বৈতবাদের পীঠ-স্থান এই শ্রীক্ষেত্র—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আদিম মঠচতুষ্টয়ের প্রধানতম মঠ 'গোবর্দ্ধন মঠ' এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধপ্রভাবের প্রধান কেন্দ্র ছিল এই দেশ।

এহেন স্থানে প্রেম-ভক্তির অনর্গল উচ্ছ্বাস-সমৃদ্ধ ব্রজলীলার পরিপোষক প্রেম-সঙ্কীর্ত্তনের মহামহোৎসব দ্বারা রথযাত্রা-চ্ছলে সেই চিরবাঞ্ছিত বৃন্দাবন-কেলি পুনঃপ্রকটিত এবং জয়যুক্ত হইল।

ক্রমান্বয়ে অষ্টাদশ বৎসর, বৎসরের পর বৎসর, রথোপলক্ষ্যে এই মহা-প্রেম-লীলা-প্রচার দ্বারা বিশাল ভূ-ভারত ব্যাপিয়া এক নব-তরঙ্গ তুলিলেন—এক অভূত-পূর্ব্ব প্রেরণা এবং আলোড়নের সৃষ্টি ও পুষ্টি করিলেন—তাহারই ঢেউ এই চারিশত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে—আরও কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিবে—তাহা লীলাময় ভগবান্ই জানেন।

রথ-যাত্রায় লক্ষ লক্ষ লোক স্ত্রী-পুরুষ, বাল-বৃদ্ধ-যুবা, অন্ধ-খঞ্জ কেমনই যেন দিশা-হারা পাগল-পারা হইয়া যায়। ইহা কি, রথোপরি 'বামন'-বিগ্রহ দেখিবার জন্য! 'বামন' অর্থে "অ-পাণি-পাদ" দারু-ব্রহ্ম জগন্নাথ—চলতি কথায় "ঠুঁটা জগন্নাথ"। এই বিগ্রহ তো বৎসরের অন্য ৩৬৪ দিন মন্দিরে নানা লীলা-বৈচিত্র্যে দৃষ্ট হইতেছেন।

রথোপরি 'বামন' কেন, স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'পার্থ-সারথি'রূপে রথোপরি বিরাজমান। সেই কুরুক্ষেত্রও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কই, সেখানে তো এই অসম্ভব লোক-সংঘট্ট ঘটে না—যেমন শ্রীক্ষেত্রে, তেমন অলৌকিক প্রেরণা উন্মাদনা কখনও উদিত হয় না।

"রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"—তবে কি, 'পুনর্জন্ম-নিরোধরূপ পুণ্যফলের লোভে' এই অসম্ভব আকুলতা-ব্যাকুলতা। তাহা নহে, কারণ 'পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' এই বচনটী অতি পুরাকাল হইতে আমাদের দেশে ছোট বড় নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্ররোচকরূপে প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে এমন কিছু অসাধারণ বা অভিনব প্রেরণা-শক্তি নাই, যাহার গুণে দিগ্‌দিগন্তর হইতে এত লোক টানিয়া আনিতে পারে।

টীকাকার না হইলে যেমন দুর্বোধ্য বিষয় সহজ-বোধ্য হয় না, জীবন্ত আদর্শ না দেখিলে, আচারযোগে প্রচার না হইলে, তেমনই ভগবানের লীলা বুঝিতে পারা যায় না।

রথ-যাত্রাচ্ছলে শ্রীভগবান্ কলিতে বৃন্দাবন-লীলার জীবন্ত প্রকাশ দেখাইলেন—একাদিক্রমে দিবা-রাত্রি-ব্যাপী 'নব-রাত্র' অবিচ্ছেদ লীলা-বিলাস—যাহা বৃন্দাবনে ব্রজ-গোপীর ভাগ্যেও ঘটে নাই।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বিনা কে ইহা জানাইত—দেখাইত—বুঝাইত।

কলি-হত অ-কৃতী জীব, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের মহিমায়, শ্রীকৃষ্ণ এবং বৃন্দাবন জানিয়া ধন্য হইল,—যথাহি শ্রীচরিতামৃতে :—

শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
কৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বৃন্দাবন ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা-রহস্যের ব্যাখ্যাতা।

মহাজন গাহিয়াছেন :—

এ মন, শচীর নন্দন বিনে।
প্রেম বলি নাম　　অতি অদ্ভুত
শ্রুত হৈত কার কাণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ নামের　　স-গুণ মহিমা
কে বা জানাইত আর।
বৃন্দা-বিপিনের　　মহা মাধুরিমা
প্রবেশ হইত কার ॥
কে বা জানাইত　　রাধার মাধুর্য্য
রস যশ চমৎকার।
তার অনুভব　　সাত্ত্বিক বিকার
গোচর ছিল বা কার ॥

[প্রেমানন্দ দাস]

আমরা সকলে সম-স্বরে বলি :—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেম-দীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥

যিনি কৃষ্ণভাবামৃত [উন্নতোজ্জ্বল-রস] আস্বাদন করিয়া এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া, প্রেম-দীক্ষা [শুদ্ধ-প্রীতিমূল ভজন-প্রণালী] বিষয়ক দিব্যজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে বন্দনা করি।
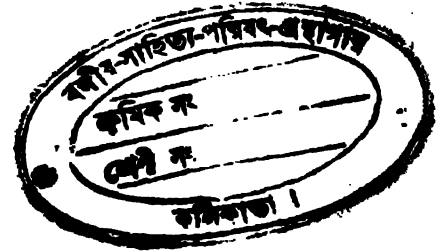
রবীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

মোরা বলি, 'আর কেন ?—ক্ষান্ত করো বাণীর নির্ঝর
নবযুগ-মধুচ্ছন্দা !'　মধ্যাহ্নের হ'ল অবসান ;
ছায়া হ'ল দীর্ঘতর ;—পূরবীতে যে করুণ তান,
বাজিছে কম্পিত সুরে, তা'রো শেষ ; গাঢ় কণ্ঠস্বর।
মোরা বলি, 'কোথা' গাও ?—নগরীর বিলাস-সাগর
দুলিছে কি তব সুরে ?' কিম্বা কোথা সে বলিষ্ঠ প্রাণ
যে ধরিবে বজ্রকণ্ঠে পরিত্যক্ত তোমার বিষাণ ?
ছায়া এলো ; কেন আর ?—ক্ষান্ত করো বাণীর নির্ঝর।

দূর হ'তে কা'রা কহে, 'নহে. নহে, আরো কিছুকাল !'
না ফুরা'তে শেষরশ্মি গোধূলির অস্ফুট প্রবাহে,
কবি। তুমি ক্লান্ত করে লেখনীর শেষ রক্তদানে
ঘুচাও এ মৃত্যু-তৃষা ! ওই দু'টি নয়ন বিশাল
না মুদিতে, স্পর্শে তা'র স্নিগ্ধ করো বিশ্বের প্রবাহে !
জীবন রচিব মোরা মৃত্যুজয়ী তোমার ও গানে ! *

* রবি-বাসরের 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসবে পঠিত

মাসপঞ্জী

রাজনৈতিক—

২১এ আষাঢ়…পুনায় বালক বিপ্লবীদল—৯জন বালক গ্রেপ্তার। ব্রহ্মে বিদ্রোহী ও সৈন্যদলে লড়াই—দেশী কামান হইতে সেনাদলের উপর বিদ্রোহীদের গোলাবর্ষণ—উপদ্রুতস্থলে ব্রহ্মের লাট। সন্ধি-সর্ত্ত পালনের জন্য সালিসী বোর্ড গঠনে মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব। মজঃফরপুরে বিনা লাইসেন্সে জনসভা নিষিদ্ধ। বোম্বাই-এ পিকেটকারীদের বিরাট্ সম্মেলন—আরও এক বৎসর পিকেটিং চালাইবার নির্দ্দেশ।

২২এ…আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী—জেলের ভিতরে শব-সৎকার—শহরে সর্ব্বত্র হরতাল—স্কুল-কলেজ বন্ধ—নানাস্থানে মিছিল ও শোক-সভা।

২৩এ…বোম্বাই-এ কংগ্রেস-ওয়ার্কিং-কমিটির অধিবেশন আরম্ভ—যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযান সম্বন্ধে আলোচনা—হোম-সেক্রেটারীর নিকট মহাত্মাজীর পত্র—সরকার-পক্ষ হইতে দিল্লী-চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ। রেঙ্গুণে নানাস্থানে ডাকাতি ও হত্যা—বিদ্রোহীদের সৈন্যদলের ঘাঁটি আক্রমণ।

২৪এ…বিদ্রোহীদল ও থারাওয়াডীবাসীদের ভীষণ সংঘর্ষ—২০ জন বিদ্রোহী নিহত ও ২ জন ধৃত। কাঁথীতে খানাতল্লাস। বান্নূতে পিকেটিং-এর ফলে ৫ জন কংগ্রেস-কর্ম্মী গ্রেপ্তার।

২৫এ রেঙ্গুণ সানরাজ্যে ৫০ জন সশস্ত্র বিদ্রোহীর বন্দুক-সহ পুরাদস্তর ডাকাতি—গ্রামে পিটুনী পুলিশ। মহাত্মাজীর প্রস্তাবিত সালিসী বোর্ড গঠন সম্পর্কে সরকারী-ভাবে অক্ষমতা জ্ঞাপন—চুক্তি-ভঙ্গের অভিযোগে মহাত্মাজীর বড়লাটের নিকট পুনরায় তার।

২৬এ. মহাত্মাজীর নিকট বড়লাটের চিঠি—বড়লাটের সহিত পরামর্শকল্পে মহাত্মাজীর সুরাট হইয়া সিমলা যাত্রা। "হিন্দুপঞ্চ"-অফিসে খানাতল্লাস।

২৭এ…শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইয়ের মোর্ভি যাত্রা। "হর হর মহাদেও" পত্রিকার সম্পাদক গ্রেপ্তার। বৈদেশিক রাষ্ট্র অর্ডিন্যান্স-এর কবলে লাহোরের দৈনিকপত্র "জমিদার"-সম্পাদক।

২৮এ… মজঃফরপুরে খানাতল্লাস—"লোকসংগ্রহ" অফিসে হানা—"রাষ্ট্রীয় গজল" নামক নিষিদ্ধ পুস্তকের মূল ও প্রেস-কপি পুলিশের হস্তগত। রেঙ্গুণে পূর্ব্ববৎ ডাকাতি ও নরহত্যা—সহস্রাধিক বিদ্রোহীর আত্মসমর্পণ।

৩০এ … মহাত্মা গন্ধীর সিমলায় উপস্থিতি—স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ এমার্সনের সহিত ৩ ঘণ্টাকাল আলোচনা। বাঙলার নানাস্থানে গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস।

৩১এ…মহাত্মা গন্ধীর সহিত হোম-সেক্রেটারী মিঃ এমার্সনের দিল্লী-চুক্তি সম্পর্কে ১০ ঘণ্টাকাল আলোচনা। শানরাজ্যে ৯২ জন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার—বিদ্রোহী নেতার পলায়ন। পদুকোটা ষ্টেটে ভীষণ চাঞ্চল্য—মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স-বৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল ও জনসাধারণের উত্তেজনার পরিণাম—উত্তেজিত জনতা-কর্ত্তৃক অফিস-আদালত লুণ্ঠিত—পুলিশ ও সেনাবাহিনী বিপর্য্যস্ত—জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদী-দিগকে খালাস।

১লা শ্রাবণ…স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যর জেম্‌স্ ক্রেরারের সহিত মহাত্মাজীর সাক্ষাৎ ও দেড় ঘণ্টাকাল উভয়ের আলোচনা—পণ্ডিত জওহরলালের নিকট মহাত্মার তার। থায়েট-মিওতে (রেঙ্গুণ) বিদ্রোহীদের হানা—১৮টী ডাকাতি, ১টী নরহত্যা।

২রা…বড়লাট ও মহাত্মার ৩ ঘণ্টাকাল আলোচনা। সিমলায় পণ্ডিত জওহরলালের উপস্থিতি—অশ্বারোহণে বড়লাট-প্রাসাদে গমন—তোরণদ্বারে স্যর কয়লী হোসেন-কর্ত্তৃক অভ্যর্থনা ও স্যর জর্জ্জ সুষ্টারের সহিত পরিচয় সাধন।

৩রা…হোম-সেক্রেটারীর সহিত পণ্ডিত জওহরলালের সাক্ষাৎ ও ৩ ঘণ্টা আলোচনা। বিগত ৭ই মে কলেজ ষ্ট্রীটস্থ পুস্তকের দোকান মেসার্স সেন ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেন ও তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারীকে হত্যা করিবার অভিযোগে আসামী লাহোরবাসী আবদুল্লা খান ও মীর আমেদের প্রতি হাইকোর্টের দায়রা-জজ মিঃ লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌-কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডের আদেশ—'প্রাচীনকাহিনী"র শোচনীয় পরিণাম। কাণপুরে বিপ্লবীর গুলি—একজন গ্রেপ্তার। লায়ালপুর জিলায় (লাহোর) পুলিশ ও ফেরারী আসামীদের সঙ্ঘর্ষ। বাঙ্গালোরে শ্রমিক-চাঞ্চল্য—মিলের সম্মুখে উত্তেজিত জনতা—জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—৫ জন নিহত ও এক শত জন আহত।

৫ই.. জার্ম্মাণী হইতে সদ্যঃপ্রত্যাবৃত্ত শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার (বোম্বাই)। ধারাওয়াড়ি বিদ্রোহীদের বিচার—৩ জনের প্রাণদণ্ড ও ৪৫ জনের নির্ব্বাসন। বড়লাটের সহিত মহাত্মাজীর ও অর্থসচিবের সহিত পণ্ডিত জওহরলালের আলোচনা।

৬ই.. বোম্বাই-এর গভর্ণর স্যর আর্নেষ্ট হট্‌সন-এর পুনা ফার্গুসন কলেজ প্রদর্শনকালে উক্ত কলেজের রিভলভার-ধারী জনৈক ছাত্র কর্ত্তৃক প্রাণনাশের চেষ্টা—লাটসাহেব-কর্ত্তৃক আক্রমণকারী ধৃত—স্কন্ধদেশে সামান্য আঘাত। মহাত্মা গন্ধী ও পণ্ডিত জওহরলালের সিমলা ত্যাগ।

৭ই.. নয়াদিল্লীতে মহাত্মাজীর সহিত ডাঃ আনসারী ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা। চাঁদপুরের ইনস্পেক্টর তারিণী মুখোপাধ্যায় খুনের মামলার আসামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রেরিত আপীল প্রিভিকাউন্সিল-কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য। অখিল ভারত হিন্দুমহাসভার সেক্রেটারী পণ্ডিত জগৎ নারায়ণের কারাদণ্ড—কাণপুর দাঙ্গার সম্বন্ধে বিবৃতির জের।

৮ই... কংগ্রেস-ওয়ার্কিং-কমিটির সদস্য সর্দ্দার শার্দ্দূল সিং কবীশ্বর গ্রেপ্তার—পঞ্জাব সামন্তরাজ্য প্রজাসম্মিলন বে-আইনী ঘোষণা—সম্মিলনের অধিবেশন পুলিশ-কর্ত্তৃক ছত্রভঙ্গ। বারদোলী তালুকে সরকারী কর্ম্মচারীদের অত্যাচার-উৎপীড়ন সম্পর্কে কালেক্টরের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মহাত্মাজীর বারদোলী-অভিমুখে যাত্রা। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের গ্রেপ্তারের জের—লক্ষ্ণৌ কালাকাঁকর রাজপ্রাসাদে পুলিশের হানা—একটী শ্বেতাঙ্গ মহিলা ও রাজার ভ্রাতা গ্রেপ্তার—বোম্বাই-এ নওজোয়ান ভারতসভার সেক্রেটারী মিঃ ইউসুফ কলিকাতাওয়ালার বাড়ী খানাতল্লাস।

৯ই... কাণপুরে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উচ্ছেদপ্রয়াসে ২ মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি। সুরাটের কালেক্টারের নিকট মহাত্মার 'চরম পত্র'—খাজনা আদায়ে জটিল সমস্যা বড়লাটের নিকট পত্রের মর্ম্মজ্ঞাপন।

১১ই...আলিপুর জজ-আদালতে বিচারনিরত ডিষ্ট্রিক্ট-জজ মিঃ গার্লিক আততায়ীর হস্তে গুলীর আঘাতে নিহত—আততায়ীর সঙ্গে পুলিশের রিভলভার লইয়া যুদ্ধ—সার্জ্জেণ্টের রিভলভারের গুলীতে আততায়ী নিহত। লক্ষ্ণৌ সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টরের প্রধান সহকারী ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগের সেক্রেটারী খান্ সাহেব হাফিজ মহিউদ্দিন পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ পাঠানযুবক-কর্ত্তৃক ছুরিকাহত—আঘাতকারী গ্রেপ্তার।

১২ই...পেশোয়ারে শ্রীযুক্ত দেবীদাস গন্ধী—সীমান্তের অবস্থা-সম্বন্ধে তদন্ত।

১৬ই...ব্রহ্মে বিদ্রোহ-দমন ও শান্তিশৃঙ্খলা-রক্ষাকল্পে বড়লাট কর্ত্তৃক অর্ডিন্যান্স জারী—লর্ড উইলিংডনের বিবৃতি।

১৯এ...আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাত্রি অনুমান এক ঘটিকায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাস-এর ফাঁসী—জেলের মধ্যেই মৃতদেহ দাহ। বোম্বাই-এ "মণি-ভবনে" কংগ্রেস-ওয়ার্কিং-কমিটির অধিবেশন আরম্ভ।

২০এ...জাতীয় পতাকায় গৈরিক, শ্বেত ও হরিৎবর্ণ—ত্যাগ, শান্তি ও শৌর্য্যের প্রতীক—বোম্বাই-এ ওয়ার্কিং-কমিটীর অধিবেশনে পতাকা-কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা।

২১এ...বাঙ্গালোরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন নিষিদ্ধ।

২২এ...জাতীয় পতাকার পরিবর্ত্তন ওয়ার্কিং-কমিটীর প্রস্তাব-অনুযায়ী গৃহীত। ব্রহ্মে সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহী-দলের সংঘর্ষ—৩ জন গ্রামবাসী নিহত।

২৩এ. বোম্বাই-এ আবার বাস্তাতঙ্ক—শোভাযাত্রার উপর আক্রমণ—হিন্দু-মুসলমানে শোচনীয় সংঘর্ষ। ভারতের নব-কল্পিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন—বোম্বাই-এ বিরাট উৎসব—সভাপতি প্যাটেলের প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা।

২৪এ…মহাত্মাজীর নিকট বোম্বাই-লাটের তার। গোলটেবিলে যোগদান-সম্পর্কে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র-সমিতিতে মহাত্মাজীর বিবৃতি—আভ্যন্তরীণ বিবাদে মহাত্মাজীর ক্ষোভ-প্রকাশ।

২৫এ…পাটনায় স্যর আলি ইমামের সভাপতিত্বে বিরাট্ জনসভায় দক্ষিণ আফ্রিকার বহিষ্কারনীতি-সম্পর্কে আলোচনা।

বৈদেশিক—

১লা শ্রাবণ…রোমের গীর্জ্জায় বোমা আবিষ্কার—রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের বিরোধের পরিণতি—পোপের দারুণ দুশ্চিন্তা।

৭ই ··লণ্ডনে আন্তর্জ্জাতিক শক্তিসমূহে বৈঠকের উপ-সংহার—ঋণ-পরিশোধের তারিখ বিলম্বিত।

১২ই··সাংহাইতে ফরাসী আদালত চীনাদের হাতে সমর্পণ—নূতন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত।

২১এ…লণ্ডনে প্রচুর বারিপাত—বহু রাস্তাঘাট জলমগ্ন।

২২এ…জার্ম্মাণীর বলশেভিক মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের আশঙ্কা প্রশিয়া গবর্ণমেন্টের স্বৈরাচার—প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গের প্রতিবাদ।

২৪এ…ম্যাক্সোতে ভীষণ দৈব-দুর্ব্বিপাক—বন্যার ফলে হাঁসপাতাল-গৃহ ভূমিসাৎ—৪০০ লোকের অপমৃত্যু।

২৫এ…প্রশিয়া প্রতিনিধিসভা-ভঙ্গের চেষ্টা বিফল—দুইজন পুলিশ-কাপ্তেন নিহত—রাজস্ব-সচিব ও পররাষ্ট্র-সচিবকে হত্যার ষড়যন্ত্র—বোমাদ্বারা ট্রেণ ধ্বংসের উদ্যম।

সামাজিক—

২১এ আষাঢ়…চট্টগ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড—৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

২৪এ…কটকে ভীষণ দাঙ্গা—২ জন নিহত—৭ জন আহত।

২৫এ…বাঙ্গালার নানাস্থানে দারুণ অর্থকষ্ট—বহু জমিদারী নীলামে—রাজস্ব-প্রদানে অক্ষমতা।

২রা শ্রাবণ…জুনাগড় রাজ্যে বহু হিন্দু নিহত—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিণাম—সশস্ত্র মুসলমান গুণ্ডাদের আক্রমণ।

৬ই…বোম্বাই-এ মদের দোকানে পিকেটিং—২ জন স্বেচ্ছাসেবক ভীষণভাবে প্রহৃত।

৭ই…ব্রহ্মবিদ্রোহীদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার অভিলাষে বৌদ্ধধর্ম্ম-যাজক সভাকর্ত্তৃক নিযুক্ত বৌদ্ধধর্ম্ম-মন্দিরের চারি-জন বিশিষ্ট পুরোহিতের খারাওয়াডি রওনা—সরকারের নিকট অপরাধীদিগের প্রতি ক্ষমাপ্রার্থনা।

১৯এ…বোম্বাই-এ জাতীয় মুস্লিম-দলের বৈঠকে সাম্প্রদায়িক দলের গুণ্ডামী—মিঃ ব্রেলভি, চাগলা ও নরীম্যান প্রমুখ ১৭ জন আহত—১০ জন চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে রক্ষিত। বারাণসীর মহারাজা স্যর প্রভু-নারায়ণ সিং বাহাদুরের ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন।

২১এ…নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবাচারিয়ারের অকোলা-অভিমুখে যাত্রা।

২৩এ…এলাহাবাদে মেয়ো-হলে জমিয়ৎ-উল-উলেমার বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ।

২৫এ. অঙ্কশাস্ত্রের অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক শ্রীযুক্ত সোমেশ-চন্দ্র বসুর নোয়াখালীতে বিপুল সংবর্দ্ধনা।

সভা-সমিতি—

২৬এ আষাঢ়…নড়াইল নারী-সম্মেলনে শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবীর বক্তৃতা।

২৭এ…রাজা মণীন্দ্র স্মৃতিমন্দিরের পাঠাগার বিভাগের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহাসমারোহে 'বর্ষা-মঙ্গল' ঋতু উৎসব।

২-৩রা শ্রাবণ··বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনীর ৬ষ্ঠ অধিবেশন—সভাপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী।

৮ই··বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ঊনচত্বারিংশৎ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে পরিষৎমন্দিরে প্রীতি-সম্মিলন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের ৪৭তম বার্ষিক স্মৃতিসভা—আচার্য্য রমণ, অধ্যাপক কালিদাস নাগ প্রভৃতির বক্তৃতা।

১২ই…আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে এলবার্ট-হলে রায়ত-সভার অধিবেশন—বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত।

১৩ই…বিদ্যাসাগর স্মৃতি-দিবস—কলিকাতা লিটারারী সোসাইটীর উদ্যোগে বিডন পার্কে চত্বারিংশৎ মৃত্যু-বার্ষিকী উৎসব।

১৬ই…লোকমান্য তিলক স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠান—সর্ব্বত্র সভাসমিতি ও মিছিল।

২১এ…বাঙ্গালার রাষ্ট্রগুরু স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের ষষ্ঠতম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠান—এলবার্ট হলে মহতী জনসভা।

২৫এ…বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে এলবার্ট-হলে জনসভা।

কলেরার প্রকোপ

বাঙ্গলায় মহামারী দমনের ভার প্রধানতঃ জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত এবং দার্জ্জিলিং ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত সকল জেলাতেই ঐজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। ইহার জন্য প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা সাহায্য করা হয়। দার্জ্জিলিং ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম—এই দুইটি জেলায় মহামারী দমন ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের খাস তত্ত্বাবধানে আছে।

বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই কলেরার প্রকোপ দৃষ্ট হয়। যে সমস্ত জেলায় কলেরা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেই সকল জেলায় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে কলেরা-প্রতিষেধক টীকা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার বিশেষভাবে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি সমূহকে কলেরার টীকা দিবার সঙ্গে সঙ্গে বীজাণু ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতেও বলা হইয়াছিল। কিন্তু কলেরা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব একই সময়ে হওয়াতে অনেক জেলাবোর্ড মহামারী দমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে না পারাতে বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। নদীয়া, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় সরকার হইতে চিকিৎসক সরবরাহ করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টারের রিপোর্ট অনুসারে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট সাময়িকভাবে অতিরিক্ত স্যানিটারী ইনস্পেক্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত বাঁকুড়া, যশোহর, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও বগুড়া জেলাবোর্ডসমূহকে ১০ জন স্যানিটারী ইনস্পেক্টার সরবরাহ করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নদীয়া, যশোহর, ঢাকা ও পাবনা এই ছয়টি জেলায় গত ৪ঠা এপ্রিল হইতে ২রা মে তারিখের মধ্যে কলেরায় মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৯০টি কমিয়া গিয়াছে। গত ছয় মাসের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বিনা মূল্যে দশ লক্ষেরও অধিক মাত্রা কলেরা-প্রতিষেধক টীকা সরবরাহ করিয়াছেন।

—সঞ্জীবনী

কচুরীর অত্যাচার

বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই কচুরীর অত্যাচার। যেখানে জল সেখানেই এই রক্তবীজের বংশ বিদ্যমান। এই কচুরীর অত্যাচারে পূর্ব্ববঙ্গের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ জলপথগুলি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বড় বড় বিলাঞ্চলের ধান্যের উপর পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ লোকের জীবন নির্ভর করে; কিন্তু কচুরীর সৃষ্টি হওয়া অবধি এই সকল বিলের ধান নষ্ট হইয়া যাওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গবাসীর দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। নদী, খাল, বিল, মাঠ প্রভৃতির কোনটীও বর্ষাকালে এই সাংঘাতিক রক্তবীজের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পায় না। সম্প্রতি ফরিদপুরের চন্দনা নদীটী বন্ধ হইয়া যাইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শুধু চন্দনারই যে এই দুরবস্থা তাহাই নহে, পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ ক্ষুদ্র নদীর অবস্থাই ঐরূপ। অথচ এই সকল ক্ষুদ্র নদী জলপথ হিসাবে সাধারণের চলাচলের জন্য একান্তই আবশ্যক। প্রায় সর্ব্বত্র ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বোর্ড সমূহের হাতে যথেষ্ট অর্থ থাকে না বলিয়া এই কচুরীর অত্যাচার হইতে কৃষক এবং জনসাধারণকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না। এ বিষয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা নীরব থাকিয়া কর্ত্তব্যের

অবহেলা করিতেছেন। স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রীর কর্ত্তব্যের মধ্যে কচুরী দূরীকরণের কর্ত্তব্যও পড়ে। —নায়ক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আগামী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের প্রবেশিকা, আই-এ, আই-এস-সি, বি-এ, ও বি-এস-সি পরীক্ষা এবং ১৯৩১ সনের নবেম্বর মাসের ও ১৯৩২ সনের এপ্রিল মাসের ডাক্তারী পরীক্ষার তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পরীক্ষার নাম ও তারিখ

ডাক্তারী পরীক্ষা (নবেম্বর ১৯৩১)—১২ই নবেম্বর ১৯৩১,
আই-এ এবং আই-এস-সি—১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২,
প্রবেশিকা —৯ই মার্চ্চ ১৯৩২,
বি-এ এবং বি-এস-সি (অনার্স)—২১শে মার্চ্চ ১৯৩২,
বি-এ এবং বি-এস-সি (পাশ)—২৯শে মার্চ্চ ১৯৩২,
ডাক্তারী পরীক্ষা —১৫ই এপ্রিল ১৯৩২

বিগত প্রবেশিকা পরীক্ষায় মোট ১৭৭৮৩ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল। তন্মধ্যে ১২২৪২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। ৫০০২ জন প্রথম বিভাগ, ৫৫২৩ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ১৬৭৪ জন তৃতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে। গড়ে শতকরা ৬৮.৭ জন পাশ হইয়াছে।

আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষার মধ্যে আই-এ পরীক্ষায় মোট ৩৫২২ জন ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৭১৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। ৪৮২ জন প্রথম বিভাগ, ৯৪২ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ২৮৭ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। শতকরা পাশের সংখ্যা ৪৮.৪।

৩২৩৮ জন ছাত্রের মধ্যে ১৭৪২ জন আই-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬১০ জন প্রথম বিভাগ, ৮৫৬ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ২৬৭ জন তৃতীয় বিভাগে পাশ হইয়াছে। শতকরা পাশের সংখ্যা ৫৩.৫।

নূতন নিয়ম অনুযায়ী ২৩৩ জন ছাত্রের মধ্যে ৯১ জন ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

—বঙ্গবাণী

বিবাহে বরপণ

প্রতিকার আছে। বরপণের বিরুদ্ধে চীৎকার, পুত্রের পিতাগণকে নির্ল্লোভ হইবার সদুপদেশ দান, ইহার প্রতিকার নহে! কন্যাদারগ্রস্ত হতভাগ্যদের বিদ্রোহই ইহার প্রতিকার! শ্রেণী, শাখা, কুলমান ঘটিত ধোঁকার টাটী ভাঙ্গিয়া বৈবাহিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করিয়া তোলাই ইহার প্রধান প্রতিকার। অবিবাহিতা কুমারী কন্যাগণ যাহাতে এমন শিক্ষা পায়, যাহাদ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে পারে—তাহার ব্যবস্থাও প্রয়োজন। ইহা দশজনের কাজ নহে—দশজনের যাঁহারা মাথা তাঁহাদের কাজ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানে মনুষ্যত্ব ও হৃদয়ের অত্যন্ত অভাব! পিতামাতাকে সমাজের লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিরুপায় কুমারী পুড়িয়া মরিল—সমাজও নিশ্চিন্ত হইল—কিন্তু চিরদিনই কি পুড়িয়া মরিয়া, সমাজকে ইহারা মুক্তি দিবে! বোবা বালিকা কি কোনদিন কথা কহিবে না? ইহারা কি নিঃশব্দে এক সমাজ-বিপ্লবকে আসন্ন করিয়া তুলিতেছে না? মূঢ়, আত্মসর্ব্বস্ব, নিজ-মাংস-পিণ্ডমাত্র প্রিয়, নিকৃষ্টচরিত্র, ঘৃণ্যব্যবহারযুক্ত অথচ উচ্চজাতীয় বলিয়া আভিজাত্যের অহঙ্কারে স্ফীত যাহারা, তাহাদের কর্ণে কি সেই আগতপ্রায় বিপ্লবতরঙ্গের কলধ্বনি প্রবেশ করিতেছে না? —আনন্দবাজার

বন্যার প্রকোপ

ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীতে অস্বাভাবিক রূপে জল বৃদ্ধি হইয়াছে। সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, সলপ, পিংনা, ময়মনসিংহ জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং ঢাকা জিলার পশ্চিমাংশ এবং ঢাকা জিলার পশ্চিমাংশ জলে প্লাবিত হইয়াছে। পাকা, আসন্ন পাকা আউস্ ও আমন ধানের ক্ষেতগুলি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে পাট দেরীতে কাটা হয় তাহার অবস্থাও তদ্রূপ। প্রত্যহ ৯।১০ ইঞ্চি জল বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া প্রকাশ—গৃহপালিত পশুর দুর্দ্দশার একশেষ হইতেছে। কারণ সমস্ত গোচারণ-ভূমি জলমগ্ন হওয়ায় তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ হইতেছে না, খড়-কুটা যাহা লোকের বাড়ীতে ছিল, তাহাও জলে ভাসাইয়া নিয়াছে। শীঘ্র জল কমিবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। জামালপুর প্রভৃতি স্থানে ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের রাস্তার উপর

দিয়া নৌকা চলাচল করিতে পারে। লোকের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। একেই দেশে দারুণ অন্নাভাব, তাহার উপর আবার জল-প্লাবন। "বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা ?"

ইতিমধ্যে বিক্রমপুরের অনেক স্থান পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ধানকুনিয়া বাজার নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। আরও অনেক গ্রামের নদীগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতেও প্রকৃতির খেয়াল তৃপ্ত হয় নাই। পদ্মার জল ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া প্রকাশ, ইতিমধ্যেই গোয়ালন্দ ঘাট প্রভৃতি জলে ডুবিয়া গিয়াছে। যেরূপ ভাবে জল বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, শীঘ্রই বহু জায়গা জলে ভাসিয়া যাইবে। বিক্রমপুরবাসীদের ক্ষতি অবর্ণনীয়। বাড়ী-ঘর নদীতে ভাঙ্গিয়া নেওয়ায়, অনেকে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে যাইয়া কোনপ্রকারে স্থানসংগ্রহ করিয়া বাস করিতেছে। অর্থাভাবের জন্য অন্যত্র যাইয়া ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না। তাহার উপর আবার বন্যার প্রকোপ। দেশে যে শীঘ্রই মন্বন্তরের হাহাকার উঠিবে না, তাহা কে বলিবে ?

—ঢাকাপ্রকাশ

ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য

বঙ্গদেশের নূতন প্রজাসত্ব আইন অনুসারে গত ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভূস্বামীর প্রাপ্য ফি বাবদে গবর্ণমেণ্টের নিকট ৮৩,৪৮,২০৩ টাকা মজুদ হইয়াছিল তাহার মধ্যে ভূম্যধিকারী সকল ৪৬,০৭, ৪৭১ টাকা লইয়াছেন এবং ৩৭,৪০,৭৩২ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা আছে। প্রজার জমী হস্তান্তর হইবার সময়ে জমিদারের প্রাপ্য ফি পাঠাইবার জন্য রেজিষ্ট্রারের নিকট মনি-অর্ডার ফি প্রভৃতি জমা দেওয়া হয়, তথাপি ভূম্যধিকারিগণের ৩৭ লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্ট কেন আটকাইয়া রাখিয়াছেন। এই বৎসর অর্থের অভাবে অনেক ভূম্যধিকারী খাজনা দিতে পারিতেছে না, এদিকে তাহাদের প্রাপ্য টাকা গভর্ণমেণ্টের হাতে পড়িয়া আছে। অবিলম্বে প্রজাসত্ব আইনের সংশোধন করিয়া বিক্রয়ের টাকা জমা দিবার এক মাসের মধ্যে যাহাতে ভূম্যধিকারী তাহার প্রাপ্য টাকা পান তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

নূতন প্রজাসত্ব আইন অনুসারে জমিদারের প্রাপ্য ফি গবর্ণমেণ্টের হস্তে কত জমা হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র এই তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

জেলা	টাকার পরিমাণ
বাখরগঞ্জ	২,৪০,১৭৩৶৯ পাই
বাঁকুড়া	১,৪৮,৪০১৶১১ ,,
বীরভূম	১,০৫,৯৭৩৶৯ ,,
বগুড়া	১,০৬,৭৪১৷৷১ ,,
বর্দ্ধমান	১,১৭,১২৩৷৮ ,,
চট্টগ্রাম	৮৬,৬৯৭৷৶৯ ,,
ঢাকা	৩,৯৮,৪৭৬৷৶৯ ,,
দিনাজপুর	১,৭২,৯০৮ /৭ ,,
ফরিদপুর	২,২৭,০৫০৶১০ ,,
হুগলী	৬৩,০০৬৷৷১০ ,,
হাবড়া	১,০৮,৬১৫৷৷/২ ,,
জলপাইগুড়ী	২৫,৭২৮৵৬ ,,
যশোহর	৪৯,৯১৩৷৶৭ ,,
খুলনা	২৬,৯০১৷৵৯ ,,
মালদহ	৬৬,৩৯৫৷৶০ ,,
মেদিনীপুর	৩,০৬,৭১৪৷৬ ,,
মুর্শিদাবাদ	৫০,৫৪৭৷৵১ ,,
ময়মনসিংহ	৪,২৫,৫৯১৷৷১১ ,,
নদীয়া	৯৫,৯৩৭৷৵৫ ,,
নোয়াখালী	৫৪,২৯০ ৵১০ ,,
পাবনা	২,৫৬,২৮০৷/৩ ,,
রাজসাহী	১,২৯,৯১৫৶৭ ,,
রংপুর	১,১২,২৮০৲৬ ,,
ত্রিপুরা	১,৬৫,৬১২৷/১ ,,
২৪ পরগণা	৯৬,৩৬৭৲৯ ,,
মোট	৩৭,৪০,৭৩২৷৷৶৫ পাই

—সঞ্জীবনী

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দণ্ডনীয় অপরাধ সত্বেও ভেজাল বন্ধ হইতেছে না। ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভেজাল খাদ্যদ্রব্য নিবারণের জন্য আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর গত ১৯২৭ সালে বাঙ্গালার প্রায় সকল স্থানে ঐ

আইন প্রচলন দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়-বন্ধের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তবু ভেজাল খাদ্য সর্বত্র বিক্রয় হইতেছে।

যদি কেহ ভেজাল দুধ, দই, ছানা, ঘি, মাখন, সরিষার তৈল, ময়দা, আটা ও চা বিক্রয় করে তবে ঐ আইন অনুসারে বিক্রেতাকে সাজা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই দেশের লোকেরা ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা অবগত হইলে সকলেই বলিবেন, বাঙ্গালী বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে একান্ত উদাসীন।

১৯২৯-৩০ সালের শাসন-বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে, হাওড়ার জেলা বোর্ড উক্ত আইন অনুসারে কোন কাজ করেন নাই।

দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা ও ময়মনসিংহ জেলা-বোর্ড খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি না, তাহা জানা যায় নাই।

অন্যান্য জেলা-বোর্ড সেনীটারী ইন্‌স্পেক্টারদিগকে ঐ আইনের ১০ ও ১২ ধারা অনুসারে কার্য্য করিতে আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি, অধিকাংশ স্থানেই ঐ ধারা প্রয়োগ করা হইতেছে না।

সুতরাং ভেজাল দুধ, ভেজাল ঘি, ভেজাল সরিষার তৈল প্রভৃতি অবাধে বিক্রয় হইতেছে এবং বাঙ্গালীকে অজীর্ণ রোগে জরাজীর্ণ করিতেছে।

সেনিটারী ইন্‌স্পেক্টরগণ ভেজাল দ্রব্য বন্ধ করিবার জন্য কি করিতেছেন, তাহা আমরা জানি না। সম্প্রতি বর্দ্ধমানে একটা মোকদ্দমা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে প্রায় ৪টিন ঘি বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২ টিন পরীক্ষা করিয়া তাহা ভেজাল বলিয়া প্রেরকের বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়। কিন্তু যে প্রণালীতে পরীক্ষা করা হয়, তাহা অবৈধ মনে করিয়া জেলার জজ আসামীকে মুক্তি দিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্বাস্থ্য-পরিদর্শকদের দ্বারা যথারীতি কার্য্য হইতেছে না।

জেলা-বোর্ড ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়-সম্বন্ধে যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন না। ভেজাল বন্ধের যে আইন আছে জন-সাধারণ তাহা মানে না, স্বাস্থ্য-ইন্‌স্পেক্টরগণও এ বিষয়ে তেমন মনোযোগী নহেন। সুতরাং বাঙ্গালা দেশে অবাধে ভেজাল ঘি, ভেজাল তৈল ইত্যাদি চলিতেছে।

কলিকাতা ব্যতীত বাঙ্গলা দেশের মিউনিসিপালিটী-সমূহ ২১ জন স্বাস্থ্য-রক্ষক ডাক্তার ও ৯৯ জন ইন্‌স্পেক্টার নিয়োগ করার কথা। তন্মধ্যে ২০ জন স্বাস্থ্য-রক্ষক ডাক্তার ও ৯৭ জন স্বাস্থ্য-ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আমরা যতদূর জানি ঢাকা মিউনিসিপালিটীর স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী ভেজাল নিবারণে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহার ইঙ্গিতে সহরের স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টারগণও যথা-সাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ভেজাল বিক্রেতাদের দমন করিবার জন্য ফৌজদারীতেও সোপর্দ্দ করা হইতেছে। কিন্তু সময় সময় দণ্ডের মাত্রা যেরূপ লঘু হইতেছে তাহাতে স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীদের শ্রম পণ্ড করিয়া দিতেছে বলিয়াই মনে হয়। যাহার উপর মানবের স্বাস্থ্য ও জীবন নির্ভর করে সে বিষয় নিয়া ছেলেখেলা কোনমতেই সমর্থনীয় নহে।

দার্জ্জিলিং ব্যতীত অপর প্রত্যেক জেলায় স্বাস্থ্য-রক্ষক ডাক্তার নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাঙ্গলার ৫১৫টী থানায় স্বাস্থ্য-ইন্‌স্পেক্টর বা এসিষ্টাণ্ট স্বাস্থ্য-রক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। তবু ভেজাল দ্রব্যের কাটতি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভেজাল দ্রব্য সেবন করিয়া বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য দিন দিন নষ্ট হইতেছে।

অধিকাংশ জেলাবোর্ড স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য যতটা মন দেওয়া উচিত, তাহা দিতেছেন না।

বাঙ্গালীকে যদি বাঁচাইতে হয়, তবে ভেজাল খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয় সর্ব্বপ্রযত্নে বন্ধ করিতে হইবে। সকলে ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট হউন।

—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

Printed by Sauriadra Kumar Ghosh at the Biswabhandar Press, 256, Cornwallis Street, Calcutta and Published by the same from the Panchapushpa Office, 31, Telipara Lane, Calcutta.
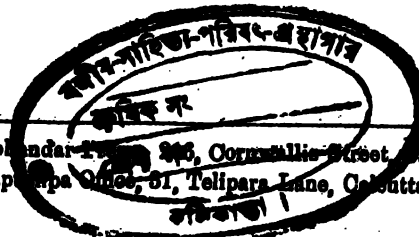
৪র্থ বর্ষ
প্রথমার্দ্ধ

ভাদ্র, ১৩৩৮

পঞ্চম সংখ্যা

বয়ঃসন্ধি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

মুকুলের বার্ত্তা বহি' তনুলতা আরক্ত পল্লবে,
চপল চোখের ভাষা লভিয়াছে বাণীর সন্ধান;
গালের গোলাপজাম পরিপুষ্ট গোলাপী গৌরবে,
কৃষ্ণসায়রের জলে কালো কেশ করে নিত্য স্নান।

মঞ্জরিত বক্ষতলে রহস্যের মন্দার মঞ্জরী
আপন গোপন বাস সবিস্ময়ে খুঁজিছে গোপনে;
শ্রীঅঙ্গের ঋজু রেখা বঙ্কিম ভঙ্গীতে উঠে ভরি';
মন্থরতা মৌন হয়ে নেমে আসে চঞ্চল চরণে।

মন্দির মেলিছে চূড়া; দূরে বাজে মিলনের বাঁশী,
বিগ্রহের অপেক্ষায় শূন্য পড়ে' আছে হৃদি-পাট;
অশ্রুর কুয়াশা-আড়ে মিলায় উচ্ছল কলহাসি,
অজানার আকিঞ্চনে মুক্তি মাগে মর্ম্মের কপাট।

সর্ব্বাঙ্গে লাগায়ে দোল অন্তরের বসন্ত উৎসব
হানে রঙ্গ-পিচিকারী অলক্ষিতে হাসে মনোভব।

শকুন্তলা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

(৪)

শ্রাবণের 'পঞ্চপুষ্পে' আমরা দেখিয়াছিলাম, দুষ্যন্ত কঠোরভাবে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এ প্রত্যাখ্যানের মূলে শকুন্তলার অম্লানরূপের প্রতি আকর্ষণের অভাব অথবা অভিভোগে শকুন্তলার উপর অরুচি কিংবা অবজ্ঞা নহে—কারণ, আমরা শুনিয়াছি, তাপসদিগের মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা বলিতেছেন—

কে এ রমণী হেরি?
শুষ্কপত্রমাঝে যেন নবকিশলয়!

দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে দুষ্যন্তের স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছে—শকুন্তলাকে তিনি যে কথাপ্রসঙ্গে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিয়াছিলেন, সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন—কিমত্রভবতী পরিণীতপূর্ব্বা? গৌতমী, তাপসদ্বয়—বিশেষতঃ শকুন্তলা তাঁহাকে নানামতে স্মরণ করাইয়া দিলেন কিন্তু ছন্নস্মৃতি দুষ্যন্তের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছুতেই স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিল না। শকুন্তলা তাঁহার নিকট পরস্ত্রী—অম্লানকান্তি, পরমলোভনীয়া হইলেও পরস্ত্রী—তিনি তাহাকে গ্রহণ করিয়া 'পরস্ত্রীস্পর্শপাংশুল' হইবেন কিরূপে?

অম্লানরূপসী এই
উপনীত বিনা নিমন্ত্রণে—
পরিণীতা? কিম্বা নহে?
ভাবি তাই অনিশ্চিত মনে।
প্রভাতে ভ্রমর যথা
হিমকণাসিক্ত কুন্দফুল
উপভোগে পরিত্যাগে
চিত্ত মোর তুল্য দ্বিধাকুল!

কিন্তু এ দ্বিধা বেশিক্ষণ থাকিল না—রাজার ধর্ম্মবুদ্ধিরই জয় হইল—

বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্‌মুখী বৃত্তিঃ
—পরনারীস্পর্শ-পরাঙ্‌মুখ
সদা জেন বশীর অন্তর।

তাই দুষ্যন্ত অসংকোচে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহার উপর প্রতীহারীর স্বগতোক্তিই ঠিক—'অহো ধর্ম্মাবেক্ষিতা ভর্ত্তুঃ! এমন যুগোপনত (অনায়াসলব্ধ) রূপ দেখিয়া কে দ্বিধা করে বল?' শকুন্তলার সে সময়ের অবস্থা আমরা পূর্ব্বেই চিত্রিত দেখিয়াছি—

প্রত্যাখ্যান-ব্যাকুলিতা,
স্বজনের করে অনুসার
গুরুসম গুরুশিষ্য
'তিষ্ঠ' বলি করিলে হুঙ্কার।
বাষ্প-কলুষিত দৃষ্টি
স্থাপি বালা ক্রূর পতি পানে
দাঁড়াইলা অবিচল—
বিষদিগ্ধ শল্য হানে প্রাণে।

দুর্ব্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন—'তুমি একান্ত মনে যাহার চিন্তা করিতেছ সে তোমাকে বিস্মৃত হইবে—স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোপি সন্।' এই অভিশাপের একটী মাত্র আসান ছিল—কিন্তু 'অভিজ্ঞানাভরণ-দর্শনেন শাপোনিবর্ত্তিষ্যতে'—যদি শকুন্তলা কোনরূপ অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারেন, তবে শাপের অবসান হইবে।' অভিজ্ঞান শকুন্তলার হাতেই ছিল—কারণ, রাজা রাজধানী ফিরিবার সময় স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরী শকুন্তলার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়াছিলেন। শকুন্তলা এ শাপবৃত্তান্ত জানিতেন না কিন্তু তাঁহার সখীরা জানিতেন। সেইজন্য বিদায়কালে সখীরা শকুন্তলাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন—'যদিই রাজা চিনিতে না পারেন, তবে তাঁহার নামাঙ্কিত ঐ আংটী-টী তাঁহাকে দেখাইও।' পথে আসিবার সময় শচীতীর্থে অবগাহন-কালে শকুন্তলার অঙ্গুলী হইতে

স্খলিত হইয়া ঐ অঙ্গুরী গঙ্গাজলে নিমগ্ন হইতেছিল—এক রোহিত মৎস্য তাহাকে গ্রাস করে। প্রয়োজনের সময় ঐ অভিজ্ঞান দর্শাইতে না পারায় শকুন্তলা কিরূপ বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা তাহা দেখিয়াছি। ইহা শকুন্তলার দুর্দৈব বই আর কি ? কিন্তু যাহাই হউক, অভিজ্ঞান-দর্শন ভিন্ন যখন অভিশাপের আসান হইবার নহে তখন শাপের প্রভাব আপাততঃ অক্ষুণ্ণই রহিল এবং দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে নির্ম্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ইহার কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-ভাবে ঐ নিদর্শন দুষ্যন্তের হস্তগত হইল এবং তাহার ফলে শকুন্তলা-বিষয়ে নষ্টস্মৃতি তাঁহার তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল। ঘটনাটী এইরূপ :—শচীতীর্থে যে রোহিত মৎস্য শকুন্তলার অঙ্গুলীভ্রষ্ট রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরীটী গ্রাস করিয়াছিল, দৈবক্রমে ঐ মৎস্য এক ধীবরের জালে পড়ে। ধীবর ভাগা দিয়া বেচিবার উদ্দেশে ঐ রুই মৎস্যকে খণ্ড খণ্ড করিলে, তাহার পেটের মধ্যে ঐ রত্নখচিত আংটিটী পাওয়া গেল। বর্ণজ্ঞানহীন জেলিয়া এত শত কি বুঝিবে ? সে বাজারে ঐ আংটিটী বিক্রয় করিতে গেলে, রাজনামাঙ্কিত দেখিয়া চোর বলিয়া পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল এবং বিলক্ষণ মারপিটের পর রাজশ্যালক নগরপালের নিকট নীত হইল। চোরের পক্ষে শূল অব্যর্থ—তথাপি নগরপাল আংটিতে আমিষগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া এবং উহার উপর রাজনাম অঙ্কিত দেখিয়া একবার রাজার আদেশ লওয়া আবশ্যক মনে করেন—রাজকুলমেব গচ্ছামঃ—রাজার নিকট গেল।

বলা বাহুল্য, অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীর দর্শনমাত্রে অভি-শাপের অবসান হইল এবং রাজা নষ্টস্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন। তস্স দংসণেণ ভট্টিণো অভিমদো জনো সুমরা-বিদো। মুহুত্তকং পকিদিগম্ভীরোবি পজ্জুস্সুঅণো আসি। শকুন্তলা-ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার চিত্তপটে ফুটিয়া উঠিল এবং স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও তাঁহার চক্ষু অশ্রুপর্য্যাকুল হইল। তিনি ধীবরের জন্য সমুচিত পুরস্কার দিয়া নগরপালকে বিদায় করিলেন এবং তদবধি বিরহবেদনা এবং দারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠ অঙ্ক দুষ্যন্তের ঐ হা-হুতাশের কাকলীতে মুখরিত এবং কাব্যামোদীর বেশ উপভোগ্য।

প্রথমং সারঙ্গাক্ষ্যা প্রিয়য়া প্রতিবোধ্যমানমপি সুপ্তম্।
অনুশয়দুঃখায়েদং হতহৃদয়ং সম্প্রতি বিবুদ্ধম্।
পূর্ব্বে হরিণাক্ষী প্রিয়া বোধিলে আমারে
রহিলাম নিদ্রামগ্ন হায় !
এ হতহৃদয় এবে হ'লো জাগরিত
অনুশয়-দুঃখে প্রাণ যায় !

কারণ, যদৈব অঙ্গুলীয়কদর্শনাদ্ অনুস্মৃতং
দেবেন, সত্যম্ ঊঢ়পূর্ব্বা মে তত্র ভবতী
রহসি শকুন্তলা, মোহাৎ প্রত্যাদিষ্টেতি,
তদা প্রভৃত্যেব পশ্চাৎতাপমুপগতো দেবঃ

——অঙ্গুরী দেখিয়া রাজা যখনই বুঝিলেন, সত্যই শকুন্তলাকে তিনি গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু মোহবশতঃ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তখন হইতেই পশ্চাৎ-তাপ তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দুষ্যন্তের সেই শোচনীয় অবস্থা আমরা কঞ্চুকীর মুখে শুনিতে পাই—

রম্যং দ্বেষ্টি, যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে
শয্যাপ্রান্তবিবর্ত্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপা।
দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি ব্রীড়াবিলক্ষশ্চিরম্॥
রমণীরে দ্বেষ, পূর্ব্বমত প্রতিদিন
মন্ত্রিবর্গে না করে সম্ভাষ, শয্যাপ্রান্তে
বিবর্ত্তন করি যাপে বিনিদ্র রজনী ;
দাক্ষিণ্য বশতঃ যবে মহিষীগণেরে
দিতে যান উচিত উত্তর, নাম-বিপর্য্যয়ে
বিলজ্জিত, বহুক্ষণ রহেন বিহ্বল।

বসন্তোৎসব সে যুগের একটা বিশিষ্ট উৎসব—মধুমাসে চূতাঙ্কুর ফুটিয়া বর্ণে স্বাদে গন্ধে তখন নাগর-নাগরীকে উন্মাদিত করিত। তাহারা উদ্যানে উপবনে পল্লীপথে সম্মিলিত হইয়া পরভৃতিকা মধুকরিকার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গান করিত :—

আতাম্র হরি অপত্তর বসন্তমাসস্স জীঅসব্বস্স।
দিট্ঠোসি চূঅকোরঅ উদুমঙ্গল তুমং পসাএমি॥

চুত-অঙ্কুর ! তাম্র পাণ্ডুর

আর হরিত—রসভার,

মধুমাস—জীবনসার !

হে ঋতুমঙ্গল ! আঁখি জুড়ায়ল,

লহ লহ লহ নমস্কার।

সেই জনপ্রিয় বসন্তোৎসব রাজা প্রতিষিদ্ধ করিলেন ফলে——

চুতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ
সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরবকং তৎ কোরকাবস্থয়া
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্দ্ধকৃষ্টং শরম্ ॥

সুচির-উদ্গত আম্র-মুকুল, তবুও পরাগহীন,
বিকাশ উন্মুখ কুরবক-কলি, রহে সে কোরক-লীন।
গত শীত-ঋতু, তথাপি কোকিল-কণ্ঠে ফুটে না স্বর,
বুঝি সংহরিল, চকিত মদন তূণ-নিষ্কাশিত শর।

রাজকার্য্যে রাজার আর মন নাই—তিনি যেটুকু না করিলে নয় কোনক্রমে সারিয়া বাকি সময় একান্তে বয়স্য মাধব্যের সঙ্গে যাপন করেন। তাঁহার কথার বিষয়, চিন্তার বিষয়, ধ্যানের বিষয়—শকুন্তলা। বয়স্য নানামতে তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন, নানাভাবে তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ বাঁচাইতে যান—কিন্তু পারেন না। একদিন কথা উঠিল, সেই যে—প্রত্যাখ্যানের পর—

নিন্দি যবে অদৃষ্ট আপন, শকুন্তলা
ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপিয়া বাহু কান্দিতে লাগিল,
জ্যোতিঃ এক নারীমূর্ত্তিধারী, তুলি তাঁরে
অপ্সরতীর্থের মুখে হৈলা অদর্শন

—মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন সে আকাশচারী কে ?

রাজা বলিলেন—"পতিদেবতা রমণীকে অন্য কে স্পর্শ করিতে পারে ? নিশ্চয়, শকুন্তলার জননী মেনকা।" মাধব্য বলিলেন, 'তবে আর ভাবনা কি ? মা কি আর বেশীদিন কন্যার বিরহ-দুঃখ দেখিতে পারেন ? শীঘ্রই মিলাইয়া দিবেন।'

দুষ্যন্ত বলিলেন, 'সখে ! সে আশা দুরাশা ! দেখ—

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যৈঃ।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে
মনোরথানাম্ অতটপ্রপাতাঃ ॥

স্বপ্ন সে কি ? মায়া সে কি ? সে কি মতিভ্রম ?
কিম্বা সুকৃতির মম অবসান—ক্রম ?
অতীত মিলন এবে দুরাশা কেবল
তুঙ্গ, হায় ! মনোরথ—প্রপাতের স্থল !

চিত্তবিনোদনের জন্য দুষ্যন্ত বহু যত্ন করিয়া শকুন্তলার এক আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন (সেকালে চিত্রাঙ্কনবিদ্যা বেশ লোকায়ত হইয়াছিল দেখা যায়) —এখন ঐ আলেখ্যশেষা শকুন্তলাই তাঁহার চিত্তের একমাত্র অবলম্বন। অবশ্য, দুগ্ধের স্বাদ কখনও ঘোলে মিটিতে পারে না। রাজা একথা বেশ জানেন—তথাপি—।

সাক্ষাৎ প্রিয়াম্ উপগতাম্ অপহায় পূর্ব্বং
চিত্রার্পিতাম্ অহমিমাং বহুমন্যমানঃ।
স্রোতোবহাং পথি নিকামজলাম্ অতীত্য
জাতঃ সখে ! প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥

উপগতা প্রেয়সীরে করি প্রত্যাখ্যান
এবে চিত্রগতা তাঁরে করি বহুমান !
পথে পূর্ণতোয়া নদী উপেক্ষি হেলায়
প্রচুর প্রণয় আজি মৃগতৃষ্ণিকায় !

একদিনের ঘটনা। সময় শীত ও গ্রীষ্মের সন্ধি অর্থাৎ ভোর বসন্তকাল। পূর্ব্বরাত্রি রাজা বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়াছেন—শরীর অবসন্ন। অদ্য রাজাসনে বসিতে পারেন নাই—

চিরপ্রবোধাৎ ন সম্ভাবিতম্
অস্মাভিঃ অদ্য ধর্ম্মাসনম্ অধ্যাসিতুম্।

বিনোদের আশায় অন্তঃপুরস্থ প্রমোদবনের মাধবীমণ্ডপে বয়স্যের সহিত প্রবেশ করিয়াছেন। আসন্ন-পরিচারিকা চতুরিকা রাজার আদেশমত দুষ্যন্তের স্বহস্তলিখিত চিত্রফলকগত শকুন্তলার প্রতিকৃতি সেখানে উপস্থিত করিল। কি সুন্দর প্রতিকৃতি !

মাধব্য দেখিলেন, ঠিক যেন সজীব চিত্র ! যেন প্রাণবতী প্রতিমা ! রাজাকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—'ধন্য আপনার নিপুণতা !

অবাদি বিজ যে দিট্ঠী নিন্নুণ্ণদপ্পদেসেসু—

নিয়োন্নত স্থানগুলিতে আমার দৃষ্টি যেন স্খলিত হইতেছে—এমন জীবন্ত যে, কথা কহিতে ইচ্ছা হইতেছে।' রাজা বলিলেন—কি বল !

অলোকসামান্য সেই লাবণ্য প্রিয়ার
চিত্রে কতটুকু তার হয়েছে চিত্রিত ?

—তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদ্‌ অন্বিতম্‌।

চিত্রফলকে তিনটী রমণীমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল—শকুন্তলা ও তাঁহার সখীদ্বয়। তিনজনেই সুন্দরী। মাধব্য তো রক্ত-মাংসের শকুন্তলাকে কোনদিন দেখেন নাই। তিনি একটু দ্বিধায় পড়িলেন—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী শকুন্তলা ? রাজা বলিলেন—"কোন্‌টী বল দেখি ? মাধব্য একটু ঠাহর করিয়া বলিলেন—হাঁ ঠিক হইয়াছে—যাঁহার শিথিল কেশবন্ধন হইতে এই ফুলগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে, যাঁহার মুখে স্বেদবিন্দু লাগিয়া আছে, বাহু দুইটী শ্রম-শ্লথ, যিনি জলসেকস্নিগ্ধ নবপল্লবশোভী সহকারবৃক্ষের পার্শ্বে ঈষৎ পরিশ্রান্তা-ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন—ইনিই শকুন্তলা —অপর দুইটী তাঁহার সখী।' রাজা বলিলেন—'ঠিক চিনিয়াছ।'

মাধব্য চিত্রফলকের প্রতি একটু নিপুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—একি ? কেন ইনি রক্তকমলের ন্যায় সুন্দর করতলে মুখ আবরণ করিয়া ভীত ভীতার মত দাঁড়াইয়া আছেন ? ওঃ একটা ফুলের মধুচোর ভ্রমর ইহার মুখকমলের দিকে ছুটিয়াছে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন—ইহা সেই ভ্রমরের চিত্র—দুষ্যন্ত কণ্বাশ্রমে শকুন্তলার প্রথম দর্শনের দিন যাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর ! হতাস্ত্বং খলু কৃতী॥
লীলায়িত নেত্র দুটি অপাঙ্গ-চপল
বার বার করিছ স্পর্শন
কহিবে রহস্য যেন শ্রুতির নিকটে
কি যে মৃদু করিছ স্বনন
বাহু উৎক্ষেপিয়া বালা নিষেধিতে, তার
কাম-সার চুম্বিছ অধর
তত্ত্ব খুঁজি হায় মোরা ব্যর্থ-মনোরথ
তুমি কৃতী ওহে মধুকর !

এ যে চিত্রগত ভ্রমর, চিত্রগতা শকুন্তলা দুষ্যন্ত তখন তাহা ভুলিয়া গেলেন। তিনি তর্জ্জন করিয়া বলিলেন—

অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং
পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং স্পৃশসি চেদ্‌ ভ্রমর ! প্রিয়ায়া
স্বাং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্‌॥
নবীন পল্লব সম লোভনীয় অতি
প্রিয়ার যে বিম্বাধর করিয়াছি পান
সন্তর্পণে রতোৎসবে, সে অধর স্পর্শ
যদি কর মধুকর ! দণ্ড দিব তবে
পদ্মকোষ-কারাগারে করিয়া বন্ধন।

বয়স্য বলিলেন—'করেন কি ? এ যে চিত্র ! রাজা বলিলেন—'চিত্র ? বল কি ? বন্ধু ! একি করিলে ?

দর্শনসুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।
স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা॥
তন্ময় হৃদয়ে আমি লক্ষিয়া প্রিয়ায়
সাক্ষাৎ দর্শনসুখ লভেছিনু যেন—
কেন সখা ! অকরুণ জাগাইয়া স্মৃতি
করিলে কান্তারে পুনঃ চিত্রে পরিণত ?

—এই বলিয়া রাজা রোদন করিতে লাগিলেন। ইহার উপর অভিজ্ঞের মন্তব্য এই—পূর্ব্বাপরবিরোধী অপূর্ব্বঃ এষ বিরহমার্গঃ—একেই বলে প্রেমরঙ্গে বিচিত্র তরঙ্গ !

রাজা বলিলেন, 'বয়স্য ! কতদিন আর এ দুঃখভোগ করিব ? দেখ—

প্রজাগরাৎ খিলীভূত স্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি॥
সতত জাগরহেতু
সুদুর্লভ স্বপ্নে সমাগম
জাগ্রতে নয়নবারি
চিত্রগতা না দেয় দর্শন !

স্বচিত্রিত আলেখ্যের প্রশংসাবাদে বাধা দিয়া রাজা বলিলেন—

যদ্যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তৎ
তদ্ অন্যথা—

চিত্রে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তাহা সংশোধন করিতে হইবে। রাজাদেশে চতুরিকা বর্তিকা ও বর্ণক আনয়ন করিল। মাধব্য জিজ্ঞাসিলেন—আবার কি আঁকিবেন ? রাজা বলিলেন—

কার্য্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণ-হরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥

আঁকিব মালিনী নদী-সৈকতে যাহার
রহিবে নিষণ্ণ সখা ! মরাল-মিথুন—
সন্নিকটে তার হিমাদ্রি-পূত-পাদ-
মূলে বিরচিব শান্ত হরিণের যূথ—
বনতরু—বল্কলম্বিত যার শাখে
তার তলে কৃষ্ণসার-মৃগ-শৃঙ্গোপরি
বামচক্ষু-কণ্ডূয়ন-নিরতা হরিণী।

আর আঁকিব—

কৃতং ন কর্ণার্পিতবন্ধনং সখে শিরীষমাগণ্ডবিলম্বিকেশরম্।
ন বা শরচ্চন্দ্রমরীচিকোমলং মৃণালসূত্রং রচিতং স্তনান্তরে॥

চিত্রে পুনঃ আকপোল-বিলম্বি-কেশর
আঁকিব প্রিয়ার কর্ণে শিরীষ-মঞ্জরী,
আর সখে ! শরচ্চন্দ্র-মরীচি কোমল
বিরচিব স্তনান্তরে মৃণাল-মালিকা।

দুষ্মন্তের আর একটী বিনোদের সম্বল ছিল—সেই অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়। ধীবরের হাত হইতে উদ্ধার হওয়া অবধি, তিনি উহা নিজের অঙ্গুলিতে ধারণ করিতেন। মাধব্য সান্ত্বনা দিতেন—দেখুন আংটিটী যেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনার হস্তগত হইয়াছে, শকুন্তলার সহিতও তেমনি অচিন্তনীয় উপায়ে মিলন ঘটিবে। রাজার হৃদয় উহাতে শান্ত হইত না। তিনি বলিতেন, অঙ্গুরীয় মত আমিও শোচনীয়। বহু পুণ্যে ও দুর্লভ স্থান লাভ করিয়াছিল—সেখান হইতে চ্যুত হইল—আমারও সেই দশা।

তব সুচরিতম্ অঙ্গুলীয় ! নূনং প্রতনু মমেব
বিভাব্যতে ফলেন।
অরুণনখমনোরমাসু তস্যাশ্চ্যুতম্
অপি লব্ধপদং তদঙ্গুলীষু

হে অঙ্গুরি ! পুণ্য তব স্বল্প মোরি মত
ফল দেখি হয় অনুমান।
রক্ত নখ মনোরম অঙ্গুলি হইতে
হ'লে চ্যুত লভি তথা স্থান !

কখন অঙ্গুরীকে ভৎসনা করিতেন—

উপালপ্স্যে তাবদ্ অঙ্গুলীয়কম্।
কথং নু তং বন্ধুরকোমলাঙ্গুলিং
করং বিহায়াসি নিমগ্নম্ অম্ভসি ?
বন্ধুর কোমল সেই অঙ্গুলি ত্যজিয়া
হে অঙ্গুরি ! কি কারণে ঝাঁপ দিলে জলে ?

আবার বলিতেন—অথবা

অচেতন তুমি—গুণ লখিবে কেমনে ?
আমি কেন অনাদর করিনু প্রিয়ায় ?
অচেতনং নাম গুণং ন লক্ষয়েৎ
ময়ৈব কস্মাৎ অবধীরিতা প্রিয়া।
তাই বলি—মূঢ় কে ? তুমি না আমি ?'

শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন—'হে অকারণ পরিত্যক্তে ! অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। সদয় হইয়া আমাকে একবার দর্শন দাও।'

আর একদিনের ঘটনা। দুষ্মন্তের নিয়ম ছিল, যেদিন রাজাসনে বসিতে পারিতেন না, প্রধান অমাত্য সেদিন-কার কার্য্যবিবরণ পত্রস্থ করিয়া রাজার গোচর করিতেন। একদিনকার বিবরণে দেখা গেল, সমুদ্রযাত্রী বণিক্ ধন-মিত্র নৌকা-মজ্জনে মৃত হইয়াছে। তাহার বহু বিত্ত, কিন্তু দুর্ভাগ্য নিঃসন্তান। অমাত্য লিখিয়াছেন, এ অবস্থায় তাহার ধনরাশি রাজারই প্রাপ্য। দুষ্মন্ত পত্র পড়িয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন—'কষ্টং খলু অনপত্যতা—নিঃসন্তান হওয়া কত বড় দুঃখ! আদেশ দিলেন—'ধনমিত্র যখন বহুধনের অধিকারী, তখন তাহার

একাধিক পত্নী থাকা সম্ভব। সন্ধান করা হউক কোন স্ত্রী গর্ভবতী আছে কি না? যদি থাকে, সেই গর্ভস্থ শিশুই পিতৃধনের অধিকারী হইবে।' ধনমিত্রের ঘটনায় রাজার স্মরণ হইল তিনিও নিঃসন্তান! 'সন্ততির বিলোপে বিত্ত পরহস্তগত হয়। আমার অবসানে পুরুবংশলক্ষ্মীর ঐ দশাই ঘটিবে—মমাপ্যন্তে পুরুবংশশ্রিয় এষ বৃত্তান্তঃ!' রাজা অধীর হইলেন। তাঁহার মনে পড়িল প্রত্যাখ্যান-কালে শকুন্তলা তাঁহার বংশবীজ ধারণ করিতেছিলেন—

সংরোপিতেঽপ্যাত্মনি ধর্ম্মপত্নী
　　ত্যক্তা ময়া নাম কুলপ্রতিষ্ঠা।
কল্পিষ্যমানা মহতে ফলায়
　　বসুন্ধরা কিল ইবোপ্তবীজা॥
ত্যজিলাম ধর্ম্মপত্নী, কুলের প্রতিষ্ঠা
　　অন্তর্বত্নী পুত্র-সম্ভাবিতা।
যথাকালে উপ্তবীজ ধরিত্রীর সম
　　ভূরি শস্য-ধারণ-উচিতা॥

তিনি কল্পনা-নেত্রে দেখিলেন তাঁহার পিতৃকুল পরম সঙ্কটাপন্ন—

অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতিসম্ভৃতানি
কো নঃ কুলে নিবপনানি করিষ্যতীতি।
নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তং
ধৌতাশ্রুশেষম্ উদকং পিতরঃ পিবন্তি॥
'ইহার অভাবে পুনঃ বংশে আমাদের
কে করিবে শ্রাদ্ধ-কর্ম্ম শ্রুতি-অনুযায়ী'
চিন্তি ইহা পিতৃকুল অশ্রুসিক্ত আঁখি
অপুত্রক মোর দত্ত জলে ধৌত করি'
অবশিষ্ট বারি হায়! করিছেন পান।

এই চিন্তায় দুষ্যন্তের শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—মোহম্ উপগতঃ।

একেই বলে দীপ থাকিতে ব্যবধান দোষে অন্ধকার ভোগ—যদি কৃথু দীপে ববধানদোসেণ এসো অন্ধআরদোসং অণুহোদি।

আমরা জানি, শকুন্তলাকে তাঁহার জননী মেনকা স্বামি-প্রত্যাখানে রোরুদ্যমানা দেখিয়া আকাশযানে উঠাইয়া তপস্বিগণের পরমাদরের স্থান হেমকূট পর্ব্বতে কাশ্যপ-আশ্রমে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে শকুন্তলা যথাকালে চক্রবর্ত্তিলক্ষণযুক্ত একটী বীরপুত্র প্রসব করিয়াছেন। ভগবান্ মারীচ স্বয়ং শিশুর জাতকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া তাহার হস্তে রক্ষাকবচ বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং তদবধি শুচিব্রতা শকুন্তলা 'নিয়মব্যাপৃতা' থাকিয়া পুত্রের লালনপালন করিতেছেন। অবশ্য দুষ্যন্ত এ বৃত্তান্ত আদৌ জানেন না।

এইরূপে শোকে দুঃখে যাতনায় ভাবনায় অনুশয়ে অনুতাপে দুষ্যন্ত কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। অহরহঃ অন্তরে দারুণ দাবদাহ এবং অনুতপ্ত চিত্তের অশ্রুবর্ষণে তাহাকে নির্ব্বাপিত করিবার ব্যর্থপ্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লক্ষ্য করিয়াছেন—'এই অনুতাপ তপস্যা। × × লাভ' করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী সাধনা, তপস্যা। × × সেই জন্য কবি পরস্পরকে যথার্থভাবে, চিরন্তনভাবে লাভের জন্য দুষ্যন্ত-শকুন্তলাকে দীর্ঘ দুঃসহ তপস্যায় প্রবৃত্ত করিলেন। × × অহরহ পরম বেদনার উত্তাপে শকুন্তলা রাজার হৃদয়ের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল। × × তিনি পূর্ব্বে কখনও যথার্থ প্রেমের উপায় ও অবসর পান নাই। × × এবারে বিধাতা কঠিন দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া রাজাকে প্রকৃত প্রেমের অধিকারী করিলেন। দীর্ঘ তপস্যায় দেবতার আসন টলে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। দেবতারা উৎসুক হইয়া এমন ব্যবস্থা করিলেন, যাহাতে দুষ্যন্ত অচিরে ধর্ম্মপত্নীকে অভিনন্দিত করেন—যজ্ঞভাগোৎসুকা দেবা এব তথা অনুষ্ঠাস্যন্তি যথা অচিরেণ ধর্ম্মপত্নীং ভর্ত্তা অভি-নন্দিষ্যতীতি। দেবেন্দ্র দৈত্যদমনের অছিলায় দুষ্যন্তকে অমরাবতীতে আনাইবার জন্য মাতলিকে দূত প্রেরণ করিলেন। মাতলি দেখিলেন—রাজা মুহ্যমান, যেন ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি। রাজাকে জাগাইবার জন্য তিনি একটা উৎকট কৌশল অবলম্বন করিলেন—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Horse-play।

আমরা জানি দুষ্যন্ত বহুবল্লভ ছিলেন—তাঁহার একাধিক মহিষী। রাণী হংসপাদিকার আমরা পূর্ব্বেই সাক্ষাৎ পাইয়াছি—তিনি সঙ্গীতশালা হইতে গুঞ্জরিয়া গান,

গাহিতেছিলেন—পূর্ব্বরূপ অভিনব মধুলোভী মধুকরকে ভিরস্কার করিয়া—

অহিনব মধুলোলুবো তুমং ইত্যাদি—কারণ, তিনি ছিলেন সকৃৎকৃত প্রণয়োঽয়ং জনঃ। অন্য একটী রাণী (বসুমতী, বেশ প্রবলা—কারণ, তিনি 'বহুমানগর্ব্বিতা'; যখন চতুরিকা রাজার আদেশমত বর্ত্তিকাবর্ণক লইয়া আসিতেছিল বসুমতী তাহা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লন—সবলাৎকারং গৃহীতঃ। ভাগ্যে দেবীর ওড়না তরুশাখায় বিলগ্ন হইয়াছিল, সেই সুযোগে চতুরিকা কোনমতে পলাইয়া দুষ্যন্তকে সংবাদ দেয়। রাজা প্রমাদ গণিয়া শকুন্তলার চিত্রপটখানি মাধব্যের জিম্মায় দিয়া তাহাকে সরাইয়া দেন। মাধব্য নিজেকে ও আলেখ্যটাকে বাঁচাইবার জন্য 'মেঘ প্রতিচ্ছন্দ' নামক তুঙ্গ প্রাসাদের উচ্চ চূড়ায় সরাসর পলাইয়া যায়। এখন ঐ প্রাসাদ হইতে মাধব্যের আর্ত্তস্বর শুনা গেল—'অব্রহ্মণ্যং অব্রহ্মণ্যং—বয়স্য ব্রহ্মহত্যা হয়—রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

রাজা চকিত হইয়া বলিলেন—কঃ কোঽত্র ভোঃ—কে আছ? ব্যাপার কি?

প্রতিহারী সসম্ভ্রমে প্রবেশ করিয়া বলিল—মহারাজ! এক অদৃশ্য প্রাণী আপনার বয়স্যকে মেঘপ্রতিচ্ছন্দের চূড়ায় তুলিয়া নিষ্পেষণ করিতেছে। রাজা আশ্বাস দিয়া বলিলেন—বয়স্য ভয় নাই—এ আমি ধনুর্ব্বাণ লইয়া যাইতেছি।

'ভয় নাই? খুব ভয় আছে। বিড়াল-গৃহীত মূষিকের ন্যায় আমি নিগৃহীত হইতেছি। অবিহা অবিহা—হায়! হায়! হায়!' রাজা অলক্ষ্য শত্রুকে দৃষ্টির অগোচর জানিয়া তাহার প্রতি শব্দভেদী বাণসন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন—অমনি মাতলি সশরীরে দেখা দিয়া দুষ্যন্তকে বলিলেন—

> কৃতাঃ শরব্যং হরিণা তবাসুরাঃ
> শরাসনং তেষু বিকৃষ্যতাম্ ইদম্।
> প্রসাদসৌম্যানি সতাং সুহৃজ্জনে
> পতন্তি চক্ষূংষি ন দারুণাঃ শরাঃ॥
> অসুরে রচিলা বিধি শরব্য তোমার
> তার প্রতি টানো শরাসন
> প্রসাদমধুর দৃষ্টি নহে শরাঘাত
> সুহৃজ্জনে দেন সাধুজন।

রাজা সসম্ভ্রমে বলিলেন—'এ কি মহেন্দ্র-সারথি মাতলি যে—স্বাগতং।' মাতলি বলিলেন—দুর্জ্জয় নামক এক দানবের দল উৎপাত করিতেছে—তাহারা ইন্দ্রের বধ্য নয়। তাহাদের বধ করিবার ভার আপনার উপর। আসুন রথ প্রস্তুত। বিজয়-যাত্রা করুন।

দুষ্যন্ত বলিলেন—এ আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ! কিন্তু বলুন তো মাধব্যের প্রতি এতটা দয়াপ্রকাশ কেন?

মাতলি বলিলেন—ইহার উত্তর সহজ। আপনাকে বড়ই মুহ্যমান দেখিলাম—প্রবুদ্ধ করি কিরূপে? দেখুন—

> জ্বলতি চলিতেন্ধনোঽগ্নিঃ
> বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণং কুরুতে।
> প্রায়ঃ স্বং মহিমানং
> ক্ষোভাৎ প্রতিপদ্যতে হি জনঃ।
> জ্বলে অগ্নি ইন্ধন-চালনে
> উত্তেজিত ফণী ফণা তুলে।
> পরকৃত ধর্ষণ বিহনে
> (প্রায় লোক) আপন মহিমা থাকে ভুলে।

তখন দুষ্যন্ত মাতলির রথারোহণে অমরাবতীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

'দুর্জ্জয়' নামক দানব-বধ দুষ্যন্তের পক্ষে কিছু অধিক কথা নহে। একদিনের যুদ্ধেই তাহা নিষ্পন্ন হইল। বিদায়কালে মহেন্দ্র দুষ্যন্তের প্রচুর সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ঐ সম্বর্দ্ধনার পরিচয় আমরা দুষ্যন্তের মুখে শুনিতে পাই।

> অন্তর্গত প্রার্থনমন্তিকস্থং
> জয়ন্তমুদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন।
> আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা
> মন্দারমালা হরিণা পিনদ্ধা॥
> বিদায়ের কালে করিলা যে সৎকার বাসব,
> কল্পনা-অতীত তাহা; বসাইয়া মোরে দেব
> অর্দ্ধাসনে, নিজ বক্ষ হ'তে খুলি মন্দারের মালা
> হরি-চন্দনে চর্চ্চিত, পরাইলা গলে মম,
> মৃদু হাস্যে জয়ন্তে উপেক্ষি, দাঁড়াইলা যিনি
> নিকটে তাঁহার দেবদত্তা ম'নে মাল্য-অভিলাষী।

এইরূপে সৎকৃত ও অভ্যর্থিত হইয়া দুষ্যন্ত যুদ্ধের পরদিন মাতলির রথে আরোহণ করিলেন। পথে কিরূপে সপুত্রা শকুন্তলার সহিত তাঁহার মিলন ঘটিল—আগামী বারে আমরা তাহা বিবৃত করিব।

আলোচনা

কায়স্থকবি সোড্ঢল ও কায়স্থজাতির উৎপত্তি

একাদশ বর্ষ পূর্ব্বে গায়কবাড় দরবার হইতে উদয়সুন্দরী-কথা নামক একখানি সংস্কৃত চম্পূ কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত কাব্যের কবি বালভ কায়স্থবংশীয় সোড্ঢল। কবি লাটদেশে অর্থাৎ বর্ত্তমান গুজরাট প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সুর, মাতা পদ্মাবতী, পিতামহ সোল্লপেয় এবং প্রপিতামহ চণ্ডপতি। অতি শৈশবে কবির পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি মাতুল গঙ্গাধর কর্ত্তৃক পরিপালিত হন। গঙ্গাধর লাট-রাজ যোগিরাজের প্রিয়বয়স্য ছিলেন। সোড্ঢল কুমার কীর্ত্তিরাজের পুত্র সিংহরাজের সহাধ্যায়ী ছিলেন। তাঁহাদের অধ্যাপক ছিলেন মনীষী চন্দ্র। সোড্ঢলের পূর্ব্বপুরুষগণ লাটদেশের সিকরহারীয়, বাহিরিহার, অন্নাপল্লীয় ইত্যাদি বিষয়ের পুরুষানুক্রমে ধ্রুবপ্রভুর কার্য্য করিয়াছেন। এক এক বিষয়ে বহু গ্রাম থাকিত। ধ্রুবপ্রভুগণ গ্রামের ধ্রুবগণের প্রধান ছিলেন। ধ্রুবগণ বলভীরাজগণের সময় হইতে পুরুষানুক্রমে গ্রামের রাজস্বের অধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন। কচ্ছ, গুজরাট ও কাঠিয়াবাড়ের নাগরব্রাহ্মণ, মোঢ় ও অন্যান্য বানিয়াদিগের মধ্যে এখনও ধ্রু এবং ধ্রুবা পদবী দেখিতে পাওয়া যায়।

সোড্ঢল কোঙ্কণের রাজা, নাগার্জ্জুন ছিত্তরাজ এবং মুম্মুণিরাজ ভ্রাতৃত্রয়ের সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং কিছুকাল লাটরাজ বৎসরাজের সভায়ও ছিলেন। ছিত্তরাজের ৯৪৮ শকাব্দের (১০২৬ খৃষ্টাব্দ) এবং মুম্মুণিরাজের দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং সোড্ঢল একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলা যাইতে পারে।

সোড্ঢল বালভ-কায়স্থবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে বলভী নগরে বাস হেতু ইহাদের বালভ নাম হইয়াছে। এই বালভ-কায়স্থবংশের বংশকর্ত্তা বলভীরাজ শিলাদিত্যের ভ্রাতা কলাদিত্য। সোড্ঢল আপনাকে এই কলাদিত্যের বংশধর ও ক্ষত্রিয় বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই বলভীরাজবংশকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। সোড্ঢল বলেন এই কলাদিত্য মহেশ্বরের কায়স্থনামক গণের অবতার। এই কায়স্থনামক গণ মহেশ্বরের কায়ের এত সান্নিধ্যে থাকিতেন যে তাঁহাকে কায়ে স্থিত বলা যাইতে পারে এবং এই জন্যই তাঁহার নাম কায়স্থ হইয়াছে (প্রায়শো বিদিত এব ভবতামভিপ্রসিদ্ধঃ কায়স্থো নাম গণঃ শ্রীকণ্ঠসন্নিধানাস্তে। স চাষ্টমূর্ত্তের্ভগবতো জলময়ীং মূর্ত্তিমধিষ্ঠিতস্তাসন্নসহচরত্বেন কায়ে স্থিতত্বাৎ কায়স্থ ইতি)। মহেশ্বরের নিদেশে শিলাদিত্যের রাজকার্য্যের সহায়তার জন্য তিনি কলাদিত্যরূপে মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহ করেন। শিলাদিত্য ও তাঁহার রাজ্যলক্ষ্মীর উপদেশানুসারে নিজভ্রাতা কলাদিত্যকে রাজ্যের সর্ব্বাধিকারস্বামিত্ব ও মুদ্রা প্রদান করেন। (উদয়সুন্দরীকথা, প্রথম ও অষ্টম উচ্ছ্বাস)

সোড্ঢলের কথায় মনে হয় যেন কায়স্থ শব্দ ও কায়স্থ-জাতির উৎপত্তি এই কলাদিত্য হইতে। এখন দেখা যাউক এই কলাদিত্য কোন্ সময়ের লোক। সোড্ঢল লিখিয়াছেন—"কংকন বলীয়সা সপ্তাঙ্গসমগ্রেণোত্তরাপথ-স্বামিনা মান্ধতৃবংশ-প্রভবেন ভুভৃতা ধর্ম্মপালেন সহ বিগ্রহো দীর্ঘতামবাপ।" উত্তরাপথস্বামী ধর্ম্মপাল নামক রাজা যে বাঙ্গলার পালরাজবংশীয় দ্বিতীয় রাজা ধর্ম্মপাল সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ধর্ম্মপাল অষ্টম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছেন, সুতরাং কায়স্থ শব্দের ও জাতির উৎপত্তি অষ্টম শতাব্দীতে বলিতে হয়। আমরা পঞ্চম শতাব্দীর দামোদরপুরের তাম্রলিপিতে (Ep. Ind. vol. xv.) কায়স্থ শব্দের উল্লেখ পাই। মৃচ্ছকটিক ও যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে (প্রথম অধ্যায়ও) কায়স্থ শব্দ পাওয়া যায়। এই উভয়ই পঞ্চম শতাব্দীরও পূর্ব্বের বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। ইহার সকলগুলিতে কায়স্থ শব্দ কর্ম্মবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, জাতিবাচক নহে। [illegible] যায়, মৃচ্ছকটিকের কায়স্থ জাতিতে [illegible] ছিলেন। কারণ, নবম অঙ্কে শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থকে ... [illegible] করিতেছেন (শ্রেষ্ঠি,

অধিকৃতেভ্যঃ বহিঃ। হয় তো নিযুক্তাঃ, অপি কুশলং ভবতাম্)। মনু ২য় অধ্যায়ের ১২৭ শ্লোকে বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ং ॥ বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেবচ।" কেহ হয় তো আপত্তি করিয়া বলিবেন, শ্রেষ্ঠীও কি ব্রাহ্মণ ছিল? শ্রেষ্ঠির ব্রাহ্মণ হইবার কোন বাধা দেখা যায় না। চারুদত্ত যদি তিন পুরুষ সার্থবাহ হইয়া এবং শ্রেষ্ঠিচত্বরে বাস করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তবে শ্রেষ্ঠির ব্রাহ্মণ হইতে বাধা কি? সুতরাং দেখা যাইতেছে, কায়স্থ তখনও জাতি-বাচক হয় নাই। কাজেই কায়স্থ শব্দের বা পদের উৎপত্তি অষ্টম শতাব্দীর বলাদিত্য হইতে কখনই বলা যাইতে পারে না। কায়স্থজাতির উৎপত্তি ঐ সময় হইতে কোন কোন দেশে আরম্ভ হইতে পারে। কায়স্থজাতির উৎপত্তি যে নবম শতাব্দীতে হইয়াছে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকুটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের ৭৯৩ শকে (৮৭১ খৃষ্টাব্দে) প্রদত্ত সঞ্জানে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের লেখক বালভ কায়স্থবংশীয় ধর্ম্মাধিকরণিক সেনাভোগিক বৎসরাজপুত্র গুণধবলকে পাই (Ep. Ind., Vol. XVIII., p. 251)। আবার ৯২৭ বিক্রমাব্দে ৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত দ্বিতীয় জয়াদিত্যের গোরক্ষপুর তাম্রশাসনে নৈথপুর কায়স্থ মহাক্ষপটলিক বলদ্ধুক এবং চিত্রপটভিবুক্ত কায়স্থ কেশবের সন্ধান পাই (J. A. S. B., Vol. LXIX., pt 1, pp. 88-92)। সুতরাং নবম শতাব্দীতে যে কায়স্থজাতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে বোধহয় দশম শতাব্দীতে কায়স্থ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। কারণ, 'ন্যায়কন্দলী'কার শ্রীধরাচার্য্যের পৃষ্ঠপোষক ভূরিশ্রেষ্ঠিরাজ কায়স্থ পাণ্ডুদাসের (৯৯১ খৃষ্টাব্দ) পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কায়স্থ-জাতির উল্লেখ পাই নাই। অষ্টম শতাব্দীর ধর্ম্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে কায়স্থ পদবাচকই দেখিতে পাই। বাঙ্গালায় এক কি দুই শতাব্দী পরে হইবার কারণও পাওয়া যায়। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের বাঁশখেরা তাম্রশাসনে দেখিতে পাই তাঁহার পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাপন করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালায় দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে পাইতেছি অষ্টম শতাব্দীতে ধর্ম্মপাল বাঙ্গালায় এবং ঐ সময়ে শুভকরদেব উড়িষ্যায় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা করিতেছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তো অতি প্রাচীন, তাহার আবার ব্যবস্থাপন কেন? আমাদের মনে হয় বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলা হওয়ায় ইঁহারা পুনঃশৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। এই যে নূতন করিয়া বর্ণাশ্রম সংস্কার করা হয় এই সময়েই কায়স্থবৃত্তিবগণ কায়স্থ নামক নূতন জাতিতে পরিণত হইয়া থাকিবেন।

বলভী বা বালগামবাসী কায়স্থগণ বোধহয় বালম বা বালম্য নামেও পরিচিত হইয়াছিল। ১২শ খৃষ্টাব্দে খোদিত ভিন্‌মলে প্রাপ্ত স্তম্ভে বালম্য কায়স্থের উল্লেখ পাওয়া যায় (Bombay Gazetteer, vol. I, pt. 1, p. 474)। বালম নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এখনও বর্ত্তমান। ইহারা বালগামবাসী কায়স্থগণের পুরোহিত ছিল। মুসলমান-দিগের বিবাদ করিয়া চতুর্দ্দশ শতকে গুজরাট চলিয়া গিয়াছে (Bom. Gaz., vol. IX, pt. I., p. 20)। বালভ বা বালম্য কায়স্থ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রতিপত্তিশালী কায়স্থগণ যে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। স্বামী বিজ্ঞানন্দ তাঁহার Comprehensive History of Kayasthas, vol, I. pt. I-এ বালভ এবং বর্ত্তমান বাল্মীকি কায়স্থ এক বলিয়াছেন। তাহা সম্ভবপর নহে। বাল্মীকি কায়স্থগণ চিত্রগুপ্ত কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি বালভ কায়স্থ কখনও চিত্রগুপ্ত-সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয় নাই; বিশেষতঃ বালভ হইতে বাল্মীকি শব্দের উৎপত্তি হওয়াও সম্ভবপর নহে। বাল্মীকি কায়স্থগণ মাথুর, ভাটনগর ইত্যাদি চিত্রগুপ্ত কায়স্থগণের ন্যায় উপবীতও ধারণ করে না। যাঁহারা একাদশ শতাব্দীতে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাঁহারা উপবীতহীন সম্ভব নহে। (Bomb. Gaz., vol. IX., pt, I., p. 67) আমাদের মনে হয় বালভ কায়স্থগণ ধ্রুবপ্রভুর কার্য্য করিয়া ধ্রুবপ্রভু নামে পরিচিত হইয়াছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ধ্রুবপ্রভু নামে একশ্রেণীর লেখক (writer) আছেন। তাঁহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন না। তাঁহারা বলেন তাঁহারা ধ্রুবের বংশধর। ইহার কারণ বোধহয় তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচয় ভুলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের ধ্রুবপ্রভু নাম দেখিয়া তাঁহাদের ধ্রুবের বংশধর বলিয়া মনে

করেন। আর একশ্রেণীর লেখক পত্তন বা পঠারীয়প্রভু নামে পরিচিত। 'কায়প্রভু ও পত্তনপ্রভু একই মূলপ্রভু বলিয়া উভয় শ্রেণীই স্বীকার করেন, কিন্তু উঁহাদের মধ্যে বিবাহাদি চলে না। স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে পঠারীয়গণকে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। উক্ত প্রেসিডেন্সির ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণও লেখকশ্রেণীভুক্ত। এই পঠারীয়গণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও কায়স্থ বলিয়াই পরিচয় দিত। (Ep. Ind., vol. XIX, p. 45)। লিপিতে পঠারীর স্থলে কটারীর লিখিত হইয়াছে। তাহা লিপিপ্রমাদে যে ঘটিয়াছে তাহা বেশ অনুমান করা যায়। কটারীর কায়স্থ বলিয়া কোন কায়স্থ-শ্রেণীর নাম শোনা যায় নাই।

আমরা দেখিয়াছি অষ্টম শতাব্দীতে কায়স্থগণ জাতিতে পরিণত হইতেছে। কায়স্থজাতির উৎপত্তির প্রবাদগুলি ইহার পরেই রচিত হইয়াছে বলিতে হইবে। 'কায়ে স্থিত' হইতে কায়স্থ শব্দের বুৎপত্তি একাদশ শতাব্দীতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তখনও কায়স্থের চিত্রগুপ্ত হইতে উৎপত্তির ইতিহাস রচিত হয় নাই। ইহা আমরা গোড়চন্দ্রের কথা হইতেও অনুমান করিতে পারি। বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে প্রথম চিত্রগুপ্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। তখনও চিত্রগুপ্ত যমের একটী নাম মাত্র। তাহাতে লিখিত আছে:—ওঁ যমং তর্পয়ামি। ওঁ যমরাজং তর্পয়ামি। ওঁ ধর্ম্মং তর্পয়ামি। ওঁ ধর্ম্মরাজং তর্পয়ামি। ওঁ কালং তর্পয়ামি। ওঁ নীলং তর্পয়ামি। ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ং তর্পয়ামি। ওঁ বৈবস্বতং তর্পয়ামি। ওঁ চিত্রগুপ্তং তর্পয়ামি। ওঁ উদুম্বরং তর্পয়ামি। ওঁ বৈবস্বতপার্ষদাং তর্পয়ামি। ওঁ বৈবস্বতপার্ষদীশ্চ তর্পয়ামি। (২-৫-৯-১১) ইহা হইতে দেখা যাইতেছে তখনও যম হইতে পৃথক্ হইয়া তাঁহারা পার্ষদ বা লেখকশ্রেণীতে ভুক্ত হন নাই। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্র খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত। এই চিত্রগুপ্তকে যমের লেখকরূপে পরে দেখিতে পাই। স্কন্দপুরাণের প্রভাস-খণ্ডের ১৩৯ অধ্যায়ে চিত্রগুপ্তকে যমের লেখক নিযুক্ত হইতে দেখিতে পাই। এই চিত্রগুপ্ত মিত্র নামা এক কায়স্থের পুত্র। তাঁহার চিত্রা নামে এক ভগিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার কোন বংশের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এখানেও দেখিতে পাইতেছি চিত্রের পূর্ব্বেও কায়স্থ ছিল। বিচিত্র নামে যমের আর একজন লেখকের নাম পাওয়া যায় ১৪৩ ও ২৪৩ অধ্যায়ে। নারদীয় মহাপুরাণের উল্লিখিত স্কন্দপুরাণের বিষয়ো-পক্রমণীতে এই অধ্যায়গুলির উল্লেখ নাই। এই প্রভাস-খণ্ডের ২৩৯ খণ্ডে নাগরব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্যের ১৬শ অধ্যায়ে লেখক চিত্রগুপ্তের উল্লেখ আছে। গরুড়পুরাণে বিচিত্র যমের অনুজ এবং চিত্র নামের রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। স্কন্দপুরাণ মহাপুরাণের অন্তর্গত, সুতরাং প্রাচীন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল দরবারের পুস্তকালয়ে গুপ্তাক্ষরে লিখিত স্কন্দপুরাণ দেখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সি, ভি, বৈদ্য তৎপ্রণীত History of Mediaeval Hindu India নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডের ২৫৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন স্কন্দপুরাণ ৮ম শতাব্দীর, আবার ঐ পুস্তকের ২য় খণ্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন উহা নবম কিংবা দশম শতাব্দীর। আবার ইহার পরপৃষ্ঠায়ই বলিতেছেন উহা একাদশ শতকের পরবর্ত্তী নহে। ইহা তাঁহার মত মাত্র। ইহার কোন কোন অংশ যে দ্বাদশ শতকের ও পরবর্ত্তী তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। নাগরখণ্ডের ১১শ ও ১১৩ম অধ্যায়ে আনর্ত্তপুরের রাজাকর্ত্তৃক চমৎকারপুর বা বর্ত্তমান বড়নগরের প্রাকার নির্ম্মাণের কথা পাওয়া যায়। এই প্রাকার চালুক্যরাজ কুমারপালের সময়ে ১২০৮ বিক্রমসংবতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। (Ep. Ind., vol. I., p. 293) স্কন্দপুরাণ যত প্রাচীনই হউক, প্রভাসখণ্ডের উপরোক্ত অংশ যখন নারদীয় পুরাণে প্রাপ্ত স্কন্দপুরাণের সূচীতে পাওয়া যায় না তখন যে ইহা পরবর্ত্তীকালের যোজনা সে-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। তবে কবে যোজিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আবার এই প্রভাসখণ্ডের অন্তর্গত বস্ত্রাপথ-(গির্ণার) মাহাত্ম্যখণ্ডে কান্যকুব্জ ভোজরাজার (দশম শতাব্দী) উল্লেখ আছে।

কায়স্থদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা ইহার প্রমাণস্বরূপ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের অন্তর্গত 'কায়স্থোৎপত্তি বা চিত্রগুপ্তকথা' উপস্থিত করেন। কিন্তু ইহা অধুনা মুদ্রিত পদ্মপুরাণে পাওয়া যায় না। তবে উক্ত পুরাণের উত্তরখণ্ডে

প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারক্রবর্ণিকার কায়স্থানাং সমুৎপত্তিং গদাধ্যাখ্যানম্' কথা পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে তখন কায়স্থ বলিয়া একটা জাতি ছিল। উত্তরখণ্ড-লেখক তাহাদের উৎপত্তি লিখিবেন মনে করিলেও কোন কারণে এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন অথবা ঐ অংশ পরবর্ত্তীকালে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যখন অন্য কোথায়ও হস্তলিখিত পুঁথিতেও উহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, তখন প্রথমোক্ত অনুমানই অধিক সম্ভবপর। যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে, ঐ অংশ পরবর্ত্তীকালে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইলেও এখন চিত্রগুপ্ত কায়স্থগণ যাহা উপস্থিত করিতেছেন তাহাই যে পদ্মপুরাণে ছিল তাহার প্রমাণ কি? হয়তো প্রভাসখণ্ডে যে বিবরণ পাওয়া যায় অথবা সোড্ঢল যাহা লিখিয়াছেন সেইরূপ কিছু ছিল। যাহা হউক এখন দেখা যাউক 'কায়স্থোৎপত্তি বা চিত্রগুপ্ত কথা'য় কি পাওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে যে ব্রহ্মা সৃষ্টির পর সমাধিস্থ হইলে তাহার কায় হইতে শ্যামবর্ণ, পদ্মলোচন, কম্বুগ্রীব, গূঢ়শিরা, পরমসুন্দর এক পুরুষ উৎপন্ন হন। তাঁহার হস্তে লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্র। ব্রহ্মা ঐ পুরুষকে বলিলেন তুমি যখন আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ তখন তুমি 'কায়স্থ' নামে খ্যাত হইলে, আর তোমার নাম চিত্রগুপ্ত হইল। ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারার্থ ধর্ম্মরাজের সভায় তোমার স্থান নিরূপিত হইল। তৎপর এই চিত্রগুপ্তের ভট্টনাগর, সেনক, গৌড়, শ্রীবাস্তব, মাথুর, অহিষ্ঠান, শৈকসেন এবং অম্বষ্ঠ নামে পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিল। চিত্রগুপ্ত তাহার পুত্রদিগকে বলিলেন যে তাহারা সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা, ব্রাহ্মণদিগের পালন, অতিথিসেবা, প্রজার নিকট হইতে কর-আদায় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিবে।

আজকাল চিত্রগুপ্ত কায়স্থগণের শাখাগুলি চিত্রগুপ্তের উপরোক্ত পুত্রগণের নামানুসারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কতকগুলি যে বাসস্থানের নামানুসারে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে প্রবাদও কতকটা এইরূপ। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে এই তথাকথিত পুরাণোক্ত কায়স্থোৎপত্তির বিবরণ এই শাখাবিভাগের পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে। আরও দেখা যাইতেছে ইহার কার্য্য প্রজার নিকট হইতে কর-আদায় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেচন। প্রত্যক্ষ-পক্ষেও আমরা যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি (১ম অধ্যায়) দামোদরপুর তাম্রশাসন (Ep. Ind., vol. XV, p. 130), ধর্ম্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন (Ep. Ind., vol. IV), এবং অপরার্কের স্মৃতিনিবন্ধে কায়স্থগণকে রাজস্ব-সংগ্রাহকরূপেই দেখিতে পাই। আবার বিষ্ণুস্মৃতি, মৃচ্ছকটিক এবং সজ্জন তাম্রশাসনে ইহাদিগকে ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত দেখিতে পাই। লিপি এই কার্য্যের আনুষঙ্গিক কার্য্য ছিল। পরবর্ত্তীকালে লিপিই বোধহয় প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল; তাই ইহাদিগকে লেখক ও গণক বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখি। আমরা দেখিয়াছি কায়স্থ অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং এই জাতির উৎপত্তির বিবরণ দশম শতাব্দীর পরেই রচিত হইয়া থাকিবে। কত পরে তাহা পরে দেখিতে চেষ্টা করিব।

সোড্ঢল-প্রদত্ত কায়স্থোৎপত্তি-বিবরণের সহিত তথা-কথিত পদ্মপুরাণীয় বিবরণের কতকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সোড্ঢল লিখিয়াছেন—অষ্টমূর্ত্তি ভগবান্ মহেশ্বরের জলময়ী মূর্ত্তির আশ্রয়হেতু, সুতরাং 'কায়ে স্থিত' কায়স্থ নামকগণ হইতে কায়স্থ শব্দ ও কায়স্থ জাতির উৎপত্তি। উক্ত পদ্মপুরাণীয় বিবরণ মতে ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া কায়স্থ নাম হইয়াছে। উভয় মতেই 'কায়' শব্দ হইতে কায়স্থ শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু কায় হইতে উৎপন্ন এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা 'কায়স্থ' শব্দ সিদ্ধ হয় না, 'কায়জ' হইতে পারে। সোড্ঢল বলিয়াছেন—মহেশ্বরের জলময়ী মূর্ত্তির নিকটে থাকার জন্য কায়স্থনামকগণকে জলে বাস করিতে হইত, তজ্জন্য তিনি সমুদ্রের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সমুদ্রমন্থন-সময়ে মন্দর পর্ব্বতের আলোড়নে জল অত্যন্ত বিক্ষোভিত হওয়াতে সাগরদুহিতা লক্ষ্মী এক কোণে অবস্থিতি করিতেছিলেন। যখন আর কিছুতেই লক্ষ্মীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না, তখন দেবতাদিগের প্রার্থনানুসারে কায়স্থনামকগণ লক্ষ্মীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সমুদ্র হইতে উত্থিত হইলেন (উদয়সুন্দরীকথা, ১০ পৃঃ)। আবার পদ্মপুরাণীয় বিবরণে চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হওয়া লিখিলেও

পরে আবার তাঁহারা প্রার্থনায় দেখিতেছি চিত্রগুপ্তকে 'ব্রিয়াদহ সমুৎপন্ন সমুদ্রমহাসোদর' ও বলা হইয়াছে (কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ৩য় সংস্করণ, ৩৭ পৃঃ)। উভয় মতেই কায়স্থ রাজকর্ম্মচারী। এমন কি সোড্ঢল বলিয়াছেন যে রাজগণ কায়স্থদিগকে নিযুক্ত করেন তাঁহারা মহেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন; অর্থাৎ ত্রিলোচন হবেন, যথা—

"তৃতীয়মক্ষিতারেণং কায়স্থ ইতি লোচনম্।
রাজবর্গবহন্নেব ভবেদত্র মহেশ্বরঃ॥"

(উদয়সুন্দরীকথা, ১২ পৃষ্ঠা)

ইহা দ্বারা মনে হয় তথাকথিত পদ্মপুরাণীয় বিবরণ সোড্ঢলের বিবরণের পরবর্ত্তীকালে রচিত। ইহার অন্য প্রমাণও দিতেছি।

দশম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে প্রাচীন লিপিতে গৌড়কায়স্থ, বাস্তব্যকায়স্থ, মাথুরকায়স্থ ও শকসেন কায়স্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাস্তব্যকায়স্থগণ কালঞ্জরের চন্দেল্ল এবং কনৌজের গাহড়বাল রাজদরবারে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এমন কি ইহাদের বংশপ্রশস্তি-সংবলিত, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের একাধিক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোথায়ও নিজদিগকে চিত্রগুপ্তবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয় নাই। বরঞ্চ ত্রয়োদশ শতাব্দীর চন্দেল্লরাজ ভোজবর্ম্মার সময়ের বংশপ্রশস্তি লিপিতে বাস্তব্যকায়স্থ সুভট আপনাকে বাস্তব-বংশধর বলিয়াছেন (Ep. Ind., vol. I, p. 333)। বোধহয় তখন ইহারা মনে করিতেন 'বাস্ত' হইতে তাঁহাদের শ্রেণীনাম 'বাস্তব্য' উদ্ভূত হইয়াছে।

কায়স্থগণ কিরূপে চিত্রগুপ্তের বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহা বেশ অনুমান করা যাইতে পারে। চিত্রগুপ্ত যমরাজের লেখক এবং বিচারক, ধন্বন্তরি দেবচিকিৎসক এবং বিশ্বকর্ম্মা দেবশিল্পী। সুতরাং দক্ষ কায়স্থের উপমা চিত্রগুপ্ত, দক্ষ চিকিৎসকের উপমা ধন্বন্তরি এবং সুনিপুণ শিল্পীর উপমা বিশ্বকর্ম্মা। পরবর্ত্তীকালে দেখা যাইতেছে কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশ, বৈদ্যগণ ধন্বন্তরির বংশ এবং শিল্পিগণ বিশ্বকর্ম্মার বংশ বলিয়া পরিচয় দিতেছে এবং ইহা কোন-না-কোন পুরাণের দোহাই দিয়া প্রচার করিতেছে এবং কোন কোন পুরাণে স্থান লাভও করিয়াছে। ইহার উদাহরণও দিতেছি। নেপালের বৈদ্যদিগের অন্য নাম ধামন্তর। কনৌজের মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের ১১৭১ (১১১৫ খৃঃ অঃ) সম্বতের তাম্রশাসনের লেখক জল্হণ (Ep. Ind., VIII., p. 153) আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন—'করণিকোজ্জ্বলতো　　বিদ্বৎশিল্পগুণোপশো গুণৈঃ। যশসে জল্হণঃ শ্রীমান লিখতাম্রকং মুদা।" অর্থাৎ করণিকবংশোদ্ভব বিদ্বান, যশস্বী জল্হণ এই তাম্রলিপি লিখিয়াছেন। উক্ত মহারাজার ১১৭২ সম্বতের তাম্রলিপিতে এই জল্হণই নিজকে শ্রীবাস্তব্যকুলোদ্ভূত কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়াছে (Ep. Ind., Vol. IV., p. 104)। ইহার পরেই দেখিতে পাই মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র মহারাজ জয়ন্তচন্দ্র বা জয়চন্দ্রের (১২৪৩ বিক্রমসংবৎ) সভাকবি শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে চিত্রগুপ্ত কায়স্থ হইয়া গিয়াছে। ইন্দ্র, যমাদি অন্যান্য দেবতার সহিত দময়ন্তীর স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইয়াছে, যথা,—

দৃগ্গোচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈঃ প
এতদীয়ঃ।
উদ্বৃত্ত পত্রস্য যদীদ একো মসেন্দ্বিধচ্ছোপরি পত্রমঙ্কঃ॥

(১৪শ সর্গ)

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে চিত্রগুপ্ত দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কায়স্থ ও লেখক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও বাস্তব্য কায়স্থগণ আপনাদিগকে বাস্তব-বংশধর বলিয়াছে। চিত্রগুপ্তের কোন উল্লেখ করে নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে তথাকথিত পদ্মপুরাণীয় কায়স্থোৎপত্তি-বিবরণ ত্রয়োদশ শতাব্দী অথবা তৎপরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ মুখে চিত্রগুপ্তবংশীয় বলিলেও ইহাদের চারিশ্রেণীর অন্যতম বঙ্গজ কায়স্থদিগের কুলজীগ্রন্থে ইহাদিগকে চিত্রগুপ্তের ভ্রাতা চিত্রসেনের কাহারও মতে চিত্রদেবের বংশধর বলা হইয়াছে, যথা,—"চিত্রগুপ্তো গত স্বর্গে বিচিত্রে নাগসন্নিধৌ॥ চিত্রসেন পৃথিব্যাং" (শব্দকল্পদ্রুম)। এই চিত্রগুপ্ত প্রদীপের পৌত্র এবং কায়স্থের পুত্র। ইহার কোন বংশ নাই। বিচিত্র সম্ভবতঃ নাগবংশীয় কায়স্থগণের আদিপুরুষ। বঙ্গদেশে পূর্ব্বে চিত্রগুপ্তের তত প্রচার-প্রতিপত্তি ছিল না। অধুনা কয়েক

বংগায় হইতে যুক্তপ্রদেশ ও বেহারের কায়স্থগণের দেখা-দেখি এখানেও চিত্রগুপ্ত-পূজা আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা উপরে দেখিতে পাইলাম বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে চিত্রগুপ্ত, যমের একটী নাম। স্কন্দপুরাণান্তর্গত প্রভাস-খণ্ডে মিত্র নাম্মা কায়স্থের পুত্র যম লেখক নিযুক্ত করিয়া যমপুরে লইয়া গেলেন। তারপর তথাকথিত পদ্মপুরাণীয় বিবরণ-অনুসারে ব্রহ্মার শরীর হইতে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি এবং কায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া কায়স্থ নামেও খ্যাত। ইহাতে চিত্রগুপ্তকে ধর্ম্মরূপী এবং লক্ষ্মীর সহিত সমুদ্র-মন্থনে উৎপন্নও বলা হইয়াছে। বঙ্গজ কায়স্থ-কুলজী মতে [illegible] দের পুত্র চিত্রগুপ্ত। ইহা ভিন্ন গরুড়পুরাণে লিখিত [illegible] ব্রহ্মা সর্ব্বগত বায়ু এবং তেজবিবৃদ্ধিমান্ সূর্য্যকে সৃ[illegible] লেন এবং তাঁহা হইতে চিত্রগুপ্ত সংযুত ধর্ম্মরাজ [illegible] উক্ত গরুড়পুরাণে আবার বিচিত্রকে সূর্য্যপুত্র [illegible] যমের অনুজ বলা হইয়াছে (বঙ্গবাসী সংস্করণ, গরুড়পুরাণ, ৬১৬ ও ৬২২ পৃষ্ঠা)। ইহাতে মনে হয় যম ও চিত্রগুপ্ত সহজ এবং বিচিত্র ইহাদের অনুজ।

এই সব চিত্রগুপ্ত ছাড়া আর এক চিত্রগুপ্তের সন্ধান পাওয়া যায় গুজরাটের নাগরব্রাহ্মণদিগের মধ্যে। বড়নগরবাসী পণ্ডিত গঙ্গাশঙ্কর পঞ্চোলী গুজরাটী ভাষায় লিখিত তৎপ্রণীত 'নাগরোৎপত্তি' নামক পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় নাগর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে তিনপ্রকার মতের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—

প্রথম মত	দ্বিতীয় মত	তৃতীয় মত
১। আভ্যন্তর অর্থাৎ যাঁহারা বড়নগরবাসী	১। আভ্যন্তর	১। বড়নগরা।
২। বাহ্য অর্থাৎ যাহা-দিগকে ঐ গ্রামের বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।	২। বাহ্য	২। বিসলনগরা।
৩। ভট্ট অর্থাৎ রণমত্ত	৩। ষষ্ঠ্যা চোথানী সুরাধীমত্ত	৩। সাঠোদরা।
৪। অভট্ট	৪। পিত্থ্যা (প্রশ্নোরা)	৪। কৃষ্ণোরা।
৫। চিত্রকূটা	৫। চিত্রকূটা (কূটকর্ম্মা)	৫। চিত্রোড়া।
৬। গর্ত্তাতীর্থবাসী	৬। চিত্রগুপ্ত	৬। প্রশ্নোরা।

নাগরব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই চিত্রগুপ্ত নামে শ্রেণী-বিভাগের উৎপত্তির কোন ইতিহাস দেওয়া হয় নাই। তৃতীয় মতই বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ। চিত্র-গুপ্তই বোধ হয় বর্ত্তমান সময়ের কৃষ্ণোরা। কিন্তু কৃষ্ণোরা ও চিত্রোড়া কোথায় আছে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। চিত্তোড়ের সংস্কৃত নাম চিত্রকূট প্রাচীন লিপিতে পাওয়া যায়। আবার প্রথম মতানুসারে ভট্ট একটী শ্রেণীর নাম। চিত্রগুপ্ত কায়স্থদিগের মধ্যে ভট্টনাগর নামে একটী শ্রেণী দেখা যায়। ডক্টর দেবদত্ত ভাণ্ডারকর বলেন বঙ্গীয় কায়স্থ ও নাগরব্রাহ্মণগণ একমূলসম্ভূত। উভয় জাতির মধ্যে আচার-ব্যবহারে কতকগুলি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ১৩৩১-৩২ সনের কায়স্থ-সমাজ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। নাগরব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে এই চিত্রগুপ্ত শ্রেণী আসিল কি প্রকারে? এবং তাহারা গেলই বা কোথায়? ইহা দ্বারা স্বতঃই সন্দেহ হয় যে এই চিত্রগুপ্তশ্রেণীর নাগরব্রাহ্মণগণই হয় তো চিত্রগুপ্ত কায়স্থের মূল। ইহাদের চিত্রগুপ্ত নাম হইবার কারণ কি? স্কন্দপুরাণস্থ নাগরখণ্ডের ১০৭ অধ্যায়ে নাগর-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক বৎসবংশীয় চিত্রশর্ম্মার উল্লেখ পাই। এই চিত্রশর্ম্মাই প্রথম পাতালের হাটকেশ্বরের অনুকরণে চমৎকারপুর বা বর্ত্তমান বড়নগরে হাটকেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করেন। মহাদেব ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই বরপ্রদান করেন যে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি ও অন্যান্য বংশধরগণ পৃথিবীতে যতদিন চন্দ্রতারকা বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল যথাবিধি অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ ও তর্পণ-কার্য্যে আদিবংশ সংস্থাপক তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া শ্রাদ্ধতর্পণ করিবেন। ইহাতে অন্য নাগরব্রাহ্মণগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া প্রত্যেকেই লিঙ্গস্থাপন করেন। এই চিত্রশর্ম্মাই সম্ভবতঃ চিত্রগুপ্ত এবং তাঁহার বংশধরগণই 'চিত্রগুপ্ত' এই শ্রেণী নামে পরিচিত হইয়া থাকিবে। চিত্রগুপ্তের নাম যেমন তর্পণে ব্যবহৃত হয় ইহার নামও সেইরূপ ব্যবহৃত হইত অথবা নাগর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহারা কায়স্থবৃত্তিক ছিল, তাহারাই চিত্রগুপ্তশ্রেণী নামে পরিচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যমের লেখক চিত্রগুপ্তই ছিল লেখক বা কায়স্থ-দিগের আদর্শ। নাগর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে বহু কায়স্থ-

বৃত্তিক ছিল তাহার প্রমাণও প্রাচীন লিপিতে পাওয়া যায়।

কাঠিয়াবাড়ের কোডিনারে প্রাপ্ত নানাকের প্রশস্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, বৈজবাপী গোত্রীয় নাগরব্রাহ্মণগণ চালুক্যরাজাদিগের শ্রীকরণের কার্য্য করিয়া শুক্লা নামক গ্রাম লাভ করিয়াছিল (Ind. Ant., Vol. XI., p. 102)। ইহা ভিন্ন প্রাচীনলিপিতে লেখকরূপেও দেখিতে পাই।

এই গেল চিত্রগুপ্ত কায়স্থের কথা। এখন আমরা চান্দ্রসেনী বা প্রভুকায়স্থদিগের উৎপত্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রভুগণ বলেন যে, যখন পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে আক্রমণ করিয়া অন্য ক্ষত্রিয়গণকে আক্রমণ করেন, তখন রাজা চন্দ্রসেনের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা-অবস্থায় দালভ্যমুনির আশ্রয়-গ্রহণ করেন। পরশুরামও দালভ্যাশ্রমে আসিয়া চন্দ্রসেন-পত্নীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে বলেন। ইহাতে দালভ্য উঁহার গর্ভস্থ সন্তানটী প্রার্থনা করেন। পরশুরাম বলিলেন এই বালক (গর্ভস্থ) বালক 'কায়স্থ' নামে পরিচিত হইবে এবং ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারিবে না। চিত্রগুপ্তের নিয়ত স্বধর্ম্ম লেখ্যকর্ম্মই ইহার উপজীব্য হইবে। তাঁহারা ইহার প্রমাণস্বরূপ স্কন্দপুরাণান্তর্গত সহ্যাদ্রিখণ্ডের ৪৭ অধ্যায় উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই আখ্যান চিত্রগুপ্ত-আখ্যানেরও পরবর্ত্তী। নারদীয়পুরাণে স্কন্দপুরাণের যে সাতটী খণ্ডের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে সহ্যাদ্রিখণ্ডের নাম পাওয়া যায় না। সকল আখ্যানগুলিই কায়স্থজাতি গঠিত হইবার পরে তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়, কারণ সকলেই কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি দিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহারা এখন প্রভুকায়স্থ নামে পরিচিত। আমরা দেখিয়াছি করণ-প্রভুগণ করণকর্ম্মচারিগণের প্রধান বলিয়া করণপ্রভু নামে পরিচিত হইয়াছে। প্রভুকায়স্থগণও কায়স্থ কর্ম্মচারিগণের প্রধান বা প্রভু বলিয়া প্রভুকায়স্থ বা কায়স্থপ্রভু নামে পরিচিত হইয়া থাকিবে। বঙ্গদেশের প্রাচীন লিপিতে আমরা জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহাকায়স্থ ও প্রথমকায়স্থের উল্লেখ পাই। এই প্রভুকায়স্থ ইহাদের সমপর্য্যায়স্থ বলিয়াই মনে হয়।

আমরা উপরে যাহা দেখাইলাম তাহা দ্বারা কায়স্থজাতির উৎপত্তির একটা ক্রম-স্তর বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কায়স্থ পূর্ব্বে বৃত্তিবাচক ছিল, পরে জাতিবাচক হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই উভয় বর্ণ কায়স্থবৃত্তি গ্রহণ করিত, তাই কায়স্থদিগের মধ্যে কতক ব্রাহ্মণ ও কতক ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করেন। কচ্ছ প্রদেশের কায়স্থগণ পৌরহিত্য, লিপি ও মুদ্রাব্যবসায়ী (Hindu Tribes and Castes by Sherring, 1881 A. D., Vol II, p 241)। চিত্রগুপ্তকায়স্থগণের অন্যতম সূর্য্যধ্বজগণ আপনাদিগকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলেন। বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে কায়স্থনামে পরিচিত এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে (Enthoven's Caste and Tribes of Bombay)। গুজরাটের ঔদিচ্য ব্রাহ্মণদিগের একটি শাখার নাম 'কায়তিয়া' (ibid)। এই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের ন্যায় মিত্র, সোম, বিষ্ণু, দত্ত, ইন্দ্র ইত্যাদি সম্মান বা পদবী আছে। বোম্বে প্রদেশে ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে এক জাতি আছে। তাঁহারা লেখক-শ্রেণীভুক্ত। তাঁহাদের ব্রহ্মক্ষত্রিয় নাম তাঁহাদের ব্রাহ্মণ হইতে উৎপত্তিই প্রমাণ করিতেছে। পাঠারীয় বা পত্তন-প্রভুগণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে (পূর্ব্বার্দ্ধ ৬৯।৫-২) ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। আমরা দেখাইয়াছি পূর্ব্বে ইহারাও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিত। সহ্যাদ্রিখণ্ডের ২৮ অধ্যায়ে উঁহাদের লিপিজীবিকার কথাও আছে। করণপ্রভুগণ এই পত্তন-প্রভুগণেরই একটা শাখা। বাঙ্গলকায়স্থ ও প্রভুকায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। চিত্রগুপ্ত কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করেন। গরুড়পুরাণ মতে চিত্রগুপ্ত যমের ভ্রাতা এবং উভয়েই সূর্য্যের পুত্র। শতপথব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদানুসারে যম ক্ষত্রিয়, সুতরাং চিত্রগুপ্তও ক্ষত্রিয়। বঙ্গীয় কায়স্থগণও ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত দেবদত্ত ভাণ্ডারকর দেখাইয়াছেন (Indian Antiquary, 1911) ইহাদের উৎপত্তি নাগর-ব্রাহ্মণ হইতে। আমরাও এ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রমাণ পাইয়াছি। যাঁহারা কায়স্থবৃত্তিক তাঁহাদের মধ্যের কতক-গুলি অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে কায়স্থ নামে একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। ইঁহাদের উৎপত্তির আখ্যানগুলি একাদশ শতাব্দী ও তৎপরবর্ত্তীকালে রচিত। চিত্রগুপ্তের মূর্ত্তিকল্পনা সম্ভবতঃ মৎস্য ও ভবিষ্যপুরাণোক্ত সূর্য্যের পার্শ্বদ পিঙ্গলের অনুকরণে করা হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে ইহার নাম কুণ্ডী, যথা,—"মসীভাজনসংযুক্তো বিভ্রৎ কুণ্ডীতু দক্ষিণে।" মৎস্যপুরাণ—"লেখনী-পত্রকে কার্য্যে পিঙ্গলশ্চাতিপিঙ্গলঃ।"

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

"বসন্ত জাগ্রত দ্বারে"

(কবিতা)

শ্রীকরুণাময় বসু

ওগো মৃত্যু, কাল এসো ক্লান্ত দু'টি চক্ষু মোর ঢাকি',
আজিও কাঁপিছে প্রাণে বসন্ত-স্বপন।
যৌবন নিকুঞ্জে মোর পুষ্প আজো মেলে নাই আঁখি,
অস্ফুট্ কুসুম-কলি ক'রোনা চয়ন।
ধরণীর দুঃখ সুখ সুনির্ম্মল আকাশের আলো,
মধুর প্রভাতখানি, গোধূলির সোণা।
সকলি যে চক্ষে মোর স্বপ্ন সম লাগিয়াছে ভালো,
এত সুখ এত দ্রুত লুটায়ে দিয়োনা।

যুগান্তের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বক্ষতলে নিত্য ওঠে বাজি,
সূর্য্যালোক করি পান মর্ম্মপুট ভরি'।
এখনো লভে নি হিয়া প্রাণ-ভরা আনন্দের সাজি,
হে দরদী মৃত্যু-বঁধু, কেমনে গো মরি!
আসিয়া বসন্ত যবে জাগাইবে ব্যাকুলহৃদয়ে,
মধুভরা মর্ম্মদল বিচিত্র বরণে;
সেইক্ষনে ওগো মৃত্যু, প্রেমস্নিগ্ধ প্রাণটুকু লয়ে,
নিঃশেষে ঝরিয়া যাব তোমার চরণে। *

---

* সরোজিনী নাইডুর 'গোল্ডেন থ্রেশোল্ড' কাব্যের একটী কবিতার অনুবাদ।

কাব্য ও বস্তুতন্ত্রতা

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

দার্শনিক বেন্থাম ব'লেছেন কাব্য এবং সত্যের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ আছে অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে আমরা যে জিনিস পাই তার পনের আনাই কাল্পনিক, সত্যের অংশ তার মধ্যে থাকে খুব অল্প। গোয়ালার দুধ নামে পরিচিত শ্বেতাভ জলীয় পদার্থের মত তা'তে সারবস্তু বড়ই কম, জলের ভাগই অধিক। কোথাকার সামান্য একটুখানি ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে তার ওপর কল্পনার আল্পনা এঁকে এমন ক'রেই সেটাকে কবি প্রকাশ করেন যে আসল বস্তুটাকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। এমন যে জিনিস যা মানুষের কোন প্রয়োজনেই লাগে না—যা কেবল শব্দের সুষমায় এবং ছন্দের হিল্লোলে আমাদের মনকে ভুলিয়ে কোন্ এক অপরূপ রূপ-কথার রাজ্যে নিয়ে যায় সেটাকে আমাদের অবসর-সময়ের খেলার সামগ্রী ব'লেই গণ্য করা উচিত, তার বেশী মূল্য তার নেই। অনেকে আবার কাব্যকে কল্পনাবিলাসীর বিকৃতমস্তিষ্কের প্রলাপ ব'লেও মনে করেন। তাঁদের মতে এমন সব ভাব কাব্যের ভিতরে স্থান পায় যা মানুষ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কখনই বরদাস্ত কর্‌তে অভ্যস্ত নয়। তৃতীয় একদল লোকের বিশ্বাস যে কাব্যের সঙ্গে দুর্নীতির রীতিমত সম্বন্ধ আছে এবং একটু-আধটু অশ্লীলতার ইঙ্গিত অন্ততঃ না থাক্‌লে কাব্য-নাটক ভাল জমে না। লোকে যে কাব্য-চর্চ্চা করে তার প্রধান কারণই হ'চ্ছে যে তা'তে ক'রে মানুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তির তৃপ্তি কতক পরিমাণে সাধিত হ'তে পারে। মানুষের ষড়্‌রিপুর মধ্যে প্রথমটীর চেয়ে প্রবল আর কোন্‌টী আছে? অতএব শৃঙ্গার-রসের সমাবেশ যে কাব্যে যত বেশি সে কাব্য আমাদের তত হৃদ্য হয়।

প্রথমে প্রথমদলের আপত্তির আলোচনা করা যাক্। তাঁদের প্রধান অভিযোগ এই যে কাব্য জিনিসটা আগাগোড়াই ধোঁয়া, সারবস্তু তার ভিতর কিছুই নেই। কাব্য কল্পনানুরঞ্জিত মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরা চান জাগতিক কল্যাণের মাপ-কাঠিতে সাহিত্যের দর যাচাই ক'রতে। টাকা-আনা-পাই ছাড়িয়ে তাঁদের বুদ্ধি এগোয় না। সুতরাং যার মধ্যে সত্যের আভাস অথবা উদরপূর্ত্তির উপায় পাওয়া যায় না বস্তুপন্থীরা সে জিনিসের কোন প্রয়োজন আছে ব'লেই স্বীকার করেন না। বিচার্য্য এই যে সারবস্তু ব'ল্‌তে বোঝায় কি? দেহটাই যদি মানুষের সব হ'ত, মন ব'লে যদি কোন বালাই তার না থাক্‌ত, তাহ'লেও হয় তো বলা যেতে পারত যে সারবস্তু তাই যা মানুষের দেহ-যন্ত্রটাকে লাবণ্যযুক্ত করে আর ভোগ-বিলাসের যাবতীয় আস্‌বাব্ তার সামনে এনে ধরে দেয়। কিন্তু বড়বাড়ী আর জুড়িগাড়ী সংগ্রহ হ'লেই তো মানুষের মনের শূন্যতাটা ভরে ওঠে না। সেই যে আকাশ-পাতালব্যাপী বিরাট্ শূন্যতা, যেখানে মানুষ "যাহা চায় তাহা ভুল ক'রে চায়, যাহা পায় তাহা চাহে না," অর্থনীতিকের নির্দ্দেশিত কোন পন্থাই তো সেই মহামরুতে শান্তির স্নিগ্ধচ্ছায়াটাকে ঘনিয়ে আন্‌তে পারে না। প্রত্যক্ষবাদী জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলকেও তাই একসময়ে ব'ল্‌তে হয়েছিল যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্য তাঁকে জীবনে যে নির্বৃতির আস্বাদ দিয়েছে, পৃথিবীর আর কোন কিছুই তা পারে নি। সুতরাং 'ধোঁয়া'রও দাম আছে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় কথা, সাহিত্যে উদরপূর্ত্তির উপায় বর্ণিত না থাক্‌লেও সত্যের আভাস তা'তে আছে প্রচুর। সত্যের সহিত সাহিত্যের মূলতঃ কোনই বিরোধ নেই। প্রত্যুত: সাহিত্য ও সত্য সমার্থবাচক। সত্য কি জিনিস? যা ঘটে তাই কি কেবল সত্য? কবিচিত্তের গোমুখীমুখে যে সত্য-সুরধুনীর উদ্ভব হয় তার পুণ্য-প্রবাহে স্নান ক'রে কি কোটি কোটি নরনারী শুচি ও নির্ম্মল হয় না? শিল্পী রুডের আঁকা নিসর্গ-চিত্রগুলিতে মানুষ, গরু, গাছপালা প্রভৃতির ছবিগুলি ঠিক স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত হয় নি ব'লে কে কবে অনুযোগ ক'রেছে? কবির কাব্যে ইতিহাসের ঘটনানু-বর্ত্তিতার সন্ধান ক'রতে গেলে অবশ্যই হতাশ হ'তে হ'বে।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলপ-পড়া সাক্ষীর মত সত্যকথা কবি বলেন না। যখন তিনি "আইআগো"র দুরভিসন্ধি, "ওথেলো"র ঈর্ষ্যা ও সন্দেহ বা "দেস্‌দিমোনা"র হত্যার কথা বিবৃত করেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য থাকে মানব-মনের প্রাথমিক বৃত্তিগুলিকে আমাদের মনের সামনে ধ'রে দেওয়া। আর ইতিহাসেই কি আমরা ঘটনাপুঞ্জের অবিকৃত আলেখ্য পাই? সার্ ওরাল্টর র‍্যালে যখন পৃথিবীর ইতিহাস সঙ্কলন কর্‌ছিলেন তখন একদিন ঠিক তাঁর জানালার নীচে তাঁর চোখের সামনে একটা ভীষণ মারপিট্ হ'য়ে গেল। ব্যাপারটার প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ ক'র্‌তে গিয়ে তিনি দেখ্‌লেন যে কোন দু'জন লোকই ঠিক এককথা বলে না। সেইদিন তিনি প্রথম উপলব্ধি ক'র্‌লেন যে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সত্যের নামে কত অসংখ্য মিথ্যা নির্ব্বিবাদে চ'লে যাচ্ছে। নিজের চোখে যা দেখা গেল তারই সম্বন্ধে যখন এত গোলযোগ, তখন দু'হাজার বছর আগেকার কোন ঘটনার অকপট ইতিহাস লিখ্‌তে যাওয়া কি বিড়ম্বনা!

কাব্য কি? অন্তঃপ্রেরণাবলে কবি মনোজগতে জীব-জগতের যে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেন তারই অভিব্যক্তি হয় কাব্যে। বস্তুর বহিঃরূপের সঙ্গে তা অবিকল মেলে না অথচ আমরা মনে-প্রাণে জানি তার মত সত্য জগতে আর কিছুই নেই। প্রেমিকচূড়ামণি চণ্ডীদাস যখন শ্রীহরি-বিরহে রাধার মনোভাব বর্ণন ক'র্‌তে গিয়ে প্রিয়বিরহে তাঁর নিজের মনের অবস্থা একটা একটা ক'রে রাধার ওপর আরোপ ক'রেছেন তখন তাঁর অমূল্য পদগুলি কি সত্যের দিক্ দিয়ে অণুমাত্র ক্ষুণ্ন হ'য়েছে? তাঁর প্রেমগদ্‌গদ কণ্ঠের অশ্রুকোমল কমনীয় রাগিণী যখন শুনি, তন্ময়চিত্তে যখন পাঠ করি—

"আনের পরাণ আনের অন্তরে আমার পরাণ তুমি।
তিল আধ তাই নয়নে না হেরি মরণ বাসি যে আমি॥"

তখন বিরহী-হৃদয়ের এই মর্ম্মন্তুদ উচ্ছ্বাস আমাদের প্রাণের তারে যে মূর্চ্ছনা ঝঙ্কৃত করে তার চেয়ে গভীরতর সত্য আর কি আছে? সত্য ও তথ্য একজিনিস নয়। বাহিরে যা ঘটে তাই তথ্য, অন্তরের নিভৃত নিত্য লোকেই সত্যের স্বরূপ বিম্বিত হয়। কাব্য, ইতিহাস বা ঘটনাপুঞ্জের সমষ্টি নয়; বিজ্ঞান অথবা প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহের অন্তর্নিহিত কারণসূত্রের অনুসন্ধানও নয়। সত্যদর্শী কবির চিত্তদর্পণেই আলোক প্রতিফলিত হয়। সত্য সর্ব্বকালেই সত্য—শাশ্বত এবং অপরিবর্ত্তিনীয়। বিজ্ঞান কালে কালে পরিবর্ত্তমান। গতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিউটনের যে সকল প্রাথমিক সূত্র এতদিন পর্য্যন্ত অভ্রান্ত ব'লেই মান্য হ'য়ে আসছিল, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদের আবিষ্কারের পরেও কি তাদের সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই বলা চলে? আমাদের প্রাচীন সভ্যতার কতটুকু পাই আমরা খাঁটি ইতিহাসের মধ্যে? ব্যাস-বাল্মীকির কাব্যে ভারতের অতীত সভ্যতার যে চিত্র অঙ্কিত র'য়েছে তা থেকেই আর কি আমাদের পুরান দিনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পরিচয় পাই না? হোমরের কাব্যে গ্রীসের আদিম সভ্যতার যে নিদর্শন প্রতিফলিত র'য়েছে, সেই দেশ-সম্বন্ধে লিখিত কোন্ ইতিহাস তার চেয়ে বড় সত্যের ইঙ্গিত ক'র্‌তে পেরেছে? বেকন্ ব'লেছেন, কবি প্রকৃতির বাইরের রূপটাকে অন্তরস্থ কামনার আলোকে রঙীন ক'রে নেন; যা বিশ্বের সকল লোকের মধ্যে সকল কালেই সমভাবে বর্ত্তমান আছে এমন সব সার্ব্বজনীন সত্যের আভাস দেয় কাব্য; মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গের অমৃত-রসে আমাদের সঞ্জীবিত রাখে, দুঃখকে সুসহ করে, সঙ্কটকে মধুময় করে, আমাদের মনের সামনে উন্মুক্ত ক'রে দেয় আনন্দের চির-নন্দন! কবি-কঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে সেই সময় কবি বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরকরণার নানাবিভাগের যে চমৎকার চলচ্চিত্র পাওয়া যায় তার সামান্য একটু নমুনা হিসাবে এইখানে "কালকেতুর অঙ্গুরী ভাঙ্গাইতে বণিকালয়ে গমন" অধ্যায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে যে গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টি, যে অপূর্ব্ব লিপিকুশলতা, মানবমনের সঙ্গে যে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের অভিব্যক্তি দেখা যায় তা 'ইতিহাসে' দুর্লভ। মনীষী এরিষ্টট্‌ল্ বলেন, ইতিহাসের চেয়ে কাব্যে দার্শনিকতা অনেক বেশী; বিশ্বজনীন সত্য নিয়ে হ'ল কাব্যের কারবার, ঘটনা-বিশেষের প্রতিলিপির নাম ইতিহাস। সুতরাং কাব্য যে অনাবশ্যক এ মত কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

এখন দ্বিতীয় অভিযোগটার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক্। বাস্তবিক কাব্য কি বিকারগ্রস্তের প্রলাপ? রামায়ণের মধ্যে দশানন রাবণের কথা আছে, মহাভারতে

হিড়িম্বা-ঘটোৎকচের কাহিনী আছে, গ্রীকপুরাণে 'সেন্টর' প্রভৃতির অলৌকিক আখ্যায়িকা আছে সত্য কিন্তু যার একটীমাত্র দেহে দশমল্লের বীর্য্যের সমাবেশ হ'য়েছিল, অত্যাচার ও উৎপীড়ন ক'রেছিল যে শত হস্তে, যে উদগ্র পাশবশক্তির প্রতীক ছিল এই নরদুর্লভ অবয়ব তাকে না দেখে যদি আমরা কেবল তার হাত-পাগুলাই দেখি তা-হ'লে কবি এবং কাব্যের ওপর অবিচার করা হ'বে সন্দেহ নেই। এই মনোবৃত্তি অনেকটা শিশু-মনোবৃত্তির অনুরূপ; কথামালার গল্প শুনতে শুনতে শিশুরা যেমন জিজ্ঞাসা ক'রে বসে, "বাবা, শেয়ালে কি কথা কইতে পারে?" "আচ্ছা, মানুষ আকাশে ওড়ে কি ক'রে?" এই সকল লোকের আপত্তিও কতকটা সেই ধরণের। প্রোক্লাসের মতে প্লেটো যে তাঁর গণতন্ত্র থেকে কাব্যকে নির্ব্বাসিত ক'রেছিলেন তার কারণ এ নয় যে কাব্যকলা সম্বন্ধে তাঁর বাস্তবিক কোন অশ্রদ্ধা ছিল; আশঙ্কা ছিল পাছে তরুণ-সম্প্রদায় একে ভুল বোঝে এবং রূপক ও বাস্তবের প্রভেদ নির্ণয় করতে অসমর্থ হয়; আসলে কিন্তু তিনি ললিতকলার মধ্যে খাঁটি কাব্যকে সকলের উপরে আসন দিতেন। "দুই আর দু'এ চার" পর্য্যন্ত যাদের দৌড়—এই রকম গাণিতিক বুদ্ধি-সর্ব্বস্ব লোকের পক্ষে

She plays me like a lute, what tune she will,
No string in me but trembles at her touch;

অর্থাৎ—

বীণার মত আমায় ল'য়ে করে কেবল খেলা,
বাজায় নানান্ সুর!
সব ক'টী তার কাঁপে আমার পেয়ে পরশ তারই
সুখে—হৃদয় ভরপুর!

এই রকম কমনীয় মাধুর্য্যের উপলব্ধি হওয়া সহজ নয়। বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির নিত্য নবীন কান্তি তাদের চোখে ধরা পড়ে না,—পত্রের মর্ম্মরে, নৃত্যপরা তটিনীর কলগানে, উপলখণ্ডের অন্তরালে অনন্ত উপদেশের ইঙ্গিত তারা পায় না। বস্তুতঃই তারা অনুকম্পার পাত্র।

কাব্যের বিরুদ্ধে সব-চেয়ে বড় অভিযোগ এই যে কাব্য দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়—এমন কি কাব্যের প্রধান অঙ্গই হ'ল অশ্লীলতা। একথা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কোন কোন কাব্যে অশ্লীলতা-দোষ থাকতে পারে; তাই ব'লে কাব্যমাত্রই দুর্নীতিদুষিত এরূপ মন্তব্য সমীচীন নয়। "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটকের উপরই কালিদাসের কবিযশঃ প্রতিষ্ঠিত, ঋতুসংহারের উপর নয়; রামপ্রসাদের খ্যাতি তাঁ'র ভাবগভীর শ্যামাসঙ্গীতগুলির জন্য, বিদ্যাসুন্দরের জন্য নয়; ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বিশেষ পরিচিত হ'লেও তাঁর কবি-গৌরব কামাত্মক বর্ণনাগুলির মধ্যে কখনই নিহিত নেই। সেক্সপীয়রের 'ওথেলো', 'হ্যামলেট্' ছেড়ে 'ভিনস্ ও এডোনিস্' কে কবে পড়ে? অবশ্য স্থায়িভাবের উপজীব্য রসটাকে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে সেই ভাবের খুঁটিনাটিগুলিরও উল্লেখ অনেক সময়ে অপরিহার্য্য হ'য়ে পড়ে—কিন্তু সত্যকার-শিল্পী যিনি তিনি কখনই এমনভাবে সেগুলির প্রকাশ করেন না যা'তে সেইগুলির উপরই বিশেষ ক'রে আমাদের দৃষ্টি পড়ে এবং সমগ্রের সংহতি ও সুষমার দিক্ থেকে আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হই। গ্রীসের মর্ম্মর-মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই নিরাবরণ, তাই ব'লে আমাদের দৃষ্টি কি খণ্ডের দিকেই আকৃষ্ট হয়, না নারী-বা-নররূপের অখণ্ড সুষমাই আমাদের মুগ্ধ করে? বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদে অনেকে নীতিবিগর্হিতভাবের সন্ধান পান, কিন্তু বিশেষ ক'রে সেই 'স্খলিত' পংক্তিগুলির লোভেই কি আমরা তাঁদের কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই, না, তাঁদের কবিপ্রতিভার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে—এমন কিছু অনির্ব্বচনীয়তা আছে যার জন্যে এইসকল প্রেমিক কবির লীলানিকুঞ্জে প্রবেশ ক'রতে আমরা বাধ্য হই? দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিদ্যাপতি লিখেছেন;—

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরণ-চপলগতি লোচন লেল॥
অব সবখনে রহু আঁচরে হাত।
লাজে সখীগণে না পুছয় বাত॥

* * *

শৈশব যৌবন উপজল বাদ।
কেও ন মানয়ে জয় অবসাদ॥

* * *

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন॥

আরে [illegible] কারণ ঝাঁট।
শৈশব সকলি চমকি দেল পীঠ। ইত্যাদি

রাধারাণীর এই যে অপরূপ রূপবর্ণনা, এ এমন সজীব, এমন প্রাণময়ী যে প'ড়্তে প'ড়্তে মনে হয় যেন সেই মুকুলিকা দেবীরূপিণী তরুণী আমাদের চোখের সামনে চপল-মন্থর চরণে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 'পয়োধর', 'নিতম্ব' প্রভৃতি দু'একটা শব্দ আছে ব'লে বাস্তবিকই আমাদের চিত্তে কোন বিক্ষোভ উপস্থিত হয় কি? 'যৌবনের অঙ্কুর কিছু কিছু উৎপন্ন হ'ল। বালিকা-সুলভ চরণচাঞ্চল্য দূর হ'ল, কিন্তু তার বদলে দেখা দিল যুবতী-জনোচিত অপাঙ্গের চঞ্চলতা' প্রথম দুটী চরণেই যখন এই অপূর্ব্ব সুন্দরভাবের ইঙ্গিত পাই তখন কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা কি স্বতঃই নত হয় না? তবে পাপকে মধুর ও লোভনীয় করবার জন্যই যেখানে আপত্তিজনক শব্দ ও ভাবের অবতারণা সেখানে সমর্থন করবার কিছুই নেই এবং সেই শ্রেণীর সাহিত্য চিরকালের সিংহাসনে স্থান পেয়েছে বা পাবে এমন বিশ্বাসও আমাদের নেই।

শিল্পের উদ্দেশ্য আনন্দ দেওয়া—সু অথবা কু, কোনরূপ নীতিপ্রচার করা নয়, আজকালকার অনেক বিশিষ্ট সমালোচকই এ কথা ব'লে থাকেন। তাঁরা "শিল্পের জন্যই শিল্প" এই মতবাদের ব্যাখ্যাতা! এ বিষয়ে কিন্তু কোন পূর্ব্বতন পাশ্চাত্য মনীষী একটা বড় সুন্দর কথা ব'লেছেন। তাঁর মতে কাব্যের চরম উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষাদান কিন্তু সেই শিক্ষা দেওয়া চাই আনন্দের মধ্য দিয়ে। ডাঃ জনসনের মতে ইউরিপিডিসের প্রত্যেক কথাই এক-একটী উপদেশ এবং সেক্সপীয়রের সমগ্র গ্রন্থাবলি অনুসন্ধান করলে সামাজিক ও ধর্ম্ম-নৈতিক সূত্রসম্বলিত একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হ'তে পারে। অথচ ইউরিপিডিস অথবা সেক্সপীয়রের কাব্য আলোচনা ক'র্লে প্রথমেই কিছু তাঁর নীতির দিক্‌টা আমাদের চোখে পড়ে না। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে যে শিক্ষা তা আমাদের যত হৃদয়গ্রাহী হয়, কাটা ছাটা নীরস নীতিকথা কখনো সেরূপ হয় না। কাব্য অজ্ঞাতসারে আমাদের আত্মাকে ঊর্দ্ধলোকের দিকে নিয়ে যায়, ধূলিমলিন ধরণীর কলুষস্পর্শ থেকে আমাদের শুদ্ধ ও শাশ্বত শান্তির রাজ্যে পৌঁছে দেয়। কাব্যের মধ্যে শ্লীলোপদেশ থাকা উচিত কি না সে প্রশ্ন অনাবশ্যক। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে কাব্যের গহন অতলতায় অবগাহন ক'রে নীতির মাণিক্য যে অনেকে আহরণ ক'রে থাকেন সে-বিষয়ে সংশয় নেই। বস্তুতন্ত্রতার দিক্ থেকে এ হিসাবেও কাব্যের মূল্য খানিকটা আছে।

আমরা জানি, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনস্বী এবং ওজঃশালী পুরুষেরাও কাব্যের যথোচিত সমাদর ক'রে গিয়েছেন। মাসিদনপতি সিকন্দর শিবিরে অবস্থানকালেও সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে মূল্যবান্ রজতপেটিকায় হোমরের কাব্য-গ্রন্থ রাখতেন এবং রাত্রে উপাধানের নীচে রেখে শয়ন করতেন। কোয়েবেক্ যুদ্ধের পূর্ব্বদিন সায়াহ্নেও জেনারেল উল্‌ফ গ্রের 'এলিজি'র আবৃত্তি শুনে বলেছিলেন, "ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার চেয়ে এইরূপ কবিতার রচয়িতা হওয়ার সৌভাগ্যকে আমি অধিকতর বরণীয় মনে করি।" অথচ যোদ্ধা হিসাবে উভয়েরই খ্যাতি ছিল বিপুল ও সুদূর-প্রসারী। কবি-প্রতিভার রক্তচরণে জগজ্জয়ী বীরের এই যে অযাচিত শ্রদ্ধাঞ্জলি, কাব্যের উপযোগিতা-সম্বন্ধে এর চেয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হ'তে পারে?
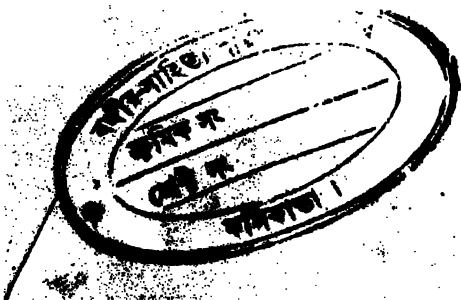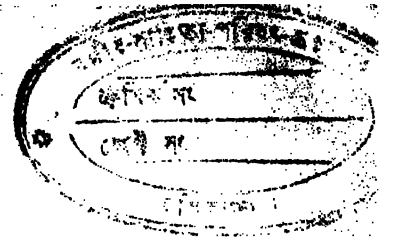
গান্ধিজী

বন্দে আলী মিঞা

হে মহামানব তোমারে নমস্কার!
নব ভারতের দীক্ষার গুরু—মহিমার অবতার,
আঁধার রাতের দুর্যোগে হায়
হতাশায় কাঁপে প্রাণ ;
বন্দিনী দেশ-জননী মোদের—
কেঁদে কেঁদে ম্রিয়মাণ।
অশ্রু জমিয়া লোণা হ'ল যত
সাগরের নীল জল,
রুদ্ধ ব্যথায় দিবানিশি তাই
করে ওরা কোলাহল,
এই অমারাতে ঝড়ের কণ্ঠে গাহিলে ত্যাগের গান,
সত্যের দীপ হাতে লয়ে এসে করিলে হে আহ্বান ;
—ভয় নাই—ভয় নাই—
চোখের তিমির টুটে গেছে আজ চারিদিকে
রোশ্‌নাই।

হে ঋষি মহান্ তোমারে নমস্কার!
জাতির দ্বন্দ্ব ঘুচায়েছ তুমি—ছোট নহে কেহ আর,
নিখিল মানুষে কোলাকুলি আজ
সমান সকল ঠাঁই
মেথর কি মুচি, নমঃশূদ্র
সকলে তোমার ভাই ;—
বাক্‌হীন ধরা—তাহার সাথেও
কহিতে পেরেছ কথা
মাটির বুকের শৃঙ্খলভার—
তোমায় হানিছে ব্যথা!
তোমার পায়ের চলা পথ হ'তে ধূলা তুলে মাথে লই,
তারি সাথে তব মহান্ ব্রতের শিখা যেন বুকে বই ;
অদূরেতে কোনো দিন
এই সাধনার সিদ্ধি মিলিবে—পুরাতন হ'বে ক্ষীণ।

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে 'কৃষ্ণ-চরিত্র'

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—'কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান'—ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেই একথা বিশ্বাস করেন। কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাস ও ঐতিহাসিক সত্য, অনেক সময়ে এ দুয়ের মধ্যে ঐক্য রাখা সম্ভবপর হয় না। ইতিহাসের সম্বন্ধ বহির্জগৎ লইয়া কিন্তু ধর্ম্মের অনুভূতি ও প্রসার হয় অন্তর্জ্জগতে, তাই ধর্ম্ম-সংস্কার ও ঐতিহাসিক সত্য এ উভয়ের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ঐতিহাসিক বুদ্ধ ও চৈতন্য এবং বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবগণের কল্পিত এই দুয়ের চিত্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অন্যান্য অনেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের সম্বন্ধেই একথা খাটে।

বুদ্ধ ও চৈতন্যের ন্যায় কৃষ্ণও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ছিলেন এবং ভক্তগণের হস্তে তিনিও অতিপ্রাকৃত মানুষরূপে কল্পিত হইয়াছেন। এই কল্পিত চরিত্রের পশ্চাতে যে ঐতিহাসিক মানুষটী লুক্কায়িত আছে তাহার অনুসন্ধান করাই ইতিহাসের কার্য্য। চৈতন্য-সম্বন্ধে এই কার্য্য এখনও খুব কঠিন হয় নাই। বুদ্ধদেব চৈতন্যের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং তাঁহার প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটন করা আরও দুরূহ। কিন্তু দুরূহ হইলেও এ সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা হইয়াছে এবং কিছু কিছু ফললাভও হইয়াছে। কৃষ্ণ বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং তাঁহার জীবনের প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করা আরও কষ্টকর। কৃষ্ণ-বাসুদেব যে বুদ্ধ ও চৈতন্যের ন্যায় একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এই সম্বন্ধেই কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পণ্ডিতগণের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, অনেকের মনে এখনও হয় তো আছে। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকই এখন স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কৃষ্ণ অথবা বাসুদেব নামে সত্য-সত্যই একজন ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। এই দেবকীপুত্র কৃষ্ণই যে পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণবগণের উপাস্য দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছেন এই সিদ্ধান্ত অনেকেই সমীচীন বলিয়া মনে করেন। বুদ্ধদেবের ন্যায় কৃষ্ণ-বাসুদেবও কালক্রমে ভক্তগণের ঈশ্বররূপে পরিগণিত হইয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। (১)

পুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অপ্রাকৃত ও অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সমুদয় কাহিনীর মধ্য হইতে কৃষ্ণের যথার্থ জীবনচরিত সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যাঁহারা কৃষ্ণের ভক্ত বা উপাসক নহেন তাঁহাদের গ্রন্থেও এই ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। অবশ্য এগুলিও গল্প, কিন্তু ইহাতে কৃষ্ণ মানুষরূপেই কল্পিত হইয়াছেন। ভক্তগণের মানসপ্রসূত অতিরঞ্জিত চিত্রের সহিত এইগুলির তুলনা করিলে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে। কেবল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মসাহিত্যে কৃষ্ণ কিরূপভাবে অঙ্কিত হইয়াছেন মাত্র তাহারই কিছু নিদর্শন দিতে চেষ্টা করিব। বৌদ্ধ "ঘত জাতকে" নিম্নলিখিত আখ্যানটী আছে।

অতীতকালে উত্তরাপথে কংসরাজ্যে (২) অসিতঞ্জন-নগরে মহাকংস নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। কংস ও

---

(১) কৃষ্ণ যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ Sir R. G. Bhandarkar প্রণীত Vaishnavism, Saivism and Minor Religious System এবং Dr. H. C. Roy Choudhury প্রণীত Early History of Vaishnavism দ্রষ্টব্য।

(২) মূলের কংসভোগ শব্দটী ইংরেজী অনুবাদক Kamsa District এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। কংস শব্দ কোন ভূভাগ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত এরূপ প্রমাণ পাই নাই।

উপকংস নামে দুই পুত্র ও দেবগর্ভা (দেবগত্তা) নামে তাঁহার এক কন্যা জন্মিয়াছিল। এই কন্যার জন্মদিবসে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন যে, ইহার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র কংসরাজ্য (১) ও কংসবংশ বিনাশ করিবে। রাজা মহাকংস অপত্যস্নেহপ্রযুক্ত কন্যার প্রাণবধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর কংস রাজা ও উপকংস উপরাজা হইলেন। ভগিনীর প্রাণনাশ করিলে লোকনিন্দা হইবে এই বিবেচনায় তাঁহারা ইহাকে বিবাহ না দিয়া একস্তম্ভযুক্ত (২) প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিলেন। নন্দগোপা নামে দেবগর্ভার এক পরিচারিকা ছিল। তাহার স্বামী অন্ধকবৃষ্ণি (? অন্ধকবেণ্হু) দেবগর্ভার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন

তৎকালে উত্তর মথুরায় (মধুরা) মহাসাগর নামক রাজা ছিলেন। তাঁহার সাগর ও উপসাগর নামক দুই পুত্র তাঁহার মৃত্যুর পর যথাক্রমে রাজা ও উপরাজা হইয়াছিলেন। উপসাগর ভ্রাতার অন্তঃপুরে দুষ্কার্য্যের অপরাধে ধৃত হইয়া সহাধ্যায়ী ও বাল্যসুহৃৎ উপকংসের নিকট পলায়ন করিলেন। উপকংসের অনুরোধে রাজা কংস তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। ক্রমে উপসাগর দেবগর্ভার বিবরণ অবগত হইয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন, দেবগর্ভাও তাহাকে দর্শন করিয়া ও নন্দগোপার নিকট তাহার পরিচয় অবগত হইয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। ক্রমে নন্দগোপার সাহায্যে নিশাযোগে দেবগর্ভার গৃহে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল এবং এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে দেবগর্ভার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তখন কংস ও উপকংস দুই ভ্রাতা নন্দগোপাকে অভয়দানপূর্ব্বক তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উপসাগরের সহিত দেবগর্ভার বিবাহ দিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন যে যদি দেবগর্ভার কন্যাসন্তান হয় তাহা হইলে কিছু বলিবেন না কিন্তু যদি পুত্রসন্তান হয় তাহা হইলে অবিলম্বে তাহার প্রাণনাশ করিবেন।

যথাকালে দেবগর্ভা একটী কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। কংস ও উপকংস ইহা শুনিয়া অতিশয় তুষ্ট হইলেন এবং নবজাত কন্যার 'অঞ্জনদেবী' এই নামকরণ করিলেন। গোবর্দ্ধনান (গোবড্ঢমান) নামক গ্রাম তাহারা ভগিনীকে প্রদান করিলেন এবং উপসাগর ও দেবগর্ভা অতঃপর তথায় বাস করিতে লাগিলেন

কালক্রমে একই দিনে দেবগর্ভা ও নন্দগোপার গর্ভসঞ্চার হইল এবং একদিনেই দেবগর্ভা একটী পুত্র ও নন্দগোপা একটী কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। দেবগর্ভা পুত্রের প্রাণনাশভয়ে ভীতা হইয়া গোপনে স্বীয় সন্তান নন্দগোপার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং নন্দগোপার কন্যা নিজের নিকট আনাইয়া রাখিলেন। তাঁহার ভ্রাতারাও ভগিনীর কন্যাসন্তান প্রসব হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে যথাবিধি লালন-পালনের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে ক্রমে দেবগর্ভার দশ পুত্র ও নন্দগোপার দশ কন্যা জন্মিল। পুত্রগণ নন্দগোপার নিকট ও কন্যাগণ দেবগর্ভার নিকট পালিত হইল; কেহই কিছু জানিতে পারিল না। দেবগর্ভার জ্যেষ্ঠপুত্র বাসুদেব, দ্বিতীয় পুত্র বলদেব এবং অবশিষ্ট পুত্রগণ যথাক্রমে চন্দ্রদেব (চন্দদেব), সূর্য্যদেব (সুরিয়দেব), অগ্নিদেব (অগ্গিদেব), বরুণদেব, অর্জ্জুন (অজ্জুন), প্রদ্যুম্ন (৩) (? পজ্জুন) ঘৃতপণ্ডিত (ঘতপণ্ডিত) ও অঙ্কুর নামে অভিহিত হইল।

'অন্ধকবৃষ্ণিদাস পুত্র' নামে পরিচিত এই ভ্রাতৃগণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বলশালী ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। তাহারা পরস্বাপহরণ এমন-কি রাজদ্রব্য পর্য্যন্ত লুট করিতে আরম্ভ করিল। প্রজাগণ রাজার নিকট

---

(১) এখানেও মূলে আছে 'কংসভোগ' কিন্তু 'কংসগোত্ত' অর্থাৎ 'কংসগোত্র' এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

(২) ইংরেজী অনুবাদক মূলের "একথূণকং পাসাদং" এই শব্দদ্বয়ের 'a single round-tower' এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু পালি 'থূণা' (সংস্কৃত—স্থূণা) শব্দের অর্থ স্তম্ভ। পালি মহাবংশে 'একথূণিকং গেহং' এই পদের "an apartment built on a single pillar" Childers এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন (Childer's Pali Dictionary, p. 505)। একস্তম্ভযুক্ত প্রসাদটী ঠিক কি রকম বুঝিতে পারা যায় না। প্রাচীন ভারতের স্থপতিবিদ্যা-বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারা এই বিবরটী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

(৩) 'পজ্জুন' সংস্কৃত প্রদ্যুম্ন ও পর্জ্জন্য এ উভয়েরই রূপান্তর হওয়া সম্ভব। (English Translation of the Jatakas, Vol. IV. p. 51 fn. 1)

অভিযোগ আনয়ন করিলে রাজা অন্ধকবৃষ্ণিকে ডাকাইয়া পুত্রগণের দুর্বিনীত আচরণের নিমিত্ত তাহাকে অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিলেন। ভীত হইয়া অন্ধকবৃষ্ণি রাজ-সমীপে যথাযথ নিবেদন করিল। রাজা কংস, ইহারা তাহার ভগিনীপুত্র, এই গূঢ় রহস্য বিদিত হইয়া কি উপায়ে ইহাদের বিনাশ-সাধন করা যায়, অমাত্যবর্গের সহিত তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অমাত্যবর্গ বলিলেন, "ইহারা মল্লযুদ্ধকারী, নগর-মধ্যে মল্লযুদ্ধ হইবে এইরূপ ঘোষণা করা যাউক, তৎপর ইহারা যুদ্ধমণ্ডপে উপস্থিত হইলে ইহাদের বিনাশ করা যাইবে।" তদনুসারে রাজা চাণূর ও মুষ্টিক (মুট্‌ঠিক) নামক মল্লদ্বয়কে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন এবং ভেরীবাদন দ্বারা সপ্তম দিবসে রাজদ্বারে মল্লযুদ্ধ হইবে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন।

যথাসময়ে চাণূর ও মুষ্টিক রঙ্গস্থলে আসিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ করিল। অন্ধকবৃষ্ণির দশ পুত্রও পথিমধ্যে রজকবীথি লুণ্ঠন করিয়া দিব্য বিচিত্র বস্ত্র এবং গন্ধবণিক্‌ ও মালাকরের নিকট হইতে গন্ধ ও মাল্য গ্রহণ করিয়া সুশোভিত ও সুগন্ধযুক্ত হইয়া যুদ্ধমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।

প্রথমে বলদেব চাণূর ও মুষ্টিককে হত্যা করিলেন। (১) মুষ্টিক মৃত্যুকালে প্রার্থনা করিল যেন যক্ষ হইয়া বলদেবকে গ্রাস করিতে পারে, তদনুসারে কালমত্তিয় নামক অরণ্যে সে যক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। অতঃপর বাসুদেব চক্রক্ষেপণ করিয়া কংস ও উপকংস দুই ভ্রাতার শিরশ্ছেদন করিলেন। ভীত ত্রস্ত অধিবাসিগণ তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহারা অসিতঞ্জন নগরে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন ও মাতাপিতাকে তথায় আনাইলেন। তৎপর সমগ্র ভারতবর্ষ জয়ের উদ্দেশে বহির্গত হইয়া কালসেন রাজার রাজধানী অযোধ্যানগরী অধিকার করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিলেন। অনন্তর তাঁহারা দ্বারাবতী জয়ের উদ্দেশে নির্গত হইলেন। দ্বারাবতী নগরীর একদিকে সমুদ্র একদিকে পর্ব্বত। শত্রু উপস্থিত হইলেই ইহার রক্ষক যক্ষ গর্দ্দভরবে চীৎকার করিতে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ সমগ্র নগরী উৎপতিত হইয়া সমুদ্র মধ্যে এক দ্বীপে অবস্থান করে। পরে শত্রু পশ্চাৎপদ হইলে পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বাসুদেব ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ দ্বারাবতী গ্রহণে অসমর্থ হইয়া কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের শরণাপন্ন হইলেন। পরে তাঁহার পরামর্শ অনুসরণ করিয়া দ্বারাবতী রাজ্য অধিকার করিলেন। ক্রমে তাঁহারা চক্রদ্বারা ত্রিষষ্ঠী সহস্র রাজার প্রাণবধ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ স্বীয় অধিকার স্থাপনপূর্ব্বক দ্বারাবতীতে অধিষ্ঠিত হইলেন। সমগ্র রাজ্য দশভাগে বিভক্ত হইল। সর্ব্বকনিষ্ঠ অঙ্কুর বাণিজ্যে লিপ্ত হইলেন, অবশিষ্ট নয় ভ্রাতা ও তাঁহাদের ভগিনী অঞ্জনদেবী এক-একটী রাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং দ্বারাবতীতে বসবাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা পুত্রকন্যা-সমভিব্যাহারে বহুবর্ষ রাজত্ব করিলেন। তৎকালে মনুষ্যের আয়ুঃ-পরিমাণ বিংশসহস্র বর্ষকাল ছিল।

কালক্রমে বাসুদেবের এক পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে বাসুদেব শোকে উন্মত্ত হইলেন এবং সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল মৃতপুত্রের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত ঘৃতপণ্ডিত এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায় আকাশের দিকে চাহিয়া 'আমাকে একটী শশক দাও', 'আমাকে একটী শশক দাও' এই বলিয়া দ্বারাবতীর পথে পথে বেড়াইতে লাগিলেন। রোহিণেয় নামক অমাত্য বাসুদেবের নিকট এই সংবাদ নিবেদন করিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ শীঘ্র ওঠ, হে কেশব তুমি এখানে বিলাপ করিতেছ আর তোমার ভ্রাতা উন্মত্ত হইয়া ঘুরিতেছে।" ইহা শুনিয়া কেশব ঘৃতপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কিরূপ শশক চাও বল, মণি-মুক্তা, স্বর্ণ-রৌপ্য-লৌহ, শঙ্খ-শিলা অথবা প্রবাল-নির্ম্মিত যেরূপ শশক চাও আমি তাহাই আনিয়া দিতেছি। ঘৃতপণ্ডিত বলিলেন, 'আমি এ সকল কিছুই চাই না, কেবল চন্দ্রের কোলে যে শশক আছে আমাকে তাহাই আনিয়া দাও।' রাজা বাসুদেব ভ্রাতার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে ইহা নিঃসংশয়ে স্থির করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ তুমি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, কারণ তুমি অ-প্রার্থনীয় বস্তুর প্রার্থনা করিতেছ।" ইহা শুনিয়া ঘৃতপণ্ডিত বলিলেন, "হে কৃষ্ণ যদি তুমি ইহা জান, তবে মৃতপুত্রের নিমিত্ত শোক

---

(১) জাতক, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৯

করিতেছ কেন?" এই কথা শুনিয়া বাসুদেব পুত্রশোক পরিহার করিলেন।

বাসুদেব বহুকাল রাজ্যশাসন করিলে একদা তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পরামর্শ করিলেন, "ঋষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন দিব্যচক্ষুঃ-সম্পন্ন কি না আমরা ইহার পরীক্ষা করিব।" একটী বালকের উদরে একটী বালিশ বান্ধিয়া তাঁহারা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে জিজ্ঞাসা করিল "তাপস, এই কুমারী কি প্রসব করিবে?" মুনি দিব্যচক্ষুতে সমুদয় অবগত হইয়া বলিলেন, "অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে ইহার খদিরকাষ্ঠ প্রসব হইবে। উহা দগ্ধ করিয়া ভস্মরাশি নদীজলে নিক্ষেপ করিলেও তদ্দ্বারা বাসুদেবকুল বিনষ্ট হইবে।" তখন বালকগণ তপস্বীকে ভণ্ড বিবেচনা করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিল। রাজগণ সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া ভীত হইলেন। সপ্তম দিবসে উক্ত কুমারের কুক্ষি হইতে খদিরকাষ্ঠ নির্গত হইলে তাহা ভস্ম করিয়া নদীজলে ভাসাইয়া দিলেন। কিয়দ্দূর নদী-পার্শ্বে লাগিয়া ভস্মরাশি একটী এরক বৃক্ষে পরিণত হইল।

অনন্তর একদিন রাজগণ ও রাজকুমারগণ জলকেলি উপলক্ষে ঐস্থানে গমন করিয়া কলহে রত হইলেন। মুষল অভাবে তাহারা এরক বৃক্ষের পত্র লইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ঐ পত্র মুষল-আকারে পরিণত হইয়া পরস্পরের বিনাশ করিতে লাগিল। বাসুদেব, বলদেব, অঞ্জনা দেবী ও তাহাদের পুরোহিত রথে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। আর সকলে ঐস্থানে বিনষ্ট হইলেন। পথিমধ্যে কালমত্তিয়-বনে মল্ল মুষ্টিক স্বীয় প্রার্থনা-অনুসারে যক্ষযোনি-রূপে বাস করিতেছিল; বলদেব তাহার হস্তে নিহত হইলেন। বাসুদেব বনমধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন এমন সময়ে জরা নামক ব্যাধ শূকরভ্রমে তাঁহাকে বধ করিল। এইরূপে অঞ্জনা ব্যতীত সকলেই বিনষ্ট হইলেন।

অন্যান্য বৌদ্ধজাতকেও কৃষ্ণ-বাসুদেবের উল্লেখ আছে। কুম্ভজাতকেও সুরাপানের দোষ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গাথাটী উদ্ধৃত হইয়াছে—(১)

"এই সুরাপান করিয়াই অন্ধকবৃষ্ণি-পুত্রগণ (অন্ধক বেন্‌হু পুত্তা) সমুদ্রতীরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মুষলদ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছিল।"

সংকিচ্চ জাতকে সাধু ব্যক্তির প্রতি অসদাচরণ করিলে কি বিষময় পরিণাম ঘটে তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গাথাটী উদ্ধৃত হইয়াছে—(২)

"ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে আক্রমণের ফলে অন্ধকবৃষ্ণিগণ (অন্ধক বেন্‌হুয়ো) পরস্পরের মুষলের আঘাতে যমালয়ে গমন করিয়াছিল।

জৈন উত্তরাধ্যয়ণ-সূত্রে কৃষ্ণ-বাসুদেব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্প আছে।

"শৌর্য্যপুর নামক নগরে বাসুদেব নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই স্ত্রী, রোহিণী ও দেবকী। রোহিণীর পুত্র রাম, দেবকীর পুত্র কেশব। শৌর্য্যপুরে আর একজন রাজা ছিলেন তাঁহার নাম সমুদ্রবিজয়, তাঁহার স্ত্রী শিবার গর্ভে অরিষ্টনেমি নামে তাঁহার এক পুত্র হয়।

"কেশব রাজীমতীর নামে এক রাজকন্যার সহিত অরিষ্টনেমির বিবাহ স্থির করিলেন। বৃষ্ণিবংশীয় কুমার অরিষ্টনেমি সৈন্য-সামন্ত-পরিবৃত হইয়া উপযুক্ত সমারোহ সহকারে বিবাহ করিতে চলিলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখিলেন কতকগুলি পশুবধের আয়োজন হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহারই বিবাহের ভোজ-উপলক্ষে এই সমুদয় পশুবধ করা হইবে। ইহা শুনিয়া তাঁহার মনে গভীর দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি সংসার ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া দ্বারকাপুরী ত্যাগ করিয়া রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলেন। রাম ও কেশব অরিষ্ট-নেমির সহিত রৈবতকে সাক্ষাৎ করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন।"

এই গল্পের শৌর্য্যপুর, সম্ভবতঃ 'মথুরা'। কৃষ্ণের এক নাম শৌরি, সম্ভবতঃ ইহা হইতেই শৌর্য্যপুরের উৎপত্তি। কিন্তু অরিষ্টনেমির বিবাহ প্রভৃতি ঘটনা দ্বারকাতেই হইয়াছিল।

'অন্তগড় দসাও' নামক আর একখানি জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে কৃষ্ণের অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। প্রধান প্রধান অংশগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। (১) "দ্বারাবতী নগরীতে বাসুদেব রাজত্ব করিতেন, তাঁহার আর এক নাম

(১) জাতক, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৮

(২) জাতক, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৮৭

ছিল কৃষ্ণ। দশার্হ-বংশীয় সমুদ্রবিজয়, বলদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, মহাসেন, বীরসেন, উগ্রসেন প্রভৃতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রুক্মিণী প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র রাণী এবং অনঙ্গসেনা-প্রমুখ বহু সহস্র বারবণিতা ছিল।"

(২) দ্বারাবতী নগরীতে বসুদেব নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম দেবকী। একদিন মহাত্মা অরিষ্টনেমি দ্বারাবতীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ছয়জন শিষ্য দেবকীর নিকট ভিক্ষার জন্য গমন করিল। দেবকী এই শিষ্যগণের কান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং পরিচয় লইয়া জানিলেন যে ইহারা ছয় ভাই। তাঁহাদের পিতার নাম 'নাগ', মাতার নাম সুলসা এবং তাঁহাদের জন্মস্থান ভদ্দিলপুর। তাহারা চলিয়া গেলে দেবকী মনে মনে ভাবিলেন "বাল্যকালে এক সাধু আমার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল যে আমার এমন আটটী পুত্র হইবে যে তাহাদের তুল্য ভারতবর্ষে আর দেখা যাইবে না। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হওয়ার কোন লক্ষণ দেখিতেছি না—সুতরাং মহাত্মা অরিষ্টনেমিকে এই বিষয় নিবেদন করিব।" অতঃপর দেবকী অরিষ্টনেমির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অরিষ্টনেমি দেবকীকে বলিলেন—"ভদ্দিলপুরে নাগ নামক এক ব্যক্তির সুলসা নামে স্ত্রী ছিল। তাহার বাল্যকালে এক জ্যোতির্বিদ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে সে মৃৎবৎসা হইবে। সুলসা ভক্তি-সহকারে 'হরিণেগমেসী' নামক দেবের পূজা করিল। ফলে তুমি ও সুলসা একই কালে সন্তান প্রসব করিলে, কিন্তু হরিণেগমেসী সুলসার মৃতপুত্রগুলি তোমার নিকট রাখিয়া তোমার পুত্রদিগকে সুলসার নিকট রাখিত। প্রকৃতপক্ষে সুলসার পুত্র নামে পরিচিত অরিষ্টনেমির ছয় শিষ্য তোমারই সন্তান।" তখন দেবকী মনে মনে ভাবিলেন—"হায় আমি নলকুবেরের ন্যায় সাতটী পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করিলাম, কিন্তু একটীকেও শিশু-অবস্থায় পালন করিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র পুত্র কৃষ্ণ-বাসুদেব ছয়মাস অন্তর একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে।" অতঃপর দেবকী কৃষ্ণের নিকট নিজের দুঃখের কথা বলিলেন। তখন কৃষ্ণ হরিণেগমেসী দেবকে স্তবে তুষ্ট করিয়া তাঁহার এক কনিষ্ঠ পুত্র জন্মিবে এই বর লাভ করিলেন। ক্রমে দেবকীর এক পুত্র হইল—তাহার নাম হইল "গয়-সুকুমাল।" গয়-সুকুমাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া অরিষ্টনেমির নিকট দীক্ষালাভ করিল।

(৩) একদিন কৃষ্ণ অরিষ্টনেমিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে দ্বারাবতী নগরীর ধ্বংস হইবে? অরিষ্টনেমি বলিলেন, "জল, অগ্নি ও দ্বৈপায়ন ইহার ধ্বংসের কারণ হইবে।" এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ ভাবিলেন তাঁহার বংশের অনিরুদ্ধ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহারাই সুখী আর তিনি রাজ্যের দায়িত্ব বহন করায় সংসার ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। অরিষ্টনেমি তাহার মনের গোপন চিন্তা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ তাহা হইবার নয়, বাসুদেব মাত্রেই পূর্ব্বজন্মে দুষ্কৃত করিয়াছে, সুতরাং তাহারা এজন্মে সন্ন্যাস লইতে পারিবে না।"

তখন কৃষ্ণ অরিষ্টনেমিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার মৃত্যুর পরে আমি কোথায় জন্মগ্রহণ করিব?" অরিষ্টনেমি বলিলেন, "তোমার মাতাপিতার আহ্বানে তুমি এই স্থান ত্যাগ করিবার পর, প্রবল জলস্রোত, অগ্নি ও দ্বৈপায়নের ক্রোধ দ্বারাবতী নগরীর ধ্বংসের কারণ হইবে। রাম ও বলদেবের সহিত তুমি দক্ষিণসমুদ্রের দিকে "পাণ্ডু মথুরায় পাণ্ডু রাজার পুত্র" যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের নিকট যাত্রা করিবে। কোশম্ব-বনে বৃহৎ ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নিম্নে পীতবাসধারী তোমার বাম পায়ে জরাকুমারের বাণ লাগিয়া তোমার মৃত্যু হইবে। মৃত্যুর পর তুমি নরকে যাইবে।" এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। তখন অরিষ্টনেমি বলিলেন, "তুমি দুঃখিত হইও না। নরকভোগের পর এই ভারতবর্ষেই পৌণ্ড্রদেশে তোমার জন্ম হইবে এবং তুমি মোক্ষলাভ করিবে।" অতঃপর কৃষ্ণের পত্নী পদ্মাবতী, গৌরী, সত্যভামা, রুক্মিণী, জম্বুবতী প্রভৃতি অরিষ্টনেমির নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ভিক্ষুণীর জীবনযাপন করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে মোক্ষলাভ করিলেন।

কৃষ্ণ-সম্বন্ধে জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে আর যে সমুদয় আখ্যান আছে বাহুল্যভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। যে কয়েকটী আখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সম্যক্ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করাও বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কৃষ্ণের জন্মের ও জীবনের মূলবিবরণ পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে

যেরূপ পাওয়া যায় তাহার সহিত উক্ত আখ্যানগুলির প্রভেদও যেমন আছে সামঞ্জস্যও তেমনি। যশোদার সহিত সন্তান বিনিময়, কংসের আখ্যান, দ্বারকার রাজ্য-স্থাপন, পাণ্ডবগণের সহিত সখ্য, দ্বারকার ধ্বংস ও অপঘাত-মৃত্যু প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে একটা ঐক্য এই সকল গল্পের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই সমুদয় বিভিন্ন উপাদানের তুলনা-মূলক আলোচনা দ্বারাই কৃষ্ণ-চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি গড়িতে হইবে। পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে কৃষ্ণের চরিত্র যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থেও বুদ্ধের চিত্র সেইরূপ—তথাপি বুদ্ধের ঐতিহাসিক কাহিনী কতক পরিমাণে উদ্ধার করা সম্ভবপর হইয়াছে। অনুরূপ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া উল্লিখিত উপাদানের সাহায্যে কৃষ্ণ-চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি গঠিত হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়।

মোহ

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী নীলিমা দেবী

ঊনিশ

বর ও কনে চলিয়া গেল। সেই কোলাহলপূর্ণ বাটী হঠাৎ যেন সুপ্তিমগ্ন হইল। নীলিমার মা ও মামীমা বড়ই অধীরা হইয়া কাঁদিতেছেন, রেণু ও তাহার মা তাঁহাদের সান্ত্বনা দিতেছেন। রমা তো এত কাঁদিতেছে যে তাহাকে নির্ম্মল ও তাহার পিতা শান্ত করিতে ব্যস্ত। মেয়েকে বড় করিয়া বিবাহ দিয়াছেন, নীলিমা একবার দিন-কয়েকের জন্য পিত্রালয়ে আসিবে, তাহার পর স্বামীর সঙ্গে তাহার কর্ম্মস্থল ঢাকায় চলিয়া যাইবে। ইচ্ছা করিলেই মেয়েকে দেখিতে পারিবেন না বলিয়া নীলিমার মাতার বেশী মন খারাপ।

সকলেই একঘরে, কেবল প্রীতি সেখানে নাই। স্ব স্ব দুঃখে জড়িত কাহারও তাহার কথা মনে পড়ে নাই। নীলিমা চলিয়া যাইবার সময় প্রীতি বারান্দায় একটা থামের গায়ে যেমন ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল, সে যেন তখন জ্ঞানহারা। তাহার চোখে এক বিন্দু জল নাই কিন্তু তাহাতে কোন সুগভীর বেদনা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্রমে তাহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল, বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল; এমন সময় সেখানে নির্ম্মল আসিয়া পড়িল। নির্ম্মল ঘরে প্রীতিকে দেখিতে না পাইয়া তাহার সন্ধানে বাগানে যাইতেছিল, প্রীতি যে বাগান ও মুক্ত বাতাস বড়ই ভালবাসে। পথে প্রীতিকে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়া সে ভয়বিহ্বল হইয়া দ্রুতপদে আসিয়া তাহার হাত-দু'টী ধরিয়া তাহাকে 'কি হয়েছে প্রীতি, অমনভাবে চেয়ে রয়েছ কেন' বলিয়া প্রশ্ন করিল। প্রীতির নিকট হইতে কোনরূপ উত্তর না পাইয়া সে উদ্বিগ্ন হইয়া কি করিবে ভাবিতেছে ও হাতেমুখে জলের ছিটা দিবার জন্য ছুটিয়া গিয়া জল আনিয়া হাতে মুখে ছিটাইতেছে। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া হাত-মুখ মুছাইয়া দিয়া তাহাকে ধরিয়া রহিয়াছে। এমন সময় দেবব্রত সেখানে আসিয়া দেখিল, তখনও নির্ম্মল প্রীতির হাত ধরিয়া কাঁপিতেছে, তাহার উৎকণ্ঠার শেষ নাই। এই দৃশ্যে রাগে হিংসায় দেবব্রতের সর্ব্বশরীর জলিয়া উঠিল। কি অধিকারে নির্ম্মল প্রীতিকে এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবে ধরিতে

পারে। সে তো পাতান সম্পর্কে দাদা বই তো নয়। প্রীতিই বা কি রকম মেয়ে যে এ সব প্রশ্রয় দেয়? এই সকল চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া হঠাৎ দেবব্রতের মনে হইল তবে কি প্রীতি নির্ম্মলকে ভালবাসে? তাই কি কাল রাত্রে সে যখন প্রীতিকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিল প্রীতি সে আলিঙ্গন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছিল? প্রীতি তো তাহার বিবাহিতা স্ত্রী, তাহার উপর তো দেবব্রতের পূর্ণ অধিকার, সে যদি লুকাইয়াই প্রণয় করে তাহাতেই বা প্রীতির এত আপত্তি কেন? এইসকল চিন্তা মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মনে জাগিয়া উঠিল আবার পরক্ষণেই দেবব্রত লজ্জায় সেই চিন্তা বর্জ্জন করিল। সে নিজে কত বড় অপরাধী তাহা তাহার মনে হইল। প্রীতি যদি নির্ম্মলের প্রেমের প্রতিদান দেয় তবুও কি দেবব্রত তাহাকে দুষিতে পারে?

কাছে আসিয়া প্রীতির যাতনামাখা মুখখানি দেখিয়া দেবব্রত বড় অধীর হইয়া পড়িল। তারপর এমন করুণভাবে সে "প্রীতি, প্রীতি, চোখ চাও একবার, কি হয়েছে তোমার?" বলিল যে নির্ম্মল একটু আশ্চর্য্য হইল। কিন্তু তখন ও-সকল কথা ভাবিবার সময় ছিল না। নির্ম্মল দেবব্রতকে বলিল, "ভাই একে একা রেখে আমি কোথাও যেতে পারছি না, গিয়ে মা ও বাবাকে ডেকে আন তো। আর একজন ডাক্তার আন্‌তে যাও। আমার বড় ভাবনা হচ্ছে। কাল রাত্রেই আমার মনে হচ্ছিল যে প্রীতি একটু বেশী রকম উত্তেজিত, সে আনন্দের অভিনয় কর্‌ছিল। বেচারা নিজের মনের দুঃখ চেপে চেপে রাখে, লোকের সামনে কেবল হাস্যময়ী ভাব বজায় রাখে; এত কষ্ট কি তার মত বড়লোকের আনন্দদুলালীর সহ্য হয়।"

প্রীতি এই সময় পড়িয়া যাইবার মত হওয়ায় নির্ম্মল দেবব্রতের সাহায্যে তাহার মাথা কোলে রাখিয়া শোয়াইয়া দিল। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া প্রীতি একবার চোখ মেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ব্যস্ত হ'বেন না, আমি অনেকটা ভাল আছি। কাউকে ডাক্‌বার বা অস্থির কর্‌বার দরকার নাই। একটু চুপ করে' থাক্‌লেই ঠিক হয়ে যাবে। মুহূর্ত্তের দৌর্ব্বল্যে এরূপ হয়েছে, আমি এরূপ বিদায়-দৃশ্য সহ্য করতে পারি না।" নির্ম্মল কিন্তু শুনিল না, সে দেবব্রতকে তাহার জায়গায় বসিতে বলিয়া তাহার মাকে ডাকিতে গেল।

তখন দেবব্রত প্রীতির হাতখানি লইয়া তাহাতে অতি ধীরে একটী চুম্বন করিল। সেই স্পর্শে প্রীতি চোখ আবার চাহিল, একটী হৃদয়ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। আস্তে আস্তে হাতখানি সরাইয়া লইয়া বলিল, "কেন আমাকে মনোব্যথা দিচ্ছেন? আমি আপনার কাছে পরস্ত্রীর মত, তাহার বেশী নহি। আপনি যে খোলাখুলি বলেছিলেন যে আপনি আমাকে ভালবাসেন না, তাই চান না ও মেম বিয়ে করেছেন। সে সত্যপ্রিয়তার জন্য আমি আপনাকে শ্রদ্ধা কর্‌তাম, সে শ্রদ্ধা কেন হারাবেন? অব্যবস্থিতচিত্ত হ'বেন না, আমি জানি যে চলে গেলেই আপনি আমাকে ভুলে যা'বেন। আজ আর আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না, দয়া করে' আর ভালবাসার কথা বল্‌বেন না। আমি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না।"

কাতরস্বরে উৎকণ্ঠিত দেবব্রত বলিল, "তোমাকে ব্যথা দেওয়ার জন্য আমাকে ক্ষমা কর, কিন্তু এটা জেনো প্রীতি যে আমি জীবনে আর তোমাকে ভুল্‌তে পার্‌ব না। তুমি যত দূরেই থাক না কেন তোমার মূর্ত্তি আমার জীবন-মরণের সঙ্গিনী হ'য়ে থাক্‌বে। তুমি বিশ্বাস কর বা নাই কর এ কথা সত্য, তোমার কাছে মিথ্যা বল্‌ব না। আমি তোমার ভালবাসা বা শ্রদ্ধা পা'বার উপযুক্ত নই, তবু কেন তুমি আমাকে বাঁচিয়ে চল্‌ছ বুঝি না, তুমি কেন যে প্রতিশোধ নাও না তাও জানি না। আমি নিজেকে যে কঠিন জালে ফেলেছি তা' থেকে ছাড়ান্‌ পাবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু নিজে ভুগি তা'তে ক্ষতি নেই, তোমার কষ্ট আর সইতে পারছি না। তোমাকে কেমন করে' সুখী করব বল? কালরাত্রে তুমি আমাকে সকলের কাছে আমাদের সম্বন্ধ স্বীকার করতে বলেছিলে, তা'তে যদি তুমি সুখী হও আমি এখনই তাই করব। কাল সাহস হয় নি সত্য, কিন্তু আজ আমি সকলই করতে প্রস্তুত। আমি তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করছি, তুমি যা' ভাল বোঝ কর—আজ আমি সব চেয়ে বেশী তোমার সুখ চাইছি।"

প্রীতি শুধু ধীরে উত্তর দিল, "আপনার খোকার ও

তা'র মা'র কথা ভাবুন। আমার কথা যখন গোড়াতে ভাবেন নি তখন এখন আর সময় কেটে গেছে।"

প্রীতি চুপ হইয়া গেল। এই সময় নির্ম্মল ও তাহার পিতামাতা আসিয়া প্রীতিকে দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রীতি লজ্জিত হইয়া সত্বর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "দাদা, কেন যে তুমি অকারণ সকলকে ব্যস্ত করলে, এমন ব্যস্তবাগীশ লোকও তো দেখি নি কখনও। সবাই কেঁদে শাস্ত হয়েছেন, আমি চেপে থাকৃতে চেষ্টা করেছিলাম তাই অমন হ'য়েছিল।" নির্ম্মল কোন উত্তর দিল না কিন্তু সেদিন আর সে এক মুহূর্ত্তেরও জন্য প্রীতির কাছ-ছাড়া হইল না। দেবব্রতও তাহার কাছে কাছে রহিল।

ইহার পর যে কয়দিন প্রীতি লক্ষ্মৌ শহরে রহিল সে বেশ সহজভাবেই কাটাইল, তাহার মনের দারুণ ব্যথা কাহাকেও জানিতে দিল না। স্বামীকে সে এতদিন কল্পনায় ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সদালাপ করিয়া, স্বামীর মুখে আদর ও ভালবাসার কথা শুনিয়া তাহার মনে যে কি অভিনব রসের সঞ্চার হইল তাহা সে নিজেই সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। সে লক্ষ্মৌএ থাকিতেও পারিতেছিল না অথচ দেবব্রতকে ছাড়িয়া দূরেও যাইতে চাহিতেছিল না।

এদিকে দেবব্রতের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তাহার কাজে মন নাই, কিছু ভাল লাগে না, রাত্রে নিদ্রা নাই, সে যেন কেমন হইয়া গেল। সে প্রত্যহ নৃপেনবাবুর বাটীতে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, সে যেন প্রাণের সকল আনন্দ ত্যাগ করিয়াছে—তাহার স্ফূর্ত্তি নাই, সদাই বিমর্ষ।

বিশ

রেণুকার মাতা বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বাড়ী ফিরিবার দিন সন্নিকট অথচ নৃপেনবাবুরা বিবাহের কথা কিছুই উত্থাপন করিতেছেন না। নির্ম্মলের মামা ও মামীর এই বিবাহে খুব মত ও আগ্রহ। তাঁহারাই এই প্রস্তাব প্রথম করেন কিন্তু নির্ম্মলের পিতামাতা কোনদিন এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেন নাই। তাবে বুঝা যাইত যে তাঁহাদেরও ইচ্ছা আছে। রেণুকার পিতা নির্ম্মলের মামীমাতার খুড়তুত ভাই, সেই জন্য রেণুদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা। নির্ম্মল রেণুকাকে বাল্যাবধি জানিত কিন্তু তাহার মনে কখনও রেণুকে বিবাহ করিবার কথা উদয় হয় নাই। কলিকাতা ফিরিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে নির্ম্মলের মাকে একা নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রেণুকার মা তাঁহার কাছে গিয়া বসিলেন। একটু বাজে কথাবার্ত্তার পর বলিলেন, "দিদি, আমরা তো চলে যাচ্ছি, রেণুর বিয়ের কিছু তো এখনও স্থির হ'ল না। আপনাদের কি মত তা'ও জানতে পারলুম না। উনি লিখেছেন কথাটা স্থির করে' যেতে, সেই জন্যেই তো আমি সংসার ফেলে এসে এতদিন আছি। আপনার দাদা ও আমার ননদ তো আমাদের অনেকদিন থেকে আশা দিয়ে রেখেছেন। মেয়ে বড় হ'ল ভাই, আর তো আমি চুপ করে' থাকতে পারছি না। আপনাদের মুখের কথা পেলে আমি নিশ্চিন্ত হ'ব।"

উত্তরে নির্ম্মলের মা বলিলেন, "এ তো ভাই আনন্দের বিষয়। রেণুকে বউ করবার আমার তো খুবই ইচ্ছা আছে, আমি ওকে খুব ভালবাসি। আজ ওঁকে বলব একটা ঠিক করতে। তবে, ভাই, ছেলে বড় হ'য়েছে তা'র মতটাও তো একবার নিতে হ'বে। আজ তো অমির ও নীলিমা আসবে, সকলে থেকে কথাটা ঠিক করা যাবে।"

রেণুকার মা চলিয়া যাইবার একটু পরেই নির্ম্মল ও প্রীতি সেই ঘরে আসিল।

নির্ম্মল বলিল, "মা, তুমি যে মাসীমার অনুমতি নিয়েছ তো প্রীতিকে আর কিছুদিন এখানে রেখে দিচ্ছ, তা' হ'লে প্রীতিকে কে নিয়ে যাবে? আমাকে তো তিন দিন পরে যেতেই হ'বে, আবার কিন্তু আমার আসবার সুবিধা হ'বে না।"

নির্ম্মলের মা বলিলেন, "আমি নিজেই না হয় ওকে নিয়ে যা'ব। প্রীতিকে আমার ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। নীলিমা চলে গিয়ে অবধি প্রীতি ছায়ার মত আমার কাছে কাছে থাকে, আমি নীলিমার অভাব অনুভব করি না। প্রীতি যদি আমার কাছে চিরদিন থাকতে পারত তো আমার আহ্লাদের সীমা থাকৃত না।"

"মা তুমি তো বড় স্বার্থপর, মাসীমার কথা একবার

ভাবছ না। তিনি একা আছেন, তবু তোমার জন্য কষ্ট স্বীকার করছেন।"

"মেয়ের মা হ'লে ছাড়াছাড়ির কষ্ট সহ্য করতেই হয়। প্রীতিকে যদি শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে হয় তখন কি হ'বে?"

"তুমি তো সে ভাগ্যি কর নি যে প্রীতির শাশুড়ী হ'বে।"

"প্রীতিকে যদি বধূরূপে পা'বার হ'ত তা' হ'লে কি ছাড়তুম রে।"

এইসকল অপ্রিয় আলোচনায় প্রীতি অসুস্থ বোধ করিতেছিল এবং প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য বলিল, "ছি দাদা, ও সব কি কথা। মাসীমা যে আমার মা'র মত। মা বলেন মাসীমার কাছে আমি থাক্‌লে তাঁর ভাবনা হয় না, তাই তো আমাকে পাঠিয়েছেন। দুঃখের বিষয় মাসী-মা এতদূরে থাকেন তাই তাঁর কাছে বেশী আস্‌তে পাই না।"

তারপর নির্ম্মলের মা বলিলেন,—"অমিয় ও নীলিমা তো দিন পনের পরে যা'বে, সেই সময় প্রীতিকে পাঠা'ব। যা'ক, এখন সে কথা থাক। নির্ম্মল আমি তোমার বিয়ে শীঘ্র দিতে চাই।"

নির্ম্মল বাধা দিয়া বলিল, "কেন মা, তোমার হঠাৎ সে সাধ হ'ল? প্রীতির শাশুড়ী হ'বার কথায় বুঝি সে কথা মনে পড়ে গেল? আচ্ছা, শোনাই যাক্ না কনের বিবরণ।"

"বিবরণ আর কষ্ট করে' শুন্‌তে হ'বে না। কনের সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ আছে। এখন, আমার কথা শোন। রেণুর সঙ্গে আমরা তোমার বিয়ে দেব ভাব্‌ছি, মেয়েটীকে আমাদের খুব পছন্দ, তা'রা যাবার আগে কথাটা স্থির করে' ফেল্‌তে চাই। তোমার এ বিষয় কি মত আমি জান্‌তে চাই। তুমিও তো রেণুকে বেশ পছন্দ কর।"

প্রীতি নির্ম্মলের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সে দেখিল নির্ম্মলের মুখের সমস্ত রক্ত যেন একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। নির্ম্মল একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রীতির দিকে চাহিল, সেই দৃষ্টিতে প্রীতির অন্তর কেমন ব্যাকুল হইল। নির্ম্মল বলিল, "মা তোমাকে তো অনেক দিন আগেই আমি বলেছি যে আমি বিয়ে করব না, তবে কেন আবার এসব কথা বলছ?"

"সে ছিল বাবা, কি দুঃখে বিয়ে কর্‌বে না? আগে বল্‌তে রোজগার না করে' বিয়ে কর্‌ব না। সে আপত্তি আর শুন্‌ছি না, এখন তো রোজগার কর্‌বার ক্ষমতা হয়েছে, রোজগার ক্রমেই হ'বে। যতদিন না হয় আমি তোমাকে যথেষ্ট টাকা দেব, তোমার কোনও অভাব হ'বে না।"

"না, আমি কিছুতেই বিয়ে কর্‌ব না। আজ-কালের দিনে নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে কি কেউ বিয়ে করে? তোমরা অনেক দিতে পার কিন্তু সে আমার ভাল লাগ্‌বে না। ট্রাম-ভাড়া এখনও জোটে না, আবার বউ ঘাড়ে চাপাবে।"

"তোমার বাবার সঙ্গে এ বিষয় কথা কয়ে যা' হ'ক ঠিক করা যাবে। তোমার মামা-মামী ভদ্রলোকদের এতদিন আশা দিয়ে রেখেছেন, এখন কি "না" বলা যায়?"

"কেন আমায় না জানিয়ে আশা দিলেন? আমি তো তা'র জন্যে দায়ী হ'তে পার্‌ব না। যাই বল, আমার সঙ্কল্প নড়্‌বে না। যদি তোমার কথা রাখতে হয়, বিমলের সঙ্গে বিয়ে দাও না। সে তো বড় হয়েছে, শীঘ্র বিলাতও যাচ্ছে।" এই বলিয়া নির্ম্মল সেখান হইতে চলিয়া গেল।

প্রীতি মনে মনে ভাবিতেছিল, দাদার মুখ কেন ওরকম হ'য়ে গেল? সাধারণতঃ মায়ের এত বাধ্য সে কেন ওকথা শুন্‌তে চাইছে না। খুব সুন্দরী না হ'লেও রেণু তো বেশ দেখতে, অমনটীও সর্ব্বদা দেখা যায় না, গুণও তো অনেক আছে। দাদা বাজে ওজোর কর্‌লে, ওর জেদের অন্য কারণ নিশ্চয় আছে। তবে কি সে অন্য কাউকে ভাল-বাসে? বিলাতে কোন প্রণয়িনী নাই তো? নিজের মনে এই কথা উঠিতেই প্রীতি লজ্জিত হইল, সকলে তো আর তাহার স্বামীর মত নহে।

নির্ম্মলের মা প্রীতিকে সস্নেহে বলিলেন,—"তুমি চুপ করে' আছ কেন মা, তোমার এ বিষয়ে কি মত?"

"আমার তো এ সম্বন্ধ খুব ভালই লাগ্‌ছে। মাসীমা, দাদা যেন কি চায় আমার মনে হ'ল।"

এমন সময় রমা আসিয়া নীলিমার ঘর সাজাইবার জন্য প্রীতিকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

নির্ম্মলের মা ভাবিতে লাগিলেন, নির্ম্মলের বিবাহ কর্‌তে এত আপত্তির কারণ কি? প্রীতি যা বল্লে তাই না কি? সে কি চায় কিছুই ভেবে পেলেন না

সেদিন বিকালবেলা যখন সকলে একসঙ্গে চা খাইতে বসিয়াছিলেন, তখন রেণু ও তার মা ছিলেন না, তাঁহারা কাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। আবার নির্ম্মলের বিবাহের কথা উঠিল, নৃপেনবাবু বলিলেন, "নির্ম্মল, রেণুর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবার আমাদের ইচ্ছা। আমি চাই যে তোমার চলে যা'বার আগে আশীর্ব্বাদ করে' ফেলি এবং বৈশাখ মাসে কল্‌কাতা গিয়ে তোমার বিয়ে দিয়ে দিই।"

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তরে নির্ম্মল দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—"আমি বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না, একথা মাকে অনেকদিনই বলেছি। আপনাদের এ কথা রাখতে পার্‌ব না সেজন্য আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন।"

"কেন বিয়ে করবে না আমি জান্‌তে চাই। কি কারণ না বল্‌লে আমি কোন কথা শুন্‌ব না

নির্ম্মলের মামা-মামীও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "এ বিয়ে না হ'লে আমাদের বড় অপমান হ'বে, বিয়ে তোমাকে কর্‌তেই হ'বে। আমরা তোমাকে ছেলের মতন করে' মানুষ করেছি, আমরা তা'দের কথা দিয়ে এতদিন রেখেছি, এখন কোনও আপত্তি আর চল্‌বে না।"

নির্ম্মল অতি নম্র ও কাতরভাবে বলিল, "সকলে আমাকে ক্ষমা করুন, বিয়ে তো আমি এখন কর্‌বই না, জীবনে কখনও কর্‌ব কি না সন্দেহ। জোর করে' বিয়ে দিয়ে কোন শুভফল হ'তে পারে না।"

নির্ম্মলের মামীমা রাগিয়া বলিলেন, "যখন রেণুর সঙ্গে এত মেশামিশি কর্‌তে তখন একথা বল নি কেন? মেয়ে বড় হয়েছে, সে জেনেছে তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'বে এখন তুমি বিয়ে কর্‌বে না বল্লে কতখানি অন্যায় করা হয় বল তো।"

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, "মামীমা, আমার দোষ দিচ্ছ কেন, আমি মোটেই কা'রও সঙ্গে বেশী মিশি নি। রেণুকে আমি নিজের বোনের মত দেখেছি ও সেইমতই তার সঙ্গে ব্যবহার করেছি, একদিনও অন্যরকম ভাব দেখাই নি। আর তোমরা তো আমাকে কোনদিনও জানাও নি যে রেণুর সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক করেছ। আমাকে কিছু না জানিয়ে কেন যে তা'কে জানালে তা' তো বুঝি না। আমাকে আর কিছু বলাই বৃথা, আমি বিয়ে কর্‌ব না।"

নৃপেনবাবু রাগিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু নির্ম্মলের মা ও অমিয় তাঁহাকে বিরত করিলেন। নির্ম্মলের মা বলিলেন, "ছেলে বড় হয়েছে, জোর করে' তা'কে কিছু করান উচিত নয়।"

নৃপেনবাবু তবু বলিলেন, "নির্ম্মল, আমি তোমাকে তিনমাস সময় দিলাম, তুমি ভাল করে' ভেবে দেখ।"

নির্ম্মলের মামা বলিলেন, "রেণুকে বিয়ে কর্‌লে আমি তোমাকে থাকবার বাড়ী তোমার মনোমত করে' তৈরী করে' দেব।"

নির্ম্মল কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। ঘরে সকলেরই মন ভার হইয়া রহিল। অমিয় ও নীলিমা আসিয়াছে কত আনন্দ হইবে না এই অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটিল। প্রীতি অত্যন্ত দুঃখিত ও গম্ভীর হইয়া গেল। নির্ম্মলের উপর সকলে বিরক্ত হইয়াছেন দেখিয়া সে অত্যন্ত ব্যথা পাইল। তাহার দাদা কখনও কোন অন্যায় করিতে পারে না, এই তাহার বিশ্বাস, তাই তাহার দাদাকে কেহ কিছু বলিলে প্রীতির অসহ্য হয়।

নির্ম্মল চলিয়া যাইতেই নৃপেনবাবুও উঠিলেন ও অমিয়কে বলিলেন, "আমার সঙ্গে একটু বেড়া'তে যাবে চল।"

রমা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমাকে নিয়ে যাবেন কি?"

নৃপেনবাবু বলিলেন, "না, আমি হেঁটে বেড়াতে যাচ্ছি আর অমিয়র সঙ্গে আমার কথা আছে, এখন তোমার আমার সঙ্গে যাওয়া হ'বে না। ইচ্ছা কর তো তোমার মা ও তোমরা সকলে মোটরে বেড়িয়ে আসতে পার।"

উত্তরে রমা বলিল, "বাবা, ড্রাইভার তো নেই, সে যে ছোট মোটরে রেণুদি'দের নিয়ে গেছে।"

নৃপেনবাবু বলিলেন, "বিমলকে বল তোমাদের নিয়ে যেতে।"

রমা বলিল, "ছোটদা'ও তাঁদের সঙ্গে গেছে।" তারপর রমা প্রীতির দিকে চাহিয়া বলিল, "প্রীতিদি, তুমি ড্রাইভ কর্‌বে ভাই?"

রমার মা বলিলেন, "আমি যেতে পারব না আমার কাজ আছে। রমা, আজ আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। রাত্রে ২।৪ জনকে খেতে বলেছি, তুমি সেই সব একটু বন্দোবস্ত কর।" তাহার পর তিনি নিজের ভ্রাতৃজায়াকে বলিলেন, "বৌদি, তোমার ভাই মিষ্টি করা সব হ'য়ে গেছে কি? চল, যা' বাকী আছে সেরে ফেলা যা'ক।" এই বলিয়া সকলে উঠিয়া পড়িলেন।

একত্রিশ

প্রীতি নীলিমার সঙ্গে গেল। দুইবন্ধু যখন নিজেদের ঘরে গেল তখন প্রীতি নীলিমাকে বলিল, "ভাই, এ কি হ'ল! দাদার বিয়ে কর্‌তে এত আপত্তি কেন? দাদা কখনও তো মেসোমহাশয় বা মাসীমার কথার ওপর কথা বলেন না, আজই বা এত জেদ্ কর্‌লেন কেন? সকলে দাদার উপর অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন, আমার ভাই বড় মন খারাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা ভাই, তোর কি মনে হয় বল্ তো?"

নীলিমা বলিল, "আমার ভাই মনে হচ্ছে যে এত আপত্তির কারণ 'দাদা কাউকে ভালবাসে' বা সে বিলাতে বিয়ে করে' এসেছে।"

উত্তরে প্রীতি বলিল, "না ভাই, বিয়ে করেছেন বলে' আমার বিশ্বাস হয় না, তবে কাউকে ভালবাসা সম্ভব। কিন্তু ভাই আজ দাদার কথায় বড়ই হতাশ হয়ে পড়েছি। তবে কি দাদা যা'কে চান সে দাদাকে ভালবাসে না?—আচ্ছা ভাই, এ সব কথা যে আমরা বল্‌ছি কিন্তু এর আগে তো একদিনও আমাদের কা'রও মনে হয় নি যে দাদা কাউকে ভালবাসেন বা কা'রও প্রতি আসক্ত।"

"কি জানি ভাই, কিছুই তো বুঝতে পার্‌ছি না। দাদা তো কা'রও সঙ্গে বেশী মেশে না এবং সকলেরই সঙ্গে বেশ সহজভাবে ব্যবহার করে। হয় তো বিলাতে কাহারও প্রেমে পড়েছে।"

"যাই হ'ক, এখন রেণুর কি হ'বে? তোর কি মনে হয় সে মনে মনে দাদাকে বিয়ে কর্‌বে ভেবেছে? তা' হ'লে তো বড় অন্যায় হ'বে।"

"না ভাই, কি জানি কেন আমার মনে হয় যে রেণুর বিমলের সঙ্গে বেশী মিল। রেণু দাদাকে একটু বেশীরকম শ্রদ্ধার চোখে দেখে বলে' আমার মনে হয়। ওর বোধ হয় বিমলকে বিয়ে কর্‌তে আপত্তি হ'বে না।"

"সে হ'লে খুব ভাল, বিমল খুব ভাল ছেলে। কিন্তু ভাই আমার মনে হয় আমাদের দাদার মত কেউ নয়। দাদার কি উঁচু মন, তিনি কি স্বার্থত্যাগী, কি রকমে সদাই পরের জন্য চিন্তা করেন। দাদা নিজের কথা ভাবেন না, কিসে অপরকে সুখী কর্‌তে পার্‌বেন তাই সর্ব্বদা ভাবেন। তাই তো আজকের গোঁ দেখে আরও বেশী আশ্চর্য্য হয়েছি। নিশ্চয় খুব বেশীরকম কিছু কারণ আছে তাই এত আপত্তি। তা' না হ'লে মামীমার মনে দাদা কখনও ব্যথা দিতেন না।"

নীলিমাকে তাহার মা ডাকাতে সে চলিয়া গেল। নির্ম্মল কোথায় গেল ব্যস্ত হইয়া প্রীতি সেই সন্ধানে গেল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল প্রীতি বাগানে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইল যে বাগানের শেষপ্রান্তে এক লতাকুঞ্জের কাছে ঘাসের উপর কে হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে। প্রীতি বুঝিল যে সে নির্ম্মল, সে ত্রস্তভাবে তাহার কাছে গেল। নির্ম্মল তখনও মুখ তুলিল না, প্রীতি আস্তে আস্তে তাহার কাঁধে হাত দিয়া ডাকিল, "দাদা!" নির্ম্মল সে স্পর্শে একটু কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু মুখ না তুলিয়াই বলিল, "প্রীতি, তুমি!—কেন এলে?

প্রীতি আব্দারের সুরে বলিল,—"আগে ওঠ, তারপর অন্য কথা হ'বে। এখানে এমন সময় কি ঘাসের ওপর বসে থাকে? কি ছেলেমানুষ তুমি দাদা—ভাগ্যে আমি এলুম।" এই বলিয়া প্রীতি হাত ধরিয়া নির্ম্মলকে তুলিতে গেল। নির্ম্মল একবার মুখ তুলিয়া প্রীতির মুখের দিকে নীরবে চাহিল, আবার মুখ হাতের মধ্যে লুকাইল। কি ব্যথাভরা সে চাহনি! প্রীতির প্রাণটা সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সে নির্ম্মলের পাশে বসিয়া বলিল, "দাদা, তোমার প্রাণের কি গোপন কথা আছে আমাকে বল্‌বে কি? কেন তোমার বিয়ে কর্‌তে এত আপত্তি জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি? তুমি কিসের দুঃখে বিয়ে কর্‌তে চাইছ না—তুমি কা'রও দুঃখ-কষ্ট দেখতে পার না আর মামীমার প্রাণে এত বড় বেশী দাগা দিচ্ছ কেন, দাদা?"

নির্ম্মল প্রীতিকে বাধা দিয়া বলিল, "প্রীতি, তোমার

কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, সেটা তোমাকে রাখতে হ'বে। যে যাই বলুক তুমি কখনও কাউকেও বিয়ে কর্তে আমাকে অনুরোধ ক'র না। আমি কোন বিশেষ কারণে বিয়ে কর্‌ব না, এর বেশী আর কিছু কাউকে বল্‌ব না। বাবা-মাকে হতাশ কর্তে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু কি কর্‌ব উপায় নেই।"

"দাদা, তা' যেন বুঝলাম কিন্তু আমরা কি কোনরকমে তোমাকে সাহায্য কর্তে পারি না? তোমাকে দেখে আজ কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে যে তুমি ব্যর্থ প্রেমে এত কাতর। আমার ভুল কি না জানি না কিন্তু আমার এইটাই দৃঢ় ধারণা। দাদা, তা'কে কি পা'বার নয়?"

নির্ম্মল কৃত্রিম হাসি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা sentimental (ভাবপ্রবণ) মেয়ে তো, এর মধ্যে কত কি রচে ফেলেছ, দেখছি।"

প্রীতি বড়ই লজ্জিত হইয়া চুপ হইয়া গেল এবং উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "দাদা, ঘরে যাও, এখানে থাকা হ'বে না। এই তো কাল একটা মস্ত সাপ মারা গেছে আর তুমি কি না সব চেয়ে অন্ধকার গাছপালা-ঘেরা জায়গা বেছে বসেছ। ওঠ, আর দেরী ক'র না।"

নির্ম্মল উঠিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইল, প্রীতি কিন্তু যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। নির্ম্মল যখন দেখিল প্রীতি তাহার সঙ্গে আসিতেছে না, তখন সে আবার ফিরিয়া গিয়া দেখিল প্রীতি অন্যমনস্ক হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

নির্ম্মল আসিয়া বলিল, "বেশ মেয়ে তো! আমাকে তাড়া দিয়ে নিজে যে দাঁড়িয়ে রইলে, তোমাকে বুঝি যেতে হ'বে না?"

"আমি একটু বেড়াতে এসেছি, আমি পরে যাব। ঘরের ভেতর আমার সব সময় ভাল লাগে না।"

"আমি তো তোমাকে এখানে রেখে যেতে পারি না।" তারপর হঠাৎ নির্ম্মল প্রীতির হাতখানি ধরিয়া বলিল, "প্রীতি! তোমার অনুমানই ঠিক। আমার কোন আশা নেই, কেউ আমার ব্যথা কমাতে পার্‌বে না। এ পৃথিবীতে কা'রও কাছে আমি এ কথা স্বীকার কর্তে চাই না বা জানতে দিতেও চাই না, তাই তোমাকে ঠাট্টা করেছিলাম। তুমি কেমন করে' বুঝতে পেরেছ জানি না।"

"ভুক্তভোগী যে হয় সেই বুঝতে পারে, আজ তোমার চোখে তোমার নিজ প্রাণের ছবি ফুটে উঠেছিল, তাই আমি দেখেছি, বুঝেছি, জেনেছি। দাদা, আমি তোমাকে জোর করে' এসব কথা বল্লুম সে জন্য আমি বড় লজ্জিত—দুঃখিত, আমাকে ক্ষমা করবে কি? কেন জানি না, তোমার জন্য আমার বড় কষ্ট হচ্ছিল, তাই তোমাকে খুঁজতে এসেছিলাম।"

"প্রীতি, তুমি কি যে বল্‌ছ তা' তুমি জান না, তাই ক্ষমা চাইছ। আমার পক্ষে খুবই অন্যায় হ'বে জেনেও; হয়'তো শুধু তোমাকেই একদিন সব কথা না বলে থাক্‌তে পার্‌ব না। যতদিন চুপ করে' সইতে পারি সইব।"

নির্ম্মল এই বলিয়া মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল ও প্রীতির হাত ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কথাগুলিতে প্রীতির অন্তর যেন হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। ভাবিল নীলিমার বিবাহের পরদিন তাহার যখন দৌর্ব্বল্য ও কষ্ট হইয়াছিল, তখন তো নির্ম্মল তাহাকে অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবা করিয়া সুস্থ করিয়াছিল। তবে কি নির্ম্মল তাহাকেই ভালবাসে, তাহারই জন্য কি জীবনের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে? এই কথাগুলি চকিতে প্রীতির মনের মধ্যে উদিত হইল। পরমুহূর্ত্তেই আবার প্রীতির মনে হইল যে তাহা কখনও সম্ভব নহে। সে ভাবিল—"আমারই বোধ হয় মাথা খারাপ হ'য়েছে দাদার কথাই ঠিক, sentimental ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছি। দাদা তো ঠিক বড় ভাইয়ের মতই সর্ব্বদা ব্যবহার করে, কখনও তো অন্যভাব দেখি নি।" এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রীতি একটু তন্ময়ভাবে নির্ম্মলের সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল, নির্ম্মলও তখন যেন কি একটা ভাবে বিভোর হইয়া চলিতে লাগিল।

এমন সময় দেবব্রত সেইখানে উপস্থিত হইল। প্রীতি ও নির্ম্মলকে এইভাবে দেখিয়া দেবব্রতের সর্ব্বশরীর যেন জ্বলিয়া উঠিল। প্রীতির উপর তাহার বড়ই রাগ হইল এবং নির্ম্মলের প্রতি হিংসায় সে যে কি বলিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল,

প্রীতির কি অন্যায়, সে কি ভুলে গেছে যে সে একজনের বিবাহিতা স্ত্রী? তার তো নির্ম্মলের সঙ্গে একা নির্জ্জনে এরূপভাবে থাকা অতিশয় অন্যায়। নির্ম্মলও কি বলে' সব জেনে ইচ্ছা করে' পরস্ত্রীর সঙ্গে মিশ্‌ছে।" দেবব্রতের ইচ্ছা হইল দুই-চারিটা কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া ইহাদের শিক্ষা দেয়। কিন্তু সে যতক্ষণ নিজের প্রীতির সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ না করে ততক্ষণ তো তাহার শিক্ষা দিবার কোনও অধিকার নাই। এই মনে করিয়া দেবব্রত নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, "ভাই নির্ম্মল, আমার তোমার উপর হিংসা হচ্ছে, তুমি কেমন মনের মত সঙ্গী নিয়ে এমন মধুর সন্ধ্যাটী কাটাচ্ছ, আর আমি একা একা শুষ্ক কাজ করে' মাথা ধরে' কষ্ট পাচ্ছি। আমাকে কেউ একটু আহাও বলে না। দেবব্রতের কণ্ঠস্বরে বেশ একটু আবেগ ছিল, তাহাতে প্রীতি চম্‌কাইয়া উঠিল। নির্ম্মল উত্তর দিল, "যেমন বোকার মত স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়েছেন তার ফল ভোগ করুন। অত করে' যে সবাই বলি মেম সাহেবকে যা' ইচ্ছা তাই কর্‌তে দেবেন না, তা' শোনা হয় না কেন? এখনও তো এমন কিছুই গরম পড়ে নি, মেম সাহেব বেশ তো আর কিছুদিন এখানে থাক্‌তে পারত। মেমের ভয়ে এমন কেঁচো হয়ে যান যে তার ওপর কথাটী বল্‌বার সাহস পর্য্যন্ত নেই, এখন সঙ্গিনী কোথায় পাবেন?"

উত্তরে দেবব্রত বলিল,—"তা' হ'লে তো তোমারও সঙ্গিনী পাওয়া উচিত ছিল না। যদি রেণুকার সঙ্গে বেড়াতে তা' হ'লেও বা কতকটা সাজ্‌ত।"

"কেন রেণুকাতে আর প্রীতিতে কি তফাৎ?"

"কেন রেণুকাকে তুমি বিয়ে কর্‌তে পার কিন্তু প্রীতিকে তো পেতে পার না। ভুলে যেও না যে সে পরের স্ত্রী।"

নির্ম্মলের মাথা গরম হইয়া উঠিল, সে একটু রুক্ষস্বরে বলিল, "সে কথা কাউকে আমায় শিখিয়ে দেবার দরকার নেই। প্রীতির হিতাহিতের দিকে লক্ষ্য আপনার চেয়ে বোধ হয় আমি বেশী রাখ্‌তে জানি। প্রীতির আত্মমর্য্যাদা আমার কাছে প্রাণের চেয়ে বড়।"

প্রীতি দেখিল যে একটা বিষম ঝগড়া বাধিয়া যায়। সে তাড়াতাড়ি, বলিল "মিষ্টার বোস, আপনার কি বড় বেশী-রকম মাথা ধরেছে? বিকেলবেলা এই নূতন গরম পড়্‌বার মুখে ঘরে বসে কাজ করা উচিত হয় নি। আমি অনেকক্ষণই ভাবছিলাম যে আপনি কেন আস্‌ছেন না। বড় কষ্ট হচ্ছে কি? চলুন বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে একটু বিশ্রাম কর্‌বেন। মাথায় একটু অডিকলম দিয়ে অন্ধকারে চুপ করে' শুয়ে থাক্‌লে ভাল হয়ে যাবে।" এই বলিয়া প্রীতি অগ্রসর হইয়া নিজের ঘর হইতে অডিকলম আনিতে গেল। নির্ম্মলের মেজাজ তখন বিগড়াইয়া ছিল, তাহার উপর সে দেবব্রতের ব্যবহারে বিশেষ বিচলিত হইয়াছিল, তাই সেও প্রীতির সঙ্গে চলিয়া গেল।

প্রীতি বলিল, "দাদা, আজ তুমি কি সভ্যতা-ভব্যতা ভুলে গেলে, একটু ওঁর কাছে বস্‌লে না কেন?"

নির্ম্মল বলিল, "ওঁর কথায় আমার বড়ই রাগ হয়েছে, থাক্‌লে হয় তো ঝগড়া হ'য়ে যাবে, তাই চলে যাচ্ছি। ওঁর কি অধিকার আছে তোমার বিষয় অমন করে' বলার? তুমিই বা ওঁর জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ওঁর সঙ্গে তোমার কথা বলাই উচিত হয় নি, কি রকম আস্পর্দ্ধা বল দেখি?"

"অসুখ করেছে শুনে কষ্ট হ'ল, তা'তে একটু যত্ন করা কি এত দোষের হ'বে, দাদা?"

এই বলিয়া প্রীতি নিজের ঘরে চলিয়া গেল। অডিকলম ও স্মেলিংসল্ট, লইয়া শীঘ্রই সে ফিরিল, তখনও সেখানে আর কেহ আসেন নাই। প্রীতি ফিরিয়া দেখিল দেবব্রত নিজেই নিজের মাথা টিপিতেছে ও মাথায় হাত বুলাইতেছে। দেবব্রতকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া প্রীতির কষ্ট হইল, সে সব ভুলিয়া তাড়াতাড়ি দেবব্রতের মাথায় অডিকলমের পটি দিয়া আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "খুব বেশী যন্ত্রণা হচ্ছে কি?"

দেবব্রত বলিল, "হাঁ, কিন্তু তোমার হাতের স্পর্শে আমার অর্দ্ধেক কষ্ট কমে গেছে মনে হচ্ছে।"

"আজ একটু সকাল-সকাল শুয়ে ঘুমাতে চেষ্টা কর্‌বেন তা' হ'লে কাল আপনি বেশ ভাল বোধ করবেন।"

"আর কষ্ট কর্‌তে হ'বে না, আমার সামনে এস" বলিয়া প্রীতির হাত ধরিয়া তাহাকে সামনে টানিয়া আনিয়া নিজের ইজিচেয়ারের হাতলটার উপর বসাইতে চেষ্টা

করিল। প্রীতির তাহাতে যেন চমক ভাঙিল; কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, "আমার হাত ছেড়ে দিন, আমি যাই। একটু আপনি ঘুমাতে চেষ্টা করুন, এখনও সকলের আসতে কিছু দেরী আছে বোধ হয়। খানিকক্ষণ চোখ বুঝে থাক্‌লে মাথার কষ্ট কমে যাবে ও যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব হ'বে।"

"আমার কাছে একটু বস না প্রীতি, তোমাকে দেখ্‌লেও আমার মনে শান্তি পাই।"

"একা অন্ধকারে আপনার কাছে আমি বসে আছি দেখ্‌লে লোকে কি মনে করবে। তা'তে আপনারও ক্ষতি হ'বে আমারও ক্ষতি হ'বে।"

"এই মাত্র যে অন্ধকারে একলা নির্ম্মলের সঙ্গে বেড়াচ্ছিলে তা'তে কি লোকে বড় ভাল বলবে? কই, তখন তো তোমার মনে এরকম দ্বিধা হয় নি।"

"ও কি কথা বল্‌ছেন আপনি? নির্ম্মল যে আমার দাদা। সে যে ঠিক আমার নিজের ভায়ের মত। আমি তো সর্ব্বদাই তার সঙ্গে বেড়াই, কই আজ পর্য্যন্ত কেউ তো কিছু বলে নি।"

"যদিও না বলে থাকে শীঘ্রই বল্‌বে। প্রীতি, তোমার সাবধান হওয়া উচিত। একজন অবিবাহিত যুবকের সঙ্গে এত বেশী মেশামিশি কি ভাল? আমার কাছে বসার দরুণ কেউ যদি তোমাকে কিছু বলে তুমি নিজেকে বাঁচাবার উপায় খুঁজে পাবে, আমিও তোমার মর্য্যাদারক্ষা করতে পারব, কিন্তু নির্ম্মল তো তা' পারবে না।"

প্রীতি মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, বুঝিল দেবব্রত যাহা বলিতেছে তাহা সত্য, অথচ দেবব্রতের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। মনে হইল দেবব্রতের এ কথা বলিবার আর কোনই অধিকার নাই। যে এতদিন তাহার কোনও খোঁজ রাখে নাই, যে এখনও তাহাকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে অসমর্থ, তাহার কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। এই সকল কথা ভাবিয়া প্রীতি একটু বিরক্তির স্বরে বলিল, "আমি আমার নিজের মান বজায় রাখতে জানি না? কই এতদিন তো আমার সুনামরক্ষা করবার কথা আপনার মনে হয় নি, আজ তবে নূতন করে সে চেষ্টা কেন? এ-সম্বন্ধে আপনার কোন কথা বলা শোভা পায় না। আপনার সঙ্গে ঝগড়া করবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই, বিশেষ আজ আপনি অসুস্থ। আমি যাই।"

"প্রীতি যাইতে উদ্যত হইল কিন্তু দেবব্রত তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "প্রীতি, রাগ ক'র না। বেশ স্বামীর কাছ থেকে উপদেশ নিতে যদি এতই খারাপ লাগে, সমাজের সামনে তো বন্ধু বলে স্বীকার কর, বন্ধুর উপদেশটা গ্রহণ করতে আপত্তি হ'বে না বোধ হয়।"

প্রীতি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "বন্ধু কবে থেকে হ'লেন! সমপ্রাণ হ'লেই 'সখা' হয়, জিজ্ঞাসা করি কবে থেকে প্রাণের সমতা হ'ল!"

যাতনাক্লিষ্ট দেবব্রত দুই হাত দিয়া নিজের মুখ ঢাকিয়া একটা অস্ফুট আওয়াজ করিল। সে বেদনাধ্বনি প্রীতির প্রাণে আঘাত করিল। লজ্জিতা হইয়া সে দেবব্রতের হাত দুইখানি ধরিয়া বলিল, "আমি জ্ঞানহারা হয়ে কড়া কথা বলেছি, ক্ষমা করবেন। আপনি ভাল কথাই বলেছেন, তা'তে আমার রাগ করা উচিত হয় নি।

এরূপ সময় বাহিরে কাঁকরের পথে পায়ের আওয়াজ শুনা গেল এবং নৃপেনবাবু ও অমিয়'র গলার আওয়াজ শুনিয়া প্রীতি সেখান হইতে চলিয়া গেল। ভিতরে যাইতে যাইতে প্রীতি ভাবিতে লাগিল মিষ্টার ঘোষের নির্ম্মলের প্রতি হিংসার কারণ কি? আমি নির্ম্মলকে বড় দাদার মত ভালবাসি সত্য, কিন্তু এ ভালবাসায় তো কামের গন্ধ নাই, এতে তো ওঁরই বা হিংসা হ'বার কথা নয়। আমাদের সম্বন্ধের কথা তো ওঁকে জানিয়েছি। যিনি স্বেচ্ছায় বিনা কারণে তাঁর ধর্ম্মপত্নীকে ত্যাগ করতে পেরেছেন, আবার এখন তাঁর প্রতি দরদ দেখিয়ে তাঁর 'সুনামরক্ষায়' জন্ম এত ব্যস্ততা কেন? এতে ওরই বা হিংসা হ'বে কেন? তবে কি মিষ্টার ঘোষ সত্যই আমাকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছেন? ভাল না বাসলে হিংসা আসবে কেন? আবার ভাবিল যে যদি ভালবাসিয়াই থাকেন তো কেন এখনও সকলের কাছে আমাদের সত্য পরিচয় প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন?

দেবব্রতের এরূপ অদ্ভুত ব্যবহার প্রীতি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না। প্রীতির মনোভাব ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। একবার তাহার দেবব্রতের ব্যবহার নীচ বলিয়া বোধ হইল, তাহার প্রতি রাগ ও ঘৃণা হইতে

লাগিল। মনে হইল দেবব্রত কাপুরুষ, তাহার সঙ্গে আর মিশিবে না, কোন সম্পর্ক রাখিবে না। আবার প্রীতির মনে পড়িল যে দেবব্রত অশেষ কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করিতেছে, কত বিনিদ্র যামিনী প্রীতির জানালার নীচে দেবব্রত কাটাইয়াছে তাহাও প্রীতির অবিদিত ছিল না। আজ দেবব্রতকে অসুস্থ দেখিয়া প্রীতির ইচ্ছা হইতেছিল সমস্তক্ষণ তাহার নিকট থাকিয়া সেবা করে। সে রাগ হওয়া সত্ত্বেও বোধ হয় দেবব্রতের সেবায় বিরত হইত না, শুধু লোকাপবাদের ভয়ে সে চলিয়া আসিল

ভিতরে গিয়া প্রীতি ভাবিল যে নৃপেনবাবুর স্ত্রীকে দেবব্রতের অসুস্থ হওয়ার কথা জানাইয়া নিজের বেশ-বিন্যাস করিতে যাইবে। সেই উদ্দেশ্যে নৃপেনবাবুর স্ত্রীর শয্যাগৃহের কাছে গিয়া শুনিতে পাইল যে তাহারই বিষয় কথা হইতেছে। গোপনে কথা শুনা অন্যায় জানিয়াও প্রীতি সে লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গেল ও শুনিতে পাইল যে নির্ম্মলের মামীমা বলিতেছেন, "তুমি যাই বল ভাই, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে প্রীতিরই জন্য নির্ম্মল বিয়ে কর্‌তে চাইছে না। আমার দৃঢ় ধারণা যে নির্ম্মল প্রীতিকে ভালবাসে। তোমরা কেন যে দেখ্‌তে পাও না বা বুঝ্‌তে পার না জানি না। আমি তো দেখি ছেলেটা প্রীতিকে দেখ্‌লে কেমন হ'য়ে যায়, প্রীতি ঘরে থাক্‌লে নির্ম্মল তার মুখের দিক্ থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। প্রীতি ইঙ্গিতে কথা বল্লে নির্ম্মল বুঝ্‌তে পারে, কিসে প্রীতি খুসী হ'বে সর্ব্বদা সেই চেষ্টা। আগে মনে কর্‌তাম, আহা মেয়েটার দুঃখের জীবন, তাই নির্ম্মল ওকে এত যত্ন করে, কিন্তু নির্ম্মলের আজ্‌কের ব্যবহারে আমার কেবলই এই মনে হচ্ছে।"

নির্ম্মলের মা একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "দেখ বৌদিদি, ওরকম কথা আমি শুন্‌তে চাই না। জান এতে কত বড় অন্যায় হয়। প্রীতি আমাদের মেয়ে, সে নির্ম্মলকে পেয়ে যেন বড়ভাই পেয়েছে, সকল বিষয় সে নির্ম্মলের উপর নির্ভর করে, যেমন নীলিমা, প্রীতিও তেমনই। আহা, ওর মা ও প্রীতি আমাদের পেয়ে যেন কত আপনার জন পেয়েছে, আমাদের কত বিশ্বাস করে, কত ভালবাসে। আমার মনে হয় প্রীতি যেন সত্যই আমার পেটে হয়েছে। বৌদি আর কখনও অমন কথা মনে এন না; ওরা যদি শুন্‌তে পায় কি মনে কর্‌বে বল তো। তুমি যা' বল্‌ছ আমি তা' বিশ্বাস কর্‌তে পারব না।"

নির্ম্মলের মামীমা বলিলেন,—"তা' কর্‌বে কেন? ছেলেটা সংসারী হ'বে না তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে।"

হতাশভাবে নির্ম্মলের মা বলিলেন,—"তা' কি করতে পারি বল। তুমি যা' বল্‌ছ তাই যদি সত্য হয়, তার আর কি প্রতীকার আছে? নির্ম্মল যদি সব জেনেও প্রীতিকে ভালবেসে থাকে, তার তো কোন উপায় নেই। অমন মেয়েকে না ভালবাসাই আশ্চর্য্য। যদি কোন উপায় থাক্‌ত আমি ওকে বউ করে' সুখী হ'তাম। কি লক্ষ্মী মেয়ে, যেমন অতুলনীয় রূপ, তেমনি গুণ। ওর বিয়েটা যদি মুছে ফেলা যেত তো এখনি আমি ওকে বউ করতাম, ওকে পেলে আমি আর কারও কথা ভাবতুম না। এখনও যদি কোন ব্যবস্থা করা যায় তো আমি ওকে বউ করি।"

প্রীতি এই কথাগুলি শুনিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কত কথাই তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, সে যে কি করিবে যেন ভাবিয়া পাইতেছিল না। এইমাত্র দেবব্রত তাহাকে যাহা বলিতেছিল তাহাই তো ঠিক হইল, অথচ সে দেবব্রতকে রূঢ় কথা বলিয়া অসুস্থ অবস্থায় কত কষ্ট দিয়া আসিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া দেবব্রতের কাছে ক্ষমা চায় এবং তাহাকে মিনতি করিয়া বলে যে লোকনিন্দা হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে, তাহার পরিচয় দিতে। তাহা না হইলে হয় তো ক্রমে ক্রমে আরও কত মন্দ কথা লোকে বলিতে সাহস করিবে। আবার পরমুহূর্ত্তেই প্রীতির মনে হইল, কখনই ওঁর কাছে আমি ভিক্ষা চাইব না। কেন উনি নিজে হ'তে আমার পরিচয় দেবেন না। তা'তে আমার অধিকার আছে, ওঁর স্বেচ্ছায় আমাকে সেটুকু দেওয়া উচিত। যদি ভালবেসে থাকেন তো নিশ্চয় কোনদিন আমার পরিচয় দেবেন।

নির্ম্মলের মামীমার উপর প্রীতির খুব রাগ হইল। রক্তের সংস্রব না থাকিলে এই পৃথিবীতে কেহ ভাই-বোন হইতে পারে না কি? সে সঙ্কল্প করিল যে ভাই বোনের কিরূপ পবিত্র বন্ধন হইতে পারে তাহা সে জগৎকে দেখাইয়া দিবে। লোকনিন্দার ভয়ে কি সে পিছাইবে? নিজের ভাই তাহার

হয় নাই সত্য, কিন্তু নির্ম্মলের প্রতি তাহার কি শ্রদ্ধা, কি ভক্তি, কি পবিত্র ভালবাসা। কই সে তো কখনও নির্ম্মলকে পুরুষ বলিয়া ভাবে নাই। এই চিন্তাস্রোতের মাঝখানে হঠাৎ প্রীতির মনে আবার অন্যদিকে গেল। সে ভাবিল, আচ্ছা এঁরা যা' বলছেন তা' যদি সত্য হয়, যদি দাদা আমাকে ভালবেসে থাকে তো কি উপায় হ'বে? হঠাৎ তাহার মনের মধ্যে নীলিমার বিবাহের পরদিনের কথা জাগিয়া উঠিল। নির্ম্মলের সেদিনের ব্যবহারের ভিতর প্রাণের আবেগটা কি বেশীভাবেই ফুটিয়া উঠে নাই, নির্ম্মলের ও দেবব্রতের চাহনি আরও বেদনায় ভরা, আরও হতাশভাব পূর্ণ। আজও বাগানে সে কি যেন অন্তরের ব্যথা জানাইতে গিয়া জানাইল না। হায়, যদি সত্যই নির্ম্মল তাহাকে ভালবাসিয়া থাকে তবে তাহার জন্য নির্ম্মলও কি সব সুখ বিসর্জ্জন দিবে? সে তো নির্ম্মলের ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারিবে না। বিধির এ কি নিষ্ঠুর খেলা, দুইটী জীবন কি এইরকম করিয়াই নষ্ট করিবেন। কেন নির্ম্মল সমস্ত জানিয়াও তাহার প্রতি আসক্ত হইল? না, কখনই এ সম্ভব নহে। নির্ম্মল কখনই স্বেচ্ছায় নিজের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারে না—নিশ্চয় সকলের ভুল। একদিন-না-একদিন সকলের এ ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে।

এইরূপ নানা দুশ্চিন্তায় যখন প্রীতি জর্জ্জরিত হইতেছিল তখন সে আর একলা থাকিতে পারিল না। সে শীঘ্র সজ্জা করিয়া দেবব্রতের নিকট যাইবার জন্য অস্থির হইল। বাহিরে যাইবার পথে একবার সে নির্ম্মলের মাকে দেবব্রতের অসুখের কথা বলিবার জন্য তাঁহার ঘরে গেল। তিনি তখনও রমাকে সাজাইতেছিলেন, নিজে প্রস্তুত হন নাই। প্রীতিকে দেখিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া বলিলেন, "আমার মা এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি যে আমার মাকে অনেকক্ষণ না দেখলে থাকতে পারি না।"

উত্তরে প্রীতি বলিল, "বাগানে ছিলাম মাসীমা। মিষ্টার ঘোষের বড় মাথা ধরেছে তাঁকে নীচের বারান্দায় আরাম চেয়ারে শুতে বলে আমি 'অডিকলন' আর 'স্মেলিংসল্ট' দিয়ে এসেছি। তাঁকে বড়ই অসুস্থ মনে হ'ল।

"তার কাছে কে আছে মা?"

"একাই আছেন।"

"নির্ম্মল কোথায় জান কি?"

"বাগানে ছিলেন, তারপর নিজের ঘরে গেছেন।"

"প্রীতি, তুমি একটু দেবব্রতের কাছে যাও মা। রমা, তুইও যা, আমি যত শীঘ্র পারি যাচ্ছি। আহা, বেচারার জন্য আমার বড় কষ্ট হয়, ওকে কেউ যত্ন করবার নেই, বেশীর ভাগ সময় একাই থাকে—মেম বিয়ে করার ফল। ওর মা ও তো ছেলের কাছে আসতে পারেন না যে একটু যত্ন পাবে। শুনেছি যে তিনি না কি মেম বিয়ে করার জন্য ভয়ানক চটে গেছেন এবং ছেলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেন না। অতটা করা কি তাঁর উচিত? ছেলে যদি ভুল করেই থাকে মা কি তাই বলে' ছেলেকে ছাড়তে পারে।"

উত্তরে ব্যথিতকণ্ঠে প্রীতি বলিল,—"মাসীমা, আপনি ওঁর মাকে চেনেন না, তাই ওকথা বলছেন। তিনি দেবী, তবে তিনি বড় ব্যথা পেয়েছেন তাই ছেলেকে ক্ষমা করতে পারছেন না। ছেলেকে তিনি দেখে গেছেন ও সর্ব্বদা খবর নেন। মিষ্টার ঘোষের ভাইরা তো সর্ব্বদা চিঠি লেখেন। ওঁদের পরিবারের সকলে অতি ভাল ও তাঁদের মনের ঐক্য খুব। ইনি যে এমন কাজ করবেন কেউ স্বপ্নেও ভাবেন নি। ওঁর মা কেঁদে কেঁদে দিন কাটান, ছেলের সঙ্গে বিচ্ছেদ তিনি সহ্য করতে পারছেন না। ছেলে যা' খেতে ভালবাসতেন তিনি সব ত্যাগ করেছেন।"

নির্ম্মলের মা বলিলেন,—"যা হ'বার হ'য়ে গেছে তা' তো আর বদ্‌লাবার উপায় নেই, তখন ছেলের সঙ্গে মনান্তর করে কেন কষ্ট পাচ্ছেন? এজন্য দেবব্রতও বড়ই দুঃখিত। মায়ের কথা উঠলেই ও যেন কেমন হ'য়ে যায়, চোখ জলে ভরে' আসে, আমি দেখেছি।"

রমা বলিল, "তুমি মা সব দেখতে পাও। মাকে যদি এত ভালবাসতেন তা' হ'লে কখনও মায়ের অমতে মেম বিয়ে করতে পারতেন না। আচ্ছা প্রীতিদি, তুমি তো দেখছি ওঁদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ, তবে তুমি কেন দেবদাকে মিষ্টার ঘোষ বল? আগে কি বলে' ডাকতে ভাই?"

প্রীতির মুখ একেবারে রক্তজবার মত লাল হইয়া উঠিল, সে কি যে উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "রমা তোমার হয়েছে কি, চল আমরা

যাই। তিনি কেমন আছেন দেখি গিয়ে।" এই বলিয়া রমার জন্ত অপেক্ষা না করিয়াই প্রীতি চলিয়া গেল। নির্ম্মলের মা প্রীতির মুখের ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "প্রীতি, অমন লাল হ'য়ে উঠল কেন?" কিন্তু তাঁর বড় তাড়াতাড়ি ছিল বলিয়া সে বিষয় আর ভাবিবার সময় পাইলেন।

প্রীতি নীচে আসিয়া দেখিল, অমিয় ও দেবব্রত কথা কহিতেছে। দূর হইতে সে বুঝিল যে নির্ম্মলের বিবাহের বিষয় কথা হইতেছে। দেবব্রত বলিতেছে, "আমি জানতুম যে নির্ম্মল সহজে বিয়ে করতে চাইবে না।"

"কিসে আপনি জানলেন?"

"একটু চোখ খুলে থাকলেই বুঝতে পারবেন।"

"আমি তো কিছু বুঝতে পারি নি।"

"হয় তো আমার ভ্রম।"

প্রীতি বুঝিল এসকল কথা বেশী না হওয়াই ভাল, সে দেবব্রতের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছেন? একটু মাথার কষ্ট কমেছে কি?"

অমিয় ঠাট্টা আরম্ভ করিল, "আমার ইচ্ছা করছে মাথা ধরে' পড়ে থাকতে, তা' হ'লে তবু অনেকের দয়া হয়, একটু মিষ্টি কথা শুনতে পাওয়া যায়।"

প্রীতি বলিল,—"জামাইবাবু, আপনার ঠাট্টা কি সব সময়ই, একজন কষ্ট পেলে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করা বুঝি আপনাদের ভদ্রতা ও রীতিবিরুদ্ধই।"

"তুমি খুব জিজ্ঞাসা কর, আমি এখন যাই। তোমার সহচরীটী কি করছেন, তাঁর যে বড় এখনও দেখা নাই।" বলিয়া অমিয় উঠিবার চেষ্টা করিল।

প্রীতি বলিল, "এত তাড়াতাড়ি কেন? একটু বসুন না।"

উত্তরে অমিয় বলিল, "না, শেষে দেরী হ'য়ে যাবে। আমাকে স্নান করতেই হ'বে।"

"এখনও তার অনেক সময় আছে। তবে আপনি বোধ হয় এতক্ষণ নীলিমাকে না দেখে আর থাকতে পারছেন না। যা'ন শীগ্‌গির, নইলে হয় তো বকুনি খাবেন। সে তো সম্ভবতঃ আপনারই আশাতে বসে আছে, তা' না হ'লে এতক্ষণ একা ঘরে কি করছে?"

"বাবা! ভয় ঢুকিয়ে দিলে যে, যদি চটে থাকেন তা' হ'লে আমি তো মানভঞ্জন করতে পারব না।"

"খুব পারবেন। আর অত বড়াইয়ে কাজ নেই, যান।"

অমিয় চলিয়া গেলে প্রীতি দেবব্রতের কাছে গিয়া কপালে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কষ্ট কমেছে কি? জর হয় নি তো?"

দেবব্রত প্রীতির হাতখানি কপালে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তোমার স্পর্শে আমার সব অসুখ ভাল হ'য়ে যায়। প্রীতি তুমি জান কি যে তোমার জন্ত ভেবে ভেবেই আমার অসুখ হয়েছে, আমার নিজদোষে আমাকে চিরদিন ভুগতে হ'বে। কেমন করে' তোমাকে সুখী করতে পারব আর নিজেও সুখী হ'ব এই চিন্তা আমাকে পাগল করে' তুলেছে। আমার রাত্রে ঘুম নেই, সারাদিন শান্তি নেই। প্রীতি, আমি তোমাকেই দিবা-নিশি চাই, কিন্তু পাবার উপায় নেই। যা'ক, আমি এখন নিজের সুখের চেয়ে তোমাকে সুখী করতে বেশী ব্যস্ত। তোমাকে নিভৃতে নিশ্চিন্ত মনে কয়েকটী কথা বলতে চাই, তুমি শুনবে কি? আমি বড় অপরাধী, তোমার সঙ্গে কথা বলবারও অধিকার আমার নেই। বাস্তবিকই আমি তোমার সঙ্গে পরম শত্রুর মতই ব্যবহার করেছি, তোমার এত অনিষ্ট করেছি যে তার তুলনা নেই। তবু বলছি আমাকে দু'টী কথা বলবার অবসর দাও।"

প্রীতি বলিল,—"আমার সঙ্গে আপনার কি লুকান কথা থাকতে পারে বুঝতে পারছি না, আমাদের মধ্যে তো কোন সম্পর্কই নাই। তবু আপনি যদি কথা বলতে চান আমি আপত্তি করব না। হয় তো আমাদের মধ্যে একটা বোঝা-পড়া হয়ে যাওয়া ভাল, যদিও তার আবশ্যকতা আমি বিশেষ দেখছি না। আর কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা নিজ নিজ পথে চলে যাব, হয় তো এ জীবনে আর কখনও দেখা হ'বে না, তখন এসকল কথায় কি প্রয়োজন? আর আজ আপনি অসুস্থ, আপনার মন বিচলিত, আর আজ কথা কইবেন না। চোখ বুজে চুপ করে' শুয়ে থাকলে আরাম পাবেন। যা' বলবার আছে না হয় ২।৪ দিন পরেই বলবেন।"

দেবব্রত বলিল, "তখন তোমায় কোথায় পাব? তুমি তো চলে যাচ্ছ।"

"আপনি শোনেন্ নি বোধ হয় আমি এখন যাচ্ছি না। মাসীমার ও নীলিমার একান্ত অনুরোধে থেকে যাচ্ছি। আমি নীলিমার সঙ্গে যাব।"

"আর নির্ম্মল ?"

"দাদা পরশু যাচ্ছেন।"

"তোমার সঙ্গে কথা বল্‌বার সুযোগ হওয়া বড় শক্ত, এতদিন চেষ্টা করে' সুযোগ পাই নি। তুমি যে সেই বিয়ের দিন থেকেই আমাকে দূরে দূরে রেখে চল।"

"কই, দূরে রাখতে তো চেষ্টা করি নি। যেদিন ইচ্ছা খুব সকাল-সকাল বাগানে এলেই আমার সঙ্গে নিভৃতে কথা কইবার সুযোগ পাবেন। এ বাড়ীতে আমার মত শীঘ্র কেউ ওঠেন না, আমি প্রত্যহ সকালে বাগানে বেড়াই।"

"তুমি একাই থাক ?"

"হাঁ, আমি একলাই থাক্‌তে ভালবাসি, তবে দাদা এক-একদিন এসে পড়ে।"

এমন সময় নির্ম্মলের মা আসিয়া দেবব্রতকে মাতার স্নেহে ও যত্নে ভরিয়া দিলেন। ক্রমে একে একে সকলেই আসিয়া পড়িলেন। প্রীতিকে সকলেই ভালবাসেন, সকলেই তাহাকে চাহেন, কাজেই সে মহা ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে বেড়াইতে লাগিল। সন্ধ্যায় আনন্দসভা খুবই সফল হইল। দেবব্রত সুস্থ হইয়া উঠিল, নির্ম্মলও শান্ত হইল, আনন্দের স্রোতে সকলেই মনঃপ্রাণ খুলিয়া আনন্দে যোগ দিল।

ক্রমশঃ

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে স্বাদেশিকতা

শ্রীফণীভূষণ রায়

যে জিনিসটার মূল্য কম সেই জিনিসটাকেই বহুমূল্য জিনিসের সঙ্গে চালাইবার যে আস্পর্দ্ধা তাহাকেই বলে 'ব্যবসাদারি'—ব্যবসা নয়, 'ব্যবসাদারি'। প্রতীচ্য সাহিত্য-সমালোচনায় অনেক সময়েই এই 'ব্যবসাদারি' চলে—যদিচ চলা অনুচিত; কারণ সাহিত্য জিনিসটা অমূল্য, মোটেই বেচা-কেনার জিনিস নয়। গলার জোরে সকলকে হতপ্রভ করিয়া নিজে বড় হইবার 'বাহবা' ইংরাজ তথা প্রতীচ্যগণ অনেক সময়েই লইয়াছেন। Edmund Gosse স্কট-সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"England may challenge the literatures of the world to produce a purer talent or a writer who has with a more brilliant and sustained vivacity combined the novel with the romance—the tale of manners with the tale of wonder." ইহার উত্তরে আমরাও তাল ঠুকিয়া বলিতে পারি "Bengal may challenge etc. etc." কারণ যে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ (tale of manners) আর কপালকুণ্ডলা (tale of wonder) লিখিয়াছেন তিনি কি Sir Walter Scott-এর সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারেন না ? সাহিত্য-ক্ষেত্রে "মরমের কথাই" শ্রোতব্য—'গরম কথা' নহে। তবে ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল বলিতে হইবে। আমাদের পাশ্চাত্য বিশেষতঃ ইংরাজ গুরুগণ এই রকম কথা বলিতে নিরতিশয় অভ্যস্ত। কেবলমাত্র ইহাই নহে, তাহা হইলে তো কোন বাদ-বিসংবাদ ছিল না। নিজেদের ঘোল ইহারা টক বলেন না—কিন্তু পরের ঘোলের 'টকত্ব' অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে মুহূর্ত্তমধ্যে আবিষ্কার করিয়া বসেন। এই স্বাজাত্যাভিমানী পণ্ডিতগণ কেবল নিজেদের প্রশংসায় চতুর্দ্দিক্ মুখর করিয়া তোলেন না—অপর জাতির কিংবা তাহার সাহিত্য-সম্বন্ধে অ-যথার্থ মতবাদ প্রচার করিয়া সেই জাতিকে এবং সেই সাহিত্যকে হতমান করিবার চেষ্টাতেও

অসাধারণ পটুত্ব দেখান। একটা উদাহরণ দিতেছি—

অনেক পণ্ডিতই এই যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছেন। আধুনিক কালের সংস্কৃত বিদ্যার্থীরা তাঁহাদিগের কাছে সকল প্রকারেই ঋণী। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা জ্ঞানশালী হইয়াও শালীনতা লাভ করেন নাই। সংস্কৃত সাহিত্য-সম্বন্ধে সচরাচর তাঁহারা এমন দাম্ভিকভাবে কথা বলেন যাহাতে মনে হয়, ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের হস্তগত হইয়াছে বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্যও তাঁহাদিগের 'পিনালকোডে'র অধিকারে আসিয়া পড়িয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য তাঁহাদিগের কাছে ধনীর গৃহে আগত ভিক্ষুকের ন্যায়—সময়মত হাঁকাইয়া দেওয়াও চলে আবার ইচ্ছা হইলে ভিক্ষা দুইমুঠা দেওয়াও চলে।··· সাহেব অশ্রদ্ধার সহিত বলেন—অমুক কবির কাব্য ইউরোপীয় 'রুচি'তে বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়।...আমরা কিন্তু যুক্তকরে নিবেদন করিতে পারি—ইউরোপীয় 'রুচি' ভূমিকদম্বের মত বিকসিত হইবার বহুপূর্ব্বেই কাব্যখানা রচিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এ সব খুঁটিনাটির কথা। একটা বিশেষ মতবাদ যাহা প্রতীচ্যের প্রত্যেক পণ্ডিতই প্রচার করিয়াছেন তাহা এই যে, আমরা চিরকালই জীবনকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি এবং এই উপেক্ষা করাটাই হইল আমাদের একমাত্র মহৎ কর্ত্তব্য। এমন কি আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহগণ যাঁহারা আমাদিগের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাঁহারাও কটিবস্ত্র কিংবা দিগম্বর হইয়া বটবৃক্ষতলে শিবনেত্র হইয়া বসিয়া থাকিতেন। অর্থাৎ সকল সাহিত্যই জীবনের প্রতিচ্ছবি কেবল আমাদিগের সাহিত্যই—জীবন-ত্যাগের, জীবন-ছাড়িয়া পলায়নের প্রতিচিত্র। তথ্যটা বেশ। তবে এই একটু সংশয় থাকিয়া যায় যে জীবনকে অস্বীকার করিলে জীবনজাত যে সাহিত্য তাহার সৃষ্টি কি সম্ভবপর হয়? জীবনপথের পথিক না হইয়া সাহিত্য রসের রসিক কি করিয়া হওয়া যায়?

এই সমস্ত মতবাদ অন্য কোন দেশেই চলিত না, কিন্তু আমাদিগের দেশে চলে, কারণ ইঙ্গ-বেদের উপর আমাদিগের শ্রদ্ধা অসাধারণ। যাঁহারা সংস্কৃত 'ডিগ্রীর' জন্য পড়েন তাঁহাদিগের মধ্যে শতকরা নব্বই জন ছাত্রের ইহাই হইল স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত যে সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ দুইখানি নাটকে—অভিজ্ঞান শকুন্তলায় এবং উত্তর-রামচরিতে—দীর্ঘশ্মশ্রু সব তপস্বীরা এবং বল্কল পরিধান পরায়ণা সব তপস্বিনীরা কেবলমাত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এই দুই মহানাটকে আশ্রম এবং তপোবন সারা দেশময় বিস্তারলাভ করিয়াছে। এই দুইখানি নাটক পড়া এবং 'মোহমুদ্গর' স্তোত্র আবৃত্তি করা প্রায় সমতুল্য। বৈরাগ্য অর্থাৎ জীবনকে অস্বীকার করাই এই দুই মহানাটকের মূল রাগিণী। জীবনকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রতিফলিত করিয়া বহুভঙ্গিম করিবার প্রয়াস এই দুইখানি মহানাটকে কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। এই দুইখানি নাটক বৈরাগ্য-শতক না হইলেও—বৈরাগ্য-সপ্তাঙ্ক। এই-ভাবে আমরা সাধারণতঃ চিন্তা করি। সুতরাং এই দুইখানি নাটক আমরা 'প্রাণবন্ত' ভাবে পড়ি না কিংবা পড়িতে পারি না—যুগ-যুগব্যাপী অমর জীবনের একটা স্পন্দন যে ইহাদের প্রতি পত্রে পত্রে আছে তাহা অনুভব করিবার প্রয়াস-মাত্র করি না। কিন্তু ইংরাজ-সমালোচকদিগের কাছেই শিখিয়াছি -"মহৎ জীবনই মহৎ সাহিত্যের জনক" এবং সংস্কৃত-সাহিত্য পড়িয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছি—সংস্কৃতসাহিত্য মহৎ সাহিত্য—সুতরাং বলিতে সাহস করি যে যুগে সংস্কৃত সাহিত্য রচিত হইয়াছিল সে যুগে জীবনও সপ্ত-তল-সৌধের মত সমুন্নত ছিল। "Oldenberg বলেন—"Whatever is, appears to the Indian worthless compared to the marginal illuminations with which his fancy surrounds it or that morbid impression of sorrow and disease which has survived all changes of fortune etc.,"—এই সব কথা এ যুগের ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি প্রযোজ্য হইলেও সেই যুগের ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে খাটে না যখন তাঁহারা ছিলেন জাগ্রত ও জীবিত—যখন তাঁহারা কেবল বাঁচিতেনই না, সেই বাঁচাকে শাশ্বত একটা সৌন্দর্য্য অভিব্যক্তির মধ্যে চিরজীবী করিয়া রাখিবার স্পর্দ্ধা রাখিতেন। নদীর জলে ডুব দিলে মাটি পাওয়া যায়—আমরা কাব্যস্রোতে ডুব দিয়া পূর্ব্বতন জীবনকে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব।

"উত্তরচরিতের" প্রথম অঙ্কে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে রাজদম্পতীর অপূর্ব্ব দাম্পত্যলীলা ও ভাগ্যবিপর্য্যয় সন্দর্শন

করি—পরবর্ত্তী অঙ্কেই কিন্তু উপস্থিত হই—বিন্ধ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া পঞ্চবটীর বিশাল অরণ্যে। কথায় আছে—মনসা মথুরাং গচ্ছামি—আমরা মনে, মনেও এই বিন্ধ্য পর্ব্বতকে অতিক্রম করিতে পারিতাম না যদি না সেই মহাপুরুষ, আর্য্য-সভ্যতার সেই অগ্রদূত ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য আর্য্য-সভ্যতার স্রোতধারাকে ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশ হইতে দক্ষিণ সমুদ্রতীরে বহন করিয়া লইয়া না যাইতেন। There shall be no Alps—নেপোলিয়ানের এই গর্ব্বিত বাণী আমাদের স্মৃতিফলকে চিরমুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অগস্ত্য ঋষি যে একদিন বিন্ধ্য পর্ব্বতের গগনস্পর্শী তুঙ্গতাকে ধিক্কারের সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন—তাহা আমাদিগের জাতীয় সংবিতের কোন খানে কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। অথচ অগস্ত্য ঋষির তুলনায় নেপোলিয়ান তো মানবক। নেপোলিয়ান ও তৎপূর্ব্বে হানিবাল আলপ্‌স পর্ব্বতকে নতমুণ্ড করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্থেজীয় সভ্যতাকে হানিবাল ও ফরাসী প্রভুত্বকে নেপোলিয়ান আল্‌স পর্ব্বতের অপর প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু অত্যাশ্চর্য্য এই অগস্ত্যের জয়। শত শতাব্দীর পরও দেখি অনার্য্য দক্ষিণাবর্ত্তে আর্য্যসভ্যতা যোজনব্যাপী অশ্বত্থের মত দৃঢ়মূল হইয়া রহিয়াছে। মহাকবি ভবভূতি তাঁহার "উত্তরচরিতে" অনার্য্যভূমিতে আর্য্যগণের এই যে দিগ্বিজয় পরম উল্লাসের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন—দেশবুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ হইয়া অবলীলাক্রমে গঙ্গা-গোদাবরীর সংযোগস্থাপন করিয়াছেন এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া গোদাবরী-রত্নাকর-সঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগটাকে দূরবিসারী দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়াছেন। তবে মহাকবি-বর্ণিত এই যে জয়—ইহা আধুনিক কালের বুভুক্ষার জয় নহে—ইহা চিত্তজয়। সুতরাং মহাকবি এই 'জয়'-ঘোষণা করিতে গিয়া দুর্গের কথা, সৈন্যের কথা, অত্যাচার-নিপীড়নের কথা বলেন নাই—বলিয়াছেন বিদ্যালয়ের কথা, শিক্ষাগারের কথা, কেমন করিয়া অভিমানিনী এক শিক্ষার্থিনী সেই এককালে দাক্ষিণাত্যে পাঠ করিতে গিয়াছিলেন—তাহার কথা। আর্য্যগণ জয় করিতেন—গ্রাস করিবার জন্য নয়—দান করিবার জন্য (শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্য জহার ন তু মেদিনীম্)। বস্তুতঃ অগস্ত্য ঋষি ছিলেন যে জয়ের পুরোহিত—তাহার জয়ে রাহুর গ্রাস ছিল না—ছিল চন্দ্রের সুধাবিতরণ। অগস্ত্য ঋষির যুগ-প্রবর্ত্তক জীবনের পুণ্যকাহিনীটা স্মরণ করিলেই এই উক্তির সারবত্তা নির্দ্ধারিত হইবে। পরচিত্তকে করায়ত্ত করিবার সাধারণ চেষ্টাকে ঋষিপ্রবর জীবন-বেদের পুরুষসূক্ত বলিয়া মানেন নাই—পরন্তু পরকে আপন করিবার দুরূহ ব্রতকে আপনার অগ্রগামী (পূর্ব্বমর্ষৎ) জীবনে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি "অগস্ত্যযাত্রা" করিয়াছিলেন। এই পুণ্যকথা ভবভূতি "উত্তরচরিতে" মনে রাখিয়াছেন। প্রথম যেদিন বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে আর্য্য-শিক্ষাগার স্থাপিত হয়, সেই দিনকার পবিত্র স্মৃতি ভবভূতি ভুলিতে পারেন নাই, সেই স্মৃতিকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিবার জন্য, অগস্ত্য ঋষির পূতস্মৃতির পূজার জন্য, ভবভূতি তাঁহার "পঞ্চবটী-প্রবেশ" নামক দ্বিতীয় অঙ্কের পরিকল্পনা করিয়াছেন। আজ বাসুদেবের সমসাময়িক কোন বাঙ্গালী বাঁচিয়া থাকিলে, নবদ্বীপে "ন্যায়-চতুষ্পাঠী"-স্থাপনের কাহিনীটা বেশ গর্ব্ব-গদগদকণ্ঠেই বলিতেন;—ভবভূতিও তাহাই করিয়াছেন। "উত্তরচরিত" তো মস্ত বড় একখানা 'জাতীয়' নাটক—রামচরিত্র ইহার বর্ণনার নাটকীয় বিষয় হইলেও আর্য্য-চরিত্রই ইহার বর্ণনার মুখ্য বিষয়। সেই চরিত্রের বলিষ্ঠ এবং অম্লান পরিচয় ইহার পত্রে পত্রে আছে। প্রাচীন আর্য্যগণের মত দাতা পৃথিবীতে আর কেহ হইয়াছেন কি? দেবতারাও অমৃত-বণ্টনে পক্ষপাতিত্ব করিতেন—অ-দেবের জন্য অমৃত-পরিবেষণ কোনকালেই হয় নাই। আমাদের পূর্ব্বপিতামহগণ সভ্যতা-বণ্টনে কোন কার্পণ্য করেন নাই। অনার্য্যের তৃষিত ওষ্ঠাধরের সম্মুখে তাঁহারা শুভ্র বিদ্যার উচ্ছ্বসিত পানপাত্র সমাদরের সহিত ধরিয়াছেন। বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সভ্যতারূপ অমৃত-ভোজনের উৎসব সমভাবেই চলিয়াছিল। তাই তো অভিমানিনী সেই আর্য্যকন্যার কথা ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা হয় না—গঙ্গা-গোদাবরীর সংবাদ নিছক কবি-কল্পনা বলিয়া মনে হয় না। আর্য্যকন্যার বিদ্যাভ্যাসের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন—আর্য্য চরিত্রের উদ্দেশে ইহা একটা প্রকাণ্ড ও বিরাট কীর্ত্তিস্তোত্র। যজ্ঞ অর্থাৎ মনুষ্য-দান

ব্যাপার যাঁহাদিগের ধর্ম্ম—তাঁহাদিগের হস্তে অপরিসীম দাতৃত্বশক্তি যে থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। পরিব্যাপ্ত হওয়াই জীবনের লক্ষণ এবং আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু দান করাই হিন্দুদিগের সাধনা (অনন্দানাম তে লোকান্ ..) এই দুইটী কথা মনে রাখিলে হিন্দু-জীবন-স্রোত কেন যে বিন্ধ্য পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তকে প্লাবিত করিয়াছিল অনায়াসেই বুঝিতে পারিব··· একটা অক্ষর বাণীতে এই গৌরবোজ্জ্বল তথ্যকে প্রকাশ করিয়া ভবভূতি আমাদিগের চিরকালের কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।

সে যাহাই হউক, অগস্ত্য ঋষির পদানুসরণ করিয়া (অগস্ত্যাচরিতাসাং ..) আমরা অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া জনস্থানের বিশাল অরণ্যে উপস্থিত হইয়াছি। ঐখানে আসিয়া আমরা যেন অযথা ত্বরা প্রকাশ না করি। এখানে দেখিবার অনেক কিছু আছে বলিয়াই উদ্বেগহীন তন্ময়তার সহিত দরকার—নতুবা এই অসীম চিত্রশালায় অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি দেখিবার মত দেখা হইবে না। বলিতে কি, ভবভূতি ভৈরবকণ্ঠে এখানে যে গান ধরিয়াছেন তাহা ধ্রুপদ—অশোভন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে এই স্থিতিবহুল সঙ্গীতের মর্য্যাদা পদে পদে ক্ষুণ্ণই হইবে। কিন্তু কথা উঠিতে পারে, নাটকে তো ইহার অবকাশ নাই—এই যে সুপ্রচুর বর্ণনাসম্ভার—ইহার অবসর নাটকে কোথায়? কথাটা ঠিক, কিন্তু এস্থলে আমরা নাটকীয় যৌক্তিকতা বিবেচনা করিব না—তদপেক্ষা গভীরতর সত্যের অনুসরণ করিব—কেন ভবভূতি এমন অদম্য উচ্ছ্বাসের সহিত, এমন প্রাণভরা কল্পনার সহিত, এমন উজ্জ্বল হৃদ্যতার সহিত জনস্থানের রূপচিত্রটী আঁকিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি জীবন্ত জাতি হইতাম, তবে এই সমস্যার সমাধান করিতে আমাদিগকে প্রয়াস-মাত্র করিতে হইত না। আমরা নিঃসংশয়কণ্ঠে বলিতে পারিতাম পৃথিবীর সহিত যাঁহার নাড়ীর বন্ধন নাই, তাঁহার পক্ষে এমন বর্ণনা করা অসম্ভব—তাঁহার কণ্ঠে এমন বাণীর আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব। বিন্ধ্য পর্ব্বতের পাদমূল হইতে সমুদ্র-গোদাবরী-সঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডের যে বিশাল রূপচিত্রটী ভবভূতির লেখনী মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে—গভীর মনঃসংযোগের সহিত তাহা নিরীক্ষণ করিলে বলিতে হয় ভবভূতিও সেই দেবীকে নতজানু হইয়া প্রণাম করিতেন যে দেবীকে বঙ্কিম "বন্দেমাতরম্" বলিয়া অভিবাদন করিয়াছেন। কি মহান্—মনোরম—গম্ভীর দৃশ্যাবলী! আমার যদি গঠনপটু হস্ত থাকিত তাহা হইলে রৌদ্রকরোজ্জ্বলা, নদীকুন্তলা, ইতস্ততঃ পর্ব্বতশ্রেণী-কর্ত্তৃক উচ্চাবচা মায়ের মূর্ত্তিটি আঁকিয়া দেখাইতাম—মাতা কোথাও ভীমা কোথাও কান্তা! কোথাও—"স্নিগ্ধশ্যামা" "মুখর ককুভো ঝঙ্কৃতৈ র্নির্ঝরাণাং"—আবার কোথাও "নিষ্কূজস্তিমিতাঃ"—"প্রচণ্ডাসত্ত্বঘনা"—"ভীষণাভোগরুক্ষঃ"। কোথাও "তপ্ত মরুর উষর দৃশ্য" আবার কোথাও "শ্যামল শস্যে হাসিছে বিশ্ব"! অপূর্ব্ব দুর্ল্লভ অনবদ্য শোভারাশি!···রৌদ্রদগ্ধ তপ্ত মধ্যাহ্নে এই জনস্থানের গভীর অরণ্যে যে রূপের হাট বসে তাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ; সে রূপের মায়া চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরই চোখে লাগে। তখন কপোতকুক্কুটকুলের ক্লান্ত কূজনধ্বনি ঈষৎ কর্ণগোচর হয়, খাদ্যান্বেষণতৎপর "ছায়াপাস্করমান বিষ্কিরগণে"র চঞ্চু-আঘাতে কুলায়দ্রুমের ত্বক্ ক্ষত-বিক্ষত হয় এবং অকস্মাৎ আগত আতপতপ্ত হস্তীযূথের পৃষ্ঠ ঘর্ষণে কম্পিত তীরতরুর পতনোন্মুখ পুষ্পাবলীর দ্বারা গোদাবরীর অর্চ্চনা হয়। দূরে প্রস্রবণ গিরির নীলরেখা—ওখানকার গিরি, নদী, বনস্থলী যে মত্ত হরিণের দ্বারা চঞ্চল, "বিরুবন্"-ময়ূরের দ্বারা মুখর এবং আমঞ্জু বঞ্জুল লতার দ্বারা মনোহর তাহা কি বলিতে হইবে? উৎকর্ণ হইলে শুনিব দূরে, দক্ষিণে "গদ্গদনদৎ"-গোদাবরী সুধীর গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রবাহিত হইতেছে। সেই বিপুল জলরাশির কলকল্লোল কি মাতৃপূজার শঙ্খধ্বনির মতই শুনাইবে না? মাটির মধ্যে যিনি মা'কে দেখেন—মৃন্ময়ী যাঁহার দৃষ্টিতে চিন্ময়ী হইয়া উঠেন—তাঁহার পক্ষেই এহেন রূপের সৃষ্টি করা সম্ভব। মনে পড়ে আর-একজন কবির কথা—গ্রীক নাটককার সফোক্লেসের কথা—যিনি "Oedipus at Colonus" নাটকের ভুবন-বিখ্যাত parodas (দেশস্তোত্র)টী লিখিয়া গিয়াছেন। জানি না কোন্ বিজয়ী-যুগে "উত্তরচরিতম্" লিখিত হইয়াছিল—কিন্তু কবির স্বরূপটী কাব্যে ধরা পড়িয়া আছে। বস্তুতঃ "Oedipus at Colonus" নাটকের—দেশস্তোত্র লিখিয়া গ্রীক কবি সফোক্লেস যদি স্বদেশ-প্রেমিক হইয়া

থাকেন—"উত্তরচরিতে"র জনস্থান-বর্ণনা করিয়া হিন্দু কবি ভবভূতি স্বদেশ-প্রেমিক হইয়াছেন—তাহা নিঃসন্দেহ···তবে যদি আমরা "উত্তরচরিত" পড়িতে গিয়া "ব্যাকরণ-বিভীষিকা"গুলিকে আয়ত্ত করিয়াই কর্ত্তব্যশেষ করিয়াছি বলিয়া মনে করি, তবে বলিতে হয়—তরবারিকে আমরা ক্ষৌরকার্য্যে লাগাইতেছি—সে দুর্ভাগ্য আমাদের, মহাকবির নয়।

* * * *

শকুন্তলা-শোকে দুষ্মন্ত দুর্ম্মনা হইয়াছেন। দেবাধিপতি বাসব তখন শত্রুনিপীড়িত। ইন্দ্রসারথি মাতলি আসিয়াছেন দেবসমাজের পক্ষ হইতে দুষ্মন্তকে যুদ্ধের জন্য সসম্মানে আহ্বান করিতে, কারণ "দৈত্যৈঃ শক্রবৈরাঃ" দেবতারা "পৌরহূতে বজ্রে" এবং দুষ্মন্তের "অধিজ্যে ধনুষি" সবিশেষ আস্থাস্থাপন করিতেন—এই দু'টাই ছিল তাঁহাদের আশ্রয় স্থল। কালফণীকে জাগরিত করিবার জন্য ডমরুধ্বনির আবশ্যক হয়—বিমনা দুষ্মন্তকে প্রণোদিত করিবার জন্য মাতলি বিদূষককে কপট আক্রমণ করিলেন। নেপথ্যে বিদূষকের মরণভয়ে চীৎকার (মারীচের মুখে হে লক্ষ্মণ) নিমেষের মধ্যেই দুষ্মন্তকে প্রবুদ্ধ করিল। দুষ্মন্ত বিশাল-ধনুতে বাণযোজনা করিলেন—সেইক্ষণেই মাতলি হাসিমুখে আসিয়া দুষ্মন্তকে অভিবাদন করিলেন এবং বলিলেন—"প্রসাদসৌম্যানি ইত্যাদি"। বেচারা দুষ্মন্তের পক্ষে বাণ-যোজনা করাই বিড়ম্বনা-মাত্র—হয় উর্দ্ধবাহু তপস্বী আসিয়া বলিবেন—"আশ্রম মৃগোঽয়ং"—না হয় ইন্দ্রের-সারথি মাতলি আসিয়া বলিবেন—এ' কি রকমের আচরণ—"প্রসাদ-সৌম্যানি সতাং সুহৃজ্জনে"...সে যাহাই হউক, দুষ্মন্ত ইন্দ্রাদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য তূর্ণগতি রথে চড়িয়া স্বর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন। যুদ্ধে শত্রু পরাস্ত হইল। সপ্তম অঙ্কে দেখি—গঙ্গাবতরণের ন্যায় বিজয়ী দুষ্মন্তের পৃথিবীতে পুনরাগমন। ইন্দ্র-রথ তখনও আকাশ-পথে—দূরে স্বর্গের বিলীয়মান স্বপ্নচ্ছবি অদূরে হৈমকূট গিরি—রক্তাস্তসূর্য্যের স্থির শোভায় সুমনোহর। সেই অপূর্ব্ব শোভাসম্পদের মধ্যে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্ত—তাঁহার গলে তখনও বাসবদত্ত বিজয়ী মাল্য—হরিচন্দনাঙ্কিত বিজয়ী মাল্য—পৃথিবীকে, মাতাকে, মৃন্ময়ীকে সন্দর্শন করিলেন। দেবকণ্ঠ মাতলির কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"অহো উদাররমণীয়া পৃথিবী"। পুরাণ-কবি বাল্মীকি একদিন আর্য্যাবর্ত্তের যৌবন-প্রতীক বিজয় সিংহ রামভদ্রের মুখে বলিয়াছিলেন

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—মহাকবি ও দুষ্মন্ত-মাতলি-সংবাদে সেই কথাই প্রমাণ করিলেন—স্বর্গাদপি গরীয়সী—কোথায় লাগে স্বর্গ—বনরাজিনীলা আমার মায়ের কাছে—স্বর্গ কোথায় লাগে ? মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—মৃন্ময়ী মায়ের প্রত্যেক ধূলিকণাও যে মধুমৎ—মধুবাতা ঋতায়তে—মায়ের অঙ্গন দিয়া যে বাতাস বহিয়া যায়—স্বর্গের পারিজাতগন্ধচোর মন্দ মৃদুলানিল তাহার মত মধুগন্ধী কি করিয়া হইবে ?.. ওল্ডেনবার্গ-প্রমুখ তবুও যদি বলেন—"that morbid impression of sorrow and disease"···তবে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। যে জাতির "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"এর মত নাটক আছে—সে জাতি যে চিরকাল দুঃখবাদী এবং দুঃখগ্রস্ত ছিল তাহা বলিলে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যকে প্রভাহীন বলিতে হয়। তবে—পণ্ডিতেরা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করুন্। আমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ মহাকবির মহাবাক্য স্মরণ করিয়া শেষ করিতেছি—"অহো উদার-রমণীয়া পৃথিবী—উদার-রমণীয়া পৃথিবী"!

আহুতি

(গল্প)

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

ই, বি, রেলের ছোট্ট একটা ষ্টেশন্…বারকয়েক বদলীর পর কিছুদিন আগে সৃষ্টিধর আজ এই ষ্টেশনেই বদলী হইয়াছে! সৃষ্টিধর বুকিং ক্লার্ক,—মাল 'বুক' করে, আর ট্রেণের ঘণ্টা হইলে 'টিকিট্ কেসে'র সুমুখে আসিয়া দাঁড়ায়…জানালার পাশে প্যাসেঞ্জারের দল তখন ভিড় করিয়া হাঁকে—· 'বাবু· টিকিট্,··বা…বু…'

জানালার ছোট্ট রন্ধ্রের ভিতর দিয়া সমবেত যাত্রীর সমস্ত হাতগুলিই যেন একসঙ্গে ঢুকিয়া পড়িতে চায়,… ব্যাপার দেখিয়া সৃষ্টিধর হক্‌চকাইয়া যায়,…একটু রুক্ষকণ্ঠে বলে—'. কি মুস্কিল,…বলি গাড়ী কি চ'লে গেল না কি ·হাঁ…মশায়রা…?'

সৃষ্টিধরের আশ্বাসবাণীতে গুঞ্জনটা একটু স্তিমিত হয়

…এরপর দশমিনিটেই সব কাজ ফর্সা! হুস্ হুস্ শব্দে ট্রেণ আসিয়া পড়ে। বোঁচকা-বুঁচকী হাতে হুমড়ি খাইয়া কতকগুলি লোক কামরায় ওঠে,—কতকগুলি আবার নামেও—,…সঙ্গে সঙ্গে কুলীদের চেঁচামেচি·· ষ্টেশন্ মাষ্টারের ছুটাছুটি কয়েকটা মুহূর্ত্ত ধরিয়া ষ্টেশনটাকে যেন জীবন্ত করিয়া তোলে!

রুদ্র বংশী-নিনাদে চতুর্দ্দিক্ চকিত করিয়া ট্রেণ আবার চলিয়া যায়,…সমস্ত ষ্টেশনে পূর্ব্বের সেই নিস্তব্ধতা ভরিয়া আসে…,বড় বাবু আদায়-করা টিকিটগুলি সৃষ্টিধরের টেবিলের উপর রাখিয়া যান,…সৃষ্টিধর নিঃশব্দে তা' দেখে,… কথাটী কয় না!…রাত্রি-দিনের অবিরাম কাজের ভিতর সৃষ্টিধরের বিশটী বছর ঠিক এমনি করিয়া কাটিয়া গেছে,… একই কাজ…অভিজ্ঞতার খরদৃষ্টিতে সৃষ্টিধরের কাজে আর কিছু বাধে না…সবই সহজ, অবাধ…কিন্তু তবুও একটু বাধে,…আর সে কোথায়…সৃষ্টিধরের তাহা অজ্ঞাত নাই।

দশ বছরের মেয়ে শুভা আসিয়া বলে—' বাবা হাটে যেতে হ'বে যে · এখুনি ?'

সৃষ্টিধর ঘাড় উঁচাইয়া বলে—'…ওঃ··আজ বুঝি হাটুবার…কিন্তু কি আন্‌তে হ'বে মা।'

হাটের ফর্দ্দটা শুভা আর দিতে পারে না—'বলে— কি জানি, তুমি এস তো তারপর·· '

টিকিট-ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সৃষ্টিধর শুভার সহিত বাহির হয়।

বাসার পথ…ঐ যে বড় বাবুর বড় কোয়ার্টার—আর তা'রই লাগোয়া সৃষ্টিধরের ছোট্ট কোয়ার্টারটী—ও যেন ঠিক একটী রহস্যপুরী…এই ঘরে তারই মত কতজন আসিয়া চলিয়া গেছে,…তাদের বৈচিত্র্যহীন স্বল্পপরিসর জীবনের দিনগুলি একের পর একটী করিয়া কাটিয়া গেছে, এই পায়ে চলার পথটীতে তাদের জীবনের স্মৃতিগুলি এখনও হয় তো উষারাগের মত সমুজ্জ্বল রহিয়াছে,…ঐ খালাসী কোয়ার্টারটির ভিতর হইতে ভোর সন্ধ্যায় তখনও বুঝি ঠিক আজিকার মতই করুণ হিন্দী সঙ্গীতের সুর উঠিত… পাশের রাস্তাটী দিয়া ভিন্ন গ্রামের লোকগুলি হাটবারের দিন চঞ্চলগতিতে হাঁটিয়া যাইত, যাইবার সময় এই নিঃশব্দ কোয়ার্টারটীর দিকে তা'রা একবার দৃষ্টিপাত করিতে ভুলিত না। তা'দের পায়ের শব্দে ছেলেগুলি হয় তো দুপ্‌দাপ্ করিয়া ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিত… বাহিরে আসিয়া নগ্নমূর্ত্তিতে হাতের আঙুল চুষিতে চুষিতে চলন্ত পথিকদের দিকে একদৃষ্টে তাহারা চাহিয়া থাকিত; চাহিয়া চাহিয়া কিছুক্ষণ পরে আবার ওরা ঘরের কোণে… মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিত…,…বাসায় ফিরিতে ফিরিতে সৃষ্টিধর এই সমস্তই ভাবিতে থাকে। রাত্রিদিনের শ্রান্তি-হীন গতির সহিত আর কতদিন তাহাকে এমনি করিয়া চলিতে হইবে…কে জানে?

বাসার রুদ্ধ দরজাটার কাছে আসিয়া কি ভাবিয়া স্বষ্টিধর পিছন ফিরিয়া চাহিল,...দেখিল গর্ত্তের ধারের ছোট্ট কুল-গাছটী হইতে শুভা আঁচল ভরিয়া কুল পাড়িতেছে।

'আরে কাঁচা যে, পাড়িস নি ক...ও শুভা।'

'না...বাবা...আর গোটাকয়েক—' শুভা পাড়িয়া চলে ...ওকে আর পায় কে তখন!

স্বষ্টিধর আর ভ্রূক্ষেপ করিল না...

দরজার কড়া নাড়িতেই দরজা খুলিয়া যায়, এই চিরন্তন সঙ্কেতের সহিত ভিতরের প্রাণীটির বেশ পরিচয় হইয়া গেছে।

দরজা খুলিয়া সম্মুখের পথটী রোধ করিয়া যে দাঁড়ায়—সে ভামিনী,...পরিপূর্ণ যৌবনের প্রতিটী হিল্লোল তার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে—কটিতটের সঙ্গে মিশ্ খাইয়া চওড়া লাল-পাড় শাড়ীটা দু'খানি অলক্তচিহ্নিত পায়ের উপর মুহুর্মুহু শিহরিয়া উঠিতেছে, মুখের প্রতিটী কুঞ্চন-রেখায় মুকুলিত যৌবনের সুষমা...চোখের প্রান্তে কৈশরের দুষ্টু চপলতা, সে চপলতা মধুর ও মদির..স্বষ্টিধর দৃষ্টি নত করিল।

ভামিনী হাসিল—হাসিয়া বলিল—...'গাড়ী তো অনেক-ক্ষণ আগে চলে গেছে...এতক্ষণ কি হ'চ্ছিল মশায়ের?'

স্বষ্টিধর ভামিনীকে পিছনে ফেলিয়া দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইল; একটী শিশুমেয়ে ছিন্ন একখানি মাদুরের উপর সেখানে কান্না সুরু করিয়াছিল, সেখানে আসিয়া বলিল—'কাঁদছে কেন? মেরেছ না কি?'

'হাঁ মেরেছিই তো...আমার মেয়ে...মারব না? বাঃ...রে...'—ঢেউএর মত হেলিতে-দুলিতে ভামিনী দাওয়ার উপর উঠিয়া আসে—স্বষ্টিধরের সুমুখে দাঁড়াইয়া বলে—'কিন্তু তোমার দেরীর উত্তর দিলে না যে?'

স্বষ্টিধর ঘাড় উচাইয়া চাহিল, দেরীর কৈফিয়ৎটা সে মনে-মনেই আঁকিতে থাকে।

বলিল—'যাক্...হাটে কি আনৃতে হ'বে..শুনি?'

'কিছু না...'—ভামিনী মুখখানি গম্ভীর করিয়া তুলিল।

'বেশ...'—স্বষ্টিধর প্রস্থানের উপক্রম করিল, ভামিনী অমনই খপ্ করিয়া তা'র ডান হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—'অত রাগ রাগ কেন মশায়ের একটু বসলে বুঝি আর...'

ঐ টুকুতেই যত কিছু বিভ্রাট, স্বষ্টিধরকে অগত্যা বেতের চেয়ারটীতে বসিয়া পড়িতে হয়।

ভামিনী মাথার কাছে সরিয়া আসিয়া বলে—'ও মা... আজ দেখছি অনেকগুলি পেকেছে...দেখি...দেখি।'

স্বষ্টিধরের মাথাটী ভামিনী দু'হাত দিয়া টানিয়া লয়—পাকা চুল ক'টী লোপাট না করিলে ওর আর স্বস্তি নাই।

শুধু আজ বলিয়া নয়—দু'টী বছর হইতে ভামিনীর এই চেষ্টা—এই কৃচ্ছ্রসাধনা।

দু'টী বছর আগে যে নারীটী তাহার স্থানে রাজত্ব করিয়াছে, ভামিনী তা'র সংবাদ রাখে না, সংসার তখন কেমন ছিল, স্বষ্টিধরের মনের গতি তখন কোন দিকে...মাথার চুলগুলিতে তা'র পাক ধরিয়াছে কি না... সে ইতিহাস ভামিনী ইচ্ছা করিয়াই রাখে নাই, জিজ্ঞাসা করিলে স্বষ্টিধর বলিত কি না কে জানে, কিন্তু ভামিনী তা' করে নাই, স্বষ্টিধরের শূন্যনীড়ে শুধু সে আসিয়াছে এই-টুকুই সে জানে, প্রথম আসিয়া সে শুভাকে দেখিয়াছে...শুভা তখন আরও ছোট...চোখের কোণে তার হাসি..., শুভা তা'কে ডাকিয়াছিল—'মা'......তারপর আর কিছু নয়,.........দুটী বছরের অবিরাম দিন রাত্রি-গুলি চলিয়া গেল,.. যৌবনের বনে তা'র ফুল ফুটিল,... তারপর একটী সন্তানের হইল সে মা...সবদিকেরই হইল পরিবর্ত্তন—হইল না কেবল এই স্বষ্টিধরের,...দুটী বছর পূর্ব্বে এই মানুষটীকে সে যে চোখে দেখিয়াছে...আজও দেখিতেছে ঠিক সেই চোখেই...

পাকা চুলগুলি একে একে নির্ম্মূল করিয়া ভামিনী বলিল 'সত্যি...আমাকে তোমার আর ভাল লাগে না... না গো?'

স্বষ্টিধর অবাক্, ভামিনীর আজ হইল কি? সংসারে আসিয়া কোনদিনই তো সে একথা শুধায় নাই...কিন্তু আজ?

স্বষ্টিধর বুঝিল...ভামিনীর সন্ধিৎসু দৃষ্টিটী আজ সব কিছুকেই আবিষ্কার করিতে চায়, এমন কি তা'র ছদ্ম-বেশটীকেও.........কিন্তু কেমন করিয়াই বা সে তার মনের অবস্থাটী খুলিয়া বলে।

সৃষ্টিধর হাসিল,— হাসিয়া বলিল…'তোমার কি তাই বিশ্বাস হয় ভামিনী ?'

ব্যস্ আর কিছু নয়,…ভামিনী এতেই সুখী,…অবিশ্বাস করার আর কি-ই বা আছে।

পরমুহূর্তে নিজের দেহশ্রীর দিকে চাহিয়া ভামিনী একমুখ হাসিয়া বলিল—'আজ বড় বাবুর বৌ কি বল্‌ছিল জান ?'

'কি ভামিনী ?'

বল্‌ছিল…'ভামি তোর রূপ যেন ফেটে পড়্‌ছে…'

সৃষ্টিধর হাসি-রোধ করিতে পারিল না…, ভামিনীরও হইল তাই। ভামিনীর সরল চাপল্যে সৃষ্টিধর হাসিল—আর ভামিনী হাসিল নিজের রূপের গৌরবে।

সৃষ্টিধর ভাবিতে লাগিল…ভামিনী কি ছেলেমানুষ, সংসারে সে ঢুকিয়াছে বটে…কিন্তু সংসারের দুঃখ-দৈন্য ওর অন্তরে এতটুকু দাগ কাটিতে পারে নাই ? পরক্ষণেই একটা নিবিড় দীর্ঘশ্বাস সৃষ্টিধরের বুকের পঞ্জর ভেদ করিয়া বাহিরের শূন্যতায় মিশিয়া গেল। ভামিনীর এই রূপ এই যৌবন, শোকমথিত অন্তরের মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়া ভামিনীকে কি সে সুখী করিতে পারিবে ! সৃষ্টিধর দেখিল সে ভুল করিয়াছে।

ভামিনী বলিল 'আজ কিন্তু তা' আনা চাই !'—

'কি ভামিনী ?'

'কেন রোজ রোজ কি ব'লে দিতে হ'বে না কি ?' —ভামিনী ভ্রূকুটি করিল !

সৃষ্টিধর বুঝিয়াছিল সব, তবু না বোঝার ভাণ করিয়া চক্ষু মুদিয়া রহিল !

ভামিনী অমনই তা'র কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, 'কলপ—কলপ—চুলের কলপ, মনে নেই ?'

সৃষ্টিধর হাসি চাপিতে পারিল না, বলিল, 'বুড়া বয়সে চুলে কলপ দিলে লোকে কি বল্‌বে ভামিনী ?'

'বলুক, লোকের বলার কি যায় আসে শুনি ?'—ভামিনীর স্বরে তীক্ষ্ণতা…কিন্তু এ তীক্ষ্ণতার আড়ালে যে আঘাত নাই, সৃষ্টিধর তা' ভাল করিয়াই জানে।

সৃষ্টিধর কি বলিতে যাইতেছিল ; ভামিনী বলিল—'যাও নাওয়ার সময় না হ'তে হাট থেকে ফিরে এস, হাটে আর কি-ই বা আনবে…হাঁ, মনে পড়েছে…'

'কি ভামিনী !'

'শুভার জন্যে রবারের চুড়ি নিয়ে এস, হাত দু'খানা ন্যাড়া আমি দেখতে পারি নে।'

'আচ্ছা…'—একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া সৃষ্টিধর চলিয়া গেল !

শুভার উপর ভামিনীর দরদ আছে। ভামিনী ভাবিতে পারে না,—এ মেয়ে তা'র নিজের নয়, অন্য কা'রর ! শুভাকে নিজের হাতে খাওয়ান—ওর চুল বাঁধিয়া দেওয়া, কাপড় পরান—কপালে টিপ আঁকা—এর প্রত্যেকটা কাজই ভামিনী নিজের হাতে করে, কোনদিন একটু ব্যতিক্রম হইলেই ভামিনীর প্রাণে লাগে !

সেদিন বড়বাবুর বউ আসিয়া বলিল—'ভামি তোর নিজের মেয়েটার তো একটু যত্ন করিস্ নে…'

ভামিনীর চোখ দুটি বড় হইয়া উঠিল, বলিল—'কেন শুভা কি আমার পর না কি…'

বড়বাবুর বউ এর কোন উত্তর করিল না,—ভামিনীর নিরেট মূর্খতায় হয় তো মনে মনে একটু হাসিল !

শুভা আবদারের স্বরে বলিল, 'মা তুমি যেমন যত্ন কর, আমার আপন মাও অতটা কর্‌ত না ক।'

ভামিনী মুখ তুলিয়া চায়, শুভা কি তবে তা'র আপন নয় ? এই আপন না হওয়ার চিন্তাটা ভামিনী অন্তরের সঙ্গে বরদাস্ত করিতে পারে না ; এই পৃথিবীর আলো-হাসি রূপ, রস—এ যেমন এর নিজের সম্পদ, ভামিনী ভাবে শুভাও ঠিক তা'র ততখানিই আপনার।

শুভার কথায় ভামিনী চঞ্চল হইয়া ওঠে—বলে—'হ্যাঁরে…, তোর মাতে আর আমাতে কি কিছু তফাৎ দেখিস্ ?'

শুভা লজ্জিত হইয়া বলে,—'একটুও নয় মা, বরং তুমিই যেন আমার বেশী ভাল…'

ভামিনীর রক্তিম মুখখানি এক অভিনব দীপ্তিতে জল্ জল্ করিয়া উঠে—শুভা সে মুখের দিকে শুধু ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া চায়……

তবু সৃষ্টিধরের কাছেও ভামিনী এ প্রশ্নটা আর একবার না পাড়িয়া থাকিতে পারিল না ; জিজ্ঞাসা করিল,—'শুভার মা আমার চেয়ে শুভাকে কি বেশী ভালবাস্‌ত গা ?'

সৃষ্টিধর অবাক্ তবু এ আকস্মিক প্রশ্নের উদ্দেশ্যটা যে কি, এবং এরূপ প্রশ্নের ভামিনী কিরূপ জবাবই বা চায়—সৃষ্টিধর তা' জানে, তাই হাসিয়া বলিল—'তাই কি আর বাস্ত ভামিনী ?'

সব চুকিয়া যায়...ভামিনী আর কিছু শুনিতে চায় না, নিজের মতটা অক্ষুন্ন রহিলেই তার হইল...ঐটুকুতেই ও সুখী। ভামিনীকে যদি সৃষ্টিধর বলিত—'শুভাকে কি শুভার মার চেয়ে কেউ বেশী ভালবাসতে পারে ভামিনী ?' তাহা হইলেই ভামিনী কি করিত জানি না, কিন্তু সৃষ্টিধরের মুখ দিয়া তা' বাহির হয় না, বাহির হয় না এইজন্য সংসারটা দেখিতেছিল সে বৈরাগ্যের দৃষ্টিতে, গৃহীর দিন তো তা'র শেষ হইয়াছিল !

তবু ভামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া সৃষ্টিধরের আজ অনেক কথাই মনে হয়......মনে হয় এমনই একখানি মুখের কথা...যে মুখখানিকে ঘেরিয়া জীবনের বসন্ত তা'র একদিন রূপে রসে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল,··· চোখে আকাশ ছিল সেদিন ছন্দময়...পৃথিবী ছিল স্বপ্নময়ী,···কিন্তু কোথায় গেল সে-সব আজ..., আজিকার যাত্রাপথে সে মুখখানি যে একটীবারও ধরা দেয় না···শুধু আড়াল হইতেই সরিয়া দাঁড়ায়···অদৃশ্য মুক্তির পানপাত্রটী আকণ্ঠ পান করিবার জন্য সৃষ্টিধরের তৃষিত অন্তর আজ আকুল হইয়া উঠে, কিন্তু কবে আর সন্ধান মিলিবে? কতদূরে কোথায় গো ? সহসা ভামিনীর কথা মনে পড়ায় সৃষ্টিধরের আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠে···তা'র মুক্তির দিনে ক্ষুদ্র নীড়ের একান্তে কাহার প্রতীক্ষায় ভামিনী বসিয়া থাকিবে···কিসের আশায় ? সৃষ্টিধর আর ভাবিতে পারে না, অতিকষ্টে একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া যায়।

দিন যায়,···

এই নিভৃত নীড়ের কোণটুকুতেই ভামিনীর যৌবনের দিনগুলি কাটিতে থাকে, কাজ না থাকিলে ভামিনী জানালার পাশে আসিয়া বসে, দেখে ক্ষুদ্র ষ্টেশনটী কখনও মুখর কখনও বা স্তব্ধ কখনও এর বুকে বাস্তবের রুদ্ররূপ...কখনও প্রকৃতির অটল গাম্ভীর্য্য—ঠিক যেন ছায়াবাজী !

ভামিনী একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, আর কল্পনার মালা গাঁথে !

ভামিনী বলে— 'বর দেখেছ গা বর···, ইষ্টিশানে এই গাড়ীতে বর-কণে নাম্‌ল,···ফুটফুটে বর. ছোট্ট বৌটী· দেখেছ ?'

কত বর, কত বধূ যায় আসে, কেই বা তা'র খবর রাখে ? সৃষ্টিধর উত্তর দেয়—'না...কেন ?'

'দেখ নি ?···এই যে এখুনি নাম্‌ল···শুভাও যে দেখেছে···'

সৃষ্টিধর না হাসিয়া থাকিতে পারে না, ভামিনী যা' বলে তা' ঠিক সংসার-অনভিজ্ঞ অনূঢ়ার মুখেই শোভা পায়।

ভামিনীর মুখখানা ক্রোধে লাল হইয়া উঠে, বলে— 'বেশ···বিশ্বাস হ'ল না তো ?'

'হ'য়েছে ভামিনী...এই তো···এই ট্রেণেই নাম্‌ল...? দেখি নি···বাঃ···রে···'

না দেখিলেও সৃষ্টিধরকে এই কথাই বলিতে হয়, নইলেই যে মুস্কিল।

ভামিনী আশ্বস্ত হয়...

তবু ঐ বর-বধূর কল্পনাই ভামিনীর প্রাণে নূতন একটা আশার আলোক দিয়া যায়,—ভামিনী বার বার করিয়া শুভার কথাই ভাবে !

সেদিন সৃষ্টিধর বাসায় ফিরিতেই ভামিনী সরাসরি বলিয়া ফেলিল—'শুভার একটা বর খুঁজে দাও না গো শুভা যে বড় হ'ল···'

'বড় হ'ল, শুভাকে তা'হলে কি পর ক'রে ফেল্‌তে চাও ভামিনী ?'—মুখ ফিরিয়া সৃষ্টিধর প্রশ্ন করিল !

পর...?···কথাটা শুনিয়া ভামিনী একেবারে আকাশ হইতে পড়ে। বর-বধূর যে সম্মোহন ছবিটী ওর চোখের উপর দুলিতেছিল, নিমেষে তা' অদৃশ্য হইয়া গেল...ভামিনী কথাটী পর্য্যন্ত বলিতে পারে না।

সৃষ্টিধর ব্যাপারটা বুঝিল,—হাসিয়া বলিল,—'শুভা যে এখনও ছেলেমানুষ ভামিনী, আর একটু বড় না হ'লে তো আর .'

ভামিনী নির্ব্বাক্, পাথরের মত অটল মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল সেদিনকার সেই দৃশ্যটা—সেই বর-বধূ...

বয়সটাও ঠিক শুভার মতই ছোট।...ভামিনী খানিকক্ষণ ...াল্ ক্যাল্ করিয়া চাহিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল!

স্বষ্টিধর ফের ডাকিল—'ভামিনী...।'

'কি বল্‌ছ...' ভামিনী আসিয়া স্থির মূর্ত্তিতে দাঁড়াইল .. স্বষ্টিধর বলিল, তুমি রাগ ক'র না ভামিনী...শুভা আর একটু বড় হ'ক . বুঝেছ?'

'হ'ক' ভামিনী প্রস্থানের উপক্রম করে—স্বষ্টিধরের চোখে ভামিনীর মুখের করুণ ভাবটা ধরা পড়িতে বাধে না। একটা স্তব্ধ বেদনা তার সারা মুখখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলে।

স্বষ্টিধর অন্যমনস্কের মত কি ভাবিতে থাকে।

দাওয়ার একপ্রান্তে ভামিনীর ছোট মেয়েটা নিঃশব্দে শুইয়া আছে। ছিন্নমলিন শয্যার নিবিড় দৈন্যকে দূর করিয়া তার রূপের আলোটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে; স্বষ্টিধরের মনে হয়, এই স্যাঁতসেঁতে আলোবাতাসহীন ঘরে প্রতিদিনই তো এই মেয়েটাকে পড়িয়া থাকিতে দেখে...ওর করুণ চোখ দুটির দিকে চাহিয়া ভামিনীর স্নেহবুভুক্ষু প্রাণ একটীবারও তো কই বিষণ্ণ হইয়া উঠে না? ভামিনীর সমস্ত অন্তর কিছুদিন হইতে মাতৃহীনা শুভারই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, শুভার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুভারই উপর ওর চক্ষুদুটী সতত যত্নশীল হইয়া উঠিতেছে, .. সুমুখে নিজের যে একটা দারিদ্র্যপূর্ণ সংসার এটুকুও একরকম ভুলিতেই বসিয়াছে! ভামিনীর এই আত্মবিস্মৃত ভাব দেখিয়া স্বষ্টিধর বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া ওঠে!

স্বষ্টিধর ডাকিল—'ভামিনী...সারাদিন এখানে যে এটা এম্‌নি ক'রে গড়ায়,...এ কি ভাল...?'

ভামিনী উত্তর দিল—'আমার ভাল আমি দেখ্‌ব..., তোমার দেখে লাভ কি শুনি?'

ভামিনী যে এ উত্তর দিবে স্বষ্টিধর তা' জানিত...তাই কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোর করিয়াই একটু হাসিল; কিন্তু ভামিনী এ হাসির আর প্রতিবাদ করিল না।

স্বষ্টিধর দেখিল ভামিনীর জীবনে পরিবর্ত্তন আসিতে সুরু করিয়াছে। নবমুকুলিত যৌবনের প্রখর চপলতা তা'র কবিকে ...লাবণ্যদৃপ্ত মুখখানিতে এবার যেটুকু ঘনাইয়া আসিতেছে, সেটুকু জ্বর উত্তাপ নয়,...মাতৃত্বেরই মমতা-স্নেহের কান্তি।

ভামিনীর নিবিড় মমতার গণ্ডীর ভিতর আসিয়াও স্বষ্টিধর নিজের মনকে স্থির করিতে পারিল না, অতীতের স্মৃতির দাহটা প্রতি নিঃশ্বাসে সে অনুভব করে। সংসার বলিয়া যে কিছু একটা আছে...এর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রতিনিয়তই যে মানুষকে মাটির দিকে আকর্ষণ করিতে পারে, এটুকুও সে ভাবিতে পারে না, একটা করুণ সুর আসিয়া তা'র সমস্ত প্রাণকে অতীতের মোহে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, স্বষ্টিধর অতীতের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে!

বড়বাবু সেদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিলেন, 'কই বিয়ে ক'রেও তো আপনার মনের অবস্থা ফির্‌ল না...স্বষ্টিধর-বাবু, দিন দিনই যে একটু কেমনতর হ'য়ে উঠ্‌ছেন!'

কথা শুনিয়া স্বষ্টিধর একটু হাসিল, সে হাসি স্বাভাবিক নয়—কৃত্রিম।

'অথচ শুন্‌তে পাই,...গিন্নীর মন না কি...খুবই উঁচু... তবুও সে কেন...' স্বষ্টিধর আবার হাসিল,—বলিল, 'আমিও তো...সেইটাই ভাবি বড়বাবু...'

বড়বাবু উপদেশ দিলেন, 'সংসারটা... তো আর ভাব্‌বার জায়গা নয় স্বষ্টিধর বাবু..., কাজ কর্‌বার জায়গা—'

স্বষ্টিধর এ কথার উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল,— মনে মনে বলিল, হাঁ—কাজের জায়গাই সত্যি—মুক্তির জায়গা নয়—

বড়বাবুর ঘরের ভিতর টেলিফোনের যন্ত্রটা কিড়িং কিড়িং শব্দে বাজিয়া ওঠে,...বড়বাবু উঠিয়া দাঁড়ান, যাবার আগে একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন—'মনের অবস্থা এবার সার্‌বে স্বষ্টিধরবাবু..., ঈশ্বর-ইচ্ছায় একটা পুত্রমুখ দেখুন।'

সত্যি ভামিনীর আর একটা মাতৃত্বের দিনও আসন্নপ্রায় ...ভিতরের ব্যাপারটা নিজের গৃহিণীর মুখ হইতে বড়-বাবু আজ কয়েকদিন পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

বড়বাবু চলিয়া গেলে স্বষ্টিধর টিকিট-ঘরের টুলের উপরেই বসিয়া রহিল!...পুত্র-মুখ? কা'র পুত্র—ভামিনীর...

তাঁত

মুক্তির দ্বারে আসিয়া আবার সে ডুবিবে মোহের আবর্ত্তে! সৃষ্টিধর একবার শিহরিয়া উঠিল!

জলখাবারের থালা লইয়া ভামিনী আসিয়া বলিল, 'শুভার যে আজ জ্বর…'

জ্বর…কিন্তু তোমার কি শুনি?'

আঘাতটা যে নির্ম্মম,…সৃষ্টিধর তা' জানে!

থালা রাখিয়া ভামিনী প্রস্থান করিল না, দাঁড়াইয়া রহিল! সৃষ্টিধর অপাঙ্গে একবার ভামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া খাইতে বসিল, কিন্তু চিন্তার দ্বন্দ্ব তা'র থামিল না! সৃষ্টিধর ভাবিতে লাগিল…ভামিনীর কথা, ভামিনী কই আর তেমন করিয়া হাসে না, তেমনি করিয়া কাছে আসিয়া পাকা চুলের উপর বিদ্রোহী হয় না…, সৃষ্টিধর আশ্চর্য্য হইল!

ডাকিল—'ভামিনী!'

'কেন?'

'আমার কথায় রাগ করেছ?'

সৃষ্টিধরের মুখে নূতন কথা…ভামিনীরও বিস্ময় জাগিল! বলিল,—'রাগ? তোমার কি তাই মনে হয়?'

'না ভামিনী না,…সত্যি শুভার অসুখ কি বেশী?'

'বেশী নয়… আজই হঠাৎ অসুখ ক'রেছে…'

'ওঃ সেরে যাবে…'—তারপর একটু থামিয়াই বলিল—

'শুভার বিয়ের কথা বলেছ ভামিনী…এই ক'টা মাস সবুর কর, তারপর…' ভামিনী কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বর-বধূর সম্মোহন ছবিটী আর একবার তার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল কি না… কে জানে?

সৃষ্টিধর খাইতে লাগিল…

আসন্নপ্রসবা ভামিনীর মুখখানির দিকে চাহিয়া সৃষ্টিধরের জীবনটী বেশ একটু মুখর হইয়া উঠিয়াছে, দুটী বৎসর পূর্ব্বে যে নারীটী তার সংসার হইতে বিদায় লইয়াছিল আজ বুঝি তার আকস্মিক আবির্ভাব হইল!…তা'র কল্যাণ-হস্তের পরশ পাইয়া সংসারটী আজ সজীব—প্রাণবান্!

ভামিনীর বেশভূষার দিকে তেম. আর লক্ষ্য নাই—পরণের শাড়ীখানি ময়লা,—গায়ের ব্লাউজটাও তদ্রূপ, মাথার অলকগুচ্ছ স্থানে স্থানে উচ্ছৃঙ্খল,—ভামিনী এখন রীতিমত গৃহিণী।

সৃষ্টিধর সেদিন একটু রসিকতা করিয়া ফেলিল,—'জামাই আসবে ব'লে কি এখন থেকেই সুসার করছ ভামিনী—'

ভামিনী শুভার চুল বাঁধিতেছিল,—বলিল 'সুসার কিসে দেখলে তুমি—'

সৃষ্টিধর হাসিয়া বলিল,—'কেন, নিজের বেশভূষার খরচটা পর্য্যন্ত বেমালুম ছেঁটে ফেলেছ দেখছি—'

ভামিনী অপ্রস্তুত হইল,—ভাবটুকু তাড়াতাড়ি গোপন করিয়া লইয়া বলিল,—'ও, এই কথা, বলি বুড়ো বয়সেও কি আবার বেশভূষা নিয়ে রঙ্গ করব—হাঁ গো—'

'সেই তো, বুড়ো বয়সে আমিও কেমন তোমার কলপের সঙ্গে আড়ি দিয়েছি—তাই না ভামিনী—?' সৃ[illegible] ওষ্ঠ-প্রান্তে এক ঝিলিক হাসি—

ভামিনীও আর হাসি রাখিতে পারি[illegible],—হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে মুখে লজ্জার একটী স্নিগ্ধ রেখা ফুটিয়া উঠিল। ভামিনী ভাবিল—কি ছেলেমানুষীই না একদিন করিয়াছে সে—

কয়েকটী দিনের পর—

টিকিট-ঘরের স্বচ্ছ চিম্‌নীর আলোয় সৃষ্টিধর সেদিন 'লেজার ফোলিও' লইয়া ব্যস্ত, দৌড়িতে দৌড়িতে শুভা আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল!

সৃষ্টিধর মুখ তুলিয়া চাহিল—'কি হ'ল রে'

'মা'র খুব কষ্ট হ'চ্ছে বাবা, এস না একবার—'

সৃষ্টিধরের ব্যাপারটী বুঝিতে দেরী হইল না,—প্রসবোন্মুখী ভামিনীর স্নেহাতুর একখানি মুখ তার পড়িয়া গেল—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল ব[illegible] সেই কথাটাও!

সৃষ্টিধর উঠিয়া দাঁড়াইল।

দরজা ঠেলিয়া শুভার সহিত সৃষ্টিধর ধীরে ধীরে ঢুকিল। সমস্ত বাড়ীটা নিবিড় স্তব্ধতায় কে'ন খাঁ খাঁ

করিতেছে—যেন পা বাড়াইতেও ভয় হয়। ভামিনী যে ঘরে থাকিত,—সেই ঘরের নিকটে আসিয়া সৃষ্টিধর স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ধাই বলিতেছে 'এ বারটা খোকা হ'ল মা—'

সৃষ্টিধরের বুকখানি আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সৃষ্টিধর আর বাহিরে দাঁড়াইতে পারিল না, আনন্দাতিশয্যে ভামিনীর ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখিল—সুমুখেই ধাই, সদ্যোজাত একটা শিশু মেঝের পড়িয়া চীৎকার করিতেছে—পাশে অজস্র রক্তস্রাব, সেই রক্তের উপর নিঃসাড় হইয়া পড়িয়া আছে ভামিনী, ভামিনীর সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

চোখে মুখে জল দিতে দিতে ধাই বলিল,—'বাবু মা বুঝি হ'য়ে গেল—'

রক্তপিণ্ডটার দিকে ভামিনীর দুটা চক্ষু সত্যই তখন স্থির, তা'র গালের পাশ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িয়াছে,—পাণ্ডুর মুখখানিতে মাতৃত্বের একটা মমতাময়ী কান্তি,—সেটুকুও বুঝি ধীরে ধীরে মুছিয়া যায়—

সৃষ্টিধর কোন কথা কহিল না—চোখের পলকটা পর্য্যন্ত পড়িল না তা'র,—শুধু স্থির দৃষ্টিতে কি দেখিতে লাগিল—

ভামিনী সত্য-সত্যই চলিয়া গেল। শুভার ভবিষ্যৎ লইয়া যে সম্মোহন ছবিটা সে একদিন মনের পটে আঁকিয়াছিল—তারও আর চিহ্ন রহিল না।

মা-হারা একরত্তি ছেলেটা রাত্রিদিন এখন শুভার কোলে-কোলেই ফেরে; সৃষ্টিধর একদৃষ্টে এটার দিকে চায়, আর ভাবে,—ভাবে এই বুঝি তা'র পুত্র-দর্শন!

—কিন্তু জীবন দিয়া যে নারীটা আজ এই সম্পদটা রাখিয়া গেল, সে কি সত্যই তাহাকে মুক্তি দিল?

'রায়বেশে' নাচ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

[এই নাচ বাঙ্গলার প্রাচীন রণনৃত্য, এমন বীরত্বব্যঞ্জক নৃত্য সমস্ত সভ্যজগতে বিরল। বীরভূমের কালেক্টর প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মিঃ গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস এই নৃত্যের প্রচলনের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় এই নৃত্য ও ব্যায়াম সর্ব্বত্র আদৃত হইতেছে। এই নৃত্য বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পদ ও গৌরব। সর্ব্বত্র এই নৃত্যের প্রকাশ হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।]

১

পল্লীবালক পল্লীযুবা 'রায়বেশে' নাচ্ নাচ্‌রে তোরা,
চন্দ্র তোদের জ্বলছে ভালে কে বলে ও কপাল পোড়া।
মরাল-নাচন, ময়ূর-নাচন, সাগর-নাচন দেখতে না চাই,
আনন্দ দেয়, বুককে নাচায় বীরত্বময় তোদের নাচাই।
ভুবন ঘুরে মিলবে নাক মিলবে নাক ইহার জোড়া,
পল্লীবালক পল্লীযুবা 'রায়বেশে' নাচ্ নাচ্‌রে তোরা।

২

নাচ্‌রে তোরা নাচ্‌রে তোরা রাঢ়ের মাটী আবার নাচা,
নীরস জীবন তোদের নাচে হ'ক্‌রে সরস হ'ক্‌রে তাজা।
বঙ্গ চতুরঙ্গ সেনা, এই নাচেতেই নেচে ছিল,
নৃত্যমাঝে নিত্য রাজে দূর সুদূরের সে হিল্লোলও।
তবে তরুণ তেমনি করে তোদের বিশাল বক্ষ ঘোরা
পল্লীবালক পল্লীযুবা 'রায়বেশে' নাচ নাচ্‌রে তোরা।

৩

গঙ্গা নাচা, অজয় নাচা, আবার ময়ূরাক্ষী নাচা,
অতীত রণ-নৃত্য দেশের নূতন করে নিত্য বাঁচা।
কাজ কি মোদের 'প্যাভলোভা'রে, কাজ কি উদয়শঙ্করেতে,
তোদের নাচে সুন্দর শিব জাগবে দেশের কঙ্করেতে।
অশ্বমেধের যজ্ঞতুরগ তোদের দেখে তৃপ্ত মোরা,
পল্লীবালক পল্লীযুবা 'রায়বেশে' নাচ নাচ্‌রে তোরা।

শ্রমজীবীশিক্ষা-পরিষৎ

ব্রজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু তিনটী,—স্বাস্থ্য, অর্থ ও শিক্ষা। এ তিনটীর অভাবে মানুষের জীবন একেবারেই অচল হইয়া পড়ে; যে ব্যক্তির এই তিনটী অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব, সে ব্যক্তি সংসারক্ষেত্রে নিতান্ত অকেজো আগাছার মত বিরাজ করে। পরন্তু এই তিনটী বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই তিনটী মানুষের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, ইহার যে কোন একটা বা দুইটীকে অবলম্বন করিয়া মানুষ তাহার জীবন-যাত্রার পথ সরল ও সুগম করিয়া তুলিতে পারে না।

কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলি। এ জগতে মানুষের আসা শুধু মরণ উপলক্ষ্য করিয়া নয়, কিছুকাল মর্ত্ত্যলোকে বাঁচিয়া থাকার উপলক্ষ্যেও বটে। মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবেও। কিন্তু বিনা আহারে বাঁচা-কার্য্যটা কোনমতেই সম্পন্ন হয় না। তারপর পরা জিনিসটা—মানুষের আদিম সভ্যতার যুগে হয় তো ছিল না—না থাকারই কথা—কিন্তু সভ্যতার প্রসার ও উন্নতির ফলে এখন খাওয়ারই মত একটা প্রধান উপকরণে পরিণত; তাই পরা জিনিসটা মানুষ এ যুগে ইচ্ছা করিলেও ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং খাওয়া ও পরা মানুষের বাঁচিয়া থাকার দুইটী প্রধান উপকরণ। এই দুই উপকরণের সংস্থান অর্থ ছাড়া হয় না। এস্থলে অর্থ

কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, যাহা খাওয়া-পরা অর্জ্জনের একটা উপায় অর্থাৎ যে বস্তুটার বিনিময়ে খাওয়া-পরার সংগ্রহ ও সংস্থান সম্ভবপর হয়। সুতরাং মানুষের পক্ষে তাহার দেহটাকে খাটাইবার প্রয়োজন এবং দেহটাকে রীতিমত খাটাইতে না পারিলে কোন কিছু অর্জ্জন অসম্ভব। শরীরের সুস্থ অবস্থানের নাম স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য না থাকিলে শরীর কর্ম্মক্ষম হইতে স্বীকার করে না। অতএব খাওয়া ও স্বাস্থ্য—এই দুইটী মানুষের শুধু মানুষের কেন, সচেতন জীবমাত্রেরই বাঁচিয়া থাকার অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ; মানুষের ক্ষেত্রে পরাটা বোঝার উপর শাকের আঁটির মত জুটিয়া গিয়াছে। শিক্ষাকে অবশ্য বাঁচিয়া থাকার মূল-উপাদান হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে পাই না; কিন্তু শিক্ষা না থাকিলে এই খাওয়া, পরা ও স্বাস্থ্যের সুসমন্বয় করিয়া জীবনযাত্রার পথ সরল ও সুগম করা তো হয়ই না, বাঁচারও কোন সার্থকতা থাকে না। মানুষের যথার্থরূপে বাঁচায় শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন এবং সেই হিসাবে শিক্ষাও একটী মূল-উপকরণ।

পৃথিবীতে সমগ্র জীবের বাঁচার একটী সূত্র আছে, সে সূত্রটী হইতেছে সংগ্রাম—জীবনের জন্য, টিকিয়া থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম। মানুষ এই সংগ্রাম করিয়া বাঁচিতেছে এবং ভবিষ্যতেও বাঁচিবে। সুতরাং মানুষকে বাঁচিতে হইবে, বাঁচিবার জন্য খাওয়া-পরা সংস্থানের প্রয়াস পাইতে হইবে এবং সেই জন্য নিরন্তর একটানা সংগ্রাম চালাইতে হইবে।

মানুষের মধ্যে শক্তি-সামর্থ্যের পরম্পরা হিসাবে বিবিধ স্তরের সৃষ্টি ঠিক কি করিয়া এবং কোন যুগ হইতে সুরু হইয়াছিল জানি না; যাঁহারা মানবসমাজের নানাদিকের ইতিহাস লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারাই জানেন এবং জানাইতে পারেন। আমাদের সাধারণ সহজ-বুদ্ধিতে এই ধারণা হয় যে, মানুষের বাঁচিয়া থাকার জন্য যে নিরন্তর চিরন্তনী সংগ্রাম, সেই সংগ্রামই অনেকাংশে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টির জন্য দায়ী। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সংগ্রামে দুর্ব্বল ও সবলের সৃষ্টি করে। পারিপার্শ্বিক নানা অবস্থা হইতে যে-মানুষ যে-কারণে এবং যেমন করিয়াই হোক শক্তি ও সামর্থ্য-সঞ্চয়ের সুযোগ ও সুবিধা পায়, সে-মানুষ সবল হইয়া উঠে, মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়; আর যে-মানুষ দুর্ভাগ্যবশতঃ পারে না, সে হয় অক্ষম, সে হয় দুর্ব্বল, তাই বাধ্য হইয়া মাথা নীচু করিয়া সবলের সান্নিধ্য হইতে সরিয়া যায়। সবল হইতেছে ধনী, শক্তিমান, বুদ্ধিমান এবং সেই জন্য তাহার আভিজাত্যের এত গৌরব, বংশ-মর্য্যাদার এত দাবী; দুর্ব্বল হইতেছে নির্ব্বোধ, তাহার ধনের অভাব, তাহার শক্তির অভাব এবং সেইজন্যই তাহার আভিজাত্য-গৌরবের প্রতি এত লোভ, বংশ-মর্য্যাদা গঠনে এত প্রয়াস।

ধর্ম্মগত, বংশগত এবং ধনগত অনৈক্যের হেতু এবং এই অনৈক্যের বিভিন্ন সমবায়ে সমগ্র মানবসমাজে বহুতর সম্প্রদায়, বহুতর স্তর হইয়া গিয়াছে এবং যতকাল এই অনৈক্য থাকিবে, ততকাল বোধ করি সম্প্রদায়ের ও স্তরের কোনও অভাব ঘটিবে না। সমগ্র মানুষের সমাজ যত সম্প্রদায়েই, যত স্তরেই বিভক্ত হোক না কেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে ও স্তরের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই বাঁচার একটা অধিকার আছে; তাহারা বাঁচার জন্য অতি ন্যায়-সঙ্গত দাবী করিতে পারে। তাহাদের বাঁচা শুধু কোন-ক্রমে দু'টী খাইয়া সামান্য পরিয়া সংসারে দু'দণ্ডকাল টিকিয়া থাকার নিমিত্ত বাঁচা নয়, বাঁচার মত করিয়া, বাঁচার—জীবন-টাকে সার্থক করিয়া তুলিবার নিমিত্ত বাঁচার অতি-প্রাকৃত, সঙ্গত, ন্যায্য অধিকার ও দাবী। মানুষ জীবন-যাপন ব্যাপারে হোক না অতি তুচ্ছ, অতি হীন, হোক না তাহার লীলা-খেলার স্বল্প পরিসর, বড় বড় শক্তির শক্ত বাঁধনের পর শক্ত বাঁধন, তথাপি তাহার মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিবার, জীবনের মধ্যে জীবনের সন্ধান পাওয়ার উদ্যমকে ব্যর্থ করিবার, মানবজন্মের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ বিফল করিবার তিলমাত্র অধিকার কাহারও নাই।

খর্ব্ব করা, ব্যর্থ করা, বিফল করার অধিকার নাই,—ইহা অতি বড় অন্যায়, নীতি বিগর্হিত এবং সৃষ্টির শক্তি ও বুদ্ধির পরম অপব্যবহার। এসব কথা আমরা জানি, নিত্যই শুনি এবং জোর গলায় অন্য দশজনকে শুনাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা এই নীতির, এই আদর্শের দোহাই মানিয়া চলি না, এ সত্যের লেশমাত্র অনুসরণ করি না, বরঞ্চ প্রতিপদক্ষেপে ইহারই বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কঠিন

প্রতিবাদ করি। একথা স্বীকার্য্য যে সংস্কারকে মানুষ বড় সহজে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে না এবং সংস্কার মানুষের শুভবুদ্ধিকে এমনই করিয়াই আচ্ছন্ন করিয়া থাকে যে, আমরা সত্য জানিয়া শুনিয়াও সত্য আচরণে কুণ্ঠা বোধ করি।

এই সংস্কার এমনই বদ্ধমূল হইয়া যাওয়ার প্রধান হেতু এই যে, মানুষের মধ্যে বড় ও ছোট'র বিকট-বৈষম্যের ভিত্তি খুবই পাকাভাবে গাঁথা হইয়া গিয়াছে। বড় ও ছোট'র ভেদাভেদ সম্পূর্ণ ধুইয়া মুছিয়া নিরবিচ্ছিন্ন সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিলেই যে বৈষম্যের চিহ্ন জগত হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে—তাহা বলার মত দুরদর্শিতা নাই এবং সর্ব্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ সাম্যের প্রতিষ্ঠার যুক্তিযুক্ততা ও সম্ভাব্য এক্ষেত্রে বিচার্য্যও নহে। জগতের ইতিহাসে অতীতকালে বৈষম্য যে আকারেই হোক ছিল এবং বর্ত্তমানে প্রকটভাবে আছে; সুতরাং অতীত ও বর্ত্তমান বিচার করিয়া ভবিষ্যতে যে আকারেই হোক বৈষম্য থাকা স্বাভাবিক এ অনুমান সমীচীন।

জগতে যাহারা ভাগ্য বিপর্য্যয়ে ছোট হইয়া গিয়াছে, বড়রা যাহাদের ছোট মনে করিয়া নিজেদের উচ্চাসন হইতে দূরে সরাইয়া রাখে এবং যাহারা নিজেদের অতি ছোট মনে করিয়া সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্ববিষয়ে, সর্ব্বকার্য্যে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া থাকে খুব সাধারণভাবে তাহাদের শ্রমজীবী বলা যায়। সমস্ত ছোটদের জন্য শ্রমজীবী শব্দটা ব্যবহারে অর্থটা অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া পড়ে সন্দেহ নাই এবং ছোট-মাত্রেরাই যে শ্রমজীবী—ইহাও সত্য নয়। কলকারখানা, খনি প্রভৃতি বৃহৎ যান্ত্রিক শিল্প-ব্যবসাদিতে নিযুক্ত থাকিয়া কঠিন কায়িকশ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জ্জন করে ও তৎসঙ্গে দেশের ধনসম্পদ সমৃদ্ধ করে, অথচ নিজেদের কানাকড়ি মূলধন হিসাবে থাকে না, তাহারাই যথার্থ (এবং প্রত্যক্ষভাবে) শ্রমজীবী। বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ দেহখানাই তাহাদের মূলধন, তাহারই জোরে দেহটাকে সময়-স্রোতে কিছুকাল কোনক্রমে ভাসাইয়া রাখার উপযুক্ত অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে, ইহার চেয়ে বেশী সম্পদ তাহাদের অদৃষ্টে বড়-একটা জোটে না এবং সে সু-অদৃষ্ট লইয়াও তাহারা জন্মগ্রহণ করে না। এই শ্রেণীর শ্রমজীবী ছাড়া জগতে আরও ছোট আছে এবং কঠিন কায়িকশ্রম তাহাদের উপজীব্য। খাটার সম্বন্ধে তাহাদের কাহারও পূর্ণ কাহারও বা সাময়িক স্বাধীনতা আছে—খাটা না-খাটা তাহাদের ইচ্ছা-সাপেক্ষ—জোর চলে না, তবুও পেটের দারুণ জ্বালা চাবুক মারিয়া সামর্থ্যের অতিরিক্ত খাটাইয়া লয়। চাষ-বাস, মৎস্য-ব্যবসা, পশুপালন, কুটির-শিল্প প্রভৃতি বহু ছোট খাট ব্যবসা আছে, সে-সব ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তিদের ন্যূনাধিক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, তত্রাচ তাহাদের সারাজীবনে বিশ্রামের বিশেষ অবসর বড় একটা জোটে না এবং পর্য্যাপ্ত অন্নবস্ত্রের সংস্থানও করিয়া উঠিতে পারে না। তাহা ছাড়া আরও একটী ছোট সম্প্রদায় আছে, যাহাদের দাসবৃত্তি অবলম্বনে ব্যক্তিগত দাসত্বের জন্য জাতীয় ধনোৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে না। প্রত্যক্ষ ধনোৎপাদনের তরফ হইতে বিচার করিলে হয় তো ইহাদের কেহই খাঁটি শ্রমজীবী নহে, বরঞ্চ ইহাদের কাহারও কাহারও সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী ধনিকে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে এবং কার্য্যক্ষেত্রে দু'চারজন যে হয় নাই, এমনও নহে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও শ্রমজীবী শব্দটার সরল অর্থে ইহারা ও খাঁটি শ্রমিক উভয়েই শ্রমজীবী বলিয়া অভিহিত হইলে নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। এই প্রসঙ্গে বলা ভাল যে জীবিকার্থে ধনিক-আশ্রয়ী বুদ্ধিজীবিরাও শ্রমজীবী, তাঁহারাও অপ্রত্যক্ষভাবে ধনোৎপাদনে সহায়তা করেন।

বাংলাদেশে খাঁটি শ্রমজীবীর সংখ্যা খুব কম এবং যাহা আছে তাহার অধিকাংশই অ-বাঙ্গালী। বাংলা কৃষি-প্রধান দেশ; কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী প্রভৃতির সংখ্যা অত্যধিক; সংখ্যায় বাংলার শতকরা ৮০ জন এই জাতীয় শ্রম-জীবী। য়ুরোপ ও য়ুরোপীয়ভাবে সুসভ্য দেশে ইহার উল্টা ব্যাপার, সেখানে মজুরের সংখ্যাই বেশী। য়ুরোপ খাঁটি শ্রমজীবী-সমস্যায় নিষ্পীড়িত, ভারত অ-খাঁটি শ্রমজীবী সমস্যায় নিষ্পীড়িত।

সমস্যাটা আর কিছু নয়—বাঁচিয়া থাকার সমস্যা অর্থাৎ শ্রমজীবীরা বাঁচিয়া থাকিবে কিংবা সমূলে বিনষ্ট হইবে—ইহাই সমস্যা। শ্রমজীবীদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হোক এবং তাহার ফলে হাহাকার ধ্বনির নিবৃত্তি ঘটুক—ইহা কেহই চাহেন না, বিশেষতঃ ধনিকেরা কদাচ অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, তোমাদের শ্রমের পরিবর্ত্তে

আমরা যাহা দান করি, তাহা তোমাদের খাওয়া-পরার পক্ষে যথেষ্ট; বরঞ্চ অতিরিক্ত। সুতরাং নিয়ত কান্নাকাটির এই উপদ্রব নিতান্ত অহৈতুকী ও অনর্থক। অ-খাটি শ্রমজীবী-সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য, তোমরা তো স্বাধীন, কম বেশী খাটা ও অর্জ্জন করা তো তোমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ। তোমাদের অর্থবান হওয়াতে তো কেহ বাধা দিতেছে না, বরঞ্চ প্রত্যেক পরইষ্টকামীমাত্রেই সেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা রাষ্ট্র, তোমার জমিদার, তোমার মহাজন, তোমার রক্ষক, অতএব আমাদের হিসাব-নিকাশ কড়ার-গণ্ডার চুকাইয়া দেওয়া তোমাদের কর্ত্তব্য এবং তাহা তোমাদের যেমন করিয়াই হোক দিতেই হইবে। তেমনই দাসদিগকে বলা হয় যে, তোরা বাপু দু'বেলা খাইতে পাস্ না, আমরা দয়া করিয়া দি; কিন্তু শুধু শুধু বসাইয়া খাওয়াইতে পারি না, পরিবর্ত্তে কিছু করাইয়া লই। সুতরাং বড়র প্রতি তোদের এই যে ঈর্ষা—ইহা অতীব অন্যায় এবং অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক।

ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করিলে এই বোঝা যায় যে, যাহারা সংসারে বড় হইয়া জন্মিয়াছে, তাহারা বড় হইয়াই থাকিবে, যেহেতু বড় হইয়া জন্মান' তাহাদের সৌভাগ্য—ঈশ্বরের অযাচতি দান এবং যাহারা ছোট হইয়া জন্মিয়াছে তাহারা ছোট হইয়াই থাকিবে, যেহেতু ছোট হইয়া জন্মান'র দুর্ভাগ্য ললাটের লিখা—বিধাতাপুরুষের স্বহস্তের ছাপ। অতএব এই বিধির বিধান উল্টাইবার জন্য যে প্রাণ-মন প্রচেষ্টা, তাহা যেন অনেকটা অ-দৃষ্ট, বিধাতার সহিত কোঁদল করার জন্য কোমর বাঁধিয়া আস্ফালন করা। বড় বড়র মতই জীবন আরম্ভ করিবে, তারপর যদি মন্দ-ভাগ্যবশতঃ সে বড়ত্ব খসাইয়া ছোট'র দলে মিশিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সেটা তাহার ব্যক্তিগত চরম দুর্ভাগ্য এবং তেমনই ছোট যদি কোনপ্রকারে অকস্মাৎ বড় হইয়া যায়, তাহা হইলে সেটা তাহার ব্যক্তিগত পরম সৌভাগ্য অর্থাৎ ভাগ্য-বিপর্য্যয়—ভাল'র দিকেই হোক আর মন্দর দিকেই হোক—কেহ অস্বীকার করেন না কিন্তু অধিকার ও দাবীতে যে পার্থক্য আছে, তাহা সম্পূর্ণ বজায় থাকুক—ইহাই সকলের একান্ত প্রার্থনাও ঈপ্সা। বজায় থাকা ঈপ্সিত এবং হয় তো বিশ্বের প্রকৃতি-তত্ত্বের দিক দিয়া প্রয়োজনীয় অথবা অনতিক্রম্য স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু বড় বড় হইয়াই বাঁচুক এবং ছোট ছোট হইয়াই বাঁচুক,—বাঁচা ও টিকিয়া থাকা উভয়েরই অভিপ্রেত।

বাঁচিতে হইলে জীবমাত্রেরই আহারের প্রয়োজন। তারপর মানুষের জন্য পরা এবং খাওয়া-পরার জন্য সুস্বাস্থ্য; থাকার জন্য বাসস্থান, আলো ও বাতাস। সুতরাং একটা মানুষের দেহরক্ষার জন্য অন্ন, বস্ত্র এবং আলো-বাতাসপূর্ণ বাসগৃহের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ইহার সঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে মানুষ শুধু রক্ত-মাংস ও কঠিন হাড় দিয়াই গঠিত নয়; শরীরের সহিত মন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত মস্তিষ্ক তাহার সম্পূর্ণ গঠন কার্য্যে সহায়তা করিয়াছে। শরীর ও মন এমনই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত যে একটীর অপরটী না হইলে চলে না এবং সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিলে বোধ করি বাঁচে না। তাই শুধু দেহকে অথবা মনকে পুষ্ট করিয়া চলিলে মানুষ আর যাহাই হোক কখনও ঠিক মানুষ হয় না; সুতরাং দেহ ও মনের পরিপুষ্টির জন্য উভয় প্রকারের খাদ্য আবশ্যক। যাহা মনের পুষ্টি সাধন করে, যাহার জন্য মানুষ তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে যথাযথ-ভাবে সু-সমন্বয়ের সহিত পরিচালনা করিতে পারে, যাহার জন্য মানুষ জীবনটাকে বুঝিতে, দেখিতে এবং উপলব্ধি করিতে পারে, তাহাই শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষা হইল জানা এবং জানাকে কায়মনোবাক্যে উপলব্ধি করা। সুতরাং মানুষের বাঁচায় শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। মনুষ্যেতর জীবে এই শিক্ষার অস্তিত্ব ও প্রয়োজন কতটা জানি না—জীবতত্ত্ববিদেরা বলিতে পারেন—তবে তাহাদের ভিতর বিদ্যা শিক্ষা না থাকিলেও সহজবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার শিক্ষা আছে এবং চলে, ইহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মানুষের জীবনে এই শিক্ষার অস্তিত্ব আছে, এ শিক্ষা তাহার চাই, এ শিক্ষা না পাইলে সে মানুষের মত মানুষ হইয়া বাঁচিতে পারে না।

শ্রমিকের জীবন-যাত্রা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইব, সে যাহা উপার্জ্জন করে তাহা হয় তো সূক্ষ্ম হিসাবে অন্ন বস্ত্র সংস্থানের পক্ষে পর্য্যাপ্ত, তবুও সে উদরপূর্ণ আহার পায় না। বাসস্থান অতি নোংরা, আলো-বাতাসের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই এবং গৃহের পরিসরের অনুপাতে

বাহুল্য প্রচুর। আচার-ব্যবহারের অতিশয় শিথিলতা এবং নিজেদের মধ্যে আলাপের ভাষা অতি কদর্য্য। নীতির কোন মর্য্যাদা রাখে না, বোধ করি জানে না এবং জানাও সম্ভব নয়। ধনীর বিলাসের উপর দুর্দ্দমনীয় লোভ; সেইজন্য জীবনের অতি উৎকৃষ্ট অংশগুলি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া হীন প্রমোদ ও বিলাসের উপকরণ ক্রয় করে এবং এমনইভাবে ধনীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে সার্থক মনে করে।

একথাটা এ ক্ষেত্রে বলিয়া রাখা ভাল যে সকল দেশের শ্রমিকের অবস্থা এক নয় এবং এক হইতে পারে না। ধর্ম্ম, রীতি ও নীতি, আচার ও ব্যবহারের ভেদাভেদ এবং যুগে যুগে এ সবের পরিবর্ত্তন মানুষের মধ্যে বহু প্রভেদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ছাড়া ভৌগলিক আবেষ্টনীর বিচিত্র প্রভাব মানুষের জীবনকে নানা বৈচিত্র্যে গড়িয়া তোলে। রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও রুচির পার্থক্য অনুসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাল্-মশলা বিভিন্ন হইবেই। এ তো গেল প্রকৃতি ও প্রতিবেশের প্রভাব-হেতু বৈষম্য। অনেক দেশে, বিশেষতঃ য়ুরোপে শ্রমিকেরা দল-বদ্ধভাবে দাবী করিতে শিখিয়াছে, ভগবানের মার বলিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া সুখ-দুঃখের হিসাব-নিকাশ আর তাহারা করে না, অভাব-দৈন্যের গভীরতা বুঝিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধির প্রতি ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তাহাদের মধ্যে জাগিয়াছে। ফলে, তাহাদের দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিছু বাড়িয়াছে, স্বাবলম্বী হইবার কিছু সুবিধা পাইয়াছে এবং ভবিষ্যতে অনেক বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সব শ্রমিকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ইতিহাস একেবারে মসীবর্ণে লিপ্ত নয়। দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মালমশলা সব শ্রমিকের এক নয় এবং সকলের জীবনযাত্রা একেবারে মলিনও নয়, তবুও তাহাদের অভাব দৈন্যের অবধি নাই এবং কমই হোক আর্ বেশী হোক মালিন্যের হাত বড় কেহ তেমন এড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

সভ্যপ্রধান দেশে শ্রমজীবি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য—সংহতি, দাবীর অধিকার, দাবী আদায় এবং তারপর আত্মধর্ম্ম চর্চ্চা। য়ুরোপে এই শিক্ষার ফলে সংহতি শক্তি কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই শক্তির অমানুষিকী প্রভাব প্রত্যেক নরনারী কিরূপ অনুভব করিয়াছে, তাহার অদ্ভুত, অপূর্ব্ব ইতিহাস সকলেই জানেন। সংহতির একান্ত প্রয়োজন, সংহতি-শক্তি অসীম ও অজেয়, মানুষের জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট, শ্রমিক-জীবনে সংহতি-শক্তি চাই-ই—এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সংঘর্ষমূলক সংহতিকে শিক্ষার মূলসূত্র বা মুখ্য উদ্দেশ্য করা কর্ত্তব্য কি না বিচার্য্য; কারণ, শিক্ষার সহিত বাঁচিয়া থাকার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এবং শিক্ষা হইল জীবনপথে প্রতি পদক্ষেপের প্রতিমুহূর্ত্তের ভুল-ভ্রান্তির নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সমষ্টি; সুতরাং শ্রমিকের দাবী করার অধিকার অতিশয় সঙ্গত ইহা জানা, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা এবং নিয়ত পরিবর্দ্ধমান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি লইয়া জীবন-যাত্রায় ধনিকের সহিত পাল্লা দেওয়া বোধ করি যথার্থ শিক্ষা নয়; কারণ, সে শিক্ষাটা বিরোধের। সংঘর্ষ—চিরন্তন সংঘর্ষই হইল সে শিক্ষার পদ্ধতি; তাহাতে কাহারও ভাগ্যে ওঠে অমৃতকণা, কাহারও ভাগ্যে ওঠে হলাহল এবং সে হলাহল কণ্ঠে ধারণ করেন এমন নীলকণ্ঠ জগতে আছে কি না জানি না। শিক্ষার প্রথম কথা হইল, নিজেকে জানা; নিজের শক্তি-সামর্থ্যের ওজন বোঝা; প্রতিদিনের ভুল-ভ্রান্তির খুঁটিনাটির সম্যক পরিচয় গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যত জীবনের ভিত্তি গড়িয়া তোলা; নিজের মধ্যে যে মানুষ নিয়ত বাস করিতেছে—যাহা মানুষের মনুষ্যত্ব—তাহাকে জাগান'—প্রকাশ করা। এই তো হইল শিক্ষা। এই শিক্ষা পাইতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে, বাধাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে হইবে। সংহতি, দাবীর কথা, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মালমশলা যথাস্থানে আপন প্রয়োজনমত গড়িয়া উঠিবে।

শ্রমজীবীরা যে মানুষ, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে তাহাদের সম্পূর্ণ দাবী আছে, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিকসিত করিবার মত মালমশ্‌লা অন্যান্য মানুষের মতই আছে এবং সে শক্তি উপযুক্ত সুবিধা পাইলেই জাগ্রত হইতে পারে, এ কথা উচ্চবংশ, পদমর্য্যাদার বা ধনগৌরবের দোহাই দিয়া অস্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া মানবসমাজে বাস করার একটা মূলনীতি আছে, তাহা এই—যে লোক মনুষ্যত্বের দাবী রাখে, অপরকে তাহার মনুষ্যত্বের প্রতি

সম্যক মর্য্যাদা জ্ঞাপন করিতে বলে, সে লোক অপর ব্যক্তির মনুষ্যত্বে তেমনই মর্য্যাদা দান করিতে বাধ্য, অন্যথায় তাহার নিজের মর্য্যাদাই অস্বীকৃত হয়। অতএব যাঁহারা বলেন, শ্রমজীবীরা ছোট লোক, সব মানুষের সমান হইয়া বাস করার অনুপযুক্ত এবং উপযুক্ত করা স্বার্থ-প্রতিকূল বলিয়া অকর্ত্তব্য, তাঁহাদের প্রকৃষ্ট আত্মমর্য্যাদার জ্ঞানই হয় নাই। যে মানুষ চোখের সামনে মনুষ্যত্বকে কুণ্ঠিত ও ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে প্রতিনিয়ত দেখে, তাহাকে কুড়াইয়া রক্ষা করা দূরে থাকুক; হেয় ভাবিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া মনে মনে বোধ করি উপহাস করে, স্পর্শভয়ে সঙ্কুচিত অঙ্গে দূরে সরিয়া যায়, সে মানুষ কি মানুষ? তা'র কি কোনও বোধ-শক্তি আছে?

কথাগুলি বলা অথবা লেখা দিব্য সহজ, শুনিতেও পরম উপভোগ্য এবং চোখের সামনে একটা মনোরম মহত্তর বিশ্বের দৃশ্য আঁকিয়া দেয়; কিন্তু বাস্তব-জগত ঠিক এমনটি নয় এবং হইতে পারিলে কোন কথাই ছিল না,—একটা সুশৃঙ্খল নিয়মের একটানা উজান স্রোতে অনন্ত মানব জীবন-প্রবাহ একই মুখে নিরন্তর প্রবাহিত হইত। বাস্তব-জগত সমতলভূমি নহে, রীতিমত বন্ধুর; এখানে মানব-প্রকৃতির বৈচিত্র্যে অন্ত নাই; আত্মবোধহীন, আত্মবিরোধী এবং আত্মঘাতী মানুষের অভাবও নাই। তাই, এই সকল বিচিত্রতার সমষ্টি লইয়াই জগতের নানা ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে; সুতরাং এই সব বিরোধ-দ্বন্দ্ব, বাধা-বিপত্তির মধ্য হইতেই একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সরল, সুগম ও সহজ পথ গঠন করিতে হইবে। বিরোধ ও ভাঙ্গার দিক দিয়া পথ গঠন করা বোধ করি সহজ, এবং সেই পথই গঠিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত মঙ্গল, জগতের যথার্থ শুভ করিবার দিকে তাহার ঠিক কতটুকু মূল্য বলিতে পারি না এবং বিরোধই বিরোধ-নিবৃত্তির একমাত্র পথ,—চিরন্তন ও স্থায়ী—সহজবুদ্ধি এ কথা ঠিক গ্রহণ করিতে পারে না। ধনিক ও শ্রমিকের বিপরীত প্রকৃতির মধ্যেও একটা বিষয়ে মিল আছে, সেটা স্বার্থ, সেটা তাহাদের বাঁচিয়া থাকা। এই মিলের ভিত্তির উপর নানা জীবন-দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্যে একটা কল্যাণের পথ গড়া সম্ভব কি না দেখা কর্ত্তব্য।

বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। সমগ্র বাংলার এক-চতুর্থাংশে লোকের চাষই একমাত্র উপজীবিকা এবং বাংলার প্রায় অর্দ্ধাংশ লোক ইহাদের উপর নির্ভরশীল। তারপর মৎস্যজীবী, কুটীর-শিল্পী এবং মজুর ও কুলি লইয়া বাংলার শতকরা ৮০ জন শ্রমজীবী। জাতিতত্ত্বে দেখা যায়, নিম্নশ্রেণীর সম্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য হিন্দু এবং মুসলমান—তাহারও বেশীর ভাগ নিম্নবর্ণের ধর্ম্মান্তরিত হিন্দু এই সম্প্রদায়ভুক্ত। হিন্দুর নিম্নবর্ণের ধর্ম্মান্তরিত খৃষ্টানও আছে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের দর্শন মেলে না, এমনও নয় তবে মোটা হিসাবে উল্লেখযোগ্য নয়।

বাঙ্গালী চাষী ভাগে প্রায় ৫।৬ বিঘা জমি চাষ করিতে পায়; সুতরাং জমিদার ও মহাজনের প্রাপ্য-গণ্ডা চুকাইয়া ভাগে ইহাদের যে কত থাকে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অর্থনীতিবিদেরা বলেন,—বড় ভীড়, অতএব ইহাদের চাষের কাজ হইতে সরাইয়া বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া মজুর-শিল্পী হিসাবে লাগাইয়া দাও। কিন্তু চাষী সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা কিছু বেশী এবং এই মর্য্যাদা সাধারণ কুলী-মজুর হওয়ার প্রতিবন্ধক। যাহারা নিতান্ত পেটের দায়ে কুলী হইয়াছে, তাহারা এ'কূল ও ও'কূল—দু'কূলই হারাইয়াছে। সমগ্র কর্ম্মী-সম্প্রদায়েরই একদিকে যেমন নিয়ত বর্দ্ধমান দারিদ্র্য ও অস্থি-মজ্জা চুষিয়া লইতেছে, তেমনই নিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিলাসোপকরণ তাহাদের চক্ষু-মন ঝলসাইয়া দিতেছে।

এইজন্যই বোধ করি ইহাদের অশিক্ষা, নিরক্ষরতা আমাদের প্রাণে বড় বাজে। তাই ইহাদের কাছে গিয়া আমরা বলি, তোমাদের দুর্দ্দশার অবধি নাই। তাহার কারণ আমরা জানি, তোমরা লেখাপড়া জান না, লোকে তোমাদের ঠকায়, তোমরা নিতান্ত অবোধ। এস, দু'পাতা বই পড়; ইহাতে তোমাদের মন উন্নত হইবে, শরীর ভাল হইবে, আমাদের মত নৈতিক বুদ্ধি হইবে। তাহারা উত্তর দেয়, 'বই পড়িলে বিদ্যা হয়, আমাদের খুব ভাল হয়, আমরা ভদ্র হই। তবে বিদ্যার তো আমাদের দু'বেলা পেট ভরে না, ম্যালেরিয়াও সারে না। আর রীতি-নীতি আমরা বুঝি না, দুঃখকষ্টে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর আমাদের যেমোমদ কত বেশী স্ফূর্ত্তি দেয়—সে কি বাবুরা জানেন না?'

ইহার উত্তর যে আমরা কিছু দিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে

না; বরঞ্চ মনে করিয়াছি, ইহারা নিতান্ত অজ্ঞান, ভগবান ইহাদের সুমতি দিন। কিন্তু দৈত্যকুলে প্রহ্লাদই জন্মে, সুতরাং এত সহজে বিনা বাধায় শিক্ষিত হইবার আহ্বান একেবারে নিষ্ফল হইয়া যায় না; দু'দশজন ডাক শুনিয়া পড়িতে আসে, মনোযোগ-সহকারে পড়ে এবং পাঠান্তে বলে, চাষবাস, দিন-মজুরাদির কাজে আর তাহার রুচি নাই, সে এখন লেখাপড়ার কাজ করিয়া অর্থ অর্জ্জন করিবে, যেহেতু সে বাপ-খুড়ার চেয়ে ভদ্র হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে সে তাহাই করে এবং সময় পাইলে 'রাজকন্যার গুপ্তকথা' পড়িয়া শিক্ষার মর্ম্ম উপলব্ধি করে। যাহার অদৃষ্টে লেখাপড়ার কাজ জোটে না, সে বাধ্য হইয়া পৈতৃক-বৃত্তি বা সেই রকমের কোন শ্রমিকবৃত্তি অবলম্বন করে এবং বছর দশেক পরে আদম-সুমারিরকালে জানা যায়, সে নাম সই করিতে জানে না।

শিক্ষা-বিস্তারের এবংবিধ ইতিহাস দেখিয়া দু'একজন স্বদেশপ্রাণ বলেন, আমাদের জাতের ধাতে এ রকম আমদানী গণ-প্রাথমিক শিক্ষা সহিবে না এবং এরূপ অনর্থক অপব্যয় করিতে দেশবাসী প্রস্তুত নয়,—এজন্য বিশেষ খাজনা দেওয়া তো দূরের কথা, আমাদের খাঁটি দেশী গণ-শিক্ষা যাহা ছিল, তাহাই আবার চলুক অর্থাৎ কবির গান, যাত্রা, পুরাণপাঠ; কথকতা, কীর্ত্তন, পাঁচালী—এইসব কর, এই সব চালাও। বৌদ্ধ, শঙ্কর, বৈষ্ণব, সহজিয়া প্রভৃতি ধর্ম্মমত এই পথেই জনমন স্পর্শ করিয়াছিল, প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। কিন্তু সাতমণ তেলও পোড়ে না এবং রাধাও নাচে না।

কিন্তু এখন যদি আমরা দেশের শিক্ষা-বিস্তারের কথাটা সম্যকভাবে পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে আমাদের চোখে ইহার একটী বর্ণ নিতান্ত অসত্য নয়, ইহা স্পষ্টরূপে ধরা পড়িবে। অবশ্য জগতে কোন কিছুই নিছক মন্দ নয়, কথাটা খুবই সত্য; তবুও ইহাতে যেটুকু মন্দ আছে, সেটুকু পরিমাণে নিতান্ত অল্প নয়, ইহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। য়ুরোপে সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ফলে রোমাঞ্চকর ঘটনামূলক সাহিত্যের প্রসার ও বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা তথাকার দু'চারজন কর্ম্মী অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এটা অবশ্য কোনমতেই শুভ লক্ষণ নয়। পঠিত বিদ্যার প্রয়োগ অনেকক্ষেত্রে বেশী পাপ বা বেশী অন্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে, একথা আজ আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

ব্যাপারটা কিছু ঘোরাল হইয়া দাঁড়াইল। মানুষের শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন, অথচ শিক্ষা বলিয়া যে জিনিসটা দেওয়া হইতেছে সেটা ঠিক প্রকৃত শিক্ষা নহে, বরঞ্চ ঘটনা-চক্রে অনেকটা অশিক্ষা বা কুশিক্ষা হইয়া দাড়াইয়াছে। আধুনিক জগতের আবহাওয়া সার্ব্বজনীন গণ-শিক্ষার দাবী করে, উৎকৃষ্ট মানুষ সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করে। তাই আজ নানা আদর্শের সংঘাতে অন্তরলোক এত উদ্বেলিত।

ব্যবহারিক হিসাবে শিক্ষা দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে দেখা যায়, একটী হইতেছে ব্যক্তির হৃদয়-মনের সম্পূর্ণ প্রসারণ ও উন্নয়ন, অপরটী হইতেছে এমন একটী পন্থা নির্দ্ধারণ যদ্দারা ব্যক্তির স্বার্থরক্ষা ও স্বার্থে সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ জীবন-যাত্রায় মোটা লাভের অঙ্ক বাড়াইবার পন্থা। প্রথমটী বহু সাধনা-সাপেক্ষ, দ্বিতীয়টি দেশকালও পাত্র বিবেচনায় বুদ্ধি শানিত করা। জগতে শিক্ষা এইভাবে দ্বিধা খণ্ডিত, একদিকে দু'চার মনীষী, অপরদিকে বাকী সব। শিক্ষা এমন করিয়া খণ্ডিত হওয়ায় তা'র যত কিছু গলদ, যত কিছু মন্দ মানুষের জীবনযাত্রা পদ্ধতি বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই প্রকৃত শিক্ষা পাইতে হইলে স্বার্থের সংঘাত হইতে, দ্বন্দ্বের হুঙ্কার হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে শিক্ষাকে অখণ্ডিত রাখিতে হইবে, খণ্ডাংশের মধ্যে সমন্বয় আনিতে হইবে।

জন্ম হইতে সুরু করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকার যেটুকু মেয়াদ, সেইটুকু পুরাপুরি উপভোগ করা অর্থাৎ জীবনটাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা দিয়া ভোগ করা,—ইহার জন্য শিক্ষার যত কিছু আয়োজন। ভোগে ধনিকের পক্ষে পথ অব্যাহত, মধ্যবিত্তের পক্ষে অব্যাহত না হইলেও সুগম করা কঠিন নহে, কিন্তু শ্রমিকের পক্ষে বাধা প্রচুর। এ কথা সর্ব্বদেশেই প্রযুজ্য।

শ্রমিক দিবারাত্র কঠিন কায়িক শ্রম করিতে বাধ্য। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনীর পর সে একটু তরল ফুর্ত্তি চায়, শ্রমক্লান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটা সহজ উল্লাস চায়। যাহা কিছু নীরস, শক্ত, ধীরমননসাধ্য, সে সবই তাহার কাছে

অতিশয় তিক্ত ও কটু। দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগে তাহার মন সর্ব্বদা ভারাক্রান্ত, দারিদ্র্যের চাপে প্রাণ সঙ্কুচিত ও শুষ্ক; অর্থের উপর ঐকান্তিক লোভ, তাহার উপর ধনীর অনায়াসসাধ্য জীবন-যাত্রার ব্যর্থ অনুকরণ করার প্রয়াসও আছে, বিলাস-সামগ্রী তাহার চোখে সুদুর্ল্লভ মনোহর বস্তু বলিয়াই ঠেকে। আরও সে মনে করে, সে যে কাজে নিযুক্ত তাহা ভদ্রজনোচিত নহে—যেহেতু কাজগুলি হেয় এবং ভদ্র লোক মাত্রেই উচ্চবংশজাত, শিক্ষিত; সুতরাং ভদ্র-সাজিলে শ্রমের হাত এড়ান যায়। কথাগুলি সত্য বলিয়াই ধারণা এবং যাহারা একটু পরিশ্রম করিয়া সমাজের নিম্নস্তরের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিবেন, বাঙ্গালী শ্রমিকের ঘরকন্নার কথাবার্ত্তা লইয়া আত্মীয়তা করিবেন, তাঁহাদেরই আশা করি এই ধারণা হইবে। বরঞ্চ বিশ্বাস করি, তাঁহারা এই পথে ইহার চেয়েও বৃহত্তর অসন্তোষ, দুর্দ্দান্ত লোভও আকাঙ্ক্ষার তপ্তশ্বাস অনুভব করিবেন।

অধিক সংখ্যক মানবের অবধারিত মৃত্যুর পথে গতি দেখিয়া দুই চারিজন মহাপ্রাণ অনুকম্পার বেদনায় বিধান দিলেন, 'তোমাদের বাঁচিবার একমাত্র পথ পৃথিবী হইতে ধনিকের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া সাম্যের প্রতিষ্ঠায়।' এ পথে দশজন মরে এবং বাঁচে হাজার জন। কিন্তু বাঁচার এই সবিক্রম আয়োজনের কোলাহলে ঠিক বাঁচা, ঠিক করিয়া জীবন ভোগ করা, জীবন সার্থক হয় কি না জানি না। লাঠির চোটে মাথাই ফাটে, বুদ্ধি ফোটে কি না বলা কঠিন।

পক্ষান্তরে আমরা দেখি এবং অনুমান করি, অজ্ঞানই ধ্রুব মরণ-পথে অগ্রসর হওয়ার মূলকারণ, অতএব জ্ঞানালোকে এ তিমির দূর করা হোক। জ্ঞানালোক একটা জ্বালা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তিমিরনাশ হইয়াছে কি না আজ পর্য্যন্ত টের পাওয়া যায় নাই; তবে অল্প আলোক ও প্রচুর অন্ধকার জড়াইয়া যে অদ্ভুত বস্তুটীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ভীষণাকৃতি আমাদের চমকাইয়া দেয়।

শিক্ষাদান ব্যাপারটাই কঠিন, তারপর যদি শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সমাজিক রুচির, আচার-ব্যবহারের ও নীতির খুব বেশী পার্থক্য হয়, তাহা হইলে ব্যাপারটা আরও দুরূহ হইয়া ওঠে। আহারকে কেন্দ্র করিয়া শ্রমিকের জীবনের সাধ-আকাঙ্ক্ষা অতি ক্ষুদ্র পরিসর মধ্যে খেলা করে। বাংলাদেশে যাঁহারা শ্রমজীবীর শিক্ষাভার লইয়াছেন, তাঁহারা সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। ফলে, ইঁহারা অজ্ঞাতসারে আপন সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও ধারা শ্রমিক জীবনের উপর চাপাইয়া বসেন।

শ্রমজীবীকে দু'পাতা বাংলা ও ইংরাজী বই পড়াইয়া ও কিছু হিসাব কষাইয়া তাহার মানসিক উন্নতি করা, দেহও আহার-সম্বন্ধে দু'চারিটা শুষ্ক উপদেশ দিয়া বা দেহরক্ষার কয়েকটা কসরত শিখাইয়া দৈহিক উন্নতির পথ বাতলাইয়া দেওয়া এবং দশজন মহাত্মা ও মনীষীর জীবন-চরিত পড়াইয়া ও সম্ভবতঃ ক্ষেত্রবিশেষে নিজের কয়েকটা নৈতিক আদর্শ দেখাইয়া শ্রমিককে নিজের মত নীতিবান করিয়া তোলা,—আমার বোধ হয় শুধুই কল্পনা। বিবিধ পারিপার্শ্বিক আব-হাওয়ার ভিতর মানব-মনের বিচিত্র ইতিহাস, কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও বিচার করিলে এই মহদুদ্দেশ্যে কতখানি গলদ ও অসঙ্গতি আছে, তাহা ধরা পড়ে। কথাটা এই, মন, দেহ ও নীতি শ্রমিকের; ইহার সংস্কার, উন্নতি বা পরিপুষ্টি করা তাহার হাতে, সেই পারে এবং তাহার পক্ষেই সম্ভব অর্থাৎ গতি আসিবে অন্তর্মুখের উৎস হইতে, বাহিরের চাকচিক্য হইতে নয়।

আপত্তি হইতে পারে যে কথাটা সত্য নয়, করা সম্ভব এবং তাহার দৃষ্টান্তও আছে। হয় তো আছে। কিন্তু একটা ব্যক্তিকে দিয়া,তাহার আংশিক রূপ দিয়া তাহার সমগ্রতাকে বিচার করা যায় না। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব যে, যে জিনিসটাকে লইয়া সফলতার গর্ব্ব অনুভব করিতেছি, ঠিক সেই জিনিসটাই একটা মস্ত বড় বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিয়াছে। যে শ্রমিক এই শিক্ষা পাইয়া পুরাপুরি ভদ্র হইয়া উঠিয়াছে, সে শ্রমিক তাহার সংসারে, তাহার সমাজে এমনই বেয়াড়া বেখাপ হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার জীবনের সব সুখ শান্তি একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার স্ত্রী, তাহার ভগিনী, তাহার পিতামাতার সহিত সে মিশিতে পারে না, সে তাহাদের সহিত কথা কহিয়া সুখ পায় না এবং তাহাদের আচার, রীতি, রুচি, সংস্কার ভালই হোক আর মন্দই হোক তাহার চোখে বিসদৃশ ও অত্যন্ত অন্যায় ঠেকে। ফলে তাহার মধ্যে যে সমস্ত অসন্তোষ ও দুরাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়, তাহা তাহার, তাহার

পরিবারবর্গ, তাহার সমাজের পক্ষে কখনই শুভকর নহে।

কথাটা দাঁড়ায় এই যে, যে উদ্দেশ্যে শ্রমজীবীকে শিক্ষাদান করা হয়, সে উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান সম্ভব নয় এবং তাহাদের মঙ্গলসাধন উপলক্ষ্যে যে সব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের কোনও শুভ হয় নাই, বরঞ্চ অকল্যাণই করা হইয়াছে।

আমরা বলি, আমাদের উদ্দেশ্য কেবল দেহ মন ও নীতির উন্নতিতে আবদ্ধ নয়, আমাদের এই উদ্দেশ্যের অন্তরালে আর একটী মহত্তর আদর্শ আছে তাহা এই, শ্রমমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা। আমরা শ্রমিককে এই শিক্ষা দান করি, তোমরা শ্রমকে যথোচিত মর্য্যাদা দান কর, যেহেতু কোনও শ্রমই হেয় নয় এবং দৃষ্টান্ত দেখাই, দেখ, আমরা তোমাদের ঘৃণা করি না, তোমাদের পাশে বসি এবং প্রয়োজন মত তোমাদের কাজে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু শুধু কথায় কাজ হয় না, কারণ বন্ধ্যার প্রসববেদনায় মর্ম্ম কথা না জানাই সম্ভব। যে যে জিনিসটা লইয়া অহোরাত্র নাড়াচাড়া করিতেছে, জাগতিক জীবনে তাহার মূল্য কতটুকু, তাহার মর্য্যাদা কতখানি, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম সে ছাড়া আর কাহারও জানা সম্ভব নয় অর্থাৎ শ্রমের যথার্থ মর্য্যাদা সে দেয় নাই, আমরাও দিই নাই এবং বোধ করি কোনকালে কোন দলই দিবে না। সাম্যবাদীরা জীবিকা-অর্জ্জন ব্যাপারে ধনিক ও শ্রমিকে উভয়েরই সমান শ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থমূল্য ও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কাজটা ভাল বা মন্দ হইয়াছে, তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই, তবে এ পথে শ্রমমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি না সন্দেহের বস্তু

আসল কথা, বর্ত্তমান সভ্যতার মূলভিত্তি হইল শ্রমের আর্থিকমূল্য দানে। এই অর্থমূল্যে শ্রমের মূল্য যাচাই করা যতকাল চলিবে, ততকাল যথার্থ শ্রমমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাহাই নয়, আধুনিক সভ্য-মানবের জীবন-দর্শনে ইহা এমন করিয়াই শিকড় গাড়িয়াছে যে এ-সম্পর্কে কোন প্রশ্নই আধুনিক মানবের মনে ওঠে না। তাই উক্তি দ্বারা প্রচারে বা লাঠির জোরে সমানশ্রম ব্যবস্থায় শ্রম-মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠায় সন্দেহ জাগে। শ্রমমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা গড়িতে হইলে বর্ত্তমান সভ্যতার, আধুনিক মানুষের জীবন দর্শনের ভিত্তি নূতন ধারণায়, নূতন আদর্শে গড়া প্রয়োজন এবং সে কাজ একদিনের নয়; যে পদ্ধতিতে এই কয়েক হাজার বছরে বর্ত্তমান সভ্যতার ভিত্তি অতিদূর প্রান্তরস্থিত নিরক্ষর অশিক্ষিত মনে শিকড় প্রসার করিয়াছে, তাহার জীবন-দর্শনে কিছু আধুনিক রূপ দিয়াছে, ঠিক সেই জাতীয় পদ্ধতিতে নূতন আদর্শকে চলিতে হইবে।

মানুষের সবচেয়ে বড় স্বার্থ হইল বাঁচিয়া থাকা, এ স্বার্থে মানুষে মানুষে যথার্থ বিরোধ নাই। কথাটা বুঝাইতেছি। একগ্রাস অন্ন দুইজনে দুইভাবে গ্রহণ করিতে পারে, প্রথম একের হাত হইতে কাড়িয়া অপরের গ্রহণ, দ্বিতীয় হইল দুজনে মিলিয়া ভাগ করিয়া লওয়া। প্রথমটায় স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই স্বার্থহানির বীজ উপ্ত, এখানে মানুষের স্বার্থ-বোধ অতি স্থূল রকমের এবং স্বার্থও খুব ছোট; দ্বিতীয়টাতে স্বার্থ-সিদ্ধি পরিমাণে কম দেখায় বটে, কিন্তু স্বার্থহানির কোন সম্ভাবনা নাই, এখানে স্বার্থবোধ সূক্ষ্ম, স্বার্থও বৃহৎ এবং ইহার মূলে রহিয়াছে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে মানুষ একত্র হইয়াছে, সমাজ গড়িয়াছে, সৃষ্টির-গতি রাখিয়াছে।

যে-স্বার্থে, যে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ পরস্পরকে জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক—বিশ্বাস করিয়া একত্রিত হইয়াছিল, সে স্বার্থের সে প্রয়োজনের উপর হইতে আজ তাহার দৃষ্টি ভ্রষ্ট হইয়াছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ও স্তর তাহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়াছে। তাই আজ মানুষের সমাজ থাকিলেও ধনিক-শ্রমিকে এত অবিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি ভীষণ সন্দেহ, ক্ষুদ্র স্বার্থের এই রকমেরই রাজত্ব। তাই এ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়া সর্ব্বমানবের মিলনকেন্দ্র গড়িয়া তোলা।

মিল হয় সমানে সমানে, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। আমরা দেখি ধনিকে শ্রমিকে মিল নাই,—কিন্তু সে মিল নাই কোথায়? মানুষটাতে নয়, মানুষটার ঐসব মুখোসে। এই মুখোস রূপের আকৃতি বদলায়, সুতরাং মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হওয়া খুবই সম্ভব? উভয়েই মানুষ, পরস্পরের সান্নিধ্যে অনায়াসেই আসিতে পারে। এই আসার পথে

ধনিক ও মধ্যবিত্তের একটু সহজ হওয়া প্রয়োজন—যাহাতে সে যে মানুষ এই পরিচয় সহজেই মেলে, তেমনই শ্রমিকেরও কিছু উঠিয়া আসা দরকার—সে-যে মানুষ, সে পরিচয়টা ঢাকা না পড়ে। এই প্রচেষ্টায় হয় তো বা বর্ত্তমান সভ্যতার গতিমুখ ঘুরিতেও পারে, হয় তো বা জীবন দর্শনে নূতন রঙ লাগিতে পারে, শ্রমমর্য্যাদাও হয় তো বা আপন প্রতিষ্ঠার একটুকু স্থান পাইতেও পারে।

শক্তিমান তাহার শক্তি সহজে ত্যাগ করিবে না এবং গায়ের জোরে, ত্যাগ করানর চেষ্টা অন্যায় ও অকর্ত্তব্য। শক্তিহীনের পক্ষে শক্তিমানের শক্তি খর্ব্বের দ্বন্দ্ব তাহার স্বার্থেরই পরিপন্থী এবং তাহাতে শক্তির অপচয় হয়। আর এ দ্বন্দ্বে ধন-সংখ্যার গৌরবের বদলে জনসংখ্যার গৌরবের বেশী গড়িয়া উঠিতে, আসল ব্যথায় প্রাণ ঠিক তেমনই নিষ্পীড়িত হইতে থাকিবে। দ্বন্দ্বের পথে কল্যাণ নাই, শান্তি নাই।

বাঁচার স্বার্থে মানুষ এক, এই স্বার্থ বোঝায় তাহার যথার্থ শক্তি, এই স্বার্থে আত্মপ্রকাশ করায় তাহার জীবন। তাই মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস আনিতেই হইবে, মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলিতে হইবে। ধনিক ও শ্রমিককে এ শিক্ষা পাইতে হইবে। পাওয়ার উপলক্ষ্যে যদি কথকতা পাঁচালী প্রভৃতির সাহায্যে শ্রমিককে আনন্দ দিতে এবং নিজেদের পাইতে হয়, তাহা স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্যাশিক্ষাদান উপলক্ষ্যে যদি পরস্পর মেলামেশায় সহজ আত্মীয়তা করার সুযোগ আসে, সে সুযোগ ছাড়া সঙ্গত নয়। বাংলাদেশে নিরক্ষরতা বেশী, সুতরাং এই উপলক্ষ্যে মেলামেশার সুযোগ প্রচুর এবং সহজেই আত্মীয়তা-বোধ জাগিয়া উঠিতে পারে—কিছুকাল বোধ করি দেড় শত কি দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে গ্রামগুলিতে এমনিতর আত্মীয়তা-বোধ ছাড়াইয়া রহিয়াছিল। আর একটা কথা, বাঙ্গালী মোটামুটিভাবে শান্তিপ্রিয় জাতি, সুতরাং এ পরীক্ষার ক্ষেত্র বাংলাদেশেই হওয়ার সুবিধা-জনক *।

* শ্রমজীবিশিক্ষা-পরিষদের (৯ ও ১০, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, উত্তর বিভাগ, দ্বিতল কলিকাতা।) কর্ম্মী-সম্মিলনে আলোচনার জন্য ১৩৩৩ সালে এই প্রবন্ধটী রচিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে কিন্তু সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রকাশ করা হইল। পরিষৎ গত ২০ বৎসর ধরিয়া এই কাজ করিতে-ছেন। কেহ এই ব্যাপারে ঔৎসুক্য বোধ করিলে পরিষদের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

মিলন-সূত্র

(গল্প)

শ্রীকৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য্য

এক

তা'রা দু'জনেই ছিল, জগন্নাথ কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু তাদের পরস্পর জাতি ছিল বিভিন্ন—হিন্দু ও মুসলমান। নাম—অনিল ও রহমৎ। তাদের যতটুকু আন্তরিক প্রীতি ছিল, বাহিরে ঠিক ততটুকু অপ্রীতি প্রকাশ পে'ত।

কেউ জান্ত না—এই বিভিন্ন জাতীয় দুটী সহাধ্যায়ীর পরস্পর ভালবাসা কত গভীর—কত নির্ম্মল।

রহমতের ভালবাসা অনিলের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল কেমন করে, তা' অনিলও জান্ত না, রহমতও জান্ত না। জান্বার আগ্রহ তাদের মোটেই ছিল না—থাক্‌লেও সেটা ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু—

তাদের দুজনকে কেন্দ্র করে কলেজের হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের ভেতর পরস্পর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সাম্প্র-দায়িকতা গড়ে উঠেছিল। অদূর ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করে দুজনে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিল। ভেতরের ব্যাপারট

তলিয়ে দেখবার সুযোগ তা'রা কেউ কাউকে দেয় নি। দেবার চেষ্টা কর্‌লেও পেরে ওঠে নি। তাদের ছিল বড্ড ভয়, পাছে কেউ তাদের প্রাণের ভালবাসার কথা জেনে ফেলে; তাই জানাতেও পারে নি, জান্‌তেও দেয় নি।

ভালবাসার ভেতর দিয়ে বাহিরে যা' প্রকাশ পে'ত, তা'তে ছিল মহত্বপূর্ণ জ্ঞান-প্রতিযোগিতা আর মহান্ উচ্চ আদর্শ। কিন্তু—

কলেজের ছেলেরা ভাব্‌ত ঠিক উ'টা। যে বস্তুকে উপলক্ষ্য করে, তা'রা জ্ঞানের যাত্রা-পথে তাদের জীবনকে চালিয়েছিল, সে বস্তুটার সন্ধান পেয়েছিল বন্ধুদ্বয়—এগার বছর আগে যখন তা'রা পড়্‌ত এণ্ট্রান্স স্কুলের ফোর্থ ক্লাসে।

ক্লাসের ভেতর ছিল তারা'ই সকলের বরেণ্য। প্রতিযোগিতাও ছিল তা'দের ভেতর নানা রকমের।

রহমৎ যে বছর অধিকার কর্‌ত প্রথমস্থান, সে বছর অনিলের ক্ষোভের থাক্‌ত না সীমা। দু'জনের চল্‌ত এম্‌নি প্রতিযোগিতা—হয়তো পরবছর অনিল হ'য়ে যেত প্রথম। এই নিয়ে দুজনের মৌখিক ঝগড়াও অনেক হ'ত।

তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল অনেক রকমের। রহমৎ মুসলমান হ'লেও ঝোঁক ছিল তার সংস্কৃতের ওপর খুব বেশী। কাজেই আর্‌বীর সাথে চালিয়েছিল সংস্কৃত। অনিলের তেমন আগ্রহ না থাক্‌লেও শুধু রহমতকে পরাজিত কর্‌বার জন্যেই আরবীর ওপর দিয়েছিল এমন অখণ্ড মনোযোগ যে মৌলবী সাহেবকেও তাকে পড়াতে ব্যতিব্যস্ত হ'তে হ'ত।

এই দুইটী বিভিন্নজাতীয় সহাধ্যায়ী বন্ধু বিভিন্ন জাতীয় ভাষার সাথে এমন নিবিড়ভাবে আপনাদের বিলিয়ে দিয়েছিল যে এনট্রান্স, আই-এ, বি-এ, পর্য্যন্তও তাদের একই রকমের প্রতিযোগিতা চলেছিল।

তার ওপর ধর্ম্ম নিয়ে তাদের চল্‌ত ঘোর তর্ক। রহমৎ গীতা ও উপনিষদ্ গুলাকে এমনি অভ্যস্ত করে নিয়েছিল যে, অনিলের সাথে তার মূর্ত্তি-পূজা নিয়ে অস্বাভাবিক রকমের তর্ক হ'ত, শেষ অবধি তর্ক গড়িয়ে পড়্‌ত ঝগড়ার দিকে। এটা ছিল তাদের দৈনিককৃত্য। এ ঝগড়ার ভেতর প্রেম ছিল কতখানি, তা বড় একটা কেউ জান্‌ত না।

এমনিভাবে উচ্চ আদর্শকে আঁকড়ে ধরে সকল দিক দিয়ে তাদের মধ্যে ভালবাসা বেশ বেড়ে চল্‌ছিল; কিন্তু—

কলেজের হিন্দু ছেলেরা চটে গেল মূর্ত্তি-পূজার বিরোধী রহমতের ওপর, আর মুসলমান ছেলেরা চট্‌ল হিন্দুদের ওপর।

শেষ অবধি রহমৎ যখন দেখত—তাদের প্রাণ-খোলা তর্কের ভেতর মহান্ আদর্শ থাক্‌লেও, অজ্ঞাতসারে ছাত্রদের বুকের ভেতর জেগে উঠেছে রুদ্রশক্তির তাণ্ডব নর্ত্তন, তখন তাদের মূর্খতা দেখে অনিলের হাত চেপে ছুটে পালাত উর্দ্ধশ্বাসে।

সংগ্রামরত সৈনিকদের এড়িয়ে, উভয়পক্ষের সেনাপতির পরস্পর সন্ধি হ'লে সৈনিকদের অবস্থা যেমন হয়, অনিল ও রহমতের আকস্মিক মিলন ও অন্তর্দ্ধানে তাদের মনের অবস্থাও হ'ত ঠিক তেমনই। কিন্তু—

রহমৎ ও অনিল দুজনেই ভাব্‌ত শুধু সহধ্যায়ীদের কথা। অন্ধবিশ্বাসী সতীর্থদের জন্যে তাদের প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠ্‌ত। আর প্রতিমুহূর্ত্তে তাদের মনে জাগত—যে দেশে তর্কের ভেতর সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিযোগিতার ভেতর রক্তারক্তি, মহান্ আদর্শের ভেতর কুসংস্কার, ধর্ম্মের নামে স্বেচ্ছাচারিতা, সে দেশের শান্তি কোথায়? কিন্তু—

শেষ অবধি তখন ছাত্রদের ঈর্ষানল এই দুটী বন্ধুর ওপর পড়ল, যখন তারা টের পেল এদের অন্তরও বাহির এক রকমের নয়।

তারা বুঝল তাদের ভেতর যে ঝগড়াটুকু তর্কের ভেতর দিয়ে এসে পড়ত, সেটুকু ঝগড়া নয়—তীব্র ভালবাসার অনুভূতির চরম ফল।

বর্ষাকালের বিদ্যুতের মত এই সত্যটুকু যখন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল—তখন শত শত চক্ষুর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি এড়িয়ে চলা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়্‌ল। পৈশাচিক প্রেরণা সাম্প্রদায়িকতার ভেতর দিয়ে শত শত হিন্দু-মুসলমান ছাত্রের মনের কোণে বন্ধুত্ব ছেদন করবার প্রবল আগ্রহ জাগিয়ে দিল।

বাহ্য জগতের সাথে সম্বন্ধ রাখ্‌তে তা'রা কতই না চেষ্টা করেছিল! কিন্তু—

প্রতিকূল হাওয়া তাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে

চল্‌ল। বাহ্য-জগতে তাদের কোন সম্বন্ধ থাক্‌ল না—রইল শুধু মর্ম্মস্রোত—আর প্রকৃত প্রাণের টান।

দুই

জগন্নাথ কলেজের ছাত্রদের অন্তরে-অন্তরে এমনই সাম্প্রদায়িকতা যখন চল্‌ছিল, তখন সমগ্র ঢাকা শহর জুড়েই সাম্প্রদায়িক-অনল দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তারপর একদিন—দাবানলের মত আত্মপ্রকাশ করে সমগ্র শহরের বুকে ছড়িয়ে পড়্‌ল।

"আল্লা হো আকবর" রবে গগন-পবন মুখরিত করে, মুস্লিমের ক্ষিপ্ত জনতা পাড়াপড়্‌শী হিন্দুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। হিন্দুদের আত্মরক্ষা করার সুযোগও তারা দিলে না। ধনপ্রাণ নিয়ে পালাবার পূর্ব্বেই শোণিতলিপ্সু মুস্লিমের হাতে তাদের নির্য্যাতন চল্‌তে লাগল।

মা—আর তার ছোট বোন উষাকে নিয়ে রহমতের পাশের বাড়ীতে অনিলরা থাকত। রহমতের পিতা গফুর মিঞা জজকোর্টের উকিল, অনিলের পিতার সাথে ছিল তার অশেষ বন্ধুত্ব। কিন্তু—

দাঙ্গার সময় সে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব শূন্য আকাশে বিলীন হ'য়ে গেল। তার ওপর যখন রহমতের সাথে অনিলের মৌখিক মনোমালিন্যের সংবাদটী অতিরঞ্জিত হ'য়ে গফুর মিঞার কাণে এল তখন তিনি আপনার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেল্লেন। ক্ষিপ্ত জনসমুদ্রের ভেতর আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে অসহায় যুবকের সর্ব্বনাশ কর্‌তে ছুটে গেলেন।

"আল্লা হো আকবর" ধ্বনি গফুরের মুখ থেকে বেরোতেই, শত শত মুস্লিম যুবক অনিলের বাড়ীর দিকে ধেয়ে চল্‌ল।

অসহায় যুবক একবার মাত্র উচ্চারণ কর্‌ল—"বন্দে-মাতরম্"; পরক্ষণেই পিতার রিভলবার থেকে, জনসমুদ্রের ওপর গুলি ছুঁড়্‌তে সুরু করল।—কিন্তু—আর কতক্ষণ—গুলি প্রায় শেষ হ'তে চল্‌ল—। পাশে দাঁড়িয়ে ছোট বোন উষা আত্মহারা হ'য়ে জনতার উপর-ইট পাটকেল ছুড়ছিল। সহসা আততায়ীর বর্শাঘাতে মূর্চ্ছিত হয়ে ধরার বুকে আশ্রয় নিল। উষার বুকের ভেতর থেকে অরুন্তুদ আর্ত্তনাদ উঠল। কোলাহল ভেদ করে সে আর্ত্তনাদ রহমতের কাণে পৌছল। পরক্ষণেই অনিলের চীৎকার ধ্বনি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুল্‌ল—"ভাই রহমৎ! বন্ধু রহমৎ! আমার উষাকে বাঁচাও!"

রহমৎ আগে মোটেই বুঝ্‌তে পারে নি—এই ক্ষিপ্ত জনতার নেতা কে? কিন্তু স্বচক্ষে যখন দেখতে পেল,—হতভাগ্যদের হত্যা-যজ্ঞের পুরোহিত তারই পিতা, তখন বীর যুবকের প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠল—বন্ধুকে বাঁচাতে—সে উন্মত্তের মত ছুটে গেল।

তারপর সাঁজোয়া গাড়ী নিয়ে ফিরে আস্তেই অনিলের করুণ চীৎকার,—উষার মর্ম্মদাহী আর্ত্তনাদ তার কাণে পৌছল। বীর যুবক উন্মত্তের মত ছুটে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ধরাবলুণ্ঠিতা হতভাগিনীকে তুলে বসিয়ে আশ্বাস দিতে লাগল।

পরক্ষণেই ঝড়ের বেগে ফিরে এসে, অনিলের হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে—বলে উঠল "বন্ধু অনিল, যাও—শেষ বিদায়—আমায় ক্ষমা কর—"

তারপর—অনিল যখন সাঁজোয়া গাড়ীতে পুলিশ বেষ্টিত হ'য়ে চল্‌ছিল তখন মুস্লিমবীর মৃত্যুকে বরণ কর্‌বার জন্যে সজোরে রিভলবার আঁক্‌ড়ে ধরে শেষ গুলী ক'টী নিঃশেষ কচ্ছিল।

ক্ষিপ্ত জনতার ভেতর থেকে উচ্চৈঃস্বরে বেরোচ্ছিল 'কাফেরকে হত্যা কর—'

সঙ্গে সঙ্গে জনতার মুখ থেকেও বেরোচ্ছিল—"আল্লা হো আকবর।" বীর রহমৎ তখন উদ্‌ভ্রান্তের মত টিপ ছিল—রিভলবারের স্প্রিং—কিন্তু—"গুলী" তখন শেষ—রিভলবার শব্দহীন। সঙ্গে সঙ্গে জনতার ভেতরে গফুর সাহেবের মুখ থেকে উচ্চারিত হ'ল—গুলী শেষ হয়েছে এবার কাফেরকে হত্যা কর—

কথা শেষ হওয়ার আগেই রক্তলিপ্সু বর্শা তীরবেগে এসে পড়্‌ল রহমতের বুকে।

মুস্লীম বীরের মর্ম্মদাহী আর্ত্তনাদ এক মুহূর্ত্তের জন্যে ক্ষিপ্ত জনতাকে স্তব্ধ করে দিল—মুখ থেকে বেরোল,—"বাপ-জান—"

অদূরে স্তব্ধ জনতা ভেদ করে সে মর্ম্মন্তুদ আহ্বান গফুর সাহেবের কাণে গিয়ে পৌছিল—ছুটে এসে দেখলেন—অনিলের স্থলে রক্তাক্ত কলেবরে মুস্লীমবীর—পুত্র রহমৎ, মুস্লীম

জনতার ভেতর গফুর সাহেবের গগনভেদী চীৎকার ধ্বনিত হ'তে লাগল। মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদের ভেতর দিয়ে তাঁহার মুখ থেকে—বেরুল, 'মুস্লীম-সমাজ! আমি ভুল বুঝেছি, তোমরা ভুল বুঝেছ, আমি হিন্দুর সাথে মিলনের কবিতা লিখে রাখব রহমতের রক্ত দিয়ে—তোমরা ঘরে ফিরে যাও—'

রহমতের তৈলহীন জীবন-প্রদীপ তখন নিব নিব, সে ক্ষীণ কণ্ঠে বল্ল—'বাপজান! আমায় ক্ষমা কর! অনিল আমার প্রাণের বন্ধু—তাকে দেখো—যদি এখনও বাঁচাতে পার—আমার রক্ত দিয়ে "মিলন"-সূত্র রঞ্জিত কর! আমাদের দুজনের কায়া ছিল ভিন্ন, আত্মা ছিল এক। আমি কোরাণ সরিফের বাণী পালন করেছি—বাপজান!'—বলবার হয় তো তার আরও কিছু ছিল কিন্তু আর বলা হ'ল না—অনন্ত স্মৃতি রেখে মুস্লিম্ বীরের আত্মা চলে গেল ধীরে ধীরে পরপারের সন্ধানে—রেখে গেল—"ভালবাসার স্মৃতি" আর "মুস্লিমের বীরত্ব"।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে আস্‌ছিল—। সরে গেল জনতা। নির্ব্বাক নিস্পন্দ গফুর সাহেবের কাণে এসে ধ্বনিত হচ্ছিল—কে যেন গায়িতেছিল—

> হিন্দু মুসলমান এক মায়ের সন্তান—
> সমস্বরে গাও আজি মিলন গান,
> ভুলে যাও ভাই ভেদাভেদ জ্ঞান
> এই তো 'মুক্তি,' এই তো স্বাধীনতার চরম-সন্ধান।

হিন্দুর জীবনে ঐক্য

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য

বৎসরান্তে হোলির উৎসব লাগিয়াছে। ফাল্গুন আবার ফিরিয়াছে। আমের মুকুলে গাছগুলা ছাইয়া ফেলিয়াছে। কোকিলের পঞ্চস্বরে দিঙমণ্ডল ঝঙ্কৃত। হিন্দুস্থানীর দল রাস্তায় রাস্তায় "হোলি হায়" বলিয়া চীৎকার করিয়া দ্রুত তালে খঞ্জনী বাজাইয়া পল্লীর চমক ভাঙ্গাইতেছে। নিরীহ বাঙ্গালী শিশুও শান্ত শিষ্টভাব ছাড়িয়া পথের লোকের উপর দৌরাত্ম্য করিতেছে-ফাগ ছুঁড়িতেছে—উড়াইতেছে—গায়ে, কাপড়ে রঙ দিতেছে। গালি খাইতেছে—ঝগড়া করিতেছে। দোলের এই সকল বাহ্য অঙ্গ অনেকটা পূর্ব্বের মতই আছে, কিন্তু হিন্দু সমাজের প্রাণে সেই স্পন্দন—সেই দোলা দিতে ইহা আর কি পারে? সেকালে আনুষ্ঠানিক হিন্দু বুঝাইতে বলিত, অমুকের বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব ঘটে! এই দুইটাই জনসাধারণের ধর্ম্ম-জীবনে প্রধান উৎসব ছিল। এই দুই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী শক্তি ও প্রেমের সাধনা করিয়াছে। তাই এককালে দশভুজার পূজায় বাঙ্গালী আনন্দ হিল্লোলে ভাসিত—আত্মহারা হইত। সে আনন্দ, উৎসাহ, সে মিলনের আগ্রহ আছে কি? সার্ব্বজনীন শক্তি-পূজার উৎসবে সে বিরাট্ আকার কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু এককালে প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থেরই ইহা যে গৌরব ছিল। আর দোল? প্রেমের উৎসব—গালভরা হাসি, প্রাণ-খোলা আমোদ-কৌতুক, উচ্ছলিত জীবনীশক্তির সর্ব্বতোবিসারী সে স্পন্দন—কোথায় পাইব? দোলের অনুষ্ঠানের প্রত্যেক অংশেই যে প্রীতি, ও পরিহাসের কোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিত, সে মেড়া-পোড়া, সে চাঁচর, সে আবিরে মাতামাতি—ক্রমশঃই যেন শীর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। ইহার অর্থ কি?

শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায় ইহাকে একরূপ দূরে পরিহার করিয়া থাকে। প্রাচীন উৎসবাদির মধ্য হইতে আমরা কতদূর সরিয়া পড়িয়াছি—ইহা তাহারই পরিচয়। যে পর্ব্ব ও উৎসব, এত পূজা প্রভৃতির মধ্যে অতীত যুগে দেশের প্রাণ পুষ্ট হইয়াছিল তাহার সহিত নাড়ীর বন্ধন ক্রমশঃ ক্ষীণ কোথাও বা ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। জীবনের

পরিচয় বাজে কাজে। যাহার প্রাণশক্তি ক্ষীণ সে অতি অল্প বিষয়েই আগ্রহ ও উৎসাহ বোধ করিয়া থাকে। তাহার চিত্তের পরিধি নিতান্তই সীমাবদ্ধ। যাহার প্রাণ সরল ও সুপুষ্ট—তাহাকে বিশ্বের সকল রূপ, রস নিত্য আকৃষ্ট করিয়া থাকে—সে বন্যার প্রবাহের মত কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কূল ছাপাইয়া বহিতে থাকে। তাই স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য্যে বাঙ্গালার প্রাণ যখন সতেজ ও সরস ছিল তখন নানা প্রকার আমোদ ও উৎসবের ভিতর দিয়া সে চরম সার্থকতা ও তৃপ্তি পাইত। সোণার বাঙ্গলার সেই সুখের দিনের স্মৃতির নিদর্শন এই দোলের উৎসব, যে উৎসবের শুষ্ক কঙ্কাল আজ চোখে পড়ে।

মনুষ্য মনের স্বাভাবিক সুস্থবৃত্তি যে প্রীতি—যাহাতে জগৎ মনোরম, জীবন আশাময়, সংসার সংহত হয়, যাহার উচ্ছ্বসিত লীলাই দোলযাত্রা তাহা যেন ভাঁটার জলের মত হিন্দুর সামাজিক জীবনের ক্ষতকে শূন্য করিয়া অপসৃত হইয়া পড়িতেছে। চারিদিকে শুধু মতের ও পথেরই বাহুল্য —দিন দিন অসংখ্য নূতন দল, নূতন প্রতিষ্ঠান দেখা দিতেছে। বিভ্রান্ত পথহারা সমাজকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখাইবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। কত সমিতি, সঙ্ঘ, সভা ও সম্মেলন জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি-স্থাপনের জন্য বসন্তে ঘণ্টাকর্ণ ফুলের মত যে চারিদিকে মাথা তুলিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সে পরেশ-পাথরের সন্ধান এখনও ফুরাইতেছে না—জাতির প্রাণ যে টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া কুচা সোণার মত ছড়াইয়া রহিয়াছে—তাহাকে এক করিবার সে 'প্যান' কিছুতেই মিলিল না। দোল পূর্ণিমায় উপাস্য প্রেমের দেবতার আশীর্ব্বাদে সে সন্ধান মিলিবে কি? যে ঠাকুরের চরণ স্পর্শে পাষাণও সোণা হয় হিন্দুর মানসাকাশে তাঁহার উদয় হইবে কি?

সামাজিক বিষয় লইয়া যত আলোচনা, আন্দোলন আজকাল চলিতেছে তাহাতে হিন্দু-জীবনের ঐক্যের বার্ত্তা কচিৎ শোনা গিয়া থাকে—কারণ আন্দোলনের প্রাণ দ্বন্দ্ব—বিরোধ। যাঁহারা প্রাচীনকে রক্ষা করিতে তৎপর, তাঁহারা স্মার্ত্ত-বিধানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জনে জনে যত প্রকার পার্থক্য ও প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা বজায় রাখাই কল্যাণ ও নিরাপত্তার হেতু—ইহা বুঝাইতে ব্যস্ত। যাঁহারা সংস্কারক তাঁহারা এই সকল প্রভেদ ও পার্থক্য দূর করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিলেও—সমাজ মধ্যে কার্য্যতঃ এক নূতন বিভাগ ও বিচ্ছেদ ঘটাইতেছেন। ফলে মিলনের মন্ত্র চক্ষুর অন্তরালে গিয়া পড়িতেছে।

হিন্দু বলিলে সাধারণতঃ মানুষে মানুষে, স্ত্রী ও পুরুষে, জাতি ও বর্ণ অনুসারে অসংখ্য বৈষম্যের কথাই ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু বৈষম্যে কখনও কোন সমাজকে বাঁধিতে পারে কি? হিন্দু সমাজের নানা স্তর, নানা সম্প্রদায়কে যে অনুভূতি মিলিত ও সংহত করিয়াছিল তাহা কি? জীবনের ক্রম ও পরিণতি সম্বন্ধে কোন্ ধারণা সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে সাধারণ ছিল, যাহা সকল ঘটনা, সকল পরিবর্ত্তনকে সঙ্গতি দিয়াছিল, সকল পার্থক্যের মাঝে সমপ্রাণতা—সহানুভূতি জাগাইয়াছিল? আচণ্ডালব্রাহ্মণ সকলকেই একই প্রকার ধর্ম্মের আস্বাদ দিয়াছিল? সকলকে এক ভূমিতে উপনীত করিয়াছিল? জীবনে আনন্দ, মরণে সান্ত্বনা দিয়াছিল? উৎসুকচিত্ত দোলপূর্ণিমায় প্রীতির উৎসব সেই তত্ত্ব খোঁজে না কি?

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। হিন্দুর জীবনের দুইটী ভাগ—একটী লৌকিক, সামাজিক বা ব্যবহারিক, অপরটী আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক। ব্যবহারিক জগতে মনুষ্যের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে নানা ইতর-বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। বিশেষ ধর্ম্ম যে কত অসংখ্য প্রকারের হইতে পারে—স্মৃতি গ্রন্থে তাহার প্রমাণ যথা, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, দেশ-ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম। ব্যবহারিক ভেদবুদ্ধি হইতেই এ সকলের উৎপত্তি। এই জন্যই অধিকার ও অনধিকারের সূক্ষ্ম বিচার—আচার ও অনুষ্ঠানের নানা প্রকার তারতম্য। শৌচ ও প্রায়শ্চিত্তের ক্ষেত্রে বর্ণ-হিসাবে নানা বিধান। তাহা হইলে সামাজিক বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঐক্য বা সাম্য কোথায়? এই সকল প্রভেদের দিক্‌টাই বজায় রাখা এক দল সমাজের কল্যাণ ও আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু শাস্ত্রে বিশেষ ধর্ম্মের প্রপঞ্চ যেমন বিস্তৃতভাবে প্রকটিত হইয়াছে সামান্য বা সাধারণ ধর্ম্মও তেমনই বহুস্থলে কীর্ত্তিত হয় না কি? মনু বলিয়াছেন—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।

সন্তোষ ও ক্ষমা, চিত্তবৃত্তি ও সংযম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিরোধ, জ্ঞানার্জ্জন, জ্ঞানবিস্তার, সত্য এবং অক্রোধ—ইহা সাধারণ ধর্ম্মের লক্ষণ। মহাভারতেও লিখিত আছে—

সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষো হ্রীঃ ক্ষমার্জবম্।
জ্ঞানং শমো দয়া ধ্যানমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

এই সাধারণ ও সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি নানা কারণে যে দুর্ব্বল হইয়া, অবজ্ঞাত হইয়া পড়িতেছে তাহা যাঁহারা বিশেষ ধর্ম্মের নানা প্রপঞ্চ বজায় রাখিতে ব্যস্ত প্রায় প্রত্যেক স্থলে তাহা তাঁহাদের লক্ষ্যের অতীত হয় না কি?

গৃহস্থ মাত্রের পালনীয় আর একটী কর্ম্ম—পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান। স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিগণের, হোমের দ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণের এবং অন্নের দ্বারা জীবসাধারণের অর্চ্চনা করা শাস্ত্রানুসারে প্রতি হিন্দু গৃহীর নিত্য অনুষ্ঠেয়। ইহাও একটী সাধারণ ধর্ম্ম। সভ্য সমাজকে নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইলে কোন না কোন আকারে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিতেই হইবে। যাঁহারা অতীতে জ্ঞানের দীপ জ্বালাইয়া সমাজের অজ্ঞানতা দূর করিয়াছিলেন এবং নানা তত্ত্বের সম্পদ্ অধস্তন পুরুষগণের জন্য সঞ্চিত রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ শোধ করিবার একমাত্র উপায় জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানবিস্তার। আবার যে অলক্ষ্য শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণে পঞ্চভূতের লীলাক্ষেত্র এই স্থাবর জঙ্গম চরাচর এবং তন্মধ্যে মনুষ্য-জীবনের বিকাশ সেই দেবগণেরও নিত্য উপাসনা ব্যতিরেকে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি পশু থাকে। সেই অলক্ষ্য শক্তির অনুভূতি জাগ্রত রাখার জন্যই দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের বিধান। আবার মনুষ্য-সত্তার এই দেহ যে পিতৃ-পুরুষ-পরম্পরার শুদ্ধ ও সুস্থ জীবনযাত্রার ফলে মানব পাইয়া থাকে—তাঁহাদের অর্চ্চনার নাম শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধই সমাজের রক্ষা-কবচ—পিতাপুত্রের সম্বন্ধের মূল—সমাজের ধারা বজায় করিবার উপায়। কিন্তু এই দেব, পিতৃ ও ঋষিগণের ঋণই সমগ্র নহে। মনুষ্য-জীবন জনহীন প্রান্তর বা সমুদ্র-মধ্যস্থ শূন্য দ্বীপে যাপিত হইতে পারে না—স্বজাতীয়ের সহিত নিত্য নানা প্রকার বিনিময়ের দ্বারা মানব-জীবন পুষ্ট ও গঠিত হয়। এই সমান জাতীয় প্রাণীর নিকট আমরা যে অশেষ উপকার পাইয়া থাকি তাহার যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদান—অতিথি-সেবা। এতদ্ব্যতীত সকল প্রাণীর নিকট মানুষের কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আছে—সকল প্রকার প্রাণীর সমাবেশে বিচিত্র এই জগতে মানবের উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই সকল জীবের সহিত মানবের কি সম্বন্ধ তাহা বিজ্ঞানও আজকাল বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। চারিদিকে এই যে ঊর্ণনাভের জালের মত সংযোগের সূত্র বিস্তৃত রহিয়াছে—কীটপতঙ্গ হইতে শ্রীভগবান্ পর্য্যন্ত যে সম্বন্ধের শৃঙ্খলা গ্রথিত রহিয়াছে—ইহার মধ্যে বিন্দুতে মানবের স্থান। জীবনকে যদি ব্যাপকভাবে দূরদৃষ্টিসহ নিরীক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে এই ঋষি, দেব, পিতৃ, নর ও ভূতগণে পরিবেষ্টিত ও পরিরক্ষিত একটা জ্ঞানের স্ফুরণ ভিন্ন ইহা কি? পঞ্চ মহাযজ্ঞের উদাত্ত কল্পনায় মনুষ্য-সমাজ ও মনুষ্য-জীবনের যে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—পৃথিবীর অন্যত্র তাহার তুলনা কোথায়? অথচ সুদূর বৈদিকযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই আদর্শ হিন্দুর চিত্তপটে অঙ্কিত থাকিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক গৃহীকে জীবনের স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়াছে। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের পালনই হিন্দুর হিন্দুত্বের একটী সাধারণ ভিত্তি। ইহার দ্বারা সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মতা-বোধ হিন্দুর মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকে বা থাকিত। এই সর্ব্বজীবের ঐক্যোপলব্ধি হইতেই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতাম্—শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের এই চরম প্রার্থনায়—ব্যক্ত। সামাজিক জীব হিসাবে গৃহীর পালনীয় যেমন পঞ্চ মহাযজ্ঞ—তেমনই অপর দিকে ব্যক্তি হিসাবে সার্থকতালাভের জন্য মনুষ্যের প্রয়োজন—স্বীয় দেবত্বানুভূতি। আত্মার স্বরূপ প্রকাশে হিন্দুর উপনিষদ্ ও দর্শন চিন্তা-জগতে অদ্বিতীয়। কিন্তু এই স্বরূপ যাহাতে নিত্য ধ্যান ও ধারণার বিষয় হইতে পারে হিন্দুর উপাসনা-পদ্ধতি সেইভাবে রচিত। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম্মের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—মানুষের মধ্যে নিহিত দেবত্বের স্ফুরণই ধর্ম্ম। দেবতা ও মানুষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র পদার্থ হইলে উপাসনার ফল কি? স্রষ্টা ও সৃষ্টের মধ্যে সংযোগ-সেতু উপাসনা। সেতুর এক প্রান্তে তট—অপর প্রান্তে যদি অকূল পাথার হয়—তাহা হইলে যোগ হয় কিরূপে? সমানে অসমানে মিলনের অর্থ কি? তাই শাস্ত্রের উপদেশ—দেবো ভূত্বা দেবং যজেত।—

অহং দেবোঽথ নৈবেদ্যং পুষ্পগন্ধাদিকং যৎ।
তোয়াধারস্তথা তোয়ং দেবং দেবায় যোজয়েৎ॥

—এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রের অনিবার্য্য গাম্ভীর্য্যে এই তত্ত্বেরই বিস্তার।

উপাসক, উপাসনার উপকরণ এবং উপাস্য—সকলই দেবময়। এই দেবত্ববুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই আস্তিক হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয় মন্ত্রটী এইরূপ—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

হিন্দুস্থানের জনসমাজকে একদিকে গার্হস্থ্য ও সামাজিক-জীবনে ও অপর দিকে অধ্যাত্ম-সাধনায় দৃঢ়, স্থির ও নিবিষ্ট করিবার জন্য মানবদেহে শ্রীভগবান্ দুইবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে উত্তরকোশলে "রাঘব রঘুপতি রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম"-রূপে এবং দ্বাপরে বৃন্দাবন-বিহারী গোপগোপীচিত্তহারী নন্দদুলালরূপে। হিন্দু পঞ্চ দেবতার পূজা করে মন্দিরে—কিন্তু তাহার মনোমন্দিরের অধীশ্বর এই দুই দিব্য পুরুষ। তাই ভক্ত ভারতের এক অর্দ্ধাংশ শ্রীরামদাস এবং অপর অর্দ্ধাংশ শ্রীকৃষ্ণদাস। বর্ত্তমান যুগের সমন্বয়াবতার পরমহংসদেবের শ্রীরামকৃষ্ণ নাম আকস্মিক বা অহেতুক নহে। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে ভারত সাগরের তীর পর্য্যন্ত কত অরণ্য, কত পর্ব্বত, কত নদী, কত জনস্থান এককালে রঘুপতির পদরজঃ বুকে করিয়াছিল বলিয়া আজও পবিত্র তীর্থরূপে অগণিত নরনারীকে পুণ্য বিতরণ করিতেছে এবং কত কবি, কত কথক, কত গায়কের মুখে সেই উদার মহনীয় কাহিনী যুগে যুগে ধ্বনিত হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের আকাশ-বাতাস কম্পিত ও জনমন স্তব্ধ করিয়াছিল। আজও সেই পিতৃসত্য পালনের জন্য রাজ্য ও সিংহাসন ত্যাগের কথা, তরুণী বণিতাকে সাথে করিয়া ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম কান্তার অতিক্রমণের করুণ ইতিবৃত্ত হিন্দুকে ব্যাকুল করে—তাহার চিত্ত বিগলিত করে। হিন্দুর গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনাকাশে রামসীতার শ্রবণাভিরাম জীবন-কথা ধ্রুব নক্ষত্রের মত আজিও স্থির, স্নিগ্ধ-জ্যোতি বিকিরণ করিয়া সংসারের গহন পাথারে অগণিত নরনারীর অন্তরের আনন্দ ও কল্যাণের পথনির্দ্দেশ করিতেছে; কিন্তু গার্হস্থ্যের অতীত, সামাজিক-জীবনের পারে যে আর একটী ভূমার রাজ্য মানুষকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে—যেখানে দারাপুত্র, বিত্ত, পরিজন ভুলিয়া, পার্থিব সুখ-দুঃখের মায়া অতিক্রম করিয়া জীব অনন্তের সন্ধানে অগ্রসর হয়—জীবনের গভীরতম তত্ত্বের সম্মুখীন হয়—হিন্দুকে নিরন্তর তাহা স্মরণ করাইবার জন্য, তৎপ্রতি উন্মুখ রাখিবার জন্য দশাবতারের অতিরিক্ত শ্রীভগবানের অপর রূপ—শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি—নিরত বিরাজমান। বৈষ্ণব সাধক কবিগণ এই রসঘন রাধারমণ-মূর্ত্তির ধ্যানে বিভোর—ইহার মহিমা ব্যাখ্যানে আত্মহারা। ভক্তের চোখে শ্রীভগবানের এই মূর্ত্তি সর্ব্বদা সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত—মাত্র কল্পনার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা ইহার অনুভব করিতে হয় না। আকাশের নীলিমায়, মেঘের কালিমায়, তরুলতার শ্যামলতায়, কোকিলের কাল পাখায়—অধঃ, ঊর্দ্ধ, সম্মুখে, পশ্চাতে যেখানে শ্রীরাধার মত ভক্তের দৃষ্টি পড়ে সেইখানেই এই অনন্তের রূপ প্রতিভাসিত হয়। সেই জন্য বৈষ্ণব কবির উক্তি—

সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল
সেই হেরে যার আঁখি হয় নিরমল।

আর্য্য-সভ্যতার আদি উৎস—এই ভূমার সন্ধানে। অনন্তের এই অনুভূতি আর্য্য-জীবনের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এই আকর্ষণ হিন্দু-সমাজকে আজও মুগ্ধ রাখিয়াছে—তাই নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যে নানা আদর্শের সংঘাত সত্ত্বেও হিন্দু অন্তর্মুখীন—ভক্তির প্রাণ হিন্দু সমাজের বিষ্ণু-পঞ্জরের তলে এখনও নিত্য স্পন্দিত। সেই জন্যই ভক্ত বলেন—শ্যামের বাঁশরী নিত্যই ধ্বনিত—সেই বিশ্ব-বিমোহন মুরলীর স্বরলহরী সতত সুরের জাল বুনিতেছে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এই ধ্বনির নিখিল-মোহন শক্তি বুঝাইবার জন্য গায়িয়াছেন—

লোকানুন্মদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্ ক্ষোণীরুহান্ হর্ষয়ন্
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্ গোবৃন্দমানন্দয়ন্।
গোপান্ সম্ভ্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্ সপ্তস্বরান্ জৃম্ভয়ন্
ওঙ্কারার্থমুদীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ॥

চির-নবীন, চির-সুকুমার সেই গোপকুমারের বংশীরব নিত্য জয়ী। এই সুরের তরঙ্গে সপ্তলোক উন্মাদনাময়। এই ধ্বনিতে শ্রুতি মুখরিত। মহীরুহসকল আনন্দে পুলকিত; পাষাণ বিগলিত, মৃগকুল অবশ, গোবৃন্দ উল্লসিত, গোপগণ সম্ভ্রমে চকিত, মুনিগণ ধ্যানে নিমীলিতনেত্র। সপ্তস্বর মূর্চ্ছিত এবং শ্রুতিসার প্রণব ইহাতে উদীরিত।

এই মুরলী-ধ্বনির ঝঙ্কারে মাতোয়ারা হইয়া কত সাধু,

কত ভক্ত, কত সন্ন্যাসী গৃহপরিজন-বিত্তবৈভব ত্যাগ করিয়া, যে লোকালয় হইতে সুদূরে নিবিড় জঙ্গল, দুর্গম গুহা আশ্রয় করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন ও অপার আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন। এইসকল ভক্ত ও বিরক্ত পুরুষের অন্তরের বাসনা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রার্থনাতে অভিব্যক্ত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চিন্ময় বিগ্রহের সাক্ষাৎলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া ভক্ত চূড়ামণি গাহিয়াছেন—

ন যাচেঽহং রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূং।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

রাজ্য চাই না—কনক-মণিমাণিক্য-সম্পদ্‌ও চাই না, সকল লোক যে মনোরমা কান্তার আকাঙ্ক্ষায় কাতর তাহাও চাই না। ভূতনাথ মহাদেব যাঁহার কীর্ত্তিগাথা গানে অনাদিকাল হইতে নিত্য নিরত সেই প্রভু জগন্নাথ আমার নয়নপথের পথিক হউন—শুধু ইহাই চাই।

বিশ্বাত্মভূত পুরুষকে নয়নগোচর করিবার, বংশীধারীর নিত্যঝঙ্কৃত বেণুরব কর্ণগোচর করিবার এই যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ইহাই হিন্দুর জীবন ও হিন্দু-সমাজের মূলতত্ত্ব। শ্রদ্ধার সম্পদ্ এই সূত্রে গ্রথিত হইয়াই হিন্দু-সমাজের নানা বিভাগ, জীবনের নানা স্তর, কর্ত্তব্যের নানা বৈচিত্র্য ঐক্য-বদ্ধ হইয়াছিল। ঐক্যবদ্ধ হইয়া মালার আকারে জাতিকে বাঁধিয়াছিল, বাঁচাইয়া রাখিয়া ছিল—আনন্দ ও সান্ত্বনা দানে সজীব ও সতেজ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে নানা মত ও নানা পথের দ্বন্দ্বের মাঝে এই মিলনের রহস্যকে আবার পরিস্ফুট ও বাস্তব আকারে পরিণত করার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। নহিলে পৃথিবীময় নবীনকে, অজ্ঞাতকে বরণ করিবার জন্য যে চাঞ্চল্যের তরঙ্গ চারিদিকে প্রসৃত হইতেছে তাহার মাঝে হিন্দুর আত্মবিস্মৃতি অনিবার্য্য।

জ্বলন্ত চুল্লী

(গল্প)

শ্রীআশু চট্টোপাধ্যায়

গ্রীষ্মের গুমট সন্ধ্যা। সূর্য্যাস্তের শেষ আভাটুকু তখনও মিলিয়ে যায় নি। বাগানের অন্ধকার গাছগুলা যেন মূর্ত্তিমান স্তব্ধতা। রাস্তার ধারে একটা গ্যাসের আলো মিটমিট করে জলছিল—দূরের বিলীয়মান দিগন্তের কোলে রেল-লাইনের তিনটী অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছিল।

হাওয়ার আশায় তারা খোলা জানলার পাশে বসেছিল।

একটু ভয়ে ভয়ে লোকটী বল্লে, "সে কিছু সন্দেহ করে না তো ?"

"হাঁ, আবার সন্দেহ কর্‌বেন!" এমনই বিরক্তির সঙ্গে মেয়েটী উত্তর দিল যে মনে হ'ল তা'তেও তার অসন্তোষ, "কাজ আর দর-দস্তুর ছাড়া উনি বোঝেন কি ? এসব বোঝবার জন্যে যেটুকু কল্পনা-শক্তির দরকার তাও ওঁর নেই।"

লোকটী বল্লে, "এই সব কেজো লোকদের ওসব মনোবৃত্তি থাকে না। আমি জানি ওদের হৃদয় বলে কোন জিনিস নেই।"

"ওঁর অন্ততঃ নেই" বলেই মেয়েটী অপ্রসন্ন মুখ জানালার দিকে ফিরিয়ে নিল।

ভীষণ শব্দে একটা ট্রেণ চলে গেল। বাড়ীটা যেন কেঁপে উঠল।

লোকটী বলতে লাগল, "দেখ না আগে দেশটা কেমন সুন্দর ছিল। এখন যেদিকে চাও কেবল কল, কারখানা, ধোঁয়া—" গলাটাকে একটু নামিয়ে বল্লে, "কিন্তু মনে থাকে যেন—কালকে—"

জানালার বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে মেয়েটী উত্তর দিলে, "হাঁ, কালকে।"

মেয়েটার হাত নিজের হাতের ভেতর টেনে নিয়ে লোকটা বল্লে, "প্রিয়তমে!"

চকিতে মেয়েটী ফিরে তার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি কোমল হ'য়ে এল। বল্লে, "প্রিয়তম! আমি অবাক হ'য়ে ভাবি কোথা থেকে তুমি এসে—"

"আমি এসে—কি?"

"এসে আমার সামনে এমন প্রেমের ভুবন খুলে দিলে—"

খট্ করে দরজাটা বন্ধ হ'বার শব্দ হ'ল। মাথা ফিরিয়েই তারা ভীষণরকমে চমকে উঠল; অন্ধকার ঘরে একটা অন্ধকার মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে—নিঃশব্দে।

অশোকের শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। নিঃশব্দে কখন দরজাটা খোলা হ'য়েছে তারা জানতে পারে নি তো! কি কি কথা সে শুনেছে? সব কথাই শুনেছে না কি? কিছু দেখতে পেয়েছে কি? প্রশ্নের আর অন্ত নেই।

কিছুক্ষণের অসহ্য স্তব্ধতার পর নবাগত লোকটী বললে, "তারপর?"

দু'হাতে জানালাটা চেপে ধরে স্খলিতকণ্ঠে অশোক বললে, "মনে করেছিলাম তোমার সঙ্গে আজ আর দেখা হ'ল না বিপিন।"

অন্ধকারের ভিতর থেকে বিপিনের বীভৎস চেহারাটা এগিয়ে এল। অশোকের কথায় সে কোন উত্তর দিল না, মাত্র কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটার বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছল। গলাটাকে যথাসম্ভব কাঁপতে না দিয়ে সে বললে, "অশোকবাবুকে বলছিলাম যে তুমি এসে পড়তেও পার।"

বিপিন নিঃশব্দে পাশের চৌকীটাতে বসে পড়ল। সে উত্তেজনা দমন করবার চেষ্টা করছিল। জ্বলন্ত দৃষ্টি তার বিশ্বস্ত বন্ধু আর বিশ্বাসের পাত্রী স্ত্রীর উপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

মনে হচ্ছিল এতক্ষণে সকলেই সকলের অবস্থা বুঝে নিয়েছে। কেবল অবস্থাটাকে সহজ করবার মত কথা কেউ খুঁজে পাচ্ছিল না।

শেষে স্বামীই নিস্তব্ধতা ভাঙলে, "তুমি আমায় খুঁজছিলে অশোক?"

চমকে উঠে অশোক বললে, "হাঁ, তোমায় খুঁজতেই এসেছিলাম।" সে ভেবে দেখলে শেষ পর্য্যন্ত মিথ্যা কথা তাকে বলতেই হ'বে।

বিপিন শুধু বললে, "ওঃ।"

"এখানে চাঁদের আলোর আর কারখানার ধোঁয়ার যে চমৎকার দৃশ্যের অবতারণা হয় তুমি তাই আমায় দেখাবে বলেছিলে।"

বিপিন নিরস কণ্ঠে বললে, "ওঃ।"

"অশোক বলতে লাগল, "তাই আফিসের পরে বিকালের ট্রেণে উঠে ভাবলাম আজ তুমি রাত্রে কারখানায় যাবার আগে তোমায় ধরে তোমার সঙ্গে যাব।"

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ, ব্যাপারটা কি চাপা পড়ে গেল না কি? সত্যই কি সে কিছু জানতে পেরেছে? ঘরে কতক্ষণ সে এসেছিল? কিন্তু যখন দরজার শব্দ হ'য়েছিল তখন দুজনের ভঙ্গীটা মোটেই শোভন—

বিপিন স্ত্রীর দিকে চেয়ে ছিল। পরে একবার অশোকের দিকে চেয়ে দেখলে। তারপরে সে যেন হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হ'য়ে গেল। বললে, "হাঁ হাঁ, কারখানার ভিতরের জীবন-নাট্য তোমায় দেখাব বলেছিলাম বটে। আশ্চর্য্য ব্যাপার, একদম ভুলে গেছলাম!"

অশোক বলতে লাগল, "অবশ্য এতে যদি তোমার অসুবিধায় ফেলা হয়, বিপিন, তবে নাই বা—"

বিপিন চমকে উঠল। তার অন্ধকার চোখের কোণে কেমন একটা নূতন আলো ভেসে উঠল। সে বললে, "নানা, অসুবিধা আর কি?"

এতক্ষণে মেয়েটী প্রকৃতিস্থ হ'য়ে উঠেছিল। স্বামীর দিকে ফিরে সে বললে, "অশোকবাবুর কাছেও আগুন আর ধোঁয়ার সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করছিলে বুঝি? আশ্চর্য্য মত কিন্তু তোমার! বল কি না যে পৃথিবীতে একমাত্র কলকব্জাই সুশ্রী! আমি জানতাম অশোকবাবু, যে আপনি ওঁর হাত থেকে নিস্তার পাবেন না। ওঁর এই এক আবিষ্কার যে—"

স্ত্রীর উৎসাহ নিবিয়ে দিয়ে রুক্ষভাবে বিপিন বললে, "আমি আবার কি আবিষ্কার করি!—তবে আজকাল দু'-একটা যা' আবিষ্কার করতে হচ্ছে—তা'তে—" সে থেমে গেল।

"তা'তে কি ?" স্ত্রী বল্লে।

"কিছু না" বলে সে উঠে দাঁড়াল। বন্ধুর কাঁধে প্রকাণ্ড থাবাটা রেখে বললে, "কারখানা দেখতে যাবে না কি ?"

"চল না" বলে অশোক উঠে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ অন্ধকারে তিনজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল—বিপিনের হাতটা তখনও অশোকের কাঁধে। অশোকের একবার মনে হ'ল যে আগের ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। কিন্তু মেয়েটা তার স্বামীকে ভাল করেই জানত ;—জানত যে ওই স্থির গাম্ভীর্য্যের পিছনে বিভীষিকা লুকিয়ে আছে।

"হাঁ চল যাওয়া যাক" বলে বিপিন দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল।

"আমার ছাতাটা ?" বলে অশোক অন্ধকারে ফিরে দাঁড়াল।

"ওটা আমার এসরাজ" বলে মেয়েটা অকস্মাৎ উচ্চহাস্য ক'রে উঠল। চেয়ারের পিছনে দু'জনের হাতে হাতে স্পর্শ হ'ল।

"এই যে পেয়েছি।" অশোক বল্লে।

মেয়েটার মনে হ'ল তাকে চুপিচুপি সাবধান করে দেয়। কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। সুযোগ চলে গেল।

"পেলে হে ?" দরজা থেকে বিপিন হাঁকলে।

অশোক তার দিকে এগিয়ে গেল।

মেয়েটা ছুটে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখলে বনের পথে দুটা মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল।

* * *

গুমটে অশোকের বড় কষ্ট হচ্ছিল। দু'জনে নিঃশব্দে পথ হাঁটছিল। দূরে দূরে দু'-একটা পাহাড়। কোথাও একটা বাড়ীর জানলার আলো জ্বলছে। দূরে দূরে কোন কোন কারখানার তখনও কাজ চলছে। চিম্‌নীগুলা দৈত্যের মত আকাশের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রেল-লাইনের ধারে ধারে কয়লা ঢালা। দু'-একটা মালগাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আর দূরে কোম্পানীর "জ্বলন্ত চুল্লী" (Blast furnace) লোহার কারখানা। বিপিন এখানেই কাজ করে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল চিমনীর মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরিয়ে আকাশ রাঙা করে তুলছে আর তার পরেই রাশি রাশি কালো ধোঁয়ায় গগন আচ্ছন্ন হ'য়ে যাচ্ছে।

অশোক নিস্তব্ধতা ভেঙে বললে, "সত্যি বিপিন, এখানকার আলো-ছায়ার খেলা চমৎকার।"

বিপিন উত্তর দিল না। সে রেল-লাইন আর কারখানার দিকে চেয়ে চেয়ে কি একটা সমস্যার সমাধান করছিল।

অশোক একবার তার দিকে, একবার দূরের দিকে চেয়ে বললে, "অবশ্য চাঁদের আলো এখনও ভাল করে ফোটে নি।"

সহসা নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির মত বিপিন বললে, "চাঁদের আলো ফোটে নি ?—তা বটে, তা বটে।"

একবার সে ম্লান চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলে, পরে বন্ধুর হাতটা সজোরে চেপে ধরে রেল-লাইনের পথটা ধরে বললে, "চল।"

অশোক দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল, সহসা দু-জনের চোখে চোখে মিলল—সে দৃষ্টির মধ্যে কত কি লুকান ছিল। অশোক অনুভব করল যে বন্ধুর সবলবাহু তাকে এমন ভাবে বেষ্টন করে রয়েছে যে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাকে চলতে হচ্ছে।

তারপরই বিপিন আবোল-তাবোল কত কি বকতে লাগল,—কারখানা, রেলওয়ে, দৃশ্য-পরিকল্পনা, কাজকর্ম্ম কত কি। দম নেবার জন্য সে যখন থামলে তখন তার সবল বাহুর বেষ্টনটা বন্ধুর কাঁধের চারপাশে চেপে বসল। ভূত-গ্রস্তের মত তারা সজোরে রেললাইনের দিকে এগিয়ে চলতে লাগল। অশোক নিঃশব্দে শুধু প্রাণপণে দাঁড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল।

শেষে সে অস্ফুটভাবে বললে, "একি বিপিন, তুমি আমার হাতটাকে ভেঙে দেবার চেষ্টা করছ কেন ? আর আমায় এমন করে টেনেই বা নিয়ে চলেছ কোথায় ?"

বিপিন তাকে ছেড়ে দিলে। তার ধরণও যেন বদলে গেল। বললে, "তোমার হাত ভাঙব কি হে ? কিন্তু তুমিই তো আমার এমনভাবেই হাত ধরাধরি করে চলতে শিখিয়েছিলে।"

অশোক হেসে বললে, "তা হ'লে তুমি এখনও তা ভাল

করে শিখতে পারি নি। বাবা! একেবারে কাবু হ'য়ে পড়েছি!"

বিপিন উত্তর দিল না। ততক্ষণে তারা রেললাইন পার হ'বার গেটের কাছে এসে পড়েছে, সেখান থেকে কারখানাটা বেশ কাছে। গেটেতে "সাবধান ট্রেণ আসবে" লেখাটা কয়লাতে প্রায় মুছে গেছে।

"বেশ দৃশ্য নয়?" বিপিন বললে, "দেখ একটা ট্রেণ আসছে। ধোঁয়া উড়ছে, সামনে 'টর্চ্চ লাইটের' চোখটা জ্বলছে, কেমন ছন্দময় শব্দ! কিন্তু মোটা মুখওয়ালা চিমনী করে দেওয়াতে আমাদের জ্বলন্ত চুল্লীও বেশ দেখতে হয়েছে। চিমনীগুলা শেকল দিয়ে ঝোলান থাকে। দিনে যেমন থামের মত ধোঁয়া ওঠে রাত্রে তেমনই আগুনের হল্‌কা। তোমার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।"

অশোক বললে, "ওঃ। দেখ চাঁদটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।"

বিপিন হঠাৎ তাকে ধরে লাইন পার হ'বার দরজাটার দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললে "চলে এস।" তারপরেই এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যা'তে হতবুদ্ধি হ'য়ে যেতে হয়। অর্দ্ধপথে লাইনের মধ্যে বিপিনের সবলবাহু তাকে যেন পিছনদিকে ঠেলে ধরে রাখতে লাগল। পাশের দিকে চেয়ে সে দেখলে ট্রেণটা দৈত্যের মত তাদের দিকে ছুটে আসছে। অশোক প্রাণপণে বিপিনের হাত ছাড়িয়ে লাইনের ভিতর থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। একমুহূর্ত্তের ধস্তাধস্তি। বিপিন যে তাকে লাইনের মধ্যে ধরে রেখেছিল সেটাও যেমন নিশ্চিত আবার সেই যে তাকে সজোরে টেনে লাইনের বাইরে নিয়ে এসেছিল সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

হাঁপাতে হাঁপাতে বিপিন বললে, "লাইনের মধ্যে দাঁড়াতে আছে!"

অশোক বললে, "ট্রেণটাকে আমি দেখতে পাই নি তো, পেলে কি আর আহম্মুখের মত অমন করে দাঁড়াতুম।"

বিপিন বললে, "চুল্লীর সম্বন্ধে যা বলছিলাম শোন নি বোধ হয়?"

অশোক বল্লে, "না।"

বিপিন বল্লে, "যদি ট্রেণ চাপা পড়তে কি হ'ত বল তো?"

অশোক বল্লে, "কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেছলাম।"

তারপর বিপিন আবার তাদের জ্বলন্ত চুল্লীর বর্ণনা করতে করতে চলতে লাগল। বল্লে, "চুল্লী দেখাবার আগে তোমায় আমাদের কারখানাটা দেখাব চল।"

অশোক নিঃশব্দে চলতে লাগল। সে লাইনের ব্যাপারটা মনে মনে আলোচনা করছিল। বিপিন কি সত্যই তাকে ট্রেণের আগে চেপে ধরেছিল না এটা তার কল্পনা? আর একটু হ'লেই কি সে খুন হয়ে যেত?

যদি এই দৈত্যটা সত্যই কিছু জেনে থাকে। কিছুক্ষণের জন্য অশোক নিজের জীবন-সম্বন্ধে ভীত হ'য়ে উঠল, কিন্তু কিছুক্ষণ মনের সঙ্গে তর্ক করার পর এভাব দূর হ'য়ে গেল, হয় তো বিপিন কিছুই শোনে নি। আর যাই হ'ক, বিপিনই তো তাকে লাইন থেকে টেনে এনেছিল।

অশোক বলে উঠল, "চাঁদের কি সুন্দর শোভা হয়েছে দেখ!"

কারখানার কাছে যেতেই ভীষণ শব্দ কাণে আসতে লাগল। মজুররা বিপিনকে দেখে নমস্কার করতে লাগল। জলের ধারা যেখানে আগুনের আভায় রক্তবর্ণ হয়েছে সেদিকে অশোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিপিন বললে, "দেখ একজায়গায় জলটা পাপের মত রক্তবর্ণ আবার আর একস্থানে চাঁদের আলো পড়াতে মৃত্যুর মত ফ্যাকাসে।"

মাথাটা একবার ঘুরিয়েই অশোক তার সতর্ক দৃষ্টি বন্ধুর উপর ফেলে বললে, "এস আর একটা দিক দেখিয়ে আনি।" বলেই বিপিন অগ্রসর হ'ল। এখন আর বিপিন সজোরে তাকে ধরে ছিল না, তাই অশোকের একটু সাহস হ'ল, কিন্তু তবু সে ভাবতে লাগল। 'পাপের মত লাল' আর 'মৃত্যুর মত ফ্যাকাসে' বললে কেন? দৈবাৎ? হয় তো তাই।

তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল গলান লোহা কেমন করে হাতুড়ীর আঘাতে নানারূপ গ্রহণ করছে। কাচের ভিতর দিয়ে চুল্লীর ভিতরে উঁকি মেরে অশোক দেখলে একটা বিরাট্ আগুন ক্ষুধার্ত্ত হিংস্র পশুর মত পাগল হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।...

তারপরে তারা রেলিং-ঘেরা এমন একটা সাঁকোর মত জায়গায় এসে দাঁড়াল যেটা মাটী থেকে পঞ্চাশ হাত উঁচু। ছোট গাড়ী যাবার লাইন পাতা রয়েছে। অশোকের ভয় করতে লাগল। উপরে মেঘের সঙ্গে চাঁদের দ্বন্দ্ব চলছিল।

"ওই সেই চুল্লী যার কথা তোমায় বলছিলাম" বিপিন বল্লে।

অশোক শক্ত করে রেলিংটা ধরে নীচে চুল্লীটার দিকে চেয়ে রইল। অসহ্য তাপ। গলান লোহার ফোটবার শব্দে আর আগুনের হুঙ্কারে বিপিনের কথাগুলা অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু এখন যেমন করেই হ'ক ব্যাপারটা দেখে নিতে হ'বে।...

বিপিন চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "ওর ভেতরের উত্তাপ হাজার ডিগ্রী। তুমি যদি ওর ভেতরে পড়ে যাও তবে মুহূর্ত্তে বারুদের মত জ্বলে ওঠ। হাত বাড়িয়ে উত্তাপটা পরীক্ষা করে দেখ। এখানেই রেলিংএর বর্ষণোন্মুখ বিন্দুগুলা যেন ফুটছে। চুল্লীটার গায়ের তাপই তিনশো ডিগ্রী ?"

অশোক বল্লে—"কি ! তিনশো ডিগ্রী ?"

বিপিন বললে, "হাঁ, তিনশো ডিগ্রী। পলকে তোমার দেহের সব রক্ত ফুটে উঠবে।"

অশোক ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে, "কি বল্লে ?"

"পলকে তোমার সমস্ত রক্ত—; না পালাতে পারবে না।"

"আমায় যেতে দাও" অশোক চেঁচাতে লাগল, "আমার হাত ছেড়ে দাও।"

প্রথমে এক হাতে পরে দু'হাত দিয়ে সে রেলিংটাকে চেপে ধরলে। কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পরে সহসা একটা ভীষণ ধাক্কায় বিপিন তাকে রেলিং থেকে ছাড়িয়ে নিলে। অশোক বিপিনকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। কিছুক্ষণ শূন্যে ঝুলতে লাগল, পরে গাল, ঘাড় আর হাঁটু একসঙ্গে তপ্ত চিমনী স্পর্শ করলে।

যে চেনটা দিয়ে চিমনীটা ঝোলান ছিল মরিয়া হ'য়ে সেটাকে জড়িয়ে ধরলে ;—চিমনীটা যেন একটু নেমে গেল আর নীচের বহ্নিকুণ্ড থেকে অগ্নির রক্তজিহ্বা যেন তার দিকে ছুটে আসতে লাগল। হাঁটুতে অসহ্য যন্ত্রণা হ'তে লাগল, হাতের মাংস পোড়ার গন্ধ উঠতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে সে চেন ধরে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল। এমন সময় কে যেন তার মাথায় আঘাত করলে। চুল্লীর মুখ-গহ্বরটা যেন তার চারদিকে ঘিরে আসতে লাগল।

উপরে চেয়ে দেখলে বিপিন একটা কয়লা বোঝাই গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তখন চেঁচাচ্ছিল, "পুড়ে মর পাজী। স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিস, পুড়ে মর পুড়ে মর।"

হঠাৎ সে পাশ থেকে কয়লার চাঁই তুলতে লাগল আর অশোকের দিকে ছুড়তে লাগল।

"বিপিন !" অশোক চেঁচাতে লাগল, "বিপিন ?"

চুল্লীর তপ্ত গাত্র থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য চেন ধরে ঝুলে থেকে সে চেঁচাতে লাগল। সব কয়লার চাঁই-গুলোই এসে তাকে আঘাত করছিল। তার জামা-কাপড় জ্বলতে লাগল। সহসা চিমনীটা নেমে গেল আর এক ঝলক অগ্নিশিখা এসে তাকে ঘিরে ধরলে।

তাকে আর মানুষ বলে চেনা যাচ্ছিল না। আগুনের হল্কা চলে গেলে বিপিন দেখলে মাথায় রক্তমাখা একটা কাল বস্তু তখনও যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে চেন ধরে ঝুলছে।

সেই অমানুষিক জীবটার দিক থেকে মাঝে মাঝে কাতর ধ্বনি ছুটে আসছিল।

এই দৃশ্যে সহসা তার সমস্ত রাগ চলে গেল। একটা ভীষণ দুর্ব্বলতা তাকে ঘিরে ধরলে। ক্রমে সে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল।

সে চেঁচিয়ে উঠল, "ওঃ ভগবান ! একি করেছি আমি ?"

সে বুঝতে পারলে নীচের জীবটার যদিও মৃত্যুর আর বিলম্ব নেই—তবু তার দেহের সমস্ত রক্ত তাপে ফুটছে। সেই অবস্থায় ভীষণ যন্ত্রণার কথা তার মনের মধ্যে এসে আর অন্য সব চিন্তা দূর করে দিলে। এক মুহূর্ত্তের দ্বিধার পর গাড়ীর সব কয়লাগুলি সে মূর্ত্তিটার উপর ঢেলে দিলে। কয়লা গুলা সশব্দে পড়ে গড়িয়ে গেল। যন্ত্রণাধ্বনি সহসা থেমে গেল, নীচ থেকে ধুলা, ধোঁয়া আর আগুনের আভাস উঠে আসতে লাগল।

অবস্থাটা কাটলে দেখা গেল চিমনী পরিষ্কার হ'য়ে গেছে।

রেলিংটা চেপে ধরে বিপিন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কি বলবার চেষ্টা করলে—পারলে না।

নীচে থেকে মজুরদের কথাবার্ত্তা ও ... ভেসে আসতে লাগল। *

* এইচ, জি, ওয়েলসের গল্পাবলম্বনে।
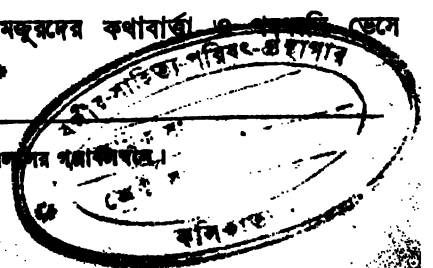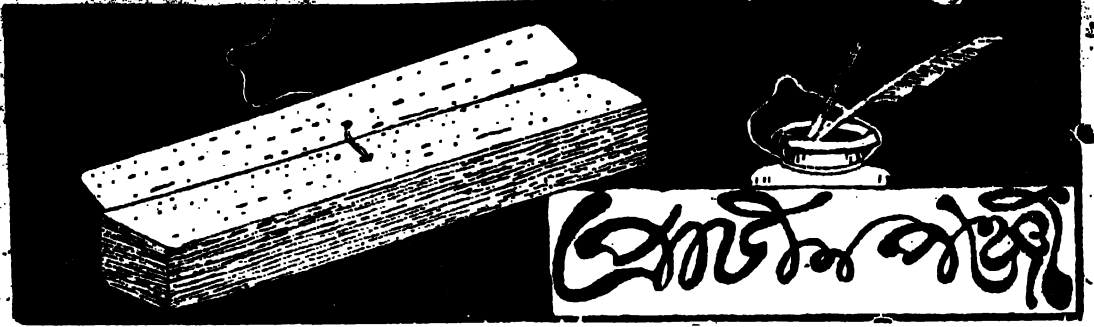
দি বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর

হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা পাঠ্যাবস্থাতে "পার্থিনন" (Parthenon) নামে একখানি সাময়িক পত্র ফিরিঙ্গি শিক্ষক ডিরোজিওর উৎসাহে প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইয়া কলেজের দর্শক (visitor) এবং এচ্‌ উলসনের আদেশে উহা রহিত হইয়া যায়। এ-সম্বন্ধে সমাচার দর্পণের "১৮৩০ সালের বর্ষফল" প্রবন্ধে নিম্নপ্রকার উল্লেখ আছে :—

"মার্চ ৪। কয়েক জন হিন্দু যুবব্যক্তির দ্বারা ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পার্থিনন নামক এক সম্বাদপত্র ধর্ম্মসভার উদ্যোগেতে নিবৃত্ত হয়।" সমাচারদর্পণ, ১লা জানুয়ারি, ১৮৩১ ; ১৮ই পৌষ, ১২৩৭ (পঞ্চপুষ্প, বৈশাখ, ১৩৩৮)

এই সংবাদপত্র সম্পূর্ণ ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত হইত এবং ইংরাজি ১৮৪২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর পাঠে আমরা অবগত হই যে, প্রথম সংখ্যায় "স্ত্রীশিক্ষা" এবং "ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস" এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল।

পরে ছাত্রেরা ক্রমে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া "জ্ঞানাম্বেষণ" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। অধিকন্তু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রিফরমার নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এনকোয়েরার পত্রিকা ইংরাজি ১৮৩১ সালের ১৭ই মে এবং জ্ঞানাম্বেষণ ঐ বৎসরের ১৮ই জুন হইতে প্রকাশ হইয়াছিল। উভয় পত্রিকা ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ হইত। ডিরোজিও ঐ বৎসরের ২০এ এপ্রিল তারিখে হিন্দুকলেজের শিক্ষকতা কার্য্য হইতে অবহৃত হইয়াছিলেন এবং ২৩এ ডিসেম্বর তারিখে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং বলিতে হইবে তিনি ছাত্রদের এই কৃতিত্ব দেখিয়া গিয়াছিলেন। এনকোয়েরার বরাবরই ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ হইত কিন্তু জ্ঞানাম্বেষণ পরে ইংরাজি ও বাঙ্গালা দুই ভাষায় প্রকাশিত হইত। (সমাচারদর্পণ। ১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯) *

জ্ঞানাম্বেষণ প্রকাশের প্রায় এগার বৎসর ব্যবধানের পর "দি বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর" সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করিব। স্পেক্‌টেটরের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় (১৮৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল) সূচনায় এইরূপ লিখিত ছিল :—

অস্মদ্দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির উপযোগী বিষয় সকল আমাদিগের সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করণার্থে আমরা এতৎপত্র প্রকাশ করণে উদ্যত হইয়াছি এবং যে প্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের উদ্যোগের আনুকূল্যের সম্ভাবনা, যে হেতু রাজ্যশাসন করিয়া প্রজার মঙ্গলবিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সচেষ্ট হইতেছেন এবং ভারতবর্ষস্থ ও ইংলণ্ডদেশস্থ ইংরাজের মধ্যে অনেকের অন্তঃকরণে আমারদিগের হিতেচ্ছা প্রবল হইতেছে। অপর এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে এবং তাঁহারা বিশেষ যত্নবান হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার দর্শিতে পারে। আর তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদিগের

* পঞ্চপুষ্প, বৈশাখ, ১৩৩৮

স্ব স্ব মতের বিরুদ্ধ লেখা প্রকাশে এ ক্লেশ তাহার মূল হইয়েছে। অতএব এতদ্রূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সমীপে দুঃখসমূহ নিবেদনপূর্ব্বক যাহাতে ঐ ক্লেশ নিবারণ এবং দেশের অবস্থার উৎকৃষ্টতা হয় তাহার প্রার্থনা এবং আমাদিগের প্রাথিত বিষয়ে সাহায্যকরণার্থে ইংরাজদিগের অনুরোধ করা, আর সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে স্বদেশের মঙ্গলার্থে সম্যক্‌প্রকারে যত্ন করিতে প্রবৃত্তিপ্রদান, এবং অস্মদ্দেশীয় সাধারণ জনগণকে স্ব স্ব হিতাহিত উত্তমরূপে বিবেচনা দ্বারা উৎসাহাবলম্বনপূর্ব্বক আপনাদের মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইয়া প্রার্থনা করা আমাদিগের যথাসাধ্য অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ানুসারে আমরা এতৎপত্রে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব যদ্দ্বারা রীতি ব্যবহারাদির উত্তমতা এবং বিদ্যা, কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্যাদির বৃদ্ধি আর রাজ্যশাসন কার্য্যের সুনিয়ম হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি হয়।

আমাদিগের এমৎ আশ্বাস হইতেছে যে, যাঁহারা এই অভিপ্রায় উত্তম জ্ঞান করেন, তাঁহারা অবশ্যই আমাদিগকে উৎসাহপ্রদান করিবেন এবং আমরা শিক্ষিত বন্ধুগণের নিকটে এই বিনতি করি যে, তাহারা এই পত্রদ্বারা আপনাদিগের মধ্যে পরস্পর প্রণয়বৃদ্ধিকরতঃ একবাক্য হইয়া যথাসাধ্য সৎকর্ম্মের উদ্যোগ করুন।"

এই সংখ্যার পরিশিষ্টে পত্রিকাচালনা-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত ছিল :—

"এতৎ পত্র ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়া আপাততঃ মাসমধ্যে একবার প্রকাশিত হইবে কিন্তু যে সকল ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃত্বে ইহা নির্ব্বাহ হইবে তাহাদিগের এতদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা নাই, অতএব গ্রাহকবৃদ্ধি হইয়া অধিকবার প্রকাশ হওনের ব্যয় উৎপন্ন হইলে একবারের অধিকও প্রকাশ হইবেক।"

বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর ইংরাজি ১৮৪২ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাস যাবৎ মাসিক প্রকাশিত হইয়াছিল, তবে ১৪ই জুন ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত এক সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছিল। এই পাঁচ মাসের সাত সংখ্যার কোন্ সংখ্যার কত পাতা ছিল, নিম্নে তাহার তালিকা প্রকাশিত হইল :—

প্রথম	সংখ্যা	এপ্রিল	১২ পাতা
দ্বিতীয়	"	মে	১৬ "
তৃতীয়	"	জুন	১৬ "
চতুর্থ	"	১৪ই জুন (অতিরিক্ত সংখ্যা)	৪ "
পঞ্চম	"	জুলাই	১৬ "
ষষ্ঠ	"	আগষ্ট	১৬ "
সপ্তম	"	সেপ্টেম্বর	১২ "

সপ্তম সংখ্যার পরিশিষ্টে নিম্নলিখিত প্যারা প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"এক্ষণে এতৎপত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়া মাসে দুইবার প্রকাশ হইবেক।"

পাক্ষিক বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর ১৫ই সেপ্টেম্বর এক সংখ্যা অক্টোবর মাসে দুই সংখ্যা নবেম্বর মাসে দুই সংখ্যা এবং ডিসেম্বরে দুই সংখ্যা এই সাত সংখ্যা ও মাসিক সাত সংখ্যার মোট চোদ্দ সংখ্যা প্রকাশ ১৮৪২তে প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

পরে পাক্ষিক স্পেক্‌টেটর দ্বিতীয় ভলুমে (ইংরাজি ১৮৪৩ সালের) জানুয়ারী মাসে দুই সংখ্যা, এবং ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইয়া চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা (ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ) একত্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ পাক্ষিক স্পেক্‌টেটর দশ সংখ্যা এবং ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ একত্রিত দুই সংখ্যার সর্ব্বসমেত বারো সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রতি সংখ্যা বারো পাতা থাকিত কেবল একত্রিত সংখ্যা ছাব্বিশ পাতায় ছিল।

একত্রিত সংখ্যার শেষভাগে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"এতৎ পত্র এক্ষণে মাসে দুইবার প্রকাশ না হইয়া মেঃ টপসন সাহেবের সাহায্যে সপ্তাহান্তর প্রকাশ হইবেক, এতৎ ক্ষুদ্র পত্রিকা দ্বারা যাহাতে ভারতবর্ষের উপকার হয় তন্নিমিত্ত উক্ত সাহেব অতি যত্নবান, আমরা ভরসা করি পাঠকবর্গ এই সংবাদ শ্রবণে আহ্লাদিত হইবেন। বর্ত্তমান গ্রাহকদিগের নিকট ইহার মূল্য বৃদ্ধি করা যাইবেক না কিন্তু এতৎ পত্র নির্ব্বাহে অধিক ব্যয় হইবেক আমাদিগের বলা বাহুল্য, অতএব সাহায্য প্রাপ্ত হইলে আপ্যায়িত হইব ; আমরা ভরসা করি আগামী পত্রে গ্রাহকের সংখ্যা-

ধিক্য এবং পত্রের অভিপ্রায়ানুযায়িক প্রেরিত পত্র প্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশ করিতে পারিব।"

সাপ্তাহিক স্পেক্‌টেটর ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যায় (১৮৪৩র ৮ই ও ১৬ই মার্চ্চের) বার পাতা ও ষোলপাতা প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে অষ্টম সংখ্যা হইতে ৩৯ সংখ্যা বা শেষ সংখ্যা পর্য্যন্ত এই ৩৪ সংখ্যা মাসিক আটপাতা করিয়া প্রকাশিত হইত। স্পেক্‌টেটরের ৮ই মার্চ্চ তারিখ হইতে ১লা মে তারিখ পর্য্যন্ত এই আট সংখ্যায় "মেষ্টর জর্জ্জ টমসনের সাহায্য" লিখিত থাকিত ইহাতে বোধ হয় টমসন সাহেব ইংরাজি স্তম্ভে প্রকাশিত বিশেষতঃ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি সংস্থাপন ও তৎউদ্দীপনাসূচক-প্রবন্ধাদি প্রণয়ন ও সংশোধন করিতেন এবং কিছু অর্থ সাহায্যও করিতেন।

কিন্তু সাপ্তাহিক স্পেক্টেটর ঠিক সাতদিন অন্তর প্রকাশিত হইত না। যদি ইহা সাপ্তাহান্তর প্রকাশিত হইত তাহা হইলে ৮ই মার্চ্চ হইতে ২০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ৩৪ না হইয়া ৩৮ সংখ্যায় সম্পূর্ণ হইত। কোন কোন তারিখে স্পেক্টেটর প্রকাশিত হইয়াছিল নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল;—৮, ১৬ এবং ২৪ মার্চ্চ, ১, ১০, ১৭ এবং ২৫ এপ্রিল, ১, ৮, ১৭, এবং ২৫ মে, ১, ৮, ১৬ এবং ২৪ জুন, ১, ১১, ১৬ এবং ২৪ জুলাই, ১, ৯, ১৬ এবং ২৪ আগষ্ট, ১, ৯, ১৬ এবং ২৪ সেপ্টেম্বর, ১, ১০, ১৭ এবং ২৪ অক্টোবর ও ১, ৯ এবং ২০ নবেম্বর ১৮৪৩।

দ্বিতীয় ভলুমের উনচত্বারিংশৎ (১৮৪৩র ২০শে নবেম্বর) সংখ্যায় সর্ব্বপ্রথমে পরিচালকদের নিম্নলিখিত খেদোক্তি প্রকাশ হইয়াছিল:—

১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসাবধি বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর পত্র মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশ হয়, প্রোপ্রাইটরদিগের এতদ্দ্বারা লাভকরণের ইচ্ছা না থাকাতে ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসাবধি পক্ষান্তে প্রকাশ হইতে লাগিল এবং যদিও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই এবং আয় দ্বারা ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না তথাচ প্রোপ্রাইটরেরা এই পত্রিকা বিশেষ-রূপে দেশোপকারিণী করণাশয়ে ১৮৪৩ সালের মার্চ্চ মাসাবধি সাপ্তাহিক করিলেন তাঁহারা প্রায় ৮ মাস পর্য্যন্ত ইহা হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ হয় কি না পরীক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু শেষে দেখিলেন যে ইহাতে সহস্র মুদ্রার অধিক ক্ষতি হইয়াছে। সাপ্তাহিক হওয়াতে যদিও গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়াছিল তথাচ তদ্দ্বারা সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না আর যে অভিপ্রায়ে এ পত্র সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকে পাঠ করিবে এবং সকলে নানা বিষয়ের উপর লিখিবে তাহা হইল না অতএব প্রোপ্রাইটরেরা এতৎ পত্রের সাহায্য-কারি গ্রাহকদিগের নিকট এবং সহকারি সম্পাদকবর্গ সন্নিধানে বিনয়পূর্ব্বক খেদান্বিত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে অদ্যাবধি এতৎ পত্র প্রকাশ স্থগিত করা গেল যে সকল কারণে রহিত হইতেছে কোন উপায় দ্বারা যদি তাহা পরিবর্ত্ত হয় তবে আহ্লাদ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রকাশ করিবেন।

যে যে মহাশয়েরা এক বৎসরের মূল্য আগামী প্রদান করিয়াছেন তাহার মধ্যে যে টাকা পাওনা হয় তাহা ত্বরায় তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইবেক। যদ্যপি ঐ টাকা দেওনের অথবা হিসাবকরণের ভ্রম হয় তবে লালদীঘির উত্তর পশ্চিম ৮নং মিসির্‌স রোজারিও কোম্পানীর বাটী তত্তৎ বিষয়ক পত্র প্রেরিত হইলে বেঙ্গাল স্পেক্টেটরের অধ্যক্ষেরা প্রাপ্ত হইবেন।

এই পত্রিকার শিরোভাগে কেবল ইংরাজি নাম থাকিত এবং আমরা ইহার কোন ও সংখ্যায় বাঙ্গালা তারিখ দেখিতে পাই না, কেবলমাত্র ইংরাজি তারিখ থাকিত। ইহা আকারে ১০॥×৮ ইঞ্চি অর্থাৎ ডিমাই চারপেজি ছিল। ইহাতে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন, শিক্ষা বিস্তার ধর্ম্মাধিকরণে অসঙ্গত বিচার প্রভৃতি নানারূপ বিষয় নূনাধিক স্থান পাইত। বঙ্গদেশের ভূস্বামীরা কিরূপে প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিতেন ও তাহার জন্য আইন কিরূপ যুক্ত ছিল তাহা সময়ে সময়ে এই পত্রিকায় প্রকাশ হইত। অধিকন্তু টমসন সাহেব এদেশে আসিয়া কিরূপে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপনা করিয়া দিলেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ আমরা এই পত্রিকায় দেখিতে পাই।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মযাজক যে লং সাহেব Descriptive Catalogue of Bengali Books নামক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকা সম্বন্ধে উহাতে এইরূপ উল্লেখ আছে:—

In 1842. Bengal Spectator—useful news.

Edited by R. G. Ghose and P. C. Mitra. Lasted two years.

[১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গাল স্পেক্টেটর—প্রয়োজনীয় সংবাদ-পত্র। শিক্ষিত বঙ্গবাসী রামগোপাল ঘোষ এবং প্যারীচাঁদ মিত্র দ্বারা সম্পাদিত। দুই বৎসর স্থায়ী ছিল।*]

ইহার চারি বৎসর পর ইংরাজি ১৮৫৯ সালে লং সাহেব সরকার গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে আর একখানি বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক তালিকা † প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে স্পেক্‌টেটর সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে :—

Bengal Spectator. 1842. Anglo Bengali, edited by R. G. Ghose and P. C, Mittra to advocated reform (Page XXXIX).

[বেঙ্গাল স্পেক্টেটর। ১৮৪২ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কারাদি সমর্থনার্থে রামগোপাল ঘোষ এবং প্যারীচাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত। (৩৯ পৃষ্ঠা)] পরে পাদটীকায় :—

A useful paper, its bilingual character was against it, doubling the expense.

[ব্যবহারোপযোগী পত্রিকা। দুই ভাষায় প্রকাশ হইত বলিয়া মুদ্রাঙ্কন ব্যয় দ্বিগুণ হইত ইহাই প্রকাশের অন্তরায় হইয়াছিল।]

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা ইংরাজি ১৮৩৩ সাল হইতে দুই ভাষায় প্রকাশ হইত ; কিন্তু ইহা কিরূপে মুদ্রণ হইত তাহা আমরা অবগত নহি, অর্থাৎ প্রথম কয়েক পাতা ইংরাজিতে এবং পরের কয়েক পাতা বাঙ্গলায়, অথবা এক পাতা ইংরাজিতে এবং পরের পাতা বাঙ্গালায় অথবা এক পাতারই দুই স্তম্ভে এক স্তম্ভ ইংরাজিতে অপর স্তম্ভ বাঙ্গালায়। স্পেক্‌টেটর কিন্তু শেষোক্তভাবে প্রকাশ হইত।

এইবার আমরা স্পেক্‌টরে কিরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ হইত তাহা উদ্ধৃত করিব।

পূর্ব্বে দেশের শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ এবং রাজস্ব বিভাগভুক্ত যে কোনও উচ্চকার্য্যে বাঙ্গালীদের স্থান ছিল না। জন সলিভান নামক জনৈক মান্দ্রাজ সিভিলিয়ন অবসর গ্রহণান্তর স্বত্বাধিকারী সভায় (Court of Proprietors) প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইংরাজি ১৮৪২ সালের ২১শে ডিসেম্বর তারিখের কোর্ট অব প্রোপ্রাইটরদের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে সলিভান সাহেব প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগকে অনুরোধ করা যাউক যে তাঁহারা ভারত গবর্ণমেণ্টকে তত্রত্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোকের যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। এতদর্থে তিনি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত সনন্দের ৮৭ প্রকরণ উল্লেখ করিয়া তাহা সার্থকতা সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অধিবেশনে সভাপতি স্যার জেমস্ ল লুসিংটন (Sir James Law Lushington) উত্তর করিলেন যে ভারতবাসীদের শিক্ষার্থে নানা শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেরণা করা যাইতেছে, দেশীয় লোকেরা উপযুক্ত হইলে গুণ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে উচ্চকার্য্যে নিয়োগ করা হইবেক। ফলে প্রস্তাবটি প্রতিগ্রহণ করা হইয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বিবৃত আছে। অতঃপর কলিকাতা নিবাসী ব্যক্তিরা সলিবান সাহেব যাহা প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা অনুমোদনার্থে, ভারতবাসীর পক্ষে তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে এবং কোর্ট অফ প্রোপ্রাইটরদের অধিবেশনে এতৎ বিষয়ে পুনঃ বিচারের আবেদন করণের বিবেচনার্থে টাউন হলে এক প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করিতে প্রধান সেরিফকে অনুরোধ করিলেন। ঐ বৎসরের ১৮ই এপ্রিল তারিখে এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল এবং আমরা ২৫শে এপ্রিলের বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর হইতে তৎবিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।

---

* পুস্তিকার সম্পূর্ণ নাম—A Descriptive Catalogue of Bengali Works containing a classified list of fourteen hundred Bengali books and pamphlets which have issued from the press, during the last sixty years with occasional notices of subjects, the price and where printed by J. Long. Calcutta. Printed by Sanders Coms & Co. no 65 Cossitollah 1855.

† পুস্তিকখানির সম্পূর্ণ নাম ;—A return relating to publications in the Bengali language in 1857 with a notice of the past condition and future prospects of the Vernacular Press of Bengal, submitted to Government by Reverend J. Long. 1859 (Selections from the Records of Bengal Government no XXXI).

মেং জান সলিবান সাহেবকে প্রশংসা পত্র প্রদানার্থক সভা ১৮ই এপ্রিল টাউন হলে হইয়াছিল। কতিপয় ইংরাজ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও এতদ্দেশীয় প্রায় পাঁচশত লোক উপস্থিত ছিলেন। এভেস্ ক্রিরি স্মিথ সাহেব প্রধান সরিফ সভাপতি হইয়াছিলেন তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে লা কমিশনর মেং ডি এলিয়ট ও বাম পার্শ্বে মেং জর্জ্জ টমসন ছিলেন।

১৫০ জনের স্বাক্ষরিত সভা আহ্বান করণার্থক পত্র পঠিত হইলে সরিফ সাহেব কহিলেন যে উপস্থিত বিষয়ে যে যে বক্তৃতা করিবেন তাহা মনোযোগ ও অপক্ষপাতিত্ব পূর্ব্বক শুনা যাইবেক।

শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ, শ্রীযুত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মেং জর্জ টমসন সাহেব সভায় বক্তৃতা করিলেন। নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা সকল সভায় সম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইল।

শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষের পোশকতায় ধার্য্য হইল।

১ গত ২১ ডিসেম্বর ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রোপ্রাইটরদিগের সভাতে মেষ্টর জান সলিবান সাহেব (যিনি পূর্ব্বে মান্দ্রাজের সিবিল সরবিসে নিযুক্ত ছিলেন) এতদ্দেশীয়দিগের গুণ বিবেচনা পূর্ব্বক রাজকীয় তাবৎ কর্ম্মে নিয়োগ হয় এতদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, অতএব এই সভার মতে তাহার প্রতি ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

রাজা বরদা কান্ত রায় বাহাদুরের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের পোষকতায় এই ধার্য্য হইল।

২ এতদ্বিষয়ে যাঁহারা ২ সম্মত হন তাঁহাদিগের এই প্রশংসা পত্রে স্বাক্ষর করান যাইবেক তৎপরে সলিবান সাহেবের সমীপে বিলাতে প্রেরিত হইবেক।

জান সলিবান স্কোয়ার মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়,

গত ২১ ডিসেম্বর কোর্ট অফ প্রোপ্রাইটরদিগের সভাতে আপনি এতদ্দেশীয় লোকের গত চার্টরের ৮৭ প্রকরণানুসারে রাজকীয় উচ্চকর্ম্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত ক্ষমতা প্রকাশপূর্ব্বক অনেক সচ্চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা এতৎ সংবাদ জানুয়ারি মাসের ওভরল্যাণ্ড মেইল দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি।

এতদ্দেশের রাজকীয় কর্ম্মে ইংরাজদিগের পরিবর্ত্তে অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী নিযুক্ত করিলে ন্যায্য ও ব্যয়ের লাঘব এবং রাজনীতি সম্মত হয় এই কহিয়া আপনি যে সকল যুক্তি ও কারণাদি দর্শাইয়াছেন তৎপাঠে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।

মহাশয় এবম্প্রকার অচিন্তনীয় সাহায্য করাতে কলিকাতাস্থ কতিপয় লোক প্রকাশ্য সভায় আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশক পত্র প্রেরণের নির্দ্ধার্য্যার্থে কলিকাতার প্রধান সরিফের সমীপে পাঠাইবার জন্য একখানি পত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ঐ পত্র নগরস্থ অন্যান্য বিজ্ঞ লোকদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়া আপনার প্রতি সকলেরই সমভাব দেখিয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা তৎপত্রে বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে স্বাক্ষর করাইবার অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই তথাপি অনেক বিজ্ঞ মান্য ও সম্ভ্রান্ত লোকের স্বাক্ষরিত করিয়া প্রধান সরিফের সমীপে পাঠাইয়াছিলেন।

আপনকার প্রতি ধন্যবাদ করিতে অস্মদ্দেশীয় সকলেই সম্মত হইয়াছেন, এক্ষণে আমরা আপনাকে বিশেষরূপে জ্ঞাত করাইতেছি আপনি যে প্রকার সদভিপ্রায়ে ইণ্ডিয়া হৌসে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম অস্মদাদির বোধগম্য হইয়াছে।

আমাদিগের অভিলাষ মত যদিও আপনার সচ্চেষ্টা সফল হয় নাই তথাচ এতদ্বিষয়ে মহাশয়ের সম্পূর্ণ মানস থাকাতে আমরা আপনকার প্রতি সমভাবেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আপনকার সাহায্যে আমাদিগের মঙ্গল হইতে পারিবেক কারণ আপনি এতদ্দেশে অনেক ২ সম্ভ্রান্ত কর্ম্ম করাতে আপনকার মত গ্রাহ্য হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

আপনি এতদ্দেশের লোকদিগের চরিত্র এবং তাঁহারা এক্ষণে যে সকল কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত আছেন তাহাদের তন্নির্ব্বাহের ক্ষমতা এই দুই বিষয় যথার্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে বাঙ্গালীদিগকে যে সকল কর্ম্মার্পণের নিষেধ রহিয়াছে সে সকল কার্য্য নির্ব্বাহে উপযুক্ত ও ক্ষমতা বিশিষ্ট সুচরিত্র লোক এতদ্দেশের মধ্যে অনেক আছেন। আর চার্টরের লিখিত নিয়মানুসারে কর্ম্ম হইলে এতদ্দেশের উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকদিগের পক্ষে

অনেক ফল দর্শিত কারণ তাঁহারা কর্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত এতাদৃশ যত্ন করিতেন যে যে সকল কর্ম এক্ষণে সিবিল সরবেণ্টদিগের দ্বারা নির্ব্বাহ হয় তাহাতে তাঁহারা উপযুক্ত হইতে পারিতেন।

মহাশয় এতদ্দেশীয় লোকের হিত চেষ্টা করাতে সকলেই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছেন অতএব আমরা তাঁহাদিগের প্রতিনিধি স্বজন হইয়া মহাশয়ের সমীপে ধন্যবাদ প্রকাশ করিতেছি আপনি গ্রহণ করিবেন। আমাদের প্রার্থনা এই যে উত্তর কালে এতদ্দেশীয় লোকদিগের সকল কর্ম্মে যেন সদ্ব্যবহার করা হয় এবং তাহাতে যেন আপনকার বর্ণনা সত্য হয় ও এতদ্দেশের অবস্থাজ্ঞ অন্যান্য বিখ্যাত ইউরোপীয় মহাশয়েরা আপনকার অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।

কয়েক বৎসরাবধি এতদ্দেশীয়দিগকে রাজকীয় কর্ম্মার্পণের উৎসাহ প্রদান করাতে আমরা এতদবকাশে গবর্ণমেণ্টের নিকটেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, সম্প্রতি ইহাদিগের প্রতি যে ২ ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন তাহা আমরা মনের মধ্যে বিলক্ষণরূপে জানিতেছি এবং আমরা ঐ সকল কর্ম্মের দ্বারা আপনাদিগকে উপকৃত বোধ করিতেছি কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা যেরূপে কর্ম্ম সমাধা করিয়াছেন তাহাতে অধিক লোককে কষ্ট দেওয়া ও তাহাদিগকে উচ্চ ২ কর্ম্মে নিযুক্ত করা উচিত এবং ইহাই তাহাদিগের উচ্চপদাভিষেকের ঔচিত্যে প্রধান কারণ বোধ করা কর্ত্তব্য।

অবশেষে আমরা প্রার্থনা করি যে আপনি এতদ্দেশীয় লোকদিগের সুখ এবং উন্নতি বিষয়ে সম্প্রতি যেরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন আপনার চেষ্টা সেইরূপ থাকুক, আমরা আপনাকে বিশেষরূপে জ্ঞাত করাইতেছি এতদ্বিষয়ে আপনকার পরিশ্রমের ফল যাহাই হউক, মহাশয়ের নাম ও গুণ চিরস্মরণীয় হইবেক।

আমরা মহাশয়ের বাধ্য এবং এক রাজ্যস্থ প্রজাগণ।

৩ রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের পোষকতায় স্থির হইল এই প্রশংসা পত্র মেষ্টর সলিবান সাহেবকে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে অনুরোধ করা যাইবেক যে তাঁহারা এতৎপত্রে স্বাক্ষরকারিগণের প্রতিনিধিরূপ হইয়া যেরূপে ভাল বোঝেন সেই প্রকারে উক্ত মহাশয়ের হস্তে এতৎ পত্রার্পণ করিবেন। স্যার চারলস্ ফারবেস্, মেজর জেনেরল ব্রিগ্‌স্, মেং সারজাণ্ট মেজিনি, মেং ক্রেন্সিশ কর্ণেক ব্রোম, জান কুলুইস, এবং জান ফারবেস।

৪ শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু বাবু চন্দ্রশেখর দেবের পোষকতায় স্থির হইল যে নিম্নলিখিত আবেদন পত্র প্রথমতঃ সকলে গ্রাহ্য করুন তৎপরে কলিকাতা নগরবাসিদিগের স্বাক্ষর করাইয়া বিলাতে মেষ্টর সলিবান সাহেবের নিকট এই অনুরোধ করিয়া প্রেরণ করা যাউক যে তিনি যেন কোর্ট অফ প্রোপ্রাইটরদিগের সভাতে ইহা উপস্থিত করেন।

লণ্ডন নগরস্থ ইণ্ডিয়া হৌসে সভাকারি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ষ্টকের মান্য অধ্যক্ষ মহাশয় সমীপেষু।

হে মহাশয়গণ!

কলিকাতা নিবাসি নিম্নে স্বাক্ষরকারি ব্যক্তিরা যথোচিত সম্মান পুরঃসর আপনাদিগের সমীপে নিবেদন করিতেছেন।

যৎকালে ইংলণ্ডীয় মহাশয়দিগের ভারতবর্ষে অধিকার স্থাপন হয় তৎকালীন এতদ্দেশ সংক্রান্ত সমুদায় রাজকীয় কর্ম্ম এতদ্দেশীয় জনগণের হস্তে সমর্পিত ছিল এবং অত্রত্য ব্যক্তি-দিগের ক্ষমতা দ্বারা সহজেই তৎকর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ হইত।

কিন্তু ইংলণ্ডীয়েরা এতদ্রাজ্যে স্বাধিকারের দৃঢ়তা হইবা-মাত্র এখানকার লোকদিগকে এই সকল কর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত করিয়া তত্তৎকার্য্যে কবেনণ্ট সিবিল সরবেণ্ট নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময়াবধি গত কএক বৎসর পর্য্যন্ত এতদ্দেশের লোকদিগকে কেবল ক্ষুদ্র ২ কর্ম্মার্পণ করিতে লাগিলেন, এবং তাহাদিগকে অত্যল্প বেতন দানের নিয়ম করিলেন সুতরাং তাহারা লোভী হইল আর যে সকল ব্যক্তিকে আত্মকার্য্য নির্ব্বাহার্থে তাহাদিগের নিকট যাইতে হইত তাহারাও উৎকোচ প্রদান ব্যতিরেকে প্রায় স্বকার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হইতেন না।

অতএব প্রায় নীচ ব্যক্তিরাই গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইত এবং তাহারা বেতনের অল্পতাপ্রযুক্ত কুক্রিয়া করিত কিন্তু তাহাদিগের অসচ্চরিত্র দ্বারা এতদ্দেশীয় তাবন্মনুষ্য কুস্বভাবরূপ অপবাদগ্রস্ত হইয়াছেন।

গত চার্টরের ৮৭ প্রকরণে লিখিত আছে যে "ভারতবর্ষজাত লোকের ও বিলাতের রাজার তদ্দেশবাসি প্রজার ধর্ম্ম, জন্মস্থান, বংশ এবং বর্ণ অথবা ইহার মধ্যে অন্যতম কোন কারণ কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইবেক না।"

আপনাদিগের আবেদনকারিরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত ইহা স্বীকার করিতেছেন যে উক্ত আইন প্রচার হইয়া অবধি এতদ্দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টপদে নিযুক্ত হইতেছেন এবং ইহাদিগের প্রতি এক্ষণে কিঞ্চিৎ সদ্ব্যবহারও হইতেছে তথাচ আপনাদিগের আবেদনকারিগণের বিবেচনায় এই বোধ হয় যে পক্ষপাত বিহীন পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা যে অভিপ্রায়ে উক্ত আইন করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় নাই।

আপনাদিগের আবেদনকারিদের মত এই যে ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই মান্য বিদ্বান ও সৎমনুষ্য আছেন এক্ষণে যে সকল কর্ম্ম ইউরোপীয় লোক দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহা ইহারা অনায়াসে সমাধা করিতে সক্ষম, তথাচ ঐ নিয়ম অদ্যাবধি চালিত হয় নাই।

অতএব আপনাদের আবেদনকারিদিগের প্রার্থনা এই যে গত ২১ ডিসেম্বর মেং জান সলিবান সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আপনাদিগের সভাতে পুনর্ব্বার বিবেচিত হয়।

শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তির প্রস্তাবে বাবু শ্যামাচরণ সেনের পোষকতায় স্থির হইল—

৫ গত ২১ ডিসেম্বর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া প্রোপ্রাইটরদিগের সভাতে মেষ্টর সলিবান সাহেবের উক্ত প্রস্তাবে যে যে মহাশয়েরা পোষকতা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এ সভার ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য আর তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করা যায় যে তাঁহারা আমাদিগের প্রার্থনা সিদ্ধির নিমিত্ত সাহায্য করুন।

শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ সেটের প্রস্তাবে বাবু রামতনু লাহিড়ির পোষকতায় স্থির হইল—

৬ উক্ত প্রশংসাপত্রে এবং আবেদন পত্রে সকলের স্বাক্ষরার্থে এবং স্থলপথগামি ডাকযোগে বিলাতে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত ও পঞ্চম প্রতিজ্ঞার কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা কমিটিস্বরূপে নিযুক্ত হউন এবং তাঁহাদিগের সভ্য বৃদ্ধি করণে ক্ষমতা থাকুক—

শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ,
„ তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী,
„ চন্দ্রসেখর দেব,
„ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও
„ প্যারীচাঁদ মিত্র।

শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ পোষকতা করিলেন যে প্রধান সরিফ শীঘ্র এই সভা আহ্বান করিয়াছেন এবং উত্তমরূপে সভাপতিত্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন অতএব তাঁহার প্রতি সভার ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

বলাবাহুল্য ইহার পূর্ব্বে বিলাতে ভারতের মঙ্গলের জন্য কোন প্রশ্ন হইলে সে সংবাদ এখানে পৌছিত না; যদি কখনও আসিত তাহা ইংরাজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া তাহাদের মধ্যে আন্দোলন হইত, তাহাতে এদেশবাসীরা কর্ণপাতও করিতেন না, ইহাতে বুঝিতে হইবে যে এই আন্দোলন দেশবাসীর ঔদাসীন্য ত্যাগের পরিচয়।

উত্তরে সলিবান সাহেবও কমিটি (Sir Charles Forbes, Bart, Major General Briggs, Serjeant Gasibe, Francis Carnac Brown, John Lewis এবং George Forbes) এদেশীয় কমিটিকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা বেঙ্গল হরকারা পত্রিকার ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল এবং ৬ই মে তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এতৎসম্বন্ধে বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর পত্রিকায় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা, ১০ই এবং ১৭ই অক্টোবর তারিখে যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

[১ অক্টোবর। ১৮৪৩]

গত ২১ ডিসেম্বরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া হৌসে সলিবান সাহেবের প্রস্তাব।

টৌন হালে প্রকাণ্ড সভা হইয়া মেষ্টর সলিবান সাহেবের নিকট যে ধন্যবাদ পত্র ও দরখাস্ত প্রেরণ করা ধার্য্য হয়, তাহা স্বাক্ষরিত হইতেছে এবং অনেক ২ সম্ভ্রান্ত লোক

স্বাক্ষর করিয়াছেন বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যেই ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবেক এতদ্বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য নিয়ে লিখিতেছি।

বর্ত্তমান চার্টারের ৮৭ প্রকরণানুসারে রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহের প্রথা চলিত না থাকাতে রাজ্য শাসন উত্তমরূপে হইতেছে না এবং দেশের পক্ষে অনেক অমঙ্গল ঘটিতেছে, রাজ্যাধিকারির উচিত এই যে সকলের অধিকার নিরাপদে রাখেন এবং তাহা হইলেই রাজ্যশাসনের ধারা সুন্দর ও বিচার সম্মত হয়। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আমাদের পক্ষে উপকারজনক অনেক কর্ম্ম করিয়াছেন ইহাতে আমরা যদিও তাঁহাদের নিকট বাধিত আছি তথাচ তাঁহাদিগের যেরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহাতে তাঁহারা পূর্ব্বাবধি তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না, মুসলমানদিগের রাজ্যশাসন অনেকাংশে মন্দ ছিল ইহা সত্য বটে কিন্তু তাঁহাদের রাজকীয় কর্ম্মে লোক নিযুক্ত করণ বিষয়ে স্বজাতি-বিজাতি বিচার দ্বারা পক্ষপাত ছিল না। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের রাজত্ব যে দেশে দৃঢ়তর হয় তদ্দেশীয় লোকেরা কর্ম্মোপযুক্ত হইলেও (স্বজাতিকে ২) রাজকীয় কর্ম্মানধিকারী করেন ইতিহাস-বেত্তা মিল সাহেব এবং আরমি সাহেবের লিখন দৃষ্টি করিলে এতদ্বিষয় সপ্রমাণ হইবেক

স্যার টমাস মন্‌রো সাহেব কহিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষীয় লোকদের রাজ্যাধিকার কালীন এতদ্দেশের জনগণ উচ্চকর্ম্ম প্রাপ্ত হইত এবং ইংলণ্ডীয়েরা যদি এখানে না আসিতেন তবে উহাদের মধ্যে কোন ২ ব্যক্তি গবর্ণর হইত কিন্তু এক্ষণে এদেশ অস্মদাদির হস্তগত হওয়াতে অত্রত্য ব্যক্তিরা অত্যন্ত জঘন্য পদস্থ হইয়াছে। সলিবান সাহেব কহিয়াছিলেন যে মাইসোর ও নিজাম দেশ ইংলণ্ডীয়দিগের অধীনস্থ হওয়াতে তত্তদ্দেশীয় ব্যক্তিরা রাজকীয় কর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত হইয়াছেন এবং নিজামদেশ আমাদের অধিকৃত হওনের অগ্রে অস্মদ্দেশস্থ একজন কর্ম্মচারী কহিয়াছিলেন যে নিজাম দেশ অধিকৃত হইলে তিনি এক কর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।"

হে মহাশয়, আমি যে সকল কথা কহিলাম তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত এস্থলে লার্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেবের মত কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, উক্ত লার্ড সাহেব অনেকবার স্বীকার করিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডীয় রাজশাসনাপেক্ষা মুসলমানদিগের শাসনের ধারা বিবিধপ্রকারে উৎকৃষ্ট ছিল মুসলমানেরা যে দেশ জয় করিত সেখানে বসতি করিত এবং তদ্দেশীয় লোকদিগের সহিত আত্মীয়তা ভাবে মিশিতে হইত ও তাহাদিগকে সমান অধিকার প্রদান করিত সুতরাং তাহাদিগের রাজত্বকালীন জয়ী ও পরাজিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর স্নেহ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ছিল, আমরা যে প্রকারে রাজ্যশাসন করিতেছি ইহা মুসলমানদিগের শাসনের নিয়মের বিপরীত, আমরা কেবল বল প্রকাশ করিয়া কর্ম্ম করিতেছি এবং লভ্যজনকতার বিষয় আপনাদিগের হস্তগত করিয়া রাখিয়াছি।"

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশে আপনাদের অধিকার সুদৃঢ় করণের পর যদি রাজকীয় কর্ম্ম প্রদান বিষয়ে কবেনণ্ট এবং অনকবেনণ্ট প্রভেদ না রাখিতেন তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের পূর্ব্ব দুঃখের উদ্বোধ হইত না ইহারা মনে করিতেন যে এখানে রাজত্ব দৃঢ় করিবার নিমিত্তই ইংলণ্ডীয়েরা আমাদিগকে রাজকীয় কর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিলেন বস্তুতঃ ইংরাজেরা প্রজার ক্লেশকারক নহেন। কোম্পানী যখন এতদ্দেশে অধিকার করেন তখন তাঁহাদের কুটীর কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত সিবিলসারবিসের আবশ্যক ছিল কিন্তু যখন তাঁহাদের বাণিজ্য কার্য্য রহিত হইয়া এতদ্দেশের আধিপত্য স্থির হইল এবং ইংলণ্ড হইতে রাজ্যকরণের ক্ষমতা পাইলেন তখন স্বদেশীয় লোকের মঙ্গলের জন্য অন্য বিষয়ের বিবেচনা করা উচিত ছিল না। সিবিলসরবেণ্টদের বিলাতে হেলিবরি কালেজে বিদ্যাশিক্ষা করিবার নিয়ম আছে এবং ভারতবর্ষে আসিয়াও তাঁহাদিগকে শিক্ষা করিতে হয় এ সকল সত্য বটে কিন্তু তাঁহারা যাহা শিক্ষা করেন তদ্দ্বারা যে এতদ্দেশের কর্ম্মফল বোধ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিতে পারেন ইহাতে আমার সন্দেহ হয়। বহুসংখ্যক মুন্সির নিকট শ্রুত হইয়াছি যে সিবিল সরবেণ্টেরা যখন এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া কর্ম্মোপযুক্ত বলিয়া প্রশংসা পত্র পান তখন তাহাদের বর্ণজ্ঞানও সুন্দররূপে হয় না, যদিও তাহাদের মধ্যে দু একজন পরিশ্রমপূর্ব্বক শিক্ষা করেন তথাচ অনেকেই অনভিজ্ঞ থাকেন।

এবং ঐ সিবিল সরবেণ্টেরা এতদ্দেশের লোকদিগের

রীতি চরিত্র ভালরূপে জানেন না যে হেতু অনেকেই আপন অধীনস্থ কর্ম্মকারিদিগের প্রতি তাদৃশ স্নেহ প্রকাশ করেন না এবং এতদ্দেশের অন্যান্য ব্যক্তির সহিত তাঁহাদিগের মনের মিল নাই এ প্রযুক্ত কাহারো সহিত উত্তমরূপে ব্যবহার করেন না সুতরাং স্বভাবাদি জানিতে পারেন না, তাঁহারা যে এ দেশের বিষয় কর্ম্ম করেন ইহার অন্য কারণ এই যে তাঁহারা এক কর্ম্মে বাল্যবৃত্তি হইয়া অধিককাল থাকেন না এবং গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহাদিগের যোগ্যতা বিবেচনা না করিয়া প্রায় সর্ব্বদা কর্ম্মের পরিবর্ত্ত করিয়া দেন, আর তাঁহারা যাহা ২ শিক্ষা করেন তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় ব্যবস্থা শিক্ষার কোন নিয়ম নাই, গবর্ণমেণ্ট কহেন যে কর্ম্ম করিতে করিতেই ব্যবস্থা বিষয়ে বিজ্ঞতা ও কর্ম্ম দক্ষতা জন্মিবেক কিন্তু তাঁহারা অজ্ঞতা প্রযুক্ত যে কত লোকের পক্ষে অন্যায় করিতেছেন তাহা গণনা করিয়া বলিতে পারা যায় না, তাঁহারা যে কোন্ সময়ে কর্ম্মদক্ষ ও ব্যবস্থাজ্ঞ হইবেন ইহা কে কহিতে পারে? মফঃসলে যদি সিবিল সরবেণ্টদিগের পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম থাকিত তবে জানিতে পারিতাম তাঁহারা যে কর্ম্ম করিতেছেন তাহাতে পারক কি না এবং পরে যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন তাহা করিতে পারিবেন কি না তাঁহাদিগের কর্ম্ম দেখিয়া তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বোধ করা যাইতে পারে না যেহেতু অনেকেই অবগত আছেন যে মফঃসলে আমলাদিগের দ্বারাই তাবৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় সিবিলিয়ান সাহেবেরা সাক্ষী মাত্র থাকেন; কয়েক বৎসর হইল সদর আদালতের সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে যুবা সিবিলিয়ানদিগকে আদালতের রেজিষ্টারি কর্ম্মে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য কারণ তাহা না করিলে তাঁহাদিগের প্রতি এতদ্দেশীয় যে সকল বিচারকদিগের কার্য্য তদারক করণের ভার থাকিতে পারিবেক না অজ্ঞতাপ্রযুক্ত অনুসন্ধান করিত (ভার থাকিবে তাহা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত অনুসন্ধান করিতে পারিবেক না?); অতএব সদর আদালতের সাহেবদের পত্র দ্বারা ও আমার কথা সপ্রমাণ হইতে পারে তবে এবম্প্রকার রীতিতে বিচার সুন্দররূপে কি প্রকারে হইতে পারে? জানসন্ সাহেবের 'ষ্ট্রেঞ্জের ইন ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকে সিবিলসারবিসের অবস্থা বিষয়ক যে কয়েক পংক্তি লিখিত আছে তাহা নূতন ও যথার্থ, এ কারণ সংগৃহীত হইল এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক যে গভর্ণমেণ্ট নব্য সিবিলিয়নের অযোগ্যতা শোধনে ও উৎপাত জনক সকল ব্যাপার নিবারণের কি উপায় করিয়াছেন; যে উপায় করিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র হয় নাই, নব্য সিবিলিয়ন সেণ্ডহেডে জাহাজ পঁহুছিলে স্বীয় আগমন বিজ্ঞাপন করেন ও সেই দিবসাবধি সরকারি বহিতে তাঁহার নাম লিখিত হয়, তাঁহাকে সুন্দররূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কোন উপায় হয় না, কোন কর্ম্মচারী তাঁহার মুখের একটীও বাক্য শুনিতে বাঞ্ছা করেন না। আর তাঁহার কলিকাতায় কোন কুটুম্ব বা বন্ধু না থাকিলে অন্য কাহারো বাটিতে নিমন্ত্রিত হয়েন না, মমতাক্রান্ত বুদ্ধি রহিত ব্যক্তির সহিত একত্রে বাস করিয়া ধননাশক ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হইতে বাঞ্ছা করেন।

উক্ত ধননাশক সিবিলিয়নেরা যে প্রকার থাকেন তাহা তাঁহাদিগের বিলাতীয় কুটুম্বেরা জানিতে পারেন না কেবল কলিকাতাবাসিরাই জানেন। অশ্বারোহণ ক্রীড়া, সেম-পেন্নিন, টিফিন, ডিনর, বিলিয়ার্ড গৃহ, ফাইবস কোর্ট (fives court), নর্ত্তকীয় বাইয়ের সহিত রাত্রি ক্ষেপন এই সকল কর্ম্মে স্বীয় সর্ব্বনাশ হেতু প্রবর্ত্ত হয়েন এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যাপারও আছে তদপেক্ষা আর কিছু উৎপাত-জনক নাই যাঁহারা সিবিলিয়নদিগের বাটীর নিকটস্থ আছেন তাঁহারাই তন্মর্ম্মজ্ঞ আছেন এবং কলিকাতার পোলিসের দপ্তরখানা হইতে ও এ কথার পোষকতার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

যদ্যপি কেহ কহেন যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পরীক্ষা প্রদানানন্তর সিবিলিয়নেরা সরকারি কর্ম্ম পান, উত্তর, এক্ষণে উক্ত কলেজের অবস্থা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে ও যে প্রকার পরীক্ষার কর্ম্মার্পণ হইতেছে সে কোন কর্ম্মের নহে। লর্ড ওএলেসলি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে ঐ কালেজ বিশেষ উপকারজনক হইবে যেহেতু তথায় এডম এলফিনষ্টন, মেটকাফ, জন কিম্প, মেকেঞ্জি ও অন্যান্য মহাশয়েরা শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং এথনও কিন্তু তাঁহাদিগের তুল্য লোক কালেজের ভগ্নাবস্থা হওয়া অবধি দৃষ্ট হয় নাই।

পূর্ব্বের রীতি বিবেচনা করিলে উক্ত অবস্থার অন্যথা হইতে পারে না কারণ পূর্ব্বে সুশিক্ষার্থে বিবিধ প্রকার

উৎসাহ প্রদত্ত হইত; প্রকাশ্য পরীক্ষা-কালীন গবর্ণর জেনেরল সাহেব স্বয়ং আসিতেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগকে পারিতোষিক প্রদত্ত হইত ও যে ২ সিবিলিয়নদিগের গুণ প্রকাশ হইত তাঁহারা রাজকীয় কর্ম্ম সকলে নিযুক্ত হইতেন। যদি স্যাৎ কেহ বর্ত্তমান সিবিলিয়নদিগের ন্যায় ঘৃণার্হ ব্যাপারে নিমগ্ন হইতেন তথাপি কলেজের সদবস্থা থাকাতে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের সদাদর ছিল কারণ নিপুণতার পুরস্কার হইত এক্ষণে এই প্রবর্ত্তক উপায়ের বিরহে ছাত্রদিগের স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম সুতরাং তাহার একপ্রকার লোপ হইয়াছে। এক্ষণে তথায় শিক্ষক নাই ও তাহার সকল পুস্তক সাধারণ পুস্তকালয়ে প্রেরিত হইয়াছে।

এবম্প্রকার মূলোৎপাটন মন্দজনক ও অনর্থক ঐ কালেজের বিনাশ না করিয়া উৎকৃষ্ট করা কর্ত্তব্য ছিল যদ্যপি পূর্ব্বাপেক্ষা সুনিয়মে পুনঃসংস্থাপিত হয় তবে তাহাতে সিবিল সরবিসের উপকার ও তৎকর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদিগের পিতামাতাদিগের অন্যপ্রকার প্রার্থিত রক্ষণাবেক্ষণ হইতে পারে না, ঐ কালেজে একজন প্রিন্সিপেল প্রকৃতরূপে কর্তৃত্ব করিলে হিন্দু ও মুসলমান আইন ও গবর্ণমেণ্ট আইনের প্রতি উপদেশ দেওনার্থে প্রফেসর নিযুক্ত হইলে ছাত্রদিগের এতদ্দেশীয় ভাষায় শিক্ষা ও কথোপকথন কথনার্থে মুন্সি রাখিলে ও হাজীর হওন ও বাস করণের ভাল বিধি হইলে সিবিলিয়নদিগের ও তাঁহাদিগের কর্ম্মালয় এই দেশ উভয়ের উপকার হইতে পারে।

উক্ত প্রকার উপদেশের উপায় না থাকাতে যে ফল হইতেছে তাহা মেং মার্সমেন সাহেব যাঁহার কথা এ বিষয়ে অতি মান্য তিনি কহেন "যদ্যপি সর্ব্বনিম্নপদাভিষিক্ত মুন্সেফ ইউরোপীয় সিবিলিয়ন যাঁহার অধীনে তাঁহাকে করিতে হইত তাঁহার অপেক্ষা এতদ্দেশীয় ভাষা সকল না জানিলে কর্ম্ম পান না। আর এতদ্দেশীয় ভাষা যাহা বিচারালয়ে প্রচলিত আছে তাহা না জানিলে নিষ্কর্ম্মা অপেক্ষা অধম হইতে হয় কারণ ধূর্ত্ত আমলার হস্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া মন্দের মূলক হয়েন। এতদ্দেশীয় ভাষার জ্ঞানাভাবে সুতরাং আমলার সাহায্য ব্যতিরেকে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে না ও আমলার স্বীয় ইষ্ট সিদ্ধ্যর্থে বিচারের ব্যাঘাত করে।

সিবিলিয়ন কর্ম্ম আরম্ভ করণে উচ্চ পদাভিষিক্ত কর্ম্মকারিদিগের তাঁহারা ভাষা শিক্ষার্থে যত্ন দূরে যায় ও ভাষার জ্ঞানাভাব থাকিলে ও তিনি কর্ম্ম করেন তাহাতে উপর আদালতের সাহেবেরা কিছুই কহেন না কিন্তু আইনের অন্যায় করিলে তিরস্কৃত হয়েন, যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিচার সম্পর্কীয় কর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থে পরীক্ষা করিতে হইতেছে তবে এই বিধি সিবিলিয়নদিগের প্রতি হওনে বড় আবশ্যক এই অভিপ্রায়েই কালেজ স্থাপিত হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শীঘ্রই রহিত হইল এবং সিবিলিয়নেরা আইন না জানিলেই কর্ম্মকরণের প্রথা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই কর্ম্ম করিতে ২ উক্ত অনভিজ্ঞতা দূরে যাইবে কিন্তু তাহাদিগের শিক্ষা নবিসের নিমিত্তে লোকদিগের কি ক্লেশ ও কত ক্ষতি।"

এইরূপ প্রাথমিক অবস্থানন্তর—তাহাদিগের কর্ম্মদক্ষতা হওয়া অতি অসাধারণ ও দশ জনের মধ্যে একজনও পাওয়া যায় না যে স্বকর্ম্মে উত্তমরূপে মনোযোগী। আমি কলিকাতার অনেক উচ্চপদাভিষিক্ত কর্ম্মকারিদিগের নাম করিতে পারি যাঁহারা কর্ম্মালয়ে কখনই না বসিয়া স্ব ২ সাক্ষরার্থক কাগজ গৃহে বিলিয়ার্ড ঘরে রূকেট খেলার ঘরে লইয়া যান তবে যে তাহাদিগের—নিম্নপদাভিষিক্ত কর্ম্ম করিয়া কুব্যবহার করে ও তাঁহাদিগের সদা অনুপস্থিত জন্য আমলারা দুষ্কর্ম্ম করণের—অবকাশ পান তাহা কি আশ্চর্য্য?

[১০ই অক্টোবর ১৮৪৩]

আমরা নিরন্তর যে লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নাম কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্মরণ করিয়া থাকি তিনি সিবিল সরবেণ্টদিগের অকর্ম্মণ্যতা জ্ঞাত হইয়া বলিয়াছিলেন "ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষের রাজ্য কার্য্য তদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের নির্ব্বাহ করা উচিত, ইংলণ্ড হইতে যে ৮০০ শত কিম্বা এক সহস্র লোক তথায় প্রেরিত হয় কেবল তাহাদিগের লাভ ও ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত গণতা করা অকর্ত্তব্য। আর ঐ সকল প্রেরিত ব্যক্তিকে রাজকীয় যে ২ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যায় তাহাদিগের সম্যকরূপে তন্নির্ব্বাহের ক্ষমতা নাই সুতরাং তাঁহারা যে ২ রাজস্ব ও বিচার সম্পর্কীয় কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হন তাহা প্রকৃতরূপে সমাধা করিতে পারেন না।"

অপর—স্যার টমাস ব্রেন সাহেব ১৮৩০ সালে স্বাক্ষ্য

প্রদানকালীন কহিয়াছিলেন "সিবিল সরবিসের অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় তৎকর্ম্মাকাঙ্ক্ষিদিগের উপযুক্ত মতে জ্ঞান বা দিক্‌-দর্শন হয় না"।

সিবিল সরবেণ্টদিগকে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থানুসারে মোক-র্দ্দমার বিচার করিতে হয় কিন্তু তাঁহারা এদেশের ব্যবস্থা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত নহেন মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে বিচার করিতে হইলে প্রায় আদালতের মৌলবীর বাক্যে নির্ভর করেন এবং হিন্দু শাস্ত্রানুসারে মোকর্দ্দমা করিতে হইলে পণ্ডিতের কথায় নির্ভর করিয়া থাকেন।

সিবিল সরবিসের মধ্যে আর এক কদর্য্য বিষয় আছে যথা সিবিল সরবেণ্ট-সাহেবেরা জ্ঞাত আছেন যে তাঁহা-দিগের স্ব ২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ যে শিক্ষা করা আবশ্যক তাহা না করিলেও গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের ব্যায়ানুকূল্য করিবেন এ প্রযুক্ত তাঁহারা শিক্ষার নিমিত্ত পরিশ্রম বা উদ্যোগ করিতে প্রায় স্বীকার করেন না। গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় কোন কর্ম্মচারির কোন অংশে কিঞ্চিৎ অপরাধ পাইলে তাহার হস্তে আর রাজকীয় কর্ম্ম সমর্পণ করেন না কিন্তু সিবিল সরবেণ্টদিগের পক্ষে সে নিয়ম নাই, সিবিলিয়নদিগের মধ্যে কেহ ২ অত্যন্ত উপযুক্ত আছেন আমরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মান্য করি এবং কখনই তাঁহা-দিগের প্রতি দোষারোপ করি না কিন্তু কেবল নিয়মের প্রতি দোষ দেখাইলাম অতএব ভরসা করি পাঠকবর্গ অস্মদুক্তিতে বিরুদ্ধ জ্ঞান করিবেন না। প্রস্তাবিত বিষয়ে যাহা ২ উক্ত হইল এই কথা ইংলণ্ডনিবাসী হিন্দুদিগের প্রতি এবং ফ্রান্স দেশস্থ চীন জাতীয়দের প্রতি ও জর্ম্মেণী দেশস্থ বিলোচিদিগের প্রতিও বলা যাইতে পারে।

সিবিল সরবেণ্টদিগের দলবদ্ধতা আর এক অমঙ্গলের কারণ, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কাহারও প্রতি সুবিচার করিতে পারেন না, প্রায় সর্ব্বদাই সহরে এবং মফঃসলে এ বিষয়ের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা যদিও স্বীকার করি যে সিবিল সরবিস সংস্থাপন মন্দ কর্ম্ম নয় তথাচ বলিতে পারি যে জয়ী এবং পরাজিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রভেদ রাখা অনুচিত আর সিবিল সারবেণ্টদিগের দ্বারা এতদ্দেশীয়দিগকে "তুই এই পর্য্যন্ত গমন করিবি ইহার অতিরিক্ত যাইতে পারিবি না" এই বলিয়া তুচ্ছ করা অকর্ত্তব্য, ফলত দেশের মঙ্গল ও উন্নতির বিরুদ্ধ কর্ম্মে পোষকতা করা গবর্ণমেণ্টের কদাচ কর্ত্তব্য নয় ইহাতে কেবল গুণিব্যক্তির নৈরাশ্য হয় এবং বিদ্যা ও পরিশ্রমের পুরস্কার হয় না। আর স্বাভাবিক নিয়ম সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করা উচিত তাহা রহিত করিলে কিম্বা স্থগিতার্থ যত্ন করিলে পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা যায়।

"হে দুরাত্মা, তুমি বৃথা মায়াবির কুহক বুঝিতে চেষ্টা করিতেছ আর তুমি মনের গতিকে রুদ্ধ করিতে মিথ্যা বাঞ্ছা কর, তুমি কি বায়ুর গতিরোধ করিতে এবং ঘূর্ণায়মান পৃথিবীমণ্ডল স্থির করিতে ও সমুদ্রের তরঙ্গকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারহ? না, অনিবার্য্য সাগরের বীচি তুমি শস্ত্রধারী হইলেও তোমাকে তুচ্ছ করিবেক, কেন্যুট নামক মহারাজও সমুদ্রের তরঙ্গ ফিরাইতে পারেন নাই।"

বাণিজ্য বিষয়ক প্রতিবন্ধক থাকিলে যদ্রূপ ব্যবসাতে ব্যাঘাত জন্মে পদের অসমানতাতেও তদ্রূপ রাজকীয় কর্ম্মের হানি হয় অতএব ইতিহাস সংক্রান্ত উদাহরণ কিম্বা সিবিল সরবেণ্টদিগের অকর্ম্মণ্যতা অথবা বিচার বিষয়ক স্বাভাবিক রীতি বর্ত্ম বিবেচনা করিলে সকলে কহিবেন যে বর্ত্তমান সনন্দের ৮৭ প্রকরণের বিধি শীঘ্র প্রচলিত করা অত্যাবশ্যক, এবিষয়ে আমরা যাহা কহিলাম তাহা কোন মতে অসঙ্গত বা অন্যায় নহে। যদিও এতদ্দেশীয়েরা তাবৎ প্রকার রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে সম্যক্‌রূপে সক্ষম না হউক তথাচ যে যে বিষয়ে ইহাদিগের পারকতা আছে আবশ্যক মতে তত্তদ্বিষয়ে উক্ত সনন্দের ৮৭ ধারা প্রচলিত করা উচিত ছিল তাহা হইলেই পরস্পরের ঈর্ষা ও ভেদজ্ঞানের নিবৃত্তি হইত এবং পৃথিবীর মনুষ্যেরা জানিতে পারিতেন যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজত্বে প্রজারা কেবল গুণের দ্বারা রাজকীয় কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় সহায় কোন কার্য্যকর নহে, এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক রাজকীয় কর্ম্মে অনুপযুক্ত আছেন একথা সত্য কিন্তু এ নিমিত্ত যোগ্য ব্যক্তিরা তত্তৎপদ হইতে নিরাশও হইতে পারেন না, তাঁহারা এদেশে জন্মিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদিগের ঐ সকল কর্ম্ম পাইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, আর তাঁহারা এদেশের রীতিনীতি বিশেষরূপে অবগত হইতে ও তাহাদিগের উচ্চপদ আসিতে পারে। যদিও ১৮৩১ সাল অবধি রাজস্ব আবগারি এবং বিচার

সম্পর্কীয় প্রধান ২ কর্ম্মে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক নিযুক্ত হইতেছেন এবং তাহাদিগের ক্ষমতা ও পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে তথাচ কবেনণ্ট এবং অনকবেনণ্ট কর্ম্মকারীদের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা এবং ভেদজ্ঞান অদ্যাবধি বলবৎ আছে যেহেতু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি অনকবেনণ্ট কর্ম্মকারী কখনই কবেনণ্ট কর্ম্মকারীর পদে আরূঢ় হইলেন না এবং শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকেও প্রথমোক্ত কর্ম্মকারির কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে দেখিলাম না, এতদ্দেশীয়—কর্ম্মকারিরা অতি প্রবীণ এবং বিবিধ প্রকারে বহুদর্শী হইলেও তাঁহাদিগকে—অল্প বয়স্ক এবং বিবেচনা রহিত কিঞ্চিদজ্ঞ জজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহাশয়দিগের অধীনে থাকিতে হয়। এতদ্দেশের লোকেরা যে নানাবিধ কর্ম্মে উপযুক্ত, বোধ হয় সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের বোধগম্য হইয়াছে কারণ বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে সদর আদালতের ডিপুটী রেজিষ্টরি এবং সুন্দর বনের অচিরস্থায়ী কমিশনর কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ডিপুটী মাজষ্ট্রেটী পদেও অনেককে নিযুক্ত করিবেন। প্রথমোক্ত কর্ম্ম অতি প্রধান, দ্বিতীয় অচিরস্থায়ী, তৃতীয় কর্ম্মার্পণের যেরূপ নিয়ম শুনা যাইতেছে তাহাতে অনুমান হয় এখানকার লোকেরা উত্তরকালে রাজকীয় কর্ম্ম অধিক প্রাপ্ত হইবেন কিন্তু ঐ পদে লোক নিযুক্ত হইলে পরে কি প্রকার হইয়া উঠে দেখা যাইবেক। প্রস্তাবিত বিষয়ে আমার বাদানুবাদ করণের তাৎপর্য্য এই যে কবেনণ্ট এবং অনকবেনণ্ট কর্ম্মকারিদিগের মধ্যে প্রভেদ না থাকে এবং গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় উচ্চপদ উপযুক্ত ব্যক্তিমাত্রকে দেওনের প্রথা হয় আর কর্ম্মার্পণকালীন কর্ম্মকারিদিগের কেবল গুণের বিবেচনা না হয় সহায়ের প্রতি দৃষ্টি রহিত হয়। এক্ষণে এতদ্দেশীয় কর্ম্মকারিরা ভাবি উচ্চপদের আশায় নিরাশ হইয়া আছেন কিন্তু এরূপ নৈরাশ্য করা অতি অন্যায় সুতরাং—যদবধি ঐ নিয়মের অন্যথা না হয় তদবধি দেশের পক্ষে কুশল সম্ভাবনা নাই অতএব ঐ অন্যায় নিয়ম যাহাতে শীঘ্র রহিত হয় এমত উপায় করা কর্ত্তব্য তাহা হইলে বিচার, উত্তম রাজশাসন, পরিমিতাচরণাদির সম্মত কর্ম্ম হইবেক। এক্ষণে শেষোক্ত দুই বিষয়ে কিঞ্চিৎ কহিতেছি, সলিবান সাহেব পরিমিত ব্যয়ের উপর দৃষ্টি করিয়াই বাঙ্গালীদিগকে তাবৎ প্রকার রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করণের প্রস্তাব করেন ও তদর্থ বাদানুবাদ করেন, কারণ গত ৫ বৎসরের মধ্যে কোম্পানীর ১০০০০০০০ পৌণ্ড ঋণ হয় এবং গত বৎসরে ২০৪৪০০ টাকা খাজনা ন্যূন হয় অর্থাৎ সমুদায়ে ১০০২০৪৪০ পৌণ্ড অথবা ১০০২০৪৪০০ টাকা ঋণ বৃদ্ধি হয় এবং যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে উহা অপেক্ষা আরো বৃদ্ধি হইত। সিবিল সরবেণ্টদিগের বেতনেই অধিক ব্যয় হয় তাহাদিগের এক কর্ত্তৃত্ব রহিত করিয়া যদি বাঙ্গালীদিগকে তৎপদে নিযুক্ত করা হয় তবে ব্যয়ের অনেক লাঘব হয় আর বাঙ্গালীদিগকে রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে যে উত্তমরূপে যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না ইহা কেহ বলিতে পারিবেন না যেহেতু ১৮৩৬ সালাবধি ১৮৪০ সাল পর্য্যন্ত সদর আদালত হইতে যে সকল রিপোর্ট প্রকাশ হয় তদ্দ্বারা সকলে অবগত হইয়াছেন যে বাঙ্গলা প্রদেশের ১৬৭ জন প্রিন্সিপেল সদর আমীনের মধ্যে ১৩ জনের এবং ১২১ সদর আমীনের মধ্যে কেবল ছয় ব্যক্তির নামে মন্দ রিপোর্ট হয়, যদি প্রথমাবধি বিবেচনা পূর্ব্বক তত্তৎ কর্ম্মে লোক নিযুক্ত হইত তবে বোধ হয় উহাও হইত না, সে যাহা হউক, এক্ষণে যাহা হইয়াছে তাহাতেও আমরা সাহসান্বিত হইতে পারি ; আমাদিগের—দুঃখের বিষয় এই যে তথাপি চারি রাজ্যের মধ্যে সমুদায়ে এতদ্দেশীয় বিচারক ৪৬০ জন মাত্র কিন্তু সিভিলিয়ন প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮২৫ জন। এলাহাবাদ কোর্টের ১৮৪০ সালের রিপোর্টেতেও বাঙ্গালী জজদিগের সুখ্যাতি প্রকাশ হইয়াছে অতএব আমরা নিঃসন্দেহরূপে কহিতে পারি বাঙ্গালীদিগকে কর্ম্মদানের প্রথা বিস্তারিত করিলে সর্ব্বত্র সুবিচার হইবেক।

এতদ্দেশীয় কর্ম্মকারিদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত যে সকল আইনের প্রচার হইয়াছে তদ্দ্বারা, বাঙ্গালীদিগের কর্ম্মদক্ষতা সপ্রমাণ হইতে পারে, ইঁহারা অনেক গুরুতর ও পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন এবং করিতেছেন আর প্রায় তাবৎ কর্ম্মের অধিকাংশ ভার ইঁহাদের হস্তে পতিত হয়। সলিবান সাহেব বক্তৃতাকালীন কহিয়াছিলেন যে ১১৭৯ (?) শালের পর ১০৬৬৪০০৬০ (?) মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হয় তন্মধ্যে ইউরোপীয়েরা ৪৯৮৫ মোকর্দ্দমার বিচার করেন এবং বাঙ্গালি কর্ম্মকারকদের দ্বারা ১৬৬৪৬০ মোকর্দ্দমার বিচার নিষ্পত্তি হয় অতএব এতদ্দেশীয়রা ইংরাজদিগের অপেক্ষা নয়গুণ (?) কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

১৮২৯ শালের ৫ই নবেম্বর মেষ্টর বটর ওয়ার্থবেলি সাহেব

স্বীয় মত লিখনকালীন কহেন যে "যে সকল জেলা হইতে সবিচারের রিপোর্ট পাওয়া যায় সেখানে প্রায় মুন্সেফ সদর আমীন দ্বারা বিচার হয়, এক্ষণকার সদর আমীনেরা উত্তম আইনজ্ঞ এবং বহুদর্শী তাঁহারা বাদি প্রতিবাদির সহিত উপযুক্ত ব্যবহার করাতে রাইতেরা ইউরোপীয় জজ অপেক্ষা তাহাদিগতে অধিক মাণ্য করে।"

[১৭ই অক্টোবর ১৮৪৩]

স্যার হেন্‌রি ষ্ট্রাচি সাহেব কহিয়াছিলেন "অনুমান হয় মোকর্দ্দমার বিচার বিষয়ে আমাদিগের কর্তৃত্বাপেক্ষা এদেশীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব রাখা ভাল, এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বের রীতিতে যে কএকটা দোষ আছে তাহা অনায়াসে নূতন নিয়ম দ্বারা শুধরান যাইতে পারে"। অপর, নেটিব কমিশনরি বিষয়ে উক্ত সাহেব এইরূপ কহিয়াছিলেন যে ঐ কর্ম্মকারি এতদ্দেশীয় বহুসংখ্যক ব্যক্তি অবলীলাক্রমে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতেছেন আর ইহাদিগের এতদ্দেশীয় ভাষাতে সহজ নৈপুণ্য থাকাতে সম্মুখে যে সমস্ত লোক উপস্থিত হয় তাহাদিগের রীতি চরিত্রাদি সুন্দররূপে জ্ঞাত হইতে পারেন সুতরাং ইহাদের আদালতে প্রায় মিথ্যা শপথের ব্যাপার শুনিতে পাওয়া যায় না। আমি বিলক্ষণরূপে অবগত আছি এতদ্দেশীয় সামান্য কর্ম্মদক্ষ লোকেরাও কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন প্রাপ্ত হইলে ইউরোপীয় মহাশয়দিগের অপেক্ষা অধিক সতর্কতাপূর্ব্বক কঠিন ২ মোকর্দ্দমার সাক্ষির পরীক্ষা লইতে পারেন অতএব এক্ষণে প্রার্থনা এই যে নেটিব কমিশনরদিগের বেতন বৃদ্ধি হয় এবং তাহাদিগের প্রতি অধিক টাকার মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তির ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। যদি কেহ কহেন যে এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে কোন ২ ব্যক্তি বিদ্যাভ্যাস দ্বারা পারক হইয়া কঠিন ২ মোকর্দ্দমার বিচার করিতে পারেন এ কথা সত্য কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই অল্পজ্ঞানী ও অবহুদর্শী সুতরাং ইউরোপীয়েরা যেমন বিবেচনা ও বিজ্ঞতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এতদ্দেশীয়েরা কখন তদ্রূপ পারিবেন না, ইহাতে আমি এই উত্তর করি, এদেশের লোকদিগকে যে প্রকার দাসত্বে রাখিয়াছেন তাহাতে ইহারা উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না তথাচ ইহাদিগের হস্তে যে যে কর্ম্ম বিশ্বাসপূর্ব্বক অর্পিত হয় তন্নির্ব্বাহোপযুক্ত বিদ্যা ইহারা অনায়াসে শিক্ষা করিয়া থাকেন ফলতঃ যদি ইহাদিগের উৎসাহ ও সাহস ভঙ্গ না হয় তবে এতদ্দেশ ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকৃত হওনের পূর্ব্বে ইহারা যদ্রূপ তাবৎকর্ম্ম দক্ষ ছিলেন কিঞ্চিৎকাল পরে সকলেই তদ্রূপ হইতে পারেন। আর রিচার্ডস সাহেব ১৮৩০ সালে সাক্ষ্য প্রদান কালীন কহিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি এক্ষণে যেরূপ বিচার সম্পর্কীয় কর্ম্মের ভারার্পণ করা যাইতেছে তদপেক্ষা অধিক করিলে দেশের পক্ষে বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে ভারতবর্ষীয় ইতিহাস মধ্যে আমরা অনেক বিষয়ে নৈরাশ্য বোধ করি কিন্তু ইহার এক প্রধান কারণ আছে অর্থাৎ আমরা এখানকার লোকদিগের বিদ্যা ও বুদ্ধির অল্পতা অনুমান করিয়া ইহাদিগকে হেয় জ্ঞান করত স্বদেশী ব্যক্তিদিগের হস্তে রাজকীয় প্রধান ২ কর্ম্মার্পণ করিয়া থাকি কিন্তু আমার বিবেচনায় এই বোধ হয় যে এদেশের মোকর্দ্দমার বিচারার্থে অধিকাংশ এতদ্দেশীয় লোক নিযুক্ত করিলে প্রজাদিগের স্বত্ব রক্ষা ও সুখে রক্ষণাবেক্ষণ হয় ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টও সতত এই প্রার্থনা করেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় লোকদিগের প্রতি হেয় বুদ্ধি ও তাচ্ছীল্য থাকিবেক সে পর্য্যন্ত আমাদিগের ভারতবর্ষীয় কার্য্য কোন মতে সুপ্রতুল হইবেক না।"

কর্ণেল ওয়াকার, স্যার জন মালকম, স্যার টমাস মনরো, মেং এম এলফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতির মত এই যে এতদ্দেশের রাজকীয় তাবৎ কর্ম্ম বাঙ্গালীদিগের দ্বারা নির্ব্বাহ করা যায়, সলিবান সাহেব আপনার প্রস্তাব কালীন ঐ সকল ব্যক্তির মত প্রমাণ দিয়াছেন এবং হোলট মেকেঞ্জি, ডেভিড হিল, আলেকজণ্ডর ডঙ্কিন কেম্বল, আলেকজণ্ডর রাস এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যান্য মহাশয়দিগের উক্তরূপ অভিপ্রায় দর্শাইয়া স্বীয় প্রস্তাবের দার্ঢ্য করিয়াছেন। আমাদের দুঃখের বিষয় এই যে এতাদৃশ বহু সংখ্যক মহাশয়ের এবম্প্রকার অভিপ্রায় সত্বেও বাঙ্গালিদিগকে তাবৎ উচ্চ কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন, এ বিষয়ে চেপলিন সাহেবের কথা প্রমাণে এই বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গালিদিগের সচ্চরিত্রের প্রতি অনর্থক সন্দেহ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকেরা যে সদাচারী তদ্বিষয়ে ওয়ারিণ হেষ্টিং, স্যার জান মালকম, স্যার টমস মনরো, ডবলিউ চেপলিন,

মেজর জেনেরেল স্তার এম স্মিথ্ কাপ্তেন ওয়েষ্ট মেকট, রাজা রামমোহন রায়, মেং আর রিকার্ডো, বিসপ হেবর, স্তার চারলস ফারবস, প্রফেসর এইচ ২ উইলসন, মেং এ, ডি কেমবেল প্রভৃতি সদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

অন্যান্য দেশীয় ব্যক্তিদিগের স্তায় এদেশের লোকেরাও উৎকোচ গ্রহণাদি কুক্রিয়া করিয়া থাকেন কিন্তু একারণে কেবল ইহাদিগকে সরকারি প্রধান ২ কর্ম্মে নিঃসম্পর্ক করা অনুচিত। ইংলণ্ডীয় মহাশয়দিগের দ্বারা এতদ্দেশ অধিকৃত হওনের প্রথমকালে যখন গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রধান কর্ম্মচারিদিগের বেতন অল্প ছিল তখন তাঁহারা কি প্রকারে উৎকোচাদি গ্রহণ করিতেন তাহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার স্প্রাই সাহেব কহেন যে এতদ্দেশীয় লোকদিগের হস্তে বিশ্বাস করিয়া যে প্রধান ২ কর্ম্ম দেওয়া যায় না ইহার কারণ এই, ইহারা প্রায় অসৎ এবং কৃতঘ্ন; কিন্তু ঐ মহাশয়ের স্মরণ করা উচিত যে ইউরোপীয় কর্ম্মকারকেরা অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং নীতিজ্ঞ হইয়াও যদবধি গবর্ণমেণ্ট হইতে উপযুক্ত বেতন প্রাপ্ত না হইয়াছিলেন তদবধি তাঁহারা সরকারের বিশ্বাসপাত্র হইতে পারেন নাই সুতরাং ভারতবর্ষের রাজকীয় কর্ম্ম সংক্রান্ত ইতিহাস মধ্যে তাঁহাদিগের অনেক কুক্রিয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়; এতদ্দেশীয় লোকেরা অদ্যাবধি ঐ প্রকার কর্ম্ম করিয়া তদ্রূপে যে অপরাধি হয়েন নাই ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করা কর্ত্তব্য। ইউরোপের সমস্ত গবর্ণমেণ্ট স্ব ২ অধীনস্থ প্রজাদিগের লভ্য দর্শাইয়া তাহাদিগকে উচ্চপদ প্রদানপূর্ব্বক বশীভূতে রাখিয়াছেন এবং তাহাদিগের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হইতেছেন আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে যদি ঐরূপ কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হইতে করেন তবে এখানেও ঐ প্রকার রাজনীতি স্থাপন করুন তাহা হইলে অল্পকালের মধ্যে ইউরোপীয়দিগের স্তায় ভারতবর্ষীয়দের কৃতজ্ঞতা দেখিতে পাইবেন।

পশ্চাল্লিখিত তালিকাতে ইউরোপীয়দিগের অসদ্ব্যবহারের অশুভ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইবেক। ১৭৫৭ সালাবধি ১৭৭৬ সাল পর্য্যন্ত এদেশের রাজা এবং অন্যান্ত লোকেরা যত টাকা উৎকোচ দেয় তাহা কমিটির নিকট সপ্রমাণ হয়। ঐ টাকা কোন্ সময়ে দত্ত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি কত পাইয়াছিল তাহার তালিকা নিয়ে দৃষ্ট হইবেক।

১৭৫৭ মিরজাফিরের পক্ষে যত দেওয়াতে মেষ্টর ড্রেক গবর্ণর—২৮০০০০ টাকা ৩১,৫০০ পৌণ্ড।

কর্ণেল ক্লাইব সিলেক্ট কমিটীর দ্বিতীয় মেম্বর রূপে	২৮০০০০	
ঐ কমাণ্ডরিন চিপরূপে	২০০০০০	
ঐ গোপনে	১৬০০০০০	
	২০৮০০০০	২৩৪৩০০০
মেষ্টর ওয়াট্স কমিটির মেম্বর রূপে	২৪০০০০	
ঐ গুপ্ত কর্ম্মকারি রূপে	৮০০০০০	
	১০৪০০০০	১১৭০০০
মেজর কিলপাট্রিক	২৪০০০০	২৭০০০
ঐ গুপ্ত কর্ম্মকার রূপে	৩০০০০০	৩৩৭৫০
মেষ্টর মেনিঙ্গ হেম	২৪০০০০	২৭০০০
মেষ্টর বেচার	২৪০০০০	২৭০০০
কৌন্সলের ৬ মেম্বর প্রত্যেকে এক লক্ষ	৬০০০০০	৬৮০০০
মেষ্টর ওয়াল্স	৫০০০০০	৫৬২৫০
মেষ্টর স্ক্রুফটন	২০০০০০	২২৫০০
মেষ্টর লসিংটন	৫০০০০	৫৬২৫
কাপ্টেন গ্রাণ্ট	১০০০০০	১১২৫০
যুদ্ধ জাহাজ এবং সৈন্তদিগের		৬০০০০০
		১২৬১০৭৫

লর্ড ক্লাইব প্রধান সেনাপতিরূপে যে দুই লক্ষ প্রাপ্ত হন তাহা এই হিসাব হইতে রহিত হইবেক কারণ তাহা সৈন্তগণের দানের অন্তর্গত ছিল　　২২৫০০

১২৩৮৫৭৫

১৭৬০ সালে কাসীমের পক্ষে নির্দ্ধার্য্য হয়

মেষ্টর সমার		২৮০০০
তথা হাল ও এল	২৭০০০০	৩০৯৩৭
তথা এম গাইচ	১৮০০০০	২০৬২৮
তথা স্মিথ	১৩০৩০০	১৫৩৫৪

মেজর ইয়রক	১৩৪০০০	১৫৩৫৪
জেনেরল কৈলাড	২০০০০০	২২৯১৬
মেষ্টর বেন্সিটার্ট ১৭৬২		
শালে ৭ লক্ষ পান কিন্তু		
তাহা হইতে দুই লক্ষ		
জেনেরল কৈলাডের হয়		
অতএব তাঁহার হিসাবে		
৫ লক্ষ হইয়াছিল	৫০০০০০	৫৮৩৩৩
মেষ্টর এস গাইচ ৫০০০ স্বর্ণ মোহর ৭৫০০০		৮৭৫৯
		২০০২০৯

১৭৬১ সালে জেফরের পক্ষে ধার্য্য হয়

সৈন্যদিগের চুক্তি	২৫০০০০০	২৯১৬৬৬
জাহাজের চুক্তি	১২৫০০০০	১৪৫৮৩৩
		৪৩৭৪৯৯

১৭৬৪ সালে মেজর মর্নো বলবন্ত সিংহের নিকট		
প্রাপ্ত হন		১০০০০
নবাবের নিকট হইতে পান		৩০০০
মেজর মণ্টোর পরিবারের কর্ম্মকারিরা উক্ত		
নবাবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়		৩০০০
চিয়ালির বণিক্‌দিগের নিকট		
সৈন্তেরা পান	৪০০০০০	৪৬৬৬৬
		৬২৬৬৬

নদ জিমল দৌলার বন্দোবস্ত ১৭৬৫

মেষ্টর স্পেনসার	২০০০০০	২৩৩৩৩
মেং প্লেডেল বরজেট এবং গ্রে		
প্রত্যেক এক ২ লক্ষ	৩০০০০০	৩৫০০০
মেং জানষ্টোন	২৮৭০০০	২৭৫৫০
মেং লেসেষ্টার	১১২৫০০	১৩১২৫
মেং সিনিয়ার	১৭২৫০০	২০১২৫
মেং মিডিলটন	১২২৫০০	১৪২৯১
মেং গিডন জানষ্টোন	৫০০০০	৫৮৩৩
		১৩৯৩৫৭

জেনেরল কর্ণ-সি ১৭৬৫ সালে বলবন্ত

সিংহ হইতে পান	৮০০০০	৯৩৩৩
এবং রাজা হইতে পান	২০০০০০	২৩৩৩৩
লার্ড ক্লাইব হইতে ১৭৬৬ সালে পান	৫০০০০০	৬৮৩৩৩
		৯০৯৯৯

জেফরের স্থাপন ১৭৫৭

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী	১২০০০০০
ইউরোপীয়েরা	৬০০০০০
এতদ্দেশীয়েরা	২৫০০০০
আরমেনিয়ন	১০০০০০
	২১৫০০০০

কাজীম ১৭৬০

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী	৬২৫০০

জেফর ১৭৬০

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী	৩৭৫০০০
ইউরোপীয় নেটীব	৬০০০০০
	৯৭৫০০০

সুজা দৌলার সহিত সন্ধি

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী	৫০০০০০০	৫৮৩৩৩৩
সমুদায়ে পুরস্কার ২১৬৯৬৬৫ নির্দ্ধার্য্য		£৩৭৭০৮৩
লার্ড ক্লাইবের জাইগীর সমুদায়ে		£৫৯৪০৪৯৮

সরকারের অনকবেনণ্ট কর্ম্মকারকেরা অধিক বেতনাদি পাইয়া পরে নীতিজ্ঞ হইয়াছেন অতএব এতদ্দেশীয় লোক-দিগের পক্ষে ঐ রীতি প্রচলিত হইলে ইহারাও নীতিজ্ঞ এবং সৎ হইতে পারিবেন ভারতবর্ষের মধ্যে কোন ২ স্থানের লোকেরা তত্তদেশের জল বায়ু এবং অন্যান্য কারণে ইংলণ্ডীয়-দিগের তুল্য বলবান নহেন ইহা সত্য কিন্তু ইহারা ইংলণ্ডীয় মহাশয়গণের তুল্য সুশিক্ষিত ও জ্ঞান এবং নীতিজ্ঞান বিষয়ে তাহাদিগের সমান, অতএব এই সকল বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান সনন্দের ৮৭ প্রকরণ সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত করা অত্যাবশ্যক। আমাদিগের আশ্বাস হইতেছে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে ধর্ম্মতঃ ত্রুটি না করিলে অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবেক ইতি।

শ্রীসুখেন্দুলাল মিত্র

জেনেভা-ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বৃহস্পতিবার ২রা অক্টোবর, ১৯৩০

বিজয়াদশমী

শরতের নির্ম্মল নীল আকাশে চিরপরিচিত সুধাকর পাহাড়-জঙ্গল-হ্রদের উপর দেশেরই মত মধুবর্ষণ করিতেছে। দেশের কথা, দেশের লোকের কথা বার বার মনে করিয়া দিতেছে। পাঁচ ঘণ্টা আগে দেশে এই সুধা-বণ্টন করিয়া চির-অতৃপ্তকে তৃপ্ত করিবার জন্যই যেন বহু সহস্র ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিয়া অভয় দিতেছে। অভয়ার কৃপায় বিজয়া যথার্থ বিজয়া হোক।

এবার লীগ অব নেসনস্ সভায় ভারত-প্রতিনিধিগণের কৃতিত্বের যথেষ্ট যশ হইয়াছে। কিন্তু আসল কথার ধার দিয়াও কেহ যাইতেছেন না। আমার দাঁত কন্‌কন্ করিয়াছে এ-সংবাদ তারে পাইওনীয়ার পত্রে গিয়াছে। কিন্তু দেশের যে সমূহ সর্ব্বনাশ হইতেছে এবং চুয়ান্ন জাতির প্রতিনিধির সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে সে কথা তুলিবার যো নাই এ-কথা কোন কাগজে তারে বা বেতারে যায় না।

বিনা তারে বিদ্যুৎ সংবাদ—কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি আর্থার বরোজ্ মিসেস্ হোমাইটের পরিচয়-পত্র লইয়া দেখা করিতে আসিতেছেন। তাঁহাকে এ-কথা বলিব। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে লীগ যেরূপ ঢিমে-তে-তালায় নির্জ্জীবভাবে চলিয়াছে, তাহাতে কোন কাজ হইবে না। এ বিষয়ে উন্নতি ও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। লীগের খরচ ভারতবর্ষ যাহা দেয়, তাহা ৭ লাখ হইতে ১০ লাখ টাকা হইবে। এ দান হিসাবে ভারতের স্থান ষষ্ঠ—ইহাতে প্রচুর সম্মান অবশ্য আছে, কিন্তু প্রতিদান নাই। ভারতবর্ষের লোক বিশেষ কোন উপকার পায় না, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে। রোম, টোকিও, স্ানকিন, লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, বুডাপেষ্ট, পিকিং-এ লীগের নিজ আফিস আছে। কিন্তু এত বড় ভারতবর্ষের কোথাও একটা আফিস নাই। ভারতগভর্ণমেণ্ট আবার খরচ করিয়া কেন আফিস করিবে তাহার কারণ নাই। এখানকার আফিসে সকল জাতির বড় বড় চাকুরী; কিন্তু ভারতবর্ষের অতি অল্প লোকের ছোট ছোট চাকুরী। ভারতবর্ষ হইতে যে সব অধ্যাপক ও নেতা আসেন, তাঁহাদের দ্বারা এখানে বিশিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা নাই। লীগের মধ্যে ভারতবর্ষের মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়, কারণ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দৈন্য অত্যধিক, এই সকল কথার আলোচনা অতি তীব্রভাবে আমার করিতে হইল। আমার সহ-প্রতিনিধিগণকে আমাদের রিপোর্টে এই সব কথা তুলিতে বলিয়া বিজয়ার আয়োজন করিলাম। ভগবৎ ইচ্ছায় বিজয় হউক।

শুক্রবার ৩রা অক্টোবর, ১৯৩০

গতকল্য জেনিভা-ইউনিভারসিটির অধ্যাপক মিঃ রাপ্যার্ড সাহেবের পল্লীনিবাসে মধ্যাহ্ন-ভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। য়্যাসেম্বিলীর মিটিংএর পর তাঁর মোটর করিয়া তাঁর বন-ভবনে লইয়া গিয়া অতিথি-সৎকারের চূড়ান্ত করিলেন। সদানন্দ বিজ্ঞান-অধ্যাপক নিজের কাজের আনন্দে ও উৎসাহে ভোর হইয়া আছেন, স্ত্রীও তদনুরূপ, পাঁচ মিনিটের পরিচয়ে নিতান্ত আপনার করিয়া লইলেন—নিষিদ্ধ মাংস ব্যতীত তাঁহাদের কোন আয়োজন ছিল না বলিয়া আমার আহারের জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে যথাসাধ্য উদ্যোগ করিয়া আমাকে তৃপ্ত করিলেন। এই স্থানে আপদ্ধর্ম্ম মনে করিয়া হয় তো নিয়মিত আহারের বহির্ভূত কাজ কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে। কিন্তু "মা থাকিলে কি মনে করিতেন" এই ভাবিয়া আমি আজীবন এবিষয়ে বিশেষ সতর্কতা রক্ষা করিতেছি। তাঁর জন্য এখনও গতাসু হই

নাই। রুটী, পনীর, শাকসব্জীতে একবেলা একদিন কাটান হিন্দুর ছেলের পক্ষে শক্ত কথা নয়।

আমেরিকার দুইজন অধ্যাপক অতিথি ছিলেন। তাঁহারা কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, একজন শিক্ষিত হিন্দু বিদেশে আসিয়া অসুবিধা সত্ত্বেও নিজ নিয়ম পালন করিতে তৎপর, ইহা তাঁহাদের ধারণার মধ্যেই আসে নাই

এই উপলক্ষে ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তা হইল। মিস মেওর পুস্তক পড়িয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের যে অদ্ভুত ধারণা হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্ম কিছু বেগ পাইতে হইল, ভারতকে সর্ব্বজাতির সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্ররোচিত হইয়া মিস মেও যে সকল জঘন্ত কুৎসার অবতারণা করিয়াছেন, অনবরত তাহার প্রতিবাদ করা বই ভারতবাসীর গত্যন্তর নাই।

য়্যাসেম্বিলীর কমিটীতে যথেষ্ট পরিশ্রম করা হইতেছে। কাজও কিছু হইতেছে, এ পর্য্যন্ত মহারাজা বিকানীর ছাড়া প্রকাশ্য সভায় কোন ভারত-প্রতিনিধি কোন কথা বলেন নাই। অধ্যাপক র্যাপার্ড ও তাঁহার অতিথিগণের সহিত কথাবার্ত্তার ফলে মনে হইল যে প্রকাশ্য সভায় বড় গলায় বলিয়া যাইতে হইবে যে সভ্য ইউরোপ ও আমেরিকাকে দিবার মত ভারতবর্ষের নিজস্ব অনেক কিছু এখনও আছে।

আজ য়্যাসেম্বিলীর সভায় সেই সুরে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলাম। লোকের যথেষ্ট মনঃপূত হইল, করতালি, 'সেক-হ্যাণ্ড,' 'কনগ্র্যাচুলেসনের' অভিনন্দনের অতি মাত্রা পাইয়া অভিভূত হইয়া পড়িলাম। দুঃখের বিষয় আমি লিখিয়া বক্তৃতা দিতে পারি না। যদি বক্তৃতা লিখি তাহা হইলে মুখস্থ করিয়া বলিতে পারি না। কাগজ হইতে পড়িতে হয়, তাহা এরূপ সভায় অশোভন। কাজেই মনে যা আসে মুখে তাহাই বলিতে হয়। বলাটা নিতান্ত মন্দ হয় নাই, দেশে কাউন্সেলের রিপোর্টটারেরা সর্ব্বদা নালিশ করিত যে আমার দ্রুত বক্তৃতা তাহারা রিপোর্ট করিতে পারে না, এখানেও সেই দুর্দ্দশা, বক্তৃতার পর লিখিয়া কাগজওয়ালাকে দেওয়া আমার অভ্যাস নাই, কাজেই এ সকল সংবাদ দেশে বা বিদেশে প্রকাশ হইবার অবসর হয় না। আমার দাঁতের কন্‌কনানির কথা বিলাত হইতে তারে পাইওনীয়ার পত্রে গিয়াছিল কিন্তু দেশের জন্ম এত কথা বলিতেছি তাহার সংবাদ যায় না।

ব্রিটিশ ডেলিগেশনের মিষ্টার বাক্সটন গোড়া হইতেই বিশেষ যত্ন এবং আপ্যায়ন করিতেছেন। আজ চা খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বারংবার স্পষ্টাক্ষরে বলিলাম এবং তাঁহার দলকে ও দলপতিগণকে বুঝাইতে বলিলেন যে, ভারতবর্ষের প্রতি ন্যায় বিচার না করা অবধি ভারতবাসী কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিবে না। সকল কথায় তাঁহারা মুখে একমত হন, কিন্তু কাজের বেলায় কিছু হয় না—বিভ্রাট তো এখানেই।

পুনরায় বিলাত যাইবার জন্ম মেয়ে-পুরুষে বারংবার আমাকে জিদ করিতেছেন, সময়ে সময়ে মনও টলিতেছে। কিন্তু মত পরিবর্ত্তন করিতে তত প্রস্তুত নই।

ক্রমশঃ খুব ঠাণ্ডা পড়িয়া আসিতেছে। অন্য কোন কারণে না হউক, এই কারণেই শীঘ্র দেশে ফিরিতে হইবে।

মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান বিজয়া-সম্ভাষণের কার্ড প্রতি বৎসর যেমন পাঠান, এবারও এখানে তাহা পাঠাইয়াছেন, তাঁহার অভিবাদনের পরিবর্ত্তে অভিবাদন পাঠাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে জোর করিয়া লিখিলাম যে বিলাতে অকারণ অর্থ ব্যয় না করিয়া দেশে গিয়া নিজের কর্ত্তব্য পালনের চেষ্টা করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। হয় তো এ কথা তাঁহার ভাল লাগিবে না। তিনি বারবার আমায় বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন, একথা লিখিবার যখন অবসর দিয়াছেন তখন স্পষ্টাক্ষরে কথাটা বলা উচিত। পুনরায় বিলাতে ফিরিয়া যাইবার জন্ম পীড়াপীড়ি বাড়িয়া গেল। বিলাতে লর্ড লিটনের সঙ্গে দেখা হয় নাই আমি লণ্ডনে ফিরিয়া যাইব না শুনিয়া তিনি বিশেষ দুঃখ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। মিষ্টার বক্সটন ও মিষ্টার ডাল্টন উভয়েই পার্লামেন্টের বিশিষ্ট সভ্যদের সঙ্গে দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তা কহিলে ভারতের পক্ষে অনেক উপকার সম্ভব জানাইলেন; হয় তো ইহা আংশিক সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে এ পথ অবলম্বন দুঃসাধ্য।

য়্যাসেম্বিলীতে প্রকাশ্য বক্তৃতার পর ক্যানেডা, অং প্রভৃতি স্থানের সহিত সখ্যতা আরও বাড়িয়া গেল, ক্যানাডার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্যর বর্ব্বার্ট বার্ডন বক্তৃতার পর

আমার নিকটে উঠিয়া আসিয়া অভিনন্দন করিলেন ইংরাজিতে যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বার্ডন একজন প্রধান বক্তা। তাঁহার খ্যাতিও জগৎ-বিখ্যাত।

রবিবার ৫ই অক্টোবর, ১৯৩০।

কাল শনিবার লীগ অব নেসন্‌স য়্যাসেম্বিলীর শেষ অধিবেশন হইয়া কার্য্য শেষ হইয়াছে। তারপর সভাস্থলে বিদায়ের পালা, রাত্রেও বিদায়ের পালা, যাঁহারা বিলাত ফিরিবেন ও যাঁহারা এই হোটেলে এতদিন একত্রে থাকিয়া সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন কাল তাঁহারা সকলেই চলিয়া গেলেন, স্যর ডেনিস্ ব্রে, স্যর বসন্ত মল্লিক, স্যর জুনাফিকার আলি, মিষ্টার বাজপাই ও অন্যান্য অনেক লোক গেলেন, আমাদের সঙ্গে যে সেক্রেটারী আসিয়াছিলেন ও আফিসের লোকেরা লণ্ডন হইতে আসিয়াছিল তাঁহারও গেলেন। সকলেই কাজের সুবিধার ও ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন, সকলকে যথাযথ ধন্যবাদ ও কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও সামান্য কিছু কিছু পুরস্কার দিয়া তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলাম। একদিন কর্ম্মচারী ও লেডী টাইপিষ্টদিগের বাহিরে গিয়া "চড়ুই ভাতার" ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। নানাপক্ষী এক হোটেল-বৃক্ষে মাসাবধি বাস করিয়া আজ দশদিকে গমন করিল। ব্রিটিশ ও অন্যান্য ডেলিগেটরা ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান হইয়াছেন, বাকী আজ সব গেলেন; হোটেল একবারে ফাঁক হইয়া গেল। আমাদের মার্সেলস্ এবং জাহাজ ধরিতে আরও পাঁচদিন বাকী। হয়তো এ পাঁচদিন ফ্রান্সের দক্ষিণে কোন কোন স্থানে বেড়াইয়া যাওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তাহার ক্ষমতা ও উৎসাহ কুলাইতেছে না। সেইজন্য এইখানেই পাঁচদিন কাঁটান স্থির করিলাম, হোটেলের খরচা বিষম। ঘরের ভাড়া প্রত্যহ এক পাউণ্ড, খাওয়ার খরচ প্রত্যহ এক পাউণ্ডের উপর। সকল জিনিসই এখানে দুর্ম্মূল্য। কয়দিনে প্রায় হাজার মাইল মোটরে গতিবিধি হইয়াছে। তথাপি মোটের উপর এখানে থাকাই স্থির।

যেমন লোকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেছে, তেমনই আমাদিগকেও করিতে হইবে। দুপুরে, রাত্রে চা-পানের নিমন্ত্রণে ক্রমশঃ সব বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ান হইয়াছে। বাকী যে সব বন্ধুবান্ধব আছেন আজ হোটেলে বা পার্টিতে আহ্বান করিয়া আলাপ-পরিচয় ও বিদায় গ্রহণ করা হইল। কোন কোন ক্ষেত্রে মনোমালিন্যবশতঃ সকলকে একদিন নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নাই, ভারতবাসীর অল্প সংখ্যকের মধ্যেও এ মনোমালিন্য বড়ই পরিতাপের বিষয়। কালরাত্রে ও আজ সমস্তদিন বৃষ্টি হইয়া খুব ঠাণ্ডা পড়িয়াছে।

সোমবার ৬ই অক্টোবর, ১৯৩০।

আজ ক্ষণে ক্ষণে জল-বায়ুর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে, সকালের জলবৃষ্টি—তারপর খুব রৌদ্র, তারপর খুব জল, তারপর মেঘ, শীত। এইরূপ পরিবর্ত্তনে যথেষ্ট অসুখ হয়—সর্দ্দি কাশী, নিউমোনিয়া প্রভৃতি খুব হইতেছে। বাহিরে বেড়াইতে যাইবার মোটে সুবিধা নাই, শহরের পথ-ঘাটও বন্ধ, যাইতে হইলে মোটরের প্রয়োজন। যতদূর সাধ্য সাবধানে থাকার চেষ্টা করিতেছি। এখনও বহুখানার নিমন্ত্রণ আসিতেছে—তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইতেছি। আমাদের নিমন্ত্রণকারীদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও এখনও খাওয়ান হয় নাই, কাজেই ক্রমশঃ সে সব কাজ সারিয়া যাইতে হইতেছে, এ সকল সামাজিক দেনা রাখিয়া যাওয়া কোন মতেই হইতে পারে না।

ক্রমে ক্রমে যাহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় লওয়া উচিৎ তাহাদের সঙ্গে বিদায় লইতেছি, অনেক প্রধান প্রধান পুরুষ ও প্রধান কর্ম্মচারী চলিয়া গিয়াছেন। লীগ সভার প্রধান কর্ম্মচারী স্যর এরিক ড্রমণ্ড লীগের প্রাণ স্বরূপ, তিনি বিশেষ যত্ন ও আদরের সহিত বিদায় নিলেন। যাহাতে ভারতবর্ষে লীগের আফিস স্থাপিত হয় এবং যে সকল বরেণ্য সভ্যেরা লীগে প্রতিবৎসর আসেন তাহাদের মধ্যে বাছাই করা পণ্ডিতগণের দ্বারা ভাল ভাল বক্তৃতা করিবার ব্যবস্থা করাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলাম।

স্যর এরিক ড্রমণ্ড বড়লাট আরউনের অনুরক্ত বন্ধু। তাঁহাকে অভিবাদন জানাইতে বলিলেন।

গত শনিবার রাত্রে ফ্রান্সে লোমহর্ষণ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, সভ্য-জগৎ তাহাতে তটস্থ হইয়া পড়িয়াছে। R-101 নামে প্রকাণ্ড হাওয়ার জাহাজ বিস্তর যাত্রী লইয়া বিলাত হইতে ভারতবর্ষে যাইতেছিল, এতলোক লইয়া এত বড়

হাওয়ার জাহাজ কখনও ভারতবর্ষে যায় নাই। রাত্র দুইটার সময় ফ্রান্সের মাঝ বরাবর সেই জাহাজে কিরূপে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ৫০।৬০জন লোক মারা গিয়াছে এই শোকাবহ ব্যাপারে হাওয়ার জাহাজ বিভাগের প্রধান মন্ত্রী লর্ড টমসন, Air Admiral (হাওয়ার জাহাজ-বিভাগের প্রধান সেনাপতি) প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি জীবন হারাইয়াছেন। সকলের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে—হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে; জাহাজ যখন মাটীতে পড়ে তখন সাহায্যার্থে বিস্তর লোক ছুটিয়া আসিয়াছিল। রাত্রে এ দুর্ঘটনা হইলেও সাহায্য ও চেষ্টার ক্রটী হয় নাই। কিন্তু এমন ভীষণ অগ্নিকাণ্ড যে বহুদূর হইতেও উত্তাপের জন্য কেহ অগ্রসর হইতে পারে নাই। জাহাজের জলের চৌবাচ্চা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে কয়েকজন অৰ্দ্ধদগ্ধ যাত্রী রক্ষা পাইয়াছে।

আজ লেডী ব্লমফিল্ডের উদ্যোগে এ বিষয়ে শোক-প্রকাশ জন্য এক সভা হয়। আমাকে সে সভায় প্রধান বক্তা হইবার সম্মান দেওয়া হইয়াছিল। মানুষের শিল্প-কৃতিত্ব ও বিজ্ঞান-কৃতিত্ব সময়ে সময়ে এই সকল দারুণ বিভ্রাট নিবারণ করিতে পারে না। এই কথা লইয়া কিছু আলোচনা হইল। ভগবদিচ্ছা ছাড়া যে মানুষের ইচ্ছায় কার্য্য হয় না তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের স্মৃতি উপলক্ষে শ্রীযুত অমূল্য-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সে উপলক্ষেও বক্তৃতা করার আহ্বান ছিল। এ সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য নরনারীর মনোযোগ ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে। ইহা আশা ও আনন্দের কথা। ইউরোপ ও আমেরিকার এ সকল আলোচনার সাহায্যে ভারতবর্ষের দাবী সভ্য-জগতের নিকট দিন দিন স্বীকৃত হইবে। ইহাতে সুফলের আশা করা অসঙ্গত নয়।

জলবায়ুর গতিক দেখিয়া মনে হইতেছে যে, যতদিন জাহাজে না চড়া যায় ততদিন ফ্রান্সের দক্ষিণে কোনস্থানে গিয়া কাটাইলে ভাল হইত। কিন্তু অল্পদিনের জন্য নূতন ব্যবস্থার সুবিধা হইল না। আজ ভারি ভারি মাল কুক এণ্ড সন-এর প্রতিযোগী কোম্পানী Wagon Letsএর জিম্মা করিয়া ঝাড়া হাত-পা হওয়া গেল; কিন্তু প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসের অভাব হইতেছে। তিন চারদিন নিতান্ত বাসায় থাকা কিংবা রেল গাড়ীতে থাকার মত করিয়া থাকিতে হইবে।

চশমার সুবিধা হইতেছে না বলিয়া চক্ষুরোগের বিখ্যাত ডাঃ ভোল (Dr Bolle)-এর নিকট পুনরায় গেলাম। তাঁহার পরামর্শ মত চশমা বদলাইতে দোকানে গিয়া দেখিলাম যে দোকানদারের নিকট সেদিন চশমা কিনিয়াছিলাম তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং মনে পড়িয়াও তো মানুষের কাজ কিছু হয় না।

স্যর বসন্ত মল্লিকের এই হাওয়ার জাহাজে ভারতবর্ষে যাইবার কথা ছিল, আমাদের যাওয়ার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। মারে কৃষ্ণ রাখে কে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

মঙ্গলবার ৭ই অক্টোবর, ১৯৩০

সমস্ত দিন বৃষ্টি-বাদল মেঘ ও ঠাণ্ডা। হোটেলের বাহিরে যাওয়া দুঃসাধ্য। সমস্ত সকাল বেলাটাই ঘরে পড়িয়া কাটিল। ডাক্তার ঘোষ যে ফ্রেঞ্চ-সুইস মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার আড়াই বৎসরের মেয়েটিকে লইয়া দেখা করিতে আসিলেন, ডাক্তার ঘোষ আসিতে পারেন নাই, মহিলা বিদুষী ও বুদ্ধিমতী, যথাসাধ্য তাঁহাকে গৃহস্থালীর উপদেশ দিলাম।

২টার পর বৃষ্টি সত্ত্বেও চশমাওয়ালার দোকানে গেলাম। কার্য্য শেষ হইল না, হোটেল মিরাবো হইতে পণ্ডিত শ্যাম-শঙ্করকে লইয়া জেনেভা ইউনিভারসিটি দেখিতে গেলাম। Internctional Law এর অধ্যাপক Professor Rappard Rectorকে পূর্ব্বে পরিচয় পত্র পাঠাইয়াছিলাম। রেক্টর মহোদয় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া ইউনিভার-সিটির কার্য্যকলাপ দেখাইলেন। উদ্ভিদ্-বিদ্যায় অধ্যাপক একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত। যেরূপভাবে যে বিভাগ গঠিত হইয়াছে ভারতবর্ষে তাহা করিতে এখনও ২০।২৫ বৎসর লাগিবে। ছোট নগণ্য ইউনিভারসিটি জেনেভাকে তাচ্ছিল্য করিবার যো নাই, অনেক তথ্য সব শুনিলাম, যাহার ধারণা পূর্ব্বে কিছুমাত্র ছিল না। জেনেভার অধ্যাপকদিগের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহারা নিজ নিজ আড্ডায় বসিয়াই নিজ নিজ শাস্ত্রচর্চ্চায় তৎপর। বিদেশে জাঁকজমক প্রকাশের তাঁহাদের ইচ্ছা নাই। অঙ্কবিভাগ, আইনবিভাগ, বিজ্ঞান,

ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিভাগেই খুব জোরের সহিত কাজ হইতেছে। বহুপূর্ব্বেই ইউনিভারসিটির সহিত পরিচয় হইয়া নিত্য সেখানে যাতায়াত করি নাই ইহাতেই দুঃখ হইল। যেখানে লীগ মিটিং হইত, ইউনিভারসিটি ঠিক তাহারই সম্মুখে।

মান্দ্রাজ অঞ্চলের পিঠাপুরাম দেশের মহারাজা সপরিবারে বেড়াইতে আসিয়া এখানে আছেন, আজ হঠাৎ তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইল। রাজা রামমোহন রায়, ব্রাহ্মসমাজ, ইউনিভারসিটি প্রভৃতি-সম্বন্ধে বহু আলাপ হইল। তিনি ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী, নিজে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী স্বাধীনচেতা, শিক্ষিত, সৎসাহসী জমিদার। ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ব্রিষ্টলে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-মন্দির মেরামত করিয়া দিয়াছেন।

বুধবার ৮ই অক্টোবর, ১৯৩০

আজ ও মেঘ ও ঠাণ্ডা। জেনেভার লোকেই বলিতেছে এমন সময় এমন জঘন্য জল-হাওয়া কখন দেখে নাই।

মানের দায়ে বড় হোটেলে কয়দিন কাটাইয়া খরচ করা ছাড়া বিশেষ কোন ফলোদয় হইল না। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ইউনিভারসিটি অঞ্চলে পুনরায় বেড়াইতে গেলাম, কাল যে সব জিনিস দেখা বাকী ছিল ও যে সব অধ্যাপকগণের সহিত কথাবার্ত্তা হয় নাই তাহা হইল। সব হওয়া সম্ভব নয়, যতদূর সম্ভব তাহাই হইল। এই চার পাঁচদিন কাছাকাছি সুবিধা মত বাসা থাকিলে এ কাজ আরও ভাল হইত।

ইউনিভারসিটির পশ্চাতেই সুন্দর বাগান, বড় বড় গাছের সারি দেওয়া পথ ও চমৎকার দূর্ব্বাক্ষেত্র। পড়াশুনার জায়গা বলিয়া এখানে কোন নীরসতা বা কঠোরতা নাই। লাইব্রেরী ও পড়িবার ঘরের ব্যবস্থা ও আলোক-প্রণালী দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয় বড় বড় জানালা দিয়া আলোক আসিতেছে, ছাতের উপর হইতে আলো আসিতেছে। প্রত্যেক পাঠকের স্বতন্ত্র আসন, তাহাদের ছাতা, কোট, টুপী রাখার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। দিন দুপুরে আলো জ্বালিয়া পড়িতে হয় না, চোখের মাথা খাইতে হয় না, Rassum-স্মরণার্থ স্বতন্ত্র লাইব্রেরী আছে—তাহার প্রতিমূর্ত্তি (Bust)ও এখানে আছে। প্রত্যেক ফ্যাকলটীর স্বতন্ত্র লাইব্রেরী আছে, Relief Map-সাহায্যে আল্‌পস পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন অংশ, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও অষ্ট্রিয়া দেশের আল্‌পস বিভাগ দেখিয়া অনেক জিনিস সহজে বোঝা গেল। Rheine, Rhone, Danube, Po, Aver প্রভৃতি বড় বড় নদী ভিন্ন ভিন্ন গ্লেসিয়ার হইতে বাহির হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সাগরে গিয়া কেমন পড়িতেছে তাহা সুন্দররূপে দেখা গেল।

Hotel De Villa অর্থাৎ টাউন হলে পুরাতন পুঁথি পত্র ও নূতন পুস্তকের সম্ভার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। সেখানে অধ্যাপক বোর্জোয়াস প্রকৃতিতে ও মূর্ত্তিতে ঋষিতুল্য ব্যক্তি। তাহার সঙ্গে Reform movements, History of Switzerland প্রভৃতি-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া মুগ্ধ হইতে হইল। ৭০ বৎসর বয়সেও তাঁহার অদম্য জ্ঞান-পিপাসা ও কর্ম্মশক্তি, রাজা রামমোহন রায়-সম্বন্ধে তাঁহার কিছু জানা ছিল না,—সব বুঝাইয়া বলিলাম যে Reform-যুগের যেমন অন্যান্য মনীষিগণের মূর্ত্তি Reform Movementএ রহিয়াছে, রাজা রামমোহন রায়ের মূর্ত্তিও সেই স্থানে স্থান পাওয়া উচিত।

যদি কখন পুনরায় ইউনিভারসিটি সংস্কার ও পুনর্গঠনের সুবিধা পাই তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র জেনেভা ইউনিভারসিটিতে যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহা মনে থাকিবে। ভারতবর্ষের ছাত্রেরা আসিলে প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা, এখন লীগ অব নেসন্‌স-এর সাহায্যে জগতের সকল সভ্যজাতির নিকট ভারতের কথা উপস্থিত করিতে হইবে, ভারতের দাবী জানাইতে হইবে। তাহার জন্য যে সকল পণ্ডিত কর্ম্মীর প্রয়োজন তাহারা এখানে যত শীঘ্র প্রস্তুত হইতে পারিবেন, তত অন্য কোথায়ও নয়। International Law এবং Constitutional Law-সম্বন্ধে এখানে প্রচুর আলোচনা হইতেছে এবং International Tribunal of Justice-সাহায্যে তাহা কাজে লাগান হইতেছে। এইরূপ অনেক কীর্ত্তি লীগ স্থাপন করিতেছে।

এই Hotel De Villa ও ইউনিভারসিটির মধ্যে এক প্রাচীর আছে। তাহা উপলক্ষ করিয়া জেনেভার লোকদের বাৎসরিক উৎসব হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে এইখানে House of Savoy কর্ত্তৃক সৈনিকগণকে নৈশ সমরে পরাস্ত করিয়া

জেনেভার স্বাধীনতা স্থাপিত হয়—ইহার স্মরণ চিহ্নস্বরূপ এই উৎসবের আয়োজন।

নিকটেই Historical Museum প্রভৃতি লোক শিক্ষার স্থান আছে।

ইউনিভারসিটির সম্মুখে মিস ষ্টৌরী নামে এক সুইস রমণীর এক বইয়ের দোকান আছে। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে অনেক পুস্তক এখানে বিক্রয় হয়। মিস ষ্টৌরী রবিবাবুর ভক্ত। তাহাকে আনিয়া জেনেভার বাহিরে বাগানে রাখা হইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে বিশেষ কড়া পাহারায় তদ্বির হইয়াছিল। স্যর বসন্ত মল্লিক পর্য্যন্ত দেখা করিতে পান নাই। মিস ষ্টৌরী ও এণ্ড্রুজ সাহেবের তত্ত্বাবধানে টিকিট করিয়া বক্তৃতা, কবিতা-পাঠ ও শিল্প-প্রদর্শনী হইয়াছিল। রবিবাবু এখান হইতে রুসিয়া গিয়াছেন, সেখান হইতে আমেরিকা যাইবেন।

ক্রমশঃ

সম্মোহিতা

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী উষা মিত্র

পাঁচ

প্রাতঃকালে অপূর্ব্ববেশধারী যুবকদ্বয়কে গ্রামের পথে আসিতে দেখিয়া—গ্রামের বালক-বালিকারা অবাক্-বিস্ময়ে দেখিতে লাগিল। নরেনকে উহারা গীতাদের বাড়ীতে বারকয়েক দেখিলেও তাহার সঙ্গী সুন্দর পরিচ্ছদধারী যুবাকে কোনদিন দেখে নাই। উহার শুভ্র আদ্দির পাঞ্জাবী, স্বর্ণ-ফ্রেমে আবদ্ধ চশ্‌মা, মিহি ধুতী ঝকঝকে জুতা ও উজ্জ্বল রিষ্টওয়াচ বালকগণের মনে কৌতূহল ও নয়নে বিস্ময় আনয়ন করিয়াছিল। জমীদার ব্যতীত অপর কাহাকেও ঐরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে দেখে নাই, সুতরাং তাহাদের শিশু-চিত্তে ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে জমীদার রমেশ চৌধুরী ছাড়া অন্যের ঐ সকল ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। বালকের দল ছুটিয়া গৃহে গিয়া জননী ও ভগিনীদিগকে এ বিস্ময়কর সংবাদ দিল। অল্পক্ষণ মধ্যে সারা গ্রামখানিতে ইহাদিগের আগমন, পরিচ্ছদ, এমনকি জিতেনের কালো কোঁকড়ান চুলগুলার পর্য্যন্ত সমালোচনা হইয়া গেল। ক্রমে বন্ধুদ্বয় কুন্তলার ক্ষুদ্র গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকিল,—"বৌদি"। ফুলেরই মত শুভ্র-সুন্দর ছোট মেয়ে গীতালি লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া নরেনকে বেষ্টন করিয়া ধরিল কিন্তু অপরিচিত অপর ভদ্রলোকের উপর দৃষ্টি পড়িতেই সুন্দর মুখখানি নীচু করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। হাসিয়া নরেন উহাকে কোলে তুলিয়া বলিল—"এঁকে লজ্জা করো না গীতারাণী, আমি যেমন তোমার কাকা এও তেমনি তোমার কাকা হয়—জিতেনকাকা বল্‌বে, কেমন?" মস্তক দুলাইয়া গীতা স্বীকার করিয়া লইল।

তখন জিতেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাকে কাকা বল্‌বে তো?"

নরেনের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া সে বলিল,—"না।"

বন্ধুদ্বয় হাসিয়া উঠিল। নরেন জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন তুমি ওঁকে কাকা বল্‌বে না গীতা?"

লজ্জায় গীতা নরেনের বক্ষে মুখ লুকাইল।

"তোমার মা কোথায় গীতি?"

ধীরে ধীরে গীতা বলিল,—"মা ঘাটে গেছেন।"

"এত বেলায় ঘাটে গেছেন?"

"কাল মা সারারাত জেগেছিলেন কি না?"

"কেন?"

"ধীরেনমামার খুব অসুখ,—মা সারারাত সেখানে ছিলেন, সকালে এসে শুয়েছেন সেইজন্যে দেরী হ'য়েছে উঠতে।"

জিতেন জিজ্ঞাসুনেত্রে বন্ধুর দিকে চাহিল। নরেন বলিল,—"আমার বৌদির ও এক বাতিক, যত রাজ্যের দীন-দুঃখী-অনাথদের সেবা করবেন, তাদের কষ্ট কমাতে চেষ্টা করবেন।"

"নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে—নোঙরা আবর্জ্জনা ঘেঁটে ছোটলোকদের বাঁচিয়ে তুলে লাভ?"

"লাভ-লোকসান তিনিই জানেন ভাই, তাঁর কাজের আলোচনা করতে হ'লে নিজেকে তার উপযুক্ত ক'রে গড়ে তুলতে হ'বে, বড়লোকের বিলাসী ছেলে তুমি, তা'তে আবার খাস কলকাতার লোক, অভাবের জ্বালা কোনদিন সইতে হয় নি, দুঃখীর দরদ বোঝবার ক্ষমতা নেই,—লাভ নিয়ে কারবার, লোকসানের ভেতর যে অমূল্য বস্তুর স্বাদ পাওয়া যায় সে-স্বাদ তোমার পক্ষে পাওয়া অস্বাভাবিক—একথা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। বৌঠানের কাজের সমালোচনা করবার স্পর্দ্ধা রাখি না, সে-সাহসও নেই।"

"হ'তে পারেন তিনি দেবী কিন্তু তাই ব'লে যে ওঁর কাজ অন্ধভাবে মেনে নিতে হ'বে এর কোন মানে নেই।"

"কিন্তু ওঁর কাজ যে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবার মতই হয় জিতেন।"

"হ'তে পারে তবে—"

এমন সময়ে জলপূর্ণ কলসী-কক্ষে সিক্তবসনে কুন্তলা ডাকিল, "কে ঠাকুরপো না কি?"

জিতেন সৌন্দর্য্যের ললামভূতা এই রমণীর দিকে চাহিয়া রহিল,মানবীর এত রূপ যে হইতে পারে,তাহা তাহার ধারণার অতীত ছিল। নিবিড় সিক্ত কেশদাম পৃষ্ঠের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে—পরণে সাদা থানখানি—অলঙ্কারবিহীনা সুন্দরী মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর ন্যায় গ্রীবা ঈষৎ উন্নত করিয়া জিতেনের দিকে চাহিয়া প্রণত নরেনকে উঠাইয়া বলিলেন,—"বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ভাই, ভেতরে চল তোমরা

দারিদ্র্য ঐশ্বর্য্যের সম্মুখে কিরূপ অকুণ্ঠিতভাবে উন্নতশিরে দাঁড়াইবার স্পর্দ্ধা রাখে—অন্ত প্রথম ইহা উপলব্ধি করিয়া লজ্জায় জিতেন সঙ্কুচিত হইল। অন্দরে প্রবেশ করিয়া সে বিমুগ্ধভাবে চাহিয়া রহিল। কল্যাণী গৃহিণীর দরদী হাতের স্পর্শে এমন সুষ্ঠুভাবে প্রত্যেকটা বস্তুকে থাকিতে পূর্ব্বে দেখে নাই।—কোনখানে এতটুকু আবর্জ্জনা, একটু ময়লা নাই। গোময় লিপ্ত অঙ্গনের একধারে ক্ষুদ্র একটু তুলসীমঞ্চ—উহারই নিকটে অল্প একটু স্থান বেড়িয়া মল্লিকা, বেলা, যুঁই, গাঁদা ফুলের গাছগুলি,—সাদা, হলদে প্রস্ফুটিত-অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত পুষ্পে শোভমান—একধারে ছোট্ট একখানা গোয়ালে ধূসরবর্ণের পরিষ্কার গাভীটী। প্রশংসমান, প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়া জিতেন দেখিতে লাগিল—অঙ্গনবেষ্টিত, বেড়ার গায়ে পুষ্পিত লতার সৌন্দর্য্য,—গৃহস্বামিনীর সুরুচির যথেষ্ট পরিচয় দিতেছিল। শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া, দালানে মাদুর পাতিয়া কুন্তলা বলিল,—"এস তোমরা ব'সবে এখানে।"

"এ আমার বন্ধু জিতেন—আজ একে ধ'রে এনেছি বৌ'ঠান।"

"বেশ ক'রেছ ঠাকুরপো—অনেকদিন পরে এসেছ, আজ থাকবে তো? কিন্তু জিতেন ভাইটীর ভারি যে কষ্ট হ'বে এখানে।"

জিতেনের মুগ্ধভাব লক্ষ্য করিয়া একটুকু হাসিয়া উহাকে ঠেলা দিয়া নরেন বলিল,—"বৌ'ঠান বলছেন এখানে তোমার কষ্ট হ'বে।"

মোহাবিষ্টের ন্যায় জিতেন বলিল,—"তোমাকে একটা প্রণাম করতে পর্য্যন্ত ভুলে গেছি—দিদির কাছে ভাইয়ের কষ্ট হ'তে পারে না। অনেক হেঁটেছি, ভারি ক্ষিদে পেয়ে গেছে।"

স্মিতহাস্যে কুন্তলা বলিল, "তাও বটে, আমার যেন কি হ'য়েছে, গীতা দু'গ্লাস জল দিয়ে যা।" দু'খানি রেকাবে কয়েকটা নারিকেল-লাড়ু ও সন্দেশ রাখিয়া কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল,—"মুড়ী-মুড়কী আনব ঠাকুরপো?"

সাগ্রহে জিতেন বলিল, "দাও দিদি তোমার হাতের তৈরী নিশ্চয়—ও না খায় আমি খাব।"

'আমি খাব না কেন? বৌদি কি জানে না ঐ মুড়ীর লোভেই না এতদূর ছুটে আসি।"

উহাদিগের জলযোগ প্রায় শেষ হইয়া আসিতে কুন্তলা রন্ধনের জন্য যেমন উঠিতে যাইবেন অমনই জনৈক প্রতি-

বেণীর গৃহাগত নারীর আকুল মর্ম্মভেদী ক্রন্দন শুনিয়া স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

ব্যথাভরা কণ্ঠে নরেন বলিল,—"সব বোধ হয় শেষ হ'য়ে গেল—ধীরেনদার স্ত্রী কাঁদছেন।"

একটুখানি কি ভাবিয়া কুন্তলা বলিল,—"আমি একবার দেখে আসি তোমরা ততক্ষণ গীতার সঙ্গে গল্প কর।"

"দাঁড়াও বৌ'ঠান আমিও তোমার সঙ্গে যাব।" তারপর নরেন মৃদুস্বরে জিতেনকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই যাবি না কি?"

ততোধিক মৃদুকণ্ঠে জিতেন উত্তর দিল,—"না ভাই আমোদ করতে এসেছি, দু'দিনের জন্যে—"

বাধা দিয়া নরেন বলিল,—"থাক্—তুমি তা হ'লে গীতাকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়িয়ে এস একটু।"

পিতার বক্ষে লুণ্ঠিতা যুবতী কন্যা শিবরাণীকে টানিয়া তুলিয়া কুন্তলা বক্ষে চাপিয়া ধরিল। ধীরেনের সদ্য-বিধবা পত্নী স্বামীর পদদ্বয়ে মুখ লুকাইয়া জানি না কিসের গভীর ব্যথা নীরবে নিবেদন করিয়া দিতেছিল—বুঝিবা সংসার-যাত্রার অবশিষ্ট দিনগুলির পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে-ছিল। কুন্তলার নেত্রসম্মুখে এমনই এক ব্যথাভরা মর্ম্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য চিত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সেদিনও সে এমনই নীরবে নতশিরে দেবতার অমোঘ বজ্র,—বুক পাতিয়া লইয়াছিল। কুন্তলা আর এ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য দেখিতে পারিল না, অশ্রু উহার দৃষ্টিপথ রোধ করিয়া দিল। সান্ত্বনা দিতে আসিয়া নিজেই কাঁদিয়া আকুল হইল। ধীরে ধীরে নরেন কুন্তলাকে স্পর্শ করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল,—"একি কর্‌ছ বৌদি?"

নেত্রমার্জ্জনা করিয়া কুন্তলা বলিল,—"পার্‌ছি না যে দেখ্‌তে ঠাকুরপো।"

"বাইরে—ওই রকে গিয়ে একটু বস—এস এদিকে।"

কুন্তলাকে লইয়া বাহিরে আসিয়া নরেন গীতার সমভি-ব্যাহারী জিতেনকে দেখিয়া একটু অবাক্ হইয়া গেল। দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া কুন্তলাকে বলিলেন,—"এত বড় দুর্দ্দিনেও গাঁয়ের কেউ এ বাড়ীতে এলে না কেন বৌঠান?"

"ধীরেন ঠাকুরপো যে একঘরে।"

"অপরাধ?"

"তোমার মনে নেই ঠাকুরপো? সেই যে শিবানীকে চুরী করে কে নিয়ে যায়—তারপর দু'দিন বাদে পুকুর পাড়ে তাকে পাওয়া যায়।"

"হাঁ মনে পড়েছে এবার। কিন্তু তা'তে ওঁর দোষ কি?—একঘরে করেছেন কে?"

অবনত মস্তকে সঙ্কোচের সহিত কুন্তলা বলিল,—"ঠাকুরপো!"

"রমেন চৌধুরী?"

আশ্চর্য্যভাবে জিতেন বলিল, "রমেন চৌধুরী দিদির দেবর না কি?"

"হাঁ, কিন্তু চুরি করে নিয়ে গেছল কে বৌদি?"

লজ্জায় কুন্তলা মুখ তুলিতে পারিলেন না। জিতেন বলিল, "এমন অন্যায়ের প্রতিবাদ গাঁয়ে কেউ করলে না?"

"কে করবে ভাই? তিনি জমিদার, তাঁর কাজের প্রতিবাদ করবার মত সাহস এ গাঁয়ে কারুর নেই। ওঁর পরিচয় তুমি পাও নি জিতেন।"

"জানি দিদি অনেক কথা নরেনের মুখে শুনেছি, কেমন করে' বড় ভাইয়ের বিধবার সর্ব্বনাশ করে' পথে বার করে দিয়েছে, কেমন করে' সে চণ্ডাল—।"

"চুপ চুপ কর ভাই ও কথা বলো না।"

বিমূঢ়ভাবে জিতেন বলিল, "কেন বলব না দিদি? যে চণ্ডাল তাকেও দেবতার আসন দিতে হ'বে—কিন্তু—" নরেনের ইঙ্গিতে জিতেন থামিল।

"সেই মেয়েটাকে ঘরে নিয়েছেন বলে কি ধীরেনবাবুকে একঘরে করা হয়েছে?"

"তাই।"

অল্পক্ষণ ভাবিয়া জিতেন বলিল,—"কিন্তু দিদি দু'দিন যে মেয়ে বাইরে ছিল তাকে ঘরে নেওয়া সত্যিই ধীরেনবাবুর অন্যায় হয়েছে।"

কুন্তলা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"অন্যায় হ'য়েছে বলছ? বাড়ীতে ঢুকতে না দিয়ে বেশ্যার সংখ্যা কি বাড়ান উচিত ছিল? কি তার অপরাধ শুনি?"

কথাটা হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাওয়াতে জিতেন অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া বলিল,—"না,—অপরাধ তার কিছু নেই, কিন্তু সমাজ—"

কুন্তলা আপনার মনের ক্রোধ গোপন করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—"সমাজ কিসের সমাজ, কোথায় তোমাদের সমাজ? যখন অসহায় নারীকে জোর করে' নিয়ে গেছল, তখন কোথায় ছিল সমাজ? নিষ্পাপ অবলা নারীর উপর, যে অন্যায় করে তার মাথায় মিথ্যা কাল্পনিক অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দেয়, তাকেই কি তোমরা বিচারক করে' ধর্ম্মের আকর বলে মাথায় তুলে নিতে বল? এতটুকু সঙ্কীর্ণ গণ্ডী টেনে দিয়ে যদি সমাজ নিজের মহত্ব প্রচার করতে চায়—সে সমাজকে আমি মানি না,—চাই না তাকে মানতে। শত অত্যাচার এই সমাজের বুকে প্রত্যহ হ'য়ে যাচ্ছে। নির্দ্দোষীকে জোর করে দোষীর আসনে বসান হচ্ছে। নারীর নারীত্ব দানবের হাতে যে সমাজ আহুতিস্বরূপ তুলে ধরছে—তার সেই অন্যায় শাসনও কি মানতে বল তোমরা?"

"না দিদি, এটা তোমার ভুল ধারণা—এতবড় পাষণ্ড আমাদের সমাজ নয় যে স্বেচ্ছায় নারীর নারীত্ব দৈত্যের হাতে তুলে ধরবে।"

"নয় কিসে? এই মাত্র তুমিই স্বীকার করেছ শিবানীকে ঘরে নেওয়া ঠিক হয় নি।"

"তা স্বীকার করছি।"

"কেন?"

"সে রমণী, অপবিত্রা, সে দেবতার ভোগে লাগে না দিদি।"

"কিন্তু দেবতা পেলে কোথায় ভাই? পশু ছাড়া দেবতা এখানে খুব কম আছে—অথচ দেখ পুরুষ স্বেচ্ছায় শত অপরাধ করলেও তার সময় কথাটী নেই—এই স্বার্থে ভরা সমাজ নিয়েই না তোমাদের কারবার।"

"কিন্তু দিদি আবহমান কাল থেকে না তোমরাই স্বামীকে দেবতার আসনে বসিয়ে এসেছ।"

"ভুল বুঝ না তুমি—আমাদের শিক্ষা দিয়া এসেছে রমণীর পতিই দেবতা—পতির প্রতি পত্নীর একনিষ্ঠ প্রেম, আনুগত্য থাকা চাই, আর পত্নীর প্রতি পতিদেবতার কোন কর্ত্তব্যই নাই। নারীকে অপমানিত, পদদলিত, লাঞ্ছিত করবার এমন সুযোগ সহজে কি স্বার্থপর চরিত্রহীন পুরুষদের গঠিত সমাজ ছাড়তে পারে? যাক্ সে কথা। আমরা কিন্তু পতিকে দেবতার আসনে চিরকালই বসিয়ে এসেছি সত্য, দেবতার সেবার জন্য আমরা চিরকালই মনঃপ্রাণ নিয়োগ করে থাকি, কিন্তু মিথ্যা অপবাদ যে স্বামী জানিয়া শুনিয়া সমাজের ভয়ে নতমস্তকে স্বীকার করে তাকে দেবতা তো বলতে পারি না—মানুষের মধ্যেও গ্রহণ করতে পারি না। আবার বক্তৃতার সময় সভ্যজগতের লোকদের সহিত সমান তালে পা ফেলবার জন্য এদেশের পুরুষেরা যখন নরনারীর সমান অধিকার বলিয়া চীৎকার করে, তখন কি বাস্তবিকই হাসি পায় না। বিনাদোষে বা সামান্য দোষে রমণীর জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা সমাজ দেয়, তাহার অপেক্ষা শতগুণ বেশী দোষ করলেও পুরুষের কোন সাজাই হয় না।"

"অধিকার পুরুষ নারীর সমান—বড় গলায় যারা বলে আমি তার দলে নেই কিন্তু—। আচ্ছা তুমিই বল, একটু বুঝে দেখ দিদি,—স্বামী যদি দেবতা, তবে দেবতার নির্ম্মাল্য যে, তার নির্ম্মল হওয়াই উচিত, তা'তে একটু ময়লা লাগলে সে কি দেবতার ভোগে লাগতে পারে? এ ছাড়া আর একটা বাধা,—নারী যে মা,—জননী, গৃহিণী, মায়ের যে নিষ্পাপ পূত থাকা চাই, এর প্রয়োজনীয়তা গর্ভধারিণী নারী যে বংশের ও রক্তের ধারাকে অব্যাহত রাখবে।"

কিছুকাল ভাবিয়া কুন্তলা বলিলেন,—"কিন্তু জিজ্ঞাসা করি দেবতা বল্‌তেই কাকে বোঝ ভাই? চরিত্রে যিনি আদর্শ, ত্যাগে যিনি সুমহান্, বিরাট্ যাহার অন্তঃকরণ, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা যাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না তিনিই না দেবতা? দেবতা যে তারও কি দোষ থাকা সম্ভব? এমন নীচ, সঙ্কীর্ণ স্বার্থভরা মন দেবতার হয় না,—হয় তা মানুষেরই, এ সহজ কথাটা, বোঝ না কেন? যে পুরুষ স্বেচ্ছায় নারীর নারীত্ব পশুকে উপহার দেয় তাকেও কি দেবতার আসনে কোন মেয়ে বসাতে পারে? সে পুরুষের সকল অত্যাচার দেবত্বের দোহাই দিয়ে নতমস্তকে অন্ধভাবে কোন মেয়ে কি মেনে নিতে পারে? স্বীকার করছি দেবতার অর্ঘ্য শুদ্ধ বিমল হওয়াই প্রয়োজন, কিন্তু সে অর্ঘ্য দেবতার—মানবের নয়।—আমাকে দেখিয়ে দাও বুঝিয়ে দাও কোথায় সে দেবতা? যাক্ নারী স্বামীকে পূজা,

ক'রে এসেছে আজও করছে—সে কি ঐ সঙ্কীর্ণচেতা নারীর সম্মান-অপহারক নীচ পশুকে করে এসেছে—কখনই না ভুল বুঝ না জিতেন।"

"ভুল করছ দিদি, এমন পুরুষ, এমন সমাজ কোথায় দেখেছ তুমি যে স্বেচ্ছায় নারীকে পশুর কবলে ফেলে দিয়েছে ?"

কুন্তলা এবার প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া ফেলিল, পরে বলিল, "এই না বার বার তুমিই স্বীকার করচ তাকে বাপ-মায়ের ঘরে নেওয়া ঠিক হয় নি।"

"হাঁ, সে ঠিক—"

"চুপ কর—ঠিক বলো না, বরং এটা তোমার সমাজের কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা,—স্বার্থপরতা, তাকে বাড়ীতে স্থান না দিলে কি সে করত ভাই ?"

"কেন চাকরী করে খেতে পারত।"

"পাগল হ'য়েছ ? গাঁয়ের মেয়ে লেখাপড়া জানে না,—সেলাই তেমন জানে না। বাসন মাজা ? তাও ওই পতিতাকে ঘরে কেউ ঢুকতে দিত না ; প্রকারান্তরে তাকে—তার সেই নারীত্বটুকুকে দানবের হাতে তুলে দেওয়া হ'ত না কি ? পতিতার পংক্তিতে বসান হ'ত না কি ? এই তোমাদের সমাজ ? এই তোমাদের দেবত্ব, মনুষত্ব ? এরই এত বড়াই কর ? সমাজের বুকে এতটুকু স্থান কি ছিল না ? ঐ অভাগীকে টেনে নিয়ে, একটু অশ্রয় দেবার ? তার বাপের উদার বুকে এ সাহস ছিল, তাই না তাঁকে আমি এত শ্রদ্ধা করি।"

ক্ষোভভরা কণ্ঠে জিতেন বলিল,—"মাপ কর দিদি, না বুঝে আজ বড় ব্যথা—"

বাধা দিয়া নরেন বলিল,— "তর্ক রাখ জিতেন, যা বুঝছি বৌ'ঠান, মড়া টেনে ফেলতে হ'বে আমায়—এখন তার উপায় কর।"

বিপন্নভাবে কুন্তলা বলিলেন,—"সে ঠিক, কিন্তু একা তুমি করবে কি ?"

"কেন—ছোটলোকেরা পয়সার লোভেও কি কেউ মড়া তুলবে না ?"

"না।"

"কেন ?"

"মড়া তুলে শেষে একঘরে হ'য়ে কে থাকবে বল ? এটা যে তোমাদের সমাজের নিয়ম, আশ্চর্য্য হ'বার নেই এতে কিছু।"

নরেন বাহির হইয়া গেল। কুন্তলা গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরেনবাবুর স্ত্রীর নিকট বসিলেন।

কতক্ষণ পরে শুষ্কমুখে ফিরিয়া নরেন জানাইল,—জমিদারের ভয়ে কেউ আসিল না। উদ্বিগ্নমুখে কুন্তলা উঠিলেন। বাধা দিয়া জিতেন বলিল, "শুধু শুধু অপমান হ'তে যেও না দিদি, যা বুঝছি আসবে না কেউ,—আমি আর নরেন নিয়ে যেতে পারব।"

অতিশয় বিস্ময়ে নরেন তাহার বিলাসী আত্মসুখী বন্ধুর প্রস্তাব শুনিল। ভাবিল হঠাৎ বন্ধুর মস্তিষ্কের কোনরূপ বিকৃতি ঘটিল না তো ? এ কি নূতন বিস্ময়কর কথা সে শুনিতেছে।

"কিন্তু শেষে এই নিয়ে না তোমায় সমাজে জবাবদিহি করতে হয়।" জিতেন চাহিয়া দেখিল কুন্তলা সত্যই উহা বলিতেছেন না বিদ্রূপ করিতেছেন বোঝা গেল না। উহার মনে হইল একটু যেন চপল হাসি উহার রক্ত করবীর ন্যায় ঠোঁটের মাঝে খেলিয়া গেল।

"কিন্তু দু'জনে কি পারবে ভাই ?" কুন্তলা উভয়ের বলিষ্ঠ দেহের প্রতি একবার চাহিল।

"না, এমনি পারব না দিদি, তবে চাদরে বেঁধে, মোটা কাপড়ে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে পারব।"

"তাই যাও—কিন্তু একটু ভেবে কাজ কর—ঝোঁকের মাথায় না বুঝে—"

"মাপ ক'রো দিদি, লজ্জা আর দিও না।"

"তবে এস।"

ধীরেনবাবুর স্ত্রী কন্যাকে অন্য গৃহে লইয়া যাইতে যাইতে সহসা কুন্তলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, "কিন্তু তোমরা যে কায়স্থ—এঁরা ব্রাহ্মণ—ছোঁবার অধিকার নেই আমাদের।"

কাঁদিয়া শিবানীর জননী বলিলেন—"কার অধিকার নেই ঠাকুরঝি, তোমাদের ? তোমরা মানুষ নও দিদি দেবতা, দেবতার অধিকার যে সব তা'তে।"

শ্মশানান্তে রাত্রে কুন্তলার গৃহে ফিরিবার সময় জিতেনের মনে হইল জীবনের মধ্যে সত্যই অন্য যেন কিছু করা

হইল—অন্তরের প্রতি চাহিতে গিয়া বিস্ময়ে সে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। এতখানি পরিবর্ত্তন, যে রেবীর অযাচিত করুণায় আজ সম্ভবপর হইল, তাঁরই উদ্দেশে সে ভক্তিভরে বারবার প্রণতি জানাইল।

ছয়

জিতেনদের গৃহে সেদিন খুব সমারোহ। সম্মানের সহিত এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় ডাক্তার স্বীয় আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব ও জিতেনের বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রন্ধনাদির ভার ছিল সুলেখার উপর। অভ্যর্থনার ভার পড়িয়াছিল নরেন দাসের উপর। কি একটা বস্তু চাহিতে আসিয়া রন্ধনগৃহমধ্যস্থা সুলেখার কর্ম্মরতা স্তব্ধমূর্ত্তির পানে চাহিয়া নরেন কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল। একটুকু মধুর হাসি হাসিয়া সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল,—"কিছু দরকার আছে কি ?"

প্রকৃতিস্থ হইয়া নরেন উত্তর দিল,—"ফুলের তোড়া-গুলা খুঁজে পাচ্ছি না।"

"এক মিনিট সবুর কর এটা নামিয়ে যাচ্ছি।"

সর্ব্বদা যাতায়াতে দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া নরেন এখন ইঁহাদিগের পরম আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সুলেখা 'আপনি' সম্বোধন ছাড়িয়া কবে যে নরেনকে 'তুমি' বলিতে আরম্ভ করিয়া আপনার জনের মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছিল সে—তত্ত্বটুকু আজও নরেনের নিকট রহস্যাবৃত রহিয়া গিয়াছে। ব্যস্তভাবে শরৎবাবু আসিয়া বলিলেন,—"গ্রামোফোনের নতুন রেকর্ড খুঁজে পাচ্ছি না মা,—কিন্তু তুমি সেই সকাল থেকে রাঁধছ ? এত পরিশ্রম ক'রো না লেখা, শেষে আবার কোন অসুখ-বিসুখ হ'য়ে পড়্‌বে।"

অপ্রস্তুতভাবে নরেনের দিকে চাহিয়া সবেগে মাথা নাড়িয়া লেখা বলিল,—"এ আবার কাজ কি বাবা, আমার কিছু হ'বে না, তুমি ভেব না, চা এক কাপ দেব এখন ?"

"থাক—থাক ; একদিন চা না খেলে চল্‌বে,—আজ এত হাঙ্গামার মধ্যে আর চা নিয়ে ব'স না, তার চেয়ে ঠাকুরকে সব বুঝিয়ে দিয়ে তুমি একটু বাইরে এসে ব'স।"

হাসিয়া সুলেখা বলিল,—"তাই কি হয় বাবা ? ঠাকুর কি এ-সব পারে—সব নষ্ট ক'রে ফেল্‌বে।"

স্নেহপূর্ণস্বরে ডাক্তার বলিলেন, "ওই আমার মা'টীর দোষ,—জান নরেন—কাজ পেলে ক্ষিদে-তেষ্টা পর্য্যন্ত পাগলীর মনে থাকে না। সেই সকাল থেকে রাঁধছে, আর রান্নাও যা করে—চমৎকার। এক-একটা ব্যঞ্জনের স্বাদই বা কি। আমার মেয়ে ব'লে বল্‌ছি না, যার ঘরে আমার এ লক্ষ্মী—"

বাধা দিয়া লেখা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাবা—"

কন্যার এ স্বর পিতা বেশই চিনিতেন। অগত্যা তাহাকে মধ্যপথেই থামিয়া যাইতে হইল।

মুগ্ধকণ্ঠে নরেন বলিল,—"বাবা ঠিক ব'লেছেন রাগের এতে কিছু নেই লেখা।"

অভিমানভরে লেখা বলিল,—"তুমিও ও-কথা ব'ল্‌ছ নরেনদা।"

অভিভূতের ন্যায় নরেন এই শ্যামশ্রীমণ্ডিত অভিমানিনী তরুণীর দিকে আবেগভরা সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। সে-দৃষ্টির সম্মুখে সুলেখা অস্থির হইয়া উঠিল। পিতা একটা বড় রকমের স্বস্তির শ্বাস ফেলিলেন। উভয়ের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া—মৃদু হাসিয়া তিনি সরিয়া গেলেন। গমনোন্মুখ নরেনকে দেখিতে দেখিতে লেখার মনে হইল—এমন সুন্দর, এমন সুশ্রী, এমন প্রতি অঙ্গের ললিতভঙ্গী সে তো জীবনে আর কখনও দেখে নাই। তাহার সৌন্দর্য্যপ্রিয় নারী-অন্তর মুগ্ধ হইয়া পড়িল। নব জীবনের তরুণ আলোয় চিত্ত ভরিয়া উঠিল—নিমেষের মধ্যে ভবিষ্যতের রঙীন চিত্র ভাব-সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর পড়িয়া স্ফীত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রূপের উজ্জ্বল দীপশিখায় লেখার অন্তর-বাহির আলোকিত হইয়া উঠিল। সৌন্দর্য্যের নেশায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। নরেন ফিরিয়া চাহিতে লেখার স্বচ্ছ কালো চোখের,—তাহার আবেগভরা দৃষ্টির সহিত আপনার দৃষ্টি বিনিময় হওয়ায় সে লজ্জিতভাবে জোর করিয়া উৎসুক সৌন্দর্য্য-পিপাসু চক্ষু ফিরাইয়া লইল। কার্য্যব্যপদেশে ডাক্তার-গৃহিণী ঐদিকে গিয়া উভয়ের বিমুগ্ধভাব লক্ষ্য করিয়া অন্তরে জলিয়া উঠিলেন,—ভাবিলেন একি বেহায়া মেয়ে,—এক পুরুষের দিকে অমন নির্লজ্জভাবে চাহিতে লজ্জা করিল

না। যদিও উহাদের সকলের ইচ্ছা নরেনকে জামাতৃপদে বরণ করিয়া দুইটী তরুণ-হৃদয়ের মিলন ঘটাইয়া দিবেন। কিন্তু ভবিষ্যতের অঙ্কে কি নিহিত আছে কে জানে। বিবাহ যদি নাই হয়, তখন? কন্যা যদি অন্যকে বিবাহ করিতে না চাহে,—তিনি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, এই জন্যেই না তিনি সাহেবী স্কুলে পড়া,—মেয়েকে স্বাধীন ক'রে তোলা আদৌ পছন্দ করেন না। লজ্জায় সঙ্কোচে মরিয়া গিয়া লেখা রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিল, কেন সে অমন করিয়া উহার প্রতি চাহিতে গেল। ছিঃ ছিঃ, তিনি কি মনে করিলেন। কত বড় বেহায়াই না ভাবিলেন? আর মা,—মা-ই বা কি ভাবিলেন। ঘৃণায়—লজ্জায়—অপমানে লেখার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। না, মা বোধ হয় তাহার এ সরমহীনতা লক্ষ্য করেন নাই, আর তিনি? কিন্তু সে যে উহাকে লুকাইয়া দেখিতেছিল,—উহারই বা—ফিরিয়া চাহিয়া তাহাকে অপদস্থ করিবার কি এমন প্রয়োজন ছিল? এবার সে নরেনের উপরও চটিল কিন্তু মুহূর্তের জন্যে, পরক্ষণে আবার সেই দুর্নিবার লজ্জা তার সারা চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল। এমন সময় ঠাকুর বলিল, "দিদি চায়ের জল যে সব পড়ে যাচ্ছে।"

সহসা রুষ্ট হইয়া সুলেখা বলিল,—"পারি না আর,—একটু চাও কি ক'রে দিতে পার না তুমি?"

ঠাকুর জানিত এই খামখেয়ালী মেয়েটীর কথার প্রতিবাদ করা কিরূপ বিপজ্জনক। নহে তো সে বলিতে পারিত এ-সংসারে এতদিন কাজ করিয়াও উহাকে কোনদিন চা প্রস্তুত করিতে কেহ বলে নাই। পিতার চা বা খাবার কেহ তৈয়ার করিলে লেখা সহিতে পারিত না, কাঁদিয়া-কাটিয়া সারা বাড়ীখানা মুখর করিয়া তুলিত। বিনাবাক্যে চায়ের ফুটন্ত জল ঠাকুর কেটলীতে ঢালিল।

সুলেখা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—"সর—সর, বাহাদুরী করতে হ'বে না। ওই চা'ই না বাবা মুখে দেবে?" চায়ের বাটী হস্তে ধীরপদে সে বাহিরে পিতার কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল, নরেনের সহিত দৃষ্টি-বিনিময়ে লেখা সঙ্কুচিত হইল, দুর্দ্দমনীয় লজ্জায় দেহ কাঁপিয়া উঠিল। অসাবধানে হস্তস্থিত চায়ের বাটী স্খলিত হইয়া মাটীতে টুকরা টুকরা হইয়া পড়িল। কন্যার বিবর্ণ পাংশু মুখ দেখিয়া ডাক্তার ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেখা কি হ'য়েছে মা? অমন কর্‌ছ কেন?"

পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মুখ লুকাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। এই অভিমানিনী কন্যার প্রকৃতি পিতার অগোচর ছিল না—এমনটী তো নূতন নহে—এতটুকু একটু ব্যথা লেখা সহিতে পারিত না—এ কথা যতখানি তিনি জানিতেন বা বুঝিতেন এমন অপরে বুঝিত না। তিনি সস্নেহে কন্যার উদ্গত অশ্রু মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।

অবাক-বিস্ময়ে নরেন উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন নরেনের বিস্মিত ভাব লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ একটু স্নেহের মৃদু আঘাতে কন্যার পিঠ চাপড়াইয়া ডাক্তার বলিলেন, "এ আমার মায়ের আর এক পাগলামী,—মার কাছে হয় তো একটু বকুনী খেয়েছে—তাই এ অভিমান।" পিতার কোলে লেখা লজ্জায় দুঃখে মরমে মরিয়া যাইতে চাহিল—ছিঃ এ কি ছেলে-মানুষী করিতেছে,—এক লজ্জা ঢাকিতে আসিয়া আবার কি যে করিয়া বসিল। সবেগে নিজকে মুক্ত করিয়া—নরেনকে অধিকতর বিস্মিত, চমকিত করিয়া দ্রুতবেগে লেখা চলিয়া গেল। ডাক্তার কি বলিতে গিয়া গৃহিনীর আর্ত্তকণ্ঠের বিলাপ শুনিয়া অন্দরের দিকে ছুটিলেন। জিতেনের সংজ্ঞাহীন মস্তক কোলে লইয়া মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতার ন্যায় লেখা উহার জ্ঞানসঞ্চারের চেষ্টা করিতেছিল, জননী মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন। কম্পিত বক্ষে ডাক্তার পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। "দেখ তো বাবা মাথায় বেশী লেগেছে না কি?"

"আমি পার্‌ছি না লেখা।"

"তুমি তো ডাক্তারি পড়ছ—দেখ না একবার নরেনদা!" লেখা ও নরেনের যত্নে জিতেন অল্পক্ষণের ভিতর একটু চাহিয়া বলিল, "মাথার এ পাশে বড় ব্যথা, বেণ্ডেজ করে দে লেখা।"

"দাদা ভাই" বলিয়া সে আর বলিতে পারিল না, তাহার চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু অবিরলধারে পড়িতে লাগিল।"

এক হস্তে লেখার মস্তক বক্ষের উপর টানিয়া অজস্র চুম্বনে ভরাইয়া জিতেন বলিল,—"স্থির হ' রাণী—মাথায় কিছু দে, বড় ব্যথা।"

প্রীতিভরা সাগ্রহ দৃষ্টি মেলিয়া ভ্রাতা-ভগিনীর এই

অনাবিল স্নেহ—বুভুক্ষিতের ন্যায় হৃদয় ভরিয়া নরেন উপভোগ করিতে লাগিল। উহারও এক জননী ব্যতীত ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া, পিতা,—সবই যে বর্ত্তমান, কিন্তু—এমন সহানুভূতি ও স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় কাহারও নিকট হইতে সে পায় নাই, কি হৃদয়গ্রাহী করুণ দৃশ্য বিধাতা আজি ক্ষুধাতুর নেত্র-সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া আঘাত-পরীক্ষান্তে ডাক্তার ঔষধ লাগাইয়া দিলেন।

"উৎকণ্ঠিত লেখা সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছিল দাদা?"

"পড়ে গেছি লেখা।"

নিকটে দণ্ডায়মান সহিস উত্তর দিল, "পড়ে যান নি দিদিমণি।"

"তবে?"

সকলের উৎসুক দৃষ্টি সহিসের দিকে সন্নিবিষ্ট হইল। সহিস বলিল,—দাদাবাবুর ফিটন যখন মোড় ঘুরিয়া বড় রাস্তায় যাইতেছিল, তখন বিপরীত দিক্ হইতে আগত মোটরের ধাক্কায় এক খঞ্জ পথের মাঝে লুটাইয়া পড়ে—দাদাবাবু আমার নিষেধ সত্বেও উহাকে বাঁচাইতে গিয়া দ্রুতগামী মোটরের আঘাতে আহত হইয়াছেন। অতিকষ্টে উহার সংজ্ঞাহীন দেহ তুলিয়া আনিতে পারিয়াছি।

এই কথার ভিতর দিয়া যেটুকু সত্য আজ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল উহা শ্রবণে সকলের অপেক্ষা নরেন অধিকতর বিস্মিত হইল। কারণ এই সৌখীন ভাববিলাসী গর্ব্বিত যুবকের গরীবের প্রতি এত মমতা এত সহানুভূতি সে তো কোনদিন আশা করে নাই—এ যে একরূপ অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

জননী শান্তি দেবী ভয়ে শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এমন কি দরকার ছিল বাপু—সহিসকে বল্লেই তো হ'ত।"

করুণকণ্ঠে লেখা বলিল, "বেশ করেছ দাদা, কি হ'ল সে লোকের?"

"তুই বেশ নেকা মেয়ে, বাছা আমার অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল—কি করে ও জানবে, কি হ'ল সে লোকের"।

"তার কি হ'ল জাকর?"

"কে জানে দিদিমণি—হয় তো রাস্তায় পড়ে আছে।"

অনুযোগের স্বরে লেখা বলিল—"তাকে সেখানে ফেলে তুমি চলে এলে? না না যাও এক্ষুণি তাকে নিয়ে এস।"

নেত্রদ্বয় কপালে উঠাইয়া গৃহিণী বলিলেন,—"ও আবার কি কথা—তাকে এখানে এনে কি হ'বে?"

অনুনয়ের স্বরে জিতেন বলিল, "আসুক না মা?"

"সবি অনাছিষ্টি"—বিরক্ত হইয়া জননী এই কথা বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

আপন মনে বকিতে বকিতে সহিস খঞ্জের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

সে দিবসের আমোদ আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারিলেন না।

সাত

জিতেনের মাতা বলিলেন, "এত ভাল ভাল সুন্দর মেয়ের ফটো থেকে একটীও পছন্দ হ'ল না জিতু?"

হাসিয়া জিতেন বলিল, "পছন্দ যে হয় নি এমন কি কিছু বলেছি।"

জিতেন এখন সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রের বিবাহের জন্য উদ্বিগ্না জননী বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী, ধনবানের কন্যাদিগের ফটো একত্রিত করিয়াছিলেন। জিতেন যখন বিবাহে অনিচ্ছা প্রদর্শন করিল, তখন তিনি শঙ্কিতা হইয়া উঠিয়া, প্রশ্ন করিলেন,—"তবে?"

"বিয়ে আমি করব না মা।"

অশান্তকণ্ঠে জননী বলিলেন,—"বিয়ে করবি না এ আবার কি কথা?"

"ইচ্ছে করে না যে।"

"সংসারে সবাই যা করছে তুইবা তা করবি না কেন, কই আগে এ কথা তোর মুখে তো শুনি নি—কিন্তু কেন করবি না?"

"এমনি ইচ্ছে করে না।"

"ভাই-বোনে যা ইচ্ছে হয় তোদের কর—আর আমি থাকছি না এ সংসারে।"

মায়ের চোখে জল দেখিয়া জিতেন বিচলিত হইল। জননীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া আহতকণ্ঠে সে বলিল, "আমি

পারব না মা,—কি হ'বে বিয়ে করে', আমি তুমি বেশ আছি।"

"কেন তুই পারবি না,—কি হয়েছে—সব কথা খুলে বল বাবা।"

"কিছু হয় নি মা, অমনিই হ'চ্ছে করে না।"

"বংশ যে লোপ হ'বে বাপ—একমাত্র তুই-ই যে আমার বংশধর।"

"জিতেনের বিয়ের কথা বলছ মা?" নরেন চেয়ারে উপবেশন করিতে করিতে বলিল,—"কই ফটো দেখি।"

"ও আর দেখে কি হবে বাবা, জিতু বিয়ে করবে না।"

"কেন, এইটী যে চমৎকার দেখতে একেও পছন্দ হয় নি?"

"বিয়েই করব না তার আবার পছন্দ।"

"বিয়ে করবে না সে কি?"

বিরক্ত হইয়া জিতেন বলিল,—"একটা সামান্য কথা নিয়ে হুলস্থূল করবার দরকার নেই নরেন, এখন বিয়ে করতে পারব না।"

"ওঁকে বলে তা হ'লে কাশীতে আমায় পাঠিয়ে দাও তোমরা,—না হয় আমার দিদির কাছে চলে যাব সেই ব্যবস্থা করে' দাও নরেন।" বলিয়া গৃহিণী উঠিয়া গেলেন।

নরেন বলিল, "পাশ করেছ তবে এ আপত্তি কিসের? কেন মিথ্যে মার মনে কষ্ট দিচ্ছ।"

"মা যদি শুধু শুধু কষ্ট পান তবে উপায়?"

"কিন্তু এতগুলা সুন্দরীর মধ্যে মানসীকে খুঁজে পেলে না?"

"না।"

"তোমার পছন্দের তারিফ করতে পারছি না জিতেন এমন সুন্দর এই,—একেও না?"

দৃঢ়কণ্ঠে জিতেন বলিল,—"না।"

"দেখা যাবে কোন্ অপ্সরীকে তুই আনিস্।"

জিতেন হাসিয়া উঠিল,—"যদি কোনদিন আনি—লুকিয়ে রাখব না এ ঠিক, কিন্তু তুই বিয়ে করছিস্ না কেন?"

"সত্যি বলছি, পরীক্ষায় পাশ যেদিন করব ঠিক তার দু'দিন বাদে বিয়ে করব।"

"কিন্তু সেদিকে আগ্রহ তেমন দেখছি না, এক খেলা ছাড়া অন্য কিছু তোমার কাম্য আছে, এ তো মনে হয় না। এবার দিদির ওখানে গেলে তাঁকে তোমার সব কথা ব'লে দেব, কি ক'রে দিনের পর দিন কলেজ কামাই ক'রে তাঁর আদরের দেবরটী খেলার মাঠে কাটিয়ে দেন, সব ব'লে দেব।"

"না রে—বলিস না লক্ষ্মী ভাই—দ্বিতীয়ার নিমন্ত্রণে যাচ্ছ তো?"

"নিশ্চয় যাব, মধ্যে ক'দিন গেছলুম তোকে বলতে ভুলে গেছি। আচ্ছা—উনি তোমার কেমন বৌদি হ'ন নরেন?"

"রক্তের সম্বন্ধ নেই কিছু—খেলার মাঠে দাদা অর্থাৎ বৌদির স্বামীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, তারপর তিনিই আমায় এই স্নেহশীলা রমণীর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন, সে তুমি বুঝবে না ভাই—রক্তের সম্বন্ধ না থাকলেও উনি আমার কত আপনার—কত শ্রদ্ধেয়!"

"সত্যি নরেন তোদের সেই পাড়াগাঁয়ে যে অমন বিদুষী,—ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিতা—ধৈর্য্যের প্রতিমা থাকতে পারে এ কল্পনারও অতীত।"

"না জিতেন, তুমি ওঁর কিছুই দেখ নি, জান নি এখনও,—কত বড় বড় আঘাত যে উনি অটল শৈলের মত বুক পেতে নিয়েছেন সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার—আগে ঐ বৌদিকে রাণীর আসনে দেখেছি—আর আজ তাঁকেই আবার পৃথিবীর কোণটীতে সঙ্কীর্ণ একটু জায়গায় তেমনই অটল—অচল—হাসিমুখে থাকতে দেখছি, অবস্থার পরিবর্ত্তন কিছু-মাত্র তাঁর মনে চাঞ্চল্য আনতে পারে নি। কি অসীম ধৈর্য্য—অনন্ত সে শক্তি—তুমি যে তাঁর কিছুরই সঙ্গে পরিচিত নও জিতেন।"

"যেটুকু দেখেছি—বুঝেছি তাই যথেষ্ট—আশ্চর্য্য নরেন এই যে অল্প সময়ের মধ্যে আমার 'আইডিয়া' (ভাব) গুলা পর্য্যন্ত বদলে গেল কেমন ক'রে? যাক্ সে কথা—কাল সকালে একবার এস, দিদিকে প্রণামের জন্যে ভাল শাড়ী একখানা কিনতে হ'বে।"

"ভাল শাড়ী দিয়ে কি হ'বে জিতেন? খাদী ছাড়া বৌদি কিছু পরেন না।"

"আই না কি ?"

উহার মনে পড়িল মোটা একখানা কি যেন পরিতে দেখিয়াছিল।

ফটোখানা জিতেনের সম্মুখে ধরিয়া নরেন আগ্রহের সহিত বলিল, "আচ্ছা জিতেন, সত্যি বল—এই মেয়েটাকেও তোমার পছন্দ হয় নি ?"

"পছন্দ যে হয় নি এমন কি ব'লেছি কিছু ?"

"তবে বিয়েতে এ বিতৃষ্ণা—এর মানে ?"

"সব কথার কি অর্থ থাকে নরেন।"

"না কিন্তু—চল্ না—চাক্ষুষ দেখে আসা যাবে।"

হাই তুলিয়া জিতেন বলিল,—"তাতে লাভ ?"

"লাভ যথেষ্ট, যদি ভাল লাগে বিয়ে করবে।"

"বিয়ে যে করতেই হ'বে এমন কি কোন কথা আছে ?"

"তোমার মাথা কি আজ ঠিক নেই জিতেন।" নরেন বিস্মিত হইয়া উঠিতেছিল।

"না হে মাথা আমার ঠিক আছে।"

"তবে, সবাই যা করে তুমিই বাদ যাবে কেন, এর কারণটা ?"

"কারণ যে একটা আছে তা স্বীকার করি—সে কি এমনও হ'তে পারে না যে আর সবাইয়ের মত নগদ বিদায়ের লোভ আমার না থাকতে পারে—পৃথিবীর পনের আনা মানুষকে বাদ দিয়ে বাকি এক আনার মধ্যে আমায় ধরা কি এতই শক্ত ? এত বড় দুনিয়ার মধ্যে যেমন রং-বেরংয়ের মানুষ আছে, তাদের ইচ্ছাও রকমারি থাকবে অস্বীকার করা চলে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমেরও বিচিত্রতা সপ্রমাণ হ'য়ে যায়—এক কথায় আমার প্রাণ চায় বিচিত্রকে।"

"সে আবার কি ?"

"না, তুই সত্যিই জ্বালালি, রামশরণ লেখাকে ডেকে দে তো।"

"লেখা কি করবে ?"

"বিয়ে বিয়ে ক'রে তোরাও খেপেছিস্, আমাকেও দলভুক্ত করবার যোগাড় ক'রেছিস্—লেখার মিষ্টি গলার দু'টা গান শোনা যা'ক—তা'তে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই, লেখার গান শোন নি ?"

"না।"

চঞ্চলা হরিণীর মত আসিয়া লেখা বলিল,—"[illegible] ডেকেছ আমায় ?"

"ডেকেছি, একটা গান কর রাণী।"

নরেনের দিকে চাহিয়া লেখা একটু থামিয়া বলিল, "আজ পারব না দাদা।"

"কেন রে কি হ'ল তোর আবার—আয় লক্ষ্মীরাণী দু'টা গান শুধু গাইবি।"

"না।"

আগ্রহভরে নরেন বলিল, "পার যদি গাও না একটা লেখা।"

চেয়ার দু'খানা অর্গানের নিকটস্থ করিয়া বন্ধুদ্বয় বসিল,—নরেন বলিল, "এস লেখা।"

ব্রীড়াবনত মুখে ধীরপদে লেখা অর্গানের ডালা খুলিল—"চাবিগুলার উপর হাত রাখিয়া আবার সরাইয়া লইল। সে বহুলোকের সম্মুখে গাহিয়াছে কিন্তু এমন সঙ্কোচ পূর্ব্বে কখনও তো তার অনুভূত হয় নাই।"

নরেন আগ্রহভরে অনুনয়ের স্বরে বলিল,—"হাত সরিও না—গাও লেখা।"

চকিতে একবার চাহিয়া সুলেখা অর্গানের চাবি টিপিল—কিন্তু, গলার স্বর যে বাহির হইতে চাহে না। নরেনের এত কাছে সে কোনদিন বসে নাই—বড় লজ্জা করিতে লাগিল। এ হইল কি ? ছিঃ এত দুর্ব্বল সে ! কিসের এ দুর্ব্বলতা ! জোর করিয়া সকল সঙ্কোচ সব লজ্জা ঝাড়িয়া ফেলিয়া মিষ্টকণ্ঠে সাধা গলায় লেখা গাহিল,—'সুন্দর তুমি সুন্দর হে হৃদয়-দেবতা আমারি।' গমক গিটকিরীতে—মূর্চ্ছনায়—সঙ্গীত পূর্ণগ্রামে উঠিল, আবিষ্টের ন্যায় নরেন তরুণী গায়িকার প্রতি চাহিয়া রহিল। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময়ী ধরণী উহার নেত্রের সম্মুখে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যময়ী সৌন্দর্য্যময়ী হইয়া উঠিল। কতক্ষণ পরে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নরেন সোজা হইয়া বসিয়া দেখিল জিতেন গৃহে নাই, সঙ্গীতও থামিয়া গিয়াছে কিন্তু সেই সুমিষ্ট কণ্ঠের আবেগ-ভরা কথাগুলার তখনও সমাপ্তি হয় নাই, উহা কি এক মোহময় জাল রচনা করিয়া অন্তরের মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছে। লালসাপূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়া নরেন বলিল,—"বড় মিষ্টি, এমন

গান জীবনে শুনিনি কখনও, বন্ধ ক'রো না সুলেখা আর একটা গাও।"

ভক্তের এ কাতর অনুরোধ অবহেলা করিতে না পারিয়া মনপ্রাণ ঢালিয়া লেখা গাহিল,

"তোমারি লাগিয়া নীরব যামিনী
যাপিয়াছি বহুক্লেশে,
তোমারি মুরতি করিয়া আরতি
কত নিশি গেছে কেটে।
তোমারই পূত বীণার ঝঙ্কারে
গেছে ঘুম মম টুটে,
তব নিরমল মুরতি প্রভা
উঠেছে নিখিলে ফুটে।
সারা নিশা জেগে বাসর সাজায়ে
ব'সে আছি হেথা একা,
ল'য়ে ভকতি-অঞ্জলি আছি যে দাঁড়ায়ে
এস এস লও সখা।"

সঙ্গীতের আকুল আহ্বানে, নরেনের বুকের মধ্যে পুলকের ঢেউ বহিতে লাগিল। শূন্য বুক পরিপূর্ণতায় ভরিয়া উঠিল। প্রত্যেকটী রক্তবিন্দু আবেগে কাঁপিতে লাগিল। মুগ্ধ-বিস্ময়ে নরেন লেখার আনত মুখের দিকে চাহিয়া স্বীয় অবশ হাতখানা টানিয়া তুলিয়া লেখার ফুলের ন্যায় নরম হাত মুঠার মাঝে চাপিয়া ধরিল। এই স্নেহস্পর্শে লেখার মনে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দের লহর ছুটিল। তার শিরায়-উপশিরায়, কে যেন বিদ্যুৎবেগ ছুটাইয়া দিল, কি সে সর্ব্বগ্রাসী উন্মাদ স্পর্শ! লেখা কি বলিতে চাহিল কিন্তু অস্ফুট শব্দ ছাড়া মুখ হইতে কোন কিছু বাহির হইল না। স্পর্শের মাদকতায় সে বিভোর—তন্ময় হইয়া রহিল। মনে মনে সে ভক্তি ও প্রেমের অঞ্জলিভরা অর্ঘ্য লইয়া স্পর্শকারীর চরণে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল। স্পর্শের এই স্মৃতি যাহাতে চিরস্মরণীয় থাকে, ভগবানের নিকট লেখা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিল।

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে উচ্চশব্দে জিতেন হাসিয়া উঠিল। দারুণ লজ্জায় নরেনের হাত ছাড়িয়া ঝড়ের ন্যায় বেগে স্বীয় কক্ষে আসিয়া সুলেখা দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। উহার দেহের কম্পন তখনও বন্ধ হয় নাই। বিছানায় শুইয়া পড়িল, কিন্তু সে-দিবসের ন্যায়,—মাতা যেদিন উহার লাজে-ভরা চাহনি দেখিয়াছিলেন, কই আজ তো সেরূপ লজ্জা করিতেছে না, বরং মনে হইল, দেবতার স্পর্শে সে আজি পবিত্রা, ধন্যা হইয়াছে। অদ্য এই এক মোহময় রঙ্গীন অধ্যায়ের সূচনায় হৃদয়ের মুক্ত দ্বার খুলিয়া গেল। উৎকণ্ঠিতা লেখার মনে একবার সন্দেহের মেঘ দেখা দিল—সে ভাবিল যদি এ দাসীর পূজা দেবতার কাজে না লাগে—আর সে ভাবিতে পারিল না, পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, না—না অসম্ভব—ইহার মধ্যে যে এতটুকু মলিনতা, মিথ্যা, প্রতারণা নাই।

লেখার বাবা পরদিবস কতকগুলা অবান্তর কথার পর নরেনের কাছে লেখার কথা তুলিলেন,—"লেখা বড় হ'য়ে উঠেছে, তাই তোমার মা'র ইচ্ছা—আগামী অগ্রাণে তোমাদের বিয়ে হোক।" প্রার্থিত বস্তু হাতের মধ্যে এমন সহজভাবে পাইয়াও নরেন বিস্ময়ে আত্মহারা হইল।

"রাজি আছ তুমি নরেন?"

বিকৃতকণ্ঠে নরেন বলিল,—"কিন্তু পরীক্ষার এখনও দেরী আছে যে।"

"বেশ—পরীক্ষার পরেই তবে বিয়ের দিন দেখি।" নরেন নীরব রহিল। সম্মতি বুঝিয়া ডাক্তার উঠিলেন।

ক্রমশঃ

ছড়া

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

সঙ্কলয়িতা—শ্রীইন্দুবিকাশ বসু

(৪০১)

ছ্যাঁদা ঘটি, চোরা গাই,
চোর পড়সী, ধূর্ত্ত ভাই,
মূর্খ ছেলে, স্ত্রী নষ্ট—
এই কয়টা বড় কষ্ট।

(৪০২)

নূতন নূতন ন কড়া,
পুরান হ'লে ছ' কড়া।

(৪০৩)

কোঁদলীর নাড়ী কোঁ কোঁ করে,
কোঁদল নইলে থাকতে নারে।

(৪০৪)

রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?
মারে কৃষ্ণ রাখে কে ?

(৪০৫)

যখনি মেঘ ধরে,
তখনি বৃষ্টি ঝরে।

(৪০৬)

দোষ দোষ—
কাঁঠালের কোষ ;
যত দোষ
ধুমসীর দোষ।

(৪০৭)

যে যারে না দেখতে পারে,
আঁধার রাতে উকুন মারে।

(৪০৮)

হাতী যখন কাদে পড়ে,
চামচিকিতে লাথী মারে।

(৪০৯)

এক'শ আট কলাগাছ রুয়ে,
থাকগে চাষা ঘরে শুয়ে।

(৪১০)

সাপ, শালা, জমিদার,
এ তিন নহে আপনার।

(৪১১)

জল, জামাই, জমিদার,
এ তিন নহে আপনার।

(৪১২)

বুড়ো হাগে মরতে,
ছেলে হাগে তরতে।

(৪১৩)

কখনও খেয়ো না তুমি
তালে আর খোলে,
কখনও ভুলো না তুমি
কুলোকের বোলে।

(৪১৪)

খায় মালসাট মেরে,
উঠে হাঁটু ধরে।
(অতি ভোজনের পরিণাম)

(৪১৫)

মিছে আমার করি,
কে আমার আমি কার
কার জন্ত মরি ?

(৪১৬)

কেঁকাপেটী খায়দায়,
নাদাপেটীর নামে যায়।

(৪১৭)

কাছে থাকে যতক্ষণ,
আমার আমার ততক্ষণ।
পথে গেলে পোড়ে মন,
বাড়ী গেলে চন্ চন্।

(৪১৮)

তিন রাঁধুনী হেসপেসে—
খেরালকে বলে ভাত খে'সে।

(৪১৯)

যার ভাল তারে,
আয় খেঁদী মোর ঘরে।

(৪২০)

পড়লে চাষা গরু খায়,
উঠলে চাষা বামুন খায়।
(চাষার অবস্থা খারাপ হইলে গরুকে খুব খাটাইয়া লয়; অবস্থা ভাল হইলে ব্রাহ্মণকে হীন চক্ষে দেখে)

(৪২১)

যত হাসি তত কান্না
ব'লে গেছে রামশর্ম্মা।

(৪২২)

প্রাণে যদি শান্তি চাও,
ভগবানে মন দাও।

(৪২৩)

ক্রোধ, হিংসা যেবা করে,
আপনি আপনি কেঁদে মরে।

(৪২৪)

বাঁকদ, বামুন, বাঁশ,
তিনে বংশ নাশ।

(৪২৫)

তাল, তেঁতুল, কুল,
তিনে করে বংশ নির্ম্মূল।

(৪২৬)

অলসের নিদ্রা বেশী,
দরিদ্রের ক্ষুধা বেশী।

(৪২৭)

যেমন সরা তেমন হাঁড়ি,
গ'ড়ে রেখেছে কুমার বাড়ী।

(৪২৮)

যে ছুঁড়ি সতীনে পড়ে,
তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।

(৪২৯)

যেমন কন্যা ভানুমতী,
তেমন পাত্র জোলা তাঁতি।
(উভয়েই সমান—যেমন বর, তেমন ক'নে—যেমন হাঁড়ি, তেমন সরা)

(৪৩০)

রূপের গরব কোর না,
পেছন দিকে চেয় না।

(৪৩১)

হায় রে গরব কতদিন,
চোখে চেয়ে মানুষ চিন।

(৪৩২)

ব্যাঙ্ লাফায়, চ্যাঙ্ লাফায়,
খল্‌সে বলে আমিও লাফাই।

(৪৩৩)

মনে করি গুরুর ক'রব সেবা,
পদ দেখে বলি আর না বাবা।

(৪৩৪)

চিতার সুখে গীতা,
মন হয়েছে কথা।

(৪৩৫)

খেয়ে হা—, শুয়ে জাগে,
তার গতি কভু না লাগে।

(৪৩৬)

পুঁই, কচু, কুমো—
তিন আমাশার বেগো।
(এইগুলিতে আমাশয় বাড়ে)

'অন্তিমের সাধনা'

শিল্পী—শ্রীযামিনী রায়

JUNO PRINTING WORKS—CALCUTTA.

(৪৩৭)

এক কান কাটা শহরের বার দিয়ে যায়।
দু'কান কাটা শহর মর ভিতর দে যায়

(৪৩৮)

কুকুরের হ'ল মুগের পথ্যি,
কুকুর বলে—এ কি বিপত্তি!

(৪৩৯)

ভাল দেখে বৌ আনলাম ঘরে,
বাঁশ দেখে বৌ বা জী করে।

(৪৪০)

সুনাম কচ্ছপগতি,
দুর্নাম পবনগতি।

(৪৪১)

ঘরগুণে সেব্বের মাটী
যে আসে সে বিয়ার বেটী।

(৪৪২)

হাতে খোলা,
পো—মালা।

(৪৪৩)

দিন গেল আলে ডালে,
রাত হ'লে চেরাগ জ্বালে।

(৪৪৪)

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা
ঘুনিয়ে বসে পাশে ;
কথা দিয়ে কথা লয়,
প্রাণে বধে শেষে।

(৪৪৫)

পথে পেলাম কামার,
কাল প্যাজিয়ে দে আমার।

(৪৪৬)

দূর মণ্ডল,—নিকট পাণি ;
নিকট মণ্ডল—দূর পাণি।
(চন্দ্রমণ্ডল সম্বন্ধে ইহা বলা হয়)

(৪৪৭)

কিছুতে না যাবে মোর
মনের বিকার,
মান আর অপমান
সমান আমার।

(৪৪৮)

আপনি ভেঙেছে মন
উপায় কি তার,
ভাঙ্গা মন কখনও কি
জোড়া লাগে আর ?

(৪৪৯)

বড় দাগা দিয়েছিস্ সাধের সময়,
ভাঙ্গা ঘরে চুরি আর এখন কি হয় ?

(৪৫০)

জন্মে করে নাই লক্ষ্মীপুজো,
একেবারে দশভুজো।

(৪৫১)

গিছে কাজে জ্বালাও বাতি,
ওহে করাল চক্রবর্ত্তী।

(৪৫২)

ভাই বল বন্ধু বল
সম্পদের সাথী,
অসময় নিদান কালে
গোবিন্দ সারথী।

(৪৫৩)

কি করে ঝালে ঝেলে,
কি না হয় দমকা জ্বালে।
(দমকা=খুব বেশী)

(৪৫৪)

ছ'মাসে ন' মাসে নাহি পাই দরশন,
এখন আমার প্রতি কিসের যতন।

(৪৫৫)

একলা ঘরের গিন্নী হ'ব,
চাবিকাঠি ছুলিয়ে নাইতে যাব।

(৪৫৬)

গতর নাই চোপায় দড়,
মেগে খায় তার পাণি বড়।

(৪৫৭)

হতচ্ছেদ্দার নেমন্তন্ন,
ডাকতে পড়ে নি মনে ;
ডাকো ডাকবে, না ডাকো না ডাকবে,
বিকট মূর্ত্তি দেখাও কেনে ?

(৪৫৮)

ঘাটের নৌকা ঘাটে রৈল,
কাণ্ডারী কোথায় পালিয়ে গেল।

(৪৫৯)

মাছ ধুইলে মিঠে,
মাংস ধু'লে শিঠে।

(৪৬০)

হাসতে গিয়ে কান্না এল,
কাঁদতে গিয়ে হাসি,
দূর থেকে তোমায় আমি
বড্ড ভালবাসি।
কাছে এসে বসলে ঘেঁসে
কথা নেইক মুখে,
কত ভালবাসি তাহা
দেখলে তুমি চোখে।

(৪৬১)

পূর্ণিমার চন্দ্র দেখি
তেঁতুল হ'ল বক,
গেঁড়ি-গুগলি এরা বলে
আমরা হ'ব শঙ্খ,
ডেংরা কাক বলে আমি
করব একাদশী,
লেজ কাটা কুকুর বলে
যাব বারাণসী।
(ডেংরা কাক = দাঁড়কাক)

(৪৬২)

মুখেতে মৃদুল হাসি,
অন্তরে গরল রাশি।

(৪৬৩)

আপনি বড় ভালো,
তাই লোককে বল কালো।

(৪৬৪)

বৃহন্নলা সারথী যার,
পরাভব কোথা তার ?

(৪৬৫)

'আদরমণি' সাধের ঝী,
বাজনা হ'ল না,
তিন কাহারে তুলে নে গেল
দেখতে পেলাম না।

(৪৬৬)

ভাবে গদগদ তেলেকুচা,
ভাবে গদগদ বনের ছুঁচা,
ভাবে গদগদ কিশোরী কাঁদে,
ভাবে গদগদ পুঁটুলী বাঁধে।

(৪৬৭)

মনটী সখের বটে,
হাতে কিন্তু পয়সা নাই ;
জোনাকী পোকার আলো দেখে,
গ্যাস-বাতির সখ মিটাই।

(৪৬৮)

পথে পেলাম কামার,
দা গড়ে দে আমার।

(৪৬৯)

ধীরে ধীরে বোনে,
তাঁতি সকল জিনে।

(৪৭০)

দাঁড়ালে পোয়া, বসলে ক্রোশ,
পথ বলে মোর কিসের দোষ।

(৪৭১)

যত ইচ্ছা তত যাও,
ক্রোশ অন্তর পা ধোও।

(৪৭২)

খোয় হাঁ—, শুয়ে জাগে,
সে মানুষ কোন কাজে না লাগে।

(৪৭৩)

বরের মাথায় চাঁপা ফুল,
কনের মাথায় টাকা,
এমন বরের বিয়ে দোষ
তার গোঁফ-জোড়াটা পাকা।

(৪৭৪)

ধনপতি রায়—
পাকা পান খায়,
একসের তামাক দিয়ে
বৌ আনতে যায়।

(৪৭৫)

কাজ নাই কাজ করে,
ধানে চালে এক করে।

(৪৭৬)

পিঠে পিঠে করেন বৌ,
এক পিঠে তিন বৌ,
আর তো খেতে নারেন বৌ।

(৪৭৭)

নাপিতের আসি,
ধোপার বাসি।

(৪৭৮)

কারো খেয়ে খেপে বারো,
কারো র'য়ে ব'সে তেরো।

(৪৭৯)

অল্প খাস তো বেশী খা,
বেশী খাস তো অল্প খা।

(৪৮০)

নদীর ধারে বাস,
ভাবনা বারমাস।

(৪৮১)

ঘরের পাপ বুড়ী,
পেটের পাপ মুড়ী।

(৪৮২)

বেগুন তোর পোঁদ কেন খারা ?
মোর বংশাবলীর ধারা।

(৪৮৩)

তেঁতুলি তুমি শুড় ফলিও,
ত্যজিও বক্র বয়ানা,
ভোমরা তুমি যুগে যুগে থাক
মুখ খুকে কল্লে শেয়ানা।

[কোন ফরসা লোকের কাল স্ত্রী ছিল। স্বামীর ভয় ছিল পাছে স্ত্রীর সঙ্গে থাকিয়া রং কাল হইয়া যায়। একদিন সে দেখে সাদা তেঁতুল ফুলে ভোমরা বসিয়াছে; তার জন্য সেই ফুল কাল হইল না। ইহা দেখিয়া তাহার ভ্রম দূর হওয়াতে সে বলিতেছে]

(৪৮৪)

মাথা নাই তার,
মাথা ব্যথা, তার।

(৪৮৫)

জল, জোলাপ, জুয়াচুরী
এ তিন নিয়ে ডাক্তারী।

(৪৮৬)

কে আছে এমন হিতু,
অদিনে খাওয়াবে ছাতু।

(৪৮৭)

পরপ্রত্যাশী নর,
গলায় দড়ি দিয়ে মর।

(৪৮৮)

সখা যার জনার্দ্দন
তার সনে কি সাজে রণ?

(৪৮৯)

এক পুতের আশা,
আর নদীর তীরে বাসা।

(৪৯০)

তোমার সমান দাতা কেবা আছে আর,
যতনে রাখিছ চেপে আপন ভাণ্ডার,
সময়েতে এক ফোঁটা কর নাই দান,
বক্ষে করে রক্ষে কর যক্ষের সমান।

(৪৯১)

ঝোলে, ঝালে, কি অম্বলে,
ছক্কাতে তো, মরে যাই—
আলু যে না ভালবাসে,
তার ভালবাসার মুখে ছাই।

(৪৯২)

হাটে গেছল সতীনের মা,
দেখে এল বাঘের পা;
তুই বললি, মুই শুনলি,
মরি বাঁচি, মা, বাঘ দেখলি।

(৪৯৩)

কাঁকালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কে?
কাল মঙ্গলবার করবে যে।
ও তো বরং দাঁড়িয়ে আছে,
আমার শুনে কাঁকাল ভেঙ্গে গেছে।

(৪৯৪)

লোকলজ্জায় রাঁধি-বাড়ি,
পেটের জ্বালায় খাই,
লজ্জা-সরম আছে বলে
কাপড় পোরে যাই।

(৪৯৫)

ধীরে জ্বাল, ঘন কাঠি,
তারে বলি দুধ আউটি।

(৪৯৬)

দই খাবে মেধো,
কড়ি দেবে সেধো।

(৪৯৭)

আমি ঘরভাঙ্গানি সই,
পরের মন্দকারী নই,
কথা কই আপন রেখে,
শুছি দিই দু'দিক্ থেকে।

(৪৯৮)

আর আমি কোন ঘাটে
ধুয়েছি হে মুখ,
মুছে গেল এত দিনে
চিরকেলে দুখ।

(৪৯৯)

গায়ের মশা ঝিনুকে চাছে,
মাথার উকুন বাঁদরে বাছে,
মাকে বলো—ভাল আছে।

(৫০০)

যেখানে সেখানে থাকুক রাম,
সিঁথেয় থাকুক এয়োত নাম।

মাসপঞ্জী

রাজনৈতিক—

১লা ভাদ্র...রাঁচীতে লর্ড ও লেডী উইলিংডন।

২রা ভাদ্র...খারাওয়াড়ি-বিদ্রোহ মামলার বিচারে আরও দুইজনের মৃত্যুদণ্ড ও ৩৮ জনের দ্বীপান্তর। থেয়াটমিওতে প্রায় ৪০০ বিদ্রোহীর আত্মসমর্পণ—দুইজন ডাকাত ধৃত। কলিকাতায় সস্ত্রীক বড়লাট। মহাত্মা গন্ধী-কর্ত্তৃক গভর্ণমেণ্ট্-এর বিরুদ্ধে দিল্লী-চুক্তি-ভঙ্গ-অভিযোগের তালিকা প্রকাশ। কোণাপুর সেণ্ট্রাল জেলে প্রায় ২০০ বন্দীর অনশন ধর্ম্মঘট—দণ্ডভোগ-হ্রাসের দাবী।

৩রা ভাদ্র...বড়লাটের অকস্মাৎ কলিকাতা ত্যাগ ও সিমলা যাত্রা—শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট্-এর পদত্যাগ ও কংগ্রেস নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের গুজব—আতঙ্কের ফলে বোম্বাই-এর শেয়ারের বাজারে মন্দা।

৪ঠা...ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ আলেক্‌জেণ্ডার ক্যাসেল্‌সকে জনৈক যুবকের আকস্মিক আক্রমণ—টাঙ্গাইলে ভীষণ চাঞ্চল্য—হট্টগোলে আততায়ীর পলায়ন।

৬ই...দিল্লী-চুক্তি-ভঙ্গ-অভিযোগের সরকারী উত্তর—কংগ্রেস-কর্ম্মীদের উপর দোষারোপ।

৮ই...মহাত্মা গন্ধীর সদলবলে সিমলায় আগমন—স্বরাষ্ট্র-সচিবের সহিত আলোচনা—বড়লাটের পীড়া। পেশোয়ারে আরও দুই মাসের জন্য পুনরায় ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি। প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাঁসপাতালে মিঃ ক্যাসেল্‌সের অস্ত্রোপচার—আততায়ীর উদ্দেশে টাঙ্গাইল ও কলিকাতায় খানাতল্লাসী ও পুলিশের হানা।

১১ই...বার্দ্দোলী তালুকে রাজস্ব আদায় তদন্ত-সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের ইস্তাহার—নাসিকের কালেক্টর মিঃ আর, জি, গর্ডন সালিস নিযুক্ত। শান রাজ্যের বিদ্রোহী-দলের নেতা সায়াসানের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ।

১২ই..."রাজপুতানা" জাহাজে মহাত্মা গন্ধীর লণ্ডন যাত্রা—বোম্বাই শহরে জনমণ্ডলীর অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা—ভারতের উপকূল-ভূমি ত্যাগের প্রাক্কালে দেশবাসীর বিপুল বিদায়-অভিনন্দন ও জয়ধ্বনি।

১৩ই...কলিকাতার নানাস্থানে নবকল্পিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন। চট্টগ্রামে খেলার মাঠে স্থানীয় পুলিস ইন্‌সপেক্টার খান বাহাদুর আসানুল্লা আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১৪ই...পুরীতে স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সিংহের সভাপতিত্বে ৪৬তম জাতীয় মহাসভার অভ্যর্থনা-সমিতির প্রথম সভা। জামাডোবায় কয়লার খনির পাঁচশত শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত—মাসিক বেতনের পরিবর্ত্তনে দৈনিক বেতন গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশের পরিণাম। লাহোরের দৈনিক "জমিদার" পত্রের সম্পাদকের প্রতি পররাষ্ট্র অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ।

১৮ই...'হিন্দুস্থান' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ বিষ্ণু শর্ম্মা রাজদ্রোহসূচক রচনা প্রকাশ-অপরাধে করাচীর অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

২০এ...মৈমনসিংহের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার।

বৈদেশিক—

১লা ভাদ্র...বৃটেনে প্রবল বাত্যা—১৩ জনের মৃত্যু।

৩রা...ইয়াংসি-উপত্যকায় মহাপ্লাবনের ফলে ৩ কোটি লোক গৃহহীন—১ কোটি লোক সর্ব্বহারা। ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক সঙ্কট—বিভিন্ন দলপতির আলোচনা—শ্রমিকদলে গুরুতর মতভেদ।

৫ই...হাঙ্গেরীর মন্ত্রীসভার পদত্যাগ। স্পেনে ক্যাথলিক বিদ্রোহের সম্ভাবনা—রোমের সহিত সংযোগ-স্থাপন—উত্তরাঞ্চলে ত্রিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ—আরও তিনটী গণতান্ত্রিক বাহিনী প্রস্তুত—সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির আশায় রাজা আলফান্সোর উদ্যোগ।

৭ই...বিলাতের শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের পদত্যাগ—তিন দলের মিলিত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা—ছয় মাস মধ্যেই আবার

সাধারণ নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা। চীনে বন্যার ফলে ২০ লক্ষ লোকের মৃত্যু—৩০ হাজার বর্গমাইল জলপ্লাবিত।

৮ই...কোয়েটায় ভীষণ ভূমিকম্প—বহু ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ। প্যালেষ্টাইনে গোলযোগ—আরবদিগের ধর্ম্মঘটে হাঙ্গামা—পুলিশ-কর্ত্তৃক গুলী-বর্ষণ।

৯ই...পর্ত্তুগালে সামরিক বিদ্রোহের ফলে ৪০ জনের মৃত্যু—২০০ লোক আহত।

১১ই...বন্যার ফলে চীনে ১০ লক্ষ লোকের সর্ব্বনাশ—জলে ডুবিয়া আড়াই লক্ষ লোকের মৃত্যু।

১৩ই...নিউজিল্যাণ্ডে ভীষণ তুষার-ঝঞ্ঝার ফলে অকল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন ছাত্র ও ৬ জন ছাত্রী ভ্রমণোদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া নিরুদ্দেশ।

১৬ই...এডেনে মহাত্মা গন্ধীর বিপুল অভ্যর্থনা—জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষরূপে অভিনন্দন—কটিবাস-পরিহিত গন্ধীজীর স্বহস্তে জাহাজ-পরিচালনা—গোলটেবিল-বৈঠকে মহাত্মাজীর 'কর্ম্মপদ্ধতি'-সম্বন্ধে বিবৃতি।

১৭ই...রোমে পোপ ও গভর্ণমেণ্টের আপোষ—ক্যাথলিক্‌দিগের "কর্ম্ম-পরিষদ"-এর কার্য্যকলাপ বিধানের বিধান। স্পেনদেশে শ্রমিক-মহলে অসন্তোষ—সৈনিকদের সহিত ধর্ম্মঘটকারীদের সংঘর্ষ—বহু হতাহত।

১৮ই...অষ্ট্রো-জার্ম্মাণ সন্ধি-প্রস্তাব পরিত্যক্ত।

১৯এ...অষ্ট্রিয়ার দুরবস্থা—আন্তর্জ্জাতিক সাহায্য প্রার্থনা। গ্রেট্‌বৃটেনে অতিরিক্ত বারিপাতের ফলে বহুস্থান জলমগ্ন—মিড্‌ল্যাণ্ডের কয়েকটা রেলপথে ট্রেণ-চলাচল বন্ধ।

২০এ...বিলাতের ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট মিউজিয়মে জনৈক অজ্ঞাতনামা আমেরিকাবাসীর 'ক্যানিং জুয়েল' নামে একটী প্রাচীন ভারতীয় মণি দান।

সামাজিক—

১লা ভাদ্র...লাহোরে শিখনেতা সর্দ্দার খড়ক সিংহ ২৫ জন লোকসহ গ্রেপ্তার—দোকানের স্বত্ব লইয়া বিবাদ।

৫ই...ডেরা ইস্মাইল খাঁর দাঙ্গা—১৪ জন মুসলমান ও ৭ জন হিন্দু গ্রেপ্তার—বহু ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন।

১৫ই...চট্টগ্রামে মুসলমানদের ভীষণ অত্যাচার—কোটী টাকার সম্পত্তি লুঠ—হিন্দুদের বহু ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ স্থানীয় সিনিয়র ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ নন্দী সাংঘাতিকভাবে আহত—বহু হতাহত—৮জন হাঁসপাতালে।

১৬ই...ঝরিয়ার কয়লা-খনির শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট—বহু পরিমাণে বেতন-হ্রাসের জের।

১৭ই...মহাত্মা গন্ধীর অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রাজা-গোপালাচারীর উপর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রের পরিচালন ও সম্পাদনভার।

১৮ই...পাদুকোটায় ১২৭ জনের বিরুদ্ধে দাঙ্গাহাঙ্গামার অভিযোগ—৪৬ জন আসামী ফেরার।

১৯এ...চট্টগ্রাম হাঙ্গামায় স্থানীয় জনৈক মহাপ্রাণ মাড়োয়ারীর চারিশত সন্ত্রস্ত হিন্দু মহিলা ও বালক-বালিকাকে আশ্রয়-দান।

২০এ...'শ্রমিক'-সম্পাদকের মামলা।

সভাসমিতি—

৩রা ভাদ্র...শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এলবার্ট হলে স্বদেশপ্রেমিক স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান।

৫ই...শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে এলবার্ট হলে 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর ২৭ বার্ষিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষে জনসভা।

৬ই...শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্ত্তৃক বর্ষা-ঋতু উৎসব (বর্ষামঙ্গল) উপলক্ষে শান্তিনিকেতন বিশ্ব-ভারতীতে জৈন ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সপ্তত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেনের সভাপতিত্বে বেলঘরিয়ার উদ্যান-সম্মিলনীতে "রসচক্র-"এর পক্ষ হইতে সুকবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে অভিনন্দন প্রদান।

১৪ই...কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের চত্বারিংশৎ প্রতিষ্ঠা-দিবসের অনুষ্ঠান তথা বন্যার্ত্তের সাহায্যার্থ জলসা।

১৮ই...আর্য্য-সমাজ মন্দিরে মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী-উৎসব—শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও ভজন।

১৯এ...বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটী হলে পণ্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্মাষ্টমী-সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২০এ...কলেজ স্কোয়ারে রাজা মাননীয় স্যর মন্মথনাথ রায়চৌধুরী মূর্ত্তিক কর্ত্তৃক স্বর্গীয় রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুরের মর্ম্মর-প্রতিষ্ঠান।

প্লাবনের মূল কারণ

বর্ষা-ঋতুর এই সময়ে বঙ্গদেশের দক্ষিণ হইতে মৌসুমী বাতাস বেশ জোরের সহিত প্রবাহিত হয় বলিয়া বঙ্গ, বিহার, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের সর্ব্বত্র বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সময়ে বঙ্গোপসাগরে প্রায়ই ঝড় হয়। তজ্জন্য পূর্ব্ব দিক্ হইতে বাতাস পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। বঙ্গোপসাগরের এই ঝড় পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা বা মান্দ্রাজের তীরে উপনীত হইয়া ঐ সকল স্থানে অধিক বারিপাতের ফলে প্লাবন আনয়ন করে। কখন কখন প্রতি সপ্তাহে একটা বা দুইটা ঝড় হয় এবং দেখা গিয়াছে, এক পক্ষে অন্ততঃ একটা ঝড় নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। এবৎসর বঙ্গোপসাগরে এপর্য্যন্ত মাত্র দুইটা ঝড়ের উৎপত্তি হয় এবং তাহাও বেশী গভীর ঝড় নহে। এরূপ অবস্থায় সমস্ত মৌসুমী বাতাস বঙ্গদেশের উপর দিয়া হিমালয়ের আঘাত পাইয়া থামিয়া গিয়াছে। এই কারণেই উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশে ও আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। এই বৃষ্টির জল এক ব্রহ্মপুত্র নদী দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে ভীষণ জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়াছে।

—সঞ্জীবনী

বন্যা ও রেলপথ

প্রায় প্রতি বৎসরই বন্যার জলে বাঙ্গালা ভাসিয়া যায়। দরিদ্র প্রজাকুল ধনে প্রাণে মরিয়া থাকে। বন্যার কারণ নির্ণয়ের জন্য এবং তাহার প্রতিকারের জন্যও কত যে আন্দোলন-আলোচনা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রেলের বাঁধ বন্যার একটি প্রধান কারণ। রেলের বাঁধের জন্য জলনিকাশ ব্যাহত হইয়া থাকে। ময়মনসিংহ সরিষাবাড়ী অঞ্চলে এবার যে বন্যার জল বাধিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ কারণ রেলের বাঁধ। ফ্রি-প্রসের সংবাদদাতা ঐ অঞ্চলে যমুনার জল বৃদ্ধি জনিত বন্যার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"সরিষাবাড়ী হইতে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট ষ্টেশন পর্য্যন্ত চারি মাইল রেলপথের মধ্যে মাত্র তিন স্থানে তিনটি জলনিকাশের ছোট ছোট সেতু আছে। ইহার একটি মাত্র দুই ফুট চওড়া। আর একটী আন্দাজ চারি ফুট। বাঁধের পশ্চিম দিকের জল পূর্ব্বদিকের অপেক্ষা প্রায় দুই হাত উচ্চ। ঐ কয়টি ছোট ছোট সেতু দিয়া এত জল কখনই নিকাশ হইতে পারে না।" অনেকবার এসম্বন্ধে তদন্ত প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ এবং ইঞ্জিনিয়ারেরা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, রেলপথে জলনিকাশের উপযুক্তরূপ সেতু নির্ম্মাণ না করিলে কিছুতেই বন্যার প্রকোপ হইতে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

—বঙ্গবাসী

বঙ্গেশ্বরের দান

বাঙ্গালার লাট বাহাদুর এবার সহরে অবস্থান কালে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে যে দান করিয়াছেন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১)	মুস্লিম অনাথ আশ্রম	৭৫০৲
(২)	মূক ও বধির বিদ্যালয়	২৫০৲
(৩)	রামকৃষ্ণ মিশন	১৫০৲
(৪)	সারস্বত সমাজ	৭৫০৲
(৫)	হিন্দু-মুসলমান সেবাশ্রম	১০০৲
(৬)	চৈতন্য সেবাশ্রম	৫০৲
		২০৫০৲

মাননীয়া লেডী জ্যাকসন্ মহোদয়া এবার সহরে অবস্থানকালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে যে দান করিয়াছেন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১)	মূক ও বধির বিদ্যালয়	২৫০৲
(২)	মুস্লিম অনাথ আশ্রম	২৫০৲
(৩)	ঢাকা মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান	৫০০৲
(৪)	হিন্দু বিধবাশ্রম	২০০৲
(৫)	হিন্দু অনাথ আশ্রম	২০০৲
		১৪০০৲

—ঢাকাপ্রকাশ

সুদের আইন

টাকার সুদের আগে ঘোড়াও দৌড়িতে পারে না,—কথাটা খুব সত্য। তাই অনেকেই সুদের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইতে দেখা যায়; পরন্তু পক্ষান্তরে সুদের টাকায় অনেককে কোটিপতি হইতেও দেখা যায়। বহুজনের সর্ব্বনাশ করিয়া একজনকে অর্থশালী হওয়ার প্রশ্রয় দেওয়াও ভাল নহে। তাই সুদের কবল হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য সকল দেশেই আইন প্রচলিত আছে। তবে, কোথাও এই আইন তেমন কার্য্যকারী হইতে দেখা যায় না। কেতাবের আইন কেতাবেই থাকিয়া যায়; তাহা অধমর্ণকে উত্তমর্ণের সুদের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। তথাপি স্যার মহম্মদ ইয়াকুব সুদ শাসনের জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা আদরণীয়। সুদ নির্ভর করে, লোকের গরজের উপর। ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতা যুক্তি করিয়া যখন আইনভঙ্গ করে, তখন আইন কোন্ কাজে লাগিবে? বাঙ্গালায় এবং ভারতের সর্ব্বত্রই এখন টাকার টানাটানি হইয়াছে; ঋণ না করিলে জমিদারের জমিদারী রক্ষা হইতেছে না, ঋণ না করিলে প্রজার পেট চলিতেছে না, ঋণ না করিলে ব্যবসায়ীর ব্যবসায় চলিতেছে না। এরূপ অবস্থায় কি সুদের আইন মানিয়া ঋণের লেন-দেন সম্ভবপর হইতে পারে? অথচ না হইলেও উপায় নাই; অত্যধিক হারের সুদে ঋণ করিয়া বহু লোকই বিব্রত হইয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে কিছুদিন পরে এদেশে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হইবে যে, তাহার ধ্বংসকর প্রভাব হইতে দেশ রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। যাহারা টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসায় করে, আইন করিয়া তাহাদের হাত বাঁধিয়া দেওয়া সহজ নহে; কিন্তু যাহা সহজ ও সম্ভব তাহাই বা গবরমেণ্ট করিতেছেন কৈ? বাঙ্গালার অনেক স্থানেই কোঅপারেটিভ সমিতি হইতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই সব সমিতি হইতে রীতিমত সম্পত্তি বন্ধক না রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয় না। তথাপি এই টাকার জন্য যে পরিমাণে সুদ আদায় করা হয়, তাহা সাইলক জাতীয় কুসীদ-ব্যবসায়ীদের সুদ অপেক্ষাও বেশী। ডাক-ঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ ৩ টাকা, কোম্পানীর কাগজের সুদ সাধারণতঃ ৩॥০ টাকা, কোন কোন ঋণের কাগজের সুদ ৪।৫।৬৲ টাকা পর্য্যন্তও আছে। ব্যাঙ্কের সুদ ৭৲ টাকা। কিন্তু কো-অপারিটিভ সমিতির সুদ একেবারে ১২॥০ টাকা হইবে কেন? গত কয়েক বৎসরে বাঙ্গালায় কো-অপারিটিভ পদ্ধতি বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে; কিন্তু সমিতিগুলির সুদের হার কম হইলে, তাহা আরও আদর পাইতে পারিবে।

—বঙ্গবাসী

নিষ্কর

বঙ্গে নিষ্কর জমিদারী এবং নিষ্কর প্রজাস্বত্ব যতগুলি আছে তাহার তালিকা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে।

জেলা	নিষ্কর জমিদারী	নিষ্কর প্রজাস্বত্ব সংখ্যা
বাঁকুড়া	৪০৬	৮৬৩৮২
মেদিনীপুর	২২০৩	৮৮৯৩
নদীয়া	৪৭২	৫১০৭৬
যশোহর	২১৪	৬২৩৯১
খুলনা	৫৩	৩৪৮৩১
ঢাকা	১৯০৩	৪৭১:৫
ময়মনসিংহ	১৬৯৭	৫৩০২২
ফরিদপুর	১১৭	২৮৭৮৩
বাখরগঞ্জ	৪৯	৩২৩৯৭
ত্রিপুরা	২৬৫	১৫৬৩৬
নোয়াখালী	১০২	২৪৬৪
রাজসাহী	১০৮	২৩৯০২
জলপাইগুড়ী	২৯১	×
বগুড়া	৪৪	১২৫২৬
পাবনা	৪৫	১৬৯৭৮

গান্ধার-শিল্পকলা

(পুনরাবৃত্তি)

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

বোধ হয় এই নিমন্ত্রণে যোগ দিতেই "ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল.........প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে নিস্তব্ধ নির্ব্বাক" সহস্র মাইল পাড়ি দিয়া 'দুর্দ্দম গ্রীষ্ম-প্রান্তে' দিল্লী যাই।

"ওঁ

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ

সবিনয় নিবেদন মিদং,

মহাশয়, আগামী——— শ্রাবণ ১৩৩৭ সন, শনিবার,......বাটিস্থ শ্রীযুক্ত বাবু স্বর্ণলতা বসুর প্রথম পুত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রকুমার বসুর সহিত আমার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নারাণীর শুভ পরিণয় হইবে। অতএব মহাশয় উক্তদিবসে সবান্ধবে মদীয়......ভবনে আগমন পূর্ব্বক শুভকার্য্যে যোগদান করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

তাং... ..শ্রাবণ, ৩৭ } নিবেদিকা
নিউ-দিল্লী। } শ্রীনীলিমারাণী দেব।

লৌকিকতার পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদই প্রার্থনীয়।"

(ইতি কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রণ)।

(বরপক্ষের নিমন্ত্রণ-পত্রিকা)

"নহে স্বদেশে, নহে বিদেশে,
বাঙালীর তীর্থ কর্ম্মক্ষেত্রে
নহে বসন্তে, নহে শরতে,
দুর্দ্দম ঋতু গ্রীষ্ম-প্রান্তে—
নহে তরুণ-তরুণীর, প্রাচীন-নবীনার মধুমিলনে,—
—কিশোর-কিশোরীর সোনার স্বপনে—
রথ-দ্বিতীয়ায়, কৃষ্ণা নীলিমায়,
হে ভদ্র, তব দরশ মাগি,
ধন্য গণি, এ দীনার পুত্র পুত্তলিকতাউদ্বাহে।
শ্রীস্বর্ণ বসু।"

এই পত্রের অপর পৃষ্ঠায় আছে :—

"বিবৃতিঃ

প্রজাপতির

.........,নিউ দিল্লীতে, এক ঝলক বাঙলা-বাতাসে শ্রাবণ আবির্ভাব।

প্রজাপতির একজন মুগ্ধ উপাসক বাঙালী তাহার বাঙালী বন্ধুর সবান্ধবে দর্শন যাচনা করিতেছে।

{ পূজারী —শ্রীমান্ যতীন্দ্রকুমার বসু
{ পূজারিণী —শ্রীমতী জ্যোৎস্নারাণী দেব

মঙ্গলবারে বধূর মধু-বণ্টন-মাঙ্গল্য। শ্রীস্বর্ণ বসু।"

একবয়সী বন্ধুদের নামে আর একখানি নিমন্ত্রণপত্র ছিল :—

"খোকার বে কাল্‌কে ভাই—
সাত্‌-তাড়াতাড়ি, তাই না তাই—
যেমনি কথা, অম্‌নি পাকা,
কি কপালের লেখা জোকা।
তোমরা এলে কতই খুশী,
বল্‌তে পারে কলম-মসী!
এসোই, এসোই, এসো,
রইলো মাথার দিব্যি—
ভুলে গেলে হবেই কিন্তু,
জন্মের আড়ি সত্যি।
শ্রীসোণা।"

ক্ষুদ্র বান্ধবীদিগের এমন নিমন্ত্রণ এড়াই, এমন বৃদ্ধ

---

* শ্রাবণ সংখ্যার গান্ধার-শিল্পকলা-অবতরণিকার পুনরাবৃত্তি।

এখনও হই নাই। বৈবাহিকাদ্বয়ের বয়স—দশ বৎসর। পাত্র-পাত্রী অধুনা মথুরা-শিল্পের নিদর্শন-পুত্তলিকা।

* * * *

এইদেশী লোক বলে ৯ দিল্লী—ইন্দ্রপ্রস্থ, পৃথ্বীরাজকা দিল্লী, কুতবাবাদ, তোগলকাবাদ, ফিরোজাবাদ, শাজাহানাবাদ ইত্যাদি, সপ্তমেরই আজও পর্যন্ত দেখা মিলিয়াছে আবার অষ্টম দিল্লীর আবির্ভাব হইবে। ভারত-ভাগ্য-বিধাতার নিত্য পাদ-পীঠ, চির-রঙ্গমঞ্চ এই দিল্লী।

পঞ্চপুষ্পের পাঠকেরা তো এই "কিশোর-কিশোরীর সোণার স্বপনে" মিলিতে পারেন নাই; 'মিষ্টান্নো...' বন্দোবস্তও করিতে পারি নাই। পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিমত (গান্ধার-শিল্পকলা অবতরণিকা,—শ্রাবণ পঞ্চপুষ্প) যাহা সাধ্য, গান্ধার-শিল্পকলার

হারীতী

-সেই সপ্তম ইংরাজের নয়া-দিল্লী এই সপ্ত নামে ভারতেতিহাসের সপ্তাঙ্ক নাটক অভিনয় চলিয়াছে। ভারতীয় পূর্ণতম নাটক নবাঙ্ক, দুই অঙ্কের দুই দিল্লী ভবিষ্যতের বুকে, তাহাদিগের হদিশ্ কোনই উর্দ্দু-ফার্শি কেতাব-প্রবাদেও মিলে না। নবযুগ আগমনের মহতী বেদনার আভাস মাত্র আজ পাই না, চোখে বুঝি নবারুণের তরুণ আলো লাগে। নবসুরে ঐক্যতান বাজিতেছে। আর কিছু পরিচয় পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি।

নিমন্ত্রণে যোগদান করিয়া দিল্লী হইতে বর্ত্তমান গান্ধার-শিল্পের পীঠস্থান লাহোর ও মথুরা জাদুঘর পুনর্দ্দর্শন করিতে যাই—লক্ষ্ণৌ ও সারনাথ জাদুঘরেরও আবার সাক্ষাৎ ঘটে। সর্ব্বত্রই লক্ষ্য না করিয়া পারিলাম না, টিকটিকি-বিভাগের যেন কন্যাদায় পড়িয়াছে—আমার জন্মপত্রিকায় এতই তীব্র আগ্রহ উৎসাহ; মনে হইল বাঙ্গালী হওয়াতেই এত অত্যধিক খাতির।

সীমার মধ্যে অসীমের আভাস দিতে পারাই আর্ট, আর ঐখানেই কৃতকার্য্যতার অভাব দেখিয়াই বলিতেছিলাম, গান্ধারশিল্পী কর্ম্মকার মাত্র, রূপকার নয়।

কুবের ও হারীতী

বুদ্ধমূর্ত্তি রচনার কথা বলিতেছিলাম। ভারুত-সাঁচীতে বুদ্ধমূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাই না, সেখানে বুদ্ধকে বুঝাইতে নানারূপ নিদর্শন-চিহ্নের ব্যবহার করা হইয়াছে। গান্ধার-শিল্পে বিশেষ অভিজ্ঞ ফুশে বলিয়াছেন—বুদ্ধমূর্ত্তির কল্পনা ও রচনা বৈদেশিক। গ্রুয়েন্‌ডেল আবার সেই কথাই বলিয়াছেন—বার্গেস তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং সাধারণতঃ বিলাতী পণ্ডিতদিগের মত ঐরূপ।* তাঁহারা বলিতেছেন, ভারতীয় বুদ্ধমূর্ত্তির আদর্শ মিলে গান্ধার শিল্পপ্রকরণে। কথাটা সত্য নয়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ভারতীয় শিল্পকলার ক্ল্যাসিক্যাল বা স্বর্ণ-যুগ বলা হইতেছে গুপ্তকালকে। 'গুপ্ত'-বুদ্ধই, বুদ্ধ-মূর্ত্তির আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেই বুদ্ধ-মূর্ত্তির ইতিহাস সন্ধান করিলে, নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, ইহা গান্ধার-বুদ্ধের বংশধর নয়—মথুরা-বুদ্ধের ধারাই এখানে বহিয়া চলিয়াছে। গান্ধার-শিল্পকলা খৃষ্ট-জন্মের কিছু পূর্ব্বে সৃষ্টি হয়—গুপ্ত-যুগের উদয়ে (খৃঃ† অব্দ চতুর্থ শতকের প্রাক্কালে) ইহা ভারতীয় ধারায় মিশিয়া লোপ পায়—তাহার আর স্বাধীন সত্তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না।

অনেককাল পূর্ব্বে নয়, কিছুদিন আগেই, ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল, মথুরা-শিল্পকলা, গান্ধার-শিল্পেরই কোন শাখা-বিশেষ মাত্র। কথাটার সত্যের লেশমাত্রও নাই। মথুরা-শিল্পের শ্রেণীবিশেষেরই উপর গান্ধার-শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য হয়—কিন্তু মথুরা-শিল্প বলিতে যাহা বুঝি তাহা একান্তই গান্ধার-শিল্পকলা-প্রভাব হইতে স্বাধীন বা মুক্ত। তাহার ইতিহাসের সন্ধান লইতে গেলে দেখি, ভারুত-সাঁচীর একান্ত ভারতীয় জাতীয় শিল্পকলার ধারাই বহিয়া চলিয়াছে।

হারীতী ও কুবের

* অধুনা প্রকাশিত গেটের পুস্তক—'উত্তরাপথ-বৌদ্ধ-দেবতা' পুস্তকেও এই কথাই বলা হইয়াছে হ্যাভেল ও বিষয়টী ধরিতে পারেন নাই।

† 'খৃষ্টাব্দ' বানানকে ভাদ্রের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অশুদ্ধ বলিয়াছেন। কথাটা 'খৃষ্টাস'—খৃষ্ট লিখিলে অশুদ্ধ বিবেচনার কারণ দেখি না।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে মথুরায় স্বতন্ত্র ধারায় বুদ্ধমূর্ত্তি রচিত হইতেছিল। স্বয়ং ভোগেল্ স্বীকার করিতেছেন—মথুরার বিশিষ্ট বুদ্ধ-মূর্ত্তি সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছিল এবং মথুরা-শিল্পের অস্তিত্বের সারা যুগ ধরিয়া বৌদ্ধ-শিল্পকলার উপর ইহার সবিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। এ কথা স্বীকার করিতে তিনি টীকা করিয়াছেন 'ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।' গান্ধার-শিল্প-প্রভাব সম্বন্ধে এতদিনের এত কথা ডুবিয়া যায় দেখিয়া, এই টীকা বা স্বগতোক্তি স্বাভাবিক বিবেচনা করিতে পারি।

চিহ্নিত ভাস্কর্য্যের উদ্ধার হইয়াছে, তাহা হইতে একটী তথ্যের উদ্ভব হয়। লোরিয়ান-টাঙ্গাইয়ের বুদ্ধমূর্ত্তির (কলিকাতা যাদুঘর) তারিখ ৩১৮—সেলিউকিড অব্দ অনুসারে ইহা দাঁড়ায় খৃঃ অব্দে ৬; হস্তনগর মূর্ত্তি হয় ৭২। ইউসুফজাই জেলায় তাখ্‌ত্‌-ই-বাহীতে প্রচুর গান্ধার-ভাস্কর্য্য উদ্ধার হইয়াছে—গডোফারেসের লিপির তারিখ ৪৬। শিরকাপে, একটী সুন্দর নারীমূর্ত্তিকে মুদ্রার তুলনায় তারিখ দেওয়া হইয়াছে ৫৩। খৃষ্টীয় এই প্রথম শতকের মথুরা-বুদ্ধমূর্ত্তিরও অভাব নাই।

হারীতী

একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখি; কোন কোন ব্যক্তি গ্রীক-গান্ধার-শিল্পকে রোমীয়-গ্রীক নাম দিয়াছেন, ইহা ভুল, শেষোক্ত শিল্পের সহিত এই শিল্পের মাতা-পুত্র সম্বন্ধ নয়, ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ—উভয়েরই মাতা গ্রীক শিল্পকলা। একই কুশান যুগে গান্ধার-বুদ্ধ ও মথুরা-বুদ্ধ পাশা-পাশি রচিত হইতে লাগিল। যে অতি সামান্য কয়েকটী তারিখ-

গান্ধার-শিল্পকে আমাদিগের প্রথম হইতে বিবেচনা করিতে হইবে, ভারতীয়-শিল্পের গ্রীক্ প্রভাবান্বিত রূপ হিসাবেই এবং গ্রীক্-শিল্পের ভারতীয় রূপ হিসাবে নয়। মাত্র এ্যাপোলো মূর্ত্তির বুদ্ধ নাম দেওয়া হয় নাই—দীর্ঘ-কালের ভারতীয় সাহিত্য ও ঐতিহ্য মতে, লোকপরম্পরাগত মনের মূর্ত্তিকে রূপ দেওয়া হইয়াছে। ঠিক এইরূপেই

মথুরার বুদ্ধমূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। তবে গান্ধারে নিম্ন-শ্রেণীর গ্রীক্-শিল্পী গ্রীক্-গঠন-রীতির মোহ প্রথমে আদবেই কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। পূর্ব্বেই এ কথা বলিয়াছি যে গান্ধারী-বৌদ্ধ-গ্রীক্ ভারতীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সে ডুবিয়া যায় নাই—তাহার গ্রীক্ সত্তা

গ্রীক্ অনুপ্রেরণার গ্রীক্ গঠন-রীতিতে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

আবার ঐ গান্ধারে ভারতীয় ভাবের বৃদ্ধির অনুপাত যতই বাড়িতে লাগিল, তাহার গ্রীক্ রূপের ততই হ্রাস পাইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই হিসাবেই সাধারণতঃ গান্ধার-ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের বয়স নিরূপিত করা হয়। ক্রমে ভারতীয় ভাব ও হেলেনীয় ভাবের সম্পূর্ণ সম্মিলনে এক নূতন শিল্পকলা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিরোধের ভাব দিনে দিনে লোপ পাইতে লাগিল। গান্ধারের রীতিবিশেষ যাহা অবশিষ্ট রহিল—তাহা ভারতীয়েরই পর্য্যায়ে স্থান পাইল। এই যে বিরোধের অন্ত হইতেছে—ইহার চিহ্ন পাই খৃষ্ট অব্দ দ্বিতীয় শতকেই। তাই মথুরায় নয়—যেখানে কোন শ্রেণীর শিল্প বিশেষ করিয়া গান্ধার-রীতি ভাবাপন্ন (যথা —বিশেষ করিয়া রিলিফ্ নিদর্শনে)—সুদূর অমরাবতীতে দেশী শিল্পকলার ঐ সময়ে গান্ধার গঠন-পদ্ধতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। সে পদ্ধতি তখন ভারতীয় বলিয়াই বিবেচিত হইতেছিল। যেমন শক-হুন-পহ্লব সকলে নিঃশব্দে ভারতীয় বলিয়া গণ্য হইতেছিল—এমনই করিয়াই কালে গান্ধার-গ্রীক্ প্রভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পাইল।

বলিয়াছি, গান্ধার শিল্পকলায় আদিতেও বুদ্ধমূর্ত্তি ভারতীয় ভাবেই অনুপ্রাণিত। তাহা গ্রীক এ্যাপোলো নূতন পোষাকে মাত্র নয়। সে শিল্পকলারও কৈশোর তাই ভারতীয় যোগীমূর্ত্তি দেখা দিল। গত সংখ্যায় ১০ নং চিত্র (লাহোর মিউজিয়ম) ভারতীয় যোগীর চমৎকার ফটো চিত্র। কিন্তু শিল্পীর কাজ তো ফটোগ্রাফারের কাজ নয়। সে মাত্র বাহ্য-প্রতিরূপ সৃষ্টি করিয়াই তো ক্ষান্ত নয়, তাহার বৈশিষ্ট্য হইতেছে অন্তরের রূপপ্রকাশে।

এক সূত্র দিয়াছি—গান্ধার শিল্পী কর্ম্মকার, রূপকার নয়। এই কথাতেই তাহার স্বরূপের বিশেষ পরিচয় হয়। কর্ম্মকারের সার্থকতার চূড়ান্ত হইতে পারে নিখুঁত ফটোগ্রাফীতে।
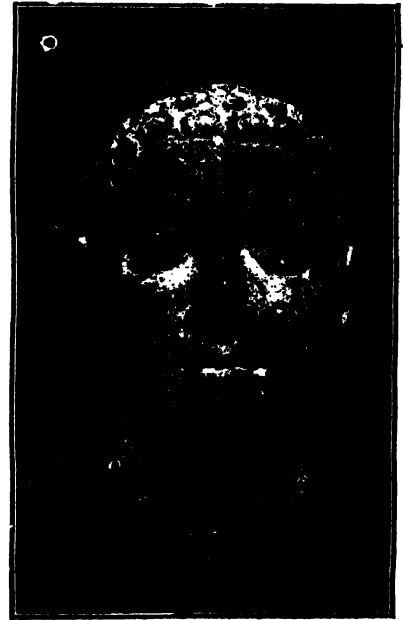
তাহারই পরিচয় ঐ ১০ নং চিত্র। কিন্তু ঐ অস্থি-চর্ম্মসার কঙ্কাল-বুদ্ধ তো মহাযোগী ভারতীয় বুদ্ধ নয়। সারা এসিয়ার শিল্পকলায় এই যোগীর রূপ-কল্পনা ভারতীয় শিল্প-কলার এক অতুলন দান। পৃথিবীর কোন শিল্পকলায় এই এক রূপের এত অসীম প্রভাবের আর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই মহাযোগী বুদ্ধের অমন রূপাকৃতি আদর্শ তো কোথাও মিলে না—ভারতে নয়, সিংহলে নয়, বৃহত্তর ভারতে

নয়, চীনে নয়, জাপানে নয়, নেপালে নয়, কোথাও নয়। ভারতীয় কলাশিল্পের প্রভাব পৌঁছিয়াছে এমন কোন দেশে নয়। বুদ্ধের সুবিখ্যাত দ্বাত্রিংশতি প্রধান-লক্ষণ ও অশীতী গৌণ-

লক্ষণ কিছু তো ইহার প্রতিপোষক দেখি না। বুদ্ধের ধর্ম্মে ও দেহের অমন নিপীড়ন নিষিদ্ধ। মহামুনির অমন রূপকল্পনা, কল্পনার দৈন্যের পরিচায়ক, ইহা কর্ম্মকারের কর্ম্ম, 'ইতর' সৃষ্টি। দিব্যদীপ্তি-উজ্জ্বল, শান্ত-সমাহিত, কোটি চন্দ্র-জিনি রূপের কি ঐ কল্পনা! সে রূপ দেখিয়া দীপ্তযৌবনা নারী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিল— অতি সার্থক ইহার পিতা, অত্যন্ত গরীয়সী ইহার মাতা, অতি ধন্যা ইহার স্ত্রী! মদোন্মত্ত দস্যু নিমেষে শ্রীচরণকমলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। গোরার অপরূপ রূপ-বর্ণনার সহিত তো সকলের পরিচয় আছে—বুদ্ধের রূপ বর্ণনা তাহার অপেক্ষা সামান্য একটুও কম উজ্জ্বল করিয়া কল্পনা করা হয় নাই। এ কাজ আরম্ভ করে আদি-বৌদ্ধ বা থেরবাদীরা নয়, সারা হীনযানেই নর-রূপী বুদ্ধের কল্পনাই স্বীকৃত হইয়াছে—লোকোত্তর বুদ্ধের কথা শুনায় প্রথম মহাসাঙ্ঘিকেরা। সর্ব্বাস্তিবাদীনরা, সৌত্রান্তিকেরা তাহা কম বেশী মানিয়া লইতে থাকে। দিব্যরূপ সে বুদ্ধের উপমা দিতে সর্ব্ব দেবতারা নিতান্ত ম্লান হইয়া যায়। 'স্ব-সম্ভোগকায়' বা 'সম্ভোগ-কায়' বুদ্ধের রূপ ও মাহাত্ম্য বচনাতীত।* বুদ্ধ দাঁড়াইলেন দেবাদিদেব। 'সর্ব্বদেবতা চ বোধিসত্ত্বস্য পাদয়োর্নিপতিতা। ততো রাজা শুদ্ধোদনেন বোধিসত্ত্ব দেবতানামত্যয়ং দেব ইতি তেন বোধিসত্ত্বস্য দেবাতিদেব ইতি নামধেয়ং কৃতম।'' † মহাসাঙ্ঘিকদিগের ভক্তিবাদ এমনই করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বনিয়াদ গড়িয়া তুলিল। মহাসাঙ্ঘিকদিগের কাল হইতেই এবং মহাযানের উদয়েই যে বৌদ্ধধর্ম্মের দেবতাগণের অনুপ্রেরণা আসিয়াছিল, ইহা বুঝিতে কোনই কষ্ট থাকে না।

গান্ধারের এই গ্রীক্-বৌদ্ধ-শিল্পীরা এই দেবাদিদেব বুদ্ধকে ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। দেবতা-বুদ্ধ ও যোগী-বুদ্ধ উভভাবে মিলিয়া যে বুদ্ধভাবের উদ্ভব হইয়াছে, নবাগতের নিকট তাহা প্রথমে ধরা পড়া অসম্ভব। তাই প্রথম যুগের সৃষ্টি অত বেশী হেলেনীক্। পূর্ব্ববারে বলিয়াছি, যে সূত্রমতে ভাস্কর্য্য-নিদর্শন নবীন-প্রাচীন স্থিরীকৃত হয় সেই সূত্রমতেই শিল্প-সৌন্দর্য্য ইউরোপের পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ বিচার করিয়াছেন। মূর্ত্তি যতই হেলেনীক্ হইয়াছে, মাত্র

বাহ্য মাংসল সৌন্দর্য্যের অনুপাত যতই বেশী দেখা গিয়াছে—শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে তাহাকে তাঁহারা ততই উচ্চে স্থান দিয়া-

* মৎলিখিত 'বৌদ্ধ শিল্পকলার অনুপ্রেরণা'—বৈশাখ, পঞ্চপুষ্প দ্রষ্টব্য।

†—দিব্যাবদান—৩৯১ পৃঃ। ললিতবিস্তরে (পৃঃ ১৩৭) আছে— "শিবস্কন্দনারায়ণকুবেরচন্দ্রসূর্য্যবৈশ্রবণশক্রব্রহ্মলোক-পালপ্রভৃতয়ঃ প্রতিমা সর্ব্বাঃ স্বেভ্যঃ স্বেভ্যঃ স্থানেভ্যো বঞ্চ্যাণ বোধিসত্ত্বস্য ক্রমতলয়োর্নিপতন্তি। এইসকল দেবতার তখন প্রচুর প্রতিপত্তির পরিচয় পাই।

ছেন। ভারতীয় শিল্পকলাতত্ত্ব বুঝিতে এত বড় ভুল সূত্র আর নাই। এখানে রূপের অন্তরে অরূপের সন্ধানই চলিয়াছে—এই অরূপের সন্ধানই দার্শনিক, কবি, শিল্পী সকলের পরম সাধনা। সে তপস্যা সার্থক হইয়াছে, যতই দেহাতীতের আভাস প্রকাশ পাইয়াছে দেহের আশ্রয়ে। এই বিশিষ্ট ভারতীয়-ভাব গান্ধার-শিল্পকলায়ও ক্রমে যে স্থান পাইল, অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে তাহার পরিচয় পাইতে থাকি। তাহাতে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সঞ্চার হইয়াছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। লোরিয়েন-টঙ্গাইয়ের ভাস্কর্য্য (কলিকাতা জাদুঘর) এই শেষ যুগের (খৃষ্টাব্দে তৃতীয় শতক), এবং গ্রুয়েন্‌ডেল স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—ইহাই গান্ধার শিল্পকলার সুবর্ণযুগ।

গান্ধারের এই শিল্প যেমন ভারতীয় কলা-শিল্পের অতি শোচনীয় সৃষ্টি, তেমনি গ্রীক্ শিল্প-কলারও ইহা হীনতম নিদর্শন। এই শিল্পীরা, এ্যাথেন্সের পারথিনন, এ্যাথেন্স ও এগ্রিজেন্টামের জুপিটার-মন্দির শিল্পীদিগের, এবং কোরিন্থিয়ান অলিম্পাসের জুপিটার-মন্দির, লাইসিক্রেটের স্মৃতি-কীর্ত্তি ইত্যাদির শিল্পীগণের 'জাত'ই নয়। সে অতুলন গ্রীক্ স্থাপত্য-শিল্পের তো পরিচয়ই নাই। অবশ্য সেই অতুলন

স্থাপত্য-শিল্প গ্রীসের নিজস্ব নয়—তাহার সর্ব্বস্বই ঋণপ্রাপ্ত, হয় মিশর হইতে, নয় এ্যাসেরিয়া হইতে। গ্রীসের অতুলন প্রতিভা হইতেছে, তাহাকে জাতীয় পর্য্যায়ে তুলিয়া লওয়া। তাহা সম্ভব হইয়াছিল এইজন্য যে অনার্য্য 'পেল্যাসজি' সভ্যতার বনিয়াদে গ্রীক্ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্য সংস্কৃতিকে আপন করিয়া 'হজম' করিয়া লইবার দিকে আর্য্য-দিগের এক অসামান্য জাতীয় প্রতিভা আছে।

নিম্নশ্রেণীর গ্রীক্-শিল্পীর হাতে ভারতীয় শিল্প-কলা গান্ধারে এক অপরূপ আকার পাইতেছিল। প্রথমেই গণ্ডগোল বাধে ইহার জাতিনির্ণয়ে। এমন ঘটনার দুই-একটা এই দেশী ঐতিহাসিক উদাহরণ দিয়াই কথাটা শেষ করিব। কোন পক্ষ তুলনা দিয়াছেন, আকবরের আমলে পারস্য শিল্পকলার আমদানী। সে পাপের 'জের' কিন্তু বেশীদিন চলে নাই। ইহাকে 'হজম' করিয়াই নূতন মোগল-শিল্পকলা জাগিয়া উঠে। সাহিত্য-ইতিহাসেও দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। দেশী সাহিত্য উর্দ্দু-পার্শির আক্রমণে এতই ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যে যুগ-বিশেষের সে সাহিত্য অবোধ্যের কাছাকাছি। ইংরেজীর অনুপ্রেরণায় যে আশ্চর্য্য সাহিত্য পড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কঠিনতম অভিযোগ হইতেছে, ইহা জাতীয় সাহিত্য নয়, ইহা প্রাণহীন। সুবিশাল রোমক শিল্পের বিরুদ্ধেও ঐ অভিযোগ আনা চলে—উহা জাতীয় নহে, তাই প্রাণস্পন্দন-চিহ্নের অভাব দেখি। ইট্রাস্‌কান শিল্পের বনিয়াদের উপর দাঁড়াইয়া, গ্রীক্-শিল্পে দীক্ষা এবং অদ্বিতীয় সাম্রাজ্যের বিরাট্ আড়ম্বরে তাহার প্রকাশ-প্রচেষ্টা, শিল্পকলার কষ্টিপাথরে পরীক্ষায় প্রায়

ব্যর্থই হইয়া গিয়াছে—যদিও ইমারতের অতি বিশালত্বের অনন্য প্রভাবে সাধারণের চক্ষুতে ইহা অতি মহান্ বলিয়া মনে হয়।

এইবার গান্ধার-ভাস্কর্য্যের কয়েকটী মূর্ত্তির কিছু পরিচয় দিতেছি।

হারীতী গান্ধার-ভাস্কর্য্যের একটী সুপরিচিত মূর্ত্তি। হারীতী ও শীতলাকে এক করা হইয়াছে। শীতলা তাহারই পরিপোষক। গল্পটী সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। তন্ত্রমতে শীতলার বর্ণনা হইতেছে—

"ওঁ শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগবিলসম্মার্জ্জনীপূর্ণকুম্ভাং।
মার্জ্জন্যা পূর্ণকুম্ভাদমৃতময়জলং তাপশান্ত্যৈ ক্ষিপন্তীম্॥
দিগ্বস্ত্রাং মূর্দ্ধ্নি সূর্পাং কনকমণিগণৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাং।
বিস্ফোটাদ্যুগ্রতাপপ্রশমনকরীং শীতলাং ত্বাং ভজামি॥"

এই শীতলাকে কি হারীতী-মূর্ত্তির সহিত মিলাইতে পারি?

হিন্দু দেবী ও হারীতী বৌদ্ধসৃষ্টি ইহা স্বীকার করিতে হইবে। হারীতীর সন্ধান লইতে হইবে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত একান্ত জড়িত প্রাক্-বৌদ্ধযুগ হইতে আগতা যক্ষীতে। ভারুত-সাঁচী হইতে চিরদিন সে যক্ষী বৌদ্ধশিল্পকলার একটী বিশিষ্ট স্থান পাইয়া আসিয়াছে। সারা বৌদ্ধ-সাহিত্যে বুদ্ধের অতি ভক্তোপাসিকা রূপে তাহার একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। হারীতীর যে গল্প বৌদ্ধ-সাহিত্যে পাই তাহাও বৌদ্ধসাহিত্যে হারীতীর বৃত্তান্ত হইতেছে:—হারীতী কোন জন্মে এই কামনা করে, রাজগৃহের শিশুদিগের সে ভক্ষণ করিবে। জন্মান্তরে সে হয় যক্ষরাজ 'প্রজ্ঞকের' স্ত্রী। তাহার ৫০০ সন্তান (বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ আছে)। ললিতবিস্তর হইতে মনে হয়, যক্ষের নাম প্রজ্ঞকের ব্যাখ্যা হইতেছে—'পঞ্চিক' শব্দ, পঞ্চিক অর্থে প্রধান। যক্ষশিশু-দিগের আহারের নিমিত্ত নিত্য মানুষ-শিশুর প্রয়োজন হইত।

মানুষেরা বুদ্ধের শরণাপন্ন হইল। বুদ্ধ যক্ষিণীর প্রিয়তম কনিষ্ঠ সন্তানটীকে নিজ উদরের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। পরে অনুসন্ধানরতা যক্ষিণীকে বলিলেন—তোমার তো এত সন্তান, তবু একটীর জন্য এত আকুলতা—মানুষের প্রত্যেকের একটী দুইটী সন্তান, তাহার হত্যায় মনে যে কতই আঘাত লাগে তাহা কি বুঝিতে পার না? যক্ষী সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। বুদ্ধ ভিক্ষুদিগের ভিক্ষাংশ হইতে তাহার সন্তানদিগের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ইতসিং বলেন, এই জন্যই বিহারের আহার-কক্ষে হারীতীর মূর্ত্তি দেখা যায়, ক্রোড়ে তাহার (সেই কনিষ্ঠ) শিশু, জানু জড়াইয়া আরও সব শিশু। হারীতীকে দৈনিক অন্ন উপচার দেওয়া হইত। এই যক্ষী-মাতা চতুর্মহারাজিকদিগের নিমন্ত্রিতা। জাপানে হারীতীকে শিশুদিগের দেবী, পৃথিবীর রক্ষয়িত্রী দেবী বলা হয়। তাহার সঙ্গে থাকে হয় সেই কনিষ্ঠ সন্তানটী, নয় ছয়টী কন্যা। হারীতী বিশেষ করিয়া ষষ্ঠীজাতীয়া দেবী।

হারীতী নামেরও সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। চীন অনুবাদে যক্ষীর প্রথম নাম বলা হইয়াছে হুয়ান্সী—অর্থ—আনন্দ। তাহার নিজের ও সন্তানগণের জন্য রাজগৃহের শিশুগণকে হরণ করার নিমিত্ত তাহার নাম হইল হারীতী। হুয়ান্সী প্রথমে রাজগৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিল। হুয়েনসাং তক্ষশিলার কুড়ী মাইল উত্তরে হারীতীর নবধর্ম্মে দীক্ষার স্থান নির্দ্দেশ করেন। তাহা হইতেছে গান্ধার প্রদেশ। ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতায় সুন্দর কবিতায় এই আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। মহাবস্তুতে কুণ্ডলা যক্ষীর গল্প হারীতী অবদানের যেন সূচনা করে। ইতসিং বলেন—বিহারে হারীতী-মূর্ত্তি কুবেরের ঠিক সম্মুখবর্ত্তী থাকিত। জাভায়ও তাই দেখি। চীনে হারীতী ও কোয়ান্-ইন্ দেবী এক হইয়া গেল এবং দেবীর নাম হইল—সুঙ্গসীং (ষষ্ঠীদেবী)। তুরফানেও ঠিক তাই।

যক্ষী হারীতীর স্বামী হইতেছে যক্ষরাজ। যক্ষরাজ তো একান্ত ভক্তোপাসক বৈশ্রাবণ কুবের—অন্যতম চতুর্মহারাজ। চতুর্মহারাজিকের নিম্নেই আবার তাহার স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে। উপরের ছবি দুইটিতে হারীতীর সকল কথা একেবারে পরিষ্কার হইয়া যায়।

কুবেরের বসিবার ভঙ্গীটী বিদেশী বলা হইয়াছে। ভারতীয় আসনেই এমন ভঙ্গী আছে। মূর্ত্তিটীকে কুবেররূপে জিয়াস্ বলা হইয়াছে। এই কুবের-হারীতী বা যক্ষ-তত্ত্ব যে অতি প্রাচীন, প্রাক্-বুদ্ধযুগেও সুবিদিত ছিল, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। স্মিথ স্বীকার করেন যে আসনের নীচে খোদা-মূর্ত্তি প্রাচীন জানপদ-শিল্পকলারই চিহ্ন, কিন্তু আসল যক্ষমূর্ত্তির বেলায় সে প্রশ্ন আর তুলেন না। ভারতের পূর্ব্বের সেই প্রাচীন কলার চিহ্ন পারখমের যক্ষে কি ইহার অনুপ্রেরণা মিলে না? বঙ্গের ভাস্কের বিশেষত্ব, এমন কি শিশুদিগের

খোনতার দেবতা

মূর্ত্তি, সমস্ত হারীতী-মূর্ত্তিই যে হেলেনীয় গঠন-পদ্ধতি-বিশিষ্ট, তাহা অস্বীকার করিবার দরকার নাই। তবু গান্ধার-মূর্ত্তি পাইলেই গ্রীক্ দেব-দেবীর সন্ধান করিতে হইবে এমন নিয়মের অর্থ দেখি না। বুদ্ধমূর্ত্তির কথায়, যোগী সিদ্ধার্থ-মূর্ত্তির কথায়, বলিয়াছি যে ভারতীয় শাস্ত্রের, ভারতীয় কথার সহিত পরিচয় তো অগভীর নয়—অভাব মাত্র ভারতীয় প্রাণের। যক্ষরাজের মূর্ত্তি, চির-প্রচলিত যক্ষমূর্ত্তিতেই সন্ধান পাওয়া যাইবে, গ্রীক্ দেবরাজে নহে।

এইবার হারীতীর অন্য একটী চিত্র দিতেছি। মনে হয় না হারীতী বিশেষ করিয়া ভারতীয় রূপ পাইতেছে? শিশু-সন্তানেই হারীতীর রূপ বুঝিতে হইবে—ঐরূপ অন্য কোন বৌদ্ধ দেবীর কথা জানি না। ক্রমে হারীতীর জন-

প্রিয়তা তাহাকে হিন্দু দেবী করিয়া তুলিল এবং এখন এই সেকালে হারীতী হিন্দু ও বৌদ্ধ সকলেরই অতি প্রিয় দেবী।

গান্ধার-শিল্পকলাকে একান্ত বৌদ্ধ-সংক্রান্ত বলিয়া বিশেষরূপে চিহ্নিত করিয়াছি। চারসদায়—হস্তনগরে একটী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে—তিন মাথা, তিন চক্ষু, ছয় হাত, হাতে ডমরু, ত্রিশূল ও কমণ্ডলু, পশ্চাতে একটী ষণ্ড। ইনি শিব তুলনায় বৌদ্ধচিহ্নের পরিমাণ যথেষ্ট কম, হিন্দুধর্ম্মের সংবাদও তো নহে। কনিষ্কের সহিত প্রথম খৃষ্টান সম্রাট্ কনষ্টান-টাইনের তুলনা চলে। উভয়ে সুবিধা বুঝিয়া দরকার দেখিয়া নূতন ধর্ম্মের পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কনিষ্কের বিরাট্ সাম্রাজ্য মধ্য এসিয়া পর্য্যন্ত পৌছাইয়াছিল। বহু বিভিন্ন জাতি, বহু বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার সাম্রাজ্যের অধিবাসী ছিল। তিনি তাহাদিগের প্রত্যেকেরই পক্ষপাতী

হারীতী

হইতে পারেন (ত্রিমূর্ত্তি-লোকেশ্বর হওয়াও অসম্ভব নয়)। কনিষ্ককে অশোকের সহিত তুলনা বড় অশোভন। অশোকের ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। কনিষ্কের নূতন ধর্ম্মাবলম্বনে রাজনৈতিক কারণ আছে। কনিষ্ক কানেষ্কি সত্যই কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাহার মুদ্রায় সর্ব্ব-ধর্ম্মের জয়জয়কার দেখিতে পাই। জৈত্রিক ইরাণীয় বা সেন্ট্রাল এসিয়ান্ ধর্ম্মেরই যেন প্রভাব বেশী এবং সেই ছিলেন। সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট রহিল। দীর্ঘলুপ্ত, অধুনা উদ্ধারকৃত সেন্ট্র্যাল এসিয়াটিক শিল্পকলার যদি পরিচয় গ্রহণ করি—কথাটা বেশ বুঝিতে পারিব। দিল্লীর সেন্ট্র্যাল এসিয়াটিক অ্যান্টিকুইটিজ্ জাদুঘরের চিত্রাবলীতে এত বিভিন্ন দেশীয় স্বতন্ত্র শিল্পকলার অস্তিত্ব দেখি যে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। গান্ধার-শিল্পের ঢের বেশী সত্তার পরিচয় পাই এইখানে—যেখানে স্থানীয় গান্ধার-শিল্পেও মিলে না। শক, মঙ্গো-

সীয়ান, পারগু, চীনা—প্রত্যেকেরই স্বাধীন সত্তার পরিচয় পাই। কনিষ্কের যুগকে বুঝিতে হইলে, এই কথাই বুঝিতে হইবে।

এইবার সাতখানি চিত্র দিতেছি—গান্ধার, গ্রীক (কম-বেশী), ভারতীয় (কম-বেশী) ও শক-হেলেনীয় (কম-বেশী) প্রভাব যে কেমন করিয়া স্থান পাইয়াছিল, তাহার পরিষ্কার পরিচয় এইখানে পাইব। এই তিনটী শ্রেণীর সন্মিক্ষণেরও চিহ্ন দেখিব। সিদিয়ান্ প্রভাব গান্ধার ও মথুরা শিল্পে যথেষ্ট। শকদিগের ভারত-আগমনের নির্দ্দিষ্ট তারিখের আলোচনার স্থান ইহা নহে, তবে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে তাহা আমাদিগের এই শিল্পকলাযুগের যথেষ্ট পূর্ব্বে এবং শক্‌দিগের ভারতীয় হইয়া যাইতে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল। বর্ত্তমানে শাকদ্বীপীর সন্ধান পাওয়া একটুও দুরূহ নয়। শাক্যরা শক্ ছিল বলিয়া মনে হইতে পারে। শাক্যদিগের যেখানে বিশেষ করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই দীঘ-নিকায়ের অম্বোষ্ঠসূত্রে, শাক্যদিগের এক একান্ত অসামান্য জাত্যাভিমানের পরিচয় পাই। অতি বিশিষ্ট জাতীয়তা-রক্ষার জন্য ভ্রাতা-ভগিনীর সংযোগ হইয়াছে; আর তাহার বিশেষ নির্ব্বিরোধ বাহবা দেওয়া হইয়াছে। এই চরম জাত্যাভিমানে শাক্যেরা তাহাদিগের সম্রাট্ কোশল রাজকে কন্যাদান করে নাই এবং তাহাতেই তাহাদিগের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটাইয়াছে। কোশলরাজের তো সারা উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃপতিবর্গের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল বলিয়া জানি। শকদিগের এই বিশিষ্ট জাতীয়তার পরিচয় যুগ-যুগান্তর ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি। মগ বা হূণদিগের ইতিহাস যদি চর্চ্চা করি, ভারতবর্ষে শক্-ইতিহাসের ধারার খবর পাই। আঙ্গীরস-ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণদিগের ইতিহাসও তাহাই। সুদূর দাক্ষিণাত্যে এই কালের কাছাকাছি নহপান-দিগের শকত্বের প্রকাশ্য পরিচয় অনুশাসনে পাই। ভারতবর্ষে সূর্য্য বা মিত্রোপাসনার ইতিহাস, শকদিগের ইতিহাস। ভবিষ্যপুরাণের বহ্মপর্ব্ব সুপ্রাচীন, আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। ভবিষ্যের ঐ পর্ব্ব ও শাম্ব ও বরাহপুরাণ হইতে আমরা পাই, কৃষ্ণপুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া মিত্রপূজায় আরোগ্যলাভ করেন—শাক্‌দ্বীপ হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়া সে পূজা সম্পন্ন করে। মগধ বা কিকটের উপর প্রাচীন আর্য্যদিগের বড় রাগ। ভবিষ্যপুরাণে পাই, জরথুষ্ট্র বেদের বিকৃত ব্যাখ্যা করেন। সেই জরথুষ্ট্রিয় মগ-ব্রাহ্মনদিগের নাম হইতে মগধ নাম এবং সে দেশ ঘৃণ্য বিবেচিত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। পালি 'মিলিন্দ প্রশ্ন' হইতে বুঝি, ঐ যুগে বিশাল 'শাকল' নগর সমৃদ্ধিতে অতুলন ছিল। সেই 'শাকল' নাম শক-সংযুক্ত। যাহা হউক, ইহা এক স্বতন্ত্র দীর্ঘ ইতিহাস, ইহার আলোচনা এইস্থানে সম্ভব নয়। শক-সংস্কৃতি কনিষ্কের রক্তে বহিতেছিল, তাহার রাজ্যের মধ্যস্থান গান্ধারে কুশান-যুগে শক্-প্রভাবের পরিচয় স্বাভাবিক। গান্ধার-শিল্পের বিভিন্ন অলঙ্কারে, কঠিন মুখভাবে, বিশিষ্ট গঠন ইত্যাদিতে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাই।

এইবার একটী অতি অপূর্ব্ব মূর্ত্তির চিত্র দেওয়া গেল। ইহাকে বলা হইয়াছে গ্রীক্‌দেবতা—হারপোক্রেটস্, নীরবতার দেবতা। বিশুদ্ধ প্যালাসএথেনীরও সন্ধান গান্ধারেও পাইয়াছি এথেনী ও এই মূর্ত্তি দুইখানি যাহা আমরা গান্ধার-শিল্পকলা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি তাহার গ্রীক্‌যুগের। আচ্ছা, ইহাকে কি শিশু-গৌতম বলা চলে না? গান্ধার-ভাস্কর্য্যশালায় তো শিশু-গৌতমের ছড়া-ছড়ি। কলিকাতা-জাদুঘরে, লোরিয়ান-টঙ্গাইয়ের লুম্বিনী-উদ্যান-দৃশ্যে (বুদ্ধের জন্ম-দৃশ্য) হইতে অজন্তার (১৬নং গুহায়) 'অসিত ও বুদ্ধ' চিত্রে শিশু গৌতমকে, বৌদ্ধ-শিল্পকলায় বারংবার দেখিতে পাই। সোয়াট হইতে প্রাপ্ত বর্ত্তমানে বার্লিন জাদুঘরে রক্ষিত একখানি 'রিলিফ' দেখি—তাহাতে প্রাচীর-অলঙ্কার-চিত্র হইতেছে ঢেউয়ের মত বাঁকা ফুলেরমালার প্রতি ঢেউয়ের মধ্যে একটী শিশু। অমরাবতীতে শিশু রাহুলকে 'পিতৃধন' ভিক্ষা করিতে দেখি। সোয়াটের কাফিরকোট্ হইতে প্রাপ্ত 'রিলিফে' (বৃটিশ জাদুঘর) বুদ্ধের সহচর কোন বোধিসত্ব হিসাবে একটী অপূর্ব্ব শিশুকে দেখি। আবার এই তো কৃষ্ণের যুগ। হেলিওডোরাসের লিপির তারিখ খৃঃ পূঃ ১৫০। সেইখানে তো কৃষ্ণ-বসুদেবের সর্ব্বজনপ্রিয়তার নির্ভুল নিদর্শন পাই! কিশোর কৃষ্ণের 'দুষ্ট হাসিটী' ইহার মুখে যেন লাগিয়া আছে। কুশান-শ্রেষ্ঠের ধর্ম্মসংক্রান্ত বাহ্য উদার-নীতির কথা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি, এমন মূর্ত্তি-সৃষ্টি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। পালি-পিটকে বসুদেবত্বের বিশেষ জন-প্রিয়তার কথা আছে। জৈনেরা খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতকেই

কৃষ্ণ-তন্ত্রকে একান্ত নিজেদের করিয়া লইয়াছিল। মূর্ত্তির হাতে কিছু ছিল নিশ্চয়, বাঁশী হওয়া সম্ভব।

এইবার যে মূর্ত্তিটার ছবি দিলাম, তাহা ভক্তিশ্রীতে শান্ত সমাহিত। শহর্‌-ই-বাললে প্রাপ্ত। বৌদ্ধ-সঙ্ঘের কোন পুন্যশ্লোকা গরীয়সী দাতা উপাসিকা হইবেন। গান্ধার-শিল্পী

যে ক্রমে কতই আইডিয়ালিষ্টিক্ (ভাবতন্ত্র) হইতেছিল, তাহার সম্যক্ পরিচয় পাই এইখানে; সে যে ক্রমশঃই ভারতীয় হইয়া উঠিতেছিল (মণ্ডনশিল্পে শক্-প্রভাবটুকু বাদ দিয়া) তাহা আর বুঝিতে বাকী থাকে না।

পূর্ব্ববারে গান্ধার-শিল্পকলায় প্রকৃতির স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছি। বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ভারতীয় শিল্পের প্রথম দিন হইতেই, প্রকৃতি ও মানুষের বিভিন্ন সত্তা বিবেচনা করা হয় নাই। উপনিষদের অখণ্ড সত্তার বাণী শিল্পীর অন্তরও ছাপাইয়া ফেলিয়াছে। প্রথমেই বলিয়াছিলাম 'ইয়ুরোপ প্রকৃতি বলিতে বুঝে প্রকৃতির বাহ্যরূপ, তাহার অন্তরের রস বড় নয়।' গ্রীসের নাগরিক সংস্কৃতিজ শিল্পকলা কখনও প্রকৃতির অন্তরের রূপের ধ্যানে সমাহিত হয় নাই। সেখানে প্রকৃতি ছিল উৎসবের দিনে, ছুটির দিনে—নগর হইতে বাহিরে পৌঁছিলে ক্ষণিকের সাথী মাত্র। মানুষের জীবনের সহিত সে মিশিয়া ছিল না।

আর এইদেশে ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল। তাই ভারুতে দেখি পুষ্পলতায় আর মানুষে এক হইয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে গান্ধারের একখানি অনবদ্য-সুন্দর শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের চিত্র দিলাম। ইহাতেই আমার কথা বুঝা যাইবে যে, গান্ধার-শিল্পীকে প্রকৃতি কেমন করিয়া স্পর্শ করিয়াছিল। শিল্পী প্রকৃতির অনুপ্রেরণার জন্য গ্রীক্‌-শিল্পের নিকট একটুও ঋণী নয়— সে শিল্পে প্রকৃতির কোনই অনুপ্রেরণা নাই; ইহা বিশুদ্ধ ভারতীয়।

৩

লীলা-কমল
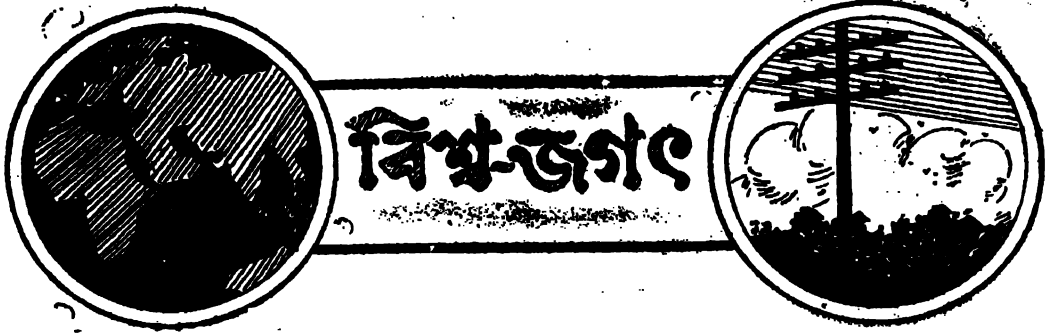
বিজ্ঞান

মার্কনির নূতন আবিষ্কার

বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক (মার্কনিকে) নিশ্চয়ই আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট নূতন করিয়া পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে না। সম্প্রতি তিনি ইতালিতে এক বৈজ্ঞানিক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে বেতার-তরঙ্গ (রেডিও-ওয়েভস্) যে বায়ু-তরঙ্গ ভেদ করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়িতে পারে এ সম্বন্ধে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যদি মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহে আমরা কোন দিন গমন করিতে পারি, তাহা হইলে সেই স্থান হইতে আমরা পৃথিবীতে বেতার-সাহায্যে সংবাদ পাঠাইতে পারিব।

আমরা এই বিষয়ের একখানি ছবি দিলাম।

অতিকায় বৈদ্যুতিক আলোক
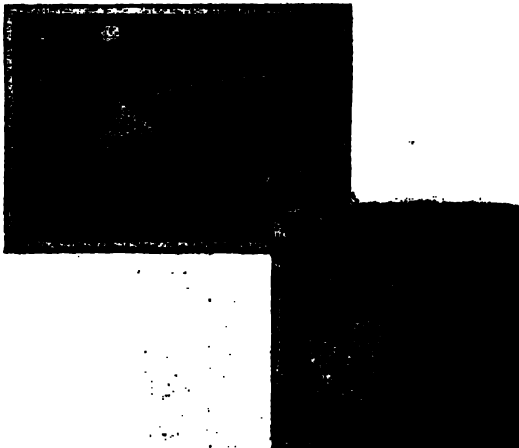
আমেরিকায় রাত্রিকালে বিমানপোতের পথ-প্রদর্শনের জন্য একপ্রকার উজ্জ্বল আলোক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই আলোর বাতিগুলি (ল্যাম্পস) দিন দিন উজ্জ্বলতায় অপরাপর বৈদ্যুতিক বাতিকে পরাস্ত করিতেছে। কেবল তাহাই নহে ইহাদের আয়তন সাধারণ বৈদ্যুতিক বাতি হইতে অতিরিক্ত রকমের বৃহৎ। আমরা এখানে এইরূপ একটী বাতির ছবি দিলাম। এই বাতিটী উজ্জ্বলতায় ১,০৭৫,০০০ বাতির সমকক্ষ এবং ইহা এরূপ বৃহৎ যে ইহার মধ্যে একজন ভদ্রমহিলা বসিয়া থাকিতে পারেন।

আমাদের উপরে ছবি দেখুন।

যন্ত্রে শ্বাস-গ্রহণ

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শাস্ত্রের নব নব যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনে যে মানব-সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে সে সম্বন্ধে আমরা বিশ্বজগতের পৃষ্ঠায় একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। এইবার আমরা সম্প্রতি আবিষ্কৃত এইরূপ একটী যন্ত্রের পরিচয় দিব।

যে সমস্ত রোগী হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্ব্বলতার জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে তাহাদের প্রাণরক্ষার জন্য এই যন্ত্রটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা নানারূপ সূক্ষ্ম কলকব্জার সমাবেশে গঠিত। রোগীকে যন্ত্রটীর উপর শয়ন করাইয়া দিয়া ঢাকনা দিয়া তাহার সমস্ত দেহটী ঢাকিয়া দেওয়া হয় এবং যন্ত্রের কল-কাঠি নাড়িলে রোগীর নিঃশ্বাস ক্রমশঃ সরল হইয়া আসে —রোগী নিরাময় হইয়া যায়। যন্ত্রটী দেখিতে একটু অদ্ভুত রকমের।

আমরা ইহার একখানি ছবি দিলাম।
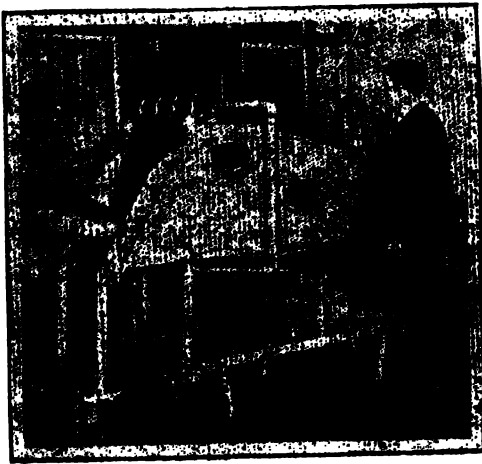
বিচিত্র ল্যাম্প-সেড

নিউ ইয়র্কের একজন ভদ্রমহিলা গত বৎসর বড়দিনের সময় আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে যে সমস্ত খৃষ্টমাস কার্ড পাইয়াছিলেন তাহা এক সঙ্গে জড় করিয়া একটি বিচিত্র ল্যাম্প-সেড তৈয়ারী করিয়াছেন। বন্ধুগণের কথা সর্ব্ব সময় স্মরণ রাখিবার জন্য এই ভদ্রমহিলা সেডটি তৈয়ারী করিয়াছেন।

আমরা ইহার একখানি ছবি দিলাম ইহা দেখিতে ভারী সুন্দর হইয়াছে।

যান-বাহনের ক্রম-বিকাশ

কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার একটী প্রদর্শনীতে কয়েকটী আধুনিক যানবাহনের প্রথম সংস্করণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। আমরা এখানে তাহার দু একটীর পরিচয় দিলাম।

আমাদের দেওয়া ছবিটীর উপরেরটীতে যে ছোট এঞ্জিনটী দেখা যাইবে তাহা ১৮৪০ খৃঃ গ্রানভিল্ হইতে প্যারিস্ ষ্টেশনে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হইত। এই ছবির পার্শ্বস্থিত দণ্ডায়মান আধুনিক এঞ্জিনটার সহিত তুলনা করিয়া পাঠক বিচার করুন! মধ্যে যে মোটরকারটা দেখা যাইতেছে উহা পৃথিবীর প্রথম মোটরকারগুলির মধ্যে অন্যতম। উহার গঠন-বৈশিষ্ট্য আধুনিক মোটারকার হইতে যে কত বিভিন্ন তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। ছবির নিম্নে যে সমস্ত সাইকেলগুলি দেখা যাইতেছে তাহা বাম দিক হইতে দেখিলে
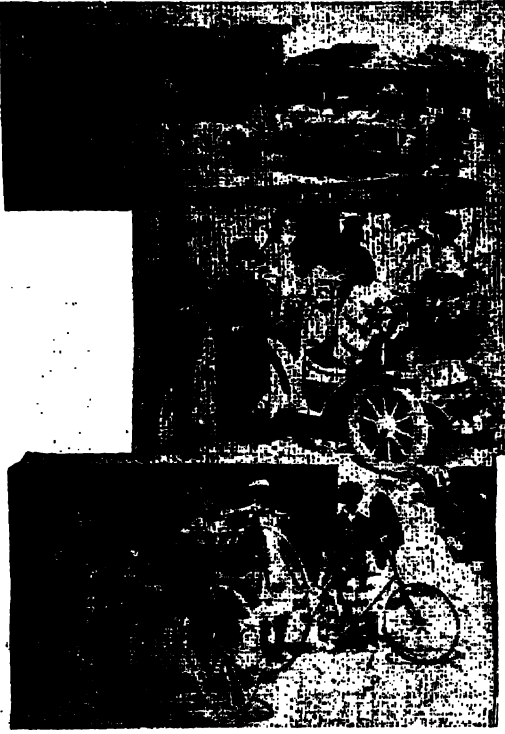
প্রথমটী ১৮৪০ খৃঃ, ২য়টি ১৮৬০ খৃঃ, ৩য়টি ১৮৯০ খৃঃ এবং ৪র্থটি ১৮৯২ খৃঃ ব্যবহৃত হইয়াছিল।

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা হাল্‌কা কাঠ :—

আমরা বলি হালকা যেন সোলা—সোলা অপেক্ষা হাল্‌কা কাঠজাতীয় জিনিস যে আছে তাহা আমরা জানিতাম না। আজ কিছুদিন হইল দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়াডর দেশের জঙ্গলে এক অদ্ভুত কাঠের আবিষ্কার হইয়াছে। সমপরিমাণ সোলার অর্দ্ধেক ভারি এই কাঠের নাম "বালসা"। এই 'বালসা' গাছ ৭০।৮০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হয় এবং দৈর্ঘ্যের ব্যাস ৩০ হইতে ৩৭ ইঞ্চি হইয়া থাকে। এই কাঠ আমাদের দেশের জাম, কাঁঠালের মত শক্ত অথচ ছুরি দিয়া কাটা চলে, আবার রবারের মত আঙ্গুলের চাপ দিয়া সঙ্কুচিত করা যায়। আজ বিশ বৎসর পূর্ব্বে একজন আমেরিকাবাসী নাবিক এই কাঠের সন্ধান পান—এই কাঠ এতদিন জীবন-রক্ষণ ভেলা ও উড়েজাহাজের ভিতরের পিঠ তৈয়ারীর ব্যবহারে লাগিতেছিল; বর্ত্তমানে ইহার আর এক গুণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরের আকাশচুম্বী এক প্রাসাদের পঞ্চবিংশতি তলে এক বিশাল রেশমের কারখানা ছিল, তার কল কারখানার শব্দে সেই বাড়ীর নিম্নতলবাসীরা অস্থির হইয়া পড়িলেন। রবার ও অন্য অনেক প্রকার জিনিস দিয়াও শব্দ যখন কিছুই কমিল না, তখন একজনের মাথায় এই 'বালসা' কাঠের কথা ওঠে। 'বালসা' কাঠে অলৌকিক ফল পাওয়া গিয়াছে, ঠিক নীচের তলার লোকেরাও আর শব্দের জন্য কোন অসুবিধাই ভোগ করেন না। এখন এই 'বালসা' কাঠ শব্দ ও তাপ-নিবারকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

শূন্যপথে নদীপার :—

ওয়েলেস্ দেশের নিউপোর্ট সহরের শূন্যপথে নদী পারাপারের অনুরূপ ব্যবস্থা ইউরোপের আর কোথাও নাই। যে প্রণালীতে ক্রেণ-এর সাহায্যে শূন্যপথে জাহাজে মাল বোঝাই ও সাজান হয় সেইভাবেই নিউপোর্টের নদীর উপর দিয়া মানুষ, মাল ও গাড়ীর পারাপার হইয়া থাকে।

ক্লান্তি পরিমাপক যন্ত্র :—

মানুষের ক্লান্তির লক্ষণ তাহার মুখে প্রকাশ পায় সত্য কিন্তু সে ক্লান্তি মাপিবার কথা এপর্য্যন্ত কেহ ভাবে নাই। বর্ত্তমানে আমেরিকার এক মোটরের চাকা ব্যবসায়ী তাহাদের কারখানার শ্রমিকদের ক্লান্তি মাপিবার এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহার শ্রমিকদের কে কোন কার্য্যের উপযোগী তাহাই নির্দ্ধারণ করিতেছেন। যন্ত্রটি দেখিতে কতকটা দেহের ভার মাপিবায় যন্ত্রের ন্যায়। দেহের ভার মাপিবার জন্য যেমন একটি পাটাতনে উপর দাঁড়াইলেই একটি কাঁটা ঘুরিয়া আমাদের ভার নির্ণয় করিয়া দেয়, তেমনই এই যন্ত্রের প্ল্যাটফারমের নীচে দুইটি কাঁটা আছে। ক্লান্ত শ্রমিক প্ল্যাটফরমের উপর দাঁড়াইলেই প্ল্যাটফরমটি নড়িতে থাকে। এবং কাটা দুইটি নড়িয়া তাহার ক্লান্তির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। দেহের সহিত মনের নিকট সম্বন্ধ, হয়ত এইরূপ যন্ত্রে মানসিক ক্লান্তিও কোনদিন ধরা পড়বে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা

জন্মাষ্টমী এবং বৃন্দাবন

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ

মুখবন্ধ
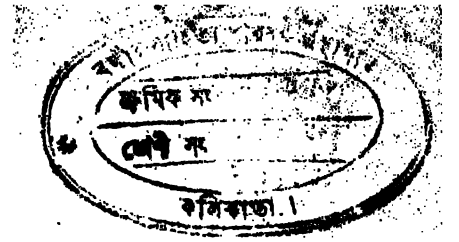
বাঙ্গালা সাহিত্যের উনবিংশ শতাব্দের সম্রাট্ ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র অবলম্বন করিয়া "কৃষ্ণচরিত্র" নামক অত্যুত্তম কাব্যরচনা করিয়া অমর হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলারহস্য মহাসমুদ্রের মতই অপরিমেয় এবং অসীম; এমন অগস্ত্য কেহই নাই, যে তিনি সে মহাসমুদ্র গণ্ডূষে পান করিবার শক্তি ধরেন। তাই, আমরাও সেই লীলা-সমুদ্রের এককণামাত্র লইয়া একটু আনন্দ উপভোগ করিতে চাই। প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমবাবুর লেখার এক-আধটু আলোচনাও করিতে হইবে। সাহিত্য-সম্রাটের উপর আমাদের অগাধ ভক্তি আছে বলিয়াই, তাঁহার কথা "লাখ কথার এক কথা" বলিয়া মানি বলিয়াই, তাঁহার লেখার আলোচনা করিতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা লইয়া আলোচনা করিতে গেলে, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ আলোচকের প্রধান অবলম্বন হইয়া থাকে। "হরিবংশ"কে স্বয়ং ব্যাসদেব এবং অন্যান্য প্রাচীনেরা মহাভারতেরই শেষ অংশ বলিয়া প্রচার এবং গ্রহণ করিয়াছেন, আমরাও তাঁহাদেরই পদানুবর্ত্তী; সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে হরিবংশের উল্লেখ করিতেছি না। তথাচ, একথা প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি যে হরিবংশই শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনার মূলশাস্ত্র, অন্যান্য গ্রন্থ হরিবংশকেই আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে। আমাদের মতে, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবত এই গ্রন্থ তিনখানির মধ্যে হরিবংশ আদিম, বিষ্ণুপুরাণ মধ্যম এবং শ্রীমদ্ভাগবত অন্ত্য; এমন কি শ্রীমদ্ভাগবতকে বিষ্ণুপুরাণের বিস্তৃততর এবং কাব্যাকারের সংস্করণ বলিতেও আমাদের আপত্তি নাই।

শ্রদ্ধাভাজন ৺চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাভারতকে প্রথম স্থান দিলেও হরিবংশকে সেস্থান দেন নাই, পরন্তু তিনি হরিবংশকে বিষ্ণুপুরাণ অপেক্ষা নবীন বলিয়াছেন। আমাদের মতে ৺বঙ্কিমবাবু মহাভারতের রচনাকাল, রচনারীতি এবং উহার মধ্যে প্রক্ষিপ্তাংশের বাহুল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাদের দ্বারা মোটের উপর মহাভারতের উপর বড় অবিচার হইয়াছে; হরিবংশের উপর এই অবিচারের মাত্রা আরও অনেক অধিক হইয়াছে।

"কৃষ্ণচরিত্র" পুস্তকের প্রথম খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদ এবং ষোড়শ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে যে, মহাভারতের অনুক্রমণিকা অধ্যায়ের শেষে "হরিবংশ" পর্ব্বের নাম উল্লিখিত হইলেও উহাতে কেবল "হরিবংশ ও ভবিষ্য-পর্ব্বের নাম আছে, বিষ্ণুপর্ব্বের নামমাত্র নাই" এবং এই কথার প্রমাণস্বরূপ মহাভারতের পর্ব্বাধ্যায় সংগ্রহ হইতে নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা—

"অষ্টাদশৈবমুক্তানি পর্ব্বাণ্যেতান্যশেষতঃ। ৩৭৮।
খিলেষু হরিবংশঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ প্রকীর্ত্তিম্।
দশশ্লোকসহস্রাণি বিংশশ্লোক-শতানি চ। ৩৭৯।
খিলেষু হরিবংশে চ সংখ্যাতানি মহর্ষিণা॥"

এই স্থান পড়িয়া আমাদের মনে হয়, যে, বঙ্কিমবাবু স্বয়ং "নজীর খুঁজিবার" পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া অন্য কাহারও উপর সেই কাজের ভার দিয়াছিলেন;—এখনও বড় বড় অনেক উকীল-ব্যারিষ্টাররা "জুনিয়ার"দিগের উপর সেই ভার দেন। যাহা হউক, এই ভার অযোগ্য-পাত্রের উপর পড়িয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় এবং তাহার ফলে মহাভারতের ঋষির উপর ঘোর অবিচার হইয়াছে। কেবলমাত্র, তাহাই নহে, যে সকল পাঠক বঙ্কিমের বাক্যকে ব্যাসদেবের বাণী অপেক্ষাও মূল্যবান মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উপরেও অবিচার হইয়াছে। কেবল হরিবংশের "বিষ্ণুপর্ব" নহে, "অনুগীতা"র উল্লেখও

পর্বসংগ্রহে দুইটী—বঙ্কিমবাবু বড় গলায় বলিয়া গিয়াছেন। অথচ প্রকৃত কথা তাহা নহে, আসল পর্বসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে :—

"ততোঽশ্বমেধিকং পর্ব সর্বপাপপ্রণাশনম্।
অনুগীতাততঃ পর্বজ্ঞেয়মধ্যাত্মবাচকম্ ॥ ৭৯ ॥

* * *

হরিবংশস্ততঃ পর্ব পুরাণং খিলসংজ্ঞিতম্।
বিষ্ণুপর্বশিশোশ্চর্যাবিষ্ণোঃ কংসবধস্তথা ॥ ৮২
ভবিষ্যপর্বচাপ্যুক্তং খিলেষেবাদ্ভুতং মহৎ।
এতৎ পর্বশতং পূর্ণং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা ॥ ৮৩ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই পর্বসংগ্রহ অধ্যায়ে শতপর্ব মহাভারতের প্রত্যেক পর্বের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হরিবংশের "হরিবংশ পর্ব, বিষ্ণুপর্ব এবং ভবিষ্যপর্ব" এই তিনটী পর্ব লইয়া মহাভারতের শতপর্ব পূর্ণ হইয়াছে। হরিবংশের মধ্যে "বিষ্ণুপর্ব"ই কৃষ্ণলীলা বর্ণনাত্মক পর্ব। যদি বঙ্কিমবাবু স্বয়ং দ্বিতীয় অধ্যায়টী পাঠ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই অবিচার করিতে হইত না।

যাহা হউক, বঙ্কিমবাবুর প্রতিজ্ঞা ছিল, "পর্বসংগ্রহে যাহার উল্লেখ পাওয়া যাইবে না তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে হইবে।" এখন দেখা গেল, পর্বসংগ্রহে "বিষ্ণুপর্বে"র উল্লেখ আছে এবং উহার শতপর্ব মহাভারতের একটী বিশেষ পর্ব তাহাও লিখিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার স্বকৃত সূত্রানুসারেই আর হরিবংশ এবং তদন্তর্গত বিষ্ণুপর্বকে "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া চলিবে না। তিনি ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং ডাক্তার হোরেস উইলসনের হরিবংশের আধুনিকত্ব-সম্বন্ধে মত তুলিয়া তাহার সমর্থন করিয়াছেন। ৺সিংহ মশায় এবং উইলসন সাহেব হরিবংশের "রচনাপ্রণালী ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা" অথবা "Internal evidence" বিচার করিয়া উক্ত গ্রন্থকে "আধুনিক" বলিয়া রায় দিয়াছেন; আমাদের এমত সাধ্য নাই যে আমরা কোন সংস্কৃত গ্রন্থের "রচনাপ্রণালী ও তাৎপর্য্য পর্যালোচনা" অথবা আভ্যন্তরীণ প্রমাণের বিচার করিয়া তাহার বয়স স্থির করিতে পারি। সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন, "হরিবংশের রচনাপ্রণালী ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন।" আমরা যে "বিচক্ষণ" নহি, তাহা স্বীকার করিতেছি। "আধ্যাত্মিক মর্মার্থের" মত "আভ্যন্তরীণ প্রমাণ" ও সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সহজবোধ্য নহে।

হরিবংশের সাধ্যমত কলঙ্কভঞ্জন করিবার পর, কোন গ্রন্থের মৌলিকতা বা প্রাচীনতা নির্দ্দেশের যে সূত্র বঙ্কিমবাবু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরাও তাহাই গ্রহণ করিয়া হরিবংশকে প্রথমস্থান, বিষ্ণুকে দ্বিতীয় স্থান এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণকে অন্তিম স্থান দিয়াছি। তাঁহার সূত্রটী এই—"স্থূলকথা এই যে, গ্রন্থে অমৌলিক অনৈসর্গিক, উপন্যাস (গল্প) ভাগ যত বাড়িয়াছে, সেই গ্রন্থ তত আধুনিক।" বঙ্কিমের এই সূত্র নির্দ্দেশে "তথাস্তু" বলিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। আমাদের বলিবার এবং বুঝিবার সুবিধার জন্য এই বিষয়টী প্রশ্নোত্তরক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রশ্ন

১। দেবকীর সহিত কংসের কি সম্বন্ধ?

উত্তর

১। বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণের মতে কংসের পিতা উগ্রসেন এবং দেবকীর পিতা দেবক সহদর, সুতরাং দেবকী কংসের খুড়তুতো ভগিনী। ব্যবহার দেখিয়া কংসকে দেবকীর অপেক্ষা বয়সে বড় বলিয়া মনে হয়। সাধারণ লোকেও কথকতা এবং যাত্রা-কীর্ত্তনাদি শুনিয়া দেবকীকে কংসের বয়ঃকনিষ্ঠা খুড়তুতো ভগিনী বলিয়াই জানেন।

কাশ্মীরের কবি (সময় আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দ) ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার "দশাবতার কাব্যে" দেবকীকে কংসের পিতৃস্বসা বা পিসী বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ তিনি কোথায় পাইলেন?

হরিবংশের বিভিন্ন স্থানে দুই প্রকার সম্বন্ধের কথাই লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে নারদ-বাক্যে দেবকীকে কংসের "লঘুস্বসা" বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিতেছেন, "অন্যেতু পিতৃস্বসেতি পাঠং প্রকল্প্য পিতৃসম্বন্ধিনী-স্বসা ব্যবহিত-

ভগিনীতি ব্যাচখ্যুঃ"। "স্বসা" অর্থে ছোট ভগিনী; নীলকণ্ঠ বলিতেছেন, "কোন কোন ব্যাখ্যাকার "পিতৃস্বসা" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়া "পিতার সম্বন্ধে স্বসা—দূরসম্পর্কের ভগিনী" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ক্ষেমেন্দ্র হরিবংশের "পিতৃস্বসা" পাঠ গ্রহণ করিয়া তাহার অর্থ "পিসী"—করিয়াছেন।

হরিবংশের উক্ত বিষ্ণুপর্ব্বের ২২শ অধ্যায়ের বসুদেবকে সম্বোধন করিয়া প্রদত্ত কংসের দীর্ঘ বক্তৃতায় বসুদেবকে "পিসীর স্বামী বা পিসে" এবং শ্রীকৃষ্ণবলরামকে "পিসীর পুত্র বা পিস্তুতো ভাই" বলা হইয়াছে যথা :—

"ইহ ত্বং জাতসংবৃদ্ধো মম পিত্রা বিবর্দ্ধিতঃ।
পিতৃস্বসুশ্চ মে ভর্ত্তা যদূনাং প্রথমো গুরুঃ ॥৭৯॥"

এবং অক্রূর সম্বোধনে,

"দ্রষ্টব্যৌ চ ময়াবশ্যং বালৌ তাবমরোপমৌ।
পিতৃস্বসুঃ সুতৌ মুখ্যৌ ব্রজবাসৌ বনেচরৌ ॥৯০॥"

নীলকণ্ঠ উভয় স্থানেই "পিতৃব্যসম্বন্ধিন্যা স্বসুঃ" করিয়া পাশ কাটাইয়াছেন; কিন্তু বসুদেবকে যেরূপ জরাজীর্ণ পলিতকেশ, বয়োবৃদ্ধ বলিয়া পুনঃ পুনঃ বর্ণিত করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি কংসের কনিষ্ঠা ভগিনীপতি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ঐ বিষ্ণুপর্ব্বের ৪র্থ অধ্যায়ে কংস-কর্ত্তৃক যশোদাকন্যার বধের চেষ্টা হইবার পর—কংস ব্যর্থপ্রযত্ন এবং অনুতপ্ত হইয়া দেবকীর নিকট স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যখন বলিলেন,—"দেবকি, আমি তোমার পায়ে আমার মাথা রাখিয়া ভিক্ষা চাহিতেছি, আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রাগ করিও না,"—তখন দেবকী "ঠিক মায়ের মত বাছা, উঠ, উঠ' এইরূপ বলিতে বলিতে কংসকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। দেবকীর সান্ত্বনাবাক্যে—কংসকে সম্বোধন করিয়া একবার "বৎস" এবং দুইবার "পুত্র" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এইস্থানে নীলকণ্ঠ "বৎসেতি সম্বোধনাৎ কংসাদিয়ং জ্যেষ্ঠেতি গম্যতে—'বৎস' এই সম্বোধন করায় কংস হইতে ইনি বয়সে বড় জানা যাইতেছে—"লিখিয়াছেন। তিনি প্রথম অধ্যায়ে যে "লঘুস্বসা" দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কি এসময়ে ভুলিয়া গিয়াছিলেন?

বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবৎ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, যে, কংস দেবকীর বিবাহের পর আত্মীয়তা এবং স্নেহবশতঃ নিজেই বরকন্যার রথের ঘোড়া হাঁকাইয়া আসিতেছিলেন এবং সেই সময়েই দৈববাণী হয়। যথা বিষ্ণুপুরাণে :—

"যামেতাং বহসে মূঢ় সহভর্ত্রা রথে স্থিতাম্।
অস্যাস্তবাষ্টমো গর্ভঃ প্রাণানপহরিষ্যতি ॥৮॥" প্রথম অধ্যায়, ৫ম অংশ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে—

"অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ ॥ ২৪॥" দশম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়। অর্থাৎ "রে মূর্খ, যাহাকে তুই আদর করিয়া রথে চাপাইয়া লইয়া যাইতেছিস্ তাহার অষ্টম গর্ভের পুত্র তোর প্রাণবধ করিবে।"

হরিবংশে—এই উপাখ্যান নাই। তথায় যাহা আছে তাহাতে কংস যে বসুদেব-দেবকীর বিবাহ নিজ চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না,—সে যেন তখন পুরাতন ব্যাপার হইয়া গিয়াছে।

আমাদের মত এই যে, হরিবংশে দেবকীকে কংসের পিসীই বলা হইয়াছে এবং তাহাই ঐতিহাসিক। পরে কোন কারণে সম্বন্ধের কথা বদলাইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে যদি কোন বিশেষজ্ঞ নূতন কোন সংবাদ দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা কৃতজ্ঞ হইব।

প্রশ্ন

২। কংসের মৃত্যু বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তি কি?

উত্তর

২। বিষ্ণুপুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা আছে, তাহা উপরে লিখিত হইয়াছে। হরিবংশে যাহা আছে, তাহা লিখিতেছি :—

একদিন নারদ ঋষি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া মথুরা নগরে কংস রাজার সভায় উপস্থিত হইলেন এবং কংসকে সংবাদ দিলেন যে, দেবগণ ব্রহ্মার সভায় বসিয়া কংসকে বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির সহিত মারিয়া ফেলিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছেন এবং সেই ষড়যন্ত্রের ফলে স্বয়ং বিষ্ণুই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। নারদ আরও বলিলেন,—"এই যে তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী দেবকী মথুরায় রহিয়াছেন, তাঁহারই অষ্টম গর্ভ তোমার মৃত্যু ঘটাইবেন। আমি তোমাকে বড়ই ভালবাসি, তাই এই সংবাদ তোমাকে দিবার জন্য আসিয়াছি। তুমি দেবকীর গর্ভস্থ

(শিশু) বিনষ্ট করিবার চেষ্টা কর এবং সমস্ত প্রিয়বস্তু ভোগ কর, তোমার মঙ্গল হউক ; এই আমি চলিলাম।" (বিষ্ণু-পর্ব্ব, প্রথম অধ্যায়, ৭ম হইতে ২০শ শ্লোক)

প্রশ্ন

৩। দেবকী এবং বসুদেবের প্রতি কংস কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন ? এবং আত্মরক্ষার জন্যই বা কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ?

উত্তর

৩। বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণের মতে কংস পূর্ব্বলিখিত দৈব্যবাণী শুনিয়াই দেবকীকে তৎক্ষণাৎ কাটিবার জন্য কোষ হইতে খড়্গ বাহির করিলেন এবং যখন তিনি দেবকীকে কাটিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন, তখন বসুদেব কংসকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তুমি দেবকীকে কাটিও না, ইহার জন্য তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই, যে জন্য তুমি ভয় করিতেছ, আমি ইহার গর্ভের সমুদায় শিশুকেই তোমার হাতে সঁপিয়া দিব।" বসুদেবের কথায় কংসও "তাহাই হইবে" বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং দেবকীকে লইয়া বসুদেব গৃহে প্রবেশ করিলেন। (বিষ্ণু-পুরাণ' ৫ম অংশ, প্রথম অধ্যায়, ২৫শ—৫৫তম শ্লোক)

ইহার পর, ভাগবতে আছে যে, যথাকালে দেবকীর প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে সত্যপ্রতিজ্ঞ বসুদেব নবজাত শিশুটীকে কংসের হাতে আনিয়া দিলেন। কংস বসুদেবের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, "আপনি নবকুমারকে লইয়া যাউন, ইহা হইতে আমার ভয় নাই, আপনার অষ্টম-পুত্র আমার মৃত্যুর কারণ হইবেন, এই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" বসুদেব ছেলেটীকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন। (শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়, ৫৭তম হইতে ৬১তম শ্লোক) বসুদেব এইরূপে প্রথম পুত্রকে লইয়া ফিরিয়া গেলে নারদ আসিয়া কংসকে সাবধান করিয়া দিলেন যে বসুদেব, নন্দাদি ব্রজগোপ, রোহিণী, দেবকী এবং ব্রজগোপীগণ সকলেই দেবদেবীর অবতার কংসকে বিনাশ-উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন। কংস এই কথা শুনিয়া বসুদেব এবং দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গৃহে রাখিলেন এবং তাঁহাদের শিশুগুলিকে জন্মিবামাত্রই মারিয়া ফেলিতে লাগিলেন। (ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়, ৬২তম হইতে ৭৩৭ম পর্য্যন্ত) বিষ্ণুপুরাণে, এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে দেবকী, এবং বসুদেবকে নিগ্রহ করার কথা ৫ম অংশ ৪র্থ অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকে পাওয়া যায়।

হরিবংশের উপাখ্যান বেশ স্বাভাবিক এবং সেকালের রাজনীতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত। নারদের মুখে নিজের মৃত্যুর আশঙ্কার কথা জানিতে পারিয়াই কংস তাঁহার হিতার্থী সচিবগণকে আদেশ দিলেন, "আপনারা দেবকীর শিশুহত্যা বিষয়ে যত্ন করিতে থাকুন। প্রথম হইতে সমস্ত গর্ভজাত শিশুকেই বধ করিতে হইবে ; যেহেতু যেখানে আপনাদের সন্দেহ থাকে, সেই সন্দেহকে মূল হইতেই বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। গুপ্তচরের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত অবস্থায় দেবকী বিশ্বস্তচিত্তে গৃহে থাকুন, তিনি প্রকাশ্যে স্বাধীনভাবেই বিচরণ করুন, কিন্তু গর্ভসময়ে সাবধানতা লইতে হইবে। আমার পরিচারিকা নারীরা দেবকীর মাসিক স্ত্রীধর্ম্মের সময় হইতে কয় মাস হয়, গণিয়া রাখুক, তাহা হইলে, প্রসবকাল আমরাই জানিতে পারিব। অন্তঃপুররক্ষক যণ্ডগণ (খোজা) এবং অন্তঃপুররক্ষিণী নারীগণ দিবারাত্রি অতি সতর্কতার সহিত স্ত্রীজনসংকুল অন্তঃপুরে বসুদেবের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবে, অথচ তাঁহাকে জানিতে দিবেন না যে তিনি নজরবন্দী আছেন।" "এইরূপে বাহ্যতঃ 'জামাই আদরে' কিন্তু প্রকৃত বন্দিরূপে বসুদেবকে রাজ-অন্দরে রাখা হইল।

(হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ২য় অধ্যায়, ১ম হইতে ৫ম শ্লোক)

প্রশ্ন

৪। কয় মাস গর্ভধারণ করার পর দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন ?

উত্তর

৪। বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেখিতে পাই নাই ; কিন্তু হরিবংশে পাইয়াছি যে, দেবকী এবং যশোদা উভয়েই অসম্পূর্ণ গর্ভকালে, অষ্টমমাসে শ্রীকৃষ্ণ এবং যোগমায়াকে প্রসব করিয়াছিলেন। ভগবান্ যোগমায়াকে এই বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "আমরা উভয়েই ঠিক অষ্টম মাসে জন্মগ্রহণ করিব," (বিষ্ণুপর্ব্ব, ২য় অধ্যায় ৩৭শ (শ্লোক) এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে

উভয়েই ঠিক অষ্টম মাসে, অসম্পূর্ণ গর্ভকালে জন্মিয়াছিলেন। (বিষ্ণুপর্ব্ব ৪র্থ অধ্যায়, ১১শ শ্লোক)

প্রশ্ন

৫। কোন মাসে, কোন তিথিতে; কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং যোগমায়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?

উত্তর

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবতে মাস, তিথির উল্লেখ নাই, কেবলমাত্র "নিশীথে তমউদ্ভূতে—অন্ধকারময় অর্দ্ধরাত্রে" শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা আছে। (শ্রীমদ্‌ভাগবত,) ১০ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায় ৮ম শ্লোক) হরিবংশে মাসের উল্লেখ নাই, যোগমায়া নবমী তিথি পড়িলেই, এবং উভয়েই কৃষ্ণপক্ষের অর্দ্ধরাত্রে, অভিজিৎ নক্ষত্রে, বিজয় মুহূর্ত্তে জয়ন্তী নামক রাত্রিতে জন্ম গ্রহণ করার কথা আছে। (বিষ্ণুপর্ব্ব, ২য় অধ্যায়, ৩৫শ, ৩৬শ এবং ৪র্থ অধ্যায়, ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোক) বিষ্ণুপুরাণে, বর্ষাকালে শ্রাবণমাসে, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ এবং নবমী তিথি পড়িলে যোগমায়া অর্দ্ধরাত্রে জন্মিয়া ছিলেন, লিখিত আছে। (বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ, ১ম অধ্যায়, ৭৮তম শ্লোক, এবং তৃতীয় অধ্যায়, ৭ম শ্লোক)

প্রশ্ন

৬। শ্রীকৃষ্ণ এবং যোগমায়া যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন আকাশের অবস্থা কিরূপ ছিল?

উত্তর

৬। বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং খুব বৃষ্টি পড়িতেছিল; (বিষ্ণুপুরাণ ৫ম অংশ তৃতীয় অধ্যায়, ১৭শ শ্লোক, শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়। ৫০ এবং ৫১তম শ্লোক); কিন্তু হরিবংশের মতে "সেই সময়ে মঙ্গলময় বায়ু বহিতে লাগিল, ধূলি প্রশান্ত হইয়া গেল এবং জ্যোতিষ্ক (নক্ষত্র, গণ অতিশয় প্রকাশ পাইতে লাগিল" (সুতরাং আকাশের অবস্থা পরিষ্কৃত ছিল)। (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৪র্থ অধ্যায় ১৬শ শ্লোক)

প্রশ্ন

৭। বসুদেব নবজাত শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া নন্দালয়ে যখন রাখিতে যান, তখন তাঁহাকে যমুনা পার হইতে হইয়াছিল কি না?

উত্তর

৭। হরিবংশের মতে বসুদেবকে যমুনা নদী পার হইতে হয় নাই (বিষ্ণুপর্ব্ব ৪র্থ অধ্যায়, ২৪শ হইতে ২৬শ শ্লোক); কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবতের মতে তাঁহাকে যমুনা পার হইতে হইয়াছিল। (বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ, তৃতীয় অধ্যায় ১৮শ শ্লোক এবং ভাগবৎ, ১০ম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়ের ৫১ তম শ্লোক।)

প্রশ্ন

৮। বসুদেব যেস্থানে নন্দপত্নী যশোদাকে সদ্যঃপ্রসূতাবস্থায় পাইয়া ছেলে এবং মেয়ে বদলাবদলি করিলেন, সে স্থান কোথায়?

উত্তর

৮। হরিবংশের মতে সেই স্থান মথুরা নগরের নিকটে যমুনা নদীর যে পারে রাজধানী মথুরা, সেই পারেই অবস্থিত ছিল। (বিষ্ণুপর্ব্ব, ৫ম অধ্যায়) বিষ্ণুপুরাণের মতে, সেই স্থান মথুরা নগরের নিকটে, কিন্তু যমুনার অপর পারে, যমুনার তীরেই অবস্থিত ছিল; নন্দ প্রভৃতি গোপবৃদ্ধগণ কংসের প্রাপ্য বার্ষিক কর প্রদানের উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক গাড়ী ডুলি ইত্যাদি লইয়া যমুনার অপর পারে আসিয়া নদীর তটেই শিবির (আড্ডা) সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই শিবিরেই যশোদাকে সদ্যঃ প্রসূতা অবস্থায় পাইয়া বসুদেব ছেলেটীকে রাখিয়া মেয়েটীকে লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। (৫ম অংশ, ৩য় অধ্যায়, ১৯শ এবং ২১শ শ্লোক) শ্রীমদ্‌ভাগবতে ঠিক স্থান নির্দ্দেশ নাই, তবে যমুনা পার হইয়া অধিক দূরে নহে; যেহেতু তখনই বসুদেব নিদ্রিতা যশোদার কোলে ছেলেটি রাখিয়া মেয়েটি লইয়া আসিয়া নিজের ঘরে আসিলেন এবং উহাকে দেবকীর বিছানায় শোয়াইয়া নিজে "ভালমানুষটীর মত" পায়ে শিকল পরিয়া শুইয়া পড়িলেন। (৫২তম এবং ৫৩ তম শ্লোক, ৩য় অধ্যায়, ১০ম স্কন্ধ) বাঙ্গালী গোস্বামী ঠাকুরেরা "মহাবন" নামক ক্ষুদ্র একটী নগরে নন্দগোপের গৃহ ছিল এবং তথায় এই ঘটনা হইয়াছিল বলেন এবং ভক্তদিগের ভক্তির প্রস্রবণ ছুটাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে যশোদার শয়ন গৃহ, নবজাত শ্রীকৃষ্ণের দোলা প্রভৃতি পবিত্র চিহ্ন হুবহু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই "মহাবন" নামক ছোট শহরটি যমুনার পূর্ব্বপারে (মথুরা যমুনার পশ্চিম পারে অবস্থিত) এবং মথুরা নগর হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। যমুনার অপেক্ষাকৃত নিকটে মথুরা হইতে ৪ মাইল দূরে "গোকুল" নামে আর একটী ছোট শহর আছে। নাম "গোকুল" হইলেও এখানে শ্রীকৃষ্ণের লীলার কোন স্মৃতি চিহ্ন নাই। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের অপেক্ষা পুরাতন সময়ের কোন মন্দির "মহাবন" অথবা "গোকুল" শহরে নাই। বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের গুরুস্থান হওয়ার জন্য সম্প্রতি ইহার মর্য্যাদা বাড়িয়াছে। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মামুদ (গজনীর) মথুরা এবং মহাবন উভয় নগরেরই ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন (মথুরা জিলার গেজেটিয়ার)। হরিবংশের প্রমাণ গ্রহণ করিলে, "মহাবন" কিংবা "গোকুল" উভয়ের মধ্যে কোন স্থানেই বসুদেব ছেলেমেয়ে বদল করেন নাই, পরন্তু সে স্থান মথুরা নগরেরই উপকণ্ঠে ছিল, তাহা আগেই বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন

৯। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর তাঁহার এবং যোগমায়ার প্রভাবে বসুদেব দেবকীর কারাগারের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া যাওয়া, রক্ষিবর্গের নিদ্রিত হইয়া পড়া, বসুদেবের পায়ের শিকল খুলিয়া পড়া, ঘোর বর্ষায় সহস্রশীর্ষ শেষনাগ ফণা ছত্র দ্বারা বসুদেব এবং তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশুকে রক্ষা করা এবং বর্ষার অজস্র বারিপাতে স্ফীতকায়া তরঙ্গসঙ্কুলা যমুনার জল বসুদেবের জানুর উর্দ্ধে উঠিতে না পারা,—ইত্যাকার অলৌকিক ঘটনা পরম্পরার (miracles) কোন পৌরাণিক প্রমাণ আছে কি না?

উত্তর

৯। হরিবংশের মতে, উল্লিখিত অলৌকিক ঘটনাগুলির একটীও ঘটে নাই এবং ঘটিবার কারণও নাই। কারণ (১) বসুদেব-দেবকী শৃঙ্খলাবদ্ধ বা কারারুদ্ধ ছিলেন না, গুপ্তভাবে নজর বন্দী ছিলেন মাত্র; তাই, শৃঙ্খল-মোচন, রুদ্ধদ্বার মুক্ত হওয়া এবং রক্ষিবর্গের নিদ্রিত হওয়ার প্রয়োজনও ছিল না; (২) সে রাত্রিতে বৃষ্টিই হয় নাই, এবং বসুদেবকে যমুনা পার হইতেই হয় নাই; সুতরাং উল্লিখিত অলৌকিক ঘটনা,—অর্থাৎ শেষনাগের ফণাবিস্তার এবং যমুনা নদীর আত্মসংকোচ করার আবশ্যকতা ছিল না। অপর পক্ষে, বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের মধ্যে উল্লিখিত সবগুলি অলৌকিক ঘটনাই ঘটয়াছিল। (বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ তৃতীয় অধ্যায় ১৫শ হইতে ২৩শ শ্লোক এবং ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায় ৪৮শ হইতে ৫৩তম শ্লোক) এস্থলে আরও একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, দেবকীর অসম্পূর্ণ গর্ভকালে, অষ্টম মাসে, হঠাৎ পুত্র জন্ম হওয়ায়, কংসের নিযুক্ত গুপ্তরক্ষীরা ও এই অকাল প্রসবের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সুতরাং নজরবন্দীটা ও তেমন কড়া গোছের ছিল না। গর্ভের নবম মাস গত হইলে, বোধ হয় পাহারার একটু অধিক কড়াকড়ি হইত এবং বসুদেবকে একটু বিপদে পড়িতে হইত। তবে সকলযুগে, সকল সময়েই, অর্থের অতি প্রভাবশালিনী মায়া থাকে, যাহার মাহাত্ম্যে অতি সযত্নরক্ষিত দুর্গ বা কারাগারের দ্বার ও খুলিয়া যায়। পুরাণকারেরা অবশ্য এমন নির্ভাজ গদ্যময়ী (Prosaic) বর্ণনা দ্বারা তাঁহাদের কাব্যরস মাটি করিবেন, এরূপ দুরাশা কেহই করিবেন না। পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহাদের সেরূপ গদ্যময়ী রুচি থাকে, তাঁহারা সেটাও ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

প্রশ্ন

১০। দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান জাত হইলে, সে সংবাদ কংস কেমন করিয়া পাইলেন?

উত্তর

১০। হরিবংশের মতে, "বসুদেব স্বয়ং 'সুন্দরী কন্যা জন্মিয়াছে' এই সংবাদ উগ্রসেনপুত্র কংসকে নিবেদন করিলেন।" (বিষ্ণুপর্ব্ব, ৪র্থ অধ্যায়, ২৮শ শ্লোক) বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত উভয়েরই মতে, বসুদেব যশোদার কন্যাকে আনিয়া দেবকীর শয্যার উপর রাখিবার পর "নবজাত শিশুর ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইয়া রক্ষিবর্গ তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া কংসকে দেবকীর সন্তান হওয়ার সংবাদ জানাইল।" (বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ, তৃতীয় অধ্যায়, ২৪শ শ্লোক; ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম এবং ২য় শ্লোক)

প্রশ্ন

১১। কংস উক্ত সংবাদ শুনিবার পর কি করিলেন এবং কি ঘটনা তাহার পর ঘটিল ?

১১। এইবার, সমস্ত শাস্ত্রের মতেই একটী অত্যাশ্চর্য্যময়, অনির্ব্বচনীয় দৈব মহিমায় পরিপূর্ণ ব্যাপার ঘটিল। বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই ব্যাপার অনেকটা সংক্ষিপ্তভাবে, এবং হরিবংশে অধিকতর বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে, তিনখানি পুঁথির লিখিত বিবরণ লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণের কথা! "কংস শীঘ্র দেবকীর গৃহে আসিয়া সদ্যোজাতা বালিকাকে গ্রহণ করিলেন, দেবকী গদ্‌গদকণ্ঠে 'আহা, ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও', বলিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। কংস বালিকাকে এক শিলার উপর আছাড় মারিতে গেলেন কিন্তু নিক্ষিপ্ত হইয়াও তিনি শিলার উপর পড়িলেন না, আকাশেই রহিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্রেশোভিতা অষ্টভুজা মহতী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং ক্রুদ্ধা হইয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে কংসকে বলিলেন, 'রে কংস, আমাকে শিলায় আছাড় মারিয়া কি হইবে ? যিনি তোমাকে বধ করিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন ; তিনি দেবগণের সর্ব্বস্বস্বরূপ, পুরাকালেও তিনি তোমার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন।' দিব্যমাল্য, দিব্যগন্ধ এবং দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃতা দেবী এই কথা বলিয়া, কংসের চক্ষুর সম্মুখেই সিদ্ধগণের দ্বারা সংস্তুতা হইতে হইতে আকাশমার্গ দিয়া চলিয়া গেলেন।" (বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ, ৩য় অধ্যায়, ২৫শ হইতে ২৯শ শ্লোক।)

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমদ্‌ভাগবতের আখ্যান। "কংস তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া, 'ইনিই আমার মৃত্যু' এই ভাবিয়া বিহ্বলচিত্তে, স্খলিতপদে, মুক্তকেশে, শীঘ্রই সূতিকা গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃপার পাত্রী দেবী দেবকী করুণস্বরে ভ্রাতাকে বলিলেন! 'হে কল্যাণ, এটি তোমার স্নুষা, * এটি মেয়ে, ইহাকে মারা তোমার উচিত নহে। † ভাই, দৈব-প্রেরিত হইয়া তুমি অগ্নিতুল্য আমার অনেকগুলি শিশুকে মারিয়াছ, একটি কন্যা আমাকে দাও। হে প্রভো, আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী, আমি পুত্রহীনা, বড়ই দুঃখিনী ; ভাই, হতভাগিনীকে এই শেষ সন্ততিটি তোমার দেওয়া উচিত।' শ্রীশুক বলিলেন, কন্যাকে দুই হস্তের দ্বারা বুকের উপর লুকাইয়া নিতান্ত দুঃখিনীর মত কাঁদিতে কাঁদিতে দেবকী শিশুটির প্রাণভিক্ষা করিলেও সেই খল তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে তাঁহার হাত হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইল। স্বার্থবশে স্নেহলেশশূন্য কংস সদ্যোজাতা সেই ভাগিনেয়ীর দুই পা ধরিয়া শিলার উপর তাঁহাকে আছাড় দিলেন। বিষ্ণুর কনিষ্ঠা সেই দেবী, কংসের হস্ত হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তখনই অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত অষ্টভুজা মূর্ত্তিতে আকাশে উঠিলেন, লোকে দেখিল। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ দিব্য বস্ত্র, মাল্য, চন্দন এবং রত্নাভরণে ভূষিত হইল এবং তাঁহার হস্তসমূহে ধনুঃ, শূল, বাণ, চর্ম্ম, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র এবং গদা শোভা পাইতে লাগিল এবং তিনি সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, অপ্‌সরঃ কিন্নর এবং উরগ প্রভৃতির দ্বারা নানা উপহারে পূজিতা এবং সংস্তুতা হইতে হইতে বলিলেন, 'রে মূর্খ, আমাকে মারিয়া কি হইবে ? যিনি তোমার মৃত্যুর কর্ত্তা, তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—তিনি তোমার পূর্ব শত্রু ; নিরপরাধ যাহারা, তাহাদিগকে বৃথা হিংসা করিও না।' ভগবতী মায়াদেবী কংসকে এই কথা বলিয়া পৃথিবীতে নানাস্থানে নানা-নামে বিরাজিত হইলেন।" (১০ম স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়, ৩য় হইতে ১৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত)

এই যশোদা-কন্যা যোগমায়া আদ্যাশক্তি ভগবতী ; মায়া, সন্ধ্যা, নিদ্রা প্রভৃতি নামে তাঁহাকে পরিচিত করা হইয়া থাকে। কংস-বিনাশের নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণু স্বীকৃত হইয়া তাঁহার শক্তি যোগমায়া অথবা নিদ্রাকে কতকগুলি উপদেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং যাহা যাহা পরে হইবে, সকলই তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনিই যে ভূতি, সন্নতি, ক্ষান্তি, কান্তি, দ্যৌঃ, পৃথিবী, ধৃতি, লজ্জা, পুষ্টি, আর্য্যা, দুর্গা, বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রা, ভদ্রকালী, ক্ষেমদা, ভাগ্যদা ইত্যাদি নানা নামে, নানা রূপে, নানা

* "স্নুষা" শব্দের অর্থ পুত্রবধূ। সে কালের সমাজে দেবকীর কন্যার সহিত কংসের পুত্রের বিবাহ চলিতে পারিত। অর্জ্জুন মাতুলকন্যা সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছেন। ৺ গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী তাঁহার "Hindu Law" পুস্তকের ১১১ পৃষ্ঠায় এই ব্যবহারের অনুকূলে বৈদিক নজীর তুলিয়াছেন।

† স্ত্রীবধ সর্ব্বাবস্থাতেই নিষিদ্ধ।

স্থানে, সুরা এবং মাংস প্রভৃতি উপহার ও বহুবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন, তিনিই শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যের বিনাশকারিণী এবং ভক্তের সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়িনী,—তাহাও ভগবান্ তৎকালে বলিয়াছিলেন। এই ভগবানের ভবিষ্যদ্‌বাণী ও বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ ভাগবতে ও বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শুধু দেবীর পূজার উপকরণ 'ধূপ, উপহার এবং বলি প্রভৃতি' লিখিত হইয়াছে; সুরা, মাংস, ভক্ষ্যাদির কথা স্পষ্ট বলা হয় নাই। (বিষ্ণু পুরাণ, ৫ম অংশ, ১ম অধ্যায়, ৭৫ তম হইতে ৮৭ তম শ্লোক এবং ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়, ৭ম হইতে ১২শ শ্লোক)

হরিবংশে এই ব্যাপার বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তথায় নিদ্রার প্রতি ভগবানের ভবিষ্যদ্‌বাণীর সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :—"তুমি আমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিলে, আমি তোমাকে অনুগ্রহ করিব, যাহাতে পৃথিবীতে তোমার প্রভাব আমার সমান হইবে, এবং তুমি সমস্ত লোকের পূজনীয়া দেবী হইবে। নন্দগোপের প্রিয়তমা পত্নী যশোদার গর্ভে তুমি জন্মগ্রহণ করিবে, আমি বসুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভে জন্মিব; উভয়ের জন্ম একরাত্রিতে, প্রায় তুল্য কালেই হইবে। বসুদেব আমাকে আনিয়া যশোদার শয্যায় রাখিয়া তোমাকে লইয়া দেবকীর শয্যায় রাখিবেন। কংস আসিয়া তোমার পা ধরিয়া শিলার উপরে আছাড় মারিবে। কিন্তু তুমি মুক্তি পাইয়া আকাশে চিরস্থায়ী স্থান পাইবে। তোমার রূপ আমার মত কৃষ্ণ হইবে কিন্তু তোমার মুখ বলরামের মত গৌর হইবে, তোমার বাহু আমার বাহুর মত হইবে। তোমার হস্তে সুনির্ম্মল শতদল, সুরাপূর্ণ পাত্র, সুবর্ণের মুষ্টি (হাতল)-যুক্ত খড়্গ এবং উন্নত ত্রিশূল শোভা পাইবে। নীলবর্ণের কৌশেয় বস্ত্র এবং পীতবর্ণের উত্তরীয় অঙ্গে এবং শাণিত শূলের মত সমুজ্জল মুক্তামালা বক্ষে শোভা পাইবে। দুই কর্ণ দিব্য কুণ্ডলযুগ্মে বিভূষিত এবং চন্দ্র অপেক্ষা ও সুন্দরতর মুখের দ্বারা তুমি বিরাজিত হইবে; বিচিত্র শোভাময় কবরী-বন্ধের উপর মুকুট শোভা পাইবে। ভীষণ ভুজঙ্গের মত ভুজ সমূহ দ্বারা দশদিক ভূষিত করিবে। ময়ূরপুচ্ছ-বিনির্মিত উচ্চ ধ্বজ এবং ময়ূরপুচ্ছ সংঘটিত অঙ্গদ (অনন্ত) দ্বারা শোভা পাইবে। ঘোরতর ভূতগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া এবং কৌমারব্রত গ্রহণ করিয়া আমার আদেশে তুমি স্বর্গে যাইবে। তথায় ইন্দ্র তোমাকে ভগিনীরূপে গ্রহণ করিয়া এবং দিব্য অভিষেকের দ্বারা পূজা করিয়া তোমাকে দেবতাগণের অধিকার প্রদান করিবেন। ইন্দ্রই তোমাকে নগশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যের উপর চিরস্থায়ী স্থান প্রদান করিবেন। তাহার পর তুমি সকলের প্রার্থনা পূর্ণকারিণী এবং ইচ্ছামত রূপধারিণী হইয়া ত্রিভুবনে বিচরণ করিবে। সেই বিন্ধ্যপর্ব্বতে তুমি পর্ব্বতবাসী শুম্ভ-নিশুম্ভ দানব-দ্বয়ের তাহাদের সহায়কগণের সহিত বিনাশ করিবে। ভূতগণ তোমার অনুচারী হইবে এবং মদ্যমাংস বলি তোমার প্রিয় হইবে। নবমী তিথিতে তুমি পশুবলি সহিত পূজা পাইবে। আমার প্রভাব যাহারা অবগত আছে, এরূপ যে সকল মানুষ তোমাকে প্রণাম করিবে, তাহাদিগের পক্ষে ধন অথবা পুত্র কিছুই দুর্লভ হইবে না। নির্জ্জন মরুময় ভূমিতে অবসন্ন, মহাসাগরে নিমগ্ন কিংবা দস্যুগণের দ্বারা বিপন্ন মানবগণের তুমিই পরমা গতি হইবে। যে ব্যক্তি তোমাকে এই (বক্ষ্যমাণ) স্তোত্রের দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে, তাহার পক্ষে আমি কখনও অপ্রাপ্য হইব না কিংবা সে ও কখনও আমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবে না।" (বিষ্ণুপর্ব্ব, ২য় অধ্যায়, ২৭শ শ্লোক হইতে ৫৫ম শ্লোক) ইহার পর চতুর্থ অধ্যায়ে বিখ্যাত আর্য্যাস্তব বর্ণিত হইয়াছে।

যথাকালে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইল। কংস বসুদেবের মুখে কন্যা জন্মের কথা শুনিয়াই রক্ষিবর্গের সহিত দৌড়িয়া বসুদেবের বাড়ীতে আসিলেন এবং দেবকী এবং তাঁহার গৃহের অন্যান্য নারীদিগের কাতর ক্রন্দন এবং প্রার্থনা সকলই উপেক্ষা করিয়া কন্যাটিকে কাড়িয়া লইলেন। তিনি উহাকে লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সহসা শিলার উপর আছাড় মারিলেন; কিন্তু সেই কন্যা আছাড়ের বেগে শিলার উপর না পড়িয়া লম্ফ দিয়া আকাশে উঠিলেন। তথায় তিনি সদ্যোজাতা আটমাসের শিশুর মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া মুক্তকেশী এক অদ্ভুতরূপিণী পূর্ণ যুবতীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি গজকুম্ভের মত

পীনপয়োধরা, রথের মত বিস্তীর্ণ জঘনা, চন্দ্রবক্ত্রা, চতুর্ভুজা, বিদ্যুতের মত বর্ণধারিণী, প্রাতঃসূর্য্যের মত উজ্জ্বলনয়না, মেঘাচ্ছাদিত সন্ধ্যাকালের মত ভীষণা, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় স্বরশালিনী, নীল এবং পীতবর্ণের বস্ত্র এবং উত্তরীয়ধারিণী, হারশোভিত সর্বাঙ্গী, উজ্জ্বলমুকুটভূষিতা, দিব্য মাল্য-চন্দনচর্চ্চিতা, দেবগণের দ্বারা সংস্তুতা তেজোময়ী, রৌদ্র-রূপা এক কন্যার রূপে ভূতগণসমাবৃত সেই অন্ধকারময়ী রাত্রিতে বিপরীত ভয়ঙ্করভাবে নৃত্য এবং হাস্য করিতে করিতে আকাশে অবস্থিতি করিলেন এবং তথায় উৎকৃষ্ট সুরা পান করিলেন, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন এবং রোষের সহিত কংসকে বলিলেন, "রে কংস, কংস, তুমি নিজেরই বিনাশের জন্য আমাকে যে সহসা তুলিয়া ধরিয়া শিলার উপরে আছাড় মারিয়াছ, সেইজন্য আমি তোমার অন্তিমকালে, শত্রু যখন তোমাকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে সেই সময়ে, আমার হাত দিয়া তোমার দেহ বিদীর্ণ করিয়া উষ্ণ শোণিত পান করিব।" এইরূপ ভয়ানক বাক্য বলিবার পর, দেবী তাঁহার ভূতগণকে সঙ্গে লইয়া ইচ্ছামত পথ দিয়া আকাশে দেবগণের আবাসে চলিয়া গেলেন। (বিষ্ণুপর্ব, ৪র্থ অধ্যায়, ২৯শ হইতে ৪৫শ শ্লোক।)

এই অলৌকিক ব্যাপার, সদ্যোজাতা বালিকার আকাশে তেজোময়ী চণ্ডিকামূর্ত্তির ধারণের বর্ণনা পড়িতে গেলে সামবেদীয় কেনোপনিষদে বর্ণিত "উমা হৈমবতী"-রূপিণী ব্রহ্মশক্তির আকাশে আবির্ভূত হওয়ার উপাখ্যান মনে পড়ে। দেবীভাগবত-পুরাণেও উপনিষদুক্ত আখ্যানটি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে; তবে, তথায় ব্রহ্মশক্তির সৌম্যরূপ চিত্রিত হইয়াছে আর এই হরিবংশে তাঁহার ভীষণরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ।

প্রশ্ন

১২ যোগমায়া এইরূপে চণ্ডিকামূর্ত্তি ধারণ এবং কংসকে তাহার বিনাশের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া প্রস্থান করিলে কংস এবং বসুদেব কি করিলেন?

উত্তর

১২। যোগমায়া ঐরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া অন্তর্হিতা হইলে কংস স্বকীয় যত্ন নিষ্ফল এবং মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সাধারণ কাপুরুষ অথচ অত্যাচারী এবং হিংসুক ব্যক্তির মত দেবকী এবং বসুদেবের নিকট নিজের সমুদায় পাপের বোঝা নিয়তি, কাল এবং দৈবের উপর চাপাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং উদারহৃদয় বসুদেব ও দেবকী উহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন। (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৪র্থ অধ্যায়, ৫০ শতম হইতে ৬৫তম শ্লোক এবং শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়, ১৫শ হইতে ২৭শ শ্লোক।) বসুদেব এবং দেবকীর নিকট ক্ষমা পাইয়া কংস তাঁহাদের শৃঙ্খলমোচন এবং কারামুক্তি করিয়া নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ঐ ঐ ১৪শ এবং ২৪শ শ্লোক।) নিজের প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সেই পাপিষ্ঠ কংস আপনার স্বরূপ ধারণ করিলে তিনি স্বকীয় অনুবর্ত্তী এবং বন্ধু স্থানীয় অরিষ্ট,ধেনু, কেশী, পুতনা প্রভৃতি অসুর-অসুরীদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে,তাহারা যেন সর্বদা সর্বত্র দেবদ্বিজ এবং গোপগণের হিংসা করে এবং যজ্ঞ, দান, পূজা এবং তপস্যা-কার্য্যে বাধা দেয়, যেহেতু দেবকীর কন্যা বলিয়াছে যে, আমার মৃত্যুরূপী শত্রু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন বালকমাত্রকেই বধ করিতে হইবে। কংসের অনুচরগণও সেই আদেশ অনুমোদন করিয়া বলিল, "হে রাজন্, নগর, গ্রাম এবং ব্রজের গোপদিগের সাময়িক আবাসস্থান, ব্রজ, ঘোষ (গোকুল বা আভীরপল্লী) সর্বত্র দশদিনের অধিক বয়সে অথবা দশদিনের ন্যূন বয়সের শিশুমাত্রকেই বধ করিতে হইবে।" (বিষ্ণুপুরাণ, ৫ অংশ, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম হইতে ১৩শ শ্লোক এবং ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, চতুর্থ অধ্যায়, ২৯শ হইতে ৪২শ শ্লোক)

বসুদেব কংসের এই মন্ত্রণা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ নন্দগোপের শিবিরে গমন করিয়া নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার পুত্র এবং তাহার মাতা রোহিণী আপনার আশ্রয়ে আছেন, এক্ষণে আপনি সপুত্রা যশোদাকে লইয়া ব্রজে গমন করুন। আপনি আপনার পুত্রের এবং আমার পুত্রের যথাবিধি জাতকর্ম সুসম্পন্ন করাইবেন এবং সাবধানতার সহিত তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন। নিষ্ঠুর কংস শিশুমাত্রকেই বধ করার আদেশ দিয়াছে, সেজন্য আমার বড় ভয় হইয়াছে, আমার পুত্র জ্যেষ্ঠ, তোমার পুত্র কনিষ্ঠ, উভয়কেই সমান যত্নের সহিত

রক্ষণ এবং পালন করিবেন। বাল্যকালে শিশুমাত্রেই ক্রীড়াচঞ্চল, কোপন এবং অসতর্ক হইয়া থাকে, এতএব সর্ববিষয়েই দৃষ্টি রাখিবে। আর, বৃন্দাবনে কখনও ঘোষ স্থাপন করিবেন না। তথায় ভয়ঙ্কর বেশী দৈত্য বাস করে।" (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৫ম অধ্যায়, ১—১৩ শ্লোক) বিষ্ণুপুরাণেও ঠিক এইরূপভাবে বসুদেব-কর্ত্তৃক নন্দগোপকে পরামর্শ এবং উপদেশ দিবার আখ্যান আছে; অধিক কথা এইটুকু আছে যে, "আপনারা তো সকলেই রাজার প্রাপ্য বার্ষিক কর দিয়াছেন, যেজন্য আসিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং মহাধনবান্ লোকের পক্ষে আর এস্থানে থাকা উচিত নহে, যে জন্য আসিয়াছিলেন, তাহা যখন নিষ্পন্ন হইয়াছে, তখন আপনারা শীঘ্র নিজ গোকুলে ফিরিয়া যাউন।" (বিষ্ণু-পুরাণ, ৫ম অংশ, ৫ম অধ্যায়, ১—৫ শ্লোক)

বসুদেব নন্দগোপকে এইরূপ পরামর্শ দিয়া অবশেষে বলিলেন, "হে নন্দগোপ, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, শীঘ্রগামী যানে চড়িয়া শীঘ্র ব্রজে চলিয়া যাউন, এই পক্ষিগণ আপনার দক্ষিণ ও বাম দিকে কলধ্বনি করিয়া শুভযাত্রার সূচনা করিতেছে। ব্রজের গোষ্ঠে কীট, পক্ষী, সরীসৃপ, গো এবং গোবৎস হইতে শিশুদুইটীকে রক্ষা করিবেন।" (বিষ্ণুপর্ব, ৫ম অধ্যায়, ১২—১৩ শ্লোক)

বাসুদেব নন্দগোপকে এইরূপে কংসের মনের কথা শুনাইয়া সাবধান করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং নন্দগোপ যশোদার সহিত আনন্দে যানে (শকটে) আরোহণ করিয়া এবং বালকদিগের বহিত শিবিকায় নবজাত শিশুটীকে শয়ন করাইয়া সদলবলে ব্রজে গমন করিলেন। (বিষ্ণুপর্ব, ৫ম অধ্যায়, ১৪—১৫ শ্লোক বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ, ৫ম অধ্যায়, ৬ শ্লোক)

শ্রীমদ্‌ভাগবতে বসুদেব-কর্ত্তৃক নন্দগোপকে সাবধান করার কথা এসময়ে নাই; প্রায় একবর্ষ পরে নন্দাদিগোপগণ যখন কংসের প্রাপ্য বার্ষিক রাজকর দিতে আসিয়াছিলেন, তখন এই ব্যাপার হওয়ার কথা আছে। (১০ স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়, ১৯—৩২ শ্লোক)

প্রশ্ন

১৩। উল্লিখিত ব্রজ বা গোকুল কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, আধুনিক মানচিত্রে তাহার স্থাননির্দ্দেশ করা যাইতে পারে কি না?

উত্তর

১৩। বর্ত্তমান "গোকুল" নামক স্থানে কিংবা "মহাবন" নামক নগরে উহা যে ছিল না, তাহা শাস্ত্রীয় বর্ণনা হইতে উপলব্ধ হয়। বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা হইতে এই স্থাননির্ণয়ের কোন সাহায্য হয় না এবং শ্রীমদ্-ভাগবতপুরাণের মতে যশোদা যেস্থানে যোগমায়াকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেস্থান নন্দগোপের কোন অস্থায়ী শিবির নহে (যেমন হরিবংশে এবং বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে), পরন্তু উহা নন্দগোপের স্থায়ী বাসগৃহ এবং বসুদেব নন্দের ঐ বাসগৃহে আসিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে নিদ্রিতা যশোদার শয্যায় রাখিয়া যোগমায়াকে লইয়া গিয়াছিলেন এবং নন্দ তাঁহার সেই বাসগৃহে বা বাড়ীতেই পুত্রের "জন্মোৎসব" করিয়াছিলেন। উক্তস্থানে যাতায়াত করিবার জন্য বসুদেবকে যমুনানদী পায়ে হাঁটিয়া পার হইতে হইয়াছিল, —তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবত (এবং বিষ্ণুপুরাণেও) পুরাণের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের মতে ঐ স্থান কংসের করদানের জন্য আগত নন্দগোপের অস্থায়ী শিবির আর ভাগবতের মতে উহা তাহার স্থায়ী বাড়ী; এই মাত্র প্রভেদ। ভাগবতের বর্ণনাকে অনুসরণ করিয়াই বাঙ্গালী গোস্বামী প্রভুরা "গোকুল" এবং "মহাবনে" শ্রীকৃষ্ণের আদিম লীলাস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। আধুনিক মানচিত্রে প্রাচীন লীলাস্থানগুলির যথাযথ সন্নিবেশ করা অসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়।

হরিবংশেই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার স্থানগুলি অধিকতর বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপরে ১৩শ প্রশ্নের উত্তরে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মরাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই বসুদেব নন্দগোপের অস্থায়ী আবাসস্থানে (শকটাদি রাখার স্থানে বা শিবিরে) আসিয়া অতিশীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন এবং "বৃন্দাবনে" তিনি কদাপি "ঘোষ" বা গোরু রাখার স্থান না করেন, তাহার জন্য সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর নন্দগোপ নবজাত শিশুটীকে শিবিকা বা ডুলিতে দিয়া যশোদার সহিত নিজে শীঘ্রগামী শকটে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা কোন্ পথে, কোথায় গেলেন? হরিবংশ হইতে সেই পথের, সেই স্থানের বর্ণনা তুলিতেছি:—

"বসুদেব শীতলবায়ুপূর্ণ, বহুজলাকীর্ণ, নির্জন এবং যমুনানদীর তীরগামী পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে গোবর্ধন পর্বতের সমীপস্থ সুন্দর প্রদেশে সেই গোব্রজ দেখিতে পাইলেন এবং তথায় প্রবেশ করিয়া শকটাদি যানপূর্ণ এবং সুখকর স্থানে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন।"

অতএব এইস্থান গোবর্ধন পর্বতের সমীপবর্তীই ছিল এবং গোবর্ধন পর্বতের নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্থানে নন্দগোপের এবং শ্রীমতী রাধার মাতাপিতার বাসস্থান এখনও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বাঙ্গালীর "বৃন্দাবন" সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাইবে।

বিলাতে গন্ধীজী

গন্ধীজী বিলাতে যাওয়ার ফলে ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি হইবে কি না জানি না। না হইলে আবার দেশে নিরস্ত্র-সংগ্রাম আরম্ভ হইবে কি না তাহাও জানি না, তবে তাঁহার বিলাত-যাত্রায় আমাদের অনেক দিক দিয়া অনেক লাভ হইল।

*　　*　　*

ওদেশের নর-নারী এই কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার হৃদয়-মনের পরিচয় পাইয়াছে। তাঁহার বালসুলভ সরল উদার হৃদয়ের, তাঁহার জীব-প্রীতির, তাঁহার ভগবদ্‌ভক্তি ও নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ভগবানের চিহ্নিত অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করিয়াছে। কি জাহাজে, কি ইংলণ্ডে আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কোনরূপ সংকীর্ণতার গণ্ডীর ভিতর না থাকার দরুণ সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের লোকের সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ-সূত্র অক্ষুণ্ণ আছে। কোনরূপ সংস্কারের অধীন তিনি নন বলিয়া জগতের লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। আমেরিকা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যগ্র, ফরাসী ব্যগ্র, মিশর ব্যগ্র, আর কত স্থানের অধিবাসীরা ব্যগ্র।

*　　*　　*

গন্ধীজীর নাম স্মরণ করিয়া আজ যে জগতের লোক পুণ্যলাভ করিতেছে ইহার কারণ কি? এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ভেদজ্ঞান নাই, সকলেই তাঁহার নিকট অবলীলাক্রমে যাইতে পারে, যে কেউ তাঁহাকে পত্র লিখিলে জবাব পায়। অক্রোধ, অহিংসা, আশ্রিতবৎসল, বন্ধুবৎসল, সরল, কোমল আর কর্ত্তব্যে একনিষ্ঠ, বিবেকের বলে বলীয়ান, ন্যায় ও বিচারের দাবীতে তেজোদৃপ্ত, অটল, কঠোর বলিয়া তিনি আজ জগতে নমস্য হইয়াছেন।

*　　*　　*

তাঁহার 'আশ্রমে' আহার বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব নাই। সকলে যাহা আহার করে, তাহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর খাদ্যের ব্যবস্থা আশ্রমের কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নিজের জন্য নাই। ধনী, নির্ধন, সকলের আলয়েই তিনি একই রকমভাবে বাস করিতে অভ্যস্ত। তাই আজ প্রাসাদ হইতে কুটীর পর্য্যন্ত তাবৎ ভবনের দ্বার তাঁহার জন্য সাদরে উন্মুক্ত হইয়াছে—রাষ্ট্রের প্রধানতম নেতা হইতে সামান্যতম গৃহস্থ পর্য্যন্ত তাঁহার স্পর্শে আসিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি বুঝিতে পারিয়াছে—অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে শিখিয়াছে—সকলে একাকার হইয়া গিয়াছে।

*　　*　　*

পশ্চিম নিশ্চয়ই আর একবার ভারতের কাছে মাথা নত করিবে। কৃষ্টির (cultureএর) দিক দিয়া করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের নিকটে, ত্যাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার দিক দিয়া করিবে গন্ধীজীর কাছে। করিবেই বা বলি কেন? না দেখিয়াই করিয়াছিল, দেখিয়া আজ তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় শহরে—সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য অতিথি যিনি, তাঁহার বেশ কিন্তু ফকিরের মতই আছে। বিশ্ববাসী বিমুগ্ধ নেত্রে এদৃশ্য দেখিতেছে।

*　　*　　*

এবারকার আদমসুমারী

বিগত আদমসুমারীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে সমগ্র ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যা ৩৫,২৯৮৬, ৮৭৬। ইহার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ২৩,৩৩০৯৩৭ আর মুসলমানের সংখ্যা ৭৭৭৪৩৯২৮। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার সহিত ইহার তুলনা করিয়া স্থির হইয়াছে যে ভারতের লোকসংখ্যা দশবৎসরে শতকরা ১০.৬ বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ৩৫,২৯৮৬৮৭৬ নর-নারী হিসাবে এইরূপে বিভক্ত :—পুরুষ ১৮১৯২১৯১৪ আর স্ত্রীলোক ১৭১০৬৪৯৬২। এই সকল সংখ্যায় আস্থা স্থাপন করা কিন্তু দুরূহ। এবারকার লোক গণনায় অনেকে যোগদান করেন নাই। যাহা হউক এই সকল সংখ্যা হইতে নরনারীর পরিমাণের একটা আভাস পাওয়া যায়, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইহার মধ্যে বৃটিশ ভারতে হিন্দু ১৭,৬৯,৩৪,৪৩৫ এবং মুসলমান ৬,৭০,৫৫,৫১০। বঙ্গ দেশে কিন্তু হিন্দু ২১,৫৩৭,৯২১ ও মুসলমান ২৭,৫৩০,৩২১।

*　　*　　*

অবলা-আশ্রম

শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ প্রসাদ যে 'অবলা-আশ্রমের' যথাক্রমে প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী সেই

অবলা-আশ্রম-সম্বন্ধে যে সকল জঘন্য কথা সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে রাজনীতিকে জলাঞ্জলি দিয়া গান্ধীজীকে দেশে ফিরাইয়া আনিয়া ইংরাজের কার্য্যের সমালোচনা বন্ধ করিয়া, এক-কথায় সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত নারীদের প্রতি উহার লেডি সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ও উহার সম্পাদক যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছে তাহা সত্য হইলে ব্যাপারটা যে কতবড় গুরুতর হইয়াছে তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সংবাদপত্রের বিবরণের উপর আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। আমরা বিশ্বাস করিতেই পারি না যে কোন শিক্ষিত ভদ্র মহিলা, কি ভদ্রলোক মহিলাদের অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে বা অকথ্য-ভাষায় গালিগালাজ করিতে পারে?

* * *

যাহা হউক কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ কয়েকজন কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তি ঐ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া একটা অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত করিয়া তদন্তের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও তদন্তের রিপোর্ট বাহির হইতে না দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছি। এ সমস্ত বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া শীঘ্রই রিপোর্ট বাহির করা উচিত। প্রকৃত দোষীর যাহাতে সমুচিত শিক্ষা হয় তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এমন একটা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের নামে যদি সংবাদ-পত্রের দ্বারা কুৎসা রটিত হয় তাহা হইলে তাহা দূর করিয়া সাধারণের সহানুভূতি যাহাতে এই প্রতিষ্ঠান সম্যকভাবে পাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা সমিতির অবশ্য কর্ত্তব্য।

* * *

এখন কথা হইতেছে অবলা-আশ্রমে কত দিন ধরিয়া এই সমস্ত আশ্রমবাসিনী নারীদিগকে সাহায্য করিতে পারা যায়? কুটীরশিল্পে শিক্ষিতা করিয়া তাহাদের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পথ স্থির করিয়া দিতে হইবে, বিবাহ দিয়া যাহাতে ভালভাবে সংসার চালাইতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। আর এইগুলিই হইতেছে অবলা আশ্রমের উদ্দেশ্য।

* * *

অবলা-আশ্রমের এই সকল সদুদ্দেশ্যের সহায়ক হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। সম্প্রতি যে-ভাবে আশ্রমটী চলিতেছে তাহাতে সুচারুভাবে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। অবশ্য এই দুর্দ্দিনে লোকের নিকট অর্থ-সাহায্য চাওয়া বড় শক্ত কথা, তাহা হইলেও মাতৃজাতির উন্নতিকল্পে সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া যদি এই অনুষ্ঠানটীকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

* * *

যতীন্দ্রমোহনের অভিনন্দন

বিগত ৬ই ভাদ্র 'রস চক্র' হইতে যশস্বী কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। বাঙ্গালার বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক এই উপলক্ষ্যে বেলঘরিয়ার একটী উদ্যানে সমবেত হইয়াছিলেন। সুকবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পত্র পাঠ করেন। আমরা যতীন্দ্রমোহনের এই সম্বর্দ্ধনায় আনন্দিত হইয়াছি তিনি বাঙ্গালার কাব্য-জগৎকে স্বীয় আলোকে প্রদীপ্ত করিয়াছেন। এ সংখ্যায় স্থানাভাবে এই সম্মেলনের বিশেষ বিবরণ আমরা দিতে পারিলাম না। আগামী সংখ্যায় দিব।

* * *

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাঙ্গালায় বহুবার অভিনন্দিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগ ও যত্নে শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব-প্রমুখ সাহিত্যিকদের অভিনন্দন হইয়া গিয়াছে। এখন আর প্রকৃত রসস্রষ্টাদের অভিনন্দন হইতে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ না হওয়া কোনমতেই বাঙ্গালীর নয়। 'রস-চক্রে'র সদস্যেরা সুকবি যতীন্দ্রমোহনকে অভিনন্দিত করিয়া ক্রমশঃ অন্যান্য সাহিত্যসাধকদের প্রতিও যে সুবিচার করিবেন সে কথা আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি।

* * *

আমাদের দেশে স্মৃতির পূজা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। মানুষের স্মৃতি-শক্তিটা বড় ক্ষীণ। পূর্ব্বতন রসস্রষ্টাদের কথা আমরা মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাই। নূতনের মোহে পুরাতনের প্রতি আমরা ততদূর শ্রদ্ধাবান থাকি না—ভুলিয়া যাই তাঁহাদের দাবীর কথা; তাই মাঝে মাঝে সেটা স্মরণ করাইয়া দেওয়া শোভন।

* * *

বাঙ্গালীর কর্ত্তৃত্ব

বাঙ্গালী কোন প্রতিষ্ঠানেই কর্ত্তৃত্ব রাখিতে পারিতেছে না। পূর্ব্বে বেঙ্গল বাস-সিণ্ডিকেটের বাঙ্গালী সেক্রেটারী ছিল। তাঁর কার্য্য-কুশলতার গুণে বাস-সিণ্ডিকেট একটা শক্তিমান প্রচেষ্টায় পরিণত হইয়াছিল এবং তার সাফল্য কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানির মত প্রবল বিলাতী সঙ্ঘকেও চঞ্চল করিয়াছিল; কিন্তু এখন তাহা অ-বাঙ্গালীর হাতে গিয়াছে। কোন কোন বাস কোম্পানী-সিণ্ডিকেটের গণ্ডী হইতে সরিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি? বাস সিণ্ডিকেটের আভ্যন্তরিক কোন গোলযোগ নিশ্চয়ই আছে। বাঙ্গালীর হাত হইতে একে একে সব ব্যাপার চলিয়া যাইতেছে বলিয়া মাথা চাপড়াইলে তো কোন ফল হইবে না। বাঙ্গালী কেন কোনও উদ্যমকে আয়ত্তে রাখিতে পারে না, তাহার কারণ খুঁজিতে হইবে ও দূর করিতে হইবে।

* * *

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ

রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্ছবি-সংক্রান্ত পত্রিকায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী সম্বন্ধে যে বিজ্ঞপ্তি করিয়াছেন, তাহার প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

"প্রতি জাতির জীবনে এক একটা সময় আসে যখন তার পক্ষে প্রয়োজনীয় হয় নব প্রেরণা, নূতন আদর্শ, নবীন দৃষ্টি। তখনই সমগ্র জাতির ঐকান্তিক কামনার ফলস্বরূপ আবির্ভূত হন এক একটী অসাধারণ প্রতিভা। তাঁরা অবতীর্ণ হয়ে জাতিকে নবজীবন দান করেন, জীবন-যাত্রায় সবল যুগিয়ে তারা করেন শক্তিমান। তাই তাঁদের আবির্ভাব, তাদের প্রগতি তাঁদের পরিণতি মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে, প্রতিভার পূজা করে তারা নিজেদের জীবন ধন্য করে।

*　　*　　*

সত্তর বছর আগে বাঙ্গলার বুকে এমন একটা প্রতিভার আবির্ভাব হ'য়েছিল। সত্তর বছর ধ'রে বাঙ্গালা উন্মুখ আগ্রহে রবীন্দ্রনাথের দান গ্রহণ ক'রে আস্‌ছে। এত দিনের এই আগ্রহের ফলে একটু একটু করে সে বুঝতে পেরেছে কি বিরাট্ এক প্রতিভা জাতির কত বড় দুঃসময়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে। তাই আজ কবির আবির্ভাবের সপ্ততিতম বর্ষে বালবৃদ্ধবণিতা সমবেতভাবে স্বকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁর বন্দনা ক'রেছে সমস্বরে প্রার্থনা করেছে, জয়তু রবীন্দ্র।

*　　*　　*

আমরা তাই বাঙ্গালার নাট্যকারদের, নাট্য-সমালোচকদের, অভিনেতৃদের, রঙ্গালয়ের মালিকদের, মঞ্চশিল্পীদের, প্রদর্শকদের, আলোক-চিত্র-শিল্পীদের, চিত্র নাট্য যন্ত্রচালিতাদের আহ্বান করছি যে তাঁরা সকলে মিলিত হ'য়ে এ বিষয়ে তাঁদের কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে যত্নবান হোন।"

হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার সমাধান

হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার কি উপায়ে সমাধান হইবে, তাহা কেহই জানেন না। সম্মুখে ইহার কোন পথের রেখাও দেখিতে পাইতেছি না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,' আমরা ভারতীয় হিন্দু মুসলমান একই দেশমাতৃকার সন্তান। চিরকাল পাশাপাশি বাস করিয়া এক সম্মিলিত রাষ্ট্র-তন্ত্র গড়িয়া তুলিব, জয় পরাজয়ের সমান অংশ সমভাবে বাঁটিয়া লইব। এই নিদারুণ সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সামান্য সাধু মুসলমানকে তাঁহাদের মহান্ ধর্ম্মের নামে, তাঁহাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার নামে ও বিপন্ন মানব-সমাজের নামে আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া যে পাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া আমাদিগের উন্নতির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় ডুবাইয়া দিয়া সমগ্র জগতের চক্ষে আমাদিগকে হীন ও উপহাসাস্পদ প্রতিপন্ন করিয়া ফেলিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে, উহার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিতেছি। যাঁহাদের উদ্দেশ করিয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি করিয়াছেন, তাহাদের মনস্তত্ত্ব ইহাতে পরিবর্ত্তিত হইবে কি?

বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ উপাধিদান

কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাইএর বিশ্ববিদ্যালয়, স্যর ডি, মোল্লা, স্যর সি ভি রমণ, স্যর এম, বিশ্বেশ্বরায়া এবং স্যর জে মোদিকে বিশেষ উপাধিদান সভায় অবৈতনিক এল-এল-ডি উপাধি দান করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে স্যর সি ভি রমণের কৃতিত্ব-সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছুই বলিব না। অপর তিনজনও তাঁহাদের পরিচয় জগতের সমক্ষে দিয়া ধন্য হইয়াছেন।

স্যর দিনশ মোল্লা বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বাধিকরণ প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আইন-সম্বন্ধে তাঁহার কৃতিত্বের ইহা কম পরিচায়ক নয়। সর্ব্বপ্রথমে ইনি এটর্ণীর অফিসে যোগদান করিয়া আইনব্যবসা চালাইতে থাকেন। ক্রমে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি আইন সম্বন্ধে অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করেন; তাঁহার তীক্ষ্ণধীর পরিচয় তাঁহার বহু পুস্তকেই দেখিতে পাওয়া যায়।

স্যর গুণদুম্ বিশ্বেশ্বরায়া বহুদিন হইতে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সহিত সংযুক্ত আছেন। ইনি একজন প্রখ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার। সমগ্র ভারতবর্ষের বহুস্থানেই তাঁহার কৃতিত্বের অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ত্ত-বিভাগের খাল-খনন কার্য্যে তাঁহার বিশেষ পটুতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার সর্ব্বকার্য্যেই ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ বিশেষভাবে লক্ষ্য হয়। ১৯১২ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত ইনি মহীশূর রাজ্যের দেওয়ানের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া যে যশ লাভ করিয়াছেন তাহা হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি রাজ্য-শাসকদিগের ভিতরে যে একজন সুশাসক ছিলেন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

স্যর জীবনজী মোদি জগতের মনীষীবৃন্দের নিকট হইতে শ্রদ্ধার প্রকচন্দন পাইয়া বরেণ্য হইয়াছেন। সংস্কৃত, পার্শী ও জাভেস্তা ভাষায় তাঁহার জ্ঞান অসীম। এসকল বিষয়ে তিনি একরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও অশোভন হয় না। পার্শীদিগের পুরাতন ইতিহাস ও রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী'র বোম্বাই শাখার এবং বোম্বাই নৃতত্ত্ব সমিতির (Anthropological Society) তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বহু গবেষণাপূর্ণ পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহারই যত্নে পার্শীদিগের ইতিহাস ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন জ্ঞান সভ্য-জগত পাইয়াছে। এই উপাধি সভায় অস্থায়ী গভর্ণর স্যর আরনেষ্ট-হোটসন সাহেব তাঁহার সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন "মানবের জ্ঞানের প্রচারকল্পে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার যথোপযুক্ত স্বকৃতি এই উপাধি বর্ষণ হইয়াছে।"

গুণীগণের গুণের আদর করিয়া বোম্বায়ের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে। উপাধি সৎপাত্রেই ন্যস্ত হইয়াছে। এই উপাধি-বিতরণের পর স্যর চন্দ্রবেঙ্কটেশ্বর রমণ উপাধি গৃহীতাদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া যে একটা সত্য কথা বলিয়াছেন তাহা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের স্মরণ রাখা উচিত। তিনি বলিয়াছেন, গবেষক ছাত্রদের দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের যশ অর্জ্জিত হয়—সভ্য-জগতের

নিশ্চই তাহারাই জাতিকে উন্নত করিতে পারে। নূতন জ্ঞানের আলোক-শিখা প্রজ্বলিত রাখিতে তাঁহারা উজ্জ্বল করিয়া থাকেন। ইহাদের কৃতকর্মের সহায়তা যে হইতে হয়—তাহা দর ইহাতে জন্য খরচের একটা সুব্যবস্থা হয় তাহা বিশেষ গবর্ণমেণ্টেরই দেখা কর্ত্তব্য। যার সন্তুলান অর্থাদিক হইতেই হউক—ইহাদের জন্য যে ব্যয় হয় অন্যান্য সভ্য-দেশের তুলনায় তাহা যৎসামান্য। এ খরচ কমাইলে কোনরূপেই চলিবে না।

বাস্তবিকই পোষ্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগের খরচ কোন মতেই হ্রাস হইতে দেওয়া উচিত নয়।

অর্থনীতির কৃতী ছাত্রী

মহীশূরের মহারাণী রমণী-কলেজের ছাত্রী কুমারী ইউ, অভয়াম্বল সন ১৯২৯ সালে অর্থনীতিতে পারদর্শীতা লাভ করিবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। এখানে কৃতিত্বের সহিত বি-এ উপাধি লাভ করিয়া উচ্চ-শিক্ষার জন্য তিনি ব্যগ্র হন। এক্ষণে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর অব ফিলজপি (পি-এচ ডি) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই সম্মানের উপাধি বোধ হয় দক্ষিণ ভারতে ইতিপূর্ব্বে আর কোন মহিলাই পান নাই। তাঁহার রচনায় পরীক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে রচনার পাণ্ডিত্য ছাত্রদের যেমন উপকারে আসিবে, তেমনই যাঁহারা মহীশূরের ধনাগমের পথ সুগম করিতে চা'ন তাঁহাদের পক্ষেও যথেষ্ট সাহায্য করিবে, এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষের ধনাগমের পথে উদ্যমশীল- যাত্রীদিগকে সহায়তা করিবে। তিনি সমগ্র ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেভাবে অর্থনীতির আলোচনা হয় তাহা দেখিয়া শীঘ্রই দেশে ফিরিবেন। আশা করি তাঁহার নিকট হইতে ভারতবর্ষ অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাইবে।

সমালোচনা

উদিতা—(কাব্যগ্রন্থ) শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী প্রণীত। ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বাঁধাই ২, দুই টাকা।

এই সদ্য-প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থখানির মধ্যে আমরা সত্যকারের রস-সৃষ্টির পরিচয় পাইয়াছি। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী একজন সত্যকারের চিন্তাশীল কবি। চিন্তাশীল কবিদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহাদের মনের মধ্যে সৃষ্টি-রহস্যের অপূর্ব্বতা পূর্ব্ব হইতেই একটা অশরীরী তত্ত্বরূপে বিরাজ করে। সৃষ্টির কোন রূপবস্তু যখন তাঁহার মনকে মুগ্ধ করে সেই বিশেষ রূপবস্তুটী তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের শরীরী আকার লইয়া মনের মধ্যে রসানুভূতি জাগায় না মাত্র, তাহার সহিত পূর্ব্ব-সঞ্চিত অশরীরী তত্ত্বটাকে পর্য্যন্ত রীতিমত নাড়া দিয়া যায়। ফলে যে জিনিসটী পূর্ব্ব হইতে কবির মনের মধ্যে তত্ত্বরূপে বিরাজ করিতেছিল—বহির্জগতের ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্পর্শে তাহাও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপবস্তুতে পরিণত হয়। এমনি করিয়া যাহা ছিল তত্ত্ববস্তু তাহা হইয়া উঠিল রসবস্তু। এই যে তত্ত্বকে রূপে পরিণত করিয়া তোলা, এই যে ভাববস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপবস্তুতে পরিণত করিয়া তুলিয়া উপভোগ করা—ইহা সোজা শক্তির কাজ নয়। জ্ঞান এবং অনুভূতি যাঁহার মধ্যে সমানভাবে বিরাজমান—এই শ্রেণীর কবিতা কেবল তাঁহাদেরই কাছ হইতে আশা করা যাইতে পারে। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর কবিতার গভীর চিন্তাশীলতার সহিত নিবিড় রসানুভূতির একটী অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এই একটীমাত্র কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াই লেখিকা একজন প্রথম শ্রেণীর কবিরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন। শুধু ভাবুকতা নয়,—ইহার ভাষা এবং ছন্দোলংকারিত্বও আমাদিগকে মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় বলিয়াছেন—"মৈত্রেয়ীর কাব্যে ক্রমে তত্ত্বের আমলই যদি প্রধান হয়ে উঠে তবে এ সম্বন্ধে তার রচনার অনন্যপূর্ব্বতা বঙ্গসাহিত্যে একটা বিশেষ স্থান নিতে পারবে।" আমরাও সেই আশাই করি। এই শক্তিশালী মহিলাকবির নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু প্রত্যাশা করি। ইঁহার ভাবুকতাপূর্ণ কবিতাবলী বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিয়া তুলুক ইহাই আমাদের আন্তরিক বাসনা।

জমাখরচ—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীরাধেশ রায়। বাণী প্রেস। পৃঃ ১৪৯, মূল্য দেড় টাকা। গল্পের বই। পাঁচটী গল্পের সমাবেশ। প্রথম গল্পের নাম হইতেই পুস্তকের নামকরণ। "জমা-খরচ" গল্পটীর খ্যাতি আছে। পড়িয়া দেখিলাম খ্যাতির যথেষ্ট কারণও আছে। অন্যান্য গল্পগুলিও সুখ্যাতির যোগ্য। লেখকের হাত বেশ মিষ্ট। গল্প লিখিবার ভঙ্গী যেমন সহজ তেমনই হৃদয়গ্রাহী। ঘটনার তরণীগুলি সাবলীল ভাষার স্রোতে বেশ তর্ তর্ করিয়াই ভাসিয়া চলিয়াছে। পালে অনুকূল হাওয়া লাগিয়াছে মাঝিও বেশ পাকা। জুয়াচুরী বর্ণনায় কবি বেশ নিপুণ; 'জমা-খরচ' গল্পে এর পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের অধুনা-প্রকাশিত অন্যান্য গল্পেও জুয়াচুরী রসের প্রাবল্য আছে। "যাদুকরী" গল্পটীতে দিদিমার স্নেহার্দ্র হৃদয়, শিশু খাঁদার স্নেহ-আবদার-মিশ্রিত নিছক ছেলেমানুষী—বিন্দুর মাতৃ-হৃদয়ের মতই বিমাতৃ-হৃদয়-পরিচয় লেখকের অপূর্ব্ব চরিত্রাঙ্কনের দক্ষতার অভ্রান্ত নিদর্শন। গুরুচরণের মুক্তি করুণরসে ভরা দারুণ ট্রেজেডি। "কবির সাধনায়" লেখকের ব্যঙ্গ হাসিরই উদ্রেক করে, হৃদয় বিদ্ধ করে না। 'ফল্গু-ধারা'র চিত্রটী সাধারণ গৃহস্থ-ঘরেরই সাধারণ চিত্র, কিন্তু অঙ্কনের গুণে কি বিচিত্র হইয়া ফুটিয়াছে। এই রকম সহজ সরল রেখায় এত চমৎকার ছবি আঁকা অতি বড় দক্ষ চিত্রকরেই পারিয়া থাকে। এ যে কত বড় আর্ট তাহা প্রকৃত আর্টিষ্টরাই বুঝিবেন। ছাপা-কাগজ-বাঁধাই সমস্ত ভাল।

ঘূর্ণি—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, এম্‌-এ। প্রকাশক শ্রীগণেশ রায়। বাণী প্রেস। পৃঃ ২০৬। মূল্য দেড় টাকা। উপন্যাস। বিশ্বপতিবাবু 'ঘরের ডাক' উপন্যাস লিখিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। "ঘূর্ণি" উপন্যাসে ঠিক ততটা পাকা হাতের পরিচয় না পাওয়া গেলেও হাতটা যে কাঁচা নয় সে-কথা বেশ জোর করিয়াই বলা চলে। আমাদের মনে হয় 'ঘূর্ণি' 'ঘরের ডাকের' আগে লেখা, পরে প্রকাশিত। তবুও তরুণ লেখক নিজের কৃতিত্বের ও দক্ষতার উপর বিশ্বাস করিয়া চারিধারে জালের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অবলীলাক্রমে জাল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। স্থানে স্থানে এমন আবর্ত্তের ঘূর্ণীপাক আছে যে ভয় হয় নৌকা বুঝি এইবার ডোবে, কিন্তু পরক্ষণে দেখি মাঝি একটা ঝিঁকা মারিয়া নৌকার মুখ ঘুরাইয়া লইয়াছেন। মহিম ও পারুলই বইখানির নায়ক ও নায়িকা। একটা নির্জ্জন বাড়ীতে সম্পর্কহীন যুবক-যুবতীর একত্র বাস করা নিরাপদ নহে এবং সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলা চলে তাহা এ সমাজে অস্বাভাবিক। কিন্তু পারুল ও মহিম এই রকম অবস্থাতেই দিন কাটাইতে লাগিল। পারুলের নামমাত্র বিবাহ হইয়াছিল এক বৃদ্ধের সঙ্গে, কিন্তু পারুল কখনও স্বামীর ঘর করে নাই। সাধারণতঃ দেখিতে পাই গ্রাম্য জমীদারকে ভীষণ অত্যাচারী করিয়া আঁকা হয় কিন্তু বিশ্বপতিবাবু কালীকিঙ্করের উপর প্রসন্ন, তাঁহাকে একজন উদার ও সদাশয় ব্যক্তি রূপেই পরিচিত করিয়াছেন। সামাজিক সঙ্কীর্ণতার কথাও বেশ নিপুণভাবে বলা হইয়াছে। অধঃপতিত ও নির্য্যাতিতের প্রতি লেখকের অকৃত্রিম দরদ আছে। কি উপায়ে সমাজের এই অবনত স্তরকে উন্নত করা যায় তাহার দিগ্‌দর্শনও লেখক বেশ সহৃদয়তার সহিত করিয়াছেন। তথাকথিত 'উচ্চস্তরের' গলদ কোথায় তাহাও তিনি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন। মহিম ও পারুলের পরস্পরের অবিচ্ছিন্ন সান্নিধ্যে তাহাদের অন্তরের অন্তরালে নিয়ত যে ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছে লেখক সে-বিষয়েও অন্ধ নন, এটা যে স্বাভাবিক তাহা তিনি বেশ বোঝেন। বর্ষার-রাত্রে পারুলের সেই হৃদয়-চাঞ্চল্য, সেই দুর্ব্বার মনোবেগ, সেই দুর্দ্দমনীয়-মিলনাকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের নিপুণ বর্ণনা ভুলিবার নয়। আবার পারুলের সেই অসাধারণ সংযম, নারীজনসুলভ লজ্জার রক্ষা-কবচে আত্ম-রক্ষা তাহাও ভুলিবার নয়। এ অবস্থায় কিন্তু মহিম যদি অনুরূপ চঞ্চল হইত তাহা হইলে পারুলের জীবনে চরম অনর্থপাত কিছুতেই ঠেকান যাইত না। এখানে স্বাভাবিকতার দোহাই দিয়া অনেক তরুণ লেখক কিছুতেই পিছাইতেন না, কিন্তু বিশ্বপতিবাবু সংস্কারমুক্ত হইতে পারেন নাই বলিয়া এ দৃশ্যের অবতারণা করেন নাই। হয়তো বা আর্ট ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিন্তু নীতি-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত আর্ট যে প্রকৃত আর্ট নয় তাহা বুঝিবার সময় আসিতেছে। যাহা হউক বইখানি পড়িয়া আমরা খুসী হইলাম। ভাষাও বেশ সরল ও চিত্তাকর্ষক, কোথাও জটিলতা নাই, ড্যাশ-ডটেরও ছড়াছড়ি নাই। কাগজ-ছাপা উৎকৃষ্ট। প্রচ্ছদপটে "ঘূর্ণি" জ্ঞাপক চিত্রখানি খুবই উপযোগী—গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ঐ ছোট্ট অর্থপূর্ণ ছবি হইতেই বেশ বুঝা যায়।

স্বপ্নশেষ—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম্‌-এ। রসচক্র সাহিত্য সংসদ হইতে প্রকাশিত। নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। আলোচ্য পুস্তকখানিতে চারিটী গল্প আছে। প্রথম গল্পের নামানুসারে পুস্তকখানির নামকরণ হইয়াছে। স্বপ্নশেষ গল্পটী যখন আমরা মাসিকপত্রে পড়িয়াছিলাম তখনই পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। নিপুণ কথা-সাহিত্যিকের তুলিকায় প্রত্যেক চরিত্রটী সজীব হইয়া উঠিয়াছে। অকৃতদার বৃদ্ধ নিবারণ চন্দ্রের চরিত্রেই লেখকের নিপুণতা অধিকতর ফুটিয়া উঠিয়াছে—কেমন করিয়া হঠাৎ পল্লীর একটী ছোট মেয়ে স্বভা তার ছোট ভাইটাকে কোলে করিয়া আসিয়া এই বৃদ্ধের সহিত মধুর বাবা-মশাই সম্পর্ক পাতাইয়া প্রত্যহ তাহার কাজগুলি সুসম্পন্ন করিয়া দিয়া নীরস বৃদ্ধের প্রাণে সরসতা আনিয়া দিয়াছিল; অবাধ কেমন করিয়া এই নাতনীটীর উপর তাহার মনের গোপন অন্ধকার কোণে প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা নিবারণচন্দ্র ব্যক্ত না করিলে স্বভার বিবাহে তাহার পিতা ঘনশ্যামের জমীজায়গা যায় পৈত্রিক ভদ্রাসনটুকু বাঁধা পড়িবে শুনিয়া সমবেদনায় কাতর হইয়া যখন তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—"দেখুন ঘনশ্যামবাবু, আপনার সমস্ত জমি-জারাত ম য় ভদ্রাসন নিজের গাঁটের কড়ি দিয়ে খালাস ক'রে দিতে পারি—যদি স্বভার সঙ্গে আমার —"। আর যায় কোথায় কৌশলী ঘনশ্যাম এই উদাসীন জমীদারকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া বিবাহে সম্মতি দিল। দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়া গেল। বিবাহ-রাত্রে মাত্র পুরোহিত ও নাপিতকে সঙ্গে লইয়া বরবেশী বৃদ্ধ নিবারণচন্দ্র আসিয়া ঘনশ্যামের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইল। এই সময়ের যে চিত্রটী অঙ্কিত হইয়াছে তাহা যেমন মনোরম তেমনই মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া খাঁটি সত্য। নিবারণচন্দ্র বিবাহে অনিচ্ছুক শুনিয়া ঘনশ্যাম ভাবিল বুঝি এত বড় দাঁওটা ফস্কাইয়া যায়। তারপর তাহার নিকট হইতে বেমালুম নগদ পনের হাজার টাকা আদায় লইয়া সেই বিবাহ-রাত্রেই পূর্ব্বস্থিরীকৃত পাত্র বিমলের হাতে স্বভার বিবাহ দিল। বাস্তবিকই ঘটনাটাকে একটা স্বপ্নের শেষ ছাড়া আর কি বলিতে পারা যায়। বৃদ্ধের প্রাণে যে রোমান্সের আঁচটুকু লাগিয়া জীবনটাকে ক্ষণেক একটু আলোকিত করিয়াছিল—মায়াপুরীর সৃষ্টি করিয়াছিল—চিন্তা-সূর্য্যের উদয়ে তাহা দূর হইয়া গেল। 'রাখালী' ও 'তরুণী ভার্য্যা' গল্পদুটীও মন্দ নয়। 'পথের বাঁকে' গল্পটীতে একজন বিয়ে-পাগলা ৩০।৪৫ বছরের ভালমানুষ 'বরকে' কলিকাতায় কয়জন 'ইয়ার' বন্ধুরা কলিকাতার একজন বেশ্যা পটলীকে কন্যা সাজাইয়া যে অভিনয় করিয়াছিল, অভিনয় হিসাবে তাহা মন্দ না হইলেও হাবভাবকুশলা পটলীর প্রাণে যে করুণরসের উদ্রেক করিয়া দিয়াছে তাহা উপভোগ্য। ঘটনা হইতেছে এই:—কাশীর নকুড়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিপত্নীক। দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। রাখিয়া গিয়াছে মাত্র একটী পুত্রসন্তান। এই সন্তানটীকে নকুড়চন্দ্র বরাবর স্তোকবাক্য দিয়া আসিয়াছে যে শীঘ্র

তাহার 'মা' আসিয়া তাহাকে আদর-যত্ন করিবে। কিন্তু কয়েকবার জোচ্চরেরা তাহাকে ঠকাইয়া তাহার নিকট হইতে কিছিৎ রজতমূল্য আদায় করিয়াছে মাত্র, বিবাহ দেয় নাই। এবার ও সে তাহার পুত্রকে লইয়া বিবাহ করিতে উপস্থিত। পুত্রকে কস্তাবেণী পটলীর নিকট রাখিয়া রাত্রিতে যখন তাহারা শয়ন করিয়াছে তখন কোন সময়ে হয় তো ভয় পাইয়া শীর্ণ মাতৃহারা শিশুটী নীরবে তার কোলে আসিয়া বসিয়াছে। এই বাহু-স্পর্শে পটলীর স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল—সে 'প্রাণপণ বলে তাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ছোট্ট মেয়েটির মত করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।' তারপর ভোররাত্রে পটলী উঠিয়া দলের একজনকে সঙ্গে লইয়া বন্ধুদিগকে ছাড়িয়া নির্জ্জন অন্ধকার পথে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িল। হইলেও এই করুণরসাত্মক চিত্রের অবতারণায় গল্পটী চলনসই হইয়াছে। পথের বাঁকের গল্পটির আখ্যান ভাগ তত সুবিধা জনক না হইলেও এক কথায় বলিতে গেলে চারিটী গল্পেই লেখক স্বপ্নের শেষ কৃতিত্বের সহিত দেখাইয়াছেন। গল্পগুলি পড়িয়া মনে একটু রঙীন স্বপ্নের আবেশ থাকিয়া যায়।

আহরণী—শ্রীকালিদাস রায়। 'রস-চক্র-সাহিত্য-সংসদ-সম্পাদিত। হেমচন্দ্র বাগচী দ্বারা প্রকাশিত। পৃঃ ২৪৮। মূল্য ২৲ দুই টাকা। দুই খণ্ড একত্রে বাঁধান। কালিদাসবাবু বহু বৎসর হইতে বহু কবিতা লিখিয়া আসিতেছেন মাসিক পত্রিকা খুলিলেই কালিদাসবাবুর নাম চোখে না পড়িয়া যায় না। তিনি অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার গতি আজকাল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এই পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক ও ক্রমোন্নতির পরিচায়ক। কৈশোরে যিনি 'কুন্দ-কিসলয় (অধুনা বল্লরী) ফুটাইয়া ছিলেন এখন যদি তাঁহার কাব্য-কল্প-বৃক্ষে অমৃতফল না ফলে তবে তাঁহার ও বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের নিতান্ত দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। যৌবনে যিনি 'ব্রজ-বেণু'শুনিয়া আত্মহারা হইয়া ছুটিয়াছিলেন আজ যদি তিনি সেই বেণু-বাদকের পরিণত বয়সর কবিতা পাইয়া শান্ত-সমাহিত হ'ন তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে? কালিদাসবাবুর একটী বদনাম' (!) আছে তিনি বড় 'সংস্কৃত-ঘেঁসা।' কিন্তু যিনি সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের যথার্থ রসাস্বাদন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তিনিই বুঝিবেন কালিদাসবাবু বাঙ্গলা কাব্য সাহিত্যের সে অপূর্ব্ব রসের ছিটা-ফোঁটা মাত্র বিতরণ করিয়াই ভাষার ও কাব্যের কত গৌরববৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাকে কত ঐশ্বর্য্যময় ও মধুময় করিতেছেন। কালিদাসবাবুর আধুনিক অনেক কবিতাতেই ভারতীয় শিক্ষার নিজস্ব মহিমা স্বগৌরবে উদ্ভাসিত হইতেছে। এই দীর্ঘ কবিতাগুলি ধারাবাহিক ক্রমে মন দিয়া পড়িলে প্রাচীন ভারতের একখানি অপূর্ব্ব চিত্রের অন্তকাংশ হৃদয়ে অঙ্কিত হইবে এবং অবশিষ্টাংশের জন্ত পাঠকের কৌতুহল জাগরিত হইবে। ইহা কবির কম কৃতিত্ব নয়, এবং এই শ্রেণীর কবিতাগুলির সার্থকতা এইখানেই। আজকালের লেখা দেখিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছে কালিদাসবাবু বুঝি অন্যান্য বিষয়ের কবিতা কখনও লেখেন নই এবং সেই কারণে তাঁহার অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভাকে তাঁহারা খাটো করিয়াই দেখিতেছেন। কিন্তু এ ধারণা যে কত ভুল তাহা সমালোচ্য "আহরণী" গ্রন্থ হইতেই বেশ বোঝা যাইবে। কালিদাসবাবু পল্লীচিত্র অঙ্কনে, গৃহস্থলীর সুখ দুঃখের কথা লইয়া কবিতা-রচনায়, মুটে-মজুর-চাষীর পুঞ্জীভূত বেদনা প্রকাশে সিদ্ধহস্ত। এসম্বন্ধে তিনি অনেক অনবদ্য সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া কাব্যসাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। প্রেমাত্মক ও রূপাত্মক কবিতায়ও তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। সামাজিক দুর্নীতি মোচনেও তিনি যথেষ্ট প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহার হাস্য ও ব্যঙ্গ রসাত্মক কবিতা এবং লালিকাগুলিও প্রসিদ্ধ। অনেকগুলি গানও তিনি রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালীর কণ্ঠে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। অনুবাদও তিনি বেশ নিপুণ। এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যে যথার্থই বিরল। এহেন কবিপ্রতিভার সম্যক রসাস্বাদন করিতে হইলে কবির সমগ্র কাব্যগ্রন্থাবলীর আলোচনা করা উচিত, কিন্তু তাহা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া "রসচক্রের" সভ্যেরা অনেক বিবেচনা ও বিচার করিয়া এই সংগ্রহ নির্ব্বাচন করিয়া 'আহরণী' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই আহরণী হইতে কবির নানা ভাবের কবিতারই নমুনা পাওয়া যাইবে এবং উপরে কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে যে উক্তি করা হইয়াছে তাহার সার্থকতা ও যথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। আর একটী বিষয় উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি—পরলোকগত গুণিগনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া অনবদ্য সুন্দর কবিতারচনা করিতে কালিদাসবাবু অদ্বিতীয়। 'আহরণী'র সূচিপত্র হইতে পুস্তকখানির কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে—ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কালিদাসবাবুর শ্রেষ্ঠ কবিতা-গুলিরই ইহাতে সমাবেশ আছে, তবুও মনে হয় আরও দুইচারিটী কবিতার ইহাতে স্থান হইলে ভাল হইত। কাগজও বাঁধাই ভাল। ছাপা বড় ঘনঘন। মলাটের ছবিটী একটু অদ্ভুত গোছের।

যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ শুভক্ষণেই 'চয়নিকা' প্রকাশ করিয়াছিলেন—পরে সত্যেন্দ্রনাথের "কাব্য সঞ্চয়নের আবির্ভাব। করুণানিদান ও অনতিবিলম্বে কাব্যভারতীর কণ্ঠে "শতনরী" দুলাইলেন। নব-অভিনন্দিত বাগচী কবি তাঁহার নব-নির্ম্মিত—"ইলাবাস" ভবনে আর কতদিন আলস্যে কাল কাটাইবেন? তাঁহার এই শ্রেণীর কাব্য 'যতীন্দ্র-সুধা'র আস্বাদ হইতে আর কতদিন আমরা বঞ্চিত থাকিব?

Printed by Saurindra Kumar Ghosh at the Biswabhandar Press, 216, Cornwallis Street, Calcutta and Published by the same from the Panchapushpa Office, 31 Telipara Lane, Calcutta.

৪র্থ বর্ষ প্রথমার্দ্ধ | আশ্বিন, ১৩৩৮ | ষষ্ঠ সংখ্যা

শকুন্তলা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

(৫)

গত মাসের পঞ্চপুষ্পে আমরা দেখিয়াছি, দানববিজয়ী দুষ্মন্ত মাতলি-চালিত রথে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিতেছেন। কিছুদূর গিয়া মাতলি বলিলেন—দেখন মহারাজ! আপনার যশঃ কিরূপ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—

বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ সুরসুন্দরীণাং
বর্ণৈরমী কল্পলতাং শুকেষু।
বিচিন্ত্য গীতক্ষমম্ অর্থজাতং
দিবৌকসস্তচ্চরিতং লিখন্তি।

প্রসাধন অবশেষ সুর-সুন্দরীর
করিয়া আদান, দেবগণ চিত্রবর্ণে
লিখিয়াছে কীর্ত্তিগাথা তব, কল্পলতা-
চ্ছদে, গীতাক্ষরযুত; মুখরিত আজি
স্বর্গ-লোক দেখ ভূপ তব যশোগানে!

ক্রমশঃ রথ বায়ুস্তরে অবতরণ করিল। রাজা বলিলেন—মেঘপদবীম্ অবতীর্ণৌ স্বঃ। কিসে?

অয়ম্ অরবিবরেভ্যশ্চাতকৈ র্নিষ্পতদ্ভির্
হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতম্ উপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং
পিশুনয়তি রথস্তে শীকরক্লিন্ননেমিঃ॥

দেখ রথ ক্লিন্ন-নেমি সলিল শীকরে
অর-অন্তরালে দেখ উড়িছে চাতক,
অশ্বের শরীর ক্ষণ-প্রভা-প্রভালিপ্ত,
বারি-গর্ভ মেঘ-স্তরে চলিছে স্যন্দন।

ক্রমশঃ ভূমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইল—অহো উদাররমণীয়া পৃথিবী। রাজা জিজ্ঞাসিলেন—মাতলি! এ কোন্ পর্ব্বত?—পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগরে অবগাঢ় থাকিয়া দ্রব সুবর্ণরসে যেন সান্ধ্য মেঘখণ্ডের ন্যায় দেখা যাইতেছে। মাতলি বলিলেন—ইহার নাম হেমকূট—তাপসদিগের পবিত্র ক্ষেত্র।

স্বায়ম্ভুব মরীচের্যঃ প্রবভূব প্রজাপতিঃ।
সুরাসুরগুরুঃ সোত্র সপত্নীক স্তপস্যতি॥

ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচিতনয়
সুরাসুরগুরু প্রজাপতি
এই হেমকূটশৃঙ্গে তপস্যা-নিরত
পত্নীসহ করেন বসতি।

রাজা বলিলেন—এত বড় সৌভাগ্য তো অবহেলা

করা উচিত নহে। রথ নামান—ভগবান্ মারীচকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাই।

রথগতি স্তিমিত হইলে দুষ্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—মারীচাশ্রম পর্ব্বতের কোন্ অংশে? মাতলি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—ঐ যেখানে এক মুনির দেহ-বল্মীকে অর্দ্ধগ্রস্ত, বক্ষঃস্থল জীর্ণ সর্পত্বগ্ জড়িত, কণ্ঠ শুষ্কলতা-বন্ধনপীড়িত, জটামণ্ডল পক্ষিনীড়াকীর্ণ—যত্র স্থাণুরিবাচলো মুনিরসৌ অভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ—যেখানে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল থাকিয়া মুনি সূর্য্যবিম্বের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। দুষ্যন্ত বলিলেন—এ যে স্বর্গেরও অধিক নির্বৃতিস্থান—যেন অমৃতহ্রদে অবগাহন করিলাম—স্বর্গাৎ অধিকতরং নির্বৃতিস্থানম্—অমৃতহ্রদমিব অবগাঢ়োস্মি।

উভয়ে রথ হইতে অবতরণ করিয়া আশ্রমের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজা সবিস্ময়ে দেখিলেন, ঋষিদিগের তপোবনভূমি কি বিচিত্র!

প্রাণানাম্ অনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে
তোয়ে কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে পুণ্যাভিষেকক্রিয়া।
ধ্যানং রত্নশিলাগৃহেষু বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমো
যদ্ বাঞ্ছন্তি তপোভিরন্য মুনয় স্তস্মিন্ তপস্যন্ত্যমী॥

কল্প-বৃক্ষবনে করি বাস, বায়ু মাত্র ভখি'
প্রাণ-বৃত্তি করেন ধারণ,
স্বর্ণ-পদ্ম-রেণু-মিশ্র জলে, পুণ্যস্নানক্রিয়া
নিত্য দেখি হয় নির্ব্বাহন,
রত্ন-শিলা-গৃহে ধ্যান, সুরসুন্দরীর অতি-
সন্নিকটে সংযম আচরে
অন্য মুনি চাহে যাহা তপস্যার ফল, হেথা
তপস্বীরা তৃণজ্ঞান করে।

মাতলি সন্ধান লইয়া জানিলেন মহর্ষি মারীচ এখন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত আছেন। তিনি দুষ্যন্তকে উচিত অবসরের প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দুষ্যন্ত এক অশোকবৃক্ষের মূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইল। তিনি বলিলেন—এ কি!

মনোরথায় নাশংসে কিং বাহো! স্পন্দসে মুধা।
পূর্ব্বাবধীরিতং শ্রেয়ো দুঃখং হি পরিবর্ত্ততে॥

মনোরথে নিরাশ্বাস,
বৃথা কেন বাহুর স্পন্দন?
এবে দুঃখ সার শুধু
পূর্ব্বে শ্রেয়ঃ করিয়া হেলন।

এমন সময় নেপথ্য হইতে ধ্বনি শুনা গেল—'মা কখু চাবলং করেহি। কহং গদো এব্বং অত্তণো পকিদিং—দুষ্টামি করিও না, ঠিক্ নিজের স্বভাবের অনুরূপ?' রাজা বিস্মিত হইলেন—ভাবিলেন একি আশ্রমের বিপরীত অবিনয়? অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—একটী অবাল-বলশালী বালক দুইজন তাপসী-কর্ত্তৃক নিবারিত হইতেছে

কোনু খলু অয়ং অবাল সত্ত্বো বালঃ?
অর্দ্ধপীত মাতৃস্তন
কেশর-সংমর্দ্দ বিক্লবিত
সিংহশিশু সহ খেলি,
বলাৎকারে করে আকর্ষিত।
অর্দ্ধপীত স্তনং মাতুরামর্দ্দক্লিষ্টকেশরম্।
প্রক্রীড়িতুং সিংহশিশুং বলাৎকারেণ কর্ষতি।

বালকের ভয়ের লেশ নাই—সিংহশিশুকে বলিতেছে—সিংহি! হাঁ কর—তোর্ ক'টা দাঁত গণিয়া দেখি।

প্রথমা তাপসী বলিল—অশিষ্ট বালক! এসব প্রাণী আমাদের সন্তানতুল্য—কেন এদের ত্যক্ত কর? এ কি! তোমার জিদ যে বাড়িয়া উঠিল! সাধে 'সর্ব্বদমন' নাম রাখিয়াছে!

দর্শনমাত্রেই বালকের প্রতি রাজার মন পুত্রস্নেহে সিক্ত হইল। তিনি ভাবিলেন—'যেন ইহার প্রতি ঔরসে ইব পুত্রে স্নিহ্যতি মে মনঃ—পুত্র-স্নেহে আমার চিত্ত আর্দ্র হইতেছে?—বোধ হয় আমি নিঃসন্তান বলিয়া।

দ্বিতীয়া তাপসী বালককে বলিল—যদি এ সিংহ-শিশুকে না ছেড়ে দাও, তবে সিংহী তোমায় কামড়াইয়া দিবে। বালক ভ্রুকুটী করিয়া বলিল—ওঃ ভয়ে গেলাম আর কি। রাজার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি অন্তরাল হইতে মনে মনে বলিলেন—

মহতঃ তেজসো বীজং বালোঽয়ং প্রতিভাতি মে
স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেধাপেক্ষ ইব স্থিতঃ ॥
সুমহান্ তেজঃকণা এই শিশু মম মনে লয়
বহ্নির স্ফুলিঙ্গ যেন অপেক্ষিছে ইন্ধন-নিচয়।

প্রথমা তাপসী বালককে ভুলাইবার জন্য বলিলেন—'আচ্ছা এ শাবকটীকে ছাড়িয়া দাও, তোমায় খেলনা দিতেছি।' বালক হস্তপ্রসারণ করিয়া বলিল—কই দাও? রাজা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন—বালকের হস্তে চক্রবর্ত্তি-লক্ষণ!

প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারিতো
বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
অলক্ষ্যপত্রান্তরমিদ্ধরাগয়া
নবোষসা ভিন্নম্ ইবৈকপঙ্কজম্ ॥
লোভনীয় দ্রব্য আশে প্রসারিত কর
জালবদ্ধ অঙ্গুলীনিচয়—হেরি যেন
অবিশ্লিষ্ট-দল, দীপ্ত রাগ-সুরঞ্জিত,
নব-উষা-উন্মীলিত একটী পঙ্কজ!

দ্বিতীয়া তাপসী প্রথমাকে বলিলেন—এ কথায় ভুলিবার পাত্র নয়, আমার কুটীরে যে মৃন্ময় ময়ূর আছে আনিয়া দাও। প্রথমা ঐ ময়ূর আনিতে গেলেন। বালক হাসিয়া বলিল, ততক্ষণ এই সিংহকে লইয়াই খেলা করি-দাব ইমিণা এব্ব খীলিস্সং। ইতিমধ্যে রাজার চিত্তে বাৎসল্যরস উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—

নিস্পৃহয়ামি খলু দুর্ললিতায় অস্মৈ ॥
আলক্ষ্যদন্তমুকুলান্ অনিমিত্তহাসৈর্
অব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো
ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনী-ভবন্তি ॥
স্নেহসিক্ত চিত্ত কেন অশান্ত বালকে?
অৰ্দ্ধব্যক্ত দন্তপাতি অহৈতুক হাসে,
রমনীয় আধভাষ অব্যক্ত-অক্ষর
উৎসঙ্গ-লোলুপ তনয়েরে ধরি ক্রোড়ে—
তার অঙ্গরজে হয় ধূসরিত দেহ
যার, ধন্য সেই জন এই ধরামাঝে।

তাপসী দেখিলেন বালক কিছুতেই সিংহশিশুকে ছাড়ে না। নিকটে রাজাকে দেখিয়া বলিলেন 'মহাশয়! এদিকে একবার আসিবেন কি? এ বালক সিংহশাবককে কঠিন মুষ্টিতে ধরিয়াছে। আপনি ইহাকে ছাড়াইয়া দিন।' রাজা অগ্রসর হইয়া বলিলেন—অয়ি! ভো মহর্ষি-পুত্রক—

এবমাশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা সংযমঃ কিমিতি জন্মনস্ত্বয়া।
সত্ত্বসংশ্রয়গুণোঽপি দূষ্যতে কৃষ্ণসর্পশিশুনেব চন্দনঃ ॥
জন্মগত বৎস! তব সংযম—আচার
সর্ব্বপ্রাণি-হিতকর—আশ্রম-বিরুদ্ধ
বৃত্তি করি আচরণ—ঋষিপুত্র তুমি—
কেন তারে করিছ সদোষ, করয়ে যেমতি
কাল কৃষ্ণসর্পশিশু চন্দনদূষণ।

তাপসী বলিলেন, মহাশয়! এ বালক ঋষি-কুমার নহে। রাজা বলিলেন, ইহার আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া তাহা বুঝা যায় বটে। তবে স্থান-সম্বন্ধে মনে করিয়া আমার ঐরূপ অনুমান হইয়াছিল! রাজা সিংহশিশুকে মোচন করিয়া দিলেন। বালক কিছুমাত্র ঔদ্ধত্য করিল না। বালকের স্পর্শসুখলাভে রাজা স্বগত বলিতে লাগিলেন—

অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ,
স্পৃষ্টস্য গাত্রেষু সুখং মমৈবম্।
কাং নির্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্য্যাদ্,
যস্যায়ম্ অঙ্গাৎ কৃতিনঃ প্ররূঢ়ঃ ॥
নাহি জানি কার কুলাঙ্কুর!
স্পর্শে মোর এত সুখোদয়!
ভাগ্যবান্ যাহার অঙ্গজ
কি নির্বৃতি তার চিত্তে হয়

উভয়ের আকৃতির সৌসাদৃশ্য দেখিয়া তাপসী বলিলেন কি আশ্চর্য্য—ইমস্স বালঅস্স রূপসংবাদিনি দে আখিদি এ বালকের আকৃতির সহিত আপনার আশ্চর্য্য মিল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, এ বালক যদি ঋষিকুমার নহে তবে কোন্ কুলে জন্ম।

তাপসী। পুরুবংশে।

রাজা। (স্বগত) একি আমারই বংশ যে। হ'বে—কোন পৌরব রাজর্ষি শেষ জীবনে আশ্রমবাসী হইয়াছেন।

(প্রকাশ্যে) কিন্তু ইচ্ছা করিলেইতো মানুষ এখানে আসিতে পারে না।

তাপসী। অপ্সরার সম্বন্ধে এই শিশুর মাতা মারীচ আশ্রমে প্রসূতা হইয়াছেন।

অপ্সরা সম্বন্ধ শুনিয়া রাজার আশা আর এক ধাপ উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এ বালকের জননী কোন্ রাজর্ষির পত্নী? তাপসী বলিলেন—কে সে ধর্ম্ম-পত্নীত্যাগীর নাম মুখে আনিবে? রাজা ভাবিলেন—এ অপবাদ কি আমাকেই লক্ষ্য করিতেছে?

ভাল, শিশুর মার নামই জিজ্ঞাসা করি না কেন! না—পরস্ত্রীর চর্চ্চা অনুচিত।

এমন সময় অপর তাপসী মৃণ্ময় ময়ূর হস্তে প্রবেশ করিয়া বলিল, "শকুন্ত-লাবণ্যং পেক্ষ" বলা বাহুল্য বালকটী দুষ্যন্তের ঔরস পুত্র। প্রত্যাখ্যানের পর এই মারীচ আশ্রমে তাহাকে প্রসব করিয়াছিলেন। সে মাতৃনামের সাদৃশ্যে বিড়ম্বিত হইয়া বলিয়া উঠিল—কহিং বা মে অম্বা। কোথায় আমার মা। রাজা ভাবিলেন তবে তো এর মার নাম শকুন্তলা। আবার ভাবিলেন যে এরকম নাম-সাদৃশ্য তো দুর্লভ নয়। আমি মরীচিকায় বিভ্রান্ত হইতেছি। ইহার পর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। বালকের মনিবন্ধে যে রক্ষাকবচ ছিল সিংহশিশুর সহিত বিমর্দ্দের সময় তাহা মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল। রাজা হঠাৎ উঠাইয়া তাহা বালকের হস্তে বাঁধিয়া দিলেন। ঋষির প্রদত্ত ঐ রক্ষাকবচ——তাহার এই বিশেষত্ব ছিল যে যদি পিতামাতা ভিন্ন কেহ ঐ ভূপতিত কবচ স্পর্শ করে, তবে কবচ সর্প হইয়া তাহাকে দংশন করিবে। অবশ্য দুষ্যন্ত যখন বালকের পিতা, তখন কবচের কোন বিকৃতি ঘটিল না। রাজা এ বৃত্তান্ত শুনিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন এবং সহর্ষে বলিলেন—'কথমিব সম্পূর্ণমপি মে মনোরথং নাভিনন্দামি এতদিনে আমার মনোরথ সফল হইল, তাহার অভিনন্দন করি। এই বলিয়া বালককে আলিঙ্গন করিলেন।

বালক বলিল—কে তুমি? ছাড়—মার কাছে যাই।

রাজা বলিলেন—পুত্র আমার সহিতই মাতাকে অভিনন্দিত করিবে।

বালক। দুষ্যন্ত আমার পিতা—তুমি নও।

ইতিমধ্যে তাপসীরা গিয়া শকুন্তলাকে সংবাদ দিয়াছে। শকুন্তলা আশা-নিরাশায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। এত বৎসর পরে শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন, অয়ে! সেয়ম্ অত্র ভবতী শকুন্তলা যৈষা

—বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈক বেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥

পরিধানে ধূসর বসন,
ব্রতাচারে শুষ্কমুখী,
এক বেণী করিয়া ধারণ
শুদ্ধশীলা বণিতা আমার
সুদীর্ঘ বিরহ ব্রত,—নিষ্করুণ আমি—
মোর তরে করেন পালন।

দুষ্যন্তের অনুতাপ-বিবর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া শকুন্তলা প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। ভাবিলেন—কে এ আমার বাছাকে গাত্রসংসর্গে মলিন করিতেছে? বালক মাতাকে বলিল—দেখ মা! কে আমায় ছেলে বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছে। শকুন্তলা ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিলেন এবং স্বগত বলিলেন—হৃদয় আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও, দেবতা কোপ ত্যাগ করিয়া সদয় হইয়াছেন। ইনি আর্য্যপুত্রই বটেন।

রাজা বলিলেন—

স্মৃতিভিন্নমোহতমসো দিষ্ট্যা প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি।
উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্॥

লব্ধ স্মৃতি, ছিন্ন আজি মোহ-অন্ধকার
বহুভাগ্যে হে সুমুখি—সম্মুখে আমার
উপস্থিত তুমি—যেন হয়েছে মিলিত
গ্রহণান্তে শশধর রোহিণী সহিত।

শকুন্তলা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, 'জেদু জেদু অজ্জ-উত্তো—আর্য্যপুত্রের জয় হ'ক।'

পাশ্চাত্য সমালোচকেরা কবিগুরু দান্তের Divine Comedy কাব্যে দেবর ও ভ্রাতৃজায়া উপলক্ষে that day we read no more এই স্বল্পাক্ষর স্বীকারোক্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন Reticence বা কবিকৃত বাক্‌সংযমের উহাই চরম। শকুন্তলার এই স্বল্পোক্তি যদি তাঁহাদের

বিজ্ঞাত থাকিত, তবে বোধহয় তাঁহারা ইহাকেই প্রথম স্থান দিতেন। কত বৎসর ধরিয়া শকুন্তলা কিরূপ দুঃখ-যাতনা ভোগ করিয়াছেন! নিরপরাধা সর্ব্বজন সমক্ষে কিরূপ লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইয়াছিলেন! তথাপি "আর্য্যপুত্রের জয় হউক" এই উক্তিতে আমরা দেখিলাম শকুন্তলার অন্তরতর নারীপ্রকৃতি কিরূপ "সংযত, সহিষ্ণু; একাগ্রতপঃ-পরায়ণা, কল্যাণ-ধর্ম্মের শাসনে একান্ত নিয়ন্ত্রিতা। * * দারুণতম বিশ্বাসঘাতকার আঘাতেও তাহাকে ধৈর্য্যে-ক্ষমায় কল্যাণে (কিরূপ) স্থির রাখিয়াছে।" রাজা বলিলেন—

সুন্দরি!

বাষ্পেণ প্রতিষিদ্ধেঽপি জয়শব্দে জিতং ময়া।
যৎ তে দৃষ্টম্‌অসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটংমুখম্॥
বাষ্পরুদ্ধ জয়-শব্দ, কিন্তু আমি তবু জয়যুত।
দেখিয়া তোমার মুখ, অযতন-রক্ত ওষ্ঠপুট॥

ব্যাপার দেখিয়া সর্ব্বদমন বিস্ময়ের চূড়ায় উঠিয়াছে। সে জননীকে জিজ্ঞাসা করিল—এ কে মা! শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'বাছা! তোমার অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।' রাজা শকুন্তলার অশ্রু মার্জ্জন করিয়া বলিলেন—

মোহান্ময়া সুতনু পূর্ব্বমুপেক্ষিতস্তে
যো বাষ্পবিন্দুরধরং পরিবাধমানঃ।
তং তাবদাকুটিলপক্ষ্মবিলগ্নম্ অদ্য
কান্তে! প্রমৃজ্য বিগতানুশয়ো ভবামি॥
যেই বাষ্পবিন্দু তব অধর-লুলিত
ক্লেশদায়ী—হে সুন্দরি! পূর্ব্বে-উপেক্ষিনু
মোহবশে, এস আজি মুছাইয়া তারে
কুটিল কটাক্ষ-লগ্ন অক্ষপুটে তব
হৃদয়ের গুরুভার করিব লাঘব।

রাজা আরও বলিলেন—

সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকম্ অপৈতু তে
কিমপি মনসঃ সংমোহো মে তদা বলবান্‌অভূৎ!
হে সুতনু! হৃদয় হইতে
প্রত্যাখ্যান দুঃখ কর দূর।
কি এক সংমোহে তদা
মন মম ছিল ভোরপুর॥

এই বলিয়া রাজা শকুন্তলার চরণে পতিত হইলেন। শকুন্তলা তাঁহাকে আস্তে-ব্যস্তে উঠাইয়া বলিলেন—'করেন কি? নিশ্চয়ই আমার পূর্ব্ব-জন্মের পাপের ফল। সেই-জন্য সদয় হইয়াও আর্য্যপুত্র আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছিলেন।' শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা এ অভাগীকে আর্য্যপুত্রের কিরূপে মনে পড়িল? (তখন অবধি দুষ্যন্ত বা শকুন্তলা কেহই দুর্ব্বাসার শাপবৃত্তান্ত জানেন না)। রাজা সেই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দেখাইয়া বলিলেন—এই অঙ্গুরী পাইতেই সমস্ত পূর্ব্বকথা স্মরণে আসিল। শকুন্তলা বলিলেন—'কি অনুবিত্ত! প্রত্যয় জন্মাইবার সময় এ দুর্লভ হইয়াছিল—আর্য্যপুত্রস্য প্রত্যয়নকালে দুর্লভমাসীৎ!' রাজা সেই অভিজ্ঞান অঙ্গুরী শকুন্তলার অঙ্গুলীতে পরাইতে গেলেন। বলিলেন 'ঋতুসমবায়চিহ্নম্ প্রতিপদ্যতাং লতাকুসুমম্। ঋতুসমাগমে লতা কুসমচিহ্ন ধারণ করুক।' শকুন্তলা বলিলেন, না ইহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না! ইহা আপনার আঙ্গুলেই থাকুক।

অবসর বুঝিয়া মাতলি প্রবেশ করিয়া দুষ্যন্তকে অভিনন্দন করিলেন—দিষ্ট্যা ধর্ম্মপত্নী সমাগমেন পুত্রমুখদর্শনেন চ আয়ুষ্মান্ বর্দ্ধতে। বলিলেন—সপত্নীক মহর্ষি আপনাকে দর্শন দিবেন। পুত্রভার্য্যা সহিত অগ্রসর হউন।

দূর হইতে রাজাকে লক্ষ্য করিয়া মারীচ অদিতিকে বলিলেন—

পুত্রস্য তে রণশিরস্যয়ম্‌অগ্রযায়ী
দুষ্যন্ত ইত্যভিহিতো ভুবনস্য ভর্ত্তা।
চাপেন যস্য বিনিবর্ত্তিতকর্ম জাতং
তৎ কোটিমৎ কুলিশম্‌আভরণং মঘোনঃ॥
এই সে দুষ্যন্ত দেবি! ভর্ত্তা ভুবনের
অমর বাহিনী মুখে সদা অগ্রসর—
শরাসনে যাঁর নিবর্ত্তিত দেব কার্য্য-
হেতু—পুত্রবাসবের করে হইয়াছে
কুটিল কুলিশ আজি মাত্র আভরণ।

রাজা ঋষি-দম্পতীকে দূর হইতে দর্শন করিয়া ভক্তি গদ্গদ ভাষায় মাতলিকে বলিলেন—

প্রাহুর্দ্বাদশধা স্থিতস্য মুনয়ো যত্তেজসঃ কারণং
ভর্তারং ভুবনত্রয়স্য সুষুবে যদ্যজ্ঞভাগেশ্বরম্।
যস্মিন্নাত্মভুবঃ পরোঽপি পুরুষশ্চক্রে ভবায়াস্পদং
দ্বন্দ্বং দক্ষমরীচিসম্ভবমিদং তৎ স্রষ্টুরেকান্তরম্ ॥
এই সে দম্পতি দক্ষ-মরীচি-সম্ভূত,
দ্বাদশ আদিত্যস্থিত তেজের নিদান,
ত্রিলোকীর পতি ইন্দ্র যজ্ঞ-ভাগহারী
জনমিল যাঁহা হ'তে, পরম পুরুষ
স্বয়ম্ভূ বামনরূপে অবতার তরে
করিলা আস্পদ যাঁরে, যে দম্পতি শুনি
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হ'তে এক (ই) ব্যবধান!

রাজা অগ্রসর হইয়া উভয়কে প্রণাম করিলেন। শকুন্তলা পুত্রকে লইয়া তাঁহাদের চরণে পতিত হইলেন। মারীচ আশীর্ব্বাদ করিলেন—

আখণ্ডলসমো ভর্ত্তা জয়ন্তপ্রতিমঃ সুতঃ।
আশীরন্যা ন তে যোগ্যা পৌলোমীসদৃশীভব ॥
ইন্দ্রতুল্য ভর্ত্তা তব
জয়ন্তপ্রতিম পুত্র আর।
শচীর সদৃশী হও—
অন্য আশীঃ অযোগ্য তোমার।

মারীচ আরও বলিলেন—

দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।
শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্ ॥
অহো! সাধ্বী শকুন্তলা, তুমি, সুপুত্র তোমার তাত!
শ্রদ্ধা বিধি বিত্ত যেন, মিলিত ত্রিতয় এক সাথ।

দুষ্যন্ত বলিলেন—এ সমস্তই আপনার অনুগ্রহ।

উদেতি পূর্ব্বং কুসুমং ততঃ ফলং,
ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রম
স্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ ॥
পূর্ব্বে ফুল, পরে তার ফল,
পূর্ব্বে মেঘ, বৃষ্টি দেখি অনন্তর।
কার্য্য-কারণের এই ক্রম
(কিন্তু) তব প্রসাদের সিদ্ধি পুরঃসর।

মাতলি বলিলেন 'বিধাতৃপুরুষদিগের প্রসাদ এবংবিধই বটে।'

রাজা বলিলেন 'মহর্ষি! আপনি সর্ব্বজ্ঞ। আমার একটা মহৎ সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আপনার এই সেবিকাকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করি। কিন্তু পরে ইহার বন্ধুরা ইহাকে মৎসকাশে প্রেরণ করিলে স্মৃতিভ্রংশে প্রত্যাখ্যান করিয়া অপরাধী হই। পশ্চাৎ অঙ্গুরী দর্শনে সকল কথা স্মরণ হয়। এ ঘটনার হেতু কি?

মহর্ষি বলিলেন—বৎস! তোমার কোনও অপরাধ নাই—দুর্ব্বাসার অভিশাপেই তোমার মতিভ্রম ঘটিয়াছিল।

রাজা স্বস্তিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—এষ বচনীয়াৎ মুক্তোস্মি—আঃ নিন্দা হইতে মুক্ত হইলাম। শকুন্তলা স্বগত বলিলেন—বিঃ আনন্দ! তবে তো আর্য্যপুত্র আমাকে অকারণে ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু শাপের কথা তো কিছুই মনে হইতেছে না। হবে—সেইজন্যই সখীরা ভর্ত্তাকে অভিজ্ঞান দর্শাইতে বলিয়াছিল! মারীচ বলিলেন—বৎসে! এখন সব জানিলে, স্বামীর প্রতি আর কোপ রাখিও না। দেখ,

শাপাদসি প্রতিহতা স্মৃতিরোধরুক্ষে
ভর্ত্তর্য্যপেততমসি প্রভুতা তবৈব।
ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহতপ্রসাদে
শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলভ-প্রকাশা ॥
শাপবশে স্মৃতিরোধ হইলে ভর্ত্তার
তাই রুক্ষভাবে তোমা কৈলা প্রত্যাখ্যান
এবে মোহ অন্ধকার বিগত তাঁহার
তোমার প্রভুতা পূর্ণ। দেখ সু-দর্পণ
প্রতিবিম্ব নাহি ধরে, স্বচ্ছতা তাহার
মলাদগ্ধ হ'লে, কিন্তু শুদ্ধ হয় যবে
সে দর্পণ, ছায়াগ্রহ সুলভ তাহার।

মারীচ দুষ্যন্তকে বলিলেন—বৎস! শকুন্তলার গর্ভজাত তোমার এই পুত্রের আমি স্বয়ং জাত-কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়াছি। ইহার ভবিষ্যৎ অতিশয় উজ্জ্বল।

রাজা—ভগবান্! অত্র খলু মে বংশপ্রতিষ্ঠা—ইহাতেই আমার বংশের প্রতিষ্ঠা—এই বলিয়া বালকের হস্ত গ্রহণ করিলেন।

মারীচ বলিলেন—তাহাই হইবে এ বালক 'চক্রবর্ত্তী'।

রথেনানুদ্‌ঘাতস্তিমিতগতিনা তীর্ণজলধিঃ
পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বসুধাম্ অপ্রতিরথঃ।
ইহায়ং সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্ব্বদমনঃ
পুনর্যাস্যত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্য ভরণাৎ॥
উত্তরি জলধিতূর্ণ স্থিত গতিরথে॥
পুত্র তব প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, অনায়াসে
সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা করিবে বিজয়।
হেথা জন্তুচয়—প্রসভদমন হেতু
যে 'সর্ব্বদমন' খ্যাত—লোকের ভরণে
পশ্চাৎ 'ভরত' নামে হইবে বিশ্রুত।

অভিজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই, এই দৌষ্মন্তি ভরতের নামানুসারেই আমাদের এ ভারতবর্ষ।

অদিতি বলিলেন—'ভগবান্! মহর্ষি কণ্বের নিকট এ সুখ-সংবাদ প্রেরণ করুন। কন্যার শাপ-নিবৃত্তির ব্যাপার তিনি যেন জানিতে পারেন।' শকুন্তলা স্বগত বলিলেন 'ভগবতী আমার কথাই বলিলেন।'

মারীচ। —'তপস্যার প্রভাবে কিছুই তাহার অবিদিত নাই। তথাপি এ প্রিয় সন্দেশ প্রেরণ করা উচিত বটে।'

তখন মহর্ষির আদেশ মতে তাঁহার শিষ্য গালব কণ্ব-ঋষির আশ্রমের অভিমুখে আকাশ পথে (বিহায় সা গত্বা) প্রস্থান করিলেন।

মারীচ দুষ্মন্তকে বলিলেন—বৎস! তুমিও দারা-পুত্র-সহ ইন্দ্রের রথে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে প্রতিগমন কর। আশীর্ব্বাদ করি,

তব ভবতু বিড়ৌজাঃ প্রাজ্যবৃষ্টিঃ প্রজাসু
ত্বমপি বিততযজ্ঞঃ স্বর্গিণঃ প্রীণয়স্ব।
যুগশতপরিবর্ত্তান্ এবম্ অন্যোন্যকৃত্যৈর্
নয়তম্ উভয়লোকানুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ॥
হোন ইন্দ্র হিতকারী প্রচুর বর্ষণে
তুমিও বিততযজ্ঞে তোষ দেবগণে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য শুভশ্লাঘ্য পালনে কৃত্যের
শত যুগ পরিবর্ত্ত হোক্ উভয়ের!

মালিনীতীরে হিমালয়ের সানুদেশে কথাশ্রমে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছিল। আজ স্বর্গের উপকণ্ঠে হেমকূট পর্ব্বতে মারীচাশ্রমে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার উত্তর মিলন সংঘটিত হইল। পূর্ব্ব মিলনের মূলে ছিল—কামের চটুলতা, ইন্দ্রিয় বৃত্তির উত্তেজনা, ভোগের তীব্রতর তৃষা। এ উত্তর মিলনের ভিত্তি হইল—ক্ষমা, শ্রদ্ধা, স্বস্তি, শান্তি। পূর্ব্ব-মিলন স্থায়ী হয় নাই—এ উত্তর মিলন হইল শাশ্বত। কারণ, এ মিলন জিত হইল অনুতাপের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, নিয়ম সংযম দ্বারা, ধৈর্য্যের দ্বারা, সহনশীলতা দ্বারা। 'কাম আর প্রেমে হয় বহুত অন্তর'—যাহা মর্ত্ত্যের ভঙ্গুর কাম ছিল—তাহা আজ স্বর্গের শাশ্বত প্রেমে চরম সার্থকতা অর্জ্জন করিল।

ইহার পর প্রাচীন নাটকের প্রথা-অনুযায়ী ভারত-বাক্য। সূত্রধার এই আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া নাটকের উপসংহার করিতেন। শকুন্তলার ভারতবাক্যে এইরূপ:—

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ॥
প্রজাহিতে সদারত রহুন নৃপতি
মহীয়সী হোন শ্রুতজ্ঞের সরস্বতী।
দেদীপ্যশকতি নীললোহিত শঙ্কর
ক্ষপন করুন শম্ভু মম জন্মান্তর।

এখন মহাকবি গেটের সেই উক্তিটী স্মরণ করুন—
বসন্তের ফুল্ল ফুল, শরতের ফলের
পুষ্ট তিরপিত আত্মা মোহে যাহে মানবের মন
স্বরগের মরতের এই ঠাঁই অপূর্ব্ব মিলন
'শকুন্তলা' 'শকুন্তলা' এই কিবা আর আছে অকথন?

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—গেটের এ শ্লোকটী আনন্দের অত্যুক্তি নহে—ইহা রসজ্ঞের বিচার। কারণ, কবিতা-রস-মাধুর্য্যং কবির্বেত্তি—কবি ভিন্ন কাব্যের মাধুর্য্য-রস কে আস্বাদ করিতে জানে?

কুড়ানো মাণিক

(মীরা বাঈ হইতে)

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়

এসো তুমি, সাঁঝ এসেছ—ঘনিয়ে এলো আঁধার ঘোর,
আনন্দ আজ উথল হবে তুমি এলেই বন্ধু মোর
সূর্য্য এবং ধরা মোরা—এড়িয়ে যাবার জো-ই যে নাই
মন বুঝেনা—মীরার হিয়া হামেসা চায় তোমায় তাই।

সুপ্ত জগৎ—বিরহেতে আমিই কেবল জাগ্‌ছি রাত,
গাঁথ্‌ছি ব'সে মোতির মালা—কর্‌ছি আরো অশ্রুপাত
গাঁথ্‌ছি মালা অশ্রুজলের—তারা গুণে রাত পোহায়
মীরার বঁধু ফির্‌বে কখন—শুভক্ষণ ঐযে যায়।

মাতাল যারা, মদের লাগি তাদের যেমন মন অধীর,
প্রাণের নিধি প্রিয়ের লাগি তেমনি হৃদয় নয়কো থির।
কেউবা করে বন্দনা আর কেউবা দেখায় নিন্দা ভয়,
বন্ধু আমার মন হরেছে—ফিরে চাওয়ার নেই সময়।

দাঁড়াও আমার আখির আগে—চোখের সাথে মিলাও চোখ.
আমায় ভুলে যাওয়াই তোমার বিস্মরণের কাজল হোক্।
ভাসছি ভব-সাগর বুকে—নাওগো তুলে মিটাও খেদ,
সেই মিলনে মিলাও আমায়, যে মিলনের নেই কো ছেদ।

স্নেহের বাঁধন ছিন্ন করে বন্ধু, তুমি কোথায় গেলে,
তোমার পরেই ভর্‌সা যাহার—চলে গেলে তারেই ফেলে!
ভাসিয়ে তরি রেখে গেছ এই বিরহের দরিয়ায়,
বন্ধু, তুমি আস্‌বে কবে?—আর থাকা যে যায় না হায়!

হৃদয় আমার যে হরেছে দেখব তারে সর্ব্বক্ষণ,
তাহার ধ্যানে—তার স্মরণেই মগ্ন হয়ে রইবে মন।
চরণ তাহার পড়বে যেথায় ধরার হ'বে তীর্থ সেই,
মগন হ'য়ে রইবে মীরা তীর্থ-রেণু—তার তলেই।

চীনের সভ্যতা ও জাতীয় আন্দোলন

শ্রীঅজিত ঘোষ

জগতের প্রাচীন সভ্যজাতিগুলির মধ্যে চীন অন্যতম। ইউরোপের প্রাচীনতম গ্রীসীয় ও রোমীয় সভ্যতা যখনও জগতে আলোকপাত করে নাই তাহার বহুপূর্ব্বেই চীনের জাগরণ হইয়াছিল। * প্রাচ্যেও ভারতবর্ষের পরেই চীনের স্থান অপ্রতিহত। ইতিহাস যেখানে তাহার সভ্যতার পর্য্যায় খুলিয়া বসিয়াছে, সেইখানেই তাহার পাতায় পাতায় চীনের কীর্ত্তি বিজড়িত—ভারত, মিশরের মত তাহারও স্থান অটুট রহিয়াছে। জ্ঞান ও ধর্ম্মে, কর্ম্মে ও বীর্য্যে চীন তাহার নিজের অধিকার বজায় রাখিয়াছে।
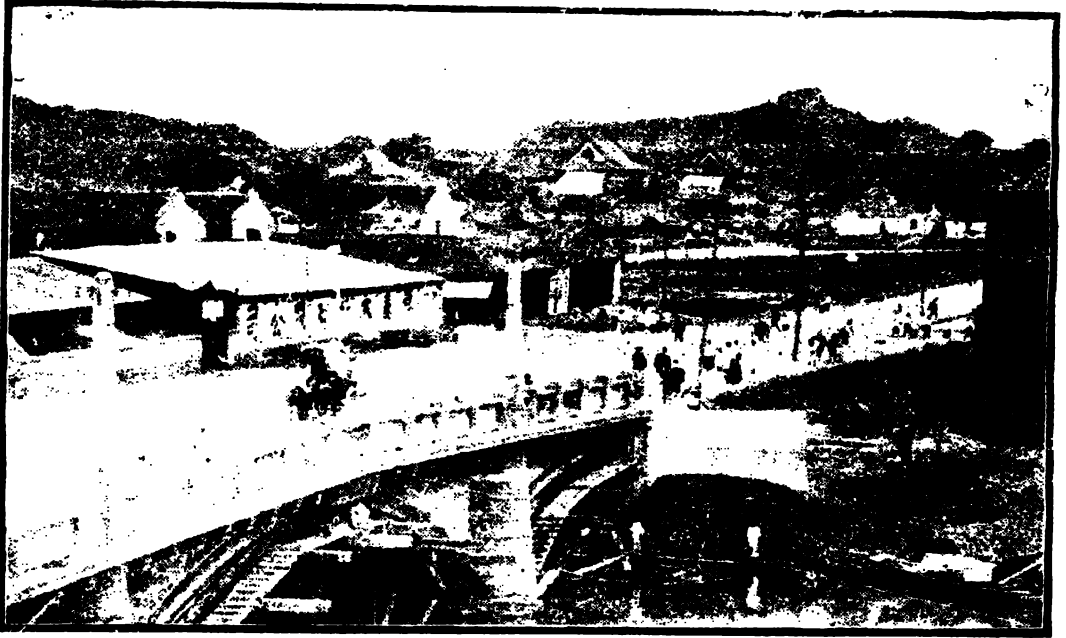
চীনের সভ্যতা যে কতদিনের তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। চীন-সভ্যতার প্রথম ইতিহাস উপকথার মধ্যেই নিহিত: সুতরাং তখনকার কোন মৌলিক সভ্যতা প্রতিপন্ন করা শক্ত কথা। তবে ইউরোপের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই যে চীনের অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহা অনেক পাশ্চাত্য মনীষীও স্বীকার করিয়াছেন। খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই চীনদেশের অনেক রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও তাহাদের কোন ধারাবাহিক পর্য্যায় আমরা পাই না, তথাপি উহাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট ধারা আলোছায়ার মধ্যেই প্রবাহিত; কিন্তু উহারা যে কিরূপ সভ্যতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা আমরা অতীতের অনুশীলন হইতেই উপলব্ধি করিতে পারি। চীনের

চীনের নূতন রাজধানী নানকিনের সম্পদরাশির অন্যতম চত্বর

* Before Greece and Rome, China was standing, and still she stands; in all essentials unchanged; apart.

—History of the World, Harmsworth.

The Chinese were a remarkably civilised nation a thousand years before Christ. That was sometime before Greek civilization can be said to have begun.

—Chinese Civilization, H. A. Giles.

প্রাচীর আজও তাহার অমর সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

চীনের ধর্ম্ম।—চীনের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মের নাম সান্-তি

চীনের প্রাচীর (পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের মধ্যে একটী) সিন্-বংশের সি-ওয়াঙ্-ডি ইহা নির্ম্মাণ করেন। ইনি ১৩ বৎসর বয়সে সিংহাসনারোহণ করিয়া সি-গান-ফু (Se-gan-foo) তে ইঁহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং সমগ্র চীনদেশ জয় করিয়া ওয়াঙ্ (Hoang) অর্থাৎ সম্রাট্ হইয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য এই বিশাল প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। এই সিন্-সিই তাহার বংশের নামের অনুকরণে চীনের নাম প্রতিষ্ঠা করেন—সিন্ হইতে চীনের উৎপত্তি।

অর্থাৎ স্বর্গ। এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকের নাম কনফিউসিয়াস্ (Confucius)। ইনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং চীনদেশে নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া ন্যায়ের মন্ত্র-প্রচারকরূপে ধর্ম্মশিক্ষা দেন। ইনি ইঁহার সমুদয় শত্রু জয় করিয়া খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৮ অব্দে দেহত্যাগ করেন। এই ধর্ম্মের সঙ্গে দুইপ্রকার দর্শন অন্তর্নিহিত—একটী অন্তর্জ্ঞানোপলব্ধ দর্শন (Intuitive philosophy) আর একটী অধ্যাত্ম-দর্শন (Metaphysical philosophy)। এই দুই প্রকার দর্শনের সহিত চীনের আর একটী প্রাচীন ধর্ম্ম 'তাও' ধর্ম্মের বিশেষ সংযোগ আছে। লাও জে (জন্ম খৃঃ পূঃ ৬০৪) এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। 'বৃদ্ধ-যুবা' বলিয়াই ইনি বিশেষ খ্যাত। ইনি নিষ্কাম কর্ম্ম ও ভক্তিবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। দয়া, বিনয় প্রভৃতির অনুশীলন ও শত্রুর প্রতি প্রেম প্রদর্শন ইঁহার উদ্দেশ্য।

চীন-প্রাচীরের এক প্রান্ত

চীন-গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট সংকাই সেক্

বর্ত্তমানে চীনজাতির ধর্ম্ম বৌদ্ধ। খৃঃ পূঃ ১২৬ অব্দে এই ধর্ম্ম চীনদেশে প্রচারিত হয়। চীনজাতি নিরাকার

ঈশ্বর বিশ্বাস করে, কিন্তু অন্যান্য জাতির তুলনায় গোঁড়া স্বভাবাপন্ন নয়।

বর্ত্তমানে চীনা কন্‌সাল-জেনারেল

চীনের সাহিত্য ও শিল্প-কলারও বিশেষ কৃতিত্ব আছে। সাহিত্যের ভাণ্ডার চীনের অফুরন্ত এবং উহার শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চ্চার অনুরাগও খুব বেশী। প্রাচীন চীন-সাহিত্যে কাব্য, গদ্য-সাহিত্যে দর্শন প্রভৃতির বহুল পরিমাণে চর্চ্চা হইয়াছিল। কাব্যসাহিত্য ক্রটিবর্জ্জিত এবং উপন্যাসসমূহ ধর্ম্মবিষয়ক। ইতিহাসে ও জ্যোতিষেও চীনের অনুশীলন দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ২২০০ বৎসরের পূর্ব্বেও চৈনিক পণ্ডিত নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির গণনা করিতে শিখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া চৈনিক পর্য্যটকগণ তাঁহাদের দেশের সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য কিরূপ তথ্য ও উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার বহু পরিচয়ও আমরা পাইয়াছি।

শিল্প-কলার দিক দিয়াও চীনের শক্তি অটুট আছে। খৃষ্টজন্মের ১০০০ বৎসর পূর্ব্বেও আমরা চীনের শিল্প-কলার বহু পরিচয় পাই। এই সময়কার কারুকার্য্য-শোভিত রথ, সিল্ক, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর অনেক চীনা চিত্রও আমরা দেখিতে পাই।

চীনজাতির উৎপত্তি যে কোথা হইতে, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। Terrien de Lacouperie ও Robert Kennaway Douglasএর মত অনুসারে অনেকে উহার উৎপত্তি অক্কাডীয় জাতি হইতে অনুমান করেন। Richthofenএর ধারণা কিন্তু বিভিন্ন ধরণের। তাঁহার মতে

নানকিনার চাংসান রোডে চীন-গণতন্ত্রের প্রবর্ত্তক সান-ইয়াটের স্মৃতিমন্দির
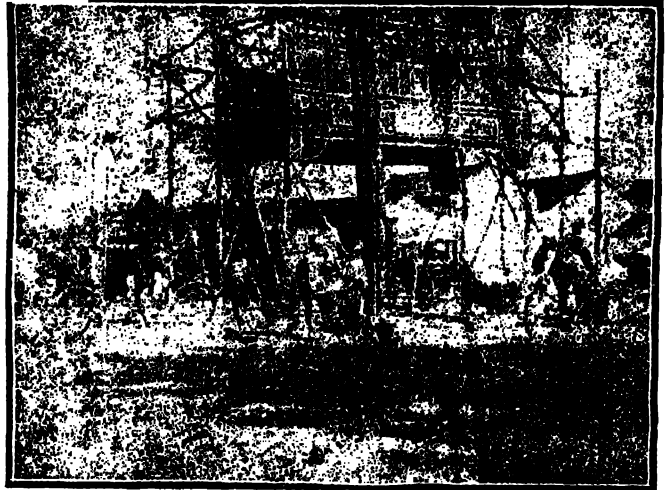
তারিম উপত্যকাতেই চীনের প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং সেইস্থান হইতে অক্কাডীয়দের সহিত মিলিত হইয়া ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। আক্কাডীয় জাতি হইতেই চীনজাতির উৎপত্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ প্রাচীন অক্কাডীয় লিপির সহিত তথাকথিত চৈনিক-লিপির সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

চীনের সহিত ভারতবর্ষের পরিচয় বহুদিনের। তাহাদের সহিত ভারতের ভাবধারার অনেক আদান-প্রদানও হইয়াছে। ভারত চীনে অভিযান করিয়াছে, ধর্ম্মপ্রচারও করিয়াছে, আর চীনও আসিয়াছে পর্য্যটকরূপে ভারতের ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে, তাহার নিকট হইতে

চীন-গণতন্ত্রের পররাষ্ট্রসচিব ডাঃ সি টিংওয়াং

সান্-ইয়াটের মৃতদেহ নানকিনের কবরখানায় লইয়া যাওয়া হইতেছে

চীনের বধ্যভূমির দৃশ্য

চীনের ধুনীয়া প্যাগোডা— ইহার উচ্চতা ২৫০ ফুট

হঙ্ কঙের রাস্তায় চীন মৃতদেহের শোভাযাত্রা

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জ্জন করিতে। ভারত তাহার তীর্থক্ষেত্র, তাহার জ্ঞানোন্মেষের প্রথম সহায়ক। য়ুয়ন্-চোয়ঙ্, ঈ-চিঙ্, অ-লিয়ে-পো-মোনো (A-li´-ye´-po mono), ওই-য়ে (Hoei-ye´), উ-কঙ (Ou kong), কি-ঈ

চীনবাসীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

হঙ্ কঙের একটী প্রধান খেয়াঘাটের দৃশ্য

(Ke-ye), সে-হোয়ান্ (Ts'e-hoan) প্রভৃতি ইহাদের জাজ্বল্য প্রমাণ।

প্রাচীন চীনদেশের অনেক রাজবংশের পরিচয় আমরা পাই, তাহার আভাষও আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। এই সমুদয় বংশের রাজত্বকালে তাহাদের স্বতন্ত্র শাসন-প্রণালীও ছিল। প্রাচীনকালে রাজাই পুরোহিতের কার্য্য করিতেন। এই পুরোহিত-রাজা ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া প্রজার মঙ্গলার্থে

চীনের ভূতপূর্ব্ব সম্রাজ্ঞী

আত্মদান করিতেন। এই আত্মদান অর্থাৎ প্রজার মঙ্গলে নিজেকে উৎসর্গ করা তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু তৎকালীন শাসন বিষয়ে কয়েকটী স্থানে চীনের কতকগুলি দোষ বড়ই মারাত্মক। প্রথমতঃ শাস্তির বিষয়ে কঠোরতায় চীনের মত নির্দ্দয় জাতি জগতে বিরল। তাহাদের পাশবিক অত্যাচারপূর্ণ নির্দ্দয়

চীনের বিখ্যাত অভিনেত্রী আভানা-মে-শুয়ং

হংকং বন্দর
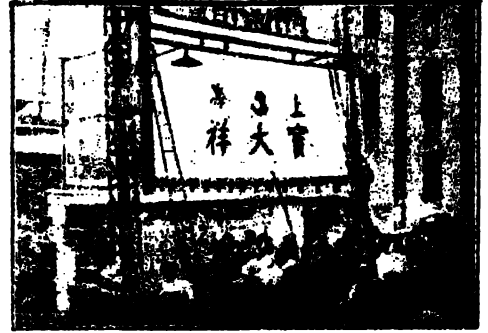
সাংহাইএর পথের দৃশ্য
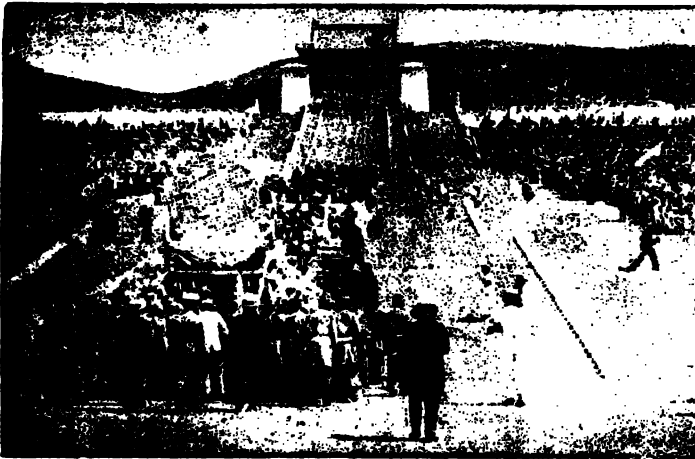
নানকিন রোডের দৃশ্য—সাংহাই

বর্ত্তমান চীনের রাজপথ

নানকিন শহরের বাহিরে সিঙ্—কবরখানার পথের দুইধারে প্রস্তর-নির্ম্মিত হস্তী

চীন-মহিলার সুতাকাটা—১নং

আবাহমান কাল হইতেই ছিল—১৯১১খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল; কিন্তু এই সময়েই কর্ম্মক্ষেত্রে সান্‌-ইয়াট সেন (Sun-yat-sen) এর আবির্ভাব হইল। সান্‌-ইয়াট-রাজতন্ত্র শাসন-শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন; তাহারই ফলে আজ প্রজা-তন্ত্র (Republican form of Government) চীনের শাসনপ্রণালী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মত চীনদেশও যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ফরাসী বণিকদের অল্পবিস্তর ক্রীড়নকরূপে পরিণত হইল, তখন সে কিন্তু তাহার জাতীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ছাড়ে নাই। সাম্রাজ্যলোভী বিদেশীয়ের সংস্পর্শে

প্রাণ-সংহা -প্রথা কোন ইতিহাসে দেখা যায় না। চীনাদের এ কর্কশ ও রূঢ় প্রকৃতি বহুদিন পর্য্যন্ত এক ভাবেই ছিল।

মু যুদ্ধের পূর্ব্বে সাঙ্‌এর অধিপতি চৌ-সিনের বিরুদ্ধে চৌ-বংশের রাজা উএর বক্তৃতায় তখনকার যুদ্ধবিস্থারও বেশ সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় (খৃষ্টপূর্ব্ব ১১৩৪-১৬)। চৌ-বংশ সম্ভবতঃ চীনের সর্ব্বপ্রাচীন রাজবংশ। উ-ওয়াঙ্‌ এই বংশের রাজা।

চীনে রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী

চীনদেশীয় পাল্কী

আসিয়াও চীন স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছে। চীনের এই শক্তির মূলে তরুণ যুবশক্তি নিহিত ছিল। নিজের কার্য্য গুছাইয়া বিদেশী যখন স্বীয় প্রসার ও প্রভাব বিস্তারে তৎপর হইল, তখন তরুণ চীন বসিয়া থাকে নাই।

চীন-মহিলার সুতাকাটা—২নং

চীনের নৌ-বিদ্যার অভাব ছিল খুবই বেশী। এই নৌ-বিদ্যা লইয়াই তরুণ-আন্দোলনের সূচনা হইল। এছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানচর্চ্চা, কলা ও শিক্ষার অভাবও ছিল। নিজেদের এই দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া চৈনিক যুবকদের মধ্যে জাগরণের চাঞ্চল্য ওঠা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

চীনের পূর্ব্বতন যুগের বিবাহের সাজ

আধুনিক বেশে চীনা রমণী—মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে

চীনের বর্ত্তমান বিবাহের সাজ

জাতীয় পতাকা লইয়া চীনের কুমিংটন সেনাদল

জাতীয় সম্পদের পরিমাণ-বর্দ্ধনের বশবর্ত্তী হইয়া জগতের আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার সহিত পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে তরুণ ছাত্র-সম্প্রদায় পাশ্চাত্যের নানা শিক্ষাকেন্দ্রে গমন করিল—ইহার পশ্চাতে রহিল চীন-গভর্ণমেণ্ট। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের অংশের ঘটনা।

উত্তর-চীনের সেনাবাহিনী পরাজিত হইয়া উনা এর নদী পার হইয়া হঙ্‌কঙ্‌ যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে
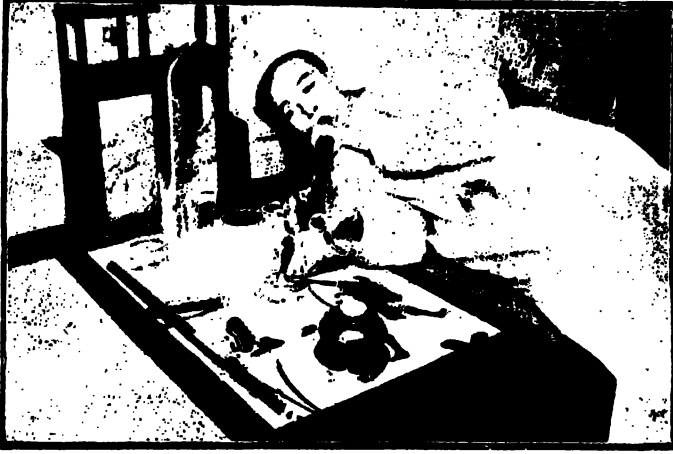
চীনা কানী-মদ্যপায়ী। কানী-পান চীনের একটী প্রধান অভিশাপ ছিল—বর্ত্তমানে ইহা চীনদেশ হইতে একেবারে দুরীভূত হইয়াছে

স্বদেশপ্রেম, জাতীয় শক্তি-পূজার উন্মাদনা যুব-সমাজে এই আন্দোলন আনিয়াছিল। ইহারই বলে তাহারা জাতীয় শক্তি দৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহারই অনুভূতি ও

চীনের জাতীয় দলের প্রচার কার্য্যের জন্য ক্যান্টনের ঘরের ভিতর চীনা ভাষায় উপদেশানুযায়ী লিখিয়া রাখা হইয়াছে—এইরূপভাবে চীনের সকল স্থানে প্রচার-কার্য্য চালান হয়।

বর্ত্তমান রুচিসঙ্গত চীনা রমণীর বেণী রচনা—চীনরমণীগণ চুলের খুব যত্ন লয়। উহারা চুলকে গৌরবের বস্তু মনে করে। ইহাদের চুল বাঁধিবার কোন বিশেষ ধরণ নাই—যে যার নিজ নিজ রুচিসঙ্গত চুল বাঁধে। চীন-সভ্যতার প্রাচীনতার ন্যায় চীন মহিলার বেণী-রচনাও খুব প্রাচীন।

অনুরাগের অনুকম্পায় বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, সাহিত্য, কলা ও শিল্পে চীনা-জাতির জীবনে নূতন যুগের অবতারণা হইয়াছে।

বিদেশীর নানা আঘাতে চঞ্চল হইয়া চীনের সুপ্তশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই আঘাত না লাগিলে তরুণের জাগ-

সাংহাইয়ে ফরাসীর এলাকা
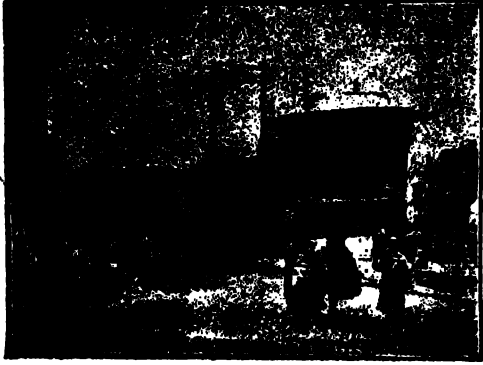
রণ হইতে কি না বলিতে পারি না। অত্যাচার জীবকে সজীব করিয়া তুলে, লাঞ্ছনা শক্তি দেয়।

চীনে গণতন্ত্রের প্রথম সাড়া উঠিয়াছিল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। আমেরিকায় শিক্ষারত চৈনিক-যুবকবৃন্দের তত্রত্য প্রজাতন্ত্র-ভাবধারার সহিত পরিচিত হইয়া ফিরিলে চীন-গভর্ণমেণ্ট সাংহাই পরীক্ষাগার অবরোধ করিয়া তাহাদের উপর নৃশংস
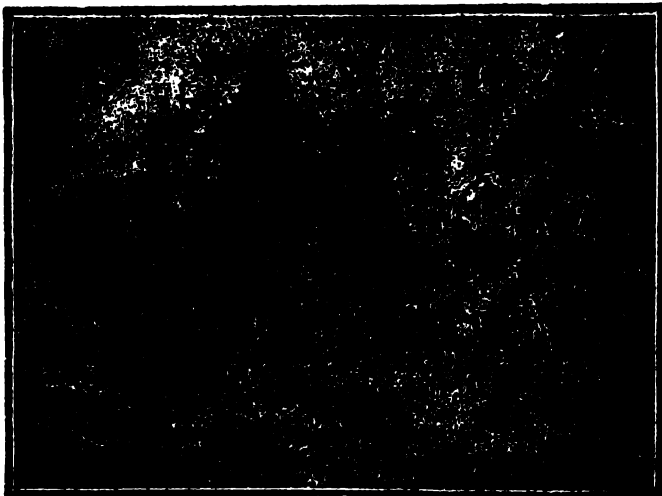
চীনের জাতীয় সেনাদল নানকিনের ভিতর দিয়া যাইতেছে

অত্যাচার ও হত্যা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে দেশে ভীষণ আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। ফলে স্বাধীনচেতা ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বিদ্বেষ ও ক্রোধাগ্নির সৃষ্টি হইল এবং

জাতীয় সেনাদলের নেতা চাং-কাই-শেক্ সেনাগণের সম্মুখে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিতেছেন

চীন ও রুষিয়ার সীমান্তে চীনের ইষ্টার্ণ রেলওয়ে সম্পর্কে বিবাদের সময় পাশ্চাত্য শিক্ষিত চৈনিক সেনাদল

একটী নূতন বিপ্লবীদলের প্রতিষ্ঠা হইল। এই গুপ্ত বিপ্লবীদলের নেতা হইলেন মনীষী ডাক্তার সান্-ইয়াট্। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সান্-ইয়াটের সাধনা সফল হইল।

যদিও সান্-ইয়াট জয়লাভ করিলেন বটে কিন্তু উত্তর-চীনের প্রবলপরাক্রান্ত সেনানায়ক ওয়াম্-সি-কাই তাঁহার
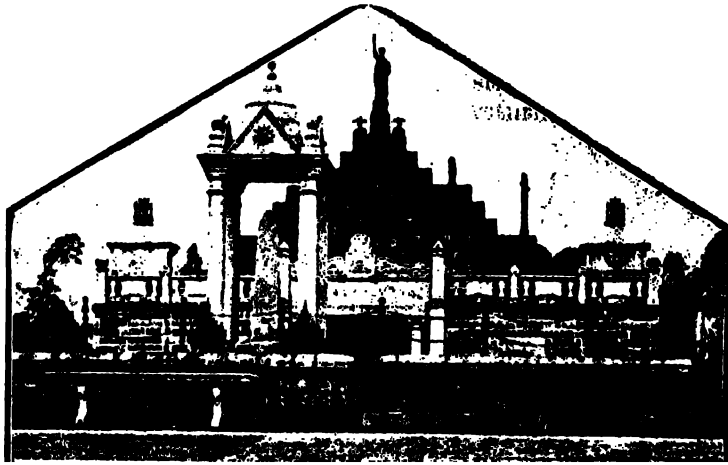
গণতন্ত্র আন্দোলনে ৭২ জন বীরের স্মৃতিরক্ষার জন্য ক্যান্টন নগরের স্মৃতিস্তম্ভ

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন; তবে চীন-গণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হইবার আশ্বাস পাইয়া তিনি মিত্রতা করিলেন। চীন-গভর্ণমেণ্ট সান্-ইয়াটের হস্তগত ছিল, সুতরাং তাঁহার সাহায্যে অতঃপর উত্তর-চীন জয় করিয়া সান্-ইয়াট প্রেসিডেণ্ট হইলেন ও শাসন-পদ্ধতির সংস্কার করিলেন। চীনে নূতন যুগের অবতারণা হইল।

আজ চীন জগতের শ্রেষ্ঠ স্বাধীন জাতিগুলির মধ্যে অন্যতম। জগতের সভ্যতায় সেও অংশীদাররূপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-গরিমায়, কারুশিল্পে পূজায় ডালি তুলিয়া ধরিয়াছে।

মিস্ ডলী লিম্—ইনি সাংহাইএর পক্ষের যুদ্ধ বেতার-বার্ত্তা পাঠাইয়াছিলেন

অভিনেত্রী

(গল্প)

শ্রীমনোজ গুপ্ত

বেলা প্রায় আড়াইটে। আষাঢ়ের রোদ—জ্বলন্ত হাওয়ায় গা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মত রাস্তায়ও বড় একটা লোক দেখা যায় না। রাস্তার পিচ্ গিয়েছে গলে—মোট-বোঝাই গাড়ী নিয়ে যেতে যেতে গরুগুলোর পায়ের লোহার নাল যায় গলা পিচে আটকে—চলতে পারে না। গাড়োয়ান দেয় তাড়া—লোহার নাল ছিঁড়ে যায়—তবু তাকে চলতে হয়। এমনি পথে চলছিল সুব্রত। সকালে বেরিয়েছিল চেনা লোকের কাছে সাহায্যের জন্যে। বেলা দশটা থেকে 'ষ্টেটশম্যানের' বিজ্ঞাপনের 'কর্ম্মখালীর' স্তম্ভগুলা দেখে ঘুরেছে যত অফিসে। রোজ যেমন হয় আজও তেমনই সে ভাবলে, 'বাড়ী তো যাব কিন্তু খাব কি আর খাওয়াইবই বা কি ?' এক একবার মনে হত, দেয় জীবনটা শেষ করে কিন্তু পারত না। সে না হয় অভাবের তাড়না থেকে মুক্তি পেলে কিন্তু তার মুখ চেয়ে যারা আছে তাদের অবস্থা কি হ'বে? রোজ সকালে উঠে ভাবে আজ একটা কিছু বোধহয় হ'বে কিন্তু এ দু'বছরের মধ্যে কিছু হ'ল না। বি-এ কি এম্-এ পাস করেও লোক একটা চাকরী জোটাতে পারে না; সে তো মাত্র আই-এস্-সি পর্য্যন্ত পড়েছে। তাকে চাকরী দেবে কে? সে ছেলে ছিল বেশ ভালই! তার বাপ্ আশা করেছিলেন, সে উন্নতি করবে—হয় তো করত—যদি না অসময়ে বাপ্ তার ঘাড়ে মা আর বোনকে ফেলে দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করতেন। সে কিন্তু একটুও দমে নি! তার নিজের ওপর ছিল অগাধ বিশ্বাস—তাই বাপ্ মারা যেতে সে বড় জোর করেই বোনকে বলেছিল, 'ভয় করিস নে বোন; তোর ভাই অন্ততঃ মোট বয়েও তোদের বাঁচাতে পারবে।' কিন্তু দু'বছরের এই নিষ্ফলতায় তার নিজের ওপর সে বিশ্বাস চলে গেছে। সে বেশ বুঝেছে যে, মোট বয়ে সত্যই সংসার চালাতে বাঙ্গালীর ছেলে পারে না—আর অন্য কোন উপায়ও চোখে পড়ে না। বাঙ্গালী যেন ভগবানের একটা অভিশাপের মতই আজ ভারতবর্ষে বেঁচে রয়েছে—তার বাঁচবার যেন কোনই দরকার নেই—বোধহয় অধিকারও নেই।

বাড়ী ঢুকে সুব্রত ডাকল, "মা"; তার ছোট বোন শোভা এসে দাঁড়াল। শোভা বল্লে, "আজ তোমার এত দেরী কেন দাদা? সেই কোন সকালে বেরিয়েছিলে! এ রকম করলে কতদিন খাটতে পারবে?"

"এতেও তো ভাই আজ দু'বছরের মধ্যে কিছু হ'ল না। রোজ সকালে যে ক'টা চাকরির খবর পাই, সব জায়গাই যাই; কিন্তু একটা না একটা বাধা পড়েই। আর এরকম করে ক'দিন চলে বল্?"

"অত ভাবছ কেন দাদা? সত্যিই কি আর এমনিই হ'বে? ভগবান তো আছেন।"

"তোর ঐ কথাটা বাদ দিয়ে আর সব কথাই মেনে নিতে পারি বোন। যেদিন তিনজনে একসঙ্গে না খেতে পেয়ে কুঁকড়ে মরে থাকব, সেদিনও বোধহয় তোর ভগবানের থাকার কোন ব্যাঘাত হ'বে না।"

শোভা আর কোন কথা বললে না। এইখানে তার দাদার সঙ্গে তার মেলে না।

শোভা ছিল সুব্রতের দুঃখের জীবনে একমাত্র শান্তি। মায়ের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মেজাজটা পাল্লা রেখে চলে আজ এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে তিনি এই দুঃখের দিনেও সুব্রতকে যখন-তখন তার অকর্ম্মণ্যতা-সম্বন্ধে সচেতন করে দেন। শোভা যতটা পারে সুব্রতকে এ থেকে বাঁচিয়ে চলে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর শোভা সুব্রতের কাছে বসে জেনে নেয়, সে কোথায় কোথায় গিয়েছিল, এমন কি, কে কি বল্লে। দৈনন্দিন নিষ্ফলতার দুঃখের অংশ নেবার একজন ...ী আছে দেখে সুব্রত অনেকটা সান্ত্বনা পায়। একদিন সে বলেছিল, 'দেখ্ শোভা তুই যদি না থাকতিস্

তা হ'লে এতদিন আর আমার অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যেত না।

খেয়ে উঠেই সুব্রতকে জামা গায়ে দিতে দেখে শোভা বল্‌লে, "এর মধ্যে চলেছ কোথায় ?"

"আজকের কর্ম্মভোগের এখনও একটু বাকি আছে সেটা সেরে আসতে যাচ্ছি।"

"আর একটু পরে গেলে হ'ত না ?"

"এ সময় ভিন্ন তাদের আর আজ দেখা পাওয়া যাবে না।"

* * *

সুব্রত চলেছিল একটা থিয়েটারে; যাদের সংস্পর্শে কোন দিন আস্‌তে হ'বে বলে সে কল্পনাও করতে পারে নি, আজ তাদেরই কাছে চলেছে ভিক্ষের জন্যে। তা'ছাড়া কি ? তারা যদি দয়া করে একটা চাকরি দেয় তা হ'লে সে খেতে পাবে। এ-কথা ভাবতেও তার অন্তর তিক্ত হ'য়ে ওঠে কিন্তু উপায় নেই।

সুব্রত গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে। হুকুম হ'ল তাকে ভিতরে নিয়ে যাবার। তখন মহলা চলছে। সুব্রত তা জান্‌ত না। জান্‌লে সে বোধ হয় যেতে রাজি হ'ত না। সে ম্যানেজারকে নমস্কার করে বল্‌লে, "আপনি লোক নেবেন শুনলাম—"

ম্যানেজার তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লেন, "হাঁ নেব। আপনার qualification কি ?" (গুণের পরিচয় চাই)

"আমি আই এস্‌-সি পর্য্যন্ত পড়েছি।"

"উপাধিধারী হ'লেই ভাল হ'ত। তা' যা'ক আপনি হ'লেও চলবে। তা বেশ আপনি কবে থেকে কাজে আস্‌তে পারেন ?"

সুব্রত আশা করে নি যে, এত সহজে চাকুরি জুটে যাবে। সে বল্‌লে, "বলেন তো আজই আসতে পারি।"

"বেশ, তা হ'লে আপনি জামিনটা নিয়ে আসবেন। নিয়োগপত্র লিখে দেব।"

"জামিন ? কি জামিন দিতে হ'বে ? সে কথা তো কিছু লেখা ছিল না !"

"না লেখা হয় নি; তবে cashএর (টাকার) কাজে যে জামিন দিতে হয় এ কথা কি আপনার জানা নেই ? হাজার টাকা জামিন দিতে পারবেন"

"হাজার টাকা জামিনই যদি দিতে পারব তা হ'লে আর চাকরি করতে আসব কেন ?"

"তবে কি করবেন ? টাকা দিতে পারেন তো আপনার চাকরি হ'তে পারে।"

"দেখুন আমার এমন অবস্থা নেই যে, অত টাকা দি। আমার সম্বন্ধে যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয় তা হ'লে দু'এক জন বড় লোকের প্রশংসাপত্র (certificate) আমি এনে দিতে পারি। আমার মনুষ্যত্বের বোধ হয় কিছু দাম থাক্‌তে পারে ?"

"মনুষ্যত্বের দামটা বাজারে এক পয়সাও নয় ! যাক্‌, আপনি কোন লোকের কাছ থেকে ঐ টাকা নিয়ে জমা দিতে তো পারেন !"

"আজ দু' বছর অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়ে চলেছি কিন্তু ধার করি নি। ওটা আমি কিছুতেই পারি না।"

এক বছর আগেও সুব্রত নিজের অভাবের কথা কোন লোককে এত স্পষ্ট করে বলতে পারে নি। তার আত্ম-মর্য্যাদায় বাধ্‌ত; কিন্তু আজকাল বলে—বেশ সহজেই। পিছন থেকে কে বল্‌লে, "আপনার বাড়ীতে আছেন কে কে ?" সুব্রত ফিরে দেখ্‌লে একজন মহিলা—তিনি যে একজন অভিনেত্রী এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহই ছিল না। তাই তার কথা শুনে একটু বিব্রত হয়ে পড়্‌ল। ম্যানেজার বল্‌লেন, "কি সন্ধ্যা তুমি যে হঠাৎ ? এখন তো আস্‌বার কথা ছিল না ! কতক্ষণ এসেছ ?"

"তা অনেকক্ষণ, এই আপনাদের কথা শুনছিলাম।" তার পর সুব্রতের দিকে ফিরে বল্‌লে, "যদি কেউ আপনার হ'য়ে টাকা দিয়ে দেয় তাতে তো আপনার আপত্তি আছে, কিন্তু যদি কেউ 'মনুষ্যত্বের বাজারে এক পয়সাও দাম নেই জেনেও,' আপনার মনুষ্যত্বের জামিন হয় অবশ্য টাকা না দিয়ে, তাতে আপনার কিছু আপত্তি আছে ?"

সুব্রত কোন উত্তর দিতে পার্‌ল না; কিছুক্ষণ নির্ব্বাক-বিস্ময়ে সন্ধ্যার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ম্যানেজার বল্‌লেন, "কে জামিন হ'বে সন্ধ্যা ?"

"কেন ? আমিই হ'ব ! কোনদিন কোন মানুষকে

এত জোরের সঙ্গে নিজের মনুষ্যত্বের গৌরব করতে দেখি নি, তাই ওটা যে থাকা সম্ভব তা ভুলে গিয়েছিলাম। একবার বিশ্বাস করেই দেখি না! জীবনে কোনদিন কাউকে বিশ্বাস করি নি। আর যদিই দু' এক হাজার টাকা যায় তাতেই বা কি?"

সুব্রত তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার একবারও মনে হল না যে, সন্ধ্যা অভিনেত্রী। সে তার মুখের ওপর দেখ্‌লে বিশ্ব-নারীর নারীত্বের—মাতৃত্বের ছায়া। বললে, "আপনি তো আমার কোন পরিচয়ই পান নি মা; তবে কি করে আমার জন্যে জামিন হ'তে চাইছেন?"

"এ কথার জবাব তো তোমার নিজের কথাতেই আছে; যখন 'মা' বল্‌লে তখনই তোমার মনে হওয়া উচিত ছিল, মায়ের কাছে ছেলের পরিচয় অজানা থাকতে পারে না।"

সুব্রতকে ম্যানেজার বিনা জামিনেই চাকরীতে বাহাল করতে বাধ্য হ'লেন—কারণ সন্ধ্যার ইচ্ছা। সুব্রত চলে গেলে তিনি বল্‌লেন, "কি সন্ধ্যা, হঠাৎ যে 'মা' হ'বার সখ্‌ হল?"

"এতদিন যে হয় নি এটাই কি আশ্চর্য্যের কথা নয়? ওটাতে যে আমাদের জন্মগত দাবী!" এই বলে সে চলে গেল।

* * *

সুব্রত বাড়ী এসে শোভাকে সব কথা বল্‌লে। শোভা বল্‌লে, "তোমার পথে-পাওয়া 'মা' যা' উপকার করলেন, তোমার নিজের মা-বোন কোনদিন সে উপকার কর্‌তে পার্‌বে না।"

"কিন্তু থিয়েটারের সম্পর্কে কোন কাজ কর্‌তে যে ইচ্ছা হয় না!"

"কেন দাদা? তুমি তো আর থিয়েটার কর্‌বে না! যে কোনদিন আগুনের কাছে ঘেঁসে না, সে বড়, না যে আগুন নিয়ে খেলা করে অথচ তার গায়ে আগুনের আঁচ্‌ পর্য্যন্ত লাগে না, সে বড়?"

সুব্রত এ কথার কোন উত্তর দিল না, কারণ উত্তর দেবার কিছুই ছিল না।

* * *

সুব্রত রোজ তার কাজে যায়; কাজ হ'য়ে গেলে বাড়ী ফিরে আসে। কোনদিন 'প্লে' (অভিনয়) বা 'রিহার্সেল' মহলা দেখ্‌তে যায় না। দেখ্‌বার তার কোন আগ্রহও নেই।

সেদিন সকালে কাজের কোন ভিড় ছিল না। সে বসে একটা কাগজ পড়ছিল। হঠাৎ ফোনের ঘণ্টাটা বেজে উঠল। তুলে নিয়ে সে জিজ্ঞাস করলে, "কে আপনি?"

"তুমি সুব্রত?"

"হাঁ, আপনি কে?"

"গলা শুনে বুঝতে পার্‌লে না? বেশ ছেলে তো তুমি? আজ পর্য্যন্ত কোনদিন আর তোমার চুলের টিকিটী পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় না। তোমার 'মা' তোমায় দেখ্‌তে চায়, এক্ষুনি এস।"

সুব্রত একবার মনে কর্‌লে, 'যাব না; কাজ বেশী ছিল বলে কাটিয়ে দেব।' কিন্তু তখনি তার মনে হ'ল, 'না যাওয়াটা দুর্ব্বলতা—যাবে না কেন?' টেলিফোন-ডিরেক্টারী থেকে সন্ধ্যার বাড়ীর ঠিকানাটা দেখে নিয়ে সে চল্‌ল।

সন্ধ্যার বাড়ী গিয়ে পৌছিতেই সে বল্‌লে, "তোমার কাজের ক্ষতি হ'ল?"

"না, আমি বাড়ী যাবই মনে কর্‌ছিলাম। আজকে সকাল থেকেই কোন কাজ ছিল না।"

"আচ্ছা তোমায় তো সেই প্রথম দিন ছাড়া আর দেখি নি? রোজ আস তো?"

"হাঁ, রোজই আসি।"

"রোজ আস অথচ একদিনও দেখা কর না! সেদিন তা হ'লে যে 'মা' বলেছিলে সেটা কথার কথা!"

"তা হ'লে আপনি তো যে 'ছেলে' বলেছিলেন সেটা শুধু কথার কথা! আপনিও তো রোজ যান, কোনদিন কি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন? মা ডেকে পাঠালে ছেলে কি না গিয়ে থাকতে পারত!"

"আমি যে সেদিন কথার কথা বলি নি তার প্রমাণ এই যে, সেইদিনই 'আপনার' পর্দা থেকে 'তুমি'র পর্দায় নেমে আস্‌তে পেরেছিলাম। 'আপনি'র গণ্ডীর সীমা ডিঙিয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে বড় সোজা কাজ নয়।"

"ওটা আমার একটা বদ্ অভ্যাসের মত হ'য়ে গেছে ; টপ্ করে ছেড়ে দিতে পারি না।"

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়ায় সন্ধ্যা বল্লে,"ভারি অন্যায় হয়েছে। এত বেলায় তোমায় ডাকতে পাঠান। কখন বাড়ী যাবে, কখনই বা খাওয়া-দাওয়া করবে ?"

"দু'বছর চাকরির চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে আর কিছু হোক্ না হোক্, কিছুক্ষণ না খেয়ে থাকার অভ্যাসটা খুব হ'য়ে গেছে।"

একটী চাকর একটা ছোট রেকাবীতে গোটাকতক সন্দেশ এনে সুব্রতর সাম্নে রেখে গেল। সন্ধ্যা বল্লে, "এক গ্লাস জল ঢেলে নাও বাবা।"

সুব্রতের মনে হ'ল সন্ধ্যা তাকে নিজে হাতে জল দিতে চায় না তাই তারও জেদ হ'ল ওঁর হাত থেকেই জল নেবে। সে বল্লে, "আপনিই দিন।"

সন্ধ্যা মহাসমস্যায় পড়্ল। কি বলে ? সে যে কেন তাকে নিজে জল নিতে বল্লে তা তো তাকে বল্তে পারবে না!

সুব্রত বল্লে,"লোকের বাড়ীতে গেলে কখন কেউ নিজে জল গড়িয়ে নিয়ে খায় ?"

"পরের বাড়ীতে গেলে নেয় না বটে, কিন্তু নিজের বাড়ীতে নিজের মার কাছে এলে নেয়।"

"মা যদি কোন কাজে ব্যস্ত থাকেন তা হ'লে নেয়।"

সন্ধ্যা বুঝ্ল তার এই জেদী ছেলে সুব্রত কথা ফেরাবে না। সুব্রত যত সহজে বললে, সন্ধ্যা তত সহজে দিতে পার্ল না সে যে নিজেকে মা বলেছে! কি করে বলে আমি তোমায় জল দিতে পারব না ? কিন্তু তাকে যে বল্তেই হ'বে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে নিয়ে সে বল্লে, "আমি কি, তা তো তুমি জানো বাবা! তবে কেন জোর কর্ছ ?" গলাটা তার বড্ড ভারী।

সুব্রত বল্লে, "হাঁ জানি তুমি কি! যেদিন প্রথম তোমায় দেখেছি সেইদিনই জেনেছি যে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নারী যারা তারাও যা তুমিও তাই—তুমি আমার মা।"

সন্ধ্যার চোখ ভিজে গিয়েছিল, সে উঠে গিয়ে সুব্রতকে জল এনে দিলে।

*　　*　　*

সন্ধ্যার অনুরোধে সুব্রতকে প্রায়ই সন্ধ্যার বাড়ীতে যেতে হয়। আগের অভ্যাস মত এখনও শোভার কাছে প্রত্যেক দিনের সব কথা তাকে বলে। একদিন শোভা বল্লে, "দাদা তোমার মাকে আমার একদিন দেখ্তে ইচ্ছে করে।"

"দূর পাগ্লী, আমার 'মা' কি তোর 'মা' নয় রে ? আমি জানি তোকে দেখ্লেও তিনি আমারই মত আপনার করে নেবেন ; কিন্তু তাঁর সঙ্গে তোর দেখা হয় কি করে বল ? তাঁকে তো আর এখানে আনা যায় না।"

"বেশ তো আমিই না হয় তোমার সঙ্গে একদিন যাব

"সেটা কি ঠিক হ'বে ?"

"তুমি থাক্বে তো, তবে অন্যায় হ'বে কেন ?"

"আচ্ছা তাঁকে বলে দেখি।"

*　　*　　*

সুব্রত একদিন সন্ধ্যাকে বল্লে, "শোভা একদিন আস্তে চায়।" সন্ধ্যা প্রথমে আপত্তি করেছিল কিন্তু শোভাকে দেখ্বার ইচ্ছে তারও খুব ছিল ; তাই বললে, "একদিন ক্ষাণিকক্ষণের জন্যে তাকে নিয়ে এস।"

দু'দিন পরে সুব্রত শোভাকে নিয়ে এল সন্ধ্যার বাড়ী— শোভা তার মাকে বলে এল সে চলেছে তার এক বন্ধুর বাড়ী। শোভাকে দেখে সন্ধ্যা বল্লে, "এমন বোন না হ'লে কি এমন ভাই হয় ?"

সুব্রত বল্লে, "ঠিক হ'ল না মা ; তোমার বলা উচিত ছিল, 'এমন ভাই না হ'লে কি এমন বোন হয়' ; কারণ আমার দেখে ওতো গড়ে উঠেছে, আমি তো আর ওর দেখে হই নি !"

"ভুল সুব্রত, ও তোমার পরে এসেছে বটে কিন্তু তবু তুমিই ওর দেখে এমনটা হ'তে পেরেছ।"

শোভা বল্লে, "তা হোক্ আর না হোক্, তুমি কিন্তু এ 'মা'কে পাওয়ার জন্যে আমার কাছে অনেক ঋণী। তখন তো চাকরীই নিতে রাজি হও নি।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা কর্লে, "কেন বল তো মা ?"

"ওঃ, থিয়েটারের ওপর দাদার যা রাগ !"

"তাই সুব্রতকে কোনদিন থিয়েটারের ভেতরে দেখা যায় না! সত্যি যারা থিয়েটার করে তাদের মধ্যে হীনতাটা এত বেশী যে, অনেক সময় তাদের নিজেদের চোখেও সেটা ধরা পড়ে।"

"আমারও আগে ঠিক এই ধারণাই ছিল মা, কিন্তু তোমাকে দেখে পর্য্যন্ত আমার সে ধারণাটা অনেকটা গেছে।"

"তা হ'লে তুমি থিয়েটার দেখ না কেন?"

"ওর মধ্যে যেটুকু অসুন্দর, আমার চোখে সেইটাই আগে পড়ে, তাই ওথেকে দূরে থাকি।"

* * *

কিছুদিন পরে ম্যানেজার সন্ধ্যাকে বল্লেন, "তুমি যখন-তখন সুব্রতকে ডেকে পাঠাও তাতে আমাদের কাজের ক্ষতি হয়। তোমার খাতিরে পড়ে ওকে নিয়েছি, কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে চলবে কেন? আর তোমার এ মা-গিরি চল্‌বে কতদিন?"

"সে কথা জান্‌তে চাইবার কোন অধিকার আপনার নেই?"

"তাই না কি? তা বোধ হয় একটু থাক্‌তে পারে।"

"না পারে না; কারণ আপনার চাকরিতে আজ থেকে আমি ইস্তফা দিচ্ছি।"

"তুমি ইস্তফা দিলেই আমরা তোমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য নই, তা বোধ হয় তোমার জানা আছে! বাকী যে ক'মাসের চুক্তি আছে সে ক'মাস আইনের জোরে কাজ করাতে বাধ্য করতে পারি।"

"সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখবেন যে, ঐ চুক্তির বলে নূতন বইএর চতুর্থ রাত্রির বিক্রীর চার ভাগের এক টাকা আমার হ'ল পাওনা—আজ পর্য্যন্ত তা কি আমাকে দিয়েছেন, না আমি তা কোনদিন চেয়েছি! সেটা আদায় কর্‌তেও পারি।"

এর পরে ম্যানেজারের আর কথা বলবার মত সাহস হ'ল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন, "বেশ যাও—কোথায় যাচ্ছ জান্‌তে পারি কি?"

* * *

সেদিন সুব্রত তার কাজ করতে আরম্ভ করছে এমন সময় ম্যানেজার তাকে ডেকে পাঠালেন। সে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে বল্লেন, "আপনার কাজে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হ'তে পারি নি; তবে সন্ধ্যার জন্যে আপনাকে রাখ্‌তে বাধ্য হয়েছিলাম। সে যখন চাকরি ছেড়ে দিলে তখন আপনাকে আর কি করে রাখি বলুন?"

"বেশ আমার কাজ বুঝে নিন্‌।"

ম্যানেজারকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে সুব্রত গেল সন্ধ্যার কাছে। সন্ধ্যা তাকে দেখেই বল্লে, "এই দেখ, আমি এখুনি ভাব্‌ছিলাম তোমায় ফোন করব; তোমায় ভয়ানক দরকার ছিল।"

"আমিও একটা ভয়ানক দরকারেই তোমার কাছে এসেছি মা! চাকরি ছাড়লে কেন?"

"দুই সন্ধ্যায় ঝগড়া বেধেছিল; তার মধ্যে একজন সুব্রতর মা—সন্ধ্যা; আর একজন অভিনেত্রী সন্ধ্যা; সুব্রতর মায়ের জিত হল, তাই অভিনেত্রীকে পালাতে হ'ল। যাক্‌ সে কথা; সংসারে থাক্‌তে হ'লে পয়সা চাই ও কাজ যখন করবই না তখন পেট চালানর জন্য আমি এখন কারখানা খুলব স্থির করেছি। তুমি আমার সাহায্য করতে পারবে?"

"আমি তো ও কাজ কিছুই জানি না!"

"ও কাজ জানবার তোমার কোন দরকার নেই; দরকার একটু বুদ্ধির; তা তোমার আছে আমি জানি! তুমি কেবল কাজ চালাবার ভার নাও।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কি? চাকরি তো তুমি করবেই তা না হয় আমারই কাছে কর না! জান তো আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, এখন এটা সুরু করলে আমার সে ক্ষতিটা বোধ হয় পুষিয়ে যাবে।"

সুব্রত বেশ বুঝতে পারল যে, সন্ধ্যা চায় তাকে সাহায্য করতে; পাছে সে নিতে রাজি না হয় তাই এ পথ তাকে অবলম্বন করতে হয়েছে। প্রথম যেদিন সে সন্ধ্যাকে দেখে সেদিন হ'লে এ সাহায্য নিতে সে পারত না; কিন্তু আজ তার কোন বাধা মনেও এল না। সে শুধু ভাবছিল, লোকের চোখে তুমি একজন সামান্য নটী; কিন্তু সাধারণ নারী থেকে তুমি কত উঁচুতে! আমার সঙ্গে তোমার কতটুকু পরিচয়, অথচ আমারই মাতৃত্বের দাবীতে কতটা ত্যাগ স্বীকার করলে! এতো আমার নিজের গর্ভধারিণী মার কাছে আমি আজও পাই নি।

রাজী হইয়া সুব্রত সেদিনের মত বিদায় লইল।

* * *

সুব্রত বাড়ীর দিকে চলেছিল, শোভাকে সব কথা জানাবার জন্যে কিন্তু বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতে তার মুখের দিকে চেয়ে

শোভা দাদাকে শিউরে উঠে বললে, "কি হয়েছে তোমার ?"

"কেন ? কি আবার হ'বে ?"

"অত মুখ ভার করে আছ ? ওটা যে তোমার স্বভাব-বিরুদ্ধ।"

"স্বভাব-বিরুদ্ধ জিনিসও অনেক সময় স্বভাব-সিদ্ধ হ'য়ে যায়।"

"থাক্, তোমার আজ যে এত দেরী ?"

"আরও কিছুক্ষণ দেরী করে এলেও বোধ হয় অসন্তুষ্ট হ'বার কারণ ঘটত না।"

"তার মানে ?"

"তার মানে এই যে, দুর্ভাগ্যটাকে যত ঠেলে রেখে দেওয়া যায় ততই ভাল।"

"আমার তো মনে হয় ঠিক তার উল্টো ; দুর্ভাগ্যটাকে যত তাড়াতাড়ি বাগে আনা যায় ততই ভাল। সে তো হ'ল, কিন্তু দুর্ভাগ্যটা কি বল শুনি।"

"চাকরি গিয়েছে ; কেন জানিস ? মা' দিয়েছেন চাকরি ছেড়ে—তাঁর মতে সুব্রতর মা হ'তে গেলে,নটী হওয়া চলে না।"

"এ আর এমন কি দুর্ভাগ্য ? চাকরি গেছে, আবার হ'বে।"

"হ'বে কেন—হয়েছে, অর্থাৎ মা দিয়েছেন। তিনি দেখ্‌লেন যে ছেলের এমন যোগ্যতা নেই যে চাকরি যোগাড় করে নেয় ; অথচ 'সাহায্য নেব না' বলবার মত আত্মগৌরবটা আছে, তাই তাঁর খেয়াল হয়েছে একটা কারখানা খুলবেন—আমি তার ম্যানেজার হ'ব।"

"তা'ত হ'ল, কিন্তু এদিকে এক মহা গোল বেঁধেছে। নীরেনদার মা এসে মাকে বলে গেছে, তুমি না কি নিজে থিয়েটার কর ; যখন তখন সন্ধ্যার বাড়ী যাও ; আমিও গিয়েছিলাম ; এই সব কত কি ! মা আজ চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করেছেন।"

"তা আজ থেকেই তো জান্‌তে পারবেন চাকরি আমার গেছে।"

"তাতে বিশেষ সুবিধা হ'বে না কারণ তোমাকে তো তোমার মা'র বাড়ী প্রায়ই যেতে হ'বে।"

"সে তো হ'বেই, তাতে হ'য়েছে কি ? 'মা' বলে ডেকেছি—"

"কিন্তু মা তা—"

"বুঝতে চান না, এই তো ? তুই তা হ'লে সব কথা বলেছিস ?"

"হাঁ দাদা, বলেছি ; তাতে ফল হ'ল এই যে মা তাঁর নিজের মেয়েকে যা' ইচ্ছে বল্‌তেও একটু দ্বিধা বোধ করলেন না।"

"কি করব বোন ? দিনকতক একটু শান্তিতে ছিলাম, তাও অদৃষ্টের পরিহাসে সইল না।"

"মা যে চট্‌বেন এ তো জানা কথা ! শুধু মা কেন, পৃথিবীর অনেকেই চট্‌বে—এমন কি ক'দিন আগেকার সুব্রত থাক্‌লে সেও বোধ হয় বিশেষ সন্তুষ্ট হ'ত না।"

শোভা চুপ করে রইল, কোন কথা বল্‌তে পারলে না।

* * *

সন্ধ্যার কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা যখন তার সহকর্মীদের মধ্যে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল তখন অনেকেই হাসলে—তার দুর্বুদ্ধি দেখে কেউ কেউ ঠাট্টা করতেও ছাড়লে না। তাদের মধ্যে একজন তার বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করলে—তার ভুলের কথা জানিয়ে দিতে। সে বললে, "কি সন্ধ্যা, 'ছেলের' কথায় যে একেবারে চাকরি ছেড়ে দিলে ! বলি এও কি অভিনেত্রী সন্ধ্যার আর নতুন অভিনয় না কি ? সত্যি কথাটা কি বল তো।"

সন্ধ্যা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বললে, "যাও ! তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই না ! হীনতার মাপকাঠি দিয়ে পৃথিবীর সব জিনিস মাপা যায় না।"

* * *

সুব্রত আর বেশী রাত পর্য্যন্ত বাইরে থাকে না দেখে তার মা'য়ের ভারি একটা গৌরব বোধ হ'ল। তিনি ভাব্‌লেন, লোকে বলে ছেলে বড় হ'য়ে গেলে আর মা-বাপের শাসন মানে না, এই তো কেমন এক ধমকে সিধে হ'য়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন না যে সুব্রত বহুদিন তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। এবার শোভা গেল তার কাছ থেকে তার দাদার কাছে। অন্তর চায় আন্তরিকতা ; দুঃখ চায় সমবেদনা—অন্তর আঘাত চায় না ; তাতে আহত হৃদয় শুধু রক্তাক্ত হ'য়ে ওঠে।

* * *

সন্ধ্যার কারখানা আরম্ভ হয়ে গেছে। এত তাড়াতাড়ি যে হ'বে তা সে ভাবতেও পারে নি কিন্তু তার অর্থের আর সুব্রতের পরিশ্রমের অপ্রাচুর্য্য হয় নি, তাই অল্প ক'দিনের মধ্যে কারখানার কাজ সুরু হ'ল। সুব্রত হ'ল ম্যানেজার কিন্তু সে তাদের ইঞ্জিনীয়ারের কাছে রীতিমত কাজ শিখতে লাগল। এতে তাকে খাটতে হ'ত খুব বেশী, কিন্তু তাতে সে বেশ আনন্দ পেতে লাগল।

সুব্রতের মা যখন বুঝলেন সুব্রত থিয়েটারের চাকরি ছেড়ে কোন কারখানার কর্ত্তা হয়েছে তখন তাঁর খেয়াল হ'ল ছেলের বিয়ে দেবার। সে জন্যে তিনি একটু বেশী রকমে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। তাঁর প্রধান ভয়, ছেলে একবার বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল, যদি আবার যায়। বাঙ্গালীর ছেলের জন্যে মেয়ের অভাব আজও হয় নি; তা' সে ছেলে যাই হোক না কেন! সুব্রতও তো ভাল ছেলে—রোজগার করছে। তার মা এক জায়গায় বিয়ের প্রায় সব ঠিক করে ফেললেন। সুব্রতের হ'ল মহা বিপদ। বিয়ে যে সে করতে অরাজি তা নয়, তবে সে এমন মেয়ে বিয়ে করতে চায় যে, তার মত সন্ধ্যাকে মা বলে গ্রহণ করতে পারবে। সে শোভাকে বললে, "কি করি বোন?

"কেন বিয়ে করতে তোমার আপত্তি কি?"

"আপত্তি বিয়ে করতে নেই বটে তবে সে যদি আমার নূতন মাকে ঠিক আমারই মত মেনে নিতে না পারে?"

"পারুক আর না পারুক তাতে কি এসে যায়? তাকে জানাবার বিশেষ কি দরকার?"

"তা হয় না বোন। জানাতে তা'কে হ'বেই। যার সঙ্গে সারা জীবন থাকতে হ'বে তাকে আমার জীবনের এ কথাটাও জানাতে হ'বে। কিন্তু আমি চাই আগে জানাতে; যদি কেউ তাতে রাজি হয়, আমি তাকে বিয়ে করতে পারি।"

"আমার সন্দেহ হয় দাদা, তা হ'লে বোধ হয় তোমার বিয়ে করা হ'বে না।"

সুব্রত এবারকার মত রক্ষা পেয়ে গেল। কন্যাপক্ষ খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন যে সুব্রত কাজ করে অভিনেত্রী সন্ধ্যার কারখানায়। ঘটক এসে সুব্রতের মাকে দু'চারটে কড়া কথা বেশ শুনিয়ে দিয়ে গেল। তিনি অবাক হ'য়ে গেলেন। এত বড় চাল সে তার ওপর চেলেছে! 'আচ্ছা দেখা যাক ও ভূত ওর ঘাড় থেকে নামান যায় কি না।' তাঁর একবারও মনে হ'ল না যে 'ভূত নামাতে' গেলে হয় তো বাড়ীতে টাকা আসার পথটা খুব প্রশস্ত হ'য়ে উঠবে না। তিনি ডেকে পাঠালেন নীরেনকে, কারণ সে সন্ধ্যার সব খবর জানে। তাকে বললেন, "তুমি এ সব কথা জানতে?"

"কে জানে না তাই বলুন?"

"তা হ'লে আমায় জানাও নি কেন?"

"দেশশুদ্ধ লোক জানে অথচ আপনি জানেন না একথা আমার মনেও হয় নি।"

"তুমি আমায় আজ সেই মাগীর বাড়ী নিয়ে যাবে?"

"আপনি সেখানে যাবেন?"

"তা যেতে হ'বে বৈ কি! ভূত যদি বেয়াড়া হয় তা' হ'লে রোজাকে একটু কষ্ট সহ করতে হয়।"

"কিন্তু তাকে চটিয়ে হ'বে এই যে, সুব্রতের চাকরিটা যাবে।"

"যায় যাক। না খেতে পেয়ে মরতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু চোখের ওপর নিজের ছেলের সর্ব্বনাশ দেখতে পারি না।"

তিনি যখন নীরেনের সঙ্গে গাড়ীতে উঠলেন তখন শোভার শুনে একটু ভয় হ'ল। এরা যায় কোথা? জিগেস করলে, "মা তুমি যাচ্ছ কোথায়?"

"সে খোঁজে তোর দরকার কি?"

শোভা বুঝল আজ একটা কিছু ঘটবেই। কিন্তু উপায় কি? বাধা দেবার মত শক্তি তো তার নেই।

সুব্রতের মাকে দেখে সন্ধ্যা আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিল, বললে, "আপনি কে? আপনাকে তো চিনতে পারছি না।"

"তা পারবে কেন? বসে বসে আমার সর্ব্বনাশ করছ—তা আমায় চিনবে কেন? এর চেয়ে যে আমার ছেলে চোখের সুমুখে মরে যাওয়া ছিল ভাল।"

"আপনি সুব্রতের মা? ছিঃ, ছিঃ ও কথা মুখে আর অকল্যাণ করবেন না!"

"কি? তুই মাগী আজ আমায় তার কল্যাণ-অকল্যাণ শেখাবি?"

"সুব্রত আমায় মা বলেছে ; তার কল্যাণ—"

"যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা সুব্রত তোকে মা বলেছে ? কাঁটার চোটে তোর ভণ্ডামী যদি না ভাঙি তো আমার নাম মিথ্যে।"

"আপনি কি চান ?"

"আমি চাই আমার ছেলেকে ফিরে। তুই তার পথ থেকে সরে দাঁড়াবি।"

"তাই হ'বে, যান।"

* * *

সন্ধ্যা ঘরের ভেতর চলে গেল। বসে বসে অনেকক্ষণ কাঁদলে ; শেষে ঠিক করলে, সত্যিই তো আমার কি দুঃসাহস ! সুব্রত ভদ্র ঘরের ছেলে ; আমি তাকে কি করে নিজের ছেলের মত পেতে পারি ? তার সমাজ আছে, ধর্ম্ম আছে, মা বোন আছে ; তাকে তো আমি আমার বলে কোন মতেই পেতে পারি না। সে আমার মাতৃত্বের অধিকার দিলেও তো তা আমি নিতে পারি না। মন তো এ কথা মানতে চায় না। কিন্তু তা যে তাকে মানতেই হ'বে ! সুব্রতকে সে ফিরিয়ে দেবে তার মায়ের কোলে—বুক ভেঙ্গে গেলেও দেবে। যে কদিন সে তাকে পেয়েছে—নিজের ক'রে তাই যে তার আশার অনেক বেশী ! তার মনে হ'ল কিছুক্ষণের মধ্যেই সুব্রত আসবে। ফোন ধরে সে ডাকলে তাদের থিয়েটারের ম্যানেজারকে। তিনি তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হলেন। সে বললে, "দেখুন ভেবে দেখলাম এ রকম করে চলবে না। সময় যেন কাটতেই চায় না ! আপনারা কি আমার জায়গায় লোক নিয়েছেন ?"

"লোক নি আর নাই নি তুমি যখন যাবে তখনি তোমার জায়গা ফিরে পাবে।"

"বেশ তা হ'লে কাল থেকেই যাব।"

ঠিক সেই সময় সুব্রত এসে হাজির হ'ল। ম্যানেজারকে দেখে সে খুব আশ্চর্য্য হ'য়েছিল। ম্যানেজারও উঠে যাবার সময় বললেন,"তা হ'লে তাই ঠিক রইল ; কাল থেকেই যেও।"

তিনি চলে গেলে সুব্রত বললে, "কাল থেকে কোথায় যাবে মা ?"

"থিয়েটারে।"

"থিয়েটারে ফিরে যাবে ?"

"তাইতো ভাবছি। অনেক সময়েই মানুষ নিজের মন বুঝতে পারে না ; সেদিন আমিও পারি নি। ভুল করেছিলাম।"

সুব্রতর বিশ্বাস হ'ল না। তার মনে হ'ল এ যেন একটা তার পরীক্ষা। সন্ধ্যার মুখের দিকে চেয়ে সে চমকে উঠল ! এ মুখের মধ্যে মাতৃত্বের সন্ধান সে কি করে পেয়েছিল ? এত কঠিন, এত নির্ম্মম কি স্নেহশীলা রমণীর মুখের ভাব হ'তে পারে ? কোনটা তার সত্যি তার কোনটা তার অভিনয়—মাতৃত্বের সেই করুণার মূর্ত্তি না তার এই নির্ম্মম কঠিন মূর্ত্তি ?

সন্ধ্যা বললে, "কি দেখছ সুব্রত ? তোমার সেই মা সন্ধ্যাকে ? সে একটা অভিনয় ! তাকে এ মুখে তো আর খুঁজে পাবে না ! আর তুমি তো সত্যিই তা চাও না, চাও আমার সাহায্য—বাঁচবার জন্যে।"

"মিথ্যা কথা ! আমি তোমার কাছে এসেছিলাম তোমার পবিত্র নারীত্বের—মাতৃত্বের সন্ধান পেয়ে। আজ তোমার সত্যি চেহারাটা দেখতে পেয়েছি ! এখন আমি তোমায় ঘৃণা করি।"

সুব্রত মুহূর্ত্তের জন্যেও আর ফিরে চাইলে না। মাতালের মত টলতে টলতে বাড়ী গেল। তাকে দেখেই শোভা ছুটে এল। সমস্ত দিনটা তার কেটেছে উৎকণ্ঠায়, কি করে তার দাদাকে আজকের সব কথা জানাবে। তাকে দেখে সুব্রত বললে "উঃ শোভা মানুষ কি করে এত শয়তান হয় বলতে পারিস ?"

"শয়তান ? সে কি দাদা ? শয়তান কে ?"

"যাকে একদিন মা বলে ডেকে পথের ধুলো থেকে স্বর্গের বেদীতে তুলেছিলাম—"

"স্বর্গের বেদীই যে তাঁর আসন দাদা ; তিনি তো পথের ধুলোর নন !"

"তাই ভাবতাম বটে কিন্তু আজ—"

"ভুল দাদা, ভুল, মস্ত ভুল করেছ ! সে আজ তোমায় যা বলেছে সব তাঁর অভিনয় ; সে শুধু মা'র লাঞ্ছনায়—"

"মা'র লাঞ্ছনায় ?"

"মা যে আজ তাঁর কাছে গিয়েছিলেন—নীরেনদার সঙ্গে। নীরেনদা বললে, তাঁকে আজ যা বলে এসেছেন, কোন মানুষ তা মানুষকে বলতে পারে না।"

লোকটার কথা শেষ হবার আগেই সুব্রত ছুটেছিল সন্ধ্যার বাড়ীর দিকে। সন্ধ্যার বাড়ীর দারোয়ান তাকে সেলাম করলে। সে ছুটেই ওপরে যাচ্ছিল ; দরেয়ান বললে, "বাবু মাজী বাহার গিয়া।"

"কাঁহা ?"

"মালুম নেহি ! ট্যাক্সি লেয়ায়া ; উনকো বলা কি চলো হাওড়া ষ্টিশন।"

তৎক্ষণাৎ সুব্রত আর একখানা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল হাওড়ার দিকে। গিয়েই কুলীকে জিগ্‌গেস করলে, "কোন গাড়ী এখুনি ছাড়বে ?"

"কোন গাড়ীতো এখুনি ছাড়বে না বাবু।"

"কোন গাড়ী এখুনি ছেড়ে গেছে ?"

"দশ মিনিট হ'ল ছেড়েছে।"

সে পরের ষ্টেশনে তার করে দিল। উত্তর এল 'সন্ধ্যা বলে কেউ এ গাড়ীতে নেই'।

অনুতাপানলে জর্জ্জরিত বিক্ষুব্ধ হ'য়ে সুব্রত সেইখানেই বসে পড়ল।

পাবনা জেলার প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন —"বাংলার খাঁটী লোক-সাহিত্য ও গ্রাম্য-সাহিত্য দিন দিন লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই।" সুখের বিষয় বর্ত্তমান কালে বাংলার অনেক অংশেই প্রাচীন গ্রন্থ ও প্রাচীন কবিদের পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু পাবনা জেলার প্রতি এখনও কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। ইহার প্রধান কারণ নিজেদের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি পাবনাবাসীর অবহেলা। যাহা হউক বর্ত্তমানে পাবনার কয়েকজন প্রাচীন কবির নাম ও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল কবি ও গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।—

১। চতুর্ভুজ

প্রাচীনকালে যে সকল গৌড় কবি সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চতুর্ভুজ একজন প্রধান কবি। চতুর্ভুজের গ্রন্থের নাম "হরিচরিত কাব্যম্"। তাহার বর্ণনীয় বিষয় "কৃষ্ণলীলা" ; ত্রয়োদশ সর্গে, ১২৫০ শ্লোকে সমাপ্ত। ১৩২০ সালে আষাঢ় মাসের "সাহিত্য" পত্রিকাতে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "গৌড় কবি চতুর্ভুজ" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে "১৪১৫ শকাব্দ (১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ) কাব্য সমাপ্তির কাল বলিয়া জানিতে পারা যায়।"

চতুর্ভুজ তাঁহার "হরিচরিত কাব্যে" নিজের যে বংশ-বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে জানিতে পারা যায় "পূরাকালে বরেন্দ্রী মণ্ডলে, করঞ্জ নামে সুপরিচিত গ্রামে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-কাব্য-নিপুণ বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। স্বর্ণরেখ এই সমগ্র গ্রামখানি ধর্ম্মপাল নামক নৃপতির নিকট হইতে শাসনরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" চতুর্ভুজ এই স্বর্ণরেখেরই অধস্তন পুরুষ।

এই করঞ্জ গ্রাম কোথায় ? পাবনা জেলার সাঁথিয়া থানার অধীনে করঞ্জ নামে এক গ্রাম আছে। এই গ্রামে বহু কাশ্যপ ও বাৎস্য গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বাস। রাজসাহী ও বগুড়া জেলায়ও এই নামে দুইটী গ্রাম আছে ; কিন্তু এই গ্রাম দুইটীতে পূর্ব্বাপর ব্রাহ্মণের বাস দেখিতে পাওয়া যায় না এবং এই গ্রাম দুইটী পাবনার অন্তর্গত করঞ্জ গ্রামের মত প্রাচীনও নহে। আমাদের বিবেচনায় পাবনা জেলার অন্তর্গত করঞ্জ গ্রামই চতুর্ভুজ-বর্ণিত করঞ্জ গ্রাম।

২। নরোত্তম ঠাকুর

এই জেলার শুজানগর থানার অধীন গোপালপুর গ্রামের কায়স্থ জমীদার কৃষ্ণানন্দ দত্তের ঔরসে ইনি ১৪৫৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই ইহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। পরে—বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া খেতুর গ্রামে বাস করিতে থাকেন। ইহার জ্যেষ্ঠতাত পুরুষোত্তম দত্তের বংশধরগণ এখনও বেড়া থানার অন্তর্গত সাগরকান্দি গ্রামে বাস করিতেছেন। নরোত্তমের প্রতিষ্ঠিত গোপাল-পুরের আখড়া এখনও বিদ্যমান আছে।

ইনি প্রার্থনাতত্ত্ব, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও চৌতিশা পদাবলী রচনা করেন।

৩। কুল্লুক ভট্ট

প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইনি পাবনা জেলার চাটমহর থানার অধীন গুয়াখারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার বিষয়ে "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে;—"কুল্লুকভট্ট যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, তৎকৃত মনুসংহিতায়—'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামক টীকা, তাহার পরিচয় দিতেছে: দেশীয় পণ্ডিতেরা মন্বর্থমুক্তাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। মন্বর্থমুক্তাবলী-সম্বন্ধে স্যর উইলিয়ম জোন্সের উক্তি স্মরণ করিলে আর কিছুই বলিতে হয় না। (At-length appeared Kullaka Bhatta, a Bramine of Bengal, who after a painful course of study produced a work, of which it may perhaps be said very truly, that it is the shortest yet the most luminous, and the least ostentatious, yet the most learned, the deepest yet the most agreeable commentary ever composed on any author, ancient or modern, European or Asiatic). কুল্লুক ভট্ট "যমসংহিতার"ও একখানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন।"

৪। অদ্ভুতাচার্য্য

ইহার আসল নাম নিত্যানন্দ। "অদ্ভুতাচার্য্য" উপাধি। ইনি "রামায়ণ" রচনা করিয়াছিলেন। ইহার রচিত রামায়ণ উত্তরবঙ্গে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের ব্যয়ে রংপুর সাহিত্য-পরিষদ এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। অদ্ভুতাচার্য্য পাবনা জেলার সাঁতোল গ্রামের নিকট সোনাবাজু পরগণার বরবরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

৫। কৃষ্ণকিশোর রায়

ইনি ১১৮০ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে "দুর্গ লীলা তরঙ্গিণী" মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি দুইখণ্ডে, সপ্তদশ তরঙ্গে সমাপ্ত। গ্রন্থখানি 'সাহিত্যসভা'র তত্ত্বাবধানে ১৩০৯ শকে "সাহিত্য সংহিতায়" মুদ্রিত হইতেছিল, কিন্তু পরে (পৌষ, ১৩১২) কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায়-কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের নিবেদনে লিখিত আছে:—

"গ্রন্থকার বহুকাল পরলোক গমন করিয়াছেন। ১২৩০ সালে তাঁহার ৫০ বৎসর বয়সে এই পুস্তক লেখা শেষ হয়। তাঁহার লিখিত অন্যান্য ছোট ছোট পুস্তকের মধ্যে সত্যনারায়ণের পাচালি, ব্রহ্মবিচার প্রভৃতি কতকগুলি পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু পুরাতন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ভাগবত ও মহাভাগবত পুরাণ প্রভৃতিই প্রধান।......গোয়ালন্দের নিকটবর্ত্তী পানেড়গ্রামে, গ্রন্থকারের নিবাস ছিল। পদ্মা তাহার অস্তিত্ব লোপ করিয়াছে। পদ্মায় বাড়ী ভাঙ্গিয়া যাইবার পর কবি পাবনা জেলার শিবপুর গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও শিবপুরগ্রামে বাস করিতেছেন।

৬। শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম

ইনি পাবনা জেলার খুরকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত নৈয়ায়িক। শ্রীকৃষ্ণ নাটোররাজ রামজীবনের একজন সভাসদ ছিলেন এবং ১৬৪৫ শকে "পদাঙ্কদূত" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন

৭। গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ

ইনি পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌমের পৌত্র মুর্শিদাবাদ জজ-আদালতের পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের শিষ্য। গোবিন্দকান্ত সুপ্রসিদ্ধ "লঘুভারত" নামক সংস্কৃত কাব্যেতিহাসের রচয়িতা। ইনি পাবনা জেলার অন্তর্গত শালকিয়া (চাটমহর থানার অধীন) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৮। দিগম্বর রায়

দিগম্বর পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণকিশোর রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইহার রচিত একখানি মাত্র হস্তলিখিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুঁথিখানি তুলট কাগজে লেখা। প্রচ্ছদপটে পুঁথির নাম এইরূপ লিখিত আছে ;—

"ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণান্তর্গত

* * খণ্ডে মঙ্গল মানাবতি উপাখ্যান।"

পুঁথিখানি পদকীর্ত্তনের জন্য লিখিত হয়, তাহা পড়িলেই বুঝা যায়।

৯। গুরুপ্রসাদ সেন

ইনি কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের পিতা। গুরুপ্রসাদ মুন্সেফী করিতেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল ; ব্রজ ভাষাতেও তিনি যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি "পদচিন্তামণি মালা" নামক কীর্ত্তন-গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। নিবাস ভাঙ্গা-বাড়ী, পাবনা।

১০। রামপ্রসাদ মৈত্র

ইনি ইংরেজ আমলের প্রথমে মথুরা থানার অন্তর্গত নাকালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সমসাময়িক ইতিহাস কবিতাকারে রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার অনেক কবিতা এখনও পাওয়া যায়।

১১। দুর্গাচরণ সান্যাল

ইনি পাবনা জেলার মথুরা থানার অন্তর্গত বক্তারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গাচরণ শৈশব হইতেই অতিশয় দুরন্ত ও বলশালী ছিলেন। একবার এক সাহেব মারার জন্য তাঁহার ছয় বৎসরের জেল হইয়াছিল। তিনি জেলে যাইবার পূর্ব্বেই "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া গ্রন্থখানি প্রকাশিত করেন।

১২। যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ইনি পাবনা জেলার ভারেঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যাদবচন্দ্র কুচবিহারের জজ হইয়াছিলেন এবং পরে পেন্সন লইয়া মৈমনসিংহ গৌরীপুরের দেওয়ান হন। ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের ইতিহাস "কুলশাস্ত্র দীপিকা" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যসমূহের ইতিহাস ও ইংরেজ আমলে তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে "Native states of India." নামক একখানি ইংরেজী গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। যাদবচন্দ্র ১৩১৮ সালের ২৩শে আষাঢ় পরলোক গমন করেন।

১৩। দুর্গানারায়ণ চৌধুরী

গায়ক এবং কবি। ইনি পাবনা জেলার ভারেঙ্গা গ্রামের বিখ্যাত চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ আছে ; তন্মধ্যে "কাব্যকুসুমাঞ্জলি" ও "সঙ্গীত কুসুমাঞ্জলি" প্রধান। ইনি ১৯১০ সালের মার্চ্চ মাসে পরলোক গমন করেন। নাটোর রাজের বড় তরফের দেওয়ান শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ইহার পুত্র।

১৪। বেলায়েৎ হোসেন

পাবনা অঞ্চলের বিখ্যাত "রাম-মঙ্গল" গায়ক। ইনি পাবনা জেলার পাইখন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত "রামলীলা" নামক হস্তলিখিত পুঁথি—এখনও কবির পৌত্রের নিকট আছে। ইনি একজন সাধু ও ভক্ত ছিলেন। প্রবাদ আছে যে একবার তিনি মৈমনসিংহ-গৌরীপুরের রাজ বাড়ীতে 'রাম-মঙ্গল' গান করিতে যান ; কিন্তু মুসলমান বলিয়া গৌরীপুরের তৎকালীন মহারাজ তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। ইহাতে না কি দুর্গা প্রতিমা হঠাৎ ঘুরিয়া উত্তরমুখা হয়। পরে যখন বেলায়েৎ আসিয়া গান করেন, তখন প্রতিমা পুনরায় দক্ষিণমুখী হয়। ইহার গান-সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ এখনও এদিকে শুনিতে পাওয়া যায়।

আরও অনেক হিন্দু ও মুসলমান কবির গান এবং নাম পাওয়া যায়, কিন্তু পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। না। ভবিষ্যতে তাঁহাদের পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল।
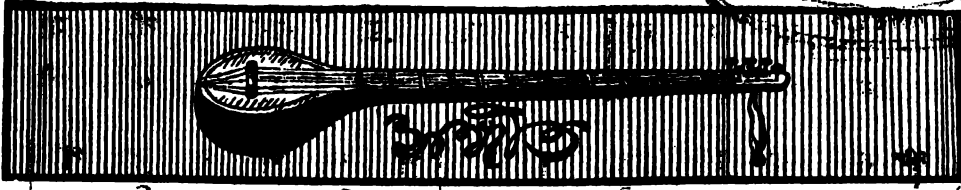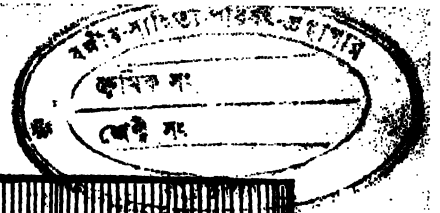
কথা ও সুর
শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি
শৈলেশকুমার দত্ত গুপ্ত

বাঁরোয়া-মিশ্র—একতালা (বিলম্বিত লয়)

এখনো কেন কেন গো
তীরে বাঁধা তরণী।
ডুবিছে মলিন তপন ধীরে
ছায়ায় ঢাকিছে ধরণী ॥

শোন পরপারে,
উঠে বারেব্যরে,
আকুল বাঁশরী বাজি—
(বুঝি) কুঞ্জ ভবনে,
মধুর মিলনে
বিরহ টুটিবে আজি ;
আনিছে মধুর মলয় মন্দ
নব নন্দন কুসুম গন্ধ,
ওই চাহ ফিরে, আসে ধীরে ধীরে
যামিনী জোছনা বরণী।

ওগো ত্বরা করি',
ছেড়ে দাও তরী,
বয়ে যায় শুভ লগ্ন—
(তুমি) করে অবহেলা,
কাটাইলে বেলা
রহিলে স্বপনে মগ্ন ;
এ বিজন তটিনী পুলিনে একা
রয়েছ পাইতে যাহার দেখা
ওই হের তা'রি চরণ প্রান্তে
রঙ্গে লুটিছে তটিনী ॥

০ ১ + ৩
II জ্ঞা জ্ঞা রজ্ঞা | রা সা ন্‌া | সা জ্ঞা রা | -জ্ঞা মা পা | মা । জ্ঞরা
এ খ নো০ | ০ কে ন | কে ন গো | ০ ০ ০ | ধী ০ রে

। সা রা | সা ন্‌া । | সা । । | পা গা পা | পা দা পা | মা পা মা
০ ধী ধী | ভ র ০ | ণী ০ ০ | ডু বি ছে | ম লি ন | ত প ন

জ্ঞা -রা সা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রা সা রা | সা ন্‌া । | সা । । II
ধী ০ রে | ছা য়া য় | ঢা কি ছে | ধ র ০ | ণী ০ ০

০ ১ + ৩
II { জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা মা | পা পা পা | মপদা পা পা | দা দা দা
শো ন প | র পা রে | উ ঠে বা | রে০০ বা রে | অ কু ল
ও গো স্ব | রা ক রি | ছে ড়ে দা | ও০১ ত রী | ব য়ে যা

পা মা পা | জ্ঞা -মা -জ্ঞমা | পা-দা পা } | জ্ঞা পা পা | পা দা পা
বা শ রী | বা ০ ০০ | জি ০ ০ | কু ঞ্জ | ভ ব নে
য় শু ভ | ল ০ ০গ্‌ | ন ০ ০ | ক রে অ | ব হে লা

মা পা মা | জ্ঞা রা সা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রা সা রা | সা ন্‌া । | সা । ।
ম ধু র | মি ল নে | বি র হ | টু টি বে | আ ০ ০ | জি ০ ০
কা টা ই | লে বে লা | র হি লে | স্ব প ন | ম ০ গ্‌ | ন ০ ০

মা পা পা | মপা না না | র্সা র্সা র্সা | র্সা না র্সা | ণা ণা ধা | । ণা ণা | মা র্সা ণা
আ নি ছে | ম০ ধু র | ম ল য় | ন ন্‌ দ | ন ব ন | ন্‌ দ ন | কু সু ম
বি জ ন | ত০ টি নী | পু লি নে | এ ০ কা | র য়ে ছ | পা ই তে | যা হা র

ধণা ধা পা | পা । পা | পা পা পা | পা ণা দা | পা মা । | মা পা গা
গ০ ন্‌ ধ | ও ই চা | হ ফি রে | আ সে ধী | রে ধী রে | যা মি নী
বে০ ০ খা | ও ই ছে | র তা রি | চ র ণ | প্রা ন্‌ তে | র ঙ্‌ গে

মগা গা গা | গা -মা গমা | পা -দা -পা | মা পা মা | জ্ঞা রা সা
জো০ ছ না | ব ০ র০ | ণী ০ ০ | যা মি নী | জো ছ না
লু০ টি ছে | ত ০ টি০ | নী ০ ০ | র ঙ্‌ গে | লু টি ছে

সা ন্‌া । | সা । । IIII
ব র ০ | ণী ০ ০
ত টি ০ | নী ০ ০

[শিক্ষার্থীগণ সুবিধামত "মধ্যম"কে "সা" করিয়া গাহিতে পারেন।]

মোহ

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী নীলিমা দেবী

বাইশ

পরদিন সকালে কথামত প্রীতি উষার সঙ্গে সঙ্গে বাগানে গেল। এত প্রত্যূষে গিয়াও সে দেখিল যে দেবব্রত তাহার প্রতীক্ষায় ঘুরিতেছে ও প্রীতিকে দূর হইতে দেখিয়া সে স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। প্রীতিকে উষার আলোকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল, তাহার সুন্দর সরল পবিত্র মুখখানি দেখিয়া মনে হইতে-ছিল যেন কোন আশ্রম-পালিতা ঋষিকন্যা। প্রীতিকে দেখিলে মানুষের মনে প্রথমেই যেন এক স্নিগ্ধভাব আসে, ভক্তির উদ্রেক হয়! দেবব্রত একেবারে মুগ্ধ হইয়া অপলকনয়নে দেখিতে লাগিল, রূপ দেখিতে দেখিতে সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল। প্রীতি দেবব্রতের নিকটে আসিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া নিজেও তন্ময় হইয়া দেবব্রতের বিভোরভাব দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দেবব্রতের এক করুণ দীর্ঘশ্বাসে উভয়ের চমক ভাঙ্গিল।

প্রীতি বলিল—"রাত্রে ঘুমোতে পেরেছিলেন তো ?"

উত্তরে দেবব্রত বলিল,—"হাঁ, তোমার সেবায় সুস্থ হ'য়ে ঘুমিয়েছি।—কিন্তু প্রীতি চিরদিনই কি পরের মত আমাকে আপনি বল্‌বে।"

"তা' ছাড়া আর কি বল্‌তে পারি বলুন ?"

"একবার 'তুমি' বলে আমাকে একটু তৃপ্তি দাও।"

"বড় যে আপনার তাকেই তুমি বলা যায়।"

"প্রীতি আমি কি তোমার কেউ নই ?"

"ধর্ম্মতঃ আপনার মত আপন জন আমার কেউ নয়, কিন্তু সে-সম্বন্ধ তো আপনি চিরদিনের মত নিজহাতে বিচ্ছিন্ন করে' দিয়েছেন ? এখন নূতন কি বল্‌তে চা'ন বলুন, আমি তো বুঝ্‌তে পারছি না যে কি মীমাংসা হ'তে পারে।"

নির্ম্মল নিজগৃহের জানালা হইতে এতক্ষণ দুই জনের ব্যবহার দেখিয়া ক্রোধে ও হিংসায় জর্জ্জরিত হইতেছিল, সে সত্বর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিয়া দেখিল উভয়েরই বেশ শান্তভাব। তবে তো সে ভুল দেখিয়াছে, ভাবিয়া একটু লজ্জিত হইল।

নির্ম্মল দেবব্রতকে জিজ্ঞাসা করিল, "এত ভোরে বেড়ান অভ্যাস কবে থেকে হ'ল ?"

দেবব্রত বলিল,—"এই আজ প্রথম, এর পূর্ব্বে যদি জানতাম যে সকাল সকাল উঠ্‌লে এমন সব সঙ্গী পাব তো আগেই এ অভ্যাস আরম্ভ করতুম্। তুমিও কি এ অভ্যাসটা নূতন করেছ ?"

নির্ম্মল চুপ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সকলেই নীরব রহিল, সকলেরই কেমন বাধ-বাধ বোধ হইতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই দেবব্রত বলিল, "আমি যাই, অনেক কাজ আছে। তোমরা সুখে বেড়াও।"

প্রীতি বলিল,—"এখন যাবেন কেন ? বেলা তো হয় নি, আর একটু থাকুন না। সকালের হাওয়াতে শরীর বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠবে। কাল অত কষ্ট পেলেন, আজ নাই বা বেশী কাজ করলেন ?"

দেবব্রত বলিল,—"আমার বাগানটা একটু দেখি গিয়ে, বহুদিন ওধারে নজর দিতে পারি নি। আজ তোমাকে দেখে বাগানে না গিয়ে একটু গল্প করতে এসেছিলাম।"

নির্ম্মল বলিল,—"আমি বুঝি বাধা দিলাম ?"

স্থিরভাবে দেবব্রত উত্তর দিল—"না ভাই, তুমি আসাতে বাধা হ'বে কেন ?" এই বলিয়া দেবব্রত চলিয়া গেল। নির্ম্মল বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, প্রীতিকে কি যে বলিবে স্থির করিতে পারিতেছিল

না। তাহার মনে তখনও বোধহয় মাঝে মাঝে দেবব্রতের প্রতি কেমন একটা অসন্তোষের ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল।

প্রীতিই প্রথম কথা কহিল। সে বলিল, "দাদা, আমি তোমাকেই চাইছিলাম, তোমার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা আছে।"

নির্ম্মল মৃদু হাসিয়া স্নেহভরে বলিল, "কি কথা,প্রীতি ?"

"দাদা, কাল তোমার মাথার ঠিক ছিল না, তাই বল্‌তে সাহস পাই নি। যদিও তোমাকে বিয়ের কথা বল্‌তে বারণ করেছ, আমাকে আর একটীবার সে-কথা কইতে দাও। ভাই, তুমি একটু স্থির হ'য়ে ভেবে দেখেছ কি যে তুমি বিয়ে না কর্‌লে সকলে কি রকম ব্যথিত হ'বেন ? জানি না রেণুকার প্রতিই বা কতটা অন্যায় করা হ'বে। সে যদি তোমাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করে' থাকে তা' হ'লে কি হ'বে ? এই কথা মনে হওয়ায় আমি কাতর হ'য়েছি, আমি তোমাকে এত বড় অন্যায় কর্‌তে দিতে পারি না।"

"আর আমি যদি আমার হৃদয়মন্দিরে আমার একমাত্র জীবনসঙ্গিনীকে স্থাপনা করে' থাকি ? যদি ভগবানকে সাক্ষী করে' শুধু তারই অর্চ্চনায় জীবনযাপন কর্‌ব বলে শপথ করে' থাকি, তা' হ'লে কি হ'বে প্রীতি ? আমি কি রেণুকে বিয়ে কর্‌লে নিজের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি সত্য আচরণ কর্‌ব ? আমি আর বেশী কিছু বল্‌ব না, আমার সঙ্কল্প অটুট থাকবে।"

প্রীতির চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে নির্ম্মলের হাত ধরিয়া বলিল, "কে সে নারী—যার জন্য তুমি সব বিসর্জ্জন দিলে দাদা ? সে কি এত প্রেম, এত ভালবাসা পাবার উপযুক্ত ? দাদা, তা'কে কি কিছুতে পেতে পার্‌বে না ?"

"এখন তো পাবার আশা কিছু দেখছি না।"

"দাদা, সব তো বুঝ্‌লাম কিন্তু একটা কথা ভাব্‌ছি। তুমি যদি বিয়ে না কর তো তোমাতে আমাতে মেশামিশিতে অনেক লোক অনেক কথা বল্‌বে। তা' হ'লে যে বড় ব্যথা পাব।"

"মন্দ লোক মন্দ কথা বল্‌বে কিন্তু সে বেশীদিন থাক্‌বে না। তোমায় আমায় বড় পবিত্র বন্ধন, প্রীতি, এতে কোন কালিমা পড়্‌বে না।"

"দাদা, তুমি তো সে কথা বল্‌ছ কিন্তু তোমার মত মন কা'র ? এই যে তুমি বিয়ে কর্‌তে চাইছ না, হয় তো এই থেকেই কত কথা উঠ্‌বে। আমার বড় ভয় হয় পাছে লোকে তোমার আমার মধ্যে একটা প্রাচীর তুলে দেয়।"

"সে কখনও হ'তে দেব না। কেন কেউ কিছু বলেছে না কি ?"

"না।"

"আর শোন প্রীতি, আমি কালই রেণুর সঙ্গে এ বিষয় কথা কয়েছি, তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। রেণু আমাকে বড় ভায়ের মত দেখে। বিমলের সঙ্গে বিয়েতে তার মত বই অমত নেই বুঝ্‌লাম। আর বিমলও খুব রাজী। আজই আমি বাবা-মা'কে এবিষয় বল্‌ব আর রেণুরা চলে যাবার আগেই যা'তে—বিয়ের কথা পাকা হ'য়ে যায় তার সব ব্যবস্থা কর্‌ব। আমার বিশ্বাস সব ঠিক হ'য়ে যাবে, শুধু মামাবাবু-মামীমার হয়তো রাগ পড়বে না।"

এমন সময় একটা সুন্দর ফুলের তোড়া হাতে করিয়া দেবব্রত পুনরায় সেখানে আসিল এবং প্রীতিকে দিয়া বলিল, "আমার হ'য়ে নবদম্পতীকে দিও।" আর একটা সুন্দর গোলাপ প্রীতিকে পরিতে দিয়া দেবব্রত সতৃষ্ণনয়নে প্রীতির দিকে চাহিল। প্রীতি একবার ফুলটী সস্নেহে আঘ্রাণ করিয়া নিজের বুকের কাপড়ে আটকাইয়া দিল। সে দেবব্রতকে ধন্যবাদ দিল না, শুধু বলিল, "এমন সুন্দর ফুল কেন ছিঁড়লেন ? এযে আপনার বাগান অমন আলো করে' থাকত।"

দেবব্রত বলিল—"এ ফুল তোমারই উপযুক্ত, তাই তোমার জন্য এনেছি। তুমি পরেছ এর চেয়ে আর আনন্দের কি আছে ?"

নির্ম্মল বলিল—"ভাগ্যে মেমসাহেবটী এখানে নেই, নইলে মজা দেখতেন !"

দেবব্রত নিরুত্তরে বিষণ্ণবদনে চলিয়া গেল।

নির্ম্মল প্রীতিকে বলিল—"দেবদার' ক'দিন কি যে হয়েছে বুঝতে পার্‌ছি না। উনি কি নিজের বিবাহসম্বন্ধে অনুতাপ কর্‌ছেন না কি ? কে জানে ?"

"আমার কিন্তু মনে হয় স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির জন্য ওঁর স্ফূর্ত্তি নাই। বেচারা একা একা বড়ই কষ্ট পাচ্ছে।"

তেইশ

ঘণ্টা তিন পরে নির্ম্মল তাহার মাতাকে একা পাইয়া বলিল, "মা, যদি তোমার কোন বিশেষ কাজ না থাকে আমার ঘরে একবার এস তো।"

নির্ম্মলের মা স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন,—"বাবা, তোমার দরকার, আমার যতই কাজ থাকুক না কেন, আগে তোমার কথা শুনব।"

নির্ম্মলের ঘরে গিয়া তাহার মা দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

"মা, দরজা বন্ধ করলে যে?"

"আমারও একটু বিশেষ কথা আছে। তোমার দরকার আগে শুনি।"

"মা, কাল তোমাদের কথা রাখতে পারি নি বলে আমি বড় দুঃখিত। তোমাদের অবাধ্য হ'তে আমার বড় কষ্ট হয়।"

"বাবা, তবে কি তোর মত বদলেছে? আঃ! বাঁচলুম।"

"মা, তুমি আমার কথা আগে শোন, কেন বৃথা আশা করছ? মা আমার একটা আব্‌দার, অনুরোধ তোমাকে রাখ্‌তেই হ'বে। বিয়ের কথা আর আমাকে বলো না, কখনও বিয়ে করব না। মা, তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলো যেন আমার ওপর রাগ না করেন, কোন বিশেষ কারণে আমি বিয়ে করতে পারব না।"

"কি কারণ, বাবা? তোর কি কোন অসুখ আছে না কি?"

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, "না, মা, সে সব কিছু নয়:— মা, আমি বিমল ও রেণুর মন বুঝেছি, তোমরা ওদের বিয়েটা ঠিক করে' ফেল। মামীমা ও রেণুর মা নিশ্চিন্ত হ'বেন। বিমল যখন আই-সি-এস্ হচ্ছে তখন আমার চেয়ে ওঁরা ভাল জামাই পাবেন, দুঃখ করবার তো কিছু থাকবে না।"

"তা' যেন সব বুঝলাম, বিমলের বিয়ের জন্য আমরা এত তো ব্যস্ত ছিলাম না। যা' হোক, উনি যা' ভাল বুঝবেন করবেন। রেণুকে আমাদের বউ করতেই হ'বে। দাদা, ও বৌদির খাতিরও রাখ্‌তে হ'বে, আর মেয়েটীকেও আমার বেশ ভাল লেগেছে। বিমলের সঙ্গে বিয়ে হ'তে পারে যেন কিন্তু বাবা, তুমি কেন বিয়ে করবে না তা'র কারণ কি আমাকেও বলবে না।"

নির্ম্মল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার মুখে বেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে তার মা'কে বড় ভালবাসিত, মায়ের কাছে জীবনে কোনও কথা লুকায় নাই কিন্তু তাহার মনের এই গোপন কথাটী সে তাঁহাকেও বলিতে ইচ্ছুক নহে।

নির্ম্মলের মা তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন যে তাঁহার পুত্রের কি একটা ভীষণ কষ্ট হইতেছে। তিনি নির্ম্মলের কাছে গিয়া তাহার মাথাটী নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "বাবা, যদি বল্‌তে কষ্ট হয় বা ইচ্ছা না হয় বল্‌তে হ'বে না। একটা কথা কেবল জান্‌তে চাই—তাকে কি পাবার কোন আশা নাই? আমি কি কিছু করতে পারি না?"

"না, মা, কিছুই করবার নেই। তুমি মনে করো না যে আমি বড় অসুখী, তাকে আমি ভালবেসেই সুখী। প্রতিদানের আশায় বা তাকে পাবার আশায় আমি ভালবাসি নি। যাক্ ও কথায় আর কাজ নেই, আমার একটা অনুরোধ তোমাকে রাখ্‌তে হ'বে; তুমি আজই বিমলের বিয়েটা ঠিক ক'রে দাও। আর কাল তো আমাদের যাওয়া তা' হ'লে ঠিক?"

"হাঁ, ঠিকই তো আছে। তবে যদি এই বিয়ের কথা পাকাপাকি করতে দুই-একদিন দেরী হয়।"

এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। নির্ম্মল বুঝিল যে তাহার বুদ্ধিমতী মাতা তাহার প্রাণের গোপন কথার সন্ধান পাইয়াছেন।

চব্বিশ

রেণুর সঙ্গে বিমলের বিবাহ পাকা হইয়া গিয়াছে। সকলেরই মন খুব প্রফুল্ল, রেণুকার মাতাও খুবই খুসী। বিমল নির্ম্মলের মত না হইলেও রেণুর মা তাহাকে খুবই

পছন্দ করিতেন। প্রীতি, নীলিমা ও রেণুকা এই কয়দিন খুব হাস্য-কৌতুকে কাটাইয়াছে। তিন বন্ধু সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকিত, বেচারা অমিয়কে হতাশ হইয়া দেবব্রতের সঙ্গ লইতে হইয়াছে। এদিকে রমার ঠাট্টার জ্বালায় বিমল অতিষ্ঠ হইয়া একপ্রকার বাড়ী-ছাড়া হইয়াছে। নির্ম্মলের মামীমা যদিও খুসী যে ভাইঝিটী সৎপাত্রে পড়িবে, তথাপি তাহার মনে সুখ নাই। তাঁহার সন্তানহীনা, বুভুক্ষু হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ নির্ম্মলের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নির্ম্মল বিবাহ করিবে না, একথা যেন তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। তিনি যে কত আশা করিয়াছিলেন যে নির্ম্মলের বউ ও ছেলেপুলেদের লইয়া তাঁহার বাটী পূর্ণ করিবেন। তাঁহার সকল আশা সমূলে বিনষ্ট হইল দেখিয়া তিনি বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন এবং প্রীতিই যে নির্ম্মলের সকল সুখের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে এই বিশ্বাসে তাহার প্রতি বীতরাগ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন কেমন করিয়া নির্ম্মলের মন প্রীতির প্রতি বিরূপ করিয়া দিতে পারেন। একবার ভাবিলেন নির্ম্মলকে লইয়া লক্ষ্ণৌ শহরে থাকিয়া যাইবেন ও নির্ম্মলও লক্ষ্ণৌ-এ ব্যবসা চালাইতে থাকুক, তাহা হইলে প্রীতির সহিত ছাড়াছাড়ি হইবে, সময়ে নির্ম্মল সকলই ভুলিবে ও সংসারী হইবে। প্রীতি যে এখন কলিকাতা যাইবে না তাহাতে তিনি খুব সুখী। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে কলিকাতা গিয়া একটী পরমা সুন্দরী মেয়ে সন্ধান করিয়া তাহাকে দেখাইয়া নির্ম্মলের মন ভুলাইয়া দিবেন। উপস্থিত তিনি নির্ম্মলকে লইয়া পলাইতে পারিলে যেন কতকটা শান্ত হ'ন। আজ কয়দিন নির্ম্মল তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই, সে জন্যও তাহার মনটা ভাল নাই।

পরদিন প্রাতে তাঁহাদের যাইবার সব স্থির। বেলা তিনটার সময় তিনি নিজের আসবাবপত্র সব গুছাইতে-ছিলেন। নির্ম্মল বরাবর এই কাজটী তাঁহার করিয়া দিত কিন্তু আজ নির্ম্মলের দেখা নাই। তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন যে নির্ম্মল রমা ও প্রীতির সঙ্গে গল্প করিতেছে। সেজন্য প্রীতির উপর তিনি আরও বিরক্ত হইলেন।

অল্পক্ষণ পরেই নির্ম্মল তাঁহার ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি মামীমা, তোমার কি এর মধ্যে সব গোছান হ'য়ে গেল না কি? আমাকে ডাক নি কেন?"

উত্তরে তিনি বলিলেন,—"তোমার যে বাবা এতক্ষণে মনে পড়েছে এই আমার ভাগ্যি!"

নির্ম্মল মামীমাতার নিকট বসিয়া পড়িয়া বলিল, "মামীমা আজ আবার তোমার কি হ'ল, এত রাগ কেন? গল্প করতে করতে দেরী হ'য়ে গেছে, তা' এখনও তো সময় আছে, গুছাতে আর কতক্ষণই বা লাগে। মামীমা, রেণুর বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল, এইবার তুমি খুসী তো, আর আমার ওপর রাগ করবে না আশা করি। দেখ্‌লে তো রেণু আমাকে বড় ভায়ের মতই দেখে। তুমিই কেবল কত কথা বল্লে আর আমাকে দোষ দিলে।"

এই কথাগুলিতে নির্ম্মলের মামীমা যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তুই আর আমার কাছে ওকথা তুলিস্ নি। তুই যে এমন হ'য়ে যাবি তা স্বপ্নেও ভাবি নি।"

"কেন, মামীমা, আমার কি দোষ হয়েছে, আমি কি হয়েছি?"

"আবার জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করছে না? বাপ-মা, আমাদের কারও কথা শুনলি না। কেন বিয়ে করলি না আমি যেন বুঝ্‌তে পারি না, তোর বাপ-মার দোষেই তো এই কাণ্ড হ'ল। সকলকে একেবারে আপন করে' নেয়। কত বলেছিলাম যে মেয়ে-পুরুষে এত মিশ্‌তে দিও না, তা' আমার কথা কেউ গ্রাহ্য করে নি, এখন ছেলেকে হারালে।"

"মামীমা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, তুমি কি ওসব পাগলের মত বক্‌ছ?"

"হাঁ আমি পাগল বই কি? তুই যে ঐ মেয়েটার খপ্পরে পড়ে পাগল হ'লি, তার কি?"

নির্ম্মল রাগিয়া বলিল, "মামীমা তুমি কার কথা বল্‌ছ।"

"যে তোকে বিয়ে করতে দিলে না, যার সঙ্গ পেলে তুই সব ভুলে যাস, যাকে রোজ না দেখ্‌লে তোর চলে না। দেখ্, নির্ম্মল, এখনও আমার কথা শোন্, বিয়ে করে' সংসারী হ'।"

"আমি তোমার কোন কথা শুনব না। তোমাকে

বল্‌ছি যদি তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে চাও তো ওসব কথা আর মুখে এনো না। জান না কি তুমি কার নামে এই সব বিশ্রী কথা বল্‌ছ? সে দেবী তার মত সতী-লক্ষ্মী মেয়ে খুব কম আছে।"

"আহা কি আমার দেবী রে! তাই তার পেছনে যত ছোক্‌রারা ঘোরে, বুড়োরাও বাদ যায় না। এই দেবব্রতটা তো কাছ্‌ছাড়া—

"থাম মামীমা, আর কোন কথা শুনতে চাই না, এক্ষুনি যদি ওসব কথা ফিরে না নাও, তা হ'লে আজ থেকে আর তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাক্‌বে না। আমি মাকে ডেকে এনে এখনি এর একটা মীমাংসা কর্‌ছি।"

এই বলিয়া নির্ম্মল তাহার মাকে গিয়া সকল কথা জানাইল। তিনি তখনই আসিয়া তাঁহার ভ্রাতৃজায়াকে বলিলেন, "কি করলে বৌদি, একজন নিরপরাধ ভদ্রকন্যার নামে এই সব মিথ্যা কথা কি বল্‌তে হয়। একেই তো বেচারা স্বামী-পরিত্যক্তা হ'য়ে মরমে মরে আছে, তার উপর এসব কুৎসিত ইঙ্গিত শুনলে হয় তো সে আত্মহত্যাই করে' বস্‌বে। এই জন্যই লোকে বলে যে যার সন্তান হয় নি সে সন্তানের মর্ম্ম বোঝে না।"

নির্ম্মল বলিল, "মা, যতদিন মামীমার ওরকম মনের অবস্থা থাক্‌বে ততদিন আমি ওদের কাছে থাক্‌ব না। এতবড় কথা আমি সহ্য কর্‌ব না। মামীমা না হ'য়ে আর কেউ যদি একথা বল্‌ত আমি জন্মেও আর তার মুখদর্শন করতুম না। নীলিমাকে যদি কেউ এরকম কথা বলে তোমাদের কেমন লাগ্‌বে বলতো।" এই বলিয়া নির্ম্মল সে-ঘর হইতে চলিয়া গেল।

নির্ম্মলের মাও "কাজটা ভাল কর নি" বৌদি বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্যাপারটা এতদূর গড়াইবে নির্ম্মলের মামীমা ভাবেন নাই, কাজেই তিনি নিরাশ ও ভীত হইলেন। তাঁহার ভয় হইল পাছে নির্ম্মল সত্যই আর তাঁহাদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে। নির্ম্মল যে এক কথার মানুষ তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি নির্ম্মলকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাবা, রাগ করিস্‌ নি, আমরা সেকেলে-ধরণের লোক, আমাদের চোখে ওসব কেমন ভাল লাগে না। মেয়েটার নামে ওসব কথা বলা আমার খুবই অন্যায় হয়েছে, তুই বিয়ে কর্‌বি না বলাতে আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। আমি যে অনেক আশা করেছিলেম তোর বউ নিয়ে সংসারী হ'ব।"

নির্ম্মলও তাহার উপর রাগ করার জন্য ক্ষমা চাহিল। একরকম সকল মিটিয়া গেল।

পঁচিশ

চারিদিন হইল নির্ম্মলেরা চলিয়া গিয়াছে, বাড়ীটা একেবারে যেন নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তথাপি দেবব্রত প্রীতির সহিত নিরালায় কথা কহিবার সুযোগ পাইতেছিল না। প্রতিদিনই অতি প্রত্যূষে প্রীতির সঙ্গে তাহার দেখা হয়, কিন্তু প্রতিদিনই রমা সঙ্গে থাকে। আর প্রত্যহই বৈকালে নৃপেনবাবুদের সঙ্গে প্রীতি বেড়াইতে যায়। তাঁহাদের ফিরিতেও রাত্রি হইয়া যায়, কাজেই পূর্ব্বের মত প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়েও দেখা হয় না।

সেদিন অমিয়র এক বন্ধুর বাড়ীতে সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। সকলেই গিয়াছেন, কেবল প্রীতির শরীরটা তত ভাল নাই বলিয়া সে যায় নাই। নৃপেনবাবুর স্ত্রী তাহাকে একা রাখিয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না, প্রীতি অনেক করিয়া বলাতে তিনি যাইতে রাজী হইলেন। প্রীতির বুড়ি মাসী আছে বলিয়া তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত মনে যাইতে পারিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। চারি-দিক্‌ প্রায় অন্ধকার হইয়াছে, প্রীতি একলা বসিয়া গান গাহিতেছে। তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর চারিদিক্‌ যেন মুখরিত করিয়াছে, সে মন-ভোলান, পাগল-করা স্বর দেবব্রতের কর্ণে যাওয়াতে সে আর থাকিতে পারিল না। দেবব্রত জানিত যে সকলের নিমন্ত্রণ আছে, ওঁদের গাড়ীও যাইতে দেখিয়াছিল। সে তখন একাকী নিজের বাগানে বেড়াইতেছিল, অল্প পরেই গানের আওয়াজ শুনিয়া সে প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কিন্তু অবিলম্বে প্রীতির গলা চিনিল ও ধীরে ধীরে যেখানে প্রীতি গান গাহিতেছিল সেখানে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। প্রীতি নিজের গানে এতই বিভোর ছিল যে তাহার

পশ্চাতে যে দেবব্রত আসিয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই।

প্রীতি নিজমনে গান গাহিতে লাগিল, সেই গানে সে তাহার প্রাণের সঞ্চিত ভালবাসা যেন কাহার উদ্দেশ্যে ঢালিয়া দিতেছিল। সেই প্রাণের উচ্ছ্বাস দেবব্রতকে অভিভূত করিল, সে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। দেবব্রতের চমক ভাঙ্গিল, তখন ঘর অন্ধকার, প্রীতির গান থামিয়াছে, কিন্তু প্রীতির উদাসীন মন তখনও তন্ময়। অতি ধীরে দেবব্রত প্রীতির নিকট গেল, একবার তাহার লোভ হইল যে প্রীতিকে একটী চুম্বন দেয় কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া সে প্রীতির কাঁধে হাত রাখিল। প্রীতি চম্‌কাইয়া উঠিল, বলিল, "আপনি কখন এলেন?"

দেবব্রত বলিল, "অনেকক্ষণ এসেছি, তোমার গান আমাকে পাগল করে' টেনে এনেছে।"

"আমি কিছুই জান্‌তে পারি নি।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"প্রীতি, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, এই সুযোগে বলে নেওয়া যা'ক। কিছুতেই আর তোমাকে একলা পাই না।"

ততক্ষণে প্রীতি আলো জালিয়া দিয়া একটা সোফায় গিয়া বসিল। দেবব্রত গিয়া তাহারই পাশে বসিল, তাহাতে সে আপত্তি করিল না। অন্য সময় সে দেবব্রতকে এত কাছে আসিতে দিত না কিন্তু তখন সে যেন মোহাচ্ছন্ন। কয়দিন যাবৎ সে দিবারাত্রি দেবব্রতের কথাই ভাবিয়াছে, তাহাকেই স্বপ্নেও দেখিয়াছে। এই সময় যদি দেবব্রত তাহাকে নিজের বুকে টানিয়া লইত, হয় তো প্রীতি আত্মদান করিত। সে গানের ভিতর দিয়াও আজ দেবব্রতেরই অর্চ্চনা করিতেছিল, দেবব্রতের পাশে বসিয়া সে যেন ধ্যানমগ্ন। কিন্তু দেবব্রত তাহা বুঝিল না। যদিও তাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা যে প্রীতিকে আলিঙ্গন করে, তাহার সাহস হইল না, সুবর্ণ-সুযোগ হারাইল। দেবব্রত শুধু প্রীতির [illegible] চাহিল, প্রীতির চাহনিতে সে আবেশ ও [illegible] দীপ্তির প্রকাশ দেখিল—সে ভুল বুঝিল। তাহার মনে হইল প্রীতি বুঝি তাহার কোন অনুপস্থিত প্রণয়ীর চিন্তায় মগ্ন।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, "প্রীতি, কে সে ভাগ্যবান যার উদ্দেশ্যে তোমার এই প্রেমাঞ্জলি?"

প্রীতির মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইল, সে চকিতে প্রেমবিহ্বলনেত্রে দেবব্রতের দিকে চাহিয়া মুখ নত করিয়া বলিল, "আমি যা'রই জন্য আত্মদান করি না কেন, আপনার তা'তে কি যায় আসে?"

দেবব্রত সে চাহনি দেখিল না, সে তখন চিন্তামগ্ন, বিভোর। সে উত্তর দিল, "আমার তা'তে যথেষ্ট আসে যায়, কিন্তু আমার কথা এখন থাক। আমি এত স্বার্থপর যে এতদিন কেবল নিজের কথাই ভেবেছি, তোমার কথা একবারও ভাবি নি। তুমি যে অন্য কাউকে ভালবাস্‌তে পার, কাউকে চাইতে পার, সে কথা তো একবারও ভাবি নি। প্রীতি, তুমি যদি কাউকে ভালবেসে' থাক, আমি কিংবা অন্য কেউই তোমাকে দোষ দিতে পারে না। আমি তো তোমার কাছে কিছুরই আশা বা দাবী কর্‌তে পারি না, তবু আমি এতদিন কেবল 'তোমাকে চাই' বলে তোমাকে কত না বিরক্ত করেছি। আমি নিজের ভালবাসায় এতই আত্মহারা হ'য়েছিলাম যে তোমার কথা ভাবতে সময় পাই নি, কেবল নিজসুখের কথাই ভেবেছি—আমি এমনই স্বার্থপর। তোমাকে কেমন করে' সুখী কর্‌তে পারি বল? তোমার জীবনটা যে শুধু নিরাশায় কাট্‌বে তা' তো হ'তে পারে না।"

"আপনার মাথাটা খারাপ হয়েছে দেখ্‌ছি। কি সব বাজে কথা বল্‌ছেন। ওসব কথা রেখে দিন, অন্য কিছু বল্‌বার থাকে তো বলুন।"

"আমার মাথা খারাপ হয় নি। যে নিজে ভালবেসেছে সে অপর কা'রও মধ্যে প্রণয়ের চিহ্ন সহজেই বুঝ্‌তে পারে। তোমার মুখের ভাবে, চোখের চাহনিতে, গানের ভাষায় আজ তোমার প্রাণের গোপন কথা জানিয়ে দিয়েছে। আমাদের সমাজের এমন নিয়ম যে কিছুতেই বিবাহ-বন্ধন ছেঁড়া যায় না, অন্য ধর্ম্মের হ'লে আজ তুমি

আমাকে 'ডাইভোর্স' করে' আবার বিয়ে করতে পারতে। তোমাকে আমি সুখী দেখতে চাই। আমি তোমার যোগ্য নই, তোমার যোগ্য একজন আছে আমি জানি— সে তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগী হয়েছে।"

"ভালবাসা নামক ব্যাধির যে আপনি এত বড় বিচক্ষণ চিকিৎসক তা' জানতুম না। এই রোগ দেখলেই যদি আপনি চিনতে পারেন তা' হ'লে এর ব্যবস্থাও আপনার করতে পারা উচিত, অন্যের কাছে যাই কেন বলুন।"

"তোমার এ রোগ ভাল করবার মত খুব ভাল লোকই আছে। সেও উদ্‌গ্রীব হ'য়েই আছে কিন্তু ধর্ম্মের বন্ধনের জন্য কিছু করতে পারছে না।"

"তাই না কি? আমার তো তা' জানা ছিল না, তা' হ'লে এতদিন না হয় একটা ব্যবস্থা করা যেতো। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আপনি নিজের দায়িত্বটা এড়াবার জন্য এতদিন ধরে' ভাবছিলেন আর শেষে এই উপায় স্থির করেছেন। উত্তম উপায় নির্দ্ধারণ করেছেন যা' হ'ক। দেখুন আপনার ভয় নেই, আমি কখনই আপনার ওপর কোনরকম দাবী করব না। এসব অযাচিত উপদেশও আমি শুনতে চাই না। অন্য কিছু যদি বলতে চান তো বলুন, তার পর আমি আপনাকে কয়েকটা কথা বলব।"

"প্রীতি, তুমি কি নিষ্ঠুর! তুমি কেন আমার মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করছ না। আমি তোমার প্রতি মস্ত বড় অন্যায় করে ফেলেছি, তার আর সংশোধনের উপায় নেই, কিন্তু আমি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিজের সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। আমাকে বিশ্বাস কর, তোমাকে যে অন্যের হ'তে বলছি সে-কথা, বলতেও আমার বুকের ভেতর ফেটে যাচ্ছে। প্রীতি, তোমার যতটা পাওয়া উচিত ততটা আমার যে দেবার উপায় নেই, তাই তোমাকে কিছুই উৎসর্গ করতে আমার সাহস নেই। পৃথিবীতে যা' কিছু শ্রেষ্ঠ সবই তোমার পাওয়া উচিত, আমার যে তোমাকে দেবার মত কিছুই নেই। নীলিমার বিয়ের পরদিনই আমি সকলের সামনে আমাদের পরিচয় দিতে রাজী ছিলাম, কেন দিই নি জান? তুমি রাণী, তোমাকে আর একজনের অংশীদার করতে ইচ্ছা হ'ল না, তার সঙ্গে একদিনও তুমি ঘর কর আমি চাই না। আর বেশী বলবার আমার সামর্থ্য নেই—"

"কেন আপনি এত অস্থির হচ্ছেন। আমার বিশ্বাস আমি চলে গেলে পর আপনার এ চাঞ্চল্য ক'মে যাবে। আমাকে দেখে আপনার অনুতাপ হচ্ছে তাই কষ্ট পাচ্চেন। আমাকে এত দিন তো ভুলেই ছিলেন, আবার আপনার স্ত্রী-পুত্রকে পেলে ক্রমে মন থেকে আমার কথা সরে যাবে। আমার জন্য আপনার সুখের নীড় ভাঙবেন না।"

"যতদিন আমার দেহে প্রাণ থাকবে তোমাকে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলব না। তোমার স্মৃতিটুকুই আমাকে শত কষ্টেও আনন্দ দেবে। প্রীতি, তুমি বুঝলে না এই আমার দুঃখ রইল।" এই বলিয়া হঠাৎ দেবব্রত প্রীতির পায়ের কাছে বসিয়া তাহার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

প্রীতি নির্ব্বাক্, কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না। সে পূর্ব্বে কখনও পুরুষ মানুষকে কাঁদিতে দেখে নাই। সে স্তম্ভিত হইল ও দেবব্রতের কাতরতায় চঞ্চল হইয়া পড়িল। সে ধীরে দেবব্রতের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিল—চোখে চোখে মিলনে উভয়েই বিহ্বল হইল। ধীরে, অতি ধীরে, দুইজনে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন এক নিগূঢ় আকর্ষণী শক্তি দুইটী প্রাণের মিলনের উপক্রম করিতেছিল, তাহারা উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত এমন সময় বাহিরে কে ডাকিল, "সাহেব, তার আয়া।" চমক ভাঙ্গিল, মোহ টুটিল, উভয়েই সরিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু দুইজনেরই মুখ রক্তবিহীন, দুইজনেই উত্তেজিত, উভয়েরই অঙ্গ থরথর কাঁপিতে লাগিল।

প্রীতি বসিয়া পড়িল। দেবব্রত অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া তাহার চাকরের হাত হইতে তারটী লইল। কিন্তু সে তখনও এতই অস্থির, এতই চঞ্চল যে সে খুলিতে পারিল না। প্রীতি শীঘ্র স্থির হইল, সে দেবব্রতের হাত হইতে তারটী লইয়া খুলিয়া পড়িল। তার করিয়াছেন মেমসাহেব—খোকার বড় অসুখ, শীঘ্র যাইতে লিখিয়াছেন

"ভগবান আপনাকে কর্ত্তব্য দেখিয়ে দিলেন" বলিয়া প্রীতি দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল। কেবল দরজার কাছে একবার ফিরিয়া বলিল, "আর আপনা সঙ্গে আমার দেখা হ'বে না।"

দেবব্রত ডাকিল, "প্রীতি, দাঁড়াও! একবার ফি এস।" কিন্তু ততক্ষণে প্রীতি শ্রবণের সীমার বাহিরে।

ছাব্বিশ

দেবব্রত ও প্রীতির সে রাত্রি কেমন করিয়া কাটি তাহা বর্ণনা করা কঠিন, চিত্তচাঞ্চল্যের শেষ নাই, মনো-ব্যথার অন্ত নাই। প্রীতি সেই যে গিয়া শুইল আর উঠিল না, অসুখের ভাণ করিয়া কিছু খাইলও না। তাহার মনের মধ্যে সমস্ত রাত্রি ভীষণ ঝড় বহিল।

প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রীতি দেবব্রতকে লিখিল "কাল সন্ধ্যার ব্যাপারটা ভুলে যাবেন, আমাদের উভয়ের দুর্ব্বলতার চিহ্ন ব্যতীত উহা আর কিছুই নহে। কোন অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি বোধহয় আমাদের জ্ঞান-হারা করেছিল। আমার নিকট হইতে দূরে সরে গেলেই আপনার সে মোহ কেটে যাবে, আবার আপনার মেম ও খোকাকে নিয়ে সুখে দিনযাপন করতে পারবেন

আমার প্রাণের ভেতর কে যেন বলে দিচ্ছে যে খোকা ভাল আছে, তাহার সামান্যই অসুখ করেছে। শুধু আমাদের ভুল দেখিয়ে দেবার জন্যই ঘটনাচক্রে তার এল। খোকার মাতার ওপর আপনি অন্যায় করতে যাচ্ছিলেন, নিয়তি বাধা দিল। আপনি সুখী হোন এই আমার আন্তরিক কামনা, আমার জন্য আপনি বিচলিত হ'বেন না।"

এই চিঠি প্রীতি ঝি-মাসীর হাতে দিয়া বলিল, "একটু বেলা হ'লে ওঁদের হাতে দিয়ে এস।" সে মুখ-হাত ধুইয়া তখনই নীচে নামিল।

তখন সকলেই চায়ের টেবিলে বসিয়াছেন, দেবব্রতও সেখানে। একরাত্রে দেবব্রতের চেহারা যে কি বিশ্রী হইয়াছে তাহা প্রীতির নজরে পড়িল, সে মনে মনে ব্যথা পাইল। সে ঘরে ঢুকিবার আগেই তাহার একবার মনে হইল পলাইবে কিন্তু তাহা পারিল না। আর একবার দেবব্রতকে দেখিতে, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে বড় সা হইল। প্রীতি শুনিল, রমার মা বলিতেছেন "ছেলে অসুখ হয়েছে বলে এত ভয় কি, বাবা? একরাত্রে যে তোমার পাঁচবৎসর বয়স বেড়ে গেছে। কিছু ভেবে না, তোমার খোকা ভাল হয়ে উঠ্‌বে।"

দেবব্রত অস্থিরকণ্ঠে বলিল, "সে জন্য নয়, কাকীম আমার শরীর ও মন ভাল নেই, অনেকদিন থেকে রাতে ঘুম হয় না।"

এই কথা বলিয়া দেবব্রত একবার প্রীতির দিকে চাহিল। প্রীতি এতক্ষণ একদৃষ্টে তাহারই মুখপানে চাহিয়াছিল। দেবব্রত দেখিয়া ফেলিতেই চোখ নামাই লইল। সেই দৃষ্টিতে দুইজনে দুইজনের ব্যথা পরস্পরকে জানাইয়া দিল। দেবব্রত বলিতে লাগিল, "আজই মে আমি যাব। আর সময় পাব না, অনেক কাজ আছে তাই এখনই দেখা করতে এলুম। নীলিমাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হ'বে জানি না।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অমিয়র সহিত করমর্দ্দন করিয়া তাহা দীর্ঘজীবন ও চিত্তসুখ কামনা করিল। নীলিমা নত হইয়া নমস্কার করিতে তাহার হাত ধরিয়া তুলিল। কিন্তু প্রীতির সামনে গিয়া সে আত্মহারা হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার বাক্‌শক্তি কে যেন হরণ করিল। সে অনিমেষনেত্রে প্রীতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন কে প্রীতির প্রতিমূর্ত্তি তাহার হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া লইতেছে। প্রীতিও প্রস্তর-প্রতিমা সম নির্ব্বাক্ নিশ্চল, তাহার হৃদয়ের স্পন্দনও যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দুইজনে প্রায় আত্মপরিচয় দিয়া ফেলিল কিন্তু প্রীতি সংযত হইল। সে খুব নীচু হইয়া দেবব্রতকে নমস্কার করিতে গেল। দেবব্রত তাহার দুইটী হাত নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া প্রীতির দিকে চাহিল। সে চাহনিতে কত প্রেম, সে স্পর্শে কত সোহাগ! কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না, নীরবে বিদায় লইল।

দেবব্রত চলিয়া গেলে প্রীতি খুব মনের জোর করিয়া নিজেকে সংযত করিল। এতক্ষণ রমা অনর্গল কথা কহিতে-ছিল, তাহার মনে পূর্ব্বরাত্রের নিমন্ত্রণ বাটীর কথা ভরিয়া ছিল, রমার গল্পে সকলেই সেই দিকে মন দিয়াছিলেন,

ও দেবব্রতের বিদায়কালীন বিষণ্ণতা লক্ষ্য করিলেন না।

বাড়ী ফিরিয়া দেবব্রত চিঠিখানি পাইয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইল। সে প্রীতির বিষয় কি যে ভাবিবে স্থির করিতে পারিল না। "এই কি সেই যার কাছে এই-মাত্র বিদায় নিয়ে এলুম, যার মুখে-চোখে কত ব্যথা, কত প্রেমের আভাস পেলাম। তবে কি সবই আমার ভুল? আমি সে ছবি কি কল্পনায় এঁকেছি?—তাই হওয়া সম্ভব, সে কেন আমায় ভালবাস্‌বে? আমাকে তো ঘৃণাই কর্‌বার কথা। প্রীতি নিশ্চয় নির্ম্মলকে ভালবাসে, নির্ম্মলই সত্য প্রীতির উপযুক্ত সঙ্গী। আমিও প্রীতিকে অনেক দিতে পারতুম কিন্তু মোহান্ধ হ'য়ে আমি সে পথে নিজেই কণ্টক দিয়েছি। এমির প্রতি যে আমি আসক্ত হ'লাম সেটা কি সত্য প্রণয় না মোহের বন্ধন? সে সময় আমি বড়ই একলা ছিলাম, তাই এমির রূপে, যৌবনে মুগ্ধ হয়ে রক্তমাংসের টানে আমি তাহার মোহে পড়েছিলাম। কখনও তো খুব মনের মিল হয় নি, অথচ প্রীতির সহিত আমার কত বিষয় মিল আছে। এমির রূপে মাদকতা আছে, তাহাতেই আমার সুখ কিন্তু প্রীতির স্নিগ্ধ কান্তি আমার হৃদয় শীতল করে। মনে হয় প্রীতি যেন আমার খেলার সাথী, বন্ধু, সহচরী, সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার সঙ্গিনী, প্রণয়িনী, স্ত্রী ও সচিব। প্রীতি আমাকে স্বর্গসুখের আস্বাদ দেয়। কিন্তু এমিকে ত্যাগ করিতেও পারিতেছি না, ধিক! আমাকে।" দেবব্রত এইরূপ কতই ভাবিল কিন্তু তাহাকে শীঘ্র যাইতে হইল।

সাতাশ

মুসৌরীতে গিয়া দেবব্রত দেখিল প্রীতি যাহা বলিয়াছিল তাহাই ঠিক। তাহার ছেলের দাঁত ওঠার জন্য হঠাৎ খুব বেশী জ্বর হইয়া তিন-চারিবার 'তড়কা' হইয়াছিল, তাহাতে এমি ভয় পাইয়া তার করিয়াছিল। দেবব্রত যখন পৌছিল তখন ছেলেটার সামান্য জ্বর ছিল কিন্তু সে বেশ খেলা করিতেছিল। এমি দেবব্রতকে দেখিয়া বলিল, "এ কি, তোমার এমন চেহারা হয়েছে কেন? বোধ হয় এই গরমে বেশী খাটুনী হ'য়েছে তাই এমন হ'য়ে গেছ। এখানে কয়দিন বিশ্রাম করলেই ভাল হ'য়ে যাবে।"

দেবব্রত দর্শদিনের জন্য আসিয়াছিল। খোকাকে দেখিয়া তাহার প্রথম ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাইতে, তাহা হইলে প্রীতি কলিকাতা ফিরিবার পূর্ব্বে আর একবার তাহাকে দেখিবার ও সব কথা বুঝিয়া বলিবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু আবার মনে হইল, প্রীতি তো তাহাকে চায় না, ভালবাসে না, তখন গিয়ে লাভ কি? প্রীতি যদি তাহাকে ভালবাস্‌ত তো ওরকম চিঠি লিখ্‌তে পার্‌ত না, আর সেদিন রাত্রেও অমন করে' চলে যেত না। প্রীতির বোধহয় সেদিন তাহার কাতরতা দেখে মুহূর্ত্তের জন্য দৌর্ব্বল্য এসেছিল এবং সে তো তাই লিখেছেও। কিন্তু প্রীতিকে না পেলে তাহার জীবন তো সুখী হ'তে পার্‌বে না। পরক্ষণে তাহার মনে হইল, এখনি যদি চলিয়া যাই এমি কি মনে করিবে! এই ভাবিয়া দেবব্রত ফিরিয়া যাইবার বাসনা দমন করিল।

ক্রমে খোকাকে ও এমিকে পাইয়া দেবব্রতর তাপিত হৃদয় কতকটা শান্ত হইল। লক্ষ্ণৌ শহরের প্রচণ্ড গরমের পর পাহাড়ের শীতল বাতাসে তাহার শরীরও একটু ভাল হইল। দেবব্রত ফিরিয়া যাইবার দুইদিন পূর্ব্বে ডিনারের পর এমিকে বলিল, "এমি, আমার সঙ্গে ফিরিয়া চল। আমি আর একা একা থাক্‌তে পার্‌ছি না, আমি তোমাকে চাই।"

উত্তরে এমি বলিল, "Don't be silly (বোকার মত কথা বলো না) আমি এই গরমে কি ক'রে যাব?"

"এমি তুমি বুঝতে পার্‌ছ না যে আমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে, তা হ'লে ওকথা বল্‌তে না। আমার বড় দরকার না হ'লে আমার জন্যে তোমাকে কষ্ট কর্‌তে বল্‌তুম না। তুমি আর পনের দিন থেকে আমার কাছে এস, তা না হ'লে আমি বাঁচতে পার্‌ব না।"

"আচ্ছা স্বার্থপর তো তুমি। তোমরা প্রাচ্য জাতীয়েরা কেবল নিজেদের সুখের কথা ভাব। ছেলেটার শরীর খারাপ হ'বে, খোকা হ'বার পর আমারও বহুদিনের জন্য বায়ুপরিবর্ত্তনের দরকার, এখন এই গরমের মধ্যে কেমন করে' আমাদের যাবার কথা ভাব্‌তেও তুমি

পার্‌ছ বুঝি না। তুমি একেবারে পাগল হয়েছে।"

"আমি যদি সেখানে থাক্‌তে পারি আর কত শত লোক থাক্‌তে পারেন, তখন তুমিই বা পার্‌বে না কেন? আমাদের দেশের মেয়েরা তো স্বামীর জন্য নিজেদের সুখ হাসিমুখে বিসর্জ্জন দেয়। তুমি যদি আমাকে যথার্থ ভালবাস্‌তে তা হ'লে আজ আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি কর্‌তে না।"

"তোমার ওসব ছেলেমানুষী রাখ, মিছে কেন বক্‌বকি কর্‌চ, আমি যেতে পার্‌ব না। এত যদি তোমার একা একা মনে হচ্ছে, এসময় তো আমি নেই, তোমার মাকে কেন আস্‌তে বল না। মা'র সঙ্গে থাক্‌বার জন্যে যে অস্থির হ'তে, তিনি যদি তোমায় ভালবাসেন তো এ সময়ে কেন আসেন না?"

"তোমাকে আর আমার জন্য ভাব্‌তে হ'বে না। মাকে আস্‌তে বল্‌বার আমার মুখ নেই, ইচ্ছাও নেই। আমার সঙ্গিনীর দরকার ছিল, সে সুখ তুমি যখন দেবে না, তখন যা' হয় হ'বে।" এই বলিয়া দেবব্রত বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল।

এমি তখন ভাবিল, "বেচারা একটু বেশী ব্যথা পেয়েছে হয় তো কাজটা ঠিক হয় নি। তাই বলে আমিও প্রস্তাবে রাজী হ'তে পারি না, এই গরমে কে সেখানে যাবে? এখানের এত আমোদ-প্রমোদ ছেড়ে আমি সেখানে পুড়ে মর্‌তে যাই আর কি? এখন একটু বিরক্ত হচ্ছে কিন্তু কখনও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে নাই। এবার ও করবে না। আজ একটু বেশী মিষ্ট ব্যবহারে ও আদরে মন ভুলিয়ে দেব।"

এমি পূর্ব্বে প্রতিবারই রূপের ফাঁদে দেবব্রতকে দাস করিয়া ফেলিত, মনে করিল এবারও তাই করিবে। হায়! এমি তো বুঝিল না যে মানুষ যখন প্রাণের মতন সঙ্গী পায় তখন আর রূপের লালসা থাকে না। এমির রূপের উপাসক অনেকেই ছিল, অনেক পুরুষই তাহার রূপের আগুনে পুড়িবার জন্য ব্যস্ত ছিল, এমিও অনেককেই সেই আগুনের শিখায় খেলাইয়াছে কিন্তু ধরা দেয় নাই। এমির ধারণা সে তাহার রূপের ছটায় বিশ্ববিজয় করিতে পারে। দেবব্রত যে কখনও সে মোহবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে এমন কথা তাহার মনের কোণেও স্থান পাইত না, সে দেবব্রতের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, এ শীকার পালাই-বার নহে। দেবব্রতের কাছে সে যে কেন নিজেকে ধরা দিয়াছিল তাহা সে নিজেই ঠিক বুঝিতে পারিত না। দেবব্রতের মধ্যে কি একটা শান্ত স্নিগ্ধ ভাব ছিল, যাহার জন্য তাহার প্রকৃতিটা এমিরবড়ই ভাল লাগিত; তদ্ভিন্ন সে এমির সুখের জন্য এত ব্যস্ত, তাহার ব্যবহার এত নম্র যে এমি তাহাকে ভাল না বাসিয়া পারিত না। কিন্তু এমির মন স্বার্থে পূর্ণ, সে নিজের সুখের পথে কোন বাধাই মানিত না। পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্র কেহই তাহার সুখের আগে নহে। কাজেই দেবব্রতের ব্যথা বুঝিয়াও সে স্থির করিল "অন্যায় আব্‌দার কর্‌লে আমি শুন্‌তে বাধ্য নই।"

দেবব্রত মনের ব্যথা ভুলিবার জন্য অনেকক্ষণ বেড়াইল, বাড়ী ফিরিয়া দেখিল সব নিস্তব্ধ। সে আশা করিয়াছিল যে, এমি তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে। এমিকে শায়িত জানিয়া দেবব্রত শয্যা-গৃহে না গিয়া ড্রইং-রুমে একটা আরাম কেদারায় শুইয়া রাত্রি-যাপন করিল।

দেবব্রত ঘরে শুইতে না আসাতে এমির বড় রাগ হইল। পরদিন প্রাতে সে দেবব্রতর সঙ্গে ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত কহিল না—দেবব্রতও সমস্ত দিন একা একা ঘুরিল। অনেক রকম চিন্তা করিয়া সে ঠিক করিল যে এমির সঙ্গে যখন জীবনযাপন করিতে হইবে, এমি যখন তাহার পুত্রের জননী তখন মনোমালিন্য করিয়া অশান্তি বৃদ্ধি করায় কি ফল? সেইদিন রাত্রে সে এমিকে বলিল, "কাল আমার মনের ও মাথার ঠিক ছিল না, তাই স্বার্থ-পরের মত নিজের সুখের জন্য তোমাকে কষ্ট কর্‌তে ব'লে-ছিলাম, তুমি কিছু মনে করো না। আমি চাই যে তোমরা সুখে থাক, কাল রাত্রের ঝগ্‌ড়ার জন্য আমাকে ক্ষমা কর।"

এমি তৃপ্ত হইল, সে ভাবিল যে এই যুদ্ধেও সে জয়ী হইয়াছে।

ঝড় শেষ হইল কিন্তু মেঘ রহিয়া গেল, বিজয়িনী এমি সে মেঘ লক্ষ্য করিল না। দেবব্রতের হৃদয়ে যে বিচ্ছেদের

বীজবপন হইল এমি তাহা বুঝিল না। এমি দেবব্রতকে প্রাণ দেয় নাই, নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিবাহ করিয়াছিল। এমি দেবব্রতের বিষয় এতই নিশ্চিন্ত ছিল যে তাহার মনে দেবব্রতের হৃদয় জয় করিবার আকাঙ্ক্ষাটুকুও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে জানিত যে তাহার রূপের লোভ দেবব্রত কখনই সামলাইতে পারিবে না। শুধু রূপে যে প্রাণ ধরিয়া রাখা যায় না তাহা এমি জানিত না, সে মনে করিত যে রূপের মোহে পৃথিবী বশ করা যায়।

লক্ষ্ণৌ শহরে যে দেবব্রত ফিরিল সে কিন্তু পূর্ব্বের দেবব্রত নহে, এক নূতন মানুষ। তাহার আর সে আনন্দ নাই, সে সজীবতা নাই। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল যে স্ত্রীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্যের কোন ত্রুটি হইতে দিবে না, কিন্তু যে স্ত্রী তাহার ব্যথা বুঝিল না তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতার আবশ্যক নাই।

দেবব্রত কর্ম্মে মন ভুলাইতে প্রয়াস পাইল। রমা ও তাহার মা ডাকিলে সে তাঁহাদের বাড়ী যায়, আর কোথাও যায় না। রমাদের বাটী যাইবার তাহার আরও কারণ প্রীতির সংবাদ লইতে, সে কৌশলে সর্ব্বদাই সে সংবাদ লইত। তবে তাহাকে এ সম্বন্ধে বেশী কষ্ট পাইতে হইত না, রমার মুখে সর্ব্বদাই প্রীতির কথা লাগিয়া থাকিত।

এইরূপে দেবব্রত নিরাশায় জীবনযাপন করিতে লাগিল, ওদিকে তাহার স্ত্রী আমোদে শৈলবিহারে ব্যস্ত রহিল।

ছড়া

শ্রীইন্দুবিকাশ বসু

(৫০১)

মেঘ হ'য়েছে চাকা চাকা,
কি কর শ্বশুর লেখা-জোকা,
ক্ষেতের মাঝে বাঁধগে আল,
বৃষ্টি হ'বে আজকাল।

(৫০২)

মনে মনে খেদ বড়
কান্না পায় রাতে,
পরমান্ন পিঠে পুলী
খাই স্বপনেতে।

(৫০৩)

যশোদা কি ভাগ্যবতী,
পরের পুতে পুত্রবতী।

(৫০৪)

মাসী বল, পিসী বল,
মায়ের বড় নয়।
ভাজা বল, ভুজি বল,
ভাতের বড় নয়।

(৫০৫)

গোঁসাই ঠাকুর মরে—
মন রক্ষার তরে।

(৫০৬)

বোয়ের পাগ্গা ভারী, পা গোদা,
বউকে কিছু ব'ল না দাদা।

(৫০৭)

বড় কথা মনে পড়ল আঁচাতে আঁচাতে,
ঠাকুরঝীকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।
ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ,
জলের ভেতর তোমাদের কি কুটুম আছে?

(স্নানের সময়ে ননদকে কুমীরে লইয়া গিয়াছে, সেই কথা ভাত খাইবার পর বউয়ের মনে পড়াতে শাশুড়ীকে বলিতেছে)

(৫০৮)

আপনি পাগল, পতি পাগল,
পাগল তার চেলা;
এক পাগলে রক্ষা নাই,
তিন পাগলের মেলা।

(৫০৯)
পরের ধনে আপন ছালা,
যত ইচ্ছা ভরে ফেলা !

(৫১০)
হাতে কালী, মুখে কালী,
বাছা আমার লিখে এলি।

(৫১১)
বেটা বিয়লু বউকে দিলুম,
ঝী বিয়লু জামাইকে দিলুম,
আপনি হলুম বাঁদী
পা ছেড়ে ব'সে কাঁদি।

(৫১২)
স্বামীর ধন থাকলে
পরিবার হয় লক্ষ্মী ;
যার চক্ষু জুড়ায়
বোয়ের গিন্নীপনা দেখি।

(৫১৩)
দম্পতি সুখেতে ভুলি থেক না যুবক,
পরিণামে ফল তার হইবে নরক।

(৫১৪)
এ ধর্ম্ম তোমার ভায়া
ধর্ম্মে নাহি স'বে,
লোকনিন্দা হয়েছে তো
শেষটা নরক হবে।

(৫১৫)
জান নাক জানবে ;—
গেঁতি জান প-দিয়ে বসে বসে কাঁদবে।

(৫১৬)
তেঁতুলে বাগদী যেন ফিরিঙ্গীর ঝাঁক,
বাঁচিনেকো দেখিয়ে তাদের ফোতো জাঁক।

(৫১৭)
সিন্ধু ভরা আছে সুধা
বিন্দু নাহি চায় ;
বিষ খেতে রিষধরী
ধরিবারে যায়।

(৫১৮)
দশদিন চোরের,
একদিন সাধের।

(৫১৯)
টক, টেঁসো, আঁটিসারা,
শস্তশূন্য আঁশ ভরা,
এই আম বিলাবার ধারা।

(৫২০)
ছেলে মেয়ে কাপড় ছেঁড়ে,
আপনার ক্ষতি আপনি করে।

(৫২১)
ঘোড়ার পেট, গাধার পিঠ,
খালি থাকে কদাচিৎ।

(৫২২)
পরের মাথায় দিয়ে হাত
কিরে কাড়ে নির্ঘাত।
(কিরে কাড়ে—শপথ করে)

(৫২৩)
টাকার নাও পাহাড় চলে,
অনুরোধে ঢেঁকী গেলে।

(৫২৪)
আপনি গিন্নী স্বয়ংবরা,
কি বিলায় মোর খই কলা।

(৫২৫)
সাজা গোজা সার,
পাল্‌কী আসা ভার।

(৫২৬)
ঘরে নাই ভাজা ভুজা,
নিত্য করেন গোঁসাই পূজা।

(৫২৭)
আর যেন নাহি লাগে তোমার বাতাস,
ফেলেছি ঘাড়ের বোঝা হ'য়েছি খালাস।

(৫২৮)
পেটে রাখলেই গুণ করে,
যায় করলেই ছুরি ধরে।

(৫২৯)

নি-খাউস্তির পাড়া,
ভাই গোটা ছাগল পোড়া ;

(৫৩০)

লাথি, ঝাঁটা পায়ের তল,
ভাত পাথরটা বুকের বল।

(৫৩১)

ভাতে বলে মোরে খা,
হাম্বুর কেড়ে ঘরে যা।
(হাম্বুর কেড়ে—হামাগুড়ি দিয়ে)

(৫৩২)

শিখেছ কোথায় ?
ঠেকেছি যথায়।

(৫৩৩)

পঞ্চম মঙ্গল কার,
রন্ধ্রগত শনি ?
কে দিল অনলে হাত,
কে ধরিল ফণী ?

(৫৩৪)

দরিদ্রের দুনা ব্যয়,
পান্তাভাতে লবণ ক্ষয়।

(৫৩৫)

লোকে বলে, আছি ভাল,
শালুক খেয়ে দাঁত কাল।

(৫৩৬)

আলো চাল, বাকসের গুড়ি,
আপনার গরবে ফাঁপা টুরি।

(৫৩৭)

এমন কখনও দেখেনি বাপের বাপে,
যে মেয়ে হ'য়ে বলদে চাপে।

(৫৩৮)

ননদিনী রায় বাঘিনী
দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সোজা,
কলিতে বউ রাজা।

(৫৩৯)

যদি দেখ মুকুন্দ চাঁপা, মাকুন্দ চোপা
এক পা যেও না বাপা।

(৫৪০)

বাপকো বেটা, সিপাহীকো ঘোড়া,
কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া।

(৫৪১)

গান জানি না, মান জানি না,
খাই একপাত দোক্তা,
পড়ে আছি শিমুলগাছের তক্তা।

(৫৪২)

সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে,
গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে।

(৫৪৩)

ন গাঁ মাগিলে যা,
সাত গাঁ মাগিলেও তা।

(৫৪৪)

আপন মান আপনি রাখ,
কাটা কান চুল দিয়ে ঢাক।

(৫৪৫)

মেয়ে মেয়ে ভুট কল্লে খেয়ে,
হরিভক্তি উড়ে গেল মেয়ের পানে চেয়ে।

(৫৪৬)

গিন্নী হওয়ার বড় সাধ,
কাঁখে কলসী বড়ই বাধ।

(৫৪৭)

বাড়ীর গাছা,
আপন বাছা।
(এই দুইয়ে বড় আপন হয়)

(৫৪৮)

ছিল ঢেঁকী হ'ল তুল,
কাটতে কাটতে নির্মূল।
(তুল=তুলাদণ্ড)

(৫৪৯)
আষাঢ়ে না হ'ল সুতো,
হা সুতো যো সুতো,
বোলতে না হ'ল পুত,
হা পুত যো পুত।

(৫৫০)
বামুন গেছে ঘর,
লাঙ্গল তুলে ধর।

(৫৫১)
ঠাকুরে করেছে হেলা,
রাখালে মেরেছে ঢেলা।

(৫৫২)
ছেন্দার ছাই,
হাত পেতে খাই।

(৫৫৩)
নিত্য নূতনে বাসনা,
পুরাতনে হয় ঘৃণা।

(৫৫৪)
যদি থাকে আগাপাছা,
কি করবে তার শাগামাছা।
(আগাপাছা = ঘৃত ও দুগ্ধ)

(৫৫৫)
আগনেংলা যেদিকে যায়,
পাছনেংলা সেদিকে ধায়।

(৫৫৬)
আম শুনতে ধান শুনেছে,
চাঁদ লিখতে ফাঁদ লিখেছে।

(৫৫৭)
কু রাঁধুনীর হাতে,
রুই মাছ কাঁদে।

(৫৫৮)
গুরুর কথা না শোন কানে,
প্রাণটা যাবে হেঁচকা টানে।

(৫৫৯)
পোদ্দারের পো পণ্ডিত হ'লে,
বাপকে বাড়ীর কৃষাণ ব'লে।

(৫৬০)
সুন্দরের শত বায়না,
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে
হেসে কথা কয় না।

(৫৬১)
যত ছিল নাড়া বুনে,
সব হ'ল কীর্ত্তুনে।

(৫৬২)
মুখে সব মিঠে,
নিম নিষিন্দে পেটে।

(৫৬৩)
না গজাতে ঘুণ ধরে,
না উঠতে আছাড়।
বাসরেতে পতি মরে,
বাসি-বেতে রাঁড়।

(৫৬৪)
দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা,
ঘনিয়ে বসে কাছে।
কথা দিয়ে কথা নেয়,
প্রাণে বধে পাছে।

(৫৬৫)
অতি মর্ম্ম যার,
হতশ্রী তার।

(৫৬৬)
কোথাকারের কে,
দুটো আমড়া ভাতে দে।

(৫৬৭)
ও:র, তোরে যমরাজা ভুলেছে,
চিত্রগুপ্ত পাঁজি পুঁথি উল্টে দিয়েছে।

(৫৬৮)
মা হওয়া কি মুখের কথা,
শুধু প্রসব করলেই হয় না মাতা।
বাপ হওয়া কি মুখের কথা,
শুধু জন্মদানেই হয় না পিতা।

(৫৬৯)

নেই স্বামী, নেই পুত,
বেড়ায় যেন যমদূত।

(৫৭০)

স্বামীতে না পুছে,
স্ত্রী বলে, মোর আদর আছে।

(৫৭১)

না দেখে চ'লে যায়,
পায় পায় হোঁচট খায়।

(৫৭২)

দুর্ভিক্ষ অল্পকাল,
স্মরণ থাকে চিরকাল।

(৫৭৩)

তুমি যদি হরি পতিতপাবন,
তবে কেন আমার দশা হে এমন।

(৫৭৪)

ব্যাঙেও চায় ঠ্যাং মেলতে,
কুঁজাও চায় চিৎ হ'য়ে শুতে।

(৫৭৫)

ম'রেও না মরে সে,
যদি লোকে ঘোষে,
বেঁচেও না বাঁচে সে,
যদি লোকে দোষে।

(৫৭৬)

দেবতার বেলা লীলাখেলা,
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।

(৫৭৭)

আপনি করলে লীলাখেলা,
দোষ লিখলে পরের বেলা।

(৫৭৮)

চরকা আমার ভাতার পুত,
চরকা আমার নাতি;
চরকার দৌলতে আমার
দুয়ারে বাঁধা হাতী।

(৫৭৯)

হেলায় গেল বেলা,
জনে শুকাক ধান,
উঠ কলসী জলকে চল,
ঢেঁকী কুটুক ধান।

(জনে = জ্যোৎস্নায়; অলসতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়)

(৫৮০)

শুনলে সাড়া,
তো নিলে পাড়া

(৫৮১)

ভবানন্দ ওগো তোর ক্ষুরে দণ্ডবৎ,
কেমনে গিলিলে তুমি সারথীর রথ।

(৫৮২)

সবাই যদি হবে দে,
তবে এঁটো পাত কুড়াবে কে?

(৫৮৩)

ঢেঁকশালে যদি মাণিক পাই,
তবে কেন পর্ব্বতে যাই।

(৫৮৪)

দেব ধন, বুঝবো মন,
কেড়ে নিতে কতক্ষণ?

(৫৮৫)

আপন বুদ্ধিতে তর,
পর বুদ্ধিতে মর।

(৫৮৬)

বাহিরে কোঁচার পত্তন,
ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন।

(৫৮৭)

কাল বামুন, কটা শূদ্র,
বেটে মুসলমান,
ঘরজামই আর পোষ্য-পুত্র
সকলই সমান।

(৫৮৮)

কাহারও ঘী-রুটী,
কাহারও দাঁত ছিরকুটী।

(৫৮৯)

দুর্জ্জনকে দূরে পরিহার

দূর হ'তে করি নমস্কার।

(৫৯০)

গঙ্গার জল গঙ্গায় র'ল,

পিতৃপুরুষ উদ্ধার হ'ল।

(৫৯১)

কালি ছিলাম বসে স্বর্ণপিঁড়ে,

আজ বসেছি আস্তাকুড়ে।

(৫৯২)

কাছা দিতে কোঁচা আটে না,

কোঁচা দিতে কাছা আটে না।

(৫৯৩)

উণ ভাতে দুনো বল,

বিস্তর ভাতে রসাতল।

(৫৯৪)

অতি বাড় বেড়ো নাকো

ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে।

অতি ছোট হোয়ো নাকো

ছাগলে মুড়াবে।

(৫৯৫)

গরুর কুটুম পালে পালে,

মানুষের কুটুম এলে গেলে।

(গরু পালে অনায়াসে মিশিয়া যায়, মানুষের আসা যাওয়া করিলে কুটুম্বিতা থাকে)

(৫৯৬)

বিপদ উড়িয়া আসে,

যায় যবে পা ঘসে ঘসে।

(৫৯৭)

গাঁ বড় তার মাঝের পাড়া,

নাক নাই তার নথ নাড়া।

(৫৯৮)

সকল কথা আছে চিতে,

কাপড়টী ছিনিয়ে নেছ

পৌষ মাসের শীতে।

(৫৯৯)

কেউ বা শিখে দেখে,

কেউ বা শিখে ঠেকে।

(৬০০)

পাতাল ফোঁড়, বিন্নাফোঁড়,

মহিষাশিঙ্গা, কুই চামার,

মুখঝাবড়া, নিমের পাত—

মোচ রাখে ছয় জাত।

(বিন্না = বীরণ (?) — বেনাগাছ

= ঝাঁটা (?)

কিংবা বিনাহ (?)

'কুই' এর অর্থ করিতে সঙ্কলয়িতা অসমর্থ

এই ছয় রকমের গোঁফ আছে)

উপহার

শিল্পী শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস

JUNO PRINTING WORKS CALCUTTA.

নারী-প্রগতি-সম্বন্ধে দুই একটী কথা

শ্রীবিমলাচরণ দেব

অল্পদিন আগে ইংলণ্ডে একখানি বই প্রকাশিত হইয়াছে। উহার নাম The S cret of my successful Marriage. উহা কয়েকটী অল্প-বিস্তর বিখ্যাত ইংরেজের বিবাহিত-জীবনের কথা। লেখক স্ত্রীলোকেরা।

আজকাল নারী-প্রগতির দিনে এই বইখানি কৌতূহলোদ্দীপক বটে; কারণ ইহাতে একটা সেকেলে ভাব দেখা যায় এবং এইভাবের সহিত বর্ত্তমান প্রগতি ও তাহার মনস্তত্ত্বের কথা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

লেখিকাগণের মধ্যে একজনের কথা বলি। ইনি লণ্ডনের Dean Inge (বা "Gloomy Dean") এর স্ত্রী। ইঁহার বিবাহের দিন ইঁহার মাতা ইঁহাকে বলেন :—

To-day, God is putting into your hands the life of a good and great man, and it will be in your power to make or mar his life. Do your utmost to help him in every way you can. ('আজ ভগবান্ তোমারি হাতে যে সৎ ও মহৎ ব্যক্তিকে সমর্পণ করলেন, তাকে উন্নত বা অবনত করা তোমার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। তাকে সকল রকমে সাহায্য করতে চেষ্টা করো।')

বলা বাহুল্য যে শ্রীমতী তাঁহার মাতার উপদেশবাণী যত্নের সহিত মনে রাখিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন।

স্বামীর জীবন সাফল্য-শ্রীমণ্ডিত করিতে বা নিরাশ-বিফলতায় পর্য্যবসিত করিতে স্ত্রী কতদূর পারেন তাহা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়। ইহার অর্থ নহে যে, স্ত্রীর জীবন সম্বন্ধে স্বামীর কোন দায়িত্ব নাই বা স্বামীর কোন কার্য্যের ফলস্বরূপ স্ত্রীর জীবন বিফল বা ভারাক্রান্ত হইয়া যায় না।

আমার বক্তব্য এই যে, স্বামী ও স্ত্রী সংসারে দুইটী বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে ব্যাপৃত এবং কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন হইলেও পরস্পরের সাহায্য করিতে সমর্থ।

কার্য্যক্ষেত্র যে পৃথক ইহা প্রকৃতিই দেখাইয়া দিতেছে। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, একের কার্য্যক্ষেত্রে অপ[illegible] হইয়াছে, তজ্জন্য ইহা সাধারণ নিয়ম ব[illegible] যায় না। মোটামুটি ধরিলে ইহা বলা যায় যে, [illegible] কার্য্যক্ষেত্র প্রধানতঃ বহির্জগতে। স্ত্রীর কার্য্যক্ষেত্র [illegible]

সময়ে সময়ে স্ত্রীলোককে বহির্জ্জগতের কার্য্যে সফল হইতে দেখা যায় এবং পুরুষকে গৃহস্থালীর কার্য্যে দ[illegible] হইতে দেখা যায়। পুরুষালি ছাঁদের স্ত্রীলোক ও মেয়েলি ছাঁদের পুরুষ কম হইলেও নেহাৎ বিরল নহে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বহির্জ্জগতের কার্য্যে নাম অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের চেহারায় স্ত্রীসুলভ রমণীয়তার অভাব স্পষ্টই দেখা যায়। দেখা যায় সুস্পষ্টরূপে পুরুষ-সুলভ কঠোরতা ও পুরুষোচিত মনোবৃত্তি।

এইজন্য মনে হয় যে পুরুষালি স্ত্রীলোক ও মেয়েলি পুরুষ দুইই প্রকৃতি-বিপর্য্যয় (Freak)। এ বিষয়ের চর্চ্চা হিন্দু প্রজনন-শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে। কি কারণে সন্তানোৎপাদনকালে মাতাপিতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থানুসারে সন্তানের আকার-প্রকার, মনোবৃত্তি প্রভৃতি কি ভাবে ভাবিত হয় এবং ব্যক্তির আকার-প্রকার মনোবৃত্তি প্রভৃতির সহিত গ্রহগণের সম্বন্ধ, এই সমস্ত লইয়া হিন্দুগণ বহুকাল হইতে গবেষণা করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং তদনুসারে গার্হস্থ্যানীতি প্রণীত হইয়াছে।

এক্ষণে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি যে, পুরুষের কার্য্য প্রধানতঃ বহির্জ্জগতে ও নারীর কার্য্য গৃহে অর্থাৎ সন্তান-পালন ও গৃহ-সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি করায়।

নারী-প্রগতি-বাদিগণ যে নারী ও পুরুষের বহির্জ্জগৎ-সম্বন্ধে সমান অধিকার বলেন, তাহা সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় বোধ হয় সমীচীন নহে ; বরং প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। তাহাতে হয় এই যে, নারী স্বীয় প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া পুরুষের জন্য নির্দ্দিষ্ট পথে গিয়া 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হইয়া পড়েন।

প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে থাকিয়া পরস্পরের সাহচর্য্য ও সহানুভূতি দ্বারা সামাজিক কর্ত্তব্য সাধন করাই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। "সংগোক্তৌ চরতো ধর্ম্ম।" ধর্ম্ম অর্থে এস্থলে নিজ নিজ ধর্ম্ম। অর্থাৎ যাহা পুরুষের ধর্ম্ম—তাহা অবিচারে ও সম্পূর্ণরূপে যে নারীর ধর্ম্ম তাহা হইতে পারে না। এমন কতকগুলি স্থান আছে যেখানে একই জিনিস একের ধর্ম্ম ও অপরের পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা ও অধর্ম্ম। এরূপও আছে যে কোন বিষয়ে কিছুদূর পর্য্যন্ত দুই জনেরই অবাধ ও সমান গতি, কিন্তু একটা সীমার পর একের গতি আছে, অপরের পক্ষে নাই। এরূপ স্থলে দুইএর সমান অধিকার বলিলে কদর্থ করা হয় বলিয়া মনে হয়। ইহার একটী উদাহরণ পাই স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে। শিক্ষা যে কেবল পুরুষে আবদ্ধ থাকিবে, তাহা নিশ্চয়ই ঠিক নয়। কিন্তু "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" অর্থে—নিশ্চয়ই ইহা নয় যে পুরুষকে যতদূর যেভাবে শিক্ষা দিবে, কন্যাকেও ঠিক সেই ভাবে ও ততদূর শিক্ষা দিবে। ইহাতে লাভের মধ্যে হইবে যে কন্যার সুকুমার ভাব লোপ পাইয়া একটা এমন কঠোরভাবের আবির্ভাব হইবে, যাহাতে সে দুয়ের বা'র হইয়া যাইবে। তখন সে 'পুরুষ'ও হইবে না, অথচ স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যের দিকে, প্রকৃতির যাহা উদ্দেশ্য সে দিকে, তাহার বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিবে। সেটা সমাজের পক্ষে হিতকর কি না বিচার্য্য।

এরূপ যে হয় ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত নহে। পাঠকগণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে এরূপ দেখিতে পাইবেন।

স্ত্রী-প্রগতি বর্ত্তমান আকারে যে দেশ হইতে আসিয়াছে সে দেশেও এই আত্যন্তিক প্রগতির বিষময় ফল অনুভূত হইতেছে।

১৯১৫ সালে 'Socialist Review' নামক পত্রিকায় Halford নামক একজন লেখক 'Sex and Statistics' নামক একটী প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে ইংলণ্ডে সামাজিক অধোগতি, দুর্নীতি, সাংসারিক অশান্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন যে, এই সমস্ত কুফলের প্রধান কারণ হইতেছে "Practical abolition of early marriage," এবং আরও লেখেন :—"Yet we are encouraging with all our might those influences of education and so called emancipation which tend more and more to make women unwilling both for marriage and child-bearing. (অর্থাৎ তথাপি যে শিক্ষা ও তথাকথিত মুক্তির প্রভাবে নারীগণ বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন ব্যাপারে উত্তরোত্তর পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িতেছেন সেই প্রভাবকে আমরা যথাসাধ্য উৎসাহ দিতেছি।)

ইহার সহিত Registrar General of England and Wales এর Report হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন :—

যে শহরে স্ত্রীশিক্ষা বেশ প্রচলিত

শহর	লোকসংখ্যা	১৯১০ সালে জন্মসংখ্যা
উলউইচ	১৪,৯৭৫	২০১
হ্যাম্পষ্টেড	৮৫,৫১০	১,২৬৯
হর্ণসি	৮৪,৩০২	১,৩৭৭
ষ্টোক নিউইংটন	৫০,৬৮৩	৯১৫
মোট	২৩৫,৭৭০	৩,৭৬২

যে শহরে স্ত্রীশিক্ষা কম প্রচলিত

অভ্‌লি	১৬,১০৭	৪৮০
চেষ্টার-লে-ষ্ট্রিট	৭৮,৫৯৫	২,৮২৫
ক্যানিংটাউন	৮২,২৬১	২,৭৫৬
পপ্‌লার	৫৬,৩২৭	১,৭৪০
মোট	২৩৩,২৯০	৭,৮০১

লেখক আরও বলেন—It is very generally asserted by psychologists that education

beyond certain limits necessarily produces in women on asexual condition.

(মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ প্রায়শঃ বলিয়া থাকেন যে, নারীগণ নির্দ্দিষ্ট শিক্ষার সীমা অতিক্রম করিলে এমন অবস্থায় আসিয়া পড়েন যেখানে তাহাদের নারীত্ব হারাইয়া ফেলে।)

এই কথা ও উপরোক্ত সংখ্যাগুলি প্রণিধান-যোগ্য।

১৯১৫ সালে লিখিত উক্ত তথ্যগুলির সত্যতা আজও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিষয়বিশেষে (অর্থাৎ শিক্ষায়) সীমা উল্লঙ্ঘন ও তাহার কুফল-সম্বন্ধে বলিলাম। বারান্তরে আমাদিগের প্রাচীন আদর্শ ও সে আদর্শ কতখানি সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় পুনরানয়ন বা পুনরুদ্ধার করা যায়, বিবেচনা করিব।

শিকার-কাহিনী

(গল্প)

শ্রীফণিভূষণ রায়

ঝম্‌ঝমাঝম বৃষ্টির আর বিরাম নাই

শিকার-মঞ্চের ছোট্ট জানালাটী দিয়ে দূর নজরে চোখে পড়ে অস্পষ্ট গাছগুলার সারি—অবিশ্রাম ধারা-পাতের ঘোম্‌টায় যেন মুখ ঢেকেছে। গাছগুলার এধারে চষা মাঠ—সেখানে বৃষ্টির জল প্রপাতের মত এঁকে-বেঁকে চলেছে—খানা-ডোবাগুলা ঘোলাটে জলে ভরে উঠল বলে। নদীর ধারে রাস্তাটার উপর শ্যাওলা-পঁচা জল ঝির্ ঝিরিয়ে পড়্‌ছিল।

চারদিক নীরব নিঃঝুম—সব চুপ্ চাপ, জানালায় ছাদে—ঝুপ্‌ঝুপ বৃষ্টির শব্দ—বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। অন্ধকারে অন্ধকার ছোট্ট ঘরটা—সকলেই যেন হতভম্ব হ'য়ে বসে আছে। হঠাৎ আগুনটা কে যেন উস্কে দিল, আগুনের আলোয় সকলে যেন প্রাণ ফিরে পেল, "পাইপ" থেকে আবার ভর্‌ভর্ করে ধোঁয়া ছুটল!···ঘরের "প্ল্যাষ্টার" দেওয়া মেজেয় তিনটে কুকুর এতক্ষণ শুয়ে ছিল—সেগুলা এখন উঠে খুব ল্যাজ নাড়্‌তে সুরু কল্ল—মেজের উপর-কার শুকনো পাতাগুলো কুকুরগুলার কাছে উড়ে উড়ে যাচ্ছিল। আমাদের দলে তিনটী "শহুরে" (পাখীর) শিকারী ছিল—তারা এতক্ষণ আগুনের দিকে পা' লম্বা করে এগিয়ে হেলান দিয়ে চুপ করে শুয়েছিল—এবার ফিস্ ফিসানি সুরু হ'ল—যত রাজ্যের সব শিকারের গল্প—আগুনের আঁচ লেগে তাদের ভিজা জুতা হ'তে ততক্ষণ ধোয়া উঠতে সুরু করেছে।

খুব চট্‌পট্ ব্যাপারটা ঘটে গেলে—ওদের মধ্যে একজন সোৎসাহে বল্‌ছিল—আর সবাই তখন চুপ মেরেছিল—খুব চট্‌পট্—মস্তবড় একটা খরগোস···বুঝ্‌লে না এখনও যেন চোখে ভাসছে···পরদিন খাবার টেবিলে ধূমায়মান খরগোসটী রাখবার সময় "মাদ্‌লিন" আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌ছিল—কি ভারী! আর আমার মামাবাবু (ভগবান-তাঁর আত্মার সদ্গতি করুন্) যখন ছুরী চালিয়ে জিনিস-টাকে বাগাবার চেষ্টায় ছিলেন তখন তাঁকে রীতিমত হয়রান হ'তে হয়েছিল···

যাক্ এইখানেই থামা ভাল—এর পরে যা' সব আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছিল তা' আর বলে কাজ নেই। তোম্‌রা হয় তো মনে কর্ব্বে আমি বানিয়ে বল্‌ছি—হয় তো মনে ঠাওরাবে—আমি একটা বুজ্‌রুক।

কিন্তু কারোও চোখের চাহনিতে কিংবা মুখের ভঙ্গীতে অবিশ্বাসের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না—তখন মসিয়ে গোল্ল চেয়ারা ঘুরিয়ে আরাম করে বস্‌লেন এবং গোঁফের ফাঁকে একটুখানি হেসে সুরু করে দিলেন···

হাঁ তারপর—আমি তোমাদিগকে আগেই বলেছি—মামাবাবু তো ছুরী চালাচ্ছেন কিন্তু কি যেন কিসে আট্‌কিয়ে যাচ্ছে, সুবিধা করে উঠতে পাচ্ছেন না। কি যে ওর পেটের মধ্যে আছে কে জানে?···খুব রেগে-মেগে জোর্‌সে ছুরী চালাতেই—ছুরীটা ঢুকে গেল—আর সেই গরম গরম রান্নাকরা খরগোসটার ছুরী-চেরা পেট হ'তে বেরিয়ে এল মসলা-সুগন্ধি একটা-দুটো-বিশটা-পঁচিশটা স্বর্ণমুদ্রা ঝক্‌ঝক্ করা মোহর—কোনটা গেল মাটিতে পড়ে, কোনটা "টুন্" করে লাগল গিয়ে পেয়ালায়—আর কতকগুলা গড়িয়ে গড়িয়ে এধারে-ওধারে ছড়িয়ে পড়্‌ল।

—আশ্চর্য্য! গোল্ল কি বল্‌ছ তুমি আমাদের···

—মোটেই আশ্চর্য্য নয় নেহাৎ মামুলী ব্যাপার—বল্‌ছি শোন, তখন আমার বয়স বার বছর—আমি মসিয়ে ল্য মার্কীর তাবেদারি কর্‌তাম। একটা লোকের মতন লোক ছিলেন মার্কী, যদিও একটু পাগ্‌লাটে ধরণের আর একটু কৃপণ-প্রকৃতির—কিন্তু একেবারে সেই পুরানো আমলের লোক। আমার বাপ-পিতামহ ছিলেন তাঁর চাষী; যখন আমি স্কুল ছাড়লাম তিনি আমায় তাঁর

"পেজ"-গিরিতে বাহাল করলেন। কাজকর্ম্ম বেশী কিছু ছিল না—শিকারের দিনে শিকারের থলে আমাকে বয়ে নিতে হ'ত, জুতোর কালিটালি লাগাতে হ'ত· মাইনা স্বরূপ আমি পেতাম মঁসিয়ে ল্যা মার্কীর পুরোনো পোষাকাদি···

লোকে তাঁকে প্রকাণ্ড ধনী বলত—যদিও তিনি তাঁর পুরানো প্রাসাদের এক জীর্ণ কোঠায় জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন ; প্রত্যেক মাসে শহরে তিনি নিয়মিত ভাবে যেতেন তাঁর তহশীলদারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এবং আদায়ী খাজনার টাকা বুঝে নিতে। কিন্তু কখনও দেখি নি মসিয়ে মার্কীর সঙ্গে টাকার থলে বা কিছু—অতগুলা টাকা যে তিনি কোথায় গুঁজে নিয়ে আসতেন—তা' ভগবানই জানেন···

একদিন সন্ধ্যাবেলা টাকা বুঝে নিয়ে আমরা বাড়ী ফিরছিলাম বনের মধ্য দিয়ে বাঁধান রাস্তায়—মসিয়ে আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে আর আমি পিছনে পিছনে পায়ে হেটে···হাঁ মসিয়ের ভারী চমৎকার একটা বন্দুক ছিল। সকল সময় সেটা থাক্ত তাঁর গলায় ঝোলান, আমি সেটা তারিফ করতে করতে যাচ্ছিলাম। শিকার এবং অস্ত্র-শস্ত্রের সম্বন্ধে আমার উৎসাহের অবধি ছিল না—মদের মত ওসব আমাকে মাতাল করত।—আমার হাত যা সুড়্সুড়্ করছিল যদি একটীবারের জন্য ঐ বন্দুকটা একটু নাড়াচাড়া করতে পেতাম ! বন্দুকতো বন্দুক, বন্দুকের নালায় রূপার পাতে হরেক রকমের নকসা আর হাতলে একটা বুনো শুয়োরের আস্ত মাথা খোদাই করা। হ'লে কি হ'বে মসিয়ে ওটাকে এক মিনিটের জন্য হাতছাড়া করতেন না—গাঁয়ের চাষারা বলাবলি করত—ওটাকে না নিয়ে শুলে মসিয়ের ঘুম হয় না !

আঃ একটীবারের জন্যও যদি শুনতে পেতাম বন্দুকটার গুরু গম্ভীর আওয়াজ—কিন্তু আমার মনে হ'ত বন্দুকটা ব্যবহার করতে মসিয়ে যেন ইতস্ততঃ করতেন। দেশটা ছিল শিকারে ভর্ত্তি ; প্রায়ই খরগোস, প্যাটরিজ—বনঘুঘু আমাদের নজরে আসত—একেবারে মুখোমুখি এসে পড়ত—তখন মসিয়ে বন্দুক ঘাড়ে চড়াতেন, টিপ নিতেন ·· কিন্তু কিছুতেই আওয়াজ কর্ত্তেন না। অনেক মাথা ঘামিয়েছি কিন্তু মসিয়ের আচরণের অর্থ বুঝতে পারি নি।

সাধারণতঃ প্রাসাদ থেকে শহরে যাওয়া এবং আসা, সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তের মধ্যেই হ'য়ে যেত, কিন্তু যেদিনকার কথা বলছি, সেদিন ঘোড়াটা এক পায়ে খোঁড়াচ্ছিল ; সুতরাং যখন রাত্রি হ'ল তখন দেখি অর্দ্ধেক রাস্তাও আসা হয় নি। রাত্রির অন্ধকারে পেঁচা ডাকতে সুরু করেছিল—চারিদিকে "জঙ্গুলে" গাছগুলা বাতাসে মড়্মড়িয়ে উঠ্ছিল। মসিয়ে বলছিলেন—রাস্তায় বিপদ আপদ হ'তে কতক্ষণ—

আপনার হাতে অমন বন্দুক থাকতে—

—চুপ্ কর হে ছোক্রা, এমন চোর আছে যে বন্দুক পর্য্যন্ত "গাপ্" করতে পারে।

তখন ঠিক হ'ল রাত্রির মত আমরা Logisudu vieil Ane Rouge হোটেলে থাক্ব—আমার মামা ছিলেন হোটেলওয়ালা, তিনি অবসর সময় করতেন হোটেলগিরি আর বাকী সময়টা করতেন মসিয়ের "জঙ্গলে" অবৈধ শিকার। আহা বেচারীর খদ্দের ছিল যত রাজ্যের গাড়োয়ান, মুটে-মজুর ; সুতরাং এধারে-ওধারে কিছু না করলে চলে কি করে।

শোবার ঘরগুলোর—"তছনছ" অবস্থা দেখে ঠিক করা গেল "চিম্নীর" ধারেই রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে· মসিয়ের জন্য পাওয়া গেল একটা পুরানো আরাম-কেদারা—আমি একখানা বেঞ্চের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগ্লাম্।

মিনিট কয়েক পরেই—মামা মস্ত চোঙওয়ালা এক বন্দুক ঘাড়ে ঘরে ঢুক্লেন এবং আমি চোখ চেয়ে আছি দেখে বল্লেন—যাবি আমার সঙ্গে—যাস্ তো দেখ্তে পাবি কেমন করে গর্ত্তে লুকান খরগোস শিকার করে—

যাব ! আমি তো যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছি—কিন্তু বন্দুক যে নাই—মামারও একটা বই বন্দুক ছিল না···

মামা আস্তে আস্তে বল্লেন—মসিয়ের বন্দুকটা নিয়ে চল না—ফের গুলি ভরে রাখলেই হবে এখন—পিপড়েটা পর্য্যন্ত কিছু তা' হ'লে টের পাবে না—

ভয়ানক প্রলোভনে পড়ে গেলাম—মসিয়ে নাক

ডাকাচ্ছেন—বন্দুকটা চক্ চক্ করছে—মামা চলে যাচ্ছেন কি করি তাড়াতাড়ি বন্দুকটা নিলাম।

আমরা যখন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি তখন তালগাছের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ উঠেছে…তখন ঝোপ-ঝাড়, ঘাসে ঢাকা মাটির ঢিপি, লতা-জড়ান গাছের গুঁড়ি আমরা লক্ষ্য করতে করতে যাচ্ছিলাম।

মামা হঠাৎ ফিস্‌ফিসিয়ে বল্লেন—চুপ্—দেখ্‌ছিস্ কত বড় একটা ধাড়ী খরগোস—

প্রথমে কেবল একটা খস্‌খসানি শুন্‌লাম ঝোপের মধ্যে—তারপর দেখ্‌লাম একটা কাল ছায়া··এক সঙ্গে দুইটা বন্দুকের আওয়াজ হ'ল—

—বেয়াকুব—খরগোসটা কুড়িয়ে নিতে নিতে মামা বল্লেন—আচ্ছা হাতসই তো তোর—মাঝখান থেকে এই চারা "ওক" (oak) গাছটা মেরে ফেল্লি গুলীর চোটে, দেখ্‌তো চারাটা কেমন ভেঙ্গে পড়েছে।

অপছন্দ হ'লে আর কি বল্‌ব—কিন্তু মনে হচ্ছিল আমি ঠিকই গুলি করেছি।

বন্দুকটা ভরে তখনই আবার যথাস্থানে রাখ্‌লাম—আর খরগোসটাকে "শিক্-কাবাবের" জন্য রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিলাম··পরদিন বেলা আটটার সময় মসিয়ে উঠ্‌লেন। প্রাতরাশের সময় ধূমায়মান খরগোসটা পেলে মসিয়ে কি খুব খুসী হ'বেন না? সুতরাং খাবার টেবিলে গিয়ে বস্‌বার সময় আমার মনে কোন ভয়-ভাবনাই ছিল না!

দুর্ভাগ্যবশতঃ কিন্তু মামা মসিয়ের সৌজন্যে এবং প্রফুল্লতায় একটু বেশী রকম উৎসাহিত হ'য়ে পড়লেন এবং আরও বাড়িয়ে গল্প জুড়ে দিলেন। রোষ্ট করা খরগোসটা যতবারই দেখ্‌ছিলেন—ততবারই আমার দিকে মুচ্‌কে হাসছিলেন—কাল রাতের গল্পটা বল্‌বার জন্য যে তিনি ছট্‌ফট্ কচ্ছিলেন—তা' বেশ বোঝা যাচ্ছিল···খরগোসটায় ছুরী চালাতে চালাতে গল্প শুরু করে দিলেন এবং ফলাও করে বল্‌তে লাগ্‌লেন—কেমন শিকারী আমি—ওক গাছের চারাটা কেমন বেমালুম শিকার করেছি—তাও আবার অমন চমৎকার বন্দুক দিয়ে ·

কি!—মসিয়ে চেয়ার ছেড়ে তৎক্ষণ উঠে পড়েছেন—তুই বন্দুক ছেড়েছিলি—আমার বন্দুক দিয়ে শিকার করেছিলি—বল্ হতভাগা—বল্‌তে বল্‌তে মসিয়ে রাগে একেবারে শাদা হ'য়ে পড়লেন।

—আজ্ঞে—হাঁ···হাঁ···

—অরে ডাকাত—খুনে—বদমাস্·· কেন এ'কাজ করলি? বন্দুকের গুলির নীচে—পঁচিশটা স্বর্ণমুদ্রা ভরা ছিল যে—পঁচিশটা "লুইডর্"

ও বাবা কি ব্যাপার! শহর থেকে আস্‌বার-যাবার সময়—মসিয়ে দেখ্‌ছি বন্দুকের চোঙকেই টাকার থলেরূপে ব্যবহার করেন! এক মিনিটেই সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল! এখন বুঝলাম—কেন বন্দুক ছাড়বার সময় ওরকম জোরসে ধাক্কা খেয়েছিলাম—এখন মনে পড়ল।—সত্যিই তো—বন্দুক আওয়াজের পরই—চন্দ্রালোকের মধ্যে একটা স্বর্ণ-বৃষ্টি হ'য়ে যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল···তাই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম—সামনে যে কোন পুষ্করিণী পাই তারি ত'াতেই আমার লজ্জা এবং জীবন লুকোতে হ'বে ··

এমন সময় মামার কণ্ঠস্বর আমার কানে এল—স্বর্ণমুদ্রা-গুলা তখন টেবিলের উপর গড়াতে, গড়াতে ঠুন্-ঠুন্-ঠুন্ আরম্ভ করেছে—

—ওরে এই জন্যই খরগোসটা এত ভারী ঠেকেছে—আর শোন্, শোন্—তা'হলে লোকসান কিছু হয় নি এবং হেসে মামা আরও বল্‌তে লাগ্‌লেন "আপনি নিশ্চয়ই আমাকে অকর্ম্মণ্য বল্‌বেন কিন্তু ওর গুলিটাই দেখছি—লেগেছিল···পঁচিশ পঁচিশটা স্বর্ণমুদ্রা বন্দুক ছাড়্‌বার—খুব চমৎকার টোটা—রাজরাজড়ারাও হামেশা এমন বন্দুক ছাড়তে পারেন না!"

গুলিটার সঙ্গে, সঙ্গে—তোমরা হয় তো বিশ্বাস কর্ব্বে না—স্বর্ণ মুদ্রাগুলা একদম সেঁধিয়ে পড়েছিল—এখন একটার পর একটা পাওয়া যাচ্ছিল—যতই কাটা হচ্ছিল—ততই বেরোচ্ছিল—

···দোষের মধ্যে একটু মসলা-সুগন্ধি—তা' না হ'লে মুদ্রাগুলা যেমন ছিল চক্‌চকে তেম্নি ছিল নিখুঁত···

—সব গুলোই পা'ওয়া গেছিল গোছ—একটাও হারায় নি তা' হ'লে!

—পেছনদিককার—ঠ্যাঙে—পার্শ্বে—কোমরে—সর্ব্বত্রই মুদ্রাগুলো পাওয়া যাচ্ছিল—দু'টো আবার—পড়েছিল মাথায় সেঁদিয়ে ··

—পঁচিশটাই পেলে ?

—কি আর—বলব তোমায়—বানিয়ে আমি বলছি না—একটাই মোটে—পাওয়া যায় নি—আর সেটা মসিয়ে-তবে হলপ ক'রে যদি বলতে বল, বলছি আমার মাইনে থেকে কেটে নেবেন বলছিলেন···

বৃষ্টি—কখন থেমে গেছে—জানি না—সুতরাং গল্পও থামল—পশ্চিমাকাশ এমন লাল হয়েছে—মনে হয় যেন সূর্য্যোদয় হচ্ছে—তখন রাস্তা থেকে জল সরে গিয়েছে—দেখে সবাই বুঝল ঝোপ-ঝাড়ের ধারে ধারে খরগোস শিকারের সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হয়েছে।*

* ফরাসী সাহিত্যিক Mon Paul Arene-র মূল Props de chasse গল্পের অনুবাদ।

Paul Arene সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি—

জন্ম ১৮৪৩—মৃত্যু ১৮৯৬—আলফঁস দোদের বন্ধু এবং তাঁহার মত "প্রভাঁস্" (Provence) প্রদেশের গল্প লিখিয়া ফরাসী সাহিত্যে বিখ্যাত অাঁরী বেরাজে (Henry Berenger) তাঁর La France Intellectuelle গ্রন্থে Paul Arene-কে "maitre" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার ভাষা সাবলীল ও প্রাণবন্ত।

তাঁর অনেক বইয়ের মধ্যে—Jean des Figues, La Guense parfumee, La Chevre de'or বিখ্যাত

গান

শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন অচিন দেশের প্রেমের পালা—
হৃদ্-আকাশে উড়্‌তেছে রে।
কোন বনে সে ছিল রে ভাই মধুর তানে মাতাল করে।
(ও) প্রেমের বন্যা বহায় আজি' ওর মুখেতে সুধা ঝরে।
প্রেমিক বিনেও প্রেমের সুধা আর কেউ পান করতে নারে।
ও আপন-ভোলা দেয় না ধরা গেয়ে বেড়ায় আপন সুরে।
(মোর) মত্ত আজি হ'তেছে প্রাণ কেমনে ওরে রাখবো ধরে॥

বিশ্বমাতৃকাশ্রীশ্রীদুর্গা

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

হিন্দু নরনারী প্রভাতে প্রাতরোত্থান করার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম 'শ্রীদুর্গা' নাম স্মরণ করিয়াই নিশীথ-নীরবতা ভঙ্গ করেন। তাঁহারা আবাল্য এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী যে—

'প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥'

এতদ্ভিন্ন যুদ্ধযাত্রা, প্রবাসযাত্রা, তীর্থযাত্রা, মহাযাত্রা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার যাত্রাকালে এবং সকল শুভ কর্ম্মারম্ভে তাঁহারা দুর্গা-নাম বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া থাকেন। হিন্দুদের হৃদয়ে এই নামের এতটা প্রভাব কিরূপে বদ্ধমূল হইল তাহা জানিতে হইলে এই নামোৎপত্তি-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে। এই নামোৎপত্তি-সম্বন্ধে বহু সংস্কৃত শ্লোক আছে, তন্মধ্যে কয়েকটী উল্লেখ করিতেছি— 'দুর্গাত্তারয়সে দুর্গে! তত্ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ' দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করেন, এইজন্য লোকেরা তাঁহাকে দুর্গা বলে।

'দুর্গো দৈত্যে, মহাবিঘ্নে, ভববন্ধে, কুকর্ম্মণি।
শোকে, দুঃখে চ নরকে, যমদণ্ডে চ জন্মনি॥
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥'

দেব-মানব-শত্রু দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, কুকর্ম্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্মগ্রহণ, মহাভয়, রোগযন্ত্রণা প্রভৃতির বাচক হইতেছে 'দুর্গ' শব্দ আর 'আ' শব্দটী হইতেছে তদ্বিনাশ-বাচক। অতএব পূর্ব্বোক্ত সমুদয়কে যিনি বিনাশ করিতে সমর্থা, তিনিই 'দুর্গা' নামে বিঘোষিতা। চণ্ডীতে মহামুনি মেধস স্বয়ং ভগবতীর মুখ হইতেই নির্গত করাইয়াছেন—

'তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গামাখ্যাং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥'

বিশ্ববিঘ্নকারী দুর্গ নামক মহাসুরকে যখন আমি বধ করিব, তখনই আমার নাম 'দুর্গা' হইবে। পৌরাণিক নানা বর্ণনা হইতেও এই সব বাক্যের প্রতিধ্বনিই বিশেষ করিয়া পাওয়া যায়। এই নামের এমনই মাহাত্ম্য যে পুনঃ পুনঃ সমুদ্রমন্থনের ফলে শেষবার যখন বিষ উত্থিত হইল তখন মহাদেব স্বয়ং তাহা পান করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্গা-নাম স্মরণ করার ফলে তাঁর কোনই অনিষ্ট হয় নাই। সাধক রামপ্রসাদের ভক্তিসুধা-সিক্তি-কণ্ঠে এই পৌরাণিক তথ্যের প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল—

'শ্রীদুর্গানাম ভুলোনা, ভুলোনা।
ভুলোনা, ভুলোনা, ভুলোনা।
শ্রীদুর্গা স্মরণে সমুদ্র-মন্থনে
বিষপানে বিশ্বনাথ ম'ল না॥...

ইত্যাদি' এইরূপে এই নামের পশ্চাতে এত বেশী মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে যে, স্বভাবতঃ ভক্তিপ্রবণ হিন্দু জাতির হৃদয়ে ইহার অনুপম প্রভাব বিস্তার লাভ করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

দুর্গার প্রাচীনত্ব

এই দেবীর প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে কলিকাতা সংস্কৃতসাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত 'দুর্গাপূজাতত্ত্বম্ নামক গ্রন্থে এবং প্রাচীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত 'দুর্গা' নামক প্রবন্ধে বিশেষ বিস্তারিত-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সে সব আলোচনার সম্পূর্ণ উল্লেখ করা এখানে অসম্ভব, তবে যথোচিত মর্ম্মাভাস মাত্র এখানে দিব। আর্য্যজাতির চিত্তে ভগবদারাধনার পবিত্র-ভাব আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ প্রাচীনতম বৈদিকযুগ হইতেই এই দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সুপ্রাচীন ঋগ্বেদে যজ্ঞ বৈদিকে দক্ষতনয়াকে দুর্গা বলিয়া ধারণা করা হইত। তাঁর কাষ ছিল যজ্ঞে প্রদত্ত হব্য দেবতাদের কাছে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া, এজন্য নাম হইয়া ছিল হব্যবাহিনী। কোন কিছু লইয়া যাতায়াত করিতে হইলেই বাহনের দরকার এই নিমিত্ত পশুরাজ সিংহ বাহনরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল, কুণ্ডের দশদিক দেবীর দশ

হাত হইল। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য আরও কয়েকজন দেবতার অধিষ্ঠান হইল। বিঘ্নবিপদের হাত হইতে কুণ্ডকে রক্ষা করিবার জন্যে একজন যোদ্ধার আবির্ভাব হইল, তিনিই দেবসেনাপতি কার্ত্তিক। যজ্ঞের সূচনাকারী হোতা, ঋত্বিক, পুরোহিত ও যজমানরূপী চারিহস্ত-বিশিষ্ট একজন দেবতার আবির্ভাব হইল, তিনিই গণেশ। তা' ছাড়া বেদজ্ঞানদাত্রী সর্ব্ববিদ্যারূপিণী সরস্বতী ও যজ্ঞানুষ্ঠানে আবশ্যকীয় অর্থাদি দান করিবার জন্য লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইল। বহুবৎসর এইসব চিন্তাধারা ধ্যান-ধারণার ভিতর দিয়াই প্রবাহিত হইতেছিল কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে যখন ধারণাকে দৃষ্টিগোচর করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া সগুণ উপাসনার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইল, তখন শিল্পীদের চেষ্টায় ধ্যানের মূর্ত্তি বাস্তব আকার ধারণ করিল। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভাবের প্রবর্ত্তন এবং প্রাচীন ভাবের সংস্কার বহুল পরিমাণে হইয়াছে কিন্তু অন্তর্নিহিত জাতীয় ভাবধারাটী চির-অক্ষুণ্ণভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, কারণ তাহা সত্য জ্ঞান, আনন্দ এবং ব্রহ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিতরে কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই—পরিবর্ত্তন সব বাহিরে, তাই বিভিন্ন-কালের ও বিভিন্ন স্থানের দুর্গাপ্রতিমূর্ত্তিসমূহকে খুব অভিনিবেশসহকারে দর্শন করিলে ঐসব বহির্জগতের প্রবর্ত্তন ও সংস্কারের প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।

দেবীর বিশ্বজননীত্ব ও সার্ব্বজনীন পূজা

বহুধা-বিভক্ত ধর্ম্মজগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক ধর্ম্মবিশ্বাসীই ঈশ্বরের সহিত কোনও না কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেছেন। কেহ বা পিতৃভাবে, কেহ বা প্রভুভাবে, কেহ বা বন্ধুভাবে কিন্তু হিন্দুজাতি এতদতিরিক্ত মাতৃভাবে ভগবদারাধনা করিয়া থাকেন। এই মহতী ধারণাটী তাঁহাদের জাতীয় জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমানে ইহা ভারতের বাহিরে ও ক্রমশঃ মানব মনে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ভগবতীকে পদ্মনাভ-সহোদরী নারায়ণী এবং ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী বলিয়াও অভিহিত করা হয়। আমাদের শাস্ত্র সৃজনীশক্তিরূপা প্রকৃতিকে স্পষ্টতমভাবে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে; তাই মাতৃসাধনায় আমাদের অন্তর হিঃ সদা উৎফুল্ল, আমাদের গর্ভধারিণী মা, জন্মভূমি মা, ভাষা মা, জ্ঞানান্নদায়িনী মা, ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী মা, বেদ-গায়ত্রী-গীতা-উপনিষদ্ মা, জ্যোতি, আকাশ, জল, বাতাস সবই মা, সর্ব্বরূপময়ী ভুবনমনমোহিনী মা! এই মা নাম লইয়া আনন্দ পায় না, মাকে দেখিলে হৃদয়ে ভক্তি জাগে না, মাতৃচরণ বন্দনার জন্য মাথা-নত হয় না এমন মানুষ বিশ্ব-সংসারে আছে কি না সন্দেহ! জগতের সকল জাতির সকল ভাষায় অল্পাধিক বৈষম্যের ভিতর দিয়া এই 'মা' নাম নিনাদিত। মানবশিশু মাত্রেই এমন কি অনেক পশু-শিশুও ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই স্বতস্ফূর্ত্ত 'মা' শব্দ স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে। আমার মনে হয় ঋষি-আবিষ্কৃত বেদের আদিম মন্ত্র ওম্ এবং মা সম্পূর্ণ অভিন্ন; মা-ই ওম্ আর ওম্-ই মা! ভগবদ্বাচক প্রণাম-উপাসনা যেমন চির-অবিরোধী ও সার্ব্বজনীন তেমন এই মাতৃ-উপাসনাও সম্পূর্ণ সার্ব্বজনীন। মাতৃ-পূজায় অনধিকারী কেহ নাই। সন্তান উচ্চ বা নীচ, সম্রাট্ বা কাঙ্গাল, পণ্ডিত বা মূর্খ, সুরূপ বা বিকলাঙ্গ কুরূপ, পুরুষ বা রমণী—যাই হউক না কেন মায়ের স্নেহ-যত্নের ন্যায় তাঁর পূজারও সকলেই সমধিকারী। মায়ের সন্তানের পক্ষে এমন প্রাণমাতানো পূজা আর কি আছে? মায়ের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধাভক্তি ভগবন্মুখী হইলে ভক্তের সাধনা সর্ব্বতোভাবে সহজ ও হৃদয়গ্রাহী হইবে বলিয়াই ভারতীয় মহর্ষিগণ এই মাতৃভাবে ভগবদারাধনার সুমহৎ পন্থা আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

দুর্গা সমরাধিষ্ঠাত্রীদেবতা

ঋষিধ্যানোত্থিত দেবীর যে মূর্ত্তিটীকে আমরা পূজা করিয়া থাকি তাহা মহিষমর্দ্দিনী। পুরাণে বর্ণিত মহিষা-সুরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃতা থাকিবার একটী উজ্জ্বল চিত্র। রূপের বর্ণনায় দেখা যায়—দেবী উগ্রভাবপ্রকাশক ত্রিভঙ্গিমাকারে দণ্ডায়মানা হইয়া মহিষাসুর-বধে নিযুক্তা। দশহাতে দশ দশটী সুতীক্ষ্ণ যুদ্ধাস্ত্র। দেবীর নিম্নে ছিন্নশির মহিষ। মহিষের মাথা কাটা যাওয়াতে ছিন্ন দেহ হইতে খড়্গপাণি দানব বাহির হইতেছে। দানবের বক্ষ দেবীর

শূলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত, তার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত ও দেবীর হস্তাবৃত নাগপাশে বেষ্টিত, নয়ন ভ্রুকুটীযুক্ত, মুখের ভাব ভীষণ এবং মুহুর্মুহুঃ রক্ত বমন হইতেছে। দেবী 'আঃ' এই সঙ্কেতবাক্যে সিংহকে অসুর আক্রমণে উদ্যুক্ত করিলেন। তাঁর দক্ষিণ পদ সিংহপৃষ্ঠের উপর এবং বামপদ সামান্য উপরে তুলিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মহিষের স্কন্ধ চাপিয়া ধরিয়াছেন। দেবী যে যথার্থই যুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী তাহা তাঁহার রূপ-সৌষ্ঠবের প্রত্যেক ভঙ্গীতে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে। দেবীর আর কোনও রূপকে দুর্গা নামে অভিহিত করা হয় না, সমরোল্লাসিনী ও সমররঙ্গিনী এই মহিষমর্দ্দিনীরূপই দুর্গা নামে অভিহিত। চণ্ডীর গুপ্তবতী নামক টীকায় বর্ণনা আছে—

'একৈবশক্তিঃ পরমেশ্বরস্য ভিন্না চতুর্ধা বিনিয়োগকালে।
ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ, কোপেষু কালী, সমরেষু দুর্গা॥

সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী জগন্মাতা বিশ্বসন্তানকে সকল আসুরিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য 'সমরেষু দুর্গা' এই রণরঙ্গিণী বেশ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বেশ আরও শিক্ষা দিতেছে যে, যাহারা মঙ্গলের সাধক হইবে তাহাদিগকে প্রপঞ্চময় বিশ্বরঙ্গমঞ্চে সর্ব্বদা অতীব সতর্ক থাকিতে হইবে এবং বাধা-বিঘ্নকে সদর্পে দলিত করিয়া বীরের ন্যায় শ্রেয়োপথে চলিবার জন্য যথোচিত বিবেক প্রহরণও লইয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জীবনভরা এই যুদ্ধের লীলাই চলিতেছে। কত যে যুদ্ধ প্রতিনিয়ত করিতে হইতেছে তার ইয়ত্তা নাই, আর জয়-পরাজয়েরও অবধি নাই! এই অবিরাম যুদ্ধ-সমাকুল রণক্ষেত্রে জগন্মাতা আর কি বেশে সাজিবেন?

বিজয়কামী হিন্দুবীরেন্দ্রবর্গের আদর্শ উপাস্যা এই মহাশক্তিময়ী দুর্গা। যুদ্ধে তাঁহাদের উৎসাহ, শক্তি এবং বিজয় এই সমরোল্লাসিনীর আশীর্ব্বাদ হইতেই বিনির্গত। যুদ্ধ-যাত্রাকালে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা এবং যুদ্ধান্তে বিজয় লাভের পর মহাসমারোহে দুর্গার্চ্চনা করিয়া বিজয়োৎসব করা হিন্দুদের জাতীয়-জীবনের একটী বৈশিষ্ট্য। দেবাসুর যুদ্ধে সকল অসুর বিনষ্ট হইলে পর দেবতা ও ঋষিগণ প্রভূত ভক্তিসহকারে দেবীর অর্চ্চনা করিয়া অভয়-আশীষ লাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণে দুর্গাদেবীর কোন উল্লেখ না থাকিলেও মহাভাগবত, দেবী ভাগবত, কালিকা-পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ এবং মহাভারতের বনপর্ব্ব, রাবণস্য বধার্থায়' শ্রীরামচন্দ্র-কর্ত্তৃক দুর্গার্চ্চনার কথা সবিশেষ বর্ণিত আছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ পার্থ বীর দুর্গাস্তব পাঠ করিয়া সমরাধিষ্ঠাত্রীর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। হরিবংশে দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ যখন দানবাধিপতি বানের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মহাসঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন, তখন প্রভূত নিষ্ঠার সহিত দুর্গার স্তব গান করিয়া শক্তিময়ীর আশীর্ব্বাদে বিপন্মুক্ত হইয়াছিলেন।

হিন্দুদের জাতীয় ধমনীতে স্বাধীনতার উষ্ণ শোণিত যখন প্রবাহিত ছিল, তখন সেই মধ্যযুগের ইতিহাসেও আমরা এই ভাবটী প্রকট দেখিতে পাই। মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ, বাংলার প্রতাপাদিত্য, পূর্ব্ববঙ্গের চাঁদ রায়, কেদার রায় এবং দাক্ষিণাত্যের ছত্রপতি শিবাজী ইত্যাদি বীরেন্দ্র কেশরীদের সামরিক জীবনে শক্তি-উপাসনার উজ্জ্বল প্রমাণ বিদ্যমান। তাঁহারা ছিলেন যথার্থ শক্তি-সাধক, তাই মহাশক্তিকে আরাধনা করিয়া শাক্ত নামের সার্থকতাও সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন; আর তাঁহাদেরই বংশধর আমরা বর্ত্তমানে স্বাধীনতাহীন, লুপ্ত-গৌরব এবং হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও নিজ নিজ পূজার মণ্ডপে শৈল, ধাতব বা মৃন্ময় আধার জগন্মাতাকে যথাসাধ্য পূজা করিয়া থাকি, কিন্তু সেই শক্তি-সাধনা, শক্তিচর্চ্চা, শক্তি পরীক্ষা ও সংযম-শিক্ষার অভাবে আমাদের বলিতে যা কিছু সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য চাই শক্তিসাধনা, চাই সংযম-শিক্ষা।

শারদীয়া পূজার বৈশিষ্ট্য এবং স্থানভেদে পূজাপদ্ধতির পার্থক্য

দুর্গাপূজাকে কলির অশ্বমেধ বলিয়া ধারণা করা হয়। বস্তুতঃ ধর্ম্মজগতে হিন্দুদের নিকট ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব-পূর্ণ অনুষ্ঠান। এই পূজা বৎসরে দুইবার হয়; বসন্তকালে বাসন্তী পূজা এবং শরৎকালে শারদীয়া পূজা। শেষোক্ত পূজাটীর প্রাধান্যই বেশী; কারণ উহা অকালের পূজা। 'পূজা' আসিতেছে বলিলে এই শারদীয়া দুর্গা পূজাকেই

বুঝায়। এই অকালে মাতৃবোধনের মাহাত্ম্য পুরাণে যথেষ্ট বর্ণিত রহিয়াছে। কালিকাপুরাণে আছে—এই সময়ে দেবী মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে আবির্ভূতা হইয়া 'মহিষাসুর' বধ করেন, দেবীপুরাণে আছে—এই সময়ে দেবী বিন্ধ্যপর্ব্বতে আবির্ভূতা হইয়া 'ঘোরাসুর' বধ করেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দ্বাদশ অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে দেবী বাক্য আছে—

'শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥
সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ'—

ইহা ছাড়া দক্ষযজ্ঞ বিনাশের নিমিত্ত শারদীয়া মহাষ্টমী দিনেই ভদ্রকালীরূপে জগন্মাতার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহার জন্য শারদীয় আশ্বিনের শুক্লপক্ষটী দেবীপক্ষ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। এই সব বিশেষ বিশেষ দেবীমাহাত্ম্যপূর্ণ পৌরাণিক কাহিনীর বলেই শারদীয়া পূজার প্রভাব এতটা বেশী।

দেবীকে মৃন্ময়ীরূপে পূজা করিবার ভাবটী তাঁর বোধন-মন্ত্রে এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বর্ণিত সুরথসমাধির পূজা হইতেই স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়; কিন্তু বর্ত্তমানে এই প্রথা বাংলায় এবং তৎসংলগ্ন বিহার ও আসামেই বিশেষভাবে প্রচলিত। ভারতের অন্যত্র কোথাও এরূপ দৃষ্ট হয় না। নেপালে নবপত্রিকারূপে অর্থাৎ—

ব্রহ্মাণী কদলীকাণ্ডে, দাড়িমে রক্তদন্তিকা।
ধান্যে লক্ষ্মী, হরিদ্রায়াং দুর্গা, মানপত্রকে— ॥
চামুণ্ডা, কালিকা কচ্বা, শিবা বিল্বে প্রতিষ্ঠিতা।
অশোকে শোকরহিতা, জয়ন্ত্যাং কার্ত্তিকী স্মৃতা॥"

এইরূপ নয়টী দেববৃক্ষকে একত্র করিয়া দেবীর পূজা হয়। এই নবপত্রিকার পূজা প্রতিমার সহিতও সর্ব্বত্রই হয়। কাশ্মীরে 'অম্বা', গুজরাটে হিঙ্গলা বা রুদ্রাণী, কান্যকুব্জে কল্যাণী, দাক্ষিণাত্যে অম্বিকা বা অম্বা, মিথিলায় উমা ইত্যাদি নামে ও রূপে পূজা হয়। এতদ্ভিন্ন উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে নবরাত্র অর্থাৎ শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত নয় দিন দুর্গাব্রত খুব ভক্তির সহিত উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে।

বলিদান

পূজায় যা কিছু নিবেদন করা যায় তাহাই বলি, কিন্তু এই শব্দ বিশেষ-ভাবে পশু নিধনকেই বুঝায়। এজন্য দুর্গাপূজায় পশুবলির ব্যবস্থা রহিয়াছে। অসুরদলন, পশু-দলন দুর্গা মায়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, রুধিরপ্রিয়া দেবী রুধির পান করিয়াই মহাতৃপ্তিলাভ করেন। পূর্ব্বে প্রায় সব রকম পশু বলি এবং এমন কি নরবলিও প্রচলিত ছিল, এখন ছাগ, মেষ ও মহিষ ছাড়া অন্য কিছু বড় দেখা যায় না। পশু রক্তে দেবীর তর্পণ ছাড়া স্বদেহ রুধিরেও দেবী-তর্পণের বিশেষ বিধি আছে। এই স্বদেহ রুধির দানের যে একটী স্মরণীয় কাহিনী সৌভাগ্যক্রমে কোনও এক বৎসরের পূজায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম তাহাই এখানে বিবৃত করিয়া পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি।

ময়মনসিংহ জেলার বর্ষামগ্ন পূর্ব্বপ্রান্তে মৃগা গ্রাম বর্ত্তমান, গ্রামে প্রায় হাজার দুই লোকের বসবাস। প্রতি বৎসরই এই গ্রামের বিশিষ্ট দু'তিনখানা বাড়ীতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই কয় বাড়ীর পূজায় গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সবাই প্রাণ ভরিয়া পূজার আনন্দ উপভোগ করিয়া ধন্য হয়। গ্রামের হোম চৌধুরী জমীদারবংশের লুপ্তসর্ব্বস্ব বংশধর রামচন্দ্র হোম চৌধুরী যিনি কিঞ্চিন্ন্যূন শত বৎসর জীবিত থাকিয়া গত ১৩৩৫ সনে শ্রাবণের শান্ত শীতল ধারার সহিত অনন্তে বিলীন হইয়াছেন, তিনিও তাঁর বাড়ীতে প্রতি বৎসর সুখে হউক্ বা দুঃখে হউক্, সঞ্চিত অথবা ঋণকৃত অর্থে হউক্ পূজার অনুষ্ঠানটী যথাবিধি সম্পাদন করিতেনই করিতেন। শত অভাব, শত বাধা বিঘ্ন, এমন কি প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনের বিয়োগেও তিনি ভক্তি এবং ধৈর্য্য সহকারে পূজার কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন। দারুণ অর্থাভাব যখন উপস্থিত হইয়াছে, তখন হিতৈষীদের দ্বারা পূজানুষ্ঠানে বিরত থাকিবার জন্য যথেষ্ট অনুরুদ্ধ হইয়াও ঋণকৃত বা সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থে সম্পূর্ণ পরিণাম চিন্তাহীন হইয়া মহাধূমধামের সহিত পূজার উৎসবানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিয়াছেন। পূজার সময় উপস্থিত হইলে কি করিয়া তাহা সুনির্ব্বাহ হইবে এই ভাবনায় অস্থির হইয়া সব করিয়া যাইতেন, পূজার পর কি হইবে না হইবে সে বিষয় অণুমাত্র চিন্তাও তাঁর হৃদয়কে বিচলিত করিতে

সমর্থ হইত না। দুর্গা বা চণ্ডীতে তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল, নিজের বা পত্নী-পুত্রাদির সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময়েও তিনি চিকিৎসক না ডাকিয়া সৎ ব্রাহ্মণের দ্বারা চণ্ডীপাঠ করাইতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের বলে সুফলও পাইতেন। জীবনে তাঁহাকে কখনও ঔষধ সেবন করিতে দেখা যায় নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি ভক্তি-বিশ্বাসকে অচল অটল রাখিয়াছিলেন; ব্যর্থতা-নিপীড়ন বা উপহাস-তাচ্ছিল্য কোন কিছুই তাঁহার ধারণাকে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হয় নাই।

একবার পূজাতে বলির পশু কিছুতেই সংগৃহীত হয় নাই। বলির উপযুক্ত মেষ বা ছাগের সন্ধানে চারিদিকে লোকজন পাঠাইয়া নবমীর দিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্তও কোন পশু সংগৃহীত হইয়া আসিল না, এজন্য তিনি মহা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস মহাশক্তি পূজা "মনোহরৈশ্চ বলিভিরুপহারৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ" ছাড়া সুসম্পন্ন হয় না। "কর্ত্তব্যা চাপরা পূজা নবম্যামেবমেব হি। বলিমন্ত্র বিশেষেণ দেয়ো মৎপ্রীতয়ে সদা॥"—বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে-বর্ণিত স্বয়ং মহাদেবীর এই উক্তিটীও তাঁর সবিশেষ জানা ছিল; তাই এই নবমী দিনেও বলি না হইলে পূজার অঙ্গহানি হইবে এই চিন্তায় তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নবমী পূজার বলির সময় উপস্থিত, পূজকেরা বলির আয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য চৌধুরী মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি পূজার মণ্ডপ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মা! -মা! বলিয়া বার কতক উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, তৎপর পুরোহিতের কথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন—'মার যখন পশুরক্ত গ্রহণ করিবার ইচ্ছা নাই, তখন এই অধমের বুকের রক্তেই আজ মাতৃ-তর্পণ করিতে হইবে।' "সংপ্রাং তৃপ্তিমায়াতি স্বদেহ রুধিরেণ তু"—এই শাস্ত্রবাক্যের যথার্থ মর্ম্ম তাঁর বিশেষ-ভাবে জানা ছিল এবং রাজা সুরথসমাধি "নিজগাত্রাৎ সৃগুক্ষিতম্" বলিদ্বারা যেরূপ চণ্ডী তর্পণ করিয়াছিলেন সেই পৌরাণিক জলন্ত উদাহরণটীও তাঁহার ভক্তি-বিশ্বাস-মার্জ্জিত সুনির্ম্মল মানস-দর্পণে সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল; তাই উপস্থিত সুযোগে কাল বিলম্ব না করিয়া কোমরের বস্ত্র বেষ্টনী হইতে একটি ধারাল ছুরিকা বাহির করিলেন এবং রুধির পাত্র আনিবার জন্য পুরোহিতকে সাহুনয় অনুরোধ করিয়া স্বহস্তেই বুক চিরিয়া রক্ত বাহির করিতে বার দুই চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না;—ষষ্ঠীর বোধন হইতে তিনি নিরম্বু উপবাসী, কাজেই প্রাণে অসীম ভক্তিপূর্ণ মহানন্দের শক্তি তরঙ্গ খেলিতে থাকিলেও বার্দ্ধক্যবশতঃ দেহ তাঁর টলিতেছিল, হাত তাঁর কাঁপিতেছিল;—নিজেকে অসমর্থ বুঝিয়া তিনি পুরোহিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিলেন—'বাবা! আমি পারছি না তুমি এসে এই ছুরিকা দ্বারা বুক থেকে রক্ত বের করে মায়ের পূজায় নিবেদন করে দাও বাবা! তুমি নিজে ডাক্তার—কাটা-চেরার কাজে অভ্যস্ত, তুমি ঠিক্ পারবে, কোন ভয়-ভাবনা নাই, মায়ের আশীর্ব্বাদে সব মঙ্গল হ'বে; এতকাল পশুর রুধিরে মায়ের তর্পণ হইয়াছে—আজ স্বরুধিরে হউক্!' এই বলিতে বলিতে আনন্দোচ্ছ্বসিত বিমল অশ্রুধারা দুনয়ন দিয়া দরবিগলিত-ভাবে বহিতে লাগিল। এ দৃশ্য কি মনোরম! কি স্বর্গীয় আনন্দের পবিত্র মহিমমণ্ডিত! কি অপার্থিব ভক্তি-বিশ্বাসের শক্তিমন্ত্রে সঞ্জীবিত? এ দৃশ্য দর্শনে কার না প্রাণে ভক্তির উদ্রেক হয়? কোন্ ভক্তিহীন অবিশ্বাসী ধর্ম্মের প্রেরণা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে?

পুরোহিত ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ ভক্তের আগ্রহাতিশয্য ও দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া সুনিপুণ হস্তে বুক চিরিয়া রক্ত বাহির করিলেন। রুধির ধারা নির্দ্দিষ্ট পাত্রে সংরক্ষিত হইল, বৃদ্ধের কোনরূপ যাতনা বোধ গোটেই দৃষ্ট হইল না। নিজের বক্ষোনিঃসৃত রক্ত আজ মায়ের কাছে নিবেদিত হইল, এই আনন্দে তিনি তখন নাচিয়া উঠিলেন—রক্ত মোক্ষণ বন্ধ হইল কি না হইল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই—মহানন্দের তড়িৎপ্রবাহে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঘনঘন রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, তিনি ভক্তি-গদগদ চিত্তে উদাত্তকণ্ঠে—"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে! শিবে! সর্ব্বার্থসাধিকে! শরণ্যে! ত্র্যম্বকে! গৌরি নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥"—এই সর্ব্ব-বিদিত জগন্মাতার প্রণাম-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া এই প্রণাম চলিল, তাঁর

দেহ-নিঃসৃত ঘর্ম্ম ও নয়ন-নিঃসৃত ভক্তি-ধারা-প্লাবনে নীচের মাটি কর্দ্দম হইয়া গেল, আর সেই কর্দ্দম-প্রলেপ তাঁর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলেন। তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান নাই, তিনি শিশুর মত ব্যাকুলভাবে মুহুর্মুহুঃ উচ্চৈঃস্বরে 'মা'! 'মা'! বলিয়া ডাকিতেছেন আর ভূমিতে মাথা ঠুকিয়া শতসহস্র প্রণাম করিতেছেন; -চারিদিকে শতাধিক বালবৃদ্ধ নরনারী চিত্রাপিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া এই মহাশক্তি-পূজার মহাভাবভক্তির লীলা-খেলা সন্দর্শন করিয়া অপার ভাগবৎ তৃপ্তি অনুভব করিতে-ছিল,—আর পূজামণ্ডপে ভক্ত হৃদয়ের রুধির-ধারায় শক্তি-তর্পণ সমাপন করিয়া পূজকগণ "জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে॥… ……দুর্গে! দুর্গে! রক্ষণি স্বাহা দুর্গায়ৈ নমঃ"—মন্ত্রে যথাবিধি হোম করিতে লাগিলেন, স্থণ্ডিলের বহ্নি-শিখা দাউ দাউ করিয়া অগণিত লেলিহান্ জিহ্বা প্রসারণপূর্ব্বক আজ্য আহুতি গ্রহণ করিতে লাগিল, ক্রমে পূর্ণাহুতি প্রদান হইল,—শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁজ, ঘড়ি, কাঁসর, ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদির তুমুল বাদ্যধ্বনি ও শত শত কণ্ঠ-নিঃসৃত 'জয় মা দুর্গা' ধ্বনিতে পূজামণ্ডপে সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ-বাতাস মহা-আন্দোলিত হইয়া উঠিল, মহোল্লাসের এক ঝটিকা যেন বহিতে লাগিল। মা ব্রহ্মময়ীও যেন তাঁর মৃন্ময় রূপের মধ্য দিয়া স্বর্গীয় হাস্যচ্ছটায় ও পলকহীন সস্নেহ দৃষ্টিতে সকলকে বিমুগ্ধ করিলেন এবং ভক্তের পূজা গ্রহণ করিয়া অশেষ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ ভক্তের তখনও প্রণামযজ্ঞ চলিতেছে, পুরোহিত হোমের 'আয়ুস', ও দেবীর আশীর্ব্বাদসহ মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত চৌধুরী মহাশয়ের কাছে আসিলেন এবং মায়ের আশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্য তাঁর মাথায় স্পর্শ করাইয়া মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞ আয়ুস দ্বারা ললাটে, কণ্ঠে, বাহুমূলে ও হৃদয়ে তিলক পরাইয়া দিলেন। বৃদ্ধভক্ত এতক্ষণ "মা"! "তোমার ইচ্ছা হোক পূরণ"—এই বলিতে বলিতে উঠিয়া বসিলেন ও সতৃষ্ণনয়নে জগন্মাতৃ-প্রতিমা ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া পুরোহিতের চরণ স্পর্শ করিয়া অতীব কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মার পূজা ঠিক্ হয়েছে তো? কোন অঙ্গহানি হয় নি তো বাবা!" পুরোহিত অতীব সসম্ভ্রমে ও প্রশান্তভাবে বলিলেন—'আপ-নার পূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে, মা আনন্দময়ী আপনার অটল ভক্তি ও বিশ্বাসের ভিতর দিয়া মহানন্দের তুফান ছুটাইয়া দিয়াছেন, উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করুন, আজ সবাই যে অপার্থিব আনন্দে মেতে গিয়েছিল, এতক্ষণ যে কে কোথায় ছিল তার হুস্ কারু ছিল না!—এই আনন্দানুভবই মায়ের দয়া, ইহাই মায়ের অশেষ আশীর্ব্বাদ! আজ আপনার পূজা সার্থকতায় ভরপুর! আপনার হৃদয়ের ভক্তি-বিশ্বাস মহাসাফল্যমণ্ডিত!

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা দেখিয়াছি, দেখিতেছি এবং ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় হয় তো জীবনান্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আরও বহু দেখিব,—কিন্তু এমন খাঁটি ভক্তের বুকের রক্তে শক্তিময়ীর মহাপূজা আর কখনও প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ঘটিবে কি না তাহা স্বয়ং শক্তিরূপিণীই জানেন!

———

নারী-নিগ্রহ

বাঙ্গলার কলঙ্ক কাহিনী লিখিবার পূর্ব্বে মিঃ লোম্যানকে স্মরণ হইতেছে। বাঙ্গলায় কত চুরি কত ডাকাইতি ও নরহত্যা হয় পুলিশের রিপোর্টে তাহা বর্ণিত হয় কিন্তু বাঙ্গলায় কত নারী অপহৃতা হয়, কত নারীর সতীত্ব নষ্ট হয়, পুলিশ রিপোর্টে তাহার স্থান ছিল না। টাকা চুরি অপেক্ষা নারী চুরি যে গুরুতর অপরাধ, নরহত্যা অপেক্ষা যে নারীর সতীত্বনাশ অধিকতর সাংঘাতিক ব্যাপার, ইহা মিঃ লোম্যানের পূর্ব্বে আর কেহ অনুভব করেন নাই। ১৯২৯ সালের বার্ষিক রিপোর্ট মিঃ লোম্যানই সর্ব্বপ্রথমে পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে নারী-হরণ মোকদ্দমার সমুচিত তদ্বির করিতে আদেশ করেন। এই মহৎ কার্য্যের জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

১৯৩০ সালের পুলিশ-রিপোর্টেও নারীহরণের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। একথা অতি সত্য যে, পুলিশ নারীহরণের যত সংবাদ পায়, তাহার অপেক্ষা ৩।৪ গুণ নারীঅপহৃতা ও লাঞ্ছিতা হইয়া থাকে। লোকলজ্জা-ভয়ে তাহা গোপন করা হয়। যত নারী অপহৃতা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়, তাহা অপেক্ষা ৫ গুণ বেশী নারী পরের দ্বারা লাঞ্ছিতা হইয়া কি দুঃখ জীবন কাটাইতেছে, কেহ তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে না।

১৯৩০ সালের পুলিশ রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে, নারীহরণের ১৯৮ মোকদ্দমায় ও নারীর সতীত্ব নাশের ৪১১ মোকদ্দমা সত্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছিল।

নারীহরণের ৬৮ মোকদ্দমায় ১৭৯ জনের শাস্তি হইয়াছে, সতীত্ব নাশের ১৩০ মোকদ্দমায় ১৫০ জনের শাস্তি হইয়াছে।

২৪ পরগণাতেই নারীহরণের মোকদ্দমা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। নদীয়া, ময়মনসিংহ, ঢাকা, দিনাজপুর ও বাকরগঞ্জেও ঐ দুই শ্রেণীর মোকদ্দমার সংখ্যা বেশী।

গত বৎসর যে জেলায় যত নারীহরণের মোকদ্দমা হইয়াছে

জেলার নাম	গতবৎসরের মুলতবি	বর্ত্তমান বর্ষের	বর্ত্তমান বর্ষের মুলতবি	সত্য মোকদ্দমা	মিথ্যা মোকদ্দমা	দণ্ড
২৪ পরগণা	৫	২৪	৬	২৬	২	৭
নদীয়া	৬	১৩	১	১৩	—	৮
মুর্শিদাবাদ	—	—	—	—	—	—
যশোহর	১	৮	২	৪	—	২
খুলনা	২	৫	২	৩	১	২
	১৪	৫০	১১	৪৬	৩	১৯
বর্দ্ধমান	১	৭	২	১৭	১	১
বীরভূম	—	৩	—	১	—	১
বাঁকুড়া	—	৩	—	২	—	১
মেদিনীপুর	—	১	—	৪	—	১
হুগলী	—	৮	৩	৩	১	২
হাওড়া	৫	৫	৪	৫	১	৩
	৬	২৭	৯	৩২	৩	৯
রাজসাহী	৬	১০	৬	৯	—	২
দিনাজপুর	—	৫	২	৬	—	—
জলপাইগুড়ি	১	৩	১	১	—	১
রঙ্গপুর	১৮	৩১	১৭	১৭	৩	৫
বগুড়া	৪	২৫	১১	৫	৩	১
পাবনা	৩	৬	১	৫	—	২

জেলার নাম	গতবৎসরের মুলতবি	বর্ত্তমান বর্ষের	বর্ত্তমান মুলতবি	বর্ষের সত্য মোকদ্দকা	মিথ্যা মোকদ্দমা	দণ্ড
মালদহ	১	১	২	—	—	—
দার্জ্জিলিং	১	৪	১	১	১	১
	৩৪	৮৫	৪১	৪৪	৭	১২
ঢাকা	৩	৯	১	১২	২	১
ময়মনসিংহ	১৯	৭৩	২৯	৩৪	৩	৯
ত্রিপুরা	—	৬	১	৬	১	২
	২২	৮৮	৩১	৫২	৬	১২
বাকরগঞ্জ	৪	১৮	৫	১৬	১	৫
ফরিদপুর	২	৭	৩	৬	—	১
নোয়াখালী	১	১	১	২	—	—
চট্টগ্রাম	—	৪	২	—	—	—
	৭	৩০	১১	২৪	১	৬
সর্ব্বমোট	—৮৩	২৮০	১০৩	১৯৮	২০	৫৮

সতীত্ব-নাশের মোকদ্দমা

জেলার নাম	গতবৎসরের মুলতবি	বর্ত্তমান বর্ষের	বর্ত্তমান বর্ষের মুলতবি	মোকদ্দমা সত্য	মিথ্যা মোকদ্দমা	দণ্ড
২৪শ পরগণা	৬	৩১	৪	৪৮	৬	১০
নদীয়া	৯	৩৮	২	৫০	—	১৫
মুর্শিদাবাদ	৪	৩	—	১৫	—	২
যশোহর	৪	১০	২	১১	—	৩
খুলনা	১	১১	—	৮	১	২
	২৪	৯৩	৮	১৩২	৪	৩২
বর্দ্ধমান	—	৯	২	১৯	—	৩
বীরভূম	—	৬	১	১৭	—	২
বাঁকুড়া	—	২	—	৪	—	—
মেদিনীপুর	—	৭	২	১৪	—	১
হুগলী	—	৬	১	৩	—	১
হাওড়া	১	৭	—	১১	২	১
	১	৩৭	৬	৬৮	২	৮
রাজসাহী	২	৭	১	৬	১	৪
দিনাজপুর	৪	১৬	৫	২৮	২	৯
জলপাইগুড়ী	১	১	—	২	—	—
রঙ্গপুর	৩	১৯	৫	১৬	—	২
বগুড়া	১	৮	১	৭	—	৩
পাবনা	—	১০	—	১০	—	১
মালদহ	২	৬	—	৬	২	৪
দার্জ্জিলিং	—	৫	১	৬	—	—
	১৩	৭২	১৩	৮১	৫	২৩
ঢাকা	৫	১১	৩	৪০	১	৫
ময়মনসিংহ	৪	২৯	১	২৬	—	১৪
ত্রিপুরা	—	৪	১	৭	—	—
	৯	৪৪	৫	৭৩	১	১৯
বাকরগঞ্জ	২	১৮	১	২৫	২	৩
ফরিদপুর	১	২	—	২	—	১
নোয়াখালী	—	৮	৩	১৭	—	১
চট্টগ্রাম	—	৬	২	৩	—	—
	৩	৩৪	৬	৪৭	২	৫
সর্ব্বমোট—	৫০	২৮০	৩৮	৪১১	১৪	৮৭

১৯৩০ সালে নারী-হরণের ১৯৮ ও সতীত্বহরণের ৪১১ মোকদ্দমা সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল। নারী-হরণের ৬৮ মোকদ্দমায় ১৭৯ জনের এবং সতীত্ব-হরণের ১৩১ মোকদ্দমায় ১৬৩ জনের সাজা হইয়াছে। অবশিষ্ট মোকদ্দমার বিচার শেষ হয় নাই।

নারীহরণ ও সতীত্বনাশের ৬০৯ টা মোকদ্দমা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া কি বাঙ্গালী এখনও জাগ্রত হইবে না?

এই মহা পাপ দূর করিবার জন্য কি বাঙ্গালী নরনারী আপনার শক্তিসামর্থ্য প্রয়োগ করিবেন?

— সঞ্জীবনী

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় করবৃদ্ধি

গত মঙ্গলবার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে রাজস্ব বিল উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহার ফলে গত ৩০এ সেপ্টেম্বর হইতে ভারতে বর্ত্তমান আয়কর হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রকম কর শতকরা ২৫৲ টাকা হারে

বর্দ্ধিত হইবে। আমদানী শুল্ক ও রপ্তানী শুল্কও ঐ হারে বৃদ্ধি হইবে। পরে ভারতীয় পোষ্টাল রেট শতকরা ৫০৲ টাকা হারে বর্দ্ধিত হইবে।

বর্ত্তমান বৎসরে আয়করের বৃদ্ধি শতকরা ১২।০ টাকা হিসাবেই ধরা হইবে। পর বৎসর হইতে উহা শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে বাড়িবে। বাৎসরিক ১০০০৲ হইতে ২০০০৲ টাকা যাহাদের আয় তাহাদেরও আয়কর দিতে হইবে।

নূতন করের মধ্যে কাঁচা তুলার উপর প্রতি পাউণ্ডে দুই পয়সা করিয়া ও কলকব্জা ও রং। এর উপর, যাহার উপর এত দিন কোন কর ছিল না, শতকরা দশ টাকা হিসাবে আমদানি-শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে।

ব্যয়সংক্ষেপের ব্যবস্থা

বড়লাট তাঁহার মাহিনার শতকরা ২০৲ টাকা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার শাসনপরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের মাহিয়ানা হইতে শতকরা ১৫৲ টাকা বাদ দিবেন।

সরকারী কর্ম্মচারী ও চুক্তিবদ্ধ কর্ম্মচারীদের (আই সি এস, আই এম এস, প্রভৃতি) মাহিনা আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ বা তৎপূর্ব্ব কোনো সময় পর্য্যন্ত শতকরা দশ টাকা হারে কমিয়া যাইবে।

অনুমান করা যায় যে, ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৩২ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত চার মাসে সরকারী কর্ম্মচারীদের মাহিনা বাবদ ৩৫ লক্ষ টাকা বাঁচিবে এবং ১৯৩৩ সালে উক্ত খাতে এক কোটী ১৫ লক্ষ টাকা বাঁচিবে। সৈনিক বিভাগের খরচ ৪।০ ক্রোর টাকা কম করা হইবে।

ঘাট্‌তির পরিবর্ত্তে বাড়তি

সাধারণ অবস্থায় এই বৎসর ও আগামী বৎসর—এই দুই বৎসরে ঘাট্‌তি হইত ৩৯০৫ লক্ষ টাকা ; কিন্তু এই নূতন রাজস্ব বিল অনুসারে কার্য্য হইলে ১৯৩২—৩৩ সালের শেষে ৫২৩ লক্ষ টাকা বাড়্‌তি হইবে।

রাজস্বের এই স্বাচ্ছল্যের অবস্থা হইলেই সরকারী কর্ম্মচারীদের মাহিনা পূর্ব্ববৎই হইবে এবং আয়করের বৃদ্ধিও কমাইয়া দেওয়া হইবে।

বর্দ্ধিত করের তালিকা

নূতন রাজস্ব-বিলে করবৃদ্ধির যে প্রস্তাব আছে তাহার সংক্ষিপ্ত সার নিয়ে প্রদত্ত হইল।

১। কাঁচা তুলার পাউণ্ড পিছু দুই পয়সা আমদানী শুল্ক।

২। কলকব্জার উপর শতকরা দশ টাকা হারে আমদানী শুল্ক।

৩। রংয়ের উপর শতকরা দশ টাকা হারে আমদানী শুল্ক।

৪। লাল চিনির আমদানী শুল্ক ৬৫০ আনা হইতে ৭।০ আনায় পরিণত হইবে।

৫। জোড়া পিছু জুতার উপর অন্তত চার আনা করিয়া আমদানী শুল্ক।

৬। কৃত্রিম রেশমী সূতার উপর আমদানী শুল্ক মূল্যানুপাতে শতকরা ১০৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকায় পরিণত হইবে।

৭। কৃত্রিম রেশমী বস্ত্রাদি, কর্পূর ও ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের উপর আমদানী শুল্ক মূল্যানুপাতে শতকরা ২০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকায় দাঁড়াইবে।

৮। ইহা ছাড়া সমস্ত আমদানী দ্রব্যের উপর শুল্কের হার বর্ত্তমান হারের উপর আরও সিকি ভাগ বাড়িবে।

৯। ১০০০৲ টাকা হইতে ১১৯৯৲ টাকা পর্য্যন্ত আয়ের জন্য বর্ত্তমান বৎসরে টাকা পিছু দু'পাই এবং আগামী বৎসরে টাকা পিছু চার পাই করিয়া আয়কর ধার্য্য হইবে।

১০। ২০০০৲ টাকার অধিক আয়ের জন্য এই বৎসরে বর্ত্তমান আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের এক-অষ্টমাংশ এবং আগামী বৎসরে এক-চতুর্থাংশ আরও অধিক দিতে হইবে।

১১। বর্ত্তমানে যে হারে আবগারী ও লবণশুল্ক আদায় করা হইতেছে তাহার উপর আরও এক-চতুর্থাংশ আদায় করা হইবে।

১২। খামে চিঠি লিখিতে খরচ লাগিবে ছয় পয়সা এবং পোষ্ট কার্ডে তিন পয়সা।

১৩। আমদানী শুল্ক ও আবগারী এবং লবণ শুল্কের বাড়তি ৩০এ সেপ্টেম্বর হইতেই কার্য্যকারী হইবে। খাম পোষ্ট কার্ডের দাম কোন্ তারিখ হইতে বাড়িবে সপারিষদ বড়লাট তাহা পরে ঘোষণা করিবেন।

—সময়

আলোচনা

মহিলা-কবি 'ঠাকুরাণী দাসী'

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত শ্রাবণ মাসের 'পঞ্চপুষ্পে' শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নবপ্রকাশিত 'বঙ্গের মহিলা-কবি' পুস্তক-সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন মন্মথবাবুর প্রবন্ধের একস্থলে আছে :—

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সুপণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৎসম্পাদিত 'মুখার্জীর ম্যাগেজিনে' 'Bengali Female Literature' নামক একটী প্রবন্ধে...লিখিয়াছেন—"১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে 'প্রভাকর' মাসিকপত্রে ঠাকুরাণী দাসী নাম্নী এক মহিলা তাঁহার নিজনামে নানা গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতেন; বোধ হয় নিজনামে এই মহিলাই সর্ব্বপ্রথম স্বরচিত কবিতা প্রকাশ করেন।"

এই প্রসঙ্গে মন্মথবাবু লিখিয়াছেন,—

"এই ঠাকুরাণী দাসী কে তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। ঈশ্বর গুপ্তের যুগের মহিলা কবিদের রচনারও কিছু নিদর্শন সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়।"

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তিতে ভুল আছে। 'ঠাকুরাণী দাসী' নাম দিয়া 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা বাহির হইত সত্য, কিন্তু ইহা লেখিকার আসল নাম নহে,—ছদ্মনাম। আমার কাছে 'সংবাদ প্রভাকরে'র কয়েকখানি সংখ্যা রহিয়াছে। তাহার দুইখানিতে ঠাকুরাণী দাসীর রচনা ও তৎসম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মন্তব্য দেখিতেছি। যোগেন্দ্র-বাবুর 'বঙ্গের মহিলা-কবি' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে হয়তো এগুলি কাজে লাগিতে পারে, এই ভাবিয়া 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :—

সংবাদ প্রভাকর

(১লা বৈশাখ ১২৬৫। ১৩ই এপ্রিল ১৮৫৮)

"আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে বিশেষ বিশেষ দিবসে সুরাগ-সূচক-স্বাভিপ্রায়-সম্বলিত বিশেষ বিশেষ কুলকন্যার গদ্য পদ্যময়-প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি, অদ্য নূতন বৎসরের নূতন দিবসের অধীন হইয়া 'ঠাকুরাণী' নাম্নী নূতন-রচনাপ্রেরিকা কবিতাকারিণী এক ভদ্র কুলবালার কবিতা অবিকল পশ্চাদ্ভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে পাঠ করিয়া যথাযোগ্য সাধুবাদ প্রদান করুন। কারণ এই কবিতা সর্ব্বপ্রকার সুগুণসম্পন্ন হইয়াছে, যতি, মিল, ছন্দ, রস,ভাব,অর্থ, সকলদিগ্ সমানরূপে রক্ষা হইয়াছে।— এবং সকল গুণের প্রধান গুণ, যে, প্রসাদ গুণ,—তাহাতেই পরিপূর্ণ। এই কবিতার প্রথম চরণে "নম প্রভাকর" সম্বোধনসূচক-পদ-জন্য এই শব্দে কেহ কেহ দোষার্পণ করিতে পারেন, কিন্তু ভাষা-কবিতায় ইহা কখনই দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা। যখন পূর্ব্বতন অনেক পণ্ডিত কবি-কদম্বের এতদ্রূপ রচনার কেহই এপর্য্যন্ত দোষ দর্শন করেন নাই, তখন ব্যাকরণাদি-বোধ-বিহীনা এক কুলবালা অবলার এই রচনায় দোষ দৃষ্টি করিবেন, এমন অবিবেকি ছলগ্রাহী কে আছেন? তথাচ আমরা এতদ্দোষ খণ্ডনার্থ প্রাচীন বিখ্যাত কবি "রামেশ্বরী" গ্রন্থ হইতে এক চরণার্দ্ধ উদ্ধৃত করিলাম।

যথা।

'নম দেব নারায়ণ, নিত্যরূপ নিরঞ্জন'

আমরা অভিমানশূন্য ছাত্রগণকে অনুরোধ করি, হে বাপু! তোমরা 'ঠাকুরাণী' প্রণীত এই রুচির রচনার অনুকরণ কর, তাহা হইলেই সর্ব্বতোভাবে উত্তম হইবে, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কবিতার কি পুরস্কার প্রদান করিব? তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ঠাকুরাণী দাসীকে 'ঠাকুরাণী মাসী' অথবা 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলাম। দুঃখের বিষয় এই, যে, জগদীশ্বর ইহাকে বিধবা করিয়াছেন। যাহা হউক, এই রচনা বিষয়ে কেহই আর সন্দেহ করিয়া কোনো কথা কহিতে পারিবেন না। কেননা আমারদিগের বিশেষ বিশ্বাসি-সত্যপ্রিয় প্রিয়তম সবিদ্বান বন্ধু 'মেট্রোপলিটন্ কলেজের

শিক্ষক শ্রীযুত বাবু নন্দলাল দাস আপনার হস্তাক্ষরিত পত্র সমভিব্যাহারে কবিতাটি প্রেরণ করেন। আমরা সাধারণের সুগোচরার্থ সেই পত্রখানিকে সাক্ষিস্বরূপ করিয়া এই পত্রটি পত্রস্থ করিলাম।

To

Baboo Issur Chunder Goopto,

My Dear Sir.

I beg at present to enclose herewith for publication in an early issue a paper containing a few verses written by a lady of a respectable family—she is a widow, and is occupied with nothing but reading and writing. The hand writing is hers. You can depend upon my word that the verses are the actual production of a Bengalee female. I hope therefore you will have no objection to insert it. I can assure you, my dear sir, that I would not have taken the trouble of sending it to you; had it not been the composition of a lady of respectable connections. Hoping you are well.

I am, dear Sir,
Your's truly,
NUND LOLL DOSS.

Nimtollah,
29th March, 1858"

[শ্রীমতি ঠাকুরাণীদাসীর বিরচিত গদ্য পদ্য।]

"গুণাগ্রগণ্য ধন্য মান্য শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

"এ দেশের অভিনব বিদ্যাভিলাষীণী কামিনীগণের রচিত দুই একটি প্রবন্ধ কৃপা করিয়া স্বীয় দৈনিক প্রভাকর পত্রে প্রকটন করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া সাহস পূর্ব্বক সবিনয়ে নিবেদিতেছি, মল্লিখিত কতিপয় পঙ্ক্তি সংশোধন পূর্ব্বক মহাশয়ের ভুবনোজ্জল পত্রৈক পার্শ্বে যৎসামান্য স্থান দান করিয়া এ হীনমতি অবলার উৎসাহ বর্দ্ধনে বাধিত করিবেন।"

লঘু ত্রিপদী।

নম প্রভাকর, মম শঙ্কা হর,
কিঙ্করীরে কৃপা কর।
যে তব মহিমা, কে জানিবে সীমা,
তুমি সর্ব্ব গুণাকর॥
তোমার বর্ণনা, করিতে রচনা,
ইচ্ছুক পামর মন।
কিন্তু আমি নারী, প্রকাশিতে নারি,
সাহস না করে পণ।
পুরাণাদি যত, সর্ব্ব শাস্ত্র মত,
তুমি ব্রহ্ম তেজোময়।
স্থূল সূক্ষ্ম অতি, তুমি গ্রহপতি,
তোমাতে সকলি হয়॥
জগৎ রক্ষণ, তুমি সে কারণ,
তুমিতো জগৎ সার।
সর্ব্ব জীবোপর, ওহে দিবাকর,
আছে তব সুবিচার॥
অচলে প্রকাশ, সদা শূন্যে বাস,
এক চক্র-রথে গতি।
যাও অস্তাচল, তেজি ধরাতল,
প্রিয়া-জায়া ছায়াপতি॥
বেদের বচন, জ্যোতির গঠন,
মস্তকে মাণিক ধরা।
আহা কিবা রূপ, না দেখি স্বরূপ,
লোহিত-বসন-পরা॥
জগৎ নয়ন, সত্য সনাতন,
স্মরণে কলুষ নাশ।
যুগ যুগান্তর, আছ নিরন্তর,
কভু নাহি বৃদ্ধি হ্রাস॥
জগৎ পালক, দিবা প্রকাশক,
সুরলোক সহ স্থিতি।
তিমির নাশক, সলিল শোষক,
নলিনী তোষণে প্রীতি॥
অতি খরকর, পোড়ে কলেবর,
জর জর জীব তাপে।
ধরণী বিদরে, অসহ্য অন্তরে,
কুমুদিনী ভয়ে কাঁপে॥

হেরে তব ভাব, কার সুপ্রভাত,
কেহবা অকূলে ভাসে।
লয়েছি স্মরণ, অনল বরণ,
চরণ কমল আশে ॥

ঠাকুরাণী দাসী।'

আহা!—এই গদ্য পদ্য কি চমৎকার হইয়াছে—যত-দুর পর্য্যন্ত উত্তম হইবার তাহা হইয়াছে।—আমরা পূর্ব্বেই ইহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছি, এইক্ষণে ধন্যবাদ ভিন্ন আর কি অধিক অমূল্য রত্ন প্রদান করিতে পারি? যে পুরুষ এবং যে স্ত্রীলোক এই রচনা পাঠ করিবেন তাঁহারই ইহাতে মনের সহিত সন্তুষ্ট হইয়া পুনঃ পুনই প্রতিষ্ঠা করিবেন।"

সংবাদ প্রভাকর

(১লা মাঘ ১২৬৫, ১৩ জানুয়ারী ১৮৫৯)

শ্রীমতী ঠাকুরাণী দাসী

"তথা" গদ্য পদ্য রচনা

কোনো পূজ্যপাদ মহামান্য ব্রাহ্মণের কন্যা, যিনি "ঠাকুরাণী দাসী" প্রকাশ্যে এই নাম প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদাই সুমধুর গদ্য-পদ্য-পরিপূরিত-প্রবন্ধপুঞ্জ প্ররচন পূর্ব্বক প্রভাকর পত্রে প্রকটন করিয়া থাকেন। যাঁহার সংরচিত সেই সমুদয় সুধাময়-সুচারু সরল-সাধু সন্দর্ভ সন্দর্শনে সদালাপি সদনুশীলনশালি সদনুরাগি সুকবি সুলেখক সমূহের সংস্তোষের সীমা থাকেনা।—অনেক রচনার্থি যুবকজনেরা এপর্য্যন্ত যাঁহার ন্যায় অতি উত্তমরূপ গদ্য পদ্য রচনায় নিপুণ হয়েন নাই। সেই গুণবতী বিদ্যাবতী বিপ্রবালা "ঠাকুরাণী দাসী" আমারদিগের "মা" অথবা মায়ের ভগিনী "মাসী" ইনি দয়াময়ী-দৈবশক্তি দেবীর দয়াবলে অতি উচ্চ উৎকৃষ্টরূপ রচনা-শক্তি প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক সাতিশয় সমাদর সহকারে সদা সদালোচনায় ও শাস্ত্রালাপে সংলিপ্তা থাকায় নিকট সম্বন্ধীয় কোনো প্রাচীন পুরুষ ইঁহার প্রতি প্রতিকূল ভাবে দোষাভাস প্রকাশ করাতে দারুণতর দুঃখিনী হইয়া লেখনী ধরিয়া যতদূর পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের আক্ষেপ বর্ণনা করিতে হয়, তাহাই করিয়া একখানি গদ্য পদ্যময়ী রচনা আমারদিগের নিকট প্রেরণ করেন, আমরা গত ২৭ অগ্রহায়ণ দিবসীয় প্রভাকরে সেই পত্রখানি প্রকটিত করিয়া তাঁহাকে প্রচুরতর প্রমাণ প্রয়োগে প্রকৃষ্টরূপ প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় প্রকাশচ্ছলে নিন্দা-কারিদিগের নিন্দাবাদ খণ্ডন করি। জননী তৎপাঠে সীমাশূন্য সন্তোষসাগরে প্লাবিত হইয়া সাধারণ সমাজে আপনার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশার্থে অপর একটি আনন্দ প্রকাশক প্রবন্ধ প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রবন্ধ-পূরিত গদ্য পদ্য মদ্য অপেক্ষা অধিক মুগ্ধকর, চিত্তহর, প্রফুল্লকর জ্ঞানে অদ্যবাসরীয় পত্রে প্রকাশ করিতেছি, ইহার দৃষ্টি ও রসাস্বাদন মাত্রই সুপাত্র-পাঠক পুঞ্জের গাত্র-পাত্র পুলকে পরিপূরিত হইবে। দেখুন, কি চমৎকার! কি চমৎকার! ইহাঁর বদনগলিত সুধা-স্খলিত ললিত চলিত শব্দ গুলীন দলিত-অঞ্জনে মূর্ত্তিমান্ হইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় চিত্ত-চমৎকারকর বিচিত্র বিনোদ আভাস প্রকাশ করিতেছে! ..

হে সুপাত্র ছাত্রগণ! হে বিদ্যানুরাগি কাব্যপ্রিয় শাস্ত্রালাপি মহাশয়গণ! আপনারা বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক ঠাকুরাণী দাসী প্রণীত নিম্ন-প্রকাশিত গদ্য-পদ্য-রচনাটি পাঠ করিয়া যতদূর পর্য্যন্ত সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়, তাহাই করুন। সর্ব্ব সমাজ বিশিষ্ট পণ্ডিত-মণ্ডিত সভারূঢ় রচক ও কবি হইতে যে প্রকার গদ্য ও কবিতা রচনার সম্ভাবনা নাই, এক পিঞ্জর রুদ্ধ কোকিলের ন্যায় কুলকন্যা কর্ত্তৃক তদধিক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রচনা অতি সহজে অনায়াসেই রচিত হইয়াছে। ইহা আশার অতীত আনন্দ-কর ব্যাপার। ... ...

পরন্তু সকলে আর একটি আশ্চর্য্য দেখুন্ আমারদিগের মাতা অদ্যকার প্রকাশিত পদ্য মধ্যে শেষ পদের প্রথম অর্দ্ধভাগ কি সুন্দররূপে বিন্যাস করিয়াছেন।

যথা

"ছোট ছোট তরুবর, ধরে বেশ মনোহর,
গলে পরি জোনাকির হার।"

আমরা একাল পর্য্যন্ত কত কত প্রাচীন কবির প্ররচিত "সন্ধ্যাবর্ণন" পাঠ করিলাম, কিন্তু তরুণ অরু গলদেশে

জোনাকির হার ধারণ পূর্ব্বক সুচারু শোভা সঞ্চার করিতেছে, এমত সুন্দর দৃষ্টান্ত তাহার কোনো কবিতাতেই দেখিতে পাই নাই। সুতরাং এই দৃষ্টান্তটিকে নূতন দৃষ্টান্তই বলিতে হইবে।... ...

এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতিরা সংপ্রতি বিদ্যালোচনা পূর্ব্বক রচনার সূচনা করিতেছেন, ইহার অপেক্ষা অধিক আহ্লাদ কর ব্যাপার আর কি আছে! ইহারা বিদ্যাবতী হইলেই দেশের সমস্ত দুর্দ্দশা, দুর্গতি এবং দুর্ণাম দূর হইবে তাহাতে আর সংশয় কি?... ...

প্রস্তাব সাঙ্গ কালীন আমরা আহ্লাদ-সাগরে প্লাবিত হইয়া সকৃতজ্ঞচিত্তে লিখিতেছি, উক্তা গুণ যুক্তা দ্বিজাঙ্গনার রুচির-রচনা-মাধুর্য্য এবং অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকার্য্য সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আমারদিগের এই শিমুলিয়া পল্লীস্থ সর্ব্বাগ্রগণ্য সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সুবিখ্যাত সুধার্ম্মিক ধনিবরের গুণবতী বিদ্যাবতী পতিপ্রণা সাধ্বীসতী কন্যা তাঁহাকে ভক্তিভরে "প্রণামি স্বরূপ" একটি সুযোগ্য উপঢৌকন প্রদানার্থ সেই বস্তুটি আমাদিগের নিকট অর্পণ করিয়াছেন। আমরা অবিলম্বেই সেই প্রণামি উপকার প্রেরণ করিব, জননী অনুগ্রহ পূর্ব্বক যেন তাহা গ্রহণ করেন,।...

"মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু। নিবেদনমিদং।

সম্পাদক মহাশয়! পরদ্বেষি নিন্দক বৃন্দের গরলময়-বাক্যে জর্জ্জরিত হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলাম, মহাশয়ের অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়াই এ ব্রতের দক্ষিণান্ত করিব, আপনার পীযুষ-সদৃশ সুমধুর-বাক্য-বিরচিত-উপদেশ আকর্ণনে মন পুনর্ব্বার প্রবৃত্তির শরণ গত হইল। এক্ষণে কি লিখিব, কি লিখিব? এই ভাবনাই বলবতী দেখিতেছি এবং কি উপায় দ্বারা এই সদুপদেশ লাভের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব, সে চিন্তাতেও আকুলা করিতেছে, কিন্তু কুলবালা জনের সম্বল আর কি আছে? তবে দুবেলা এই প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর

[দুঃখের বিষয়, আমি যে-সংখ্যা সংবাদ প্রভাকর হইতে ইহা উদ্ধৃত করিতেছি তাহা খণ্ডিত পরবর্ত্তী দুই পৃষ্ঠা (১৩-১৪) নাই]
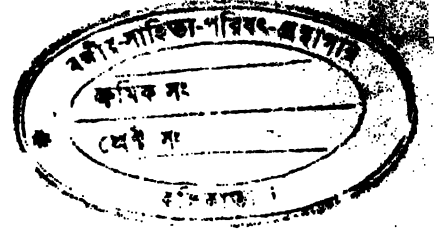
হোটেলওয়ালা

(চিত্র)

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার বাদুড়বাগানের সরু ইট-বাঁধান গলিটার মধ্যে তিন তলা বাড়ীতে অনেককালের পাড়ার সব-জান্তা মেস। মেসটার খ্যাতি-অখ্যাতি দুই আছে। মেসটার গৌরবও যেমন আছে, অগৌরবও তেমনি যে নেই তা নয়। বাড়ী থেকে আরম্ভ ক'রে তার ভিতরের বাসিন্দা পর্য্যন্ত সবারই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বাড়ীটা আশে পাশের নীচু দোতলা বাড়ীগুলার মাঝে সগৌরবে তার তিনতলা উঁচু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জাত্যভিমানেও সে অনেকের চেয়ে যেন বড়, এর আভাসও বাড়ীটার গঠন-ভঙ্গী থেকে জান্‌তে পারা যায়, আর বয়সে যে সে সব বাড়ীর চেয়ে বড় এ তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়—দেয়াল থেকে চুণ বালি খ'সে পড়েছে। লোনা-লাগা ইটের গায়ে বালি ধরাবার ব্যর্থ চেষ্টাও বোঝা যায়; এখানে-সেখানে বালি খসে-পড়া ফাঁকের মাঝে মাঝে নতুন বালির দাগ; কিন্তু বালিগুলা লোনা ইটের দাঁত খিঁচুনী ঢাকতে পারে নি। বাড়ীটা যেন আশেপাশের বাড়ীগুলাকে দাঁত খিঁচিয়ে বল্‌ছে—দূরমপসর। ছোট বাড়ীগুলাও ভড়্‌কে গিয়ে চোরের মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীর সামনেই এক গোয়ালার বাথান। বাড়ীতে ঢুকতে-বেরুতে পূত গোময় এবং গো-মূত্রের দর্শন ও গন্ধে নিজেকে ধন্য করতে হয়। বাড়ীর বাইরেটা যতই মন্দ হোক ভিতরটা তেমন ছিল না। মস্ত বড় ফাঁকা উঠান পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে তকতকে। ইলেকট্রিক আলোও আছে; ঘরগুলাও নেহাৎ মন্দ নয়; বরং ভালই বলা যেতে পারে অন্য মেসের তুলনায়। পরিচ্ছন্নতার জন্য এই মেসের একটা সুখ্যাতি আছে, তার মূলে মেসের ম্যানেজার পূর্ণেন্দু। আবার খাওয়া এবং লৌকিক-ব্যবহার সম্বন্ধে যে অখ্যাতি আছে তার মূলেও সেই পূর্ণেন্দু।

এই পূর্ণেন্দু জীবটী একটী অদ্ভুত সৃষ্টি ভগবানের। এর চাল-চলনটা ঠিক মেয়েলী ধরণের কি পুরুষালী এটা সব সময় বোঝা যেত না। ললিত-লবঙ্গ-লতা গোছ ছিপ্‌-ছিপে গড়ন। রংও যে নেহাত ময়লা তাও নয়। বাপ-মা ছেলেবেলায় আদর করে এই সুন্দর ছেলেটীর কপালে উল্কীর টিপ পরিয়ে দিয়েছিলেন। এখনও সেটা চাঁদের কলঙ্কের মত পূর্ণেন্দুর কপালে কাল হ'য়ে রয়েছে। পূর্ণেন্দু কপালে চন্দনের ফোঁটাও কাটে, সময় সময় গলায় রুদ্রাক্ষের মালাও দোলায়, আবার মাছ-মাংস খেতেও কসুর করে না। অবশ্য বল্‌তে পারা যায় যে, এই বাহিরের ধর্ম্মাবরণের সঙ্গে অন্তরের ধর্ম্মের কোনই সম্পর্ক নেই—এটা পূর্ণেন্দুর প্রতি বেশ জোর করেই বলা যায়। ফোঁটা কাটার আর যাই উদ্দেশ্য থাক্‌,—সেটা সে কপালের বাল্যের জয়তিলক উল্কীকে যৌবনের অগৌরবের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এবং ঢাকা দেবার জন্যই কাটত। আরও একটা গূঢ় রহস্য ছিল—সেটা অবশ্য পূর্ণেন্দুর শত্রুরা বলত—যে, এই ফোঁটা কাটা এবং মালা ধারণ নাকি লোক ভোলাবার মহৎ অস্ত্ররূপে পূর্ণেন্দু ব্যবহার করে। পূর্ণেন্দু বিবাহিত এবং যদিও তার স্ত্রী দেখতে শুন্‌তে মন্দ নয় তবু তার স্ত্রীর প্রতি বীতরাগের যথেষ্ট কারণ ছিল। তার স্ত্রী নেহাৎ হিন্দুর ঘরের অল্প-শিক্ষিতা মেয়ে। বাপ-মা জোর ক'রে এর সঙ্গে বিয়ে দেয়। তাই পূর্ণেন্দুর এটা মোটেই পছন্দ হয় নি। স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য বোধে সে বছরে একবার বাড়ী যায়। সে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে যে, এই অশিক্ষিতা স্ত্রীগুলার পক্ষে এর চেয়ে বেশী আশা করাই অন্যায়।

পূর্ণেন্দু স্কুলে মাষ্টারী করে; মাহিনা যৎসামান্য পায়, তাতে তার কিছু মাত্র আসে যায় না। মেসের খরচ বাবদ উদ্বৃত্ত টাকা সে আত্মসাৎ করে—তার খাটুনির মজুরীর স্বরূপ। তারপর সকালে বিকালে ছেলে পড়িয়ে—ছেলের চেয়ে মেয়ে পড়িয়েই সে বেশ দুপয়সা রোজগার করে।

পূর্ণেন্দুর একটা মস্ত গুণ সে চট্ করে লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে, কেউ-ই তার সততা এবং চরিত্রের উপর সন্দেহ করে না—লোক ভোলাবার অদ্ভুত ক্ষমতা তার এটা মানতেই হ'বে। সেই জন্যই ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীই জোটে তার বেশী। পড়ার বিদ্যা তার থাক আর না থাক সে নানা উপায়ে কাজ চালিয়ে নেয়। মিষ্টি মুখে সে মেসের দোতলাবাসী কালীপদ মাষ্টারের কাছ থেকে সব জেনে-শুনে নিয়ে গিয়ে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ উদ্গার করে দেয় ছাত্রীদের কাছে – এটাও তো মস্ত বড় গুণ, কটা লোকে পারে। তার ছাত্রীদের মধ্যে তরুণী ষোড়শীই বেশী। আরও একটা আশ্চর্য্য এই যে, এদের অভিভাবকেরাও পূর্ণেন্দুকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেন। ঠাকুরবাড়ী অভিনয় দেখাতে নিয়ে যেতে হ'লে পূর্ণেন্দু ছাড়া আর কেউ-ই পারে না, এই ধারণা। পূর্ণেন্দুও কৃতার্থ হয়ে এই কষ্টটুকু স্বীকার করে। সে না কি স্ত্রীর অভাব এই রকম করেই পূর্ণ করে—এটাও অবশ্য দুষ্ট লোকের রটনা।

পূর্ণেন্দুর কুট নীতির মধ্যে প্রবেশ করা সাধারণ লোকের পক্ষে একটু দুরূহ ছিল। চাণক্য পণ্ডিত একটু কষ্ট করে বেঁচে থাকলে, পূর্ণেন্দু-নীতির কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় পেয়ে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করতে পারতেন—তাঁর দুর্ভাগ্য।

বেশ-বিন্যাস-সম্বন্ধেও সে উদাসীন ছিল না। পড়াতে যাবার আগে সকালে বিকালে "পিয়ার্স সোপে" নিজের সৌন্দর্য্যকে অধিকতর ফুটিয়ে তুলতো। এবেলা যে কাপড় পরতো ওবেলা সেটা পরতো না। খদ্দর পরতো - তাতে না কি আভিজাত্য বাড়ে, লোকের কাছে খাতির পাওয়া যায়,—ধন্য মহাত্মা গন্ধী।

পূর্ণেন্দুর কথা বলার ধরণ ছিল অদ্ভুত। যখন যার সঙ্গে যে-রকম ভাবে কথা বললে কাজ উদ্ধার হ'বে সেটা তার বেশ জানা ছিল। যখন কোন লোকের কাছ থেকে আত্মীয়ভাবে কাজ উদ্ধার করবার দরকার হ'ত, তখন পূর্ণেন্দু এমন একটা অদ্ভুত নাকি সুর বের করতো, যেটা মেয়েদের কথাবলার ব্যর্থ অনুকরণ হ'য়ে দাঁড়াতো। মুখের ওপর হাসি ফুটিয়ে সমস্ত শরীরটাকে অদ্ভুতভাবে দুলিয়ে সুর মিহি ক'রে টেনে টেনে বলতো—এই যে, দাদা, বলি ভাল তো। আসুন, আসুন অনেকদিন দেখি নি। এমনি ক'রে তার সঙ্গে কতকালের পরিচিতের মত আলাপ জমিয়ে তোলে। আবার যার কাছে স্বার্থের কোন নাম গন্ধ নেই সেখানে গলাটাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করবার ব্যর্থ চেষ্টায় কথা বলে। সেটুকু হয় এক অদ্ভুত শ্রোতব্য জিনিস।

সকালে উঠে রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে কপালে দীর্ঘ ফোঁটা কেটে সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে যখন পূর্ণেন্দু স্তব পাঠ করতো তখন তাকে দেখলে কেউ-ই বোধ হয় বলতে সাহস করবে না যে, এই লোকের মধ্যে এতখানি শয়তানী পোরা আছে।

কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে পূর্ণেন্দু বুক ফুলিয়ে গোপনে এই মেস বনাম বোর্ডিং চালায়। কেউ যদি বলে, এ বোর্ডিং। পূর্ণেন্দু তীব্র প্রতিবাদ ক'রে বলে—না, এ মেস। আমাদের নিজের মধ্যে এই ব্যবস্থা যে, এটা বোর্ডিংয়ের মত চালান হ'বে কিন্তু প্রকৃত এটা মেস।

—তবে নির্দ্দিষ্ট খরচ পড়ে কেন প্রত্যেক মাসে?

—এইটাই এই মেসের বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের অনুমোদিত

—এই কথাগুলা পূর্ণেন্দু জোর ক'রেই বলতো। কিন্তু এই 'আমরা' যে কে এ ঠিক বোঝা যেত না। সে হয় তো নিজের সম্বন্ধেই গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করে।

কেউ যদি বলে—বেশ, মেসই যদি তবে তোমার একাধিপত্য কেন?

পূর্ণেন্দু তার উত্তরে বলে—এটাও তো আমাদের ব্যবস্থা। সকলের কষ্ট হ'বে বলেই আমাকে এই দায়িত্ব কাঁধে করতে হ'য়েছে। নইলে আমার কি! কে এই কষ্ট যেচে ঘাড়ে নেয়। সকলের কষ্ট লাঘব করবার জন্যই আমায় বাধ্য হ'য়ে এই ভার নিতে হ'য়েছে।

—বেশ তবে ছেড়ে দাও আমরা চালাই।

—বেশ তো এতো আমারই ভাল, কষ্ট থেকে মুক্তি পাব। নিন্ না আপনারা। পূর্ণেন্দু মুখে এই কথা বলে বটে, কিন্তু কাজে ঠিক অতখানি ঔদার্য্য দেখায় না। দু'দিন আর কারোর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে না। কথাটা চাপা প'ড়ে গেলেই আবার স্বরূপ মূর্ত্তি ধরে।

রাত্রে যখন খাবার ঘরে এক সঙ্গে সকলে খেতে বসে, তখন সকলেই প্রায় পূর্ণেন্দুর সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা কর্‌তে থাকে। খাওয়া খারাপের আলোচনা থেকে আরম্ভ ক'রে অনেক আলোচনাই চলে তখন। পূর্ণেন্দু পা টিপে টিপে এসে বাইরের সরু গলিতে খাবার ঘরের পিছনে আলো-ছায়ায় নিজেকে লুকিয়ে মন্তব্য শোনে এবং কা'রার সঙ্গে দেখা না ক'রে চোরের মত পা টিপে ওপরে চ'লে যায়। পূর্ণেন্দুর দু'ই একটী গুপ্তচরও আছে। তারা পূর্ণেন্দুর রাজ্য-পরিচালনে সাহায্য ক'রে। তাদের মধ্যে একটী হচ্ছে বনবিহারী। সে পূর্ণেন্দুকে 'বাবুদা' বলে ডাকে। মেসের মধ্যে গুজব বনবিহারী পূর্ণেন্দুর কাছ থেকে সাহায্য পায়—খাই-খরচ তাকে পূরা দিতে হয় না। এর বিনিময়ে বনবিহারী মেসের সকলের কথা পূর্ণেন্দুর কাণে তোলে।

সেদিন বনবিহারী এসে পূর্ণেন্দুকে বল্‌লে—বাবুদা, রাসমোহন বল্‌ছিল যে, খাওয়া একেবারে যাচ্ছেতাই হচ্ছে। আর আপনাকে যা নয় তাই বল্‌লে।

পূর্ণেন্দু শুনে বল্‌লে—তাই না কি। রাসমোহনটা হচ্ছে একটা অভদ্র ছোট লোক। নেহাৎ অনেকদিন আছে তাই কিছু বল্‌তে পারি নে।

পরদিন পূর্ণেন্দু যেন কিছুই জানে না এমনিভাবে রাসমোহনের কাছে গিয়ে বল্‌লে—জানেন মশায় ভাল রাঁধতে দেব কি, ভাল রান্না যেটা হ'বে সেইটাই সকলে বেশী ক'রে খাবে। এমনি সব অভদ্র। আর বাড়ীতে তো কে কি খায় তা তো আমার জানা আছে এখানে এসে সব লম্বা লম্বা চাল।

রাসমোহন একটু ঠোঁটকাটা লোক। সে বল্‌লে—আহা, বাড়ীতে কে কি খায় তা তো বেশ বোঝাই যায়। আমাদের মুখে তোমার ব্যবস্থার রান্না রোচে না, আর তুমি অম্লান বদনে খেয়ে যাও। যদিও অনেকদিন খাওই না। তোমার সব মেসো, পিসে, দাদা, বাবা, মা, দিদি, সব পাতান আছে তাদের স্কন্ধে খেয়ে নিজের খরচ বাঁচাও।

এই সম্বন্ধের খোঁচায় পূর্ণেন্দু রেগে উঠ্‌ল। বল্‌লে—জান, বাবাকে ব'লে তোমায় উঠিয়ে দিতে পারি।

এইখানেই পূর্ণেন্দু-সম্বন্ধে আর একটু বল্‌বার আছে। মেসের এই বাড়ী পূর্ণেন্দু দখল করছে অদ্ভুত উপায়ে বাড়ীখানা পাড়ার কৃপণ ধনী কাশী রক্ষিতের। ডাকসাইটে কৃপণ কাশীকে পূর্ণেন্দু হাত করেছিল; তার বাহাদুরী বটে! কাশীর ছেলে সূর্য্যমোহনের সঙ্গে পূর্ণেন্দুর বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্বের আশ্রয়ে পূর্ণেন্দু কাশীকে 'ধর্ম্মবাবা' বলা সুরু করলে। প্রথমে সকলের অসাক্ষাতে ডাকৃত, ক্রমশঃ সাহস সঞ্চয় ক'রে সকলের সাক্ষাতেই 'বাবা' ব'লে ডাকে এবং এই আত্মীয়তার জন্য কাশী হেন কৃপণ ব্যক্তিও বাড়ীখানার ভার পূর্ণেন্দুর উপর ন্যস্ত করেছে। বাড়ী ভাড়া পূর্ণেন্দুকে দিতে হয় না। যে ঘর ভাড়া থাকবে তার নির্দ্দিষ্ট ভাড়া কাশীকে সংগ্রহ ক'রে দেয়। যে ঘর ভাড়া না হ'বে তার জন্যে পূর্ণেন্দুকে কিছুই দিতে হয় না। সেটা কাশীর হিসাব থেকেই বাদ যায়। কাজেই পূর্ণেন্দুর ভাড়ার কোন বিশেষ দায়িত্ব নেই এবং সেইজন্য সে মেসের সভ্যদের বিশেষ গ্রাহ্য ক'রে না। এল গেল তার তো লোকসান বিশেষ নেই—যেতে কাশীর যাবে। কাশীও পূর্ণেন্দুর অমায়িক ব্যবহারে এবং 'বাবা' ডাকে ভুলে কিছুই বলে না।

এই জোরেই পূর্ণেন্দু রাসমোহনকে বল্‌লে, তোমায় উঠিয়ে দেব।

রাসমোহন বল্‌লে—উঠিয়ে দিলে আর মেস তো কোথাও পাওয়া যাবে না!

পূর্ণেন্দু বল্‌লে—এমনটী আর কোথাও পাচ্ছেন না মশায়। এই তো নৃপেনবাবু উঠে গিয়েছিলেন আবার তাঁকে এখানেই আস্‌তে হ'ল। আর খাওয়া খারাপ বল্‌ছেন, দেখুন না অরবিন্দবাবু এই মেসের খেয়েই কেমন দিন দিন মোটা হচ্ছেন।

রাসমোহন শ্লেষের সুরে বল্‌লে—দেখুন এক কাজ করুন, কৃপাসিন্ধুবাবু রোগা তার একটা ছবি ছাপুন, নীচে লিখুন—মেসে আসিবার পূর্ব্বে, আর তারই পাশে অরবিন্দ-বাবুর একটা ছবি ছাপুন নীচে লিখুন, মেসে আসিবার পরে—এই যেমন "এডওয়ার্ডস্ টনিকের" বিজ্ঞাপন দেয় ম্যালিরিয়া-গ্রস্ত রোগীর ছবির নীচে লিখে, "ঔষধ খাইবার পূর্ব্বের অবস্থা ও পরের অবস্থা।" তা হ'লেই তোমার মেসের বেশ বিজ্ঞাপন হ'বে।

পূর্ণেন্দুর মুখটা একটু ভার হ'য়ে গেল এই কথার খোঁচায়। পূর্ণেন্দুর আর এক পার্ষদ যদুনন্দন পাশেই

দাঁড়িয়ে ছিল, সে তাকে রাসমোহনের শ্লেষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে—পূর্ণেন্দু, রাসমোহন বাবু বলছেন মন্দ নয়। তাই একটা ছাপ। বলে ব্যঙ্গটাকে সহজ করবার জন্যে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল। পূর্ণেন্দু দ্বিরুক্তি না ক'রে রাগে গর্‌ গর্‌ করতে করতে সেখান থেকে চ'লে গেল। কি ক'রে রাসমোহনকে তাড়ান যায় তাই ভাবতে লাগ্‌ল। যদুনন্দনও মুখ চুণ ক'রে স'রে পড়্‌ল।

পূর্ণেন্দুর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল লোকের সঙ্গে মেশবার। বড় লোক এবং সভা-সমিতি সবের সঙ্গেই তার যোগ ছিল। ঠাকুরবাড়ী 'তপতী' অভিনয় হ'বে। পূর্ণেন্দু টিকিট যোগাড়ের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। এ অভিনয় না দেখ্‌লে তার আভিজাত্য বজায় থাকে না, অথচ জোগাড়ই বা হয় কোথা থেকে। রামেন্দু একখানা টিকিট কিনেছিল কম দামের কিন্তু কোন কারণে যেতে না পারায় সেই টিকিটখানা সে কিন্‌লে। কিন্তু এ তার মনের মত হ'ল না—অত পেছনে! শেষে অনেক চেষ্টায় তার বড়লোক বন্ধু রতীনের কাছ থেকে একটা বেশী দামের টিকিট ভিক্ষে ক'রে সংগ্রহ করলে। রতীন বিশ্বভারতীর সভ্য ব'লে বেশী দামের টিকিট অর্দ্ধমূল্যে পেয়েছিল। পূর্ণেন্দু তার কাছ থেকে সেইখানা কোন রকম ক'রে চেয়ে এনে নিজের আভিজাত্য বজায় রাখলে। এটা জানাজানি হ'য়ে সে ধরা পড়ে গেল। রাসমোহন বললে—কি মশায় পরের পয়সায় খুব যে বাবুয়ানী হচ্ছে। অভিনয় কেমন লাগ্‌ল।

পূর্ণেন্দু রেগে বললে—পরের পয়সায় কি রকম?

রাসমোহন বললে—নয় তো কি? আপনি কি আর নিজের গাঁট থেকে খরচ করে যাবার লোক।

পূর্ণেন্দু কথাটা চাপা দেবার চেষ্টায় বললে—আপনার ঘর ভাড়া আর খাই-খরচ তিন মাসের বাকি আছে দিয়ে দেবেন।

রাসমোহন গম্ভীরভাবে বললে- আহা দেবই তো। বলি তোমার সংসার কি অচল হয়েছে না কি।

পরে একটু হেসে বললে আমরা তো টাকা দিয়ে, নিজেরা না খেয়ে তোমার সংসার প্রতিপালন করছি। পকেটকাটারা লোকের পকেট কাটে, আর তুমি কাটছ লোকের পেট—তুমি পেটকাটা—তুমি হচ্ছো তাদের চেয়েও বদমায়েস।

এই কথায় পূর্ণেন্দু রেগে উঠে রাসমোহনকে আক্রমণ করলে। সঙ্গে সঙ্গে তার আর দু'ভাই এসে যোগ দিলে। সকলে এসে ছাড়িয়ে দেওয়ার পর রাসমোহন নালিশ করলে পুলিশে এবং ভিতরের ব্যাপার ওসব বললে পুলিশে।

পুলিশ যখন সরজমীনে তদন্তে এল তখন পূর্ণেন্দুর মুখ শুকিয়ে গেল। সকলকে খোসামোদ করতে লাগ্‌ল এবং খাওয়া-দাওয়া, যত্ন প্রভৃতির মাত্রা বেড়ে গেল। সকলের কাছ থেকে একটা কাগজে লিখিয়ে নিলে যে, এটা মেস এবং সে সকলের নির্ব্বাচিত ম্যানেজার। সকলেই দয়াপরবশ হ'য়ে সই করলে। কেবল সই করলে না অরবিন্দ। তার ওপরও পূর্ণেন্দুর রাগ সম্পূর্ণ। বনবিহারীকে বললে—অরবিন্দ কি কম। কিন্তু পূর্ণেন্দু অরবিন্দের বলিষ্ঠ চেহারা দেখে বোধ হয় কিছু বলতে সাহস করে না। কিছুদিন পূর্ব্বে রজনীকে দু'একটা বেফাঁস কথা বলায় রজনী বেশ দু'একটা উত্তম-মধ্যম দিয়ে দেয়। পূর্ণেন্দু কিছুই করতে পারে নি তার। সেইজন্যে অরবিন্দকেও বোধহয় সে ভয় করে। যাইহোক সেবার সকলে মিলে পূর্ণেন্দুকে বাঁকিয়ে দিলে।

কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হ'ল।

সকলের এই সইয়ের কাগজ হ'ল তার রক্ষা কবচ। সেইটের বলে সে সকলকে আবার উৎপীড়ন করতে লাগ্‌ল। কেউ কিছু বললেই সেই কাগজ দেখিয়ে বলে, যা পারেন করুন, আমায় কিছুই করতে পারবেন না—এই আপনাদের নিজের সই। জানেন মশাই, আমি অনেক লোক দেখ্‌লাম, অনেক লোক কিন্‌লাম, আমায় ঠকাতে পারবেন না। এই লোক চরিয়েই আমি খাচ্চি। নিজের পায় নিজেরা কুড়ুল মেরে সকলকেই বাধ্য হয়ে চুপ করতে হ'ল।

পাছে রাত্রে কেউ পালিয়ে যায় এই ভয়ে পূর্ণেন্দু সদর দরজায় চাবি দিয়ে রাখ্‌তো। এত সাবধানতা সত্ত্বেও একদিন দেখা গেল যে, রাসমোহনের ঘর খালি।

কখন কোন সুযোগে সে পূর্ণেন্দুর সাবধানী চোখকে ফাঁকি দিয়ে কয়েক মাসের ভাড়া এবং খাই খরচের টাকা মেরে পালিয়েছে। সকালে উঠেই পূর্ণেন্দুর নজর পড়্‌ল রাসমোহনের খালি ঘরটার প্রতি। ঘরের শূন্যতা দেখে তার মনটাও শূন্য হয়ে হায় হায় ক'রে উঠ্‌ল। চীৎকার ক'রে চাকরদের ডাকৃতে লাগ্‌ল—ওরে ওরে নকুল' শীগ্‌গির ওপরে আয়।

চাকরেরা ওপরে আস্‌তেই পূর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা কর্‌লে-তোরা জানিস্ কখন রাসমোহন চলে গেছে? তারা বললে—না।

পূর্ণেন্দু চীৎকারে বাড়ী মাথায় করতে লাগ্‌ল। মেসের অন্যান্য সকলে এসে উপস্থিত হ'ল। পূর্ণেন্দু বল্‌তে লাগ্‌ল—দেখেছেন মশাই একবার জচ্চুরী। কতগুলো টাকা ফাঁকি দিয়ে গেল।

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন কে চাপা গলায় বল্‌লে তুমি বারমাস আমাদের কতটাকা ফাঁকি দিচ্ছ, আর রাসমোহন না হয় একবার দিয়েচে তাতে অত উতলা হচ্ছ কেন চাঁদ।

পূর্ণেন্দুর তখন এই সব মন্তব্য শোনবার মত মনের অবস্থা ছিল না। সে বল্‌তে লাগ্‌ল—বাবাকে ভাড়া বুঝিয়ে দিতে হবে, তাঁকেতো বল্‌তে পারবো না যে, টাকা ফাঁকি দিয়েছে। আবার মুদির কাছেও দেনা আছে।

কাশী তাতে চালাক। মধ্যে মধ্যে এসে দেখে যায় কোনঘর খালি, কোনঘর ভর্ত্তি। ভর্ত্তি ঘরের ভাড়া সে বুঝে নেয়। আর মুদির দোকানের দেনার নমুনা পাওয়া যায় মধ্যে মধ্যে মুদি জিনিস দেওয়া বন্ধ করে।

এই দুই অবস্থার মধ্যে প'ড়ে পূর্ণেন্দু ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। অনেকগুলো টাকা। চোখ তার ছল্‌ছলে, মুখ তার কাঁদ কাঁদ। সে হায় হায় করতে করতে মাটিতে ব'সে পড়্‌ল। অন্য সকলে সহানুভূতি দেখান দূরে থাক্ পূর্ণেন্দুর দুঃখ বেশ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে লাগ্‌ল—কেউ-ই তো তার ব্যবহারে সন্তুষ্ট নয়!

প্রাচীন ইরাণের দেবদেবী

শ্রীঅশোকনাথ বেদান্ততীর্থ

গত চৈত্র সংখ্যার পঞ্চপুষ্পে ইরাণের কয়েকজন দেব-দেবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আরও কয়েকজনের পরিচয় দেওয়া গেল।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, ইরাণের অধিকাংশ দেবদেবীই কোন না কোন আধ্যাত্মিক ভাব অথবা সদ্গুণের personification মাত্র। 'দয়েনা' দেবীও ইঁহাদেরই অন্যতম। দয়েনা হিন্দুর 'শ্রদ্ধা'র সহিত তুলনীয়া। গাথায় ইহার নাম না পাওয়া যাইলেও অবেস্তার নবীনাংশমধ্যে ইহার বিবরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। এইরূপ আর একটী personified দেবী—'চিশ্‌তি'র সহিত দয়েনার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রায়ই উভয়ের নাম একত্র জড়িত দেখিতে পাওয়া যায়। চিশ্‌তি জ্ঞানের মূর্ত্তি। প্রসন্না হইলে তিনি দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে একটু লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আচার্য্য জরথুশ্‌ত্রের একটী কন্যার নামও 'পোউরুচিশ্‌তি' (অর্থাৎ পরম জ্ঞান)*।

অবেস্তার আধুনিক অংশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রেতাত্মাদিগের শুভাশুভ কর্ম্মের বিচারভার পড়িয়াছে স্রওষের উপর, আর কার্য্যে তাঁহার সহকারী দুইজন —"রশ্নু" (ন্যায়বান্) ও "মিথ্র" (মিত্র)। সূক্ষ্ম-শরীর

---

* আমাদের মনে হয় আচার্য্যের পুত্রকন্যা সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, সে সবই রূপকমাত্র।

এই স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিবার পর চতুর্থদিনে * "চিন্বৎ" সেতু + পার হইয়া বিচারকগণের সম্মুখীন হয়। ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থলে অবস্থিত এই সেতু অতিক্রম করিবার পরই পাপী ও পুণ্যবান্‌দিগকে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়। তাহার পর বিচারান্তে যাঁহার যেরূপ সুকৃত বা দুষ্কৃত, তদনুসারে অল্লাধিক সুখ বা দুঃখভোগের জন্য আদেশ হইয়া থাকে।

এই দুইজন বিচারকের মধ্যে রশ্নুকে বলা হয় রজিশ্‌ত বা পরম ন্যায়বান্। অধার্ম্মিকগণ ইঁহার ভয়ে সর্ব্বদা কম্পমান। স্রওষের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সম্পর্কে একটী নিগূঢ় কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। স্রওষ হইতেছেন ঋতের মূর্ত্তি। ঋতের অপ্রতিহত প্রভাবে—অহরের পক্ষপাতশূন্য বিচারে দেহীর সুকৃত ও দুষ্কৃত তুলাদণ্ডে নিপুণভাবে নিরূপিত হইয়া যথোপযুক্ত সুখ বা দুঃখময় ফল প্রদান —ইহাই হইতেছে মূলতঃ প্রতিপাদ্য। স্রওষের উপর বিচারভার প্রদান ইহারই রূপকমাত্র। এই বিচারের সময় পার্থিব আবরণ যত কিছু থাকিতে পারে, সকলই প্রেতের দেহ হইতে আপনি খসিয়া পড়ে। তাহার সমান চিনিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব বা ভ্রম হয় না। আর তখন তাহার অনুগামী হইতে একমাত্র কৃতকর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাহার সপক্ষে বা বিপক্ষে তাহারাই সাক্ষ্য দিয়া থাকে। আত্মা মনুষ্যলোকে শরীর ধারণ করিবার পূর্ব্বে নিজের মনোমত পথ বাছিয়া লইবার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়া থাকে §; কিন্তু কোন পথ একবার অবলম্বন করিলে আর উহা কিছুতেই পরিত্যাগ করা যায় না। তখন তাহারই ফলভোগ করিতে হয়। অবেস্তার একস্থানে ‡ একটী অতি সুন্দর বর্ণনা আছে, যেন একটী নারীমূর্ত্তি—মূর্ত্তিমতী কৃতকর্ম্মসমষ্টি *—সেতুর উপর ঠিক মধ্যপথে আসিয়া প্রেতকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিচারকগণের সম্মুখে লইয়া যাইতেছেন। বলাবাহুল্য, ইহা কৃতকর্ম্মানুসারে ফলভোগের রূপকমাত্র।

রশ্নুর সহিত বিচারক হিসাবে মিথ্রের খুব নিকট সম্পর্ক। মিথ্র আর্য্যগণের আলোকদাতা দেবগণের অন্যতম। বেদে ইহার নাম মিত্র, অসুর বরুণের ইনি সহচর। বেদে শিক্ষার্থিগণের নিকট "মিত্রাবরুণৌ" এই দেবতাদ্বন্দ্বটী সুপরিচিত। ইরাণেও মিথ্রকে আর একটী সৌর দেবতা 'হ্বরে-ক্ষএত'-এর সহিত একযোগে আহূত হইতে দেখা যায়। জোরোয়াষ্ট্রিয়গণের দৈনিক প্রাতঃসন্ধ্যার মন্ত্রেও এই দেবযুগলের স্তুতি করিতে হয়। অবেস্তার একটী অতি দীর্ঘ যশ্‌ত + (স্তোত্র) মিথ্রের স্তুতিতেই পর্য্যবসিত। আলোকদাতা (গোমান্—গো =কিরণ), প্রাণাধিপতি [অসুর—অসু (=প্রাণ)+র (=দাতা)—প্রাণদাতা] মিথ্র অন্ধকারের নাশক। এই অন্ধকার বলিতে অবশ্য আধিভৌতিক জগতের তমঃ ও আধ্যাত্মিক অজ্ঞানান্ধকার বা মায়াকে বুঝায়। তাই জ্যোতিষ্মান্ মিথ্র সত্যের প্রকাশক। এদিকে আবার মিথ্র ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতীক; ইহজগতের বিচারালয়ের তিনিই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আর ন্যায় বিচারের অধিপতি বলিয়া মিথ্রের নামে আইনের চুক্তি করা হইয়া থাকে। ‡ এসিয়ামাইনরের বোঘাজ্‌কোই অঞ্চলে যে সকল ইষ্টকলিপি পাওয়া গিয়াছে, § তাহা হইতে বুঝা যায় যে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৪০০-১৫০০ অব্দে ইণ্ডো-ইরাণীয় ‡‡ সভ্যতার ঢেউ এসিয়ামাইনরের সুদূর পশ্চিমপ্রান্তেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। হিটাইট্‌গণের রাজা সুব্বিলুলিউমা ও

---

* হিন্দুশাস্ত্রের মতে অশৌচকাল মধ্যে (১০ দিন, ১২ দিন, ১৫ দিন বা একমাস) প্রেতের গতি হয় না। পূরকপিণ্ডদানের পর আতিবাহিক দেহ লাভ হইলে পরলোকে গতি হয়।

\+ যমদ্বারে অবস্থিতা ভগ্না বৈতরিণী নদীর উপর কোন সেতু নাই বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রের বর্ণনা। কৃষ্ণা গাভীর সাহায্যে উহা পার হইতে হয়।

§ এইজন্য ইহার নাম 'উরবান্' বা বরণকারী (chooser)।

‡ যশ্‌ত—২২।

* সুকৃতকারীর নিকট এই রমণী সুন্দরীরূপে ও পাপীর নিকট ইনি কুৎসিতারূপে দর্শন দিয়া থাকেন।

\+ যশ্‌ত—১০।

‡ মিথ্র শব্দের অর্থই চুক্তি।

§ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে হিউগো উইন্‌ক্লার উহা আবিষ্কার করেন।

‡‡ কেহ কেহ ইহাতে কেবল বৈদিক সভ্যতার প্রভাবই দেখিতে পান। Winternitz. Hist. of Indian Lit. Vol. I দ্রষ্টব্য।

মিতানির রাজা মত্তিউজার মধ্যে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহাতে ব্যাবিলনীয় ও হিটাইট্‌গণের অন্যান্য দেবদেবীর সহিত মিত্র (মি-ইত্‌-র), বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য-দ্বয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী আখামিনীয় যুগে মিত্র পূজার একটী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল; এবং ক্রমশ এই মিত্রপূজা গ্রীস্‌ ও রোমেও বিস্তার লাভ করে। সমগ্র ইউরোপে, এমন কি সুদূর ইংলণ্ডেও মিত্রদেবের বহু মন্দির পাওয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হইবার সময়ে এই সুপ্রাচীন আর্য্যদেবতাটীর উপাসনা এতই প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, নবপ্রবর্ত্তিত খ্রীষ্টধর্ম্মে ইহার প্রভাবের ছায়া অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্য্যগণের আর একটী সুপ্রাচীন দেবতা অবেস্তার যুগে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহার নাম 'বেরেথ্রঘ্ন' (=বৈদিক বৃত্রঘ্ন)। হিন্দুদিগের শাস্ত্রে দেবরাজ ইন্দ্রই বৃত্রের নিহন্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; কিন্তু ইরাণীয় শাস্ত্রে ইন্দ্রকে দেবতা বলিয়াই ধরা হয় নাই। অবেস্তায় বেরেথ্রঘ্ন ও ইন্দ্রকে পৃথক্‌ করিয়াই ধরা হইয়াছে। বেরেথ্রঘ্ন একজন শ্রেষ্ঠ দেবতা; কিন্তু 'ইন্দ্র' একজন মহাপরাক্রান্ত দানব—'অংগ্রিমন্যু' ব্যতীত তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই। সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ যশ্‌ত পাঠ করিতে করিতে অনেক সময় বৈদিক ইন্দ্রসূক্তগুলির কথা মনে পড়ে। এই সূক্তটীর রচনা এত সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী যে, মনে হয় যেন আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই দেবাসুরযুদ্ধ সংঘটিত হইতেছে—যেন সে যুদ্ধের সংঘর্ষধ্বনি কাণে আসিয়া পৌঁছায়। বেরেথ্রঘ্ন বিজয়ের অধিপতি। তাই উভয় পক্ষীয় বিজিগীষু নরপতিগণ যুদ্ধের আগে বেরেথ্রঘ্নের উপাসনা করিয়া থাকেন। বেরেথ্রঘ্ন কামরূপী। উপরি-উক্ত সূক্তে তাঁহার দশবিধ বিভিন্নরূপের বর্ণনা দেওয়া আছে। উহাদের মধ্যে কয়েকটী আবার পশুর মূর্ত্তি।

প্রাচীন ইন্দোইরানীয় দেবগণের মধ্যে তিনটী জ্যোতিষ্করূপী দেবতার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরের যুগেও ইহারা পূজা হইতে বঞ্চিত হন নাই। এই তিনটীর নাম যথাক্রমে 'হ্বরে-ক্ষএত' বা সূর্য্য, 'মাওঙহ' (মাসা) বা চন্দ্র এবং 'উষহ্‌' বা উষা। ইহাদের মধ্যে প্রথমটীর সহিত মিথ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইনি বৈদিক সবিতার স্থানীয়। পরের যুগে ইহার নাম হইয়াছে—'খুর্‌শীদ'। বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইনি অমর জ্যোতির্ম্ময়, ও দ্রুতগামী অশ্ববিশিষ্ট। অহুরের ইনি চক্ষুঃস্বরূপ। তাঁহার উদ্দেশে রচিত স্তোত্র দুইটীতে * অবেস্তার অতুল কাব্য-সম্পদের কিছু আভাষ পাওয়া যায়। আধিদৈবিক সূর্য্যের উপাসনার ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক পরম জ্যোতির সন্ধানলাভ কিরূপে করা যায়, তাহাই স্তোত্র দুইটীর মূল প্রতিপাদ্য। আমাদের পুরাণেও আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণের উল্লেখ ও উপনিষদের আদিত্যান্তর্গত হিরণ্ময়পুরুষের বর্ণনা ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে।

মাওঙহ্‌ জীবরাজ্যের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। এদিক্‌ হইতে জীবজগতের অধিপতি বোহুমনোর সহিত ইহার খুব নিকট সম্পর্ক। ইনি পুরুষ দেবতা। ইহারই সহধর্ম্মিনী হইতেছেন দেবী 'দ্রবাস্প'। প্রাণিগণের সুখস্বাস্থ্য ইহারই হস্তে †।

অবেস্তায় উষহের উল্লেখ খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক উষসের উদ্দেশে যেমন বহু মন্ত্র রচিত হইয়াছে, উষহের উদ্দেশে সেরূপ বহু স্তুতি নাই। মাত্র একটী সূক্তে ইহার স্তুতি করা হইয়াছে। সে স্তোত্রটীও আবার অতি ক্ষুদ্র; তবে কাব্য-সৌন্দর্য্যে ও চিন্তার মহিমায় উহা একরূপ অতুলনীয়। দেবী উষ্‌হ আবার কোন কোন স্থলে পুংস্ত্বভাব প্রাপ্ত হইয়া 'উষহিন'-রূপে পরিণত হইয়াছেন ‡।

অপরাপর জ্যোতিষ্করূপী দেবগণের মধ্যে 'তিশ্‌ত্র্যা' বা 'ধ্বা' নক্ষত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। বৃষ্টির সহিত ইহার সম্পর্ক খুব নিকট। সপ্তম যশ্‌তে ইহার স্তুতি করা হইয়াছে। অনাবৃষ্টিকারক 'অপওশ' দানবের সহিত ইহার যুদ্ধ ও পরিশেষে ইহার বিজয়লাভ, বৈদিক ইন্দ্র-বৃত্রসংগ্রামের সহিত তুলিত হইতে পারে।

---

* নিয়াযিশ্‌—১, ও যশ্‌ত—৬।

† মাসের মধ্যে যে কয়দিন বোহুমনো, মাওঙহ, দ্রবাস্প (গোশ্‌) ও রামন্‌ (বায়ু) এর উদ্দেশে পৃথক্‌ রাখা হয়, সে কয়দিন ধর্ম্মপ্রাণ, পারসীগণ মাংসাহার করেন না।

‡ গাহ—৫।

অন্যান্য মহাভূতগুলির মধ্যে অপ, মরুৎ ও ক্ষিতিকে অবেস্তায় দেবত্ব প্রদান করা হইয়াছে। আথাম্নিনীয় যুগে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবী 'অরদ্‌বিসূর অনাহিত' অহুর মজ্‌দ ও মিথ্রের ন্যায় ইরাণের রাজশক্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পরিপালকরূপে কল্পিত হইয়াছিলেন। অনাহিতের পূজা-পদ্ধতি নানাদেশে প্রসারলাভ করিয়াছিল। এক কথায় ইহাকে মিথ্রের সহধর্ম্মিনী বলা যাইতে পারে। পঞ্চম যশ্‌ত ইঁহারই উদ্দেশে রচিত। তথায় আমরা দেখিতে পাই যে, অনাহিত সুন্দরী মহিমময়ী কুমারী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা। ইরাণের শ্রেষ্ঠ বীরগণ তাঁহার অর্চ্চনায় রত, এবং তিনিও তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিতেছেন। পারস্যে তাঁহার মূর্ত্তিও পূজিত হইত বলিয়া গ্রীক্ লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। আর্টাক্সারাক্সেস্ স্পেমোন তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত যশ্‌তের বর্ণনা হুবহু মিলিয়া যায়।

'রামন্' (বায়ু) মরুদ্‌গণের অধিপতি। স্বয়ং অহুরের সম্বন্ধে যে সকল বিশেষণ অবেস্তায় দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই বায়ুর সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইয়াছে। বৈদিক সূক্তেও এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। তাঁহার উদ্দেশে রচিত পঞ্চদশ সংখ্যক যশ্‌তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বয়ং অহুরও তাহার অনুগ্রহপ্রার্থী। ইরাণের রাজমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা ধার্ম্মিক, রামন্ তাঁহাদের সহায়; আর যাঁহারা ধর্ম্মদ্বেষী, রামন্ তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন না।

ভূতধাত্রী ধরিত্রী অবেস্তায় 'জাম' নামে অভিহিত হইয়াছেন। 'জাম যশ্‌ত' (১৯) মধ্যে সমুদ্রমেখলা উর্ব্বীর আধিপত্য সম্বন্ধে ইরাণের রাজবংশের একটী ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এই রাজশ্রী ইরাণের রাজর্ষিগণ অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন: যিনি রাজশক্তিপরিচালনার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন, দেবী ধরণী কেবল তাঁহাকেই ভজনা করিতেন না। অন্যথা একের মৃত্যুর পর অপরে উত্তরাধিকারসূত্রে এই আধিপত্যলাভ করিতেন। অতএব এই যশ্‌তটীকে ইরাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরবর্ত্তী যুগের সুপ্রসিদ্ধ পারসীককাব্য 'শাহ্-নামেহ্' গ্রন্থে বর্ণিত ইরাণের 'প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকগণে'র* ইতিহাসের সহিত অবেস্তার বিবরণ একেবারে হুবহু মিলিয়া যায়।

---

* প্রাচীন ইরাণের আদি আর্য্যবংশের নাম—'পেশ্‌দাদী' অথবা প্রথম ধর্ম্মপ্রযোজক (First Lawgivers)।

রামেশ্বর দাসের 'হাটের প্রবন্ধ'

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

নরোত্তম দাসের 'হাটপত্তন,' বলরাম দাসের 'হাট-বন্দনা'-জাতীয় একখানি অতিক্ষুদ্র হস্তলিখিত পুঁথি আমার নিকটে আছে। পত্র সংখ্যা মাত্র দুই, তবে উভয় পৃষ্ঠে লেখা। ইহার রচয়িতা রামেশ্বর দাস, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও ইহার কোনও পরিচয় জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, ইনি নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীনিবাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন, অতএব সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না। পত্র দুইখানির বামভাগ ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে, অচিরেই সেই দিক্ অপাঠ্য হইয়া উঠিবে এই আশঙ্কায় এই অপ্রকাশিত পুঁথিখানি ছাপিয়া রাখিতেছি।

পুষ্পিকায় লিপিকরের নাম বা নকলের তারিখ নাই, কিন্তু লিপিকরের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা প্রয়োজন। ব ও র' এর প্রভেদ, ব' এর তলে একটী হেলানিয়া রেখা, র' এর তলে একটী ফোঁটা। ল ন' এর মত, এবং ণ্ণ ত্ত' র' ঠ ন্ঠ' র, ও ন্ত ন্ড' র মত। ট' র মাত্রা বাঁকা। চ একটী দণ্ডায়মান ডিম্বাকৃতি, সরু দিকটী

মাথার দিকে, একটী মাত্রার সহিত সংযুক্ত। ঈ' কারের যে অংশ মাত্রার উপরে থাকে, সেই অংশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এত অস্পষ্ট ও ক্ষুদ্র যে ঈ'কার ও আ'কারে তফাৎ ধরা কঠিন। ং অক্ষরের মাথার দক্ষিণভাগে একটী শূন্য বসাইয়া নিষ্পন্ন।

ওঁ শ্রীহরি :—

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন জাহাতে প্রচার॥
কলি ঘোর পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময়।
পূর্ণ শশধর ভেল চৈতন্য তাহায়॥
পূর্ন্ন কুম্ভ নিত্যানন্দ অবধূত রায়।
তৃষ্ণা ভরি কৈল পান অদ্বৈত তাহায়॥
অঞ্জলি ২ খান আর যত জন।
প্রেমদাতা নিত্যাই চান্দ পতিত-পাবন॥
প্রেমের ভাণ্ডারি তাঁহে ঠাকুর নিতাই।
সর্ব্বজীবে সম দয়া ভিন্ন ভেদ নাঞি॥
প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্য গোসাঞি।
নদী নানা সভে আসি হৈলা এক ঠাঞি॥
পরিপূর্ন্ন ভেল বহে প্রেমামৃত ধারা।
হরিদাস পাতিল তাহে নাম নৌকাপারা॥
সংকীর্ত্তন ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাঢ়িল।
ভকত মকর তাহে ডুবিয়া রহিল॥
তৃণরূপি ভাসে তাহে পাষণ্ডির গণ।
ফাফর হইঞা তারা ভাবে মনে মন॥
হরিনাম নৌকা করি নিতাই সাজিল।
দাণ্ডি হঞা হরিদাস বাহিঞা চলিল॥
প্রেমের পাথরে নৌকা ছাড়ি দিল জবে।
কুল পাব বোলি কেহো নৌকা ধরে লোভে॥
নিন্দুর তার্কিক যত পা···তে পড়িল।
সমন নগরে তারা গমন করিল॥
চৈতন্যের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন।
হাটের পত্তন নিত্যাই রচিল তখন॥
ঘাটের উপরে থানা হাট বসাইল।
পাষণ্ডি দলন বালা (?) নিশান পুতিল॥
চারিদিগে চারি রস কুঠরি করিঞা।
হরিনাম দিল তার চৌদিগ বেঢ়িঞা॥
চৌকিদার হরিদাস ফুকারে ঘন ঘন।
হাটে বস্তা বেচ কেন জার জেই মন॥
হাটে বসি রাজা হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ।
মুচ্ছদ্দি হৈইল তাহে মুরারি মুকুন্দ॥
পশারি চৈতন্য ভেল ভাণ্ডারি গদাধর।
অদ্বৈত মুনসি ভেল পরথাই দামোদর॥
প্রেমের ভাণ্ডারি ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হা'ট ফিরে লইঞা গাগরি॥
আর যত ভক্ত আইসে মণ্ডলি করিঞা।
হাট মধ্যে বৈসে সভে সদাগর হঞা॥
দাণ্ডিধর গৌরিদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
তে'ল করি ফিরে প্রেম জার যত দূর॥
শ্রীবাস শিবানন্দ লিখেন দুইজন।
এই মত প্রেম সিন্ধু হাটের পত্তন॥
সংকীর্ত্তনরূপি মদ হাটে বিকাইল।
রাজ আজ্ঞা সিরে ধরি সভে পান কৈল॥
পান করি মত্ত সভে হইলা বিভোর।
চৈতন্য নিত্যাইর হাটে হরি হরি বোল॥
দীনহীন দুরাচার কিছুই না মানে।
ব্রহ্মার দুল্লর্ভ প্রেম দিল জনে জনে॥
এই মত গৌড় দেশে হাট বসাইঞা।
নীলাচলে কৈলা বাস সন্যাস করিঞা॥
তাঁহা জাঞা কৈলা প্রভু মহিমা প্রচুর।
সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দম্ভ কৈলা চুর॥
প্রতাপরুদ্রের কৃপা কৈলা গৌর-হরি।
রামানন্দ সঙ্গে দেখা তীর্থ গোদাবরি॥
হাট করি লেখা জোখা সুমার করিঞা।
রামানন্দ কণ্ঠে থুইল গোলক পুরিঞা॥
শ্রীসনাতনরূপ জবে আসিঞা মিলিল।
গোলক সুমারিরূপ মোহর করিল॥
মোহর লইঞা তিহোঁ করিল গমন।
চৈতন্য পাঠাইল তারে শ্রীবৃন্দাবন॥

তাহা ভাঙ্গা কৈলরূপ টাকসাল পত্তন।
কারিগর আইল যত শ্রীরূপের গণ ॥
কারিগরগণ যত অলঙ্কার কৈল।
ঠাকুর বৈষ্ণব তাহা হৃদয়ে করিল ॥
গলিত কাঞ্চন ভেল রস পরকিয়া।
সোহাগা মিশ্রিত ভেল প্রকাশ নদীয়া ॥
এই মত অলঙ্কার যত যত ছিল।
বহুমূল্য অলঙ্কার বহুত গঠিল ॥
পাঞা করিঞা শ্রীরূপ গোসাঞি থুইল।
শ্রীজীব গোসাঞি তাহা গঠন করিল ॥
থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ হৈল।
সদাগরগণে বহু বিতরণ কৈল ॥
নরোত্তম ঠাকুর ঠাকুর শ্রীনিবাস।
অলঙ্কার বানাইঞা করিল প্রকাশ ॥
ঠাকুর বৈষ্ণব বিনু অন্য নাহি জানে।
লোভেতে লইল কেহো করিঞা যতনে ॥
শ্রীগুরুপ্রসাদে ইহা মিলয়ে সর্ব্বথা।
সংক্ষেপে করিল কিছু ভজনের কথা ॥
প্রেমের বাট প্রেমের ঘাট প্রেমের তরঙ্গ।
প্রেমাধিন গৌরচন্দ্র পূর্ব্বলীলা রঙ্গ ॥
প্রেমের সায়রে হংস শ্রীরূপ গোসাঞি ভেল।
নিরখিব রত্নমনি প্রথ (?) করিল ॥
মুঞি কোন খুদ্র জীব অতি দুরাচার—
কি জানি চৈতন্য লীলা সমুদ্র পাথার ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ হিয়া মাঝে ধরি।
চৈতনের হাটে নিত্য করি ঝাড়ুদারি ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রেমপরবন্ধ।
দাস রামেশ্বর কহে হাটের প্রবন্ধ ॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোসামিনে নমঃ।

কবিকর্ণের পালা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা পত্তসাহিত্যের বয়স নাকি হাজার বৎসর—পুরাতত্ত্ববিদেরা গণিয়া স্থির করিয়াছেন। কবিও অগণিত জন্মিয়াছেন, কিন্তু সেই যে কৃত্তিবাস, কাশীদাস ও মুকুন্দরাম আমাদের জুড়িয়া রহিলেন—সে সিংহাসন হইতে আর তাঁদের—কেহই নড়াইতে পারিল না। অথচ কাব্য হিসাবে, বই তিন খানির স্থান অনেক নীচেই, সমালোচকেরা সাব্যস্ত করিবেন। জয়দেব, ভারতচন্দ্র অনেক উঁচুদরের কবি কিন্তু কৃত্তিবাস, কাশীরাম ও মুকুন্দরামের রচনার সেই সরল স্বাভাবিকতা,উদার অনাড়ম্বরতা, আমরা জয়দেবের, ভারতচন্দ্রের লেখায় দেখিতে পাই না। তাঁরা আমাদের বাহবা পাইবার যোগ্য, কিন্তু হৃদয়তন্ত্রী সে তালে ঝনিয়া উঠে না। আমাদের আলোচ্য কবিকর্ণের পালাগুলির যা কিছু মূল্য বা কিছু মাধুর্য্য তা ওই দিক্ দিয়াই। ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁকেও সমৃদ্ধ করিয়াছিল কিন্তু লেখনী তিনি ধারণ করেন নাই কবিদের কাব্যসুধা পান করাইতে। নিজের প্রতিবেশী, সরল-বিশ্বাসী নিরক্ষর গ্রামবাসীদের জন্য তিনি পালা রচনা করিয়াছিলেন। তাই যদিও রসগ্রাহী তাঁকে মর্য্যাদা দেখান নাই—তবু উৎকলপল্লীর প্রতি বারোয়ারী আঙিনায়,চণ্ডীমণ্ডপে,দালানে তাঁর পালা এখনও পঠিত বা অভিনীত হইয়া থাকে। কৃষক সমস্তদিনের পরিশ্রমের পর ছুটিয়া আসে, বৃদ্ধ সংসারের দুঃসহ দাবদাহ এড়াইবার উদ্দেশ্যে নাতি-নাত্‌নীকে লইয়া সমাগত হয়, মুদীরাও লোকঠকানর দুস্তর পাপরাশী শ্রবণের ছলে লাঘব করিয়া লয়! অক্ষয়রসনিস্যন্দী এই পালাগুলি বার বার শ্রবণের ফলেও মধুরতা হারায় না। গৃহের দিদিমারা ও ঠাকুমা প্রতি সংক্রান্তিতে পালা শ্রবণে আনন্দ লাভ করেন।

আত্মহারা শ্রোতাদের উপর পৌষ রজনী পোহাইয়া আসে। উৎসবে, আমোদে, পূজাপার্ব্বণে বিবাহাদি শুভ কার্য্যে—পালাগুলি অত্যাজ্য সঙ্গী। আজ আমরা পালাগুলি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পালাগুলির রচয়িতার নাম বোধহয় শঙ্করাচার্য্য। তাঁহার ছদ্মনাম কবিকর্ণ। এই দুই নামই পালাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। ১৬টী পালায় ১৬টী গল্প আছে। শেষটীতে তিনি সমস্ত পালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। পালার উপাস্য দেবতা সত্যপীর বা পীরপয়গম্বর। তিনি একাকারে রাম, রহমন, জগন্নাথ। স্থানে স্থানে তাঁহাকে খোদা, নিরাকার প্রভু ও সত্যনারায়ণ নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। সত্যপীর, নানা উপায়ে নিজ প্রভাব জগতে বিস্তার করিলেন ও নানাস্থানে নানা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা নিজ পূজা গ্রহণ করাইয়া, জগতে আপনার পূজার বিস্তার করিলেন, ইহাই হইল ষোলটী পালার প্রতিপাদ্য বিষয়। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণের যে বৃত্তান্ত ও যে চারিটী গল্প প্রায় মৌলিক হইলেও, পালাকারীরা মূল বৃত্তান্তের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। পুরাণে, নারদ মর্ত্তলোকের দুঃখ দেখিয়া ইহার প্রতিকারার্থ বিষ্ণুকে কোন উপায় জিজ্ঞাসা করিলে বিষ্ণু সত্যনারায়ণের দৃশ্যই দুঃখনাশের উপায়, এই কথা বলেন ও তৎসঙ্গে নারদকে সত্যনারায়ণের চারিটী গল্প বলেন। পালায় কিন্তু প্রায় প্রতি গল্প নিজে সত্যপীর একটীর পর একটী স্থানে নিজ পূজার বিস্তার করিতেছেন। পুরাণের বিষ্ণু এখানে বক্তা নহেন। তবে যদিও পুরাণের সত্যনারায়ণ পালায় হইয়াছেন সত্যপীর, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন ফকির, তাহা হইলেও শ্রোতামহলে সুপরিচিত পুরাণের নারদ মহর্ষিকে পালাকারক এড়াইতে পারেন নাই। অন্যান্য স্থানেও পুরাণোক্ত গল্পের ছায়া পাওয়া যায়। এক কথায় ইহা মুসলমানী রাজত্বের ছায়ায় বসিয়া নূতন করিয়া লেখা পুরা-ধর্ম্ম-কাহিনী!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শেষ পালার প্রত্যেক গল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে। এইরূপ একটী বিবরণে রাজা গজেন্দ্র বেচারার দুর্দ্দশা দেখুন। ইহাতে আপনারা পালার বৃত্তান্তগুলির ধারা মোটামুটীভাবে বুঝিতে পারিবেন।

> গজেন্দ্র রাজাকে দয়া আপনি করিল।
> পুত্রবর দিয়া তবে শিরিনী মানাল॥
> পুত্র পায়ে মহারাজা পূজা নাহি করে।
> ষষ্ঠি দিন রাত্রে তবে রাজপুত্র মরে॥
> রাজা রাণী দুইজনে ক্রন্দন করিল।
> স্বর্ণ সিন্দুকেতে ভরি শ্মশানে পুতিল॥
> করামত জাহির করিতে নারায়ণ।
> শ্মশানেতে গিয়া তবে বাঁচায় নন্দন॥
> রাজাকে সে পুত্র দিয়া বলেন ফকির।
> ঘরে গিয়া পূজ তুমি দেব সত্যপীর॥
>
> (৩য় পালা)

কখন সত্যপীর ঠাকুর রাজপুত্রের বিয়ের জন্য সুন্দরী কন্যার ঘটকালী করিয়া পূজা পাইতেছেন (৪), কখন বা রাজা ও উজিরের পুত্রকে নিধন করিয়া আপনার 'করামত জাহির' করিতেছেন (১) কখনও বা শ্বশুরের নিকট হইতে পূজা না পাইয়া কনিষ্ঠা বধূর নিকট হইতে পূজা লইতেছেন ও পরে শ্বশুরকে বহু কষ্ট দিয়া তাহার নিকট হইতেও পূজা আদায় করিতেছেন (৯)। সত্যপীর ঠাকুর বেশ ধূর্ত্ত। তিনি সাধারণের মধ্যে পূজার প্রচার না করিয়া রাজা, বাদসা ও ধনীব্যক্তিদের মধ্যে স্ব-প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন। ঠাকুর এটুকু জানিতেন যে রাজা, বাদসা-উজির প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহার প্রচার হইলে অতিশীঘ্রই সাধারণের মধ্যে তাঁর পূজা বিস্তার হইবে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, পালার উপাস্য দেবতা পরমেশ্বর বা খোদা হইলে তিনি অনেকগুলি মনুষ্যোচিত দোষ-দুষ্ট। তাঁর রাগ কম নহে; গল্পের সাধুর সন্তান সত্যপীরকে না স্বীকার করায় সত্যপীর তাহাকে দ্বাদশ বৎসর কারাগারে আবদ্ধ করাইয়া রাখিলেন (৬) ও এক বণিক্ পূজা বলিয়া যাওয়ায় —তিনি সেইরূপ ধারণ করিয়া বিবাহ রাত্রিতে বণিকের কন্যার স্বামীকে দংশন করিলেন (১২)। পালার সত্যপীর ঠাকুর সর্ব্বশক্তিমান কিন্তু তিনি ভক্তের ঠাকুর বা কাঙালের ঠাকুর নহেন। তিনি কূট বুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া বা ধমকাইয়া পূজা লইতে চান। কিন্তু সত্যপীররূপী ভগবানও খোদার এইরূপ বর্ণনার জন্য পালাকার দায়ী নহেন।

এক্ষেত্রে তিনি পুরাণোক্ত সত্যনারায়ণ যিনি মনুষ্যের দুঃখ তাপ-নাশের একমাত্র কারণ তাঁরও রাগ কম নহে। স্কন্দ পুরাণের লীলাবতী উপাখ্যানে আমরা দেখি যে, বণিক্ সত্যনারায়ণের পূজা বিস্মৃত হওয়ায় সত্যনারায়ণ তাঁর সমস্ত ধন দস্যুদ্বারা অপহৃত করাইলেন ও তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ করাইলেন। কেবল ইহাই নহে, বেচারী লীলাবতী বহু বৎসরান্তে স্বামীর আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সত্যনারায়ণকে কিছু প্রসাদ অভুক্ত রাখিয়াই সমুদ্রতীরে দৌড়িয়া গেলেন। এই সামান্য অপরাধে সত্যনারায়ণদেব যাহা করিলেন তাহা শুনুন :—

ইতি মাতৃবচঃশ্রুত্বা ব্রতং কৃত্বা সমাপ্য চ
প্রসাদং সংপরিত্যজ্য গতা সা চ পতিং প্রতি ॥
তেন রুষ্টো সত্যদেবো ভর্ত্তারং তরণীং তথা।
সংহৃত্য চ ধনৈঃ সার্দ্ধং জলে তস্মিন্ সমর্পয়ৎ ॥

সুতরাং দেখুন কেবল ব্রত করিলেই নিস্তার পাওয়া গেল, এমন নয়। প্রসাদ ফেলিলেও বিপদ। বেচারা লীলাবতীর অজ্ঞানকৃত এই দোষে সত্যদেব ধন ও স্বামীর সহিত তরণীকে ডুবাইলেন। সত্যনারায়ণ ঠাকুর যখন এমন সত্যপীর ঠাকুরকেই বা কেন দোষ দিই।

পালায় চৈতন্যদেবের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। একটী পালার নায়ক হইতেছেন ঔরঙ্গ বাদসা। ইহাতে মনে হয় যে পালাগুলি মোগল-রাজত্বের অবনতির যুগে রচিত হইয়াছিল। রামেশ্বরী পালার ন্যায় উর্দ্দূবহুল না হইলেও কবিকর্ণের পালায় বহু উর্দ্দূশব্দের সুদক্ষপ্রয়োগ পাওয়া যায়। কবিকর্ণ গ্রাম্য কবি। গ্রাম্য সুলভ সরলতা, অনাড়ম্বরতাই তাঁর রচনায় সুস্ফুট, মহাকবিদের উচ্চাদরের উপমার, ছন্দবিন্যাস বা অলঙ্কারের পারিপাট্য পালাগুলিতে দাবী করা অন্যায়। ষোলটী পালায় কবির জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পালাকার শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন এবং ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন প্রভৃতি রামায়ণ-মহাভারতের গল্প হইতে ভূরি ভূরি মনোরম উপমা প্রদান করিয়াছেন। সাধারণ গৃহস্থালীর বহু বিষয়ও তাঁর পালা হইতে পাওয়া যায়। মোটকথা, আমাদের পালাকারকে উৎকলের মুকুন্দরাম বলা চলে।

হিন্দু ও মুসলমানের ঈশ্বর যে এক, এই কথাটী পালাকার বিশেষ জোর দিয়া বলতে চান। তাঁর সত্যপীর হিন্দু ও মুসলমান দুইয়েরই নিকট হইতে পূজা আদায় করিতেছেন। পালার মধ্যে বহু উচ্চ ভাবের উক্তি পাওয়া যায়। ১ম পালায় পীর বলিতেছেন :—

জগন্নাথরূপে আমি উড়িষ্যাতে আর।
হিন্দুমুসলমান সব করি একাকার ॥
আমি পির দেবতা অলেখ নিরাকার।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল করণ আমার ॥
ফকির হইয়া আমি বুলিব সংসারে।
করাতাম করাইব জমিন উপরে ॥
রাম রহমন এক পুরাণ কুরাণে।
দেখিব কেমনে লোক মানে কি না মানে ॥

মনে হয় যেন হুসেনী যুগের কথা। হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মরই মূলভিত্তি এক—কারণ দুধর্ম্মেরই উপাস্য-দেবতা ঈশ্বর—এই যে সামঞ্জস্যের ভাব, ইহাই পালাকারের মনে ওতপ্রোত ছিল। এই সমন্বয় মনোভাব উৎকলে ধর্ম্মবিদ্বেষ হ্রাস করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে পাশাপাশি দুই ধর্ম্মাবলম্বীকে বাস করিতে হইবে সে দেশে জনসাধারণের সাহিত্যে এরূপ উক্তির যে কি প্রয়োজনীয়তা তাহা আর বলিতে হইবে না। তৃতীয় পালায় সত্যপীরের পূজা করিতে অস্বীকৃত রাজা ও ফকিরের কথোপকথন শ্রবণ করুন :—

'ভাগবত ছাড়ি ফকির পড়িব কুরান,
হিন্দু হৈয়া মুখে নিব মুসলমান নাম ?
ফকির বলেন বাবা কহিরে তুমারে
করহ কাহারে পূজা দুনিয়া ভিতরে ? ॥
রাজা বলে ত্রৈলোক্য ঈশ্বর নারায়ণ
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে করিয়ে ভজন ॥
ফকির বলেন তুহা শুন সাবধানে
সেরূপ তুমার কৃষ্ণ হৈল বৃন্দাবনে ॥
রাম রহমান দুই এক করি লেখ।
আসিলে গোবিন্দরূপ চক্ষু ভরি দেখ ॥

সত্যপীর কেবল হিন্দুরাজাকে হিন্দুর ঈশ্বর ও মুসলমানের ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দেন নি, মুসলমান

পাদ্‌সাকেও এ-সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন। অন্ত এক পালার উক্তি শুনুন :—

পাদ্‌সা বলেন বাবা ফকির ঠাকুর
কেমনেতে নারায়ণ শিরিনী দস্তর ॥
মুসলমান ভিতরেতে ইষ্ট যে খোদায়
ইস্‌কি শিরিনী দিতে কার্য্যসিদ্ধি হয় ॥
ফকির বলেন বাবা মত্‌ কহ এবা
এক নিরাকার প্রভু একই ভরসা"।

কবি কর্ণ এইরূপ বহুস্থানে 'নিরাকারে'র উল্লেখ করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক পালায় এইরূপ কোন না কোন উক্তি পাওয়া যায়। পালার এই সব উক্তি স্কন্দ-পুরাণে নাই। পালাকর্ত্তার এগুলি নিজস্ব। পালাকার উচ্চশ্রেণীর কবি ভাবে পাঠকগণের ভক্তি পাইতে পারেন, কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোকের ভালবাসা পাইয়া আসিতেছেন। তিনি জনসাধারণের গুরু না হইতে পারেন ; কিন্তু তিনি তাহাদের পরম বন্ধু। উৎকলবাসী উৎসবের সময়ে, আনন্দের সময়ে, উন্নতির সময়ে—কবিকে স্মরণ করে ও গ্রামে গ্রামে, হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ভুলিয়া শিরিনী ভক্ষণ করে।

আকাশ-প্রিয়া

শ্রীবিমল মিত্র

আমার আকাশ অন্ধ হয়েছে,
অন্ধকারে !
তোমারেই খুঁজি অবগুণ্ঠিতা
সকল দ্বারে !
অরুণ আলোর স্পর্শ লভিয়া
জাগিয়া উঠি ;
তোমারে দেখি না—বারে বারে মেলি
নয়ন দুটি !
হারানো সুরটি বেজে থেমে যায়
বীণার তারে—
তোমারেই খুঁজি—হে লীলা-ললিতা
সকল দ্বারে !

সন্ধ্যাবেলায় নিশি গন্ধার
কি মোহ মরি !
বক্ষ আমার চঞ্চল হয়
তোমারে স্মরি' !
কক্ষে কক্ষে দীপ জ্বালি, তুমি
আসিবে ব'লে,
স্বপ্নে আমার উৎসুক আঁখি
ওঠে যে জ্বলে',
জানি না কখন কেটে যায় বৃথা
সে বিভাবরী।
চক্ষে আমার ঝরে' পড়ে লোব
তোমারে স্মরি !

গাঁদা

গাঁদাফুলের গাছ আমাদের দেশে যথেষ্ট, সাধারণে ইহাকে ফুলের গাছই জানে, কিন্তু রোগ নিবারণে ইহার গুণ অশেষ।

রক্তরোধে।—গাঁদা পাতা অতি অদ্ভুত গুণসম্পন্ন। কোনো স্থান কাটিয়া গেলে কয়েকটি গাঁদা পাতা ছেঁচিয়া লাগাইয়া বাঁধিয়া দিলে রক্ত পড়া নিবারিত হয় এবং ঐ স্থান জোড়া লাগিয়া থাকে।

ক্ষত রোগে।—কয়েকটী গাঁদা পাতা গাওয়া ঘিয়ে ভাজিয়া ঘৃতের সহিত মিশাইয়া মলম প্রস্তুত করিতে হয়। এই মলম নানা প্রকার ক্ষত-রোগে প্রয়োগ করিলে ক্ষত স্থান শুষ্ক হয় এবং ক্ষতস্থান জোড়া লাগিয়া থাকে। ইহার সহিত একটু 'সোহাগার খই' মিশাইয়া লইলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

কার্ব্বঙ্কল প্রভৃতিতে।—পৃষ্ঠব্রণ বা কার্ব্বঙ্কল এবং অন্যান্য দূষিত ক্ষত রোগে গাঁদা পাতা বাটিয়া ময়দা এবং সুজির সহিত মিশাইয়া একটু গরম করিয়া পুলটিশ দিলে ব্রণের সর্ব্বপ্রকার দোষ নষ্ট হয়। এই প্রকারে পুলটিশ্ দিতে দিতে ঐ ব্রণ নরম হইয়া আসে এবং উহা ফাটিয়া সমস্ত দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। কার্ব্বঙ্কলে ছোট গোয়ালে পাতার পুলটিশ দেওয়ার কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু গাঁদা পাতার পুলটিশ—ছোট গোয়ালে পাতা অপেক্ষাও উপকারী। ছোট গোয়ালে পাতার পুলটিশে ব্রণ স্থান চুলকায়, কিন্তু গাঁদা পাতার পুলটিশে তাহার আশঙ্কা নাই। পৃষ্ঠব্রণ বা কার্ব্বঙ্কলে যদি পিত্তের প্রকোপ বেশী থাকে, তাহা হইলে প্রথমে গুলঞ্চ বাটিয়া উহার পুলটিশ দিয়া তাহার পরে গাঁদা পাতার পুলটিশ দিলে শীঘ্র অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

প্রদরে।—রক্ত-প্রদরে গাঁদা পাতার রসসহ ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা আমরা করিয়া থাকি, কিন্তু ঔষধ না দিয়া যদি কেবলমাত্র গাঁদা পাতার রসই এক চামচ করিয়া একটু চিনি মিশাইয়া রক্তস্রাবে সেবন করান যায়, তাহা হইলে উহা দ্বারাই স্রাব বন্ধ হইয়া থাকে।

ক্ষত ধৌতে।—ক্ষত ধৌতের জন্য গাঁদা পাতা-সিদ্ধ জল বিশেষ উপকারী। কতকগুলি গাঁদা পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে ক্ষত শীঘ্র সারিয়া যায়।

মূত্র রোধে।—মূত্র রোধ বা মূত্র পরিষ্কার হইতে না থাকিলে, ২ তোলা গাঁদা ফুল আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ সেবন করিলে সহজে প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া থাকে। যাঁহারা মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে বহুদিন কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কবিরাজ মহাশয়দিগের নিকট হইতে শোধিত শিলাজতু লইয়া উহার সহিত ঐ ক্বাথ সেবনে বেশী ফল পাইবেন। শিলাজতুর মাত্রা রোগীর ধাতু ও প্রকৃতি অনুসারে এক আনা হইতে দুই আনা। যাঁহারা পাচনের মত সিদ্ধ করিয়া লইতে কষ্ট বোধ করিবেন, তাঁহারা গাঁদা ফুলের রসের সহিতও শিলাজতু সেবন করিতে পারেন।

প্রমেহে।—জ্বালা-যন্ত্রণাময় প্রমেহে গাঁদা পাতার রস সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। রক্তপ্রস্রাবেও গাঁদা পাতার রস সেবন করাইয়া আমরা বিশেষ উপকার

পাইয়াছি। যেখানে অল্প অল্প প্রস্রাব হইতেছে, সেখানে সোরা ভিজান জলের সহিত ২ তোলা গাঁদা পাতার রস মিশাইয়া সেবন করিতে দিলে সন্থ উপকার হইবে।

শুক্রস্তম্ভনে।—গাঁদা ফুলের বীচ অর্থাৎ ফুলের যে অংশ কৃষ্ণবর্ণ এবং পুঁতিলে অঙ্কুর হয়—শুক্রস্তম্ভনের অপূর্ব্ব ঔষধ। একটী গাঁদা ফুলের সমস্ত বীচ চিনির সহিত প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। ইহাতে শুক্র-মেহ অর্থাৎ অজ্ঞাত-শুক্রস্খলন প্রভৃতি অবস্থায় অথবা নিদ্রাবস্থায় শুক্রস্খলন হইলে—চমৎকার ফল হইয়া থাকে।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন
(আয়ুর্ব্বিজ্ঞান-সম্মিলনী)

শ্রীহট্ট

অতীতের প্রতি যতদূর দৃষ্টি যায়—তারও দূরে অতি-দূরে, স্মৃতির যবনিকার অন্তরালে, মানব সভ্যতার প্রথম প্রভাতে—তুষারমৌলী হিমাদ্রীর পাদদেশ ব্যাপিয়া মহাসাগরে নীল উর্ম্মিমালা যখন নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিত—সেই জলধির বক্ষে সে পুণ্য মুহূর্ত্তে ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী বঙ্গলক্ষ্মী অপরূপ সুষমায় দিগদিগন্ত আলোকিত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন সেদিন হইতেই শ্রীভূমি তাহার শ্যামল অঙ্কে শোভা পাইতেছিল। সেই বাঙ্গালা ও শ্রীহট্ট যদিও আজিকার বাঙ্গালা ও শ্রীহট্ট নহে, কালচক্রে, বহু সৃষ্টি ও ধ্বংসের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী জাতি গঠিত হইয়াছে, তবুও বঙ্গভূমির সহিত শ্রীভূমির বিচ্ছেদ কোন কালেই ঘটে নাই।

ইতিহাসের রুদ্ধ কবাট মুক্ত করিলে দেখা যাইবে মহাভারতের যুগে যখন বিশাল ভারতভূমি খণ্ড খণ্ড স্বাধীন নরপতির শাসনাধীন ছিল, সেই সময়ে যে লাউড়ের রাজা ভগদত্ত কুরুপতি দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিয়া কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন, সেই লাউড় রাজ্য ময়মনসিংহ প্রভৃতি কয়েকটী জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভাটেরার নবাবিষ্কৃত তাম্রফলক—দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বকার বলিয়া যাহা প্রমাণিত হইয়াছে—এই তাম্রফলকদ্বয় নাগরাক্ষরে অনুরূপ, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ইহা স্বীকার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউয়েঙসাঙ সাগরতটে যে "শিলিচটল" রাজ্যের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও এই শ্রীভূমি শ্রীহট্ট। 'শিলিচটল' তৎকালে ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গীয় জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্রীহট্টের গৌড়, লাউড় ও জয়ন্তীয়া এই তিনটী খণ্ডরাজ্যের রাজন্য-বর্গ বাঙ্গালীই ছিলেন এবং গৌড় ও লাউড় রাজ্যের সীমা ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। বস্তুতঃ, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ত্রিপুরারাজ্যের ইতিহাস ও শ্রীহট্টের ইতিহাস ঘনিষ্টভাবে জড়িত—বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই। ভারতের ইতিহাস কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে—ধারাবাহিক কোন ইতিবৃত্ত এ পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক উদ্ধার করিতে পারেন নাই। অতীত ধ্বংসস্তূপ হইতে যতটুকু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করিয়াছে তাহাতে শ্রীহট্টে ও বাঙ্গালা দেশের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অস্বীকার করার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

ভারতে মুসলমান প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও দেখিতে পাওয়া যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে তোগলক-বংশীয় সম্রাটদের রাজত্বকালে, হজরত শাহজলাল-কর্ত্তৃক শ্রীহট্ট বঙ্গসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া নবাবের শাসনাধীন হয় (After the death of Shah Jalal, the district was included in the kingdom of Bengal and put in charge of a Nawab—*Hunter*)। তৎপর মোগল-সম্রাট আকবরের শাসন সময়ে রাজস্ব-সচিব রাজা টোডরমল্ল কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ যে ১৯টী সরকারে বিভক্ত হয় শ্রীহট্ট জেলা তন্মধ্যে একটি 'সরকার' রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। শ্রীহট্ট বঙ্গদেশভুক্ত ছিল বলিয়া ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের সুবাদার ইসলাম খাঁ আসাম-বিজয়ে যাত্রা করিলে শ্রীহট্টের ফৌজদার শ্রীহট্টিয়া সৈন্যবাহিনীসহ তাঁর সাহায্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলে শ্রীহট্টও তৎসঙ্গে ইংরেজের করায়ত্ত হয়। তখনও মুসলমান আমীল বা নবাব শ্রীহট্টজেলার শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেন। নবাবী আমলের দলিলপত্রে দৃষ্ট হয়, তৎকালে শ্রীহট্টের বাঙ্গালা মিশ্রিত সংস্কৃতেই দলিলাদি লিখিত হইত। শ্রীহট্টের বর্ত্তমান কথ্য ভাষা যে গৌড়ীয় ভাষার অপভ্রংশ শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব মহাশয়

অকাট্য যুক্তি দ্বারা মৌলবী বাজার সাহিত্য-সম্মিলনীর অভিভাষণে প্রমাণ করিয়াছেন।

বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে শ্রীহট্টের বিরাট্ দানের তুলনা নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব সাহিত্য বাঙ্গলার অপূর্ব্ব সম্পদ। বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবি একদা বিশ্বজগতে এই মহাবাণী শুনাইয়াছিলেন—

"শুনহে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

মানুষকে এমন বৃহৎ ও মহৎভাবে আর কোন ধর্ম্মমত কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই। এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য শ্রীভূমির সন্তান। বৈষ্ণবাচার্য্য অদ্বৈতপ্রভু যাঁর হুঙ্কারে শ্রীচৈতন্য প্রেমতরঙ্গে বঙ্গভূমি ডুবাইতে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিও এই পুণ্যভূমি শ্রীহট্টের মহাপ্রভুর পার্ষদ, প্রিয় শিষ্য—

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত,
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত।
ভবরোগ নাশ বৈদ্য মুরারী নাম যার
শ্রীহট্ট এসব বৈষ্ণবের অবতার।"

শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সাধক কবির জন্মদান করিয়া শ্রীভূমি বাঙ্গালার লোকপূজ্য হইয়াছিল। নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক রঘুনাথ শিরোমণি, নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার, পদকর্ত্তা যদুনাথ, পাঠক রত্নগর্ভাচার্য্য, 'সময়-প্রদীপ'-প্রণেতা জ্যোতির্ব্বিদ হরিহরাচার্য্য, 'দীপিকা-প্রভা-রচয়িতা গোবিন্দাচার্য্য 'অষ্ট-বিংশতি প্রদীপ'-প্রণেতা মহেশ্বর কাব্যালঙ্কার, পদ্মপুরাণের কবি ষষ্ঠীবর দাস ও নারায়ণ দেব, "রাজমালা"র প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর বাঙ্গালার সাহিত্য-সাধনায় এই মহৎ দান করিয়া গিয়াছেন—কালের ব্যবধান কিংবা উদ্ধত রাজবিধান তাহা মলিন করিতে পারিবে না। সাধক ও তত্ত্বজ্ঞানিদের মধ্যে রামকৃষ্ণ গোঁসাই, ঠাকুরবাণী, পাগল শঙ্কর, বঞ্চিত ঘোষ, ঠাকুর জীবন শ্রীভূমিকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানের মধ্যে পার্শী গ্রন্থকার রেয়াজ উদ্দিন ও কবি রেহান উদ্দিন দিল্লীর বাদসাহ-কর্ত্তৃক 'বুলবুলে-বাঙ্গলা' অর্থাৎ বাঙ্গালার বুলবুল উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। লাউড়ের বাঙ্গালী রাজা দিব্যসিংহ ইটার বাঙ্গালী রাজা সুবিদ নারায়ণ, শ্রীহট্টের বাঙ্গালী নবাব হরকৃষ্ণ দাস বাঙ্গালীর যশঃ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। নবাব হরকৃষ্ণের বাঙ্গালী সেনাপতি রাধানাথের প্রভুভক্তি ও বীরত্বের কাহিনী হতভাগ্য নবাব সিরাজৌদ্দলার বাঙ্গালী সেনাপতি মোহনলালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাঙ্গালী-কবি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সেই বীরত্ব কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন—

"বাঙ্গালীর শেষবীর্য্য স্বাধীন শোণিত,
শ্রীহট্ট সুরমাতটে হইল পতিত,
সেনাপতি রাধানাথ, করিয়া অরাতিপাত
অগণ্য-যবন-সৈন্য-বেগ নিবারিল,
যবন-বিজয়-লক্ষ্মী টলিতে লাগিল॥
অবশেষে অবিশ্বাস-নিহত-জীবন,
প্রভুর রক্তাক্ত শির শূলাগ্রে নিরখি,
নিহত প্রভু আমার! কার তরে যুদ্ধ আর?
যথা কৃষ্ণ তথা রাধা বলিয়া অমনি,
বক্ষে নিমজ্জিয়া অসি পড়িলা ধরণী।"

সেকালে শ্রীহট্টবাসীর সাহস ও বীরত্বের কথা ইংরাজ কালেক্টর লিণ্ডসে সাহেবের জীবনীতে লিখিত আছে। ১৭৮৩ সালে লিণ্ডসে সাহেব ওয়ারেন হেষ্টিংসকে লিখিয়া-ছিলেন—"The natives are well known to be the most turbulent of any in Bengal." ফিরিঙ্গি-শাসন-অসহিষ্ণু শ্রীহট্টবাসীর হাতে লিণ্ডসে সাহেবের কয়েকবার প্রাণসংশয় ঘটিয়াছিল।

এই সুদীর্ঘ দিনের নিবিড় বন্ধন যে নির্ম্মম রাজ-বিধান ছিন্ন করিয়া নিল, শ্রীহট্টবাসী তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই—এই ৫৭ বৎসর নির্ব্বাসনের পরেও পারিতেছে না। এ যদি "সেন্টিমেণ্টালিজম' হয় তাহা হইলে বলিব এই 'সেন্টিমেণ্ট' যার নাই সে মনুষ্য নামের অযোগ্য। এই সেন্টিমেণ্টের তাড়নায় ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে সুরমাতটে দাঁড়াইয়া শ্রীহট্টের নরনারী লর্ড নর্থব্রুকের নিকট যে করুণ আবেদন করিয়াছিল—সে আবেদনের ভাষা কি মর্ম্মস্পর্শী—"হে মহামান্য বড়লাট! শ্রীহট্টের নরনারী আমরা, নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, শ্রীহট্টকে আসামের সহিত যুক্ত করিবেন না" (Your Lordship's memorialists can assure

your Excellency that the whole district would like one man fall at your feet and pray your Excellency not to transfer Sylhet to Assam)। মনে পড়ে, সেদিন সত্যাগ্রহী অভিযানের পূর্ব্বে লর্ড আরউনের নিকট মহাত্মা গান্ধীর চরমলিপি,—মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের নিকট ভারতের দুর্দ্দশার কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। লর্ড আরউইন মহাত্মার আকুল আহ্বানে যেমন কর্ণপাত করেন নাই, ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড নর্থব্রুকও তেমনি শ্রীহট্টবাসীর নিবেদন পদদলিত করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার সহিত শ্রীহট্টের যোগ অবিচ্ছেদ্য—এই ৫৭ বৎসরেও যোগ ছিন্ন হয় নাই, ইংরাজ রাজত্বের অন্তকাল পর্য্যন্তও হইবে না। শ্রীহট্টবাসী চিরদিন বঙ্গভূমিকে জন্মভূমি বলিয়া জানিয়াছে ও জানিবে—তাই সপ্তকোটী বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আজও শ্রীহট্টবাসী বাঙ্গালা মাকে ডাকে—

আমার সোণার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি,
তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

শ্রীঅনাথবন্ধু সেন
(জনশক্তি)

জেনেভা-ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

৯ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ১৯৩০

আজ জেনেভায় অবস্থিতির শেষ দিন। যাত্রার দিনটা কোথায়ও ভাল লাগে না, আনন্দের দিন নয়। নানা পক্ষী এক বৃক্ষ হইতে নিশাবসানে যখন দশদিকে ধাবিত হয়, তাহাদের প্রভাতীগানের আনন্দলহরীর সহিত করুণ রসের মিশ্রণ আছে কি না তাহারাই জানে, আর জানেন বিধাতা; কিন্তু মায়াজালবদ্ধ মানবকে তাঁহার গঠনের অভিপ্রায় অনুরূপ। যেখানে থাক, যতদিন থাক মায়ার জাল সেখানে বোনা হইয়াছে, মাকড়সার জালের মত ক্ষীণবল হইলেও তাহা জাল এবং ছিঁড়িতে হয়—উহা ছিন্ন ভিন্ন করিতে বাধ্য হয়; তাহাতে সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্যের অভাব ঘটিবেই ঘটিবে।

দেশী-বিদেশী বন্ধুদের কৃপায়, যত্নে ও আতিথ্যে জেনেভার প্রবাসক্লেশ বিশেষ অনুভূত হয় নাই। যে হোটেলের খাবার জ্বালায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা ছাড়িতেও ক্লেশবোধ হইল। যে ঘরটীতে (৯১নং) ছিলাম তাহার অসুবিধা নিবারণের জন্য ম্যানেজার কয়দিন ধরিয়া অন্য ঘর লইতে বলিতেছিলেন—কিন্তু তাহাও পছন্দ হইতেছিল না। সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে যে ঘরে বেশী দিন কাটাইয়া সামান্য শেষ কয়দিনের জন্য তাহাও ছাড়িতে ইচ্ছা গেল না, অন্য হোটেলে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা গেল না। ফ্রান্সের দক্ষিণে বা সুইজারল্যাণ্ডের অন্য কোন ভাল জায়গায় যাইতেও ইচ্ছা গেল না। সংসারের নিয়মই এই। যাহাদের ছাড়িয়া যাইতে বা ছাড়িয়া থাকিতে মায়া হয় তাহারা তো তাহা বোঝে না। বয়স-দোষে অনিচ্ছার মূলে আলস্যও হয় তো আছে এবং কয়দিন ক্রমাগত বৃষ্টি ও ঠাণ্ডার জন্যও তাহা হইল না।

বাদলার জন্য সমস্তদিন হোটেলেই কাটিল, আজও নিমন্ত্রণের ধূম খুব। ডাক্তার ও মিসেস দাস, মিষ্টার ও মিসেস চাটার্জ্জী—(অমূল্য) মিষ্টার ও মিসেস দালাল সকলেই বিদায়-ভোজের আয়োজন ও পীড়াপিড়ি করিয়াছিলেন, সকলেই ষ্টেশন পর্য্যন্ত দেখা করিতে

আসিলেন। আর আসিলেন পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর, মিষ্টার তারিণী সিংহ, ডাক্তার সুবল ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীমান্ সুধীন্দ্র ঘোষ। বিদায়-পর্য্যায় করুণ হইল।

জল-বৃষ্টির মধ্যেই মার্শেলস্‌-এর ট্রেণ রাত ৮।৩৫ মিনিটের সময় জেনেভা হইতে ছাড়িল। বেলগ্রেড ষ্টেশনে ফরাসীরাজ্য আরম্ভ। চুঙ্গী মাসুল আদায়ের জন্য গাড়ী অনেকক্ষণ থামিল। মাল তদারক-সম্বন্ধে আমাদের উপর কোন গোলযোগ হইল না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ফ্রেঞ্চ রাজদূত যে ছাড়পত্র দিয়াছেন তাহার উপর কথা চলে না।

রাজার হালে Wagon Lit গাড়ীতে শয্যা ও শয়ন-কক্ষের আসবাবের কোন অভাব বা অসৌন্দর্য্য নাই, ইহার জন্য দণ্ড অনেক দিতে হয়, কিন্তু শয্যাসম্ভারে যদি নিদ্রা আনিতে পারিত তাহা হইলে জগতের অনেক দুঃখ ঘুচিত। সমস্ত রাত্র নানা চিন্তায় অভিভূত ছিলাম। পলকমাত্রও নিদ্রা হইল না। ভোর পাঁচটার সময় মার্শেলস্ নামিতে হইবে এই কারণেও নিদ্রার অভাব হইল।

রজনী কিন্তু বৃথা গেল না বরং সার্থকতা ও সাফল্যে পূর্ণ। প্রথমবার ১৯১২ সালে ফ্রান্সের রাস্তায় বাড়ী ফিরিবার সময় রেল গাড়ীতে যে সার্থকতায় ধন্য হইয়াছিলাম, আজও প্রভুর কৃপায় তাহা ঘটিল। অনেক কাজ বাকী—তাঁহার অপার দয়ায় রাত্রি কাটিল।

S. S. Ramzak (রামজাক)

১০ই অক্টোবর, শুক্রবার, ১৯৩০

এত বড় ষ্টেশন মার্সেলস্—ইহাতে যাত্রী বসিবার ঘর-(Waiting Room) এর চিহ্নও নাই—যাহা আছে, তাহাতে সময় অতিবাহন ভদ্রলোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। বিশ্রামাগার ও জলযোগের ব্যবস্থা (Refreshment Room) ষ্টেশনে থাকিলে হোটেলওয়ালাদের ব্যবসায় চলে না বলিয়া বোধ হয় এইরূপ ব্যবস্থা। প্লাটফর্ম্মের উপর ঠেলা গাড়ীতে ভোরে কাফি বিক্রয় হইতেছে। বিস্তর লোক তাহা খাইতেছে, কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তি ও ভরসায় কুলাইল না। কাজেই হোটেলের আশ্রয় অবলম্বন করিতে হইল, বড় বড় বন্দরে নানা রকম চোর-জুয়াচোর জোটে। অত ভোরে টমাস কুক প্রভৃতির দোভাষীও উপস্থিত না থাকাতে হোটেলে উঠিতে হইল। হাত-মুখ ধোওয়া, জঘন্য কাফি খাওয়া ও কিছুক্ষণ শয্যায় আশ্রয় লইয়া অনিদ্রার শোধ তোলার চেষ্টার জন্য দণ্ড বড় কম দিতে হইল না।

বেলা হইলে টমাস কুকের লোকের সাহায্যে মালপত্র সংগ্রহ করিয়া বেলা ১০টা নাগাদ জাহাজে উঠিলাম। মার্সেলস্ শহরে উল্লেখযোগ্য পারিপাট্য বিশেষ কিছু নাই—রাস্তা ঘাট বাড়ী সবই ফ্রান্সের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের শহরের মত, কিন্তু বহু পুরাতন শহর বলিয়া গির্জ্জা, মনুমেণ্ট প্রভৃতির বাহুল্য যথেষ্টই আছে। বিদেশীকে অল্প সময়ের জন্য থাকিতে হয় বলিয়া হোটেলও অনেক। রাস্তায় গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা লণ্ডন বা জেনেভা কিংবা কলিকাতার মতও সুখের নয়, বরং অনেক অংশে হীন। Notre Dame, Chateni de If প্রভৃতির উল্লেখ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে করিয়াছি, তাহাতে বিশেষ কিছু নাই।

জল-হাওয়ার দেশ ছাড়িয়া সূর্য্যালোকে তৃপ্তিবোধ হইল—বরং গরমও ছিল। কিন্তু সমুদ্রের ধারে পৌছিতে দারুণ ঠাণ্ডা, কনকণে হাওয়া বহিতে লাগিল। জাহাজের বাহিরে দাঁড়ায় কার সাধ্য, সমস্তদিন প্রায় কেবিনেই কাটিল—রাত্রের অনিদ্রা, এই হাওয়া তার উপর আবার **গলফ অব লিঁয়োতে** (Gulf of Leon) সমুদ্র-চাঞ্চল্য (Ground Swell) এর সঙ্গে সঙ্গে তুফান উঠিল। বেলা ১টার পর জাহাজ ছাড়িল, সমস্ত দিনরাত ঐ বিক্ষোভের দরুণ জাহাজের চারিদিকে উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ (Pitch you Roll) হইল আবার টেবিলে বাসন রক্ষার জন্য বেড়া (Barrir) দিতে হইল।

শনিবার, ১১ই অক্টোবর, ১৯৩০

রাত্রের দুর্য্যোগ কাটিয়া গিয়া সুন্দর প্রভাত দর্শন ঘটিল। "অজপা" মন্ত্র আপনা হইতে মনে পড়িল, ক্রমে ক্রমে লোকজনের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ হইল, পরিচিত-অপরিচিত অনেক লোক, জেনেভায় আমাদের সরকারী ভোজে যাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে বম্বে প্রদেশের ভোর-রাজ্যের মহারাজা ছিলেন, তিনি সদলে জাহাজে আছেন, মাদ্রাজ জেলের অধ্যক্ষ Major Contractor I. M. S. আছেন, ভারতীয় হিসাব-বিভাগের পেনসনপ্রাপ্ত হেজেলটাইন (Hezeltine) আছেন,

কলিকাতার সওদাগর Hirredge আছেন, চক্ষুর ডাক্তার Major Kerwin আছেন, আর আছেন আমার এই কয় মাসের ভ্রমণ ও কর্ম্মসহচর প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক স্যর জেহাঙ্গীর কয়াজী। জাহাজটী ছোট, ব্যবস্থা-বন্দোবস্তও বড় সুবিধার নয়। শুনিলাম ভারতে ডাক এ জাহাজে যাইতেছে না। 'রাওলপিণ্ডি' নামক অন্য জাহাজে যাইতেছে, যাত্রী বেশী হওয়াতে একটা বেশী জাহাজ দিয়াছে। গত্যন্তর নাই।

রবিবার, ১২ই অক্টোবর, ১৯৩০

সুন্দর প্রভাত, না গরম না বেশী ঠাণ্ডা, জাহাজের সকলে যে যার ব্যবস্থা করিয়া বসিয়াছে। নূতন বাড়ীতে নূতন ঘরকন্না পাতা হইয়াছে। নূতন বন্ধুত্ব, নূতন আত্মীয়তা, নূতন প্রীতি-অপ্রীতির সৃষ্টি হইতেছে। পুরাতন পশ্চাতে পড়িয়াছে। পূর্ব্বস্মৃতি অনেক মুছিয়া গিয়াছে ও দারুণ ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কাহারও খেয়াল নাই, সংসারের সুখ-দুঃখ মান-অপমান, শোক, আনন্দ সব তোলা আছে কিন্তু যেন যোগবলে অতীত ও ভবিষ্যৎ লুপ্ত, সুন্দর প্রভাতের মধুর বাতাস সব পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে।

ভূমধ্য-সাগর অপূর্ব্ব গৌরবের অধিকারী। টেবেনিয়ান সমুদ্রে অতীত কলহ, বর্ত্তমানে অশান্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছে—তার নীল বক্ষ কত আততায়ীর রক্তে রঞ্জিত, ইতিহাস তাহার অকাট্য সাক্ষ্য দিতেছে, তথাপি বর্ত্তমান-মুগ্ধ মানব অন্ধ—ইচ্ছা করিয়া অন্ধ।

সিসিলি ও ইটালির মধ্যে **গলফ অব মেসিনা** (Gulf of Massina) সকালে পার হইলাম, কাজেই আগ্নেয়গিরির সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য নয়নগোচর হইল না। মনে পড়িল রোমানদিগের সহিত কার্থেজ বীর **হ্যানিবল**-(Hannibal) এর আমরণ পণ সংগ্রাম, কোথা আজ সেই রোম, কোথায় কার্থেজ। আছে বর্ত্তমান ভূমধ্য সাগর—পূর্ব্বে যাহা ছিল নৃশংস সাহারা তুল্য মরুভূমি। রবিবার ভগবান আরাধনার ঘণ্টা শুনিতে পাইলাম, শুনিলাম খাবার ঘণ্টা।

সোমবার, ১৩ই অক্টোবর, ১৯৩০

জাহাজ পূর্ব্বমুখে চলিয়াছে। ঘড়ির কাঁটা এখন না পিছাইয়া দিয়া আগাইয়া দেওয়া হইতেছে। বাড়ীর কাছে যত আগাইয়া যাইতেছে সময়ের তারতম্য তত কমিতেছে।

বেলা একটার সময় ক্রীট দ্বীপ বামে রাখিয়া জাহাজ চলিল। তীরের খুব নিকট দিয়াই যাইতেছে, ক্রীট দ্বীপের পাহাড়ে বরফ খুব পড়ে—ঠাণ্ডা বেশ বুঝা যায়। সর্ব্বত্র পাহাড়ে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, আমরা জেনেভা ছাড়িবার পূর্ব্বে হইতে কয়দিন ধরিয়া আলপস্ পর্ব্বতে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, কাজেই শেষ কয়দিন যেখানে শীতের খুব প্রকোপ ছিল, মার্সেলস্এও তাহার জের চলিয়াছিল, এখন ঠাণ্ডা বেশ কমিয়া আসিতেছে, বরং দুপুর বেলা গরম। আমার এবারকার কেবিন পোর্ট সাইডে নয় কাজেই দুপুর বেলা বিকালের রৌদ্র ভোগ করিতে হয় বেশী।

এই জাহাজে পাটনা হাইকোর্টের চারজন জজ ছুটির শেষে ফিরিয়া যাইতেছেন। ইহার মধ্যে জজ রস পূর্ব্ব-পরিচিত, আলিপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানে ইনি জজিয়তী করিয়া পাটনা হাইকোর্টে আসিয়াছেন। ইঁহাদের ছুটী কলিকাতা হাইকোর্টের পূর্ব্বে হয় কাজেই পাটনা হাইকোর্ট পূর্ব্বে খোলে। কলিকাতা হাইকোর্টের জজেরা পরের জাহাজে ভারতবর্ষে ফিরিবেন। জজ বাহাদুরদের সঙ্গে পুরাতন কথা অনেক হইল, সহযাত্রীদিগের সহিত আলাপ পরিচয় ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং নানা কথার আলোচনা চলিতেছে। বরাবরই দেখিয়াছি একটু সাবধানে থাকিয়া নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিলে লোক আপনা-আপনি আলাপ করে। ইহাদের সঙ্গে আলাপের মূল্য আছে। এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা ভারতবাসীর সঙ্গে মোটেই মিলিতে চায় না অথবা শিক্ষা ও ভদ্রতার অভাবে মিশিতে পারে না, তাহাদের হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়। এখন ইহাদের মধ্যে ভারত-বিদ্বেষ যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে ইহাই মঙ্গল।

সকলেরই মুখে এক কথা। ভারতের দেশ-হিতৈষী-দিগের অনুচিত ব্যবহারে ইংরাজের অপ্রীতির কারণ হইয়াছে, ইহাই তাহারা প্রমাণ করিতে চান। এ অনুচিত ব্যবহারের জন্য সকলে দায়ী নয়। ইহার যথেষ্ট কারণ আছে এবং যতদিন এ ব্যবহার প্রকট হয় নাই

ততদিনও এই শ্রেণীর লোকের ভারতবাসীর প্রতি যথেষ্ট বিদ্বেষ ছিল, একথা তাহারা ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়া যান।

এবার জাহাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক ও ছেলেপুলের সংখ্যা বেশী, যাহাদের পরিবারগণ বিলাত গিয়াছিলেন তাঁহারা সব ফিরিতেছেন। Rangoon Port Office এর **Price** ও কলিকাতার এক Cable companyর **Leake** নামে দুইজন ইংরাজ খুব ঘনিষ্ঠতা করিতেছেন, বম্বে প্রদেশের মহারাজা ভোর খুব আত্মীয়তা করিতেছেন। তাঁহার রাজ্য ক্ষুদ্র হইলেও তিনি অনেক লোকহিতকর কার্য্যের উদ্যোগী, সেই সকল উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার প্রয়াসে পুত্রকে লইয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে লোক জন ও কর্ম্মচারী অনেক আছে।

আলস্যবশতঃ সূর্য্যোদয়-দর্শন বড় ঘটে না, কিন্তু অস্তঃশোভা দেখিয়া নিত্য মুগ্ধ হইতেছি, "নীল সিন্ধু-জল"-বক্ষে সে অপূর্ব্ব লালিমার বিকাশ ভুলিবার নয়।

বেড়ান, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি যেরূপ চলিয়াছে তিন মাস পূর্ব্বে পরিজনবর্গ বোধ হয় তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেন না। ভগবান জানেন এ স্বাস্থ্য কত দিন টিকিবে।

মঙ্গলবার, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৩০

ক্রমশঃ গরম বাড়িতেছে, কিন্তু ঠাণ্ডাও বেশ আছে, নরম-গরম মিলিয়া জল-হাওয়া একরকম উপভোগ্য ও স্থানীয় রূপ ধারণ করিতেছে। লেভাণ্ট সমুদ্র পূর্ব্ব কীর্ত্তির বহু পরিবাদ ফিনিসিয়ান-ইহুদী ইতিহাসের সহিত নিগূঢ়ভাবে সম্বদ্ধ। বর্ত্তমান ইতিহাসেও ইহার স্থান কম নয়। প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে সকল জাতিরই ঔৎসুক্য, আশঙ্কা ও আশার অবধি নাই। লর্ড লীটনের পত্রে জেনেভাতে অবগত হইয়াছিলাম যে, তিনি আপাততঃ অল্পদিনের জন্য ও শীঘ্র অধিকদিনের জন্য প্যালেষ্টাইন যাইবেন, তাঁহার সেখানে কি কাজ ঠিক জানি না। গোলমাল যদি মিটাইতে পারেন তাহা হইলে দুঃর্ভাগ্য-বশতঃ বঙ্গদেশে যে অকীর্ত্তি অর্জ্জন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল তাহার কতকাংশ মোচন হইবে।

'আমরা পোর্ট সৈয়দ শীঘ্র পৌছিব' কাল এই কথা চায়ের টেবিলে উল্লেখ করাতে পেশওয়ার প্রদেশের একজন সৈনিক কর্ম্মচারী বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "I am afraid so" (তাই তো মনে হচ্ছে)। সে কথা আমার মনে বা মুখে আসিবে কেন? তিনি যাইতেছেন দেশ ছাড়িয়া; আমি যাইতেছি দেশে; আমি যাইতেছি উদ্‌গ্রীব হইয়া, তিনি "I am afraid so" বলিবেন ইহার আশ্চর্য্য কি?

আগামী কল্য সকালে পোর্ট সৈয়দ পৌছিবার কথা ছিল। কিন্তু জাহাজ খুব দ্রুত চলিয়াছে, যদিও লণ্ডন হইতে বারংবার নিষেধ বিনা তারে না আসিত আমরা আরও শীঘ্র পৌছিতাম, পুরাতন হইলেও **রামজাক** জাহাজ কর্ম্মঠ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। P. & O. কোম্পানী এই যাত্রার পরই কোন আমেরিকান কোম্পানীকে ইহা বিক্রয় করিবে স্থির হইয়া গিয়াছে। কর্ম্মচারী মহলে হাহাকার পড়িয়াছে কারণ আজকাল মন্দার দিনে সহসা চাকুরী মেলা দায়। ষ্টুয়ার্ড (Steward) পার্শার (Purser) প্রভৃতি কর্ম্মচারী খুব যত্ন আপ্যায়ন করিতেছে। দুপুরবেলা সুরুয়া পোলাও ডাল প্রভৃতির আয়োজন হইত। দুপুরবেলা ডেকের উপর গোমাংসের সুরুয়ার ব্যবস্থা বরাবর ছিল কাজেই মাদৃশ জন বঞ্চিত থাকিত। আমি এবার স্পষ্ট বলিলাম যে কেবল Bovril ব্যবস্থা অত্যন্ত অন্যায় কারণ তাহার মাংস আমরা লইতে পারি না, কাজেই অপর ব্যবস্থা হইয়াছে। গুছাইয়া সময় মত বলিতে পারিলে এ সব সামান্য ক্রুটী শোধন হইয়া যায়। দিল্লী রেলওয়ে বোর্ডের একটী কর্ম্মচারী সপরিবারে যাইতেছেন। তাঁহাদের চাল গোপাল তুল্য; কুড়ি মাসের একটী চমৎকার ছেলে আছে, কি জানি কেন তাহার আকর্ষণ আমার উপর পড়িয়াছে। মা, বাপ ছাড়িয়া ছুটিয়া আমার কোলে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে ও থাকিতে চায়। গোপাল-মাহাত্ম্য তাহাদিগকে কিছু বুঝাইলাম। কানপুর (Cawnpur Atherton West Company) তুলা কলের একজন মালিক ওয়েষ্ট সাহেব-সম্বন্ধে ও খৃষ্ট চরিত ও ক্রুশের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। কুলিদের দুর্দ্দশা-মোচনে সাহেব প্রতিশ্রুত হইলেন এবং ভারতীয় তথ্য-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ ও সহানুভূতি সৃষ্টির উদ্দেশে পুস্তকের তালিকাও করিয়া লইলেন। কলিকাতার

জহুরী হ্যামিণ্টন কোম্পানীর বড় সাহেব মিঃ গ্র্যাণ্ট এবং যোধপুর মহারাজার কৌন্‌সলের ভাইস প্রেসিডেণ্ট Col. Wyndhan স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভারতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলেন, সকল শ্রেণীর ইংরাজের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়াছে—চেষ্টা হইতেছে যে কিসে হাঙ্গামার মীমাংসা হয়। খেলাধূলা, বাজী, ঘোড়-দৌড় নাচ ও তজ্জন্য চাঁদা প্রভৃতির আয়োজন হইতেছে। গরম বেশী পড়িবার পূর্ব্বে এ সকল বিষয়ের শেষ করিবার চেষ্টা হইতেছে। তবে জাহাজ ছোট, স্থান অল্প; কাজেই আসর জমিতেছে না।

পোর্ট সৈয়দ পৌঁছিতে প্রায় পাঁচটা বাজিল। ভাঙ্গা পোলে জাহাজের গায়ে ঠিক করিয়া লাগাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল, অন্ধকারে বন্দরে নামিতে ইচ্ছা হইল না। বারংবার যাতায়াতের জন্য আগ্রহ, ঔৎসুক্য, উত্তেজনা সব কমিয়া আসিতেছে। নামিয়া দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। দোকান, হোটেল, আফিস, বদমাইসের আড্ডা এই সব লইয়া পোর্ট সৈয়দ। পূর্ব্বে যেরূপ বীভৎস ও জঘন্য কাণ্ড হইত এখন তাহার কম। ইংরেজী ফরাসী ও ইজিপ্সিয়ান পুলিশ অনেক শাসন করিয়াছেন; এখন শুদ্ধ ইজিপ্সিয়ান কর্ত্তৃপক্ষগণের হস্তে সব ভার, কোথায় কিরূপ দাঁড়াইবে বলা যায় না।

রি, বাজীকর, দোকানদারের ভিড় ও হাঙ্গামা বরাবর যেমন দেখা যায় এবারও তাই পুরাতন, যাত্রী নামি", নূতন উঠিল—পাইলট,ডাক্তার,পুলিস, চুঙ্গী আদায়ের কর্ম্মচারী, যাত্রীদের আত্মীয় প্রভৃতিতে ছোট জাহাজ রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত মুখরিত বন্দরের দুইধারে প্রকাণ্ড ইলেকট্রিক আলো ও ইলেকট্রিক আলোর বিজ্ঞাপনে জল স্থল আলোকিত করিয়া অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে দিনে দিনেই পোর্ট সৈয়দে যাওয়া আসা হইয়াছে কাজেই এখানে অপূর্ব্ব আলোকপাত দেখি নাই। বম্বে, এডেন, মার্সেলস্ এর এরূপ আলোকপাতের সম্ভাবনা নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার কোন কোন বন্দরে দেখিয়াছি।

এই স্থানের মধ্যে দেখিলাম আর এক অপূর্ব্ব শোভা—আমার ডাইনে ও বাঁয়ে একখানা বড় জার্ম্মান ও একখানা বড় ডচ্ জাহাজ পূর্ণ-আলোকিত ভূমধ্য সাগরে প্রবেশ করিল। এই দুই বড় জাহাজ ধীরগমনে যখন দক্ষিণ ও বামে গেল তখন পুলকিত না হইয়া থাকিবার যো ছিল না। Like Ships Pa-sings in the rights পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত।

এই দ্বীপমালার মধ্য দিয়া এসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের মহাসঙ্গম ত্রিবেনী পশ্চাতে রাখিয়া সুয়েজখালে রাত্রি ১১॥ টার সময় প্রবেশ করিলাম। মন যে তিমিরে সেই তিমিরে।

বুধবার, ১৫ই অক্টোবর, ১৯২০

সমস্ত রাত ধরিয়া সুয়েজখাল পার শেষ হইল না। প্রাতঃকালে দুই ধারে বিস্তীর্ণ মরুভূমির সহিত পুনঃ পরিচয় করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। মাঝে মাঝে বড় বড় হ্রদ—Bitter Lake—মাঝে অন্য জাহাজের স্থান করিবার জন্য খাল চওড়া করা হইয়াছে। Dredger সর্ব্বদা খাল দোরস্ত রাখিবার জন্য মাটী কাটিতেছে। মরুভূমির মাঝেও গাছপালা আছে, আরব ও ইজিপসীয়ান (মিশর দেশীয়) বালক বালিকারা জাহাজ দেখিয়া চিৎকার করিতেছে, আনন্দে নাচিতেছে। নিত্য যাহা দেখিতেছে, তাহা দেখিয়াও এই আনন্দ। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তীরের মাছির দল আসিয়া পরিচয় করিতেছে। বহু কাল মশা, মাছি, ছারপোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়াছি, পুনঃ পরিচয় আরম্ভ হইল। কাণ্তারা, পোর্ট টিউফিক (Port Tewfik) প্রভৃতি পার হইয়া সুয়েজ পৌঁছিতে প্রায় সাড়ে বারটা বেলা বাজিল। দেখিতে দেখিতে খোলা সমুদ্রে আবার পড়িলাম, লোহিত সমুদ্র লোহিত মূর্ত্তি ধারণ করিতে বিলম্ব করিল না। দূরে উত্তর পশ্চিম পড়িয়া রহিল, সুয়ে শহর—তাহার পশ্চিমে নরাকৃতি-সদীর মত দেখি Murry Hill.

বৃহস্পতিবার, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৩০

গরম গরম করিয়া মেয়ে পুরুষে ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু তাহ তে আমোদ-আহ্লাদ, খেলা-ধূলার ত্রুটী কিছুই নাই, আমরাই কেবল অসাড় হইয়া ডেক-চেয়ারে পড়িয়া আছি। আর পরের পর Morning Tea, Breakfast, Deck Soup, Lunch, Afternoon Tea, Evening appetiser, Dinner and supper তুচ্ছ এই কয়টা খাবার ঠিক ঘণ্টা মত পাইয়া খাইতেছি, ইহার বিপর্য্যয় ব্যত্যয় কিছুমাত্র

নাই। অনিদ্রা বন্ধ করিবার জন্য কোন কোন রাত্র ২টার সময় রুটী ও বাদাম ভাজা চলিয়াছে, ইহার বর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। মাত্রায় কম হইলেও সংখ্যায় কম নয়। রুটী, বিস্কুট, কেক, স্কনস্ Out meal Cake, শাক-সব্জী, নানারকম ফল, মাখম পনির, মাছ, মাংস, পুডিং, আইসক্রীম, শ্যাণ্ডউইর সব পর্য্যায় মত আসিতেছে। এ তাগাদা নূতন করিয়া দিতেছি না এইজন্য যে, দেখাইতে যাই গো-মাংস ও শূকর মাংস না খাইলে জাহাজে বা বিদেশে অনাহারে মরিতে হয় না।

শিয়াসকোট Cavalry officer, Southern Marballa Ryর Assistant Transafare officer, লাহোর বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইতিহাসের নূতন অধ্যাপক মিঃ ব্রুস, (Mr. Broosh) প্রভৃতি অযাচিতভাবে অগ্রসর হইয়া আলাপ করিলেন। ভারতের এখন বড় দুর্ভাগ্য, তাই আমাদিগকে ইচ্ছা করিয়া পিছাইয়া থাকিতে হয়। যখন কোন মহাত্মা আগুয়ান হইয়া আলাপ পরিচয় করেন, তখন কথাবার্ত্তা হয়। কলিকাতার চক্ষু-চিকিৎসক কর্ণেল কারওয়ান (Col. Kerwan) এর সঙ্গে আলাপের ইচ্ছা ছিল, হঠাৎ তিনি নিজেই আসিয়া জুটিলেন।

কাল রাত্রে সাদা-মাটা নাচ হইয়া গিয়াছে। আজ Fancy Dress Ball—সাজ-গোজ ধুম-ধাম খুব হইল, পাছে ইহারা মনে করে যে বাবুরা নিজেদের মেয়েদের বাহিরে আনেন না; অথচ আমাদের মেয়েদের অনাবৃত সৌন্দর্য্য দেখিবার ইচ্ছা করেন। এইজন্য কয়দিন কষ্ট পাইয়াও দিয়া আজ আর একটি দাঁও আসিল, অহনৎহানি দণ্ডানি গচ্ছাতি যমমন্দিরং। জীবও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে!

সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি আলোচনার বিষয় "উঃ কি গরম" বাস্তবিক সকলে মিলিয়া দেখা হওয়া মাত্র এ সংবাদ নূতন সংবাদ দিবার মত ঔৎসুক্যের না দিলেও জানিতে বাকী থাকে না যে কয়দিন বিষম গরম চলিয়াছে। লোহিত সমুদ্রে গরম চলিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু অন্যান্য বারের মত কষ্টকর গরম এ-কথা বলা চলে না! দুপুরের পর হইতে এবার আমার কেবিনের দিকে পশ্চিমে রৌদ্র পাওয়া যায় তার জন্য গরম বেশী বোধ হইতেছে।

রাত দুইটার পর হইতে অনেকক্ষণ ডেকে কাটাইতে হইয়াছে, মেয়েরাও যে যার বালিস চাদর বগলে লইয়া ডেকে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে, লোহিত দ্রে প্রতিবারই এরূপ হয়। জল নীল দেখিতেছি, লোহিত কখনও দেখি নাই। কেহ কেহ কখনও কখনও লোহিত জল দেখে, কিন্তু গগনে যে লোহিত দেখিতেছি তাহাই যথেষ্ট। দুই দিকে নিকটে না হয় দূরে মরুভূমি; কখনও মার চিৎকার মত কি মনে হয়, উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়া যে হাওয়া আসে তাহাও উত্তপ্ত।

আলস্যবশতঃ সূর্য্যোদয় দর্শন ঘটে না। আজ ছয়টা বাজিবার পূর্ব্বে ডেকে আসিয়া অপূর্ব্ব সূর্য্যোদয়-শোভা দর্শন করিয়া অজপার পূর্ণ উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। অরুণ ও সূর্য্য প্রতিনিয়ত এই মোহন সাজে সাজিয়া জগতের প্রতি অংশকে উদ্বুদ্ধ ও আনন্দিত করিতেছেন। আমি যেখানে আছি আমারই জন্য সেখানে উদয় ও অস্তের এই অপূর্ব্ব নানা অভিনয় হইতেছে, তাহা নয়। লীলাময় প্রতিনিয়ত পৃথিবীর প্রত্যেক অংশে আবর্ত্তন বলে এ শোভাসম্পৎ ছড়াইতেছেন।

কয়াজী সাহেবের রাঁধুনী ঠাকুরের সহিত প্রত্যহ দেখা শুনা করার ফলে ডাল, পোলাও, চাপাটী, কোর্ম্মা প্রভৃতির নিত্য অবতারণা হইতেছে। নিত্য নূতন নূতন লোক যাচিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে, ভারতবর্ষের ভাগ্য-বিচার, ভারতবাসীর বিচার সকলেই অল্পবিস্তর করিতেছে। সামান্য যে-কিছু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ভারতের দুর্দ্দৈব্য নিত্য বাড়িতেছে মনে হয়।

আমি এ সকল নাচ-তামাসা হইতে দূরে থাকিয়া নিজের কেবিনের দিকেই ঘেঁসিয়া বসিয়াছিলাম, সাজগোজ করা অনেক সাহেব মেম আসিয়া আলাপ আপ্যায়ন করিলেন— তাঁহাদের সাজগোজ কেমন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ পাঠান, কেহ বেদুইন, আরব সর্দ্দার, কেহ সোম, কেহ ভাঁড়, কেহ আরও কত কিছু সাজিয়া গরমে গলদ ঘর্ম্ম হইয়াও নাচ-মামাসার রাত ১২টা পর্য্যন্ত কাটাইল। জাতির শক্তি ইহাতেই বাড়িয়া যাইতেছে।

মেমেদের সার্ট ঘাঘরা ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া আবার বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে শীলতা ও সুনীতিপ্রিয়তা ফিরিয়া আসিলেই রক্ষা, সকল বিষয়েই স্ত্রী ও পুরুষের তুল্য অধিকার

দাবীর পর যে সব ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিতেছে তাহাতে চমকিয়া উঠিতে হয়, বিলাতের বিখ্যাত পাদরী Dean Juge ও Common Streeten তাঁহাদের পুস্তকে এ সম্বন্ধে যে ভীষণ বিবৃতি করিয়াছেন তাহা যেন বিশ্বাসই হয় না।

শনিবার, ১৮ই অক্টোবর, ১৯৩০

বেলা ১॥ সময় মধ্যাহ্ন ভোজনে সময় পেরিন (Perin) দ্বীপ বামে রাখিয়া এডেনের দিকে জাহাজ অগ্রসর হইতে লাগিল, লোহিত সমুদ্রের লোহিত মূর্ত্তি ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। দুইদিন হইতে যে ভীষণ গরম এবং হাওয়ার অভাব সকলেই অনুভব করিতেছিল তাহা কমিয়া আসিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে এডেন পৌঁছিবার কথা ছিল তাহা হইল না, সন্ধ্যার পর জাহাজ এডেন পৌঁছিল। শোভাশূন্য নগ্নগাত্র এডেনের পাহাড়ও আলোমালায় সজ্জিত হইয়া নিতান্ত মন্দ দেখাইতেছিল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভাবে ও মানবের চেষ্টায় ও যত্নে মনোহারিত্ব লাভ করা একেবারে দুর্লভ নহে। জগতে মনোহারিত্বের স্থান ও প্রয়োজন যথেষ্ঠ আছে।

এ বন্দর ও পোর্টসৈয়দ রাত্রের আলোকে কখনও দেখি নাই—মন্দ লাগিল না। বন্দরে নামিবার ইচ্ছা ছিল না। তবে সহযাত্রী পারসীগণের অনুরোধে এডেনওয়ালা স্যর হরমনজী দিনসার (Sir Harmonji Dinshow) Aden Wallabr পক্ষের সনির্ব্বন্ধ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। তাঁহারাই ষ্টীমলাঞ্চে করিয়া লইয়া গেলেন, পাঁচ মাইল দূরে crater অর্থাৎ আগ্নেয়গিরির গর্ভস্থানে তাঁহাদের অগ্নি পূজার মন্দিরে (Fire Temple) লইয়া গেলেন—পার্শী প্রথামত ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। আজ স্যর হরমনজীর পিতৃশ্রাদ্ধ বাসর—অনেক লোকের আহ্বান হইয়াছিল। ইহাদের এডেনের কারবার ১৮৬৪ সাল হইতে চলিয়াছে—সম্ভ্রান্ত যাত্রীদিগকে স্বল্প সময়ের জন্যও নামাইয়া লইয়া তাঁহারা এইরূপে আদর আপ্যায়ন করেন। ১৯১২ সালে এইরূপে আতিথ্যলাভ করিয়াছিলাম মনে আছে। তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষগণের মুখ মাঝে মাঝে মনে হয়। পুরাতন লোক কাহাকেও দেখিলাম না। রাত্রি অন্ধকার বলিয়া Moses Tank নামে বিখ্যাত জলাধার দেখিতে যাইবার সুবিধা হইল না। গতবারে তাহা দেখিয়াছি ও বর্ণনা করিরাছি। সমুদ্রের লোণা জল হইতে সুপেয় পানীয় জল তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করা দিনশা কোম্পানীর প্রধান কারবার ছিল। জলের দাম অনেক দিতে হয় বলিয়া অনেকে আটশত নয়শত ফিট পর্য্যন্ত নামাইয়া অনেক পাতকুয়া করিয়াছে—কিন্তু জল তত সুন্দর নহে, লোহিত সমুদ্রে নূতন নূতন অনেক বন্দর হইয়াছে বলিয়া এখানকার কারবার কম হইয়াছে। এডেন সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বের অধীন হইতে উপনিবেশ আপিস (Colonial office) এর অধীনে গিয়াছে। ভারতবাসীর স্থানীয় লোকের তাহা বিশেষ অসুবিধা, দক্ষিণ আফ্রিকায় যাহা হইতেছে এখানেও তাহাই ক্রমশঃ হইবে। ছোট জায়গা বলিয়া এ ব্যাপারটা নিতান্ত ছোট নয়।

পার্শী মহাজনেরা এ সকল জায়গায় একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইত। এখন কমিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব যথেষ্ট বাড়িয়াছে।

কর্ম্মপ্রাণ পার্শী সম্প্রদায় যে কংগ্রেসের সহিত পূর্ণপ্রাণে যোগ দিবে পূর্ব্বে তাহা কেহ মনে করিত না। কিন্তু এখন তাহা ঘটিয়াছে।

এ জাহাজেও কয়লা পোড়ে না। তেলের আগুনে জাহাজ চলে। অন্য কোম্পানী এ জাহাজ বিক্রয় করিয়াছে, বম্বে হইতে নিউজিল্যাণ্ডে চলিয়া যাইবে। সেইজন্য অনেক তেল লইতে হইল। কাজেই ১টার সময় না ছাড়িয়া জাহাজ ছাড়িতে ভোর হইয়া গেল।

একে তো গরম তার উপর আবার কখন জাহাজ ছাড়ে এই অনিশ্চতায় রাত্রে নিদ্রার যথেষ্ট ব্যাঘাত হইল। চিন্তাস্রোতের ব্যাঘাত না হইয়া বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইল। ইএ মহাসমুদ্র অনন্তকাল অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে—কে জানে তার চিন্তা-স্রোত কি। ক্ষুদ্র নগণ্য অকর্ম্মণ্য মানব এই বিস্তৃত জলরাশি দেখিয়া এত অধীর হয় কেন? নিজ অকর্ম্মণ্যতা প্রতি পদে তাহার চিন্তার সহায় হয়।

(ক্রমশঃ)

— —

মাসপঞ্জী

রাজনৈতিক—

২১এ ভাদ্র "কংগ্রেস বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সঙ্ঘ" অফিসে পুলিশের হানা—কয়েকটী সংবাদপত্র কার্য্যালয়ে তল্লাসী। এসোসিয়েটেড্ প্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায়ের ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অকস্মাৎ মূর্চ্ছা ও রিপণ হাসপাতালে প্রাণত্যাগ। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে নূতন প্রেসবিল—সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে গভর্ণমেণ্টের অতীত অভিজ্ঞতার শঙ্কা।

২২এ…পার্লামেণ্ট সভায় প্রবল বিতর্ক—বেকারের সাহায্যহ্রাসে সাধারণ ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা।

২৩এ…পাঞ্জাব-লাটকে হত্যার ষড়যন্ত্রের মামলার রায়—৩ জন আসামীরই ফাঁসীর হুকুম। বোম্বাই গভর্ণরের প্রতি গুলীবর্ষণ সম্পর্কে আসামী গোগেটের প্রতি ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ।

২৫এ…পাটনা বোমার মামলার অন্যতম আসামী সুরজনাথ চোরের প্রতি আইনের ১৯ (ই, এফ) ধারানুযায়ী ৩ বৎসর সশ্রম এবং বিস্ফোরক আইনের ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ।

২৬এ…ব্রহ্মের গ্রামে গ্রামে ডাকাতি, খুন ও জখম—পুলিশ ও বিদ্রোহীর সংঘর্ষ—কতিপয় বিদ্রোহী নিহত।

৩০এ… প্রেস-বিল সিলেক্ট-কমিটীর হাতে অর্পণ। লাহোর ম্যাক্‌লাগান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পিকেটিং করার ফলে মৌলানা বোখারী প্রমুখ ২০০ মুসলমান গ্রেপ্তার—অধ্যক্ষকে কর্ম্মচ্যুত করার চেষ্টা…লাহোরে বিষম চাঞ্চল্য। মান্দ্রাজে মিঃ সি, বিজয় রাঘবচারিয়া কর্তৃক বিনির্ম্মিত কংগ্রেস গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন।

৩১এ…মেদিনীপুরস্থ হিজলী বন্দীশালায় বন্দীদের উপর বে-পরোয়া গুলিচালনা—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত—অন্যান্য ২৫ জন আহত। ম্যাক্‌লাগান কলেজে (লাহোর) পিকেটিং—১১০ জন গ্রেপ্তার—৫৫ জনের প্রতি দণ্ডাদেশ।

১লা আশ্বিন…"হিন্দু" পত্রিকা-কার্য্যালয়ে (মাদ্রাজ) প্রেসবিলের প্রতিবাদকল্পে সংবাদিকগণের সভা—শ্রীযুক্ত রামস্বামী শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রতিবাদসূচক প্রস্তাবাবলী গৃহীত। লাহোর "পিপল" পত্রিকার সম্পাদক লালা ফিরোজ চাঁদ বৈশেদিক রাষ্ট্র অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী অভিযুক্ত। মৈমনসিংহের ত্যাগী ও প্রবীণ কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর মজুমদারের বক্সা দুর্গ হইতে বিনা সর্ত্তে মুক্তিলাভ।

২রা…বঙ্গীয় প্রাদেশিক, ছাত্র-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দাস পালঘাট যাত্রাকালে কালীকট ষ্টেশনে গ্রেপ্তার—১১৭ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ।

৪ঠা…ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে হিজলীর গুলী সম্বন্ধে আলোচনা—পরিষদের সদস্যদের বিস্ময়। "নব্য সাহিত্য-ভবন", শ্রীসরস্বতী প্রেস, "স্বদেশ"-অফিস প্রভৃতি বহুস্থানে খানাতল্লাসীর ধুম্।

৫ই…ব্যাঙ্ক বন্ধে ভারতের সর্ব্বত্র আশঙ্কা ও উদ্বেগ।

৮ই…ব্রহ্ম-বিদ্রোহী-মামলার রায়—আরও দুই জনের মৃত্যুদণ্ড—২২ জনের নির্ব্বাসন ও ৩ জনের সশ্রম কারাদণ্ড। "দেশের বাণী" (নোয়াখালী) পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর প্রতি ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় আরও তিন মাস কারাদণ্ডের আদেশ।

১১ই…ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভায় কার্পন অথবা আবগারী শুল্ক সম্বন্ধীয় ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংরক্ষণ সম্পর্কীয় দুইটী বিল পাশ।

১৩ই · কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'প্রাণস্পর্শা আবেদন'এর ফলে হিজলীর রাজবন্দিগণের অনশন ত্যাগ—বন্দীদিগের সহিত সাক্ষাতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে বাধা প্রদান—হাসপাতালে ক'একজনের ভীষণ অবস্থা। প্রেস-বিলের প্রতিবাদকল্পে 'ষ্টেট্‌সম্যান' ভিন্ন সকল দৈনিকপত্র প্রকাশ বন্ধ।

১৬ই…বাঙ্গালার সর্ব্বত্র খানাতল্লাসের হিড়িক—মৈমনসিংহে দুইজন গ্রেপ্তার—মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সুদূর পল্লীতে পুলিশ-বাহিনীর যাত্রা। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেস-বিল পাশ।

১৯এ · কলিকাতায় শান্তিপূর্ণ পিকেটিং। ভিক্ষু উত্তমের ভ্রাতা বৌদ্ধশ্রমণ শিন আহরিয়া ১২৪ক ধারানুযায়ী অভিযুক্ত। মহাত্মা গন্ধীর জন্মতিথি-উৎসবে যোগদান করার অপরাধে ত্রিচুর সহকারী হাইস্কুলের একশত ছাত্রকে বিদ্যালয় হইতে বরখাস্ত

২০এ…হিজলী তদন্ত-কমিটীর চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের হিজলী বন্দীশালার ভিতরে গিয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন।

বৈদেশিক—

২১এ ভাদ্র…মিশরের জাতীয়দল কর্ত্তৃক মহাত্মাজীকে সুয়েজ-বন্দরে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা—জগলুল-পত্নী নাহাস পাশা কর্ত্তৃক অভিনন্দিত।

২২এ কোয়েটায় ভূমিকম্প—৮ সহস্র লোকের গৃহ-ত্যাগ। পার্লামেন্টে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি—হেণ্ডারশন ও ম্যাক্‌ডোনাল্ডের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ—৬০০ দর্শকের উল্লাস-চীৎকার।

২৫এ · মার্সেলিসে মহাত্মাজীর উপস্থিতিতে বিপুল জনতার উল্লাস-ধ্বনি—ভারতীয় ছাত্রদের বিপুল অভ্যর্থনা। বৃটিশ হন্দুরাসে দৈবদুর্য্যোগ—ঘূর্ণীবাত্যার পর বান—৪০০ মৃত্যু এবং বিস্তর ক্ষতি।

২৬এ…লণ্ডন নগরে 'অর্দ্ধনগ্ন রাজদ্রোহী ফকির'এর বিপুল অভ্যর্থনা—কোকষ্টোনে পুলিশ কর্ত্তৃক জনতা-নিয়ন্ত্রণ।

২৭এ…ইউষ্টনে সুহৃদ্‌-মিলন-মন্দিরে শ্রদ্ধানত নরনারীর অর্ঘ্যদান ও মহাত্মাজীকে মানপত্র-প্রদান।

২৮এ—সেণ্ট জেম্‌স প্রাসাদে মহাত্মাজী—যুক্তরাষ্ট্র-গঠন-কমিটীর বৈঠকে প্রথমে যোগদান। অষ্ট্রিয়ায় ক্যাসিষ্ট-বিদ্রোহ—উত্তরাঞ্চলে গোলযোগ—শাসনভার গ্রহণের ঘোষণা—শান্তি প্রতিষ্ঠায় কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যম।

২৯এ…জাতীয় ব্যয়-সঙ্কোচ-বিষয়ক বিল পার্লামেন্টে গৃহীত—৭ কোটি পাউণ্ড ব্যয়হ্রাসের ব্যবস্থা। বার্লিনের রাজপথে ক্যাসিষ্ট বনাম কমিউনিষ্ট দাঙ্গার ফলে ৬৫জন আহত—জনতার উপর পুলিশের লাঠি চালনা—মহিলাগণ পদদলিত।

৩১এ…স্পেনে শ্রমিক গণতন্ত্র ঘোষণা—শাসনতন্ত্রের সংস্কার। পর্ত্তুগীজ নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ—লিস্‌বন ও ওপর্টো নগরীতে সামরিক আইন জারি।

১লা আশ্বিন · চীন ও জাপানে সংগ্রামের সূচনা…৮০ জন চীনা সৈন্য নিহত—মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুকডেনে গোলা বর্ষণ—মাঞ্চুরিয়া-গভর্ণর কর্ত্তৃক চীনাদের অস্ত্র-পরিত্যাগ ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ-গ্রহণের বিরুদ্ধে আদেশ-প্রচার।

৩রা · ইংলণ্ডে দারুণ অর্থনীতিক সঙ্কট—ব্যাঙ্ক হইতে স্বর্ণ বিক্রয় সাময়িকভাবে বন্ধ

৫ই · মহাত্মা গন্ধীর ল্যাঙ্কাশায়ারে উপস্থিতি—ষ্টেশনে ষ্টেশনে দর্শনেচ্ছু নর-নারীর শ্রদ্ধা—দুই দিনের জন্য শ্রমিক-কুলের সহিত আন্তরিক আলাপ।

১০ই…তুরস্কে নূতন সংবাদপত্র-আইন প্রবর্ত্তন—মহিলাদের উপর বিভিন্ন সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের ভার। সোভিয়েট রুশিয়ার অনুকরণে চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১০ বৎসরের জন্য একটী কার্য্যতালিকা প্রস্তুত।

১১ই · বৃটেনের অনুকরণে নরওয়ে ও সুইডেনের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক স্বর্ণখনি পরিত্যাগ—ফলে ব্যাঙ্কে সুদের হার বৃদ্ধি। মুকদেম হইতে পিকিং-যাত্রী ট্রেণের বিপদ্‌—চীনা-দস্যু কর্ত্তৃক ট্রেণ লুণ্ঠ—৩০ জন যাত্রী নিহত—ইঞ্জিন ও পাঁচখানি কামরা লাইনচ্যুত।

১২ই…বৃটিশ বেকারের লর্ড সভায় প্রবেশ করিতে অগ্রসর হওয়ায় অশ্বারোহী পুলিশ কর্ত্তৃক লাঞ্ছনা!

১৬ই…কংগ্রেসকে বাদ দিয়া ভারতের রাষ্ট্ররূপ নিরূপণের কল্পনা—আপোষ মীমাংসার চেষ্টায় নৈরাশ্যজনক পরিণতি। গ্লাসগোতে গুরুতর হাঙ্গামা—৪৯ জন গ্রেপ্তার-বেকার জনতা কর্ত্তৃক দোকান-পাট লুণ্ঠ

২০এ · ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার—শ্রমিকদলের সম্মিলনে মহাত্মাজীকে সমর্থন।

সামাজিক—

২১এ ভাদ্র…জামসেদপুরে শ্রমিক-মহলে চাঞ্চল্য।

২৫এ „ …সাঙ্গরুরে (লাহোর) শিখ মন্দিরে অখণ্ড পাঠ (ধর্ম্মসভা) নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ—৫০০ আকালী গ্রেপ্তার।

১লা আশ্বিন…হিজলী বন্দীশালায় নিহত স্বদেশ-প্রেমিকদের শবদেহ লইয়া কলিকাতায় নর-নারীর বিরাট মিছিল—হাওড়া ষ্টেশনে আগ্রহাকুল বিপুল জনতা—কেওড়াতলার শ্মশানে অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য।

২রা যুক্তপ্রদেশের কৃষক-সমস্যা সম্পর্কীয় কংগ্রেস-তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ।

৫ই…শ্রীনগরে (কাশ্মীর) বিষম চাঞ্চল্য—উত্তেজিত জনতার সেনাবাহিনীকে আক্রমণ—৪ জন নিহত ও ৬ জন আহত—সরকার-পক্ষে ৯০ জন আহত।

১১ই…"কংগ্রেস" (মাদ্রাজ) পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত এম, অন্নপুর্ণিয়ার কারামুক্তি।

১৩ই…পাতিয়ালার মহেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক কে, কে, মুখার্জ্জী দালানের ছাদে নিদ্রিতাবস্থায় আততায়ীহস্তে নিহত—পত্নী ও শিশু কন্যা গুরুতরভাবে আহত—দুর্ব্বৃত্ত গ্রেপ্তার।

১৬ই…মীরাট কলেজে ডাক্তার আন্সারী কর্ত্তৃক স্বর্গীয় মোতীলাল নেহরুর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন।

১৭ই…উল্টাডাঙ্গা ডাকাইতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার ও শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবীর হাজতবাস।

২০এ…সংযুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের এলাহাবাদ ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট্‌ ট্রাষ্ট তুলিয়া দিবার সঙ্কল্প।

সভা-সমিতি—

২৬এ ভাদ্র…শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাদ্বয়কে বাঙ্গলা হইতে বিচ্ছিন্ন করার (১৮৭৪ সালে) স্মৃতিদিবন উদ্‌যাপনার্থে ও উক্ত জেলাদ্বয়কে পুনরায় বাঙ্গলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার উদ্দেশে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে এলবার্ট হলে বিরাট জনসভা।

২৭এ টাউন হলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে চট্টগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে আলোচনা-বৈঠক। এলবার্ট হলে স্বর্গীয় কে, সি, রায়ের শোকসভা। মৃত্যুঞ্জয় বীর যতীন্দ্রনাথ দাসের স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলিকাতার সর্ব্বত্র স্মৃতি-তর্পণের আয়োজন।

৩১এ…লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ষট্‌পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বাঙ্গালার নানাস্থানে সাহিত্যিক সম্মেলনের আয়োজন।

২রা আশ্বিন…ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে হ্যালিডে পার্কে বিরাট্‌ সভা—হিজলীর আত্মোৎসর্গকারিগণের প্রতি কলিকাতাবাসীর শ্রদ্ধা নিবেদন। গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহোৎসব-উপলক্ষে শ্রীরাধাষ্টমী-উৎসব।

৩রা…সংস্কৃত কলেজ-ভবনে রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনা—"কবি-সার্ব্বভৌম" উপাধি দ্বারা কবিগুরুকে অভিনন্দন—অনুষ্ঠানে বহু মনীষীর যোগদান।

৪ঠা স্যর নীলরতন সরকারের সভাপতিত্বে প্রেস-বিল ও হিজলী বন্দীনিবাসে গুলীচালনার প্রতিবাদকল্পে এলবার্ট হলে সংবাদপত্রসেবিগণের বিরাট্‌ সভা।

৯ই কলিকাতা টাউন হলে 'চট্টগ্রাম ও হিজলীর অমানুষিক কাণ্ডের প্রতিবাদকল্পে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে নগরবাসীর বিরাট্‌ সভা।

১০ই রামমোহন লাইব্রেরী হলে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রাজা রামমোহন রায়ের অষ্ট-নবতিতম বার্ষিক স্মৃতিসভা। ঐ উদ্দেশ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে এলবার্ট হলেও মহতী জনসভা। কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে নৈহাটি মিত্রপাড়াস্থ বঙ্কিম পাঠাগার-ভবনে উক্ত পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব।

১১ই…রঙ্গমহল নাট্যপীঠে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাণীকুঞ্জের বাৎসরিক সভার অনুষ্ঠান।

সাহিত্যিক—

১০ই আশ্বিন বাঙ্গালার কৃতি সাহিত্যিক কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরপাড়াস্থিত বাসভবনে পরলোক-গমন।

১২ই…"সাবিত্রী" নাটকের জন্য সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় মহাশয়ের লালগোলার কুমার ধীরেন্দ্র-নারায়ণ রায়ের নিকট হইতে একটী স্বর্ণনির্ম্মিত 'ফাউণ্টেন-পেন' উপহার-প্রাপ্তি।

মিশরের পিরামিড

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী

(১)

মিশরের সর্ব্বত্র সমাধি-মন্দিরের এত বাহুল্য যে কোন কোন পর্য্যটক মিশরকে "কবরের দেশ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মিশরের পিরামিডের নাম শুনে নাই এমন লোকের সংখ্যা অতি অল্প। মিশরে প্রায় ৬০—৭০টী পিরামিড আছে। তন্মধ্যে গীজে (Ghizeh) নগরের তিনটীই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে আবার খুফুর (Khufu) পিরামিডই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা ৪০ বিঘা জমি ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহার পাদদেশের দৈর্ঘ্য ৭৫৫ ফিট, উচ্চতা ৪৮১ ফিট; ১ লক্ষ প্রস্তরখণ্ডে উহা নির্ম্মিত; প্রত্যেক খণ্ডের ওজন ৬৮ মণ কথিত আছে ১ লক্ষ লোক ক্রমাগত ২০ বৎসর কাজ করিয়া এই সুবৃহৎ পিরামিড্‌টী তৈয়ার করিয়াছিল। এই সকল পিরামিড দেখিয়া সকল যুগের পর্য্যটকগণই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। হেরোডোটাস লিখিয়াছেন—'ব্যাবিলোনিয়ার অট্টালিকা প্রভৃতি বাদ দিলে পৃথিবীতে আর এমন কোন অট্টালিকা নাই যাহা মিশরের পিরামিডের মত বিস্ময়কর। রোমের অত্যুচ্চ মন্দিরাদির সহিত পরিচিত Germanicus ও এই সকল পিরামিড দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"Soldiers, forty centuries look down upon you from the top of the pyramids." ফরাসী সৈন্যবৃন্দ, বিগত চল্লিশ শতবর্ষ এই সকল পিরামিডের উপর হইতে তোমাদিগের সমরলীলা দেখিবার জন্য উৎসুক-নেত্রে চাহিয়া আছে।" গ্রীক্ ও রোমক জাতি মিশরের পিরামিডকে পৃথিবীর সপ্ত-আশ্চর্য্যের অন্যতম বলিয়া গণনা করিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও অনেক পণ্ডিত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন—কি করিয়া এরূপ সুবিশাল সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

উপরি-উক্ত গীজে নগরের পিরামিড তিনটী চতুর্থ রাজবংশের পর পর তিন জন রাজা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম—খুফু (Khufu) শাফ্‌রা (Shafra) এবং মেনকৌরা (Menkawra)। পিরামিডসকল কি উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলিয়াছেন। কাহারও মতে পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধির পরিমাপের জন্য পিরামিডসকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবার কাহারও মতে নক্ষত্রাদির গতিবিধি নিরূপণের জন্য ইহাদের নির্ম্মাণ হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে পিরামিডসকল তৈয়ার করা হইয়াছিল মিশরের রাজাদের শব-রক্ষার জন্য। প্রস্তর সিন্ধুকের (Sarcophagus) মধ্যে রাজাদের মৃতদেহ স্থাপিত করিয়া উহা পিরামিডের মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠে রক্ষা করা হইত

এই সকল পিরামিড নির্ম্মাণ করিতে বিস্তর লোকের প্রয়োজন হইত। হেরোডোটাস একটা পিরামিডের সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে উহা নির্ম্মাণ করিতে একলক্ষ লোকের ক্রমাগত ২০ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। মিশরের নিরীহ শ্রমজীবী-সম্প্রদায়কে রাজা নিতান্ত উৎপীড়িত করিয়াই পিরামিড নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।

পিরামিডের বর্ণনা প্রসঙ্গে আর একটা অদ্ভুত বস্তুর বর্ণনা না করিয়া থাকা যায় না। সেটী হইতেছে সুপ্রসিদ্ধ স্ফিঙ্ক্‌স্ (Sphinx) প্রতিমূর্ত্তি। এই প্রতিমূর্ত্তির মুখ মানুষের মত কিন্তু শরীর সিংহের মত লম্বা, কান দুইটী হাতীর কাণের মত সুবিস্তৃত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৮৭ ফিট, উচ্চতায় ৬ ফিট হইবে। দ্বিতীয় পিরামিডের (সাফ্‌রার পিরামিড) সম্মুখ-ভাগে ইহা অবস্থিত। এই বিশালকায় অদ্ভুত মূর্ত্তিটী কি উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা আজিও ঠিকরূপে নিরূপিত হয় নাই। মূর্ত্তিটীর আকার সম্বন্ধেও মতভেদ যথেষ্ট। কেহ বলেন সিংহের মুখ, কেহ বলেন মেষের মুখ, কেহ বলেন রাজার মুখ, কেহ বলেন স্ত্রীলোকের মুখ, আবার কোন

কোন ঐতিহাসিক বলেন ইহা দেবতা হার্মাফিসের (উদিত তপন) প্রতিমূর্ত্তি

(২)

পিরামিডের গাত্রে অনেক রকমের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল চিত্রই পিরামিড-যুগের ঐতিহাসিক উপকরণ। ঐ সকল চিত্র হইতে আমরা তখনকার মিশরী-দের সভ্যতা, ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পকলা, ধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তর জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

ধাতু আবিষ্কারের পূর্ব্বে মিশরীরা রৌদ্রে শুকান ইট দিয়া সমাধি তৈয়ার করিয়া তাহার ভিতরে রাজাদের দেহ রক্ষা করিত। কিন্তু ধাতু আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাধি-নির্ম্মাণে প্রস্তরের ব্যবহার হইতে লাগিল। ধাতুর তৈয়ারী ধারাল অস্ত্রে প্রস্তর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহার সাহায্যে পিরামিডসকল নির্ম্মিত হইত। প্রস্তর-যুগ অবসানের ১৫০ বৎসরের মধ্যেই মিশরীরা গীজের পিরামিডের মত বিরাট্ সমাধিগৃহ নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছিল। এরূপ দ্রুত উন্নতি অন্য কোন দেশের ইতিহাসে দেখা যায় না।

আমরা এক্ষণে পিরামিড-যুগের শাসন-প্রণালী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। মিশরের রাজার প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্যের এই প্রমাণটাই যথেষ্ট যে, তিনি এক লক্ষ লোক দ্বারা পিরামিড নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগের ২০ বৎসরের খাওয়ার বন্দোবস্তও করিয়া-ছিলেন। লোকে তাহাকে এরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত যে, তাহার নামোল্লেখ না করিয়া তিনি যে প্রাসাদে বাস করিতেন তাহার উল্লেখ করিত। মিশরী ভাষায় রাজার নাম "ফেরা-ও (Pharaoh) উহার প্রকৃত অর্থ "প্রকাণ্ড ভবন"। ফেরাওর কর-সংগ্রাহক কর্ম্মচারী ছিল। তাহারা সমগ্র মিশরদেশের কর আদায় করিত। প্রয়োজন হইলে তাহারা বিচারও করিত। পূর্ত্তবিভাগে বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। তখনও মুদ্রার প্রচলন হয় নাই, কাজেই শস্য, মদ্য, মধু, বস্ত্র প্রভৃতি কর স্বরূপে গ্রহণ করা হইত। রাজভাণ্ডারে এই সকল জমা থাকিত।

রাজধানীর সকল গৃহই 'রোদে-পোড়া' ইটে তৈরী, ছাদ কাঠের। রাজবাড়ীর চারিদিকে সুরম্য উদ্যান ছিল। রাজবাটী ব্যতীত রাজধানীতে কর্ম্মচারিগণের আবাসগৃহ, কার্য্যালয় প্রভৃতিও ছিল।

বিশালাকৃতি পিরামিড্ নির্ম্মাণের প্রথা ষষ্ঠরাজবংশ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী রাজবংশের নৃপতিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে জনসাধারণের বিশেষ ক্ষতি হইত না। অধিকন্তু তখন শ্রমিক-দের মজুরীও বাড়িয়াছিল। এই সময়ে মিশরের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রীতদাসের সংখ্যা অতি অল্প। শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের কার্য্যের প্রসারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল মোটের উপর এই সময়টাকে মিশরের 'সত্যযুগ' (Golden age) বলিয়া ধরা যায়। সর্ব্বত্রই বেশ শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছিল। বাহির হইতে কোন আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না। মিশরও দিগ্বিজয়ের কোন প্রয়োজন অনুভব করে নাই। তবে মাঝে মাঝে যে দক্ষিণদেশের নিগ্রোদের উপরে এবং পূর্ব্বদেশের যাযাবর জাতিদের উপর আক্রমণ হইত, সেটা শুধু মিশরের ক্ষাত্রতেজকে উদ্দীপিত রাখিবার জন্য। বস্তুতঃ এই সময়ে মিশরের শক্তি অন্য কোনদিকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া শুধু তাহার আর্থিক ও শিল্পোন্নতি-বিধানেয় জন্যই সমগ্রভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল

(৩)

পিরামিড হইতে স্খলিত কয়েকখানা প্রস্তর হইতে জানা গিয়াছে যে খৃঃ পূঃ অষ্টবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিশরের ফেরাওগণ (Pharaoh) ফিনিশিয়ার উপকূল-ভাগে বানিজ্য-জাহাজ প্রেরণ করিতেন। উক্ত প্রস্তর-খণ্ডসমূহের মধ্যে আমরা সমুদ্রগামী জাহাজের যে প্রতি-মূর্ত্তি পাই তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। খৃঃ পূঃ ত্রিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'ফেরাও' লেবাননের প্রসিদ্ধ Cedar কাষ্ঠ আনিবার জন্য ৪০খানা জাহাজ প্রেরণ করিয়াছিলেন। শেষ প্রস্তরযুগে এ সকল মিশরী জাহাজই ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগে সভ্যতা প্রচার করিয়াছিল। আফ্রিকার দক্ষিণভাগেও মিশরী বাণিজ্য প্রসারলাভ করিয়াছিল। মিশররাজ সুদানের আদিম অধিবাসীদের সহিত বানিজ্যের জন্য গাধা বোঝাই করিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রেরণ করিতেন আর তাহাদিগের নিকট হইতে হাতীর দাঁত, উট পাখীর পালক, নানা প্রকার ধূপ ইত্যাদি গ্রহণ করিতেন।
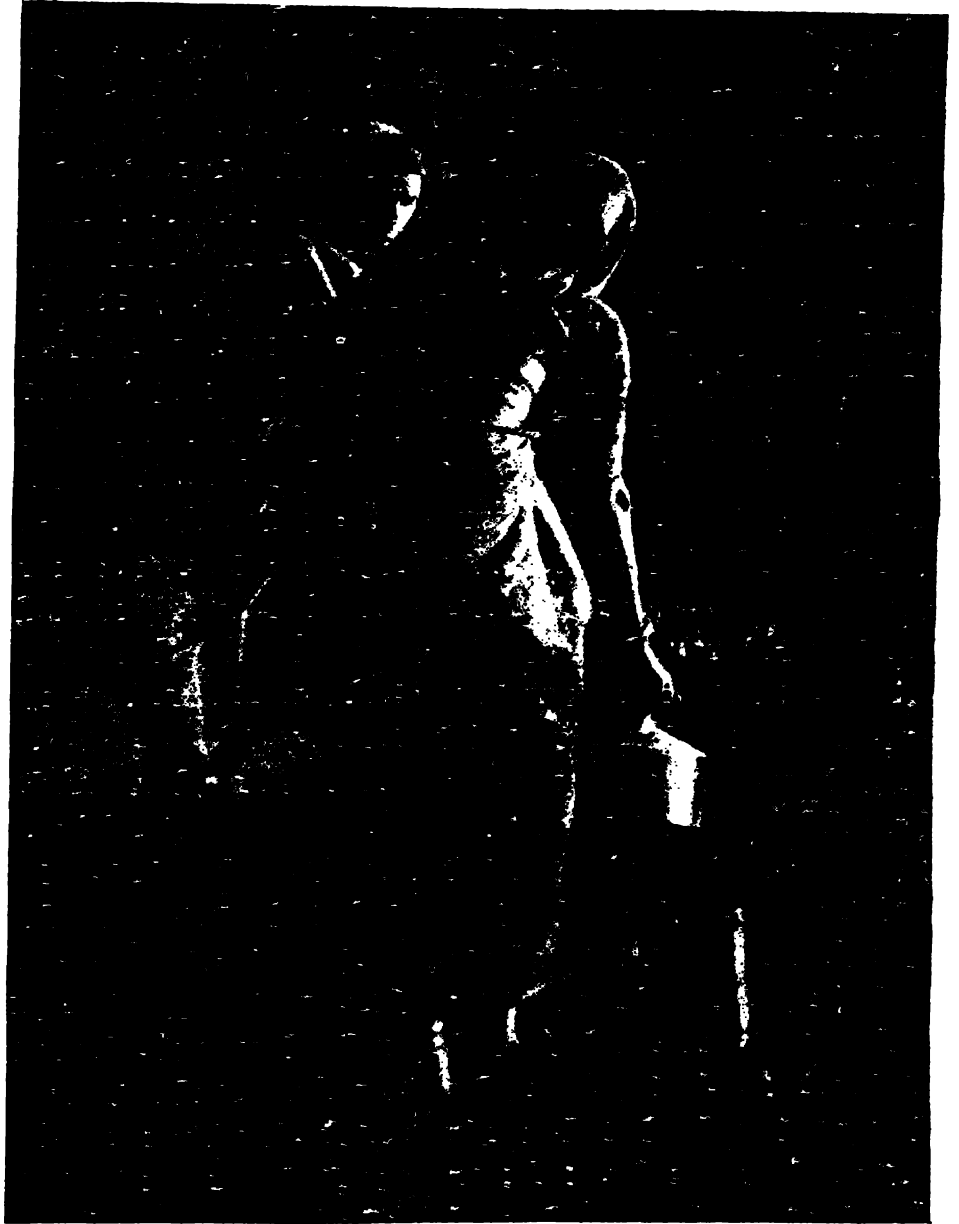
আলো ও ছায়া

শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

UNO PRINTING WORKS' CALCUTTA.

দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক বণিকের প্রাণাত্যয় ঘটিয়াছিল, কোন কোন স্থলে তাহাদিগের অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লোহিত সাগরের দাক্ষণভাগের সহিত সহজে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মিশরীরা একটা খাল কাটিয়া নীলনদ ও লোহিত সাগরের সংযোগ করিয়া দিয়াছিল। বর্ত্তমান সুয়েজ খালের এই প্রাচীন সংস্করণটী ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে খনিত হইয়াছিল।

পিরামিডের মধ্যে একটা পৃথক্ কোঠায় মৃত ব্যক্তির জন্য বিবিধ খাদ্য ও পানীয় সঞ্চিত রাখা হইত। মিশরীদের বিশ্বাস ছিল যে, প্রেতাত্মা প্রত্যহ কবর হইতে উঠিয়া ঐস্থানে আসিয়া আত্মীয় কর্ত্তৃক রক্ষিত খাদ্যপানীয় গ্রহণ করিয়া ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ করিবে। তাহার সময়ে দৈনন্দিন জীবনে যে সকল ঘটনা মোটামুটি ঘটিত তাহাদের একটা জীবন্ত চিত্রও ঐ কোঠার দেয়ালের উপর অঙ্কিত থাকিত। ঐ সকল চিত্র হইতে আমরা প্রায় ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরীরা কি ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা পাই।

ঐ সময়ে অশ্বের প্রচলন হয় নাই। ভূমিকর্ষণ, ভারবহন, এই উভয় কর্ম্মেই গরু নিযুক্ত হইত। কোন কোন স্থানে ভারবহনের জন্য গর্দ্দভও নিযুক্ত হইত। পূর্ব্বে কুম্ভকারেরা হাত দিয়া ঘট তৈয়ার করিত। এক্ষণে কুম্ভকারেরা চক্র সাহায্যে তাহা করিতে লাগিল। স্ত্রীলোক-গণ চরকাতে অতি সুন্দর সূক্ষ্ম সূতা কাটিত। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বিনিময়ে কাজ চলিত। মুদ্রার তখনও আবিষ্কার হয় নাই। তবে রাজপ্রাসাদে নির্দ্দিষ্ট ওজনের সোনার আংটী দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদান চলিত। কখন কখন তামার আংটীও ব্যবহৃত হইত। এই সকল আংটী মুদ্রারই অগ্রদূত। পিরামিড-যুগে সমাজে তিন শ্রেণী

এবং (৩) কুলীন বংশ

নিযুক্ত ছিল।

পিরামিড-যুগে মিশরে চিত্র হইয়াছিল, তাহা না হইলে এ নির্ম্মাণ সম্ভবপর হইত না। দেখিলে এখনও জীবন্ত পৃথিবীর কোন দেশে নির্ম্মিত হয় নাই—ঐতিহাসিকে করিয়াছেন।

(৪)

আমরা এক্ষণে পিরামিড-যুগের ধর্ম্ম আলোচনা করিব। মিশরীরা অনে করিত। তাহাদের মধ্যে দুইজন দেব নাম 'রি,' অপরের নাম 'ওসিরিস' হিন্দু আর্য্যগণের ন্যায় মিশরিগণও করিত। নীলনদ তাহার সলিল উর্ব্বর করিয়া দেয়। ঐ শান্তিতে জীবন ধারণ শান্তিময় জীবন—এই তিন একজন আছেন, তাহারই নাম "ওসিরিস্"। ঋষিগণের মত একই ভাবে "ওসিরিসের" নিকট প্রার্থনা ইহকালে খাদ্যপ্রদান করিয়া পরকালেও আমাদিগকে ... করিও।" মিশরীদের এ প্রার্থনা-মন্ত্র ... বৈদিক ঋষির নিম্নলিখিত ঋগ্ মন্ত্রটীকে স্মরণ করাইয়া দেয়;—

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে ...

... ।"

সম্মোহিতা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী উষা মিত্র

আট

যুধিষ্ঠির পাশায় সর্ব্বস্ব হারিয়েছেন শুনিয়াও বুঝি দ্রৌপদীর মুখা..তের এত বড় পরিবর্ত্তন হয় নাই, একঘর লোকের সম্মুখে দেবরের মুখ হইতে কথাটা শুনিয়া কুন্তলা যেন বজ্রাহত দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় পাংশু হইয়া উঠিল। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-নিমন্ত্রণে আগত জিতেন ও নরেনকে পরিতোষ-রূপে ভোজন করাইয়া সবেমাত্র এক গ্রাস অন্ন মুখে দিতে গিয়া শুনিল জমীদার উহাকে আহ্বান করিতেছেন। বিস্ময়ের সহিত উহারই পরিত্যক্ত বাস-ভবনের দ্বারদেশে ...সিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য জানাইল—বৈঠকে তাহাকে ...ইতে আদেশ হইয়াছে। লম্পট-পরিবৃত রমেনের ...ড় করাইয়া ভৃত্য সরিয়া গেল। কিন্তু উহার ... এত বড় চক্র—অপমানের এমন ভীষণ প্রণালী ...ইয়াছে ইহা কুন্তলা ধারণাতে আনিতে পারে ...দার বলিল, "কি, কথা কচ্ছ না যে বৌঠান, আমি ... করেছি—তোমার পেয়ারের ঐ লম্পট ছোঁড়া ...ন গিছলে তার সাহায্য করতে?"

৮০

কুন্তলা ... কহিতে পারিল না—মৌন হাহাকারে উহার অন্তর ব্যাপিয়া উঠিল। অধৈর্য্য রমেন চীৎকার করিয়া উঠিল—"উত্তর দাও, কেন কিসের জন্যে গিছলে তুমি।"

জোর করিয়া সকল জড়তা সরাইয়া ধীরকণ্ঠে কুন্তলা বলিল—"আমি নারী এ কথা ভুলোনা ঠাকুরপো, তাই নারীর আহ্বান অবহেলা করতে পারি নে।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া রমেন বলিল—"তোমার পরিচয় পেয়েছি কিন্তু আমার প্রজা—যাকে একঘরে করেছি—কি অধিকার আছে তোমার তার সাহায্য করবার!"

বেদনা-ভরা হাসি হাসিয়া কুন্তলা বলিল,—"অধিকার আমার আছে, সে কথা ভুললে যে চলবে না আজ।"

অসহিষ্ণু জমীদার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—"জানতে চাই কি সে অধিকার বুঝিয়ে দাও—বল শীগগীর।"

সংযত কণ্ঠে কুন্তলা উত্তর দিল, "সে অধিকার স্বামীর স্বত্বের অধিকার—নারীর অধিকার,—সন্তানের জননীর অধিকার—ভগিনীর অধিকার—জমীদার বধূর অধিকার—বাড়ীর কর্ত্রী ঠাকরুণের অধিকার।"

একটু বক্র হাসিয়া রমেন বলিল, "বাঃ বাঃ বেশ বলেছ কিন্তু এতগুলো অধিকার কবে কে দিল তোমায়?"

গর্ব্বভরে কুন্তলা বলিল,—এ গুলো আমার নিজস্ব সম্পত্তি ঠাকুরপো—দেবতার দান; নিমিত্ত মাত্র আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় তোমার বাবা হয়েছিলেন, তিনি আজ না থাকলেও আমার সেই অধিকারগুলো তেমনই অক্ষত অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। সব হারিয়েছি কিন্তু অধিকার হারাইনি আজও—ও গুলা ঠিক একই ভাবে রয়েছে, এ খাঁটি সত্য। তুমি জোর করে আমাকে আড়ালে ঠেলে দিলেও সরবে না ও-গুলো।" নির্লজ্জ রমেন জোর করিয়া একটু হাসিল,—"সেই অধিকারের জোরে বুঝি ভাই পরিচয়ে নরেন ছোঁড়াকে আর এক ছোঁড়াকে ঘরে ঢুকিয়েছে? কে হয় ওরা? তোমার সে কথা বলতে হয় ত আপত্তি নেই।"

এই শ্লেষ, এই কুৎসিত ইঙ্গিত কুন্তলাকে বিঁধিল। উহার দেহ কাঁপিয়া উঠিল—অণুতে পরমাণুতে উগ্র বিষ ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এত বড় ঘৃণ্য কথার কি উত্তর দিবে সে! মানুষের স্পর্দ্ধা যখন ভাষা পায় তার নীচতা, সঙ্কীর্ণতা, হৃদয়হীনতার সঙ্গে মিশিয়া সে যে কি বীভৎস ব্যাপার হইয়া ওঠে আজ কুন্তলা তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে

বুঝিল—অনুভব করিয়া মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া রমেনের মুখের দিকে চাহিয়া দীপ্তকণ্ঠে ডাকিল—"ঠাকুরপো!" ঐ মহীয়সী রমণীর দিকে রমেন চাহিয়া থাকিতে পারিল না। আপন হইতে দৃষ্টি উহার নত হইয়া পড়িল। পার্শ্বে উপবিষ্ট বিনয় জমীদারের কর্ণে কি বলিল—পর মুহূর্ত্তে রমেনের অপ্রস্তুত মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া কঠোর হইয়া উঠিল,—"না—না তোমায় বলতে হ'বে ওরা তোমার কে—কিসের সম্বন্ধ ওদের সঙ্গে।"

শান্তকণ্ঠে কুন্তলা উত্তর দিল, "তোমার আর একটা কথারও উত্তর দিতে পারব না ঠাকুরপো।"

"কেন?"

"তোমার ভাই—আমার মৃত স্বামীর আত্মার অবমাননা করা হ'বে বলে আর আমার নারীর মর্য্যাদায়—স্ত্রীর মর্য্যাদায় আঘাত লাগবে বলে।"

"তোমার লেকচার শুনতে ডাকি নি, মাত্র এক কথায় বলে যাও ওরা তোমার কে?"

বিরক্তস্বরে কুন্তলা বলিল, "ওরা আমার কে এ কথা আমার চেয়েও তুমি ভাল জান, কারণ সে ঘটনা এখন তেমন পুরাণো হয় নি।"

"বল এক কথা, কে ওরা তোমার—কি অধিকারে ঘরে এনেছ।"

"তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এই এক ঘর লম্পটের সামনে এক বিধবাকে অপমান করবার তোমারই বা কি অধিকার আছে? কথা বল—মুখ তোল ঠাকুরপো—কত তুচ্ছ কারণে কাকে কি বলছ আজ? এত শীগগীর এত বড় অধঃপতন কেমন করে হ'ল তোমার, উত্তর দাও চুপ করে থেক না।"

রমেনের মুখ কালো হইয়া উঠিল, কি বলিতে গিয়া কুন্তলার অকুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল। উহার মনে হইতে লাগিল কুন্তলার মধ্য হইতে কি এক স্বর্গীয় দীপ্তি তীরবেগে বাহির হইয়া উহার প্রগলভ পাশব বৃত্তিগুলিকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে। রমেনকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া বিনয় উহাকে ঠেলা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"ছিঃ মেয়ে মানুষের সামনে কথা খুঁজে পেলে না উত্তর দিতে বল ওঁকে নরেন ওর—"

"চুপ কর্ শয়তান।"

পার্শ্বে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি গর্জ্জিয়া উঠিয়া বিনয়ের আত্মরক্ষার অবসর না দিয়া উহার গলা চাপিয়া ধরিল।

নম্রকণ্ঠে কুন্তলা বলিল, "ছেড়ে দাও ভাই, এর কিছু দোষ নেই।"

বিনয় উহার কবল হইতে মুক্ত হইয়া অপমানে ক্রোধে লজ্জায় রমেনের অবনত মুখের প্রতি চাহিয়া ফুলিতে লাগিল। ভদ্রব্যক্তি রমেনের অবনত মুখের দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া ঘৃণাভরে বলিলেন, "ছি! ছি! তুমি জমীদার—এত নীচ? নিজের ভাইয়ের স্ত্রী—এক বিধবা মেয়েকে এই শয়তানগুলোর সামনে কুৎসিতভাবে মিথ্যে করে আঘাত করতে লজ্জা বোধ করলে না? বিবেক বলে, কর্ত্তব্য বলে, ন্যায় বলে কিছু কি নেই? ভেতরটা তোমার এত বড় পশুত্বে ভরা? আর জমীদারের পালিত এই কুকুরগুলো!" দৃষ্টি ফিরাইয়া কুন্তলার প্রতি ভক্তিনম্র নেত্র স্থাপিত করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "মা, এত আঘাত নারী যে হাসিমুখে—সহিষ্ণুতার সঙ্গে সইতে পারে এ আজ প্রথম দেখলুম। একটু পায়ের ধুলো দাও মা, নিয়ে যাব তোমার বোনেদের জন্য। শত শত রমেন চৌধুরীর সাধ্য নেই তোমায় অপমানে বিঁধবার,—তোমায় চেনবার ওদের কি শক্তি আছে মা! চল মা আর এখানে দাঁড়িও না।" দন্তে অধর চাপিয়া রক্তনেত্রে কুন্তলার গমনরতা মূর্ত্তির পানে চাহিয়া জমীদার মনে মনে উহাকে জব্দ করিবার প্রতিজ্ঞা করিল। এ গর্ব্বিতা নারীকে সমুচিত শাস্তি দিতে না পারিলে বন্ধুমহলে মুখ দেখান দুষ্কর হইয়া উঠিবে। হারিলে যে চলিবে না—উহার স্নেহাস্পদদিগকে দলিয়া পিসিয়া মারিতে হইবে। সকল কার্য্যে বাধা দিবার অগ্রণী হইতেছে ঐ নারী—কি তাহার শক্তি, যে শক্তির নিকট উহার ন্যায় দুর্দ্দান্তকেও আজ বাক্যহীন—লজ্জিত—পরাজিত হইতে হইল। কিন্তু অন্তকার এই লজ্জা—এই পরাজয়ের অপমান, এক ঘর বন্ধুর সম্মুখে এ লজ্জা উহাকে তেমনভাবে বিঁধিতে পারিল না, বরং তাহার অশান্ত হৃদয়মধ্যে এইটুকু সান্ত্বনা জাগিয়া উঠিতেছিল যে, তাহার বৌঠান তো কোন অন্যায় কথা বলেন নাই—বাস্তবিক অধিকারে আপনার বাড়ীর বধূকে সে সাধারণ

বৈঠকখানায় উপস্থিত করিয়াছি। কুন্তলা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনকার মত বন্ধুদিগকে বিদায় করিয়া রমেন বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

* * *

ব্যথিত বিবর্ণমুখে কুন্তলা যখন ফিরিয়া আসিল একটু আশ্চর্য্য হইয়া নরেন জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে তোমার? কেন ডেকেছিলেন রমেনবাবু?"

ম্লান হাসিয়া সে কহিল, "এমনি।" সেই মুহূর্ত্তে ঝোড়ো হাওয়ার ন্যায় বেগে গৃহে প্রবেশ করিয়া উত্তপ্তকণ্ঠে ইলা বলিল—"কেন তুমি রোজ রোজ এত অপমান সহ্য কর বৌদি?"

জোর করিয়া ঐ দুর্দ্দান্ত মেয়েটাকে ক্রোড়ে টানিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বাষ্পজড়িত কণ্ঠে কুন্তলা বলিল, —"কেউ আমায় অপমান করে নি ইলা।"

"করে নি? মিথ্যে বাদী, দাদা তোমায় যা সব বলেছে—সব শুনেছি—তখন বাড়ী ছিলুম না—সইয়ের দাদা সব বলেছে"।

"সে আর অপমান কিরে! তুই আজ সারাদিন কোথায় ছিলি"।

কুন্তলা সেই লজ্জাকর ব্যাপার জিতেনের সম্মুখে বাধা দিতে চাহিতেছিল।

"অপমান নয়? কি বলছ বৌদি! জিতেন বাবু—নরেন বাবুকে নিয়ে কি সব বিশ্রী কথা তোমায় বলেছেন। না না, এ তুমি সইতে পার, আমি সইব না বলে দিচ্ছি। কিছু কি শুনতে পাও না? গাঁয়ের সবাই কত কি বলছে তোমার নামে। কেন, কিসের জন্যে এত অপমান সহ্য কর? দাদা বড় বাড়িয়ে তুলেছেন দিন দিন, সইয়ের দাদা বলছিলেন—নালিস করলে এক্ষুনি অর্দ্ধেক বিষয় পাবে তুমি—দাদার সব চালাকি বেরিয়ে যাবে। না বৌদি মুখ চেপ না। আমি সবার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছি—কাদির মা—শ্যামলার পিসি এদের সবার সঙ্গে। ঐ বুড়ী ডাইনী কি বললে জান? জিতেন বাবু—"

শুষ্কমুখে কুন্তলা একবার চাহিল—"চুপ কর ইলা।" জিতেন আড়ষ্ট-কণ্ঠ হইয়া উঠিল। নরেন অসহ্য বিস্ময়ে উহাদিগের দিকে চাহিয়া রহিল। লজ্জায় অপমানে কুন্তলার মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। চপল বালিকা কি এ করিয়া বসিল। "চুপ তুমি কর বৌদি—কি অধিকার আছে তাদের—তোমার নামে যা তা বলবার?"

"বললেই বা,—দুটো কি সইতে পারব না—সইবার জন্যেই যে আমাদের জন্ম ইলি, এ কথা কখনও ভুলে যাস না।"

"আমরাই শুধু সইব আর পুরুষটা।"

স্নিগ্ধস্বরে কুন্তলা বলিল,—"তাদের কি এত বড় ক্ষমাশীল প্রাণ আছে রে পাগলি।"

"না—না, যা মিথ্যে তা কেন আমরা সইব—কেন তারা যা তা বলবে।"

মৃদু হাসিয়া কুন্তলা করুণ স্বরে বলিল, "তাদের দোষ কিছু নেই—ঐটুকুই যে পাওনা আমার তাদের কাছে।"

"এই তোমার পাওনা—কি বলছ বৌদি? যে জিতেন-বাবু নরেন বাবুকে ভাই বল—"

কুন্তলার আর্ত্তকণ্ঠে গৃহস্থিত সকলে চমকিত হইয়া উঠিল। "থাম্ ইলা—পাগল হয়েছিস্ তাই আজ এখানে আর কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না!"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ইলা বলিল,—"থাকলেই বা কেবলই—"।

"কে এঁরা জানিস?"

উপেক্ষা ভরে সে বলিল,—"না"

"এ দুটী আমার ভাই—ঐটী নরেন এ জিতেন"

একটু লজ্জিত হইয়া ইলা বলিল,—"ওঁদের বারণ করে দাও এখানে আসতে।"

'ইলা—ইলা।' এ কণ্ঠস্বর জিতেন চিনিত, কত বড় আঘাতে যে মানবের কণ্ঠে এমন ব্যথা ভরা করুণ স্বর ফুটে ওঠা সম্ভব ইহা বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিল। শুধু চক্ষুর একটু তৃপ্তি-সাধন করিয়া এক মহৎ প্রাণকে অপমানে এবং আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তুলিয়াছে—আজ কথাটা বুঝিতে পারিয়া সুগভীর ব্যথার ধিক্কারে তাহার অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। বেদনায় বোধ-শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিল। এ কোথায়—কোন আলেয়ার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে সে! মরণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই যে!

বাস্তবের রূঢ় নির্ম্মম আঘাতে হঠাৎ যে সত্যটুকু অভাবনীয়রূপে আবিষ্কার হইয়া পড়িল—উহার নিজের অন্তরে উহার মধ্যে অধিক যত বিষই থাকুক, যত বড় কটূক্তিই থাকুক, উহারই মধ্যে যে সুখ-সান্ত্বনা প্রচ্ছন্ন ছিল—পরম আগ্রহে জিতেন উহাকে অন্তরে চাপিয়া ধরিল। সাময়িক উত্তেজনা কিঞ্চিৎ উপশমিত হইলে অপরাধীর ন্যায় জিতেন মুখ তুলিল। "খাবার করতে হবে যে ভুলেই গেছি" বলিয়া সেই মুহূর্ত্তে কোন দিকে না চাহিয়া ইলাকে সঙ্গে লইয়া কুন্তলা উঠিয়া পড়িল।

কুন্তলা যখন ফিরিল উহার মুখের সকল বিরাগ সমুদয় বিষণ্ণতা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যেন কোন কিছু হয় নাই—এমনই ভাবে হাসিয়া কুন্তলা বলিল,—"বাঃ—এখনও যে বসেই আছ, হাতে মুখে জল দিয়ে এস—চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" চায়ের বাটী দুটা রাখিয়া ইলার হস্তস্থিত খাবারের রেকাব দুখানা নামাইতে নামাইতে বলিল,—"ইলা পারিস যদি রাতে একবার আসিস্।"

উত্তরে সে বলিল, "আসব।"

এমন নির্ম্মম আঘাতের পরও যে নারী নিজেকে অবিচলিত, শান্ত, সংযত করিয়া রাখিতে পারে—কি মহৎ উপাদানে তাহার হৃদয় গঠিত! মুগ্ধবিস্ময়ে জিতেন ভাবিল এ নারীচিত্ত গঠন কালে ভুলক্রমে বিধাতা পাথরের টুকরা প্রবেশ করাইয়া দেন নাই তো। ভক্তিতে উহার মস্তক নত হইয়া ঐ দীনা রমণীর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া ধন্য হইতে চাহিল। নরেন বিবর্ণ মুখে বলিল,—"আমরা যাই দিদি, যেখানে থাকি তোমার ছোট ভাইকে একবার ডাক দিলেই এসে হাজির হ'ব।"

"তুমি কি এমনি করে হৃদয়হীন লোকগুলোকে জয়ের টীকা পরা'তে চাও ঠাকুরপো?"

"তার মানে?"

"এতে যে মিথ্যেকে স্বীকার করে নেওয়া হ'বে,—বুঝছ না কেন? তোমার দিদিকে সবারি সামনে হীন-ঘৃণিত প্রতিপন্ন করতে চাও? তাদের তুমি,—তুমিও সাহায্য করতে চাও?"

উহার পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে নরেন বলিল,—"তোমায় হীন—ঘৃণিত প্রতিপন্ন করব আমি? কত যে ক্ষুদ্র আমি এতো জাননা দিদি, আমার দিদিকে কতখানি ভালবাসি সে যে জান না তুমি—কত বেশী ভক্তি শ্রদ্ধা করি—কত—" বেদনায় উহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল।

স্নেহে বড় ভগিনীরই ন্যায় বসিয়া পড়িয়া উহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া কেশের মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে তরল কণ্ঠে কুন্তলা বলিল,—"তবে কেন চলে যেতে চাইছিলে? কেন আর আসতে চাচ্ছিলে না তুমি? বুঝছ না এতে তোমার দিদিকে কত বড় হীনতা স্বীকার করিয়ে দিতে চাচ্ছ। কিন্তু জিতেনকে না হয় এন না সমাজ—" জিতেন হাসিয়া উঠিল। এতক্ষণ পরে হাসিতে পারিয়া তাহার মন কিছু হাল্‌কা হইল।

"তুমি না বললেও জোর করে আসব।"

মিষ্ট হাসিয়া কুন্তলা বলিল,—"যে দিন তোমায় ভাই বলে স্বীকার করেছি—সেইদিন নিষেধ করবার অধিকারও যে হারিয়েছি জিতেন!"

"একটা কথা বলব দিদি?"

"না আজ থাক ভাই।"

"না আজই তোমায় শুনতে হ'বে—কেন তুমি নিজের ন্যায্য পাওনা-গুলো বুঝে নিচ্ছ না—কেন এত অত্যাচার সহ্য কর?"

"কি করব ভাই?"

"কেন উপায় যে রয়েইছে,—তা ছাড়া এত বড় বিষয় পেলে সকলে তোমায় ভয় করে তোমার প্রাপ্য সম্মান করে চলবে—নিত্য অপমানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।"

কুন্তলা একটুকু হাসিল মাত্র

"না, তোমার ও হাসিতে ভুলব না—একবার অনুমতি দাও দিদি।"

"কিন্তু এযে হবার নয়!"

"কেন নয়?"

"প্রথম বাধা—ঘুস দিয়ে নিজের সম্মান বজায় রাখতে চাই না—ছিঃ সে বড় বিশ্রী—দ্বিতীয় তিনি আমার স্বামীর ভাই।"

"বিস্ময়-বিমুগ্ধ জিতেন বলিল,—"সত্যিই তোমাকে চেনা বড় শক্ত—তবে যে সেদিন অত তর্ক করলে—

অন্যায়ের বিরুদ্ধে—স্বামীকে না কি দেবত্ব দেওয়া যায় না—এ সব তবে মুখের কথা ?”

“স্বামী যে আমাদের দেবতা এ কথা অস্বীকার করবার মত সাহস আমার নেই ভাই—কিন্তু আমার মতে পশুর অধম যে স্বামী তাকে কেউ দেবত্ব দিতে পারে না—তা সে তোমাদের সীতা-সাবিত্রীর যত চিত্রই চোখের সামনে ধরনা কেন—তাই বলে যে আমার স্বামীও সেই দলের ছিলেন এমন কি কিছু বলেছি ? আমার স্বামী বলে বলছি না সত্যই তিনি দেবতা ছিলেন, জিতেন।”

“এত বড় অত্যেচারেও ? এতে যে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়—বাস্তব বলে স্বীকার করা হয়।”

“ভুল বুঝ না, স্বীকার করা হ’ত তখন যখন তোমাদের এখানে আসতে নিষেধ করে দিতুম—মেনে নেওয়া হত তখন যখন না কি তার বিরুদ্ধে তাঁর ভাইয়ের বিষয়ের জন্তে উত্যক্ত করা হ’ত। আমার স্বামীর বড় স্নেহাস্পদ ছোট ভাই তার একটুকু অন্যায়ে কি আমায় বিচলিত হ’য়ে তাকে অপদস্থ করা উচিত ? সত্যি কখন লুকান থাকে না ভাই, কোনদিন একটুখানি ফাঁকের মাঝে সে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করবেই করবে।

“না দিদি, তোমার মতের সমর্থন করতে পারছি না, অন্যায় যা তা চিরকালই অন্যায়।”

“আজ তোমার দিদির উপর অন্যায় হচ্ছে বলে সইতে পারছ না ভাই কিন্তু—এই তুমিই—সে দিন শিবানীর কথায়—অত বড় অন্যায়কেও ন্যায় বলে—সমাজের নিয়ম বলে সমর্থন করতে কুণ্ঠিত হও নি,—মানুষের স্বভাবই এইরূপ।”

‘অর্থাৎ বিনা বাধায় তাকে সমাজে তুলে নিতে হ’বে ?”

“হুঁ।”

“তুমি শাস্ত্র এবং সমাজ এ দুটোর শাসন মাননা তা’হলে ?”

“মানি কিন্তু সব নয়।”

“মানে ?”

“এই মাত্র তুমিই স্বীকার করছ অন্যায় যা তা চিরকাল অন্যায়।”

“করছি—কিন্তু তোমাতে আর শিবানীতে সমান হ’তে পারে না—।”

“কেন ?”

“তার কথা আলাদা, আমরা মানতে বাধ্য—কারণ নিয়ম ভাঙ্গবার অধিকার কাহারও নেই—আজ যদি সমাজের শাসন না মানি তবে কাল দেখ প্রলয় অবশ্যম্ভাবী। কেন এ বুঝনা দিদি।”

“তার অপরাধ ইচ্ছে করে নয়, বরং জোর করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়ে ছিল, আমার সেটা হ’ল কিনা গোপনীয় আচ্ছা জিতেন,—ঠাকুরপোর ইঙ্গিত মানে…”

“দিদি !”

“থাম তুমি—মনে কিছু ভাবাও পাপ তো—একবার একটুখানি চিন্তা—একটু খুব ছোট্ট একটু ভুল—”

“হ্যাঁ—পাপ, কি বলতে চাও তুমি—”

শান্তভাবে কুন্তলা কহিল, “কিন্তু এমন মানুষ কি তুমি দেখাতে পার যে কোন দিন ভুল করেনি—তোমাদের অত বড় বুদ্ধই যে ভুল করে গেছেন ”

হাসিয়া জিতেন বলিল,—“বুদ্ধ কি ভুল করেছিলেন দিদি ?”

‘ভুল না করলে আর এত শীগগীর বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত থেকে লোপ পেতে বসত না—কিন্তু সমাজের নিয়ম কি শুধু মেয়েদের জন্যে—পুরুষদের জন্যে নয় ?”

“থাকবে না কেন তাদেরও মানা উচিত।”

“কটা পুরুষ মেনে থাকে ?”

“তারা মানবে না বলে কি স্ত্রীলোকও সে দলে যাবে ? ধ্বংসের যেটুকু বাকি আছে সে টুকুও যে ভরে উঠবে তা হ’লে। নারীকে এক প্রধান—”

“চুপ কর জিতেন—শোন—”

“না তুমি শোনো দিকি শিবানীর কথা—হাঁ সমাজের অন্যায়—”

“ন্যায় হয়েছে বলছ ? পুরুষ স্বার্থপর—কি বুঝবে তুমি নারীর হাহাকার—কি জানবে তুমি তাদের মর্ম্মবেদনার কথা। সমাজ—সমাজ শুধু লাঞ্ছনা অপমান অত্যাচার আর তীব্র দণ্ড শাস্তি দিতেই আছে। অসহায় নারী অভিশপ্ত লাঞ্ছিত জীবন নিয়ে সামান্য একটু কোণে যে দাঁড়াবে তারও

উপায় রাখ না। শিবানীর কথা ছেড়ে দাও—মস্ত অন্যায় স্বীকার কর আর না কর এমন অনেক মেয়ে আছে যারা জীবনে ভুল করছে কিন্তু লুকিয়ে যদি রাখতে পারলে আর ভাল যদি প্রকাশ হ'ল তবেই সর্ব্বনাশ, অথবা শাস্ত্র বলতে মনে পাপ চিন্তা উদয় হওয়া পাপ। তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, মানুষ দুর্ব্বল—স্বভাব কোনদিন তার বদলাবে না বা বদলাতে পারে না। যদি একটাও সে ভুল করে—অত কথায় কাজ কি—তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি তিনিও তো মস্ত ভুল—"

"চোখে মুখে চটুল হাসি মাখাইয়া জিতেন জিজ্ঞাসা করিল,—তিনি আবার কি ভুল করলেন ?"

"হাঁ আমি বলি আর তুমি হাস।"

"সত্যি হাসব না—বল না দিদি !"

"সাপ জিনিসটা দেখতে কত সুন্দর অথচ তাকেই এমন ভাবে সৃষ্টি করলেন যে, তার দিকে চায় কার সাধ্যি—এ ভুল নয় ? এখুনি তো তর্কের তুফানে কতকগুলো কারণ বার করবে জানি—কিন্তু এটা তাঁর মস্ত ভুল। হাঁ তিনিই যখন ভুল করলেন তখন পদদলিত—লাঞ্ছিত—অল্পবুদ্ধি অশিক্ষিতা নারী – "

"উচ্চ শব্দে জিতেন হাসিয়া উঠিল, "মস্ত আবিষ্কার করে ফেলেছ তো কিন্তু—এর কারণ—"

"না - তর্ক করতে পারি না—শোন তুমি—সমাজের অবিচারের কথা—হাঁ—যে সমাজের নিকট থেকে নারী এত বড় অসম্মান, এমন ঘৃণা পাচ্ছে—তাকে সে মানবে ? তার অন্যায়গুলো সে মানবে ?"

"ঘৃণা ?"

"হাঁ ঘৃণা—বিধবাকে তোমরা ঘৃণা কর।"

"বিহ্বলভাবে চাহিয়া জিতেন বলিল,—"বুঝছি না—এ তোমার ভুল—"

"বাধা দিয়া শান্তকণ্ঠে কুন্তলা বলিল,—"কোন শুভ কাজে তার মুখ দেখা হয় না—আমার বোধ হয় কোন দেশের কোন সমাজ নারীর জন্য এত বড় অপমান—এমন বিড়ম্বিত জীবনের লাঞ্ছনা সৃজন করতে পারে নি।"

"স্বীকার করছি এটা মস্ত অন্যায়—কিন্তু তুমি কি দেখিয়ে দিতে পার—কোন দেশের সম্বন্ধে এমন এক আধটু অন্যায় নিয়ম নেই ?"

"এই হ'ল তোমার একটু অন্যায়। মনে কর কোন বিধবার মেয়ের বা বোনের—কিংবা কোন নিকট আত্মীয়ের মেয়ে, অথচ সে কোন জিনিস ছুঁতে পাবে না—দেখতে পাবে না—নিজের নির্য্যাতিত অভিশপ্ত জীবন নিয়ে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'বে—কিন্তু কেন ? সন্তানের জননী সে—বাপের মেয়ে সে—ভাইয়ের বোন সে—স্বামীর স্ত্রী সে—কোন অধিকারে—কিসের জোরে তার কপালে এত বড় রাজটীকা দেবে তোমরা ?"

"হাঁ স্বীকার করছি খুবই অন্যায় কিন্তু প্রতীকারেরও তো চেষ্টা হচ্ছে—এটা কিন্তু আবহমানকাল থেকে ছিল না দিদি—যখন কোন কিছু ভাঙ্গতে সুরু করে তখন—তার অনেকখানিই অধঃপতিত হয়ে যায়, আবার নতুন নিয়মে যখন সে গড়ে ওঠে তাতে গলদও কিছু থাকা স্বাভাবিক ; বেশী দোষ তুমি এর জন্য সমাজকে দিতে পার না—কিন্তু বিধবাদের জন্যে ব্রহ্মচর্য্য,—ও জিনিস কি অন্যায় বল তুমি।"

"শুধু বিধবাদেয় জন্যে নয় জিতেন—এ সব সময় সব লোকের জন্যে ভাল নিয়ম সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করছি, ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বাংশে বাঞ্ছনীয় কিন্তু সমাজের স্থিতিকল্পে এ কথাও মুক্তকণ্ঠে বলি, সমাজ কি কখন সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষার সুযোগ বা সহায়ক হইয়াছে ? ছোটবেলা থেকে পুরুষ ও রমণীকে বিলাসিতার মধ্যে মানুষ করে একদিন কোন এক মুহূর্ত্তে চাবুক নিয়ে যদি সমাজ দাঁড়ায় সংযমহীন সাজা দিতে, তবে তার ফল কি শুভ হতে পারে ? কত মেয়ে না বুঝেই বৈধব্যের নিয়মগুলো লোক-দেখান করে যায় অথচ তাদের প্রাণ এ-সব করতে চায় না। সকলের মন তো একভাবে হ'তে পারে না ভাই ! অথচ এই যে প্রতারণা—নিজের অন্তরের সঙ্গে এই যে লুকোচুরী - এটাকে কোথায় কোন পাপের পথে টেনে নিয়ে যায় এ কি ভেবেছো কোন দিন ? তাদের বোঝাবার, শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে কোনদিন ? ভুল বুঝ না—এখন এই বর্ত্তমানের কথা বলছি—তারপর তার চক্ষুর উপর তার সমবয়সী রমণীদের স্বামী—সোহাগের সুখের চিত্র

অনবরত দেখিতেছি—ঐ বিষয়ের আলোচনাও তাদের সহিত সর্ব্বদা হইতেছে ; তাতে করে কি তাদের চিত্তক্ষোভের কারণ জন্মাতে পারে না—তাদের কি দেবতা বলতে চাও ? অবশ্য নির্লোভ সংযত অবস্থা মানুষ পেতে পারে—কিন্তু বিলাসিতা মধ্যে থেকে যায়। তারপর সে পরিষ্কার কাপড় একখানা পরতে, গাত্র পরিষ্কারের জন্য একখানা কি সাবান মাখতে পারে না বা চিত্ত-বিনোদনের জন্য একটা গান করতে পারে না—বল বল চুপ করো না—এগুলো কি অত্যাচার নয় ?"

"স্বীকার করছি কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলছি—"

"না আর বলার কিছু নেই—স্বীকার যখন করছ—অন্যায় যা চিরকালই অন্যায়, এই না ? তখন ? এতই যদি সইতে পেরে থাকি তখন—আজকের এই সামান্য অন্যায়ে বিচলিত হলে তো আমার চলবে না, এ যে আমাদের পাওনা—নিতে আমাদিগকেই হবে—"

অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে জিতেন বলিল,—"তাই যদি হবে সেদিন শিবানীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল কেন ?"

"কারণ যে, আমার নিজের কথা তো ছিল না তাতে—"

"কিন্তু তাহলে এটাকে তুমি অন্যায় বলে মানছ তো ?"

কিন্তু স্নেহের কাছে যে অন্যায়ের কিছু মূল্য নেই ভাই, স্নেহ যে সবার ওপরে।"

"তুমি কি ওই পাষণ্ডকে স্নেহ কর দিদি এখনও ?"

"ও যে আমার কত বড় স্নেহের পাত্র সে কথা নাই বা শুনলে ভাই—স্বামীর ছোট ভাই তাকে যে বরাবর সেই চোখেই দেখে আসছি। আজ তার একটু বোঝবার ভুলে—এত সহজেই কি মন থেকে দূর করে দেওয়া যায় ?

"কিন্তু সে এ-স্নেহের মর্য্যাদা যে বোঝে না দিদি !"

"নাই বা বুঝল—তাতে আমার ক্ষতি কি—নারীর যে সার্থকতাই রিক্ততার মধ্যে দিয়ে !"

"আচ্ছা দিদি তুমি কি দুনিয়ার সকল লোককে এমনিই ভাবে ভালবাস ?"

"কই তা পারি ভাই !"

"না না মিছে বলো না—আমি জানি তুমি সবাইকে এমনি ভালবাস। আমার মনে হয় আমাদের দেশের নারীর মত ক্ষমা করবার এত বড় শক্তি কোন দেশের মেয়ের নেই। আপনাকে রিক্ত করে বিলিয়ে দিতে কোন দেশের নারী জানে না ?"

হাসিয়া কুন্তলা বলিল,—"কিন্তু এখানেও ভুল করছ তুমি। বিলিয়ে দেবার ক্ষমতা যত বড়ই হোক কিন্তু এর মধ্যেও স্বার্থ একটু আছে ভাই, নিঃস্বার্থভাবে এটা আমরা করি না।"

"কিসের স্বার্থ দিদি ?"

"আপনাকে বিলিয়ে দেবার ক্ষমতা যত বড়ই হোক কিন্তু আমার মানুষকে জয় করে তারাই, এ স্বার্থটুকু অস্বীকার করা চলে না জিতেন। আর রিক্ততার মধ্যে দিয়ে—ক্ষমার মধ্যে দিয়ে—যে সুখ-শান্তি-সান্ত্বনা তারা পায় তারই কি তুলনা আছে ?"

"কিন্তু তোমরা যখন রিক্ততার নেশায় মেতে ওঠ, তখন—পুরুষ হয়ে আমরা কি করি সে যদি জানতে।"

"জানি ভাই, কিন্তু এতে নারীর কতটুকু ক্ষতি করতে পারে ? একটুকুও না, বরং ওরই মধ্যে তারা যেটুকু পেয়ে যায় সেটুকু চিরস্থায়ী ভাবে থেকে যায়।"

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে জিতেন ঐ মূর্ত্তিমতী দয়ার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, উহার মনে হইল বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল ঐশ্বর্য্য, সকল ঔদার্য্য, বৈরাগ্য, ঐ শান্ত মুখখানিতে ভরিয়া আছে। উহার মুগ্ধ ভাব লক্ষ্য করিয়া কুন্তলা লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইল। হাসিয়া উঁহাকে একটু ঠেলিয়া নরেন বলিল,—"হাঁ করে চেয়ে রয়েছিস যে ?"

"দেখছিলুম আমার দিদির মুখখানার মধ্যে কি কি ভাব রয়েছে। সত্যি দিদি বাহিরে তুমি যে পরিমাণে সুন্দর ভেতরটা তার চেয়ে বেশী সুন্দর—এমন কিন্তু বড় একটা দেখা যায় না—তুমি দেবী।" গীতাকে আসিতে দেখিয়া অনাবশ্যক আত্মপ্রশংসায় লজ্জিতা কুন্তলা উঠিয়া সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল "গীতা তোর যে চুল বাঁধা হয় নি—রা।"

নয়

প্রতি শুক্রবার সিরাজপুরে হাট বসিত। জিতেন গীতার জন্য দু'টা খেলনা কিনিল। গীতার কয়দিন ধরিয়া জর

হইয়াছিল। নরেন থাকিতে পারে নাই কিন্তু রুগ্না শিশুকে ছাড়িয়া জিতেন যাইতে পারে নাই। হাট হইতে ফিরিবার পথে সে দেখিতে পাইল এক নগ্ন বালক প্রাণপণে দৌড়াইতেছে পশ্চাতে ক্রুদ্ধ ষাঁড় উহাকে তাড়া করিয়া চলিয়াছে। গ্রামবাসী স্ত্রী-পুরুষ ভীত ত্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। মুহূর্ত্তমাত্র সেদিকে চাহিয়া লম্ফ দিয়া উহার শিং দু'টী ধরিয়া ফেলিয়া জিতেন বার কয়েক জোরে ঘুরাইয়া উহার পৃষ্ঠদেশে উঠিয়া পড়িল। ভীত প্রশংসমান দৃষ্টিতে উপস্থিত নরনারী এই সুদর্শন বলিষ্ঠ যুবার অসীম সাহসিকতা দেখিতেছিল। উহাকে ফেলিবার জন্য বার কয়েক ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়া ষাঁড় সম্মুখের দিকে ছুটিল।

জনতার মধ্য হইতে কেহ জিজ্ঞাসা করিল—"এ ছেলেটী কে গা?" কাহার ক্রূর কণ্ঠের সরলপূর্ণ কথা দুটী উহার কর্ণে প্রবেশ করিল, "জান না? জমীদারদের বিধবা বৌটার ওই যে—." ছেলেটীকে উন্মত্ত ষাঁড়ের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারায় যে শান্তি ও আনন্দ প্রাণে আসিয়াছিল—ঐ বীভৎস অশ্লীল ইঙ্গিতসূচক কাথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহা অন্তর্হিত হইল। হায় ভগবান, সংযমের—আত্মত্যাগের প্রতিদান তুমি এমনই ভাবেই কি দিয়া থাক? অপাপ-বিদ্ধা উচ্চমনা যে নারী—প্রাণপণ শক্তিতে অটল-ভাবে সংসারের সঙ্গে যুঝিতেছে—তার একি শাস্তি। চিন্তান্বিত জিতেনের গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইয়া গেল।

উদ্বিগ্ন-মুখে বিলম্বের কারণ কুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলে জিতেন উত্তর দিতে পারিল না। ঐ মহীয়সী নারীর দিকে সে চাহিতে পারিতেছিল না।

"ওকি অমন শুকো মুখে রয়েছ কেন? কি হয়েছে?"

জোর করিয়া হাসিয়া জিতেন বলিল, "কিছু না দিদি, গীতা কেমন আছে?" এই গোপনের প্রয়াসটুকু বুঝিতে পারিলেও কুন্তলার সেদিক মনোযোগ দেবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না। গীতার নিমিত্ত প্রাণ উহার উদ্বেগ-অশান্তিতে পূর্ণ; উদাসস্বরে সে বলিল,—"ভাল নয়—আমার মনে হচ্ছে সে মানুষ চিনতে পারছে না।"

"সে কি? না—না এ তোমার বোঝবার ভুল। কবিরাজকে আর একবার ডাকব?" বিকারের ঘোরে গীতা চেঁচাইল—"মা আমি যাব না।"

"না--মা কোথায় যাবে রাণী।" সন্তর্পণে উহাকে বিছানায় শোয়াইয়া জিতেন ফিরিল।

জিতেনের হস্ত ধারণ করিয়া ভয়ার্ত্তকণ্ঠে কুন্তলা বলিল,—তুমি যেও না জিতেন আমার বড় ভয় করছে—গীতা বাঁচবে না।" দুঃখে উহার কণ্ঠ বুজিয়া আসিল। পতনোন্মুখ কুন্তলার দেহ হস্ত বিস্তারে ধৃত করিয়া গীতার পার্শ্বে সযত্নে বসাইয়া জিতেন বলিল—"এ সময়ে অধৈর্য্য হয়ো না দিদি, এমন পাপ কর নি যার জন্যে এত বড় শাস্তি তোমার মাথায় ভগবান তুলে দেবেন।" ঠিক এমনই সময় গ্রামের দুইজন বর্ষীয়সী রমণী ইলার সহিত গৃহে আসিয়া ঢুকিলেন।

"ওমা—এ কি কাণ্ড।" অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ দীর্ঘ করিয়া উহারা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ইলা একবার সকলের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল—কি বলিবার জন্য উহার ওষ্ঠ ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে গীতার আবার উঠিয়া বসায় ইলা ঐ দিকে ফিরিল। যত্নে উহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে আগতা রমণীদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"কাণ্ড আবার কি দেখলে? অসহায় বিধবার কেউ যদি দরকারে সাহায্য একটু করেন সেটুকুও কি সইতে পার না তোমরা?"

এ সময়কার দৃষ্টি ও কটূক্তি উপলব্ধি করিয়া অন্তরে জিতেন আহত হইল। গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় সে বলিয়া গেল—"নরেনকে ভাল ডাক্তার সঙ্গে করে আনবার জন্যে টেলিগ্রাফ করতে চললুম। যতক্ষণ না ফিরি—তোমার বৌদির কাছে থেক ইলা।"

জমীদারদের এই মুখরা মেয়েটাকে গ্রামের সকলে ভয় করিয়া চলিত। কিছু যেন হয় নাই এই ভাব প্রকাশ করিয়া স্নিগ্ধস্বরে প্রথমা বর্ষীয়সী কহিলেন,—"গীতার অসুখের কথা আমরা কিছু জানি না মা।"

রুষ্ট হইয়া ইলা বলিল,—"তা জানবে কেন? তবে যে মহাত্মা দয়া করে একটু সাহায্য করছেন তাঁর খবর রাখ। তোমাদের বাড়ীতে কষ্টের সময় মুখে একটু জল দিতে, রোগের সময় সেবা করতে এই গীতারই মাকে দয়া করে

স্মরণ করে থাক কিন্তু টিপ্পনী কাটবার সময়, মিছে দুর্নাম দেবার সময়, ঐ সাধ্বীকে কথা দিয়ে বিঁধবার সময়—তোমাদের ডাকবার কষ্ট পর্য্যন্ত করতে হয় না; এমনি তোমরা।" এমন করিয়া মুখের উপর সত্য বলিতে এ মেয়েটীর স্থায় অপরে পারিত না। কাঠ হইয়া নারীদ্বয় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধমক দিয়া কুন্তলা বলিল,—"ও কি কর্‌ছিস ইলি, দিন দিন বড় মুখরা হয়ে উঠছ তুমি। ছিঃ অমন করে কাউকে অপমান করতে নেই।" মুখখানি এতটুকু করিয়া ইলা গীতার শিয়রে বসিয়া পড়িল। ভয়ে ভয়ে রমণীদ্বয় বলিলেন, "বেশী কিছু বলো না মা, শেষে আবার ঘরে থাকা কঠিন হ'য়ে উঠবে; তোমার সামনে ও চুপ করে থাকবে।" কথা বলিবার জন্ত ইলা ছটফট করিতে লাগিল কিন্তু কুন্তলার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া কিছু বলিতে সাহস করিল না। কুন্তলা বলিল, "কেন?"

"ওমা তা তুমি জান না? ঝি-বৌরা জল নিতে গেলে ঢেলা মেরে কলসী ভেঙ্গে দেবে—বাগানের তরী-তরকারী রাতারাতি কেটে চিবিয়ে ফেলে দেবে—ইট ছুঁড়বে—কত বলব মা, ও একা নয় সঙ্গী-সাথী আবার আছে কিনা।"

বিরক্ত হইয়া কুন্তলা কহিল,—"এই সব বিদ্যে হচ্ছে বুঝি তোর?"

গর্জ্জনের সহিত ইলা বলিল,—"এরা দেখেছে কেউ এ সব করতে আমায়? শুধু শুধু বললেই হয় না। সেই সঙ্গে নিজেদের গুণ ঢাকছ কেন? সেও প্রকাশ কর, কি সব কথা বল তোমরা বৌদির নামে? আবার ভাল করে বৌদির সামনে, তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি ফের যদি অমনি সব বল—এবার তা হ'লে ঢিল মেরে ছাড়ব না—ঘরে আগুন দিয়ে সব কটাকে পুড়িয়ে ছাড়ব।" ধীর পদে ইলা উঠিয়া গেল। আড়ষ্টভাবে কুন্তলা বসিয়া রহিল—কথা বলিতে উহার ইচ্ছা হইল না।

"ওমা এ সব কি কথা গো! ইলা বলে কি? আমাদের কত আদরের সুন্দর বৌ তার নামে পারি কি কুৎসা করতে? সত্যি হোক মিথ্যে হোক, আমরা কি তা পারি।"

জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে যাহার কন্তা শায়িত—এ সময়ে এই সব কথা লইয়া বাদানুবাদ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর তুষার-শীতল বুভুক্ষু হস্ত ঐ ক্ষুদ্র কলিকাকে টানিয়া লইতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—এ কথা যেন কেহ উহার কানে কানে কহিয়া দিতেছিল। তাই মধ্যে মধ্যে আতঙ্কে কি এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় কুন্তলা কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কি এক অজানা গভীর ব্যথায় সারা বিশ্বের উপর তাহার ক্ষমাশীল—ধৈর্য্যশীল হৃদয় বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল। তাই অন্তরে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। জিতেনকে ফিরিতে দেখিয়া রমণীদ্বয় রাত্রে আসিবার ভরসা দিয়া বিদায় লইলেন। বিকালের দিকে গীতা অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। কুন্তলার নিকট হইতে জোর করিয়া জিতেন গীতাকে ক্রোড়ে লইল। উহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কুন্তলা ডাকিল,—"গীতালি মা আমার!" কেহ উত্তর দিল না। বেদানার রসটুকু চামচে করিয়া মুখে দিতে গিয়া ইলা দেখিল—সেই ক্ষুদ্র অনাঘ্রাত পুষ্পটুকু বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে,—পারিজাতের স্থান এ ধরায় নাই। হাহাকার করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। কুন্তলা লুটাইয়া পড়িল—অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে সে কাঁদিয়া উঠিল,—"জিতেন দাও ভাই ফিরিয়ে দাও আমার গীতাকে।"

পদতলে লুণ্ঠিতা—শোকের প্রতিমূর্ত্তিকে কি বলিয়া—সে সান্ত্বনা দিবে? ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। জিতেন স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। মায়ের স্থায় বক্ষে জড়াইয়া মুখের উপর মুখ দিয়া ইলা ডাকিল,—"দিদি—বৌদি—স্বর্গের জিনিস পৃথিবীতে থাকে না—যেতে দাও ওকে, সেখানেই ও বরং শান্তিতে থাকবে।" (ক্রমশঃ)

সমালোচনা

চিত্রণ—শ্রীপ্রকৃতি দেবী। প্রকাশক এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড্ কোং ৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ইহা একখানি শিল্প-পরিকল্পনার নিদর্শন গ্রন্থ। ইহাতে সূচী-শিল্প, আলিপনা, ফুলের গহনা ও অন্যান্য সাধারণ শিল্পকার্য্যের চল্লিশটী আদর্শ পরিকল্পনা সংগৃহীত হইয়াছে। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত মুকুল চন্দ্র দে মহাশয় একটী সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় এই প্রকার কারুশিল্পের উপকারিতা দেখাইয়া এই পুস্তকখানির বহু প্রচার কামনা করিয়াছেন। যে পুস্তক মুকুল বাবুর মত নিপুণ শিল্পীর শুভেচ্ছা লাভ করিতে পারিয়াছে, সে পুস্তক প্রত্যেক শিল্পপ্রিয় ব্যক্তির কাছেই আদর পাইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রত্যেক বিশিষ্ট সভ্যতাই সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্যের ন্যায় অতি সামান্য ছোটখাট কারুশিল্পের মধ্যেও আপন বিশেষ রূপটি ফুটাইয়া তোলে। বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে মেয়েরা আলিপনা, কাঁথা সেলাই প্রভৃতি সাধারণ শিল্পকার্য্যের ভিতর দিয়া বহুকাল যাবৎ একটা বিশেষ কলাসৌন্দর্য্যকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত প্রথম সংস্পর্শের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি বহির্মুখীন হইয়া উঠিয়াছিল এবং নিজেদের ঘরের এই সমস্ত চারুকার্য্যের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা ও ঔদাসীন্যই দেখা দিয়াছিল। ফলে বিলাতী চারুকলার নিকৃষ্ট নকলে আমাদের ভদ্রসমাজের গৃহসৌন্দর্য্য আবিল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সুখের বিষয় কিছুকাল যাবৎ জাতীয় নবোদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে আবার আমাদের দৃষ্টি ঘরের দিকে ফিরিয়াছে। আমাদের গৃহকোণে যে শিল্পকলা এতদিন অনাদরে সঙ্গোপনে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছিল, আবার আমাদের শিক্ষিত ভদ্রসমাজ সে শিল্পকলার আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই কিছুকাল যাবৎ অন্যান্য শিল্পের ন্যায় আমাদের লুপ্তপ্রায় সূচীশিল্পেরও পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকখানি সূচীশিল্পের নিদর্শন-পুস্তক আমাদের চোখে পড়িয়াছে। তার মধ্যে শ্রীমতী প্রকৃতিদেবীর এই 'চিত্রণ' অন্যতম উৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে যে চল্লিশটী নিদর্শন আছে তার মধ্যে অধিকাংশই আমাদের কাছে খুব সুন্দর মনে হইল। আমাদের দেশের মেয়েরা এই আদর্শগুলি দেখিয়া শিল্পকার্য্যে অগ্রসর হইলে আমাদের গৃহশ্রী উজ্জলতর হইয়া উঠিবে। মুকুলবাবু সত্যই বলিয়াছেন এই সমস্ত শিল্প-নিদর্শন ছাপা হইয়া প্রচারিত হইলে লোকের রুচি মার্জ্জিত হইবে এবং দেশের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসগুলি সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিবে। আশা করি এই পুস্তকখানি আমাদের দেশের শিল্পানুরাগী মেয়েদের নিকট যথোচিত সমাদর লাভ করিবে। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ সবই সুন্দর হইয়াছে। চিত্রগুলির অধিকাংশই সমগ্র পৃষ্ঠাব্যাপী।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

আগাছা—শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল। নাথ ব্রাদার্স। পৃঃ ১৫২। দাম ১৲ টাকা। উপন্যাস। উপন্যাসখানিতে প্লটের বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রের বৈচিত্র্য নাই অশ্লীলতার যথেষ্ট উপাদান সত্ত্বেও বইখানি অশ্লীল হয় নাই। ভাষার গতি আছে, ভঙ্গীটিও সহজ ও সরল। অবনীর স্ত্রীর অসুখের সময় নার্স আসিয়া তাহাকে শুশ্রূষা করে ও সুস্থ করিয়া তোলে। অবশ্য নার্সটী যুবতী ও সুন্দরী এবং সে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া একা থাকে। অবনীই রাত্রে তাহাকে ডাকিয়া আনে। তার পর নার্সের আবার অসুখের পালা, অবনীই অবশ্য রাত জাগিয়া তাহাকে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া সারায়। এ সময়ও নার্সের সহযোগিনীরা একবার উঁকি মারেন নাই। অবনীর সুবিধার জন্যই এই রকম অস্বাভাবিক ব্যাপার করিতে হইয়াছে। নার্সের আবার একটি দুর্দ্দান্ত ও দুশ্চরিত্র স্বামী আছে বিজয়, তার ওপর নার্সের আবার দরদও আছে, তাহাকে ফৌজদারী মোকদ্দমা হইতে বাঁচাইবার জন্য নার্সের উকিল অবনীরই সাহায্য লয়, এই উপলক্ষেও উভয়ের সাহায্যের ও ঘনিষ্ঠতার মাত্রা বাড়ে। প্লট যাহাই হউক, অবনীরও নার্স শান্তার মধ্যে লেখক কখন 'বেচালে'র অবতারণা করেন নাই, যদিও অবস্থাগতিকে তাহার অনেক সুবিধা ছিল। লেখকের নিকট এইজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তবে হাঁ, এক রাত্রি অবনী অতিরিক্ত মদ খাইয়া শান্তার ঘরে অসংযত ব্যবহার করিয়াছিল। অবনীর স্ত্রীর শান্তার সঙ্গে ব্যবহার আদর্শ ব্যবহার হইতে পারে কিন্তু তাহা স্বভাব-বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। মাঝখানে খোকা আসিয়া দুইজন স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রীতির সেতু বাঁধিয়া গল্পটীকে স্থানে স্থানে বেশ মধুর করিয়া তুলিয়াছে। অবনী ও শান্তার মনোভাব বিশ্লেষণও বেশ নৈপুণ্যের সহিত করা হইয়াছে। তবে শান্তাকে মাঝে মাঝে একটু বাড়াবাড়ি নীতিবাগীশ করা হইয়াছে। অবনী শান্তার চেয়ে ঢের সাদা সিধা মানুষ। বইখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সবই ভাল। প্রচ্ছদপটের ছবিখানি না থাকিলেও ক্ষতি ছিল না। শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলাদেশের গাছপালা (১ম ভাগ)—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, ভিষগ্রত্ন, এল্-এ-এম্-এস্। বাণী ট্রেডার্স, ৭০।১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৩৮ সাল। ৵০+৵০+৬২ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৵০ আনা।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা-প্রণালী পুনঃপ্রচলনকল্পে অধুনা যাঁহারা একাগ্রচিত্তে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সন্মিলনী" ও "স্বাস্থ্য" পত্রিকাদ্বয়ের সহযোগী সম্পাদকরূপে তথা "পারিবারিক চিকিৎসা," "বাঙ্গালীর খাদ্য," "নেশা" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় বহু লুপ্তসম্পদের যে সন্ধান দিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, তাহা তাঁহার কলিকাতা যামিনী ভূষণ অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় ও বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের কৃতী অধ্যাপক ও

অভিজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন অপেক্ষা অধিকতর গৌরব-জনক। "বাঙ্গলাদেশের গাছগাছড়া" নামক দ্রব্যগুণ বিষয়ক অপূর্ব্ব পুস্তক লিখিয়া তিনি দেশবাসীর যে কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন, আশা করি, তাঁহাকে তাঁহার সে প্রাপ্য মর্য্যাদা দান করিতে কেহই কার্পণ্য করিবেন না। এরূপ পুস্তকের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা যে অসীম তাহা বলা বাহুল্য। লেখক এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিবেদন করিতে গিয়া বলিতেছেন,— "বাঙ্গলার আনাচে কানাচে অযত্নসম্ভূত এত বৃক্ষলতা জন্মিয়া থাকে যাহার গুণাগুণ জানা থাকিলে বহু রোগের চিকিৎসা চিকিৎসকের বিনা সাহায্যে হইতে পারে।...যেরূপ 'অন্নসমস্যা চমৎকারা' অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সকলেরই গাছগাছড়ার গুণাগুণ ও পাচন, মুষ্টিযোগ প্রভৃতির ব্যবহারবিধি জানিয়া রাখা আবশ্যক।...পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা বা সকল গাছের আয়ুর্ব্বেদীয় সকল গুণ প্রকাশ করিয়া পুস্তকখানিকে গুরুগম্ভীর করিয়া তোলা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।" গ্রন্থখানিকে যে গুরুগম্ভীর করিয়া তোলা হয় নাই তাহা ইহার ভাষার প্রাঞ্জলতা ও আলোচ্য-বিষয়ের সহজসারল্য হইতেই অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইবে। দেশের এই দারুণ আর্থিক দুর্দ্দিনে যাঁহারা 'নিজেদের পরিজনবর্গের প্রাথমিক চিকিৎসা চিকিৎসকের বিনা সাহায্যে নির্ব্বাহ করিতে' চাহেন, তাঁহারা অচিরাৎ এই অমূল্য গ্রন্থের একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখুন, মাত্র পাঁচ আনার বিনিময়ে তাঁহারা সময়ে-অসময়ে অযথা অর্থব্যয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, ইহা নিশ্চিত। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। আমরা যথাসম্ভব এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ দেখিতে পাইব বলিয়া প্রতীক্ষায় রহিলাম।

ক. কা. ব

ওমর খৈয়াম—শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী প্রণীত। স্যর যদুনাথ সরকার কে-টি, সি-আই-ই লিখিত ভূমিকা সংবলিত; তিনখানি চিত্রযুক্ত এবং সুন্দর শক্তভাবে বাঁধা। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ওমরের জীবনচরিত। পারস্য-সাহিত্যের প্রতি গ্রন্থকারের অসাধারণ অনুরাগ। তাহারই ফলে তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শেখ সাদীর জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন। সেই পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হওয়ায় লেখক আবার পারস্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ওমর খৈয়ামের জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে গুরুতর বিষয়ের আলোচনা বা গবেষণা এখন এত অল্প পরিমাণে হইতেছে যে, তাহাতে চিন্তাশীল রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষ ক্লেশ অনুভব করেন। অথচ মৌলিক অনুসন্ধান বা গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়াই বড় বড় সাহিত্য গড়িয়া উঠে; সুতরাং এই দিক্ দিয়া লক্ষ্য করিলে সাহিত্যিক মাত্রেই সুরেশবাবুর এই ওমর চরিতাখ্যায়িকা দেখিয়া আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

পুস্তকখানিতে বারুটী অধ্যায়ে ওমরের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বারটি অধ্যায়ের বিষয়গুলি হইতেছে—(১) ওমরের জন্মভূমি, (২) বিদ্যালয়ে ওমর, (৩) ওমর-গুরু আবু আলি সিনা, (৪) ওমরের বন্ধু লাভ, (৫) গণিতবিদ্ ওমর, (৬) মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস, (৭) জ্যোতির্বিদ ওমর, (৮) জ্ঞানী ওমর, (৯) মুসলিম দর্শনের কথা, (১০) দার্শনিক ওমর, (১১) কবি ওমর এবং (১২) ওমরের শেষ জীবন। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, একটি কবিকে বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলে সমসাময়িক সাহিত্য, ইতিহাস ও দেশের কথা পর্য্যালোচনা করার যে আবশ্যকতা আছে গ্রন্থকার তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছেন ও যথাযথ ভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় পুস্তকখানির একটী সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পারস্য-সাহিত্য ও ইতিহাস-সম্বন্ধে যদুনাথের গবেষণা ও অধিকার অসাধারণ। সুতরাং তাঁহার এই সুন্দর সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটী পুস্তকের গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছে। ভূমিকার একস্থানে তিনি পুস্তকখানি-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"এই গ্রন্থে আরব-সভ্যতার বিকাশ, জ্ঞানের বিভাগগুলি এবং প্রত্যেক বিভাগে পূর্ব্ব-পরের কি সম্বন্ধ তাহার বর্ণনা ও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া এবং নবীনতম ও প্রামাণিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থগুলির তথ্য ও মত উদ্ধৃত করিয়া, লেখক বঙ্গভাষার ইতিহাস-বিভাগের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। মধ্যযুগে পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার ইতিহাস হিসাবে এই বইখানি বঙ্গভাষায় নবীনতম সম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ।...আশা করি এই গ্রন্থের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ওমর এবং মুসলমান জগৎ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস বঙ্গদেশ হইতে দূর হইবে।

বাস্তবিকই পুস্তকখানি ওমরের জীবন-প্রসঙ্গে রচিত একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থও বটে। ওমরের যে কবিত্বসুধায় আজ সমস্ত শিক্ষিত জগৎ পরিতৃপ্ত সেই অপূর্ব্ব কবি যে আবার গোঁড়া বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন তাহা বাস্তবিকই কৌতুকজনক। এই কবির এই কৌতুককর জীবন-কাহিনী অত্যন্ত নিপুণ ও বিশদভাবে সুন্দর ভাষায় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে সুবিন্যস্ত ও সুবিচারমূলক জীবন-চরিতের যথেষ্ট অভাব আছে। এই পুস্তকখানি সেই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পুস্তকখানিতে কবি ওমরের দুইখানি চিত্র এবং তাঁহার সমাধি-মন্দিরের একখানি চিত্র সংযোজিত হইয়াছে।

ভরসা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে ছাপা বিষয়ে নির্ভুল করিবার চেষ্টা করিবেন। এই সংস্করণে কতকগুলি ছাপার ভুল চোখে পড়িল।

ওমর খৈয়াম—শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী। একুমি প্রেস, ১১৫ সি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীনবীন বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

ওমর খৈয়ামের ৩০টি রুবাইয়ের সচিত্র পদ্যানুবাদ। বঙ্গসাহিত্যে ওমরের কাব্যানুবাদের অভাব নাই। আগের কথা ছাড়িয়া দিয়া অতি আধুনিক কালের মধ্যে আসিলে চার পাঁচখানি অনুবাদের নাম করা যাইতে পারে।—আমি শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রমোহন বসু ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায়ের অনুবাদের কথা বলিতেছি। এতগুলি পদ্যানুবাদ সত্বেও শ্যামাপদ বাবুর অনুবাদের কি প্রয়োজন ছিল এবং সে-অনুবাদের উৎকর্ষ কোথায় তাহাই আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

উপরে লিখিত অনুবাদগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা, তিনি ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়ায়, যথার্থ মূলানুগ হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাকে ঠিক কবির অনুবাদ বলা চলে না। হিতেন্দ্রবাবুর অনুবাদটীকে আদর্শ স্বরূপ ধরিয়া শ্যামাপদ বাবু যে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তাহার বিশেষত্ব দুইটী—(১) ইহা মূলানুগ; (২) ইহা যথার্থ কবিত্বময়। একই অনুবাদে এই দুইটি গুণ বর্ত্তমান থাকাই একান্ত ভাবে বাঞ্ছনীয়। সেইজন্য আমরা দেখিতেছি, ওমর-কাব্যের বহু অনুবাদ থাকা সত্বেও শ্যামাপদ বাবুর অনুবাদের মত একখানি অনুবাদের অবকাশ ও প্রয়োজন ছিল। শ্যামাপদবাবু অত্যন্ত নিপুণ হস্তে এই প্রয়োজন মিটাইয়াছেন। তিনি কবি রূপে বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে পরিচিত নহেন; তথাপি তাঁহার এই ওমর-কাব্যানুবাদ তাঁহাকে কবিরূপে সুপরিচিত করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। অনাবশ্যক ভাবে ফেনাইয়া বা নিজের ভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়া অনুবাদক কোথাও অনুবাদটিকে ভারাক্রান্ত করেন নাই। তাঁহার অনুবাদ মূলানুগ, সরল ও সুন্দর হইয়াছে।

পারস্যের রুবাই ছন্দ চারটী চরণে গ্রথিত। সেইজন্য ইহার অপর নাম 'চহার বইত্‌'। ইহাকে চতুষ্পদী কবিতা বলা যাইতে পারে। এই ছন্দের লক্ষণ এই—"চারিটি চরণের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ পরস্পরের সহিত মিল রাখিয়া চলে। তৃতীয় চরণ স্বাধীন, তবে কখনও কখনও স্বেচ্ছায় মিলের অধীন হয়। সমগ্র রুবাইয়ের ভাবটুকুকে ঘনীভূত করা এবং উহার গতিটিকে নির্দ্দেশ করাই চতুর্থ চরণের কার্য্য।"
—(শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী)

শ্যামাপদ বাবু রুবাইয়ের এই রীতি পুরাপুরি রক্ষা করিয়াছেন।

তাঁহার অনুবাদ পুস্তকের আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইহার রঙিন ও এক রঙা ছবিগুলি সমস্তই একটী দশ-বৎসরের বালকের আঁকা। এই বালকের নাম শ্রীমান্ ঋরিন বসু। ছবিগুলি সমারোহপূর্ণ না হইলেও সেগুলি একটী সহজ অনাড়ম্বর অথচ স্নিগ্ধকর কল্পনাবিলাসের পরিচায়ক। একটী দশ বৎসরের বালকের এই শক্তি আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। এ বালকের ভবিষ্যৎ যে অত্যন্ত আশাপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মতে এই চিত্রগুলিও পাঠকের কাছে পুস্তকের বৈশিষ্ট্য রূপ দান করিবে।

পুস্তকটিকে মেট্রিয়াশি রাশি প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় উদ্ভট রঙদের চিত্র-সংযোগে জবড়জঙ্গ করিয়া তোলা হয় নাই তাহাতে স্বস্তি বোধ করা যায়। প্রত্যেক পৃষ্ঠাই সুরুচির রেখাচিত্রে শোভিত। ছাপাও পরিষ্কার। তবে মলাটের উপরে বা মলাট-আবরক কাগজের উপরকার সোনালি রঙের পরিকল্পনাটী তেমন উজ্জ্বল বা শোভন হয় নাই।

শ্যামলী—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন। চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম আট আনা।

কবিতা-পুস্তক। লেখককে যুবকও বলা চলে না, তিনি ১৮ বৎসরের বালক। আবার এই পুস্তকের কবিতাগুলি তাঁহার বোল হইতে সতের বৎসর বয়সের রচনা। সুতরাং লেখাগুলি কাঁচা হইবে ইহাই ভাবিয়া লওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা আনন্দের সহিত বলিতেছি, লেখাগুলি কাঁচা নহে, কবিতাগুলি বহুস্থলে ভাবে ও কল্পনায় বালক-মনের পরিচয় দিতেছে বটে, কিন্তু খুব কাঁচা হাতের পরিচয় দিতেছে না। ইহা একটী বালকের পক্ষে আশার কথা। আর কবিতাগুলি মাঝে মাঝে যে বালক-মনের পরিচয় আছে তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রশংসার্হ বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে। কেন না, বালকের লেখায় যদি বালক-চিত্তের পরিচয় না পাইয়া "জেঠামির" পরিচয় পাই তবে তো লেখকের ভবিষ্যৎ চিত্তোন্নতির আশা করিতে পারি না। কিন্তু এই বাল-ভাব আমাদিগকে লেখকের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আশান্বিত করিয়াছে। কবিতাগুলির অনেক স্থানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু কালে এই বালক সে-প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবে বলিয়া ভরসা হয়।

মাঝে মাঝে ছন্দের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে; কিন্তু তাহা অতি নগণ্য বলিয়াই মনে করি। তবে একটি বিষয়ে আমরা এই বালক কবিকে সতর্ক করিতে চাই। সেটী তাঁহার ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের বানান। তাঁহার কবিতায় এইরূপ বানান বহু স্থলে আছে—'কতো,' 'শতো,' 'আছো,' 'গেলো,' 'নিলো,' 'রোয়েছে' ইত্যাদি। এই শব্দগুলিতে 'ও' কার না দিলেও পড়িতে বা বুঝিতে কোন অসুবিধা হইত না। অথচ এই অপ্রয়োজনীয় 'ও' কার ব্যবহারের দ্বারা ভাষাকে বিড়ম্বিত করা হইয়াছে; তাহা মোটেই সঙ্গত নহে।

মহাত্মা গান্ধী—শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র। বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

মহাত্মা গান্ধীর সচিত্র জীবন-কথা। সম্প্রতি শ্রদ্ধের দেশকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় গান্ধীজির আত্মচরিতের বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উপকার করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গভাষায় গান্ধীজির জীবন চরিতের অনুসন্ধান করিতে গেলে একখানি মাত্র মনে পড়ে। তাহা শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা ছাড়া উল্লেখযোগ্য গান্ধী-চরিত বাঙ্গলায় আছে কি না আমাদের ঠিক মনে পড়িতেছে না। যাহা হউক, তাহার পরেই আমরা আলোচ্য জীবনচরিতখানি পাইতেছি।

গান্ধী-জীবন-ব্যাখ্যানের বিশেষ প্রয়োজন বঙ্গসাহিত্যে আছে। এই পুস্তকটি সেই প্রয়োজন অনেকটা মিটাইবে।

যোগেশ-বাবুর গান্ধীচরিতে এই মহাপুরুষের অসংখ্য কর্মময় জীবনের ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ আছে বটে, কিন্তু গান্ধীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও গভীরতার বিশ্লেষণ তাহাতে নাই। আলোচ্য জীবনচরিত খানির বিশেষত্ব এই—ইহাতে লেখক গান্ধীজির অনুষ্ঠিত ছোট বড় সমস্ত কর্মের বিবৃতির মধ্য দিয়া এই জগৎ পূজ্য মহামানবের চরিত্রটীকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য গান্ধী-চরিত্র কীর্ত্তন এবং সে উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সফল হইয়াছে। গান্ধীজির জীবনের ঘটনাবলী তিনি বাদ দেন নাই, তবে তাহা সুকৌশলে সংক্ষেপে বলিয়াছেন; অনাবশ্যক ভাবে বাড়াইয়া বলেন নাই এবং যতটুকু বলিলে গান্ধী-চরিত্রের বিশেষত্বগুলি পরিস্ফুট করা যাইবে তিনি ততটুকুই বলিয়াছেন। মোটের উপর, বইটি পড়িয়া ইহাই মনে হয় যে, সাধারণের নিকট এই মহৎ চরিত্রটি উজ্জ্বল করিয়া ধরিবার বিশেষ চেষ্টা লেখক করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা চরিত্র-ব্যাখানের উপযোগী সরল অথচ মর্য্যাদাসম্পন্ন। গান্ধী-চরিত্র বুঝিবার পক্ষে পুস্তকটি বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

পুস্তকটিতে গান্ধীজির মাত্র একখানি চিত্র আছে। গান্ধীজির বিভিন্ন বয়সের কয়েকখানি ছবি ইহাতে থাকা উচিত ছিল। তাহাতে পুস্তকের গৌরব বর্দ্ধিত হইত। ছাপা ও বাঁধাই ভালই; কিন্তু কাগজ ভাল দেওয়া হয় নাই।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

পরিচয়

(গল্প)

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

দু-ধারে ধু-ধু-মাঠ, মাঝখান দিয়ে একটা প্যাসেঞ্জার-ট্রেণ এঁকে বেঁকে চলেছে। এই ট্রেণেরই একটা সেকেণ্ড-ক্লাস্ গাড়ীর মধ্যে দোলগোবিন্দ শুঁই সদলবলে তাঁর চন্দননগরের বাগানে চলেছেন। বেঁটে-খেঁটে লোকটা, রং মিশ-কালো, চোখ-দুটো ছোট-ছোট এবং গোলাকার, মাথার চুল সজারুর কাঁটার মত খোঁচা খোঁচা, ঠেঁঠ পুরু এবং নাকটা কিঞ্চিত বসা। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পরণে ফরাসডাঙ্গার মিহি জরিপাড় ধুতি। পায়ে সোণালীরংএর পম্প্-সু। দু-হাতের মোটা মোটা বেঁটে বেঁটে আঙুলে কম করে এক ডজন আংটি; ডান হাতের কনুইয়ের উপর প্রকাণ্ড একটা সোণার কবচ পাতলা পাঞ্জাবীর আস্তেনের আড়াল থেকে ঝিলিক্ মারছে এবং পাঞ্জাবীর গলার বোতামটী খোলা থাকায় ভিতরকার গোলাপী সিল্কের গেঞ্জির আড়াল দিয়ে সরু একছড়া সোণার হার ক্ষণ-প্রভার মত মধ্যে মধ্যে চিক্ চিক্ করে উঠছে।

গাড়ীর মধ্যে একটী যুবতীও রয়েছে। ছিপ্-ছিপে গড়ন,—একহারার উপর দিব্যি মানান-সই চেহারা। রং খুব ফর্সা না হলেও বেশ একটু জৌলুস্ আছে। মুখ-চোখ যে খুব ভাল তা নয়, কিন্তু সব জড়িয়ে দিব্যি একটা আল্‌গা ছিরি আছে। এ ছাড়া যে কয়টী জীব গাড়ী-খানির মধ্যে সশরীরে বর্ত্তমান, তাঁদের রূপ এবং গুণ কোনটারই স্বতন্ত্র পরিচয়ের দরকার করে না—বাবুর পরিচয়েই তাঁদের পরিচয়।

ট্রেণটা সবে লিলুয়া ষ্টেশন ছাড়িয়াছে। একটু পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন আর বৃষ্টি নেই বটে কিন্তু একটা এলো-মেলো খোড়ো-হাওয়া চারিদিকে মাতা-মাতি করে বেড়াচ্ছে। সেই এলো-মেলো বাদলা-হাওয়ায় যুবতীটির কপালের উপরকার কোঁকড়া কোঁকড়া ঝুরো চুলগুলো মুখে-চোখে এসে পড়াতে যুবতী ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠছিল।—হঠাৎ শুঁই-মশাই বলে উঠলেন—"বাতাসও তোর সঙ্গে রসিকতা করতে ছাড়ে না বিনি!—কি চেহারা নিয়েই জন্মেছিলে বাবা!"

বিনি তার এলোমেলো চুলগুলোকে সংযত করতে করতে একটা অর্থ-পূর্ণ মৃদু হাসি ঠোঁটের ডগায় এনে

বল্লে—"বাতাসের যে পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই,—নইলে রসিকতা করে করুক না।"

নিলু চেঁচিয়ে উঠলো—"জিতা রও বাইজি, আমার যদি পয়সা থাকতো মাইরি বলছি তোর এক একটি কথা গ্রামোফোনে রেকর্ড করে রাখতুম।"

গুঁই সগর্ব্বে বলে উঠলো—"একি বাবা রেখো মল্লিক.কর মেয়েমানুষ রাখা!-রাখবো তো বাবা বাজারের সেরা চিজ রাখবো—না পারি তো শালা সন্নিসি হয়ে বেরিয়ে যাবো সোভি আচ্ছা—তবু বাবা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করছি না।

ক্ষেত্তর বলে উঠলো—"যা বলেছ বড়বাবু, শালা রেখো মল্লিককে সেদিন বল্লুম—'একটা ভাল মেয়েমানুষ হাতে আছে রাখবে?' শালা আগেই বলে কি না—'কি পড়বে?' মর শালা—আগে মেয়েমানুষ ত্যাখ্—তা নয় আগেই দরদস্তুর!"

অবিনাশ বলে উঠলো—"যতই হোক্ দু'পুরুষে বড়-লোক বইতো নয়—বনেদি হ'তে ঢের দেরী! বড়বাবুরা চোদ্দপুরুষ ধরে এই কাজ করে আসছেন—ইয়ারকি নয়!"

এই সময় ট্রেণটা বেলুড় ষ্টেশনে এসে থামলো।

হঠাৎ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে একবার মাত্র চেয়েই ক্ষেত্তর বলে উঠলো—"দেখুন বড়বাবু ঐ লোকটা বিনির দিকে কি রকম করে চেয়ে রয়েছে—শালা মরেছে!" সকলে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে সত্যই একটী আধা-বয়সী ভদ্রলোক অনিমেষ নয়নে তাদের গাড়ীখানার দিকে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে।

গুঁই-মশাই বলে উঠলো—"কেউ গিয়ে ধাঁ করে লোকটাকে আমাদের গাড়ীতে ধরে আনতে পারিস,—দিব্যি মজা করা যাবে!—লোকটার হাতে একটা ব্যাগও রয়েছে—নিশ্চয়ই এই ট্রেণেই কোথাও যাবে। সেকেণ্ড-ক্লাসের টিকিট্ নয়—কাজেই আমাদের গাড়ীতে উঠতে পারছে না—ভজা, বোঁ করে গিয়ে লোকটাকে বচন্-সচন্ দিয়ে এই গাড়ীতে তুলে দিতে পারিস?-মাইরি তা'হলে ভারি মজা হয়!—যা বোঁ করে চলে যা—গাড়ী ছাড়ল ব'লে।"

কথাটা শেষ হ'বার পূর্ব্বেই ভজা তড়াক করে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো এবং লোকটীর কাছে গিয়ে কোন প্রকার ভূমিকা না করেই বল্লে—"আসুন না আমাদের গাড়ীতে, অনেক জায়গা আছে!"

লোকটী তার মুখের দিকে একবার চেয়েই অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়ে বল্লে—"আমি এ ট্রেণে যাবো না—আমি অপেক্ষা করছি কলকাতার ট্রেণের জন্যে।"

ভজা তথাপি কি বলতে যাচ্ছিল—হঠাৎ ঠং ঠং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠলো!—এক দৌড়ে গাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ে সে বল্লে—"লোকটা কলকাতার ট্রেণের জন্যে অপেক্ষা করছে।"

গুঁই মশাই একটু ক্ষুণ্ণস্বরেই বল্লে—"লোকটা এলে কিন্তু ভারি মজা হোতো নয় বিনি?"

বিনি একটু হেসে বল্লে—"তা হোতো বৈ কি!"

গুঁই বল্লে—"তুই কি করতিস্ মাইরি?"

বিনি সগর্ব্বে বল্লে—"এমন হাব-ভাব দেখাতুম যেন ওকে দেখে একবারে মরে ভূত হয়ে গেছি।"

অবিনাশ বলে উঠলো—"ওঃ তা'হলে যা মজা হোতো মাইরি। বিনির হাব-ভাব বাবা—কার সাধ্যি ধরে ফেলে। লোকটা ভাবতো ওকে দেখে ছুঁড়ী মরেছে; তারপর শালাকে একবার চন্দননগরের বাগানে নিয়ে গিয়ে ফেলে সারারাত বাঁদর-নাচান যেতো। কি দাওটাই ফস্কালো মাইরি!—যেমন লোককে পাঠিয়েছিলেন বড়বাবু।"

ভজা চেঁচিয়ে উঠলো—"সে এ ট্রেণেই যাচ্ছে না, তাকে কি করে নিয়ে আসবো শুনি?"

অবিনাশ খিঁচিয়ে উঠলো—"আমি হ'লে বলতুম—'বিবিজান আপনাকে একবার ডাকছেন'—তারপর ও তো ও, ওর চোদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত ছুটে আসতো।"

বিনি বলে উঠলো—"চোর পালালে বুদ্ধি অনেকেরই বাড়ে।"

গুঁই বল্লে—"যা বলেছ!"

গাড়ী চলতে লাগলো।—ক্ষেত্তর এতক্ষণ একধারে চুপ করে বসেছিল—হঠাৎ রক্তবর্ণ চক্ষুদুটীকে বিস্ফারিত করে বল্লে—"সেবার কি রকম মজা হয়েছিল বড়বাবু!"

বড়বাবু তার রূপার প্রকাণ্ড ডিবেটা থেকে চারটে পান বার করে বৃহৎ একটা হাঁ করে সবকটা একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে গালদুটো ফুলিয়ে বল্লে—"কোন্‌বারের কথা বলছিস্ বল দেখি ?"

"সেই যেবার আমরা খড়দার রাস দেখতে গেছলুম।"

বড়বাবু লাফিয়ে উঠলো—"ওঃ সে ঘটনা জীবনে কখন ভুলতে পারবো না!—সে কথা যখন মনে পড়ে তখন মাইরি বিনি তোর পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে। ওঃ—লোকটাকে কি নাচান্‌টাই নাচিয়েছিলি মাইরি!"

বিনি সগর্ব্বে বলে উঠলে—"লোকটা শেষকালে আর্য্য-সমাজী মতে বিয়ে করতে পর্য্যন্ত চেয়েছিল।"

অবিনাশ বল্লে—"সত্যি বলতে কি বড়বাবু—আমার সে সময় একটু ভয়ও হয়েছিল। বিনি যে রকম চোখ মুখের ভাব করছিল আমার এক একবার মনে হচ্ছিল হয় তো বা সত্যিই ছোঁড়াকে দেখে বিনি মরেছে,—কখন কার মনে"—

কথাটাকে শেষ করতে না দিয়েই ক্ষেত্তর বলে উঠলো—"মাইরি বলছি বড়বাবু—আমারও ভয় হয়েছিল—বলিহারি বাইজী!"

বিনি কোন কথা বল্লে না,—কেবল একটা গর্ব্বের হাসি তার পাতলা ঠোঁট দুটোর উপর দিয়ে অলক্ষিতে খেলে গেল।

জগা বলে উঠলো—"সাক্ষাৎ উর্ব্বশী মাইরি, কোন্‌দিন ডানা মেলে না উড়ে যাও বাবা!"

অবিনাশ বলে উঠলো—"আচ্ছা বিনি—তুই তো ভদ্দর ঘরের বউ ছিলি,—হবে এ সব শিখলি কোথায় ?"

বিনির হ'য়ে শুঁই উত্তর দিলে—"এ সব কি কেউ কাউকে শেখাতে পারে রে আহাম্মক—এ সব হচ্ছে ভগবানদত্ত ক্ষমতা।"

গাড়ী চলেছে। মধ্যে দু একটা ষ্টেশন কখন পার হ'য়ে গেছে কেউ টেরই পায় নি—সকলেই গল্পে মত্ত। বিনি তার জীবনে কজন পুরুষকে বোকা বানিয়েছে, তার পাল্লায় পড়ে অতি বড় ধড়ীবাজ লোকও কেমন করে আহাম্মক বনে গেছে, শুঁই মশায়ের সঙ্গে পরিচয় হবার পূর্ব্বে কোন্ কোন কাপ্তেনকে সে কি ভাবে জব্দ করে দিয়েছে—এই সব বাহাদুরীর ইতিহাস সে সগর্ব্বে আউড়ে যাচ্ছিল এবং সপরিষদ শুঁই তাই শুনে যাচ্ছিল।—হঠাৎ কি মনে করে শুঁই বলে উঠলো—"আমাকে কিন্তু জব্দ করতে পারিস নি বিনি।"

চোখ দুটোকে একটু বাঁকিয়ে বিনি বল্লে—"এখানে নিজেই জব্দ হয়ে গেছি মাইরি।"

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেণ হাওড়াপুলী ষ্টেশনে এসে লাগলো।—হঠাৎ বাইরের দিকে চেয়েই অবিনাশ বলে উঠলো—"বড় বাবু আবার একটা ক্যাব্‌লা পাওয়া গেছে,—এবার কিন্তু ওকে নিশ্চয়ই গাড়ীতে তুলতে হ'বে! ওঃ কি ভাবে তাকিয়ে আছে দেখুন—শালা যেন গিলবে।"

অবিনাশের কথায় বাইরের দিকে চেয়ে সকলে দেখলে বাস্তবিকই তাদের গাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটী লোক হাঁ করে পলকহীন দৃষ্টিতে বিনির মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে—ঠিক যেন একটী পাথরের 'সট্যাচু' (মূর্ত্তি)

ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ ষাট হ'বে। গায়ে জামা নেই। একটী অর্দ্ধমলিন জীর্ণ পাতলা উত্তরীয় ভাঁজ করে কাঁধের উপর ফেলা। কপালে—চন্দনের ফোঁটা;—বগলে খেরোজড়ান একখানি পুঁথি এবং ডান হাতে একটী পিতলের নূতন ঘড়া। সম্ভবতঃ কাছে পিঠে কোথাও ব্রাহ্মণ-বিদায়ের ব্যবস্থা ছিল। কাজ সেরে বাড়ী ফেরবার জন্য ট্রেণের অপেক্ষা করছিলেন।

অবিনাশ গাড়ীর ভিতর থেকেই শশব্যস্তে বলে উঠলো—"আসুন ভট্‌চায্যি-মশাই—এই গাড়ীতে জায়গা আছে।"

জগা চেঁচিয়ে উঠলো—"বিবিজান আপনাকে ডাকছেন মশাই—বিশেষ দরকার আছে।"—

বিনি কি বলতে যাচ্ছিল—সকলের চেঁচামেঁচি এবং হুড়োহুড়িতে তার কথা শোনাই গেল না।

শুঁই চেঁচিয়ে উঠলো—"আপনি না এলে বিবিজান আত্মহত্যা করবে মশাই।"

সকলের চেঁচামেঁচিতে হঠাৎ চমক ভাঙতেই লোকটী মুখ নামিয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, এমন সময় তড়াক্ করে গাড়ী থেকে লাফিয়ে

পড়ে অবিনাশ তাকে জোর করে জাপটে ধরে গাড়ীর মধ্যে তুলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে।

লোকটী গাড়ীর মধ্যে উঠতেই গুঁই-মশাই অভিনয়ের ভঙ্গীতে সুরু করলে—"আপনি কি রকম নিষ্ঠুর লোক মশাই!—আমাদের বিনোদিনী আপনাকে দেখে মরতে বসেছে আর আপনি কিনা স্বচ্ছন্দে তাকে ফেলে চলে যাচ্ছিলেন?—দেখুন দেখি বেচারির অবস্থাটা।"

কথাটা শেষ করে বিনির দিকে একবার চেয়েই গুঁই-মশাই হাসি সামলাতে পারলে না।—সে দেখলে বিনি বেঞ্চের উপর ঢলে পড়েছে—তার চক্ষু নিমিলিত—দেহ শিথিল—নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে কিনা সন্দেহ,—কে বলবে তার দেহের ত্রিসীমানায় কোথাও চৈতন্যের লেশমাত্র বর্ত্তমান রয়েছে।

অবিনাশ গুঁই-মশায়ের কানে কানে বল্লে—"বলিহারি বাবা!—কার সাণ্ডি ধরে ন্যাকামো করছে।"

ক্ষেত্তর চুপি চুপি বল্লে—"পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে করে বড়বাবু।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে আগন্তুকের দিকে চেয়ে গুঁই-মশাই গম্ভীরভাবে বল্লে—"দেখুন দেখি কি নয়ন-বাণটাই মেরেছেন মশাই—এমনি করেই অবলা বধ করতে হয় দাদা!"

লোকটীর মুখ দিয়ে একটী কথাও বেরুলো না,—সে পাথরের মূর্ত্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ক্ষেত্তর চাপাহাসির সুরে বলে উঠলো—"উভয়ের নয়নবাণে উভয়েই জর্জ্জরিত দেখছি।"

অবিনাশ লোকটীকে একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলো—"বাপ্ কৃষ্ণ চেয়ে দেখ—তোমার শ্রীরাধা তোমার বিরহে ছিন্নলতিকার মত ধূলায় লুণ্ঠিত।"

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেণ হুস্ হুস্ শব্দে ষ্টেশন ত্যাগ করে চলতে সুরু করে দিলে।

সহসা যেন চেতনা লাভ করে লোকটী বলে উঠলো—"আপনারা দয়া করে আমাকে পথ ছেড়ে দিন—আমি অন্য গাড়ীতে চলে যাই।"—তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কম্পিত!

তাকে জোর করে বেঞ্চের উপর বসিয়ে দিয়ে অবিনাশ বলে উঠলো—"স্ত্রীহত্যার পাতক হবেন না মশাই—দোহাই আপনার।"

গুঁই অতি কষ্টে হাসি চেপে বলে উঠলো—"শ্রীমতী তোমার মূর্চ্ছা ত্যাগ করে চেয়ে দেখ—তোমারি নাগর তোমার কুঞ্জদুয়ারে দণ্ডায়মান।—ওঠো বিধুমুখী!—বারেক চেয়ে দেখ।"

কিন্তু শ্রীমতীর কাছ থেকে কোন উত্তরই পাওয়া গেল না।

অবিনাশ গুঁই-মশায়ের কানে কানে বল্লে—"বলিহারি বড়বাবু!—কে বলবে ঢং করছে।"

বড়বাবু চাপা গলায় বল্লে—"মুখ দিয়ে গাঁজা পর্য্যন্ত ভাঙ্গছে—তা দেখিছিস্?—রেধো মল্লিকের চোদ্দ পুরুষ এমন মেয়েমানুষ কখন চোখে দেখেছে?

হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বিনি বলে উঠলো—"একটু জল!"

অবিনাশ অতি কষ্টে হাসি সামলে নিয়ে বল্লে—"তোমার নাগরের প্রেমসুধা পান করে তৃষ্ণা নিবারণ কর রাধে—জলে যে এ তৃষ্ণা নিবারণ হবার নয় প্রেমময়ী!"

বিনি কোন কথা বল্লে না—কেবল একটা অস্পষ্ট ঘড় ঘড় শব্দ তার কণ্ঠ থেকে বারেক নির্গত হয়ে থেমে গেল।

এবার আর কেউ হাসি সামলাতে পারলে না, একটা বিকট হাস্যধ্বনি ট্রেণের ঘড়ঘড়ানিকে পর্য্যন্ত ছাপিয়ে উঠলো।

হাসির বেগটা একটু থামলে আগন্তুক বৃদ্ধের দিকে চেয়ে অবিনাশ বল্লে—"একেই বলে প্রেমের দশদশা বুঝলেন মশাই! এখন ঠ্যালা বুঝুন!"

ক্ষেত্তর বল্লে—"এ পক্ষেও দেখছি ঐ একই দশা উপস্থিত। রাধাকৃষ্ণের লীলা—হরি হরি বল!"

হরিধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেণটা বৈদ্যবাটী ষ্টেশনে এসে লাগলো।

এই সময় হঠাৎ একটী কোট-প্যাণ্ট পরা অতিকায় ভদ্রলোক পশ্চাতে কুলির মাথায় পর্ব্বতপ্রমাণ মোট-ঘাট নিয়ে গাড়ীখানার মধ্যে উঠে পড়ে একটা অপ্রত্যাশিত গোলমালের সৃষ্টি করে বসল। লোকটী একাই একশ,—যেমন লম্বা—তেমনি চওড়া। তাঁর সঙ্গের মালপত্রগুলিও তাঁর চেহারার সঙ্গে দিব্যি সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে।

ভদ্রলোক প্রথম কুলীনের বিয়ে বালপত্র গুছিয়ে গাঁছিয়ে রেখে ঠিক হয়ে তাকিয়ে বসলেন—তখন গুঁই-মশাই এবং তাঁর অনুচরবর্গ অবাক হয়ে দেখলে ভট্টাচায্যি-মশাই এই গোলমালের ফাঁকে কখন এক সময় গাড়ী থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছেন,—পড়ে রয়েছে কেবল তাঁর দেনো পিতলের ঘড়াটা।

শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে সকলেই হতাশ হয়ে পড়েছিল। অবিনাশ গাড়ী থেকে নেমে পড়ে লুপ্তরত্নো-দ্ধারের শেষ চেষ্টা করতে যাচ্ছিল—হঠাৎ গাড়ী চল্‌তে সুরু করায় বাধ্য হয়ে থেমে গেল।

অত্যন্ত ক্ষুন্নস্বরে ক্ষেত্তর বলে উঠলো—"আর মিছে কষ্ট করা বিনি—নাগর পালিয়েছে,—উঠে পড়্!"

কিন্তু বিনির কাছ থেকে কোন উত্তর এল না।

গুঁই-মশাই বলে উঠলো—"মিথ্যে পড়ে থাকা,—আর ব্রজে আসবে না নীলমণি!"

তথাপি কোন উত্তর নেই।

আগন্তুক অতিকায় ভদ্রলোকটী এতক্ষণ চুপ করে বসে এদের কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছিলেন—হঠাৎ বিনির দিকে চেয়েই বলে উঠলেন—"আপনারা করছেন কি—স্ত্রীলোকটী মূর্চ্ছা গেছেন—দেখতে পাচ্ছেন না।"

অবিনাশ হো হো করে হেসে উঠলো। গুঁই সগর্ব্বে বলে উঠলো—"কি রকম অভিনয় বলুন মশাই!"

আগন্তুক ভদ্রলোকটী কিন্তু কোন কথা কানে তুললেন না। তিনি সহসা তাঁর বিরাট কোটের বিরাটতর বুক-পকেটের ভিতর থেকে ষ্টেথেস্‌কোপটা বার করে ফেলে বিনির নিকটে গিয়ে তার বুকে সেটাকে লাগিয়ে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করেই শশব্যস্তে বলে উঠলেন—"ইনি দেখছি অনেকক্ষণ হোলো অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। আপনারা শিগ্‌গির এঁর মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিন,—নইলে কি থেকে কি হয় বলা যায় না।"

গুঁই এবং অবিনাশ একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে।

ক্ষেত্তর সভয়ে বল্লে—"তবে কি সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেছে ডাক্তারবাবু?"

লোকটী নিকটস্থ কুঁজো থেকে গ্লাসে করে জল গড়াতে গড়াতে বিরক্তভাবে বল্লেন—"তবে কি ইয়ারকি করছি আপনাদের সঙ্গে!"

নামরহস্য

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

শেক্ষপিয়র লিখিয়াছেন,—

"———নামে কি করে?

গোলাপ, যে নামে ডাক, সৌরভ বিতরে।"

কিন্তু নামমাহাত্ম্যে কি কিছু নাই? কেবল নামের গুণে এ সংসারে অনেক সিদ্ধ, অনেক নিষ্ফল উদ্যম প্রশংসিত হয় না কি? শেক্ষপিয়র নিজেই দেখাইয়াছেন যে, নামের গুণ আছে। জুলিয়স সিজরের হত্যাকারীদিগের মধ্যে এক জনের নাম ছিল—'সীনা'। সীনা নামে আর এক জন কবি ছিলেন। এণ্টনির বক্তৃতা শুনিয়া রোমের অধিবাসিগণ যখন সিজরের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় কবি সীনার সহিত অকস্মাৎ পথে তাহাদের দেখা। তাহাদের মধ্যে এইরূপ কথা হইল,—

নাগরিক। তুমি কোথায় যাইতেছ?

সীনা। সিজরের সৎকার দেখিতে।

না। শত্রুভাবে, না মিত্রভাবে?

সী। মিত্রভাবে।

না। তোমার নাম কি, সত্য বল।

সী। সত্যই বলিতেছি আমার নাম সীনা।

না। এ এক জন ষড়যন্ত্রকারী, ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেল।

সী। আমি কবি সীনা! আমি কবি সীনা!

না। ইহার কদর্য্য কবিতার জন্য ইহাকে খণ্ড খণ্ড কর।

সী। আমি হত্যাকারী সীনা নহি।

না। নাই বা হইল, ইহার নাম ত সীনা বটে। ইহার হৃদয় হইতে নামটা ত উৎপাটন কর।

নাম-মাহাত্ম্য কিছু নাই কি?

১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে পারী নগরের "রু ব্লাঙ্কি" নামক রাস্তার ৭০ নং বাড়ীতে প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিগণ সমবেত। ঘোর বিপদ। লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফ্রান্সের সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য দারুণ ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। প্রতিনিধিগণ ভীত, চকিত, ক্রুদ্ধ, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। বড়ই কঠিন সময়। সময়ও অল্প। স্থির হইল, প্রকৃতিপুঞ্জকে উত্তেজিত করা আবশ্যক। তজ্জন্য ঘোষণা অবিলম্বে প্রচার করিতে হইবে। অনেকে বলিয়া উঠিল,—"কি ঘোষণা দিতে হইবে বলুন, আমরা লিখিয়া লইতেছি।"

ভিক্টর হুগো বলিতে লাগিলেন; বোডিন্ লিখিলেন,—"লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বিদ্রোহী।"

জুলস্ ফাবার বলিলেন,—নেপোলিয়ন কথাটা কাটিয়া দাও। প্রজাসাধারণ ও সৈন্যমধ্যে সে মহিমাময় নামের প্রভাব অসীম।

ভিক্টর হুগো বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছেন।"

"নেপোলিয়ন" কথাটা কাটিয়া দেওয়া হইল। লেখা হইল,—"লুই বোনাপার্ট বিদ্রোহী।"

নামের মাহাত্ম্য কিছু নাই কি? লুই নেপোলিয়নও কেবল নামের গুণেই সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের নামের গুণ ও দোষ অতি বিস্তৃতরূপে স্বীকৃত। শুধু স্বীকৃত নহে; কার্য্যেও প্রতিপাদিত। নাম না করিয়া আমাদের কোন কাজ হয় না। জমাখরচের খাতাই লিখি, আর চিঠি লিখি, অগ্রে শ্রীদুর্গা বা শ্রীহরি না লিখিলে চলে না। কেহ কেহ প্রতিদিন নিয়মিতসংখ্যক দুর্গানাম না লিখিয়া আর কিছু লিখে না। বিপদে মধুসূদন, শয়নে পদ্মনাভ, শয্যাত্যাগে ও যাত্রাকালে দুর্গা-নাম না করিয়া আমাদের কোন কাজ হয়? অন্ধকার রাত্রে বিজন পথে আমরা "রাম রাম" বলিয়া চলি,—বিশ্বাস, নামের গুণে, প্রেতযোনি পলাইবে; নিশাকালে সর্পের কথা উঠিলে স্ত্রীলোকেরা গড়ুরের নাম করে—ধারণা, সাপ আর আসিবে না, ভক্ত বলেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাম কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

জ্ঞান নহে, কর্ম্ম নহে, ভক্তি নহে—কেবল নাম। নামের সেবক আমাদের মতন কেহ নাই।

আমরা জানি কেবল নামের গুণে ত্রেতাযুগে জলে শিলা ভাসিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি,—

"হরিনামের গুণে শুষ্ক তরু মঞ্জুরিল।"

আবার পক্ষান্তরে, কেবল নামের গুণে গ্রাবু খেলায় চারিখানা তাস

উঠিয়া যায়। এমন নাম আছে, যাহা আহারের পূর্ব্বে কেহ করে না। সে নাম করিলে আহারে বিঘ্ন [illegible] — হয় প্রস্তুতপ্রায় অন্নের হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া আকায় পরে [illegible] মুখের আহার জলের জালা ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যায়।

কেবল নামের জন্ত আমাদের কতই না আগ্রহ, কতই না লালসা। মুমূর্ষু ভিক্ষুক আসিয়া প্রাণপাত করিলেও যিনি একটা পয়সা দেন না, নিজের নাম গেজেটে দেখিবার জন্ত তিনি শত সহস্র মুদ্রা অকাতরে জলে ফেলিয়া দিয়া থাকেন। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, নিরাশ্রয় প্রজার মুখের গ্রাস হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া যাঁহারা পাওনা খাজনার কড়া ক্রান্তি আদায় করিয়া লয়েন, তাঁহারাই একটা নামের জন্ত, একটা "রায় বাহাদুর" "রাজা-বাহাদুরে"র জন্ত শালগ্রামের উপবীত পর্য্যন্ত বেচিয়া শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিতে যারপরনাই ব্যগ্র, এবং করিতে পাইলে যারপরনাই কৃতার্থ। আমরা নাম পাড়াইবার জন্ত ভারতবৎসল, নাম পাড়াইবার জন্ত সমাজসংস্কারক, নাম পাড়াইবার জন্ত কাগজে লিখি, নাম পাড়াইবার জন্ত সভা করিয়া বক্তৃতা করি, এবং উত্তমর্ণকে ঠকাইবার জন্ত সম্পত্তি বেনামী করি।

মানুষের নামের সম্বন্ধে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর নামের পক্ষপাতী। বীরভূমের লোকের নামে "হরি" শব্দটা বড় প্রবল; যথা—ভবহরি, রাখহরি, থাকহরি, বলহরি। ঢাকা অঞ্চলে পুরুষের নাম—রামচন্দ্র, কালীচন্দ্র, বঙ্কচন্দ্র, শশীচন্দ্র; স্ত্রীলোকের নাম—রামমণি, কৃষ্ণমণি, হরমণি। ময়মনসিংহে "কিশোর" কথাটার খুব প্রাদুর্ভাব—রাধাকিশোর, নন্দকিশোর, ভবানীকিশোর, যুগলকিশোর, কেবলকিশোর। আমাদের এ অঞ্চলে অনেকে আজ কাল পুত্রকন্তার নাম নাটক উপন্তাস হইতে বাছিয়া বাহির করে। পূর্ব্বে লোকে দেবতার নামে ছেলে মেয়ের নাম রাখিত। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! উন্নতি না অবনতি!

কতকগুলি নাম আছে, যাহা শুনিলেই নামধারীর প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা আপনাআপনি মনে উদয় হয়। নামধারীকে কখন দেখি নাই, তাহার কথা কাহারও কাছে শুনি নাই, তাহার কোন কার্য্যের সহিত পরিচিত নহি, অথচ কেবল নাম শুনিয়া স্থির করিয়া লই, লোকটা কি রকমের। এই প্রথম ধারণা অনেক সময় পরে সংশোধন করিতে হয় বটে, কিন্তু তখন মনে হয়—নাম এবং নামধারী পরস্পর উপযোগী নহে—এ লোকের এ নাম হওয়া উচিত ছিল না। "নবীন" নামটা শুনিলেই মনে হয়, লোকটা বেশ চতুর, রসিক, আমোদপ্রিয়, শ্যামবর্ণ, নাতিস্থূল, নাতিকৃশ। ইয়ারকির মজলিশে বেশ পশার; পণ্ডিতের মধ্যে কিছু মুখচোরা। পক্ষান্তরে তেমনি "গোবর্দ্ধন" নাম শুনিলেই মনে হয়, লোকটা নির্ব্বোধ, একটু হাবা, স্থূলকায়, একটু "রামবল্লভ" রকমের, বাজার হাট করিতে গিয়া দরদাম লইয়া প্রত্যহই দোকানদারের সহিত ঝগড়া করে, এবং প্রত্যহই ঠকিয়া আসে। কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস, জিনিসপত্র কিনিতে তাহার জোড়া বিশ্ব বাঙ্গালায় আর কেহ নাই। রামসদয় মিত্রের পত্নীর সম্বন্ধে রজনী বলিয়াছে,—"তাঁহার প্রকৃত নাম কি জানি না, কিন্তু তাঁহার গলায় সাই সাঁই শব্দ শুনিয়া রামমণি ব্যতীত অন্ত নাম আমার মনে আসে না।"

পাঁচ জনে নাম করিবে, ইহার জন্ত কত লোকে কত দুষ্কর্ম্ম করে—খ্যাতির জন্ত কলঙ্ক কিনে। সুনামই হউক, দুর্নামই হউক, নাম ত বটে। এইরূপ নামের জন্ত একটা প্রাচীন গ্রীক একটা দেবমন্দির পোড়াইয়াছিল।

ইংরাজেরা বলেন, Give your dog a bad name and hang it. ইহার অর্থ তোমার কুকুরের একটা বদনাম দেও, তাহার পর তাহাকে ফাঁসি দিও। এইরূপ কোন কথা বাঙ্গলায় নাই বটে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, কেহ কেহ চাকর ছাড়াইতে হইলে একটা দুর্নাম দিয়া ছাড়ায়। অন্ত দিকে মানুষের স্বভাব এই যে নিজের কুপ্রবৃত্তি, কুঅভ্যাস, কুকাজে একটা সদাখ্যা প্রদান করিয়া আত্ম-প্রতারণা করে। আমরা যদি সকল সময়ে সকল বিষয়কে তাহার প্রকৃত নামে অভিহিত করি, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক পাপের হাত এড়াইতে পারি।

আমাদের দেশের লোকে একটা বড় ভুল করিয়া থাকে। বেনামী দরখাস্ত গ্রহণ করে। যাহাদের প্রকাশ হইবার সাহস নাই, তাহারাই বেনামী দরখাস্ত বা চিঠি লেখে। আমরা এতই অল্পবুদ্ধি যে, আমরা তাহাই গ্রহণ করি, এবং তদনুসারে কার্য্য করি। নামের কথা আর বলিব কি, যে জিনিস সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, তাহারই নাম বিনামা। এই প্রবন্ধটাই যে "সাহিত্যে" স্থান পাইতেছে, সেও বোধ করি যে কেবল একটা নামের জন্ত।

এই পার্থিব জীবনের শেষ—মৃত্যু। মৃত্যু ত ক্ষণিক। তাহারই পর অনন্ত। তাহাকেই পরিণাম বলে। নামের কথা ইহার উপর আর কি বলিব।

সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩০১

ঐতিহাসিক কাগজপত্র

সখারাম গণেশ দেউস্কর

খৃষ্টীয় ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপন-পূর্ব্বক মোসলমানদিগের শাসনশৃঙ্খল হইতে হিন্দুসমাজকে মুক্ত করিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার আভাস আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি। ভূতপূর্ব্ব মহারাষ্ট্রপতিগণের শাসনব্যবস্থা ও প্রজাপালনী নীতি কিরূপ ছিল, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্ত, মহারাষ্ট্রীয় কৃতবিদ্যমণ্ডলীর প্রযত্নে, পেশওয়েদিগের ও মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার, জাইগীরদার ও সামন্তবর্গের বংশধরগণের দপ্তর হইতে ও অন্যান্ত সূত্রে যে বিবিধ ঐতিহাসিক কাগজপত্রের সংগ্রহ ও প্রকাশ হইতেছে, তাহার বিবরণও সময়ে সময়ে সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সংপ্রতি এই সকল দেশীয়

ঐতিহাসিক উপকরণের স্বরূপ-যোগাড়া কিরূপ, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে আমরা কয়েকটি মূল কাগজ-পত্রের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম।

কন্যা-বিক্রয়-নিষেধ।

অসমর্থ কন্যাবিক্রয়-প্রথা রহিত করিবার জন্য মহারাষ্ট্রপতিগণ কিরূপ শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাই নিম্নে প্রকাশিত তিনটি পত্র হইতে জানিতে পারা যায়। পত্রগুলি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অতি আশ্চর্য্যরূপে জনৈক গন্ধবণিকের গৃহে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। পত্রাঙ্কিতরাজমুদ্রা ও হস্তাক্ষরাদির প্রতি মনোযোগ করিলে পত্রগুলি কৃত্রিম বা মূলের অনুলিপি বলিয়া বোধ হয় না।

প্রথম পত্রে দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের আদেশ ও পরবর্ত্তী পত্রদ্বয়ে রাজাদেশ কিরূপে প্রতিপালিত হইল, তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। পত্রগুলি ১৮১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত।

(প্রথম পত্র)

"শ্রী।

"বেদমূর্ত্তি, রাজশ্রী, ধর্ম্মাধিকারী, জোশী, (১) উপাধ্যায় ও সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী, সাং নেওয়াসে (২) প্রভৃতি মহল, গোসাঁই (৩) মহোদয়েষু—

"সেবক (৪) বাজীরাও রঘুনাথ প্রধানের নমস্কার। সুরুসন ইসনে অশর মরাতেন ব অলফ (৫), ব্রাহ্মণসমাজে কেহ যেন বরপক্ষের নিকট হইতে কন্যার নিষ্ক্রয়স্বরূপ ধন বা ঋণস্বরূপ কোনও প্রকারে অর্থাদি গ্রহণ না করিয়া কন্যাদান করে, এই আদেশ আপনাদিগকে ও ঐ পরগণার দেশমুখ দেশপাণ্ডে পাটিল, কুলকরণী (৬) ও মহাজন-প্রভৃতিদিগকে জ্ঞাপন করিবার, ... পরগণামজকুরের মামলেদার (৭) রাজশ্রী ... আপ্পাজী মহাশয়ের প্রতি আদেশ করা হইয়াছে। তিনিও সকলের নিকট তাহা ঘোষণা করিবেন। তাঁহার ঘোষণা প্রচারিত হইবার পর, যদি কেহ কন্যার দান-পূর্ব্বক বরপক্ষ হইতে নগদ টাকা কড়ি বা ঋণস্বরূপ ধন গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সে সংবাদ বিবাহের অব্যবহিত পরে, বরপক্ষকে ও মধ্যস্থকে (ঘটককে) রাজসরকারে পরগণা মজকুরের মামলেদারের নিকট জানাইতে হইবে। সে সংবাদ পাইবামাত্র মামলেদার ঐ বিষয়ে তদন্ত করিয়া বরপক্ষ হইতে প্রাপ্ত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে কন্যাপক্ষকে বাধ্য করিবেন এবং কন্যাপক্ষ শুল্ক-বিক্রয় করিয়া যত টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তত টাকা তাঁহার নিকট হইতে দণ্ডস্বরূপ আদায় করিবেন। মধ্যস্থ টাকা লইয়া থাকিলে, তাহা তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু যদি বরপক্ষ ও মধ্যস্থেরা এইরূপ বিবাহের বিষয় কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিতে ঔদাস্য প্রকাশ করে, এবং রাজকর্ম্মচারীরা যদি অন্য সূত্রে তাহা অবগত হইতে পারেন, তাহা হইলে কন্যাপক্ষের ন্যায় বরপক্ষ ও মধ্যস্থও দণ্ডভাজন হইবেন। এরূপ ক্ষেত্রে মামলেদার মহাশয় কন্যাপক্ষকে পূর্ব্বকথিতরূপে দণ্ডিত করিয়া বরপক্ষের নিকট হইতে কন্যাপক্ষের প্রদত্ত দণ্ডের দ্বিগুণ এবং মধ্যস্থের নিকট হইতে, তিনি যত অর্থ পাইয়াছেন, তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড আদায় করিবেন। পরগণা মজকুরের মামলেদারকে এ বিষয়ে যথোচিত ক্ষমতাপ্রদানার্থ স্বতন্ত্র সনদ পত্র দেওয়া হইয়াছে। আপনাদিগকে এই পত্র দ্বারা তাহা বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে। অতএব বরপক্ষের নিকট হইতে নিষ্ক্রয় বা ঋণস্বরূপে অর্থ গ্রহণ না করিয়া অতঃপর সকলে কন্যার বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজের কেহ কন্যার বিবাহকালে বরপক্ষের নিকট হইতে নিষ্ক্রয় বা ঋণ গ্রহণ করিলে পূর্ব্বোক্ত রাজাদেশ অনুসারে মামলেদার কন্যাপক্ষ, বরপক্ষ ও মধ্যস্থকে দণ্ডিত করিতে পারিবেন। ইহা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা গেল। তারিখ ২২শে জমাদিলাওয়ল। আজ্ঞানুসার

(লেখনসীমা) (৮)।"

---

(১) সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিতে হইলে বেদচর্চ্চাপ্রধান মহারাষ্ট্রদেশে অদ্যাপি "বেদমূর্ত্তি" পাঠ লিখিত হইয়া থাকে।

"রাজশ্রিয়া বিরাজিত" এই সংস্কৃত বিশেষণটি সংক্ষেপে "রাজশ্রী" রূপে লিখিত হয়।

জোশী—জ্যোতিষী। ইঁহারা এ দেশীয় গ্রহবিপ্রের সমস্ত কার্য্য করেন; কিন্তু এ দেশের ন্যায় অপেক্ষাকৃত অবর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন না।

(২) নেওয়াসে—অহম্মদনগরের উত্তরে গোদাবরী তীরে অবস্থিত।

(৩) সদাচারপরায়ণ ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদিগকে মহারাষ্ট্রদেশে "গোঁসাই" বলিয়া বিশেষিত করা হয়।

(৪) যাঁহাদিগের নামে এই আদেশ-পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ; এই কারণে স্বয়ং ব্রাহ্মণ ও মহারাষ্ট্রপতি হইয়াও বাজীরাও আপনার সম্বন্ধে "সেবক" পাঠের প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্যান্য পেশওয়েগণও এইরূপ পাঠ লিখিতেন।

(৫) অর্থাৎ সুর সন ১২১২। এই আরবী সন দাক্ষিণাত্য কৃষকসমাজে বহুল প্রচলিত। জুন মাসের প্রারম্ভে সূর্য্য মৃগশিরা নক্ষত্রে গমন করিলে এই বর্ষের আরম্ভ হয়। মহম্মদ তগলক বোধ হয় এই অব্দের প্রবর্ত্তক। সুর সনে ৫৯৯ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এই আদেশ-পত্র প্রচারিত হয়।

(৬) দেশমুখ—পরগণার শাসক প্রধান কর্ম্মচারী। দেশপাণ্ডে—দেশমুখের অধীন মহালের কার্য্যপরিদর্শক কর্ম্মচারী। পাটিল—গ্রামরক্ষক। কুলকরণী—গ্রামলেখক।

(৭) মামলেদার—তালুকের শাসক ও রাজস্ব-সংগ্রাহক কর্ম্মচারী।

(৮) এই স্থানে লেখন-সীমা-বোধক রাজমুদ্রা অঙ্কিত আছে।

(২য় পত্র)

"শ্রীরাম [illegible]"

সেবমূর্ত্তি রাজশ্রী "শ্রীমন্ত [illegible] ওয়াই (৯) পরগণা।
"ওয়াই" পুরাপাদেষু—
সেবক পরশুরাম খণ্ডেরাও (১০) রাস্তার (পরগণা ওয়াই) নমস্কার। বিং তপ্ত—আপনি বর্ত্তমান বর্ষে কন্যার বিবাহকালে দিনিষরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া রোজা (সমন) দ্বারা আপনাকে (এখানে) আনা হইয়াছিল। তাহার পর তদন্ত প্রকাশ পাইল যে, আপনি কন্যাবিক্রয় পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করেন নাই। এই কারণে আপনাকে এই অব্যাহতিপত্র দেওয়া গেল। অতঃপর এ সম্বন্ধে আপনাকে আর কেহ উত্যক্ত করিতে পারিবে না। আপনি গ্রামান্তিক অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যথাযথ কালহরণ করুন। তাং ১৫ জমাদিলাখর সন সল্লাস আশর মৈয়াতন। (১২১৩ বা ১৮১২ খৃঃ) অধিক লেখা বাহুল্য, লিখেলন ইতি।"

(৩য় পত্র)

"শ্রী॥

শ্রীমন্ত রাজশ্রী বাবাসাহেব মহোদয়েষু—

আশ্রিত ত্রিম্বক জোশী কালের সেবোক্ত আশীর্ব্বাদ। বিনে দন এই যে, আমি স্বীয় বিবাহকালে আমার শ্বশুর তীর্থস্বরূপ (পূজনীয়) রাজশ্রী গোপাল পন্থ রাজওয়াড়ে মহাশয়কে ছয় শত টাকা দিয়াছিলাম। তাহা আমাকে প্রত্যর্পিত করিবার জন্য সরকার হইতে শ্বশুর মহাশয়ের প্রতি আদেশ হইয়াছিল। তদনুসারে তাঁহার নিকট হইতে আমি উল্লিখিত ছয় শত টাকা ফিরিয়া পাইলাম। আমার বিবাহ সংক্রান্ত আর কোনও প্রকার প্রাপ্য রহিল না। মিতি (১১) ভাদ্রপদ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী শকে ১৭৩৪ অঙ্গিরা নাম সংবৎসরে। অধিক কি লিখিব, বিজ্ঞাপন ইতি।

(এই প্রাপ্তিস্বীকারপত্র আমার) স্বহস্তাক্ষরে লিখিত। উল্লিখিত টাকা মোর-দীক্ষিত ও চিন্তোপান্ত (১২) দেশমুখ, ইঁহাদিগের সমক্ষে প্রাপ্ত হইলাম। মিতি পূর্ব্বোল্লিখিত।

সাক্ষী
১। ধোণ্ডো পরশরাম।
লেখংশাম পরলীকর।"

(৪র্থ পত্র)

সংস্কৃত পত্র।

নিম্ন প্রকাশিত পত্রখানি পেশওয়াগণের চিটনবীসের দপ্তর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহকে "সওয়াই মাধব রাও" বা মাধব রাও নারায়ণ পেশওয়ে কর্ত্তৃক লিখিত পত্রের পাণ্ডুলিপি বলিয়া বোধ হয়। চিটনবীস মহোদয়ের দপ্তর হইতে প্রাপ্ত পত্রসমূহের অধিকাংশই স্বর্ণ-রজতাঙ্কিত-লতাপত্রবিচিত্র কাগজে লিখিত।

"শ্রী

"স্বস্তি শ্রীমদ্ভবমনোহারিণী সন্দোহ-সম্পূরিতাশেষ-জটামণ্ডল-পরিলসচ্ছিব-চরণদ্বন্দ্ব-নিষ্পন্দ-ভজনানন্দিত-সমস্ত-পুরুষার্থ-সার্থকীকৃত-নিজবংশাবতারেষু-পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ধন্য রাজন্য-মূর্দ্ধন্যাচরিত-ধর্ম্মাচরণ-প্রচারণ চাতুরী ধুরীণেষু, সৌজন্য সিন্ধুষু, শ্রীমহারাজাধিরাজ-মহারাণা-শ্রীমদ্ ভীমসিংহ-নৃপবর্য্যেষু—

"শ্রীমন্মাধবরাও-নারায়ণ-পণ্ডিত প্রধান-বিহিতানীরাশয়ঃ সমুল্লসন্তু। পৌষ কৃষ্ণ—(১৩) বধি শ্রীমৎ-ত্রিলোচনকৃপয়া পরিণামঃ ক্ষেমিণো বয়ং, ভবদীয়ং শমৌক্ষেমমানাস্মহে। বিশেষস্তু মৌজে বাড়ী পরগণে মেওয়াড়ায়ঃ" গ্রামঃ শ্রীরাণাজীভিরস্মৎ পূর্ব্বজৌ গঙ্গাধরনামক-বিষ্ণুমহাদেব-সদাশিব-মহাদেবাখ্যা বুভৌ ভ্রাতরৌ (১৪) একত্র স্থিতিমন্তৌ, তয়োর্জ্যেষ্ঠৌ বিষ্ণুমহাদেব ইতি তন্নামপুরস্কারেণ দত্তঃ। তদনন্তরং বিষ্ণুমহাদেবো সদাশিবমহাদেবস্য পুত্রো রঘুনাথরাযশ্চ উভৌ বিভক্তৌ জাতৌ। তদানীমেতদ্গ্রামস্যোপভোগ উভাভ্যাং সহৈব কর্ত্তব্য ইতি নিশ্চয়ে জাতেঽপি একবিংশতিসংবৎসরপর্য্যন্তং গণপতরায় বিষ্ণুনা একেনৈব সম্পূর্ণগ্রামস্যোপভোগঃ কৃতঃ। অস্মাকমর্দ্ধাংশো ন দত্তেতি সদাশিবরঘুনাথেন নিবেদিতং। অতঃ অধুনা যাবৎ সংবৎসরপর্য্যন্তঃ সম্পূর্ণ-গ্রামস্যোপভোগঃ গণপতরায়-বিষ্ণুনা কৃতস্তথা বর্ত্তমান একবিংশতিসংবৎসর-পর্য্যন্তং সদাশিবরঘুনাথঃ সম্পূর্ণগ্রামস্যোপভোগং করিষ্যতি। অগ্রে উভাবপি সমান-বিভাগাভ্যামনুভবিষ্যতঃ। গণপতরায় বিষ্ণুযাস্যবরোধং করিষ্যতি চেচ্ছ্রী-মদ্ভিঃ নিগৃহ্যঃ—"

সাহিত্য, কার্ত্তিক, ১৩০৭।

---

(৯) ওয়াই প্রদেশ সাতারা জেলার অন্তর্গত ও কৃষ্ণাতীরে অবস্থিত।

(১০) পরশরাম—পরশুরাম শব্দের প্রচলিত রূপ। খণ্ডেরাও—'খণ্ড' অর্থে তরবারি; শিবের অবতারী মূর্ত্তি খণ্ডেরাও বা খণ্ডোবা নামে মহারাষ্ট্রে পূজিত হয়। এ স্থলে দেবনামানুসারে মানবের নামকরণ হইয়াছে।

(১১) এই সময় পরিমাণবোধক "মিতি" শব্দ আরবী "তারিখ" শব্দের পরিবর্ত্তে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১২) মোর দীক্ষিত—ময়ূরেশ্বর দীক্ষিত। চিন্তোপন্ত—চিন্তামণি পণ্ডিত। সেইরূপ ধোণ্ডো—ঢুণ্ঢিরাজ।

(১৩) এইখানে মিতি বা তারিখ দিবার জন্য একটু জায়গা ফাঁক রাখা হইয়াছে।

(১৪) অর্থাৎ বিষ্ণু মহাদেব গঙ্গে (পত্নি) ও সদাশিব মহাদেব গঙ্গে নামক ভ্রাতৃযুগল।
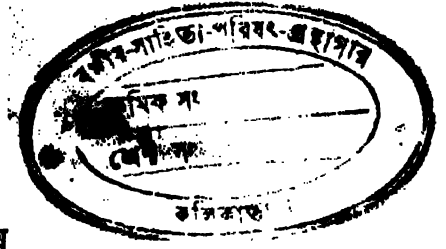
প্রকৃতি

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

১

প্রকৃতি বলিতে আমরা সাধারণতঃ জড় জগৎকেই বুঝিয়া থাকি। জড়ের মধ্যে যে শক্তি খেলা করিতেছে তার বোধটী প্রচ্ছন্ন থাকে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিচারের সুবিধার জন্ম জড় পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা হয়। তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থকে জড় বা ব্যক্ত প্রকৃতি এবং তদন্তর্গত অতীন্দ্রিয় শক্তিকে শক্তি বা অব্যক্ত প্রকৃতি আখ্যা দিয়া থাকি। বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকৃতির আর অন্য কোন অর্থ নাই।

জড়শক্তি ব্যতীত আর একটী শক্তির খেলা আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, তাহার ক্রিয়া ভিন্ন প্রকার তাহার যেখানে ক্রিয়া দেখা যায় সেইস্থানের নাম জীবলোক জড়শক্তি হইতে বিশেষিত করিবার জন্ম জীবান্তর্গত শক্তিকে চিৎশক্তি বলা হয়। এই চিৎশক্তির প্রধান ক্রিয়া চেতনা এবং চেতনাজনিত আনন্দ; সেই আনন্দধারার প্রতিরোধ-কারী শক্তিসমূহের সহিত যুদ্ধের প্রচেষ্টা তাহার গৌণ ক্রিয়া। এই প্রচেষ্টা শারীরযন্ত্র সাপেক্ষ, এবং সেই শরীর বিবিধ প্রকারের। জীব-শরীরের চরমোৎকর্ষ মানব-দেহে। সকল জীবই বাঁচিবার আনন্দ উপভোগ করিবার জন্ম তাহাদের দেহানুরূপ চেষ্টা করে। মানুষের মধ্যে বাঁচার আনন্দের সহিত আরও দুইপ্রকার আনন্দ জড়িত থাকিতে দেখা যায়; সেটী জ্ঞানের আনন্দ ও ত্যাগের আনন্দ। মানুষ শুধু অনন্ত জীবন লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চায় না। সে জানিতে চায়, জানিবার বস্তু খুঁজিয়া বেড়ায়—জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা সে কিছুতেই শান্ত করিতে চায় না! সে চায় প্রেম, ভালবাসতে, সমস্ত উপার্জ্জিত জ্ঞান সম্পদ সে বিলাইয়া দিতে চায়, সমস্ত বাঁচার সুখ সে ত্যাগ করতে পারে ভালবাসার জন্যে; এইটীই তার বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব যেখানে নাই সে মানুষকে আমরা পশুসম বলি এবং যে মানবে এই গুণের চরমোৎকর্ষ হইয়াছে তাহাকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করি। দেহের চরমোৎকর্ষ মানব-শরীরে এবং দেহীর চরমোৎকর্ষ ঐ দেবত্বলাভে। দেহীর এই যে প্রকৃতি—অমৃতময়ী, জ্ঞানময়ী ও প্রেমময়ী—সেই প্রকৃতির বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, 'ভূমিরাপোঽনলো বায়ু খং মনোবুদ্ধিরেব চ অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা'। শেষোক্ত তিনটী প্রকৃতির ক্রিয়া আমরা কি জড়ের মধ্যে দেখিতে পাই? জড় প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এই তিনটীকেও যদি জড়বৎ ভূত পদার্থ মনে করা হয় তবে তাহাদের সূক্ষ্মভূতই বলিতে হইবে, আর পুরুষ বা জীবকে আত্মা বা spirit বলিতে হইবে। শেষোক্তটী ভগবানের 'পরা-প্রকৃতি'। এস্থলে আমাদের জ্ঞানের বিষয়সমূহ প্রধান-দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বুঝিতে হইবে। চেতন—আত্মপুরুষ আর জড়-প্রকৃতি। প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা ঠিক এই রকমই বুঝিয়াছেন। Kantএর প্রকৃতি পুরুষবাদ এইরূপ জ্ঞান হইতে প্রসূত। Herbert Spencerএর মতে প্রকৃতি পুরুষ, Matter and Spirit বিশ্বনিহিত এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির অভিব্যক্তি। তাহার মতে অবাঙ্‌মনসোগোচর পদার্থটী ব্রহ্ম। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষরূপে প্রথমে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন। সাংখ্য ও বেদান্তের বহুবিধ ভাষ্য আছে। শঙ্কর-প্রমুখ ভাষ্যকারদের মতের সহিত Spencerএর মতের সামান্যই পার্থক্য। Spencer প্রকৃতিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। শঙ্কর বলেন—যাহা পরিবর্ত্তনশীল, তাহা অনিত্য। ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ, তাহা হ'তে অনিত্য জগতের উদ্ভব হইতে পারে না। অনিত্য জগতের যে প্রকৃতি তাহা মিথ্যা মায়া মাত্র। ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় সত্য। শঙ্করের ব্রহ্ম আর Spencerএর অচিন্ত্য বা unknowable প্রায় একই পদার্থ বলিলে বিশেষ দোষ হইবে না। অচিন্ত্য ও অব্যক্ত

পদার্থটী ব্যক্ত জগদ্রূপে [illegible]। শঙ্কর জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না, ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। তাঁহার ব্রহ্ম, জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে এবং জগতের অস্তিত্ব তর্কে উড়াইয়া দিলেও তাহার সত্তা জীবন থাকিতে আমাদের নিকট কিছুতেই বিলীন হইবে না। বস্তুর প্রকৃতিই বস্তুর পরিচায়ক। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রকৃতিই আমাদের নিকট তাঁহার পরিচয় দিবে। তাই ভগবান্ তাঁহার আট রকম প্রকৃতি ব্যতীত একটী শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন, সেটী জীব, 'যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ'। মনে হয় চেতন ও অচেতন এই উভয় ভাব তাহার প্রকৃতিতে আছে। অচেতন প্রকৃতিকে অর্থাৎ ক্ষিতি অপ্ তেজ প্রভৃতিকে যদি ঈশ্বরের প্রকৃতি বলে স্বীকার করি, তবে তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্য Spencerএরমতেরই সমর্থন করে। আর যদি তাঁহার বাক্যের ভিন্ন অভিপ্রায় থাকে তবে বলিতে হইবে শ্লোকটীর মধ্যে কিছু প্রচ্ছন্ন থাকিয়া গেল। এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ বিচার করিবার ভার গীতায় গীতগোবিন্দ মহাশয়দের উপর ন্যস্ত করে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

আলোচনাটী যাহাতে রুচিকর হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার আগে সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত আপনাদের নিকট প্রকাশ করা প্রয়োজন।

২

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থের মধ্যে আমরা একজন জ্ঞাতা দেখিতে পাই। জ্ঞাতার অস্তিত্বের প্রমাণ করিতে কি কোন তর্কের প্রয়োজন? জ্ঞাতাকে আমরা দেহের মধ্যে খুঁজিয়া পাই, দেহের বাহিরে পাই না, এবং দেহটী যে জ্ঞাতা নহে তাহার মৃতদেহ হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। জ্ঞাতা দেহাধিষ্ঠিত হইয়া দেহ এবং দেহের বাহিরে সকল বস্তুকে জানে, এবং এই দেহই তাঁহাকে জ্ঞাতা রূপে জানাইয়া দেয়। সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞাতাকে পুরুষ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আর যিনি এই দেহটী সৃজন করিয়াছেন, যদ্দারা পুরুষ নিজেকে ও জগৎকে জানে ও জানায় তাঁহাকে প্রকৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; তিনি স্বয়ং অব্যক্ত, তাঁহার কার্য্যরূপ দেহটাই আমাদের নিকট কেবল ব্যক্ত। দেহের প্রীতিজনক, প্রবৃত্তিজনক ও বিষাদজনক কার্য্য হইতে কারণরূপিণী অব্যক্ত প্রকৃতিতে এই তিন গুণ আছে অনুমান করা হয়। তাহার সহিত পুরুষের কোন কারণে মিলন হ'লেই ভোগ ও জ্ঞানজনক এই দেহটী পুরুষের জন্য তিনি নির্ম্মাণ করেন। প্রথম মিলনেই তিনি মহৎ হন। তারপর তিনি ত্রয়োবিংশতি পদার্থ সৃজন করেন। অহঙ্কার মন বুদ্ধি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বগাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মুখ হস্ত পাদ পায়ু উপস্থাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং আকাশ অনল অনিল জল ও মৃত্তিকা এই পঞ্চ মহাভূত। প্রথম আটটী খাঁটী প্রকৃতি অর্থাৎ অব্যক্ত, কারণ প্রকৃতির অব্যক্তত্ব ঐ আটটীতে আছে। তারপর মনসহ দশটী ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত প্রকৃতির বিকৃতি। প্রকৃতির প্রেম-পয়োধিতে এই তেইশ রকম লহর উঠিলে পুরুষ তাহাতে হাবুডুবু খাইতে থাকে। এই প্রেম-পাথারে সাঁতার দিতে না জানিলেই বিবিধ দুঃখের উৎপত্তি হয়। সেই সব দুঃখ আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধি-ভৌতিক ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। পুরুষ যদি কোনদিন প্রকৃতির কার্য্যে বিরক্ত হন এবং তীব্র বিরক্তির ফলে প্রকৃতির চাতুরী ধরে ফেলেন ও তাঁহার মায়ার আবরণ খুলতে পারেন তবে প্রকৃতি 'আমার সব দেখে ফেলেছে' বলে লজ্জায় লুকায়। পুরুষ তখন ত্রিবিধ দুঃখের হাত হ'তে একেবারে নিষ্কৃতিলাভ করে। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে পুরুষের কৈবল্য লাভ হয়। কেবলরাম হওয়াই পরমপুরুষার্থ। এই পরমার্থ লাভ করিতে হইলে প্রকৃতির প্রেম-পাথারে একবার ঝাঁপ দিতেই হইবে, কারণ গুণবতী স্ত্রীর ন্যায় প্রকৃতি পুরুষকে কৈবল্য দিবার জন্যই এই অপূর্ব্ব রচনা করিয়া থাকেন। এই মোট তত্ত্ব। ইহার উপরে ভাষ্য অনুভাষ্য টীকা টীপ্পনির চোটে আসল ঢাকা পড়ে গেছে। গুণবতীকে বারনারীতে পরিণত করা হইয়াছে। পুরুষ হইয়াছেন অনেক। একজন পুরুষ যদি তাঁর ছিনালী ধরতে পারেন তবে তাঁকে ছেড়ে তিনি অন্য পুরুষের ভজনা করেন, অর্থাৎ একজন পুরুষ মুক্ত হলে জগতের সকল পুরুষ মুক্তিলাভ করে না। তর্কের চোটে ঈশ্বর উড়ে গেছেন। সংসারে আছে এক প্রকৃতি আর অসংখ্য পুরুষ। তাদের মুক্তির উপায় বিরক্তি-

বাবার উপদেশ মত কার্য্য করা। তাহলেই গুণবতী শুদ্ধ পুরুষ ভজনা করিবার জন্য ঘর ছেড়ে বাহিরে পা বাড়াবেন! গুণবতীকে হারিয়ে শিষ্যের ক্যাবলা হতে আর বিলম্ব হবে না।

দেবহুতী-তনয় ভগবান্ কপিলদেবের উক্তিতে এসব কিছুই নাই। কেনই বা থাকবে? আদিম-যুগের মানুষ, সরস প্রাণ, নীরব প্রেম—তখন বেশী কথার উৎপত্তিও হয় নাই, বেশী কিছু দেখবারও ছিল না; সুতরাং লম্বা-চওড়া একটী দর্শনশাস্ত্র যে লেখা হয়েছিল এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস-যোগ্য নহে। খুব ছোট ছোট তেইশটী কথা তিনি বলেছিলেন; যথা:—ত্রিবিধং দুঃখং, ত্রিবিধং প্রমাণং ত্রৈগুণ্যম্, পুরুষঃ, অষ্টধা প্রকৃতয়ঃ, ষোড়ষস্ত বিকারঃ ইত্যাদি। এক একটী কথায় দুই তিনটীর বেশী শব্দ নাই। সাংখ্যসমুদ্র মহাশয়রা সেই কথাগুলিকে তত্ত্বসমান বলেন। ভগবান্ কপিল সেই ২৩টী কথা বলে কৈবল্য লাভ করেছিলেন। সেগুলি তাঁর জীবনকাব্যের সার কথা! একটী কাব্যের কাটাম বেশ হতে পারে।

৩

দর্শনের চশমা চোখে দিয়ে কাব্য আলোচনা করে পুরাতনেরা কিরূপ বিড়ম্বিত হয়েছেন তা' সকলেই বেশ বুঝতে পারবেন। একজন লিখে গেলেন 'আছিল দেউল এক বিচিত্র গঠন, ক্রোধে উঠে তুলে ফেলে পবননন্দন।' এটা কাব্যও নয়, রামায়ণের কথাও নয়। রামায়ণ ছাড়া পবন-নন্দনের দর্শন তরুণেরা অনেকস্থানেই পেয়ে থাকবেন। এটী গণিতের কথা অর্থাৎ ইহা শুভঙ্করীতে আছে। পবননন্দনের নাম শুনে যদি আপনারা রামায়ণের বিভিন্ন পাঠ দেখ্‌তে ব্যস্ত হন অথবা বিবিধ কাব্যগ্রন্থ তোলপাড় করেন তবে কি খুঁজে পাবেন? শেষে নিশ্চয়ই এক একজন এক এক রকম সিদ্ধান্ত করে তর্ক করবেন। অবশেষে পশ্চিম পক্ষকে সালিসী মানবেন। ঘরের গরু গোয়ালে বাঁধা থাক্‌ল আর আপনারা পাঁচ ভায়ে বনে বনে, গ্রামে গ্রামে, গো অন্বেষণ করতে গিয়ে গো-বেড়ন লাভ করলেন। এদিকে পশ্চিম-পাড়ার মধু খুড়ো আপনাদের গরুটী খুলে নিয়ে নিজের গোয়ালে পুরলেন, তারপর মধুর বচনে আপনাদের বিবাদ মিটাতে এলেন। কি সূত্রে কি কথা উঠল না বুঝলেই যত গণ্ডগোল, মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামা। বেদ চাষার গান বলে যতদিন নির্ণয় হয় নাই ততদিন কি গণ্ডগোলই ছিল? এ দেশের আচার্য্য মহাশয়রা বুঝতেন ঘণ্টা—ঈশ্বরের বাক্য বলে সেগুলা আবৃত্তি করতেন। এখন কিছু কিছু বুঝতে পারছেন। আদিমযুগের আর্য্য কৃষকগণ ক্ষেত্র-কর্ষণ করবার সময় ভয়ে বা ভক্তিতে প্রকৃতিকে দেবতা ভাবিয়া স্তব করিতেন। প্রসঙ্গটী না বুঝিলেই পূর্ব্ব পক্ষ ও উত্তর পক্ষের কলহ উঠে; যখন চতুর পশ্চিম পক্ষ এসে চক্ষুদান দেন তখন 'বুঝেছি বুঝেছি' বলে শান্ত হন। তাই বলিতে ছিলাম, কাব্যকে দর্শনের চক্ষে দেখ্‌লে এই পরিণাম।

সাংখ্যদর্শন কপিলঠাকুরের আত্মকাহিনী। তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম বিয়োগান্তক কাব্য কেহ কখনও লেখে নাই,লিখ্‌তে পারে না। শুধু ইহাই নহে, কপিল কাব্যের জন্মদাতা। আপনারা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করবেন ও জগতের কাছে জোর গলায় বল্‌তে পারবেন যে, ভারতে এত বড় একটা লোক জন্মেছিলেন।

আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করছেন বাজে কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা, কাজের কথাই হ'ক। কপিল ঠাকুরের কাব্যে বা দর্শনে প্রথমেই কাজের কথা; কার্য্য-সিদ্ধির বিজ্ঞান জানান তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। 'কাজ কাজ' করে ঘুরে বেড়ান, কটী সিদ্ধ হয়েছে বলুন ত? কেন হয় না, ভেবে দেখেছেন কি? প্রকৃতি, প্রকৃতি—বস্তুর প্রকৃতি চিনলেই তাকে কাজে লাগান যায়। ব্যক্তির প্রকৃতি চিনলে তাকে দিয়ে নিজের অনেক কাজ বাগান যায়। ভারতের ৩৩ কোটী প্রজাপুঞ্জের প্রকৃতি চিন্‌তে পেরে ইংরেজ কত সহজে বিশাল রাজ্য বিস্তার করে ফেলেছেন। পরকে কাজে লাগাতে হলে যেমন তার প্রকৃতি জানা দরকার তেমনি নিজকে কাজের লোক করতে হ'লে নিজের প্রকৃতি জানা দরকার এবং তাহা জানতে হ'লে নিজেকে প্রকৃতির অতীত বুঝতে হবে। তাহা না বুঝলেই নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন মনে করে প্রকৃতি হয়ে যেতে হবে। ঠিক এইরূপে ভারতবাসী সাংখ্যজ্ঞানের অভাবে বহু কাল নিজেদের পুরুষত্ব হারিয়ে প্রকৃতিত্ব লাভ করেছে।

সাংখ্যজ্ঞান প্রথম উন্মেষিত হয়েছিল কপিলের শিষ্য আসুরীর মধ্যে। কপিলদর্শন যেমন ভীতিপ্রদ, অসুরের বাচ্ছাও তেমনি ভয়ঙ্কর, মা-দুর্গার অসুর দেখেছেন ত?

কিরূপ ক্রুদ্ধ কপিল দৃষ্টি আর ভয়ঙ্কর দাঁত খামুটী? যখন আসুরীর আবির্ভাব হয়েছিল তখন ভারতের কপিলদর্শনে সকল জাতি ভয়ে আড়ষ্ট হ'ত। ভারত থেকে আসুরীর অন্তর্দ্ধান অনেকদিন হয়েছে। ভট্টাচার্য্য-মহাশয়েরা তর্পণের সময় আসুরীকে একগণ্ডুষ জল মন্ত্র পড়েছেন—ভাবেন, আসুরী পরলোক গমন করেছেন। যাঁহাদের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে তাঁহারা নিশ্চয় দেখবেন—আসুরী পূর্ব্বলোক হইতে পশ্চিমলোকে গমন করেছেন এবং সেখান হইতে তাঁহার কপিল দৃষ্টি ঘুরাচ্ছেন। ভারতবাসীর এখন মুক্তি-লাভের জন্য চেষ্টা হয়েছে। মুমূর্ষু অবস্থায় মুমুক্ষু হলে কৈবল্য-লাভের বিলম্ব হয় না, সুতরাং ভারত শীঘ্রই কৈবল্য লাভ করবে। এতদিন এ মুমুক্ষুত্ব আসে নাই কেন;—অর্থাৎ দুঃখকে সুখজ্ঞান। এতাবৎকাল যাকে সুখ বলে মনে করেছিল সেটা নিছক দুঃখ, এখন বুঝতে পেরেছে। জাতিগতও সুখ নাই ব্যক্তিগতও সুখ নাই। সংসারে সুখ কোথায়ও নাই। কেবল দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ—ত্রিবিধ দুঃখ। আপনারা বুঝতে পারছেন না, দুঃখ কোথায়? প্রকৃতি পুরুষের প্রভেদ বুঝতে পারলেই মুক্তি। এ মুক্তিপদ-লাভের চেষ্টা আসে না দুঃখকে সুখ বোধ করার জন্য। দুঃখটা কি আগে বুঝুন, তবে সে চেষ্টা আসবে।

দুঃখ ত্রিবিধ।

প্রথম আধিদৈবিক—এ দুঃখ দেবতাদের দিক হতে আসে। এই যে বিস্বাদ চা, চিনি দুগ্ধের সমতার অভাব, আর যে রোজ তরকারিতে লবন ও ঝালের বৈষম্য, ডালে ঘৃতের অযোগ, হরিদ্রার অতিযোগ; ভাত কতক সিদ্ধ, কতক অর্দ্ধ-সিদ্ধ, কতক একবারে চাল, এসব দৈব দুঃখ—বামুনঠাকুরের দিক হ'তে আসে। এর উপায় আছে কি? উড়ে বদলে পাঁড়ে রাখুন, পাঁড়ে বদলে বাঙ্গালী রাখুন। দুদিন, দুদিন,—তারপর যথাপূর্ব্বম্ তথাপরম্।

তারপর আধ্যাত্মিক—আত্ম বুঝতে হ'লে বেদান্ত পড়বার এখানে কোন দরকার হবে না। এই যাঁর প্রেরণায় আপনি চলে ফিরে বেড়ান, যাঁর জন্য আপনি সংসারের সকলের কথা জানতে পারেন অথচ তাঁর বিষয় আপনার মনের গোচর করিতে কেহ কোনদিন সক্ষম হয় নাই। সেই তিনি আপনার আত্মা, প্রাণাধিকা প্রাণেশ্বরী। তার মুখ যখন ভারি হয়—তখনি কি দুঃখ বলুন দেখি? সব চেয়ে বেশী ঐ আধ্যাত্মিক। ইহার কি উপায় থাকিতে পারে। দেশী বিদেশী সুতি রেশমী পশমী রং-বেরংএর কাপড় দিন; অলঙ্কার—হার বলয় কেউর কঙ্কন—তর-বেতরের দিন; ইহা ক্ষণস্থায়ী—আবার যে মুখভারি সেই মুখভারি। সব রকম দুই চার সেট দিতে থাকুন—আবার যে কে সেই। কেবল ভাঙ্গান আর গড়ান। কঠিন, কঠিন—আধ্যাত্মিক দুঃখ সব চেয়ে কঠিন।

শেষ আধিভৌতিক—যদি কেহ বলেন যার দেবতা নাই তাহার কি দুঃখ নাই? সত্যই ত, দেবতার কৃপালাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু আত্মা ত আছে। কেহ বলবেন আত্মাকে পাওয়া আরো কঠিন। যম নচিকেতাকে বলেছিলেন—বিদ্যা বুদ্ধি তপস্যা কোনটাতে ওঁকে পাওয়া যায় না, উনি যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া বরণ না করেন; সুতরাং যে সব হতভাগ্যদের আত্মা নাই তাহাদের কি কোনই দুঃখ নাই? আধিভৌতিক—আত্মার হাত থেকে এড়ালেই ভূতের হাতে গিয়ে পড়তে হবে। আজকাল মেয়েরা কেরোসিন তৈলের সাহায্যে সহজেই আত্মার হাত থেকে অব্যাহতি পান, কিন্তু ভূতের হাত হতে নিষ্কৃতি নাই, আত্মার হাত এড়ালেই ভূতত্ব প্রাপ্তি, কারণ 'সর্ব্বম্ ভূতময়ং জগৎ'। সুতরাং আধিভৌতিক দুঃখ হ'তে কোনরূপে পরিত্রাণ নাই। এই দেখুন-সকল জিনীষে ভেজাল। সরিসার তৈলে গোঁজ বা কুসুম খেলে পেট ছেড়ে দেয়, নারিকেল তেলে কেরোসিন মাখ্‌লে মাথার চুল উঠে যায়, ময়দায় চুন মেশাইয়া খেলে পেটে শূল ব্যথা উঠে, ঘীয়ে চর্ব্বী মেখে খেলে অম্বলে বুক জলে যায়; বলুন কোনটাতে সুখ আছে? যাঁরা চাকরী চাকরী করেন তাঁদের এর উপর মহাভৌতিক দুঃখ—বড়বাবুর মুখবিকৃতি আর ছোট সাহেবের রক্তচক্ষু! উপায় আছে কি? খেটে খেটে প্রাণপাত করুন, দুদিন মুখটা ভাল দেখবেন। বড় জোর পাঁচ বৎসর পরে বড় সাহেব ৯৲ মাহিনা বৃদ্ধি করে দেবেন। এদিকে বড়-বাবুর স্ত্রীর মামাত ভগ্নির পিসেমহাশয়ের ছেলে সবে ঢুকেচেন, বৎসর না যেতেই তাঁর কার্য্যকুশলতার জন্য ১০৲ দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হ'ল। এ সব যখন দেখেন, তখন

কিরকম দুঃখ হয় বলুন? উপায় আছে কি? সিদ্ধেশ্বরী আনন্দময়ী কালীঘাটের মা কালীর পূজা মানবেন? —অনিশ্চিত। ঠিকমত পূজাই হবে না। যদিই বা হয় তবে ব্রাহ্মণ দক্ষিণায় সন্তুষ্ট হ'বে না—সব পণ্ড হ'বে। মা রাজী হ'লে আজ কিছু টাকা পেলেন, কাল ডাক্তার আর উকিলে শেষ করে নিয়ে গেল। আবার মানুন, কতবার মানবেন মানুন। তাই কপিলঠাকুর প্রথমেই বলেছিলেন 'ত্রিবিধং দুঃখং'।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিদের শাস্ত্রে প্রথমেই কাজের কথা। বাজে কথা একটুকুও বলতেন না। তাই ছোট ছোট সূত্র রচনা করতেন। অ-কার ই-কার অনুস্বর বিসর্গ একটীও বাজে নয়! আর প্রয়োজনের অধিক একটা বর্ণও পারেন না। তাঁরা ছিলেন কাজের লোক, তাঁদের শিষ্যেরা ছিল ততোধিক কার্য্যক্ষম। বাজে কথা বল্‌লে গুরুর গরুর হাল করতেন। পানিণীর মহাভাষ্যে পতঞ্জলি-তাহা বেশ দেখাইয়াছেন। বাজে কথা একবারে বাদ দিতে গিয়ে শাস্ত্র-কর্ত্তারা নিজের পরিচয় পর্য্যন্ত দেন নাই। শিষ্যেরাও চাইতেন না। যাঁরা আপনা হ'তে শিষ্ট হ'তে চাইতেন তাঁরাই উঁহাদের শিষ্য হ'তে যেতেন। গুরু গরজ করে কাহাকেও শিষ্ট করবার জন্য শাসনবাক্য প্রচার করতেন না।

আজকাল কথার দাম হয় কথকের পরিচয় নিয়ে। কথার মাহাত্ম্যে কথকের পরিচয় হয় না। সুতরাং একালের রীতি অনুযায়ী কপিলঠাকুরের পরিচয় দিব। সে পরিচয় পেলে তাঁর কথার কতখানি মূল্য বুঝতে পারবেন। কপিলের পিতামহ হচ্ছেন স্বয়ম্ভু ভট্টাচার্য্য—আদিপুরুষ ব্রহ্মা—যিনি বেদ রচনা করেছিলেন। তিনি সৃষ্টি করে বেদ লিখেছিলেন যাহাতে তাঁর বংশধররূপে আপনারা তাঁর নাম করেন। সরল কথায় কপিল ঈশ্বরের পৌত্র। এখন আপনারা বুঝুন—কপিলকাব্যকে নিরীশ্বর দর্শন বলে কত বৃথা তর্ক করেছেন। তখন সবে সৃষ্টির সুরু। কটাই বা লোক ছিল। যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই স্বয়ম্ভুঠাকুরকে চিনতেন। কেহ কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন নাই—ঈশ্বর আছেন কি নাই। পিতামহকে যখন সকলেই চিনতেন তখন কপিল ঠাকুরকে কষ্ট করে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে হয় নাই। কত বড় ভুল হয়ে গেছে, এর জন্যে কত লাঠালাঠি হয়েছে, এখন ত হচ্ছেই। এখন আপনারা বুঝতে পারছেন যে, কপিলের আত্মকাহিনীকে শুধু দর্শন নয়, নিরীশ্বর দর্শন বলে তর্ক করা কতখানি মূর্খতা।

৫

কপিলের পিতা কর্দ্দম ঋষি। সৃষ্টির তখন প্রথম অবস্থা। পৃথিবীর জল শুকায় নাই। স্বয়ম্ভুঠাকুর জঙ্গলে কুঁড়ে বেঁধে বাস করতেন, ছেলে কাদা ঘেঁটে ঘোঁটে বেড়াত তাই তাঁর আদর করে নাম রেখেছিলেন কাদা—কর্দ্দম। সেই কর্দ্দমের পুত্র কপিল। একেবারে নির্গুণ গঙ্গারাম। মুখ দিয়ে কথা ভাল বেরুত না, স্ত স্ত করতেন, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতেন আর নিষ্কর্ম্মার মত সর্ব্বদা বসে থাকতেন। স্বয়ম্ভুঠাকুর বড় আশা করেছিলেন, পৌত্র মানুষ হ'য়ে বংশের মুখোজ্জ্বল করবে। তিনি নিজে স্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ। কি উপায়ে অচলকে সচল, নির্ব্বোধকে বুদ্ধিমান করতে হয় জানতেন। তাই তিনি এক গুণবতী কন্যার সহিত নাতীর বিবাহ দিলেন।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিধাতা নাতীর বিবাহ দিয়ে সন্ন্যাস নিলেন এবং যোগের দ্বারা দেহত্যাগ করতে চলে গেলেন। পিতা কর্দ্দম বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। বন অল্পই ছিল। বেশীর ভাগই কাদা। কর্দ্দম তাঁহার পরম প্রিয় কর্দ্দমরাশির মধ্যে গিয়ে পড়লেন, তারপর কখন উঠলেন তার কোন ইতিহাস নাই। মাতা দেবহুতী দেবতাদের ডাকে পূর্ব্বেই স্বর্গে গমন করেছিলেন—কপিল পড়লেন সংসার একা।

প্রজাপতির ঘর থেকে গুণবতী স্বামীর ঘরে এলেন। তখন দক্ষরাজা ছিলেন পরম শ্রোত্রিয়। যত মেয়ে সব তাঁর ঘরেই পাওয়া যেত। নবোঢ়া বধূ এসে দেখলেন ঘরে দ্বিতীয় মানুষ নাই, তিনি তখন হলেন প্রধানগু, কিন্তু এখনকার মেয়েদের মত বেহায়া নন্। আদি যুগের ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে—মস্ত ঘোমটা। কপিলঠাকুর অবগুণ্ঠিতা পত্নীকে দেখে ভাবলেন—অবক্তম্। মুখে কথা নাই। লজ্জায় জড়সড় দেখে ঠাকুর ভাবলেন, এ কি অচেতন? তিনি কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসে ঘোমটা খুললেন। চার-চক্ষের-মিলন হতেই গুণবতী একটু মুচ্‌কে হাসলেন। আর যায় কোথা, নির্গুণ পুরুষের ত্রিগুণে রাগ অর্থাৎ

আসক্তি এল। গুণবতী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এই প্রকৃতি—'মহৎ' হ'লেন। তারপর—আহ্লাদে ফুলতে ফুলতে একবারে আটখানা হয়ে গেলেন; তাই—'অষ্টধা প্রকৃতমঃ'। ছিল এক, হল আট। ঠাকুর নিজকে খুব ভাগ্যবান্ মনে করলেন, এই হল—অহঙ্কার। তিনি ত অচল অলস অবশ। শুধু অহঙ্কার করলেই ত হবে না। তাঁর হাতের কাছে—মুখের কাছে সব ধরে দেওয়া চাই। তিনি কথন গুণবতীর দিকে কটাক্ষ করলেন, গুণবতী আহ্লাদে আটখানা আগেই হয়েছিলেন, তার একখানা নিয়ে বললেন—এই বুদ্ধি তোমার কাছে সদা সর্ব্বদা থাকবে ঐ বুদ্ধি। তাই ঠাকুর এক দণ্ড বুদ্ধিকে চোখের আড়াল করেন না। গুণবতী তার আর এক অংশ দিয়ে বল্লেন—এই নাও মণি বা মোহিনী—এ সর্ব্বদা তোমার ঘরের কাজ করবে—এই মন। এখন ঠাকুরের হুকুম দেখে কে। ওরে আলো নিয়ে আয়, আমার খাবার কই, কাহারও সাড়া পাচ্ছি না, ব্যাপার কি, চন্দনের বাটী কোথায় গেল, পূজার আসন ফুল জল কিছুরই আয়োজন নাই যে—মনি তার হুকুম তামিল করতে দশদিকে ছুটোছুটী করে পেরে উঠে না। তখন বুদ্ধির সঙ্গে পরামর্শ করে দশটা চাকর তৈরী করে ফেলে—এরাই দশ ইন্দ্রিয়। এই সব শুনে প্রকৃতির পাঁচ অংশ কুপিত হ'লেন—এই তমগুণ। পাঁচজনে পাঁচরকম হয়েছিলেন—তার নাম তন্মাত্র। ঠাকুরের অন্নে মন উঠে না দেখে এরা পাঁচজনে মোটামুটী বেশী বেশী জিনিস তৈরী করে ফেললেন। তার এক একটাই কত রকমের, ঠাকুর কখনও কল্পনাও করেন নাই। এইরূপে বিষয়পঞ্চকের খনি পঞ্চমহাভূত সৃজন হল। দক্ষরাজার মেয়ে সকল কাজেই দক্ষ, একবারে শতরূপা। সৃষ্টিকর্ত্তার সমসাময়িক সকলেই শিল্পী। ইচ্ছা মাত্রেই চট্ করে সব তৈয়ারী করতে পারতেন। আমরা তাদের বংশধর সব আয়েসী ও পর-প্রত্যাশী হয়ে পড়েছি। এখন যেটা আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে—তখন সেটা অতি সহজ ছিল। ঐ শতরূপা মেয়েদের কাছে ভানুমতী কোথায় লাগে। আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে একটী প্রাসাদ তৈরী করতে কত ইঞ্জিনীয়ারের কত বৎসরের লাগে, আর ওঁরা মনে করলে একদিন না শেষ হতেই একটা ব্রহ্মাণ্ড রচনা করতে পারেন, তাহা দেখিয়া দেবতারা বিস্মিত হন।

এইরূপে কর্দ্দমকুটিরকে গুণবতী দাসদাসী পরিবৃত স্বর্ণ অট্টালিকায় পরিণত করলেন। কপিলঠাকুর অনেক দিন সুখে কাটালেন। বানপ্রস্থ সন্ন্যাসের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। স্বয়ম্ভুঠাকুরের এক রকম জলেই বাস ছিল, কর্দ্দমঠাকুর কাদায় কাটিয়েছিলেন। তাঁহাদের সংসার ত্যাগ করা সহজ হয়েছিল। কপিলঠাকুর মায়াবশে গিয়েছিলেন, সংসার ছাড়তে পারেন নাই। কিন্তু সংস্কার যাবে কোথায়। সবে মাত্র তিন পুরুষ বৈত নয়! মেজাজটী একটু খিটখিটে হয়ে উঠল। গুণবতীর সঙ্গে সামান্য বিষয় নিয়ে নিত্য কলহ। আজ শুক্তটা পান্‌সে হয়েছে, কাল ঝোলে বড়ী দেওয়া হয়নি কেন, পরশু বেগুন-পোড়ায় একটু কাঁচা লঙ্কা টিপে দিতে পারনি; এই সব নিয়ে খিটিমিটি। এদিকে খাওয়ার একটু এদিক্ ওদিক্ হ'লেই পেট খারাপ, বায়ু বৃদ্ধি, বুক্ ধড়ফড়। যত রাগ গুণবতীর উপর—এই বৈরাগ্য। তারপর পুরাতন স্মৃতি জেগে উঠল। কোথায় আমি—অচল অলস অবশ—আর এ সব কোথা হ'তে এল। বুদ্ধি বললে—এ সব ঐ গুণবতীর কার্য্য। ঠাকুর গুণবতীর উপর কতদূর কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন বলা যায় না। তবে একদিন অশুভক্ষণে ঠাকরুণ কপিলঠাকুরকে কর্ত্তা বলে ডেকেছিলেন, আর কি, উনি একেবারে ক্ষেপে উঠলেন,—বল্লেন—কর্ত্তা, কর্ত্তা, কর্ত্তা কে? আমি কোনদিনও কর্ত্তা নই। কর্ত্তা কর্ত্তা বলে ছিনালী করতে হবে না, কে কর্ত্তা এই শুনাচ্ছি—এই বলে গুণবতীর গুণ ব্যাখ্যান করতে বসলেন। কটাই বা ছাই, ২২টী কি ২৩টী সাংখ্যরত্নাকর মহাশয়। যাকে তত্ত্ব সমাস বলেন, সেটা কি দর্শনশাস্ত্র? সে যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বক্রোক্তি! ভাগ্য, ভাগ্য, কপিলের ভাগ্য! আমাদেরও নিত্য হতেছে। কিন্তু রাজার মেয়ে কি না, লজ্জায় দুঃখে মরমে মরে গেলেন। সেই যে শয্যা নিলেন আর উঠলেন না। ঠাকুরের তখন ভীমরতি ধরেছে—একবার উঠেও দেখলেন না। লোক-লস্কর সব চলে গেল। ভ্যাবাগঙ্গারাম সেইখানেই বসে থাকলেন—সোণার অট্টালিকা খসে ধসে মাটী হয়ে গেল।

কত বড় একটা Tragedy হয়ে গেল! মা'এরা বলবেন গুণবতী সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে মরতে পেরেছে, বড় ভাগ্যবতী। সে কি একটা কথা হল? বুড়ো ত সহমরণেই গেল। আপনারা কেহই পরে মরতে চান না, আপনিও নন, উনিও নন' খুব সাবধান, কি হতে কি হয়। বিশেষ ঐ বয়সে। এখন মানভঞ্জনের পালায় পীরিত ঝালিয়ে তুলছেন, তখন কিন্তু Heartfail করবে। এই সব দেখে ব্যাসদেব কপিল-কাব্যের যে উপসংহার লিখেছিলেন তাতে বলছেন 'মৌনবদিতরেষাং,' অর্থাৎ অরসিক ইতর লোকেরা তখন মৌন হয়ে কালযাপন করবে। তাদের মন-কসাকসি হবেই, মুখ বুজে যেকটা দিন কাটে। আপনারা বলবেন ওটা বেদান্তের কথা। আমি কি বলছি 'নয়'! বেদান্ত ব্যাসদেব-রচিত কাব্যের কাটাম। কপিল-কাব্য যে অরসিকদের হাতে পড়ে উৎকট দর্শনশাস্ত্রে পরিণত হয়েছে, এখন বুঝলেন কি?

যদি আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়ে থাকে ও শাস্ত্র-প্রমাণ চান তবে একটা দু'টো অনুস্বার বিসর্গ দেখাতে হবে। বর্ব্বরের ভাষা আপনারা যখন শুনবেনই তখন আমার আর বলতে লজ্জা কি?

তথা হি কারিকায়াং—

ত্রিগুণমবিবেকী বিষয় সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা পুমান্॥

ব্যক্ত জাগতিক পদার্থ কেমন? ত্রিগুণসম্পন্ন, অবিবেকী অবিচারে কার্য্য করে, বিষয় পরের ভোগ্য, সামান্য—সাধারণ অচেতন, প্রসবধর্ম্মি—নিত্য নূতন সৃজন করে। 'তথা প্রধানং'—এই তথাতেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কার্য্যে গুণ কারণে থাকে, এই সৎকার্য্যবাদ। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ব্যক্ত জগতের অন্তরালে যে অব্যক্ত প্রকৃতি খেলা করছেন তিনিও ব্যক্তের গুণসম্পন্ন; কিন্তু প্রধান আর জড়ে প্রকৃতি কিরূপে এক হল? একই কারণ সকল করিতে পারে না। একটা কারণ কোন বিশিষ্ট কার্য্য করিতে সক্ষম। তিল হইতে তৈল হয়, ঘৃত হয় না। জড়শক্তি হইতে চেতন পুরুষের উদ্ভব কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? তথা শব্দ এখানে উপমার নিমিত্ত। শ্লোকের শেষাংশে আর একটা তথা আছে, সেটী কি পাদপূরণের জন্য, না সাংখ্যতীর্থ মহাশয়দের মাথায় বাতাস দিবার জন্য! ঈশ্বর কৃষ্ণ বড় রসিক ছিলেন; তাই তথা দিয়ে মনের অনেক ব্যথা দূর করেছিলেন। তাঁর গৃহিনী যখন পঞ্চ-ব্যঞ্জনসহ অন্নজল দিয়ে আসনে বসিয়ে পাখার বাতাস করছিলেন তখন তিনি মুচকে মুচকে হেসেছিলেন; কারণ বিবেকের চেয়ে সংস্কারের প্রেরণাটী যে বেশী, পুরুষ চেতাইলেও যে একবারে অচৈতন্য, তার উপর যে প্রসবধর্ম্মি—যার জন্য খেয়ে, পরে, বসে, শুয়ে একদণ্ড স্বস্তি নাই—এ সব বিশেষণগুলি কাহাদের উপর প্রযোজ্য তাহা আপনাদের [illegible] জানা আছে। ঐ তথার আড়াল থেকে না বললে ঈশ্বরকৃষ্ণের সেদিন কি দশা হ'ত বলুন না? অত আদর হত কি? আপনারা একদিন পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আপনাদের কি দশা হয়।

এখন ত্রিগুণের ব্যাখ্যাটা শুনুন:—

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকা প্রকাশ প্রবৃত্তি নিয়মার্থা
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয় জনন মিথুন বৃত্তয়শ্চগুণাঃ

বা! বা! ঈশ্বরকৃষ্ণ এখানে এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছেন। জড়বিজ্ঞানে মূলসূত্র আর পীরিতের প্রচ্ছন্নরস এক কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। যে সেদিক দিয়ে লয়। ঐ সেদিন বাড়ী ফিরতে বেশী রাত হয়েছিল, কি দেখেছিলেন? মুখ একবারে—হুঁ। ঐ তমগুণ, বিষাদাত্মক। আপনার নিয়মার্থ, অর্থাৎ সকাল সকাল বাড়ী ফিরবেন। কাল যে অত ব্যাপার, বিরক্তি, আর আপনার ওগো ওগো—হুঁ। ঐ রজগুণ; প্রবৃত্ত্যর্থ, সোহাগ আদর বাড়াবার জন্য। আর যে, মাঝে মাঝে গলাগলি ঢলাঢলি ঐ সব সত্ত্বগুন। ঐ সব সত্ত্বলক্ষণ আপনার প্রকাশার্থ। আপনি যে একটা মানুষের মধ্যে মানুষ বলে পরিচয় দিচ্ছেন, সে ঐ প্রীতির জন্য।

এই হল অন্বয়মুখী প্রমাণ। এইবার ব্যতিরেকমুখী প্রমাণ দিতেছি:—

তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যঃ ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ
এতে স্মৃতা বিশেষা শান্তা ঘোরা মূঢ়াশ্চ।

তন্মাত্র থেকে ভূতগণের উৎপত্তি কোথা[illegible]কিরূপে হয়? ভূতেদের নিশ্চয় চেনেন, ভূতের বাবাকেও কেহ কেহ চেনেন। কিন্তু এই পঞ্চভূতের জননীদের নিশ্চয় চেনেন না। পঞ্চ-মহাভূত হইতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দের উৎপত্তি

হয়। ইহার বিপরীতটী কখন দেখেছেন কি? তন্মাত্রগুলি আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে আছে। তৎ-মাত্র, কোন ভূতের পাত্তা নয়, সে অঘটন ঘটন পটিয়সী—প্রকৃতির মাত্রা যিনি পুরুষের স্পর্শে হেসে আটকুট হয়েছিলেন। কোন ইন্দ্রিয়বন্ত্র বিকৃত নহে অথচ বিষয় গৃহীত হইতেছে না, এরূপ কখন দেখেছেন কি? চক্ষুর কোন বিকৃতি নাই, ছানি পড়ে নাই, অথচ দেখ্‌তে পাচ্ছে না; কর্ণ পটাহ বিকৃতি নহে অথচ শুনতে পাচ্ছে না। এরকমটী দেখলে বুঝতে হ'বে ইন্দ্রিয় ও বাহ্যভূত ছাড়া অন্য কোন পদার্থ আছে। স্নায়ুর অভাব বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বলিলে কারণ ঠিক বুঝা যায় না। স্নায়ুগুলি পথ—ইন্দ্রিয়দ্বার হ'তে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত; তাহার মধ্যে বাহিরের ভূতেদের সহকারী পদার্থ থাকে। সেইগুলি সাংখ্য বা বেদান্তের ভূত। আকাশে রূপের তরঙ্গ উঠে এবং সেই তরঙ্গ স্নায়ুমধ্যস্থিত তৈজস ধাতু বা পদার্থকে তরঙ্গায়িত করে। বাতাসে শব্দের তরঙ্গ উঠে, কর্ণপটাহের অভ্যন্তরে যে অবকাশ থাকে সেইখানে সেই তরঙ্গ গৃহীত হয়। শরীরান্তর্গত বায়ুই স্পর্শের বাহক। ইহারা ইহাদের স্ব স্ব স্রষ্টা তন্মাত্রদের নিকট বিষয়সমূহকে উপনীত করে। তন্মাত্রগুলি নিজ নিজ বিষয়ে রূপান্তরিত হয়। মনে করুন আপনি একটী গরু দেখিলেন। ইহা কিরূপে নিষ্পন্ন হইল? আকাশের রূপের তরঙ্গ চক্ষুর দ্বারে এসে পঁহুছিল। চক্ষুর অন্তর্গত তৈজসধাতু (ফস্ফরসের মত) রূপের হিল্লোল গ্রহণ করিয়া নাচিতে নাচিতে রূপতন্মাত্রার নিকট আনিয়া দিল। রূপ তন্মাত্র তখন গরুর একটী চিত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিল। পরদিন আপনি গরু দেখিলেন। পূর্ব্বদিনের মত রূপ তন্মাত্র আবার একখানি চিত্রে পরিণত হ'লেন। এই দুইখানি আলোকচিত্র মিলাইয়া বুদ্ধি বললেন 'হাঁ, এটী গরু বটে'। মন দেখিয়া চিনিয়া রাখিল। কর্ত্তার হুকুম হ'লে মন তন্মাত্র-রচিত নকল গরু প্রথমে দেখাবে; তারপর হুকুম হ'লে আসল গরু আনিবার জন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়কে তাড়না করবে তারা যেথান থেকে পারে গরু এনে হাজির করবে! বুদ্ধি তখ [illegible] না করে মন্তব্য প্রকাশ করবেন এবং কর্ত্তার দ্বিতীয় আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবেন।

এই তন্মাত্রগুলা এত সূক্ষ্ম যে, মরার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়। মাথার মধ্যে যাহা থাকে তাহা পঞ্চ-মহাভূতেরই অংশ। তন্মাত্রসকল স্বকার্য্যোপযোগী ভূতসকলকে গড়িয়া লয়। মৃত্যুর পর ভূতসকল পড়িয়া থাকে—আত্মার সহিত মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও পঞ্চ-তন্মাত্র অদৃশ্য হয়। ভৌতিক দেহ ক্রমে বিস্রস্ত হইয়া পঞ্চমহাভূতে বিলীন হয়। চতুর্ব্বিংশতির তত্ত্বোৎপত্তির ক্রমানুযায়ী সৃষ্টি বাহ্যজগতে হয় না। সাংখ্যের সৃষ্টির ক্রম ভিন্ন-জগতে হয়; তাহা না বুঝিয়া সাংখ্য-ভাষ্যকরেরা বিষম গোলযোগে পড়িয়াছেন। তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

তস্মাৎ তৎ সংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং
গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তা এব ভবত্যুদাসীনঃ।

সাধারণ ব্যাখ্যা—তাহার সংযোগে অচেতন লিঙ্গ অর্থাৎ বুদ্ধি চেতনাবৎ হয় এবং গুণসকলের কর্ত্তৃত্ব ভুলিয়া নির্গুণ উদাসীন পুরুষ নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন।

লিঙ্গ মানে বুদ্ধি কোন অভিধানে নাই। ভাষ্যকারেরা একটী নূতন পরিভাষা করিয়া বুদ্ধিকে লিঙ্গ বলিয়াছেন। লিঙ্গ সাবয়ব, এ কথা কারিকাকার প্রথমেই বলেছেন। বুদ্ধির কোন অবয়ব আছে কি? তবে কি অর্থ হবে? লিঙ্গকে যথাস্থানে রাখলেই অর্থ আপনি প্রকাশ হবে। 'অচেতনং চেতনাবদ্ ইব লিঙ্গং'। ব্যক্ত জড়জগতের যে লিঙ্গ তাহা সাবয়ব এবং অচেতন, ব্যক্ত চেতন-জগতের যে লিঙ্গ তাহা সাবয়ব কিন্তু চেতনাবদ্ অর্থাৎ সেই অবয়ব চেতনাযুক্ত। অচেতন চেতনাযুক্ত কখন হয়? 'তৎ তয়োঃ-সংযোগাৎ', প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে। এই সংযোগ ঘটিলে অচেতন পদার্থ নিত্য চেতনাবদের মত আচরণ করে অর্থাৎ চেতনের শরীর সৃজন করে বা অবয়বে পরিণত হয় আর উদাসীন পুরুষ কর্ত্তার মত হ'ন। শুধু পুরুষের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও পুরুষের সংযোগ ব্যতীত ক্রিয়াশীল হ'ন না। নর-নারীর মধ্যে এই প্রকৃতি-পুরুষের অধিষ্ঠান। সেই প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগের ফল কথিত হইয়াছে। ব্যক্ত জগতের সংযোগের কথা নয়। সে সংযোগ হয় ইন্দ্রিয়পথে, তাহার ফলে ব্যক্ত-জগৎ আনন্দে চেতনাবৎ আচরণ করে না, কিংবা অহঙ্কার মন বুদ্ধি তন্মাত্র দশেন্দ্রিয় ও ভূতগণের সৃজন করে না। সুতরাং এই প্রকৃতি জড় বা matter নহে। ইনি অব্যক্ত, নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন না—যাহা প্রকাশ করেন তাহা

পুরুষে আরোপ করেন এবং পুরুষের কর্তৃত্বের ভ্রান্তি উৎপাদন করেন। ইনি অবিবেকী, অজ্ঞাত প্রেরণার বশে কার্য্য করেন। তাঁহার সমস্ত প্রেরণা পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্ত। ইনি অচেতন—মৃত পাষাণের অবস্থিত হইয়াও পুরুষের চেতনা জাগাইয়া দেন এবং পূর্ব্বোক্ত ক্রমানুযায়ী পুরুষের ভোগ ও মোক্ষসাধনে অপূর্ব্ব দেহ রচনা করেন। সেই পরাশক্তি কি জড়? 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং' বলিয়া যাঁহার গৌরব করিয়াছেন তিনি কি জড়বিজ্ঞানের ভৌতিক শক্তি?

যে ত্রিগুণধারিণী চেতনাকারিণী প্রকৃতি পরবমশ্বরীর রসে নিমজ্জিত হইয়া পুরুষ দিব্য ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, যাঁর প্রেমের ডাকে তিনি উন্মত্ত হইয়া ধাবিত হ'ন, যার কটাক্ষে মূক প্রকৃতিপুঞ্জ প্রফুল্লচপলতায় মুখরিত হয়, যাঁর হাসিতে উষার আলোক ফুটিয়া উঠে ও উল্লাসে সরসীবক্ষে লহর ছুটিতে থাকে, যাঁর নিশ্বাসে বাতাসে বীণার সুর ভেসে এসে উদাস প্রাণে নবীন আশার সঞ্চার করে, যিনি জড় প্রকৃতি নন—পুরুষের প্রমাতা। তিনি পুরুষোত্তমকে বহুপুরুষরূপে প্রদর্শন করিয়া ঘোষণা করেন—ইনি ভোক্তা, ইনি ত্রাতা, ইনি ঈশ্বর—একমেবাদ্বিতীয়ম্। যিনি জড়ের প্রকৃতি নন, তিনি পুরুষের প্রকৃতি—পুরুষের মূল্য জানাইয়া দেন। যেমন টাকার একদিকে পৃথ্বীশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি আর অন্য দিকে তার পরিচয় এক রূপেয়া। জগৎপাতার স্বরূপে গড়া জীবে শিবত্বের ছাপ দিয়া তিনি জানাইয়া দেন এক-রূপেয়া একই রূপ একামেবাদ্বিতীয়ং। জীব যতক্ষণ তার শিবত্বের উপলব্ধি করিতে পারে না ততক্ষণ প্রকৃতি তাকে পুনঃ পুনঃ প্রসব করে ছাপ মেরে দেন শিবমদ্বিতীয়ং। জীব যতদিন জীব, ততদিন প্রকৃত মোহিনী রমণী। যখন তার শিবত্বের উপলব্ধি হয় তখন প্রকৃতি জননীরূপে দেখা দেন। প্রকৃতির মাতৃত্ব বা প্রমাতৃত্ব বুঝতে পারলেই জীব পুরুষের শিবত্ব বা কৈবল্য লাভ হয়; তখন পুরুষ আর বহু নয় একমেবাদ্বীতীয়ম্।

এবম্বিধ প্রকৃতি কপিলের কাব্যের নায়িকা। প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানের কথা তত্ত্বজ্ঞেরা কপিলদর্শনে বুঝাইয়াছেন। দুইটী পদার্থের ভেদজ্ঞান বলিতে উভয়ের যথাতথ্য জ্ঞান বুঝায়, দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ ও স্বাধীন, এরূপ জ্ঞান সব সময়ে নাও বুঝাইতে পারে। এইরূপ পুরুষের স্বাতন্ত্রতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য লিঙ্গবিদ্ধকারী নাগা সন্ন্যাসীদের আবির্ভাব। ঐ সব মুক্ত পুরুষদের ভুল সংশোধনের জন্য প্রকৃতি পুরুষকে আত্মা আখ্যা দিয়া বহুযুগপরে ব্যাসদেব কপিল-কাব্যের উপসংহার বা নূতন ছাঁচে নূতন সংস্কার রচনা করেছিলেন। ভুল যাহা ঘটিয়াছে তাহা আপনারা বেশ বুঝিতেছেন 'কৌপীনবন্ত বহুভাগ্যবন্ত'। ঐরূপ ভাগ্যবান্ যদি না হইতে চান তবে বেদান্তের আলোচনা আর একদিন করিব। আজ বঙ্গের ভাষায় প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া মা পরমেশ্বরীর চরণে যে অপরাধ করিলাম সন্তান বলিয়া তিনি ক্ষমা করুন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

ভারতে বীমাব্যবসায়

ভারতে বীমা-ব্যবসায় সম্পর্কে সরকারী রিপোর্ট সেদিন প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে (১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রেল হইতে ৩০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত) ভারতে ব্যবসায়কারী দেশী ও বিদেশী কোম্পানীগুলির আয়-ব্যয় এবং বার্ষিক নূতন কাজের হিসাব প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইংলণ্ডে বীমা-ব্যবসায় সম্পর্কিত সর্ব্বশেষ রিপোর্টে (১৯৩১ খৃষ্টাব্দ, মার্চ্চ) কোন কোন স্থলে এপ্রিলের হিসাব আমরা পাইতেছি; কিন্তু ভারতীয় বীমা-ব্যবসায়-সম্পর্কিত সরকারী সর্ব্বশেষ রিপোর্টে তাহার একবৎসর পূর্ব্বেকার হিসাব ও তথ্যমাত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; অর্থাৎ ভারত সরকারের তুলনায় বিলাতী ব্যবসায়-বিভাগ পূর্ণ এক বৎসর বা ত্রয়োদশ মাস পূর্ব্বে বীমা-ব্যবসায়-সংক্রান্ত সর্ব্বশেষ সংবাদ প্রকাশ করেন। ভারত-সরকারের পক্ষেও এ সম্পর্কে তৎপরতা দেখান প্রয়োজন। বর্ত্তমানে ভারত-

সরকারের Actuary (বীমা-ব্যবসায়ের হিসাব-বিশেষজ্ঞ) পদে একজন বাঙ্গালী অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুত এন্, এল্, মুখার্জ্জি। আমরা আশা করি, তাঁহার চেষ্টায় বীমা-সংক্রান্ত অতীব প্রয়োজনীয় রিপোর্টগুলি যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশ করার ব্যবস্থা হইবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ববৎসর সরকারী রিপোর্টে দেশীয় ও বিদেশীয় বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে তারতম্য প্রদর্শন করা হইত। সরকারী রিপোর্টে দেশীয় কোম্পানীগুলির দোষ অনুসন্ধানের ও বাহির করার চেষ্টা হইত। অন্যদিকে বিদেশী কোম্পানীগুলির গুণগুলিই ভালভাবে লিখিত হইত। তাহাদেরও যে দোষ থাকিতে পারে তাহা সরকারী রিপোর্টপাঠে কাহারও মনে ধারণা হইত না। দেশীয় কোম্পানীর ত্রুটি অনুসন্ধান ও বিদেশীয় কোম্পানীর দোষক্ষালনের এই প্রচেষ্টায় দেশীয় বীমা-ব্যবসায়ীগণ বারম্বার অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সরকারের পূর্ব্বতন Actuary মিঃ মিকল্ গত বৎসর অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পদাধিষ্ঠিত শ্রীযুত এন্, এল্, মুখার্জ্জি বর্ত্তমান বৎসরে সরকারী রিপোর্ট হইতে দেশীয় এবং বিদেশীয় কোম্পানীর মধ্যে পক্ষপাতমূলক মন্তব্য ও পরিচ্ছেদগুলি তুলিয়া দিয়াছেন। ইহাতে ভারতীয় বীমা-ব্যবসায়ের মঙ্গলাকাঙ্খী, প্রত্যেক ব্যক্তিই সন্তুষ্ট হইবেন।

আলোচ্য রিপোর্টখানি বাজারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই মুখোপাধ্যায় মহাশয় কতকগুলি য়ুরোপীয় পত্রিকার নিকট সমালোচনার্থ উহা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কোন দেশীয় পত্রিকার নিকট তিনি উহা পাঠান নাই। সহযোগী "ইন্সিওরেন্স এণ্ড ফাইন্যান্স রিভিউ" তাঁহাদের গত সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লিখিয়াছেন "এংলোইণ্ডিয়ান কোন পত্রিকার নিকট প্রেরিত একখানি রিপোর্টে লিখিত ছিল যে,—"with Mr. Mukherji's Compliments." ইহাতে মনে হয় যে, মিঃ মুখার্জ্জির উপদেশক্রমে ঐ রিপোর্টখানি অন্যান্য ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রেরণের বহুপূর্ব্বে উক্ত য়ুরোপীয় পত্রিকার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ভারতীয় ও বিদেশী-পরিচালিত পত্রিকার মধ্যে এইরূপ পক্ষপাতমূলক ব্যবহার অত্যন্ত আপত্তিজনক। রাজকোষ হইতে প্রদত্ত অর্থে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। দরিদ্র দেশবাসীই রাজকোষে অর্থ দিয়া থাকে। এমতাবস্থায় সরকারী রিপোর্টগুলি দেশবাসীর উপকারার্থে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় পত্রিকায় সমালোচনার জন্য প্রেরিত হওয়া উচিত এ বিষয়ে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

১৯২৯-৩০ সনে বীমা-ব্যবসায়

১৯২৯-৩০ সনে মোট ২৫৭টি কোম্পানী ভারতে বীমা সংগ্রহ করিয়াছে; ইহার মধ্যে ১০৮টি ভারতীয় ও ১৪৯টি বিদেশী। ১০৮টি ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে ৪৬টি বোম্বায়ে, ২০টি বাঙ্গলায়, ১৯টি মাদ্রাজে, ১২টি পাঞ্জাবে, ৪টি দিল্লীতে, ২টি যুক্তপ্রদেশে, ২টি মধ্যপ্রদেশে, ১টি আজমীরে ও ২টি ব্রহ্মদেশে প্রতিষ্ঠিত। অ-ভারতীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে ৭২টি ইংলণ্ডে ৩০টি ইংরেজাধিকৃত অন্যান্য উপনিবেশে, ১৯টি য়ুরোপীয় মহাদেশে, ১৩টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ১০টি জাপানে ও ৫টি জাভদ্বীপে সমিতিভুক্ত। পূর্ব্ব-বৎসরের তুলনায় আলোচ্য-বৎসরে ভারতীয় কোম্পানীর সংখ্যা ১১টি ও ইংরেজশাসিত উপনিবেশে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর সংখ্যা ১টি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে ৭১টি জীবন-বীমার ব্যবসায় করে, তাহারা অন্যবিধ কোনরূপ বীমা (যথা, অগ্নি, দৈবদুর্ঘটনা, নৌ, মোটর প্রভৃতি) করে না। অবশিষ্ট ৩৭টি ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে ১৮টি অন্যবিধ বীমার দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে জীবন-বীমার ব্যবসায় করে, অন্য ১৯টি কোম্পানী জীবন-বীমার ব্যবসায় করে না, তাহারা অন্যপ্রকার বীমার কার্য্যে রত আছে।

বিদেশী ১৪৯টি কোম্পানীর মধ্যে ১২৫টি জীবন-বীমার কাজ করে না; তাহারা অন্যবিধ বীমার কাজে রত আছে। ৯টি বিদেশী কোম্পানী মাত্র জীবন-বীমার কাজ করে; অন্য ১৫টি কোম্পানী জীবন-বীমার সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রকার বীমার কাজও করিয়া থাকে। মোট ২৪টি বিদেশী কোম্পানী ভারত হইতে জীবন-বীমা সংগ্রহ করে; তন্মধ্যে ১৭টি ইংলণ্ডে, ৬টি ইংরেজাধিকৃত অন্যান্য উপনিবেশে ও ১টি জার্ম্মেনীতে প্রতিষ্ঠিত।

(ক্রমশঃ)

হরিহরের দুর্ব্বলতা

(গল্প)

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

—এক—

দোকানখানি মোড়ের মাথায়ই; বেশ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। ভিতরে, দেয়ালের তিনদিকে আঁটা কাঠের র‍্যাক—তাহাতে বিবিধ রকমের সুদৃশ্য লেবেল-মারা নানা ছাঁদের বোতল; একদিকে দেশী, অন্যদিকে বিলাতী—দোকানখানি মদের।

আজ হরতাল; দোকানের মালিক হরিহরবাবু তাই অন্যদিন অপেক্ষা একটু সকাল সকাল আসিয়াছেন। মাদক-দ্রব্য বয়কট হইয়া অবধি দোকান বড় মন্দা যাইতেছে। এমন কি কলিকাতা হইতে চারিশত মাইল দূরবর্ত্তী এই মোহনগঞ্জ সব্‌ডিভিসনেও তাহার বাতাস লাগিয়াছে। বিশেষতঃ ইস্কুলের ছেলে ও কংগ্রেসকর্ম্মীদের জ্বালায় প্রকাশ্যে কোনও ভদ্রলোক মদ্য কিনিতে সাহসী হইতেছেন না। একমাত্র ভরসা সাহেবদিগের ক্লাব ও বাড়ী; তা' জন কুড়ি সাহেব আর কত টানিতে পারে? এদিকে মেথর পাড়ায়ও ভীষণ গণ্ডগোল—দেশীর কাট্‌তি কমিয়া গিয়াছে।

হরিহরবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। কলেজে থাকিতে মদ্যকে গোমাংস তুল্য মনে করিতেন এবং উহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থে জীবন-ধারণের ধারণাও হয় তো আসে নাই; কিন্তু সময়ে সবই হয়। নগদ বহু টাকা নজর দিয়া তিনি যে এই মদ্য বিক্রয়ের ফরমান্ পাইয়াছেন, তাহাও দশ বৎসর হইতে চলিল। লোকে বলে, এই দশ বৎসরে তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে পারিয়াছেন—সেটা গুজবও হইতে পারে।

হরিহরবাবুকে কিছুতেই সুপুরুষ বলা চলে না। রং কালো, মাথা টাক—স্থূল লোমশ দেহ। উচ্চস্বরে কথা বলেন—কথা বলিবার সময় কপালের রগ ফুলিয়া উঠে—মাথাটা একটু ঝুকিয়া পড়ে।

দোকানে চারিজন কর্ম্মচারী। দুইজন মদ্য বিক্রয় করেন, একজন তাহার হিসাব রক্ষা করেন; অন্যটী দারোয়ান—সময়ে আর্দ্দালীর কাজও করিয়া থাকে।

হরিহরবাবু ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন, কর্ম্মচারিদের মধ্যে তিনজন অনুপস্থিত। হিসাব-রক্ষক অনিলবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—কি হে আজ হরতালের জন্য যে বাবুদের আসাই হয় নাই।

অনিল আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—আজ্ঞে তা' নয় রমেশের অসুখ।

—হু, হরতালের দিনে কি অসুখ তা' আমি জানি—যাও আর ন্যাকামি করতে হ'বে না—সাতদিনের মাইনে কাটা যাবে।" কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, "আর দারোয়ানটা?"

অনিল কি বলিতে যাইয়া চুপ করিল। হরিহরবাবু প্রায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আঃ বলই না বাপু কি হয়েছে?—তারও জ্বর নয় আমাশয়,—কি হয়েছে?—কেমন?"

—আজ্ঞে তা' নয়।

—তবে?

—সে বলেছে, বলিয়া অনিল চুপ করিল।

হরিহরবাবুর ক্রোধের মাত্রা ছাড়াইয়া গেল; মুখ বিকৃতি করিয়া বলিলেন,—সে বলেছে—সে বলেছে—কি আমার পিণ্ডি দিতে বলেছে? অনিলের নিকট প্রভুর এ মেজাজ কিছুমাত্র নূতন নহে, তবে আজ হরতালের দিনে পাড়ার ছেলেদের উপহাস সহ্য করিয়া তাহাকে কাজে আসিতে হইয়াছে, তাই তাহার মনও একটু উত্ত্যক্ত ছিল। একটু জোর দিয়াই সে বলিল,—সে বলেছে, মদ গোমাংস তুল্য, সে আর এ দোকান মাড়াইবে না; বলে; লোককে মদ খাইতে শেখানোর চাইতে—বুকে ছুরি মেরে রোজগার করাও ভাল।

উষ্মার আবেগে সে ব্যাপারটা একটু বাড়াইয়াই বলিল; কিন্তু ঘৃতে অগ্নি সংযোগ হইল। হরিহরবাবু তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন,—'শালা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির—বেটার নামে তহবিল তছরুপের মোকদ্দমা করব—দেখো অনিল তোমাকে সাক্ষী দিতে হ'বে, বল্‌বে একশো টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

অনিল চুপ করিয়া রহিল।

হরিহরবাবু দোকানের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন।

চারিদিকে নিস্তব্ধতা—আশে পাশের দোকানপাট সব বন্ধ। রাস্তার গাড়ী ঘোড়া তো দূরের কথা লোক চলাচলও বড় একটা হইতেছে না। অপর দিকের র'কে পাহারাওয়ালাটা দেয়াল ঠেস দিয়া হা করিয়া ঘুমাইতেছে—অন্য দিন পাশের পানওয়ালীর দোকানের কাছে দাঁড়াইয়া রসালাপের সঙ্গে সঙ্গে খৈনি টিপে। হরিহরবাবু প্রায় আধ ঘণ্টা কাল পাইচারি করিলেন—এ পর্য্যন্ত একটা বোতলও বিক্রয় হয় নাই—এ বেলা কিছু হইবারও সম্ভাবনা অল্প। তিনি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

—দুই—

বাড়ীতে ঢুকিয়াই হরিহরবাবু দেখিলেন, দুইটী খদ্দর পরিহিত যুবক তাঁহার বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতেছে, মাথায় গান্ধীটুপি। বুঝিলেন ইহারা কংগ্রেসের লোক। তিনি ঢুকিতেই, ইহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বিনীত অভিবাদন করিল। হরিহরবাবু রুক্ষস্বরে বলিলেন,—'কি চান?' যুবকদ্বয়ের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠটী বলিল,—আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ—

হরিহরবাবু প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। যুবকটী বলিতে লাগিল,—আজ্ঞে, মোহনগঞ্জে বিলাতী জিনিস বয়কট-সম্পর্কে; কি রকম করে—

বাধা দিয়া হরিহরবাবু বলিলেন,—তার সাথে আমার সম্পর্ক কি?

—আপনার সাথে সম্পর্ক কি?—আপনার সাথেই তো সব চেয়ে বেশী সম্পর্ক! এ প্রচেষ্টায় আপনার চাইতে কে বেশী দান করে?

হরিহরবাবু অবাক হইয়া গেলেন; বলিলেন,—দান?—আমার? কি বল্‌ছেন?'

—আজ্ঞে, এ কি আর চাপা থাকে? কাল সকালে যে কংগ্রেস অফিসে পাঁচশ টাকা পাঠিয়ে দিলেন!

হরিহরবাবু আরো অবাক্ হইলেন; বলিলেন,—বলেন কি?—আমি টাকা পাঠালাম কংগ্রেস অফিসে—পাচশো? ঠাট্টা-তামাসার আর যায়গা পেলেন না! ভালো, মশায়রা পথ দেখুন তো?—নইলে—

যুবক দুইটী হতভম্ব হইয়া গেল। বলিল,—আজ্ঞে ভুল হ'বার তো কথা নয়—আপনার দানের কথা তো খবরের কাগজে ছাপা হতে চলে গেছে! আমাদের জেলা কমিটির সভাপতি—

কথাটা শেষ করিতে হইল না, হরিহরবাবু বলিলেন,—পথ দেখুন মশায়—পথ দেখুন—এটা থিয়েটারের ষ্টেজ নয়! যুবক দুইটী অভিভূতের মত এক পা দুই পা করিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহাদের গমন-পথের দিকে চাহিয়া হরিহরবাবু মনে মনে কি যেন স্থির করিলেন; বিড় বিড় করিয়া বলিলেন,—রসো বাপু মজাটা টের পাওয়াচ্ছি—বাড়ী চড়াও হ'য়ে তামাসা—আর জায়গা পেলে না!

অন্দরের দিকে খোকার জোর গলার আওয়াজ শুনা যাইতেছে—সে যেন বুড়িমাকে কি বলিতেছে। খোকা হরিহরবাবুর একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র; হরিহরবাবু নিঃসন্তান, পিতৃমাতৃহীন খোকাকে পুত্রের মত মানুষ করিতেছেন—তাঁহার জীবনের সমস্ত রস এই খোকাকে ঘিরিয়া। খোকা স্থানীয় বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে; বয়স তের-চৌদ্দ বৎসর।

হরিবাবু অন্দরে ঢুকিয়া সম্মুখে খোকার মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। খোকার পরণে খদ্দরের ধুতি—খদ্দরের পাঞ্জাবী—মাথায় গান্ধীটুপি। সকাল হইতেই এই রকম বিসদৃশ ব্যাপার দেখিতে দেখিতে হরিহরবাবুর মেজাজ চড়িয়াই ছিল, এখন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি খোকার কাণ ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া গালে কশিয়া একটা চড় দিলেন।

খোকা কাঁদিল না,—বুঝিতে পারিল না, কি দোষে সে মার খাইতেছে।

—আজ যে বড় ইস্কুলে যাস্ নি ?

খোকা নিরুত্তর। কর্ত্তার আওয়াজে গিন্নী বিনোদিনী ছুটিয়া আসিয়াছেন, তিনি খোকাকে বুকে টানিয়া বলিলেন, —ও কি দোষটা করেছে যে ওকে মারলে ?

হরিহরবাবু ভেংচাইয়া বলিলেন,—দোষটা কি করেছে ? —লেখাপড়া তো সব চুলোয়—ওকে এ কাপড় কিনে দিলে কে ?

বিনোদিনী একটু অবাক্ হইয়া বলিলেন,—'কেন আমিই কিনে দিয়েছি !

—তা' ভারী কাজ করেছো—আমি পই পই করে না তোমাকে বলেছি যে, আমার বাড়ীতে ও সব চল্‌বে না—তবু—

বিনোদিনী হাসিয়া বলিল, 'তা বেশ—নিজে তো পাঁচশো টাকা কংগ্রেসে দিলে—আর ছেলে খদ্দর পরেছে বলে মার দিচ্ছ—তোমার হ'ল কি

হরিহরবাবুর ভ্রুকুটি-কঠিন মুখ আরো কঠিন হইল; বলিলেন,—কংগ্রেস পাঁচশো—কংগ্রেস পাঁচশো—সবাই আজ হ'ল কি ? অই ছোঁড়া দুটো বুঝি বলে গেল ?

—ছোঁড়া দুটো বল্‌বে কেন, এ কথা আর এখানকার কে না জানে ? আজ সকালেও তো ডেপুটীবাবুর বউ এসেছিল, বল্‌ল, 'তোমাদের কর্ত্তার কিন্তু ভাই সাহস আছে —মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট না কি তাঁর 'রায় সাহেব' উপাধির জন্য লিখেছিলেন, তার মোহ ছেড়ে যে কংগ্রেসে দান করতে গেলেন—আমাদের কর্ত্তা বলেন, এইতো চাই—আমরা পারি না পরের গোলাম—

হরিহরবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল, বলিলেন, 'একথা কি তাঁদেরও কানে উঠেছে না কি ?

গৃহিনী কি উত্তর দিলেন, তাহার এক বর্ণও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, এই সেদিন হাঁসপাতালের ইউরোপীয় বিভাগের জন্য এক সহস্র টাকা দান করায়—সাহেব মহলে তাঁহার কিই না প্রতিপত্তি হইয়াছে ! মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে খাস্ কামরায় বসাইয়া হাসিমুখে গল্প করেন। আম্‌লারা, শুধু আম্‌লারা কেন, সময় সময় হাকিমরাও আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে। পুলিস সাহেব 'হ্যালো হরিহরবাবু' বলিয়া তাঁহাকে পাশে বসায়। দারোগাগুলিতো তাঁহাকে দূর হইতে দেখিলেই নমস্কার করে। সম্প্রতি তাঁহার 'রায় সাহেব' উপাধির জন্য সুপারিশ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ-পত্রও দিয়াছেন। সম্মুখে রাজার জন্মতিথি, এবার সেটা হবারও সম্ভাবনা। এর মধ্যে যদি এই অপকলঙ্ক সাহেবদের কর্ণে পৌছে তবে ?——ভাবিতে ভাবিতে হরিহরবাবুর সেদিন ভাল করিয়া স্নানাহার হইল না।

—তিন—

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পরের দিন দুইটী ইংরাজী ও তিনটী বাংলা কাগজে প্রকাশিত হইল যে, মোহনগঞ্জের প্রসিদ্ধ মদ্য-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরিহর রায় বি-এ, মহোদয় তাঁহাদের মহকুমার বিদেশী বন্ধ ও স্বদেশী প্রচলনের জন্য পাঁচশত টাকা কংগ্রেস-ফণ্ডে দান করিয়াছেন আর ভবিষ্যতে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। প্রায় সকল কাগজেই তাঁহার দানের কথা লইয়া আরো লাইন পাঁচেক লেখা হইয়াছে।

হরিহরবাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হায় ! হায় ! একেবারেই যে তাহার সর্ব্বনাশ হইল। কাল ভাবিয়াছিলেন, সাহেবদের কাছে এটাকে গুজব বলিয়া উড়াইয়া দিবেন—এমন কি দরকার পড়িলে ক্লাবে একটা পার্টিরও বন্দোবস্তও করিবেন—ডালি দিবার ব্যবস্থাও তিনি করিয়া রাখিয়াছেন—কিন্তু এখন তো আর ইহাকে গুজব বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। সাহেবেরা বলিবেন তুমি টাকা না দিলে কি আর তারা শুধু শুধুই কাগজে ছাপিয়া দিয়াছে ?—তাহার উত্তর কি ? হরিহরবাবু আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন !

সহসা একটা কোলাহলের শব্দে তিনি জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, জন কুড়ি খদ্দর-পরিহিত যুবক গেট পার হইয়া তাহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে; তাহাদের অগ্রভাগে কালিকার সেই যুবক দুইটী। হরিহরবাবুর সমস্ত মন তিক্ততায় ভরিয়া গেল—সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াও ইহারা তৃপ্ত নহে—আবার পরিহাসেরও আশা রাখে ! তিনি বাহিরে আসিয়া চাকরকে কি বলিলেন, তাহাকে দেখিয়া ছেলের দল সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল 'বন্দেমাতরম্'।

চাকরটা দৌড়াইয়া গিয়া তাহাদিগকে বলিল, 'বাবু কাহারও সহিত দেখা করিবেন না।' তাহারা হল্লা করিতে করিতে ফিরিয়া গেল। কিন্তু তথাপি দেখা করিতে হইল। দুপুরে সরকারী চাপরাশী 'এক্সাইস' অফিসের চিঠি আনিয়া দিল,—তাঁহাকে তখনই তাহার অফিসে দেখা করিতে হইবে।

হরিহরবাবু ভাল করিয়া ধড়াচূড়া বাঁধিয়া হাকিমের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। হাকিমের ঘরের পাশে বহুক্ষণ অপেক্ষার পর তাহার দর্শন মিলিল। ইনি বাঙ্গালী মুসলমান, বলিলেন,—আপনার দোকান সম্পর্কে অনেক খারাপ রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে, এ সব করলে আপনার পক্ষে লাইসেন্স বজায় রাখা শক্ত হবে।

হরিহরবাবু এ সকল হুম্‌কির অর্থ বুঝিতেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি আপনি কিছু ভাব্‌বেন না' বলিয়া বক্রদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন।

হাকিম সে দিকে দৃষ্টিমাত্রও না করিয়া বলিলেন, মহকুমা-হাকিম আপনার উপর চটেছেন।

হরিহরবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—তাঁর সাথে একবার দেখা হ'বে কি?

—তা' হতে পারে দেখুন।

হরিহরবাবু এ ঘর হইতে বাহির হইয়াই কংগ্রেসের মুণ্ডপাত করিতে করিতে ম্যাজিষ্ট্রেটের খাস্ কামরার দিকে অগ্রসর হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিয়া সিগারেট টানিতেছিলেন। হরিহরবাবু কার্ড পাঠাইবামাত্র ডাকিয়া পাঠাইলেন।

হরিহরবাবু ঘরে ঢুকিয়াই অভিবাদনের সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন,—স্যর, কংগ্রেসীদের যন্ত্রণায় আর পারা যাচ্ছে না একটা বিহিত করুন!

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহার জন্য আদবেই প্রস্তুত ছিলেন না, উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি ব্যাপার?

—আজ্ঞে তারা আমার পাঁচশো টাকা জোর করিয়া নিয়া গিয়াছে!

—কি রকম, আপনি কি সে টাকা তাদের ফণ্ডে দান করেন নি?

—বলেন কি? আমি দান করব!

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অবাক্ হইলেন, বলিলেন, কি ব্যাপার বলুন তো।

উত্তরে হরিহরবাবু অনর্গল যে মিথ্যা ঘটনার বিবৃতি করিলেন, তাহা সংক্ষেপে এই:—

হরতালের পূর্ব্বদিন রাত্রে আটটায় দোকান বন্ধ করিবার সময় তিনি দরোয়ানের হাতে পাঁচশত টাকা বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু সারারাত্রিতেও দারোয়ান তাঁর বাড়ীতে পোঁছে নাই। তিনি রাত্রে দুইবার খোঁজ করিয়াছেন, তাহার বাসায়ও তাহাকে পাওয়া যায় নাই। খবর পাওয়া গিয়াছে যে, সে কংগ্রেস অফিসে আটক আছে। তারপর আজ সকালে এই দানের কথা কাগজে পড়িয়া তিনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়াছেন—কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটা তাঁহার নিকট জলের মত হইয়া গিয়াছে। কথাগুলি বলিয়া হরিহরবাবু পুনরায় সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

সাহেব বলিলেন,—এতো ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার তা আপনি মোকদ্দমা রুজু করুন না।

—আজ্ঞে, স্যর তা তো করবই, তবে তার আগে আপনাকে একবার জিজ্ঞাসা না করে—

—তার আবার কথা! আপনি আর দেরী করবেন না, হাঁ তা আপনার সাক্ষী টাক্ষী আছে তো?

—হ্যাঁ স্যর, তা খুব আছে। বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন। ভাবিলেন, যাক্ বাবা, এক ঢিলে দুই পাখী। দেখি কেমন বাবা তুমি ধর্ম্মপুত্তুর দারোয়ান আর কেমনই বা তোমার কংগ্রেসের চালবাজী!

কোনও উকীল এই দরখাস্ত দিতে সম্মত হইল না। অনেক বলিয়া কহিয়া, বেশী টাকা ফি দিয়া একজন মোক্তারকে রাজী করান গেল। দরখাস্ত পেশ হইল।

সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ান অযোধ্যারাম ও কংগ্রেস অফিসের নামে সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। ফলে, সারা মহকুমায় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

সন্ধ্যায় প্রফুল্লমনে শিস্ দিতে দিতে হরিহরবাবু বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

—চার—

বিকালের ডাকে আগত দুইখানি চিঠি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। হরিহরবাবু চা ও খাবারের সঙ্গে সঙ্গে পত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। একখানা লিখিয়াছেন তাঁহার অতি পুরাতন বন্ধু শৈলেন। শৈলেন এখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট—আলিপুরে আছে। কলেজে একসঙ্গে পড়িবার সময় তাঁহাদের কি সৌহার্দ্দ্যই না ছিল—লোকে তাঁহাদের বলিত, জোড়মাণিক। শৈলেন লিখিয়াছে—

ভাই হরিহর,

তোমাকে মদের পিপার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া ভাবিয়াছিলাম তুমি পচিয়া গিয়াছ—কিন্তু আজ সকালের কাগজে তোমার কথা পড়িয়া মনে হইল, আমরা মরিয়া গিয়াছি—জিয়ানরসে তোমার তাজা প্রাণ টাট্‌কাই আছে। তোমাকে ভাল বাসিতাম—আজ কেবল শ্রদ্ধা করিতেই ইচ্ছা হইতেছে—তুমি অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছ। ইত্যাদি ... ...

পত্র পড়িতে পড়িতে হরিহরবাবুর মনে গত জীবনের একখানা নির্ম্মলোজ্জ্বল ছবি উঁকি ঝুঁকি দিতেছিল। যৌবনের প্রারম্ভে জননী জন্মভূমির দুঃখনাশের জন্য কি সে সজীব আগ্রহ! তখন স্বদেশীযুগ—ঘরে ঘরে বিলাতী বয়কট—রাস্তায় রাস্তায় স্বদেশী সঙ্গীত! সে দিনে তরুণ প্রাণের কি সে আকাঙ্ক্ষা—সারা রাত্রি জাগিয়া দেশভক্তিকর কার্য্যের তালিকা প্রস্তুতে সে কি আনন্দ! আর আজ?—বৎসরের পর বৎসর মনের জমিতে পলি পড়িয়াছে—তাহাতে ফুলের গাছ গজায় নাই—ঝাকড়া সেওড়া গাছের সার দাঁড়াইয়াছে! আজিকার হরিহরকে দেখিলে কে বলিবে, ইনি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতী কাপড় পাইলেই তার অগ্নিসংস্কার করিতেন? আর শৈলেন স্বয়ং গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইয়াও—আঃ হরিহর না শিক্ষিত? বিশ্ববিদ্যালয় না তাহাকে উচ্চশিক্ষার ছাপ মাড়িয়া দিয়াছে? নিরক্ষরকে না তিনি ঘৃণা করেন? কোন্ মুখে? কাল যখন কাগজে আজিকার এই কলঙ্ক-কাহিনী বাহির হইবে তখন?

মাথা ধরিয়াছে বলিয়া হরিহরবাবু শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু সারারাত্রির মধ্যে তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। বিনোদিনী কিছুই বুঝিতে পারিল না।

পরদিন প্রাতে আসিয়া দোকানের একজন কর্ম্মচারী খবর দিল, দোকানের সম্মুখে চার পাঁচজন লোক শুইয়া রহিয়াছে বলে, আমরা সত্যাগ্রহী, আমাদের না মাড়াইয়া কেহ ঘরে ঢুকিতে পারিবে না।

এক মুহূর্ত্তে হরিহরবাবুর সমস্ত রাত্রির চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটিল। বলিলেন,—পুলিশ ডাকতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একখানা আবেদন লিখিয়া চাকর দিয়া উহা পাঠাইয়া দিলেন।

দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হরিহরবাবু দেখিলেন, সেখানে অসম্ভব জনতা, সত্যাগ্রহীদের না মাড়াইয়া ঘরে ঢোকা অসম্ভব। তিনি জোর করিয়া ছেলেদের মাড়াইয়া দোকানে ঢুকিলেন। চারিদিকের সকলে "সেম" "সেম" করিয়া উঠিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল। একদল পুলিশের সঙ্গে স্বয়ং পুলিশ সাহেব ও একজন সার্জ্জেণ্ট। আসিয়াই তাহারা জনতাকে চলিয়া যাইতে আদেশ দিল। জনতা সরিল না। পুলিশ সাহেব স্বয়ং সত্যাগ্রহীদের উঠিয়া যাইতে বলিলেন—তাহারা উঠিল না। পুলিশ তাহাদের টানিয়া নিয়া দূরে ছাড়িয়া দিয়া আসিল, পরে দরজার দুইপাশে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে সত্যাগ্রহীরা পুনরায় দরজার দিকে আসিতে চেষ্টা করিল। পুলিশ সাহেব বারবার তাহাদের সাবধান করিয়া দিলেন কিন্তু তাহারা মরণপণে কার্য্যে অগ্রসর। জনতা আরো ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

একটীর পর একটী—সাতটী সত্যাগ্রহী সমগ্র বিশ্বের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উন্নতশীরে দণ্ডায়মান—গাত্রে শুভ্র খদ্দর, যোগীমূর্ত্তি যেন মৌন-সমাধিমগ্ন! সাধ্য কি পুলিশবাহিনীর যে, তাহাদের গতিরোধ করে! তাহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইল।

পুলিশ সাহেব হুকুম দিলেন, সরিয়ে দাও। সার্জ্জেণ্ট বেত উঠাইল। সমগ্র জনতা "সেম" "সেম" করিয়া উঠিল, কিন্তু সার্জ্জেণ্ট থামিল না। একটীর পর একটী করিয়া আঘাতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে জর্জ্জরিত করিয়া চলিল। প্রতিদ্বন্দ্বী বাক্যহীন শব্দহীন মুখে নির্ব্বিকার ভাবে তাহার প্রাপ্য

সম্মান গ্রহণ করিতে লাগিল; একটুকু কাতরতা তাহার মুখে নাই, স্বয়ং নীলকণ্ঠের মত বিশ্বের বিষ গ্রহণ করিয়া যেন সে নির্লিপ্ত! আঘাতের পর আঘাত চলিল বেত্র উঠিল নামিল আবার উঠিল; দেহ রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত—শুভ্র খদ্দর তাজা রক্তের দাগে রাঙা হইয়া উঠিল। বালক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

তারপর দ্বিতীয়, শীর্ণকায় কিশোর; চোখে মুখে এক স্বর্গীয় হাসি!

হরিহরবাবু দোকান হইতে সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে অপলক নেত্রে। দেখিতেছিলেন আর মনে হইতেছিল, হয় তো পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া আসিয়াছে ভারতের ঘরে ঘরে আজ যুগ-প্রবর্ত্তকের জন্ম হইয়াছে—ঘরে ঘরে চৈতন্য, ঘরে ঘরে যিশুখৃষ্ট! জগতের যত অত্যাচার, যত অন্যায় এই সর্ব্বজয়ী হুতাশনের রক্তশিখায় ভস্মীভূত হইতেছে, এই যজ্ঞধূম হইতে বাহির হইবে জগতের একটা মহান স্বপ্ন! মৃত্যুকে কে আজ আনন্দে বরণ করে? দৈত্যকে কে আজ হেয় জ্ঞান করে? মানুষ আজ সর্ব্বভয় অতিক্রম করিয়া দেবত্বে পৌঁছিয়াছে অমৃতের পুত্র আজ বহু বৎসরের নিদ্রা হইতে সহসা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে!

এই যে বিদ্রোহী বীর, নিশ্চল নির্ব্বিকারভাবে অসহ্য দৈহিক কষ্ট সহাস্যে বরণ করিয়া লইতেছে—চোখের সুমুখে রক্তে মুখ ভাসিয়া গেল, ঘামের মত দরদর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, নির্য্যাতিতের ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই! এদের জন্য যদি সত্যাই পাঁচশো টাকা দিতে পারিতাম, পাঁচশো কেন যদি সমস্ত জীবনই!

পুলিশ সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিয়া তৃতীয়টার দিকে অগ্রসর হইলে হরিহরবাবুর চমক ভাঙিল। দেখিলেন, তৃতীয়টী তাঁহার খোকা; চোখে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি, মুখে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ। তাঁহার মনে হইল পৃথিবীটা দুলিয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে অন্ধকার আর অই সাত সাতটা উল্কাপিণ্ড তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। অর সহ্য হইল না দরজার হুড়কাটা টানিয়া লইয়া সাজানো বোতলগুলিকে উন্মাদের মত ভাঙ্গিতে সুরু করিলেন। সমগ্র জনতা সে শব্দে দোকানের দিকে চাহিয়া দেখিল। পুলিশ সাহেব ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু ততক্ষণে হরিহর ঘরের সমস্ত বোতল নিঃশেষ করিয়া উন্মাদের মত বাহিরে আসিয়া সার্জ্জেণ্টের উপ'র লাফাইয়া পড়িলেন—যেন পিঞ্জর হইতে ছাড়া পাওয়া সিংহ।

পুলিশ সাহেব আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতে হরিহর-বাবুর সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। পুলিশ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'ল হরিহরবাবু?

হরিহরবাবু কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন,—আজ্ঞে দেখলেন আমার বোতলগুলি সব ভেঙ্গে দিয়ে গেল।

পুলিশ সাহেব একটু বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। পরমুহূর্ত্তেই হয় তো সমস্ত ব্যাপারটার একটা বিশিষ্ট অর্থ খুঁজিয়া পাইয়া বলিলেন,—তা বটে তাদের সনাক্ত করতে পারবেন?

হরিহরবাবু অম্লান-বদনে দুইজন সত্যাগ্রহীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

পুলিশ সাহেব হাসিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলেন, তাহার পর হয়ত সমগ্র ভারতবাসীর জাতীয়তাকে ধিক্কার দিবার জন্যই বলিলেন,—থ্যাঙ্কস্ হরিহরবাবু।

হরিহরবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

১৯২৯—৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতে উৎপন্ন খদ্দর :—

আহম্মদাবাদ হইতে অখিল-ভারত কাটুনী-সঙ্ঘের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য-বর্ষে মোট ৫৩০৮১৬ টাকার খদ্দর ভারতে বিক্রয় হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা এ বৎসর শতকরা ৬৮ ভাগ খদ্দর উৎপন্ন হইয়াছে। দিল্লী, কাশ্মীর, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাবে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা দ্বিগুণ, যুক্ত-প্রদেশে প্রায় তিনগুণ এবং বিহার, উৎকল ও রাজস্থানে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা যথাক্রমে শতকরা ৬৫, ৬৬ ও ৮০ ভাগ অধিক খদ্দর উৎপন্ন হইয়াছে। তামিল-নাইড়ুতেও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। প্রায় সকল দেশেরই এ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে কিন্তু বঙ্গদেশে হয় নাই। ইহার একমাত্র কারণ, বাঙ্গালায় কর্ম্মীদের মধ্যে অধিকাংশই এ সময় কারাগারাবদ্ধ ছিলেন।

আলোচ্যবর্ষে খদ্দর উৎপন্ন হইয়াছে ১১২৬২৫১১ বর্গ গজ—উহার ওজন ৩৯৬৪৯৭৫ পাউণ্ড। খদ্দর উৎপন্নের সঙ্গে সঙ্গে এ বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ১৬ ভাগ বিক্রয় হইয়াছে।

ফলে দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বাপেক্ষা ভারতীয় খদ্দর-শিল্পের উন্নতি হইতেছে। কিন্তু এ উন্নতি আধুনিক ভারতের পক্ষে কিছুই নয়। ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু যে খদ্দরের প্রচার হওয়া উচিৎ তাহা নয়, খদ্দর উৎপন্ন করিবার পক্ষেও সকলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। চরকায় সূতা-কাটা ও তাঁতে কাপড়-বোনা প্রত্যেককে স্বাবলম্বী করিবার একমাত্র উপায়।

ভারতে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী ও দেশীয় মিলসম্প্রদায় :—

গতবৎসর অপেক্ষা এ বৎসর বিলাতী কাপড়ের আমদানী প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৯—৩০ সনে ভারতে বিলাতী কাপড়ের আমদানী হইয়াছিল ৭৮ কোটী টাকার ও বিলাতী সূতার আমদানী হইয়াছিল ৬ কোটী টাকার; কিন্তু ১৯৩০—৩১ সনের রিপোর্টপাঠে জানা যায় যে, এ বৎসর বিলাতী কাপড়ের আমদানী হইয়াছে ৪১ কোটী টাকার ও বিলাতী সূতার আমদানী হইয়াছে তিন কোটী টাকার।

বিলাতী বস্ত্রের চাহিদা ক্রমশঃ যে কমিতেছে তাহার অনেকটা ক্ষতিপূরণ করিয়াছে চীন ও জাপান; ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রথম চারি মাসে চীন ও জাপান হইতে বস্ত্র আমদানীর মোট পরিমাণ ছিল ৩৬৮৯১০০০ বর্গগজ আর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪২৮৮৭০০০ বর্গ গজ। এ আমদানীও ভারতীয় খদ্দর-শিল্প ও মিলের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, কারণ যাহা আসিয়াছে তাহা ভারতের পক্ষে যথেষ্ট নয়, ভারতকে অনেক বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া কল চালাইতে হয়।

ভারতের মিলগুলির সর্ব্বপ্রধান বাধা হইতেছে অতিরিক্ত শুল্ক। ইহা প্রধানতঃ ৪০ নম্বরের ঊর্দ্ধে সূতা উৎপন্ন করিলে দিতে হয়। সুতরাং বস্ত্র-নির্ম্মাণে মিল-কর্ত্তৃপক্ষকে বেশ বাধা অতিক্রম করিতে হয়। আমাদের দেশে যে পরিমাণ মিল আছে তাহাদের কার্য্যকরী শক্তির অভাব বা মিল-সম্প্রদায়ের মূলধনের অভাবের জন্য বস্ত্র অন্য দেশ হইতে আমদানীর প্রয়োজন, ঠিক তাহা নয়। এ বিষয়ে তাহাদের শক্তিও প্রচুর আছে, কিন্তু বাধাগুলি অতিক্রম করিতে না পারিলে ভারত স্বাবলম্বী হইতে পারিবে না। আমরা নিম্নে আমাদের দেশের কতকগুলি মিল ও তাহাদের মূলধনের একটী তালিকা দিলাম—

মিল	মূলধন (টাকা)
ই, ডি, সাসুন ইউনাইটেড মিলস্ (বোম্বাই)—	১০ কোটী
নিউ ভিক্টোরিয়া কোং লিঃ (কানপুর)—	৫ কোটী
বাকিংহাম ও কর্ণাটিক কোং লিঃ (মাদ্রাজ)—	২॥০ কোটী
আগ্রা ইউনাইটেড মিলস্ লিঃ (আগ্রা)—	১॥০ কোটী
কেশোরাম কটন মিলস্ (কলিকাতা)—	৮০ লক্ষ
খিলচাঁদ মিল লিঃ (বোম্বাই)—	৮০ লক্ষ
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ (শ্রীরামপুর)—	১৮ লক্ষ
আমেদাবাদ এডভান্স মিলস্ (আমেদাবাদ)—	১০ লক্ষ

ভারতকে সর্ব্বপ্রকারেই অন্যায় সহ্য করিতে হয়। ভারতে যে কাপড় ও সূতা আসিবে তাহার শুল্ক আছে, কিন্তু ভারত হইতে যে তূলা বিদেশে রপ্তানী হইবে তাহার কোন শুল্ক নাই। বৃটেনে তূলা উৎপন্ন হয় না—তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা। ইহার ফলে মধ্য হইতে চীন ও জাপান একটু সুবিধা করিয়া লইয়াছে। এখান হইতে বিনা-শুল্কে তূলা লইয়া গিয়া শুল্কসমেত কাপড় চালান করা চীন কিংবা জাপানের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। এস্থলে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পকে যে কিরূপ বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

বাঙ্গালার কুটীর-শিল্পে গৃহসজ্জার উপকরণ :—

বাঙ্গালার বর্ত্তমান অন্নকষ্ট যে কিরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। বাঙ্গালার পল্লী-শ্রীর অধঃপতন আজ ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে; ইহার কারণ বাঙ্গালার পল্লীর লোকদের লাভজনক উপজীবিকার অভাব। এই অভাব ঘটিয়াছে বাঙ্গালীর সহানুভূতি নাই বলিয়া। এখনও বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে অনেক শিল্পী আছে, যাহারা স্বাবলম্বী হইবার সুযোগ ও সুবিধা পায় না; তাহারা সেরূপ পাইলে অন্নকষ্ট অনেকটা দূর হইতে পারে। বাঙ্গালায় তাঁতি-জোলার অভাব নাই কিন্তু তারা বেকার। কম্বল, গালিচা ও রেশমজাত নানাপ্রকার বস্ত্র নির্ম্মাণে এখনও বাঙ্গালার পুরাতন শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। তাহাতে জাতীয় শিল্পও বজায় থাকে, পল্লীশ্রীও অনেকটা উন্নত হয়। গৃহসজ্জার উপকরণে মাদুর, শীতলপাটী ও বেতের নানারূপ জিনিস বাঙ্গালার নিজস্ব। এখন সস্তায় টিনের বাক্স, সুটকেস প্রভৃতি নানারূপ জিনিসে এগুলি প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

প্রত্যেক জেলাতেই এখন বাঁশ, বেত ও নলখাগড়া দ্বারা নানাবিধ গৃহসজ্জা প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়। দরমা, ঘাসের চাটাই, ঝুড়ি, চাঙ্গারী প্রভৃতি না হইলে গৃহস্থের চলে না; কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ বাঁশ ও বেতের সুন্দর ও শোভন-শিল্পের কাজ ছিল তাহার আদর ক্রমশঃই কমিতেছে। সহানুভূতি পাইলে এদেশের লোকেরা এখনও যে নানাবিধ গৃহসজ্জার উপকরণ তৈয়ারী করিতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার এই প্রাচীন শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। ইহার পক্ষপাতী হওয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই উচিত।

শ্রীযুক্ত এ, এস্, রামকুমার :—

বহুরূপধারী লন চ্যানীর নাম বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। নিজের রূপ গোপন করিয়া অন্যের রূপ ধারণ করিতে চ্যানীর মত পূর্ব্বে কেহই পারিতেন না। তিনি এখন মৃত; সম্প্রতি তাহার স্থলে ইতিমধ্যেই এমন একজন যুবকের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি দ্বিতীয় লন চ্যানী কিংবা ভারতীয় লন চ্যানী নামে আখ্যাত হইতে পারেন। ইহা তাহার পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। এই যুবকের নাম শ্রীযুক্ত এ, এস্, রামকুমার। ইনি ভারতীয় এবং ইহার বয়স মাত্র ২২ বৎসর। এই বয়সেই শ্রীযুক্ত রামকুমার রূপ-পরিবর্ত্তনে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, যাহা দেখিলে শুধু ভারতবাসী কেন ইউরোপীয় অভিনেতৃসম্প্রদায়ও মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছেন। লন চ্যানীর বিখ্যাত চিত্র "হাঞ্চব্যাক অব্ নোটারডেম" ইনি সম্পূর্ণভাবে নকল করিতে পারিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্বর্গীয় মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত মালব্যজী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, লালা লজপত রায়, মিঃ বলডুইন, ডগলাস ফেয়ার ফ্যাঙ্কস্ প্রভৃতির অবিকল আকার-প্রকারে অঙ্গ-ভঙ্গী দেখাইয়া ইনি সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছেন। রামকুমারের ২০ পাটী দন্ত আছে, তাহার সাহায্যেই তিনি রূপ-পরিবর্ত্তনে সমর্থ হন। শুধু যে এইটুকু প্রতিভাই রামকুমারের আছে তাহা নয়, এ পর্য্যন্ত তিনি বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া ১০টী ভাষা ও বহু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামকুমারের দক্ষতায় বাস্তবিকই মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। আশা করি, তিনি আরও উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন এবং ভারতীয় চিত্র-জগতে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিবেন। আমরা এই প্রতিভাবান্ যুবকের সম্বন্ধে নানা তথ্য চিত্রসহ ভবিষ্যতে পাঠকসমাজে জানাইবার আশায় রহিলাম।

গান্ধী-আরউইন দালান :—

সম্প্রতি মাদ্রাজের কুম্ভকোনম নামক স্থানে কাবেরী নদীর উপর একলক্ষ টাকা ব্যয়ে একটী বৃহৎ দালান নির্ম্মিত

হইয়াছে। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে গান্ধী-আরউইন দালান। দিল্লীতে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি মহাত্মা গন্ধী ও ভূতপূর্ব্ব বড়লাট বাহাদুর লর্ড আরউইনের মধ্যে

দিল্লীর চুক্তির নিদর্শনরূপে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইংরেজ ও ভারতীয়ের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের ও সদ্ভাবের চিহ্নস্বরূপ এই দালান ব্যবহৃত হইতে থাকিলে সুখের হইবে, নচেৎ অর্থব্যয় অপব্যয় হইবে।

পার্শী বিদুষী

কুমারী পিলু বেসাবেভালা একজন পার্শী যুবতী। সম্প্রতি

ইনি লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া 'মাষ্টার অব এডুকেশন' উপাধি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইনি বৃষ্টল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডিপ্লোমা অব এডুকেশন' পাইয়াছিলেন। লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়া 'মাষ্টার অব এডুকেশন' লাভ পার্শী রমণীর পক্ষে এই প্রথম।

আন্তর্জ্জাতিক নারী-সমিতি

জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক নারীসমিতির ভারতীয় প্রতিনিধি দুইজন। তাহাদের মধ্যে শ্রীমতী মায়া দাশ অন্যতম। মিসেস্ দাশ বঙ্গীয় মহিলা। ভারতবর্ষের ভিতর নারী-সংক্রান্ত

সমস্ত অনুষ্ঠানেই বাঙ্গলা দেশের রমণীকে অগ্রণী হইতে দেখা যায়। ইহা যে প্রকৃত গৌরবের বিষয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীঅজিত ঘোষ
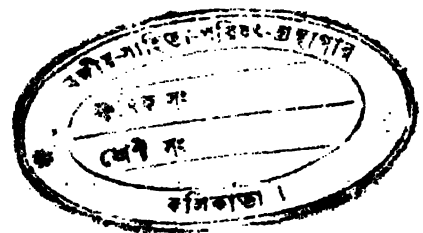
আলাপ আলোচনা

মহাত্মাজীর নিমন্ত্রণ-গ্রহণ ও বিলাত-যাত্রা :—

গত জানুয়ারীমাসে বিলাতে গোল টেবিল বৈঠকের শেষ অধিবেশন হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কার্য্য শেষ হয় নাই—না হইবার প্রথম ও প্রধান কারণ হইতেছে যাঁহাদিগকে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্য

বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে বড়লাট-ভবন হইতে ফিরিবার পথে মহাত্মাজী

আমন্ত্রিত করা হইয়াছিল তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রতিনিধি বলিয়া কোন কথা বলিতে পারেন না, তাঁহারা যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্তিগত হিসাবেই বলিয়াছিলেন। ভারতের কংগ্রেস পক্ষের লোককে বাদ দিয়া ভারত-সংক্রান্ত কোন আইন-কানুন গঠিত করিতে গেলে ভারতবাসীর অধিকাংশ লোকের যে তাহা মনঃপূত হইবে না বৈঠকের পরামর্শ-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বে তাহা বুঝেন নাই বা বুঝিলেও গ্রাহ্য করেন নাই। যাহা হউক পরিশেষে কর্ত্তৃপক্ষ আপনাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া কংগ্রেসপক্ষকে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, অনেক বাক্-বিতণ্ডা ও ভারতসরকারের সহিত আলোচনার পর কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি মহাত্মা গন্ধীজীকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রণ-গ্রহণ করিয়া বৈঠকে যোগদান করিতে পাঠাইয়াছেন।

* *

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই মহাত্মা গন্ধীজী বোম্বাই সহর হইতে "রাজপুতানা" জাহাজে ভারতের অগণিত সন্তান-সন্ততির মঙ্গল ইচ্ছা লইয়া গমন করেন। ভারতবাসী তাঁহার দিকে উদ্গ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। তাহাদের প্রাণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা কতদিনে কি ভাবে তিনি মিটাইতে পারিবেন; তবে একথাও ভারতবাসী ভালরূপেই জানে যে সংখ্যাধিক্যের জোরে তাঁহার মত ভাসিয়া গেলেও সেখানকার বিদ্বন্মণ্ডলী বুঝিতে পারিবে তাঁহার কি কুশাগ্র-বুদ্ধি, চিন্তার কি গভীরতা! সরলপ্রকৃতি উদারচেতা মহানুভব গন্ধীজীর মহানুভবতা কত উচ্চাঙ্গের। বাস্তবিকই সমগ্র ভারতের কল্যাণ যদি কাহারও ধ্যান ও ধারণায় বিষয়ীভূত হইয়া থাকে তবে তাহা একমাত্র মহাত্মাজীরই হইয়াছে। ভারতের ভিতর জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে যদি কোন লোক সমগ্র ভারতবাসীকে

বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে মহাত্মাজী শ্রীযুক্ত মালব্য ও শ্রীমতী নরোজিনী নাইডু

প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া থাকে, সকলের শুভ কামনা যদি কাহারও প্রার্থনায় মূর্ত্ত হইয়া থাকে তবে তাহা মহাত্মাজীরই। আমরা এ কথা বলিতেছি না যাঁহারা ভারত হইতে গিয়াছেন তাহারা ভারতের স্বার্থের দিকে অবহিত নন; তবে আমরা একথা বলিতে চাই অনেকেই সম্প্রদায় বা

জাতিধর্ম্মবর্ণের স্বার্থ রক্ষার জন্যই গিয়াছেন—সমগ্র ভারতকে প্রেমের চক্ষুতে দেখিতে পারিয়াছেন মাত্র একজন—মহাত্মা গন্ধীজী। এই ত্যাগবীর কৌপীনধারীর আপনার বলিবার কিছু নাই—সাম্প্রদায়িকতা বা জাতিবর্ণের সংকীর্ণ গণ্ডী ত্যাগ করিয়া তিনি সমগ্র ভারতের জন্য চিন্তা করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন—তাঁহার কথায় আমরাও বলি তিনি ভারতবাসীর ভিতর শতকরা পচানব্বই জনের সত্যই তিনি প্রতিনিধি।

* *

মহাত্মাজী যখন জাহাজে করিয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহার বালসুলভ স্বভাব দেখিয়া জাহাজের বালকবৃন্দ তাঁহাকে তাহাদের সাথী করিয়া লইল—তিনি তাহাদের সহিত খেলাধূলা করিতে লাগিলেন। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া জাহাজের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী যাত্রীগণের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ("লিড্ কাইণ্ড্লী লাইট্")—হে মঙ্গলশিখা আমাকে চারিদিকের ঘন অন্ধকারের আবরণের ভিতর দিয়া লইয়া চল—আমায় লইয়া চল। আজ আমি ঘর হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি—তুমি আমার পথপ্রদর্শক হও।

* *

জাহাজের যাত্রীদের ভিতর অনেকেরই সামুদ্রিক পীড়া

রাজপুতনা জাহাজে মহাত্মাজী ও কাপ্তেন জ্যাক

হইয়াছিল, কিন্তু মহাত্মার কিছুই হয় নাই। তিনি সমস্ত দিন নির্দ্ধারিত কার্য্য করিতেন, অবসর সময়ে জাহাজের কাপ্তেন তাহাকে জাহাজের অংশ বিশেষ ভালরূপে বুঝাইয়া যন্ত্রগুলির ব্যবহার দেখাইয়া দিয়াছিলেন। জানিবার ও শিখিবার প্রতি তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়া কাপ্তেন বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। মিশরের ভিতর দিয়া যাইবার সময় তিনি জগলুল পাশার বিধবা পত্নীর নিকট হইতে শুভ-কামনাসূচক পত্র পান; তারপর জাতীয় দলের সভাপতি নহুসপাশা জানাইলেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনার মহৎ আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ প্রাণের একাগ্রতা বলে আপনি যেন সিদ্ধিলাভ করেন।

* *

জাহাজ যখন সুয়েজ বন্দরে আসিয়া ভিড়িল, তখন দর্শনপ্রার্থী মিশরবাসীদিগকে তিনি বলিলেন, মহম্মদ ছিলেন জগতে শান্তি ধর্ম্মের প্রচারক। তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী-দের একমাত্র কর্ত্তব্য হইতেছে শান্তিস্থাপনের সহায়তা করা। আর এই মহৎকার্য্য কতকটা নির্ভর করিতেছে ভারতের স্বাধীনতা ও একতা স্থাপনের উপর। ভারত স্বাধীন না হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি আসিতে পারে না।

* *

জাহাজে বেতারে তাঁহার বন্ধুবর্গ বিলাতে তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে যে ভোজ-সভার আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাক যোগ দিতে অনুরোধ করেন। উত্তরে মহাত্মাজী জানান কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে এমন কি আমার মত বৃদ্ধের জন্মতিথি উৎসবে যোগদান করিবার আমার কোনরূপ ইচ্ছা নাই।

এডেনে যখন জাহাজ আসিল, তখন প্রবাসী ভারত সন্তানদের বিষণ্ণ ম্লান মুখ দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে গন্ধীজী তাঁহাদের নিকট হইতে জানিলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সভা-মণ্ডপে কংগ্রেস-নির্দ্দিষ্ট ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ধূলাপায়েই গন্ধীজী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দেখা করিয়া সমস্তই বুঝাইয়া দিলে অনুমতি পাইতে বিলম্ব হইল না। উত্তোলিত জাতীয় পতাকার নিম্নে দাঁড়াইয়া গন্ধীজী বলিলেন, এই পতাকাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভারতের কত লোক প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন—রমণীরা পর্য্যন্ত নির্য্যাতিত হইয়াছেন, অবিচলিত চিত্তে লাঠির আঘাত সহ্য করিয়াছেন। সেই জন্য ভারতবাসীর এমন কোন সভা আমি ভাবিতেই পারি না যেখানে না এই পতাকা উড্ডীন হইবে।

ফ্রান্সের মার্শেলিস বন্দরে যখন জাহাজ আসিয়া

পৌঁছিল তখন প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রও ফরাসী সংবাদিকেরা তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। সহাস্য বদনে তিনি সকলের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। পরিশেষে একজন কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করেন, যদি রাজার সহিত আপনাকে সাক্ষাৎ করিতে হয়, তাহা হইলে কি আপনি এই পোষাকেই যাইবেন। উত্তরে তিনি যাহা

মহাত্মাজী কাপ্তেন জ্যাকের নিকট হইতে দূরবীণ-ব্যাবহার শিক্ষা করিতেছেন

বহুবার বলিয়াছেন, তাহাই হাসিয়া বলেন—'দীন ভারতের দীনতম ব্যক্তি অন্য পোষাকে গিয়া রাজাকে অপমান করিতে পারে না—দরিদ্র ভারতের প্রতিনিধির যে বেশ হওয়া যুক্তিসঙ্গত আমি তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকি।

তারপর আসিল—কাষ্টমস্ ইনস্পেক্টার। তাঁহার জিজ্ঞাস্যের যথাযথ উত্তর দিবার পর তিনি গন্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেন আপনার কিছু বক্তব্য আছে।

হাসিয়া তিনি বলিলেন—আমি ভারতের এক দরিদ্র ভিক্ষু, আমার সামান্য মূল্যের সম্পত্তি মাত্র হইতেছে—ছয়টী চরকা, গোটাকতক বন্দীদের ব্যবহার্য্য ডিস, ছাগলের দুধের একটা বালতি, ছয় খানা হাতে কাটা সুতার খাদি, একখানা গামছা, আর আমার আত্ম-সম্মান।

১২ই সেপ্টেম্বর গন্ধীজী ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন। তখন প্রবলবেগেই বৃষ্টি পড়িতেছিল, তথাপি ভারতের—এই ত্যাগবীর ন্যায়নিষ্ঠ আত্ম-সমাহিত সর্ব্বজীবে দয়াপ্রবণ অহিংসামন্ত্রের রাজনৈতিক সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য বিরাট্ জনতা হইয়াছিল। ইংলণ্ডের বহু সম্ভ্রান্তব্যক্তি তাঁহাকে অভ্যর্থিত করেন। সভার পক্ষ হইতে মিঃ হাউসম্যান তাঁহাকে মাল্যপ্রদান করিয়া বলেন, ইহা অপেক্ষা আমার জীবনে গৌরবজনক আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই।

গোল টেবিল বৈঠক ও মহাত্মা গন্ধীজী :—

প্রথমকার টোল টেবিল বৈঠকে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল তাহা এবার আবার পুনরালোচিত হয়; কারণ বৈঠকের যুক্ত-রাষ্ট্র সব কমিটিতে গন্ধীজী দুই দিন যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন কংগ্রেস সমগ্র ভারতের মুখপাত্র, আর তিনি আসিয়াছেন কংগ্রেসের প্রতিনিধি-রূপে এবং কংগ্রেসের দাবী হইতেছে পূর্ণ স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশীদারত্ব। প্রথম বক্তৃতাতেই তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে আমি যে স্বাধীনতা চাহিতেছি সে স্বাধীনতা ভিখারীর দানে নাই—প্রাণের টানে আছে। অন্যদেশের সারাংশ শোষণ করিবার জন্য তিনি ভারতের স্বাধীনতা চাহিতেছেন না—তিনি জগতের মঙ্গলের জন্যই ভারতের

কিংস্‌লি হল

স্বাধীনতা চাহিতেছেন। নিরুপদ্রব অহিংস উপায়ে তিনি স্বাধীনতার কামনা করেন। অহিংস- উপায়ে দেশের মঙ্গল সাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন, যে ভাবে এই নূতন বৈঠকের সদস্য নির্ব্বাচন হইয়াছে, তাহাতে এই বৈঠকের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা হয় নাই। মূক ভারতের যদি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবার সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে আমাদের মধ্যে অনেকেই নির্ব্বাচিত হইতে পারিতেন না। তার পর তিনি বলেন যে পদ্ধতিতে বৈঠকের কার্য্য-কলাপ চলিতেছে তাহাতে আসল কথার আলোচনা না হইয়া কেবল বাজে কথার আলোচনা হইতেছে। যসরকার তদিন তাঁহাদের মতলব কি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত না করেন, ততক্ষণ আমরা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিব না।

কমন্স সভাগৃহে গন্ধীজীর বক্তৃতা :—

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে কমন্স সভার এক প্রশস্ত সভাগৃহে গন্ধীজী যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি বলেন,—"আপনারা আমাকে জেলে বন্দী করিয়া রাখুন তাহাও ভাল, কিন্তু ক্রীতদাসরূপে আমি আপনাদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারিব না। আপনারা যে বিধি প্রচলিত করিতে চান তাহাতে রাজস্বের শতকরা ৮০ ভাগ ছাড়িয়া দিতে হইবে শাসনযন্ত্র চালাইবার জন্য, আর কেবলমাত্র ২০ ভাগ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হাঁসপাতাল, রাজপথ প্রভৃতি বাবদে ব্যয় করিতে হইবে। যে প্রকার স্বাধীনতা লাভ করিলে ৫ কিংবা ১০ বছরের পর ভারত-সরকারকে দেউলিয়া হইয়া যাইতে হইবে, আমি সে প্রকার স্বাধীনতা স্পর্শ না করিয়া বরং বাধ্য হইয়া পরাধীন অবস্থায় থাকিব এবং আপনাকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিব। কোন আত্মসম্মানজ্ঞান-বিশিষ্ট ভারতবাসীই এইরূপ স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে চাহিবেন না।"

শরৎচন্দ্রের ষট্পঞ্চাশত জন্মোৎসব :—

বিগত ২রা আশ্বিন শনিবার স্থানীয় বেতার কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁর ষট্পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মানকল্পে 'শরৎ-শর্ব্বরী'র আয়োজন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শরৎচন্দ্র স্বীয় উপস্থিতির দ্বারা বেতারের আসরকে ধন্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বেতারের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রভৃতি স্বরচিত গদ্য এবং শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা স্বরচিত কবিতাবলীর দ্বারা শরৎচন্দ্রের প্রতি ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের নিকট আমরা শরৎচন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবন ও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের জন্য আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি।

সংস্কৃত কলেজে রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনা :—

গত ৩রা আশ্বিন রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় সংস্কৃত কলেজ-ভবনে কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবর্গ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে "কবি-সার্ব্বভৌম" উপাধি দ্বারা অভিনন্দিত করেন। সভায় বহু বিদ্বজ্জন ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কবিগুরুকে অধ্যাপকবর্গের পক্ষ হইতে যে অভ্যর্থনা করেন তাহার একস্থলে বলেন—"সংস্কৃত কলেজ সমস্ত টোল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান লইয়া দেশে সংস্কৃতের চর্চ্চা বজায় রাখিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে এমন কি জয়পুর বিকানীর হইতেও এখানে সকলে সংস্কৃত পরীক্ষা দিতে আসে, আপনি শুধু কবি নহেন, সংস্কৃত ভাষাতেও আপনার বুৎপত্তি গভীর। আমাদের এই সামান্য 'কবি সার্ব্বভৌম' উপাধি আপনাকে দিতেছি, আপনার মহিমায় তাহা গৌরবান্বিত করিয়া লইবেন।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য সুললিত সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দিয়া উপাধি পত্র প্রদান করেন।

উত্তরে কবিবর বলিয়াছেন—আপনারা জানেন আমার দেহ দুর্ব্বল ও ক্লান্ত, আমার মন নানা চিন্তায় ব্যাকুল। সেইজন্যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দির থেকে যে সম্মান অভিবাদন আমি পেলাম তার যথাযোগ্য প্রত্যভিবাদন করতে পারি এমন শক্তি আমার নাই। সেইজন্যে আমি ক্ষমা চাই। এই বিদ্যামন্দির থেকে সম্মানলাভের কল্পনা কোনদিন আমি করি নি, এ আমার আশার অতীত। একদিন ছিল যখন পণ্ডিতের সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের বিরোধ ছিল। এর প্রতি কিছু অবজ্ঞাও তখন করা হয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃতের আলয় থেকে বাঙ্গলা তখন যথোচিত সম্মান পায় নি। তার কারণও হয়ত ছিল। তখন বাঙ্গলা ছিল অপরিণত, সাহিত্যের অনুপযোগী। এর দৈন্যকে

উপেক্ষা করা অন্যায় ছিল না। কিন্তু যে শক্তি তখন এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে শক্তি এ কোথা থেকে পেয়েছে? সংস্কৃতরূপ অমৃতের উৎস থেকে। সেই কারণেই তার পরিণতিও চলেছে কোথায় বাধা পায় নি। বাইরে থেকে যে সকল বিদ্যালয় আমরা করেছি তা রক্ষে করা সম্ভব হ'ল, কারণ বাঙ্গালার দৈন্য ও অভাব আজ আর বেশী নেই। পারিভাষিকের কিছু দারিদ্র্যও আছে বটে কিন্তু সে দারিদ্র্যও পূর্ণ করবার উপায় আছে সংস্কৃতের মধ্যে। আমাকে উপলক্ষ্য করে আজ বাঙ্গলা ভাষাকে আপনারা সে সম্মান দিলেন তাতে আমার পরমানন্দ।

একদিন ছিল ভারতবর্ষে ভাষা-বোধ বলে একটা প্রতিভা ছিল। ভারতবর্ষ পাণিনীর জন্মভূমি। তখনকার দিনে প্রাকৃতকে যাঁরা বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন পরম পণ্ডিত। একটা আশ্চর্য্য, এই প্রাকৃতের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা ছিল না। সংস্কৃত-ব্যাকরণের চাপে তাঁরা প্রাকৃতকে বিলুপ্ত করেন নি। তার কারণ, ভাষা-সম্বন্ধে তাঁদের ছিল আশ্চর্য্য বোধশক্তি। আমরা আজকাল সংস্কৃত শিখে বাঙ্গলা ভাষাকে অস্বীকার করি, তার ত্রুটী দেখি ও নিন্দা করি। আমরা ভুলে যাই যে বাঙ্গলার একটি স্বকীয়তা আছে। সে নিজের মধ্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠ হবে। অবশ্য সংস্কৃত থেকেই সে শব্দসম্পদ পাবে। কিন্তু তার নিজের দেহের প্রকৃতি সংস্কৃত দ্বারা আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা অন্যায় হবে। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতরা কখনও সে চেষ্টা করেন নি। আমি সেকালের পণ্ডিতদের বাঙ্গালায় লেখা অনেক পুরাণ পুঁথি দেখেছি; তার বানান তাঁরা বাঙ্গালা ভাষাকে প্রাকৃত জেনেই করেছিলেন। তাঁরা অশিক্ষিত ছিলেন, তাঁদের ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ছিল না, একথা বলা চলবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও দেখেছি। এখনকার পণ্ডিতদের মত ষত্ব ণত্ব নিয়ে তাঁরা গোলমাল করেন নি। তা করলে "শ্রবণ" থেকে "শোনা" কখনই তাঁরা করতেন না। "কাণ", "পাণ", "চুণ" এসবই তাঁরা "ন" লিখতেন। এখনকার পণ্ডিতরা বাঙ্গলার উপর সংস্কৃত আরোপ করবার জন্যে "ন" এর মাত্রা ভেদ করে "ণ" এর জয়-পতাকা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাতে ভাষা পীড়িত হয়। সেটা আমাদের চিন্তা প্রণালীর বিরোধী। যাঁরা মনে করছেন বাইরে থেকে বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের অনুগামী করে শুদ্ধি দান করবেন, তাঁরা সেই দোষ করছেন যা ভারতে ছিল না। এ দোষ পশ্চিমের দোষ ইংরাজীতে শব্দ ধ্বনির অনুযায়ী নয় ল্যাটিন ও গ্রীক থেকে উদ্ভূত শব্দের বানানের সঙ্গে ধ্বনির বিরোধ হইলেও তারা তা রক্ষা করেন এতদ্বারা তাঁরা ইতিহাসকে রক্ষা করেছেন।

কিন্তু কেবলমাত্র ইতিহাসকে রক্ষা করতে গেলে ডারউইন-কথিত আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের যে জিনিবটী খসে গেছে সেটীকে আবার সংযোজিত করতে হয়।

আজকার দিনে সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বাঙ্গালা ভাষাকে যদি বাহুল্য বলে স্বীকার করেন তবে আমরা ধন্য হব। সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালার নাড়ীর যোগ, সংস্কৃতের মধ্যেই তার আভিজাত্য ভাষা ও সাহিত্য থেকে তপস্যা ও আভিজাত্য। যদি চলে যায়, বাঙ্গলা তার একান্ত নাড়ীর যোগ যদি ভুলে — তবে সে ঐশ্বর্য্য থেকে ভ্রষ্ট হবে, তার দীনতার অন্ত থাকবে না। বাঙ্গালা লিখতে সংস্কৃত প্রত্যয়, উপসর্গ প্রভৃতির সাহায্য না পেলে এক পা'ও চলা অসম্ভব।

বাঙ্গালায় লিখতে গিয়ে আমাকে প্রতিপদে নতুন কথা আবিষ্কার করতে হয়েছে। তার কারণ বাঙ্গলা ভাষা ঘরের ভাষা ছিল। এর মধ্যে কোন সার্ব্বভৌমিক মূল্য প্রকাশ পায় নি। সেজন্য এর দৈন্য বা অভাব রয়ে গেছে। সে দৈন্য পূরণের সুযোগ আমাদের দেশেই আছে। জাপানী ভাষার মধ্যে অনুরূপ একটী উদাহরণ পাওয়া যায়। জাপানীদের ভাষা এমনভাবে রচনা সম্ভব নয় যাতে তত্ত্ব ঘটিত সকল অর্থ প্রকাশ করতে পারা যায়। জাপানীর সঙ্গে সেজন্যে চীনে ভাষাও রয়ে গেছে। যুদ্ধের দ্বারা সেদিনও জাপান চীনকে অসম্মান করেছে, অপমান করেছে। কিন্তু ভাষার মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে, সে চীনকে সম্মান করতে বাধ্য। তাই জাপানী অক্ষরের মধ্যে চৈনিক অক্ষরও রয়ে গেছে। ঘরের কথা জাপানী ভাষায় চলে হয়ত, কিন্তু চীনের ভাষা না জানলে প্রকাশ ও উপলব্ধির দিক থেকে কোন রচনা অসম্ভব। বাঙ্গলায় সেটাই চলে এসেছে। সংস্কৃতের অতিরিক্ত গুরুভার থেকে বাঙ্গালাকে আমি উদ্ধার করতে পেরেছি বাঙ্গালাকে সংস্কৃত ভাষার দানসত্র ও অন্নসত্র থেকে দূরে নিয়ে এলেই অপকার হবে, সেটা ভুল। আজকার দিনে ইউরোপীয় ভাষা

ও সাহিত্য না জানলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হবে না। ভাষার দিক থেকে ও নতুন সঙ্গীত ও ধ্বনিমাহাত্ম্যের জন্য এদের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিন্দনীয়।

কিন্তু তবুও সংস্কৃতের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের যাতে পরিচয় হয় তা আমি চাই। আমাদের ছাত্ররা ভারগ্রস্ত স্বীকার করি, কিন্তু সে অনিবার্য্য; কিন্তু যা' অনিবার্য্য তার জন্যে অন্যভার লাঘব করে জাতিকে আত্মপ্রকাশ করবার শক্তি থেকে বঞ্চিত না করে।

আমাকে যে উপাধিতে আপনারা ভূষিত করিলেন, তার জন্যে আবার আপনাদের প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কিন্তু এও বলি যে, অযোগ্য পাত্রে যদি সম্মান অর্পিত হয়ে থাকে সে দায়িত্ব আপনাদের। আমার কিছুই গোপন নাই। সংস্কৃত ভাষায় আমার অধিকার সঙ্কীর্ণ তথাপি যখন আপনারা আমাকে এই পুরস্কার দিলেন, এর জন্যে কাউকে যদি নিন্দাভাগী হতে হয় ত সে আপনাদের।

পরলোকে কেশবচন্দ্র :-

বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্ন কালে সিমলার রাষ্ট্রীয় পরিষদ-গৃহের বারান্দায় অকস্মাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র রায় পরলোক গমন করিয়াছেন। সে দিন রাষ্ট্রীয় পরিষদে সংবাদপত্রের ক্ষমতা-সঙ্কোচের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে একটা প্রস্তাব উপস্থিত হইবার কথা থাকে। শরীরের অসুস্থতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া এই বিলের প্রতিবাদ করিবার জন্যই তিনি পরিষদে উপস্থিত হইাছিলেন। প্রস্তাব উপস্থিত হইবার পুর্ব্বেই অসুস্থ বোধ করিয়া বারান্দায় আসেন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে নাই। সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার ন্যায় সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক ব্যক্তি বড়ই দুর্ল্লভ, লাভ-লোকসানের দিকে না চাহিয়া, বড়-লোক বা সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়া তিনি বিবেক বলে যাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বুঝিতেন তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যক্ত করিতেন। সামান্য অবস্থা হইতে তিনি উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠিয়াছিলেন। সামান্য ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের কেরাণীগিরি চাকুরী হইতে এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রতিষ্টাতা হওয়া বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তিনি যেরূপ জন-প্রিয় ছিলেন সেইরূপ সরকারও গুণবত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। আমারা তাঁহার বিয়োগে ব্যথিত হইয়াছি।

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ :—

গত ৯ই সেপ্টেম্বর আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কথা-শিল্পী অনাবিল হাস্য-কৌতুক রচনায় প্রথিতযশঃ ও সঙ্গীত-বিশারদ শ্রদ্ধেয় রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুরকে হারাইয়াছি। তাঁহার ন্যায় অমায়িক, সরল প্রকৃতির সেকালের লোক প্রায় একে একে সকলেই চলিয়া যাইতেছেন, উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়াও তিনি অবসরমত "মানসী ও মর্ম্মবাণী", "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প লিখিয়া বিমল আনন্দধারা দান করিতেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল সাহিত্য ও সঙ্গীত-সাধনায় কাটাইয়া দিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় শরীরের অসুস্থতা-নিবন্ধন তাহার সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। প্রত্যেক বঙ্গভাষাভাষীরাই তাঁহার বিয়োগে সন্তপ্ত।

ত্রুটীস্বীকার :—

অনিবার্য্য কারণে আমরা যথাসময়ে আশ্বিন সংখ্যা প্রকাশ করিতে পারি নাই, তজ্জন্য ত্রুটিস্বীকার করিতেছি। শীঘ্রই কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ যুগ্মসংখ্যা করিয়া বাহির করিব, তৎপর পৌষসংখ্যা হইতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত করিয়া গ্রাহক-অনুগ্রাহকবর্গের তৃপ্তি-সাধনে যত্নবান হইব।

বিশ্ব-জগৎ

মিঃ স্মিথের গাড়ী :—

এখানে আমরা একটী নূতন ধরণের মোটার গাড়ীর ছবি দিলাম। ইহা স্মিথ নামক অষ্ট্রেলিয়ার একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইনি জগতের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী মোটার-চালকরূপে পরিচিত হইতে

চান। স্যর ম্যালকম ক্যাম্বেল ঘণ্টায় ২৪৫ মাইল অতিক্রম করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। স্মিথ [illegible] অপেক্ষা দ্রুত যাইবেন আশা করেন।

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হোটেল :—

আমরা যে ছবিটী দিয়ে দিলাম, সেটী আমেরিকার চিকাগো শহরের [illegible]
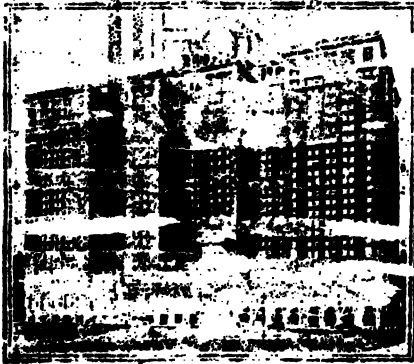
সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হোটেল। সম্প্রতি ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে তিন হাজার ঘর ও গলফ্ খেলিবার সুদৃশ্য সুবৃহৎ স্থান আছে।

পুলিশের হাতে বেতার :—

আমরা প্রায়ই বেতার-সম্বন্ধীয় অনেক প্রকার নূতন নূতন আবিষ্কার দেখিতে পাই। এতৎসংলগ্ন নূতন উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে কেন্দ্রের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাওয়ার

এই যন্ত্রটী সর্ব্বদাই পুলিশের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে থাকে। ছবিতে লণ্ডনের মিঃ এচ্, ডব্লিউ, আডিয়ে বোতাম টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

ক্ষুধানাশী ঔষধ :—

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্ল ষ্টেজকান ডিমুট্রেন নামক একপ্রকার ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে খাদ্যের সারবস্তু (ভিটামিন) এমন সূক্ষ্মভাবে ঘনীভূত আছে যে, ছয় আউন্স পরিমিত ডিমুট্রেণ বুক, পিঠ অথবা পায়ের চামড়ার উপর প্রলেপ দিলেই একজনের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। তাহার আর কিছু খাইবার প্রয়োজন হয় না। যাহারা অরুচি ও অজীর্ণ-রোগে ভোগেন, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

—শ্রীশৌরীন ঘোষ

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক বিশ্বভাণ্ডার প্রেস, ২১৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত
[illegible] পুষ্প-কার্য্যালয়, ৩১ তেলিপাড়া লেন হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত।